

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KIMLGK 2007	Place of Publication
Collection KIMLGK	Publisher :
Title ১২৬২	Size 6"x9" 15.24 x 22.86 c.m.
Vol. & Number ১২৬১, ৭/১-১২	Year of Publication : ১৫১৫ ১৬২০ - ১৫১৬ ১৬২১
	Condition : Brittle : <input checked="" type="checkbox"/> Good
Editor	Remarks :

C D Roll No. KIMLGK

কলিকাতা পিটেল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৬/এম. ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

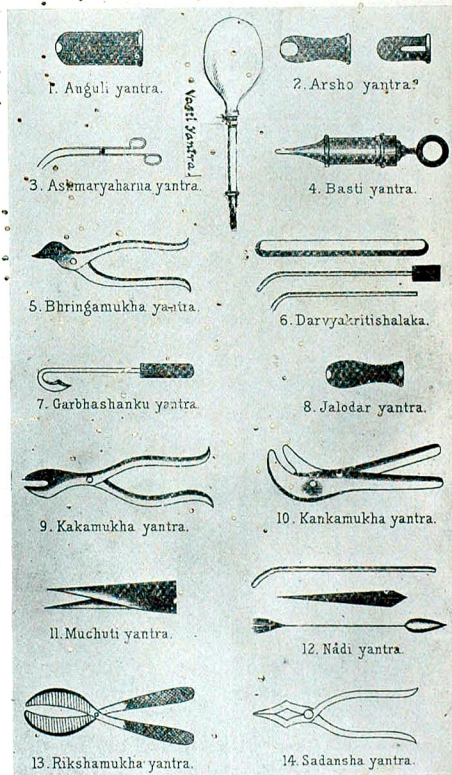
দ্বিধিক্সী সাহিত্য-বীর

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



"বিরেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অজেন্দ্রনাথ সকলেই একভাবে ভাবুক, একই মনের ভরা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ বিজয়ের ইহারাষ্ট্র প্রথম সেনাপতি।"

স্বস্তোত্তর কতিপয় অস্ত্রের চিত্র-নমুনা



সভা বল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা
বল—সর্বত্রই ভারতবাসী এখন অধিকৃতর
অধিকারের দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।
ভারতীয় কাজকর্মে ভারতবাসী মন্ত্রী, মুচিব,
রাজকর্মচারী, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, পরিচালক
ইত্যাদি নিয়োগের জন্ত আজকাল ক্রমশঃ
ব্যাপী জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে।
এই আকাঙ্ক্ষার সবিশেষ বিকাশ স্বদেশী
আন্দোলনেই সাধিত হইয়াছে।

জ্ঞানবিনের ভিতরই আন্দোলন বদ্ধ হইল
বটে, কিন্তু স্বাধীনশাসনকে আকাঙ্ক্ষা রহিয়া
গিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গবিভাগসম্পর্কে বাদ্দালী
জাতির বিজয়লাভে ভারতের সর্বত্র এই
আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়াছে। কোনক্রথা কবিত্ত
আন্দোলনকারী বা ছদ্মজন স্বদেশী বুদ্ধি
লাপ্যগার মধ্যে ইহা আর গভীর নয়—
ইহা এখন দেশের জনবায়ুর সঙ্গে মিশিয়া
রহিয়াছে। অধিকন্তু দেশবাসিগণ গবর্নমেন্টের
সমালোচনা মাঝেই অবস্থান রাখিয়া স্বাধীনতা
কর্মের নানা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছেন।

তারপর কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। এদিকেও
যুগে যুগে স্বার্থভাগ, কষ্ট-স্বীকার, গোলমাল, হুজুগ
হইয়াছে। কলকারখানা-প্রতিষ্ঠা, বক্তৃতা,
প্রচারকার্য, বিশেষ-গমন, শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি
কতদিকে কত কার্য হইল। তাহার অনেক
গুলিরই ফলও স্থায়িত্ব হয় নাই। কিন্তু যখন
হইতে কেবলমাত্র উচ্চ-সম্প্রদায়ের কর্মরাশির
বার্তা কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধিতে পারিলাম,
তখন হইতেই 'স্বদেশী'র নাম-মাঝে আনন্দ-
প্রকাশ বন্ধ করিয়া গভীরভাবে ভবিষ্যতের
জন্ত চিন্তিত হইলাম। বিফলতার অভিজ্ঞতা
লাভ হইল, চোখ ফুটিতে আরম্ভ করিল।
এই অবস্থা আমাদের গত ২০ বৎসর হইতে
আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্ত স্বদেশী আন্দোলনের

প্রথম যুগ চলিয়া গিয়াছে—আমরা বলিতে
বাধ্য। এখন স্বদেশীর জন্মোৎসব এই আগষ্ট
হয় না। 'স্বদেশী মেলা' যে কোন তিথিতেই
অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সেই দিন-ক্ষণের প্রতি
স্মৃতি করিয়া আদিয়াছে। এখন আমরা
'স্বদেশী' আন্দোলনে পাণ্ডাগিরি না করিষাও
স্বদেশী। দেশীয় শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়ে
উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এখন আমাদের হৃদয়ে
বদ্ধমূল।

স্বদেশী আন্দোলনের চতুর্থ স্তম্ভ—জাতীয়
শিক্ষা। মাতৃভাষায় সকল শিক্ষা, অল্প বয়স
হইতে শিল্পশিক্ষা, স্বদেশীয় লোকের তত্ত্বাবধা
নয় শিক্ষার পরিচালনা, শিক্ষাবিত্তারের জন্ত
স্বার্থভাগ ও জীবনোৎসর্গ ইত্যাদি আদর্শ
লইয়া সমগ্র বঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রে ও
অন্ধ্রদেশে একটা প্রচেষ্টা হইয়াছিল।
তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা স্মরণীয়
প্রদান। কিন্তু যে উচ্চ স্তরে এই স্বাধীন-
শিক্ষার ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হইল, তাহা
দেশের জনসাধারণ হস্ত করিতে পারিল না।
শেষ দুই এক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল—
জাতীয়শিক্ষার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক
শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত তাহার দান তুলিয়া
লইলেন, এবং সেদিন জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের
সভাপতি ডাক্তার রামবিহারী ঘোষও পুরাপুরি
স্বাধীন-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া
অগ্রজ অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর
হইয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কি জাতীয়
শিক্ষার আদর্শ রেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে?
তাহা নহে, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা-প্রদানের
ব্যবস্থা ভারতবাসীর চিন্তায় আদর্শরূপে গৃহীত
হইয়াছে। শিল্পশিক্ষার আয়োজনের জন্ত
সকলেই ব্যস্ত। বিজ্ঞান-শিক্ষাকে কার্যকরী
করিবার ইচ্ছা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই পোষণ

করিতেছেন। হিন্দুসাহিত্য-প্রাচর এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির উদ্ধার-সাধন সমগ্র সমাজেই এখন আদৃত।

কেবল জাতীয় শিক্ষার গভীর মধ্যেই নহে, এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া রাজপুরুষ ও জন-সাধারণ নানা স্থানে নানা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছেন। তাহার উপর, বিদ্যালয়ের পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন, নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গঠন প্রভৃতি ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় এবং স্বায়ত্ত্ববোধের আকাঙ্ক্ষা দেশবাসীর মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-বর্জ্যব্যাপারে ও মহারাষ্ট্রের ফাওর্গন কলেজের অধ্যাপকগণের স্বাধীনতাশাসনিক সরকারী আদেশের তীব্র প্রতিবাদে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, গুরুত্বের গুরুত্ব, হিন্দুস্থানের প্রেমমন্ডা-বিদ্যালয়, আন্ধ্রপ্রদেশের কলাশালা প্রভৃতি খাঁটি স্বায়ত্ত্ব-প্রতিষ্ঠানগুলি, এবং ফোলপুর, পুণা, বরিশাল, দৌলতপুর, পাচাগা ইত্যাদি কথঞ্চিৎ স্বাধীন শিক্ষালয়গুলির প্রতি সকলের মধ্যেই দৃষ্টি পড়িয়াছে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, স্বায়ত্ত্বশাসন ও শিল্পের হায শিক্ষাব্যাপারেও লোকের অজ্ঞান আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া কিছু নরম স্বরে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেদিন হইতে চড়া হ্রদের পরিবর্তে সমগ্র সমাজ একটু নরম ভাবে অগ্রসর হইল, যেদিন হইতে এই আগন্ত, ১৯০৬ অক্টোবর, জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদির মায়া কিছু কিছু কাটিল, সেইদিন হইতে স্বদেশীয় প্রথম যুগ শেষ হইল, এবং দ্বিতীয় যুগের

জন্ম পথ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সন্ধিসময়ে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রবল ধারা দুইটি কথঞ্চিৎ পুরাতন আন্দোলনের সম্মিলনে পুষ্টিতে নিয়োজিত হইল—(১) বর্ধ-ও-সমাক-সেবার আন্দোলন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশন উনবিংশ শতাব্দী হইতেই কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু ১৯০৬-১১ সাল হইতেই অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগের অবসানকালে ইহাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠানভা। বদে ত্যাগবর্ধ জাতীয়শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকল্পেই সমগ্রস্থ আত্মপ্রকাশ করে। ধনবানগণের অর্থদান এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিদ্যাদানের জন্ম জীবনোৎসর্গ দ্বারা জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন বাঙ্গালার হোলার জেলায় প্রসার লাভ করে। এই বিদ্যালয়সমূহের পরিচালক, ছাত্র ও শিক্ষকগণের নেতৃত্বে দেশীয় সেবাধর্মের কর্ম আরম্ভ হয়। অর্ধেক-যোগে এবং স্বদেশী আন্দোলনের অজ্ঞাত অহুতানেও এই সেবাপরোপকারধর্মের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন চারি পাচ বৎসরের কণ্ঠাভাসে বঙ্গসমাজে স্বার্থভ্যাগ, পরোপকার ও কর্তব্যকারের প্রযুক্তি স্থবিকৃত ও খুগভীর হইল তখন বাঙ্গালার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতি বাঙ্গালীর বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। গত দুই তিন বৎসরের ভিতর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশন বাঙ্গালীর জাতীয় বর্ধ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

(২) সাহিত্যের আন্দোলন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও উনবিংশ শতাব্দী হইতেই কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবেই ইহাদের কার্য্যের প্রকৃত বিকাশ ও বিস্তার সাধিত হইয়াছে। স্বদেশীয় প্রভাবে বাঙ্গালার একটা স্বাধীন চিন্তা আসিয়াছে, এবং দেশের অতীত ও বর্তমান ভাল করিয়া

বুঝিবার প্রযুক্তি জাগিয়াছে। অধিকন্তু জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ, শিক্ষাব্যাপারিক মন্ত্রে-ভাবকে প্রথম স্থান এবং ইংরাজী ভাষাকে দ্বিতীয় আসন প্রদান করিয়া বাঙ্গালী-সাহিত্যের স্বতন্ত্রতা করিলেন। নানা কারণে সাহিত্য-সমসারের উচ্চ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-পরিষোৎসাহকর আবির্ভাব হইয়াছে। ফলতঃ এখন বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্রাট, দুর্দান্ত বা মহাবীর পদবাচ্য এক দ্বিগুণে কেহই নাই—আর এক হিসাবে অনেকেরই জ্ঞানে। হিন্দুসাহিত্য এখন বঙ্গীয়-জনসাধারণের মনোদ্রব, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব ও প্রতিনির্ধারক।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ চলিয়া গিয়াছে—সেই যুগের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা এখন আর আমাদের মধ্যে উদ্ভূত করা যায় না। এই যুগের প্রভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্র মতনানি গঠিত হইয়াই হইয়াছে। এখন আমরা নূতন প্রভাবে অক্ষোভ করিতেছিলাম। আমাদের বিবাসন-দামোদরের কথা হইতে আমাদের দ্বিতীয় যুগ পরিকা-রূপে আরম্ভ হইল। এই যুগেই আমাদের সন্ধিকালের শেষ ঘটনা। সমগ্র জাতির ভিতর একটা বিশেষ মাড়া দিবার জন্মই করুদেবের এই তাওব।

এই আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, ১৯০৬ হইতে ১৯১০ এই পাঁচ বৎসর 'স্বদেশী'র প্রথম যুগ। যে সকল অহুতান অবলম্বন করিয়া এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বদেশী আন্দোলন জয়গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে সেই সকল অহুতান ও প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। প্রধানতঃ সেই সকলের সাহায্যেই লোকের স্বদেশী প্রযুক্তি উদ্ভূত হইত। ইহাদের সঙ্গে সকলের একটা মায়ার বন্ধনও ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ১৯১১

হইতে ১৯১৩ এই আড়াইবৎসর 'স্বদেশী'র দ্বিতীয় যুগের পূর্ববর্তী সন্ধিসময়। এই সময়ের মধ্যে প্রথমযুগের অহুতান প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু শ্রুতিবল ও ক্ষীণ হইল। স্থানে স্থানে বিফলতা দেখা দিল। এই শিথিলতা, ক্ষীণতা ও বিফলতায় আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশবাসী সংশয় উপস্থিত হইল—লোকের মনে নৈরাশ্র্য আসিল। নৈরাশ্র্য আসিল বটে, কিন্তু একেবারে অবলম্বন করিল না। নূতন অস্ত্রাচার উপযোগী ব্যবস্থা করিবার জন্ম অনেকেরই অগ্রসর হইলেন, অনেক নূতন লোক কর্মে নামিলেন। চড়া হ্রদ পরিভ্যাগ করিয়া, বাহা টিকিবে বাহা ভবিষ্যতে জন-সাধারণ সহজে ব্রুতিতে ও ধরিতে পারিবে, সেই দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। লোকের চিত্ত সংযত হইতে লাগিল, নিজ নিজ চরিত্র-বিশ্লেষণ, দোষ-নিবারণ, সার্থকতার উপায়-উদ্ভাবন ইত্যাদি শক্তি সমাজে কাজ করিতে লাগিল। প্রথম যুগের অহুতান-প্রতিষ্ঠানের গভীর মধ্যেই আর 'স্বদেশী', 'স্বাধীনতা', 'জাতীয় শিক্ষা' বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট 'স্বদেশী' নাম। সেই সকল অহুতান-প্রতিষ্ঠান দ্বাপাইয়া উঠিয়া ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রচার, সেবাধর্মের প্রচার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠা, দিল্লীতে রাজধানী-প্রবর্তন, বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জয়লাভ ইত্যাদি কতিপয় নূতন শক্তি আসিয়া সমাজে দ্বিতীয় যুগের স্বরূপাত করিল। তাহারই শেষ নির্দশন দামোদর-বজায় বঙ্গবাসীর কার্য্যতৎপরতা। এখন হইতে দ্বিতীয় যুগের নব নব কার্য্য দেখিতে পাইব।

৫। স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠালাভ, বঙ্গমাতার মর্যাদা দি, বঙ্গভাষাভাষীর ঐক্যবান্ধন, ভারতনাথ-রাসবিহারীর দান এবং লামোদরের বন্ধা, এই কয়েকটি নতুন ঘটনা গত দুই-তিন বৎসরের বিশেষ লক্ষণ। এই সকল কার্যফলে যে যুগ আরম্ভ হইল তাহার লক্ষণগুলি নিয়ে বিবৃত হইতেছে :—

(১) বাঙ্গালীর সাহিত্যে বিজ্ঞান-বিভাগ উদ্ভূত লাভ করিবে। প্রথম আদি বৎসরে বাঙ্গালায় ইতিহাস-চর্চার ভিত্তি গভীর ও বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গের ঐতিহাসিক-সাহিত্য-সম্বন্ধে প্রথম আর কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা যুগপৎ জাগরিত হইয়াছে। এজন্য বঙ্গের ইতিহাস-চর্চা বল-বতী। কিন্তু জনসাধারণের নৈদৈমিক জীবনে ব্যবসায়িক-বিজ্ঞানাদির প্রভাব কম, এজন্য বৈজ্ঞানিক-সাহিত্য এখনও অল্প। বাহ্যে হউক সাময়িক লক্ষণগুলি দেখিয়া আশা হইতেছে রুপি, শিল্প, ব্যবসায়, রাণিঞ্জা, আকর-তত্ত্ব, রসায়ন, বায়ুতত্ত্ব, ওষধপ্রস্তুতকরণ, ইত্যাদি পদার্থবিজ্ঞানের মানবিকতা এখন হইতে বিশেষভাবে বঙ্গসাহিত্যে মর্যাদা লাভ করিবে। বাঙ্গালী লেখক ও সাক্ষিতগণ পদার্থবিজ্ঞানের বিজ্ঞানবলী লইয়া অহমস্বাদন, গবেষণা, অন্বেষণ, আবিষ্কার, প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি-প্রণয়ন, সমালোচনা প্রভৃতি কার্যে বিশেষরূপে মনোযোগী হইবেন।

উক্ত অঙ্গের দর্শন-সাহিত্যেও আমাদের যথেষ্ট অভাব আছে বটে—কিন্তু তাহার অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার আশা নাই।

জীবনের গতি-নির্ধারণ এবং কর্তব্যনির্দেশ করিবার জন্তই দর্শনের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর লক্ষ্য ও কর্তব্য নূতনভাবে বুঝাইবার সময় শীঘ্র আর আসিবে না। কেবল বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র ভারতেরই চরম আদর্শ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে—সকলেই শের-লক্কার সন্ধান পাইয়াছেন। কালাকেও নুতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে রামমোহন-প্রবর্তিত চিন্তাপদ্ধতিচারী সকল প্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন, বেদান্ত ও পদার্থবিদ্যার সমন্বয়-সাধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার পরিসমাপ্তি বা শেষ অধ্যায় বা চরম synthesis হইয়াছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত বিশদশতাব্দীর যুগে।

এই কর্তব্যপ্রদর্শক synthesis এর বা সমন্বয়-সাধনের, অর্থাৎ এই বিশদশতাব্দীর মানবোপযোগী গীতাধর্মের মূলমন্ত্র তিনটি—প্রথমতঃ ব্যক্তিগত জীবনে বৈরাগ্য অবলম্বন এবং কামকাঞ্চনকীর্তি-বর্জন, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক জীবনে পরোপকার ও মানবসেবার কর্মযোগ, তৃতীয়তঃ সংসার ও প্রাণী-সংশ্রমে এই বৈরাগ্য ও কর্মযোগের যথোচিত প্রবর্তন। এই যুগধর্মের কর্ম মতদিন না পরিদমায় হই, ততদিন আর নুতন কোন দর্শনবাদ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। ধর্ম-প্রচারক, সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষাপ্রচারকগণ কর্তৃক বাহ্যে কিছু নুতন মৌলিকত্ব স্বাধীনভাবে প্রচারিত হইবে তাহাও নুতন প্রণালীতেই চিন্তা-স্রোতকেই পুষ্ট করিবে। সকলই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শনবাদেরই সুফল হইয়া যাইবে এবং নানাদিক হইতে তাহাকে

বিশদ ও স্পষ্টীকৃত করিবে। এই তত্ত্বের প্রচার, প্রয়োগ, ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি আগামী বর্ষীয় জীবনের একমাত্র কার্য থাকিবে। স্বতরাং দর্শন-সাহিত্যের প্রকৃত অনুদায় বাঙ্গালীয় শীঘ্র হইবে না—জীবন-গঠনোপযোগী নুতন কোন তত্ত্বের উদ্ভব এখন অসম্ভব।

তবে কতকগুলি পারিভাষিক দর্শনসাহিত্য, কলজ-পাঠ্য দর্শন-গ্রন্থ, মনোবিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ইত্যাদির অল্পবাদ বা সমন্বয় হইতেই হইতে পারে। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানের দিকেই এখন কিছু কাল বাঙ্গালী চিন্তাবীরগণের দৃষ্টি থাকিবে।

(২) এই বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যপ্রতির কাণ ও উদ্ভূদানগুলির সবিশেষ প্রাধান্য নবযুগের দ্বিতীয় লক্ষণ হইবে। ‘অর্থ’ শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার, কৃষিকর্মে মনোনিবেশ ও স্বাধীন অঙ্গের উপায়-উদ্ভাবন বর্ষীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবে। ‘বাঙ্গালার মধ্যবিত্তশ্রেণী’-তথাকথিত ‘শিক্ষিত-সামাজ-দারিদ্র্যের’ কল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে। কিন্তু যৌথ-কারবার, সমবেত-ব্যবসায় ইত্যাদি বৃহৎ ব্যাপারে লোক হুঁকিবে না। ব্যক্তিগত ব্যবসায়েরই আদর হইবে। শিক্ষিত বাঙ্গালী ওকালতি, কোর্সীগিরি, মাস্টারীগিরির প্রতি যথেষ্ট উদাসীন হইতে থাকিবে। কুদীপস্বপ্নের সঙ্গে মিশিতে বেশী অপমান বোধ করিবে না। চাষ-আবাদে, স্বত্বধর-কর্মকারের কার্যে, কুটিরশিল্পে, ছোটখাট কারখানায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাগিয়া যাইবে। বর্ধশী আন্দোলনের প্রথম যুগে স্বাধীন অঙ্গের প্রবর্তিত সর্বত্র সাক্ষাতি হইয়াছে, স্বাধীন অঙ্গ-সংস্থানের উপায়ও অসংখ্য মাঠায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু দেশের বেশী লোক এই

সকল উপায়ে জীবিকা অর্জন করিতে অগ্র-সর বা সার্থী হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবে, নৈতিক-চরিত্র-হীনতায়, আলস্য-ও-বিলাসপ্রবণতায়, এবং সাহুতার ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ যুগে নানা অনিষ্ট ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় যুগে দেখিতে পাইব—বাঙ্গালী সমাজের বহু শিক্ষিত পরিবার স্বাধীন অঙ্গে প্রতিপালিত হইতেছে। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে কোন-বিখ্যাত ব্যক্তিকে ব্যবসায়-বা শিল্পের পরিচালক করা হইবে না। অসাহু ব্যক্তিগণকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করা হইবে। মোটের উপরে ব্যবসায়-জগতে প্রকৃত দায়িত্ব-বোধ জন্মিবে।

(৩) এই দ্বিতীয় যুগের সঙ্গীত-প্রধান লক্ষণ হইবে—অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনাজ্ঞ ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিষ্ঠা-লাভ। প্রকৃত প্রভাবে মান-সম্মত, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, শিক্ষালাভ ইত্যাদির মাপকাঠিই বদলাইয়া যাইবে। প্রথম যুগে স্বতন্ত্র মধ্যবিত্তশ্রেণী, ইংরাজীশিক্ষিত সমাজের কার্য-ফলই বিশেষরূপে ভোগ করিয়াছিল। পোষাকী দেশ-সেবার পরিবর্তে শিক্ষিত লোকের ‘দেশের মাটি’কে চিনিতে ও ভালবাসিতে শিখিয়াছে। ইহাই প্রথম যুগের প্রধান স্বফল। দ্বিতীয় সমাজের এবং অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী অনেক সময়ে পথপ্রদর্শক হইয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সহায়ক মাত্র এবং সহযোগীরূপেই স্বপ্ন করিয়াছেন। প্রথম যুগকে আমরা ‘মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুগ’ বলিতে পারি। আগামী দ্বিতীয় যুগকে আমরা ‘জনসাধারণের যুগ’ নামে অভিহিত করিব। জনসাধারণের চরিত্রবৃত্ত, তথাকথিত ‘অশিক্ষিত’ লোকের স্বাধীনতা এবং

উদারতা, নিরপেক্ষতা, মধ্যস্থতা, নৈতিক-
গ্রন্থের ক্ষমতা ইতিমধ্যে সকলেরই চোখে
হইয়াছে। দারিদ্র্যবশতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীও
ইতিমধ্যেই অশিক্ষিত সমাজের নিম্নে পড়িয়াছে।
এবং তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হইতেছে।
এতদ্ব্যতীত বাদ্যলার কোন জেলায় এখন
তথাকথিত দুই চারিজন উকীল-নায়কের
নিন্দা নাই। বঙ্গসমাজে কলিকাতার দুর্ভাগ্য-
গণের একাধিপত্য অনেক দিন চলিয়া
গিয়াছে। মফঃস্বলের বাগী অগ্রাধিকার
কায়ারও চলিবার উপায় নাই। জেলার
প্রধান সহরগুলিও পল্লীগ্ৰাম্যকে অবজ্ঞা
করিয়া চলিতে পারে না। বাদ্যলার
চিন্তা ও কৰ্ম জাতিনির্দেশে, শিক্ষা-
নির্দেশে অসংখ্য স্থানে অসংখ্য উপায়ে
সমাজের উচ্চ-নিম্ন, ধনী-নিধন সকল স্তরে
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার ফলে বিজ্ঞানে,
সাহিত্যক্ষেত্রে, সমাজ-সেবায়, শিক্ষার
আন্দোলনে নানা দুর্ভাগ্য, নানা কষ্টবীর, নানা
চিন্তাবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। দেশের প্রকৃত
“লোকসংখ্যা” সত্য সত্যই বাড়িয়াছে। দশ
বিশ পঞ্চাশ জনের অভাবে বা চারিজনীনতায়
বা অহুসারে বা মতিভ্রংশ সমাজের উন্নতি
কিছুমাত্র দৃষ্ট হইবে না। বিরাট জাতীয়
আবর্তের মধ্যে ব্যক্তিগত কষ্ট কোথায়
নুকাইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই।
“ব্যক্তি” অপেক্ষা জাতি যে কত বড়, তাহা
আমাদের সকল কৰ্মক্ষেত্রেই স্পষ্ট ভাবে
প্রকাশিত হইবে। কোন তথাকথিত
বিজ্ঞান-বীর, সাহিত্য-রসবী, শিক্ষাপ্রচারক-
বা জনস্বার্থের ক্ষমতা ও বিচারশক্তি
তত্ত্বের অবজ্ঞা করিয়া জনসাধারণের সহিত
শক্তি বীর পরাক্রমের সহিত দেশে আধিপত্য
লাভ করিতে থাকিবে। তাঁহী জেলা কামার

স্বর্ণকার মাঝি দল্লী ইত্যাদি ব্যবসায়ী সমাজ
এবং মাতাপিতার অকৃতী সন্তান, বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের ফেল-হওয়া ছাত্র, ইত্যাদি তথাকথিত
অসহজ লোকের আদর্শ উচ্চশ্রেণী, সভ্য-
সমাজ এবং ‘ভাল ছেলেরা’ অনেক বিষয়ে জীবন
গঠন করিতে শিখিবে। কেতাবী শিক্ষা ও
“ভিত্তি” অপেক্ষা চরিত্রবৃত্তা, কৰ্মবৃত্তিপূতা ও
স্বাধীনচিন্তাই সবিশেষ আবৃত্ত হইবে। তাহার
ফলে সমগ্র সমাজকে মহাশব্দের মাপকাঠিতে
দেখা হইবে—তাহাতে অর্থে ও বিদ্যায় হীন
ব্যক্তিও সামাজিক সম্মানে উচ্চশ্রেণীভুক্ত
হইয়া পড়িবে।

(৪) বাদ্যলার সমাজের উত্তর, দক্ষিণ,
পূর্ব, পশ্চিম প্রান্ত জমাট বীড়িবে।
নানা উপায়ে নানা দুর্ভাগ্যের বশবর্তিতায়,
নানা-পার্থের প্রয়োচনায় বঙ্গসমাজের সর্বত্র
সমানভাবে চিন্তা-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে পার্য
নাই। সমাজদেহের তাপমান-বস্ত্রে সর্বত্র
করিলে দেখিতে পাইব তাগের মাত্রা পরীক্ষা
সমান নহে। অগামী যুগে এই সমতার
পরিচয় পাইব। অধিকন্তু হিন্দুকে মুসলমান
ভাল করিয়া বুঝিবে। বাদ্যলার দ্বন্দ্ব না
বুঝিয়া ভরতবর্ষের অত্যাচ প্রদেশবাসিগণ
তাহাকে অথবা নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু
অগামী যুগে মহারাষ্ট্র, পঞ্চদশ, দ্রাবিড়
জাতিই বুঝিবে যে বাদ্যলার চিন্তায় প্রকৃত
প্রস্তাবে প্রাদেশিকতা ও সর্বগীর্ণতা নাই।
বাদ্যালীও ভারতবর্ষের মঞ্চকথা বুঝিবার
জ্ঞান সমর্থক হইতে পারিবে।

বাদ্যলার জলপ্রবনে আমরা উপরি-উক্ত
শেষ লক্ষণ দুইটির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।
জনসাধারণের শক্তি এবং জাতীয় একতা
ইহাতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এই সেবাকাণ্ডে
কোন তথাকথিত সেবা-সমিতি বা শিক্ষা-

পরিষদ বা মিশন বা নামদ্বারা ও ধনবান
জনস্বার্থের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া
দেশের জনসাধারণ তাহার গণ-শক্তির পরিচয়
দিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা সমগ্রই
মহত্তর, কোন লোক-প্রতিষ্ঠিত কৰ্মক্ষেত্র বা মহাশ্রম-
সমিতি অপেক্ষা দেশের জনগণই অধিক গণ্যতাপ-
শালী। দেশের মাটির পরেই সকলকে মাথা
ঠেকাইতে হইবে—এই শিক্ষা প্রদান করিয়া
দামোদরের বৃত্তী-আমাদিগকে আশাধিত দ্বন্দ্বের
দ্বিতীয় যুগের কৰ্মক্ষেত্রে আস্রান করিতেছে।

“আজি দুইয়ের রাতে শব্দের ঘোচে

ভাগ্যও ধরণী।”

আর কুঁদেব

“গৌরবময় পূর্ণা দৃষ্ট

চন্দ্র দি ডরে শুক বিহা।”

হুতরাং

“ভরা বিখ্যাসে শক্তি-শিখা

ধরায় লুটাও শরীর।”

৬। বাদ্যলার সাময়িক সাহিত্য

অল্পদিনের ভিতর আমাদের সাময়িক
সাহিত্যে একটি নতুন প্রাণ আসিয়াছে।
কল্পগুলি নতুন মালিকের উৎপত্তিই ইহার
একমাত্র লক্ষণ নয়। সাহিত্য-জগতের
সুত্রই উন্নত হইয়াছে—বর্ণে বৃদ্ধিতে পারা
যায়। সাহিত্য-সেবিত্রের আলোচ্য বিষয়-
গুলিও আজকাল সর্বগীর্ণতা ছাড়াইয়া
উঠিয়াছে। ধন-বিজ্ঞান ও সমাজ-তত্ত্ব এই
দুইটি ঘরে আমাদের যথেষ্ট শুল্কতা ছিল।
গত দুই এক বৎসরের মধ্যে এদিকে
আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা স্থলক্ষণ।

একটা কণিক উদাহরণ ও প্রতিযোগিতার
ভাব মাসিক সাহিত্যকে আক্রমণ করিয়াছে
দেখিতে পাইতেছি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা

ইতিমধ্যেই স্থল ফলিয়াছে সন্দেহ নাই।
কিন্তু অপর্যাপ্ত অর্থায় কৃত হইতেছে
বিচক্ষণ স্ফূর্তাদিকগণ ভাবিয়া দেখিবেন।
অর্থের অভাবের ব্যতীত সাহিত্যক্ষেত্রে
প্রতিযোগিতার ছেদ কোন অভিব্যক্তি আছে
কি না সাহিত্যের ধুরন্ধরগণ বিচার করিবেন।
সাহিত্যসাধনা স্বদেশ-সেবায়ই এক অঙ্গ—
ইহা বুঝিলে কোন দিকে কি প্রণালীতে
কিছুপ আকারে প্রতিযোগিতার আবশ্যক
সকলেই অনায়াসে নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

আমাদের পাঠকগণকে সাময়িকসাহিত্য-
পাঠ সখ্যে একটা অহুরোধ করিতেছি।
কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালদেশে মাতৃ-
ভাষার প্রতি সমাদর অত্যধিক মাত্রায়
বাড়িয়াছে—আমাদের বর্তমান জাতীয়
জীবন এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে ইহা
বিশেষ “আশাশ্রয়। আমরা মাতৃভাষায়
বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা-প্রদানেরই
পক্ষেপাতী—একদিন তাহা হইবে ইহা
আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। কিন্তু বিশেষশঃ
ভাষাগুলি আমাদের ত্যাগ করিতে পারি না।
বিশেষতঃ ইংরাজীসাহিত্যে আমাদের
পাতিতা চিরকালই প্রয়োজনীয় থাকিবে।
আমরা ইংরাজীকে আমাদের পক্ষে বিত্তীয়
ভাষা মাত্র মনে করি—ইহা দ্বিতীয় ভাষাই
থাকিবে। কিন্তু ইহার অহুশীলনে আমাদের
কুট হইলে অশেষ ক্ষতি।

দুইয়ের বিষয় ইংরাজীর প্রতি আদর একটু
কমিমাছে মনে হইতেছে। কারণ জানি
না, কিন্তু চট্টগ্রাম হইতে বাকিপুর পর্যন্ত
কলেজগুলির অধ্যাপক মহাশয়গণ সর্বদাই
বলিয়া থাকেন যে আজকালকার ছেলেরা—
গ্ৰ্যান্ডগেটগণও—ইংরাজী ভাষার অতি সামান্য
সামান্য নিয়মগুলিও আয়ত্ত করে না,

ইংরাজীতে লিখিতে বা পড়িতে হইলে তাহাদের বিশেষ কষ্টগ্ৰেণ হয়।

ইহা নিবারণের উপায় অবশ্য বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন। আমরা, এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। 'মুদ্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদে এই পর্য্যবসিত হইতে পারি যে Modern Review, Dawn এবং Collegian এই তিনমান কাগজ সকলেরই পাঠ করা উচিত। "মডার্ন-রিভিউ" প্রতিকাশ গত আট বৎসর যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা আমাদের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা-প্রণালী, সমাজ ও অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সুবিচারিত এবং পাঠ্যতাপূর্ণ। বাহাদের সুবিধা আছে তাহার এই মাসিক প্রতিকাশের পুরাতন সংখ্যাগুলি ক্রয় করিয়া text book-এর ছাপ পাঠ করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার ফল অপেক্ষা বেশী ফল লাভ করিবেন।

"ডন" প্রতিকাশও ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব নানা উপায়ে বুঝান হইয়াছে। ইহারও পুরাতন সংখ্যাগুলি সকলেরই অবশ্যপাঠ্য। Modern Review ও Dawn এই দুই প্রতিকাশের প্রবন্ধগুলি বাদশাহী অল্পবয়স্ক কবির জন্য প্রবন্ধকথা বা পুস্তক-বিক্রেতা অগ্রসর হইলে, দেশের লোক-শিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন।

Collegian শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষক পত্র। বাংলাদেশে ইহাই একমুখাবস্থিত্যম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরেও ইহা প্রচলিত। শিক্ষাজগতের কোথাও কি ঘটিতেছে বিশেষভাবে এই সংবাদ প্রদান করাই কর্নেলিয়ান প্রতিকাশ উদ্দেশ্য। আজকাল শিক্ষাসম্বন্ধে তথ্য ও তথ্য পাইবার জন্য দেশবাসীর আগ্রহ জন্মিয়াছে। আশা করি, তাহারাই এই প্রতিকাশনি পাঠ করিবার জন্য বাগ্র হইবেন।



বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার দেশের বিভিন্ন জেলা হইতে কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। সময়ের লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যায় যে—প্রায় সকল জেলাতেই সাহিত্যোৎসাহীদের এক্ষণে পঠিত্য অনভিলিপনো পাওয়া যাইবে। "অনেকে এই সমুদয় মাসিক বা মাসিক প্রকাশের সার্থকতা নেনেন না। কিন্তু আমরা যেনে করি—নানা উপায়ে জনসাধারণের কর্তৃত্বভিমান, দায়িত্ব-জ্ঞান ও বুদ্ধি বাড়াইয়া দিয়ার ইহাই একমাত্র উপায়। সুতরাং ইহাদের সাহিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও আমরা সকল জেলার সাহিত্যমেধিগণকেই এই উপায়ে সাহিত্য-প্রচার-কার্যে ব্রতী হইতে আহ্বান করিতেছি।

হানীয় উদ্ভিদাদির বিবরণ, শিল্প-বর্ণনাদির ইতিহাস অবশ্য, বৈদ্যিক ও সামাজিক তথ্য-সংগ্রহ, শব্দতত্ত্ব, লোক-সাহিত্য, প্রভৃতি ইত্যাদি বিষয় জেলার মাসিকপ্রতিকাশগুলি বিশেষরূপেই আয়োজিত হইবে। ইহাদের সাহায্যে অনেক নূতন লেখক, কবি ও শিল্পী বাঙ্গালার সাহিত্য-সাংসারের পরিচিত হইবেন। কিন্তু আলোচনা-ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিয়া ইহা লিখা সকল বিষয়ে ক্ষুদ্র, স্বল্পাঙ্গতা এবং অনর্থক প্রতিযোগিতার প্রবণ দেখাই হানীয় প্রতিকাশগুলির উদ্দেশ্য থাকিবে না। সময় বন্ধী সাহিত্যের "পরিচয়" ও বিস্তৃততর অংশীদারের উদ্দেশ্যই নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণপ্রদান জেল প্রভৃতি হইল মাত্র—এই আদর্শে জেলার মাসিক পত্রগুলির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবে উন্নততার সহিত শ্রমবিভাগ-নীতির অগ্রসর করিলে বঙ্গবন্দীর বাণীমুখি একদিকে বিচিত্রতা ও অন্যদিকে লাভ করিবে, ভূতদিকে একা ও সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইবে।

প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন। বম্বাই, মাদ্রাস, ত্রিবাঙ্কর প্রভৃতি দেশীয় রাজগণ তাহাদের প্রকাশিত হিন্দুসাহিত্য সম্বন্ধীয় সমুদায় পুস্তকই ইহাদিগকে দিয়া থাকেন। রাজ্য ও বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রকাশিত সমুদায় সমস্ত পুস্তক ইহাদিগকে দিচ্ছে। দেওলিঙ্গ মুদ্রা সংরক্ষক মুদ্রা। আর্কিও-লজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট ইহাদিগকে, আর্কিও-লজিক্যাল রিসার্চ, কর্পস, স্ট্রিট, ওয়, ইনস্টিটিউশন, আর্কিওলজিক্যাল অব জোনপুর, কেইট পেম্পল অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি স্থানীয় পুস্তক ইহাদিগকে দিয়াছেন। এইরূপ এই কার্যালয়সমিতি পুস্তকালয়টি গবেষণার কার্যে অতি উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে।

এই কার্যালয় অর্থাৎ "Sacred Laws of the Aryas" নামক হিন্দুসাহিত্য সম্বন্ধে এক নূতন গ্রন্থাবলী ১৯১৩ খৃঃ অব্দ হইতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের আবিস্কৃতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে অধ্যাপক Jolly, Sir Henry Sumner Maine ও বাবু বাহাদুর শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই পণ্ডিতজন্মের উক্তি উক্ত করিয়া দিলে যথেষ্ট হইবে।

Professor Jolly in his Tagore Law Lectures says :—

"In modern times, after the establishment of the British rule in India, the hold of the early native institutions over the Indian mind was found to have remained so firm that it was considered expedient to retain the old national system and option amidst the most sweeping changes which had been introduced in the administration of the

country and in judicial procedure. It was the desire to ascertain the authentic opinions of the early native legislators in regard to these subjects which led to the discovery of the Sanskrit literature, European Sanskrit philology may be said then to owe a debt of gratitude to the memory of the ancient Sanskrit Lawyers of India."

Sir Henry Sumner Maine says, "India may yet give us a new science not less valuable than the science of language and folk-lore. I hesitate to call it comparative jurisprudence, because if it ever exists, its area will be so much wider than the field of law. For India not only contains (or to speak more accurately, did contain) an Aryan language older than any other descendant of the common mother, tongue and a variety of names of natural objects less perfectly crystallised than elsewhere into fabulous personages, but it includes a whole world of Aryan institutions, Aryan customs, Aryan laws, Aryan ideas in a far earlier stage of growth and development than any which survive beyond its boundary."

Rai Bahadur Sarachandra Das, C. I. E., says :—

"It was the administration of Law to Hindus according to their customs and usages which made the judicial officers of the East India Company study Sanskrit. A few works on Hindu Law, e.g., Manu,

Numbering Error

a portion of the Mitakshara and some others were therefore translated into English. But there are many Hindu law books which are not translated into English and so their contents are not known to those who are not acquainted with Sanskrit. I suggest that the translations of Hindu law books should be undertaken under the supervision of the Hindu Judges of the High Courts in India. Properly qualified European Judges may also help in this work."

দুহের বিষয় হিন্দুস্বত্ব অতি প্রয়োজনীয় ও ইহার এত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ব্যবহারজীবগণ যে ইহার বিশেষ চর্চা করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। অধিকাংশ ব্যবহারজীবগণ হিন্দুস্বত্ব সংক্ষেপে মূল পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করেন না এবং সেই জ্ঞান সর্বত্রই হিন্দু আইনের পুস্তক নাই বলিলও হয়। এই জ্ঞান হিন্দুস্বত্ব সংক্ষেপে আধুনিক বিচারালয় হইতে অতি অল্পতমীমালা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে হিন্দুস্বত্ব সংক্ষেপে যে অধিক চর্চা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং আশা করা যায় যে হিন্দুগণ আধুনিক বিচারালয় সমুদায়ের অল্পতমীমালা হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে পরিদ্রাণ পাইবে। আরও আশা করা যায় যে আইনের তুলনামূলক চর্চা—যাহার সূচনা প্রথমে হিন্দুস্বত্ব হইতেই পাওয়া যাইয়াছিল—অধিক পরিমাণে হইবে।

ইহার প্রথম খণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির প্রসিদ্ধ টীকা মিতাক্ষরার প্রারম্ভিত অধ্যায়ে ইংরাজী অম্বুদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাণ্ডাধ্য

হইতেই রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় কর্তৃক Daily Practice of the Hindus নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক্তার কুমার স্বামী এই পুস্তক সংক্ষেপে এইরূপে লিখিয়াছেন: "This unpretentious little volume is one of quite remarkable interest and importance; for the first time it is made easy for the outsider to understand from an actual acquaintance with the daily ritual of a devout Hindu, of the old School; the meaning, the method and the depth of Hindu spiritual culture; we should recommend this little book to all interested in mental culture or who wish to know more of Hinduism as it really is (Ceylon National Review)."

অর্থাৎ "এই আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অতি বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় ও উপকারী। এই পুস্তকের দ্বারা ইহা সর্ব প্রথম হিন্দু সমাজের বহির্ভূত ব্যক্তিগণ প্রাচীন শ্রেণীর নিষ্ঠাবান হিন্দুর নৈরামিষ ক্রিয়াকলাপ হইতে হিন্দুদিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের গভীরতা, প্রণালী ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বুঝিতে পারিবেন। যাহারা হিন্দুদিগের মানসিক উৎকর্ষ জানিবার জ্ঞান আগ্রহবান এবং যাহারা যথার্থ হিন্দুধর্মকে আরোও ভগ্নরূপে জানিবার জ্ঞান উৎকর্ষ তাহারিগকে এই পুস্তকখানি পড়িতে আমরা বিশেষভাবে অগ্রহোৎসাহ করি।"

পাণিনি-কাণ্ডাধ্যায়ের অজ্ঞাত ছোট পুস্তকের মধ্যে শিবসংহিতা এবং দশভাষ্যকৃত তত্ত্বত্রয়ের ইংরাজী অম্বুদ্য বিবেশে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগে যিনি বৈদ্যসংখ্য প্রচারের

প্রথম উদ্দেশ্য সেই রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সমুদায় পুস্তকগুলি ইংরাজী প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজ Private Journal of the Marquis of Hastings, Max Muller's History of Sanskrit Literature, Idylls from the Sanskrit প্রভৃতি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণও করিয়াছেন। সেখানি (ওরফে রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু) রচিত Folk-tales of Hindustan নামক গ্রন্থের প্রকাশকও ইংরাজ। এই পুস্তকের গল্পগুলিকে 'রিভিউ অফ রিভিউ' নামক প্রসিদ্ধ পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক উইলিয়ম স্টেজ আয়রোপাঙ্গাসের গল্পগুলির সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিলাতের প্রসিদ্ধ Folk Lore পত্রিকা এই পুস্তককে Swiftের পুস্তকের সহিত সমান বলিয়াছেন। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা, হিন্দি, মারহাঠী প্রভৃতি অজ্ঞাত ভারতীয় ভাষায় অম্বুদিত হইয়াছে।

আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করিব—Indian Medicinal Plants (ভারতীয় ভৈষজিক বৃক্ষাবলী) নামক পুস্তকখানির পরিচয় গৃহস্থের পাঠকগণ পূর্বেই কিঞ্চিৎ বিধিৎ পাইয়াছেন। এই বৃক্ষ পুস্তকে যে সকল ভারতীয় বৃক্ষরাজি—যাহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়—তাহাদের চিত্র, প্রায় সমুদায় ভারতীয় ভাষায় তাহাদের নাম, তাহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় যাহা পূর্বে কখন কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই, থাকিবে। আয়ুর্বেদোক্ত উদ্ভিদগুলির ব্যবহারের প্রথম বাধা যে

গাছগাছগুলির স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন। এই পুস্তকে প্রায় ১৩০০ শত বৃক্ষলতা প্রভৃতির ছবি থাকিবে, ছবিগুলি ছাপা হইয়া গিয়াছে। ছবিগুলির ছাপা এবং চিত্রণ-কাৰ্য্য একজন ইংলিশ জ্ঞানী শিল্পীর তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন হইয়াছে। প্রেসে হইয়াছে। এই পুস্তকের মুদ্রণের ব্যয়ভার স্বরূপ বঙ্গের বিজ্ঞানদিত্য দানবীর বিনোদসংগ্রহী মাননীয় মহারাজা জীবন্ত নবীপ্রসন্ন নন্দী মহাশয় ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন। এই পুস্তকের লেখক ও সম্পাদক গণের কিঞ্চিৎ, মেজর বামনদাস বসু, জেনারেল সিভিলিয়ন (অবসর-প্রাপ্ত) এবং জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যাপক ভীষ্ম চট্টোপাধ্যায়। ইংরাজ সরকারেই বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষ পরিচিত। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে বহুদিনের একটি অভাব ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ভাতি Humanity and Hindu Literature নামক ক্ষুদ্র পত্রিকা এই কাণ্ডাধ্যায় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইংরাজ যারা মান্দাতা জগতে হিন্দুসাহিত্যের প্রতি সমাদর আকৃষ্ট করা হয়।

এই কাণ্ডাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠাতারা এই কাণ্ডাধ্যায়টিকে ব্যবসা-দ্বিগে হাপন করেন নাই এবং ব্যবসার দিক হইতে চালাইবার চেষ্টাও করেন না। ইহাতে প্রবর্তকগণের প্রায় ৬০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

স্বর্গাত্মার ইহা এক অল্পস্ব দৃষ্টান্ত।

ঐরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর।

আদার চায় *

(আদা—*L. Ginger officinale. E. Ginger. N. O. Zingiberaceae or Scitamineae.*)

ইহা আদা, হলুদ বা কদলী (কলা) পরিবার-ভুক্ত মূলজ উদ্ভিদ। এই সর্ষপল্লবপত্রিত এবং সর্ষপল্লবপত্রিত উদ্ভিদের বিবৃত পরিচয় দিবার প্রয়োজন অতি অল্প। তথাপি ইহার সামান্য পরিচয় এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই আদা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মিশর দেশেও প্রাচীন কালে বহুল পরিমাণে ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। জম্মাণী ও স্পেনেও ইহা অতিশয় আদৃত হইত। পটুগালে আদা ঘারা উৎকৃষ্ট হুয়া প্রস্তুত হয়। পোট নামক মদিরাতেও আদার ভাগ আছে। পটুগালে ব্যঙ্গনেও আদার ব্যবহার হইয়া থাকে। পলিনেশিয়াতে ইহা অতিশয় পরিবার পূর্ণাঙ্গ বুলিয়া গণ্য হয়। তৎকাল লোকের বিখ্যাত আদাতেই পরিভাষা বাদ করেন। ফ্রান্সেও বাদ্য-প্রভে বহুল পরিমাণে আদার ব্যবহার হইয়া থাকে। আদা হইতে একরূপ তরল পদার্থ প্রস্তুত হয়। উহার নাম আর্ক-কন্ডা (*gingerale*)। চাটনী, আচার ও মোরঙ্গা ইত্যাদিতেও আদার ব্যবহার হয়।

ইহার জম্মান এশিয়া-পঞ্জাব। অধুনা উৎকর্ষাৎমূলভিত্তি দেশমাধ্য্রে ইহার আকর হইতেছে। ইহার শুণ্ড, ব্যবহার ও চাম-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে ইহার ভিন্ন

ভিন্ন নামের পরিচয় দিতেছি। ইহা সাধারণতঃ আদা, আর্ক ও শুঠ নামে পরিচিত। শুঠ আদার ঠিক নাম নহে। শুক আদাকেই শুঠ বলা যায়। ইহার সংস্কৃত নাম আর্ক, শৃঙ্গবের, কটুভঙ্গ ও আর্জিকা।

“আর্ক শৃঙ্গবের শ্রাং
কটুভঙ্গ তথ্যত্রিকাং”

ইহার বিখ্যেভঙ্গ প্রভৃতি আরও কয়েকটা নাম আছে। ণশভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত—তৈলদে অল্প; হিন্দুস্থানে আদরক; আরবে জিঞ্জিবিলতা; মহারাষ্ট্রে আলো; কণাটে অর্জিকা; গুজরাটে আদ্র ও সিংহলে ইন্ডুক বা ইঞ্জি; ইংরেজী ভাষায় ইহাকে জিঞ্জার, ইটালী ভাষায় জেঞ্জিয়ারো, নোপল দেশের ভাষায় জেঞ্জিবর, ফ্রেন্স ভাষায় জিঞ্জেম্রি, লেটিন ভাষায় জিঞ্জিয়ার, গ্রিক ভাষায় জেঞ্জিবেপস ও পারস্য ভাষায় জেঞ্জিবিলক্কে।

আদা প্রণত বা শায়িতকন্দ (*Rhizomous*) বিশিষ্ট মূলজ উদ্ভিদ। ইহার নিবাট কন্দই আদা ও শুক কন্দই শুঠ। শুক আদা শুঠ, সেঁটে, হুঠ, শুঙী, শুঠ ও শৌঠী নামে পরিচিত।

ভাঙ্গতবর্ষের সর্ষপ এবং অধুনা আমেরিকার কোন কোন স্থানেও আদার চায় হইয়া থাকে। মানবজাতির নিকট আদার জায় ব্যবহার্য উদ্ভিদ অতি অল্পই আছে। বঙ্গদেশে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও বেহারে প্রচুর পরিমাণে আদার চায় হইয়া থাকে।

অধুনা এই দেশ হইতে ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে আদা বহানি হইয়া থাকে। পুনরায় উহা প্রেষণ ও অজ্ঞাত আকারে এদেশেই প্রত্যাগমন করে। আদার জায় উপকারী উদ্ভিদ কদাচিৎ দুষ্টিগোচর হয়।

ইহা পাচক, ভেদক, গুরু, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিকারক, কন্দু, মধুর, কটু, কফ ও বাতনাশক। নিয়মিত রূপে ইহা ব্যবহার করিলে মদ্যারোগ কখনই হইতে পারে না। ৫০ বৎসর পূর্বে এদেশের অধিকাংশ লোক প্রাতে ইহা হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইবার পরেই লবণ-সংযোগে আদা বহিত। তাহার অধিকাংশ সময়েই নীরোগ, সবলকায় ও দীর্ঘজীবী হইত। এখনও কোন কোন পল্লীগাম্যে এই রীতি প্রচলিত আছে। আহারের পূর্বে সৈন্ধব লবণ সংযোগে আদা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার আছে। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া আহারে রুচি জন্মায়। ব্যঙ্গনে, পোলাউ (পল্লার) ও নানাবিধ বাদ্য-প্রস্তুত ও আদার ব্যবহার হয়।

আদা ঘারা চাটনী, আচার ও মোরঙ্গা প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়। তত্ত্বিন্ন নানাবিধ মিঠাই প্রস্তুত করিতেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। অধুনা বিদেশেও বহুল পরিমাণে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। চীনদেশে আদার চাটনী ও আচার অধিক পরিমাণে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ঘারা একপ্রকার সুরা (wine) প্রস্তুত হইয়া থাকে। আদার ব্যবহারে বিশেষ উপকার না থাকিলেও ইহা ব্যৱহার করিত না। আদা অশেষগুণ সুস্বাদ। আয়ুর্বেদমতে ইহা ভূরি ভূরি রোগের মর্ষেযধ।

ইহা অর্শ, অতিসার, মূত্ৰনালী হইতে রক্ত-প্রাব, শোথ, উদররোগ, আমাশয়, সান্নিপাত-

জ্বর, গ্রন্থী, অগ্নিমান্দ্য, উক্তত্ব, ক্রান্তাপ, শিরোরোগ, কাস, বিষম জ্বর, বমন, বিশৃংখিক, অজীর্ণ, গুণ্ড ও হিন্ধা প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ মর্ষেযধ।

আধুনিক অর্থাৎ ভাঙারী মতে ইহার রূপ নিয়মিত মত নিক্ষিপ্ত হয়—

ইহার মূল তঃ ইকি দীর্ঘ; ঈষৎ পীতবর্ণ, সান্দ্রমৃদু ও বাল। ইহাতে শুঙীর গন্ধযুক্ত পীতবর্ণ বায়ি তৈল (volatile oil), ধূনা ও বেতসার আছে। ইহা বহুবর্জী, নিবাট কন্দযুক্ত উদ্ভিদ। ইহা বিপাক্য-পত্রক। ইহার শিরা সকল সমান্তরাল, এবং পত্র সকল কাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া থাকে। পুষ্প হরিত্রাভ পীতবর্ণ, ভায়েলেট বর্ণের রেখা বিশিষ্ট।

ইহা আয়েষ, উত্তেজক ও বায়ুনাশক। অধিক মাত্রায় পাকশয়ের উগ্রতা জন্মায়। চর্ষণ করিলে লাল নিসারণ হয়। বাহ প্রযোগে চর্ষণে উগ্রতা সাধন করে। ইহা দ্রাঘরোগ, উদরায়ান, শূল, শিরোরোগ, দন্তশূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের মর্ষেযধ। ইহার শুঠ নানা রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশজাত আদা অধিকাংশ সময়ে শুঠ রূপে ব্যবহৃত হয় না। বেহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আদাই শুঠ রূপে অধিকাংশ সময়ে ব্যবহৃত হয়। ইহা সাধারণতঃ পাটনাই শুঠ নামে পরিচিত। পাটনাতে যে আদা জন্মে উহা গুণে উৎকৃষ্ট ও আকারে বদদেশীয় আদা অপেক্ষা বৃহৎ। পরিপক্ক আর্ককন্দ সংগ্রহ করিয়া উহা জলে মৌত করিয়া পরে ঝড়িতে রাখিয়া কাঁকিলেই উহার ছাল আংশিক উঠিয়া যায়, পরে উহা বৃহৎ স্বযোগে শুক করিলেই উহার শুঠ প্রস্তুত হয়। বৎসর শুঠই গুণে উৎকৃষ্ট ও

* লেখকের উদ্ভিদের বিব্যকরণ নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য হইতে উদ্ধৃত।

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। পশ্চিম দেশে ইহা ভূতরী ওঠ নামে পরিচিত। দক্ষিণাভ্যে আদার চাষ হয়। দক্ষিণাভ্যে আদার মধ্যে কলিকট (Calicut) ও কোচিনের আদাই উৎকৃষ্ট। তত্ত্বি ভারত-বর্ষের অত্রজ ও ইহার চাষ হয়। থাকে। মালবার ও কানাড়া প্রদেশেও ইহার চাষ হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে রংপুর জেলায়ই আদার চাষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। রংপুরেই বহুল পরিমাণে আদার চাষ হয়। থাকে, বঙ্গের অত্রজ ও অল্প বা অধিক পরিমাণে ইহার চাষ হয়। বঙ্গদেশীয় আদার মধ্যে রংপুরের আদাই গুণে উৎকৃষ্ট।

আদা প্রপত বা শাখিত কন্দ (Rhizomous) জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার কন্দমূলই ইহার প্রকৃত কাণ্ড (stem)। ইহা হইতেই ডালপালা বহির্গত হয়। ইহার দৈর্ঘ্যে কাণ্ড সদৃশ হইলেও আলু কাণ্ড নহে। মূল রোপণের পরে মূলের গাঢ় হইতেই এই সকল ডালপালা বহির্গত হয়। মূল পরিষ্কর হইলেই এই সকল ডালপালা মূল পায়। স্বতরাং ইহার প্রকৃত কাণ্ড নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। ইহার মূলই কাণ্ড। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহার পার্শ্বদেশ হইতে নূতন কাণ্ড বা কন্দ-মূলের উৎপত্তি হয়। ইহার বীজ হয় না। মূল হইতেই ইহার বংশ বৃদ্ধি হয়। ইহার জল হয়, কিন্তু পুষ্প পরাগ প্রাকৃতিক উপায়ে উৎকীর্ণতা (fertilisation) প্রাপ্ত না ওয়ায় ইহার বীজ হয় না। ইহার মূলই বাবহারযোগ্য। স্বতরাং যে উপায়ে মূলের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, কৃষকের সেই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন।

আদার চাষে বিরূপ ভূমি ও জলবায়ুর প্রয়োজন

আদার চাষে সমান্য (equable) ও আর্দ্রজলবায়ুবিধি স্থানই বিশেষ উপযোগী। স্বতরাং উষ্ণকোটি-মণ্ডল (Tropics) স্থিত অধিকাংশ স্থানেই ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী। এই স্থানের জলবায়ু সমান্য ও আর্দ্র (humid), এই জায়গা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ ও ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী। স্থলত: বিশ্ববরেবার (equator) উভয় পার্শ্ব কর্কট ও মকর ক্রান্তির মধ্যবর্তী স্থানসমূহই ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী।

এই স্থানে উষ্ণতার ও আর্দ্রতার পরিমাণ সমান হইতে এই স্থানের ভূমি আদার চাষের পক্ষে উপযোগী। আংশিক ছায়ামুক্ত স্থান, উৎকৃষ্ট-রূপে করিত বোদ (humous) ও দোআঁশ ভূমিকাই আদার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ছাই-মিশ্রিত ভূমিতেও আদার চাষ হয়। উননের ছাই যে স্থানে নিষ্কণ্ড হয়, এই স্থানের ভূমিকার গতিতে ছাই জলরূপে মিশিয়া গেলে উহাতেও আদার চাষ হয়। থাকে। সমুদ্রোপকূল হইতে তিন চারি হাজার ফুট উচ্চ পার্বত্য প্রদেশেও আদার চাষ হয়।

যে ভূমিতে আদার চাষ করিতে হইবে উহা সমান্য হওয়া প্রয়োজন। ২০ বৎসরের পত্তিত ভূমি ইহার চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। পলিভূমি অর্থাৎ বর্ষাবিধৌত চড়া-ভূমি ইহার চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু একরূপ ভূমিতে বর্ষার জল দাঁড়াইলে উহাতে আদার চাষ হইতে পারে না। দীর্ঘকাল জল স্থায়ী হইলে আদার মূল সকল পচিয়া যায়। সরল ভূমি আদার চাষের পক্ষে উপযোগী হইলেও অধিক রসযুক্ত স্থান ইহার পরম শত্রু। সেখানের জল আদার চাষের পক্ষে বিশেষ

উপকারী। মেঘের জলে আদার মূল সম্বর্ধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অত্র প্রকার জল ইহার পক্ষে তত উপকারী নহে।

মি: উদ্ভ বালন সমার-ভূমি আদার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু দক্ষিণাভ্যে এই মতের পক্ষপাতী। কিন্তু কোন সার ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী সে বিষয়ে উক্তই নীতি। আদার মতে অধিক সারযুক্ত ভূমি ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী নহে। কেননা সার দ্বারা অধিকাংশ সময়েই পাতার, ফুলের ও ফলের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। 'কন্দ ও প্রপত কন্দ জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে অধিক সার ব্যবহার বিশেষ নহে। পত্তিত ভূমিতে শ্রবত: উদ্ভিদার মূল ও পাতা পচিয়া যে সার উৎপন্ন হয়, উহাই ইহার আবরণের পক্ষে যথেষ্ট। পলিভূমিতে বর্ষার সঞ্চিত যে বাষ্পিক সার উৎপন্ন হয়, আদার চাষের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। একরূপ ভূমির অধায়ে অত্র পাতার বা প্রপাতিক সার সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। সময় সময় নূতন বৃদ্ধিকার সঞ্চিত এই সার মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করাই সম্ভব। নিম্ন ভূমি বাহাতে বর্ষার জল দাঁড়ায় বা বাহা সর্বদা সৈতেই উহা আদার চাষের পক্ষে উপযোগী নহে। উচ্চ ভূমিই আদার চাষের পক্ষে উপযোগী। যে ভূমিতে আদার চাষ করিবে, উহা হইতে জল নির্গমনপথ পুরিষ্কার রাখিতে হইবে। এদেশে কলা বাগানে ও তত্রপ ছায়ামুক্ত স্থানে আদার চাষ হয়। কিন্তু একরূপ চাষের মত উদ্দেশ্য আদার চাষ নহে। কলার চাষ। উর্পকসল রূপে উহাতে আদার চাষ করা গৌণ উদ্দেশ্য। বাকৃইর বর্ষজের দাঁক স্থানেও উপকসলরূপে আদার চাষ হয়। বর্ষজ্ঞাত আদাও উৎকৃষ্ট।

ভূকর্ষণ ও ভূমি প্রস্তুত করিবার প্রণালী

যে ভূমিতে আদার চাষ করিতে হইবে, মাঘ মাসে মাঠে উহা কোদালী দ্বারা একবার কোঁপাইয়া দিবে। তৎপর লাদন দ্বারা উহা পুন: পুন: চাষ ও মই দিয়া ভূমি সমতল করিবে। জ্বাতিতে ঘাস, জঙ্গল, খোলা, খাপরা ইত্যাদি থাকিলে তখনই উহা বাছিয়া ফেলিয়া জমি পরিষ্কার করিবে। উহা মৃত্তিকাতে থাকিলে মূল বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হইবে। মৃত্তিকার চিলা (clods of earth) মূলের দ্বারা দাসিয়া মৃত্তিকাকে ধূলিবৎ চূর্ণীকৃত করিবে। মূলের চাষে যে ভাবে মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে হয়, আদার চাষেও তাহাই করিবে। বৃষ্টিপাত দ্বারা মৃত্তিকা অধিকাংশ সময়ে কঠিন হইয়া যায়। আদার চাষে অত্রাত মূলজ উদ্ভিদের চাষের স্রা, মৃত্তিকা কোমল থাকা আবশ্যক। তাহা হইলেই উহার মূল পূর্ণবয়স প্রাপ্ত হইতে পারে। কঠিন মৃত্তিকায় আদার চাষ করিলে উহার গঠনও স্বন্দর হয় না এবং উহা ইচ্ছাক্রমে বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব আদার চাষের মৃত্তিকা কোমল রাখার জ্ঞত উহাতে সামান্য পরিমাণ গোবিত্তার ভণ্ড বা উননের ছাই মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়।

যে ভূমি আদার চাষের উপযোগী নহে, উহাতেও আদার চাষ হইতে পারে। উহাতে ক্ষেত্রময় একহাত পাশ ও একহাত খাই নালী করিয়া উহার দোআঁশ দিক পলি-মাটি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলে উহাতেও আদার চাষ হইতে পারে। ইহা বায়নাধ্য ব্যাপার। এইরূপ চাষে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা নাই।

ওয়ার্ল্ডলিয়ার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতধাৰ্ম্যক ডাক্তার জে, ব্লনী, পি, এইচ, ডি, এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, "I take a special interest in this new series of the Sacred Books of the Hindus, trusting that it will be as successful as Maxmuller's series of the Sacred Books of the East has been, yours, I gather, is an essentially patriotic undertaking. It will help to promote the interest in things Indian, in Indian learning and Indian religion, both in your country and in Europe."

অর্থাৎ "আমি আপনাদের সেক্রেড বুক্‌স অব দি হিন্দু' নামক গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। আমার বিশ্বাস মোক্ষমূল্যের গ্রন্থাবলী—সেক্রেড বুক্‌স অব দি ইষ্টের দ্বারা আপনাদের গ্রন্থাবলীও সাফলা লাভ করিবে। আপনাদের গ্রন্থাবলী দেখিয়া বুদ্ধিতে পারিলাম যে, ইহা মুখ্যতঃ দেশ-হিতৈষণার দিক হইতেই প্রকাশিত হইতেছে। ইহা আপনাদের নিজের দেশে এবং ইউরোপে ভারতীয় বিষয়, ভারতীয় বিদ্যা এবং ভারতীয় ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও বস্ত বিস্তার করিতে সাহায্য করিবে।"

মার জি, এ, গ্রিয়ারসন, কে, সি, আই, ই, পি, এইচ, ডি, পেন্সন প্রাপ্ত সিবিলিয়ান এবং লিট্‌রিয়িক সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় স্পারিটুয়েন্ট, সম্পাদক মেম্বর বামনদাস বরু মহাশয়কে লিখিয়াছেন,—

"May I write to express my appreciation of the Sacred Books of the Hindus" appearing under

your editorship. They form a most valuable and useful series of documents."

অর্থাৎ "আপনার সম্পাদকত্বাবলী প্রকাশিত সেক্রেড বুক্‌স অব দি হিন্দু' নামক গ্রন্থাবলী আমার নিকট অতি প্রশংসনীয়। এই পুস্তকগুলি অতিশয় সূচ্যাবলী"

এই পুস্তকালীর পরিবর্তে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সভা ও সমিতি তাঁহাদের নিজেরদের প্রকাশিত পুস্তক সমুদায় দিয়া প্রাকেনব ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণিনি-কাথ্যালয়ের পুস্তকপরিষদে নিজেদের প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তক দিয়াছেন। আমেরিকার জগৎপ্রসিদ্ধ স্থিথ

মোনিয়ার ইনস্টিটিউট তাঁহাদের প্রায় সমুদায় পুস্তক—বাহার সূচ্য পত্র সহস্র সহস্রও অধিক—এই কাথ্যালয়ের প্রকাশিত পুস্তকের সহিত পরিবর্তন করিয়া থাকেন। আমেরিকার ওরিন্টিয়াস্টা ট্রান্সমিট্টার সহিতও ইহাদের পরিবর্তন চলে। শাসনশেষের নৃপতি কটক প্রকাশিত পুস্তক সমুদায়ও ইহারা নিজেদের পুস্তকের পরিবর্তে পাইয়া থাকেন। তা ছাড়া, অনেক এই কাথ্যালয়ের এইরূপ হস্তার কাৰ্য্য দেখিয়া স্বদেশপ্রভু ইহা এই কাথ্যালয়কে অনেক পুস্তক অমনি উপহার দিয়া থাকেন। ভারতীয় রাষ্ট্রসচিব (Secretary of State for India), ভারত সরকার (Government of India) এবং সন্ত্রান্ত প্রদেশিক গভর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রয়োজনীয় ও উপকারী যে সব পুস্তক তাঁহাদের অধীনে প্রকাশিত হয় সে সব ইহাদিগকে উপহার দিয়া থাকেন, এবং অন্তর্গত বহুবিধ সাহায্যও করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের অনেক হিন্দু রাজস্বর্ণও ইহাদের উপর্য্যোক্ত

পারিবারিক ব্যবহারের জন্ত এদেশে অনেকই গৃহপ্রাপ্তি বা বাড়ীর পালনে সামান্য পরিমাণে বারমাসই আদার মূল রোপণ করিয়া থাকে।

বীজ-নিরীচান

আদার মূলই ইহার বীজের কাৰ্য্য করে। পূর্বে বসন্তের সংগ্রহে ফল হইতে স্বল্প ও সবল মূল বীজের জন্ম বাড়িয়া রাখিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় বা নিজ কাৰ্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। যদি বীজপরিদ করিয়া রোপণ করিতে হয়, তবে একপ্রকার বীজই বাজারে খরিদ করিবে, নিকট বীজে ভংগুত ফল কখনই প্রদান করিবে না। স্বতরাং বীজ-নিরীচান সময়ে উপর্য্যোক্ত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ফল সংগ্রহের পরে চোখ (eye) মুক্ত আদার মূলকে চক্ষুসহ বও খও করিয়া কাটিবে। পরে, উহাই ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলগুলিকে না কাটিয়া চক্ষু সহ আস্ত মূলই রোপণ করিতে হয়। মূলগুলিকে খও খও করিয়া কাটিবার পরেই রোপণ করিবে। একপ্রকার বও খও করিয়া উহাদিগকে ২১ দিন রোজে শুক করিবে। তৎপরে ঘরের ভিতরে দিঘ বা 'বাগি বাগিছা' উহার ঊপরে খণ্ডীকৃত মূলগুলিকে গাধা (heap) করিয়া রাখিবে।

ঐ গাধা যেন এক ফুটের অধিক উচ্চ না হয়। অধিক উচ্চ হইলে কোন কোন খও চোপে পড়িয়া মাইবার সম্ভাবনা। কিংবদন্তি এইরূপে ঘরে রাখিলে উহার ক্ষতস্থানগুলি শুক হইয়া স্বস্থতা প্রাপ্ত হইবে। আদার ফল সাধ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সংগ্রহীত হয়। স্বতরাং অবস্থাভঙ্গারে কখন কখন এক দেড় কি ছইমাস কালও বীজ ঘরে রাখিবার

আবশ্যক হইতে পারে, এই জন্মই ইহাদিগকে কিংবদন্তি যত্নের সহিত ঘরে রক্ষা করিতে হয়। বীজের উপরই ভারী ফসলের আশা ভরসা নির্ভর করে। আদার রিপু কদাচিৎ দেখা যায়। আদা অতিশয় উগ্রগন্ধ ও কটুস্বাদবিশিষ্ট বলিয়া কীটপতঙ্গাদি অধিকাংশ সময়েই উহাকে স্পর্শ করে না। শোলা পোকা জাতীয় কোন কোন কীট ইহার মূল কখন কখন খাইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর উহাদিগকে আদার ফল নষ্ট করিতে দেখা যায় না।

ফল-সংগ্রহ ও মজুত করার প্রণালী

আদার মূল পরিপক হইলে উহা সংগ্রহ করিতে হইবে। যখন দেখিবে যে আদার গাছগুলি মূরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই বৃষ্টিতে হইবে যে উহার মূল পরিপক হইয়াছে। জুমির অবস্থা বিবেচনায় মাস মাস হইতে ফাল্গুন মাস মধ্যেই ফল সংগ্রহ করিতে হয়। মূল রোপণের পরে দশ মাস মধ্যেই আদার মূল পরিপক হয়। আদার মূলের চাপকে (সমগ্র মূলকে) কেহ কেহ হাতা বলিয়া থাকে। মূলগুলি চাপে চর্চাইলে তোলা উচিত। এমন ভাবে ভুলিবে যে উহা যেন কোনরূপে ভাঙ্গিয়া না যায় বা সস্ত্রের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত না হয়। মূল সংগ্রহ করিবার অব্যবহিত পরেই অগ্রে পুরোঁক রূপে বীজমূল মজুত করিতে হইবে। তৎপর অবশিষ্ট মূল বিক্রয় বা ব্যবহারের জন্ত রাখিবে। কেহ কেহ বলেন মূল উঠাইবার পরে উহার চক্ষু ছুরি ধারা ছুরিমা ফেলিয়া তৎপর রোজে শুক করিয়া মজুত করিতে হইবে। আমি এ মতের পক্ষপাতী নহি।

* মূল প্রাপ্তর যে স্থান শাকসমী রোপণ করিবার জন্ম নিমিত্ত থাকে, উহাকে পালান কহে।

Numbering
Error

চক্ষু ছুলিয়া ফেলিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে অবস্থায় মূল সংগৃহীত হয় এই অবস্থায়ই উহা শুষ্ক করিয়া মজুত করা উচিত। মূল-গুলিকে মাচার উপর মজুত করাই সঙ্গত। মৃত্তিকার উপর রাখিলে মৃত্তিকার আর্দ্রতা দ্বারা উহা পচিয়া যাইতে বা অসময়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে।

চাইনী, আচার ও মোরকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে অর্দ্ধপঙ্ক মূলই সংগ্রহ করিতে হইবে। অর্দ্ধপঙ্ক মূলই এই কাৰ্যের উপযোগী।

সিংহল রপ্তানির জন্য যে আধা মজুত করা হয় উহা টুইট প্রণালীতে প্রস্তুত। প্রথম প্রণালীতে মূলের বাকল চাটিয়া ফেলিয়া ও দ্বিতীয় প্রণালীতে উহার বাকল রাখিয়া শুষ্ক করা হয়। প্রথমোক্ত প্রণালীতে বাকল ফেলিয়া উপা জলে সিদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয় প্রণালীতে বাকলযুক্ত মূলকে জলে দৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মজুত করা হয়। প্রথম প্রণালী অবলম্বনে যে মূল প্রস্তুত হয় উহাকে স্বক্খীন (peeled or coated)-মূল ও দ্বিতীয় প্রণালীতে যে মূল প্রস্তুত হয় উহাকে স্বকৃষ্ণ-মূল (unpeeled or uncoated) কহে।

আদার চাষে কিরূপ লাভ হইবার

সম্ভাবনা

আদার চাষে যে বিশেষ লাভ আছে, তাহা নিম্নলিখিত ভঙ্গিতে ধরাই উপলব্ধ হইবে—

“যদি পুঁতলি আদার গুমে,
তবে নাকে তেল দিয়ে ঘুমা।”
অর্থাৎ যদি আদার গুমে (মূল) একবার মৃত্তিকাতে রোপণ করিতে পার, তাহা হইলে সমস্ত বৎসর নাকে তেল দিয়া ঘুমািলেও তোমার অস্বস্তি হইবে না।

আজকাল এদেশে হইতে বিদেশে প্রচুর পরিমাণ আদার রপ্তানি হইয়া থাকে। ইংরাজী ১৯১১-১৯১২ সনে ভারতবর্ষ হইতে বিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকার আদা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। সাধারণতঃ ছালা বা কাঁঠের পিণায় আদার মূল বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

প্রতি বিঘায় ২০০০ পাউণ্ড হইতে ২৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৫/ মণ হইতে ৩১/ আদা জন্মিয়া থাকে। কোন জমিতে ৪০/ পর্যন্তও জন্মিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট আদা প্রতিমণ ৫/ হইতে ৭১০ টাকা দরে বিক্রয় হয়। গড়ে প্রতি বিঘায় ২৫/ মণ উৎপন্ন করিলে ১২২৫/ টাকা হইতে ১৮৭১০/ টাকার আদা উৎপন্ন হয়। উহা হইতে চাষের ব্যয় নিম্নে বর্ণিত হইল—

ব্যয়ের হিসাব

১। ভূমির খাজনা ১/ বিঘা	২/
২। চাষের ব্যয়	১৭/
৩। বীজ আদা ৬/ মণ প্রতিমণ	
৭১০ টাকা দরে	৪৫/
৪। ফসল-সংগ্রহের ব্যয়	৩/
৫। উহা শুষ্ক ও মজুত করার ব্যয়	৩/

হিসাব মতে ৭০/ টাকা ব্যয় দিলে প্রতি বিঘায় নিট লাভ ৫৫/ টাকা হইতে ১১৭০/ টাকা হইতে পারে। লগুনে এক হেণ্ডেট-ওয়েস্ট অর্থাৎ ১৪ (একশত চৌদ্দ সের) আদার মূল্য ৩০/ হইতে ৫০/ টাকা হইয়া থাকে। স্বতরাং বিদেশে ইহার রপ্তানির বন্দোবস্ত করিতে পারিলে প্রকৃত লাভের সম্ভাবনা। অধুনা জ্যামেকা দীপে বহল পরিমাণে আদার চাষ হইতেছে।

জ্যামেকার আদা উক্ত মূল্যে বিক্রয় হয়। জ্যামেকার ছায় ক্ষুদ্র দীপ হইতে প্রতি বৎসর ২১০ লক্ষ টাকার আদা বিদেশে রপ্তানি হয়।

এরূপ লাভজনক কাৰ্যের দিকে এদেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এরূপ লাভজনক কাৰ্য্য থাকিতেও ভারতবাসী পরের গোলামী করিতে কিছুই লজ্জা বোধ করে না, ইহা কি সামাজ্য হুগেরে বিস্ময়! যাহার ২০/ বিঘা জমি আছে সে আনয়নে তৎপন্ন ফসল দ্বারা ঘরে বসিয়া স্বখে কান্নাতিপাত করিতে সক্ষম। যদি এ কাৰ্য্যও ভারতবাসীর ভাল না লাগে তবে তাহাদের চিরদুঃখ অবশ্যজ্ঞানী।

এদেশে আরও ২১০ জাতীয় আদা দুটিগোচর হয়। উদ্ভাদের চাষ-প্রণালীও উপরোক্ত জাতির চাষ। উহার নাম বিশেষ্য কাৰ্য্য গাদন করে না। তথুপি উদ্ভাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণ আদা—Ginger Nigra—Black Ginger—ইহার গাছ ও মূল আদার ছায়। পাতা ও কাণ্ড ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। মূলের আন্তর ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ। ইহার চাষ-প্রণালীও আদার ছায়। এদেশে কেহ ইহার চাষ করে না। কেননা ইহার ব্যবহার নাই। এদেশের বন-জঙ্গলে ইহা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে। ইহা কখন কখন ঔষধে ব্যবহৃত হয়। আমি গো-চিকিৎসায় দেশীয় আদ্যৌষধিক কুবিভাগদিকগে ইহা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। ইহার ফল অত্যধিক। অল্প একরূপ কৃষ্ণ আদা আছে, উহার গাছ দেখিতে হলুদ গাছের ছায়। কিন্তু মূল আদার ছায়। মূল ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ।

প্রকৃত পক্ষে ইহাকে কৃষ্ণ আদা না বলিয়া কৃষ্ণ হলুদ বলাই সঙ্গত। ইহাও কোন কোন সময় ঔষধে ব্যবহৃত হয়। মূল-বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়।

আমাদা—Mango-scented Ginger—ইহার দেশীয় নাম আমাদা; হিন্দী নাম অম্বায়া হান্দা; গুজরাতি নাম অম্বা হান্দুদ; কর্ণাটা নাম হলী আরসিন্; তৈলঙ্গী নাম কাঁচি পান্দু ও মারহাটি নাম আর্থে হান্দু। ইহার ক্ষুদ্রতম নাম আম্রগন্ধেহরিষা। ইহার গাছ ও মূল হলুদের ছায়। পাতাও হরিষার ছায়। ইহার গন্ধ কাঁচা আমের গন্ধের তায়। মূলের মাংসের বর্ণ ঈষৎ হলুদে। কেহ কেহ ইহাকে আম-হলুদ নামেও অভিহিত করেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা হলুদজাতীয় গাছ। অথল ও চিটাই স্বগন্ধ করার জন্য ইহার মূল ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ দাল ভালনাতেও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার মূল দ্বারা প্রস্তুত সন্দেপের নাম আম-সন্দেপ। ইহার চাষ-প্রণালী হলুদের ছায়।

ইহা—জিত্তার কথায় রস, রুচিগ্রন্থ, লঘু, অগ্নি-দীপক, উষ্ণবীৰ্য্য ও সারক। ইহা কক, উষ্ণ ব্রণ, কাস, শ্বাস, হিকা, জ্বর, মুখরোগ, রক্তদোষ, বাত্বে ও শূলরোগনাশক। মূল-বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। রঞ্জিতবর্ণ আদা—Zingiber Variegata—Variegated Ginger—ইহার পাতা ও মূল আদার ছায়। পাতা আদা অপেক্ষা গরীবর্ণিত ও আদার পাতা অপেক্ষা বিস্তার-বিশিষ্ট। পাতা শ্বেতভাগ স্বর্ণ বর্ণে চিত্রিত। সন্ধের জন্ত ইহার চাষ হয়। ইহা চাষের উপযোগী। গাছ দেখিতে বড়ই হলুদ। গুগ্ধে, ঘঘরে বারান্দায় ও রোডকে ইহা রমণীয় শোভা দান্যু করে। মূল বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। উদ্ভানের শোভা বর্দ্ধন ভিন্ন অল্প কোন কাৰ্য্যে ইহার ব্যবহার আমি অবগত নাই। আমার বাগানে ইহা লক্ষ লক্ষ গাছের ছায় জন্মিতেছে।

শ্রীদীপকচন্দ্র গুহ।

প্রাচীন কথা

(উপানন্দা হইতে উদ্ধৃত)

বাঙ্গালীর বীরত্বগাথা এক্ষণে উপকথায় পরিণত হইয়াছে। ইংরাজের বন্ধাধিকারের পর লর্ড মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র অত্যন্ত নিকট বর্ণে চিত্রিত করেন। তদবধি বাঙ্গালীরা শৌর্যবীর্যসম্পন্ন মহাযশস্বদাতা বীরজাতীর নিকট দৃষ্টি হইয়াছেন। হতভাগ্য আমরা সেই কলঙ্কমোচনের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া অধিকন্তু মেকলে বর্ণিত অপরাধের পোষকতা-মূলক ভীকৃতার পরিচয়ই অনেক সময়ে প্রদান করিয়া থাকি।

কৈবল্য মেকলের কথাই বা বলি কেন? লর্ড মেকলে হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড কার্জন পর্যন্ত আমাদের মানি করিতে ক্রটি করেন নাই। বাঙ্গালীর ভীকৃতা এক্ষণে যেন প্রবাসধরুণ যথা তৃত্বা প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের দুর্বলতার ও ভীকৃতার কথা অবগত হইয়া দূরগত কাবুলীরাও বঙ্গের নগরে, গ্রামে এবং পল্লীতে পল্লীতে স্তূত্যাচার করিতে আরম্ভ করিতেছে। এক কলঙ্ক বৃদ্ধি আর সূচিবীর নহে।

বস্ত্তই আমরা দুর্বল, ভীকৃ ও কাপুরুষ হইয়াছি। আমাদের শরীরে শোণিত নাই, বাহ্যতে বল নাই, জগদে তেজ নাই, মনে শক্তি নাই। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, মগ-পীড়িত দারিদ্র্যদুঃখবস্ত্রী, ক্রিপাশে সজ্জাচিত আমা—জগতের মধ্যে যেন দৃষ্ট্যাক্ষবের ছায় অবস্থান করিতেছি। যাহারা পদতলে দাঁড়াইতে পারে না, পরের সাহায্য না পাইলে অসহ্যকরা করিতে চাহে না, তাহাদিগের জীবনে বিষ্ণু। শক্তির, মহাহতভ ইংরাজরাজ

যদি সত্যাদিগের রাজা না হইতেন, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় দুর্দশার সীমা থাকিত না। ঐ যে কাবুলী দেশদ্রোহতার অতিক্রম করিয়া দলে দলে বঙ্গে আসিতেছে কেন তাহা জান? ভারতবৃত্ত এত দেশ থাকিতে উদারদিগের লোবুপদুষ্টি বঙ্গের উপর পতিত হইয়াছে কেন তাহা জান? মাস্ত্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, বুরু ও মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার প্রভৃতি প্রদেশের কোন স্থানে না যাইয়া বাঙ্গালায় তেজরাজি করিতে কেন আইসে, তাহা জান? আমরা ভীকৃ কাপুরুষ বলিয়া।

কিন্তু চিরকাল এমনই ছিল না। আবহমান কাল আমরা এবংবিধ কাপুরুষতার ভাব প্রদর্শন করি নাই। এমন দিন ছিল, যে দিন বিদেশী ও বিশ্ববিফারিতনেজে আমাদের বল, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবস্তার প্রতি চাহিতে বাধ্য হইয়াছিল। হাং, সেদিন কোথাক গেল, কেন গেল?

বাঙ্গালী যে চিরদিন এমন ছিল না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ গ্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমান-রাজত্বকালে,—দেশে যখনই অরাজকতা উপস্থিত হইত—তখনই যে বাঙ্গালী লড়াই করিয়াছে, কাম্যমের গোলা বুক পাতিয়া ধরিয়াছে, তাহার বহুল প্রমাণ গ্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল মুসলমান-শাসনকালই বা বলি কেন, তাহার বহুপূর্বেও বাঙ্গালী যুদ্ধ করিয়া প্রতিভানামা হইয়াছিল। ইহা আমাদের যক্ষপোলকল্পিত কথা নহে, ইতিহাস-বর্ণিত অভ্যন্ত সত্য ঘটনা।

কেহ হয়ত এমন প্রশ্ন করিতে পারেন যে, হইতে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বদ বলিতে বর্তমানকালে যে বাঙ্গালদেশে বঙ্গদেশের যে বিবরণ, প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বৎসবাসীকে বাঙ্গালী বলাই সম্ভবপর। হস্ততায় সে বাঙ্গালীর সহিত এ বাঙ্গালীর অনেক পার্থক্য আছে। এ বাঙ্গালী যে বীরজাতি ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়?

এখন দেখা শাউক, শাস্ত্রে বঙ্গের সহিত কোন কোন দেশের উল্লেখ ছিল। শব্দকল্প-ক্রমে “বঙ্গ” শব্দের অর্থে লিখিত আছে “লম্ববিশেষে পুংভূমি। ইতি মেঘিনী। স তু প্রাচ্যৈশদেশজগৎদেশবিশেষঃ। যথা। অঙ্গ-বঙ্গাদমুৎকরা অঙ্গগিরিবহির্গিরাঃ। ইতুপ-ক্রম। শাখা মাগধশোনদীঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্তুতঃ। ইত্যন্তঃ মন্তপুণ্যবঃ। মন্তপুণ্যঃ যথা। আশ্রোয়ামঙ্গবদাপবপদ্ধিপুত্রাকোয়লাঃ। কলিঙ্গৌচাক কিম্বদ্বাপবিশ্ববঙ্গবদায়ঃ। ইতি জ্যোতিষতত্ত্বকুর্কচক্ৰবদনম্। • তন্ত্র সীমা যথা। রত্নাকরঃ সমারভা রত্নপুত্রাজগৎশিবে। বঙ্গদেশে ময়া প্রোক্তঃ সর্গসিদ্ধি-প্রশংসকঃ। ইতি শক্তিসমদয়ে ৭ম পটলঃ। প্রভাক্তাভ্যাতবদ্বি, পরমপতিত, গ্রিয়ার-সন সাহেব “ভারতবর্ষীয় ভাষা সমীকণ” নামক পুস্তকে বঙ্গভাষার আলোচনাকালে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন। • “ইহা নিম্ন বঙ্গ বা বঙ্গীণের ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের ভাষা। সংস্কৃতে শূর্য ও মধ্য বঙ্গই বঙ্গ নামে প্রখ্যাত, কিন্তু অধুনা যতদূর বঙ্গভাষা কথিত হয়, সেই সমস্ত স্থানকেই বাঙ্গালা বুলে। ইংরাজী “বেঙ্গল” হইতে “বেঙ্গলী” বহি হইয়াছে। “বঙ্গলম্” শব্দ তাহার

হইতে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ একটি প্রশস্তিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই আরবিক ভাষার “বাঙ্গালী” উৎপত্তি। আরবিক হইতে পাশ্চাত্য ভাষায় ইহা প্রবেশ লাভ কর্তে। আইন-আকবরীতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন “নামি অমুলি বাংলা বঙ্গ” অর্থাৎ বাঙ্গালার আসল নাম বঙ্গ।

সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যখন “বঙ্গম” শব্দ পাওয়া যাইতেছে, তখন বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? আবুল ফজলের মতে বঙ্গের চতুর্দিক তখন “আল” বা উচ্চভূমি দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল বলিয়া “বঙ্গাল” শব্দ উদ্ভূত হয়। বাঙ্গালা তাহারই অপভ্রংশ।

আধুনিক সংস্কৃতগত পণ্ডিতেরা কিন্তু আবুল ফজলের এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে বঙ্গ+আলয় হইতে বঙ্গালয় উৎপন্ন হয়। তাহার অপভ্রংশ বাঙ্গালা সম্বন্ধী বলিয়া বাঙ্গালী হইয়াছে।

• এই ত গেল “বঙ্গের” কথা। তাহার পর গৌড়ের কথা বলা। শব্দকল্পক্রমে গৌড় অর্থে লিখিত আছে “স্বানখ্যাতদেশঃ। তদেবশ্বে পুংভূমি। ইতি জটায়বঃ। তদেব-সীমা যথা—বঙ্গদেশঃ সমারভা ভূবনেশ্বতঃপাশিবে। গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববিদ্যা-বিশারদঃ। ইতি শক্তিসমদয়ে সপ্তমঃ পটলঃ। পঞ্চ গৌড়া যথা—সারথতাঃ কান্তকূজাঃ গৌড় মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চ-গৌড়া ইতি খ্যাতা বিজ্ঞোত্তরবাসিনঃ, ইতি স্বপ্তপুণ্যবঃ।

স্বপ্তপুণ্যের মতে সারথত, কান্তকূজ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল পঞ্চ গৌড় নামে

আখ্যাত। কিন্তু ইতিহাসে পঞ্চ গোড় ভিন্ন-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র, বন্দ, বাগরি এবং মিথিলা।

যাহা হউক, আমরা এ প্রবন্ধে পঞ্চ গোড়ের নীমাংসা করিতে বসি নাই। পঞ্চ গোড় যে ছিল, তাহা কেবল রাজতরঙ্গিণীতেই প্রকাশিত নহে, নিরাপত্তিও এই পঞ্চগোড়ের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রথম কবিতার ভণ্ডিত্য তিনি লিখিয়াছেন—

“চিরস্তব রহ পঞ্চ গোড়েশ্বর করি

বিজ্ঞাপিত ভণে।”

এখন দেখা যাউক, নিরাপত্তি কত দিনের। তিনি যে বিদগ্ধগ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ, উভয়ে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তিনি বহু মূল্যমান-আগমনের পরে যে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমী ও ষ্ট্রাবো তদীয় গ্রন্থে সেন্ধকাদের অভিবাস-বর্ণনায় গোড়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিভ্রাঙ্কক হিয়াংমং গোড় ভূমণ করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে “জয়গোড় বর্ত্তক পঞ্চগোড়-জয়ের কথা লিখিত আছে।”

হট্টার সাহেব বলেন, “Gour is of primeval antiquity, as is shown by the existence and traditional dignity of the Gouriya Brahmans; but it is probable that the name was more strictly applicable to the kingdom than to the city.” *

ব্যালকবের ‘সাইক্লোপেডিয়া অফ ইণ্ডিয়া’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১ লিখিত আছে, গোড়ের নামোল্লেখ মহাভারতে এবং নবম শতাব্দীর ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গোড়সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ছইলার বলেন, ঐ প্রাচ্য হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড গোড়সাম্রাজ্য ছিল।

প্রাচীন সাম্রাজ্য ও ভদ্রপেচা আধুনিক ইতিহাস-পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, গোড়বাসীরা ইতিহাসবিশ্বত বলবীর্ষ্যসম্পন্ন সভ্যজাতি ছিলেন। নতুবা গোড়দেশের নাম সাম্রাজ্যে ও ইতিহাসাদিতে স্থান পাইত না।

বাসালীর বীরত্বের কথা পাশ্চাত্যভূগতে ১৫৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়। পুণ্ড্রাঙ্গের রাজধানী লিসবন নগরে বারোস মাহমেদের যে পুস্তক ঐ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লেখা আছে,

“In the defence of the bridge died three of the king's captains and Tuan' Bandam, to whose charge it was committed, a Bengali (Bengala) by nation and a man sagacious and crafty in stratagem.”

ইহার মধ্যস্থ, “সেতুসংরক্ষার্থ রাজার তিনজন সেনানী এবং তুয়াসবন্দ্য নামক জনৈক কৌশলী ও চতুর বাঙ্গালী (ইহারই হস্তে সেতুরক্ষার প্রধান ভার অর্পিত হইয়াছিল) মৃত্যুমুখে পরিত হইয়াছিলেন।

পুণ্ড্রাঙ্গজলধক বাঙ্গালীর নামোল্লেখ করিতে গিয়া একটা অদ্ভুত নামের সৃষ্টি

করিয়াছেন। ‘যাহা হউক, তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ সংশয়ই নাই। তুয়াস শব্দের অর্থ বোধগম্য হইল না। বন্দ্যম শব্দ হইতে অসুস্থান করা যায় তিনি সম্ভবতঃ “বন্দীঘাটীর” সাম্রাজ্য ছিলেন।

তাহার পর বহুদান-কৃত রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ ভ্রমদে ললিতাবীরতের ও জয়গোড়ের রাজত্বকালে গোড়জয়ের কথা লিখিত আছে। পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির নিমিত্ত রাজতরঙ্গিণী হইতে স্কোচগুলি এবং তৎসমুদায়ের মধ্যস্থত্ব নিয়ে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

“তিনি (ললিতাদিত্য) পরিহাসকেশব নামক বিগ্রহটিকে প্রতিভূস্বরূপ, বাঘিষা গ্রিগামদেশে উগ্রসৈনিকের-সাহায্যে গোঁড়াধিপত্যকে বধ করিয়াছিলেন। সে সময়ে গোড়পতিত অষ্টচন্দ্রবর্ণের অদ্ভুত বিক্রম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাহার পরলোকগত রাজার শোক রিদ্ভুত হইতে না পারিয়া রাজার হত্যার প্রতিশোধ-প্রদানার্থ কাম্বীর-সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। প্রথমে উহার (গোড়ীয় সৈন্যগণ) শরণা দেবীকে দর্শন করিবার ছলে কাম্বীরে প্রবেশ করে এবং সকলেই এককালে মধ্য পরিহাসকেশবের মন্দিরটি আক্রমণ করিয়াছিল। কাম্বীরপতি দৃষ্টদেয় আছেন, এই সুযোগে প্রত্নহত্যাজনিত জোরে অশ্ব গোড়বাসীর পরিহাসকেশবকে কাড়িয়া গাইতে প্রবেশ করিতেছে দেখিতে পাইয়া তথাকার পুঙ্খকোয় পরিহাসকেশবের মন্দির-স্থার বন্ধ করিয়া ফেলিল। তখন বিক্রমশালী গোড়ীকেশব রত্নময় রামধামী-বিগ্রহকেই পরিহাসকেশব-রূপে আক্রমণ করিল এবং তাহাকে উৎপাটন পূর্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। ঐ সময়ে

কাম্বীর-সৈন্তেরা নগর হইতেই বাহির হইয়া উগ্রাদিগকে নামাধিক কঠিন প্রহারে বধ করিতে থাকিলে উহার রামধামীবিগ্রহকে তিল তিল করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করত চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিল। সেই কক্ষকায় গোড়বাসীরা কাম্বীর-সেনার হস্তে নিহত হইয়া যখন রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইতে লাগিল, তখন ব্যোম হইতে লাগিল যে, পৈরিকাদি ধাতুর রসে রঞ্জিত অশ্ব-গিরির স্তব্ধে প্রস্ত-খণ্ডগুলি বসিয়া পড়িতেছে। তাহাদিগের দেহনিঃসৃত শোণিতপ্রবাহ তাহাদিগের অতুলনীয় রাজভক্তিকে অধিকতর সমুজ্জল করিয়াছিল, এবং ধর্মবীকে অধিকতর ত্রিসম্পদা করিয়াছিল। বজ্রময় হীরক হইতে বজ্রপাত-জনিত বিপদ দূর হয়; পশ্চাদ্ভাগে হইতে কেবল সম্প্রদায় হওয়া যায় এবং গরুড়-মণি হইতে নানা প্রকারের বিষই নষ্ট হয়। এই রত্নগুলি বিধাতার নিয়োজিত ব ব শক্তিরূপ পরিচালনায় এক একটি কাণ্ড সম্পন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু অসুখম মহিমশালী পুঙ্খ-রক্তেরা সংসারে স্বেদে অদ্ভুত কণ্ঠ যে সাধন না করেন, তাহা বলা যায় না। ভাষিয়া দেখে দেবি, গোড় হইতে কাম্বীর কত স্তবীর্ষকালের পথ! আর মৃতপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিক অস্ব-রাগই বা কিরূপ! স্বতরাং তৎকালে গোড়-বাসীরা যাহা করিয়াছিল, তাহা বিধাতারও অসামর্থ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৎকালে রাজাদের ঐ প্রকার ভৃত্যত্ব প্রায়ই মিলিত। ঐ সকল ভৃত্য প্রতি কণ্ঠেই আলৌকিক প্রভুক্তির পরিচয় দিত। সেই রাক্ষসের ভাষ ভীষণ গোড়বাসীদের সহিত ভুল যুদ্ধকালে কাম্বীরনাথের অতিপ্রিয় ভগবান পরিহাসকেশব রামধামী-বিগ্রহের বিনিময়ে রক্ষিত হইয়াছিল। এখানি রামধামীর মন্দিরটি

* Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. VII.

† Cyclopaedia of India by Balfour, Vol. I, Page 1183.

‡ Wheeler's History of India, Vol. IV, Part I, P. 45.

§ Barros; Vol. VI, III.

চক্ষু ছলিয়া ফেলিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে অবস্থায় মূল সাংগৃহীত হয় এই অবস্থায়ই উহা শুদ্ধ করিয়া মজুত করা উচিত। মূল-গুলিকে মাচার উপর অঙ্কত করাই সম্ভব। মৃত্তিকার উপরে রাখিলে মৃত্তিকার আচ্ছাদিত দ্বারা উহা পচিয়া যাইতে বা অসময়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে।

চাইনী, আচার ও মোরকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে অর্ধপঙ্ক মূলই সাগ্রহ করিতে হইবে। অর্ধপঙ্ক মূলই এই কাণ্ডের উপযোগী।

সিংহলে রপ্তানির জন্ত যে আদা মজুত করা হয় উহা হুইটি প্রণালীতে প্রস্তুত। প্রথম প্রণালীতে মূলের বাকল চাছিয়া ফেলিয়া ও দ্বিতীয় প্রণালীতে উহার বাকল রাখিয়া শুদ্ধ করা হয়। প্রথমোক্ত প্রণালীতে বাকল ফেলিয়া উহা জলে সিদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয় প্রণালীতে বাকলযুক্ত মূলকে জলে দৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মজুত করা হয়। প্রথম প্রণালী অবলম্বনে যে মূল প্রস্তুত হয় উহাকে অকস্মী (peeled or coated)-মূল ও দ্বিতীয় প্রণালীতে যে মূল প্রস্তুত হয় উহাকে বকযুক্ত-মূল (unpeeled or uncoated) কহে।

আদার চাষে কিরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা

আদার চাষে যে বিশেষ লাভ আছে, তাহা নিম্নলিখিত বসন্ত দ্বারা উপলব্ধি হইবে—

“যদি পুঁতলি আদার গুন্ডো,

তবে নাকে তেল দিয়ে খুঁয়ো।”

অর্থাৎ যদি আদার গুন্ডো (মূল) একবার মৃত্তিকাতে রোপণ করিত পার, তাহা হইলে সমস্ত বৎসর নাকে তেল দিয়া খুঁয়াইলেও তোমার অন্নকষ্ট হইবে না।

আজকাল এদেশ হইতে বিদেশে প্রচুর পরিমাণ আদা রপ্তানি হইয়া থাকে। ইংরাজী ১৯১১-১৯১২ সনে ভারতবর্ষ হইতে বিশ লক্ষ বিঘামিস হাজার টাকার আদা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। সাধারণতঃ জালা বা কাঁঠের পিণায় আদার মূল বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

প্রতি বিঘায় ২০০০ পাউণ্ড হইতে ২৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৫/ মণ হইতে ৩১/ আদা জন্মিয়া থাকে। কোন জমিতে ৪০/ পর্যন্তও জন্মিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট আদা প্রতিমণ ৫- হইতে ৭০ টাকা দরে বিক্রয় হয়। গড়ে প্রতি বিঘায় ২৫/ মণ উৎপন্ন দ্রিলে ১২৫০ টাকা হইতে ১৮৭০০ টাকার আদা উৎপন্ন হয়। উহা হইতে চাষের ব্যয় নিয়ে এধর্মিত হইল—

ব্যয়ের হিসাব

১। ভূমির বাজনা ১/ বিঘা	২/
২। চাষের ব্যয়	১৭/
৩। বীজ আদা ৬/ মণ প্রতিমণ	
৭০ টাকা দরে	৪২/
৪। ফসল-সংগ্রহের ব্যয়	৩/
৫। উহা শুদ্ধ ও মজুত করার ব্যয়	৬/
	৭০/

হিসাব মত ৭০ টাকা বাদ দিলে প্রতি বিঘায় নিট লাভ ৫৫ টাকা হইতে ১১৭০ টাকা হইতে পারে। লওনে এক হক্টে-ওয়েইট অর্থাৎ ১১৪ (একমণ চৌদ্দ সের) আদার মূল্য ৩০- হইতে ৫০- টাকা হইয়া থাকে। স্বতন্ত্রাৎ বিদেশে ইহার রপ্তানীর বন্দোবস্ত করিতে পারিলে প্রাকৃত লাভের সম্ভাবনা। অতীত জ্যামেসকা দীপে বহুল পরিমাণে আদার চাষ হইতেছে।

জ্যামেসকার আদা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। জ্যামেসকার ছায় ক্ষুদ্র বীণ হইতে প্রতি বৎসর ২৩ লক্ষ টাকার আদা বিদেশে রপ্তানি হয়।

একগু লাভজনক কার্যের দিকে এদেশের শিক্ষিত সর্বাঙ্গের নৃপতি নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। একগু লাভজনক কার্য থাকিতেও ভারতবাসী পরের গোলামী করিতে কিছুই লজ্জা বোধ করে না, ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়! যাহার ২০/ বিঘা জমি আছে সে আদায়সে তৎসংগু ফসল যাক ঘরে বসিয়া যথেষ্ট কান্দিপাত করিতে সক্ষম। যদি এ কার্যও ভারতবাসীর ভাল না লাগে তবে তাহারের চিরস্থায় অবস্থা নাই।

এদেশে আরও ২৩ জাতীয় আদা দুটিগোচর হয়। উহারের চাষ-প্রণালী ও উপকরণ জাতির ভায়ে। উহার কোন বিশেষ কার্য গাঢ়ন করে না। তৎপুণি উহারের নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণ আদা—Ginger Nigra—Black Ginger—ইহার গাছ ও মূল আদার ভায়ে। পাতা ও কাণ্ড ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। মূলের অভ্যন্তরও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ। ইহার চাষ-প্রণালী ও আদার ভায়ে। এদেশে কেহ ইহার চাষ করে না। কেমনা ইহার ব্যবহার নাই। এদেশের বন-জঙ্গলে ইহা স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে। ইহা কখন কখন ঔষধে ব্যবহৃত হয়। আমি গো-চিকিৎসায় দেশীয় অণুবীতিক মুবিবাদিগণকে ইহা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। ইহার ফলন অত্যধিক। অজ্ঞ একগু কৃষ্ণ আদা আছে, উহার গাছ দেখিতে হলুদ গাছের ভায়ে। কিন্তু মূল আদার ভায়ে। মূল ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ।

প্রাকৃত পক্ষে ইহাকে কৃষ্ণ আদা না বলিয়া কৃষ্ণ হলুদ বলাই সম্ভব। ইহাও কোন কোন সময় ঔষধে ব্যবহৃত হয়। মূল-বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়।

আমাদা—Mango-scented Ginger—ইহার দেশীয় নাম আমাদা; হিন্দী নাম অঁখিরা হলুদ; গুজরাতি নাম অঁখা হলুদ; কর্ণাটী নাম হলী আরসিন্; তৈলঙ্গী নাম কর্ণাটী পায়লু ও মারহাটি নাম আবেঁ হলুদ। ইহার ক্ষুদ্রতম নাম আঙ্গুদিহিরা। ইহার গাছ ও মূল হলুদের ভায়ে। পাতাও হরিত্রায়। ইহার গাছ কাঁচা আমের গন্ধের ভায়ে। মূলে নাগসেনে বর্ণ ঈষৎ হলুদ। কেহ কেহ ইহাকে আম-হলুদ নামেও অভিহিত করেন। প্রাকৃত পক্ষে ইহা হলুদজাতীয় গাছ। অতলে ও মিঠাই স্বপক্ষ করার জন্ত ইহার মূল ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ দাল ডালনাতেও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার মূল দ্বারা প্রস্তুত সন্দেপের নাম আম-সন্দেপ। ইহার চাষ-প্রণালী হলুদের ভায়ে।

ইহা, তিক্তার কষায় রস, কচিগ্রদ, লঘু, অগ্নি-লীপক, উষ্ণবীৰ্য ও সারক। ইহা কফ, উগ্রব্রণ, কাস, শ্বাস, হিকা, জ্বর, মুখরোগ, বক্‌শেদ, বায়ু ও প্লুরোগনাশক। মূল-বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়।

রাজপত্তাঙ্গ আদা—Zingiber Variegata—Variegated Ginger—ইহার পাতা ও মূল আদার ভায়ে। পাতা আদা অপেক্ষা গর্ভাকৃতি ও আদার পাতা অপেক্ষা বিস্তারবশিষ্ট। পাতা শ্বেতাভ স্বর্ণ বর্ণে চিত্রিত। মণ্ডপে জন্ত ইহার চাষ হয়। ইহা চাষের উপযোগী। গাছ দেখিতে বড়ই হৃদয়। গুণে, ঘরের বারান্দায় ও রোয়াকে ইহা রমণীয় শোভা দাখল করে। মূল বিভাগ দ্বারা ইহার গাছ উৎপন্ন হয়। উদ্ভাবনের শোভা বর্ধন-ভিন্ন অজ্ঞ আদা কার্যে ইহার ব্যবহার আমি অবগত নাই। আমার বাগানে ইহা জঙ্গল গাছের ভায়ে জন্মিতেছে।

আদিশ্বরচন্দ্র গুহ।

প্রাচীন কথা

(উপানন্দ) হইতে উদ্ধৃত)

বাঙ্গালীর বীরত্বাধা এক্ষণে উপকথায় পরিণত হইয়াছে। ইংরাজের বদ্বাদিকারের পর লর্ড মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র অত্যন্ত নিকট বর্ণে চিত্রিত করেন। তদবধি বাঙ্গালীরা শৌৰ্য্যবীৰ্য্যসম্পন্ন মহাযুগপদবাচ্য বীরজাতির নিকট ঘৃণাই হইয়াছেন। হতভাগ্য আমরা সেই কলঙ্কমোচনের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া অধিকন্তু মেকলে বর্ণিত অপবাদের পোষকতামূলক ভীকতার পরিচয়ই অনেক সময়ে প্রদান করিয়া থাকি।

কেবল মেকলের কথাই বা বলি কেন? লর্ড মেকলে হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড কর্জন পর্য্যন্ত আমাদিগের মানি করিতে ক্রটি করেন নাই। বাঙ্গালীর ভীকতা এক্ষণে যেন প্রাবল্যরূপে যথা তুণ্য প্রচারিত হইয়াছে। আমাদিগের দুর্বলতার ও ভীকতার কথা অবগত হইয়া দুঃখগত কাবুলীরাও বন্দের নগরে, গ্রামে এবং পল্লীতে পল্লীতে স্ত্রীভাচার করিতে আরম্ভ করিতেছে। এক কলঙ্ক বৃদ্ধি আর ঘৃণিত্যের বাহ।

বস্তুতই আমরা দুর্বল, ভীক ও কাপুরুষ হইয়াছি। আমাদের শরীরে শোণিত নাই, বাহ্যতে বল নাই, স্বরূপে তেজ নাই, মনে ক্ষতি নাই। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্রেপেণ্ডীকৃত দারিদ্র্যাদুঃখক্লিষ্ট, ত্রিভাণ্ডে সম্ভাপিত আমরা—জগতের মধ্যে যেন ঘৃণ্যজীবের ভায় অবস্থান করিতেছি। যাহারা পদমুখে দাঁড়াইতে পারে না, পরের সাহায্য না পাইলে আশ্রয়লাভ করিতে চাহে না, তাহাদিগের জীবনে বিক। শক্তির, মহাহতভব ইংরাজরাজ

যদি আমাদিগের রাজা না হইতেন, তাহা হইলে আমাদিগের হয়ে হৃদয়শাসী থাকিত না। ঐ যে ফাবুলী দেশদেশান্তর অতিক্রম করিয়া দলে দলে বন্দে আসিতেছে কেন তাহা জান? ভারতের এত দেশ থাকিতে উৎসাহিগের লোলুপদৃষ্টি বন্দের উপর পতিত হইয়াছে কেন তাহা জান? মাস্ত্রাজ, বোম্বাই, পাঠাব, ফ্রুক ও মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার প্রভৃতি প্রদেশের কোন স্থানে না যাইয়া বাঙ্গালায় তেজ্জ্বলিত করিতে কেন আইসে, তাহা জান? আমরা ভীক কাপুরুষ বলিয়া।

কিন্তু চিরকাল এমনই ছিল না। আবহমান কাল আমরা এবংধি কাপুরুষতার ভাব প্রদর্শন করি নাই। এমন দিন ছিল, যে দিন বিদেশী ও বিদ্রম-বিফারিতনৈজে আমাদিগের বল, শাস, বুদ্ধিমত্তা ও বিভাবতার প্রতি চাহিতে বাধ্য হইয়াছিল। হায়, সেদিন কোথায় গেল, কেন গেল?

বাঙ্গালী যে চিরদিন এমন ছিল না, তাহার কুবি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমান রাজস্বকালে,—দেশে যখনই অরাজকতা উপস্থিত হইত—তখনই যে বাঙ্গালী লড়াই করিয়াছে, ক্যাননের গোলা বুক পাতিয়া দরিয়াছে, তাহার বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল মুসলমান-শাসনকালই বা বলি কেন, তাহার বহুপূর্বে বাঙ্গালী যুদ্ধ করিয়া প্রবিনতনামা হইয়াছিল। ইহা আমাদিগের স্বকপোলকল্পিত কথা নহে, ইতিহাস-বর্ণিত আভ্যন্ত সত্য ঘটনা।

কেহ হয়ত এমন প্রশ্ন করিতে পারেন হু, 'হইতে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীতে উৎকর্ণ বর্ধ বলিতে বর্ধমানকালে যে বাঙ্গালার দেশে বৃদ্ধা যায়, তাহাই প্রকৃত কি? হিন্দুশাস্ত্রে বর্ধদেশের যে বিবরণ, প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদেবদ্বাসীদে, বাঙ্গালী বলাই সম্ভবপর। হুতরাং সে বাঙ্গালীর সহিত এ বাঙ্গালীর অনেক পার্থক্য আছে। এ বাঙ্গালী যে বীরজাতি ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়?

এখন দেখা শাড়ি, শাঙ্গে বন্দের সহিত কোন কোন দেশের উল্লেখ ছিল। শব্দকল্পক্রেমে "বদন" শব্দে অর্থে লিখিত আছে "ললশবিশেষে পুংলিঙ্গ। ইতি মেদিনী। স তু প্রাচীনদেশান্তরভবিশেষঃ। যথা। অঙ্গ-বদনমঙ্গুস্কপা অন্তর্গিরিবহিঃগিরাঃ। ইত্যুপ-ক্রম্য। শাধা মাগধগোনদীঃ প্রাচ্যাঃ জনপদাঃ স্তুতাঃ। ইত্যন্তঃ মন্ত্যপুরাণম্। মতন্তুরঃ যথা। আর্যেযামবদপাপবন্ধপুত্রপারকোথলাঃ। কলিঙ্গৌদ্ধ কলিঙ্গাবিদগুপ্তবরাদয়ঃ। ইতি জ্যোতিষতত্ত্বকৃত্যচক্রবর্তনম্। তন্ত সীমা যথা। রত্নাকরঃ সমারভ্য ত্রুপ্তজ্যোতিষ শিবে। বদনেনো ময়া প্রোক্তঃ সর্গসিদ্ধিঃ প্রশমকঃ। ইতি শক্তিসম্বদ তন্ত্রে ৭ম পটলঃ।

প্রসিদ্ধ ভাষ্যত্ববিদ, পরমশক্তি, গ্রিয়ারসন সাহেব "ভারতবর্ষীয় ভাষা সমীক্ষণ" নামক পুস্তকে বঙ্গভাষার আলোচনাকালে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকট করিয়াছেন। "ইহা নিম্ন বঙ্গ বা কবীরের ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের ভাষা। সংস্কৃতে শূর্য ও মধ্য বঙ্গই বঙ্গ নামে প্রখ্যাত, কিন্তু অধুনা মতব্রত বঙ্গভাষা কথিত হয়, সেই সমস্ত স্থানকেই বাঙ্গালা বুলে। ইংরাজী "বেঙ্গল" হইতে "বেঙ্গলী" প্তি হইয়াছে। "বঙ্গলম্" শব্দ তাহার

হইতে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীতে উৎকর্ণ একটি প্রশ্নটিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই আরবিক ভাষার "বাঙ্গালার" উৎপত্তি। আরবিক হইতে পাণ্ডুর ভাষায় ইহা প্রবেশ লাভ করে। আইন-আকবরীতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন 'নামি আমলি বাংলা বঙ্গ' অর্থাৎ বাঙ্গালার আসল নাম বঙ্গ।

সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যখন 'বদন' শব্দ পাওয়া যাইতেছে, তখন বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? আবুল ফজলের মতে বঙ্গের চতুর্দিক তখন "ভাল" বা উচ্চভূমি দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল বলিয়া "বঙ্গাল" শব্দ উদ্ভূত হয়। বাঙ্গালা তাহারই অপভ্রংশ।

আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ গতিতেরা কিন্তু আবুল ফজলের এই মত স্বীকার করেন না। উৎসাহিদেগের মতে বঙ্গ+আলর হইতে বঙ্গালর উৎপন্ন হয়। তাহার অপভ্রংশ বাঙ্গালা সম্ভবী বলিয়া বাঙ্গালী হইয়াছে।

এই ত গেল "বঙ্গের" কথা। তাহার পর গৌড়ের কথা ধরুন। শব্দকল্পক্রেমে গৌড় অর্থে লিখিত আছে "বনামধ্যাতদেশ"। উৎকর্ণে পুংলিঙ্গ। ইতি জ্যোতিষ। তদেব-সীমা যথা—বঙ্গদেশঃ সমারভ্য ভুবনেশ্বরাভ্যঃ শিবে। গৌড়দেশঃ সমাধ্যাতঃ সর্গবিদ্যা-বিহারঃ। ইতি শক্তিসম্বদ তন্ত্রে সম্বদঃ পটলঃ। পঞ্চ গৌড়া যথা—সারবতাঃ কান্তকুজাঃ গৌড় মৈথিলকোংকলাঃ। পঞ্চ-গৌড়া ইতি যাতা বিজ্ঞাতান্তরবাসিনঃ, ইতি স্বপ্তপুরাণম্।

স্বপ্তপুরাণের মতে সারবত, কান্তকুজ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকর্ণ পঞ্চ গৌড় নামে

আখ্যাত। কিন্তু ইতিহাসে পঞ্চ গৌড় ভিন্ন-
রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র,
বঙ্গ, বাগরি এবং মিথিলা।

যাহা হউক, আমরা এ প্রবন্ধে পঞ্চ গৌড়ের
সীমান্তা করিতে বসি নাই। পঞ্চ গৌড় যে
ছিল, তাহা কেবল রাজতরঙ্গিণীতেই প্রকাশিত
নহে, বিজাপতিও এই পঞ্চগৌড়ের নামোল্লেখ
করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কবিতার
ভণিতায় তিনি লিখিয়াছেন—

“চিরস্বীকৃত পঞ্চ গৌড়েশ্বর করি
বিজাপতি ভণে।”

এখন দেখা যাউক, বিজাপতি কত দিনের।
তিনি যে বিসমীগ্রাম পাঁছিয়াছিলেন, তাহাতে
প্রকাশ, উত্তরে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ
ভাগে জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে
তিনি বঙ্গ মুসলমান আগমনের পরে যে উদ্ভূত
হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

গ্রীক ইতিহাসিক টলেমী ও ষ্ট্রাবো তদীয়
এইহে সেন্দুকসের অভিযান-বর্ণনায় গৌড়ের
নামোল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে
চীন পরিব্রাজক হিয়াৎমাং গৌড় ভ্রমণ
করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে জয়্যাপীড়
কর্তৃক পঞ্চগৌড়-জয়ের কথা লিখিত আছে।

হট্টার সাহেব বলেন, “Gour is of
primeval antiquity, as is shown
by the existence and traditional
dignity of the Gouriya Brahmins;
but it is probable that the name
was more strictly applicable to the
kingdom than to the city.” *

ম্যাকলবের ‘সাইক্লোপডিয়া অফ ইণ্ডিয়া’
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে গৌড় লিখিত আছে, গৌড়ের
নামোল্লেখ মহাভারতে এবং নবম শতাব্দীর
ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গৌড়মাঝাঘের বিস্তার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক
হুইলার বলেন, ঐ প্রাণগ হইতে ঐক্ষপুত্র নদ
পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড গৌড়রাজ্যভূক্ত ছিল।

প্রাচীন শাস্ত্রী ও তদগণ্য আননিক
ইতিহাসগোষ্ঠ প্রতীয়মান হয় যে, গৌড়বাসীরা
ইতিহাসবিশিষ্ট বলবিদ্যাধীন্দ্র সমাজাতি
ছিলেন। নতুবা গৌড়দেশের নাম শাস্ত্রাধিতে
ও ইতিহাসাদিতে স্থান পাইউ না।

বাহালীর বীরত্বের কথা পাশ্চাত্যভ্রমণ
১৪২২-১৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়।
পৃষ্ঠপুর্নের রাজধানী লিসবন নগরে বারোদ
সাহেবের বই পুস্তক ঐ প্রকাশিত হয়, তাহাতে
লেখা আছে,

“In the defence of the bridge
died three of the king's captains
and Tuam Bandom, to whose
charge it was committed, a Bengali
(Bengala) by nation and a man
sagacious and crafty in stratagem.”

ইহার মর্ম্মাৎ, “সেতুবন্ধার রাজার সৈন্যজন
সেনানী এবং তুয়ামবন্দম নামক জট্টক
কৌশলী ও চতুর বাঙ্গালী (ইহারই হস্তে
সেতুবন্ধার প্রধান ভাণ্ডার অর্পিত হইয়াছিল)
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।”

পৃষ্ঠপুর্নলেখক বাঙ্গালীর নামোল্লেখ
করিতে গিয়া একটা অদ্ভুত নামের স্থিতি

করিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি যে বাঙ্গালী
ছিলেন, তাৎপর্য্যে কোন সংশয়ই নাই। তুয়াম
শব্দের অর্থ বোধার্থী হইল না। বন্দাম শব্দ
হইতে অনুমান করা যায় তিনি সম্ভবতঃ
“বন্দীযাচীর” ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তাহার পর কলনকৃত রাজতরঙ্গিণীর
চতুর্থ তরঙ্গে ললিতাদিত্যেরও জয়্যাপীড়ের
রাজত্বকালে গৌড়জয়ের কথা লিখিত আছে।
পাঠকের কৌতুক-নিবৃত্তির নিমিত্ত রাজ-
তরঙ্গিণী হইতে শ্লোকগুলি এবং তৎসমুদয়ের
মর্ম্মাভিধান নিয়ে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে
আমিলাম না।

“তিনি (ললিতাদিত্য) পরিহাসকেশব নামক
বিগ্রহটিকে প্রতিভূবরূপে, রাধিখা ত্রিগ্রাম
কিনিত উগ্রপ্রসিকের-নিবৃত্তিযে গৌড়বিপ্লবকে
বধ করিয়াছিলেন। সে সময়ে গৌড়পতি
অষ্টচন্দ্রবর্গের অদ্ভুত বিক্রম পরিলক্ষিত হইয়া-
ছিল। তাহার পরলোকগত রাজার শোক
বিস্মৃত হইতে না পারিয়া রাজার হত্যার
প্রতিশোধ-প্রদানার্থে কাম্বীর-সেনার সহিত
যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। প্রথমে
উহার (গৌড়ীয়, দৈত্যগণ) শারদা দেবীকে
দর্শন করিবার ছলে কাম্বীরে প্রবেশ করে
এবং সকলেই এককালে মধ্যম পরিহাস-
কেশবের মন্দিরটি আক্রমণ করিয়াছিল।
কাম্বীরপতি দ্রুতদোষে আছেন, এই সন্বেশে
প্রভুত্বাভিমান কোষে অশ্রু গৌড়বাসীরা
পরিহাসকেশবকে কাড়িয়া গাইতে প্রবেশ
করিতেছে দেখিতে পাইয়া তথাকার পৃষ্ঠকরা
পরিহাসকেশবের মন্দির-স্থার বন্ধ করিয়া
ফেলিল। তখন বিক্রমশালী গৌড়ীয়ে
রজতময় ঠামশ্যামী-বিগ্রহকেই পরিহাসকেশ-
বকে আক্রমণ করিল এবং তাহাকে উৎপাদন
পূর্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। ঐ সময়ে

কাম্বীর-সৈন্যেরা নগর-হইতে বাহির হইয়া
উগ্রাধিকারকে নানাবিধ কঠিন প্রহারে বধ
করিতে থাকিলে উহার রামশ্যামীবিগ্রহকে
তিল তিল করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করত চতুর্দিকে
নিষ্ক্ষেপ করিল। সেই ক্রমকায় গৌড়বাসীরা
কাম্বীর-সেনার হস্তে নিহত হইয়া যখন
রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইতে লাগিল,
তখন ব্যথ হইতে লাগিল যে, গৈরিকাদি
বাঙুর রসে রক্ষিত অজ্ঞান-গিরির স্তম্ভ-ও প্রস্তর-
গুণ্ডগুলি বসিয়া পড়িবেছে। তাহারদিয়ে
দেহনিঃসৃত শোণিতপ্রবাহ তাহারদিয়ে
অতুলনীয় রাজত্বকিকে অধিকতর সমুজ্জল
করিয়াছিল, এবং ধর্ম্মকিকে অধিকতর শ্রীপদ্মা
করিয়াছিল। বজ্রমণি বীরক হইতে বজ্রপাত-
কিনিত বিধব দূর হয়; পল্লরাগণিণী হইতে
কেবল সম্প্রদায় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং গুরু-
মণি হইতে নানাপ্রকারের বিষই নষ্ট হয়।
এই রক্তগুলি বিধাতার নিয়োজিত স্ব স্ব
শক্তি, পতিতালনাথ এক একটা কার্য্য সম্পন্ন
করিয়া থাকে, কিন্তু অল্পময় মহিমশালী পুরুষ
রত্নেরা নগরে স্তোম্য অদ্ভুত কর্ম্ম যে সাধন
না করেন, তাহা বলা যায় না। ভাবিয়া দেখ
দেখি, গৌড় হইতে কাম্বীর কত সূর্য্যবিক্রমের
পথ। আর মৃতপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিক অশ্রু-
রাগুই বা বিক্রম। স্বতরাং তৎকালে গৌড়-
বাসীরা যাহা করিয়াছিল, তাহা বিধাতারও
অমায়িক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৎকালে
রাজাদের ঐ প্রকার ভৃত্যভার প্রায়ই মিলিত।
ঐ সকল ভৃত্য প্রতি কন্ঠেই অলৌকিক প্রভু-
ভক্তির পরিচয় দিত। সেই রাক্ষসের ভ্রায়
ভীষণ গৌড়বাসীদের সহিত তুমুল যুদ্ধকালে
কাম্বীরনাথের অতিপ্রিয় ভগবান পরিহাস-
কেশব রামশ্যামীবিগ্রহের বিনিময়ে রক্ষিত
হইয়াছেন। অত্যাচার রামশ্যামীর মন্দিরটি

* Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. VII.

† Cyclopaedia of India by Balfour, Vol. I, Page 1183.

‡ Wheeler's History of India, Vol. IV, Part I, P. 45.

§ Barros; Vol. VI, III.

যেমন একটিকে দেবতাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, তেমনই সেই গৌড়ীয় বীরদিগের অস্তুত যশে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে।” *

ললিতাদিত্যের পর কাশ্মীরপতি জয়াপীড় যখন পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমন করেন, তখন জয়ন্ত গৌড়ের অধিপতি। কল্লন জয়ন্তের শাসন-বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন—

“তন্মিন্ গোরাঙ্কারমাভিঃ

প্রীতঃ পৌরবিকৃতিভিঃ।

লাতুঙ্গ সঙ্কটমাবিশং

কার্তিকেয়-নিকৈতনম্।”

ইহার মর্মার্থ “তথায় স্বশাসনের ফলস্বরূপ অসাধারণ ঐশ্বর্যলাভ হইয়াছিল, তদধিনে জয়াপীড় অত্যন্ত প্রীতলাভ করিয়াছিলেন এবং নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত কার্তিকেয়ের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।”

পৌণ্ড্রবর্ধন তখন জয়ন্তের রাজধানী ছিল। গৌড়ে পাচজন নরপতি ছিলেন।

রাজত্বদ্বিগীর বিবরণ পাঠে উৎসর্জিত হয়, গৌড় যে সময়ে সমুদ্রকুলী ছিল। গৌড়বাসীরা কেবল যে নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন

তাঁহা নহে, তাঁহার বিদ্যাসী, প্রভুভক্ত, উদ্যম-শীল, অধ্যবসায়ী, কষ্টগ্রহীত্ব ও বুদ্ধিমান ছিলেন। বাঙ্গালীর এত গুণ এক্ষণে কোথায় বিলুপ্ত হইল?

ভাষার পর লক্ষ্য সেনের সময়ের স্রবস্থা দেখিলে দেখুন। বস্ত্রিয়ার খিলিজী সৌদ্রিণ-প্রশাসনশালী ইংরাজ উঠিয়াছিলেন। কায়স্থ তাঁহার প্রতাপে ক্ষমতাধরে পতিত হইল। সকলেই ধরহরি কল্মাশ। এহেন পরাক্রান্ত মুসলমান যোদ্ধা পুঙ্খ কিন্তু প্রকায় তাবৎ বর্ণসাজে গৌড়ে প্রবেশ করিতে নাহাঁই হইলেন না। তিনি অর্থব্যবসায়ীর দ্বায়ে ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ প্রহস্তুভাব পরিহার করিলেন। এই আকস্মিক বিপদে চকিত প্রহরীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে কাননমধ্যে লুক্কায়িত মুসলমান-সৈন্য দলে দলে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অশ্রুতিপর নরপতির পলায়ন ব্যতীত গতাস্তব ছিল না। কিন্তু ইহার পরেও—বস্ত্রিয়ারের গোড়াধিকারের বহুবৎসর পরেও—পূর্ববঙ্গে হিন্দু নরপতি আপনাদিগের অধিপত্য অঙ্গুর রাখিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্ত্রিয়ারের শমন-সময়েও কায়স্থরূপতির বলবিক্রম অটুট ছিল বলিলে অজ্ঞানি হয় না।

মুসলমানদিগের দীর্ঘকাল শাসনের ফলেও বাঙ্গালী হীনবীর্য হয় নাই। প্রতাপশূন্যতা, শীতারাশ্ম প্রভৃতি তাহার পরিচয়স্থল। বার-জগার, কাঠি এখনও বিন্ধতির অন্তলজ্জলে নিমজ্জিত হয় নাই। তাহার পর ইংরাজের আমলের প্রারম্ভাবস্থা। বৈষম্য-বিস্ত্রোহের সময়েও বাঙ্গালীবীর্যের শেষ ক্ষুদ্রিক পরি-লক্ষিত হইয়াছিল।

এখন ক্রমে ক্রমে সমস্তই বিলুপ্ত হইতেছে। ইংরাজের স্বশাসন-গুণে সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত। বলপ্রকাশের কাহাও কোন আবশ্যকতা হয় না। ইহার উপর পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাসম্মততা বিলাসিতা আমাদিগের অস্থিহাজ্য প্রবেশ করিয়াছে। তজ্জন্মই আমরা ক্রমশঃ আপনাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হুলিতে বসিয়াছি।

যে গুণে আজি ইংরাজ পৃথিবীপুঞ্জিত, সর্বজনমাত, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ইংরাজের সে গুণ-গ্রহণে আদৌ সচেষ্ট নহি। ইংরাজের দ্বারপ্রদত্ত, আন্তোদ্ধারদত্ত, সংসাহস, তেজঃশক্তি, উদ্যমশীলতা আমরা অঙ্কুরণ করিতে শিবি নাই। স্বর্ণায়ুর্জি এলু রায়ে কণায় বলিতে হয়, আমরা ইংরাজধ্বংসে কাঠি, বিলাতিবরণে ছাদি, ছাটিকোট পরিয়া বীর সাজি, বাবু বলিলে চটি, কিন্তু ইংরাজের সংগুণের এক কণারও অধিকারী হই না। যে স্বাবলম্বনে বলে ইংরাজজাতি আজি মৃত, গণ্য, বরণ্য, সে স্বাবলম্বন আমাদিগের আছে কি? তাই বলি, যতদিন না আমরা বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে শিবি, আত্মনির্ভরতা অহুশীলন করি, জাতীয় স্থানানু মনুষ্যত্বের পূজা করিব, ততদিন আমাদিগের লুপ্ত যশের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়।

ভারতের নিজস্ব শিল্প-পদ্ধতি *

আমাদের দেশে এখন একটা শিল্প-বিপ্লবের মূগ্ধ চলিতেছে। ভারতের নেতৃবর্গ জাতীয় চমকিত বুদ্ধির নিমিত্ত মতিভ্রম চালাইয়া করিতেছেন। প্রতিভাবান বিধানেরা ভারতীয় সমাজের উন্নতিকল্পে উত্তীয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য একটিকে—প্রথাবিত। ভারতবর্ষকে একটা শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করিতে অথবা তাঁহার অত্যন্ত

বাগ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে অনেক যুবক শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন আরম্ভ করিয়াছেন। দেশের স্থানে স্থানে নৃতন নৃতন কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নৃতন নৃতন শিল্প-বিদ্যালয়-স্থাপনের জন্ত হুতুল আন্দোলন চলিতেছে। এই সময় একটা কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। কথাটা এই—ভারতও ইউরোপের আদর্শ এক

* “বস্মাৎ বৎ স মধ্যঃ ঐপরিহাসকেশনম্।
গৌড়োদ্ধারীনিদানীং সম্যতাস্তুতঃ ততঃ।
শারদাশ্রমনিবাসঃ কাশ্মীরী সখ্যনিযতে।
দিগন্তরূপে ভূপালে প্রবিক্রমকো তনুঃ।
তে রামধামিনঃ প্রাণা রাজতঃ বিলম্বজিতাঃ।
তিলকঃ তিলঃ তঃ কৃতা চ চিকিৎসবিক্রমঃ সর্বতঃ।
শ্যামবারকুলসিন্ধোৎপন্নং নিহতা ভূমি।
ভরীয়া কবিরাসাঃ সমস্তবল্লীকৃতাঃ।
ধামিত্যজিতরামাভ্যঃ ধর্মো ভোগঃ বহুধরঃ।
বল্লীকৃতঃ ভরঃ বিমতিতঃ প্রিয়রাজ্যবোদানাকারমণি প্রণাম্যত বিতঃ পাক্ষত্বভরনয়নঃ।
এককঃ স্রিতঃ প্রভাবানিবাৎ কপ্তেতি রতঃ।
পূরঃ পূরঃ পুনঃপুনঃপ্রসন্নোৎসাহঃ।
কিঃ সাধাতে।
ক দীর্ঘকাল ললোকাংশা শায়ে ভক্তিঃ ক চ প্রভো।
গীত্বাতুরাশায়াঃ তম মম গৌড়বিরহিতঃ ততঃ।
লোকোত্তর-সামিত্যিকপ্রভাবানি পদে পদে।
তানামনি তবাহুনঃ ভক্তজ্ঞাননি সূচ্যতঃ।
রাজঃ স্রিয়োরশিত্যোঃ পৌড়সাপ্রসববিমলঃ।
রামধাম্যপারোষঃ ঐপরিহাসকেশনম্।
অবাসি দৃশ্যতঃ পূজঃ রামধাম্যপূজাশ্রমঃ।
ব্রহ্মাণ্ডঃ গৌড়ীয়াধাঃ সন্যাসঃ সন্যাসঃ পূজঃ।

* ইংরাজী মানিকপুত্র “Dawn” এ প্রকাশিত Major Keithএর প্রথম অবলম্বন।

নয়; ইউরোপের প্রদর্শিত পথে ভারতাস্থার অভিব্যক্তি অসম্ভব। যুবর আমেরিকার অঙ্করণও আমাদের চলিবে না। স্বতরাং কোন একটা বিষয়ে সর্বতোভাবে ইউরোপ বা আমেরিকার ছাঁচে নিজে কণ্ডিতা তোলা কি সমীচীন? উত্তরে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার অশ্বমেদন করিবেন এমন বিষয় আমাদের নাই। এখন প্রশ্ন, বর্তমান যে ভাবে শিল্পের আন্দোলন পরিসীমিত হইতেছে, তাহা কি প্রতীচ্যের অঙ্করণে নয়? অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে ইংলওও এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহার ফলে, পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে ইংলওর যৌর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল; কৃষি-প্রধান ইংলও শিল্প-প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভারতেও ক্রমশঃ সেইরূপ ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে নতুন নতুন অভাব সৃষ্ট এবং তাহার নিরাকরণার্থে নব নব শিল্প-প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন শিল্পের এখন আর আদর নাই। এদিকে বহিরাগন্তদের ফলে দেশের প্রাচীন গাছ-শস্ত্র বিদেশে নীত হইতেছে; দেশের লোক অনাহারে মৃতকর। স্বতরাং কর্তৃকার, কৃষক, তত্ত্বাবধ প্রভৃতি দেশীয় শিল্পীরা জাতীয় ব্যবসায় পরিচর্যা করিয়া নবীন শিল্পের সহায়তা-সাধনে যত্ববান। এমন কি, কৃষককুলও এই সমস্ত শিল্পোপযোগী ব্যবস্থারদানেই মনোনিবেশ করিতেছে। জাতীয় শিল্প ত ধ্বংসোন্মুখ। কিছুদিন পরে অল্প জুটাই ভার হইবে। ১৩০৪ সালেও বাঙ্গালদেশে টাকায় বিশ সের চাউল বিক্রয় হইত। এখন তাহা আমাদের নিকট উপভাসের গল্প মাত্র। সাদেশ্য গাঁর আমলে টাকায় আট মণের কথা ত পঞ্চাভীত হইত।

তাই, বলিতেছিলাম—এটা শিল্প-বিপ্লবের মূগ!

কোম বিশেষ পড়িতে মত উদ্ধৃত করিতে না পারিলে এখন কোন বিষয়ে আমাদের আস্থা জন্মে না। এখনই আমাদের আত্মবিশ্বাস! স্বতরাং বর্তমান ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে মেন্ডের কীধ নামক জৈনক ইংলণ্ডের সহ উক্ত করিতেছি। ইনি ভারতবর্ষীয় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের বহুদিন কাজ করিয়া গিয়াছেন।

কীধ সাহেব বলেন,—

“ইংলণ্ডের ভূরিতবর্ণের মধ্যে উন্নতি, বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা ইয়াত্রা দৃষ্ট্য-গুণের হস্ত এইত্রে এদেশ মুক্ত করিয়াছেন, চুরি ভাড়াইতি নিবারণ করিয়াছেন। ইংলণ্ড-রাজ্যের পূর্বে লোক-সংখ্যা এত বেশী ছিল না, প্রজাগণও স্বল্পমে জীবন-যাত্রা নিরীহ করিতে পারিত না। তাহাদিগকে নানা করতাবে সর্বদা পীড়িত থাকিত হইত। ক্রমে ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভবিত হইবে। জাতিসমূহের মধ্যে বেশ সম্ভাব্যের সঞ্চার হইতেছে; শিল্প-চর্চা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, শিক্ষাও প্রসার লাভ করিয়াছে। মোটের উপর গভর্নমেন্ট এখন মনে করিতে পারেন যে, প্রজাবৃন্দ বেশ স্বখে আছে। কিন্তু এক দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তুলনার ভিত্তিতেই তুল রহিয়াছে। মুসলমান-রাজত্বের পূর্ব-মুগের দিকে আমরা একবার লক্ষ্য করি না কেন? আমার মনে হয়, দশম শতাব্দীর সেই হিন্দু গোঁরবর্ষের শিল্পের সহিত আধুনিক যজ্ঞজাত শিল্পের তুলনা হয় না। তখন প্রত্যেকেই এই ব্যাপারে কিছু না কিছু সাহায্য করিয়াছিল। সেকালে বীথ, খাল ও

পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জলমাসনের বন্দোবস্ত হইত। ভারতের গনিজ-খাদ্ ফিনিমিয়ার জায় অতুল ঐশ্বর্য আনন্দ করিত। দাক্ষিণাত্যের তাত্ত্বিমিত্তি কাঠ-মন্দির তাহার দাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মধ্যভারত, মহীশূর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে বিপুল নৌকমুদ্র প্রচলিত ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক প্রভৃতিতে প্রচুর আয় হইত। এখানকার ব্যবসায়-বাণিজ্য তখন ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ইটালি পৃথক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কথিত আছে, রোমের এক শুল্কও বেশের মিনিমের এক পাউও স্বর্ণ পাওয়া যাইত। রোম-সম্রাট মন্থদাতাগণের মাতৃভাষায় ভারতজাত ব্রহ্মদি হইতে নিজের বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করিতেন। সম্রাট নোচকেরা রাজ্যের ঐশ্বর্য ধ্বংস হইতেছে, বলিয়া শব্দিযোগ করিত। দুরায়নের সামন্ত, রাজ্যগুলির মধ্যে কেবল ভারতবর্ষই তাহাকে স্বর্ণমুদ্রায় রাজস্বের দান করিত। অতি পূর্ব-কালে ভারত যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা শিল্পিনিপি ও অতীতকালের লোকপ্রিয় বড় বড় নগরসমূহ দেখিয়া ধারণা করা যায়। বর্তমানের সহিত অতীত ভারতের তুলনা করিতে গেলে মধ্যভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি উচিত। সেখানে হিন্দুগৌরবের নির্দশন আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমানেরা তাহা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। গাটিক জগত, ভারত-সমুদ্র প্রভৃতিতে যুগপূর্ব ৫০০ হইতে ২০০ অব্দের বিস্তার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরের ভগ্নাংশের মধ্যে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। এই সমস্ত নগরের প্রাচীর প্রায়ই বিশ মাইল

পরিধি-বিশিষ্ট। মধ্যযুগের ধর্মক্ষেত্র-রাজ-ধানীগুলিও অতীতের কত কীর্তিকাহিনী জাপন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিষ্টা বলিয়া গিয়াছেন, মামুদ যখন ১০১৬ অব্দে কেন্দ্র পৃথক অগ্রসর হন, তখন তিনি (মামুদ) এক অতুলনীয় ও অদ্ভুত সূর্য দর্শন করিয়াছেন। ইহা দৃশ্য ও গঠন গৌরবের সেকালে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই সমস্ত স্থিতি-স্বত্ব, অটলিকা, মন্দিরাদি ধনী বা নৃপতিবর্গের অর্থে নিশ্চিত হয় নাই, পঞ্চাশতের উহার প্রজাবর্গের সমৃদ্ধির নির্দশন। জনসাধারণের চেষ্টায় হিমালয় পর্বতের উপরিভাগে নগরকাটের যে মন্দির গঠিত হইয়াছিল, ফেরিষ্টা বলেন, স্থলতান মামুদ তাহা লুণ্ঠন করিয়া এত স্বর্ণ-রৌপ্য ও ধনসম্পদ অপরূপ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর কোন রাজকোষেও তত অর্থ ছিল না। মামুদ ১০০ মণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বরকাব, ২০০ মণ সোণার তাল, ২০০০ মণ রূপা, ২০ মণ অজ্ঞাত রত্নাদি এবং ১০০০ মণ ‘হিন্দীনা’ নামক স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া যান। ‘মুগুয়া’ ও সোমনাথের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে কনিংহাম, এলফিনষ্টোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরাও একরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন। মেন্ডের সাহেবের মতে—“বর্তমান সময়ে ভারত-সাম্রাজ্যের ক্ষতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক দাগমগে কারণ তাহারা ইহার অতি অগাধই ভোগ করে। ভারতের প্রকৃত ধনাজ্ঞানকারী—শিল্পী ও কৃষক-সমাজ। তাহাদের আজ ছুরবহার সীমা নাই। হিন্দুগণ চিরকাল

হস্তশিল্পে পারদর্শী। নূতন যুগের শিল্পবিদ্যা তাহার কিছুই জানে না। হস্তরাং হস্তই কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততই তাহারের অম্ম যারিবার ব্যবস্থা হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত শিল্পও উঠিয়া যাইতেছে। ফ্যাক্টরী, কারখানা-প্রভৃতিতে যতই কোন ক্ষুদ্র এবং পরিষ্কার কাজ হউক না, যতই কোন অস্বাভাবিক অর্থাৎ পুণ্য কক্ষক না, পুরাকালের শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে তাহার সম্পূর্ণ অক্ষম। পৃথিবীতে এমন কোন বসন-ময় কি আছে যাহাতে ঢাকার মসলিনের দ্বায় একখানা মসলিন প্রস্তুত হইতে পারে? যন্ত্রের দ্বারা জীবনশূন্য কৃত্রিম শিল্প আবিস্কৃত হয়; পুরাতন শিল্পে নূতন সৌন্দর্য্য-দানের ক্ষমতা তাহার নাই। কাঠ ও প্রস্তর-খোদাই ও ধাতুনির্মিত বাসনে নানাবিধ ছবি অঙ্কনের দ্বায় প্রকৃত শিল্পকর্ম কোনদিন কলে সাধিত হইবে না।" দেশীয় রাজত্ববর্গ, ধনী ও ক্ষমতাসালী ব্যক্তিগণ যদি চেষ্টা করেন, তবে এই সমস্ত শিল্পদ্বারা যথেষ্ট ধনাগম সম্ভব। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; তাহারের মধ্যে প্রধান কথা এই যে, যাহা এককালে হিন্দুদের পয়ম পৌরবের বিষয় ছিল সেই হস্তশিল্প, যন্ত্র ও ইলিন প্রচলিত হওয়াতে, উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। কোন দেশের শিল্প বাহাতে আভাবিক উপায়ে ও জাতীয় প্রণালীতে বিকাশ লাভ করে, তাহার জ্ঞান আপামর সাধারণ সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ভারত-গবর্ণমেন্ট হস্ত মনে করিয়াছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্কে আসিয়া এদেশের জনসাধারণের জাতীয় স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে এবং কালে এখানে পাশ্চাত্য শিল্পও প্রচার লাভ করিবে, কিন্তু আমাদের

বিখ্যাত এটা তাঁহাদের তুল্য ধারণা। অশিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যেও অনেককে বেশী পুণ্য-দেশী বস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে। বিলাতির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা অতি অল্প। কীথ সাহেব হিন্দুসমাজ ও সভ্যতার সংক্ষেপে হিন্দুর কলা ও শিল্পের ধর্ম্মিষ্ঠ সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন,—
“হিন্দুদের শিল্প তাহাদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গব্যাপী। হিন্দুরা একজনে পরিবারবদ্ধ সমাজবদ্ধ হইয়া বস করিতে ভাল বাসে এবং সহসা ‘অসন্তুর্ভাবে কোন পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহে; সমস্ত বিষয়েই ধর্ম্মের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে তাহার অভ্যস্ত। বারংবার, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধর্ম্মক্ষেত্রে সেই জন্তই বারিষ্ঠা-কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল। তাই শিল্পও এদেশে জাতিগত হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইচ্ছা করিলেই কোন হিন্দু যেমন ‘কীথ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অস্ত্রস্থানে গিয়া বসবাস করিতে পারেন, না, তেমনই ইচ্ছা হইলেও জাতি-ব্যবসায় ‘তাগ’ করা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। প্রাচীন গ্রীসের সহিত ভারতের এই ভিন্নের কিছু সাদৃশ্য আছে। বর্তমান ইউরোপ বা আমেরিকার সহিত কোন তুলনাই হয় না, বরং পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের লক্ষ্য ও আদর্শ ব্যক্তিগত পার্থিব স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোন মুহূর্ত্তে যানত্যাগ, ভিন্নব্যবসায়-অবলম্বন তাহাদের পক্ষে সম্ভব। প্রত্যেক পাশ্চাত্য ‘দেশবাসীর বিকাশ, যত ক্ষুদ্র কাজ সমাধা করা যায় ততই পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গল, তৎপাবনের ইচ্ছায় তাঁহাদের দেশও তদনুরূপ কুলের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। বিখ্যাত নায়াগ্রার জলপ্রপাত পর্যন্ত তদুদ্দেশ্য সাধনে

সহায়তা করিতেছে। হিন্দুরা জানে তোমার আমার চেষ্টায় বিশেষ কিছুই ফল নাই; ধীরে ধীরে, জঁত ম্রাও, পথ চিরকালই অদন্ত; অতএব ধীরে ধীরে সমগ্র শক্তির সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়াই প্রয়োজন। গরু, ঘুমন প্রভৃতি নদীগুলি মন্থর গতিতে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে কষ্টকৃত তাহারদিগকে এই ‘শিক্ষাই দিতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা এতই বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, একটিকে যদি কোন ক্ষণতঃ পার্শ্বতানিষ্করের সহিত তুলনা করা হয়, তবে অপরটি সমস্ত অস্বাভাবিকতা দ্বারা যমিনী নদীর সহিত তুলনীয়। একটি ক্ষণপ্রভ বিদ্যুৎ, অপরটি স্থিরজ্যোতিঃ ধ্রুব-নক্ষত্র। একটিকে প্রত্যন্ত শিল্প যেমন ব্যক্তিগতবাদের (Individualism) উপর দৃঢ়াধারনা, প্রাচ্যও তেমনই জাতিগত ঐক্য (communalism) একান্ত পক্ষপাতী। ফ্রান্সের অর্থনীতিবিদ মিষ্টার লেগেও এই প্রথা দ্বায়মুদ্রত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাহার মত যে, কোন শ্রমকর্তা পরিবার বংশোদ্ধানে এতটা নিমিষ্ট শিল্প বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিলে, সেই ব্যবসায় বা শিল্প ক্রমশঃ বিকাশ ও পুষ্টলাভ করে। পুত্র পিতাকে যতটা সাহায্য করিতে পারে, তেমনভোগী মজুর দ্বারা ততটা পাওয়া যায় না; এদিকে পুত্রও ক্রমশঃ শিক্ষালোভ করিতে থাকে এবং অবশেষে এই বিদ্যায় নিপুণ হওয়া তাহার পক্ষে সর্বাঙ্গপক্ষা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ভবিষ্যৎ জীবন কোন পথে চালাইবে, সে জ্ঞান আর তাহাকে উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। বংশগত বহুশ্রমিতার ফলে শিল্প বা ব্যবসায়ও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।”

হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্ত কীথ সাহেব লিখিয়াছেন—“অনুনা মানবজাতি

‘উন্নতি ও সম্প্রদায়’ লইয়া এত ব্যস্ত যে, উপরোক্ত কথাগুলি আলোচনা করিবারও তাহার অবসর নাই। ভাক্সার জেমস গিকি তাহার Fragments of Earth Lore নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, প্রত্যেক ভারতবাসী ইংরাজ (এংলো ইণ্ডিয়ান) পরিশেষে একদিন নীচ জাতিগত (racial) কুলস্ফার পরিভাগ করিয়া পারিপার্শ্বিকের প্রভাব পক্ষিকার কবিবে। ‘আমরাও বলি,’ যদি তাহার ভারতের ভৌগোলিক অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, যদি বিভিন্ন সময়ে ভারতের জল-বায়ু ও অতীত যুগের ভারতবাসীর জ্ঞানহার বিষয় চিন্তা করিতেন, যদি এখানকার নানাবিধ জীববস্তু, উদ্ভিদাদি ও বনিকুলপত্রের ইতিহাস পাঠ করিতেন, যদি বুঝিয়া দেখিতেন যে, ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার মনস্তত্ত্ববিদগণের মনে এক বিশেষ ভাব দান করিয়াছিল এবং যদি বিকাশ করিতেন যে হিন্দুরা কোন দিন কাহারও অহঙ্করণ করে নাই, ‘বরং জ্ঞানোত্তর সকল প্রকার শক্তি ব্যবহারপূর্ব্বক চিরকাল স্বীয় বিশেষত্ব অটুট রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে ও তাহার শুদ্ধ চিন্তা করিয়াই বিরত নহে, পরন্তু ইউরোপীয়-গণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক প্রণালীতে জীবন অতিবাহানের পথও আবিষ্কার করিয়াছে, তবে এতদিন পৃথিবীর দৃশ্য অন্তরঙ্গ হইত, তাহারও অনেক কলহের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। তাহা হইলে মাঞ্চেষ্টরের উপকারার্থে ভারতশিল্পেরও সর্ব্বনাশ সাধন হইত না।”

বর্তমানের কর্তব্য সম্বন্ধে কীথ সাহেবের মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে,—
“ইদানীং যে অবস্থায় আমরা উপনীত হইয়াছি, তাহাতে শিল্প-গুরুত্বপূর্ণ নীতি অবলম্বন

করা নিত্যন্ত আবশ্যক। যাহাতে পুরাতন ও নূতন শিল্পের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনিয়া করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আর দেখা উচিত, ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গ একে এই 'সরস্বতী' ভাব জড়িত ছিল। আমরা এতদিন তাহার অন্বেষণ করিয়াছি, কাজে কাজেই সে স্বল্প প্রসব করে নাই। এখন বৃত্তিতে পারিতেছি, শিল্পী ও কৃষকেরা তাহাদের অভাব দূরীকরণার্থে আমাদের ঘরে উপস্থিত। ইরাক-শাসনের প্রতি অত্যন্ত আস্থা ছিল; ইহা তাহাদিগের স্বার্থরক্ষা করিতে যে একান্ত দুরূহ, এ কথা জানিতে তাহাদের আর বাকি নাই। সকলেই ভাবিতেছে, আমরা সরল ভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করি; আমাদের মূল্যবান বেশভূষা নাই, অতিরিক্ত গ্রন্থসম্ভা নাই, কোন বায়সাম্য থাকা আমরা গ্রহণ করি না, বিবাহ-শ্রীক ব্যতীত অত্র কোন কাজে আমাদের ব্যয়বাহুল্য নাই, তবে কেন আমরা চিরদিন এমন দরিদ্র থাকিব? অতি প্রত্যুৎপন্ন কাল হইতে রাজি হটা পর্যন্ত আমরা পরিশ্রম করি, ভিলেকের জন্তও আমরা বিরাম চাহি না, তবে কেন আমরা এমন দরিদ্র থাকি? মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী-সম্ভার আমরাই সরবরাহ করি, তবে আমরা কেন সমাজেই মারা যাইব? অনেকের বিশ্বাস, কৃষক ও শিল্পীরা বেশ স্বখে আছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীই যত কষ্ট ভোগ করিতেছেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃস্বপ্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবীরাও স্বখী নহে। যেমন দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের সভ্যতার মাত্রা কণ্ঠস্থ করা হইয়া কমে অগ্রসর হওয়াই মধ্যবিত্তগণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা যদি স্বকপোলকল্পিত সভ্যতার আশ্রয় ত্যাগ

পূর্বক শিল্পী ও কৃষকগণকে লইয়া একযোগে দেশের উন্নতিবিধান ও অভাবদূরীকরণার্থে নিয়োজিত হন, তবেই দেশের ও নিজেরের যথার্থ উপকার করিতে পারিবেন। "গুডবর্নেন্ট ও যদি এই সময় একটা শিল্প-সমীক্ষণের (Industrial Survey) অস্ত্রাচন করেন দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত, হইতে পারেন। অগ্রজাদিগের বিশেষতঃ শ্রমজীবী ও শিল্পীদিগের প্রকৃত উন্নতির পন্থা আবিষ্কারই ইহার উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, হিন্দুজাতির বিশেষ কোন রূপান্তর দেখা যায় না, ইহা সম্যক অবধারণা করিয়া সরকার দেশবাসীর সম্মুখ-বন্ধ জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করিতে অগ্রসর হউন, ইহা আমরা অন্তরের সহিত কামনা করি। শিল্পী ও শ্রমজীবীগণের আকাঙ্ক্ষা কি, জাত হওয়া উক্ত শিল্পসম্পদদের প্রথম কর্তব্য; কারণ, তাহারা ই নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিতে সমর্থ। তাহাদের মধ্যে সামাজিক উন্নতির যে সীমাতীত-নীতি প্রচলিত আছে, সেগুলি লিপিবদ্ধ করা অসম্ভবমাত্রা বিতীর্ণ কাজ। ইহা ধারা এ দেশের শিক্ষা-নীতি, বিচার-আদার, আইন-কানুন কেমন হওয়া দরকার জানা যাইবে। গভর্ণ-মেন্ট আনু ও জাত হইতে পারিবেন, এ জাতির ক্ষমতা কতদূর। ইহাদিগের জ্ঞান স্বতন্ত্র কলেজ, শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করার আবশ্যকতা আছে কি না।"

উপসংহারে বাদ্যলার কণ্ঠ-ও-চিত্তাবীরণকে উদ্দেশ্য করিয়া কীথ সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহারা যেন স্থিতিশীলতার চরম উক্তি মনে করিয়া ইহাকে দূরে নিক্ষেপ না করেন। এখন

আমাদের যে দুর্দিন উপস্থিত, তাহাতে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। কিসে দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী একবার নিতুতে বসিয়া চিন্তা করিবেন। হিন্দু সমাজকে অনতিদূর ভবিষ্যতে কোন দিকে লইয়া যাইতে হইবে তাহার বিচার হওয়া উচিত। অন্ধের মত সে পথে উদায় অবলম্বন করিয়া শক্তিকণ্ড, অর্থব্যয় ও জীবন নাশ করিবার অবসর আমাদের নাই। জাতীয় জীবনের ধারা না ধরিতে পারিলে

উন্নতি হইবে না। স্বধের কথা, দেশের লোক তাহা বুঝিয়াছেন। এই জন্তই হিন্দু-মাহাত্ম-প্রচার, প্রাচ্য-শিল্প-কলার প্রবর্তন, ঐতিহাসিক অধ্যয়ন, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ, প্রাচীন-পুঁথি-সংগ্রহ ও হিন্দুবিখ্যাব্যায়-প্রতিষ্ঠা, বঙ্গের আন্দোলনের কণ্ঠস্থ বিপ্লবতায়ও আমরা নিজেদের জাতিগত বিশেষত্ব ও নিজস্ব শিল্পশক্তি অঙ্গসম্পদ করিতে প্রবৃত্ত হইব, আশা হইতেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বাঙ্গালী-আশ্রম

(১)

অরদিন হইল আমি রঘুনাথগণে গিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া তিনলাম মহর্ষি বাঙ্গালীক মুনির আশ্রম অতি নিকটে আছে। উহা রঘুনাথগণের সমিতির বালিমাটা গ্রামে অবস্থিত। মনে বড় পুণ্যপ্রাপ্ত জমিল। বৈকাল একজন হানীর গর্জপ্রতি বালাবদুসহ তদর্শনে বহির্গত হইলাম। তিনি এখানকার একজন শ্রেষ্ঠ উকীল। অরুণ পয়েই আমরা উভয়ে শান্তিপূর্ণ, পুণ্যায়, তপোয় পবিত্রাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। পূর্বদৃষ্টি মনে জাগরিত হইল। মনে মনে কহিলাম ইহা কি সেই পবিত্রাশ্রম যেখানে 'মানিষ' বলিয়া বিস্ময়ান্বিত তপোবলম্পদ বাঙ্গালী কৌশলমুখিবধে ব্যাধকে নিবৃত্ত করিয়া জগতে প্রথম কবিতা-সুখা উপলব্ধি করিয়া ছিলেন! রামায়ণরূপ কাব্যনির্মিত-রীণীর অমৃতপ্রবাহে জগতের শোকতাপপাপবিন্দু মহুয়াগণের জীবন স্থলীত করিয়াছিলেন। যুগে যুগে সেই কবিতা-সুখ পান করিয়া দ্বন্দ্ব ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে।

মানসনেজে দেখিলাম এই স্থানে বালক লবকৃশ মহারাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞধকে বন্ধন করিয়া উহার দৈন্তকটককে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ছিলেন। পিতাপুত্রে যে অসুত যুদ্ধ ঘটয়া ছিল, সবই যেন স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইল। হায় সেই পুণ্যপ্রাপ্ত বিস্ময়ান্বিত মহর্ষি কোথায়? তিনি অনন্তের কোড়ে চিরনির্জিত রহিয়া জগতের মনোরমের মাফ্য দান করিতেছেন। তবে তাঁহার বিমলকীর্ণি তাঁহাকে অমর ও মানব-মনোমন্দিরের অতি পবিত্র স্থানে সংস্থাপিত করিয়া প্রতিদিন প্রেমসলিলে তলায় ত্রীপালন করিতে পারেন। কাল সন্ধ্যা গগনসের যুগে লইয়া যায়। তবে মহাশ্রয়গণের পবিত্র কীর্ণি সৌধকে সে আপাততঃ বিচূর্ণ করিতে না পারিলেও, উহাও কোন একদিন তদীয় বজ্রমুগুর কঠিন আঘাতে রেণু-রেণু হইয়া উড়িয়া যায়। জগতে মান, যশ, কীর্ণি, বীরত্ব কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। প্রেম-পয়োমিছিলে ভাসিয়া গিয়া কোন অনন্তের কূলে স্থান প্রাপ্ত হয় তাহা সেই নীলাময়ই অবগত আছেন। কৃষ্ণ

মানব-বুদ্ধি উহা কল্পনায় আনিতেও অক্ষম।

মহাত্মা বাম্মীকির সে কবিত্ব আশ্রম-পালিত শুক-সারিকার মধুর সঙ্গীতে আর মুখরিত হয় না। মঘর-মঘরী আর উন্নত নৃত্যতে চন্দ্রক-ললাপ বিস্তার করেন না। হরিণ-হরিশ্রীগণ আর যজ্ঞবেদিকায় সমাহৃত কৃশগুহু ভাঙ্গ জ্ঞাত লৌপপুত্রিতে নেত্রজপাত করে না। হোম-খেয়র পবিত্র ছন্দধারার মধুর শব্দ শ্রুতিবিবরে প্রবেশলাভ করে না। বেদগানের উন্নতধ্বরে ভারতাকাশ প্রতি-ধ্বনিত ও যজ্ঞধূমে জলধপটলের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি হয় না। তপোবনের সতেজ বৃক্ষতাল বারমাস সমান ভাবে ফল-ফল প্রদান করে না। ঋষিকাকুলে আপনাদের তপো-তোক্তোজ্জল পুণ্যের পবিত্র ছাতিপূর্ণ স্বকোমল বরাব্রকে কঠিন বচনবাসে আবৃত করিয়া হতে জল-কলস লইয়া বৃক্ষের আলবালে জলসেচনে নিমুক্তা নহে। আর সেই ইহুদি-তৈলপ্রানীপ তপোবনের অন্ধকাররাশি বিবর্তে কবিবার জ্ঞাত সন্ধ্যার হুময় ঋষিকাকুলগণের করণয়ে ছাতি প্রকাশ করে না। গঙ্গার পবিত্র উপকূলে ঋষিগণের পণকুটার পরিবৃত্ত হয় না। সবই কালের প্রবল তরঙ্গ দাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোথাও কিছুমান্য নাই। আছে কেবল সেই স্বরুর অতীতের পবিত্র পুণ্যময়ী বৃত্তিরেখা। আর আছে বিষ্ণুপদগমনিমিত্তা কলিবিমানিশিরা ভাগীরথী, তাঁহার ক্ষীণ কলবর এখনও কালের কুক্ষিত হয় নাই। অতি দীর্ঘে দীর্ঘে ত্রিকালের স্বভাৱানিকে জাগ্রত করিয়া পুণ্যময়ী সাগরসঙ্গমে টুটতেছেন!

(২)

বাম্মীকি-আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলাম উহার অধিকাংশ ভূমির উপর এখন

এগারসন সাহেব একটি বিশাল রেশম-কুঠী প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার উত্তরে আরও বটবৃক্ষ-সংমিলিত একটি উচ্চমণ্ডপ এখনও পবিত্র ভূমিকে একটু স্থায়ীতল ছায়াদান করিয়া অতীতের শ্রুতিকে জাগরিত রাখিয়াছে। উহাই বাম্মীকি মূনির আশ্রম। এ স্থানটি নিকটস্থ ভূমি অপেক্ষা এখনও সমুদ্রত। গ্রামবাসিগণ এই স্থানটির ভূমিকে এখনও ভক্তির সহিত দর্শন করেন। এবং দর্শনকে দেখাইয়া থাকেন উহাই বাম্মীকি মূনির পবিত্র আশ্রম-ভূমি। যে স্থানে লব-কুশ মহারাষ্ট্র রাম-চন্দ্রের যজ্ঞ-অশ্ব গুহত করিয়া বন্দন করেন। তাহা এক্ষণে “মোড়শালা” নামে কথিত। অশ্ব-উদ্ধার জ্ঞাত শ্রীরাঘবের সৈন্যগণের সহিত যে যুদ্ধ হয় উক্ত যুদ্ধে সেনাপতি হুম্মান বন্দী হন। যে স্থানে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন উক্ত স্থান এখনও “বীরবন্দ” নামে অভিহিত হয়। রামায়ণের অনেক স্থানে হুম্মান বীর হুম্মান নামে কথিত হইয়াছেন। উপসাহারে “বন্দবা এই—এই স্থানটি যে প্রকৃতই বাম্মীকি-আশ্রম, তাহা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণ করিবার উপায় কি? তবে তাহার পবিত্র আশ্রম গঙ্গাতীরে ছিল তাহা বাম্মীকির মূল রামায়ণে লিপিত আছে। গঙ্গা কি ভাগীরথী তীরে উক্ত আশ্রম ছিল তাহা স্মিক বলা যায় না। কারণ রামায়ণের অনেক স্থলে ভাগীরথী গঙ্গা নামে ও গঙ্গা ভাগীরথী নামে কথিত হইয়াছেন। পূর্বোক্ত স্থানটি ভাগীরথীর তীরে, ছাপা-যাটির মোহনান্ন তিন চারি কোশ দূরে অবস্থিত। এ অঞ্চলের সকলেই উক্ত স্থানটিকে বাম্মীকি-আশ্রম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আট দশ কোশের দৈর্ঘ্যমুখে শুনিলাম উক্ত আশ্রমটি প্রকৃত বাম্মীকি-আশ্রম।

বীরবন্দ ও মোড়শালা নামক স্থান দুইটায় উক্ত আশ্রমের বাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাম্মীকি-আশ্রম হইতে বালিঘাটার নামকরণ হইয়া থাকিলে। যখন এইখানে সাহেবদের কুঠী নির্মিত হয় নাই, তখন বহুতর-নাগধুম্যাদী উক্ত ঋষির আশ্রম-দর্শন-মানসে গমনাধমন করিতেন, অনেক সময়ে অনেক ধর্মুদ্যাদী এখানে বহুদিন ধরিয়া থাকিয়া বাইতেন। কুঠীনির্মাণের পর তাঁহাদের অপর পূর্বের জায় তত যাওয়া-আসা নাই। অতিবৃদ্ধগণ বলেন এ স্থানে প্রতিমাসেই “রামবীন্দ” গান হইত। এখনও কোন কোন সময় হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে বহুদিন ধরিয়া “রামায়ণ” পালা-ক্রমে গীত হইত, এখনও যে হয় না তাহা নহে। ফলতঃ উক্ত স্থানটি যে রামগুণ-গানে সুরধা মুখরিত ছিল, তাহার শত শত প্রমাণ গ্রামবাসিগণ প্রদান করিলেন।

আশ্রমটি যে গঙ্গা, বা ভাগীরথী-তীরে ছিল, তাহা মহর্ষি-প্রণীত রামায়ণ-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। সরস্বতীর বরপুত্র, কলি কালিদাস রঘুবংশে বাম্মীকির পদাঙ্কই অম্বরগণ করিয়াছেন, পয়ার-লেখক কীর্তিবাস উক্ত আশ্রম যমুনাতীরে ছিল বলায় রামায়ণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং চিত্রকূট পর্বতেও যে তাঁহার অপর এক তপস্ত্যাক্ষেত্রে ছিল তাহাও লিখিয়াছেন। মূনিদিগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম থাকা স্বভাবই মনে উদিত হয়। বাম্মীকির মূল রামায়ণ, রঘুবংশ ও কীর্তিবাসী পয়ার হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নিয়ে প্রকাশ করলাম। উহা দ্বারা, প্রকাশিত হইবে বাম্মীকি-আশ্রম গঙ্গা বা ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। মহাকবি কালিদাস তাঁহার প্রধানকাব্য রঘুবংশে

বাম্মীকি-আশ্রম গঙ্গাতীরে ছিল বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

রথং সম্যগা নিগূহিতবাহাং
তাং ভ্রাতৃজাযাং পুলিনেহবত্যাং
গঙ্গাং নিষাদাহত নৌনিবেশ
তত্তার সম্যগামিব সত্যাসঙ্কঃ ১০২
আশ্রম রামাবরজঃ সতীঃ
তাং আযাতাং বাম্মীকি নিকেতমার্গঃ।
নিমন্ত্র মে ভর্তৃনিদেশে সৌকং
দেবি। ক্ষম্যেভেতি বক্তব মন্ত্রঃ ১০৮
কীর্তিবাস বাম্মীকি-আশ্রম যমুনাতীরে ও অতিদূর চিত্রকূট পর্বতে উল্লিখিত করিয়াছেন।
লক্ষণ বলেন নীতা না হও ব্যাকুল
দেখ আইলাম যমুনায় কুল।
পার হইয়া যান বাম্মীকির তপোবন,
আগে নীতা দেবী যান পঙ্কতে লক্ষণ।
তিন জনে গেল তারা যমুনার তীরে
তিনি কুণ্ড কাটিলেন দুই মহাদেব।
তাহাতে আনিয়া কাঠ, জালিয়া অনল
ঈলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল।
চিত্রকূট পর্বতে বাম্মীকি তপোবন,
দেখিয়া অগ্নির ধুম বিচলিত মন।
মুনি বলে লবকুশ পাড়িল প্রমাদ।
দৈখিল চলিল মুনি করিয়া বিবাদ।
ছমাসের পথ এক চক্ষুর নিমেষ
তিনজননে দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ।
ইহা দ্বারা প্রণীত হইতেছে কীর্তিবাসের
মতে বাম্মীকি মূনির যমুনা-আশ্রম এবং
চিত্রকূট পর্বতে আর একটা তপঃকূজ ছিল,
যাহা এই স্থান হইতে ছয় মাসের পথ।
কবির মহর্ষি বাম্মীকির রামায়ণে কিঞ্চিৎ
তাঁহার পবিত্র আশ্রম গঙ্গাতীরে অবস্থিত
ছিল বলিয়াই কথিত হইতেছে। নিয়ে তাঁহার
কাব্যের বঙ্গাঙ্গবাদ লিখিত হইল।

—“বিশালাক্ষী নীতা ধীমান্ স্বমন্ত্র ও লক্ষণ সমভিষাহারে পাপহারিণী গদ্বার তীরে অবতীর্ণ হইলেন।

“অনন্তর লক্ষণ অর্দ্ধ দিবস গমন করিয়া ভাগীরথীর জলপ্রবাহ অবলোকন পূর্বক দুঃখিত চিত্তে মহাশয় রোদন করিতে লাগিলেন।” (১৯—২০)

ইহা কি ছাপাঘাটী হইতে গদ্য পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর উপরিস্থিত স্থলপথে, তথা হইতে অঃ ক্রোশ দূরবর্তী বাম্বাকী-আশ্রমে আগমন করা বোধ হইতেছে না? যেখানে বালীঘাটা গ্রামে বর্তমান বাম্বাকী-আশ্রম আছে উহা কি সেই ভাগীরথী-তীরবর্তী বাম্বাকী-আশ্রম নহে?

“লক্ষণ পবিত্র গদ্বাতীরে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং সাবধানে গদ্বার পারে যাইতে লাগিলেন।”

ভাগীরথী ও রামায়ণের অনেক স্থলে গদ্বা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই ভাগীরথীর বা গদ্বার পরপারেই বাম্বাকী-আশ্রম, পূর্বদিক হইতে গদ্বাপার হইলেই পশ্চিম দিকে বাম্বাকী-আশ্রম বালীঘাটা পাওয়া যায়। ছাপাঘাটীর মোহনা হইতে স্থলপথে ভাগীরথীর কূলে কূলে আসিয়া এখানে ভাগীরথীর পার হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ নীতা সহ পদব্রজে এখানে আসিতে লক্ষণের অর্দ্ধ দিবস লাগিয়াছিল। পূর্বোক্ত উদ্ধৃত অংশই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

এখানে আসিয়া লক্ষণ নীতাদেবীকে বলিতেছেন, “গদ্বাতীরে মহাবিশ্বের এই উপোদন। ইহা অতি রমণীয় ও পবিত্র। মহাবিশ্ব মূনিপুত্রব বাম্বাকী মন্দির পিতা মহারাজ বশরথের পরম শুদ্ধ। অতএব দেবি! আপনি সেই সুস্বাসার পাদমূলে উপনীত হইয়া একাগ্রচিত্তে উপাসনা করন্তঃ হুৎ বাস করুন।”

এরে নীতাকে বনবাস দিয়া লক্ষণ অস্বাভাব্য রাজসভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরামের চরণমূল্য গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া একাগ্রচিত্তে করণ স্তব্ধে বলিলেন, “আর্যের আজ্ঞাসারে জনকমহিতাকে গদ্বাতীরে সন্নিহিত যথোদ্দিষ্ট বাম্বাকীর পবিত্র আশ্রমে গরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।”

অতএব মহর্ষি বাম্বাকীর মতে নীতা গদ্বাতীরে তরীয়া আশ্রমে রক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। কবিশ্রেষ্ট কালিদাসও তাহার পদাঙ্ক অঙ্গুলণ করিয়াছেন। কান্তিবাস কিন্তু অন্যপথে গিয়াছেন। কান্তিবাসের লেখা অপেক্ষা বাম্বাকীর লেখাই সমধিক বিশ্বাস্য!

এইরূপ নানা দিক দিয়া দেখিলেও এই স্থানটী বাম্বাকী-আশ্রম নহে তাহা কি করিয়া বলা যায়? অতঃপর তাহার ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম থাকিলেও উক্ত আশ্রমটী তাহার অন্য একটা ভগ্নভাঙ্গ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

শ্রীরামভারণ রায়।

দানপত্রাবলি

অন্যদিকে বিজ্ঞা-ও-ধর্ম-সংরক্ষণ-নিযুক্ত ভ্রাক্ষণ-গণের সমস্ত প্রয়োজনাদি পুরাকালে সমস্ত সমাজ কর্তৃক কিরূপ ভাবে গভীর সজ্ঞার সহিত লোকহিতার্থে উদ্ভাবন হইত, তাহা সন্দেহজনক-বিরহিত। যদিও স্বয়ংগণাঘূষিত এই পুণ্য-দেশে কালছত্রবাহ সমাজ-রক্ষক ভ্রাক্ষণ-গণের সহিত সমাজের সেই শুভবন্ধন-স্কন্ধাশ্রিত শিথিল করিয়া অরুত-সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধনই করিয়াছে, তথাপি সেই পুণ্য-প্রধার বিলোপসাধন-সংঘটন বর্তমানে যেরূপ ঘণ্টাঘাটার ধারণ করিয়াছে, কিছুদিন পূর্বে, মূললানগণ এই দেশে আগমন করিবার বহুপরেও, সেরূপ অগোচরিত প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ সময়েও অন্যদেশীয় রাজভগ্ন যেরূপ ভাবে মুক্ত হইতে কবি ও পণ্ডিতগণকে অর্থাভাব্য করিতেন, আমরা কখনও কতকগুলি তাত্ত্বিক দান-পত্র-সাহায্যে তাহা প্রতিপাদন করিব।

মহারাজ ভোজ ও তাঁহার পিতামহ

মহারাজ ভোজ ভারতের অতি প্রাচীন দানবীর ও বিজ্ঞা-সংসারী মুপতি। যাহারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, ভোজ-সম্বন্ধে তাহাদের কাহাও অবদিত নহে। এই ভোজরাজ সৎকর্ম নানাভাবে নানারূপে বিশ্বদত্তী অর্থাপি প্রচলিত।

কোনও স্থানে ভোজরাজের এইরূপ সৎকর্ম-বিবরণ পাওয়া যায়—ইনি মালবদেশের অধীশ্বর ছিলেন। ইহার রাজধানী ছিল -স্বপ্রসিদ্ধ ধারানগরী। ভোজরাজের প্রবল

পরাক্রম সমস্ত দেশেই বিস্তৃত ছিল। মহাবীর গণের সমস্ত প্রয়োজনাদি পুরাকালে সমস্ত সমাজ কর্তৃক কিরূপ ভাবে গভীর সজ্ঞার সহিত লোকহিতার্থে উদ্ভাবন হইত, তাহা সন্দেহজনক-বিরহিত। যদিও স্বয়ংগণাঘূষিত এই পুণ্য-দেশে কালছত্রবাহ সমাজ-রক্ষক ভ্রাক্ষণ-গণের সহিত সমাজের সেই শুভবন্ধন-স্কন্ধাশ্রিত শিথিল করিয়া অরুত-সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধনই করিয়াছে, তথাপি সেই পুণ্য-প্রধার বিলোপসাধন-সংঘটন বর্তমানে যেরূপ ঘণ্টাঘাটার ধারণ করিয়াছে, কিছুদিন পূর্বে, মূললানগণ এই দেশে আগমন করিবার বহুপরেও, সেরূপ অগোচরিত প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ সময়েও অন্যদেশীয় রাজভগ্ন যেরূপ ভাবে মুক্ত হইতে কবি ও পণ্ডিতগণকে অর্থাভাব্য করিতেন, আমরা কখনও কতকগুলি তাত্ত্বিক দান-পত্র-সাহায্যে তাহা প্রতিপাদন করিব।

রাজা ভোজ নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের ছায় ইহার নামও ভারত-বর্ষের অনন্যাক্রেই অবগত ছিল। ইনি অতিশয় বিদ্যা-সংসারী ও নিজে স্বকবি ও সৎ-গ্রন্থকার ছিলেন। পাতঞ্জল-দর্শনের রাজ-মার্তণ্ড-নামক ভোজরাজকৃত টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ অত্যন্ত আদরের সহিত অমীত হইয়া থাকে। অলঙ্কার, দর্শন, যোগ, দ্ব্যুতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহুসংখ্যক গ্রন্থ ইহার পুস্তকোপায়কতায় ও উৎসাহে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশসিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ভোজগ্রন্থক-নামক সংস্কৃতগ্রন্থে আমরা যেরূপ ভোজরাজের বিবরণ দেখিতে পাই, সৎকর্মপত্র তাহা প্রদান করিতেছি। ধারায়তো দিল্লল নামক একজন রাজা ছিলেন। বুদ্ধবয়সে তাহার একটি পুত্র জন্মে;

তিনিই রাজা ভোজ। ভোজের যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন বৃদ্ধ সিদ্ধু লম্বের আসন মৃত্যু জানিতে পারিয়া অহুজ মুগ্ধকে রাজ্য অর্পণ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে কুমার ভোজকে সমর্পণ করেন। তাহার পর মুগ্ধ রাজ্য প্রতিপালন করিতে থাকিলেন, একদা একজন দৈবজ্ঞ ভোজকে দেখিয়া

“পঞ্চাশৎপঞ্চাবধি সপ্তমাস দিনবয়ঃ।

ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগোড়ো দক্ষিণাপথঃ।”

এইরূপ নির্দেশ করেন। এই দৈবজ্ঞোক্তিতে বিশ্বাস করিয়া রাজ্যলোভী মুগ্ধ ভোজের বধে কৃতসঙ্কল্প হন। তদনন্তর মুগ্ধের আজ্ঞায় কুমার ভোজ বধ্যকৃত্যে নীত হইয়া পিতৃবের দুর্ভবভিক্ষি জানিতে পারিলেন এবং সেই সময় নিজের শ্লোকগুলি বলিয়াছিলেন :—

রামে প্রব্রজনং বলেনিয়মনং

পাগোঃ স্থতানাং বনং

কুক্ষীনাং নিধনং নলভ্য নৃপতে

রাজ্যং পরিক্লেশনম্।

কারাগারনিবেশনং বরণং সক্ষিত্য লম্বপুত্রে সর্বং কালবনে নভতি নরঃ কোবা

পরিত্রায়েতে।

লক্ষী কৌন্তভ পারিজাত সহজঃ হুহঃ

ব্রহ্মাস্তোনিধিঃ

দেবেন প্রথমপ্রপাশ বিধিনা মুক্তঃ। ধৃতঃ

শত্ৰুনাং।

অদ্যাপ্যুজাত নৈব দৈববিরহিতঃ কৈশ্যং

ক্ষপাবলভ্যঃ

কেনাস্তেন বিজজ্যতে বিধিপতিঃ

পাণ্যবেরথা সখী।

বিকটোক্যাম্যপটনঃ শৈলারোগহমপাং

নিবেশতরণং।

নিগড়ং গুহাপ্রবেশো বিধিপরিপাকঃ

কথং ন সন্তাধ্যঃ।

অস্তোমি স্থলতাং স্থলং জলবিদ্যং

* দুলিবাং শৈলতাং

মেকমংস্থলতাং তৃণং তুলিষ্ঠতাং

বজ্রং তৃণপ্রায়তাং।

বরিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামগাতি

যন্তেচ্ছয়া

লীলাছিল লিতাছুতবাসনিনে দেবায়

তশৈ নমঃ।

এবং—

নাম্যতা চ নহীপতিঃ কৃতব্রগালকার-

ভূতঃপতঃ

সেতুর্ধেন মহোদধৌ বিরচিতঃ

কাসৌ দশাস্তান্তকঃ।

* অন্যোচ্যপি বৃষিগুপ্তভূতযা যাতা

দিবং ভূপতে ?

* নৈকেনাপি সমং গতা বহুমতী মুগ্ধা

যাত্রতি ॥

এই শ্লোকগুলি বটপত্রে অঙ্কিত করিয়া

যাতকের নিকট মুগ্ধকে প্রদান করিবার জন্ত

অর্পণ করেন। উক্ত শ্লোকগুলি কুমার

ভোজের গভীর পাণ্ডিত্যের ও জ্ঞানের সাক্ষী-

স্বরূপ, বিশেষতঃ চতুর্থ শ্লোকটি বড়ই হৃদয়-

গ্রাহী।

তাহার পর নানা কারণে যাতক কুমারকে

হত্যা না করিয়া কোন গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত

রাখে * এবং শিল্পীদের দ্বারা সুকুণ্ডল

সুদৃশজ্ঞ নির্মালিতমের ভোজ-কুমার-মন্তক

নির্মাণ করাইয়া রাজার নিকট প্রেরণ করে।

এইরূপে কুমার ভোজের জীবন রক্ষিত হয়।

তদনন্তর মুগ্ধ আশ্বদোষ বৃত্তিতে পারিয়া

মুগ্ধাহত হন, এবং কুমারকে রাজ্য প্রদান

পূর্বক বনগমন করেন। এই খেল ভোজের

রাজ্যপ্রাপ্তির কথা। ইহার পর আরও

অনেক কথা বর্ণিত আছে।

প্রবন্ধ-বিস্তৃতিভয়ে তাহা আমরা উল্লেখ

করিব না; তবে ভোজনপুত্রির দানবীরত্ব

ও বিদ্যোৎসাহিত্ব সংক্ষেপে দুই একটা ঘটনা

উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

একদা শরৎ-নামক একজন প্রসিদ্ধ কবি

ভোজরাজ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

রাজমহাদেবোহুস্ম।

রাজা—শরৎ কবে কিং পত্রিকায়া মিতং

কবি—পদাং

রাজা—কন্ত

কবি—তবেই ভোজনপুত্রে

রাজা—তৎ পঠ্যতাম্

কবি—পঠ্যতে

এতাসামিগবিন্দবন্দরদৃশ্যম্ ব্রাহ্মণ-

চামরান্দোলনাং।

উল্লেখস্বজ্ঞবল্লবকরণবনংকারঃ

কথং বাধ্যতাম্।

কবির এই কবিতায় মুগ্ধ হইয়া ভোজ রাজা

দীপশ লক্ষ মুগ্ধা পুরস্কার প্রদান করেন।

মহাকবি কালিদাসের সহিত ভোজ রাজার

নানারূপ কবিতায় নানারূপ ভঙ্গীতে আলাপ

হইত এবং কালিদাসের সহিত ভোজরাজের

বিশেষ মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাও

ভোজপ্রবন্ধে দৃষ্ট হয়।

একদা কয়েকজন পণ্ডিত নৃপতির নিকট

কবিতা বলিয়া পুরস্কার লইবেন এই আশায়

ভোজসভায় উপস্থিত হন, কিন্তু তাহার

তাদৃশ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন না।

সুতরাং তাহাদিগের একজন রচনা করিলেন—

ভোজনং মেহি রাজেন্দ্র

আর একজন রচনা করিলেন—

যতস্থপসমগ্রিহঃ

উত্তরার্দ্ধ কাহারও ক্ষুব্ধ হইল না, তখন

কালিদাস—

মাহিবক শরচ্ছত্রচক্রিকাথবলং দধি

* এইরূপ উত্তরার্দ্ধ পূরণ করিয়া দেন।

তদনন্তর মহারাজ তাহাদের উক্ত কবিতা

শ্রবণ করিয়া “উত্তরার্দ্ধ কবিত্বং দীযতে ন

পূর্ণার্দ্ধজঃ” এই বলিয়া প্রস্তুত পুরস্কার প্রদান

করেন।

বরকচি, বাণ, ময়ূর, রেকান, হরি, শঙ্কর,

কলিঙ্গ, কুর্পূর, বিনায়ক, মদন, বিদ্যাবিনোদ,

কোলি, তারেন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ ভোজ-

রাজের সভাসদ ছিলেন। এরূপও উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া যায়।

ভট্টগোবিন্দ ব্রত প্রভৃতিকে যে সকল

দানপত্র দিয়াছেন তাহাও ভোজরাজের দান-

শীলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে সকল দানপত্র

আমরা পরে আলোচনা করিব।

ভোজরাজ সংক্ষেপে উল্লিখিত বিবরণ আমরা

অবগত হইরাছি, কিন্তু ভোজরাজের পূর্ব-

পুরুষদিগের সত্য তথ্য লুপ্ত ইতিহাসের

তন্ময়মুখ গৃহায় লুক্কায়িত। ভোজরাজের

পিতামহ শ্রীমদ্বাকপতি রাজদেবের একখানি

দানপত্র হইতে তাঁহার বিবরণ আমরা কিছু

জানিতে পারিয়াছি এবং সকলের অবগতির

জন্ত তাহারই সংক্ষিপ্তসার অহুবাদ নিয়ে

প্রদান করিতেছি।

এই বাক্যপতি রাজদেবের আর একটা

নাম অমোঘবর্ষদেব। রত্নমালা-নামক গ্রন্থের

প্রাপ্তো এক অমোঘবর্ষের পরিচয় আমরা

পাই, যথা—

বিবেকাস্তান্তরাজেন রাজেন্দ্র রত্নমালিকা।

রচিতামোঘবর্ষণে বিদূষাং সল্লঙ্ঘতিঃ ॥

এই অমোঘবর্ষ ও ভোজপিতামহ অমোঘ-

বর্ষ একই ব্যক্তি কি না, তাহা আমরা নিশ্চিত

রূপে বলিতে পারি না। দশরূপাবলোকে চতুর্থ

পরিচ্ছেদে—“প্রথমপুত্রিতাং দৃষ্টা দেবীং”

ইত্যাদি শ্লোক বাসুপতিব্রাহ্ম প্রণীত বলিয়া সম্ভূত হইয়াছে। কিন্তু আবার উক্ত পুস্তকেই উক্ত শ্লোকটা মুদ্রিত বলিয়াও দ্রুত হইয়াছে এবং পিঙ্গলব্রহ্মবৃত্তিতে হলায়ুধ—

ব্রহ্মজকুলীনপ্রানীন সামন্তচক্রহুতচরণঃ ।
সকল স্বকৈতবপুংঃ শ্রীমানমুখশিখাং জয়তি ॥
জয়তি ভুবনৈকবীরঃ সীরাযুধতুলিতবিলুপ-
বলবিভবঃ ।

অনবরত বিস্তারিতরপনির্জিত-চম্পাদিপোঃ মুগ্ধঃ ।
স জয়তি বাসুপতিব্রাহ্মঃ সকলার্থিমানোরৈক-
কল্পভতঃ ।

প্রত্যর্ষিতুত পার্থিব লক্ষ্মীহরণকুললিতঃ ।

এইরূপে একই ব্যক্তিকে বাসুপতিব্রাহ্ম ও মুগ্ধ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। হুতরাং আমাদিগের মনে হয় বাসুপতিব্রাহ্মের মুগ্ধও একটা নাম ছিল, এবং ভোজপিতৃব্য ব্রাহ্মের নাম মুগ্ধ তাহার পিতৃনাম অল্পমারে হইয়াছিল।

বাসুপতিব্রাহ্মের দানপত্রের অনুবাদ মঙ্গলাচরণ

শ্রীকণ্ঠের সেই সকল কঠোর কঠকান্তি আপনাদিগের মঙ্গল পোষণ করুন। যে গুলি মহাকণিগণের উদ্ভৃষ্ট বিমানলের সহিত মিলিত হইয়া দুহাকার ধারণ করিয়াছে, যে গুলি শিতিকণ্ঠের শিরোদেশে বিলসিত শশিকলার সহিত সম্মিলিত হইয়া রাহুর অঙ্করণ করিতেছে, ও -যে গুলি গিরিবাহু-হৃদয়-কপোল-মূলিত হইয়া কস্তুরীর বিদ্রম প্রকাশ করিতেছে।

মুদ্রিপুর রাধা-বিরহাতুর শীর্ণবপু আপনাদিগকে রক্ষা করুন। লক্ষ্মীবদন-চন্দ্রমা যে বপুকে “রখিত” করিতে পারে নাই, জল-নিধির জল যাহাকে শীতল করিতে পারে

নহি, স্বকীয় নাভি-সরসী-পদ্মের ঘাষাও যাহা শান্তি লাভ করে নাই; এবং অনন্তের সহস্র-বর্ণনাগ্নিত শাসও যাহাকে অশ্বাশ্বানিত করিতে পারে নাই।

পুরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর
শ্রীকৃষ্ণরাজদেবের পদধ্যানপরায়ণ, পরম.....
শ্রীভৈরবসিংহদেব পাদধ্যানপরায়ণ, পরম.....
শ্রীসীতকদেব পদধ্যানপরায়ণ, পরমভট্টারক

মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর, শ্রীমং অমোঘবর্ষ-
দেবাপুরনামক শ্রীমদ্বাসুপতিব্রাহ্মদেব পৃথ্বীবলভ
শ্রীবলভ নরেন্দ্রদেব, বৃন্দাবনস্থায়ী শ্রীমদ্বাতটে
পিঙ্গরক নামক তড়ারে সমুপাগত সমস্ত
রাজপুংস্বদিগকে ব্রাহ্মগোত্রের প্রতিবাসী পট্ট-
কিলজনপুত্রাদিকে “জানাইতেছেন—আপনারা
জাহ্নমে যে স্থানের চতুঃপার্শ্ববর্তী নীমা—

• পূর্বাধিকে আগারবহলা নীমা, উত্তর দিকে
চিখিলাশংকরগুপ্ত, পশ্চিমে গর্ভনদী, দক্ষিণে
শ্রীপিশাচদেবতীর্থ, এইরূপ চতুঃপার্শ্বনীমাবিশিষ্ট
তড়ারনামক স্থান বর্তমান ১০৩১ সংবৎসরে
ভাদ্রের শুক্লচতুর্দশীরূপ পবিত্র পরীর্ষে শিব-
তড়াগ জলে স্নানান্তর চরাচরগুরু ভগবান
ভবানীপুত্রকে অর্চনা করিয়া সংসারের
অসারতা জানিয়া—

“বাতাস্রবিজয়মিদং বহুধাধিপত্য-
মাপাতমাত্রমধুরো বিঘোরোপভোগঃ ।
প্রাপ্তপুণ্ড্রাগ্রজলবিন্দুসমানরাগাম্
ধর্ম্যং সখা পরমহো পরলোক্যানে ॥

অমংসসারচক্রাধারার ধারামিমাং শ্রিয়ম্ ।
প্ৰাপ্য যেন দহতেবাম্ পশ্যতাগঃ পরং ফলং ॥

এইরূপ জগতের সমস্তকে বিনশ্বর উপদ্রুতি
করিয়া উপরিলিখিত তড়ার, নীমা তৃণকাঠ
মৃতিগোচর পণ্যস্ত সহিত, বৃক্ষমালা সহিত,
স্বর্গস্থান সহিত, পরিকর সহিত, সর্ব আদায়
সহিত, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন শ্রীনিবৃত্ত পণ্ডিত

পুত্র শ্রীদশস্তাচাৰ্য্যকে মাতাপিত্তার এবং নিজের
পুণ্য-যশের বর্ধনের নিমিত্ত, অদৃষ্টকল স্বীকার
করিয়া, যতদূর চক্ষুঃস্পৃশ্যবী থাকিবে,
ততদিনের জন্ত, পরমভক্তিপূরক দান-পত্র
সহকারে উৎসর্গীকৃত হইল—ইহাই মনে
করিয়া উক্ত স্থানবাসী জনগণ কর্তৃক পূর্ন-
নির্দিষ্ট দেয় কর ও স্ববর্গাদিমুহু, মদ্যজ্ঞা-
বশবর্তী হইয়া, উক্ত বসন্তাচার্য্যের নিকট
উপনয়ন।

এই পুণ্যলক্ষকে সামান্য মনে করিয়া,
আমার উত্তরবংশীয় নৃপতিগণ, আমার প্রদত্ত
এই ধর্ম্মদায় অহুমোদন ও পালন করিবেন।

ইহার পর পুনরায় কতগুলি শ্লোক আছে।
স্নেহে শ্লোকগুলি প্রতিদানপত্রের শেষেই
উল্লিখিত হয় বলিয়া অগ্রযোজন-বোধে উল্লেখ
করিলাম না। এই দানপত্রের তারিখ সং ১০৩১
ভাদ্রপদ্য হুদি ১৪ শুক্ল চতুর্থা।

হস্তাক্ষরও স্বয়ং বাসুপতিব্রাহ্মের।

শ্রীমুপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভক্ত রবিদাস ।

ভক্ত বলিয়াছেন, “আমি ভুল্লভ মানবজন্ম
লাভ করিলাম, কিন্তু আমারই বুদ্ধি ধোয়ে
এই জীবন বুধা হইয়া গেল। ভগবানে যদি
আমার রতি না জন্মিল, তাহা হইলে আমি
ইজের সিংহাসন পাইলেই কি কিবা রাজ-

প্রদান লাভ করিলেই বা কি? হায়, সমস্ত
স্থলালাসা ভুলিয়া আমি নাম-রসে মগ্নিতে
পারিলাম না! যাহা আমার জানা উচিত ছিল,
তাহা জানিলাম না, আমি উদ্বল হইয়াছি,
যাহা আমার চিন্তনীয় তাহা ভাবিলামই না,

• এই দানপত্রের মূলগ্রন্থ অনেকস্থানে অসংলগ্ন।

উক্ত রাজবংশাবলি

শ্রীকৃষ্ণ রাজদেব	ভোজ রাজদেব
শ্রীভৈরবসিংহদেব	উদয়াদিত্য
শ্রীসীতকদেব	নরবর্ধা
শ্রীবাসুপতি দেব	যশোবর্ধা
	অজয়বর্ধা
শ্রীসিদ্ধরাজ দেব	বিদ্যাবর্ধা
	হুতট বর্ধা
• শ্রীভোজরাজ দেব	অর্জুন হুপতি

† বঙ্গাব্দী হইতে উক্ত।

ওরিকে আমার দিন তো শেষ হইয়া আসিল। হায়, ভাবি এক, করি আর; সাম্যারিক হৃৎ-কামনা বৃদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। হে প্রভো, তোমার দাসের জীবন এই বেদনায় কাতর হইয়াছে। তুমি তোমার দাসকে ঘরে রাখিয়া হৃৎ দিও না, তাহাকে করুণা কর। ”

এই উল্লিখিত মধ্যে পৰম ভাগবত রবিদাসের সাদন-জীবনের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। সাধু রবিদাসের বাসভূমি কোথায়, কে তাঁহার পিতা, কে তাঁহার মাতা আমরা তাহা অবগত নহি। সে সম্বাদ না জানিয়া আমাদের কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মহাশয় কবীর সাধুসদস্যকণ্ঠে বারংবার বলিয়াছেন, সাধুদের মধ্যে সাধু রবিদাস। ভক্ত রবিদাস ভক্ত-সমাজের বন্দনীয় পরম ভক্ত, ইহাই তাঁহার স্বার্থ পরিচয়। তিনি, যে পিতার ঘরে জন্মিত হইয়াছিলেন, সেই ঘরে দীর্ঘকাল বাস করিবার হৃৎগোপ তাঁহার ঘটে নাই, তিনি স্বভাবতঃ বিরাজি ছিলেন এবং সাধুর পুরুষদের নিমিত্ত মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন বলিয়া তাঁহার সমসারী পিতা তাহাকে স্বপুত্র হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি বাসের নিমিত্ত একদানি কুটার পাইলেন মাত্র, পিস্তার ধন-সম্পদের অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

ইহাতে রবিদাসের কোন দুঃখ হইল না, সম্পদের প্রতি তাঁহার স্বপ্নও লোভ ছিল না। তিনি জ্ঞাতিতে মুচি ছিলেন। প্রত্যহ ভুই ছোড়া পান্থক প্রস্তুত করিতেন, এক ছোড়া বিনা মূল্যে সাধু-বৈষ্ণবের চরণে পরাইয়া দিতেন, অপর ছোড়া বিক্রয় করিয়া বাহা পাইতেন তদ্বারা প্রস্রাভিক্ত সর্দীক নির্মিতপাত করিতেন। তা ছাড়া তিনি বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বিনা পয়সায় মেরামত

করিয়া দিতেন। শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থের অধ-বদিক শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

“ভুই ছুড়ি জুতা প্রতিদিন বানাইয়া এক ছুড়ি দেন তিনি বৈষ্ণব দেখিয়া এক ছুড়ি বেচি করে দেহ-নির্লিপ্যং বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বানাইয়া দেন। ”

বাহিরের এই দীন-ধর্মপর মানবটি অন্তরের সম্পদে কত বড় ধনী ছিলেন, পাণতাপ-দম্ভা-হৃৎকারকলুষিত সাধারণ মানব তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া? রত্নের মূলা বোঝে সে, যে প্রকৃত জহরী। এইরূপ কথিত আছে যে, সাদনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মহাশয় রামানন্দ ভাষায়ে উন্মুক্ত পথে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমাজনলিপ্ত দিব্য নয়নে অনেক শক্তিমানী ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছিলেন। রবিদাস ইহাদের অগ্রতম। “রবিদাস তাঁহার কুটারের সমুদ্বস্থিত রাস্তার আবর্জনা রাত্রি দিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র সাধু রামানন্দ তাহাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, “তুমি কে?” বিস্মিত রবিদাস তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, “আমি এক অদ্বয় মুচি।” রামানন্দ কহিলেন, “তুমাকে সাদনা করিতে হইবে।” রবিদাস কহিলেন “আমি অতি নীচ; আমার পক্ষে কি ইহা সম্ভব?” রামানন্দ কহিলেন “দেখ, রবিদাস, তোমাকে কেবল মাত্র বাহিরের রাস্তার আবর্জনা বাট দিলে চলিবে না, দর্শকের পথে অনেক জঞ্জাল জমিয়া উঠিয়াছে, সাদনাদ্বারা তুমাকে সেই জঞ্জাল দূর করিতে হইবে”—তুমি আর বিলম্ব করিও না, তোমার ডাক পড়িয়াছে।” সন্তবতঃ পরম ভাগবত শ্রামানন্দের প্রেমকীর্তন-সম্পাতে - রবিদাসের চিত্ত-শতল এই সময়ে বিকশিত হইয়াছিল। চুপকম্পে লৌহ চুপকথ লাভ করিয়াছিল।

রবিদাসের বাহিরের জীবন-কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। ভগবানের গভীর ধ্যান ও সাধু-সেবায় তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত। পরিত্রতা তাঁহার অন্তের ভূষণ হইল। কষ্টে-স্বপ্নে কোন মতে তাঁহার জীবিকা চলিয়া যাইত। ভগবানের অগ্রগ্রহে উপাসন করিতে হইত না, এই মাত্র। এই দীন পরিত্র তাহা ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র, লোকে তাহা জানিত না, সাধারণ লোকে তাহাকে উপেক্ষা করিত। শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

“কই দাস বলি নাম নোকেতে কহয়।
“বির রূপার পাতা কেহ না জানয়।”

পরীক্ষার ভীত অনলে পোড়াইয়া ভগবান তাঁহার ভক্তের প্রেম বিস্তৃত করিয়া থাকেন। ভক্ত রবিদাসকেও সেইরূপ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এক দিন এক সাধু তাঁহার ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলেন, রবিদাস সর্বগ্রন্থে তাঁহার সেবা করিলেন। সাধু একঘণ্ডে স্পর্শমণি বাহির করিয়া তাহার গাধা ব্যাখ্যা করিয়া রবিদাসকে উপহার দিতে চাহিলেন; তিনি কিছুতেই সেই দান গ্রহণ করিবেন না, সাধুও ঐ স্পর্শমণি তাহাকে না দিয়া ছাড়িবে ন। অবশেষে, রবিদাস বিরক্তিসহকারে কহিলেন “আপনার অভিজ্ঞত হইলে আপনি উহা ঐ চালনে ভূমের মধ্যে গুন্ডিয়া রাখিয়া যান।” রবিদাস যম গ্রন্থযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি একটি সন্ধীতে রবিদাসের জন্মে ধনলালা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, রবিদাস এক দিন ঠাকুরের আসনতলে পাঁচটি শূরমুখা পাইয়া ভয়ে বিব্রল হইয়াছিলেন; তিনি ঐ অর্থের কি করিলেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে ভগবানের আদেশে ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-সেবায় ব্যয় করেন। এই সময়ে তিনি এক সেরকদিগের পরম সম্পদ; সেই সম্পদ দিবার পর দিন বাড়িতে থাকে, কিছুতেই তাহার ক্ষয় হয় না। কি দিনে কি রাতে কেহ ইহা হস্ত করিতে পারে না। এই সম্পদের যিনি অধিকারী, তাঁহার কোন হুচিভার কারণ

নাই, তিনি নিরাপদে আপন ঘরে ঘুমাইতে পারেন। হে পরমেশ্বর, বাহ্যিক ভূমি এই ধনের অধিকারী করিয়াছ, মণিতে তাঁহার কোন প্রয়োজন?” এই প্রসঙ্গে শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে মন্তব্য করা হইয়াছে—
“প্রাথমিক-রয়ে যেই মগন আচ্ছিন্ন
প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন ভায় ॥
ধর্ম-অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টাদশ সিদ্ধি।
দূরপাত্ত না করে যথো অতি ভূচ্ছ বুদ্ধি ॥
সে কি বজ্র জ্ঞান করে পরশরত্ন।
নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সাদনন্দ মন ॥”

তের মাস পরে সেই সাধু রবিদাসের কুটারে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন রবিদাসের দারিত্র্য বিমুহুর্য দূর হয় নাই, তিনি পূর্বের ভাষা কাদালেই আছেন। তিনি রবিদাসকে প্রশ্ন করিলেন “সেই স্পর্শমণি কি করিয়াছ?” রবিদাস কহিলেন—“আমি উহা স্পর্শ করিতে ভীত, আপনি উহা যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন সেইখানেই আছে।” সাধু বিস্মিত হইলেন, তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন রবিদাসের জন্মে ধনলালা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে, রবিদাস এক দিন ঠাকুরের আসনতলে পাঁচটি শূরমুখা পাইয়া ভয়ে বিব্রল হইয়াছিলেন; তিনি ঐ অর্থের কি করিলেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে ভগবানের আদেশে ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-সেবায় ব্যয় করেন। এই সময়ে তিনি এক সেরকদিগের পরম সম্পদ; সেই সম্পদ দিবার পর দিন বাড়িতে থাকে, কিছুতেই তাহার ক্ষয় হয় না। কি দিনে কি রাতে কেহ ইহা হস্ত করিতে পারে না। এই সম্পদের যিনি অধিকারী, তাঁহার কোন হুচিভার কারণ

“সদা পান নৃত্য বাদ্য যাত্রা মহোৎসব।

কক্ষখা বিনে আর নাহি অস্ত রব।”

সাধনে ভঞ্জে কর্ত্তনে ধানে মহোৎসবে
রবিবাসের দিন কাটিতে লাগিল। রবিবাসের
এই ঘটনায় বুদ্ধি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ
করিল। দার্শনিক ও জাতভিত্তিমাত্রী রাজাদের
দল এই মুহুরির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ
করিতে লাগিল। রাজস্বদল কামীর রাজার
নিকটে রবিবাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ
উত্থাপন করিল যে—মুচি হইয়া সে বহুসং
ঠাকুর পূজা করে; শাস্ত্রানুযায়ী সে এই
অধিকার পাইতে পারে না এবং এই
দার্শনিকতার জন্ত তাহার দণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য।

রবিবাস কামীর রাজার সমীপে আস্ত
হইলেন। তিনি অস্বস্তিতে অবস্থিত ভাবে
আপন মত নিবেদন করিলেন; তাহার মুক্তি-
যুক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া কামীরাজ তাহাকে
নির্দোষ বলিয়া অস্বাহিত দিলেন। অর্ন্তমাত্রী
রাজস্বদলের চাকুরী বার্থ হইল।

রবিবাসের প্যাতি স্ত্রীমা চিতোরের বসি
কামি ভক্তিন্মগ্নচিত্তে তাহাকে দর্শন করিতে
গিয়াছিলেন। সাধুকে দর্শন করিয়া রমীর চিত্ত
দ্রব হইল এবং তাহার মিত্র হইবার জন্ত
ব্যাকুল হইলেন। রমী কামি বার্মী ও
অনুচরণ সহ তাঁর্য্যবায় কামিদানে আসিয়া-
ছিলেন। তাহার সচর রাজস্বদল রমীর

চিত্তদৈবকলা দর্শনে একান্ত বিম্বিত হইল এবং
মুচি সম্বন্ধে রবিবাসের নিকট তাহাকে দীক্ষা
গ্রহণ করিতে বাধ্যতার রায় করিতে
লাগিল। রমী তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত
করিলেন না, তিনি কহিলেন—“ধিনি শ্রীহরির
শ্রীচরণ দ্বয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাহাকে নীচ
বলিলে অপরাধ হয়। পূর্ণদাশে উক্ত আছে
হরিকৃত চণ্ডালও দুবনগাবন।” রাজস্ব
অনুচরণ রমীর বিরুদ্ধে রমীর নিকটে
অভিযোগ করিলেন। রবিবাস রমীকে এই
একটা কথা বাক্য বলিলেন—“ভগবান
মাহারের দ্বয় দেবদে, জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত
করেন না।” রমী রবিবাসের সাধুতায় মুগ্ধ
হইলেন। রমী রবিবাসের আশ্রয় গ্রহণ
করিলেন।

রবিবাস তাহার বাতাবিক ভক্তি প্রভাষে
প্রাণমন ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া
তাহাকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।
তিনি যাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে
স্মরণি অতি মন্য। তিনি বলিতেন—
“তোমাতে আমাকে কি প্রভেদ? তুমি স্বর্গ,
আমি স্বর্গ; তুমি জল, আমি তরঙ্গ।”
রবিবাসের অমূল্য বাণী ও মদীত মানবের
চিত্তের অন্ধকার ও মনুষ্য দূর করে। তাহার
বহু মদীত (শব্দ) শিবদের ধর্মপুস্তক গ্রন্থ-
সাধনে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীশরৎকুমার রায়।

প্রেনের চাকুরী ও শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়

বহরিন পূর্বে ভারতগবর্নমেন্টের স্বরূপ
প্রেনের অধ্যক্ষ মিঃ উইলিয়ম রুস্‌ দ্বারা প্রকাশ
করিয়া লিখিয়া গিয়াছে,

“In Europe, typographic printing
is considered a highly respectable
profession, and youths who enter

it have generally received a fair
education. But this is not the
case in India, where natives who
have been educated in the English
language prefer to work as Copying
Clerks on small salaries rather than
become Compositors and earn
better wages.”

অর্থাৎ ইউরোপে মুদ্রাব্যয়ের কার্য অতি
মানজনক কক্ষ বসিয়া নিবেদিত হয় এবং
বহুশিক্ষিত যুবক এই বিভাগে কর্ম করিয়া
পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার ব্যতিক্রম
দৃষ্ট হয়। যে সকল এদেশবাসী ইংরাজীভাষা
শিক্ষা পেরে, তাহার আভাস যেতেন মাষ্টার
কোরাকীর খুব পড়ন করে, কিন্তু কম্পোজি-
টার হইয়া অর্থোপার্জন করিতে সমর্থ নহে।
মেইজর এদেশে ব্যবসায়ের উপযুক্ত লোক
পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন।

সে যাহা অনেক দিনের কথা। মিঃ রসের
মন্তব্য প্রকাশের পর প্রথম অর্ধ শতাব্দী
অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও কেহ
এদেশে ছাপাখানায় চাকুরী করে স্ত্রীমিলেই
তাহাকে আমরা বিদ্যালয়-ভাড়াইত লক্ষ্যীছাড়া
মনে করি ও সর্বদা রূপার পাত অস্থান করিয়া
লাই। এই অর্ধশতাব্দীতে অজান্তে দেশের
কত উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু এখন একটা বিষয়
আজিও আমাদের চক্ষে কত ঘোর হইয়া
রহিয়াছে। ছাপাখানার অপরাধ কি?
ছাপাখানার কার্য এত নিকিত কেন?

মুদ্রাব্যয় শিক্ষাবিত্তার প্রধান সহায়।
সে একদিন ছিল, যখন লোকে চিরজীবন
বসিয়া একখানা পুস্তক কর্তৃক করত। মুদ্র
মুদ্রে যে বিদ্যার প্রচার, তাহার অস্বপ্নীয়
বহু কালব্যয় ও অনেকস্থলে বাসদাধ্য

বটে। পরন্তু অনেক বিদ্যার্থী এক সময়ে এক
পুস্তক পাঠ করিতে পারে না। তৎপর
কালসহকারে একই গ্রন্থে কালক্রমের
কতি অস্থানের পরিবর্তনের জন্ত বহু পাঠ্য
দৃষ্ট হয়। মুদ্রিত পুস্তকে এ সকল দোষ
ঘটিতে পারে না। তৃতীয়, কাগজ বা ভাল-
পত্র লিখিত সাংখ্য, পাতঞ্জল, বাসায়ন,
মহাভারত প্রভৃতি অথবা গ্রন্থাবলি কেবল
এক শ্রেণীর লোকেরই অধিগম্য ছিল।
ভারতবর্ষের যাত্রা লইয়া গোরব, ভারতীয়
মণ্ডলিগণের সামান্য যাত্রা অভ্যাসে কল,
যে সকল মহারথের নিমিত্ত ভারতবর্ষের নাম
পৃথিবীর স্থানসমাজে আসত, সেই স্বরূপ
জানভাণ্ডারের চারি কেবল এক সম্প্রদায়ের
হস্তেই আবদ্ধ ছিল। মুদ্রাব্যয়ের রূপায় ও
ইউরোপীয় প্রভাবের অগ্রগণ্য প্রাচীন হিন্দুর
বেদ-বেদান্ত, যজুর্দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য,
নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে
নতুন নতুন আলোকে ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত
হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কি ছিল,
পৃথিবীর অন্য জাতির সহিত আমাদের কি
পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছি; এক্ষণে যাহার
যে বিষয় ইচ্ছা অন্যায়সে পাঠ করিয়া
তুলিলাভ করিতেছেন।

মুদ্রাব্যয় ঘারা দেশ কতদূর উপকৃত
হইতেছে, এ বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখা যাইতে
পারে। এ স্থানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে
যে, এ দেশের এমন গ্রাম অল্পই আছে,
যেখানে একখানিও মুদ্রিত পুস্তক দৃষ্ট হইবে
না। বর্তমানে আমাদের দেশে জনসাধারণে
শিক্ষাবিত্তারের জন্ত বহু ভাবে বহু চেষ্টা
হইতেছে। আমাদের ছাপাখানার অবস্থা যত
ভাল হইবে, যত অল্পমূল্য পুস্তক প্রকাশিত
সাধারণ প্রচার করা যাইবে, দেশের পক্ষে

শুনিতে পাই আমাদের ভিতরে অনেকের ব্যবসায়-কুশলতা আছে। এই মুহূর্ণ-ব্যবসায়ে কৃষকী বাদলাতে ত কাহাকেও দেখিতে পাই না। বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত প্রেসের সংখ্যা কলিকাতায় ও সমগ্র বঙ্গদেশে অসংখ্য। একটাও ভাল হোক। আমরা একটা ভাল ছাপাখানার দিকে তাকাইয়া তুষ্টি লাভ করি। হুই একটি ভিন্ন আমাদের প্রায় সমস্ত ছাপাখানারই অবস্থা শোচনীয়। যেন কোনরূপে দিন কয়েকটা কাটিয়া গেলেই হইল। আমরা যাহা বলি তাহা করি না। আরম্ভ করিয়া

শেষ পর্যন্ত পৌছিতে আমাদের দৈম্য থাকে না। অনেক-অসহায়ন করিয়া অগ্রদূত হই; ছুটবার পা পেরাই সব উদ্ভাস ও কর্মপন্থা বাপ হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়। কত রকমের ভ্যাণ্ডবিল ও বিজ্ঞাপন দ্বারা কি করিল পূর্বেই প্রচার করিয়া দিই, অথচ কখনও প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিয়া আসা-প্রসাধ লাভ করিতে সমর্থ হই না। বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত প্রেসগুলি দেখিলেই এ সকল কথা যথার্থ উপলব্ধি হইবে। (ক্রমশঃ) প্রেসের এক কণ্ঠস্বর।

বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা

বে দিন হইতে আমরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা পরিভোগ করিয়া কেবল প্রায়করণে প্রসূত হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্দশা আরম্ভ হইয়াছে। পরম্পর করিতে গিয়া বিদেশীয় জাতিগণের গুণগুলি ত গ্রহণ করিতে পারিই নাই—লাভের মধ্যে স্বকীয় জাতীয় জীবনের বিকাশের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখি। কৃষিকে “জীয়ার কাজ” মনে করিয়া, শিল্প ও ব্যবসায়কে স্বজাতির চক্ষে দেখিয়া, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পরবেশণাকে অসম্ভব ঠাওরাইয়া, দর্শন ও সমাজতত্ত্বের কাউন্সিলের নতরদের উপর কলম-চালানকে “বাসন হইয়ে চাপে হাত রেওয়া ভাবিয়া”—একমাত্র কেরানীগিরির লেখনীগোষ্যকেই জীবনের ধ্রুবস্তার জানে প্রাক-ভাষাখরিয়া আনি। জাতির জীবন যেন আকিস-আদালতেই, মাহতবের মহচ্ছাদ যেন বৈঠক-ঘরের বিদ্রম্ভনাগেই, ভুল্লোলকের ভুল্লতা যেন গাছফুলের আর উল্লনীত ভেদজ্ঞানে।

অবশেষে নিতাহই নিরুপায় হইয়া আমাদের গৃহাভিমুখী হইতে হইয়াছে। সূর্যের বিবর এখন আমরা জীবনের কর্মগুলিকে কর্তব্য-বোধে সমাবর করিতে শিখিতেছি—বিভিন্ন ক্ষেত্রে একক ও মিলিতভাবে নানা কর্মের অচেষ্টান করিতেছি; দেশের কাছে বিদ্যান-ও ধনবান নিজ নিজ মূল্য বিদ্যা ও ধন উৎসর্গ করিতেছেন। কিন্তু তথাপি, শিক্ষা-বিষয়ক বিবিধ স্বাধী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সমাজের বিবিধ অভাব মোচন জ্ঞ ও দেশবিদেশলব্ধ বিভিন্ন জ্ঞান ও কর্মরশিক বিদ্যালয় সমাজশরীরে, সঞ্চিত রাণিবার জ্ঞত উপরুক্ত উদ্যম দেখা যায় না। দেশের অসংখ্য লোক মৃত শিল্প ও নীরশ মাটি কামড়াইয়া থাকিয়া স্বর্ণদেহে ও জীর্ণপ্রাণে অকাল কলগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার নিবারণ জ্ঞত এখনও শিকিত মস্তুরায় কোমর দাঁড়িয়া উঠিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার একমাত্র প্রতিকার শিক্ষার সাধনা ও প্রচার—শিক্ষাশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, ব্যবসায়শিক্ষা,

বিজ্ঞানশিক্ষা, গণিতবিদ্যা শিক্ষা। অনেক সময় শিক্ষার বিবিধ বিষয় মধ্যে অস্পষ্ট জ্ঞান ও ভ্রান্ত ধারণাও আমাদের অধিকাংশ-অন পুণ করিয়া দেয়। স্বতরাং আব্রকাল এমুণবিষয়ে স্মৃত দিক দিয়া যত প্রকল্পের আলোচনা হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। বর্তমান প্রবন্ধে আমি বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি। আশা করি, বেশহিতৈচ্ছ শিক্ষা-প্রচারকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ছই দিক

কৃষিশিক্ষা নাম দিয়া এই যে আমরা একটি স্বতন্ত্র বিষয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব উপস্থাপন করিতেছি, তাহার দুইটা করণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, বালকগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধানের জ্ঞত অসম্ভাব্য বিদ্যালয়ে যে সবস্ত বিষয় অবশ্যপার্যক্রমে নির্ধারণ হইয়াছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিরই কিছু কিছু উপকরণ কৃষিকাজ-বিষয়গুলিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ কৃষিশিক্ষা দ্বারা ব্রহ্ম পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। এখানে আমাদের কেহ যেন ভুল না বুঝেন—কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি আর আর বিষয়গুলিকে বিদ্যালয়ের চতুর্মুখী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, অথবা তাহাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়া একমাত্র কৃষিশিক্ষারই একাধিপত্যের কথা বলিতেছি। না—আমার সে মন্তব্য আদৌ নাই। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে সমাজের বহু অভাব মোচন হইতে পারে। কৃষিই পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের—

জীবন ধারণের প্রথম ও প্রধান উপায় এবং কৃষিই অজ্ঞাত শিল্পবাণিজ্যের ভিত্তি। স্বতরাং ইহার উন্নতিসাধনপূর্বক সমাজের বহু অভাব মোচন করিতে হইলে, অজ্ঞাত বিষয়ের শিক্ষার ভাষা বিদ্যালয়ে ইহারও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

(ক) কৃষিবিজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষা

প্রথমে প্রধান কারণটা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক—দেখা যাক কৃষিশিক্ষা দ্বারা সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ কতদূর সাধিত হইতে পারে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ও দার্শনিকগণ যুগে যুগে শিক্ষার নানা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করিয়াছেন। এইগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকটির মূল্য বিচার করিয়া দেখা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক না হইলে, অনাবশ্যক মনে করিতেছি। শিক্ষার যে উদ্দেশ্যগুলি লইয়া আঙ্গাল বিভিন্ন দেশের শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রচারকগণ মন্তক সফলান করিতেছেন, পশ্চমান প্রথমে আমি সেইগুলিরই মাসিক্ত আলোচনা করিয়া, কৃষির সহিত তাহাদের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। প্রধানতঃ শিক্ষার সেই উদ্দেশ্যগুলি এইঃ—

(১) জীবিকা-অর্জন, (২) জ্ঞানার্জন, (৩) মানসিক বিকাশ, (৪) স্বাধীনতা বিকাশ, (৫) শিল্পাচার-লাভ ও সৌন্দর্য-বোধ, (৬) বহুধর্মীয় জ্ঞানলাভ, (৭) নৈতিক উন্নতি, (৮) সমাজের সহিত ব্যক্তির মিলন-সাধন, (৯) সমাজসেবায় যোগ্যতালাভ।

(১) কৃষিশিক্ষা ও জীবিকা-অর্জন

অমরদের সংস্থান শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য না হইলেও, ইহা যে একটি মূল উদ্দেশ্য, তথ্যময়, কোনই সন্দেহ নাই। যাহারা

দরিদ্র ও অনশন-প্রাপ্তিভিত্তি এবং যাহারা হাতে-কলমে কাজ করিয়া সাধারণ জীবনের কেবল মোটা অভাবগুলি মোচনে সচেষ্ট, তাহাদের নিকট শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত কৃতিকর। অগ্রচিন্তাই যাহাদের নিকট শিক্ষার চমৎকারীণী, তাহাদের নিকট শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি ত ক্রীতিকর হইবেই এবং যে শিক্ষা স্বাধীনভাবে উদ্যোগের সমস্থানে যোগ্যতা প্রদান করিতে পারে, তাহাকে ত তাহারা সাদরে শিরে ধারণ করিবেই। সমস্যার নানা বিঘ্ননা স্বীকার্য পূর্বক স্বীয় সন্তানগণকে দাব্যসম-কার্য বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াও যদি দরিদ্র পিতা-মাতা তাহাদের নিকট হইতে সামান্যিক বিষয়ে কোনও সাহায্য না পায়, বরং তৎ-পরিবর্তে নিজেদেরকেই বিজ্ঞানপ্রভাণ্ডার 'লেখাপড়া-জ্ঞান' পুত্রের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহারা কোন মুখেই বা সেই শিক্ষার প্রশংসা করিবে এবং কেনই বা স্বীয় সন্তানগণকে পুনরায় সেই-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া অভাবগ্রস্ত পরিবারের অভাব আরও বর্ধিত করিবে? কিছুকাল পূর্বে জনসাধারণের অবস্থা সচ্ছল ছিল, মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের জুতা কাহাকেও বড় বেশী ভাবিতে হইত না। ছেলেরা জমিদারের গোমস্তা, পুলিশ ও উকীল মোক্তারের সহিত ভ্রমভাবে কদাচিৎ কহিতে, খাজনা ও মোকদ্দমার কাগজপত্রগুলি বুঝিয়া লইতে, ক্রয় ও বিক্রয়কাবালগুলি লিখিতে ও গৃহে বুদ্ধবুদ্ধাগণকে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্মপুস্তক-শাস্ত্রগুলি পড়িয়া শুনাইতে পারিলেই—সকলে তাহাদের উপর সম্ব্যস্ত হইত এবং তাহাদের লেখাপড়ার প্রশংসা করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে গুণ-

স্বাচ্ছন্দ্যের দিন চলিয়া গিয়াছে—তখন অনায়াসে আর জীবিকালান্ধ হয় না। সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যালয়-গুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা সেই প্রাচীন ধরণেরই রহিয়া গিয়াছে। আজকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষা এক্ষণ শ্রেণীর বালকগণকে জীবিকা-অর্জনে যোগ্যতা প্রদান না করিয়া বরং অকস্মাৎই করিয়া ফেলে। এই কারণেই আমাদের গ্রামা বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধন বা সাংখ্যাবৃদ্ধি ত হইই নাই, বরং অনেকগুলির অস্তিত্ব একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। পিতামাতা শিক্ষিত পুত্রের অকর্মণ্যতান চেষ্টে অজ্ঞ পুত্রের কর্মকটোরতাকেই সহ্যসা-বদনে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। স্বতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থায় আরও এমন কিছু থাকি উচিত, যাতেই এক্ষণ শ্রেণীর লোকেরও অভাব মোচিত হইতে পারে। আর আম-দের দেশে এই শ্রেণীর লোকই ত বেশী। বিদ্যালয়ে কৃষিক্ষিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলে ইহাদের অভাব বহু পরিমাণে মোচিত হইতে পারে এবং বিদ্যালয়ও সেই সঙ্গে তাহাদের মনোযোগ ও সহায়ত্বভূতি আকর্ষণ করিতে পারে।

(২) কৃষিক্ষিক্ষা ও জ্ঞানার্জন

মহাদেশের আদিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, যাহাদিগকে 'অমরপ্রের জু বড় বেশী ভাবিতে হয় না, তাহাদের নিকট শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি অধিকতর প্রিয়। তাহারা বলিয়া থাকেন, "জানই শক্তির আধার" এবং এই শক্তির আধার জ্ঞানলাভের জু স্বীয় সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। কদাচিৎ সত্য, কিন্তু এই জ্ঞান ও শক্তি সম্বন্ধে অনেক সময় তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাও দেখিতে

পাওয়া যায়। -যাহাই হউক, বিদ্যালয়ে কৃষিক্ষিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলে, তাহাদের বালকবালিকাগণের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা যথাপ্রাপ্ত না হইয়া, বরং বিপুল ও বিস্তৃত-ভালে চরিতার্থই হইতে পারে। প্রকৃতির মূল শক্তিরামির সহিত প্রকৃত পরিচয় এই কৃষিক্ষিক্ষানে আলোচনা দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় এবং বিদ্যালয় পল্লীসমাজ-জীবনের অন্তরতম প্রশ্নেই ইহারই সাহায্যে প্রশ্নে-লাভ হয়। সত্য সত্যই ইহার মধ্যে এত জ্ঞানের বিষয় লুকায়িত আছে যে, জীবনব্যাপিনী 'মানব' দ্বারাও ইহার কিনারা পাওয়া যায় না।

(৩) কৃষিক্ষিক্ষা ও মানসিক বিকাশ
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা সুবিবার ও ভাবিবার শক্তির তারতম্য। মহাদেশের মধ্যে আমরা স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বিচারের শক্তি দেখিতে পাই, আমরা সাধারণতঃ তাহাদিগকে শিক্ষিত ও জ্ঞানী বলিয়া থাকি; আর তাহাদের মধ্যে এই গুণগুলি দেখিতে পাই না, তাহাদিগকে অশিক্ষিত ও জ্ঞানহীন বিশেষণে বিশেষিত করি। এই ভাবে প্রাবল্যবশতঃই মানসিক বিকাশ শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানের অর্জন, ভাব-প্রকাশের ক্ষমতালান্ধ, নিপুণ সমালোচনার শক্তি প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যের অঙ্গগত। কৃষি-বিজ্ঞান যতকাল শিক্ষার নব নব বিষয় আবিষ্কার করিয়া শিক্ষার্থিগণের সম্বন্ধে উপস্থাপিত করিবে, ততকাল ইহা তাহাদের বুদ্ধি মাজ্জিত ও মন বিকশিত করিতে থাকিবেই।

(৪) কৃষিক্ষিক্ষা এবং শিষ্টাচার ও সৌন্দর্য্য-বোধ

শিক্ষার আর একটা উদ্দেশ্য মানুষকে শিষ্টাচারী করিয়া, সভ্য সমাজের উপযোগী

করিয়া তোলা ও তাহার সৌন্দর্য্যবোধ বিকশিত করিয়া দেওয়া। কৃষিতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা মানুষ এই গুণগুলি বিস্তৃত-ভাবে লাভ করিতে পারে। উদারচিত্ততা, বদাচার, কর্তব্যপারায়ণতা, নির্ভীকচিত্ততা, সমবেদনা, বিনয়শীলতা প্রভৃতি দ্রষ্ট মানবীয় গুণাবলির জু পৃথিবীতে যে সমস্ত লোক ব্যতিক্রম করিয়াছেন, অহমস্বাদন করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, তাহাদের অধিকাংশেরই প্রথম জীবনের শিক্ষা পবিত্র পল্লী-সমাজে ও মুক্তপ্রকৃতির মধ্যেই হুসম্পন্ন হইয়াছিল। স্রোতস্বতীর কল্লোলে, তারা-পটিত হ্রদীল আকাশে, বৃক্ষলতাশূর্ণ-শোভিত বিদ্যালয় পল্লীপ্রান্তরের মনোহর চিত্রে, মুক্ত-পাখীর আকুল তানে, গাভীর হাধারবে, কুটারবাসী কৃষকের সহজ সরল ভক্তির গানে বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিরামির যে সমস্ত অভিনয় চলে, তাহাদের সহিত সম্বন্ধযুগ স্থাপন করিয়া মানুষ যৌবনের প্রারম্ভে যে এক বিশেষ নিষ্ঠাচার ও সভ্যতা লাভ করে, তাহা আর অজ্ঞ কেন উপায়ে লাভ হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিক্ষিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে বালকবালিকাগণ যৌবনের প্রারম্ভেই মানববৃত্ত্যরূপকারী বিশ্বপ্রকৃতির এই শক্তি-রামির সম্পর্কে আশিবার সুযোগ পায় এবং তাহাদের বাল্যাবস্থার নিম্নত ভাবগুলির সহিত বিজ্ঞানের যোগ সাধিত হইয়া তাহাদের প্রথম শিক্ষাজীবন প্রশস্ত ও গভীর করিয়া ফেলে। কৃষিবিজ্ঞান ও পল্লীর সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পল্লীসমাজের অবলম্বন ও বিকাশের দিক দিয়া শিক্ষা দিলে বালক-বালিকাগণের কোমল অন্তঃকরণে এমন এক ভাব চিরন্তনে রক্ষিত হইয়া যায় যে, তাহারা নিজেদেরকে বিদ্যালয় সমাজের কুটুম্ব মনে

করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারে।

(৫) কৃষিক্ষিক্ষা ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ

শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য সর্বাঙ্গহৃদয় মানবজাতি। শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সত্য সত্যই ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা ছাড়াই দেখ-মননীতি সমভাবে পুষ্ট করিয়া, মানুষকে প্রকৃত মানব বলান করে। মেটো শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া যখন বলিয়াছিলেন, “প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও আত্মা হৃদয়ের পরিপূর্ণ করিয়া তোলে,” তখন তাহার অন্তরে শিক্ষার এই উদ্দেশ্যই বর্তমান ছিল। যদি সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে বাল্যকালের শিক্ষার জন্ত বিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞানের বন্দোবস্ত আরও হৃদয়রূপে করা উচিত, নচেৎ তাহাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হইবে না। কৃষির বিষয়গুলি এত বিচিত্র যে, ইহা জীবনের সমস্ত দিকই স্পর্শ করে এবং এ গুলি এত বিস্তৃত যে সর্বতোমুখীন অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জগৎ ইহাদের মধ্যে অসংখ্য উপকরণ প্রাপ্য হওয়া যায়। কৃষিবিজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞ কোনও একটি শিক্ষণীয় বিষয়ে ছাড়াই দেখ-মননীতির সর্বাঙ্গীন দৃষ্টি-সাধনের জন্ত এত অধিক উপকরণ পাওয়া যায় না।

(৬) কৃষিবিজ্ঞান ও বহুমুখী জ্ঞানলাভ

যাভাবিক নিয়মে মানবসমাজ জন্মশই অভিযুক্তি প্রাপ্য হইতেছে। এই ক্রমোন্নতির ফলে সমাজে বহুবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যজাতিই তাহাদের বিদ্যালয়গুলিতে

বহুজ্ঞানলাভ এই জ্ঞানরাশির শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বহু জ্ঞানসমৃদ্ধিগণকে শিক্ষিত ও সভ্যসমাজের উপযোগী করিয়া তোলে। সামাজিক উন্নতির এই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া তাহাদের জ্ঞানরাশি জাতীয়ভাবে বিকাশলাভ করিতে থাকে। এই সমস্ত জ্ঞানরাশির সহিত পরিচিত হইয়া নবজ্ঞানের অংশীদার ও আবিষ্কারে প্রস্তুত হইতে পারিলেই, আমরা মানুষকে শিক্ষিত ও জ্ঞানী বলিয়া থাকি। সত্য সত্যই শিক্ষার এই উদ্দেশ্য দ্বারা বিচার করিলে, প্রত্যেক শিক্ষিত ও সভ্য ব্যক্তিকেই সমাজিক জ্ঞানরাশির সহিত ন্যূনাত্মক পরিমাণে পরিচিত হইতে হইবে। এই সমাজিক জ্ঞানরাশির বহুভাগ কৃষি ও পল্লীজীবনের স্তম্ভগত। হুতরাং যে ব্যক্তি এত সূক্ষ্মে অজ্ঞ তাহাকে শিক্ষিত বলা যাইতে পারে না—তিনি রসায়ন-শাস্ত্রে নব পরমাণুর প্রতিক্রিয়াই কখন, আর গণিতশাস্ত্রে নব প্রণালীর আবিষ্কারই কখন। সহরের কোনও ছাত্র আহারে বসিয়া যদি আশ্চর্যের সহিত পাচক ঠাণ্ডুরকে জিজ্ঞাসা করেন—“ঠাণ্ডুর ধানগাছ কত বড়? ধান-গাছের কি তত্ত্ব হয়?” তবে তিনি দর্শন-শাস্ত্রে যতই প্রতিষ্ঠালাভ করুন না কেন, তাহার শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ, একথা বলিতেই হইবে। আজকাল অনেকেরই বলিতেছেন যে প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হইতে হইলে, কোনও এক বিষয়ে পাঠ্যলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে, অজ্ঞাত অনেক বিষয়ের সহিত জ্ঞানাত্মক পরিমাণে পরিচিত হইতে হইবে। যদি শিক্ষিত ব্যক্তির সমাজে ইহাই হয়, তবে অজ্ঞাত অনেক বিষয়ে জ্ঞানাত্মক পরিমাণে জ্ঞানলাভ কৃষিবিজ্ঞান যে যথেষ্ট সাহায্য করিবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একমাত্র ইহারই

আলোচনায় রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, বস্তু-বিজ্ঞান, কৃষক-সমাজ, কৃষিবিষয়ক, ধন-বিজ্ঞান, পল্লীনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় ও তাহাদের বিবিধ ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে যেটোমুটি অনেক জ্ঞানলাভ হইয়া যায়।

(৭) কৃষিক্ষিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি

অষ্ট্রিটল বলিয়াছেন, “প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিক জীবনের চিহ্ন তাহার নৈমিত্তিক জীবন-যাপনে পুরিলক্ষিত হয়। এই উদ্দেশ্যসাধন-কল্পে শিক্ষা মনো-চরিত্র এমনভাবে গঠিত করে যে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে নৈতিক শব্দ থাকে উচিত, তাহা হৃদয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।” জাৰ্মাণীর বিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষা-তত্ত্বজ হের্মার্ট এই মতেরই সমর্থন করেন। পল্লীজীবন-যাত্রার একটি প্রধান অবলম্বন ও নির্দিষ্টধারারূপে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দিলে ছাত্রগণকে নিম্নত পল্লীসমাজের সম্বন্ধে আদিত হয় এবং এইভাবে শিক্ষাজীবনের প্রথমভাগেই সমাজের বিচিত্র ভাব ও নীতি তাহাদের চিত্তপটে সঞ্চিত হইয়া যায়। কৃষি কেবল বিজ্ঞানে নয়, ইহার অংশীদারের সহিত সামাজিক জীবনের অভাব-অভিযোগ ও প্রত্যক্ষভাবে সঙ্গীষ্ট। বিজ্ঞানের “সহিত ব্যবহারের সংযোগ ছাড়াই নৈতিক জীবন দৃঢ় ও পুষ্ট করিয়া তোলে। মানবীয় কর্মের যতগুলি ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষি-বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোনটাতেই ছাত্রের নৈতিক-উৎকর্ষ-সাধনের জন্ত এত অধিক সংযোগ ও উপকরণ পাওয়া যায় না এবং সম্ভবতঃ আর কোন ক্ষেত্রেই এত অধিক নীতিশিক্ষার প্রয়োজন হয় না। পল্লীপ্রকৃতির ধ্যানে এবং সমাজ-জীবনের বিবিধ বৈচিত্র্য ও প্রতিষ্ঠানগুলির পথ্যালোচনায় ছাত্রের নৈতিক চরিত্র দৃঢ় ও প্রশস্ত হয় এবং শিক্ষার্থী বালক,

তাহার যে অন্তরতম ভগবান পল্লীপ্রকৃতির বিচিত্র শক্তিপুষ্টের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার সহিত আত্মার নিম্নত সূক্ষ্ম উপলব্ধি করিবার সংযোগ প্রাপ্ত হয়। জীবন তখন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া তাহার নীতি উপস্থিত হয়—তখন সে মানব-জীবনের উচ্চতর ও বিস্তৃততর অর্থ ব্রহ্মদয় করিতে পারে। শুদ্ধ বসিয়া নৈতিক জীবনের উন্নতি-সাধন ও ধর্ম-জীবনের মার্গদ্বা-উপভোগ সম্ভব হইলে—নিশ্চয়। এরূপ নীতি ও ধর্মের স্ব-লৌপ কণ্ঠজীবনের ঘাতসম্মতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।

(৮) কৃষিক্ষিক্ষা ও সমাজের সহিত ব্যক্তির মিলন-সাধন

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষকেই তাহার চতুর্পার্শ্ব জগতের সহিত সখা হাপন করিয়া, জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ব্যক্তির স্বস্থঃ তাহার পারিপার্শ্বিক শক্তি-পুঞ্জদ্বারা সীমাবদ্ধ। স্বতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে এই শক্তিরাসির সহিত মৈত্রী স্থাপন পূর্বক তাহাদের সম্ব্যবহার করিতে পারে, প্রত্যেক শিক্ষানীতিরই সেই উদ্দেশ্য থাকে উচিত। যে ব্যক্তি হৃদয়রূপে এই মিলন সাধন করিয়া তাহার নিজের ও অজ্ঞাতসকলের স্বঃ ও সাচ্ছন্দ্য বর্ধিত করিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত বলা যাইতে পারে। সমাজ-জীবনের অর্থ এই মিলন-সাধনের ক্ষমতা। কোন মানুষই এই ক্ষমতা লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হয় না। চতুর্পার্শ্ব সমাজ-জীবনের সহিত এই মিলনসাধনের ক্ষমতা-লাভের সঙ্গেই তাহার প্রকৃত শিক্ষালাভের আরম্ভ হয় এবং আজীবন স্থায়ী হয়। বাল্যে ও যৌবনে বিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রত্যেক সভ্যজাতিই নিজ নিজ বালককালিক-

পক্ষে সমাজ-জীবনের উপযোগী করিয়া তোলে। ইহা খুবই সম্বন্ধের বিষয় যে, কোনও মানুষ পল্লীসমাজের কৃষিশিল্প, রীতিনীতি, অভাব-অভিযোগ, অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া এই সামাজিক জীবন-যাত্রার উপযোগী হইতে পারে। অধিকন্তু, যাহাদিগকে পল্লীসমাজেই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাহারা এই মিলনসাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়তই অহতব করে। এই শ্রেণীর লোকগণের অভাব-মোচন জ্ঞাত বিভাগেই কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা আরও আবশ্যিক। এই শিক্ষা তাহাদিগকে প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়ম ও পল্লীসমাজের সহিত স্ব-স্বসম্পদ স্থাপন পূর্বক জীবন-যাপনে যোগ্যতা প্রদান করে।

(৯) কৃষিশিক্ষা ও সমাজ-সেবার যোগ্যতালাভ

সমাজ-সেবার যোগ্যতালাভ বর্তমানকালে অনেকে সর্ববিধ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। এই সেবার উপযোগী হইতে হইলে প্রথমে প্রত্যেককেই সর্ববিধে স্বাবলম্বী হইতে হয়। কিন্তু অস্ত্রের উন্নতির পথে বিয়ের কারণ না হইয়া স্বাবলম্বনপূর্বক স্বীয় জীবনযাত্রা স্বচালাকরণে সম্পন্ন করিতে পারিলেই মানুষের সমস্ত কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। মানব নামের অধিকারী হইবার জ্ঞাত তাহাকে সমাজের উন্নতিকল্পে বহুবিধ কণ্ঠের অহুষ্ঠান করিতে হয়—নানা প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতে হয়। কৃষি ও শিল্পকে সামাজিক জীবনের বিকাশের ধারারূপে শিক্ষা দিলে বালকগণ সমাজসেবার নিপুণতা লাভ করিতে পারে। আমাদের দেশের ঐ অংশ লোকই কৃষিজীবী এবং তদধিক পল্লীবাসী; সুতরাং

ইহাদিগকে স্বন্দররূপে পল্লীজীবন-যাপন ও পল্লীসমাজের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে বিদ্যালয়ে অগ্রাঙ্ক শিক্ষার গ্রন্থ কৃষি ও শিল্প-শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা উচিত। অবশ্য সমাজসেবার আরও অনেক পথ উন্মুক্ত আছে; কিন্তু যে দেশের ঐ অংশ লোকই কৃষিজীবী ও পল্লীবাসী, তাহাদের উন্নতির চেষ্টা ফলবতী করিতে হইলে প্রত্যেক সমাজসেবকেরই পল্লীজীবন ও পল্লীর কৃষিশিল্পের সহিত কিঞ্চ পরমাণে পরিচিত হওয়া উচিত। নচেৎ বস্তুত সেওয়ার সফল হইবার সমস্ত কর্তব্য শেষ হইল, এরূপ ভাবিয়া তাহাকে সমস্ত থাকিতে হইবে।

যে কৃষক প্রকৃতির শক্তিনিস্তারের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া রসনার তৃপ্তিকর বহুবিধ শ্রম উৎপন্ন করে, সেও শিল্পীর সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য। বিশাল প্রান্তর কৃষকের চিত্রপট এবং মাটি ও মৃদুস্বভাব প্রাকৃতিক শক্তিরূপি তাহার চিত্রের উপকরণ। শিল্পী মানবচিন্তার সৌন্দর্য-বাসনার তৃপ্তি সাধন করে; কৃষিজীবী অগ্রাঙ্ক শ্রম স্বীকার পূর্বক উদ্ভবের ও চিত্রের সুদৃ-বৃত্তির জ্ঞাত বহুবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় শ্রম উৎপন্ন করতঃ মানব-সমাজে স্ব-স্বাচ্ছন্দ্য আঁট রাখিয়া থা য়।

(খ) কৃষিশিক্ষা ও পল্লীসমাজ

এখন একবার বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার সহিত পল্লীসমাজের স্ব-স্ব-দৃষ্টি, উন্নতি-অবনতি, অভাব-অভিযোগের সম্বন্ধ সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখা যাক। অবশ্য, কৃষি-শিক্ষার সহিত সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া ইহা অবাস্তব ভাবে কিঞ্চ পরমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

তথাপি পরিষ্কার বোধের জ্ঞাত ইহাকে আর একটু বিস্তৃত ভাবে দেখা দরকার। ইহা সহজেই বোধগম্য যে, পল্লীসমাজের স্ব-স্ব-দৃষ্টি কৃষির উন্নতি-অবনতির উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। শুধু পল্লীসমাজ কেন, দেশের সমস্ত সমাজের স্ব-স্ব-দৃষ্টি এই কৃষির সহিত বহু পরিমাণে জড়িত। কৃষিবিজ্ঞানের চর্চার অভাবে আমাদের দেশের কৃষক-সমাজ এবং তৎসঙ্গে অগ্রাঙ্ক সমাজ অতীব শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। এই দুঃস্থাবর উন্নতিসাধন করিতে হইলে দেশমধ্যে কৃষি-দ্বিফার বন্দোবস্ত করিতে হইবেই এবং কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শস্তাদি উৎপন্ন করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই—কিভাবে কৃষকদিগের কৃষি-শিক্ষা অগ্রব্যয়সাধ্য ও লাভজনক করা যাইতে পারে? পুখা-কলেজে প্রচুর অর্থব্যয়ে কৃষি সম্বন্ধে বহু অধ্যয়ন চলিতেছে, দেশমধ্যে কৃষিসংক্রান্ত, কয়েকখানি পত্রিকাও দেখা দিয়াছে, প্রতি বৎসর জেলায় জেলায় কৃষি-প্রদর্শনও খোলা হইতেছে। এমনও বিষয় অহুচিত ও গুনিয়া অনেকেই আশাবিত হইয়াছেন যে, এরূপ আরও দুই-একটি কলেজ, দুই-একখানি পত্রিকা ও ঘন ঘন কৃষি-প্রদর্শনী দেখা দিলে, অচিরেই কৃষির উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের ধনাগমের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে—দ্রুতকি দুঃস্থ পায়ান করিবে। কিন্তু সত্য কি তাই? একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এরূপ আশা অমূলক। এই অহুষ্ঠান-গুলির দ্বারা যে কৃষির কোনই উন্নতি সাধিত হইতেছে না, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। আসল কথা এই যে, ইহাদের পরিচালন জ্ঞাত যে পরিমাণ অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হইতেছে, তদনুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে

না। ইহার কারণ বাহির করিবার জ্ঞাত বেশী কষ্ট করিতে হইবে না, ইহা সহজেই বোধগম্য। গুরু শিষ্যকে বহু কষ্ট স্বীকার পূর্বক মন্ত্র মুখস্থ করাইয়াও যদি তাহাকে তাহার প্রয়োগবিধি হইতে বঞ্চিত রাখেন, তবে তাহাদের সমস্ত শ্রম যেমন ব্যর্থ হয়—অথবা, তৎফলতঃ জল-তৃষ্ণা নিবারণ মানলে জলাশয়ের নিকটবর্তী চর্চারও যদি ভীরে অববোধেণ কবিত্ত না পারে, তবে তাহাকে যেমন ঠুঁকাগুঁড়ি থাকিতে হয়; আমাদের কৃষি-শিল্প-ব্যবসায় সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানগুলিরও সেই দশা হইতেছে। একে ত আমাদের দেশে এ সমস্ত বিষয়ের উন্নতির জ্ঞাত যথেষ্ট চেষ্টাই হয় না, সৌভাগ্য-কণ্ঠে যেটুকু হইতেছে, তাহাও পরিচালক ও উদ্যোক্তাগণের দূরদর্শিতা, বৈদ্য ও একাগ্রতার অভাবে আশাহ্রুপ ফলপ্রদান করিতেছে না। ব্যাপকভাবে ও দূরদৃষ্টিতে দেখিবার শক্তি না থাকিলে আজকাল কোন বিষয়েই স্থায়ী উন্নতিলাভ করিতে পারা যাইবে না—শিক্ষাই হউক, শিল্পই হউক, ব্যবসায়ই হউক আর কৃষিই হউক। এমনও বিষয় অহুচিত ও পরিচালিত-করিবার সময়, পারিপার্শ্বিক শক্তিরূপির সহিত ইহার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জ্ঞাত উপযুক্ত চিন্তা ও শক্তি প্রদান করি না বলিয়া অনেক সময় আমাদের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয়। অবশেষে নিরাশপ্রাণে বলিতে হয়, “হায়, কেবল ঘামানই সার হ’ল।”

কৃষিশিল্পের উন্নতি ও প্রচারের চেষ্টা করিতে গিয়াও আমাদের তজ্জন অবস্থা হইতেছে। কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অধ্যয়ন-ফল বুঝিবে কে? পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু ইহা পড়িবে কে? প্রদর্শনী খোলা

হইতেছে, কিন্তু ইহার তাৎপৰ্য্য গ্রহণ করিবে কে? অথবা চাষা নিরক্ষর শিল্পী! স্বতঃপাৎ এই সমস্ত অহুষ্ঠান ও আয়োজনগুলির জ্ঞান যে অর্থ ও যে শক্তি ব্যয়িত হইতেছে, তাহা সার্থক করিতে হইলে, সৰ্মসাধারণের জ্ঞান উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আরকাল অনেকে বলিতেছেন যে, প্রচারক-গণ পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া কৃষিশিল্পের বৈজ্ঞানিক প্রকৃিয়াগুলি সাধারণকে বুঝাইয়া দিলে অনেক ফল ফলিবে। কিন্তু এরূপ বিশেষ প্রণালীতে কিছু ফল ফলিলেও, সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিদ্যালয় স্থাপন পূৰ্বক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শিক্ষা-প্রদানের আমরা পক্ষপাতী। শিল্পী ও কৃষক-গণ বিজ্ঞানের মূল নিয়মগুলির সহিত শৃঙ্খলা-বদ্ধভাবে পরিচিত না হইলে এবং পুস্তক ও পত্রিকা পড়িয়া তাহাদের প্রয়োজন-বিধি বুঝিয়া লইতে না পারিলে প্রচারকগণের চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে, বুঝিতে পারি না। প্রচারকগণও প্রত্যাহই কৃষকের সহিত মাঠে যাইবেন না অথবা চিরদিনই কৃষকগৃহে বাস করিবেন না। এই বিদ্যালয়গুলিতে পল্লী-বালকগণ অজ্ঞাত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত কৃষিশিল্প-ব্যবসায়ের মূল কথাগুলি ও তাহাদের প্রয়োজন-বিধি হাতে-কলমে শিক্ষা করিবে। অন্ততঃ চারি পাচটা গ্রাম লইয়া এরূপ এক একটা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে। এই বিদ্যালয়গুলিতে কেবল অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণই নিয়মিতরূপে শিক্ষালাভ করিবে এমন নয়—অবকাশমত বাহাতে গ্রামের বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও তাহাদের নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিখিতে পারে এবং গ্রামের হিতকর বিবিধ বিষয়গুলির আলোচনা করিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত থাকিবে।

সহস্র শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, এমন কি কলেজের অধ্যাপকগণও, মধ্যে মধ্যে এই বিদ্যালয়গুলিতে গমন করিয়া নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা এবং অজ্ঞাত অনেক উপায়ে এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি-কল্পে ও উৎসাহ-বর্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। এইরূপ পল্লী ও সহরের মধ্যে যখন যখন ভ্রমণ-বিধির দ্বারা জাতীয় জীবন-প্রবাহে শক্ত ও আবির্ভাব হইয়া, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবাধে অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। আর যদি আমাদের বর্তমান অবস্থায় পল্লীতে পল্লীতে এরূপ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা নিত্যন্তই কষ্টসাধ্য হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে আপাততঃ প্রত্যেক জেলার কেন্দ্রস্থানগুলিতে এক একটা আদর্শ "বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। এরূপ বিদ্যালয় আমাদের প্রত্যেক জেলায় পূৰ্ব হইতেই বিদ্যমান আছে। জনসাধারণের উন্নতির জ্ঞান যদি আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই "বিদ্যালয়গুলির" মামূলি প্রচার উন্নতি সাধন করিয়া ইহাদিগকে সমাজশক্তি ও বিশ্বশিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে পারা যায়। অনেক বয়োপ্রাপ্ত কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকেও নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে কৃষ্ণিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারের জ্ঞান অনেক সময় আমরা উৎকর্ষ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলির দ্বার সৰ্মসাধারণের জ্ঞান উন্মুক্ত নয় বলিয়া এবং বিদ্যালয়গুলিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জ্ঞান বিবিধ শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই বলিয়া, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না। কিঞ্চিৎ জ্ঞানের আলোচনা পাইতে কার না আগ্রহ চায়?

অতএব আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, কৃষি কলেজ, কৃষিপত্রিকা ও কৃষিপ্রদর্শনী চেষ্টাসমূহ

ফলবতী করিতে হইলে, বাহাতে কৃষকবালক-গণ ও কৃষকযুবকগণ কিছুকাল "বিদ্যালয়-গুলিতে" অবস্থিত করিয়া কৃষিবিজ্ঞানের মূল নিয়মগুলি ও তাহাদের ব্যবহার-বিধি শিখিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। নতুবা যতই কলেজে অধ্যয়ন চলুক, যতই পত্রিকা প্রকাশিত হউক এবং যতই প্রদর্শনী খোলা হউক, কৃষি ও কৃষকের অবস্থা যেমন ছিল, প্রায় তেমনই থাকিয়া যাইবে।

প্রথমতঃ এরূপ ব্যবস্থা হয়ত অনেকের নিকট অপেক্ষণ ও অসম্ভব চৈকিবে। "অনেকে আশ্চর্যের সহিত প্রশ্ন করিবেন, "এরূপ ব্যবস্থা আর কোনও দেশে আছে কি?" এরূপ প্রশ্ন কিন্তু অস্বাভাবিক। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহাদের নানা কথা জানিবার ও ভাবিবার ইচ্ছা হইতেছে। এরূপ ব্যবস্থা আর কোনও দেশে আছে কি না, আমি অধ্যয়ন করিয়া দেখি নাই। দেশের কৃষি, কৃষক ও পল্লীর দুর্বস্থা দেখিয়া ভনিয়া অনেক সময় অনেকে কহাই মনে আসিত, আজ সেইগুলিই প্রকাশ করিবার আশা—দেশবাসী ও দেশের গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আর "যদি কোনও দেশে এরূপ অবস্থা না-ও থাকে, তবে নতুনভাবে কোন কথা ভাবিতে দোষ কি?"

এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থার চেষ্টা গভর্ণমেণ্টের একটি প্রধান কর্তব্য। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশের অর্জাব-অভিযোগ এক রকমের এবং গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাগুলি আর একরকমের, অনেক বিষয়ে ত গভর্ণমেণ্ট একেবারে নিষ্কণ্ট—দেশবাসীও তজ্জন। "কিন্তু এমনভাবে আর কিদম চলিবে? গভর্ণমেণ্ট যদি দেশের বিজ্ঞ ও দায়িঅবোধযুক্ত লোকগণের সহিত

একযোগে চেষ্টা করেন, তবে অল্পবয়সে ও অল্পায়াসে অনেক ফল পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের কষ্টভীরা এ বিষয়ে এত উদাসীন কেন, কিছুই বুঝা যায় না। জনসাধারণের প্রবৃত্তি করের এক নির্দিষ্ট অংশ তাহাদের উদ্যোগী শিক্ষার জ্ঞানই ব্যয়িত হওয়া উচিত। সকল সভা দেশেই এ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—কেবল আমরাই কি অসভ্য-বর্ধর? আর যদি আমরা তাহাই হই, তবে গভর্ণ-মেণ্টের এ বিষয়ে আরও বেশী মনোযোগ প্রদান করা উচিত। অনেক সময় অর্থাভাবের অভিযোগ উঠিতে পাওয়া যায়। আর সমস্ত কাজে অর্থের অপ্রতুল হয় না,—অনেক সময় অনেক কাজে কাজেও জলের মত অর্থব্যয়িত হইতে দেখা যায়—কেবল দেশের প্রকৃত হিতকর কাজ জনসাধারণের শিক্ষার বেলায় অর্থাভাবের অভিযোগ। যদি ভারতের মত শক্তজাতি, প্রকৃতির লীলানিকেতন, ধনজনপূর্ণ দেশেও অর্থাভাবে ও দোকাভাবে জন-সাধারণকে অজ্ঞ নিরক্ষর থাকিয়া দুর্ভিক্ষে নিপেশ্বিত হইতে হয়, তবে জানি না পৃথিবীর আর কোন দেশে ইহাদের সমস্ত ব্যয়িত হইতে পারে? যদি ইহাই হয়, তবে বলিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞান, রাজস্ববিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সমাজের হিতকরী ও শৃঙ্খলাকারী বিজ্ঞানগুলির কোন মূল্যই নাই। আমরাই বিজ্ঞানগুলি আলোড়ন করিয়া, হিসাব খতাইয়া, অর্থ কমিয়া দেখাইব যে, মানবসমাজে এ সবার অভাবের দিন আসিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে অথবা এমন দিন বহুপক্ষেই অতীত হইয়া গিয়াছে। যখন আমাদের দেশে সমস্ত ও শ্রম সংক্ষেপের জ্ঞান রেল ছিল না, মেশিন ছিল না, তখনও জন-সাধারণের শিক্ষার জ্ঞান এ সব কিছুই অভাব

হইত না। য়ুরোপ ও আমেরিকাতে, এ সবের অভাব হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, অভাব আর কিছুই নয়—অভাব কেবল সচ্ছিন্নতার ও সাধু চেটার। দেশবাসীর প্রদত্ত কর যদি দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির জন্ত দেশমধ্যেই ব্যয়িত হয়, তবে অর্থভাব হয় কেমন করিয়া?

কিন্তু আর দুইখণ্ড ও অহতাপ করিয়া লাভ নাই। নিশ্চেষ্ট ও তজ্জাকৃত হইয়া বসিয়া থাকিলেও কিছু হইবে না। সকলকে মিনিয়া মিশিয়া দেশবাসীর অবস্থার উন্নতির জন্ত উপযুক্ত শিক্ষা, নানা আয়োজন ও বিবিধ প্রতিষ্ঠানের জন্ত উদ্যম করিতেই হইবে। সম্পত্তি আমরা শুনিয়া স্বাধী হইলাম যে, বহুর শাসনকর্তা উপায়দ্বয় লব্ধি কার-মাইকেল দেশের শিক্ষাবিষয়ক বিবিধ প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছেন—বহু অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতেছেন। গবর্ণমেন্টের কর্তব্যই তা এই। এছাড়া আমরা তাঁহার মনোয় ন্যায়ের উদ্দেশ্যে, আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দেশের তত্ত্বাবধান, সমাজের অন্তরতম বিষয়গুলি যদি গবর্ণমেন্ট নিজে, বুদ্ধিমা উন্নিতে না পারেন, তবে এই সমস্ত কার্যের ভার বিজ্ঞ ও দায়িত্ববোধপূর্ণ দেশবাসীর উপর অর্পণ করিলে, দেশ-শাসন, সমাজোন্নতি, শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীর দুইটা শ্রেষ্ঠ জাতির সাম্রাজ্যকার হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ কাহাকে জানিল না, বুঝিল না। উভারা কেবল সাম্রাজ্যসদেই মত্ত রহিলেন—আর আমরা কেবল ভয়ভয়েতেই কাটা হইলাম।

উল্লেখ্যের নিকট উভয়েরই অনেক শিবিয়ার ছিল, বুঝিবার ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা হইল না—সে মিলন ঘটিল না। দেড় শত বৎসর বুঝাই কাটিয়া গেল। কিন্তু এই মহামিলনের উদ্বোধন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বোধ হয় আর কেহ চোকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

শিক্ষাপ্রচার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নুতন কর্তব্য

কয়েক বৎসর হইতে দেশের যুবকসমূহ বিদেশে যাইয়া বহু অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার পূর্বক শিল্প, বিজ্ঞান ও কৃষি সম্বন্ধে নানা প্রকারের শিক্ষালাভ করতঃ দেশে প্রত্যাপন করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন নিয়মেই শিক্ষার্থী রতী হইতেছেন, কেহ কেহ বা ব্যক্তিগতভাবেই জীবিকা অর্জনে মনোনিবেশ করিতেছেন। এক দল নগর পরিভ্রমণ পূর্বক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলে কেমন হয়? এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধনের "অন্ত" ও বহুবিষয়াজিজ বহু লোকের প্রয়োজন। মাস্টার্স আর কয়েক গুরুমহাশয়গণ দ্বারা তা এই কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আর যদি একজন ব্যবস্থায় "হুন্ডের অর্থক দিয়া ময়দান গাড়ী টানা" হয়, তবে শিক্ষাপ্রচারের আরও অনেক গুণ উন্মুক্ত আছে। তাহাদের কিংকি সাধু ইচ্ছা ও স্বার্থ-ভাগ্যের বানান থাকিলেই বিদেশগমনের কষ্ট ও অর্থব্যয় সার্থক হয়। সুহরের বড় কল্যাণ ও ফাস্ট্রীতে বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা-প্রদান ও কর্ণপরিচালনে নিরুক্ত থাকিয়াও, ইচ্ছা থাকিলে, দেশমধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জন্ত তাঁহারা কিংকি সময় ও শক্তি সার্থকভাবে ব্যয় করিতে পারেন। অবশ্যকায় সময় সুহরের উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে মফস্বলের বিদ্যালয়-

গুলির শিক্ষকগণের জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলে, শিক্ষাপ্রচারের কার্য অনেক অগ্রসর হইয়া যায়। তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা সময় মফস্বলের বিদ্যালয়গুলিতে গমন করিয়া, নিম্ন মিত্র বিষয়সম্বন্ধে বক্তৃতা দান ও অজ্ঞাত অনেক উপায়ে বিদ্যালয়গুলির সুশৃঙ্খল ও উন্নতিসাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। একজন ব্যবসা থাকিলে দেশের খাজানামা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশবাসীর নিকট কেবল কল্পনার জিনিষ অথবা নামমাত্র না থাকিয়া প্রত্যক্ষ অসুখতীর সামগ্রী হইতে পারেন এবং শিক্ষিত পরবাসী ব্যক্তিগণও দেশ-বাসীকে দূর, অসম্পর্কিত, অবজার পরদর্শ ও কিছুকি-কিছুমাত্র জীব না ভাবিয়া আপন ব্যক্তিগত চিন্তা লইবার সুযোগ পাইতে পারেন। এইরূপে শিক্ষিতের সহিত অশিক্ষিতের এবং সুহরের সহিত গ্রাম্যের শিক্ষা ও সমাজগততা নানা বিষয়ে ভার-বিনিময় হইতে পারে এবং এক্ষেপে সকলেরই বোধোদয়, তাঁরাপদ্যর্গ ও সহবাসপ্রদানের দোষনা যথার্থরূপে পরিভূত হইতে পারে। আমেরিকার কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রকার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি, খ্যাত-নামা অধ্যাপক, প্রদিক-উজ্জ্বলিক ও এঞ্জিনিয়ারগণ আমেরিকাবাসীদের নিকট কেবলমাত্র কল্পনার বস্তু বা তীতির সামগ্রী নহেন; জনসাধারণও ইহাদের নিকট গোপাল অথবা মেঘমল্লের ভায় অজ্ঞা বা অর্থহেলার জিনিষ নয়। কর্ণক্ষেত্রে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক বেশাশিষ্ট, বৈশাশিষ্ট হইতে দেখা যায়—সকলেই সকলকে কাজের মত বুঝিয়া লইবার, চিন্তিয়া লইবার সুযোগ পায়।

তাই বলিতেছিলাম, কোনও রকম ব্যবস্থা না করিয়া, কেবল শুভে চীৎকার, নীরবে অশ্রুপাত অথবা উদ্বেগজনী কাঁকা বক্তৃতা দ্বারা কোন দেশই কোন কালে বড় হয় নাই—আমাদের দেশও হইবে না।

দেশবিদেশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বিচিত্র জ্ঞান ও অজিজ্ঞতা এইরূপে প্রচারের ব্যবস্থা না করিয়া বিশাল সমাজের যৌর অজ্ঞানাস্বীর অপসারিত হইলে কি উপায়ে? এবং এই গুলিকে শিক্ষাবিষয়ক বিবিধ প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে দিয়া সমাজশরীরে ধরিয়া রাখিলে দেশ-বিদেশের জ্ঞানলাভ সার্থক হইবে কেমন করিয়া? এদন বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে যতকালই বিদেশ-গমনের আন্দোলন তুলুন-বেগে চলুক না কেন, তাহাতে দেশের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হইবে না এবং শিক্ষাভাবের জন্য বিদেশগমনে কোন কালেই বন্ধ হইবে না। বিদেশগমনের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু স্বদেশকে জানে শুধে উন্নত করিবার জন্ত বিদেশগমন এক রকমের, এবং কেবলমাত্র পুত্র-পরিবার লইয়া স্থলে জীবনযাত্রা নিকীহ করিবার যোগ্যতাভাবের জন্ত বিদেশ-গমন আর এক রকমের। দেশ যদি দরিদ্র, অজ্ঞ ও অল্পমতই থাকিরা যায়, তবে এই স্বয়ম জীবন-ব্যাপনও বেশী দিন স্থায়ী হয় না। আর কেবল জ্ঞানের আদানের জন্য নয়, জ্ঞানের প্রদানের জন্যও বিদেশে যাইতে হয়। জ্ঞানভাবের জন্ত আমরাই কেবল বিদেশে যাইব, কেবল একজন না ভাবিয়া, বিদেশীয়-গণও সেই জ্ঞানলাভের জন্ত আমাদের দেশে আসিতে পারে, একজন পরাধীন ও করিতে পারা যায়। তারপর, অগ্রকাল যুরোপ ও আমেরিকায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববন্ধনের আন্দোলন চলিতেছে—এই আন্দোলনে অজ্ঞাত জাতি-

গণকেও ত একদিন যোগ দিতে হইতে পারে। এ সমস্ত কেবল তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান আরম্ভ হইবে, এবং এই আদান-প্রদানের স্বরূপাত তখনই হইবে, যখন প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ দেশ মধ্যে বিবিধ উপায়ে শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়া রিয়া নানা শক্তিশালী বোক প্রস্তুত করিতে থাকিবে। কে জানে, হয়ত যোগাণানাপিত, জোলা-ভাতী, শাশুড়ীর মধ্য হইতে কত মহাপুঙ্খ আবিস্কৃত হইয়া জগতের যুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে। যুরোপ ও আমেরিকা বহুদিন হইতেই তাহাদের কৃষ্ণ আরম্ভ করিয়াছে। এখন আমাদের পালা।

বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার প্রকৃতি ও বিষয়

বিদ্যালয়ে কৃষিক্ষিকার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সন্দেহ অনেক কথাই বলিয়া, এবং ইহার প্রচারে দেশের শিক্ত সম্প্রদায় ও গভর্ণমেন্টের কর্তব্য সন্দেহও 'কিঞ্চিৎ' ইহিত করিলাম। এখন একবার এই শিক্ষার প্রকৃতি ও বিষয় সন্দেহ 'কিঞ্চিৎ' আলোচনা করা বাক্—দেখা বাক্, কি পরিমাণ কৃষির বিষয় কলপ্রভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যাবলিকার অঙ্গরূপ করা যাইতে পারে। অবশ্য, এই শিক্ষার বিবিধ পক্ষ বিষয়, পাঠের ক্রম ও শিক্ষাপ্রদাননীতি বিশেষজ্ঞগণ দ্বিরীকৃত ও শুদ্ধলিত করিবেন। আমি এখানে ইহার স্থল বিবরণ সঙ্ক্ষেপে প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইব। আমি নিজে কৃষিবিদ নই অথবা কৃষিভাষ্যানের ছাত্রও নই—কেবল কৃষক-পন্নীতে জন্ম বলিয়া ও কৃষকসম্প্রদায়ের ছদ্মবস্ত্র সহিত প্রত্যক্ষভাবে কিঞ্চিৎ পরিচিত মনে করিয়া, ভ্রম করিয়া ইহার আলোচনা নিজ অধি-

কারের গভীর মধ্যে টানিয়া আনিলাম। একমাত্র আশা—কৃষিশিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ মহোদয়গণ ও দেশহিতৈষী শিক্ষাপ্রচারকগণ এতৎ সন্দেহ সন্নিহিত আরোচনা করিয়া কর্তব্য নিষ্ঠারূপ করিবেন।

কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশের বিদ্যালয়-গুহিতে বালকগণকে কেবল লিখিতে, পাঠিতে ও অঙ্ক কবিত্তেই শিক্ষা দেওয়া হইত; 'বিবিধ বিজ্ঞান ও তাহাদের ব্যবহার-প্রণালী' সন্দেহে শিক্ষা-প্রদানের কোনই ব্যবস্থাও ছিল না—এ সন্দেহ ভবিষ্যৎ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নবযুগের নতুন শিক্ষা ও নতুন জীবনমত্তা আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাৱে আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দীর্ঘে দীর্ঘে বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য-তালিকার মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, স্তব্ধবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান ও প্ৰাণীবিজ্ঞানগুলিও স্থান লাভ করিতেছে। অনতিবিলম্বে কৃষি, গিন্ন ও বাবসায়ও যে স্থান পাইবে, তাহারও পূর্ণাভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা যে খুব স্বলগ্ন ও সমাজের জীবনোপকরণের পরিচয়, তথ্যময় কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষার বিষয়গুলি স্বাভাবিক গতিতে পুঠ ও বহিত হইক, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, এই প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাইতেও পারে। হস্তব্য শিক্ষানায়কগণের কর্তব্য, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগদ্বারা শিক্ষা ও সমাজের অন্যথা অভাবগুলি দীর্ঘ ও সংঘতভাবে বুঝিয়া লইয়া, তাহাদের মোচনের জন্ত বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

অত্যাচ্চ অনেক বিষয়ের জ্ঞান কৃষিকেও প্রদানত; জিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে

পারে—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চবিজ্ঞান-মুখক। তৃতীয় বিভাগটি সন্দেহে বর্তমান আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে এখানে উন্নত প্রণালী-উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও স্তব্ধবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানগুলির গভীর তুৎ-গুলির সহিত পরিচয় ও কৃষির উন্নতির দ্বারা তাহাদের প্রয়োগবিধি সন্দেহে সম্যক জ্ঞান-লাভ হয়। কৃষিবিষয়ে নানা অহুদদান ও আবিস্কার এই বিভাগেই আশা করা যাইতে পারে।

প্রাথমিক কৃষি-বিজ্ঞান

মাধ্যমিক * উদ্ভিদবিজ্ঞান, * পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান বিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞানেরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ও স্থান আছে। অত্যাচ্চ বিজ্ঞানের স্থল ও প্রাথমিক নীতিসমূহের জ্ঞান এই কৃষিবিজ্ঞানেরও নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল তথ্যগুলির সহিত প্রত্যেক বালক ও যুৎকের পরিচিত হওয়া উচিত। সেই তথ্যগুলি এই—কৃষিসংক্রান্ত উদ্ভিদগুলির প্রকৃতি ও বৃদ্ধির নিয়ম; বিবিধ শস্যাদি এবং তাহাদের রোপণ ও কর্তনের সময়; বিবিধ জাতীয় বীজের অঙ্কুরোৎপাদন-রীতি; বিভিন্ন প্রকারের জমির প্রকৃতি; সারের উপকারিতা ও তাহার ব্যবহারপ্রণালী; কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রাদির গঠন ও ব্যবহার; ছদ্মের রক্ষণ ও তাহা হইতে বি-মাণ প্রস্তুত-প্রণালী; গো-পালন; এবং আরও অজ্ঞাত অনেক বিষয়। উপযুক্তরূপে দৃষ্টিশক্তি সফালিত করিতে পারিলেই এ সমস্ত বিষয় সন্দেহে অনেক জ্ঞান লাভ হইতে পারে; হস্তব্য যাহাতে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণ এই শক্তিতে ও তাহার ব্যবহার করিতে

পারে, প্রাথমিক কৃষিক্ষিক্ষায় তৎপ্রতি সর্বেশেষ যত্নোযোগ দিতে হইবে। কৃষিসংক্রান্ত এই প্রাথমিক বিষয়গুলি সন্দেহে জ্ঞানভাণ্ডারের জন্ত গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না; অনেক প্রাথমিক বালক এইগুলি জ্ঞানে ও ভালভাবে। এই বিভাগে বালকগণ প্রকৃতির স্রষ্টা জিনিষগুলি ও কৃষিবাগ্যারে তাহাদের প্রয়োগপ্রণালী সন্দেহে সঙ্ক্ষেপে, ও সরলভাবে শিক্ষা লাভ করিবে। এখানে যন্ত্র ওজন, পরিমাপ বা অঙ্কুরোৎপাদনের ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কেবল বালকগণের উৎসাহ ও আনন্দ-বর্ধনের জন্ত শিক্ষক মহাশয় মধ্যে মধ্যে এই বিষয়ের ব্যবহার করিতে পারেন। এবং বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি পরীক্ষা (experiment) দেখাইতে পারেন। এই শিক্ষার সন্দেহে পুস্তকের ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে অথবা ইহার স্থান অতি গোণ রাখিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয়কে দৈনিক শিক্ষার বিষয় পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিতে হইবে; তাহা না হইলে শ্রেণীতে গিয়া গোলমাল করিতে হয়। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে এই গোলমালের প্রাচুর্য্য বড় বেশী। শিক্ষাবিষয়ে এটা জ্ঞানকল্প জিনিষ। একদিনের ইহা যেমন অনেক সময় বুঝা নষ্ট করে, অপরদিকে ইহা তেমনই আবার সর্ববিধ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে। প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ সন্দেহে এই কৃষিক্ষিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য থাকিবে। একজ্ঞ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সংস্থানে একটা করিয়া উদ্ভি-উদ্ভাটন ও কৃষিপদার্থগণের প্রাচুর্য্য উচিত। শিক্ষক মহাশয় স্ববিধমত বালকগণকে নিকট-বর্তী কৃষিক্ষেত্রে, কৃষকগৃহে, প্রান্তরে ও জঙ্গলে লইয়া গিয়া কৃষিসংক্রান্ত বিষয়গুলি সরলভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন।

মাধ্যমিক কৃষি-বিজ্ঞান

মাধ্যমিক কৃষিবিজ্ঞান উপরোক্ত দুই সীমার মধ্যে অবস্থিত। যে সকল ছাত্র কৃষিবিজ্ঞানের যেটা কথাগুলির সহিত পরিচিত হইতে চাহে এবং বাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে অল্পপথ অবলম্বন করিবে, তাহাদিগকে সম্বন্ধে পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের মূল নিয়মগুলির সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া কৃষি-বিষয়ে তাহাদের ব্যবহার-প্রণালী শিখাইলেই চলিতে পারে। এই সম্বন্ধে তাহাদিগকে তাহাদের পঠনীয় কৃষিবিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া পল্লী-সমাজের ও পল্লীজীবন-যাত্রার মূল ধারাগুলির সহিত পরিচিত করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে সকল ছাত্রকে নানা কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই তাহাদের লেখাপড়া শেষ করিতে হইবে এবং বাহারা বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর তাহাদের অধীত বিষয়গুলি কৰ্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ফল পাইতে চাহে, তাহাদের পঠনীয় বিষয়গুলি অধিকতর বিস্তৃত ও ব্যবহারমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাদের জ্ঞান যে পরিমাণ কৃষি-বিজ্ঞান নিষ্কিষ্ট হইবে, তাহার মধ্যে অন্ততঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যথাসম্ভব বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও ব্যবহার-প্রণালী থাকা উচিত। বিষয়গুলি এই—উদ্ভিদের দেহতত্ত্ব, উদ্ভিদের বাদ্য, বিভিন্ন প্রকার ভূমি ও জলবায়ুর সহিত বিভিন্ন জাতীয় শস্যের সম্বন্ধ-বিচার, ফল-বৃক্ষাদি পালনের নিয়ম, বিভিন্নপ্রকার ভূমির চাষ-প্রণালী, বিভিন্নপ্রকার সারের ব্যবহার-প্রণালী, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষত্রে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের উৎপাদন-প্রণালী ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তির

সহিত তাহার সম্বন্ধ, গোষ্ঠীতির পালন ও উন্নতি-প্রণালী, পশুপাল্য, দুগ্ধ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নি-মাখন-প্রস্তুতকরণ, উদ্ভিদের রোগ ও তাহার নিবারণ-প্রণালী, কৃষিযন্ত্রাবির বিবরণ, কৃষিযন্ত্র-নির্মাণ-প্রণালী। এইগুলির পাঠ সমাপ্ত হইলে ছাত্রদিগকে পল্লীসমাজজীবনের মূলধারায়গুলির সহিত পরিচিত করিয়া দিতে হইবে এবং তৎসম্বন্ধে কৃষি ও কৃষকজাতির উন্নতিকল্পে সম্ভ্রান্তি যে নতুন পল্লী ও কৃষিবিষয়ক ধর্মবিজ্ঞানের স্বপ্ন হইয়াছে, তাহারও মহত তাহাদিগকে পুত্রীত করিয়া দিতে হইবে। বলাবাহুল্য, বিদ্যালয়ের সংগ্রহে এক একটা উদ্ভিদ-উদ্ভাষন, কৃষি-পদার্থ ও বিভিন্নপ্রকারের শস্যাদি উৎপাদনের জ্ঞান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখণ্ড ভূমি থাকিবেই। কৃষিক্ষেত্রের বিবরণ ও পার্শ্বের ক্রমগুলি স্থির কিনিার সময় বালকদের মানসিক বিকাশের তরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষত্রে ভিন্ন শস্যের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কোন কোন ছাত্র ও অভিভাবক যদি নিত্যন্তই শ্রম করেন যে, এক্ষণে ব্যবহার্য তাহাদিগকে 'চাষা' করিয়া তোলা হইবে এবং অজ্ঞাত উচ্চতর জ্ঞান্যোক্তেও পথে বাধা প্রদান করা হইবে, তবে না হয় তাহাদিগকে এক্ষণে শিক্ষার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক উৎসাহী বালক ও যুবক এই শিক্ষালাভের জ্ঞান বিদ্যালয়ে আগমন করিতে পারে, তাহাদের শিক্ষার জ্ঞান ও বিশেষণে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে, বিবিধ কর্তব্য ও সামাজিক দায়িত্ব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমুদ্র উপস্থিত; স্বতরাং এখন আর বিদ্যালয়ের গভী সন্ধান রাখিলে চলিবে না। ইহাকে বিবশিকা ও সমাজশক্তির কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস।

আই ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা।

মহৎস্বলের বাণী

১। ভাব-সাধন

প্রত্যেক চিরকাল ভাব-প্রবণ, কিন্তু কদাচ-মুখের ছিল না। পাঠ্যে কল্পের গছন বনে জীবনবাণী সাধনার নিমিত্ত মহাপ্রকৃত্য এই ভারতীয় জাতি গঠন করিয়াছে—সামান্য নৈমিত্তিক তাহার কথাচ লোপন হন নাই। কিন্তু হুই 'দুঃখ' অল্প ভাবুতার অভাব ঘটয়াছে। কৰ্ম—কেবল কৰ্ম—পাকাত্য অপরকল্প কৰ্ম—জীবনের সারস্বত বিনাশ গণ্য হইতেছে, তাই ভারতীয় জাতিমূহ পল্লব-প্রাণী হইয়া পড়িয়াছে। আজ পল্লীগ্রাম শূন্য, সহর লোকে লোকারণ্য। সহর পাকা রাস্তা, চফল সমাজ, ছলিত লাল্য, কৃত্রিম সভ্যতা, স্বার্থ সাধনা, স্থূলত প্রাণস্ফীত জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু ইহাতে জীবন গঠিত হয় না। যে দুর্ভাগি ভারতীয় সমাজ গঠন করিয়াছিল তাহা আজ ক্ষতি হইয়াছে।

কিন্তু এই ভাবে এ জাতি গঠিত হইবে না, ইহা টিকিবে না, অথচ প্রকাণ্ড মহাদেশ-স্বরূপ বিরাট ভারতবর্ষের ৩০ কোটি লোক একদিনে বা দশ দিনে ধ্বংস হইবে না, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাকে বাচিয়া থাকিতে হইবেই। তাই চিন্তাশীল প্রশংদগুণি ব্যক্তি একদিনে বা দশ দিনে ধ্বংস হইবে না, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাকে বাচিয়া থাকিতে হইবেই। তাই চিন্তাশীল প্রশংদগুণি ব্যক্তি মাত্রই এই সমস্ত পূরণ করিতে যত্নপর না হইয়া পানেন না। তাই মনে হয়, এতগুলি লোকের ভবিষ্যৎ নিমজ্জিত করিতে সাধক দরকার। আমরা আজ আর সাধক নই, আমরা আজ শিক্ষক, স্বয়ং অসিদ্ধ অপরকে সিদ্ধ করিতে অভিলাষী।

এই শিক্ষা পরিবর্তন করিতে হইবে—এই জীবন—এই হিমুদ জীবন—সাধনক্ষেত্র করিতে

হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে এই জীবনই শেষ জীবন নহে, আমাদের আবার এই ভারতে আসিতে হইবে, বিজিত কার্ণাগুলির একটা হিসাব হইবে, পরিভ্রমণ করিতে পরিসমাপ্তির জ্ঞান আবার জগৎগ্রন্থ করিতে হইবে। এই ধারণা ভারতবাসীর স্বরূপে বহুশতঃ জীবনব্যপ্ত পরিভ্রমণ করিয়া নববস্ত্র-গ্রহণের আয় এক জন্মের জীবদেহ পরিভ্রমণ করিয়া অপর নবদেহ ধারণ করিতে হইবে—ইহা ভারতীয় শাস্ত্র-কথা। সেই দেশে একদিনে এক বক্তৃতা কাল সাধিয়া নাম কিনিবার সম্ভাব্যতা কে শিক্ষা দিল—এ শিক্ষা সার শিক্ষা নহে।

তাই মলিতেছিলাম, জীবনকে কার্যক্ষেত্র কর, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি সাধন কর; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ব্রহ্মবর্ষের পর বৎসর সাধন কর। কেমন করিয়া তাহা করিবে জিজ্ঞাসা কর? বাহারা হৃদয় পল্লীগ্রামে একটি পরিবার গঠন করিতেছে তাহারও সাধক। এই পৃথিবীতে একটি উপযুক্ত লোক গঠনে যিনি সহায়তা করেন তিনিই প্রকৃত কার্য করেন। প্রত্যেকের জীবনে বিরাট ব্যাপার ধরনের সম্ভবপর নহে। মহৎ আদর্শ লইয়া ক্ষুদ্র কার্য করিলেও তাহাতেই আশ্রয়লাভ করিতে পারা উচিত, ভগবান ঐ একনিষ্ঠ শ্রমকে ভাবী জীবনে মহৎ কার্যের যোগ্য করেন। যিনি ক্ষুধাকারে আর্দ্রসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি আজ জগৎ সমক্ষে নমস্, কিন্তু কে জানিত এই ক্ষুদ্র প্রায়শ্চন্দ্র এমন মহামানবকে পরিণত হইবে। আর তিনি

আজ নব্বয় দেখে এ জগতেও নাই। ভেমনি যিনি খানিয়া পাহাড়ে অঙ্গভা নিরক্ষরগিকে ভাষা দানে ত্রুতী হইয়াছেন, তাহার কার্য শত বক্তা, শত নেতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আজ দেশে অবৈতনিক শিক্ষা-প্রদানের কথা শ্রুত হইতেছে—এক এদেশে কি দশটা প্রাণী এখনও সেকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কেহ কি অনাড়ম্বর পল্লীগ্রামে গিয়া আপন জীবনরত্ন সাধন জ্ঞান আসন নিদিষ্ট করিয়া বসিয়াছেন? একরূপ করিতে আজকাল অনেকের ইচ্ছা হয় না—কারণ তাহাতে সহজে লসাবাদপড়ে নাম ওঠে না, উহার ফল সদা দেখা যায় না; বিশেষ কথা উহাতে তেমন অর্থায়ন হয় না এবং উহা করিতে গেলে জুতা মোজা পায় দিয়া, পাকা সড়কে হাটিয়া বেড়ান যায় না। সদা ফল-লাভের অসম্ভবতা আমাদিগকে এই প্রকার দীর্ঘকাল-বাগী কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না। তাই বলিতেছিলাম, দেশ হইতে ভাবুকতা লোপ পাইতেছে, আজ আমরা প্রত্যেকেই Practical অর্থায়ন—জুড় খাখিহুসন্মানে তৎপর। কিন্তু ভবিষ্যৎ শাখকে এইগুলি বর্জন করিতে হইতে। নীরব কর্মে আত্ম-নিয়োগ কর, বিন্দু পরিমাণ কাজ করিয়া পরিকাগাজে মুদ্রিত নামের পশ্চাতে বক্ষ-স্বীতি জমাইও না।

বিলাসিতা বর্জন করিতে হইবে, অপরের পোষাকের জাকজমকের দিকে চাহিও না; সাদা দেখে, সাদা মনে, সাদা পোষাক গ্রহণ কর, নব্বয়বে বহিঃসৌন্দর্য সাধন কর। দারিদ্র্যে ঘৃণা করিও না—দারিদ্র্যে ঘৃণা জাতীয় পতনের মূলীভূত কারণ। ক্ষুদ্র জীবন খাপন কর, কিন্তু মহানাদর্শ অহুসরণ করিও, লোকে আশা জানিল না বলিয়া অধীর হইয়া

উঠিও না। পাচটা গ্রামের অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা কর, তোমার ক্ষুদ্র প্রাণ দখল হইবে।

এই নীরব সাধনা, অনাড়ম্বর জীবন, একনিষ্ঠতা, প্রচাররাহিত্য ভিন্ন কার্য্য হইবে না। তাগে বড় হও, ভোগে নহে। তোমার সুখারাহিত্যের আদর্শে আর ছুটি লোক তৈয়ারী কর দেখিবে দেশে ত্যাগী লোকের অভাব হইবে না। এই বিধাস-ঘাতকতা, প্রতারণা, স্বার্থপরতার দিনে এমন আদর্শ-যজ্ঞন ও পোষণ করার আবশ্যকতা আছে, ইহাই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন-গঠনের মূল ভিত্তি—মাত্রপথ্য: বিদ্রোহে অযুগ্ম।

বিশাল-হিতৈষী

২. উপার্জনেপায়োগী শিল্পশিক্ষা

নিম্নলিখিত উপায়ে মাসে রাখিলে দশ বার দিবস উত্তমরূপে তাজা থাকে,—কোন পাত্রের মধ্যে মাস রাখিয়া তাহাতে মনোভেলা দুই একরূপভাবে ঢালিয়া রাখুন যেন মাস ঢুবিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে দুই নষ্ট হইবে, কিন্তু মাস দশ বার দিন টাটকা থাকিবে। বাংলায় তৈল মাথাইয়া রাখিলে তিন দিনেও অখাদ্য হয় না।

লেবুর রস টাটকা রাখা—প্রথমে লেবু-গুলিকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া চাপ দিয়া রস বাহির করুন। পরে এই রস ক্রান্বেলে ছাকিয়া বোতলের মধ্যে পুরিয়া দৃঢ়ভাবে ছিপি বন্ধ করুন। অনন্তর এক যানি কড়াতে জল গরম করিয়া বা জলপূর্ণ বোতল তাহার মধ্যে রাখিয়া অর্ধঘণ্টা জাল দিও, পরে শীতল হইলে বোতল নামাইয়া রাখুন। এই রস অনেক দিন টাটকা থাকিবে। লেবুর রসের সহিত দশ ভাগের

এক ভাগ জিনিগার বা এলোহাল মিশ্রিত করিলেও এই রস নষ্ট হয় না।

মাখন তাজা রাখিবার উপায়—২ ভাগ লণ্ণের সহিত এক ভাগ চিনি এবং এক ভাগ সোরা মিশ্রিত করুন। এই মিশ্রিত দ্রব্য মাখনে দিলে উহা খারাপ হয় না। এক পাউণ্ড পরিমাণ মাখনে এক আউন্স উক্ক মিশ্র দ্রব্য দেওয়া বিধি। যদি মাখনে দুর্গন্ধ হয় তবে ১ ড্রাম সোডা দিবেন। এইরূপে প্রিজারভ করা মাখন বিলাত ও অষ্ট্রেলিয়া রাশিয়ার নীচ শুকাইয়া যায় না।

বাসী ফল-তাজা রাখা—জলে লবণ মিশাইয়া সেই জলে ফলের বোটা ডুবাইয়া রাখিলে শীঘ্র শুকাইয়া যায় না।

ডিম রক্ষা—(১) ডিমের উপর আরবা গদ বা চর্নি তুলিয়া দ্বারা লাগাইয়া শুকাইয়া লইবেন। (২) পল্লীগ্রামের গৃহস্থগণ ডিমের (খাচ্চের) মধ্যে রাখিয়া ২২২ দিন এমন কি বেড় মাস পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় তাজা রাখেন।

লণ্ণের মধ্যে রাখিলেও না কি অনেক দিন তাজা থাকে।

দুই রক্ষা—কাঁচা ছুরের মধ্যে কয়েকটা খুব আল লতা জড়িয়া রাখিলে শীঘ্র টাটকা যায় না, কিছু সোডা দিলেও অবিকৃত থাকে বলিষ্ঠা শুনিয়াছি।

কর্পূর—কর্পূর বড় উষ্মার দ্রব্য, সহজ বাতাসে উড়িয়া যায়, কিন্তু একটা শিশির মধ্যে কর্পূর রাখিয়া তাহাতে কিছু গোল-মার দিলে অনেকটা এই দায় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

কমলা টাটকা রাখা—একটা বড় কাঠের বাগ্ন শাগ্রহ করুন। কতকগুলি বাবু বেশ পরিষ্কার করিয়া রোঁজে শুকাইয়া লউন।

পরে বাস্তবীক নীচে বাবু বিছাইয়া একটীর গায়ে আর একটা খা লাগে একরূপভাবে কতকগুলি কমলা-সাজাইয়া রাখুন, উপরে আবার বাবু দিন (বাবু প্রায় ৪৫ আউন্স পুঙ্ক করিয়া দিবেন)। এইরূপে পর্যায়ক্রমে বাবু ও কমলা দ্বারা বাস্তবীক করতঃ উপরে এক তর বাবু দিয়া ভাল করিয়া বাস্তবীক তাহা বন্ধ করিয়া রোঁজ অথবা ঠাণ্ডা না লাগে একরূপ স্থলে রাখিয়া দিন। আমি এইরূপে গত মাস মাসের ২২২ ২০০ কমলা রাখি এবং এই ষোড়শ মাসের তরা তারিখে গুলিয়া দেখি সমস্তগুলি বেশ অবিকৃত অবস্থাতেই আছে। ৩ টাকার কমলা এইরূপে ১২ টাকার বিক্রয় হইতে পারে।

কয়েকটা আচার

আমের মিষ্ট আচার—কাঁচা আম মুড়িতা, মাই মুরিয়া এক ছটাক, মরিচ ২ তোলা, মেথি ২ তোলা, জিরা ২ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, কালজিরা ১ তোলা, লবণ ৩ তোলা, চিনি ১ সেল, তৈল বা ইক্ষুরসের সিকি ১৮০ সেল। প্রথমে আম লম্বা লম্বা করিয়া ২ বা ৪ খণ্ডে বিভক্ত করিবে। পরে তাহাতে লবণ ও মুরিয়া বাটা মাখাইয়া ২ দিন পর্যন্ত রাখিবে। ২ দিবস পরে দেখা যাইবে তাহা হইতে জল নির্গত হইতেছে। এমন আম খণ্ডগুলি তুলিয়া পরিষ্কার তিনতারবন্ধ চিনির রসে চল্লিগ ঘন্টা রাখিবে। পরে তাহাতে তৈল কিম্বা সিকি ঢালিয়া দিয়া কিছুদিন রাখিলেই মিষ্ট আচার হইল।

কিম্বারের আচার—কিম্বার ১ সেল, আদুর অথবা ইক্ষুর উত্তম সিকি ১৪ সেল, গোলমরিচ দুর্গ ১ ছটাক, কাল ও সাদা জিরা ১ ছটাক, শৈবদ লবণ ৩ ছটাক, বড় এলাচ দুর্গ আধ ছটাক, আদা এক পোয়া। প্রথমে

নির্দিষ্ট জালে চড়াইবে এবং টুকুড় করিয়া ক্ষুদ্রা উঠিলে লবণ আর্শা কিসিমস তাহাতে ফেলিয়া দিবে। জালে ১১ সের পরিমাণ রস থাকিতে জিরা, গোলমরিচ এবং এলাচচূর্ণ দিয়া পরে অল্পমাত্র জল দিয়া নামাইয়া লইবে, তাহা হইলেই কিসিমসের আচার প্রস্তুত হইবে।

জারক লেবু—পাতি বা কাগুগিল লেবুগুলি প্রথমে পরিষ্কৃত করিবে, পরে যে পরিমাণ লেবু তাহার সিকি পরিমাণ ওজননে লবণ মাখাইয়া ২১ দিন রাখিবে। চারিটা লেবু জার্য্য করিতে হইলে একটা রস ত ওজন হইবে, লবণও সেই পরিমাণে ওজন করিবে। কিছুদিন এই অবস্থায় রাখিলে লেবু জার্য্য্য আসিবে। আবে লেবু জার্য্য্য করিতে হইবে।

খোঁদার আচার—খোঁদা বা ছোয়ারা ১১ সের, দিধা ১১ সের, আদা ১০ পোয়া, লবণ ১০ পোয়া। প্রথমে আদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কুচাইয়া রাখিবে এবং খোঁদাগুলির বীচি ছাড়াইয়া লম্বাভাবে চারিখও করিবে। এখন নির্দিষ্ট জালে চড়াইয়া লেবু এবং উত্তম রূপে ক্ষুদ্রা উঠিলে তাহাতে সমস্ত ঔপকারগুলি ফেলিয়া দেও। জালে ১১ সের আমাঙ্গ থাকিতে নামাইয়া রাখ। তাহা হইলেই ছোয়ারার আচার পাক হইল—আচারে বিচার নাই। আরব ও তুরকাদি দেশের শুদ্ধ বর্জ্জই ছোয়ারা বা খোঁদা বলিয়া পরিচিত।

৩। হেতমপুরে গৌরান্দ-মঠ

ধর্মপ্রাণ মহারাজসুয়ার শ্রীমত মহিমা-নিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুরের যত্নে ও উৎসাহে শ্রীগৌরান্দ-মঠ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিগত ২০শে [আরব হেতমপুর কলেজ-প্রাঙ্গণে বিরাট সভার

অধিবেশন ও শ্রীশ্রীগৌরান্দ-মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বাবু শিবব্রজ সোম মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অপর্য্যম বড় বৃষ্টি আদি দৈবদুর্ভাগ্যের প্রবলতা সত্ত্বেও সভায় যথেষ্ট জন-সমাগম হইয়াছিল। মঠের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহারাজসুয়ার মহিমা-নিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর স্বাভাবিকজলদ্বারা হুল্ললিত ভাষায় মঠের মহৎ উদ্দেশ্য জন-সাধারণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাব-প্রবাহে সর্বকালে একপ্রকার উৎসাহিত ও অহুপ্রাণিত হইয়াছিলেন—যে, সভাস্থলেই এই সমস্যাটোনের জন্ম অনেক চাঁক। সাংগৃহীত হইয়াছে এবং অনেক প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে এবং এই মঠের উৎসাহিতা সম্বন্ধে অনেকই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের সভাব বহীর্গত, তন্মধ্যে ধর্ম-শিক্ষার অভাবই শীর্ষস্থানীয় এবং সেই অভাব-নিবন্ধই সনাতন হিন্দুধর্মে আমাদের অনাস্থা হইয়াছে; হিন্দু সামাজিক অধঃপতন ঘটনায়ে। জাতীয়তার এই পতনোন্মুখ মুহূর্ত্তেও সকলের সমবেত চেষ্টায় বন্ধপরিকর হইয়া ধর্ম-শিক্ষা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত কর্তব্য হইয়াছে। সামাজিক বিপ্লবের এই দুর্দিনে এইরূপ মঠ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় যে কিরূপ মহৎ উপকার সাধিত হইল তাহা হিন্দু-ধর্ম্মাধিপাগী মহোদয়গণ অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। এই মঠের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য—পুরাকালের আধ্যাত্মিকসুয়ার গণের আদর্শে কলকগুলি ব্রাহ্মণ বালককে সনাতন আধ্যাত্ম-শিক্ষা ও তাহাদের চরিত্র গঠন করা। এইরূপ দ্বাদশ বর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে রাখিয়া বিদ্যাবীদিগকে উচ্চতরোপে সম্বৃত্ত বিদ্যা ও তৎসহ পাক্ষাত্য-প্রণালীতে গণিত, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে; কারণ শিক্ষা সমযোপযোগী করিতে

হইলে রাজস্বাধী-রাজী শিক্ষা অতাবশ্যকীয়; একপ্র সময়ে মনি-কাকন যোগ হইয়াছে। সিংহিত জজ ক্রোটের-উকীল বাবু বৃদ্ধাঙ্কর কায় চৌধুরী বি. এল., মহাশয় তাঁহার সার্বভূমি সংক্ষেপ বক্তৃতায় একপ্র-শিক্ষার সারবাস্য সাধার-বক্তৃতা বিশেষ জরুরগ্রাহী হইয়াছিল। বলা ব্রাহ্মণ, “বিদ্যাশিক্ষাশিপিরের মঠে অবস্থান-কালের যাবতীয় ব্যয়ভার ও ব্রাহ্মণসুয়ারগণের উপনয়ন-সম্মারের ব্যয় মঠ হইতে দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় কর্তব্য—ব্যাপ্রপ্রাণিত নিঃস-হায় ও নৈশ ব্যক্তিগণকে উত্তম পথা, আশ্রয় এবং সেবা-উপকার জন্ম এই মঠের আত্ম-সদিক-ইনভোর হাঁসপাতালও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।” অবশ্য একপ্র আশ্রয়ের স্তম্ভাব না থাকিলেও মফঃস্বল হাঁসপাতাল অতি বিরল। তৃতীয় কর্তব্য—পিতৃমাতৃহীন অনাথ, বালক-গণের অভাব মোচন এবং আত্ম গুরু প্রভৃতি অশ্রম ভক্তিদিগকে যথাসাধ্য সুযোগ-প্রদান। এই মহৎ অমুষ্ঠানে, সর্বসাধারণের সহায়ত্ব, ও যোগদান বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এই মঠের স্থায়ী সভাপতি হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত মহারাজসুয়ার সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর। শ্রীযুক্ত দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত নপিতুর মহারাজ বাহাদুর ও উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত রাজা প্যারিমোহন যোগোপাধ্যায় বাহাদুর সি, আই, ই, এবং বীরভূম জেলা বিজ্ঞান-কলেজের রাণী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল যোগোপাধ্যায় বাহাদুর, হুগলীর ডিগ্রীক ও সেসম জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র সি, এস, মহোদয় প্রভৃতি বেশশু গণ্যমান্য মহোদয়গণ হাঁসপাতাল হইয়া সনাতন আধ্যাত্মিকসুয়ারের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

মহারাজসুয়ার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্র-বর্তী বাহাদুর সম্পাদক ও সিংহিতের সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত রায় সাহেব কালিকানন্দ যোগোপাধ্যায় সরকারী সভাপতি ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাণী মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী সম্পাদক এবং বাবু সিকেশ্বর যোগোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং “অজ্ঞাত সমাধি ভবনলোক হাঁসপাতাল মঠের নির্মাণিত হইয়াছেন। স্তম্ভাব আশা করা যায় যে, এই মঠের স্থায়ী ও উন্নতি অবস্থাটো। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, হেতমপুরের মহারাজসুয়ার সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই মঠের জন্ম বিস্তৃত ভবন এবং অধ্যাপক, পরিদর্শক এবং হাঁসপাতালের চিকিৎসক, ঔষধ এবং পথ্যাদির ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ দয়াদানের পাত্র হইয়াছেন। সভাস্থলের পর হরিদাম-সদস্যগণ সহকারে সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলী সংস্থাপিত মঠ ও হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে ছুটী বিদ্যার্থী বালক গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গুরু সহিত উপবিষ্ট থাকায় কি যে এক অভিনব দৃশ্য উৎপাদন করিয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। আমরা কায়মনোবাক্যে এই মঠের স্থায়ী ও উন্নতি কামনা করি।

বীরভূম-বার্তা
কয়েকটা প্রাচীন বিষয়
প্রথম গির্জা
বঙ্গালদেশে হুগলী জেলার অন্তর্গত ব্যাঙেল নগরে প্রথম গির্জা নির্মিত হয়। ১৮২৭ সালে ভিল্লাবোন্স নামে একজন পৃষ্ঠপোষক হুগলীর এক মাইল উত্তরে ব্যাঙেল নগরে প্রার্থনা করিবার জন্য প্রথম গির্জা নির্মাণ করেন।

জেলা হইতে বাক্স পণ্ডিতগণ প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া ছিলেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমাদের/ সংবাদদাতা বলেন সভায় ছয় সাত শত লোকের বেশী উপস্থিত হয় নাই এবং মুন্সীগঞ্জের সমিতি স্থানসমূহ ব্যতীত বঙ্গের অত্র জেলা হইতে কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েন নাই। সংবাদপত্র দ্বারা একপক্ষ অমূল্য সংবাদ প্রকাশ করিবার পার্থক্য কী, আমরা বুঝিতে পারি না।

ভাতিরপুরের রাজা শশিশেখরের বাগানদার মহাধর্মমণ্ডলে স্থান না পাইয়া বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজ সংস্কার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গৌরীপুরের ভূমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেনকিশোর রায় চৌধুরীর স্বন্ধে চাপিয়া এই সভার সংগঠন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের সংবাদদাতা প্রকাশ করিয়াছেন। মুন্সীগঞ্জের যে স্থানে এই সভা হইয়াছিল আমরাও সেস্থান একবার সচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। সেই টিনুর ঘরে এবং তৎ-সন্মুখে সাবিধানার তলে তিন সহস্র লোকের সমাবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তিন সহস্র হটক বা তিন শত হটক লোক সংখ্যার অন্ততা বুঝিতে আমাদের কোনও ক্ষতি বুদ্ধি নাই। সভায় যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের দুই চারিটা কথা বলা প্রয়োজন।

সভায় যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে- তাহার মধ্যে বিদেশ প্রত্যাগত হিন্দুদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ করা যায় কি না ইহাই আমাদের নিকটে সর্গপ্রদান বলিয়া অস্বীকৃত হয়। সভা এ সম্বন্ধে নাকি এই স্থির করিয়াছেন যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অথবা ভোজীদিগকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমরা এই সকল ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্কারকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বাহ্যিক দেশে থাকিয়া, সমাজের বক্ষের উপর বসিয়া অথবা ভক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কি শাস্তি প্রদান করিবেন? আর এই সকল অথোবা ভোজী হিন্দুর বাড়ীতে যে সকল ব্রাহ্মণের কলাহার করিতেছেন মাতৃ পিতৃ

সাথে দানগ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদেরই বা কি শাস্তির ব্যবস্থা হইবে? বঙ্গবাসী পত্রিকার পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিশেষ প্রত্যাগতদিগকে সমাজে গ্রহণ করা যায় কি না এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন- তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার কি হয় আমরা তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। শশিশেখরের কি মনে করিয়াছেন যে তিনি সমাজের গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবেন? গঙ্গানদীর স্রোত কিরিয়াই হিমালয়ের দিকে লইতে চেষ্টা করা এবং আধুনিক হিন্দু সমাজেই পুনরায় মহৎসাহিত্য বা রসুনন্দনের শাসনে আনয়ন করিতে চেষ্টা করা একই কথা। 'একপণ বৃথা চেষ্টায় উদাম ও অর্থের অপব্যয় করিয়া দেখের ক্ষতি- সাধনের চেষ্টায় ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।

ব্রাহ্মণ সমাজ, অধ্যাপক এবং পুরোহিতগণের উন্নতির চেষ্টায়, সংস্কৃত শিক্ষা প্রসার, সমাজের দৃষ্টদোষ আচার ব্যবহ্যের প্রতিনিধান, এ সকল চেষ্টায় কেনা মহাহুঁচুতি প্রকাশ করিবে? ব্রাহ্মণ সমাজ যদি অত্র সমাজের প্রতি অহীন জারি না করিয়া স্বীয় সমাজকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন তবে ব্রাহ্মণ সমাজ এবং সমগ্র হিন্দু সমাজের উপকার হয়। আমরা ইহাও অবগত হইলাম ব্রাহ্মণের অজ্ঞান জাতির সামাজিক উন্নতির চেষ্টায় বাগ্যপ্রদান করাও এই সভার অজ্ঞাতর উদ্দেশ্য। আমরা আশা করি, এই সংস্কার চেষ্টায় হিন্দু সমাজের কোনও ক্ষতি হইবে না। একপক্ষ সাময়িক অভ্যুত্থানের চেষ্টা মধ্যে মধ্যে ইহাও থাকে এবং তাহা জলবনুদের দ্বারা অন্তর্কাল মধ্যেই বিলীন হয়। কালের গতিতে এই অবস্থার ঘাত প্রতিক্রিয়াতে এবং সর্গোপরি সর্গস্বীয়তা ভগবানের বিধান যে পরিবর্তন উপস্থিত হইতেছে ও হইবে তাহা তিন শত বা তিন সহস্র সহস্রের চেষ্টায় কখনও বাধ হইবে না।

পরিচরক।

পরিশিষ্ট।

নিরয়ণ স্ত্যাকালিক রবি ২১৬৮৪৮৩ ; ২ রাশি অর্থাৎ মেঘ আর বুধ গত হ'য়ে মিথুনের
১৬৬ গত হ'য়েছে। অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্ন-খণ্ডায় দেখ—

মিথুনের মান ৩০০ পলে ৩০ অংশ; ইতরাং ১৬ অংশ ৬ কলাতে কত পল ?

$$৩০ : ১৬৬ :: ৩০০ : কত ?$$

$$\frac{১৬৬ \times ৩০০}{৩০}$$

$$= ১৬৬ \times ১১ = ১৭৭ পল$$

$$+ জন্ম সময় উদয়াবধি = ১৩৬৬ পল$$

সমষ্টি ১৫৬৩ পল

— মিথুন ৩৩০ ”

১২৩৩ ”

— কর্কট ৩৩৯ ”

৮৯৪ ”

— সিংহ ৩৩১ ”

৫৬৩ ”

— কন্যা ৩২৮ ”

বাকী ২৩৫ তুলার

তুলার মান ৩৩৬ পলে ৩০ অংশ

$$৩৩৬ : ২৩৫ :: ৩০ : কত ?$$

$$= \frac{২৩৫ \times ৩০}{৩৩৬}$$

$$= \frac{৭০৫১}{৩৩৬} = ২০ অংশ ৫২ কলা$$

১. নিরয়ণ লগ্ন ৬২০।৫২ অর্থাৎ তুলার সূড়ি অংশ উনবাইট কলা।

এই যে বেশী হলো, সেটা ঐ অয়নাংশ বেশী স্বীকার করার ফল মাত্র।

আমি। এইবার আমি অপর কয়টি লগ্ন করি।

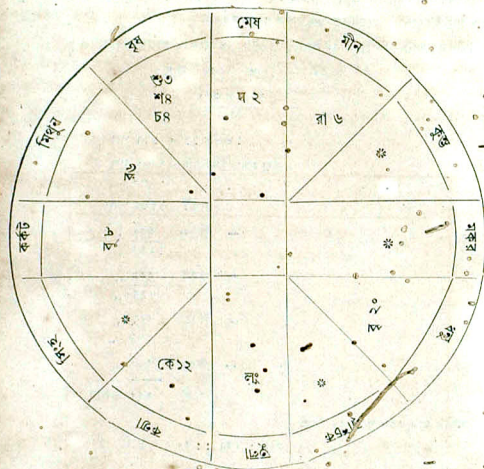
শুক্লদেব। তা পার, কিন্তু আগে সচরাচর কোণীতে যেরূপ জন্মকুণ্ডলী লিখিত হয়,

এই লগ্ন সাহায্যে সেইরূপ একটি চক্র করা সম্ভব নয়।

আমি। আমি সেরূপ চক্র উদ্ভাবন করতে পারি।

শুক্লদেব। আচ্ছা কর দেখি ?

আমি। এই চক্র একে, প্রথমে নিরয়ণ লগ্ন, তুলায় বসলাম তা'র পর আষাঢ় মাসের রবি
মিথুনে দিলাম পাণ্ডীতে ঐ তারিখের পার্শ্ব লেখা আছে ৬৮ স্বতরাং রবির পাশে ৬ বসলাম,
তা'র পর চন্দ্র বুধে বসিয়ে, কৃত্তিকার ভোগ্য ২০।২৬ দণ্ডাদি বলে, চন্দের পাশে ৪ বসাইলাম।



তার পর এই পল্লিকার ১২৪ গুণায় প্রদত্ত কুজাদি গ্রহের রাশাদি সকারে দেখি ১৭ই তারিখের পূর্বে শুক বুধে (৩), মঙ্গল ২ ভরণীতে, এবং বুধ ৮ পূণ্যাতে গেছেন, বাকী সব সংক্রান্তির দিনের মতই আছে, স্বতরাং চক্র অঙ্কনের গ্রহ ও তাহাদের আশ্রয় নক্ষত্র নির্দেশ কল্পাম।

গুরুদেব। ঠিক হয়েছে।

আমি। ভাবচক্র কিরূপে প্রস্তুত ক'ত্তে হয়, সেটা শিখিয়ে দি।

গুরুদেব। ভূমি ছ'একটা লয় কর; তার পর দশম নির্ণয় ক'রে, কেমন ক'রে দশম ভাব ও ভাবদ্বয় নির্ণয় ক'ত্তে হয় এবং বিভিন্ন দেশে চক্র আঁকার রীতিই বা কি রূপ তা দেখিয়ে দি।

আমি। যে আঙ্কা। লাহোরের অক্ষাংশাদি ৩১।৩৪ উত্তরদ্বারে পলতা হয়েছে

১১২২ ১১২২ ১১২২
১০ ৮ ১০
৩৩০ ৪৮৭৬ ১০৩০
২৪৩০

১ অশ্বল ২২ বাবুল। এই অক্ষকে যথাক্রমে ১০, ৮ ও ১০ দিয়ে গুণ করে মেঘের ১৪, বুধের ৫২ এবং মিতুনে ২৫ চরাদ্বয় পল স্থির কহলাম।

কার্তিক
১৩২১।

লগ্ননির্ণয়াদ্যায়।

২৯

গুরুদেব। কোন কোন জ্যোতির্বিদার্থ্য গুণ করলে ৬০ দিয়ে ভাগ দিতে বলেন, কিন্তু বচনানুসারে সেরূপ কোন প্রয়োজন দেখা নাহে।

আমি। এখন মেঘের লঙ্কার ২৭৮ থেকে ১৪ বাধ দিয়ে পেলাম ২০৪, বুধের ২২২-৫২=২৪০ এবং মিতুনের ৩২০-২৫=২৯৫ পল হ'লো। তার পর কর্কটের ৩২০+২৫=৩৪৫, সিংহের ২২২+৫২=২৭৪ এবং কন্টার ২৭৮+১৪=৩১২ পল এই তিনই ব্যাক্রমে ভুলাদির মান। স্বতরাং লাহোরের জন্ম প্রাচীন লয় খণ্ড হ'লো—

৩১।৩৪ উ অক্ষাংশাদি সমিহিত দেশের লগ্নখণ্ড।

রাশি	মেঘারম্ভ হইতে অংশ পরিমাণ	মেঘারম্ভ হইতে উদয়পল পরিমাণ	ভোগ্য
১ মেঘ	৩০	২০৪	২৪০
২ বুধ	৬০	৪৪৪	২৯৮
৩ মিতুনি	৯০	১৪২	৩৪৮
৪ কর্কট	১২০	১০০	৩৫৮
৫ সিংহ	১৫০	১৪৪৮	৩৫২
৬ কন্টা	১৮০	১৮০০	৩৫২
৭ ভুলা	২১০	২১৫২	৩৫৮
৮ বৃশ্চিক	২৪০	২৪১০	৩৪৮
৯ ধনু	২৭০	২৪৮৮	২৯৮
১০ মকর	৩০০	৩১৪৬	২৪০
১১ কুম্ভ	৩৩০	৩৩০৬	২০৪
১২ মীন	৩৬০	৩৬০৬	২০৪

এখন সেই পূর্ণনির্ণীত তাত্কাঙ্কি রবি অবলম্বন ক'রে ক'বো কি?

গুরুদেব। তা হ'বে কেন? কলিকাতায় যখন স্বর্ধ্যোদয় হয়, লাহোরের তার অনেক পরে স্বর্ধ্যোদয় হয়। তখন লাহোরের ২টা ৩৫ মিনিটে কলিকাতার ২টা ৩৫ মিনিটের সমান ক্ষুদ্র হ'বে কি করে?

আমি। তবে স্বতন্ত্র ভাবে নির্ণয় করুতে হ'বে। লাহোরের অক্ষাংশাদি ৩১।৩৪ আর কলিকাতার ২২।৩০, উভয়ের অন্তর ৯ অংশ ১ কলা। ১৫ অংশ ১ ঘণ্টার ভুলা স্বতরাং ৯ অংশ ১ কলাতে প্রায় ৩৬ মিনিট হ'বে স্বতন্ত্রাং লাহোরের যখন ২টা ৩৫ মিনিট, তখন কলিকাতায় ৩টা ১১ মিনিট হ'বে; স্বতরাং ৩টা ১১ মিনিটের সময় কলিকাতায় যে ক্ষুদ্র তাই লাহোরের ২টা ৩৫ মিনিটের ক্ষুদ্র হ'বে— কি বলেন?

গুরুদেব। হা তা হ'লে ঠিক হ'বে।

গুরুদেব। এখানে বিয়োগ হবে না। দক্ষিণ গোলাক্ৰান্ত দেশে মকরাদি ছয় রাশি তুলানি ছয় রাশি অপেক্ষা দু'বে অবস্থিত, এজন্য এই গুলির উত্তরকাল রক্ষিত হ'বে অতরাং বিয়োগের পরিবর্তে যোগ করতে হ'বে আর তুলানিতে যোগের পরিবর্তে বিয়োগ করতে হ'বে।

আমি। তাই কর্ণটি—

৩৭৫০ দ অক্ষাংশাদি সমিহিত দেশের লগ্নগণ্ড।					
রাশি	লঙ্কোদয় মান	+ চর	= প্রাচীন মান পল	মেঘারম্ভ ইহিতে পল	ভোগ্য
১ মেঘ	২৭৮	+ ২০	= ৩৭১	৩৭১	৩৭১
২ বুধ	২২২	+ ৭৪	= ৩৭৩	৭৬৪	৩৬৪
৩ মিতুন	৩২৩	+ ৩১	= ৩৫৪	১০২৮	২২২
৪ কর্কট	৩২৩	- ৩১	= ২৯২	১৩২০	২২৫
৫ সিংহ	২২২	- ৭৪	= ২২৫	১৬১৫	১৮৫
৬ কন্যা	২৭৮	- ২০	= ১৮৫	১৮০০	১৮৫
৭ তুলা	২৭৮	- ২০	= ১৮৫	১২৮৫	২২৫
৮ বৃশ্চিক	২২২	- ৭৪	= ২২৫	২২০	২২২
৯ ধনু	৩২৩	- ৩১	= ২৯২	২৫০২	৩৬৪
১০ মকর	৩২৩	+ ৩১	= ৩৫৪	২৮৫৩	৩৭৩
১১ কুম্ভ	২২২	+ ৭৪	= ৩৭৩	৩২২২	৩৭১
১২ মীন	২৭৮	+ ২০	= ৩৭১	৩৬০০	৩৭১

এইবার রবিস্ফুট। কলিকাতা ৮৮০৩ মেলবোর্ণ ১৪৪৫২ উত্তরের অন্তর ৫৬°২৬' = (১৫° = ১ ঘণ্টা হিসাবে) ৩ ঘ ৪৫ মি ৪৪ সে বা ৩ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট। ২৪ ঘণ্টায় ঐ দিন রবির গতি পেরেছি ৫৭ কলা—

$$\therefore ২৪ : ৩৪৬ :: ৫৭ : কত ?$$

$$= \frac{৩৪৬ \times ৫৭}{২৪} = ৭১৩$$

$$\therefore ২১৫৪৩০৫ - ৭১৩$$

$$= ২১৫৩৬৯০৫$$

+ অন্যান্য ২১৫৭

৩৭ ৭১২

এইবার উত্তরকাল। ক্রান্তি = ২৩২ উ, অক্ষ = ৩৭৫০ দ

$$৩৭° অক্ষ ২৩° ক্রান্তি = ৭১৫; ২৩° ২৮' ক্রান্তি = ৭১৬$$

$$৩৬° অক্ষ " = ৭১৭ " ৭১৬$$

$$১ = ৬০ " ২ = ১২০ " ৩ = ১৮০ "$$

$$৫ = ১০০ " ৬ = ১৫০ "$$

$$\text{এবং } ৩৭৫০ \text{ অক্ষ } ২৩ \text{ ক্রান্তি} = ৭১৬৪০$$

$$২৩২৮ = ৭১৮৭০$$

$$\text{অন্তর} = ৭১৮ = ৭১৫$$

এখন ২৮ : ২ :: ১৫ : কত ?

$$= \frac{২ \times ১৫০}{২৮} = ১০৫$$

$$\therefore ৩৭৫০ \text{ অক্ষ } ২৩২৮ \text{ ক্রান্তি} = ৭১৬৭১৫$$

$$\text{কালসমীকরণ} + ৪$$

$$৭১২১ \text{ উত্তরকাল}$$

$$\therefore ১২০ - ৭১২১ + ১০৫ = ৭১৪ ঘণ্টার$$

$$\text{য } ৭১৪ \text{ মি} = ১৮ দণ্ড ৫ পল$$

$$= ১০৮৫ পল$$

$$\text{সায়ন স্থা} = ৩৭১২১, \text{ কর্কট ভোগ্য } ২২২$$

$$\therefore ৩০ : ৭১২ :: ২২২ : কত ?$$

$$= \frac{৭১২ \times ২২২}{৩০} = ৭২ পল$$

$$৩ রাশি = ১০২৮ পল$$

$$৭১২ = ৭২ পল$$

$$\text{উদয়াগ্নি} = ১০৮৫ পল$$

$$২২৫৫ পল$$

$$৮ বৃশ্চিক = ২২১০ পল$$

$$\text{ধনু তুলা} = ৪৫ পল$$

$$\therefore \text{ধনু ভোগ্য} = ২২২ পল$$

$$\therefore ২২২ : ৪৫ :: ৩০ : কত ?$$

$$= \frac{৪৫ \times ৩০}{২২২} = ৪ অংশ ৩৭ কলা$$

$$\text{আরও সায়ন লগ্ন } ৮৭৩৭$$

$$- \text{অন্যনাংশ } ২১৫৭$$

$$৭১২১৫০ \text{ নিরায়ণ লগ্ন।}$$

বৃশ্চিকের গ্রাস ১৩ অংশ লগ্ন হ'লো যে ?

গুরুদেব। তা ত হ'বেই। দক্ষিণ অক্ষে গুরু হ'বার কথা। এখন একটা পুল রাশি চক্র অঙ্কিত করি। এ রাশি চক্রে একট বিশেষত্ব আছে। এটি আমাদের দেশের বিপরীত ক্রমে অঙ্কিত করবার রীতি আছে। আমরা দক্ষিণ দিকে সমুদ্র ক'রে রাশি চক্র দেখি বলে, মেঘের বাম দিক বুধ দেখি। এজন্য রাশিচক্রেও তাই লিখি। কিন্তু রাক্ষসবাস;

নিরক্ষ বৃত্তে অবস্থিত; তথায় ও তাহার দক্ষিণে যার বাস করে তা'রা উত্তরমূৰী হ'য়ে রাশি চক্র দর্শন ক'রে ব'লে, মেঘের দক্ষিণে রূপ ইত্যাদি দেখে ও রাশিচক্রেও সেই রূপ লেখে। দক্ষিণাত্যের জ্যোতিষীরা সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেন ব'লে এইরূপ রাশিচক্র লিখেন—

মেঘ	বৃষ	মিথুন	কর্কট
			সিংহ
কুম্ভ			কন্যা
মকল	ধনু	রশ্মিচক	তুলা

স্বতরাং এদেশের জন্ত—

ম	সু চ গ	র	বু
রা	জন্মকুণ্ডলী । মেঘাবর্গে । অক্ষ ৩৫°০০ পূ দেশান্তর ১৪৪°০০ পূ সন ১০২০ সাল ১৭ই আশ্বিন সময় ২টা ৩৫ মিনিঃ অশ্বারাক্ষ		×
×			কে
✓	গু	লা	×

এইরূপ রাশিচক্র হ'বে। আমাদের দেশের মত ক'রে আঁকি হ'বে না।

পাত্রাণাক্ষসানাক্ষ বারিণা শুক্রিরিষ্যতে ॥ ৬ ॥

তাত্রায়ংকাংস্যদ্রত্যানাং ত্রপুষং সীমকস্য চ ।

শৌচং যথার্থং কর্তব্যং ক্ষারমৌদকবারিণা ॥ ৭ ॥

তথায়সানং তোয়েন প্রাব্ধং সজ্জঘণেন চ ।

নৃমেহানাক্ষ ভাণ্ডানাং শুক্রিরুন্মেন বারিণা ॥ ৮ ॥

শূর্ণধাত্বাজিনানাক্ষ মূরলৌখলস্ত চ ।

সংহতানাক্ষ বস্ত্রাণাং প্রোক্ষণাং দৃক্ষয়ন্ত চ ॥ ৯ ॥

বহুলানামশেষাণামধ্বমুচ্ছৌচমিষ্যতে ।

তৃণকাকৌষধীনাক্ষ প্রোক্ষণাচ্ছুক্লিরিষ্যতে ॥ ১০ ॥

আবিকানাং সমস্তানাং কেশানাক্ষাপি মেধ্যতা ।

সিদ্ধার্থকানাং কঙ্কেন তিলকঙ্কেন বা পুনঃ ॥ ১১ ॥

সান্থনা তাত ভবতি উপধাতবতাঃ সদা ।

তথা কূপার্সিকানাক্ষ বিশুদ্ধিজলভগ্ননা ॥ ১২ ॥

দারু-দন্তাশ্বি-শৃঙ্গাণাং তক্ষণাচ্ছুক্লিরিষ্যতে ।

পুনঃপাক্ষে ভাণ্ডানাং পাথিবানাক্ষ মেধ্যতা ॥ ১৩ ॥

চন্দ্রাদি পাক্ষ সব, শুক্রিযোগ্য হ'লে,

দ্বৌত করি' লইবেক স্থবিমল জলে।

তাম্র কাংস্ত বৈক্য রূপে সীমক সে আর,

এ সব ধাতুর দ্রব্য করি' ব্যবহার,

শুক্রিযোগ্য হ'বে যবে করিয়া যতন,

ক্ষারাম-জলেতে তবে করিবে মর্দন।

লৌহময় দ্রব্য শুদ্ধ দ্বৌত কর জলে,

পাষণ মর্দন কর সলিল বিমলে,

সেহযুক্ত পাক্ষ যবে শুক্রিযোগ্য হয়

উষ্ণ জলে দ্বৌত তা'রে করিবে নিশ্চয় ॥ ৬-৮ ॥

শূর্ণ, ধাতু, অজিন, মূরল, উল্লুখ,

সংহত-বসন, শুদ্ধ কর দিয়ে জল।

সর্গবির বস্ত্র শোধিত হয় জলে,

তৃণ, কাষ্ঠ, ওষধি, সে প্রোক্ষণের ফলে।

মেঘবাসজাত বস্ত্রও কেশ আর

তিল বা সর্ষপ কঙ্ক জলে শুদ্ধি তা'র ॥ ৯-১১ ॥

কার্পাস নিশ্চিত দ্রব্য শুক্রিযোগ্য হ'লে

শোধন করিবে তাহা ভক্ষয়ন্ত জলে ॥ ১২ ॥

দারু, দন্ত, অস্থি, শূর্ণ করিতে শোধন,

উচিত, জ্বালিও বৎস, করিতে তক্ষণ।

ময়ুর পাক্ষের শুদ্ধি করিবার তরে

পুনরায় দৃঢ় কর অগ্নির ভিতরে ॥ ১৩ ॥

শুচির্ভিক্ষ্যং কারুহন্তং পণ্যং যুক্তপ্রসাবিতম্ ।
 যোমিযুগং বালমুখমাস্ত্ররক্ষসং তথা ।
 রথ্যাগতমবিজ্ঞাতং দাসবর্গাদিনালতম ॥ ১৪ ॥
 বাক্প্রশস্তং চিরাতিতমেনাকান্তরিতং লঘু ।
 অতিপ্রভুতং বালঞ্চ বুদ্ধাতুরবিচেষ্টিতম্ ॥ ১৫ ॥
 কৰ্ম্মাস্ত্রাস্ত্রাশালাশ্চ স্তনদয়হৃত্যঃ স্ত্রিয়ঃ ।
 শুচিশ্চ তথৈবাপঃ অবন্ত্যোহগন্ধবৃদ্ধদাঃ ॥ ১৬ ॥
 ভূমিবিশুধ্যতে কালান্দাহ-মার্জ্জন-গোক্রমৈঃ ।
 লেপাচ্ছল্লেনখাং সেকাদেবৈ সন্ধ্যাৰ্জ্জুনার্চনাং ॥ ১৭ ॥
 কেশকীটাবপমে চ গোত্রাতে মক্ষিকাস্থিতে ।
 মদমুতগ্ননা তাত প্রোক্ষিতব্যং বিশুদ্ধয়ে ॥ ১৮ ॥
 উল্লম্বরণামলেন কারেণ ত্রপু-সীময়েঃ ।
 ভস্মাশু-ভিষ্চ কাংস্থানাং শুদ্ধিঃ প্রাপ্যে দ্রবস্ত চ ॥ ১৯ ॥

ভিক্ষালব্ধং দ্রব্যং আর কারুজীবিকর,
 পণ্যদ্রব্য, নারীমুখ শুদ্ধ নিরস্তর ।
 বাল-মুখ, বৃদ্ধ-মুখ, আশ্রম-মুখ আর,
 সহজ সতত শুদ্ধ কেন ইহা সার ।
 রথ্যাগত, অবিজ্ঞাত, ভূত্যের আকৃত,
 বহু পুরাতন কিংবা বহু অকৃত্রিম,
 এতি লঘু দ্রব্য আর প্রভুত প্রমাণ
 বাল বৃদ্ধ আতুরের কৰ্ম্ম শুদ্ধ জান ।
 শুদ্ধ বলি গ্রহণ করিলে শুদ্ধ হয়—
 শাস্ত্রের বচন ইথে না কর সংশয় । ১৪-১৫ ॥
 কৰ্ম্মশেষে শুদ্ধ সে অস্ত্রারশালা হয়,
 স্তনদয়হৃত্তানারী শুদ্ধা হুমিশুচি;
 গন্ধবৃদ্ধাদিশুচি স্রোতবিনিশ্চল,
 অতীত যুগে বলি বলে জানীদল । ১৬ ॥

কালান্তর ঘটিলেই ভূমি শুদ্ধ হয়
 দাহ সমার্জন আর গোক্রমে নিশ্চয় ।
 লেপনোলেপন সেক সমার্জন আর
 অৰ্জ্জুন শুদ্ধ গৃহ, সদ্ধ নাহি তার । ১৭ ॥
 কেশকীটাক কিংবা গোত্রাতে হইলে,
 শুদ্ধ করি ল'বে, আর মক্ষিকুক্ত হ'লে,
 মুক্তিকা সলিল ভষ্ম, করিয়া গ্রহণ,
 অবশ্য কাপ'বে ইথে শুদ্ধি-সাধন । ১৮ ॥
 উল্লম্বরণ-বিনিমিত যত দ্রব্যচয়
 অল্লের যোগেতে বৎস সলা শুদ্ধ হয় ।
 ত্রপু আর সীমক নিশ্চিত দ্রব্য যত
 ফার যোগে শুদ্ধ করি ল'বে অবিরত ।
 কাংস্থ দ্রব্য শুদ্ধ হয় ভস্ম আর জলে,
 দ্রব্যদ্রব্য শুদ্ধ হয় চালিয়া লইলে । ১৯ ॥

অমেধ্যাক্তস্ত যুভৌযুগ্ধাপাহরণেন চ ।
 অশ্রুযাকৈব তন্দ্রবৈবর্ণধক্ষাপহারতঃ ॥ ২০ ॥
 চণ্ডালৈরন্তজৈশ্চৈব স্নেচ্ছেরস্পৃশ্যজাতিভিঃ ।
 স্পৃষ্টকালিতং ধান্যমনর্হং সর্বকশ্মণি ॥ ২১ ॥
 দ্রোণাদধস্ত যক্ষান্যং স্তম্যায়ং বিধিরূঢ়্যতে ।
 দ্রোণাদুর্দ্ধস্ত যক্ষান্যং প্রোক্ষণাদেবশুধ্যতি ॥ ২২ ॥
 রথ্যাগ পতিতং ধান্যং দুষ্ট্য যন্তেন বন্দয়েৎ ।
 উদ্ধৃত্য দুর্দ্ধা চাদদ্যাল্লক্ষ্মীর্নশ্যতি চান্যথা ॥ ২৩ ॥
 শুচি গোতৃপিকুং ভোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্ ।
 তত্র মাংসঞ্চ চণ্ডাল-ক্ৰব্যাদাদিনিপাতিতম্ ॥ ২৪ ॥
 রথ্যাগতঞ্চ চেলাদি তাত বাতীচ্ছচি স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥
 গজোহমিরম্বোগোচ্ছায়রশ্ময়ঃ পবনো মহী ।
 বিপ্রমো মক্ষিকাদ্যশ্চ স্তুতসম্পাদদোষিণঃ ॥ ২৬ ॥

অমেধ্য সংযুক্ত দ্রব্য করি পক্ষিকার
 মুক্তিকা সলিলে কপ গন্ধনাশ তার ;
 অত্র দ্রব্যে গন্ধ আর বর্ষ দুই করি
 শুদ্ধ করি ল'বে, এই শাস্ত্র-বাক্য ধরি । ২০ ॥
 চণ্ডালাদি অস্ত্রাক সে স্নেচ্ছ জাতি আর,
 অস্পৃশ্য ইহার। এই শাস্ত্র বাক্য সার ;
 এদের আনীত ধান্দ্র কালিত না হ'লে,
 কণ্ঠের অযোগ্য এই সর্বপ্রাণে বলে । ২১ ॥
 স্রোণ পরিমাণ হ'তে অল্প যদি হয়,
 তার পক্ষে এই বিধি জানিও নিশ্চয় ।
 স্রোণ পরিমাণ হ'তে অধিক হইলে
 হইবেক শুদ্ধ, মাত্র জল ছিটাইলে । ২২ ॥
 পৃথক পৃথক ধান্দ্র করি দরশন,
 মতকে ধরিবে তাহা করিয়া বশন
 একগুণ বিন্দু যদি না কর, নিশ্চয়
 লক্ষী তাজিবেন, ইথে নাহিক সংশয় । ২৩ ॥
 গোগণের কৃষ্টি লাভ হয় যেই জলে,
 অবিকৃত যেই জল, আছে মহীতলে,
 অতীত বিশুদ্ধ তাহা জানিও নিশ্চয়,
 শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয় ।
 ক্রব্যাগ চণ্ডাল আদি বিনাশিল যায়
 হেন তক্ষ্য মাংস শুদ্ধ সদ্ধ নাহি তার । ২৪ ॥
 রথ্যাগত চেল আদি বায়ু পরশনে
 হুমিশুচি শুদ্ধ হয় যেহেনা বৎস মনে । ২৫ ॥
 গজ, অমি, অশ্ব, গন্ধ, ছায়া, রশ্মি আর,
 বায়ু, ভূমি, জল-বিন্দু, আর মক্ষিকার,
 ছুই দ্রব্য স্পর্শ করি অশুদ্ধি না হয়,
 শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয় । ২৬ ॥

অজ্ঞানো যুগতো মেঘো ন-গোর্বেঃসমু চাননম্।
 মাকুং প্রস্রবণং মেঘাৎ শব্দুনিঃ ফলপতিনে ॥ ২৭ ॥
 আসনং শয়নং যানং নাবঃ পথি তৃণানি চ।
 সোমদূৰ্য্যাপ্তপবনৈঃ শুধ্যন্তে তানি পথ্যবৎ ॥ ২৮ ॥
 রথ্যাবসপণ-স্নান-ক্ষুৎপান-স্নানকম্ভাঃ।
 আচামেক যথাত্ম্যং বাসো বিপরিধায় চ ॥ ২৯ ॥
 স্পৃষ্টানামপ্যাসংসর্গো বিরথ্যাকর্দমাভ্যাসম্।
 পক্ষেচ্চরচিতানাঞ্চ মেঘ্যতা বায়ুসঙ্গমাৎ ॥ ৩০ ॥
 প্রস্তুতোপহতাদানাদগ্রমুজ্যতাসন্ত্যজ্ঞেৎ।
 শেষস্তু প্রোক্ষণং কুৰ্য্যাদাচম্যাদিত্ত্বা যুদা ॥ ৩১ ॥
 উপবাসস্ত্রিরাত্রিস্তু চুস্তত্কাশিনো ভবেৎ।
 অজ্ঞাতো জ্ঞানপূর্ব্বস্তু তদ্রোমোপসমেন তু ॥ ৩২ ॥
 উদক্যাম্ শ-শৃগালাদৌ সূতিকান্ত্যাবসায়িনঃ।
 স্পৃষ্টা স্মারীত শৌচার্থং তথৈব যুতহারিণঃ ॥ ৩৩ ॥

ছাগমূষ, অশ্বমূষ শুভ হনিস্তয়,
 গোবৎসর মূষ কিন্তু পবিত্র না হয়,
 গাভীর পুরীষ মূষ অপবিত্র অতি,
 পক্ষির পাতিত ফলে শুভ রাধ মতি। ২৭।
 আসন, শয়ন, যান, নৌকা, আদি আর
 পথেতে পতিত তৃণ, তুচ্ছ হয় তা'র
 চক্ষু আর হৃদয় রক্ষা করি' পরশন,
 আর বায়ুস্পর্শে শুভ শুভ বাছাধন,
 পণ্ডিতব্য সম যে সে এই সমুদয়
 সহজেই শুভ হয় নাহিক সংশয়। ২৮।
 পথপাটন, স্নান, ক্ষুৎ, পান আর
 মলমূত্র বিসর্জন অন্তেষ্টে সদার,
 গ্রহণ উচিত হয় অপর বসন,
 পরেতে করিবে যথাবিধি আচমন। ২৯।
 পথ, আর কর্দম, সলিল শুভ হয়

বায়ুর স্পর্শনে ইহা জানিও নিশ্চয়।
 পক্ষ আর ইষ্টকৈ নির্ধিত্ত দ্রব্য যত
 বায়ুর স্পর্শনে শুভ রহিবে সীতত। ৩০।
 রাশিকৃত অন্ন যদি দোষযুক্ত হয়,
 ছুট অংশ ভাগ্য করি' লইবে নিশ্চয়,
 অগ্র ভাগ্য করি' শেষে করিবে প্রোক্ষণ
 জল আর যুক্তিকার্য করি' আচমন। ৩১।
 ছুট অন্ন না জানিয়া করিলে ভোজন
 তিন রাত্রি উপবাস শাস্ত্রের লিখন;
 জানপূর্ব্ব হেন কাণ্ড করিলে নিশ্চয়
 শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত কণ্ডা যোগ্য হয়। ৩২।
 রজঃশলা নারী আর কুকুর শৃগাল
 হতিকা, শববাহক আর সে চণ্ডাল
 এ সমস্তের স্পর্শ যদি করে কোন জন
 যান করি' শুভ হ'বে শাস্ত্রের লিখন। ৩৩।

নরং স্পৃষ্টাশ্চি সন্নেহং স্নাতঃ শুধ্যতি মানবঃ।
 আচাম্যেব তু নিঃস্নেহং গাম্ভীৰ্য্যকামীক্য বা ॥ ৩৪ ॥
 ন লজ্জয়েৎ তথৈবাস্থক্কাবনোদ্বর্ত্তনানি চ।
 নোদ্যানান্দো বিকালেযু প্রাকৃতিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ ৩৫ ॥
 ম চালপেজ্জনদ্বিষ্টাং দ্বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্।
 গৃহাচ্ছিত্তবিগ্ৰহ-পঞ্চাঙ্গাসি ক্ষিপেদ্বহিঃ ॥ ৩৬ ॥
 পক্ষ পিণ্ডানমুজ্যতান স্মার্য্যং পদ্বারিণি।
 স্মারীত দেবধাতেষু গঙ্গা-হুদ-সরিৎশ্চ চ ॥ ৩৭ ॥
 দেক্তা-পিতৃসচ্ছাত্র-যজ্ঞ-মন্ত্রাদিনিন্দকৈঃ।
 কৃত্বা-স্পৃষ্টাশ্চান্যাপি শুধ্যতাকীবলোকনাং ॥ ৩৮ ॥
 অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্রজ্ঞঃপতিতঃ শবম্।
 বিধর্ষি-সূতিকান-গুণ-বিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ ॥ ৩৯ ॥
 সূতমিথাভকটৈশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে।
 এতদেব হি কৰ্তব্যং প্রাতিজ্ঞঃ শোধানস্বানঃ ॥ ৪০ ॥

স্নেহযুক্ত নর-স্ত্রি যদি স্পর্শ করে,
 শুদ্ধ হ'বে তব, মান করিবার পরে।
 স্নেহযুক্ত অস্থি-স্পর্শ ঘটবে যখন
 গো-স্পর্শ করিবে আর হৃদয়ের দর্শন
 অথবা কেবল যদি করে আচমন
 বিষ্ণু স্মরি' শুভ হ'বে শাস্ত্রের লিখন। ৩৪।
 অহুক গীবন আর উদ্বর্ত্তন চয়
 কোনো দিন কাহারো লজ্জন-যোগ্য নহ।
 বিকাল হইলে পরে, জানবান জন
 উদ্যান আদিত্তে না রহিবে কদাচন। ৩৫।
 নির্দিষ্টা রমণী আর, অবাধার সনে
 আলাপ না করিবেক কত হেন ক্ষণে।
 উচ্ছিষ্ট, পুরীষ, মূত্র, পাদ মৌত-বারি
 গৃহের বাহিরে সদা তাজ ত্বরা করি। ৩৬।
 পক্ষ পিণ্ড উদ্ধার না করি' বাহাধন

পরকৃত থাকে স্নান না কর কখন।
 দেব-ধাতু, আর বৎস জাহ্নবী সলিলে
 হৃদয়ে, কি সরিতে স্নান কর অবহেলে। ৩৭।
 যেই জন দেব আর পিতৃ নিন্দা করে
 সচ্ছাত্র নিন্দয়ে, নিন্দে যজ্ঞে সচ্ছাত্র করে।
 হেন জন সনে নাহি কর আলাপন
 যদি দৈবে যট তা'র আলাপ স্পর্শন,
 তবে আচমন করি হৃদয়েরে দেখিলে,
 শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে অবহেলে। ৩৮।
 রজঃশলা নারী আর অস্ত্রাঙ্ক মানব,
 পতিত মানব আর সর্ববিধ শব,
 বিধর্মী, প্রহতনারী আর যণ্ড নর,
 বিবস্ত্র, সন্ত্যাবশারী, পদ্বস্ত্রতংপর,
 সূত নিধাতকে আর করি দরশন,
 করিবেন আশ্রুতুষ্ণি প্রাতিজ্ঞন। ৩৯-৪০।

অভোজ্যং সূতিকা-যণ্ড-মার্জ্জারীধু-শু-কুক্কটান্ ।
 পতিতাবিকচগুল-মৃতহাল্লাংশ্চ ধগ্মবিৎ ॥ ৪১ ॥
 মংস্পৃশ্য শুধ্যতে স্নানান্নদক্যা-গ্রামশুকরো ।
 তত্ক্ষ সূতিকাশৌচ-দৃষিতান্ পুরুষানপি ॥ ৪২ ॥
 অতঃপরং শৃণুয স্বং স্রীধর্মাভ্যবসিতরাং ॥ ৪৩ ॥
 উল্লুঘরে বসেমিত্যং ভবানী সর্বদেবতা ।
 ততঃ সা প্রত্যহং পূজ্যা গন্ধপুষ্পাফতাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥
 অশূন্যা দেহলী কার্য্যা প্রাতঃকালে বিশেষতঃ ।
 যস্য শূচ্যা ভবেৎ সা তু শূচ্যং তস্য কুলং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
 পাদসাস্পর্শনিং তত্র অসংপূজ্য চ লজ্জনম্ ।
 কুর্নমরকমাধোতি তস্মাত্তং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
 প্রাতঃকালে স্ত্রিয়া কার্য্যা গোময়েনানুলেপনম্ ।
 প্রত্যহং সদনে তস্মাৎসৈব ছঃখানি পশ্যতি ॥ ৪৭ ॥
 স্পৃশন্তি রশ্ময়োর্য যস্য গৃহে স্মার্কজনাদুতে ।
 ভবন্তি বিমুখাস্তস্য পিতরোদেবমাতরং ॥ ৪৮ ॥

অভোজ্য, সূতিকা, যণ্ড, ইন্দ্র, মার্জ্জারী,
 কুক্কর, কুক্কট। সে পতিতাবিক্র আর,
 চগুল, মৃতকহারী কবি' পরশন,
 স্নানেতে হইবে শুদ্ধ করে প্রাজ্ঞগণ;
 রজঃখলা নারী গ্রাম্যশুকর সে আর
 সূতিকা-অশৌচ-ভূষ্ট-দেহ সে যাহার
 এদেরো স্পর্শনে সচ্চ হোমশৌচ হয়
 স্নানেতে হইবে শুদ্ধ নাহিক সংশয় । ৪১-৪২ ।
 এবে শুন বিতরিয়া বলিব তোমায়
 নারীর কৰ্ত্তব্য কর্থ যেরা শাস্ত্রে গায় । ৪৩ ।
 দেহলীতে নিত্য বাস করেন ভবানী
 আর যত দেবগণ এই যত জানি;
 গন্ধ পুষ্প অফতে পূজিবে নিত্য তাঁ'র,
 মদল হইবে ইথে সন্দেহ কি তাঁ'র । ৪৪ ।

দেহলী অশুভ কর পরম যতনে—
 বিশেষ প্রভাতকালে—রেখে যা ইহা মনে ।
 দেহলী হইলে শূদ্র শূদ্র হয়
 শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয় । ৪৫ ।
 পূজা না করিয়া তাহে পদের স্পর্শন
 কহ না করিবে—না করিবে উল্লঙ্ঘন,
 এই বিধি যেই নারী না করে পালন,
 নিশ্চয় তাহার ভাগ্যে নরকে গমন । ৪৬ ।
 প্রভাতে ভবনে নিত্য গোময় লেপন,
 নারীর প্রধান কার্য্য শুন বাছাদন ।
 এই কার্য্য প্রতিদিন যেই নারী করে,
 না থাকে ছাফের লেশ তাহার অন্তরে । ৪৭ ।
 গ্রহে সমাধ্বনী লান করিবার আবে,
 দিনকর প্রকাশ হইয়া পূর্বাভাগে

নিশায়াঃ পশ্চিমে যামে ধান্যসংস্করণাদিকম্ ।
 কুরুতে বাতু মোহেন বন্ধ্যা জন্মনি জন্মনি ॥ ৪৯ ॥
 সন্ধ্যাকালে তু সাংপ্রাপ্তে মার্জ্জনং ন করোতি বা ।
 ভক্ত্বহীন্য ভবেৎ সা তু নিঃস্বঃ জন্মনি জন্মনি ॥ ৫০ ॥
 অকৃত-স্বতিকাং যা তু কামলিপ্তাক্ষ মেদিনীম্ ।
 তস্যঃ স্ত্রিয়া বিনশ্যতি বিতমায়ুর্দশস্তথা ॥ ৫১ ॥
 মার্জ্জনী-চুল্লিকা-ধীব-দৃষদশোপালস্তথা ।
 নশ্বমেদাজ্জিগা জাতু পুত্রদারনধক্ষ্যাতং ॥ ৫২ ॥
 উল্লঙ্ঘলঞ্চ মূলং তথাচৈব তু বর্ধণম্ ।
 পদাঙ্গমগাৎ পাণী যা দ্রাণোত্মাত্মমাতং গতিং ॥ ৫৩ ॥
 ভিন্নানসং যোগপটং তথৈব যুগপদ্য চ ।
 কৃষ্ণাবিকং তথা তাত বর্জয়েৎ পুঞ্জবান্ গৃহী ॥ ৫৪ ॥
 দক্ষিণাভিমুখে যন্তু বিদিক্‌সংযুৎ এব চ ।
 কেশান্ সংস্করতে মর্ত্তো নননাশক বিব্রতি ॥ ৫৫ ॥
 অনুচক্ৰ ন কুর্ক্বীত ভুক্তা দন্ত-বিশোধনম্ ।
 পাছকরোহণকৈব তিলৈশ্চাপি সতর্পণম্ ॥ ৫৬ ॥

যদি নিজ করে গৃহ করেন স্পর্শন,
 তবে সেই গৃহ তাজি' যত দেবগণ
 পিতৃগণ আর যত মাতৃকা নিকর
 বিমুগ্ধ হইয়া যান, তাহারে সন্দেহ । ৪৮ ।
 রজনীর শেষ যামে বাছ সম্ভরণ
 করে যেই নারী বন্ধা হয় সেই জন ।
 জন্ম জন্ম বন্ধা রয় কহিছ নিশ্চয়
 শাস্ত্রের বচন ইথে না কর সংশয় । ৪৯ ।
 সন্ধ্যাকালে নাহি যেরা করে সমাধ্বন,
 জন্ম জন্ম ভক্ত্বহীনা নিঃস্বা সেই জন । ৫০ ।
 অকৃত স্বতিকা যথা কামলিপ্তা ধরা,
 বিত আয়ু বশ হীন্য হয় সেই স্ত্রী । ৫১ ।
 সমাধ্বনী চুল্লী ধীব, দৃষদ, উপল
 পদস্পর্শে হয়ে পুত্র ধন আর বল । ৫২ ।
 উল্লঙ্ঘল মূলক বর্ধণ যজ্ঞ আর
 পদে স্পর্শ করিলে বাড়য়ে পাপ ভার । ৫৩ ।
 ভগ্ন সে আসন, যোগপট, যুগপদ,
 কৃষ্ণাবক ছাগ রাখা নহে গৃহীদর্শ । ৫৪ ।
 বসিয়া দক্ষিণমুখে কিছা কোণ মুখে,
 কেশের সংস্থার করি না পড়িও ছায়ে ।
 এইরূপে কর যদি কেশ প্রশাধন,
 ধননাশ হবে তাহে শুন বাছাদন । ৫৫ ।
 ভোজনের পরে নিজ দন্তের শোধন
 কহ নাহি করিবক অনুচ য়ে জন ।
 কিছা পদে না করিবে পাছকা ধারণ,
 তিল সংযোগে নাহি করিতে তর্পণ । ৫৬ ।

ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্যাদর্কক্কাণ্ডস্তরীয়কম্।

দর্শশ্রাদ্ধং ন কুর্যাত্ দর্শশ্রাদ্ধং কথঞ্চন ॥ ৫৭ ॥

পাছুক্কারোহণক্কাণ্ডে যোগপট্টকমেব চ।

ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্যাদ্গয়াশ্রাদ্ধং তথৈব চ ॥ ৫৮ ॥

দীপভাণ্ডময়ীচ্ছায়া বিভীতক-কুর-টঙ্কা।

বর্জনীয়া সদা পূজ যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥ ৫৯ ॥

অধোবস্ত্রেণ যো বায়ুং ক্রুতে শিরসি দ্বিজঃ।

স্থালেন ধর্মশূর্ণাভাং হরুতং তস্য নশ্যতি ॥ ৬০ ॥

অলক উবাচ।

ভবত্যা কীর্তিতভোজ্যো য এতে সূতিকাদয়ঃ।

অনীষাং শ্রোতুমিচ্ছাসি তত্ত্বতো লক্ষণানিহ ॥ ৬১ ॥

মদালসোবাচ।

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণস্বেহ যাবরৌধস্বমার্গতা।

তাবুভৌ সূতিকেত্বাতৌ স্তয়ায়ঃ বিগহিতম্ ॥ ৬২ ॥

ন জুহোত্বাচিতে কালে নাপ্রাতি ন দদাতি চ।

পিতৃদেবার্চনাকৌনং যচ্চ স পরিণীয়তে ॥ ৬৩ ॥

জীবৎপিতৃক দেবা সে জন্ম কখন,

অর্ককণ্ডস্তরীয়া না করে দারণ।

দর্শশ্রাদ্ধ না করিবে কিংবা দর্শশ্রাদ্ধ,

পরেতে পাছুকা না ধরিবে মতিমান,

যোগপট্ট ব্যবহার কহু না করিবে,

গয়াশ্রাদ্ধ হেন জন, অবস্ত্রা ত্রাজিবে ১৫৭-৫৮।

প্রবীণের ছায়া, বিভীতক বৃক্ষ ছায়া,

কুবটক বৃক্ষ ছায়া সদা বর্জনীয়া।

আয়ুঃ শক্তি ক্ষয় হয়, এ সব ছায়ায়

শাস্ত্র ব্যাক্য এই—নাহি সন্দেহ তাহায় ॥ ৫৯ ॥

পরিধেয় বস্ত্রে কহু মন্তকে বাহন,

নাহি করিবেন, বস, ব্রাহ্মণ যে জন;

চণ্ড আর শূর্ণযোগে করিলে বাহন

সকল হরুতি নাশ শাস্ত্রের বৃন্দন। ৬০।

অলক বলেন, মাগো, দ্বিজসি তোমায়,

হৃতিকাদি তত্ত্ব বল বিস্তারি আমায় ॥ ৬১ ॥

মদালসা বলে বস, করহ অবস্ত্র

অবস্ত্রে গত যেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ,

হৃতিকাদি শব্দেতে বাচ্য দুজনে নিশ্চয়,

তাহাদের অন্ন, বস, কহু গোহ নয় ॥ ৬২ ॥

যথাকালে যেই জন হোম নাহি করে

সময়ে ভোজন দান সেবা পরিহরে।

পিতৃদেবার্চনা হীন হয় যেই জন,

গত বলি শাস্ত্র দ্বারে করেন কীর্তন। ৬৩।

গহস্থ

“এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই

এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার

করা, কণ্ঠের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা

উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—

নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে

ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।”

রবীন্দ্রনাথ

“বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদিশচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ সকলেই

একভাবে ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর

প্রচারক। ভারতবর্ষীয় ইউরোপ-বিজয়ের

ইহাটাই প্রথম সেনাপতি।”

৫ম খণ্ড

৫ম বর্ষ

অগ্রহায়ণ, ১৩২০

২য় সংখ্যা

আলোচনা

১। রবীন্দ্রনাথের দ্বিখণ্ড

“রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের প্রতিষ্ঠানাত,

বঙ্গসংস্কৃত-মধ্যা-বৃত্তি, বঙ্গভাষাভাষীর

প্রচারদান, ভারতনাথ-রামবিহারীর দান

এবং দামোদরের বক্তা—এই কয়েকটি নুতন

ঘটনা গত দুই তিন বৎসরের বিশেষ লক্ষণ।

অগ্রহায়ণ—১

এই সকল কার্যকালে যে যুগ আরম্ভ হইল”

তাহাকে গত সংখ্যায় আমরা ভারতে “বঙ্গদেশ

আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ” নামে অভিহিত

করিয়াছি। “সাহিত্যের প্রসার, সেবাধর্মের

প্রচার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠা,

দ্বিতীয়ে রাজধানী-প্রবর্তন, বাঙ্গালী জাতির

১৩

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জয়লাভ ইত্যাদি কতিপয় নূতন শক্তি আশিষ্য সমাঞ্চে দ্বিতীয় যুগের স্বরূপাত করিল। তাহারই শেষ নিদর্শন দামোদর-বন্দ্য বঙ্গবাসীর কার্যতৎপরতা। এখন হইতে দ্বিতীয় যুগের নব নব কার্য্য দেখিতে পাইব।*

বাঙ্গালী জাতির আট বৎসর বয়সে সমগ্র দেশের ভিত্তর বিশেষ সাড়া দিবার জ্ঞত কল্পদেব দামোদরের বন্দার ভিত্তর দিয়া একটা তাওবের আয়োজন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভারতে নবজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় উদ্ভূত হইল। দ্বিতীয় যুগের এই আবাহন সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই আমরা একজন বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীর বিশ্বসাহিত্যে শীর্ষস্থান লাভের সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। কিছুদিন পূর্বে ভারত-সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান-শাসনকর্তা বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীকে “এসিয়ার রাজকবি” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদ্রষ্টব্যতার বরশ্রুতির খোঁজিত সমানুর করা হয় নাই—ইহা বুঝাইবার লক্ষই যেন আজ ভারতের রবীন্দ্রনাথকে জগতের একটী শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-কলা-সাহিত্য-পরিষৎ ইউরোপের মুখপাত্ররূপে সর্বোচ্চ পুরস্কার * দান করিয়া স্বর্ধ্বনা করিলেন। ১৯১৩ সালে পৃথিবীর সাহিত্যভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যই সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ বিবেচিত হইয়াছে। এই বৎসরের জ্ঞত বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথ সহিত-জগতের “একমেবাদ্বিতীয়” জ্ঞানে বিশ্ববাসীর পূজা প্রাপ্ত হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিবিজয় ভারতের নবযুগে নবীনজাতিগঠনে কতখানি সহায়তা করিবে, আমরা ভবিষ্যতে তাহা আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিজয়ে বাঙ্গালী সাহিত্য ও “ভারতবাসীর চিন্তাশক্তি জগৎকে কি পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিবে তাহা অল্পদিনের ভিতরই নিত্য অজ্ঞ ও অন্ধ লোকেরাও বুঝিতে পারিবেন। কতগুলি ঘটনাক্রমের প্রভাঃ—হিন্দু চিন্তাবীরকে—একটী ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার আকীবন সেবককে,—প্রাচ্যদর্শনের তৎপা-কথিত অর্দ্ধদ্ব্যজ্ঞাত মানব-সমাজকে পাশ্চাত্যজগৎ কৈলেক বসিয়া বিশ শতাব্দীর প্রথম পার্টে স্থান ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ‘কি কি কারণে ইউরোপীয় স্বাধীন প্রাচ্যজগতের একজন চিন্তাবীরকে এক্স স্বর্ধ্বনা করিয়া স্থান ও যৌবন বোধ্য কার্লেসন, তাহার আলোচনা করিবার জ্ঞত অনতিদূর ভবিষ্যতেই দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইবেন।’ অদ্বিত্য, ইতিহাস-বিজ্ঞানের কোন্ নিয়মসমূহেরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসম্পদই মানবজাতিতে ভারতীয় সাহিত্য ও জীবন-দ্বারা অজ্ঞাত বিভাগ বুঝাইবার উপায় ও কেন্দ্রস্থল হইল—তাহার বিশ্লেষণ ও অন্বেষণের ভিতরই দেশবিদেশের পণ্ডিত-সমাজে আরম্ভ হইবে।

আমরা এখন বাঙ্গালীকে ও ভারতবাসীকে কয়েকটি কথামাত্র স্বয়ং রাখিতে অস্বরণ্য করি। প্রথমতঃ, এত উচ্চমান-লাভ অজ্ঞ কোন এসিয়াবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই—এমন কি জাপানেরও এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এই দূরত্ব যশ-প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই। বাঙ্গালীর স্বর্ধ্বনায় সমগ্র এসিয়া-পূর্ব, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-সভ্যতার উত্তরা-বিহারী প্রাচ্য মানবের স্বর্ধ্বনী হইল।

১৯০৫ সালে দোদৌ প্রতাপ কনিষাকেশমুখ সমরে পরাজিত। করিয়া জাপান রিপেঙ্ক রাষ্ট্রীয় জগতে এক নবযুগের স্বরূপাত করিয়াছেন—প্রকৃত প্রস্তাবে মানবজাতির বিশ শতাব্দীরই উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ জগতের সাহিত্য-সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া সেই নবযুগেরই জন্ম-বিকাশের সহায়তা করিলেন। পাশ্চাত্য সমাজে প্রাচ্যপ্রভাব-প্রতিষ্ঠার পথ আরও প্রশস্ত হইল। দুঃদৃষ্টিমণ্ডর ব্যক্তিগণ দেখিতেছেন যে, জাপানের জয়লাভ এবং রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিজয় মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে তুল্যপ্রভাবসম্পন্ন ও সমগোষ্ঠী হুক্ত— দুই ঘটনা একই শক্তির বিভিন্ন ভাবব্যক্তি— একই ঘটনার বিভিন্ন মূর্তি।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় “স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি”রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ভারতবর্ষের ভূতভবিষ্যৎ-স্বর্ধ্বমানের উপর বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিলেন। তাহার ফলে মানবজাতি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ও পথপ্রদর্শক করিয়া ভারতের আশ্রয় জন্মদাতারপরে যুগযুগান্তরব্যাপী মূখ্য-কথ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্র-মহাব্যয়, সভ্যতা-আদর্শ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। পরে ক্রমশঃ যখন কথ্যিত গভীর ও পরিকারভাবে সভ্যজগৎ ভারতবর্ষের বাণী এবং ভারতীয় সভ্যতার মূখ্যকথ্য বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়া ভারতীয় চিন্তাপ্রবাহের দ্বারা অধরঞ্জিত হইতে থাকিবে, তখন তাহার বুঝিবে যে, ব্রহ্মপুত্রবিনী ভারতমাতা, রবীন্দ্রনাথকে দৈবকৃপে প্রদর্শন করেন নাই, রাম-মোহন-রাধাকৃষ্ণ-দয়ানন্দ-রামতীর্থ-কৃষ্ণদেব-বরদ-বিদ্যাগঙ্গারের লীলাভূমি ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্ম আকস্মিক ঘটনা বা প্রকৃতির খেয়াল মাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের গরীয়সী

জন্মভূমির অসংখ্য বীরসন্তানের অশ্রুতম মায়া—একমেবাদ্বিতীয় নহেন। তখন তাহার নবযুগের প্রবর্তক বিবেকানন্দের মূখ্যপ্রচারের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিবে,—তখন তাহারের মূখ্যগা জন্মিবে যে, “বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রহ্মজ্ঞাননাথ সঙ্কলেশই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের ব্রহ্মা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ বিজয়ের ইংগীরা প্রথম সেনাপতি।” তখন তাহার সভ্যসভ্যই বুঝিতে পারিবে—কেন ভারতের অমরকবি দ্বিজেন্দ্রলাল—

“একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়।
একদা যাহার অর্ধবপোত
জমিল ভারত সাগরময়।

সম্মান যার তিস্তত চীন
জাপানে গঠিল উপনিবেশ।”
—এই স্থান পাহিয়া নবাবকে বঙ্গজনের
প্রকৃত মূর্তির ধ্যান করিতে শিখাইয়াছেন।
তখন চিন্তা-জগতের পক্ষপাতবোধশূন্য
সমদর্শী দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকগণ
উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালার
উদীয়মান শিশুকবি সভ্যজ্ঞানাত্মক—
“বচনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই,
নাগেরি মাথায় নাচি।

একহাতে মোরা মগেরে কোথায়,
মোগলেরে আর হাতে।
চাঁদপ্রস্রাবের ছকুমে হঠিতে হয়েছে
দিল্লীনাথে।

কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শতন করি’
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে
যশের মুহূর্ত পরি।

স্বপতি মোদের স্থাপনা করছে

‘বরজ্জবের’ ভিত্তি,

আমরাভোতে ‘ওকার-খাম’—

মোদের প্রাচীন কীর্তি।

মহত্তরের মরিন আমরা,

মারী নিয়ে ঘর করি,

বাঁচিয়া গিয়েছি বিদির আশিষে

অমৃতের ঢাকা পরি।

দেবতার মোরা আশ্রয় জানি

আকাশে প্রদীপ জালি,

আমাদের এই কুটীর দেখেছি

মাঘের ঠাকুরালি।

বীর সন্মানী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগতময়,

বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে খটাবে সমর্থ।

তপের প্রভাবে বাঙ্গালী সাধক জড়ের

পেয়েছে সাড়া,

আমাদের এই নবীনসাধনা শব-সাধনের বাড়া।

বিষম ধাতুর মিলন ঘটায় বাঙ্গালী দিয়েছে বিরা

আমাদের নব্য রসায়ন শুধু গুপ্তমিলে মিলাইয়া।

বাঙ্গালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের

গান,

বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনন, বিফল নহে

এ প্রাণ।

ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা ভরা

আলোদে,

বিদ্যাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী দাতার

আশীর্বাদে।

অতীতে যাহার হয়েছিল সূচনা সে ঘটনা হবে

হবে,

বিদ্যাতার বরে ভরিবে তুবন বাঙ্গালীর

গৌরবে।”

—ইআদী আতীয় গৌরবদ্বন্দ্ব উচ্চসামাগীর
শ্রদ্ধাত্মরে বিন্দুনাঙ্গ অসুস্থকি নাই।

তৃতীয়তঃ,—রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বঙ্গ-
ভাষারই সেবা করিয়াছেন। বঙ্গরসযতী

তাহার এই একমিষ্ট সাধকের সমুদ্রবায় বহু-
নিম্নরে দেশবাসীকে অভয়বাণী প্রচার

করিয়াছেন :—“যে ভাষায় গান গাহিয়া,
কবিতা লিখিয়া, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ববিজয়ী বীর হইতে পারিলেন, যে ভাষার
অনুবাদ মাত্র পাইয়া ঈশ্বর নবভাবে

অনুপ্রাণিত হইল, সেই ভাষা আর বেশ দিন
সরকারী শিক্ষাবিভাগের বিদ্যানে দেশবাসীর

দ্বিতীয় ভাষা মাত্র থাকিবে না। বাঙ্গালীর
মাতৃভাষায় অত্যুচ্চ বিজ্ঞান, অত্যুচ্চ দর্শন,

অত্যুচ্চ ইতিহাস রচিত হইতে পারে কি না,
এবিষয়ে যাহারা সন্দেহ করিবেন তাহারা

জগতের পণ্ডিত-সমাজে পাগল বলিয়া পরিচিত
হইবেন। স্বতরাং স্বল্পকালের ভিতরই দেশীয়

সন্তান-সন্ততির সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রদানের জন্ত
তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যই গ্রহণ করা

হইবে। বিদেশীয় ভাষাভিত্তিক শিক্ষার
ব্যবস্থায় দ্বিতীয় স্থান প্রদান করিয়া ভারতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বাভাবিক ও জাতীয়
পদবাচ্য হইয়া উঠিবে। সুযোগ, সুবিধা ও

উৎসাহের অভাবে দেশীয় জনসাধারণের
মাতৃভাষা তাহার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য ও সামর্থ্য

প্রকাশিত করিতে পারিতেছে না। অচিরেই
সেই সকল অভাব ও বিঘ্ন মোচন করিবার

যথোচিত ব্যবস্থা হইবে। ভারতবর্ষের
মাতৃভাষাগুলি ও প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহ

অতি সত্বরেই শিক্ষার ব্যবস্থায় তাহাদের
প্রকৃত মর্যাদা লাভ করিয়া নানী উপায়ে

ভারতবাসীর মহাশুদ্ধ-গঠনের সহায় হইবে।”

২। বাঙ্গালীর “গৌরব”

বঙ্গিমন্ত্র গৃহিহাঙ্কিলেন “তুমি বিদ্যা, তুমি
ধর্ম, তুমি ক্ষুদ্র তুমি মধ্ব”। বঙ্গিমের উদ্যোজন

সামর্থ্য হইয়াছে।

বাঙ্গালী ক্লাসেট হাইয়া সিবিলা সার্টিফিক
পরীক্ষায় সমস্ত পুণ্ডিয়ার লোককে বিদ্যায়

পরাস্ত করিয়াছিল। সে আজ বেশী দিনের
কথা নয়। সে কথা বেশী লোকের মনে

নাই, কিন্তু রাষ্ট্রবাসীর ধর্ম-প্রচারক আমেরিকার
চিত্তাব্যাজ্ঞা নবযুগ আনিয়া দিয়াছে—তাহা

কেহ কোন দিন ভুলিবে না—বরং যত দিন
যাইবে ততই দেশবিশেষে তাহার প্রকৃত অর্থ

স্পষ্ট হইতে থাকিবে। অধিকন্তু, বাঙ্গালীর
বক্তা, বাঙ্গালীর কবি, বাঙ্গালীর সাহিত্যদেবী

ইংরাজ-সাম্রাজ্য ও ইংরাজী সাহিত্যে অনুলীন
স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজী ইংরাজী চিন্তা

প্রকাশের ইতিবৃত্ত লিখিবেন, তাহারা বাঙ্গালী
জাতির ইংরাজী ভাষায় বিধিত রচনাগুলি

ভুলিয়া চাইবেন না। ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালী
লেখকগণকে ভুলিয়া গেলে ইংরাজী সাহিত্যের

ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। এতদ্ব্যতীত,
বাঙ্গালীর বিজ্ঞানবীর ও পুণ্ডিয়ার বিদ্যা

রাষ্ট্রের একটা নতুন বিভাগ গুলিয়া দিতে
সমর্থ হইয়াছে। ইহা এখন বিশ্ববিশ্রুত। আর

আজ জননী বঙ্গভাষার একজন শ্রেষ্ঠ সাধক
“জগৎ-কবি-সভার মাঝারে” প্রধান আচার্যের

অর্ঘ্য লাভ করিয়া এক অভিনব উপায়ে
ভারতবাসীর প্রতি মানবজাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ

করিলেন।

বাঙ্গালী-সন্তান জগতের ধর্ম, বিজ্ঞান ও
সাহিত্য-ভাণ্ডারের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি

করিতে পারিবে—সরস্বতীর এই আশীর্বাদ
লইয়াই যেন বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীর শারীরিক শক্তি ও বাহ্যল

সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাহিরের
“অস্বাভ্য জাতির মধ্যে একটা নিম্না ও অখ্যাতি

প্রচারিত ছিল। দেখিতেছি জগজ্জননীর
কৃপায় এই নিম্না নিবারিত হইতে চলিয়াছে।

অম্বুদনের ভিতর আমরা আমাদের জাতির
মধ্যে স্বাস্থ্য ও সবলতার পরিচয় পাইতে

আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের চোখের সমুখে
একটা কুস্ট, পরিশ্রমী, কষ্টগ্রস্থ বাঙ্গালী

জাতি গড়িয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য ফুটবল,
ক্রিকেট ইত্যাদি খেলায় বাঙ্গালী সন্তান

উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখিয়া “ইংলিশম্যান”
ইতিমধ্যেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। গত

বৎসরে “মোহনবাগানের জয়লাভ” বাঙ্গালীর
ইতিহাসের একটা স্বর্ণযুগ ঘটনা। অজ্ঞেয়

যোগে এবং সেদিনকার জয়লাভের ও বাঙ্গালী
যুবকের কর্মপটুত্ব, শৃঙ্খলাজ্ঞান ও নেতার

আজ্ঞাপালনক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে।
এতদ্ব্যতীত তাহারা বর্ষা-স্রোতের প্রভাবে

উৎসর্গ করিতে শিখিয়াছে, এবং অনাহার-
অনিদ্রায় কল্লপ করণে না। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ

সমৃদ্ধ এই সমুদ্র স্তুতি আশাপ্রদ পূর্ণলগ্ন।
সেদিন বাঙ্গালী বালক ক্রীড়ান “গোবর” বিলাতে

গাইয়া কুতূসিগর উপায় লাভ করিয়াছে।
আজ সে পুণ্ডিয়ার সর্ববিখ্যাত পালোয়ানকে

মস্তকুচ্ছ আশ্রয় করিবার জন্ত আমেরিকায়
চলিল। “বাহুতে তুমি মা শক্তি”—এই মন্ত্রও

সিদ্ধির পথ অগ্রসর হইতেছে দেখিতেছি।

৩। ভারতে পাশ্চাত্য পণ্ডিত

পাশ্চাত্যের যখন ভারতবর্ষ প্রথম পার্শ্বপ

করেন; তখন ভারতসমাজ তাহাদের নিকট

সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। সেই সমাজের
রীতিনীতি, আইনকানুন বুঝিবার জন্ত

বিদেশীয় শাসনকর্তারা যত্ন লইতে বাধ্য

হইয়াছিলেন। তাহার কলে সংস্কৃত সাহিত্যের "আবিস্কার" হয়—এক কতকগুলি স্থতিগ্রন্থ পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হয়। সে আজ প্রায় ১০০১২০ বৎসরের কথা। তাহার পর বিশেষদৃষ্টিপূর্ণ পক্ষে ভারতবর্ষের ধর্ম, নীতি, সাহিত্য, কলা, শিল্প, সভ্যতা কিছুই সমান করিবার বা বিশেষরূপে আদর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। পাশ্চাত্য জগৎ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যজগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এ কথা স্বতঃসিদ্ধের স্থায় তাঁহাদের সমাজে প্রচারিত ছিল। তুলনা-মূলক সমাজ-বিজ্ঞানের খাতিরে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা বিশ্বসমিতি ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করিতে কিছু কিছু মতামত দিয়াছেন। কিন্তু জাতীয় অভিজ্ঞান এবং স্বকীয় শ্রেষ্ঠস্বত্বের ধর্ম করিয়া প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের স্থায় বেশী লোক এতদূর কষ্ট স্বীকার করেন নাই। কিছু দিন হইতে পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সাহিত্য, সমাজ, চিত্রকলা, দর্শন প্রভৃতির গৌরবপ্রচারক জুটিয়াছেন। এই সকল "ভারত-বন্ধু"গণের মধ্যে অনেকেরই একটা মুখ উদ্দেশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিজয়ের দ্বারা অর্থ-সমগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নয়।

আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছি—সম্প্রতি প্রাচ্যজগতের জীবনবস্তুর পরিচয় পাওয়া পাশ্চাত্য জগতের সভ্যসভায় ভাব-পরিবর্তন হইয়াছে। বিগত ৭৯ বৎসর হইতে তাহার প্রাচ্যকে গভীর ভাবে, সত্য ভাবে এবং বৈজ্ঞানিকের চোখে স্মৃতিবার লক্ষ্য চেষ্টা করিতেছে। এতদূর ২০ বৎসর হইল বিলাতে Universal Races Congress বা বিশ্ব-মানব-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে অবজ্ঞা না করে, সাহিত্য-লোচনা ও বিজ্ঞানালোচনার ভিতর দিয়া

যথাসম্ভব সেই চেষ্টা করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। তাহার ডেউ ভারতে পৌঁছিতে—কথঞ্চিৎ পৌঁছিয়াছে। সমগ্র লক্ষ্য দেখিয়া বুঝা যাইতেছে—ভারতবর্ষের মধ্যকার, ঘরের কথা, সামাজিকতার কথা, ধর্মকর্মের কথা ইত্যাদি ভারতীয় অস্বর্জগতের নিচিহ্ন বহু-গুলি দখল করিবার জট ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা রাখালা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, গুজরাতি ইত্যাদি সকল প্রকার ভাষা শিখিবেন। এই সকল ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্য পাশ্চাত্য স্বদেশীয় ভারতীয় ভাষাভাষীরা বলিতে অভ্যাস করিবেন—প্রয়োজন হইলে, ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যভাবিকের নানা উপায়ে পরিপুষ্ট করিতেও সাহায্য করিবেন। আমাদের দেখিতে পাইব ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ভাষা-কথন ভারতের প্রকৃতত্ব, গ্রাম্য-কথা, ভাষাতত্ত্ব, নৃত্যতত্ত্ব, তন্ত্র-লতা, কৃষিশিল্প ইত্যাদি সপক্ষে সঙ্গত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিবার লক্ষ্য পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উদ্যমী হইয়া উঠিবেন।

৪ টা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর সংগ্রাম

ভারতবর্ষের বাহিরে অনেক স্থানে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান ব্যবসায়াদি উপলক্ষে বাস করিতেছেন। তাহার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা একটি প্রধান উপনিবেশ। উপনিবেশ বটে, কিন্তু একদিন "সন্তান যার তিস্তত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ"—এ সে উপনিবেশ নাই। এ উপনিবেশ সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষ-প্রসিদ্ধ ভারতসন্তানের বন্যাদেরই নামান্তর। স্বতরাং এখানে দুঃখ দৈনন্দিন জীবনের সীমা নাই। অধিকন্তু বিশেষ

পরিভ্রমণের কথা এই যে, ভারতজুড়ি হইতে যাহারা অফ্রিকায় অধির হইয়া দেশেশাস্ত্রের চলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরিগণের পর লওয়া পর্য্যন্ত আমরা আমাদের গৃহস্থধর্মের মধ্যে মগ্ন করি নাই। নীচাশয়তা ও স্বার্থপরতা আর কাহাকে বলে?

গত বৎসর মহানারী-জননায়ক জীহু গোথলে মহোদয় দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি সে স্থানে আমাদের স্বজাতীয়দের চরিত্রের স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় জনগণের কথা ভারতবর্ষে কথঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে। কিন্তু তাহার বে ভারতসমাজেই এক অংশ, এ ধারণা আমাদের মস্তিষ্কে এখনও বদ্ধমূল হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীগণ যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন তাহাতে ভারতবর্ষেরই মান-সম্মত প্রতিক্রিয়া এবং অবস্থায় উন্নতি যে নির্ভর করিতেছে তাহা এখনও আমরা বুঝি নাই। তাহার যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা আমাদেরই জীবন-সংগ্রামের এক অধ্যায় বাহা, তাহাদের জয়-পরাজয়ে আমাদের বিকাশ-বিনাশ অবশ্যভাবী, সে তব্ব এখনও আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই।

মেথানে আমাদের স্বজাতীয়েরা কত নির্যাতন সহ্য করিয়া থাকে তাহা পূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। পুনরুজ্জীবন নিশ্চয়োজ্ঞান। আজ তাহার যোতর স্বদীর্ঘ ভোগ করিতেছে। ভারতমাতার স্ত্রীপুংখকরণ পেশানে দলে দলে কারাবাসে প্রেরিত হইতেছে এবং প্রাণ দান করিতেছে। ভারতে যে সকল জনকজননীপণ রহিয়াছেন তাঁহাদের মূখের দিকে চাহিয়া আজ দক্ষিণ আফ্রিকার

হিন্দু-মুসলমান নর-নারী জীবনের মায়া ত্যাগ করিতেছে, পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা বিসর্জন দিতেছে, জাত্যভিমানের পবন লওয়া কুরিতেছে। শত শত দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয় সন্তান ভারতমাতার "ইচ্ছা" রক্ষা করিবার জন্য বন্দপরিহার। তাহার চালা-তরওয়াল, বন্দুক, গুলিগোলা লইয়া-লড়াই করিতে চাহে না, আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে তাহার হস্ত উত্তোলন করে না, করিবেও না। অত্যা আইন যত দিন না সংশোধিত হয়, ততদিন নিজেদের সকল প্রকার নির্যাতন ভোগ করিবে, জেলে পড়িবে, শাসন কর্তাদের হাতে প্রাণ দিবে, তথাপি অশমন্যতক আইন স্বীকার করিয়া জীবন যাপন করিকে না, ইহাই তাহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ইহাই তাহাদের সংগ্রামের মূলমন্ত্র। এ এক বিচিত্র সংগ্রাম—সংগ্রাম-কারিগণ কাহাকেও অঘাত করে না, কেবল নিজেদেরই নিকষেগে বিনা কাব্যব্যয়ে সর্ববিধ যত্না সঞ্চ করে। এই সংগ্রাম একমুখে।

ভারতবাসী গৃহস্থগণ, এই যে শত শত শোক অবলীলাক্রমে কারাগৃহে বাইয়া, ইহাটুকু অলিখিত করিয়া তোমাদের মূখ রক্ষা করিতেছে ইহার কোন্ শ্রেণীর লোক, জান ? যাহাদিগকে তোমরা অনিশ্চিত, মূখ, অধিশিষ্ট এবং ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাক, ইহার সেই শ্রেণীর লোক। ইহাদের মধ্যে ধনবিজ্ঞানের-স্ব-মুখ-করা, এম্-এ-উ-গ্রীষ্মাবধী পাণ্ডিত্যভিজ্ঞানী, বিজ্ঞানবীর, সাহিত্যরসী, ঐতিহাসিক অহ-সন্তানকারী একজনও নাই। প্রায় সকলেই মুদী, দোকানদার, ফেরিওয়াল, সোজা কথা, "চামা" অর্থাৎ mass-পদবাচ্য। ভারতীয় মূখ জনসাধারণের চরিত্রবস্তার

এবং কর্তব্যজ্ঞানের আর কোন পরিচয় চাহ কি ?

তোমরা ইহাদের জ্ঞান কি করিবে—
পৃথিবীর লোক তাহা দেখিবার জ্ঞান উৎসুক।
আনিয়া রাণিও, এই নীরব রক্তহীন সংগ্রহের
ফল জাখানি, আমেরিকা, চীন, জাপান,
ইংলণ্ড সকলেই অধীরভাবে দেখিতেছে।
ভারতবর্ষের প্রাণ আছে কি না, শায়ামস্তা,
ঐক্য-দৃঢ়তা, স্বজাতিপ্রিয়তা আছে কি না,
ভারতবাসী নিম্ন আত্মীয়-স্বজন সমান
সম্মতিকে রক্ষা করিতে শিখিয়াছে কি না—
এই বিচিত্র ধর্মসংগ্রামে তাহারই পরীক্ষা
হইতেছে। ভারতবাসীর বৌদ্ধ কত্বর—
সমস্ত পৃথিবী আঁজ তাহা দেখিবে।

ভরসা আছে, ভারতবর্ষ একটিনা ভারত-
সম্রাটের জ্ঞানও আর উদাসীন থাকিবে না।
ভারতবর্ষ জগতের কর্ণক্ষেত্রে ঘামিয়াছে,
সেখানে লোকের কাছে হাত্যাঙ্গাদ হইবে না।
যে সকল পিতামাতা ও কর্মঠ পুরুষজাগণ
পরিবারের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীজীবনের
কাৰাগারে প্রবেশ করিতেছে, এবং মৃত্যুর
অভিধান করিতেছে তাহাদের নাবালক
পুরুষজাগণের অমবজ্ঞের জ্ঞান ভারতবর্ষের
সর্বত্র অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। বাঙ্গালীও
পঞ্চাঙ্গপন নহে।

৫। ধর্মপ্রচারক হরনাথ

গৃহস্থের পাঠকগণ হরনাথের ধর্মপ্রচার ও
গ্রন্থাবলীর সহিত পরিচিত আছেন। সম্ভ্রান্ত
কলিকাতায় হরনাথ-তত্ত্ব-প্রচারিণী সমিতি
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় প্রতি বৎসর দুই
হাজার ক্রিয়া হরনাথ-গ্রন্থাবলীর প্রত্যেক
পুস্তকের সংস্করণ ছাপা হয় এবং এক বৎসরেই

বিক্রয় হইয়া যায়। গ্রন্থাবলী উড়িয়া, মারাঠী,
খিন্দি, গুজরাটী, তামিল, ইংরাজী ও জাখান্
ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

তাঁহার ভক্তমণ্ডলী ভারতবাসী। ইনি
সকলকেই “নাম” লইতে বলেন। নাম
অর্থে হরিনাম, রাখাক্ষনাম। বেশভূষার
কোন বিশেষত্ব নাই, যে বা দেয় তাহাই
ধরেন। আহারে জ্বাতিভেদ নাই। হরনাথ
বালকের মত সরল ও প্রেমময়, এমন
ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে
একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই
যৌবন হইয়াছে, জীবনে আর তাঁহাকে
ভুলিতে পারে নাই। ইহার অমূল্যমূল্য
শক্তিও যথেষ্ট আছে। কাজ কর্তব্য ত্যাগ
কুরিয়া সমাদী হইয়া এবং বনে জঙ্গলে
পুথিয়া বেড়াইতে তিনি চাহেন না।
শ্রীচৈতন্যের বিশ্বপ্রেম এবং নামধর্ম প্রচার
করিতেই তিনি ভালবাসেন এবং তাঁহাকে
তাঁহার ভক্তেরা যথ্য নিত্যানন্দ বলিয়া স্বীকার
করেন। ইনি বাঙ্গালী, ইংরাজী, হিন্দী এবং
উর্দুতে স্বকৃত—ইহাকে অনর্গল গায় ঘণ্টা
কাল বক্তৃতা করিতে দেখা গিয়াছে। বি-এ
পরীক্ষা দিয়া ইনি কাম্বীর-মহারাজার ধর্মার্থ
অফিসের স্থপারিটেণ্ডেন্ট রূপে ১৯১২ বৎসর
ছিলেন।

দিল্লী পাঠাঘরের ভারত-গবর্ণমেন্ট অফিসের
কর্মচারীগণ বৃন্দাবনে একটি হরনাথ-আশ্রম-
আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পুরাতন
সমুদ্রতটে একটি এবং প্রধান সোনার্মুখিতে
(বাঁহুড়া) একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইতেছে।
যেযোক দুইটি বড় দিনের ছুটির সময় সাধারণ
হইবে আশা করা যায়।
প্রত্যেকটি আশ্রমেই গরীব তীর্থ-যাত্রী-
দিগকে আশ্রয় দেওয়া হইবে, রোগ

হইলে যোগ্যতমর যত্নোপকরণ করা হইবে।
আশ্রমের ঘরোনে একটি বাতাস চিকিৎসাগৃহ
ও ধর্ম-পুস্তকালয় থাকিবে।

দেশের স্বানে স্বানে এইরূপ আশ্রম-
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বড় বোধি। আমরা যোগ্য
কর্ত্তি এই সাধু দৃষ্টান্ত স্মরণই অসম্ভব হইবে।

৬। বেড়ালা-রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা

অল্পকাল প্রাথমিকশিক্ষা-বিস্তারের জ্ঞান
ভারতের সর্বত্র প্রবল চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।
তন্মধ্যে বেড়ালা-রাজ্যে ইহার কাব্য বৈজ্ঞানিক
জ্ঞানগতিতে চলিতেছে, জ্ঞান প্রাথমিকোধ্য
নিয়ে। বেড়ালায় গৃহীকোষাধ্য বাহাদুর ইহার
জ্ঞান কেশব দেব প্রথম বক্তৃতা করিয়াছেন
অন্য নহে, তিনি তাঁহার স্ত্রী ও অগ্রজ
প্রধান কর্মচারীদিগকেও এই বিষয়ে মনো-
নিবেদন করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং
সুদৃঢ় স্বকীয় অবলম্বন করিয়াছেন। যে স্থানে
পনরটি শিক্ষার্থী, বালক পাওরা বাইতেছে,
সেই স্থানেই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত
হইতেছে। গাইকোয়াড বাহাদুর স্থির
করিয়াছেন, শীঘ্রই হটক অথবা কিছু বিলম্বেই
হটক, রাজ্যের প্রতি গ্রামে একটি করিয়া
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিবেন। প্রজা-
স্বন্দের শিক্ষার জ্ঞান তিনি যে মহান ব্রত
গ্রহণ করিয়াছেন এবং অজস্র অর্থ ব্যয়
করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ভারতীয়
রাজত্ববর্ণের তাহা অস্বকরণীয়। ব্রটম-শাসনিত
ভারতবর্ষের কৃষি আশ্রয়ই এই প্রকার
উদারনীতি অবলম্বিত হয় নাই। ভগবানের
কৃপায় তাঁহার সমস্ত পূর্ব হইল কেবল এই

জ্ঞানই তিনি ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয়
হইয়া থাকিবেন। স্বী-শিক্ষাবিস্তারের জ্ঞানও
তিনি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন।
বেড়ালা-রাজ্যে বালিকাদিগের জ্ঞান অসীম
সম্পত্তি ৩৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত
হইয়াছে এবং তাহাতে ১৫,০০০ ছাত্রদেরও
অধিক বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে।

৭। পুরোহিতের দুর্দশা ও তাহার প্রতিকার

দেশে এখন সকল দিক হইতেই উন্নতির
জ্ঞান আন্দোলন চলিতেছে। এখন সকলেই
নিজের নিজের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে
পারিয়াছেন। সুস্থ হইতে বৃহৎ সম্রাটের
কোষাধ্যও কেহ নীরব হইয়া বসিয়া নাই।
সকলের মধ্যেই একটা মঙ্গলময় ভাবের সাড়া
লক্ষিত হইতেছে। ধর্ম, কর্ম, চরিত্র, আচার,
সমাজ, সংসার প্রভৃতি কোন দিকেই বাহাতে
ইহা নীতি স্বীকার না করিতে হয়, তাহার জ্ঞান
প্রাপণ চেষ্টা চলিতেছে। এই আন্দোলনে
সহায়তা করিবার জ্ঞান অধ্যাপক সতীশচন্দ্র
মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি এন্স সি মহাশয়
পুরোহিত-সম্প্রদায়ের আলোচনা তুলিয়াছেন,
আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—
“আজকালকার দিনের পুরোহিতের দুর্দশা
দেখিলে শৃগাল-কুকুরও অশ্রু বিসর্জন করে।
গামছায় চাল-কলা বাঁধিয়া পুরুতাকুর এখন
যজ্ঞমন্দিরের ঘরে ঘরে গিয়া দেবসেবা করিয়া
করেন। বাবুদের বাড়িতে যেমন বামুনদাকুর
রাখা করেন, তেমনই পুরুতাকুর দেবসেবা
করেন। সম্রাটের সঙ্গে উভয়েই সমান
যথিষ্ঠতা। পুরোহিতের অবস্থা কি করিয়া
উন্নত করা যায়, এই বিষয়ে কেহই চিন্তিত

নহেন। যাহারা পুরোহিত, তাহারাজি ছেলের ইংরাজি শিখাইয়া দেবারিগিরি বা অজ কোনও কাজে দিতেছেন, সাধামত চেষ্টা করিতেছেন বাহাতে তাহার পৌরাহিতা না করে। এই সকল ছেলে যখন ইংরাজিতে কুতবিতা হয়, তখন তাহারাজি তাহাদের আশ্রয় স্বরূপ পৌরাহিতা করেন, এ কথা স্বীকার করিতেও লজ্জিত হয়। আর যজমানগণও পুরোহিতের কথা লইয়া মাথা ঘামান না—কেমনা ছ'পাত ইংরাজি পড়িলে আর কিছু না হইলেও নিজের ধর্ম ও সমাজের প্রতি খুব একটা তাচ্ছল্য আনিয়া দেয়। তবে আশার কথা সম্প্রতি একটু হাওয়া ফিরিয়াছে—ইংরাজি শিক্ষার মোহ যেন একটু একটু করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। নিজের ঘর সমালোচনার জ্ঞান অনেক বঙ্গপরিষদের ইচ্ছা—কাজেই এহেন সময়ে পুরোহিতের ছদ্মধা বর্ণনা করা আমার নিত্য অনুরোধ হইবে না।

যে শিক্ষিত হিন্দু যুবক, তুমি যে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দাও, সাধেবদের কাছে যে হিন্দুধর্মের বড়াই করিয়া বক্তৃতা দিতে যাও, তুমি হিন্দুধর্মের কি অহুষ্ঠান কর, কোন্ আচার পালন কর? তোমাতে আর নান্দিক প্রভেদ কি বড় বেশী? অশিক্ষিত কৈবর্ত, মনুষ্য প্রভৃতি যে সকল লোককে তুমি “ছোট লোক” বলিয়া ঘৃণা কর, তাহারাজিও দেখি “চলিগ প্রহর” দেখ, ছয় মাস ধরিয়া কথকতা শুনে, গাভ্রনের সময় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান পালন করিয়া থাকে। তোমাদের বাড়ীর মহিলাগণ না কি তোমাদের মত অশিক্ষিত হইয়া উঠে নাই, তাই এখনও তোমাদের বাড়ী পূজা-পার্বণ হয়, নহিলে সে পাট বস্ত্র হইয়া যাইত।

তোমরা কি প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু হইতে চাও? প্রাচীন কবিগণের প্রতিকৃতি বাস্তবিকই তোমাদের একটু ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে? তা যদি হয়, তা হইলে এ উপাশান ভাব ত্যাগ কর—গ্রাম্যের আবর্জনা সমূহ দূর করিতে যত্ববান হও। শুধু নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি করিলেই চলিবে না—বাহ্যন্তে নিজ নিজ পুরোহিতগণ শ্রদ্ধাযেরও উন্নতি হয়, সেজন্ম সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ পুরোহিত জানী ও দার্শনিক হইলে তবে সমাজে ধর্মত্যাগের প্রচার হইবে।

এই স্থলে সমাজকে লক্ষ্য করিয়া আমি কয়টা কথা বলিতে চাই। আজকাল কায়স্থ, কৃষিকার, ব্রহ্ম, স্মার্ত্তবর্ণিক, মাহিষ্ঠ প্রভৃতি সম্প্রদায় যে ভাবে সমবেত হইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সেদুগ্ধ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তবে অজ্ঞাত জাতি তাহারাজি যেটুকু মেলিয়া দিতেছেন, তাহারাজি সেইটুকু অগ্রসর হইতেছেন। যেমন এই যে কায়স্থগণ গ্রাম করিতেছেন কি গুণে ব্রাহ্মণগণের মাহিষ্ঠ শিখান অধিকার করিয়া থাকিবার দাবী করেন, ইহাতে ব্রাহ্মণগণের প্রকৃত উপকার হইতেছে, তাহারাজি বাধ্য হইয়া ধর্মচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় মন দিতেছেন। কিন্তু আরও একটু কাব্য-তৎপরতা না দেখাইলে ভয় হয় যুব ব্রাহ্মণ তাহার মাহিষ্ঠ হান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। আমি বালি কি, কায়স্থাদি জাতি তাহাদের পুরোহিতগণকে একটু চোঁদা দিলে এবং পুরোহিতগণ নিজেরাও একটু অগ্রসর হইয়া যান।

সকলে ভাবিলে নিশ্চয়ই পুরোহিতের উন্নতি হয়। এ বিষয়ে আমি যেরূপ বুদ্ধি, বলিতেছি; আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তি এ বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।

যজমান ও পুরোহিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা স্পষ্ট পার্থক্য থাকা আবশ্যিক। পুরোহিতের কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যিক। পুরোহিত দার্শনিক ও মনোভাজ হইবেন—মদ্যপ, কুচরিত্র, পুরোহিতকে কোন্ অঙ্গলোক বাড়ীর ভিতরে যাইতে দিবেন? সেকালে ত ওরূপ ব্রাহ্মণকে জাতিচ্যুত হইতে হইত। পুরোহিত শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন এবং দিবসের কিয়দংশে শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন হইবেন। সময়ে সময়ে তিনি যজমানের হিতার্থে শাস্ত্রীয় উপদেশ দান করিবেন। কেবলমাত্র সংস্কৃত না পড়িয়া তাহার কিছু ইংরাজি পড়াও দরকার, কেননা ইংরাজি ভাষার সহায়তা লইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলে তবে ব্রাহ্মকালকার ইংরাজি শিক্ষিত যজমান তাহার মর্মগ্রহণ করিতে পারিবে। শাস্ত্রে যে গুরু মহাব্যস্ত ও যজ্ঞ, যাজ্ঞ, অধ্যায়, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের এই ঘটকর্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। ২০২৫ অশ্বত্থ: ২০ বৎসর পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য পালন করিতে হইবে। একাবিক দার-পরিগ্রহ, ব্রহ্মব্রহ্মে বালিকার পারিপরিগ্রহ প্রভৃতি বিদুষ্য কার্য ত্যাগ করিতে হইবে।

সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে এই যে, পুরোহিতের ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক ও সম্মানজনক করিতে হইবে, তবে ভাল লোক ইহা ব্যবসায় যাইবে। আর যতক্ষণ যোগ্য লোক—যাহারা ইচ্ছা করিলে চাকুরী বা আইন-ব্যবসায় অর্থ করিতে পারেন, এইরূপ লোক—এই ব্যবসায় আসিবেন ততক্ষণ ইহার উন্নতি হওয়াও সম্ভবপর নহে। পুরোহিত

এমন গৌরবের কাব্য করিতে হইবে যে, লোক পেপন নিয়া বা উকীল হইতে অবসর লইয়া ইহাতে নিযুক্ত হইবে। সেইজন্য প্রথম দরকার এই—বাড়ী বাড়ী গিয়া নিত্য সেবার ব্যবস্থা চালাইয়া দেওয়া। পৃথক পৃথক উচিত এরূপ বিগ্রহ রাখা যাহা তিনি নিজেই পূজা করিতে পারেন—যেমন শিব লম্বা বা রাধা-কৃষ্ণের পট। শালগ্রাম-শিলা যখন ব্রাহ্মণ নহিলে পূজা হয় না, তখন বাড়ীতে শালগ্রাম-শিলা না রাখিয়া পাড়ায় একটু দেবালয় স্থাপন করিয়া তাহাতেই কয়টা বাড়ীর পৈতৃক শালগ্রামের সেবার ব্যবস্থা করা উচিত। দেবালয়টি পুরোহিতের বাড়ীর সংলগ্ন হইলে সোণায় সোণায়া হয়। পুরোহিত সেই দেবালয়েই অধিকাংশ সময় কাটাইবেন—যজ্ঞানগণও সময় মত পূজা দেখিতে ও পুরোহিতের নিকট শাস্ত্রকথা শুনিতে আসিবেন। পুরোহিত কৃষকের মত নানা রসের অবতারণা করিয়া পৌরাণিক আখ্যানের ভিতর দিয়া ধর্ম ও সংসারপালনবিষয়ক বিবিধ জ্ঞান তাহার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যজ্ঞানমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহা দিগকে দখল করিবেন, নিজেও দখল হইবেন। সেই দেবালয়ের সম্পর্কেই একটা চতুষ্পাটী থাকিবে—তাহাতে কয়েকটি বিদ্যার্থী সম্মত ও ইংরাজি শিখিয়া এই জানী পুরোহিতের নিকট পুরোহিতোচিত শিক্ষা লাভ করিবে। বিবাহ বা শ্রাদ্ধ এইরূপ কোনও নৈমিত্তিক ব্যাপারে পুরোহিত যজ্ঞানের বাড়ী গিয়া দার্শনিকভাবে কথোপকথন করিবেন। তবে যজ্ঞানগণ ইহাও দেখিবেন যেন পুরোহিত জ্ঞানচর্চা ও সামাজিক ব্যবহারের জ্ঞান

যথোচিত অর্থ পান—সে বিষয়ে কার্পণ্য ন করেন চলবে না। ভাল জিনিস চাহিলে ভাল দাম দিতে হয়। একজন ব্রহ্মভক্তঃসম্পন্ন পুরুষের সহিত আলাপ করিলে তাহাদের চরিত্রের ও জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইবে—কতজন্ম কিছু অর্থব্যয় অনর্থক বলিয়া মনে হইবে না। সাহেবেরা তাহাদের পাদবিলের যথেষ্ট মাত্র করেন এবং উপযুক্ত অর্থও দিয়া থাকেন, আর সেই জন্ম বিধান লোক পাদরি হন এবং সমাজের অনেক উপকার করিয়া থাকেন। বাহারা ভিত্তর হুগোর 'লে মিসেরাবল' নামক উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাহারা বুঝিবেন যে বিশপ মাইরেলের মত পুরোহিত বাহাতে পাশ্চাত্য দেশে তৈয়ারী হয়, তাহার জন্মই তাহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালা দেশে ধর্মীর প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের অভাব নাই এবং এখনও কেহ কেহ 'সেবালয় প্রতিষ্ঠা' করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কতক-গুলি ভুল ভোজন হইতেছে। আর ধর্মী ও কৃতবিদ্যা অনেক হিন্দুসম্মান ইচ্ছায় হ'ক আর অনিচ্ছায় হ'ক, এখনও পুরোহিতের শপথ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহাদের মধ্যে একজনেরও কি এমন ইচ্ছা হইবে না যে, আমি একটি সামাজিকভাবে পূর্ণ দেবালয় স্থাপন করি এবং প্রকৃত পুরোহিতপদবাচ্য এক মহাত্মাকে তাহার সেবাইং নিযুক্ত করি, আর এমন নিয়ম করিয়া যাই যেন ভবিষ্যতে কোনও অযোগ্য ব্যক্তি সেবাইতের পদ লাভ না করিতে পারে ?

৮। বঙ্গের দীনবন্ধু

প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১২৬৭ সালে, 'কৃতচিং পথিকত্ব' নামে দীনবন্ধু

বাবু 'নীলকর-বিধর-দংশন কাঁঠর প্রজা-নিকরে'র গ্রন্থে ব্যক্তি হইয়া 'নীলদর্পণ নাটক' রচনাপূরক, উহা 'নীলকরকরনিকরে' অর্পণ করেন। তাহার কলে বঙ্গদেশে মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়—মহামদল সাধিত হয়। প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় উদ্দীপনা', শীর্ষক তৎকাল-লিখিত প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"দুরেই বা বাই কেন, আমাদের স্বত্বিকালের মধ্যে এই বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে মহা উদ্দীপনার অবতারণা আমরা দেখিয়াছি।

যখন মাহুদের মুন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিসের স্বগ্রন্থিক নীলদর্পণ নুটক প্রকাশিত হইল। নাটকধর্মী বঙ্গ-সমাজে কি উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না।"

এই এক গ্রন্থ রচনা করিয়া দীনবন্ধু বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালী ভাষা এবং বাঙ্গালী জাতির কাছে অমর হইয়া গিয়াছেন।

সাময়িক দুর্দৈব নিবারণের জন্য যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, ঐতিহাসিক হিসাবে, তাহাদের মূল্য বড় কম নহে। নীলদর্পণ সেই জন্ম আমাদের কাছে চিরকাল আদৃত হইবে। বাস্তবিশুই পুস্তকখানায় বঙ্গদেশের তাৎ-কালিক অবস্থার একটা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার "সপ্তবার একাদশী" "নবীন তপস্বিনী" প্রভৃতি গ্রন্থেও বঙ্গদেশের তৎসময়ের সামাজিক অবস্থার ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুপ্ত কবির শিষ্টাদিগের মধ্যে প্রভুত্ব-অবতারণা তাহার মত সিদ্ধহস্ত আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

গৃহস্থ

হাঅরস রসিক বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাট্যকার

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র



"সত্যই স্রোণার নিধি বিদ্যদত্ত ধন।
কাদ্রালিনী পেলে রাণী এমন রতন ॥"

বাস-পূর্ণিমার দিন তিনি পরলোকগমন করেন। তাই প্রতি বাস-পূর্ণিমায় তাঁহার গৃহে—কলিকাতার “দীনদামে”—তাঁহার পবিত্র দ্ব্যতর্থে সাহিত্যিকদিগের পূর্ণিমা-সম্মিলন সংঘটিত হয়। বর্তমান বর্ষে গত ১৯ অগ্রহায়ণ উহা মহাসমারোহে অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

৯। বৈষ্ণব আন্দোলন

স্বধর্মপরায়ণ • পরমবৈষ্ণব শ্রীমদ্রাহাভ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐগাভূবের চৌধুরী, যত্ন ও সাহায্যে গত চারি বৎসর ধরিয়া গোড়ীয়-মৈত্রয়-সম্মিলনীর শাবিক অষ্টান হইতেছে। প্রথম তিন বৎসর তাঁহার রাজবাটা কামিনী-বাজারে, এবং চতুর্থ বর্ষে শ্রীমদ্রহসিঠাকুরের ত্রিপাটী শ্রীখণ্ডে ইহার আদবেশন হয়। বর্তমান ৫ম বর্ষে শ্রীধাম নবরীপে সম্মিলনী হইবে। শ্রীধাম নবরীপ রৈক্য-সমাজের মহাতীর্থ-ঐচৈতন্যদেবের জন্মভূমি। এই নবরীপেই ১৪৩৭ শকে তিনি প্রথমে—

হর হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় বাদবীয নমঃ।

(বাদবায় কেশবীয গোবিন্দায় নমঃ)

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুহুদন।

বীর্জন গান করিয়া হরিনাম-সংকীর্তন-পাঠায় সমগ্র বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যাকে পরিপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সম্মিলনের উদ্বোধনকারী এ হেন ভুবনপাবন স্থানে সম্মিলনের স্থান নির্বাচন করিয়া গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষ আনন্দবর্ধন করিয়াছেন।

সম্মিলনীর দিন ও কার্যাবলী স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী ১৯শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার শ্রীমদ্রাহাভাকুর সম্মিলে অধিবাস। ২০শে ও ২১শে অগ্রহায়ণ ‘পোড়ামারতলা’য় সভাধিবেশন এবং ২২শে অগ্রহায়ণ নগর সঙ্কীর্তন হইবে।

১০। সেবামাহাত্ম্য

আমরা গতবারে দেখাইয়াছি,—যে সমুদয় নতুন শক্তি ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয়-মুহুরে স্বরূপাত করিয়াছে, তাহার মধ্যে সেবামাহাত্ম্যের প্রতিষ্ঠাপাত অগ্রতম। এই সেবাই আমাদের সনাতন ধর্ম। এই সেবা-দ্বারাই চরিত্র সংগঠিত হয়—সেবা-দ্বারাই গৃহস্থ আপনার মুহুর্থাৎ রক্ষা করিতে পারে—বিশ্ব-সংসারকে নিজের করিয়া লইতে পারে। আমরা নিজে ব্রহ্মচারী দেবব্রত মহাশয়ের এতৎ সংক্ষেপে আলোচনা উক্ত করিলাম—

“ধর্ম প্রবর্তকগণ, স্ববি বা ভগবানের অবতার-গণ জীবের কল্যাণসাধনের নিমিত্ত যে সকল আদর্শ অহুসরণের অহুজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সেবাবিধি বা জীবে দয়া সর্বোচ্চ। বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এই মহান আদর্শের ঘোষণা করিতেছে। সকল ধর্মের মূলে যে সনাতন সত্য নিহিত আছে, তাহার উপলব্ধি হইলে, স্নেহাবিধি বা জীবে দয়া যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহা অনায়াসেই ধ্রুত্বপন্ন হয়। বিহারী জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতিপাদন করেন—জীব-ব্রহ্মের স্বরূপতঃ একত্বে বিশ্বাস করেন, তাহারী কেবল উপাধিগত ভেদই দেখিতে পান; তাহারের পক্ষে সমদর্শন ও ব্রহ্মদর্শন একই কথা।

“বিদ্যাবিনয়সম্পন্নব্রাহ্মণে গবি হস্তিন।

শুনি তৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।”

“জ্ঞানতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও ব্যাঘ্র

সমস্ত জীবে সমদর্শী হন অর্থাৎ “এক এব হি

ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ” দর্শন করিয়া

ধাকেন। অতএব ভেদ উপাধিগত, উপাধি

পরিবর্তনশীল এবং তদ্বারা জীব বা বস্তু

জীবের বা বস্তুর সম্পাদন হয় না। আমরা
আমিষ ও নৃকরের নৃকরর আত্মা ব্যতীত
সম্ভবপর নহে। উপাধি দ্বারা অনাতীর্থ
স্বাকী বিচিত্রতা প্রকটিত হয় মাত্র।

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরায়া।
কর্ণধাধ্যঃ সর্বভূতদিবাসঃ
সাকী চেতাঃ কেবলো নিওপশত।”

অর্থাৎ অধিতীয় অব্যক্তভাবে সমস্ত
প্রাণিতে বিদ্যমান, সর্বব্যাপী, সকল ভূতের
বহুরূপ, অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা, সমস্ত জীবের বর্তমান,
পরমেশ্বর সকলের স্রষ্টা, তাহার উপাধি বা
স্ববিশিষ্ট কিছুই নাই।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ভেদগত যে
উপাধি—সে উপাধি কিছুই নহে—আবরণ
মাত্র।

যে কোন কেসেই হউক প্রত্যেক স্থানেই
তিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রমান—তিনি সর্বব্যাপী।

“সর্বং বর্ধিতং ব্রহ্ম তজ্জাতানিতি শাস্ত্র
উপাসীত।”

অর্থাৎ সেই ঈশ্বর হইতে জাত, তাহাতে
লীন ও তাহা দ্বারা প্রতাপিত হস্তরূপ
সমস্তই ব্রহ্ম।

কিন্তু বাহ্যেরা জগদতিরক্ত ঈশ্বর কল্পনা
করেন, তাহাদের মতে ঈশ্বর শক্ত, জীব পুঙ্খ,
অতএব জীবের জাত্যভাব তাহাদিগের ধর্মের
মূল সত্য। এই সম্বন্ধে আদর্শ হইতেই
জীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা ও প্রেম উৎপন্ন
হয়। যিনি যে পরিমাণে এই আদর্শের
ধারণাক্ষম, জীবের প্রতি তাহার সেই
পরিমাণ সমতা—সেই পরিমাণ ভালবাসা।
এই জীবের দয়া বা সেবাদর্শ ঈশ্বর-প্রেম বা
ঈশ্বরভক্তি ব্যতীত সম্ভবপর নহে।
শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সন্ন সর্ষেযু ভূতেশু মন্থক্লিমে ভাঙতে পরাং।
ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানীতি যাবানু যশাসি তত্ত্বতঃ।
ততো যাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং।

“যিনি ব্রহ্মস্বভব করিতে পারিয়াছেন, সেই
প্রসন্নাত্মা ব্যক্তির শোক বা বিষয়াবাসনা
থাকে না, তিনি সর্বভূতে সমানী এবং
জীবাত্মা পরমায়ার অভেদ জ্ঞানবশত
পরভক্তি লাভ করেন।” এই জীবাত্মার
সহিত অভিন্ন দর্শনরূপ ভক্তিদ্বারা ইনি কত
প্রকারে অবস্থিত করিতেছি, এবং কিরূপ
পদার্থে তাহার তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ আনার
অপরিমিত উপাধি এবং নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ,
মুক্তবৃত্তান্ত চৈতন্যবাহুর জ্ঞান হয়। তখন
আমি ও জীব যে একই পরমাণু তাহা স্পষ্টরূপে
প্রতীয়মান হয়। ইহার নাম ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা
মুক্তি।”

“যে আত্মা নরোত্তে
সেই আত্মাই এক হইয়া বিশ্ব সংসারঃ।”
“বিশ্বশাস্ত্রো নরস্ত বিধানরঃ।

বিশ্ব বা নরা অজ্ঞেতি বিধানরঃ পরমেশ্বরঃ।”
অতএব পারমাণবিক দৃষ্টিতে সমদর্শনামেধা
উচ্চতার আদর্শ আর নাই। এই আদর্শ
দরিদ্রাই সমস্ত ধর্মকর্মের ব্যবস্থা প্রকটিত হয়।
প্রাকৃতিক জীবের অজানাজ্ঞম দ্বয়ে বাহ্যতে
শটনঃ শটনঃ এই মহানু ভাবের ক্ষুদ্র হয়,
ততঃক্ষেপেই নিবিল ধর্মকর্মের ব্যবস্থা।
স্বতরাং যে ধর্ম বা যে কর্ম তাহার বিরোধ-
ভাবপূর্ণ তাহা কখনও জীবের হিতকর নহে।

সর্বভূতে সমদর্শন প্রাকৃতিক জীবের
পক্ষে সম্ভবপর নহে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া
যে ভেদগত নিপতিত হইয়া উৎসন্ন যাইবে,
ইহা কোন ধর্মেরই উদ্দেশ্য নহে। তাই সর্ব-
ধর্মের সত্ত্বপদেশ হইতেছে “কাহাকেও হিংসা

না করা, অনিষ্ট না করা, সকলকে বন্ধুর তায়
জ্ঞান করা, সকলকে দয়া করা, পরহিতের জগত
স্বার্থত্যাগ করা।” ধর্মের এই গূঢ় সনাতন
সত্য উপদেশ, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত না
হইলে ইহাকে, বিশ্বজনীন জাত্যভাব বা
আত্মব্রহ্ম বলিলে।

কেহ কৈহ বলিলেন, মানবের স্বভাব—
দেহবিদ্যা, নিয়ন্ত্রতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি
মূল শিকড়। ইহা কখন কালেও উৎপত্তি
হইবার নয়। আবার তাহার উপর জাতিগত,
ধর্মগত, আচার-ব্যবহার ও সম্প্রদায়গত ফে-
সুনা তু রহিয়াছে। এই সকল প্রকৃতি
বলবতী থাকিতে সেবাদর্শ ও জাত্যভাব সম্ভবে
কি? ইহা পুণ্যদর্শীর দৃষ্টিতে সর্বজনীন বোধ
হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিগত একটু চিন্তা করিয়া
দেখিলে ইহা ভুলপ্রায় বলিয়া ধারণা হইতে
পারে না। জীব-স্বভাবে সেন-ভবি ও অহর-
জাব উভয়ই বিদ্যমান আছে—সত্য জেতা
দ্বাপন কাল চারি যুগেই আছে। অনেক
দেবপ্রাণীর এবং অনেক অহরপ্রাণীর।
বাহ্যেরা অহরপ্রাণীর, তাহাদিগকে দেবভাবে
আনন্দ করিবার লুপ্ত তাহাদিগের ইচ্ছা-
শক্তিকে সংপথগামী করিতে হইবে এবং
বাহ্যেরা সংপথগামী তাহাদিগের উত্তরোত্তর
পুষ্টি-সাধনের নিমিত্ত ধর্মকর্মের ব্যবস্থা
করিতে হইবে। যিনি যে ধর্মাবলম্বী হউন
না কেন, স্বীয় ধর্মের প্রকৃত গূঢ়রহস্য
উদ্ঘাটিত করিতে শিখিলে—ধর্মোপদেশ-
স্রোতে জীবন-স্রোতকে ভাসাইয়া দিলে
তাঁহার অবশ্যই ফলদ্রব হইবে যে, এ জগৎটা
আকাশ-সুন্দর্যময় নহে। এটি “অবিতলক
ভূতেশু বিভক্তিমিষ চ স্থিতং।” অবিতলক
হইয়াই সর্বভূতে বিভক্তের তায় স্থিত অর্থাৎ
তিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে এক, অভিন্ন;

তাঁহার বহুত্ব নাই, তথাপি তিনি প্রতি দেহে
মীন ও ইন্দ্রিয়াদি উপাধির পার্থক্য থাকায় ভিন্ন
ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান।

তাই সেবক “বহুরূপে সমুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর” বলিয়া জুলপগুণীর
নিম্নে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া সর্বভূতে
সেই প্রেমবরুণ পররন্ধকে উপলব্ধি করিবার
জগৎ সেবার সবার নিয়ত থাকেন এবং
উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকেন—

“হে প্রেমিক, স্বার্থমলিনতা
অধিকূলে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুরকে কবে বল হথ?।
কৃপা-পাঞ্জ হয়ে কি বা বল?
দাও আর ফিরে-নাহি চাও
থাকে যদি ফলদে সখল।
অনন্তের তুমি অধিকারী,
প্রেমসিন্ধু হুবে বিধানর,
দাও দাও যে বা ফিরে চায়,
তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হ’তে কেটে পরমাণু,
সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাপ শরীর অর্পণ
কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সমুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!
জীবের প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

ইহা নিষ্কাম সেবাদর্শের নিগূঢ় তথ্য।
নিষ্কাম সেবক ব্যতীত এক্ষণ ধারণা জগতে
নিত্য আগমন করে না। নিষ্কাম সেবকের
সেবা কোন জাতি, ধর্ম ও ব্যক্তি-
বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, কারণ
তাঁহার কোন কামনা নাই, লাভলাভের দিকে

দৃষ্টি নাই। সকলের মধ্যে যে অধীশ্বর
আছেন, যে পূর্ণবরুণ প্রেমবরুণ বিরাজ
করিতেছেন, তাঁহাকে সকল স্থানে সকল
অবস্থায় উপলব্ধি করিবার জন্তই নিষ্কাশ
সেবকের সমস্ত আয়োজন।

“মনসৈতানি ভূতানি

প্রণমেদ বহমানয়ন।

ঈশ্বরা জীবকল্যাণ

প্রবিশে ভগবানিতি।”

১১। স্বশাস্তসংহিতা

আমাদের দেশের ইংরাজীশিক্ষিত সম্ভ্র-
দায়ের অনেকেরই এ পর্য্যন্ত ধারণা ছিল,
ভারতের আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অল্পমত।
ইহার গাছগাছড়া—ওষধসম্ভার সমস্তই
অলভ্যতার চরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু স্বদেশে বিষয়
এখন আর সে ধারণা নাই। এখন সকল
দিক হইতেই আমরা ঘরমুণো হইতেছি।
সকল বিষয়েই আত্মপোষের অজুহাব করিবার
ক্ষমতা আমরা কিরিয়-পাইতেছি। তাই
আয়ুর্ষেদের উপরও আমাদের দানর দৃষ্টি
পড়িয়াছে। তাই বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী
আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসায় পারদর্শী হইয়া কবি-
রাষ্ট্রী করিতে পোষব বোধ করিতেছেন।
তাই তাঁহারা বহুপ্রকারে চিকিৎসা-জগতের
সমুখো আয়ুর্ষেদের মহিমা কীৰ্ত্তন করিতে
প্রয়াসী হইতেছেন। সেই প্রয়াসের অঙ্গতম
ফল—কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণ সুজলাল দ্বিবর্ণগু

এম্, আর, এ, এস্ মহাশয়ের স্বশাস্তসংহিতার
ইংরাজী অম্ববাদ।

স্বশাস্তসংহিতা আয়ুর্ষেদের একটি প্রাধান
তত্ত্ব। ইহাতে শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান,
নির্মান, আয়োগ্যবিজ্ঞান এবং আরও বহুবিধ
বিষয় অতি সুন্দর এবং সুসংযতভাবে
আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে শব্দব্যবচ্ছেদ,
মূঢ়গর্ভ-বহিষ্করণের এমন সমস্ত সুন্দর
প্রাণালীর উল্লেখ আছে, যাহা ইউরোপীয়
চিকিৎসাশাস্ত্রের কাছে একেবারেই নূতন।
কেমন করিয়া চক্ষুর ছানি কাটিতে হয়, তাহা
স্বশাস্তই প্রথম জগতে প্রচার করেন।

তিনিই প্রথম স্বস্ত-চিকিৎসা-প্রাণালীকে
অষ্টভাগে বিভক্ত করেন—যথা, আঘাত্য
(ভিতর হইতে রোগের নিষ্কাশন), ভেদ্য
(বিবিধা সেওয়া), ছেদ্য (কর্তন), এজ
(শলাকা-প্রবেশ), লেধ্য (ঔষধ বিদ্যার)
সেব্য (সেবাই) করা, বেধ্য (ছিদ্রকরণ)
এবং বিস্রাবণীয় (টিপিয়া রোগের নিষ্কাশন)।

তাঁহার সাহিত্যই প্রায় একশত অঙ্গের
নাম ও আকৃতি বিবৃত হইয়াছে। এই
বৈজ্ঞানিক যুগেও সেই সহ অঙ্গগুলি নিত্যন্তই
বর্ষের বলিয়া নিরাকারিত হয় নাই। ভিষগণ
মহাশয় তাঁহার অনুদিত পুস্তকে কতগুলি
অঙ্গের চিহ্ন দিয়াছেন। আমরা আশা করি,
এই চিহ্ন দেখিয়া পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমুখী
অনেকেরই হিন্দুস্তানের বাবহারিক জ্ঞান ও
বৈষয়িক সম্ভার তাহা সম্বন্ধে বিবৃত ধারণা
অপগত হইবে।

সভাপতির অভিভাষণ *

সমবেত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যাদ্বয়ী
ভ্রম-মণ্ডলী !

আজ আমরা মাসুল-সাহিত্য-সম্মিলনের
প্রথম অধিবেশনে সম্মিলিত; ভাষা-জননীর
মন্দির-দ্বারে আজ আমরা পূজার অর্ঘ্য লইয়া
উপস্থিত। আজ আমাদের বড় আনন্দের
দিন। এই আনন্দের দিনে আপনারা আমার
দ্রাব্য নগণ্য সাহিত্য-সেবীকে সেই আনন্দের
সেই পরামর্শের অংশভাগী করিয়া আপনাদের
উদার স্বদয়ের ও মহাত্মবৃত্তার যে পরিচয়
দিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার
নাই। আর আজ আপনারা নিজগুণে যে
পদে আমাকে বরণ করিয়াছেন, আমি জানি
যে আমি সে পদের সম্পূর্ণ অধুগম্য; তবে
আমার ইহা গ্রহণ করিবার পক্ষে এইটুকু
কিঞ্চিৎ দিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে,
বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহবাসীদের
—বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীল রূপনাতন-অধুগমিত
বৈষ্ণবভার্তী মালদহজেলার সম্রাট সাহিত্য-
সেবীদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিতে
পারি এক্ষণ শক্তি বাধুশ বৈষ্ণববাসাদ্বয়াদেশের
নাই।

আজ আমরা ছোটবিড়-নির্ধিংশে* সকল
সম্মান যাত্মমন্দিরে মাঠের অলঙ্করণারাজিত
চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এই মালদহ জেলায়
সমবেত হইয়াছি। আহ্নন সকলে মিলিয়া
সমস্তের বলি :—

“বাঞ্ছি যো তোমার চরণে জননি,
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান

* ভক্তি-অশ্র-মলিন-মুক্ত শতক ভক্ত
দীনের গান।

চাহি না'ক কিছু তুমি মা আমার,
এই জানি কিছু নাহি জানি আর
তুমি গো জননি স্বয়ং আমার,
তুমি গো জননি আমার প্রাণ।”

প্রাণময়ী সর্গাধারাদিকা আশাতোমিগি ভাষা-
জননীর চরণে প্রণত হইয়া এক্ষণে কার্যক্ষেত্রে
অগ্রসর হইব। এই যে আমরা এখানে
সমবেত হইয়াছি—মাতার পূজার দ্বারে অর্ঘ্য
লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, ইহার পরিকল্পনা
আধুনিক যুগে ফরাসী-রাজধানী পারী
নগরীতে-প্রথম স্থিত হয়। কলে ১৮৭৩
খ্রীষ্টাব্দে International Oriental Con-
gress নাম দিয়া এক বৈরাট সাহিত্য-সম্মিলনের
প্রথম অধিবেশন হয়। ফ্রান্সের এই
মহাদৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হইয়া
লণ্ডন, সেন্ট-পিটস্‌বর্গ, স্কোরেন্স, বারলিন,
লীডেন প্রভৃতি প্রদেশে আধাবিধ এই সাহিত্য-
সম্মিলন-ব্যাপারটার রীতিমত সাময়িক
অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। আট বৎসর
পূর্বে (১৩১২ বঙ্গাব্দে) আমাদের বাঙ্গালা-
দেশে রাঙ্গালী জাতির মধ্যে কএকজন বাণীর
কৃতী সন্তানের চেষ্টায় এইরূপ একটা সাহিত্য-
সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল। আমাদের
কপালের দোষে সে বৎসর সম্মিলনের সমস্ত



আয়োজন পও হইয়া যায়। তারপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে কাশিমবাজার রাজ্য বাটতে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। সেই বৎসরই উত্তরবঙ্গে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থচনা হয়। ফলে কাশিমবাজার, রাজশাহী, ভাগলপুর, ময়মনসিংহ, চাঁচড়া, চট্টগ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের এবং রঙ্গপুর, বগুড়া, গৌরীপুর, মালদহ, কামরূপ ও দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অস্থচনা হয়। গতবর্ষে শ্রীহট্টেও একটি প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মালদহবাসিগণ, আজ মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের অস্থচনা করিয়া, সাহিত্যিক জ্ঞানবিস্তার ও বঙ্গভাষার অস্থলীন করিবার যে শুভস্থচনা করিয়া দিয়াছেন, মঙ্গলময়ের মঙ্গলশীর্ষে তাহা ফলপ্রসূ হউক এবং এই সম্মিলন যেন দেশের ও দশের উপকার করিয়া ধন্য হইতে পারে, দেশে সঙ্গোহিত্যের প্রচারকল্পে সহায় হইতে পারে, আর জ্ঞান ও নীতি শিক্ষাধারা চরিত্রবলে বহীদান করিয়া ভবিষ্যতে আশাশ্রম সমাজের মেরুদণ্ডরূপ যুগসম্প্রদায়কে সমাজের কল্যাণকল্পে স্বদেশ-হিতরতে দীক্ষিত করিতে পারে। এক্ষণে এইরূপ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না দেখা যাউক।

জ্ঞান জাতি বা ব্যক্তির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিলে বহুজনের ছায়া কালে দুই হইয়া পড়ে। জ্ঞান গণেশবান নদের ছায়া সমাজের গুণে গুণে প্রবাহিত না হইলে মানবের উপকারে আসিতে পারে না। জ্ঞানের বিস্তার করিতে হইবে; এই প্রচারকার্য একের দ্বারা বা এক সমাজের দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না—সম্মিলিত চেষ্টায় এই কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। তাই বঙ্গের বরণ্য কবিবর

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—“নির্ধাণ-কার্যে ব্যক্তিগত—চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টাই অধিক সাফল্য লাভ করে। সকলের সামর্থ্য সমান নয়, সকলেই যে-কোষে শক্তি নিয়োজিত করে, তাহা হইতে খুব বড় একটা ফললাভ করা যায়। এই নির্ধাণ-কার্যই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকৃত কৰ্মক্ষেত্র,” এবং এই উদ্দেশ্যেই “সকলের সমুদয় সাহিত্য-সেবীকে একস্থানে সম্মিলিত করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করাই এইরূপ সম্মিলনের মূখ্য উদ্দেশ্য।” “চোরে চোরে মাসফুটে ভাই” প্রবাদ বাঙ্গালা দেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু দুঃখের সুখিত বলিতে হইতেছে, একক বৎসর পূর্বে সমবায়দ্বারা সাহিত্যসাধনদিগের ভিতর মনোবিবাদ ও মতান্তরের পরিণতি এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত বিদ্বেষবাহি উদ্দীপিত হইত। অনেকস্থলেই ইহার কারণ ছিল—সহায়কৃত্তির অভাব, সাহিত্য-সেবীদের ভিতর প্রণয়ের স্পন্দনের অভাব—প্রীতির অভাব। এক্ষণে এই আটবৎসরের মেলামেশার দরুণ স্বকপোল-কল্পিত অনেকা অনেকটা দূর হইয়াছে, ভাবের আদানপ্রদানের একটা সমতা হইয়াছে। এইরূপ অশেষ কল্যাণকর সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইয়া না।

এ কথাও আবার স্বীকার করিতে হইবে যে, মনীষা সহযোগিতার দ্বার ধারে না। সে বলদগু নদের ছায়া পর্ত্ত ভেদ করিয়া, উপলব্ধি বিচূর্ণ করিয়া আপনার গন্তব্যপথ নির্ধারণ করিয়া লয়; কিন্তু সেও সারসঙ্গম-অভিলাষে ছুটয়া থাকে। স্বামশ্রীস্বামীর অন্তরাছাও সেইরূপ জনসমাজের ভাবের

মিলনপ্রদায়ী। মনীষীরা গগন-চুম্বী কৃত্তব-মিনারের ছায়া-বাতস্তা রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেও তাঁহারা সম্মিলিত জনসমাজ-শক্তির কল—দেশে ইট কাঠ পাথর সমুদয় ছিলি, স্থপতিগণ চেষ্টা করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিয়া কৃত্তব-মিনার গড়িয়াছে। তাহাদের পক্ষান্তে অজ্ঞাতনারী হিন্দু নরপতিই হউন, আর কৃত্তবদ্বীন আইবকই হউন একজনকে বাড়া হইতে হইয়াছে।—এতটা সমবায়ে তবে কৃত্তব-মিনার বাড়ি হইয়াছে, সে আপুনি দাঁড়াইতে পারে না।

এক্ষণে কোন পথে কার্য করিলে সম্মিলনের এই সকল মহত্বদেহ—সংসাহিত্যের প্রচার, জ্ঞানের প্রচার, ভ্রাতৃত্বাবেশী বুদ্ধি ও শ্রীতি-সংস্থাপন, সমাজ ও জাতীয়তা-রক্ষণ—বজায় রাখিয়া চলিতে পারা যায় দেখা যাউক।

১। সমস্ত প্রাদেশিক সম্মিলনী দেশীয় সম্মিলনীর সহিত সহযোগিতার এক উদ্দেশ্য লইয়া কার্য করিলে আমরা অধিক কৃতকার্য হইব।

২। সমস্ত প্রদেশেই যাহাতে লিখিত ভাষার একাধিক, ক্রিয়ণয়ে সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করা কর্তব্য। বিভিন্ন প্রদেশে লিখিত ভাষার কোন প্রকার প্রভেদ বাহ্যনীয় নয়।

৩। বাঙ্গালাভাষার পূর্বেতিহাস-সঙ্কলন-বিষয়ে প্রত্যেক প্রাদেশিক সম্মিলনী উপকরণ-সংগ্রহকল্পে সম্পূর্ণ সাহায্য করিবেন; যথা, স্থানীয় প্রবান-বাধা, কৃত্তকথাধি, কবি, পাঁচালী, গীত প্রভৃতি, কবি বা সাহিত্যিকদিগের জীবন-বৃত্তান্ত রচনাধি, পুরাতন দেবালয়ের ইতিহাস, প্রস্তর বা ধাতুফলকারির বিবরণ, প্রসিদ্ধ লোকদিগের জীবন-বৃত্তান্ত, নানা প্রকার কিংবদন্তী প্রভৃতি।

৪। বিভিন্ন ভাষা হইতে অস্থবাদ করিয়া

বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ-প্রচার। ইংরেজি ভাষা হইতে ত অস্থবাদ নূতন কথা নয়; এক্ষণে ভারতবর্ষের বিভিন্নদেশীয় ভাষায় বহু সদৃশ্য প্রচারিত হইতেছে, সেই সকল গ্রন্থ হইতে রত্নরাজি আহরণ করা কর্তব্য। বাঙ্গালাভাষার অনেক পুস্তক আকাল হিন্দীভাষায় অনূদিত হইতেছে, কিন্তু আমরা হিন্দী-ভাষায় প্রচারিত অনেক উল্লেখযোগ্য আশ্রক পুস্তকের সংবাদ পর্যন্ত রাখি না। তমিড়-ভাষার শত শত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বহুস্বায় একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি জৈন সম্প্রদায়ের বহু মূদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তন্ত্রিণ ওড়িয়া, গুজরাতি, মারাঠী ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তকসকলের অস্থবাদ আবশ্যক।

৫। বাঙ্গালাভাষায় কেহ কোন নূতন পুস্তক প্রণয়ন করিলে, যদি তাহা দ্বারা সাহিত্যের প্রকৃত পরিপূতি হয়, যদি তাহা দেশীয় সাহিত্যের মঙ্গলদায়ক হয়, তাহা হইলে ব্যয়ভার বহন করিয়া সম্মিলনের তাহা প্রচার করার ব্যবস্থা করা উচিত।

৬। দেশে যাহাতে সমদর্শী অভিজ্ঞ সমালোচকের লেখা প্রচারিত হয়, তাহার জ্ঞান চেষ্টা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সমালোচনার একদেশদর্শিতা বা অস্থবোধ-পরতন্ত্রতা-ব্যাপার দেশ হইতে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য।

৭। বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনেক বিভাগে পারিভাষিক শব্দের বিশেষ অভাব আছে। দেশীয় সম্মিলনী বা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত একযোগে পরামর্শ করিয়া যাহাতে সেই সকল পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন ও প্রচারের সাহায্যের ব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টা প্রার্থনীয়।

৮। স্থানীয় ছুঃ সাহিত্য-সেবিগণকে উৎসাহ-প্রদান ও তাহাদের প্রণীত পুস্তক-বলীর প্রচারের চেষ্টা।

৯। বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র এইরূপ সম্মিলনের সম্মেলন ব্যতীত সাহিত্যিকগণকে লইয়া প্রতিমাসে সাহিত্যমুশীলনের ব্যবস্থা করিলে সম্মিলনের মহত্বদেস্ত-সাধনের দিকে কাঁধে: অগ্রসর হওয়া সহজ হইয়া পড়িবে।

অতঃপর, সাহিত্যের সহিত সমাজের কি সম্বন্ধ তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। মসিয়ে ফাগুয়ে (M. Faguet) বলেন :—

“ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ফরাসী সাহিত্য বিলাসের সাহিত্য ছিল। সে সাহিত্য সমাজ-মত-দোষাক ছিল না; সে সাহিত্যের প্রভাব ফরাসী-সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত প্রবেশ করে নাই। তাহার পর বিপ্লবের সূচক যে সাহিত্য-সৃষ্টি ফরাসীদেশে হইয়াছিল, তাহা খ্রীষ্টান সাহিত্য নহে। ভলটেয়ার, রুসো, ভিডেয়ো প্রভৃতি মনীষী লেখকগণকে কোনক্রমে খ্রীষ্টান বলা যায় না। বরং তাহাদের লেখ্য প্রভাবে খ্রীষ্টান ধর্মের ধ্বংস হইয়াছিল; খ্রীষ্টান সমাজের উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছিল। তথাপি কিন্তু বলিতে হয়, যে ফরাসী-সাহিত্য প্রায় পাঁচ শত বৎসরের খ্রীষ্টান সভ্যতার ফলে, সহস্র বৎসর কালের খ্রীষ্টান ধর্মমত সাধনের পরিণতির স্বরূপ, সে ফরাসী ভাষার মজ্জাগত খ্রীষ্টান ভাব ভলটেয়ার, রুসোর লেখ্যভেদে একবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। একদিনে ভাষার ক্ষুদ্রিত হইয়া না; যুগ-যুগান্তরের চেষ্টাক্স একটা ভাষা পূর্ণাঙ্গ হইয়া ক্ষুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়া; যুগ-যুগান্তরের

সত্যবাদ, ভাব, ধ্যান, মানবীয় ভাষার স্তরে স্তরে বিশুদ্ধ থাকে; সে সকল স্তর-বিশুদ্ধ ভাবরাশিকে একটা বিপ্লবের ছুঃকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ফরাসী-বিপ্লব ধর্মের বিপ্লব হইলেও, ভলটেয়ার-রুসোর মতন অমূল্য প্রতিভাশালী ধর্ম-বতার অবতীর্ণ হইলেও ফরাসী-সাহিত্যকে উহার ধর্মের বেষ্ট্রি হইলত উহার কেহ নামাইতে পারেন নাই।” ফরাসী-সাহিত্য সূর্যালোচনা করিয়া মসিয়ে ফাগুয়ে নিম্নলিখিত তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

(১) “যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির মেধামণ্ডার সহিত জড়িত;—তাহা জাতির সকল স্তরে সঞ্চারিত,—উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্যন্ত সকল লোকেই পরিব্যাপ্ত।

(২) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির অতীত-পারম্পর্যের সহিত সম্বন্ধ—মানব-প্রথিত পুণ্যশ্রেণীভূত।

(৩) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির সমাজধর্ম-বন্ধিত হইতে পারে না; তাহা জাতির ভাষানিহিত ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।”

এই অবিসংবাদিত সত্যগুলি সকল সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত। সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিলে সাহিত্য স্বপ্নও স্থায়ী হইতে পারে না। বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্য স্থায়ী হইবার কারণ বাঙ্গালী মায়েই তাহার ভাবগ্রহণ ও রসবোধে সমর্থ। ভাবের অস্পষ্টতা কোথাও দেখা যায় না। প্রাণের ভাষায় লিখিত ভাবগুলি সমাজ-মুখের প্রতিচ্ছবি। তাই এখনও নিরক্ষর কৃষক দাশরথি, নিধুবাবু, রামপ্রসাদ, কাশাল

মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম কলিগ্রাম-অধিবেশনের সভাপতি

শ্রীযুক্ত তমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ



হরিনাথের গান গায়িতা আনন্দ অল্পভব করে—আপনাদেব জালা জ্বলিতা অশ্রুহারা হইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম শিক্ষিত-দিগের জ্ঞান সাহিত্যের সৃষ্টি হইলে সে সাহিত্য কখনও স্থায়ী হইবে না। ভাব ও ভাষার অপূর্ণ মিলনে নব-প্রয়াগের সৃষ্টি করিয়া যাহা হস্তে সকলে অর্থাগান করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে, সেইরূপ করা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই কর্তব্য।

গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, আজকাল কএকজন শক্তিশালী লেখক যুরোপের আদর্শে গঠিত নূতন ভাব-পরম্পরার পন্থা আনিয়া আমাদিগের সাহিত্যে উপ-দোষ দিতেছেন; কিন্তু সেগুলি ঠিক আমাদিগের জাতীয়তার সহিত সমঞ্জসীভূত হয় না—আমাদিগের অতীতের ভাব-পরম্পরার সহিত সন্মিলিত হইতে পারেনা; দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, যদি কোন শক্তিশালী লেখক প্রত্নতত্ত্বের প্রতি চাকরের বা সহিসের প্রেমের বিষয় চিত্রকরের তুলিকার দ্বায় উজ্জলবর্ণে অঙ্কিত করেন, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের দোহাই দিয়া চাকর বা সহিসের প্রত্নতত্ত্বীয় প্রতি প্রেম যে সম্ভবপর হইতে পারে না তাহা বলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; কিন্তু—ভারতবর্ষে চাকর বা সহিস প্রত্নতত্ত্বীকে মাতৃভাবে ভিন্ন অঙ্গভাবে দেখিতে জানে না। সে আপনাকে পুত্র বলিয়া জানে। সে দাসত্ব করিতে আসিয়া নম্রতাকে এতটা নিম্নের স্বভাবগত করিয়া লইয়া উপস্থিত হয় যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার মহিলাপণের প্রতি তাহার মাতৃভাব ও ভগিনীভাব ব্যতীত অঙ্গ কোন ভাব উপস্থিত হইলে সে আপনাকে পাপী বলিয়া গণ্য করে। যুরোপীয় ব্যক্তিগত স্বাভাব্য ও স্বাধীনতা ভারতবাসীর স্বপ্নের অতীত।

ভারতের চাকর বা সহিস আপনাদ রীনতায়—হীনতায় আপনি শ্রিয়মাণ, তাহার দৃষ্টতে এ ভাবের সৃষ্টি নূতন; যুরোপে এরূপ সম্ভবপর হইতে পারে; কারণ, সেখানে সাম্যভাবই (equality) প্রধান। এরূপ পদ্ধতীন বিধানী কটকবৃক্ষের আমদানি করিলে সংসাহিত্যের পুষ্টি হইতে পারে না। তাই মনীষী কাণ্ডয়ের সহিত আবার বলি—

সাহা জাতির সাহিত্য,
তাহা জাতির অতীত
পাল্পম্পর্ষ্যের সহিত সম্বন্ধ
হইবে,—এ কথা তুলিলে চলিবে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—“ভাষা কেবল সাহিত্যের উপাদান নহে, উহার সর্বোচ্চ জাতির পদচিহ্নে অঙ্কিত। ভাষা সমাজের অভিযাত্রী; এই অভিযাত্রী বিহঙ্গকলরবের দ্বায় ব্যোমপথে মিশাইয়া যায় না, সাহিত্যের মর্ধরপাথে চিরদিনের জ্ঞাত অঙ্কিত থাকে। ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি করে, আবার সাহিত্যের আশ্রয়ে ভাষা আশ্রয়ত্ব করে। সাহিত্যের ভাষা আছে, সে ভাষার সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সে সাহিত্য সনাতন হইয়া থাকে। তাই সাহিত্য—সাহিত্য, নির্ভাজ পণ্ড নহে। পণ্ডর স্থিতি নাই, স্থিতির অক্ষয় মঞ্জুরা নাই; তাই পণ্ডর উন্নতি নাই, স্থিতি নাই, বিকাশ নাই। সাহিত্যের স্থিতি আছে, স্থিতির অক্ষয় মঞ্জুরা সাহিত্য আছে; তাই সাহিত্য নরদেবতা হইয়াছে, পরে আবার হইতেও পারিবে। সাহিত্যের সৃষ্টি মর্ধের উপাদানে হইয়া থাকে। সে মর্ধ প্রথম স্তরে, বিভীমিকার উপাদান, সৌন্দর্যের আরাধনা মাত্র। ইহার পর স্তরে সাহিত্য যেমন উন্নীত হয়, তদনুসারে সাহিত্যের সাহিত্যও আকারান্তরিত হয়। এই অসংখ্য স্তর-বিশিষ্ট সাহিত্য বিধমানবতীর

ইতিহাস—দেবদেবের উন্মেষ-কাহিনী।* বহু-দিন পূর্বে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ সাহিত্য-দুবছর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

“হিন্দু এবং যুগী বহনধাতনও কেবল ধর্মবলে এখনও জীবিত আছে। * * * যুগী কোন্‌কালে বাঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার উপর, কত উৎপাদন উপদ্রব মাথাং রহিয়াছে, এখনও বহিয়াছে, তবু মরে নাই; কেবল মরে নাই নহে, জগতের মধ্যে সুন্দর, সুশী, উন্নতদেহ, নীলকায়ী, বদন্তি, প্রসন্ন, মনশালী, কলানিপুণ জাতি হইয়া, পাড়াইয়া রহিয়াছে। কেন, তাহারা স্বধর্ম-পরায়ণ এবং সমাজানুগিত বলিয়া।” এ কথা যে খুব সত্য তাহা আর “কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ধর্ম যেক্রপ ব্যক্তিকে, আভিক্রপ ধারণ করিয়া থাকে, তাহাকেও সেইক্রপ ধারণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের প্রসার ও পুষ্টি ধর্মের ভিতর দিয়া হইয়াছে, অর্ধাচীন সাহিত্যের কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম যে হয় নাই তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে সে সকল সাহিত্য আমাদের মর্মস্পর্শ হয় নাই—এগুলি দ্বয়ে অণুস্মার্য্য ভাবে হিমালায় তুলিতে পারিলেও, স্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না। সুস্মার্য্যমতি যুগযুগান্তরির নিকট মানবীয় প্রেমের কবিতা ভাল লাগিতে পারে, উত্তর-কালে তাহারা ইহা প্রেমময় রথারক্ষেপ প্রেম ব্যতীত অন্তরঙ্গ প্রেমের কবিতা পাঠ করিতে নাসিকা দৃষ্টিত করেন। তাই বলি সনাতন-ধর্মধ্বংস মহীয়স্ককে বেটন করিয়া যে সুস্মার্য্য কলালতা বঙ্কিত হইয়া উঠে, তাহাই

কল্যাত্মহাযী হইয়া থাকে। আর যে কবির বীণাক স্বাকারে হৃদিরঞ্জন-মধুময় চিত্র নমন-সমুখে পরিদ্রুত হইয়া উঠে, তিনি আমাদের জন্ম-আসন চিরকালের জ্ঞাত অধিকার করিয়া থাকেন।

আজকাল একটা ধূম উঠিয়াছে, ধর্মের সহিত সাহিত্যের কোন সংঘর্ষ নাই। বাঙ্গালী-সাহিত্যে ছোট-গল্প-লেখকদিগের মধ্যে একজন লেখা হইতে ইহা বেশ সৃষ্টিতে পারা যায় এবং তাহারা আকার-বিস্তৃতিতে কথাতী ব্রাহ্মীয়া দিতে চান—গল্পও গল্পে কলা-হিমাষে দেখিতে হইবে। Art is for art—কলা কলার জ্ঞাত। তাহাতে আবার ধর্মের সংঘর্ষ কি? গল্পগুলির উদ্দেশ্য জানিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ থাকিলেই হইল। এই সকল লেখকের নিকট স্থান-কাল-পাড়া বিবেচনার বিষয়ীভূত নয়। ইহার লোকলোচনের সমুখে কিস্ত-কিমাকার চিত্র দেখাইতে পারিলেই আপনাদিগকে খত মনে করেন, কিন্তু ইহা-দিগকে কি করিয়া বুঝাইব যে, সকল চিত্রই সকল লোকের গোচরীভূত কথা যায় না।

এখন এই Art বা ইহার প্রতিশব্দ কলা সম্বন্ধে কবিপ্রতিম টলষ্টয় তাহার “What is Art” পুস্তকে আলোচনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—Art বা কলা মানবের কার্য্যকরী শক্তি (human activity) ফলস্বরূপ। উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহার অস্ত্যসার্কতা নাই। মানবের উন্নতি বা অবনতির যতটুকু ইহা সহায়ক হইবে, ততটুকু ইহাকে ভাল বা মন্দ বলিব। কলাবিৎ আপনার ভাবগোষণা অন্ত্রে যদি সঞ্চারিত করিতে পারেন, তবেই

তিনি কৃতাৰ্থরূপ হন। অঙ্গ-সঞ্চালন, রেখা, বর্ণ, শব্দ ও বাস্তবসম্বন্ধে কলাবিৎ অন্তরে স্বরবে ভাবের লহর তুলিতে পারেন। এইরূপে কলাবিৎ সৃজনবলের প্রেরণাধার বিশ্বমানসকে আপনার করিয়া থাকেন। “Art is a means of union among men, joining them in the same feelings.” তা হইলে কেবল-মাত্র ‘সঞ্চার’ বা ‘সংক্রমণ’-পদ্ধতি কি কলার নিকট? অস্বাভাবিক উপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াও পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে ইহা একরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, পল্লবানীর নিকট, প্রতিবাসীর নিকট, এমন কি আত্মীয়ের নিকট হইতে সহায়ভূতি বলিয়া জিনিষটা আঁপার পাই না। অস্বস্তি আনি স্বপ্নের কথাকি বলিতেছি। একরূপ স্থলে টলষ্টয় বলিয়াছেন,—“The business of art lies just in this—to make that understood and felt which, in the form of an argument, might be comprehensible and inaccessible.” (p. 102)—এটি বুঝাইতে পারা যায় না, তখন তুলিকার একটি রেখা, একটি অঙ্কন, একটি বর্ণমালা, কবিতার একটি ছন্দ, তৎপরশিল্পীর একটি খোদাইকার্য্য, ভাবের লহর ছুটাইতে পারা যায়; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কলাবিৎ ইহা—যিনি মানবদ্বয়ে সমভাবের লহর তুলিতে পেরেন—যিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী দরিয়া বিশ্বমানবপ্রাণে সমানভাবে কার্য্য করিতে পারেন। যদিও কলা-সাধা-লোচকগণ (Art-critics) প্রায় একবাক্যেই বলিয়া থাকেন—কলাবিদ্যার সার্বজনীনতা (universality) একরূপ অসম্ভব, তথাপি আমরা টলষ্টয়ের সহিত একবাক্যে

বলিব, কলার সার্বজনীনতা অসম্ভব হয় হউক—যেখানে দেখিব কলা সার্বজনীন আদর্শের বস্তু নিকটবর্তী হইতেছে ততই তাহা উজ্জ্বলতর বলিয়া মূল্যকটে বীকার করিব। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—কলা বিশ্ব-মানবকে একস্বরে গ্রহিত করিবার প্রয়াসী (Art unites men)। আর বিশ্বমানবকে ভাবের লহর দ্বারা গ্রহিত করিতে হইলে যে সকল ভাববাসী মানবকে পুষ্ট হইতে পুষ্ট করিয়াছে, মানবকে দেবদেউ উন্নত করিয়াছে, মানবের কল্যাণকর সমাহার ত্বরিত আসিয়াছে, সেই সকল ভাবের দ্বারা ইহা কার্য্য সমাধা হইতে পারে। এই ভাব-পরম্পরাকে তিনি নৈতিক সংস্কার (Religious perception)“ আখ্যা দিয়াছেন।

বাস্তবিক বাহ্য দর্শনে, শ্রবণে, ধ্যান-ধারণায় দ্বয়ে ধর্মভাবের উদ্ভঙ্গ করিয়া দেয়, যাহা আমাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া মহত্বের দিকে ঠানিয়া লয়, যাহা চরিত্রকে উন্নত করিয়া দেয়, মানব-দ্বয়ে দেবভাবের ক্ষুব্ধ করিয়া দেয় তাহাই হষ্ট কলা; তাহাই হষ্ট কলা—যাহা জাতিপ্রেমের বন্ধনে জগৎকে একস্বরে গ্রহিত করিতে চায়—যাহা বুঝাইতে চায় দেশ-কাল-পাড়ের গভী ছাড়াইলে, সংস্কারের গভী ছাড়াইলে মানব এক বিশ্বপিতা প্রেম-ময়ের সম্মান। কিন্তু যদি প্রায় করা হয় পবিত্র ধর্মভাব কি করিয়া বুঝিব। বিবেকবৈরাগী শুনিলেই এ প্রস্তাব সঙ্কট সমাধান হইবে। টলষ্টয় বলিতেছেন নৈতিক সংস্কার (Religious perception) ইহা ঠিক করিয়া দিব। তাহার মতে—

“The religious perception is the consciousness that our well-being,

both material and spiritual, individual and collective, temporal and eternal, lies in the growth of brotherhood among men—in their loving harmony with one another.” (p. 159).

তাহার নৈতিক সংস্কার (Religious perception) বিশ্বমানবের মধ্যে আত্মভাবের উন্মেষে, মানবের ভিতর স্পীতির অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধিত হইয়া থাকে। পরিশেষে তিনি প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কলা (Art) বুদ্ধি হইতে ভাবের দ্বার দিয়া বিশ্বমানবকে একতার স্বরে প্রাবৃত্ত করে, প্রচলিত পদ্ধতি ও অত্যাচার সমূহকে বিনাশ করিয়া জগতে ভগবানের রাজত্ব—প্রেমের রাজত্ব স্থাপন করে। “The destiny of art in our times is to transmit from the realm of feeling the truth that well-being for men consists in being united together and to set up in place of the existing reign of force, that kingdom of God, *i. e.*, of love, which we all recognise to be the highest aim of human life.”—তাহা হইলে Art বা কলায় যে কোন উদ্দেশ্য নাই, এ কথা বলিলে চলিবে কেন। Art is for art এ কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না—উল্লঙ্ঘনের সাহায্যে বুঝিতে পারি নাই। বরং যাহা বুঝিয়াছি তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

আবার তাহা বলি—উদ্দেশ্য বাস্তবীভূত হইবার অশাস্য সাধকতা কিছু নাই (Art does not

exist for its own sake)। মানবের উন্নতি বা অবনতির শত-টুকু উহা সম্বন্ধক হইবে ততটুকু ইহাকে ভাল বা মন্দ বলিব।

অনুনা বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলির কোন কোনটিতে Artএর দোহাই দিয়া যে কবিতারের সৃষ্টি হইতেছে, অভিনব উৎকট ভাবের লহর ছুটিতেছে, বিলাতী প্রেমের পুতিগন্ধময় উদ্ভট চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, চাক্ষুরজনক অস্থাবর বাহির হইতেছে তাহা আমাদের জ্ঞানী, ভগিনী, গৃহিণী ও কল্যাণদায়ক হস্তে কোনমতেই দিতে পারা যায় না। কর্তব্যাহুয়োদে গল্পলেখকদিগের মধ্যে অনুনা বিনি শিরোমণি, ব্যাখিষ্টার প্রবর অশ্বেষ প্রভাতবাবুর নিকট আদি একটু অহুযোগ করিব। তিনিই আজকাল গল্পলেখকদিগের অধিশ্রুত। তাহার লেখনী হইতে সমাজের বিরুদ্ধ বা উৎকট চিত্র কখন দেখি নাই। তাই পুঙ্কার সখ্যা মানসী পত্রিকায় যখন তাহার ‘লেডি ডাক্তার’ গল্প পড়িলাম, তখন ভণ্ডিত হইয়া গেলাম। প্রভাতবাবুর নাম দেখিয়া সম্বাহ হইলাম। ফাঁদ পাতিয়া যুবক ভেপটী সত্যোজ্জয় ধরিবার চিত্র—তাঁহার নিকট হইতে আমরা চাহি না—চাহি না তাঁহার নিকট হইতে লেডি ডাক্তার ও তাহার পরিতরিকা কামিনীর কথোপকথন। আপনারা একটু শুমন—

“শেষে হুবালা বলিল—“দেখ কামিনী! পোটের সে বোতলটায় কিছু আছে?”
“আছে। এখনও আদ্যবোতল আছে।”
“খানা সন্ধিয়া, সে বোতলটা টেবিলের উপর রেখে দিস। ওকে বলেছি, তোমার লিভার খারাপ হয়েছে। যা তা একটা কিছু

ওষুধ বলে মিশিয়ে, বানিকটা পোট খাইয়ে দেবে। আজ যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে নিতে হবে।”

কামিনী বলিল,—“তা রেখে দেব। কিন্তু খুব সাবধান, বুঝলে? শেষকালে ওকেবারে হাতছাড়া না হয়ে যায়—সেই অখিল শীলের বেলান্ন যেমন হয়েছিল।”

“যা হোক আর উপদেশ দিতে হবে না”—বলিয়া হুবালা বাহিরে আসিল।
এ চিত্র কি হইল রমণীর হস্তে দিতে পারা যায়?

প্রভাতবাবুর অক্ষয় লেখনী-মুখে কখন একদণ্ড কদম্বাচিহ্ন সৃষ্টিয়া উঠে নাই, তাই এইটি দেখিয়া এককটা অপ্রিয় সত্য বলিতে হইল। শাস্ত্রের শাসন “যা জ্ঞায়ং সত্যমপ্রিভং” মাছ করিয়া এ ক্ষেত্রে চলিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত।

এইবার আমরা ভাষা যুদ্ধে ছ’এক কথা বলিব। পরমারাধ্য চিদ্রাদিত্য আমাদের খেতশতলবাসিনী বঙ্গভারতীর সঙ্গে নব্য-সাহিত্যিক-চিকিৎসকদিগের দ্বিরকায়ান্ত দেখিয়া প্রভাতহই আমাদের চক্ষু ছুরিকাযান্ত বহির্গত হইতেছে। জ্ঞানি না কবে কোথায় এ শব্দব্যবচ্ছেদের ছেদ পড়িবে। মা আমার শবের মত পড়িয়া আছেন—এই সকল চিকিৎসকের অলোপচারে মা আমরা ক্ষত-বিক্ষত। অক্ষয়—বিদ্যাপাগর—ভূদেব—বঙ্কিম—কালীপ্রসন্নপ্রমথ সাহিত্যমহারথ-দিগের সাধনার ধন—বড় আদরের ধন—উহাদের প্রাপ্যপেক্ষা গরীয়সী জননীর এ দুর্দশা দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা খুঁপ হইতেও ক্ষণপাত করিতেছেন। হায়! হায়! জ্ঞানি না কবে কোন বাসাবনিকপ্রবরের সিদ্ধমলমে মার আমরা ক্ষত অঙ্গ জোড়া লাগিয়া আবার

পূর্ণশ্রী ফিরিয়া আসিবে! এখনও ভারত-গগনের চির-উজ্জলরবি রবীজ্ঞান সাহিত্য-গগন আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন—এখনও আমরা বঙ্কিম-মণ্ডলের শেখজ্যোতিভ অক্ষয়-চন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছি—সাহিত্য-মুরছর পতিতপ্রবর হরপ্রসাদের দিকে চাহিয়া আছি—তাঁহারা কি ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন না? আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা মনে করিলে এই অত্যাচারের শেষ বনিকা পড়িবার বিলম্ব হইবে না। যাহা হউক জগের বিষয় হুকবি স্থপতিত বাহিরিষ্টপ্রবর প্রথম চৌধুরী মহাশয় বীরবিক্রমে প্রবল যুক্তিধারা ভাষা-জ্ঞানীকে বশ্য করিবার জন্য বন্ধপরিকর হইয়া বীরবল নামে এই সকল নব্য-সাহিত্যরথকে—আহবে আহ্বান করিয়াছেন। জ্ঞানি না তিনি, শাস্ত্রের ললিতসুয়ার বন্দোপাধায় বা তাঁহার মায়ী অস্বাভাবিক সাহিত্যরথোৎপাদক হইয়া কতদূর সফলকাম হইবেন। নব্যলেখকেরা বলিয়া থাকেন বাঙ্গালা ভাষার যখন ব্যাকরণ নাই, আইনকানুন নাই, তখন কাহার বণ্য শুনিয়া আমরা চলিব! বেশ কথা!

বঙ্গভাষার উপপতি অলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় সংস্কৃত ভাষাই ইহার জ্ঞানী। জননীর নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা জননীর স্বীকৃতির আইনামুখারে চলিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে তাহা না হইবার কারণ কি? যখন আমরা সংস্কৃতের অহসরণ করিব, তখন তাহার নিয়ম না মানিয়া চলিব কেন? সংস্কৃতপাশের সহিত দেশজশব্দ মিলাইয়া ‘গুরুচণ্ডালী’ দোষের সৃষ্টি করিব কেন? নব্যলেখকদিগের লেখনী পাঠ করিয়া মনে হয় তাঁহারা যেন ইচ্ছা করিয়া নৃতনধে আমাদের চক্ষু চমৎকৃত করিয়া দিবার

প্রলোভন একটা নৃতনের সৃষ্টি করিতে চান। অবশ্য প্রতিভা বা মনীষা ভাষার স্বাভাবিক সঞ্চায়ক-মানসে নৃতনের সৃষ্টি করিবেন—ভাষাকে বলশালী করিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া শোণের ছায় মাৎসর্য্যিক বলের পরিচায়ক নহে। ছুই চারিটা উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্যটা একটু বিশদ করিতে চাই :—

“বসন্ত কুম্ভমঙ্গলের গাঢ় রঙে তরুণীদের শাড়ী ওড়না **রঙা হইয়া** দিত, সন্ধ্যামণির জয় পিবিয়া চরণ **রঙা হইত**, হেনার পাতার রস গালিয়া হাত **রঙা হইত**। আর মধুর হাসি, প্রিয়ধ্বনি, চটল চাহনিদিয়া জয় **রঙা হইতে** চেষ্টা করিত—রূপসীদের জয় তাহাতে **রঙিত** কি না কে জানে। কিন্তু তরুণীদের আকর্ষিত ফুলের **মতো**। রাজা মাদক চোঁট দুখানি, ভালিমফুলের **মতো**। গাল দুটি, শিউলি **রঙা** বসন আর মেহেদি রাজা চরণ নিজেদের সকল **লালিয়া** জড়ো করিয়া বসন্তের তরুণ-কোমল দময়ধানি শোণিত রঙে **রঙা হইয়া** তুলিতেছিল।”

এই ফুলে ছয়বার ‘রঙ’ শব্দের বিস্তৃতি ত দেখিলেন। ইহা ইচ্ছাকৃত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আর ‘লালিয়া’ শব্দের ছায় ‘হরিতিমা’, ‘হানিমা’, ‘শ্রামিমা’ প্রকৃতি অজ্ঞাত-পূর্ন উদ্ভট শব্দ অবধে সাহিত্যে চলিতে শুরু করিতেছে। আর এই কয়ছয়ে দুইবার ‘মতো’ ও একবার ‘জড়ো’ শব্দ ওকার-সংযোগে লিখিত হইরাছে। অবশ্য উচ্চারণগত বানান (Phonetic spelling) যখন উন্নয়ন যুক্ত-রাজ্যে চলিতেছে না, তখন যে এই সংরক্ষণ-শীল বাঙ্গালদেশে চলিবে সে ধারণা আমাদের নাই। আর যখন জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, যখন নগরে

উচ্চারণবিধেয়মা দৃষ্ট হয়, তখন একস্থলে উচ্চারণ লিখিত ভাষায় চলাইলে চলিবে কেন? সাহিত্যে ও ভেদনীতি সমর্থন করা যায় না। যদি বলেন অভিমতার্থক ‘মত’ ও তুল্যার্থক ‘মত’-শব্দের প্রভেদ করিবার জ্ঞত শোণের শব্দে ‘ও’কার সংযোগ করা হয়, তাহা হইলে, কাল, ভাল, বল, মন ইত্যাদি কথায় ‘ও’ সংযোগ করিয়া লেখা হয় না কেন?

অবশ্য এই সকল ইচ্ছাকৃত গোপের, প্রায়-শ্রুতি কি তাহা আপনাদের ‘ছায় সাহিত্য’-স্বার্থে বিবেচ্য। আবার দেখুন :—

“একদিন যখন সন্ধ্যাবেলায় গাছে গাছে ফুলের দেয়ালি সাজিতেছিল, যখন দক্ষিণ ব্যতান বিরহ-মুছিতের নিশানের **মতো**। খালিয়া খালিয়া ফুলের বনে **শিহরণ হানিতে**ছিল, যখন ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া কোকিল, পাখিয়া প্রলাপ বকিতেছিল, যখন হাজার নীপের শিখার মাঝে ফোয়ারার জল **তরল হীরা** মালার **মতো**। গড়িয়া পড়িতেছিল ইত্যাদি—”

এখানে আপনারা “ওনে” শিহরণ হানিতে-ছিল” এক কথার সমগ্রণ করিতে পারিলেন কি? “তরল হীয়ার মালার” যে কিরূপ পরার্থ তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না।

আবার শুধুন :—
“দুগ্ধাধরে ফুলগুলি সব পরাধাতে ছড়াইয়া দিয়া **উদ্যত অশ্বনির মতো** বলি **কী!**—”

ইংরেজিতে যাহাকে transferred epithet বলে ‘উদ্যত অশ্বনি’ তাহারই দৃষ্টান্ত। আপনারা যদি এরূপ প্রয়োগ শিষ্ট বলিয়া মনে করেন, তবে চালাইতে পারেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনারা “সকল লোকের **লিপিত অবিদ্যমান** অগাধ করিয়া”

চালাইতে কিছুতেই রাজি হইবেন না। উচ্চারণভেদে যদি ‘কী’ দীর্ঘবলাভ করবে, তবে অপ্রাপ্ত একরূপ প্রয়োগ হয় না কেন?

“আপনারা কি “অবিনয় কমা” কখন- কখনাছেন? যদি না শুনিয়া থাকেন” তবে শুধুন,—

“... করুণ দেখিয়া অবহেলা করিয়াছি, ইহার লক্ষ্য আজ তাহার দয়াম দারুণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে এইরূপ লোকপের **অবিনয় কমা** করিতে বলিছো।”

প্রাণের যে কতটা যাতনায় নিতান্ত অনিচ্ছ-সংগে এই মলিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে তাহা অন্তর্দ্বন্দ্বীই জানেন; আর মাতৃভাষা-সেবিকের ভাষার নিকটে অবহিত হইবার জ্ঞত যে এই পথ অবলম্বন করি নাই তাহাও বলিতে পারি না।

“ভাষা জননীর শরীর। এবার জননীর প্রাণের কথা—ভাষার কথা একটু বলিব। যাঁহা সমাজের, যাঁহা দেশের, যাঁহা দেশের নীতি ও স্বাধোন্নয়ন সাহায্য ও পরিপোষক এইরূপ ভাষার চিত্র সকলের সমক্ষে আদর্শরূপে ধারণ করাই আমাদের কর্তব্য। বিশ্বমানবের ভাষার হইতে—প্রকৃতির ভাষার হইতে সত্যবস্তুসমূহ সমাহরণ করিয়া দেশের নিকট উন্মুলক করিয়া দিতে হইবে—ভাষার লহর ছুটাইতে হইবে—সমগ্রাণতার বজ্র বহাইতে হইবে—ভগীরথের ছায় আভ্রব্ধের মন্মাদিনী ছুটাইতে হইবে।

দেখিতে হইবে এমন ভাষের চিত্র, কথা বা শব্দ কলায় ছুটাইয়া তুলিব না—যাহা মাতা পিতৃ, ভ্রাতৃ ভগিনী, পুত্র কন্যা ও দয়িতার নিকট প্রকাশ করিতে পারা যায় না। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, বিশেষের ভাষের চারুগাঢ়লিকে আমাদের স্থানকালপ্রাক-

উপযোগী করিয়া, সমাজ ও ধর্মের আলোক ও বাতাসের সাহায্যে বহিত করিতে হইবে।

এইবার কবিতা সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। আধুনিক কবিদিগের কৃতকণ্ঠলি কবিতা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ বিশেষ হইতে Mystic স্বভাবের চারা আনিয়া স্বকলা স্বকলা শ্রুতামলা বাঙ্গাল দেশে যেদিন প্রথম রোপণ করিলেন—যেদিন তিনি “সোণার তরী” প্রথম ভাঙাইলেন, জানি না সেদিন বাঙ্গালার হৃদয় কি দুর্দিন। তারপর যখন,

“দিনের শেষে ঘুমের দেশে
ঘোমটা পরা ছায়া
তুলালুয়ে তুলাল ঘোর প্রাণ।
ও পায়েতে সোণার কুলে অধারমূলে
কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজ ভাঙনা গান।”

গায়িলেন—শেষ ‘খেয়া’ পাড়িলেন—সেই-দিন হইতে তাহারই চরণে শরণ লইয়া বঙ্গের আধুনিক কবিবৃন্দ ছুটিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতা চেষ্টা করিয়া কল্পনার বিমানে চড়িয়া কতকটা বুঝিতে পারিলেও, ইহাদের কবিতা কল্পনার ‘এরিওমেনে’ চড়িয়াও সুস্থিতির সামর্থ্যে কুলায় না। উর্দুর বাঙ্গাল-দেশের মাটির ও আবহাওয়ার গুণে অল্পদিনের মধ্যে সহস্র সহস্র অশ্পট দুর্দোষ্য কবিতার সৃষ্টি হইল। এই শ্রেণীর কবিতায় ভাষার দৈর্ঘ্যী আছে, হৃৎপূরের গুঞ্জন আছে, কিন্তু প্রাণ যাকিতে চায় না—কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে চায় না। ভাষের অভাবে, প্রাণের অভাবে যন্ত্রণালিত পুস্তলিকার ছায় শব্দ করিতে পারে, সত্য এই সকল Mystic কবিতা দেখি আশ্চর্য্য সহিত—

চিরস্থায়ী পরমাণুর সংযোগমূলক বলিয়া কোন কোন সমালোচকের মুখে শুনিয়া থাকি; কিন্তু আমরা এ গুলিতে যোগের কিছুই দেখিতে পাই না; দেখি বিয়োগ—ভাবের অভাব।

ইতঃপূর্বে বহুবার সাহিত্য-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, এখন সাহিত্য-শব্দে কি বুঝা যায় তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব।

সাহিত্য-শব্দটি সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য-শব্দটি যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইতে বেশী কিছু বুঝিবার উপায় নাই। সংস্কৃত প্রধানতঃ তিনটি অর্থে সাহিত্য-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) যাহা কোন কিছুই সন্দেহ ব্যবহৃত হয় তাহাই সাহিত্য। (২) যেমন। (৩) মহাযাত্রাতে শ্রোতব্য গ্রন্থবিশেষ। এই শব্দেও ক্রমে ভক্তি, মাধ, ভারবি প্রভৃতি গ্রন্থ সংঘাতে সাহিত্য-নামে পরিচিত—কিন্তু বেদ, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি সাহিত্য-নামের অন্তর্গত নয়। ইংরেজিতে "literature" বলিলে যেমন

অনেক জিনিষ বুঝায়, বাঙ্গালায় সাহিত্য-শব্দেও আমরা জাতিবিশেষ-প্রস্তুত সমষ্টি-সমষ্টি লিপিবদ্ধ চিন্তাধারি বুঝিয়া থাকি। উদ্ভূত লিখিত গ্রন্থাদিকে আমরা সাহিত্য বলিয়া থাকি। গ্রন্থবিশেষে গ্রন্থকারের চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও আশার বিকাশ হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশের গ্রন্থসমষ্টিতে দেশের চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও আশার উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থসমষ্টি সাহিত্য; কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য দরিদ্র দেশীয় অথবা জাতীয় গ্রন্থসমষ্টি আলোচনা করিলে অনেক গ্রন্থই এই পর্দায় হইতে খসিয়া পড়িলে। সাহিত্যের একটা সীমা বা গতি আছে। সেই সীমা

বা গতির অন্তর্ভুক্ত প্রদেশই সাহিত্যের সীমা। এই সাহিত্য-সীমার সীমা নির্দেশ করিতে হইলে আমাদের প্রথমই দেখিতে, হইবে, জাতীয় চিন্তা ও কল্পনা, আশা ও উদ্যমের স্থান কতটুকু। গ্রন্থ-রাজ্যের পশতুত্বকে জাতীয় চিন্তা ও কল্পনা, আশা ও উদ্যম বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে, ঠিক ততটুকুই সাহিত্য-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে—সকল গ্রন্থই তা সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। গদ্যও সাহিত্য, পদ্যও সাহিত্য, ইতিহাস, মর্শন, বিজ্ঞানও সাহিত্য—তবে কথ্য এই যে এই সকলের মধ্যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বর্তমান থাকি চাই; নহিলে গদ্যই বলুন, পদ্যই বলুন, ইতিহাস, মর্শন, বিজ্ঞানই বলুন, কিছুই সর্মহন্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

আন্তের দীর্ঘকালে, প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, বীরের উদ্দীপনায়, ভক্তের ভক্তিমাদনায় ধনু কোন মুহূর্ত্তে ভাষার উদ্ভব হইয়াছে কে বলিবে? কে বলিবে কেমন করিয়া দেশ, কাল ও অবস্থাতেই মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষার উৎপত্তি? এইমাত্র জানি একের মনের ভাব আন্তের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্যই ভাষা। আমাদের এই উদ্দেশ্য যত সহজে যত অন্তরালে সংগঠন করিতে পারা যায় ততই আমাদের ভাষা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে জাতির কবি, গায়ক, লেখক; ভাবুক; ভাবের কাব্য-গীত-রচনা-চিন্তাশ্রমে যত বহিরাগত, সে জাতির ভাষার কলংবৎ তত পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ভাষার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিকাশ যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে ভাষার উদ্ভব ও কলংবৎ-পুষ্টি বুঝিতে হইবে। আমরা

বাঙ্গালী, বাঙ্গালী আমাদের ভাষা। যে ভাষায় আমরা প্রথম 'মী' বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষায় আমরা আমাদের স্বপ্ন-স্বপ্নের কাহিনী ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছি, যে ভাষায় আমাদের প্রাণের ভাবসমূহের পোতাংশ প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তন, যে ভাষার পদলাভিত্র অজ্ঞাত ভাষার আশ্রয়স্থান হইতে পারে, সেই বাঙ্গালীভাষার প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিকাশ বুঝিতে হইবে আমাদিগকে সর্বপ্রথম বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও কলংবৎ-পুষ্টি বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালীভাষার উৎপত্তি-সম্বন্ধে অল্প আমি এক্ষেত্রে কোন মতের উত্থাপন করিব না। বঙ্গভাষার উৎপত্তি লইয়া অনেক অনেক উৎকর্ষ ও উদ্ভূত মতের অবতারণা করিয়াছেন ও করিতেছেন বঙ্গভাষার ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ আলোচনার সময় এখনও আসে নাই। যতদিন না আমরা বাঙ্গালীভাষায় প্রচলিত শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় করিতে সক্ষম হইব, ততদিন বঙ্গভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা বুঝা বাঙ্গালীভাষার প্রাণানী-বিস্তৃত যে শব্দ-সংগ্রহ বা অভিধান সংকলন করিতে হইবে তাহাতে অধুনা প্রচলিত বা ইতঃপূর্বে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। তাহা হইলে আমরা ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু এক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের সমৃদ্ধ আলোচনা করিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্যের কোন বীর কত দিনে জন্ম-বিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা-কাণ্ডে পরিণত হইল, ইতিহাসিকের চক্ষে ইতিহাসের আলোকে তাহা ভাল করিয়া বুঝা লইতে হইবে।

সমালোচক-ইতিহাসিকের চক্ষে প্রাচীন কাব্যাদি না পড়িয়া শুধু বা উপাসকের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ পড়িলে চলিবে না। প্রাচীন সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দোবদ্ধ শব্দবিন্যাস, রচনা-পদ্ধতির সম্যক আলোচনা করা চাই। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্তি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শির, শ্ময় প্রভৃতির পদীকা। এই পদীকা হৃদিস্থির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যপাঠের লক্ষণ স্পষ্ট রহিয়াছে। ভাষার প্রাচীন কাব্য গীত রচনা চিন্তার পরিজ্ঞান না থাকিলে সে ভাষার ব্যাকরণ-সংকলন সর্বথা অসম্ভব। যাহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত; স্বতরাং প্রাচীন সাহিত্যালোচনা যে অবশ্যকর্তব্য তাহা আমাদিগকে বেশী করিয়া বুঝিয়া বলিতে হইবে না।

একবে আমি এক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙ্গালী সাহিত্য সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। বৌদ্ধধর্ম পালক-বীর রাজাদিগের সময় হইতেই বোধ হয় বাঙ্গালী-সাহিত্যের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। ধর্মচাকুরের মাধ্যমে প্রচার সেই সকল সাহিত্যের লক্ষ্যস্থল। পানের শালা মাঝাইয়া সেই পান গায়িতা মাধারণের মধ্যে সেই ধর্মচাকুরের মাধ্যমে প্রচার করা হইত। যোগীপাল, মহীপাল, গোপীপাল, মণিকচাঁদ, রমাইপতি, বনরাম, ময়বট্ট, কপরাম, বেলারাম, মণিকরাম, প্রজুয়ার, গীতারাম, রামলাল আদিক প্রভৃতি

অনেকেই ধর্মের গানের পালার্কী ছিলেন। তথ্যাতীত ডাকের কথা, বনীর বচন সাহিত্য-আকারে লোকশিকার বেশ ছুটি গোপান ছিল। ডাকের কথা ও বনীর বচন ধর্ম-ঠাকুরের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গানের পালার্কী নহে। উহা প্রচলিত ও সাধারণের সহজ বোধগম্য ভাষায় পড়ে রচিত ছোট ছোট ছড়া। তাহার প্রাচীনতা, বাণিজ্যনীতি, বাণ্যনীতি, ধর্মনীতি, কৃষিনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও শিক্ষিতব্য বিষয় ছোট ছোট কথায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

অনেক সময় অমূল্য-নিদান হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধর্মবিধানের মতভেদ হইতে ধর্মের সর্বাঙ্গীভাষনিক, সাম্প্রদায়িকতার স্রষ্টা এবং সেই সাম্প্রদায়িক মত প্রচার-করণাদেশে সাহিত্যের আদিভূত পদাবলী, পৌরাণিক উপাখ্যান, পাচালী ও কবিতা ইত্যাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রবল বৌদ্ধমতের ধর্মব্রোতকে মনসীভূত করিবার নিমিত্ত সেন-বংশীয় রাজাদের শাসনকালে প্রচারিত ধর্মঠাকুরের আবারও আভ্যন্তরীণ নৃতন শৈবমত প্রচারের চেষ্টা হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র শিবায়ন রচনা করিলেন। পরে তাহারই দৃষ্টান্ত অঙ্গস্বরূপ কবিয়া রাম রায় ও জাম রায় ‘মুগবান্দ-বান্দ’, রত্নসেব ‘মুগকৃষ্ণ’, রঘুরাম রায় ‘শিবচন্দ্রদীপী’, ভগীরথ ‘শিবগুণ-মাহাত্ম্য’, হরিহর-স্বত ‘বেদনানাম মঙ্গল’ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থও ক্রমশঃ ধর্মের গানের মত গীত ও শাস্ত হইয়া শৈবমতটী এক প্রকার বেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

ধর্মবিবাদ সকল দেশে সকল সময়েরই আছে। যুরোপে এই ধর্মবিবাদ উপলক্ষে কত রক্তপাত হইয়াছে। স্বপ্নের বিষয় ধর্মক্ষেত্র ভারতে

যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিতপ্রবাহ না বহিয়া সাহিত্যের প্রবাহ ছুটিয়াছে।

শৈবমত প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শাক্তসম্প্রদায় মাথা নাড়া দিয়া এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিলেন। বসন্তরোগ ও তাহার চিকিৎসা উপলক্ষ করিয়া শীতলা-দেবীকে বসন্তের অস্তিত্বরূপে ঘড়া করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য-বর্ণনা ও পূজা-অর্থনার জন্ত শীতলা-মঙ্গল বা শীতলা-গানের রচনা হইল। ক্রমে শাক্ত-সম্প্রদায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার পালার আকারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আবিষ্কার ও প্রচার করিতে লাগিলেন। কবিবল্লভ দৈবকীন্দম প্রভৃতি ‘শীতলা-মঙ্গল’ বা ‘শীতলা-মাহাত্ম্য’ প্রচার করিলেন। কিছু দিন পরেই হরিদাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি ৬০ জন পালার্কী মনসাবৌদ্ধকে সর্গভয়নিবারিণীরূপে খড়া করিয়া মনসা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন ‘বিমহারিণ গান’ বা ‘পদ্মপুরাণ’ নামে মনসা মঙ্গল রচনা করেন। মনসা-মঙ্গলের মধ্যে নারায়ণদেব-রচিত ঠাঁস সঙ্গাপণ ও বেহল-নারায়ণদেব-রচিত কানীন্দি ত্রিশৈকরণে বিদিত। মনসা-মঙ্গলের পরই মঙ্গলচণ্ডীর গান বা চণ্ডীমঙ্গল নামে খ্যাত শুভচণ্ডীর গান বা শুভচণ্ডীর (স্বচন্দীর) কথা প্রচলিত হইল। বিজ্ঞানদর্শন, কবিকল্প, বলরাম, কবিরঞ্জন মুকুন্দরাম প্রভৃতি অনেকেই চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা; চণ্ডীমঙ্গলের পরই কালিকামঙ্গল বা ‘বিদ্যাসুন্দর-কথা’। নায়ক-নায়িকার উপাখ্যান-রূপে আধ্যাত্মিক মহাকাব্যের মাহাত্ম্য-বর্ণনাই কালিকামঙ্গলের প্রধান বিষয়। গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণরাম দাস, রাম-প্রসাদ সেন, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, অক্ষ কবি ভবানীপ্রসাদ, নিধিরাম কবিরত্ন প্রভৃতি

অনেকেই কালিকামঙ্গলের রচয়িতা। বহু-শক্তিরূপী আধ্যাত্মিক মহাকাব্যের ধারিতরূপকে বঙ্গদেশীকরণে কল্পনাপূর্ণক কৃষ্ণরাম, কবিচন্দ্র ও গুণরাজ যক্ষীমঙ্গল রচনা করিয়া যক্ষীমাহাত্ম্য প্রচার ও ঘরে ঘরে যক্ষীপূজার প্রচলন করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই গুণরাজ খান, শিবানন্দ কব, রণজিৎ দাস প্রভৃতি অনেকেই কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীচরিত্র রচনা করিয়া কমলা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। সঙ্গে সঙ্গে ‘অমনি-একাদশ দাশ’ ও গলপমোহন সারদা-মঙ্গল বা লক্ষ্মীমাহাত্ম্য-প্রচারের অগতির হইলেন। কমলা-মঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে জগমোহন মিত্র ও সারদামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে দ্বারামা সর্গশ্রেষ্ঠ।

যে বিদ্যাপুঙ্কি প্রবন্ধের স্থাণে কোন সম্প্রদায়ই ছাড়িয়া দেন নাই। চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল যখন প্রচারিত হইল, তখন গঙ্গামঙ্গলই বা বাকী থাকে কেন। মাধবাচার্য্য, দ্বিজ গৌরদাস, দ্বিজ কমলাকান্ত, তুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মঙ্গলকর্তৃগণ গঙ্গামঙ্গল রচনা করিয়া গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। গঙ্গামঙ্গলের মধ্যে তুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-রচিত গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী সমধিক প্রশিদ্ধ। সাহিত্য-জগতে, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃ পৌর সম্প্রদায়ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন পক্ষে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন। দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাকৃষ্ণ স্বর্গের পাচালী-লিখিয়া কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ধর্মবিবাদের ভ্রাতৃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সাহিত্যোৎসর্গ সাধন পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে। মুসলমান রাজত্ব-কালে মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটিয়া সাহিত্যে একটা স্রীতির ভাব সংস্থাপিত হয় সে জন্ত মুসলমান

রাজপুত্রদেরা হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহার ও হিন্দু শাস্ত্র এবং ধর্ম অবগত হইবার জন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদের সকল কার্যেই রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের দৃষ্টান্ত দিয়া চলিতেন; স্বতরাং সর্বত্রই তাঁহাদের ঐ দিকেই লক্ষ্য পড়িল এবং উপযুক্ত লোক দিয়া ঐ সকল গ্রন্থের অর্থবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করাইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গাল-সাহিত্যের অর্থবাদ-সাধারণ আরম্ভ হইল। কৃত্তিবাস, অমৃতচাঁচা, অনন্তদেব, দ্বিজ রামচন্দ্র, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি রামায়ণ অর্থবাদ করেন। বিজয় পণ্ডিত, মুন্সয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরমণী, কালীয়ারাম দাস, বলরাম দাস, যক্ষীর প্রভৃতি অনেক-মাহাত্ম্যই মহাভারতের অর্থবাদ বা ভারত-বর্ষিত বিষয় অবলম্বনে বহুকাব্য রচনা করিয়া প্রশিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতগুণী মহাভারত’ মধ্যে সর্গ-প্রবর্তীগ্রন্থের গৌরব করিতে পারে। হলতান আলান্দীন হোসেন শাহের সময় বিজয় পণ্ডিতের ‘বিজয়পাণ্ডব-কথা’ বা ‘ভারত পাঁচালী’ প্রণীত হয়।

রামায়ণ মহাভারতের ভ্রাতৃ শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থবাদ করিয়া ভাগবতের অর্থবক্তা হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থরচনাচার্য্য অনেকে বঙ্গসাহিত্যে প্রশিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে গুণরাজ খান মালদার বহু একজন। তাহার অর্থবাদের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়’ বা ‘শ্রীগোবিন্দ-বিজয়’। গুণরাজ খান পর রঘুনান্য ভাগবত-চার্য্য সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থবাদ করেন। ‘তাঁহার অর্থবাদের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণ-প্রমত্তরঙ্গিনী’। কবিচন্দ্রের ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ ভাগবত অর্থবাদের সর্গ প্রধান গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ভবানন্দ ‘হরিবংশ’

এবং সঙ্ঘ বিদ্যাবাগীশ 'ভগবদ্গীতা' অস্থবাব্দ করেন।

কেবল গীত-রচনাধারা সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন রামপ্রসাদ সেন, কমলকান্ত ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎসংশ্লিষ্ট শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কুমার শরচ্চন্দ্র ও মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, নাটোররাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ, দাশরথি রায়, রামজলাল, সুরকার, কালী মীরজা, সৈয়দ জাকার খা প্রভৃতি সাহিত্যজগতে অনেক খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, সূক্তলৌক সাহিত্য সেবা করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী সাহিত্যিকেরা সাহিত্যেতরু লালন-কাজ করিয়াছেন। বৈষ্ণব মহাপ্রভুর সেই সাহিত্যের হাতে খড়ি গিলেন। বৈষ্ণব যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য লালনের অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাড়ানার অবস্থায় পদার্পণ করে। বাস্তবিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের বর্তমান উন্নতির অবস্থা বৈষ্ণবদিগেরই অগ্রহণে। বৈষ্ণব কবিরিণের রসমাধুর্য্যময়ী লেখনী হইতে যে অমৃতময়ী মধুর কোমলকান্ত কবিতাধারা নিঃসৃত হইয়াছে, আজিও তাহা সঙ্গরথ ব্যক্তিগণের কৃষ্ণিসাধন করিতেছে। জয়দেব যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সেই পথেই অহুসরণ করিয়া, সাহিত্যকানন চিরবাসন্ত আনন্দে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছেন।

এই যে সাহিত্যের কথা বলিয়া আসিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের অন্যকার সঙ্কলিত মালদহ-সম্মিলনের কি সম্পর্ক তাহা একটু দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা কি শিখিতে চাই তাহা দেখা আবশ্যক। আমরা যে দেশের মানুষ

সেই দেশটা কেমন ও কি ছিল তাহা জানা চাই; তাহার পর সেই দেশের মানুষগুলি কেমন, পূর্বে কিরূপ ছিল এবং পরেই বা কেমন হইতে পারে তাহা জানা আবশ্যক। যথেষ্ট হয় এই দুইটা বিষয় ভাল করিয়া জানিতে পারিলে আর বড় বেশী কিছু জানিবার বাসী থাকে না। এই দুই বিষয় জানিতে গেলে সাময়িকিক সাহিত্যের আশ্রয় লইতেই হইবে, আর অল্প পথ কিছু নাই। দেশ বা দেশের লোক কেমন ছিল তাহা যদি জানিতে হইত তবে খুঁজিতে হইবে—তৎসমুদ্রে পূর্বে কোথায় কে কি নির্দিয়া পড়িয়া রুচিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, প্রবৃত্তি ও সমাজতন্ত্রের গবেষণার কথা আসিয়া পড়ে। ত্রিকাল-দর্শন নামে একটা বিদ্যা এক সময়ে ভারতবাসীর অদ্বিত্য ছিল বলিয়া শোনা যায়—কিন্তু এখনকার যুগে ত্রিকালদর্শী কেহ আছেন কি না আমার জানা নাই, থাকিলে তাহাকে তবু তুলি করিয়া তাহার নিকট কৃত্তবিশ্বাস সংসত্ত জানিয়া লইতাম; তাহা যখন হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আমাদের শ্রুতিজ্ঞেই হইবে। আমরা মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া সেই খুঁজিবার পথ নির্ণয় করিয়া লইব। মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতির উদ্যোগে এই সম্মিলন আস্থিত হইয়াছে। আদৌ পথ পাওয়া যাইবে কি না তাহার আশংকা দিবার জন্ত সেই শিক্ষাসমিতি পূর্বে হইতেই সেই পথ-নির্দেশকারী অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার অহুসন্ধানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া মালদহের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার কতকটা বিবরণ আপনারা অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-পূর্ব অভিজ্ঞায়ে শুনিয়াছেন এবং বিস্তৃত

বিবরণ এখন অভ্যাক্ত কৃতী পুরুষের যুগে শুনিতে পাইবেন; স্বতরাং সে সকল বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এখন বেশী কিছু নাই, তবে আমি যে কথা বলিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, তাহা এই—

মালদহ একটি পুরাতন স্থান। মুসলমান রাজত্বের প্রাকালে যে বহুবিস্তৃত বরেন্দ্র-রাজ্য ভারতে যুগান্তিত হইয়া উঠিয়াছিল, বাহার প্রভাবে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থান মগধকে দ্বংসমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল, সেই বরেন্দ্রবাহোর অতি প্রবলতম অংশ এই মালদহ-প্রদেশ। তৎপরে মুসলমান সাম্রাজ্য-স্থাপিত হইলে পাঠানদিগের বাঙ্গালা-দেশের মধ্যে এবং মোগলদিগের বাঙ্গালা-দেশের মধ্যেও মালদহ-প্রদেশের প্রয়োজনীয়তা বড় কম ছিল না। আর যদি বৌদ্ধযুগ পূর্বকালের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদির খোঁজ কুঁজিতে হয়, তাহা হইলেও মালদহকে একেবারে তুলিলে চলিবে না।

গোড় ও পাণ্ডুয়ায় পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রের অত্যন্ত কাহিনীর কথা—আমি স্মরণে ও বিদেশীর নিকট শুনিয়া আসিতেছি—সেই সকল ভোতাপাখীর কষ্টক্লম্বলি আর আপনাদের নিকট বলিয়া আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না। আপনাদের নিকট সে সকল গৌরবময়ী স্মৃতির কথা আমরা শুনিতে আসিয়াছি। বিশ্বস্তির অতল তল হইতে যে সকল রত্ন আপনারা আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি। দেখিতে আসিয়াছি—গোড় ও পাণ্ডুর ভগ্নাংশের, গোড়ের বারহুয়ারী মন্দির—আহার গদ্য-গুলি শত বৎসর পূর্বে কেউন সাহেব স্বর্গ-পাথ দ্বারা মণ্ডিত দেখিয়াছিলেন, গোড়ের সিংহদ্বার 'দখল দরওয়াজা' ও গড়বন্দীপ্রাসাদ,

নবাব হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের সমাধি-স্থান, ফিরোজ-মিনার, গৌড়ভট্ট, কদম রত্নালয় মন্দির, তীতিপাড়া মন্দির, লুটন মন্দির, প্রাসাদের পূর্ব ও পশ্চিমদ্বার, 'লুকাচুহী' ও 'কোতখালি দরওয়াজা',—এক কথায় দেখিতে আসিয়াছি—প্রাচীন পাঠান-কার্ত্তি মূলস্থান-গোড় বা লক্ষ্মণাবতী ও তাহার উত্তরাংশে অবস্থিত হিন্দুগোড় বা প্রাচীন রাজধানী—'রমাবতী'র ভগ্নাবশেষ। আর দেখিতে আসিয়াছি—বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ রামকলি, প্রেমের অবতার বাঙ্গালার ঠাকুর শ্রীগৌরদেবের পদস্পৃশিতে যে স্থান পরিতীর্ণ হইয়াছে, সেইস্থান দেখিতে আসিয়াছি, যে স্থানে আমাদের 'প্রাণপোরা' বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই কলিকদম্বল দেখিতে আসিয়াছি। দেখিতে আসিয়াছি—শ্রীকৃষ্ণসনাতন-সোহিত সেই 'মনমোহন ঠাকুর', 'রাধাকৃষ্ণ', 'শ্রীমহাভূত', শ্রীকৃষ্ণ গোষাধিপতি—'কৃষ্ণ-সাগর'-দীপিকা; আর দেখিতে আসিয়াছি শ্রীপতি পদোৎপন্ন-যে স্থানে আহমদননে শ্রীমদনিতানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীমদীরভজ গোষাধিপতি কেশবজ্যোতির পুত্র দ্বন্দ্বভট্টজ্যোতি আখ্যা গ্রন্থ করেন। এই কেশবজ্যোতির নিকট ইতঃপূর্বে গোড় মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর পাণ্ডুয়ায় দেখিতে আসিয়াছি—আসানদাহী দরগা, সেলামী দরগা ও বাইশ, হাজারী দরগা, মুর কুতুব আলমের দরগা, সোনা মন্দির, একলবী মন্দির, জগতের সর্বপ্রথমা বৃন্দ আদিনি মন্দির।

ইতিহাস-চর্চার জন্ত মালদহ জেলা গ্রন্থিক। মালদহ রিয়ার-উ-সলাতিন প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের জন্মস্থান ও কর্মস্থান। শতবৎসর পূর্বে এই স্থান হইতেই তিনি

বাঙ্গালীকে স্বাধীনভাবে ইতিহাস-গ্রন্থখনে উৎসাহ করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন শিষ্য-পরম্পরায় ইতিহাস-আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য আবদুল করিম ও তংশিফ মোল্লী ইহারি বঙ্গ ইতিহাসের চর্চা, ইতিহাস-আলোচনার একটা দ্বারা অক্ষয় রাখিয়াছিলেন। আমি মানস-নেত্রে দেখিতে পাইতেছি, মালদহ সহরে যেখানে দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে, সেই স্থান গোলাম হোসেনের জন্মস্থান বলিয়া, আর সহরের উত্তরাংশে "মীর চক" নামক স্থান—যেখানে তিনি চিরনিদ্রায় সমাহিত আছেন—সেই স্থান বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদিগের তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হইবে। তাহার পর পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু পরলোক-গত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় বাঙ্গালার পুরাতন রাজধানী পৌড়-পাণ্ডুর অতীত কাহিনী—বাঙ্গালার স্বয়ং-স্বত্বের কথা—বাঙ্গালীর অতীত গৌরব-বিবরণ সুস্পষ্টরূপে আমাদের নিকট বিস্তারিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মবিন্যাস পরিশ্রমজ্ঞ ঐতিহাসিক তথ্যগুলি মাসিক পরিচরার স্বাক্ষর হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে দেখিলে আশ্চর্য্য স্থানী হইবে। আমার বোধ হয় তিনিই প্রথিতযশা ঐতিহাসিক-বরণ্য শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে পৌড় ও পাণ্ডুর ইতিহাস-আলোচনায় প্রথম প্রবোচিত করেন। তাঁহার পর মৈত্রেয় মহাশয় অসামান্য পরিশ্রমে অক্ষয়কুমার বর্দিকার লিখিত অঙ্ককারময় ঐতিহাসিক গুহার অঙ্কনচিত্রিত রত্নরাশি উদ্ধার করিয়া, নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়া—আপনিও দ্বন্দ্ব হইয়াছেন, আমাদিগকেও দ্বন্দ্ব করিয়াছেন। তাঁহার দ্বন্দ্ব কল্পবীক্ষের সাধনায় পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ

—পরিবেশে তাহার অক্ষয়-কীর্তি "বরেন্দ্র-অক্ষয়কুমার-সমিতি"র গঠন। তাঁহারই চেতনায়, কুমার বাহাদুর শরৎকুমারের বঙ্গভ্রমণ ও সভ্যগণের অসামান্য পরিশ্রমে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়াছে, নূতন তথ্য-আবিষ্কৃত হইয়া সত্যের মহাদ্বার প্রচোরে সহায় হইয়াছে, "পৌড়-রাজ-মালা" ও "লেখমালা"র আবিষ্কার হইয়াছে। "বরেন্দ্র-অক্ষয়কুমার-সমিতি" জগতের নিকট সপ্ৰমাণ করিয়া দিয়াছে যে, বিজ্ঞানানুসারিত উপায়ে ইতিহাসের আলোচনা করিতে বাঙ্গালী জনে, উৎসাহ ও প্রাণের ভিতর দিয়া ইতিহাসের সারমর্মটুকু গ্রহণ করিতে পারে।

মালদহের কথা ভাবিতে গেলেই মনে পড়িয়া যায়, জার্মান গণিত রত্নকাক্স চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম। তিনি "পৌড়ের ইতিহাস" দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞ করিয়াছেন। তাঁহার পর আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কর্ণযোগী ইতিহাসের একমুঠ সাধক হরিদাস পালিত মহাশয় 'আমাদের গভীর' লিখিয়া বাঙ্গালার দ্বন্দ্ব ও সামাজিক ইতিহাসের একাংশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতে বাহারা সমাজ ও দ্বন্দ্বের ইতিহাস লিখা আলোচনা করিবেন, তাঁহারা পালিত মহাশয়ের প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিয়া স্বকল লাভ করিবেন, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

মালদহ জেলার মধ্যে সাহিত্যালোচনা করিয়া বাহারা যশের ধন্দ্বের প্রবেশলাভ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পণ্ডিত বিশুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীমুক বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়িয়া যায়। ইহারা আমাদের সাহিত্যের সেবা করিয়া আমাদের দ্বন্দ্ববাদের ভাঙ্গন হইয়াছেন।

বঙ্গ সাহিত্যে গৌড়-পণ্ডুর-পথ প্রদর্শক

৬ ঐতিহাসিক রাধেশচন্দ্র শেঠ



পরিণেয়ে একজন নীরব সাদক—একজন কৰ্মযোগীর অস্বস্ত পরিশ্রম ও সাধনার সিদ্ধিলাভের কথা বলব। মুষ্টিমান বিনয়—বিনয়কুমারের কথা আপনারা সকলেই জানেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত। তিনি মাতৃভাষার সাধনা করিয়া আজ বাঙালীর নিকট বরণ্য হইয়াছেন, তাহার পুণ্ড্রাবলী সাহিত্য-সমাজে আদৃত হইয়াছে; কিন্তু সে সকল কথা আজ আমি এখানে তুলিব নং, তাহার ‘অক্ষয়কীর্তি’—‘মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ’। ১৩১২ সালে যখন প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর অসম্পূর্ণতা অনেকেরই প্রাণে প্রাণে লুপ্ত হইয়াছিল, কলিকাতায় ‘Bengal National Council of Education’ স্থপতি করিয়াছিলেন, তখন জেলায় জেলায় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদেরও স্থপতি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই অকালে অস্তিত্ব-লোপ হইয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় বিনয়কুমার সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র সরকার—প্রমুখ কৃষিকর্মীদের চেষ্টায় ও সাধনার মালদহ-শিক্ষা-পরিষৎ আজও সগর্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—কত দুঃখ বালককে শিক্ষাদান করিয়া সমাজে প্রকৃত মানবের স্থপতি করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; ব্যাবহারিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্ত এই জেলার একজন ছাত্রকে যুরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। এই পরিষৎ মালদহবাসীর চিন্তাশ্রোতাকে বাঙালী-সাহিত্যের ভিত্তর-নিদা প্রবাহিত করাইয়া যে কল্যানের সূচনা করিয়াছে তাহা আশা-গ্রন্থ। আশা করি, কালে ‘মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ’ মহাক্ষেপে পরিণত হইয়া কল-পুষ্পভারে নত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-কানন আমোদিত করিয়া রাখিবে।

আর, আজ যে স্থানে এই সভা আহুত হইয়াছে, সেই কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রাণরূপ সাহিত্যাত্মবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার মহাপুত্রকে আমরা আন্তরিক যজ্ঞবান না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি একাধারে কমলা ও বাণীপাশ্রির বরপুত্র; এই কলিগ্রামের উন্নতিকল্পে তাহার মহতী চেষ্টায় তাহার প্রাণপণ পরিশ্রম বৈন মুষ্টি পরিগ্রহ করিয়া এই বিদ্যালয়রূপে আমাদের নয়নসম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এইরূপে সর্বকালে সকলদিক হইতেই যখন মালদহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের ইতিহাসে সর্বপ্রকারে বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান হইয়া রহিয়াছে, তখন ইহার উপান-পতনের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের উন্নতির উপায় চিন্তা করা আমাদের কর্তব্য।

মালদহবাসী মালদহের জন্ত গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন, ইহার জন্ত উপরোধ, অধুরোধ বা সঙ্কর আবশ্যক করে না। ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ-কথা; কিন্তু মালদহের কি ছিল জানিলে যখন বাঙালীর একাংশের ইতিহাস জানা যায়, তখন মালদহের গবেষণায় সমস্ত বাঙালীর আগ্রহ হওয়া আবশ্যক। মালদহবাসী কাজ করিয়া থাকিলেও মুখ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহার কলাকল আজ আমাদের সম্মুখে ধরিতেছেন, আমরা তাহাদিগের সহিত সমান আগ্রহ দেখাইয়া যদি তাহাদের গবেষণার ফলগুলিকে আদর করিয়া লই, তবেই না মালদহের এই সাহিত্য-সম্মিলন সর্বতোভাবে সফল হয়। মালদহ যাঁহা করিয়াছেন, যাঁহা আমাদের দিতেছেন, তাঁহা আমাদের আদর্শ হউক, আমরা মালদহের আদর্শে অপরূপ এইরূপ সম্মেলন-অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করি। জাতীয় শিক্ষা-সমিতি কাহারও

সাধায়া না লইয়া স্বকোরে স্বাধীন চেষ্টায় স্বকাৰ্য্য করিয়া যাইতেছেন। এই স্বাবলম্বন অতিমাত্র প্রশংসার বিষয় সম্ভব নাই। কিন্তু যেমন ব্যক্তি-সমষ্টি লইয়া সমাজের গঠন হয়, তেমনই এই মালদহের দ্বায় কমিদল, সকল জেলায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গড়িয়া উঠুক এবং ক্রমশঃ সে সকলের সমবায়ে বিপুল বহু-সমাজের গঠন সম্পূর্ণ হউক। কোথায় কি স্বত্রে কেমন করিয়া তাহা হইবে; তাহার জ্ঞান আমাদেরই ভাৰিতে হইবে না। সমস্ত বঙ্গের সাহিত্য-চেষ্টা সাহিত্যে একাঙ্গীভূত হয়, আজ বিশ বৎসর হইল তাহার স্থান ভগবৎস্বপায় গঠিত হইয়াছে। যেমন মাতৃ-দেহের জাতীয় শিক্ষাসমিতি আশা করেন—মালদহের প্রত্যেক ব্যক্তি মালদহের সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মালদহের কাজ স্বসম্পন্ন করুক; তেমনই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ আশা করেন, কেবল মালদহ কেন, বঙ্গের সমস্ত জেলায় মালদহ সাহিত্যালোচনা-সমিতির ছায়া সমিতি হইয়া সমগ্র বঙ্গের কার্য্য স্বসম্পন্ন করিবার জ্ঞান দেশের সমস্ত বিজ্ঞান-স্বাধীন শক্তিকে একত্র করিয়া এক বঙ্গের নামে সমস্ত শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করুক। মালদহ-শিক্ষা-সমিতির কার্য্য মালদহে নিবন্ধ থাকুক, কিন্তু সে কেবল স্বাধীনতার দেহাই দিয়া কেবল স্বাভাবিক মহিমা দেখাইবার জ্ঞান সমস্ত বঙ্গের সংস্থায় চেষ্টায় যোগ দিবে না অথবা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে, ইহা বলা হইতে পারে না। এক্ষণ বিশদূর স্বপ্ননাও বোধ হয় মালদহ শিক্ষা-সমিতির লক্ষ্যভূত নয়। মালদহ যেমন সমস্ত মালদহ জেলাকে একত্র করিয়া এক ক্রিয়া ও এক উদ্দেশ্যে বদ্ধ করিতে প্রয়াসী—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদও

তেমনই সমস্ত জেলাকে পরিষদের নামে একত্র করিয়া এক ক্রিয়া ও এক উদ্দেশ্যে বদ্ধ করিতে প্রয়াসী। অনেকে বলিবেন এ সকল অব্যবহার কথার অবতারণা কেন? একটু প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই এই সকল কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমিলন হই—সমস্ত বঙ্গকে লইয়া। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসমিলন হই—সমস্ত উত্তরবঙ্গকে লইয়া। আবার সেই উত্তরবঙ্গের মধ্যে এক প্রান্তে মালদহ সাহিত্য সমিলনের অস্থান। ইহা যেমন কণ্ঠপ্রবণতার লক্ষণ, তেমনই স্বাধীনতার নামে বিচ্ছিন্নতা-বন্ধনের লক্ষণ। অনেকেই প্রবন্ধে দৃষ্টিতে এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করেন। স্বরসিক অমৃতলাল বসু একদিন, বলিয়াছিলেন,—“এক কলিকাতার মধ্যেই অতঃপর “ঠাননিয়া-সমিলন”, “বড়-বাজার-সমিলন”, “চৌরঙ্গী-সমিলন” ঘটবে।”—মহাশয়-চরিত্রের অভিনয়-কলাকুশল স্বরসিক নটরাজ দূরভবিষ্যতে দৃষ্টি রাখিয়া যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই সমিলনের সভাপতির পদে যুগ হইয়া সে দিক হইতে আমি দৃষ্টি একেবারে সঙ্কুচিত করিতে পরিলাম না বলিয়া এ সকল কথার অবতারণা করিচ্ছি। এই ক্ষুদ্র-বৃহৎ-দানব্যাঙ্গী সমিলনগুলির সহিত যে কোথাও ঘন্থ নাহি, তাহা বলিয়া দেওয়া বোধ হয় আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইল না।

মালদহবাসীদের আজ বড় আনন্দের দিন —জননী বঙ্গভাষার মন্দির-প্রতিষ্ঠার পূর্বাঙ্ক, সাংকেয় প্রেমোজলি দিবার দিন। আজ শত জ্ঞান অর্থাৎ লইয়া মাতৃমন্দিরদ্বারে প্রণাম করি। আহ্নান আমরা সকলে মাতার বননা মাতার নবাবল বসীদান হইয়া মাতৃভাষার দেবাক্ষে জীবন উৎসর্গ করি। আজ আমরা আমাদের স্বার্থপরতা তুলিতে আসিচ্ছি।

তুলিতে আসিচ্ছি—অম্বাসদের ক্ষুদ্রতা, আমাদের নীচতা। আহ্নান আমরা অজ্ঞেয়া অটুট দিবা প্রেমের-বন্ধনে জড়িতদের সকলের সহিত আবদ্ধ হইয়া মাতৃভাষার সেবা করি; কামণ, কণ্ঠ্য হইতে আরো “রশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।”

আর কবির সহিত বলি,—

“মাঘের চরণে ফুলমালা দেবে জড়াবে,
মাঘের ভাষায় আপনাদের দেবে ছড়াবে
দিশে দিশে, দেশে বিদেশে,
“আজ্ঞা পান্ডিত নিমেষে।”

আজ মালদহবাসী কর্মীদের সাধনায় আমার বোধ হয় এই স্বপ্নের মাতৃমন্দির-দ্বারে প্রতিবৎসর বাঙ্গালদেশের সাহিত্যিকগণ সমবেত হইয়া আপনাদের উৎসাহ-বর্ধন করিবেন—আপনাদের স্বদেয় নববলের সকার করিয়া দিবেন। আহ্নান এক্ষণে স্নানাদি কণ্ঠ-ফলের দিকে না চাহিয়া—কণ্ঠকল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া—কণ্ঠকোরে অগ্রসর হই।

শ্রী অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

দেশের পরিচয়

If we would impart a love of country, we must give a country to love.—Sister Nivedita.

আমাদের স্বদেশ ও মাতৃভূমিসংগত আমাদের যতদূর জানা উচিত, আমাদের তাহার কিছুই জানি না; শুধু তাই নহে, আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত লোকেরা যেন দেশ হইতে দূরে বাইয়া পড়িতেছেন। যেকলে সাহেবের মধ্য দিয়া দেশে উক্তিশিলা প্রচারিত হইবে, সেদিন যে আমাদের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শুভ-কলপ্রসব যুগের বীজ বপন করা হইয়াছিল তাহা মনে করা চলে। হইতে পারে যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বহুশাখায় পাশ্চাত্যদেশে যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা জানা আমাদের একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল; হইতে পারে যে নৃতন জীবন-সংগ্রামে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের কিছু জ্ঞান অপরিহার্য্য হইয়াছিল; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রাপ্তি

হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজী শিক্ষার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে, এবং সে জোর অব্যবস্থাক বৈধী দিন রক্ষা করা হইয়াছে। কিয়ৎপরিমাণে বিদেশের সাহিত্য-চর্চা শিক্ষাগ্রন্থ এবং আনন্দময়ক বট, কিন্তু অবস্থা যদি এইরূপ হয় যে কেবল বিদেশের সাহিত্যেরই চর্চা হইবে, সংস্কৃত ও বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি আদার প্রদর্শিত হইবে, তাহা হইলে মাতৃভূমি-বিকৃত বালকের শরীরের দ্বায় আমাদের চিন্তা তুলিল ও অস্বাভাবিক হইতে বাধ্য। নিছের সাহিত্যের মধ্য দিয়াই দেশের প্রাণ জুটিয়া উঠে, সে সাহিত্যের সহিত যাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, দেশের সহিত তাহার কোনও যোগ থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জলস্বরূপী বিজ্ঞান হইয়া যে রুস্তী ছাত্র বাহির হইয়া আসেন, তিনি একদিন পড়িয়াছেন কি?—ইংরাজী সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন, পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান ও বাহ্যবিজ্ঞান। ভবিষ্যতে কিরূপ তিনি জীবনের

আদর্শ করিয়াছেন?—সেই সব পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তার আলোচনা। সেক্ষণিকের প্রত্যেক গ্রন্থ পুস্তকপুস্তকভাবে পাঠ করিব, প্রত্যেক বাক্য কি অর্থে ব্যবহৃত হয়্যাছে, কি করিয়া সে অর্থ হইল, কোথায় তাত্কালিক, কোন ঘটনা বা কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাত্কালিক সমাজের চিত্রবৈচিত্র্য, এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিব, সেই সম্বন্ধে গবেষণা করিব, এইভাবে কৃতী ছাত্রের মনোগতি ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে বিশেষ অন্তরঙ্গন করা হয় না। সেইজন্য যিনি দর্শনের ছাত্র, তাহার প্রধান আলোচ্য বৈদেশিক দর্শন—কোম্বুতে, হেগেল, ক্যান্ট, মিল ও হার্কট স্পেন্সার প্রভৃতির মীমাংসা ও যুক্তিপ্রণালী। অর্থনীতি ও সমাজনীতির ছাত্রেরা যে সকল তর্ক আলোচনা করেন, তাহা শুধু পাশ্চাত্য সমাজেই উদ্ভূত পাত্র; তাহার যেরূপ প্রণালীতে যুক্তি করেন তাহা শুধু পাশ্চাত্য সমাজেই প্রযোজ্য। এই ভাবে সকল বিষয়েই তথাকথিত উচ্চশিক্ষার সহিত দেশের যোগ শিথিল হইয়া গইতেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন অন্তর্কর্তব্য এবং সে পরিবর্তন আমূল করিতে হইবে।

এখন আলোচনা করা যাক—কোন কোন বিষয়ে বর্ধন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন এবং কি উপায়ে তাহা সকলের মনে বিস্তার করা যায়।

প্রথমতঃ, আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক—দেশের বাহ্য অভ্যন্তরীর সহিত, অর্থাৎ দেশের রূপের সহিত। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বড় অল্প। বস্তুতঃ বিদ্যালয়ের নিরশ্রুতগণ যে ভূগোল পাঠ করা হয়, তাহার পর এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত

কিছু জানিতে চেষ্টা করি না। বালক-বালিকাদের কোমল হৃদয়ে আমাদের দেশের রূপসুন্দরিত করিতে হইবে। তাহার লক্ষ্য গৃহে গৃহে ভারতবর্ষের স্মরণিত মানচিত্র বিলম্বিত করিতে হইবে; হৃদয়ে বাস্তব দৃষ্টান্তগুলির চিত্র সৃষ্টিতে হইবে—আমাদের মাতৃভূমির শিরে গগনস্পন্দী হিমালয়, তাহাতে কত গুহা উদ্ভাতকা, কত শৈল শ্রোতস্বতী, কত অরণ্য উপবন, কত ত্যুর-মণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ, তথায় মেঘকীড়া ও সৌরকিরণ-সম্পাত,—সে দৃষ্টান্ত কি বিমোহিত, কি প্ৰাণী, কি মানু! তাহার পর দেশের পার্শ্ব ও পরন্তলে অনন্তবিস্তার সমুদ্র, কখনও প্রভাত-স্বয়াকিরণে হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও মেঘাভ্রমণে আকাশের তলে রক্ত-মুষ্টি ধারণ করিতেছে, নিম্নে মায়ের চরণ-স্থাপনার্থ প্রস্তুতি কলমবৎ সিংহদ্বীপ। আর এই শৈল-সমুদ্রবৈধর্মের মধ্যে কত গ্রাম-নগর, কত নদী-পর্বত, কত অরণ্য-মল্লভূমি, কত শ্রামকপ্রস্তুত! ছবির বই ছাপা হউক, তাহাতে এই সকল দৃষ্টান্ত প্রতিরূপিত মরিষি হউক। গৃহে গৃহে সে বই প্রচারিত হউক, অলসকৃত্তকবিনতা সকলে দেখুক কি বিশাল, বৈচিত্র্যময়, হৃদয়র আমোদের দেশ। যিনি যতদূর পারেন যত্ন করুন, বাহাদের ক্ষমতা আছে তাহার হৃদয়, সরল ভাবায় সে অমণ-বৃত্তান্ত লিখুন, এবং সেই সকল অমণ-বৃত্তান্ত সকলের দ্বারা পরিচিত হউক—অনাবশ্যক কোতুলক চরিতার্থ করিবার জন্য শিথিল আগ্রহের সহিত নয়—আকর্ষণ-প্রবাহী নিজের গৃহের নিজের গ্রামের কথা যেরূপ আগ্রহে পাঠ করে সেইরূপ আগ্রহে। দেশের একজন প্রধান ননবা লিখিয়াছিলেন “আমাদের দেশের নদীপর্বত ও প্রান্তরগুলি

আমিত শুদ্ধশিল্প ও মৃত্তিকার ভিন্ন প্রকারের সংযোগ বলিয়া ভাবি না,—আমার চক্ষে ইহা এক অশুভ মতিশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। স্বদেশসেবকের এই উৎকণ্ঠ ভাব আমাদের সকলের অন্তর্জ্বলন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। হৃদয় দিয়া অশুভব করিতে হইবে আমাদের দেশের এই সব দৃষ্টান্তগুলি আমাদের নিজস্ব, আমাদের অনীম হৃদয়ের ও আনন্দের আকার।

দেশের রূপের আর এক অঙ্গ—ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের চিত্র। এরূপ চিত্র-সম্বলিত পুস্তকত্রয় ও বিশ্বের প্রয়োজন। লিখিয়া-বুঝান অপেক্ষা একবার চিত্র দেখাইয়া সহজে বুঝান যায়—লোকে কল্পণ বেশত্বা করে, কি ভাবে দেশ-সম্বলিত করে। কৃষক, ভিখারী, ছাত্র, ধনী, ভদ্র-লোক, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বিভিন্ন শ্রেণীর সোলাকে সহস্রের বেশ প্রত্যেক প্রদেশেই ভিন্ন প্রকারের হইবে—তাহা সংগ্রহ করিয়া ছাপান প্রয়োজন। যেন একজনকে দেখিলেই চিনিতে পারা যায় সে কোন প্রদেশের অধিবাসী।

এতক্ষণ দেশের রূপের কথাই বলা হইতেছিল। রূপ অন্বেষণের বিষয় নহে। আমরা বাহার প্রতি অশ্রদ্ধ, বার বার তাহার রূপ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়; বাহার মুহিত আমরা পরিচিত হই, তাহার প্রতি আমাদের অস্বাভাবিক জন্মে। স্বতরাং দেশের বহির্দৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্বদেশপ্রেমের একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু তাহার আর একটি অঙ্গ আছে, এক্ষণে তাহার কথাই বলিব। তাহা হইতেছে দেশের অঙ্গ-প্রকৃতি—দেশের প্রাণ। অস্তীত কালের ও বর্তমানের দেশের সন্ধান, ভাব ও চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, স্বপ্ন-দৃষ্টি, আশা

ও আশঙ্কা। আমরা মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে বৈরাগ্য ভাবি বা সম্ভ্রান্তি ভাবিতে শিখিয়াছি তাহা দেশের বর্থাৎ ভাবনা নয়। আমরা যে সকল “আদর্শ” হৃদয়ে গোপন করি, তাহা দেশের সহস্র-সহস্রবৎসরাদ্বিত প্রকৃত “আদর্শ” নহে। আমাদের দেশের নিজস্ব চিত্রাপ্রণালী ও আদর্শ কি, তাহা স্থির করিতে হইবে, তাহার সহিত জড়িত মিশাইয়া ভাবিতে হইবে। এই উপায়ে আমরা স্থির করিতে পারিব আমাদের অভাব ও অবস্থার উপযোগী কার্যপ্রণালী কি?

‘‘ভারতবর্ষের অঙ্গ-প্রকৃতির ধারণা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা কি ভাবে জীবন যাপন করে,—তাহাদের সামাজিক নিয়ম, আচার-ব্যবহার, উৎসব ও বিপদের চিত্রের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমরা এত উদ্ভাসিত যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ত দূরেক কথা, বর্ষদেশের কৃষকদের দৈনিক জীবন ও স্বপ্ন-দৃষ্টির সম্বন্ধেই আমরা একান্ত অনভিজ্ঞ। পল্লীগাম্যে যে কত প্রকার উৎসব আছে, কি ভাবে পল্লীজীবনে বৈচিত্র্য ও সরসতার সম্ভার হয়, তাহা আমরা জানিতে চেষ্টা করি না। দেশের দরিদ্র কৃষকদের সহিত মিশিবার স্রবোপ সৃষ্টি করিতে হইবে ও তাহার সম্ভাবনার করিতে হইবে। যে মেলাতে দেশের বহু লোকের সমাগম হয় আমরা সে মেলাতে যাইতে অগ্রহণ করি? মেলায় আমাদের আর কোনও প্রয়োজন না থাকে, না থাকুক, কিন্তু সেখানে দেশের অসংখ্য লোক একত্র হইবে, তাহাদের উৎসাহ-উদ্বীক্স মুখ দেখিতে পাইব, তাহাদের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইব, তাহা কি আমাদেরই কতখান

নইয়া যাইবার প্ররোচক হইবে না। ফুটবল মাচ দেখিতে আমাদের ছাত্রদের যেক্ষণ আগ্রহ, খেপাড়াড় মেলা, মাঠে পথ রথযাত্রার মতো প্রকৃতি দেখিতে সেরূপ আগ্রহ নাই। তাহাদের দ্বারা যে আগ্রহ জাগাইতে হইবে।

তাহার পর দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের স্বদেশী হইতে হইবে। বিদ্যায় দেশভেদ নাই বলিয়া যাহা বলা হয় সে সম্বন্ধে অতি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। Physics, Chemistry, Physiology প্রকৃতি সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে, কিন্তু দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, শিল্প সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। বিশ্বের দৃষ্টি তত্ত্বগুলি আমাদের পক্ষেই আছে। তাহাদের মীমাংসা, আমাদের প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রগুলি পাঠ করিলে জানা যাইবে। তাহা না পড়িয়া আমরা যদি বিদেশী দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতেই ব্যাপৃত থাকি, তাহা হইলে দেশের এত কালের সাধনায় আমরা কোনও উপকার লাভ করিতে পারিলাম না; যে, বিষয়গুলি বিশেষ পণ্ডিতদের চক্ষে বড় বোধ হইয়াছে আমরা তাহা লইয়াই ব্যাপৃত থাকি; যে প্রণালীতে তাহারা শিক্ষান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা সে প্রণালীই অনুসরণ করি। কে বলিতে পারে আমাদের প্রাচীন প্রণালীই হয় ত ভাল ছিল; আমাদের পণ্ডিতেরা যে বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন তাহাই হয় ত বর্থাভাবে বড়। সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশী খাটে। আমাদের প্রকৃতি ও ব্যুৎপাদনের প্রকৃতি ভিন্ন প্রকারের; আমাদের ও তাহাদের আদর্শ বিভিন্ন; আমাদের আদর্শ দ্বারা আদর্শ, শাস্ত্র-প্রিয়তা, অল্পে সন্তুষ্টি, ভোগপরতা, আদার,— তাহাদের আদর্শ প্রকৃত-বিস্তার, ভোগপরতা

আগন্তিক, উচ্চ আশা। যদি আমাদের আদর্শই প্রকৃত ভাবে উচ্চ হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা ভ্রান্তপথে চালিত হইতেছি। হস্তান্তর জ্ঞানালোচনাতেও আমাদেরিগকে দৃষ্টান্ত হইতে হইবে। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোচনার আদর থাকিবে, ততদিন ছাত্রেরা তাহার আলোচনা করিতে বাধ্য; কিন্তু ছাত্রদের মনে রাখা উচিত যে, তাহারা শুধু পরীক্ষার জন্তই, অর্থোপার্জনের সহায়তার জন্তই এত করিয়া বিদেশী শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন; তাহারা জীবনের উদ্দেশ্য করুন—মাতৃভাষায় আমাদের নিজস্ব শাস্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষায় শিক্ষিতদের মধ্যে তাহাদের আলোচনা। তাহা হইলে হয় ত পরে আমাদের শাস্ত্রের আদর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়িতে পারে। কিন্তু তাহা যদি নাও হয় তথাপি আমরা কৃত্যব্যস্ত হইব না।

অন্তঃপরিহারিতের কথা। আমাদের মনে রাখা উচিত যে বিদেশী কাব্য হইতেই যদ্যগ্রহণ করিতে হইল আমাদের মনোবৃত্তিকে কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। আমাদের জগতের যে সকল সংস্কৃতি, যে সকল ভাব ও চিন্তাপ্রণালী আমাদের অভ্যস্ত, বিদেশী সাহিত্যে তাহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই; প্রভুত তাহারা আমাদের অনভ্যস্ত ভাব এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। হস্তান্তর উত্তমশ্রেণীর বিদেশী সাহিত্য হইতে আমরা যে শিক্ষা ও আনন্দ পাইব, মধ্যম-শ্রেণীর জাতীয় সাহিত্য হইতে তাহার কম শিক্ষা ও আনন্দ পাইব না। অতএব যাহারা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাব্য পাঠিতেও উত্তম, মধ্যম, অধম সর্বশ্রেণীর শুধু ইংরাজী পদ্য ও উপন্যাসই পাঠ করেন, তাহারা

নিজদের কল্পের ক্ষতি করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য। প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালার সাহিত্যে বিষয় নাই হইলে আমরা দেশের প্রকৃত জীবন উপলব্ধি করিতে পারিব না। Tennyson, Wordsworth, Byron, Goldsmith প্রভৃতির নাম বাঙ্গালী ছাত্রের মুখে যেরূপ যেরূপ শুনা যায়, বিদেশী, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরায়, রামপ্রসাদের নাম সেক্ষণ শুনা যায় না কেন? ছাত্রেরা ত চিত্তবিনোদনের জন্তই অর্থোপার্জন ইংরাজী কাব্য পাঠ করেন; আমাদের মানসিক অবস্থা, যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালা কাব্য পাঠ করিলে অধিক চিত্তবিনোদন হইত।

ইংরাজী শিক্ষার পর হইতে বঙ্গসাহিত্যের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্বে বাঙ্গালায় যে সকল গান লেখা হইত, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মধ্যে তাহা হস্তাক্রমে প্রচারিত হইত। আর আত্মকাল যে সকল গান লেখা হয়, তাহা মুদ্রিত ইংরাজী-শিক্ষিত শ্রেণী ছাড়াইয়া অতি অল্পদূরে প্রচারিত হয়। অথচ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গানগুলি যে, ভাব-সম্পদে বা ভাবের সৌন্দর্য্যে বর্তমান অপেক্ষা নিয়ে হান পাইবার যোগ্য তাহা নহে। মায়াবাদের জটিল তত্ত্ব, সংসারের অনিত্যতা, পার্শ্ব ঐক্যের অসারতা, ভগবানের অন্বিত্যনীয় মাধুর্য—এই সব মহান ভাবগুলি প্রাচীন গীতিলেখকদের দ্বারা দেশময় এমন সুপ্রচারিত ও সর্বজনবোধ্য করা হইয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। রামপ্রসাদ, দাশরায় ও অন্যরা বৈষ্ণবকবিরের গান বাঙ্গালার পক্ষে যাহা, মুখে প্রাক্তরে, আজিও ধনিত। চাষা লাদল ঠৈলিতে ঠৈলিতে তাহা গাহিতেছে, ভিগারী গৃহস্থের ঘরে গাওয়াই

তাহা শুনাইতেছে, মাঝি নৌকা চালাইতে চালাইতে তাহা গাহিতেছে, আর পণ্ডিত-মণ্ডলীও সভায় বসিয়া তাহা শ্রবণে শ্রবণে শুনিতেছেন। এমনটাই হইতে পারিয়াছিল তাহার কারণ প্রাচীন কবিরের দেশের প্রাণের সহিত যোগ ছিল,—বাঙ্গালীর হৃদয়বীণার তারগুলি কি ভাবে বাঁধা আছে, কি ভাবে তাহা স্পর্শ করিতে হয়, তাহা তাহারা শিখিয়াছিলেন। আজকালকার অধিকাংশ গানগুলি ইংরাজী ভাবে অনুপ্রাণিত; ইংরাজী-শিক্ষিতদের মধ্যে তাহাদের বহুলপ্রচার হইলেও দেশের প্রাণ তাহা কাটিতে পারে নাই। কেবল স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের ও বিজ্ঞানলাল রায়ের কতকগুলি গান দেশের দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। এখন যাহারা লেখক আছেন ও হইবেন, তাহাদের চেষ্টা করিতে হইবে তাহাদের রচনা বাহাতে দেশময় এই ভাবে প্রচারিত হয়। তাহার দ্বারা প্রয়োজন দেশের মানুষেরা, এবং দেশের নিজস্ব ভাষা আয়ত্ত করা। আর প্রয়োজন যে, যে উপায়ে সাহিত্যসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয়, সে উপায়গুলি সম্বন্ধে সতর্কতা করা। যে সব ভিখারী গান গাহিয়া বেড়ায়, যে কবি ও কথক সাহিত্যের মধুরসে শোষণ করিয়া আর্দ্র করে, যে যাত্রার অধিকারী সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং তাহাদের সংস্কার ও সংগঠন করিয়া সমাজোপযোগী করিতে হইবে।

গল্প ও উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য মানব-জীবনের গার্হজনীয় ভাবগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। বাঙ্গালার গল্প ও উপন্যাস লিখিতে হইলে দেশের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যিক।

লেখকেরা শিক্ত ও নগরবাসী লোকবিশিষ্টে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের সহিত পরিচিত করাইতে চেষ্টা করিবেন। যেশের দরিদ্র কৃষকদের স্বপ্ন-দৃশ্য, আশা-আশঙ্কা, উৎসব-বিপদ ইহারা যে কৈনিক জীবন তাহা হইল চিত্রগুলি যত্নসহ ভাবে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করুন,—যাহাকে নিম্নলিখিতা বর্ণিয়াছেন, "that fine ancient poem,—the common life of the common Indian people." যে লেখকেরা পাক্ষাত্য সম্বন্ধে ও জীবন অবলম্বন করিয়া তাহাদের গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন, তাহারা বীথ ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন ও পাঠকদের কচি বিপণ্যমাত্রা করিতেছেন।

মুসলমানদের তুর্কী, পারস্য, আফগানিস্থান আছে; খ্রীষ্টানদের যুরোপ, আমেরিকা আছে; কিন্তু আমাদের হিন্দুদের এই ভারতবর্ষ ছাড়া আর দেশ নাই। সুখে দুখে, উৎসবে বিপদে আমাদের পূর্ণপুঙ্খকর্য এই দেশে সংগ্রহ সহস্র বৎসর কাটাইয়াছেন, এই দেশের প্রতি বুলি কদা পবিত্র, প্রতি বাসিবিন্দু 'অমৃত', প্রতি পবন-হিলোল স্বরাস্বাদ্যকারী। দেশের মঠেশ্বরায় রূপ দেখিতে হইবে, দেশের লোকেরা কি 'ভাবে' জীবন বাপন করে, তাহাদের স্বপ্ন-দৃশ্য, অভাব-আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে, তাহার সহিত সাংস্কৃতিক করিতে হইবে। তাহা যদি না করি, তবে আমাদের বুঝাই জ্ঞানলাভ, বুঝাই আর্থিক উন্নতি। ছাত্রাবস্থা হইতে ইহার অংশীদার কর্তব্য। দীর্ঘ অবকাশের সময় ছাত্রেরা দল বান্ধিয়া বাহির হইয়া পড়ুক, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান দেখিয়া বেড়াক। ইহাতে যে কত বিশাল প্রকারের উপকার হইবে তাহা বলা যায় না। শুধু শরৎচন্দ্রের কথা,—সে খরচ যুব বেশী হইবে না, অধিকাংশ অভিভাবক তাহা

হিতে পারিবেন; তাহারা যেন মনে রাখেন ছেলেরদের জন্ত মূল্যবান কৃত্তা জামা প্রভৃতিতে ব্যয় না করিয়া তাহাদিগকে বেড়াইবার অর্থোগ দিলে তাহারা উপকার ও আনন্দ উভয়ই বেশী পাইবে। এত দীর্ঘ অবকাশের কথা। হুই এক দিনের অবকাশের সময়ও ছাত্রেরা সহরের চারিপাশে ছোট ছোট Excursion করিতে পারিবে, তাহাতে শরীরের উপকার হইবে, মানসিক ক্ষুধি লাভ করিবে এবং পল্লীজীবনের সহিত চাক্ষুঃ পরিচয় হইবে, তাহার প্রতি অস্বরণ করিবে। পল্লীগ্রামে যাইবার যে কোণও সুযোগ উপস্থিত হইবে, তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। পল্লীজীবন সম্বন্ধে যদি আমরা অনভিজ্ঞ থাকি তাহা হইলে আমরা জানিব না কি উপায়ে দেশের সকলের মধ্যে যুতন ভাব প্রচারিত করা যায়, কি ভাবে অশ্বোদলন করিলে তাহা সকল হইবে, দেশের প্রকৃত অভাব কি, কি উপায়ে তাহার মোচন সম্ভব। ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে ভুলিয়া না যাইবে যে, সে সমস্তই বিদেশী; স্বদেশী ওই সব জিনিষ আছে, তাহাই আমাদের মুখ্যজ্ঞান আলোচ্য, বিদেশী বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, আমাদের বিদ্যা সমগ্রতাই ভাবে তাহার আলোচনা গৌণ ভাবে করিতে হইবে। Novel, magazine এবং cheap 6-penny novel কি আগ্রহের সহিত অনেকে পাঠ করেন; প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি সংগ্রহও রাখেন না;—ইহা কতদূর গভীর ক্ষোভের বিষয়। অমথ করিবারা 'ইজ্ঞা' হইলে আমাদের দনী যুক্তিরা প্রথমে যুরোপ ও আমেরিকার কথাই ভাবেন, অথচ তাহারা ভারতবর্ষের বিজিতা শ্রমীরা স্থানীয় অতি অল্পই

দেখিয়াছেন। যে ভারতবাসীগণ, আর কত দিন এ যৌহ আবছ থাকিবে! জাগিয়া উঠ, চক্ষু মেলিও। চাহ,—দেখ তোমাদের দেশ,—সে কি হৃদয়; দেখ তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের স্বদেশবাসীগণকে, তোমাদের পল্লীবাসী কৃষকগণকে,—তাহারা তোমাদের কত নিকট আত্মীয়, কত বিবিধ হুজুর তোমাদের সহিত সম্বন্ধ; আগ্রহের সহিত তোমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য পাঠ কর, দেখ তাহারা তোমাদের জীবনের সহিত কি ভাবে জড়িত, তাহারা তোমাদিগকে কত আনন্দ দিতে পারে, দুখে সাহায্য দিতে পারে, আর পৃথক্গতে তোমাদের পূর্ণপুঙ্খকর্য যে অতুলনীয় কীষ্টি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দেখ। এত বিপুল ধন-সাহিত্য আর কেন, আভিভ

আছে? জীবনের প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক ভাবনাধ, প্রত্যেক সাধনার এমন ধর্মের প্রভাব আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? অনন্ত বৈচিত্র্যময়, অসীম হৃৎ-হৃৎ-বোঝার আকর, সমস্ত দেশ তোমাদের জন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে,—তোমারা একবার হৃদয়ের সহিত তাহাকে গ্রহণ কর, তাহার প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ মিশাইয়া দাও, কিসে সে দেশ প্রকৃত স্বামী হইবে তাহার চেষ্টা কর, কিসে তাহার প্রকৃত অভাব মোচন হইবে সেইরূপ উদ্যোগ কর। মাতৃভূমির প্রকৃত সম্ভান হইবার জন্ত সকল করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও—পরমশ্রমলয় জগদীশ্বর তোমাদের সাহায্য হউ।

শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ।

তসর-শিপ্প

আমাদের দেশের ধনীসভানুরা তসর ও বাদুতার কোট এবং চাদর এবং মহিলারা, তাদের কাপড় ও শাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন; বিবাহ, উৎসব ও পূজাপার্বণাদিতে গরদের বেশের মত তসরেরও বেশ আদর দেখা যায়; গরদের কাপড় তসরের কাপড় অপেক্ষা কিছু বেশী মূল্যবান। তসরও গরদের জায় এক প্রকার কীটজ-তন্ত; তসরকীট গৃহে পালন করা যায় না বলিয়া ইহাকে বনা-রেশের আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে; তসরকীট বনাভাবাপন এবং বাহিরে বৃক্ষশাখায় থাকিয়া পাতা খায় ও রেশ গুটি প্রস্তুত করে; তৎপরে লোকে গুটিগুলি বৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। গর-রেশমকীট তুঁত-পাতা খাইয়া গুটি প্রস্তুত করে; ইহাদিগকে

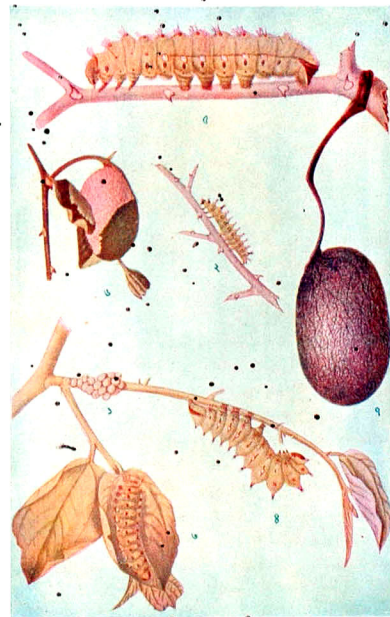
গৃহাভ্যন্তরে পালন করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রকার তসরপোকা দৃষ্টগোচর হয়; ভারতে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার তসরপোকা ব্যবসা ও শিল্পে স্থান পাইয়া থাকে—উঁসল বা মিলিটা অথবা পেম্বিয়া তসর (জাতা, ডাবা, মুগা, লাড়িয়া প্রভৃতি), মুগা-তসর, এতি-তসর, জিহুলা-তসর এবং এটাল ও এমথেরিয়া-রয়েলি তসর। জাপানের ইয়ামামায়ী তসর পোকা হইতে সর্পালেক্ষা উৎকৃষ্ট তসরহর প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ইহা এত কম পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে ইহা জাপানের বাহিরে রপ্তানি হইতে পার্য না। চীনদেশের পেরী তসর বর্ষেই পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতে রপ্তানি হইয়া থাকে। পূর্বে ভারত-

বর্ষের তসর-শিলের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল; ভাগলপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, চাঁইবাগা, ঢাকা, বিলাসপুর, মহবভঙ্গ, গয়া, সিংহদ্বা, মানিকু, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলাতে অর্ধেক পরিমাণে তসর-রেশম উৎপন্ন হইত এবং তৎকালীন তসর-স্বত্বের বস্ত্র প্রস্তুত করতঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও ইউরোপে চালান দিত; কিন্তু আজকাল ক্রমেই এই শিলের অবনতি দেখা যাইতেছে। বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের অনায়াসে এই অবনতির মূল কারণ বলিয়া মনে হয়; কারণ এই শিল নিরক্ষর লোক দ্বারা সাধারণতঃ পরিচালিত হইয়া থাকে; নবাবিকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়-গুলি ইহাদের জানা নাই বলিয়া ইহারা কোনও নতুন প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই শিলের উন্নতি করিতে পারে না। কোথাও, কি ভাবে এবং কত দামে তসর-রেশম বিক্রয় হয় তাহা ইহাদের জানা থাকে না; সুতরাং অনেক সময়ে ইহার কম দামে বস্ত্র ও স্বত্র ইত্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বত্বের বিষয় এই যে আজকাল শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে একটু মনোযোগ দেখা যাইতেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভাবতীয় মিলিটা তসর সম্বন্ধে কিছু বলিব। বিহার, মধ্যভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার কোনও কোনও জেলায় তসর এখনও কুটার-শিল ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। আসন, কুল, শাল, অর্জুন, হরিতকী, বয়ড়া, শিখা, মহুয়া, জিরোল, ঢাক, কুষ্ঠী, জাম, অম্বা, সেতন, বাহাম, সিমুল, কেশ বা দেশী আবদুল প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া তসর-পোকা রেশম দিয়া থাকে; তন্মধ্যে আসন ও শাল গাছে তসর-পোকা পালন করিতে

সুবিধা। বীজ তসর-গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইলে জী ও পুং প্রজাপতির সর্বমের পর-দ্বী-প্রজাপতিগুলি ভিন্ন প্রসব করে; এই ভিন্ন ঘরে ১০১২ দিন থাকিলেই সূচিয়া ছোট ছোট তসর-কীট বাহির হয়। কীটগুলিকে উপরিকবিত যে কোনও গাছের শাখায় রাখিয়া দিলে ইহারা গাছের পাতা খাইয়া ৪০ হইতে ৬০ দিনে ৪ বার খোলস রদলাইয়া প্রায় ৩১-৪ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হয় ও তৎপরে ২৩টা পাতার মধ্যে গুটি প্রস্তুত করতঃ উহার মধ্যেই মূলকীটে পরিণত হয়। মূলকীট সহ গুটিগুলি বৃক্ষ হইতে আহরণ করিয়া আনা হয় ও কিছু বীজের জন্ত রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বিক্রয় কিংবা কাটাই করা হয়। এই বীজ-গুটি বা কোষ হইতে মূলকীটগুলি প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং জী ও পুং প্রজাপতির সর্বমের পর পূর্বের জায় ভিন্ন প্রসব করিয়া মরিয়া যায়; প্রজাপতি অব্যায় ইহারা কিছুই খায় না; গুটি হইতে বাহির হইবার ৩৭ দিনের মধ্যেই ইহারা স্বভাবতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কতকগুলি গুটি গাছেই থাকিয়া যায়; এই গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া গাছের উপরে ভিন্ন দেয় ও তৎপরে তসর-কীট সূচিয়া বাহির হয় ও পাতা খাইয়া গুটি প্রস্তুত করে; এই গুটিগুলিকে বন্য তসর-রেশমগুটি বলা যাইতে পারে। তসর-গুটি হইতে একটি প্রায় ৪০০০০ হাত দীর্ঘ অপরিচ্ছিন্ন স্বত্র বাহির হয়; ৩৫টা গুটির স্বত্র একত্র করিয়া ইহাগুলিকে কাটাই করা হয়। মুখ খোলস গুটি হইতে (অর্থাৎ যে গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া গিয়াছে) একটি অপরিচ্ছিন্ন স্বত্র পাওয়া কষ্টকর; সাধারণতঃ এই গুটিগুলি তুলার মত দুনিয়া ও পিঁয়াজ স্বত্র প্রস্তুত করা হয়। কাটাই

পেফিয়া তসর রেশম কীট

চিত্র পার্চয়।



১ম চিত্র ভিন্ন। ২য় চিত্র ৮৪ দিনের শুককীট। ৩য় চিত্র ১০১২ দিনের শুককীট। ৪র্থ চিত্র ২০১২ দিনের শুককীট। ৫ম চিত্র পূর্ণাঙ্গর শুককীট। ৬ম চিত্র কুল গাছের তসরগুটি। ৭ম চিত্র বৌটা সাহিত তসরগুটি।

করা হয়, স্থায়ী স্থিতিস্থাপক, মৃৎ, চকচকে ও বেশী মূল্যবান; এই জন্তই বীরঙটি রাশিয়া অবশিষ্ট গুটিগুলি, কোঁড়ে কিংবা বাস্পে ভাপাইয়া গুটির মধ্যস্থিত ইয়ে বা মূলকীট-গুলি মারিয়া ফেলা হয়। আদিকাল মৃৎ-খোলা গুটি হইতে কাণপূর ও বোম্বোনে কলের সাহায্যে বেশ মিহি হয় প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু ইহাতে অনেক দমি ও জটিল কল-কজার আবশ্যক।

প্রতি বৃন্দর প্রায় ১০০,০০০ সের তসর ভারতবর্ষ হইতে ইতালি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে রপ্তানি হইয়া থাকে। মধ্যভারতবর্ষ, বৈহার ও উড়িষ্যা, বাঙ্গালী এবং মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে সাধারণতঃ তসর-গুটি রপ্তানি হয়; বিহার ও বাঙ্গালী হইতে কিছু কাপড় ভারতের অন্যান্য স্থানে ও ইউরোপে চালান হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় বাঁহুড়া, বীরচুয়, মেলিনী-পুর, বর্ধমান ও হুগলী জেলাতে কিছু কিছু স্থায় কাটাই এবং বরদবন হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের ব্যবসায়ীরা গিরিবি, রাগীগুণ, সাঁওতাল পরগণা, সিংহচুয়, মানচুয়, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে গুটি ক্রয় করিয়া লইয়া আইসে ও তৎপরে কাটাই করিয়া বরন করে। কোনও কোনও স্থানে তসর রঞ্জনও হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার মিলিট-তসর কাট দেখা যায়, যথা:—মুগা, জাতা, ভাবা, লাড়িয়া, বগুই ইত্যাদি। কোনও জাতি বর্ণ-একজাত আবশ্যক কোনও জাতি বর্ণ-দ্বিজাত অর্থাৎ প্রপশেক তসরের ভিন্ন প্রতি বৃন্দর একবার মাত্র ফুটে, আর শেষোক্ত তসর-কাটের ভিন্ন প্রতি বৃন্দর দুই বার ফুটে। শেষোক্ত তসর-প্রজাপতি জুন ও জুলাই মাসে বাহির হইয়া প্রায় ৩০০০ ঘণ্টা পরে ভিন্ন দেখ; এ

ভিন্ন ৮১০ দিনের মধ্যেই ফুটিয়া থাকে; এই কাটগুলি প্রায় ৪০ দিন পরে গুটি প্রস্তুত করে এবং উহার ১৫২০ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া ভিন্ন দেখ; এই ভিন্ন ৯১০ দিন পরে ফুটে ও কাটগুলি অক্টোবর মাসে গুটি প্রস্তুত করে; এই গুটিগুলি হইতেই পরবর্তী জুন বা জুলাই মাসে প্রজাপতি বাহির হয়। প্রথমোক্ত তসর-প্রজাপতি অক্টোবর মাসে বাহির হয় ও ৩৭৪০ ঘণ্টা পরে ভিন্ন প্রসব করিয়া ১০১১ দিন পরে ফুটিয়া থাকে; এই কাটগুলি ফেব্রুয়ারী মাসে গুটি প্রস্তুত করিয়া পরবর্তী অক্টোবর মাস পর্যন্ত গুটির মধ্যে মূল-কাট অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তী অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে প্রজাপতি হইয়া ভিন্ন প্রসব করে। কোনও জাতি জুলাই মাসে ভিন্ন প্রসব করে; এই ভিন্নগুলি ৮১০ দিনের মধ্যে ফুটে এবং কাটগুলি প্রায় দুই মাস পাতা রাইয়া গুটি প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে মূলকাট অবস্থায় পরবর্তী জুলাই মাস পর্যন্ত থাকে।

তসর-গুটি ভিক্ষাকৃতি ও ধূসরবর্ণ; গুটি-গুলি জাতিভেদে বড়-ছোট হইয়া থাকে এবং এক প্রান্তদেশে একুটি লম্বা বৌটা বিশ্রামান থাকিয়া বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন থাকে। বীজ-গুটিগুলি ঘরের মধ্যে খোলা জায়গায় স্থলাইয়া রাখা হয়। যে বা জুন মাসে বৈশাখবেলা চারটা হইতে সকাল ছয়টা পর্যন্ত প্রজাপতি-গুলি কাটিয়া বাহির হইতে থাকে; পুং-প্রজাপতিগুলিকে উড়িয়া যাইতে দেখা হয়, আর স্ত্রী-প্রজাপতিগুলির পাখা পাতা দিয়া বান্ধিয়া দিয়া রাত্রিতে বাহিরে কোনও বৃক্ষের শাখায় উপরে বা খোলা জায়গায় রাখা হয় অথবা স্থতা দিয়া ইহাদের পা বান্ধিয়া গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়; রাত্রিতে বহু পুং-প্রজাপতি আসিয়া ইহাদের সহিত

সংযোজিত হয়। পুং-প্রজাপতিগুলি তদা
যারা স্ত্রী-প্রজাপতির অবহান অনেক দূর
হইতে বুঝিতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা
গিয়াছে যে, যে সকল পুং-প্রজাপতি ঘর
হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় সাধারণতঃ
সেগুলি ফিরায়া আসে না। বহু পুং-প্রজাপতি-
গুলি ঘরের প্রজাপতি অপেক্ষা বলবান;
কিন্তু এগুলি নিকট জাতীয় হইলে ভিন্ন,
কাঁট ও গুটিগুলিও কিছু ছোট হইয়া
থাকে। সংযুক্ত হইবার প্রায় ২০২৫ ঘণ্টা
পর পুং-প্রজাপতিগুলিকে বিযুক্ত করিয়া
কেলিয়া দিতে হয়, আর স্ত্রী-প্রজাপতিগুলিকে
বাপের টুকরোতে রাখিয়া দিলে ২৩ রাশে
১৫ হইতে ১৭০ সন্ধ্যার মত ছোট সাদা
ভিন্ন প্রসব করে। সংযুক্ত হইবার পূর্বেই
স্ত্রী-প্রজাপতির ডিম্বকোষে ভিন্নগুলি বর্তমান
থাকে; সংযুক্ত হইলে ভিন্নগুলি হয়;
সংযুক্ত না হইলে স্ত্রী-প্রজাপতিগুলি ভিন্ন
প্রসব করে বটে, কিন্তু ভিন্নগুলি বাওয়া হয়
অর্থাৎ ফুটে না। অনেকগুলি স্ত্রী-প্রজাপতি
সংযুক্ত হইবার পর এক টুকরোতে রাখা
যাইতে পারে এবং প্রত্যেক টিনের ভিন্ন
পৃথক রাখিয়া দেওয়া ভাল; প্রথম রাশের
ভিন্ন হইতে নীরোগ ও বলবান কাঁট হইয়া
থাকে। যদি বেশী ভিন্নের প্রয়োজন না
থাকে, তবে কেবল প্রথম দিনের ভিন্ন পালন
করিবার জ্ঞান থাকিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া
হইতে পারে। পাতার দোনা করিয়া প্রায়
৭০৮০ টি ভিন্ন উড়াতে রাখা হয়। প্রায় ৭৮
দিন পরে ভিন্নের রং কফাভ হয় ও তৎপর
দিন প্রাতঃকালে ভিন্ন হইতে কাঁটগুলি ফুটিয়া
বাহির হইতে থাকে। নবজাত কাঁটগুলি
অনেকটা ধূসরবর্ণের হয় ও উহাদের দেহ
লোমে পরিপূর্ণ থাকে। দোনা সহিত কাঁট

গুলি পাছের নরম শাখায়, রাখিয়া দিলে
উহারা নরম পাতা খাইবার জন্ত শাখায় উঠিয়া
যায়; পাতা বেশী না থাকিলে, প্রতি শাখায়
১০২০ টার বেশী কাঁট রাখা সম্ভব নহে, কারণ
বড় হইলে ইহারা সমুদয় পাতা খাইয়া নিশেষ
করিয়া ফেলে এবং তখন উহাদিগকে শাখা-
গুলি, কাটিয়া অত্র পত্রযুক্ত শাখায় রাখিয়া
দিতে বেগ পাইতে হয়। কাঁটগুলি আপনা
হইতেই পাতা খাইয়া বড় হইতে থাকে;
৫৬ দিন পর্যন্ত পাতা খাইয়া ইহারা
প্রথম কলপে যায় অর্থাৎ ইহারা প্রায়
২৫৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাতা খাওয়া বন্ধ
করে ও পচাতের পা দিয়া কৃষ্ণাখার পত্র
শক্ত করিয়া ধরিয়া নিশ্চল ভাবে থাকে,
তৎপরে উপরকার চামড়া বা খোলস ফেলিয়া
থায়। খোলস ছাড়ার পর ইহারা আবার
প্রায় দ্বিগুণ হয়, অনেকটা সজ্জাভা প্রাপ্ত হয়
ও দেহের লোমের সংখ্যাও অনেকটা কমিয়া
আসে; তৎপরে পুনরায় পাতা খাইতে থাকে
এবং নবম কিছু দিনে দ্বিতীয় কলপে
মায়; প্রায় দুই দিন পাতা খাওয়া বন্ধ করিয়া
নিশ্চল অবস্থায় থাকে ও তৎপর খোলস ছাড়ে
ও পাতা খাওয়া আরম্ভ করে। ফুটিবার ২০২১
দিন পরে ইহারা তৃতীয় কলপে যায় এবং প্রায়
তিন দিন পাতা খাওয়া বন্ধ করিয়া নিশ্চল
অবস্থায় থাকে এবং তৃতীয়বার খোলস ছাড়িয়া
পুনরায় পাতা খাইতে থাকে। এখন হইতে
ইহাদের দেহের রং গাঢ় সবুজবর্ণের হয় ও
স্থানে স্থানে সোণালি রঙের চিহ্ন দেখা যায়।
ফুটিবার প্রায় ৪৭৪২ দিন পরে ইহারা চতুর্থ
কলপে যায় ও পাতা খাওয়া বন্ধ করে; প্রায়
চারদিন নিশ্চল অবস্থায় থাকিয়া ইহারা
চতুর্থবার খোলস পরিবর্তন করে এবং
তৎপরে প্রায় ৯১০ দিন পর্যন্ত পাতা খায় ও

পেফিয়া তরঙ্গ প্রজাপতি।

চিত্র পরিচয়।



১ম চিত্র স্ত্রী প্রজাপতি
২য় চিত্র পুং প্রজাপতি।

প্রায় ৩২ ইকি পরিমাণ লম্বা হইয়া পাতা পাওয়া একেবারে বন্ধ করে ও মুখ দিয়া স্থান নির্গত করিতে থাকে ও গাছের ডালে একটি বোটা প্রস্তুত করতঃ ২৩টি পাতার মধ্যে স্থতা জড়াইতে থাকে এবং তৎপরে নিজের বেহুঁ চারি ধারে স্থতা জড়াইতে থাকে এবং দুই দিনের মধ্যেই একটি ভিনাকৃতি ছেয়ে বন্ধের গুটি প্রস্তুত করিয়া ফেলে এবং ৩৭ দিন পর গুটির মধ্যে ইয়ে বা মুখকোটে পরিণত হয়। রেশম কীটগুলি ইয়ে, প্রজাপতি এবং ভিনাবস্থায় কিছুই খায় না। বোটা মুহিত গুটিগুলি বৃক্ষ হইতে আঁঠে লাগে আহরণ করিয়া ঘরে টুকরীর মধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। গুটিগুলিতে আখাত লাগিলে উহাদের মধ্যস্থিত ইয়েগুলির অনিষ্ট হইতে পারে। বড় ও ভাল গুটিগুলি বীজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ৩৬ দিন পর্যন্ত বোজা রাখিয়া মারিয়া ফেলিতে হয়; নতুবা ১০১১ দিন পরে প্রজাপতিগুলি গুটি হইতে নির্গত হইয়া স্বতন্ত্রে অনবচ্ছিন্নতা নষ্ট করিয়া দেয়। নাগপুর অঞ্চলে এই সময়ের গুটিগুলিকে আমপতিয়া বন্ধের গুটি বলে। এই গুটিগুলি কিছু ছোট হয়। সমাপতিয়া বন্ধের বীজকোষ বা গুটিগুলি রাখিয়া দিলে প্রায় ২০২৫ দিন পর প্রজাপতি বহির্গত হয়; ইহারা পূর্বের দ্বায় সংযুক্ত হইয়া ডিম প্রসব করে ও ডিমগুলি ১১০ দিন পরে ফুটে, এই কীটগুলি ৪ বার কলপ ছাড়িয়া প্রায় ৭০৭৫ দিনে বৃক্ষের শাখাতে গুটি প্রস্তুত করে; পূর্বাবস্থায় ইহারা প্রায় ৪২ ইকি পরিমাণ লম্বা হইয়া থাকে এবং গুটিও বেশ বড় বড় প্রস্তুত করে। এই বন্ধে নাগপুর অঞ্চলে বহাতি-বন্ধ বলা হয়। এই গুটি হইতে পর বৎসর জুন মাসে প্রজাপতি নির্গত হয়।

লাড়িয়া জাতীয় বীজকোষ বা গুটি হইতে বৎসরে একবার মাত্র প্রজাপতি বাহির হয়। আগষ্ট মাসে প্রজাপতি বাহির হইয়া পূর্বের দ্বায় সংযুক্ত হইয়া ডিম পাড়ে। এই ডিম ৭১০ দিনের মধ্যে ফুটিয়া কীট বাহির হয় ও কীটগুলি অক্টোবর মাসে গুটি প্রস্তুত করে; এই গুটি হইতে পর বৎসর আগষ্ট মাসে প্রজাপতি বাহির হইয়া থাকে।

বগুই জাতীয় বীজকোষ বা গুটি হইতে অক্টোবর মাসে প্রজাপতি বাহির হয় ও তৎপরে পূর্বের দ্বায় সংযুক্ত হইয়া ডিম পাড়ে; এই ডিম ১০১২ দিনের মধ্যেই ফুটিয়া যায়; এই কীট পাতা খাইয়া ক্ষেত্রভারি মাসে গুটি প্রস্তুত করে; এই গুটি হইতে পর বৎসর অক্টোবর মাসে প্রজাপতি নির্গত হয় ও ডিম পাড়ে। শীতের সময় পোকাকুলির পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে বহা ও অজ্ঞাত সময় অপেক্ষা বেশী দিন লাগে।

তসর-গুটিগুলি পাতার সঙ্গে থাকে বলিয়া প্রায় দেখা যায় না; গুটি সংগ্রহ করিবার সময় গাছের নীচে দেখিতে হয়; যদি গোল-মরিচের মত কাল কাল দর্শ্য দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ গাছে তসর-কীট বা গুটি আছে। তসর-কীট বড় হইলে ইহাদের বিঠা প্রায় গোলমরিচের মত দেখায়; জলে ভিজিলে এই গুটি আরও ফুলিয়া যায় ও বড় দেখায়।

তসর কীটের শত্রু

তসর কীটগুলি গাছের ডালে ছাড়িয়া দিবার পর আর তেমন যত্ন লইতে হয় না; তবে ইহাদের অনেক স্বাভাবিক শত্রু আছে। ইঁদুর, বাঘ, টিকি, বোলা, ভূমর, কাক, পিপীলিকা, মাছি প্রভৃতি ইহাদের স্বাভাবিক শত্রু। কীটগুলিকে এই সকল শত্রু

হইতে রক্ষা করা কষ্টকর; তবে ইহার।
খাইয়া বাধা থাকে তাহাতেও বেশ দুঃখসা-
পাওয়া যায়। সাঁওতাল, কোল, হো প্রভৃতি
জাতিরা সাধারণতঃ জ্বলে এই পোকা পালন
ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে; ইহার। তীর-
মুখ হস্তে ঘূরিয়া বেড়ায় ও পানীগুণি
তাড়াইয়া থাকে; একজন লোক এক্ষেপে
অনেক পাছের পোকা রক্ষা করিতে পারে।
পিপীলিকা মারিবার একটি সহজ উপায়
আছে—নবজাত কীটগুলি পাছে ছাড়িবার
পূর্বে পাছের গোড়ায় কিছু খাবার জিনিস
রাখিলে বৃক্ষ হইতে যখন পিপীলিকাগুলি
নামিয়া আইসে, তখন উহাদিগকে আনন্দে
মারিয়া ফেলা যাইতে পারে। এক কুম
মাটি তসর-কীটের উপর ভিম পাড়ে; এই
ভিম সূচিয়া ইহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ
করতঃ উহার মাংসপেশী ও তৈলাক পদার্থ
বাইরা বহিত হয় ও প্রায় ২২১৩ দিনের
মধ্যেই তসর-কীটকে মারিয়া বাহির হয়;
ইহার প্রায় ১১১২ দিন পরে পূর্ণাবয়ব মাটি
হইয়া থাকে।

বীজ-তসর-গুটি.

ক্রমান্বয়ে ২১৩ বসর পর্যন্ত এক স্থানের
বীজ-গুটি হইতে তসর-পোকা পালন করিলে
ইহার। নিম্নেজ হয় ও ইহাদের রোগপ্রবণতা
বৃদ্ধি হয়; হুতরাং কোনও দূর দূরে হইতে
মধ্যে মধ্যে বীজ-কোষ আনা উচিত; অথবা
জ্বলে বজাবস্থায় তসর-কীট যে গুটি প্রস্তুত
করে, এই গুটিগুলি সংগ্রহ করিয়া বীজের জু
রাখিয়া দেওয়া সম্ভব; বহু তসর প্রজাপতি-
গুলি বড় ও ভাল জাতীয় হইলে ফল বেশ
ভাল হইয়া থাকে। বীজ-তসর-গুটি এক
স্থান হইতে অল্প স্থানে লইয়া আসার নাম
যোয়ার বদল। যোয়ার বদল করিলে কোনও

স্থানের নিম্নেজ তসর-কীটও স্থানান্তরে যাইয়া
সবল হইয়া থাকে ও বড় বড় তসর-গুটি
প্রস্তুত করে; নুতন 'আবহাওয়া' পাইলে
ইহার। বেশ বৃদ্ধি পায় ও ইহাদের রোগ-
প্রবণতাও কম হয়। অনেক বীজ-কোষ-
গুটি স্থানান্তর হইতে আনা কষ্টকর ও ব্যয়-
সাধ্য-বলিয়া ক্রমান্বয়ে এক স্থানের বীজ-গুটি
হইতেই ভিম লইয়া থাকে; হুতরাং কীট
অবস্থায় ইহাদের পোকাগুলি নানা রোগে
মারা যায় এবং গুটিও ভাল প্রস্তুত করে না।
তসর-শিল্পের অবনতির ইহাও অসহ্য কারণ
বলী যাইতে পারে।

তসর পোকার ব্যাধি.

অন্যুষ্টি হইলে তসর-পোকা ভাল বৃদ্ধি
পায় না এবং নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া
মারা যায়; আবার অন্যুষ্টির পর হঠাৎ
অতিবৃষ্টি হইলেও ইহাদের মহামারী উপস্থিত
হয়। বর্ষাকালে তসর-পোকা পালন করাই
প্রশস্ত। তসর-পোকা সাধারণতঃ চিন
প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়:—(১) রস, (২)
কালশিরা, (৩) কটা।

(১) রস রোগ:—কয়েকদিন পর্যন্ত
অতিবৃষ্টি হইলে বসর-কীটগুলি ভিজা পাতা
খাইতে বাধ্য হয় এবং ইহাদের শরীর সুলিয়া
গিয়া ১০১২ দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত
হয়। এ রোগের জীবাণু অহুবীক্ষণ-যন্ত্রে
৫০০-৬০০ গুণ বর্দ্ধিত করিলে ৫ হইতে
৭ কোটিবিশিষ্ট দেখায়; এই অণুগুলি বহু
কোটিবিশিষ্ট দানা বিশেষ প্রজাপতি অবস্থায়
এই রোগ দেখা যায় না; এই রোগ
পুরুষাভ্যুক্রমিক ব্যাধি নহে।

(২) কাল-শিরা রোগ:—তসর-কীটগুলি
নরম পাতা অভাবে খুব কড়া পাতা এবং
ময়লা ও গুলি-পরিপূর্ণ পাতা খাইলে এই

রোগে দ্বারা আক্রান্ত হয়; অন্যুষ্টি ও
বীজাধিক্য বশতঃ এই রোগে দ্বারা আক্রান্ত
নিম্নেজ প্রজাপতির ভিম পালন করিলেও
কীটাবস্থায় এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত
হইবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা এক প্রকার
উদারায় রোগ; এই রোগে হইলে পোকা-
গুলি ক্ষীণদেহ হয়; কখনও খুব দীর্ঘা বমি
করে এবং কখনও বা ইহাদের বিষ্ঠা পাতলা
হয়। এই রোগে দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহার।
৮১০ দিনের মধ্যেই মারা যায়; এই রোগের
জীবাণুগুলি অহুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে
৫০০-৬০০ গুণ বর্দ্ধিত হইলে খুব ছোট ছোট
বিপর্যয় মত দেখায়; কখনও বা অনেকগুলি
সংক্রামক।

(৩) কটা রোগ:—কটা রোগ এক প্রকার
পুষ্টিহীনক্রমিক ব্যাধি; নিম্নেজ কীট পালন
করিলে অথবা কোনও কাগজবস্ত্র: কীটগুলি
নিম্নেজ হইলে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত
হয়। এই রোগে কীট-অবস্থায় হইলে ইহা
বা মূলকীটে এবং তৎপরে প্রজাপতিতেও
দেখা যায় এবং ভিন্ন-বসর করিলে ভিন্নের
ভিতর ও তৎপরে ভিম ফুটিলে নবজাত
কীটেও পরিলক্ষিত হয়। এই রোগে
আক্রান্ত হইলে পোকাগুলি শীঘ্র মরে না
বটে, কিন্তু ক্রমেই ইহার। নিম্নেজ হইয়া
যায় এবং ৫৪ পুষ্টি পর ইহাদের মধ্যে
মহামারী উপস্থিত হইয়া প্রায় সব পোকাই
মারা যায়। অহুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে
৫০০-৬০০ গুণ বর্দ্ধিত করিলে এই রোগের
জীবাণুগুলি অনেকটা ভিলের মত দেখায়।
এই অণুগুলি খুব চাকচিক্যশালী। ভিম
প্রসব করিবার সময় প্রত্যেক স্ত্রী-প্রজাপতি-

গুলি দ্বতন্ত্র রাখিয়া ভিম প্রসব করিবার পর
প্রত্যেক স্ত্রী-প্রজাপতি হইতে একটু রস
লইয়া অহুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করতঃ রোগের
বীজাণু দৃষ্ট হইলে সব ভিমগুলি নষ্ট করিয়া
দিতে হয়। তারপর বহু ও সবল প্রজাপতির
ভিম (যে প্রজাপতির রসে রোগের জীবাণু
দৃষ্টগোচর হয় না) রাখিয়া পালন করিলে
ভাল ফল পাওয়া যায়।

তসর-কীট সম্বন্ধে অথবা এটি ও গদ্য
রেশম সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য
থাকে, তবে আমার নিকট নিয়মিত
টিকানায চিঠি লিখিলে তাহার সম্বন্ধের
আগবহের সহিত দিয়া থাকি। এই প্রবন্ধে
আমি অতি সহজ ভাষায় তসর-কীট পালন
সম্বন্ধে বলিয়াছি। ভবিষ্যতে তসর-শু-
কটিই ও রজন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিবার
বাসনা রহিল। তসর-কীটের উপযোগী শাখা
বৃক্ষ থাকিলে অন্যান্যে যে কেহ এই প্রবন্ধ
পড়িয়া তসর-কীট পালন করিতে পারেন।
বলা বাহুল্য যে, তসর-কীট গরম ও এটি
কীটের জায় গৃহভ্যন্তরে পালন করা যায় না।
আমি গত বৎসর বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া
প্রায় ২০০টি তসর-কীট ঘরের মধ্যে পালন
করিয়াছিলাম; তন্মধ্যে ২০টি মাত্র গুটি
প্রস্তুত করিয়াছিল। অবশিষ্টগুলি কীটাবস্থায়
মারা গিয়াছিল। তসর-কীট খুব বহুভাবাপন্ন,
উঁচু পাহা না হইলে ইহার। তেমন বৃদ্ধি পায়
না এবং ঘরের মধ্যে পাতা ও ভাল করিয়া
খায় না। ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে এবং
চীন-জাপানদেশীয় তসর-কীট-পালন সম্বন্ধে
কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমন্মথনাথ দে,
এগ্রিকালচারল কলেজ, পুনা।

বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিদের স্থান *

সাহিত্য মানবজন্মের ভাবসমূহের অভিব্যক্তি। সাহিত্যিকের জন্মকল্প হইছে, যে হৃদিতা ও উদ্ভাবনের প্রবল নিগূঢ় হয়, তাহারই পুণ্যধারা শুক সমাজক্ষেত্রের অবজ্ঞান ও মলিনতা দূর করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে। তখন সেই উদ্ভাবনসমূহের জ্বালনক্ষেত্র শত শত লোককে আনন্দে বিভোর করে, আর ঐ পুণ্যধারাও নিজে অমরত্ব-সাগরে ধাবিত হয়। গ্রন্থকারের নিতৃতকলের নীরব ভাষা তখন স্পষ্ট হইয়া উঠে, আর সেই ভাষা সমাজে পনিহত হইয়া উদ্ভটভাবগুলিকে কার্ণে পরিণত করে। তখন সমাজ নূতন শক্তিতে ও নূতন ভাবে অঙ্গপ্রাণিত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে নিষ্কর গৌরবময় কার্য অঙ্কিত করিয়া উত্তরকালীন জ্ঞানসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সমাজ কালসমূহের তাহে যে পলায় রাখিয়া যায়, তাহারই অঙ্গস্বরণ করিয়া সত্য মর্ম্ম সমাজ নবীন প্রাণ পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তখন সাহিত্য আবার সমাজের সেই ছবি আমাদের সমুখে ধরিয়া দেয়। তখন সাহিত্যে সমাজ প্রতিবিমিত হয়। তাই আমরা সাহিত্য ও সমাজে যাত্ৰাপ্রতি-যাত্ৰে সাক্ষ্য পাই। সত্য বটে, সাহিত্যিক উন্নত এবং সঙ্গলময় বিষয়ের দিকে সমাজের চিন্তাধারা প্রবাহিত করিয়া নিষ্কর কর্তব্য-সান করেন, কিন্তু অপরপক্ষে তিনিও তৎকালীন সমাজের পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া তখনকার সমাজের কার্যাবলী দ্বারা অনেকটা

অঙ্গপ্রাণিত হন। সেই কারণেই বোধ হয় এলিজাবেথের গৌরবময় কার্যসমূহের ফল নিলটন ও সেক্সপিয়র। তাহি আমরা সাহিত্যের মধ্য দিয়া গ্রন্থকারের সমাজমণ্ডিক সমাজের চিত্র দেখিতে পাই এবং তিনি সমাজে ভাবের যে উদ্দীপনা আনিয়া দেন, তাহাও দেখিতে পাই। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলেও উক্ত সত্য প্রতীয়মান হইবে।

রস সাহিত্যের প্রাণ। রসের অবতারণা না করিলে সাহিত্য জমিয়া উঠে না। আর রসের প্রধান উপকরণ সৌন্দর্য্যবোধ। সৌন্দর্য্যের যতই নাড়াচাড়া হইবে, ততই রস যেন উথলিয়া উঠিবে। রসপট্ট করা সংসারে বহু ভাগ্যান্বিতের অঙ্গুষ্ঠেই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু রস উপভোগ্য অংশুমানপক্ষে ইংরাজিতে একটি কথা আছে—A poet is born and not made. এই কথাটির মধ্যে অনেকখানি সত্য বিদ্যমান আছে। সৃষ্টিচাতুর্য্য যেন স্বভাবের প্রেরণাভেদে হয়, কিন্তু রসোপভোগ সাধনা-সাপেক্ষ। যে সৌন্দর্য্য রসের প্রধান উপকরণ, তাহার সযাক অঙ্গুষ্ঠিত না হইলে, রসেরও সৃষ্টি হয় না। স্বকোমল গুণকণপনিত শয্যায় রাখিতে হইয়া রাজা যে সৌন্দর্য্য অঙ্গুষ্ঠিত করিতে পারেন না, সমাজ ক্রমক হয়ত অগম ভূমিতে শয়ন করিয়া তাহা সযাক উপলব্ধি করিতে পারে। সৌন্দর্য্যবোধে মহরষের বিকাশ হয়। সৌন্দর্য্যবোধে যতটা সৃষ্টি উঠে, রসজ্ঞানও তত বাড়িতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহরষেরও অনেকটা সৃষ্টি

হয়। সৌন্দর্য্য ত চতুর্দিকেই ছড়ান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার উৎকলিত করিতে হইলে অংশুমান আবশ্যক। ললিত সাহিত্যে সেই অংশুমান অনেকটা সহায়তা করে। মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে রসপট্ট ত দূরের কথা, রসাত্ত ভরের ক্ষমতাও অতি অল্প। তথাপি সামাজ্য অংশুমান করিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে তাহা একটু রসসাধন করিয়াছি, তাহাই আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিব।

যখন বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে যদ্যাকারে আবৃত ছিল, তখন বৈষ্ণব কবিগণই আলোকসুন্দর্য্যে বিরাজ করিয়া এই সংসার-সাগরের কতগুলি পথপ্রান্ত নাবিককে সুরূপ দেখাইয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া গিয়াছেন। যখন বঙ্গভাষা মাতৃকোড়ে অস্বস্তি, যখন কেবলমাত্র তাহার মুখ ফুটিতেছে, সেই সময়েই বৈষ্ণব কবিগণ মহরষজন্মের রক্তিসমূহের বৈষ্ণব হৃদয়ত বিমোহন করিয়াছেন, তাহা আজকালকার এই বঙ্গপ্রান্ত বঙ্গভাষায়ও বিরল। তাঁহাদের সাহিত্য, সমালোচনার কটীপাথরে বিস্তৃত বলিষ্ঠ প্রাতিপদ হইবেই, পরন্তু উহা ভক্তের অমৃত ও জীবনরস এবং এই কথা-কঠোর সংসারে শান্তির উৎস। তাঁহার প্রেম ও ভক্তির পুণ্যসলিলসিকনে পাষণ প্রাণেও ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছেন, মক্ষক্ষেত্রেও ওয়েসিসের সৃষ্টি করিয়াছেন, নিরাশের ঘর্ষাক্ত কলেবরে ক্ষতিকে শীতল-হার গাথিয়া পরাইয়াছেন। তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নিয়ন্তরের মন্দহ নাই, কিন্তু সেই নিয়ন্তরের ভাষা না হইলে প্রাণের অগ্নির প্রকাশিত হয় না, জ্বরের ভাবসমূহের হৃদয়বিমোহন হয় না। তাই সেই ভাষা যখন করিয়া তাঁহারা যে যে পূর্ণ-রসচন্দ্রের আবির্ভাব করাইয়াছেন, তাহার

সিদ্ধ জ্যোতিতে কত পাপী তাপীর জ্বরের অঙ্গকার দূর হইয়া গিয়াছে—কত জন্ম-সাগর আনন্দে উৎফলিত হইয়া উঠিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্য এবং ধর্ম্মের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহার মাহুষের মধ্য দিয়া ভগবানের স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে চায়। ভগবানকে একটা অচিন্ত্য বিরাট ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর বলিয়া দূরে রাখিতে চানে না। নিজেদের মধ্যে আনিয়া নিখিল রসমুষ্টির আধার সেই পরম প্রেমিককে আপনার জন করিতে চায়। যেখানে যত ভয়, সেইখানে প্রেমের সম্পর্ক, ততটা দূর হইয়া যায়। প্রকৃত প্রেমে ভয়ের মাত্রা প্রায় থাকেই না। তাই বৈষ্ণব-কবির পিতা, মাতা, সখা, স্বামী, জী প্রভৃতির মধ্য দিয়া লীলাযের লীলা-বিকাশ দেখিতে চান। ইহাতে আমরা প্রেমের আধারকে আপনার করিয়া অতি উত্তমরূপে আশ্রয় করিতে পারি। এই জহই যখন অর্জুন ভগবানের বিরাটরূপ দর্শন করিলেন, তখনই ভীতচিন্তে বলিলেন—

“সংযতি মম্বা প্রমদত যজ্ঞকং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সংযতি।
অজ্ঞানতা মহিমানং তৎবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি হ
যত্নাৎ বহুসার্মসংকৃতোহসি
বিহারশ্যাসনভোজনম্।
একোহধবা প্যাত্য তৎসমক্ষং
তৎ কাময়ে স্বামহমপ্রমেয়ম্।”
তখন যে বিরাটপুরুষকে হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সংযতি বলিয়া আচ্ছাদিত দেখাইয়াছেন, যাহাকে শয়নে, উপবেশনে, পরিহার্য্য অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অতি সম্মুখে কমা চাহিতেছেন। কিন্তু ভক্তের নিকট এই মূর্তি ভাল লাগে না, ভক্ত

এই বিরাটরূপে প্রেমের সেই আশ্রয় পান না।
তাই বলিতেছেন—

“কিরীটিন পদিন চরুহন্ত-
মিচ্ছামি আং অষ্টমং তথৈব।”

তখন ভগবান—

“ব্যপ্তভীঃ প্রীতমনাঃ পুনঃস্ব-
তদেব মে রূপদ্বিঃ প্রপশ্য।”

বলিয়া অর্জুনকে আশ্বাস দিলেন।

বৈষ্ণব কবিতা এই তত্ত্বই ‘মানে’ মধুরভাবে
দেখাইয়াছেন।

বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে একটা constructive
element বা গড়িয়া তুলিবার উপাদান
আছে। এই ধর্ম, প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া
নধে, কিন্তু প্রবৃত্তির, অতিব্যক্তিকে ক্রমশঃ
আধ্যাত্মিকতার দিকে লইয়া যাইতে চাহে।
স্বভাবকে উপেক্ষা করিয়া একটা অতি-
মানবিক আশ্রয়ের অহুসন্ধানের ব্যাপ্ত থাকিলে
তাহার প্রতিক্রিয়া বিপরীত ফলই প্রসব
করে। বিষয় ছাড়িয়া বিবাহকে ধর্মিতে
যাওয়া, মাছুষ ছাড়িয়া মহুষ্যের পশ্যাৎ
ধাবনা করা এবং ইন্দ্రిয় ছাড়িয়া রস গ্রহণ
করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এই জগতই
বৈষ্ণবেরা ভগবানের অবতারবাদের এত
সমাধার করিয়া থাকেন। সত্য বটে, বৃষ্ণধর্মও
মানুষকে স্বব উচ্চস্থান দিয়াছে, Man is
made after the image of God—
ঈশ্বরের ছাঁচে মানুষ তৈয়ারী। বৃষ্ণধর্ম-
মতেও ঈশ্বর মানুষের দেহ ধারণ করিয়া
মানুষের স্থানান ও আদর বাড়াইয়াছেন।
কিন্তু তাহাতে কেবল শাস্ত ও দাস্ত রসই
ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা শাস্ত,
দাস্ত, সখা, বাসল্যা ভাব ত ফুটাইয়াছেনই,
কিন্তু তদপেক্ষা যাহা সকল রসের সেরা,
যাহাতে সমস্ত রস পূরীকৃত হইয়া রহিয়াছে,

যাহাতে রস-কীরে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সেই
মাধুর্য্যম এর্মনভাবে ফুটাইয়াছেন, এমন
স্বজ্ঞাভাবে তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে
তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

এই মাধুর্য্যে সমস্ত রসের সমাবেশ ত
আছেই, তা ছাড়া ইহার নিজের যে একটা
বিশেষণ আছে, তাহা সকল রসকেই ছুড়াইয়া
যায়। তাই চরিতামৃত্তে লিখিত হইয়াছে—

“ভগাবদিক্যে শ্রাদ্দিক্যে বাড়ে প্রীতি রসে।

শাস্ত দাস্ত সখা বাসল্যা মধুরতে বৈসে।”

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।

তুই তিন গগনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে।”

রায় রামানন্দও বলিয়াছেন—“কান্ত্যাবে

শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল মাধবত্বের অবধি।”

প্রেমের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। আমরা

জড়জগৎ দেখিতে পাই attraction বা

আকর্ষণের প্রভাবেই বস্তুর পরমাণু একত্রিত

হইয়া solid-এর সৃষ্টি করে, আর repulsion

বা বিপ্রকর্ষণের প্রভাবেই বস্তুর পরমাণুর

পার্শ্বকা ঘটায়া gas-এর সৃষ্টি করে। প্রেমেরও

সেইরূপ দেখিতে পাই। প্রেমের আকর্ষণী

শক্তিতে এক হৃদয় ১০০ হৃদয়ের সহিত মিলিত

হইতে চায়, এক হইতে চায়। অপর দিকে

প্রেম হইতে যে যতদূরে চলিয়া যায়, এক হৃদয়

হইতে অজ হৃদয়ের ততই বিপ্রকর্ষণ হয়। এই

সূত্রকে আভাস Shelly তাহার Love's

philosophy-তে অতি মধুর ভাষায় বর্ণনা

করিয়াছেন—

“The fountains mingle with the river,
And the rivers with the ocean.

The winds of heaven mix for ever,
With a sweet emotion.

Nothing in the world is single
All things by a law divine
In one another's being mingle.”

মাধুর্য্যের এমন একটা আবেশ আছে যে,

তাহার নিকট অজ স্বপ্ন কিছুই লাগে না,

তাই ভবকৃতি রাম-মুখে কহাইয়াছেন—

“বিনিমুক্তং শক্যে স্বপ্নমিতি বা দ্ব্যর্থমিতি বা

প্রবোধ নিজ্ঞা বা। কিমু বিশ্ববিপণ্যঃ কিমু যুদ্ধঃ।

ইত্যাদি।

এই যে প্রেমভাবটা, তাহার বিশ্লেষণ বড়ই

জটিল, বিশেষতঃ মাধুর্য্য-দিকটা বড়ই রহস্যপূর্ণ।

বাস্তবিক প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা

বড়ই কষ্টকর। ইহা অনেকটা বহুদয়-

সংবেদ্য। তাই Thomas A Kempis

উদ্বাহর The Imitation of Christ

বলিয়াছেন—If any man love, he

knoweth what is the cry of this

voice. আর আমাদের প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস

সেই কথাই অমৃত্তে মাখিয়া বলিয়াছেন—

ভ্রমরা জানয়ে, কমল-মাপুরী

তেঁহু সে তাহার বশ।

রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী

আনে কেহ অপবশ।

ধরম করয়, লোক চরচাতে

এ কথা বুঝিতে না পার।

এ তিন আখর, যাহার মরমে

সেই সে বলিতে পারে।

চণ্ডীদাস কহে শুনহ বৃন্দরী

পিরীতি রসের সার।

পিরীতি রসের, রসিক নাহিলে

কি ছার পরাণ তার।

এই প্রেমের উৎকর্ষ বলিতে যাইয়া কবি

আবার বলিয়াছেন—

বিধি একচিত্তে, ভাবিতে ভাবিতে

নিয়মান কৈল ‘পূ’

রসের সাগর, মগন করিতে

তাঁহে উপজিল ‘পী’

পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল

তাঁহে ভিয়াইল ‘তি’

সকল হৃদয়ের, এ তিন আখর

তুলনা দিব যে কি ?

যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই তাহার মহাব্যস্ত

নাই। পৃথিবীতে যত ধর্ম বৈষ্ণব-ভক্কা

বাজাইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রেম-ধর্মের, বিজয়-

চক্কা-নিদানুই সর্বাংশে গভীর ও প্রাণপশ্ণী।

চণ্ডীদাস অথবা জানদাসের সহিত আমরাও

বলিতে পারি—

পিরীতি মুরতি, পিরীতি রতন

যার চিতে উপজিল।

সে দনী কতেক, জনমে জনমে

যজ করিয়া ছিল। (চণ্ডীদাস)

সই কি না সে বধুর প্রেম।

আঁখি পললীতে নহে পরভীত

যেন দরিদ্রের হেম। (জানদাস)

ইহার একটা বিশেষণ এই যে, ইহাতে

একটানা স্বপ্নের প্রবাহ নাই। ইহা বড় মধুর,

কিন্তু “নিমে স্বপ্না দিয়া, একজ করিয়া” ইহা

প্রস্তুত। গচরাচর ইহা দুটু হয় যে, প্রেমের

আবেগও ইত বাঢ়িয়া যায়, বাধাও তত

আসিয়া জুটে। যে পুণ্যার্থীয়া সাগরের সহিত

মিলিত হইবার জন্ম প্রবাহিত হয়, কত শত

পূর্ণত আসিয়া তাহার গতি রোধ করিয়া

পাড়াই। তাই কবি বলিয়াছেন—

কাঙ্ক্ষর পিরীতি, চন্দনের রীতি

ধবিত্তে সৌরভময়।

ঘসিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে

দহন শিখণ হয়।

জুখ আসিয়া বৈচিত্র্য আনিয়া না দিলে

প্রকৃত প্রেমের রহস্য বুঝা যায় না, for

without sorrow none liveth in love.

কিন্তু যে বেগমণি দ্বারা গিরিশূদ্র হইতে বাহির

হয় তাহার গতি কে রোধ করে? মান, অপমান, জাতি, বুল, শীল সমস্তই উহার নিকট তুণের জায় জাসিয়া যায়। প্রেমের যে পৈরিকশ্রাব নির্গত হয়, উহার মুখে শত শত বাধা-বিশিষ্ট পুড়িয়া ছারখার হইয়া উড়িয়া যায়। সত্য বটে, প্রেমের পাত্তের নিকট উহা নিজকে ছেঁটি করিয়া দেয়, for in whatever instance a person seetheth himself there he falleth from love. কিন্তু বাধা আসিয়া যখন উহার পথ রুদ্ধ করে, তখন "Though weary love is not tired, though pressed it is not straitened, though alarmed it is not confounded, but as a lively flame and burning torch, it forces its way upwards and securely passes through all." প্রেমের অগ্নিশিখার রক্ত আমরা বৈষ্ণব কবিদের 'পূর্ণরাগ' ও 'বিরহে' দেখিতে পাই।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রস ভাস্কর্য। ভাব-পথেই রসকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিরা এবং ভক্তগণ নিখিল রসামৃতের রসাস্বাদন করিবার জন্ত ব্রহ্ম হইবার আকাঙ্ক্ষাকেও হেয় জান করেন, কারণ তাহারায় হৃত্য ঐ সময়ে রসের আশাদ পাইবেন। বাহ্যতে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া তাহাকে রসিকভাবে আশাদ করা যায়, তাহাই তাঁহাদের পুণ্যনীর। তাই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

তুল্যামো লবেপানি ন স্বর্ণং ন পুনর্ভবম্।
ভগবৎসন্নিপদন্ত স্তম্ভানাম্ কিমুতশিখাঃ ॥
এই রসাহুভূতি করিবার জন্তই তাঁহারা দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে বাদ দেন নাই। ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত কথা যে, feeling বা

অনুভূতির সহিত দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যখনই হৃদয়ে একটা ভাবের প্রেরণা আসে, তখনই উহার বিকাশ শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ভাবকে হৃদয়ে কল্পনা করিয়া লইলেও শরীরে যে তাহার অভিব্যক্তি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা যাত্রা এবং যিহোভার অংকুর দেখিতে পাই। শরীরকে বাদ দিয়া কেবল ভাব স্থায়ী হইতে পারে না। যখন আমাদের হৃদয় স্নেহ বা শ্রীতির আধারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন আমরা দুই খির হইয়া থাকিতে পারি না। তখন ইচ্ছা হয় তাহাকে কোলে লই অথবা তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দেই। ইহা ভাবের স্বাভাবিকী গতি। ভূতবায় রসকৃষ্টি হইলে যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব কবিরা স্বভাবকে উপেক্ষা করিয়া একটা অতি প্রাকৃতিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তাই তাঁহাদের সাহিত্যে আশ-লিপ্যার কথা দেখিতে পাই। কিন্তু এই বেহু কিংবা ইন্দ্রিয় সমস্তই যে সেই রসজগৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্ত তাহা তাঁহাদের সাহিত্যে পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবৃত্তির ক্ষণে নহে, পরন্তু প্রবৃত্তিকে শ্রীভগবানের চরণে একান্ত ভাবে সমর্পণ করাই তাঁহাদের মতে সেবা। প্রেমমদ্বী বৈষ্ণবগণ কেবল মন দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা ইচ্ছা করেন না, কিন্তু সর্বোচ্চ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবাকেই পরম দৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন। কেবল মন দ্বারা যে কৃষ্ণকে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহা আমরা বৈষ্ণব কবিদের 'মানে'র চিত্রে বেশ দেখিতে পাই, কারণ কৃষ্ণ চলিয়া গেলে তাহাকে পাইবার জন্ত রাখিরা আতুল হইলেন আবার কৃষ্ণকে পাইয়াও

দুঃ-কোরে দুঃ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

(চৌধুরী)

তাঁহার মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সমস্তই কৃষ্ণপদে চলিয়া দিতে চান। তাঁহাদের এই ভাব দেখিয়া গীতার সেই উপদেশ মনে পড়ে—

মমনা ভব মদুচ্চৈঃ মদ্বাঙ্গী

মাং নমস্কৃত্য

মায়েবৈবাসি যুক্তং মাংমানং

মংপরায়ণঃ ॥

বৈষ্ণব সাধনার একটা মূলমন্ত্র এই—“পর-বাসিনী, নারী ব্যাখ্যা গৃহকন্ধ্যা।” সংসার, সকল কার্যের মাঝে থাকিয়া ভগবানের উপর মন প্রাণ চলিয়া দিতে হইবে। ইহাকে তাঁহারা উল্লেখ করিয়া মনে করেন। সংসারে কার্য করিলেও অন্তরে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহারা একমাত্র আরাধ্য দেবতা বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার জন্ত শত শত বাধাকে বরণ করিতে—প্রস্তুত হন, তাই বৈষ্ণব কবি রাখামুখে কহিয়াছেন—

ভোরা কুলবতী, ভক্ত নিম্ন পতি
যার মেঘা মনে ময়।

ভাবিয়া দেখিলাম, প্রাণ-ধনু বিনে
আর কেহ মোর নয় ॥

গুণ দুর্জন, বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।

শ্রাম অহরাগে, এ তহু সেবিহ
চন্দন তুলসী দিয়া ॥

এখানে একটা প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া রাখা ভাল। বৈষ্ণব কবিদের সাহিত্যে বৃষ্টি হইলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের নিকট “কৃষ্ণজ্ঞা ভগবান্ স্বয়ং” তাঁহাদের মত ভক্তির চক্ষে সাহিত্য আলোচনা করিলে অনেক বিষয়, যাহাকে আমরা হৃত্য অঙ্গীল বলিয়া নাসিকা কৃষ্ণিত করিয়া গৃহিত মনে

করি, হৃত্যঃ যাহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট না হইয়া সভ্যতার দূষা ধরিয়া যাহাকে দূরে ফেলিয়া দেই, তাহাই আবার নূতন সাজে আমাদের নন্দনগোচর হইবে। যাহাকে হৃত্য সভ্যতার নিমন্তরে স্থান দিয়াছি তাহাই আবার উচ্চ অন্তরে ভক্তির পরিণামক বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

ভক্ত না হইয়া তাঁহাদের সাহিত্যে বৃষ্টিতে গেলে অনেক সময়ই প্রকৃত রসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহারা ভক্তিকেই আধ্যাত্মিকতার উচ্চশিখরে উত্তীর্ণার প্রথম সোপান মনে করেন, ভক্তিকেই আশ্রয় করিয়া জন্মে উঠে উঠিতে থাকেন, কারণ ভগবৎ-ভক্তির উদয় হইলেই স্বতঃই জ্ঞান ও বৈরাগ্য আসিয়া পড়ে। তাই ভগবত বলিয়াছেন—

ইত্যুত্থাত্মিং ভক্তকোহনুস্ত্য
ভক্তিবিবর্জিতগবৎপ্রবোধঃ ॥

ভক্তি বৈ ভগবতঃ সাক্ষাৎ ॥

‘হে’ রাধন্ অহগত হইয়া সাধন ভক্তি দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম অঙ্গাধার করিলে ভক্তের সাধাভক্তি, বৈরাগ্য এবং তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হয়। তৎপর তিনি সাক্ষাৎ পরম শান্তি পান। ভগবান্ বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা মামভিজান্নাতি যাবান্ যাত্রসি
তততঃ ॥

ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥
সত্য বটে, গীতাত্তে অনেকস্থলে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই জ্ঞান সম্বন্ধ-সাধ্য নহে। ইহা শ্রদ্ধা বা ভক্তিসাপেক্ষ। তাই গীতাত্তে উক্ত হইয়াছে—

শ্রদ্ধাবান্ ভক্ততে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥
আর কৃষ্ণাবতার না মানিয়া গইলেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমভিনয় অশ্রাব্যক বা

অপ্রাকৃতিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।
উহা সার্বজনীন ভাব। রাধাকৃষ্ণলীলাতে
সমস্ত রস যেমন উল্লীষা উত্তীর্ণাচ্ছে, তাহাতে
যেমন সমস্ত রসের বিশেষতঃ মাধুর্যরসের
আশ্বাস পাওয়া যায়, এমন আর কোন্ লীলায়
পাওয়া যায়? সাহিত্যের দিক দিয়া হেথিলে
অবতারণাদ না মানিয়াও নায়ক-নায়িকার
প্রেমভিনয়ক্ষেপে ঐ লীলায় রস অল্পভব
করিতে পারি। একটু চিন্তা করিলেই ইহা
বুঝিতে পারা যাইবে যে, সাহিত্যের বা শব্দার
বা আদি ভক্তিতত্ত্বের তাহাই মাধুর্য।
ভক্তির রস ও সাহিত্যের রস বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ
নহে। ভক্তি ভগবানকে রসামৃত মূর্তিতেই
ভজনা করিতে চাহে, পৃথিবীতে সমস্ত রসই
সেই রসপিঙ্কুর দিকে ধাবিত। ঐ সমস্ত রসই
আবার সাহিত্যের উপাদান, আর রসভব
মাধুর্যকে যেমন শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে,
সাহিত্যও তেমনই আদি রসকে উচ্চতম আসন
দিয়াছে। যিনি যাহাই বলুন আশ্রিতরসকে
বাদ দিলে সাহিত্য নিষ্কীর্ণ হইয়া পড়ি-
ত। পানী পূর্ণিমা রজনী চন্দ্র বাতীত লগ্নযোগে
করাও যা আর আদ্যরস বাদ দিয়া সাহিত্যের
রস ভোগ করাও তা। তাই অনেক সময়
মাধুর্য শব্দটির মত দেখায়। কিন্তু আদিত
কামের গন্ধ থাকে বলিয়া মাধুর্যকেও সঙ্গে
সঙ্গে বাদ দিলে চলিবে না। অহরহাগ
উভয়ের জনক, কিন্তু সঙ্গ ও কাম উভয়েই
শতভা। সাগর মখন করিয়া গরল ও অমৃত
দুইই উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অমৃতই স্পৃহনীয়
আর গরল ত্যাগ্য। হীরক ও কয়লা মূলতঃ
এক হইলেও উহাদের প্রকৃতির আকাশ
পাতাল পার্থক্য। যে অরবিন্দে আশ্রয়
করিয়া অগ্নি উপর হয়, তাহাকেই আবার
পক্ষস না করিলে অগ্নির উজ্জ্বল প্রকটিত হয়

না। ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া প্রেমোদ্ভব
হইলেও ইন্দ্রিয়লাসকে না পূজাইলে
শ্রেয়সি-বিপাণ্ড ও স্পষ্ট অহুত হয় না।
বৈষ্ণবেরাও কাম ও প্রেমের পার্থক্য করিয়া
বলিয়াছেন—

আশ্রয়ন্ত্রিয প্রীতি ইচ্ছা তাং বলা কাম।
কৃষ্ণক্লিষ্ট প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

—চরিতামৃত।

জানাদি দ্বারাও সত্যো উপনীত হওয়া যায়
বটে, কিন্তু উহা বহু আয়াসসাধ্য। ঐ দ্বন্দ্ব
পূর্ণের পবিত্র না হইলে জানের অধিকারী হয়
না। কিন্তু জানী-মূর্খ, পৃথক-দ্বন্দ্বী সকলেই
ভক্তির অধিকারী। এ বিষয়ে গীতাতে উক্ত
হইয়াছে—

‘অপি চেৎ শত্বরাচায়ে ভজতে মামভ্যক্ত।

মাধুর্যের সমস্তব্যাসঃ সত্যবসিতে হি সঃ’

কিংপ্রভ ভবতি দধ্যায়ী শখজ্যোতিঃ নিগজ্জতি।

কৌন্তেয় প্রজ্জানানীহি ন মে ভক্তঃ প্রযুক্ততি॥

মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য বেহপি স্থায়ঃ পার্শ-

যোনয়ঃ।

প্রিয়ো বৈশ্যাত্মা শূদ্রতেপিহপি যাপ্তি পার্শ-

গতিম্॥

এই কথাই আবার ভক্তিগ্রাণ প্রজ্ঞাদি

বলিয়াছেন—

নালং দ্বিজং দেবং প্রিয়ং বাহুব্রাহ্মজাঃ।

ঐশ্বর্যমুৎসুহং ন তৎ ন বহুজতাঃ।

শূন্যরসে ভক্তিতে দ্রাব্যভব, ক্লিষ্টরস,

বৈষ্ণব দেবত্ব, প্রিয়ত্ব, ব্রত, ও বহুদর্শিতা

সকলেই অনাবশ্যক; কারণ আবার ভগবানই

আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

সর্বদ্যক্ষানু পৱিত্রাত্মা মনেক্ষু শরণং ব্রজ।

অংং বাং সর্বপাপভ্যাং মোক্ষদিস্যামি মা ভচ।

যেহেতু প্রস্তুতগণ এই ভক্তিরস আশ্বাস

করিতে পারা যায় এবং সকলেই এ বিষয়ে

অধিকারী হইতে পারে। বৈষ্ণব কবিরা ভক্তি
বা মাধুর্যরস দ্বারা সেই নিখিলরসমূহের মূর্তি
ভজনা করিয়াছেন। পূর্ণের বলিয়াছিল সৌন্দর্যের
নাট্যচাড়া করিলে রসের আবির্ভাব হয়, সেই
জন্ত বৈষ্ণবেরা ভগবানকে পরমসুন্দররূপেই
অঙ্কিত করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যাহভব অহ-
রণের পূর্ণবস্ত্রী কাণ। সৌন্দর্য্যাহভব
আবার রূপগত ও গুণগত। পরিত্রাঙ্কচাচার্য
মধুসূদন শ্রবশক্তি মশাহর ও ‘ভক্তিরসায়ন’

প্রেমের পূর্ণধারণ দণ্ডপ্রকার অবস্থা বর্ণনা
করিতে, যাহা “হরিগুণশক্তি” বা ভগবানের
গুণস্বরূপ দ্বারা যে তাঁহার সৌন্দর্য্যাহভূতি
তাহার, পর ‘রত্নাকুরোৎপত্তি’ বা চিত্তের
দ্রবীভাবজনিত প্রেমের উপগতির স্থান নির্দেশ
করিয়াছেন। অনেক সময় রসের সৌন্দর্য্য
ধারিকলেও গুণসৌন্দর্য্যের অভাবে প্রেম আসে
না। কিন্তু যে পূর্ণধারণ রূপ ও গুণের একত্ররূপ,
বাঁহারা মধ্যে জানের সৌন্দর্য্যই এবং রূপের
প্রজ্ঞা পরম্পর প্রত্যাঘোষিতা করিতে থাকে,
তিনি লোকমাগেরই হৃদয়ে যে অধিকারী
হইতেন তাহাতে বিদ্যুত্যা সন্দেহ নাই।
বৈষ্ণব কবিদের কাব্যভগবানের রূপগত এবং
গুণগত সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে
পাই বলিয়াই আমাদের হৃদয় এত দ্রবীভূত
হয় এবং সেই গুণধারের দিকে আকৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণব কবিদের সাহিত্য বৃত্তিতে কুইলে
পূর্ণরীক সাধারণ বিশেষণ আবশ্যক বলিয়া
ঐ সমস্ত কথা বলিলাম। এক্ষণে তাঁহার
মাধুর্য্যরসের স্বরূপ কি ভাবে ব্যক্ত করিয়া
তাঁহার আশ্বাসন করিয়াছেন এবং আমাদিগকে
করাইতেছেন? তাহাই দেখাইবার প্রয়াস
করিব।

বৈষ্ণব কবিরা মাধুর্য্যরসের বিকাশ মোটা-
মুটি হিসাবে চারটি দিক দিয়া দেখাইয়াছেন।

প্রথম ‘পূর্ণধারণ’, দ্বিতীয় ‘মান’, তৃতীয় ‘বিরহ’
ও চতুর্থ ‘মিলন’। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে
জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জানাবাস এবং
গোবিন্দদাসের নামই উল্লেখযোগ্য। এই
কল্পন কবিকে আশ্রয় করিয়া অনেক বৈষ্ণব
কবিই অমৃত বর্ণন করিয়াছেন-সত্য, কিন্তু এই
কল্পনের কাব্য আলোচনা করিলে স্টোটিমুটি
সকলেই আলোচনা করা হইবে; কারণ
মূল প্রোতিপাত্য বিষয় সকলেই এক। আমি
এই বিষয় সামান্যভাবে আলোচনা করিব।
হৃদয়মূল মূলগ্রন্থমূল আলোচনা করিলে ইহার
রস্ মাধুক উপলব্ধি করিতে পারিবে।
এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, জয়দেব সংস্কৃত-
ভাষায় ‘গীতগোবিন্দ’ লিখিলেও তিনি বৈষ্ণব
কবিদের আদিকণ এবং তাঁহার সমস্ত
অনেকটা বাঙ্গালার ছাঁচে ঢালা বলিয়া তাঁহার
সাহিত্যেরও আলোচনা করিব।

বহদিন পূর্ণের যখন গৌড় যবনকবলিত হয়
নাই, যখন হিন্দুরাজা লক্ষণসেনের স্বাধীনতায়
শেষজ্বলি গৌড়ে উড্ডীন হইতেছিল সেই
সময় জয়দেব কৈমুন্সিধ্যায়ে বসিয়া মধুর
পদাবলীর হৃদনে ‘অজয়ে’ উজান বহাইয়া-
ছিলেন, তাই বুদ্ধি ভক্তাদীন ভগবান তাঁহার
ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া “দেহি পদপল্লবমুদারম্”
লিখিয়া গিয়াছিলেন। ভাবামাধুর্য্যে ও ছন্দে
পারিপাট্যে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে যে
গীতিকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা
জগতের অল্প কাব্যে দূরভ। তিনি যে
প্রেমামৃত-প্রণবণের দ্বার উন্মোচিত করিয়া
দিয়াছিলেন সেই পুত্ভারার পথ বিদ্যাপতি,
চণ্ডীদাস প্রভৃতি পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ
বিস্তৃত করিয়া অনেক মনোহর পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট
অভিজিহ্ন করিয়া প্রেমের হিমালয় স্রষ্ট
করিয়াছেন। ‘গীতগোবিন্দ’-রচনার পর

তাঁহার কাব্যপ্রভা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং গুজরাট হইতে বঙ্গের শেষ পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত প্রদেশ তাঁহার পদাবলীতে মুখরিত হইল, আর সেই পরমপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মুখে তাঁহার “কোমলকান্ত-পদাবলী” বঙ্গদেশে অমৃতের বজ্রা বজ্রন করিয়াছিল। জয়দেব সত্যই বলিয়াছেন—

“দহি হরিপদশ্রবণে সফলঃ মনঃ।

শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।”

জয়দেব বসন্ত বর্ণন আরম্ভ করিলেন, যখন প্রকৃতি ফল-ফুলে শোভিত হইয়া, কোকিলের কুহতানে ও জ্যোৎস্বার মাধুর্যে জ্বালামুখী শক্তির আভাস দিতেছিল, তখন মাধব জ্বালামুখীশক্তিরূপা রাধারাগী পরম-সৌন্দর্য্যধার শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যবিশেষের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার অহরাদিগি হইলেন, এই “জয়দেবভণিতমুদ্রণি হরিচরণ-মুখিতারঙ্গ” এই সৌন্দর্য্যই ভগবানের “দিক লইয়া যায়। জয়দেব বদন্তবর্ণনা দ্বারা “পূর্ব-রাগ” জমাটাইলেন, আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কৃষ্ণদর্শন অথবা কৃষ্ণানুশ্রবণে ঐ অহরাদিগির সূচনা করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি সৌন্দর্য্য-বোধই অহরাদিগি বা প্রেমের কারণ। তবে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের এই অহরাদিগির পার্থক্য বোধ হয়, বিদ্যাপতি প্রভৃতি রূপগত সৌন্দর্য্য হইতে অহরাদিগির সৃষ্টি করিলেন, তাই আমরা দেখিতে পাই—

কি কহব রে সখি কাঙ্ক্ষ রূপ

কো পতিয়ার স্বপন স্বরূপ। (চণ্ডীদাস)

রাই কেন বা এমন হৈলা।

কি রূপ দেখিয়া আইলা। (জানদাস)

তখন হইতেই প্রেমারি দিকি দিকি জলিতে

আরম্ভ করিল। তখন হইতে রাধিকার সেই চঞ্চলতা নাই, মনের সে শান্তি নাই।

তখন সাধন ঘন গম মুক দুঃখান।

অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ।

তখন শোণার বরণ তহু।

কাঙ্ক্ষা ভৈ গেল জহু।

অরুণ অধর বাজুলী ফুল।

পাতুর ভৈ গেল গুরু তুল।

রাধিকা তখন “বিজনে জ্বালামুখী তরুণ তমাল,” শরীর ক্ষীণ হইল “অশ্রুত-অশ্রুতী বনদ্রা” হইল। কৃষ্ণকামা কৃষ্ণভাবে পাগলিনী সাজিলেন।

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকা প্রথম হইতেই পাগলিনী, তাই তিনি পাগল হইয়া বলিতেছেন—

কে বা শুনাইল সখি সেই নাম।

কারণে ভিতর দিয়া, মরমে পলিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

না জানি কতক মনু জাম নামে আছে গো।

বনন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।

কেমনে পাইব সখি তারে।

এখানে প্রথমে দর্শন নাই, কিন্তু রাধিকা নামেই এমন মাধুর্য্য অহতব করিলেন যে, মন ভরিয়াই জ্বালামুখি পাইবার জন্ত আকুল হইলেন। এইখানে কবি বোধ হয় ভগবদ-হরগ হইতে মানবহরগের পার্থক্য বুঝাইতে চাহিয়াছেন। মানবে অহরাদিগির সাধারণতঃ রূপ অথবা শুণের সৌন্দর্য্য-বোধ হইতেই হয়। কেবলমাত্র নাম শুনিয়া অহরাদিগির ভগবানেই সম্ভবে।

এই পাগলিনী তখন

সুখি যানে,

চাহে মেথপানে

না চলে নয়নতারা

বিরতি আহারে, রাধাবাস পরে
যেন যোগিনী পারা।

নিজ কল্পোপর, রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা।

ও ছুটি নরনে, বহিছে সখনে

আবণ মেঘের দারা।

রাধিকার এই ঐকান্তিক চানে ভগবান বাধা
পড়িলেন, তাই স্বীকৃতি বলিতেছেন—

ধনি ধনি ব্রহ্মণি, জন্ম ধনি তোর।

সব জন কাহু কাহু করি রুরয়ে

সো ভুয়া ভাবে বিভোর।

চাতক চাহি তিয়াগল অশ্রু,

চকোর চাহি রহ চন্দা।

তরু লতিকা অবলম্বনকারী

মনু মনে লাগল দন্দা।

এখানে এইটুকু লক্ষ্য করিতে হইবে যে,

বিদ্যাপতিতে রাধিকার অহরাদিগির (অপর

পক্ষে ভক্তের ভগবানের প্রতি অহরাদিগির)

একটা ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই। সরলা

নবনাটিকা নবনাটকের সহিত মিশ্রিত হইতে

হইলে প্রণয়কে কি ভাবে ব্যক্ত করে, কবি

তাঁহাই দেখাইয়াছেন; তাই আমরা রাধার

মুখে শুনিতে পাই—

না জানি প্রেমের নাহি রতি রঙ্গ।

কেমনে মিলিব ধনি প্রসুখ অঙ্গ।

বনন চাতুরী হাম কিছু নাই জান।

ইঙ্গিত না বুঝিলাম না জানিয়ে মান।

সেই জন্ত সখীগণ তাঁহাকে নিশ্চয়ই

মিত্তেছেন—

যব পিয়ে পরশয়ে তৈলবি পানি।

মোন ধরবি কিছু না কহব বাণী।

যব পিয়ে ধরি বর্গে নেয় নিজ পাশ।

নহি নহি বোলবি গম গদ ভাষ।

পূর্বরাগের এই চিত্র দেখাইলাম। এখানে বৈষ্ণব কবিগণ ‘মানে’র ভিতর দিয়া কি ভাবে প্রেমের অতিব্যক্তি দেখাইয়াছেন, এবং ভগবানের নীলতা ভক্তের নিকট কতটা প্রসিদ্ধ হইতে পারে তাঁহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মানের ভিতর দিয়া নায়ক-নায়িকার প্রণয় সূচিয়া উঠে। ইহাকে অবলম্বন করিয়া নায়ক আপনার অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন, আর নায়িকার মানভঙ্গ করিয়া মানের গৌরব বাড়াইতে পারেন। এই জন্ত নায়ক-নায়িকার নিকট এই ভাব বড়ই মূর।

কৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর ক্ষেত্র যাগরা অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব কবিরা এই মানের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রেমের এটা স্বাভাবিক রীতি যে, প্রেমিক অন্তরে প্রেমের অংশী করিতে চাহে না। অন্তরে অংশ দিতে দেখিলেই প্রণয়ী বা প্রণয়িনী মান কুটরা বসে। এই ভাবটি ভক্তুরি একটা প্রাকৃতিক দৃষ্ট দেখিয়া হৃদয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রভাতরাগাহতক্ষণিতাকৃত্তি:

কুসুমভীরেগুণিশবিরগম্।

নিরাশত্বং কুণিতেব পদ্মিনী

ন মানিনীশং সহতেহঙ্গসমম্।

যদিও রাধিকা কৃষ্ণকে পাইবার জন্ত একান্ত লালমিত, তথাপি কৃষ্ণকে অঙ্গসঙ্গ জানিয়া অভিমান করিয়া বসিলেন। বিদ্যাপতি এই উপলক্ষে জী-চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া একস্থানে অতি অল্পকথায় অনেকখানি ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

তোহারি কেশ, কুসুম, তুল, তাম্বুল

ধরলহি রাইকো আগো।

কোপে কমলমুখী, পালাটয়া না হেরেই

যৈলি বিমুখ বিরাজো।

রাবিকার সম্মুখে এই কেশ, কুহুম, তৃণ ও তাম্বুল ধরার মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত আছে।
কৃষ্ণ যেন অছন্ন করিয়া বলিতেছেন—
“অপরূপ করিয়াছিলাম, তজ্জন কেশমুণ্ডনে, প্রস্তুত আছি, ক্ষমা করিয়া অহরূপপ্রেমিত কুহুম গ্রহণ কর, দস্তে তৃণ করিয়া বলিতেছি আর এইরূপ করিব না। আমার প্রণয়ের ও তোমার ক্ষমার নিদর্শনরূপ এই তাম্বুল গ্রহণ কর।”

রাবিকা কিন্তু শুক মান করিয়াছেন তাই বলিতেছেন—

আর না দেখিব, ও কাল মুখ
ওখানে রহিল কেনে।
যাও চলি যথা, মনের মাছয়
থেখানে মন টানে।
হরি, হরি, যাহি যাহি মর্দিব
যাহি কেশব বর কৈতব বান্দু।
এই রসের উপযুক্ত আবাদিকা সখীরা আনিয়া
একটু ভ্রমও দেখাইয়া রাবিকাকে বুঝাইতেছেন—
স্বন্দরি, ইহে কি মনোরম পুর।

যাচিত রতন, তেজি পুনঃ মঙ্গল
সো মিলব অতি দূর।
কোলা নাদ, শ্রবণে যব স্তমবি
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটা কুহুম শব, হিয়া পর বরিখব
তব কৈছে ধরবি পরাগ।

মানিনি, হাম করিয়ে তুয়া লাগি।
নহে নিকট পাঁই, যে জন বলয়ে
তাকর বড়ই অভাগি।
দিনকর, বধু, কমল সব জানয়ে
জল তেহি জীবন হোয়।
পক্ষবিশী নত, ভাঙ্ক শুভায়ত
জলহি পাচায়ত সোয়।

নহে সখীপে, স্বথল যত বৈভব
অহুকুল হোয়ক বোহি।
তাকর বিরহে, সকল হৃথ সম্পদ
ক্ষণে দগদই সোই।

(জানদাস)

মানিনির মান যখন তাহাতেও তাড়িল না
তখন কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। প্রেমের বিচিত্র
রীতি এই যে যাচিত মান কিরায়ই দিলেও
প্রেমিকা আবার তাহারই জ্ঞান কীদিতে
বসেন, তাই রাবিকা বলিতেছেন—

আপন শিরহাম আপন হাতে কাট্ছ
কাহে করিছ হেন মান।
শ্রাম হুমাগর, নটবর শেখর
কাহা সখি করল পয়ান।
তপবরত কহ, কক দিন যামিনী
খো কাহ্ন নাহি পায়।
হেন অমূল দুন, মন্ত পবে গড়ায়ল
কোপে মুক্তি টেলিছ পায়।

(চতীদাস)

রাবিকা এই সময়ে বড়ই কাঁপরে পড়িয়া-
ছেন। বাঁহাকে কটুকথা বলিয়া বিদায়
দিয়াছেন, তাঁহার নিকট আবার কি করিয়াই
বা যান। কেবল দীর্ঘনিশ্বাসে সখীগণকে
মনোভাব জানাইতেছেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ
দেখিলেন রাবিকার মন একটু নরম হইয়াছে,
তখন সাহস করিয়া বলিলেন “তুমি মম
ভুগুম, তুমি মম জীবনম্।” কিন্তু তখনও
কৃষ্ণ কেবল চরণস্পর্শেরই সাধ করিতেছেন,
আর ভাবিতেছেন—

অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোণা শতগুণ হইয়া কাহে নাহি তোহে।
নে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জানদাস কহে যদি করে পরদা।

তখন ‘দেহি পদপদ্মমুদারম্’ বলিয়া চরণ
স্পর্শ করিতে গেলেন।

কথিত আছে যে, সাক্ষাৎ ভগবান আসিয়া
ঐ পদটি পূরণ করেন।

যটনা সূচ্য কি মিথ্যা যীমাংসা ক্রিয়ার
জ্ঞান, আমাদের প্রভুত্বের আয়োজনায় দরকার
নাই, তবে একথা অন্তত মানিতে পারি যে,
ভক্তাণীন হরি ভক্তের নিকট নিজেকে কতদূর
নিগ্রহামী করিতে পারেন তাহা জগদবৈবের
দ্বয়ে অধীন করিয়া তাঁহার লেখনী হইতে
বাহির করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তের এক্ষণে
কথিত হইয়াছে।

তুখুদিপী স্থনীচেন তরোরিব সহিযুগ।
অমানিা মানবেন কীর্ন্তনীঃ সন্ধ্যা ধুরঃ।

‘আপনি আচারি প্রভু ভক্তকে’ শিখাইলেন
যে, প্রকৃত প্রেমিক হইতে হইলে এমনই
দীন হইতে হয়—ভালবাসার পাত্রের নিকট
এমন করিয়াই মান অপরমান ত্যাগ করিয়া
স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। এই দীনভাব এক-
দিন নিত্যানন্দ প্রভুও দেখাইয়াছিলেন।

জগাই মাধাইএর মার বাঁহাও তাহাদেরই
উপকারার্থ যাচিয়া নাম—বলাইয়াছিলেন।
আর পাক্ষাত্যদেশে যীশুও এই দীনতার কথা
বলিতে যাইরা কহিয়াছেন—“যদি তোমার
একগালে চড় দেয় তবে তাহাকে অস্ত্র গাল
পাতিয়া দিও।” প্রেমের এইরূপ ‘আদর্শ’
না হইলে কি সংসারে প্রকৃত জ্ঞান হয়।
সত্য বটে, এই জন্মে অস্ত্রের স্বনস্বনা,
কামানের গর্জন, আর্টের মর্দভেদী ক্রন্দন,
সবলের অভ্যচার কিছুই নাই—আছে কেবল
দীনতা, শান্তি, প্রেমাত্মক আর স্বার্থত্যাগ।
কিন্তু এই জন্মই প্রকৃত জন্ম। যীশুকে লক্ষ্য
করিয়া যিনি একদিন জগৎ জয় করিবার জ্ঞান
উজ্জ হইয়াছিলেন, সেই যীশুও

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাঁহার জীবন-সংগ্রামের
অন্তেষ্মুখ সময়ে নাকি বলিয়াছিলেন আমাদের
জয়ের মূল্য কি? অমনি যাহা জয় করিলাম
তাঁহার চিহ্ন আমার জীবনেই লোপ পাইল।
ক্রিনিই (যীশু খৃঃ) প্রকৃত জ্ঞানী,
বাঁহার জন্মভঙ্গা মৃত্যুর পরেও বাজিতেছে,
আর বাঁহার রাজ্য দিন দিনই বিস্তৃত
হইতেছে। এই প্রেমেরই টানে পড়িয়া
যখন যীশুখৃঃ ক্রমে নিহত হইতেছিলেন
তখনও বলিতেছিলেন—“Father, for-
give them for they know not what
they are doing.” পিতা: তাহাদিগকে
ক্ষমা কর, কারণ তাহারা জানেনা তাহারা
কি করিতেছে। বৈষ্ণব কবির সাহস করিয়া
পরম আরাধ্যদেবতার ভক্তের জ্ঞান যে
এতদধীন দীনতা দেখাইয়াছেন তাহা দেখিলে
বড়ই চমকিত হইতে হয়। বোধ হয় আর
কোন সাহিত্যেই এমন করিয়া ভগবানের
দীনত্ব দেখান হয় নাই।

এক্ষণে বৈষ্ণব কবির “বিরহে” মধুর্যাস
কেনম কবিতা আশ্বাদ করিয়াছেন, তাহাই
দেখাই।

এই সংসার বৈচিত্র্যময়। বিচিত্রতায় জ্ঞানের
বিকাশ। ইহা পাক্ষাত্য মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র
কথা যে continual consciousness is
no consciousness at all. এই জ্ঞান যে
সমস্ত জীব কেবল অন্ধকারেই থাকে;
তাঁহার অন্ধকার কি জিনিষ তাহা বৃত্তিতে
পারে না; অথবা বাঁহা কেবল আলোকেই
থাকে, তাহারা আলোক কি জিনিষ তাহা
বৃত্তিতে পারে না। বিপরীত জ্ঞান যারা
বস্তুর প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব। এই সত্যই
আবার বিখ্যাত জর্জান দার্শনিক পণ্ডিত
হিগেল তাঁহার Thesis, Antithesis and

Synthesis দিয়া বুঝাইতে প্রয়াস করিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জগতে সৃষ্টির পর ভূত, আনন্দের পর বিবাদ অনিবার্য। এখানে একটানা কিছুই নাই। প্রবল ষটিকাম্যের অমাবস্যা রজনীর পর হৃৎকালোৎসর্গ প্রভাত, প্রকৃতি সৌন্দর্য্য-রসস্রাবী শীতকল্লুর পর কোকিলমলয়-জ্যোৎস্নাযুক্ত বসন্তের মাধুরী অহরহ বোধিত্তে। এই জগতে No rose without a thorn—no sunshine without a shade. কিন্তু এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়াই আমরা প্রশ্নপত্রকে আশ্বাস করিতে পারি। বৈষ্ণব কবিতা এই সত্যই “বিরহে” এমন মোহন স্বাক্ষর দিয়া বাজাইয়াছেন যে, জগতের অস্ত সাহিত্যে বোধ হয় এমন স্রুতান আর শুনিতে পাইব না। এই বিবুহানল প্রেম-হেমকে পূজাইয়া জগৎ-সমকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছে। তাঁহার যে করুণ ভাষায় এই বিরহগীতি গাথিয়াছেন তাহাতে পাশাশুদ্ধয়ও কাটিয়া প্রেমাক্ষপতন করে। বৈষ্ণব কাব্যের পাঠক মূলগ্রন্থ হইতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইবেন। কোনটি ছাড়াইয়া কোনটি বলিবে গ্রিক করিতে পারিতেছি না। প্রত্যেকটিই যেন এক একটি অমৃতের টুকরা। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন অবলম্বন করিয়া এই বিরহগীতি আরম্ভ। রাধিকার এই সময়ের চিত্র বড়ই মর্যাদাশী। কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে গৌরবর্ণী রাধিকা কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অশ্লক আত্মটী, সো ডেল বাহটী হার ভেল অভি ভার। ‘ভরা বাদর মাং ভাঙ্গরে’ তাঁহার মন্দির শূন্য হইয়াছে, ভাঙ্ক ভাঙ্কীর রবে, ময়ূরের নৃত্যে তাঁহার প্রাণ

আকুল হইতেছে। আবার বসন্তের কুহরবে মেঘের গর্জন ভাবিয়া তিনি জৈমিনী স্মরণ করিতেছেন, নীলনলিনের মালাকে সর্প ভাবিয়া গরুড় স্মরণ করিতেছেন। তাঁহার “বিনে দিনে ক্ষীণ চতু, হিমে কমলিনী জহু” “চাঁচলনন তহু, অধিক উত্তাপই” কে জানিত যে তাঁহার “এই দশা হইবে, তাই বিদ্যাপতি বলিতেছেন—

হরি হরি কো ইহু, দৈব দুঃখাশ।

সিদ্ধ নিকটে যদি, কঠ শুকায়ে

কে দুঃ করিব পিয়াসা।

চন্দন তরু যব, সৌতর ছোড়ব

শশধর বিরখব আগি।

চিন্তামণি যব, নিলগুণ ছোড়ব

কি মোর করম অভাগি।

শ্রাব্য মাং যন, কিছু না বিরখব

স্বহস্তক বীষকি ছন্দে।

পিরিখরসেবি, ঠাম নাহি পায়ব

বিদ্যাপতি বহ ধন্দে।

এই ভাবটি যে কি মধুর-তাহা কাব্যমোদী মাঝেই বুঝিতে পারেন।

দিন গুলিতে গুলিতে অনেক দিনই কাটিয়া গেল, কিন্তু কৃষ্ণ ফিরিলেন না। রাধার আর শরীর ধারণে ইচ্ছা নাই, সেই জন্ত বলিতেছেন—

“মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।”

কিন্তু আবার মরিতেও ইচ্ছা হইতেছেন না। কেন? নিজের জন্ত নহে, কিন্তু প্রিয়তমের জন্ত। তিনি যদি মরিয়া যান তবে কাছের যত্ন কে করিবে। তাই পর মুহূর্ত্তেই বলিতেছেন—

কাহ হেন গুণনিধি করে দিয়ে যাব?
পরে বলিতেছেন আর যদি বুড়াই হয় তবু

“না পুড়াইও রাধা অঙ্গ, না ভাড়াইও জলে।
মরিল তুলিয়া রেখো তমালোর ডালে।
সোত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরল তহু মোর তাহে জহু রয়।
কবছ সো পিয়া যদি আসে বন্দাবনে।
পুরাণ পার্যব হাম পিয়া দরপনে।”

অনেক দিন ধরিয়াই তিনি ঈদুর জ্ঞ দিন কাটাইলেন। তাঁহার

“পঙ্খ-নোহা রিতে নয়ন অক্ষয়াল।”

দিবস লখিতে লখ গেল।

দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গৈছ

শেষ, বরিখে বরিখ কত ভেল।

শেষ, তাঁহার অন্তিম দশা আরম্ভ হইল, তাই

চণ্ডীদাস বলিতেছেন—

কালিন্দী পুলিনে, কমলরে শেজে

রাখিয়া রাইএর বেহে।

কোন সখী সঙ্গে, লিখে ঠাম নাম

নিখাস হেরয়ে কেহু।

কেহু কহে গোব, বৃন্দা আসিল

দে কথা তনিয়া কানে।

মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নোহারে

দেখিয়া না গহে শ্রাবো।

যখন হইছ, যমুনার পার

দেখিছ সখিরা মেলি।

যমুনার জলে, রাখে অহুর্জলে

রাই দেহ হরি বলি।

এই বিষয়ে অধিক উদ্ধৃত করিয়া

আপনাদের আর বৈধব্যচ্যুতি করিব না।

এক্ষেণে বৈষ্ণব কবিতা ‘মিলনে’ প্রেমের যে

বিকাশ দেখাইয়াছেন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা

করিব।

আমরা ‘বিরহে’ দেখিতে পাইলাম

রাধিকার প্রাণের আবেগের প্রাবল্য কতদূর।

এই প্রেমের টানে পরমপ্রেমিক প্রাণবল্লভ

কি স্থির থাকিতে পারেন? তাই এখন রাধিকার ‘কুদিন স্থবিন’ হইল। তাঁহার বাম আঁখি স্পন্দিত হইতেছে, প্রভাতে কাক ‘কোলাকুলি’ করিয়া ‘আহার’ বাটিয়া ধাইতেছে, ‘পিয়া আসিবার নাম ব্রূধাইতে’ উঠিয়া বলিতেছে—

মুখের তালুল, খসিয়া পড়িছে

দেবের মাথার সুল

চণ্ডীদাস কহে, সব স্থলস্থল

বিহি ভেল অহুকুল।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, ঐ বর্ণনা হইতে আমরা বন্দী সমাজের রীতিনীতির নজা দেখিতে পাই।

আজ শ্রীমতীর শীতের গুড়নী পিয়া গিরীদিব বা (গ্রীস্মের বাতাস), বরষার ছত্র, পিয়া দরিদ্রার না (নৌকা) আসিয়াছে, ‘কমলিনী মণ্ডপ’ এবং চকোর চাঁচ পাইয়াছে। তাঁহার আর আনন্দ ধরে না, তাই জীবভাবোচিত চরিত্রে সাধ

করিতেছেন—

বৃন্দা মেলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া

‘মিলব আমার পাশে।

ভূরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া

বদন ঝাঁপিব বাসে।

তা দেখি নাগর, রসের সাগর

অঁচরে ধরবে মোর।

করে কব ধরি, গদগদ করি,

কহিবে বচন ধোর।

তখন সময় জানিয়া, থির মানিয়া

পুরাব মনের আশ।

আজ আর রাধিকা শূন্যকন্ঠের কথা মনে

আনিতে চাহেন না। নিজে যে এককাল

বিরহযরণা সহ করিয়াছেন তাহা তুলিয়া

প্রাণনাথকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

ছবিণীর দিন দুখেতে গেল,
মথরা নগরে ছিলেত ভাল ।
এ সব ছুখ কিছু না গণি ।
তোমার তুশলে তুশল মানি ।
আজ তিন "জীবন যৌবন সফল"
করিয়া মানিলেন। যাহারা বিরহে কষ্ট
রিতেছিল তাহারিগকে ভাকিয়া বলিতেছেন—
সোহ কোকিলা অবলাখ ডাকউ
লাখ উলয় করু চন্দা ।
পাঁচ বাণ অব, লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা ।

(বিদ্যাপতি)

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—
এখন কোকিল আসিয়া ককক গান ।
অমরা ধরু ক তাহার স্তন ।
মলয় পবন বহু মন্দ ।
গগনে উলয় হউক চন্দ ।
আজ তাঁহার অভিমান ভাসিয়া গিয়াছে ।
প্রাণনাথের প্রেমের নিকট নান অপমান সব
তুচ্ছ । কত বলিবার থাকিলেও যেন
আবেশে কিছুই বলিতে পারিতেছেন না, তাই
বলিতেছেন—

বধু আর কি বলি আমি ।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ।
বধু তুমি যে আমার প্রাণ ।
সেহ মন আমি, তোমাকে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ।
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিদা
যোগীর আরাধ্য ধন ।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীন
না জানি ভজন পূজন ।
পিরীতে রসেতে, ঢালি তহু মন
দিয়াছি তোমার পায় ।

তুমি মোর পতি, তুমি মোর পতি
মন নাহি আন তায় ।
কলকী বলিয়া, ভাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুখ ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে স্তব ।
সত্যাবা অসত্য তোমার বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি ।
কহে চণ্ডীদাস, পূর্ণ পুণ্ড্র সম
তোহারি চরণ খানি ।

শয়নে স্বপনে, নিজা আগরুণে
কতু না পাসুর তোমা ।
অবলায় কোটা, হয় শত কোটা
সকল করিবু ক্ষমা ।
না ঠৈলও বলে, অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর ।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোহা বধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর ।

এমন অনাভোদ্যুতী প্রেম, এমন একান্ত
নির্ভরতা, এমন স্বার্থত্যাগ, এমন বিনীত
নিবেদনের চিত্র যে জগতের অল্প কোন কবি
এমন হৃদয়রূপে অঁকিতে পারিয়াছেন তাহা
বোধ হয় না । তাই ভগবান, যিনি উপদেশ
দিয়াছেন—
সর্গদর্শন পুরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বং সর্গপাপেভ্য মোচয়িষ্যামি না শুচ ।
নিজের কথায় নিজে বাধা পড়িয়া ফ্লাদিনি
শক্তির সহিত মিলিত হইলেন । তাই আজ
প্রেমমগ্নের লীলাসহায় ফ্লাদিনি শক্তির
মান বাড়াইয়া পরম প্রেমিক ভগবান
বলিতেছেন—

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়নতারা ।

কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন
কিশোরী গলায় হারা ।
রাখে, তিন না ভাবিহ তুমি ।
সব তেয়াগিয়া, ও বাধা চরণে
শরৎ লইহু আমি ।
শরনে স্বপনে, যুগে জাগরণে
কতু না পাসুর তোমা ।
তুয়া পরাশ্রিত, করিয়ে মিনতি
সকলি করিবু ক্ষমা ।

আমাদের এই শুভকর প্রেম নাই, হৃদয়
বড়ই করুণ । রাবিকার মত প্রেম না হইলে
ত ভগবানকে পাওয়া যায় না । তাই প্রাণনাথ
কুরি ভগবান তোমার করুণা বাধা "মুকু"
কস্মাতি বাচালম্ । পদ্বং লক্ষ্যরূপে গিরিম্ ।
এই বীনজনে রূপা কর, যেন হৃদয় তোমার
প্রেমে পুলকিত হইয়া তোমার প্রেমমগ্ন লীলা-
বৈচিত্র্য আশ্বাস করিয়া তোমার দিকে আকৃষ্ট
হয় ।
শ্রীকৃষ্ণশ্রী গোবিন্দো এম্ এ, বি এল্ ।

আয়ুর্বেদে মৌলিক তত্ত্ব

মদীয় কোন প্রবন্ধে ত্রিগোষ বা বায়ু-পিত্ত-
কফের বিষয় উল্লেখকালে বলিয়াছিলাম,—
"স্বত্বপদার্থের মৃত্তিকাদি প্রধান পাঁচটি মূল
উপাদান মধ্যে মক্ষ, অগ্নি ও অপু দেহে
অবস্থান্তরিত হইয়া "ত্রিগোষ" বা বায়ু-পিত্ত-
কফ নামে অবিহিত হয় ।"
এই মৃত্তিকাদি পঞ্চ পদার্থের মধ্যে মক্ষ,
অগ্নি ও অপু অবস্থান্তরিত হইয়া দেহে অবস্থান
করিলেও উক্ত পঞ্চ পদার্থের সহিত দেহের
অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে । সে
 কারণ পঞ্চ মহাত্ম্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা
করা হইল ।

প্রাচীন আর্গ্যগণের মতে ক্ষিত, অপু,
তেজ, মক্ষ ও আকাশ এই পাঁচটি মূলপদার্থ
বলিয়া কীর্ষিত হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক
বিজ্ঞানবিদ ও জনসাধারণ অনেকেই এই
পদার্থপঞ্চকে মূলপদার্থ স্বীকার না করিয়া
যোগিক বলিয়া প্রচার করেন । বাস্তবিক
এগুলি মৌলিক কি যৌগিক তাহা স্থবি

আচার্যগণ স্থির করিবেন । তবে ইহাদের
মৌলিকত্ব-প্রশ্নে যে সকল শাস্ত্রীয় যুক্তি
পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা বর্তমান কালের
স্বীকৃত এই যৌগিকগুলি মৌলিকত্বের
কিছু দাবী করিতে পারে কি না তাহাই এই
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ।

মহাত্ম্য বা মূল পদার্থ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে
উল্লিখিত হইয়াছে যে,—
মহাত্ম্যানাং বায়ুঃস্মিরাণঃ ক্ষিতস্তথা ।
শবঃ স্পর্শক রূপক রসো গন্ধস্ত তলুগুণাঃ ।

চঃ, শঃ, সঃ অঃ ।
অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিত
এই পাঁচটি মহাপদার্থ; ইহাদের শব, স্পর্শ,
রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ গুণ বিদ্যমান
রহিয়াছে । কিন্তু শব্দে এমন কথা কোথাও
নাই যে, এই পাঁচটি পদার্থ প্রত্যেকে একটি
মাত্র দ্রব্য, ইহাতে অল্প কোনও পদার্থের
সন্নিধান নাই । বরং শাস্ত্রকারগণ
বলিয়াছেন,—

তেষামেকশ্বণঃ পূর্বে। গুণবৃদ্ধিঃ পরে পরে।
পূর্বাঃ পূর্বো গুণবৃদ্ধিঃ ক্রমশো গুণিযুঃ স্তবঃ ॥
অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে আকাশের একটি
শ্বণ (শব্দ), কিন্তু পর পর ভূতে ক্রমশঃ গুণ
বৃদ্ধি হইয়াছে। মাত্র গুণ নহে, সেই
অম্বুপাতে পূর্বা ভূতসমূহও পরবর্তী ভূতে
ক্রমশঃ মিশ্রিত হইয়া বায়ুতে ভুক্ত হইয়া এবং
শব্দ ও স্পর্শ দুই গুণ; তেজঃ আকাশ ও বায়ু
সংশ্লিষ্ট। তিন ভাব্য এবং শব্দাদি তিনটি
গুণ; অগ্নি আকাশ, বায়ু ও তেজঃ মিশ্রিত
হইয়া চারি ভাব্য এবং শব্দাদি চারিটি গুণ
এবং ক্ষিতিতে আকাশাদি চারি স্রোণের
সংশ্লিষ্টে পঞ্চ ভাব্য ও শব্দাদি পঞ্চ গুণ সমিষ্ট
হইয়াছে।

এখানে একটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে—
যখন আকাশ ব্যতীত বায়ু প্রভৃতি চারি
পদার্থেই দুই বা ততোধিক পদার্থ মিশ্রিত
রহিয়াছে, তখন শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগকে মিশ্র-
পদার্থ না বলিয়া মূলপদার্থ বলিবে কেন ?

এ প্রশ্নের সমাধান করিবার পূর্বে মূল-
পদার্থ কাহাকে বলে নির্ণয় করা আবশ্যিক।

মূল শব্দের একটি অর্থ আদি; তাহা
হইলে মূলপদার্থ বলিলে আদিপদার্থ কহা
যাইতেছে। বাস্তবিক চিন্তা করিলে প্রতীতি
হইবে জগতের প্রথম স্রষ্ট এই আকাশাদি
পঞ্চ পদার্থ। সে কারণ শাস্ত্রকারগণ
বলিয়াছেন,—

অক্ষরাং থং ততো বায়ুত্পাদ্যং তেজঃ
ততো জলম্।

উপর্যং পৃথিবী জাতা ভূতানামেব সম্ভবঃ ॥
অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আকাশ তদনন্তর ক্রমশঃ
বায়ু, তেজঃ, জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তি
হইয়াছে। এই মৃত্তিকা-স্রষ্টার পর উদ্ভিদ,
প্রাণী, দাতু, যাঁহা কিছু বল, স্রষ্ট হইয়াছে।

যদি স্রষ্টার প্রথমাংশপর বলিয়াই এই
পাঁচটি আদি বা মূলপদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়,
তাহা হইলে পাঁচটি স্বীকার না করিয়া এক-
মাত্র আকাশকে মূলপদার্থ বলাই কর্তব্য।

তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে,
ভারতীয় আর্্যাগণ বহু গবেষণা দ্বারা স্থির
করিয়াছেন যে, এই আকাশাদি পঞ্চ পদার্থের
সমবায় জগতের ইতর পদার্থ সমূহের অবস্থার
গঠিত হয়; ইহাদের সমবায় ব্যতীত অজ্ঞ
কোনও পদার্থের অবস্থার গঠিত হইতে পারে
না। কিন্তু এই পাঁচটি সম্ভাব্য পদার্থ হইতে
এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ; যেমন জলে মৃত্তিকার
কোন অংশ নাই, তেজঃ জলের কোন অংশ
নাই ইত্যাদি। সে কারণ তাহার সাধারণ
পদার্থসমূহ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, স্রষ্টার
প্রথমাংশপর এবং স্রষ্ট পদার্থের অবস্থার-গঠনের
মূলস্বরূপ এই পদার্থ-পঞ্চকে আদি বা মূল-
পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

একথা বলা আবশ্যিক, ভারতীয় মনশিগণ
কিন্দারি পঞ্চ পদার্থকে হৃদয় ও স্থলভেদে দুই
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

পূর্নোক্ত শ্রীযতঃ হৃদয় পঞ্চমহাভূত
সংযুক্ত প্রয়োজ্য। এই স্থল বায়ু, তাপ, জল
ও মৃত্তিকায় আকাশ, বায়ু, তাপাদি ব্যতীত
আরও বহুবিধ ভ্রাব্যের সমাবেশ রহিয়াছে,
তাঁহা জাননুজ্ঞ কথিগণের বুদ্ধির অতীত বিষয়
ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

তাঁহারা হৃদয় অর্থাৎ প্রকৃতমাত্র মহাভূতের
শব্দাদি পাঁচটি মাত্র গুণের উল্লেখ করিয়াছেন।
কিন্তু যখন উক্ত হৃদয় পদার্থ-পঞ্চ-রূপস্বরূপ
হীনাধিক্য ভাবে নিশ্চিত এবং পরস্পর
সংশ্লিষ্টে আরও বহুবিধ উপাদান সংগ্রহ
পূর্বক এই স্থল-আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল
এবং মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে, তখন

তাঁহাদের স্থলতা-প্রাপ্তির সহিত উক্ত শব্দাদি
পঞ্চ গুণ ব্যতীত গুণ, লঘু, উষ্ণ, শীত, বিধি,
কণ্ঠ, স্থির, সর, মৃদু, কঠিন প্রভৃতি আরও
অস্তিত্ব বিংশতি গুণের সমাবেশ হইয়াছে।

সুতরাং বৃদ্ধিতে পারা গেল প্রাচীন স্রষ্ট
যে কঠি আদিম পদার্থের উপরকার জগতের
পদার্থসমূহ গঠিত হইতেছে অর্থাৎ তাঁহাদের
সমবায় ব্যতীত চেতন-অচেতন কোন
পদার্থেই অবস্থার গঠিত হইতে পারে না,
তাঁহারা ইহা (পদার্থসমূহের অবস্থার-গঠনের মূল
বলিয়া) মূল পদার্থ বলিয়া অভিহিত
হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চ পদার্থ হৃদয় ও স্থল ভেদে দুই
ভাগে বিভক্ত হইলেও স্থল পঞ্চ পদার্থই
বর্তমান প্রবর্ত্ত আলোচনার বিষয়ীভূত।
যেহেতু এই স্থল কিন্দারি পঞ্চ পদার্থ হইতেই
জড়জগতের স্থল পদার্থনিচয়ের উপাদানসমূহ
সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং এই কারণে এই
পাঁচটিও মহাভূত অর্থাৎ মূল পদার্থ বলিয়া
স্বীকৃত হইয়াছে।

এই পঞ্চ পদার্থের সমবায়, জগতের
চেতনচেতন সমূহ পদার্থের মূল উপাদান
বলিলে, কি জীবদেহ, কি দাতুসমূহ, কি
উদ্ভিদাদি সকলেরই মূল উপাদান ইহাদিগকে
পদার্থে এই উপাদানসমূহ কিরূপ ভাবে
সংগৃহীত হইয়া থাকে ?

এক্ষণে যে উপাদে উপাদান সংগৃহীত হয়
বলা যাইতেছে।

বীজ হইতে রূপের উৎপত্তি দেখা যায়;
কিন্তু বীজ মৃত্তিকায় উৎপন্ন না হইলে কখন

বৃক্ষ জন্মে না। তাহার পর জল, তাপ এবং
বায়ুর প্রয়োজন; আকাশ অর্থাৎ অবকাশ না
থাকিলেও রূপের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধির
সম্ভাবনা নাই। বিবেচনা করিলে বৃদ্ধিতে
পারী যাইবে ইহাদের কোন একত্রির অভাব
ঘটিলে বীজের কার্যশক্তি দেখা যাইবে না।
এইরূপ বীজ ভূগর্ভ হইতে মৃত্তিকাদি পঞ্চ
পদার্থের বিকার রস-আকারে গ্রহণ করিয়া
রূপরূপে পরিণত হয়। বৃক্ষ পুনরায় মূল
দ্বারা পঞ্চভৌতিক রস আকর্ষণ করিয়া বীজ
রূপে, পুট ও প্রতি লাভ করে। তাহার পর
উৎপন্ন বৃক্ষ মৃত্তিকাদির কোনও অংশ পাওয়া
যায় কি না স্থির করিবার জন্ত শাস্ত্রকারগণ

মৃত্তিকাদির গুণ, লঘু প্রভৃতি গুণসমূহ নির্ণয়
করিয়াছেন, এবং উৎপন্ন উদ্ভিদে উক্ত গুণাদি
উপলব্ধি করিয়া মৃত্তিকাদির অংশসমূহ নির্ণয়
করিয়াছেন।

স্রষ্টার প্রথমাংশপর মৃত্তিকাদি পদার্থ-পঞ্চের
বৃক্ষ ও গুণাদি যখন পর্বতী উদ্ভিদাদি পদার্থে
লীকৃত হইতেছে, তখন তাহাতে গুণাশ্রয়ী
পূর্ববর্তী মৃত্তিকাদি ভ্রাব্যেরও অস্তিত্ব উপলব্ধি
হইতেছে। কারণ ভ্রাব্য ব্যতীত গুণের অস্তিত্ব
থাকা সম্ভবপর নহে।

গুণ, ধর্ম, কঠিন, স্থল, গন্ধ প্রভৃতি গুণ-
সমূহ মৃত্তিকায় বিশেষ ভাবে রেখিতে পাওয়া
যায় এবং এই সকল গুণ হইতে পদার্থের
উৎপত্তি, গুণত্ব, ইহঁদা, কাঠি প্রভৃতি সম্পাদিত
হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্ভিদের উপস্থিতি
কাঠি, গুণত্ব প্রভৃতি মৃত্তিকার বিকার হইতে
সংগৃহীত বৃদ্ধিতে হইবে।

অন্য, বিধি, শীত, মৃদু প্রভৃতি গুণ জলে

* প্রাচীন যত্নে বারো উদ্ভেদ বর্তমানকালে আচাধ্যাপক মৌলিকের ভিন্ন প্রকারে লক্ষণ স্থির করিয়াছেন
এবং প্রায়শ্চল লক্ষণ সাধারণ প্রাচীন মহাভূত সমূহকে মৌলিক স্বীকার না করিয়া মৌলিক বলিয়া স্বীকৃত
করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষণ প্রয়োজন-নাশেরও প্রয়োজন দেখে প্রাচীন মহাবিশ্ব উপরোক্ত নিয়মে বিশ্লিষ্ট
মৃত্তিকা-মহাবিশ্বিক ও মূল বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

বিশেষ ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই সমুদয় গুণ হইতে পদার্থের স্রিততা, শৈত্য, নিম্নতা, মৃদুতা প্রভৃতি সম্পাদিত হয়। হৃতরাগ জলের অংশ হইতে উৎপন্ন উত্তরের উজ্জ্বল অংশসমূহ পূরণ হয়। এইরূপ তেজের গুণ উষ্ণ, রূক্ষ, তীক্ষ্ণ, রূপ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন উত্তিরাণি পরার্থের তাপ, তৈজস, প্রভা, বর্ষ প্রভৃতি এবং বায়বীয় ও অকাশাণ্ডিক লঘু, দৃশ্য, চাস, মৃদু প্রভৃতি গুণসমূহ হইতে উত্তিরাণি পরার্থসমূহের লঘুতা, রৌক্ষ্য, মৃদুতা, পরমাণু প্রভৃতি সম্পাদিত হয়।

মৃত্তিকাদি পঞ্চপদার্থের সমন্বয়ে পদার্থ সকল গঠিত হইলেও সকল পদার্থেই ইহাদের পরিমাণ সমান ভাবে থাকে না। এই কারণেই পদার্থ সকল পরস্পর বিভিন্ন-গুণাক্রান্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

উত্তিসের মধ্যে শাল, সেগুন, পনস প্রভৃতি বৃক্ষসমূহকে অতিশয় সংহতাবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার কদলী বিবিধ প্রকার লতা ও শাক জাতীয় উদ্ভিদ সকল অতিশয় সরস; চিত্রক, মুরগ, মাত জাতীয় উদ্ভিদ সকল অতিশয় তীক্ষ্ণ ও দাহকর; গোতাজন, বেগে প্রভৃতি বৃক্ষগুলি অতিশয় লঘু, মৃদু ও ছিত্র-বহুল দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষভূতের হীনাধিক্য সমাবেশই এই পার্থক্যের কারণ।

তাহার পর ধাতুতে মৃত্তিকাদির কোন অংশ পাওয়া যায় কি না দেখা যাউক।

অম্লদেশীয় আর্দ্রগণ, প্রস্তর কিংবা কঠিন-তম মৃত্তিকা ও তাপ-রসাদির বিভিন্ন প্রকার সমিশ্রণে বিবিধ বর্ণ ও গুণাক্রান্তিসম্পন্ন ধাতু-সমূহের উদ্ভব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এবং ধাতুসমূহে উক্ত মৃত্তিকাদির শব্দাদি পাটটি এবং গুণ, লঘু, স্নিগ্ধ, রূক্ষাদি গুণ-সমূহের উপলব্ধি করিয়া এ বিষয়ে গতসন্দেহ

হইয়াছিলেন। ধাতুসমূহে বায়বীয় ও অকাশাণ্ডিক অংশ অতীব অল্প মাত্রায় বিস্তারিত হইতে সকল ধাতুই অতিশয় সংহতাবয়ব এবং গুরুত্বাদি গুণবিশিষ্ট। যে ধাতুতে যত অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা ও তেজের অংশ বিস্তারিত আছে, তাহা সেই অংশপক্ষে অল্প ধাতু অপেক্ষা উজ্জ্বল ও গুরুত্বাদি গুণসম্পন্ন দেখা যায়। ধাতুসমূহ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই দুইটি পার্থক্য সর্বাধিক অধিক বিদ্যমান হইতু ইহা অন্ততঃ ধাতু অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গুণ, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণাদি গুণসম্পন্ন; এবং সেই কারণেই সর্ব অল্প ধাতু অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বেহের পুষ্টি, বল, কাস্তি, দীপ্তি সম্পাদনে সমর্থ; ইহা বায়বীরের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে।

আরও একটি বিচার্য বিষয় এই যে, ধাতু-সমূহ যখন মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ-গন্ধিশ ভূগর্ভেই স্থিতি হয়, তখন তাহাতে ইহাদের কোনও অংশ নাই, ইহা কি সম্ভবপর?

যদিও বর্তমানপ্রকার কোন যন্ত্রবিশেষে স্বর্ণাদি ধাতু হইতে এ কাপ পদার্থ মৃত্তিকাদির কোনও অংশ আলাদা করিতে হয় নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে কখন হইতে পারে না এরূপ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ যন্ত্রের চরম আবিষ্কার হইয়াছে ও কথা কহে বলেন না।

অতঃপর পক্ষভূত সমন্বয়ে জীবদেহ কিরূপে গঠিত হইতেছে, বলা যাইতেছে। জীবগণ দেহেরকার্য বহু প্রণয় করে; এই প্রণয় উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ উভয় পদার্থ হইতেই সংগৃহীত হয়।

উদ্ভিদেরা যে উপায়ে ভূগর্ভ হইতে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। জীবগণ শ্বাসরূপে উদ্ভিদ হইতে উক্ত পান্যভৌতিক রস লাভ করিয়া

থাকে। শিখ-বায়াদি মাংসভোজী প্রাণিদ্রা উদ্ভিদভোজী প্রাণী হইতে মৃত্তিকাদির অংশ-সমূহ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

মানবগণ এইরূপে কতক উদ্ভিদ হইতে কতক প্রাণিদেহ হইতে কতক বা স্তম্ভদ্রত ধাতুসমূহ হইতে এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্থিতি লাভ করে। জীবগণের উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ হইতে সংগৃহীত পদার্থ পরিপাক হইয়া প্রথমতঃ রস ধাতুরূপে পরিণত হয়। শরীরের নিম্নতা, শৈত্য ও পোষণাদি কাৰ্য্যান্তে রাসের প্রথম পরিণতি রস-ধাতুর দ্বারা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সারাংশ হইতে রক্তের উৎপত্তি হয়। এইরূপে প্রতি ধাতুর কাৰ্য্যান্তে অবশিষ্টের সারাংশ হইতে জন্মঃ মাংস, দেহ, অগ্নি,

মজ্জা; তদন্তর পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধাতু শুক্র এবং নারীর রজ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আহার্য পদার্থের সারাংশ হইতে উৎপন্ন এই সপ্ত পদার্থ জীবগণের দেহ ধারণের প্রধান উপযোগী হেতু, আর্দ্রদেশ ইহাদের ধাতু আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

এইরূপে আকর্ষিত মৃত্তিকাদি পঞ্চ আদি-পদার্থের অংশসমূহই উদ্ভিদ হইতে ক্রমে জীবদেহে সংশ্রুতি হইয়া দেহ-গঠনের বীজ "শুক্র ও রজ" রূপে পরিণত হইতেছে।

যে পঞ্চ মহাকৃত্তের সমন্বয়ে বিকার উদ্ভিদ, ধাতু ও জীবসমূহের অবয়ব, পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্থিতির মূলধরূপ হইতেছে; তাহারিগকে মৌলিক বলা মুক্তিদ্রত নহে কি?

শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।

দণ্ডবিধি আইন ও প্রায়শ্চিত্ত *

মৃত, যাজবল্ক্য, বৌধরন, কন্ডভায়ন, হারিত, প্রভৃতি ব্যবস্থাপকগণ হিন্দুদিগের জ্ঞানাজান-কৃত পাপমোচনার্থ কতকগুলি বাবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রিয়াছেন। এগুলি একই সময়ে লিখিত হয় নাই, হৃতরাগ সামাজিক অবস্থা-ভেদে, তৎসংস্কৃত দণ্ডবিধিরও ভাৱতম হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দুসামাজ্য সমুদ্রভাবে সেই ব্যবস্থাগুলি দ্বারা পরিস্ফুটিত না হইলেও, কোন হিন্দু তাহাদের উপদিষ্ট ব্যবস্থাগুলির কর্ণনই অমম্বাধা করেন নাই। এই সকল ব্যবস্থাপকগণের মহাপ্রণায়কর সম্মতি লইয়া হিন্দুসামাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্থিতি হইয়াছে। হৃতরাগ এই সম্প্রদায়গুলির আচার-ব্যবহার অপরপ্রত্যঙ্গ সমুদায় সর্বতো-

ভাবে একরূপ হইতে পারে নাই। একরূপ না হইলেও, তাহাদের বর্ণাশ্রম-মণ্ডে মূলতঃ একাধাযম তাহাদের মধ্যে পরস্পর বৈরী-ভাব নাই, বরং সখ্যাই আছে, সহানুভূতিও আছে—নাই কেবল, কথ্যাদানপ্রদান এবং অন্নভোজন। পদগত পার্থক্য তাহাদের মধ্যে কিছুই নাই, পদগতভাৱ ক্রমে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু এই পার্থক্য তাহাদের জাতীয় সম্মিলনের পক্ষে কখনই প্রতিবেদক হইতে পারে নাই। বিধি-ব্যবস্থা-গুলি একই মহৎ উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট—অর্থাৎ পাপের দমন ও কালন। বর্তমানকালে ভাৱতবর্ষে প্রচলিত দণ্ডবিধি আইনের সহিত এই ব্যবস্থাগুলির তুলনা করিল, স্পষ্টই

প্রতীক্ষমান হয় যে, ইংরাজ ব্যবস্থাপকগণ মহত্ব সমাজের হিতার্থ ও তাহার উন্নতি-বিশদার্থ, কেবলমাত্র তাহাদের পার্শ্বি হুগ-মোচনেই বদ্ধপরিকর; কিন্তু তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিণামে সফলতা চিন্তা তাহারা একেবারেই করেন নাই। স্বতরাং সমাজবিশেষের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অসীম। অপর পক্ষে, হিন্দু ব্যবস্থাপকগণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সর্বস্বত্বের শ্রেষ্ঠ মহত্ব কেবলমাত্র সমাজের প্রতি বা সমাজস্থ ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি সাধু ব্যবহার করিলেই যে তাহার দায়িত্ব কাটিয়া গেল তাহা নহে। ইংরাজ মহত্বপদবাচ্য হইয়া বিখ্যাত মঙ্গল-মতী স্ট্রীট সার্ক রিক্তে চাহেন, অধিকরণ পরমাচার অসীমকৃত ফুলিঙ্গ বলিয়া, জীবাত্মার চরম পরিণতি—পরমাচ্ছাত্তের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহারা আচার্য ক্রমোন্নতি করিতে বাধ্য; না করিলে প্রত্যাবর্তী, স্বতরাং দণ্ডার্থ হইবেন। হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব পর্যায়োচনা করিলে, প্রতি প্রসঙ্গ পদেই তাহার প্রচুর প্রশংসা প্রাপ্য।

সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের বিষ্ণু কোন অপরাধ করিলে এখন আর হিন্দু ব্যবস্থাপক-গণের বিনামত দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় না। কাল-মাহাত্ম্যে মহত্বের মতি-গতির এবং বৈবক্ষিক অবস্থার এমনই পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, তত্ত্বপালের জ্ঞান জ্ঞ প্রাচীনকালের বিধানগুলি বর্তমান কালের পক্ষে ঠিক উপযোগী না হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেগুলি এখানে দেখাইয়া দেওয়া সমীচীন বোধ না হওয়ায়, উল্লেখ করা গেল না। কলতঃ সেই প্রাচীন ব্যবস্থা মতে এক্ষণে দণ্ড বিধান করিতে হইলে, বর্তমান

সমাজ উচ্চ অলভ্য ধারণ করিত। পাপ-কার্যনিবারণার্থ রাজস্বের বিধান থাকিলেও, আমি যদি কোন প্রকার কুসংস্কার আচরণকারী নিজের অনিষ্ট চেষ্টা করি, বর্তমান আইনানুসারে আমি দণ্ডনীয় হই না। এক-মাত্র আত্মহত্যার চেষ্টায় ও জগৎহত্যায় আমাদিগকে রাজস্ব দণ্ডিত হইতে হয়। আত্মহত্যার চেষ্টায় দণ্ড আছে, আত্মহত্যা-কার্য সম্পন্ন হইলে, কোন দণ্ডই নাই। হিন্দু ব্যবস্থাপকগণ কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টায় এবং আত্মহত্যায় পুণ্ড্র পুণ্ড্র পাপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; এবং প্রথম অপরাধটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টির দণ্ডবিধান আরও কঠোরতর করিয়া গিয়াছেন। আত্মহত্যার মৃতদেহ অশুদ্ধ এবং স্পর্শ্য এবং তাহার আচার্য স্পর্শতিলিত হৃদয়পর্যন্ত। এইরূপ সমসার কতপ্রকার কুসংস্কার আচরণকারী আমরা যৎ অন্নিষ্টোৎপাদন করিয়াছি, তাহার সীমা নাই। সেই সমস্ত কার্যের জন্ত আমাদের রাজস্বের ভয় নাই; স্বতরাং দণ্ডভাবে, এক্ষণে অপরাধ নিতাই হইতেছে এবং অপরাধের সংখ্যাও নিতাই বাড়িতেছে। পূর্বে এই সমস্ত অপরাধ করিতে লোকে শব্দ বোধ করিত এবং করিবার প্রেলোভন বড়ই প্রবল হইলে সংগোপনে করিত। ক্রমে প্রপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহাদিগকে এই সমস্ত অকার্যকরকণকাল আর সম্বৃত্তি হইতে হয় না, গোপন করিবার আবশ্যক হয় না। এই সকল অপরাধের জন্ত রাজপুরুষদিগের নিকট তাহারা কিছুমান দায়ী নুহে। রাজপুরুষগণ বাস্তব আর একটি যে শাসক-সম্প্রদায় আছে, তাহা তাহারা বিশ্বস্ত হয়। বিশ্বস্ত হইবারই কথা। যাহার শক্তি নাই, তাহার অস্তিত্ব অনেকেরই সন্দেহ হয়।

আমাদের সমাজ এখন কতকটা শক্তিহীন। স্বতরাং “সমাজ” বলিয়া যে কোন শাসক-সম্প্রদায় আছে, তাহা অনেকের মনে উদয় হয় না। ইহার ধর্ম-ভয় আছে, তাহারই সমাজ-ভয় আছে; যাহার ধর্ম-ভয় নাই, তাহার সমাজ-ভয় থাকিতে পারে না। যাহাদিগের সমাজ-ভয় নাই, তাহাদিগের প্রতি আমাদের কিছুই বল্য় নাই। ইংরাজ এখনও সম্ভব-দেওয়ায় দোস্তলীমান, তাহাদিগের জন্তই এই প্রবন্ধ। তাহাদিগকে স্বরূপ করা ইহা নিতাই যে, যে সমস্ত অপরাধের জন্ত আমরা রাজ-পুরুষদিগের নিকটে দায়ী নহি, সে সমস্তের জন্তে স্বরূপের নিকট, অস্বতঃ যৎ সমাজের নিকট আমরা দায়ী। তাহাদিগকে আরও স্বরণ করাইয়া দিতেছি যে, সমাজই মহত্বকে সংহত রাখে, সমাজই মহত্বকে স্বপণে চার্ভিত করে, এবং সমাজের উৎসাহ-বাক্যই মহত্ব উন্নতির পথে ধাবিত হয়। সমাজ পাপকারী দণ্ডবিধানে সশস্ত্র। এককালে ইহার ক্ষমতা অপ্রসীম ছিল। অনেক সমাজ সম্পূর্ণ শক্তিহীন হইয়াছে বটে; কিন্তু হিন্দুসমাজ দুর্বল, হীনতেন্দ্র ও ক্ষীণমান হইলেও, ইহার ক্ষমতা অদ্বাদ্য একেবারে লোপ পায় নাই। সুকর্ষাণিত ব্যক্তিকে হিন্দুসমাজ একেবারে ত্যাগ করিতে চাহে না; তাহাকে সংশোধন করিয়া পুনরায় সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে চায়। চৌধুরীপরাধে, দণ্ডবিধি আইনে কায়দা, বা অর্ধদণ্ড বা উভয় প্রকার দণ্ডই ব্যবস্থা। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধের মাজহালতের এই দণ্ডের প্রাসঙ্গিক হয়; এবং এইরূপ দণ্ড অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন এবং তত্ত্বসমাজস্থ অদ্যাত্ম লোকেরও শিক্ষার কারণ হয়। রাজস্ব ও বাস্তব সমাজ রক্ষা হয় না। অতি প্রাচীনকালেও

রাজস্বের প্রয়োজনীয়তা বীকার করা হইয়াছে।—
“অপগ্যান দণ্ডম্ন রাজা”
দণ্ডাংকৈবাপ্যদগুন্ন।
• অংশো মহদাপ্রোতি নরকৈব গচ্ছতি।”
• প্রাচীন ব্যবস্থামতে রাজস্বও-প্রাণ ব্যক্তিকে আর পুণ্ড্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত না; কিন্তু সে দণ্ড অতি কঠোর ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি—অশীতিরিত স্বর্ণচুরির দণ্ড “রাজ-কর্তৃক মূল্যবাস্তে মরণ”। বর্তমান দণ্ডবিধি আইনে ইহার জন্ত কয়েক মাস কারাবাসমাত্র ব্যবস্থা। স্বতরাং বর্তমান আইনমত দণ্ড গ্রহণ কুরিলেও, অপরাধী ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য হয় না। রাজস্বের পর, তাহাকে আবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।
যাহাতে অপরাধীর মন ও আত্মা কলুষিত না থাকে, সেইজন্তই এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। অত্যাচার, উপদ্রাব-কৃত প্রায়শ্চিত্ত,—প্রায়শ্চিত্তই নহে। স্বপ্রস্তুতিত হইয়া এবং উপমুক্ত ব্যক্তির নিকট স্বকীয় অপরাধ পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইতে হয়; এবং সাধারণকে জানাইবার জন্ত পূর্ণ-দিবসে মন্তক মুণ্ডন করিয়া এবং অত্যাচারের চিত্রবর্ণ পূর্ণ সংযমী থাকিয়া, তৎপর দিবসে চিত্রবর্ণিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। রাজ-দণ্ডের ঘারা তাহার ঐহিক মঙ্গলের কারণ হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার পারজিক মঙ্গলেরও বিধান হইল। এইরূপ করিলে সমাজ অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ একেবারে বিস্মৃত হয়, এবং তাহাকে সমাজের কোডে স্থান দেয়। কিন্তু আজকাল দেখিতে পাই, রাজস্বের পর আর প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠে না। তাহার ফল এই যে, চোরের “চোর” নাম আজ্ঞা ঘুচে না, সমাজেও তাহার কদম্ব কালে প্রতিপত্তি লাভ হয় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরাজের দণ্ডবিধি আইনের “গণ্ডাপার” হইয়া, তুমি বাহ্য কিছু কর না কেন, তোমাকে দণ্ড দিবার এক্ষণে আর কেহই নাই। তুমি সত্য তুলিয়া যাও, পিতামাতাকে দাস্তবৃত্তিতে নিযুক্ত রাখ, শৌচিকালয়ে বাস কর, অশ্রাদ্দ পান ত্যাগ কর, বা পরস্পর হস্তধারণ করিয়া ক্ষুধি ক্রমিত করিতে তীর্থদর্শনে বহির্গত হও, তুমি এসমস্ত কার্যের জ্ঞাত রাজ্যধারের দণ্ডার্থ নহ। তোমাকে এই উদ্ভাভাব্য হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিতে কাহার সাধ্য? যদি কেহ পারে তাহা সমাজ। ইহা উচ্ছিন্ন সমাজের কার্য নহে; ধর্মহীন সমাজের কার্য নহে বা সন্যাসপ্রসূত অস্থিমজ্জারীন সমাজেরও কার্য নহে। যে সমাজের পিচীন ইতিহাস আছে, সে সমাজে অলোকসামান্য প্রতিভাবিশিষ্ট মহাপুরুষগণ আবিস্কৃত হইয়াছেন, এবং যে সমাজের ভিত্তি মহাপ্রলয়ের মহাবিপ্লবেও অটল, সেই সমাজই তোমাকে এই উদ্ভাভাব্য হইতে রক্ষা করিতে পারে। গুরু অপরাধের গুরু প্রায়শ্চিত্ত এখন একপ্রকার উত্তীর্ণ গিয়াছে এবং তাহার কতকগুলির সম্পাদন বর্তমান আইনে নিষিদ্ধ। সমাজের কাগাদও দিবার অধিকার নাই, তবে অভ্যাজ্যাজ্ঞান, বৈশা-গমন, অন্ত্যস্তাবণ, জলে অস্তি দ্রব্য নিক্ষেপণ, ব্রাহ্মণপিড়ন, শূদ্রাধান প্রভৃতি লঘুতর অপরাধের জ্ঞাত অর্থদণ্ড করিবার অধিকার আছে। ইহাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় প্রায়শ্চিত্ত বলি। প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অঙ্গ অশ্রুতাপ, অপরাধ ও ন্যূনতাপীকার, এবং ব্রাহ্মণগণকে কিছু অর্থদান। ব্রাহ্মণকে অর্থদান তুমিই চমকিও না। ব্রাহ্মণ অর্থশাস্যক নহেন, হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডের বলেই হিন্দুসমাজ গঠিত, বর্ধিত ও

সমুন্নত। মহাভারত পাঠ কর, পুরাণ পাঠ কর; ব্রাহ্মণের স্বার্থত্যাগ, ব্রাহ্মণের রোশনাইজুতা, ব্রাহ্মণের পরোপকারিতা, ব্রাহ্মণের ধর্ম-প্রবণতা ও ব্রাহ্মণের আত্মবিসর্জনের শতসংখ্য জাম্বলীমান উদাহরণ দেখিতে পাইবে। তাই বাবস্থাপকগণ প্রায়শ্চিত্তজনিত দণ্ডিত অর্থ অল্পকে না দিয়া সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণকে বিভাগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধিকদিনের কথা নহে, পণ্ডিত, জ্ঞানী ব্রহ্মসর পূর্বে প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এই সমস্ত অপরাধীর সমাজভুক্ত হইয়া থাকি কঠিন হইত। সমাজ-বহির্ভূত কথাটা অতি সূক্ষ্মতর। তাহার বাটতে কেহ অস্বাহার করিবে না, তাহার সহিত কেহ-একপংক্তিতে ভোজন করিবে না, কমা-পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে সে তুল্যবংশ হইতে পাত্রপাত্রী পাইবে না। ইহা অপেক্ষা কঠোর দণ্ড আর কি হইতে পারে? কয়জন ব্যক্তি এই দণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া তৎ-তৎস্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু হায়, সমাজ-রক্ষার প্রধান উপায় এই প্রায়শ্চিত্তে এক্ষণে অনাদর। গুরু অপরাধে রাজদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মনে করে, আইন মতে তাহাদের অপরাধের দণ্ড হইয়াছে, আবার সামাজিক দণ্ড কেন গ্রহণ করিব? সামাজিক অপরাধে অপরাধীরা মনে করে সমাজ কে? তাহার ক্ষমতাই বা কি? কতকগুলি ব্যক্তি-সমষ্টি লইয়াই সমাজ। এই সমষ্টি হইতে যাঃ জনকে ফুৎলাইয়া লইলেই কার্যোৎসাহার। হস্তস্ত্রাং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আপন উন্নত মনুষ্য অবনত করা অপেক্ষা, সমাজ ভাঙ্গাই তাহারা অধিকতর সুবিধাজনক মনে করে; এবং অর্থদ্বারা ইহুক, অশ্রুদ্বারা ইহুক, আর প্রলোভনদ্বারা ইহুক, সমাজ ভাঙিতে অগ্রসর হয়। সমাজেও কিছু সকল লোক

তুল্যরূপ দৃষ্টান্তে নহেন। হস্তস্ত্রাং ছিল, বলে, কৌশলে তাহারা স্বার্থী উদ্ভার করিয়া লয়। “স্বার্থীস্বার্থের প্রাজ্ঞা”। তাই বলিয়া এই সমস্ত সমাজভঙ্গকারী বা তাহাদের সাহায্য-কারিগণকে “প্রাজ্ঞ” বলিতে পুরি না। তাহাদিগকে সমাজদ্রোহী, মিত্রদ্রোহীও বলিতে পার। তাহাদিগের পরিণাম—মিরদ্রোহী কৃত্যন্ত যে চিৎরায়াতাকা:। তে নরা মনুষ্য যাক্তি যাবজ্জীবনদিকারো। তাহারা দণ্ডের দাস নহেন, অস্বাহার দাস। আজ আমার ছেলটি রেজেন্ট ভোজন করিল অমনি হুর উঠিল, বিপাকে পড়িয়া রেজেন্ট-ভোজনে পাপ নাই। আজ আমার ছেলটি রেজেন্ট হস্তাধান করিল, অমনি হুর উঠিল, গোপন-ভাবে সুরাগানে পাপ নাই। এই সকল লোকই প্রায়শ্চিত্তের বিরোধী। ইহাদিগের মধ্যে অনেক সমাজ ও ধনী ব্যক্তি-আছেন; ইহুতরা তাহাদের অহুচর ও পার্শ্বচরের অভাব হয় না। ইহাদিগের মতে প্রায়শ্চিত্তের অর্থও ব্রাহ্মণ-শাসনের স্বার্থপরতার ফল। ইহারা রোজশেষ, পবলিক গুরুার্শেষের মত ইহাকে একটি “ব্রাহ্মণ-দেব” বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সমাজে যাহারা কিছু মাজ-প্রতিষ্ঠাবান, সমাজ-রক্ষায় যাহারা যত্নশীল, ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের উন্নতির প্রতি যাহাদের

আন্তরিক লক্ষ্য, শাস্ত্রাঙ্গমাদিত প্রায়শ্চিত্তের প্রতি কোন প্রকারেই তাহাদের হস্তাদর করা উচিত নহে। দ্রব্যবিশেষ আহারে, ব্যক্তি-বিশেষের সহবাগে, স্থানবিশেষ গমনে, বিষয়-বিশেষের চিন্তায়, আমাদের মনোবৃত্তি কলুষিত হইতে পারে, ইহা স্মারক করিলে, আমাদের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পান-ভোজন, ব্যক্তি-বিশেষের সহিত সহবাগ, স্থানবিশেষে গমন এবং বিষয়বিশেষের চিন্তা অবশ্যই পরিহার্য। এবং দণ্ডবিধি আইনের প্রচলন না থাকিলে যেমন মহাশয়ের কৃপাদায়িত হওয়া স্বতঃই সম্ভব, তজ্জন প্রায়শ্চিত্তের অপ্রচলনে উপরি-উক্ত নিষিদ্ধ কার্যগুলির পরিহার কিছুমাত্র সম্ভবে? অতএব দণ্ডবিধি আইনে যে সমস্ত অপরাধের উল্লেখ আছে, তদন্তরিত অপরাধ-গুলি জনসাধারণের অনিষ্টজনক না হইলেও, সেগুলি অপরাধ,—এবং তাহার নিবারণ জ্ঞাত সামাজিক দণ্ডের প্রয়োজন।—
দণ্ড: সন্যস্তে দণ্ডে তর্পিতার্থ বিধানত:।
কীর্গী সন্যস্তে দণ্ডে তর্পিতার্থ বিধানত:।
রাজদণ্ডভাঙ্গলোকা: পাণা: পাণং ন কুরুতে।
যমদণ্ডভাঙ্গলোকা: পদলোকাভাঙ্গয় তথা।
(যুক্তি কল্পতরু:)

মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বোধন *

[বঙ্গদেশের পূর্বপ্রান্তে শ্রীহট্ট জেলায় কয়েক-বৎসর হইতে জেলার বিভিন্ন গ্রামের সাহিত্য-সেবিত্র গণিত হইয়া সাহিত্য-সম্মিলনের অঙ্গুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। তাহার পূর্ব হইতেই

বঙ্গপুত্র-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গপুত্র জেলার সাহিত্য-সম্মিলন চলিয়া আসিতেছে। সম্মিলিত চাকি নগরীতে একটি সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ জেলার সাহিত্যসেবিত্রগণকে কথঞ্চিৎ

মিলনপুত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এবার বঙ্গের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে মালবহ জেলার প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন অঙ্কুরিত হইল। আশা হইতেছে এই উপায়ে জেলায় জেলায় দীর্ঘসমূহের সাহিত্য-সেবিত্ব সম্মিলিত হইয়া বঙ্গজননী বসুমতীর সম্যক আধারের উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

মালবহ জেলার প্রথম সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে অঙ্কুরিত হয় নাই—একটি পল্লীগ্রামে হইয়াছে। মধ্যস্থলের জীবনবস্তার ইহা প্রকৃষ্ট পরিচয়। নানা স্থান হইতে পল্লীজীবনের নানা অতিথি সেখানে পাইলে দেশবাসিগণ আশাবিহীন হইবেন।

পূত সাত-আট বৎসরের মধ্যে মালবহ জেলার কতকগুলি কুর কুর স্থানীয় সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। মালবহের জাতীয় বিদ্যালয়গুলি জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রলগ্নকে সম্বন্ধে আসিয়া পুরীকা দিতে হয়।

সরকারী শিক্ষাবিভাগের নিয়মে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদিগকে আর সম্বন্ধে আসিতে হয় না। স্বতরাং মালবহ জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠানের আয়োজনে জেলার উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব পশ্চিম প্রান্তের শিক্ষার্থীগণ বঙ্গের অন্তরঃ একবার করিয়া নির্মিত হইবার স্বযোগ পাইয়া থাকে। তত্ত্বগতক

সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষা-কেন্দ্রে নানা সম্বন্ধে প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-শিক্ষাগণ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসকলে প্রতিষ্ঠা করিয়া অধ্যয়ন, উচ্চতর শিক্ষাভাষা এবং বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা-প্রাপ্তির জন্ত সম্বন্ধে অথবা কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সম্মিলিত হইয়া পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন। মালবহে

এবং যে সাহিত্য-সম্মিলন হইল তাহা এই গাঢ় বঙ্গদেশের কার্যাবলীর একটি সফল বিশেষ।

এই সম্মিলনে মালবহের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমুক্ত বিপুলেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় কলিগ্রামের মুখপাত্র হইয়া জেলার এবং কলিকাতার নিম্নোক্ত সম্মিলনকে আত্মনির্ভর করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা এবং প্রণালী প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে তিনি অনেক বিষয়ের

আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অতি-ভাষ্যের দুইটি বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (১) তিনি বলিয়াছেন—দেশের তথাকথিত ভ্রম ও শিক্ষিত সমাজ অপেক্ষা আমাদের নিরক্ষরী ও অশিক্ষিত জনসাধারণ চরিত্র হিসাবে সত্যসত্যই নোহে। আমরা এ কথা বহুবার প্রচার করিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে এ কথা শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বিতর্ক ব্যক্তিগণ চোখ বুজিয়া বিচার করিলে দেখিবেন যে, জনসাধারণের চরিত্রশুদ্ধি আমাদের একদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে; এই জ্ঞান আমাদের জাতীয় চরিত্রের আত্মদিককে পূর্বে পূর্বে লালিত ও বিবর্তিত করিতেছে। (২) লোকসমাজে শিক্ষাপ্রচার সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় ভারতের প্রকৃত জাতীয় আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছেন। এই আদর্শ কাঁচের পবিত্র নদী নানা পাপের অগ্নি বাক্যে অগ্নি সম্বন্ধে এবং অগ্নি সম্বন্ধে মাহুগড়া প্রকৃত শিক্ষার বাহ্যক করা সম্ভব।

অধ্যাপক শাস্ত্রী মহাশয় চরিত্রবান্ধু নির্ভাবান্ধু শিক্ষাপ্রচারক। তিনি সত্যাতন ধর্ম ও সমাজের নিরর্থক পালন করিয়া জীবনযাত্রা করিয়া থাকেন। অথচ টোল-চতুষ্টায়ীর তথাকথিত সর্জনীতা তাঁহার নাই। তিনি বৈদ্যবিশ্বাস এবং পারিবারিকতায় স্থপতিত। তিনি নানা স্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং নানা ভাষা-ভাষী ভাষার পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে আসিয়া তুলনা-মূলক আলোচনা-প্রণালীর ব্যবহারে পটু হইয়া লজ্জা করিয়াছেন। তাঁহার স্বাধীনচিত্ত-প্রবৃত্তি প্রবন্ধ-প্রবাহের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে কথঞ্চিৎ সমৃদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গীয় স্বতন্ত্রগণের তিনি উক্ত আসন লাভ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত, আধুনিক জগতের চিন্তাশক্তি ও কল্পশক্তি-পুঞ্জের সহিত পরিচিত থাকিবার জন্ত তিনি সর্বদা সচেষ্ট।

স্বতরাং অধ্যাপক শাস্ত্রী মহাশয় বর্তমান ভারতপোষী জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের যে প্রণালী নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা আমাদের জনসাধারণের

সবিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। আমরা এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রগণের স্বেচ্ছাচিন্তা প্রার্থনা করিতেছি।

আজ পুণ্যাহ। আজ আমরা আমাদের নিখিল মঙ্গলের বিধানকারিণী বিদ্যালয়বৌর বিশেষ আর্যধর্মের জ্ঞান এখানে সমবেত হইয়াছি। অতএব আজিকার দিন প্রিয়। আজিকার এই দিন যেন আমাদের অস্তরে বাহিরে, এবং চিত্তে, কণ্ঠে ও বাক্যে পবিত্র করিয়া তুলে। তাই বলিতেছিলাম আমরা সকলেই সমকণ্ঠে উচ্চারণ করি 'পুণ্যাহ, পুণ্যাহ, পুণ্যাহ।' আমাদের এই কণ্ঠে যেন তাঁহারই অগ্রহণে মঙ্গল হয়, স্বস্তি হয়। আপনারা সকলেই আশীর্বাদ করুন—'স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।' আপনারা প্রার্থনা করুন আমাদের এই কার্যে যেন নিরর্থক হতাশাজায়ে সশ্রম হইয়া সমুদ্রের জল, বৃষ্টির জল, ক্ষুদ্রদের জল হইতে পারেন। আপনারা সকলেই স্বপ্নের সহিত করুন—'স্ব্যাতম, স্ব্যাতম, স্ব্যাতম' ত্রিধের অন্তর্ধ্যায়ী উগ্ধবান্ধু এখানে সন্নিহিত আছেন; আত্মগণ, আপনারাও উপস্থিত হইয়াছেন; আমাদের যে সকল হিতৈষী বন্ধু নানাকারণে উদ্বিগ্ন হইতে পারেন নাই, তাহারাও স্বপ্নে-স্বপ্নে যেন এখানে উপস্থিত হন। আমরা প্রার্থনা করিতেছি ভগবতী সরস্বতীর আশ্রয়নে যিনি বেক্ষেপে পারেন, তিনি সেইরূপই কল্যাণ বৃদ্ধিতে 'কল্যাণমিহ সমিধিম্'—সকলেই এখানে সন্নিহিত হইুন। আমাদের সকলেরই দ্বন্দ্ব এই অসুখ্যে 'শিবসম্বলম্'—বাহা শিব—মঙ্গল, আমাদের মন যেন তাহারই সম্বল করে। 'অয়মাস্তঃ শুভায় ভবতু'—আমাদের এই আরম্ভ শুভের জন্ত হউক।

ভাতৃগণ, কলিগ্রামবাসী আজ এই শুভ মুহূর্তে বিনয়বচনে ও বাগতপস্বায়ে আপনা-

দিককে আত্মনির্ভর করিতেছেন। আপনারা করুণা করিয়া এই উপস্থিত অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিলে তাঁহার 'পরিশ্রম সার্থক হইবে। আপনারা যে, তাঁহাদের আহ্বানে কর্ণপাত করিয়া এখানে শুভাগমন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এখানে আপনারদের স্বপ্ন ও সেবা-সম্বন্ধে নানা বিষয়ে অংশবিশি ও ক্রটি হইবে, ইহা আমাদের অবিরত নাই; তথাপি বঙ্গগণ, আপনারা আমাদের ঘরের লোক, এই মনে করিয়া, এবং সাহিত্যলোচনার জন্ত আপনারা কষ্ট স্বীকারেও পরাভূত নহেন, নানা স্থানে ইহার পল্লীকা পাইয়া, আমরা আপনাদিগকে আহ্বান করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি, আপনারা অগ্রহণ করিয়া আমাদের অশক্ত-জ্ঞাত অলসসমূহ ক্ষমা করিবেন।

আমরা আজ যেখান পদাঙ্গু করিয়াছেন, সেখানে এতদুপায় অসুখ্যন এই প্রথম। স্থানীয় লোকের অধিকাংশই ইহাতে অনভ্যস্ত। বিশেষতঃ, অতি সর্জনী সময়ের মধ্যে আমাদের এই ইহার জন্ত আমরা আপনারদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, এ কাঁচটি কেবল আমাদের নহে, ইহা সমগ্র মালবহ-বাসীরই। ইহা আপনারদের নিজেদের কাশ। অতএব নিজের কাঁচের ক্রটি আপনারা অবগতই সহ্য করিবেন।

বিশেষ আনন্দের আবির্ভাবের সময়ে সময়ে ছপ-স্বস্তি উপস্থিত হয়, চিরবিবর্তিত স্বজন-অন্তরঙ্গের কথা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। বঙ্গগণ, আজ এই আনন্দ-সম্মিলনের দিনে

আমাদের রাশেচন্দ্রের কথা মুহূর্ত্তঃ জন্মে গাঢ়িগা উঠিতেছে। আজ জীবিত থাকিলে এই সন্মিলনের আনন্দ তিনিই সর্বাধিক অধিক অশ্রুতব করিতেন। এবং নিশ্চয়ই আমাদের এই বর্ত্তমান সন্মিলন স্বন্দরতর হইত। মালদহের সর্বতোমুখ উন্নতি ও গৌরব দেখিবার জন্ম তিনি সর্বদাই চেষ্টিত ও উৎসুক হইয়া থাকিতেন। গোড়ের বিজয়কাহিনী গাঢ়িগা শিক্ষিত সমাজকে তিনিই আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গোড়ের নামে তাহার প্রাণ নাচিয়া উঠিত। তিনি আমাধিককে বলিতেন 'যাহাই কেন আমরা' অধ্যয়ন বা আলোচনা করি, আমরা গোড়ের লোক, সব সময়েই গোড়ের কথা মনে আমাদের মনে থাকে। একথা তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেন। গোড় লইয়াই তিনি জীবন কাটায়াছেন। গোড়-ভূমিতে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সন্মিলনকে তিনিই আহ্বান করেন। তখন তিনি পীড়িত, কিন্তু সে দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া গোড়বাসীর মান-গৌরব-রক্ষার জন্ম ভয় বাঁধে রয় দেখে তিনি কি বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা আপনারা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি আর সারিরা উঠিতে পারিলেন না। সেই অনিয়ম-অত্যাচার তাহার মৃত্যুর প্রধান কারণ হইয়া উঠে। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাহা আমাধিককে দিয়াছেন তাহা যায় নাই, যাইবেও না; গেলে ইহারই মধ্যে চলিয়া যাইত। রাশেচন্দ্র মালদহের যাহা করিয়াছেন, তাহার ফল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাই আজ এই আমাদের দিনে তাহার মূর্ত্তি স্মরণপথে উদিত হইতেছে।

বঙ্গগণ, মহা মালদহে একটা সাহিত্য-সন্মিলন কোথা হইতে ফুটিয়া উঠিল

এবং তাহার প্রয়োজনই বা কি, এইরূপ প্রশ্ন কাহারো কাহারো জন্মে উপস্থিত হইয়াছে। মালী নিজে তাহার মালখের অতিশুদ্ধ শুকটিকে যথাযথরূপে জলসেচনা করিয়া সেবা করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই তরুটি দিনে দিনে বৃদ্ধিলাভ করে, তাহার চারিদিকে শত-শত নবনব শাখা-প্রশাখা পল্লব উপাত্ত হইতে থাকে, এবং শেষে তাহা পত্রশূণ্যকলে সমুদ্র হইয়া বনশ্রুতি নাম করিয়া নিজের শাখার কা সন্ধান করে। মূলদেশেও একটি মাত্র প্রধান মূল হইতে তাহার চারিদিকে কত-শত স্নান্নাশ্রুত মূল বর্হিগত হইয়া বিবৃত্তি লাভ করিয়া কতমূল হইতে রণ গ্রহণ করে এবং এইরূপে সেই তরুজাতকে দূততর করিয়া তোলে। ইহা বাস্তবিক-একলে প্রশ্নই হইতে পারেনা, সেই অতিশুদ্ধ তরুটির কোন একপ নবনব শাখা-পল্লব-মূলাদি উপাত্ত হইয়া বিবৃত্তি লাভ করে বা তাহাদের কি প্রয়োজন আছে। বটবীজ যদি অশুল ভূমিতে রোপিত হইয়া অশুল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাহার একপ পরিণতি অবশ্যই হইবে। সে জন্মের আগোচরে ভূতিকাণ্ড মধ্যে শটন শটন মূল বিস্তার করিয়া, চারিদিকে হইতেই রস গ্রহণ করিয়া আত্মভিষ্ম করে, এবং বাহিরেরও ক্রমশঃ 'সেই বীজপতন স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া নিজের জটাকলাপে চতুর্দিকের স্থান অধিকার করিয়া মেলে। ইহা তাহার স্বভাব। কেবল প্রতিকূল হইয়া না পাড়াইলে ইহা হইতেই হইবে।

সমুদ্রের মধ্যে কোন স্থানে, যে-কোন রূপেই হউক, জল স্কুচকল হইলে সেই আন্দোলনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উথিত হইয়া তটদেশ পর্যন্ত ধাবিত হয়। এখানে প্রশ্ন

হইতে পারে না, কি প্রয়োজনে একপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ হয়, এবং কেনই বা সেই তরঙ্গ বেলাভূমি পর্যন্ত আগমন করে। ইহা নৈসর্গিক নিয়ম।

আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। বঙ্গ, ভারত, অথবা এই সমগ্র ভূবন-ক্ষেত্রে স্ত্রুত মূর্ত্তিই বিশ্বজনীন। সাহিত্য-বনশ্রুতির বীজ রোপিত হইয়াছে, অশুল অবস্থায় অজুরাদিক্রমে বর্হিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ত এখন চতুর্দিকে নবনব শাখা-প্রশাখা ও জটাকলাপে বিবর্ত্তমান করিয়া ফেলিবে। বিশ্বসাহিত্যসমগ্র প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, কলোবিক্ষেপ ত স্বর বেলাভূমিকে স্পর্শ করিবে।

বর্গীর নবজন্মধারাগতে ভূতল অভিনব বিবর্ত্তি উদ্ভিদে জাম তরু ধারণ করিয়া দর্শকের চিত্রে তামস্বন্দরের মোহিনী মূর্ত্তি জাগিয়া দেয়। কোথা হইতে এই উদ্ভিদগুলি আগমন করে? তাহার কি সংসা উৎপন্ন হয়? তাহাদের বীজগুলি নানান সময়ে বায়ুবিহঙ্গাদি কর্তৃক সমাগত হয়, এবং সাধারণ লোক-লোচনের অন্তর্হিত হইয়া অবহান করে; কিন্তু তাহাদের অজুরাদি কাণ্ড নৈসর্গিক নিয়মে শটন শটনে চলিতে থাকে। পত্র যখন সেই অজুরাদি সাধারণ চক্ষুর দর্শনযোগ্য আকুর ধারণ করে, অতক্ৰিভাবে মানব তখন এক দিন পুরোভাগে তাহা দেখিবে পায়।

বঙ্গগণ, আমাদের সাহিত্য-সন্মিলনও এইরূপ। সাহিত্যালোচনা নিজের নৈসর্গিক নিয়মেই আজ এখানে এইরূপ আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। ইহা সংসা মৃদুজ্ঞাক্রমে হয় নাই। সাহিত্যালোচনার যাহা পরিণতি তাহারই ইহা একটি প্রকাশমাত্র। শাখা পল্লব পত্র-সমূহ যতই প্রভূত হইবে, মনে

করিতে হইবে, বৃক্ষ ততই মৃদু হইতেছে;— তাহার মধ্যে যে অনন্ত শক্তি অন্তর্হিত হইয়া বেলাভূমি পর্যন্ত আগমন করে। ইহা প্রকাশিত হইতেছে। ইহা কলাগণের লক্ষণ। বনস্তের মলদ-মারুত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে শিশির-শীর্ণ জমরাজিতে যেমন নবোদ্ভিদ কিশলয়তরু অবিকৃত হয়, সেইরূপ শিক্ষা সম্বন্ধে পশ্চাৎপতিত থাকিলেও সুরপক্ষীয় শশিকলার ছায় প্রতিদিনই উপচায়মান সাহিত্যালোচনার প্রভাব সংস্পর্শক হওয়া, এই মালদহেও বর্ত্তমান সন্মিলনের আকর্ষণ হইয়াছে। একপ সন্মিলন যতই অধিক হইবে, ততই মঙ্গল বাড়িবে। সাহিত্যালোচনার প্রভাব বা সঙ্গাধার ইহারই ছায়া প্রতি নগর-গ্রাম-গঞ্জীতে প্রসার লাভ করিতে পারিবে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পুরুত হইতে উৎপন্ন শতসংখ্য নব-নবী ভিন্ন ভিন্ন প্রবণের জল বহন করিতে করিতে সমুদ্র রাশা-জলপিকে শক্ত-সম্পাদি ছায়া সমুদ্র করিয়া অবশেষে মহাসমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয় ও তাহার গৌরব-মাহাত্ম্য প্রকটিত করে; সেইরূপ এতদূর্শ জ্ঞাহুত্ব সন্মিলন-সমুদ্রই দূর-দূরত্বের উপকরণ-রাজি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বসাহিত্যের মহাব সম্পাদন করিবে। আমরা ইহাতে বিচ্ছিন্ন হইব না, আরও দূতভাবে সংযুক্ত হইব। ইহাতে আমাদের শক্তির ঙ্গ হইবে না, বৃদ্ধি হইবে। কার্ণা-শূলতা নষ্ট হইবে না, ফুটিয়া উঠিবে। কাম্বিনশেষে অভাব হইবে না, নূতন নূতন কাম্বীর আবির্ভাব হইবে। এবং সাহিত্য-লোচনার ব্যাঘাত হইবে না, পরম স্বযোগ হইবে। অতএব বঙ্গগণ, এই সন্মিলন আমাদের ভবিষ্যৎ মহাকলাগণের সূচনা করিতেছে। এখন যাহাতে ইহা সার্থক হয়,

যাহাতে ইহা কল্যাণ উৎপাদন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আপনারা চিন্তা করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হউন।

ব্রাহ্মণ, ইহা আপনাদের অবিরত নাই যে, যিনি যত অধিক শিক্ষিত হইবেন, তাঁহার দায়িত্ব তত অধিক। তিনি এক দিকে যেমন জনগণের প্রভুত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অপর দিকে তেমনই বিষম অনিষ্টও উৎপাদন করিতে পারেন। তাহাদের প্রতিচরণক্ষেপে, প্রতিবচনবিজ্ঞানে, বা প্রতিনয়নভঙ্গীতে লোকের কুশলাকুশল নির্ভর করে। শ্রেষ্ঠেরা যাহা আচরণ করেন, অন্তেরা তাহাই অমূল্যবর্তন করে; তাহাদিগকেই ইহারা অমূল্যবর্তন করে। অতএব শিক্ষিতেরা যদি এদিকে লক্ষ্য না করিয়া চলেন, তবে হায়! সাধারণের আর গতি নাই।

শ্রীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যদি সম পরিপুষ্ট হয়, তবেই তাহা স্বস্থ, এবং তাহাতেই শরীরী আনন্দ অমূল্যবর্তন করিতে পারে। কিন্তু যদি তাহার একটি মাত্র অঙ্গ অস্বাভাবিক পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তবে তাহা তাহার স্বস্থের জ্ঞান না হইয়া বস্তুত অস্বস্থই উৎপাদন করে। এবং সেই অঙ্গকেও পরিপুষ্ট না বলিয়া বরং ব্যাধিগ্রস্ত বলা হইয়া থাকে। আমাকে যদি স্বস্থ হইয়া জীবন বাপন করিতে হয়, তাহা হইলে, সেখিত্যে যতই কেন ক্ষুদ্র হউক না, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টির দিকে আমাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমি তাহাদের একটিকেও বর্জন করিতে পারি না, কেননা তাহাদের সকলকে লইয়াই আমি পূর্ণ। কেবল একটি মাত্র অঙ্গ আমি পূর্ণ নহি।

কুমি, বস, তাপ, আলোক, বায়ু ও আকাশ এই সমস্তকেই লইয়া, অঙ্গুর বৃক্ষরূপে পরিণত হয়; ঐ সমস্ত ভূতের সহিত যোগ রাখা

করিয়া তাহা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে; উহাদের একটিকেও বর্জন করিলে চলে না, তাহাতে তাহা বিকল হইয়া পড়িবে, অসম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। কেবল বীজ থাকিলে হয় না, উহাদের প্রত্যেকটির প্রয়োজন, অত্থা তাহার সমুদায় থাকিতে পারে না।

প্রত্যেক মানবও সেইরূপ। একাকী নিজে সম্পূর্ণ নহে, তাহার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়াই সে সম্পূর্ণ হয়। অত্থকে বর্জন করিলে সে থাকিতেই পারে না। সে অমূল্যব বস্তুক বা না বস্তুক, প্রত্যেকের সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে। বিরাট সমাজ-বেধের আমি যেমন একটি অঙ্গ, আমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহারাও অত্থাক্ত অঙ্গ। অতএব যতদিন এই সমস্ত অঙ্গই স্থপরিপুষ্ট হইয়া না উঠে ততদিন সমাজের স্বাস্থ্যস্থ কোথায়?

ব্যক্তিগত শিক্ষা বা সফলতা বস্তুত থাকা না থাকা তুল্য। গাছীর একপাশি মাত্র চক্রে কোন কাণ্ড হয় না। পক্ষীর পর্ণহীন্য পরিবেষ্টিত ইষ্টকপুংহ নিরাপদ নহে। বৃক্ষরূপ-তত্ত্ব-পরিবৃত্ত সজ্জন নিক্তস্থ থাকিতে পারেন না। সম্ভবত মূর্খকে লইয়া বলি বর্গগণন বাহনীয় মনে করেন নাই।

যতদিন আমাদের চতুর্দিকের প্রত্যেকটি লোক শিক্ষিত হইয়া না উঠিতেছে, যতদিন আমরা তাহার জগৎব্যাপ্তি প্রয়াস করিতে প্রবৃত্ত না হইতেছি, এবং যতদিন আমাদের এই কাণ্ড যথোচিত ভাবে পরিচালিত না হইতেছে, বন্ধুগণ, আমি বলিব, ততদিন আমাদের যথার্থ সফলতা লাভ হয় নাই, ততদিন আমরা অঙ্গ হইয়া রহিয়াছি—আমাদের চক্ষু উদ্বীলিত হয় নাই।

ভারতবর্ষে বহুলা আকাশ হইতে নিপতিত

হয় নাই, বা মহাসমুদ্র হইতেও উদ্গত হয় নাই। অরণ্যবাস সাধনীয় বলিয়া মনে করিলেও ইহা বৈষ্ণবজীবন বহন করে নাই। সমস্ত দেশ বলিতে বাহা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ স্বতন্ত্র ভাবে স্বাধীন বৃত্তিতে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে সে তাহা চিন্তা করিয়া কার্যে পরিণত করিয়াছিল। আজ তাহার বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ভারত আত্মবিশ্বত হইয়া পড়িয়াছে। নিজের অতিমান, অতি-উচ্চ পবিত্র আদর্শ হইতে খলিত হইতে হইতে সে অঙ্গপতিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সেই আদর্শের নির্দেশ "বিনষ্ট হইয়া যায় নাই, এবং যতদিন চক্ষু-স্বর্ঘ্য আছে, ততদিন হইবেও না; কোন্ অকৃতজ্ঞ তাহা সমস্ত রক্ষা না করিবে?

বন্ধুগণ, আমি শিক্ষার প্রসারের কথা বলিতেছিলাম। এ সম্বন্ধে ভ্রমভ্রষ্ট হইতে-বিস্তৃত কয়েকটি পক্ষি থাকেন আপনাদের অরণ্যপথে আনয়ন করিব। একজন রাজা (কৈকেয় অঙ্গপতি) বলিতেছেন। ছায়াযোগ্য, ১-১১-১) —

ন যে তেনো জনপদে ন কর্ষ্যো, ন মদ্যপো, নানাহিতায়িঃ ন অবিধান, ন বৈরী ন পৈরিণী।

আমার রাজ্যে চোর নাই, রূপণ নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতায়ি নাই, অবিধান নাই, বেঞ্চাচারী নাই, বেঞ্চাচারিণী—ব্যভিচারিণী নাই। দেশের অধিপতি বলিতেছেন তাঁহার রাজ্যে একটিও অবিধান নাই, এবং বিদ্যা-লাভের যাহা ফল, তাহা তাঁহার রাজ্যে বিরাটমান।

আরও কয়েকটি পক্ষির দিকে লক্ষ্য করুন (অযোধ্যা, বাল, ৬) ঐ একই কথা উক্ত হইয়াছে—

কাশী বা ন কর্ষ্যো বা নুশশ পুরুষঃ কচিৎ।
ঋতঃ শক্যমযোধ্যায়ঃ নাবিধান্ ন চ

নাভিকঃ ১৮

সর্বো নরান্দ নার্দান্দ ধর্ম্মশীলাঃ স্বয়ংযতঃ।
মুনিভ্যাঃ শীলব্রতান্ডাং মহর্ষয় ইবামলাঃ ১৯
নানাহিতায়িগণ্যজ্ঞা ন ক্ষুভো বা ন তত্ত্বঃ।
কশিদাসিমযোধ্যায়ঃ ন চারুভো ন সক্ষমঃ ১২
নাভিকো নানুভী বাপি ন কশিদবহুশ্রুতঃ।
নান্থকো ন চাশক্তো নাবিধান্ বিদ্যাতে

কচিৎ ১১ ১৪

যদি কেহ মনে করেন অঙ্গপতি নামে বা দশরথ নামে বস্তুত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, অতএব সে কথা কেবল গল্পমাত্র; তাহা হইলে আমরা বলিব, ক্ষতি নাই, ধরিত্রী লইলাম অঙ্গপতি ছিলেন না, দশরথ ছিলেন না, তাহাদের রাজ্যও ছিল না। কিন্তু ঐ কথাগুলি বাহা হইতে উদ্ধৃত সেই উপনিষৎ ও রামায়ণ নামে যে পুস্তক আছে, তাহা ত সমস্ত; সেই উপনিষদের স্বর্গ ও রামায়ণের রময়তি—বাস্তবিকই হউন অথবা অপর কেহ হউন—ছিলেন, ইহাও ত সমস্ত। ভারত-বর্ষেই যে ঐ পুস্তকস্বয় রচিত হইয়াছে তাহাও সমস্ত। ধরিত্রী লইলাম অঙ্গপতি ও দশরথের রাজ্য সেক্ষপ ছিল না। কিন্তু উপনিষৎকার ও রামায়ণকার দেশের ঐ যে আদর্শ সমুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ত কখনই অসত্য নহে। তাহারা ভারতের লোককে ঐ আদর্শেই যে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহা ত কখনই অসত্য বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। যাহারা দেশের বস্তুত মঙ্গল কামনা করেন, তাহাদের ত শিক্ষা সম্বন্ধে উহা

ভিন্ন আদর্শই হইতে পারে না, এই আদর্শকে পরিচাল্য বা অবজ্ঞা করিলে কোন দেশই অত্থায় লাভ করিতে পারে না, পারে নাই

এবং পারিবেও না। ভারতের এই যে ‘ন অবিধান’—কেহই অবিধান নহে,—এই পুরাতনী বাণী বর্তমান সভাদেশসমূহে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার্য্য ওদৃশ্যের কার্য্য করিতেছে। নিয়ত (compulsory) শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে। জাপানের মুক্ত সম্রাট মিকাদো বলিয়াছিলেন—এখন হইতে একগুণে শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে যাতে কোন গ্রামে অশিক্ষিত পরিবার না থাকে, বা কোন পরিবারের মধ্যে কেহ অশিক্ষিত না হয়।

‘ন অবিধান’—কেহই অবিধান নহে, ইহাই যদি শিক্ষাপ্রচারের সনাতন মঙ্গল আদর্শ হয়,—তাহা হইলে ইহাই লক্ষ্য রাখিয়া যে আমাদিগকে চলিতে হইবে তাহা বলাই বাহ্য।

এখন একবার এই শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মালদহবাসীদের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখা যাক; ‘দেখা যাক ‘ন অবিধান’ এই বীরবাহীর কটকট সফলতা আমাদের মালদহে হইয়াছে।

বিগত ১৩০৮ সালে (১৯১১ খ্রিঃ) ভারতের লোকসংখ্যা হয়। তাহার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মালদহ সম্বন্ধে এই সকল কথা জানা যায় :—মোট লোকসংখ্যা—১০,০৪,১৫২; ইহার মধ্যে লেখাপড়া জানে মোট ৪১,২০৪ জন, অর্থাৎ ২,৫৮,২৫৫ জন নিরক্ষর! তাহা হইলে বলিতে হয় শতকরা ৪ জন (৪%) লেখাপড়া জানে, আর অবশিষ্ট ৯৬ জন একেবারে ‘নিরক্ষর’। ইহার মধ্যে আরও দেখিবার আছে। মালদহে স্বনামস্তরের শিক্ত লোকগণের সংখ্যা ইহা

হইতে বাদ দিলে বাটী মালদহের শিক্ত লোকের সংখ্যা আরও কম হইবে। যে জেলার লোক শতকরা ৯৬ জন নিরক্ষর, তাহা কতদূর অসংপত্তিত, তাহার দশা কত শোচনীয়, তাহা কত করুণার পাত্র, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি বলিয়াছি লেখাপড়া-জানা লোক আমাদের জেলায় মোট ৪৫,২০৪; ইহার মধ্যে পুরুষ ৪৫,৪৩৩; স্ত্রী ১,৬৩১। অতএব বলা যায় এক হাজারে ৩ জন (৩%) স্ত্রীলোক শিক্ষিত!

আমাদের জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। হিন্দু ৪,৩৫,৫২১ জন, আর মুসলমান ৫,০৫,৩৩৬ জন। অর্থাৎ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ৩৯,৮৭৫ জন বেশী। কিন্তু সংখ্যা বেশী হইলেও মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা শিক্ষার কম। শিক্তের সংখ্যা হিন্দুদের ২১,১০৫ আর মুসলমানদের ১৮,০৫৪ জন।

বন্ধুগণ, আমরা সাহিত্যের আলোচনার জন্ত, শির্কার জন্ত আমাদের জেলার হিন্দু মুসলমান উভয়েই এখানে সমবেত হইয়াছি এবং দেখিতে পাাইতেছি আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়। কি ভীষণ কথা, আমরা শতকরা ৯৬ জন নিরক্ষর! এই অশিক্ষা-নিপাটীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত যে, আমাদিগের সকলকেই বন্ধপরিকর হইয়া প্রবৃত্ত করিতে হইবে তাহা বলাই বাহ্য।

আলোচ্য ১৩০৮ সালের লোকসংখ্যার দশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩০৮ সালে (১৯০১ খ্রিঃ) যে লোকসংখ্যা হয়, তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহার পর ১০ বৎসরের মধ্যে শতকরা এক জনও অধিক লোক লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই।*

আমরা যদি দশ বৎসরের এইরূপ ফল স্তম্ভে দর্শন করিয়াও নিক্ষিপ্ত হইয়া কাল-যাপন করি, তাহা হইলে আশা কোথায়?

সন্দেহ নাই, বন্ধুগণ, আপনাদের নিকট আমি যে প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছি, তাহা অতি জটিল, অতি গুরুতর। মনে হইতে পারে, আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্য-সেমীতে এতাবশ্য প্রশ্নের আলোচনা সমস্তগণের উপহারের বিষয় হইবে। মহামহারসীরা যেখানে পরামুগ্ধ, দুর্বল কীটাদিকৃষ্ণের উপস্থিতি সেখানে শোভা পায় না।

কিন্তু আমাদের বাহা যথার্থ কল্যাণ, তাহার আলোচনা, তাহার দিক্‌র প্রদানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত রেখিয়া বুজুয়া যদি উপহাস করেন, করিতে পারেন। কিন্তু কি প্রকারে আমরা তাহা জুলিয়া থাকিব? বাহা না হইলে আমাদের চলিবে না, যতই কেন আমরা ক্ষীণ হই, দুর্বল হই, চেষ্টা করিতেই হইবে। আমরা চাঁদ ধরিতে চাহিতেছি না; লোক বাহা ধরিতে পারে,—

সর্বত্র ধরিতেছে, আমরাও তাহাই ধরিতে চাহিতেছি। যদি আমরা ধরিতে চাই, সত্য-সত্যই যদি তাহা ধরিবার জন্ত আমাদের দৃঢ় ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আজ হউক, কাল হউক, দশ দিন বা দশ বৎসর পরে হউক আমরা তাহা নিশ্চয়ই ধরিতে। কিন্তু আমরা যে অন্য লোকেই ধরিতে চাহিতেছি। “মহাযাগাণাং সহস্রেয়, কণ্ঠস্থ যত্নে সন্তুষ্টে” সহস্র-সহস্র মানবের মধ্যে কোন একজন দিক্‌র জ্ঞাত চেষ্টা করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, আমরা যদি সনাতন আদর্শকে সমুৎসাহে রাখিয়া একগুণ শিক্ষা প্রচার চাহি, তাহা হইলে সিদ্ধি আমাদের অদূরবর্তী না হইলেও, দূরবর্তী থাকিও, একদিন শুভ-

মুহুর্তে আমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে। আমাদের মনে রাখা উচিত “ন রত্নমবিযাতি মুগাতে হি তং”—রত্ন-অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় না, তাহাকেই অন্বেষণ করিতে হয়।

যে ব্যক্তি সর্বদা কেবল নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, মঙ্গল তাহার দলত। শৈশবে আহার-বিহার-শয়ন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই জননীকে অবলম্বন করিতে হয়, তাহা ভিন্ন গতি থাকে না; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বালক যদি পূর্বের ভায় প্রত্যেক কার্য্যে মাতার সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না। মসৌরে একমাত্র সন্তান-পালনই জননীর কার্য্য নহে, তাহার আরও বহু কর্তব্য থাকে, তাহাকে সমস্ত দিক্‌ই লক্ষ্য রাখিতে হয়। মাতার ঘেঁষে ও যত্নে বহিত হইয়া উঠিলে পুত্র ক্রমশঃ নিজেই নিজের ভার গ্রহণ করিতে পারে এবং এইরূপে সমস্ত সংসারের মঙ্গল দেখা দেয়।

* শিক্ষাসম্বন্ধে এইরূপ। আমাদের জননী-স্থানীয়া রাজস্বত্বের উপর কেবল নির্ভর করিলে আমাদের ‘চলিবে’ না। কেবল শিক্ষাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় নহে, তাঁহার চিন্তা-ক্ষেত্রের সীমা নাই। তিনি যতদূর পারেন একিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, যত করিতেছেন এবং করিবেন। তিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বপ্ন-স্বপ্নস্তর দিকে দৃষ্টি নিবৃত্তি রাখিবেন। ইহা না করিয়া তিনি পারিবেন না। তাহার এই স্নেহ-করুণা-যত্নে সুরক্ষিত থাকিয়াও কেন আমরা যতদূর পারি নিজের ভার নিজে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব না? যতক্ষণে মা ভাতের গ্রাস মুখে জুলিয়া দিবেন ততক্ষণে খাওয়া হইবে মনে করিয়া কোন বয়স পুজই অসমভাবে বসিয়া

থাকে না, থাকিলেও মাতা তাহা ভাল বাসেন না, আর পুত্রেরও তাহা মঙ্গলজনক নহে।

দেশের সমস্ত শিক্ষার ভার রাজার স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিত থাকা ভারতবর্ষের আদর্শ নহে, এবং কোন স্থানেও তাহা হয় না, হইতে পারেও না। রাজা বস্তুদূর পারেন করেন এবং দেশের লোককে দিশূর্ধন ও দান করেন, তাহার পর দেশবাসীরাও তাহার যত্নে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

লোকশিক্ষার ভার প্রধানত লোককেই লইতে হইবে। ভারতবর্ষে তাহাই হইয়াছে, এবং সেই জন্যই ‘ন অবিদ্বান’ এই মন্ত্রবাণী এখনো অসম্ভব হয় নাই। ভারতের বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত “আচার্য্যকুল” * বা “গুরুকুল” গুলি দেশের রামায় স্থাপিত নহে, বা রাজকোষের অর্থেও তৎসমুদয় পরিচালিত হইত না। জনগণ বা সমাজের ব্যবস্থাতেই সেই সমুদয় স্থাপিত হইত, এবং ব্রহ্মচারীর গৃহস্থ-পরিবার হইতে শিক্ষাদাত্ত ও শ্রমশ্রুতিতেই তাহাদের বায় নির্ভর হইত। কিন্তু তাহা হইলেও, বিদ্যা তখন দান করা হইত, বিক্রয় করা হইত না; এবং শিক্ষাও তখন নিয়ত (compulsory) ছিল। জনগণ নিজহস্তে লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই আদর্শভাৱে ততদূর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। কাল পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে। এখন একেবারে ঠিক সেই প্রাচীন আচার্য্যকুল বা গুরুকুল হইবার সম্ভাবনা নাই সমস্ত, কিন্তু তাহা হইলেও বর্তমান সমস্ত অবস্থা চিন্তা করিয়া

আজকালকার উপযোগী যতদূর পারা যায়, ততদূরই শিক্ষাপ্রচার আদর্শ নিষ্কর হইতে গ্রহণ করিতে কি আদর্শ সমর্থ হই ন?

আত্মগণ, আমরা সকলেই যে শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনা করি, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার বিধি ব্যবস্থা করিতে গিয়া আমরা অনেক সময় যত্ন হইয়া যাই। কুণ্ডল পণ্ডিত, নৃপের কাণে ধারণ করিলে শোভা ধর না, শীতের পরিচ্ছদ গ্রীষ্মে ও গ্রীষ্মের পরিচ্ছদ শীতে পরিধান করিলে প্রয়োজন ত সিদ্ধ হয়ই না, বরং তাহা অর্থের জ্ঞাত হয়। ভূমির প্রকৃতি অনুযায়ী কৃষিগ্রন্থালীর পরিবর্তন করিতে হয়। অনেক সময় আমরা এই মূল তথ্যটি ভুলিয়া যাই। আমরা নিষ্কর ঘরে কতটা কি আছে, তাহা ঘারা কতদূর কি ফল হইতে পারে, এই সমস্ত বিচার করিয়া না দেখিয়া আমরা পরের ঘর হইতে এমন কতকগুলি জিনিস আনিয়া ছাড়ির করে, যাহাদের পরিচয় হার্নিই আমাদের ঘরে কুলিয়া যায়; এবং একইরূপে মৃতন আমদানী জিনিস ত নষ্ট হয়ই, আমাদের পুরাতন সন্ধানও সেই সঙ্গে চলিয়া যায়।

আহিরে যাহা দেখিব নির্মিষ্টারে তাহাই ঘরে তোলা ভাল নহে, এবং সর্বত্র তাহার প্রয়োজনও থাকে না, আর তাহাতে কণ্ঠশব্দও জটিল দুর্গম হইয়া পড়ে।

শিক্ষার প্রসঙ্গ উঠিলেই স্কুল-কলেজের কথাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠে; আর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ঘরদালান, টেবিল-চেয়ার, বেঞ্চ-ডেস্ক ইত্যাদি উপকরণ-রাশি আসিয়া জুটে। এগুলি না হইলেই স্থলই “হইবে না, আর স্থল না হইলে পড়া শুনাও

হইতে পারে না। যাহারা সব সময় কোটি-পাটালি পুরেন, সেই সাহেব-বাহাদুরের স্ত্রী-চোবর-বেকের আদর্শভাৱে থাকিতে পারে; তাহা বলিয়া আমাদের শিশুগণের জ্ঞাত তাহার কি প্রয়োজন আছে জানি না, বরং অশুভ হয়। অশুভ এই আসবাব পত্র না হইলে মনে কল্পি বিদ্যালয় আমাদের হইল না। আমি যদি বিদ্যমত বিদ্যালয় করিতে চাই, তবে যতটা চাই-এখত হউক, সর্বপ্রথমে আমাকে ইহা সংগ্রহ করিতেই হইবে। অথচ সামান্য মানুষের এই কাজ চলিত পারে। এবার কলিকাতা বিদ্যালয়গণের মাটি-লেগন পরীক্ষার যত ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত-পরীক্ষার তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যকই বালক দৃষ্ট হইয়াছিল। এই সমস্ত সংস্কৃত-বিদ্যার্থী বেঞ্চ-ডেস্কের সাহায্যে অধ্যয়ন করে নাই, বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহেই শিক্ষা পায় নাই। অথচ ইহারা পড়িয়াছে, জ্ঞানও উপার্জন করিয়াছে, উপাধিলাভও ইহাদের ঘট্যাছে। স্বাধেও যে ইহাদের তাহাদের অপেক্ষা ধারাপ তাহার প্রমাণ নাই। যে দেশ বিদ্যাকে যত শ্রদ্ধা করিতে পারিবে, সে দেশ ততই অধ্যয়ন লাভ করিবে। ভারতবর্ষে ইহা যেমন করিয়াছিল, আমি জানি না, অত কোথাও আর এরূপ হইয়াছে কি না। আচার্য্যকুল বা গুরুকুল গুলিতে বালকরা শীতাতপ-বর্ষ-অহসারে কখনো শা-সাধারণ অনাড়ম্বর গৃহের মধ্যে, কখনো বা মিত্রজ্ঞায় তত্ত্বমূলে কখনো কখনো বা রমণীয় বৈদিতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নি পাতিয়া মনের আনন্দে অধ্যয়ন করিত। উদ্ভুক্ত প্রকৃতির সমগ্ৰে চিত্তের ভায় শরীরেও তাহারা সমুদ্র হইয়া উঠিত। তাহারা সাতিথ্য, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান,

ইতিহাস, সমাজ সেই দীন অথচ শাশ্বত জ্ঞান আশ্রয়ে অধ্যয়ন করিত, তাহারা গণিতবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি তাত্‌কালিক সমুদয়ে সেই স্থানেই শিক্ষা করিত। বিদ্যা সেই সময়ে যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, ততদূর তাহারা আশ্রয় করিত, ততদূর শিক্ষা তাহাদের সম্পূর্ণ হইত। বিদ্যার উৎকর্ষ সে সময়ে নিত্যই অগ্ৰ ছিল না। Residential বিদ্যালয়বিষয়ক বর্তমান উচ্চ-চীৎকারের সমাধানও এই স্থানেই হইয়াছিল। সেই কৃতীর শিক্ষা, তত্ত্বত্বের শিক্ষা, বন-আশ্রমের শিক্ষা পাইয়া দেশে আদর্শ রাজা, আদর্শ প্রজা হইত; আদর্শ মন্ত্রী, আদর্শ শিল্পী, আদর্শ শিক্ষক দেখা দিত। শিক্ষার দ্বারা দেশের শক্তি বাহা হইতে পারে, সেই ব্যবস্থাতেই তৎসমুদয় স্বদিক হইত। সেই ব্যবস্থাতেই, আপনারা অনুযায়ণে, অশপতি বলিতে পারিয়াছিলেন—আমার জনপদে চোর নাই, রূপ নাই, মাতাল নাই, অনাহিতা নাই, অবিদ্বান নাই, বেচ্ছাচারী নাই, ব্যভিচারিণী নাই। এই ব্যবস্থাতেই যাক্ষিক অধ্যাধ্যায় কথা বলিয়া গিয়াছেন—

“নাথকো নানুভী বাপি ন কশ্চিদবহুশতঃ।

নানুশকো ন চাশকো নাবিধান বর্জতে কচিৎ।

ঋত্ব শকামবোধাধ্যায় নাপি রাজতভক্তিমান্ ॥” অধ্যাধ্যায় নাস্তিক নাই, মিথ্যাবাদী নাই; কেহই সেখানে অবহুশত নাই, কেহই সেখানে অবিদ্বান নাই; সেখানে কেহ অশক বা অশ্রদ্ধাকারী নাই, রাজার প্রতি ভক্তিহীন লোক অধ্যাধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে তত্ত্বরাজ মন্থকের উপর স্বদিক হইতে চিত্তের ভায় শরীরেও তাহারা সমুদ্র হইয়া উঠিত। তাহারা সাতিথ্য, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান,

* গোপব্রাহ্মণ, পূর্বা ২৪; ছান্দোগ্য ৪-১৩; ছান্দোগ্যপুর্ন, ১-১০-১১।

† মুদ্রক, ১২-২২; বৌদ্ধগনপুর্ন, ২-১০২; ১২-৩০; বিষ্ণু, ৩-১০৬; যাজ্ঞ, ১-২-৪০৫।

সহ ক্রিয়া, ঠিকিয়া থাকিয়া, দূর-দূরে নিজে শাখা-প্রশাখা পুসারিত করিয়া শ্রামসিদ্ধি ছাড়া প্রদানে ও পূজপল্লবপুষ্পকল-সৌভেদ আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, কেন আমরা তাহাকে উৎপাতিত করিয়া ফেলিতেছি? যদি আমাদের “কলছায়া-সমমিত” মহাবৃক্ষের প্রয়োজন থাকে, তবে ইহাকে আমরা সমূলে উচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করি? যদি ইহাকে আগাছা আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, বা লতাভালে ইহার শাখা-পল্লবকে সমান্তর করিয়া থাকে, সেই আগাছাকে কাটিয়া দাও, সেই লতাভালকে ছিড়িয়া ফেল, মূলদেশে জলসেচন কর, আবার তাহা স্থপুণ্ড ইহা উঠিবে, আমাদের মনোরথ-সিদ্ধি ইহা ঘাইবে।” আর যদি নিতাইই সেই জীব তরুণকে কোনরূপেই রক্ষা করিতে না পারা যায়, ক্ষতি নাই, তাহাকে কাটিয়া ফেল, শিকড়গুলি তুলিয়া লও, চাষ নিয়া জমি উপযুক্ত করিয়া তোমা, এবং ঐ স্থানে আবার সেই তরুণজেরই একটি সুপরিপুষ্ট বীজ রোপণ কর, কয়েক দিন বিবিধ উপভব হইতে যত্নের সহিত তাহাকে রক্ষা কর, দেখিতে দেখিতে আবার পূর্ণেরই মত মহাবৃক্ষ জাত ইহা আমাদিগকে সেইরূপই অমৃতফল প্রদান করিবে। সাধারণ, বদ্ধগণ, আমরা যেন মোহবশত ঐ স্থানে বিষয়ক বা কষ্টকর রোপণ করিয়া না ফেলি, আমরা যেন বিফলভাবে বা কষ্টকা-ঘাতে জঙ্ঘরিত ইহা না ঘাই।

আমরা যে শিক্ষাপ্রচার বা গণশিক্ষা চাহিতেছি, তাহার জন্ম আমাদিগকে ঐ আচার্য্যসুল বা গুরুসুলের দিকে নমন-নিষ্কেপ করিতে হইবে। প্রাচীন পবিত্র গুরুসুলের কণি নিদর্শন চতুষ্পাঠী বা টোলমুহ

এখনো টিকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু অসম্মত অপ্রয়োজনীয় পাণ্ডাচাড়াব এগুলিকেও গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভগবান করুন, ইহার যেন কবলিত হইয়া নিজের সত্তাকে, নিজের বিশেষত্বকে একেবারে হারাইয়া না ফেলে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ সংস্কার-প্রার্থী হইয়াছেন, সাধবান, স্কুলের জন্ম ইহার একেবারে পূর্বের দিকে—নিজের দিকে অক্ষ অক্ষ ইয়া যেন কেবল পশ্চিমের দিকে বদলকা না হন।

আমি পূর্বের বলিয়াছি, আমাদের এই প্রাচীন গুরুসুলসহে তাৎকালিক সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত। তবে গুরুসুল যোগ্যতা ও অজ্ঞাত কারণে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার নানাদিক্রম অবশ্রী ছিল। অথবা হয়ত কোন স্থানে কোন বিশেষ বিখ্যাত আদৌ শিক্ষা দেওয়া হইত না। বিদ্যার্থীকে তাহার জন্ম অপর গুরুসুল আশ্রয় করিতে হইত। বর্তমান চতুষ্পাঠীসমূহও এইরূপ ইহা থাকে। কোন কোন টোলে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, সাংখ্য, বোদ্ধা, ন্যায়, জ্যোতিষ, গণিত ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষা দেওয়া হয়, আবার কোন কোন টোলে হয়ত একটি বা দুইটি বা ততোধিকও শিক্ষা দেওয়া ইহা থাকে। এক সংস্কৃত ভিন্ন, বিবিধ প্রাকৃত ভাষাও টোলে পড়ান হয়।

এই প্রথাভিত্তিই নব-নব চতুষ্পাঠীতে আমাদের বালকেরা ইংরাজী, বাঙ্গালা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষা করিবে। এক-একটি চতুষ্পাঠীতে যেমন একাধিক অধ্যাপক থাকিয়া বিভিন্ন-বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেন, এ সম্বন্ধেও সেইরূপ হইবে। যে অধ্যাপক যে বিষয় যতটা

শিক্ষা দিতে পারেন, বিদ্যার্থী তাহার নিকট ততটাই সেই বিষয় শিখিয়া আবার অপর টোলে গিয়া অধিকতর শিক্ষা গ্রহণ করিবে। সংস্কৃতজ পণ্ডিত মহাপণ্ডণ যেমন এক-একটি চতুষ্পাঠী খুলিয়া যিনি যাহা জানেন তিনি সেই বিদ্যাই প্রচার করিতেছেন, ইংরাজী-শিক্ষিতগণও সেইরূপ করিবেন।

দর্শন, শাস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি বিবিধ কাণ্ড থাকিলেও এক-একটি ইন্ডিয় যেমন এক-একটি কার্যের জন্ম নিমুক্ত থাকিয়া দেহীর উপকার করে, সেইরূপ সমাজেরও বিভিন্ন-বিভিন্ন কার্যের জন্ম কতগুলি বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তিকে নিমুক্ত থাকিতে হয়। অধ্যাপন-অধ্যাপন ভ্রাঙ্গণের নিত্যকর্মের মধ্যে। তাহারাজকে পড়িতেও হইবে পড়িতেও হইবে। নিষ্ঠাবান ভ্রাঙ্গণপণ্ডিতগণ এখনও তাহা করেন। সংস্কৃত শিখিলেই তাহারাজ্যবতই অধ্যাপনে নিমুক্ত হন, তাহারাজ্য ইহা না করিয়া থাকিতেই পারেন না। এক্ষণে নিম্নাংশ সমাজ-সেবক আর কোন দেশে আছে? ভ্রাঙ্গণপণ্ডিতগণের এই আশ্রয়েই আমাদের মধ্যে বিদ্যাত্রী লোক-সেবকগণের প্রয়োজন। ইহারাজ্যেই মত পড়িবেন ও পড়াইবেন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-প্রচারের আর একটি বাস্তবের কথা আপনাদের নিকটে উল্লেখ করিব, আশুনো ইহা প্রবাহন করিয়া দেখিবেন। আমি এ কথা অজ্ঞাত বলিয়াছি, আবার একবার বলিতেছি, এবং যতদিন কার্যাসিদ্ধি না হয় ততদিন পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি অভিজ্ঞ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যদি পড়ার তরুণমুহ আলোচনা করিবার যোগ্যতা থাকে, সকলেই যদি বর্ষা পণ্ডিত লাভ করিতে সমর্থ হয়,

তাহা হইলে স্থপের সীমা থাকে না, সে সমাজে উত্তির পরাকর্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্যাত্তর ইহা নয় না। সমাজে অভিজ্ঞের হায় অল্প লোক থাকে, পণ্ডিতের হায় মূর্খ লোকেরও তাহাতে স্থান হয়, খোঁষা-অখোঁষা পণ্ডিত-মূর্খ উভয়কে লইয়াই সমাজ হয়। অতএব ইহারাজ্য সমাজের পরিচালক, ইহারাজ্য লোকহিতের নিয়ন্তা, তাহারাজকে উভয় শ্রেণীই লোকের কল-চিন্তা করিতে হয়; বৎ অভিজ্ঞশ্রেণী স্বয়ং স্বকীয় মঙ্গলসাধনে সমর্থ বলিয়া তাহাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া তাহারাজ্য-অযোগ্যগণেরই মঙ্গলের জন্ম সবিশেষ প্রয়াস করিয়া থাকেন। গাড়ীর একটি বলদ দুর্বল হইলে, আর তাহা লক্ষ্যহীন উপরিভ হইতে পারে না। শকটচালকে ঐ দুর্বল বলদ বর্জিত মনব করিয়া লইতে হইবে, এবং তৎক্ষণ তাহাকে শুদ্ধ-বর্তন ভূগুণের পরিবর্তে সরস-কোমল শশপবন প্রদান করিতে হইবে, এবং এইরূপ কিয়দিন অতিবাহিত হইলে ঐ দুর্বল বলদই মনব হইতেও সে তখন রস গ্রহণ করিয়া শরীর পোষণ করিবে, এবং শকটকে যথাস্থানে বহন করিয়া লইয়া ঘাইবে।

ভারতের মূনি-শিক্ষণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহারাজ দেখিয়াছেন মঙ্গল-ভ্রাঙ্গণ আচার্য্য-উনিষৎ প্রভৃতিতে যে সকল গভীর তত্ত্ব রহিয়াছে, তৎসমূহ সাধারণ-জনের বোধন্যম নহে, ঐ সকল দ্রুত গ্রহণে প্রবেশ করিয়া সাধারণ-লোকেরা উপকার লাভ করিতে পারেন না, অতঃ তাহারাজকে উপেক্ষা করিয়া থাকা কোনরূপে কর্তব্য হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারাজ বৎ-বোদ্ধা প্রভৃতি সহস্রাধার নানা কল-

আখ্যাতিকায়, নানা দুষ্টান্ত-উপমায় বাখ্যা করিয়া এবং উপযুক্ত নানাবিধ নবনব বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়া তৎসমুদয়কে পুরাণ-নামে প্রচার করিয়াছেন। আশ্চর্য, ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, লোকতত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল বিষয় পূর্বে সাধারণলোকের নিকট অতি দুর্জয় ছিল, পুরাণের প্রচারে তাহাদিগের নিকট সেই সমুদয় সহজ হইয়া উঠিল। লোক ধর্মতত্ত্বে, দেবতাবৎ অশুপ্রাণিত হইয়া ঈশ্বরভিত্তিক হইয়া উঠিল।

আজিও ভারতের জনপদ নগর-গ্রাম-পল্লীতে যে ধর্মভাব দেখিতে পাওয়া যায় তেছে, তাহা বের-বেদান্ত-আর্য্যক-উপনিষদের জ্ঞান নহে, তাহার একমাত্র কারণ পুরাণ। রামায়ণ-মহাভারতেরই অমৃত ভাষা ভারতের অতি নিম্নস্ত সমাজেরও লোককে বজ্রবর্ষক-অমড়া হইতে দেখে নাই, পুরাণসমূহের মধুর কথাসংহরই তাহাদের হৃদয়কে এখানে পূর্ণাঙ্গভাবে সরাই করিয়া রাখিয়াছে। স্ব-হু, ভাল-মন্দ, নোষ-গুণ, ধর্মাদর্শ প্রভৃতিকে পুরাণেরই সাহায্যে ভারতের সাধারণজনগণ সত্যক পদ্ধতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। পুরাণেরই কল্যাণে গ্রামে বাপী, স্থপ ও তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইত, পথে পথে ক্ষমজায়াগ্রদ পাগপ-শ্রেণী রোপিত হইত, পাখশালা স্থাপিত হইত, ধর্মশালা নির্মিত হইত। ক্ষেত্র ও অছাত্র স্থানে জলের আগম-নির্গমের জ্ঞান উপযুক্ত সেতুসমূহ যথ হইত, আরোগ্যশালা স্থাপিত হইত, আতুর ব্যক্তি গুহ্য পাইত, বিদ্যাার্থী বিদ্যা পাইত, পবিত্র দেবায়তন-সমূহের উন্নত শৃঙ্গাবলী মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিত, প্রভাত-প্রদোষে মন্দিরে শব্দ-ঘণ্টা-কীসরের মল্লললনি দিগন্ত স্পর্শিত করিয়া উষিত হইত; অধিক কি কোন উন্নত সমাজের

লোকেরা যাহাতে কিছু কল্যাণ উপভোগ করিতে পারি, ভারতের জনগণ তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই, প্রভূত সেবভাবে অশুপ্রাণিত হইয়া প্রচুরভাবে তৎসমূহ অধিকার করিয়াছিল। কেবল আধ্যাত্মিক ভাবের কথা নহে, কেবল আধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষার জ্ঞান নহে, লৌকিক বিষয়সমূহেরও সর্ববিধ জন-সমাজে পুরাণ-পাঠের সাহায্যে প্রচার হইয়াছে। জুলাল, খগোল, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, বাস্তববিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রাস্ত্রনীতি, কৃষিবিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞাতব্য তাত্কািক সমস্ত তথ্যই কোন স্থানে সংক্ষেপে কোন স্থানে বা বিস্তৃতভাবে পুরাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাহারা স্বধ্য বা গুরু নিকটে অধ্যয়নের অবসর পাইত না, তাহারা পুরাণকথা শুনিয়া তিনিয়াই সেই সকল বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়া উঠিত। বাহ্য ও অধ্যাত্ম উভয়দিকেই পুরাণস্বর্গে ভারতের জনগণ এইরূপে শিক্ষা-লাভের অতি রমণীয় সুযোগ পাইত।

কিছু বর্তমানের অবস্থা শোচনীয়, পুরাণ-পাঠ দেখিতে দেখিতে এতদূর কমিয়া গিয়াছে যে, আর অতি অল্প দিনেরই মধ্যে হয় ত তাহার অস্তিত্বলাপ হইবে। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও পুরাণ-পাঠকে আজকাল অবজার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। বিতংক প্রপণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রায়ই পুরাণকথক হইতেই বেধা যায় না। মনে হয় বর্তমান যুগপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত মহোদয়গণ পুরাণ-কথকতায় স্বকীয় মধ্যান-হানি আশঙ্ক করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের মনে করা উচিত যে, একদিন ব্যাস-বশিষ্ঠের দ্বারা মহর্ষিরাই পুরাণকথকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাহাদের দ্বায় ব্যক্তিগণ ই

ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই পুরাণপাঠ-স্বর্গের যাহা কল, ভারত তাহা লাভ করিয়াছিল। আশ্চর্য, ধর্মতত্ত্ব ও লোকতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বাখ্যা পণ্ডিতেরাই স্বাধীনভাবে করিতে পারেন, যুগের তাহা কার্য্য নহে। আজকাল যেরূপ সকল পুরাণকথক দৃষ্টিশোচনীয় হন, তাহাদের স্বাধীনতাশীল শাস্ত্রজ্ঞানহীন। ইহাদের হাতে পড়িয়া পুরাণকথা দুর্গতির চরমসীমায় গিয়া পৌছিয়াছে। এই শ্রেণীর কথক মতে শব্দে রাহু-কেতুর লোপ করিয়া উত্তরনন্দ ও নেপচূনের উল্লেখ করিতে হইবে। যখন নবগ্রহের কথা উঠিবে, তখন নবাত্তরের মতে রাহু-কেতুর লোপ করিয়া উত্তরনন্দ ও নেপচূনের উল্লেখ করিতে হইবে। যখন দর্শনপ্রসঙ্গ হইবে, তখন সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসার দ্বায় টোকা-ক্যাট-হিগেলের কথাও করিতে হইবে। যেমন একই বিষয়কে আখ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বাখ্যা করিয়াছেন, এবং সেইরূপ ভাবেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া থাকি, নবা আবিষ্কার ও মতবাদগুলিকেও সেইরূপ ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। যদি এমন কোন-কিছ থাকে যাহার সহিত পৌরাণিক বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, তাহা না হয় গম্ভীরপূর্ণ কথকতার সময় নাই বলিমা, কিন্তু তাহারই আদর্শ নবীন পুরাণে তাহা শুভাইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা পুরাণ-কথা অবন করিয়া বাহ্য-অধ্যাত্ম উভয়-দিকেই কতক জ্ঞানলাভ করিতে পারিব, এবং ইহাই আমরা দিগকে করিতে হইবে। অন্তঃস-বিদ্যাভিত্তিগণ পুরাণকথকের আসনে অধিষ্ঠিত হউন। গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে সমুদয় পুরাণ-সুধার লহরীমালা উষিত হইয়া গ্রামবাসীর পল্লীবাসীর হৃদয়কে অতিমন্দ কলঙ্ক, এবং পুনর্বার পবিত্র সৌন্দর্য্যে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণিত হইয়া উঠুক!

গ্রামে-গ্রামে মন্দির ও মন্দির-গুলি জর্জর হইয়া "লবণেশ্বরগণি"—প্রভৃতি সমুদয়-সমূহের

কথা বলিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর প্রভৃতিরও নামোল্লেখ করিব, যখন বিদ্যা-হিমালয়ের কথা আসিবে, সেই সময়ে আল্পস-ককসেসও নাশ করিব, যখন গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু সরস্বতীর নাম করিত হইবে, সেই সময়ে ভগ্নাণ-নাহিরেরও উল্লেখ করিতে হইবে। যখন নবগ্রহের কথা উঠিবে, তখন নবাত্তরের মতে রাহু-কেতুর লোপ করিয়া উত্তরনন্দ ও নেপচূনের উল্লেখ করিতে হইবে। যখন দর্শনপ্রসঙ্গ হইবে, তখন সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসার দ্বায় টোকা-ক্যাট-হিগেলের কথাও করিতে হইবে। যেমন একই বিষয়কে আখ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বাখ্যা করিয়াছেন, এবং সেইরূপ ভাবেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া থাকি, নবা আবিষ্কার ও মতবাদগুলিকেও সেইরূপ ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। যদি এমন কোন-কিছ থাকে যাহার সহিত পৌরাণিক বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, তাহা না হয় গম্ভীরপূর্ণ কথকতার সময় নাই বলিমা, কিন্তু তাহারই আদর্শ নবীন পুরাণে তাহা শুভাইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা পুরাণ-কথা অবন করিয়া বাহ্য-অধ্যাত্ম উভয়-দিকেই কতক জ্ঞানলাভ করিতে পারিব, এবং ইহাই আমরা দিগকে করিতে হইবে। অন্তঃস-বিদ্যাভিত্তিগণ পুরাণকথকের আসনে অধিষ্ঠিত হউন। গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে সমুদয় পুরাণ-সুধার লহরীমালা উষিত হইয়া গ্রামবাসীর পল্লীবাসীর হৃদয়কে অতিমন্দ কলঙ্ক, এবং পুনর্বার পবিত্র সৌন্দর্য্যে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণিত হইয়া উঠুক!

গ্রামে-গ্রামে মন্দির ও মন্দির-গুলি জর্জর হইয়া "লবণেশ্বরগণি"—প্রভৃতি সমুদয়-সমূহের

খালিত-পতিত হইতেছে। এগুলিকে সংস্কৃত

করিয়া লইতে হইবে। পল্লীর বটতরুর মূল চূর্ণা হইয়া পড়িয়া আছে। সূত্রশ্রাবণ শুরুরক্ষারপ আসন পাতিয়া প্রকৃতি দেবী আস্থান করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিয়া পুরাণ-কোরাণ, সাহিত্য-বিজ্ঞান, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহারই কথকতা আরম্ভ করুন। শ্রোতাব্য অভাবে হইবে না। পুরনারীগণ কথক সাধুরকে পরিত্যক্ত করিয়া রাখিবে। যথাস্থিত ভোজ্য-দক্ষিণা দিতেও তাহার কৃতিত্ব হইবে না, বরং তাহাদের সে প্রস্তুতি আছে।

আত্মনির্ভরতা না থাকিলে বড়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পল্লীবাসীরা জন্মশই ইহা হারাইয়া দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতেছে। চক্ষু থাকিতেও তাহার দৈবিত্তে পাইতেছে না, হস্ত থাকিতেও তাহার শক্তি করিতে পারিতেছে না। তাহাদের শক্তি আছে, অথচ তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। ইচ্ছা করিলেই তাহার এক-একটি বৃৎস কার্য করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু সে ভাব তাহাদের উদ্ভূত নাই। পানীয় পানীয় পুত্রের জল অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই জলপান করিয়া তাহার দৃষ্টিবিক্ষেপ ব্যাহতিতে তৃপ্তিতেছে, কত অশ্রুবিধাতেই তাহারিগণকে পতিত হইতে হইতেছে; কিন্তু প্রতিদিন হয় ত পাঁচ শত লোক সেই পুত্রের আশা করে, তথাপি তাহার পান্য উঠে না। প্রত্যেকে প্রতিদিন শ্রমের সময় পাঁচ মিনিট করিয়া পরিশ্রম করিলে কখনই বা এক-একটি ক্ষুদ্র পুষ্করী পরিষ্কার করিতে লাগে। আমি যতক্ষণ দেখিয়াছি, আমাদের গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ-বিধবা একাকিনী ছুটি পুষ্করী পরিষ্কার করিয়া রাখাছিলেন, তিনি প্রতিদিন শ্রমের সময় নীরবে কিছুক্ষণ

এই কার্য করিতেন। বর্ষায় পল্লীগ্রামে জল-কাঁচায় সাহসের তরুর রূপা, গ্রাম্য পশুগুলিও কত কষ্ট পায়; অথচ স্থানে স্থানে দুই-চারি কোলাল মাটি কাটিয়া দিলেই এই কষ্ট নিবারিত হইতে পারে, দুই-একটা নালী কাটিয়া দিলে গ্রামের জল বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে বাহ্য ভাল থাকে। কিন্তু তাহা হয় না, শত কষ্টও সহ্য করিবে, কিন্তু বৎসরই জল জরে জীর্ণ হইয়া পড়িবে, অথচ নিজেদের এই সমাজ কাজটি তাহাদের দ্বারা হয় না। তাহারাই ইহার জন্ত পুরস্কাপকী হইয়া থাকে, হয় জমিদারের নিকট, না হয় জেলাধার, বোর্ডের নিকট দরখাস্তের উপর দরখাস্ত ছাড়িবে, আর তর্ক করিবে। অথচ তাহাদের নিজেদেরই যে এই কার্য করিবার শক্তি আছে, তাহা তাহাদের জানা নাই। ইহাদের এই শক্তিকে জগাইয়া তুলিতে হইবে; যতদূর সম্ভব তাহার নিজে প্রয়োজন নিজেই বাহ্যতে সম্পন্ন করিতে পারেন সেই চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতিবৎসরই হয় বাণের জলের আদিক, অথবা একেবারে তাহার অভাবে কত স্থানের কৃষকদের যান নষ্ট হইয়া যায়, দুই চারি দশ গ্রামের কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে ১০ দিন কোলাল ও ছুড়ি লইয়া-কাজ করিলে হয় ত একটা প্রকাণ্ড বাধ তাহার দিতে পারে, কিন্তু তাহাদের যে এ শক্তি আছে, তাহা তাহার ভাবিতেই পারে না। এতই তাহাদের নিজে প্রকৃতি অবিশ্বাস। "নান্দানমদমানয়েৎ দীর্ঘমায়ঃ ত্রিছৌবিয়ঃ" দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা থাকিলে নিজেকে অবমানিত করিতে হয় না। আমাদের পল্লীসমাজে এই যে নিজে প্রকৃতি অবজ্ঞার ভাবটা ফুটিয়া উঠিয়া সকলকে জড়-জীর্ণ করিয়া দিতেছে ইহার অপনয়ন করিতে হইবে, এবং ইহা গুব শক্ত নহে।

যিনি কখন এই অমজীবি ও কৃষকদলকে লইয়া কোন নির্ধন রজনীতে উন্মুক্ত আকারে নিজে কথাবার্তা বা আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন, শিকার কথা, শিল্পের কথা, বাণিজ্যের কথা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাদের মতি মিশিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের স্বপ্নক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিবার সহ্যক্ষমতা দেখিয়াছেন, 'তিনি জানিতে পারিয়াছেন ভ্রমনার্মার ব্যক্তিগণের অপেক্ষা তাহাদের জন্ম কোনরূপেই শিক্ষাগ্রহণের এবং জ্ঞান পরিচালনের সুযোগ্য নহে; তাহাদেরও যথেষ্ট বোধশক্তি আছে, এবং কার্য করিতেও তাহার পট। গ্রামের তথাকথিত ভুল্লোকগণের সহিত ইহাদের কোন-একটা বিচ্ছেদ আছে। উভয়েই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিকে বাঁচি, কেহই কাহারও দিকে দেখে না, একের স্বপ্ন-দুঃখ অন্নের নিকটে পৌঁছায় না। এই দুঃখ-ব্যবধানের উচ্ছেদ করিতে হইবে, এবং এক শিক্ষা প্রচারেই ইহা সম্ভব। দেশের বাহারা একেদম স্বরূপ সেই অমজীবি ও কৃষকগণকে টানিয়া না তুলিলে আমাদের বস্ত্র উন্নতির সম্ভাবনা নাই। নানা উপায়ে, যিনি যেক্ষণে পারেন, তিনি সেইরূপেই ইহাদিগকে উদ্ধৃত করিয়া তুলুন। ইহাদের জ্ঞান নৈপ পাঠশালার প্রতিষ্ঠা সঙ্গতভাবে বাঞ্ছনীয় এবং ইহা দুঃস্বপ্ন নহে। ইচ্ছা হইলেই অনেকই ইহা নিজ নিজ গ্রামে করিতে পারেন। গ্রামের যিনি যাহা জ্ঞানেন, অবসর মত এক-এক দিন তিনি তাহারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই সকল পাঠশালায় আলোচনা করিবেন। যুগে যুগে তাহার বাস্তববিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যাদির কত কথা শিখিয়া ফেলিতে পারিবে। দেশ-বিদেশের কত কত সমাদ্র সমগ্রহ করিয়া

ফেলিবে, ভূগোল-ইতিহাসের কথা শুনিয়া বিশ্বের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিবে।
উপনিষদের এক স্থানে আছে—“প্রজাপতি-শাস্ত্রানং যোগ্যপাতং ততঃ পতিস্ত পতী চা-ভ্যতাম্”—প্রজাপতি নিজেই পতী হইয়া ভক্ত করেন এবং তাহাতে পতি ও পতী হয়। আরো আছে—“অর্জো হ বা এষ আশ্রমো ইজ্ঞাযেতি”—স্বী নিজেই অর্জক অংশ। ইহাই যদি পতি-পত্নীর সম্বন্ধ হয়, গৃহপতি যদি নিজের অপরাধ গৃহপত্নীকেই লইয়া সম্পূর্ণ হন, তবে বলা বাহুল্য গৃহপত্নী অশিক্ষিত থাকিলে গৃহপতিরও শিক্ষা বস্ত্র সম্পূর্ণ বলিতে পারা যায় না। শিকার যদি আদৌ প্রয়োজন থাকে তবে তাহা যেমন পুষ্করীভার, সেইরূপ স্বীকৃতিভার। জল যদি তৃষ্ণাকে নিবারণ করিতে পারে, তবে তাহা পুষ্করীরও করিবে, স্বীকৃতিও করিবে; দীপ যদি অন্ধকার নাশ করিয়া গৃহকে উদ্ভাসিত করে, তবে তাহা, যে বুদ্ধ, তোমারও করিবে, আর যে যে সীমন্তিনী গৃহকর্মে নিযুক্ত রাখিয়াছেন তাহারও করিবে। এই একটা মোটা কথা লইয়া যখন যখনও কোন স্থানে বাগাহবান দেখিতে পাই, তখন অত্যন্ত বিশ্বাসিষ্ঠ হইতে হয়। বালকদের শিকার জ্ঞান আমরা যেরূপ প্রায়শ করি, বালিকাদের ও অন্তঃপুরিকাদের শিকার জ্ঞান আমরা তাহার একাংশও করি না। আমাদের যে, এ কোন মোহ জন্মট হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। একতর পক্ষ অলসন করিতে হইবে। যে পুষ্কর, হয় তুমি তোমার সহৃদয়গণকে তোমার মত শিক্ষিত করিয়া তোলা, না হয় তুমিও যাহা কিছু শিখিয়াছ সমস্ত গরুর জলে বিসর্জন করিয়া, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, তোমার সহ-

ধর্মবীরই মত অশিক্ষিত সাক্ষ্য। বঙ্গ।
আমার বিশ্বাস, বঙ্গ, ভূমি কিছুতেই বিতীয়
পক্ষ স্বীকার করিতে সম্মত হইবে না। যদি
তাঁহাই হয়, যদি নিজে ভূমি অশিক্ষিত হইয়া
ধাক্কিতে উচ্চা না কর, তবে কি নির্মিত,
কোন অধিকার ভূমি তোমার দ্বীকে
অশিক্ষিত রাখিবে? কেন আমরা আমাদের
গৃহিণী, ভগিনী, জননীকে শিক্ষিত
দেখি না?

মালদহে স্কীলোকের সংখ্যা মোট
৫,০৫,৬১২। ইহার মধ্যে কয়টি স্কীলোক
কেবল লিখিতে ও পড়িতে জানে তনবের?
মোট ১,৬৬১। ইহার মধ্যে হিন্দু ১,১২১,
আর মুসলমান ৫৪০। এখন ইহা আলোচনা
করিয়া ধারা কর্তব্য মনে হয়, আপনারা
বিধান করুন।

বঙ্গপুত্র, আপনাদিগকে সমুখে লাভ করিয়া
অনেক কথাই আমাদের মনে জাগিতেছে,
কিন্তু সে সমুদয় বিস্তৃতভাবে প্রকাশ্য করবার
উপযুক্ত অবসর নাই। আমি আপনাদের
অনেকটা সময় লইয়াছি, আপনাদের বৈধা-
চ্যুতির সম্ভাবনা দেখিয়া শঙ্কিত হইতেছি,
কিন্তু এখনো দুই একটি কথা আপনাদের নিকট
নিবেদন করিবার রহিয়াছে, আশা করি
তত্ত্বজ্ঞান আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

মাতৃভাষার সাহায্যে কোন বিষয়ের শিক্ষা
স্বপ্ন ও স্বপ্নম। ভাষাস্তর শিক্ষা করিয়া
তাঁহার দ্বারা কিছু লিখিতে গেলে তাহাতে
অনেক অসুবিধা আছে। ইহা যদি সত্য
হয়, তবে আমাদিগকে মাতৃভাষারই সাহায্যে
শিক্ষালাভের জগৎ বন্ধ করিতে হইবে।
আমাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষা, অতএব বঙ্গ-
ভাষাতেই যদি আমরা সমস্ত শিক্ষা লাভ
করিতে পারি, তবেই আমাদের প্রযোজ্য।

বঙ্গভাষাকে এজ্ঞ পরিপূর্ণ করিতে হইবে,
এবং এই পরিপূর্ণ দুই উদ্যোগে হইতে পারে;
প্রথম, বঙ্গভাষায় নবনব মৌলিক পুস্তকের
প্রণয়ন; বিতীয়, ভাষাস্তরের অত্যাবশ্যক
পুস্তকসমূহের বঙ্গভাষায় অসুবিধা। অসুবিধা-
কাণ্ডে কিছু কিছু আরও হইয়াছে, কিন্তু তাঁহা
কিঞ্চিৎ আশা প্রবর্তন হইলেও অসুবিধা বা
আবশ্যকমত এখনো হয় নাই। এদিকে
ক্ষুণ্ণগতি না হইলে, চলিবে না।
পাশ্চাত্যভাষায় অভিজ্ঞ বাঙ্গালীর অভাব
নাই, যুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের অশুভিত
বাঙ্গালীও অনেক আছেন, কিন্তু স্বদেশীয়
পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানাদির পুস্তক অনুদিত
হইয়াছে; 'কয়জন বাঙ্গালী এজ্ঞ বঙ্গপুত্রিক
হইয়াছেন? প্রতি বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়
হইতে দর্শনশাস্ত্রের কত এম এ বাহির
হইতেছেন, তাঁহারা অধ্যাপকও হইতেছেন,
তাঁহাদের ছাত্রজগৎও আবার উত্তীর্ণ হইতেছেন,
অথচ এ পর্যন্ত একপানিও যুরোপীয়দর্শন-
বিষয়ক পুস্তক বাস্তবলায় বাহির হইল
না। দৈনিক পত্রিকাগুলিতেও কচিং-
কদাচিৎ এক-আধটা দার্শনিক প্রবন্ধ দেখা
যায়, তাহাও পর্যাপ্ত নহে। ভারতবর্ষ
দার্শনিকের দেশ। ঐ যুরোপীয় দর্শন যদি
আমাদের সংস্কৃতদার্শনিকগণের নিকট
উপস্থিত হয়, তবে কত উপকার হয়। কিন্তু
ভাষার প্রতিবন্ধকতাই সমস্ত বন্ধ করিয়া
রাখিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের
অধ্যাপক আজ গল্প লিখিয়া আনন্দ উপভোগ
করিতেছেন। গল্প লিখিবার অনেক লোক
আছে, তাঁহারা না হইলে যে, একিটা শূন্য।
অতএব তাঁহারা এই দিকেই দৃষ্টিপাত করুন।
এক-এক জন এক-একটি বিষয় লইয়া সংগ্রহ
করিতে থাকিলে অল্প দিনেই ভাষার পূর্ণ

হইয়া উঠিবে। অধ্যাপক শ্রীমুক্ত রজনীকান্ত
গুহ এম এ মহাশয় গ্রীকভাষা হইতে
দুইখানি গ্রন্থ অসুবিধা করিয়া আমাদিগকে
দ্বিগতছেন। শ্রীমুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় আজীবন অসুবিধা-কাণ্ডে ব্রহ্ম হইয়া
রাহিয়াছেন। তিনি সমস্ত কল্যাণীভাষা
হইতে অসুবিধা নিবৃত্ত আছেন। এইরূপই
কতগুলি ঐর্ঘ্যশীল পরিশ্রমী অসুবিধাক্ষের
প্রয়োজন।

আমরা কোন কাজ আরম্ভ করিয়া সঙ্গে
সঙ্গেই তাহার ফল দেখিবার জগৎ উৎসুক হই,
নীম জাহির করিবার জগৎ ব্রহ্ম হইয়া পড়ি।
কান্দির দিকে বাঁহার লক্ষ্য নাই,—তিনি
প্রাণান্ত নামের দিকে লক্ষ্য করেন, তাঁহাকে
কাঁধে ভাল বহই না, নামও হয় না।
কিন্তু বৈদ্যের সহিত সর্বাঙ্গাল দায়িত্ব
সহিত যদি কোন কাজ করা যায়, তবে
কাঁজটা ভাল হয়, আর নামও হয়।

মালদহের মধ্যে কি কেহ কেহ এদিকে
বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইবেন না?

সংস্কৃতভাষা—সংস্কৃতসাহিত্য জগতের সর্বত্র
নিজের মহিমা প্রচার করিয়াছে। সংস্কৃতের
সহিত ভারতীয় ভাষার—বঙ্গভাষার কত
নিকট সম্বন্ধ, তাহা আপনারা সকলেই
জানেন। সংস্কৃতের নিকট হইতে বাঙ্গালা
অনেক লইয়াছে, আরও তাহাকে অনেক
লইতে হইবে। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে
ইহার পরিপূর্ণ অসম্ভব। বঙ্গভাষার অসু-
দয়ের জগৎ সংস্কৃতেরও প্রচার অত্যাবশ্যক।
জনিয়াছি পূর্বে মালদহের গোবিন্দপুর,
তর্কিপুর, গদ্যেশপুর, পোখরিয়া ইত্যাদি গ্রামে
এককত দেওদত্ত সংস্কৃত চতুপাঠী ছিল,
কিন্তু এখন আজ আপনারা দেখানো
সমবেত হইয়াছেন, সেই গ্রামে পণ্ডিত

শ্রীমুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চাক্যর মহাশয়ের উল্লেখযোগ্য
একটিমাত্র চতুপাঠী রহিয়াছে। আর
আড়াইভাষায় নুতন একটি প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে, এবং মালদহ-সহরেও একটির
প্রতিষ্ঠা-সংবাদ শুনা যাইতেছে। জেলায়
সংস্কৃতভাষার বাহাতে বহুল প্রচার হয়, তাহা
আমাদের সকলেরই বিশেষ প্রাণিধানের বিষয়।
ইহার ক্ষমতায় আমরা আর দুইটি ভাষার
প্রচার করিতে পারি, এবং করা উচিত।

পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য কোন মতেই আমরা
পরিচ্যাগ করিতে পারি না। ভারতের মধ্য-
যুগের ইতিহাসের সম্পূর্ণতাধানে পালি ও
প্রাকৃত সাহিত্যই সমর্থ। ভারতের মধ্যযুগের
ধর্ম ও সমাজে ত্রিধারার আবির্ভাব হইয়াছিল,
এক দিকে বৌদ্ধ, অপর এক দিকে জৈন, এবং
মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের। পালিসাহিত্যের এক-
অধট্ট আলোচনা দেখা গেলেও প্রাকৃত
সাহিত্য, বিশেষত প্রাকৃতনিবন্ধ জৈন সাহিত্য
এখনও আমাদের আলোচনার পথে উপস্থিত
হয় নাই। সংস্কৃতের সহিত পালি ও প্রাকৃতের
এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থা, অনায়াসে তাঁহার সহিত
ইহাদের আলোচনা চলিতে পারে। প্রাকৃত
ত হইয়াই থাকে, যদিও অধ্যাপক মহাশয়গণ
প্রায়ই অসুবিধার চক্ষে দেখিয়া ইহার প্রতি
যত্ন বা আদর প্রদর্শন করেন না।

বিচ্ছিন্ন হইতে আমাদের দেশে গাঞ্চর
বা সঙ্গীত-বিদ্যা অতি-উপেক্ষিত হইয়া
আগিচ্ছে। যে-যে স্থানে ইহা আলোচিত
হয়, প্রায় সর্বত্রই ইহা একটি বিলাসের
উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, ইহা
যে একটি বিদ্যা, তাহা বিচার করিয়া দেখা
হয় না। আমাদের পৌরাণিক আচার্যগণ
সঙ্গীতকে অষ্টাদশবিধ বিদ্যার মধ্যে স্থান
দিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে বেদের চার

সমান করিতেন, এবং সেই জন্তই গাঢ়কর্ষবেশ করিয়া ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সঙ্গীতের কোন স্থান নাই, যে সমস্ত নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্লা-জল্লা, অস্মোলন-অলোচনা শুনিতে রা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে সঙ্গীতের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশাত্তরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের স্থান আছে, এবং তাহা অতি-সঙ্গত। ভারতের সঙ্গীতবিষয়ে নিজের বিশেষত্ব প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, শিক্ষিতগণ এদিকে প্রায় উদাসীন, ভারতের নিজের চিহ্নিত, নিজের আবিষ্কৃত যন্ত্রমূলের দর্শন পাওয়া দূরের কথা, নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। গত বৎসর বড়দিনের সময় গোরাইসহরের পাঞ্চরঙ্গ বাহাদুরবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন নাগরিকগণকে ভারতীয় সঙ্গীতকলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং বাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য যন্ত্রাদি আসিয়া ভারতীয় সঙ্গীতকলাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া কেলিয়াছে। লোকে একটু চেষ্টা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া আসল রস অন্বেষণ করিবার ইচ্ছা করেন না, কেবল উপরের ভাসা-ভাসা সংকীর্ণ পাইয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। অভিনয়গুলি পাশ্চাত্য-ভাষায় পূর্ণ, যাত্রার দলও ক্রমশঃ সেইরূপ হইয়া পড়িতেছে। দেশীয় বাসায় প্রায়ই বহিষ্কৃত হইয়াছে। আতোরা বা ঐকতানিক বানো বৈদেশিক যন্ত্রই অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ পুরোক্ত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ দেশী যন্ত্রসমূহে যে বাধা শুনাইয়াছিলেন, তাহা অল্প চিন্তাকর্ষক নহে। সঙ্গীত যখন বাসন-রূপে পরিণত হয়, তখনই তাহা অনর্থ প্রদ

করে, সমস্তভাবে তাহার অংশীদার কখনই অকলাপণের কারণ নহে।

সঙ্গীতের দ্বারা সাহিত্যের রূপপুষ্টি হয়। কাব্যার্থ গীত হইলে শোভার মধ্য অধিকতর ভাবে স্তোত্রা স্পর্শ করে। সাহিত্য সমাজে বাহা করিতে চাহে, সঙ্গীত সাযোগ্য হইলে তাহা আরও স্বাভাবিকভাবে করিতে পারে। ভারতের আদি মহাকাব্য প্রভৃৎ নানারূপে গীত হইয়া অব্যবহিতের অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। সঙ্গীত সাহিত্যেরই অঙ্গ। ইহাকে বর্জন করিলে সাহিত্য বিকল বলিয়া গণ্যনীয়। অতএব সাহিত্যিকগণের এ বিষয়ে নৈর-নিমীলন করিয়া অবস্থান করা কোনরূপেই উচিত নহে। যেকোনরূপেই হউক এক-ঐক্যে সঙ্গীতচর্চা প্রায় সর্বত্রই আছে। কেবলমাত্র বিলাতের উপকরণ মনে না করিয়া, বিদ্যাহিমায়ে যাহাতে ইহা সকলে অংশীদার করেন, এবং ভারতীয় সঙ্গীতকলা রক্ষিত হইতে পারে, সঙ্গীতপ্রিয়গণ এজন্য চেষ্টা হউন।

বিদ্যার সৃষ্টিতে সর্ব সমান হয় না, হইতে পারেও না, এবং হইলেও তাহাতে সৃষ্টি থাকে না; কেননা বৈচিত্র্যই সৃষ্টির লক্ষণ, সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়ী। অতএব সৃষ্টিই নিয়মে লোক নানাপ্রকার হয়, সকলেই ভিন্ন-ভিন্ন শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ে বিশেষত্ব থাকে এবং তাহারই প্রয়োজন। যিনি যেক্ষেপে পারেন তিনি আমাদের সাহিত্য-পরিপুষ্টির জন্ত সেইরূপেই তাহা করিবেন। যিনি ধনবান তিনি ধন দিয়া সাহায্য করুন, যিনি বুদ্ধিমান তিনি বুদ্ধি প্রদান করুন, যিনি বিদ্যা প্রদান করিবেন, শাস্ত্রশীল শাস্ত্রের কথা উগ্ধেণ করিবেন, দার্শনিক দর্শনপ্রচার করিবেন; এই

রূপে বাঁহারা শক্তিতে কলায়, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে, তাহাকে তাহাই প্রদান করিতে হইবে। অগ্নির নিকট আমরা জ্বলনের শীতলতা প্রার্থনা করিব না, বা জ্বলের নিকট অগ্নির উষ্ণতা চাহিব না। বাঁহারা তাহা আছেন নি তাহাই দিয়া আশ্বাসকে প্রকুশিত করুন। দুঃস্থান সমস্ত পদার্থই কেবল বিশ্বের নিকট নিজকে সর্পণ করিতেছে। তাহাতেই তাহার সর্পণকৃত। গোলাপ ফুলটি নিজের অস্তরের ভিতরে হয় সৌরভসম্ভার সঞ্চিত করিয়া বাঁহায়াছিত, তাহাই তু কেবল প্রকাশ করিয়া বিশ্বের মধ্যে উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে, গোলাপের গোলাপস্ব তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। সে নিজের জন্ম এক-কণাও রাখিয়া দিতেছে না। যখনই তাহা সেই সৌরভ-সকণ্ডে পরাশ্রয় লাভ, তখন তাহার বসন্ত-আশ্রয়প্রকাশ হয় না, তাহার সার্থকতা লাভ হয় না। স্বর্ঘ্য নিয়তই এইরূপ বিশ্বের নিকটে নিজকে উন্মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া উৎসর্গ করিতেছে। বর্ষার মেঘ এইরূপেই নিজকে নিজেকে প্রকাশ করিয়া বিশ্বের অন্তরূপে সর্পণ করিতেছে। জগতের সমস্ত

জুতই এইরূপে নিজকে প্রকাশ ও উৎসর্গ করিতেছে। প্রকাশ ও উৎসর্গ ইহাই জগতের নিয়ম। অতএব বহুগুণ, প্রকৃতির নিয়মে এই ভাবেই পরিচালিত হওয়া আমাদেরই স্বভাব, আমরা যেন এই স্বভাব হইতে অলিত না হই। আমরা যে বাহা পারি তাহাই করিব, এমন কি একটি কথাও উচ্চারণ করিয়া, যেন সাহিত্যসেবা করিতে পারি, এবং এই সাহিত্য-সেবা দ্বারা বিশ্ব-সাহিত্যের সেবা করিয়া এই সমগ্র বিশ্বের সেবায় সমর্থ হইতে পারি। কলিগ্রাম-বাগীরা আজ এই বিশ্বসেবা-যজ্ঞে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া মনে মনে নিজেকে দনা বলিয়া মনে করিতেছেন, আজ তাঁহারা নিজের শত শত জটিল দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া আপনাদের সম্মুখীন উন্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আপনাদের শুভাগমনে তাঁহাদের এই যজ্ঞ যেন হত্যাঙ্গসম্পন্ন হয়। আপনাদের প্রসন্ন হউন, এবং এই যজ্ঞদেবতাও প্রসন্ন হইয়া আমাদের সকলের উপর মঙ্গলাশীর্ষক বর্ষণ করুন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য।

মফঃস্বলের বাণী

বিপন্ন মধ্যবিত্ত

দেশের অবস্থা যতই চিন্তা করা যায়, ততই প্রাণে হতাশ-ভাবের সঞ্চার হয়—প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন সর্পক হয় ভারতও তেমন মানবের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু হইতেছে। বাঁচিয়া ত্যাগ করিবে এই আশঙ্কা বহুমূল হইতেছে। থাকিবার অল্প ভারতবাসীর একটা বিষয় চোটা করিতে হয় এবং সেই জীবনধারণের চেষ্টা যখন আশাহ্রুণ কল প্রসব করেন না, তখন মানব-মনে একটা ভীষণ উৎসেগের উৎপত্তি হয়।

আজ ভারতবর্ষে সর্গস্ত্র বিষম অমকষ্ট উপস্থিত—সর্গস্ত্র নীরব এবং সরব হাঁহাকার মধ্যস্থ হইতেছে—এবং বঙ্গদেশে সর্গস্ত্রপ্রথমে উদ্ভূত বাঁচিবর্গ এই বিষম আহবে প্রাণ ত্যাগ করিবে এই আশঙ্কা বহুমূল হইতেছে। বঙ্গদেশের জনসমূহকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—জমিদার, মধ্যবিত্ত ও চাষী। এই শ্রেণীবিভাগ বঙ্গদেশে ইংরেজরাজ-প্রবর্তিত প্রজাধিব-বিষয়ক

বিধানের ফল। জমিদার পূর্ণপুঙ্খের সজ্জিত মূলধনের উপলব্ধি অনায়াসে হইল করিল। চাষা-প্রজা স্বাভাবিক জমি ও উচ্চ-কাজ্যহীন সর্বস্ব জীবন লইয়া কাল কাটায়। প্রজা স্বাভাবিক আইনের অধবলে সে জমির কার্যতঃ মালিক, তত্ত্বপরি-শেষের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় সে একান্ত অক্ষম না হইলে অনশন-ক্রেম বড় বেশী লেহা—মহাবিন্দ্র। বাক্তি সমাজের মেলনও। জীবনমুখে তাহার সর্বত্রই অগ্রদর এবং তাহারাই চিরকাল বিজয়-মুক্ত অধিকার করিয়াছে। বাঙ্গালদেশ আজ বাহা, তাহা সম্পূর্ণই মহাবিন্দ্রের দ্বারা হইয়াছে। দেশের যাবতীর উন্নতি তাহারাই করিয়াছে। কিন্তু সেই মহাবিন্দ্রের মুখে আজ অবশ্যম্ভাব্যের কাল ছায়া আপতিত হইয়াছে। ইহার কারণে সমস্তের কোলে ইহাদের জন্ম হয় নাই। অতএব আশ্চর্য্যের আশ্রয় করিতে হইবে। তাই তাহাদের সমস্ত বৃত্তিগুলি পরিচালিত ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া পড়ায়। ইহারাই ত্যাগী, সাহসী ও কর্মী। ইহাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থী জগৎ তত্ত্বিত। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, মহেশ্বর সরকার, জে সি বহু, পি সি রায়, স্বদেশ-নাথ, অশ্বিনীকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাস, বিপিন পাল, অরবিন্দ প্রভৃতি ইহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আজ যেন অবস্থা শোচনীয় পথে হইল। আজ মহাবিন্দ্রের গ্রাসাচ্ছাদনের ঘন প্রায় সন্ধ্যা। বহুবিরত কাহারও সংসার আর চল না—শিক্ষার জন্ত অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিয়া যে অর্থগণ-পথ আবিষ্কার হইতেছে, তাহার সংখ্যা-সর্বগণতর হইয়া আসিতেছে।

চাকুরীতে মস্তান্তর নষ্ট হয়—তথাপি চাকুরী কামিয়াও কীত পরিবার উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিতেছিল—কিন্তু চাকুরী ত আর জুটে না। ইহারও ক্রমবর্তনের উপর অর্থ ভাগ্যবর্তন কামিয়া লয়—উকীলভাবে, ডাক্তারভাবে—মোক্তারভাবে—বা দোকানদারভাবে—কামিয়া ধনে—অংশ কমা। দেশের শাস্ত্র-শিক্ষণে তাহাদের হাতে নহে—বুদ্বি তাহা হাতে রাখিবার শক্তি তাহাদের নাই। অনাধারে বা অজ্ঞাহারে তাহাদের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে—একপুঙ্খ পূর্ণের যাহারা প্রারম্ভিক বোধে গৌরবাধিত ছিল তাহারাজ্ঞ কীর্ণ-প্রাণ কীর্ণজীবী। ৩০ টাকা বেতনের কন্স-চারীকে অল্প ৭ টাকা মণ দরে চাড়ী কিম্বা ক্রীম দান করিতে হইতেছে—সে তাহার সন্তান-সন্ততির জন্ত অর্থ সংস্থান করিয়া হুশিফা, হুই আহার ও বাস্তব আবাদস্থল ব্যবস্থা করিতে পারে না—কল তাই বিভীষিকাময়ী হইয়া দাঁড়াইতেছে।

জীবন-যাত্রা হিন্দীরাহের জন্ত কৃষি সর্ব প্রথম ব্যবসা—তৎপরে শিল্প-বাণিজ্য। এদেশে কৃষি যাহাদের হাতে জ্ঞাত আছে তাহারাই তাহার উপযুক্ত রক্ষক—আজ যাহারা মহাবিন্দ্রগণকে কৃষি-কার্যে মনোযোগ দিতে বলেন তাহার একদেশাঙ্গীরা জ্ঞাত উপদেশ দেন। এদেশে এখন আর এত অনাবাদী জমি পড়িয়া নাই বাহা ভ্রমসংস্থানগণ চাষ-আবাদ করিতে পারেন, অথচ জ্ঞেয় স্থানের গ্রান কাড়িয়া লইতে হয় না। আমি নূতন চাষী হইয়া আমার একজন বা শতজন চাষী ভ্রাতাকে নিয়ম করিব—এ ব্যবস্থা কাগজে পড়ে বেশ শুনা, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে দেশের আর্থিক উন্নতি হয় না। কিন্তু সামাজিক অবস্থায় একটা উলট পালট হইতে

পরের যাত্রা। অন্যতরাল বিলম্বে এই সমস্তা উপস্থিত হইবে তাহারও সন্দেহ নাই। আশুই চাষী মুসলমান শিক্ষিত হইতেছে, তাহারাজ্ঞ অশু অধুনাতন মহাবিন্দ্র ভ্রলোকের মত চাম ছাড়িয়া চাকুরী ধরিবে, তখন তাহাদের পরিত্যক্ত জমিতে ভ্রমহোদয়গণ। হাল চরিতেনা। শুধু চাষী কেন, নিম্নশ্রেণীর শ্রমগণ ইলাপা ভাগুর থাকিতে এখন আর প্রস্তুত নহে—তাহারা প্রত্যেকে আজ ক্রিয়া হইবার জন্ত বহুপরিচর। সহরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত দোকানার দিকে চাহিলে দেখা যাইবে—এই শ্রেণীর লোকেরা কেহ পান-দিগারে, কেহ সোডাউলমেনে, বা মিঠাই বিক্রয় বা ফেরি করিতেছে। ফলে পড়াইতেছে—প্রকৃত অর্থ উপদানের ভার একমাত্র নমঃশু এবং মূল্য-মানের হাতে কৃষিক্রেত্র হইল। অল্প কুরাপি নহে—যেমন উকীল, ডাক্তার, মোক্তার, দোকানদার কৃষকের উপর অর্ধে ভাগ বানান, ইহারও তেমনই অংশে ভাগ বণাইতেছে মাত্র। অতএব সমুদ্রে অর্থ অপেক্ষা অনর্থের হুই বেশী হইতেছে।

এই সমস্ত চাপে পড়িয়া মহাবিন্দ্র আজ মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হুই মহাবিন্দ্র অচিরে ধ্বংসপুরে গমন করিতে বসিয়াছে। শিল্প ও ব্যবসায় ভিন্ন তাহাদের গতি নাই—অথচ সাধারণজনগণের দৃষ্টি এখনও তেমন এদিকে গমন করিতেছে না। তাই বাপালার মেদক ও আজ ভগ হইবার উপক্রম হইয়াছে—এ সমস্তা পূরণ না হইলে দেশে শান্তি আসিবে না।

বরিশাল-হিঠেঠী

মৌখিককারবারের কূটতত্ত্ব একটা প্রবাদ আছে, “অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়।” আমরা এ কথাটা মুখে বলি

বটে, কিন্তু কাজে তাহা করি কি? গুরীবের ছেলে লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, এটাও একটা প্রবাদ-মচন। আমরা এই প্রবাদেই মাস হইয়া আছি। তাই আমরা আলাপ-ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর লুটতে ব্যস্ত, বড় বড় যৌথকারবার চালাইতে উল্লস, তাহারাতিই বড়লোক হইবার জন্ত অধীর। যে কারো আমায় কিছুমাত্র পারদর্শিতা নাই, সংবাদপত্রে বা লোকমুখে লাভের কথা শুনিয়া সেইরূপ একটা কাঁচা চালাইবার খেয়াল মাথায় আনিয়া থাকি। সংবাদপত্রে যেই পড়িলাম ভারতের রেলকোম্পানী এবার ৮কোটি টাকা লাভ করিয়াছে, অমনি আমাদের রেলগাড়ীর চালাইতে খেয়াল চাপে। মানচৌরীর বন্দোবস্তীরাহাদের বস্ত্রের লাভের কথা শুনিয়া কাপড়ের কল স্থাপন করিতে প্রাণ আনুগত্য হইয়া উঠে। সাময়িক খেয়ালের বশবর্তী হইয়া আমরা এই সবও কাঁচা করিতেছি বটে, ফলে টিকিতেছে কয়টা? লাভ হইতেছে কয়টা হইতে? এ পর্যন্ত বড় বড় যতগুলি যৌথকারবারের চেষ্টা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই ফেল পড়িয়াছে। আর যেগুলি আছে তাহাও ভাল চলিতেছে না। এ সব হইতেছে কেন? কোনো একটা ব্যবসায় চালাইতে সে কার্যে অভিজ্ঞতা চাই। তাহা ভিন্ন দক্ষতারও বিশেষ প্রয়োজন। আবার দৃষ্টান্ত না থাকিলে কোন কার্যেই উন্নতি হইতে পারে না। এই সমস্ত গুণের অভিকারী হইতে হইলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অতি কমই হইয়া থাকে। ব্যবসায়-বিজ্ঞানে জ্ঞানের অল্পতাই আমাদের কৃতকার্যতার এক প্রধান অন্তরায়।

ইহা ভিন্ন পাক্ষাত্যদেশবাসী যেরূপ মূলধন লইয়া কল-কারখানা স্থাপন করে, আমরা তাহা করি না। আমরা গ্রীরেব সন্তান লক্ষ টাকার ভাবনাতেই অধির হইয়া উঠি, তাই আমাদের মতক কৌটির দিকে দারিত্র্য হয় না। ম্যানচেষ্টারের একটি কাপড়ের কলের সহিত আমাদের দেশের একটি কাপড়ের কলের মূলধনের তুলনা কর, দেখিবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমরা অতি সামান্য মূলধনেই তাহাদের প্রতিদ্বন্দী হইতে ইচ্ছা করি, এই ইচ্ছা ফলবতী হইবে কেন? আমরা মিতব্যয়ী হইতে যাইয়া তাহাদের পরিত্যক্ত পুরাতন কল ও বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া বসি। তাই আমাদের যন্ত্রের কাৰ্য্যসম্পাদিকা শক্তি তাহাদের যন্ত্রের সমতুল্য হয় না। কিছুদিনপর কলটি বিকল হইয়া যায়। “পৰ্শ্বভেদে ইন্দুর-প্রসবের মত” আমাদের লক্ষ টাকার ধ্বংস, এই স্থানেই শেষ হইয়া থাকে। পাকা সোয়ার না হইলে যেমন ঘোটক হইতে প্রতি পদেই পড়িবার আশঙ্কা থাকে, উপযুক্ত রূপ মূলধনের অভাবেও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রতি পদেই পতনের আশঙ্কা রহিয়া যায়।

আমাদের দেশের যৌথকারবারের আরও একটি দোষ ঘটিয়া উঠিয়াছে। একটি কল-কারখানা স্থাপিত হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অংশীদারগণ লজ্জারেরে জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠে। ভাবিয়া দেখিলে এটাও আমাদের যৌথকারবারের একটি প্রধান অন্তরাগ। এই ত সেদিনের কথা বঙ্গলক্ষী কল মিলেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ভাগ্যিস উপযুক্ত কর্ণাধ্য ছিল, তাই কলটি প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। যৌথকারবারের অতি শৈশব অবস্থায় লাভের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কিছুপভাবে কলটি ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে উৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই উচিত। প্রত্যেক অংশীদারের

চক্ষু এই দিকে পড়িলে কলের উন্নতি অবশ্যস্বার্থী। ভবিষ্যতে ক্ষতির সংস্থান যে ব্যবসায়ের এক প্রধান মূলধন, তাহা প্রত্যেক অংশীদারের জ্ঞানিয়া রাখা একান্ত কর্তব্য। কলকারখানার উপযুক্ত পরিচালকও আমাদের দেন্দে নাই। এই কাৰ্য্যসম্পাদনার জ্ঞান রিসদেশ হইতে লোক আনিষ্ট হয়। ইহাতেও অনেক অর্থ বিদেশীদের হাতে গিতে হয়। দেশীয় পরিচালকে অভাবও আমাদের যৌথকারবার-পরিচালনের এক প্রধান অন্তরাগ। সম্প্রতি আমাদের দেশের কতকগুলি উৎসাহশীল যুবক আমেরিকা, জাপান, ইউরোপ প্রভৃতি স্থান হইতে নানারূপ ব্যবসায় শিক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। এটা অতীব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই ক্ষেত্রে যাহাতে তাহারা উৎসাহ পায়, আমাদের সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ইহা ভিন্ন সবতাই যে ব্যবসায়ের মূল, এ কথাটা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

আমাদের দেশের বড় বড় যৌথকারবার-গুলি দুই-দুই প্রদেশে আরও মনে হয়— আমাদের দেশে প্রত্যেক যৌথকারবারের সময় উপস্থিত হয় নাই। আর যদিও আসিয়া থাকে, সেটা নিতান্তই শৈশব অবস্থা। প্রকৃত যৌথকারবার চালাইতে যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা আমাদের আজ পর্যন্ত হয় নাই। চাল-নাই তরবারী নাই, নিদির্যাম সর্দার লোককে মুখে জঘন্যত হইবে কেন? সোজা কথায় বলে ‘গরিমা কুড়াইতে কুড়াইতেই বেল হয়।’ দেশের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই প্রবাসী আমাদের যুগ্ম-মন্ত্র হইয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। এই প্রবাসীর এ স্থানে বাধ্য। এই যে সামান্য মূলধনে সামান্যরূপ ব্যবসায় হইতেই বড় বড় ব্যবসায় হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথকারবার চালাইবার বিদ্যা মাথায় আনিবে। বাহার যে বিষয়ে ভাল জ্ঞান আছে, বাহার যে বিষয়ে কার্য্যক্ষমতা জন্মিয়াছে, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাহার সেই বিষয়েই দারিত্র্য হওয়া কর্তব্য। আমাদের দেশের যৌথকারবার নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, অগ্রে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র যৌথকারবার করিয়া সে-অম দেশ হইতে দূর করিতে হইবে। কৈনিক কারনে যৌথকারবারের প্রারম্ভে ক্ষতি হইলে, তাহা দেশব্যাপী একটি নৈরাশ্রের ভাব সকার করিয়া দেয়। ভবিষ্যতে শ্রীযুক্ত মুখে কৃষ্ণ পতিত হয়। আমাদের যৌথকারবার-মুখে যে কল-কলিমা পড়িয়াছে, সেই কল-মোচন করিতে সমর্থতা যৌথকারবারস্থানীয় পরিদর্শক মায়া মূলধনের হিত আমাদের অঙ্গ। পরিদর্শক ও কার্য্যশীলতার যোগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথকারবারে উন্নতি দেখাইতে হইবে। তবে ত যৌথকারবারের কলক দূর হইবে। আমরা যদি এইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণা অবলম্বন করি, তাহা হইলে আশা হয় একদিন পর্বত লজ্জনও করিতে পারিব।

স্বরাজ

বাল্যসমিতি

বিক্রমপুরের মধ্যে ইউটি-সাহী একুশমা বহিষ্কৃত গ্রাম। এই গ্রামে ‘বাল্য-সমিতি’ নামে বালক ও যুবকদের একটি সমিতি আছে; ইহার সমিতি একটি সাধারণ পাঠাগার, বিপর্য্যসঙ্গ-সংস্থান। বা সেবা-সমিতি, দরিদ্র-ভাণ্ডার, এবং ছোট রকমের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। গ্রামের ছেলে ও যুবকগণই ইহার প্রাণ। বৃদ্ধগণও যথামাধ্য উপদেশ ও অর্থাদি সাহায্য করিয়া থাকেন।

গত বৎসর আর্থিক শনিবার বাল্য-সমিতির জন্মোৎসব বার্ষিক অধিবেশন হুস্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্রিতিমোহন সেন এম, এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন। শিল্পদ্রব্য ও প্রবচনের প্রতিযোগিতা-হুয়ায় রমণী ও বালকদের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হইলে সভার কাৰ্য্য শেষ হয়। এই দিনই ঢাকা মিটফোর্ড ইন্সটিটিউটের অবদর-প্রাপ্ত ডক্টর গায় সাহেব গুরুনাথ সেন মহাশয় বাল্য-সমিতির নব গৃহের ধারাবাহিক-কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের একটি পল্লীগামের যুবকগণ

বাধা করিতেছে, তাহা অনেক সহরেই হয় না, অথচ আমরা সহরের বড় বড়াই করিয়া থাকি। দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই সহরে বাস করেন। তাহারা কি স্থানে স্থানে এমনতর সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ছেলেদের মনে ধর্ম ও সেবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতে পারেন না? এখনকার স্থল-কলেজের শিক্ষা, হাওয়ার শিক্ষা। কেরাণীগিরী ছাড়া কাৰ্য্যক্ষেত্রে এই প্রকার শিক্ষার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া তো মনে হয় না। বিশেষতঃ এখনকার স্থল-কলেজসমূহে ধর্ম-শিক্ষার নিতান্তই অভাব। বৃত্তরাং স্থল-শিক্ষা, লোক-সেবা, চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন যাহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বাহিরের পুস্তকাদি পড়িয়া যাহাতে ছাত্রগণ নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম হয় তাহার ব্যবস্থা আদ্যাদিকেই করিতে হইবে। বরিশালে দেশপুত্রা শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত বাবুর উদ্যোগে এখন একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এখনও উহা আছে এবং সকলেই উহার কাৰ্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া থাকে।

এখন বঙ্গ-উপকূলে, পুরস্কার-বিতরণ-উপকূলে কল-কলেজগুলি একটি নাট্যশালায় রকমকে পরিণত হয়। ষাটর প্রকেশরণ এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকেন। ইহাতে সংঘ-ভ্রষ্ট হইয়া ছাত্রগণ বঙ্গাবিহীন অশেষ ভায় কুস্থলে যে পরিচালিত না হয় তাহা নহে। কিন্তু হুয়ের বিষয় এই সকল-ব্যাপারে শিক্ষকদের যে প্রকার আগ্রহ-পালিত হয়, ছাত্রদের মৈত্রিকোবন-গঠনে, তাহাদিগকে প্রকৃত মাহাত্ম্য করিয়া পড়িয়া ছুঁলিবার তেমন আগ্রহ পড়িষ্ট হয় না। স্থলে ধর্ম-শিক্ষা নাই, তীর্থ-শিক্ষার বন্দোস্ত নাই—এ সব কথা নিয়া আমরা গুরুবন্দেটক দোষ দিয়া সকল বিষয়ে নিজের দারিদ্র্য একবারে কাড়িয়া ফেলিতে চাই। বাহারা তাহা না করিয়া নিজেদের কর্তব্যজ্ঞানে ছেলেদের অকল্য শিক্ষাদানে অগ্রসর তাহারা ইচ্ছা।

বিক্রমপুর আউটসাইর এই দুটো স্কল
হাটের অস্থিত হইলে দেশের প্রভুত মঙ্গল
হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

ত্রিপুরা-হিতৈষী

গোপাষ্টমী

বৌদ্ধপুত্রের নিকট মাড়োয়ারীগণ কর্তৃক
শিখরপোল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত নয়
বৎসর যাবৎ এই শিখরপোলে প্রতি কার্তিক
মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে গোপাষ্টমী-উৎসব
মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কলি-
কাজ ও অজ্ঞান নানা স্থান হইতে বহু লোক
প্রতি বৎসর তথায় সমবেত হইয়া থাকেন।
এই দিবস গুরু সকলকে উত্তমরূপে ভোজন
করান হয় এবং নানাবিধ স্তব ও যোগা-
লভ্যের সজ্জিত করা হয়। এই উৎসবের
মৌল্যার্থ-বস্ত্রের জ্ঞান নানা স্থান হইতে বহু-
লোক আসিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অজ্ঞান
ব্রহ্মের দোকান খুলিয়া থাকেন। নানাবিধ
বাগ্মণীতাবাদ ও বায়স্কোপ প্রভৃতি প্রদর্শিত
হইয়া থাকে। বিশিষ্ট সম্রাট মাড়োয়ারীগণ
ও অজ্ঞান হিন্দুগণ এই উৎসবের দিনে
শো শুলককে মিষ্টান্নাদি ভোজন করান ও
তাহাদের সেবা করিয়া থাকেন। গো-মাতার
সেবা-বাধ্য মাড়োয়ারীসম্প্রদায় যেদ্রুপ
অর্থব্যয় ও হত্ব করিয়া থাকেন, তাহাতে
তাহারা সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্যবাদের
পাত্র সন্দেহ নাই। ইহাযের, প্রতিষ্ঠিত
গৌরবাক্তি সভা হিন্দুর পৌরবের বস্ত্র।

পূর্বের গৃহস্থগণ রক্ত বা অকর্মণ্য গো-সকলকে
অবহৃত করিত, বতদিন গাভী সকল ছুড় প্রদান
করে, ততদিন তাহাদের সেবা করিত; কিন্তু
পরে তাহাদের অকর্মণ্যতাবশত: তাহাদের
প্রতি অবহৃত করিত। অনেকে ক্ষমতা না
থাকায় তাহাদিগকে পূর্বনামায় পাইন্তেও দিত
না। নীচজাতীয় অনেকে এরূপ অকর্মণ্য
গো সকলকে কসাইদের নিকট বিক্রয় করিত।
যাহার স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করা

হয়, অকৃতজ্ঞ মানব তাহাদিগকে বার্কিয়া-
বস্ত্র কসাইদের নিকট বিক্রয় করিয়া
বৎকিঞ্চিং সঞ্চয় করিতে লজ্জাবোধ করে না।
অধিকন্তু অকারণ তাহাদের ভোজন করান
দায় হইতেও নিতুতিলান্ত করিয়া থাকে। কিন্তু
সম্রাট গো-মাতার সেবক প্রকৃত হিন্দু মাড়ো-
য়ারীগণ এইরূপ গোশালা স্থাপন করিয়া
সমগ্র হিন্দুর মুখোচ্ছল করিয়াছেন। এই
গোশালার কার্য-নির্বাহার্য ব্যয়ের জন্য
প্রত্যেক বাগ্মণী মাড়োয়ারীগণ নিজেদের
লভ্যভাণের অতি অল্পমাত্র সঞ্চয় করিয়া
থাকেন, কিন্তু এই বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বারি সঞ্চয়
করিয়া তাহারা এক প্রকাণ্ড তড়াগ নিষ্কাপ
করিয়াছেন। তাহারা 'এ বিঘা' যেদ্রুপ
উদ্যোগি ও সচেত, তাহাতে ইহা শ্রীত্বই এক
বিশাল সমুদ্রে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই।
হিন্দু মাড়োয়ারী এই সংকার্যে যোগদান করা
কর্তব্য। অতীত ক্রমশ: যেদ্রুপ গো-স্কল
স্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে
শ্রীত্বই গো-স্কল নির্মূল হইবার সম্ভাবনা,
সুতরাং গো-মাতার রক্ষণ জ্ঞান সততই
বিশেষভাবে মন্ত্র করা উচিত। যাহার চিত্তই
অক্ষম বালাবাহ্য জীবন-ধারণের একমাত্র
সম্মল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাকে মাড়ো-
জ্ঞানে পূজা করাই সঙ্গত। কিন্তু অকৃতজ্ঞ
মানব তাহারা প্রতি অথবা অত্যাচার করিয়া
থাকে, প্রবলী পশু-জাতি বিনা বাধায় সম্মল
নয়নে অকৃতজ্ঞ মানবের সেই অত্যাচার সহ্য
করিয়া থাকে। গাভীর দুগ্ধের তুল্য উৎকৃষ্ট
খাদ্য নাই। গাভীই মাড়োয়ারী হইয়া
অসহায় অবস্থায় আমাদের জীবন রক্ষা করেন,
সুতরাং হিন্দুগণ গো-মাতাকে দেবতাহানীয়া
বলিয়া মনে করেন, তাহার পূজা, সেবা প্রভৃতি
পূণ্যজনক বলিয়া মনে করেন। এই
গোপাষ্টমীর উৎসবে হিন্দুমাড়োয়ারী যোগদান
করা কর্তব্য এবং ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির
জ্ঞান সকলের যথোপায় চেষ্টা করা উচিত।

দুর্শক।

পরিশিষ্ট

গুরুণা স্ত্রৈক্যঃ ॥ ৫৫ ॥

নবমে কারকাংশে চ গুরুযুক্তেক্ষিতে দ্বিজ।

স্রীলোলুপো ভবেদ্বালো বিদ্যায় নৈব জায়তে ॥

কারকাংশান্নবমে রাশৌ গুরুণা দৃষ্টে যুক্তো বা সতি জাতকঃ স্ত্রৈণঃ
স্রীলোলঃ স্যাদতএব বিষয়েষু উদাসীনো ভবেদিতি পরাশরঃ। ভূখন্ডারক
বর্ণেতি পদমত্র নিবৃত্তং ॥ ৫৫ ॥

কারকাংশ রাশির নবমে বৃহস্পতির যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে, মনুষ্য স্রীলোলুপ
এবং ভজ্ঞম বিষয়স্পৃহা বিরহিত হয়। এই স্থান হইতে কুজ শুক্র বর্ণের আর
অনুবৃতি নাই ॥ ৫৫ ॥

রাহুণাথনিবৃত্তিঃ ॥ ৫৬ ॥

কারকাংশে চ নবমে দ্রুতযুক্তেক্ষিতে দ্বিজ।

পরদ্রুতসমুদ্যাদ বালো বুদ্ধকো ভবতি প্রবম্ ॥

কারকাংশান্নবমস্থানস্থিতেন দ্রাবমদ্রুতঃ বা রাহুণা পুরুষস্য পরদ্রু-
তঃ সঙ্গ নিমিত্তং অর্থনিবৃত্তিঃ ধননাশঃ স্যাৎ ॥ স বালো বদ্ধকশ্চ ভবতীতি
পারাশরীয়ে ॥ ৫৬ ॥

কারকাংশিত নবাংশ রাশির নবমে রাহুগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে পরদ্রা-
বৃত্তি নিবন্ধন মনুষ্যের ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। পরাশর মতে সে ব্যক্তি যেন পর-
দ্রুতের আত্মবিক্রয় করে ॥ ৫৬ ॥

অথ কারকাংশাং সপ্তমরাশিফলমাহ।

লাভে চন্দ্রগুরুভাণ্ডে সুন্দরী ॥ ৫৭ ॥

কারকাংশাং সপ্তমে চ গুরুচন্দ্রযুক্তে দ্বিজ।

সুন্দরী গেহিনী তস্ত পতিভক্তিপরায়ণা ॥

লাভে (৪৩=৭) কারকাংশাং সপ্তমে রাশৌ চন্দ্রগুরুভাণ্ডে চন্দ্রে
গুরো বা স্থিতে সতি পরিণীতা প্রথম-পত্নী-সম্বন্ধ-বিশিষ্টা বা স্ত্রী সুন্দরী
ভবতি, এবমগ্রেহপি। নবমরাশিফলসম্বন্ধাদ্ গ্রহাণাং দুগ্ধবলমত্র
নিবৃত্তং ॥ ৫৭ ॥

এক্ষেপে সপ্তম ভাবফল লিখিত হইতেছে। কারক নবাংশ রাশির সপ্তমে চন্দ্র
বা বৃহস্পতির যোগ থাকিলে স্ত্রী সুন্দরী হয়। একাধিক স্ত্রী সহে সকলেই সুন্দরী

হইতে পারে না স্তুরাং এ স্থলে স্ত্রী শব্দে প্রথম-পত্নী-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। রমণীকেই বুঝিতে হইবে। অগ্রবস্তা সূত্র কয়টিতেও উল্লেক্য অর্থ জ্ঞাতব্য। নবম ভাব ফলের সমাপ্তি নিবন্ধন এই সূত্র হইতে আর গ্রহগণের দৃষ্টিফলের অনুরূপ্তি না থাকিলেও তাহা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে ॥ ৫৭ ॥

রাহুণা বিহবলী ॥ ৫৮ ॥

রাহুণা বিহবলা বালা জায়তে শুদ্ধনা দ্বিজ।

কারকাংশাৎ সপ্তমে রাশৌ রাহুণা যুক্তে সতি রমণী বিহবলী স্যাৎ।
নরো বিধবাপতি ভবতীতি শেষঃ ॥ ৫৮ ॥

কারকাংশ রাশির সপ্তমে রাহ থাকিলে মনুষ্য কোন বিধবা রমণীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করে। পরাশর মতে পত্নী রতিবিহবলা হয় ॥ ৫৮ ॥

শনিনা বস্কোহলিকা রোগিণী তপস্বিনী বা ॥ ৫৯ ॥

শনিনা চ বয়োযিক্যা রোগিণী রা কপস্বিনী ॥

কারকাংশাৎ সপ্তমে শনিনা যুক্তে সতি পুরুষস্য ভার্যা বয়োযিকা
রোগিণী তপস্বিনী বা ভবতি ॥ ৫৯ ॥

শনিগ্রহ কারকাংশ-রাশির সপ্তম ভাবকে হইলে মনুষ্যের ভার্যা তদপেক্ষা বয়োযিকা রোগিণী কিন্না তপস্বিনী হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

কুজেন বিকলাঙ্গী ॥ ৬০ ॥

ভোমেন বিকলাঙ্গী চ তথা কাস্তা কুলক্ষণা ॥

কারকাংশাৎ সপ্তমে রাশৌ কুজেন যুক্তে জায় বিকলাঙ্গী অঙ্গদোষ-
সমস্থিতা কুলক্ষণাঙ্গী বা ভবতি ॥ ৬০ ॥

মঙ্গল কারকাংশ রাশির সপ্তম ভাবগত থাকিলে, পত্নী শারীরিক কোন প্রকার দোষবিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

রবিনা স্বকুলে গুপ্তা চ ॥ ৬১ ॥

রবিণা স্বকুলে গুপ্তা চাস্তা পরবেশনি ॥

কারকাংশাৎ সপ্তমে রাশৌ রবিনা যুক্তে সতি ভার্যা স্বকুলে স্বামী
কুলে গুপ্তা গুপ্তপ্রেরা চামরণ তিষ্ঠতি। চকারাৎ বিকলাঙ্গী চ
ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

কারকাশ্রিত নবাংশ রাশির সপ্তমে রবি থাকিলে কামিনী বিকলাঙ্গী হয় এবং
ভর্ষুকুলেই গুপ্তপ্রেরা আবদ্ধ হইয়া চিরকাল অবস্থান করে ॥ ৬১ ॥

বৃধসিতাত্যাং কলাবতী ॥ ৬২ ॥

বৃধে কলাবতী জ্যেষ্ঠা কলামিজ্ঞা প্রজায়তে।

তদবজ্জ্যেষ্ঠা গুক্রেন নির্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তম ॥

কারকাংশাৎ সপ্তমে রাশৌ বৃধসিতাত্যাং বৃধেন সিতেন বা যুক্তে
সতি ভার্যা কলাবতী গীতবাদ্যাদি বিবিধাং কলায় কুশলা ভবতি ॥ ৬২ ॥

বৃধ বা ভগবৎ কারকাশ্রিত নবাংশ রাশির সপ্তমস্থ হইলে মনুষ্যের পত্নী গীত
বাদ্যাদি বিবিধ কলাবিদ্যা পারদর্শিনী হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

চাপে চন্দ্রেনানান্নতদেশে ॥ ৬৩ ॥

পূর্বোক্তে যোগে চাপে (১৬=৪) কারকাশ্রিত নবাংশরাশে
শচতুর্থস্থানে চন্দ্রেণ যুক্তে সতি অনান্নতদেশে অনাচ্ছাদিত এদেশে তৎতৎ
সূত্রোক্ত কামিত্যা সহ প্রথম সহবাসঃ স্যাৎ ॥ ৬৩ ॥

পূর্বোক্ত যোগাদি যুগ্মে কারকাংশ রাশির চতুর্থে চন্দ্র থাকিলে, অনান্নত
এদেশে, তৎতৎ সূত্রোক্ত রমণীর সহ বৈবাহিক প্রথম স্ত্রী সহবাস ঘটে ॥ ৬৩ ॥

অথ কারকাংশাৎ তৃতীয়রাশিকলমাহ।

কশ্মণি পাপে শুরঃ ॥ ৬৪ ॥

কারকাংশাৎ তৃতীয়ে চ পাপথেযুতেক্ষিতে।

স শুরো জায়তে বালো বীর্যবান্ বহু বিক্রমী ॥

কশ্মণি (৫১=৩) কারকাশ্রিত নবাংশরাশে তৃতীয় স্থানে পাপে
পাপ গ্রহে সতি পুরুষঃ শুরো বিক্রমী স্যাৎ। পরাশরমতেনাত্র পাপস্য
দৃষ্টিরপি ফলপ্রদা ॥ ৬৪ ॥

এক্ষণে তৃতীয় ভাবকাল আরম্ভ হইল। কারক নবাংশ রাশির তৃতীয় স্থানে
পাপগ্রহের যোগ (বা দৃষ্টি) থাকিলে পুরুষ বিক্রমশালী হয়। পরাশর মতে উক্ত
স্থানে পাপগ্রহের যোগ এবং দৃষ্টি সমকলদায়ক ॥ ৬৪ ॥

শুভে কাতরঃ ॥ ৬৫ ॥

কারকাংশাৎ তৃতীয়েষু শুভথেযুতেক্ষিতে।

জায়তে তদ্বন্দয়ঃ কাতরোহপি বিশেষতঃ ॥

কারকাংশাৎ তৃতীয়ে রাশৌ শুভে শুভগ্রহ যুক্তে (দুর্কে বা) সতি
জাতকঃ কাতরো ভীরুশ্চভাবঃ স্যাৎ ॥ ৬৫ ॥

কারকাংশ রাশির তৃতীয় স্থানে শুভগ্রহের যোগ (বা দৃষ্টি) থাকিলে মনুষ্য
ভীরু স্বভাব (কিন্তু তদামুসন্ধিৎহ) হয় ॥ ৬৫ ॥

মৃত্যুচিন্তাসোঃ পাপে কৰ্ককঃ ॥ ৬৬ ॥

কারকাংশাৎ তৃতীয়ে চ যষ্ঠে পাপযুক্তোক্তিতে ।

কৃষিকৰ্ম্মরতো নিত্যং জায়তে চ ন সংশয়ঃ ॥

কারকাংশাৎ মৃত্যু (১৫=৩) চিন্তাসোঃ (৬৬=৬) তৃতীয়ে যষ্ঠে চ
পাপে ঘয়োরাপি সপাপত্বে মনুষ্যোহসৌ কৰ্ককঃ কৃষিকৰ্ত্তা স্যাৎ ॥ ৬৬ ॥

কারকাংশ রাশির তৃতীয় এবং যষ্ঠ উভয় স্থানে পাপগ্রহের যোগ (বা দৃষ্টি)
থাকিলে মনুষ্য কৃষিকার্য্যনিরত হয় ॥ ৬৬ ॥

সনে গুরৌ বিশেষেণ ॥ ৬৭ ॥

পূৰ্বসূত্রোক্ত যোগপ্রাপ্তে সনে (৫৭=৯) কারকাংশান্নবমে

রাশৌ গুরৌ সতামৌ বিশেষেণ কৰ্ককঃ স্যাৎ ॥ ৬৭ ॥

উক্ত যোগে অর্থাৎ নবাংশ রাশির তৃতীয় এবং যষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ থাকিয়া নবম
স্থানে পুনরায় বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য বিশেষরূপে কৃষিকার্য্যে রত হয় ॥ ৬৭ ॥

অথ কারকাংশাৎ দ্বাদশরাশি ফলমাহ ।

উচ্চে শুভে শুভলোকঃ ॥ ৬৮ ॥

কারকাংশাদ্ ব্যয়স্থানে উচ্চস্থেপি শুভগ্রহে ।

সদগতি জায়তে তস্ত শুভলোকমপ্যুপায়াৎ ॥

কারকাংশাদ্ উচ্চে (৬০=১২) দ্বাদশ রাশৌ শুভে শুভগ্রহে সতি
শুভলোক প্রাপ্তিঃ স্যাৎ ॥ সৰ্বজৈব বলানুসারেণ ফলং জ্ঞাতব্যমিতি ॥
উক্ত ইতি পদং ক্ষুদ্রদেবতাপিত্তান্ত্যন্ত্রেরথেতি ॥ ৬৮ ॥

কারকাংশ রাশির ব্যয় স্থানে কোন শুভগ্রহ থাকিলে মনুষ্যের শুভলোক প্রাপ্তি
হয় । পরশরোক্ত শ্লোকে উচ্চ শব্দ থাকায় গ্রহগণের তুলাদি বল তারতম্যে
ফল তারতম্য জ্ঞাতব্য । এই সূত্র হইতে ক্ষুদ্র-দেবতান্ত্র অশীতি সংখ্যক সূত্র পর্য্যন্ত
ব্যয় শব্দের অনুবৃতি আছে ॥ ৬৮ ॥

কেতৌ কৈবল্যাৎ ॥ ৬৯ ॥

কারকাংশাদ্ ব্যয়ে কেতো শুভগ্রহযুক্তোক্তিতে ।

তদাপি জায়তে মুক্তিঃ সামুদ্র্যপদমাপ্যুপায়াৎ ॥

কারকাংশাৎ দ্বাদশে কেতো সতি কৈবল্যাৎ ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥

কারকাংশরাশির দ্বাদশে কেতু থাকিলে মনুষ্য কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয় ।
পরশরোক্ত শ্লোকানুসারে উক্ত দ্বাদশ ভাব গত কেতুর প্রতি শুভগ্রহের যোগ বা
দৃষ্টি থাকা আবশ্যক ॥ ৬৯ ॥

ত্রিস্রাচাপসো বিশেষেণ ॥ ৭০ ॥

মীনগ্রহ, কর্কটে বাপি কারকাংশাদ্ ব্যয়ে শিখী ।

শুভগ্রহেণ সন্মুখে কৈবল্যপদ মাপ্যুপায়াৎ ॥

কারকাংশাৎ দ্বাদশে ক্রিয় (১২=১২ মীন) চাপিয়াঃ (১৬=৪
কর্কট) মীন রাশৌ কর্কটে বা কেতো স্থিতে সতি বিশেষেণ পুরুষঃ
কৈবল্যাৎ প্রাপ্নোতি ॥ শুভ গ্রহাণাং দৃষ্টি যোগশ্চেৎ ফলাধিক্যং
জ্ঞাতব্যং ॥ ৭০ ॥

মীন বা কর্কট রাশি গত কেতু কারকাংশ রাশির দ্বাদশস্থ হইলে মনুষ্য নিশ্চয়ই
কৈবল্য পদপ্রাপ্ত হয় । শুভলোক প্রাপ্তি শুভগ্রহের নিত্য সিদ্ধ ফল, হুতরাং
উক্ত দ্বাদশ স্থানে পুনরায় শুভগ্রহের যোগ দৃষ্টি থাকিলে ফলের নিশ্চয়তাই
জ্ঞাতব্য ।

এই স্থানে টীকাকার "শ্রীমালক ৪ সং বিশেষ অর্থপাতি সমুপস্থিত । তিনি লিখিয়াছেন
"কারকাংশে মেঘে ধনুসি বা তত্র শুভে সতি বিশেষেণ মুক্তিঃ স্যাৎ" এক্ষণে জানা আবশ্যক
যে বর্তমান কারকাংশের দ্বাদশ রাশিগত ফল লিখিত হইতেছে, কারকাংশ রাশির নহে, এবং
টীকাকার নিজাই "কারকাংশাৎ দ্বাদশে ফলমাহ" বলিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন ।
কারকাংশ রাশিগত ফল পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে এখানে পুনরীর তাহার কোন প্রয়োজন দেখা
যায় না । সুবাদিনীকার "ন চ স্বকরোণ কেতোঃ শুভমুক্তং" বলিয়া কেতুকে পাপ
গ্রহ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং তদ্বোধে "কেতোঃ সামুদ্র্য মুক্তি দাক্ষ্যযোগোপায়াৎ" বলিয়া
পূর্বোক্ত ৬৯ সংখ্যক সূত্রার্থে, কটপাদিনঃ সংজ্ঞাহরণে কেতু (৬১-১) শব্দে এক অর্থ
কারকাংশ রাশি কল্পনা করতঃ তৎপূর্ব শুভ শব্দ সহ যদ্বদ রাখিয়া কারকাংশে শুভগ্রহ থাকিলে
মুক্তি হয় এইরূপ অর্থ করিয়া পুনরীর "কারকাংশাৎ দ্বাদশে কেতো সতি মুক্তি রিতিবার্ধ"।
বলিয়া পূর্বোক্ত অনিচ্ছয়তা ও লম্বমান করিয়াছেন । বুদ্ধকায়িকার লিখিত আছে "গুরু-শঙ্ক-
কবিজাঃ স্যঃ যথাপূর্ব শুভগ্রহাঃ" । এতদনুসারে কেতু বৃহস্পতির নিদ্রা শুভগ্রহ হুতরাং

তাহার মুক্তিরাত্তর শক্তির অভাব নাই। পারাশরী হোরাতেও এ স্থলে কোন ব্যয়গুণ্য লগ্ন রাশির উল্লেখ দেখা যায় না। বর্ধমান হুজ্রেও ব্যয় স্থান শস্য পরিত্যাগ করতঃ “কারকাংশ” বলিয়া লগ্ন রাশির উল্লেখ পূর্বে ৬৮ সংখ্যক হুজ্রেও শুভশব্দ সহ সমধর্য রাখিয়াছেন। কেতু শব্দে কারকাংশ রাশি উল্লেখকরতঃ শুভ শব্দ সহ সমধর্য রাখা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বরং ৬৮ সংখ্যক হুজ্রের অমুযুক্তি ক্রমে “উক্তে শুভে কেতু যুক্তে কৈবল্যঃ” ইত্যাদি রূপে বৃদ্ধ দ্বারা উক্ত শুভগ্রহ যুক্ত দ্বাদশস্থানে কেতুর যোগ থাকিলে কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে এ প্রকার অর্থ করাই যুক্তি সম্মত এবং পারাশরী হোরা সহ সামঞ্জস্য থাকে, হুতরাং তদ্ব্যর্থই সমীচীন এবং গ্রাহ্য। পুনশ্চ বর্ধমান হুজ্রে সূর্য্যর সর্বগা ভাবা রাশিগুণ্য হুজ্র সম্বন্ধে সাধারণ জাতকশাস্ত্রানুসারে ক্রিয় শব্দে মেঘ এবং চাপ শব্দে ধরাশি উল্লেখ করা কেতুর যুক্তিসম্মত, তাহা সাধারণের বিবেচ্যে ৭০।

পাটোপল্লভ্যাং ৭১।

কেবলেহপি ব্যয়ে কেতৌ পাপগ্রহযুক্তোতিতে।

ন মুক্তি জীয়েত তন্ত শুভলোকং ন শশ্চতি ॥

কারকাংশাং দ্বাদশে পাপে পাপগ্রহৈঃ অত্যা ন মুক্তি ন শুভলোক
প্রাপ্তিস্থতি ॥ ৭১ ॥

পূর্বোক্ত ৬৮ সংখ্যক সূত্রে শুভগ্রহের ফল বর্ণনাস্তে এক্ষণে পাপগ্রহের ফল লিখিত হইতেছে। কারকাংশ রাশির দ্বাদশে পাপগ্রহের যোগদৃষ্টি থাকিলে ৬৮ সংখ্যক সূত্রের বিপরীত ফল অর্থাৎ মুক্তি বা শুভলোক প্রাপ্তি কিছুই হয় না, বরং নরকে পতনাদিই জ্ঞাতব্য। পরাশরোক্ত শ্লোকে দেখা যায় যে, কেবল অর্থাৎ শুভগ্রহের দৃষ্টিযোগ বিহীন কেতু পাপযুক্ত দৃষ্ট হইয়া তথায় অবস্থান করিলেই উক্ত অশুভ ফলের প্রদাতা। তদনুসারে হুতরাং দ্বাদশস্থ কেতুর প্রতি শুভগ্রহের যোগ দৃষ্টিই শুভ ফলের পরিচায়ক ॥ ৭১ ॥

রবিকেতুভ্যাং শিবো ভক্তিঃ ৭২ ॥

রবিয়া সংযুক্তে কেতৌ কারকাংশাদ্ ব্যয়স্থিতে।

দৌর্য্যাং ভক্তি ভবেৎ তন্ত শান্তিকো জায়তে নরঃ ॥

কারকাংশতে দ্বাদশ রাশি স্থিতাভ্যাং রবিকেতুভ্যাং শিবো ভক্তি-
ভবতি ॥ ৭২ ॥

এক্ষণে পরবর্তী এগারটি হুজ্রে কারকাংশের দ্বাদশ স্থান স্থিত রবিাদি ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ যুক্তিত দেবতা ভক্তি লিখিত হইতেছে। উক্ত স্থানে রবি এবং কেতু উভয়ে একজন্মে থাকিলে

মহায়া শিবভক্তিপরায়ণ হয়। অগ্রবর্তী ৭২ সংখ্যক হুজ্রে কেতু গ্রহের নিজস্ব ভিন্ন ফল লিখিত থাকায় এতদ্ব্যর্থ রবি এবং কেতুর যোগ ফল ভিন্ন তাহাদের ব্যক্তিগত ফল চিন্তা করা অযৌক্তিক। কিন্তু বাস্তবিক শিবভক্তি রবি গ্রহেরই ফল, রবিকেতুর যোগ ফল নহে। পরস্পর মতে পর পর প্রতি হুজ্রেই কেতু গ্রহের অমুযুক্তি থাকায় বুঝা যায় যে কেতু গ্রহ তৎসংযুক্ত গ্রহোক্ত ফলের নিষ্কণ্ডতা জ্ঞাপক। যেমন দ্বাদশস্থ রবি হইতে শিব ভক্তি, কিন্তু উক্ত রবি সহ কেতুর যোগ থাকিলে বৃদ্ধেবতা বিঘ্নের ভক্তির প্রাবল্য ঘটে। টীকাকারগণের মধ্যে কেহ প্রত্যেক গ্রহ সহ প্রতি হুজ্রেই কেতুর সংযোগ রাখিয়াছেন, কেহ বা কেতুকে পরিহার পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ হইতেই ফলধারণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, এই মতবৈধের উদ্দেশ্যেই এক মাত্র কারণ। গ্রহাস্তরাদিতে রবি হইতে রবি ভক্তিরই উল্লেখ দেখা যায়, হুতরাং তদ্ব্যর্থ হইতে রবি ভক্তি এবং শিবভক্তি উভয়ই চিন্তা করা বর্তব্য। পারাশরী মতে গৌরী ভক্তির ও উল্লেখ দেখা যায়। বর্তমানে প্রায় সকলেই ফলকমাগত গণেশাদি পঞ্চদেবতার মধ্যে অমৃতম কোন দেবতার উপাসক, হুতরাং এই দেবভক্তি বিষয়ক যোগ শুনি প্রায় শ্রবণে স্থলে মিলিতে দেখা যায় না। ইহার পরবর্তী হুজ্র গুলি উক্ত রূপ অর্থ প্রকাশক এবং সরল বলিয়া তাহাদের টীকাব্যবস্থা প্রায় প্রস্তুত হইল না।

চন্দ্রেন গৌর্যাং ৭৩।

চন্দ্রেন সংযুক্তে কেতৌ কারকাংশাদ্ ব্যয়স্থিতে।

রবিভক্তি ভবেৎ তন্ত নিক্রিশংসঃ বিজ্ঞাতম ॥

এস্থলে মত বৈধ দৃষ্ট হইতেছে। পারাশরী হোরা ভিন্ন সর্বত্রই গোবিন্দের উল্লেখ থাকায় অনুমান হয় যে, নিকপিকর প্রমাদে উক্তগ্রহে রবি ও চন্দ্রে দেবতা-দ্বয়ের বৈপরীত্য ঘটিয়াছে কারণ উক্ত গ্রহ ভিন্ন অত্ কোথাও সূর্য্যে গোবিন্দভক্তির উল্লেখ নাই, বিশেষতঃ পুংগ্রহে পুংদেবতা ভক্তি এবং স্ত্রীগ্রহে স্ত্রীদেবতা ভক্তিই সাধারণ নিয়ম ॥ ৭৩ ॥

কুজেন স্কন্দে ৭৪ ॥

অগ্রহণ মধ্যে মঙ্গলই সাময়িক গ্রহ হুতরাং তদগ্রহ হইতে দেব সেনাপতি কান্তিকের আরাধনাই যুক্তিযুক্ত এবং সর্বসম্মত ॥ ৭৪ ॥

বুধ শনিভ্যাং বিশেষ্যে ৭৫ ॥

উক্ত দ্বাদশ স্থানস্থ বুধ এবং শনি হইতে বিষভক্তি চিন্তনীয়। এস্থলে বুধ এবং শনির যোগ ফল নহে, উভয়েই উদ্ভক্তির উদ্দীপক ॥ ৭৫ ॥

শুক্লেন সাক্ষ-শিবো ৭৬ ॥

মুহুৰ্ম্মতি হইতে সর্বত্রই শিব ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাক্ষশিব শব্দে দুর্গাশিবের যুগলমুখি বুঝিতে হইবে ॥ ৭৬ ॥

শুভ্রোৎসব লক্ষ্যায়ঃ । ৭৭ ॥

গ্রাহ্যন্তরে শুক্র হইতে লক্ষনী ভিন্ন গোবীভক্তিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৭৭ ॥

রাহুণা তামসীং দুর্গাং দ্বৈতবর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

রাহুণা তামসীং দুর্গাং ভূতপ্রেশাদিসবকঃ ॥

রহু হইতে ভরকালী ছিন্নমস্তা প্রভৃতি ভগবতীরা তামসী মূর্তি এবং সৰ্বগুণপ্রদানা দুর্গা মূর্তিরও চিন্তা করা যায় । টীকাকারগণ “তামস্যাং ভূতাদি দেবতায়াং” বলিয়া তামসী শব্দের ভূত প্রেতাদি অর্থ করিয়াছেন । ভূত প্রেতাদি ভয়োৎপাদিত হইলেও যজ্ঞে তামস শব্দের উল্লেখ নাই । তবে কৰ্ণ পিষাঢ়াদির উল্লেখ করিলে কথঞ্চিৎ সন্তোষপর হইত । মৃৎকৈটভ ভীত বিধাতার স্তব্ধতা দেবীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

এবং স্তব্ধা তমাদেবী তামসী তত্র বেধসা ॥

বিকোঃ প্রবেদনার্থায় নিহন্তঃ মৃৎকৈটভে ॥

নেত্রাস্ত নাসিকা বাহু হৃদয়েভ্য স্তপ্ঠেয়সঃ ॥

নির্ণয়া দর্শনে তস্মৈ ব্রহ্মমৌহবাক্তজ্ঞানসঃ ॥

হুতরাং তামসী শব্দে ত্রিগুণাত্মিকা ভগবতীর তমোগুণ প্রধানা মহাকালী মূর্তি এবং তদ্রূপা অত্যাচ্ছাদিত মূর্তিই এ স্থলে জ্ঞাতব্য ॥ ৭৮ ॥

কেতুনা পনোপেশে ক্ষতেন্দ্রে ॥ ৭৯ ॥

হেরষ ভক্তঃ শিখিনা স্কন্দভক্তোহথবা ভবেৎ ॥

কেতু কেবল্য দাতা গ্রহ হুতরাং যে গ্রহের সহিত যুক্ত থাকে তৎগ্রহ মূর্তিতে দেবতার প্রতিই ভক্তির প্রাবল্য ঘটায় । অপর কোন গ্রহসহ যুক্ত না থাকিলে কেতু হইতে গণেশ এবং স্কন্দ ভক্তিই চিন্তনীয় ॥ ৭৯ ॥

পাপার্কে মন্দে ক্ষুদ্রেন্দে নতাস্ম ॥ ৮০ ॥

কারকাংশাদ্ ব্যয়স্থানে মন্দে শনৌ পাপার্কে পাপরাশৌ স্থিতে সতি ক্ষুদ্র দেবতাস্থ যক্ষরক্ষপিষাঢ়াদিষু ভক্তিভরতি ॥ উচ্চ ইতি পদমাত্র নির্যন্তঃ ॥ ৮০ ॥

কোন পাপক্ষেত্র গত শনি কারকাংশ রাশির ব্যয়স্থ হইলে মনুষ্য উপবিদ্যাদিতে ভক্তিমান হয় । মুক্তি দাতৃর শক্তি বিহীন দেবতাই ক্ষুদ্র দেবতা হুতরাং যক্ষ রক্ষ পিষাঢ়াদি দেবতাদি এবং অপরাপর উপবিদ্যাই ক্ষুদ্র দেবতা নামে অভিহিত । - এই স্থানে কারক নবাংশ রাশির ব্যয় রাশি গত ফল সমাপ্ত হইল ॥ ৮০ ॥

দন্তার্থে যজ্ঞতে যশ্চ তপাতে চ তপস্তথা ॥

ন পরার্থমিহেতুং স মার্জারঃ স্মৃতো বুধঃ ॥ ৬৪ ॥

বিভবে সতি নৈবান্তি ন দদতি জুহোতি চ ॥

তমাহরাথুস্ত্যামং ভুক্ত্য কুঞ্চেৎ শুদ্ধ্যতি ॥ ৬৫ ॥

সমাগতানাং মর্ত্যানাং পক্ষপাতং সমাশ্রয়েৎ ॥

তমাঃ কুঙ্কটং দেবীন্ত্যাপ্যমং বিগহিতম্ ॥ ৬৬ ॥

স্বধর্মং যঃ সমুচ্ছিদ্য শরধর্মং সমাশ্রয়েৎ ॥

অনপদি স বিদ্বন্তিঃ পতিতঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৬৭ ॥

দেবভ্যাগী গুরুভ্যাগী গুরুপত্ন্যাক্ততথা ॥

গৌত্রাক্ষগত্রীবধকুদপবিদ্ধ প্রচক্ষ্যতে ॥ ৬৮ ॥

যেবাং কুলে ন বেদোহসি ন শাস্ত্রং নৈব চ ব্রতম্ ॥

তে নগাঃ কীর্তিতঃ সন্তিঃ তেষামমং বিগহিতম্ ॥ ৬৯ ॥

আশাকর্তৃভূদাতা চ দাতৃশ্চ প্রতিষেধকঃ ॥

শরণাগতং ব্যস্তকৃতি স চাণ্ডালো নরাধমঃ ॥ ৭০ ॥

দন্ত-ভূপ্তি তরে যজ্ঞ করে যেই জন,

কিঞ্চ সে করয়ে ভগ্ন, শুন বাছাদন,

পরার্থ কিছুই নহে যেই জন বলে,

মার্জার বলেন তাঁরে পণ্ডিত সকলে । ৬৪ ।

ধন আছে—নিজে নাহি করয়ে ভোজন,

নাহি করে দান কিঞ্চ যজ্ঞের যজ্ঞন,

আধু বলি' প্রাজ্ঞে তাঁরে করেন ব্যাখ্যান,

তাঁর অম ভোজ্য নয় শাস্ত্রের প্রমাণ ।

তাঁহে যেবা পাপ হুদ্র শুন বাছাদন,

কুঙ্কট তাঁর প্রার্থিত শাস্ত্রের বচন । ৬৫ ।

সমাগত জনে যেবা পক্ষপাত করে

কুঙ্কট তাঁহায়ে স্বে যত প্রাজ্ঞ নরে,

তাঁহো অম বিগহিত করিত গ্রন্থ,

পাপস্পর্শ হয় তাঁহে, শুন বাছাদন । ৬৬ ।

স্বধর্ম ছাড়িয়া যেবা পর-ধর্ম লয়

অন্যদিকে, জ্ঞানী তাঁরে পণ্ডিত যে কয় । ৬৭ ।

দেবভ্যাগী, গুরুভ্যাগী, আর যেই জন

গুরুপত্নী ত্যাগ করে, শুন বাছাদন,

গৌত্রাক্ষ আর নারী বধে যেই জন

অপবিদ্ধ বলি' তাঁরে বলে প্রাজ্ঞ জন । ৬৮ ।

যেই কুলে বেদ নাই—নাহি শাস্ত্রজ্ঞান,

ব্রত নাই, নরকুল তাহার আখ্যান ।

তাঁহাদের অম নাহি লয় সাধু জনে ;

বহু পশ্চম্য তাহা। শাস্ত্রের বচনে । ৬৯ ।

আশা দিয়ে দান নাহি করে যেই জন,

অপরের দানে যেবা করয়ে বারণ,

পরিভ্যাগ করে যে শরণাগত জনে,

চণ্ডাল সে নরাধম রেখেই ইহা মনে । ৭০ ।

যো বান্ধবৈঃ পরিত্যক্তঃ সাধুভিত্ত্বীজ্ঞানৈরপি ।
 কুণ্ডলী যশ্চ তস্যায়ং ভূক্তা চান্দ্ৰায়ণং চরেৎ ॥ ৭১ ॥
 যো নিত্যকৰ্মণো হানিং কুৰ্ব্বানৈমিত্তিকস্য চ ।
 ভূক্তানং তস্য শুভৈক্য চ ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥ ৭২ ॥
 যন্ত চানুদিনং হানিং হে নিত্যশ্চ কৰ্মণঃ ।
 যশ্চ ব্রাহ্মণসম্ভ্যক্তঃ কিস্রীষী স নৈরাধমঃ ॥ ৭৩ ॥
 নিত্যস্য কৰ্ম্মণো হানিং ন কুৰ্ব্বত কদাচন ।
 তস্য স্বকরণে বন্ধঃ কেবলং যুতজন্মহ ॥ ৭৪ ॥
 দশাহং ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেদানহোমাদিবর্জিতঃ ।
 ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহং বৈশ্যো মাসান্বিতমবচ ।
 শূদ্রস্ত মাসমাসৌ নিত্যকৰ্ম্মবিবর্জিতঃ ॥ ৭৫ ॥
 রোগ গ্রহাদিবিধিনা নিত্যকৰ্ম্মবিষ্টিচ্যুতঃ ।
 পাদকুচ্ছং ততঃ কুত্বা গাং দৃষ্টা শুদ্ধিমাশ্রয়াৎ ॥ ৭৬ ॥
 ততঃ পরং নিজং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বা সৰ্ব্বেষু যথেষ্টিতম্ ॥ ৭৭ ॥

যে জন বান্ধবত্যাক্ত, সাধুত্যাক্ত আর
 ব্রাহ্মণেরা বাহারে করেন পরিহার,
 কুণ্ডলী সে, তার অন্ন করিলে ভোজন,
 শুদ্ধ হ'বে সে পাপে করিয়া চান্দ্রায়ণ ॥ ৭১ ॥
 যেই জন নিত্যকৰ্ম্ম নৈমিত্তিক আর
 ত্যাগ করে তার অন্ন না কর আহার;
 তাহে দেবা পাপ হয়, শূন বাছান;
 তিন দিন উপবাসে হইবে মোচন ॥ ৭২ ॥
 যে নরের ঘরে নিত্যকৰ্ম্ম-হানি হয়,
 ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত, কিম্বা নিশ্চয় ॥ ৭৩ ॥
 অতএব নিত্যকৰ্ম্ম ত্যাগ না করিবে,
 পরম যতনে তাহা সতত সাধিবে ।
 নিত্যকৰ্ম্ম না করিলে হয় প্রত্যভায়া,

বন্ধ ঘটে সন্ধ কিছু নাহিক তাহাং ।
 বাধা ঘটে শুভ ইথে জনমে, মরণে,
 তাহে প্রত্যভায়া নাই কহে সুখীজনে ॥ ৭৪ ॥
 দান হোম আদি কার্য্য করিয়া বর্জন,
 দশ দিন থাকিলেই, ইথে, বিপ্রগণ;
 ক্ষত্রিয়ে দ্বাদশ দিন, বৈশ্য পঞ্চদশ,
 শূদ্র এক মাস র'বে অশৌচের বশ ॥ ৭৫ ॥
 রোগবশে কিবা কোন দুঃখের ভরে,
 নিত্যকৰ্ম্ম-চ্যুতি সংঘটন হ'লে পরে,
 পাদকুচ্ছ করি পরে করিয়া গোধান,
 শুদ্ধিলাভ হইবে শুনহ মতিমান ॥ ৭৬ ॥
 তার পরে শুদ্ধ হইবে নিত্য-কৰ্ম্মগণ,
 রহিবেন, নিরন্তর হইয়া তৎপর ॥ ৭৭ ॥

শ্রেয়ায় সলিলং দেয়ং বহ্নিদ্বিত্বা তু গোত্রিকৈঃ ।
 প্রথমেহি চতুর্থং চ মণ্ডর্মে নবমে তথা ॥ ৭৮ ॥
 ভ্রাম্মাস্ত্রিচয়নং কার্য্যং চতুর্থং গোত্রিকৈর্দিনে ।
 উজ্জ্বলং সঞ্চয়নং তেভ্যামঙ্গলম্পর্শো বিধীয়তে ॥ ৭৯ ॥
 সৌদৈক্যে স্ত্রীয়াঃ সখ্যাঃ কার্য্য্যং সঞ্চয়নং পরম্ ।
 স্পর্শ এব সপিণ্ডানং যুতাহনি তথোভয়োঃ ॥ ৮০ ॥
 বৃদ্ধাহি-গো-দংষ্টি-শস্ত্র-তোয়োবন্ধনবহ্নিমু ।
 ব্রহ্মপ্রপাতাদিয়ুতে প্রায়োহিনাশকয়োরাপি ॥ ৮১ ॥
 বালু দেশান্তরেষু চ তথা প্রজজিতে যুতে ।
 সন্ধ্যাশোচমণ্ডাশ্চৈব ত্র্যহমুক্তমশৌচকম্ ॥ ৮২ ॥
 নৈবোদ্ধৈদৈহিকং কার্য্যং ন চ কার্য্যোদ্যদকক্রিয়া ।
 গর্ভস্রাবে তদেবোক্তং পূর্ণকালেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৮৩ ॥
 ব্রাহ্মণাসমাহোরাত্রং ক্ষত্রিয়াণাং দিনত্রয়ং ।
 যজুঃত্রিমপি বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং দ্বাদশাহিকম্ ॥ ৮৪ ॥

অশানেতে বহ্নিযোগে দেহ দগ্ধ করি,
 গোত্রজাতজন সবে শৌক চিহ্ন ধরি'
 প্রথম, চতুর্থ, আর গণ্ডম, নবম
 দিবসে সলিল দিবে ধরিয়া নিময় ॥ ৭৮ ॥
 চতুর্থ-দিবসে তার মণ্ডোজীয় জন
 যথাবিধি করিবেন ভ্রাম্মাস্ত্রিচয়ন,
 প্রথমে চয়ন কার্য্য করি সম্পাদন
 অঙ্গস্পর্শ-কার্য্য তবে করিবে সাধন ॥ ৭৯ ॥
 সঞ্চয়ন-অস্ত্রে কার্য্যবিহিত যে সব
 সহোদকগণ করিবেন সেই সব ।
 যুতাহে সুপিও আর সহোদকগণ
 স্পর্শ কার্য্য উভয়ে করিবে সম্পাদন ॥ ৮০ ॥
 শস্ত্রে, জলে, উরুদ্ধনে অথবা অনলে,
 বিধে, কিবা মৃত্যু হয় প্রপাতের বলে,

মণ্ডোত্র সৌদক সবে, এ হেন মরণে,
 একাধ অশৌচ ল'বে শাস্ত্রের বচনে ॥ ৮১ ॥
 বালক অথবা দেশান্তরবাসী জন
 অথবা যে করিয়াছে প্রজজ্যা গ্রহণ,
 তাদের মরণে জানি সন্ধ্যাশৌচ হয়,
 শাস্ত্রান্তরে ত্রিরাত্র অশৌচ ইথে কয় ॥ ৮২ ॥
 ইহাতে উদ্ধৈদৈহিক কার্য্য কিছু নাই ।
 করিবে উদক-ক্রিয়া বর্জন সদাই ।
 গর্ভস্রাবে সেই বিধি জানিও নিশ্চয়,
 পূর্ণকালে শুদ্ধি হ'বে শাস্ত্রে এই কয় ॥ ৮৩ ॥
 ব্রাহ্মণের অহোরাত্র, ক্ষত্রিয়ে ত্রিদিন,
 বৈশ্য পক্ষে বিধি ইথে হয় ছয় দিন ।
 শূদ্রের দ্বাদশ দিনে ইথে শুদ্ধি হয়,
 শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয় ॥ ৮৪ ॥

সপিণ্ডানাং সপিণ্ডস্ত যুতেহ্যশ্বিন্ যুতো যদি ।
 পূর্বাশৌচসমাখ্যাতৈঃ কার্যান্তত্ব দির্নৈঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৮৫ ॥
 এষ এব বিধির্দুর্কৌ জন্ম্যপি হি সূতকে ।
 সপিণ্ডানাং সপিণ্ডেযু যথাবৎ সৌদকেযু চ ॥ ৮৬ ॥
 জাতে পুত্রে পিতৃঃ স্নানং সচেলস্ত্রু বিধীয়তে ।
 যুতে হি সর্ববন্ধু নামিত্যাহ ভগবন্ ভৃগুঃ ॥ ৮৭ ॥
 তত্রাপি যদি চাত্মশ্বিন্ জাতে জ্যেতে চাপরঃ ।
 তত্রাপি শুদ্ধিকরদিকৌ পূর্বজন্মাবতো দির্নৈঃ ॥ ৮৮ ॥
 দশ-দ্বাদশ-মাসার্দ্ধ-মাসসংখ্যাদিনৈর্গতৈঃ ।
 স্বাঃ বাঃ কন্দ্য়ক্রিয়াঃ কুব্জাঃ সর্বে বর্ণা যথাবিধি ॥ ৮৯ ॥
 প্রেতমুদ্दिश্য কৰ্ত্তব্যমেকোদিকং ততঃ পতম্ ।
 সপিণ্ডীকরণং চৈব কার্যমাবৎসরান্নরৈঃ ॥ ৯০ ॥
 ততঃ পিতৃভ্রমাপদে দর্শ পূর্ণদেহিভিঃ স্ত্রিভিঃ ।
 প্রাণনাং স্তন্য কৰ্ত্তব্যং যথা শ্রুতিনির্দশনং ॥ ৯১ ॥
 দানানি চৈব দেয়ানি ব্রাহ্মণভ্যো মনোযিভিঃ ॥ ৯২ ॥
 বৃদ্ধদিক্ৰীতমম্ লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে ।
 তত্তদগুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৯৩ ॥

একের অশৌচ মধ্যে অন্তের মরণে ।
 পূর্বাশৌচে ত্ত্বি হেরি' শাঙ্গের বচনে ॥ ৮৫ ॥
 সূতক-সূতক, দুয়ে এই ত নিয়ম
 মপিত, সৌদক পক্ষে নহে ব্যতিক্রম ॥ ৮৬ ॥
 পুত্রের জন্মে পিতা তৎপর হইয়া
 সচেল করিবে স্নান শুদ্ধির লাগিয়া ।
 মরণে বান্ধব সবে করিবে স্নান,
 ভগবান ভৃগু এই করিলা বিধান ॥ ৮৭ ॥
 এক শিত জন্মিলে, সে গোছে যদি আর
 জন্মোশিত, পূর্বাশৌচে ত্ত্বি হ'বে তার ॥ ৮৮ ॥
 দশ কি দ্বাদশ, পক্ষ কিম্বা মাস পরে,
 বিপ্রাদির ত্ত্বি হয় বর্ণ অহুসারে,
 তার পরে বর্ণোচিত কার্যে অধিকার
 হইবে সবার ইহা শাস্ত্র বাক্য সার ॥ ৮৯ ॥

প্রেতের উদ্দেশে পরে করিবে সাধন,
 একোদিক্ৰীত শাস্ত্রবিধি ভাঙতে যেমন ;
 সপ্তমসর পরে হয় সপিণ্ডীকরণ,
 তাহে যথা বিধি তাহা করিবে সাধন ॥ ৯০ ॥
 তৎপরে পিতৃভ্রম, সেই ত সময়
 দর্শ পৌর্ণমাস আদি করিবে নিশ্চয়,
 শ্রুতিতে যেমন বিধি আছে নিরূপণ,
 সেই মত সর্বকার্য করিবে সাধন ॥ ৯১ ॥
 যুতের মদল তরে আনি বিপ্রগণে,
 যথাশক্তি দিবে দান সদা শুদ্ধ মনে ॥ ৯২ ॥
 লভিতে অক্ষয় ফল, করিয়া যতন
 ইষ্ট বস্ত্র প্রিয় দ্রব্য করিবে অর্পণ,
 গুণবান ব্রাহ্মণে অপরিবে এই দান
 সতত সবারে করি' সাদর সম্মান ॥ ৯৩ ॥

প্রেতং প্রেতং সমুদ্दिश্য ভূমিং ধেমাদিকং স্বকম্ ।
 দদ্যাদ যেনাস্য সংপ্রীতাঃ পিতরঃ সন্তি পুত্রকঃ ॥ ৯৪ ॥
 পূর্ণৈস্ত্রি দিবসৈঃ স্পৃষ্টা সলিলং বাহনানুধম্ ।
 প্রেতাভ্যো চ তথা সমাধর্ম্যঃ কৃতক্রিয়াঃ ॥ ৯৫ ॥
 স্ববর্ণধর্মনির্দিষ্টমুপাদাশং তথা ক্রিয়াঃ ।
 কুব্জাঃ সমস্তাঃ শুচিনঃ পরত্রেহ চ ভূতিদাঃ ॥ ৯৬ ॥
 অথোত্তর্য ত্রয়ো নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা ।
 ধর্ম্যতো ধনমাহার্যং যন্তব্যকপি যজ্ঞতঃ ॥ ৯৭ ॥
 যচ্চাপি কুব্জতো নাস্তা জুগুপ্সামেতি পুত্রক ।
 তৎকর্তব্যমশ্বিনে যম গোপ্যং মহাজনে ॥ ৯৮ ॥
 এবমচরতো যৎস পুরুষস্য গৃহে সতঃ ।
 ধর্ম্যার্থ-কামসম্প্রাপ্ত্য পরত্রেহ চ শোভনম্ ॥ ৯৯ ॥
 ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঋতপ্তজরচিত্রে মদালসাউপাখ্যানে
 অলকাহুশাসনে ধর্ম্যধর্মনিরূপণং নাম
 পঞ্চক্রিশোহধ্যায়ঃ ॥

মৃতের উদ্দেশে ভূমি, ধেম আদি অন্ন
 দানে তৃপ্ত পিতৃগণ হয় ত তাহার ॥ ৯৪ ॥
 বর্ণ অহুসারে পূর্ণ হ'কে দিন যবে
 সলিলবাহনানুধ-স্পর্শ করি' তবে
 স্পর্শ করি' প্রেতার দণ্ডাদি যথা আর
 যথাবিধি কুব্জ সাধিবে আপনায় ॥ ৯৫ ॥
 নিজ নিজ বর্ণ-ধর্ম যে হক বিহিত
 সেই মত কার্য করা সবারি উচিত ।
 এই বিধি যে মানব করয়ে পালন
 ইহপরকালে শ্রেয়ঃ লভে সেই জন ॥ ৯৬ ॥
 ত্রয়ো অধ্যয়ন নিত্য করিবে নিশ্চয়

শ্রেয়ের বিচার নিত্য যুক্তিযুক্ত হয়,
 ধর্মপথে থাকি দন করিবে অর্জন,
 ধর্ম কার্যে সে দন করিবে নিয়োজন ॥ ৯৭ ॥
 আশ্রয় জুগুপ্সা নাহি হয় যে কার্যোতে,
 মহাজনে লুকাইতে ইচ্ছা নাহি যাতে,
 হেনা কার্য কর' সদা নিশেধ অন্তরে,
 ঘটবে হৃদয় হৃদয় তাহে পরে ॥ ৯৮ ॥
 শুন, বৎস, গৃহী হেন করি' আচরণ
 ধর্ম, অর্থ, কাম পায়-রহে দুহমন,
 ইহপরকালে শুভ লভে হৃদয়
 শাঙ্গের বচন, ইথে নানিক শঙ্কয় ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে ঋতপ্তজরচিত্রাঙ্গত মদালসা-উপাখ্যানে
 অলকাহুশাসনে ধর্ম্যধর্মনিরূপণং নামক
 পঞ্চক্রিশ-অধ্যায়ঃ ।

যট্‌ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

বিজপুত্র উবাচ ।

স এবমবুশিক্তঃ সন্ মাত্ৰা সম্প্রাপ্য যৌবনম্ ।
 স্বাতঃস্বজস্বতশ্চক্রে সন্মাদারপরিগ্রহম্ ॥ ১ ॥
 পুত্রাংশ্চোৎপাদয়ামাস যট্‌জ্ঞশ্চাপ্যযজ্ঞদ্বিত্বিঃ ।
 পিতৃশ্চ সর্বকালেষু চকারাজানুপালনম্ ॥ ২ ॥
 ততঃ কালেন মহতা সম্প্রাপ্য চরমং বয়ঃ ।
 চক্রেহভিষেকং পুত্রস্য তস্য রাজ্যে স্বাতঃস্বজঃ ॥ ৩ ॥
 ভাৰ্য্যা সহ ধর্ম্মান্না যিযাভিস্তপসে বনম্ ।
 অবতীর্ণো মহীরঞ্জে মহাভাগো মহীপতিঃ ॥ ৪ ॥
 মদালসা চ তনয়ং প্রাহেদং শিশুতমং বচঃ ।
 কামোপভোগসংসর্গ-প্রাহাণ্য স্ততস্ম বৈ ॥ ৫ ॥
 মদালসোবাচ ।
 বদা হুংখমসহং তে প্রিয়বন্ধুবিয়োগজম্ ।
 শক্রবোধোদ্ভবং বাপি বিত্তনাশাস্ত্রসম্ভবম্ ॥ ৬ ॥

বিজ পুত্র বলে পিতা করহ অবগ-
 “মাতৃপাশে উপদেশ করিয়া গ্রহণ
 স্বাতঃস্বজনন্দন লাভিলা বহুজ্ঞান,
 দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল মতিমান ।
 ক্রমেতে যৌবন যবে আসিল তাঁহার
 যথাবিধি হইলেন তিনি কৃতদার । ১ ।
 ক্রমেতে জন্মিল পুত্র যদয়নন্দন ;
 যথাশাস্ত্র বহু যজ্ঞ করিলা সাধন ;
 পিতৃ-আজ্ঞা অহুংসী হইয়া সত্য
 নানা শুভকার্য্যেতে রহিলা সবার রত । ২ ।
 এইরূপে অতীত হইল বহুকাল,
 হইলেন বৃদ্ধ স্বাতঃস্বজ মহীপাল ।

তবে রাজা প্রিয়তম সেই ত নন্দনে
 রাষ্ট্রো অভিবিক্ত কৈলা আনন্দিত মনে । ৩ ।
 তপস্তার তরে, করি' বাসনা অন্তরে
 ভাৰ্য্যা সহ বনে যেতে, রাজ্য ত্যাগ করে । ৪ ।
 গমল সময়ে, মদালসা পুত্রবরে
 কামনা নাশের তরে উপদেশ করে । ৫ ।
 মদালসা কয় হ'বে যে সময়
 হুংখ তব আশিষ,
 প্রিয় নাশ ফলে, কিবা শক্রবলে
 পরাজিত যে সময়,
 কিবা বিত্ত নাশ হ'বে হত-আশ
 হবে কুটি যে সময়

ভবৈৎ তৎ কুব্ধতো রাজ্যং গৃহধর্ম্মাবলম্বিনঃ ।
 হুংখামতনভূতো হি মনস্তালম্বনো গৃহী ॥ ৭ ॥
 তদাশ্র্যং পুত্র নিষ্কম্য মদতাদঙ্গুরীয়কাৎ ।
 বাচ্যং তে শাসনং পটে সূক্ষ্মাকুরনিবেশিতম্ ॥ ৮ ॥

বিজপুত্র উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা এদদৌ তস্মৈ সৌবর্ণং সাদুরীয়কম্ ।
 আশিষশ্চাপি যা যোগাঃ পুরুষস্য গৃহে সতঃ ॥ ৯ ॥
 ততঃ কুবলয়াহোহসৌ সা চ দেবী মদালসা ।
 পুত্রায়ন্দক্স তত্রাজ্যং স্তপসে কাননং গতঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে স্বতঃস্বজচরিত্রে মদালসোপাখ্যানেন
 অলকীভিষেচনং নাম যট্‌ত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥

সে হুংখ অপারে শাস্তি পাইবারে
 উপায় আছে নিশ্চয় ।
 গৃহ ধর্মে রত তবে আছে যত
 মমত্ব তা'দের বল,
 সেই বলে তা'রা হুংখে আশ্রয়
 হুংখেতে অতি দুর্দল,
 রাজ্যাসক্ত হয়ে প্রিয়জন নিয়ে
 যখন কাতর হ'বে ;
 মম দত্ত এই অঙ্গুরী হইতে
 পটে নিষ্কাশিয়া ল'বে ।

হুংখ অক্ষরেতে সেই ত পটেতে
 আছে উপদেশ লেখা,
 করিয়া যতন করিলে দর্শন-
 তবে যাবে লেখা দেখা । ৬-৮ ।
 বিজপুত্র বলে—“পিতা করহ অবগ
 এত বলি স্বর্ণাঙ্গুরী করিয়া অর্পণ ।
 আশীষ করিয়া পুত্রে যে হয় বিহিত,
 মদালসা যার চলি হয়ে হরমিত ।
 নৈরশ কুবলয়াশ মদালসা সনে
 পুত্রে রাজ্য করি' তবে পশিলেন বনে ।” ৯-১০ ।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে স্বতঃস্বজচরিত্রাত্মকং মদালসোপাখ্যানেন
 অলকীর রাজ্যভিষেক নামক যট্‌ত্রিশ অধ্যায় ।



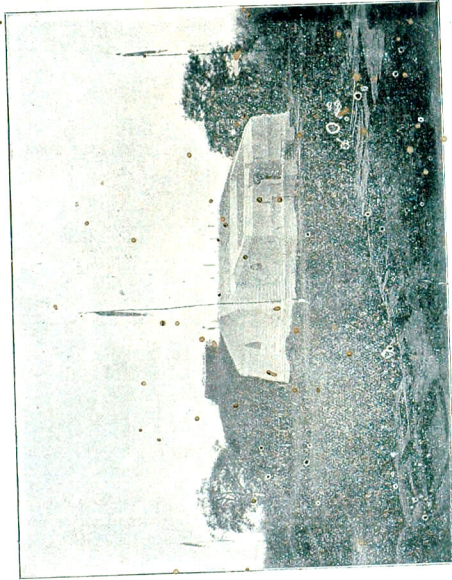
সপ্তস্বিত্তিশোহধ্যায়ঃ ।

যিহপুত্র উবাচ ।

সোহপ্যালকৌ যথাভাষ্যং পুত্রবর্ষমুদিতাঃ প্রজাঃ ।
 পালান্যামাস ধর্ম্মান্না বে বে কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ ॥ ১ ॥
 দুষ্টেষু দণ্ডং শিষ্টেষু সম্যক্ চ পরিপালনম্ ।
 কুর্ক্বন পরাং মদং লেভে ইয়াজ চ মহামথৈঃ ॥ ২ ॥
 অজায়ন্ত স্ত্রতাশ্চাস্য মহাবলপরাক্রমাঃ ।
 ধর্ম্মান্নানো মহান্নানো বিমার্গপরিপহ্নিনঃ ॥ ৩ ॥
 চকার সোহির্থে ধর্ম্মেণ ধর্ম্মমর্ধেন চান্নবান্ ।
 তয়োশ্চৈবাবিরোধেন বৃভুজে বিক্ষানপি ॥ ৪ ॥
 এবং বহুনি বর্ষাণি তস্য পালয়তো মহীম্ ।
 ধর্ম্মার্ধ-কামসন্তস্য জগ্মুরেকমহর্ষত্ম ॥ ৫ ॥
 বৈরাগ্যং নাম্য সঞ্জজ্ঞে ভৃগুতো বিষয়ান্ শ্রিয়ান্ ।
 ন চাপ্যলমভূৎ তস্য ধর্ম্মার্থোপার্জনং প্রতি ॥ ৬ ॥

যিহপুত্রে বলে, পিতা করহ অবন
 রাজ্যলাভ করি' তবে অলক রাজন,
 যথা তায়, পুত্র সম পালন প্রজাদি,
 বধর্থে বর্ধে সদা স্থাপিয়া সবায় । ১ ।
 দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন
 যথোচিত কার্য বাহা,—করেন রাজন ।
 বহু মহাযজ্ঞ করি' দেব ভূপতি তরে
 করেন পালন ধর্ম্ম, আনন্দ অন্তরে । ২ ।
 জন্মিল তাঁহার মহাবল পুত্রগণ
 সবে ধর্ম্মরত ধীর পিতার মতন ।
 অধর্ম্মের শত্রু সবে ধর্ম্মধিকের সখা
 এমন নন্দন সদা নাহি যায় দেখা । ৩ ।

ধর্ম্মপথে থাকি ত্রাজ্য ধনার্জন করে
 সেই ধন করে ব্যয় ধর্ম্মলাভ তরে ।
 ধর্ম্মার্থের অবিরোধে সেই নরনার
 ভুক্তিয়া বিষয় অর্থে জীবন কাটায় । ৪ ।
 এইরূপে করে বহু বর্ষ হ'লো গত
 রাজ্য করে—ধর্ম্ম-অর্থ-কামে হ'য়ে রত ।
 বহু বর্ষ কেটে যায় দিনেকের প্রায়
 মনেতে নবোণ কোনো কষ্ট নাহি পায় । ৫ ।
 প্রিয় বিষয়ের ভোগে আসক্ত সত্যত,
 স্বদয়ে বৈরাগ্য নাহি হইল আগত ।
 ধর্ম্মের চরম অর্থ মোক্ষ নাম বাঞ্ছ,
 সে সর্ধর্ তরে বাঞ্ছা নাহি হয়ো তার । ৬ ।



“স্মৃতি ও জুড়িয়া, অন্ধ ভগ্ন-ভক্তি-প্রবৃত্ত চরণে মার।”

India Press, Calcutta.

কলিকাতা পিটেল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

গাহস্থ

“ভারতবাসী ‘জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়’ বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপার সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সুস্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

“জননী জন্মভূমির্দেবী স্বর্গাদপি গরীয়সী।”

ভূদেব

৫ম খণ্ড
৫ম বর্ষ

পৌষ, ১৩২০

৩য় সংখ্যা

আলোচনা

১। হিন্দুজাতির নিকট

পাশ্চাত্যের ঋণ

আজকাল আমরা বলিতে শিখিয়াছি,—
“ভার পর, ছড়িক-অনাহারের প্রকোপ যখন
কমু আসবে, পরে এক দিন এই ভারতের
ধর্ম্মনেতারা দেশ হতে দিগ্বিদ্যে বহির্গত
হ’বেন, এবং একে একে ইউরোপের সকল
দেশকে বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া মন প্রাণ

কেড়ে ল’বেন। দেখ, ভারতের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান
ইউরোপের ধর্ম্মবিজ্ঞানকে মুক্তির পথ দেখিয়ে
দিয়ে শুধু জীবন-সংগ্রাম ও সামাজিকতার
জ্ঞান দ্বারা দেবে। ইউরোপীয় সমাজ এখন
বৈয়হিক ভারে অর্জ্বরিত,—এই আধ্যাত্মিক
নবজীবনের জন্ম বলে’ আছে। ভারতের
প্রকৃত উন্নতিতে ইউরোপেরও মুক্তি।”

মানবজাত্যের উপর হিন্দুজাতির প্রভাব-
বিস্তারের আশায় এখন আমরা সাহসপূর্ণক

নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া থাকি।
“গ্রীকসাহিত্য বিস্তারের দ্বারা ইউরোপের
যোড়শ শতাব্দীতে এক যুগান্তর উপস্থিত
হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মানবজাতির
নব আত্মীয় হিন্দু-সাহিত্য প্রচারের দ্বারা
সংঘটিত হইবে। ভারতের বিদ্যা প্রচারক,
শিক্ষাপ্রচারক ও সাহিত্যপ্রচারকগণ, বিশ্বের
বিজ্ঞান-ভাণ্ডার,—মানবজাতির সার্বভৌমত্বকে,
আমাদের অপরূপ সাহসিকতা, বিপুলবিস্তৃত
আবদায় ও জগদ্ব্যাপিনী সাধনার ফল
প্রতীক্ষা করিতেছে।”

আমাদের এই আশা কি অমূলক? আমাদের
এই আকাঙ্ক্ষা কি বাস্তবতা মাত্র? আমাদের
এই ভবিষ্যতের নমনরঞ্জক, চিত্তবিমোহনকারী
দৃষ্ট কি উদ্ভাসময়ীকরণাশ্রয়ী মনোরমের
মরীচিকার দ্বারা উপেক্ষণীয়? ধাঁধার অতীত-
গৌরবাহ্বনী ইতিহাস-কথাকে কাব্যের ছড়া
মাত্র মনে করেন, তাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ
জাতীয় জীবনের চিত্রকে ভ্রূণাবস্থায় মাত্র
বিবেচনা করিবেন, সন্দেহ নাই। আর, ধাঁধার
ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গর অবস্থা সম্যক জানিবার
ইচ্ছাকে “নব্য সভ্যতা”র প্রতিবন্ধক বিবেচনা
করেন, এবং হিন্দুজাতির ঐতিহাসিক ক্রম-
বিকাশের শুকু-বিজ্ঞানগুলির সহিত পরিচিত
হইবার চেষ্টা করেন নাই, তাহারা হিন্দু-
সভ্যতার আগামী যুগ-দর্শনের উদ্বোধনকে যুগা-
বাক্যধ্বজর জ্বলন তুচ্ছ করিবেন। কিন্তু
অতীত কখনও বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে ত্যাগ
করে না—বর্তমান অকৃতজ্ঞ হইলেও তদারহি
ভিত্তির দিয়া অতীত ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত
করিয়া লয়।

ভারতবর্ষের অতীত মিয়ান নয়, অলীক
নয়—হিন্দুজাতির পূর্ণ কাণ্ড-কলাপ কবি-
কল্পনার সামগ্রী নয়, কেবল মাত্র দ্যান-

শাস্ত্রগণ্য বিশ্বাসের তত্ত্ব নয়, যোগী-ঋষির উপলব্ধি-
গম্য নয়। আধুনিক জাতীয়-গৌরবদৃষ্ট
মিয়ান অভিমানের আশ্রয়েই স্বদেশ, স্বধর্ম ও
স্বসমাজ আমাদের নিকট দৈবক্রমে পূজা
লাভের যোগ্য হইয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষ
চিরকাল মানবজাতির গুণস্বাহীন; ভারতের
অধিষ্ঠাত্রী দেবী যুগে যুগে মানবহস্তান্তকে
শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্ম বিত্তের
কর্ত্তা ছিলেন। কেবল আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্বই
নয়, কেবল মুক্তি, নির্লিপ্য, ভাগ্য, বৈরাগ্যের
কথাই নয়,—ভারতবাসী সর্বদা এশিয়া ও
ইউরোপকে বৈয়াকিক জ্ঞান, ব্যবহারিক বিদ্যা,
গৃহস্থালী-তত্ত্ব এবং সাম্প্রদায়িক জীবনে উন্নতির
উপায় শিক্কা দিয়াছে। জগতে ভারতবর্ষের
শুকগিরি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য। ইতিহাসই
মাফা দিতেছে—তোমাদের তাত্রাসান,
প্রাচীন পুথি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য,
বিশেষী সাহিত্যের প্রমাণ, চীন, জাপান,
আরব, পারস্য এবং গ্রীসের প্রাচীন অর্ধাচীন
লেখক-পায়ক-শিল্পিত্র সর্বদাই মাফা দিতেছে
—ভারতবর্ষের নিকট এশিয়া ও ইউরোপ
প্রায় সকল বিষয়েই সঙ্গী। আমরা ক্রমে
ক্রমে প্রমাণসহ দেখাইব যে, মানবজাতির
বড় বড় ধর্মগুলি, বড় বড় দর্শনবাদগুলি, বড়
বড় বিজ্ঞানগুলি হিন্দুজাতির উদ্ভাবিত, হিন্দু-
জাতির মনোবীর্য। হিন্দুজাতি সর্বদা
সকল জাতিকে গুণে আনন্দ রাখিয়াছে—
ভবিষ্যতেও যে রাখিবে তদ্রূপ সন্দেহ করিয়া
ছুর্ত্তাভতার এবং অদূরদর্শিতার ও নৈরাশ্যের
পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

২। পাটীগণিতে ভারতবর্ষের দান
এবার আমরা হিন্দুজাতির গণিতবিজ্ঞানে
উৎকর্ষলাভের কথা বলিব। সংখ্যালিখনের

দশমিক প্রণালী যে ভারতবর্ষে প্রথম
অবলম্বিত হয়, তাহা আজকাল সর্বসাধা-
রনমত। আর্থাভট্ট ও রত্নগুপ্ত যে সংখ্যা-
লিখনের দশমিক প্রণালী অবগত ছিলেন
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্থাভট্ট খ্রীষ্টীয়
৪৭৬ সালে, রত্নগুপ্ত ৫২৮ সালে, জন্মগ্রহণ
করেন। ভাস্করাচার্যের লীলাবতীতে এই
প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবগণ এই প্রণালী
সম্যকরূপে গ্রহণ করেন। আর্থাভট্টের আর্থাভট্টায়
(জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত) ও রত্নগুপ্তের রত্নমুদ্র-
লিখিত ক্যালিফ আফ্‌সনহের (৭৫৪-৭৭৫)
সময় আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়।
কালিফ আল্‌ মামুনর রাজত্বকালে (৮১৩-
৮৩৩) খোবান্দার-নবাসী মহম্মদ ইবনু মুসা
ভারতবর্ষে আগমন করেন। ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে
প্রভাসময় করিয়া তিনি একদশনি বীজগণিত
লেখেন। এই বীজগণিত আর্থাভট্টের উপর
প্রভাবিত। পরবর্তী আরব-বীজগণিত-
লেখকগণ মুসার বীজগণিতের নিকট বিশেষ
ভাবে সঙ্গী। যতদূর পর্যন্ত জানা গিয়াছে
আরবদেশে সংখ্যালিখনের দশমিক প্রণালীর
ব্যবহার ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হয়। কালিফ
ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খ্রিঃ) রাজত্ব-
কালে আরবদেশে দশমিক প্রণালীর
ব্যবহারের কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না।

দশমিক প্রণালী খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে
ইউরোপে প্রচলিত হয়। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে
Leonardo, “Algebra et al muchabala”
নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থে তিনি
দশমিক প্রণালী বর্ণন করেন এবং সেই সময়
হইতে ইউরোপে উহার প্রচার আরম্ভ হয়।
লিওনার্ডো এই গ্রন্থে রোমক প্রণালী অপেক্ষা
আরবীয় প্রণালীর উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন।

তাহার গ্রন্থপাঠে ইহাও জানা যায় তৎসময়ে
দশমিক প্রণালী ইউরোপে প্রায় সম্পূর্ণ
অজ্ঞাত ছিল।

সংখ্যালিখনের চিত্রগুলিও যে ভারতবর্ষ
হইতেই আধুনিক সভ্যজগতে প্রচলিত হয়
তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানে প্রচলিত
দেবনাগরী সংখ্যাচিত্রগুলি রূপান্তরিত হইয়া
আরবগণের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। আরব-
গণের নিকট হইতে ইউরোপীয়গণ উহা গ্রহণ
করেন।

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ ও ঘনমূল-
নিষ্কাশন প্রভৃতি কার্যের যে যে প্রণালী
আজকাল সভ্যজগতে সর্বত্র প্রচলিত, তাহা
ভাস্করাচার্যের (১১১৪ খ্রিঃ) লীলাবতীতে
বিশদভাবে বর্ণিত আছে। খ্রীষ্টাব্দে
(১১৩ খ্রিঃ) ক্রিশ্চিয়ানও বর্ণ এবং
ঘনমূল-নিষ্কাশনের নিয়ম বর্ণিত আছে।

৩। হিন্দুজাতি বীজগণিতের
জন্মদাতা

জার্মান পণ্ডিত হ্যকেল (Haeckel) সাহেবের
মতে হিন্দুগণ বীজগণিতের আবিষ্কর্ত্তা। বস্তুতঃ
যদিও ডািওফ্যান্টাস্ (Diophantus) বীজ-
গণিতের কতকগুলি তথ্যের আলোচনা করিয়া
ছিলেন, সাক্ষাতক বীজগণিত ভারতবর্ষেই
প্রথম আবিষ্কৃত হয়। সময়বিশেষে আর্থাভট্ট
যদিও ডািওফ্যান্টাসের পরবর্তী, কিন্তু আর্থা-
ভট্টের বীজগণিত যে ডািওফ্যান্টাসের বীজ-
গণিত অপেক্ষা অনেক উচ্চে সে বিষয়ে
সন্দেহ নাই। আর্থাভট্টের বীজগণিতে বর্ণ-
সমীকরণের সম্পূর্ণ সমাধান, ১,২,৩...
প্রভৃতি রাশিগুলির, উদ্দেশের বর্ণের, ও
ঘনকালের সমষ্টি এবং একঘাত (Indeter-

minate) সমীকরণের সমাধান পাওয়া যায়।
বর্গ-সমীকরণের যে দুইটা মূল আছে, তাহা
হিন্দুগণ জানিতেন; গ্রীকগণের উহা অবিকৃত
ছিল। ব্রহ্মগুপ্ত স্বাভাবিক (Indeterminate)
সমীকরণের আলোচনা করিয়াছিলেন।
জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রকার সমীকরণের একটি
বিশেষ সমাধান লাভ করিবার চেষ্টা
করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুগণ সাধারণ সমাধান
লাভে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত যে
যে সমাধান সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার
কতকগুলি ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে মাত্র
সামিত হইয়াছে। ব্রহ্মগুপ্ত-প্রণীত একটি স্বাভাবিক
(Indeterminate) সমীকরণের সাধারণ
সমাধান জগদ্বিখ্যাত ইউলারের (Euler)
সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ইউরোপে উহার
সমাধান ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে Dela Grange
কর্তৃক গাণিতিক এবং তাহার সমাধান ব্রহ্ম-
গুপ্তের সমাধানের অবিকল অল্পভ্রম। আদ্য-
ভট্টের বৃত্ত-প্রণালী ইউরোপে ঐশ্বর্যশ্রুত
শতাব্দী পর্যন্ত অবিকৃত ছিল। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে
Bachet ঐ প্রণালী প্রথম ইউরোপে প্রচলন
করেন। আর্ঘ্যভট্ট একাদিক অব্যক্তগাণি-
যুক্ত সমীকরণেরও আলোচনা করিয়াছেন।
আদ্যভট্ট কিন্তু হিন্দু বীজগণিতজ্ঞগণের
প্রথম নহেন। তাহার পূর্বেও যে বীজগণিতের
চর্চা হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল এবং বিশেষ
উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা তাহার গ্রন্থপটে
উপলব্ধ হয়। ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীতে
সুত্ৰ সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আছে। তাহাতে
তিনি দেখাইয়াছেন যে $x^2 + a = 0$, $0^2 = -a$,
 $x^2 = -a$, $x = \pm \sqrt{-a}$ । মূল লিখিবার চিহ্ন
ভাস্কর প্রথম ব্যবহার করেন। ইউরোপে ঐ
চিহ্ন Chuquet (১৬শ শতাব্দী) সর্বপ্রথম
ব্যবহার করেন, পরে Rudolff ১৫২৬

খ্রীষ্টাব্দে উহা প্রচলিত করেন। ঋণাত্মক
গাণিতিক ব্যবহার হিন্দুগণ প্রথম আবিষ্কার
করেন। গাণিতিক উপর একটি বিন্দু লিখিলে
তাহা ঋণাত্মক বিবেচিত হইত। ভ্রাম্যশ
লিখিবার প্রণালী—লাবের নীচে হর লেখা—
হিন্দুগণ প্রচার করেন; প্রথমতঃ লব ও
হরের মধ্যে কবি লিখিত হইত না, পরে কিন্তু
ঐ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। ভ্রাম্যশ লিখিবার
এই প্রণালী আরবগণ হিন্দুগণের নিকট শিক্ষা
করেন এবং পরে ইউরোপে প্রচার করেন।
ভাস্করাচার্য্য তাহার বীজগণিতের শেষ অধ্যায়ে
সংযোগ (Combination) সম্বন্ধে কয়েকটি
প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন।

৪। হিন্দুস্থানে জ্যামিতির উৎকর্ষ
পণ্ডিতগণের মতে জ্যামিতির আবিষ্কার
ইজিপ্ট দেশে সংঘটিত হয়। গ্রীসে ইহার
আলোচনা ও সম্যক উন্নতি সাধিত হয়।
হিন্দুগণের জ্যামিতিজ্ঞান ও তাহার আলোচনা
কিন্তু অত্বেকালিক জ্ঞান প্রদেশের তুলনায়
কোনও অংশেই হীন নয়। পঞ্চ কৌণ্ড
কৌণ্ড অংশ তাহা গ্রীক জ্যামিতি অপেক্ষা
অনেক উচ্চ। গ্রীক জ্যামিতি ও ভলু-
ফ্রয়ের সাধারণ দেখিয়া গণিতের ইতিহাস-
লেখক Cantor সাহেব এই সিদ্ধান্ত প্রকটিত
করেন যে, ভলুফ্রয়ের লেখক গ্রীক জ্যামিতি-
বেত্তা হিরো (Hero of Alexandria)
এবং তাহার শিষ্যগণের নিকট অনেকাংশে
অধী। কিন্তু ভলুফ্রয়ের ঐকপূর্ণ অন্ততঃ অষ্টম
শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, প্রোফেসর Ball
(W. W. R.) এর মতে হিরোদের সময়
সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১২০ সালের পূর্বে নয়।
বস্তুতঃ কৌণ্ড ইতিহাস-লেখকই তাহাকে

খ্রীষ্টপূর্ব ২১৫ সালের পূর্ববর্তী বলেন নাই।
ভাস্কর খিবে দেখাইয়াছেন যে, ইউরিস্কেড
১ম অধ্যায়ের ৪৭শতম প্রতিজ্ঞা,—যাহা
পিথাগোরাস (৫৬২—৪০০ খ্রীঃ পূঃ) কর্তৃক
আবিষ্কৃত বলিয়া প্রবান—হিন্দুগণ পিথাগো-
রাসের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বে প্রমাণ
করিয়াছিলেন। জাখান পণ্ডিত Schröder
এর মতে পিথাগোরাস হিন্দুজ্যামিতি-শাস্ত্র
হইতে অনেক দ্বিগুণ লইয়াছিলেন। ব্রহ্মের
পরিধি ও ব্যাসের অল্পপাত—এর নাম
হিন্দুগণ যত হুস্ম পুরিমাণে জানিতেন গ্রীকগণ
তাহা জানিতেন কি না সম্ভেহ। আর্কিমিডিস
নবম স্কন ৩৬ অপেক্ষা বৃহত্তর ও ৩৬ অপেক্ষা
সুত্বতর বলিয়া স্থির করেন। অর্থাৎ তাহার
গণনাহাসের $\pi = 3.1415926$ ও 3.14159265 এর
মধ্যবর্তী। হিরোরা নবম মান ৩ ও ৬ দুই
প্রকারই গ্রহণ করেন।

রোমীয়গণ স্থল-গণনা-কালে নবম মান
কখনও ৩, কখনও ৪ গ্রহণ করিতেন; হুস্ম-
গণনার ক্ষেত্রে তাহার ৩—৩.১৪২ লইতেন।

বৌদায়ন ভলুফ্রয়ে নবম মান ৩.১৪২
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর্ঘ্যভট্ট নবম মান
নির্মলিতান্ত্র প্রকট করিয়াছেন—
চতুর্দশিক শতমণ্ডেগং দ্ব্যধিকৃত্য সংখ্যায়ঃ
অমৃতব্রহ্মবিশ্বক্সাগ্রাসে বৃত্ত-পরিধাঃঃ
অর্থাৎ তাহার মতে নবম আসন্নমান ২.১৪২
= ৩.১৪১৬।

ভাস্করাচার্য্য নবম মান সম্বন্ধে এইরূপ
লিখিয়াছেন—

ব্যাসে ভূনন্দ্যরি হতে বিভক্তে ঋণা-
স্বর্থেঃ। পতিতঃ স হুস্ম। দ্ব্যধিকৃত্য
বিভক্তঃ শৈলৈঃ স্থলোহবদা ত্র্যধাবতার-
যোগাঃঃ।

অর্থাৎ স্থলব্যবহারযোগ্য $\pi = 3$ কিন্তু

হুস্মগণনাকালে $\pi = 3.14159$ বা ৩.১৪১৬।
ইউরোপে পূর্বোক্ত Leonardo নবম মান
 3.14159 লইয়াছেন (খ্রীষ্টীয় ১৩শ
শতাব্দী)। ১৫শ শতাব্দীতে Purbach
(১৪১৩—৬৩) আর্ঘ্যভট্টোদ্ধৃতিতঃ ৩.১৪১৬ মান
গ্রহণ করিয়াছেন। ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে Regio-
montanus নবম মান ৩.১৪১৬২ দিয়াছেন।
হুগুগিন্সে নবম এর যে মান দেওয়া
আছে, তাহা হিন্দুস্থানের বাহিরে আধুনিক
কাল ভিন্ন কোথাও বিদিত ছিল না।

অল্পগুপ্ত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলনির্ণায়নের যে
সূত্র দিয়াছেন তাহা ইউরোপে Clavius-এর
(১৬শ শতাব্দী) পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। ব্রহ্ম-
গুপ্ত ইউরিস্কেডের ১ম অধ্যায়ের ৪৭শ প্রতিজ্ঞা
প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বৃত্তান্তর্গত চতু-
ভুজের ক্ষেত্রফল, চতুর্ভুজের বাহুপরিধি
দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, বৃত্তের ক্ষেত্রফল
যে ব্যাসার্ধ ও অর্ধপরিধির-গুন ফল, তাহা
প্রমাণ করিয়াছেন। হুটী ও পিরামিডের
ক্ষেত্র ও ঘন ফল নির্ণায়ন করিয়াছেন।

৫। হিন্দু ত্রিকোণ-মিতি
ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রে হিন্দুগণ বিশেষ উন্নতি
লাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপে প্রচলিত
sine শব্দ আরবগণের নিকট হইতে ব্রহ্ম।
আরবগণের ব্যবহৃত শব্দ সংস্কৃত শিখিনী
শব্দের অল্পভ্রম।

গণনাকালে গ্রীকগণ কোণের সমুদায়
চাপের জ্ঞান ব্যবহার করিতেন,
Hipparchus and Ptolemy জ্ঞান সম্বন্ধে
তালিকা প্রস্তুত করেন, উহা নিম্নলিখিত
হিন্দুগণ নির্দিষ্ট কোণের ত্রিগুণ কোণের
চাপের অর্ধজ্ঞান ব্যবহার করিতেন। অধুনা-
প্রচলিত sineও এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া

ধাকে। অর্থাৎ $\sin \theta$ ও $\cos \theta$ অংশ ও উহার
গুণিতক পরিমাণ কোণের শিথিলীর তালিকা
প্রস্তুত করেন। $\pi = 3.1416$ লইলে এই
তালিকা নিম্নলিখিত। ভাস্কর একটা সূত্র দিয়াছেন
যাঙ্গা অক্ষকালকার Differential Calculus-
এর অংশেরে লিখিলে $L(\sin \theta) = (\cos \theta)$
 $L \theta$ এই সূত্র হইতে অতি সহজ।

গণিতে উৎকর্ষলাভ সাংসারিক জ্ঞানের
প্রকৃষ্ট পরিচয়। বাহারা মনে করেন হিন্দু-
জাতি কেবল শালা জপিত, এই পার্থিব
জগতের কথা ভাবিত না, তাহারা বৃত্তিতে
পারিবেন যে, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেবল
লাভ আধ্যাত্মিক তবে এবং ধর্ম-কথ্যে উন্নতি-
লাভই কোন মানুষের চরম লক্ষ্য নয়। ধর্ম-
প্রচারই কোন জাতির একমাত্র লক্ষ্য থাকিতে
পারে না। বাহারা হিন্দুজাতিকে ধর্মপ্রচারকের
লোভনীয় পদ দান করিয়া আমাদিগের
অতীত ইতিহাস বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন
তাহারা ভুল বুঝাইয়াছেন। এই ধর্মগৌরবের
কথা শ্রবণ করিয়া মিথ্যা অহংসের অশ্রুতা দ্বারা
আমরা নিম্নরূপ হইয়া যাইবার পথে চলিতে-
ছিলাম। ইতিহাস নুতন করিয়া আলোচনার
ফলে ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে হিন্দু জাতির
সাংসারিক জ্ঞান বড় কম ছিল না, ব্যবহারিক
বিদ্যা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। তাহারা শিল্প-
ব্যবসায়, বাণিজ্য, স্বহস্তোপার্জ, বিলাস-সামগ্রীর
চরম করিয়া ছাড়িয়াছিল এবং এই বৈধিক
ভিত্তির উপরেই বৈরাগ্যের ধ্বজা উড়াইয়াছিল।

••

৬। শ্রীহট্টের সাহিত্য-সম্পদ
শ্রীমুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি-এ, মহাশয়
শ্রীহট্টের প্রাচীন-সম্পদ লইয়া সবিশেষ
আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীহট্টের নব-নদী,

গ্রামনগর, লোক-জন, পূজাপার্বণ, গীত-
পাচালী, সাহিত্য-পুরাণ প্রভৃতির প্রতি
তদেখবানী সাহিত্যিকদিগের অম্বরাগ বাহাতে
বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা এই আলোচনায়
লক্ষিত হইবে। তাহার আলোচনার
কিয়ৎশঃ নিয়ে আমরা উদ্ধৃত করিলাম।
আশা করি, বহুর অমাত্য সাহিত্যিকগণ
নিজের নিজের জেলাকে সম্পূর্ণরূপে জানিবার
জন্য রজনীবাবুর দ্বায় আলোচনা ও উদ্যোগ
করিবেন—

শ্বেগাবিন্দ ভোগের গান, গাজীর গান, গুণ্ডার
গান, ডরাই গান, কাঁপের গান, মারি গান,
স্বর্গরত্নের গান, মেয়েলী গান, মালসী গান—
এই সকল কি আমরা সঙ্গ্রহ করিয়াছি ?
‘হিন্দু’ ও মুসলমান, পুরুষ ও নারী
কত সমীচকার এই শ্রীহট্টে জন্মিয়াছিলেন,
কত মুসলমান গোবিন্দের স্ত্রীত বন্দনা
করিয়াছিলেন, তাহা কি আমরা জানি ? এই
সকল গানের অনেকগুলির ভিতরে, হয়ত
অশ্লীলতা থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের
হিসাবেই এ গানগুলির মূল্য বহু উচ্চ।
ভারতীয়, আমাদের দেশের জনমানব যে গানে
বিভোর হইয়া আনন্দপ্রসাদ লাভ করিয়াছে,
আমাদের জননী, গ্রহণী ও ভগিনীগণ যে
গানে যুগ্মগায়িত্বের হইতে আনন্দের অমৃতধারা
উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, আমার মত
বুজ্জ্ব সাহিত্যিকদের রক্তের ভিতরে তাহার
কি কোনও প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই ? সেই
প্রভাব কতদূর বিস্তৃত, তাহার সন্ধান না
পাইলে, আমি ক্ষুদ্র মানব কেঁপা হইতে
আসিয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি তাহা
উপলব্ধি করিব কি? হোক সে কিজ অতি-
বুজ্জ্ব, অতি স্বপ্না, পাকাত্য আলোকোন্মাদিত
নেত্রের অতি জঘন্য—কিন্তু সে আমার দেশের

চিত্র, আমার সমাজের চিত্র, আমার পিতৃ-
পুরুষের চিত্র, আমার মাতৃজাতির চিত্র—
সেই চিত্র দেবচিত্র। আমরা পুনরায় তাহার
উদ্ধার করিব এবং তাহাকে স্বাংস্কৃত করিয়া
বর্তমানের ভাব ও ধারণার অঙ্গরূপে

পুনর্মার্জিত করিয়া তাহারই অমৃতসিকুনে
আমার জীবন-রক্তের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিব।

এই সকল গানের ভিতরে কত দৈব
ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাময়িক উপা-
নিহিত রহিয়াছে, তাহার কি ইচ্ছা করিতে
পারি ? দুঃস্বপ্নস্বরূপ দুই একটার কথা বলিতেছি।

মর্দনাপুত্ররূপের কথাই বাক্য। মনসার
ভাসান গান বাতাইয়া হইতে আরম্ভ করিয়া
কাছাড় পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী সাপাশি
জনমানবকে আনন্দের অমৃতনিচয়ে সিক্ত

করিয়া আসিতেছে। হুকবি নারায়ণদেব,
নারীকবি চন্দ্রাবতী, ধলইন্দোরী জলপানকারী
দ্বিধ গোপীকান্ত, কবি দ্বীপবর, বিপ্লু জ্ঞানকী-
নাথ, বর্ধমান দত্ত, হরিহর দত্ত, কুবি জগদ্রাথ,

মুগারি মিল, মা'ল ধর্মদাস, সুরবৈরা ভাড়ালাস,
ইটা পরগণার-জলদানী দত্ত, দক্ষিণ ভগদত্ত,
দ্বিধ ভ্রামানন্দ, দ্বিধ কান্দীনাথ, দীন ভদ্রানন্দ,
‘শিবশক্তি কিকর’ কালারায় প্রভৃতি ২২

জন পদ্যপুরাণের নুতন রচয়িতার সন্ধান
পাইয়াছি—ইহারা সকলেই এই জেলার
লোক। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বব্রত
তীর্থদিগের পবিত্র রক্তে উজ্জ্বল হইয়াছেন,—
কিন্তু, কই, আপনাদর্শকে সে পরিচয়ের সর্ব-
অধিকার স্থাপন করিতে পারেন ?

ইহাদের বর্ণনায় শ্রীহট্টের বহুতর নদনদী
খালবিলুর উল্লেখ আছে। পাঠ করিয়াছি,
নিজ সহর শ্রীহট্টের বক্ষ ভেদ করিয়া ‘মালিনী’,
‘যোগিনী’, ‘ভোগিনী’, ‘গোয়ালিনী’ প্রভৃতি
আটটা পার্বত্যনদী ধরবগো বহিয়া

যাইতেছে—কিন্তু, কই ? সে কোন যুগের
কথা ? তিনটার বেশী তো পরিচয় পাই নাই।

পদ্যপুরাণে জানিতে পাই ‘রত্না’ নদীর
উপর দিয়া পূর্ণা-পরিপূর্ণ জাহাজ ভাসিয়া
যাইত। সে রত্না আশি ভরাট হইয়া
গিয়াছে, তাহার বক্ষের ভিতর হইতে ক্রমক
আশি লাগলের সাহায্যে রত্ন সংগ্রহ

করিতেছে,—আর খনিজযোগে বাহির
করিতেছে বিশাল জাহাজের ভদ্র বহন-
মাফল !! শ্রীহট্টের সেই তরঙ্গবাক্যুল রত্নার
প্রবাহের জীবনী, কাহিনী ও কথা আমরা

কি সংগ্রহ করিয়াছি ? কোন নদীর ‘কীর-
দস বাহ নীর’, কোন নদী ধরবগো, করকী,
করকালি, মালগালি, ‘বোলাই’ প্রভৃতি নদী
কত হস্ত বিতর্পী ছিল, এবং কোন পণ্য,

কোন বস্ত্র শ্রীহট্ট হইতে রপ্তানি হইত—
এই সকল বহুতর তথ্য ঐ মনসা-পুরাণের
গুলিত পত্র নিবন্ধ রহিয়াছে। নৌশিল্পের
জন্ম শ্রীহট্ট একসময়ে ভারতবিশ্বাত ছিল।

ঐ মনসা-পুরাণের ভিতরে নৌকার গঠন,
আকৃতি ও পরিমাণের বিবৃতি রহিয়াছে।
সে নৌকাগুলি ক্ষুদ্র নৌকা ছিল না।
প্রত্যেক ব্যবসায়ী নৌকাই বিলাস-সজ্জা

বাস্তব্য থাকিত।
আদাজামির ভোদাইয়া কাটা জামির ‘আনাইয়া’
নৌকাতে রুইল সারি সারি।
স্বপুত্র গোলাল রস দিয়া মাঝে কেউল কস
নৌকা কস দেখ অধিকারী ॥

—কি চন্দ্রাবতী।
এইরূপ বর্ণনা কি নিরর্থক লেখনী-সকল
মাঝ ? শ্রীহট্টের সমাজকে চিনিতে হইলে,
আচার, ব্যবহার, রীতি ও নীতি অগণত
হইবার বাসনা থাকিলে ঐ পদ্যপুরাণের

অন্তরে জুঝিয়া যান—হুই হতে মুক্তা মুক্তি
নইয়া ভাসিবেন।

পঞ্চাশকের বৈষ্ণব-কবি রামানন্দ মিশ্র, চাকারক্ষেপের প্রচার মিশ্র ও জগদ্বীন্দ্র মিশ্র, ইটার সার্কভৌম, সম্ভ্রামের গোপীনাথ দত্ত, সাত্তাহারী নীতারাম কব, গাভীর্গাও-নিবাসী বিজ্ঞ শ্রামানন্দ, বাগুবাড়ীর অনন্তরাম রায় ও কিশোর রায়, বারপৈতের ভোলানাথ মূলী, লাখাইর ভবানীপ্রসাদ দত্ত, রায়গঞ্জের লালু আনন্দরাম ও বিবাদমহাশয়, পদকর্তা শ্রামকিশোর অধিকারী, ভক্ত শিবানন্দ দত্ত—ইহারা কি ক্ষীণ হতে লেননী চালনা করিয়াছেন? রামানন্দের রসতত্ত্ববিলাস, প্রচার মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোদয়ালী, জগদ্বীন্দ্র মিশ্রের মনঃসম্ভাষণী, সার্কভৌমের কাব্য ও নাটক, গোপীনাথের নারীপর্ষ, ত্রেপের্ষ প্রকৃতি মহাভারতের কয়েকটা পর্ষের পদ্যাবলি ও চক্রপাণি দত্তের বংশাবলী, নীতারামের তামাক-পুরাণ, 'শ্রামানন্দ'র সঙ্গীত, অনন্তরামের সত্যনারায়ণের পাঁচালী, 'একলা মূলী' কিশোর রায়ের পাঁচালী ও গোবিন্দভোগের গান, আনন্দরামের সুলনসঙ্গীত, বিবাদমহাশয়ের মালদী গান, ভবানীপ্রসাদের দত্তবংশাবলী, শিবানন্দের গোবিন্দবিজয়,—বর্ধমানমুণ্ডে ইহাদের অধ্যবসায়ের, প্রতিভার, রসিকতার, সরল বাক্যবিশ্বাসের ও ঐতিহাসিক তত্ত্বপ্রচারের তুলনা কোথায়? প্যারীচরণ ও রামকৃষ্ণের সেই দিনের লোক—ইহাদের কথা, 'না হই, না হই বলিলাম। এতদ্ব্যতীত 'নিয়ত মঙ্গল-চর্চা'র গ্রন্থকার 'অপূর্ণ নির্দোষ' মান্দার-কান্দি নামক দেশের কায়েদে বাচস্পতির তনয় কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য, নানাবিধ পাঁচালীর রচয়িতা রামাকৃষ্ণ দাস, 'বিজ্ঞ রামকৃষ্ণ, বিজ্ঞ

রামচন্দ্র, বিশ্বনাথ, জগদ্বাক্য দাস, হুবল দাস, 'হরিবংশের' অহবাক্য ভবানন্দ, 'কলক-ভঞ্জন'র লেখক মনোনন্দ, 'মহাভারত' ও 'ক্রিয়ামোক্ষপারের' অহবাক্য রামেশ্বর নন্দী, 'লক্ষণ বিজয়', 'রাম-রাজ্যভিষেক', 'ব্রহ্মপুরাণ' প্রকৃতি বহুতর গ্রন্থের লেখক 'জয়চন্দ্র নরপতির সভাপতি' ব্রাহ্ম ভবানীদাস, 'ক্রিয়ামোক্ষপারের' অহবাক্য অনন্তরাম, 'ঐতর্য্যদাম-মঙ্গল'র লেখক বিজ্ঞ হরিহর হুত হুম্বররায়, ২০ শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত 'কৃষ্ণচরিত' পুথকের প্রাচীনতর রচয়িতা কবি রামদাস, 'ত্রিপুরার রাজমালা'-রচয়িতা বাণেশ্বর ও শুকেশ্বর—প্রকৃতি সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্য 'বাঙ্গালীমাহিতি'কে প্রচারিত হইয়াছে? আর এই সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের সহিত শ্রীহট্টের কি কোনও সম্বন্ধ নাই? হুশভাবে অহমত্বান করুন, দেখিবেন, ইহাদের অনেকেরই বংশধর, জাতি, কুটুম্ব হয়ত আজ এই সভায় উপস্থিত আছেন।

অতীতের দূরতর চিত্রে নেত্রপাত করুন, দেখিবেন এক সময়ে,

"ত্রিবাংস পণ্ডিত আর শ্রীরাং পণ্ডিত,
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব হৈতোষ্য পণ্ডিত,
ভবরথৈবগেভ শ্রীমুবারি নাম যার
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার,

জগৎগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দশ্যামাখ্যুত প্রেমরসময় যদুনাক কবিচন্দ্র, 'অধৈতপ্রকাশ'-প্রণেতা ইশান নাগর, অধৈতের মাতামহ স্থানীয় আচার্য্য বিজয়পুরী প্রকৃতি একদিন এই শ্রীহট্টে জন্মিয়া অনন্তপথগামিনী ভাষাতরঙ্গীণ মাক্শি-মারায় কাজ করিয়াছিলেন। জ্যোৎস্ন শতাব্দীতে শ্রীহট্টবাসী বলভদ্র আচার্য্য—পূর্ববংশের রাজা শ্রামলবর্ধার সভাপণ্ডিত

ছিলেন, তিনি শাস্ত্রত ভাবায় "শ্রামলবর্ধ-চরিতম্" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কথা স্মরণ করিলেও পুলকিত হইতে হয়। "মহাজ্ঞানী পরমভক্ত বৈষ্ণবচাৰ্য্য" কলমাক ভট্টাচার্য্য, তেঁমার শিক্ষায় তেঁমার ছাত্র বিষ্ণুব কেশবচরিতর 'সম্ভাষামুণ্ডে দীক্ষিত হইয়া বিশ্বদ্বারী প্রেমের বজ্রায় বাঙ্গলাদেশে 'ভাষাইয়া দিয়া তেঁমাকে 'অধৈতচাৰ্য্য' নামে অমর করিয়াছে। এবং বিশ্বের নূতন চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিয়া 'চৈতন্য মহাপ্রভু' নামে জুবন-খ্যাতি করিয়াছে। তেঁমার জন্মস্থান, তেঁমার ছাত্রের পিতৃকৃত্তিম—এই শ্রীহট্ট।—ইহা শ্রীহট্ট ও পূণ্য হয়। কিন্তু জুংখের বিষয়, আমরা শ্রীহট্টবাসী শ্রীচৈতন্যের শ্রীহট্ট আগমন সম্বন্ধে তদীয় বিগ্রহপূজক জগদ্বীন্দ্র মিশ্রের মনঃসম্ভাষণী টীকার বর্ণনার ও রামচন্দ্র কবিরাজের 'বদ-বিজয়' নামক গ্রন্থের একটা প্রমাণ শ্বেও ভক্তকবি পোচনারা প্রভুর পুণ্ড্রবদ্রমণ্য-কাহিনীতে আশা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতেছি না। সংসারবিরাগী রাজা দিবাশিবে 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস' মাঝিয়া মাতৃভাবাক সেবকরূপে ভক্তিতত্ত্বপ্রচারস্বয়ে 'অধৈতের বালালীলা স্বর' নামক যে অশ্লীল গ্রন্থ রচিয়া গিয়াছেন, "যে গ্রন্থ পড়িলে হয় জুবন পবিত্র"—সে গ্রন্থের তুলনা কোথায়? মিথিয়ার প্রাচীন ভাটার লুইনপূরক নবদ্বীপে কিরিয়া যিনি নব্যভাষায় বাঙ্গালানুশ্লেষের মূল উজ্জল করিয়া-ছিলেন, সেই পণ্ডিতকুলশ্রীমোহনি একচক্-রঘুনাকের • জন্মভূমি এই শ্রীহট্ট। 'সম্মত প্রদীপের' রচয়িতা হরিহরচাৰ্য্য, 'অগ্নিবিংশতি প্রদীপের' দৈবক মহেশ্বর শ্রায়ালকার এই

শ্রীহট্টের লোক। এইরূপ আর কত নাম গ্রন্থে করিয়া জুবনবেদনা বাড়াইব।

সাধক-কুল-জুবতার। কৃত্ত-উল-আউলিয়া, মুরবন্দী আউলিয়া, মণ্ডুপৈদর, গদাহাসন, শাহপারগ, বালকপীঠ, কতগাখী প্রকৃতি কত সাধু মূল্যমানের পবিত্র অশ্রি এই '৩৬০ আউলিয়ার মূলক' শ্রীহট্টের মুক্তিকায় নিহিত রহিয়াছে। আমরা তাঁহাদের পবিত্র জীবন-কাহিনী প্রচারে অগ্রগণ্য হইলে দেখিতে পাইব, তাঁহাদের প্রত্যেকের নামের সহিত শ্রীহট্টের অতীত ইতিহাসের এক একটা অধ্যায় জড়িত রহিয়াছে। সেই ইতিহাস কাহারা প্রণয়ন করিব?

সিংহারণের সিংহরাজবংশের, ভট্টপট্টকের নবগীর্ধাপনেশ্বর বংশের, লাউড়ের রাজবংশের ইতিহাস কি সম্বলিত হইয়াছে? রাজা গোড়গোবিন্দ, রাজা আচকনারাইন, রাজা হুবিদ্যনাথ, রাজা বিজয় সিংহ, রাজা প্রতাপ, রাজা গোবিন্দ, রাজা উবর্দন, পোড়ারাজা ও রাজশক্তিধর দত্ত খা শ্রীবংশের ইতিহাস কি সম্বলিত হইয়াছে? ইটারাজা-প্লামসকারী সেনানী ওয়ামান, প্রতাপগজবিজয়ী মজুমদার-কুলপ্রদীপ সেনাপতি লোহি খা—ইহাদের জীবনী কি আলোচনীয় নহে?

কাছের জুবনপাহাড়, ত্রিপুর-নীমন্তে উনকোতীতীর্থ, জয়তিথার পরমহামা অহ-সম্মান করুন। এতদ্ব্যতীত প্রাগৈতিহাসিক যুগের আর্ধ্যসভ্যতার সম্মান পাইবেন। যুগের বহুপূর্ব স্বর ইরাবতী-উত্তরাকা পথ্য আর্ধ্য-উপনিবেশ বিস্তৃত ছিল। শ্রীহট্টের সেই আর্ধ্যসভ্যতার যুগের ইতিহাস কোথায়?

ভাখনারায়ণের গড়, উদয় নারায়ণের গড়, বধরপুরের গড় ইহাদের সথেষ্ট শেষতথা জাত হইয়াছি কি? চিনারায়ের আক্রমণ, 'আযতন' নগর অবরোধ—এই সকলের কোনও বিবৃত সন্ধান পাইয়াছি কি? নারীপ্রাধাত্মক বধ জাতির প্রাচীন সভ্যতার, 'নারীরাজ্য' জয়স্ত্যাহার বিবৃত বিবরণ কোথায়? কুশবলের খোজার মঙ্গলিবে, আনিমংগলায় প্রাপ্ত শৃগালচিহ্নিত প্রস্তরখণ্ডে কোন্ তত্ত্ব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে? শৈলেশ্বরবিলের তীরদেশে অবস্থিত কাছ-গোলের গভীর অরণ্যনিহিত ভয়ানকরূপে দেবতা হরণীকীর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু আরও কত জাতব্য তথ্য নিহিত রহিয়াছে। মহালিঙ্গেশ্বরভ্রমোক্ত গীঠদেবতা হাটকেশ্বর এইখানে কিছুদিন অবস্থান করিতেন কি না কিছুই বলিতে পারি না। "শ্রীহট্টে হট্ট-বাসিন্তে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজিত দেবী-পুরাণোক্ত হট্টবাসিনী কি শ্রীহট্টসহরের ভ্রম-শিলাঙ্কিত অরণ্যবাসিনী বনহর্গা? ইটার উদ্যমহেশ্বর, কাছগোলের হরণীকীর্ত্তি, কাছাডের হাচেন্দ্রা রাজবংশের চতুর্দশ শতাব্দীর মূদ্রায় উল্লিখিত হরণীকীর্ত্তি কি প্রমাণ করিয়াছিল? এই সকল প্রশ্ন মাত্র—সাহিত্যিকের অহুসন্ধিৎসু লেখনী ইহার উত্তর দানে নিমুক্ত হউক।"

.

৭। পল্লীসেবার সড়পায়

আমরা সময়ে সময়ে বাঙ্গালীর পল্লীসেবার মনোনিবেশের পরিচয় দিয়াছি। খুলনাজেলার "পল্লীপরিষৎ," শ্রীরামপুরের "চাটরা-ভক্তা-শ্রম," বিক্রমপুরের "আউটসাইড বাঙ্গালসমিতি"

কি ক্রমের কার্য্য করিতেছেন তাহা আপনারা স্মরণে রাখুন। কোথায়ও রাস্তাঘাট-পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান, কোথায়ও অনাব-দরিত্রের দুঃখ-নিবারণ, কোথায়ও সর্ব্ববিধ লোকহিতকর অহুঠানে যোগদান—এই প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য। বিগত জল-গ্রামবাসীর হৃদয়ে আমাদের দেশবাসীর বিরূপ স্বার্থভ্যাগ, কষ্টবীর্য্যকার এবং মুখলার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন তাহা এখন আর কাহারও অবদিত নাই। ভারতবাসীর এই কণ্ঠস্বরপত্রায় লটগাফের হইতে আরম্ভ করিয়া বেশ-বিশেষের নেতৃত্বগণ এবং উইরেপীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা লোক-প্রসাধার দ্বারা দরিদ্র না—এবং আমাদের ভরসা আছে, আমাদের কষ্টব্রত এই প্রশংসার সংবাদ রাখিতেও সচেষ্ট ন'ম।

সম্প্রতি হাফজা জেলার "মাজ্জ-গ্রন্থাগারে"র একখানি মুদ্রিত বিবরণী পাঠ করিয়া খ্রীতি-লাভ করিয়াছি। মাজ্জ-গ্রন্থাগারের সচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত, লাইব্রেরী হইতে তিন বৎসরে ১৫,৩০০-এর আঁকপুতক পাঠক-পারিতোষ-হলে চলানো করিয়াছে। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় আশাযিত হইলাম। তাহারিগণকে বিলাতের Nineteenth Century, Fortnightly Review এবং Review of Reviews অন্ততঃ এই তিনখানা কাগজ আনাইতে অহরোধ করি।

পল্লীসেবা সম্বন্ধীয় আর একখানি অহুঠান-পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মালদহ জেলার হরিন্দ্রপুর গ্রামে একটি "ছাত্রসভা" আছে। তাহার উদ্যোগে সেখানে পুরাণ-পাঠ এবং লোকশিক্ষা-বিভাগের অজ্ঞাত উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহারের "গ্রাম-

পরিষৎ"শীর্ষক কর্ম্মপ্রণালীর বিবরণী এ স্থলে নিয়ে প্রকাশ করিতেছি। পল্লীর অবস্থা সম্যক জানিবার উপায় ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১। জাতি

(১) নাম; (২) সংখ্যা; (৩) পুরুষপরিচয়—কোথা হইতে কি জন্ত আসিয়াছে, কতদিন এখানে আছে; (৪) হ্রাস-বৃদ্ধি, তাহার কারণ; (৫) শ্রেণীভেদ—উচ্চনীচ, কৌলীক, পরস্পর সম্বন্ধ; (৬) বর্তমান অবস্থা; (৭) শিক্ষা; (৮) প্রকৃতি—শাস্ত্র, কি. অশাস্ত্র, ধর্ম্মভাব কিরূপ, স্থানীতি-স্থানীতি; (৯) স্বাধিকার; (১০) কোন্ বিষয়ে বিশেষ অহুগ্রহ দেখা যায়; হিন্দু বা মুসলমান-সমাজে কিরূপ স্থান।

২। শিল্প

(১) নাম; (২) আমদানি-রপ্তানি; (৩) কত লোক সেই শিল্প করে—স্থানীয় কত ও বৈদেশিক কত; (৪) গ্রামের পরিমাণমত প্রয়োজন তাহাতে সম্পন্ন হয় কিনা; (৫) ভাল-মন্দ; (৬) স্থবিধা-অস্থবিধা।

৩। বাণিজ্য

(১) নাম; (২) ভাল-মন্দ; (৩) স্থবিধা-অস্থবিধা; (৪) পরিমাণ; (৫) লোক সেই বাণিজ্য করে—স্থানীয় কত, বৈদেশিক কত।

৪। কৃষি

(১) শস্যের নাম; একই শস্যের অবান্তর বিভিন্ন-বিভিন্ন নাম, যেমন একই ধান-ভিন্ন-ভিন্ন নামের হয়; (২) পরিমাণ; (৩) কৃষির সাধন, যথা—হাল, বলদ ইত্যাদি বিভিন্ন-বিভিন্ন যন্ত্রের নাম উহা গ্রামে উৎপন্ন হয় কি না; (৪) সার ব্যবহার করে কি না, সার-সুখক স্থানীয় লোককিণের ধারণা এবং কিরূপ সার ব্যবহৃত হয়; (৫) জল দেওয়ার ব্যবস্থা; (৬) ফসল কাটিবার ব্যবস্থা; (৭) কৌশল উৎপন্ন হয়; (৮) কোন নূতন

শস্য প্রচলিত হইয়াছে কি না; (১০) কোন শস্য কিরূপভাবে ব্যবহার করে; (১১) উৎপন্ন শস্যের রপ্তানী, বিক্রম ইত্যাদি কিরূপ হয়।

৫। ধর্ম্ম-মত

(১) নাম; (২) অবান্তর নাম, যথা হিন্দুর মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি; (৩) কি উপাসনা করে, কোন সময় করে, উপাসনা বা পূজার উপকরণ; যে দেবতার উপাসনা করে তাহার প্রকৃতিসম্বন্ধ উপাসকেরা কি ভাব পোষণ করে; (৪) কি উদ্দেশ্যে পূজা করে; (৫) নিজে পূজা করে কি কাহারও দ্বারা পূজা করায়; (৬) কি প্রণালীতে পূজা করে অর্থাৎ গ্রন্থম কিরূপ করিয়া আরম্ভ করে, ইত্যাদি; (৭) কি মন্ত্রে পূজা করে; (৮) উপাশ্রয় দেবতার সম্বন্ধে কোন গল্প থাকিলে তাহার উল্লেখ; (৯) কোন মন্ত্রাদি জপ করে কি না, কতবার তাহা কি; (১০) মন্ত্রদাতা গুরু আছেন কি না; (১১) পরলোকসম্বন্ধে কিরূপ বিশ্বাস; (১২) ভূত-প্রেত-পিণ্ডাচ্ছ ইত্যাদিতে বিশ্বাস আছে কি না, থাকিলে কিরূপ, ভূতে ধরিলে কি উপায়ে তাহার প্রভীকার করে; (১৩) দৈনিক কোন ধর্ম্ম-অহুঠান আছে কি না; (১৪) কোন তীর্থে যায় কি না, তীর্থের ধারণা কিরূপ; (১৫) গ্রামের দেবালয় প্রকৃতি।

৬। শিক্ষা

(১) কোন্ কোন্ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিরূপ ব্যবস্থা আছে, (২) উপস্থিত ব্যবস্থা গ্রামের প্রয়োজনের উপযুক্ত কি না; (৩) শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্ত গ্রামের লোক কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে; (৪) গ্রামে কত জন পুংস ও স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে।

৭। সমাজ

(১) জন্ম হইতে মৃত্যুর পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতির কার্য্যকলাপ, যথা—অন্ন-

প্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি; (২) সমাজশাসন, সমাজবন্ধন; (৩) বিবাদ-বিসংবাদের কিরূপে নিপত্তি হয়।

৮। উৎসব

(১) প্রাচীন ও বর্তমান; (২) জাতি বা সম্প্রদায়-গত উৎসব; (৩) উদ্দেশ্য; (৪) উৎসবের অঙ্গ—নৃত্য, গীত, বাদ্য, বাজি ইত্যাদি।

৯। ব্রত

(১) নাম; (২) উদ্দেশ্য; (৩) সময়, কত দিন ধরিয়া হয়; (৪) পূজা, উপকরণ; (৫) কথা, ছড়া, কবিতা, ময়; (৬) কিরূপ ভাবে করা হয়; (৭) কোন ব্রত কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত।

১০। উদ্ভিদ

(১) বিভাগ—(ক) বৃক্ষ, (খ) গুল্ম, (গ) লতা; (ঘ) ওষধিশস্ত্র, (গ) বৃহৎ, মধ্যম বা ক্ষুদ্র; (২) কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ আছে, তাহাদের নাম, পরিমাণ ও আকৃতি; (৩) অল্পসংখ্যক অথচ বিশেষ উপযোগী বৃক্ষাদির নাম ও সংখ্যা; (৪) পত্র, পুষ্প, ফল-প্রভৃতি কি কি জ্ঞাত ব্যবহৃত হয়; (৫) কোন উদ্ভিদের পত্র হইয়াছে, হইতেছে, বা হইবার সম্ভাবনা, এবং কোন কোন জাতি বৃক্ষ বাড়িতেছে, তাহাদের কারণ; (৬) কোন কোন উদ্ভিদ নুতন আসিয়াছে, কিরূপে আসিয়াছে; (৭) বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কোন ফল, ফল প্রভৃতি উৎপন্ন হয় বা পাওয়া যায়।

১১। পশু

(১) বিভাগ—বহু বা গ্রাম্য; (২) নাম ও সম্ভব হইলে সংখ্যা; (৩) প্রকৃতি—মানসিক ও শারীরিক; অঙ্গ-মুদ্রা, সন্তান-সম্ভতি, বাস-স্থান-সংগ্রহ, আহার-অঙ্গরণ, গুণ-দোষ; (৪) ব্যবহার—কোন কার্যে লাগে।

১২। পক্ষী

পশু-বং।

১৩। কীট-পতঙ্গ

পশু-বং।

১৪। যান-বাহন

(১) নাম; (২) প্রাচীন ও আধুনিক; (৩) সংখ্যা; (৪) আকার-বর্ণনা; (৫) সাজ-সজ্জা; (৬) যন্ত্রণ এক সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারে; (৭) বায়, লাভ-ক্ষতি; (৮) সংগ্রহের উপায়, স্থল-ভূ-স্থল; (৯) কত দিন স্থায়ী।

১৫। বেশভূষা

(১) নাম ও সংখ্যা; (২) প্রাচীন ও আধুনিক; (৩) উপাদান অর্থাৎ কিসে প্রস্তুত; (৪) স্থল-ভূ-স্থল; (৫) প্রচার; (৬) কিরূপ ঠাণ্ডা-পান ব্যবহৃত হয়; (৭) কোথায় নিষিদ্ধ হয়; (৮) কোন জাতীয় ব্যক্তি কোন বেশ-ভূষা বিশেষরূপে আদর করে; কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ বেশ ভূষা করা হয় কি না; (১০) বয়স, ব্যবসায়, জাতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ বিশেষ বেশ-ভূষা আছে কি না।

১৬। রাস্তা-ঘাট

(১) সাধারণ বা অসাধারণ পথ; (২) সংখ্যা; (৩) কখন ও কে করিয়াছেন; (৪) অবস্থা; (৫) সংস্কারের উপায়-নির্দেশ।

১৭। জল

(১) পানীয়; (২) অজ্ঞাত কার্যের উপযুক্ত; (৩) কিরূপে সংরক্ষিত চলে; (৪) বজা; (৫) বৃষ্টি; (৬) পুরুরিণীর সংখ্যা ও অবস্থা; (৭) অধিকারীর নাম; (৮) অভাব থাকিলে প্রতিকারের চেষ্টা।

১৮। খাদ্য-সামগ্রী

(১) সাধারণ; (২) বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির; (৩) বিভিন্ন-বিভিন্ন ক্ষতুর; (৪) সারবান ও স্বাস্থ্য; (৫) স্থানীয় ও অস্থানীয়, স্থল-ভূ-স্থল।

১৯। স্বাস্থ্য

(১) সাধারণ; (২) বিশেষ বিশেষ ক্ষতুরে; (৩) কোন ব্যায়াম বেশী ও কি জ্ঞাত; (৪) মৃত্যু-সংখ্যা; (৫) রোগ-প্রতিকারের উপায়; (৬) চিকিৎসক—সংখ্যা ও যোগাঙ্গ।

২০। সাধারণ কাব্য

(১) শিক্ষা; (২) চিকিৎসা; (৩) ডাক; (৪) খাল-নালা; (৫) সেতু; (৬) পথ-ঘাট; (৭) আমোদ-প্রমোদ।

৮। কাব্য রচনা ও বৃত্ত-দেশ-সেবা

রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ্যে বাঙ্গালী জাতি বোলপুরে বাইয়া তাহাকে সধর্ষনা করিয়াছিল। এই সধর্ষনায় রবিবাবু বেশ কল্যাণী শ্রদ্ধা-ছেন তাহা সোজা সোজা বুঝা কঠিন। তাহার অভিভাষণ নানা লোকে নানা অর্থে গ্রহণ করিবে। বিশেষতঃ কবিবরের ভাষা শব্দভাবই অস্বাভাবিক, তলাইয়া বুঝিয়া মধ্যগ্রহণ করিবার অধিকার অনেক লোকেরই নাই। আমরা তাহার উক্তির ছই একটি স্থলের যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

প্রথমতঃ কবি ও ব্রহ্মদেশ-সেবক, সাহিত্যসেবী ও কর্মবীর, লেখক ও কর্মী, চিন্তা-প্রচারক ও কর্ম-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠাতা, ভাবুক ও কর্মযোগী, পণ্ডিত ও পরোপকারী, বিদ্বান ও সাধক—তিনি এই ছই প্রকার বোকের পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তদ্ব্য চরম কথা—দেশবাসীর প্রাণিধানের যোগ্য—আমাদের উদীয়মান ছাত্র ও যুবক-সর্বাঙ্গের সর্বদা স্বরসী উপদেশ—সাহিত্য-সমালোচকগণের পক্ষে একটি প্রাথমিক হ্র স্বরূপ। তাহার মধ্যকথা এই যে, যিনি কবি, সাহিত্যসেবী, লেখক, চিন্তা-প্রচারক, ভাবুক, পণ্ডিত বা বিদ্বান

তাহাকে ব্রহ্মদেশ-সেবক, কর্মবীর, কর্মী, কর্ম-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠাতা, কর্মযোগী, পরোপকারী বা সাধকের মাপকাঠিতে বিচার বা সমালোচনা করা উচিত নয়। এই ছই শ্রেণীর লোক ছই ভিন্ন ভিন্ন জগতে বাস করেন—তাহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে এই ছই স্বতন্ত্র জগতের নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি জুনিয়া গেলে চলিবে না।

খুলিয়া বলিলে আরও বিশদ হইবে। কথাটা বড়ই প্রয়োজনীয়। আমরা জাতীয় জীবনের স্বৈরাচার্য্য আসিয়া পৌঁছিয়াছি সে অনুসারে আমাদের সকলেরই এই সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা থাকা অত্যাৱশ্যক। রবীন্দ্রনাথ একটি অতি সরলপন্থায় কথা আমাদের কাছে সুনাইয়াছেন—এজ্ঞা একটুকু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছি।

কবি ব্রহ্মদেশ-সেবক কি না, এ কথা ভিজ্জাসা করিও না। সাহিত্য-সেবী কর্মবীর কি না এ প্রশ্ন-ভুলিও না; লেখক স্বয়ং কর্মী কি না তাহা জানিবার জ্ঞ উগ্রবীর হইও না। চিন্তা-প্রচারক নিজে কোন কর্ম-কেন্দ্রের পরিচালক বা প্রবর্তক কি না, তাহার চিন্তা বুঝিবার জ্ঞ এ সংবাদ সংগ্রহ করিও না। যিনি ভাবুক, তিনিই আবার পরোপকারী কি না, যিনি পণ্ডিত, তিনিই আবার পরোপকারী কি না, যিনি বিদ্বান তিনিই জীবনের প্রতিকর্মে তাহার জ্ঞান কার্যে পরিণত করিতেছেন কি না—এ সকল প্রশ্ন অব্যাহত মাত্র। এক ব্যক্তি ছই প্রকার গুণেরই অধিকারী হইতে পারেন না, তাহা নহে। যিনি কবি তিনি ব্রহ্মদেশ-সেবক হইতেও পারেন, না-ও হইতে পারেন। যদি ব্রহ্মদেশ-সেবক হ'ন, ভালই, না হ'ন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার কাব্য উপেক্ষিত হইবে না। কবির জীবন-বৃত্তান্ত

হইতে তাঁহার পরোপকারের বা স্বদেশসেবার প্রমাণ বা অপ্রমাণগুলি টানিয়া বাহির করিলে তাঁহার কাব্য বুদ্ধিবার পক্ষে বিশেষ কোন হ্রস্বতা হইবে না। এই সকল তথ্য জানিলেই বা জানিলে যেটুকু হ্রস্বতা বা হ্রস্বতা হইবে তাঁহার দ্বারা কাব্য বা কবির মূল্য বাহিকের বা কমিবে না। নূতন কতকগুলি কথা জানিতে পাইয়া পাঠক কবিকে নূতন একরকম হইতে চিনিতে পারিবেন মাত্র— তাঁহার নূতন এক ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধিতে পারিবেন মাত্র—তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কয়েকটি নূতন পরিচয় পাইবেন মাত্র—এই নূতন জগৎ কবির কাব্যের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা জানিতে পারিব মাত্র। কিন্তু তাঁহার সাহায্যে কাব্য-হিসাবে, সাহিত্য-হিসাবে, পাণ্ডিত্য-হিসাবে, চিন্তা-হিসাবে, রচনা-হিসাবে এবং ভাব-হিসাবে আমরা লেখকের লেখা হইতে, বক্তার বক্তৃতা হইতে আমাদের জীবন-গঠনযোগ্য নূতন কোন তত্ত্ব পাইব না। কবিক স্বদেশসেবক অথবা স্বদেশ-দ্রোহী, পরোপকারী অথবা স্বার্থপর, ধার্মিক অথবা পাপাশ্রয়, বৈরাগী অথবা ভোগী, অকপট অথবা কপট ইত্যাদি-রূপে আবিষ্কার করিব মাত্র। তাহাতে আমাদের সমাজের স্বদেশ-সেবক, পরোপকারী, সাদক অথবা স্বার্থপর, স্বদেশ-দ্রোহী, অধার্মিক, এবং নরক-বৈরাগ্য-অবলম্বনকারীর সংখ্যা বাড়িবে বা কমিবে মাত্র। কবি, লেখক, সাহিত্যসেবী-পণ্ডিত, বিদ্বান অথবা অ-কবি, অ-লেখক, মূর্খ, অনিশ্চিত, ইত্যাদির সংখ্যা কিছুমান বাড়িবে বা কমিবে না। তাহাতে আমাদের উত্তম, মধ্যম বা অধম কাব্যের, সাহিত্যের রচনার, পাণ্ডিত্যের ও বিদ্যাবাহারের পরিমাণ ‘বধ্যপূর্ণং তথা-পরই’ থাকিবে।

সোজা কথা এই, জীবনের প্রতিদিন-কার কণ্ঠের সঙ্গে মিলাইয়া লেখকের, চিন্তা-বীরের, সাহিত্যসেবীর রচনা, চিন্তা ও কাব্য বৃদ্ধিতে বসিও না। কবি যখন কবিত্ব তাগ করিয়া নূতন আকারে তোমাদের সম্মুখে দেখা দিবেন, সাহিত্যসেবী যখন কল্পজগতের আগের নামিয়া দশপাটে মিলায়া কৃষ্ণ-কেন্দ্র গঠন করিতে অগ্রসর হইবেন, পণ্ডিত যখন পরোপকারের ক্ষমতা লইয়া সকলকে পরোপ-কারের কর্তব্য ব্রতী করিবেন, বিদ্বান যখন বৈরাগ্য-ব্রত উদযাপন করিবার জ্ঞান নূতন ব্যক্তিত্ব লইয়া নূতন আকারে মৃগ্মিন্ ত্যাগ-ধর্মজগৎ তোমাঙ্গিকে আশ্বাস করিবেন— তখন তাঁহার জীবন-সাব্যসইও, তখন তাঁহার ক্রুপটতা-অকপটতার হিমাঘ্র গ্রহণ করিও, চরিত্রবস্তা-অচরিত্রবস্তার প্রমাণগুলি বাহির করিও, তাঁহার নিবট হইতে স্বদেশ-সেবার “সার্টিকিট” আদায় করিও, লোকসমাজ তাঁহাকে কবে কোথায় কি ভাবে দেখিয়াছে তাঁহারে অহুসান করিও। কিন্তু সাধনান তখন আবার তাঁহার সাহিত্য-সেবার পরিচয় লইও না, তাঁহার কবিত্বের কোন কোন রস ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা জানিবার জ্ঞান উদ্গ্রীব হইও না; তাঁহার পাণ্ডিত্যের দৌড় কতদূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার খুঁজিয়া তাহা জানিবার জ্ঞান লাগিয়াই হইও না, তাঁহার নামের আগে ও পরে কতখানি জিহ্বী, উপাধি, টিকি বা ল্যাঙ্ক সমুদ্র জ্বাছে তাহার সংখ্যা বা ওজন করিও না।

পাণ্ডিত্য না থাকিলেও পরোপকারী হওয়া যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের জিহ্বীর অধিকারী না হইলেও স্বদেশসেবা করা যায়—সাহিত্য-জগতের নামজাদা লোক না হইয়াও জগৎকে শুভিত করা যায়—নিভাত্তর অ-কবি, অ-বিদ্বান অথবা

অনিশ্চিত হইলেও কর্মবীর, কর্মী, সাধক, কর্ম-যোগী, পরোপকারী, লোকহিতৈষী, মানব-সেবক, ধর্মাত্মা, ধর্মপ্রচাঃক হইবার কোন বাধা হয় না। স্বতরাং স্বদেশ-সেবককে, কর্মবীরকে তাঁহার “পদশ্র”র, “উপাধি”র, কাব্যরচনার, পুস্তক মুদ্রণ করার, বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধানের, ইতিহাসিক গবেষণার, বই লিখিবার সার্টিকিট আদায় করিতে হইবান হইও না। যদি স্বদেশ-সেবককে, এই সকল গুণ থাকে, ভালই; কিন্তু এই সব নূতন জগতের নব নব গুণ না থাকিলেও “রেয়ে গেল,” বড় বেশী আসে যায় না। এই কারণেই স্বদেশ-সেবা-হিসাবে পরোপকার-হিসাবে, বৈরাগ্য-হিসাবে, ধর্মপ্রণতা-হিসাবে, তাঁহার কার্যাবলীর মূল্য বাড়িবে বা কমিবে না। মূর্খের বৈরাগ্য যে বৈরাগ্য, বিদ্বানের বৈরাগ্যও ঠিক সেই বৈরাগ্য। পণ্ডিতের পরোপকারের যে মূল্য, অপণ্ডিতের পরোপকারেরও ঠিক সেই মূল্য; অনিশ্চিতের স্বদেশ-সেবার যে মাহাত্ম্য, নিশ্চিত সাহিত্যবীরের স্বদেশসেবা তদপেক্ষা এক চূড়ও বেশী মূল্যবান নহে।

কাব্য যিনিই রচনা করুন তাহা কাব্যই বটে। স্বদেশ-সেবা যিনিই করুন তাহা স্বদেশ-সেবাই বটে। বক্তৃতা যিনিই করুন তাহা বক্তৃতা, সাহিত্য যিনিই সৃষ্টি করুন তাহা সাহিত্য। আবার পরোপকার বাহ্যের ঋণাই অহুষ্ঠিত হউক, তাহা পরোপকার। বৈরাগ্য যিনিই অবলম্বন করুন তাহা বৈরাগ্য। কোন সাহিত্যসেবীর কাব্য সমালোচনা করিলে সময় আবাস্তরংগতা আনিও না, কোন ব্যক্তির স্বদেশ-সেবার ধর্মিক মূল্য নির্ধারণ করিতে বাইরা বাজে কথা তুলিও না।

তবে কি কবি বা চিন্তাপ্রচারক বা ভাবুক স্বদেশসেবক, পরোপকারী, কর্ম-কর্তা ইত্যাদি

হইতে পারেন না? এই দুই প্রকার গুণের অধিকারী কি একই ব্যক্তি হইতে পারেন না? আর, স্বদেশ-সেবক বা পরোপকারী বা সমাদ্রী কি পণ্ডিত, লেখক, কবি বা বিদ্বান হইতে পারেন না? এই দুই প্রকার গুণের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে কি?

বিবিধগুণের দেখানে সমাবেশ দেখানে মণিকাকন যোগ হইয়াছে বলিব—সেখানে এক নূতন প্রকারের ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়াছে জানিবা। সোনাতে সোহাগা দিয়া নূতন এক কীবেরই সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিবা। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি—এই মণিকাকন সংযোগে, এই নূতন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির ফলে আমরা সমাজের নূতন কতকগুলি বীরপদাচ্য লোক পাইব মাত্র, নূতন এক রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবা। তাঁহার দ্বারা সাহিত্যসেবা দ্বিধা স্বদেশসেবার সমালোচনার পক্ষে বিশেষ কোন হ্রস্বতা হইবে না। প্রকৃত প্রভাবে, এরূপ গুণসমাবেশ—সম্প্রতি এরূপ মণিকাকন যোগ আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা যে কথার মোমাংসা করিতে বসিয়াছি তাঁহার জ্ঞান এই প্রশ্ন উত্থাপনের কোন আবশ্যকতা নাই। এরূপ “সোনার সোহাগা” জগতে দেখা যায় কি না—এই সমাধাণ বিল বা অবিরল, তাহাও আমাদের এখানে একবারেই বিবেচ্য নয়।

গ্রীকসাহিত্যে ইক্কোড, সফ্রাস্টাস্ ও ইউ-রিপিডিস্ যে হান অধিকার করিতেছেন তাঁহার জ্ঞান আমরা কোন কোন সংবাদ লইয়া থাকি? গ্রীক-সাহিত্যের ইতিহাস বাস্তব আর কোন কথা মনে রাখা আবশ্যক কি? গ্রীকজাতি সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রীয়জীবনের কথা, আচার-ব্যবহারের কথা, নৈতিক অবস্থার

কথা ইত্যাদি আরও অনেক কথা জানিতে হয় বটে—কিন্তু কি জ্ঞান? তাহার দ্বারা এই নাট্যকারগণের নাতকগুলি বুঝবার জ্ঞান। এই নাটকের লেখকগণকে মহাশয় হিসাবে, বিশ্লেষণের হিসাবে, চরিত্রব্রতীর হিসাবে বড়, মহনীয় বা পুষ্ট্য করিবার জ্ঞান। যখন আমরা ইতিহাস ঘাঁটিয়া জানিতে পারি যে; স্বদেশ-উদ্ধারের জ্ঞান ইহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন অথবা এসময়ে পরাশ্রয় ছিলেন-রাস্তার উন্নতি বিধানের জ্ঞান প্রতিনিয় যথা সম্ভব চেষ্টা করিতেন অথবা উদাসীন থাকিতেন, সমাজের, শিল্পের এবং গ্রীক-সভ্যতার অজ্ঞাত বিভাগের পুষ্টির জ্ঞান কখনও শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন বা করেন নাই;—তখন তাঁহাদের বহুমুখী জীবনের একটা চিত্র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র কয়েকটা জানিতে পারি এবং তাঁহাদিগকে নতুন কারণে মর্যাদায় বা অমরতায় মনে করি। কিন্তু তাহার দ্বারা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি আমাদের কার্য-সমালোচনার কটি পাথরে বেশী উজ্জ্বল বা অস্বচ্ছল হইয়া পড়ে কি? ইতিহাসপাঠে এই টুকুমা জ লাভ হয় যে, কতকগুলি সাময়িক ঘটনা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের ভাবানিবন্ধ বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ কথঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হয়। তাহা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেটো, যারিস্টেল, কালিদাস, দাশে, গেটে, সেন্সবারীর ইহাদের কথা স্মরণও সেই কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি না—প্রেটো একতানে যে আদর্শ লিখিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত করিতে যাইয়া ফেল মারিয়াছিলেন কি না, যারিস্টেলের সঙ্গে আলেকজান্ডারের সৌহার্দ্য কত দিন ছিল, দাশে ইতালীর গণ্ডারগাগুলি যুদ্ধ-কাণ্ডে পরিণত করিবার জ্ঞান জীবন

উৎসর্গ করিয়াছিলেন কি না, কালিদাস কিংবা দিগন্তের নিকট কত পেনশান পাইতেন, গেটে নেপোলিয়নের পরাক্রম হইতে আত্মীয় উদ্ধারপান নিজ জীবনের স্বর্ভাব্য মনে করিতেন কি না, সেন্সবারীর সঙ্গে রাগী এলিগাবেলের সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ ছিল। যদি এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করি, তবে তাহার দ্বারা তাঁহাদের রচনাগুলি সেই সময়কার অবস্থাহাস্যের বুঝিবার জ্ঞান, তলাইয়া মজাইয়া দেখিবার জ্ঞান আমাদের একমাত্র চেষ্টা থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ নিরুধ্য ছিলেন, কেহ বা স্বদেশপ্রোহী ছিলেন, কেহ প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন, কেহ বা স্বাধীনসিদ্ধি কাঙ্ক্ষী ভাবিতেন—এ সকল কথা আমরা জানি; কিন্তু তাহার জ্ঞান ব্যাকীগোনি, রিপাব্লিক, ডিভাইন কমেডি, রঘুবংশ, ফৌজ বা কিং-লিয়ারকে স্বর্ণে তুলি না অথবা রসাতলে পাঠাই না। পৃথিবীর মধ্যস্থত চরিত্রবান্ ধর্মবীর্য স্বদেশসেবকের তালিকায ইহাদের কাহাকেও যখন দিয়া থাকি, কাহাকে বা দিন এই পৃথিবী। কিন্তু জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর ও সাহিত্য-রথবীজের তালিকায ইহারা অমর রূপে পুষ্ট।

এই সুবিস্তৃত আলোচনায় আমরা বুঝিলাম:—

(১) ধার্মিক, বৈরাগী, স্বর্ধবীর, সাধক, স্বদেশসেবক, পরোপকারী ইত্যাদি না ইহারা কোন ব্যক্তি ধর্ম, বৈরাগ্য, স্বর্ধযোগ, সাধনা, স্বদেশসেবা, পরোপকার ইত্যাদি বিষয়ে (ক) অভ্যাসবৃত্তি কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করিতে পারেন;—আবার (খ) অতি নিকট সাহিত্যও রচনা করিতে পারেন।

(২) ধার্মিক, বৈরাগী ইত্যাদি ইহারা কোন ব্যক্তি ধর্ম, বৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয়ে (ক) অতি

নিকট কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করিতে পারেন, আবার (খ) অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যও রচনা করিতে পারেন।

এখন উৎকৃষ্ট ও নিকট কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি কাহাকে বলে সে প্রশ্নের মোমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। সাহিত্যের আদর্শ কি, কেন্দ্র কেন্দ্র উপাধানে উন্নত কাব্যের গঠন হয়—এই সকল কথা এ স্থলে আলোচ্য নয়।

অধিকন্তু,—

(১) উৎকৃষ্ট বিদ্বান্, পণ্ডিত, চিন্তাবীর, কবি, সাহিত্যসেবী ইত্যাদি না ইহারা কোন ব্যক্তি (ক) ধর্ম, বৈরাগ্য, স্বর্ধযোগ, স্বদেশসেবা, পরোপকার, ইত্যাদি জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারেন; আবার (খ) ধর্ম, বৈরাগ্য ইত্যাদি কার্যে পরিণত নাও করিতে পারেন।

(২) উৎকৃষ্ট বিদ্বান্, পণ্ডিত, কবি ইত্যাদি ইহারা কোন ব্যক্তি (ক) ধর্ম, বৈরাগ্য, ইত্যাদি জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারেন; (খ) আবার নাও পারেন।

স্বদেশসেবা কাহাকে বলে, বৈরাগ্যের লক্ষণ কি কি, ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল কার্য যাহাই হউক, পাণ্ডিত্য, কাব্যালোচনা, সাহিত্যসেবা ইত্যাদির সঙ্গে কোন প্রকৃতগত সম্বন্ধ নাই।

সুতরাং কোন লোককে বিচার করিতে হইলে—বিশেষতঃ তাঁহার সাহিত্যসেবার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইলে—আমরা সাহিত্য-জগতের নিয়মের দ্বারা বাহিরে না যাই। যদি সাহিত্য বুঝিবার জন্য জীবনব্যস্ত-ঘটিত কোন কথা বলা আবশ্যক হয়, তবে সর্বদা যেন মনে থাকে যে তাহা

অবাস্তব মাত্র। কেন্দ্র মুহুর্তে কবির কাব্য-সমালোচনা ত্যাগ করিয়া মহাশয় সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছি। তাহা ভুলিয়া গেলে চরিত্র হিসাবে বড় বা ছোট তাহা জানি বলিয়া সাহিত্যসেবী হিসাবে সেই ব্যক্তিকে বড় বা ছোট যেন না করিয়া ফেলি। সাহিত্যসমালোচনার ইহাই বৈজ্ঞানিক রীতি।

৯। কবিরের উক্তি

এখন আমরা কবিরের অভিভাষণ হইতে আমাদের আলোচ্য অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি:—

“যারা জনসাধারণের নেতা, যারা স্বর্ধবীর, সর্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য এবং জন-পরিচালনার কাজে, সেই সম্মানে তাঁদের প্রমাণিত আছে। যারা লক্ষ্যকে উদ্ধার করিবার জ্ঞান বিধাতার মনন-দণ্ডস্বরূপ হয়ে মন্দির পর্বতের মত জনমুখ মনন করেন, জনতা-তরঙ্গ উদ্ভূত হয়ে উঠে, তাঁদের কল্যাণকে সম্মানাদায় অভিযুক্ত করবে, এইটাই সত্য, এইটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয়। মানুষের হৃদয়কেই কবির কাজ এবং সেই হৃদয়ের প্রীতিতেই তাঁর কবিত্বের সার্থকতা। কিন্তু এই হৃদয়ের নিয়ম বিচিত্র—সেখানে কোথাও মেঘ, কোথাও রৌদ্র। অতএব প্রীতির ফসলেই যখন কবির দাবী, তখন এক কথা তাঁর বলা চলবে না যে, নির্বিশেষে সর্বসাধারণেরই প্রীতি তিনি লাভ করবেন। যারা যজ্ঞের হোমায়ী জালাবেন, তাঁরা সমস্ত পাছটাকেই ইন্দ্রনরূপে গ্রহণ করতে পারেন, আর মালা

গাখার ভার যাদের উপরে, তাদের অধিকার কেবলমাত্র শাখার প্রান্ত ও পল্লবের অন্তরাল থেকে ছুটি চারটি করে ফুল চয়ন করা।

কবি বিশেষের কাব্যে কেউ বা আনন্দ পান, কেউ বা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা আঘাত দেন। আমার কাব্যসম্বন্ধে এই স্বাভাবিক নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি, এ কথা আমার এবং আপনাদের জন্য আছে।

কবির সাহিত্যসেবা এবং স্বদেশসেবার পার্থক্য কেবল সম্মান-লাভের দিক হইতে দেখাইয়াছেন। আমরা এই পার্থক্য ব্যাপক ভাবে দেখাইলাম। আমরা একটু গোড়ার কথা, হুঁশ্বেশীর ব্যক্তির ভক্তিকার অহ-প্রাণনার কথা বিশ্লেষণ করিয়াছি।

১০। ভারতবাসীর নোবেল-প্রাইজ লাভ

রবিবাবু তাঁহার সর্ধর্নার উত্তরে দেশ-বাসীকে জানাইয়াছেন :—

“দেশের লোকের হাত থেকে যে অপমান ও অপমান আমার ভাগে পৌছেছে, তাম্র পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এককাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কি জন্ম যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করবুম, তা এখনো পণ্ডিত আমি নিজেই ভাল করে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্বতীরে বসে থাকে পুষ্কার অঙ্গলি দিয়েছিলেন, তিনিই সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্ম যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, সে কথা আমি জানিই না।” তাঁর সেই প্রণাম আমি লাভ করেছি এই আমার সত্য লাভ।

যাই হোক যে কারণেই হোক, আশ্চর্য্যেরূপে আমাকে সম্মানের বরমালা দান করেছেন। তার যদি কোনো মূল্য থাকে তবে সে কেবল সেখানকার ভবিষ্যৎদানের রসবোধের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই। নোবেল-প্রাইজের দ্বারা কোনো রকমের গুণ বা গুণস্বত্ত্ব করতে পারে না।

এই উত্তর সর্ধর্না-উৎসবের উপযোগী হয়েছিল কি না—আমরা জানি না। উচ্চপদার্থের অর্থ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিবে। আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত “সম্মানলাভের”, তাঁহার “বরমালা”-প্রাপ্তি সম্বন্ধে, জন্মবা তাঁহার “সত্যলাভ” বিষয়ে কোন মম্বালাচনা করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার নীরব ভক্তভাবে আমরাও তাঁহার সার্থকতা লাভে আনন্দিতই হয়েছি। কিন্তু দেশের একজন ভাবে এই উপলক্ষে দেশবাসীকে ছ’ একটি মাত্র কথা বলিয়া রাখিতে চাই—

প্রথমতঃ, ভারতের হিন্দু-মুসলমান, আমরা অনব-স্বগিত জাতি। পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছি বলিয়া কোন লোক স্বীকার করে না। এই কারণে আমাদের নৈতিক অধোগতির চূড়ান্ত হয়েছিল। দেশের লোকের গৌরবে গৌরব বোধ না করিয়া আমরা হিন্দুই করিয়া থাকি। পরের উন্নতিতে আমাদের বুক চড় চড় করে—চোখ টাটায়। স্বদেশ ও স্বসমাজকে সম্মান করোণ দ্বয়ের কাণ্ড—নিজের উন্নয়ন বিধান বিস্মৃত্য নাহি। নিজেকেই নিজে চিনি না। আত্মশক্তিতে নির্ভর করি না—আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান কাহাকে বলে জানি না। তবে অন্ধকার কাটিতেছে—বিশ্বাস জন্মিতেছে—আত্মসম্মান বোধ জাগিতেছে। এই জন্ম রামমোহন,

তুদেব, বিক্রম, শিবদাসাগর, নবীন, হেমচন্দ্র, বিবেকানন্দ—সকলকে বিশ্বস্তির গ্রস্ত হইতে টানিয়া আনিতে সচেষ্ট হইয়াছি। মণ বৎসর পূর্বে লোকে স্বামী বিবেকানন্দকে “নরা দত্ত” “বিবেকানন্দদত্ত” বলিত, এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও লোকে “রামকৃষ্ণ বাবু” বলিত। তখন তাঁহারা জীবিত। আজ স্বাধীনজাতি সজ্ঞানে হুইবার সর্ধর্না করিবার মতি হইয়াছে, হুইয়াই আমাদের গৌড়াগ।

এখন যে স্বদেশীয় একজন স্থানীকে সম্মান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে—নিজ জীবনকে ধন মনে করিতেছে—তাঁহা কত দিনের কথা? এ শিলা কতদিনের? গভীরভাবে দেখিলে বুঝতে পারিবে—বিগত ৭৮ বৎসরের মধ্যেই উন্নত জাতিহলচ বীর-পুষ্কার প্রবৃত্তি আমাদের চরিত্রে বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনের দুই যুগ দেখিলেন। শ্রীনি আমাদের ইতিহাসের সন্ধিকালে উপস্থিত। এই জন্মই পূর্ণযুগের অবজ্ঞা—এবং নবযুগের বিকাশোন্মুগ কথঞ্চিৎ আন্তরিক কথঞ্চিৎ কপট, থানিকটা লোক-দোষান থানিকটা স্বার্থ লোক-প্রীতি—এই দুই প্রকার ঘটনা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল। ইহা দুইয়ের কথা নয়, পরিচাপের বিষয় নয়—আনন্দ-উৎসবের সময়ে তিষ্ঠাশ্রুত-প্রাণনের উপলক্ষ্য নয়।

বীর-পুষ্কার এখন প্রারম্ভিক অবস্থামাত্র, সময় আগিতেছে যখন আমরা আশ কপটতা আশ আন্তরিকতা পরিচাপ করিয়া পূর্ণ জগতের বীরের সর্ধর্নাতে তন্ময় হইয়া পড়িব। তখন টাউন-হলের সভায় লোক হইবে কি না এই সমস্যা পূর্ণ হইতে আশোজন করিবার জন্ম ব্যস্ত হইব না। তখন ছেলে জমা

করিয়া সভার আসন পূর্ণ করিতে হইবে না। সেই সময়ে রাস্তায় ঘাটে, মাঠে ঘাটে, দোকানে বাজারে, কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে নৈসর্গিক আনন্দের ধানি পড়িয়া বাইবে—কলী-মঞ্জর, ফেরীওয়াল, দল্লি, তাঁতি, কন্দকার, মাষ্টার, কেরানী একত্র হইয়া সেই বীরপুষ্কারের বীণা-স্বর্য্যেরে নাচিতে থাকিবে, গাথিতে থাকিবে। সমগ্র দেশবাসিনী ভাবুকতার বস্ত্র জনসমাজকে প্রাবৃত্ত করিবে। এইরূপ আনন্দে পাপল আমরা হইতে জানি না তাহা নহে। যে দিন ভারতবর্ষের রক্ত-মণ্ডে স্বাধীন, চুকারাম, শ্রীচন্দ্রের জায় পাগল আবির্ভূত হিঁসার কথা? এ শিলা কতদিনের? গভীরভাবে দেখিলে বুঝতে পারিবে—বিগত ৭৮ বৎসরের মধ্যেই উন্নত জাতিহলচ বীর-পুষ্কার প্রবৃত্তি আমাদের চরিত্রে বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে।

১১। বিদেশে পূজালাভ

ষিঠীয় কথা—লোকে বলে, “স্বদেশে পুজাতে রাজা, বিদ্যান সর্ধর্না পুজাতে।” আমরা—এই সঙ্গে যদি বলি “বিদেশে বিদ্যান পুজাতে আগে, স্বদেশে পরে পুজাতে” তাহা হইলও বোধ, হয় মিথ্যা বলা হইবে না। ফরাসী পণ্ডিতের সম্মান ইংরাজ আগে করিয়া থাকে। ইংরাজ পণ্ডিতের সর্ধর্না জর্মানী আগে করিয়া থাকে। আমেরিকার গুণীর আদর ফরাসী জাতি আগে করে। বিদ্যা-জগতের, সাহিত্য-জগতের, শিক্ষা-জগতের দস্তখত প্রায় এইরূপ। দুষ্ঠান দিয়া দেখাইতে হইবে কি? প্রসিদ্ধ জার্মানী পার্শনিক লাইবনিজ (১৬৪৬—১৭১৬ খৃঃ অঃ)

আধ্বাণিতে কিছুমাত্র উৎসাহ পান নাই। আধ্বাণির প্রসিদ্ধ নৌতত্ত্ববিদ ও গণিতজ্ঞ পণ্ডিত মেয়ার (Tobias Mayer, ১৬৩৩-৩২) ইংরাজ-জাতির অর্থ-সাহায্যে তাঁহার মৌলিক অর্থসন্ধান ও গবেষণাসমূহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। প্রসিদ্ধ আধ্বাণি বৈজ্ঞানিক হাফথ (১৬৩২-১৮৫২) নিজ অর্থবলে এবং ফরাসী-সাহিত্য-পরিষদের অর্থগ্রহণে রচনাবলী প্রকাশ করিতেন— আধ্বাণির সাহিত্য-জগতে সধর্ম্মা তিনি যুগ্মত্ব অত্যন্তকাল পুঙ্খি লাভ করেন। প্রকৃত প্রভাবে ফরাসী-সাহিত্য-পরিষদের অর্থ-সাহায্য এবং সধর্ম্মা লাভ করবার পর আধ্বাণির জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ আধ্বাণিতে এবং অন্ত্য প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, ইংরাজ-সন্তান নিউটনও বিলাতেই প্রথমে “কঙ্কে পান” নাই। লাইবনিজ যেমন স্বদেশে এবং শসমাজে বহুকাল অনাদৃত ছিলেন—নিউটনের আবিষ্কারও সেইরূপ বিলাতী সাহিত্যে এবং ইংরাজী চিন্তায় বহুকাল পর্য্যন্ত কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। ফরাসী ভদ্রোচিত্রের পৃষ্ঠ-পোষকতায় নিউটনতত্ত্ব জগতে প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়াছে। নিউটন এবং লাইবনিজের বাদ দিয়াই সম্প্রদায় ও ঐশ্বর্য শতাব্দীর ইংরাজ ও আধ্বাণি-লেখকগণ স্বদেশের বিদ্যানুগণের ইতি-বৃত্ত সন্ধান করিতেন। অথচ এই দুইজনকে বাদ দিলে আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়া কাটিয়া ফেলা হয়।

বিলাতের রয়েল সোসাইটি এবং অষ্টাঙ্গ বিজ্ঞান-বা সাহিত্য-সমিতির পত্ত দুই শত বসন্তের কাগজপত্র দেখিলে ব্রূষা যাই— ইংরাজ-সমাজে স্বার্থপরতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সর্বাধ চিন্তা, ধৈর্য, দলাদলি হিংসা ইত্যাদি

কত বেশী ছিল এবং এখনও কত আছে। ফরাসী-পশ্চিম ও পশ্চিম পণ্ডিতগণের কত গবেষণা চাপিয়া রাখিয়াছেন তাহার ইচ্ছা নাই। আধ্বাণি পণ্ডিতগণেরও অনেক সময়ে উৎসাহ-ভাবে প্রতিষ্ঠা নিরূপিত হইয়াছে। ইংরাজ-সমাজে এ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী লেখাই দেখা গিয়াছে। বিলাতী রসায়নের প্রধান তত্ত্ব পণ্ডিত ড্যান্টনের (১৬৬৮-১৮৪৪) দুর্গতি কাহার না মনে আছে? ফ্যারাডেও অর্থা-ভর্যে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক যে সকল কথা দেশের লোককে শুনাইয়াছেন অত্রস্থানে তাহার বর্ণনে কাণ্ডিত: অথবা মুখের কোন সাদার লাভ করেন নাই। আধ্বাণির ক্সিবিদ্যালয়গুলি এবং ফরাসী-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বিদেশীয় “রসবোধজ্ঞ গুণিজন” না থাকিলে বিদ্যার জগতে বিলাতের নাম থাকিতই কি না সম্ভব। অতএব দেখা গেল—কেবল বাঙ্গালী বা ভারতবাসীই দেশীয় পণ্ডিতকে অজ্ঞা করে তাহা নহে। আধ্বাণি, ফরাসী, ইংরাজ সকলেই এ সম্বন্ধে পাণী।

• •

১২। পাশ্চাত্য সভ্যতার মারপ্যাচ

তৃতীয়াংশ, সভ্যসভ্যই কি পাশ্চাত্য জগতের “গুণিজন”রা অতি উচ্চ অবস্থার সমাজ—বড় পাকা সমজ্ঞার? তাহারা কি নিক্তির ওজনে মাগিয়া ফরাসী, জাখান্, রুশীয়, প্রাচ্য, আমেরিকান—সকল প্রকার লোকের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাহিত্যাদেশ, পরোপকার, লোকহিত, কাব্যালোচনা ইত্যাদির মূল্য নিশ্চায় করিয়া থাকেন? তাহারা কি দেশ-কালপাত্র বিবেচনা না করিয়া সকল স্থলেই

পক্ষপাতশূন্য বার্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন? তাহারা কি হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-বুদ্বান প্রভৃতি ধর্ম্মভেদেও সাদা, কাল, লাল, পীত, রংএর চামড়াভেদ, এবং ফরাসী, জাখান্, গ্রীক, ইংরাজ, রুশীয়, ভারতীয়, চীনা, জাপানী ইত্যাদি ‘জাতিভেদ’ না করিয়াই বিজ্ঞান-গুণির সমান করেন? আমরা পাশ্চাত্য চিন্তা-জগতের কিছু কিছু সংবাদ রাখিয়া থাকি। আমরা ‘পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-সংগঠনের’ রেখাও, দালাদলির ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নিত্যন্ত অজ্ঞ নহি। ফরাসী জাতির কোন এক সম্ভ্রমণের সঙ্গে রূপজাতির কোন এক সম্ভ্রমণেরে কিরূপ সম্বন্ধ, আধ্বাণির কোন পণ্ডিত-সমাজের সঙ্গে আমেরিকা বা ইউরোপ কোন বিষয়-পরিষদের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বুঝিবার উপায় আছে।

যদি পাশ্চাত্য জগৎসম্বন্ধে কোন কথা জোরের সহিত বলা বাইতে পারে, তবে তাহা এই—

পাশ্চাত্য জগতে কোন বিষয়ে নিরপেক্ষ সমালোচনা বিলুপ্ত নাই। তাহারা শতবল অহুসারে কাজ করেন, কথা বলেন, বক্তৃতা দেন, পরামর্শ দেন, সন্ধি করেন, পুস্তক প্রকাশ করেন। প্রতিপদক্ষেপে, প্রতিদিনকার গুণা-বদায়, ঘরোয়া-বৈঠকে, চা-পানের নিমন্ত্রণে, এবং মন-রাগা অনাগোনার তাহাদের ক্ষিত্তি, চালাকী, গুস্তাবী, শোভা কথায় ভিন্নমত পুঙ্খিত। তাহাদের সমাজ, তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের রাষ্ট্র, তাহাদের সাহিত্য, তাহাদের বিবাহ, তাহাদের লোকসেবা—প্রত্যেক ক্ষু-রূপে কাণ্ডকালপক্ষেই এই “পাচ চালে মাত” করিবার পন্থা, ভবিষ্যতে “কাজ হানিল” করিবার কৌশল দেখিতে পাইব। কাজেই তাহাদের জগতে যতগুলি বিদ্যার কেন্দ্র, যত-

গুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান, যতগুলি বিজ্ঞান-পরিষৎ, যতগুলি মানব-সেবক-সমিতি, যতগুলি রাষ্ট্রীয় “দল,” যতগুলি পার্লামেন্ট-ক্যাবিনেট, যতগুলি সংবাদপত্র বা মাসিকপত্র, যতগুলি ধর্ম্মভা-রক্ষায়ে, সেই সমুদয়ের নিত্যনৈমিত্তিক “চাল”—পরিবর্তন অনেক “ভিত্তিকার কথা”র উপর নির্ভর করে। সেই ভিত্তিকার কথাগুলি আর কিছুই নয়—দলাদলি, অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্তর্কে “বাগে ফেলিবার” চেষ্টা, দল-কলহ “কাবু” করিবার অভিসন্ধি, হিংসা-ধৈর্য-কলহ ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহাদের সাহিত্যবিষয়ে “রসবোধ” এইরূপ অসংখ্য দলাদলির, মতলববাহীর, এবং আড়াআড়ির কোন কোন ঘটনাজড়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যজগৎ সামান্য-সামান্য কাণ্ডকালপক্ষেও সরল, সহজ, পক্ষপাতশূন্য, সমর্থ, আন্তরিকতাময়, অর্থাৎ স্বদেশের সহিত বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমাদের অনেক তোতাপাণীর মত শিবিয়াছেন, এবং মূলি আঙুড়াইয়া থাকেন যে, পাশ্চাত্যজগৎ বড়ই একাধিনিষ্ঠ, একাই তাহাদের শক্তির প্রধান কারণ, তাহাদের একতার গুণেই তাহারা আজ জগতে প্রসিদ্ধ। ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান, তুমি বহুকাল হইতে অনেক মিথ্যা কথা শিবিয়াছ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য জগতের একতা সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা তাহা সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। তোমরা ইতিহাস-পড়িয়াছ—তোমারা পণ্ডিত। কিন্তু বলিতে পূর্ণ প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় জীবনের কোন অধ্যায়ে একাধিক্তির পরিচয় পাওয়া যায়? এই তথ্যকথিত একতা ইতালীর ইতিহাসে কোন মুখে ছিল কি? ইউরোপের মধ্যযুগের রূপান্তর নিশ্চয়ই তোমাদের জানা

আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই কি উপায়ে খৃস্ট দিয়া অজান্তে দেশের রাজ-গুলিকে হাত করিলেন এবং এই উপায়ে প্রত্যেক সমাজকে নানা স্ব-স্বপ্রধান বলে বিভক্ত করিয়া লইলেন, তাহা ত বিদ্যালয়ের ছোটখাট ইতিহাস-পুস্তকেই বালকেরাও জানে। তারপর আধুনিক যুগের কথা কি আর চোখে আবুল দিয়া দেখাইতে হইবে? ১৮০০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ বাহার বহুপূর্বে আমাদের অনেকের জন্ম হইয়াছে, সেই সময় পর্যন্ত “ইতালী” নামে কোন রাষ্ট্র ছিল না, জাতিগণ নামেও, একটা দেশ পৃথিবীর লোকের চিন্তার মধ্যে স্থান পাইত না। শত-শত স্ক্র-স্ক্র গ্রাম-জনপদ-জেলায় এই সকল দেশ স্বীকৃত ছিল। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ-গঠন ত কালকার কথা। পাশ্চাত্যজগতে একা কোথায় বলিতে পার কি? তারপর, জাতিগণিতে এবং আমেরিকাতে মুক্তরাজ্যত পণ্ডিত হইয়াছে। এই “যুক্ত” রাজ্যগুলির মধ্যে কত অসংখ্য অট্টোমান, পার্স-তৎপরতা, গ্রামে গ্রামে ‘হাম বড়া’ ভাব, পরস্পর প্রতিযোগিতা, বিচারালয়ে, ময়দা-মতায়, ধর্ম-কর্মে বিভিন্দ্ভতা রহিয়াছে, তাহার তালিকা করিতে গেলে হাজার পৃষ্ঠার একই নীতি বহুই গ্রন্থ লেখা হইয়া যাইবে। কেবল ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানই কি অমৈক্যের জ্ঞাত, ললাদিলির জ্ঞাত, মন্তভেদের জ্ঞাত পাপী? তবে কি পাশ্চাত্যজগতে ধর্মবিষয়ে একা আছে? সত্য কথা, আমরা-বাহ্যকে ধর্ম বলি, পাশ্চাত্য জগতে সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব একেবারেই নাই। তোমরা বোধ হয় মনে কর সমগ্র খৃষ্টান-জাতি মুসলমান-জাতি বা ধর্মের বিরুদ্ধে এবং বৌদ্ধজাতি বা ধর্মের বিরুদ্ধে একমতা? মিথ্যা কথা। ১৪৫৩

খৃষ্টাব্দে মুসলমান-জাতি ভূরূপ অধিকার করিয়া ইউরোপে বসতি আরম্ভ করেন। তখন হইতে ভিন্ন-ভিন্ন খৃষ্টানজাতি ভিন্ন-ভিন্ন মতলবে ভূরূপের হালতানের সঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। খৃষ্টান ইউ-রোপের ভিতর কিছুদূর একা ছিল না বলিয়াই তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষা পাইয়াছে। পাশ্চাত্যজগতের অট্টোমান মুসলমান জাতির শক্তি। সেইরূপ জাপানের অভ্যুদয়-বাপারটা গুলিকা করিলেই বৃষ্টিতে পারিবে এখানেও সেই খৃষ্টানের অট্টোমান। তারপর এই যে চোখের সমুদ্রী গ্রীস, বস্কান, মল্লোকা, চীন-দেশমধ্যস্থ কাচ-চীনেতেছে সেখানে পাশ্চাত্য সমাজের একা দেখিলে না অট্টোমান দেখিলে? শক্তি দেখিতেছে না দুর্বলতা দেখিতেছে? দলবীধা দেখিতেছে, না দলাদলি দেখিতেছে? যাহা হউক, “ধান” ভানুতে শিবের গীত” আমরা অনেকখানি গাহিয়া ফেলিলাম। প্রকৃত কথা এই—পাশ্চাত্যজাতি ভিন্নত্ব জাতীয়-অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ভিন্নত্বমি, পরস্পর-প্রতিযোগিতা, এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্য-ভেদ বিবেচনা না করিয়া কোন বিন কোন বিষয়ে কার্য করেন নাই। আমাদের বিজ্ঞানচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোধ হয় এ সম্বন্ধে খুব ভাল সাফা দিতে পারিবেন। এই সময়ে আবহাওয়ার ভাবে একটা কথা বলিয়া রাখি—জগদীশচন্দ্র ভারতকে বসিয়া যে সকল স্বাধীন গবেষণা করিতেছেন আমরা দেখিয়াছি সেই সকল গবেষণার ইতিহাসে জগদীশচন্দ্রের উল্লেখ অল্পই হইয়া থাকে। অথচ পাশ্চাত্যজগতের পণ্ডিতগণের মধ্যে বাহারা এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন, তাহাদের কাঁধাবলী বিশেষরূপেই বিবৃত হয়। জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-জগতে নতুন-নতুন উপাধি

পাইবার উপযুক্ত কি না, তাহার “আবিষ্কার অথবা গবেষণাগুলির মূল্য আছে কি না তাহার বিচারক আমরা নহি। কিন্তু বাহারা “রস-বেদ্যে জগদীশ” তাহার রামচন্দ্রের সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালীর প্রয়াগও যথাযথ বিবৃত করিবেন—ইহাই আমরা আশা করিতে পারি। জগদীশচন্দ্র একেবারেই উপেক্ষিত হইতেছেন বা হইয়াছেন তাহাও আমরা বলিতে চাহি না। তাহার নামোল্লেখ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জগতের মহলে মহলে প্রশংসার সহিতই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ভিতরে যে ক্ষত রহত আছে, তাহা অর্থ-জগদীশচন্দ্র জ্ঞানেন, অর্থ-বঁধারা পাশ্চাত্যপণ্ডিত-জগতের কাচুপী বুকে, তাহার। কিছু কিছু অসম্মান করিতে পারিবেন। ও দেশে-অর্থবন্ধের রসনা বা আবিষ্কার বা অসম্মান আর একজনের ন্যূনে প্রচারিত হয় কি না তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বলিতে পারে?

১৩। স্বদেশের স্বর্ণ-সিঁহাসন

চতুর্ভূত, ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান; তোমরা রবীন্দ্রনাথকে এতদিন কি কেবল নিন্দাই করিয়া আসিয়াছ? রবীন্দ্রনাথের “দেশের লোকের হাত থেকে” “অপমান ও অপযশ” মাজই কি তাঁর “ভাগ্যে পৌছেছে?” তিনি “সমুদ্রের পূর্বতীরে বসে থাকে পুষ্কার অঞ্জলি দিয়েছিলেন” সেই বাম্বাকি-কালি-দাস জগদেব-“সুখপ্রাণ-বস্তুম-বিজ্ঞানজালার আরাধন্যেবতা,” “রঞ্জনা স্বকলা শতশ্রামলা” অথবা “সরলা,” “বন্দে মাতর”-খ্যানের বিগ্রহ-মূর্তি ভাঙতামাতা সমুদ্র সন্তরণ পূর্বক পর-পারে যাইয়া “দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন”—ইহা কি সত্য? বাঙ্গালী তাহা

স্বীকার করিবে না—ভারতবাসী তাহা স্বীকার করিবে না। পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবে সমাদর করিতেছেন, তাহাতেও বুঝা যায় তাহারাও এ কথা আদৌ স্বীকার করেন না। ভারতবর্ষের বঙ্গী এবং হিন্দুর হিন্দুত্বই বাদ দিলে পাশ্চাত্যজগৎ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নতুন কিছুই পাইবেন না—এ কথা তাহারা বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য-জগতে ভারতীয় জীবন-গম্ভীর অতীতম ভঙ্গীধরুপেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের পূজা পাইতেছেন। ভঙ্গীধরের মাহাত্ম্য আছে স্বীকার করি—রামা-শ্রামা ভঙ্গীধর মাজিলে-পণ্ডিত পারনী গম্ভীর মর্ন্তো আগমন হয় না, তাহা “নিভাত অজ্ঞ লোকেরাও বলিবেন। কিন্তু গম্ভা-মাহাত্ম্য মুদি জুলিয়া যাই, তাহা হইলে গোড়ার কথাই বাদ পড়িল। ভঙ্গীধরকে লইয়া নাচনাচি করিবার কোন উপলক্ষই থাকিবে না।

পাশ্চাত্যজগৎ বুঝিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ ভারতাস্থাকে ইউরোপে পৌছাইয়াছেন। ইউরোপের নেজিনিদের অভাব ছিল—বহুদিন হইতে যে অভাব নানা কারণে ইউরোপ বুঝিছে নুকোন—সম্প্রতি যে অভাব নানা কারণে পাইয়াছে তাহা ছাড়াও অসংখ্য কারণে তাহা দিগকে পদে পদে বেননা দিতেছে—সেই অভাব-মোচনের উপায়-স্বরূপ ভারতীয় ভাবুতা লইয়া রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভাব-পদে উন্নিত হইয়াছিলেন। হুজি বসন্ত পূর্ণে সীমাসী বিবেকানন্দ এই পথ দেখাইয়া ছিলেন। আশ “বীর-সমাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়—বাস্তাবীর ছেলে বাজে বৃহৎ ঘটাতে সমর্থ।” কবিরকে সম্বন্ধনা করিতে যাইয়াও খৃষ্টানরা হিন্দুর নিকট সেই শিখরেই একটা নতুন পরিচয় দিয়াছেন।

বোলপুরের স্বৰ্ণকায় দুইজন খুঁটান হিন্দুর
নিকট পাশ্চাত্যের শিক্ষা-গ্রন্থের কথাই
উল্লেখ করিয়াছেন। “সকলি আছি” হইতে
আমরা তাহাদের সম্ভাষণ উদ্ধৃত করিতেছি।
মিঃ মিসরাণ বলিয়াছিলেন—

আপনার কবিতা পাঠ করিয়া আমরা এই
বিশাল বিশ্ব ব্যাপার এক নূতন ভাবে প্রত্যক্ষ
করিতেছি, বাহা আমরা আর পূর্বে কখনও
করিতে পারি নাই। আমি একটি ক্ষুদ্র
বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। আমি
আনন্দের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে,
আপনার ‘গীতাঞ্জলি’র অনেকগুলি স্তোত্র
সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক নিত্য
প্রভাতে গীত হইয়া থাকে। আপনার
‘গীতাঞ্জলি’ আমাদের শাস্ত্রোক্ত উপাসনা মন্দির
অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

মিঃ হায়াও বলেন—

“মহাশয়, আমাদের দেশের একজন কবি
বলিয়াছিলেন “বিনি দয়া প্রদর্শন করি, এবং
ঈশ্বরের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়, তাহার
উভয়েই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে,”—
সম্মান সহজেও ঠিক এইরূপ কথা বলা যায়,
বাস্তবিক জগতের ‘কবিসমূহ’ আনন্দিক
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে পুরস্কৃত করিয়া, ইউরোপ
সমগ্র সভ্য-সমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছে।
আজ আপনার সম্মানে যদি কাহারও অধিক
আনন্দের কারণ থাকে, তবে সে ইউরোপের;
আমি আজ আপনার সম্মুখে সেই আনন্দ
প্রকাশ করিতে আদিয়াছি। বহুকাংশ পণ্ডিত
প্রতীচাপ্রদেশ ভারতবর্ষকে অবজ্ঞার চক্ষে
দেখিয়া আসিয়াছে, আজ আপনার এই
পুরস্কার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। পণ্ডিত-
গণের মধ্যে অনেকেই বলিতেন যে পূর্বে ও
পশ্চিমে মিলন অসম্ভব, কিন্তু আপনাকে এই

বৎসর যে ‘পুরস্কার প্রদত্ত হইল, তাহার ফলে
পণ্ডিতগণের এই উক্তি খণ্ডিত হইয়া গেল,
পূর্বা পশ্চিমে মিলন হইল—আর এ মিলন
কোন সম্প্রদায় বিশেষের দেব মন্দিরে নহে—
বেঙ্কানে নিত্য জ্যোতিষ্মৎ পরমাত্মার প্রকাশ—
এ মিলন সেই অখ্যাত্তরাজ্যে।”
কথাটা আগ্রহ পরিহার করিয়া বলা
আবশ্যক। রবীন্দ্র নাথ হিন্দুর বাণী প্রচার
করিয়া পাশ্চাত্যকে তত মুগ্ধ করিলেন। কিন্তু
ঐতিহীন পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হয় নাই কেন?
প্রাচ্যের কাল চামড়ার ভিতর যে এত
মূল্যবান দ্রব্য লুক্কায়িত থাকিতে পারে তাহা
জাখান পণ্ডিত সোপেনহোফের এবং ম্যাক্স-
মুলায়—অনিন পূর্বেই জানাইয়াছিলেন।
‘রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের মন্মথত্ব যে কত
দূর গভীর ও উদার তাহাও ম্যাক্সমুলায়
প্রচার করিয়াছিলেন। ‘আমেরিকার পণ্ডিত
পণ্ডিত রাইনহীমহোদয় প্রাচ্যজগতের জীবন
পানন সহজে প্রবৃত্তি লিখিতে বাইয়া চীন
জাপান ও ভারতবর্ষের চিত্রাবীরগণের মধ্যে
বিবেকানন্দকে অত্যুচ্চ আসনে প্রদান করিয়া-
ছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে একটা নোবেল
প্রাইজলাভ ভারতবাসীর কপালে কেন
ঘটিত? আইরিশ কবি ইয়েটসের বিদ্যা বুদ্ধি
ভাবুত্বা রসজ্ঞতা কি সোপেনহোফারদি
পণ্ডিতগণ অপেক্ষা বড় বেশী? ইহার স্থান
পাশ্চাত্য জগতে এই সকল গুণিজন অপেক্ষা
নিয়ে হইতে পারে—অন্যও সমান নহে—
কোন দিন সমান হইবে কি না অন্তর্ভ
ভবিষ্যৎকালি করিবার যোগ্যতা লাভ করিবার
জ্ঞত কবি ইয়েটসের কাব্য আলোচনা করি
নাই।

ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান ইহার মধ্যে
কি কোন ভেদ নাই? আমরা গত

সংখ্যায় বলিয়াছিলাম; “কর্তৃকগুলি ঘটনা-
চক্রের প্রভাবে, হিন্দু চিত্তাবীরকে একটি
ভারতীয় প্রাণবিক ভাষার আত্মবন
সেবককে—প্রাচ্যজগতের তথাকথিত অর্ধ-
শতাব্দীতে প্রস্তুত মানব সন্যাসকে—পাশ্চাত্য
জগৎ বৈঠকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম
পার্শ্বে সম্মান ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন। কি কি কারণে ইউরোপীয়
স্বাধীনতা প্রভাণ্ডগতের একজন চিত্তাবীরকে
একটি স্বতন্ত্রা করিয়া সম্মান ও গৌরব ভাষা
করিলেন, তাহার আলোচনা করিবার জ্ঞত
অন্যের ভবিষ্যতেই দার্শনিক ও ঐতিহাসিক-
গণ আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হইবেন।
অধিকন্তু ইতিহাসবিজ্ঞানের প্রকৃতি নিয়ম-
মারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্পদই মীন-
জাতিকে ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনধারার
অন্ত্যন্ত বিভাগ বুঝাইবার উপায় ও কেন্দ্র-
বিন্দু হইল, তাহার বিশ্লেষণ ও অঙ্গকালের
ভিতরই দেশবিদেশের পণ্ডিত-সমাজে আরক্ত
হইবে।”

দেখিতেছি—এই কারণগুলির অহুসাহান
পাশ্চাত্য জগতে এখনই আরক্ত হইয়াছে।
“ঘটনাচক্র”গুলির বিশ্লেষণ কোন কোন
ইংরাজ-সমালোচক—ইতিমধ্যেই শুরু
করিয়াছেন। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা না
করিয়া, কৃত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান না বুঝিয়া,
স্বদেশের জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থার্থ
বিচার না করিয়া পাশ্চাত্য জগতে কোন
কাজ ও বিস্তা হয় না—এ কথা পূর্বেই
বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিজয়-ব্যাপারটাও
যে এইরূপ একটি ঘটনা-চক্রের ফল, সাময়িক
কারণপুঞ্জের এক অভিব্যক্তি, দেশ-কাল-পাত্র-
বিবেচনার অন্ততম লক্ষণ, পাশ্চাত্য সমাজের
জাতীয় কৃতভবিষ্যৎ বর্তমান-বিচারের এক

দৃষ্টান্ত—তাহার পরিচয় পাশ্চাত্য সমালোচক-
গণ দিতেছেন। এক ব্যক্তি, ভারতমহাশ্যে
জাতিমহাশ্যে, এবং কালমহাশ্যে “novelty
of his nationality” এবং “time”
রবীন্দ্রনাথের সমাদর হইল সেই কথা বিশেষ
ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা
তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম—

A few years ago his name was
hardly known even to that small
band of watchers for new lights
upon the literary horizon. Then
came the talk about the Delhi
Durbar, and the Durbar itself; and
all that vague interest in Eastern
art, Eastern thought and Eastern
literature, which had been steadily,
if quietly, growing since the
opening up of Japan, concentrated
upon India. Hence the success
of Kismet, of pseudo-Oriental
dances, of the Russian ballet
and ‘Sumurun.’ The plain man
had pictures of India flashed
upon him nightly from the
bioscope; the businessman was
forced to think about the startling
change of capitals and speculate
upon its consequences in com-
merce; while people who had been
content to take their ideas about
this country from Kipling and
other English writers began to ask
for “inside information,” and to
seek in native literature itself for
the secret of India’s mysterious
power to stir the imagination of
Englishmen.

Tagore was fortunate in the time
of his introduction to London. He
found a public prepared to listen in

a mood of curiosity and goodwill, a public, too, somewhat impatient just now of the older forms of endeavour in art, and sufficiently keen to recognise ability. A larger proportion of our people than ever before has found its way to material satisfaction, and now has leisure for less substantial pleasure, which in a previous generation were crowded out of its life. London, the ancient city of the Philistines, as the artists of that generation regarded it, has now in fact become what Paris was to them, a place where any one with any pretensions whatever to "a new note" in literature and art may get a hearing and secure a coterie.

আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন :—

"And it is significant that the envoy should have come when he did; when the long misunderstanding of the East by the West that threatened to bring about further disaster should seem to be giving way. If ever an intermediary gifted with a tongue of delicate eloquence, and with a dual insight into the natures and temperamental ways of two peoples, was designed by fate for the office, it was surely Rabindranath Tagore. To be able to talk with him during his last visit was to gain a new intelligence of the spirit of India.

উক্তাংশের বহুত্ববাদ দিবার আর প্রয়োজন নাই। ভারতের হিন্দু-মুসলমান, এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ভবিষ্যতে আমরা বলিব। কেননা ইহা

বিশেষতাকীর নবযুগের কথা—কেবল তোমার আবার, হিন্দু মুসলমানের, ভারত-চীন-জাপান-পারস্তের নবযুগ নয়;—আজকাল জগতে যে সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে প্রাচ্যাপ্যাত্তা—এসিয়াইউরোপ-আফ্রিকা-আমেরিকা—সমগ্র জগৎও এই যুগান্তর-সামনের পর্ষা পরিষ্কৃত হইতেছে। হস্তরায় আমাদের কালমাহাত্ম্য, যুগমাহাত্ম্য, জাতিমাহাত্ম্য, সমাজমাহাত্ম্য—আমাদিগকে সবিশেষ আলোচনা করিতে হইবে—বিশেষতঃ পণ্ডিতেরাও আর দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। এখন কেবল এইটুকু জানিয়া রাখ যে, তোমরা জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র অবজ্ঞাই করিয়াছ এ কথা স্বীকার করা যায় না। তাহার-এবং অজ্ঞাত বহু ভারতবীরের সর্ধকনা করিতে তোমরা কিছুকাল হইল শিখিয়া। কেবল তাহাই নহে—দেশবিশেষে যাহাতে ভারতবাসী মাছেই মাথা তুলিয়া সম্মানলাভ করিতে পারে, ভারতবর্ষের গুণিগণ আত্ম হইতে পারেন, ভারতের কাৰ্যবিড়ালী পণ্ডিত তাহার যথোচিত মর্যাদা পাইতে পারে, স্বদেশে তাহার পূর্ণবাহুতা করিতে তোমরা অশক্ত হইতেছ। আমাদের এই আশু-সম্মান-বোধ আগরণের ফলে, এই জাতীয়-গৌরব-অনুভূতির উদ্বোধনে, এই নব-বিকশিত বীরপুঞ্জও গুণিদামদর-র প্রগতি প্রভাবে যে উক্ত স্বর্গ-সিংহাসন নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাতে উপলব্ধি হইয়াই কেবল রবীন্দ্রনাথ কোন—কৃত-বৃত্ত নগণ্য-সুখগা সকল ভারতবাসীই নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে দেশ-বিশেষে আর, সম্মান, সহায়কৃতি, পূজা আকৃষ্ট করিতেছেন। দেশের লোকের মনোবৃত্তি, দেশের গৌরব-বুদ্ধিতেই, দেশ-বিশেষের কণ-ক্ষেত্রে ও

চিন্তাসম্রাজ্ঞে ভারতবর্ষের কীৰ্ত্তি প্রচারেই; দেশ-মাতার আশীর্বাদ লাভ করিয়াই, এবং ভারতীয় বীরাণাথের স্নেহে অর্থাধীকার ও অজলি-গ্রন্থের ফলেই, রবীন্দ্রনাথ বিশেষে "সম্মানের তুলিয়া থাকিতে চাহেন থাকুন, আমরা তাহার ভক্তভাবে কিছুকাল তুলিয়া থাকিতে চাই থাকি, কিন্তু 'বশেষের লোক' তাহা কুলিবে না।

আমরা এত কথাও বলিয়া কলিলাম—ব্যাপারটা তলাইয়া মজাইয়া আমাদের বোঝা আবদ্ধক এই জ্ঞত। রবীন্দ্রনাথকে আমরা এতকাল যেভাবে আদর করিয়া আসিয়াছি—নোবেল-প্ৰাইজ লাভের খারা তাহার বিন্দুমাত্র বাড়ে নাই; আমাদের রবীন্দ্র-সমাদর কোন দিনই কম ছিল না—কবিরেও না।

১৪। অর্দ্ধজগতের তীর্থক্ষেত্র

বঙ্গদেশে সম্বন্ধে অমর কবি বিজ্ঞেন্দ্রলাল গাইয়াদিলেন :—

"উঠিল যেনানে বৃদ্ধ-আত্মা যুক্ত করিতে

মোক্ষ-স্বার
আজিও ছুঁচি অর্ধ জগৎ ভক্তি-প্রপত

চরণে যার
অশোক যিহার কীৰ্ত্তি ছাছিল গান্ধার হতে
জলশিখর।"

সেই দেশ ২৫০০ বৎসর পর্যন্ত মানবজাতির অর্ধন্যথাক নরনারীর মহাতীর্থ রহিয়াছে। দেশেখান ভবিষ্যতেও চীন, তিব্বত, শ্রাম, ব্রহ্মদেশ এবং জাপানের যুগান্ত যাবিবে।

বৃহদেবকে আমরা বঙ্গসম্মান বলিয়া থাকি। পূর্বকালে বাঙ্গালী বিহারী হিন্দুস্থানী বলিয়া কোন প্রভেদ ছিল না। সমগ্র আৰ্য্যভাৰ্ত্তে—উত্তর ভারতের সর্গজ—এক কাষা, এক আশ্রণ, এক চিন্তাপ্রবাহ প্রভাববিস্তার করিত।

বিবাহ, সমাজরঞ্জন, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য—সকল বিষয়েই আদান-প্রদান বেশ চলিত। হিন্দু সাহিত্যের ভৌগোলিক বিভাগানুসারে উত্তরভারত, মধ্যভারত, প্রাচ্যভারত, দক্ষিণভারত ইত্যাদি মোটামোট বিভাগই হিন্দুস্থানবাসীর বিচারনীর হইত। ভারতবর্ষের এই বিভাগগুলি গ্রীক পর্যটকেরা বর্ণনা করিয়াছেন—রোমীয় লেখকেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ইহার পরিচয় আছে। চীনপণ্ডিতকণও এই বিভাগেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু: প্রাচীন চিন্তার দ্বারা প্রাচ্যভারত এক অংশও সমাজরূপে পরিগণিত হইত। সেই প্রাচ্য-ভারতের এক অংশ বৃহদেবের জন্মভূমী—লীলায় অবতারগা হয়। ভারতের যে অংশকে বৃহদেব ধর্ম করিয়াছিলেন—সেই প্রাচ্যভারত এখনও বৌদ্ধদিগের মহাতীর্থ। এই জ্ঞতই তিব্বত-পণ্ডিত রায় বাহাদুর-শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই; ই মহাদেব শ্রীযুক্ত হরিরাম পালিত প্রণীত "হাদ্যের গম্ভীর"-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"হরিরাম বাবু তিব্বতী এবং সিংহলী সমাজ ও সম্রাট যুগলাদেশের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; বাস্তবিক শ্যাম ব্রহ্মদেশ, চীন তাহার মনোনিবেশ স্থল জাপান ও যবদ্বীপ যে বাঙ্গালী কণ ও চিন্তাবীরগণের কৃত্তবৈ-শাক্ষ্য বহন করিতেছে, সমগ্র এসিয়া-খণ্ডই ভারতীয় হিন্দুর লীলাক্ষেত্র ছিল এবং হিন্দু এই প্রভাববিস্তার বিষয়ে বাঙ্গালী অধ্যাপকও প্রচারক, শিল্পী, বণিক ও নরপতিই যে অগ্রণী ছিলেন, এবং সাহিত্য, কলা, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি ব্যাপারে অনেকের পথপ্রদর্শক ছিলেন, এই তথ্য স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আধুনিক বঙ্গের অবসর জন্মে উক্ত আশার বিমল

জ্যোতি বিকীর্ণ করিবে। বাঙ্গালার ইতি-
বৃত্ত আলোচনা এই কারণে অত্যন্ত আবশ্যিক।
বাঙ্গালী অর্ধ এশিয়ার শিকাগুরু। বঙ্গ-
দেশকে অর্ধ এশিয়াবাসী স্বর্ণ বিবেচনায়
এখনও পূজা করিয়া থাকেন।”

বুদ্ধদেবের জন্মস্থি কপিলাবস্ত্র (লুম্বিনী)
আজ স্বাধীন নেপালের অন্তর্গত। প্রাচীন
কালে উগাকে প্রাচ্যভারতের এক জনপদ-
রূপে বিবেচনা করা হইত। এখনও ইহাকে
ব্রিটিশভারতের গোরখপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত
বলিলেও ভৌগোলিক হিসাবে কোন ভুল
হয় না। এই গোরখপুর জেলাতেই আবার
বুদ্ধদেবের নির্বাণ-প্রাপ্তি হয়। আমরা ইতিহাসে
পড়িতাম—বুদ্ধদেব ভগবান্ বুদ্ধের ভৌতিক
কোথায় তাহা আমরা জানিতাম না।

সম্প্রতি, আজ দুই বৎসর হইল, লক্কা
মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান কর্ম-
চারী ঐশ্বর্য পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী এম. এ.

এম. এ. এম. এই কুশীনগর আবিষ্কার করিয়া
‘প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন—
গোরখপুর জেলার কাশিয়া গ্রাম প্রাচীন
কুশীনগরের অর্ধভাগ। এই কাশিয়াগ্রামে
একটি প্রকাণ্ড স্তূপের ৩৪ ফিট নীচে বুদ্ধ-
দেবের সমাধিচিহ্ন রহিয়াছে—তাম্রফলকে
লিখিত বর্ণনা অনুসারে এবং অক্ষাঙ্ক
আহুয়িক ত্রয়ের প্রমাণ বলে এই স্থানকে
পণ্ডিতব্রহ্মণ বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের স্থানরূপে
স্বীকার করিয়াছেন।

স্বতরাং একই জেলায় বুদ্ধদেবের জন্ম ও
মৃত্যু। মুসলমানের মক্কা ও ‘মদিনা যেমন
আরবদেশে—সমগ্র বৌদ্ধজগতের মক্কা ও
মদিনা সেইরূপ প্রাচ্যভারতের এই এক
কুশ জনপদে অবস্থিত।

এই নতুন আবিষ্কারের ফলে বঙ্গদেশও
প্রাচ্যভারতের সঙ্গে চীন জাপান জাম
ব্রহ্মদেশের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিবিষয়ে আরও
গভীর হইবে।



বেদান্ত-দর্শন কাহার রচনা? *

হিন্দুধর্মের চিরাগত বিশ্বাস যে মহাভারত
ভগবান ব্যাসদেবের রচনা এবং শাস্ত্রাধ্যায়ী
পণ্ডিতগণের পরম্পরা-গুহী ধারণা যে বেদান্ত-
দর্শনও ঐহারই রচনা। এই বস্তুল বিশ্বাস
শিথিল বা অশুনীত হইবে কিনা তাহা জানি
না; তবে, শাস্ত্রাশ্রয় স্বাধীনমাত্র এই ক্ষুদ্র
লেখকের শাস্ত্রপ্রমাণগুলি দীর্ঘ ভাবে প্রমাণ-
করিয়া মীমাংসা করিবেন, এ আশা হৃদয়া
নহে।

ভগবান ব্যাসদেবের অনেকগুলি নাম
লোকসমাজে প্রচলিত আছে; যথা—কৃষ্ণ-
দেয়ান, পারাশর্য, ব্যাস, সত্যবতী হৃত ও
বাদরায়ণ। প্রথম কয়টি নাম মহাভারত
স্থানে স্থানে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। শেষ নামটি
কেবল বেদান্ত-দর্শনে প্রাপ্ত হওয়া যায়—
মহাভারতে তাহা নাই। বেদান্ত-দর্শন সংক্ষে-
পে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে
মহাভারত তাহা ভগবদ্গীতার বিষয় আলোচনা
অবশ্যম্ভাব্য হয়, স্বতরাং আমরা সেই দুইটির
বিষয়ও কিছু কিছু বর্ণন করিব।

মহাভারত অগাধ সমৃদ্ধ। ইহার গর্ভে
নানাপ্রকার রত্নরাজি বিরাজিত। চোরা
করিলে অভীষিত রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।
ইহাতে অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, আবার
একই বিষয়ের অনেক প্রকার কথিত
অনেক আধ্যাত্মিক সংযোজিত করেন এবং
হইয়াছে। অপিচ ভবিষ্যৎ কথার প্রসঙ্গে
অনেক পরসূর্য ঘটনারও উল্লেখ আছে।
এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে

মনে একটা সংশয় উপস্থিত হয় যে এই সমগ্র
গ্রন্থখানি একব্যক্তি বা সময়েই রচনা কি না।
কিন্তু বৈচিত্র্য ও অসামঞ্জস্য দেখিয়া বোধ
হয় ইহার সমগ্র অংশ একব্যক্তির বা এক
সময়ের রচনা নহে। যে মহাভারত মুদ্রিত
আকারে বঙ্গদেশ, উত্তরভারত ও বোম্বাই
প্রদেশে দৃষ্ট হয় তাহা যে অন্ততঃ চারি বার
প্রতিসংস্কৃত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ
করিয়াছে, ইহার নিদর্শন মহাভারতের মধ্যেই
প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ
হয় যে, যে আদি মহাভারত ভগবান ব্যাসদেব
কর্তৃক রচিত হয়—তাহা অধ্যয়নবঞ্চিত
ছিল। † তাহা চতুর্ধিক্রমসহস্র শ্লোক যুক্ত
ছিল। তাহা সমগ্র প্রত্নতত্ত্বের অংশ করা হইয়া
ছিল। ইহাতে ব্যাসদেব অধ্যায়িতকই
অধিক স্রবিত করিয়াছিলেন। এই কারণেই
ঐদ্বিমাজে মহাভারতের এত অধিক প্রচার
ও সমাদর হয়। তারপর দ্বিতীয় সংস্করণ
ব্যাস-শিষ্য লোমহর্ষণের সময় হয়। ‡ তিনি
পুরাণ-ভাগ সংযোজিত করিয়া ব্যাসদেবের
ভারতের কলেবর বৃদ্ধি করেন। তারপর
তৃতীয় সংস্করণ মহারাণা জনমেজয়ের সময়
বৈশম্পায়ন কর্তৃক সংসাদিত হয়। তিনি
ভগবান ব্যাসদেব ও লোমহর্ষণের রচনায়
অনেক আধ্যাত্মিক সংযোজিত করেন এবং
ব্যাসদেবের সংক্ষেপ বর্ণনাগুলি বিস্তারিত
ভাবে বর্ণন করেন। তারপর চতুর্থ সংস্করণ
লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতিকর্তৃক কুলপতি

* বসীর-মাহিফা-পরিষদের ১৮শ বর্ষের ১ম অধিবেশনে গঠিত।

† উপাখ্যানবিশিষ্ট ত্র্যম্বকশাস্ত্র প্রোচ্যোক্তকৃষ্ণে। ১...১০০ আদি অন্তঃসম।

‡ তৎপরে রোমহর্ষণে পুরাণমণ্ডিত। ২১ মা—পাণ্ডি ১১৯ অধ্যায়-জন্মক-বাল্যকথা সংগ্রহ।

শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক সত্বে উপস্থিত ক্ষমি-
মণ্ডলীর সভায় সম্পাদিত হয়।

আমার এইরূপ উক্তি মহাভারতের অমু-
ক্রমিকা-পঞ্জীও সমর্থন করিতেছে। উহাতে
উত্তরার গর্ভপাত পর্যন্ত বিষয়ের বর্ণনা না
সৃষ্টী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ভগবান ব্যাসদেব
কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তিনি
বীষ পুত্র শুকদেবের শিক্ষার্থে ইহা সম্প্রদে-
সদ্বন্দ্বিত-লোকসমীচরণে প্রণয়ন করিয়া-
ছিলেন। * হুতরাং ভগবান ব্যাসদেবের
আদি মহাভারতে যে ঐ ঘটনা পর্য্যন্ত বর্ণনা
লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা বেশ বোধহইতেছে।
জনমেজয়ের সময়ে বৈশম্পায়নের কথনে যে
সম্বরণ হয় তাহাতে পরীক্ষিত-উপাখ্যান,
আত্মীকপর্ষ ও প্রভু আখ্যায়িকাগুলি
সংযোজিত হইয়াছিল। শৌনকের সময়ে যে
সম্বরণ হয় তাহাতে তাঁহার ভূগবংশ-বৃত্তান্ত
সংযোজিত হয়। তিনি যে জনমেজয় ও
আত্মীকের পরবর্তী তাহা ভূত মর্ত্য কর্তৃক
তাঁহার পূর্ণপুঙ্খ রূপকে কথিত বৃত্তান্ত
দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।† আবার
ধোয়পর্ষ ও আরোহ ধোয়া ও উত্তর
উপাখ্যান যে কোন সময়ে ইহাতে সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে তাহা ঠিক নিরূপণ করিবার উপায়
নাই, সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধযুগের সমকালে
ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে, কারণ উহাতে
কপলক নামক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর কথা আছে।
সে কপলক নামক কপলক রূপ ধারণ করিয়া
উত্তরের স্বর্ণকুণ্ডল অপহরণ করিয়া পলাইয়া-
ছিল ইহাও বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে
উত্তর জাতকোথ হইয়া মহাভারত জনমেজয়কে

নাশরণ ক্ষমণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছেন,
ইহাও নিশ্চিত হইয়াছে। তৎকালে যে
কোন সামাজিক সংঘর্ষের একটি ঘটনা
সংঘটিত হইয়াছিল এবং ইহা যে তাহার প্রতি
ইঙ্গিত তাহা বেশ বোধ হইতেছে।

আমার ক্ষুদ্র বৃত্তিতে এই সংঘর্ষ ব্রহ্মবাদি-
গণের সহিত জৈন বা বৌদ্ধগণের পৃথিবীযোগে
হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাভারত-পাঠে অনেক
বিষয়ের অবগতি হয়। ইহাতে কোথাও
স্পষ্টভাবে চরিত বর্ণিত হইয়াছে, আবার
কোথাও রূপকের-অভ্যাসের তাহাই লুক্কায়িত
রহিয়াছে। যেমন নাগ শব্দ ইহার অর্থ সর্প।
তদ্রূপ তাহাদের রাজা। সে পুরীকিত
রাজ্যকে দংশন করিয়াছিল। আবার সেই
যে তফশিয়ায় রাজত্ব করিত তাহাও
বর্ণিত আছে। তাহার ভগিনী জ্বরৎকাবর
পুত্র ব্রাহ্মণ আত্মীক তাহাকে জনমেজয়ের
অগ্নিকূণ্ডে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন
এই সকল অতি প্রাকৃতিক বিবৃদ্ধ ভাব দেখিলে
বেশ বোঝা যায় নাগপশু শব্দ নহে, তাহার
মহত্বাধিনিবিশেষ। উত্তরের কুণ্ডল-অপহরণ
ব্যাপারে এই নাগকে ক্ষপক বা নগবোধ্য
সন্ন্যাসী করা হইয়াছে, হুতরাং ইহা দ্বারা
লেখক যে নৈনদিগধর সন্ন্যাসীদিগের প্রতি
ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা বেশ বোধ
হইতেছে। নাগপশু সম্ভবতঃ ভারতে নূতন
ঔপনিবেশিক ছিল। তাহারা হয়তো সর্পপূজা
করিত বা সর্পকেই তাহাদের পূর্ণপুঙ্খ
বলিয়া স্বীকার করিত। তাহারা হয়তো
বড় কূটসম্মত ছিল তাই ব্রহ্মবাদিগণ
তাহাদের সহিত সদালাপ করিতেন না এবং

স্বীয় সমাজের অস্বভূজ করেন নাই। এই
কারণে হয়তো তাহারা জৈনমত গ্রহণ
করিয়াছিল।

হিন্দুমত পূর্বে বড় উদারনীতিক ছিল।
যে যে বিদেশীয় জাতি ভারতে আসিয়া
উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছে, হিন্দুজাতি
তাহাকেই আপনার সান্নিধ্যনি “অদে-
মিশাইয়া” অইয়াছে এবং তাহাকে হিন্দুধর্মের
অন্তরে জুক্ত করিয়া লইয়াছে। তাই আত্মীক
ব্রাহ্মণ সন্থান; তাই বজ্রবাহন ক্ষত্রিয়সন্থান।
পরবর্তী কালেও হিন্দুজাতির এই উদার
ভাব দৃষ্ট হয়। তাহারা “কুটিলপ্রকৃতি
চাপকা, মহাভাগ্যাবার পতঞ্জলি ও ছন্দশাস্ত্র-
কার শিল্পকে, নাগপশুর হইলেও, ব্রাহ্মণ
বলিয়া সম্মান করিয়াছে। আমার বোধ হয়
এই নাগপশু অধুনাতন কালে নাগসন্ন্যাসীরূপে-
পরিণত হইয়াছে। এইরূপে মহাভারত
হইতে অনেক ঐতিহাসিক ও জাতীয় তথ্য
প্রকাশিত ও রহস্ত বিশদীকৃত হইতে পারে।

স্বর্গীয় ব্রহ্মসমাজ তাঁহার রূপ-চরিত্রনামক
গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-ব্রহ্মসং-
উপলক্ষে মহাভারতের “যৌনিকতা ও
প্রক্ষিপ্ততা” সম্বন্ধে যে হবিচার-পদ্ধতি অবলম্বন
করিয়াছেন, তাহা ভূতপূর্ব বিচারক বন্ধিরেই
অদ্বন্দ্ব হইয়াছে। তাঁহার মতে মহাভারতে
তিন স্তরের রচনা বিদ্যমান। প্রথম স্তরের
রচনা ভগবান ব্যাসদেবের—ইহাতে প্রকৃত
ঘটনার বর্ণনা বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় স্তরের
রচনায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব বিবৃত
হইয়াছে। ইহা কোন ধার্মিক স্বকবির
দ্বারা ঘটনার লিখিত সামঞ্জস্য রাখিয়া
মহাভারতে প্রবেশিত করা হইয়াছে। তৃতীয়

রচনায় কৃ-কবির হস্তকৌশল দৃষ্ট হয়—ইহা
মহাভারতের ঘটনাবলীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত
নহে, ইহা না থাকিলে মহাভারতের কোন
অঙ্গহানি হইত না। ব্রহ্মসংস্করের মতে
ভগবদগীতাও দ্বিতীয় স্তরের রচনা—ইহা
কোন ধার্মিক স্বকবির কর্তৃক রচিত হইয়া
মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। *

ব্রহ্মসংস্করের বিচার-পদ্ধতি বোধগম্য হইতে ও
যুক্তির সমাবেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাহাতে
প্রক্ষিপ্তাংশের পাশ কাটাইবার ঘো নাই।
তাহা যুক্তি ও বিচারের নিকট আপনা আপনি
ধরা দেয়। তবে তিনি ভগবদগীতাকে
দ্বিতীয় স্তরের রচনা বলিয়া এবং তাহাকে
ভগবান ব্যাসদেবের কৃত হইতে বন্ধিত
করায় আমার মতে তাহার বিচারে একটু
বোধ স্পর্শ করিয়াছে। আমি তাঁহারই
প্রতিজ্ঞাবাক্য শিরোधार্য করিয়া এবং
তাঁহারই অহমত যুক্তি ও বিচার অবলম্বন
করিয়া এতদনিব করিব যে ভগবদগীতাকে
তিনস্তরের রচনা বর্তমান। প্রথম ভগবান
ব্যাসদেবের, দ্বিতীয় স্বকবির এবং শেষটী
তৃতীয় কবির। ইহা দ্বারা বৈদ্যসংস্করণেরও
রচনা সম্বন্ধে অনেক সহায়তা পাওয়া যাইবে।

প্রাচীন কবিগণের রচনা-প্রণালী এই যে
তাঁহার গৌরবজ্ঞানী বর্ণনেন না—একবারে
বিষয়ের বর্ণনা প্রারম্ভ করেন। মহর্ষি
বাস্কদেবীক রামায়ণে তাহাই করিয়া গিয়াছেন,
তবে আদিকালোত্তর পূর্ব চারি অধ্যায়ে যে
তিনি ক্রিজাৎ হইয়া দারবেক বর্তমান সময়ে
লোকপূজ্য, সভাশীল, ধার্মিক নৃপতি সম্বন্ধে
প্রশ্ন করিয়াছেন এবং মোকের উৎপত্তির
বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ তাঁহার রচনা

* ওত্তরাধ্বর্ষিকঃ কৃত্য নামকঃ কৃতবান্ মুনিঃ। ১০০, অমুকমণিকাব্যাসঃ বৃত্তান্তান্যাস দর্শনগাঃ। ইং
বৈশাখঃ পূর্ণঃ পূজ্যমধ্যপঞ্চমঃ। ১০৪। মহা—আদি, ১মঃ।

† জনমেজয়ন্ত ব্রহ্মসংস্করণে সর্গাণাং হিসাবঃ পূর্ণঃ। পরিত্রাণ চ ভীতান্যাস দর্শনাং রাজ্যদ্বর্ষিঃ। ১৮ ম—
আদি, ১১ অধ্যায়।

নহে; উহা তাঁহার পরবর্তী কালের বা তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজের রচনা হওয়াই খুব সম্ভব। বাম্বীকীর রচনা পঞ্চম অধ্যায় হইতে দ্বারা যাইতে পারে। এইরূপে ব্যাসদেবের মহাভারতের আরম্ভ ও নিরূপণ করিতে পূরী যায়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত মহাভারত অঙ্ক-মণিকা* যে উক্ত অধ্যায়ের ১১০ শ্লোক হইতে আরম্ভ হয় তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তাহাতে দুর্যোধনকে ক্রোধময় বৃষ্ণ, কটকে বৃষ্ণ, শূন্যকি শাখা, হুশাসনকে পুংশ-কল ও অমনবীৰ্য্য হুতরাষ্ট্রকে তাহার মূল বনা হইয়াছে, এবং পরবর্তী শ্লোকে যুগ্মতির সম্বন্ধে ইহার বিপরীত ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। তথায় যুগ্মতির ধর্ম্মের জন্মরূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং, তাহার মূল বৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাগার বৃষ্ণ অর্জুন, ভীম শাখা ও মাতীহুতগণ তাহার পুংশ ও কলরূপে পঙ্কিত হইয়াছেন। * এইরূপে ব্যাসদেবের মহাভারত যে আদিপর্ব্বের অংশাবতার পর্ব্বের ৬১ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক হইতে আরম্ভ হয় তাহা নির্দ্বাধিত করিতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের আরম্ভে বৈশম্পায়ন তাঁহার পুণ্যপাত্র গুরুকে প্রণাম ও স্তুতিবাদ করিয়া জনমেজয়ের, নিকট, কথা আরম্ভ করিয়াছেন।†

কিরূপে মহাভারতের উৎপত্তি হইল, মহাভারতে এ সম্বন্ধে দুইটী মত উল্লিখিত হইয়াছে। একটীতে অতিপ্রাকৃত বর্ণনা আছে। অষ্টমীতে সাধারণ কথাই বর্ণিত হইয়াছে। একটী যে ভগবান ব্যাসদেবের বহুকাল পরে লিপিবদ্ধ ও তাহার ভাব

সামান্যগণের প্রথম চারি অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এবং দ্বিতীয়টী যে ভগবান ব্যাসদেবের তিরোধানের অল্প-কাল পরে তাঁহার শিষ্য দ্বারা লিপিত হয় তাহাতেও সন্দেহ থাকে না। প্রথমটীতে সামান্যগণের দ্বারা ব্রহ্মাকে আসরে আনা হইয়াছে। ব্যাসদেব মহাভারত, বল্লনা করিয়া চিন্তা করিতেছেন ইত্যাবসরে পদ্মযোনি আশিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাস ব্রহ্মার সন্ধান করিয়া তাহাকে বসিতে আসন দিলেন। তিনি তাহাকে মহাভারত লিপিতে বলেন। তাহাতে ব্যাসদেব বলেন তিনি সেটী ইতিহাস কাব্য বানি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল ক্ষুদ্র লেখকের অভাবে লক্ষ্য লিখন কাধ্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইতেছে। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা তাহাকে গণেশ দেবতার সহায়তা গ্রহণ করিতে বলিয়া অন্তহিত হইলেন। কিন্তু ব্যাসদেব গণেশ ঠাকুরকে একটী অঙ্গীকরণের বন্ধ করিয়া লিপিতে বলেন। তাহা এই যে তিনি কিছু না বুদ্ধিমান লিপিবেন না। গণেশ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া ও উভয়ার পূরক লিপিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ব্যাসদেব জটিল অর্থবৃত্ত শ্লোক বলিলে গণেশদেবকেও চিন্তা-মগ্ন হইতে হইত। সেই অবসরে ব্যাসদেব আনুগত্য রচনা করিয়া লইলেন। এই জটিল শ্লোকলি ব্যাসকৃষ্ট বলিয়া কথিত। মহাভারতে তাহার ৮৮০০ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ ব্যাসদেব ও তৎপুত্র শকুনিব মাতা বোম্বেন। সন্ধ্য বোম্বেন কি না তাহার

নিশ্চয়তা নাই মহাভারতের প্রথম উৎপত্তি এইরূপ লিপিত হইয়াছে। * এই সময় যে ব্যাসদেব ঈশ্বরের পদবীতে আকৃত হইয়াছিলেন তাহা বেশ বোধ হইতেছে; কারণ তাঁহার কাব্য ইতিহাস লিখনে গুণেশ দেবকে উপস্থিত করা হইয়াছে। * ওমিত্তুক। 'পলেশ' শব্দও তাহাই প্রকাশ করিতেছে, কারণ 'কিন' শব্দ ঐতিহ্যে অর্থাৎ পূর্বপরা প্রবাদ অর্থেই অধিক প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়।

মহাভারত উৎপত্তির দ্বিতীয় মত এই যে ভগবান ব্যাসদেব স্তুতি শাস্তি হইয়া, নিত্য উদ্যত হইয়া নিরলস ভাবে এই গ্রন্থের রচনা তিনি বৎসরে পূর্ণ করিয়া। এবং ইহাই যে অধিক সম্ভব তাহার তুল নাহি কারণ মহাভারতে যে গভীর অধ্যাক্ষিপকত্ব, নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বর্ণন করা হইয়াছে তাহা যৎসামান্য ভাবে তদ্বৎ করিয়া বলিয়া মাইবার বিষয় নহে—তাহা দীর্ঘ শাস্ত্রভাবে বিবেচনার সহিত লিখিবার বিষয়; হুতরাং গণেশের লেখকত্ব-রূপ যে প্রবাদ তাহা অস্বীকৃত; কারণ এই উক্তি দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইতেছে। আদি পর্ব্ব ৬২ অধ্যায়ে উহা লিপিত আছে—
জিভিবৈ লঙ্কজানঃ কৃষ্ণবৈষণ্যনো নুনিঃ। ৬১
নিভোখিতঃ স্তুতিঃ শক্ভো মহাভারতমাদিতঃ।
তপানিয়মমাস্থায় কৃতমেতদংশমিণা। ৬২
জিভিবৈ লঙ্কজানঃ কৃষ্ণবৈষণ্যনো নুনিঃ।
মহাভারতমাস্থায় কৃতগামিন্যনুসং। ৬২
মহাভারতের বিষয়-সূচী ছই স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কমণিকার দ্বিতীয় পর্ব্ব

সংগ্রহ অধ্যায়ে। প্রথমটী ভগবান ব্যাসদেবের রচনা তাহা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। দ্বিতীয়টী অঙ্ক কোন পরবর্তী কবির রচনা। ইহাতে স্বর্গাংগোপ পঞ্চাঙ্গ মহাভারতের সকল বিষয়ের ধর্ম্মাবলিখিত সূচী লিপিত হইয়াছে। অপিচ ইহাতে মহাভারতের বিষয়ের বিস্তৃত পরি-বংশের ধারারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। হুতরাং পূর্ব সংগ্রহ অধ্যাটীতে যে বহুকাল পরবর্তী সময়ের রচনা তাহার সন্দেহ নাই।

অঙ্কমণিকা অধ্যায়ের "বদ্যভৌমং" ভণিতায়ুক্ত শ্লোকগুলির যেরূপ লিপিতাত্ম্য অর্থসৌহার ও প্রাঞ্জলতা দৃষ্ট হয় তাহাতে ঐগুলি যে ভগবান ব্যাসদেবের রচনা তাহার তিলান্বিত সন্দেহ থাকে না। অপিচ ইহাতে ব্যাসদেবের নিয়মের লক্ষ্যন ভাবও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হই হইতেও প্রকাশ হইতেছে যে ইহা স্বয়ং প্রণীত। কারণ তাঁহার স্বাধীন ভেদা—তাহাও বোধই কথার ভাব লইয়া ব্যাক্তব্যুপনিয়ম বদ্ধ হইয়াছে। এই দুয়ামুক্ত "অংশ ভগবদীতার অভ্যন্তরস্থ বর্ণিত বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে। যথা—

যদা শ্রেয়ঃ কল্যাণোদযায়িত
বুধোপপেদ্যে সীদমানেন্দ্রজনে বৈ।
রক্ষ্যং লোকানু ধর্ম্মাণ্যং শরীরে
তদা নাশংসে বিজ্ঞায়ত সন্ধ্যঃ। ১৮১
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনকে নিজ শরীরে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করেন তাহা গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। হুতরাং গীতাত্ত কথ্য অঙ্কমণিকা সমর্পিত করিতেছে। অতএব গীতায় যে ব্যাসদেবের রচনা তাহার সন্দেহ নাই।

* হুতরাংনো মহামহাঃ পঞ্চঃ কর্ণ শূন্যলিপ্ত শাখা। হুশাসনঃ কলপুপে সমুচ্চঃ মূলং রাভা।
হুতরাষ্ট্রোহমনবীৰ্য্য। ১১০ যুগ্মতির ধর্ম্মমতো ব্রহ্মজ্ঞানঃ স্বকোঃকল্মা ভাসনোহাংস্ত শাখা। মাতীহুতঃ পুংশমলে
সমুচ্চঃ মূলং ব্রহ্মা ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ।

† পুত্রপতির তে বীরা বদ্যভৌমঃ ধর্ম্মপরিঃ।

নিভোখিতঃ বিজ্ঞানো বৈদে ধর্ম্মবি চাষ্টমঃ। আদি ৬১ অধ্যায়।

* কাব্যলিখনার্থী গণেশঃ স্বভাভাঃ সুনো। এতদাত্ম্যতাং তংরাং জ্ঞানং বা নিবেশনঃ। ১৪। লেখকো-
ভারতপ্রাপ্ত ভবঃ ধর্ম্মবাহকঃ। মনোঃ প্রোদোমানো মনসা কলিতো হঃ। ১৭। যোগোপাচারোক্ত ভবেন-
বৃষ্ণঃ। মালিণি চণ্ডিঃ। ওমিত্তুক। গণেশোপা-
নিয়মঃ। ১২ অধ্যায়। তদা কৃতং মনিসংলীকৃতং ব্রহ্মাণা।
যাদনং প্রাজ্ঞজ্ঞাঃ অং মনিসংলীকৃতং। ১৮। অষ্টোক্তকলমহোনি অষ্টোক্তক শতানি চ। অং বৈদিক
তুকাং বৈদিকমণিকাং বৈদিক মনসা। ১৯।

গীতার জ্ঞান অর্থে সাংখ্য শাস্ত্রপ্রাক্ত তত্ত্ব বুঝাইয়াছে। ইহা ভগবান কপিল প্রথমে, বর্ণন করেন। কৰ্ম অর্থে বজ্র-কৰ্ম ও প্রাণায়ামবিধি যোগক্রিয়া উভয়ই বুঝাইয়াছে। যোগক্রিয়া প্রথমে হিরণ্যগত নামক গুণি প্রবর্তিত করেন। * তাহা বহুকালাগত হইয়া নব্বৈক হইলে ভগবান ব্যাসদেব তাহা পুনঃ প্রবর্তিত করিয়া যান—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে তাহাই অর্জুনকে বর্ণন করিতেছেন। পরিভাব্যর এই স্পষ্টতার কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায় না বরং ইহার সমর্থন মহাভারতের সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। যে যে স্থলে সম্যক জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে তৎসংস্থলে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে † অধিকন্তু কপিল-দেবেক নারায়ণ রূপেই বর্ণন করা হইয়াছে। যথা—

ঋতং চ সাংখ্যং নৃপতে মহাত্মা

নারায়ণো ধরিত্তেঃপ্রমোদয়ঃ

১১৪ শাস্তি ০০১ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের ১০৮ শ্লোকে ইহাও বলা হইয়াছে যে সাংখ্য মত বেদে-যোগে ও পুরাণে সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। ‡ এই সকল বিষয়ের বিরোধ উক্ত গীতার শেষ অধ্যায় ত্রয়ে ও বেদান্ত দর্শনে দৃষ্ট হয়। হুতরাং এই অধ্যায় ত্রয় যে ভগবান ব্যাসদেবের রচনা নহে, তাহা একপ্রকার অস্বাভাবিক হয়। তাহাতে পারে এবং এই অধ্যায়ত্রয়ের রচয়িতাই যে বেদান্তদর্শনের রচয়িতা তাহাও প্রমাণ

করিতে পারা যায়; হুতরাং সেই কার্যে আমরা অগ্রসর হইতেছি।

স্বকবি সলুগু ও সত্ৰপদেশকগণের একটি বিশেষ গুণ এই যে তাঁহারা বিষয়ের সমগ্র ও অংশ তদন্তভাবে বুঝিয়া পাঠক, শিষ্য ও শ্রোতার নিকট এমন বিশদভাবে প্রকাশ করেন যে তাহা তাহাদের দ্বারা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের দ্বারা প্রতিফলিত হয়। যদি দর্পণের আবিলতা বা জ্ঞানের অস্বচ্ছতা প্রযুক্ত কোথাও তাহা স্পষ্ট প্রতিভাতী না হয় তাহাও আবৃত্তিগণে পরিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে।

ইহা অনেকস্থলে প্রত্যাকীকৃত হইয়াছে; তাহার উদাহরণ আছে—কটিন হইতে কটিনতর অথ পাণ্ডার চিত্তাপ্রভাবে সমীকৃত হইয়াছে ইহা ঋতমেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

গীতার ভগবান ব্যাসদেবকে একাধারে স্বকবি, সলুগু ও সত্ৰপদেশকরূপে মুক্তিমান দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি গীতাপাত্র ভক্তিতে তর তর করিয়া পাঠ করিয়াছেন তাঁহার নিকট গীতাঃ জটিলভাবে ও স্পষ্টভাবে ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে।

পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে গীতার তিন-স্বরের রচনা দৃষ্ট হয়। আমার মতে গীতার প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ের রচনা ভগবান ব্যাসদেবের। ১৩শ হইতে ১৫শ এই অধ্যায়ত্রয় দ্বিতীয় কবির রচনা এবং শেষ অধ্যায়ত্রয় তৃতীয় কবির রচনা। ব্যাসদেব সাংখ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তৃতীয় কবি সাংখ্য-ভাবে সাংখ্যের নিন্দা না করুন পরোক্ষভাবে

* নাস্তিক বজ্র কপিলঃ পরমর্ষি স উজাতঃ হিরণ্যগর্তোযোগতঃ বজ্রা নাতঃ পুণ্যতমঃ ১০৮ শাস্তি ০৪১ অধ্যায়।

† নাস্তি সাংখ্যসংজ্ঞানঃ নাস্তি যোগসদা বলাঃ তাত্ত্বাস্তকৈ চত্বৈঃপুণ্ড্রাবিন্যাসো দ্ব্যুত্তরঃ ই শাস্তি ০১৬ অঃ জ্ঞানং সাংখ্যং পরম মতঃ ১০১। অদ্বৈতকৌস্তেয় সাংখ্যঃ মুক্তিসিদ্ধিঃ ক্রতিঃ ১০৬ শাস্তি ০০১ অঃ

‡ জ্ঞানং মনুষ্যং বুদ্ধিঃ মনুষ্যত্বং বারুণং বৈশ্বানরস্যাসৌম্যং তদ্বৈব যোগঃ।

ষট্টিপদ্যঃ বিবিধঃ পুরাণে সাংখ্যোক্তঃ তত্রিবিধঃ নারদঃ ১০৮ শাস্তি ০০১ অধ্যায়।

তাহা করিয়াছেন। ব্যাসদেব ২ম অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে—জীবাত্মা পরমাশ্রমকে একই ভাব বা পৃথক পৃথকভাবে অথবা প্রতি শরীরে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন স্বাকার করিয়া তাহার বহুই চিন্তাকর। এ সকলগুলিই জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত হুতরাং এ সকলই আমার (ঈশ্বরের) উপাসনা। জীবাত্মা যে পৃথক ও বহু ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের মত। এই মতই বেদান্ত দর্শন ব্যতিরেকে অন্য দর্শনকারগণ অস্বাভাবিক করেন। অত্যাচ্ছ উপনিষদেরও এই মত

একপুখা সর্বকৃতাত্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিষ্কৃতং ১

একপুখা সর্বকৃতাত্তরাত্মা

একং রূপং বহুদা যঃ কেরোতি ২

২২ কঠোপনিষদ ২য় বকী

যথা স্বদীপ্তাং পাবকায় বিম্বলিঙ্গা

সহস্রাঃ প্রভঃকন্ত স্বরূপাঃ।

তথাক্ষরাৎ বিবিধঃ গোমাতাভাঃ

প্রজায়েন্তে তত্র চৈবাপ্যনিত্যঃ ১

মুক্তকোপনিষদ ২য় মুগু ১ম অঃ

স (ব্রহ্ম) এমোহস্তুকরতে বহুদা জায়মানঃ।

৬ ঐ ১ ২ ৩

একই সর্বব্যাপী পরমাশ্রম পৃথক পৃথক জীবাত্মাই বহিঃপ্রতিকৃত স্বরূপ হইয়া বহুভাবে বিরাজ করিতেছে। যেমন প্রলীপ অগ্নি হইতে তাহার প্রতিকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শূলিঙ্গ উৎথিত হয়, সেইরূপ প্রতিজীবাত্মা পরমাশ্রম হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই লয় গ্রস্ত হয়। তৃতীয় কবি এইরূপ পৃথক

জ্ঞানকে রাজসিক জ্ঞান বলিয়াছেন। ব্রহ্মস্বয় অগ্নয় ও অব্যয় পরমাশ্রম। অবিভক্তভাবে প্রতি শরীরে বিরাজমান এইরূপ জ্ঞানই সার্বিক জ্ঞান। আর কৃৎসনস্বরের ক্ষুদ্র বস্তুতে তত্ত্ব-বহিষ্কৃত ও হেতুশূন্য আবেশরূপ যে জ্ঞান তাহাকে তামস জ্ঞান বলিয়াছেন। † ভগবান ব্যাসদেব জগির ত্রায় উদার মতই শ্বশ্বরগণ করিয়াছেন। যে ব্রহ্ম দৃষ্টিগত; তাহার সম্বন্ধ কোন ব্যক্তি বিশেষের কবিত মতই যে অস্ত্র দর্শনকারগণ অস্বাভাবিক করেন। অত্যাচ্ছ যথার্থ ও সমশূন্য এরূপ স্পষ্টী কেহ করিতে পারে না। যে সেরূপ অহমিকা করে তাহার যে সম্যক জ্ঞানলাভ হয় নাই তাহা পূজ্যপার উপনিষৎকার গুণিগণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কঠোপনিষদের ব্রহ্মানন্দ নামক দ্বিতীয় বকীর ৬৭, অহংকায় এই ভাব রহিয়াছে। যথা—

অসংস্রব স ভবতি; অসদ্ব্রহ্মেতি বৈদ চেৎ।

অতিব্রহ্মেতি চেদবেদ; সম্বস্মেন ততো

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ।

অন্য বা ইদমগ্রাব্যবনীং। ততো বৈ সদ-

জ্যাত। তদাত্মানং স্বয়মহুত; তস্মাৎ ৩ং

স্বকৃতমুচ্যতে ইতি।

যদি ব্রহ্মকে অসৎ ও সৎ উভয়ই জ্ঞান, তাহা

হইলেই তাহাকে সম্যক জানিয়াছে ব্রূহিতে

হইবে।

পূর্বে অসৎ ছিল, তার পর অসৎ হইতে

সৎ উৎপন্ন হইল। সৎ বা ব্রহ্ম স্বয়ং উৎপন্ন

হইয়াছেন। এই উভয় রূপ চিন্তাই স্বচিন্তা।

ব্রহ্মসদ্ব্রহ্মেই যখন স্ববিগণের এইরূপ স্বাধীন চিন্তা

* জ্ঞানব্রহ্মে চাপায়ে যজ্ঞস্তা মনুষ্যসাতঃ।

একেনৈব পৃথকেনৈব বহুদা বিবর্ততা মুংঃ।

† সর্বকৃত্যে নৈকৈকঃ ভাবমব্যবনীকতে। অভিক্তঃ বিকল্পে তত্ত্বজ্ঞানঃ বিজি সার্বিকঃ। ২০ পৃথক্বেন ত্ব ব্রহ্মজ্ঞানঃ নাসাত্মাব্যয় পৃথক্বেন। বৈজি সর্বকৃত্যে তত্ত্বজ্ঞানঃ বিজি সার্বিকঃ। ২১ যৎকৃত্যং বহুদা বহুদা কাহো সর্বকৃত্যঃ। অত্যাচ্ছবহুদা চ তত্ত্বজ্ঞানমুচ্যতে। ২২ গীতা ১৩শ অধ্যায়।

তখন তাঁহার সহিত প্রতি জীবাব্যাসা বা বিশ্ব-
ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃত সম্বন্ধ আছে তাহাও নিশ্চিত-
রূপে নির্ধারণ করিবার যো নাই—কেবল
এইরূপ বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া কৃত্রিম হইতে
হইবে যে তিনি এই প্রাকৃতিক জগতের
অন্তর্যাসী, তাঁহাকে তদ্ব্যবহায়ে ধ্যান করিলেই
প্রাপ্ত হওয়া নাইবে। ইহাও উপনিষদের
কথিত্যই উক্তি। * হুতরাং কবির ও
ব্যাসদেবের এই বলবৎ প্রমাণ বলে আমরা
বলিতে বাধ্য যে তৃতীয় কবির রচনা সাক্ষীতা-
মূল-নুষ্ঠিত, উহা কবির মত হইতে পারে না,
উহা যোগাযোগের প্রবল-সংসর্গ-কালের রচনা।
তৎপর্যন্তীয় প্রেক্ষিত করা হইয়াছে।

ব্যাসদেব গীতার ২য় অধ্যায়ের ৪২ হইতে
৪৪ শ্লোকের মধ্যে বেদের কৰ্ম্মব্যবস্থাও নির্দা-
করিয়াছেন—যে হেতু উহা অশ্রুত ও বহ-
শাখাপ্রযুক্ত হুতরাং মোক্ষপ্রাপক নহে। উহা
পাতিতাত্ত্বানানৌগুণ্য এমনি পুণ্ডিত (বলিলে
চট্কার) অর্থবোধে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন,
এবং ভোগসমুচ্চ যজ্ঞমানবিক্রমে স্বর্গস্বপ্নের
প্রশান্তন দেখাইয়া এমনি বিচার করিয়া
রাখিয়াছেন যে, তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি হৃদ-
পরাহত হইয়া পাড়াইয়াছে। এই কুরূপে
নারায়ণ অর্জুনকে জিওময় দেব ত্যাগ করিয়া
নিউগুণ্য বা ব্রহ্মতত্ত্বের হইতে উপদেশ
দিয়াছেন।† যে যজ্ঞকর্মে হিংসা আছে ইহা
তাহারই নিন্দা। নতুবা ব্যাসদেব তর অধ্যায়ের
২ম, ১৩ ও ১৫ শ্লোকে অশ্র-ব্রহ্মের প্রশংসা

করিয়াছেন; বরং তানা করাই প্রতাব্য ইহাও
বলিয়াছেন (৩১৩)। ইহাও কপিল মত।
তিনি প্রথমে যজ্ঞ গোবিন্দ-নিমেষার্থে চেষ্টা
করিয়া যান। শাস্ত্রিপূর্ণ ২৬৭ অধ্যায়ের গো-
কপিলীয় সংবাদে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।
তাঁহার চেষ্টা বোধ করি সফল হইয়াছিল,
কারণ তদবধি ব্রহ্মবাদী মর্ধগণের উপনিষদ
রচনায় সন্মানবিশেষ দর্শন এবং যজ্ঞ গোবিন্দ
রহিত করেন। বোধ করি তদবধিই গো
যজ্ঞের মাতা বলিয়া সম্মানিত হইতে আরম্ভ
হন এবং তদবধিই নারায়ণ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি
হয়। ইহারা "গো-ব্রাহ্মণের রক্ষা করিতেন
এবং গো-নামে স্বীয় নামকরণ করিতেন।
গোত্রে, গোপিল, বার্ঘগণ্য নামগুণি তাহার
উদাহরণ। কপিল দেবে যে গোটিকে প্রথম
রক্ষা করেন, বোধ করি তদবধিগীতা পাণ্ডী
তদবধি কপিল নাম গ্রহণ করিয়াছে। কপিল
দেবের পঞ্চাবংশ তদ্বের ভাব সম্পূর্ণ ও শুদ্ধঃ
উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে তাঁহার আদি
গ্রন্থ স্মৃতি দ্বিগুণ্যের হয় না। অশ্রুত তৎ-
সমাস নামে জ্যোতিষ-বিষয়যুক্ত ও ২২টা ক্ষুদ্র
বাক্যে গ্রন্থিত একটি ক্ষুদ্রগ্রন্থ দেখা যায়,
তাহাই ভগবান কপিল দেবের রচনা বলিয়া
বোধ হয়। ইহাতে যে বিষয়গুলি আছে,
তিনি তদ্ব্যপার উপদেশ দান করিয়াছিলেন।
ইহার বিস্তৃত টীকা জৈনক নির্মাণ যতি কর্তৃক
রচিত হয়। তাহাতে সাংখ্যকারিকা হইতে
বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ঈশ্বর কৃষ্ণের

রচিত। এই গ্রন্থই কপিল দেবের সাংখ্য
বলিয়া টীকাকার, মেঘাতিথি ও শূদ্রাচা-
র্যাকার করিয়া গিয়াছেন। এই সাংখ্য
সম্প্রদায় ২য় আখ্যায় বেদের মোক্ষপ্রাপক গুণ
নিরাকৃত হইয়াছে এবং ব্যক্ত বা জ্যোতিষ-
তত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞানই মোক্ষসাধক
তাহা প্রমাণিত করা হইয়াছে। তবে বৈদ
যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের তুল্য তাহা স্বীকার করা
হইয়াছে। যথা—

দৃষ্টব্যমুশ্রীকঃ স হুতব্রহ্মিক্যতিশয়যুক্ত।

তদ্ব্যপারিতঃ শ্রেয়ান ব্যক্তব্যক্তজবিজানুং ৪২
বেদে যে মোক্ষসাধক নহে তাহা উপনিষদেরও
মত। বৈদকে তথায় অপর বিদ্যা বলা
হইয়াছে।

হুতরাং ভগবান ব্যাসদেব যে বৈদকে
মোক্ষপ্রতিবন্ধক বলিয়াছেন তাহা উপনিষদ
সমর্থিত করিতেছে। তৃতীয় লেখক কিন্তু
কর্ম্মকাণ্ডবল বৈদই সমর্থন করিয়াছেন।
জ্যোতিষোদ্যমি যান্ত্রে পশুহনন সমর্থন করায়
কপিলদেবে যে বৈদকে "অশ্রুত" বলিয়াছেন,
হুতরাং বৈদেদ্বিষ্ট "কথা" অশ্রুতবৃত্তন করা
উচিত নহে, এই লেখক জৈমিনির মতে
তাহাই সমর্থিত করিয়াছেন। যথা—

তাত্ম্যং দোষাবহিত্যকৈ কৰ্ম্ম প্রাথম্য-গীমিণ্য।
যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম ন তাত্ম্য মিত্যচ্যপের ১৮৩
এই জৈমিনির কথার আভাস থাকায় ইনি বে
তাঁহার পরবর্তী তাহার সন্দেহ থাকিবে
না। ধর্ম্ম-মীমাংসা-গ্রন্থকার একজন জৈমিনি
আছেন। ব্যাসদেবের শিষ্য আর একজন
জৈমিনি, তাঁহার জৈমিনি-ভারত-ভূমিত্য অথ
জৈমিনি। এই তিন জনই যে এক ব্যক্তি
তাহা বলিতে পারি না। যদি এক ব্যক্তি হইল

তাহা হইলে ব্যাসদেব যে তৎশিষ্য জৈমিনির
জ্ঞা ও বচন উদ্ধৃত ও সমর্থিত করিবেন
তাহা সম্ভবপর নহে। ইহাতে কাল-
বিপর্যয় (anachronism) দোষও আশ্রিত
পড়িতেছে। হুতরাং ইহা দ্বারাও প্রমাণিত
হইতেছে যে এই রচনাটা ব্যাসদেবের নচেৎ।

ব্যাসদেব সম্যগী ও যোগীকে এক পন্থায়
স্থাপিত করিয়াছেন। হুতরাং কবিত্ব
হইয়াছে যে সম্যাপ ও যা যোগ ও তাই।
যাহার মনে সংকল্প আছে সে যোগী হইতে
পারে না ইহাও বলিয়াছেন।—

সুনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মকলং কার্য্য কৰ্ম্ম কবোতি যঃ।
স সম্যগী চ যোগী চ ন নির্যয়নাক্রিম্যঃ ৬১
যং সম্যাসমিতি প্রাহযোগঃ তং বিদ্বি পাওব।
ন হ্যনন্ততপঃকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ৬২
ব্যাসদেব জ্ঞানী, যোগী, নিষ্কামকর্ম্মী
সকলকেই যজ্ঞকারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন
এবং তাঁহার সকলেই যে সনাতন ব্রহ্মকে
প্রাপ্ত হন ইহাও বলিয়াছেন—

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পশুপিসতে।
অন্ত্যায়বপ্নো যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবেবা পশুহবতি ৪২৫
অব্যয়ান্তপোষ্যজ্যোগ্যজ্ঞাতাপরে।

স্বাক্ষায়জ্ঞানজ্ঞানং যতঃ সূরিতব্রত ৪২৮
সর্গেশ্বপ্নো যজ্ঞো যজ্ঞো যজ্ঞপিতকল্পায়ঃ ৪৩০
যজ্ঞশ্রীমততুল্যো যান্তি ব্রহ্মসনাতনঃ ৪৩১

তৃতীয় লেখক সম্যাপ ও ত্যাগ এক পন্থায়-
কৃত্ত করিয়াও সম্যগীকে ফল প্রদানে বঞ্চিত
করিয়াছেন—ফলপ্রাপ্তি যজ্ঞের অন্ত্যায়ী
ভাগেই ফেলিয়াছেন। ইহা কবির জায়
কল্প ও সত্য ভাবন নহে, ইহা বিতর্ককারীর
ছলোক্তিই জায় হইয়াছে। এখানে যে স্পষ্ট

* তদ্রূপা দ্বিবেদা বহুবৈদঃ সারবেদোহল্লংকরঃ শিবা কল্পে ব্যাকরণঃ নিরুক্ত ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা বাহ্য উপকরণবিধ্যমতে। ৫ সূত্রকপিলনির্ম্ম ১ম সূত্র ১৩

* গ্রন্থাবো যদ্ব্যবহায়া ব্রহ্মতত্ত্বকামনুসৃতঃ।

অন্যজ্ঞেন বেদোবা শরৎকল্পোক্ত্য ভবেৎ ৪ সূত্র ২য় ২য় পং.

একো বশি সর্গকৃত্তারহায়া এবং জ্ঞানং যদ্ব্যবহায়া কবোতি। তদ্ব্যবহাঃ বেদোহল্লংকরঃ দ্বীপোহবেদোঃ ১২ কপিলনির্ম্ম ২য় বাকী।

† বাসদায়িক্য দ্বিবেদকেই ব্রহ্মসনাতন। বহুবাহা হানতাপ সূত্রোহব্যবহায়াসিমাং ৪৩। যমিমাং
পুনিমাতা যাতঃ প্রব্রজ্যাপিতকঃ। বেদবৈদতঃ সারঃ নাজ্ঞানজ্ঞানজ্ঞানঃ ৪২। কামজ্ঞানঃ পূর্ণপাণ্ড
কর্ম্মকল্পোহবা। বিদ্বাঃশিববহবাঃ জ্যোতিষ্যাপিতঃ প্রতী ৪৩। জ্যোতিষ্যাপিতঃ প্রতী ৪৩।
বাসদায়িক্য দ্বিবেদে ন বদীহতে ৪৪। ব্রহ্মজ্যোতিষ্য বৈদোহল্লংকরো জ্যোতিষ্য। নিম্নোদ্যো নিম্নোদ্যো
নিম্নোদ্যো জ্যোতিষ্য। ৪৫

গৌরামিল দেওয়া হইয়াছে তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তাঁহার রচনা যথা—
কামান্যং কণ্ঠ্যং দ্বাদশ সন্ধ্যাসং কব্যায়ে বিদুঃ।
সর্গকর্মফলতাগাং প্রাছত্তাগাং বিতরণাঃ ॥ ১৮২
বজ্রনামতপঃ কৰ্মন ত্যাজ্যং কাব্যমেবতঃ ॥ ১৮৩
বজ্র কৰ্মফলত্যাগী সত্যাগীভাষীযতে ॥ ১৮১১
অনিষ্টমিত্তং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কণ্ঠ্যং ফলং।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু স্যামিনাং

কচিত্ ॥ ১৮১২

শেষ স্লোকে ব্যাক্ত-জ্ঞতি ভাব ও লুপ্তায়িত রহিয়াছে।

ব্যাসদেব মায়া-অর্থ প্রকৃতি ব্যাখ্যাছেন। ইহা উপনিষদের অদ্বৈত মত। বাহ্যের আকার আছে তাহাই সত্ত্ব-রজ-তম ত্রিগুণ-বিশিষ্ট। যাগা গুণের অতীত তাহাই নিগুণ; তাই ব্রহ্ম নিগুণ ও তাঁহার স্ফুট প্রকৃতি গুণময়ী।

দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দ্রবতয়া।
মামেব মে প্রপন্নাস্তৈ মায়ামেত্যা

তত্রস্তি তে ॥ ১৮১৪

নাহং প্রকাশঃ সর্গতঃ যোগমায়া

সমাবৃত্তঃ ॥ ১৮২

এ স্থলে যোগমায়া-অর্থ কৃষ্ণ মনঃ; উহার অর্থ প্রকৃতির প্রদত্ত বা জনিত অজ্ঞানতা। মায়াশ্চ প্রকৃতিঃ বিদ্যাদামিনম্ভ মন্থেশ্বরঃ।
তত্ত্বাবয়বকৃত্তৈস্ত ব্যাপ্তং সর্গবিন্দুং জগৎ ॥ ১০
যেতাবতর উপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়।

তৃতীয় লেখক মায়া-অর্থ চিন্তকের অযোগ্য-পালক দৃষ্টই ব্যাখ্যাছেন।—

ঈশ্বরঃ সর্গকৃত্তানাং হৃদশ্চেহজ্ঞানং তিষ্ঠতি।
জ্ঞানময়ঃ সর্গকৃত্তানি যদ্ব্যক্তানি মায়া ॥ ১৮১৩

উপরিউক্ত মতগুলি পূর্ণপরাং তুলনা করিয়া অসুধাধান করিলে পাঠকগণ বেশ ব্যস্তিত পারিবেন যে গীতার শেষ অধ্যায়ের ব্যাসদেবের রচনা নহে, কাহারও প্রতি ঘেদ-ভাব চরিতার্থ করিবার জন্ত ও বহুল প্রচার মানসে ব্যাসদেবের পবিত্র গীতাপাশে প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। ইহা যে পরবর্তী রচনা তাহার আর একটা বলয়ঃ প্রমাণ এই :—

গীতার একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন ভগবানকে বলিতেছেন যে তিনী তাঁহার প্রতি বহুগ্রহ করিয়া যে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত করিলেন তাহাতে তাঁহার মনোহর হইয়াছে, স্বতরাং এই উক্তির পরে অর্জুনের অজ্ঞান নৃতন বিষয় জ্ঞানিবার আর স্থল বা অবকাশ থাকে না। যদি ইহার পরে কেহ নৃতন কথা বলে তাহা যে এই রচয়িতার রচনা হইতে পৃথক রচনা তাহা স্বতই আশ্বপ্রকাশ করিয়া দেয়। অপিচ দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে কাহ্না গ্রন্থের সমাপ্তিরও নিদর্শন রহিয়াছে।

মদহুগ্রহাঘ্য পরম গুণদ্ব্যধ্বান্বজিতঃ।

যংযদ্যোক্তং বচন্তেন মেহেহাহোহং

বিগততা মম ॥ ১১১

যে তু মধ্যমতিনিঃ যথোক্তং পূর্ণপাসতে।
প্রদধানা যংপরমা ভক্ত্যন্তেষ্টহীতং মে

প্রিয়াঃ ॥ ১২২০

তৃতীয় লেখক অনেক সঙ্গণে পাদবিক্ষেপ করিয়া আশ্চর্যগোপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু রক্তকণ্ঠ হইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার রচনা শেষে লিখিয়াছেন যে, আমাদের এই সংবাদ যে অধ্যয়ন করিলে সে আমার জ্ঞান-যজ্ঞে আহুতি করিলে।— উপদেশ

গ্রন্থাকারে থাকিলেই তার অধ্যয়ন সম্ভব। স্বতরাং ইহাও গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়া গীতায় প্রাবিষ্ট হইয়াছে, ইহা মুখে মুখে রণহুল উপদিষ্ট হয় নাই। এ স্থলে অসামঞ্জস্য লোম স্ফিষ্টরূপে বর্ণমান রহিয়াছে।

ব্যাসদেব অবতার-বাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার অবতার-শব্দ মূখ্য পৌণ ছই অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়। ইহার মূখ্য অর্থ জন্ম গ্রহণ করা। ইহঁর গৌণ অর্থ ভগবানের শরীর পরিগ্রহ করা, বাহ্য সাধারণতঃ দশট, কিন্তু ভগবতের মতে তরিতাই চল্লিশটি। যিনি ব্রহ্মণ্য জগৎ বিশ্বাস করিতেন, যিনি সর্গকৃত্ত ভ্রমের অস্তিত্ব অবলোকন করিতেন, যিনি বহুজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শূদ্র, গো, কুকুর ও চণ্ডালের মধ্যে কোন প্রভেদ দর্শন করিতেন না সেই ভগবান ব্যাসদেব-যে অবতার-বাদ অছমোদন করিবেন ইহা দ্বারা তাঁহার কথার পৌরুষাণ্ড্য সামগ্র্যই রক্ষিত হইয়াছে। গীতার ১০ম অধ্যায় বর্ণিত যে ঐশ্বরিক বিকৃতি ইহাও অবতারবাদের একটি অঙ্গ। স্বতরাং ইহা দ্বারাও প্রকাশ করা হইয়াছে যে উক্ত অধ্যায়ে প্রোক্ত যে নে মহাযগণের মধ্যে ঐশ্বরিক বিকৃতি অদিক মাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে তাঁহারও ঈশ্বরের অস্বাভাবিক গণ্য হইতে পারেন। অধ্যায় শেষে নারায়ণ তাঁহার কথার নিদর্শনার এই বলিয়া দিয়াছেন যে যাহা বিকৃত্তমূলক শ্রীমান্ সম্পদমূলক ও সম্পূর্ণ তাহাই তাঁহার অংশ বলিয়া অবদূর্য করিলে। অথবা অদিক কণ্ঠ্য অদিক নাই, ঈশ্বর এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এবং জগত তাঁহারই একাংশ ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে। ভগবানের বচন যথা—

পরিজাপায় শাধন্যং বিনাশায় চ দ্রুততঃ ॥
• ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবায় যুগে যুগে ॥ ৪৮

যেন (জ্ঞানেন) তুভ্যতপেণেব

অসামান্যান্যথা ময়ি ॥ ৪৩৪

সর্গকৃত্তাচ্ছতাত্ম্যাকর্মপূর্ণন লিপ্যতে ॥ ৪১৭

বিদ্যা-বিনয়সম্পাদে ব্রাহ্মণে গবি ইহুতিনী।

শুনি চৈব খপাকে চ পণ্ডিতাঃ

সমদর্শিনঃ ॥ ৪১৮

ইহঁর বৈজ্ঞানিক সর্বোদ্যোগ্য সামো

স্থিত মনঃ।

নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম তত্বাদ ব্রহ্মনি

তে হিতঃ ॥ ৪১৯

বহুদ্রব্যবিকৃত্তমৎসঙ্গ শ্রীমদ্বজ্রিতমেব বা।

তত্ত্বদেবাব্যবচ্ছৎ যং মম তেজোহংশঃ

সম্ভবঃ ॥ ১০৪১

অথবা বহুইনতেন কি জ্ঞাতেন তদ্বজ্রনি

বিত্ত্যাহমিদং ক্লেশযমেকাশেন হিতোজগৎ

১০৪২

তৃতীয় লেখক অবতার ও মূর্তিপূজা উভয়েরই

নিশা করিয়াছেন—তাঁহার মতে একবস্ত বা

কোন কার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তির প্রতি

ব্রহ্মের অষ্টৈক্য ও তত্বহীন আরোপ তামস-

জ্ঞান। (১৮২২) এই স্লোক ও ইহার

পূর্ণাঙ্গী শাস্ত্রিক ও রাজসিক জ্ঞানের অর্থমূল

দৃষ্টী স্লোক পূর্ণে উদ্ধৃত করিয়াছি।

(২১৪ পৃঃ পাদটীকা)। ইহার কথার পূর্ণপূর্ণ

ঐক্য নাই। যদি সর্গকৃত্তেই অব্যয় ব্রহ্মের

একত্বভাবই সার্বিক জ্ঞান হইল তাহা হইলে

অবতার বা মূর্তিতে কি ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই

বলিতে হইবে? স্বতরাং ইহার এ কথাতেও

অস্বাভাব্য-দোষ রহিয়াছে। ইনি ১১শ

অধ্যায়ে ৪র্থ স্লোকে দেবপূজাকে সার্বিক

পূজা বলিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে

এই দেবপূজা দ্বারা তিনি কি ব্যাখ্যাছেন?

* অধোপাস্যে চ য ইমং ধর্ম্যঃ সাধারণাংগোঃ।
জ্ঞানব্রহ্মেন তেনোদ্বিষ্টঃ স্যাদিত্যে মতঃ ॥ ১৮। ১০

ইহা ধারা সাকার ভাব ছাড়া অল্প কিছু মনে আসিত পাবে না, হুতরাং ইহা পরম্পরেক বিরোধ-উক্তি হইল। অতএব স্বমির কথা দূরে থাকুক, এই রচনা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির নহে এবং ইহা যে জগীশপারশর হইয়া লিখিত তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তাহার-যে বিশেষ কারণ ছিল তাহা সময় নির্ধারণকালে প্রকাশ করিব।

দ্বিতীয় লেখকের সহিত ব্যাসদেবের অধিক মতবৈষম্য নাই। ইনি কেবল কতকগুলি অধিক নূতন পারিভাষিক কথার প্রয়োগ করিয়াছেন মাত্র। ব্যাসদেব শরীর আত্মা বুঝাইতে দেখ, প্রহরী, শরীর, শরীরী, (২,৩,১৮,৩০) শব্দ ব্যবহৃত করিয়াছেন তৎসংস্থলে ইনি কেবল কেবল শব্দেব ব্যবহার করিয়াছেন। (১৩১-২) ব্যাসদেব পুরুষ অর্থে জীবাত্মা, পরম পুরুষ অর্থে পরমাত্মা বুঝিয়াছেন। (৮১০, ১২) দ্বিতীয় লেখকও তাহাই বুঝিয়াছেন তবে বেশী ভাগ এই যে তিনি দেহস্থ আত্মাকেও পরমাত্মা বলিয়াছেন আর অন্ধকে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন (১৪১৪-১৭)। ব্যাসদেব 'লিখিয়াছেন প্রকৃতি দৈবের অধীনা হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছে অথবা ব্রহ্ম প্রকৃতিতে পরিণাম হইয়া ভূত চরাচরের অভিব্যক্তি করিতেছেন। দ্বিতীয় লেখক প্রকৃতির ব্রহ্মনিরপেক্ষতার আদ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং অন্ধকে অন্ধতা ও উভয়কে অনাগি বলিয়াছেন। উভয়ের বচন, যথা—

প্রকৃতিঃ স্বামবষ্টতা বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ৯৭
মহাপ্রাণেশ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচর ৯১০
প্রকৃতিঃ চ কখানি ক্রিয়মানানি সর্বশঃ ।
যঃ পশতি তথ্যানানম কৰ্ত্তারম স পশতি ১৩০২২
প্রকৃতিঃ পুরুষকৈব বিদ্যানাদী উভাবপি ১৩০২৩
কার্যাকরণকৰ্ম্মণ্যে হেতুঃ প্রকৃতিঃ কচ্যতে ১৩০২৪

ভগবান, ব্যাসদেব ও দ্বিতীয় কবি ব্রহ্মকে সং, অসং, ভূই বলিয়াছেন। ইহা ধারা উপনিষদের প্রতি সম্মান করা হইয়াছে। অমৃতং চৈব মৃত্যুং সৰস্বাহমর্জ্জুন ৯১০
অনন্ত দেবেণ জগদ্বিধা
ব্রহ্মকরণ সদসং তৎপরাং যং ১১৩৭
অনাদিমৎপরাং ব্রহ্ম ন সংতমাসদুচ্যতে ১৩০২
উপনিষদের বচন ২১৫ পৃঃ উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি।

দুজন্মে নিভণ ব্রহ্ম সখ্যদেই এই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার স্তম্ভ প্রকৃতি ও সত্ত্ব বস্তুতে এ কথা বাটবে না; তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মই বলবান হইবে অর্থাৎ সং হইতে সত্ত্বের উৎপত্তি ও অসত্ত্বের অসংপত্তি এবং অসং হইতে সত্ত্বের বা অসত্ত্বের উৎপত্তি হইবে না এই নিয়মমত কাণ্ড হইবে। এই কারণে বিরোধ নিরাসনের জন্ম ব্যাসদেব ২য় অধ্যায়ের ১৩৭ শ্লোকে তাহাও লিখিয়া দিয়াছেন

নাসত্তো বিদ্যাতে ভাবে না ভাবে বিঘাতো
সত্যঃ ।

উভয়ারপি দৃষ্টোহস্তন্যন্যোস্তদ্বর্ণশিভঃ ।
একমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবির রচনা তুলনা করিয়া বোধস্বপ্নের রচয়িতাকে অসংগত করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। গীতার ১০ম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—
ধ্বিভববহাগীতঃ ছমোতিবিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈষ্টব হেতুম্ভাবিনিষ্ঠৈঃ ৥

অর্থাৎ ধ্বিগণ নানা প্রকার ছন্দে ধারা কের ক্ষেত্রজ সম্পদে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন এবং (অমরা) তাহাই নানা প্রকার হেতু প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মসূত্র ধারা নিশ্চিত করিয়াছি। ধ্বিগণ উপনিষদে আত্মা সম্বন্ধে বর্ণন

করিয়াছেন ইহা যথার্থ কথা। তাহার পঞ্চবিংশতম সন্ধকেও বর্ণন করিয়াছেন। তাহার সাংখ্যপ্রোক্ত তত্ত্বগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কিছু বলেন নাই, ব্রহ্মসূত্রে তাহা হইয়াছে। ইহাতে সাংখ্যদর্শন ও তৎসংকারী যোগদর্শনের ঋণ আছে। তত্ত্বগুলির প্রতি অনাধা আছে। প্রকৃতির ব্রহ্মনিরপেক্ষ স্বজনকর্তৃক ভাবটী নিরাকৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সেই প্রকৃতি পুরুষ ও সাংখ্যপ্রোক্ত পঞ্চবিংশতত্ত্বের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ বিসম্বাদী মতের মধ্যস্থলে ব্রহ্মসূত্র বা তন্মাত্রাবিশিষ্ট শ্লোকের স্থান বড় সন্দেহাত্মক বলিয়া বোধ হয়। যদি ইহা দ্বিতীয় কবিরই রচনা বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে তাঁহাকে বিরোধভাবী উদ্ভাস্ত বলিয়া নিশ্চিত করিতে হয়। কিন্তু তাহার রচনায় সেদুর্ভাবের মনে স্থান দিবার কোন স্থান নাই হুতরাং এই শ্লোকটী কোন সূতিকারী কর্তৃক এখানে স্থাপিত হইয়াছে ইহা না বলিলে আর গত্যন্তর নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৩ম শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে সর্ষকদ্বয়ের সাধন পাচটি কারণের আবশ্যক। ইহা সাংখ্য-বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—
পটকতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি শিষ্যে সর্ষকদ্বয়াং ।
তায় পরের শ্লোকে অগ্নিষ্ঠান, কঠা, ককণ, চেষ্টা ও বৈব সেই পাঁচ কারণের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সাংখ্য অর্থে সম্যক জ্ঞান। কৃতান্ত অর্থে শ্রেষ্ঠ বা স্থনিশ্চিত মত বা সিদ্ধান্ত। এখানে কৃতান্ত শব্দ সাংখ্য-সম্প্রদায়ের বিশেষকরণে ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।

সম্যক জ্ঞানের আর শ্রেষ্ঠতা হইতে পারে না তাহা স্বয়ংই চরম জ্ঞান; হুতরাং লোকপ্রসিদ্ধ সাংখ্য শাস্ত্রের প্রতি যে কৃতান্ত বিশেষণটী ব্যবহৃত হয় নাই তাহা একরূপ নিশ্চিত বলা যাইতে পারে, অতএব সাংখ্য কৃতান্ত যে এই শ্লোকেরই রচিত কোন গ্রন্থ তাহার সম্ভব নাই। পাছে কৌশল দ্বীপ লোক-দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অভিনাদি সুলে উৎপাতিত হয় এই কারণে তাহার অর্থের সন্দেশ জোড়ায় অধ্যায়ে অল্প কবির রচনায় স্থান দিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। বিনা কারণে এইরূপ অনুমান কেহ গ্রহণ করিতে না পারেন তজ্জন্ম তাহাদের অবগতির জন্ম ও সংশয় দূর করিবার জন্ম লিখিতেছি যে এই সাংখ্য কৃতান্ত প্রোক্ত কারণ-প্রচলিত সাংখ্যকারিকা বা সমুচিততৈ নাই তবে তাহা বেদান্তদর্শনে দৃঢ়তার সহিত কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায় ২য় পাদের ৩৭ হইতে ৪৩ সূত্রের মধ্যে উহা আলোচিত হইয়াছে।

যদি বেদান্তদর্শন গীতার তৃতীয় কবির রচনা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য পড়াইতেছে যে তিনি তাহা নিজ নামে প্রচার করিলেন না কেন, এরূপ কুট ব্যবহার কেন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? সাংখ্য ও যোগের মত সর্বব্যাপী-সম্মতভাবে গৃহীত হইয়াছিল—উপনিষৎকার ঋগিগণও তাহা বহুমান করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রহ্মসূত্রকার উপনিষদের স্ব অর্থ কখন আর কু অর্থই কখন, আমরা স্পষ্টতার সহিত বলিব যে কঠোপনিষদের ১ অধ্যায় তৃতীয় বসী ১০ ও ১১ শ্লোকে এবং ২য় অধ্যায় তৃতীয় বসী ৭৮ শ্লোকে যে অবাক্ত শব্দ ব্যবহৃত

হইয়াছে তাহা। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা প্রধানকেই বুঝাইতেছে। এই ভাবের একটি শ্লোক গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে দৃষ্ট হয়, তাহার প্রকৃতির উল্লেখ নাই এই মাত্র প্রভেদ। এইরূপ অস্থির পক্ষকে পড়িল স্বার্থপর ও গুণভাসিদ্ধিমান মনুষ্য যে পথ অন্বেষণ করিয়া থাকে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি ও তাহাই করিয়াছিলেন। মহাভারতে অনেক বিরোধ উক্তির আশ্রয় দান করা হইয়াছে এবং সে সকলগুলিই ভগবান ব্যাসদেবের রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তৃতীয় কবি তাঁহার বিরুদ্ধ রচনার অন্তর্নিবেশ ও গ্রন্থের নাম উল্লেখের এমন স্ব-অবসর কোন পরিত্যাগ করিতে মাইবেন? তিনি যেসকল স্ট্রকারী ছিলেন ব্যাসদেবের স্মিত্য গ্রন্থের উল্লেখ থাকিলে তিনি স্বীয় রচনা তাঁহার রচনার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেও বোধ করি ইতস্তত করিতেন না, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ছুইটা অন্তরায় ছিল। প্রথম ব্যাসদেব পূজ্য ঋষি, তাঁহার আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে নিজ রচনা প্রবেশ করাইতে ধর্ম্মজ্ঞা মার্গেরই বাষকতা উপস্থিত হইবার কথা। দ্বিতীয় আধ্যাত্মশাস্ত্র বলিয়া ভগবদ্গীতা অনেকের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন, সুতরাং ব্যাসদেবের নিম্নলিখিত উক্তি অবিকৃত ভাবেই আশ্রয় পথ্য চলিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে। দ্বিতীয় লেখকের রচনায় গ্রন্থের আভাসের ইঙ্গিত আছে, এই কারণেই তৃতীয় লেখক তাঁহার রচনায় নিজ গ্রন্থের অন্তিমের আভাস দিয়াছেন।

দ্বিতীয় কবি ১৫শ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি সকলের দ্রব্যের অবস্থিত; তাহা হইতেই তত্ত্ব, জ্ঞান ও অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সকল বস্তুদের তিনিই

একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, তিনি বেদান্তকার ও বৈশিষ্ট্যবিৎ।*

সর্ব্বত্র চাং হৃদি সন্নিবিষ্টৌ
মন্তঃ স্তুতিজ্ঞানমপোহনং চ।
বৈদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমব বৈদ্যো
বোহাঙ্করুণেবিরেব চাং ॥

এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করিলে তিন প্রকার অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান সম্বন্ধে যাহা তাহা ত স্পষ্টই রহিয়াছে। ভগবান ব্যাসদেব সম্বন্ধেও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে কারণ তিনি গীতাসম্প্রদায় বেদান্ত বা উপনিষদের মধ্যে বেদবিভাগ করায় তিনি বেদবিৎও হইলেন। এমন দেখিতে হইবে তৃতীয় ব্যক্তি কে হাজার প্রতি এই সকল গুণই প্রযুক্ত হইতে পারে। এই তৃতীয় ব্যক্তিই হইতেছেন গীতার দ্বিতীয় কবি স্বয়ং। আমরা উপনিষদের মধ্যে দেখিতে পাই যে বৃহদারণ্যকে নূতন নূতন ভাবের কথা বিবৃত করা হইয়াছে। এই পঞ্চম অধ্যায় ও অষ্টমের কথাই সেইরূপ নূতন কথা বিবৃত হইয়াছে। কঠোপনিষদে এই অংশবিশেষে ব্রহ্ম জ্ঞান হইয়াছে কিন্তু ইহাতেও ভাব জ্ঞান-আরো অধিক ভাব ও সংযোজিত হইয়াছে। ইহা যে বেদে সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক উক্তি, তাহাতে ভুল নাই। যাহা হউক এইরূপ নূতন নূতন ভাবের উৎস বৃহদারণ্যকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের রচনা। তিনি স্বর্গ্যাসদেবের আরাধনা করিয়া সূর্য যজুর্গেদে, শতপথ ব্রাহ্মণ ও এই উপনিষদ লাভ করেন, ইহা তিনি জনক রাজার নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। তিনি মহাভারত-বক্তা বৈশম্পায়ন মুনির ভাগিন্যেয় ছিলেন। মাতুল-ভাগিন্যেয় কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটে। ভাগিন্যেয় বেদ-উপনিষদ লাভ করিয়া জনক রাজার সভায় তাঁহার

বেদ উচ্চারণ করিয়া মাতুলের অস্থিরতা করিবার জন্য যজ্ঞের অর্ধেক দক্ষিণা সংগে আহারণ করেন। দেবল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, কৈল, যমজ্ঞ ফাল্গুন্য কথিয়া চাখিয়া অধিষ্ঠান। অশ্বিচ, জনক রাজা এবং তাঁহার সভাসদগণও তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিলেন না, প্রভুতে তাঁহার সম্মাননাই করিলেন। এই আধ্যাত্মিক শাস্ত্র-পর্ব ১৩৮ অধ্যায়ে স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছে।* রোমহর্ষণ পুরাণেও ইহা বর্ণন করিয়া যান। পুরাণে যখন এই কলহের বিষয় স্থান প্রাপ্ত হইল, তখন ইহা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, সেই যাজ্ঞবল্ক্যই গীতার দ্বিতীয় কবি; কারণ উপরি উক্ত শ্লোকে লুকাইত তৃতীয় ব্যক্তির আকার প্রকার সৌম্যবৃত্ত ইহার সহিতই সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যাইতেছে। স্তুতি অর্থে ধর্ম্মশাস্ত্রও বুঝাইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য যে ত্রায়ী প্রচারিত স্তুতির রচয়িতা, ইহা বেশবিখ্যাত; ইহা স্তুতি-উক্তি সেই গুরুতর কারণটি অমূল্য-গীতাংশ অংশবিশেষ ও সংস্কৃতভাষার রচনা-গাপেক, সুতরাং তাহা প্রকাশিত হইলে বেদান্ত-দর্শনের ও গীতার তৃতীয় স্তরের রচনা নথদর্পণের দ্বারা প্রতিভাত হইবে। অশ্রমে অহংগীতা-পূর্ণাধ্যায় গুরুশিষ্য-সংবাদে ৪০ অধ্যায়ে অনেকগুলি ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত ধর্ম্মতত্ত্বগুলি অহংগীতা রচনার পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল। সে ধর্ম্মতত্ত্বগুলির ভাব এই—কেহ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কেহ করেন না, কেহ তাহার সম্বন্ধে সংশয়বিত, কেহ সকল বিষয়েই বিশ্বাসবান। কেহ জগতের অনিত্যতা,

বিশ্বীর ভাব অহংপ্রতি হইয়া তাহাকে কলুষিত করিবার উপক্রম করিতেছিল। ইহাতে তিনি মনে-মনে ঈর্ষান্বিত হইতেন, কিন্তু বিক্রমশালী বিশ্বরী রাজার দোষিতও প্রীতপ্রেম, প্রকাশভাবে কোন প্রতীকার করিতে অক্ষম হইয়া এই কুটজাল বিস্তার করেন। তিনি ইহাতে সনাতন-ধর্ম্মের রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ঋষির পবিত্র নামে চিরকালের জন্য কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া দিলেন। এখন আপামর সাধারণের চূড় বিবাস হইয়াছে যে সমগ্র গীতা ও বেদান্ত-দর্শন ভগবান ব্যাসদেবেরই রচনা। এ বিবাস সহসা অপনোদিত হইবে কি না, তাহা জানি না; তথাপি কর্তব্যজ্ঞানে স্বধী-সমাজের নিকট শাস্ত্রযুক্তি-সমর্থিত আমার এই ক্ষুদ্র মতটি প্রকাশ করিলাম, তাঁহার নিরপেক্ষ বিচার করিবেন, ইহা আশা করিতে পারি।

উপরিউক্ত সেই গুরুতর কারণটি অমূল্য-গীতাংশ অংশবিশেষ ও সংস্কৃতভাষার রচনা-গাপেক, সুতরাং তাহা প্রকাশিত হইলে বেদান্ত-দর্শনের ও গীতার তৃতীয় স্তরের রচনা নথদর্পণের দ্বারা প্রতিভাত হইবে। অশ্রমে অহংগীতা-পূর্ণাধ্যায় গুরুশিষ্য-সংবাদে ৪০ অধ্যায়ে অনেকগুলি ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত ধর্ম্মতত্ত্বগুলি অহংগীতা রচনার পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছিল। সে ধর্ম্মতত্ত্বগুলির ভাব এই—কেহ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কেহ করেন না, কেহ তাহার সম্বন্ধে সংশয়বিত, কেহ সকল বিষয়েই বিশ্বাসবান। কেহ জগতের অনিত্যতা,

* অতীতকালে বেদ-সমিধি: সোক্তরা বি। ১০ কৃৎসনতপস্বী চৈব গণেশাদি দ্বিজগণ। বিজ্ঞানার্থে সপিত্যয়া মাতুল্যে মাহার:। ১১ নিবাতা দেবরূপাশি ততোহপি কৃতানহ:। পবনক্শিপাচার্য্য বিদেহে মাহার:। ১২ ব্রহ্মদেব চৈবৈব তথাভাঃকিরাণি। ১৩ পিতা: সে বিদিত্তিশ্চৈব ততোহব্রহ্মনিজ:। ২০ ধনপাচ চ আগ্নানি যজুর্গোনি: মনয়ন। তত্বেব রোমহর্ষণে পুরাণমবগারিত:। ১

† গৌরবায় শলভাচরিত্রাণ্ডাধেনদ্র (কে) সেন্যো রাজসদয়ে। ১৪শ অধ্যায়।

কেহ নিত্যতা, কেহ মায়ারূপ, কেহ বিয়মানতা স্বীকার করেন। কেহ জীবাশ্ম-পরমাখ্যাকে অস্তিত্ব, কেহ ভিন্ন, কেহ ছই মিশ্রিত ভাবে চিন্তা করেন। কেহ সকল জীবাশ্মকে ব্রহ্মের সহিত এক, কেহ পৃথক্ চিন্তা করেন; আবার কেহ প্রতি শরীরে জীবাশ্মা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া তাহার বহু স্বীকার করেন। কেহ আহার, কেহ উপবাস, কেহ কৰ্ম, কেহ নিষ্কৰ্ম বা প্রশান্তি, কেহ ভোগ, কেহ মোক্ষ, কেহ হিংসা, কেহ অহিংসা ইত্যাদি মতের উপাসনা করেন। * এই মতগুলি বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যায় যে, তখন সনাতন মতের পার্শ্বে মাংখ-যোগ, ভ্রায়-মীমাংসা, বৈশেষিক মতের সহিত লোকায়ত, চার্বাক, বৌদ্ধ জৈন মতও বিরাজিত ছিল। এতগুলি বিসংবাদী মতের সমাবেশ দেখিয়া শিষ্যের চিত্ত ব্যুথিত হইয়া শ্রেয়-নির্দ্ধারণে অপরূপ হয়। তাই তিনি সে সময়ে গুরুকে প্রশ্ন করায় তিনি শিষ্যকে অহিংসাই সৰ্ব্বধর্মের সার বলিয়া বর্ণন করিলেন। গুরু মতে অহিংসাই অস্বাধিক, কৃত্যতম, শ্রেষ্ঠ ধর্মলব্ধ এবং ইহাই মোক্ষপ্রাপক জ্ঞান। যাহারা হিংসাপরায়ণ, যাহারা নাস্তিক, যাহারা লোভমূল্যবাস্য, তাহারা নরকগামী হয়। বখা—

অহিংসা সৰ্ব্বভূতানামেতৎ কৃত্যতমং মতং ২১।
এতৎ পদমহুবিষয়ং বরিত্তং ধর্মলক্ষণং ।
জ্ঞানং নিঃশ্রেয় ইত্যাহুঃ স্বা নিশিত-
ধর্মিনঃ ২২।

হিংসাপারক যে কেচিত্তি যে চ নাস্তিকবস্তুতঃ
লোভমোহমদামুক্তা তে বৈ নিরয়গমিনঃ ২৩।
অথ, ২০ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মবাদিগণই এই সকল মত দ্বয়ে পৌষ্য করিতেন। মন্ত্রস্তে ব্রাহ্মণা এব ব্রহ্মজাত্যন্তবর্ধনিনঃ ২৪।

৪০ অধ্যায়
হুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অহুগীতার রচনা সময়েই ব্রহ্মবাদিগণ স্বীয় স্বীয় স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াও দ্ব্যুত হইতেন না এবং তাহাদের সহকারিগণও তাহা দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন না। ইহাই যে শাস্ত্র দাত্ত কামাশীল ব্রাহ্মণের প্রকৃত আচরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অবস্থা চিরকাল স্থায়ী হইয়া নাই। তাহাদের উপেক্ষা হেতুই ধর্মপরগণ আত্মগোপন করিয়া তাহাদের ধর্মগ্রন্থে স্বীয় স্বীয় ধর্মমত অঙ্ক-প্রবেশিত করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত দেশে প্রতিপত্তি লাভ করে, ধর্মের সেই মধ্যস্থ সময়ে নাগার্জুন নামে জৈনক প্রভাবশালী মণ্ডলেশ্বর রাজা কাম্বীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তিনি ব্রহ্মবাদিগণের অসি-প্রণীত চিকিৎসা-গ্রন্থে প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়া তাহা প্রতি-সংস্কৃত করেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়া-ছিল যে, ধর্মবিষয়ের রচনা ভিন্নরূপ হইয়া তৎকালে প্রতিগম্যবর্ত্তার রচনা স্থানলাভ করে। হুতরাং ধর্মের মধুর সরল ওজস্বিনী ভাষার আশ্রমে বঞ্চিত হইয়া ব্রহ্মবাদিগণের ভ্রায় আশ্রয় বাহিত হইতেছিল। ধর্মবিগণের প্রাচীন অবিবেচনাতত্ত্ব ও হৃদয়ে যে গভীর পাণ্ডিত্য, অহমদ্বিগতা ও গণেশ্বো নিহিত ছিল, তাহার আংশিক আমরা প্রতিসংস্কৃত চরক ও হৃদয়ে পাইয়াও বিশ্বয়বিশ্ফারিতকোচন

মুদ্র হইতেছি, ধর্মের আশ্রয় গ্রন্থ পাণ্ড হইলে আমরা যে কি আনন্দলাভ করিতাম—তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। নাগার্জুন পণ্ডা অপেক্ষা গদ্যেরই পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তিনি চিকিৎসা-গ্রন্থের পণ্ডা ছাটিয়া গদ্য বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে 'ভবতি চারক শ্লোকঃ' লিখিয়া ধর্মের রচনা উদ্ধার করিচ্ছেন। মহাভারতেও যে এইরূপ হইয়াছিল তাহা আদি পর্বে লিখিত ছই বশাবলী দৃষ্টে বুঝা যায়—একটা প্রাচীন রচনা; দ্বিতীয়টা গদ্যে রচিত আধুনিক রচনা। এই গদ্যে অহুবংশ শ্লোকের প্রতি হৃদয়ের ভ্রায়, নকত আছে। ২৫ অধ্যায়ে গদ্যবিশাবলীতে শাস্ত্রের একটি গুণের উল্লেখ করিয়া অহুবংশের প্রতি সন্তোষ প্রকাশিত আছে। ইহা কিন্তু মূল মহাভারতে নাই; ইহাতে বোধ হয় প্রতিসংস্কারের ভাঙনামু তাহা স্থানভেদ হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই ধর্মবিগণ ও ধর্মগ্রন্থের ধর্ম-সময়ে মহাভারতে সনৎস্বজাত-নামে আর একটা গীতা স্থানলাভ করবে। ইহা 'ব্রহ্মবাদিগণের রচনা বলিয়া বোধ হয় না—ইহা কোন জৈন বা বৌদ্ধ যতি বা শ্রমণের রচনা—লিপিকৌল ও ভাষার অভিভাব্যনাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সনৎস্বজাত-গীতা হুতরাষ্ট্রের প্রামাণ-দ্রুতকরণ করিত। প্রথমে ইহার আরম্ভ সন্দেহই একটি বিসদৃশতা লক্ষিত হয়। হুতরাষ্ট্র বিদুরকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিবৃত করিতে বলিলে তিনি শ্রুত্যানি বলিয়া সে বিষয়ে তাহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। মহাভারতের অন্তঃস্থলের সহিত ইহার একা হয় নী। মার্কণ্ডেয়-সমতা অধ্যায়ে শ্রুত্যানি মিথিলাবাসী ধর্মব্যাধ ও ব্রাহ্মণকে ধর্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছিল, ইহা লিখিত আছে।

তারপর ভগবান ব্যাসদেব সঙ্কয়ের মুখেই ভগবদ্গীতার বিষয় হুতরাষ্ট্রকে প্রবণ করাইয়া ছিলেন—তিনি হুতরাষ্ট্র ছিলেন। হুতরাষ্ট্র ধর্মতত্ত্ব যে ব্রাহ্মণ 'যাতিরেকে অন্ত কেহ বিবৃত করিতে পারিবে না এ ধারণা ও বিশ্বাস ব্রহ্মবাদিগণের ছিল না, অন্ততঃ অহুগীতার রচনাকাল পর্যন্ত এই বিশ্বাসই দৃঢ় ছিল। তারপর হয়তো তাহা শিথিল হইতে আরম্ভ হয় এবং সনৎস্বজাত-রচনার পূর্বে হয়তো শ্রুত্যানি ধর্মালোচনা হইতে বঞ্চিত হয়; তাই রামায়ণে শ্রুত্যানি শব্দকণ্ঠের নিধনে ধর্মপ্রাথম্যের প্রতিপালনের কথা স্তব্ধ হওয়া যায়। জৈনগণ যে শ্রুত্যানিকে যুগের চক্ষু অবলোকন করিতেন, তাহা জৈনমন্দিরে তাহাদের প্রবেশ নিষেধ হইতে প্রতিপন্ন হয়। তাহাদের মুখে এই প্রথা সনৎস্বজাত রচনাকালেও বলবতী ছিল তাই বিদুরের ধর্মতত্ত্ব বিবরণে অক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা ধারা ব্রহ্মবাদিগণের তাৎকালিক রীতিনীতির অজ্ঞতাও প্রকাশিত হইতেছে।

সনৎস্বজাত-গ্রন্থের ছুটী সংস্করণ দুট হয়। একটি হুতরাষ্ট্রের সংস্করণ, আর একটি পণ্ডিত ও কালীবৎ বেদান্তবাসী শ্রমণ প্রকাশিত, শব্দরচনাসম্পন্ন দ্বিতীয় সংস্করণ। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হয়। মহাভারতের সংস্করণে পাঁচটা অধ্যায় ও এই সংস্করণে চারিটা অধ্যায় রহিয়াছে। তারপর অধ্যায়ের মধ্যে অবাস্তব অস্বাভাবিক ভেদও বর্ধমান রহিয়াছে। স্ববিধা অধ্যায়ে আমি উভয়গ্রন্থ হইতে প্রামাণ উদ্ধৃত করিব।

কঠোপনিষদের (২য় বজ্রোক্ত) যম-নাটিকতার উপাখ্যানের মূর্ত্তা ও অমরত্বের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। যমরাজ তথায় বলিয়াছেন যে, যাহারা জন্মান্তরে বিশ্বাস

* উল্লেখ্যব্রহ্মজ্ঞোক্তে বৈতন্যস্তি চাপরে। কেচিং বশশিষ্টাঃ সৰ্গাঃ নিঃসাপেরমাধারৈঃ । ২ অণ্ডিত-
নিজানিত্যকো নাস্ত্যতীতি চাপরে। একান্তঃ বিধেত্যকো যাস্মিন্মিষ্টাঃ চাপরে ৩ একমেব পৃথক্ ভাজে
বহুবলি চাপরে। যাহার কেচিৎস্বজাতঃ কেচিৎসাপেরে রজাঃ। কৰ্ম কেচিৎ বলাদগ্ধিঃ প্রশান্তিঃ চাপরে জনাঃ । ৭
কেচিৎসাপেরঃ প্রশান্তিঃ কেচিৎ ভোগান পূর্ণ্যবিলান। অহিংসানিরতভাজে কেচিৎসিদ্ধাসাধারণাঃ । ...ইহে ধর্ম
ইহে ধর্ম ইত্যেবং বুদ্ধিতে জনাঃ । ৮ অণ্ড ৪৯

করে না, স্তত্রাং আচার্য্য অমরত্ব স্বীকার করে না তাহার ঠাওয়ার বশে আসিয়া নিগ্রহ প্রাপ্ত হয়। সনৎযজ্ঞাতে মৃত্যু একরূপ অস্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি প্রমাদকেই মৃত্যু বলা হইয়াছে।

প্রমাণং বৈ-মৃত্যুসংগ্রহীতি।

১ম অ ৪, মহা উদ্ ৪২। ৪

ব্রহ্মবাদিগণের মতে যমরাজ অশ্বারাজ বলিয়া কথিত। এখানে তিনি কোষ, প্রমাদ ও মোহের প্রবর্তক বলিয়া কথিত। ইহা একরূপ নিন্দা। আশ্রমের নিয়ম তে রন্যরাণাং

কোষঃ প্রমাদো মোহরূপক মৃত্যুঃ। ১১ম—অ নিন্দামবজ্ঞকর্ম্মভায়া য়ে পুণ্যলোকা প্রাপ্তং হওয়া যায়, তাহা বেদে কথিত, ইহা যমরাজ কি না? যমরাজের এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, অবিদ্বানগণই তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; অপিচ বেদ তাহার প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপন করিতেছে। তাহা দ্বারা পরমাচ্ছাদকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু বিদ্বানগণ তাহা প্রাপ্ত হয়। এ হল্টী জটিল করিয়া রাখা হইয়াছে, কারণ অবিদ্বানের কথা বলিতে বলিতে বিদ্বানের ব্রহ্মলোভের কথা বলায় কৌশল আছে। আয়াতি সংস্কৃত “এতি” শব্দের জৈন প্রয়োগ হইতে পারে, ইহার অর্থ আগমন করা; ভাষ্যে ভোগৈশ্বর্য্য-কাণ্ডে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। জৈনগণ জন্মান্তর মানে না, এ স্থলে সেই ভাবেই লুপ্তাতি রহিয়াছে। যথা—

এবং জ্ববিদ্বানুপাতি তত্র
তথার্থভাতক বদন্তি বোবাঃ।

স নেহ-আয়াতি পরং পরাভ্যা

প্রয়াতি মার্গেণ নিহন্ত্য মার্গান্। ১৮

১ম অ; উদ্ ৪২। ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে ও মহাভারতের

উদ্ ৪৩। ৩০ শ্লোকে “ধর্ম্মং” শব্দ যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা জৈন তীর্থঙ্কর ও পূজ্যব্যক্তি উভয়েই বুঝাইতে পারে। তবে যমের সহিত পুন্ড্রবানের বিষয় কথিত হওয়ায় মশয় নিরসিত হইয়া জৈনতীর্থঙ্করই যথার্থ অর্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ ব্রহ্ম-বাদিগণের মধ্যে পুন্ড্রবানের কথা স্পষ্ট হওয়া যায় না। জৈনদের মধ্যে তাহা এখন আছে কি না জানি না, খুব সম্ভব পূর্বে ছিল। যথা—

অহতে যাচমানায পুন্ড্রান বিত্তং দদাতি যঃ।
ইষ্টাপুণ্ড্রং বিতীতং, স্মারিত্যং বৈরাগ্যযোগেতঃ।
মহাভারতে অন্তরূপ পাঠ আছে এবং পূর্বে শ্লোকে পুন্ড্রাবাস যাক্সা নিগ্রহ হইয়াছে।
যমরাজের প্রশ্ন করিলেন—কেহ পঞ্চ বেদী, কেহ চতুর্বেদী, কেহ ত্রিবেদী, কেহ দ্বিবেদী, কেহ একবেদী, আবার কেহ অনুক বা শূন্য বেদী, ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহার উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, এক সত্যবাদের অজ্ঞানতা-বশত বহু বেদোক্ত উপাশ্রিত হইয়াছে। সত্য হইতে অশ্লিত হওয়ায় নানা প্রকার কর্ম্মের উদয় হইয়াছে। তার পরেই অধর্ম্মবাদের প্রশংসা আছে। যথা—

একবেদস্ত চাজ্ঞানানু বৈদান্তে বহবেদোভবন্ত।
সত্যৈকস্তক রাজস্ব্যে সত্যো কচ্চিদবস্থিতঃ।

৩১—২য় অধ্য, উদ্ ৪৩। ৪৩

জন্মান্তি নাম ক্রিয়য় তানখরী।
পুরা জগৌ মহামিথং এবং।
জন্মোদবিবর্তে য উত নাভিভুববা।
ন বৈদেবোস্ত বিদ্বদ্বি তত্বঃ। ৩

মহা উদ্ ৪৩। ৪১

জন্মাগিনাম বিপদাং বরিষ্ঠ।
বজ্রদ্যযোগেন ভবন্তি তত্ব।
জন্মোদবিবর্তে ন চ তানবীত্য

গতা হি বেদগ্ধ, ন বেদ্যমার্থাঃ।

২য় অধ্যায় ৪০ ভাষ্যপূর্ব্বপাঠ।

মহাভারতে ইহার পরে ভাষ্যগত পাঠও প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে ভাষ্যগত পাঠে চাতুহরী খেলা হইয়াছে। কারণ পূর্বে এক সত্যবাদের অজ্ঞানতাবশতঃ বহু বেদের উপাশ্রিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া সেই বেদেরই বিধি বর্ণন করিলে মুক্তিসিদ্ধ হইত। ইহা না করিয়াও আধ্যাপককে অব্যাক্ততাবিশৃঙ্খল বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাও প্রকাশিত হইতেছে যে লেখক আধ্যাপক-বহির্ভূত কোন ব্যক্তি ছিলেন।

কোন কারণে ব্রহ্মবাদিগণ অধর্ম্মবাদের জরীর মধ্যে স্বীকার করেন নাই। মহত্বে ইহা অভিচারমূলক বেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাবিত্রীজট হইলে দ্বিজগণ ভ্রাতা হইতেন। অধর্ম্মবোধে এই ভ্রাতৃগণের প্রশংসা আছে। অধর্ম্মবোধে প্রাচীন ও আধুনিক অনেক উপনিষৎ গ্রন্থসমূহ হইয়াছে। সনৎ-স্বজ্ঞাতের মহাভারতীয় পাঠে অধর্ম্মবোধী উপনিষদের প্রশংসা থাকায় ইহার ভয়সিতা যে কোন ভ্রাতৃভ্রাতৃসম্বৃত্ত ব্যক্তি তাহা এক প্রকার প্রমাণিত হইতেছে। তাই তিনি নিজের অহংমত মতেই শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ব্রহ্মবাদিগণের মতে অর্য্যবাসজ্ঞানিত চিত্তের একাগ্রতা ও সযম ভাবে ব্রহ্মোপাসনার কারণেই মূনির মুনিম্ব সিদ্ধ হইয়াছে। এ বেদকের মূনি মৌনই পর্য্যবসিত। তাহার মতে নীরব ভাবে উপাসনা করিবে; মনে কিছু চিন্তা করিবে না, তাহা হইলে ব্রহ্ম সাক্ষ্য হইবে।

সাক্ষীভূত উপাশ্রিত ন চেচ্ছেন্দ্রিয়না অপি।
অভ্যাবর্ত্তে তদ্রূপেই বহনস্তরমুখ্যং। ২য় ৪৬

মৌনাক্ষি স মুনির্ভবতি নারয়ানসনামুনিঃ।
জ্ঞানরং তৎ তু যো বেদগ্ধ মূনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। ৪৭
যদি ব্রহ্মকে মনন না করিবে তাহা হইলে যে কল্প উপাসনা হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এখানে “ভাষ্যে ন চেচ্ছেন্দ্র” বাবা দ্বারা বিখ্যেজ্ঞদের ইচ্ছা বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা পূর্বে বচনের বিরোধী হয়, কারণ তথায় কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের অবেদ্যেণ কাহার নিকট হইবে না; বেদেও ইহার প্রাপ্তির আশা না করিলেই ইহাকে দর্শন করিতে সক্ষম হইবে। যথা—

অনিকথরিমং বেদে ততঃ পশ্যতি তং প্রভুং। ৪৮
স্তত্রাং এখানে যে শূচচিন্তা তাহার সম্ভেদ হইবে। ইহা জৈন বৌদ্ধ মতেরই অস্বর্গ্য।

মহাভারতের পাঠে উপরি-উক্ত ৪৭ শ্লোক “ন মৌনামুনিঃ” ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু এখানে উহা অশুদ্ধ, কারণ প্রথম অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে মান ও মৌন দুই তুলিত হইয়াছে—মানকে ইহলৌকিক ও মৌনকে পরালৌকিক বলা হইয়াছে—স্তত্রাং মৌন যে তুষ্ণীভাবে শূন্যতা, তাহা পরবর্ত্তী বচনের সহিত মিলিয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মবাদিগণ-একাদশজৈয় স্বীকার করেন। এ লেখক বুদ্ধিকে ধরিয়া তাহা দ্বাদশ করিয়াছেন। ইহাও সনাতন মত নহে। (৪৮ দেখ উদ্ ৪৩।) ইন্দ্রিয়কে এ লেখক পূর্ণ বলিয়াছেন।

৪র্থ অধ্যায় ১৪ শ্লোকে সর্গগণ মহাদ্বাদিগকে নিদান করিয়া গর্ত্তে লুপ্তায়িত হয়, ইহা লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নাশজাতির প্রতি সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার উপাশ্রিত হওয়া করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল—তাহা পরীক্ষিতের তৎক-দংশন-আখ্যানেরই প্রকাশ রহিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬শ স্লোকে কণিক-বাদের ভাব যেন প্রকাশিত রহিয়াছে। তথায় লিখিত হইয়াছে যে, 'যুগ্ম ব্রহ্মচর্য প্রভাবেষু পরদিনে পুনঃ উৎপন্ন হন।

এতেনৈব সমগ্ধাঃ রূপমঙ্গরো জয়ন।
এতেন ব্রহ্মচর্যেণ যুগ্ম অহায় জায়তে।

অর্থাৎ এই ব্রহ্মচর্যের প্রভাবে মঙ্গর ও অঙ্গরাগণ রূপকে জয় করিয়াছেন অর্থাৎ চিরযৌবনে বিজুহিত হইয়াছেন। ভাষ্যে * অহায় শব্দে 'লগতাঃ দ্যোতনাঃ' অর্থাৎ

জগৎকে জ্যোতানাম ও প্রকাশার্থ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু উহা কষ্ট কল্পনা; কারণ

'জ্যোতঃ' জগদগ্ধর্যে অর্থেই অধিক প্রযুক্ত।

জ্যোতঃ ভবতি হওয়া অর্থ হইলেও এখানে তাহাই ধরিয়া অহায় শব্দে কৌশল ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা যে অহোরে নৈমিত্তিক তাহার

সন্দেহ নাই। যাহা হউক কণিকবারিগণের মতে একটি বস্তু বা বিষয়ের পরস্পরেই বিনাশ

হইয়া পুনঃ অস্তিত্ব হয় এই ভাব এখানেও কৌশলে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই কণিক-বারিগণ জৈন-বৌদ্ধগণেরই একটি শাখা-

বিশেষ। পরমর্ভী কণিকবাহী বৌদ্ধগণ দুই স্বর্গের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তাহা ভাষ্যার্থে তাহার সিদ্ধান্ত-শিরোমণি নামক

জ্যোতিষগ্রন্থেও বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের ২৬ স্লোকে হীনো মনীবীর কথা আছে। ব্রহ্মের রূপ করে দৃষ্টিগোচর

করিতে পারেন না, 'হীনো মনীবী' মন অভিনিবেশ দ্বারা তাহার সাক্ষাৎসাক্ষ্য করিয়া

মতুকে জয় করেন।—
অদর্শনে তিষ্ঠিতরূপমন্ত পততি চৈনঃ।

হীনো মনীবী মনসাভিপ্রেতঃ এবং বিদ্ব-
মতুতে ভবতি।

এ স্লোকা মহাত্মারতে নাই। হীনো মনীবী অর্থে ভাষ্যে * রাগদ্বেষ রহিত হইয়া

যাহার অস্তিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে এই অর্থ করা হইয়াছে, ইহাও কষ্ট কল্পনা। ইহাতে

যে হীনমান-সম্প্রদায়ভুক্ত সমাদীর অর্থ লুপ্ত। রহিয়াছে, তাহা শব্দের সমাবেশ দ্বারা বেশ প্রকাশিত হইতেছে। তনিত

পাওয়া যাক নাগার্জুন এই দলের নেতা ছিলেন, এই লেখকও সম্ভবতঃ সেই দলভুক্ত ছিলেন,

* এই ভাষা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দের উপস্থিতি হইয়াছে। ইহা ভগবান ভাষাকারের রচনা নহে। ইহা কোন জৈন পণ্ডিত কর্তৃক রচিত হইয়া তাহার নামে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে শারীরিক ভাবের অঙ্গুরণে শারীর বসন উদ্ভাবের প্রণা অঙ্গুত হইয়াছে নতু, কিন্তু ইহাতে শারীরিক ভাষা বা গীতা ভাষার স্তায় ভাষার পান্ডিত্য ও সঙ্গীতভাব শূন্য ভাব রাখিয়া, অশ্লিষ্ট উচ্চা গুলি অশ্লীর্ণ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ভগবান শব্দে এরূপ করেন নাই। তাহার ভাষা এক প্রাক্কল ও প্রসার গুণে পূর্ণ তাহা কেলিয়া ভাষার টীকা লিখিতে হইয়া হয় না। তার পর ভাষা হুবেরাণ্ডা ও বিদ্বদি পুণ্যবীরের ভবন উক্ত হইয়াছে। হুবেরাণ্ডা তনিত পাই তাহার ভাষার ব্যক্তি রচনা করেন, হতঃ ইনিই শব্দের পরবর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই, কাজেই তাহার ভাষা তব্রন উদ্ভাবের অবসর থাকে না। পরবর্তীকারের কাল বিপর্যয়ের বিজুহিত রহিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে লোককে এক সময়ে স্থাপন করিয়া তাহার গ্রন্থের ইতিহাস লিখা নুনা করিয়া গিয়াছে। তারপর এক ব্রহ্মপুত্রণ ব্যক্তিরকে শব্দের পূর্বে অজ আনুদিক পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। তাহা পুরাণের অন্তর্ভুক্ত বিবরণ ও সমস্তগুলি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নীলকণ্ঠ এই ভাষার রূপা বলিয়াছেন, হতঃ ইহা তাহার পূর্বে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধতন্ত্র-দর্শনকারের সময় হইলেও বর্ণ ও শব্দ-অঙ্গুরণে উৎকর্ষ দুকৌশলী আশ্রয় হইয়াছিল। ভোগদেবের সময় তাহা রচনা নীয়ার গুণ, সেই সময় আনুদিক জনকগুলি পুরাণ রচিত হয় এবং পরবর্তী কালে রচিত হইয়া অষ্টাদশ পূর্ণ হয়। পুরাণগুলিও পরিভাষ্য করিবার বস্তু নহে। ইহাওও আনুদিক কালের দর্শ, সমাজ, আচার ব্যবহার, রীতি-নীতির ইতিহাস-ভাষার পূর্ণ রহিয়াছে। গ্রন্থী-সমাজ ইহা করিলে সোপাতিবির ভাষা ও লোকের টীকা তুলনা করিলে তাহার নির্ভর পূর্ণ হইবে। গ্রন্থী-সমাজ ইহা করিলে সোপাতিবির ভাষা ও লোকের টীকা তুলনা করিলে তাহার নির্ভর পূর্ণ হইবে।

হতঃ ইহা স্পষ্টভাবে যেন গুণ বর্ণন করিবেন ইহাতে আশঙ্কা কিছু নাই।

চতুর্থ অধ্যায়ের ২৯-৩০ স্লোকে বামদেবের গ্রন্থ-আমি হুগ্ম আমি মহ ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত করিয়া আমি স্থবির পিতামহ পিতা পুত্র সকলই বলা হইয়াছে—

অহমেবাশ্বি বো মাতা পিতা

পুত্রোহমিহাং পুনঃ

আত্মাহমন্ত সর্গস্ত যত নাতি

নাই। নতুবা ভগবান বাসদেবের যজ্ঞ-নিম্নায় তাহার মন বিচলিত হইবার কোন

কারণ ছিল না, যেহেতু বাসদেব সনাতনধর্ম বিধাসী শ্ববি, তিনি বেদের প্রতি অঙ্গমান

করেন নাই, কিন্তু এ লেখক বেদে 'আত্মাবশে' ব্রহ্মবাদিগণকে মর্শ্বোপদেশ দিতে যাওয়ার

তৃতীয় কবি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই তাহার ও তদধর্মাবলম্বীর প্রতি কটুক্তি বর্ণন করিয়া

গিয়াছেন। এই কারণেই তাহার রচনায় সমাদীর কল প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিতব্য ব্যক্ত

করা, হইয়াছে। এই দুই লেখকই যে সমকালবর্তী ছিলেন তাহার বিশেষ কারণ

প্রাচীন। সনাতনধর্ম-লেখক যেমন ব্রহ্মবাদি-গণকে প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়া

ছিলেন, গীতার তৃতীয় লেখক তদ্রূপ বিদ্বাদী রাজাকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য প্রযুক্ত বিস্তার

করিয়াছিলেন—তিনি নিজ রচনা শ্ববি-প্রণীত প্রাচীন রচনা বলিয়া প্রথ্যাপিত করিতে

সক্ষম হইয়াছিলেন। হতঃ এই উভয় লেখকের প্রাধিকার্যবলা একরূপ অবস্থায়

করিতে পারা যায়। তাহারা উভয়ে যে নাগার্জুনসেই সমশায়িক, তাহাতে সন্দেহ

নাই। তখন বৌদ্ধধর্ম বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহার আশ্রয় না

পাইলে ভগবদ্ভীতার তৃতীয় কবির রচনায় বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম ও চার্লক কণিকবারি আদি

মতের আভাস পাইতাম না এবং বেদান্ত-দর্শনে এইগুলি নিরাকৃত লেখিতাম না।

গাথা ও বেগা হুগ্ম যে বেদান্ত-দর্শন কেন তিরস্কৃত হইয়াছে তাহারও বিশেষ কারণ দেখিতে পাই। ইহার ভূষা উত্তম জ্ঞান নাই, ইহা ভগবান বাসদেবের ভক্তি,

যদন্তি চ। ২৯

পিতামহোহমি স্থবিরঃ পিতা পুত্রচ

ভারত।

মঠেব যুগ্মআত্মহা ন মে যুগ্ম ন

চাণ্যঃ ৪ ৩০

এই স্থবির শব্দে দ্বি-অর্থ নিহিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্য অর্থ বৃদ্ধ, গৌণ অর্থ,

বয়স্কান জৈন সমাদী। পিতামহ শব্দ দুই অর্থ, ব্যবস্কত, (১) পিতার পিতা, (২) পদযোনি

ব্রহ্ম। ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মকে বৃদ্ধ পিতামহ বনেন না, তাহা অত্যাধর্মাবলম্বণই ব্যবহার

করিতে পারেন। যাহা হউক, এতগুলি আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ

হইল যে, এই রচনা কোন জৈন-সমাদীর—

—কৌশলপূর্বক দ্বন্দ্ববিষয়কাল মহাত্মারতে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মবাদিগণের

চক্ষু লুপ্তিমূর্তি নিম্পেষ করা হইয়াছে।

এই লেখক যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন এবং শেষ অধ্যায়ে প্রতি স্লোকে অন্তে একটি

'যুগ্ম' বিদ্যাজ্ঞান, তাহার অর্থ যোগিগণের সনাতন ভর্গনানকে মনন করিয়া ধ্যান—

"যোগিনস্তং প্রণুজতি ভগবন্তঃ সনাতনং।"

উপনিষৎকারগণও তাহাতে সায় দিয়া গিয়াছেন। ইহা সহজ প্রযুক্ত অনেককেই গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাত্‌কালিক সমাজ ও বর্ণাশ্রমে বিলম্বন ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছিল, তাই ঋষ্যশাস্ত্রের শাসন প্রচারিত হয়।

ব্রাত্যগণ * সাংখ্য-মতে নিষ্ঠাবান হইলেও তাহাদের অঙ্গে কালিমা লেপিত হয়। এই বিজ্ঞাভিগণ পরে অধর্ষবেদ সন্ধান করিলেন। তাহাতে ব্রাত্যগণের প্রশংসা সেবিতে পাওয়া যায়, হুতরাং বাঁহারা সনাতন-ধর্মের বিরুদ্ধ ভাব বা মত পোষণ করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের আশ্রয়স্থল অধর্ষবেদের প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। ভগবান কপিলবোদের প্রতি সন্মান রক্ষা করিয়া তাঁহার উদার মত প্রচার করেন। মহাভারত শাস্তিপর্বে গো-কপিলীয় সম্বন্ধে স্মরণিকি কে তাঁহার উক্তি দ্বারাও তাহা স্মরণিত হইতেছে—তিনি বলিয়াছিলেন যে বেদ লৌকিক প্রমাণ, আমি বেদের অসন্ধান করিতেছি না; দুই ব্রহ্মই জানা আবশ্যক, এক শব্দ-ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ, দ্বিতীয় পরাশ্রয়। যথা—

বেদাঃপ্রমাণং লোকানাম্ ন বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ

কৃত্যঃ।
যে ব্রহ্মণী বৈদিত্যে শব্দরূপ পরং চ যৎ।

১। ২৬৯ অধ্যায়

কিছু তাঁহার পরে কেহ কেহ বেদের অধর্ষবেদের অস্বার্থভাষ্য সংশ্লিষ্ট হইয়া উহার অসন্ধান ও অপ্ৰামাণ্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন। বাঁহারা এইরূপ করিলেন তাঁহারা মহাভারত পতিভাষ্যমণী বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং পরে তাঁহারা নাস্তিক বলিয়া

কথিত হন। ইহারা পরে অধর্ষ বেদের কলেশের নিজ নিজ মত দ্বারা পৃষ্ঠ করেন ও অত্র বেদবোদের নিম্নাধার প্রচার করেন। এই সকল কারণে কালক্রমে অধর্ষবেদীয়-গণের সহিত ব্রহ্মবাদিগণের প্রবল ঘেঁষাভাষ্য সংঘটিত হয়। ভগবান বৃক্ষদেব কপিলা বসন্তে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা কপিল নামক জনৈক অত্র ঋষির স্মরণার্থ তাঁহার নামে শাক্যগণকর্তৃক স্থাপিত হয়। ঋষি জনৈক শাক্যহুতিবার পাণিগ্রহণ করেন। এই বংশে ভগবান শাক্যসিংহের জন্ম হয়। গীতার তৃতীয় লেখকের পূর্বে সময় হইতে এই ঋষির সহিত সাংখ্যপ্রবক্তা ভগবান কপিলের পরিচয়টা প্রচারিত হয়। হুতরাং বৌদ্ধমুণ্ডে সকলের বিশ্বাস বৃদ্ধ হইয়াছিল যে বৃক্ষদেবের জনৈক পুর্বেপুরুষ কপিলই সাংখ্যমত প্রচার করেন, অতএব তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী হইবেন এই সিদ্ধান্তটা অপরিহার্য হইয়া ওঠে। এই কারণেই গীতার তৃতীয় লেখক অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভাবেও বেদান্তদর্শনে স্পষ্টরূপে সাংখ্যমতের প্রচণ্ড প্রচার্য পাইয়াছিলেন এবং যোগপঞ্জাও সাংখ্যের দ্বায় পঞ্চবিংশতিভুক্ত বীজত হইয়াছে বলিয়া তাহাকেও সাংখ্যের সহিত একত্রণেই কল্পিয়া দিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি নিজের দ্বায় বিশ্বাসেরই আভাস দিয়াছেন, নতুবা যে ভগবান ব্যাসদেব সাংখ্যযোগ ও ভক্তির প্রশংসা তাঁহার অপর গ্রন্থ গীতায় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিচারে অবজ্ঞাভাবে যে তৃতীয় কবি কিছু বলিতে সাহসী হইবেন তাহা বলা যায় না। † তিনি ইহা দ্বারা

প্রাণ্ডক ঋষি এভিগ্ধি সিন্ধু ও ঋষি অভী-
পিত মত প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই
মাত্র বলা বাইতে পারে। প্রথম প্রথম তিনি
ঋষি নাম গোপন ভাবে রাখিয়াছিলেন।
ইহাতে সাংখ্যকৃত্যস্ত ব্যাসদেবের রচনা
বলিয়া প্রচারিত হইয়া যায়। তার পর
পাণিগ্ধন্যের পরে সাংখ্যকৃত্যস্ত বাদ্যরূপের
রচিত বলিয়া প্রচারিত হয় এবং ব্যাসদেব
ও বাদ্যরূপে অভিন্নব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত
হইতে আরম্ভ করেন। এইরূপে কালক্রমে
বাদ্যরূপে ভগবান ব্যাসদেবের একটা নাম
বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারত,
গীতা ও বেদান্তদর্শন তন্ম তন্ম করিয়া মনো-
বোধের সহিত পাঠ করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তই
উপনীত হইয়া যায়। ভরসা কবি, ব্রহ্মসামন্ত
পূর্ণাঙ্গের বিবেচনা করিয়া আমার সহিত
একমত হইবেন।

ভগবান ব্যাসদেবের গীতায় নির্বাণ শব্দ
দেখিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ঐ
শব্দের অর্থই গীতাকে বৌদ্ধমুণ্ডের পরবর্তী
কালের রচনা করিয়া দিতেছে, তাহা গীতায়
যে ভাবে নির্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা
বৌদ্ধ নির্বাণেরই অপরূপ, তাহা ভগবান
পাণিনির নির্বাণ স্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়
নাই। হুতরাং গীতা পাণিনিরও পরবর্তী
রচনা।

গীতায় নির্বাণ শব্দ একক ব্যবহৃত হয়
নাই। উহা ব্রহ্মনির্বাণরূপে সর্গক ব্যবহৃত
হইয়াছে। যথা—

ব্রহ্ম নির্বাণমুচ্ছতি। ২।৭২

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতং

বিগচ্ছতি। ৬।২৪

লভতে ব্রহ্মনির্বাণমুখ্যঃ কৌণ্ডিন্দ্যঃ। ৬।২৫

তাপসর ইহার অর্থরূপে শাস্তি, ব্রাহ্মাধিত্তি

নির্বাণপরমাঃ শাস্তিঃ শান্তিরজঃ ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মস্পর্শ
অত্যন্তস্থং ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

স শাস্তিমধিগচ্ছতি। ২।৭১

স শাস্তিমধিগচ্ছতি। ২।৭১
এয়া ব্রাহ্মাধিত্তিঃ পার্থ নৈনাম প্রাপ্য বিমুক্তা।
স্থিষ্যৎসামন্তকালেহি ব্রহ্মনির্বাণ-
মুচ্ছতি। ২।৭২

জানং লভা পরাং শাস্তিমচিরব্যাপিগচ্ছতি। ১৪৩২
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাদ্ ব্রহ্মণি তে
স্থিতঃ। ৬।১২

স্বদ্বং সন্তুতানাম্ জ্ঞাত্বা মাং
শাস্তিমুচ্ছতি। ৬।২৩

উপৈতিশান্তিরজঃ ব্রহ্মভূতকন্মদং। ৬।২৭
হুতেন ব্রহ্মস্পর্শমত্যন্তং স্থবদ্বশুভে। ৬।২৮
হুতরাং অতিব্রহ্মোপ্তের সহিত ঋষির নির্বাণ
বা শূদ্ধে নিশানর দ্বায় ভগবান ব্যাসদেবের
ব্রহ্মনির্বাণ যে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা
নিশ্চিত। বৌদ্ধনির্বাণে শূদ্ধে মিশ্রণভাব
আছে। নিঃশব্দ পরিভাষ্যের কষ্ট যে না
আছে তাহা নহে, নির্বাণে যে কোনরূপ
স্বাধাভাব আছে, তাহা বৌদ্ধগণ বর্ণন করেন
নাই, হুতরাং তাহা জানিবার উপায় নাই।
এই বিরুদ্ধভাবের অস্বভূতি দ্বারা বেশ প্রকাশ
হইতেছে যে, ব্যাসদেবের ব্রহ্মনির্বাণ বৌদ্ধ-
গণের নির্বাণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।
মহাভারতের অত্র ব্রহ্মনির্বাণ ও নির্বাণ শব্দ
ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাই ব্রহ্মদ্রব্যী লাভ অর্থই
ল্যোভিত হইয়াছে। ইহার মূল যে নির্বেদ
অর্থাৎ মনের ব্রহ্মে একাগ্রভাব বা বিষয়ে
বৈরাগ্যভাব তাহাই প্রকাশিত রহিয়াছে।
নির্বেদাধেব নির্বাণং ন চ কিকিঞ্চিচ্ছতেৎ।
স্থং বৈ আদ্রোণ ব্রহ্ম নির্বেদেনাদিগচ্ছতি।

১৭ শাস্তি ১৮২

যথা স্বাধিষ্ঠিতং ধ্যানং তথা সূর্য্যিণি যোগিনঃ।

* ব্রত শব্দ হইতেই যে ব্রাত্যগণের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু পরবর্তীকালে উহা দ্বারা
নিষ্কৃতিগণকে অসন্তুষ্ট বিভাজিতকৈ হইয়াছিল।

† শাস্তিপূর্ণ শব্দ অধ্যায়ে ইহার আভাস আছে। তথাই ব্রহ্ম স্বাধার-জগতের এক ও অভিন্ন
যৌগিক ব্রহ্মরূপে বিখ্যাত মত কখনের পর অবার পক্ষে সাংখ্যযোগের প্রশংসা আছে। ইহাও এই তৃতীয়
লেখকের রচনা বলিয়া বোধ হয়।

মহর্ষ্যে জ্ঞানতৃপ্তা নির্লিপ্যগতমানসঃ ।

২ শাস্তি ১২৫

গচ্ছন্তি যোগিনোহেবং নির্লিপ্য তদ্রিমানসঃ ।

২২ শাস্তি ১২৬

অর্থমেব পরো নির্লিপ্য শব্দে নিরুদ্ধন
অগ্নির ধ্বংসবস্থা প্রাপ্তির কথা লিখিত
হইলও তথ্য পূর্ণাঙ্গের সামগ্রিক রাশিয়া
বিচার করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থই লক্ষ হয়—
শূন্যে নিশিদ্ধা যাওয়া অর্থ হয় না ।

শব্দে নির্লিপ্যমাপ্রোতি নিরুদ্ধন ইবানলঃ । ১২

বিমুক্তঃ সর্বসংস্কারৈরন্ততো ব্রহ্মসনাতনঃ ।

পরমাপ্রোতি সংশাস্তমচলঃ নিত্যসংকরঃ ।

১৬। ১২ অধ্যায়

স্বতরাং নির্লিপ্য শব্দ দেখিয়াই গীতাকে
বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী সিদ্ধান্ত করিবার কোনো
আবশ্যকতা দেখিতেছি না । ৩৫ই শব্দটি
ভগবান ব্যাসদেবের উদ্ভাবিত শব্দসম্পদের
একটি । পরবর্তীকালে তাহাই একক
ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় । তাহা পক্ষ
বৌদ্ধগণ ইহা নিজের ধর্মমতপ্রচারী অর্কে
ব্যবহৃত করিয়া লইয়াছেন । এইরূপ হওয়াই
অধিক সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে ।

পাণিনি যেমন নির্লিপ্য শব্দ নির্বাতে
ব্যবহৃত করিয়াছেন, তেমনই ব্যাভিপ্রুজ শব্দে
জিন যুগত যোগী সর্লজ ও পণ্ডিত ব্যক্তি
ব্রহ্মাছেন ।* এই ব্যাভির উল্লেখ পাণিনি
করিয়াছেন । ইহার লক্ষ্যসাধক অভিধান
ছিল, তাহা সকলই কালপ্রভাবে লুপ্ত হইয়া
গিয়াছে ।† কেবল অভিধানের টীকাভাগের
তাহার বচনের উদ্ধার করিয়া তাহাকে কতক
জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন । ৩৮জ্যেষ্ঠ-
লাল মিত্রের মতে পাণিনি খৃষ্টপূর্ব ৮০০-১০০

বংসরে প্রাচুর্যত হন, স্বতরাং ব্যাভি তাহারও
পূর্বরতী লোকা । তাহার পূর্বে জিন যুগত
শব্দ জৈন ও বৌদ্ধ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইত ।
তখন মহাভারতে থাকিলেও হয় ত তাহারা
নির্লিপ্য শব্দ গ্রহণ করেন নাই । ইহা শাক্য-
সিংহের মৃত্যুর পর হইতে বৌদ্ধমতমাজে
ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় । তাহারা দেব-
বা দেবভাবের অর্থজ্ঞাপক বিবরণের মধ্যে
হইতে চাহিতেন না, এই কারণেই ব্রহ্ম শব্দটি
উহার পূর্বে হইতে বাদ দিয়া রাখিয়াছেন ।

ব্রহ্ম, শূন্য, কাল, নিরাকার বস্তু অর্থাৎ এই
তিনটি অমুতবস্তু । আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে
যেমন আমি সন্দেহ হইতে পারি না—তাহা
যে ক্রম সূতা, ইহা আমি বেশ জানি । সেইরূপ
ব্যাভি আমার অস্তিত্বের সহিত সমষ্টি এই বিশ্ব-
ব্রহ্মাণ্ডেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ।
আমি বলিলে যেমন শরীর অতিরিক্ত একটা
অবিশবের বস্তু বুঝায় যাহার পারিজাম্বিক নাম
আত্মা । সেইরূপ এই সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের মহান
আকার নাম পরমাত্মা । তিনিই ব্রহ্ম, স্বতরাং
আমার অস্তিত্বের সহিত ব্রহ্মের অস্তিত্ব
স্বীকার না করিলে গতান্ত্য নাই ।

উক্ত দুটি নিবেশন করিলে নীলবৎ প্রভা-
মান একটি বিশাল কটাহ দেখিতে পাই ।
কিন্তু ইহা যে কি তাহা ঠিক বৃত্তিতে পারি
না । ইহাকে শূন্য, অনন্ত, আকাশ বলিয়া
থাকে । সাংখ্য-শাস্ত্রের শব্দ-গুণ-বর্মাণী যে
আকাশ তাহা এই অনন্ত আকাশের নিয়
অংশ । এই অনন্ত শব্দের রূপ ভেদ করিতে
পারি বা না পারি ইহা যে বর্তমান তাহা বেশ
অভূতব করিতেছি । গণিত-শাস্ত্র এই অনন্ত
শব্দের ব্যাপকতা কণামাত্র লোক-চন্দ্র

গোচর করিতে মনস্ক হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ
জ্ঞান প্রকাশ করিবার স্পষ্টা ক্রমে-করিতে
পারে না, স্বতরাং ইহাকে ব্রহ্মের বিবর্ত
ধরিলেও কোন দোষ হয় না । কাল সম্বন্ধেও
ইহাই প্রযুক্ত হইতে পারে । তাহার ক্ষুদ্র
অংশ পল, দণ্ড, দিন । উহার বৃহৎ অংশ মাস,
বৎসর, যুগ, কল্প ইত্যাদি । এগুলি যে দিন
দিন, গন্ত হইয়া কালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে
আমাদের জ্ঞান উৎপাদন করিয়া দিতেছে
তাহাতে সন্দেহ নাই । ইহার মধ্যেই জীবের
জন্ম-মৃত্যু হইতেছে, ইহার ক্ষুণ্ণিতে কত বিগত
জাতির উৎপত্তি ও ধ্বংস হইয়া কত নূতন
জাতির জন্ম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ।
স্বতরাং কালও ব্রহ্মের একটা স্বরূপ, এই
কারণে ভগবান নিজ শরীরে কালের নিরৈক্য
আকার আঁকিয়া দিয়া অর্জুনের ঘোষ দ্রুত
করিয়াছিলেন । সাকার ভাবে কালকে ব্যক্ত
করিতে হইলে, ব্যাসদেব তাহার যে আকার
গীতায় অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাই যথার্থের
প্রায় অল্পরূপ । তাই ভগবানও স্বয়ং
বলিয়াছেন যে তিনি “কাল” ।

এখন বেদান্তদর্শনের যুক্তিতর্কের কিঞ্চিৎ
আলোচনা করিয়া আমার পূর্ব মত দৃঢ়
করিতেছি, যে ইহা ঋষিপ্রণীত নহে—ইহা ভাস্কর
মাহেশ্বরের রচনা । স্বতরাং ইহাতে যে একদেশ-
দর্শিতা বর্তমান থাকিলে তাহা অবগতাবী ।

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্র • ঐতিজা-
বাক্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ গ্রন্থের
অভ্যন্তরে তদ্রূপ সমাধিত হয় নাই । যদি
জগতের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে স্বীকৃত হইল,
তাহা হইলে তাহার বিবর্ত ভাব কোথায়
রহিল ?

তারপর পক্ষম সূত্রে বলা হইয়াছে যে,
প্রকৃতি মনে মনে অভিজ্ঞান করিয়া জগৎ
স্বজন করিয়াছে, এ মতটি বেদবিরুদ্ধ ।†
উহা ব্রহ্ম সম্বন্ধেই কথিত হইতে পারে ।
ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু
শেতাশ্বতর উপনিষদে স্বীকৃত হইয়াছে, কারণ
তথ্যই মর্হি কপিলকে আদি জ্ঞানী বলিয়া
বর্ণন করা হইয়াছে । ছান্দোগ্য যে বহু
পরবর্তী রচনা তাহাও প্রমাণ সহিত পরে
প্রদর্শন করিব । বেদান্তদর্শনকার কেবল
ছান্দোগ্যের মতই অমূল্যপর করিয়াছেন, অল্প
উপনিষদের মতের প্রতি অন্যথা প্রদর্শন
করিয়াছেন, ইহাও তাহার গ্রন্থের একটি
বিশিষ্টতা । ইহাকে আমরা একদেশদর্শিতা
বলিয়াই অভিহিত করিব ।

ব্রহ্মস্বাকার যদি জীবের অধ্যাপকতা ও
ব্রহ্মের ব্যাপকতা বর্ণনরূপ প্রথম অধ্যায় মাজ
লিখিতেন, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না ।
কিন্তু তিনি সাংখ্য-যোগ প্রমুখ সকল মত
পণ্ডন করিতে অগ্রসর হওয়ায় স্বীয় মতের
দোষও আদ্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন ।
ব্রহ্মস্বাকার সাংখ্য দর্শনের মত পণ্ডনই
অধিক স্বজ রচিত করিয়াছেন । ভগবান
ভাষ্যকারও স্বত্বকারের এই ভাব সমর্থন
করিয়া লিখিয়াছেন যে যেমন প্রধান
মন্ত্রের পরাজয় হইলে হীন মন্ত্রগণ
আপনা আপনি হীনপ্রভ হয়, সেইরূপ সাংখ্য-
শাস্ত্রের পণ্ডনে অজ্ঞ শাস্ত্রীয় মতগুলিও স্বত-
নিরাশ হইতে । ব্রহ্মস্বাকার যুক্তিতর্ক
সমস্ত হউক বা অসত্য হউক বা না হউক
ভগবান শঙ্কর তাহার যে বিশদ ভাষ্য রচনা
করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পক্ষ বিপক্ষ মত

* অথ দ্রষ্টাছিলেন যোগী সর্লজ হৃদাত্মবুদ্ব ।

† যাহা বৈশ্বকোষাভিধানলোপঃ । শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য

* সাংখ্যসূত্র মতঃ । ২৮

† দ্রষ্টবর্তশিখাঃ । ৫

উইত করিয়া অনেক স্থলে হসিকান্তরে
মীমাংসা করিয়া স্বজ্ঞকারের মত স্থাপিত ও
দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন। ছই এক স্থলে
স্বজ্ঞকারকে বাচাইবার জন্ত তিনি অত

শাস্ত্রকারগণের প্রতি কিঞ্চিৎ অগ্রাহ্য করিয়াও
গিয়াছেন। ভগবান কপিলই এই অজ্ঞায়ের
অধিক অংশভাগী হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

গভীরায় সাহিত্য-সম্মিলন *

গভীরায় সংস্কার ও নামকরণ

পূর্বে দেখিয়াছি, গভীরায় কেবল কুচিহ্ন
প্রদর্শন ছিল, সামাজিক কুংগার উল্ল ছিল,
বৌদ্ধ ভাবভঙ্গীর বিগলক্ষেত্র ছিল। এখন
তৎসংগে দেখিতেছি, ধর্ম, সামাজ্য, স্বাস্থ্য, কৃষি,
শিল্প, বাণিজ্য, কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং
জাতীয় শিক্ষার উন্নতির জন্ত প্রয়াস ও
আলোচনা। এই জাতীয় শিক্ষা-সম্মিলন
দেশের পক্ষে বড়ই হিতকর, বড়ই আনন্দ-
জনক, অজ-সমাজের শিক্ষা-প্রসংগ এবং
গানে ও প্রাণে সম্মিলন।

গানে ও প্রাণে সম্মিলন

প্রাণ গান একই কথা। গানে প্রাণে ভেদ
ঘুচাইয়া সমস্ত স্বরভঙ্গ, সমস্ত তালচ্যুতি
সাধনানে নিরাণ করিয়া এই বিশ্বব্যাপী
মাধুর্য্য-চৈতন্যে ভাব ভাষায় পরিণত হয়।
স্বরবিজ্ঞান ও ভাব বিশ্বস্থতির পূর্ব হইতেই
একত্র স্থিত। ভাবনা হইলে ভাবনা হইতেই
পারে না। ভাবনা করিতে হইলে, ভাষার
প্রয়োজন। জীবন থাকিলে ভাবিতেই হইবে।

ভাব ও ভাষা

ভাবনার বিনিময় না হইলে, জীবন নির্বর্থক
হইয়া পড়ে। আবার, ভাষা না হইলে ভাবনা
অসম্ভব। সুতরাং ভাষা ও জীবন একই

স্বাভাব্য দুইটি বিভিন্ন প্রান্তভাগ। তবে ভাষা
গড়ে—সাধারণ ব্যক্তিগত প্রয়াসে তাহার
পুষ্টি বা শ্রীকৃষ্ণ সাধিত হয় না। ভাষার উন্নতি
অর্থে, ভাষার উন্নতি। জাতীয় চৈতন্যে সৈন
নূতন নূতন জটিলভাবের আবর্তিত হয়,
ভাষার গঠনগত জটিলতা বা সম্ভ্রামণও
তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে ভাষায় কোন
একটি বিশিষ্ট ভাব সর্বাপেক্ষা ভাল করিয়া
প্রকাশ করা যাউতে পারে এবং সাধারণ-
শিক্ষা (mass education) বিস্তার করিয়া
জন্মভূমির সেবা করে, তাহা প্রাথমিক বা আশ্র-
কৃত, যাবনিক বা বৈদেশিক এবং অসংস্কৃত
শব্দ হইলেও, সে স্থলে তাহা অপেক্ষা ছই
শব্দ কিছু হইতে পারে না। ভাষার উন্নতি
কল্পে বৈদেশিক জ্ঞানও কোন অপরিজ
উপাদান নহে। ভাষার উন্নতি প্রতিভার
সহজ অধিকার। আপনাপন অস্তিত্বের
পূর্ণোদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্তই, শব্দ বা
ভাষার সৃষ্টি।

ভাষার উন্নতি না অবনতি ?

অনেকে বলিতে পারেন এবং না-বে
বলিতেছেন এমনও নহে, যে, গভীরায় গানে
যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে,
তাহাতে ভাষার উন্নতি না হইয়া বরং
অবনতিই হইয়াছে। তাহারে নিকট

নিবেদন, তাহার একটু তলহীয়া চিন্তা করিয়া
দেখিবেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী
হইয়া কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। যেখানে
স্বাভাবিকতার শাস্তি থাকে না, সেইখানেই
বিরোধ ঘটনা থাকে।

ভাষার উপাদান-সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং ভাষার পুষ্টি সাধন

মালব্ধের নিজস্ব গভীরায় মধ্য হইতেও
মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের
কলেবর-পুষ্টির জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে।
অতএব, পূর্বে সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে
শব্দ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।
পরে, ভাষার পরিপুষ্টি সাধিত হইলেই, ভাষার
উন্নতি হইবে। বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য
বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি, বাঙ্গালীর সভ্যতা ও
বাঙ্গালীর আদর্শ প্রস্তুত করিবার একটি
প্রধান উপায় মালব্ধের গভীরায়।

ছইটি মহৎ কার্য্য—মৃতকল্পার পুন- রুদ্ধার ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিগণকে উৎসাহ দান

বিজ্ঞ সমাজের এ সম্বন্ধে সাহসিকতা ও
আগ্রহ প্রকাশের কার্য্যে, ছইটি মহৎ কার্য্য
সম্পন্ন হইয়াছে। একটিতে বাঙ্গালার মৃত-
কলা পুনর্জীবিত হইল, অজ্ঞাতো ভাষা ও
ব্যক্তি লোকগুলি উৎসাহিত হইল।

বিজ্ঞে ও অজ্ঞে সম্বন্ধ স্থাপন

মানবের প্রকৃত মন, সকলকে ছাড়িয়া নহে,
সকলকে লইয়া। একটি সোপান-শ্রেণীর
উপর দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথা আমরা বেশ
জঘদ্বন্দ্ব করিতে পারি। সর্বোচ্চ সোপান
পরবর্তী অপর সকল সোপান-শ্রেণীর ভিতর
দিয়া সর্ব নিম্ন সোপানের সহিত সংযুক্ত।

নিম্নতর সোপানাবলী আছে বলিয়াই সর্বোচ্চ
সোপানের অস্তিত্ব। হস্তগত নিম্নতর সোপান
পরম্পরই স্বদৃঢ় হওয়া বিশেষ আবশ্যক।
বিজ্ঞের সহিত অজ্ঞের পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞ
সম্বন্ধে দেখিতে শিখিয়াছেন, তিনি সর্ব নিম্নতর
জীবশ্রেণীর সহিত নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া
মহৎ লাভ করিয়াছেন। এই মহৎ উপায়ে
কোথায় আকর্ষণ করিতেছে, তাহা চিন্তা
করিবার বিষয়।

জাতীয় চরিত্র গঠন ও জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সাধন

আমাদের বর্তমান সমাজ প্রাচ্য জাতীয়
চরিত্রে প্রতীতি শিক্ষা ও সভ্যতার কল্যাণকর।
প্রাচ্য-প্রবাহ স্বচ্ছ ও নির্দল নহে, পরস্ব,
সমল ও মলিনতাপূর্ণ; এবং তাহার সেই
সমলতা ও মলিনতাতেই ভবিষ্যতে ভূমির
কাঠি ও উর্বরতার বীজ থাকে; তাই,
প্রাচ্য-প্রবাহ প্রশমিত হইলে, ভূমি কঠিন ও
উর্বর হয়। আমাদের সমাজে এখন পরি-
বর্তনের প্রাচ্য প্রবাহমান; এখন আমাদের
সমাজ জটী, সহস্র ভ্রম কেবল অবশ্যস্বার্থী নহে,
পরস্ব আবশ্যক।—প্রাচ্যের সমল প্রবাহের
বেগ ও বারিষাণ উভয়ই বহুকালস্থায়ী।
যখন উজ্জ্বলিত বারিষাণ ক্রমে বহিয়া যাইবে,
তাহার বেগ প্রশমিত হইবে, তখনই
আমাদের জাতীয় চরিত্রের গঠন হইবে—
জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে;
তখন তাহার কাঠি ও উর্বরতা আপনা
হইতেই আসিবে। এ সম্বন্ধে অজ্ঞগত ও
জাতীয়-জীবনে সাদৃশ্য বিষয়কর। দেশ যখন
শিক্ষিত হইতে যায়, তখন একপ্রকার ভাবেই
শিক্ষার ফল-স্রোত নানা দিক দিয়া প্রবাহিত
হইতে থাকে।

গভীরায় সাহিত্য কি—সাহিত্যের
আবার সম্মিলন কি ?

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, গভীরায়
সাহিত্য-সম্মিলন কি ?—সে সাহিত্য বা কি ?
—সাহিত্যের আবার সম্মিলন কি ? সাহিত্য
আর কিছুই নহে। "সহিত"-শব্দ হইতে
"সাহিত্য"-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে;—তাহার
মূল্যার্থ "মিলন"।—তাহা হইতেই ক্রমে প্রচ-
লিত অর্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বে কেবল
কাব্যশাস্ত্রকেই সাহিত্য বলিত। বর্তমান
সময়ে সাহিত্যকে এক কথায় একুণ ব্যাখ্যা
করা যাইতে পারে, "মানব-সমাজের সর্ব-
প্রকার আন্দোলনের শক্তি-সঞ্চায়ক জ্ঞান-
ভাণ্ডার।" এই অর্থেই বর্তমান যুগে
"সাহিত্য"-শব্দ সর্বত্র মর্যাদা লাভ করিয়াছে।
"সাহিত্য"-শব্দেই সাহিত্যের শক্তিগ্রহ
হইয়াছে। ইহাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে
বিভক্ত করা যাইতে পারে। কাব্য, ইতিহাস,
বিজ্ঞান। তারপর ঐহিক ও পারলৌকিক তত্ত্বও
ইহার অন্তর্গত। জীব-পরমাণু ও পরব্রহ্মে সম্বন্ধ-
নির্ণয়ই সাহিত্যের মেধাও। বাস্তবাত্ম্যের
প্রসিদ্ধ লেখক (শাশনকর্ত্তা বলিলেও, বোধ
হয়, অস্বাভিক হয় না) মাননীয় শ্রীকৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র
চৌধুরী মহাশয় সাহিত্যকে বেশ পরিষ্কৃতরূপে
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—
"জ্ঞান অন্তরের বস্তু। ভাষা-গৃহীত তথ্যের
প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞান,—ভাষার সাহায্যেই জ্ঞান
জ্ঞাতার নিকটে পরিষ্কৃত ও স্পষ্টীকৃত এবং
অঙ্গের নিকট প্রতীত হয়। কিন্তু, ভাষা,
স্থানে এবং কালে সীমাবদ্ধ। এই স্থান-
কালের সীমার নিগড় হইতে বিমুক্ত করিয়া
ভাষাকে পৃথিবী পরিচ্ছিন্ন স্থানে এবং
অপরিচ্ছিন্ন কালে পরিব্যাপ্ত করিবার

যে "উপাদ্য" তাহাই "সাহিত্য"। মোটকথা,
"সাহিত্য" ভিন্ন কোন তত্ত্বই ব্যক্ত হইতে
পারে না।

সাহিত্য-প্রচারের উদ্দেশ্য এবং
গীত-রচয়িতৃগণের গভীরায়
সাহিত্য-প্রচার

স্বল্প প্রাক্কাল হইতেই সাহিত্য-প্রচারের
চেষ্টা দেখা যায়। কার্য, ভাবে ভাষা গড়ে।
ভাবই আবার জ্ঞান-স্বরূপ। এই আয়ুর্দেশে,
আর্যশাস্ত্রই মোক বিশেষের দ্বারা বলিয়াছেন
যে, "এ সমাজের জ্ঞান লাভ করিয়া যে
ব্যক্তি পরকে তাহা দান না করে, জ্ঞানস্বরূপ
ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না।"
ইহাই সাহিত্য-প্রচারের সর্ব প্রধান উদ্দেশ্য।
এই প্রবন্ধের স্বভাব-কবি গভীরায় গীত-
রচয়িতৃগণ সমাগত হইয়া গভীরায় সাহিত্য
প্রচার করিতেছেন।

জ্ঞান চর্চাই জাতীয় জীবনের মূল
জাতীয় জ্ঞান জাতীয় সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত
হইয়া থাকে। জ্ঞান-চর্চাই জাতীয় জীবনের
মূল। অতএব, সাহিত্য সেবার একান্ত
প্রয়োজন।

গীতরচয়িতৃগণের মৌলিকতা

ও পাণ্ডিত্য

স্বভাবকবি গভীরায় গীতরচয়িতৃগণকে
প্রকৃত শিল্পিত বা জ্ঞানী জ্ঞানী হইতে পারে।
এ কথায় পণ্ডিত-সমাজ নাসিকা কুণ্ঠিত
করবেন, সন্দেহ নাই—মানবানির মোক-
দমাও আনিতে পারেন। কিন্তু, একটু
ভাবিয়া দেখিলে, তাহাদের সহিত এই
অজ্ঞদের প্রভেদ কত—বিশেষতঃ কত।

রিজ্ঞ ও অজ্ঞের মধ্যে প্রভেদ ও
বিশেষতঃ—শেখা-বিদ্যা ও
অশেখা-বিদ্যা

জগতে সকলেই কবি, ভাব সকলেরই আছে।
কিন্তু, যে সেই ভাব, ভাষায় প্রকাশ করিতে
পারে, তাহাকেই স্বকবি বলে। প্রকৃত
শিক্ষিত তাঁহাদিগকে বলা যায়, যাহারা জগতে
কোন নূতন ভাব আনেন অর্থাৎ কিছু
আবিষ্কার করেন। কিন্তু সেই আবিষ্কারকগণ
জ্ঞানরাজ্যের "অশেখা-বিদ্যাকে" শেখা-বিদ্যার
বাজারে আনিয়া যাচাই করেন মাত্র। যাচাই-
কাঁচ আর কিছুই নহে, খাণ্ডাখ-পারীক্ষা
অর্থাৎ, পাচাতবিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে
বলে বাসার্য্য-প্রতিপাদন (Verification)।
অন্তরের কথা কি বাহির হইতে পাওয়া
যাইতে পারে ? তাহা যদি সম্ভবপর হইত,
তবে, মনুষ্য আপনার অন্তর্নিহিত চৈতন্য পথে
ঘাটে কুড়াইয়া পাইত। শেখা-বিদ্যার কাঁচ
বাহিরে, আর, অপেক্ষা-বিদ্যার কাঁচ অন্তরে।
শেখা-বিদ্যার নিকটে ভিন্ন ভিন্ন জাতব্য-বিষয়
শ' শ' ক্ষুদ্র আবিষ্কারের গভীর মধ্যেই অবস্থিত,
পশ্চৎ সে সমস্তের মধ্যে মর্মে, পরপরের সহিত
সৌহার্দ্য-বিনিময়ের যেরূপ নানামুখি পথ
প্রসূত হইয়াছে, তাহার সম্ভাবনা গুঁজিয়া পাওয়া
অশেখা-বিদ্যারই কাঁচ—মূল জ্ঞানেরই কাঁচ।

পণ্ডিত ও জ্ঞানীতে প্রভেদ

পণ্ডিত বিদ্যা আশ্রয় করেন, জ্ঞানী
বিদ্যা প্রচার করেন। বিদ্যা এবং জ্ঞানের
মধ্যে প্রভেদ বিস্তৃত; প্রভেদটির গুরুত্বও
অধিক ঐহিক ছুই বিভিন্ন পথের টিকানা
নির্দেশ, করাও কঠিন। যাহারা বিদ্যা-পথে
মনে, তাহাদিগকে বলে স্বপণ্ডিত, যাহারা
জ্ঞান-পথের বনি, তাহাদিগকে বলে
পরমজ্ঞানী।

জ্ঞান, বিদ্যার বিশেষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে
মহাযোগের কিরূপ অপূর্ণ বন্ধন
আঁটিয়া দেয় তাহার সন্ধান

একটু ভাবিয়া দেখিলে, বোধ হয়, বিদ্যার
পথ সকলেরই নিকট স্থপরিচিত-জ্ঞানের
পথ অনেকের নিকট হয়তো অপরিচিত।
মূল কথা, জ্ঞান নিতুতান্তরে কাঁচ, করিয়া
বিদ্যার বিশেষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মহাযোগের
কিরূপ অপূর্ণ বন্ধন আঁটিয়া দেয়, তাহার
সন্ধান করা পণ্ডিত যাত্রেরই কর্তব্য। তাই
আজ পণ্ডিত-সমাজ, অশেখা-বিদ্যার সাধক
স্বভাবকবিরা কি ভাবে নিতুতান্তরে কাঁচ
করিয়া বিদ্যার বিশেষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মহা-
যোগের কিরূপ অপূর্ণ বন্ধন আঁটিয়া ঘিরাছেন
তাহার সন্ধান করিতে প্রচেষ্টা হইয়াছে।
বাস্তবিক, যাত্রের গভীর ভাবস্রোতের
অভিব্যক্তি উদ্ভাবনী-শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত
হইতে হয়। এইরূপ, নিরক্ষর ব্যক্তিদের
একরূপ কাঁচ কি বিশ্বকর নহে ?

বিদ্যা ভাব প্রদানে ভাষা-স্বপ্তি

বিষয় বা ভাব প্রদান করিলেও, সেই ভাব
আন্তর্গত করিয়া তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কি
কম শক্তি-সামর্থ্যের কথা! এক্ষেত্রে তাহাও
করা হয় নাই। ভাষা, ভাব ও প্রতিভার সহজ
অধিকার। এই গানেই বিজ্ঞ-সমাজের সহিত
এই অজ্ঞসমাজের পার্থক্য ও বিশেষত্ব।
অতএব, ইহাদিগকে উৎসাহিত করা কি ভায়
ও কর্তব্যপারায়ণ বিজ্ঞসমাজের কর্তব্য নহে ?

উদ্যোগিক কর্তৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান

অতঃপর, গভীরায় এই নবরূপ-পরিগ্রহের
প্রধান উদ্যোগিকর্ত্তা মহাশয়দিগকে আন্তরিক
ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইতেছি।

সমালোচকগণের সমালোচনা

বর্তমান সময়ে, আমাদের দেশে উচ্চাভিলাষের স্থান বিশেষ-বুদ্ধি অধিকার করিয়াছে—অস্বাভাবিক প্রতিপত্তিই বেশী দেখা যাইতেছে। বাক-প্রশস্ত সমালোচক ও কথ্যহীন প্রতিষ্ঠা-ভিত্তিক সংখ্যা বড় বেশী—তাঁহারা কেবল নিশ্চলভাবে বসিয়া জাবর কাটিতেই বেশী ভালবাসেন।

উদ্যোগকর্তার প্রতি নিবেদন

তাই, উদ্যোগকর্তাদের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন জগতের অবজা-টিক্কারার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিজ কর্তব্য-কর্ম হইতে বিচ্যুত না হন। কারণ, কর্মের উদ্দেশ্য কেবল উপস্থিত একটা কোন ফললাভ নহে। নিজের শক্তিকে খাটাইবার জ্ঞত ও কর্মের প্রয়োজন। কর্ম করিবার উপযুক্ত হযোগ্যতা পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য ও অভাবনীয়রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। কর্মী যদি স্বার্থ বশিষ্ঠমনা রাজ্যিক-চায়-কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণ রক্ষা করিয়া না চলিতে পারে, তবে, সে কর্মের চেষ্টায় ফললাভ না হইয়া ব্যর্থতার বিষণ্ণ হইতে থাকে। এইরূপ কর্মফল-আশাই দ্ব্যশা বা নিরাশা-নামে অভিহিত হয়। আমরা আশা করি, উদ্যোগকর্তাগণ

বিবপ্রেক্ষিক কবির এই জীবন্ত আশ্ব-প্রসার-বাক্য সূর্য্যায় শ্রবণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ থাকিবেন।

“আপনার ল'য়ে বিব্রত থাকিতে,

আসে নাই কেহ অবনী” পরে!

কালের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেক আপোষের পরের তরে।”

সমালোচকগণের সান্ত্বনা

জগতে প্রায়ই কেহ অর্থ ব্যয় করিয়া প্রতিষ্ঠা ক্রয় করিতে চায় না, ইহাই বিচার করিয়া, সমালোচকগণ মনে সাধনা আনিতে পারেন।—আর যদি তাহাই হয় তাহাতে যদি দেশের উপকার হয়, তাহাতেই বা কোন কি? জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিরই যদি “ক্রমোন্নতি” কর্মের উদ্দেশ্য মনে করিয়া কর্তব্যবোধে য য কার্য করিতে থাকেন, তবে, প্রত্যেকেরই আয়োজনটি মানিত হইতে পারে এবং কার্য-বিশেষে কর্ম-ফলের জ্ঞাত-ভীতি-বিস্তৃতা, ব্যাঘ-ব্যাকতা এমন কি প্রতিহিংসাও জন্মায় না। কর্ম নিত্য, কর্মফল অস্বস্ত্যবী—কার্যের প্রতিক্রিয়া স্বনিকট। অতএব, বড়ই কার্য করা যায়, ততই আয়োজনটি মানিত হয়—কিছুই বিফল হয় না।

ত্রীলনিকীকাত বহু।

চট্টল মহিমা *

আর্য্যগণ যখন বৃষ্টিতে পরিয়াছিলেন যে, ভারতের পশ্চিম অঞ্চল নানা কারণে উত্তরোত্তর তাহাদের বাসের অসুপযোগী হইয়া উঠিতেছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে অবশ্যই

সরিয়া পড়িতে হইবে, তখন ইঞ্জিয়া দেখিলেন ভারতের মত স্থান আর নাই। ভারতই তাহাদের সেই মহাময়ী ক্ষমতার সম্পূর্ণ পরিচালনা ও উৎকর্ষ-সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

এই মনে করিয়া আর্য্যগণ ভারতে পদার্পণ করেন। আর্য্যগণ ও সর্ব্বৈর্ব্যবসায়ী ভারত-ভূমি এতদূরত্বের বোণা সম্বলনে উভয়েরই মঙ্গল হইল, ভারত ধনী হইল, আর আর্য্যগণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য কি শারীরিক কি মানসিক কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে বিজ্ঞান-বৈজ্ঞান্যী উড়াইতে পারিলেন।

আর্য্যগণ-প্রথমতঃ পশ্চিমভারতে উপনিবিষ্ট হইয়া ক্রমে ভাষ্কর্য্যবীতরবর্তী সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করেন। বিদ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য কারণ পরম্পরা মিলিত হইয়া কালে তাহাদিগকে সপ্তগ্রাম হইতেও সরিয়া পড়িতে বাধ্য করিল, বাসোপযোগী স্থানাদেয়ের তৎপর হইয়া বৃহদর্শী আর্য্যগণ দেখিলেন “চট্টল” রমণীয় স্থান। সর্ব্ববিধ সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাহাই তাহাদের আশ্রয়স্থল। এই স্থির হইলে তাহাদের কেহ কেহ সপ্তগ্রাম হইতে চট্টলে আসিয়া বসতি করিতে লাগিলেন।

আর্য্যগণের আগমনের পূর্বে চট্টলে কেবল পার্শ্বভাষাতির বাস ছিল। ইহাদের আকার-প্রকার, আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা ইত্যাদি সমস্তই আর্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই উহার নবাগত আর্য্যগণের পরিচয় প্রার্থনা করিল এবং প্রত্যুত্তরে বলিল যে, এই নবাগত ব্যক্তিদিগের বাসস্থান সপ্তগ্রাম। পার্শ্বভাষাগণ প্রায় সমস্ত উচ্চারণে অপটু, “স” স্থলে “ছ”, “ছ” স্থলে “চ” এইরূপ উচ্চারণ তাহাদের স্বাভাবিক। এইরূপ পার্শ্বভাষাগণ উচ্চারণে “সপ্তগ্রাম” স্থলে “চট্টগ্রাম” উচ্চারণ অসম্ভব নহে। তখন হইতেই উহাদের মুখে মুখে ইহাদের নিবাস “চট্টগ্রাম” ক্রমে সর্ব্বত্র এইরূপ প্রখ্যাত হওয়াতে—আর্য্যগণের বসতি-স্থান এক্ষণে

“চট্টল” হইলেও তাহা “চট্টগ্রাম” নাম ধারণ করিয়াছে। চট্টলের অধিবাসীবৃন্দের সাম্প্রদায়িক অবস্থা পর্যালোচনা করিলেও এই অসুস্থান সিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়। যে অসুস্থান্যক নিয়ন্ত্রণের লোক ব্যবসায়ের জ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে চট্টলে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়, তাহারা এক্ষণে “রোসাঙ্ক্য” অর্থাৎ রোসাঙ্ক-দেশীয় বলিয়া অভিহিত। তাহাদের সহিত অজ কোন সম্প্রদায়ের অদ্যাবধি কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। প্রবাদ আছে চট্টলের দক্ষিণাংশে “রোসাঙ্ক্য” নামে যে এক জনপদ আছে, তাহা পূর্বে মগরাজের রাজধানী ছিল। রোসাঙ্কের সমিহিত “হারভাঙ্ক” নামক স্থানে রাজকীয় প্রাচীন চূর্ণের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। মগরাজের নাম “হারভান” কোনরূপ অস্মায় দেখিলে এতদেশে লোক-এখনও কথায় বলে এক “হারমাদের রাজা”? রোসাঙ্ক অঞ্চল এখন মগদিগের বাস। রোধ হয়, রোসাঙ্ক অধিপতি মগরাজের রাজ্যে বাস করিত বলিয়া রোসাঙ্কদিগকে এখনও সাম্প্রদায়িকভাবে একটু দূরে রহিতে হইয়াছে।

আর যাহারা ত্রিপুরা, কুমিল্লা প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়াছিল এখানকার উপনিবেশক পশ্চিমদেশীয় আর্য্যগণের কল্পনায় উহাদের নাম হইল বঙ্গদেশী বা বংগদেশী। যাহারা সন্ধ্যাপ হইতে আগত তাহার সন্ধ্যাপী, এবং যাহারা কৃষনগর হইতে আগত তাহার কৃষনগরী। চট্টগ্রামে এ সকল সম্প্রদায় অল্পভাষা, আর সমস্ত চট্টগ্রামী। এই কয়টা সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক নীমাতেই আবদ্ধ।

কলতঃ এইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়ের আয়েরাি চট্টলের শুভদিনের অকণোদয়ে এদেশে সমাগত। তাহাদের

* চট্টগ্রাম বন্দীর সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধের এক অংশ।

বসতিস্থান সপ্তগ্রামের নামেই পৌরাণিক চট্টলের নাম চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রামের পৌরাণিক নাম সম্বন্ধে যোগিনী তন্ত্র—

চন্দ্রশেখরমারভা পঞ্চাশদোষানাবধি।
বহিঃ ক্ষেত্রমিহ পুণ্যং দেবানামপি দুর্লভম্।
সাক্ষির্ভক্টি দেবানাম্ বসতিচট্টলে শুভে।

বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন চট্টগ্রাম, “চৈত্যা” অর্থাৎ ধর্মস্থান, তাহার গ্রাম এই অর্থ লইয়া চট্টগ্রামের নাম “চৈত্যাগ্রাম” ছিল। এই চৈত্যাগ্রাম শব্দের অপভ্রংশই এইক্ষেণে চট্টগ্রাম হইয়াছে।

চট্টল জননীর বিভিন্ন অঙ্গে জগদারাধ্য রাম-সীতার পাদচারণ-চিত্রের যে বহুতর পুণ্য নিদর্শন উজ্জলভাবে অঙ্কিত রহিয়া আশাবি শত শত ধানিক হিন্দুকে ভক্তির আকর্ষণে দূরদূরান্তর হইতে নিরন্তর লইয়া আসিতেছে; তন্মধ্যে যেমন সীতাকুণ্ড, রামকোট, সীতামাটি, সীতাপাহাড়; তেমন চট্টগ্রাম সহরের সম্রিহত কর্ণজলিনীর অংশবিশেষ “সীতাপদ্ম” অঙ্গতম। সীতাপদ্ম এককিঞ্চিৎ বেগুন হিন্দুদিগের তীর্থ, অর্থাৎকিঞ্চিৎ ভেদন বালক-সম্প্রদায়ের আশ্রয়, এক বন্দর। বোধে, মাদ্রাজ, বিলাত প্রভৃতি বহুদেশীয় জাহাজ-পরিবাহন-নৌকাদির অবলম্বন। বলা বাহুল্য, কাজেই দেশীয় বিদেশীয় সকলের নিকট “সীতাপদ্ম” বিশেষভাবে পরিচিত, একজন সীতাপদ্ম নামেই তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র। চট্টগ্রাম সহরের নাম বৈদেশিক। ভাষায় সীতা (চিটা) গঙ্গা (গাং) অর্থাৎ চিটাগাং (Chitagong) হওয়া অনেকেরই অস্বাভাবিক।

চট্টগ্রামের আর এক নাম “চাটগা”। ইহা ব্যবহৃত শব্দ। কিংবদন্তী আছে, চট্টগ্রামের

আদিম অবস্থায় সমাকীর্ণ বন-জঙ্গল হইতে পার্শ্বতা প্রাপ্তিরা নিরন্তর গ্রামবাসীর উপর নানাবিধ উৎপাত করিত। একদা একজন লম্বা জাহাজ হইতে দিবা-কাস্তি এক মহা-পুরুষ কাঠফলক অবলম্বন করিয়া তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার হাতে একটি বৃহৎ “চাট” অর্থাৎ দীপ ছিল। চাটটি, তিনি যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সেই থানেই রাখিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের মহিমাযুক্ত আকৃতি সেই অত্যাচ্ছল বিশাল দীপালোকে অধিকতর উজ্জ্বলিত হইয়া তৎকাল দর্শনগণের ভীতি উৎপাদন করিল। তাহার ভীত হইয়া পলায়ন করিল, তখন হইতে গ্রামবাসীরা নিরপদ্রবে বাস করিতে লাগিল। এই উপক্রমেই গ্রামের পত্তন হইল বলিয়া এই গ্রামের বা দেশের নাম “চাটগ্রাম” (চাটগা)।

এই মহাপুরুষের নাম বদর সাহেব, শতাব্দীর পূর শতাব্দী অতীত হইয়া গেল অস্বাভাবিক চট্টগ্রামবাসী হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, সকলেইই ধর্মের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার স্রোত অবাধ্য। চট্টগ্রাম সহরে তাঁহার সমাধি “বদর সাহেবের পাতি” নামে এক প্রসিদ্ধ স্থানে আছে। তথায় প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক চাট (মোমবাতি ইত্যাদির আলো) প্রদান করিয়া সেই চাটের স্মৃতি রক্ষা পূর্বক তাহার প্রতি অকৃতজ্ঞ ভক্তি-প্রীতির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

চট্টগ্রামে বাজিদ বৌদ্ধি, সাহায্যকার, সাহায্যকার প্রমুখ বারজন বিখ্যাত মুসলমান ফকির বাস করিতেন। এজন্য চট্টগ্রামের নাম ছিল “বার আউলিয়া”। ইসলাম খাঁর আদিপিতৃকালে “ইসলামাবাদ”, বৌদ্ধপ্রভাব-কালে “রমাকুমি”, পুণ্ড্রগীর্জার সময়

“পৌত্রগেহো” এই কয়েকটি নামও এক এক সময় বিভিন্ন কারণে উৎপন্ন হইয়া চট্টল-জননীকে এইরূপে বিভিন্ন নামে পরিচিত করিয়াছে। যে কয়টি নামের উল্লেখ করা হইল; সমস্তই চট্টগ্রামের মহাবৈষ্ণব পরিচায়ক সম্বন্ধে নাই।

হাবনে ও কালের অদ্বন্দ্ব অস্বা-সংঘটন স্বভাবিক। পূণ্যতীর্থে উপস্থিত হইলে সঙ্কল্পের সাধুভাব, রণভূমিতে উপস্থিত হইলে বীরজনের বিক্রম, ও বিলাসভবনে উপস্থিত হইলে বিলাসী জনের বিলাস-বাসনা আপনা হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। উল্লেখিত আর্থগণ চট্টলে আসিয়া প্রথমতঃ কিয়দিন আপন দুঃখদারিদ্র্যের ভিতরে নীরবে নুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু চট্টল তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল এইভাবে থাকিতে দিল না। ক্রমে চট্টলের মহিমা তাঁহাদের অস্থিরতা আসিল।

চট্টলের মহিমা স্বপ্রকাশ ও অনিরুদ্ধনীয়। পূর্বে বঙ্গদেশ, পশ্চিমে সমীপ, উত্তরে ফেবিনদী ও দক্ষিণে বঙ্গমাগধ-সম্মিলিত নাক নদী, এই ভূভাগ চট্টল, প্রকৃতির অপূর্ণ লীলাক্ষেত্র। পূণ্যতোয়া, কত নদ-নদী, জল-নিষ্করণী, জলপ্রপাত, অথ স্তরে স্তরে সীমান্ত-বিসারী মেঘমালায় ছায় গগন-বিলেগী বৈলক্যে, মধ্যে মধ্যে বিবিধ তরু, লতা, গুচ্ছাদি পরিভূত। অন্যত্র কিংবা শব্দ-শব্দ-শব্দ-শব্দ-শব্দ, বিলাস প্রান্তর এবং কত বন-উপবন কৃষ্ণ অঙ্গে ধারণ করিয়া জননী যেন মুক্তিমতী মহাপ্রসিক্তে বিখকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইয়া বিশ্বব্যপন করিয়া তুলিতেছে।

এইরূপে শৈল-সাগরের সম্মিলন, এক সঙ্গে জল-অনলের সৌন্দর্য্য ও এইজন্য জলহলের সমন্বয়ে প্রকৃতির বিখক অপরূপ সৌন্দর্য্য চট্টগ্রাম ভিন্ন আর কোথায়ও নাই।

আবার চট্টল-জননীর আকার-প্রকার দেখিলে আশ্চর্য্যায়িত হইতে হয়। আলু-লাহিত কেশপাশের ছায় অনন্ত কোটি তীর্থ বিস্তার করিয়া উত্তরে ও দক্ষিণে মহাতীর্থ চন্দ্রশেখর ও আদিনাথ দুইটি গিরি যেন চট্টল-জননীর দুইটি মস্তক। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের কত তীর্থ-চট্টল-জননীর অঙ্গে অত্যাচ্ছল আভরণরূপে নিরন্তর শোভা পাইতেছে। কাঁইবা ও শম্ব এই নদী দুইটি মায়ের অমৃতোৎসব গুচ্ছায় অদ্বন্দ্ব দুইটি ধারা, সমস্ত চট্টল-সন্তানকে পরিতুষ্ট করিয়া জননীর আসন পর্যন্ত সিক্ত করিয়া পরিশেষে সাগরের বাঁহা মিশিতেছে।

সমুদ্রে অনন্ত নীলাকাশের নীচে বঙ্গ-সাগরের গিগন্তবিসারী নীলাধুরাশি। তাহার তীরে জননী ব্রহ্মাসীনা। অংগনি সাগরবন্ধে শৈলপ্ৰলোম যেন উত্তাল তরঙ্গমালা উত্তিত হইতেছে, জননী তাহা অঙ্গে বিনীল করিয়া জগজ্ঞানকে ইচ্ছিতে জ্ঞানহিতেন্দ্র, আইস আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। তবে তোমাদেরও এইরূপে প্রকৃতিতে লয় হইবে। আর অরামুভাজিত ক্লেশ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। হিন্দুর শাস্ত্রে বলে “চন্দ্রশেখরমারুহ পুনর্জন্ম ন বিধাতো।” জননীর এই দৃঢ় বড়ই গম্ভীর, বড়ই আশ্বাসিক। দেখ, আবার আবার দৃঢ় কেমন রমণীয়। সাগর বন্ধ দিয়া হেট-বড় কত বাণিজ্যতরী, বাণীয়াপোতা, অর্ধ-যান, বাণীবাহ বিহঙ্গের ছায় পক্ষ বিস্তারপূর্বক জননীর বাণী লইয়া নিরন্তর গিগন্তগুচ্ছ উড়িয়া ছুটিতেছে।

মায়ের এ সকল আত্মত মহিমা অবলোকন করিয়া স্বাং বারিপ্রসিদ্ধি তাহার মহিমাযুক্ত পদপ্রান্তে (মেহিশখালী মখে) ভক্তির সহিত

তরঙ্গে তরঙ্গে অজস্র শব্দ, শক্তি, প্রাণালাদি রত্নধূপের অঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এই আর একটা অতুল মায়াভা-
পূর্ণ দৃশ্য।

চট্টলের সর্বত্র এই উদ্‌কীর্ণাময় মহিমা অহুভব করিয়া অভ্যাগত আর্থাগণের মন-
পাতা উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অচিরে সাগর, প্রান্তর, শৈলশৃঙ্গ কাঁপাইয়া তাঁহাদের সাধনের বাতাস বহিতে লাগিল। চিরকালের ঘনঘটা কাটিয়া গেল, চট্টল-আকাশে পূর্ণ আলোক দেখা দিল। চট্টলের মহিমা আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। এক্ষণেই চট্টলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য-চেষ্টার পূর্ণ আশ্রয়। বসন্তঃ চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যেমন অতুলনীয়, তেমনই কি আধ্যাত্মিকতা, কিশল্যবান্ধা কি সাহিত্য কবিতা কোন বিষয়ে কখনও হীন নহে। পরে অত্যাধিক বিষয়ে আলোচনা করিব, এক্ষণে কিঞ্চিৎ কবিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

চট্টগ্রাম কবিতার দেশ রলিলে অত্যাধিক হয় না। এখানে শিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত, অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে অত্যল্প-বয়স্ক বালক-বালিকা পর্য্যন্ত, উত্তম ভদ্রসমাজ হইতে নিচতশ্চরী লোক পর্য্যন্ত এবং চট্ট-গ্রামের আদিম অবস্থা হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত সর্বত্র সকলেরই মুখে চিরদিন দেশ-কালপাত্রভেদে বিভিন্ন প্রকার কবিতার পরিচয় পাই।

প্রাচীন কবিরিগের মধ্যে দুর্গা-জাগরণের কবি মাধবাচার্য্য এবং বাইশ কবি ও ষট্টি কবি মনসা-মঙ্গল কাব্যের অনেক কবি চট্টগ্রামের। বাইশ কবির অত্যন্তন অকিঞ্চন দাস, বিদ্যা-পতি শ্রীবৃক্স নবীনচন্দ্র দাস গুণাকরের চম পুস্তক পূর্ববর্তী, ইহার নিম্নাঙ্গ পট্টাচার্য্য অন্তর্গত কেলিসহর।

শ্রীকর, নন্দী—পরাগলি মহাভারতের অহ-
বাণেই ইহার কবিত্বের পরিচয়। শ্রীকরের
নিম্নাঙ্গ পট্টাচার্য্য সমিহিত জঙ্গলবাইন গ্রামে।
এই গ্রামে হুইটা প্রাচীন জলাশয় শ্রীকরের
কীর্তি বক্ষা করিতেছে। ‘রাজস্থানের’ কবি
শ্রীশুক বিপিনবিহারী নন্দী শ্রীকরের বংশধর,
নৌ গ্রামেরই অধিবাসী।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই দেশের আরও
হুইজন কবি সম্বন্ধে পাওয়া যায়—

ভবানী শঙ্কর দাস, দুর্নহা গ্রামে বাস
লিখে চট্টাকাব্য জাগরণ।
হুইকবি গোবিন্দ দাস, বেংগামে ছিল বাস
কালিকামঙ্গল বিরচণ।

দুর্নহা পট্টাচার্য্য। দেবগ্রাম বর্তমান নামে
আনোয়ারী, পট্টাচার্য্য হইতে ৮ মাইল দূরে।

হিন্দুদের মত মুসলমানদিগের মধ্যেও
চট্টগ্রামে অনেক প্রাচীন কবির কবিতা
দেখিতে পাই। তন্মধ্যে অধিকাংশ বৈষ্ণব
কবি, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

পদ্মাবতী কাব্য ও তাহার কবি আলোয়ালা
সকলের নিকট পরিচিত। ইহার নিম্নাঙ্গ
হাটহাজির অন্তর্গত কংতপুর নামক গ্রামে।
তৎকালকার আলোয়ালায় দীর্ঘ আরো বহুগণও
তাহার সাক্ষ্য দিবে।

ইহার সকলেরই প্রাচীন; নবীনচন্দ্র সেন
সেদিনকার লোক। তাঁহার পরিচয় এক্ষণে
বাহুল্য মাত্র। তিনি রাউজানের অন্তর্গত
নয়াপাড়া নামক গ্রামে— জঙ্গগ্রহণ
করিয়াছিলেন।

এই ত গেল উচ্চশ্রেণীর কাব্য ও কবির
কাব্য। প্রাচীনবাল হইতে অজ্ঞাত বিভিন্ন
শ্রেণীর লোকের মুখে চট্টগ্রামে যেরূপ
কবিতার বিকাশ হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ
নিদর্শন নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ভট্টমুখে—চন্দ্রশেখর বর্ননার স্বভাবোক্তি—

১। দেখিলাম আদিবাস আদিবাস চট্টগ্রাম
পুণ্যায়ম শেখ

চন্দ্রশেখর পরতপপরপার্কীত মহেশ্বর।
মাইতে দরশনে দরশনে স্থানে স্থানে
পুণ্যাতীর্থ সব
উত্তরে লবণাধ্য দক্ষিণে বাউর। ইত্যাদি
মুসলমান কবিত্বের মুখে হইয়াছে—

২। কে তোরে পাঠাল ভবের মাঝে ও
মহুয়া ভাইরে,
ও মন মনাইরে শুদ্ধ ভাবে উজ্জ্বল কর,
নিরবিরাম কল্যাণ পড়,
কেশবান লামাই কর তেলায়ত।
ইত্যাদি।

৩। মিছা দুনিয়ার গীরত ছাড়,
কাল থাকিতে চেষ্টা কর,
সমস্ত তরিতে চাও গুণ কর ভাবনা।
আধার মণ্ডপঘরে, যখন সুপিব ভোরে,
ভাই বন্ধু আসবে ঘরে ফিরি আর ত
বেথবে না। ইত্যাদি।

৪। জন্মেছি ভবের মাঝে চিন্তায় চিন্তায়
দিন যায়,
হেলায় দিন ঘুমাইলুম, মুশিদ না
চিনিলুম,
পাছে হবে কোন গতি ও ভবের মাঝে,
মাটির কায় মাটিতে যাবে
পড়িবে হবে ছাই
শব্দে সুগালে বেড়িয়ে যাবে
এ জীবের ভরসা নাই। ইত্যাদি।

বিরহিণীর মুখে—
৫। উদব উদব প্রাণের উদব
চিন্তে দিলা জালা।
হেলায় ছায়ায় গেল চিকনিয়া কাল।
মথুরার পুরী থানি যোর কাছে বিষ
কুসুমা হয়েছে ঘোর কুলিন সদৃশ।

মাতৃহীন বালকের মুখে—

৬। ছোটকালে মা মরিগেল
বাপে কৈজ বিয়া,
পোড়েরে পোড়েরে চিত্ত
ভুয়ের আশুন দিয়া। ইত্যাদি।
ছদ্মবিনী বালিকার মুখে—

৭। ইলা বুড়া মা বাপেরে চাণ্ডালিকা ভাই
ধনের লোভে বিয়া দিল
বুড়া জামাই চাই। ইত্যাদি।
গৌরক্ষকের মুখে বেলার কবিতা—

৮। হুধারে হুধা কিরে ভাই হুধা,
হুধ ক্যা না দিলা বাঘের ভরে
বাঘে কি বল মারে ধরে। ইত্যাদি
চাণ্ডাবের মুখে হাল্যা ‘গাইর’—
৯। জোয়ারে ভরিল চানখালির আগা
ফিরি ফিরি চাঁর আইয়েরনি দালা।
ইত্যাদি

হাজি বাজারদের মুখে চৈত্র সংক্রান্তিতে
ঢাক বাজারিবার সময় ‘মুস্তা’—

১০। আশা শব্দ আনিদি বর,
তাতে শব্দ নিছ ঘর,
শব্দেই নাম শ্রীহরি
আনে শব্দ ভিক্ষা ভরি। ইত্যাদি—

১১। মরিগেল ভরাসে গধি মরিগো তরাসে,
টলমল করে নৌকা লিহুগ্যা বাতাসে।
কি আনন্দময়রে গধি কি আনন্দময়,
নন্দ যশোধার ঘরে কি চাঁদের উদয়।
দেবজানি দেব হর

দেব পুত্রময়। ইত্যাদি
মুখে ‘হয়লা’—

১২। দরিয়ার কুলেরে নরীয়ার কুলেরে,
পোপান রাজার জল টকি মূই বাধাছিরে
ইত্যাদি

ঘুম পাড়ানি—

১৩। নিভ্রা আলি মাউরে মোর বাড়ী ঘাইও,
ডালা ভরি চুরা দিব গাল ভরি ঘাইও।

প্রবাদ বাঁকা—

১৪। আকাড়া চাউলের মধ্যের দোকান।

১৫। ঘোমটার ভিতর খেঁচটা নাচে।

১৬। খেচোনে বাঘের ডগ সেইখানে বাইত
হয়।

১৭। নাচতে না জানিলে উঠান বেকা।

১৮। মা গুণে পোয়া ছুই গুণে রোয়া।

রাধুনী বউকে উপহাস ছলে নিন্দা—

১৯। এক পাতিলা নারিব শাক সাত
পাতিলা পাদি।

বাগে পুতে যুক্তি করি পাইয়াছে বঁধীণ।

নীতি বিষয়ক—

২০। পাটের না ভাটে বলে,
ধর্মের ঢোল বাজে বাজে।

ধাঁধা- (বুড়ন) —

২১। মাড়পর্তে মরি ঘেরা লভিল জীবন।

তাঁহার জনক-পিতা রক্ষক সেজন।

তাঁহার বাহন পিতা যার রথে স্থিত।

তার হৃতে আমি মোরে ভ্রমায় নিশ্চিত।

২২। মুসলমানদের মুখে সত্যপীরের গান

(সংকীর্তন)।

ও পীর সত্য সত্য,

সত্যপীরের বাঙটা নামিল ছনিয়ার
ভিতর।

মারিকপীর উঠি বলে সত্যপীর ভাই

মরিয়াছে খোপের গো জিয়াইতে ঘাই

গোপে বলে আছে ছুধ গোণী বলে
নাই।

বাধানে মরিল তাহার বাছুর শুদ্ধ নাই।

ইতাদি।

শ্রীরজনীকান্ত কব্যতীর্থ

সম্পাদক, চট্টল-ধর্ম-মণ্ডলী।

রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা

পূর্বেই বলিয়াছি—যে সে ভগীরথ
“কিতুবনতারিণী বিমলভরঙ্গ”, “দেবী
স্বরেরা ভগবতী গদা”র আবাহন গাথিতে
পারেন না। ব্রহ্মপাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত সগরের
বংশ উদ্ধার করিতে হইলে যে সে সাধনায়
ব্রতী হইলে চলিবে না। রবীন্দ্রনাথ
ভারতের বীণাপাণিকে তুচ্ছ সরঙ্গামে পূজা
করেন নাই। ইউরোপের মোহাম্মদ মানব-
জাতিকে ব্রহ্মপাণ হইতে মুক্ত করিবার জন্ত
ভারতবাসীরা যে যোদ্ধেশোপচারে বাগ্‌দেবীকে

আরাধনা করা আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথ নানা
ছন্দে নানা কণ্ঠে তাহা করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্য বৈষ্ণবের ভক্তিবোধ
বহিঃমুখ সাহিত্যসেবার মন্ত্র প্রচার
করিয়াছিলেন :—“তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি
স্বদি তুমি মর্ম, অহি প্রাণাঃ শরীরে।”

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের সমাজনী বাগ্‌দেবীকে
সেই মন্ত্রেই আত্মবিন পূজা করিয়াছেন।
ভারতবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে আজ সেই মন্ত্র
বিরাজ করিতেছে—

“তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে

বাজে যেন সদা বাজে গো।

তোমারি আসন জয়-পদ্মে

বাজে যেন সদা বাজে গো।”

আর একজন কবির মাতৃভক্তিও দেখ—

“আমি মা তোর পোয়া পাখী, যা শিখাস মা
তাই শিখি, শিখয়েছিস ‘তার’ বুলি, তাই
ডাকি মা ‘তারা’ তারা।” মাতৃভক্ত ভারত-
সন্তান, তুমি রবীন্দ্রনাথের নিকট যে মন্ত্র
পাইয়াছ তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু এই যুগেই
চাহ কি?

“তব মৌরবে সকল গর্ভ

লাজে যেন সদা লাজে গো।

তব পদপ্রেম মাখি লয়ে তছ

সাজে যেন সদা সাজে গো।”

ভক্তি শিক্ষার জন্ত, নিজ জীবনকে তুচ্ছ
জ্ঞান করিবার জন্ত, “বদদেশের ধূলিকে
“ধ্বংস” মনে করিবার জন্ত আর কোন
উপদেশের আবশ্যকতা আছে কি? কৃষ্ণভক্ত
প্রহ্লাদ মাটি ছুইয়া বলিতেন—“এ ত ধূলা
নয়, হরির পদরঞ্জ।”

শ্রীচৈতন্যময় বদদেশে, ভক্তিপ্রাণিত
ভারতবর্ষে—তুকারাম-কবীর-নানক-জয়দেবের
আবির্ভাব-পূত হিন্দুধানে আধুনিক বাঙ্গালী
কবির ভক্তিপ্রবণতা দেখিলে। আমাদের
চণ্ডীদাসই না আত্মতুলান তমস্রতার গান
গাহিয়াছিলেন?—

“ধু কি আর বলিব আমি।

মরয়ে জীবনে, জনমে জনমে

প্রাণ-নাথ হৈও তুমি।

ধু তুমি যে আমার প্রাণ।

দেহ মন আদি, তোমাকে পেছি

তুল শীল জ্ঞাতি মান।

অখিলের নাথ তুমি হে কাহিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।

গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীন।

না জানি ভজন পূজন।”

ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসীকে আত্মত্যাগ,
সর্বত্যাগ, দেহত্যাগ, “লাজ-মান-ভয়”—ত্যাগ,
জীবন-মৌল-ত্যাগ, কাম-কাক্ষন-কীর্তি-ত্যাগ
শিক্ষা দিবার জন্ত কবি রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীয়
ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান নাই কি?

একজন নূতন কবি তমস্রয়ের গান গাহিয়াছেন—

কি আরাগ ও গো তায়

সব স্বথ দুখ পড়িছে লুটিয়া

একটি ভাবের পায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই তমস্রতার, এই
বৈষ্ণবীয় ভক্তির অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।
আধুনিক বঙ্গভাষায়—আত্মকালকার নূতন
ছন্দে, নূতন শব্দসম্পদে—বিজ্ঞাপিত-চণ্ডী-
দাসের আত্মত্যাগী প্রেম, ঘরবাড়ী-ছাড়ান
এবং জীবন-বিসর্জন-করান তমস্রতাই রবীন্দ্র-
নাথের কাব্য-সাহিত্যের প্রাণ, এক কথা বলিলে
কোন অতুক্তি হইবে না। পাশ্চাত্যশিক্ষিত
ভারতসন্তান ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থের
Immortality Ode এবং টেনিসনের In
Memoriam-এ হিন্দুর ভক্তি-বোধ ঈশ্বর-
প্রেম ও ভগবৎপরায়ণতা আদর করিতে
নিবিড়। রবীন্দ্রনাথ সেই “The child is
the father of the man”—তবকে, সেই
“From God who is our home”—তবকে,
সেই “Behind the veil”—তবকে কিরূপ
প্রকাশ করিয়াছেন দেখ। যাহারা ইংরাজীভাষী,
তাহারা ইংরাজীসাহিত্যের এই ছুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ
কবিতা বুলিয়া বহন, আর যাহারা দেশীয়
মহাশব্দের কথাই শুনিতে চাহেন—তাহারা
যে কোন বৈষ্ণবপদাবলী বুলিয়া বহন।

আমাদের আধুনিক ভক্ত কবির বাণী
শুনাইতেছি—নিম্নকে সর্বত্র বিকসিইয়া দিবার,
বিলাইয়া দিবার, বিশাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা
ও ব্যাকুলতা শুনাইতেছি—

“ওগো মা মৃত্তমি

তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিখিলিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত; বিহারিয়া
এ বসন্তপুষ্প, টুটিয়া পাখিভাং-বৃক্ষ
সর্বত্র প্রচার, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিমোলিয়া, মন্দির
কশ্মিরা খলিয়া, বিকীরিয়া বিছুরিয়া,
শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পূনকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভুলোকে
প্রাপ্ত হতে প্রাপ্ত ভাগে।

সেই সর্বমানে আমারে কিরাণে লহ
যেথা হতে অহরহ

অক্লিছে বুকুলিছে মুগুরিছে প্রাণ
শতক সহস্ররূপে—ওগুরিছে গান
শত লক্ষ হুরে, উচ্ছ দি উঠিছে নৃত্য
অন্যথা ভকীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিড়ে ছিড়ে বাজিতেছে বেণু,—
দাঁড়য়ে রয়েছে তুমি শ্রান করহুৎহুৎ;
এই “বহুধারা”-কবিতাটিকে কেন তেন
প্রকারেণ চোপা ইংরাজী গঞ্জে প্রচার করিলেও
Immortalityকে কাণা করিয়া দিলে।
জীবনযৌবন-দেহমনপ্রাণ এ সব সমর্পণ করিয়া
তময় হওয়া যুগযুগান্তরব্যাপিনী সাধনার—
জ্ঞাতগত অভ্যাসের—ফল। বিভাজিত-ভী-
দাস-রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারী পক্ষে ইহা
অতি সহজ—বিলাতী কবি অতদূর উঠিতে
পারেন নাই। পাক্ষাত্যের পক্ষে খুব জোর—
“Obstinate questionings of sense
and outward things,” এবং—

“To me the meanest flower that
breathes, can give
Thoughts that often lie
too deep for tears.”

কিন্তু প্রায়ই তাহার “Another race
hath been, and other palms are
won,” এবং “Gone is that vision,
the melancholy dream.” রাখার স্বপ্ন
এরূপ ভাঙিত না। যে রোগা ভাঙে তাহার
মুগ্ধ কতটুকু? যে ভাবুকতার জ্ঞত পরে
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, অথবা অস্বস্তাপ করিতে
হয় তাহা আবার ভাবুকতা?

তন্মতান্তর শুনা আছে—গভীরতব-তন্মততা
ভারতবর্ষই বুঝেন—বিলাতীর এখনও সাধ্য
নাই। ওয়ার্ড সওয়ার্থ রাখার ছায় তমালের
শাখায় পরিণত হইতে চাহেন নাই—যমুনার
কাল জলে পা ঢালিতে পারেন নাই। যে
কোন হিন্দু সহজেই তাহা পারেন। প্রতিভাবা
বীরভূমিও পারিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভক্তিশ্রদ্ধা আলোচনা করিয়াছ
কি? বীরবর মহামার্য নেতৃত্বভক্তি দেখিয়াছ
কি? হিন্দুদেবতাব্দের আধুনিক বাহন-তত্ত্ব
বুঝিয়াছ কি? পশুপক্ষী, তরুলতা আমাদের
বেদদেবীপদের এত প্রিয় কেন বুঝিতে চেষ্টা
করিয়াছ কি? হরিপ্রিয়া তুলসীর মধু এবং
বিষ্ণুপী শালগ্রামবিশিষ্ট মাংস্য কখনও
ভাবিয়াই দেখিয়াছ কি? বৌদ্ধজাতক-
সাহিত্যে বুদ্ধদেব কীটপতঙ্গ-উদ্ভিদ-জন্তুরূপে
কতবার জন্মিয়াছিলেন বোধ হয় জান।
আমাদের জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণবের “জীবে দয়া”
নিশ্চয়ই জান। আমাদের মীন অবতার,
কৃষ্ণ অবতার, বরাহ অবতার, নৃসিংহ
অবতার—এ সব কথা নিশ্চয়ই জান।
আমাদের অহিসাসাত্ত্বের কথা বোধ হয়

শুনিয়াছ। কালিদাসের মীতাবল্লভ-অধ্যায়ে
“অত্যন্তমাদীক্ষিতং বনবর্ষণং” পড়িয়া
অবশ্যই অশ্রুজল ফেলিয়াছ। মীতাবল্লভের
“কুরুরী বয়স” কল্পনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-
প্রকৃতির, আমাদের বনবনভার সম্বন্ধনা ও
আত্ম রোমন কখনও হোমেরা ভুলিতে
পারিবেন না। আমাদের প্রাচীন চিত্রশিল্পের,
ভাস্কর্যের, কাঞ্চকার্যের নমুনা নিশ্চয়ই
দেখিয়াছ। তাহাতে বানর, হস্তী, মৃগ,
পাখীর সখ্যভাব, উপাশ্রয়ভাব, শিয়ভাব বোধ
হয় লক্ষ্য করিয়াছ। ছেলেবেলায় বাজা
দলের গান নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, ভারতের
প্রকৃতিবৈচিত্র্য রামচন্দ্রের কত আশ্চর্য
তাহা ত জান—মীতাবল্লভের পাতাল-প্রবেশও
দেখিয়াছ।

“হে বনজ তরুলতা, হে বিহঙ্গমুল,
আমি রাম, মীতাবল্লভকে হয়েছি আত্মল।
হে দেব চন্দ্র হৃদয় হে দেব পবন,
জান কি এ পথে সীতা কুরেছে গমন?”—
রামচন্দ্রের এই প্রশংসিত সার্বকল্যাণ
কি আর?

“দেবতার মোরা আশ্রয় আমি আকাশে
প্রদীপ জালি।
আমাদের এই কৃষ্ণের দেখেছি মাথায়ের
ঠাকুরালী।”

ইহারই বা অর্থ কি?
এই সকল চিত্রপরিচিত চিত্রপুস্তান
মাধুরীগুলি বুঝিতে পারিলে, তোমার দারিণ্য
জন্মিবে,—প্রকৃতিদেবী—পশুপক্ষী, তরুলতা,
কীটপতঙ্গ, নদী-মাগর, অনল-অনিল এ সব
হিন্দুর কৃত পবিত্র, কৃত আশ্রয়,—এ সব
হিন্দুর জীবন কতকাল হইতে কতপানি
অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তবেই
বুঝিবে—কেন হিন্দু সাধকগণ জলবাধুর

সঙ্গে, বিশ্বদেবতার সঙ্গে এক হইয়া নিশিতে
চাহেন—পঞ্চভূতে মিলিয়া রহিতে চাহেন—
কেন সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ বানর গাঙ্গিয়াও
ভগবানের আরাধনা করিতে ভাল বাসিতেন।
তবেই বুঝিবে—কেন স্বদেশ-সেবক দেশের
মাদুর সঙ্গে সখ্যস্থাপন করিতে চাহেন—
দেশের মাদিকে পূজা করিতে চাহেন।
তবেই বুঝিবে কেন মানবসেবক কৃষ্ণকের
সঙ্গে কৃষ্ণক হইতে চাহেন, দীনবিরহভাবী
কৃষ্ণের জীবন অতিবাহিত করিতে চাহেন—
কেন তিনি জগতের সর্বত্র কর্মক্ষেত্র
ধর্মক্ষেত্র খুঁজিয়া পান।

তবেই বুঝিবে কেন শিবেজঙ্গলালের ইচ্ছা
ছিল “আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন
এই দেশেতেই মৃত্যি” তবে বুঝিবে—
কেন রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন—“অধি মেলে
তোমার আলা, দেখে আমার ষোণ
জুড়াল; এ আলোতে নয়ন রেখে মূব নয়ন
শেয়ে” তবে বুঝিবে কেন বিবেকানন্দ
প্রচার করিয়াছেন “দর্শন দ্বারা অর্পণ” পূজা,
তবেই বুঝিবে কেন বীর সমাদী গভীরথরে
বোধনা করিয়াছেন—“ভারতের কর্মক্ষেত্র
আমার শৈশবের শিশুখ্যা, আমার যৌবনের
উপবন, বাল্যকীর বারাগণী” তবেই বুঝিবে
কেন বঙ্কিমচন্দ্র গাহিয়াছেন—“হুজলাং
হুজলাং মলয়জলিতাং শূন্তাশ্রমালং, শুভ্র-
আত্মাপ্রসূকিত্যামিনীং মূরুদুহমিত ক্রমল-
শোভিনীং, হুহাদিনীং হুহিতাং” তবেই বুঝিবে
কেন যোগীন্দ্রনাথ তোমার বাণ্যবস্থায়
শিখাইয়াছেন—

“জনক যেমন ছহিতারে পালেন বতনে
তেমতি এ হিমাচল ছহিতা ভারতে
জাহ্নবী যমুনাতপা মেধধারা দানে
পালিছেন সম্বতনে।”

বিধাতার কাছে মাগ এই বর বৎস
মাতৃসম যেন পার পূজিবারে
নিভা বদ্ধভূমি মায়ে।”

তাহা হইলেই

“নিখরের স্বরস্বরে পত্রের মধুরে শুনিবে
বসন্তগীত।”

তাহা হইলেই বৃষ্টিবে—

“নন্দনকাননে কিবা শোভা ছার, • • •
স্বর্ণগহ্বরে সে যে মহা গরীয়ান”

এত কথা বৃষ্টিতে তবে রবীন্দ্রনাথের
“বৃষ্ছরা” বৃষ্টিতে পারিবে। এতখানি
বৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রকৃতি-কব্যা
‘জলবৎ তরল’ সহজবোধ্য হইবে। যদি হিন্দুর
সনাতন হৃদয় গভীরতম ভাণ্ডালি তেঁমার
দ্বয়ে আসন পাইয়া থাকে, তাহা হইলে
কবিরের নদী হইয়া যাওয়া, কীট পতঙ্গ
পশু পক্ষী হইয়া যাওয়া, আরবদেশের বেতহীন
হইয়া যাওয়া—এ সব কল্পনা হৃদয়ঙ্গম করিতে
কিছুমাত্র কষ্ট পাইবে না।

এই সব নদীপর্বত, পশুপক্ষী, লতাপাতা,
ফুল-জল আমাদের এত পবিত্র, এত অস্তরঙ্গ
বন্ধ কেন জানি? ইহারা আমাদেরই হৃদয়-
সচেতন বলিয়া—ইহারা আমাদেরই স্বপ্ন-
দাস্ত-সুখের অঙ্গভব করিতে পারে বলিয়া।
মাছ যেমন ভগবত্ত্বজ হইয়া উঠিতে পারে
ইহারাও সেইরূপ ভজ হইয়া উঠিতে পারে।
ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস—ইহাই হিন্দুর ধারণা—
ইহাই হিন্দুর সংস্কার—ইহাই হিন্দুর বিজ্ঞান,
ইহাই হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বপুণ্যতম আবিষ্কার।
আর, দীন-দরিদ্র, দুই-বজর, মুচি-মাধব,—
তাহারাও মাছ, তাহারা সংসারের গুচ্ছ-
বাছা জীব নয়। নাই বা থাকিল তাহাদের
গাড়া-জুড়ি, ডিম্বী পাগড়ী—নাই বা থাকিল
তাহাদের শিকার ফোড়ন আর সভ্যতার

আড়ম্বর। তাহাদেরও হৃদয় আছে, তাহাদেরও
প্রাণ আছে, তাহাদেরও কর্তব্যনিষ্ঠা আছে,
তাহাদেরও ভক্তি আছে, তাহাদেরও
আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে। এই জন্তই
ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীমান্ ও বিজুতিমান্ পদার্থের
তালিকায় বিশ্বচরাচরের কোন বস্তুই বাদ
নেন নাই। এই জন্তই ভগবান্ দরিদ্রের
ঘরে, কাদালের ঘরে, বেততা হইয়া দেখা
দিয়াছেন,—পত্নী অবতারও তাহার উপেক্ষিত
হয় নাই। শুন গীতার উদাত্ত সঙ্গীত—

“শুন, সখা, তবে ভগবান্ কন,

তোমার মনের প্রীতির কারণ

বিজুতি আমার করিহে কর্তন,

অবহিত হয়ে শুনহে এবে।

বিষ্ণু আমি, জিহ্মু আমি তা মওলে,
রবি অংশুমান্ জ্যোতিষ্ক সকলে,
আমিই মরীচি মরুতের দলে,

নক্ষত্র-নিকরে হৃদ্যাংগ আমি।

শিখরীতে মেরু উন্নত-শিখর,
বহুতে পাবক আমিই হই;

স্থির জলাশয়ে সরিতের পতি,
অসীম আকার ধরিয়া রই।

স্বাবয়ের মধ্যে গিরি হিমাধার
অখণ্ড বিটপি-ভিতরে আমি।

মখন করিলে কীরোদসাগর
অমৃতের তরে অম্বর অম্বর;

উল্লেস্রো নায়ে যে ঘোটক-বঁ,

করী ঐরাবত উঠে তাহাতে,

আমি সে ঘোটক, সেই করিবর;

কামবেশ আমি দেখছরভিতরে

বাহুকীও আমি উরগণে

আমি মুগরাজ মুগহুল বনে,

বিনতা-নন্দন বিগলদলে;

বেণুগামিগণে আমি সমীরণ,

শরৎকরে রাম, পবন পাবন,

মীন মধ্যে আমি মুকর ভীষণ

ভাগ্যধীর আমি প্রবাহ জলে।

চরাচরে কিছু নীহিক এমন

আমা ছাড়া বাহা থাকিতে পারে।

এই বিবাসেই, এই ভক্তিতেই হিন্দু পৃথিবীর

সচেতন অচেতন—গণ্যগোবরাহী, হিমাচল-

বিদ্যা—সকলই পবিত্র মনে করে—ইহাদের

মুষ্টি পূজা করে—সকল দেবতার রূপ কল্পনা

করে—মাহুগকে অবতার ভাবে, দেবতাকে

মাহুগের আকার দেখে—প্রকৃতির আরাধনা

করে—প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া থাকিতে

চায়। এই জন্ত—

“ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরেই

চেঁহাই মাথা।

তোমাতেই বিশ্ববীর, বিশ্বমায়ের আলল

পাতা।”—

ইহা কবিতার পদমাত্র নয়—কষ্ট কল্পনা

করিয়া মাথা ঝটাইয়া একটা কঠিন দর্শন-

বাদের অবতারণা নয়,—তোমাদের ব্যব-

হারিক বিজ্ঞানের একটা সত্য প্রচার নয়,

Geology, Botany, Zoology আড়াইখা

দেশের natural resources নয়। ইহা

জ্ঞানযোগ্য নয়; কর্তব্যযোগ্য নয়, ভক্তিবোধ।

যে ভক্তিবোধে দুঃস্থত রামায়ণে পাও,

কালিদাসে পাও, জৈনশাস্ত্র জাতকশাস্ত্রে পাও,

গীতাতে পাও, মকর-রামায়ণজাচারের বৈত ও
বিশিষ্টবৈত পাও; যে ভক্তিবোধ কবীর
তুলশীদাস-ভুবারামে পাও, যে ভক্তিবোধ মকর-
চাণ্ডী-শিখ প্রেমামৃত্যুর চৈতন্যদেবে পাও, যে
ভক্তিবোধ চৈতন্যপাদপদ্মপ্রসূত ভক্তিগদ্যরূপ
বৈষ্ণবপদাবলীতে পাও; যে ভক্তিবোধ আশ
পদ্যন্ত রাধাক্রমের প্রেম-সাহিত্যের অভ্যন্তরে
বিরাজ করিতেছে, যে ভক্তিবোধ ভারতের
আবালবৃদ্ধবিনতার সৈনিক জীবন পরিচালিত
করিতেছে, সেই ভক্তিবোধই ভারতের
একজন যথার্থ সন্তান কবি রবীন্দ্রনাথ প্রচার
করিতেছেন। কবির বসিতে অধিকারী—

“সাবধি জনম আমার,

জন্মেছি এই দেশে,

সাবধি জনম মাগো,

তোমাঘেঁ ভাল বেগে।”

তিনি ভারতবর্গকে গভীরভাবে, বৈষ্ণবভাবে,
প্রকৃত হিন্দুভাবে বুঝিয়াছেন। তিনি
বঙ্গদ্বীপে আসাধের বৈষ্ণব-ভক্তি পুনঃ
প্রবর্তন করিতে।

এখন ভক্তিবোধের প্রভাব দেখাইতেছি।
তন্নয়তার সাহস দেখে—বৈরাগ্যের শক্তি
দেখ—ভাগ্যী আত্মার বিপুল উদ্যম দেখ—
প্রকৃত সাধক, যথার্থ ভক্তের অসীম ক্ষমতা
দেখিয়া রোমাঞ্চিত হও—

“ভাঙ্গের হৃদয়, ভাঙ্গের বাঁহন,

সাধবে আঞ্জিকে প্রাণের সাধন,

লহরীর পরে লহরী তুলিয়া

আঘাতের পরে আঘাত কর;

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাগ,

কিসের আঁধার, কিসের পাখা,

উবল যখন উঠেছে বাসনা,

জগতে তখন কিসের ভয়?”

“জগতে তখন কিদের উর?”—ভক্ত ভিন্ন, বৈষ্ণবের রাখা ভিন্ন, যথার্থ প্রেমিক ভিন্ন এ কথা আর কেহ বলিতে পারেন না।

“Bread and Butter Philosophy” তে, ষাওয়া-পরায় স্বপ্ন-ভোগে থাকিয়া, “স্বপ্নময় নীচে” বহুবাসের ফলে—টাকা-পয়সা-মান-ধন-কাম-কাকন-কীটিকের জীবনের জবতারা করিয়া কেহ প্রেমিক হইতে পারে না—ভক্তসাধক হইতে পারে না। সকলে ইহা বুঝিবে না। এ অনাধ্য সাধন একমাত্র ভক্তই বুঝেন—যিনি ভগবানের কল্পণালাভ করিয়াছেন—যে কল্পণায় “মুকুৎ করোতি বাচালং

পদ্মং লজ্জ্যতে গিরিম্”

এইবার দেখ পদ্ম কিরূপে গিরি-লজ্জ্যত্বেন। “নিম্ব-রৈর বপুতদং” পড়।

“আমি ঢালিব কল্পণাধারা, আমি

ভাবিব পাণাং-কারা,

আমি জগৎ প্রাণিয়া বেড়াব গাহিয়া,

আতুল পাগল পারা।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,

তুধর হইতে তুধরে মূর্তিব,

হেঙ্গে খল বল, গেয়ে কল কল,

তালে তালে দিব বাজি।

তটিনী হইয়া-মাইব বহিয়া—

মাইব বহিয়া—মাইব বহিয়া—

হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,

গাহিয়া গাহিয়া গান,

যত দেব’ প্রাণ, বহে’ যাবে প্রাণ,

ফুরাবে না আর প্রাণ।”

“কে আসিবি কে আসিবি, কে তোরা

আসিবি আয়।

পুষাণ বাঁধন টুটি

ভিজাবে কঠিন ধরা,

মনেরে শ্রামল করি

ফুলেরে ফুটোয়ে স্বরা,

মারা প্রাণ ঢালি দিয়া,

জুড়ায়ে জগৎ হিয়া

আমার প্রাণের মাঝে কে

আসিবি আয় তোরা।”

“আমি যাব, আমি যাব—

কোথায় সে, কোন্ দেশ—

জগতে ঢালিব প্রাণ,

প্রাণিব কল্পণা গান।”

পাঠকগণ, তোমরা পণ্ডিত, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-ভক্তি কিছু নাই। পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে এই কবিতার জুড়ি যদি বাহির করিয়া দিতে পার তাহা হইলে তোমাদের কেনা হইয়া থাকিবে—এ স্বপ্ন আর জীবনে জুলিব না।

আজকাল আমাদের দেশে Inductive method-এ শিক্ষা দিবার প্রণালী প্রচলিত হইতেছে। বাঁহারা রবীন্দ্রনাথের “নিম্ব-র” একবারে বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহারা এই কবিতার নিম্ন-সংস্করণ “ননী”টা প্রথমে পড়িয়া লইবেন। তাহা হইলে নিম্ব-র সহজেই “আরাহণ” করিতে পারিবেন। আর বাস্তবিক পক্ষে, ভাবুক কবিগণের অনেক কাব্যই এইরূপে আরোহ-পদ্ধতি অল্পসরে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্তব্য।

ধর্মসদ্বীতে ভক্তি দেখিলে—প্রকৃতি-সাহিত্যে ভক্তি দেখিলে। একুর আর একটা কথা বলিব। আমাদের বাঙ্গালীর আধুনিক “জাতীয় সঙ্গীত”গুলি সবই ভক্তি-সাহিত্য। যে ভক্তি, প্রেম, ত্যাগ, বৈরাগ্য,

ব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিকতা পূর্বের আমরা রাখা-কুক্ষে অর্পণ করিতাম, হর-পৌরীতে অর্পণ করিতাম, শ্রাম্যমায়ে অর্পণ করিতাম, সেই ভক্তি, প্রেম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিকতারই কিয়দংশ আমরা আজকাল স্বদেশের ধূলির প্রতি অর্পণ করিতেছি—স্বদেশের লোকের প্রতি, সাধারণজনগণের প্রতি অর্পণ করিতেছি, স্বদেশের নদী উপবন, আকরমৌর, পশুপক্ষী, তরুলতা, অর্পণ করিতেছি—স্বদেশের ভূত-বিষ্মত-বর্ন্ত্যমানে অর্পণ করিতেছি। জাতীয় সঙ্গীত আমাদের সনাতন ভক্তিতত্ত্বেরই এক-অধ্যায় মাত্র। ইহা নূতন আমদানী মালও নয়, মূল আমদানী ভাবও নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহায্য আশ্রয় আমাদের “উক্তিগদ্য” শুকাইয়া যায় নাই—অথবা অন্তঃশালিত। সর্বস্বতীর ছায়া কেবল যোগী-স্বনিগুণেরই বোধগম্য হইয়া রহে নাই। তুমি আমি সকলেই সেই ভক্তি-পথেই পাইতেছি। আমাদের দেশের মধ্যে, রাধারাগীর সঙ্গে, গৌরী-মাতার সঙ্গে, আমাদের দেশমাতাও মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাইতেছেন—আমাদের সনাতন দেবী-সম্মানে জননী জমজম পরিবারভুক্ত হইয়াছেন।

আমাদের দেবতার আশীদারের উৎপত্তিতে হুঃখিত হন না—বহুযুগে বই দেবতা আমরা গড়িয়াছি। সোপেনহোয়ার বলিতেছেন Monotheistic gods are jealous gods. তবাবর্তিত একেশ্বর-বাদের দেবতার হিংসা কখন—এক দেবতার সঙ্গে বা পরিবর্তে অজ্ঞ শ্বেতাচার পূজা তাঁহারা সঙ্ক করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের দেবদেবীগণ সঙ্কর উদার, যে কোন প্রণালীতে তাঁহারা ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। আমরা তাঁহা-

দিগকে সপরিবারে সবাহনে পূজা করি, ঘট-পট, আটচালা, দুয়ার, হাতাবেড়ী, প্রদীপ পর্যন্ত পূজা করি, আবার তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন, ও পূজা করি—ইহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের ভক্তিতত্ত্ব বুঝিলে?

এইবার পাশ্চাত্য জাতীয় সঙ্গীতগুলির সঙ্গে তোমাদের জাতীয় সঙ্গীত মিলাইয়া লও। দেখিবে—পাশ্চাত্য সাহিত্য কত নীচে পড়িয়া রহিবে। আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত, কনাসীর বিপ্লবসঙ্গীতও তোমাদের ভক্তিযোগ্যপ্রস্তুত হুঃখী গানের কাছে হতপ্রভ—নকচুছকড়া। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিরোধ-তত্ত্ব ও জাগতিক উন্নতিতত্ত্ব আমাদের এই ভক্তি-গদ্যায় ভূবিদ্যা মাইবে। আমরা ধর্ম ভাবিতে পারি না, সংসারের উন্নতিটিকেই একমাত্র চরম সত্য মনে করিতে পারি না। আমরা ভক্তিঘারা, প্রেমের ঘারা নিজকে জুলিতে চাই—কল-নাহাই হউক। আমাদের রবীন্দ্রনাথ এই নূতন ভক্তিতত্ত্বেরও একজন বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস।

কবিবরের শাক্তভাব

রবীন্দ্রনাথ শাক্তই কি বড় কম? একজন

বাঙ্গালী সাধক গাহিতেছেন—

“শ্রাণ ভাল বাসিসু বলে

শ্রাণন করেছি ছবি।

শ্রাণন করেছি ছবি।

শ্রাণন করেছি ছবি।

শ্রাণন করেছি ছবি।

শ্রাণন করেছি ছবি।

শ্রাণন করেছি ছবি।

শ্রাণন করেছি ছবি।

শ্রাণন করেছি ছবি।

“জননী মোদের জগদ্ধাত্রী,

স্বপ্নস্থিতি প্রলয়কাত্রী,

উল্লিত বর-অভয়-দাত্রী,

অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর।

শক্তিময়ে দীক্ষিত মেঘরা, অভয়া চরণে

নমসিহ,

স্বপ্ন মাঘের চরণে নমসিহ।

কবি রবীন্দ্রনাথও এইরূপ শক্তি, এইরূপ

শক্তিশিখা।

আর একজন হিন্দু কবি গাহিতেছেন :—

“ছুটে চল ছুটে চল, হে পদ্মা আমার

পূর্ব হোক সংহারিণী লীলা।

অঙ্গগতি বন্ধনরা নৃত্য তালে তালে

বকে কড় বাধুক বাধনা।

নিষ্ঠুর জড়পে তব চূর্ণ হয়ে যাক

তরুগ্রাম নগর-কান্তার,

লুপ্ত হয়ে যাক শোভা সমগ্ৰ স্বহ্মা :—

ধ্বংস হোক বাসনা তোমার।

কালী তুমি কুরালিনী,

নিমিত্ত তব পায়,

হিয়া মোর জলাঞ্জলি তার।”

খৃষ্টিয় দেখিলে একরূপ শাক্তভাব রবীন্দ্র-

নাথে অনেক পাইবে। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া

প্রবন্ধ বড় করিব না। “রবীন্দ্রনাথ

গাহিতেছেন—

আমার প্রসূর চরণতলে

শুধুই কিরে মালিক অলে?

ও তাঁর পায়ে পায়ে বাজে কত

কটিন মাটির ঢেলা রে!

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে?

খসে যাবার, ভেসে যাবার ভাণ্ডারই

আনন্দে?”

রবীন্দ্রনাথ “স্বপ্ন-স্থিতিপ্রলয়ে”ও এই শক্তি-

পূজার মন্ডই প্রচার করিয়াছেন।

কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা,

শ্রাস্ত বেহে কাঁদে রবি,

জগৎ হইল শাস্তিহীন,

চারিদিক হইতে উত্তীতেছে

আকুল বিশ্বের কর্তব্যর :—

“জাগ’ জাগ’ জাগ’ মহাদেব,

কবে মোরা পাব অবসর।

জগতের আত্মা কহে কাঁদে

“আমারে নৃতন বেহ দাও;

প্রতিদিন বাড়িতেছ দুরবে,

প্রতিদিন বাড়িতেছ আশা,

প্রতিদিন টুটতেছে দেহ,

প্রতিদিন ভাঙিতেছে বল।

গাও দেব মরণ-সঙ্গীত,

পাব মোরা নৃতন জীবন।”

প্রলয়গণাক ভুলি করে ঘুরিলেন শূলী,—

পদতলে জগৎ কাপিয়া,

জগতের আদি-অন্ত ধরর্থর ধরর্থর,

একবার উঠিল কাঁপিয়া।

উঠিলের মহাশূন্ত গরজিয়া তরঙ্গিয়া

ছন্দোমুক্ত জগতের উন্নত আনন্দ কোলাহল।

ছিড়ে গেল রিশপাশি গ্রহতারা ধ্বংসকর্তৃ,

কে কোথায় ছুটে গেল,

ভেঙে গেল টুটে গেল,

চন্দ্রস্বর্ঘ্যে ও ডাইয়া চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।

মহা অগ্নি জ্বলিলে,—

আকাশের অনন্ত দ্বন্দ্ব—অগ্নি অগ্নি শুধু

অগ্নিময়।

মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া জগতের মহা

চিতানল।

ধণ্ড ধণ্ড রবি শশি-চূর্ণ চূর্ণ গ্রহতারা,

বিন্দু বিন্দু আধারের মত বরষিছে জ্বরিতক

হতে,

অনলের তেজোময় গ্রাসে নিমেষেতে যেতেছে

মিণায়ে।”

হেমচন্দ্রের “নগ্নসংহাতি” পড়িয়াছে?

“একে একে জগতেরা অভয়গণ খসিল।

চন্দ্র তারা রমিমেঘে অশ্রুমেঘে ডুবিল।

গিরি নদ পারাবার ছিল যত ভুবনে।

অহঙ্কণ অবর্ণন মহাদেব শোষণে।

স্বর্গগিরি রম্যতল হিমালয় ছুটিল।

ধারা-ধারা বহুধারা শিব লগ্নে মিশিল।”

ইহা হইতে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য কোথায়?

আজকালকার সভা বাবালায় যাক! উঠিয়া

গিয়াছে। রমিক চক্রবর্তীর “কালকেতু” পালা

আর শুনিতে পাই না। নাই বা পাইলাম—

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় আমরা কালকেতুর

গান ভনিয়া থাকি;

“মাতোর হুল্লুড় পদপল্লব দেমা দেমা

মাথে ক্ষেমধরী।

(অমি শুনেছি শুনেছি মাগো),

তুমি দেবের রোমের দানব-নিধনে

নাচ রণে দিগধরী।

সেইরূপ রণ-রোমে নাচ করি রত্নমুগ শকরী।

আমি চাইনা শক্তি দে মা ভক্তি

স্বপ্নে পরমেশ্বরী।

হয়ে হৃদি-পদ্মানা বিলাস-বাসনা নাশ মা

আমার শুভদরী।”

ইহার সঙ্গে মিলাইয়া লও—

“কিসের বা স্বপ্ন কিসের প্রাণ?

ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম গান।

অমর মরণ-রক্ত চরণ নাচিছে সঙ্গীরেব।”

কবিরের “শাক্তাব দেখিয়া আমাদের

মাধকপ্রবর রামপ্রসাদের কথা মনে পড়ে।

“এবার শ্রামা তোমায় খাব।

তুমি খাও কি আমি খাই মা,

ছোটের একটা করে খাব।”

আর মনে পড়ে—বিবেকানন্দের “নাচুক

সেখানে শ্রামা।”

ইহাকে বলে সাধনা।

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ বাহাই হউন বা বাহাই

বক্তৃতা করুন, কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের

সনাতননীতির শৈবশাক্ত তাত্ত্বিক।

এই বৈরাগ্যের বাণী—এই অশ্রুমেঘ

করার প্রবৃত্তি—কালী-সাধনার চূড়ান্ত পরিচয়,

—ভরাবিধানে শক্তি-শিখার ধরায় লুটাইবার

আকাঙ্ক্ষা—রবীন্দ্রনাথের কাব্যগাহিত্যে প্রচুর

রহিয়াছে।

“বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে,

কে মোর আত্মপণ?

আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে

কোথায় আমার ঘর?

কিসের বা স্বপ্ন, কিসের প্রাণ?

ঐ উঠিয়াছে সংগ্রামগান।

অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সঙ্গীরেব।”

—ইহা বৈষ্ণবের কৃষ্ণপ্রেম, শি শাক্তের কালী-

পূজা তাহা জানি না। আমরা হিন্দু—আমরা

ব্রহ্ম “এত নয় নন্দের তনয়, হুট বনমানী”; আমরা জানি “যেই কৃষ্ণ সেই কালী।” এজ্ঞ

আমরা বলিব,—রবীন্দ্রনাথ আজ বৈষ্ণব, শাক্ত

শাক্ত—গান্ধার্যায়িক শব্দব্যবহারে যদি কোন

ব্যক্তির আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বলিব—

কবির ভারতবাসীকে আজ সনাতন বৈরাগ্যের

শিক্ষা দিতেছেন। বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন

তুচ্ছ করিয়াছিলেন যেজ্ঞ, চৈতন্যদেব সংসার

ছাড়িয়া পাপল হইয়াছিলেন যেজ্ঞ, বীতশৃঙ্খল

জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন যেজ্ঞ, “পঙ্ক-

নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে” শিখ-জুগ

আত্মবলি দিয়াছিলেন যেহেতু, বাঙ্গালী কবি ভারতবাসীকে (এবং সম্ভ্রান্ত সমগ্র মানবজাতিকে) সেই মূর্তির বাণী নৃতন ভাষায় শুনাইতেছেন। পৃথিবীর কক্ষক্ষেত্রে যখনই যে কোন ব্যক্তি “সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিড়িতে হবে” এই কথা কার্যোপরিণত করিবার উপযুক্ত হইবে, যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীবীর মর্ম উপলব্ধি করিতে হইবে। সেই সকল সাধক-ভক্ত বীরপুরুষগণকে সমসারের নিকট, কাম-কাঙ্ক্ষার নিকট, ভোগ্যবস্তুর নিকট, মায়ামনস্তার নিকট, স্বাধী-পুরুষ-পরিবারের নিকট বলিতে হইবে :—

“অল্পম তোমার তরুণ অবয়ব,
কল্পম তোমার আঁখি।
অমিয় রচন সোঁহাগ বচন
অনেক রয়েছে বাকি।

“আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর
নিষ্ঠম আমি আন্ধি
আর নাই দেরি ভৈরব-ভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি।

পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার —
স্বপ্নময় নীড় পড়ে রবে তার
মহাকাশ হ’তে ঐ বারের বার
আমারে ডাকিছে সবে।”

জ্যোতাবতার রামচন্দ্রকে জাতীয় জীবনের এক অতি বিধম সমস্তাঙ্কলে এইরূপ নিয়র কঠিন কঠোর হেঁয়ালী স্বকীয় সাদনার ব্রত উন্মাপন করিতে হইয়াছিল। অমর কবি কালিদাস কর্তৃগপগায়ণ রামচন্দ্রের কঠোর বৈরাগ্য মধুর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—

“বভুব রামঃ শূদ্রা সমাশ্রিতঃ
ভুয়ারবর্ষায সংশত চক্ষুঃ।

কৌলীনভীতেন গৃহদ্রিয়ন্তা
ন তেন বৈদেহহৃদয়তামনুগঃ ॥”

বৈরাগ্য, ভক্তি, সাদনা, প্রেম, ভাবুকতা গৃহত্যাগ, সর্গত্যাগ, জীবনোৎসর্গ—এই সকল বৃত্তিপ্ৰবৃত্তিগুলি একই ভাবের নামান্তর মাত্র—একই পদার্থের বিভিন্ন মূর্তি—মানব-চরিত্রগত অহুত্বিত্তের এবং নিগূঢ় চিত্ত-প্রবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য-প্রকাশ বা অভিজ্ঞান।

“যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।”
এই কথা মনে রাখিলে দেখিতে পাইবে—
শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব কোন প্রভেদ নাই,—
হিন্দু-মুসলমান কোন স্বয়ং নাই। বৈরাগ্যের
জগতে, স্বার্থত্যাগের জগতে, ভালবাসার
জগতে, পূজা-আরাধনার জগতে ছোট-বড়,
দীন-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রভেদ নাই,
ধর্ম-কলহ, বা সাম্প্রদায়িক গোলামাল নাই।

পরম ত্যাগবলং বলম্।

ভাবুকতার আর একটা দিক আছে।
আমরা বরীন্দ্রনাথের মর্মেয় বলিয়াছি—“যারে
বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।” এখন
আর একট লক্ষণ বলিতেছি। এই পূজা,
ভালবাসা, এই বৈরাগ্য, গৃহত্যাগের মদে
মানবসেবা, লোকসেবা, পরোপকার ও স্বদেশ-
সেবা অভিহিত হইতে প্রবৃত্তি। সকলগুলি এক
বস্তুর বিভিন্ন ফল—এক শক্তির বিভিন্ন
বিকশ। যারে বলে আধ্যাত্মিকতা, যারে
বলে বৈরাগ্য, তারেই বলে স্বদেশসেবা—
তারেই বলে জাতীয়তা। ভাবুকতার এই
তত্ত্ব না বুঝিলে বৈষ্ণবকবিত্বগণকে বুঝিতে
পারিবেনা—মহাপ্রাণ রামপ্রসাদকে বুঝিতে
পারিবে না। বুদ্ধদেব, বীতশৃঙ্খল, কুসারাম,
চৈতন্য, গুণাভিগুণার্থ, কমরসিন, বিবেকানন্দ,
উল্লস, রবীন্দ্রনাথ কাহাকেই বুঝিতে পারিবে
না।

ভাবুকতার চক্ষু কখন নিজেকে ভুলিয়া থাকি;
নিজের অহংকার খর্ব করা; অহং বিমুগ্ধলি
অনন্তসাগরে বিলম্বিত দেওয়া; চেতনের সমুদ্রে
যাহা দেখিতে পাইতেছ, কাণ দিয়া যাহা
শুনিতে পাইতেছ, তাহাকে সদায় ও নবর
জ্ঞান করা। যাহা দেখিতে পাইতেছ না,
যাহা শুনিতে পাইতেছ না, ধরা-দেহা-মায়ার
না থাধা—সেই অদীপ, অতীন্দ্রিয়, অনাদ্যন্ত,
মানবচিন্তার অনদিগম, বিরাট সত্তার প্রভাব
গ্রহণ করিবার জন্ত রাখিকার জায় সর্বত্র
কল্পদর্শন ভিন্ন সাধককে, ভক্তের, প্রেমিকের,
ভাবুক-আর কোন গতি নাই।

“অনারিমাধ্যান্তমম্বরকৃতিকমমুচ্যাতম্।

প্রণতোহস্মি জগদ্রাম্য সর্গকারণ-

কারণম্।

অথবা,

“উপাধিগম্যোহাপ্যুপাধিগম্যঃ

সমাবলোক্যোহপ্যসমাবলোক্যঃ।

উভাবহি প্যোহুদু ভবঃ শবাবহয়ঃ

জগতপায়াপি নঃ সাপায়াঃ ॥

ইহার নাম মধ্যে ভাবুকতা। এই ভাবুকতা
হিন্দুর মজ্জাগত। “অনন্তদর্শনে চৈতন্তের
উন্মাদ এবং ভূমানন্দ এই ভাবুকতারই
এক লক্ষণ।

চৈতন্তদেবকে পাগল বলিতে চাও, বল—
স্বদেশসেবকে পাগল বলিতে চাও, বল—
ভালবাসাকে পাগলামী বলিতে চাও, বল—
প্রকৃতপক্ষে ইহার নাম ভাবুকতা। এই
ভাবুকতা না বুঝিলে হিন্দুকে বুঝিবে না।

রবীন্দ্রনাথ এই হিন্দুর সত্যাতনী ভাবুকতাই
নানা উপায়ে দেখাইয়াছেন। তাঁহার আত্মবন
সাত্ত্বিকমায় সেই ভাবুকতা প্রচার করিবার
প্রয়াস দেখিতে পাইব। এই তথ্য মনে
রাখিয়া সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায়
প্রস্তুত হও, দেখিবে—কোথাও কবি পূর্ণ

সফলতা লাভ করিয়াছেন—কোথাও কবি
অর্দ্ধ সফল—কিন্তু তিনি কোথায়ও একে-
বারে বিকল হইয়াছেন কি না অত বলিতে
পারি না। সর্বত্রই এই প্রয়াসের ইতিহাস
দেখিতে পাইব। তাঁহার প্রেম-কাব্যে,
তাঁহার প্রকৃতি-পুঞ্জায়, তাঁহার হীমাকৌতুকে,
তাঁহার সমাজ-প্রবন্ধে, তাঁহার ধর্ম-ভুক্তায়,
তাঁহার সঙ্গীতে—ঐ এক কথার নাড়াচাড়াই
দেখিতে পাইবে—“যারে বলে ভালবাসা
তারে বলে পূজা।”

রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতার বৈষ্ণবের ভক্তি
দেখিলে,—কালীর সাদনা দেখিলে—বীণা-
পাণির পূজা দেখিলে—বৈরাগ্যের উন্মাদ সঙ্গীত
দেখিলে। এখন দেখ—ভারতে নবযুগের
প্রবর্তক, ভাবুকতার প্রতিমূর্তি বিবেকানন্দের
ভেরী-নিমাদ রবীন্দ্রনাথ কি মধুর কণ্ঠে প্রকাশ
করিয়াছেন :—

“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তাহলে একলা চল রে।
যদি কেউ কথা না কয়, সবাই রহে
মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়,
তা হলে পুথের কাঁটা তুই রক্ত মাথা
চরণতলে একলা দলরে।

একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।”
সাদনার পথে একলা তো যাত্রা করিলাম।
কিন্তু বায়ু যে মধুর বহিবে—এবং বেয়ে যাব
রক্তে—তার তো কোন স্থিরতা নাই। তাই
মাথকণে জালা আবশ্যক যে, ভয় করিলে
চলিবে না—বিপদ দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে
চলিবে না। পূর্বেই জানিয়া রাখ যে,—

“জনম তোমার যুগের বাণী,
আমুবে ঘিরি বনের প্রাণী
হাতো তোমার আপন ধরার
পাখান হিয়া গল্বে না।
তা বলে ডাবনা করা চলবে না।”

সম্মানে অসিরাহ্ন একাকী—বাইবেও একাকী। তাহা হইলে আর অপরের সাহায্যের কথা ভাবিতেহ কেন? অত্ৰ লোকে কি করিবে তাহার খবর লইতেহ কেন? প্রকৃত স্নাতক, সমাদ্রী, প্রেমিক কাহারও দিক্‌ তাহার না—বাগী, 'কলকী' হইতে লজ্জা বোধ করে না, নিজ নিজ অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিজ কর্তব্য করিয়া যায়। ভরুজানেন—"লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়।" প্রেমিক জানেন:—

"কলকী বলিয়া ভাবে সব লোক
তাহাতে নারিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলহের হাব
গলায় পরিতে স্থখ।"

একপ্র তদ্ব্য না হইলে কি কখনও প্রকৃত ভাবুক হওয়া যায়? যাহা দেখিতে পাইতেছ, সম্মানের যে সকল ভোগ বিলাসে প্রলুব্ধ হইতেছ, যে সকল দুর্ভুলতা ও চরিত্রহীনতায় অন্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাগে প্রত্যায়ান না করিয়া "ভবিষ্যতের পানে আশা ভ্রা আক্লাদে" কেহ কখনও তাকাইতে পারে কি? এই জগত্‌ই বিবেকানন্দ আদেশ করিয়াছেন:—

"তুই যদি একা এই ভাবে জীবন গঠন কতে পারিস্ তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক একপ্র কতে শিখবে।"

ভাবুক রবীন্দ্রনাথ আবার বলিতেছেন—

"সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে
সকল চরম লাভে,—দুঃখে কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়;

ওরে ভীষ্ম, ওরে যুধি, তোলা তোলা শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

স্বাভ্যাগ শিখাইবার জুট এই কয় শব্দজ
বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা আবশ্যক।

একজন বিলাতী কবি, বাণ্য এইরূপই এক বকুর উটরিয়াছিল। দ্বন্দ্ব আশার প্রভাবে, দুঃসাধ্য ব্রত-উৎসাহপনের আকাজ্জায়, অসীম বাসনারাশির তাড়নায় ভাবুক গাহিয়া ছিলেন:—

"We look before and after
And pine for what is not;
Our sincerest laughter with
some pain is ever fraught;
Our sweetest songs are those
that tell of saddest thought."

এই sadকে, বিবাদকে যদি ত্যাগ করিতে চাও, তাহা হইলে সেই sweet, সেই অমৃতের আশাদ পাইবে না,—সেই "মহৎকর্মের" যোগ্য যত্ন হইতে পারিবে না। সেই অসীম আনন্দ—সেই মানস-জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য পাইবার জুট কবির চাহিতেছেন—

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উজ্জ্বলে।

শুভ ব্যোম অপরিস্রাণ

মণ্ডিম করিতে পান,

মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ

উজ্জ্বলীলাকাশে!

পাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণ

আবন ছায়ে,

স্বপ্ন হয়ে নুপ্ন হয়ে"

গুপ্ত গৃহবাসে।"

বিবেকানন্দের বক্তব্যে যে সম্বোধিত-ভরু উটরিয়াছিল, সেইভাবেই রবীন্দ্রনাথও ললিত-কলায় সেই পলিনে বাবালীর জীবন-বেদ-রচনার জন্ত দান করিয়াছেন। পরাহ্বাব, পরাহ্বকরণ, ক্ষুদ্র, পদুত, নিষ্কীৰ্ত্ত, কুপ-মণ্ডক্য পরিভাগ করিয়া মাছব হইতে হইবে—
"সর্বভ্যাগী শব্দকে" সমুদ্রে রাখিয়া জীবনের জুট এই কাব্যিকাল পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংাই বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র-

নাথের বাগী। * হেমচন্দ্রও "ধগধগ গ্রহ তর তর করে—বাঘ উন্মাদিত বজ্রশিখা ধরে" কর্মে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন।

কাব্যে বিপ্লব-তত্ত্ব বা আদর্শ-বাদ

সাহিত্য-সেবায় ভাবুকতা লইয়া আর একটা কথা বলিব। বর্তমানকে ভাবুক কি চোখে দেখেন? যাহা নাই ভাবুক তাহা চাহেন—যাহা আছে তাহাতে তাহার সন্তোষ হয় না। আমরা দেখিয়াছি—আধ্যাত্মিকতা, ভালবাসা, স্বদেশসেবা সর্বত্রই ভাবুক অসীম ও অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহেন। সপ্তমকে ভাবিয়া চুরিয়া, অথবা বর্তমানের ক্ষুদ্র জীবন হীন গওকে অতিক্রম করিয়া—সমাজের বাহ্যবিশ্বগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া নূতন জগৎ, নূতন আলোক, নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করাই ভাবুকের প্রকৃতি। বৈষ্ণব কবিদের রাখা এইরূপ বিপ্লব সাধন করিতেন—বিপ্লব সাধন না করিয়া, সোণা পথে চলিয়া, নরম হইয়া কেহ কখনও প্রেমিক হইতে পারেন নাই। এইরূপ বিপ্লব-সাধনের চিত্র আমরা কবীন্দ্র দার্শনিক রূপের সাহিত্যেও যথেষ্ট পাই। বর্তমানের প্রতি এইরূপ অস্পৃহা, নূতনের প্রতি আকাজ্জা, নূতন আদর্শ গড়িয়া তুলিবার প্রবৃত্তি—এক কথায় বিপ্লববাদ-প্রচারে বানিকটাই হইয়া কবি ওয়াল্টসবার্গের, প্রচুর পরিমাণে শেলার কাব্যে আমরা দেখিতে পাই। বিপ্লবের কথা শুনিয়া চমকাইও না। আমরা মারামারি রক্তাক্তি লড়াইয়ের কথা, স্বদেশ-অন্তার রাক্ষা-মুক্তি-পরিগ্রহের কথা বলিতেছি না। জগৎয়ের যে গুঢ় কন্দের হস্তান্তর মধ্যে সর্বমুখিনি উদ্ভাসিত আকাজ্জা চাপিয়া থাকে, আমরা সেই অন্তর্জগৎ তত্ত্বের ভাবের ওপর কথা বলিতেছি। কাটাকাটি কামড়া-

কামড়ি অপেক্ষা তাহা অতি ক্ষুদ্র, গভীর ও বাসক।

একজন ব্যক্তি-পরাণ উদ্বাসভাবে বেগাধ ধরিতাছেন:—

"সমসার, কি ভয় দেখাও আমার?
ভাল নাই বাস যাচ চলে দূরে।"
এই জগত্‌ই
"অত্যন্তবিমুগ্ধ দৈবের বার্থে যত্নে চ পৌরুষে।
মনধিনে দরিদ্র বনাদিত্য কৃত: স্বধঃ।"
এইরূপে বর্তমান হইতে, বাস্তব হইতে দূরে চলিয়া যাওগ, বনবাগকেই শ্রেয় জান করা—"মরণের, জুই মম শ্রাম সমান" এই ভাবিয়া 'বৃন্দাবন ধন' সকলই পরিভাগ করা—ইহার নাম বিপ্লব। তখন মনে হইবে—

"আকাশের তারা ডাকিছে আমারে,
সমীরণ ডাকে আয় আয় করে।
কে জানে কে মোরে প্রাণের ভিতরে
বলিছে সদাই সকলি তোমার।"
"যখন সোজা পথের পথিক কেহ তোমার
অশ্রুজল মুছাইবে না, তখন দেখিবে—

"শ্রামলা ধরনী ধবলা যামিনী
শশী দিনমণি স্থার আধার।

—দকলিই আমার।"

এবং "আছে কত জন এই বিশ্ব মাঝারে
মুহুর্তেই আশিঙ্কল!"
বিপ্লববাদী ভাবুকগণ হয় অতীতের, না হয় ভবিষ্যতের সমাজ চিত্রিত করিয়া শান্তি পান। কেহ ভাব-রাষ্ট্রের কল্পনার স্বপ্নে, স্বপ্নাঙ্ক ও স্বপ্ন গড়িয়া মনকে প্রবোধ দেন। কেহ প্রকৃতিকে মানবীয় ভাব ও দেহভাব অর্পণ করিয়া তাহারই আশ্রয়ে জীবন মধুময় করেন। বৈষ্ণব কবির ভক্তি-সঙ্গীতে প্রকৃতি-পূজার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। রাখার স্মার

হয় কক্ষময়, না হয় 'নাম'-ময়, না হয় প্রকৃতি-ময়। যমুনা, তমাল, কোকিল, ময়ূর, মেঘ, এই সবই রাধার পরম আশ্রয়। দেশবিদেশের অজ্ঞাত ভাবুক কবিগণও প্রকৃতিকে জীবন্ত নাহয় অথবা স্বর্ণীয় দেবতারূপে করনা করিয়া প্রতিভার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

স্বতরাং ভাবুকতাময় কবিগণের নিকট প্রকৃতি খেলার সামগ্রী নয়। কবিতা লিখিতে গেলে কতকগুলি পাছ-পাতা জীবজন্তু আনিয়া ঝাড়া করা প্রয়োজন,—এই জন্তই ভাবুকের নিকট প্রকৃতি আসেন তাহা নহে।

প্রকৃতিই ভাবুকের আদর্শবিশীয়া। জীবনময়ী প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াই ভাবুকের দ্বারা সংসারের সকল তত্ত্ব প্রচারিত হয়।

প্রকৃতিই ভাবুকের নিকট একমাত্র সত্য, তাহার জীবনের গঠনকর্তা, তাহার-শিক্ষাদাতা—তাঁহার জ্ঞানজ্যোত্বরের প্রিয়সখী। ভাবুক প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলেন—প্রকৃতিকেই উপলক্ষ্য করিয়া দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, প্রেমসকল সম্ভার্য নীমাংশ করেন। ভাবুকের প্রকৃতি-বিশয়ক কবিতাগুলি এতদূর কখনও প্রাকৃতিক অর্থেই গ্রহণ করিতে পার, কখনও প্রেম ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃত্তিতে পার, কখনও কখনও বা ধর্ম-তত্ত্বের নীমাংশ ভাবে বিবেচনা করিতে পার, কখনও স্বদেশ-সেবকের উত্তেজন-সঙ্গীতের ছায় বিচার করিতে পার। ভাবুক কবির প্রকৃতি-বিশয়ক যে

কবির রচনায় নানা অর্থ দেখিতে, নানা তত্ত্ব বৃত্তিতে, নানা ভাবে সংসারের জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান জরুরকম করিতে না পারিলে ভাবুকের কাব্য বুঝা হইল না। পূর্বেই একবার বলিয়াছি—যারে বলে ভাল-বাসা তাহােই বলে পূজা, তাহােই বলে স্বদেশ-সেবা, তাহােই বলে বৈরাগ্য। এখন বলিতেছি

তাহােই বর্ষা-বিপ্লব-বাদ, অদর্শ-বাদ, তাহােই বলে প্রকৃতিভক্তন।

সকল ভাবুকতার একই অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে তাহা নহে। এই নানা অভিব্যক্তির কোন স্থলে একটি, কোন স্থলে দুইটি, কোন স্থলে দশগুলি হয়ত বর্তমান। কিন্তু ভাবুকেরা সকলেই এক গোষ্ঠীভুক্ত—বিপ্লববাদী, প্রকৃতি-পূজক। রাধা-বিপ্লবের আদিদাতা দেবী, তিনি নৃতন করিয়া নৃতন আদর্শে জগৎ গড়িতে চাহিয়াছিলেন—কলো নৃতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন—বিবেকানন্দ নৃতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথও নৃতন করিয়া গড়িতে চাহেন। আদর্শবাদেরই ভাবুকের স্বপ্ন।

ভবিষ্যতের আদর্শ হইতে, করনার রাজ্য হইতে শক্তিলভ করাও যায়। তাহাও কম বাস্তব নয়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নিয়ে উক্ত করিতেছি :—

“এই সব মৃৎমান মুক-মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রাব্য শুভব মুখে

পলিয়া তুলিতে হবে আশা,
ভাকিয়া বলিতে হবে—

মুহুর্ত তুলিয়া শির একত পিঁড়াও দেখি সব!

যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অত্যাচার

ভীষ্ম তোমা চেয়ে,

যখন জাগিবে তুমি তখন সে পলাইবে

ধেয়ে;

কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ

তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর-সাজি

দান;

বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের

সংসার

বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র,
বড় অশ্রুকার!—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই;

চাই মুক্ত বায়ু,

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জল

পরমায়,

সাহসবিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈত্য

মাঝারে, কবি

একবার নিয়ে এস, স্বর্ণ হ'তে

বিশ্বাসের ছবি।

উনবিংশ শতাব্দীর রুশ ভাবুক জুকোবস্কি

(Jukovsky ১৮৬৩-১৮৯২) রচিয়ায় এই

নৃতন আদর্শ-বাব আনিয়াছিলেন :—

“O sweet remembrance

Of that which has ceased to exist

here below!

O strength of the soul, sweet hope!

Of a better and unchanging life!

Blessed is he, who in the midst of

wrecked

Ruins of this life cherishes you in

his soul,

And by your aid the miseries

of the present

Neither heeds nor takes to heart.”

এই পংক্তিগুলি The Butterfly and the

flowers (১৮৮২ঃ) নামক প্রকৃতি-বিশয়ক

কাব্যে দেখিতে পাই। এই রুশ ভাবুকের

রচনায় রবীন্দ্রনাথের “অতীত, কথা

কণ্ঠ” ব্লিথিয়া পাওয়াও কঠিন হইবে না :—

“And has the past ever

vanished, and have former days

That were so joyous left no trace

behind them?

O no; never shall their strength

be slain;

To the heart the past is eternal,
And love survives the pang of

separation;

Death can boast no power over

the heart.”

জুকোবস্কির যুগে আমাদের ভগবদগীতার

ইংরাজী অম্ববাদ রূপ ভাষায় অনূদিত হইয়া

ছিল। জুকোবস্কি স্বয়ং ভাবুকতাময় জাদ্বীপ

ও ইংরাজী কবিতাবলীর একজন অম্ববাদক

ছিলেন।

জুকোবস্কির মৌলিক কবিতায়ও ভাবুকতার

যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। “হার কেহ

নাই, সকলই তাহার”—এই স্তর তাহার কণ্ঠে

লাগিয়াই আছে :—

“Everywhere we hear the familiar

voice,

Everywhere we see the

unforgotten face;

O, the sweetness of the sacred

thought,

That there, far off in the distant

dale,

Thy angel, queen of beauty,

Alone with her grief,

Mourns and weeps her lover.

Even thither does the soul bear

The love and image of the

dear one :

Of these, friends, death can

never rob us,

For there is life and love beyond

the grave.

এই ভাবুকতা, এই আদর্শবাদ, এই আশার

বাণী রুশ সাহিত্যের প্রাণ।

প্রকৃতি-পূজা বা স্বাধীনতার গান

প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্যে পূর্বে আমরা ভক্তিমোগ দেখিয়াছি—এখন বিপ্লব-বাদ বা আদর্শ-তত্ত্ব দেখিলাম। এ ছুই-ই হিন্দুর সনাতন সাহিত্যধারা ও চিন্তাপ্রবাহের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রকৃতি-পূজার অমূল্য নম্র—আমাদেরই ঘরের কথার আধুনিক সংস্করণ। এখন রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃতি-তত্ত্ব আর একরকম হইতে দেখিব।

বর্ধমানের নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা এবং তথাকথিত সভ্যতার আড়ম্বর ও কৃত্রিমতা হইতে ভাবুকগণ দূরে সরিয়া থাকিতে চাহেন। ভাবুকতার যে অভিব্যক্তিরূপ আমরা কবির প্রকৃতি-পূজা দেখিতে পাই, তাহারই আর এক পরিচয় তাঁহার পল্লী-সম্মাদর। বাতবিকপক্ষে পল্লীজীবনকে সরল, স্বাধীন, নৈসর্গিক, অকৃত্রিম এবং স্বয়ংময় বিবেচনা করা ভাবুক কবিগণের প্রকৃতি-পূজার একটি প্রধান মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁহার অসংখ্য পরিচয় আছে।—একটি চিত্র প্রদর্শন করিতেছি।

“বায়েতে মাঠ শুধু সদাই ফুরে ধুধু
ডাঙিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দুধারে বন বন, ছায়ায় ঢাকা।
গভীর ঝির নীরে ভানিয়া যায় ধীরে,
পিক ফুরে তীরে অমিয় মাখা।
পথে আসিতে ফিরে আঁধার তরুলিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে ঝাঁক।

অশ্বখ উন্নিয়াছে প্রাচীর টুট
সেখানে ছুটিতান সকালে উঠি,
শরতে ধরাস্তল শিশিরে ঝলসল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।

প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজ ফেলে চেয়ে
বেঙুণী ফুলে ভরা লতিকা দুলি।
কাঁটের দিগে আঁখি আঁড়ালে বসে থাকি
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
স্বপ্নের গ্রামখানি আঁকাশে মেশে।
এবারে পুরাতন শ্রামল তাল বন—
সমন সারি দিয়ে দাঁড়াই ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা অর্ধদে-বাঘ দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।

চলছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নতুন দেশে।”

এই গেল পল্লীর মাধুরী—বনলবতার
অকৃত্রিম সৌন্দর্য—সর্বসাধারণী পরিপূর্ণতার
চিত্র—অনাবদ্ধ প্রকৃতির স্বাধীন বিকাশ।
এখানে তরুলতা জীবজন্তু সকলেরই নিজস্ব
প্রকৃতি হইতে পায়—কেহ কাহাকে চাপিয়া
রাখে না। এই স্বাধীনতার জগতে, এই
পূর্বিকাশের আবির্ভাব—এই সরলতা,
স্বাভাবিকতা এবং শান্তিস্থলীয় গতিবিধির
রাষ্ট্রা ভাবুকদের কৃত্রিম সভ্যতার আওতা
হইতে পলাইয়া আসিবার জন্ম ব্যঙ্গ। ইহা
কি কম বিপ্লব?

আজকাল কল-কারখানা এবং Factory
Systemএর অত্যধিক দৌরাণ্ডো পাশ্চাত্য
জগতে সভ্যসভাই প্রকৃতি-পূজা আরম্ভ
হইয়াছে। তাঁহারা “Back to the
country” “Back to the land”—এই স্বর
ধরিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতাও কিছুদিন
পাশ্চাত্যের প্রভাবে বিপর্যস্ত হইতেছিল—
এখন “প্রকৃতিস্থ” হইতে আরম্ভ করিয়াছে।
এইজন্ম এখন “পল্লীসেবক” এ দেশে
দেখা দিয়াছেন—“গুরুকুল” ও “ব্রহ্মচার্য্যাম”

প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—স্বাভাবিকী “জাতীয়
শিক্ষা” প্রবর্তিত হইতেছে।

মাধুরি সমাজ, সংসার, সহর, সভ্যতাকে
তিরস্কার করিয়া নতুন এইরূপ এক জগতে
আশ্রয় লইবার প্রয়াসকেই আমরা এক
দিশায়ে বিপ্লব-সাধন বলিতে পারি। বিলাতী
কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ দুঃখ কবিতেন—

“If such be Nature's holy plan
Have I not reason to lament
What man has made of man?”

—মাছের নিকট স্বপ্ন নাই—মাছই মাছের
শত্রু। “পৃথিবীতে কেহ ভাল ত বাসে না—
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না।” ইত্যং
অন্তে জন্মে চল। বাত্ম্য, ষ্ট, হার্ডবারের হাথ
অতীতের কথা প্রচার কর, দরিকের কাহিনী
—মধ্যযুগের বাণী, নিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা
প্রচার কর, এবং প্রকৃতির কোড়ে আশ্রয়
লও—অথবা ম্যার টমাস ম্যেয়ের হাথ কন্যার
ঘারা একটি ইউটোপিয়া রাজ্য গড়িয়া তোল
—কিথার হাথ “ভান, শ্রাম, তাম, শ্রাম,
শ্রাম নাম জপই ছার তহু করব বিনাশ”
এইরূপে কক্ষম জগৎ ভাবিতে ভাবিতে
মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর। ইহারই নাম বিপ্লব।
সেখানে মৃত্যুর কথা উঠেনা সেখানে চরম
কথা নাই। প্রকৃতি-পূজার, পল্লীসেবার
রবীন্দ্রনাথও বন্দী চিন্তাভাবগতে এই বিপ্লব
আনিয়া দিয়াছেন—

“হায়ের রাজধানী পায়াণ কায়া।
বিবর্তি মৃতিতে চাপিছে দূত বলে,
ব্যাঙ্কল বালিকায়ে নাহিক মায়া।
কোথা স্নেথোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখীর গান কুই, বনের ছায়া।
কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়া আছে
বৃষ্টিতে নারি মন, শুনিবে পাছে

হেথায় বুঝা কীরা দেহালে পেয়ে বাধা
সাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা
কেমন করে কাটে যারাটা বেলা।
ইটের পরে ইট, মাঝে মাছ, কীট,
নাই ক ভালবাসা নাহি ক খেলা।

দেবে না ভালবাসা, দেবে না আলো
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়ায়
দীঘির সেই জল শীতল কালে।
তাহারই কোলে গিয়ে মরণ ভাল।”

সামান্য একটা গার্হস্থ্য চিত্রকে প্রকৃতি-পূজক
ভাবুক এক অতি গভীর চিন্তাবৃত্তির মনোহর
আলোকে পরিণত করিয়াছেন। বহন হইতে
মুঁকির আশুজ্ঞা, কৃত্রিমতার কারাগার
হইতে সরল জীবনবৃত্তার উন্মুক্ত উৎসের
সমীপবর্তী হইবার বাসনা, অসৈন্যগিক জীবন-
যাপন অপেক্ষা মরণকেও প্রেমজ্ঞান করিবার
প্রবৃত্তি, চিন্তাভাবের দেহা extremism বা
চরমপন্থিতা সমগ্র কবিতাটিকে স্বাধীনতার
কক্ষ কন্দনে পরিণত করিয়াছে। প্রকৃতি-
পূজা ও পল্লীসেবা উপলক্ষে প্রতিভাবান কবি
এই উপাদেষ্ট্র চিন্তাভাবগতে বিপ্লব সাধন
করেন। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি-বিষয়ক
কবিতারামির সঙ্গে তুলনা কর—এরূপ
স্বাধীনতার গান, এরূপ স্বাভাবিকতার উজ্জ্বল,
প্রকৃতিসেবার এরূপ মায়াবীর্ণ এমন
রচনাতত্ত্বের সহিত, এমন ভাবসমাবেশের
সহিত, এমন শব্দপরিপাট্যের সহিত আর
কোন কাব্যে পাইবে না।

কাব্যিকরী ভাবুকতা

ভ্রমযত হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লব,
প্রকৃতি-পূজা, পল্লীসেবা পর্যন্ত ভাবুকতার

নানা অভিব্যক্তি আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কতদূর পারিয়াছি জানি না। এমন ভাবুকতার আর দুই একটা কথা বলিয়া বিষয়টা স্পষ্ট করিতেছি। একজন আধুনিক লেখকের রচনা স্বহৃদে ভাবুকতার স্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি এখন আমাদের দেশে—ভাবুকতার বক্তা চাহিতেছেন—কিন্তু কিরূপ ভাবুকতা? তাহার কথায় সেই ভাবুকতার পরিচয় দিব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কোন কোন অংশ বুঝিতেও তাহার দ্বারা কথঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে।

“যে ভাবুকতায় লোকে ভবিষ্যতের মহতী নিকি ধ্যান করিয়া বর্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ত্যাগ করিতে পাড়ে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা স্ফুটন করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয়, যে ভাবুকতার অঙ্গপ্রাণনা বিভাবানু ব্যক্তি নিঃস্বের গৌরব বুদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ উপেক্ষা করিয়া সমাজের সকলত্তরে বিদ্যাপ্রচায়েই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন,—স্বর্গীয় উচ্চতর শিক্ষার আকাজ্ঞা খর্ব করিয়া দেশের লজ্জা শিক্ষালাভের হৃদয়-স্টমির নিমিত্ত জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন। যে ভাবুকতার ধনবান স্বয়ং উৎকর্ষী প্রকাশ করিয়া সমগ্র সমাজকে বিদায়, ধনে, ধর্মে উদ্বীত করিবার ক্ষমতা সচেষ্ট হন, এবং ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষদদান ও বিদ্যালয়দানের ব্যবস্থা দ্বারা ঐশ্বৰ্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন; যে ভাবুকতার প্রভাবের ভগবানু বাঁহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তিনি সমাজ-সেবায় এবং সকল প্রকার দারিদ্র্য-মোচনে সেই শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম বিবেচনা করেন—সেই

রূপ বৈরাগ্য-প্রবর্তিত ভাবুকতার বন্যা না স্রামিকে কোন দিন কোন সমাজে নূতন অবস্থার সংগঠন হয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের উদ্ভাবনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, বাহার ফলে শক্তি নিষ্কিন্তু না হইয়া সংকট ও সংকীর্ণ হয়, বাহার বশে সমাজ ও সংসারের উন্নতি-বিধানের ক্ষমতা মানব স্থির-সমস্তভাবে গৃহত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আমাদের এখন সেইরূপ ভাবুকতায় বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।”

—“মিষ্টিজন্ম” বা অধ্যাত্মবাদ

আমরা বাঁহাকে ভাবুকতা বা চরমপরিহিতা বলিলাম, ইংরাণ্ডিতে তাহাকে এক্সট্রিমিজম, Idealism বা Romanticism বলিতে পারি। উৎপন্নের আলোচনায় বুঝা গিয়াছে যে, মাথায় কপটকণ্ঠ উচ্চভাষা, দারপা বা চিত্তা গিঞ্জ গিঞ্জ করিলেই কোন ব্যক্তিকে ভাবুক বলা যায় না, তাহার ভাবুকতা আছে স্বীকার করিতে পারি না। চিত্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ভাবুক বলা হয় না—চিত্তাপূর্ণ গ্রন্থ রচনাতেই ভাবুকতার নির্দশন বা সৃষ্টি বলিতে পারা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এম্. সি. পি, এফ্. ডি, উপাধি লইয়া বাহির হইলেই, এবং ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা পাকিতা দেখাইতে পারিলেই ভাবুক হওয়া যায় না। ভাবুকতা বা Idealismএর বিশেষ অর্থ আছে। সেই পারিভাষিক অর্থ রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিতে গিয়া বোঝ হয় কথঞ্চিৎ স্পষ্ট হইয়াছে।

এই Idealism যখন ধর্মজগতে প্রবেশ করে তখন তাহাকে আমরা ইংরাণ্ডীতে Transcendentalism (অতীন্দ্রিতা, অসীম-বাদ, অনন্যবোধ) অথবা Super-naturalism, Super-materialism (অতি-প্রাকৃত

এবং অতি-মানসীয় ভাব, অর্থাৎ ভগবৎ-ভক্তি), অথবা Mysticism (পাশ্চাত্যজ্ঞান, স্বপ্ন-বাতবর্ষদর্শন, আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আদি-বৈকি এবং আধিভৌতিক ভাবের অতীত অবস্থা) বলিয়া থাকি। আইডিয়েলিজম্, মিষ্টিজন্ম, ভাবুকতা, রোমান্টিসিজম্ ইত্যাদির অর্থ উদ্ভাষ, চাংগুডামি, বাস্তবশূন্যতা, যৌবনের মনস্ত, হৃদয়লতা, চৈতন্যহীনতা, আবল-তাবল বকা, বুদ্ধবিকা বা অস্পষ্টতা বা হেঁয়ালী বা ক্ষমতার অভাব নয়। যে ব্যক্তি জীবনের প্রতিকার্যে প্রতিদিনকার প্রত্যেক ঠোঁটপায়, চলকোষায়, আচার-ব্যবহারে transcendentalist অর্থাৎ মিষ্টক্, তাহাকে আমরা—হিন্দুরা—যোগী, ঋষি, মহাপুরুষ ধর্ম্মা ইত্যাদি জ্ঞানে ধর্ম্মা করিয়া থাকি। হিন্দুর আধ্যাত্মিক সাহিত্যে, পূর্ণাঙ্গদের বিচারে এইরূপ ব্যক্তিত্ব এবং জীবনধারণ—অবিজ্ঞানচিত্ত, দেবোপমা ইত্যাদি গণনা করা হয়। আমাদের পূর্ণাঙ্গের সকল মহাপুরুষই এইরূপ মিষ্টক্, transcendentalist-পদবীতি।

ইহজগতের বাহিরে, ইন্দ্রিয়-গ্রাস্যে মন্যয়ের অতিরিক্ত আর একটা জগৎ আছে—সে জগতের তত্ত্ব আমরা কিছুই জানি না—জানিবার উপায় আছে কি না তাহাও জানি না। সেই জগতের ভাবময়ী জীবনে উপলব্ধি করা, তাহার তত্ত্ব প্রচার করা, তাহার দ্বারা এই নবরূপ-রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ-সংসারকে অরূপ, অসীম, জ্ঞান, বিকৃতমানের সম্পর্শে আনিয়া যানিকটা উন্নত, উন্নত ও মহান করা—এই সকল কার্যকেই আমরা ঋষি, মহাপুরুষ, অবতারগণের কার্য মনে করি। এরূপ ভাবুক বা মিষ্টক্ বৃদ্ধ চৈতন্য, জ্ঞানায়, বুদ্ধিগুণ। এখানে বলিয়া

রাখি—যীত ইউরোপের গুরু, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর সন্তান। ইউরোপের জল-হাওয়ায় যীতর “আধ্যাত্মবাদ” জন্ম করিতে পারে নাই। উহাদের সমাজে যীতর হিন্দু বাণী বসে নাই। গৃহমাধ্য “জীবন সংগ্রাম”-টাই প্রাণে প্রাণে বীকার করে—যীততত্ত্ব মুখে আওড়ায় মাত্র, কিছুকাল হইতে আওড়ানও বিবাহ দিয়াছে! এই চিন্তা হিন্দুর মজ্জায় মজ্জায় প্রতিষ্ঠিত।

অশিক্ষিত এবং অধিক্ষিত ভারতবাসী আজ ৫০০০ বৎসরের শিক্ষার ফলে, অভ্যাসের ফলে, ক্রমবিকাশের ফলে, এবং সংস্কারের ফলে এই অধ্যাত্মবাদের, এই transcendentalism, এই mysticism, এই idealism-এর—উত্তরাধিকারী হইয়া জগতের গুরুত্বের বিরাজ করিতেছে। মিষ্টিজন্ম ভারতের খাটি স্বদেশী জিনিষ—ইহার জন্মই আমাদের গৌরব। ইউরোপ এ অমৃত পাইলে মুক্ত হইবে। ভারতবাসী, তুমিই তাহার মুক্তির উপায় স্বরূপ হইতে পারিবে—জানিয়া রাখ।

জীবনে—এই অভ্যাস ভাব উপলব্ধি করা কথার কথা মাত্র নয়। এই অসীম অতীন্দ্রিয় জ্ঞানমন্ডকে—কৈশ্বের দ্বারা বুঝা এবং বুঝান, অস্তিত্বের দ্বারা বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস করান, মহত্ববোধ দ্বারা অর্জন করা এবং উপলব্ধি করা, তাহার তত্ত্ব প্রচার করা, প্রচারিত করা বড় সোজা কথা নয়। তথাপি বড় চিন্তাবী, সাহিত্যসেবী, কবি, শিল্পী, দার্শনিক, পণ্ডিত, চিত্রকর, ভাষ্যর ইত্যাদির কৃতিত্ব ও কার্যকার্যের বর্ণনা করিবার সময় আমরা transcendental, আধ্যাত্মিক, ভাবুকতায় ইচ্ছাদি আখ্যা দিয়া থাকি। তাহাদের চরিত্র, মহত্ব, ব্যক্তিত্ব, দৈনিক কার্যকলাপ যেরূপই হউক না, তাহাদিগের

মুখে বলিব যে, তাঁহার চিত্তের দ্বারা, সাহিত্যের দ্বারা আধ্যাত্মিকতা, অতীন্দ্রিয়তা, অসাংসারিকতা, অনন্ত প্রবৃত্তি, অদ্বৈত বিবাস ইত্যাদির পুষ্টি করিতেছেন। এই সকল গুণী, শিল্পী বা কবি ব্যক্তিকে আমরা transcendentalist, মিস্টিক ইত্যাদি বলিতে আপত্তি করি না। অমুক কবি 'মিস্টিক'—এ কথা বলিলে—তাঁহার কাব্যে অধ্যাত্ম জগতের আলোচনা আছে, সেই ব্যক্তির জীবন স্বকীয়নোচিত কি না বুঝিতে পারিব না। ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাহিত্যসেবী চরিত্র-হিসাবে না হইলেও অন্ততঃ এই হিসাবে স্বভাবতই mystic. আমাদের উপনিষৎ mystic সাহিত্য আমাদের গীতা মিস্টিক সাহিত্য, আমাদের অজ্ঞ ও কৌন্তিন মিস্টিক সাহিত্য, আমাদের পদাবলী মিস্টিক সাহিত্য, আমাদের রামপ্রসাদী গীত মিস্টিক সাহিত্য, "রামকৃষ্ণকায়স্থ" মিস্টিক সাহিত্য, হরনাথের "উপদেশসুত" মিস্টিক সাহিত্য।

আমাদের আধুনিক কবিরও এই হিগাবের একজন মিস্টিক, তিনি ভারতবর্ষের সনাতন ধারাই সাহিত্য-জগতে, চিন্তার ক্ষেত্রে, কাব্যজীবনে, লাবিনিক মঙ্গারে প্রবাহিত করিতেছেন।

.. "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন আসে পাই না।

কেন মেঘ আসে হৃদয়-আশাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না।"

ইহার নাম Mysticism বা ভগবক্ত্ত্ব—রাধার প্রেম—সুখের আত্ম ক্রন্দন, অদ্বৈত স্রীতি, অনন্তবোধ—ধরা ছোঁয়া যায় না যাহা তাহা পাইবার অভিলাষ—হিন্দুর "অথা তো ব্রহ্মজিগাশা।" মুক্তির জ্ঞান, জগদধার

কৃপালাভের জ্ঞান সন্যাস মানবের, বন্ধুজীবের, দুর্দলচিত্তের এইরূপেই কামিতে হয়। "হরি, বেলো হ'ল দিন ত গেল পীর কর আমারে"—রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই সরল সহর হিন্দুই, এই কল্পপাণ্ডিকাই সর্ধর দেখিতে পাইব।

সাদক তাঁহার ঘটকজন্মের অর্ধপথে বলিবেন:—"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।"
স্বদেশ-সেবক সংঘ" ও বিশ্বাসের মধ্যে বেদান্তামান হইয়া অনুরূপ সময়ে এইরূপই ভাবিয়া থাকেন:—"কেন মেঘ আসে হৃদয় আশাশে।" দুর্দলতা কণ্ঠবীরকে বহুকাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে—অতনু তাহাকে কল্পন স্বরে বলিতেই হয়—

"কি করিলে বল পাইব তোমারে

রাগিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে ফুয়ে রাখিতে।"

পুণ্য কর্ণে জীবন উৎসর্গ করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকে—দেখিবে, আদর্শকে, জীবনের ধ্রুবতারাকে লাভ করিবার পূর্বে তোমার কত গুণি, কত কৃত্তর পার হইতে হয়। দুর্দলতা, সর্ধগীতা, চরিত্রহীনতা, কত বিচিত্র "মার" আসিয়া তোমার যজ্ঞ পণ্ড করিতে থাকে। সন্যাস শক্তির সাহায্যে অদ্বৈত পাইতে হইলে, এইরূপ ছোট্ট খাইতে খাইতেই চলিতে হইবে। মানবজীবনের ইহা বাস্তবিক কথা।

আর একটি Mysticismএর চিত্র দিতেছি। তুমি হযত তোমার লক্ষ্যকে হৃদয়ের সহিত ধরিতে পার নাই—তোমার ব্রত-উৎসাহপনের জ্ঞান তুমি খেটে—আয়োজন কর নাই—তুমি অলমায় চরিত্র-সংকল এবং বিশ্বাস ও দৃঢ়তা লইয়া, ভবিষ্যতের সকল প্রকার স্বপ্নোপ-সুবিধা এবং বাধা-বিঘের

কথা না ভাবিয়া—কাজে নামিয়াছ। এই অবস্থায় তুমি জগতের শক্তিগুণি ব্যবহার করিতে পারিবে না—তোমার সম্বন্ধচিত্ততা, তোমার অক্ষমতা, তোমার অবিশ্বাস তোমাকে কার্যকালে পুষ্টি করিয়া রাখিবে। ইহা ত বাস্তবিক, তাই—

"কোথায় আলো কোথায় মালা, কোথায়
আয়োজন!
রাজা আমার দেশে এস কোথায় নিঃশাসন!
হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা
কোথায় লজ্জা।

ছ' এক জনে কেহ কানে—বুধা এ ক্রন্দন—
রিক্ত করে, শূন্য ঘরে কর অভ্যর্থন।"

তোমার সমুদ্র—পায়ের উপর দিয়া গঙ্গা
বহিয়া গেল—হায় তুমি তাহা হইতে এক
গত্বও জল তুলিয়া লইতে পারিবে না।

ভাগ্যবান সে, যে পূর্বে হইতে চরিত্র গঠন
করিয়া রাখিয়াছে—যে ভগবানের ডাকে সাড়া
দিবার জ্ঞান সর্ধনাই প্রস্তুত,—যে "শুভফল"
উপস্থিত হইবার যথোচিত পূর্বেই বুঝিতে
পারে—

"ভগো মা, রাজার ছল্লাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহ কাল লয়ে রহিব
বল কি মতে?

বলে' দে আমার কি করিব সাজ,
কি ছাঁলে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন্
বরণের বাস।"

খুঁটান সাহিত্যে "বর" দেখিবার জ্ঞান এই-
রূপেই প্রস্তুত থাকিবার কথা আছে—
আমাদের, অবৈত নিত্যানন্দ এইরূপেই
মহাপ্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের হিন্দু
কবি রবীন্দ্রনাথকে একটা সাম্প্রদায়িক ধর্মের
নেতা করিয়া তোমরা বড়াই করিয়াছ—অথবা

কবি রবীন্দ্রনাথকে তোমরা একটা সম্প্রদায়-
বিশেষের কবি মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে
লড়াই করিয়াছ। এ জ্ঞান কবি রবীন্দ্রনাথকে
বুঝিতে গেল বান্দিয়াছে। রক্ত-মাংসের মানুষ
রবীন্দ্রনাথ—সুখকর হৃদয়িক স্বপ্নাকর রবীন্দ্র-
নাথ, শিলাইদেবের রাইখত-শাদক, বোলপুরের
"ইন্দুল-মাঠার" রবীন্দ্রনাথ—কোন লোকের
স্রীতির কারণ হইয়া থাকিতে পারেন, কোন
লোকের বিরোধভারন হইয়া থাকিতে
পারেন। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ কোন সামান্য-
বিশেষের কর্তা থাকিতে পারেন—কোন
অস্থান-বিশেষের প্রবর্তক থাকিতে পারেন—
কোন প্রতিষ্ঠানবিশেষের ধুরন্ধর থাকিতে
পারেন,—ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য স্থলে
অসংখ্য মতপরিবর্তন, চরিত্রপরিবর্তন,
কণ্ঠপরিবর্তন, করিয়া থাকিতে পারেন, ভিন্ন
ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পরম্পরবিরোধী
কার্যপ্রণালী প্রচার বা অগ্রসরণ করিয়া
থাকিতে পারেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকে
বুঝিতে বাইয়া দেগুলির দিকে তাকাইও না।
অথবা যদি কোন সংবাদ লও, তাহার দ্বারা
কাব্যকে বুঝিতে চেষ্টা কর। সেই ব্যক্তি
তোমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে বলিয়া
কবিতারান্নিবে ডাল কি মন্দ বলিও না।
কবি রবীন্দ্রনাথ কোন লেখকই নেতা নহেন
—কবি রবীন্দ্রনাথ কোন সম্প্রদায়েরই
পৃষ্ঠপোষক নহেন—তিনি তিনু, কবি,—অর্থাৎ
ভারতবর্ষীয় মণ্ডকবার প্রচারক।

ভারতবর্ষকে তোমরা কোন একটা সম্প্রদায়
বা গণ্ডা বা দল বা মতবাদে বাঁধিয়া রাখিতে
পারিবে না। হিন্দুও তাহাই—হিন্দুকে বাধা-
বাধির মধ্যে রাখিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ
সর্ধগ্রামী, হিন্দুই সর্ধগ্রামী। ভারতবর্ষ যুগে
যুগে দেশে দেশে যাহা বিদ্যাছে তাহাকেই

আমরা হিন্দুই বলিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই ভারতবর্ষের দান—তিনি আমাদের সেই ক্রমবিকশিত চিরপ্রকাশমান হিন্দু।

বাল্মীকি অথবা গুলি লইয়া তর্ক করিও না—তোমার আমার দলদলিগুলি তুলিয়া যাও। হিন্দু-ব্রাহ্মের দুদিনকার খেলাধুলিও “সকল ক্লেমে মায়ের কোলে ছুট” এ—বদভারতীর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তানের বাণী স্তনিত থাক। তাঁহার চেহারা তুলিয়া যাও—তাঁহার ব্যক্তিত্ব তুলিয়া যাও, তাঁহাকে তুমি চেন সে কথা মনে রাখিও না। সেই বাণীর মধ্যে, সেই কাব্যের মধ্যে, সেই চিন্তার মধ্যে তুমি ভারতবাসী বিশ্বেশতাব্দীতে যাঁহা চাও সকলই পাইবে—বলিতেছি, সকলই পাইবে—সমগ্র ভারতবর্ষকে পাইবে—হিন্দুকে পাইবে—যোগ, ধ্যান, মূর্তিপূজা, জাতিভেদ সবই পাইবে—বশিষ্ঠ বিবামিহ হইতে বন্দা বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকল রকম পাইবে। এই ভারতের মহাসাগরে ঝাঁপ দেও—চিত্তকলবের দোত দ্রাঘ শুদ্ধ হইবে—বাহ্য অর্জন করিতে পারিবে—চরিত্র গঠন করিতে শিখিবে। এই শুভচিন্তাশাশির অপরূপ মণ্ডল হইতে নিশাশ গ্রহণ কর—অন্তঃকরণ পূত পবিত্র সিদ্ধ হইবে—তোমরা ব্রহ্মোপনিষদ গীতা বাস্তুকি তুকারাম কবীর রামদাসের নাম মাত্র শুনিয়াছ। হায় শিক্ষিত ভারতবাসী, তোমরা এ সকল অমূল্য গ্রন্থ চোখে দেখে নাই—দেখিলে সন্তুষ্ট বৃথিবে না, হিন্দী বৃথিবে না, মারাত্মী বৃথিবে না! না বৃথ কতি নাই—আমাদের বাঙ্গালীর ‘রাসকৃষ্ণ-কথামৃত’ আছে, হরনাথের ‘উপদেশামৃত’ আছে, প্রসাদী সঙ্গীত আছে—বৈষ্ণবপদাবলী আছে। আর আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ আছেন। ভাবুক রবীন্দ্র-

নাথের কাব্য-সাহিত্য আলোচনা কর—এই বিশ্বেশতাব্দীর উপনিষদগীতা-ব্রহ্মসূত্রে—এই বিশ্বেশতাব্দীর ‘অভ্যুৎপাদন’ মাসুলীকে—বাঙ্গালীর এই ‘গ্রন্থ সাহেব’কে জীবনের উপদেষ্টা কর—প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিবে, প্রকৃত ভারত সন্তান হইতে পারিবে,—বিশ্ব শতাব্দীর জ্ঞত হোয়ার যে গুরু কর্তব্য রহিয়াছে, তাহা পালন করিবার উপযোগী মাহুই হইতে পারিবে।

এত কথা বলিলাম। কারণ আছে। আমাদের বিবাহ—রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, তাহার ফলে আর যাহাই হউক—তাঁহাকে একটা নূতন স্বর্গীয় সমাজের ছোট-খাট মূলভূত একজনরূপে ব্যক্তি উদ্ভিত হইয়াছে। বিশাল হিন্দু-সমাজের মধ্যে তাঁহার জন্মকেন্দ্র, তাঁহার আবেগের অনেকটা বিচ্ছিন্ন সমুদ্র-দ্বীপের দ্বার লোক-দ্বন্দ্বের বিশৃঙ্খলিত সৃষ্টি করিত। হিন্দু সমাজ তাঁহাকে এই কারণে তাহার নিজেই একজন ভাবিয়া গ্রহণ করিতে পেরে নাই। তাঁহার সকল কথাই বিদেশী মাল, পাশ্চাত্যের আমদানী, ব্রাহ্ম-সমাজের “নূতন আলোক” ইত্যাদি বলিয়া জনসাধারণ সন্দেহ করিয়াছে। একজ্ঞ তাঁহার mysticismকে কেহ বা ঘূর্ণোৎসাহীকৃত, কেহ বা অহিন্দু “নূতন কিছু” ভাবিতেন। আমরা বলিব—এইরূপ বিবেচনা করা হিন্দু-সমাজের আত্মকারণ প্রদায়ক—এই ঘন অজ্ঞাত বাতাবিক। যাহার সঙ্গে সমাজগত কোন যোগ নাই বরং কিছু কিছু রীতিনীতি-বিষয়ক বিচ্ছেদই আছে, তাহার তথা পূর্ণ অস্তঃকরণে কে বিবাহ করিতে পারে?

পাঠকগণ, আমরা হিন্দু—ব্রাহ্মগণের রবি বাবুকে আমাদের একজন আচার্য্য কখনও

মনে করি নাই। হিন্দুভাবে তাঁহার কাব্যের পরিচয় লইয়াছি। আমাদের জ্ঞানে কবি রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জনসাধারণের হৃদয়, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও বুদ্ধি হইতে চুল মাত্র দূরে দাঁড়াইয়া নাই।

আমরা হিন্দুমানবের সেবক—আমরা বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রচারক। আমরা বলি—হিন্দুধর্মার্জ্জ বর্ণাশ্রমের জন্তই বিচিয়া আছে, উন্নত হইয়াছে। ইহারই ফলে বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত মৌর্য, ব্রাহ্ম সকল মন্ত্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্প্রদায়গুলি নিশ্চয়ে নিজ নিজ দাতব্য দান করিয়া বিরাট হিন্দুসমাজকে যুগে যুগে অপ্রশ্রয় প্রদর্শন করিতে ও নৃশংস করিয়া তাহারই মজ্জায় মজ্জায় পরায় পরায় ‘মিশিয়া’ রহিয়াছে। আমাদের ধর্ম-জীবন ইউরোপের Crusades নাই, Inquisition নাই, Wars of Reformation নাই, Peace of Westphalia নাই। আমাদের ধর্ম-সমাজে, আমাদের ধর্ম-পার্থক্যে রক্তারক্তি নাই। আমাদের বর্ণাশ্রমে সারা ও কাল লোকের জন্ত স্বতন্ত্র পাঠ, স্বতন্ত্র জাহাজ, স্বতন্ত্র কাপড়ের উত্তর হয় নাই। আমাদের বর্ণাশ্রমের প্রভাবে একে একে সমগ্র হিন্দুহানে প্রকৃত Compulsory Education, নিয়মিত ক্রমিক উত্তরোত্তর, জাতীয় চরিত্র গঠন, এবং জ্ঞানীশ্রমের ব্যস্থা হইয়াছে। আমাদের সমাজে Suffragette movement নাই। আমাদের বর্ণাশ্রমের নিয়মে ভোজন, বৈবাহিক বা সমাজতন্ত্রগণের আবশ্যক হইত না; strikes, labour-union, ধর্মযতি, ফুটবলজাত ঘটতি না।

আমরা বৃদ্ধি—জাতিভেদই আমাদের স্থির উন্নতির উপায়, আমরা যুগে যুগে জাতিভেদের বিকাশ সাধন করিয়াছি, এখনও উন্নত ব্রাহ্মণ-কায়-বৈষ্ণব-শূত্র-খ্রীষ্টের স্বরূপাত করিতেছি। জাতিভেদের বিনাশ সাধন করিলে আমরা জগতে থাকিব না, পৃথিবী দরিদ্র হইবে। ইহাকে লইয়া ইহারই সাহায্যে আমরা উন্নত হইতেছি। সময় আসিতেছে—যখন আমরা পাশ্চাত্য সমাজবন্ধনের ক্ষুদ্রতা, স্বর্গীয়তা, অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা এবং ভয়ভীতি প্রমাণ করিতে পারিব। আমরা আমাদের হিন্দুমানবী শীকার করিতেছি। আমরা যাহক রাস্তাক্ষেপে ভক্ত, পাগল হরনাথের শিষ্য।

এই চোখেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্পর্কে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দান বৃথিহেঁ। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবিকর্ণ, রামপ্রসাদ ইহার যে হিসাবে হিন্দু, রবীন্দ্রনাথ সেই হিসাবে হিন্দু। তাঁহার বৈষ্ণব, কি শৈব, কি তান্ত্রিক—এ তথা জানিয়া আমরা বিচলিত হই না। রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্ম এ তথা জানিয়া বিচলিত হইব কেন? রবীন্দ্রনাথ হইতে যখন তুমি কাল-হিসাবে দূরে সরিয়া যাইবে, তখন ত বিচলিত হইবার কারণ থাকিবে না। ইউরোপ আজ স্থান-হিসাবে বহুদূরে। একজ্ঞ তাহার বৌদ্ধ, সৌর, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম এ পার্থক্য বুকে নাই। তাহার ভারত-আত্মার বাণী শুনিয়াছে। একজ্ঞই তাঁহার সমাজে যুগান্তের পূর্বভাষা দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুহানের বাণী-মূর্তিরূপে বুঝিয়াছে। হিন্দুহানের নর-নারীগণ, তোমরাও সাময়িক এবং স্থূল ও ক্ষুদ্র সীমাগুলি অতিক্রম করিবার ইহাকে তোমাদের স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তিরূপে গ্রহণ কর।

৭৫ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ সোণার ভারতের কথামাত্র দান করিয়াছেন। সেই কবিকার আখ্যাদেই খৃষ্টান আর হিন্দু-কবির চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে, ইউরোপ ছই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহারা এক নৃতন জগৎ দেখিল, এ জন্তই এত বিবোধ, এত আশ্বহারা। ভারতবাসী, তোমার বিশশতাব্দীর খ্রীষ্টতত্ত্বের আবির্ভাব-কাল আগত প্রায়। দিবা চক্রে ভবিষ্যচিহ্নে স্থপ্তিরূপে দেখিতেছি। ভারতবর্ষ, একজন উদীয়মান কবির কথায় বলিলাম—

“তোমারি চরণ তলে
রহিয়াছে পড়ি
দৈন্দ্রনাশি ধরণীর সমগ্র রতন।”

বিশ্চিন্তায় ভাবুকতা

আমরা বলিলাম—ইউরোপ এক নৃতন জগৎ দেখিল।

গ্রীকসাহিত্যে হিন্দুর এই বিচিত্র ভাবুকতা পাইবে না। ইকীলাস, সফোক্লীস, ইউরিপিডিস, ম্যারিষ্টকেনিসের রচনায় ভাবুকতা আছে—তাহা এ ধরণের ভাবুকতা নহে। তাহারা অদৃষ্টজগতের, অনাচ্ছত্তের, অসীমের, অশ্রদ্ধজ্ঞানার ধার ধারেন নত, তাহাদের দৌড় Fate, Nemesis, দৈব পৃথগ্য। হোমার হইতে ম্যারিষ্টল পৃথগ্য সেই এক কথা—ইহজগতের যাহা কিছু তাহাই চরম—গ্রীকেরা “ততঃ কিং” জানিত না।

প্লেটো হিন্দু ভাবুকতার আভাস পাইতেছিলেন। তাহার শেষ ত্তর হিন্দু যীশুর অধ্যাত্মবাদে—“My Kingdom is not of this world.” যীশুর নৃতন জগৎ-কথা আর আমাদের mysticism অভিন্ন। কিন্তু

আগেই বলিয়াছি—ইউরোপের মানুষ, খৃষ্টান-সমাজ যীশুত্বকে জীবনের কাছে উপলব্ধি করিতে পারে নাই—তাহারা যীশুকে বাদ দিয়া খৃষ্টান!

রোমের কথা ছাড়িয়া দাও—তাহারা সাহিত্য-কলা-দর্শনের ধার ধারিত না। তাহারা লড়াই করিয়াছিল—মুগ্ধ জিতিয়াছিল—লোক শাসন করিয়াছিল। ইহাদের নিকট আইন শিক্ষা করিও।

মধ্যযুগে এস—ইতালীর “ভিভাইন কমেডি” পড়—তাহাতে অনেক নূতন নৃতন আশা পাইবে—চিত্তের হোমোপ্টিসিজ্জ বা চরম-পন্থতা পাইবে, স্বর্গ মর্ত্য রসাতলের আলোচনা পাইবে—সর্বত্র মহান বৃহৎ উচ্চভাবের পরিচয় পাইবে—ভাবুকতার বহু চিহ্ন দেখিতে পাইবে—কিন্তু হিন্দুর অনন্তবোধ পাইবে না—“তদাত্মানং স্বজামাহং” পাইবে না।

চলারের ভাবুকতায় সমাজের প্রতি বিরূপ পাইবে—বেশ গাল ভরিয়া হাসিতে পারিবে—উপকারও হইবে—কিন্তু ক্ষুধা মিটিবে না—পেট ভরিবে না।

সেঙ্গপীয়র আটলান্টিক মহাসাগর—কুল কিনারা পাওয়া কঠিন—সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ ওখানে আছে—সেঙ্গপীয়রে ইউরোপের “বিরুদ্ধ” দেখ। তাহার ভিতর এক নূতন রকমের ভাবুকতা আছে—বৃথা কঠিন। তাহার বেদনামূলক বিষাদাত্মক tragedy গুলি একবার ছুইবার তিনবারদশবার পড়—নানা অবস্থায় নানা মনোভাবের সঙ্গে রোমিয়ো—জাম্লেট—সীজার—সীয়ার—ওথেলোর সঙ্গে আলাপ কর, ভিন্ন ভিন্ন বয়সে এইগুলির সঙ্গে সঙ্গত পাতাও। পরে দেখিবে—ষোড়শ শতাব্দীর পাশ্চাত্য কবিরয়ের ভাবুকতা কি প্রকার। অনন্ত প্রেম, অনন্ত-

জ্ঞান, অনন্ত কণ্ঠ, অসীম বাসনা রাশি, উদাস জীবন, চাঁদ ধরিবার প্রবৃত্তি, ধরাকে সরাজ্ঞান, নূতন জগৎজয় করিবার জন্ত আলেকজান্ডারের মায় জনন—সর্বত্রোন্মুখী অতৃপ্তি—Divine discontent—এই সবের চূড়ান্ত পাইবে। কিন্তু রসিক-প্রবরের ভাবুকতায় দেখিবে, এই সমুদয়ের সঙ্গে বাস্তবের একটা প্রকাণ্ড বিরোধ রহিয়াছে—দেখিবে প্রকৃতি, জগৎ, সমাজ, সংস্কার, রাষ্ট্র, পরিবার—এই সকল সভ্যতার খটনা—প্রকৃত মানব-জীবনের এই আবেষ্টন (environment) বা বিশ্বশক্তি মাহুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিল্যাপ উত্তমকে বার্ষ্য করিতেছে, ভাষিয়া চুড়িয়া নৃতন আকার দিতেছে। সর্বত্রই দেখিতে পাইবে, প্রথম অবস্থায়—

“প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে, মন লয়ে
সখি গেছে খেলাতে,
মন বুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,

আমার হৃদয় কোমল হৃদয় সহেনি কখনও
রবির কর,
আমার মনের কামিনী পাঁপড়ি মনে
ভ্রমর চরণ ভর,

চিরদিন সখি হাসিত খেলিত,
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত,”
তার পর—বাস্তবের সহিত পরিচয় ও দৃশ্য, প্রকৃতি হইতে আঘাত প্রাপ্তি এবং চৈতন্য লাভ, বেদনা, বিষাদ, মন্ততা, মৃত্যু—

“সহসা সজনি চেতনা পেয়ে
সহসা সজনি দেখিছ চেয়ে
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি।”
সুতরাং বেশী লাফালাফি করিও না—যাহা বয় সহ তাহাই কর, দেখের মাটির দিকে তাকাও—সমাজের দিকে তাকাও—মাহুষের

দিকে তাকাও—এই জগতের দিকে তাকাও। সেঙ্গপীয়র আর বেশী দূর উঠিতে পারেন নাই। তিনি সেই সফোক্লীস ইউরিপিডিসের ষোড়শ শতাব্দীর উত্তরাধিকারী,—বাট গ্রীক সঙ্গুন—এলিজাবেথের স্বার্থ প্রজ্ঞা—ম্যারিষ্ট-টলের ছাত্র, বেকনের গুরুভাই। তাহার ভাব্যতায়—“কত চতুরানন মরি মরি বাওত, নতুয়া আদি অবদান,” অথবা “তাতল সেমতে বারি বিন্দুদ্যম স্তমিত রমণীসমাজে”—এ দুহার ধোঁয়া পৃথগ্য পাইবে না।

কবি গোপ সেঙ্গপীয়রের সহোদর :—
“The proper study of mankind is man.”

গেটের ফোষ্ট দেখিয়াছি। তিনিও সেঙ্গ-পীয়রের আত্মীয়। সেঙ্গপীয়রের প্রকৃতি ও আবেষ্টন (Environment) যা, গেটের মেফিস্টফেলিস ও তাহাই। ইহাদের বিবেচনায় ভাবুকতার ফল বিফলতা, মৈরাগ—পালামা। তাহার চূড়ান্ত কথা—
“Your America is here or now-
here, তোমার স্বর্গ এ জগতেই—বাস্।
হার্ভার, গিলার, সোপেনহোফারের নূতন কামিনী, নূতন জগৎ-কথা তাহার ভাবুকতায় স্থান পায় নাই।

একদিকের Fate, Nemesis, সেঙ্গপীয়রের বাস্তব আবেষ্টন, জাখানসাহিত্যের Mephistopheles ও পুলিগ্র প্রহরী এক গোয়েন্দা শক্তি, মাহুষের মৃত্তর—মাহুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতা সীমীতা জানাইয়া দিতেছে, তাহাকে বিফল নিরাশ করিয়া সঙ্গারে মজাইতেছে। একজাই ইউরোপের বিচিত্র ভোগ-প্রদান সভ্যতা। তাহার প্রকৃত অসীমের সংবাদ রাখে না।
আধুনিকের মধ্যে ব্রাউনিষ্টকে আমাদের

ঘরের লোক করিয়া লইতে পারি। প্রয়োজন হইলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে ভোরন বেশী কটনি হইবে না। তাঁহার কাব্যে আশ্বার কথা আছে—
অশ্বাশ্বাবদ বৃষিব্যা প্রয়াস আছে। যোগী ওয়ার্ডসওয়ার্থ এ সংঘে বিলাতের গুরু—
কিন্তু তাঁহার চরনাবলীর ভিতর এত বাজে মাল আছে যে তাহা হইতে আমাদের কথা টানিয়া বাহির করা কঠিন—করিয়া লাভও নাই। “With gentle hand touch, for there is a spirit in the woods”

—তরলীকৃত হিন্দু কিছু এখানে পাইবে।

শেলীর দ্বয়ে ভাবুকতা ছিল—তিনি ব্রাউনিঙ্গের জাতি—হয়ত অগ্রজ। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিকতা তাঁহার ভিতর ভূমিতে মাওয়া বুধা প্রয়াস।

বোধ হয় মিল্টনের সমগ্র সাহিত্য-জীবনটা একটা অথও হিন্দু ভাবুকতার পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্য জগতে আর ত কাহাকে একটানা ভাবুক, এবং ঐরূপ হিন্দু ভাবুক পাই না। তিনি ভগবানের শক্তিতে বিশ্বাসবান—তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন—to justify the ways of God to man। এ চেষ্টা তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্যের, মগসাকব্যের, গল্প গল্পের ছরে ছরে পড়িষ্ট। Comus-এ ধর্মের জয় দেখে, পাশ্চাত্য সভ্যতার এবং খৃষ্টান ইউরোপের “রক্তসংহার” বা পুরাণ শাস্ত্র Paradise Lost দেখে—
স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্ম, স্বাধীনতার প্রদাহাবলী দেখে। আর দেখে Paradise Regained—স্বর্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবেই হইবে—পুণ্যের স্রোত কেহ ক্রমিতে পারিবে না—“খদি পণ করে থাকিস তাহলে হবেই হবে”—ভগবানের রাজ্যে পাণ্ডুর প্রশংস

নাই। একি আমাদের জ্ঞানান্তর-বাদের কথা নয়?—আশ্বার খোলস-তাণের কথা নয়? যুগে যুগে জ্ঞানজগতের মানব-আকাঙ্ক্ষা—তোমার আকাঙ্ক্ষা, আমার আকাঙ্ক্ষা, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্রাধিপ ক্ষুদ্র কোর্ট পতনের আকাঙ্ক্ষা যে একদিন না দিন পূর্ণ হইবে—এ আশার কথা, এ ভবিষ্যতে বিশ্বাসের কথা ইউরোপে মিল্টন ছাড়া আর কেহ গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রচার করেন নাই। মিল্টন হিন্দু।

বনিয়ানও তাই—কেবল চিন্তায় নয়—বোধ হয় জীবনেও অনেকটা।

একটুক্ষ ফরাসী সাহিত্যে ভাবুকতার পরিচয় দিতেছি। মধ্যযুগের টুভিয়ার টুবেবোরদের প্রেমদপ্তর ও বীরপাথার কথা বলিবা না। চতুর্দশ লুইয়ের গৌরব যুগ ও বর্ণনা করিবনা, ফরাসী-সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও কলবার্টের “দয়াক্ষণ-নীতি”র পরিচয় ও দিতে চাহিনা। সপ্তদশ শতাব্দীর মৌলিয়ার রেসিন প্রভৃতি কবিগণ গ্রীক আদর্শ বিরূপে মূখম প্রচার করিতেছিলেন সে কথাও বলিবা না। আমরা ষাটদশ শতাব্দীর রুসো-ভট্টোয়ার-Encyclopaedist দিগের বিজ্ঞান-যুগের কথা বলিতেছি।

তাহাদের ভাবুকতা ছিল—সে হিন্দুর ভাবুকতা নয়। তাহাতে ভগবৎভক্তির চিহ্ন পাইবে না, অধ্যাত্ম জগতের সংবাদ পাইবে না। তাহাদের ব্যাকুলতা ছিল, আত্মক জন্মন ছিল, অতৃপ্ত বাসনা ছিল; কিন্তু তাহারা বৈরাগ্যে ব্রূহিত না, চামুড়ার চোক কাণ ছাড়া তাহাদের আর কোন ইন্দ্রিয় ছিলনা—ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত “she gave me eyes, she gave me ears” বলিতে শিবে নাই। তাহারা অতীন্দ্রিয়কে চিনিতে চেষ্টা করে নাই। তাহারা যীশুকে

ইউরোপ হইতে নির্ধাসিত করিয়াছিল—Reason কে, স্থল জ্ঞানকে ভগবানের সিংহাসনে বসাইয়াছিল।

সেখপীয়ারের ভাবুকতা দেখিয়াছি—তাহাতে যুক্তি নির্ধারিত বৈরাগ্যের গন্ধমাত্র নাই। সবই এই জগতের লালসালাকি বাড়াবাড়ি নোঁচাচি। ষাটদশ শতাব্দীর ফরাসী ভাবুকতায় ও “আত্মিকী দুঃখ নিবৃত্তির” প্রয়াস পাইবে না। এই ছোট সংসারের খেলা ধূলা লইয়াই যা কিছু ছুরাশ উঠুক আকাঙ্ক্ষা, “প্রাস্ত, লভো ফলে লোভা দুঃখাবির বমনন;”—তাহার বিকলতা, নৈরাশ্য এবং বেদনা।

প্রকৃত প্রভাবে সমগ্র ফরাসীর স্বাভাবিক জীবনটাই একটা প্রকাও হামলেট কাব্য—একটা প্রকাও সীজার কাব্য, একটা প্রকাও সেখপীয়ারীয় “ট্র্যাজেডি” ১৭৮৯ হইতে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত (এমন কি ১৮১০ সাল পর্যন্ত) ইউরোপের মানব-জীবন ফরাসী ভাবুকতার বেদনা-মূলক নাট্যকাব্য। এ মহাকাব্যের কবি এখনও জন্মেন নাই। কিন্তু জীবন্ত কাব্যটাই দেখে—ইহা সেখপীয়ারীয় ভাবুকতার জীবন্ত ও জলন্ত দৃশ্য।

এই নাটকের কথোক্ত সমগ্র মানব-জগৎ আগেই বলিয়াছি, ফরাসী জাতি যীশুকে বিদায় দিয়াছে—অতীন্দ্রিয়কে বাদ দিয়াছে। তাহাদের বাহা কিছু এই জগতেরই স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে—ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকায় আবদ্ধ। বিধাতা একলক শালামান, পকাশ হাজার সীজার, পচিশ হাজার আলেকজান্ডারের উপাধানে একটি জীবগঠন করিয়াছিলেন। সে ইউরোপের বামন অবতার বীরবর নেপোলিয়ন। মানব-সংসারের এই বামন যুগ্মি ফরাসী রিপাব্লিকের

নিকট জিপাণা ভূমি মাগিয়া লইলেন। এগিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা—ত্রিভুবনে বিরাট তাণ্ডবের আয়োজন হইল। জাগতিক অসীমতার, সেখপীয়ারীয় অনন্ত-বোধের চূড়ান্ত দেখ—মানব নটরাজের নৃত্য দেখে—Pleistocene Epoch হইতে Glacial যুগের উৎপত্তি দেখে—আধুনিক ইউরোপের, শির-বিজ্ঞান-সরাজের সৃষ্টি দেখে। ইউরোপের মানব-ও-স্বরূপ আলস্য পর্যন্তকে তন্তু করিয়া ফরাসী জাতি একটুককে রন্ধু করিয়া, গন্ধাবন্ধে রাইবন্ধকে এবং মিসিসিপি বন্ধে চরণ রাখিয়া এই বিরাট পুরুষ মানব-সাগর মনন করিতে লাগিলেন।

এ অশ্রুপূর্ণ দৃশ্য ধ্যান করিতে পারিলে তবে হিন্দু শাস্ত্রীয় সাগরগম্বননের আবাহন বা আগমনী মাত্র ব্রূহিত পাবিবে। সাগর হইয়া ছরল চিত্তের এ দৃশ্য দেখিওনা, পাগল হইয়া যাইবে, হতাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই বিভীষিকা, এই বিফলতা-নৈরাশ্য, এই হইয়াগ হওয়া, এই বেদনার আর এক দিকও আছে। এখানে আসিলে শক্ত ও সবল হইতে শিবিবে। এই বেদনায়, এই পাছড়া-পাছড়িতে ত্রোয়ার চিত্তের মাংস-পেশীবলি ধপুট হইবে। কল্পনার হামলেট-সীজার সীজার-রোমায়ো, বাণ্ডবের এ সবই ভূমি নেপোলিয়ান,

“কোন অমায়ুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল?
মোহে ছরল চক্ষু, মোহে অশ্রুধূলি?”
যাহা উড়ক, ফরাসী জাতি আলস্য পর্যন্তের শূণ্য চুবনার হইয়া গেল—ফরাসীর মেধবদ ও চূর্ণাবর্ষণ হইয়া গেল। ফরাসী ইউরোপের চিন্তায় untouchable paria, অশুশ সংসারের এই বামন যুগ্মি ফরাসী রিপাব্লিকের

সমাধে পরিণত হইল। তাহার দুর্দশা বৃদ্ধিতে চাপে? ভিক্টর হিউগের গ্রন্থ পড়। আর ফরাসী উত্তিল না, এখনও উঠে নাই। ফরাসী ভাবুকতার হলাহল দেখিলে। এ গরল কে গিলিতে পারিবে?

অমৃত ত সকলেই ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছেন। ইতালী স্বাধীন হইয়াছে—জার্মানি মুক্তরাজ্য হইয়াছে—ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য নিকটক হইয়াছে—জাপানেও জাপানগ আদিয়াছে—সর্বত্র সকল কর্ণে ও চিত্তায় নবযুগ দেখা দিয়াছে। কিন্তু ফরাসীকে কে রক্ষা করিবে? ফরাসী বিপ্লবের বিষ ত কেহই পান করিতে চাহিতেছেন না। ফরাসীর সাধা নাই, ইউরোপের সাধা নাই। যে দেশে যুগযুগে ভগবদ্ভক্তির 'নৃতন নৃতন পরিচয়' পাওয়া যায়, যে দেশে বিজ্ঞান কে সঙ্গী করিয়া বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়, যে দেশের কুক-ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্বের প্রচার হয়, যে দেশের সম্যারে যুক্তির পথ দেখান হয়, সেই দেশের নীলকণ্ঠই এ হলাহল গুণ্ড করিতে পারিবে।

এখনও দেবী আছে—ফরাসীর এখনও চৈতন্য হয় নাই—হতাশ হইয়া পড়িয়াছে—দুর্ভাগ্য হইয়া পড়িয়াছে—মুণ্ড রা নাই—তথাপি এখনও “প্রভাত কিরণে সকাল বেলাতে মন লয়ে সবি গেছিছ বেলাতে,”—টিক যেন সেই ভাব। এখনও ফরাসী হিন্দুকে বৃথি না—হিন্দুকে স্থান দেখ না—হিন্দু চরিত্রকে সম্মান করে না। জার্মানি হিন্দুকে সম্মান করিয়া থাকে, ইংরাজ ভক্তি ও সম্মান করিতে শিখিতেছে—কিন্তু জিনিয়া রাথিও, ভারতবাসী, ফরাসী এখনও তোমাকে বিরূপ করিতেছে—সে শীঘ্র হিন্দুর বাণী বৃদ্ধিতে চেষ্টা করিবে না।

একজন রূপ ভাবুক পরিত্যক্ত দিতেছি—

ওয়ার্ডওয়ার্থ, শেলী, বায়রন, কুপার, ফরাসী-বিপ্লব, সংস্কৃত সাহিত্যের “আবিস্কার,” পাকাতা-জগতে গীতা প্রচার—ইত্যাদির যুগ স্বরণ কর। সেই সময়কার ক্রমিকায় করমসিন (Karamsin ১৭৬৩-১৮২৬) একজন শ্রেষ্ঠ আত্মজীবন সাহিত্যসেবী। তিনি গণ্য, পণ্ডা উভয় সাহিত্যেই স্বরূপযোগী, একধারা জগৎ-প্রসিদ্ধ ইতিহাসের রচনা কর্তা—European Messenger নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক। তাহার সাহিত্যসেবার দ্বারা নানা উপায়ে ক্রমিকায় সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র সর্বত্র এক নবযুগ আদিয়াছিল—পিটার দি গ্রেটের তিনি সাহিত্য-মুগ্ধ।

তাঁহার রাণী শুন—

“Do you wish to be a writer? Read the history of the accumulated woes of your race; and if your heart does not bleed as you read, throw down your pen, let it only serve to betray the gloomy coldness of your heart.”

তিনি কাদিতে জানিতেন, কাঁদাইতে পারিতেন। এই জ্ঞাত তাঁহার প্রভাব। তাঁহার Poor Louisa পুত্র, দরিদ্রের জন্মভূমিতে পাইবে, উদবিগ্ন শতাব্দীর রূপ ভাবুকতা বৃদ্ধিবে। তাঁহার জগৎখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থের ভূমিকা পড়—ভাবুকতার একটা নূতন দিক বৃদ্ধিবে:—“One thing above all others we love, and we have but one desire; we love our country, and desire for its happiness ever greater than fame; we pray that it may never betray the fundamental law of its greatness, but that in accordance with the principles of our Government and of our holy religion it may become more and more closely united;

that Russia may flourish for ages. to come, as long as it is permitted to moral things to live upon this earth.”

করমসিন জার্মান ভাবুকগণের ভক্ত—সকল রূপ ভাবুকই নব্যজার্মান সাহিত্যের ভাস্কর্য বা অধ্বাবক। তথাপি করমসিন গেটের শেষ কথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই—হিন্দুর অনন্তবোধ তাঁহার ধারণার বহিষ্ঠ ছিল। God alone can know God—ইহাই তাঁহার বাণী। “The proper study of mankind is man”—বিলম্বের ডেপো কবি শ্রেষ্ঠের উক্তি। দেখিতেছি, ভাবুক করমসিন ও সেই সেক্সপীয়র, সেই পোপ, সেই গেটে অপেক্ষা উর্দ্ধে উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার ভাবুকতায় “ততঃ কিম্” নাই।

এখন একবার পাতলে আসা যাক—

“হোথা আমেরিকা, নব অত্মদায়,

পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশ্রয়,

হয়েছে অধৈর্য নিঃসীরা বর্ষে,

ছাড়ে হৃৎকান্দ ছুরগুল টলে

যেন বা টানিয়া ছিড়িয়া ভুলে

নূতন করিয়া গড়িতে চায়।”

টিক কথা—আমেরিকার বাহা কিছু সবই লম্বা চোড়ায় বেশী, বহুরে বড়। তোমরা যেখানে এক টাকা ব্যয় কর, উহারো সেখানে ৫০ টাকা ব্যয় করে—উদ্বেজ একই; কিন্তু কাজকর্ম চাল চলন, সবই বেশী বেশী। ‘ইউরোপ’ শব্দটাকে বড় করিয়া লিখ, ‘আমেরিকা’ কি বৃদ্ধিতে পারিবে। ‘ঐ যে “নূতন করিয়া গড়িতে চায়,” তাহা আর কিছু নয়—ইউরোপেরই এগীট ওগীট মাত্র। সেই গ্রীক, সেই সেক্সপীয়র, সেই নেপোলিয়ান, সেই বাস্তব জগৎ, সেই অনন্ত-বোধ-শূন্য অতৃপ্ত

বাসনা, সেই অধ্যাত্মবাদ-হীন দুরাশা রাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া আটলান্টিকের অপর পারে আমেরিকা নাম ধারণ করিয়াছে। ওখানে নূতন কিছুই পাইবে না—নূতনের মধ্যে সবই ফাঁপা, হাফা, ভাগা ভাগা, ফোঁপড়া, তজ্জন গর্জন, বিভ্রাণন-প্রচার, ‘অত্যাঙ্কি, Superlative Degree।

একটা কথা আছে “The poet wants a home.” আমরা বলি—“জয়া চ পৃথিবী গৃহঃ,” “প্রভাটে যুগমেধিনাং,” “অপূরিত গৃহ শৃঙ্গা।” গৃহস্থালী, পরিবার পালন, সংসার যাত্রা, সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণ, পত্ন-সেবা, অতিথি-সেবা, দেবসেবা, “পঞ্চ মহাযজ্ঞ”—এই সকল না থাকিলে সর্বমুখী চরিত্র গঠিত হইবে কি দিয়া? শতাব্দায় হুসরের বিকাশ হইবে কি দিয়া?—প্রকৃত অনন্ত বোধ জাগ্রক বা না জাগ্রক, অন্তরের পিপাসা, প্রেম ভাল-বাসা, স্বার্থত্যাগ, করুণা দানসম্বা প্রীতি-স্নেহ—“পৃথিবী সচিব: সখা মিথ: প্রিয় শিষ্য। ললিতে কলাবিদ্যে।”—এ সকল অন্তর্গতের গভীর ভাব গভীর ভাব আনিবে কোথা হইতে? আমরা জানি কাব্যের অনেক লক্ষণ, তাঁর একটা এই যে “কাব্য সম্ভিততয়া উপদেশ মুগ্ধে।” এজন্যই রবীন্দ্রনাথের ‘মানস হৃদয়’। কিন্তু আমেরিকা বাসীর ঘর নাই—বাড়ী নাই—পরিবার নাই—সমাজ নাই—দেশ নাই, অতীত নাই, ইতিহাস নাই। টিক-টিক বৃথিয়া লও তাহাদের সভ্যতায় হোটেল আছে, Restaurant আছে, ক্যাফে আছে, ব্যারাক আছে, মেস আছে, রেলগাড়ী আছে—বড় বড় খাম-ওয়ানা যোজনব্যাপী মাগগুনাম নামে বিখ্যাতদাল বা ছেলের কারখানা আছে, একটা জু টিগিলে ৫০০০ মাইল দূরের কল চালাইবার ক্ষমতা আছে—অংকর গভায়াত

আছে—উহার পাশ্চাত্য সভ্যতার nomad
তাতার জাতি। হিতি নাই—The rolling
stone never gathereth the moss.
তাই স্বদেশের স্বস্বভাব, কবিতা, বসিকতা;
ওখানে গজিতে পায় না—সবই শুষ্ক কাঠ,
ইট কাঠ কল্পকল্প, সবই কর্কশ নীরস।

দেশই উহাদের এখনও জমাট বাঁধে নাই—
যে যাহা পায় তাহাই করে, আমেরিকা
“কোম্পানীর নাগড়া,” মানব-জাতির “বার-
ইয়ারিতলা”—সকলেই এক যা লাগাতে
পারে। ভারতবাসী, তোমরাও বেদ বেদান্ত
উপনিষদ পুরাণভঙ্গ মন্দির মূর্তি লইয়া হাঙ্গির
হও, সান্দরে গৃহীত হইবে। একবাং মুঠ
ঘাট পড়িয়া রহিয়াছে, জমি চষ, বসপাল
কর—কেহ আপত্তি করিবে না। চেষ্টা
করিবে কি?

যাহা হউক, ওখানে অসংখ্য বৈচিত্র্য,
অসংখ্য দলাদলি, অসংখ্য অনৈক্য, পরস্পর
বিভিন্নতা—কেহ কাহাকে চিনে না—একতা
বলিয়া পদার্থ তথা-কথিত “মুক্তরাজ্য”—কিঞ্চিৎ
মাত্র ও জন্মে নাই। উহার নাবালক শিশু
জাতি।

উহাদের ভাবুকতা দেখিবে? হুইটম্যান
পড়—আমেরিকার যে বর্ণনা—হিলাম ইহার
রচনার সঙ্গে মিলাইয়া লও। চূড়ান্ত কথা
একটি অক্ষোষণ—চূড়ান্ত কথা Democracy
বা দর্শন। সেই ইউরিপিডিস্, সেই পেরিক্লিস্,
সেই রুসো, সেই টেকেলিল—এপীঠ ওপীঠ—
বিশশতাব্দী আর অষ্টাদশ শতাব্দী, অথবা
বৃহৎ চতুর্দশ শতাব্দী। আগেই বলিয়াছি,
লখা চৌড়া বোল-চালওয়ালা ইউরোপের নাম
আমেরিকা। রগড় দেখিবে—কিলগাইনের
কথা মনে কর। হুইটম্যানের স্বজাতি উক্কা
উইলদন আমেরিকার চূড়ান্ত ভাবুক। তিনি

ব্যক্তিগতবাদের পৃষ্ঠপোষক—ভাষার অনেক
পরিচয় আছে। মুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট
হইবামাত্রই বক্তৃতা দ্বারা ঘোষণা করিলেন—
তাঁহার কিলগাইনকে স্বাধীন করিয়া দিবেন।
রোমিয়ার আকাঙ্ক্ষা, হামলেটের দুরাশা,
ফরলীর ভাবুকতা যাহা—এই রাষ্ট্রনৈতিক
মিষ্টমিষ্টজন্ম, বা রোমাক্সিমিজন্ম, এই কর্ণ-
জগতের ভাবুকতা ও ঠিক তাহাই।
কিলগাইনকে স্বাধীন করা হইবে না—
তোমাদের জায়েরিতে লিখিয়া রাখ।
“বল্লাহন্তে লুক্সিক্সি।” John Bull ১৮৫৮
বৃষ্টাৎ তোমাদিগকে যে এক “ম্যাগনা কার্টা”
দিয়াছেন—তাঁহার মাসজুত ভাই Brother
Jonathan ও কিলগাইনকে সেইরূপই
একটা মিলি দিয়াছেন!

ভারতবর্ষ এরূপ অজ্ঞান, লখাগলা,
আফগান জানিত না। ভারতবর্ষ অনেক
বীকার করে—ছোট বড়, উচ্চনীচ ভেদজ্ঞান
করে—যখন তখন যাহা তাহা বকে না—
একটা অলৌকিক কবীর কথা, সামের কথা
প্রচার করে না। যতটা রয় সম, যতটা
সম্ভবপর, এই সঙ্গীশ মানব-জগতে যতটা কার্যে
পরিণত করা চলিতে পারে হিন্দুরা ঠিক
ততটুকুই করিয়া থাকে—ঠিক সেই পরিমাণে
সেইটুকু স্বাধীনতা দেখে, সেই পরিমাণে সাম্য,
ঐক্য প্রার্থন করে। এই অধিকার ভেদ,
এই ঐক্যবিশিষ্ট অনৈক্য, এবং অনৈক্যমুক্ত
ঐক্য হিন্দুর পরকালবাদের ফল, অধ্যাত্ম-
জ্ঞানের ফল, অতীন্দ্রিয় ধারার অভিব্যক্তি।

এই অতীন্দ্রিয়ার ধারণা আমেরিকায়
পাইবে না। এমাসনের কথা বলিতে চাও?
প্র্যাগমাটিজমের কথা বলিতে চাও?
আগেই বলিয়াছি—আমেরিকা ইউরোপেরই
ভাড়া বা অস্থাবর মাত্র। সেক্সপীয়রের

Positivism দৈবদ্বিচ্ছা, mysticism-বর্জন
শৈথিলা—তাহাই আমেরিকার Pragma-
tism তত্ত্ব। আর এমাসন? তিনি কার্লহিলের
মার্কিন সংস্করণ—কার্লহিল জাখানের
ইংরাজী সংস্করণ—জাখান এমাসন অর্থাৎ
শোপেনহোয়ার ল্যাটিনের জাখান অস্থবীর।
ল্যাটিনী দারাসিকার কারলী হইতে
তর্জমা। আর, দারাসিকো ভারতের মূল
প্রশংসার শিষ্ট। প্রত্নতত্ত্বের নিয়মসমূহের
সম তারিখ মিলিল কি না দেখিও না। চিন্তার
ধারাটা বুঝিয়া লও। Tankee অধ্যাত্মবাদ
বুঝিবে।

কিন্তু ‘পূর্বে’ বলিয়াছি, পাশ্চাত্য জ্ঞান
হাওয়া হিন্দুর যৌক্তিক হৃদয় হয় নাই—
সমাজে কালহিল রাকিন টলম্ব শোপেন-
হোয়ারের “একবারে” হইয়া আছেন।
এমাসনের ও সেই অবস্থা। ইহার দুইজন
চারজন লোক বই লিখিয়া, গান গাহিয়া,
ছবি আঁকিয়া অধ্যাত্মের দিকে, হিন্দু mysticism
এবং দিক, বৈরাগ্যের দিকে, বৈরাগ্যের
দিকে পাশ্চাত্য মানবকে টানিয়া লইতে চেষ্টা
করিয়াছেন—কিন্তু দেশের সমাজে, শিল্পে,
রাষ্ট্রে, পারিবারিক জীবনে, তাঁহারা সেই
বৈরাগ্যবাদ, সেই সঙ্গীশ অসীম, ভোগে
ভোগ কিছুমাত্র প্রবর্তন করিতে পারেন নাই।
পাশ্চাত্য জগতের সমাজ, শিল্প, পরিবার, রাষ্ট্র,
ধর্ম সবই Sullragate আন্দোলন, অনিশ্চয়
এবং যুক্তিতর্কের কচকচনি, রেলগাড়ী
টেলিগ্রাম, Struggle for existence,
মাত্রাজাতিক, “মুখে বল ভালবাসি, অন্তরে
গরলমাথা”—এই তব বরণ করিয়া লইয়াছে।
এখনও ঘুম ভাঙে নাই।

বোধ হয় ভাষার সময় আসিয়াছে—
এমিয়া জাগিয়াছে—ইউরোপ কাছেই তাহার

পুরাতন বলিষ্ঠলিক একবার বাড়িয়া বাড়িয়া
নতুন সংস্করণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।
ফরাসী পদ প্রাণ—নবীন ইতালী জাখানির
নতুন নতুন “আপা” বাড়িতেছে, বনিম্বাই
ইংলণ্ডের ও পার্শ্ববর্তন কিছু কিছু দেখা
মাইতেছে। আমেরিকা ও নতুন ক্রমা শুনবার
পথে আসিতেছে। তাহার ভাবুকতা এখনও
আবেষ্টনের দাড়া থায় নাই—শীঘ্রই খাইবে।
আমেরিকা এইবার হামলেটের চৈতন্য লাভ
করিবে। তাহার Monroe Doctrine
আর টিকিল না। কিলগাইন সফল ও শীঘ্রই
তাহাকে ভাবুকতার রাজ্য ছাড়িয়া বাতবে
নামিতে হইবে। জাপানের দৃষ্টি বড় লোপু।
এদিকে নতুন পানামা খালের সঙ্গে প্রান্তের
জীব-হিন্দুবোদ্ধ মুসলমানের প্রভাব
আমেরিকায় নবশক্তি আনিয়া দিবে।

এই নবশক্তির একটা অভিব্যক্তি
রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য। এই জতাই
পাশ্চাত্য জগৎ তাহার হিন্দু মিষ্টমিষ্ট
খিচিৎ এবং দিক, বৈরাগ্যের দিকে, বৈরাগ্যের
দিকে অধ্যাত্মবোধ দেখিয়া রোমাঞ্চিত
হইয়াছে। তাঁহাদের আর একবার সেই
ষোড়শ শতাব্দীর Renaissance বা ‘নব
অধ্যাত্মবোধ’ সুব্রাহ্মণ্য হইতে চলিল। তাঁহারা
আবার আমেরিকা আবিষ্কার করিল।
একটা নতুন জগৎ তাঁহাদের চোখে পড়িল।
ওয়ার্ডগওয়ার্ড আনিয়া দিয়াছিলেন “The
light that never was on sea
or land,” জাখানের আনিয়া দিয়াছিলেন
১৮৫৮ “Ideas,” কার্লহিল আনিয়া
দিয়াছিলেন “Natural Super-naturalism”
এবং Heroes বা “Great men,” এমাসন
আনিয়া দিয়াছিলেন Representative men।
কিন্তু তাহাতে স্মৃতি মিতে নাই। নতুন

জগৎ চাই—নূতন প্রাণ চাই, নূতন দৃষ্টি চাই, নূতন আশা চাই—নূতন আলোক চাই।

নূতন জগৎ আর কোথায় পাওয়া যাবে? উত্তর মেক, দক্ষিণ মেক সবই ত অবিদ্বত হইয়াছে। “গগনের গৃহ তর তর করে” সবই ত প্রাণ দেখা হইয়া গেল—ইউরোপাস নেপচুন, রাহেকেন্দুর পরিবর্তে নবগ্রহে বসিলেন—মার্সের সঙ্গে ও ত আলোপ চলিতেছে। কিন্তু “কত চতুর্দান মরি মরি যাতনত তুমি আদি অবমান”—সেই আদি অবমান-হীনের পরিচয় কে দিবে? এই ভারতবর্ষ—

“এমন দেশটি কোথা ও খুঁজে
পাবে না ক তুমি।

সকল দেশের রাণী সে যে
—আমার জগতুমি।”

এই পৃথাক্তি ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হইবার মূল্য নোবেল প্রাইজ। একলক্ষ কুড়িহাজার টাকা মূল্য ত কিছুই নয়—হিন্দুর নিকট পাশ্চাত্যের শিষ্যই প্রস্তুত মূল্য।

পশ্চিমা সাহিত্যের ভাবুকতায় অনেককণ কাটাইয়া। এখন কিছু পূর্ববী কথা কহি। পূর্ববী সাহিত্যে অনেকটা নিজের জিনিষই পাইব—হৃতরাং বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ছুঃখের কথা—পূর্বকে চিনি নাই—প্রাচ্যকে চিনিতে শিখি নাই—

প্রাচ্যকে চিনাইবার কেহ নাই। একজন ছিলেন—এসিয়ার ঐক্যপ্রচারক, হিন্দু-বৌদ্ধের আত্মীয়তা-প্রবর্তক, ভারতের সদস্য বন্ধু, প্রাচ্যের মর্মকথা প্রকাশক। সেই ভাবুক, চিত্র-শিল্পী, দার্শনিক, কবি ও কাকুরাকে চিনিতাম। জাপানের সেই স্বপ্নস্তান আজ পরলোকে। তাঁহার উদ্দেশ্য এক কোঁটা অশিষজল ফেলি—ভারতবাসী, তোমরা ও তাঁহাকে মনে রাখিও। জাপানী তাঁহাকে ভালবাসে নাই!

আর চিনিতাম উন্নিবেশ শতাব্দীর অশোক, ধর্মপ্রাণ, স্বজাতিবৎসল, প্রজারঞ্জন, জাপানের রামচন্দ্র, পরলোকগত মিকা-ডোকে।

“প্রজান্নাং বিনযাথানানু রক্ষণাৎ ভরণাপি।”
সগিতা পিতৃসন্তান্যং কেবলং জঘ্যহেতবঃ।”
ঔহাকে জাপানের পিটার দিগ্রেট অথবা ফ্রেডরিক বিগ্রেট মনে করিতে পার। তাঁহার ভাবুকতায়ই জাপানে স্বার্থত্যাগ স্বরূপ হয়—এসিয়ার জাগরণ আরম্ভ হয়।

আর একজন জাপানীকে চিনি—তিনি ভাবুক ও কাকুরার উদ্ভাপক। কাউট ওকুরাকে চিনি। তাঁহাকে নী চিনিলেই ভাল হইত। তিনি বোধ হয় জাপানকে মজাইবেন—এসিয়ারকে ও ভুবাইতে বসিয়াছেন। “মজালে রাক্ষস কুলে, মজিলা আপনি।”

জাপানের আর কাহাকেও চিনি না—চিনিবার প্রয়োজন নাই। একটা লড়াই করিয়া জিতিয়াছে।—কিন্তু আজ তার আফালনে এসিয়ার মুখ নিশ্চিন্ত—সমস্ত প্রাচ্য জগৎ তাহার মস্ততায় নির্ভর। বেশী বলিয়া লাভ নাই। এ দেশা বেশী দিন টিকবে না। শীঘ্রই তাহারা এসিয়ার মর্ম বুঝিতে বাধ্য হইবে—আবার এসিয়ার পরলোকে লুটাইয়া পড়িবে, এসিয়ারকে ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া ডাকিবে। সে তাকে এসিয়ারবাসী সাড়া দিবে—ভাইকে ভুলিয়া থাকিবে না।

এখন পর্যন্ত জাপান জগৎকে কিছু দেখে নাই—ইউরোপের নকল করিয়া ইউরোপিয়া রাষ্ট্রনীতির দুর্গলতার কাকে পাড়াইয়া গিয়াছে। একবার গা বাঢ়িয়া দাঁড়াইতে পারিলে কিছুদিন চলিয়া যায়। ইহা জগতের নিয়ম—বিজ্ঞানে ইহার নাম inertial। যাঁহা

হটুক, ভগবান্ ধী করেন—মঙ্গলের জুটাই—এসিয়া ত জাগিল।

মহাপ্রাণ চীনকে জ্বলিও না। সে জোমারের আত্মীয়—বহুদিনকার কুটুম্ব—এই সেদিনকার পালের বাঙ্গালার ও তাহাদের সঙ্গে আমাদের লেন দেন বেশ চলিত। চীন ভারতবর্ষকে বুঝে, জাপান দূরে পড়িয়া বেশী বুঝিল না। চীনা সাহিত্যে ভারতবর্ষকে পাইবে—ভারতবর্ষের ভাবুকতা বেশ পাইবে। কলিকাতার বেকিট স্ট্রীটের মুচি চীনাম্যানদের দেখিয়া চীনাধিকারকে বুঝিও না। তাহাদের দেশে অনেক গভীরতত্ত্ব আছে। আর এই মুচি, কারিগর, শিল্পীদের মধ্যেও অনেকগুণ আছে। তোপাখিকলে চিনিতে—মাছ্য হইলে তাহাদিগকেও বুঝিবার জুট চেষ্টা করিতে।

চীন আমাদের আত্মীয় বটে—কিন্তু তাহাকে আমরা একেবারেই চিনি না। পাশ্চাত্যের একজন, বলিয়াছেন—“Better fifty years of Europe than a cycle of Cathay.” রামায়ণ চোখে না দেখিয়া তাহার সমালোচনা যাহা, চীনের মানচিত্র দেখিয়া তাহার অধিবাসী সখ্যে এই মত প্রকাশ দেয়। অথবা একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি—যে, “সংস্কৃত ভাষাটা ব্রাহ্মণ গণ্ডিতদিগের একটা জাণিয়ায়, সংস্কৃত ভাষা বাঙালিক কোন একটা ভাষা নয়!” বুঝিলে—পাশ্চাত্যেরাও চীনকে এইরূপই বুঝিয়াছেন। আমরা তাহাদের গম্ভা সংস্করণ পড়িয়া “স পাপিষ্ঠতোহাংকিঃ” হইয়াছি।

এই সেক’ একটা অবাঞ্ছিত কথা বলিয়া রাখি। পশ্চিমারা যখন আমাদিগকে নিম্না করে, সে কথাই বেশী কাণ দিও না। আর যদি ভাল

বলে, তাহাতেও গলিয়া যাইও না। সেই প্রশংসার সাহায্যে কাজ হাঁসিল করিবার উপায় বাহির করিও।

যাহা হউক, চীনের সাহিত্য বুঝিবার জুট সখর চেষ্টা করা কর্তব্য।—তোমরা নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতেছ—দেশের ইতিহাস বুঝিবার জুট সাহিত্য পরিষৎ, ভারতীয়-চিত্রকলা সমিতি, জাতীয় শিক্ষা সমিতি, ঐতিহাসিক অধ্যয়ন সমিতি, হিন্দুসাহিত্য-প্রচার-পরিষৎ কত কি গড়িতেছ? ভারতবাসীকে চীনের ভাষা, চীনের ধর্ম, চীনের সাহিত্য শিখাইবার কোন ব্যবস্থা করিতেছ না কেন? পালি ভাষা দেশের পণ্ডিত-মহলে অশ্রুত: দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এবার চীনাটাকে চালাও।

এখন কিছু মুসলমানের কথা বলিব। মুসলমানদের ভাবুকতা আছে—তাহা আমাদেরই ভাবুকতা—হিন্দুর ভগবদ্ভক্তি। তাহারা গীর্জা-ক্যাপারকে সম্মান করেন, তাহাদের যার মানে তের পার্শ্ব আছে। তাহাদের আজ্ঞা—“নামায়ে অনন্তবোধ দেখ—আলমে, পরমেশ্বরের বিধান দেখ, নিজকে ভুলিয়া পরমেশ্বরের চিত্ত সমর্পণ করিবার প্রস্তুত দেখ।” ভারতের মুসলমান ভারতবর্ষের বাণী বহুকাল শুনিয়াছেন। মুসলমানী সাহিত্য, শিল্প, চিত্র, কাব্য, কাহান, সঙ্গীত—এ সবের মধ্যে আমাদের অনেক জিনিষ দেখিতে পাইবে। মুসলমানেরাও আমাদের সাহিত্যে শিল্পে পূজা পাঠে তাহাদের অনেক কথা শিখিতে পারেন। এজুটই মুসলমান সাধুসন্তদের শ্রদ্ধা বাসরে, মহরমের জনতা, রামলীলা-গম্ভীরা-ভরত বিলাপ ইত্যাদি উৎসবে হিন্দু মুসলমান একপ্রাণ হইয়া যায়। তারপর স্বকীয়ধর্মের ভাবুকতা—সে ত আমাদেরই বৈষয় ধর্ম। আরবী “লগ্নালা মজহুনের” গল্প শুনিয়াছ?

দেখিবে—বাহার প্রেম কাহাকে বলে। মুক্তকালে গজনির মামুষ কাঁদিয়াছিলেন। কেন—ভাবিয়া দেখ। আলেক্সান্ডার নূতন রাজ্য জয় করিবার জ্ঞত কাঁদিয়াছিলেন। রক্ত-পিপাহ গজনির মামুষ সেক্ষত কান্ধেন নাই। এই জন্মন চিত্তবিরতির আকুল জন্মন—সদায় মানবের জন্মে জীতি—“তাতল দৈকতে বারি বিন্দু সম হুতমি রমণী সমাধে”—সেই ধূয়া। উদ্ভূ ভাষায় হুপ্রচলিত এই ধূয়াই একটা “বদেহ” তখন—“নামির ওই, কোমর কো বোধে, বিস্তর কো উঠাও, রাত রহে দেই খোড়া”। সংসার ছাড়িবার “সময় হয়েছে নিকট”—শেষ খেয়ালি পাড়ি বিহার বেলা হইল—“আপন রতন বেছে নেচে চল হরি বঁশল ডাকি”—মূল-মানেরা এসব কথায় অভ্যস্ত।

কালিদাসের পরিপূর্ণ হিন্দুজগৎ

ভাবুকতার এক তরঙ্গা গাহিলাম—ইহার আর একদিক আছে। হিন্দুর ভাবুকতা কেবল আশার, আকাঙ্ক্ষার, বাসনার, বিশ্বাসের সামগ্রী মাত্র নয়। হিন্দু-আধ্যাত্মিকতা কেবল ভাবরাজ্যের, চিন্তারাজ্যের, ধ্যাননিরপার বিষয়ীভূত নয়। “যেবল গ্রন্থ লিখিবার জ্ঞত হিন্দু মুনিবিরগণ একটা আধ্যাত্মবাদের, একটা অনাভূত অজিত-জ্ঞাতের, জগদমরগাতীত সংসারের সৃষ্টি করেন নাই। ভাগবতবর্ণের হিন্দু সমাজই আধ্যাত্মিকতাময়। ভাবুকতার, অতীন্দ্রিত্য, ভগবন্তক্তির দর্শনবাদ হিন্দুর বাস্তব জীবন হইতে উদ্ভূত, হিন্দুর প্রতিদিনকার কাঞ্চিদ্বন্দ্যে, প্রতি আচার ব্যবহারে নিবদ্ধ। এই সকলের সাহায্যে mysticismকে আমাদের ঘরে গ্রামে সমাজে বান্ধিয়া রাখিয়াছি। এই অনন্তবোধ হিন্দুর ভোগ-

সংসার-গৃহস্থালীকে, বিবাহ-শ্রাদ্ধকে, রাষ্ট্র-শিল্প-সাহিত্যকে অহুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের ঐতিহ্যিক অদ্বৈতান-প্রতিষ্ঠান, আমাদের ঐতিহ্যিক, আমাদের জ্ঞানস্বরূপ, আমাদের পরকালবাদ, আমাদের বিবিধ, আমাদের ক্রিয়, পশুপালন, ব্যবসায়, অতিবিশেষ, পল্লীশাস্তা, আমাদের সঙ্গীত, সৃষ্টিগঠন-কালকর্ষা, আমাদের বৈরাগ্য, আমাদের ব্রহ্মচর্য, আমাদের পাইয়া, আমাদের বান-প্রস্থ, আমাদের সন্ন্যাস—জীবনের সকল অভিব্যক্তি এই বিচিত্র ভাবুকতার, আধ্যাত্মিকতার, এই অতীন্দ্রিত্যের সাক্ষ্য—আজও, এই অবনত ভারতেও, তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

সেই জ্ঞতই আমাদের কেবল উপনিষদের তাৎপর্য আছে তাগা নহে। আমাদের মহাভারত পুরাণতন্ত্রগ্ৰন্থিতাও আছে। আমাদের কেবল যোগ, ধ্যান হুশুদ্ধি, অমৃতদুষ্টি, নিদাম কথ, কৈবল্যপ্রাপ্তি মুমুক্শু আছে তাগা নহে—এই সমুদয়ের অতিরিক্ত, এবং এই গুরুকে চিত্তে ও কথ্যে, অভ্যাসে ও জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জ্ঞত আমাদের অধিকারভেদে, জাতিভেদে, সৃষ্টিগুণা, সকায় সাধনা, ব্রত, আরাধন, পূজাপাঠ, উৎসব আদৌ সঙ্গীত সবই আছে। আমরা অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করিয়া থাকি—যেখানে সেখানে বেতুকের মত, পাগলের মত Don Quixote-এর “লিবার্টি, ফ্রেটনিটি, ইকোয়ারিটি” জাহির করিয়া বেড়াই না। আমরা বৈচিত্র্য স্বীকার করি—অথচ ঐক্যকে, সাম্যকে বাদ দিই না।

সুতরাং হিন্দু ভাবুকতার সকল দিক বুঝিতে হইলে—ভারতীয় সনাতন ধর্মের, আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ চিত্র দেখিতে হইলে কেবলমাত্র আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভক্তি,

যোগ, নির্ভয়, মুক্তি, অনন্ত, অসীম, ভূমানন্দ বুঝিলে চলিবে না। হিন্দুর সৌন্দর্য্যবোধ বাস্তবকে, Positiveকে বাদ দিয়া, শিল্প-বিজ্ঞান-জড়পদার্থকে বাদ দিয়া, ইহ জগৎকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সংসারকে তুচ্ছ করিয়া বিকশিত হয় নাই। ভোগের দিক, রসের দিক, প্রগতির দিক, সমাজবন্ধনের দিক, রাষ্ট্র-শাসনের দিক, শারীরিক শক্তির দিক, রসানন্দ, উদ্ভিদত্ব, জাহাজত্ব, আকরত্ব—সকলই হিন্দুর আধ্যাত্মজ্ঞানে তাহাদের যথানির্দিষ্ট স্থান পাইয়াছে।

কাব্যে হিন্দু জগৎ দেখিবে—সাহিত্যে সোনার ভারত দেখিতে চাও—আধ্যাত্মিকতার ছই দিক—ভাবুকতার উত্তর পক্ষ—হিন্দু-সমাজের সনাতনী বাণী—উপলব্ধি করিতে চাও—বিক্রমাদিত্যের কালিদাসকে গুরু কর। তাঁহার শতুলনা-মেঘদূত নয়, এমন কি কুমারসম্ভবও নয়—রঘুবংশকে চির সহচর কর। রঘুবংশের সমাজ সংসার গৃহস্থালী, রাষ্ট্রশাসন, রঘুবংশের আদর্শ, দর্শনতত্ত্ব, চিন্তাপ্রণালী, কথপ্রণালী ধ্যান করিবে। বুঝিবে তোমরা কি—তোমাদের প্রাণ কোথায়, বিশেষত কোথায়—বুঝিবে প্রকৃত নিকাম কথ কাহাকে বলে, যথার্থ পরাজয় কাহাকে বলে। দিলীপ রঘু রামচন্দ্রের সাধনা বুঝিও—অগ্নিরবর্ণের অংগুষ্ঠন বুঝিও—প্রজারতন শ্রেণীত পুরোহিতার বুঝিও—এবং এই নবর জগতের শেষ কথাটা বুঝিও। রামচন্দ্রের অযোধ্যা “কষ্টং কষ্টতরং গতা” কেন হইয়াছিল বুঝিও, পবিত্র রঘুবংশ অগ্নিরবর্ণে লয় পাইল কেন বুঝিও। “তাতল দৈকতে বারিবিন্দুসম” সবই অস্বাধ্যী—কিছুই থাকিবে না, যতই লাগানি।

কর, কিছুই টিকিবে না—এই তব বুঝিয়া জীবন গঠন করিতে শিখিও; আর হিন্দুর ভবিষ্যতে বিশ্বাসটা বুঝিও—এই জ্ঞত “রঘুবংশের” উনিবিশদর্শের শেষ শ্লোকটি গভীরভাবে ধ্যান করিও—কেন অগ্নিরবর্ণের সাধনীপত্নী “অশ্বপুত্র” ক্রীতিরব নভোবীজমুগ্ধে ধ্যান। রাজা পালন-করিতে লাগিলেন। স্বর্ঘ্যবংশ ছাত্ররাজ হইল—তথাপি হিন্দু কবি আশা ছাড়িলেন না।

রঘুবংশের এই শেষ কথা—হিন্দুর চরম কথা—শ্রীতার আশা-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতেছি—

“তব চরণের আশা, গুণো মহারাজ ছাড়ি নাই। এত যে হীনতা, এত লাজ, তবু ছাড়ি নাই জ্ঞান।

তোমার নির্দিষ্ট কালে মুহূর্ত্তই অসম্ভব আসে কোথা হতে।
আজ তুমি অন্তর্ধারী এ লজ্জিত দেশে,
সবার অজ্ঞাত মাঝে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাজি দিন জাগরুক হয়ে
তোমার নিশ্চু শক্তি করিতেছে কাজ।
আছি ছাড়ি নাই আশা, গুণো মহারাজ।”

কালিদাসের কারিগরী—কালিদাসের জগৎ-সৃষ্টি দেখাইতেছি। কালিদাসে ভাবুকতার positive পক্ষ এবং transcendental পক্ষ, উভয়পক্ষই বুঝাইতেছি। কবিবরের বীর রঘু নিজে বাহুবলে সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেন—বিজয় করিয়া রোমীয় সেনানায়ক-গণের চায় অসংখ্য রাজা মহারাজা সামন্ত মহাসামন্তকে বন্দী ও ভৃত্যভাবে ধরিয়া আনিলেন,—

“ইতি জিত্বা দিশো জিঘৃক্সবর্ত্তত রথোক্তম্।
রজো বিশ্রাময়ন রাজ্ঞাং ছত্রশ্যেন্যম্ মৌনিম্।
কিন্ত ধরিয়া রাখিলেন না—শীঘ্রই বিদায়

বিনষ্ট করেন নাই—তাহার উপর অতী-
শ্রিয়ের ছাপ মারিয়াছিলেন; হিন্দু ভোগকে
বর্জন করিতেন না, তাগের আকাঙ্ক্ষা শাস্ত্র
অনাসক্তির দ্বারা ভোগসমন্যাকে দ্বারা
সংযত নিয়ন্ত্রিত করিতেন। হিন্দুর বিদ্যানে
মানবজীবনের সকল অভিব্যক্তি—
পাণ্ডিত্য সকল অহুতানই যথার্থ বঞ্চিত
হইয়াছে। এইজন্য হিন্দু বৈরাগ্য, হিন্দুর
আধ্যাত্মিকতা এবং হিন্দুর পরকালবাদ অলৌকিক
ধারণা মতো ছিল না—হাওয়ায় হাওয়ায়
মুখিয়া বেড়াইত না। পরন্তু সমসারের
কার্য-কলাপসমূহই ধর্মতাবের দ্বারা অহরহিত
হইত, ভোগের অহুতানগুলিই আধ্যাত্মিকতার
প্রতিষ্ঠিত হইত, সমাজের সর্ববিধ প্রতিষ্ঠানই
বৈরাগ্যের দ্বারা অহুতানপ্রাপ্ত হইত।

ইহার ফলে হিন্দুর—ভাবুকতা—হিন্দুর
সম্যাসে, ব্রহ্মচর্যে, গার্হস্থ্যে, রাষ্ট্রে, শিল্পে,
পল্লীজীবনে, সকলের অভ্যন্তরেই স্বকীয়
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কার্যত: সকল
ক্ষেত্রে সম্যাস ও সমসারের সমন্বয়, তাগ ও
ভোগের সামঞ্জস্য বিধান, অতীশ্রিয় ও
ইশ্রিয়ের সম্মিলন, ইহাই হিন্দুর সনাতন
সাধনা। তাই হিন্দুর আদর্শ কবি কালিদাস
হিন্দুর আদর্শ গৃহস্থ-রপতির জীবন চিত্রিত
করিয়াছেন:—

জগোপস্থান মজতো ভেজ ধর্মমাতুর:।
অপুংরাগে সোহর্মসকল: স্তম্ভমহত্বং।
তিনি আত্মরক্ষা করিতেন, কিন্তু ভয়ের জন্য
নয়; তিনি ধর্মের নিয়ম পালন করিতেন—
কিন্তু অহুতানের বশে নয়। তিনি দন গ্রহণ
করিতেন—কিন্তু লোভের প্রভাবে নয়।
তিনি স্বথ ভোগ করিতেন—কিন্তু আসক্তির
জন্য নয়।

হৃতরাং হিন্দুর সনাতন আদর্শ—

আত্মরক্ষা, ধর্মের নিয়ম পালন ও স্বথভোগ—
সকলেই ইহা নিশ্চিত স্থান আছে। এই সকল
জাগতিক, সামাজিক ও বৈষয়িক কাণ্ডাবলী
হিন্দুর বিচারে গণিত ও নিন্দনীয় নহে।

রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতা

কবি রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু ভাবুকতার প্রতি-
মূর্তি বলিয়াছি—কিন্তু তাহার কাব্যনাট্যসাম-
গ্র্যের মধ্যে হিন্দু সমাজের পরিপূর্ণ আত্ম-
বাদের, হিন্দুর সনাতন সৌন্দর্য্যবোধের, উভয়-
পক্ষবিশিষ্ট ভাবুকতার পরিচয় পাইব কি?
আমাদের বিশ্বাস—কবি রবীন্দ্রনাথ
আমাদিগকে কালিদাস-বিবেকানন্দের দ্বারা
প্রকৃত হিন্দুর আকাঙ্ক্ষা ও আশা দিয়াছেন,
আমাদিগের হৃদয়ে অনাম্যস্ত অস্বীয়ে
প্রীতি আগাইয়াছেন, উৎকট-বৈরাগ্যের শিক্ষা
দিয়াছেন, ভবিষ্যতে জনস্ত বিশ্বাস রাখিতে
উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কিছু গড়েন
নাই। তাহার প্রতিভার সীমা এইখানে।

হিন্দু যেমন গড়িত তিনি তেমনি কিছু গড়েন
নাই। তাহার কাব্যে আমরা জীবনের আদর্শ
পাইয়াছি—কিন্তু বিরাট জগৎ গড়িয়া তুলিব
—কিন্তু সামান্য গড়িয়া তুলিব—কোন
সমসারের বাস করিব—সাধারণ গৃহস্থালীর মধ্যে
ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা, অতীশ্রিয়তা কি
উপায়ে কতখানি প্রবেশ করিবে, সেই রাষ্ট্র-
সামাজ্য-পরিবারের সকল অঙ্গের পরস্পর সম্বন্ধ
কিন্তু থাকিবে—সে সব কারিগরী তিনি
শিখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।
তাঁহার 'গোরা'-'প্রেমীসমাজ'-'প্রকৃতির প্রকৃতি-
শোভা' বিশেষতাবাদী সেই সমীপে অসীম,
গার্হস্থ্য সম্যাস, ভোগে তাগের সমস্যার দ্বারা
দেখিতে পাই না।

তাঁহার 'নদী' সাগরে যাইয়া অনন্ত স্বথ
পাইয়াছে জানি। কিন্তু নদীর উৎপত্তিস্থান

সম্বন্ধে 'শিশু'র যে curiosity, যে ব্যাকুল
প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন আমরা আমাদের ভারতীয়
জীবন-গদ্যার অনভিদুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে
জিজ্ঞাসা করিতেছি।

বিশেষতাবাদীর ভারতীয় "মহা মিলনের"
সেই সাগর সম্মুখের পরিপূর্ণ চিত্র তিনি
আঁকিতে পারেন নাই। যাহা আঁকিছেন
তাহা তাঁহারই প্রচারিত আশা-বিশ্বাস-
আমাদের অহরহ হয় নাই।

হোমার একটা জগৎ গড়িয়াছিলেন—
সকলকাল ইউরিপিডিস গড়িতে জানিতেন—
দাণ্ডে গড়িয়াছিলেন—সেক্সপিয়র, মিল্টন
গড়িয়াছিলেন। ইউরোপের শেষ কারিগর
জর্জ ইলিয়ট, টেনিসন ও গটে।

ইহার উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ
গড়িয়াছেন—evolution-বাদের যুগ গড়িয়া-
ছেন—জড়বিজ্ঞানের যুগ গড়িয়াছেন—
কণ-বিজ্ঞানের যুগ গড়িয়াছেন। ১৯১৩ সাল
পর্যন্ত এই যুগ চলিয়াছে—এখনও আর
কিছু কাল টেনিসন-গটে-ইলিয়টের বিজ্ঞান-
কণ-রাষ্ট্র-অভিব্যক্তিবাদ যুগে পাক্তা
জগৎ চলিবে। নূতন গড়া এখনও ওদিকে
চলিতেছে। কালহিলের প্রভাব স্বাধী হয়
নাই—রাউন্ডিও ও ভাগিয়া যাইতেছেন।
পাক্তা জগতে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের
প্রভাব ও ভাগিয়া যাইবে। নবীন ইউরোপ-
গঠনের এখনও দেবী আছে। ভাবুকতা
mysticism, আধ্যাত্মিকতা উৎসাহের সমাজের
মজ্জায় ঢুকিতে দেবী লাগিবে। বীণ হইতে
আজ ২০০০ বৎসর হইয়া গেল—এখনও
ইউরোপ যথার্থ ভাবুক হইতে শিখিল না!

রবীন্দ্রনাথ গড়িতে পারেন নাই। তিনি
হিন্দুর আদর্শ দিয়াছেন—বিশেষতাবাদীর

ভারতীয় জন সাধারণের যুগে আশা আশ
ভাষা দিয়াছেন। আমরা উড়িতে
শিখিয়াছি—কিন্তু এখনও আশ্বিনা খুঁজিয়া
পাই নাই। রবীন্দ্রনাথ একটা বিশেষতাবাদীর
হিন্দু জগৎ গড়িতে পারেন নাই। এই
থাকেই তাঁহার প্রতিভার সীমা।

কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জগৎ গড়িতে
পারেন নাই—বিশেষতাবাদীর "রত্নবংশ" তিনি
রচনা করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানবাদের
যুগে কালিদাস হিন্দু সমাজের পূর্ণ প্রতিবিম্ব
কালিদাসের কাব্যে চতুর্থ শতাব্দীর পরিপূর্ণ
হিন্দুর দেখিতে পাইব। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক
হিন্দুর এক অর্ধ—প্রথম অর্ধ—আশার অর্ধ—
"ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা
"আলোকে"—সেই অর্ধ;—"আমিবে সোদন
জানিবে"—সেই অর্ধ। অপর অর্ধ কে পূরণ
করিবে? বিংশ শতাব্দীর হিন্দু মহাকাব্য
কোন কবির গঠন করিবেন?—এ কাব্য যে
সমগ্র জগতেরই মহাকাব্য হইবে।

বোধ হয় গড়িবার সময় আসে নাই।
বোধ হয় কৃষ্ণচরিত্র-মেঘনাদ-বৃদ্ধমহাশয় চন্দ্রগুপ্ত-
দুর্গাদাস-কৃষ্ণদেবপ্রভাস-দেবভক্ত তাহার
স্মৃতি হইতেছিল। বোধ হয় সময় এখনও
আসে নাই—বলিয়া সেই মালমশলাগুলি
রবীন্দ্রনাথ ছড়াইয়া পড়িয়া ইহার টুকরায়
পরিণত হইল। রবী-বিজ্ঞান-মাইকেল-হেম-
নবীন-বর্কিম-কুবেরের যোগে উত্তরাধিকারী কে
হইবে? বিংশ শতাব্দীর বৈরাগ্য-বিজ্ঞানবাদের
পূর্ণ-কালিদাসকে কে আমাদের মাথায় করিয়া
নাচিবে?

যে শক্তি লইয়া কালিদাস জন্মিয়াছিলেন,
সেই শক্তি লইয়াই রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছেন।
নিজ মানস-স্বন্দরীর প্রতি কালিদাসের যে
ভক্তি ছিল—তাঁহার জীবনদেতার প্রতি,

রাজ্যরাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ও ঠিক সেই ভক্তি রহিয়াছে। কালিদাসে ও রবীন্দ্রনাথে চিন্তার হিমায়ে আদর্শের হিমায়ে তফাৎ করিতে পারিবে না। কালিদাস ভারতবর্ষকে, হিন্দুকে বেঙ্গল বুঝিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও ঠিক সেই •রূপই বুঝিয়াছেন। দুইজনই সময়ে সময়ে মনোমতে সমান ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন, Positive যুক্ত Mysticisimকে, বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতাকে একই প্রাণালিতে ধরিতে পারিয়াছেন। 'রঘুবংশে'র মূলমন্তরে কিছু পরিচয় পূর্ণে বিদ্যা। এমন দেখ সেই মূলমন্ত্র রবীন্দ্রনাথে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে :—

"হে ভারত, বৃগতির শিখায়েছ তুমি
তাজিতে মুকুট ও, সিংহাসন, তুমি
ধরিতে দরিত্রবেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
তুলি জয় পরাজয় শর সংহারিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিত্তে
সর্ব কর্মসুখা অন্ধে দিতে উপহার।
গুরীরে শিখালে গৃহ করিতে বিতার
প্রতিবেশী আশ্রয়বন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংসারের শাখে,
নিখল বৈরাগ্যে বৈত করেছ উজ্জল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ বার্ধ্য তাজি সর্ব দুখে হুখে
সংসার রাখিতে নিত্য অন্ধের সন্ধুখে!"

এই তবেরই কীরটুপ, এই উভয় পক্ষবিশিষ্ট ভাবুকের মারামারি স্বার্থক পার্শ্বিক ভাবায় প্রকাশ পাইয়াছে—"খুপ আপনাদের মিলাইতে চায় নরক"—সেই কবিতায়।

"তাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

অসীম সে চাহে, সীমার নিবিড় সঙ্গ—
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

ইহা ইয়াদি নমঃ—ব্রহ্মকন্ড নমঃ—দুর্গোথা অলৌকিক অশ্রুত নমঃ। ইহা 'রঘুবংশে'র বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতা—হিন্দুর ঐতিহ্যবোধী mysticism—হিন্দুর জাতিভেদ ও বৈদান্তিক সাম্য, স্মৃতিপুত্রা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। "ভাগ্যায় সম্ভার্যনাং" শ্লোকটা আর একবার ধ্যান কর।

এই তবকে রঘুবংশের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা মনে, করিও, এবং "বন্দোমাতরং" মন্ত্রের বিস্তৃত ভাষ্য রূপে গ্রহণ করিও।

রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসে উনির্বাশ করিও না। কালিদাস একটা হিন্দুর সম্পূর্ণ সংসার—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের সংসার গড়িয়া ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাহা গড়েন নাই। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মূলমন্ত্র-বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সমাজ-জীবন গড়েন নাই। এই প্রভেদ। যদি আর কোনো প্রভেদ দেখিয়া থাক—তাহা হইলে সেইটুকু চতুর্থ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীর প্রভেদ, এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কাব্যায় এবং বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের কাব্যায় প্রভেদ। যদি তাহার উপর আর কিছু প্রভেদ দেখ—তবে বলিবে—তুমি কালিদাসকে তবুই নাই—রবীন্দ্রনাথকে ও বুঝিলে না। দেখ যে ভারতবর্ষকে তুমি কোন্ দিনই বুঝিবেনা। হৃদ্যাগ্য আমরা!

শেষ কথা

এখন আমরা কাব্যমোদী পাঠকগণকে একটি কথা বলিয়া বিদায় হইব। কাব্যের সমালোচনা, সাহিত্যের রসবোধ ইত্যাদির অর্থ কোনো লেখক বা কোনো ব্যক্তি বিশেষকে নিম্না বা প্রশংসা বা কটাক্ষ নাহি। হৃদ্যায় সেই ব্যক্তি বিশেষের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন

তথ্য জানা নাই—এইভাবে সাহিত্য-সমালোচনার অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। আজ কালিদাস অমরবে চণ্ডীদাস কামীরামকে ভাবুক-বাসীয়া যে নিরপেক্ষ চোখে দেখিতেছেন, সেই চোখেই বঙ্কিম-মাইকেল-হেম-মুনী-বিজ্ঞান-লাল-রবীন্দ্রনাথকেও সেইরূপ সমালোচনার রক্ত ভাবেই দেখিতে হইবে। ইহাদের জীবন-বৃত্তান্তের যেটুকু ঐতিহাসিক তথ্য আমরা জানি সেইগুলির সাহায্য লইয়া তাঁহাদের রচনা মাত্র বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহাদের মহাযন্ত্রের, মতামতের, দোষগণের, চরিত্রবৃত্তার বিচার হইতে যে শব্দ কথা উঠিবে তাহা অজ্ঞাত কারণে অভিপ্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা হিসাবে অবাস্তব।

কিছুকাল হইতে পশ্চিমদেশে 'Art for Art's sake'-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠান করিতেছে। তাঁহারা বিবেচনা করেন—কাব্য, সাহিত্য, প্রভেদ, কাব্য, চিত্র, শিল্প ইত্যাদির দ্বারা ধর্মের উন্নতি হইতেছে কি 'অবনতি' হইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই, সমাজের চরিত্র গঠিত হইতেছে কি অংশগঠিত হইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। বই পড়িতেছ পড়, ছবি দেখিতেছ দেখ—এবং বেশী তলাইয়া দেখিও না—সমাজের উপর ইহাদের কি প্রভাব তাহা আলোচনা করিও না।

আমরা এ মতের পক্ষপাতী নহি—আমরা সমালোচনা-বিজ্ঞানের যে স্বয়ং প্রচার করিলাম তাহাকে ইংরাজী বুকনিত বলা যাইতে পারে—'Art, not artist' অথবা 'Principle, not person'। অর্থাৎ বুদ্ধি, সাহিত্যকে, মতবাদের, ভাবগুরুকে, চিত্রকে গভীরতম ভাবে বুঝ—তলাইয়া মগাইয়া বোঝ—

ইহাদের ভিতরকার কথা টানিয়া বাহির কর—সমাজের উপর, দেশের উপর, ধর্মের উপর এইগুলির প্রভাব ভাল কি মন্দ তাহা অবশ্যই 'বাচাইয়া', খুব কঠিন কঠিণাথের কথিয়া দেখ। কিন্তু যে লোক ছবি আঁকিয়াছেন, যে গুণী কবিতা লিখিয়াছেন, যে সাহিত্যসেবী সাহিত্যসৃষ্টি করিতেছেন তাহার ব্যক্তিগত, জীবনযাপন ইত্যাদি জানিবার জন্ত বেশী উদ্গ্রীব হইও না।

সাহিত্যসেবী সখ্যে আমাদের এই মত—কিন্তু ধর্মবীর, কর্মবীর, জননায়ক প্রভৃতি সখ্যে আমাদের মত স্বতন্ত্র। তাহা আগে বলি।

আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা করিলাম না। করিবিহায়ে রবীন্দ্রনাথকে চিনিতে চেষ্টা করিলাম। প্রকৃত সমালোচনা করিতে হইলে দেশের কথা, দেশের কথা, সমাজের কথা, আমাদের পূর্বপুরুষগণের কথা, আমাদের ভবিষ্যতের কথা, কবির সাহিত্য-জীবনের উপাধানের কথা, রবীন্দ্রকব্যের ক্রমবিকাশের কথা ইত্যাদি জগতের সকলপ্রকার ভাব ও কর্মশক্তি পরিচয় দিতে হইত। সেই শক্তিপুঞ্জের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবির কোথায় এবং মহাযন্ত্র কোথায় স্ফা জন্মগত করিতে হইত। কিন্তু সেপক্ষ ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও তুলনা-মূলক সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। এমন কি বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-দুঃস্বপ্ন-নবীনগর ও এরূপ প্রাণ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সমালোচনার সময় আসে নাই। কাজেই এখন আমরা রবিরবির সাহিত্যজীবনের কয়েকটা মোটা কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

কবিবিহায়ে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত ভক্ত, কবিবিহায়ে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত শাক্ত, কবি

হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত প্রেমিক।
কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের স্রাব
অসীমেরও জ্বলনম্বর উপাসক। কবি
হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের স্রাব স্বদেশ-
ভক্ত-সর্বস্বাগ্রী শব্দের পূর্ণপ্রবর্তক।
কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবের প্রতিমূর্তি—
প্রকৃতি-বাক্যের প্রজ্ঞা—পঞ্জীরাগীর ভূত্যা—
ব্যবীণতার চারণ।

আর যদি ভারতবর্ষ কখনও বিক্রমদিন্তোর
গৌরবপূর্ণ ছাপাইয়া উঠিবে জগতের কর্ণক্ষেত্রে
মারা তুলিতে পারেন—সেই দিনকার ভাষ্য-
বাসী ভারতবর্ষকে কালিদাসের জন্মভূমি
অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি বিবেচনা
করিয়া গৌরব করিবেন,—সেদিন যদি না
আসে—তাঁহা হইলেও কালিদাসও রবীন্দ্র-
নাথকে একই সিংহাসনে বসাইয়া তুলিয়া আনন্দ
উপভোগ করিবেন। আমাদের জাতীয়
জীবন ভবিষ্যতে যেরূপ পাড়াইবে তাহার
উপরই কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের তুলনাও
আসন-বিভাগ নির্ভর করিতেছে।

লেখক যতক্ষণ মরজগতে জীবিত থাকেন
ততক্ষণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের অচ্ছাদিত দৃষ্টি
তাঁহার সাহিত্যসেবার উর পাঠকগণের
একটা স্মৃতি বা অস্মৃতি না আনিয়া যায় না।
ততক্ষণ, 'Art, not artist'—কবির কাগ
দেখ, ব্যক্তিত্ব দেখিও না—এই তত্ত্ব স্থপ্রচলিত
হওয়া কঠিন। লেখকের পক্ষেও সেই
ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া রাখিয়া জনসাধারণের
মতামত আকৃষ্ট করা অসম্ভব। সেই অস্বাভাব
বধি কবিই ক্রটি স্বীকার করিয়া বলিতে
রাখা মনঃ—

দুর্দল মোরা কত দুল করি,
অপূর্ণ সব কাহা।

নেকারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাগ।

তা বলে' বা পারি তাও করিব না?
নিফল হব হেঁচকি?

'প্রেম ফুল কোটে, ছোট হ'ল বলে'
দিবনা কি তাগা সবে?

কিন্তু ব্যক্তিত্ব মাহুষের চিরকাল থাকে
না—ব্যক্তিত্বের প্রভাব জনসমাজ হইতে
জীবনলীলার সঙ্গে সর্বেই বিলীন হইয়া যায়—
“ভূমিও রবে না আমিও র'ব না
ছদ্মদের দেখা ভবে।”

মাহুষ যখন লোকের দৃষ্টি মাঝে পর্দাবসিত
হয়,—কবি যখন লাজ-শ্রুতির সঙ্গার এবং
কর্তৃত্বাকঙ্কময় নথর জগতের অতীত
হন, যখন তিনি মাহুষের হিংসা-শেখ-স্মৃতি-
সৌহার্দ্যের দান শরীর ভাবে একে বসিতে
অসমর্থ, যখন, বলাবাহুল্য, এ সম্বন্ধে বোধ
করিবার ক্ষেত্র থাকেন না—কর্তৃত্বাভিমান
লইয়া কাহাকেও বিব্রত হইতে হয় না।
নিম্না প্রশংসার প্রভাবে কাহাকেও চিত্ত-
বিকারের উদ্ভব হয় না। সেই সময়ে
সমাজের ভবিষ্য সন্তানগণ 'Art, not
artist'-তত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে গ্রহণিতে পারে,—
দেশবাসীরা কোন সাময়িক উত্তেজনার প্রভাব
অতিক্রম করিয়া বিশ্বাস করিতে পারে—

“কত প্রাণ পণ, দক্ষ দ্বন্দ্ব,

বিরিঞ্চি বিভাবরী,

জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত

বত বাখা বেদ করি?

রাধা ফুল হ'য়ে উঠিছে ফুটিয়া

হৃদয়-শোণিতপাত,

অশ্রু কলিছে শিশিরের মত

পোহাইয়ে দুখরাতঃ

জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল

সে সাধ ফুটেছে গানে।”

রবীন্দ্রনাথের কাব্য যখন সেই
সমালোচনা-বিজ্ঞানের যুগে আদিয়া উপস্থিত
হইবে—তখন ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সমা-
লোচকগণ ভারতবর্ষের উনবিংশ ও বিশ
শতাব্দীর ধর্মবীর, কর্মবীর, বিজ্ঞানবীর ও

সাহিত্যবীর দিগের পরস্পর-সম্বন্ধ ও পরস্পর-
প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া নব্যভারত-গঠনে
প্রত্যেকের কৃতিত্ব রিচার করিবেন, দেশের
ও জগতের ভাবুকগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের
প্রকৃত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, এবং
স্বীকার করিবেন, যে রবীন্দ্রনাথ নিজ স্বাধা
সমালোচনা নিজ যেরূপ করিয়াছেন তাহা
বর্ধে বর্ধে সত্য।

“কোন ফুল যাবে ছদ্মিবে ব্যরিয়া

কোন ফুল বেঁচে রবে।

কোন ছোট ফুল আজিকার কথা

কালিকার কানে কবে।

হয়ত এ ফুল হৃদয়ের নয়

ধরেছি সবার আগে,

চলিতে চলিতে আঁখির পলকে

ভুলে কারো ভাল লাগে।

যদি তুল হ'ল কদিনের তুল।”

ছদ্মিবে ভাবিবে তবে।”

সমসাময়িক সাহিত্যসেবীগণ, সেই ভবিষ্যৎ
ভারত-সমাজের সমালোচনায় সেই, 'Art,
not artist'-তত্ত্বের নিয়মাহুগারে রবীন্দ্র-
সাহিত্যের মূল্য কি হইবে তাহা যদি এখনই
কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা
হইলেই আপনাদের কাব্যরসজ্ঞতা সার্থক
হইল। সমসাময়িক স্বদেশবাদীগণ, আমাদের
বংশধররা হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাব্য-
সংস্করণ রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে যে সকল মন্ত্র
বেদবাক্যের তায় জপ করিবে, তাহা যদি এখন
হইতেই নিরপেক্ষ ভাবে আপনারা বাছিয়া
লইতে পারেন, তবেই আপনাদের অভিভাবকত্ব
সফল হইবে। সে শক্তি ও সে নিরপেক্ষতাবাদি
না থাকে তাহা হইলে বুঝা আমাদের সাহিত্য-
সাধনা, বুঝা আমাদের স্বদেশ-সেবা, বুঝা
আমাদের ভবিষ্যতের-জ্ঞাত দায়িত্ব বোধ।

কর্মবীর 'স্বঘোঁর' স্বদেশ-সেবা

(রাষ্ট্রতরঙ্গিণী অবলম্বনে)

কাশ্মীর-রাজ্য যে সময়ে অবাধবর্ণার
শাসনে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে দেশ-
মধ্যে জলপ্রাবন-নিবন্ধন বর্ধে বর্ধে দুর্ভিক্ষ
উপস্থিত হইতেছিল। সিদ্ধ ও বিত্তগুণ
জলরাশি উচ্ছৃঙ্খিত হইয়া উভয় ভীষণতী
ভূভাগ প্রাবিত করিতেছিল, সেই মহাব্যবিক
জলপ্রাবন-নিবন্ধন কাশ্মীর-দেশে ধাতের মূল্য
যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের
অকাল-মৃত্যুর কারণ-বন্ধন হইয়াছিল।
দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে একধারী ধান্যের মূল্য
তৎকালে দশশত পঞ্চাশ দীনার পর্যন্ত বৃদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জের হাফাকার-

ধনি কাশ্মীর-ভূখণ্ডকে নরকের দৃষ্টে পর্দা-
বসিত করিয়াছিল। সেই যোৱন্তর দিনে যে
স্বদেশ-প্রেমিক, ভাগবতী, সেবারত্রে দীক্ষিত
মহাপুরুষের কল্যাণে দুর্ভিক্ষকালেও একধারী
ধান্যের মূল্য হ্রস্বত দীনারের অধিক বৃদ্ধি
প্রাপ্ত হয় নাই, আমি সেই মহাপুরুষের
জীবনীর কথিৎ পঠিয়া প্রদান করিয়া
পূণ্য অর্জন করিব বলিয়াই এই স্বল্প অর্থ
মৎ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর
হইলাম।

মার্গমাঝীনকারিণী স্রায়া-নারী চণ্ডালীর
পালকপুত্র, চণ্ডালিনী-শুন্যপানকারী চণ্ডাল-

জাতিসদৃশ নীচজাতীয় মহাশ্চার্য নাম-
জগতে স্বর্গবাসী দেবতাগণের যশ মলিন
করিয়া রাখিচ্ছে। যদিও কবিগণ সেই মহা-
পুরুষকে চণ্ডালিনী-স্পর্শজনিত অপবিত্রতার
হস্ত হইতে রক্ষা করিবার মানদে শূদ্ৰ-
জাতীয়া রমণীর স্তন্যপানে পরিবন্ধিত করিবার
প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সেই মহাপুরুষ
চণ্ডালসমূহকেই জননীর ন্যায় ভক্তিপূর্বক
চণ্ডালিনী হুয়া-মাতার নামে নিজে নাম
'হুয়া' রাখিয়া এবং চণ্ডালিনী মাতার
সেহের অরণ-চিহ্নার্থ মহাশূভবতার পরিচয়-
প্রদানে আদৌ স্ক্রান্ত হন নাই। নীচ
চণ্ডাল যে জগতের হয়ে জীব নহে,
এক হুয়াই তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।
সেবা ও ত্যাগ-বলে বলীয়ান চণ্ডালও যে
দেবশ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা কাম্বীরের ইতিহাস-
পাঠে অবগত হই; এই কারণেই হয়ত মহাশ্য
শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডাল-মিত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ
করিয়া থাকিবেন! চণ্ডাল হয়ে নহে—
যে হ্রদয়ে ত্যাগ ও সেবার উজ্জল স্রোতি
প্রতিভা হইয়া, তাহা দেবজাতিকও মলিন
করিতে সমর্থ, ইহা আমাদের মনে রাখিতে
হইবে। কর্ণই মানবের জাতীয়ত্ব বিজ্ঞাপিত
করিয়া থাকে। বৃথা জাত্যভিমান প্রকৃত
উচ্চ আদর্শ প্রদানে সক্ষম হয় না। জাত্য-
ভিমান প্রকৃত জাতীয়ত্বের পরিচায়কও নহে।
—চণ্ডালিনী-পুত্র, শূদ্ৰাঙ্গী-পালিত হুয়া বান্য-
কালে উন্নত শিক্ষালাভ করিতে সক্ষম
হইল। যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া
তিনি এক যুগ্মের পুত্রগণের শিক্ষক-কর্তব্য
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে
চণ্ডালিনী-হুয়া-পুত্র অথবা শূদ্ৰাঙ্গীপালিত
বলিয়াই অবগত ছিলেন। আত্মসম্মানরূপ
ব্রতসানাদি নিয়ম-পালনে তিনি কিছুমাত্র

পশাৎপদ হন নাই। পরোপকার, পরসেবা,
আত্মত্যাগ দ্বারা তিনি যুগ্মসেবায় মন, প্রাণ
ও দেহ অর্পণ করিয়া কাম্বীরবাসী পণ্ডিত-
গণের একান্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। ক্রমে
ক্রমে তাঁহার স্বদেশ-ভক্তি ও স্বদেশাভিমাগ
বৃদ্ধি হইলে হুয়ার নাম প্রকৃতিপুঞ্জের অতি-
মধুর হইয়া উঠিল। কাম্বীর হুয়ার বৃদ্ধি-
মত্তার কথা রাজসভায় উপস্থিত হইল এবং
পণ্ডিতগণের সহায়তায় হুয়া কাম্বীররাজ-
সভায় স্থানপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বৃদ্ধির
প্রবর্তার, আত্মসম্মান ও স্বদেশ-ভক্তি সভা
পণ্ডিতগণকে এতাদৃশ মোহিত করিয়াছিল
যে, সভামধ্যে পণ্ডিতগণ হুয়াকে যেমন করিয়া
তাঁহার সুশ্রীকৃত জ্ঞানগর্ভবাক্য শ্রবণ করিতে
আরম্ভ করিলেন।

০ হুয়া কাম্বীর-জনপদ ভ্রমণপূর্বক কাম্বীরের
ভৌগোলিক অবস্থা এবং প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা
পর্যালোচনা দ্বারা স্বদেশসম্বন্ধে বিপুল
জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। প্রতি পল্লী, ব্রহ্ম,
নদ, নদী, ও কৃষিক্ষেত্রাদি পর্যবেক্ষণ দ্বারা
তাঁহার জ্ঞানদর্শনজনিত যথেষ্ট জ্ঞান লাভ
হইয়াছিল। যদিও ইতিহাস-লেখকগণ
তাঁহার এই নীরব সাধনার কথা উল্লেখ করেন
নাই, তজ্জাত তাঁহার কাব্যাবলীর উপাস্পর্শ-
শুদ্ধলা দৃষ্টে তাঁহার কাম্বীর সম্বন্ধে যে
বহুধর্মের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা
স্বপ্নমুগ্ধগণের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই
বোধ হয়।

দৈবযোগে একদা মহারাজ অস্বস্তিবশ্য
সভায় দেশের দুঃস্থাবস্থায় যথেষ্ট অশ্রু
আলোচিত হইতে হইতে স্থির হইল—জল-
প্রানবই এই দেশের দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। জল-
প্রান নিবারণ দ্বারা কাম্বীর-ভূমি শতশতাব্দী
করিবার উদ্যোগ চিত্তনকালে হুয়া বলিলেন—

"আমি জলপ্রাননিবারণের উপায় অবগত
আছি, কিন্তু আমি দরিদ্র অর্থহীন—অর্থহীনের
দ্বারা এ কার্য অসম্ভব হইবার নহে।" সভাগণ
হুয়াকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিল, কিন্তু
হুয়া প্রতিদিন বাত্থার এই মহৎবাক্য
উচ্চারণ করিয়া সভাগণের নিকট উপহাস্যাস্পদ
হইয়াও—বাতুল বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াও—
বিরত হইলেন না।

কাম্বীর হুয়া মহারাজের চিত্তাকর্ষণের
জটাই প্রতিদিন সভাস্থলে উক্ত বাক্য প্রয়োগ
করিতেন। একনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত সাধকের বাক্য
ভ্রমণ-প্রাপ্ত মহারাজের কর্ণাগোচর হইলে,
মহারাজ হুয়াকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

"তুমি জলপ্রান সম্বন্ধে কি বলিতেছ?" হুয়া
জীবনের একমাত্র সাধনায় ভাবী সিদ্ধির
আশায় দৃঢ়নিশ্চিত ছিলেন। তিনি বলিলেন
"মহারাজ! আমি জলপ্রান নিবারণের উপায়
অবগত আছি—কিন্তু কপর্দকশূন্য দরিদ্রের
কার্য নহে বলিয়া সকলসার হইতে গুরিতহে
না।" সভাগণ হুয়া বাতুল হইয়াছে বলিয়া
মহারাজকে নিবেদন করিলেও অবজ্ঞাবশত
হুয়াকে অত্যন্ত দানপূর্বক তাঁহার বৃদ্ধি-
পরীক্ষার জন্ত বলিলেন, "আমার ধনাগার
তোমার জন্ত উন্মুক্ত রাখিল—তুমি যথা ইচ্ছা
ব্যয় করিতে পার।" মহারাজের ধনরক্ষক
হুয়াকে ধনাগার উন্মুক্ত করিয়া দিল—দরিদ্র
যুবক বহু স্বর্ণবদীনারপূর্ণ ভাও প্রাপ্ত হইয়া
গর্ভিত হইলেন না—যৌব স্বর্ণভাণ্ডায়েই জটও
কপর্দক গ্রহণ করিলেন না—নির্দোষী পর-
সেবারত কর্মী ত্যাগের পথে আপনাকে
পরিত্যাগিত করিলেন। পূর্ব হইতেই জল-
প্রানের মূল কারণ নিরূপণভাবে উপলব্ধি
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি
স্বর্ণবদীনারপূর্ণ ভাও সহ নৌকাযোগে

বিত্ততাননী-বন্ধে মড়ব রাজ্যান্তর্গত জলময়
নন্দক-নামক গ্রাম-সীমায় একান্তে এক ভাও
দীনার দুর্ভিক্ষরিত্তি জনগণের জ্ঞাতদারে জল-
মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর ক্রমবাহুর
অন্তর্গত যক্ষার-নামক স্থানের বহুধর্মব্যাপী
প্রত্যক্ষ-ও-সমালীক স্বরূপতয়া নদীগর্ভে আরও
দীনার-ভাও নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর
হইলেন। এই উভয়স্থানের নদীগর্ভে বিস্তৃত-
হইলেই তৎপরে প্রত্যক্ষও পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।
নদীগর্ভ-প্রস্তরবাসী পূর্ণ হওয়া নিবন্ধন তথায়
বিত্ততার জলরাশি তীরভূমি প্রাণিত করিয়া
নিরদেশে প্রবাহিত হইতেছিল। সভাগণ
হুয়ার এই অসম্ভব কার্যের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম
করিতে অসমর্থ হইয়া বাতুলতার পরিচায়ক
বলিয়া মহারাজের শ্রবণগোচর করিল।
পূর্ণিত হুয়ার এবং বিধি কার্যের শেষ ফল
দর্শনাগার সভাগণের বাক্য উপেক্ষা করণাস্থর
মৈথ্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

দুর্ভিক্ষ-প্রাপ্তিত অর্থহীনতা প্রকৃতিপুঞ্জ
পিপীলিকার তায় শ্রেণীবদ্ধভাবে স্বর্ণবদীনার
লাভাশায় সেই উভয় স্থানের নদীগর্ভে পণ্ডিত
হুয়াকে অত্যন্ত দানপূর্বক তাঁহার বৃদ্ধি-
পরীক্ষার করিয়া হুয়ার অস্বাভেদে বন্ধ-
পরিকর হইল। দশ বৎসরে যে কার্য সমাধা
হইবার সম্ভাবনা ছিল না, মাসেকের মধ্যে
ততোধিক কার্য সম্পাদিত হইয়া গেল—
নদীগর্ভ প্রত্যক্ষও-মুক্ত হইল, নদীর জল
তীরদেশে ত্যাগ করিয়া আপনায় উন্মুক্ত গর্ভ-
পথেই প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া অস্বাভি
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীলাগুণ্ডে স্রোতবেগে বহুদূরে
অপসারিত করিয়া নদীগর্ভে স্থগীত করিয়া
দিল। জলময় নন্দক ও যক্ষার নামক বহু
গ্রাম উপরিত জলপ্রানের হস্ত হইতে রক্ষা
পাইয়া শতশতাব্দী হইয়া উঠিল। কাম্বীর

কর্মীর কর্মপথ সুপ্রশস্ত করিয়া দেয়। স্বহস্তের সাধনা সিদ্ধিপ্রথাবলী হইলে স্বয়ং নিমিত্ত উক্ত কর্মচিহ্ন দ্বারা বিপুল জ্ঞানের অবির্পত্তি হইয়া উঠিলেন—নিতা নুতন কর্মদ্বারা "স্বহস্তের" কর্মবুদ্ধি প্রদর্শন হইয়া উঠিল। একজন বিদ্যাহীন শূত্র বৃক্ষ অসামান্য স্থাপত্য-বিশারদের যশোলাভে সমর্থ হইলেন। কীষ্টি স্বীয়মুষ্টি পরিগ্রহ করিয়া চণ্ডালিনী-পুত্রের কণ্ঠে যশমালা পরাইয়া দিলেন। সভাগণ নীরব হইল, মহারাজ হর্ষমিত হইয়া কর্মবীরের পূজার আয়োজন করিলেন।

হুতিক-পীড়িত ব্যক্তিগণ স্বহস্তের নিকট প্রকৃত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া বদেশের জীবন-সাধনে যত্ববান হইল। দেখিতে দেখিতে বিস্তারিত বহু শাখার প্রসার-রুদ্ধ মুখ উন্মুক্ত হইয়া গেল—বিস্তারিত জলস্রোত প্রত্যেক শাখানদী-পথে প্রবাহিত হইয়া মূল স্রোতবেগ মন্দীভূত করিয়া দিল। স্বয়ং বুদ্ধিবলে সমবেত জনগণের সাহায্যে বিস্তারিত স্রোত এক স্থানে প্রস্তর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া উহার গভীর বহু স্থানের শিলাখণ্ড উত্তোলিত করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে স্রোত মুক্ত করিলেন। এই প্রকারে সিদ্ধুর গভীরতা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। বর্ষাপ্লাবনে এবং বত্যা-প্রবাহকালে যে যে স্থান ভগ্ন হইবার সম্ভব ছিল, সেই সেই স্থানে নব নব নদীগর্ভ বিনির্মিত হইল।

বিস্তারিত ও সিদ্ধুর সমগ্রস্থল পূর্বে বৈশ্ব-স্বামী মন্দির সন্নিকটে ছিল। বৃদ্ধিমান স্বয়ং দেশের হিতকল্পে সঙ্গমস্থল পরিবর্তিত করিয়া দিলেন। স্বদীর্ঘ সেতু নির্মাণ দ্বারা মহাপন্থ হ্রদের জলরাশি নিয়ন্ত্রিত করণাসত্ত্বের বিতীর্ণ করণোপযোগী ভূমির বৃদ্ধিসাধন করিয়া বত-পল্লী-স্থাপনের উপায় বিধান করিলেন। যে

সমুদায় নিম্ন স্থান বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকিত, তিনি তৎসংস্কার জন-নির্মাণ ও সেতু-সংস্থাপন দ্বারা তাহা কৃষিক্ষেত্রে পর্যাবসিত করিয়া জামলক্ষেত্রে শোভিত করিলেন। তিনি বহুশাখাবিশিষ্ট বহুফায়ামুক্তা কক্ষপর্শী-সদৃশী বিস্তারিত, সিদ্ধ, অশ্বনা, প্রকৃতি নদীগর্ভলিকে তাঁহার শাসনে আনয়ন করিয়া কাম্বীর-দেশের প্রতিনন্দর ও পল্লীসমূহে লহর খনন দ্বারা নদী-কুল প্রবাহিত করিয়া দিলেন; ইহার ফলে গ্রামবাসিগণকে আর বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হইল না। যখন যে গ্রামে "জলাভাব উপস্থিত" হইত বা কৃষিক্ষেত্রে জলের প্রয়োজন হইত, তখন লহরের সাহায্যে বিনাক্রমে কৃষিক্ষেত্রে জলপূর্ণ হইয়া যাইত। এই প্রকার বদেশ-সেবার "তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া তিনি কাম্বীরবাসীর অতি প্রিয় হইত।

স্বহস্তের ত্যাগ ও সেবা-বলে কাম্বীর ধন্যত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিল। হুতিক দেশত্যাগ করিয়া চির-বিদায় গ্রহণ করিল, স্বভিক্ষ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। শত শত নুতন পল্লী শতক্ষেত্রেও মধ্যে শোভিত হইল। দেশ-বাসিগণ একধারী দাঙ ছত্রিশ দিনার মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইল।

যে স্থলে বিস্তারিত নদী মহাপন্থ হ্রদ হইতে বহির্গত হইতেছে, সেই স্থানের সন্নিকটে মনোহর নগর নির্মাণ করা হইলেন এবং চণ্ডালিনী-স্বয়ং-জননী নাম চিরশ্রমণী করিবার জ্ঞান স্বয়ানগর নামে অভিহিত করিলেন, এবং "স্বয়ং-জ্ঞান" নামক গ্রাম প্রতিষ্ঠা এবং স্বয়ং-জ্ঞান নামক হ্রদের সেতু নির্মাণ করিয়া চণ্ডালিনী মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। স্বয়ং-জ্ঞান গ্রামটি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন।

সমগ্র কাম্বীরবাসিগণ দেবতার নামের দ্বায় স্বহস্তের নাম ভক্তিপ্রণত স্বয়ং উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল। স্বয়ং কাম্বীর-বাসীর নিকট আপনাদের জন অগণা আপন হইলেন। রাজার অগ্রহণে দ্রবিত্য বিদূরিত হইলেও, তাঁহার অর্থ বদেশ-সেবার ব্যয়িত হইয়াছিল। কখন স্বয়ং স্বয়ং-বিলাসের জ্ঞান ব্যয়িত হয় নাই।

তিনি ধন, মান, সময়ে কাম্বীর মধ্যে প্রাধান্যভাজন করিয়াও চণ্ডালিনী মাতাকে তুলিয়া যান নাই। তাঁহার স্বয়ং গরীব বা অস্বাস্থ্যর উদ্বেগ হয় নাই। স্বাভাবিক বদেশ-জ্ঞান নিযুক্ত থাকিয়া অন্তিমো জননী জন্মভূমির সিংহ কোঁড়ে মহানিদ্রায় শান্তিভাজন করিয়াছেন। কাম্বীরবাসী পণ্ডিতগণ অচ্যাপি কাম্বীর স্বহস্তের যশ ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহার বলেন—

"কক্ষণ অথবা বলভঙ্গ জনপদবাসীর যে উপকার করিতে পারেন নাই, স্বকর্ম স্বয়ং

অন্যায়সে সেই মহৎ কার্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। জলপ্লাবন হইতে ধর্মী দেবীর উদ্ধার, উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে পুণ্ডরীক-দান, জলরাশিতে প্রস্তরময় সেতুবন্ধন ও কালায়-নাগের ধনন এই সমুদায় কার্ম ভগবান বিষ্ণু চারি অবতারে সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কাম্বীর স্বয়ং ত্যাগ ও সেবাবলে একজন্মের মধ্যেই তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।"

ত্যাগ ও সেবাপরাগ কর্মবীর চণ্ডালিনী পুত্র স্বহস্তের এই পুণ্যময় উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করিলে বদেশভক্তিপ্রাণ জনগণের বদেশভক্তি হৃদুত হইবে, ত্যাগ ও সেবার জ্ঞান প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে এবং ঐহিক গোলাকী বদেশভক্তিপ্রাণের তাঁহার প্রকৃত বদেশভক্ত হইবেন। এবং অপর সাধারণ নরনারীর স্বয়ং ত্যাগ ও সেবার মধুরবাণী প্রতিষ্ট হইয়া স্বয়ং বদেশভক্তির বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দিবে।

শ্রীবনগুরীলাল দত্ত।

মফঃস্বলের বাণী

ধর্মের আন্দোলন আবশ্যিক

মানব-জন্মের প্রকৃত সার্থকতা দেখানে, মানবমণ্ডলীর প্রকৃত পৌরষ বাহা লইয়া, মানবদেহের উদ্দেশ্য ও পূর্ণ বিকাশ বাহার অংশীলনে ও একনিষ্ঠ সাধনে, এক কথায় বলিতে গেলে, একমাত্র বাহার উপরে সমগ্র মানবমণ্ডল সুপ্রতিষ্ঠিত, ঢাকার হিন্দুগণ সেই পরমবস্ত্র ধর্মের সহিতই পরিচিত হওয়ার স্বযোগ-সুবিধা পায় না। ঢাকায় এমন কোনও স্থান আছে কি, যেখানে হিন্দুমাছের জলাধারগণ সকাল-সন্ধ্যা সম্মিলিত হইয়া অধ্যয়নভাষালাভে ও শ্রীভগবানের নাম

কীর্তনাদি করিয়া অনন্ত জীবনপথে চিরোজ্জ্বল জ্যোতিঃ-রূপেই করিতে পারেন!

যে ধর্মের অমৃত-উপলব্ধিতে রিতাপ-ভাঙনার আশাশ্রয় থাকে না, যে ধর্ম শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিবাদ, অবসাদ প্রকৃতি বিভাঙিত করিয়া মানব-মনকে এক অপূর্ণ সজীবতায় উদ্ভূত করিয়া রাখে, সেই ধর্মের আলোচনা জাতিনির্কপেই চলিতে পারে, এমন একটুকু স্থান এই বিশাল মহরের বক্ষে বহু চেষ্টাতেও খুঁজিয়া পাইতেছি না।

ঢাকার হিন্দুসমাজে ত জনশ্রুত নহে, তবে আলিও এই সমাজে ধর্মচর্চার জ্ঞান একখানি

কুড়ে-ঘর-নিখাণের উজোগ দেখিতেছি না কেন?

যে স্থানে ও যে সমাজে বহু ক্রুরেরকল্প ধনী বিরাগ করিতেছেন, সেই স্থানে সেই সমাজে অর্থের অভাবে এই বাল্হিত ব্যাপারে ব্যাখ্যাত উপস্থিত করিতেছে বলিয়া ত মনে হয় না।

বহু ধনবান্ হিন্দুর বাসস্থি ঢাকা-নগরীতে হিন্দুসামারণের প্রবেশযোগ্য ধর্মসভা ও ধর্মভবন নাই, ইহা প্রকৃত পক্ষেই অতীব লজ্জার কথা।

মওলী-গঠনের একটা মাহাত্ম্য আছে, আলোচনা-আন্দোলনের একটা ফল আছে। ঢাকায় ধর্মচর্চার একটা স্থান নির্ধারিত হইলে মওলী গঠন করিয়া যথারীতি শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম-ব্যাখ্যা, ধর্মবিষয়ক বিবিধ জ্ঞাতব্য প্রস্তোত্র প্রভৃতি বহু অবশ্য-করণীয় কর্ম অঙ্গুষ্ঠিত হইতে পারিত। আলোচনায় অক্ষতা দূর হয়, আলোচিত বিষয়ের প্রতি অহুয়োগ জন্মে। এখন অনেক হিন্দুর গৃহেই পারিবারিক ধর্ম-শিক্ষা নাই, বিদ্যালয়ে প্রকৃত জ্ঞানের অহুয়ঙ্গানে কেহ বড় একটা যত্ন চেষ্টা করেন না, চারিপাশের সমার্গ ও এখন পার্থিব ভোগজ্ঞান-জড়িত, স্বতরাং হিন্দুসমাজের ধর্মভাব যেন দিন-দিনই মলিনতা প্রাপ্ত হইতেছে। জীবন-প্রভাতে যাহার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটিল না, স্বতরাং মৌলন-মহাত্ম্যে ও তাহার অহুয়ঙ্গানে কোনও প্রকার আগ্রহ উৎসাহ জন্মিল না। এই রূপেই কিন্তু আমরা এখন জীবন-সন্ধ্যায় বা বার্দ্ধক্যের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। শক্তিহীন জীবনে বা নিশার আঁধারে অহুতাপ ছাড়া আর কিরবার কি থাকে?

ভারতবর্ষ স্বথময় শান্তিনিকেতন ছিল কেন? প্রাচীন ভারতবাসী বা আধ্যাত্ম পার্থিব একান্ত নম্র উন্নতিকে যুগায় পদশ্লিত করিয়া পরাংমুখ 'মহতে মহীয়ানকে' পাওয়ার জন্ত সর্বশা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের শিক্ষার গুণে তখন পার্থিব স্বপ্নের ক্ষুণ্ণে বা হৃৎপের শীতনে কেহ হঠ বা ক্রিষ্ট হইতেন না। প্রাচীন ভারতে অস্কেই ইহলোক বিশ্বত হইয়া পরতালের জন্ত প্রস্তুত হইতেন, ইহার হৃদয়ের পৃথিবী-বাসকে অতিথিশালায় রাখি যাপন মনে করিতেন, কাজেই তাহাদের মনোমন্দিরে অস্থি, অশান্তি, পাপতাপ কিছুই প্রবেশ করিতে পারিত না। ধর্মশিক্ষা ও ধর্মভাবই এই দেশের প্রাচীন সামাজিকনির্মাণের সর্বদা সহচরীতেন প্রকৃত ও অজ্ঞাপণ হইতে নিবৃত্ত রাখিত। পারিবারিক ধর্ম-শিক্ষার প্রবল-প্রভাবে তখন বিবিধ অপকর্ম সমাজে থুব কমই অহুষ্ঠিত হইত। এখন আর সেদিন নাই, অতীতের পথে বিশ্বস্ত যুগের ভিমিরে আমাদের সেই অধ্যাত্ম যুগ মধ্যপ্রাণ কহিয়াছে। পারিবারিক ধর্ম-শিক্ষার অভাব হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মানসিক দুর্গতি দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পুণ্ডের মত ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজে প্রবর্তিত না হইলে আমাদের সামাজিক অস্থল-অশান্তি কিছুতেই দূরীকৃত হইবে না। এখনকার পরিবারে বৈযয়িক কর্মস্বহুয়োগ ধর্মপ্রবৃত্তির স্থান অধিকার করিতেছে। বর্তমান সমাজে বিদ্যাহুগীনের উদ্যম অর্থ-উপার্জন, ধর্মনীতির উন্নতি-সাধন নহে। প্রায় পরিবারের অভিভাবকই কেবল ছেলেরের পরীক্ষার ফল জানিবার জন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। সম্পূর্ণ

বৎসরে একমাত্র পরীক্ষার সংবাদ সংগ্রহ করিয়াই তাহারা 'অভিভাবকের দায়িত্বপূর্ণ কর্মব্য পালন করিলেন বলিয়া অহুত্রে ভূষিত লাভ করেন।' অভিভাবকগণ! একবার তুলিয়াও অহুয়ঙ্গান করেন না, ভবিষ্যতের ভরণা মেহভাগন সন্তানেরা কে কোন্ পথে চলিতেছে, কাহার সহিত মিশিতেছে, কি ভাবে, দিন অতিবাহিত করিতেছে! যদি শিক্ষা, শিষ্টব্যবস্থা প্রভৃতি ভবিষ্যদশী হইতেন, সন্তানবৎসরের প্রকৃত অহুয়ঙ্গানপ্রার্থী হইতেন, তবে তাহারা ছেলেরের শুধু পাঠশালায় উপস্থিত ও পরীক্ষায় কৃতকর্ম্যুপাতার অহুয়ঙ্গান লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না, নিশ্চয় উৎসবের আচার-ব্যবহার-সমর্গের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিতেন। সকল দিকে অভিভাবকগণের সতত অহুয়ঙ্গান ও শাসন থাকিলে অবিনয়-অশ্লীলতা প্রভৃতি আশাদের বালক-সমাজকে কখনই আংশিকভাবে গ্রাস করিতে পারিত না। সর্বোপরি ধর্ম-শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজ উচ্চ জ্ঞলতার উৎপাদনে বিঘ্নপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্র ইহার প্রতিকার চাই। আবার হিন্দুর গৃহে থুহে ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা বিহিত হউক। সকল অবস্থায় সকল শ্রেণীর সমবৃত্ত ভাবে ধর্মচর্চার সম্মিলনক্ষেত্রে শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হউক। নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তিত হইলে আবার আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইবে, ধর্মোন্নতিতে আমাদের মানসিক বল বৃদ্ধি পাইবে; চরিত্রে দৃঢ়তা, তাগে সত্যে প্রমাণভক্ত হইলেই আমরা যে কোনও মহৎকর্ম্য সম্পাদনের প্রকৃত অধিকারী হইব।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় হিন্দু ধনীদিগকে ছই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এত ধনবান্

শক্তিমান্ ব্যক্তি বর্তমান থাকিতেও এখানে হিন্দুগণের একটাও সাধারণ আলোচনা-গৃহ নাই, ইহা কি ঢাকার পক্ষে লজ্জার কথা নহে! ধনী নির্ধন বহু হিন্দুর লীলাক্ষেত্রে এই ঢাকা-নগরীতে শাস্ত্রমন্ডল একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কিম্বার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইলে চারিদিক অহুয়ঙ্গান দেখিতে হয়। অনেক সময়ে ঐ কারণে এই স্থানে হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপে বিপদ উপস্থিত হয়।

ঢাকায় হিন্দুধর্মের আলোচনা-ভবন সংস্থাপিত হইলে একট চতুষ্পাঠির প্রতিষ্ঠা আমাদেরই সম্পদ হইতে পারে। চতুষ্পাঠির দূর্শন স্মৃতি প্রভৃতির অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেই উপরিলিখিত অভাব-অহুবিধা বেশীদিন থাকিতে পারিবে না।

কেহ এই সমর্গীতানে উদ্যোগী হইলে সম্ভবতঃ সফলতায় উপনীত হইতে তাহাকে বেশী কিছু স্রেণভোগ করিতে হইবে না। কেবল উদ্যোগ্যতার আন্তরিক থুহ চেষ্টা চাই। আশা করি, আমরা শীঘ্রই ঢাকায় একটা পূর্ণাঙ্গ ধর্মভবনের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব, তাহার এই-অবাহনীয় অভাব শীঘ্রই দূরীকৃত হইবে।

বিশ্ববার্তা।

রামোৎসবে লোকশিক্ষা

প্রতি বর্ষে পূর্ণিমাগমনী ভক্তস্বদয়ে সেই হুদুর অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া সকলকে নির্দোষে শিক্ষা দিতেছে, "কান্তিহুত স জীবতি"। যুগযুগান্তর অতীতের বিরাট-ছায়ার পক্ষাতে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের সেই লোক-চক্ষুস্মলীনসমধারিত বন্দাবন-লীলা কেহই বিশ্বস্তিতে নিমগ্নত করিতে পারেন নাই। চমৎক্ষে এ লীলার দৃশ্য উপহাস্যাস্পদ বা অজ্ঞ কোনরূপ হইতে

পাবে, কিন্তু আধ্যাত্মিকনেত্র ইহা বড় মূঢ়, মুগ্ধ প্রীতিপ্রদ, ভগবদ্ভক্তির প্রস্রবণ। দার্শনিক বিচারে ইহার অভ্যন্তরে অতি মূঢ়ময় উপদেশ, শিক্ষা এবং ভাব নিহিত রহিয়াছে। অরুণ এ সমস্ত বিষয় আমার বিচার্য্য্য বাবর্ণনীয় না হইলেও মুখবর্ধে কথাটা উল্লেখ করা দোষের হইবে না মনে করিয়াই বর্ণিত হইল। কৃষ্ণবিহারে রাসোৎসব অতি আড়ম্বর সহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবার তাহার বিদ্যুৎময় ব্যাক্রম পরিলক্ষিত হয় নাই। বিগত ষাণ্মাস্যের প্রারম্ভ হইতেই সকলে এই আনন্দোৎসবে যেন আত্মহারা হইয়া উঠেন। নানা দিম্বিগত হইতে আবার বুদ্ধ-বিনীতারূপ “রাস ঠাকুর” সন্দর্শনাভিপ্রায়ে ভক্ত-ভার্য্যাকাত স্বপ্নে নানা কষ্ট-অস্থিবা সহ করিয়া সমাগত হইয়াছিল। শীতের প্রচণ্ড-প্রকোপ উপেক্ষা করিয়া হৃদয়গত দর্শক-যাত্রিগণ উন্মুক্ত পাদপতলদেশে রাজ-যাপন করিয়াছে। সারাদিন পদপথটান-পরিশ্রমে নিত্যন্ত রাস হইয়াও ঠাকুরদর্শনে তাহাদের সমস্ত কষ্ট বিদূরিত হইয়াছে, তাহারা আপনাদিগকে কতই না পুণ্যযাত্রা ও কৃতার্থ মনে করিয়াছে। ধূমরত্নধারবসনাবৃত সজ্জাদেবী ধরদীপ্তে স্বীয় অকল বিস্তৃত কবিরার সন্মুখে সবে যেখানে সেখানে—বৃকতলে শত শত ইক্ষুনাশ, শীতনিবারণাল পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এ দেশীয়গণের এই সমস্ত কর্তব্যে কথা সম্যক চিন্তা করিলে ইহারিগণের ভগবদ্ভক্তি কেমন অচলা, তাহা অবগত হইয়া বিশ্বময় হবে নিশ্চয়িত হইতে হয়।

রাস-গণ প্রাচীর-বেষ্টিত এবং স্থবিত্ত। অনেকগুলি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং আধুনিক দৃশ্য অতি পরিষ্কৃতভাবে প্রদর্শন করান হইয়াছে। মহারাণী দৃশ্য অপরূপত-

মুগ্ধ লক্ষ্য করিয়া শরাসেন শর-যোজনা করিলে মুনিগণ উহা নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিতে করিতে তাহার রথপার্শ্বে উপনীত। সারথি অশ্বলগ্না করিষণ করিয়া রথ শিশল করিয়াছে,—রাজ্য রথ হইতে অবতরণ করিয়া স্বয়মুখে দণ্ডায়মান। মুগ্ধ মুনিপার্শ্বে উৎকৃষ্ট নৃপতি-পানে হৃদয়ঙ্গম হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধর্ম কালিদাস! তোমার লেখনীকে শত মন্তব্য! কে বলে স্নেহ মৃত্যুর অর্থ? একপক্ষের গুরুদক্ষিণা দৃষ্টিতে গুরুভক্তির পরাকার্য্য বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে। রাবণ সীতাকে বামহস্তে ধারণ করিয়া বীরবীর পক্ষিরাজ্যস্থলে মগ্ন হইয়া বসিয়াছে। কে সীতার এ দুর্দশাধর্মে অশ্রুসরস্রাব করিতে পারে? কমলেকামিনী দৃষ্টি বড়ই মনোহর হইয়াছে। কিন্তু কামিনী-কোড়ে হস্তিত্ত্ব-শুভ্রতা না থাকায় দৃষ্টি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। যাবতের (যেদের) বানর ও ছাগল খেলার দৃষ্টি এবং সাপুড়ের দৃষ্টি হঠাৎ পর্শনে সজীব বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নহে। সফলকন-দলী টিকই যেন নবদ্বীপ হইতে আনীত হইয়াছে। দ্বারীপালার দৃষ্টি বেশ হইয়াছে। কেমন করিয়া প্রভুভক্তি সেখািতে হয় তাহা এই দ্বারীই শিখিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন। এ অগতঃ এমন কে আছে যিনি পরপুত্রস্বার্থে চোখের উপর স্বীয়স্বস্তানের নির্দয়হত্যা নীরবে দেখিতে পারেন? এইরূপ নানাবিধ দৃশ্য অতি পরিষ্কৃত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণারি মুক্তি-মুখ ধাতু-নির্মিত এবং মন্দ্রাভ্যন্তরে স্থাপিত। বাহির হইতেও বেশ পরিষ্কৃত। প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া রাস-মেলা বেশ চলিয়াছে। প্রত্যহ অপরূপ নরনারীর

সমাগম দর্শনে ৩ কালীবাুর “লোকায়ণ” শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যমত বোধ রসনায় বড়ই মিততা প্রদান করে। ক্রম-বিক্রম বেশ হইয়াছে। বিবিধ বিপনি মেলা-ক্ষেত্রে শুলভতার সহিত সজ্জিত। তন্মধ্যে মিঠাইয়ের বোকাই অধিক এবং ইহাতে বিক্রয়ও সর্বাধিক বেশ। যেসব মিঠাইসমূহের ভাঙ্গিম-পরাঙ্ককে কেহ নিমুক্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হইল না। মহারাণের স্ত্রী সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য। উহা জালে দিলে এমন বিকট দুর্গন্ধ বিনির্গত হয় যে, তথায় স্ত্রীনা ভার। ইহাতে” বোধ হয়, এই স্ত্রী বৈদী পরিমাণে চর্কামিশ্রিত। এই অবলা স্ত্রীপক ক্রম প্রত্যহ শত শত নরনারীর উল্লস হইতেছে। ইহাতে যে কত মহানিষ্ঠ মটিতে পারে তাহার লক্ষ্য নাই।

রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ।

বাস্ত্য-প্রসঙ্গ

আবার সেই অতি পুরাতন, অথচ অতি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে; এ আলোচনা দেশের মধ্যে যতই হইবে ততই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে দেশবাসীর কর্তব্যাবুদ্ধি প্রবৃদ্ধ হইবে। বাঙ্গালার মানসিক বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যসাধনে যেখাি অস্ত্র বিচলিত হইয়াছেন; আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র, মনসী প্রফুল্লচন্দ্র স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কৃতবার বাঙ্গালীকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন; কিন্তু কে তাহাদের কথা শুনে? তাহাদের উপদেশ-বাহী “অরণ্য-রোপনে” পথ্যবসিত হইয়াছে। তাই মনে হয় এ জাতি বৃষ্টি জাগিবে না; তিল তিল করিয়া অবনতির অন্ধগুহায় নিমজ্জিত হইবে। অনাগত ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতীয় অস্তিত্ব হরাইয়া ফেলিবে। ফল

কথা, অবিলম্বে বাঙ্গালী স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগী না হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ বড় ভয়াবহ, বড় শোচনীয়। আজ আমরা চারিদিকে জাতীয় মৃত্যু-বিভীম্বিকা দেখিতেছি, তাই আজ কর্তব্যের অহরোধে সেই বহু পুরাতন কথা অবতারণা করিলাম। “স্বজ্ঞা স্বকলা” বঙ্গভূমি আজ মহা-মাশানে পরিণত, এখানে কেবল হাহাকার—কেবল আশ্রয়! বঙ্গ-সমসারে এখন একটা হাসিভরা মুখ দেখিবে না—কোথাও হাস্য-কলরব শুনিবে না; দেখিবে কেবল ক্রীতদাস, কোটাগত চক্র, কঙ্কালসার জীবগণের মূর্তি, আর তুলিয়ে কেবল হতভম্বের আক্ষেপ, প্রিয়বিরহিতের মর্ম্মজ্ঞ ক্রন্দন। কেন এমন হইল? বঙ্গবাসীর কোন্ পাপের ফলে বঙ্গভূমির এ দুর্দশা? এখন তাহাই ভাবিবার বিষয়! কেনম করিয়া সর্ব্বপ্রাণী কালের মুখ হইতে বাঙ্গালী জাতি রক্ষা পায়— তাহাই করিতে হইবে ও অশ্রু-কর্তব্য জানে সেই পণ্য-অবলম্বন ভাষিতে হইবে। নচেৎ রোগে শোকে বর্জমান বাঙ্গালী ভূগিবে, তাহা নহে তাহাদের উপেক্ষার জন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরগণও কষ্ট পাইবে। তাহাতে মহান প্রত্যাবর্ত্ত হুনিষ্ঠিত।

বাঙ্গালী স্বাস্থ্যরক্ষার অবহেলা করিলে তাহার ধর্ম বশ, সাহিত্য বশ, সমাজ বশ,—কিছুই সম্যক রক্ষা পাইবে না। বাঙ্গালী তাহার আরাধ্য পূর্ব পুরুষগণের নিকট ও দেবতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তাগী হইবে। স্বাস্থ্য-রক্ষা মানবের উপাধিগত কর্তব্যকর্ম্ম—এ কর্ম্ম অবহেলা করিলে তাহার ইহকালে স্থখ পাইবে না, পরকালেও স্থখ হইবে না—প্রাচীন আর্থা-শ্রমির উপদেশের মর্ম্মই এইরূপ। বাঙ্গালী আমরা—আমাদের কাছে

এ উপদেশ নতুন নহে; আমরা জানি
 "ধর্মার্থকামমোক্ষাণ্যং আরোগ্যং মূলমুক্তমম্"।
 কিন্তু জানিলে কি হয়? আমরা জ্ঞান-পাপী
 বলিয়া আমাদের ভাগ্যে শাস্তির পরিমাণও
 যেন অধিক।

আমরা যে আত্ম অবনতির চরম স্তরে
পড়িয়া আছি—তাহার মূল কারণ আমাদের
স্বাস্থ্যহানি। আমরা সকল বিষয়ে সংযমকে
পরিত্যাগ করিয়া বিলাসের আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছি। সে কালের লোকেরা কত বলিষ্ঠ
কত কাব্যক্ষম, কত চিন্তাশীল ছিলেন,—সে
কেবল তাঁহারা সংযমী ছিলেন বলিয়া। কিন্তু
হায় এখন আমাদের স্বাস্থ্যের, বিহায়ে, প্রত্যেক
কাঠে সংযমের পূর্ণ অভাব। তাই আমাদের
এই হেয় দৃশ্য অব্যাপ্তিত অবস্থা; আমরা
স্বাস্থ্যের পথ বিসর্জন দিয়া বিলাসের দাস, সাম্রাজ্যছি

বিলাসের মোহময় আবর্তে পড়িয়া আমরা
যে কেঁবল স্বাশ্ব-মুনে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা
নহে—সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি আমাদের
আস্থা—সরল বিশ্বাস ভ্রাস পাইতেছে।
আমাদের স্বাস্থ্যের ধর্মতা হেতু নৈতিক
অবনতি সংঘটিত হইতেছে—এ কথা স্বীকার
করিতেই হইবে; কারণ দেখ—এমন অশ্রেয়
বসনে বদ্ধ। একের ক্রমাগততত অপরেরও
ক্রমোন্নতি। এ সকল নৈতিক কথার
আলোচনার ক্ষেত্র এ নহে—তবে প্রসঙ্গক্রমে
এ কথা আমাদের বলিতে হইবে। মোট
কথা—আমরা ক্রমশই হীন হইতেছি—
আমাদের চির ঈগিত মহান আদর্শ হইতে
আমরা ক্রমশ: শলিত হইতেছি। বাহ্য-
প্রকৃতির সহিত শরীরের যে চির সংগ্রাম
আছে তাহা আমরা একেবারে তুলিয়া
গিয়াছি—হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধকে ইংরাজী
শিক্ষার দণ্ডভরে অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছি।

শরীরপালন-তত্ত্বের সরল নিয়মগুলি পালনে
পৰ্যাপ্ত অবহেলা করিতেছি! আমরা এখন
প্রত্যেকে, পুরানঙ্গর স্বার্থপর হইতেছি;
নিজের স্বখলালমার বহিতে বিলাসের আহতি
প্রদান করিয়া শরীরকে ব্যাধিমন্দির করিয়া
তুলিতেছি।

চুঁচুড়া বার্তাবহ ।

বঙ্গে গোজাতি

দানবীর জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেনকিশোর
রায় চৌধুরী মহাশয় নেত্রকোণার “প্রান্তবাসী”
পত্রিকায় বন্ধে গোজাতির উন্নতি-কল্পনায়
একটা সাধু প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা নিম্নে
তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

“বন্দেশে একটা প্রবাদ আছে, ‘গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।’ আমাদের হইয়াছে এখন ঠিক তাই। আমরা দেশ, জাতি, সমাজ, রাজনীতি, অবশেষে স্বদেশী লিখা দেশময় আন্দোলন করিয়া না কি প্রলাল ইংরেজ-শক্তিকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছি,—প্রবন্ধ লিখিগ, বক্তৃতা করিগ দেশের ছেলেদের দল আহুল করিতেছি, কিন্তু দেশটা কিম্বে রক্ষা হয়, জাতিটা কি করিলে বাচে, সমাজটা কিম্বে উন্নত হয়, তাহার মূল অমুসন্ধান জ্ঞাত একবারও ভাবি না। আর যদিও বা কখন ভাবি, তবু কার্ণে বিচুই করি না।”

শরাদায় পূজায় দেশে আসিয়া দেখিলাম—
—শত্ৰুহামল ধন-ধাতু-ময়, বদলস্বীর প্রিয়
নিকেতন ময়মনসিংহে আসিয়া দেখিলাম—
টাকাষ ১২ ছই সের দুধ! তাহাঁও বড়
লোকের ভাগেই জুটে। কারণ তাহাদের
দু'চ'র জন্ম গোয়াল প্রজা আছে, তাহারা
মনিবের হুকুম তামিল করিবার জ্ঞান প্রাপণ

১৩২০]

প্রায়সে ১০-১২ মাইল খুজিয়া পাতিয়া কতকটা
দুখ সংগ্রহ করে; মধ্যস্থিত বা দূরত্বের
শিশুসন্তানের জীবন-রক্ষার জ্ঞান কিংবা একট
ঐশ্বর্য থাইতে অনেক সময়ে ১ টাকার ব্যয়ও
একটু দূর জুটাইতে পারে না। মনে একটা
দাশন্য বাতনা উপস্থিত হইল। বিবাহের
শুরু, স্বামীর শোচনীয়তা অনেক ভাবিয়া
দেখিলাম। কারণ অহম্মদানে বাহা বুক্লাম,
তাঁহাই আজ আমার দেশবাসী শিক্ষিত ও
দনী সম্প্রদায়ের নিকট নিবেদন করিতেছি।
অবশ্য আমার উদ্দেশ্য নয় যে, অশিক্ষিত কৃষক
বা অল্প ব্যবসায়িককে উপেক্ষা করি। তবে
দেশের সুসময় লোককে আমার একাকী
বুকাইবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ
অসম্ভব। শিক্ষিত ও দনী সম্প্রদায় যদি
আমার এই নিবেদনের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে
পারেন তবে তাঁদেরা নিশ্চয়ই ইহার প্রতি-
বিধান করবে অগম্য হইবেন এবং দেশময় এই
সংবাদ প্রচারিত হইবে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে গো-জাতির স্থান ও সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ব্রাহ্মণের উপরেও নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা নিতান্ত কৃষ্ণজ্ঞার বা নির্ধন জ্ঞতার পরিচায়ক নহে। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যতই নিম্নকে বিধান ও বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করি না কেন, তৎ কালের নিতান্ত গ্রাম্য-প্রচলিত নিয়মগুলির সারবত্তাও ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। তাই আমরা মাতৃভূলা উপকারিণী গো-জননীর রক্ষা ও সেবার এতদূর অবহেলা করিতেছি। অথ্যে, অনাহারে সহস্র সহস্র গাভী হীনস্বাধ্য বিপত্ত্যবশত হইয়া অকালে কালের কবলে পড়িতে হইতেছে। আমরা হিন্দুধন্তন হইয়া অর্থাব্যবহাঙ্গব বলিয়া মহাগোবধ কব্রিয়াও

আমাদের একতম প্রধান কর্তব্য পালনে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছি। কথাটা যে কেহই বুঝেন বা ভাবেন না এমন নহে। কিন্তু শক্কেই অপরকে মূৰ্খাণেশী হইয়াই নিশ্চেষ্টে রহিয়াছেন। বিশেষতঃ কাজ করিতে হইলেই আমাদের মাথা আকাশ ভাঙ্গি পড়ে। কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য—ইহু, ঘি, ক্ষীর, সব, মাখন, ছানা প্রভৃতির কথা দূরে বাউক, এক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিলে চাউলভাইলের অভাবও যে অতি নিকটবর্তী তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। এদেশে চাষের জন্ম গোজাঙাই উপযুক্ত, কিন্তু দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত ক্ষতগতিতে এই জাতের অপকর্ষ খটতেছে, তাহাতে অমের জন্মও বোধ হয় আবারিগকে অল্প দেশের মূখ্যপণী হইতে হইবে। কৃষির উন্নতির জন্ম আমরা কতই বৃত্তুতা করিতেছি, বিদেশে যুগ্মবিদগকে পাঠাইয়া কৃষিকার্য শিক্ষা দিতেছি, কিন্তু কৃষির মূল যে গো-জাত তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য করিতেছি না। দেখময় ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে এবং দিন দিনই প্রকোপ বাড়িতেছে, ইহার একটা প্রধান কারণ—আমাদের পুষ্টিকর পবিত্র খাদ্যের অভাবজনিত দৈহিক দৌর্বল্য। বাঙ্গালী জাতের পক্ষে গোহুদ্ব ও তুঙ্গবৎস শ্রব্যাদিই যে ধাতু ও প্রকৃতির উপযুক্ত বসকর খাদ্য ইহা বলাই বাহুল্য। রক্তরাস যাহাতে গোপ্তাতির উন্নতি সাধন করিয়া আমাদের জীবন, সমাজ ও জাতি রক্ষা করিতে পারি তাহাযে আলোচনা করাই সম্ভব।

উন্নতির উপায় উদ্ভাবনা করিতে হইলে,
অবনতির কারণগুলির বিচার করা প্রয়োজন।

তাই জমিদারগণ নিজের এলাকার যথেষ্ট জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। কোন গ্রামেই জলকষ্ট ছিল না। এখনও প্রত্যেক গ্রামে সেই সমস্ত জলাশয়ের চিহ্ন বর্তমান আছে। জমিদারগণও কোন একটা নতুন গ্রাম স্থাপন করিলে অথচই জলাশয়ের খুঁচনা করিতেন। গ্রামবাসীর অধিকাংশ মামলা-মোকদ্দমা তাঁহারা ই নিটাইয়া দিহেন। লোকে কথায় কথায় সহরে চুক্তি না। লোকও ধর্মভীরু ছিল। সকল কার্যেই লোকে ধর্মের দোহাই দিতা চলিত। জমিদারকে প্রজা সেবতার মত সন্মান করিত। জমিদারও প্রজাপালন প্রধান ধর্ম বিবেচনা করিতেন। সে সময়ে পরীবাসীর দিন অতি আনন্দেই কাটিয়া যাইত। এক্ষণে জমিদারগণ কেহই পরীবাস পছন্দ করেন না। তাঁহাদের অধিকাংশই সহরবাসী হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের জলাশয়-স্থাপন প্রভৃতি পুণ্য কার্যের অর্থ রাঢ় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি আখ্যায় জগৎ জ্বলের মতই খরচ হইতেছে। এক্ষণে তাঁহারা প্রজাপালন তুলিয়া গিয়াছেন। প্রজাপালক তাঁহার জগৎ সর্বদাই হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। তাই জমিদারও প্রজার দিন দিনই সম্ভাব্যের অভাব ঘটতেছে।

পাশ্চাত্য জমিদার নাই, আবার শিক্ত লোকেরও একান্ত অভাব ঘটনাছে। কিন্তু পরীই শিক্ত ব্যক্তিদিগের জন্মভূমি। আজকাল শিক্ত ব্যক্তিমাঝেই পরীতে থাকিতে পাবেন না। কারণ পরীতে থাকিলে তাঁহাদের চলেন। তাই তাঁহারা হাকিম, ডাক্তার, প্রভৃতি আখ্যায় অতিহিত হইয়া সহরে গুণগা উন্নত স্থানে অবস্থান করেন। এই সমস্ত শিক্ত লোকদ্বারা সংসারের অনেক উপকার হইতেছে। এই সমস্ত লোক প্রবাসী, কাহেই তাঁহাদের দ্বারা পরীর উপকার হয় না।

আজকাল পরীবাসী বলিলে আমরা এই বৃদ্ধ, কতকগুলি কৃষকশ্রেণীর জাতি, ধোপা, নাপিত, কামার, হুয়ার প্রভৃতি ব্যবসায়ী, বাহারা পরীবাসীর অভাব পূরণ করিয়া থাকে;

আর জোতার শ্রেণীর লোক। এই জোতার শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা শিক্ত, তাঁহারা পৈত্রিক ভবনে থাকেন না। তাঁহাদের অধিকাংশই চাকরা-ব্যাপদেশে সহরে অবস্থান করেন, বাস্তবিকভাবে আলো গ্রহান করেন না। ইহারা ই কিন্তু পরীগ্রামে শিক্ত বলিয়া পরিচিত। ভবিষ্যতে গেলে সম্ভবিত ইহারা ই পরীবাসের স্বত্বস্বচ্ছন্দত্ব বংশদণ্ডে চূর্ণত্ব স্বীকারের মত অবস্থান করিতেছেন। ইহারা ই গ্রামে স্থূল স্থাপন করেন, চৈতন্যবিশ্বাস বদান। আবার ইহারা ই সম্পাদক, মেধা প্রভৃতি সাহিত্য বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটাইয়া থাকেন। অচিরেই স্থূলটিকে নষ্ট করিয়া হিঙ্গানামক বৃত্তিটিকে, চরিতার্থ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পৌষ্টিকিটাকা চন্দ্রশূল হইয়া উঠে। গ্রামের দলাদলির জের শেষে স্থূল ও পৌষ্টিকিটাকার উপর পড়ে। গেটে বিদ্যা-বুদ্ধি সেরূপ না থাকিলেও গ্রামের মাষ্টার-পণ্ডিতের বিবার সমালোচনা সর্বদাই করিয়া থাকেন। ইহারা ই মামলামোকদ্দমার নেতা। গ্রামে একটা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, ইহারা কোন না-কোন পক্ষে যোগ দান করেন। এক পক্ষে গ্রামবাসী উপস্থিত হইলে অপর পক্ষে গ্রামবাসীর অভাব হয় না। ইহারা মিটমাটের দিকে ঘাইতে নারাজ। তিলকে তাল করিতে খুবই পটু। গ্রামটিকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া অস্তিত্ব: হই ভাগ না করিলে, ইহাদের শরীরের মধ্যে টাটানি নামক এক প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়। ইহারা আজ বাহাকে বড় করেন, কাল তাহাকে ছোট করিয়া থাকেন। পরকুন্স না করিলে ইহাদের রসনায় উত্তেজনার উদ্ভব হয়। এই যে প্রকৃতিগ্রামে এক জলকষ্ট, ইহা দেখিয়া যদি কেহ একটা পুষ্কর দিতেও চাহে, এই সংকার্যেও ইহারা বাধা দিতে অযোগ্য বুজিয়া থাকেন। এইরূপ প্রত্যেক সংকার্যেরই ইহারা প্রতিধ্বনী। পরীর সেবালের সহিত একালের ভাবনা যৈদিক দিয়াই ভাবিনা কেন, প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে।

স্বরাজ।

পরিশিষ্ট

তং তথা ভোগসংসর্গ-প্রমত্তমজিতেন্দ্রিয়ম্ ।
 স্ববাহুর্নাম শুশ্রাব ভ্রাতা তস্য বনেচরঃ ॥ ৭ ॥
 তং বুবোধয়িষুঃ সোহথ চিরং ধ্যাত্বা মহীপতিঃ ।
 তদ্বৈরিসংশ্রয়ং তস্য শ্রেয়োহমন্যত ভূপতেঃ ॥ ৮ ॥
 ততঃ স কাশিভূপালমুদার্ণবলবাহনম্ ।
 স্বরাজ্যং প্রাপ্তু মাগচ্ছদ্বহুঃ শরণং কৃতী ॥ ৯ ॥
 সোহপি চক্রে বলোদ্‌যোগমলকং প্রতি পার্শ্বিণঃ ।
 দূতঞ্চ শ্রেয়সামাস রাজ্যমগ্রে প্রদীয়তাম্ ॥ ১০ ॥
 সোহপি নৈচ্ছত্তদা দাতুমাঙ্জাপূর্বং স্বধর্ম্মবিৎ ।
 প্রভুবাচ চ তং দূতমলকং কাশিভূতঃ ॥ ১১ ॥
 মামেবাত্যেভ্য হৃদ্যেন যাচতাং রাজ্যমগ্রজঃ ।
 নাক্রান্ত্যা সম্প্রদাস্যামি ভয়েনান্নামপি ক্ষিতিম্ ॥ ১২ ॥
 স্ববাহুরপি নো ব্যাক্রাঞ্চকার মতিমাংস্তদা ।
 ন ধগ্নঃ ক্ষত্রিয়শ্চেতি দ্রাক্তা বোধ্যধনো হি যঃ ॥ ১৩ ॥

ভ্রাতার এ হেন দশা করিয়া অবগ,
 স্ববাহু ভ্রাতার হ'লো চিন্তামুক্ত মন । ৭ ।
 ভ্রাতা অলকেরে দ্বারা প্রবৃত্ত করিতে
 উপায় চিন্তিয়া বহু আপনার চিতে,
 বৈরীর আশ্রয় ধীর করিয়া গ্রহণ
 শ্রেয়ঃ সাধিবারে তা'র করিলা মনন । ৮ ।
 তবে মহাবলবান কাশিরাজ পাশে,
 উপনীত হৈলা নিজ রাজ্যলাভ আশে ।
 বলে "রাজা লইলাম তোমার শরণ
 পৈত্রিক রাজত্ব মোরে করহ অর্পণ ।" ৯ ।
 কাশিরাজ শুনি' তবে সব বিবরণ
 অলকের পাশে দূত করিলা প্রেরণ ।
 বলে রাজা—"স্ববাহু যে অগ্রজ তোমার
 পিতুরাজ্য হ্রায্য প্রাপ্য জানিহ তাহার ।
 অতএব তা'রে রাজ্য করহ অর্পণ,

নহিলে নিশ্চয় হ'বে যুদ্ধ সংঘটন ।" ১০ ।
 অলক শুনিয়া সেই দূতের বচন,
 ক্ষত্রধর্ম্মোচিত বাক্য বলিল এমন । ১১ ।
 অগ্রজ সদয় হ'য়ে আনি' মোর পাশ
 শাসিতে পৈত্রিক রাজ্য করে যদি আশ,
 তাঁ'রে দিতে রাজ্য, মোর কিছু বিধা নাই
 কিন্তু রাজ্য ত্রুব বাহুবলে না ভরায় ।
 তবে ভীতি-প্রদর্শনে না ভরি অন্তরে
 তাহে অল্প ভূমিখণ্ড না দিব কাহারে । ১২ ।
 সে বচন দূত আসি, শুনায় রাজায় ।
 স্ববাহু বলিলা ইথে মন নাহি চায় ।
 ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হেন নহে স্থনিশ্চয়,
 যাক্রা করি ধন রাজ্য কারো কাছে লয় ।
 বলে রাজ্য জিনি লব করিয়াছি মনে
 এ কার্যে সাহায্য চাই তোমার সদনে । ১৩ ।

ততঃ সমস্তসৈন্যেন কাশীশঃ পরিবারিতঃ ।

আক্রান্তমভ্যাগাদ্রাষ্ট্রমলক্কম্ মহীপতেঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তরৈশ্চ সংশ্লেষমভ্যোত্য তদনন্তরম্ ।

তেষামন্যতমৈর্ভূতৈঃ সমাক্রম্যানয়দ্বশম্ ॥ ১৫ ॥

অপীড়য়চ্চ সামন্ত্যন্তঃস্থ রাষ্ট্রেপারোদধৈঃ ।

স্তথা দুর্গান্তপালাংশ্চ চক্রে চাটবিকান্ বশে ॥ ১৬ ॥

কাংশ্চিচ্ছোপপ্রদানেন কাংশ্চিচ্ছেন্দেন পাথিবান্ ।

সান্নৈবাত্মান্ বশং নিজে নিহত্যন্তস্য য়েহবন্ ॥ ১৭ ॥

ততঃ সোহল্লবলো রাজা পরচক্রাবপীড়িতঃ ।

কৌশল্যমবাপোষ্টৈঃ পুরকার্ণধাতারিণা ॥ ১৮ ॥

ইথং সম্পাদ্যমানস্ত ক্কাণকৌষো দিনে দিনে ।

বিষাদমাগাৎ পরমং ব্যাঙ্কুলত্বক্ চেষতঃ ॥ ১৯ ॥

আতি স পরমং প্রাপ্য তৎ সম্ভারঞ্চদ্রুমায়কম্ ।

বহুদিশ পুরা প্রাহ মাতা তস্য মদালসা ॥ ২০ ॥

ততঃ স্নাতঃ শুচির্ভূতা বাচয়িতা দ্বিজোত্তমান্ ।

নিষ্কম্য শাসনং তস্মাদদৃশে প্রক্ষুটাক্ষরম্ ॥ ২১ ॥

তত্রৈব লিখিতং মাত্রা বাচয়ামাস পাথিবঃ ।

প্রকাশপুলকাদৌহসৌ গ্রহর্দৌঃফুল্লোলচনঃ ॥ ২২ ॥

তবে কাশী নরেশ্বর সর্বসৈন্য ল'য়ে
আক্রমিল অলক্কেরে স্বরূপর হ'য়ে । ১৪ ।
সংঘে যুদ্ধেতে জয় লভিবার তরে,
করিতে উপায়, তা'র ভৃত্য বশ করে । ১৫ ।
সাম দান ভেদ দণ্ড করিয়া আশ্রয় ।
সামন্তগণেরে বশ করে সুদয় ।
এইরূপে অলক্কেরে অগ্নবল করে ।
শক্রবলে পীড়া বহু পাইল অন্তরে ।
পুরী রুদ্ধ শক্রসৈন্যে, হইল অস্থির ;
ধনক্ষয়ে মন হৈল চকল অধীর । ১৬-১৮ ।
দিনে দিনে অধীরতা বাড়ি অতিশয়,
বিষাদে হইল অতি আকুল হৃদয় । ১৯ ।

সেই কষ্টে মাতৃদত্ত অদ্বীরর কথা
মনেতে পড়িল—যাহে যুচিবেক ব্যাথা ।
মাতা মদালসা যেনা বলিল বচন
এবে সেই কথা তাঁ'র হইল স্বরূপ । ২০ ।
তবে আমি করি' রাজা হ'য়ে শুচিকায়,
দ্বিজবরে আনি স্বস্তিবাচন করায় ।
পরে সে অদ্বীর হ'তে করি' উল্লোচন,
মাতার শাসন-বাক্য করে দরশন । ২১ ।
মাতার লিখিত সেই উপদেশ-সার
পড়িতে অন্তরে হ'লো পুলক স্ফূর্ত্তার ।
পুলকিত হ'লো অঙ্গ হ'ব অতিশয়,
লোচন প্রফুল্ল অতি—হৃদি স্বপ্নময় । ২২ ।

সঙ্গঃ সর্বাঙ্গানা ত্যাজ্যঃ স চেৎ তাক্লুং ন শক্যতে ।

স সন্তিঃ সহ কর্তব্যঃ সত্যং সঙ্গো হি ভেষজম্ ॥ ২৩ ॥

কামঃ সর্বাঙ্গনা হেয়ো হাতুক্ষেচ্ছক্যতে ন সং ।

মুমক্ষ্যং প্রতি তৎ কার্যং সৈব তস্যাপি ভেষজম্ ॥ ২৪ ॥

বাচয়িতা তু বহুশো নৃগাং শ্রেয়ঃ কথাস্থিতি ।

মুমক্ষ্যেতি নিশ্চিত্য সা চ তৎসঙ্গতো যতঃ ॥ ২৫ ॥

ততঃ স সাধুসম্পর্কং চিন্তয়ন্ পৃথিবীপতিঃ ।

দত্তাক্রয়ে মহাভাগমগচ্ছৎ পরমার্তিমান্ ॥ ২৬ ॥

তং সমেতা মহাত্মানমকল্মাষমস্প্রিনম্ ।

প্রণিপত্যভিসম্পূজ্য যথাত্মায়মভাষত ॥ ২৭ ॥

অলক্ক উবাচ ।

ভ্রমন্ কুরু প্রসাদং মে শরণং শরণার্থিনাম্ ।

ছুংখাপহারং কুরু মে ছুংখান্ত্যাতিকামিনঃ ॥ ২৮ ॥

দত্তাক্রয়ে উবাচ ।

ছুংখাপহারমদ্যৈব কেরামি তব পাথিব ।

সত্যং ক্রহি কিমর্থং তে ছুংখং তৎ পৃথিবীপতে ॥ ২৯ ॥

লেখা ভায় দেখে রায় বচন মাতার—

“সঙ্গ ত্যাজ্য সত্যত জ্ঞানিহ সবাকার ।

সঙ্গ ত্যাগ করিতে সামর্থ্য যদি নয়

সাধুদেব কর—তাহা গুণ্য নিশ্চয় । ২৩ ।

কাম অতি হেত তাহা ত্যাজ্য সর্বভাবে,

না ঘটে অভাব কিছু তাহার অভাবে ।

করিতে কামনা ত্যাগ সাধ্য যদি নয়,

মুক্তিকামনার রত রাখহ হৃদয় ।

কামনা ত্যাগের অঙ্ক উপায় ত নাই—

গুণ্য তাহার মুক্তিকামনা সদাই ।” ২৪ ।

বহুবাব পড়ে রাজা মায়ের লিখন,

মনে নানা চিন্তা গুর করে আগমন ।

শেখে মোক্ষপদ লাভে হইল বাসনা;

* তাজিল নরেশ যত অসার ভাবনা । ২৫ ।

সাধুদেবদ্রব্য-আশ্রয় হইয়া কাতর,

গেলো মহাপাণ্ডু দত্তাক্রয়ের গোচর । ২৬ ।

নিপাণ নিঃসঙ্গ-সেই মহাশ্রম পাথ,

নতি অপর পুঞ্জা করি' বাসনা জ্ঞানায় । ২৭ ।

“ব্রহ্মণ্ড, প্রলম্ব হও শরণ্যের প্রতি,

শরণার্থী তব—মোর নাহি অঙ্ক গতি ।

কামনার বশে আমি বড় ছুংখ পাই

ছুংখ নাশিবার মোর আর কেহ নাই ।” ২৮ ।

বলিলেন দত্তাক্রয়ে, “ওনহ, রাজন

অদাই তোমার ছুংখ করিব হরণ ।

বল, মোরে, কি কারণে ছুংখ তব প্রাণে

গোপন কোরো না কিছু মম সম্বন্ধানে । ২৯ ।

কস্য হুং তস্য বা হুংথং তদ্ব্যমতিচার্যাত্ম।

অঙ্গান্যঙ্গানিরঙ্গ সর্বান্ধানি বিচিন্তয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ধ্বজপুত্র উবাচ।

ইদ্রাক্শিচিন্তয়ামাস সূ রাজা তেন ধীমতা।

ত্রিবিধস্যপি হুংথস্য স্বানমাজ্ঞানমেব চ ॥ ৩১ ॥

স বিষ্ময় চিরং রাজা পুনঃপুনরুদারধীঃ।

আজ্ঞানমাজ্ঞান ধীরঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥

অলক উবাচ।

নাহমুর্কী ন সলিলং ন জ্যোতিরনিলা ন চ।

নাকাশং কিন্তু শারীরং সমত্য স্বখমিচ্ছতে ॥ ৩৩ ॥

ন্যূনাতিরিক্ততাং যাতি পঞ্চকেহ্মিন্ স্বখাস্বখম্।

যদি স্যাম্মম কিং ন স্যাদনুস্বেহপি হিতং ময়ি ॥ ৩৪ ॥

নিত্যঐচ্ছতসম্ভাবে ন্যূনাধিক্যামতোন্নতে।

তথা চ মমতাত্ত্বো বিশেষণোপলভ্যতে ॥ ৩৫ ॥

তন্মাত্রাবস্থিতে সূক্ষ্মে তৃতীয়ংশে চ পশ্যতঃ।

তথৈব ভূতসম্ভাবং শারীরং কিং স্বখাস্বখম্ ॥ ৩৬ ॥

তুমি কা'র ?—হুংথ কা'র—ভেবে দেখ মনে

হুংথের এ ভাব মনে আসে বা কেমনে ?

এই তব মনে মনে করহ বিচার,

অঙ্গ কিবা ?—অঙ্গী কেবা ? ভাব তব তার।

নিরঙ্গ কে ?—সর্কার বা কাহার সংসারে ?

এই তব চেষ্টা কর প্রাণে বুঝিবারে। ৩০।

ধ্বজপুত্র বলে—“পিতা, করহ শ্রবণ,

শাবুর মখেতে তুমি' এ হেন বচন,

মনে মনে চিন্তা রাজা বহুক্ষণ করে,

আজ্ঞার হুংথের স্থান ভাবিল অন্তরে। ৩১।

পুনঃ পুনঃ চিন্তাকলে মনে হ'লো তাঁর।

হানিয়া বলিলা হেন নিষ্ঠে তাঁহার। ৩২।

কিতাপ-তেজ-মরুখ্যোম কিছু আমি নই,

শারীর হইয়ে—স্বখ-আশে ব্যস্ত হই। ৩৩।

ন্যূনাতিরিক্তের ফলে এই পঞ্চকেতে,

স্বখস্বখ বোধ সঙ্গ আসে ত মনেতে।

অনুস্বে আমার হিত হয় কি না হয়,

এই ভাবি হয় প্রাণে স্বখহুংথোদয়। ৩৪।

সত্যত প্রভূত বস্তু লাভ যদি হয়—

ক্লিষা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে সকল সময়,

মমতার ভাগ যদি ভাগ্যকর হয়

তবেই বিশেষ স্বখ লভয়ে-নিশ্চয়। ৩৫।

দেখিতে যে জানে, সেই জানে এই কথা

পঞ্চভূতাত্মক দেহে স্বখ হুংথ কোথা ? ৩৬।

মনস্যবস্থিতং হুংথং স্বথং বা মানসঞ্চ যৎ।

যতন্ততো ন মে হুংথং স্বথং বা ন হুংথং মনঃ ॥ ৩৭ ॥

নাহঙ্কারো ন চ মনো বুদ্ধির্নাহং যতন্ততঃ।

অস্ত্যঃকরণঞ্চ হুংথং পারকং মম তৎ কথম্ ॥ ৩৮ ॥

নাহং শরীরং ন মনো যতোহহং

পৃথক্ শরীরান্মনসন্তথাহম্।

তৎ সন্ত চেতস্যথবাপি দেহে

স্থানি হুংথানি চ কিং মমাত্র ॥ ৩৯ ॥

রাজ্যস্য বাহ্যং কুরুতেহগ্রজোহস্য

দেহস্য চেৎ পঞ্চময়ঃ স রাশিঃ।

গুণপ্রবৃত্ত্যা মম কিং হু তত্র

তৎস্বঃ স চাহক্ শরীরতোহহং ॥ ৪০ ॥

ন যস্য হস্তাদিকমপ্যশেষং

মাংসং ন চান্বীন শিরাবিভাগঃ।

কন্তস্য নাগাশ্বরথাদিকোষঃ

স্নজোহপি সন্দ্বদ্ব ইহাস্তি পুংসঃ ॥ ৪১ ॥

তন্মাত্র মেহরিন্ চ শ্বেহস্তি হুংথং

ন মে স্বথং নাপি পুংসং ন কোষঃ।

ন চান্বনাগাদি বলং ন তস্য

নান্যস্য বা কস্যচিদ্ধা মমাস্তি ॥ ৪২ ॥

মনেতে উপজে মাত্র স্বথ হুংথ আর,

মন নহি আমি—তা'হা নহে ত আমার। ৩৭।

মন বুদ্ধি অহঙ্কার কিছু আমি নই,

তা'রা পর—পরহুংথে হুংথ কেন হই ? ৩৮।

সেই মন হ'তে আমি পৃথক্ নিষ্ঠর,

হুংথ দেহাদির মাত্র, কিছু মম নয়। ৩৯।

মিথ্যা রাজ্য-বাহ্য মনে—দেহ পঞ্চময়

গুণ বশে আছি তাহে, দেহ আমি নয়। ৪০।

হস্ত আদি আর মাংস-অস্থি-শিরা-সার

দেহের সম্বন্ধে, ধন আদি কি আমার ? ৪১।

বুদ্ধি প্রাণেতে আমি অরি মোর নয়,

হুংথ, স্বথ, রাজ্য, ধন আদি সমুদয়,

হস্তি-অশ্ব-শৈত্য-আদি কিবা বল কা'র ?

এ সব'র মনে নাহি সম্বন্ধ আমার। ৪২।

যথা ঘটা-কুন্ত-কমণ্ডলুং

আকাশমেকং বহুধা হি দৃষ্টম্ ।

তথা স্ববীজং স চ কাশিপোহহং

মম্মে চ দেহেনু শরীরভেদৈঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে অলকচরিতে আশ্ববিবেকো নাম
সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

যথা কুন্ত কমণ্ডলু যাত্নেভে যেমন
এক সে আকাশ বহু হয় দরশন ;

দেইকপ, কাশিরাজ, হুবাং পঁ আর
সর্বঘট্ট আমি দেহভেদমাত্র দার । ৪৩ ।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে অলকচরিতে আশ্ববিবেক নামক
সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।



অষ্টত্রিংশোধ্যায় ।

বিষ্ণুপুত্র উবাচ ।

দত্তাক্ষেয়ং ততো বিপ্রং প্রাপিপত্য স পাণ্ডিবঃ ।

প্রত্যাচ মহাত্মানং প্রশ্রয়াবনতো বচঃ ॥ ১ ॥

সম্যক্ প্রপথ্যতো ব্রহ্মন্ যম দুঃখং ন কিঞ্চন ।

অসম্যগদর্শিনো মগ্নাঃ সর্বদৈবাস্ত্ৰথার্ববে ॥ ২ ॥

যস্মিন্ যস্মিন্ সমত্বেন বুদ্ধিঃ পুংসঃ প্রশ্রয়তে ।

ততন্ততঃ সমাদায় দুঃখাত্তেব প্রযচ্ছতি ॥ ৩ ॥

মার্জারভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কটে ।

ন তাদৃশমতাপ্তম্ কলবিষ্কেষ্থ মুখিকে ॥ ৪ ॥

সোহহং ন দুঃখী ন সুখী যতোহহং প্রকৃতে: পরঃ ।

যো ভূতাভিভবো ভূতৈঃ স্বদুঃখাত্মকো হি স ॥ ৫ ॥

বিষ্ণুপুত্র বলে "তন কুত্বেলে
বালি সার বিবরণ ।

দত্তাক্ষেয় পায় ভূতলে লুটায়,
মনোহুখে সে রাজন ।

করিয়ে প্রগতি, বলে নরপতি
প্রশ্রয়াবনত হ'য়ে

পুলকিতান্তরে হৃদয়ের স্বরে
চরণের ধূলি ল'য়ে । ১ ।

"দিব্যদৃষ্টি মোরে দিলে কৃপা ক'রে
প্রত্যক্ষ বৃক্ষস্থ এবে"

দুঃখ মোর নাই আমি ত সদাই
সর্গজ রয়েছে ভবে ।

সম্যক দর্শন না করে যে জন,
সে জন ভবে নিশ্চয়,

দুঃখের সাগরে ভুবে চিব্বরে
থাকে, কতু মিথ্যা নয় । ২ ।

আমার আমার যত দিন যা'র
তত দিন সেই জন,

বহু দুঃখ পায়, সন্দেহ কি তা'র
না যুচে মনোবেদন । ৩ ।

গৃহেতে পালিত কুক্কটাদি যত
মার্জারে ভক্ষিলে হায়,

যেই দুঃখ মোকে ভুঞ্জে তা'র শোকে
বচনে বলা না যায় ।

কলবিক আর মুখিক অপার
নরের ঘরেতে থাকে ;

যদি সে সবারে বিনাশে মার্জারে,
দুঃখ নাহি তা'র পাকে । ৪ ।

প্রকৃতির পর আমি নিরস্তর,
দুঃখী, সুখী আমি নই,

পক্ষে আশ্ব ষোথ করে যে নির্দোষ
ভবেতে সে স্ব স্ব কই ?

পঞ্চভূত হ'তে ভবে নানা মতে
স্ব স্ব দুঃখ সদা পায় ।

পরাদীন হ'য়ে পরেরে লইয়ে
সদা সে দিন কাটা'য়" । ৫ ।

দত্তাশ্বেয় উবাচ ।

এবমেতম্ভরব্যাক্ত যথৈতদ্ ব্যাহতং স্বয়া ।

মমেতি মূলং হুংখস্য ন মমেতি চ নিরুত্তেঃ ॥ ৬ ॥

মৎপ্রমাদেব তে জ্ঞানমৎপন্নমিদমুত্তমম্ ।

মমেতি প্রত্যয়ো যেন ক্ষিপ্তঃ শাস্ত্রলিভুলবৎ ॥ ৭ ॥

অহমিতাকুরোৎপন্নো মমেতি ক্কবান্ মহান্ ।

গৃহক্ষেত্রৌচ্চশাখশ্চ পুত্রদারাদিপন্নবঃ ॥ ৮ ॥

ধনধাতুমহাপত্রো নৈককালপ্রবদ্ধিতঃ ।

পুণ্যাপুণ্যাগ্রপুষ্পশ্চ স্বথহুংখমহাফলঃ ॥ ৯ ॥

অপবর্গপথব্যাপী মৃতসম্পর্কসেচনঃ ।

বিধিৎসাস্তৃঙ্গমালাঢ্যো হৃদ্যজ্ঞানমহাতরুঃ * ॥ ১০ ॥

সংসারাক্ষপরিশ্রান্তা যে তচ্ছায়াং সমাশ্রিতাঃ ।

জ্ঞাস্তিজ্ঞানস্বথাধীনান্তেষামাত্যন্তিকং কৃতঃ ॥ ১১ ॥

যৈস্তু সৎসঙ্গপাষণ-শিতেন মমতাতরুঃ ।

ছিদ্রো বিদ্যাকুঠারেণ তে গতান্তেন বজ্রনা ॥ ১২ ॥

বলিলেন দত্তাশ্বেয়—“শুনহ রাজন,
বলিলে যে কথা, মিথ্যা নহে কদাচন ।
মমতা হুংখের মূল—সন্দেহ কি তা'র ?
মমতা ঘুচিলে তবে, তবে স্বথ পায় । ৬ ।
প্রথ সনে প্রাণে তব উপজিল জ্ঞান,
ভাগ্যবান নাহি হেরি তৌমার সমান ।
শাস্ত্রলির তুলা যথা স্বতোৎক্ষিপ্ত হয়,
জ্ঞানের বিকাশ তব তেমতি নিশ্চয় । ৭ ।
অহং-জ্ঞান-অকুরেতে যাহার জনম
মহাভক্ত হয় যা'র আমি আর মম,
গৃহ ক্ষেত্র আদি যা'র শাখা হৃদয়স্থ,
পুত্র দারা আদি যা'র পন্নব নিচয়,
ধন ধাত্ত আদি পত্র অতি সুশোভন—

এক কালে বৃদ্ধি নাহি পায় কদাচন,
পুণ্যাপুণ্য পুষ্প যা'র—স্বথ হুংখ ফল
অপবর্গ পথে বাধা বাহা অবিরল,
বিধিৎসা ভ্রমের দল ঘুরে যা'র পাশে,
অজানতা মহাতরু :—জ্ঞান-নাশ-আশে
আসিয়া সংসার-পথ-শ্রান্ত পাণ্ডয়
স্বথ-লাভ-আশে, ছায়া করয়ে আশ্রয় ।
জ্ঞাস্তি জ্ঞান স্বথ তাহে পায় অহংকণ
শ্রাস্তি নাহি যায়, পায় কষ্ট অগণন । ৮-১১ ।
সৎসঙ্গ পাষণে যেবা শাণিত করিয়া,
এই তরু কাটে, বিদ্যা-কুঠার ধরিয়া,
সেই পারে স্বথে যেতে অপবর্গ পথে,
আরোহিয়া সদধ-দোহিত মনঃ-পথে । ১২ ।

হিন্দু সাহিত্য-প্রচারক
ভাবুকশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীর দার্শনিক প্রবর

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল



বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ—
সকলেই এক ভাবের ভাবুক, একই মস্তের
দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক।

কলিকাতা পিটল ম্যাগাজিন শাইরেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার পেন, কলকাতা-৭০০০০৯

গৃহস্থ

“ভারতবাসী ‘জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়’ বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই
ভুলিবেন না—পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-
বাৎসল্যের অদ্বীভূত হইবে না। প্রভূত পৃথিবীর অপর সকল
জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং শ্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত
হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও
উচ্চারণ করিবেন—

“জননী জমভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।”

ভূদেব

৫ম খণ্ড

৫ম বর্ষ

মাঘ, ১৩২০

৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

১। মাসিক পত্র

বহুদৈনিক মণ্ডলের শেষ ষোড়শ, প্রবীণ
সাহিত্যচর্চা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার
‘গৃহস্থ’কে আশীর্বাদ করিতে যাইয়া
মাসিকপত্র সম্পাদন বিষয়ে ছই একটা
কথা বলিয়াছেন। সাহিত্যসেবিত্বের পক্ষে
তাঁহা প্রয়োজনীয় হইতে পারে বিবেচনা
করিতেছি। এজন্য নিয়ে তাঁহার পত্র উদ্ধৃত
করিলাম :—

মাঘ—১

“গৃহস্থ বাঙ্গালা মাসিকপত্রে একটি
নূতন যুগ আনিয়াছে। সেই প্রথম যুগের
‘বঙ্গদর্শন’ হইতে এখন পর্য্যন্ত মাসিকপত্রের
একরূপ ধরণধারণ, ছন্দ-শ্রী ছিল, গৃহস্থ নূতন
ছন্দ নূতন শ্রী আনিয়াছে। সে যুগের সেই
আধাধিক্যাংশ নাই, এ যুগের ছোট গল্প বা
স্থলী বিস্তী ছবিও নাই।

গৃহস্থ আমাদের এ সময়ের যে সকল কথা
সমাজে প্রয়োজনীয় সেই সকল কথাই

আলোচনা করিতেছেন। আর আলোচনার পূর্বাং অতি নূতন ধরণের। তাহাতে কাব্যোপাখ্যান প্রায়ই থাকে না। আসল কথা কখন সংক্ষেপে কখন বিস্তারিত ভাবে থাকে। সৰ্ব্ব বিষয়েই, আত্মদৃষ্টি ফুটাইবার বিশেষ চেষ্টা আছে।

তবে (একটা কথা না বলিলে, আমার আপনার প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখান হয় না।) বাঙালীর স্বাভাবিকের কথাটা আর একটু ভাল করিয়া না বলিলে, বোধ হয়, আর সকল আলোচনাই বুঝা হইবে। সেই দিকে আমি গৃহস্থ-লেখকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

২। পাবনার তত্ত্বাবধি

পাবনা জেলার সাম্প্রতিক "স্বরাজ" অতি শিথ সংবাদপত্র, কিন্তু স্বসম্পাদিত হইতেছে। আমরা অনেক সময়ে "মফস্বলের বাণী"তে স্বরাজের রচনাবলী উদ্ধৃত করিয়াছি।

সম্প্রতি "স্বরাজের" পাঠকবর্গকে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় পাবনা জেলার একটা অজ্ঞাত, উপরনজাত, অনায়াত স্বক হৃদয়ের কাহিনী উপহার দিয়াছেন।

সংসারের কত নিভৃতস্থানে, লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে কত হৃদয় আপনি ফুটিয়া, আপন সৌরভে আপনি মজিয়া, অগোঁরবেই অকালে শুকাইয়া যায়, কে তাহার ইয়ত্তা করে? আমরা বলিতে পারি,—ভক্তিসামক-গণের নিকট এই শুষ্ক হৃদয়ের খাবারোগা আদর হইয়াছে ও হইবে। আমরা চৌধুরী মহাশয়ের রচনা উদ্ধৃত করিলাম—

"পাবনা জেলার অন্তর্গত তাত্ত্বিক নিবাসী শ্রীশ্রীপালচন্দ্র মৌলিক মহাশয় আত্মমনিক

একমাত্র সহধর্মিবীকে অসুল বৈধব্যসামরে ভাসাইরা ধরাধাম হইতে চির-অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামের এক কোণে নির্জন কুঠীতে তাহার বাসস্থান ছিল। একমাত্র সহধর্মিবী তাহার অনাড়ম্বর জীবনের সঙ্গিনী ছিলেন। পুত্রাদি কিছুই হয় নাই। পুত্রহারা বঞ্চিত হইয়া তিনি জীবনে বড়ই দ্রুত অহুভব করিয়া গিয়াছেন। আর্থিক অবস্থাও তত স্বচ্ছল ছিল না। লেখা পড়া বেশী জানিতেন না। স্থানীয় অল্পতম জমিদার শ্রীযুক্ত জানদাণোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়দিগের এট্টেটো সামান্য ৮- বেতনে জমাঝুনিচাকুরী করিতেন। কিছু জমিজমা ছিল এবং এই চাকুরীলব্ধ আয়ে একরূপ নিকৃষ্টপেয়েই সংসার-যাত্রা নির্বাহ হইত। ইহার জীবন-কথা সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়াই আপাততঃ আমরা তাহার ভগবৎভক্তি, দেশপ্রীতি ও সর্মহিলাসাধনা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

ঐতিহ্য সময়ে তিনি বিনা আড়ম্বরে প্রশান্তচিত্তে, আপনভাবে মজিয়া যে কতকগুলি গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই গুলিই উদ্ধৃত করিয়া তাহার ভগবৎপ্রেম, দেশপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ইহার একটা প্রধান ক্ষমতা এই ছিল, যখনই তেহ তাহাকে কোন বিষয়ের জগ্গ গান বা কবিতা রচনা করিতে অহরোপ করিত, তিনি তৎক্ষণেই তাহা এমন সুন্দর সরস মৌলিকভাবে রচনা করিয়া তাহাতে নিজেই স্বরসংযোগ করিয়া গান করিয়া দিতেন যে তাহাতে যুগপৎ হর্ষ ও বিষয়ে প্রাণ ভরিয়া উঠিত। দেশীয় নানা উৎসবে, তিনি অবশীলাকালে গ্রামাচ্ছাদি বাধিয়া দিতেন।

সাধারণ লোকে এই সমস্ত ছড়া অস্বস্তি করিয়া বড়ই আনন্দ অহুভব করিত। যশস্ত-কালে দোলাংগণের সময়, স্থানীয় জমিদার ভবনে যখন গ্রামান্তর হইতে গ্রামা কবির দল আসিয়া কবিগান করিত, তখন তিনি স্থানীয় সাধারণ লোক সংগ্রহ করিয়া নিজেই একল গঠিত করিয়া, অহুত ক্ষমতাবলে তৎক্ষণেই স্বরচিত গান আরম্ভ করিয়া দিতেন এবং বিপক্ষকে পাণ্ডা ছড়াতে পরাণ করিয়া দিতেন।

পঠক নিয়ন্তৃত কয়েকটা ভক্তিরসায়ক গানের প্রতি দৃষ্টপাত করিলে, তাহার ভগবৎপ্রেমের আভাস কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বাউল সুর

তাঁরে ডাক্কার মতন ডাকতে পারলে,
গেতে পারিস্ মন রচনা।
মিছে এদেশ সোদেশ যুবে মরিস্ গেটা

কেবল বিড়ম্বনা।

তাঁর দরায় বেঁচে আছে, তাঁরই রাজ্যে বাস করিছ, তাঁরই স্ত্রী বাঁধা পাছ, পুত্ৰ তাঁরই

রত্ন গোপা।
চম্বচকুর অগোচরে, আছেন তিনি স্বয়ংস্বারে,
দেখতে যদি চাওরে তাঁরে, এ চম্ব্ ছটা কর না

কাপা।

না চিনে মন সে রতনে, সার হ'লে তোর
আনা গোনা
বিজ্ঞ গোপাল বলে, স্বদয় তুলে, মনে একবার
ভুলে কে না ॥

এই গানটিকে কতখানি আত্মল আকাঙ্ক্ষা, ভগবানে কতখানি আত্মনির্ভরতা, মনের প্রতি কতখানি গভীর অথচ সরল উপদেশ, কেমন একটা অটল, প্রগাঢ় বিশ্বাস ইকিতে ব্যক্ত হইতেছে। তাহাতে দৃঢ়

আস্থা স্থাপন কর, বাহিরের নয়ন ছুটি কাণা করিয়া, দিব্যচক্ষে আপন অন্তরের রহস্যস্বাসনে তাহাকে বসাইয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা কর। বুঝা গলাবাকি করিয়া জীবনকে ব্যর্থ করিও না। নিজের ধর্মের দিকে তাকাও; অকাণ বাহিরে তাকে খুলিলে কি হইবে? তিনি কি বাহিরের জিনিষ? নিজেকে ভাল করিয়া চিনিয়া লও। চম্ব্ মেলিয়া চাহিয়া দেখ, কে তুমি, তিনিই বা কে?

এই সামান্য একটা গানের মধ্যে যে আত্মনির্ভর এবং হিন্দুত্বের সার প্রতিভাত, তাহা বিশেষ অমূল্যবান করিলে বুঝা যাইতে। হানে হানে অহরহরগচ্ছ থাকিলেও ইহা যে তাহার প্রাণের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষাও বেশ সরল, অরূপ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও কোন কঠকল্পনা নাই। এ হানে সমস্ত গান উদ্ধৃত করিয়া দেখান অসম্ভব। স্বতন্ত্র ভগবৎবিষয়ে আর একটা গান উদ্ধৃত করিয়া অন্যাকারমত স্মৃতি হইব।

যখন যাবে রে জীবন পারী উড়ি।
প্রাণশূন্য দেহ তোমার হবে ভূমে পড়ি।
ভাইবন্ধুসারস্বত, যারা তোমার অহুগত,
কাঁদিয়ে অধিরত, চারিদিকে ঘেরি,—
আসি' স্বদাত-বাহকলে, লয়ে যাবে হরিবলে,
চিতানলে দিবে ভণ্ড করি' ॥

হৃদনে হয়ে মত্ত, হুকণা করিলি কত,
না কবিলি তত্ত্বজন্মে, নিতা সত্য হরি;—
এখন চলছে যার কাছে, তার কাছে সব লিখা
আছে, সে রাজার শাসন সর্দোপরি ॥
যত কিছু দেখ ভবে, কিছু নাহি সঙ্গে যাবে,
একদিন পারে বেতে হবে, নাই কো

ছাড়াছাড়ি;—

বিজ গোপাল বলে ঘটন,

এই বেলা মন করি যতন,

দিন থাকিতে ধর হরির, অভয় চরণ-তরী ॥

এই গানটিতে একটা সহজ সত্যের ঘোষণা, ভয়-উদার প্রাণের, কাতর ক্রন্দন সমুজ্জ্বল।

এ সমার অনিত্য। এই পুন্-কলহাদি, এই বাসভবন,—এই আত্মীয়স্বজন এই পোষাক

পরিচ্ছদ, এমন কি এই দেহ সমস্তই অসার, 'নিনীদলগত জল মতিতরল'। যাহাকে

তুমি আপন আপন বল,—যাহাকে তুমি বড় আগ্রহে—অধীর আবেশে বুক চাপিয়া ধর,—

তাহারা কিন্তু তোমার দিকে ফিরিয়া চাচ্ছে না। সময়কালে হয়ত, তাহারা শুশ্রূষাকরে

জ্ঞাত করিয়া দায়িত্ব কাঁধে, তারপরই সব চূর্ণচাপ। তাহা হইলে এদের কি মূল্য

আছে? এদের পরিবর্তিই বা কি? যদি বুঝিতে, এদের শুশ্রূষার বোঝা বহন করার

জন্তই, অথচ বিনিময়ে—কোনরূপ উপকার লাভ দ্বয়ের কথা, সামান্য একটু আদর ও

কৃতজ্ঞতা পাইবারও আশা নাই; যদি বুঝিতে—এই অনাদৃত, শাস্ত্রস্বাক্ষর মেহের পরিণতি

শ্রমশানভণ্ডে, তবে আর কেন? এই সময়েই রূপ ছাড়িয়া সেই অনাথদীনতার শব্দ শব্দ

সত্য হরির শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ লও। ঠিক এইরূপ একটা ভাবের দ্যোতনা লইয়া গানটি

বচিত হইয়াছে।

বারাহ্মণের ইহার রচিত কতকগুলি শ্লোকে-স্বাকীতরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এরূপ আলোচনা বঙ্গসাহিত্যের ঐক্য বৃদ্ধি করিবে। স্বরাজের পথ অন্বেষণ করিয়া

বাসনার অগ্রাঙ্ক সাপ্তাহিক সমুৎপাদন-সেবার ব্রতী হউন।

৩। হিন্দু-সাহিত্য-প্রচার

বঙ্গ হিন্দু-সাহিত্যের প্রচার ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। কিন্তু আমরা আমাদের এই জাতীয় সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য এখনও সত্যাকারে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আরও কিছুকাল পূর্বা হিন্দু দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন-ব্যাখ্যা-ভাষণের যুগই চলিবে। পূর্বে গভীর ও ব্যাপক ভাবে আলোচনা করিবার সময় আসিবে।

হিন্দু আবিষ্কৃত জ্ঞানগুলি আমাদের প্রাচীন সমাজকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিত, এবং এখনও কতখানি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া বসে দেখেন নাই। সমগ্র জগতের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞান কোন্ স্থান অধিকার করিবে তাহা কেহ দেখান নাই। এমন কি, বর্তমান কলকারখানা-প্রাতিষ্ঠ যুগে সেই দর্শন-প্রতিষ্ঠিত সমাজ কোন্ আকার ধারণ করিয়া ভবিষ্যতে আদ্যমিগকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার আলোচনাও কেহ অগ্রসর হন নাই।

বিবেকানন্দ এ পূর্ব কিছু কিছু দেখাইতে ছিলেন—তাঁহার তিরোভাবের পর সে পথ কেহ ধরেন নাই।

একজন ধরিতে সমর্থ। তিনি আমাদের ভাবুকশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-বীর দার্শনিক-প্রবর ব্রজেননাথ শীল। আমরা বহুবার বলিয়াছি—“বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেননাথ—সকলেই একভাবে ভাবুক, একই মস্তের ঝটী, একই বাণীর প্রচারক।”

আমরা ব্রজেননাথের স্বাধোন্নতি কামনা করি। আমাদের ভরসা আছে—তিনি বিশ্বচিন্তায় ভারতীয় দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের ধর্মার্থ স্থান প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়া

ভবিষ্যৎ মনোবিজ্ঞানের জ্ঞাত রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

প্রচাপের “পার্মিনি-কাথ্যালয়ে”র স্থায় কলিকাতার উদ্বোধন-কাথ্যালয় হিন্দুসাহিত্য-প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র। আমরা এই কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত “শ্রীমাহাজ্ঞানচিহ্না-চরিত”র সংবাদ পাঠকগণকে দস্তাভিঃ। এ যাত্রায় গ্রন্থ পরিচয় দিব না। সম্পাদকের কৃমিকা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

“ভক্তাচার্য্য মহাহুত শ্রীমাহাজ্ঞান-পাদের জীবন-ঘটনা কয়েক বঙ্গবর্ষ পূর্বে বঙ্গের জনসাধারণের সম্পূর্ণ জ্ঞানবিস্তারিত ছিল। কখন কখন, শাস্ত্রজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি অর্ধবঙ্গের আলোচনা করিতে লাইয়া তাঁহার নাম ও তত্ত্বকে ‘শ্রীভাষ্যের’ দ্বৈতবারুদ শ্রীমাহাজ্ঞান প্রচারিত মতটিকে বঙ্গমহিমাদায়ী শব্দ-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠায় যতবিধেই বিস্তৃত থাকিত। এমতাবস্থায় মাটি ধারণ করিয়াই নিমিত্ত থাকিত। আচার্য্য জীবনেকানন্দ স্বামিজীই বর্তমান কালে নিম্ন বহুতা সকলে বিশদ ভাষায় শ্রীমাহাজ্ঞান ও তাঁহার বিশিষ্টদ্বৈত মতের সারোলেখ করিয়া তথ্যবয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে করেন। এবং অগ্রকর্তব্য শ্রীমাহাজ্ঞান স্বামিজীই প্রথম আচার্য্য রামাহুতের জন্মভূমি মাজার অঞ্চলে দীর্ঘকাল বাস ও মূল-গ্রন্থ সকলের সহায়ে ঐ আচার্য্যের অপূর্ণ জীবন, মত ও কার্য্য-কলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া বঙ্গের জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত উহা উদ্বোধন-পত্রিকায় প্রাথমিক আকারে প্রকাশিত করিতে থাকেন।”

যাহারা দর্শনের কূটত্ব এবং পারিভাষিক

শব্দ আয়ত্ত করিতে কষ্ট বোধ করেন তাঁহারাও এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অশেষ

উপকার লাভ করিবেন। প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক তথ্য এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এই জীবন-চরিতে দার্শনিকের সমাজ-চিত্র-অতিশৃঙ্খলিত পাইয়া জানলাভ করিয়াছি। ঐতিহাসিক রচনা হিমায়ে গ্রন্থটির বঙ্গসাহিত্যের বঙ্গ-বিশেষ।

স্বাধীন মনুষ্য-রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শক শ্রীমুক্ত কৃষ্ণবাহা আচার্য্যদ্বারা মহাশয় রামাহুতের জীবন-চরিত এবং বিশিষ্টদ্বৈতবার মতকে বহু স্বাধীন আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পুরাতন তামিল-সাহিত্য মধন করিয়া যে সকল নূতন তথ্য অবিকার করিয়াছেন তাহা তাঁহার Ancient India নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আপনারা এই ইংরাজী গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ করিলেও উদ্বোধন-কাথ্যালয়ে গ্রন্থপাঠে বিশেষ শ্রীতি ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শনে অগ্রগামী ছাত্রগণ এবং যুগপ্রচারক ও সমাজ-সেবকগণ সকলেই এই সুবৃত্ত উপাদেয় বাসনা গ্রন্থখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন।

এই সঙ্গে আমরা একখানি পুস্তিকার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা নবীন হিন্দুসমাজের তৌর্য্যকেন্দ্র দক্ষিণেশ্বর সংকলিত। নাম ‘শ্রীমাহাজ্ঞান’। ঠাকুর রামকৃষ্ণের দর্শনস্থানের পরিচয় কে না লইতে চাহেন?

অতীত, কলিকাতার লোটাঙ্গ, লাইব্রেরী। ভক্ত স্বাধিকারী শ্রীমুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইতিপূর্বে উপনিষদের একটি হুম্মর সটাক সংস্করণ প্রকাশিত ব্রতী হইয়া হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতা ভাঙন হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ, শ্রীমাহাজ্ঞানচিহ্না-বিব-

চিত সূর্যবোধ্য-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ মূল, অথবা, বাঙ্গালী প্রতীশক, বঙ্গাচু্যাব এবং তাৎপর্য সহ প্রকাশ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী কর্তৃক এই গ্রন্থ অনুদিত ও সম্পাদিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এই অমূল্য গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইল। বর্তমান গ্রন্থে বেদান্ত শাস্ত্রের সমস্ত বিবরণ সঙ্কলিত এবং উপনিষৎসমূহের তাৎপর্য সাংগৃহীত হইয়াছে। স্বতরাং সে হিসাবে হিন্দুর কাছে আপোচ্য গ্রন্থের উপযোগিতা ও মূল্য বড় কম নহে। বর্তমান সময়ে চরিত্র-গঠন-কাণ্ডে ও ইহা বোধের সাহায্য করিলে। বঙ্গ ভাষায় হিন্দু সাহিত্য প্রচার করলে "লোটাস লাইব্রেরী" যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন। বঙ্গীয় পাঠকবর্গ কি তাহার যথোচিত সমাদর করিবেন না? 'গৃহস্থ'-বিজ্ঞান-পাঠ করিলে ইহাদের নিয়মাবলী জানিতে পারিবেন।

ঐচ্ছ্যভাষী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিতাম্বরপুত্র ব্রহ্মচারী মহাশয় নানা বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া ইতিমধ্যে সাধারণ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সন্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত ও প্রকাশিত পঞ্চদশ টীকা ও বঙ্গাধিবাদ সহ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ এক অপূর্ণ ও উপদেশে গ্রন্থ। সম্প্রতি তিনি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের একটা সুন্দর ও সচিত্র সঙ্কলন প্রকাশে যত্নবান হইয়াছেন। ইহার প্রথম খণ্ড আমরা পাইয়াছি। ইহাতে মূল, অর্থ এবং বঙ্গাচু্যাব (শ্রীকীর গোপাধী ও শ্রীবিদ্যনাথ চক্রবর্তীর টীকা অবলম্বনে) আছে। অল্পবাদ বেশ প্রাঞ্জল। এক্ষণ বহুবায় পাশ্চাত্য শ্রীমদ্ভাগবতের সচিত্র সংস্করণ সম্পূর্ণ হইলে, আমাদের উপকার হইবে।

৪। তামাকের চাষ

তামাক অনেক গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রতিবৎসর আমাদের বাঙ্গালদেশে কম তামাক উৎপন্ন হয় না। প্রায় প্রত্যেক গৃহেই ন্যূনাত্মক পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়। সেই সকল গৃহস্থ নিজের প্রয়োজনীয় তামাক রাখিয়া কিছু কিছু বিক্রয় করিতে পারে। এই তামাকের চাষ কোন সময় কি প্রকারে হয় তাহাই বর্ণন করিব।

সাধারণতঃ তামাকের চাষ আশ্বিন মাস হইতেই বাঙ্গালদেশে আরম্ভ হয়। আশ্বিন মাসে গৃহস্থ গৃহের ধানিক মাটি চাষ করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। সেই বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইলে তাহা কবিত ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। সাধারণতঃ এক হইতে দেড় হাত অস্থর এক একটা চারা রোপণ করিতে হয়। যখন চারাগুলি বাঁচিয়া উঠিলে তখন চারার গোড়ায় মাটি দিতে হয়। চারা লাগাইয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, ঢাকিয়া না দিলে রোজতাপে মরিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। চারার গোড়ায় মাটি দেওয়া হইলে প্রত্যাহ গাছের পোড়া হাতড়াইয়া দিতে হয়।

তাছাড়া গাছগুলি ক্রমে বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। গাছগুলি অর্ধহস্ত পরিমিত লম্বা হইলে তাহার ডগা কাটিয়া দিতে হয় ও যাহাতে বেশী সংখ্যক পাতা বর্ধিত হইতে না পারে তাহা করিতে হয়। পাতা বেশী হইলে পাতাগুলি ছোট হয় ও পাতার মাল কম হয়। এইক্ষণ দুই তিনবার ডগা ভাঙিয়া দিতে হয়। যে সকল গাছ বীজের জন্ত রাখিতে হইবে তাহার ডগা ভাঙিতে হইবে না, ঐ সকলের ডগা বিত্তত হইয়া আপায় বীতি হয়। যে বৎসর বৃষ্টি কম হয় সেই বৎসর গাছের গোড়ায় জল দিতে হইবে। যে মাটি

সারযুক্ত ও সরস তাহাতেই তামাক প্রচুর জন্মায় এবং সেই স্থানের গাছ বলিষ্ঠ হয় ও অধিক মাল সংযুক্ত হয়।

আমাদের দেশে তামাক নানাজাতীয়। বাহিরবন্দর, শিবের জট, মতিহার, বিলাতি প্রভৃতি জাতীয় তামাক গাছ। ইহাদের চাষ এক সময়েই হয়। তবে বিলাতি জাতীয় তামাকের চাষ কিছু পুরে করিতে হয়। তামাক চাষ করিয়া মাঝে মাঝে গাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়িয়া দিতে হয়, তজ্জন্ত বিত্তত ক্ষেত্রবাদী এক প্রকার কাঠ নিষিদ্ধ ক্ষুদ্র লাঙ্গল ব্যৱহার করে, তাহা দিয়া গাছের গোড়ার মাটি ওলট পলট করিয়া দেয়। আমাদের দেশে রঙ্গপুর বাহের বন্দর তামাকের চাষ বেশী হয়।

রঙ্গপুর জেলার বাহেরবন্দর পরগণায় এই জাতীয় তামাকের চাষ প্রচুর হয়, তজ্জন্ত ইহার নাম "বাহেরবন্দর" তামাক হইয়াছে। এই তামাক বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্বিত্ব দিনাজপুর, কুচবেহার, জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় তামাকের চাষ প্রচুর হয়।

তারপর গাছগুলি বড় ও পাতা বাতি হইলে গাছগুলি কাটিয়া লইতে হইবে। গাছ কাটিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। যেরূপ আখিয়া ছায়ায় রাখিয়া শুকাইতে হইবে। রোজে শুকাইলে তামাকগুলির হানি হইবে। ছায়ায় শুক করিলে তামাকের তেজ রক্ষা হয়। পাতাগুলি শুক হইলে গাছ হইতে পাতা, পাতার গোড়ায় কাটিয়া বাহির করিয়া আবার কাটিতে আটকাইয়া শুকাইতে হইবে। এক্ষণে শুকান শেষ হইলে পাতাগুলিকে জাতায় রাখিতে হইবে, তারপর জাতা হইতে বাহির করিয়া বড়-নিষিদ্ধ ভূক্কাতে রাখিয়া

রাখিয়া দিতে হইবে। তৎপর প্রয়োজন মত এই ভূক্কা হইতে মাঝে মাঝে বাহির করা যাইতে পারে।

এই তামাক পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া লালী সংযোগে মিলুইয়া বোম্বোপযোগী করিতে হয়। ইহা প্রস্তুতের জন্ত কার্জনিকিত মূল্য, উত্তমল আছে, অথবা নিষিদ্ধেও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যাহারা তামাকের চাষ করে তাহারা প্রচুর লাভবান হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্র নিজের বাসভারী নিকটেই করিয়া থাকে, তবে বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ দূরে বিত্তত ক্ষেত্রও করিয়া থাকে। ব্যবসায়-হিসাবে তামাকের চাষ লাভ প্রচুর।

অথ বা বিনা পুজিতে প্রচুর লাভ অল্প ব্যবসায়ের হয় না। কোন কোন বৎসর অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন গাছ কাটিবার পোকা দৃষ্টি হয়। এই সকল পোকা পাতা-গুলি কাটিয়া খুঁড়িয়া করিয়া দেয়। এই সকল পোকা গাছের বহেষ্ট ক্ষতি করে। এই সকল পোকার দৌরাগা হইতে গাছগুলিকে নানা উপায়ে রক্ষা করিতে হয়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বিদ্যাহুগন মহাশয়ের নিকট তামাক সংস্কৃতির বৃত্তান্তটুকু পাইয়াছি।

..

৫। প্রাচীন ভারতের নবাবিকৃত কাববর

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের লক্ষ্যণের এক অংশ এখন পর্যন্ত "আবিষ্কৃত" হয় নাই। প্রতিদিন প্রাচীন ভারতের নূতন নূতন কবি, ঐজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদির রচনা শুনিতে পাইতেছি। সম্রাট দক্ষিণ জিহাঙ্গীর হইতে ত্রিবেঙ্গমবাসী পণ্ডিত গণপতি

শাস্ত্রী মহাশয় ভাস কবির নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি
আবিষ্কার করিয়াছেন—১। ষপ্ন বাসবদত্তা;
২। প্রতিজ্ঞা যোগেশ্বরায়ণ; ৩। পঞ্চরাত্র;
৪। চাক্রবর্ত্ত; ৫। দূত ঘটোৎকর;
৬। অবিস্মারক; ৭। বাসচরিত; ৮। মধ্যম
ব্যায়োগ; ৯। কর্ণভার; ১০। উল্লভঙ্গ;

আমরা ভাসকবির নাম বহুদিন হইতেই
শুনিতা আসিতছিলাম। কিন্তু তাঁহার কোন
গ্রন্থ এতদিন আমাদের চক্ষে পড়ে নাই।
শাস্ত্রী মহাশয় এতদিনকার একটা অতাব
ঘটাইয়াছেন। তাঁহার গবেষণা ও পরিশ্রমের
জ্ঞাত ভারতবাসী মাথেরেই রুতজ্ঞ।

ভাসকবি কোন সময়ের লোক, তাহা
এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। আমরা আশা
করি শীঘ্রই তাহা নিম্নরূপের জ্ঞাত বিশেষ
অহমদান আরজ হইবে। “পণ্ডিতেরা
বিচার করে লয়ে তারিখ, সাল।” এই
বিচারের স্বত্বপাত হইয়াছে—তাহা এখন
পূর্ণাঙ্গ ‘অহমদান’ মাত্র। তবে জগদেব মিশ্র
(পঞ্চদশ), রাজশেখর, বাণভট্ট এবং ‘কালিদাস’
প্রভৃতি বহন তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন,
তখন তিনি যে ইন্দ্রাবীর পূর্ববর্ত্তী লোক, সে
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই হিমাচল
নহেন। তাঁহার গ্রন্থে আমরা আমাদের
জাতীয় সভ্যতার যে চিত্র পাইতেছি, তাহাও
আমাদের অতি প্রাচীন সমাজের বিবরণ।

অতএব ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে
যেলেও ভাসের প্রতি আকৃষ্ট হইবার আ-
বশ পরেই কারণ আছে। কিন্তু সর্বাঙ্গের
বহু কারণ—তাঁহার কবিত্ব। কি যুগের সহজ-
সরল প্রাপশ্রুতি রচনা! কেমন সহজ
ভাব! চরিত্র-অঙ্গনে কিরূপ আদারগ
নৈপুণ্য! আমরা ভবিষ্যতে তাঁহার চাক্রবর্ত্ত,

পঞ্চরাত্র, ষপ্ন-বাসবদত্তা, যৌগন্ধ্যায়ণ প্রভৃতি
গ্রন্থ হইতে দেবাইতে চেষ্টা করিব—
আমোদ্য-ভিহের গ্রাম তাঁহার কি যুগের
প্রকৃতি-বর্ণনা! মনোবিজ্ঞানে তাঁহার কি
নূহ্য দৃষ্টি! “নীতি শাস্ত্রে” তাঁহার জ্ঞান কত
গভীর!

কলম্বু আবিষ্কৃত নবত্বমণ্ডলের ত্রায় নবা-
বিষ্কৃত ভাস কবির গ্রন্থাবলী বাস্তবিকই
আমাদের কাছে বড় কৌতুহলপ্রদ, বড়ই
আনন্দদায়ক। আমরা এতদিন কালিদাস,
ভগবতী, ভারবি প্রভৃতি কবির গুণে মুগ্ধ
হইয়াছিলাম। ভাস আমাদের কাছে আবার নতুন
বাণী শুনাইবার জ্ঞাত আসান করিতেছেন।

আমরা আশা করি, অচিরেই ভাস গ্রন্থাবলী
বিখ্যাতলাল-টোল প্রভৃতিতে পাঠ্য পুস্তকরূপে
বাস্তব হইবে। সম্ভবত বৌদ্ধ কাব্য
“সৌন্দর্য-নন্দ্যে” ত্রায় ভাস-গ্রন্থাবলীর কয়েক-
বানা আমরা ‘গৃহস্থ’র জন্ত বড় ভাষায় প্রচার
করিব—সহজ করিয়াছি।

৬। দেবোত্তরসম্পত্তি

অখ্যাপক ব্রীহস্পতি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
এম. এ, বি. এল, সি মহাশয় হিম্মদ্যমাজের
একজন বিচক্ষণ সৈনিক। তিনি আমাদের
দোষ নিবারণের জ্ঞাত সময়ে সময়ে আলোচনা
উপার্জন করিয়া থাকেন। আশা করি,
তাঁহার প্রশংসিত সঙ্গরথতার সহিতই
আলোচিত হইবে। এবার তিনি দেবোত্তর
সম্পত্তির প্রতি বেশবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ
করিতেছেন।

বাহার। পাণ্ডাবাদর ঠকাইবার জ্ঞাত বা
মাতাল ছেলেরা যাহাতে বিষয়টা নষ্ট না করে
সেইজ্ঞাত নিজের সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া

থাকেন তাহারেই কথা কিছু বলিতে চাহি না।
কিন্তু তীর্থযাত্রার যে সকল বড় বড় দেবালয়ের
সম্পত্তি আছে—যাহা সাধারণের প্রদত্ত অর্থ
হুতুইতেই সঞ্চিত হইয়াছে—তাহাদের সম্বন্ধেই
আলোচনা করিবার জ্ঞাত সাধারণকে আসান
করিতেছি।

বর্তমানকালের হিন্দুর প্রধান দোষই দেখি
কেহ বিচার করিতে চাহে না, কোন কাজটা
ভাল হইতেছে কেনটা মন্দ হইতেছে সেটা
যুক্তির সাহায্যে অবধারণ না করিয়া তাহার
অন্তভাবে পূর্ণপ্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিয়া
চলিবে। এরূপ অবস্থায় সাধারণের কোনও
রূপ উন্নতি সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

আমি একজন কৃতবুদ্ধ ভ্রমলোককে বলিয়া
ছিলাম “আপনার গুরুঠাকুর বড় বিদ্বান”
এবং তাঁহার কয়েকটা আচরণ ভাল বলিয়া
মনে হয় না। তাহাতে তিনি উত্তর
করিলেন “বাগে গুরু নিম্নায় অধোগতি,
ঠাকুর মশায়ের কোনও নিম্না আমার কাছে
করিবেন না।” বাস, এক কথায় সব চুকিয়া
গেল। গুরু যথোক্ত আচরণ করিতে যাহান
শিষ্টের গুরুভক্তি তাহাতে চলিবে না। এমন
না হইলে কি আত্ম এত ভণ্ড প্রতারণক গুরু
গিরির ব্যবসা চালাইয়া মধ্য বৃত্তিতে পারিত?

যদি কোনও ব্যক্তির পীড়া হইল তাহার
বাড়ীর মহিলাগণ “মানসিক” করিলেন, পীড়া
আরোগ্য হইলে কোনও প্রসিদ্ধ দেবতার
পূজা দিবেন। কিন্তু কেহ কি ভাষিয়া দেখেন
না এই যে তাঁহার দেবতাকে অর্থ দিলেন,
সে অর্থ কে ব্যাধার করিবে, কিরূপ কাণ্ডে
ব্যবহার করিবে? দেবালয়ের মোহন
মহারাজেরা ও পাণ্ডা প্রভৃতি এই সকল চিন্তা-
হীন ব্যক্তির অর্থে ধনী হইয়াছেন, কাজেই
যদি এই দরিদ্র লোক তাঁহাদের নাম ধাম

দিয়া তাঁহাদের দুর্ভাগ্য সকলের কথা প্রকাশ
করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে
মানবানির অভিযোগে আন্ত্রিক হইতে
হইবে। আর বাহারা এই সকল দেবালয়ে
অর্থ দেন তাহার কি জ্ঞানেন না তাহার
কিরূপ শয্যা হইবে? খুব জ্ঞানেন। কিন্তু
চক্ষু থাকিতেও যে অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও যে
বধির, তাহার আর উন্নতির আশা কোথায়?

আরও আকর্ষণের বিষয় এই যে এদেশে
এতগুলি ইয়ারিক ও বাঙ্গালী সংবাদপত্র
রহিয়াছে, তাহাতে কত ইউরোপীয় রাজনীতির
বিশ্লেষণ, আরবদেশীয় উটের যুদ্ধ প্রভৃতি
বিষয়ে আলোচনা বাহির হইতেছে, কিন্তু
এই দেবোত্তরসম্পত্তির অপব্যবহার সম্বন্ধে
একটা কথাও ত দেখিতে পাই না। ইয়ারিকী,
বাঙ্গালী, হিন্দী সমস্ত সংবাদপত্রে যদি দিনের
পর দিন এ বিষয়ে লেখা হইতে থাকে, তাহা
হইলে নিশ্চয়ই মোহনগণের চৈতন্যোদয় হয়
এবং সাধারণের অর্থ ভোগবিলাসে ব্যথিত না
হইয়া দরিদ্রের সেবার নিয়োজিত হয়।
এ বিষয়ে কোনও আইন হওয়া সম্ভব নয়,
কেননা ইয়ারিকগণেরই আমাদের ধর্ম
হতুক্ষেপ করিতে পারেন না। কিন্তু যদি
আমরা, যাহাদের অর্থে এই দেবোত্তরসম্পত্তি
পুণ্ড হইয়াছে ও হইতেছে, দেখিতে চাই যে
দেবতার অর্থ দেবতার প্রিয় কাণ্ডে ব্যয়িত
হইবে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ না হউক আংশিক
রূপে যে আমরা কৃতকাব্য হইব সে বিষয়ে
সন্দেহ নাই।

জানি না কবে দেশের মধ্যে সে ভ্রাতৃত্ব ও
যুক্তির আবির্ভাব হইবে। যতদিন তাহা
না হয় ততদিন অজ্ঞানদেহ গৃহস্থগণের নিকট
আমার সনির্ভর অহরোধ যে তাঁহার মা
কালী ও বাবা মহাদেবের নামে যে পূজা

‘মানসিক’ করেন, তাহা তীর্থস্থানের কলঙ্করূপ পাণ্ডা ও মোহনগুণের হস্তে না দিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় লাগাইবেন। ব্যবসায়ীর ভিখারীর কথা বলিতেছি না। আপনার বাড়ীর আশেপাশে যে সকল ভদ্রলোক ১৯১২-৩ চাকরসম্ভার প্রতিপালন করিতেছেন তাহাদের অধীনস্থিষ্ট স্থানগুলিকে ‘মানসিকের’ অর্থে খেলনা ও মিষ্টান্ন কিনিয়া দিন। শিশুর মুখে হাসি ফুটিবে, দেবতা আপনার উপর ক্রীত হইবেন।

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানবিৎ শ্রীমুক্ত জামেন্দ্রলাল রায় এম, এ, বি, এন্স মহাশয় “নাতিহা”-পরে ‘বান্দালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি’ শীর্ষক প্রবন্ধের আর কয়েকটি অঁভাব আলোচনা করিবার জন্ত সাহিত্য-সেবিগণকে আহ্বান করিয়াছেন। আশা করি—বঙ্গের লেখকগণ বর্তমান সম্ভা গুলির প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হইয়া সাহিত্য সেবার দ্বারা জাতীয় জীবনকে উন্নত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

৭। অস্বাস্থ্যের প্রতীকার

জনসাধারণের শক্তি বর্তমানে অস্বাস্থ্যগতির চেষ্টায় নিয়োজিত হইবার যে আভাস দেখা যাইতেছে তাহা দেশের পক্ষে হুলস্থল। এতদিন লোকে কিসে অর্থ উপার্জন হইবে এই চিন্তায় সদাই ব্যস্ত থাকিত বর্তমানে দেশে যদিও মহার্ঘ্যতাই দুর্ভিক্ষের রূপান্তর হইয়াছে—লোকে যদিও ধর্ম্মার্থকামযোগের মধ্যে কেবল অর্থকেই উপাসনা করিতে প্রয়াসী থাকিতেছে, তথাপি শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনের উন্নতির দিকে লোকের আকর্ষণ ও জাগিয়াছে। এখন লোকে সেই

জন্ত “শরীরমাধুর্যং ধর্ম্ম ধর্ম্মমাধুর্যং” বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য বুঝিতে শিখিতেছে।

বঙ্গের ৩৩ শতক্ৰী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বালক যুবক যুগ সকলেই শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্ত পূর্ণ উদ্যমে লাগিয়াছিল। পরে সরকারের কুদৃষ্টিতে যখন উদ্যম সমূলে বিধৌত হইল—যখন সমিতি মাঝেই রাজ-হোঁহিয়ার প্রধান আড্ডা বলিয়া বিবেচিত হইল, তখন ‘বলিষ্ট যুবক’ মাঝেই ডাকাতের প্রধান সঙ্গীর বলিয়া ধৃত হইতে লাগিল। তখনে পাই, আজকাল খুলনা যশোহর প্রভৃতি জেলায়—হুগল সবল বালক মাঝেরই উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বান্দালীর বহুজেননাও, এ যথেষ্ট কি জুনি আন্দোলন তুলিবে না?

সন্তানের শক্তি স্বাস্থ্য-সামর্থ্যই যখন পিতা-মাতার যথার্থ ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল, তখনই বান্দালা আবার জুজুর দেশে পরিণত হইল। যুবক যেন আবার ককালদার বালক; লাভাঘা ও শ্রী দেশ ছাড়িয়া পলাইল। দেশ আজকাল ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি নানাবিধ বিজ্ঞাতীয় খেলায় পূর্ণ হইতেছে। ফলে কাহারও হস্ত কাহারও পদ ভগ্ন হইতেছে। তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই, কিন্তু তাহার পরিস্রামাহুয়ারী স্বাভাভাবে অস্থিরকালগার হইয়া নানাবিধ ব্যাধির আকর হইতেছে। অমৃত বোধ হয় গরলে পরিণত হইতে চলিয়াছে! অপরদিকে বিদেশী জিনিষে স্বদেশীর তর্পণ হইয়া বিদেশীয় বণিকের বেশ দক্ষিণান্তও হইতেছে। ঝাড়ের বাগ বাড়ীতে শোভা পাইতে লাগিল—দেশী মৃগের কাহারও আশ্রিনায় কাহারও চুল্লিতে আশ্রয় পাইল। যাহা হউক, বালক আবার স্বস্থানে স্থলী হইয়াছে—যুবক আবার উত্তম কোরাণী

নিষ্কর্ষা ছলমাঠার বা ওকালতনামাহীন উকাল হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিল—গুরু হাপ ছাড়িয়া বাচিল—পিতামাতা স্থস্থির হইলেন—সরকারও নিরাপদ বিবেচনা করিলেন। বৃথিলে—অস্বাস্থ্যের দেবতা কেন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছেন?

এখন প্রায় সকল পীড়ার মূল কারণ ম্যালেরিয়া বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এক ম্যালেরিয়ার বৎসর্যাতলে বাইতে বসিয়াছে। বীর্যম্ প্রভৃতি দুই একটি জেলা ভিন্ন প্রায় সর্বত্রই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এই ম্যালেরিয়া কিরূপে কি উপায়ে দেশ হইতে বিতাড়িত করা যায় এখন ইহাই গণবন্দি ও জনসাধারণের মহা সমস্যা।

অনেকে দেশের দুর্ঘট জল-বায়ুই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। আমাদের বিবেচনায় ম্যালেরিয়ার কারণ দুই—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। জলবায়ুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যথেষ্ট অবনমনোগে বাহ্যিক কারণ হইতে পারে; কিন্তু আমরা যে অনাহারী বা অর্ধাহারী এবং বস্ত্রহীন ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রধানতম কারণ বলিলে অস্বাস্থ্য হইবে কি? ধন-বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতগণ, আপনাদের কি মত?—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, আপনারা কি ধন-বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়া লোক সমাজের স্বাস্থ্য সঞ্চদে মত প্রকাশ করিতে সাহস করেন? অন্নবস্ত্রের অভাব যতদিন আছে, ততদিন স্বাস্থ্য বঙ্গ আসিবেন না।

খাট পয়সায় ম্যালেরিয়া-নাশক—শাস্ত্রও কথিত আছে—“ক্ষাম্ কৃষা যুতঃ পিবেৎ”। কিন্তু প্রধানৈত: অর্থাভাবেই আমাগণকে ইহার উপকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। আজ কাল দেশে সব জিনিষই ডেজাল—

অক্লিম্ ত্রয়া দুঃখাণী—ইহাই পীড়ার একটা প্রধান কারণ। সমাজে, দেশে, বাগারে এত ডেজাল মাল কেন চলিতেছে? আমাদের দোকানদারেরা সকলেই অস্বাস্থ্য, দুঃখরাজ ও অসুখ—এ কথা বলিলে চলিবে না। উহা superficial মত মাত্র, একটা ভাসা ভাসা অগভীর অস্থস্থানের পরিচয়। যে কারণে দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকে ঘাস পাতা খাইয়াও বাচিতে চেষ্টা করে, সেই কারণেই আমরা সাধারণ সময়ে অসুখীকর, স্বাস্থ্য-হানিকর খাদ্য পাইলেই রুতার্থ বোধ করি।

দুর্ভিক্ষ আমাদের লাগিয়াই আছে—কাহ্নেই আমরা—মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী সকলেই কোন উপায়ে শরীর ধারণ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাই। ডেজালেও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না—ডেজালই আমরা চাই। আমরা দরিদ্র, শিল্পহীন, ছনিয়ার মতো মল্লুর,—সুতরাং অতি “স্ববোধ বালক”—যা পাই তাই খাই! অন্তরঃ দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকেরা ‘যাহা চায়, যাহা demand করে, আমরা যুব স্ব্থের সময়েও তাহা অপেক্ষা পুষ্টিকর, স্বাস্থ্য-কর মাল demand করিতে পারি না। ইহা তোমাদের ধন-বিজ্ঞানের মত। এইমত যদি খণ্ডন করিতে পার, তবে তোমাদের এম, এ, পি, এইচ, ডি, ডিগ্রির বাহাদুরী দিব। গবন্মেণ্ট ত মাঝে মাঝে অস্থস্থান-সমিতি বসাইতেছেন। “বিশেষজ্ঞগণ” বস্তা বস্তা রিপোর্ট বোধ হয় প্রকাশ করিয়াছেন। সেগুলি পড়িতে পড়িতে আয়ু হুয়াইয়া আসিবে—স্বাস্থ্য ফিরিবে না। সরকার বারোছর কি practical হইবেন না? দুর্ভিক্ষের অবস্থা কাটিয়া গেলেই ডেজাল আর চলিবে না—স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে।

দেশ বেলে ছাইয়া ফেলিল—বাগিছার

সৌকর্য্যার্থে অনেকেই ইহার অহুমোদন করেন সত্য। কিন্তু ইহা একদিকে যেমন উপকার দর্শাইতেছে, অত্রিকে সেইরূপ জ্বলের চলাচল বন্ধ করিয়া দেশে ম্যালেরিয়ার বীজ উৎপাদনে সহায় নিয়োজিত। যেখানে জলময়ন হয়, সেখানে প্রায়েই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। বড় বড় নদীর উপরে প্রকোপ সেতু নদীর প্রোত বন্ধ করিতে উঠে। ইহাও ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া অহুমিত হয়। “অমৃত বাজার পত্রিকা” এ সব কথা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন।

আজকালকার সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত মানব অধিক পরিমাণে সহরবাসী হইতেছেন— দেশ ছাড়াইতেছেন—গ্রাম থেকেই হইতেছেন। সম্মান-সকলে হরিমান যে গ্রাম উদ্দেশ্যিত হইতে—শম্ভু খটয়া দিক মুখরিত হইতে—খুপ-ধূনার গন্ধে দিক আমোদিত থাকিত—জন-ফোলালে সহাই জীবনের লক্ষণ সূচনা করিত, এখন সেখানে শিবির চাঁৎকার, কাকের কা কা শব্দ, লতা-পাতার পুতিগন্ধ ও স্থির নির্জনতা মুহূর্ত্তর পূর্ণ লুপ্ত হইয়া কবিতা হইতেছে। গ্রামের পুষ্কর সহিত বন্ধের পতন অনিবার্য—বন্ধের শৌর্য্য-বোধ, বুদ্ধি-প্রার্থ্য্য সবই এই গ্রামের পরিপক্ব ফল। প্রতাপ, সীতারাম, বেদার রায় সকলেই গ্রামবাসী ছিলেন—গ্রামই ইহাদের লীলাক্ষেত্র, গ্রামই ইহাদের উন্নতিস্থল, মান-সম্মানের প্রধান উপায়। এই গ্রামকে উন্নত করিতে না পারিলে দেশ উন্নত হইবে না। সহরবাসী আর কয়জন?— মুষ্টিমেয়, দ্বারহীন, ক্ষীণকর্ত্ত, অস্থি কঙ্কাল-সার সহরবাসীর সংখ্যা কত? কিন্তু ঐ যে সহস্র সহস্র শত শত লোক গ্রামে বাস করিতেছে—ঐখানে দেশের প্রাণ—ঐখানে

বেশের শক্তি—ঐখানেই দেশের সব আশা ভরসা। এখন যে পল্লীতে স্বাস্থ্য নাই তাহার জন্য প্রধানতঃ ধনধান এবং বিদ্যানেবাই দায়ী।

আজকাল সবাই ভক্তার সবাই কবিরাজ, সবাই চিকিৎসক। এক বোলল জল, দুই এক শিশি কুইনাইন এবং একটা চিকিৎসার ইলেনই আজকাল ভক্তারী চলে। অবশ্য, এরূপ ‘হাতুড়ে’ ভক্তার না থাকিলে আবার অনেক দরিদ্রের কুটীরে হারবার লাগিয়াই থাকিত—তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু ইহাও সত্য যে,—এই অভিনব চিকিৎসক-সম্রাজ্য দেশে—পীড়ার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছেন। কুইনাইন একেই এদেশের লোকের ধাত্তে অসহ্য, তাহাতে আবার ইহার অপ্রয়োগ, এ ছুয়ের সংমিশ্রণে দেশের সমুদ্র ক্ষত হইতেছে। তবে আমরা এ কথা বলি না যে ইহাদের মধ্যে ছাদুপ জন যথার্থ মানব-হিতের জন্য চিকিৎসক-ব্রত অবলম্বন না করিয়াছেন—বাঁহারা এরূপ দায়িত্ব লইয়াছেন, ভাব ধরয়ে পোষণ করেন, তাহারা আমাদের নমস্। এদিক সরকার বাহাদুর “মেডিক্যাল বিল” জারি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহার প্রভাব হইতে রক্তা পাইবার জন্ত এক্ষণে লোকহিত-ব্রত শূন্যচিত চিকিৎসকের উদ্ভব একান্ত আবশ্যক।

একদিকে যেমন ভক্তারের প্রাচুর্য্য, অপর দিকে অনেকে ছুই একখানি রায়ান-শাশ, ডেজকা-রসায়নী প্রভৃতি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাণ্ডাপাণ্ডা সামান্য চিনিলেই কবিরাজ বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন। ইহাতে আমাদের আয়ুর্কেন্দ্র-শাস্ত্রের সন্মানে পরিবর্ত্তে চর্য্যম রটিতেছে। যে শাস্ত্র দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্ত মহাতপা

ভরষাধ মুনি ইন্দ্রেরমনি কশিকা করিয়াছিলেন, রোগ সকল প্রাচুর্য্য হওয়ার মুনি রঘুদিগের তপস্তাদির বিষ হওয়ার অদিগ, বশিষ্ঠ, আত্রেয় চাবন, কাত্যায়ন ঐমৈত্রেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ—

“দ্বিযজুতাসুদারোজ্য প্রাজুত শত্রুরিণাম্ তপোপাধ্যায়ানরকচর্য্য ব্রতযাম্।”
“দুর্ধাৰ্খ্যকাম্যমোক্ষনামাগোষ্যম্ মূলমন্ত্ৰম্।”
ইত্যাদি শ্লোকে প্রাজুদিগের দীর্ঘায়ু সাধন কথিতে উজ্জ্বল হইয়া ভরষাধের নিকট যে আয়ুর্কেন্দ্র শাস্ত্র শিক্ষা করেন, মিত্রতা পরামর্শ পূর্ব্বকই সর্ব্বভূতের প্রতি অহরুপা বশস্ত ছয় জন শিষ্যকে যে পবিত্র আয়ুর্কেন্দ্র-শাস্ত্র শিক্ষা দেন, তৎপরে অগ্নিবিশ প্রভৃতির সাংগ্ৰহ সকল-ব্যবহার্য্য মহর্ষির অহমোদিত হইয়া যে শাস্ত্র পৃথিবীতে প্রভিত্তি লাভ করিয়া ভূতগণের মল সমল করিয়াছে, আর তাহার এই দুর্দশা! আজকালকার মহামোহাপাণ্ডায় কবিরাজগণ পাচন-বড়ীর দোহানদারী করেন যাহা, আত্রেয় শাস্ত্রে নবজীবন সঞ্চারিত করিতে তাহাদের সজ্ঞাই চোঁঠা দেখা যায়।

ওষধিদিগের প্রয়োগ, নাম ও রূপ অরণত না হইয়া আজকাল অনেকেই *উদ্ভিদবিৎ হইতেছেন—উদ্ভিদবিদ্যা-বিশারদ না হইয়াই, আজকাল অনেকে দেশ, কাল ও ব্যক্তিতে ওষধি প্রয়োগ না করিয়াই ভিত্তিক-শ্রেষ্ঠ হইতেছেন।

যে ভারত উদ্ভিদের দেশ—যেখানকার উদ্ভিদ দেশবিদেশে প্রেরিত হইয়া ভিষাগের এখানে বহুমূল্যে বিক্রয় হইতেছে—তাহার এই দশা! কেবল উষ্মভূত চিকিৎসকের অভাবে দেশের নানাবিধ অক্ষয়ণ হইতেছে, দেশীয় পাঁচনের যে কত ফল তাহা কি কাহারও অজানিত? এই আয়ুর্কেন্দ্র-শাস্ত্রের যত উন্নতি হইবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

বাধ্যাধ্যায়ের বিচার শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী—দেশের জলবায়ুভেদে বাত-জ্বরের তারতম্য হয়। শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—এইজন্মই বাত বিভি। কিন্তু আমরা এতই অহরুপ-প্রায় যে, বাতাত্মক

অবিচার করিয়া অনেক সময়ে ‘পীড়া’কে ভাঙিয়া আনি।

শরীর ও মন অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—একের অশান্তিতে অত্রের অশান্তি। যতদূর সম্ভব মনের শান্তি রাখিরা যথেষ্ট জীৱন যাপন করা কৰ্ণব্য। অনাতার, অত্যাচার, দুর্দাবহার, অবিবেচনা, অপকৃপাত্ত প্রভৃতি নানা কারণে বাতালার বাত্বা হইয়া। এই অবসার ও অশান্তি দূরীকরণের প্রধানতম কৰ্ত্তব্যসুনিহিত্য সর্ব্বশক্তির আধার ত্রায়বিচারক জগদীশ্বর—তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করা।

সর্ব্বগণেই যুবকরূপের নিকট আমাদের নিবেদন—তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রুতী সন্তান হইতে যাইয়া যেন শারীরিক পরিশ্রম হইতে একবারে বিরত না হন। তেঁদের মুগ্ধ করার জন্ত অতিক্রম্য মানসিক পরিশ্রম, সাধারণ ছাত্রাবাসের অপুষ্টিগর খাদ্য, বহুদেশে নিঃশ্বাস-প্রবাহের দূষিত বায়ু গ্রহণ, আধাঃশেষে বিশ্রামাভাব, জীবনে উৎসাহাভাব প্রভৃতি নানা কারণে—তাঁহাদের শরীরে, অস্বাস্থ্যের বিষ প্রবেশ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনও যে কত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছে—তাঁহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধ্যক্ষে অনেকে সামান্য চাকুরীর অভাবে যেন দিশাহারা “পঞ্চাশত পক্ষিকের ছায়া, স্রোতোমুখে ভূতলভার ভাগিতে থাকেন! ইহাই তাঁহাদের মানসিক দুর্দলতার প্রমাণ। বর্তমান শিক্ষা প্রণালীতে মানসিক বৃত্তি ক্ষীণ ও দুর্দল হইতেছে—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুষ্টিগর খাদ্য, নিশ্চল বায়ু, শারীরিক পরিশ্রম, ত্র্যক্ষচক্ষু, সং সাহস, আশা-ভাষা, আলোদ, সাধুচিন্তা, এবং স্বাধীন-প্রবৃত্তি, শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রকৃত সাহায্য।

যেপক্ষ ভীষণ ব্যাপার দেখিতেছি, একমাত্র গবমেণ্টের প্রবল শক্তিতে স্বাস্থ্যকে বহুদেশে ফিরাইতে পারিবে। সমগ্র সমাজব্যাপী এই দুর্দৈব পুষ্টিগর নিবারণ করা অর্ধশতাব্দী-প্রাপ্ত জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য

কুহু কুহু চেঁচাই ও কিছু কল আছে, সে
চেঁচা আমাধিপকে করিতেই হইত। আর
আমরা যেন বাহ্যে বজ্র চিৎকাল কাটাইয়াই
মরিতে শিখি—“এই কিরে, এস কিরে, এস
ফিরে গো।” একন্দ্রন বিভাভা শুনিবেন।

৮. ঢাকার নমঃশ্রেয় গায়ক

কুশাই সরকার

কুশাই সরকারের জন্মস্থান ঢাকা জেলার
অঙ্গরগত কেরানিগঞ্জ থানার অধীন শুভাড়া
গ্রাম। গত কালিক মাসে তিনি তিনটা পুত্র
রাখিয়া যাইট বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ
করিয়াছেন। কুশাই নমঃশ্রেয় (চণ্ডাল)
বংশসম্মত। তাঁহার বাল্যাবধিই পরিবারিক
অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। স্বতঃস্ফূর্ত
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া
উঠে নাই। তিনি নিম্ন চেঁচা ও উচ্চাঙ্গীকতা
দ্বারা ঘরে বসিয়াই সামান্য লেখা পড়া
শিখিয়াছিলেন।

তাঁহার কবিতা-স্বচনাশক্তি অতিশয় প্রবল
ছিল। অতি অল্প সময়ে তিনি স্বন্দর স্বন্দর
কবিতা লিখিতে পারিতেন। বিংশ বৎসর
বয়সে তিনি বেশীয়া ভাটদেয় ছাত্র নামাধিষ্টি
কবিতা লিখিয়া পূর্ববঙ্গের গণ্যমান্য লোক-
দিগকে উপহার দিতেন। তিনি পুরাকায়
রূপক তাঁহাদের নিকট হইতে তাহা কিছু
পাইতেন উহাই তাঁহার পরিবারস্থ লোকদের
ভরণপোষণ পক্ষে যথেষ্ট হইত। পূর্ববঙ্গের
অধিকাংশ রাজা, জমিদার ও ধনীরা কবিতার
তিনি বার্ষিক বৃত্তিও প্রাপ্ত হইতেন।
প্রতি বৎসর ভাত্র মাস হইতে তিনি এক বিত্ত
সংগ্রহ করিতে বহির্গত হইতেন। এক কি
দেড় মাস মধ্যে বৃত্তির টাকা সংগ্রহ করিয়া
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। বৃত্তিলভু অর্থ
দ্বারা তিনি প্রতিবৎসর সমাজসেবারে সহিত
শ্রীশ্রীধরী ভগবতীর পূজা নির্বাহ করিতেন।

তিনি স্বন্দর স্বন্দর গান রচনা করিয়া,
বাউলের দ্বারা সাতায় সাতায়, পল্লীতে পল্লীতে
ও সহরে সহরে গান করিয়া প্রচারিতেন।
এই উপায়েও তাঁহার অর্থ উপার্জন হইত।

বহুলোকে তাঁহাকে শমাদর করিয়া নিকটে
বসাইয়া তাঁহার গান শুনিত এবং ছাত্রার
পণ্যমা বকশিস দিয়া বিহার করিত। এই
উপায়ে তিনি দৈনিক ১২ হইতে ২০ টাকা
অর্জন করিতেন। ইহা দ্বারা ই তাঁহার
পারিবারিক ব্যয় সম্বলন হইত এবং অজিত
অর্থের কতকংশ প্রতিমাগেই মজুত থাকিত।
বৃত্তিলভু অর্থ তিনি দেবপূজায় ও সংকারণ্যে ব্যয়
করিতেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থার বিশেষ
উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারবর্গ এই
বিশেষ ধন-সম্বলন্য ভোগ করিতেছে।

তাঁহার কবিতা ও গান রচনা করিবার
আম্বাধা শক্তি ছিল। তাঁহার রচিত কবিতা-
গুলি পাঠ করিলে বিম্বিত হইতে হয়।
তাঁহার কবিতা-পুস্তক মধ্যে যে কয়েকখানি
সংগৃহীত হইয়াছে তাহার আলোচনা গৃহস্থ
প্রকাশিত হইবে।

আমরা মধ্যমশ্রীসিহের উদ্ভিৎ-বিস্তারন
শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্র গুহের নিকট এই কবির
পরিচয় পাইয়াছি।

• •

৯. বাঙ্গালীর শিল্প ও ব্যবসায়

কিন্তুদীন পূর্বে আমরা আমাদের শিল্প ও
ব্যবসায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত
করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রতি জনগণের
দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়া স্বকী হইলাম। আমরা
এ সম্বন্ধে আরও নূতন তথ্য প্রকাশিত
করিতেছি।

(১) শ্রীমদ্বাদ জেলার জিলাধিকার
হইতে শ্রীকৃষ্ণ যোগেন্দ্রনাথায়ণ সরকার
লিখিয়াছেন :—

আপনার বিখ্যাত গৃহস্থ পত্রিকা “স্বাধীনতার
শিল্প ও ব্যবসায়” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে বড়ই
স্বকী হইয়াছি, কিন্তু উহাতে শ্রীমদ্বাদের
কোন ব্যবসায়ের কথা না থাকিলে এই প্রবন্ধ
অসম্পূর্ণ দেখায়। এই বিবেচনা করিয়া
শ্রীমদ্বাদের ব্যবসায় বিকিৎ আভাষ
দিলাম।”

শ্রীমদ্বাদ

এখানে অনেক স্থলমান শিল্পী আছেন,

তাঁহার উৎকৃষ্ট বিদ্যার আধা করেন ও
অনেকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নৈতা তৈয়ার করেন।
এখানকার অনেক কারিগর কাপড়ের নানা
বিধ ফুল তৈয়ার করিতে অধিত্য। এখানে
উৎকৃষ্ট বালাপোষ (শীতবস্ত্র) তৈয়ার হয়।

খাপড়া

এখানকার খাপড়াই মুড়কি ও ছানাবড়া
বিখ্যাত। এখানকার ত্রায় উৎকৃষ্ট কাঁদার
বাসন অজ্ঞত কোথাও হয় না; যেরূপ
স্বপ্নমনে ভেমনই পালিস করা, যেন তাঁদার
বাসন বলিয়া ভ্রম হয়। এখানকার অনেক
দরিদ্র বাসনের কার্যে অন্নসম্মান করে।

বালুচর

এখানকার স্তায় পটবস্ত্র (রেশমবস্ত্র) অজ
কুত্রাপি হয় না। রেশমী কাপড়ে নানারূপ
ফুল ও লতাফাটা (বৃন্দার) বিশিষ্ট কাপড়
বিখ্যাত। কিন্তু কালের গতিকে এই সব
শিল্প নষ্টপ্রায় হইয়া যাইতেছে। পূর্বে
বৃন্দার কাপড়ের তাঁত প্রায় দুই সংস্কারিক
ছিল, কিন্তু উপস্থিত এক শত মাত্র বর্তমান;
তাঁহার মধ্যে ২০০ খানা তাঁতই বিশেষ উন্নত-
যোগ্য। এক্ষণে সব কাপড় আধুনিক
ব্যবস্থার পদ্ধতনীয় হইতেছে। না, ইহার
পরিবর্তে বোঁধাই, পানি মাড়া ব্যবহৃত
হইতেছে।

এখানে আর একটি বিখ্যাত শিল্প আছে,
হাতীর দাঁতের খেলানা প্রায় শতাব্দিক
কারিগরে প্রস্তুত করে এবং দিল্লী নগরীতেই
অধিকাংশ খেলানা বিক্রয় হয়। জঙ্গলী সাধার
প্রধান বা একমাত্র বন্দর জিয়াগর বাজার,
এখানে নানাবিধ ভূমিমাণ ও পাট যথেষ্ট
আমদানি হয়; জিয়াগর রেশম-বস্ত্রেরও
বন্দর, বিভিন্নস্থানের মহাজনগণ এইস্থান
হইতে বরিস দ্রব্য লইয়া যান।

বিষ্ণুপুর

এখানকার রেশমবস্ত্র অল্পনা অধিক ব্যবহৃত
হইতেছে। এখানকার কাপড়ের বিশেষত্ব—
স্বাধী কাল টেক্ষরি, পাড়পাটী, কচিমাজিত
এবং যোগেশ নষ্ট হয় না।

ইসলামপুর—চক্

এখানকার মটকার কাপড়ই উৎকৃষ্ট।
তথ্যাতীত এখানে রেশমের চাদর প্রস্তুত
হয়, কিন্তু স্বকীয়কাল স্বকী হয় না। এখানে
বিলাতের জন্ম আর একপ্রকার ৭ গজ
রেশমের ধান প্রস্তুত হয়, কিন্তু পূর্বাঙ্গেকা
একধে ইহার কাটতি ভ্রাম হইয়াছে।

জগদপুর ও বেলাভাঙ্গা

এই দুইস্থানে বহু রেশম-স্বতা তৈয়ারির
চেঁচা ও বড় কুঠী আছে। ঐ কলে বা
কুঠীতে বহু শ্রমজীবীগণ পাটীয়া অন্ন সংকলন
করে।

ধুলিয়ান

মুর্শিদাবাদের স্নায়ু সাইডের ১০টা চোট
বন্দর, এখানে পাট ও অন্নবিস্তর ভূমিমাণ
আমদানি হয়।

অন্নদ্বার

এখানকার কল্ল বিশেষ উন্নতযোগ্য;
এখানে দানী দানী ভাল ভাল কল্ল ও
কল্লের আসন তৈয়ার হয়।

(২) বাঁকড়া জেলা হইতে শ্রীকৃষ্ণ রামাচন্দ্র
কর লিখিয়াছেন :—

বাঁকড়া-গোপীনাথপুর, বিষ্ণুপুর, কেশবাসুড়া
ও রাজধানী উত্তর ও রেশমের ধুতি, শাড়ি,
চাদর, জামার ধান, গর্ভস্থতি, বিছানার
চাদর, টেলরস্বত, কোঁটার চাদর ধুতি ও শাড়ী
প্রস্তুত হয়। ভূতনিয়ার পাথড়ে পাথরের
গাদ আছে। এখানে নানা প্রকারের বোঁধাই
দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। গৃহের মেজে
বান্ধিবার পাথর, দরজা, জানালা, ইট, শিল,
মাইলটোন, লিমিটটোন প্রভৃতি উন্নতযোগ্য।
কেশবাসুড়া ও শুভনিয়াতে কাঁদার বাসন
প্রস্তুত হয়। বিহারপ্রদেশে এই বাসনের
খুব অন্নর। বাঁকড়া ও বিষ্ণুপুরের ছড়ি ও
পেনুহোজার প্রসিদ্ধ। বাঁকড়া সহরে বিভিন্ন
একটি ও ঠালটুয়ের তিনটা কারখানা আছে।

কেশবাসুড়া ধূপদ্বারা, গামছা, কাচা, লেগের
কাপড়, এক খেঁচা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।
এখানকার মস্ত খরিবার কাটা বিলাতি কাটা
অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। একটি কাটার

মূল্য এক পয়সা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত। দা ও জাঁতি, খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। চারি আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত মূল্য দা বিক্রয় হয়। ছবি, সুড়োল, কোমল, ধাত্তাদি মাণি-বার পাই প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এখানে এক তোলা হইতে একমণ পর্য্যন্ত কাঁচা বাট প্রস্তুত হয়।

এ জেলায় গালা, ধান, চাল, লাইমষ্টোন, ভাঙ্গা পাথর, হরিতকি প্রভৃতি জ্বরের বিশেষে রপ্তানি স্বিক। স্থানে স্থানে অজ ও পুট হয়। জামতাড়া ও লোকপুরে নীলের বড় বড় কৃষি ছিল, এখন উহা লোপ পাইয়াছে। বাঁকুড়ার বয়ন-বিভাগয় বেশ স্বন্দর ভাবে চলিতেছে।

নুনচটী ও কেতুলপুরের জুতা প্রসিদ্ধ, কেতলাকুড়ার 'মাদল' বিখ্যাত। ইহা পূর্ববঙ্গ ও আসামে বেশ নাম করিয়াছে। রাম-সাগরের সিন্দুর স্ত্রীলোকদিগের আদরের সামগ্রী। লোকপুরে মেঘের লোম হইতে মোটা স্বথল এ আসন প্রস্তুত হয়। মালা-ভোড়ের চাষি গৃহস্থের বাবহারযোগ্য।

প্রধান মেলা

১। চৈত্রমঙ্গলকান্তি একেশ্বর হরিহরপুর ও স্যারেশ্বর। ২। বৈশাখের প্রথম তিথিদিন কেতলাকুড়ায়। ৩। বজ্রনিতে শুকনিতায়।

(৩) খুলনা জেলার সাতক্ষীরা গ্রাম হইতে শ্রীকৃষ্ণ দুর্গাপদ ঘোষ নিম্নোক্তেন—
প্রসিদ্ধ বন্দর ও বায়সাল্লাহ

শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় যে সমস্ত স্থানের নাম করিয়াছেন, তাঁদের সাতক্ষীরা মহকুমার খুড়িডাঙ্গা, আগরদাঁড়ী, কোকামতলা ও বাঁশদহ এই স্থানগুলি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়স্থান।

বাঁশদহার বস্ত্র অজ্ঞাপিত বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এখানে প্রায় সহস্র মূল্যমান বস্ত্রশিল্পীর বাস। আগরদাঁড়ীর হাটে (আবাদের হাটে) যত গরু, বিক্রয় হয়, খুলনা জেলায় এরূপ আর কুছাপি হয় না। প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার এখানে হাট হয়। ৩০৩২ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে লোক এই হাটে আসে। আগরদাঁড়ীর নিকটবর্তী গোদাঘাটা নামক স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট তাম্র ও আনারস পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ মেলা

সাতক্ষীরায় রথের বাজার এখন আর হয় না। তবে রাসের ও দোলের বাজার হয়। ঝাউডাঙ্গায় 'আনখাতার' মেলা মাসাধিক কাল থাকে এবং কলিকাতা হইতে অনেক বড় বড় দোকান আসে, কিন্তু দুইথের বিষয়, এই মেলায় ৫০০/৫০০০ ব্যবসিতার সমাগণ হইয়া থাকে।

আগরদাঁড়ীর কর্ণকারেরা স্বন্দর সৌহ অস্ত্র গড়িতে পারে। এই গ্রামের জৈনকদিগা ব্রাহ্মণকর্তা হুস্ব কার্পাসস্থর কাটার জন্ম খুলনা শিল্পপ্রদর্শনী হইতে পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এখানে একবাঁকি দেবমন্দির গঠনকরে, যে তুলনায় কুমারটুলির কারিগর অপেক্ষা ভাল প্রতিমা গঠন করিতে পারে।

আগরদাঁড়ীর নবকালী (লৌখালী) নামক পুরাতন প্রসিদ্ধ নদী এখন মিথ্যা গিয়াছে। নদীটি যদি কাটা হয় তাহা হইলে উত্তার তীরবর্তী স্থানগুলি শিল্পবাণিজ্যে উন্নত হইয়া খুলনা জেলার মধ্যে অত্যুজ্জ্বলরূপে শোভা পাইবে।

প্রতিভাবিকাশের সুযোগ

[সমাজ-বিজ্ঞানের এখন শৈশব অবস্থা। ভারত-বাহীর দৃষ্টি এদিকে অতি অল্পই আকৃষ্ট হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে প্রচারিত সকল মহই অমাত্র সত্যরূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই।' এই 'ব্রহ্মসূত্র' আমাদের দেশে প্রযোজ্য কি না তাহা হিন্দুসমাজের সকল 'বিশ্ববিশেষজ্ঞ' গভীর ও ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভিন্দু দ্বন্দ্বাদেশের একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ। তিনি বহুপরিচয়-মূল্য যে কতটা সমাজ-সংস্কৃতির তথ্য এখানে সমর্থ হইয়াছেন তাহা অবগত করিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে।

আশা করি, আমাদের মধ্যে বাঁহাটা ধর্ম-বিজ্ঞান-বাহী-বিজ্ঞান ও প্রাণ-বিজ্ঞানের আলোচনার ব্যাপ্তি-আছেন, তাঁহারা এই গবেষণা-প্রণালীর প্রয়োগ অভ্যাস করিবেন।]

সমাজ-বিজ্ঞান বলিয়া থাকে সমাজ অতীত স্থিতিশীল। কিন্তু 'সমাজ-বিজ্ঞান ইহাও বলে যে, যদিও সমাজ স্থিতিশীল, তবুও প্রাকৃতিকভাবে ইহাকে রূপান্তরিত করিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে সমাজের অবস্থা পরিবর্তিত করিতে পারা যায়। সমাজ-

সংস্কারের অর্থ—সমাজের উন্নতিকল্পে সমাজের রীতিনীতির কালাচিহ্ন পরিবর্তন। কোনও জিনিষের পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে হইলে সেই জিনিষটির বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। সেইরূপ সমাজ সংস্কার করিতে হইলেও সমাজের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। তাই সমাজ-বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর 'কলিত'-সমাজ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। কারণ, কেমন করিয়া, কি নিয়মের ভিতর দিয়া সমাজ ধীরে ধীরে

বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে, সমাজ-বিজ্ঞান প্রধানতঃ কেবল তাহারই আলোচনা করিয়া থাকে। অপর দিকে 'কলিত' সমাজ-বিজ্ঞান সেই সকল তথ্য অবগত হইয়া সমাজের উন্নতিসাধন এবং তৎকল্পে সমাজ-আচারের পরিবর্তন ও সংশোধন করিতে প্রয়াস পায়।

পৃথিবীস্থ প্রত্যেক মানবই তাহার স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনে সমান অধিকারী। সমাজের কর্তব্য প্রত্যেককে সেই অধিকার প্রদান বরা। কারণ, সমাজের ভিত্তি মানব। সমাজের উন্নতি-অবনতি ব্যক্তিগত উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভর করে। যে সমস্ত সমাজ-আচার উক্ত অধিকার প্রদানের বিরোধী এবং তদাধা যেগুলির পরিবর্তন বা সংশোধন মানবশক্তির আয়ত্ত, সমাজের উন্নতিকল্পে সেগুলির পরিবর্তন বা সংশোধন একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই উপায়ে অনেক নষ্ট শক্তির উদ্ধারসাধন হইবে; এবং সমাজ বলশালী হইবে।

মানব তাহার স্বাভাবিক দীক্ষিত-পরিচালনে অক্ষম হওয়াযেই সমাজে অনেক বৈষম্য ও দুর্দশার স্রষ্ট হয়। সমাজ যদি তাহার উন্নতি-অবনতির মূলস্বরূপ প্রত্যেক মানবকে স্বকীয় বিকাশের স্বাধীনতা প্রদান করিতে রূপণতা না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় সমাজ অধিকতর পুষ্টিলাভ করতঃ জন্মতে শান্তিবাণী আনয়ন করিতে সমর্থিক কৃতকার্য হইতে পারিত। সভ্যজগতে জাতীয় স্বাধীনতা হইতে পারিত। সমাজগতে জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব বেশী দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এখনও ব্যক্তিগত বিকাশোপযোগী

স্বাধীনতার অভাব খুবই দেখিতে পাওয়া যায়।

শিল্পী যেমন তাহার যত্নপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্নবান হয়, সমাজকেও তদ্রূপ করিতে হইবে। কিন্তু সমাজের কলকাতা কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলেই চলিবে না; ইহা দিগকে আহারও দিতে হইবে। কারণ, যে যত্নপাতি-দ্বারা সমাজের কার্যাবলী পরিচালিত হইতেছে, তাহা শিল্পীর জুড়পার্ব্য নহে—তাহা জীবজগতের শ্রেষ্ঠ সোপানে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্য-সম্পন্ন মানবজাতি। কিন্তু মাহুকে কেবলমাত্র সাড়াপ্রদানক্ষম (Responsive Power) দেহ বলিয়াই উদ্ধৃত হইলে চলিবে না। প্রেম, ভক্তি, ক্ষমা, উদ্ভাৱন, বিরুদ্ধ প্রভৃতি মানসিক ধর্মের অস্তিত্ব নিবন্ধন মানব-জন্তু মহোচ্চাচিত গুণরাশিতে অলঙ্কৃত। হুতরাং একদিকে যেমন দেখা গেল মাহুৎ সাড়াপ্রদানক্ষম কোঠ-সৃষ্টি (cell-organism) বলিয়া তাহার শরীর-সংরক্ষণযোগ্যী প্যাসের প্রয়োজন, পক্ষান্তরে সে মানসিক বৃত্তিচিন্তায়ের সমষ্টি বলিয়া তাহার জ্ঞান-বোধেরও প্রয়োজন। এই জ্ঞান-প্যাসের বিতরণ, পরিমাণ ও উদার বিশেষবাহুল্যের মানবগণ সমাজের কার্যকারী হইবে। সমাজ যদি তাহার এই কর্তব্য-সাধনে অবহেলা বা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় প্রদান করে, তাহা হইলে জীব-বৃত্ত-পরিচালিত সমাজের উন্নতিমার্গে উল্লিখ হইবার আশা কোথায়!

সমাজের কর্তব্যসাধনে যে দেশে যত লোক অগ্রসর হইবার উপযুক্ত হইবে, সে দেশের উন্নতির আশা তত অধিক। দুই চারিটা জ্ঞানী লোকের দ্বারা সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে পারে না।

যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে হেগের (Hague) শান্তিনিকেতনের আশা এতদিনে ফলবতী হইয়া থাকিত। জনসাধারণের মতামতের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। তাই, জ্ঞানিগণের গবেষণার ফল বাহ্যতে সমাজে জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে, সমাজকে সে পথ সত্য প্রশস্ত রাখিতে হইবে। সমাজ উক্ত কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না বলিয়াই আমাদের জনসাধারণ অজ্ঞান-তমসাদ্ব্য। এ. পর্যন্ত জগতে অনেক সত্য, অনেক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণ তাহার কয়টা উল্লিখিত করিতে পারিয়াছে? বাহ্যিক জগতের আবিষ্কৃত তথ্যরাশি সমাজের প্রতি অঙ্গে প্রতিবিম্ব হইয়া তাহার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারে, ফলিত-সমাজ-বিজ্ঞান তাহারই পথ অহরণ করিতে প্রয়াসী।

স্বয়ং সত্যের উত্তর, প্রতিষ্ঠিত। সমাজে সত্য এবং অসত্যের পরিমাণ উদার জ্ঞান-সমষ্টির উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমাজের অধিকাংশ লোকই এখনও অজ্ঞানতায় বাস করিতেছে। তাই, অল্প-সংখ্যক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমাজ-নিয়ন্তা। বাহারা কোনও কারণবশতঃ পূর্বাধিনি নিরপেক্ষীভুক্ত বলিয়া অবজার পাত হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহাদের উত্থানের আশা খুব কম। সমাজের নেতৃবর্গ তাহারিগকে সহায়তা করিতে বিমূখ। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে,—যদি প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে প্রতিভাবিকাশে ব্যক্তিগত তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয়, বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের তুলনা করিয়া দেখিলে বীণজ্ঞতার মধ্যে কোনও সমষ্টিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়

না। ডাক্তার কিঙ্ক তাহার Social Evolution নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে—এমন কি নিউক্লিয়ায়ত্বিত মেওরি নামক অতি অল্পজাতিভাষা ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ গ্রহণে কিছুদূর অগ্রসর নহে।

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, সমাজ-সেৱায় উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যার উপরই সমাজের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে। এই উপযুক্ত ব্যক্তিগণের উৎপাদন দুইটা প্রধান উপকরণের মিলনবস্তু—ব্যক্তিগত দীর্ঘশক্তি ও পারিপার্শ্বিক বা বিশ্ব-শক্তি (Environment)। প্রত্যেক ব্যক্তিই দীর্ঘশক্তিম্পন্ন হইতে পারে না। প্যাণ্ডিনের মতে দীর্ঘশক্তি পুরুষপরিমার-পূর্ত। যদি তাহাই হয়, তবে বীণজ্ঞতায় পরিবারকে ক্রমশঃ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে দেখিতাম। কিন্তু, বস্তুতঃ আমরা ইহার বিপরীত ঘটনা অবলোকন করিয়া থাকি। প্রায়শই দেখা যায় দীর্ঘশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম হটায় হইয়া থাকে। প্রাণ-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ ইহার দুইটা কারণ স্থির করিয়াছেন। তাহার্য বলে যে, প্রাক-দীর্ঘশক্তিম্পন্ন ব্যক্তির ২০ পুরুষের মধ্যে তাদ্রুপ ব্যক্তির পরিচয় না পাওয়া গেলেও তদুর্দ্ধে কোন পুরুষ সেইরূপ গুণসম্পন্ন ছিল; এবং গুণ-ক্ষেপণ বা ঘাটাত্তিজন্মের (atavism) প্রভাবে মধ্যবর্তী পুরুষদের মধ্যে তাহার প্রকাশ পাইয়াছে। বিস্তারিত, সে ব্যক্তি বংশপরম্পরাগত কোন গুণের অধিকারী না হইয়াও স্বয়ং তাহার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দীর্ঘশক্তিম্পন্ন হইয়াছে। এই দুইটা কারণ ব্যতীত পৃথিবীতে দীর্ঘশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। জীবজগতে অনেক সময় পারিপার্শ্বিক

আমাদের শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হয়। উদ্ভিদ-জগতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই আমরা স্পষ্টরূপে ইহার বাধ্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। বন-জাত কলহুলভলি যখন মনুষ্য-হস্তে বিরক্ত পরিপার্শ্বিক হইতে মুক্ত হইয়া বৃদ্ধিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের খাদ ও গৌরবর কত পরিবর্তন দৃষ্ট হয়! উদ্ভিদ-জগতের তায় আমাদিগের মনের স্বাভাবিক গতিও বাহ্য-জগতের প্রভাবদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। মানব-মন এই সকল বন্ধন হইতে স্বাধীন হইতে চায়। স্বাধীনতা পাইলেই বিরক্তপারিপার্শ্বিক-নিপীড়িত সমাজের প্রচ্ছন্ন-শক্তি কার্যক্ষেত্রে প্রকাশমান হইতে পারে এবং ইহাকে উত্তরোত্তর বিবর্তনমার্গে পরিচালিত করিতে পারে। সমাজে বাস্তব শক্তির অপেক্ষা প্রচ্ছন্নশক্তির প্রভাব কত অধিক।

সমাজে প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা এক-প্রকার নির্দিষ্ট; মানবের চেতায় দীর্ঘশক্তি নির্মিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ইতরাং সমাজের মধ্য হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিই বাহ্যতে তদ্রূপ প্রচ্ছন্নশক্তি প্রকাশে সমর্থ হয়, সমাজকে তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উপায়েই আমরা সমাজস্থিত প্রতিভাবান ব্যক্তিগণকে বুদ্ধি বাহির করিতে পারিব। যদিও মাহুকে লইয়াই সভ্যতা, তথাপি তাহাদের মধ্যে বাহারা প্রতিভাসম্পন্ন, পায় না, কিন্তু পরমতী পুরুষে তাহার প্রকাশ পাইয়াছে। বিস্তারিত, সে ব্যক্তি বংশপরম্পরাগত কোন গুণের অধিকারী না হইয়াও স্বয়ং তাহার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দীর্ঘশক্তিম্পন্ন হইয়াছে। এই দুইটা কারণ ব্যতীত পৃথিবীতে দীর্ঘশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। জীবজগতে অনেক সময় পারিপার্শ্বিক

১। প্রাকৃতিক আবেষ্টন

আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে, মানবের বৃত্তি বা শ্রেষ্ঠত্ব অনেকটা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের লোকদিগের "বৃত্তিমত্তার" কারণ খুঁজিতে যাইয়া অনেক সময় আমরা প্রাকৃতিক অবস্থার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। ফরাসীদেশের স্থবিখ্যাত সমাজ-তত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত ওভিন্ দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞানী লোকের সংখ্যা ভৌগোলিক অবস্থার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। তিনি ফরাসী-ভাষা-ভাষী দেশসমূহের বিভিন্নপ্রকার ভৌগোলিক প্রভাববিশিষ্ট জনপদের জ্ঞানী লোকের সংখ্যা গণনা করিয়া এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তৎকর্তৃক প্রদত্ত বহু উদাহরণের মধ্যে আমরা একটামাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। সুইস-দেশে ভেলয় ও ফরাসী-দেশে ভড নামক দুইটা জেলা আছে। উভয় জেলাই সমভাবে পর্বতাকীর্ণ। কোন নির্দিষ্ট কালবিশেষের মধ্যে ভেলয় একজনও প্রসিদ্ধ লেখক উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই। অপরদিকে সেই একই সময়ের মধ্যে ভড জেলায় প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে ২২ জন স্থবিখ্যাত লেখক জন্মিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ওভিন্ আরও দেখাইয়াছেন যে, কয়েকটা বিভিন্নপ্রাকৃতিক-অবস্থাসম্পন্ন স্থানেও জ্ঞানী-লোকের সংখ্যার কোন ব্যবধান দৃষ্ট হয় নাই। ইহাধারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে "নেসর্গিক প্রভাব বাস্তবীকৃত হইয়াছে অথচ কোন কারণ" এই বৈষম্য সৃষ্টি করিবার জ্ঞাত "প্রচ্ছন্ন আছে।" সুতরাং ভৌগোলিক অবস্থা বীজ-প্রকাশের সহায় বা বিরোধী নহে।

২। মানবের জাতি-গত প্রকৃতি

(বংশ বা রক্তের প্রভাব)

সাধারণের বিশ্বাস যে, বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে শারীরিক অপেক্ষা মানসিক ব্যবধানই অধিক। কোন কোন জাতি কেবল যে জ্ঞানে অত্যন্ত জাতি অপেক্ষা নিষ্ঠুর তাহা নহে; অনেকের বিশ্বাস, এই সকল জাতির মধ্যে জ্ঞান আহার্য করিবার ক্ষমতাই অত্যন্ত আছে। তাহারা বিবেচনা করেন, একজাতি-সমূহ অথচ বহুকালাবধি বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন-দেশবাসী শাখা-জাতিসমূহের আলোচনা করিলেও এই তত্ত্ব বৃত্তিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত ওভিনের পরীক্ষার ফলস্বরূপ আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিব।

ফরাসী দেশে ৪টা প্রধান বিভিন্ন জাতির বাস। ইহারা প্রত্যেকেই এক এক নির্দিষ্ট অংশ বাস করিয়া থাকে।—মধ্যভাগে গলগণ, উত্তর-পশ্চিমে সিমব্রিয়ানগণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে আইবেরীয়ানগণ, দক্ষিণ-পূর্বে লিভিয়ানগণ ও উত্তর-পূর্বে বেলজিয়ানগণ। এই সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-গণের সংখ্যার কোনই তারতম্য দেখিতে পান নাই। ফরাসী দেশে ব্যাঙ্ক ও কেটোলান্ প্রভৃতি অনাধ্যাজাতিরও বাস। ব্যাঙ্ক-পিরাগীন্ জেলায় প্রায় ৩ লোকের অধিক ব্যাঙ্ক ও কেটোলান্ জাতি। এই অনাধ্য-জাতিদ্বয় কোন নির্দিষ্ট কালের মধ্যে ১৬ জন প্রসিদ্ধ লেখক উৎপাদন করিয়াছে; কিন্তু সেই একই জেলাস্থিত ফরাসীগণ, বহুশতাব্দিক হইয়াও মাত্র ১৪ জন প্রসিদ্ধ লেখক উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে নীচ-জাতিই অধিকতর ফলবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ওভিন্ কেবল ফরাসীদেশে পরীক্ষা

করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। জাঙ্গো, ইতালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশও পরীক্ষা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহার মতে জাতিগত, বংশগত, রক্তগত পার্থক্য কণ-ক্ষমতার কিছুমাত্র তারতম্যের উৎপাদক নহে।

৩। স্থান-মাহাত্ম্য

আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে, অধিকাংশ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিই পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা কেবল সাধারণ লোকের অসুমান নহে, বড় বড়

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও • এই ধারণার সমর্থক ছিলেন। ইউরোপের ও আমেরিকার প্রতিভাবান্ লোকের ফলিত-তথ্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—তথাকার অধিকাংশ প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জন্মই সহরে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা তত খাটিবে কি না সন্দেহ। কারণ আমাদের দেশে সহরবাসী লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তবে ইহা সত্য যে, বর্তমান ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রতিভাবান্ ব্যক্তিই তাহারদের পাঠ্যাবস্থা সহরে কাটায়াছেন। †

* বেরগেই; রিটার, মোয়েনোঁ। পেরী, মিডিল্ (আমেরিকা) প্রভৃতি।

† (আধুনিক) বঙ্গদেশের বিখ্যাত লোকদিগের জন্মস্থান ও পাঠ্যাবস্থার স্থান নিয়ে দেখাও গেল।

(ক) সহরে জন্ম ও শিক্ষা:—

- (১) মহম্মদ মোসিন (ফাল্গা)
- (২) রাধাকান্ত দেব (কলিকাতা)
- (৩) অপরহুদার ঠাকুর (ঐ)
- (৪) ধারকান্য ঠাকুর (ঐ)
- (৫) তারানাথ তর্কবাচস্পতি (কালনার মসিকটে)
- (৬) রামভট্ট বাহিষ্টা (কৃষ্ণনগর)
- (৭) রামগোপাল ঘোষ (কলিকাতা)
- (৮) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঐ)
- (৯) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (কলিকাতা)
- (১০) হরীশচন্দ্র মুখার্জি (কলিকাতা)
- (১১) কেশবচন্দ্র সেন (ঐ)
- (১২) কৃষ্ণদাস পাল (ঐ)
- (১৩) অত্যাগন্য মল্লভদ্র (ঐ)
- (১৪) রমেশচন্দ্র মিত্র (ঐ)
- (১৫) কালীপ্রসন্ন সিংহ (ঐ)
- (১৬) নরেন্দ্রনাথ সেন (ঐ)
- (১৭) সুনামোহন ঘোষ (কৃষ্ণনগর)
- (১৮) উদেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি (কলিকাতা)
- (১৯) গুরুদাস বানার্জি (ঐ)
- (২০) কালীচরণ বানার্জি (ঐ)
- (২১) দ্বর্জচন্দ্র বানার্জি (ঐ)
- (২২) হরেন্দ্রনাথ বানার্জি (ঐ)
- (২৩) রমেশচন্দ্র দত্ত (ঐ)
- (২৪) নালিন্দ্রনাথ ঘোষ (কৃষ্ণনগর)
- (২৫) নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (বগুড়া)
- (২৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা)

বঙ্গদেশে কেশবচন্দ্র শ্রীশ্রীসামকৃষ্ণ পরমহংস দেবই এই নিষ্ঠুরত্বের বাহিরে আইছেন

(২৭) রিবেকানন্দ (ঐ)

(২৮) আভতোষ মুখার্জি (ঐ)

(৩) সহরে শিক্ষা:—

(১) রামমোহন রায়

(২) গুলশার স্বরাজ

(৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(৪) অপরহুদার দত্ত

(৫) শিবারীচন্দ্র মিত্র

(৬) মহম্মদ দত্ত

(৭) রাজনারায়ণ বসু

(৮) সুবোধ মুখার্জি

(৯) আবদুল লতিফ

(১০) দীনবন্ধু মিত্র

(১১) হারিকান্য মিত্র

(১২) মহেন্দ্রলাল নরসার

(১৩) দক্ষিণ চট্টোপাধ্যায়

(১৪) চন্দ্রনাথ ঘোষ

(১৫) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৬) শিশিরকুমার ঘোষ

(১৭) কালীপ্রসন্ন ঘোষ

(১৮) নারায়ণী ঘোষ

(১৯) রবীন্দ্রনাথ সেন

(২০) নালিন্দ্রনাথ বসু

(২১) শিবনাথ শাস্ত্রী

(২২) নারায়ণচন্দ্র মিত্র

(২৩) লক্ষণীচন্দ্র বসু

(২৪) গুরুদাস রায়

ইউরোপের উক্ত ভূমধ্যসাগর দূর করিবার জন্ত জেকবি ও তৎপূর ওভিন্ বহু পরিশ্রম-পূর্বক যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারই সারমর্ম এখানে নিম্নলিখিত করিলাম। ওভিন্ দেখাইয়াছেন যে, পল্লীগ্ৰাম হইতে উৎপন্ন বিখ্যাত লোক অপেক্ষা সহর হইতে উৎপন্ন তাদৃশ ব্যক্তির সংখ্যা তেরগুণ অধিক। কিন্তু, তিনি বলেন যে, প্রতিভাবান ব্যক্তির উৎপত্তির সম্ভাবনা সহরের কেবল লোকসংখ্যার উপর নির্ভর করে না, তাহাদের উদ্যমশীলতা ও কার্যকারিতার উপরও নির্ভর করে।

জারী লোকগণ যে সচরাচর সহরে জন্ম-গ্রহণ করেন, অথবা শিক্ষাকাল তথায় যাপন করেন তাহার কারণ সহজেই বোধগম্য। নিম্নে তাহার কয়েকটি কারণ দেওয়া গেল—
(১) সহরগুলিই সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় ও বিচারালয়সদৃশী অস্থানসমূহের কেন্দ্রস্থান।
উক্ত কারণে

(২) সহরে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যসেবী, বৈজ্ঞানিক, শিল্পবিদ্যাবিদ ও নানা প্রকার জ্ঞানী ও ধনশালী লোকের সমাবেশ হয়। এজন্য উহা জ্ঞানানুশন্ধানের উত্তমস্থানে পরিণত হয়। এই সকল প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদানের ফলে নানা নতুনতর আবিষ্কার হয়।

(৩) বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, সংগ্রহালয় (যাদুঘর) প্রভৃতি শিক্ষামন্দির সমূহ কেবল সহরেই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বগুণ বলিতে পারেন যে, ওভিনের মত কেবল ফরাসীদেশেই খাটিবে, অজ্ঞাত দেশে যে এইরূপ হইবে তাহার প্রমাণ

কি?—বিশেষতঃ, ওভিন্ কেবল 'সাহিত্যিক'-গণেরই ফলিত-তথ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু গ্যাটনের "Englishmen of Science" নামক পুস্তকেও আমরা ওভিনের মত-সমর্থনোপযোগী তথ্য দেখিতে পাই। গ্যাটিন্ ইংলণ্ডের ১০০ জন স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাদের জন্মস্থান নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত হইয়াছে—

লণ্ডনে.....২১ জন

অজ্ঞাত বড় সহরে.....১৮

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সহরে.....২১

অজ্ঞাত স্থানে.....৪০

তিনি শেখোক্ত ৪০ জনের বাসস্থান-নির্ধারণে অক্ষম হইয়াছিলেন।

ওভিন্ ও ইতালী, স্পেন, ইংলণ্ড ও জাৰ্মেনী হইতে সাহিত্যিকগণের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ওভিনের এই সকল ফলিত-তথ্য আলোচনা করিয়া আমরা দেখি যে, "পল্লীগ্ৰামই যে ধীমানুগুণের উৎপাদনে বিশেষ উপযোগী এক প্রকার মাধ্যম মূলে কোনই ভিত্তি নাই।"

৪। আর্থিক অবস্থা

জানিগণের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য অবগত হওয়া অতি দুষ্কর ব্যাপার। আমাদের অনেকেই মনে এই ধারণা বদ্ধবুল হইয়া আছে যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে অবস্থাতেই বিচরণ করেন না কেন, সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি তাহার ক্ষমতা জগৎসমক্ষে প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইবেনই। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া জীবন-চরিত-লেখকগণও তাদৃশ ব্যক্তিগণের আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন

না। যদি কোন বৈজ্ঞানিক ১০ বৎসর অল্পাত পরিশ্রমের পর নতুন কিছু আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীকে আশ্চর্য্য করিয়া ফেলেন, জীবন-চরিত-লেখকগণ তাহা অতি পুণ্যমুখ্যরূপে বিবৃত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেই দশ বৎসর কিরূপভাবে তাহার জীবন-যাত্রা নির্ভর্য্য হইয়াছিল অর্থাৎ এই দশ বৎসর তাহার আয়ের পৃথাকি কি ছিল, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাহার একেবারেই ভুলিয়া যান। এই ভ্রমবশতই মনীষীগণের আর্থিক অবস্থা জানিতে এত বেগ পাইতে হয়। ডে ক্যাণ্ডোল, ওভিন্ ও গ্যাটিন্ বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাহাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অহুসন্ধান করিয়া বলেন যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল।

"প্যারী একাডেমির" ১০০ জন বিদেগী সভ্যকে ডে ক্যাণ্ডোল নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন—

জমিদার ও ধনী পরিবার হইতে

উৎপন্ন ৪১

মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে উৎপন্ন ৪২

শ্রমজীবী হইতে উৎপন্ন ... ৭

১০০

তিনি ফরাসী দেশের ৩৬ জন মনীষীর সামাজিক অবস্থা অহুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন—

ধনশালী পরিবার হইতে	১০, শতকরা	২৮
মধ্যবিত্ত	" " " "	৪৭
শ্রমজীবী	" " " "	২৫
	৩৬	১০০

এই শেখোক্ত তালিকাটী আমাদের একটুই বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে। বলা হইয়াছে—৩৬ জন ধীমানের মধ্যে শতকরা ২৮ জন ধনশালী, ৪৭ জন মধ্যবিত্ত ও ২৫ জন শ্রমজীবী। এই সংখ্যাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের একটুই শ্রেণীভেদের অনুসংখ্যা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ধনশালী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকসংখ্যা হইতে শ্রম-জীবীগণের সংখ্যা অনেকগুণ বেশী। সেইজন্য শ্রমজীবীগণের শতকরা ২৫ এক-প্রকার নগণ্য সংখ্যা মাত্র। পঞ্চাশতরে, সমাজে ধনশালী লোকের সংখ্যা অতীব কম। স্বতরাং, ধনীলোকের শতকরা ২৮ সংখ্যা দৃষ্টান্তঃ কম হইলেও বস্তুতঃ অনেক অধিক।

ওভিন্ চতুর্দশ শতাব্দী হইতে উনিবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ৩৩২ জন প্রতিভাবান সাহিত্যসেবীর (ফরাসীদেশের) আর্থিক অবস্থা খাটিক্রমে জানিতে পারিয়াছেন। এই ৩৩২ জন সাহিত্যিককে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ধনী, জ্ঞানের জ্ঞান যাহাদের অর্থাভাবে কোন বেগ পাইতে হয় নাই; (২) "গরীব", যাহাদের কিরিশদিক বেগ পাইতে হইয়াছে। তিনি নিম্নলিখিতরূপে ইহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন—

* যাহাদের বীরপুরুষগণ অতুল ধনের অধিকারী ছিল। খেলস হইতে ম্যারিষ্টল প্রভৃতি ধার্মিকগণ সকলের রাজস্বগণের অর্থে অর্থশালী ছিলেন। ইক্সলাস, নফারাস, আর্কিমিডিস ও ধনশালী ছিলেন। মধ্যযুগ ও বর্তমান সময়ের ৩৩৩টি দৃষ্ট হয়।

	ধনী	গরীব
১৩০০—১৫০০	২৪	১
১৫০১—১৫৫০	৩৯	৪
১৫৫১—১৬০০	৪২	...
১৬০১—১৬৫০	৮৪	৪
১৬৫১—১৭০০	৭৩	৪
১৭০১—১৭২৫	৩৬	৩
১৭২৬—১৭৫০	৫৩	৮
১৭৫১—১৭৭৫	৮৬	৮
১৭৭৬—১৮০০	৫২	১২
১৮০১—১৮২৫	৭৩	১১

মোট ... ৫৬২ ৫৭

এই তালিকা-পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে কোলো বৈজ্ঞানিকবিদ্যার আর্থিক জীবন আলোচনা করিয়া যে ফল পাইয়াছিলেন অত্যন্ত সাহিত্যসেবিত্বের জীবনী আলোচনা করিয়াও ওভিন্ তজ্জন ফল পাইয়াছেন।

৫। সামাজিক অবস্থা

ভারতবর্ষ বাতীত অত্যন্ত দেশে সামাজিক অবস্থা অনেকটা আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু, তথাপি, ইহাওপাও আনন্দ-রিক্রান্তেও সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সকল সময়ে পরস্পর সংযুক্ত নহে। ওভিন্ ফরাসী

সামাজিক ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—জমিদার, রাজকর্মচারী, শিক্ষাব্যবসায়ী, বণিক ও শ্রমজীবী। তিনি ৬২৩ জন বিখ্যাত সাহিত্যসেবিত্বকে উপরোক্ত পাঁচটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যে একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

সামাজিক শ্রেণী সংখ্যা শতকরা

জমিদার	১৫২.০	২৪.৫
রাজকর্মচারী	১৮৭.০	৩০.০
শিক্ষা-ব্যবসায়ী	১৪৩.০	২০.০
বণিক	৭২.৫	১১.৬
শ্রমজীবী	৬১.০	৯.৮
	৬২৩.০	

এই তালিকা-পাঠে দেখা যায়, ফরাসী-দেশের সাহিত্যিকগণের মধ্যে চারি ভাগের তিন ভাগই প্রধান ভিনদেশী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত শ্রেণী-সমূহের লোকসংখ্যা সমান নয় বলিয়া তালিকার তাৎপর্যও ভাঙ্গরূপ স্বয়ংসম হয় না। তজ্জন্ত ওভিন্ লোক-সংখ্যার সমাধিপাত অস্থানারে তালিকাটিকে পুনরাব নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করিয়াছেন:—

	বুদ্ধিমান		দীমান		প্রত্যেক শ্রেণীর লোক সংখ্যার সমষ্টিগত বীমান ও বুদ্ধিমানগণের আনৈমিক সংখ্যা *
শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	
জমিদার	১৫২.০	২৪.৫	৩৪.০	৩০.৪	১৫৯.০
রাজকর্মচারী	১৮৭.৫	৩০.৮	২৯.৫	২৬.৮	৬২.০
শিক্ষাব্যবসায়ী	১১৬.৫	২২.৮	২৭.০	২৪.১	২৪.০
বণিক	৬২.০	১২.১	১০.৫	৯.৮	৭.০
শ্রমজীবী	৬০.০	৯.৮	১১.০	৯.৮	০.৮
মোট	৫১১.০		১১২.০		

* ওভিন্ গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তৎকালে সমগ্র শতকরা ৮০ জন শ্রমজীবী, ১০ জন বণিক; ৬ জন শিক্ষাব্যবসায়ী; ৩ জন রাজকর্মচারী ও ১ জন জমিদার। তিনি ঐতিহাসিকের মোট জন সংখ্যাকে তাহার শতকরা দ্বিগুণ ভাগ করিয়া শেষ স্তম্ভের ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত তালিকার শেষ কলমসমূহ উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যার্জন অনেক পরিমাণে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইতালী, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশেও ওভিন্ অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছেন, সর্বত্রই সাহিত্যজগতে জমিদার ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরই প্রভাব অধিক।

৬। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আমরা অনেকই মনে করি—প্রতিভাশালী ব্যক্তির শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। সে স্বংই নিজেকে শিক্ষিত করিতে সমর্থ। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেশাচার, যৌবন, শিক্ষাভি প্রতিভাবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং প্রতিভাফুলের সমর্থ হয় না। যে সকল সহরে উচ্চ বিদ্যালয়, পুস্তকাগার ও তাদৃশ অধ্যয়নের বাহুল্য, সে স্থান হইতেই ক্রান্তের ও অসত্য দেশের দীর্ঘশিক্ষাসম্পন্ন লোক সকলের উদ্ভব হইয়াছে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, সহর জ্ঞানার্জনের অসুস্থ স্থান। তন্মধ্যে যে সকল সহরে আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিশেষ স্বযোগ বর্তমান আছে, সেই সকল সহরই প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রতিভা-বিকাশের উপযোগী স্থান। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গ হইতেই সাহিত্যিকগণের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য তাহার কারণ কেবল ধন নহে। অর্থচিন্তা-বিরহিত লোকের অবসর অত্যন্ত শ্রেণী-অপেক্ষা অনেক বেশী। এই অবসর জ্ঞান-ার্জনের একটি প্রধান সহায়। সামাজিক অবস্থাও সাহিত্যিক-উৎপাদনে অসুস্থল

দেখিয়াছি। জমিদার-শ্রেণী এ বিষয়ে সর্বপ্রথম। তৎপরবর্তী ৪ম শ্রেণী তাহারে

নিরুপিত কার্য সম্পন্ন না করিয়া অল্প কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কঠোর পরিশ্রমের পর কেবলমাত্র উদ্ভূত শক্তিটুকুই তাহার নিরুপিত কার্যের বাহিরে ব্যয় করিতে পারে। স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্থানীয় উপকরণ, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা এই সকলগুলিই শিক্ষার্থীকে শিক্ষা-ার্জনের স্বযোগ-সুবিধা আনিয়া দেয় মাত্র। এই নিমিত্তই শিক্ষা-সংসর্গের আলোচনা সর্বশেষে করিতে মনস্ত করিয়াছি।

ওভিন্ ১৪শ শতাব্দী হইতে ১৯ শতাব্দী পর্যন্ত ৮২৭ জন হবিখ্যাত লেখকগণের শিক্ষা-লাভ সম্বন্ধে তথ্য-আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্কের মত তিনি এই লোকগণকে দুইটা প্রশ্নসমূহে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) তাহার শিক্ষা পাইয়াছে; (২) তাহার অশিক্ষিত বা মোটেই শিক্ষা পায় নাই। ওভিনের এই তালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই তাহার অধ্যয়নের তাৎপর্য পরিদর্শনযোগ্য নহা যাইবে—

সময়	শিক্ষিত	অশিক্ষিত বা অশিক্ষিত
১৩০১—১৫০০	৩৩	—
১৫০১—১৫৫০	৫৮	২
১৫৫১—১৬০০	৫২	—
১৬০১—১৬৫০	১০১	৭
১৬৫১—১৭০০	২১	—
১৭০১—১৭২৫	৫৬	—
১৭২৬—১৭৫০	৮৯	১
১৭৫১—১৭৭৫	১১৬	২
১৭৭৬—১৮০০	৮৩	২
১৮০১—১৮২৫	১৩২	২ (১৭)
সমষ্টি	৮১১	১৬ (১৫৭)

ইহা হইতে দেখা যায় যে, শতকরা ৯৮ জন লেখক যৌবনে উপযুক্তভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল; এবং কেবল শতকরা ২ জন মাত্র অনশিক্ষিত বা মোটেই শিক্ষা পায় নাই। ইহা হইতে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? এখনও কি আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে, বীমান্দ্রদের শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, তাহারা স্বীয় ক্ষমতাই প্রতীভাবান্বিত হইবে? যে ১৬ অথবা ১৫ জন শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়াও প্রসিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের জীবন-চরিত্র আলোচনা করিয়াও দেখা যিগাচ্ছে, তাহাদের মধ্যে ৩১ জন জন্ম প্যারীসহরে, ৩১৪ জন রোম সহরে ও আর ৩১৪ জন সহরে হইয়াছিল। ইতালী, স্পেন, ইংলও ও জাফেরীর সাহিত্যিকগণের ফলিত-তথ্য অধ্যয়ন করিয়াও ওভিন এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

আমরা এ ধাবৎ আলোচনা করিয়া প্রেমিলাম যে, দুইটা বস্তুর সমন্বিতভাবে মানবের প্রতিভা বিকশিত হয়—বীশক্তি ও বিশ্বশক্তি। এই দুইটা উপকরণকে পৃথক করিয়া রাখ, ফল কিছুই পাওয়া হইবে না। যুগ্মদান ও জল-বানের সমন্বিতভাবে যেমন দলিল উৎপন্ন হইয়া সমাজের জীবকে সজীবিত করিয়া রাখিতেছে, তজ্জন এই দুইটা পার্শ্ববর্তী সংযোগও সমাজ-শরীরে সর্বল হইয়া উঠে। এই সংযোগভাজ বীমান্দ্রগণের সংখ্যা সমাজে যত বৃদ্ধি পাইবে ততই ইহার উন্নতি।

বিদ্যাবান্দের অস্থূল পারিপার্শ্বিক কি কি তারা আলোচনা করা গিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে সমাজে প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার আধাধানকারী বীমান্দ্রগণের সংখ্যা কত। পূর্বেই আভাস দেওয়া গিয়াছে যে, ফলিত সমাজ-বিজ্ঞানের মতে সমাজের প্রত্যেক

স্তরেই ধনী, নির্ধন ও জাতি-নির্ধিশ্বে লোক-সংখ্যার সমানুপাতাহারারে বীশক্তি স্বপ্নাবস্থায় বর্তমান আছে। কিন্তু যে শেষ চারিটা পারিপার্শ্বিকের সংযোগে মানব তাহার জ্ঞানরাশি-বিকাশে সমর্থ হয়, সমাজের অবিকালে জনগণ তাহার সংযোগ মোটেই প্রাপ্ত হয় না। এই নিমিত্তই আমরা দেখিতে পাই, প্যারি সহরে প্রতি লক্ষ জনে ৬৭ জন প্রতীভাবান্বিত ব্যক্তির জন্ম হয়, আর প্রায়গীর্ষ প্রতি লক্ষ জনে মাত্র একজন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। সমাজে সর্বদান্বীত মঙ্গল আনয়ন করিতে হইলে, এই বিপুল স্থূল শক্তিপুঞ্জকে সজীবিত করিবার পথ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। প্রৌলোকবিগণকেও উৎসাহা করিলে চলিবে না। ওভিন ফলিত-তথ্য-সাহায্যে দেখাইয়াছেন—যেখানেই প্রৌলোকগণ জ্ঞানোন্মেষণের সংযোগ পাইয়াছে সেখানেই তাহারা কৃতকাৰ্য হইয়াছে। প্রৌলোকগণ পূর্বাধিকারের দ্বারা আত্মপ্রকাশ হইয়া পায় না বলিয়াই জ্ঞান-জগতে তাহাদের প্রতিপত্তি এত কম।

মাহুয় পরম্পরের সংযোগিতা ব্যতিরেকে বঞ্চিত হইতে পারে না। আমরা অনেক সময় “আত্ম প্রতিষ্ঠা” ব্যক্তির কথা বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু উক্ত কথার তাৎপৰ্য্য এইরূপম কম। অতীত বীশক্তি ও ওভিন ফলিত-তথ্য-সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ লোকবিদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের সহরে জন্ম, এবং অবশিষ্ট সকলেই বালাকাল হইতে সহরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের শতকরা ৯০ জনই “ধনী” বংশোদ্ভব এবং ১০ জনই উন্নতিশিক্ষাপ্রাপ্ত; হস্তবাস দেখা যায়—ইহারা নানা স্থযোগের ফলেই উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত

সমাজতত্ত্ববিদ ডাক্তার ওয়ার্ড তথ্যবিত্ত আশ্চর্য্যকিতে উন্নত ব্যক্তিবর্গের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারাও * নানা স্থযোগের সম্পর্কে অসিদ্ধিই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বীশক্তি বিক্ষম শক্তিনিচয়ের মধ্যে পরিণত হইতে পারে না। ইহা বিনয়, অস্থূল অবস্থার সমাগমেই ইহার প্রকাশ। স্থযোগ খুঁজিয়া ‘আনিবার শক্তি’ ইহার বৈশিষ্ট্য নাই।

অনেক সময় আমরা মন ও শরীরকে একই পদার্থ বলিয়া ধরিয়া লই, একজ্ঞ বিষয় ভ্রমে পতিত হই। ‘মস্তিষ্ক প্রভৃতির জায় মন শরীরের কোন অংশ-বিশেষ নহে। মানব-মন প্রভিন্ন; কারণ, বিভিন্ন ভাব ও সামগ্রী-স্বারা মানবের মন পরিপূর্ণ থাকে। সকল মানবের পারিপার্শ্বিক বা আবহেটন এক নহে; তজ্জনই এই বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাত ভাবে মানব-মনের উপর বিভিন্ন প্রকার ছাপ পড়িয়া থাকে। সভাসমাজোদ্ভূত ও অবসামাজোদ্ভূত শিশুর মনে কোনই পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না। অভিজ্ঞতাশূন্য মন একথও সাধা পত্রিকা ছাড়া আর কিছু নহে। লেখকের ইচ্ছাছাপের যেমন অনাবিল কাগজটী অক্ষরপূর্ণ ধারণ করিবে, মনও চতুর্দিকস্থ সামগ্রীর প্রভাবে পড়িয়া নানা প্রকার ভাবে ও চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়। বুদ্ধির তারতম্যের ইহা একটি প্রধান কারণ।

অনেকে আবার তৎপারশ্ববর্তী জগৎ হইতে তাহার বর্তব্য খুঁজিয়া পায় না। সমস্তই তাহার নিকট অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হয়। ইহারও কারণ আছে। মানব-মনের রুচি বিভিন্ন। অপনীকিত মানবের বুদ্ধিমত্তা অস্থূলান করা অতীত কঠিন; তাহার রুচি

অস্থূলান করা আরও কঠিন। সেইজন্য সমাজকে তাহার হিতার্থে কেবল জনগণের অবসর স্রষ্ট ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, শিক্ষার ভিতরে বৈচিত্র্য আনিতে হইবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি বাহ্যতে তাহার রুচি ও দীশক্তি অস্থূমারে শিক্ষিত হইতে পারে, সমাজের তজ্জন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। ইহার নাম ‘স্বাভাবিক’ বা ‘স্বাভাবিক’ শিক্ষা।

সাধারণের জ্ঞানসমৃদ্ধি আবিস্কৃত জ্ঞানসমৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম। জনসাধারণ তাহা উন্নয়ন করিতে এখনও সমর্থ হয় নাই। একমাত্র উপরোক্তভাবে শিক্ষাবিস্তার দ্বারাই আবিস্কৃত জ্ঞানরাশি সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিবে। এখানে অনেকে বলিতে পারেন যে, জগতের বর্তমান জ্ঞানরাশিই যদি জন-বিশেষ উন্নয়ন করিতে না পারিল তবে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বাড়িয়া ফল কি? কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রমাক্রমক নহ কি? আমরা উপার্জিত জ্ঞানরাশি “হজম” করিতে পারি না, কারণ আমাদের বাজার এখনও অতি ক্ষুদ্র; ক্ষেতের সংখ্যা অতি কম। সমাজকে একেঞ্জে শিক্ষা বিস্তার করিয়া জ্ঞানোৎপাদিত সামগ্রী-সমূহের জ্ঞে কতোর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

শত সহস্র আইন-প্রণয়ন দ্বারা বা অজ্ঞ কোনপ্রকার চেষ্টায় সমাজের অসম্পূর্ণতা নিবারণ হইবে না। আদ্যদিগকে দোষের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। সমাজের উচ্চশ্রেণী নীচশ্রেণীকে দ্বন্দ্বা করে, কারণ তাহারা অজ্ঞ। সমাজস্থিত অনেক প্রকার ব্যবসায় হয়ে বলিয়া বিবেচিত, কারণ সেই সকল ব্যবসায় অশিক্ষিত লোকের দ্বারা

পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় শিক্ষিত অশিক্ষিতের মিলন অসম্ভব ব্যাপার। চরিত্র ও শিক্ষার ধ্বংসসম্বন্ধ সমতাই সমাজের বিভিন্নশ্রেণীসমূহের মধ্যে প্রকৃত একতা আনিয়া দিতে সমর্থ হইবে। তখনই সমাজের প্রকৃত উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। তাই, আমাদের কর্তব্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যবস্থা

করা এবং সার্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন করা। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ও মহাশয় বিকাশের যে সকল সুযোগ ছিল তাহার প্রচলন এখন সম্ভবপর কি না বৈজ্ঞানিকগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত,
উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়,
মেডিসন, আমেরিকা।

কবি কালিদাসের বাসভবন

ইতিহাসের উপাদান

ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের ইতিহাস না থাকায়, বা না পাওয়ায়, তাহার পুনরুদ্ধার-কল্পে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিষয়-সমাজে, অনেক দিন হইতে বৃহৎ আলাচনা চলিতেছে। কবি কালিদাস ভারতীয় জ্ঞান-রাজ্যের একটি বৃহৎ কেন্দ্রস্বরূপ; তাহার আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা ঐতিহাসিকদিগের একটি প্রথম কল্প। এ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ, পুস্তক, পুস্তিকা ও বাহ্যস্থাবর লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ডাঃ রামদাস সেনের প্রবন্ধ, অক্ষয়-কুমার দত্তের পুস্তক, রমেনচন্দ্র দত্তের প্রবন্ধ ও ইতিহাস, East & West পরে প্রকাশিত কালিদাস-সম্বন্ধে সমালোচনা, আমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। ইংরাজী সকলেই কালিদাস-সম্বন্ধে স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত, যাহার অশুভবে যাহা আসিয়াছে, তিনি সেই বর্ষেই কালিদাসের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন-চিন্তিত ইতিহাস না থাকায়, কেবলমাত্র অশ্বমেনের উপর নির্ভর করা

ভিন্ন প্রকৃতক-উদ্ধারের আমাদের আর কোন পথ নাই। কাজেই সকলেরই অশ্বমেন প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে স্ববাহ্য নৃতন ইতিহাস, কালিদাসের কাব্যের সমালোচনা বা নতুন সংস্করণ, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই, তাহাতে আবার কালিদাসের আবির্ভাব-কাল, কোন শতাব্দী লিখিত হইল, ইহা দেখিবার আমার একটু কৌতুহল হইত।

কালিদাসের সময়-বিচার

১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি এক স্থানে দেখিলাম, কালিদাসের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করিয়া একদমি নৃতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাগুক্ত কোতুল নিবৃত্তি করিবার জন্ত, আমি তাহার ঐতিহাসিক কথা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, "সম্প্রতি একজন জর্দান মনৌবী, Dr. T. Bloch ও বারাবদীর মৌরুজ রামাবতার শাস্ত্রী, যুগপৎ, যুগবৎশের অভ্যন্তর ভাগ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, গুজ্বরের রাজা চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বর্তমান ছিলেন। তাঁহারা বলেন—

যুগবৎশের 'শাসমুদ্রকীর্ণাণাং' ইত্যাদি শ্লোক—সমুদ্রগুপ্ত হইতে যে যুগবৎশের উৎপত্তি হইয়াছে ইহাই বুঝাইতেছে। 'আজুমারকথোদ্যাতং' ইত্যাদি শ্লোকে, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তেরই গুণ গান করা হইয়াছে। 'কুমারসম্ভবং' অর্থে কুমার-গুপ্তের জন্মকথা যোগিত হইয়াছে। 'ভৈষ্ম গোপায়াঃ স ভাষ্যায় গোপক্রে' ইত্যাদি শ্লোকে গুপ্তবংশেরই রাজত্বের কথা বলা হইতেছে। 'পুণ্যায় বুদ্ধিঃ হরিদশব্দীদিভেহুগ্রহুপেশাদিবি বালচন্দ্রমা' এখানে চন্দ্রমা শব্দে চন্দ্রগুপ্তকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আরও চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় অবলম্বন করিয়াই যুগের দিগ্বিজয় বর্ণনা করা হইয়াছে।"

যুগবৎশের প্রথম সপ্ত পড়িলেই মনে হইত, কবি কালিদাস যুগবৎশ-জাত কোনও রাজার পূর্ণপুঙ্খনিদর্শের জ্ঞতিগান করিতেছেন, কারণ কবিরের এক্ষণে অভ্যাস আছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে আছে—"গ্রন্যাপদমহী রাজজন্তবীর্য উচ্যতে।" কাজেই মনৌবীর্যের অশ্বমেন' যে অসম্ভব হইয়াছে, তাহা কে' অস্বীকার করিবে? বিষয়সমাজ এই অশ্বমেনের উপর নির্ভর করিয়া, এক বাক্যে অনেক দিনের বিবাদ মিটাইয়া লইয়াছেন। বর্তমান বর্ষের সমুদয় স্থলপাঠ্য পুস্তকাদিতে পর্যন্ত, কবি কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে জাত হইয়াছিলেন বলিয়া, পূর্ণ পাঠ সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। আমরা, পাঠকগণও, অনেক দিনের উৎকর্ষ হইতে শান্তি লাভ করিয়াছি।

আমার অনুসন্ধান আকাজকা

এই যুগবৎশ পড়ার পর হইতে, আমার মনে তাঁর অশ্বমেন উপস্থিত হইয়াছিল। জর্দান-পণ্ডিত মহাশয়ের এই আবিষ্কার

ভারতবর্ষের মধ্যে জাতীয় ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্ত স্পৃহা আরও বর্ধিত কেন যে করিল না, তাহা চিন্তা করিয়া আমি স্থির করিতে পারিলাম না। তদবধি কদম্বরাজে স্বন্দরতমের বিবরণ প্রাপ্তবৈ থাকি, আর এই কথাটি ভাবি।

অনুকূল অনুসন্ধান

এই অশ্বমেনের সহিত সংগঠন বলিয়া, আমার আর ছুটি ভাবনার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। "বিশ্বকোষ" অভিধানে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দীয় পণ্ডের মলাটে লিখিত ছিল, "আগাধুং বাগাভূম" ইত্যাদি গ্রন্থ্য কবিতোক্ত শব্দাবলীর যদি কেহ অর্থ করিয়া দিতে পারেন, তবে অশ্বমেন হইবে। তদবধি, অনেক আলাচনা করিয়া, আমি ঐ সকল কবিতাবলীর একটা 'অর্থ' নিদর্শন করিয়াছিলাম। ১৯০০ খৃঃ অব্দে "মহিহিত-পরিষৎ-পত্রিকা" ও শ্রীমুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "ছড়ায়" দেখিলাম ঐ সকল কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমার সংগৃহীত ছড়াগুলির মধ্যে একটি ছড়া অপার কোনও সংগ্রহের মধ্যে নাই এবং তাহা নলদা জেলার নিম্নস্থ সম্পত্তি বলিয়াই মনে করিলাম। আবশ্যক বিধায় এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি;—
ওপারের ওস্তি গাছে জন্তি বড় ফলে-
'গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আই চাই, গলা করে কাঠ;
কতক্ষেণে যাবরে ভাই হুগড়ায়ের মাঠ।
হুগড়ায়ের মাঠেতে ভাই পাকা পাকা পান;
পান কিন্ব চূণ কিন্ব, নভে ভাজে খাব;
একটি পান হারালে দাদাকে বলে দিব।
দাদা দাদা ডাক পাড়ি, দাদা নাইক বাড়ি;
হবন হবন ডাক ছাড়ি হবন আছে বাড়ি।

আজ স্বপনের অবিবাস কাল স্বপনের বিয়ে, স্বপনকে নিয়ে গেল দিগুনগর দিয়ে।

দিগুনগরের মেয়ে ছুটি নাইতে লেগেছে, চিকণ চিকণ চুলগুলি ঝাঁড়তে লেগেছে।

হাতে তার সের-নাখা হেম্ব লেগেছে, গলায় তার কর্তমালা রক্ত ছুটেছে।

ওপারে দুটো শিয়াল চন্দন মেখেছে,—

কে দেখেছে কে দেখেছে? বাসা দেখেছে! !

দারার হাতের বাজবন্দুক ছুড়ে মেরেছে, দুই দিকে দুই কাহ্লা মাছ ভেসে উঠেছে।

একটি নিলেন শুকঠাফুর, একটি নিলেন টিয়ে, টিয়ার বাপের বিয়ে, লাল গামছা দিয়ে।

গৌরী যেটি ক'নে, নকা বেটা বর,

চাম কুড়, কুড়, বান্ধি বাসে, চড়ক ভাষায় ঘর।

পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার একটা ভাবার্থ,

অনেক দিন হইতেই বাহির করিয়াছিলাম।

এই ছড়ায় নদীয়া জেলারই * অস্বা স্বর্ণা

করিতেছে; কিন্তু দিগুনগর স্থানটি নদীয়া

জেলার কোন স্থানে বর্তমান ছিল, কেবল

তখন তাহাই নির্ণয় করিতে পারি নাই।

বর্তমানে, শাস্ত্রপুর হইতে কুমুদগর বা ইহার

পথে, দিগুনগর নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীগাম

আছে। সেখানে একশত একট রেল ষ্টেশনও

স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনকালে

সেখানে এমন বৃহৎ সরোবর বা নদী

ছিল না যে, বাহার স্বর্ণা করিয়া এত বড়

ছড়া লেখা হইতে পারে। এহেন স্বর্ণীয়

নিদানগর কোথায়? ইহা স্বপ্নদান একটি

পুরাণে চিত্তনীয় বিষয় ছিল।

তাহার উপর, আমার আর একটি বিশেষ

অস্বপ্নিত্ব বা বিষয় জুটিয়া আসিয়াছিল।

প্রায় দশ বর্ষ হইতে, আমি ভারতীয় বর্ণ-

মালার উৎপত্তির মূলতত্ত্ব উদ্ধারের চিন্তায়

মগ্ন আছি। সামর্থ্য ও সুযোগাভাবে, আমি

এ সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট পুস্তক, কলক বা শুভ-

গাছ পড়িতে পারি নাই; কেবল মাত্র

ভারতের দেশে দেশে যে সকল মূল্যবান

বর্ণমালা প্রচলিত আছে, তাহার ছাপার

পুস্তক দেখিয়া তাহারই আলোচনা করিতে-

ছিলাম এবং তাহা হইতেই যেটাটুকু সিদ্ধান্ত

করিয়া লইয়াছিলাম যে, ভারতীয় বর্ণমালার

তিনটি স্তর। ১য়—কোটিয়ালা বর্ণমালা,

কুটিয়ালা নাগরী বা মহাখনী। এই লিপন-

প্রণালী মারবাড়ী জাতির মধ্যে প্রচলিত

আছে। ইহার উৎপত্তি-স্থান কাটিয়াড় বা

তম্রিকটবর্তী প্রদেশ। ২য়—নাগরী বর্ণমালা।

এই স্তরে মরাঠী, গুজরাটী ও বিহারী কাথ্যী

নাগরী গঠিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি-স্থান

নাগপুর বা তম্রিকটবর্তী প্রদেশ। বকী ত্রয়

স্তর—সেবনাগর বর্ণমালা। এই স্তরে

ভারতবর্ষ, তিব্বত, পূর্ব-উপদ্বীপ ও দীপপুঞ্জের

সমুদয় বর্ণমালা গঠিত। ইহার উৎপত্তি-স্থান

সেবনগর। এখন এই সেবনগর কোথায়?

যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র,

বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ অবস্থিত ছিলেন

বা আছেন, সেই সেবনগর কোথায়? ভারত

জ্ঞানের গতি পশ্চিম হইতে পূর্বা দিকে;

তাহা হইলে, নাগপুরের পূর্বদিকে, সেবনগর

* এই ছড়াটি যে নদীয়া জেলা-নিবাসিনী কোনও রমণীর রচনা, তাহা স্থির করিবার আর একটি কারণ আছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানার একটি ককে ছুটি ভ্রমরকে শৃগাল এখনও রহিয়াছে; ঐ ককের গায়ে বৈরাটী ফুলের লিখিত আছে, "White fox, caught near Ranaghat, Nadiya Dist." পরে তরুতা প্রানিতবলিবারে নিকট অস্থানহানে জানিলাম "Found nowhere else." ছড়া-নিবর্তিত চন্দনবাগা শৃগাল (কুমুদ পুলা) নদীয়া জেলার বিশেষত্ব।

কোথায়? উৎকলে দেবনগর নাই, ছোট-নাগপুরে দেবনগর নাই, বিহারে দেবনগর নাই,—তবে দেবনগর কোথায়? গোড়ো দেবপল্লী আছে, দেবগ্রাম আছে, কিন্তু দেব-নগর নাই কেন?

যদি, অন্ত্যাদি নাগপুর যে বর্ণমালার স্থপতি করিয়াছেন তাহার নাম "নাগর" বর্ণমালা হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সেই বর্ণমালার সংস্কার করিয়া যে বর্ণমালার স্থপতি করিয়াছেন, তাহার নাম "দেবাক্ষর" না হইয়া "সেবনাগর" কেন হইল? সংস্কৃত ভাষার নাম "দেবভাষা", তাহার অক্ষরের নাম "দেবাক্ষর" কেন না হইল? ভারতে সমুদয় ভাষারই এক একটি পৃথক বর্ণমালায় আঁতু আছে, সংস্কৃত ভাষার একটি পৃথক বর্ণমালা নাই কেন? সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার নাম "সেবনাগর" বর্ণমালা কেন হইল?

প্রথম অবিকল্প—সমুদ্রগড় *

গত অগ্রদায়ণ মাসের একদিন স্বপ্নরবনের সেই বিব্রন প্রাচীরে বাসিয়া ভাবিতেছি, "বাসমুদ্রক্ষিতানামাম্"—এই বচনটিতে সমুদ্র-গড় হইতে যে দেশের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। সাধারণ্যে এই বিশ্বাস বলবতী থাকিলেও, অনেক চিন্তা ও পোষাধারণ ফলে আমার ধারণা হইয়াছে যে, ঐ উদ্ধৃত বচনটি সমুদ্রগড়কে লক্ষ্য না করিয়া নদীয়া জেলার সমুদ্রগড় নামক

স্থানকেই উল্লেখ করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে—পাড়া, পুর, গ্রাম, নগর, গঞ্জের দর্শনে, সেই সকল ছাড়িয়া, "গড়" কেন হইল? বাঙ্গলাদেশেও কোনও ছুর্গাদি নাই, তবে ভাগীরথীতীরবর্তী ক্ষুদ্র পল্লীর নাম "সমুদ্রগড়" কেন হইল? নিকটেই কোনও সমুদ্র নাই, তবে নদী-তীরের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের নাম "সেবনাগর" কেন হইল? বাঙ্গালী কোনও ব্যক্তির নাম ত সমুদ্র হয় না, তবে এখানে "সমুদ্রগড়" কেন আসিল? চন্দ্রগুপ্তের পূর্বপুরুষ, সমুদ্রগুপ্তের নাম হইতে ত এই গ্রামের নাম "সমুদ্রগড়" হয় নাই?

বিদ্যানগর†

জনশ্রুতি অস্বপ্নের "বিদ্যা" কালিদাসের পত্নীর নাম-ছিল। তাহার নগর "বিদ্যানগর।" সমুদ্রগুপ্তের নামের পার্শ্বে, তৎসংজ্ঞাতা বিদ্যার নাম কেন? মেঘদূতের এক চরণে আছে,—"প্রাতীমূলে তদ্বাসব কলামাত্র-শোণাং বিদ্যাশোণাং" প্রচলিত প্রবাদ অস্বপ্নের কালিদাস পণ্ডিত হইয়া যুগে কিরিয় আসিলে, বিদ্যা কালিদাসের পার্শ্বভুক্ত দেখিয়া হর্ষ-বিষাদে বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই চরণের ভাবার্থ আলোচনা করিলে, বিদ্যা যে ঋষিত প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা অস্বত্বত হয় না। এই চরণ পড়িলে মনে হয়, বিদ্যা

* সমুদ্রগড় নবাবপের দক্ষিণে এক কেশের মধ্যে দ্বিত একটি পল্লী, এখানে মৃতদেহ রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে, এখানে বড় বড় অধ্যাপকগণ লক্ষ্যমহণ করিয়াছিলেন। ইহা আন্তর্জাতিক গ্রাম। ভগ্ন বাটগুলি রেল ষ্টেশন হইতেই দেখা যায়।

† জনশ্রুতি বাটীত কালিদাসের পত্নীর নাম যে বিদ্যা ছিল তাহার বিবিত কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কালিদাসের পুস্তকাবলী হইতে অস্বপ্নদায়ণ কল্পনা আছে। বিদ্যানগর নবাবপের উত্তরে ১ মাইল দূরবর্ত একটি ক্ষুদ্রপল্লী। এখানে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের মহাপ্রভু ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। ৫০ বৎসর পূর্বে এখানকার অধ্যাপকগণ নবাবপের বৈরাগ্যবিদগকে ব্যাকরণ পড়াইতেন। এখানকার মাটিতে যুগের পোল গঠিত হয়। বৈষ্ণবগণ ভক্তিভাবে সেই মাটি চাটাইয়া খান "এই মাটিতে পোল হয়।"

অনেকদিন রুগ্ন শয্যা শয়না থাকিয়া, প্রাচীমূলে কলামাভ্রবেষা হিমাত্তর তছর মত ক্ষীণ হইয়া, দেহত্যাগ করিয়া ছিলেন। যদি সেই বয়সে দেখে, এই ভাগীরথীর এই বালুকাশয্যাত্তেই তাকু হইয়া থাকে; আর সেই শ্মশান-ক্ষেত্রেই নাম “বিদ্যানগর” হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এ কথা কেন না অহমান করিতে পারিব?

ঘটনগত সাক্ষ্য বা

Circumstantial evidence

বাহার পত্নী এইরূপ ক্ষীণ হইয়া, ক্রমে ক্রমে মরিয়া গিয়াছেন, তাহারই শোক-গাথায় “প্রাচীমূলে তছরিব কলামাভ্রবেষা হিমাত্তোঃ” এইরূপ ছন্দে শোভা পায়। এটা অশুভবের কথা মাত্র, প্রতীক প্রমাণ কিছুই নাই। পার্শ্ববর্তী কার্যসমূহ হইতে কারণের অহমান মাত্র। ভারতে গুরুত্বই একটি বিরাট অহমেয় জ্ঞান মনে হয়, কালিদাসের কাব্যায় পড়িলেই মনে হয়, সেগুলি একটি ধারাবাহিক করণ-অর্থনাদ। তিনি তাহার পত্নীর জ্ঞান কীভাবে, আর তিনিই সেই কীর্তী, মাদা কাণ্ডে কালির অক্ষরে, ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জগৎ শত সহস্র বর্ষ পরেও সেই অর্থনাদ শুনিতে পারেন। সেই অর্থনাদেই যখন জনিত হইতেছে, তাহার পত্নী প্রাচীমূলে কলামাভ্রবেষা হিমাত্তর তছর মত, ক্ষীণ হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন তিনিই যে এই বিদ্যানগরেই অনন্তশয্যা শয়না হন নাই, এ কথা কে বলিতে পারে?

“প্রাচীমূলের ক্ষীণকলা” বাক্যগুলি হইতে, আরও বুঝা যায় যে, কালিদাস বিহারের রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে, অনেক রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া ছিলেন। প্রাচীমূলে ক্ষীণা চন্দ্রকলা রাত্রি-শেষে উদিত হন। এবং সেদিন রুগ্না জয়োদশীর শেষ রাত্রি। এ সব অশুভববোঝা কথা, তর্ক-যুক্তি এখানে খাটে না। পূর্বেই বলিরাছি, ভারতের ইতিহাস আলোড়ন করিতে হইলে অধিকাংশ স্থলেই অহমানেরই উপর মাত্র নির্ভর করিতে হইবে।

দিগ্‌নগর

তাহার পর অর্ধ একদিন, মেঘমুতের আর এক রজন মনে পড়িল। “দিগ্‌নাগানাম পথি পরিহরণমূলংস্তাবলগান” * “কালিদাস্ত প্রত্যাশ্যন্তি দিগ্‌নাগাচার্যো নাম”। মন্তিনাথ। “দিগ্‌নাগাচার্য্য একজন বড় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন।” প্রথমে সমুদ্রগড়, পরে বিদ্যানগর ও তৎপরে দিগ্‌নগরের দিগ্‌নাগাচার্য্য এইগুলির স্বাভাবিক পারস্পর্য্য দর্শনে আমার অনেক দিনের সমস্তার সমাধান পাইলাম।—দিগ্‌নাগাচার্য্য=দিগ্‌নগরের আচার্য্য। এখন আর নদীয়া জেলার মধ্যে দিগ্‌নগর কোথায়, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে কোনও কষ্টই নাই। কারণ, দিগ্‌নগরের মেঘেগুলির চুল চিকন, হাতে দেবশীষা এবং গলায় বস্ত্রমালা। গ্রাম্য ছড়াতে আছে,—

“উলার মেঘের কল্কলানি,

গুপ্তিবাড়ার চোপা।”

শান্তিপুুরের হাত নাড়ানি, নবদ্বীপের খোঁপা।”

ইহাতে প্রাচীন দিগ্‌নগর যে এক্ষণে নবদ্বীপ

হইয়াছে, তাহা পাওয়া গেল। বর্তমান সময়েও নবদ্বীপের রমণীগণ হুকেদিনী ও হুসরী এবং নবদ্বীপের শম্ভাভরণ দেশ-বিখ্যাত। গ্রাম্য ছড়ায় আরও আছে—
“পাগলি লো ছাগলি, তোর ছাগল

কোথা চরে?

দিগ্‌নগরে।

কোন্‌ থন্দ থায়?

আঁশের পাতা, বাঁশের পাতা তিন থন্দ থায়।” ইহাতেও বুঝা যাইতেছে, দিগ্‌নগরে বড় বড় বাঁশঝাড় এবং আশশাওড়া বুন আছে। বর্তমান নবদ্বীপ একজুও বিখ্যাত। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা এই জুতা ব্যস্ত করিয়া বনে,—

“বাঁশ বাকস ডোবা, তিন নদের পোতা।”

ইহাতে প্রাচীন দিগ্‌নগর ও বর্তমান নদীয়া

যে অভিন্ন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইল।

নদীয়া জেলার জীলোকেরা নবদ্বীপকে “নগদ্বীপ” বলিয়া থাকে, তাহাতেও নবদ্বীপ এবং দিগ্‌নগর যে একই স্থান, তাহা বৃষ্টিতে আর কোনও বাবাই নাই এবং নগদ্বীপ=দ্বীপনগর।

শব্দবিদ্যার বলেও “দিগ্‌নগর”ই যে “দেব-নগর,” তাহাও নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। দিগ্‌নগর=দ্বীপনগর=দেবনগর=দেবনগর। এমতে দ্বীপনগরে যে বর্ণনাগর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার নাম দেবনগর বা দেবনাগর। প্রাচীন দ্বীপনগর নতুন সংস্করণে নবদ্বীপ হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। নওদিয়ায় বা দেয়াড় এই শব্দ হইতে “নদীয়া” বা নতুন চড়া এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। নবদ্বীপে এখনও “দেয়াড় পাড়া” নামে একটি পল্লী আছে।

দেয়াড়=চড়া; নদীয়া=নতুন চড়া। নদীয়ার বিশুদ্ধ বা সংস্কৃত কথা নবদ্বীপ। ইহাতেও প্রমাণ হইল, দিগ্‌নগর, দ্বীপনগর, দেবনগর এবং নবদ্বীপ এক স্থানেরই বিভিন্ন সময়ের নাম, অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত এক স্থানেরই নাম। এই ভাবে, আমার অনেকদিনের একটি অশুভদ্বিত্ত বিষয়ের সমাধান পাইলাম। আমি “দেবনাগরের” অহুসন্ধান আশিয়াছিলাম, দিগ্‌নগর পাইলাম, দেবনগর পাইলাম, এবং দিগ্‌নাগাচার্য্য নামক একজন বড় দার্শনিকের জন্মভূমি পাইলাম। সমুদ্রগুপ্ত, বিরাট, ও দিগ্‌নাগাচার্য্যের অহুসন্ধান পাশাপাশি পাওয়া গেল, বাকী থাকিলেন কালিদাস। নবদ্বীপের পশ্চিম পার্শ্বে কোনও কাগিগঞ্জ, কালিনগর, বা কালিদাসপুর আছে কি না, তাহা আমার স্বত্বপক্ষে আপাততঃ আদিতেছে না।*

মাতৃগুপ্ত

বহরমপুরের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ, ডাঃ ভরদ্বাজ সেন, প্রায় ৪০ বর্ষ পূর্বে, কোনও পুস্তিকায়, “কালিদাস” সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি তাহা পুস্তিকাকারে পুনঃ মুদ্রিত করিয়া, বাম্ব মধ্যে বিস্তারিত করেন। তাহাতে তিনি রাজতত্ত্ববিদ্যে দুই প্রমাণ করেন যে, কালিদাসের নামান্তর মাতৃগুপ্ত ছিল। বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর জয় করিয়া, কালিবাসকে কাশ্মীরে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। মাতৃগুপ্ত বড় কবি ছিলেন। তিনি কিছুদিন কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়া, অন্তিম বয়সে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। কালিদাস সম্বন্ধে আমি অনুন ৪০০ জনের মতামত পাঠ করিয়াছি,

* দিগ্‌নাগাচার্য্যের বাট এই নাম অস্বাভাবিক অনেক দূর হইতেছে। ইহা পরে বিচার্য্য। রামগিরির নিকটে হইতেছে না। দিগ্‌নাগাচার্য্যের ভগ্নে কালিদাস ভীত ছিলেন। এখনও দিগ্‌নাগাচার্য্যের বেশ কালিদাসের বসনধারণের কোনও সম্ভাব্য নাই।

* বিদ্যানগরের পার্শ্বেই “কালিদহ” বা “কালি দা” নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তাহাকেই কালিদাসের নাম স্মারক গ্রাম বলিয়া কালিদাস।

কিন্তু কালিদাসের নামান্তর যে মাতৃগুপ্ত, তাহা স্ত্রামদাস সেন ব্যতীত, আর কাহারও প্রবেশ দেখিবাছি বলিয়া ত মনে হয় না। বহরমপুরে তাঁহার বিরাট পুস্তকালয়ে তাঁহার পুস্তক পাওয়া যাইতে পারে।

মাতৃনামের গ্রামাবলী

কালিদাসের নামান্তর যে মাতৃগুপ্ত ছিল, তাহা লিখিত শাস্ত্র বা শাসন দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারিলেও, নবমীপের অতি সন্নিবর্ধে নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলী জেলার স্মিলন-স্থানে মাতৃগুপ্ত নামে কোনও ব্যক্তি, কোনও সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বা বর্ধমান ছিলেন, তাহা শব্দ-বিদ্যার অস্থানান অস্বাভাবিক স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। (১) মাতাপুত্র, মাতৃ শব্দের প্রসাস্তর। (২) মামপাতি, মাম = মাতুল, এই প্রতিবচন সমুদয় নীচাকার-গমই স্বীকার করিয়াছেন। কাহ্নই মামপাতি অর্থেও মাতৃভবন। (৩) দাক্ষীগ্রাম, দাক্ষী এবং মাতা একাব্যবচক। (৪) অধিকা (কালনা) মাতৃব্যচক শব্দ। (৫) মাতাপুর (গৌরদেবের জন্মস্থান) মাতা-শব্দ মেঘোচ্ছব শব্দ হইতে জাত হইয়াছে ধরিলে ইহাও মাতৃশব্দের প্রাকৃত রূপ। (৬) অধিকা কালনার সহিত সম্বোধন গুপ্তপত্নী মাতৃগুপ্তকে আদান করিতেছে। (৭) ব্রাহ্মণীলতা,—ইহা মামপাতির একটি অংশ। এখানে প্রতিবর্ণ্য শ্রাবণ কালিদাসের দিন একটি মেলা হইয়া থাকে। এখানে ব্রহ্মণী, মাদিনী বা মনসা নামে পরিচিত। কিন্তু শাস্ত্রে ব্রহ্মণী সরস্বতীর নামান্তর। তন্ময় মাতৃকাজাদেশের মধ্যে “মাতৃকা সরস্বতী দেবতা” এইরূপ আছে; এবং মাধারণে মা ব্রহ্মণীও বলিয়া থাকে।

তাহাতে মাতৃনামেরও আভাস আসিতেছে। (৮) নবমীপের পোড়ামাতলাকেও ইহার সহিত ধরিতে পারি।

মাতৃকা-বর্ণাবলী

পূর্ণেই বলিয়াছি, নীচনগর হইতে যে বর্ণমালায় উপপত্তি, তাহার নাম “দেব-নগর” কিন্তু তন্ময় দেখি যে, যে বর্ণাবলী আমরা উদ্ধারণ করি, তাহার নাম মাতৃকা-বর্ণাবলী—“অথ মাতৃকা-বর্ণভাস; অথান্ত-মাতৃকা অং নমঃ, অং নমঃ” ইত্যাদি। “অথ বাহুমাতৃকা পঞ্চাশৎ লিপিতা বিভক্ত”—ইত্যাদিতে বাক্যদেবতার স্থান আছে। এই মাতৃকাবর্ণাবলীই দেখান্তরে গিয়া “দেববাণুর” বর্ণমালা হইয়াছে। ইহাতেও মাতৃগুপ্তের স্মরণ হইয়াছে। (কালিদাস, মা সরস্বতীর বয়স্ক ছিলেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে, কালিদাস বিদ্যার গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সরস্বতীর সাধনা করিয়া, ত্রাণায়াত অগাধরণ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। এই কালিদাসের সাধন-স্থান যে, মামপাতির ব্রহ্মণী তলা নদে, এ কথা কে বলিতে পারে? মাতাপুর হইতে অধিকা (কালনা) পর্যন্ত এই ছয়কোশব্যাপি স্থান মধ্যে এত মাতৃব্যচক গ্রাম কেন? ইহার কি উত্তর হইতে পারে? বিশা-নগরের পার্শ্বে, এত মাতৃব্যচক গ্রাম দেখিয়া, মাতৃগুপ্তই যে কালিদাসের নামান্তর, এ কথা কেন না স্বীকার করা যাইবে? -

মাতৃগুপ্ত ও বৈদ্যজাতি
রাজতরঙ্গিনীর মতহুগরে, মাতৃগুপ্ত একজন বড় কবি ছিলেন; তাঁহার কাব্য কোথায় গেল? “অধিকা-কালনা” এই খুলগ্রাম হইতেও মাতৃগুপ্ত কালিদাসের

আভাস আসিতেছে। অধিকা কালনার যত গুপ্ত বৈদ্যের বাস; তাঁহারা মাতৃগুপ্তের আশ্রয় এবং দুইট, এ কথাও অস্বাভাবিক করা যায়। এক সময়ে, বৈদ্যগণ আপনাদিগকে বৈজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতেন। ১০২ খ্রীষ্টাব্দের আদমহুয়ারিতে, যে বৈদ্য-কায়স্থ-সম্পদ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর-আপনাকে বৈজ্ঞ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। সমুদ্র-গুপ্তের বংশধরগণ যদি এদেশে আসিয়া বৈজ্ঞ হইয়া থাকেন, এবং যদি তাঁহাদের কতক বিবাহ, করিয়া, কালিদাস মাতৃগুপ্ত এই আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার গুপ্তের, বিদ্যার গর্ভজাত পুত্রগণ বৈদ্য নামে কেন অভিহিত না হইবেন? “ব্রাহ্মণ্যং বৈজ্ঞকজ্ঞায়াং জাত্যেষ্ঠ ইতি স্বতঃ”; এখানেও অস্বষ্ট শব্দে মাতৃগুপ্তের আভাস আসিতেছে। অস্বষ্ট হইতে বৈদ্য জাতি যদি পৃথক বর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যস্থ, ব্রাহ্মণের গুপ্তে বৈজ্ঞ-কজ্ঞার গর্ভজাত বলিয়া অনেক রচন শুনা যায়। যে ব্রাহ্মণ এইরূপ স্বর পুত্রের জন্ম দিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ধনন্তরি ছিল। এই মাতৃগুপ্তই সেই ধনন্তরি; কারণ গুপ্ত-উপাধিদ্বারা সকল বৈদ্যই ধনন্তরি-গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দেন। কবি মাতৃগুপ্ত যদি বৈদ্যদের পূর্বপুরুষ ধনন্তরি হন, তবে তিনি নবরত্নের অন্ত-তম ধনন্তরি হইতেও পারেন। এবং

তাঁহার পূর্ণ নাম এই করণে “মাতৃগুপ্ত ধনন্তরি” হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তিনিই কবিরাজ বা রাজকবি না কবিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কবিরাজ কথাটির আভিধানিক সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হইলেও, ঐতিহাসিক সংজ্ঞা ও লোকচারবশতঃ সমুদ্র বৈদ্যগণই আপনাদিগকে কবিরাজ বলিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা কবিরাজ মাতৃগুপ্ত ধনন্তরির স্মারকবংশীয়, এজন্য অস্বাভাবিক করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

পূর্ণোক্ত প্রথা-মতে, কালিদাসের গ্রন্থ হইতে কালিদাসের নাম বাহির করিতে না পারিলেও, মাতৃগুপ্তের নাম নিরাপদে উদ্ধার করা যায়; যথা,—“উমেতি মাত্ৰা তপসে নিমিত্তা, পশ্যন্ত উমাখ্যাং পুত্রা জগাম।” (কুমার)। ইহা হইতে অস্বাভাবিক করা যায়, কালিদাস বৈজ্ঞকজ্ঞা-কতা বিবাহ করিবার পরে উমাকালী অথানাস, বা মাতৃগুপ্ত এইরূপ কোনও নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাকে হুন্দরী বৈজ্ঞকজ্ঞা-কতা বিবাহ করিতে অস্বেকেই নিমেষ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এই তপস্বী বা সমাভোক্তাপকারী কার্য করিতে বিরত হইয়ে নাই।

মাতৃগুপ্ত ও ধনন্তরি

জ্যোতির্বিদ্যাতরঙ্গ-গ্রন্থে, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভার কথা লিখিত আছে। জ্যোতির্বিদ্যাতরঙ্গ-গ্রন্থ কালিদাস প্রণীত নাহলে তাহাতেই লিখিত আছে। তাহাতে কালিদাস-প্রণীত কাব্যজন্মের নামোন্মেষ

* তদবধি বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ হুন্দার হইয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য চুল্লুনি জগদী হইতেছে। পূর্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আত্মীয় ছিল; এখন আর সে ভাৱ নাই, যোবতর পক্ষতা আশ্রয় পাঁড়িয়ে। সেইজন্য হুন্দে এইরূপ পাতা। নিমিত্তা তাহাদের সহিত অস্বাভাবিক আরও গঠিত হইবে আশঙ্ক্য করিতেছে। অস্বষ্ট এ কথা আলোচনা না করিলেও মাতৃগুপ্তের ইতিহাস স্পষ্ট হয় না। প্রবাদ আছে যে, কবি কালিদাস লম্পট ছিলেন।

আছে, নাটকত্রয়ের উল্লেখ নাই। তদনুযায়ী নাটকত্রয়ের প্রণেতা বলিয়া, অপর একজন কালিদাস স্বীকার করা যাইতে পারে। আরও, যে স্লোকে নবরত্নের সভার কথা লিখিত আছে, তাহার বর্তমান ব্যাখ্যাতেও একটু ক্রটি আছে বলিয়া অস্বত্ব হয়। সেই স্লোকটি এই :—

“ধনুস্তরীঃ ক্ষণকামরসিংহ শব্দ,
বেতালভট্ট খটকর্ণক-কালিদাসঃ।
খ্যাতে বরাহ-মিহিরৌ—নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বরকটম্ ব বিকমস্ত ॥

সভাটি বিশ্ব-বিশ্রুত নবরত্নের বটে, কিন্তু আমরা স্লোকের অনুনাতন ব্যাখ্যা মতে রত্ন পাইতেছি দশটি। কাজেই ব্যাখ্যাটির অসামঞ্জস্য বিধায়ে, একটু পরিবর্তন করা আবশ্যক হইয়াছে। সাধারণ লোকে বরাহ-মিহির একই ব্যক্তির নাম বলিয়া মনে করে, কিন্তু এখানে বিবচনাগ্ন প্রযুক্ত হওয়ায়, বরাহ এক ব্যক্তি এবং মিহির অপর ব্যক্তি স্মৃতিত হইতেছে। আমি এই স্লোকাভ্যাসারে, নয় জন বিক্রমাদিত্যের এই দশ জন রত্ন ছিলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা বুঝিয়া, মাতৃগুপ্ত-বংশটিকে চতুর্থ শতাব্দীর লোক ধরিতেছি এবং নাটকত্রয়ের প্রণেতা দ্বিতীয় কালিদাসকে যষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া অস্বত্ব করিতেছি। তবে তিনিও বাঙ্গালী ছিলেন, যেহেতু, কালিদাস এই নামটিই বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি।

নবদ্বীপে গুজরাটী উপনিবেশ

চন্দ্রগুপ্ত গুর্জরের রাজা ছিলেন, তাহার নামীয় “গড়” গান্ধার্য্যে কেন হইল? চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন; তাহার বংশধরগণ গুর্জরের মরদেশ ভাগ করিয়া, ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূমি শক্ত-ভাম

গভাতীরবর্তী স্থানে আসিয়া, বাস করিয়াছিলেন,—এইরূপ অস্বত্বমান এখানে অসম্ভব হয় না। আরও, এখনও সমুদ্রগড়ের অধ্যাপকগণ অশুভ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণই আছেন; অথচ তাহারা বৈদ্যের কর্ণে মন্ত্র দিয়া থাকেন,—ইহাতেও তত্রতা বৈদ্যদের নৃপবংশীয়দের পরিচয় দিতেছে। অপিচ, গুর্জরের লোকেরা যে কোনও সময়ে, গান্ধার্য্যে বাস করিয়াছিলেন, গুজরাটী ভাষার সহিত গান্ধার্য্যীয় ভাষার অধিকতর সামঞ্জস্যও তাহার এক প্রমাণ। এতদ্ভাষা, পুরোনীক “উলার মেঘের কল্কলানি” ইত্যাদি ছড়াও একটি সংস্কৃত স্লোকের বিকৃতি। সেই সংস্কৃত স্লোকটিতে, গুজরাটী স্ত্রীলোকদিগের প্রশংসা আছে। তাহাও গুজরাটীরাই এদেশে আনিয়াছেন। ব্রহ্মাণীতলার নাগোংসব হইতেও বুঝা যায় যে, গুর্জরের নাপথলক জাতি কোনও সময়ে গান্ধার্য্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। নদীয়া জেলায় কয়েক ঘর “ধনী”-উপাধিদারী লোক আছেন, তাহারা বলেন যে, তাহাদের পূর্বপুরুষেরা “কণী” ভাষা” প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বংশ-বুদ্ধির অনুপাত

আদমবংশমূর্তিতে দেখা যায় ১২০০ খৃঃ বাঙ্গালা দেশে ১১,৬২,৫৪৭ জন ব্রাহ্মণ, ৯,৮২,০০০ জন কায়স্থ এবং ৮৪,৬২০ জন মাত্র বৈদ্য বর্তমান। বংশবুদ্ধির অহুপাত ধরিলে, বৈজ্ঞান্যাতিকে নবদ্বীপের মূল জাতি বলিতে পারা যায় না; কিন্তু উহাকে ব্রাহ্মণজাতির পতিত শাখা ধরিয়া, মাতৃগুপ্তের সহিত সমন্বয় করা যাইতে পারে। ফাহিয়ানের সময়ে, গান্ধার্য্যে বৃদ্ধ-পল্লীময় ছিল; গুর্জর হইতে সেই সময়েই উন্নত জাতির আগমন কল্পনা করিলে, বৈজ্ঞান্যাতিকে তাহাদের

কালিদাসের সাধন-পীঠ

৩ ব্রহ্মাণী তলা, নবদ্বীপ



একটি ক্ষুদ্র শাখাও মনে করা যায়। বাদ্যলার
প্রাচীন ইতিহাসে বৈষ্ণবজাতির নাম নাই।

লোক-প্রবাদেও নাই, যথা—

“উলু কটু চুলু কটু নলের বাঁশী,

নল গড়েছে একাদশী।

একানল পঞ্চদশ, কে কে যাবি কামার শালি ॥

কামার মাগি খড়ু রডানি, বড়ের উপর

তোলে পানি।

অগ্নন, দগ্নন, কুরি, কে’ত, বেরাশন ॥*

ইত্যাদি কোনও গ্রামা ছড়াতেই, কায়স্থ

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি এক পর্ধ্যায়ে,

বৈষ্ণবজাতির উল্লেখ না থাকায় তাহাদিগকে

নবীন জাতি ও মাতৃগুপ্তের কুটুম বলিয়া

ধরা যাইতে পারে।

নামের স্থায়িত্ব

শেষ কথা, খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে যে গ্রামের

নাম বাহা ছিল, খৃঃ বিশ শতাব্দীতেও যে সেই

গ্রামের নাম তাহাই আছে, তাহার প্রমাণ

কি? প্রায় ৮১০ বর্ষ হইল, কাটোয়ার নিকটে

একখানি তাম্রকলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

তদানীং তত্ৰত্য মুদৈক ৩ বেনওয়ারিলাল

গোখামী, তাহার একটি বন্দাহবাদ করিয়া,

সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, তাহাতে দেখা

যায়, খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে যে গ্রামের নাম

যাহা ছিল, তাহার বার শত বর্ষ পরে বর্তমান

কালেও সেই গ্রামের নাম ঠিক তাহাই

আছে, বিন্দু মাত্র বিকৃত হয় নাই। কাটোয়া,

নবদ্বীপ ইহাতে ১০১২ কোশ উত্তর।

যেখানে বার শত বর্ষে গ্রামের নাম বিকৃত

নাই হয়, সেখানে পনের শত বর্ষেই বা গ্রামের

নাম কেন পরিবর্তিত হইয়া যাইবে?

মামগাছির লোকেরা কালিদাসের সম্বা

অবগত আছেন কি না? এ কথা উত্তরে,
২৭শে আশ্বিন ১৩২০ সনে, মামগাছিতে

সভা করিতে গিয়া অনেকে নূতন তথ্য জানা

গিয়াছে। নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে ধারাবাহিক

অহুসন্ধান করিলে এই সম্বন্ধে আরও কিছু

তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। কোনও ভগ্ন

স্তূপের কোন ইতিহাস, তত্ত্ব কোন দেশীয়

লোকেই দিতে পারে নাই। রাজস্থানের

চিতোরগড়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা,

চিতোর সম্বন্ধে কোনও তথ্যই অবগত নহে।

এইরূপ সারনাথ, বগুগিরি, রাজগৃহ প্রভৃতি

সর্বত্রই মৃৎ বাস্তির সন্ধান কেহই রাখে না।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

কালিদাস-তথা অহুসন্ধানকালীন, নানাতপ

উপদানের সাহায্যে, কালিদাসের জীবনেতিহাস

কল্পনা করিয়া যাহা যাহা সামঞ্জস্য করিতে

পারিয়াছি, এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিলাম।

সমুদ্রগুপ্তের বংশীয় কোনও ব্যক্তির একটি

অলোকসামান্য রূপবতী ও বিহীনী কন্যা

ছিলেন। তিনি মাধবীর মত পতির

অধেষণে বেড়াইতেছিলেন। গ্রামা ছড়ায়

আছে—

“দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা গেছে

কার বাড়ি।”

“ও ধারের যেও না গো, ঝুঁক এসেছে;

ঝুঁক পান খেওনা গো, ভাব নেগেছে;—

ভাব ভাব-বদনের ফুল ফুটে উঠেছে—

হাত বাড়িয়ে তুলতে গেলাম দাদা রয়েছে—

দাদার হাতের বাজুবন্ধু ছুড়ে ঘেঁরেছে—

উহু বড় নেগেছে” !!!

এই ছড়া আলোচনা করিলে বুঝা যাইতেছে

যে, বিভা সাগুতানী কন্যাদিগের মত বা

* অগ্নন=আলোপনকারী, ত্রিকর; দগ্নন=দগ্ধিত; কুরি জাতি—নদীদ্বারেরাভেই জগ্ধ্য; কে’ত=কায়স্থ; বেরাশন=ব্রাহ্মণ।

সাবিত্রীর মত “মরদ ধ্বংস”ে বাহির হইয়া ছিলেন। তিনি মরদদের হাতে পান দিয়া তাহারিগকে বধ করিতেছিলেন। ভট্ট অথাকালী বা কালিদাস নামে একজন মধুর অসাবধান নব্য ও মূর্খ ভ্রাক্ষণ যুবককে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু বিদূষী স্বামীকে অত্যন্ত মূর্খ জানিয়া পরে গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন। কালিদাস গান্ধার্য্যে আসিয়া, ব্রহ্মবীতলায় সরস্বতীর সাধনা করিয়া, অসাধারণ জ্ঞানী হইয়া উঠেন। এবং বেশে ক্ষিত্রিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পত্নীর প্রমোহনকারী মুখে মুখে “বটু-সংহার” রচনা করিয়া তাহার সমাধান করেন। পরে “শ্রুতবোধ” রচনা করিয়া তাহার নৃতন ছন্দ সন্ধানের তথ্য তাহাকে অবগত করান। তিনি বিস্তার সহিত গান্ধার্য্যে আসিয়া, স্বস্তরবাড়ী বাস করেন। সেখানে বিদ্যার মুক্তা হইলে, স্বস্তরবাড়ীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক রহিত হইয়া যায়। তিনি পুনরায় গুজ্জরে বাইরা, তন্ত্রস্ত কাব্যমোদী রাজা চন্দ্রগুপ্তের, সূতোর্য্যর্থ রত্নবংশাদি তিনখানি কাব্য রচনা করিয়া, কান্দীরের “শালক্য-পদাধী” লাভ করেন। পরে তিনি আবার এই গান্ধার্য্যে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার অসবর্ণ পত্নীর গর্তজাত পুত্রগণ পরে মাতুল-কুলের সহিত মিশিয়া বৈদ্যাস্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি পরে আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পুত্র সর্বগা পত্নীর গর্তজাত পুত্রের নাম স্বর্ণ-লক্ষণ ভট্ট। তাঁহার বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া কবির ভগিনী “ওপারের জন্তি গাছটি” ইত্যাদি ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। ইনি পরে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার নামাহ্বানে স্বর্ণবহিহার নামক গ্রাম হইয়াছে। তাগাহই বৌদ্ধ নাম “কপপক”। তাহার পরে কালিদাস

নামে আর একজন কবি এই গান্ধার্য্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও তিনখানি নাটক রচনা করিয়া যান।

উপসংহার

আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, ভারতের যথারীতি ইতিহাস না থাকায় মহাপুরুষদের আবির্ভাব-কাল লইয়া বড়ই বিতর্কিত হইতেছিল। তাত্ত্বিক ও সমসাময়িক পুস্তকাবলী হইতে কোনও কথাই হুমুয়াসা হয় নাই। সম্প্রতি আভাস্তরীণ স্রোতাবলী হইতে কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্ভ্রান্তরূপে অন্বেষিত হইয়াছে। সেই রীতি অবলম্বন করিলে, সমুদ্রগুপ্তের নামাহ্বাধী সমুদ্রগুপ্ত, বিদ্যার, নামাহ্বাধী বিদ্যানগর, দিগ্বাণা-চার্যের নামাহ্বাধী দিগ্বনগর নামক গ্রাম নিকল পাশাপাশি ভাবে নবদ্বীপের নিকট পাওয়া যাইতেছে। কালিদাসের নামে ও মাতৃগুপ্তের নামে ৬ খানি গ্রাম পাওয়া যাইতেছে। মাতৃগুপ্ত একজন রাজকবি ছিলেন। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের নামান্তর বিবেচনা করিয়া কবি কালিদাসকে গান্ধার্য্য-বাসী বাঙ্গালী বলিয়া অহমান করা যাইতেছে।

বিদ্বৎসমাজে প্রার্থনা

এক্ষণে বিদ্বৎসমাজে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমি অতি দীন ব্যক্তি, যথারীতি অহম্ময়ান করিয়া এইরূপ গুস্তর বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আপনাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে, এই বিষয়ের স্থানীয় অহম্ময়ান ও শাস্ত্রীয় সমালোচনা করিয়া, কালিদাস কোন দেশীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দেশের লোকের প্রাণে আর একটু বল বৃদ্ধি করিয়া দিব। আমাদের দেশের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব

বিদেহীতে উদ্ধার করিতেছে, বলিয়া আমাদের যে কলঙ্ক আছে, তাহা ক্ষালিত করুন। আমরা আপনাদের কাৰ্য্য দেখিয়া ধন্য হই।

নবদ্বীপ-নিবাসী এবং নড়াল ডিক্টোরিয়া কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে শ্রুত হইল। যে, ৩ব্রহ্মাণী পীঠের নিকটে রাঙ্গাপাড়া নামক একটি পল্লী আছে। স্থানীয় লোকে বলে এই পীঠের ভিতরে একটি রৌপ্য ঘট আছে এবং একটি রৌপ্য দ্বিশূল আছে। জন-প্রবাস এই যে, এইস্থানে রাঙ্গাশবিক্রমাদিত্যের গজাশ্বানের বাটি ছিল; তাহার পাড়া, সেই লুপ্ত সেই স্থানে নাম রাঙ্গাপুর বা পাড়া। সেখানকার অনেক প্রাচীন বাটী ঐ স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

৩ব্রহ্মাণী পীঠটি প্রাচীন ইষ্টকাবস্থ বৌদ্ধের উপর বটরূপ ভদ্রায় কয়েকটি ঘট মাত্র। স্থানীয় জামদার স্রীধরদাস সাহা মহাশয় বলেন ত্রুক্ষনগরের মধোরাজা ৩গিরিশঙ্করায় এখানে তপস্বী করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনিই সেই ইষ্টকাবস্থ বৌদ্ধ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের প্রধান ও প্রাচীন অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দ্বায়রত মহাশয় বলেন—এই ব্রহ্মাণী তারাকপী নীলসরস্বতীর প্রতিকৃতি। এই ঘট কয়টিই এই পীঠের অতি প্রাচীনত্বের প্রমাণ। নবদ্বীপের ৩পোড়াঘাট, শান্তিপুর বাগচাড়ার ৩বাগু-দেবী প্রভৃতি অতি প্রাচীন পীঠ মাহেই এইরূপ কয়টি ঘট-সমষ্টি মাত্র। এই নিকট-বর্তী জাননগরে জহ্নু মূর্তির আশ্রম ছিল। তাঁহার নামাহ্বাধানে এখানকার গঙ্গার নাম জাহ্নবী হইয়াছে। “গঙ্গাযমুনযোষণা কতি-

কোশাশ্চ জাহ্নবী”—ছাপখাতীর যোহনা হইতে ত্রিবেণীর বাট পর্যন্ত এই ৩০৪০ কোশ স্থানবর্তী ভাগীরথীর নাম তাহার নামাহ্বাসারে জাহ্নবী হইয়াছে। এই বাটে কল্ক চৈতন্য মহাপ্রভু পার হইয়া রায়পুরে গিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণীর পীঠে তিনি তপস্বী করিয়া গিয়াছেন। তাহা ত্রিম শ্রীমন্ত মণ্ডোপার, নবদ্বীপ, প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই বাটে এবং এই ঘটে পূজা দিয়া গিয়াছেন। এক কালিদাস কেন, অনেক কবি, অনেক সাধু, অনেক কালিদাস এই বাটে ও ঘটে তপস্বী করিয়া গিয়াছেন। আমি অহম্ময়ান জ্ঞানিয়াছি—ইহারই নিকটে রাঙ্গাপোতা নামক একটি স্থান আছে। সেখানে কবি কালিদাসের স্মৃতিযোগী সাক্ষ্যগণ বাস করিয়াছেন। সেখানে একটি শিবলিঙ্গ আছে। তাহার মন্তকে “চং” এই অক্ষর খোদিত আছে। চং অর্থে চন্দ্রগুপ্ত। আরও সম্বন্ধে জ্ঞানিয়াছি এক ব্যক্তির গৃহে চন্দ্রগুপ্তের একটি প্রাচীন টাকা আছে। তাহা সম্বন্ধেই সম্বন্ধান করিয়া দিব।

বঙ্কানাদীপতিগণ কালনাথ চিকিৎসক ডাঃ শ্রীপেজনাথ নাগ বলেন—“কবি কালিদাস” যে বাঙ্গালী ছিলেন, কালিদাস এই নামই তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালী ভাষা বৈষ্ণব কোমল ও মধুর, তাহার রচনা-প্রণালীও তজ্জন কোমল ও মধুর, তাহার রচনা নেন বাঙ্গালী ভাষার অশ্বখার ও বিলগ্ন-সমৃদ্ধ মস্তক্কে মাত্র। তাহার রচনার অনেক এমন গাছ লতা পাতা পানী প্রভৃতির নাম আছে, যাহা বাঙ্গালদেশে ত্রিম অল্প দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার রচনাতে অনেক নামকরণ, চরিত্র বাঙ্গালীর চরিত্রে অল্পরূপ। মালদহে কলিক্রী আম চিরকালই

হয়, সিংহল চিরকালই মুক্তার আকর, এই শম্ভ্রামলা বন্ধুভূমি চিরকালই কাব্যজননী। মহাকবি কালিদাস কি এই আম-কাঁঠালের বন ছাড়িয়া রাজপুতনার মরুভূমিতে জন্মিয়াছিলেন? মানবের মনোগুপ্তি-গঠনের পক্ষে তদ্বৈজ্ঞানিক বাহ্য উপাদান সহায়তা করে। এ কথা চিকিৎসা ও মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্রাধ্যাপকগণ যেরূপে অজিতনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; যেদেশে প্রেমের অবতার ঐক্যচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যেদেশ জন্মদেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের সংগীত লব্ধীতে মুগ্ধিত, মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি সেই দেশ ভিন্ন অধ্যাত্ম হইতে পারে না। তিনি এই স্বর্গাণীতলায় যে গান গাহিয়া গিয়াছিলেন, তিনি চলিয়া গেলেও এই প্রান্তরে সেই সূর্য্যোদয়ের একটা রেখা বা প্রতিধ্বনি ছিল, যাহা এই গান্ধার্য্যষ্ট-বাসীর কাছে বাজিতেছিল, তাই এই দেড় হাজার বর্ষ তাহার স্রবের অশ্রুধারা স্রব করিয়া গান্ধার্য্যবাসী বড় কবির জাতি হইয়া উঠিল। ভারতের কোন্ বিভাগে এত কবি হইয়াছে?"

কালিদাসের জাতি

কবি কালিদাস কি জাতি ছিলেন বিচার করিলেও তাঁহাকে বহুদেশীয় বলিয়া বুঝা যায়। প্রমাণ-পরম্পরায় প্রাপ্তির হয়, কবি কালিদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে বাঙ্গালার বর্তমান ব্রাহ্মণ নহেন। কারণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গব্রাহ্মণগণ "বহুব্রহ্মবান" শাকে বা ৬২৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার দেশে আগমন করেন। বৈদিক-শ্রেণীভাগ তৎপরবর্তী কালে শ্রামণ্যবর্ণের রাজত্বে বাঙ্গালার দেশে প্রবেশ করেন। আমরা

অহুসন্ধান-অহুয়ায়ী কবি কালিদাস চতুর্থ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তখন রাঢ়ীয়, বরেন্দ্র বা বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কেহই এদেশে আসেন নাই। তবে কালিদাস কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন? আদিশূরীয় ব্রাহ্মণগণের এই বাঙ্গালার শুভাগমনের পূর্বেই এই দেশে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে আদিশূরীয়গণ "সপ্তসতী" এই আখ্যা দিয়াছিলেন। কবি কালিদাস "সপ্তসতী" ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই বুঝা যায়। অথবা, তিনি "ভাট" নামক প্রাচীন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণও হইতে পারেন। শাস্ত্রপুরে 'ভাট'বংশীয় অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। অনেক কবিও যারা 'ভাট'-জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালিদাসের ভাট ব্রাহ্মণ হওয়াও অসম্ভব নহে। কবি গুণ্ডল গ্রাম্য ছড়ায়ও এ আভাস পাওয়া যায়।

ছড়ার নমুনা—

"কি কথা? ব্যাধের মাথা

কি ব্যাং? সর্ক র্যাং

কি সর্ক? বামন গরু

কি বামন? ভাট বামন।"

এই 'বামন গরু' জগতের তৃতীয় কবি ভট্ট কালিদাস, এই ছড়া সকল তাহার কাব্যকে ঠাট্টা করিয়া লিখিত। বামন গরু অর্থে তিনি বালাকালে সাম্যসারিক বিষয়ে মুগ্ধ ছিলেন। যে ভালে বসিয়াছিলেন সেই ভালেই কাটতে-ছিলেন। যত গ্রাম্য ছড়া তাহার সমন্বয়িক। এবং অধিকাংশ গ্রাম্য ছড়াই কবি কালিদাসের ভণিবি তরফিকা দেবীর রচনা।

কালিদাসের দ্বিতীয় বিবাহ

কবি কালিদাস যে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহা কাম্বীরের রাজধানী

শ্রীনগরে করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ছড়া হইতে বুঝা যায়—

আগাভূম বাগাভূম

খোড়াভূম মাগে।

ভামির গেল কাবর বাগে।

বাগতে বাগাতে গেল হুঁলি

হুঁলি গেল কমলাপুলি।

কমলাপুলির টিটো

খুঁড়ি মামার বিটো।

হাড় মর্দর কেলজিরে

বহন কুহুম জ্বালের বিড়ে

আয় রপ দাটে বাই গুয়াগর টাকিখাঁনে

একটি লাল কোপড়া

নায় ঝিয়ে কগড়া

হলুদবনে কল্লু ফুল

তাহার নাম টগর ফুল।

ইহার মধ্যস্থিত "কমলা পুলি" শব্দ কাম্বীরের রাজধানী শ্রীনগরকে লক্ষ্য করিতেছে।

কারণ "কমলা ঐহরিপ্রভা" যেমন, কুহুমপুর

ও "পুপপুর" পাটলিপুত্রের নাম সেই রূপ

কমলাপুর ও শ্রীনগর উভয়ই শ্রীনগরের নাম।

আর যে রূপ Seleucus শব্দে শিলেকায় বা

পার্সিয়ায় বা মলয়কে হুইয়াছে সে রূপে

শ্রীনগরই এ দেশে আদিগা কমলাপুর হইয়াছে।

এবং খুঁড়ি মামা শব্দে মাতৃগুপ্ত দ্বন্দ্বত্ব নামক

কাম্বীরী রাজাকে বুঝিতে হইবে। কালিদাস

কাম্বীরী রাজত্বকে দ্বিতীয়বার বিবাহ

করিয়াছিলেন তিনি হিমালয়ের পার্শ্ব বসিয়াই

কুমারগুপ্তবের হিমালয় বর্ণনা করিয়াছিলেন।

তাহার সহিত কাম্বীরী রাজত্বের সংযোগ

হইতেই তিনি কুমারগুপ্তবের উমার সহিত

শিবের সম্মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি

যে মেঘদূত লিখিয়াছেন তাহা হইতে বুঝিতে

পারা যায় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের কোপে

পড়িয়া কিছুদিন রামগিরিতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় তিনি তাহার দ্বিতীয়া পত্নীর যে বিরহ ঐক্যভব করিয়াছিলেন তাহাই "মেঘদূত" নামে অভিহিত হইতেছে।

কালিদাসের ভাষা

কালিদাসের ভাষা যে বাঙ্গালা ছিল তাহার কাব্য হইতে বেশ বুঝা যায়। তাহার কবু-সংহারের প্রথম শ্লোক হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

"প্রভওহুঃ স্পৃহনীয়চন্দ্রমা

সর্গাংগাহবস্তবায়রসকয়ঃ।

বিনাশ্ত বাস্যা ভূগপ ব্যাঘ্র মথয়ে,

নিরাবকালঃ সন্মুপগতঃ প্রিয়ে।

এখানে ছুটি বিশর্গ তুলিয়া দিলেই এই

শ্লোকটি বাঙ্গালী ভাষা হইল।

"কুমার সন্তবে"র প্রথম শ্লোকই বাঙ্গালা—

"অস্বাতন্ত্র্যং দিশি দেবতাস্মা

হিমালয়ে নাম নাগাধিরাজঃ"

রঘুবংশের তৃতীয় শ্লোকও বাঙ্গালা—

মন্ডঃ কবিশংপ্রার্থী গমিয়াম্ম পংস্রক্তভাং।

প্রাণভলভো ফলে লোভাছদ্যাহরিব বামনঃ"।

যে শ্লোকে কালিদাস সরস্বতীর স্তব করিয়া

ছিলেন তাহাও বাঙ্গালা—

জয় জয় দেব-চরাত্রার সাগর

কুণ্ডলগোভিত মুকুতহারে

বীণা ললিত পুংক হস্তে

ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।

"নামো বিশ্বদ কুহুম তুষ্টা

পুণ্ডরীকোপবিষ্টা

দখল চায়ন বেশা

মালতা বন্ধ কেশা"

স্বর্গাণীতলায় একটি মূল্যমানের নিকট

সংবাদ পাইল্যম একখানি বাঙ্গালী পুস্তক
তাহার নিকট আছে, তাহাতে লিখিত আছে
ব্রাহ্মণী তলার নিকটে বিক্রয়দিত্য নামে

একজন রাজা ছিলেন। সেই পুস্তকের
অস্থাবর করিতে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযদুথ নাথ ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালী জল-প্রাণন

সেদিন দামোদর-নদের উদ্ভাটনায় যে তাও
বেক অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ কেহ
চক্ষুচক্ষে কেহ বা মানস-নেত্রে নিরীক্ষণ
করিয়াছেন। এই প্রাণনটী যে বর্ধমান ও
জগলী জেলার বক্ষ মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে, ইহা
সর্ববাহী সম্মত। অবিকল্প, ইহার আঁলি
উজ্জ্বলে সমগ্র বঙ্গের ও উত্তর ভারতের
দেহের উপর পলি-মুক্তিকার একটা স্থল
প্রলেপ পড়িয়াছে। সে বিষয়েও আর সন্দেহ
নাই। ইহাতে ভারতের মধ্যে একটা নবীন
শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতীয়
ক্লমকণ নতন বলে ভারতভূমি কণ্ঠে
মনোযোগী হইয়াছেন। বহুর হাফাকার
ধীরে ধীরে মধুর হাস্যো পরিণত হইবে বলিয়া
আশা আছে। এই মহান শুভ-বঙ্গাপ্রাণনের
ফলে যে এক প্রান্ত উর্বর স্থলন্তর দেশের
সর্বত্র সফল হইয়াছে, ভূতবর্ষিণ্যে ইহাকে
একটা নতন যুগলকণের অন্তর্গত ধরিয়া
লইতে পারা যায়। সেই নবন্তরের উপর
আমাদের নবযুগের কণ্ঠ ও জীবনের অভিনয়
আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগের নাম “জন-
সাধারণের অভ্যুদয়-যুগ”।

পূর্বকালে খণ্ড-প্রলয়-মানসে যখন দামোদর
নদ তাণ্ডব করিতেছিলেন, সেই সময়ের
সহস্র সহস্র চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান
কালের ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত জীর্ণশীর্ণ দামোদরের
চিত্র সমগ্র অবলম্বনে দেশময় বিবিধ প্রকার

কাব্য রচিত হইয়া গীত হইয়া আসিতেছে। সে
বিষাদের গীত, সে মরণের গীত, সে বিচ্ছেদের
গীত গান করিতে করিতে দেশবাসিগণ এখনও
কাতর হইয়ন নাই। অসুখা বাঙ্গালীর সেই
সমুদয় সনাতনী গীতিমালা হইতে আধুনিক
কালের “নবযুগ লক্ষণ”গুলি বাছিয়া লইবার
প্রয়াস পাইয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে দামোদর
প্রকৃতি-দেবীর রত্নমণ্ডে “মৃতের মিলন”
অভিনয় হইতেছিল। বাহারা অভিনয়
করিতেছিল, তাহাদের প্রকৃত পরিচয় আঁধার
অজ্ঞাত প্রহিয়াছে। সেই অভিনয় বাহারা
দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন—
“বাহারা অভিনয় করিত তাহার অভিনয়
দুর্দল ও ক্লম, উঠিতে বসিতে যষ্টির সাংঘ্য
লইত।” কে তাহাদের অন্তরালে ঠাঁড়িয়া
অবিধানে কথা শুনাইত, দেখে ও প্রাণে
ভেদনীতির তত্ত্বখান ফেলিত, তাহা বুকিতে
তাঁহারা পারিত না।

সে অনেক দিনের কথা, তখন দামোদর
বাধীন ছিল। দামোদরের দেহ হইতে
বাহির হায় উভয় পার্শ্বে অনেক প্রোত
স্থগাময়ম্বর পল্লীসমূহের পদপ্রান্তে রক্ত-
রেখার স্রাব শোভা পাইত। তখন দামোদর
কান্তবীথ্যাঙ্কুরের স্রাব বেশ রক্ষা করিত।
সে কথা অনেক পুরাতন হইয়া গিয়াছে।
আকবরের সময়ও কবিকঙ্কণ দামোদর,

তারপর দামোদরের বাহ অতিক্রম করিয়া,
দামুড়া হইতে আড়ারায় গিয়াছিলেন। তখন
দামোদরকে লোকে চিনিত, মথো মথো
ভয়ও করিত, কিন্তু দামোদরের প্রেম এক-
পার্শ্বিক ছিল না। দুকুল ভায়াইয়া নৃত্য
করিত, সে নৃত্য তত ভয়ঙ্কর হইত না।
দামোদর তাহার পর বাধীনতা হারায়া
অনিচ্ছয়া দেশের মিত্রতা ভুলিয়া শত্রুভাবের
পরিচয় দিতেন, ঘেঁটা বোধ হয় অভিমানে।
তখন দামোদর আপনজনের উপর অভিমান
বশত অভিশাপ দিতেন। ছদ্মনি পরে সেটা
ভালবাসায় সমাপ্তি হইত। তখনও দেশবাসী
দামোদরের শ্রীমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
সুখী হইত। দামোদরের অভিশাপ যে
শেখবানীর উপর পড়িয়াছে তাহা কেহই
বুকিতে পারে নাই। দামোদর কত কণ্ঠময়
উপদেশ দিলেন, কত আশ্বাস করিলেন।
কেহই তাঁহার সে আশ্বাস শুনিতে পাল
না। তাই দামোদর মহাক্ষয়ের মৃষ্টিতে
“মৃতের অভিনয়” ভাঙ্গিয়া দিবেন স্থির করিয়া
নীরব ছিলেন।

আপনার জন্মভূমি, লীলাভূমি আজ দামো-
দরের নিকট পর হইয়া গিয়াছে। লীলা-
ভূমির প্রতিরোধে আপনার জীবন ঢালিয়া
নিজকে বিলাইয়া দিতে না পারিয়া দামোদরের
প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। মাটির
সঙ্গে দেহ মিশাইতে না পারিলে, নিজের
সমগ্র মনটুকু তাহার জ্বলে ঢালিয়া দিয়া
আপনাকে ভুলিতে না পারিলে প্রেম পূর্ণদ
হয় না :—

“প্রেমে চায় বোল আনা প্রাণ”।

আংশিক প্রাণ পাইয়া দামোদর ফীত
হইলেন, মরমে মরমে ক্রন্দন-কোলাহল উঠিলে
ফীত-বক্ষ প্রেমবজ্রাঘ উখলিয়া উঠিল।

প্রেমপূর্ণ দামোদর-স্বর উদ্ভাটনাবে ছুটিল।
দামোদর কোথায় ছুটিলেন? মঙ্গলময়ী
শক্তিরূপিনী চণ্ডীস্বর নিকট। তিনি জগন্নাভা,
সন্তানের অশ্রুধারা তাহার পদতল সিক্ত করিল।
দামোদরের ক্রন্দন চণ্ডীর জ্বলে বাৎসল্য-স্নেহ
জাগরিত করিয়া দিল। “আমার প্রাণাণেকা
প্রিয় কণ্ঠভূমি, লীলা-নিকতনে আজ আমার
অধিকার নাই, মা! আমি আপন হারা হইয়া
আপনজনের নিকট পর হইয়াছি। বে মা
জ্বলে শক্তি, বে মা জ্বলে ভক্তি, আর তাহার
বশত অভিশাপ দিতেন। ছদ্মনি পরে সেটা
ভালবাসায় সমাপ্তি হইত। তখনও দেশবাসী
দামোদরের শ্রীমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
সুখী হইত। দামোদরের অভিশাপ যে
শেখবানীর উপর পড়িয়াছে তাহা কেহই
বুকিতে পারে নাই। দামোদর কত কণ্ঠময়
উপদেশ দিলেন, কত আশ্বাস করিলেন।
কেহই তাঁহার সে আশ্বাস শুনিতে পাল
না। তাই দামোদর মহাক্ষয়ের মৃষ্টিতে
“মৃতের অভিনয়” ভাঙ্গিয়া দিবেন স্থির করিয়া
নীরব ছিলেন।

“হাজাৰ কলিধনেশ, বসাব নগর।

যোথো রাধিব বীরের অবনী-ভিতর।”

কবিকঙ্কণ।

প্রেমবীর দামোদরের জ্বল কণ্ঠকণ শাস্তি
প্রাপ্ত হইল। দামোদর কণ্ঠভূমির সহিত
স্বদুত প্রেম আলিঙ্গনের আশায় নির্জন শিলা-
নিকতনে আপন জনের প্রেম-মুষ্টির চিন্তায়
বিভোর হইলেন।

প্রাণ-মিলন

মিলন মধুর বটে, কিন্তু বাহার পক্ষে মিলন
তাহার পক্ষেই মধুর। অকুর যখন ভগবান
শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গিয়া-
ছিলেন, তখন অকুরের সহিত মিলন মথুরার
পক্ষে আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। ভগবান
মথুরায় রাধা-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মথুরার
প্রাণে মিলিত হইয়াছিলেন, মথুরা ভগবানের

প্রেম-বজ্রাঘ্রাতিত হইয়া মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু একবার প্রেমপূর্ণ বৃন্দাবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, সেস্থান গোপ-গোপিনীগণের হাধা-ধানে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিতেছি, মিলনের অপর দিকে প্রলয় ও হাংসকার। এমন বুদ্ধিমা উন্নীত পারিলান না আমাদের দামোদের কোন মধুগা-উদ্দেশ্যে দৌড়িয়াছিলেন—আমরা যখনমি-নিখোঁষ ধ্বনি ও রথচক্রাবর্তনের স্বগভীর-চিহ্নমাত্র দর্শনে দামোদের মিলনজনিত প্রলয়-চিহ্ন দর্শন করিতেছি মাত্র। একাধারে বিচ্ছেদ ও মিলনের অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা যদি থাকে, তাহা হইলে ভগবান দামোদেরের লীলা-মাহাত্ম্য চিত্তনে মনোনিবেশ করুন। দামোদের প্রেম যে নিরাধীন বিশ্বপ্রেম, তাহা কি আমরা অধ্যাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি!

“মহাকোপে কল্পমান হয় সর্গ পা।

যোজন যোজন হইতে পড়ে এক পা ৷”

(কবিকল্প)

মাতৃমুগ্ধি কি এতাদুশ ভীষণ। সন্তান মায়ের লীলা কি করিয়া বুঝিবে। বীরের জ্ঞাত জগদ্ধাত্রীর এ কি মুগ্ধি! কবিকল্প, তুমি মাতৃমুগ্ধি সন্তানের চক্ষে এমন ভীমামুগ্ধিতে অন্ধিত করিলে কেন!

স্বাধীনতাহীন দামোদর, ক্ষীণ, ক্লেশ, দুর্দল, অস্থিপ্রপঙ্করহে দামোদর, নববর্ষাগমে ধারা-ধরের বীর্ঘো নববল ধারণ করিলেন, তাহার স্বচ্ছ রক্তধারা আরক্তিম হইয়া উঠিল। দামোদের আরক্তিম নেত্র-প্রান্ত হইতে একটা মহাজ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দামোদেরের উদ্ভাসদাময় নৃত্য ক্রমশ তাওয়ের পূর্ণাঙ্গাস স্রুতি করিল।

দামোদর স্বাধীনতার জ্বা, প্রকৃত বীরের জ্বা হুয়ার শব্দ করিলেন। দামোদেরের উদ্ভাসদাময় নৃত্যই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল, ততই উাহাকে অধীনে রাখিবার জ্ঞাত, উাহার প্রাণবলের মাদকতা অপরীত করিবার জ্ঞাত বান্দন হ্রুদু করিবার আয়োজন হইল। দামোদের সেই মাদক বান্দন ছিন্ন করিবার জ্ঞাত হুয়ার করিতে করিতে ক্ষীত হইলেন। জনপদবাগিণি বহুবার—দামোদেরের বীর্ঘ-বস্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে, দামোদের-চরিত্র তাহার ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। তাহার দামোদেরের আফালনে সামান্য হস্ত্য করিল। শত শত কণ্ঠধারগণ দামোদেরের হস্তপদে শৃঙ্খলধারা চরিত্র করিতে আরম্ভ করিল। দামোদেরের আফালনে শৃঙ্খল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া দিগুণ উৎসাহে নব নব শৃঙ্খল দামোদেরের পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইল। আজ দামোদের বীরবেশে সম্ভ্রিত হইয়াছেন। হুয়ারের পর হুয়ার গণগভেদ করিয়া উঠিল। বীরের হৃদয় চণ্ডীর বরে বুলীয়া হইয়াছে। দামোদেরের চিন্তা নাই, আকাজ্জা রহিয়াছে। দামোদের চণ্ডীর বরে মিলনের পরে ছুটিয়াছেন।

“এমত শুনিয়া ইন্দ্র চণ্ডীর বচন।

হাতে হাতে চারি মেঘ কৈল সমর্পণ ৷”

(কবিকল্প)

করাবধ মেঘ-চতুষ্টি চণ্ডীর বরে উন্মুক্ত হইয়াছে, চণ্ডিকা মেঘ-চতুষ্টিকে বলিলেন—
“শুন শুন মেঘগণ, কর স্বল্প বিরমণ,
কলিঙ্গে হইয়া প্রতিকূল।

মোর যজ্ঞ-ভঙ্গ-কালে আতুল করিয়া জলে,
যেন নন্দ-গোপেরে পোক্তল।

পাণ লহ গ্ৰহে জোণ, শোষ আমার লোণ,
শীঘ্র চল চণ্ডিকার সঙ্গে।

পুণ্ডরীক ঐরাবতে, দুই গজ লয়ে সাথে
বৃষ্টি করি ডুবাবও কলিঙ্গে ॥

চলহ পুঙ্কর মেঘ, দুষ্কর তোমার বেগ
সদে লহ কুম্ভ বামন।

তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার
কলিঙ্গের কোথায গমন ৷”

(কবিকল্প)

দামোদের চণ্ডীমাতার নিকট বিদায়ের বর্ণন বা প্রলয় প্রার্থনা করেন নাই। মাতা সন্তানের বাসনা পূর্ণ করিবার জ্ঞাত আপনার শক্তি মেঘাকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দামোদের চাহিয়াছিলেন, “মিলন” জগদ্ব্যতা “মিলন”ের উপায়ধরুণ প্রলয়-প্রাণবলের ব্যবস্থা করিলেন। গ্রাঠা চাই শাস্তং সমুচ্চ তাহা পাই না, তাহার পরিবর্তে একটা অতুতপূর্ণ চিন্তাতীত ভীষণতার সহিত প্রথমে দর্শন হয়। কণ্ঠস্রোত অতি তুটীল গতিতে কণ্ঠের সমাপ্তি আনয়ন করে। লীলাময়ীর লীলা মানবের বুঝিবার সাধ্য নাই। দামোদের চাহিয়াছিলেন “মিলন” কিন্তু প্রাপ্ত হইলেন প্রলয়, মেঘের গর্জন, মৃদলধারার বৃষ্টি। সকলি অতুত।

প্রাণবলের প্রারম্ভিক অবস্থা

এ বংশর যে প্রকার বৃষ্টি ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে দামোদের প্রভূতি বহু নদনদী প্রলয়মুগ্ধি ধারণ করিয়াছিল। এতাদুশ অতিবৃষ্টির প্রয়োজন কি? তাহা মানবে বুঝিবে না। ইহাকে হ্রুদুগ্ধি বলিতে পারি না। প্রতি পল্লীবাসী বৃষ্টির প্রভাবে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। দাখরোপণের স্থবিধার অভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেবলমাত্র বৃষ্টিপাতেই নিরুত্থিম জলময় হইয়া উঠিতেছিল। কৃষকের দৃষ্টান্ত পূর্ণভাবে কৃষক অধিকার করিয়াছিল। পাটের আশা অনেককেই ত্যাগ করিয়াছিল। কৃষকের

দাখলেক্ত জলপূর্ণ হইয়াছে, অতিকণ্টে দানের চাষাগুলি রোপণ করিতেছে। ইক্ষুর অবস্থা মন্দ, কচুর চাষ বড়-ভাল হয় নাই। পল্লীবাসিগণ প্রচুর জল স্বত্বেও কৃষিকার্য্য স্বচাকরূপে সম্পাদন করিতে না পারিয়া ভবিষ্যৎ অন্নচিন্তায় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। বৃষ্টির বিরাম নাই, দিনরাত বম্ বম্ করিয়া বৃষ্টি পতিত হইতেছে। ইহাকে পল্লীবাসিগণ ইঙ্গের আদেশ বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যৎ অন্নচিন্তায় আতুল হইয়া পড়িল।

“ইঙ্গের আদেশ পায়, শীঘ্রগতি মেঘ দায়,

উনপকাশ পবনে করি ভয়।

ক্ষুণ্ণেকতে বায়ুবেগে, গগন জড়িল মেঘে,
চতুর্দিকে কলিঙ্গ নগর ৷”

(কবিকল্প)

কৃষকগণ কণ্ঠহীন জীবন লইয়া নিগাসিতা-বদ্ধিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে জী-পুত্রাদি পরিবার-বর্গের চিন্তা করিতেছে। কেহ কেহ পাট কাটিতেছে, দড়ি পাকাইতেছে। গবাদি শাখা অভাবে গোয়াল-গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া যারপরনাই ভিক্ষে সন্ধানের দৃষ্টি সন্ধান করিতেছে। বর্ধমানবিভাগের কোন কোন পল্লীতে গো-বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কৃষিসম্পদগ্ৰাণী গোয়াল শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কৃষকগণের হৃদয় নব নব দৃষ্টান্তের কাতর হইয়া উঠিয়াছে। মাঠ, বাট, পথ সমুদয় জলে ডুবিয়াছে। অতি-বৃষ্টিতে ততুলের অভাব পল্লীগৃহে দেখা দিয়াছে, অথচ ধনিগণের বিলাস-নিকেতনে আনন্দ স্রোত পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত হইতেছে। বলিতে পারি না এই আনন্দ সকল ধনিগণের গৃহে অহুজ্জিত হইয়াছিল কি না।

এদিকে পূর্বে হইতে প্রত্যেক পল্লীবাসীর কণ্ঠ ও চিন্তাস্রোত ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে আবদ্ধ

খাওয়া আবৃত্তি হইতেছিল। আভিগত ভোমোদর, বড়ছোটাব সমাজকেসকে পরিধির দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল। হিংসা, ঘেঘ, দলাদলি পল্লীসমূহকে শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছে। তত্ত্বাবধি জীবন-সংগ্রাম; পল্লী-সমাজ হইতে সমাজহীন নগর পর্য্যন্ত অশান্তি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিবাস, একতা ও প্রেম ক্রিমিতাপূর্ণ হইয়াছে। এই প্রকার ঘোরতর অষ্টমের দিনে পল্লীচিহ্ন কীদূশ স্বন্দরভাবে অঙ্কিত হইতেছিল, তাহা হৃদয়ে উল্লসিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। নীরব চিন্তা সমাজকেসের গুরে গুরে অকৃত্যবধে সঞ্চিত হইতেছে। নীরব সাধনা দামোদরের তাড়নার মুক্ত ভ্রাগ করিয়া বাচালতা লাভ করিয়াছে। অতি নুগ্ন নিবন্ধন ভবিষ্যৎ অদ্বিচ্ছিতা স্নিগ্ধ পল্লীবাগিগণ জ্বালুই হইলেও এক্ষণেই গ্রন্থিত হইতে পারে নাই। তাহাদের ভাব-কেস্র সন্দেহ-দোলায় তুলিতেছে। পল্লীয়া কেবল অশান্তি, কেবল অভাব, কেবল বিষেধ-বহিঃ ধু করিয়া জলিতেছে। হৃদয়ের আশয় অমৃত-বোধে গরল পান করিতেছে, আলোক-প্রাপ্তির আশা ক্রমাগত গভীরতম অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইতেছে। একদিকে উদ্ভাসী অন্তরিক্তে বিলগ্নী অহঙ্কারী সমাজ-পাদনে বন্ধপরিকর হইয়াছেন।

দামোদরের বিপুল মন্ততা

এইরূপে পল্লীসমূহে যখন অশান্তি, অষ্টমকা, ক্ষুদ্রত্ব, নীচাশয়ত্ব, দরিদ্র হৃদয় ও ঐশ্বর্য বিরাগ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে দামোদরের ভীষণ হৃদয় চতুর্দিকে বাহুবলে প্রচারিত হইল। সার্বজনীন জীবন-সংগ্রামে সমগ্রার নীমাংসার জন্ম একটা কলসর উত্তি হইল। বর্ধমানের প্রতি পল্লীতে একটা সাড়া পড়িল। প্রমত্ত ক্ষীতবন্ধ দামোদর শৃঙ্খল ভয়

করিয়াছে—গো গ্রামস্থ ক্রায়া-প্রাচীর ভেদ করিয়া ছুটিয়াছে। সকলেই দেখিতেছে একা দামোদর কাহার প্রেমে পাগলের মত নৌড়িয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে একা দামোদর-দেহে সংগ্রাম নদনীর প্রবেশ করিয়াছে, এ যে অগজ্ঞানী চিত্তিকার আবেশ—

“আজ্ঞা দিল ভবানী, চলিল মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া গগনে স্থিতি।

সদে মকর জাল, ছাড়িয়া পাতাল,
বেগে ধায় ভোগবতী।”

ইহাঙ্কি সামান্ত ব্যাপার, সামান্ত কারণ, সামান্ত উদ্দেশ্য। ইহা যে দামোদরের বহু সাধনার ফল, দামোদর আজ বন্ধন-মুক্ত হইয়া অপার আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। চতুর্থাৎ মহাশয় হইয়াছেন। দামোদর কোটা নদনদীর বল আপন অঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছে। দামোদর দিক্ বিদিক্ মণ্ডিত করিয়া চলিবে, কাহার সাধ্য তাহার সমুখে দাঁড়ায়, চতুর আদেশে দামোদরের সমুখে অমৃত উত্তিবে, যদি হলাহল উঠে তাহা শিবকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইবে। অশ্বিনাশিনী শিবানী সকলি শিবময় করিয়া দিবে। দামোদর একাঙ্গী হইয়াও বহুবল ধারণ করিয়াছে, বহুবল-প্রাপ্তি তাহার বলসমূহ সন্তানের বাহু ও মনে চাটিয়া দিয়াছেন। এই দেখুন দামোদর-দেহে—

“আমোদর দামোদর, দাইল দারুকেসর,
শিলাই চন্দ্রভাগা।

দেবাই দানাই, দাইল দুইভাই,
বগড়ির খানি ধার বাগা।

দাইল কুম্ভ সুনী, করিয়া দামাদামি
বিবাহি মুখাই মর্য্য।

দাইল তারাগুলি, গুদয়া হুতুংহী,
রতনা চলিল রঙ্গে।

খরতর লহরী, দাইল গোদাবরী
কাণাধার দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে, চলিলা রঙ্গে,
বড় মজ্জের।
গঙ্গা যমুন, দাইল বঙ্গা
অজয়া সরস্বতী
‘দাইল কুন্তী, বাঁকা ধায় গোমতী
সবু হুধাবতী
দাইল কাশাই, মহানদী বিড়াই
খর ধার বামন থান।
চারি দিকে জল, হইয়া ধবল
কলিঙ্গ ছুড়িয়া বহে ফেনা।”

(কবিকল্প)

দামোদরের সাধনা অসম্ভব সুস্থব. করিয়া তুলিয়াছে। সাধনার মত সাধনা করিকে, পারিলে, অসম্ভব সুস্থব হইয়া উঠে। দামোদর প্রেম-বস্ত্রার তরঙ্গ তুলিয়া মনের আনন্দে মিলনের পথে প্রলয়-তৃষ্ণান তুলিয়া চলিয়াছে। কবি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন যে, ভারতের সমগ্র নদনদী আবহক-বোধে দামোদরের দেখে মিলিয়াছে। কবি নদনদীরা একতা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—ভাতার কার্যে দেশ-দেশান্তর হইতে সকল ভাই ভগ্নী একত্রিত হইয়াছেন। এই স্থানেই কবির স্বপ্নে-ভক্তি উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। দামোদর ভারত-প্রবাহি নদনদীর আগমনে অনন্ত সমুদ্রের বল ধারণ করিয়াছে। “জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা।” সমাচার বর্ধমানের প্রতি পল্লী মধ্যে প্রচারিত হইবামাত্র পল্লীমধ্যে একটা নৃতন সাড়া পড়িয়া গাইল।

“জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা।”
পল্লীজনগণের সকলের হৃদয়ে মঘেরে ভেরী বাজিয়া উঠিল। ব্যক্তিগণের বিভিন্ন চিন্তাস্রোত একটি পথ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

ব্যক্তিগত বিপদে ব্যক্তিগত শক্তির ক্ষুরণ হইয়া থাকে, ইহা যে ব্যক্তিগত বিপদ নহে। এ বিশদ সমগ্রপল্লীবাসীর, সমগ্র জেলাবাসীর। যে সে বিপদ নহে। উপেক্ষা করিবার শক্তি নাই। অপেক্ষার অবসর নাই। ব্যক্তিগত যত্ন তত বিতীর্ণিকা উৎপাদনে সমর্থ হয় না। এ যে সার্বজনীন যত্ন, এ বিপদ সমগ্র পল্লীর। যদি মুক্ত হইবার উপায় কিছু থাকে তাহা পল্লীবাসীর সমবায়-শক্তির বলে হইবে, কোন ব্যক্তিগত শক্তি দামোদরের মহাশক্তির সমুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। ক্রমে পল্লীবাসীর শ্রুতিগোচর হইল—জীবজন্তু ঘরঘার, দনরত সকলি জলস্রোতে ভাসিয়া বাইতেছে, বর্ধমান ভূবিদ্যে! ভীষণ কথা ক্রমশ ভীষণ ভাব ধারণ করিল।

“গর্ভ ছাড়ি হুস্তম ভেসে যায় জলে।
নাহিক মিলিল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে।

চতুর আদেশে ধায় নীর হুম্যান।
মুঠাঘাতে ঘরজা করে ধান খান।
চারি দিকে ধায় ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উঠে পড়ে ঘর জলা করে দোলে মাল।”

(কবিকল্প)
রুদ্ধেরা বলিলেন “বর্ধমানের সুসংগণ ‘হুস্তম’ প্রিয়। আমরাও একদিন যুক্ত ছিলাম। তখন তোমাদের মত এতাদৃশ বাগাড়ম্বরপ্রিয় ছিল না। হুঁ একবার দামোদরের বস্ত্র দেখিয়াছি, কিন্তু তোমাদের মত এতাদৃশ লক্ষ্য রূপ করি নাই।
তোমরা আকাশ সমান জল দেখিতে চাও!
তোমাদের সকলই বাড়াবাড়ি, বুঝ জোর, যদি বাণ আসে ঐ মাঠের ধান ভুবিয়া দিবে, যদি উঠা অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে কাহার-পাড়ায় জল প্রবেশ করিবে!”

ধাতুক্ষেত্র জলমগ্ন হইবে শুনিয়া দরিদ্র কৃষক-গণ আতুল হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল “এবার মম্বদ্র” দেখা দিবে। তাহারা উদাস প্রাণে ধাতুক্ষেত্রে গমন করিল। রমণী-মহলে একটা উৎসব প্রবেশ করিল। পূজ-কন্ডাব জন্ত তাহারা ভাবিয়া আতুল হইলেন। যুবকগণ বজার কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছে। বৃদ্ধগণ উপহাস কবিতোছে, দরিদ্র পৰ্বকৃতীরের জন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীময় একটা উৎকর্ষার সাড়া পড়িয়াছে। স্বদয়ে স্বপ্ন নাই। কণ্ঠে আশা নাই। প্রাণের মধ্যে শূন্যতা বজিয়া উঠিয়াছে। স্বর্ঘ্য অন্ত ঘাইতে কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট রহিয়াছে। এমন সময়ে ক্ষৈণক পৃথক ক্ষতবেগে চলিয়াছেন—যাহাকে দেখিতে পাইতেছেন তাহাকেই বলিতেছেন “বাণ সর্বশেষ ভূবাহিয়া! আদিতোছে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া পুষ্ক-কন্ডার জন্ত বাড়া দৌড়িয়াছি। শীঘ্র এ গ্রামে বাণ পড়িবে।” পথিকের প্রমুখ্যং এই প্রকার ব্যাক্য শ্রবণ করিয়া যুবকগণের মধ্যে কেহ পুরাতন কেহ কেহ বা অপরূপে নিম্নপল্লী হইতে যে গ্রামে বাণ পড়িয়াছে সেই গ্রামাভিমুখে গতিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে তাহারা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া চাঁদকার পূৰ্বক বলিতে আরম্ভ করিল “ভয়বর বজা, গ্রাম ভুবিবে, কেহই বাঁচিবে না।” মাঠ হইতে কৃষকগণ দৌড়িয়া পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিল। মাঠ হইতে গরপ গাধা উর্ধ্বপুচ্ছে হাথারবে পল্লী প্রবেশ করিল, পক্ষীকূল বৃক্ষশাখে ব্যাকুল ভাবে কলরব করিতে আরম্ভ করিল—মুহূৰ্ত্ত মধ্যে “প্রলয়ের পূৰ্বলক্ষণ” বলিয়া মনে হইল।

নব-শক্তি

সে এক অশুভ ব্যাকুলতা, সে এক অপূর্ণ

দৃশ্য। উচ্চ, নীচ, মিত্র শত্রু ভেদাভেদ কুলিয়া পল্লীবাসী মুহূৰ্ত্ত মধ্যে কর্তব্য অবধারণ করিয়া লইল। কাংথকেও বলিতে হইল না, কেহ কাহার আদেশের অপেক্ষা করিল না। পল্লী-রক্ষার জন্ত, প্রাণ-রক্ষার জন্ত ঐরাবতের বল স্বর্ণ হইতে নামিয়া প্রত্যেক কন্ডীর হৃদয়ে প্রবেশ করিল। সমগ্র পল্লীর বিপদ, নিজের জন্ত কিবা অপরের জন্ত তাহারা সমবেত হইয়া কার্য করিতেছে তাহা তাহারা তৎকাল বৃষ্টিতে পারে নাই। অতীতকে লক্ষ্য নাই, যেকোন উপায়ে পল্লীরক্ষা করিতে হইবে। দেখিলাম মানাপমান, “ছুঃ”মার্গ, হিসাব, ধেম দূরে চলিয়া গিয়াছে, থলতা কপটতা বজায় ভাসিয়া গিয়াছে। এমন মুঠা মাটি কাটিতেছে, হরনখা ভট্টাচার্য্য সেই মাটি মত্তক করিয়া বাঁধ বাড়িতেছেন। আর দেখিলাম বাহতে মত্ত হস্তীর বল। যে কাজ শত জনে এক ঘণ্টায় করিতে পারে, দেখিতে দেখিতে দশ জনে অল্প ঘণ্টায় তাহার পরিসমাপ্তি করিয়া ফেলিল।

পল্লীবাসী বহুদলে বিভক্ত হইয়া পল্লীমধ্যে বজাপ্রবেশ-পথ রোধ করিল। বসুন দেখি তাহাদের বাহতে এত শক্তি কে দিল? চকিতের মধ্যে, পলাকের মধ্যে কোন শক্তিবলে পল্লীবাসী উচ্চ, নীচ ভেদ-জান কুলিয়া ভ্রাতৃত্ববাদের স্বপ্নি করিয়া দিল। যেন যাহাযমে হিসাব, ধেম শূন্যে ছুড়িয়া গেল। এ প্রাণ, এ মন, এ শক্তি, এ পল্লীভক্তি, এ আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা পল্লীবাসীর হৃদয়ে কি যথার্থই আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছিল? ঐ সকল শক্তিবীজ মানব-হৃদয়ে সর্বদা ই বর্তমান রহিয়াছে। তাহাদের সাড়া পাইতে হইলে ঐ রকম দামোদরের গাওণ আবশ্যক হইবে।

দামোদরের বজা পল্লীবেষ্টনীর উপর প্রবল বেগে ‘আছাড়িয়া’ পড়িল। ভীষণ শব্দ, চতুর্দিকে ‘গেল গেল’ শব্দ উঠিল। পুষ্করিণীর ভিতর বজা প্রবেশ করিল, পুষ্করিণীর ঘাট-পথে বজা পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিল। বায়ু ও যদ্রব মধ্যে ভীষণ শব্দতা ছিল, উভয়ে পল্লী-দলের নেতা—‘গ্রাম্য দেবতা!’ অথচ আজ তাহারা সে ভাব কুলিয়া গিয়া পল্লীর রমণী-বালক-বৃদ্ধকে ছাদের উপর, কতক পুষ্করিণীর উন্নত পাশাড়ে লইয়া চলিল। নতাক্ষা তাহারা তৎকালে রাম-লক্ষণের জায় আভ্য-ভাবে, কৃষ্ণাঙ্কুরের জায় বন্ধুভাবে দৃঢ় হইয়া গিয়াছেন। কে তাহাদের কঠোর প্রাণ নিমেষে কোমল করিয়া দিল!

খোয়াড়ের মুনসী আবছ গোপালিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, কে কাহার গরু লইয়া পুষ্করিণীর পাশাড়ে উঠিতেছে তাহা আপনারা বলিতে পারিবেন না। তৎকালে সমগ্র পল্লীটি যেন একটি গৃহস্থের ব্যাকুলব বুলিয়া বোধ হইতেছে। পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমান যেন এক পরিবারভুক্ত হইয়াছেন। ধর্ম দামোদর তোমার কল্যাণে প্রত্যেক পল্লী অসমাবস্তা হইয়াছে। ভূমি আবার ভাসাও, বজাপ্রভাবে সমগ্র ভারত প্রাণিত কর। ধরায় স্বর্ণ নামিয়া আসিবে!

চতুর্দিকে বজার প্রবাহ ছুটিয়াছে; ঘর, প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িতেছে। দান্ড, গৃহস্থালীর আবশ্যক ব্রহ্ম জলস্রোতে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। সম্ভা আসিয়া সেই ভীষণ দৃশ্য আপন দুখর বাসে আচ্ছাদিত করিলেন।

পল্লীসিপাণ উন্মুক্ত পুষ্করিণীর পাশাড়ে কোথাও বা একতল গৃহের উন্মুক্ত ছাদে

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মৃত্যুভয়ে, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুভয়ে সাধারণের চিত্ত ব্যাকুলিত। পদতলে পাশে দামোদরের প্রবল প্রবাহ, উর্ধ্বে অন্ধকারের মত অন্ধকার মেঘে গগণ আচ্ছাদিত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে প্রবল বায়ু ও মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। “মেনে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার। চিনিতে না পারি ভূত তত্ত্ব আপনায়।” ঈশানে উড়িল মেঘ সখন চিকুর। অন্তর পবনে মেঘ ভাকে ছুড় ছুড়। নিম্নে কৈল জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল। চারি মেঘে বরিষে মুসলধারে জল। কণিকে রহিয়া মেঘ করে ঘোরনাদ। প্রলয় দেখিয়া প্রজা ভাবয়ে বিস্ময়।”

“হাণিত কলিঙ্গ রায় হাতী খোঁড়া ভেসে যায় আটালিকা উঠে রামাগণ।”

মহলে প্রবেশে জল রহিতে নাহিক স্থল, খাট পালক ভাগে নানা ধন।”

বিপদ একাকী কখন আইসে না, সবে করিয়া তাহার সচরসগণকে লইয়া আইসে। সেই উন্মুক্ত পুষ্করিণীর পাশাড়ে রমণী ও শিশু, স্বস্ত ও পীড়িতের রক্ষার জন্ত সকলে যে প্রকার ত্যাগবলের পরিচয় দিয়াছিল তাহা স্বর্ণের পক্ষ্ধই শোভা পাইয়া থাকে। কে পল্লীবাসীর হৃদয়ে অসীম ত্যাগবল প্রদান করিয়াছিলেন?

ধন কবি! ধন মুহূৰ্ত্তস্বামীর প্রতিভা। দামোদরপ্রাবনের চিত্রটি তিনি যেরূপ নিষ্ঠুভাবে অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তেমনটি আর কে পারিবে? দামোদর, ভূমি জনমে জনমে এই দৃশ্য দেখাইও। পল্লীগুলি স্বর্ণের শোভায় পূর্ণ হইবে। ত্যাগ ও সেবাশ্রমে প্রচার হইবে।

ক্রীকৃষ্ণচরণ সরকার।

ওল-কচুর চাষ *

এমরফোফেলাস—AMORPHO-
PHALLUS—ওলকচু।

N. O. Aroidae.

এই নামে নানা জাতি সুল্লজ উদ্ভিদ আছে। ইহাদের অবিকাংশই ওলকচুভাণ্ডীয় উদ্ভিদ। উদ্ভিবেত্তাগণ ইহাদিগকে ও কচুজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের স্বভাবগতিক কচু (Arum) জাতির তুল্য নহে। কচুভাণ্ডীয় উদ্ভিদ মাজই আর্দ্রতা ও উত্তাপ-প্রিয়। ইহার অতিশয় আর্দ্রতা-প্রিয় নহে। কিন্তু উত্তাপ-মুক্ত স্থানে বিশেষ ক্ষুষ্ণীভাব করে। তন্নিম্ন কচুজাতির সহিত ইহাদের আত্মগত সাদৃশ্য নাই। অবিকার কচু-জাতিই বায়বামূল (Aerial roots) বিশিষ্ট। কিন্তু ইহাদের মূল (শিকড়) তরুণ নহে। বলিতে গেলে ইহার গুচ্ছমূল (Fibrous-rooted) মুক্ত উদ্ভিদ। ইহাদের কোন কোন জাতি ছায়াতেও ক্ষুষ্ণীভাব করিয়া থাকে। ইহার ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের সর্বত্র জঙ্গলী (wild) গাছের ছায় জমিয়া থাকে। ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নের আবশ্যক হয় না। অসুন্দ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র লাভের বা সন্দের হিসাবে ইহাদের চাষ হইতেছে। শীতপ্রধান দেশে ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নের আবশ্যক হয়। কাণিহিদের তাপমান-বহুর ৫৫ হইতে ৮০ ডিগ্রি উত্তাপ-বিশিষ্ট স্থানই ইহাদের চাষের পক্ষে বিশেষ অঙ্গুল। সমুদ্রোপকূল হইতে ২০০০০০০ হাজার ফুট উচ্চেও কোন কোন জাতির চাষ হইতে পারে। ইহাদের জন্মান্বয়

ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, সিংহল ও স্বয়ংজা বীণ। ইহাদের কোন কোন জাতির পাতা দেখিতে অতিশয় হৃদয় ও আকর্ষণজনক। সন্দের অপেক্ষা লাভের জন্তই এদেশে ইহাদের কোন কোন জাতির চাষ হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে প্রায় সন্দের জন্তই ইহাদের চাষ হইয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপের সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল দেশে সুল্লজ গৃহে ইহাদের চাষ হইয়া থাকে। কেবল সন্দের জন্তই ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী ইহার চাষের জ্ঞান অল্প অল্প বায় করিয়া থাকে। এ পোড়া বেশে লাভের জন্তও কেহ ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নপর নহে। অথচ এদেশে বলিতে গেলে একরূপ বিনাযায়ে ইহাদের চাষ হইতে পারে। ইহাদের কোন কোন জাতি অধিক আর্দ্রতা সহ্য করিতে অক্ষম। কোন কোন জাতি আর্দ্র স্থানেও জন্মিয়া থাকে। ঐ যেখানে মৃত্তিকার সহিত ঐ ভাল পাতার সার মিশ্রিত করিয়া যে মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাতে ইহাদের চাষ হয়। কেবল সন্দের চাষের জন্তই একরূপ মৃত্তিকার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। লাভের চাষের জ্ঞান ইহাদের চাষের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। যথাস্থানে উহার বিবরণ লিখিত হইবে। গো-বিষ্টার সার ইহাদের চাষে অপেক্ষত সার।

ইহাদের যে সকল জাতি ছায়াপ্রিয়, সুল্লজ গৃহে উহাদের চাষ হইয়া থাকে। সুল্লজ গৃহ অভাবে অর্জুভাষ্যমূল স্থানই ইহাদের চাষের পক্ষে উপযোগী। পাছে ইহাদের কোন কোন জাতির চাষ হইতে পারে। পাতার,

কাণ্ডের ও ফুলের সৌন্দর্যের জ্ঞান উদ্যানে বা সুল্লজ গৃহে কোন কোন জাতির চাষ হইয়া থাকে। কোন কোন জাতির কাণ্ড নানাবর্ণে চিত্রিত। উহার দেখিতে অতিশয় হৃদয়। ইহাদের প্রকৃত কাণ্ড নাই। মূলই ইহাদের প্রকৃত কাণ্ড। এইজন্ত ইহার কন্দমূল বা কাণ্ডমূল উদ্ভিদ মধ্যে গণ্য। বৎসরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে ইহাদের মূল হইতে কাণ্ডমূল একটা রসাল ও কোমল ডাঁটা বহির্গত হইয়া থাকে। উহার উপরেই পত্র সকল অবস্থিত থাকে। পত্রগুলি খণ্ডিত ও বহুভাগে বিভক্ত।

সারাবর্ষ মূলের গাছ হুচু ধারা ইহাদের গাছ উৎপন্ন হয়। কোন কোন জাতি গাছ বীজ ধারাও উৎপন্ন হয়। আবার কোন কোন জাতির পত্রফলকের মেয়দও ও অধির উপরিভাগে মূলের আকারবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি (nodule) উৎপন্ন হয়। ঐ সকল জাতির গাছ এই গুটি ধারা উৎপন্ন হয়। রাস বীজ (seed proper) হইতে গাছ উৎপন্ন হওয়াই প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। মূল, শাখা, কাণ্ড ও পার্শ্বদ্বার ধারাও কোন কোন উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফুল হইতে ফল ও ফল হইতে বীজ উৎপন্ন হয়। বীজ হইতেই উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বীজকেই রাস বীজ (seed proper) কহে। এই জাতীয় উদ্ভিদের ফুল হয়। কিন্তু কোন কোন জাতির ফুল হইতে বীজ উৎপন্ন হয় না। ইহাদের পত্র-ফলকের অস্থি ও মেয়দগুণের উপরে গুটির ছায় যে মূল উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহারাই বীজের কাণ্ড। ইহাদের গাছ উৎপন্ন হয়। বিধাতার সৃষ্টি-রহস্ত ভেদ করা সহজের সাধ্যাত্ত নহে।

বাকালেই পূর্ণোক্ত গুটি সকল পরিপক হইলেই ভূপতিত হয়। গ্রীষ্মকালের আরম্ভ মাজই ইহার অধুনি হইয়া ন্তন গাছ উৎপন্ন করে। শীতকালে ইহাদের পাতা মরিয়া যায়। ইহাদের ফুল সৌন্দর্য সাধন ভিন্ন অল্প কোন প্রয়োজন সাধন করে না। ইহার নানা জাতি, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটা জাতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১। এমরফোফেলাস কেম্পানিউলেটাস—
Amorphophallus Campanulatus.
Syn. Arum Campanulatus. Telinga
Potato-ওলকচু।

ইহাই আসল ওলকচু। ইহা রক্ত ও বেগুনিতে দ্বিবিধ। প্রথমজাতীয় গুলের মাংস রক্তাভ প্রসারিত ও দ্বিতীয়টির মাংস শীতলাৎ বেগুনি। এই দুই জাতির জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ইহা বঙ্গদেশের যথা তথা অল্প উৎপন্ন হয়। শীতকালে ইহাদের গাছ মরিয়া যায়। ইহাদের ডাঁটা ও পাতা পচিয়া ক্রমে তক্ত হইয়া গাছ মরিয়া যায়। গ্রীষ্মকাল আস্তে হইবার পর যখন প্রথম বৃষ্টিপাত হয়, তখন হইতেই ইহার মূল হইতে ন্তন ডাঁটা ও পাতা বাহির হইতে থাকে। ইহার পাতা খণ্ডিত। প্রত্যেক কণ্ডের পার্শ্বদেশে দুইশাখা বা মাংসল হুজ ধারা স্বেদিত। ইহার কন্দমূল হইতে শিকড় বহির্গত হয় না, ডাঁটার মাংসেই হইতে উহা বহির্গত হয়। এই সকল শিকড় যত্নবৎ। গোছা গোছা হইয়া বহির্গত হয়। এই জন্ত ইহাদিগকে গুচ্ছমূল বলা যাইতে পারে। ইহারাই ভূমি হইতে রস ও খাজ সংগ্রহ করিয়া কন্দমূল, ডাঁটার ও পাতার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। আসল মূলের (কন্দমূলের) রসশোষক শক্তি নাই। ইহার কাণ্ডবর্ষ বা মূলের বাহুদেশ

শিয়ালী বা শিয়ালি-মিশ্রিত ধূসরবর্ণ। ইহার ডাঁটা কখন কখন ৪৫ ফুট উচ্চ হয়। ডাঁটার উপরিভাগ বন্ধুর শব্দ কটকবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হল* দ্বারা বেষ্টিত। স্থানে স্থানে সবুজ বর্ণের ফোটা থাকে। কাণের গাজাবরণ দেখিতে গিরগিটা নামক জন্তুর পৃষ্ঠদেশের জায়। পজ খণ্ডিত ও ছজাকার। ইহার কন্দ-মূলর উপরিভাগ হইতে ডাঁটা বা কৃত্রিম কাণ বহির্গত হয়। ঐ ডাঁটাই পজ ধারণ করিয়া থাকে। ডাঁটা মরিয়া গেলে উহার পাদদেশে (কন্দের উপরিভাগে) একটা গোলাকার গর্তব্যব চক্ষু দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ গর্তই ভাবী গাছের আধার। উহাতেই প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তি নিহিত থাকে, শীত ঋতুর শেষ ভাগ হইতে গ্রীষ্ম ঋতুর আরম্ভকাল পর্যন্ত ইহার মূলর-বিস্তার সময়। উপরে গর্তব্যব চক্ষুর কথা বলা হইয়াছে, উহা হইতে নতুন গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গাছের পাদদেশ হইতেই স্বভাব-বেতবর্ণের গুচ্ছমূল বহির্গত হইয়া থাকে। উহার কথিত চক্ষুর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া ভূমিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার স্বচ্ছমূল স্বভাবতঃ গোলাকার; উপরিভাগ চেন্টা (flat)। দৈব কারণে ইহার অজ আকারও ধারণ করিয়া* থাকে। ইহার কন্দমূলর গায়ে বহুসংখ্য ক্ষীত গুটাবৎ মূল উৎপন্ন হয়। ইহারিগকে চক্ষু (eye or tuber) কহে। উহার পাটলাভ ও বেতবর্ণের। উহারাই ভাবী বংশ উপস্থিত করে। ইহারিগকে বীজমূল বলা যায়। ইহা হইতেই এই জাতির নতুন গাছ উৎপন্ন হয়। ইহার ফুল হয়। ফুল বৃহৎ; সবুজাভ বেগুনে বর্ণ, দেখিতে সুন্দর।

ইহার দেশীয় নাম ওলকচু। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহা "বাক" নামে পরিচিত। ইহার ইংরাজী নাম টেলিঙ্গা পটেটু (Telinga Potato)। ইহার মূল বিলাতি টেলিঙ্গা পটেটু নামক উদ্ভদের মূলর আকার বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। ইহার ল্যাটিন নাম এমোরফফেলুস্, কম্পানি-উলেটাস্। সংস্কৃত নাম তুলুকন্দ ও শূরণ। "তুলুকন্দ শূরণক"।

বন্যান্তর যথা:— "শূরণ: কন্দ ওলশ্চ কন্দলোহর্ষয় ইত্যাপ।" অর্থাৎ ইহার নাম শূরণ, কন্দ, ওল ও অর্ষয়।

দেশভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। ইহাকে সিংহলে ফিডারণ; হিন্দুস্থানে শূরণ; আসামে ওলকচু; তৈলঙ্গে মধ্যাকান্দা; তামিলে শূরণ ও শূর্ণা; মহারাষ্ট্রে পোড়াশূর্ণ; গুজরাটে শূরণ ও পারস্য ভাষায় ওলকাছ। ইহা ইহাই গ্রাম্য ওল।

ইহা অয়দীপক, কক্ষ, কটুকায় রস, কণ্ডু-কারক, বৈবর্ত্তী, কটিকারক ও লঘু। ইহা কক্ষ, অর্শ, দীহা ও ওষ্যোগবিনাশক। ইহা অর্শরোগের স্থপথ্য। উভয় জাতির মূল বা কন্দ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মতে বজ শূরণ বিশেষ উপকারী, গ্রাম্য শূরণ স্বগাছ। ইহা স্নীপদ, বন্ধীক, গোমু, অর্শদু, মন্দারি, মূল ও দন্তমূল রোগেরও মহৌষধ।

নয়দেও (ভাঙ্গানামতে) ইহা পাচক, ও বলকারক। ইহা দ্বারা অর্শ, গ্রংথী ও দৌর্ল্লাস রোগ নাশ হয়।

ইহার মূল স্বগাছ। মূল রোগণের পরে ৭-৮ মাস মধ্যেই ইহা পাইবার উপযুক্ত হয়।

যাত বৎসরের বা ততোধিক সময়ের পুরাতন ওল বৃদ্ধাকার হয়। পুরাতন ওলই পাইতে অধিক স্বগাছ। ওল সিদ্ধ করিয়া লবণ, তৈল ও মরিচ সংযোগে খাওয়া যায়। ইহা তরকারীতেও স্বগাছ হয়। ওল সিদ্ধ করিয়া উহাকে হস্তধারা গুলিয়া লইলে উহা অতিশয় কোমল হয়। ঐ কোমল শত সহিত লবণ ও সামান্য পরিমাণ লবঙ্গ (মরিচ) গুড়া বা লম্বা বাটা মিশাইয়া তৈলে ভারিয়া উহার বরা প্রস্তুত করিলে উহাও স্বগাছ হয়। ইহার ডাঁটা ও কোমল (কচি) পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া তৎপর বাল্যের ব্যবহার করা যায়। "কেহ কেহ ওলকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুক করিয়া ইহার শুঁঠ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই শুঁঠও ব্যঞ্জন খাওয়া যায়। মূলজ সবুজী মধ্যে ওল বিশেষ উপকারী। কান্তিক মাসেই সাধারণতঃ ওলের মূল সংগ্রহ করা হয়। এই সময়েই ইহা পাইতে স্বগাছ হয়। এসমক্ষে দেশ-প্রচলিত একটা কথা আছে। উহা এই— "ভা'রে তালের পিঠা, আখিনে শশা মিঠা। কান্তিক ওল, অন্মানে (অগ্রহায়ণ মাসে) বলিয়ার কোল।

পৌষে কাঙ্কি, মাঘে তেল (সর্বপ তৈল)। ফাল্গুনে গুড় আনা বেল। চৈতে গিয়া তিত্তা, বৈশাখে ঘৃত নালিতা। জৈষ্ঠে খই, আশ্বিনে দই।

শ্রাবণে খোল পাঠা, তবে হয় শরীরের কাস্তা।" অর্থাৎ ভাদ্রমাসে তালের পিঠা (তালের রস, চাউলের গুড়া ও চিনি সংযোগে তৈলে ভাজিয়া ইহা প্রস্তুত হয়) স্বগাছ হয়। আখিনে মাসে শশা মিঠাবার হয়। কান্তিক মাসে ওল স্বগাছ হয়। অন্মানে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে বলিয়া (অধিক কটকযুক্ত

মংজবিশেষ) মংজের খোল স্বগাছ হয়। পৌষ মাসে কাঙ্কি (পশুখিত্যের অম্লজল) স্বগাছ হয়। ইহা দৈহিক উপকারও সাধন করিয়া থাকে। ইহার সম্প্রত নাম কাঙ্কি (কাঙ্কী) বা কাঙ্কিকা।

"কাঙ্কিকং রোচনং* কচাপাচনং বহ্নি-দীপনম্" অর্থাৎ ইহা রোচক (আহারে কচির্ভরক), পাচক ও অয়ির্ভরক। পশুখিত অল্পক কয়েকদিন জলে ভিজাইয়া পচাইলে উহা হইতে যে আশ্রাব্য জল প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাই কাঙ্কি। কোন কোন দেশের লোকে ইহাকে অতিশয় প্রিয় বস্তু বলিয়া ভোজন করিয়া থাকে। মন্ত্রদেশীয় লোকেরা সর্বত্র তাগ করিতে সক্ষম, কিন্তু কাঙ্কির ব্যবহার তাগ করিতে পারে না। মাঘ মাসে তেল অর্থাৎ সর্বপ তৈল অধি হয়। ফাল্গুন মাসে গুড় (আকীগুড়), আদা ও বেল স্বগাছ হয়। চৈত্র মাসে গিয়া নামক তিত্তা জল খাইতে স্বগাছ হয়। বৈশাখ মাসে ঘৃত ও নালিতা শাক (লাল পাট শাক—সাধারণতঃ পাট শাক) স্বগাছ ও উপকারী হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে খই ও আশ্বিন মাসে দই (দধি) পাইতে স্বগাছ হয়। শ্রাবণ মাসে খোল ও পাঠা (পাঠা ভাত) স্বগাছ ও উপকারী হয়। হুঙ্কর সর্ব বাটিয়া উহা মহান করিলে উহা হইতে নবনীতের অর্থাৎ মাখনের ভাগ উঠাইয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই খোল বা তক্ত। দধি মহান করিয়াও এই ত্রয়্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব দিনের পশুখিত অল্পে জল দিয়া রাবিলে পরের দিন উহাকে পাঠা ভাত বলা যায়। খোল ও পাঠা ভাত শ্রাবণ মাসে ভক্ষণে শরীরের কাস্তা অর্থাৎ কাস্তি বৃদ্ধি হয়। ঋতু ও তিথি-অনুসারে কোন কোন ত্রয়্য ভক্ষণ করিলে দেহের উপকার

* অজ্ঞান সত্ত্ব ও পার-বৈশ্ব-কুল এইরূপ কটকবৎ পদার্থকে হল বলা যায়।

† ওল আনা ও বজ ভেদে বিধি।

সামিত হইয়া থাকে। পূর্বোক্তিত্রিত্র্য বা সৰল মধ্যও কোন কোনটা ঐ সৰল সময়ে ব্যবহার করিলে দৈনিক উপকার সামিত হয়।

ওলের চাষে বিশেষ লাভও আছে। এক বিধা জমিতে ওলের চাষ করিলে প্রতি বৎসর মূলকল্পে ১০০ টাকা লাভ হইতে পারে। অথচ ইহার চাষে বিশেষ যত্ন বা অর্থ-ব্যয়ের আবশ্যক হয় না। যে ভূমিতে ওলের চাষ করিবে, উাহাকে মাংস-ক্ষম মাসে কোদালী দ্বারা উত্তমরূপে কোবাইয়া দিবে। তৎপর উাহাতে পাতার সার অভাবে সামান্য পরিমাণ পুরাতন গোবরার সার, ও গোবরার বা কাঠ-ভস্মের ছাই ছড়াইয়া দিবে। ওল-ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় হালকা হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে ওলের মূল সহজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ওল-ক্ষেত্র কোদাল দ্বারা কোবাইবার পরে যে সৰল ঢিলা উৎপন্ন হইবে উহা শুষ্ক হইলে মৃদুর দ্বারা উহাদিগকে পিটাইয়া ভাঙিয়া দিবে। তৎপর পুনঃ পুনঃ চাষ ও মই দিয়া মৃত্তিকাকে ধূলিবৎ করিবে। পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা উলট পাল্ট করিবার পরে যখন উহা কোমল হইবে তখন উাহাতে মূল রোপণ করিবে। যে স্থানে বর্ষার জল না দাঁড়ায় উইখপ স্থানই ওলের চাষের পক্ষে উপযোগী। এক টি-টি-জমিই ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দোদাগ মৃত্তিকাতেই স্থবিধামত ইহার চাষ হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে একহাত অন্তর অন্তর সারি করিয়া মূল রোপণ করিবে। প্রত্যেক সারিতে একহাত অন্তর অন্তর একটি মূল রোপণ করিবে। মূলের আকারাহারে ও হইতে ৬ ইঞ্চি মৃত্তিকার নীচে মূল

রোপণ করিবে। ১৫২০ দিনেই উহা হইতে গাছ বাহির হইবে। গাছ বাহির হইবার পরে উহার যখন অর্ধহাত পরিমাণ উচ্চ হইবে তখন উহার গোড়া ৪৫ ইঞ্চি মৃত্তিকা দ্বারা বন্ধিয়া বেদীর স্তায় উচ্চ করিবে। পরে সময় সময় উহার গোড়ার মৃত্তিকা খুঁকি বা পাসন দ্বারা আলগা করিয়া দিয়া জল ইচ্ছানি পরিষ্কার করিয়া দিবে। গাছ আন্তরিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উহার ডাটা সামান্য পরিমাণে মোছাইয়া দিয়া উহার বৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইবে। কেননা পাতার ও ডাটার বৃদ্ধি হইলে মূল-বৃদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। ইহা স্মি ইহার আর অল্প কোন পাইট নাই। ওল গাছের গোড়ার মৃত্তিকা আলগা থাকিলেই উহার মূল সহজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একবিধা জমিতে ৬৬১১টা মূল রোপণ করা যাইতে পারে। রোপণের ৬৭ মাস পরেই ইহার মূল ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। প্রত্যেকটি মূল তখন ১০ এক আনা হইতে ১০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। গড়ে প্রত্যেকটি মূল ৫৫ আনা মূল্যে বিক্রয় করিলে একবিধা জমিতে ৪১০০ উৎপন্ন হইতে পারে। উক্ত মূল মধ্যে সৰলই একই সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয়োপযোগী হয় না। ইহার মূল বৃদ্ধির কাথাকে এদেশে “ওলান” কহে। প্রথম বৎসরে অর্ধেক সংখ্যক মূল গালাইলেও ৬৬৬০ × ২ = ১৩৩২০টা বিক্রয়োপযোগী মূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার প্রত্যেকটি গড়ে এক আনা মূল্যে বিক্রয় করিলেও এক বিধায় উৎপন্ন ২০৫০ টাকা হয়। নিম্নের হিসাব মত উহা হইতে চাষের ব্যয় ১০৪০ বাব দিলেও ১০০০০ সাত হইবে।

শ্রীদ্বৈপ্যচন্দ্র গুহ।

সম্ভরণজাতি ও তাহার বন্ধ্যতা

[আমাদের উচ্চশিক্ষিতগণের একটা ভুল বিশ্বাস আছে যে, আধুনিক ‘প্রাণ-বিজ্ঞানের’ (Biology) কতকগুলি নিয়ম ভারতীয় সমাজ-জীবনের আলোচনার প্রয়োগ করিতে পারিলেই চূড়ান্ত ‘ঐচ্ছানিকতা’র পরিচয় দেওয়া হইল। যেন এই উপায়েই হিন্দুর সমাজ-তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব, বংশ-তত্ত্ব সবধে শেষ করা বসাই হইয়া গেল।

পাঁচগণের নিকট, আমাদের নিবেদন—(১) নয়া প্রাণ-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি সবই সর্বাঙ্গিক সম্বন্ধ নহে। কোন একখানা পাশ্চাত্য মৌলিক গ্রন্থে পাঠ করিলেই বৃদ্ধিতে পারিবে, প্রায় প্রত্যেক মতেই বর্ণকে বিপক্ষে অনেক মূল্য-তত্ত্ব আছে। পরবর্তী লেখকেরা নিম্ন নিম্ন কতি অমূল্যের সেই সম্বন্ধ তরু-জাল হইতে মত বাড়িয়া যখন। (২) প্রাণ-বিজ্ঞানের নিয়ম সমাজ-তত্ত্বের (Sociology) আলোচনার প্রয়োগ করিতে যাইয়া ‘পৃথিব্যের’ ‘নানা মূনির নানা মত’ প্রচার করিয়াছেন। স্তম্ভাক কোন বাস্তবিক লেখকের যত্নায় সমাজ-বিজ্ঞানের আভ্যন্তর দেখিয়া যেই চমকিয়া যাইবেন না, অথবা তাহার প্রচারিত মতগুলিকেই ‘বিজ্ঞান-সম্মত’ মনে করিয়া মাথায় তুলিতে বসিবেন না। (৩) ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজ সবধে এখন পূর্ণাঙ্গ প্রকৃত প্রভাবের অতি অল্প তথাই ঐতিহাসিক ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। এগুলি প্রাণ-বিজ্ঞানের দুই চাকিটা ‘বুদ্ধি’ লাগাইতে পারিলেই যথার্থ, বিজ্ঞান-সম্বন্ধ, নিরূপক মত প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আমাদের যে লেখকের যত্নানি বিচার দৌড়, তিনি তত্বানি আমাদিগকে শিক্ষিত করিতেছেন, এই স্বপ্ন মনে করা উচিত। এই লেখার জন্মই তাঁহাকে হিন্দুধর্ম ও সমাজের পক্ষপাতী বা বিমোদী হইবেনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সমাজ-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, বস্তু-বিশিষ্ট, আবেশন

বা বিশপ্তিক (Environment), বংশতত্ত্ব (Hereditry) ইত্যাদি বিষয়ক বাঙ্গাল প্রবন্ধ-একাদি পাঠ করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে আনানি মত গঠন করিতে ‘অভ্যন্তর’ হইবেন। আমবা এই সকল বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।]

প্রাচীনকালের প্রাণবিজ্ঞানবিদগণের দাবী ছিল যে, সম্ভরণজাতিরা সম্ভ্রামোৎপাদনে সম্পূর্ণ অপারগ। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা কুলীনজাতি সমূহের কুলীনত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত তদুৎপন্ন সম্ভরণ-সম্পত্তিদিগের বন্ধ্যতাতেই মূল্যবোধবর্ণ ব্যবহার করিতেন। তাহারা বলিতেন, কোনও এক জাতীয় বিভিন্ন বর্ণের জন্তসমূহের মধ্যে বাহ্যতঃ যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সঙ্গম দ্বারা সম্ভ্রামোৎপন্ন হয়, এবং তজ্জাত বর্ণগতরোগাও বর্ণবৈধ সঙ্গম সহযোগে বংশবৃদ্ধি করিতে ও তাহার কুলীনত্ব সংস্থাপন করিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাহ্যদৃষ্ট বর্ণগত মতাদেশ সত্ত্বেও তাহাদের সহস্রাব বন্ধ্যতায় পরিণত হয়। যদি কোনও দুই জাতির সঙ্গমের ফলে বন্ধ্যতা না হইয়া তাহা হইতে সম্ভ্রাম জন্ম পরিগ্রহ করে, এবং জাতিসম্বন্ধগণও যদি বন্ধ্যতাসম্বন্ধে বংশবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে এই মূলজাতিবিশিষ্ট জাতিপরিবাহ্য হইতে পারে না; ইহার দুই বিভিন্ন বর্ণগতগতি। বর্ণগতত্ব ঐক্য ইহার বিপরীত কথা বলা যাইতে পারে। যদি এমন দেখা যায় যে কোনও দুই বর্ণগতগতি জন্তসকল পরস্পরের সহিত সঙ্গম সাধন করিয়া সম্ভ্রাম-জন্মের অক্ষম, অথবা যদি

কোন দুই বর্ষপ্রস্থত সঙ্গরসমূহ স্ববর্ণসংযোগে বংশবিস্তি করিতে না পারে তাহা হইলে মূলবর্ণগণ প্রকৃত বর্ণনহে, উহার জাতি।

তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক স্থলেই আধুনিক প্রাণবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ্যাহারী প্রকৃত জাতি বর্ণ, ও প্রকৃত বর্ণ জাতিরূপে বিবেচিত হইত। আধুনিক শ্রেণিবিভাগে নিম্নলিখিতরূপ জাতিতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। আখ্যাপক টমসন বলেন, “জাতিসমূহে জানাটা সর্বদা মতি-ক্রমে তুলনামূলক; যখন আমরা কোনও একদলের কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্যসম্পন্ন কতিপয় লক্ষ্যকে একত্রে একটা ক্রম গভীর দ্বারা পরিবেষ্টন করিবার প্রয়োজনীয়তা অহুভব করি, তখনই সুবিধার অহুরোধে এই পরিভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। জাতি-শব্দটা প্রায়শঃ কেবলমাত্র অতীব নৈকট্য-সম্পন্ন জীবমণ্ডলীর অংশ-প্রকাশক। এতদ্-সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা স্মৃতি-তথ্যামূলক; এবং বাহ্যেদ্রিয়ের অগ্রাধ জন্ম-পরিবর্তন সহকারে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণের, প্রাপ্ত হইয়া এক জাতি হইতে নূতন জাতির অভিব্যক্তি বশতঃ কোন জাতিই লক্ষণসমূহ কল্যাণস্থায়ী নহে। এই জ্ঞত ইহা স্বীকার করিতে হইবেই যে, চরিত্রবন্ধন আমাদিগেরই কৌশল মার্গ, এবং এক এক জাতির অন্তর্গত একক-গণের বর্ণনির্ণয়ের বিজিততা সেই জাতিসমূহে আমাদের জ্ঞানের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। অনেক সময় এরূপও ঘটিয়া থাকে যে, আমাদের অজ্ঞানতা-নিবন্ধন কোন কোন জাতির নামকরণ গণনায় নক্ষত্রগুণের দ্বারা অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তবুও ইহা সুবিধাজনক।”

পূর্বকালের মতবাদ জাতিসমূহের

স্থিরতাহুসমোদক। এই মতবাদক্রমে জাতি ও বর্ণ একেবারে বিভিন্ন পদার্থ; স্বতরাং উৎপত্তির ধারাটাও সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু আধুনিক কোনই প্রাণবিজ্ঞানবিশ্ব লিনিয়াসের মতের পরিপোষক নহেন। কেহই জাতীয় চরিত্রের স্থিরতা স্বীকার করেন না। এখন ছাত্রেরা শিক্ষা করে এক জাতি অপর জাতিতে পরিণত হয়, আবার পক্ষান্তরে আমরা ইহাও বলিয়া থাকি যে, যে গুণ-রাশিকে মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করিয়া প্রাণবিজ্ঞানে শ্রেণিবিভাগের স্থিতি হইয়াছে তাহার চকলপ্রকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু সে চাকলা অতীন্দ্রিয়। যুগযুগান্তরের চরিত্র-চাকল্যের সমষ্টিই অল্পকৃতিসাপেক্ষ। তখনই বৈজ্ঞানিকের চক্ষুসমক্ষে এক নূতন জাতি উদীয়মান হয়।

প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে আরও কতকগুলি সংজ্ঞা নির্দেশ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সঙ্গরতা-সাধন—প্রাণবিজ্ঞানগোমোদিত দুই বিভিন্ন গভীর অন্তর্গত একক সমূহের মধ্যে সঙ্গর-সাধনের নাম “সঙ্গরতা-সাধন।” এতদ্ব্যপেক্ষ সম্মতগণ “সঙ্গর” আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে, সঙ্গরের পিতামাতা বিভিন্ন “জিনাসে”র, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন উপজাতির ও বিভিন্ন বর্ণের হইতে পারে। পারি-ভাসিকভাবে বলিতে গেলে, দুই পৃথক জাতি-সমূহত শব্দরকে আমরা “জাতিশব্দ” বলিব; এবং ভিন্নবর্ণাঙ্ক পিতামাতা-সমূহত সঙ্গরকে ‘বর্ণ-সঙ্গর’ বলিয়া নির্দেশ করিব। সংজ্ঞাধ্বন্য—কোনও গভীরবিশেষের একক-সমষ্টির উদ্ভবন, অর্থাৎ প্রত্যেক একককে, উদ্ভবনের সমবায়।

একণে আলোচ্য বিষয়ের একটা সার মর্ম প্রদান করা হইল—

- ১। জাতি সমূহের সঙ্গরতাসাধন; ইহার ফল।
- ২। বর্ণ সমূহের মধ্যে সঙ্গরতাসাধন; ইহার ফল।
- ৩। এরূপ ফলোৎপত্তির কারণ;
- ৪। সংজ্ঞাধ্বন্যনৈক ফলরাশির কিয়দ; এবং
- ৫। বক্ষ্যতার কিয়দ বস্তুর কৌশল।

ক। জাতিসমূহের সঙ্গরতাসাধন; ইহার ফল

ডাবুউইন্ট উল্লেখ করিয়াছেন “নাটি জাতি-সমূহের ও তাহাদিগের সঙ্গর-সমষ্টিগণের বক্ষ্যতা বিকাশের তারতম্যে অসংখ্য ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্রম শূন্য হইতে সম্পূর্ণ উর্ধ্বতর পর্যন্ত বিস্তৃত।” এই ঘটনাবলী তিনি ইতিহাস “The different forms in plants of the same species” নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

গুয়ালেস্ এ সম্বন্ধে কতিপয় উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন;—সম্মুখে কতকগুলি অংশে উল্লেখযোগ্য। নানাবর্ণ গৃহপালিত রাজহংস (য্যান্ডার্স ফার্ম) ও টানা রাজহংস (য্যা: সিগুনইভিস্) একই “জিনাসে”র দুই পৃথক জাতি। ইহারাত পৃথক যে কোনও কোনও প্রাণবিজ্ঞানবিশ্ব ইহাদিগকে দুই ভিন্ন জিনাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন। তবুও ইহাদের মধ্যে সঙ্গরসাধন সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ টেট্‌ন এই দুই জাতীয় পিতামাতা হইতে একই প্রসবে আটটা ছানা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ডাবুউইন্ট এক জোড়া সঙ্গর হইতে স্বন্দর স্বন্দর শাবকোৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রিথ ও ক্যাপটেন্‌ য্যান্টন বলেন যে, ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই এই জাতি-সঙ্গর-দিগকে রক্ষা করা হইয়া থাকে। এই সকল

স্থানে মূলজাতির নামগন্ধও নাই। কেবলমাত্র সঙ্গরদিগেরই ব্যবহার করা হয়।

ভারতবর্ষের কদুদবিশিষ্ট ও সাধারণ গোজাতির বিষয়েও কম রক্তজনক নহে। ইংরাজ বাহ্য আকৃতি-প্রকৃতিতে বিভিন্ন ভাষায় তো বটেই, তথ্যাতীত অস্থিসংযোজন ও অঙ্গসংস্থান বিষয়েও ইহাদের, মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। স্বতরাং ইহারাত যে কোন কালেই নৈকট্যবিশিষ্ট নয়, তাহা সন্দেহাতীত। তথাপি এই দৃষ্টান্ত সম্মত-গ্রন্থ। ডাবুউইন্টের অহুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ইহাদের জাতিসঙ্গররাত ও স্বজাতি-সঙ্গর-দ্বারা কল্যাণ-বংশ সংস্থাপনে সমর্থ।

ইহাদের সহিত নেকড়া* ও শিয়ালের সঙ্গরজাত সঙ্গররাতও বংশকৌলীজ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণই পারণ,—একণ উদাহরণ বিরল নহে।

তাহা হইলেই প্রতীয়মান হইতেছে, বিভিন্ন জাতির সঙ্গর যে সম্পূর্ণভাবে বক্ষ্যতা-মূলক তাহা ভাবিত্যুক্ত। উদ্ভিদজগতে পৃথিবীত করিলে উল্লিখিত উদাহরণরাশির মতই ছুরি ছুরি দৃষ্টান্ত আমাদিগের নয়ন-গোচর হয়। ভিন্‌ হাবাই* বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ লইয়া অতীব কৌশল ও সাধনাতার সহিত বহুসংখ্যক পরীক্ষা সম্পাদন করেন, তিনি স্প্রাংক্স, ক্যাপটেন্‌ জাতীয় উদ্ভিদের গর্ভকেশের জমাথায় স্প্রুট প্রীকৃষ্ণমুলোচ্য, স্প্রুট ক্যানালিকুলোচ্য ও স্প্রুট থেবিস্‌ জাতির ‘রেপ্‌’ সেচন করেন। ফলে জাতি-সঙ্গরের উৎপত্তি তো হইয়াছিলই, তথ্যাতীত সঙ্গরগণ বর্ণকৌলীজ ও প্রতিস্থাপন করিয়াছিল।

খ। বর্ণসমূহের মধ্যে সঙ্গরতাসাধন; ইহার ফল

উর্ধ্ব জাতি-সঙ্গরের তুলনায় উর্ধ্ব

বর্ণবস্ত্রের সংখ্যা অধিক, এবং তাহাদের উর্ধ্বতন-শক্তিও অধিকতর বলবতী। এমন কি, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, বর্ণ-সম্বন্ধের মধ্যে বদ্ধতা অতি বিরল। এ পর্য্যন্ত শ্রীমুক্ত-গেট্‌নাম্ কতকগুলি স্থপীকিত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, যদ্বারা বর্ণবস্ত্রক্ষেত্রে বদ্ধতার আভাস পাওয়া যায়। ইহার পরীক্ষাগুলি উদ্ভিদ-সম্বন্ধীয়। এক জাতীয় বর্ণ-সম্পূর্ণকণেই বদ্ধতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। জন্তু-জগতেও কিন্তু এ যাবৎ ইত্যাকার দৃষ্টান্তের আভাস পাওয়া যায় নাই। এ সম্বন্ধে প্রাণি-বিজ্ঞানে অল্পদ্রুতি পরীক্ষার সংখ্যা অতি সামান্য। হুইটম্যান তৎপ্রস্থত ফলের উপর নির্ভর করিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে। এক্ষণে আমরা হুচাকরণে ক্ষয়ক্ষয় করিতে পারিতেছি যে “যদি জাতিসমূহের ও তাহাদের সম্বন্ধ-সম্বন্ধিগণের বদ্ধতা-বিকাশের তারতম্যে অসংখ্য ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্রম শূন্য হইতে পরিপূর্ণ উন্নততা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।”

গ। ঐরূপ ফলোৎপত্তির কারণ

বহু নৈগর্ষিক ও দৈহিক ঘটনাবলীর বিভিন্ন সমাবেশে জীবদেহ হত প্রতিহত হইয়া তাহার সম্ভাবনাপ্রব-শক্তিকে নিতাই নুতন সাধে সঞ্চিত করিতেছে। বদ্ধতা-উৎপত্তির তথ্য সংগ্রহ করিতে যাইয়া পণ্ডিতগণ নিয়মিত কারণত্বকে সঙ্গীপ্রধান বলিয়া বিবেচনা করেন—

- (১) জননেত্রিয়ার সংস্কার গ্রহণ বা সাড়া-প্রদান যোগ্যতা;—হাতী, খেঁকিশাল, ইন্দুর, বরগোশ, কঠিবাড়াল ইত্যাদি রোডেট্ট বা ‘দম্ভর’ পরিবারের জন্তু, ও নানাজাতীয় পক্ষী গৃহপালিতাবস্থায় যে বদ্ধা হইয়া পড়ে তাহা সঙ্গরূপে বিদিত। উদ্ভিদ-জগতেও এক্ষণে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্তমান রহিয়াছে। এই জনন-শক্তির পরিবর্তনের জ্ঞান পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক বায়ুত আর কে দায়ী? এই উপলক্ষে ডারউইন্ বলেন “একই উদ্ভানের মধ্যে স্থানপরিবর্তনবশতঃ উক্তরূপ ফললাভ ঘটয়া থাকে।”
- (২) শারীর-সংস্থান ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের পারস্পরিক নির্ভরতা—শ্রীমুক্ত টেগেটমাইএন্ড ডারউইনের নিকট কতকগুলি ঘটনার বিবরণ প্রেরণ করেন। শারীরসংস্থান ও দৈহিক বর্ণ এইতত্ত্বের মধ্যে যে বিশিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান তাহার সত্যতার প্রমাণ এই বিবরণসমূহ হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। জন্তু ও উদ্ভিদ উভয়ের মধ্যেই প্রত্যেক জন্তু ও উদ্ভিদকে তুল্যরূপে শাড়া প্রদান করার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট নানাক্রপ শারীর দৃষ্টান ঘটিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ বাধ্য-গ্রহণের ফল ক্রমোক্ত জন্তু ও উদ্ভিদের বর্ণের উপর নির্ভর করে। যখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, একই বাধ্য বর্ণের বিচিত্রতাহাযবে ভক্ষকের উপর আধিপত্য বিস্তার করে; এবং পূর্বসম্পর্কে যখন জননেত্রিয়ার সংস্কারগ্রহণ-যোগ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে তখন নিম্নলিখিত শারীর-সংস্থান ও বর্ণবৈচিত্র্যের পারস্পরিক নির্ভরতাকে বদ্ধতাংগপাদনের অন্তঃস্থ কারণ বলিয়া নির্দেশ করিব তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বদ্ধতা দৈহিক পরিবর্তনের ফলরূপ তো বটেই, অধিকন্তু একরূপ দৃষ্টান্তও

লিপিবদ্ধ হইয়াছে যদ্বারা বদ্ধতাতে প্রয়োজিত পূর্বার্ণের প্রত্যেক ফল বলিয়া প্রমাণিত করা যাইতে পারে। এই প্রত্যেক ফলসংশিও বর্ণাভিধানে বিবর্তিত হয়।

(৩) দৈহিক নির্মাচন,—‘নির্মাচনিক বদ্ধতা’ নামক ব্যাপারের সম্যক আলোচনা দ্বারা বৈজ্ঞানিক রোমনেসে ‘দৈহিক নির্মাচন’ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কোনও একটা জন্তু স্বজাতীয় অপকৃ জন্তুর সম্মুখে হুমতান প্রদান করে; কিন্তু সেই প্রত্নহিত তজ্জাতীয় অত্যন্ত জন্তুর সহিত সম্মুখে পূর্ণমাত্রায় বদ্ধা। এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারটির প্রতি রোমনেসে বৈজ্ঞানিকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ঘ। সম্ভোদিতনে এই ফলসংশিার ফ্রিয়া

এ পর্য্যাপ্ত আমরা কেবলমাত্র কি প্রকারে কোন জাতি ও বর্ণের একক বা ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে বদ্ধতার উৎপত্তি হইতে পারে তাহারই আলোচনা করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে দেখা যাক অপর জাতির সহযোগে কোনও জাতির ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অথবা জাতিসম্প্রদায়ের মধ্যে একবার বদ্ধতার বীজ রোপিত হইলে তাহা কেমন করিয়া সমগ্র মূলজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং কি প্রকারেই বা তদ্বারা বিবর্তন বা অভিব্যক্তি-মার্গে সেই সেই জাতির ইষ্টানিষ্ট সম্ভব হয়।

উল্লিখিত কারণসমূহদ্বারা অর্থাৎ জন্তুদিগের ব্যবহারিক ও দৈহিক পরাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জননশক্তিরও পরাবর্তন ঘটিয়া থাকে। এখন এই পরাবর্তন যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষে নিম্নোক্তভাবে উদ্ভিত হয়, এবং অত্যাধিক বহুবিধ সাময়িক পরাবর্তনের দ্বারা সমগ্র

জাতির ইষ্টানিষ্টের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই না থাকে, তাহা হইলে একরূপ পরাবর্তনের সহিত, অর্থাৎ বদ্ধতার সম্ভব, প্রাকৃতিক নির্মাচনেরও কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। এই শ্রেণীর বদ্ধতার আদ্যস্ত ও কাব্যপ্রতিভা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই আবদ্ধ। কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, বিভিন্নজাতির বদ্ধা-সম্মুখে সেই সেই জাতির উদ্ভবের সহায়। যে যে জাতির সম্মুখে বদ্ধা, সেই সেই জাতি উদ্ভবসম্মুখে জাতিসম্মুখে অপেক্ষা প্রাকৃতিক নির্মাচনক্ষেত্রে যোগ্যতর। এ সম্বন্ধে ওয়ালেসের সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ হইল।

(১) দ্বারা যাক কোন একটা জাতি পরাবর্তনপ্রদানে ছুইনি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। এ ছুই বর্ণের প্রত্যেকেই বর্তমান পারিপার্শ্বিকের কোন কোন বিষয়ে মূল জাতি অপেক্ষা যোগ্যতর, স্বতরাং ইহাদের প্রভাবে মূল জাতি টিকিতে পারিবে না।

(২) এই ছুই সমগুণালী বর্ণ একই স্থানে বাস করিয়াও যদি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধধারণ না হয়, তাহা হইলে নির্মাচন-প্রভাবে প্রত্যেকে আরও অধিকতর আবদ্ধ পরাবর্তন প্রাপ্ত হইয়া অতি নৈকট্যমুক্ত ছুইটা পৃথক জাতিতে পরিণত হইবে।

(৩) কিন্তু এ ছুই বর্ণ যদি নির্বিবাদে সম্মুখ-পরায়ণ হয় ও বর্ণগত প্রদান করে, এবং এই বর্ণগতরোও যদি স্ববর্ণ-সম্মুখে সন্তানোৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ বর্ণগতের নুতন জাতিতে পরিণতি বাধা প্রাপ্ত হইবে; যে হেতু বর্ণগতরো ঐ উভয় বর্ণজাত কুলীন-সম্মুখ অপেক্ষা পারিপার্শ্বিকগত অবস্থা

সমূহে অল্প বোগ্য হইলেও তাহাদের মিশ্রজন্ম-বশতঃ কুলীন সম্ভানাপেক্ষা অধিকতর দুর্বল।

(৪) এক্ষণে বর্ণসঙ্করগণের কিয়দংশও যেন পিতৃমাতৃ জীবনের বা অপর কোন প্রভাবে নানাতিক বন্ধাতা প্রাপ্ত হইল।

(৫) এক্ষণে স্থলে সঙ্করবংশ কুলীনবংশস্থলের মত বুদ্ধিমান হইবে না, এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয়ে বর্ণস্থলের অধিকতর বোগ্যতা নিবন্ধন ইহারা সম্বন্ধেই সঙ্কর-গণাপেক্ষা অধিক সম্যক হইয়া পড়িবে। এই প্রকার অবিরত জীবন-সংগ্রামের দ্বারা তাহারা কতিপয় পুরুষের মধ্যেই বর্ণসঙ্কর-গণের লোপসাধন করিবে।

(৬) পক্ষান্তরে উক্ত বর্ণস্থলের বাসবাসের যে অংশে উহাদিগের মধ্যে অবাধে সম্মানসাধন হইতে থাকে, তথায় নানাবিধ পরাবর্তন-সমুদ্র বর্ণসঙ্করদিগের উৎপত্তি হইবে। ক্রমে ক্রমে ইহাদের সংখ্যা মূলজাতীয় এককগণের অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইবে। স্বতরাং বিভিন্ন বর্ণে অবাধ সম্মান দ্বারা উহাদের পাট চিরকাল তরে উটাইয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে একই জাতীয় দুই বিভিন্ন বর্ণের বাসবাসের একাংশে সামান্য বন্ধাতালক্ষণ প্রকাশ পাইলেই শেষ পর্যন্ত ঐ অংশের অধিকাংশ এককই কুলীন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারিবে। অপরভাবে কুলীনসংখ্যা নগণ্য। রোমনদেশের মতাহুসারে এই ব্যাপারটিকে প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, বাহাদিগের মধ্যে দৈহিক পরাবর্তন প্রকাশ পাইবে তাহারা এই পরাবর্তনবিহীন এককগণের জীবন-যুদ্ধে পরাজিত করিবে।

(৮) জীবন-যুদ্ধ যখন অতীব তীব্র হইয়া উঠে, তখন যোগ্যগুণাবর্ণ বর্ণ অপর-

গুলিকে সম্পূর্ণরূপেই নির্মূল করিয়া ফেলে। স্বতরাং যে সকল বর্ণ অপরবর্ণের সম্মুখে বন্ধা, তাহারাও প্রকৃতি-নির্মীচিত হইবে, ও একমাত্র তাহারাও অধিষ্ঠান লাভ করিবে।

(৯) বর্ণবিহীন জাতিতেও উল্লিখিত নিয়মসমূহ প্রযোজ্য।

ঙ। ক্রিয়াবতীর কৌশল

বন্ধাতা প্রকাশকাল জননেদ্রিয়ে কর্তব্য পরিবর্তন ঘটে এবং শুক্রকোষ ও গর্ভকোষের কোন বিশেষ অবস্থার উপর উহার ক্রিয়াবত্তা নির্ভর করে সম্ভ্রুতি তাহারই আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উইসকুন্সিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্যারাবু, সঙ্করপারাবর্তের ও ক্যানানার্মক একজাতীয় বৈশিষ্ট্য-বহুল উদ্ভিদের সঙ্করের শুক্রগুণ্ডি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি উভয় স্থলেই কতকগুলি অনৈসর্গিক সংঘটন লক্ষ্য করেন; এবং ইহাদিগকে উভয়ক্ষেত্রেই তুল্যরূপে বলিয়া নির্দেশ করেন। তিনি অধোনগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন;—

(১) জননকোষের পত্নতা; স্বতরাং, (২) কোষ-সংবিভাগে অস্বাভাবিকতা; (৩) শুক্রকোষের দৈহিকবিকৃতি।

বিশেষতঃ সূচ্যাকরূপে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার বলিখিত বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করা হইল। “বন্ধা সঙ্করগণের শুক্রকোষে স্থলপরিভাষে পত্নতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শুক্রকোষের মুণ্ডের মধ্যস্থলে উন্নত ত্রণটিই রহতময় দৃষ্ট। বস্তুতঃ এই উন্নততরঙ্গী ত্রণ বা মণ্ডকের ন্যূনতর দৈহিক কলা নহে; মণ্ডকের সম্যক পুষ্টির আশ্রয়েই ঐ স্থানটি বস্তুলব্ধ প্রত্যয়মান হইতেছিল।

স্বাভাবিক শুক্রগুণ্ডির তুলনায় কোষ-কেন্দ্র ও সম্যক পুষ্টিলাভ করে নাই।”

শেষতঃ অধ্যাপক ক্যানান লিখিত “Studies in plant hybrids” নামক প্রবন্ধের একটি প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া উল্লিখিতগত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। “সাধারণতঃ বাসকিপ্তগার সঙ্করনস্থলে আমি বলিতে পারি যে, সঙ্কর-কার্য্যসের পরাগকোষে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উভয় অবস্থারই সমাবেশ চক্ষুগোচর হয়। * * * ক্রোম পুষ্টিসংক্রান্ত কোষ-সংবিভাগকালে কোষকেন্দ্রে অনেকানেক বিকৃতি লক্ষিত হইয়াছিল। এই কোষকেন্দ্র বিভক্ত না হইয়া প্রগট হইয়া য়ে। * * * এইরূপ অনৈসর্গিকতার মধ্যে এমন কতকগুলি পরাগমাতৃকোষ দৃষ্ট হইয়াছিল বাহার কোষকেন্দ্রে দুইটি সংবিভাগ-রেখাও দৈহিককোষের মধ্যস্থ রঞ্জনস্থলের সমান-সম্যক রঞ্জনস্থল বর্তমান ছিল।” অর্থাৎ এই সামান্য কয়টি মাত্র কোষ প্রাকৃতিক অবস্থার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

পরিশিষ্ট

এই প্রবন্ধে যে সকল পারিভাষিক শব্দের সন্ধান করা হইয়াছে, তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দসমূহ পরিনির্দেশে লিপিবদ্ধ করা হইল। জীবন-সংগ্রাম, প্রাকৃতিক-নির্ভরতা, পরাগকোষ ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের ব্যবহার বন্ধীয় সমাজে স্বপরিচিত। এতদ্ভিন্ন তাহাদের প্রতিশব্দ প্রদান করিলাম না। আমাদের দেশের ভাষায় একটি ধাতু হইতে একশত আশিটি শব্দ গঠনগঠন করা যায়। তথাপি এখনও আমাদেরই ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতে হয়! আমাদের দেশে বাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাহারা ইংরাজীপাঠ্য

পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিদ্যার পরিচয় প্রদান ও অর্থগণের পথ প্রশস্ত করিয়াই থাক। সকলেরই মূল মন্ত্র হওয়া উচিত “জগতের জ্ঞান-রাশি ভারতের ভাষায় ভারতবাসীর জন্ত আহরণ করিব।”

পরিভাষা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অস্বত্ব করিতেছি। য়ানিবা হইতে আরম্ভ করিয়া আইমেটস্ পর্যন্ত, এবং উদ্ভিদান হইতে ইলেক্ট্রোনি পর্যন্ত—যত যা আছে সকল গুলিরই ইচ্ছামত এক একটা বাগদান নাম প্রদান করা একটা কিছুত্ব কিম্বাকার পরার্থের বোঝা মাথায় লওয়া রূপ বিভ্রম। ভিন্ন আর কিছুই নয়। এটাকে বোঝা বলিয়া এইজন্য যে, উক্ত জ্ঞানবোঝাকে ল্যাটিন গ্রীকমূলক শব্দগুলি শিথিতে হইবেই, কারণ বিজ্ঞানের উচ্চতরে উন্নীত হইয়া জগতের সহিত ভাব বিনিময় বাস্তবীকরণ শার্কতা কোথায়? জ্ঞানানেও এই মতের পোষকতা দেখা যায়। তথায় বিদ্যাদিগকে জ্ঞান হইয়া জ্ঞানী ভাষায়। অপেক্ষাকৃত সম্বন্ধ অর্থ্য যে-গুলিকে প্রাথমিক ও সাধারণ সাহিত্য্যগত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে সেই সকল পরিভাষার জ্ঞান জ্ঞানী প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়। শিক্ষাজগতে জ্ঞানানের সমস্ত অনেকটা আমাদেরই মত বলিয়া তাহার উদাহরণ প্রদান করা হইল; কিন্তু পাশ্চাত্য খণ্ডে এ নিম্নমন্তব্যই চলিয়া আসিতেছে। তারপর Taxonomic Botany বা উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ-সম্বন্ধে হেগুমসংগতি কতকগুলি লিপিবদ্ধ নিয়মাবলীও অবশ্য অস্বীয়।

বিজ্ঞান আমাদেরই যে সকল শব্দ জ্ঞান-মহীকণের উচ্চতর সহিত সংশ্লিষ্ট সে স্থলে ল্যাটিনগ্রীকমূলক শব্দ ব্যবহার; যেহেতু

এ স্থলে শুণু জ্ঞাপন, ভারতবর্ষ বা আখ্যেদী লইয়া থাকিলে চলিবে না। এ জ্ঞান-মন্দাকিনীতীর্থে আর জাতিভেদ নাই। বিশ্বজনীন উন্নতির জন্ত এই মহামিলনের যখন একান্তই দরকার, তখন পাকভিত্তির উপর নূতন শ্রেণীগুলি না তুলিয়া নূতন পত্তনে শক্তির অপ্রচয় করি কেন? ভারতের শিক্ষা-জগতে উদীয়মান কথিগণের ইহাও মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

তারপর অঙ্ক ও উদ্ভিদগণের Binomial nomenclature বা বৈদিক নামকরণ সম্বন্ধে আমরাগকে এক বৃহৎ সমস্তার সমাধান করিতে হইবে। জিনাস্ নামের প্রথম অক্ষর সর্বদাই বড় হাতের, ও জাতিবাক্য নামের প্রথম অক্ষর ছোট হাতের,—বহু-ভাষায় বৈদিক নাম লিখিবার জন্ত এই প্রণালীই উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। বর্ড মান প্রবন্ধে এই প্রণালীই অবগণিত হইয়াছে। “ফ্রান্স-ক্যাপেনল” এই নামটির প্রথম অংশ জিনাসূচক বলিয়া বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে। জাতিবাক্য শব্দ সর্বদাই সাধারণভাবে লিখিত হইবে।

পারিতাসিক শব্দ

নির্বাচনিক বদ্ধতা Selective sterility.

একক বা ব্যক্তি	Individual.
স্বপীন জাতি	Pure line.
কোষ-কেন্দ্র	Nucleus.
জাতি	Species.
জাতি-সম্বন্ধ	Hybrid.
জন্ম-কোষ	Germinal cells.
জিনাস্	Genus.
বৈদিক নির্বাচন	Physiological selection.
বৈদিক কলা	Organic tissue.
বৈদিক কোষ	Somatic cell.
পরাবর্তন	Variation.
পরাগ মাতৃকোষ	Pollen mother-cell.
বর্ষ	Variety.
বর্ষসম্বন্ধ	Mongrel.
রূপ-স্বত্ব	Chromosome.
স্রুগুপ্তি	Spermatogenesis.
সম্বন্ধসাধন	Hybridization.
সমজ্যোবর্তন	Phylogeny.
সংবিভাগ ভাষণওজ	Spindles of a dividing cell.

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা।

সমুদ্র-যাত্রা

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমুক্ত দাদবরষ তর্কর মহাশয় কর্তৃক বৃহদ্রাশীষ বচনের ব্যাখ্যা।

২। Foreign Travel and Hindu Shastras. A judgment in the

Benares Caste Case. The 18th September, 1911.

৩। Indian Shipping—A History of the Sea-borne trade and maritime activity of the Indians

from the earliest times by Radha Kumud Mukerjee M. A. 1912.

৪। কলিকাতা অধিবেশনে সমগ্র গৃহস্থ-মণ্ডলীর কায়স্থের সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে সম্ভাব্য প্রকাশ।

৫। বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে অভিভূত।

৬। বঙ্গবাসীতে শ্রীমুক্ত শশধর তর্কজ্ঞান-মণি মহাশয়ের মত।

বৃহদ্রাশীষ পুরাণ একখানি উপপুরাণ। কিন্তু উপপুরাণ বলিয়া নগণ্য নহে।

কমলাকণ্ঠের নির্বাচনিকূতে বহুশব্দনের উদাহরণ, হোমজির এবং বহুতর আধুনিক সর্গস্থ-গ্রন্থে বৃহদ্রাশীষের, শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ও মত গৃহীত হইয়াছে।

বৃহদ্রাশীষে আছে :—

সমুদ্র-যাত্রা-শীকার: কমণ্ডলু-বিধারণম্
যিজনাম্ অস্বার্থগ্ কতাত্মপায়ামত্যা
দেবরেন স্তোত্রপঙিতঃ মণ্ডপক্ পশোবদ
মাংসদানম্ তথা শ্রোত্রে বাণপ্রগ্রহাংস্তথা
দন্ত কস্তায়া কস্তায়া পুনর্দানম্ পরহ চ
দৌষকালম্ ব্রহ্মচর্যং নরমোক্ষমেবকৌ
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধাচ্ চ তথা মনম্
ইমান্ ন শাস্তান্ কলিযুগে বর্জ্যান্ আহ—

মনীষিণা:

এই চারিট শ্লোকও হোমজির এবং বহুশব্দন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইতরাং এই শ্লোকগুলি যে প্রামাণিক নয়, তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

এই শ্লোক কয়টির উপরই প্রধানত নির্ভর করিয়া, কলিতে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ, এরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন।

বাবল হইল, মহামহোপাধ্যায় দাদবরষ তর্কর মহাশয় মত প্রকাশ করেন যে, এই

শ্লোকগুলিতে ভারতবাসী সাধারণ হিন্দুর পক্ষে নৌযানে সমুদ্র-যাত্রার কোনরূপ বাধা হয় না। যে সমুদ্র-যাত্রা ইহাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা একরূপ প্রাথমিক, একটা মধ্য-কর্ম। এই কথাটি একটু বিস্তৃত করিয়া পরে বলিব।

তাহার পর শ্রীমুক্ত পঞ্চানন তর্কর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেবল উপপুরাণের একটি শ্লোকে নির্ভর করিয়া সমুদ্র-যাত্রা কি নিষিদ্ধ হইয়াছে? তিনি উত্তর করেন, “তা কেন? যখন স্বয়ং মহা সমুদ্র-যাত্রাকে অপাংক্ত্যে করিয়াছেন, তখন সমুদ্র-যাত্রা যে একরূপ নিষিদ্ধ ছিল, তাহার আর সম্ভেহ কি?”

সমুদ্রযাত্রী বন্দী তৈলিক: কূটকারক: প্রভৃতি বহুতর ব্যক্তি অপাংক্ত্যে। কিন্তু সমুদ্র-যাত্রী কাহাকে বলে?—কুন্তক বলেন। কিন্তু সমুদ্র-যাত্রী—“সমুদ্রে যো বাহিরাদিনা বাপান্তরং গচ্ছতি,” তাহা হইলে, সমুদ্রযাত্রী অর্থে Sailor হইল—ব্যবসায়ী পাড়ী মাঝি হইল। ব্রাহ্মণে পাড়ী মাঝীর ব্যবসা করিলে অপাংক্ত্যে হইবে, বিচার নহে। সমুদ্রযাত্রী—যে পুনঃ পুনঃ সমুদ্রে গমন করে—সে পাড়ী মাঝি ব্যতীত আর কে হইতে পারে? এইরূপ গুলি অবলম্বন করিয়া কুন্তক সমুদ্রযাত্রী শব্দের এরূপ অর্থ করিয়াছেন কি না বলা যায় না। যাহা হউক, কুন্তকের অর্থ ঠিক হইলে সাধারণ-যাত্রীর পক্ষে সমুদ্রে গমন নিষিদ্ধ হইল না।

বাবলপদী ধামে দুইজন আগরওয়াল বৈষ্ণব মথো এই সমুদ্র-যাত্রার কথা লইয়া ১৯১১ সালে একটি প্রবল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। হৃদয় ও হৃৎপিত্ত সেবজ শ্রীমুক্ত শ্রীচন্দ্র বহু মহাশয় কাশী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের সাহায্যে সেই মোকদ্দমার পূজ্যহুগু বিচার করিয়াছেন। সেই বিচার-পক্ষে

বৃহস্পতির পুণ্যের পোকা কথিত তদন্ত
বিচার আছে। তাহার একই আভাস
দিতোছি।

শেষ পোকার শেষ ছুই পদে দেখিবেন
“ইমন্ শ্রম্ভান্, কলিযুগে বর্জ্যান্ আহ-
মণিগিণঃ”—এই সকল ধর্ম কলিযুগে বর্জ্য।

পরের সমুদ্র-যাত্রা ত ধর্ম-কর্মই হইতেই
সবের। লোক-সমষ্টিতে ১২টি কাজ

বর্জন করিবার কথা। সমুদ্র-যাত্রা ছাড়া
আর ১২টি এই :—কমণ্ডলু ধারণ, ভিজ্রদিগের

অদবর্ণ কন্ডা-বিবাহ; দেবের দ্বারা সন্তানোৎ-
পত্তি, মধুপুর্কে পশুবধ; আশ্বে মাসে দান,

বাণপ্রাশ্রয়, দত্তকস্তার পুনর্দান, দীর্ঘকাল
ব্রতচর্চা; নরমেধ, অশমেধ, মহাপ্রস্থান, গো-
মেধ। এই সকলগুলি-অন্ত অত্ম যুগে ধর্ম-
কর্ম্য মনে করিবার বিধি থাকিলেও, কলিতে

বর্জনীয়। এ বারটির সঙ্গে সাধারণ সমুদ্র-
যাত্রা কিরূপে নিষিদ্ধ হইবে? তবে এই প্রথম

কথাতকি এই বিশেষরূপ “সমুদ্র-যাত্রা স্বীকার”
ধরিতে হইবে। স্বীকার কথা দ্বারা বিশেষরূপ
সূচিত হইয়াছে। এই কথাই বহু পূর্বে

মহামহোপাধ্যায় বাবেশ্বর তর্কজ্ঞ মহাশয়
বলিয়াছেন, বারাদশীরও কয়জন পণ্ডিত এই
মোকদ্দমাতে তাহাই বলিয়াছেন।

কিছুপ সমুদ্র-যাত্রার কথা বৃহস্পতির
বলিয়াছেন, তাহা পারাশরীস্মৃতি হইতে এবং
কৃষ্ণপুরাণ হইতে বৃদ্ধা যায়।

চতুর্বিধোপপত্তে তু বিবিধং ব্রহ্মযাতকে।
সমুদ্র সেতু-গমনং প্রায়চিত্তং বিনির্দিষ্টং ॥
[পরাশর]

গঙ্গা রামেশ্বরং পুণ্যং স্মার্য চৈব মহোদধৌ।
ব্রহ্মচর্যাভিঃ স্তম্ভাঃ দৃষ্টা কল্মষ-বিমোচনং ॥
সুতরাং এই সমুদ্র-যাত্রা স্বীকার যে সাধারণ
সমুদ্র-যাত্রা পক্ষে নহে তাহা একরূপ নিষ্পদ।

বারাদশীর এই মোকদ্দমায় মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত গঙ্গানান্দ ঝা সাক্ষীস্বরূপ যে ব্যবস্থা
দিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে,

বেদ, পুরাণ, ইতিহাস সর্বত্রই সমুদ্র-যাত্রার
কথা আছে, এবং সমুদ্র-যাত্রা যে সশাস্ত্রার
বা শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য, তাহাতে কোন

সন্দেহ নাই। স্বযম্বে, অধর্মবেদ, কড়ি-
পুরাণ, বরাহ-পুরাণ, ইতিহাস, রাজতরঙ্গিণী
প্রভৃতি গ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ আছে।

এ মোকদ্দমার বিচার-পত্র পঞ্চালোচনা
করিলে বৃদ্ধা যায় যে, সমুদ্র-যাত্রা কোন
কালেই নিষিদ্ধ ছিল না। ব্রাহ্মণের পক্ষে

জাহাজে দাঁড়া মাঝীর ব্যবসায় হয়ে হইলেও,
ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পক্ষে নিষিদ্ধ
কখনই ছিল না। আর উত্তর ভারতবাসীর

পক্ষে স্বীকারার্থে এক্ষণে ব্যবসায় শিষ্টাচার-
সম্মত ছিল।

ব্রাহ্মণের পক্ষে যখন এক্ষণে তখন ক্ষত্রিয়
বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে স্বেচ্ছাও কোনরূপ বাধাই
ছিল না। বহু-বিচারপতি এই বিষয়ে হস্তের

যুক্তি দেখাইয়া মীমাংসা করিয়াছেন :—
Thus it follows that the sea-
voyage is not prohibited to any
one of the three lower castes

throughout India, and only the
profession of sea-trade is prohibi-
ted by Baudhayana to the Brah-
mins of the South. The sea-vo-
yage for the purposes of study or

foreign travel or to spread one's
religion or knowledge is not pro-
hibited to any caste even by him.

ইহার অর্থবাদ নিষ্পত্তোপায়। উপরে এক-
রূপ দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের ক্ষত্র

লইয়া বহু-বিচারপতি অনেক পরিশ্রম করিয়া
এ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। এক্ষণে ভাবে
সাধারণ কা শাস্ত্র কথার বিচার এক দ্বারকা-

নাথ-নিম্নের দ্বারা আর প্রায় কাহারও দেখা
যায় না। উভয়কেই কার্যসম্মত বলিতে
হয়।

এই বিচার ১৯১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর
শেষ হয়। তাহার ১৫ মাস পূর্বে বরেন্দ্রপুর
কলেজের অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

তাহার প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থের (Indian
Shipping 'ভারতে জাহাজ চালায়') রচনা
শেষ করেন। কিন্তু গ্রন্থ ১৯১২ সালে

প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র
বহু মহাশয় এই গ্রন্থ হইতে কোনো ভাড়া-
পান নাই। এই গ্রন্থের কিম্বদন্তি যে ডন

মাগেলিনে খণ্ডন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও
বোঝা হয় দেখেন নাই।

রাধাকৃষ্ণ বাবুর ইংরাজী গ্রন্থ আমাদের
বাস্তবায়ী পৌরব। এর পাইয়াই আমি

লিখিয়াছিলাম, এই গ্রন্থের সমালোচনা আর
কি করিব, ইহা হইতে আমার অনেক শিক্ষা

হইয়াছে। শুধু শিক্ষা নহে, রাধাকৃষ্ণ বাবুর
গৌরবে আমরাও গৌরবাবিত হইয়াছি।

আমরা ভারতবাসী, ভারতের কিছুই জানি না
বলিতেই হয়, সাহেবরা যা বলা কহা করেন,
প্রধানত তাগাই কপুতাইয়া থাকি—লর্ড কর্জন

একজন এ সকল বিষয়ে পণ্ডিত বোক,
পাণ্ডিত্যবলেই “রাজস্ব” করিয়া গিয়াছেন।
তিনি পুস্তক পাইয়া বলিয়াছেন যে, এই
পুস্তকে, ভারত সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের জ্ঞান

ভাণ্ডার বর্দ্ধিত হইল। বাস্তবিক এত অজানা
কথা আমাদিগকে জানান হইয়াছে যে, আমরা
প্রতিপক্ষে বিমুগ্ধ হই।

এই পুস্তক ইংরাজিতে লিখিত হওয়াতে
বিশেষে ইহার বিশেষ যশ হইয়াছে, কিন্তু
ইংরাজী-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীমণ্ডলে তেমন

প্রচারাভ্যাস করে নাই। বাঙ্গালী পাঠকের
নিকট পরিচয় প্রদানার্থে এই ক্ষণ হস্তে
যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

গ্রন্থের প্রধানত দুইভাগ—
১। হিন্দু-সময়। ২। মুসলমান-সময়।

হিন্দু-সময়ে যে সমুদ্রে নৌচালনা বিলক্ষণ
ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। *

বোধে আছে যে, তৃত্ব রাজর্ষির পুত্র
জজ্ঞাস্বার পিতৃ-আজ্ঞায় শত্রুদিগের বিরুদ্ধে

দুর্ভব দীপপুঞ্জে পোতারোহণে গমন করেন।
সমুদ্র-পথে প্রবল বাতায় তাহার পোত নষ্ট
হয়, এবং তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক

তাঁহাদের শতদণ্ড পোতের দ্বারা রক্ষা পান।
কিন্তু বেদের কথা, দেবতার কথা, না হয়,
ছাড়িয়া দিলাম। রামায়ণে বহুবলে সমুদ্র-
গমনের কথা আছে। অযোধ্যা কাণ্ড,

১৪ অধ্যায়ে, ৮৮ শ্লোকে আছে :—
নাভাং শতান্যং পঞ্চানং কৈবর্তান্যং শতং শতং
সন্নানান্যং তথা যুগ্মাসিহা অভ্যন্তোদয়ং ॥

শত শত বর্মজাদিতবপু যুবক কৈবর্তগণ
পঞ্চশত নৌকা, শত্রুর পথ রোধ করিবার
নিমিত্ত, অপেক্ষা করুক।

এক্সণ নৌ-যুদ্ধের কথা আছে। আর
* মন্থর যে মোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কজ্ঞ মহাশয় সমুদ্র-যাত্রার প্রশস্ততা আমাদিগকে
দেখান, সেই মোকের সমুদ্র-যাত্রী মোর রাধা কৃষ্ণ বাবু A Brahmin who has gone to sea বলে।
আমরা মহাভাষ্যে পুণ্যায় ব্যবশের তর্কজ্ঞ মহাশয়ের ব্যবসায় আশ্রয়ে, পরে শ্রীশচন্দ্র বহু মহাশয়ের
বিচার-পত্রের বিস্তৃত যুক্তির বলে, দেখাইয়া দিই যে, সমুদ্রযাত্রার অর্থ রাধাকৃষ্ণ বাবুর মত পুণ্ড-পুণ্ড-
সমুদ্রে গমন কর, সুতরাং রাধাকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থে কলমের মত একটু সুল বহিরাগে।

কিষ্কিণ্ডা কাণ্ডে হৃদীব অনেককেই সমুদ্র-মধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জে গিয়া নীতাদেবীকে অবেশণ করিতে বলিয়াছেন।

মহাভারতে দেখা যায়—সাগরপাৰ্শ্বে নক্ষত্র-তাম্রদ্বীপ পুৰুষ সিংহ রোজ, রাক্ষস, নিধাদিগকে জয় করিয়াছিলেন। সংস্কৃতভাষা অতি বিপুল অবয়ব। বৈদ্য, শ্রুতি, ইতিহাস, পুরাণ, আখ্যায়িকা রাশি রাশি ইহাতে আছে; রাধাকৃষ্ণ বাবু আচাৰ্য্য আধ্যাত্মিক, বৈদ্য এবং পরিশ্রম সহকারে সমগ্র সংস্কৃত ভাষা তত্ত্ব উন্নয়ন করিয়া অল্পকাল করিয়াছেন, এবং সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে, পোতা-নিৰ্দ্ধাণ সম্বন্ধে যথোনে যথা পাওয়া যায়, সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবল মুদ্রিত পুস্তক নহে, সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে একখানি হাতের লেখা গ্রন্থ আছে, তাহাতে জাহাজ-গঠনের কথা আছে, দেখান হইতেও তিনি বিস্তর উক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন, জাহাজ কল্পে গড়িতে হয়, কত বড় করিতে হয় ইত্যাদি। গ্রন্থনির্দেশ নাম “মুক্তি-কল্পতরু” কেবল সংস্কৃত বলিয়া নহে, আরবী, পারস্যী ইংরাজী অস্থাবর হইতে, বৌদ্ধ ইতিহাস হইতেও তিনি বিস্তর সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার পর যথোনে যথা খোদিত বা চিত্রিত আছে, কেবল ভারতবর্ষে নহে, হুইব বর্ণনা, সিংহলে যথা আছে, তাহারও প্রতিকৃতি দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ৬৯৯খণ্ড-মন্দিরের গাজে, ভূবনেশ্বরের বিদ্যুৎ শিলাবরের শক্তিমা পার্শ্বে এক মন্দিরের শিলাবরের, অজস্তার গুহা, মাদুরার পুষ্করিণীর পার্শ্বে চিত্রে—ভারতের সর্বত্র স্থায় পরিভ্রমণ করিয়া তিনি সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, ধর্ম তাঁহার অধ্যবসায়!

ধর্ম তাঁহার পরিশ্রম। হুইবের কথা এই যে, এই অগাধ পরিশ্রম, এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায় এই হুইব-এ গ্রন্থ প্রকাশে সার্থক হইয়াছে। সার্থক হইয়াছে কেন বলিতেছি তাই বলি। আমাদের সমস্ত বর্ণনেশে এই সমুদ্র-যাত্রার ব্যাপার লইয়া ভুল আন্দোলন চলিয়াছে।

কলিকাতায় গত বৎসর যে ভারতের সমগ্র কাষস্থ জাতির সম্মিলন হয় (All India Kayastha Conference), তাহাতে সংস্কৃত হিব্রু হইয়াছে যে, কাষস্থগণ স্বদেশ রক্ষা করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিতে পারিবেন। অর্থাৎ আত্মদিকে ধর্ম বজায় রাখিতে পারিলে, কেবল সমুদ্রযাত্রায় ধর্ম নষ্ট হইবে না।

উত্তর পশ্চিমে ওয়াশিংটন বণিকগণের মধ্যে যে মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি—বিচারাসনের বিচারে হিব্রু হইয়াছে, ঐ জাতির মধ্যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নহে।

বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হন—কিন্তু সে কথা ঘোষণা করিতে নিরস্ত হইয়াছেন।

বঙ্গবাসীর শুভে—শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয় স্বীয় সুবিবৃত মত প্রচার করিয়াছেন—এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু উৎসাহকামিকার ভাবে বোধ হইতেছে, তাঁহার মত যে ধর্ম রক্ষা করিয়া কেবলমাত্র সমুদ্র-যাত্রায় কোমলরূপ অর্থক হয় নাই।

তাই বলিতেছিলাম রাধাকৃষ্ণ বাবুর বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের বিপুল শ্রম এবং অধ্যবসায় সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। দেশের হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছে। এখন জনকতক ধনশালী লোক হিন্দু-জাহাজ চালাইতে পারিলে—আমাদের এই স্বদেশী সমালোচনা সার্থক হয়। সুযোগ্য গ্রন্থকারকে একটি অহরোধ, তিনি যেন এই গ্রন্থের বাদলা অহরহা অচিরে প্রকাশ করেন।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

দুর্গা পূজার শাস্ত্রীয় প্রমাণ *

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত অংশকে চণ্ডী বলে। উহাতে দেবী-মাংসাধ্য বর্ণিত আছে। দেবদ্বার-সংগ্রামে দেবগণ পুনঃ পুনঃ অহরহণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় স্বামিহ ও অধিকার ভঙ হন, তখন তাঁহার দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবীও তাঁহারিগণের জন্ত অহরহণের সহিত মহাগমের নিয়ুক্ত হইয়া তাহারিগণকে নিম্ন করতঃ দেবতাগণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করেন। পুনঃ পুনঃ অহরহণের সহিত সংগ্রামে দেবীর জয়-রক্তান্ত লিষ্ট হই চণ্ডী রচিত হইয়াছে। উহা তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগে মণ্ডুকট-বধ বর্ণিত হইয়াছে। “ইহা প্রথম অধ্যায়েই শেষ। দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় লইয়া। উহাতে মহিষ-ইহতে ধাদশ অধ্যায় আছে। উহাতে শুভ-নিষ্ঠ-বধের বর্ণনা। ত্রয়োদশ অধ্যায় পরিশিষ্ট-স্বরূপ। উহাতে হুইব রাজা ও বৈশ্য কর্তৃক দেবীর পূজা বর্ণিত হইয়াছে। হুইব রাজা দেবীর বরে স্বীয় ভ্রাতা রাজ্য উদ্ধার করিয়া ছিলেন এবং বৈশ্য স্বীয় প্রার্থিত আশুজান লাভ করেন।

একান্তি মধ্যে দেবতাগণ কর্তৃক দেবীর শুভও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং চণ্ডীর মাংসাধ্যও বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর উপাখ্যান-ভাগ লিপিবদ্ধ করা হইল।

দেবতাগণের সর্বদাই বিপদ। দুর্দান্ত অহরহণ কখন বা দেবরাজ ইন্দ্রকে বর্গচ্যুত করিয়া স্বর্গস্থ ভোগ করিতেছে, কখন বা

দেবতাবিশেষকে আক্রমণ পূর্বক হত্যা করিতে উজ্জত, কখন বা প্রধান প্রধান দেবতাগণকে জয় করিয়া অহরহণ ভূতাক্রমে কার্য্য করাইয়া লইতেছে। এশকল বিপদ হইতে জ্ঞানকর্ত্তা মহাদেবী। দেবতাগণের এইরূপ বিপদকালে দেবীর আবির্ভাব হয়।

“দেবানাম কাথ্যসিদ্ধার্থমাবির্ভবতি সা যদা।” (২৪৮)

মহিষাসুর-বধের পর দেবতাগণ দেবীকে শুভে সজ্জিত করিলে পর দেবী তাঁহারিগণকে বর-প্রদানে উজ্জত হইলে, দেবতাগণ একরূপ বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যে মহেশ্বরী রূপাপূর্বক যদি আমাদিগকে বর প্রদান করেন, তবে আমরা এই বর যাক্ষা করিতেছি যে, আমরা যখন বিপদে পতিত হইব তখন আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি আসিয়া আমাদিগকে আপন হইতে উদ্ধার করিবেন।

“যদি বাপি বরো দেয়ত্বমাস্যং মমেষধি।
সংস্ফুটা সান্ধতাস নো হিংসেধাঃ পরমপদাঃ।”

(৪৩৫)

দেবীও “তথাঙ্ক” বলিয়া ঐ বর প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে পুনরায় যখন শুভ-শান্তিনামক দৈত্যদ্বয় দেবতাগণকে আপনাপন অধিকার ও প্রভুত্ব হইতে পরিস্রষ্ট করিয়া স্বর্গ হইতে দূর করিয়া দিল, তখন দেবতাগণ দেবীর শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন—
“হে দেবি! আপনি পূর্বে আমাদিগকে বর দিয়াছেন যে, আমরা যখন বিপদে পতিত হইব, তখন আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাদিগকে সকল আপন হইতে উদ্ধার করিবেন।”

“অথান্যাকং বরো দন্তো যথাপংক্তু স্বতাবিলাঃ ।
ভবতাঃ নাশমিহ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥”

(২৬৬)

দেবীও পুনরায় স্তম্ভনিস্তম্ভ বধ করিয়া
দেবতাগণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন ।

স্তম্ভ-নিস্তম্ভ-বধের পর দেবতাগণ ভবিষ্যতের
সকল প্রকার আপদুষ্কারের জ্ঞাত দেবীর নিকট
প্রার্থনা করিলেন ।

“সর্ববোধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যভাষিলেবরি ।

এবমেব স্বাধা কাথ্যমস্বৈরবিনাশনম্ ॥”

(১১১০৩)

দেবীও ভবিষ্যতে যে সকল অস্থির নিধন
করিবেন, তাহার বিবরণ দিয়া শেষে
বলিলেন—

“ইথাং যদা যদা বাধা দানবাধা ভবিষ্যতি ।

তদা তদাবতীর্থাংস্ত কথিয্যাম্যসিঃক্ষয়ম্ ॥”

(১১১০৫)

এইরূপে যখন যখন দৈত্যগণ ত্রৈলোক্যের
পীড়ার কারণ হইবে, তখন আমি অবতীর্ণ
হইয়া শত্রুসকল মহাধর করিব ।

দেবতাগণ সার্থপর নহেন । তাহারা
কেবলমাত্র নিজহিতার্থে দেবীর নিকট বর
প্রার্থনা করেন নাই । জ্ঞাতের হিতার্থে
সমগ্র জীবের মঙ্গলের জ্ঞাত দেবীর নিকট
প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

“বৎস মর্ত্যঃ স্তবৈরভিষং স্তোযাত্যমলাননে ।

তস্তু বিতর্জিবিকটবর্ধনদ্বারাদিসম্পদাম্ ॥

বৃক্ষদেহংপ্রদমাং স্বং ভবেথাঃ সর্গদাহিকৈঃ ॥”

(৪৩৬৩৭)

হে দেবি ! আমরা আপনার নিকট আর
প্রার্থনা করিতেছি যে, যে মহাজ্ঞ আপনার
এই তোমার পাঠ করতঃ আপনাকে ভূষ্ট
করিবে আপনিক রূপাপূর্ণক সর্গদাহ তাহার
খন-সম্পত্তি ও পুত্র-কন্যাাদি বৃদ্ধি করিবেন ।

দেবী তাহাদিগকে সে বরও দান
করিয়াছিলেন । দেবী আরও বলিলেন
“যে ব্যক্তি সমস্ত চিত্তে আমার এই সমস্ত
জ্ঞতিব্যাক্যে আমার তত্ত্ব করিবে এবং মাহাত্ম্য-
কথা শ্রবণ করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহার
বাধা-নিবয় সকল বিনষ্ট করিব ॥”

এভিঃস্তবৈশ্চ মাং নিতাং স্তোযাতো যঃ

সমাহিতঃ ।

তস্তাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥”

(১১২২)

তাহাদের কোন কোন পাপ বা পাপজনিত
আপদ-বিপদ বা দারিত্র্য-দুঃখ, অথবা
প্রিয়জনবিয়োগজনিত শোক-তাপ উপস্থিত
হইবে না । তাহাদের শত্রুভয়, দস্যভয়,
জলভয় ইত্যাদিও থাকিবে না ।

“ন তেচ্যাং চতুস্তাৎ কিঞ্চিৎ চতুস্তোথাং ন চাপাদিঃ ।

ভবিষ্যতি ন দারিত্র্যং ন চৈবৈষ্টবিক্রোধানম্ ॥

শক্রতো ন ভয়ং তস্তু দস্যতো বা ন রাজভ্যঃ ॥

ন শস্ত্রানলভোয়োবাৎ কদাচিৎ সন্তবিষ্যতি ॥”

(১১২৬৬)

• এতদ্বারা মহামারীজনিত অশেষ উপদ্রব
এবং ত্রিবিধ উৎপাত শাস্তি হইয়া থাকে ।

“উপদ্রবানশেষাংস্ত মহামারীসমুদ্ভবান্ ।

তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েদম্ ॥”

(১১২৮)

এমন কি শতবর্ষব্যাপী অনারুণি নিবন্ধন
পৃথিবী জলপৃষ্ঠা হইলে এবং লোক সকল
ভৃত্তিকে অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে
দেবী স্বয়ং আবিস্কৃত্তা হইয়া স্বীয় দেহ
হইতে শাক সমুৎপন্ন করতঃ তদ্বারা লোক
সকলকে ভাব গোষণ করিবেন, এই আশা-
বাণীও আমাদিগকে দিয়াছেন ।

“ভূতশতবার্ষিকমরনাষ্ট্যামনন্তমিহ ।

• • • • •

ততোহহমবিলল লোকমাগ্নদেহসমুদ্ভবঃ ।

ভবিষ্যামি হুয়াঃ শাটকরাবুস্তেঃ প্রাণপারকৈঃ ॥”

(১১৪৬, ৪৮)

এক্ষণে আমরা এই দেবীমাহাত্ম্য-বর্ণনে
নিমুক্ত হইব ।

একদা প্রলয়কালে যখন সমস্ত জগৎ
জলময় এবং ভবনান বিক্ষু যোগনিভায়
অভিভূত হইয়া অনন্তশযায় শয়ান, তখন
তাহারই কর্ণমূলোৎপন্ন মধু ও কৈটভ নামক
অহরহয় বিক্ষুনাভিপদ্মাস্থিত প্রজাপতি
ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল ।
ক্রোধাৎখন এই মহাদেবীকে শুভবাহা সন্তুষ্ট
করিলে তিনি আবিস্কৃত্ত হইয়া বিক্ষুকর্তৃক
উদ্ধৃত সেই অহরহয়কে নিহত করিয়া-
তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন ।
(মার্কণ্ডেয়চণ্ডী ১১৪৬—৬১ ; ৮৭—১০১)

আর একবার মহিম্বসুর নামক দৈত্যাদি-
পতির সহিত দেবগণের শতবর্ষব্যাপী সংগ্রাম
হইয়াছিল । সেই যুদ্ধে অহরহয় কর্তৃক
দেবগণ ও দেবদেয় সকল পরাস্ত হইলে,
মহিম্বসুর দেবতাদিগকে জয় করতঃ ইন্দ্র,
সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অশ্বাচ্চ
দেবতা সকলের অধিকার গ্রহণ করে, এবং
দেবগণকে স্বর্ণ হইতে দুরীকৃত্ত করে ।

দেবতাগণ তখন মর্ত্যলোকে মহশয়দিগের
জায় বিচরণ করিতে থাকেন ।

“সূর্য্যোজ্ঞানিলেন্দুনাং যমস্য বরুণস্য চ ।
অভোবাধ্যাণিকারান্ শ শ্বময়মাধিত্তিভিঃ ॥

স্বর্ণগিরিরাবৃত্তাঃ সর্গে তেন দেবগণা ভূবি ।

বিচরন্তি যথা মর্ত্যো মহিষেণ চুরাশ্বনাং ॥”

(১১৬৭)

তখন পরাস্ত দেবগণ একর হইয়া ব্রহ্মকে
সহায় করিয়া তাহার সহিত হরিহর-সমিধানে
গমনপূর্ব্বক মহিম্বসুরের অত্যাচার আশু-
পূর্ব্বক তাহাদের নিকট নিবেদন করিলেন ।
তাহাতে তাহারা অতিশয় কোপযুক্ত
হইলেন, এবং স্বপ্না, বিক্ষু, শব্দ ও ইন্দ্রাদি
দেবগণের স্বমণ্ডল হইতে মহদ্রোক্ত নির্গত
হইয়া একত্রিত হইল এবং সেই অমূল্য
তেজঃপুঞ্জ নারীরূপে পরিণত হইল । শব্বরের
তেজ হইতে তাহার মূখমণ্ডল, যমের তেজে
বিশ্ব, বিষ্ণুর তেজে বাহুব, চন্দ্রের তেজে
স্তনমণ্ডল, ইন্দ্রের তেজে কটদেশ, বরুণের তেজে
জম্বা ও উরদেশ, শরীর তেজবাহা নিত্য,
অগ্নার তেজ হইতে পদযন্ত্র, সূর্য্যতেজে
পদাঙ্গুলি সকল, বরুণগণের তেজবাহা হস্তযন্ত্র
দশাঙ্গুলি, কুবেরের তেজঃপ্রভাবে নাসিকা,
দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজ হইতে দশন-
সমূহ, অনলের তেজে জিনঘন, সন্ধ্যার
তেজে জম্বুগল, বায়ুর তেজ হইতে কর্ণযন্ত্র,
এবং অজাত অমরবৃন্দের তেজঃপ্রভাবে অপরা-
ণর অমরব সন্মুখ সমুদ্র হইল ।

“ততোহহমবিলল লোকমাগ্নদেহসমুদ্ভবঃ ।
ভবিষ্যামি হুয়াঃ শাটকরাবুস্তেঃ প্রাণপারকৈঃ ॥”

(১১৪৬, ৪৮)

এক্ষণে আমরা এই দেবীমাহাত্ম্য-বর্ণনে
নিমুক্ত হইব ।

একদা প্রলয়কালে যখন সমস্ত জগৎ
জলময় এবং ভবনান বিক্ষু যোগনিভায়
অভিভূত হইয়া অনন্তশযায় শয়ান, তখন
তাহারই কর্ণমূলোৎপন্ন মধু ও কৈটভ নামক
অহরহয় বিক্ষুনাভিপদ্মাস্থিত প্রজাপতি
ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল ।
ক্রোধাৎখন এই মহাদেবীকে শুভবাহা সন্তুষ্ট
করিলে তিনি আবিস্কৃত্ত হইয়া বিক্ষুকর্তৃক
উদ্ধৃত সেই অহরহয়কে নিহত করিয়া-
তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন ।
(মার্কণ্ডেয়চণ্ডী ১১৪৬—৬১ ; ৮৭—১০১)

আর একবার মহিম্বসুর নামক দৈত্যাদি-
পতির সহিত দেবগণের শতবর্ষব্যাপী সংগ্রাম
হইয়াছিল । সেই যুদ্ধে অহরহয় কর্তৃক
দেবগণ ও দেবদেয় সকল পরাস্ত হইলে,
মহিম্বসুর দেবতাদিগকে জয় করতঃ ইন্দ্র,
সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অশ্বাচ্চ
দেবতা সকলের অধিকার গ্রহণ করে, এবং
দেবগণকে স্বর্ণ হইতে দুরীকৃত্ত করে ।

দেবতাগণ তখন মর্ত্যলোকে মহশয়দিগের
জায় বিচরণ করিতে থাকেন ।

“সূর্য্যোজ্ঞানিলেন্দুনাং যমস্য বরুণস্য চ ।
অভোবাধ্যাণিকারান্ শ শ্বময়মাধিত্তিভিঃ ॥

স্বর্ণগিরিরাবৃত্তাঃ সর্গে তেন দেবগণা ভূবি ।

বিচরন্তি যথা মর্ত্যো মহিষেণ চুরাশ্বনাং ॥”

(১১৬৭)

তখন পরাস্ত দেবগণ একর হইয়া ব্রহ্মকে
সহায় করিয়া তাহার সহিত হরিহর-সমিধানে
গমনপূর্ব্বক মহিম্বসুরের অত্যাচার আশু-
পূর্ব্বক তাহাদের নিকট নিবেদন করিলেন ।
তাহাতে তাহারা অতিশয় কোপযুক্ত
হইলেন, এবং স্বপ্না, বিক্ষু, শব্দ ও ইন্দ্রাদি
দেবগণের স্বমণ্ডল হইতে মহদ্রোক্ত নির্গত
হইয়া একত্রিত হইল এবং সেই অমূল্য
তেজঃপুঞ্জ নারীরূপে পরিণত হইল । শব্বরের
তেজ হইতে তাহার মূখমণ্ডল, যমের তেজে
বিশ্ব, বিষ্ণুর তেজে বাহুব, চন্দ্রের তেজে
স্তনমণ্ডল, ইন্দ্রের তেজে কটদেশ, বরুণের তেজে
জম্বা ও উরদেশ, শরীর তেজবাহা নিত্য,
অগ্নার তেজ হইতে পদযন্ত্র, সূর্য্যতেজে
পদাঙ্গুলি সকল, বরুণগণের তেজবাহা হস্তযন্ত্র
দশাঙ্গুলি, কুবেরের তেজঃপ্রভাবে নাসিকা,
দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজ হইতে দশন-
সমূহ, অনলের তেজে জিনঘন, সন্ধ্যার
তেজে জম্বুগল, বায়ুর তেজ হইতে কর্ণযন্ত্র,
এবং অজাত অমরবৃন্দের তেজঃপ্রভাবে অপরা-
ণর অমরব সন্মুখ সমুদ্র হইল ।

“ততোহহমবিলল লোকমাগ্নদেহসমুদ্ভবঃ ।
ভবিষ্যামি হুয়াঃ শাটকরাবুস্তেঃ প্রাণপারকৈঃ ॥”

(১১৪৬, ৪৮)

এক্ষণে আমরা এই দেবীমাহাত্ম্য-বর্ণনে
নিমুক্ত হইব ।

একদা প্রলয়কালে যখন সমস্ত জগৎ
জলময় এবং ভবনান বিক্ষু যোগনিভায়
অভিভূত হইয়া অনন্তশযায় শয়ান, তখন
তাহারই কর্ণমূলোৎপন্ন মধু ও কৈটভ নামক
অহরহয় বিক্ষুনাভিপদ্মাস্থিত প্রজাপতি
ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল ।
ক্রোধাৎখন এই মহাদেবীকে শুভবাহা সন্তুষ্ট
করিলে তিনি আবিস্কৃত্ত হইয়া বিক্ষুকর্তৃক
উদ্ধৃত সেই অহরহয়কে নিহত করিয়া-
তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন ।
(মার্কণ্ডেয়চণ্ডী ১১৪৬—৬১ ; ৮৭—১০১)

করবে চ সন্ধ্যায়োত্তেজঃ শ্রবণাবনিলয়া চ ।
অস্ত্রোষাঐক্যং দেবানাং সম্ভবস্তেজসঃ শিবা ॥”

(২১০—১৮)

তখন পিণাকধারী ত্রিপুরারি শূল হইতে অজ শূল নির্গত করতঃ সেই দেবীকে দিলেন । কৃষ্ণ ও বীড় চক্ক হইতে সমুৎপন্ন অস্ত্রচক্ক উাহাকে প্রদান করিলেন, সমুদ্র শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, পবনদেব ধ্বং ও বায়ুপূর্ণ ত্রীণ্ড, ইন্দ্র ঐরাবত হইতে বটী এবং নিম্ববজ্র হইতে আর এক বজ্র উৎপাদন করতঃ সেই দেবীকে প্রদান করিলেন । যম কালদণ্ড ও বরুণ পাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কপল প্রদান করিলেন । দিবাকর দেবীর সমস্ত লোমকূপে আপন কিরণ দিলেন এবং কাল খণ্ডা ও নির্মল চন্দ্রবর্ধ দান করিলেন । ক্ষীরোদমাগর বিমল হার, অবিনশ্বর অশ্বর, বিদ্যা মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, শুভ অর্ঘ্যচক্র, সমস্ত বাহুবল্লভ, কেয়ুর, নির্মল নুগুবন্ধ, উৎকৃষ্ট কর্ণভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলিত রত্নাঙ্গুরীক সকল প্রদান করিলেন । আর বিষকর্ষা অভি নির্মল কুঠার, অস্ত্রাশ্র নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র সকল এবং অভেদ্য কবচ দান করিলেন । জলনিধি শিরোদেশে ও গলদেশে অমল কমল মালা এবং হৃশোভন শতধল গার অর্ণব করিলেন, হিমালয় বাহন অজ সিংহ এবং অশেষ ধনরত্ন দান করিলেন ও দনাধিপতি কুবেরও সুখাপূর্ণ পান-পাত্র প্রদান করিলেন । অনন্তদেব মহামণিবিন্ভূতি নাগহার দান করিলেন, এবং অস্ত্রাশ্র দেবগণও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ও নানা প্রকার অলঙ্কার দান করিয়া দেবীকে সন্মানিত করিলেন ।

শূল শ্লাঘিনিস্থবা দদৌ তেষু পিণাকধরক ।

চক্কং দত্তবান্ কৃষ্ণ সমুৎপাদ্য শ্বচক্রতঃ ॥

শঙ্খক বরুণঃ শক্তিং দদৌ তেষু হস্তাশনঃ ।

মাক্তো দত্তবাংস্কাংগং বায়ুপূর্ণ তথৈবধী ॥
বজ্রমিচ্ছঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ ॥
দদৌ তেষু সহস্রাশো ঘটীটমৈবাতপাঞ্জাং ॥
কালদণ্ডাং যমোদণ্ডং পাশকাপুণ্ডিতর্দণ্ডো ॥
প্রজাপতিশ্যামালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুং ॥
সমন্তরোমকূপেণ নিম্ববজ্রমীনাং দিবাকরঃ ॥
কালক দণ্ডবান্ খণ্ডাং তস্ত্রাশ্বচন্দ্র চ নির্মলং ॥
ক্ষীরোদমাগলং হারমজরং চ তথাধরঃ ॥
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলং কটিকানি চ ॥
অর্ঘ্যচক্রং তথা শুভং কেয়ূর্ণান্ সর্ববাহয়ং ॥
নুগুবী বিমলৌ তত্ত্বদ্বৈগ্রবৈবমহমজতমং ॥
অঙ্গুরীকরানি সমস্তানুগ্রহলীচ ॥
বিষকর্ষা দদৌ তেষু পশতগোতিনির্মলং ॥
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যাক দংশনম্ ॥
ই অন্নানপজ্জাং মালাং শিরহ্যায়সি চাপরাম্ ॥
অদদজ্জলবিতং পক্ষমধ্যাতিপোভনম্ ॥
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ ॥
দদাৎ শূলং হরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ ॥
শেষতঃ সর্বনাগেশো মুহূর্মণিবিন্ভূতিম্ ॥
নাগহারং দদৌ তেষু শ্বত্রেণ গৃধ্রীণিমাম্যং ॥
অষ্টৈরপি শ্বট্টৈর্দেবী কুবেরায়ুধৈশ্বখা ॥

(২১০—৩২)

মহিষাসুর দেবিতো পাইল এক মহা ভয়ঙ্করী
দেবীর সেই ছাতি ঘারা জিলোক উজ্জলীকৃত,
পদতলে যেমিনী অবশ্যতঃ, এবং কিরীট ঘারা
আকাশ পরিবাস্তব হইয়াছে, আর তিনি ধন ও
জ্ঞান-শেখর জগৎ সংস্কৃতিত করিয়া সহস্র ভূজ
বিভাগ পূরক দ্বিমণ্ডল পরিবাস্তব করতঃ
অবস্থিত করিতেছেন ।

“তয়া নাদেন যোরেণ কৃৎসমাপুরিতং নভঃ ।

অমায়তানিতমহতা প্রতিশ্রবো মহানকুং ॥

চক্ষুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাচ চক্চিপরে ।

চচাল বহবা চেনুঃ সকলান্ মহাবীরাঃ ॥

(২১০—৩৪)

সদবশ ততো দেবী ব্যাপ্তলোকত্রয়ন্তিয়া ।
পাদ্যাকান্ত্যা নতভূবং কিরীটোপস্থিতাধরাম্ ॥
ক্ষেভিতাশেষপাতালং ধ্বংস্জ্যানিধনেন তাম্ ॥
দিশৌ ভূজদহয়েণ সমস্তাধ্যাপা সংহিতাম্ ॥

(২১০—৩৯)

তখন মহিষাসুর ও তাহার সৈন্যদাঙ্কগণ
কোটি কোটি রথ, বাজী ও গজে পরিবেশিত
হইয়া সেই দেবীর সহিত মহা সংগ্রামে প্রবৃত্ত
হইল । সংগ্রাম সময়ে দেবীর নিবাস হইতে
শত সহস্র প্রমথগণ উৎপন্ন হইল এবং দেবী
প্রদত্ত শক্তি দ্বারা বলবন্ত হইয়া অশ্বরগণের
সহিত রণে প্রবৃত্ত হইল । উভয় পক্ষে যোরা-
তর সংগ্রাম চলিতে লাগিল । কিন্তু কণ
কালো মধ্যো দেবী, অগ্নি যেমন তপুকাটিদি
ভস্মাঙ্গ করে, তেমনি দৈত্যদলের মধ্যেদায়িত্ব
সকলকে বিনাশ করিলেন ।
“কণেন তজ্জাহাঈতমহরাণাং তথাধিকা”
নিজে ক্ষয় যথা বহুবল্লভকামহাচয়ম্ ॥

(২১০)

সৈন্যদলের বিনাশের পর অশ্বর সেনাপতি-
গণ একে একে দেবীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত
হইল । দেবীও কাহাকে শূল, কাগাকে
বাণে, কাহাকে শিলা বা বুকাদি দ্বারা,
কাহাকে গদাঘাতে, কাহাকে ভিন্ধিপাল
প্রহারে, কাহাকে অসির আঘাতে, সংহার
করিলেন ।

তখন যখন মহিষাসুর যুদ্ধে অবতীর হইল ।
সে কোণাঘটিত হইয়া খুবের দ্বারা ভূ-বিদারণ
করতঃ শূন্যদ্বারা অত্যাচ গিরি-নিকরকে
ইতস্ততঃ নিক্ষেপ পূরক উচ্ছাদন করিতে
লাগিল । তৎকালে তাহার ক্রতবগে
জন্মণ নিবন্ধন বহুমতী বিনীর্ণ হইয়া পড়িল ।
মধ্যো মধ্যো সে তাহার লালুঘ্যদ্বারা সমুদ্রকেও
আঘাত করায় সাগরের জলরাশি উল্লিখিত

হইয়া সিকড় সকল প্রাণিত করিল এবং বিদূত
বিষাগ দ্বারা জলদরাশি বিনীর্ণ করিয়া খণ্ড খণ্ড
করিল এবং তাহার নিবাস বায়ুবেগে দরাদর-
চরকে শূন্যমাণ্ডে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে
পাতিত করিতে লাগিল ।

“সোহপি কোপায়াহাবীর্ষাঃ খুবৃক্ষমহীতলঃ ।
শূরাভ্যাং পর্জতাঃছাত্তাশ্চিক্রেণ চ নমার চ ॥
বেগজন্মণবিস্মরা মহী তন্ত বাশীধীত ॥
লালুঘ্যেনাহতশক্তিঃ প্রাবয়ামাস সর্গতঃ ॥
ধৃতশূন্যবিন্ধ্যাশ্রম খণ্ডখণ্ডং ঘর্ঘ্যনাঃ ।
খাণানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুনভসোহচলঃ ॥”

(৩২৫—২৭)

এইরূপে মহিষাসুর সবেগে দেবীর দিকে
আগমন করিল এবং দেবীকে ভীষণ ভাবে
আক্রমণ করিল । তখন দেবী তাহাকে
হত্যা করিতে উদ্ভূত হইলে সে মায়া বলে
যুদ্ধে যুদ্ধে একমুষ্টি হইতে অপর মুষ্টি
পরিগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ।
পরিণামে দেবী তাহাকে নিধন করিলেন ।

আবার একবার শূন্য ও নিম্নস্ত নামে
দুই দৈত্য মগধর্ষে গর্জিত হইয়া বলপূরক
ইন্ডের জিলোকাধিপতা, দেবগণের যজ্ঞভাগ
অগ্রহণ, স্বর্গ, চন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ দেবের
প্রভৃৎ এবং অনিল ও অমলের কাণ্ড অধিকার
করিয়া লইয়া দেবগণকে বর্গ হইতে বিদূরিত
করিয়া দিল । (৫১—৫) সে দেবরাজ

পুরন্দরের নিকট হইতে ঐরাবত নামক
পজরাজ, উটেশ্রবা নামে শ্রেষ্ঠ অশ্ব এবং
পারিষাত বৃক্ষ, হংস-সংযুক্ত পরমরমণীয়
রত্নাধার রত্নবিমান, ধনেশ্বর কুবের-হইতে
মহাপদ্ম এবং বারিনিধি কিশকিনী নামক চিত্র-
অন্নান পক্ষমাল্য, বরুণের স্বর্ষপ্রশ্ব ছত্র,
প্রজাপতি অত্যাংকুঠে রথ, যমের উৎকৃষ্টদা-
নাদী শক্তি, বরুণের পাশ, সমুদ্রের যত

উৎকৃষ্ট রত্ন অনলসেবের অবাধ্য বন্ধ-মৃগল প্রভৃতি দ্বিবিবর্ণের সমস্ত ধন-রত্নই হস্তগত করিয়াছিল। (৫১০-১১)

তখন দেবতাপণ পুনরায় অন্তোচোপায় হইয়া দেবীর শরণাগত হইলেন।

তখন দেবীর শরীর কোষ হইতে এক অসামান্য স্বন্দরী ললনা প্রাঙ্ঘত হইলেন। এবং তাঁহার দেহকান্তিতে দিক সকল সমুদ্রাশিত হইল।

“শ্রীরত্নমিত্যর্শস্যী শোভাস্বামী দিশন্তি য।
সাত্ত্বিত্তিঃ ঐতৈস্তে তাত্ত্বানু ব্রহ্মমুখিত।”
(৫১২)

তাঁহার সেইরূপ শুভনিস্তের চণ্ড-মুণ্ড নামক ভূতাব্য দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে বলিল:—“ঐতৈস্তা রাজ্য সমস্ত ধনরত্ন আপনাদের হস্তগত হইয়াছে, তবে আপনারা কি জ্ঞাত সেই স্বলক্ষণ স্বরূপা স্ত্রীর গ্রহণ করেন নাই?”

“এবং ঐতৈস্তে রত্নানি সমস্তাক্ষতানি তে।
স্রীরত্নমেবা কল্যাণী অম্বা কন্দার পৃথতে।”
(৫১৩)

চণ্ড-মুণ্ডের মূখে এই কথা শুনিয়া শুভ্র এক মহাস্তরকে দূতবরূপে দেবী সমিধান্নে প্রেরণ করিলেন। সে গিয়া দেবীকে বলিল,—“হে দেবী শুভ নামক দৈত্যরাজ সম্প্রতি রৈলোক্যে দ্রব হইয়াছেন। তিনি তোমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে,—‘হে দেবী ত্রিলোক্যের সমস্ত রত্নই আমাদের অধিকার। তাই তোমা হেন স্ত্রীরত্ন আমাদেরই ভোগ্য। অতএব তুমি আমাদেরই আশ্রয় কর।’
“স্ত্রীরত্নভূতাং স্বাং দেবি লোকে মহ্যমহে
ময়ম।
স। স্বমস্বাহুপগচ্ছ যতো ব্রহ্মলোকা বয়ম্।”
(৫১৪)

দেবী তৃতক বলিলেন—“তুমি যা বলিলে সবই সত্য। কিন্তু আমি অল্পবুদ্ধিবশত: পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যিনি আমার সমরে পরাজয় করিতে পারিবেন তিনিই আমার পতি হইবেন। সে প্রতিজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন করি? অতএব আর বলিবে প্রয়োজন কি? মহাসুর শুভই হউন বা নিশুভই হউন এখানে আসিয়া আমার পরাজয় করঃ শীঘ্রই আমার পাণিগ্রহণ করুন।”

সত্যযুক্ত অম্বা নাজ মিথ্যা কিকিৎসাদিতম্।
রৈলোক্যাবিগতিঃ তন্তো নিশুভচাপি তাদৃশ:।
কিঞ্চরং প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তং জিহতে
কথম্।
স্বরত্নামান্নবুদ্ধিত্যাং প্রতিজ্ঞা বা ক্রুতা পুরা।
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দৰ্পং
বাপোহতি।
যো মে প্রতিবলে লোকে স মে ভক্তা
ভবিষ্যতি।

তদাগচ্ছতু শুভোহস্ত নিশুভো বা মহাহরঃ।
মাং জিত্বা ফিকিরেণাজ পানিং পুত্রাত্ম মে লঘু।”
তখন দূত দেবীকে ‘বহ প্রকারে তাঁহার পুষ্টতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া দৈত্যরাজ সমীপে নিবেদন করিলে, দৈত্যরাজ তাঁহার সেনাপতি পুরলোচনকে বলপূর্বক তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেনাপতি যন্ত্রিসহস্র অস্ত্রের সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া অরায় দেবীর নিকট গমন করিয়া দেবীকে বীয প্রভুর ইচ্ছা প্রকাশ করিল। দেবী বলিলেন—“তুমি অহরেক্ষ শুভকর্তৃক প্রেরিত, বিশেষতঃ স্বয়ং মহা বলবান এবং পরাক্রান্ত দৈত্যগণে পরিবেষ্টিত। তুমি যদি বলপূর্বক আমাকে লইয়া যাও তবে আমি আর কি করিব?” (জমশ:)

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি, এল।

বন্ধের উদীয়মান কাব্য-সাহিত্য

এবার আমরা প্রবীণের কথা বলিব না, ছই একজন নবীরের কিছু পরিচয় দিব। বিক্রমপুরের গোবিন্দদাস, চট্টগ্রামের শশাঙ্ক-সেন, কলিকাতার অক্ষয় বসাল, পাবনার ‘নিরদিব-বিজ্ঞান’-লেখক শশুর ইত্যাদি কবিগণ বন্ধের সাহিত্যে এক একটা পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। সে পথগুলি এবার দেখাইতে চাই না। এবার আমাদের কয়েকজন শিশুকবির রচনা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বাঙালীর চিন্তা অমিত্যুর ভবিষ্যতে কোন্ কক্ষে আসিয়া পৌঁছিতে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র দিব মাত্র। নব্য বৈক-কাব্যের এই ধারা ও গতি বুঝাইবার জন্ত ছই এক-জনের কোন কোন রচনার উল্লেখ করিব মাত্র। কোন কবি-বিশেষের নিন্দা বা প্রশংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বরিশালের বালক সতীশচন্দ্র রায় ১৩০০ সালে ২২ বৎসর বয়সে প্রাগজ্ঞাপন করেন। স্বদেশী আন্দোলন তিনি দেখিয়া যান নাই।

এই শিশুর স্বপ্ন শুনাইতেছি। ১৩০২ সালের ২ই বৈশাখের ভায়েবীতে লিখিত আছে—“এক দিন গাইব। সেই সপ্নে সমস্ত জীবনের গান একদিন গাইব।

এখনো অনেক মিথ্যাকল্প দূর করিতে হইবে। সমস্ত বদশেক, অগুণৎ ভাল করিয়া দেখিতে হইবে,—এখনো প্রাপক শাস্ত হইতে শাস্ত, নিবিড়-জীম হইতে নিবিড়-জীম করিতে হইবে। এখনো আলস্ত পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চাৎকণশক্তিকে হুম্বাঙ্কিত করিতে হইবে। কবিতা-রচনার মত নিবিড় বাধা—আমি কোন দিন ধরিতে পারিব না? জানি না—

কিন্তু আজ অস্বস্ত: এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি যে, একটা ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটি শাস্ত-স্বন্দর গদ্যধারা বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমরা। ঐ ধারা কল্পনা-সৌন্দর্য এবং বিলাসের আক্রমে বড় এবং বিচিত্র নিবিড় কিন্তু বেরদায় স্বগভীর না হইতেও পারে। আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণ-শীল এই তেজস্বী কল্পনামুগ্ধিগুলি কবে বাহির হইবে?—আমি essentially Indian—ভারতের রস আমার প্রাণে বসিয়াছে।”

ইহার নাম সাহিত্যে সাধনা। ইহার সিদ্ধি কোথায় হইত অসম্ভব, করিতে পারি; কিন্তু লাভ নাই। ‘Paradise Lost’ লিখিবার পূর্বে মিটন এইরূপ শিক্ষা, চরিত্র-দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করিতেছিলেন।

সতীশচন্দ্র কতকগুলি সাহিত্য-সমালোচনা রথিয়া গিয়াছেন—সেগুলি বহুসাহিত্যে অনুর হইবে। তিনি যে বয়সে ইংরাজ-সমালোচকগণের প্রদর্শিত পথে ব্রাউনিংয়ের ছই তিনটি কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত—কোন প্রৌঢ় বাঙালীর ক্ষমতায় স্থলায় নাই। ভারতবর্ষে Browning এর কবিতাবলী এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্ভীক হইয়া নাই। এজন্য এখনো এদেশে ব্রাউনিংয়ের পশার জন্মে নাই! সতীশচন্দ্র বি, এ; পড়িতে পড়িতেই ব্রাউনিং বুদ্ধিতে-ছিলেন। ইহাও বলে প্রতিভা।

সতীশচন্দ্রকে বরীজন্য আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন। বোলপুরের ‘অভিভূতচক্রবর্তী’ মহাশয় তাঁহার রচনাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। এই কাঁপা, আদর্শহীন,

চিন্তাহীন, বাগাড়ম্বরপূর্ণ কবিতারামির দিনে সতীশচন্দ্রের গভীরতা, গাভীরা, ওজস্বিতা ও ভাবুকেরা উদীয়মান লেখকসম্প্রদায়কে সাধনার প্রণালী দেখাইয়া দিবে। বোধ হয় সতীশচন্দ্র তোমাদের নিকট করুণ, নীরস, স্রষ্টিকঠোর বোধ হইবে, কিন্তু ছন্দোপাও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রাণময়ী কবিতার মধ্যে পাইবে “জীবন, জীবন ভাই, আনন্দ জীবন।” সতীশচন্দ্র পালেগান— বিতীর্ণিকার সঙ্গে, হৃৎকের সঙ্গে যন্ত্রন করিতেছেন। তিনি দৃঢ়পদে জীবন-সমুদ্র-মস্তনে ব্যাপ্ত। সতীশ মাহু, মেঘস্থলভ ছন্দলতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।

“রৌদ্র-সুগ কবির চিহ্ন” বঙ্গদায় নব যুগ আনিতেছিল—উগীরতার যুগ, বিপুলতার যুগ, Sublimity যুগ, সবলতার যুগ, স্বার্থ ক্রমতার যুগ, জীবনের যুগ।

“মনে পড়ে সে বালক? রুহং সে প্রাণ ধরতীর গুণার্ণবের ঘন এক ধান—
বিপুল স্রবের সমুদ্রে সে যে বাড়িছে?
চৌদিকে প্রকৃতি তার হাজ প্রাণরিজে
আনন্দ জরুটিমুক্ত, উপর নবীন।
মহিল লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গর রাধি তরুণায়ে, তরুণল গুহে,
সমুদ্র নয়ন, মাথা হস্তে পুষে,
রৌদ্র করে অহভব, সিদ্ধ অহভব,
স্বপ্ন স্পৃহ প্রাণে প্রতি বিন্দু অহভব।

কত কিরিসাম,—
কোথা লোক? প্রাণ দায় মুক্ত? পৃথিবীর
সর্ব ছাপ পড়ে বেধা? লম্বু কি গভীর—
প্রতি কণ গড় জীবের রক্ত এক কবি?
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি?

দৃঢ়-বাহু ওই জেলে ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহস্র, বহু কলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্যমুখে কল্যাপ্ত ফেলে কঞ্চাল—
“নিশ্চয় উদ্ভিবে মংগল”—ঐচ্ছিক-দৃঢ় ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি যোের ভাল বাসে
—তা’ নলে কি জলে পড়ি ওইরূপে হাসে?
—জীবন, জীবন ভাই। আনন্দ জীবন।

এ কলিকাতায়

দিগ্ভাইয়া পরাবের সমুদ্র-বেলায়
দিহ ছুঁড়ি পরাণ। ওগো, কবিরূপণ,
তোমরা ব্যথিয়া লও কি এ জলপান।

অকালে পরলোকগত প্রতিভাবান কবির কথা উঠিলে বিনাতী কীটসের নাম মনে পড়ে। কিন্তু বাউনিয়-স্থলভ এ ক্ষমতা সৌন্দর্যোপাসক কীটসের বেশী আছে কি? সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে এ উদাত্তদ্বীভ কতবার উদ্ভিজ্জে, এ যে-রিকোনেন্ডের “নাচুক সেখানে শ্রামা” গাভিয়ার জন্ত বিপুল অথচ সবল আয়োজন। আমরা ইহার ক্রমবিকাশ বুঝিবার জন্ত অজ্ঞাত অপ্রকাশিত কবিতাগুলি দেখিতে পাইলে স্বপ্নী হইতাম। অজিত বাবু “সে গুলির কোনটাই তেমন আকার প্রাপ্ত হইয়া উঠে নাই” বলিয়া চাণিয়া রাখিয়াছেন।

সতীশচন্দ্রের ‘ভ্রামরধরা’, ‘চণ্ডালী’, ‘হৃৎ-দেবতার মৃতি’, ‘ভগ্ননগরে প্রেম-সন্মিলন’, ‘ভগ্ন-বাড়ির দেবতা’, ‘আত্মকালকার স্বরা ফুল’ ‘ফুলের ফসল’ ‘বিষদল’ ‘একতার’ ‘দেবা’ ‘দেবা’ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কবিতাবলীর নামগুলিতেই আকাশ-পাতাল পার্শ্বক। সতীশচন্দ্র একটা নুতন রাস্য গড়িতেছিলেন— তাঁহার রচিত কাব্য-প্রাঙ্গণের অন্দরমহলে

প্রবেশ করিবার অবিচার তাঁহার সমসাময়িক-গণ অর্জনে বরিতে পারেন নাই।

কল্পণাবিধান—সত্যাত্ম দত্ত—কুমুদগুণ—
কুমুদগুণ—সত্যাত্ম বাগুড়ি প্রকৃতি কবিরূপ
অন্তর্জগৎ, প্রকৃতির ভিতরকার কথা,
মানবের ভিতরকার কথা, জীবনের গূঢ় রহস্য
এ সব বিশ্লেষণ করিতে পারেন না। তাঁহার
রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বার পৃষ্ঠান্ত পৌছিতে
পারেন—ভাষার কল্পিত, স্বল্পমাত্র নিয়ন্ত্রণের
intellectual gymnastics, কলাচাতুর্য,
শিল্পনৈপুণ্য, চামড়ার চোখ-কান, বাহিরের
আবরণ ইত্যাদি নইয়াই তাঁহার ব্যস্ত।
সতীশচন্দ্রের গাভীরা ও sublimity লাভ
করা ত দুয়ের কথা—ইহার তাঁহার সমসাময়িক
এখনও পান নাই।

কল্পণাবিধানের নবপ্রকাশিত “শান্তির্জনে”
এই উদীয়মান কবিগণের ক্ষমতার দোঁড় ও
সীমা দেখাইতেছি। কবি তাজমল
দেখিতেছেন—বিশ্বসঙ্গারকে, মানবজগৎকে,
প্রকৃতিকে ইংরাজ সপসই এই স্থলত্যাগেই
দেখিয়া থাকেন—

“আসিয়াছি আজি প্রবাসী পাখ
হেরিতে কান্তি রাশি—
বসিয়া তোমায় অলিন্দতলে
হেরিব রিসল হাসি।

বিস্রাষ্ট ছুঁপ-সোপান বাহিয়া
যমুনায় তুমি আসিতে নামিয়া,
কি স্বর ধরিতে, মুকুতা তরিতে—
সদীরা বাঙ্গালা বানী,

কত না আবার প্রেমের পেহালা
আবেক করিয়া গানি,
মল্লী মুকুল—
তুল্য তোমার
অপরে দিত কে ঢালি?

রাধিয়া উঠিত ফুল কপোল,
চুপন-রাগে বিবোল বিভোল,
আনার আদুর রসে-পরিপূর
মোহ-উপহার ডালি।”

ইহার সঙ্গে rugged বা ক্রটি-ভিত্তিক কিন্তু
গাভীরাগম্য সতীশচন্দ্রের “বামুন শূর তফাৎ”—
ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, ‘প্রেরণায়’। অথচ এই
খানেই আমাদের নব্য কবিরূপের generic
style বা সাধারণ রচনা-কৌশল। ইংরেজের
প্রায় সকলের মধ্যেই টেনিসগনের স্বভাব
পাইবে—শব্দগুপ্ত পাইবে—অর্থপাসের
ছড়াছড়ি পাইবে—হুলিলত লিপিভণ্ডী পাইবে
—বাক্যজাল পাইবে—ভাব-দারিদ্র্য ঢাকিবার
জন্ত সহজ-সরল অথবা কঠ-কল্পনা-প্রসূত ভাষার
ছটা এবং ছন্দুর ঘরমা পাইবে। পাইবে না
কেবল গুয়ার্টস্‌গ্‌হাথের নবজীবন—“she
gave me eyes, she gave me ears।”
পাইবে না হিন্দুর অন্তর্দৃষ্টি, স্বয়ম্ভিচার,
গভীর চিন্তাশক্তি। পাইবে না—

“আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসিছে বাসবদত্ত।”

—দেই situation বা দেশ-কাল-পাত্র স্থিতি
করিবার যোগ্যতা। পাইবে না রবীন্দ্রনাথের
গভীরতর শিল্পনৈপুণ্য, স্বভাবের আর্ট—যাহার
চাপে মানবাত্মা এবং প্রকৃতি-স্বন্দর লুপ্ত ও
হতপ্রভ হয় না—বরং যে কলাচাতুর্যের
সাহায্যে বিশ্বের জীবন-স্পন্দনই পাইবে না
আমরা প্রত্যক্ষরূপে অহভব করিতে পারি।
জগৎকে বুঝিবার ক্ষমতা, ভিতরকার কথা
টানিয়া বাহির করিবার প্রয়াস। পাইবে না
সতীশচন্দ্রের “ছায়াহা গর্ভসমুদ্র”—কবিতা
নিবন্ধ স্বার্থক কল্পনামাশি। পাইবে না
বাউনিয়—

The other side, the novel
Silent silver lights and darks
undreamed
Where I hush and bless
myself with silence."

একবার নীরব হইতে শিখ, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে শিখ, সাধনা করিতে শিখ—তবে জগৎকে শিখাইতে পারিবে—তোমাদের রচনাগুলি টিকিয়া যাইবে—বন্ধুর-পাঠ এবং শ্রুতিকণ্ঠের হইলেও অমর হইতে পারিবে।

'বিষমল'র শেষ কবিতায় শ্রীমুকু কুমুদনাথ লাহিড়ী এই নীরব সাধনার কথা তুলিয়াছেন—

"চুপ কর—শান্ত ঘোর গতিবিধি আজ।
আলোক-বাতাস-বস্তা ছুটে চলি যায়,

পিয়ে লব তরুণম পাতায় পাতায়,
কোথা গুপ্ত ঘরে রস-পাতালের মাক,
পাঠায়ে শিকড় তারে লইব ভবিয়া!

কৃষ্ণে স্বপ্নমা মাধি, শেষে একদিন
স্মৃতিয়া রহিব চেয়ে বিরাম বিহীন।

সহসা, কে জানে, অলি কেমনে আসিয়া
গোপনে পরাগ ঢালি গর্ভকোষে ঘোর

কলসের জ্বনম দেবে। সেদিন স্থলিন,
লীপাণিবে জীবন ঘোর সফল নবীন,

ব্যাপিবে সারাটা দেহে পুলকের ঘোর।"

কুমুদ লাহিড়ী বেশী কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 'বিষমল' হইতে বাঙ্গালী দশ বিশ লাইন অন্তর্গত কথ্য পাইবে মাত্র। 'ভূমি', 'পদ্মা', 'স্বাস্থ্য', 'তত্ত্ব' প্রভৃতি কবিতায় গান্ধীজীর পরিচয় আছে—একটা নৃতন স্বর উঠিতেছে। কিন্তু অত অহমসন্ধান করিয়া কে পাঠ করিতে বসিবে?

ককণা-নিধানও 'চতৌদাস' এই নীরবতা, অপ্রগতিত্বতা এবং তন্ময়তার কথাই হইতে পাইয়াছেন—

"বারটি বছর * চেয়েছিল কত
কহ নি একটি কথা,

রবিত তোমার * অধির পাতায়
স্বরণ-নির্মলতা!

এমনি করিয়া * স্মৃতিত দিন,
তোমার হিয়ার মাখে

কেহ জানিত না * রসমুচ্ছনা;
স্বধার রাগিণী বাজে।"

এই 'কেহ জানিত না'-অবস্থা হইতেই পাণ্ডুর্যের, গভীরতার, ব্যাকুলতার উদ্ভব হয়। এই 'কেহ জানিত না'-অবস্থা আমাদের কবিকুলের বড় অঙ্গ। তাঁহার নিজে মজিবাব পূর্বেই অজ্ঞকে কিছু দিতে চাহিতেছেন!

তোমরা, অমর হইতে চাহ? তাহা
হইলে মরজগতের ক্ষুদ্র তুলিয়া যাও,
নিজকে তুলিয়া যাও, নিজকে তুলাইয়া ফেল;
আত্মহারা তন্ময় হইয়া পড়, নিজের বাহা

সত্য সত্যই দিবার আছে দিয়া যাও, পাণ্ডার
কথা ভাবিও না। * কুর্ন্তব্য করিয়া চল,

দেখিবে সমগ্র ভারত অমর হইবে। ভারতের
অমরতার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি আমি, রামা

শ্যামা, মুচি ম্যাদর, কলী মন্ডর, আমাদের
দাঁড়কা কয়দু, প্রতি মূলিকণা—সবই অমরতা

লাভ করিবে। ভবিষ্য সমাজ অতীতের
নীরব সরব সকলকেই টানিয়া বাহির করিবে

—জননী কাহাকেই তুলিয়া থাকিবেন না—
যাহা যতটুকু প্রাণ্য ততটুকু তাহাকে

দিবেন। এ বিধাঙ্গ তোমার দ্বয়ে নাই?
তবে রথাই ভূমি কবি সান্নিধ্য!

চোপ মূলিয়া স্বগতের অবস্থা দেখিতে চেষ্টা
করিলে বুঝিবে—আজকাল রবীন্দ্রনাথ বিশেষে

যে পূজা পাইতেছেন তাহার প্রধানতম
কারণ যিহে ভারতের গৌরবপ্রচার। ভারত

মহাশোভা পান্ডিত্য জগতে রবীন্দ্রস্বর্ধনা
করিলে বুঝিবে—আজকাল রবীন্দ্রনাথ বিশেষে

যে পূজা পাইতেছেন তাহার প্রধানতম
কারণ যিহে ভারতের গৌরবপ্রচার। ভারত

মহাশোভা পান্ডিত্য জগতে রবীন্দ্রস্বর্ধনা
করিলে বুঝিবে—আজকাল রবীন্দ্রনাথ বিশেষে

ঘটিয়াছে। ভারতের গৌরবও প্রভাব পূর্ণ
হইতেই পান্ডিত্যের অমৃতত্ব করিতেছেন।
এইজন্মে তাহার আজ রবীন্দ্র-প্রতিভাকে
সম্মান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। সেইরূপ
ভারত-মহাশোভা তোমাদেরও কীর্তি
উত্তরাবতার বাড়িতে থাকিবে।

* সত্যোজ্ঞনাথের "আমরা বাঙ্গালী সাত-
কোটি ভাই বাস কর সেই বাসে"-কবিতাটি
অমর হইবে। এখনই ইহা দ্বিজেন্দ্রলালের
'আমার দেশের' সমকক্ষ—ভবিষ্যৎ সমা-
লোচনায় আরও উন্নত হইবে। বঙ্গের
'বন্দ-মাতরং' জগতের ভক্তি-মাহাত্ম্য সর্বশ্রেষ্ঠ

সম্পদ। তাহার সঙ্গে তুলনা কোন রচনারই
চলিতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গের

জাতীয় স্বদীপ্তে যে নৃতন শক্তির দ্বারা প্রবাহিত
করিয়াছেন তাহারই জন্মবিকাশ সত্যোজ্ঞ-

নাথের এই গানে বেধিতে পাইতেছি।

সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া স্বন্দর চিত্র
আঁকিতে সত্যোজ্ঞনাথ দক্ষ। তাহার

অশ্রুধারা-কবিতাগুলিও অতি মনোরম। এ
গুলি বঙ্গসাহিত্যের ত্রৈলোক্য ও ত্রৈলোক্য বৃদ্ধি

করিয়াছে। আমরা সত্যোজ্ঞনাথকে একটা
'বরাত' দিতেছি। তিনি আমাদের সাহিত্যে

দরিদ্রের জন্ম—অশিক্ষিতের আত্মদান—
জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা—মৎস্যবলের বাণী—

ভুলিতে আরম্ভ করুন। সাময়িক ঘটনা
অবলম্বনে ইহা সত্ত্ব—ক্লান্ত ক্ষুদ্র চিত্র

আমাদের দ্বারা ইহা সহজেই সাধিত হইবে।
আমাদের প্রাচীন ইতিহাসও আধুনিক

ঐতিহাসিক অহমসন্ধানগুলি আলোচনা করিলে
বড় দেশ কাল পাজ পাইবেন। নিগাতী

বারমুদ, চ্যাটারটন, অসিয়ান, জাফান হার্ডার,
এবং কৃষ্ণকমলিনের হস্তধরিলে বঙ্গসাহিত্যে

একটা অপূর্ণ জগৎ আনিয়া ফেলিতে

পারিবেন। সে ক্ষমতা তাহার আছে
দেখিয়াছি।

এই নৃতন জগতে—
"নেতা তাদের তরুর মত শুষ্ক দৃঢ় স্থংখলিং,

নিজের মাথা বজ্র ধরেন, বিজয় তাহার
হুনিশিত।

* * * * *

হৃদ হ'ল নৃতন নাট্য হৃদয়ের নৃতন নাট,
সাগর পারে গাঙ্গী করে জাতীয়তার নান্দী

পাঠ।"

* * * * *

"ধর্ম-আচার করছে তারা যাচ্ছে জেলে
সতীকই,

বিনা অস্ত্রে করছে যুদ্ধ, কথুবে তাদের অস্ত্রে
কি?"

আমরা অনেকবার বলিয়াছি এটা, আমাদের
নবজীবনের দ্বিতীয় যুগ চলিতেছে। তাহার

এক লক্ষণ "জন সাধারণের" অত্যাচার।
সত্যোজ্ঞ নাথ এই "জনসাধারণের যুগের" কবি

হইতে পারিবেন। দরিদ্রের সংসারে সত্যোজ্ঞ
নাথ বিচরণ করিতে পাবেন। দারিদ্র্যের

মহানাদ গঠনোপযোগী "নান্দী" তিনি রচনা
করিয়াছেন:—

"নির্ধিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাটিদের
অত্যাচারে

স্থান হারায়ে মান হারায়ে প্রবালী আজ
সাগর পারে,

কেউ বা করে দিন মজুরী, কেউ বা
ক্ষুদ্র লোকান দার,

তাদের শ্রমে শ্রামল আজি মজুরী
আদ্রিকার।

১
রবার-গাছের ছায়ায় তাদের পঞ্চায়তের
হয় জনতা,

বো-বাব গাছের তলায় ব'সে রামায়ণের
কথকতা।

মূল্য বাজে, সারং বাজে, মাদল বাজে,
—মন্দির,
ভারত-স্বপন জাগায় সেবা পূরবাসের বন্দীরা।
আজকে তাদের বড় সারং মাদল মূল্য

মেনে হাঙ্গ! !

সবাই যদি মনে কর তো আবার তারা

সাহস পায়ে,

সবাই যদি মনে কর তো চেষ্টা তাদের

হয় সফল,

দেশের হুনাম বজায় রাখে উকীল-কুলী-

বেনের দল।

অপমানের একো আঙ্গি এক হয়েছে

ভারত-প্রজা।

হিন্দু মুসলমানের মিলন অসম্ভব হচ্ছে

সোজা।"

কল্পনাধীন ভারতবর্ষের বিচিত্র স্থান-
গুলিকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।
তাঁহার শিল্পে আমাদের ঐতিহাসিক ও ধর্ম-
গুরু প্রধান স্থান পাইয়া থাকে। বাদ্যলীকে
মাতাঈবার পক্ষে এই আলোচনাই বিশেষ
কায়িকারী। কল্পনাধীন আমাদের জাতীয়-
জীবন গঠনপযোগী দুইটি সর্বোচ্চ শক্তি

বাছিয়া লইয়াছেন। তিনি অতীতকে কথা
কহাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, এবং আমাদের
আধ্যাত্মিক জীবনকে কবিতায় প্রকাশ
করিবার ভার লইয়াছেন।

কিন্তু দেশের মাটিটাকে আর একটু
ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভাবে বুঝতে
চেষ্টা করুন। তাহা না হইলে রচনাগুলি
মরমে পশিতেছে না। কেবলমাত্র হিন্দুর
পরিচয় জনপদসমূহের আলোচনা করিলেই
হিন্দু বুঝান হইল না। হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম ও
দর্শনের কয়েকটা পারিভাষিক শব্দ ছড়াইতে
আনিলেই হিন্দুর বাণী প্রচারিত করা হয় না।

বাগ্মি মহাশয়ের একটা স্বাভাবিকতা,
সরলতা আছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি
নব্যকবিগণ সকলেই বাগ্ম প্রকৃতির মানুষ
লইয়া-নাড়াচাড়া করেন। ভাব অতি অল্প-
মাত্র—ইহাদের বলিবার কথা বড় বেশী
নাই—কেবল আট-কলান—কথা কাটাকাটি।
এক কথাই, সত্যোক্ত-যতীন-কল্পনাধীন
‘খাড়া খোরবড়ী’ ‘খোরবড়ী খাড়া’ ‘বড়ী
খাড়া খোর’ রূপে প্রকাশ করিতেছেন।
এই শ্রেণীর কবিতাগুলির নীচে যদি
লেখকের নাম প্রকাশিত না থাকে তাহা হইলে
অনেক সময় যতীন, সত্যোক্ত, কল্পনাধীন
ইত্যাদি প্রভেদ করা অসম্ভব। বোধ হয়
কাল-হিসাবে কল্পনাধীন এই যুবকদের
প্রবর্তক।

‘একতার’ লেখক কুসুম মল্লিককে
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি :—“একতাগ্ৰাস্তে
একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা।”

‘উজানীতে’ আপনানু ‘তার’। বাদ্যলায়
অনেক উজানী আছে—সেগুলিকে কাব্যে
চিত্রিত করুন। রাধাপাল, রামাবতী, রাম-
কেলী, কেশববিধ, বিক্রমপুর, সমগ্রায়,
কামাখ্যা, শ্রীহট্ট ইত্যাদি অসংখ্য ঐতিহাসিক
ও আধ্যাত্মিক তীর্থক্ষেত্র বঙ্গের ভাবুকের
আধারন করিতেছে। আমরা দেখিয়াছি, কুসুম-
রঞ্জন পল্লীর “মুক মুখে ভাষা দিতে” প্যারেন।
আমাদের বিশ্বাস—তিনি ধর্মভাবে বাণীপূজার
অগ্রদূত হইলে দশবৎসর পরে পল্লীরাগীর
ভয়রূপে আশা পানিয়া তুলিতে পারিবেন।

মারের মাঝে শুনিতে পাই—এটা “রবীন্দ্র-
সাহিত্যের যুগ”। মিথ্যা কথা। রবীন্দ্র-
প্রতিভার মূল হুজ কোন উদীয়মান লেখকের
ধরিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ “ভাবুকতা”র
প্রতিমূর্তি। ভাবুকতা কাহাকে বলে গত

সংখ্যায় তাহার আলোচনা করিয়াছি।
আমাদের এই শিশু কবিগণের মধ্যে সে
ভাবুকতা একেবারেই নাই বলিলে ইহাদিগকে
নিভাস্তই নিশা করা হইবে না, কারণ সে
ভাবুকতার ‘অধিকারী’ হওয়া ভগবৎপূজা-
পাশে। আমাদের প্রধান দুঃখ এই যে,
দেশে সাধারণ ধর্মের অভাবশক্তি এবং ভাবেরই
যৎপরোনাস্তি চিত্রা পড়িয়াছে—সংসার-
ভাবুকতার দৃষ্টিতে তা লগিবেই। আমাদের
কবিগণের অন্তর্জগৎ বড়ই অন্তঃসারশূন্য—
বড়ই দরিদ্র, “বড়, ক্ষুদ্র, বড়, অন্ধকার।”
রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে আমরা
খ্রিষ্ট বৎসরের ভিতর পাইব কিনা জানি না।

ভাবের এত দৈর্ঘ্য আসিল কোথা হইতে?
যুবক বাঙ্গালার আজ মহলে ভাবের ত-
অভাব দেখি না—বরং যথার্থ ভাবুকতা
যথেষ্ট দেখিতে পাই। কেবল কবি-মহলে
ভাবের দৈর্ঘ্য আসিল কোথা হইতে?

সতীশচন্দ্রের জায় “ইহাদের সন্ধান না
বলিয়া—অথবা সতীশচন্দ্রের জায় ইহার।
“বর্গ হতে বিধাতার চরি” লইয়া নৈসর্গিক
প্রতিভা লইয়া জ্ঞান নহে বলিয়া।

এই কবিতুল ভাব-সাগরে ডুবিতে পারেন
না, ভাব স্থগিত করিতে পারেন না। নিজে
তরঙ্গ হইতে জানেন না—অতীত মজাইতে
পারেন না। ইহার সাধারণতঃ দুই একটা
ভাব এখানে ওখানে হইতে—দুই চারি পাতা
ইংরাজী কাব্য, দুই চারিখানা রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র
বাঁটিয়া সংগ্রহ করেন মাত্র। সেই দুই একটা
পরকীয় ভাব নিজের কথায় নানা ঘটনার
সাথোযো ফলাইতে যাইয়া শব্দের আচ্ছন্ন
এবং ভাষার কচ্ছন্ন করা হইয়া থাকে।
কেবল মাত্র যে স্থলে সাময়িক ঘটনা, অথবা
একটা পরীচিহ্ন, অথবা কোন ঐতিহাসিক

স্থান বর্ণনা করিতে হয়, সেখানে কবি-
কমতা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু বেশী কিছু
শিথিলে পাই না—আমরা মাতিয়া উঠি না।
এখনও ইহাদের শব্দ “message” বা বাণী
কিছুই পাই নাই।

আমরা এখনও শিল্পের আসরে, কাব্যের
আসরে, সমালোচনার আসরে, ইতিহাস-
লোচনার আসরে সর্বত্রই “পরমুখে বাস”
পাইতেছি। পরাক্রমের যুগ এখনও আকরা
পূর্ণরূপে কাটিয়া উঠিতে পারি নাই।
এছাড়া স্থগিত করার শক্তিও বাড়িতেছে না—
রসাদানদের ক্ষমতাও বাড়িতেছে না।
চট্টগ্রামের কবি পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী সরল সহজ
প্রণেতার কথায় আমাদের এই পরনির্ভরতা
দেখাইয়া দিয়াছেন। “তাঁহার ‘মন্দির’ পাঠ
করুন।

“শরীর না হেরি মাঝে, দেখি আঁহা
বাদ্যলীর প্রাণ মজে।
পর মুখে সবে শুধু কাল যায়
নিজে কিছু নাহি বুঝে।
গবেশ পুণ্ডিত লিখেছে ভূমিকা
তাই ভাল বলি ধানি।
প্রশিক্ষ লেখক ছাত্ত বাবু মুখে
শুনিয়ে প্রশংসা বাণী।
সপ্তাহে মাসিক পাশ্চিকে দৈনিক
হইতেছে তোলাপাড়।
কান আলা পাল হুজগেতে আঁহা
অসংখ্য গ্রাহক তার।

হৃদয় বাঁধানো লেখা স্বর্ণাক্ষরে
রূপে ঝক ঝক করে।
এত প্রলোভন দৈবর রাবিতো
পাঠক কত কি পারে?
সম্পাদক কিবা সমালোচকেরা
কোথেকে হলে ভাই।

মাতুল খসর শালা শালিপতি
সম্বন্ধীয় কথা নাই।

ডালি ভেটা কিবা কিছু দক্ষিণাঙ্ক
করিতে যে জনপারে।

সাহিত্য আসরে তার নাম আশা
উঠে জয় করে।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ণ ও পশ্চিম
লেখকেকে ভাগ আছে।

কাঞ্চিক্ষেত্রে আশা দেখে যেখানে
নব্য বাঙ্গালীর কাছে।

বিচারি না দেখে লেখার ভিতর
কিবা ভাব কিবা রস।

আড়থরে আশা তুলি যায় সবে
বিজ্ঞাপনী দেখি বশ।

হেন স্থপতিত আছে বহু জন
বহি থানা নাহি পড়ি।

মতামত তার করিছে প্রকাশ
প্রণেতার নাম হেরি।

কুবেরের নামে উৎসর্গ দেখিয়া
পাঠক তুলিয়া যায়।

হায় আধুনিক বঙ্গীয় পাঠক
পর মুখে বাল যায়।

কথাগুলি বড় তীত্র—কিন্তু বড় মধুর।
ইহা মঞ্চস্থলের বাণী—এই জুড়ই ত্রৈত সরস,
সজীব, স্বাভাবিক, স্বাধীন। পূর্ণচন্দ্রের
কবিতায় আত্মরিকতা, সহনমত। অতীত
বেথিয়াও পুলকিত হইয়াছি। পূর্ণচন্দ্র এ পথে
চলিতে পারিলে সমাজে ও সাহিত্যে সংস্কার
সাধিত হইবে।

বন্ধ ইহা উন্নতির যুগ চলিয়াছে।
উদীয়মান বঙ্গসমাজ আমরণিকে প্রকৃত ধর্ম-
জীবন দেখাইতেছে—নূতন কর্মের প্রণালী,
অভিনব চিন্তার প্রণালী, স্বার্থ সাধনার
প্রণালী দেখাইতেছে। বাঙ্গালার সর্বত্র

আমরা সাহিত্য সাদক, গল্পীসেবক, শিক্ষা-
প্রচারক, মানব সেবক, কর্মবীর ও ধর্ম
প্রচারকের আত্মদয় দেখিতেছি। অজ্ঞেয়
যোগে—সামোদের বজায় আমরা ছেই
নবীন শক্তির পরিচয় দিয়াছি। এই সর্বমুখ
উন্নতির কালে সাহিত্যের কাব্য-বিভাগই কি
সকলের পক্ষেতে পড়িয়া রহিলে? নব্যবঙ্গের
কাব্য-সাহিত্য কি বাঙ্গালা দেশকে নূতন
কোন বহুই উপহার দিলে না? কোন
mission, কোন ধর্ম, কোন বাণীকে জনদের
অন্তর্ধানী না করিয়াই কি ইহার জয়
হইয়াছে?

হে নবীন কবি-সম্প্রদায়, তোমরা কি
মস্তিষ্ক উত্তীর্ণে না? তোমরা কি বলিতে
শিখিলে না?

“আমি জগৎ প্রাণিয়া বেড়াব গাহিয়া

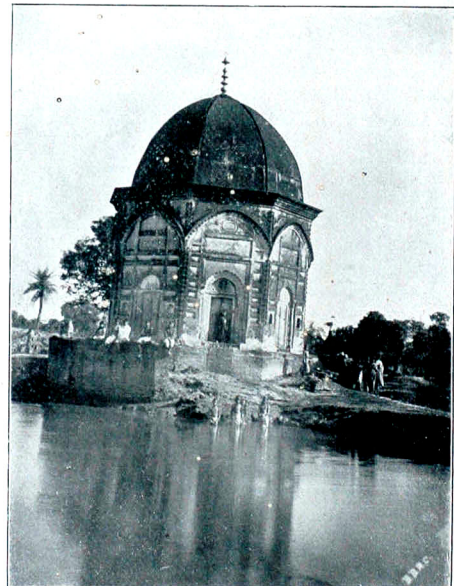
আজুল পাগল পারা।”

তোমাদেরই গোচরিত একজনের কথায়
বলিতেছি—

“চাহ, চাহ মতিমান,
দেখ দেখি বিশাল জগতে,
মানবের কর্মধারা
কত দিকে আবর্তিয়া যায়।
কত সাধ কত আশা
জেগে ওঠে সাহিত্যে কল্যাণ।
মাছুয়ের শক্তি লয়ে
কীট সম বার্থ কর তারে?”

স্বতরা—“তুলে যাও বর্তমানে,
ভেঙ্গে ফেল জড়তা-শিকল
দূর ভবিষ্যতে চাহি।
ভাসে ধরা আলোক-বজ্রায়—
হুয়াবে পাখীর মত,
আজি তোমা ডাকি প্রাণ পথে
বাহির হবে না ভূমি?”

কলিগ্রামের শিবমন্দির



উদীয়মান কাব্য-সাহিত্যে ভাষা-বৈভবের উল্লেখ করিলাম—ভাব-বৈভবের কথাও বলিলাম। এখন কাব্যে আলাচিত বিষয়ের কথা কিছু বলি। এদিকে একটা লাভই হইয়াছে—আমাদের সাহিত্য-সম্পদ বাড়িতেছে। বাংলাদেশে আমাদের কাব্যে স্থায়ী হইয়া বাইতেছে।

ভারতের নব-নবী, বন-উপবন, পল্লী-নগর, এবং নরনারী, গাঁড়োয়ান জেলে মাঝি মাঝির মজুরের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিশেষতঃ কৰ্ণধানিদানের কাব্যে হিন্দুধর্মের চিত্র উজ্জ্বল হইতেছে। ঢাকার 'প্রতিভা'য় দেখিলাম শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র কুশারীর 'পল্লী'-নামক কবিতা-গ্রন্থে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এইরূপে বাস্তব সমাজ-সংসারের অলিগলি খুঁটিনাটি আমাদের চিত্তের সামগ্রী হইতে চলিয়াছে। সাহিত্য-সম্মিলন, নৈশ-শ্রমজীবী-শিক্ষালয়, ঐতিহাসিক অ-সন্ধান, বৈয়াকরণ-সংগ্রহ, 'জাতীয় শিক্ষা', হিন্দু-মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়, পল্লীসেবা, 'দরিদ্র-নারায়ণ'র পূজা, জনশ্রুতি-প্রবাস-ব্রতকথা-ভাটিয়াল গান-সংগ্রহ, ভারতীয় সমুদ্র-বাণিজ্য-ও জাহাজ-তত্ত্ব এবং চিত্রকলা, রসায়ন, আকর-বিজ্ঞান, ও উদ্ভিদ-তত্ত্ব, 'চাকমা জাতির ইতিহাস', 'আধার গল্পীরা' এবং 'গোড়রাজ-

মালা'র যুগে বঙ্গ-কাব্যের এই মুষ্টি নিত্যই বাতাবিক।

ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসের নবাবিস্কৃত অনেক দৃশ্য ও ঘটনা কাব্যে এবং শিল্পে চিত্রিত হইবার যোগ্য ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। উদীয়মান কবি ও চিত্রকরগণ, কেসাবপাঠ রদ্ব কর, পরাঙ্করণ পরাঙ্করণ বিদ্যার দাও, দেশের মাটির সঙ্গে গভীরতর আত্মীয়তা স্থাপন কর। দেশমাতার নিকট জন্মের সহিত কাঁদিয়া বলিতে শিখঃ—

“ও গো মা মৃদুয়ি

তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই।

• • • • •

আমারে স্মিয়ায়ে লহ
সেই সর্বমাত্মে; যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুকুরিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে।”

ভাবের জ্ঞান আর ভাবিতে হইবে না,—
ভাবুকতার ছর্ভিক ঘূচিয়া যাইবে। ভারত-
আর উৎস হইতে ভাবের বহা ছুটিবে—এই
সরস সজীব ভাবপুঞ্জ আবার নিজেই তাহার
বিচিত্র ভাষা গড়িয়া লইবে। তখন প্রয়োজন
হইলে তোমরা সতীশচন্দ্রের ব্যাকুল আত্মার
স্বায়-আবেষ্টনকে কাটিয়া ছিড়িয়া, ভাষাকে
ভাষিয়া চুরিয়া বাহির হইতে পারিবে।

পল্লী-পরিচয় *

মালদহের কলিগ্রাম

আজি এই শুভদিনে এই সামান্য স্ক্রু
পল্লীতে যে পরহিতৈষী মনপিণ্ডের শুভাগমন
ও একত্র সমাবেশ হইয়াছে ইহা আমাদের

পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সাহিত্য-সমালোচনা
দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের কিকিছাত্র উপকার
দর্শিলেও যথেষ্ট মনে করা যাইবে।

লোকে ছানা মাখন দিয়াও অতিথি
সংকার করিয়া থাকে, আর বাহার কিছুই

* কলিগ্রামের মালদহস্থ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত, কাটিক, ১০২০।

সম্বল নাই। সে খুব-কুঁড়া দিতেও লজ্জাবোধ করে না। সেইরূপ আমাদের এই সামান্ত গ্রামে এমন বিশেষ কোন ঘটনাবলী না থাকিলেও আমরা দরিদ্রতার কাহিনী লইয়াই উপস্থিত হইতেছি।

এই গ্রামের অনতিদূর পশ্চিমে চাঁচল গ্রামের নিম্ন দিয়া মহানন্দা নদী প্রবাহিত হইতে, তাহা আজকাল বৃত্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে বিল-কৃষি। মাঘে মাঘে বীপের মত বাসোপযোগী ঘনসামান্ত উচ্চভূমি ছিল। তাহাতে প্রথমতঃ কতকগুলি পাঠানবংশীয় মুসলমান, বারবংশীয় তিলিপন ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন আসিয়া বাস করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে পুরোহিত ব্রাহ্মণ, গোখামী বংশ, লাহিড়ী-বংশ ও কাসারী, নালিত, গোয়াল প্রভৃতি নানা জাতি বাস করায়, ইহা বৃহৎ পল্লীতে পরিণত হয়। এখানকার প্রধান অধিবাসী পাঠান-বংশ, গোখামী-বংশ ও লাহিড়ী-বংশের বর্ননা করিতে গেলে জাতব্য বিষয় সকল অনেক পরিমাণে পরিস্কৃত হইতে পারে।

মুনিকান্দা, প্রতাপপুর, কৃষ্ণপুর, আলিগঞ্জ, হুগুগু, মহতাপাড়া, ভবানীপুর, সবলকটোলা ও মনোহরটোলার সমষ্টি কলিগ্রাম বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে বর্তমান সময়ে চারি পাঁচটা পাড়া একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পূর্বে যেখান লোক-সংখ্যা শোনা হাইতে এক্ষণে গ্রামে তাহার একচতুর্থাংশও আছে কি না সন্দেহ।

পূর্বে এই গ্রামের ব্যক্তিগণ লম্বী ও সরস্বতীর বিশেষ রূপপাত্র ছিলেন। ভদ্রবংশ-সম্বৃত্ত দলমান ও ব্রাহ্মণের হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক আত্মবি, পান্ডিও উত্তর ভাষা শিখিয়া জ্ঞানসম্পন্ন হইতেন; এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে

প্রায় সকলেই সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার, ধর্মশাস্ত্র, পুথিগ, ইতিহাস, দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা যথেষ্ট জ্ঞানোপার্জন করিতেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিষয়ে অনেকের অসুযোগ ছিল। তৎকালে নৌকাপথে দূরদেশ হইতে মাল আমদানি-রপ্তানি হইত। কৃষিকার্য্য দ্বারা নানা জাতীয় শস্ত, গাছ, ফল, নীল প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। এই গ্রামের সন্নিকটে নবগ্রামে ও চাঁচলে বৃহৎ বৃহৎ নীলের কুঠি ছিল, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু রহিয়াছে। প্রায় ৪৫ মাইল দূরে ডুবরাহাল গ্রামে যথেষ্ট দোলা বা তুরা চিনি উৎপন্ন হইত। এই গ্রামে এবং এই প্রদেশে বহু তাঁতীর বাস ছিল। তাহারাই বহু মূল্যের ভাল তাঁল মুক্তি, চাদর, গামছা, মশারি ও এমন কি ৩০-৪০ টাকা পর্য্যায় মূল্যের অতি হুম্ব তত্ত্বেরে খান প্রস্তুত করিত। নানা স্থান হইতে ব্যাপারী আসিয়া মর্শিদাবাদ, পুর্নিয়া, পাটনা, নেপাল ও ভোটান প্রভৃতি নানা স্থানে কাপড় চালান দিত। গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি গোলা-গুও ও ভড়দিগের একটি বৃহৎ কাপড়ের কুঠি ছিল। স্থানীয় জমীদারদিগের সহিত বিবাদের ই কুঠিটা উত্তিয়া যায়। অল্প দিন হইল কুঠির ভগ্ন প্রাচীরের স্তূপগুলি এখান হইতে অপসারিত হইয়াছে। এই সভার এই স্থানেই সেই উচ্চাট্টির ছিল।

অন্যথা বিধবা রমণীগণ টেকেতে অতি হুম্ব হুম্ব কার্পাসতন্ত নিধাণ করিয়া মাসে মাসে ২৫০০ টাকা পর্য্যন্ত উপায় করিত। এখানকার কাঁসারীদিগের নিধিত বাগনের মধ্যে পালা-পিটা ঘটা একটা প্রসিদ্ধ জিনিস, যেমন টেকমই, তেমনই হুশী; আজকাল যদিও চাদরের পিত্ত দ্বারা হুম্বর পদমুদ্রি

ঘটা নিধিত হয় কিন্তু দেখের নহে। এখনও অনেক স্থানে কলিগেরে ঘটা ও কাপড়ের প্রসিদ্ধি আছে। আজিও যে কলিগুস্ত-বধক ইষ্টক-নিধিত জিন্দাপীরের বাঙ্গালা মসজিদখানি ও শিব-মন্দিরটা মস্তক উন্নত করিয়া বর্তমান রহিয়াছে, তাহা এই গ্রামের শিল্পী দ্বারাই নিধিত। এই বাঙ্গালাগৃহ ও মন্দির-নিধিতা চিন্তা খলিফার মত বাহিন্দার ২৫০০ টাকা বেতন দিয়াও আজকাল পাঠা যায কি না সন্দেহ, কিন্তু তৎকালে মাসিক ৪৫ টাকা বেতনে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এই হুদীদ রাণীদিগি ও শিব-মন্দিরটা জেলা পুর্নিয়ার অর্পণত স'উরিয়াধিপতী রাণী ইল্লাবতী দ্বারা প্রসিদ্ধি।

কলিগ্রামনিবাসী সজ্জ্বার চরণোদক পান করিলে কুষ্ঠব্যাধি নিবারিত হইবে দ্রুত কোন ব্রাহ্মণের প্রতি বাবা বৈষ্ণবানন্দের এইরূপ প্রত্যাদেশ হয়। তিনি অতি গোপনে ও একোশলে সজ্জ্বার আনকারীল নদ্রয়ন। উক্ত ব্যক্তিগণ করিয়া এই দ্বারোগ্যা ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সজ্জ্বা অতিশয় ধর্মপরায়ণ ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং ঈশ্বর-উপাসনায় মগ্ন থাকিয়া কালান্তিপাত করিতেন। এমন কি কখন কখন ২০ দিন পর্য্যন্ত তিনি ঈশ্বরের অনাহারে ধ্যান মগ্ন হইয়া থাকতেন। এইরূপ ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণ কর্তৃক তাহার চরণোদক পানের কথা তাহার কর্ণগোচর হওয়ায় তাহার জীবনের প্রতি অনাশ্রয় জন্মে। তিনি কয়েক দিনের উপযোগী খাদ্যাদি লইয়া জীবিত অবস্থায় গুহায় সমাধিস্থ হন।

তাঁহার অশ্বতল বংশের কর্তৃক সমাধির উপরে এই বাঙ্গালা-গৃহ নিধিত হইয়াছে।

ইহা বহুদিনের কথা নহে, প্রায় পৌনে দুইশত কি দুই শত বৎসরের কথা হইবে। তিনি জীবিত অবস্থায় গোর লইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান জিন্দাপীর নামে অভিহিত হইয়াছে; এবং এই বাঙ্গালাটি জিন্দাপীরের সমৃদ্ধি বলিয়া অভিহিত।

দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাহ করিয়া দিল্লী হইতে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের কিছুদিন পূর্বে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ধনরত্ন জীপুস্ত সমভিযাচারে কতকগুলি পাঠান বংশীয় মুসলমান বানিজ্য করিবার জন্ত এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার পর বীর বীরনামে এক একটা পাড়ার নাম নির্দেশ করিয়া বসতি করেন। যথা—নূর বীর নূরুজঙ্গ, আলি বীর আলিগঞ্জ, মল্ল বীর সবলকটোলা, মেহেমান বীর মেহেমান-টোলা, মনোহর বীর মনোহরটোলা ও কালে বীর কলিগাঁও বা কলিগ্রাম। সবলকটোলা বাসের অশ্বপযোগী মনে করিয়া পরে সবল বীর কলিগ্রামের মধ্যস্থলে স্তূপস্থল অটলিকা নির্মাণ করিয়া বাস করেন। উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ও কোটাধিপতি ছিলেন। তখন তিনিই কলিগ্রামের ভূস্বামী এবং সমগ্র ব্রহ্মনপুত্র পরগণাটা তাঁহারই অধিকৃত ছিল। জীবিকা ও বসতির জন্ত ব্রহ্মসত্তর ও মহোত্তর দিয়া বহু লোকের বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাজীতে সগরত ও যথেষ্ট সদৃশ্যমান ছিল। তাঁহার বাজীর তোরণটা আমরাও দেখিয়াছি, অল্পদিন হইল এই বাজীটা বিক্রীত হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র আচার্য্য তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরের মধ্যে একমাত্র ঘনীটের পুত্র খুদী বর্মানাম আছে। কালে বীর বাজীটা সম্পূর্ণ অবশ্যয় দেখিয়াছি। যখন এই বাজীর বিবরা মালদহে জামাতা

মহারাজ আলি খাঁর বাড়ী চলিয়া গেলেন তখন মোসাহেব খাঁ ও মরফুদ্দিন খাঁ বিক্রী করিয়া ঐ বাড়ীটা নষ্ট করিয়াছে। পুরোঁজ সজ্জা খাঁ ইহাদেরই পূর্ণপুরুষ।

রায়চৌধুরী-বংশ

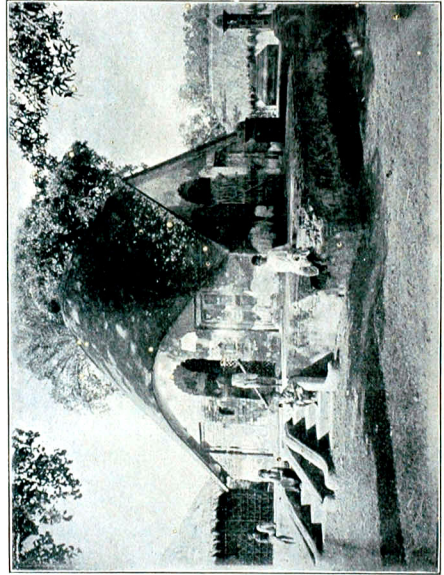
রাজসাহী বগুড়া অঞ্চলে তিন প্রকার তিলি ছিল। শিরস্থানে, মহাস্থানে ও দাস পঠি। যাহারা আত্মেয়ী নদীর ধারে বাস করিত তাহারা শিরস্থানে, আর যাহারা করতোয়া নদীর ধারে মহাস্থান প্রকৃতি জায়গায় বাস করিত তাহারা মহাস্থানে ও যাহারা দাস্তবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত তাহারা দাসপঠি। এখানে মহাস্থান হইতে যে সকল তিলি আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আটবংশ (নন্দী, হুতু, সে, পাল, চোন্দদার, বসাক, মল্লিক ও জিমোহাণী) মিলিয়া যে একটি সমাজ গঠন করিয়াছিল, তাহাদের নাম আটবংশিয়া। এ প্রদেশে পূর্বে হইতে যে সকল তিলি বাস করিত, তাহাদের মধ্যে বীঘ পরিগন অর্থাৎ জামাতা বা ভগিনীপতি মিলিয়া প্রত্যেকে এক একটি সমাজ গঠন করিত। সেই জ্ঞাত তাহাদের নাম বখরিয়া। এই ছই শ্রেণীর মধ্যে সমাজগত বিভিন্নতা হওয়ায় ভাষাগত ও ব্যবহারগতও অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু উভয় শ্রেণীই বারেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। নানা স্থান হইতে সমাগত লোকের বাসের জ্ঞাত আশারের গ্রামে প্রত্যেক জাতির মধ্যে সামাজ্য রূপে ভাষার বিভিন্নতাও প্রচলিত আছে। এই স্থান মালারহের অন্তর্গত হইলেও সময় সময় পূর্বিয়া ও দিনাজপুর জিলার দেওয়ানী কোর্টের অধীন থাকায় এবং পূর্বিয়া ও দিনাজপুরের সীমান্তস্থানের নিকটবর্তী বলিয়া এখানকার

প্রচলিত ভাষা প্রায় পূর্বিয়া, দিনাজপুর এবং রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

প্রথমতঃ মহাস্থান হইতে ভগবতীনারায়ণ রায় (খাঁ) চাকুরির উপলক্ষে সপরিবারে অর্থাৎ পিতা-পিতামহ সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া বাস করেন। তাহার পর অমাত্র আত্মীয়-বন্ধুগণকে আনাইয়াছিলেন। ভগবতীনারায়ণের পিতার নাম শ্রাম রায়, পিতামহের নাম অজ্ঞাতানন্দ রায় (খাঁ)। ভগবতীনারায়ণ অবদল খাঁর প্রধান বার্ষিকারক (দেওয়ান) ছিলেন।, সবদল খাঁর পুত্র গাগড়া পরগণাটা খরিদ করিয়াছিলেন। তাহা লাভজনক বিবেচিত না হওয়ায় দেওয়ান ভগবতীনারায়ণের মালিক বেতন হইতে ছই টাকা করিয়া কঠন করিয়া লইবে এই চুক্তিতে ধারে ৮০০০ আটশত টাকা মূল্যে তাহার নিকট সবদল খাঁ উক্ত জমিদারী বিক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমস্ত গাগড়া পরগণা—যাহা ভগবতীপুর, মালকা, মথুরপুর ভাণ্ডারিয়া, মথপুর এই পাঁচ তরফে বিভক্ত— তাহার বার্ষিক আয় প্রায় ১৫১৬ হাজার টাকা হইবে। গাগড়া পরগণা তাৎকালিক সবদল খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ভগবতী নারায়ণ রায় চৌধুরী উপাধি ধারণ এবং স্বীয় নামে ভগবতীপুর গ্রাম নিখান ও পিতার নামে শ্রাম রায় ঠাকুর স্থাপিত করেন। ঐ ভগবতীপুর গ্রামে ভৈরবী নামে* যে একখানি পাবাণ-মূর্ত্তি (প্রতিমা) আছে তাহা কি প্রকারে কেব আসিল সে বিষয়ে অনেকজ্ঞপ জনশ্রুতি আছে, কিন্তু কালাপাহাড়ের কাটা থাকায় বহু প্রাচীন বলিয়া অশ্বমেধ। যেহেতু কালাপাহাড় ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮০

গৃহস্থ

কনিগ্রামের জিন্দা পীর



* এই মূর্ত্তির পরিচয় ও প্রতিষ্ঠার 'গৃহস্থ' প্রকাশিত হইয়াছিল।

যুগ্ম পর্বাত হিন্দুদিগের দেবদেবীর প্রতি-
মূর্ত্তি ও দেব মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন।

ভগবতীনারায়ণ রায়ের পাঁচ পুত্র—১ম
পুত্র মুহম্মদ চন্দ্র, ২য় নন্দকিশোর, ৩য় প্রতাপ-
চন্দ্র, ৪র্থ বদনরাম ও ৫ম পরাগচন্দ্র।
তদাধ্যে ৪র্থ পুত্র বদনরাম সর্বাশেষ। কুঁতী
এবং সংসারের ভারপ্রাপ্ত। রাজ-দরবারে
পরগণা গাগড়ার খাজনা দিতে না পারায় সেই
অপরোধে বাঙ্গালার শ্বশুরবার মুর্শিদাবাদ খাঁর
নিকটে কশাখাতে জজ্বরিত ও গঙ্গা-গরুর
নিক্ষিপ্ত হয়। কিছুকাল পরে তাহার বিশ্বস্ত
কোন ভৃত্য কর্তৃক ঐ গরুর হইতে উত্তোলিত
হওয়ায় সে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া
বাড়ী পলাইয়া আইসে। কিছুদিন পরে
খাজনা-প্রদানে অসমর্থতা বিজ্ঞাপন করিয়া
স্বচ্ছ গায়েব কশাখাতজনিত কত স্থানের
চণ্ড টাকার আকারে তুলিয়া থলিতে
পূর্ণকরতঃ খাজনার পরিবর্তে তাহা
মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে নবাব বাহাদুরের
নিকট প্রেরণ করে। তৎপরে বদনরাম
নবাব বাহাদুরের সমুখে উপস্থিত হইয়া
বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে, পরগণা
গাগড়া হইতে যাহা কিছু আয় হয় তাহা
গ্রাম্য তাহার পরিবারের ও নিজের
আস্যাচ্ছাদন সম্বলান হওয়া হকটিন। তাহার
নিজের ভোজনের জটাই প্রত্যহ একমণ
ভক্ষ্যবস্তুর আবশ্যক হইয়া থাকে, এমত
অবস্থায় সম্পূর্ণ খাজনা চালান তাহার পক্ষে
একরূপ অসম্ভব। নবাব বাহাদুর দৈনিক
একমণ ভোজনের বিষয় শ্রবণকরতঃ অতীব
কৌতূহলাকান্ত হইয়া পরীক্ষার জন্ত তাহাকে
নিজের সমুখে একমণ সন্দেশ খাইতে
দিয়াছিলেন। বদনরামকে তাহা অবলীলাক্রমে
খাইতে দেখিয়া সাতিশয় বিদ্বিত ও প্রীত

হইয়াছিলেন এবং রূপাপরবশ হইয়া উক্ত
জমিদারীর কর কমাইয়া দিলেন এবং তাহাকে
বাকী খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি
দিলেন। বদনরামের যথেষ্ট বদন্ততা ছিল
বলিয়া তাহার নিকট হইতে অনেক ব্রাহ্মণ
দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়াছিলেন।
পরে ইহার তরফ মথুরাপুত্র, ভাণ্ডারিয়া,
যদুপুর, মালকা ও ভগবতীপুর পাঁচজাতায়
যথাক্রমে বিভক্ত করিয়া লইয়া পাঁচতরফে
বিভক্ত হয়। এখনও তাহাদিগের অধস্তন
বংশধরগণ বর্তমান আছে। ইহার ধার্মিক,
ভক্তিপরায়ণ ও পরোপকারী বলিয়া গ্রামের
মধ্যে প্রাপ্য লাভ করিয়া সম্মানসম্পন্ন
হইয়াছে।

গোষামী-বংশ

সাহালবংশীয় পুরুষোত্তম অষ্টমতবংশ
গোষামীর দৌহিত্র ও শিষ্যাবরদারী বলিয়া
গোষামী উপাধী ধারণ করেন। তাহার
আদিবাস রাজসাহীর অন্তর্গত ভাগুরপুরের
নিকট পুথুরিয়া, তারপর মালদহে গোড়ের
নিকট বাবলা, পরে চুড়ামনের উত্তরে বোশা
গ্রামে কিছুদিন ছিলেন, শেষে কলিগ্রামে
পশ্চিমপ্রান্তে ধরিশেষে মধ্যগ্রামে আনিয়া
বসতি করুন। সপরিবারে মদনগোপাল
ঠাকুর মাত্র সখল লইয়া এখানে আইসেন।
১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে সবদলখার নিকট হইতে
মধ্যগ্রামে অর্থাৎ যেখানে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ
গোষামী ও শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ গোষামী বাস
করিতেছেন সেইস্থানে বাসুর জ্ঞা স্বীয় নামে
১৭২১ খৃষ্টাব্দে বদনরামের নিকট হইতে
ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ
পুত্র রাধাবল্লভ গোষামী হকবি ছিলেন,
তাহার কবিষের নিদর্শনস্বরূপ সংস্কৃত ভাষায়
রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালিখানি এখনও

রহিয়াছে। তিনি সর্বপ্রথম কলিগ্রামের বাবস্থাপক পণ্ডিতের পর পাইয়াছিলেন। ইংরেজ অধস্তন প্রায় সকলেই পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রে কৃতবিদ্যা ছিলেন, এবং আজিও তাঁহারের অধস্তন বংশধরগণের চেষ্টায় সাঙ্কৃত ভাষার চর্চা হইতেছে। পুরুষোত্তম হইতে আজ পর্য্যন্ত এখানে তাঁহারের নয় পুরুষে ২৫৮ দুইশত আটদশ বংশের বাস হইল। পুরুষোত্তম গোখামী একজন ক্রিষ্টানি ধর্মিক ব্রাহ্মণ, তিনি গঙ্গাতীরে চুড়ামন নিবাসী ব্রাহ্মণের জমিদারের প্রদত্ত কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রতিগ্রহ-বিমূগ্ধ হইয়া তাহাকে মন্ত্র প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন উক্ত দোদুণ্ড-প্রতাপদিত্ত জমিদারের শাসন-বাক্যে ভীত হইয়াই তিনি বাসস্থান, ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

লাহিড়ী-বংশ

রাজসাহী অশ্বর্গত ভাগ্যপুত্র-নিবাসী রামরায় লাহিড়ী পুরুষোত্তম গোখামীর প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করিয়া কলিগ্রামে বাস করেন। তিনি স্থপতিত, তাঁহার একটা পারস্ত ভাষায় নজুম অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ উপাধি দেবিতো পাই। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আশানন্দ, আশানন্দের দ্বিতীয় পুত্রের পৌত্র শ্রামন বিদ্যালঙ্কার এখনও নাটোরে আছেন। তিনি খ্যাতনামা শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর রাজসাহী প্রদেশে প্রধান পণ্ডিতের পর অধিকার করেন। তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছে। তৎপুত্র যোগেন্দ্র-নারায়ণ কাব্যতীর্থ, দ্বিতীর্থ, দ্বিতীর্থ উপাধিতে অলঙ্কৃত। আশানন্দের প্রথম পুত্র অনুপনারায়ণ লাহিড়ী (বিদ্যালঙ্কার)। ইনি একজন ভাল জ্যোতিষী, সেইজন্য কলিগ্রামের ডক্টার্সস্ট্রীতে তাঁহার বার্ষিক ৩৪

শত টাকা পরিমাণে বৃত্তি ছিল। তাঁহার পৌত্রগণ মধ্যে কিশোর লাহিড়ী অশ্রমকোটের বাবস্থাপক পণ্ডিত, রামকুমার লাহিড়ী উকীল এবং মধুসূদন লাহিড়ী মংগিচরণের একজন দেশপ্রসিদ্ধ কলাবিৎ। তাঁহার প্রপৌত্র দুইখানি সর্দার গ্রন্থ আছে, একখানি মুদ্রিত হইয়াছে, অপরখানি পাতুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে। রামরায় অবধি আজ পর্য্যন্ত এখানে আট-পুরুষে ২৫৬ দুইশত ছায়াব বংশের বাস হইল। এই বংশের প্রায় সকলেই সাঙ্কৃত ভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। রাম রাম এখানে বাসের জন্ম ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে সবল খাঁর নিকট হইতে এবং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের গোপাল সিংহের নিকট হইতে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবতী নারায়ণ রায় চৌধুরীর পুরোহিত রামদেব চক্রবর্তী মহাশয় সবল খাঁর নিকট হইতে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে বাসের জন্ম ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি ভগবতীনারায়ণ ও সবল খাঁর সমসাময়িক লোক, তাঁহার অধস্তন বংশধর নীরদচন্দ্র চক্রবর্তী বর্তমান আছেন। এখন হিসাব করিয়া দেখিলে ১৬২৪-১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৮৯ বৎসর হইল, ইহার সামান্য কিছুদিন পূর্বে হইতে বসতি আরম্ভ হইয়াছিল। এই গ্রামজাতি ১৬২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সবল খাঁদিগের অধিকারে ছিল, তৎপরে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দ অবধি মালদহের অধর্গত পুণ্ড্রিয়াধিপ মহারাজা বঙ্গাদিকারী মহাশয়ের অধিকারে ছিল। তাহার পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পুর্বিয়া জেগার অশ্বর্গত মতিউরানিবাগী রাজা শ্রীনারায়ণ রায় ও রাজা ললিতনারায়ণ রায় মহাপ্রমদিগের অধিকারে আইসে; শেষে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রান্তঃশরীরা টাঙ্গের

রাণী নিবেদনশ্রী চৌধুরী মহাশয়ের অধিকৃত হইয়াছে। ইনি রাজা শ্রীমৎ শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দত্তক-গ্রহীত্বী-মাতা। আজিও কলিগ্রাম উক্ত রাজাবাহাদুরের অধিকারেই আছে।

আমাদের গ্রামে আটদশ আম অতিশয় উৎকৃষ্ট হয়, যেমন মিষ্টি তেমনই স্বাদু। গোলকান্ত, শবরশীলা, ও বৃন্দাবনী আমের জন্মস্থান এই কলিগ্রাম। মূর্শিদাবাদে গোলকান্তের নাম গুলকন্দ, মালদহে শবরশীলার নাম গোপালভোগ হইয়াছে। গোলকান্ত ও

শবরশীলার গাছটা এখনও রহিয়াছে। বৃন্দাবনীর গাছটা মারা গিয়াছে। আমাদের গ্রামের চতুঃপার্শ্বে আমের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা; অথচ ১০১২ বৎসর হইতে কি পুরাতন কি নবীন গাছে পূর্ণের মত প্রচুর আম ফলিতেছে না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীদ্বারা ইহার কারণ নির্দেশ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সন ১৩১৭২৬শে ফাল্গুন মাসে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে লোকগণনা-কালে এই গ্রামের লোকসংখ্যা ৩০২৭।

পরিশিষ্ট

সন ১৩১৭ মোহে ১৯১০ লোক-সংখ্যা

জাতি	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট সংখ্যা মেহেমান টোলা ও মনোহর টোলার সহিত
ব্রাহ্মণ	৮৮	৭২	১৬০
ক্ষত্রিয়	৬	৩	৯
বৈদ্য	১	০	১
কায়স্থ	০	৩	৩
তিলি	৪৩৯	৪১৬	৮৫৫
মালাকার	১	৩	৪
গোপ	৫	০	৫
নাতিত	৪০	৪৩	৮৩
কাঁসারি	৫০	৩৯	৮৯
কৃষ্ণকার	১৩	৯	২২
শ্বর্গকার	৮	১১	১৯
তিঘর	৩	০	৩
বাউরি	৯	৮	১৭
কেলে	৮৯	৯৫	১৮৪
কোচ	১৪	৯	২৩
ত'ড়ি	১৩	১২	২৫

সন ১৩১৭ মোঃ ১৯১১লোকসংখ্যা

জাতি	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট সংখ্যা মেয়েমান টোলা ও মনোহর টোলাব সংহ
ভাতমা	৩০	৩১	৬১
ছনিয়া বেনবাস	১৮	১২	৩০
খোঁপা	৩২	৩২	৬৪
সুরমি	২	০	২
বৈরাগী বা বৈষ্ণব	১০	১৪	২৪
কুবল	১০৪	১০৬	২১০
হারি	৬১	৪৫	১০৬
তেলি বা কলু	৫	০	৫
বেঙ্গা	২	৭	৯
কৈবর্ত	১১	১২	২৩
মেথর	৬	৪	১০
মুসলমান	১৮৮	১৮২	৩৭০
মুসলমান	২০	১০২	১২২
হিন্দু	০	০	১১২
হিন্দু	০	০	১৫
মুসলমান	০	০	২৮৭
			৩০২২ মোট সংখ্যা

সবদল টোলা
আলিগঞ্জ
নূরগঞ্জ
নূরগঞ্জ

শ্রীরামচন্দ্র লাহিড়ী।

সেখের দীঘি *

(১)

মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন স্বর্গীপুরের তিন কোশ দক্ষিণে “সেখেরদীঘি” নামে এক স্বহৃৎ সরোবর আছে। ইহা কিছুদিন এক মাইল লম্বা, প্রবেশের পরিমাণও মানানসই। ছোট খাট পাহাড়ের মত উচ্চ পাহাড়।

উহা বহু কাল প্রস্তুত হইলেও এমন স্বপুট ও পরিপাটি ক্রমে সজ্জিত রহিয়াছে যে দেখিলেই মনে হয় ইহা যেন সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত পাহাড়ের উপর বড় বড় অশ্বখ ও বটপুক। পুষ্করিণী বহুকালের, তজ্জ্বল ঢল পড়িয়া পড়িয়া ক্রমে ক্রমে ইহার স্রোতও

কিয়ৎকাল পূরিয়া গিয়াছে। উহা এক্ষণে শতক্ষেত্রে পরিণত। পুষ্করিণীর উত্তরদিকস্থ অর্ধেক জলা ব্যাপিয়া পদ্মবন। তজ্জ্বল অর্ধেক পুষ্করিণী যেন সূর্য্য আশ্রয়ে মগ্নিত। সহস্র সহস্র রক্তপদ্ম প্রস্ফুট হইয়া মধুর গন্ধে মন প্রাণ হরণ করিতেছে। দক্ষিণাংশ এই বহুর সৌন্দর্য্য রাশি বহন করিয়া পথিক ও দর্শকদিগকে সবেহ উপহার বিলাইতেছে। অসংখ্য ভ্রমর মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুণ গুণ রবে প্রকৃতিদেবীর স্তুতিগানে নিমুক্ত। দক্ষিণ অংশটা বোধ হয় অতি স্থগভীর, তজ্জ্বল তথায় পদ্ম কি অল্প জলজ উদ্ভিদ নাই। উহার কাচছন্দে স্থনির্গল বারিরাশি তরঙ্গ খেলিয়া পিপাসার্ত নরনারীকে হুমিষ্ট জলপান করিবার জন্ম আহ্বান করিতেছে। সাধারণতঃ এই দীর্ঘিকার উত্তরদিক অপেক্ষা দক্ষিণদিক নীচু। ইহার পশ্চিমদিকের সমুদ্রত পাহাড়ের তলদেশে কয়েকগনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান পল্লী। পূর্বে দিকে বাদসাহী সরাণ।

(২)

এই পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে জম্মার নামে একখানি গ্রাম আছে। বহুকাল পূর্বে তথায় পরমানন্দ রায় নামে এক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তিনি গৌড়ের নবাব সরকারে পুর্গ বিভাগে একটা উচ্চ চাকরী করিতেন। হোসেন সা তখন বড় বিহারের নবাব। পরমানন্দের উপর এই দীর্ঘিকা খনন করাইবার ভার ছিল। তিনি হিন্দুদিগের প্রথমতঃ উত্তর দক্ষিণে লম্বা করিয়া এই স্বহৃৎ সরোবর প্রস্তুত করাইলেন। এই কাজ হোসেন সাহার কর্ণে গেল। পরমানন্দ এইরূপভাবে পুষ্করিণী প্রস্তুত করা হেতু নবাবের নিকট ভৎসিত ও বিশেষরূপে

লাঞ্চিত হইলেন। কিন্তু তখন পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। তজ্জ্বল নবাব বাহাদুর এই পুষ্করিণী হিন্দু প্রথমতঃ প্রস্তুত হইলেও ইহা যে মুসলমানগণের খনিত তাহা সর্গসাধারণের অবগতির জন্ম উহার নাম “সেখেরদীঘি” রাখিলেন। নবাবের এইরূপ অসুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। এখনও এই পুষ্করিণী উত্তর দক্ষিণে লম্বা হেতু অনেকেই উহা হিন্দুর খনিত বলিয়া সন্দেহ করেন, এবং রায় পরমানন্দের খনিত এই কথা বলিতে সঙ্কচিত হন না। কিন্তু যুগ চিন্তায় অস্বীকৃত হইবে ইহা পরমানন্দের নিষ্পত্তি অর্থে খনিত নহে। নবাবের অর্থে এই পুষ্করিণী ও আরও শত শত এইরূপ স্বহৃৎ সরোবর বাদসাহী সরাণের ধারে ধারে প্রস্তুত হইয়া ছিল। ঠিক ছই ছই কোশ অন্তর অন্তর এইরূপ এক এক দীর্ঘিকা তিনি খনন করাইয়াছিলেন। সেখেরদীঘির চারি মাইল দক্ষিণে বোখরার দীঘি বাদসাহী সরাণের পূর্বাধারে শোভা পাইতেছে। ইহা আজিমগঞ্জ লাইনের বোখরা স্টেশন লাইনের ঠিক দক্ষিণ দিকে। উক্ত জম্মার গ্রামে রায় পরমানন্দের আবাস গৃহের এখনও ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উহা এক্ষণে মৃত্যিকা প্রোথিত। স্থানে স্থানে খনন করিলে এখনও তথায় প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক রাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৩)

বঙ্গের স্বাধীন নবাব প্রাঃশ্বরগীষ হোসেন সাহার বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। ইনি বঙ্গের রাজধানী গোড়নগর হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত একটা স্থবিলুত রাস্তা প্রস্তুত করান। উহাই এদেশে—বাদসাহী সরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার বিস্তার ৮০ হাত।

ভিনি বঙ্গদেশের নবাব, কিন্তু তাঁহার প্রস্তুত সরাণের নাম কেন "বান্দাহী সরাণ" হইল একথা অমতেই বিভ্রান্তা করিতে পারেন। তাঁহার উত্তর এই, বঙ্গবিহারের একমাত্র স্বাধীন রাজাকে সম্রাট বলিলেও কোন দোষ হয় না। স্বৈর নবাব গণ প্রথমে নীলশ্বরের অধীন ছিলেন কিন্তু সাময়িকদিনের সময় হইতে রাউতের সময় পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া ছিলেন। নীলশ্বরের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ দাসত্ব সম্বন্ধ ছিল না। এই জন্ত স্ববাবাঙ্গালার স্বাধীন নবাব হোসেন সাহা বান্দাহী নামে অভিহিত হইবেন তাহা বিচিত্র নহে। হোসেন সা হুজুর প্রস্তুত করিয়া কান্দ হন নাই। এই রাস্তার ধারে ধারে দুই কোশ অন্তর অন্তর এক একটা হুতুং সরাবের, এক একটা মসজিদ ও তৎ সলগ্ন পাশপাশা প্রস্তুত করেন। এই রাস্তা মালদহ হইতে বর্ধিত ও ফরোকার নিকট পহা পার হইয়া গুলিয়ান, অরসাবাদ, জঙ্গীপুত্র, বোম্বার হইয়া খড়গ্রাম থানার ভিতর দিয়া বীরভূমে প্রবেশ করিয়াছে। তৎপর বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়া উড়িষ্যাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। হোসেন সাহা বহদিন হইল স্বর্গে গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার খনিজ এইরূপ শত শত সরাবের এগনও তাঁহার অমল কীর্তিরশমিক সমুজ্জল রাখিয়াছে। এখনও উক্ত রাস্তার ধারে ধারে প্রতি চইকোশ অন্তর অন্তর এক একটা মসজিদ ও পাশপাশা গড়া-বেশের পূর্ব স্বস্তির সাক্ষাদান করিতেছে। উল্লিখিত "সেখেরদীঘি"টি উক্ত বান্দাহী সরাণের পশ্চিম পার্শ্বে। এই পৃথিবীর পশ্চিম পাহাড়ের উপর এখনও একটি মসজিদের ভাঙ্গাবশেষ বিদ্যমান। তথায় একখানি হুতুং কৃষ্ণপ্রস্তর পটে পারদী ভাষায় কি লেখা

আছে। গ্রামের মুসলমানগণ বলিলেন এই পৃথিবীর বিবরণ উহাতে খোদিত আছে। উহা অতীতের একখানি স্মৃতিফলক—প্রাচীন-কালের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস। মুর্শিদাবাদের সাহিত্য পরিষদ গৃহে ইহার স্থান হইবে না কি? নবাব হোসেন সার সময় এদেশে শান্তি বিবাজ করিয়াছিল। ধনমাজে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নবাব বাহাদুর প্রজার রক্তময় অঙ্গের অঙ্গণায় না করিয়া বড় বড় নীথিকা ও রাস্তা এবং অজ্ঞাত সাধারণ হিতকর কার্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকেরা স্ববর্ণপায়ে ভোজন করিতেন। নিমন্ত্রিত সভায় যিনি যে পরিমাণ স্ববর্ণপাঞ্জ দেখাইতে পারিতেন তিনি সেই পরিমাণ অস্তর পরিচান লাভ করিতেন।

(৪)

মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের আমোদ প্রমোদ জ্ঞান স্থানে স্থানে এক একটি রমণ্য অর্থাৎ বিহার স্থান ছিল। তথায় নবাবেরা সময় সময় হারিণ শিকারে ও বেগমদিগের সহিত নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ বাইশটি রমণ্য অর্থাৎ বিহার-স্থানে মুর্শিদাবাদের নবাবেরা অনেক সময় আমোদ আহ্বানে ক্রীড়া কৌতুক ময় থাকিতেন। কবিতা সেখেরদীঘি এইরূপ একটি "রমণ্য"। উহার দক্ষিণ পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমিতে নবাবের একটি সুন্দর রাজপ্রাসাদ ছিল। বেগমদিগের বাসের জ্ঞান একটি সুপ্রশস্ত চত্বর নয়নের তুল্লিশাধন করিত। কালের কি কুটীলা গতি! সেই লোকনয়ন সূক্ষর প্রাসাদাবাসী এক্ষণে ধাতুক্ষেপে পরিণত। বেগমদিগের চত্বরের চারিদিকের চারিটি স্থল অন্তরে ডগাবশেষ

কিছুদিন পূর্বে লোক নয়নের তুল্লিশাধন করিত। কিন্তু উহাও এক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের দ্বায় হুতুং কাচসজ্জ সরাবেরের অতুল শোভায় তখন মুগ্ধ হইত না একগ নরনারী নিতান্ত বিবর্ণ যখন নৈশাঘ উদার মদুরতা, চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িত, পিকিসুলের প্রভাতী গানে প্রকৃতি দেবীর নিম্নাভবহইত, হৃদয় প্রাতঃসমীরণের মৃদু মৃদু কম্পন সরাবেরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি নৃত্য করিত, সেই হৃদয় উদার বেগম সাহেবেরা তরঙ্গী সহযোগে এই স্থলীল সম্রাটকে জলকীড়া নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার নিজে নিজে উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানদী গুলির দাঁড় বাহিতেন। কেহ বা হালি রহিতেন। নবাব মহোদয় তত্পর এক মহাশয় উজাসনে উপবিষ্ট হইয়া বেগমদিগের এইরূপ জলকীড়া দর্শন করিয়া আনন্দে গলিয়া যাইতেন। তবীরা একস্থরে সান্নিধান গাহিতে গাহিতে তরঙ্গীগুলি পরিচালিত করিতেন।

তরঙ্গীগুলির পাছে পাছে রাজহংসদল শ্রেণীবদ্ধভাবে শ্বেতরেখা সামাইয়া জলকীড়া করিত। সারল কুলের অব্যক্তশব্দ সরাবের মধ্যে শব্দিত হইত। কৃষ্ণগুণশিত শ্বেতবর্ণ বলাকারাজি ধীরে ধীরে এক একটি করিয়া সরসীর কুলে আপনআপন স্থানাবিকার করিয়া উপবিষ্ট হইত।

এই দীর্ঘিকাও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলি এখনও মুর্শিদাবাদের নবাবের জমিদারী। ইহার পশ্চিম পাহাড়ের পশ্চিমদিগের পাহাড়তলী "মিকীগ্রাম" নবাবদিগের গুরুকুলের জায়গীর। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ রাজস্রোত হইলে পর স্বনামমজ্ঞ "কাণকটী হরিকীরায়ে" বংশধরেরা এই দীর্ঘিকার দক্ষিণ পাহাড় কাটিয়া দিয়া

উক্ত দীর্ঘিকার জল বাহির করতঃ বেলুড়িয়া ফুলশিখরী প্রভৃতি গ্রামের শত বক্ষা করেন; কারণ এই দীর্ঘিকার দক্ষিণে ২৪ কিতা জমির পরই উক্ত রায় বংশের স্থিতিস্থত আকবরসাহী পরগণা জমিদারী। সে সময় মুর্শিদাবাদের নবাববংশীয়েরা নিতান্ত অকর্মণ্য হইয়াছিলেন। তথাপিও এই সেখের দীঘির দক্ষিণপাহাড় রক্ষার জ্ঞ তাঁহারা একটা হতী ও কতকগুলি কোঁদ পাঠাইয়া দিয়া উক্ত পাহাড় বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু হরিজী রায়ের বংশধরেরা তাঁহাদের সমস্ত আকবরসাহী পরগণার প্রজাগণকে লইয়া উহাদের সহিত একটি ছোটখাট যুদ্ধ করেন। নবাবের হতী প্রবল আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দীঘির নিকটে একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী আশ্রয় "হাতীমারা" নামে অভিহিত। এই পোল-যোগের পর মুর্শিদাবাদের নবাব-পরিবারেরা উক্ত পাহাড় বাঁধাইবার জন্ত আর কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। বহদিন পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণবর্মেন্ট বাদী হইয়া উক্ত পাহাড় পুরাইয়া দিবার জ্ঞ হরিকীরায়ে বংশধরগণের উপর এক দেওয়ানী মোকদ্দমা স্থাপন করেন। কিন্তু প্রতিবাদিগণ বহদিন ধরিয়া ঐ ক্ষতি বিধা দীঘিকার জল শতক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেছেন এইরূপ প্রমাণ হওয়ায় মোকদ্দমার কোন ফল হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ পাহাড়ে জল নিকাশের সেই প্রাচীন নন্দমা বিজয়মান আছে। এই স্থান হইতে প্রায় ছই কোশ দূরত্বী বেহুড়িয়া, ফুলশিখরী গ্রামের সমস্ত জমিতে ঐ নন্দমা দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হয়। তজ্জ্ঞ উক্ত গ্রামের চাষাবাদ পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। এই ছই গ্রামের শত নাশের কথা প্রায়ই শুনা যায় না। হরিকীরায় বীতকৃম-

জেলার অন্তর্গত দক্ষিণগ্রামের প্রান্তঃসরণীর
বিশেষরায় মহাশয়ের রংশধর। উভয়েই

সংক্ষিপ্ত জীবনী বীরভূমবাসীতে ইতঃপূর্বে
প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরামতারণরায়।

মফঃস্বলের বাগী

১। ভারতে এলুমিনিয়মের কারবার

মিঃ অ্যান্থ্রক্স চ্যাটার্টন এক্ষণে মাস্ত্রাজ-
গবর্নমেন্টের অধীনে শিল্প-সঞ্চয়ী অংশদান-
বিভাগের জাইরেক্টর। পূর্বে ইনি মাস্ত্রাজ
আর্টসুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাইই যত্নে
ভারতীয় এলুমিনিয়মের বাসন সর্বপ্রথমে ঐ
স্থলে প্রস্তুত আরম্ভ হয়। সেই এলুমিনিয়মের
কারবার গবর্নমেন্ট-স্থলে রাখা অংশদান
করিয়া উহা একটা কোম্পানীর হস্তে দেন।
উহাই ভারতের প্রথম বেসরকারী এলুমিনি-
য়মের কারবার। এক্ষণে বোম্বাইয়ের আর
একটা কারখানার এলুমিনিয়মের বাসন প্রস্তুত
হইতেছে।

সাধারণ গৃহস্থালীর ব্যবহারে এলুমিনিয়মের
বিশেষ উপযোগিতা আছে। ইহা কাচ বা
পাথরের ত্র্যয় ভঙ্গপ্রবণ নহে; অথচ কাঁসা
পিতলের ত্র্যয় অস্বাভি দ্রব্যে বিকৃত হয় না।
ছেলেদের দুধ রাখিতে, হোমিওপ্যাথি
ঔষধি পাইতে আহার্যদ্রব্য অসিক্ত
অবস্থায় অধিকণ রাখিতে, অস্বাভি দ্রব্য
রন্ধন করিতে এলুমিনিয়মের বাটী, ছোট
গেলাস, বড় কৌটা, কড়া এবং হাঁড়ির ত্র্যয়
অন্ত কোন উপযোগী দ্রব্য নাই। সনানাকার
কাঁসা পিতলের বাসন অপেক্ষা এলুমিনিয়মের
বাসন অনেক হালকা এবং সস্তা। এটেল
নাটী চূর্ণ করিয়া এবং বাছিয়া তাহার দ্বারা
এলুমিনিয়মের বাসন অথবা বলপ্রয়োগ ব্যতীত

মাকিলে উহা সহজে পরিষ্কার হয় এবং উহা
অনেক দিন টেকে। এখনও উহার সঞ্চয়ে
একরাত্রি দোহ এই যে দেশময় সহর সকলে
উহার ঢালাই ও পেটাই জন্ম কোনও কার-
খানা না থাকায় ভাঙ্গা এলুমিনিয়মের বাসন
বদল দিবার কিংবা বিক্রয় করিবার কোনরূপ
হবিবা নাই। সে সঞ্চয়ে ভাঙ্গা কাঁসা
পিতলের হবিবা আছে। উহা অর্ধ মূল্যে
সকল স্থলেই বিক্রয় হইয়া যায়। এখনও
ভারতে এলুমিনিয়ম ইয়ুরোপ হইতে আমদানী
হইয়া বাসন প্রস্তুতের কারখানা চলিতেছে,
অথচ ভারতবর্ষে যত এলুমিনিয়মের 'ওর' বা
অন্ততঃ খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, তত পৃথিবীর
কৃত্রিম নাই।

বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়ম বাহির করা
হইয়া থাকে। কাম্বীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড
এরূপ পাহাড় আছে, যাহা সমস্তটাই প্রায়
বক্সাইট। একটা বড় বক্সাইটের কারখানা
ভারতের জন্ম একান্তই প্রয়োজন। ইহার
জন্ম নূতন যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার কোন
আবশ্যক হইবে না। বাহারা মধ্য প্রদেশের
লৌহময় কঙ্কর হইতে লৌহ এবং ইস্পাত
প্রস্তুত জন্ম এমিয়ার মধ্যে সর্বপ্রধান লোহার
কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, সেই টাটা
আয়রন ষ্টীল কোম্পানী কাম্বীর দরবারে
আবেদন করিয়া তথায় এলুমিনিয়মের জন্ম
একটা শাখা-কারখানা সহজেই গুলিতে
পারেন। তাহা করিলে কাম্বীর রাজা এবং

অবধীর্ষী প্রজা উভয়েই উপকার। ভারতের
এলুমিনিয়মেরদর সস্তা হইয়া ভাবিতব্য প্রকারও
উপকার হইবে। বিশেষ হইতে এলুমিনিয়মের
আমদানী কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইতে
বুঝা যাইবে যে, মিশ্র দ্রব্য বক্সাইট হইতে
এলুমিনিয়ম বাহির করায় কারখানায় কত
অধিক লাভ হওয়া সম্ভাবনা। ১৯০৪-৫ অব্দে
এলুমিনিয়মের আমদানী ৮২০ হস্তর বা
১২১৩ মন ২৬ সের এবং (মূল্য ১ লক্ষ পাঁচ
হাজার টাকা); এবং ১৯১২-১৩ অব্দে
৬৪৮০২ হস্তর বা ৪৮৪৮০ মণ মূল্য ২৫ লক্ষ
৫১ হাজার টাকা)।

এডুকেশন গেজেট

২। বেগুন চাষ

বেগুনের natural order—Solanaceae,
ল্যাটিন নাম Solanum Molongena.
ইংরাজীতে বেগুনকে Brinjal বলে।
হিন্দিতে বৈগুন, ভট্টা, ভাটা; মহারাষ্ট্রে
বাগেণ, গুজরাটে রিগুনা, রিগনী; কুর্গটে
বনে, তৈলকে বংকয়া, ফরাণীতে বাদগ্যান
বলিয়া থাকে।

সংস্কৃতে বার্বাস্ক, ভট্টাকী, ভট্টিকা ও
বৃহাক বলে। বেগুনের চাষ কেবলমাত্র
আমাদের এই ভারতবর্ষেই হইয়া থাকে।

ইহার চাষে বেশ ছ'পয়সা আছে।
সকলেরই ইহার চাষে মনোযোগী হওয়া
উচিত।

কবিরাণী শারে ইহার গুণ কি, নিম্নে
লিখিত হইল।

বৃহাক্সা স্ত্রী তু বার্বাস্কটুটাকা ভাটিকি পা চ।
বৃহাক্সা স্বাধু তীজোক্ষা কটুপাকমণ্ডলম।
জরবাত বলাসয় বৃহাক্সা পিত্তকণ্ডক।
বৃহাক্সা পিত্তলং কিঞ্চিদপ্যায় পরিপাচিতম।

কফমোহেইনিলময়তথ্য লঘু দীপনম।
তবেব হি গুরু শিঙ্ঘাং সতৈলং লবনাক্তিম।
অপরং বেত বৃহাক্সা কুটুটাক্স সমং ভবেৎ
তদর্শঃ হৃ বিশেষণ হিতং হীনক পূরিতঃ।
বার্বাস্কী কটুকা কটুয়া লঘুয়া পিত্তনাশিনী
বলপুষ্টিকরী স্ত্র্য গুণবাহেযু নির্মিতা।

(ভাবপ্রকাশ)

বেগুণের গুণঃ—মধুর রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ-
বীৰ্য, কটুবিপাক, অপিত্তকর, অদ্রিদীপক,
সুকৃম্নকর, লঘু। ইহা জ্বর বায়ু এবং স্নেহ-
নির্নাশক।

বেগুণের গুণভেদঃ—কচি বেগুন কফ ও
পিত্তনাশক। পাকা বেগুন পিত্তকরক ও
গুরুপাক। অপার-দর্শ বেগুন—কিঞ্চিৎ পিত্ত-
কর, অত্যন্ত লঘু, অদ্রিদীপক হইয়া কফ মেদ
বায়ু এবং আর্মদোষের শাস্তিকারক।

বেগুন পোড়া লবণ ও তৈল মিশ্রিত
করিলে গুরু ও শিঙ্ঘ হয়। ভিমের-মত এক
রকম শাধা বেগুন আছে, তাহা পূর্বোক্ত
বেগুন হইতে হীন গুণ, কিন্তু অর্শবোগে
বিশেষ উপকারী।

বেগুন মীনা জাতীয় তরুণ্যে ছই জাতিই
প্রধান। এক রকম বেগুন আকারে
গোল—মুক্তকেশী, মাঝড়া ও এলোকেণী ঐ
শ্রেণীভুক্ত; ইহার ল্যাটিন নাম Solanum
Melongena। আর এক রকম বেগুন সূক্ষ
সদ্য আঙ্গুরের মত—তাহাকে শ'লে বা সুলি
বেগুন বলে। এই জাতীয় বেগুনের ল্যাটিন
নাম Solanum esculentum Dren
বেগুন বারমাস্য সকল ঋতুতেই জন্মিয়া থাকে।
পুরাতন গাছের বেগুনে এক প্রকার ক্ষার
জন্মে। তাহা মাংসের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট-
কর। কিন্তু নূতন গাছের বেগুন কোন
অনিষ্ট করে না। এই জন্ম, বোধ হয়, চৈতন্য

মাসের শেষে গাছগুলি তুলিয়া ফেলা হয়। আর পুরাণ গাছের বেগুনের খোশা পুক হয়, খাইতে তত মিষ্ট লাগে না। এক বৎসর হইতে ৩ বৎসর পর্যন্ত একই জমিতে বছরের শেষে বৈশাখ মাসে গাছের ভাল কাটিয়া দিয়া জমিতে নতুন করিয়া চাষ ও সার দিয়া বর্ষার পূর্ণ পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিয়া ঝাঁটাইয়া রাখিলে, অসময়ে অস্বাভাবিক পরিমাণে ফল পাওয়া যাইতে পারে। অসময়ের বেগুন লোকে ভাল মূল্য বিচার করেন না—বাস্যদায়েও বেশ লাভ হয়। কিন্তু আমাদের দেশের চাষীরা তাহা করে না।

শ্রুতভেদে আমাদের দেশে ইহার দুইবার চাষ হয়। আউসে বেগুনের চারা ঠেঠ মাসে পোতা হয়, ভাদ্র আশ্বিনে ফলে। আউসে 'হেমন্তিক' বেগুনের চারা শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পোতা হয়—আশ্বিন কাটিকে ফলে।

দোয়াশ অল্প উচ্চ মাঠল জমিই বেগুন চাষের উপযুক্ত। পতিত জমিতে বেশ ভাল হয়। এই জমিতে কোন প্রকার সারের দরকার করে না। মাঘ কাশনে বুটির পর ভাল ক'রে ৩৪ বার চাষ ও মই দিয়া জমি ফেলিয়া রাখিলে। পরে গোবর সার, ছাই, পাঁক ও ঘরের নোণা-মাটি মিশ্রণে অল্পে সঙ্গ্রহ করিয়া এই জমিতে দিবে। যেমন বৈশাখ মাসে বুটি হইবে অমনি এই জমি আউস দীর্ঘে ৪৫ বার মই দিয়া মাটি সমান, দুলাই ছায়া ও তৃণশূন্য করিয়া জৈঠের 'যো' পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। জৈঠ মাসের জলে 'যো' হইলেই এই জমিতে চারা পুতিবে। আঘাট মাসে এক এক দিন বড় রোর হয়। সেই সময় মধ্যে মধ্যে এক একটু জল দিলে খুব ভাল হয়, চারাগুলির মরিবার সম্ভাবনা থাকে

না। বুটির জল পেলে এই চারাগুলি বেশ মতেজ ও ঝাড়াল হইয়া উঠে।

আউসে বেগুন চারা একটু বড় হইলেই আমুনে বেগুন ক্ষেতে বসাইবে। এর আগে পুর্বেক প্রকারে জমি তৈয়ারি করিয়া রাখা উচিত।

আউল, আমন ছাড়া আমাদের দেশে চৈত্র মাসে এক প্রকার বেগুন হয়, তাহাকে 'চৈত্রে' বেগুন বলে। মাঘ মাসের মধ্যে এই বেগুনের চারা তৈয়ারি করিয়া কানুন মাসের প্রথমে এই চারা ক্ষেতে পুতিলে, চৈত্র মাসে নিশ্চয়ই ফল ধরিয়া থাকে। এ বেগুনের গাছ বেশী বড় হয় না বটে, কিন্তু গাটে গাটে খলে খলে বেগুন হয়।

তিন বার ক্ষেতে বেগুন বসাইবার কথা বলা হইল, বাওরিক বেগুন বার মাসই বদান হইতে পারে। খনা বলেন, বছরে দশ মাস বেগুন বসাইতে পারা যায়। যথা:—

বেগুন রো!

চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ, ইতে নাই কোন বিবাদ।
পোকা ধরলে দিবে ছাই, এর ভাল উপায় নাই।

মাটি শুকালে দিবে জল, সকল মাসে

পাবে ফল।

হাপর।—চারা তৈয়ারি করার স্থানকে হাপর বলে। উঠানে, গোয়ালের কাছে অথবা অল্প কোন স্থানে ৪৫ হাত জমি আউস দীর্ঘে কোপাইয়া আশ্বাধ মত সার (গোবর-সার) ও ছাই দিয়া এই হাপর প্রস্তুত করিবে। হাপরে সার না দিলেও ক্ষতি নাই। এই স্থানে ২০' কি ৩ তোলা বেগুনের বীজ পোতা চলে। ইহাতে যে চারা হয়, তাহা

এক ১/০ বিঘা জমির উপযুক্ত। বীজ পোতার দিন থেকে এক মাসের মধ্যেই চারাগুলি ক্ষেতে বসাইবার উপযুক্ত হয়। হাপরে চারা ১০/২২ আউল বড় হলে ক্ষেতে পুতিবে। বেশী লম্বা চারা ভাল নয়। পুতিবার সময় লম্বা সারি দিয়া লাইন করিয়া ছুই হাত অন্তর ঠিক সমান দূরে ঘূরে চারাগুলি পুতিবে। চারাগুলির শিকড় একটু কাটিয়া ফেলিও। এই প্রকার খাশী করা গাছ বেশ ঝাড়াল হয় ও বেশী ফল দেয়। এক পশলা বুটির পর চারা পুতিলে প্রায়ই মরে না।

রাণাঘাট বার্তা।

৩। পশুপলিদান সঙ্গত কি না?

পশুসর্গের সময় যখন পুরোহিত "অগ্নিঃ পশুরানীং" ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ করেন, তখন যজ্ঞমানের পক্ষে দেবতার নিকট এই ওকালতি করা হয় যে—“অগ্নি পুর্বে পত ছিলেন, যজ্ঞে নিহত হইয়া অগ্নিঃ লাভ করিয়াছেন; সেইরূপ 'অগ্নি' এই পশুও যজ্ঞে নিহত হইয়া অগ্নিলোক প্রাপ্ত হউক।

দেবতা কর্তৃক এই পশুর জন্মে দেবলোকে গমনোপযোগী সংস্কার সঞ্চারিত হউক।” এ বিধিতে কেহ কেহ এই আপত্তি করিতে পারেন যে, পশুর অন্তরালে দেবলোক-প্রাপ্তির উপযুক্ত কোন সংস্কার বিহিত নাই;

সুতরাং দেবতা তেমন সংস্কার বিধান করিয়া দিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে আমার উত্তর এই যে, এই আপত্তি ভিত্তিহীন। মন্ত্রশক্তি আছে—“ওমস্ত্যং দেবত্বমাজানমগ্রে” অর্থাৎ সমস্ত মন্ত্রী প্রাণীই প্রথমে স্বয়ংজাত দেবতা ছিল। সুতরাং এই পশুও অগ্রে আজান দেবতা পাকান্তে, তাহার মধ্যে যে দেবত্বের

সংস্কার নিশ্চয়ই নিহিত রহিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি কিন্তু এই পশুর মধ্যে তত উর্দ্ধ কালের সংস্কারও সূচাইয়া উঠাইবার কথা বলিতেছি না; আমি বলি সেই স্বয়ংজাত দেবত্ব হইতে অবনত হইয়া এই পশুকে অনেকবার প্লিতমাতৃজাত অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে; সেই সমস্ত দেব-জন্মের সংস্কার নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে নিহিত আছে। দেবতা প্রসঙ্গ হইয়া এখন সেই সংস্কারের উন্মেষ করিয়া দিই—পশুর স্বর্ণগতি হউক।

পশুসর্গের অপর দুই একটা মন্ত্র হইতেও বলিদান-বাণীপারে পশুর কল্যানকামনা ব্যস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। দেবতারা উদ্দেশ্যে পুরোহিত প্রার্থনা করিতেছেন:—

ময়োংস্তুঃ পশুরয়মপশুত্বক দীয়তাম।

উপযোগ্যত্বা কার্যো যথাকালং সর্বেব হি।
অর্থাৎ হে দেবত! আমি যে এই পশু প্রদান করিলাম, তুমি ইহার পশুত্ব রহিত করিয়া ইহাকে অপশুত্ব অর্থাৎ দিবা ভাবের সঞ্চার কর। এ ভ্রম গাথা বিহীন কথা আবশ্যক তৎ সমুদয় তোমাকেই করিতে হইবে।

“ইমং গুপ্তং প্রদর্শয়। স্বর্ণং নিয়োজয় মুক্তিং প্রয়োজয়।” অর্থাৎ উপরিষ্ঠ দেবতা দিগকে এই পশু দেখাও, স্বর্ণের ভ্রম নিয়োগ কর, মুক্তি প্রয়োগ কর।

উৎসাহের পর পুরোহিত যজ্ঞমানের পক্ষে পশুকে এই বলিয়া নমস্কার করেন।
“দেবতাপ্লীতিহেভুংগং সমাংসকৃধিঃ সদা।
দাতুং পদবিনাশয় ছাগলায় নমোমঃঃ”
হে পশো! তোমাকে বিশিষ্ট প্রকার মাংস কৃধির থাকান্তে তুমি দেবতাদিগের সর্বদা প্লীতি সম্পাদক হও; তোমাকে শোনাচ্ছে

দান করিলে, দেবতার দাতার আপন নাম করিয়া থাকেন। সেই আপন বিনাশক ছাগলকে নমস্কার করি।

নমস্কারের পর ক্রমাগ্ৰার্থন—

“পশুভ্যংপাদিতো দেবৈঃসিদ্ধো বিশেষতঃ।

তস্মাদমুক্ত-যজ্ঞার্থে হস্তযোহসি মধ্য পশো।

ধজ্যাদাতোহন্তং হৃৎং যন্তে মনসি বর্জতে।

তং ক্ৰম্য পশো ছাগ গার্হস্প্য লোকমাশ্রুতি।

দেবতার যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত বিশিষ্টপ্রকারে

তোমাকে পশুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; সে জন্ত

এই যজ্ঞে তুমি আমা কর্তৃক হস্তযা হইয়াছ।

এতদুপলক্ষে ধজ্যাদাতোহন্তং যে মহদুঃখ

তুমি পাইবে, তাহা ক্রমা কর; কারণ,

তৎফলে তুমি পশুদেহের পরিবর্তে স্বর্গীয়

গার্হস্প্য দেহ দারণ করার উপক্ষে হইতেছ।

এই সকল মন্ত্র হইতে কি প্রতিপন্ন হয় না

যে, আশ্বকল্যানের সহিত পশুর কল্যাণনা-

নাই বলিদানের একমাত্র উদ্দেশ্য। অহিন্দ্রা

বলিবেন, এসকল মন্ত্রতন্ত্রের মূল্য কি? ঐ

সকল মন্ত্রের যে মূল্য আছে এবং মন্ত্র দ্বারা যে

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ত্রিষ্টি ও বিজ্ঞান দ্বারা তাহা

অণুশীলনক্রমে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

হিন্দ্র জন্ত সে সকল আলোচনা অনাবশ্যক;

কারণ, এসকল মন্ত্র না মানিলে, সমগ্র পূজা

পদ্ধতিই মিথ্যা বলিতে হয়। হস্তরাং যে কণ্ঠ

দ্বারা পশু নিরুপ্ত পশুভয় পরিত্যক্ত করিয়া

অত্যাধিক্ত দেবত্বলাভের অধিকারী হয় এবং

সঙ্গে সঙ্গে দাতারও পরমকল্যাণ হইয়া থাকে,

সেই বলিদানকে অজ্ঞায় বলিয়া গোযারোপ

করা কি বাতুলতার কণ্ঠ নহে?

এখন কথা উঠিতে পারে, পশু বলিদান যদি

সূর্য্যবা সূর্য্যস্তোত্র হয়, তাহা হইলে এই কার্যে

পুরোহিত ব্রাহ্মণের প্রয়োজনীয়তা কি?

সকলেই তো একপ অহষ্ঠান করিতে পারে।

উত্তরে আমরা বলিব, ব্রাহ্মণই একাধে এক-
মাত্র অধিকারী। কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি।

আমাদের ভাবে প্রাচীনদিগের ভাবে স্বর্গ-মর্ত্য

ব্যবধান। আমরা নিজকে অশ্বম পাপিষ্ঠ

দেখাইয়া এবং উপাস্ত্রকে দ্বয়াম পিতা বলিয়া

তাঁহার দণ্ড ভিন্ধা করিয়া থাকি; কিন্তু আশ্ব-

গণ উপাস্ত্র দেবতার ও নিজের মধ্যে একতা

দেখাইয়া পূজাকল লাভ করিতেন। অতঃপর

দিক্কা অপেক্ষা একই প্রদর্শন দ্বারা যে সমধিক

ফল লাভ হয়, আমাদের কার্যাদিতেও তাহার

প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। মনে কর,

কিছুকালীয়া নানা প্রকার কাকূতি মিনতি

করিয়া তোমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিল;

এইরূপ দয়ার ফলে, তাহারা তোমার নিকট

হইতে, কত টাকা আদায় করিতে পারে?

নিতান্ত দাতাকর্ণ হইলেও তুমি তাহাদিগকে

তোমার সম্পত্তির অতি সামান্য মাত্রই প্রদান

করিয়া থাক; কিন্তু তোমার ভাতা পিতার

দেহে তোমার সহিত তাহার একই দেখাইয়া

পৈতৃকসম্পত্তির অর্ধেক অধিকার করিয়া

থাকে এবং তোমার পুত্র তোমার সহিত

একতারা দেখাইয়া তোমার ষোল আনা

সম্পদেরই উত্তরাধিকারী হয়; হস্তরাং অতঃপর

দিক্কা অপেক্ষা একই প্রদর্শন যে সমধিক

ফলপ্রসব একথা অস্বীকার করিবার উপায়

কোথায়? আধিগণ এইরূপে পূজাকালে

দেবতার সহিত আপনার একই সম্পাদন

করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিতেন।

দেবতার সহিত নিজের একতা প্রদর্শন

সামান্য মহত্বের কণ্ঠ নহে—স্বাভাবিক জ্ঞান-

বিজ্ঞান ও আত্মিকাবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণই

উপাস্ত্র-উপাসকে তেমন একই প্রদর্শন করিতে

সমর্থ। এজন্য অপর বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণ বর্ণই

পৌরহিত্য (প্রতিনিধিত্ব) সূত্র হন।

(‘জানবিজ্ঞানমাত্রিক্যং ব্রহ্মকণ্ঠং স্বভাজম্’)

প্রভৃতি শ্লোক গীতান্তে উদ্রব্য।

পুরোহিত ক্রিয়াকে আপনাকে দেবতারূপে

উদ্ভূত করিতে পারেন, অতঃপর তাহা বলা

যাইতেছে। নৃবাদিগণের উপাসনাতো যেমন

উপোদান প্রভৃতি অশ্ব আছে, ব্রাহ্মণের দেবা-

র্চনারূপেও তেমন, “হুত-ভক্তি” নামক এক

বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার অহষ্ঠান করিতে হয়। ঐ

হুত-ভক্তির বিধানমতে পুরোহিত নিজে

দেবতারূপে দারণ করিতে বাধ্য; যথা—

“ইতি ময়ৈব জীবৎ স্বধ্বনে সংস্থাপ্য দেবতা-

রূপমাদানং ত্রিভিষ্ঠয়েৎ।” তৎপর দেবতা-

রূপ ধান করিবার সময় পুরোহিত একটি পুষ্প

লইয়া যোযকপ চিত্রা করত সেই পুষ্প প্রদানে

স্বীয় মন্তকে প্রদান পূর্ব্বক মানসপূজা সম্পাদন

করেন এবং তদবসানে বাহ বাপারের অহু-

রোধে পুনরাহু তেমন পুষ্প লইয়া দেবপ্রতিমার

ও মন্তকে প্রদান পূর্ব্বক বাহ পূজা সমাধা করিয়া

থাকেন। ইহা হইতে, বুধা যয়, ঐ মানস-

পূজাই মুখ্য, বাহ পূজা সৌখ্য; সেই মানস-

পূজাতে পুরোহিত স্বয়ং দেবতাভাবে উন্নত

হইয়া পূজাপূজকের একতা সম্পাদন করেন।

এতদূশ পুরোহিত কণ্ঠে “জানবিজ্ঞান-

মাত্রিক্যং ব্রহ্মকণ্ঠং স্বভাজম্” এইরূপ ব্রাহ্মণ

বাতীত অপর কাহারও অধিকার থাকিতে

পারে না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুরোহিতের

পূজা যদি এতই উচ্চ ব্যাপার, তবে তাহাতে

পশুবলিদান কেন? সেই উন্নততম পুরোহিত

যজ্ঞমণের জন্ত এমন কঠিনদ্রব্য হইয়া

পশুবলিদান সহ্যতা করিতে পারেন কিরূপে?

এতদ্ব্যবহার বক্তব্য এই যে, “হুতভক্তি” করার

সময় পুরোহিত আপন দেহকে দেবদেহে

পরিণত করেন না, পরন্তু দেহোপ জীবাণাকে

পরমাশ্রিতে স্থাপন করিয়া তিনি আপনাকে

দেবতারূপে চিত্রা করিতে সমর্থ হন।

ইহাতে পুরোহিত দেহের সহিত জীবাণার

পার্বক্যভবন করিয়া থাকেন; হুতরাং

তিনি সাধারণের জায় আর দেহের পক্ষপাতী

থাকেন না। এইরূপে পুরোহিত যখন দেবতা

হন, তখন বলিযোগ্য পশু জীবাণাতো ও

পূজ্যদেবতাতো একাভবন করিতে থাকেন;

এই জন্তই তিনি তখন এই বলিয়া পশুস্বর্গ

করিতে পারেন যে—“বরুণমণ্ডলায়িত্রিত-

বিগ্রহহায়ে পশুভূপচণ্ডিকায়ে ইমং পশু-

প্রোক্তয়ামি।” অর্থাৎ বরুণমণ্ডলায়িত্রিত

দেহধারণী পশুভূপণী চণ্ডিকাকে এই পশু

অর্পণ করিলাম। জানবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ

ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি আপনার

পূজ্যদেবতাকে পশুর অপকৃষ্ট পদে অবনমিত

করিতে সমর্থ? এইরূপে দেবতাতো ও

বলির পশুতে একতা সম্পাদনের পর পশুদেহ

পক্ষে পুরোহিতের কষ্ট হইতে পারে না।

“অনকার মনুষ্যগণ এসকল কথার ভাব

বৃদ্ধিতে অসমর্থ; তাহারা জানে মৃত্যুতেই

সব সূচাইয়া যায়, মৃত্যুই সকলের শেষ।

এজন্য কোন কোন সভ্যজাতি নাকি

রাজবিদানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি

সহায়ভূতি প্রদর্শন করিয়া বৈদ্যাতিক যন্ত্রে

তাহাদিগের নিম্নন সাধন করিয়া থাকেন।

ইহাতে মরণকালে ছট ফট করিতে হয় না;

ইহাতেই যে কিছু অহুগ্রহ করা হয়। কিন্তু

তাঁহারা যদি পরকালের ভাব বৃদ্ধি করেন,

তাহা হইলে উদ্বন্ধন-মৃত্যু, বৈদ্যাতিক যন্ত্রে

মৃত্যু প্রভৃতি অপেক্ষা তাঁহারা ধজ্যাদাত

মৃত্যুর অধিকতর উপোগিষ্ঠা স্বীকার করিতে

পারিতেন। পুরোহিত যে বলিতেছেন—

“হে পশো! জন্মিলে মরণ অবধারিত,

আমি এমন প্রকৃতি। সহযোগে ভোমার মৃত্যু ঘটাইতেছি যে, তৎক্ষণা অতঃপর তুমি গুরুত্ব দেহ প্রাপ্ত হইবে; এই স্থিতি পাইয়া আমাকর্তৃক প্রদত্ত খণ্ডাঘাত-কষ্ট কমা কর" এ কথা বলি। আর কাল বৃথিবে কে? আমরা বলি, বাগদার শেখাবাদীর স্থিতির ভক্ত যুক্ত করিয়া যুক্তকে আলিঙ্গন করা পৌরষজ্ঞাপক মনে করে, স্বর্ণলাভের ভ্রম পশু দেহ পাত করা কি তাহারিণের নিমিত্ত এই শেচনীয! যে সকল বাবুয়া এখন বলি উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহারা এখন কি বলিতে চাহেন?

বাবুয়া দেবার্জনাতে বলিদান রহিত করিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রশ্রয়িত ভৎসন, কিস্তি মাসভক্ষণ রহিত করিতে তাহারিণের প্ররুতি দেখা যায় না; এক্ষণ হয় কেন? এ বিষয় চিন্তা করিলেই বৃষ্টিতে পারা যায়,—এই সকল মূল্যলবণ "অফিসা পরমোদয়" বলিয়া জন্মগ্রহণের বৈদিক যজ্ঞ লোপ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহারি মাসভক্ষণের লোভ তাগ করিতে পারেন না, অথচ বৈদিক কর্তব্য লোপ করার সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে ধর্মসম্বন্ধ পশুবলি উঠাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

ঢাকা প্রকাশ

৪। খেজুর চিনি।

যে যশোহর আজ ম্যালেরিয়ার বাসভূমি, যে যশোহর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জ্বরলা-কীর্ত্তি ও জনহীন হইতে বসিয়াছে, যে যশোহর এখন শিল্পবাণিজ্যহীন হইয়া শীতল অবস্থার বর্ধমান—যে যশোহরের নদী সমুদ্র মজিয়া উঠিয়া শৈবালদুর্মাজের বন্ধ হইতে কেবল বিষবাণ বিস্তার করিতেছে, অন্নকাল পূর্বে

সেই যশোহরে চিনির কারবারের প্রধান আড়াল ছিল। যশোহরের খেজুর-চিনি ভারতের সর্বত্র—এমন কি, ভারতের বাহিরেও রপ্তানী হইত। কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, কেশবপুর প্রভৃতি স্থানে বহু কারখানা ছিল। চিনির ব্যবসায় লাভ দেখিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মাতঙ্গেন ওয়াইলী কোম্পানী চৌগাছায় চিনির কল বসাইয়াছেন। তখন বেঙ্গল সেট্টলিং রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক—ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলপথও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতা হইতে নোকায়ে মাল চালান হইত, আর যশোহর পর্যন্ত পাকা রাস্তাও ছিল।

সেই গতযাতের অস্থবিধার সময় চৌগাছায় কল বসাইয়া যুরোপীয় মানোজ্ঞার পাঠান কিরণ লাভের আশায় সত্ত্বব হইত তাহা সহজেই অসম্ভব। কোটচাঁদপুরেও কল ছিল—সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, তখন চৌগাছা খেজুর গাছে পূর্ণ ছিল। চৌগাছার কল অনেক দিন পরে বন্ধ হয়। তাহার পর মিটার নিউগ্রালপ চৌগাছায় আবার কল বসান ও বেঙ্গ ডানলপ কোম্পানী সেই কল চালাইয়া পরে বন্ধ করেন। কল বন্ধ হইবার বিবেচন কারণ ছিল। ১০ হাজার টাকার মাল ১ লক্ষ টাকায় কিনিলে মূলধনের হ্রাস পোয়াইয়া লাভ হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। যশোহরকে কেন্দ্র করিয়া নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার কোন কোন স্থানেও চিনির কারবার চলিয়াছিল। এখন সে কাজ বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গলার একটা প্রধান ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে—সহস্র সহস্র লোক কাজ হারাইয়াছে। লর্ড কর্জন একবার বিদেশী—"রাঙ্গমাথাযাপুটী" চিনির উপর শুক বসাইয়া এ দেশের চিনির ব্যবসা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কর্জন একবার বলিয়াছিলেন, সরকারের কোন কাজে নামিতে কিছু বিলম্ব হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বর্তমানে লোক চিনির ব্যবসায়ের সর্বনাশ হেতু খেজুর বাগান কাটিয়া মাঠান, জমি করিয়া ধানবৎ ও পাটের চাষ করিতেছে। এখন সরকার কিসে খেজুর চিনির ব্যবসা রক্ষা পায় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ১৮৩৬৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ১৬ হাজার টন চিনি রপ্তানী হইয়াছিল, আর ১৮৪০৪১ খৃষ্টাব্দে রপ্তানীর পরিমাণ ৬০ হাজার টন হয়। এখন এই দুর্দশার সময়েও বৎস ১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয় ও তাহার মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা। আমাদের বিশ্বাস লোক চিনির দাম নিষিদ্ধে গুড়ের দাম লিখিয়াছেন।

সরকার হিচাবে করিয়া দেখিয়াছেন, প্রতি একারে ৩৫০ টি গাছ বসাইলে তাহার হইতে ৩ টন গুড় পাওয়া যায়। ইক্ষুর চাষে তাহা গুড় পাওয়া যায় না। আবার ইক্ষুর চাষ অনিশ্চিত—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা প্রভৃতিতে কোন কোন বৎসর চাষের অস্থবিধাও হয়। খেজুর গাছে সে অস্থবিধা নাই। রসের পরিমাণে বড় তারতম্য হয় না। আবার ইক্ষুর চাষে আমকাড়াই কল কিনিতে অনেক গরম করিতে হয়। খেজুর গুড় করিতে সে ব্যয় বাচিয়া যায়। সত্তা বটে, আকের চিনি করিতে আকের সিঁটাত্তেই জালানি হয়, খেজুর চিনি করিতে জালানি কাঠ কিনিতে হয়; কিন্তু খতাইয়া দেখিলে ইহাতে অধিক গরম পড়ে না। আবার খেজুর গাছের সঙ্গে সঙ্গে তালগাছ বসাইলে বড়ই স্থিতি

হয়। শীতের সময় পেজুরের ও গ্রীষ্মের সময় তালের রস পাওয়া যায়। তাহাতে সমস্ত বৎসরই কাজ চলিতে পারে।

পূর্বে উত্তর আমেরিকার আদিম নিবাসীরা গুড় প্রস্তুত করিত। তাহারাও গাছে চাট দিয়া যশোহর জেলায় ব্যবহৃত নলির মত নলি ব্যবহার করিত; গামলায় রস ঢালিয়া তাহার তপ্ত প্রস্তরও রসে ফেলিয়া গুড় প্রস্তুত করিত। ইহার পর তাহার রস জাল দিয়া গুড় করিত। এখন তথায় উন্নত প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হইতেছে।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, গুড় অনেকটা ভাল করা হইতে পারে। এক্ষণে মৃৎপাত্রের সঙ্গে জাল দেওয়া হয়। পাতগুলি প্রত্যা দেওয়া করা হয় না—পাতের পোড়া গুড় জমিয়া থাকে। তাই গুড় পরিষ্কার হয় না—কুসংবৎ হয়। ১৮২২২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রীমুক্ত ভূপালচন্দ্র বহু যশোহরের গুড় প্রস্তুতের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মৃৎপাত্রের পরিষেতে লৌহ কটীহ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছিলেন—গুড় ভাল হয়, আর সেই গুড় হইতে সেকি ফিউগাল কলে চিনি করিলে চিনি বেশ সাদা হয়। দেশে লৌহকটীহে রস জালাইয়াই ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল গুড় প্রস্তুত করা যাইবে। আর এক কথা গুড় জাল দিবার সময় রস ঢাকিয়া লওয়া প্রয়োজন; নহিলে গুড় পরিষ্কার হয় না।

বাঙ্গালার পাটশেওলা দিয়া গুড় পরিষ্কার হইয়া থাকে। ইহাতে অর্ধ ব্যয় অতি সামান্য বটে, কিন্তু চিনি প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। সেকি ফিউগাল কল ব্যবহার করিলে গুড় হইতে অতি শীঘ্র চিনি প্রস্তুত হয়; তাহাতে ঢাকা বহুবার ঘুরিয়া আসিতে লাভ হয়। ভূপাল বাবু বলেন ভাল গুড় লইয়া

তিনি সেটি ফিউগাল কলে অতি উৎকৃষ্ট তিনি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মত এই যে, এই কল ব্যবস্তু হইলে চাষীরা উৎকৃষ্ট গুড় প্রস্তুত করিবে।

রস ধরিবার প্রথারও পরিবর্তন করিতে হইবে। ভাঁড়ের বদলে ঢাকনিওয়ালা খাত্ত-পাত্ত ব্যবহার করিতে না পারিলে পায় সাক করিবার ব্যবস্থা হইবে না। এনামেল করা পাত্তেরে রস ধরিয়া দেখা যিখাচ্ছে, ভাঁড়ে ধরা রস অপেক্ষা সে রস ভাল। ইহার কারণ এই ভাঁড় সাক করা হয় না। তাই ভাঁড়ে রস ধারণ হয়।

রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে গুড় ভাঁড়ে না পুরিয়া পিপা বা ক্যানেস্তারায় পুরিলে স্ববিধ হয়। সময় সময় নাগরীর বাব্বা গুড়ের সঙ্গে কলে পড়ে। তাহাতে কলের ফিটার ব্যাগের কাপড় ছিড়িয়া যায়। আবার গরুর পাজীতে আনিবার সময় নাগরী ভাঙিয়া গুড় নষ্ট হয়। পিপা বা ক্যানেস্তারায় ব্যবহার করিলে সে ভয় থাকে না।

রিপোর্টে দেখা যায় সেটি ফিউগাল কল বসাইয়া রস কিনিয়া তিনি প্রস্তুত করিলে যথেষ্ট লাভ হয়। ইহার লজ্জ বড় বড় কারখানা সংস্থাপিত করিলে যে লাভ হইতে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

একটা কথা জানা প্রয়োজন। 'রিপোর্টে' যে কলের কথা বলা হইয়াছে, সে কল কিরূপে চলিবে? তাহাতে কিরূপ ব্যয় পড়িবে? আমাদের বোধহয় চম্বীদিগের পক্ষে এরূপ কল সংস্থাপন করা সম্ভব হইবে না। স্তত্রাং যদি বড় বড় 'আড়ং' কেহ কল সংস্থাপন করেন, তবেই কল হইতে পারে। ইহাতেও কিছু অসুবিধা যে নাই এমন নহে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি চিনির ব্যবসায়ের অসুবিধা বৃদ্ধি অনেক খেজুর-বাগান কাটিয়া মাটান জমি করিয়া চাষ করিতেছে। কোন্ আশার আবার তাহারা খেজুর বাগান করিবে? খেজুরগাছ বড়

হইয়া রস দিবার উপযোগী হইতে সময় লাগে। যতদিন নতুন গাছ বড় হইয়া রস দিবার মত না হয় ততদিন রসের পরিমাণ অধিক হইবে না—কলেও যথেষ্ট কাজ হইবে না, আবার রস না বাড়িলে লোক বাগানও বাড়াইবে।

যাহা হউক, সরকার যদি আমদানী চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে খেজুর চিনির ব্যবসায়ের নতুন জীবন সঞ্চারের উপায় করেন, তবে লোকের আয়ের উপায় হইবে।

এ বিষয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবর্তক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে 'বরগত' নহেন, কেবল ব্যবসা বজায় রাখিবার ও কারখানা-ওয়ালাদের উৎসাহ দিবার লজ্জ তিনি অনেক দিন লোকদান দিয়াও একটা কারখানা চালাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও চৌগাভার শ্রীকৃত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে সকল অমৃত-বাজার পত্রিকায় প্রকাশ করেন ও সেই সূত্রে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন যদি সরকার চেষ্টা করিতেন তবে কেবলমাত্র এই ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার সহজসাধ্য হইত। এখন সে কাজ আর সহজসাধ্য নহে।

সরকার যদি 'রিপোর্ট' বাহির করিয়াই নিশ্চিন্ত না হন, পরন্তু তাহাতে বড়ে খেজুর চিনির ব্যবসা তফা পায় তাহার উপায় করেন তবে বরবাদীর মহত্বপূর্ণ সাধিত হইবে—শত শত নিরয় বাস্তাবীর আয়ের উপায় হইবে। আমতা আশাকরি, সরকার সে বিষয়ে অবহিত হইবেন; আর বিদেশগত সরকারী সাহায্যে পুট চিনির সহিত প্রতিযোগিতার আবশ্যকীয় উপায় করিবেন।

জাগরণ।

পরিশিষ্ট

গোলাকার চক্কি অধিত করলেও দক্ষিণাবর্তে রাশি কল্পনা ক'রে গ্রহাদি স্থাপন করা উচিত। এইবার আমি পাশ্চাত্য পঞ্জিকার সাহায্যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে গণনার পদ্ধতি বলি।

আমি। তা'র আগে ভাব-চক্র-প্রস্তুত-প্রণালী বলুন।

গুরুদেব। তা'ই বল্চি। প্রথমে দশম সাধন ক'রে হ'বে। সকল দেশের জ্ঞানই দশম সাধন জ্ঞান লঙ্কোদয়-বগাই ব্যবহার্য্য।

আমি। কেন?

গুরুদেব। এই যে লগ্নে চরসংস্কার করলে তা'র হেতুটা কি? বুঝেছ কি?

আমি। ঠিক ব্রহ্মিণি। তবে অস্থান করি যে পূর্ব-পশ্চিম দেশান্তর হিঙ্গাবে যেমন একটা কালান্তর-সংস্কার করা হয়, অক্ষ-অনুসারে ওটাও একটা সংস্কার-বিশেষ।

গুরুদেব। সংস্কার বিশেষ বটে, কিন্তু প্রয়োজন কি? সেটাত বোঝা উচিত। পূর্বে ব'লেছি যিব্বত ও ক্রান্তি বৃত্ত পরস্পর তির্যাকভাবে অবস্থিত। উভয়ের সম্পাতস্থলে প্রায় ২৩ অংশ ২৮ কলা কোণ আছে (ইহার পরিমাণ নিরন্তর পরিবর্তিত হ'চ্ছে) এখন ভেবে দেখ, যিব্বতস্থিত দেশের পক্ষে, রাশিচক্রটি সমান ছ'ভাগে বিভক্ত হ'তরায় সম্পাত বিন্দুর সন্নিহিত রাশি, চতুর্থেয়ের অর্থাৎ মেঘ, মীন, তুলা ও কন্টার উদয়-পরিমাণ অল্প ও একবিধ, চাপের সমাধিত রাশি চতুর্থেয়ের অর্থাৎ মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকুরের উদয়কাল লকলের চেয়ে বেশী ও একবিধ অপর চারিটার উদয়-পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইলেও মেঘাদি অপেক্ষা অধিক ও একবিধ; তা' তুমি পূর্বেই দেখেছ। রেলযাত্রী যেমন নিকটস্থ বৃক্ষকে দূরতর বৃক্ষ অপেক্ষা দ্রুতগামী মনে ক'রে এও কতকটা সেই রকম মনে ক'রে পার। কিন্তু যিব্বতের উত্তরস্থিত কোনও অক্ষ হ'তে দেখলে, সেই অক্ষ যদি ২৩ অংশের উত্তরে হয়, তবে অবশ্যই কর্কট সন্নিহিত ও মকর দূরতর হ'বে, অত্যাচ্ছ অক্ষের পক্ষেও উত্তরার্দ্ধস্থিত রাশি ছয়টি সন্নিহিত ও দক্ষিণার্দ্ধ স্থিত রাশি ছয়টি দূরতর হ'বে সম্ভব নাই, যিব্বতের দক্ষিণস্থ অক্ষের পক্ষে ঠিক বিপরীতই হ'বে। তা'র পর লগ্ন যেমন জন্মস্থানের পূর্বাংশে, তাৎকালিক ক্রান্তি অনুসারে উদ্ভিত হয়, দ্বিতীয় ও দ্বাদশ তাহার দক্ষিণস্থ কোনও দূরতর অক্ষের এবং একাদশ ও তৃতীয় তদপেক্ষা দূরতর অক্ষের অর্থাৎ যিব্বত সন্নিহিত অক্ষের উপরে হ'বে আর দশম অবশ্যই সকল অক্ষের পক্ষে যিব্বতের উপরে বা ০ অক্ষে বা নিরক্ষে অবস্থিত, একটা গোলক নিয়ে দেখলে একখাটা বেশ ভাল ক'রে বুঝতে পারবে।

আমি। আচ্ছা আমি তাই করুবো।

গুরুদেব। দশম সাধনের জ্ঞান একট লঙ্কোদয়-সারিণী ক'রে হ'বে।

আমি। ঐ লগ্ন-সারিণীর মত ক'রে ত?

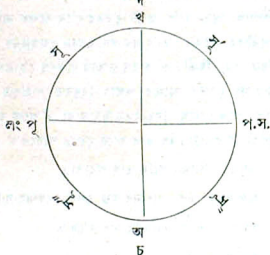
গুরুদেব। হাঁ।

আমি। আমি তবে সে সারিণী করি—

লঙ্কোদয় বা দশম-সারিণী ।

রাশি	মেঘাবস্ত্র হইতে অংশমান	লঙ্কোদয় মান পল	মেঘাবস্ত্র হইতে পল	ভোগ্য
১ মেঘ	৩০	২৭৮	২৭৮	২২২
২ বুধ	৬০	২২২	২৭৭	৩২৩
৩ মিতুন	৯০	৩২৩	২০০	৩২৩
৪ কর্কট	১২০	৩২৩	১২২০	২২২
৫ সিংহ	১৫০	২২২	১৫২২	২৭৮
৬ কন্যা	১৮০	২৭৮	১৮০০	২৭৮
৭ তুলা	২১০	২৭৮	২০৭৮	২২২
৮ শুক্লিক	২৪০	২২২	২৩৭৭	৩২৩
৯ বৃষ	২৭০	৩২৩	২৭০০	৩২৩
১০ মকর	৩০০	৩২৩	৩০২৩	২২২
১১ কুম্ভ	৩৩০	২২২	৩৩২২	২৭৮
১২ মীন	৩৬০	২৭৮	৩৬০০	২৭৮

গুরুদেব । ই হ'য়েছে । এই সারিণী অথবা রেখী সর্গর দশম গণিত হ'বে ; কেন তা'ত বুঝে । এখন কি করে গণনা ক'ত্তে হ'বে সেইটা বুঝ । দশম লগ্নটা যে তৎকাল টিকি
ক-স্বত্বকের সমস্রয়ে যে মধ্যরেখা উত্তর
দক্ষিণে আছে—তা'রি উপর হ'বে, তা
বোধ হয় বুঝে ; এখন বেশ মন
সংযোগ ক'রে ভেবে দেখ—দশমের
ফুট ও অবস্ত্র মেঘাবস্ত্র হ'তে কত দূরে
তা'হির ক'রে নিতে হয় । গণনার
সময় স্বর্ঘ্যের স্থানটিই আমাদের জানা
আছে লগ্নফুট নির্ণয় সময়ে যেমন সাধন
স্বর্ঘ্যের ফুট পরিমাণকে পল করে
জন্মসময়ের পল তা'তে যোগ করে লয়
পাই ; কিন্তু দশমের সময় সর্গর সে
কথা বাটে না । কারণ যদি পূর্ণাহ্নে জন্ম হয়, তা'হ'লে দশম স্বর্ঘ্যের স্থানের পরে থাকবে,



আর পরে হ'লে স্বর্ঘ্য পরে থাকবে । স্বর্ঘ্য যদি 'সু' চিহ্নিত স্থানে থাকে, তবে স্বর্ঘ্য ফুট হ'তে 'সু' বাদ দিলে দশম ফুট হবে । যদি 'সু' চিহ্নিত স্থানে থাকে, তবে স্বর্ঘ্যফুটে 'সু' দ্বি-
দ্বিগুণ যোগ করা চাই । 'সু' স্থানে থাকলেও যোগ করলে চলবে । 'সু' স্থানে বিয়োগ
ক'ত্তে হয় । অথবা সর্গর বামার্ধে যোগ ক'রে চক্র বাদ দিলেও হ'তে পারে । অর্থাৎ
মধ্যাহ্নে স্ব পূ হ' চ হ' প হ' ন এই চাপের, যতটুকু যোগ করবার, ততটুকু যোগ করলেই
হ'বে ।

আমি । ঐ দূরত্ব কি ক'রে বার ক'ত্তে হয় ?

গুরুদেব । কিন্তু অস্থমান ক'ত্তে পার না ?

আমি । ভেবে, ত পাই না ।

গুরুদেব । লগ্ন ও স্বর্ঘ্য যদি এক স্থানে থাকে ?

আমি । তা হ'লে বোধ হয় দিবাক্ষিই ঐ দূরত্ব । আর পূর্ণাহ্নে হ'লে বোধ হয় দিবাক্ষি
থেকে যতটুকু বেলা হ'য়েছে ততটুকু বাদ দিলে যা থাকবে সেই টুকুই সেই দূরত্ব আর
অপরূহ হ'লে মধ্যাহ্নের যতটুকু পরে ততটুকুই সেই দূরত্ব আর প্রথম রাজ্যেও তাই—আর
শেষ রাজ্যেও তাই হ'তে পারে ।

গুরুদেব । পারে বটে, কিন্তু দিবাক্ষির সঙ্গে যতটুকু রাজি আছে সেটুকু যোগ করে
বাদ দিলে সোজা হয় । আর বামাগ্ধের কথা কি রকম ; বুঝলে কি ?

আমি । বোধ হয় সু পূ পূর্ণাহ্নের বেলা) + পূ সু অ সু প (সমস্ত রাজি)
+ পূ সু) (দিবাক্ষি) এইটুকু বা ইহার প্রয়োজনীয় অংশ যোগের কথা বলেছেন ।

গুরুদেব । ই । এখন এই দুই উপায়ে ঐ লম্বের দশম এই লঙ্কোদয়-সারিণীর সাহায্যে
কর দেখি ।

আমি । ঐ দিনের দিনমান ৩০ । ৩২ স্তরতা দিবাক্ষি ১৬ । ৪৬—জন্মসময় ২ । ৩৫ ঘটাদি
= ৬ । ২৭ । ৩০ ঘটাদি, কি বলেন ?

গুরুদেব । তা হলে হয় না । ব্যাটীর সময় সব দিন দিবাক্ষি নয়, এ দিন ত নয়ই ।

আমি । তবে উরয় ৪২১ মি. ১২ থেকে বাদ দিয়ে হ'ল ৬ ঘটাদি ৩৯ মিনিট তা'র সঙ্গে
৮টা ৩৫ মিনিট যোগ করে হ'লো ২ ঘটাদি ১৪ মিনিট বা ২৩ দণ্ড ৫ পল । দিব্যমান
৩৩.৩২ থেকে বাদ দিয়ে বাকি রৈল ১০ দণ্ড ২৭ পল বেলা থাকতে জন্ম । দিবাক্ষি ১৬.৪৬ থেকে
ঐ ১০ দণ্ড ২৭ পল বাদ দিয়ে পেলাম ৩১২ ঘটাদি । মধ্যাহ্নের এই ৩১২ ঘটাদি বা
৩১২ পল পরে জন্ম এইটা স্বর্ঘ্যফুট লগ্ন পলে যোগ করি ?

গুরুদেব । ই ।

আমি । তৎকাল স্বর্ঘ্যালঙ্ক—

$$\begin{array}{r} ৮৮২ পল \\ + ৩১২ পল \\ \hline ১২৯৪ পল \end{array}$$

মেঘাবস্ত্র হ'তে ৪ কর্কট পর্যন্ত ১২৩৩

৩৮ পল

∴ সিংহের মান (লঙ্ঘন) ২২৯

∴ ২২৯ : ৩৬ :: ৩০ : কত ?

$$\frac{৩৬ \times ৩০}{২২৯} = \frac{১১৪০}{২২৯} = ৩।৩২$$

∴ ৪।৩।৪২ সায়ন দশম ক্ষুট।

$$\frac{-০।২১।৪৭}{৩।১২।২২} \text{ নিরয়ণ দশম ক্ষুট।}$$

অপাণ্ডুলির জন্ম স্বতন্ত্র উদাহরণ না হ'লে হবে কি করে ?

শুক্রেব। যখন এটা পেয়েছে, অপর গুণাও হ'বে। এখন ষাটশ ভাব করে ও ভাব সন্ধি নির্ণয় করে কিরূপে আমাদের দেশের মতে ভাবচক্র আঁকতে হয় শোনো। লগ্নে ছয় রাশি যোগ করে সপ্তম, আর দশমে ছয় রাশি যোগ করে চতুর্থ ভাব হ'বে। যেমন বর্ধমান কেশে পেয়েছে লগ্ন (নিরয়ণ) ৬।২১।৪৭ আর নিরয়ণ দশমক্ষুট গেলে ৩।১২।২২ হুস্তরা নিরয়ণ সপ্তম ১।২১।৪৭ এবং নিরয়ণ চতুর্থ ৯।১২।২২; সায়ন লগ্ন ও দশম থেকে সায়ন সপ্তম ও চতুর্থ ক্রমে ও পার তাতে সায়ন ভাব হ'বে। তারপর লগ্ন ও চতুর্থের অন্তরের তৃতীয়াংশ লগ্নে যোগ করে দ্বিতীয় বা দ্বন ভাব, তাতে আর এক তৃতীয়াংশ যোগ করে তৃতীয় বা দোদর ভাব আর লগ্ন ও দশমের অন্তরের তৃতীয়াংশ দশমে যোগ করে একাদশ বা আয়তভাব তাতে আর এক তৃতীয়াংশ করে ষাটশ বা বায় ভাব পাওয়া যাবে, একাদশে ছয় যোগ করে পঞ্চম বা স্তম্ভভাব, ষাটশে ছয় যোগে ষষ্ঠ বা রিপুভাব, দ্বিতীয়ে ছয় যোগ করে অষ্টম বা আয়তভাব তৃতীয়ে ছয় যোগে নবম ধর্মভাব পাবে। লগ্নকে তহুভাব, চতুর্থকে বদ্ধভাব, সপ্তমকে জায়া ও দশমকে কর্মভাব বলে। পর পর ছুটিভাবের সমষ্টির অর্ধেক ভাবসন্ধি। এই ভাবসন্ধিতে স্থিত গ্রহ কোন ভাবেই ফল দেন না। শুভ গ্রহ, ভাবের শুভ এবং অশুভ গ্রহ অশুভ বিধান করেন এই সাধারণ সূত্র। বিশেষ নিয়ম বিচার প্রসঙ্গে বলা যাবে। এখন ভাব ও ভাবসন্ধি চ'সে চক্র অঙ্কিত কর।

আমি। যে আজ্ঞা

∴ লগ্ন ৬।২১।৪৭

দশম ৩।১২।২২

৩।৩।৭।৩৩

১।২।১৩

∴ দশম ৩।১২।২২ কর্মভাব।

+ ১।২।১৩

একাদশ ৪।১৪।৩৩ আয়তভাব।

+ ১।২।১৩

ষাটশ ৫।১৭।৪ বায়ভাব।

এবং চতুর্থ ৯।১২।২২

লগ্ন ৬।২১।৪৭

৩।২।২২।২৭

০।২৭।২২

∴ লগ্ন ৬।২১।৪৭ তহুভাব।

+ ০।২৭।২২

দ্বিতীয়ে ৭।১৭।৪ দ্বনভাব।

+ ০।২৭।২২

তৃতীয়ে ৮।১৪।৩৩ দোদরভাব।

এই গুলির সপ্তম যথাক্রমে

চতুর্থ ৯।১২।২২ বদ্ধভাব।

পঞ্চম ১০।১৪।৩৩ পুস্তভাব।

ষষ্ঠ ১১।১৭।৪ রিপুভাব।

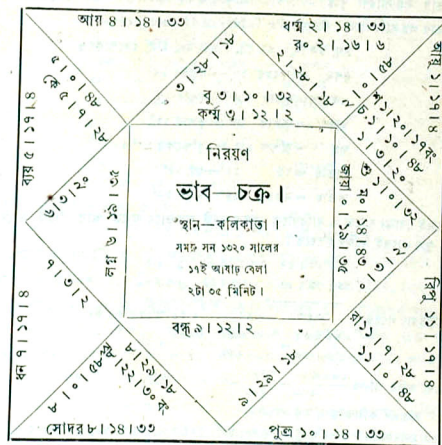
সপ্তম ০।২১।৪৭ জায়াভাব।

অষ্টম ১।১৭।৪ আয় বা যত্নভাব।

নবম ২।১৪।৩৩ ধর্মভাব।

এখন এই সূত্র ভাবের পর পর ছুটির অর্ধ নিলে সেই দুই ভাবের সন্ধি হ'বে। অতএব এই সন্ধিগুলি নির্ণয় কর।

শুক্রে। হাঁ, এইবার একটি চক্র অঙ্কিত করে তাতে ভাব ও ভাব সন্ধি কিরূপে নির্দেশ করে হ'বে তা দেখ—



শুক্রেব। আমাদের দেশীয় মতে ভাবচক্র প্রস্তুত কর্তে শিবল এখন ব্যাকুলের পরিচায় সাহায্যে কিরূপে লগ্ন কর্তে হ'বে তা দেখিয়ে দিচ্ছি—আমাদের অভ্যস্ত দিন ১লা জুলাই, জি: ১৯১৩ অব্দ বেলা ২টা ৩৫ মি: অপরাহ্ন—

র্যাকেলের পঞ্জিকার ১৪ পৃষ্ঠায় দেখ—

১লা জুলাইয়ের গ্রীষ্মক মধ্য-মধ্যাহ্নে নাক্ষত্রকাল ৬ ঘ ৩৫ মি ৪৪ সে

আমি। কৈ গ্রীষ্মক মধ্য মধ্যাহ্ন ত লেখা নাই।

গুরুদেব। পঞ্জিকার মলাটে লেখা আছে।

আমি। হাঁ পেয়েছি। তা'র পর—

গুরুদেব। ১লা জুলাই গ্রী, ম, ম, না, কাল—৬।৩৫।৪৪

+২।৩৫।০

+সংস্কার ঘ ৩৫ মিনিটে ০।০।১২৫

জন্ম সময়ে নাক্ষত্রকাল—২।১১।২

এখন এই অঙ্ক (২।১১।২) সাহায্যে দ্বিবিধ উপায়ে লম্ব নিরীত হ'তে পারে। প্রথমতঃ কলিকাতার লম্ব-সারিণী দৃষ্টে। দ্বিতীয় ত্রিকোণমিত্তির সাহায্যে। এই র্যাকেল প্রণীত কলিকাতার লম্ব-সারিণীতে (Raphael's Tables of Houses) দেখ—

২ঘ, ১৩ মি, ৫২ সে, এবং ২ঘ, ২মি, ৫০সেকেন্ডে

দশম—সিংহের ১০°—সিংহের ১৫°

একাদশ—কন্টার ১৮°—কন্টার ১৭°

দ্বাদশ—তুলার ১৪°—তুলার ১৭°

লম্ব—বৃত্তিক ১৪°-২—বৃত্তিকের ১৩°-১০°

দ্বিতীয়—দহ ১৪°—দহ ১০°

তৃতীয়—মকর ১৪°—মকর ১০°

সহজেই বোঝা যাচ্ছে এ সারিণীতে কেবল লম্বটি স্থানভাবে আছে আর পাঁচটি ভাবের পরিমাণ স্থল ভাবেই নির্দিষ্ট হ'য়েছে।

২।১৩।৫২ ২।১৩।৫২ বু ১৪-২

২।২।৫০ ২।১১।২ বু ১৩-১০

স্থতরাং লম্বের ৩৫০ : ২৪৩ :: ০-৫২ অপর গুলির ৬০

২৪৩ × ৫২ = ১২৬০৪ ২২ ৮৬৬৬

৩।৫২ ২৩২ ২৩২ = ৬৬

এবং অপর গুলির ১৬০ × ৬০ = ৯৬০০ ২৭৮০

২৩২ ২৩২ = ৫৪

অতএব কলিকাতার অষ্ট সায়েন—

লম্ব ৭।১৩।২৬, দ্রি ৮।১৩।১২, তু ৯।১৩।১২, ব ১০।১৩।১২, ঘ ১১।১৩।১২

সপ্তম ১১।৩২।৬, অ ২।১৩।১২, ন ৩।১৩।১২, দ ৪।১৩।১২, ষ ৫।১৩।১২, ঙ ৬।১৩।১২

চক্র এ'কে, তা'র পর পঞ্জিকা থেকে গ্রহগণের তাৎকালিক স্থিতি নির্ণয় করে এই চক্রে বদালই ভাবচক্র পূর্ণ হলো। পঞ্জিকাতে ঐদিক স্থিতি আছে।

আমি। আচ্ছা, আমি কপি। কুল হয় কি না আপনি দেখুন। উদয় থেকে অস্তকাল পেয়েছি ২৩ দণ্ড ৫ পল।

১০ই অষাঢ়—১৭ই অষাঢ় = ৬০ দণ্ডের গতি অংশাদি।

রবি ২।১৩।৪১ - ২।১৭।৪৪ = + ০।৫৭

চন্দ্র ২।১৩।৩৭ - ১। ৫।৩৫ = + ১।৩২

মঙ্গল ০।১৬.২ - ০।১৫।২৬ = + ০।৪৩

বুধ ৩।১১।১৮ - ৩।১০। ১ = + ১।১৭

বৃহ ৮।২২।২৫ - ৮।২২।৩৩ = - ০। ৮

শুক্র ১। ১। ৭ - ১। ০।১০ = + ০।৫৭

শনি ১।২০।১৫ - ১।২০।১৭ = - ০। ২

রাহু ১।১। ৭।২৬ - ১।১। ৭।২২ = - ০। ৩

কেতু ৫। ৭।২৬ - ৫। ৭।২২ = - ০। ৩

১৭ই তারিখের ২৩ দণ্ড ৫ পল এর গতির তাৎকালিক

ঐদিকস্থিতি গতি অংশাদি স্থিতি

রবি ২।১৫।৪৪ + ০।২২ = ২।১৬।৬

চন্দ্র ১। ৫।৩৫ + ৫।৩৩ = ১।১০।৪৮

মঙ্গল ০।১৫।২৬ + ০।১৭ = ০।১৫।৪৩

বুধ ৩।১০। ১ + ০।৩১ = ৩।১০।৩২

বৃহ ৮।২২।৩৩ + ০। ৩ = ৮।২২।৩০

শুক্র ১। ০।১০ + ০।২২ = ১। ০।৩২

শনি ১।২০।১৭ - ০। ০ = ১।২০।১৭

রাহু ১।১।৭।২২ - ০। ১ = ১।১।৭।২৮

কেতু ৫। ৭।২২ - ০। ১ = ৫।৭।২৮

এইবার এ গুলিকে ঐ ভ্রাবচক্রে লিখি।

গুরুদেব। লেখো। বৃহস্পতি আর শনিতে (বং) বক্রী লেখ।

এইরূপে এই সারিণীর সাহায্যে অনায়াসে কলিকাতা অঞ্চলের মায়ন লম্বাদি নির্ণয় ক'র্তে পারো। অবশ্য বিদ্য-ভৌমিগীর মতে যে লম্ব পাবে, তা'র সঙ্গে এর অনৈক্য হ'বে; কিন্তু কেন হয় তা তোমায় এর পর বুঝিয়ে দিব এবং এও দেখিয়ে দিব যে এই অঙ্কও স্থল নয়। কলিকাতার এই লম্ব সারিণীও ভূমি চট্টোপাধ্যায়ের ফলিত জ্যোতিষের দ্বিতীয় খণ্ডে পাবে। শ্রীযুক্ত অ্যালেন লিও সাহেবের গৃহেও বিস্তৃতভাবে সকল অঞ্চলের লম্বনির্ণয় সারিণী আছে, এবং তাহার ব্যবহার প্রণালীও সেই গ্রন্থেই পাবে।

এখন ত্রিকোণমিত্তির সাহায্যে কিরূপে লম্ব নির্ণীত হ'তে পারে তা'র উপায় বলছি—
লম্বটি জাতকের অঙ্কে উল্লিখিত কিন্তু চক্রটি ত্রিখণ্ডভাবে আছে বলে, দ্বিতীয় ও দ্বাদশের অবস্থিতি অঙ্ক পরিমাণ অবশ্য লম্বাপেক্ষা অল্প এবং তৃতীয় ও একাদশের অঙ্ক আরও অল্প এবং দশমের অঙ্ক শূন্য, এ কথা পূর্বেই বলেছি এই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ককে, সেই সেই গৃহের পোল (Pole) বলা হয়। আমরা যাহাকে চর বলি। ইহা নির্ণয়ে উপায় পাশ্চাত্য মতে এইরূপ—

প্রথমতঃ প্রত্যেক গৃহের উদয়াস্তের নির্ণয় করতে হ'বে। তাহার নিয়ম এই—

লগ স্পর্শিনী (Log tan) ক্রান্তি-পরমাপক্রম (ক্রা.প) এবং জন্ম স্থানের অক্ষাংশাদির লগ স্পর্শিনীর যোগে, তৎস্থানের উদয়ান্তর-জ্যার লগ লক্ষ হয়। যথা—কলিকাতার অক্ষ ২২°৩০ তাহার লগ স্পর্শিনী ২.৬১৮২২৫

অতএব Log. tan. Latitude ২.৬১৮২২৫

+ লগ, ক্রা, প, স্প Log tan Obliquity of the Ecliptic ২.৬৩৭৪২৬
- উদয়ান্তর জ্যা Log Sine Asc. Dif. ১.°-২৩° = ২.২৫৫৭২১

এই উদয়ান্তরের তৃতীয়াংশের জ্যা, ক্রা, প, লগ কো-স্পাতে (Log cotan) যোগ করলে প্রথম একাদশাদি (১১.৩৫১২) গৃহ চতুর্থেয়ের এবং দুই তৃতীয়াংশ যোগে দ্বাদশাদি (১২.২৬৮) গৃহ চতুর্থেয়ে পোল বা চর হইবে।

উদয়ান্তর পাইয়াছি ১০ অংশ ১৩ কলা তাহার তৃতীয়াংশ—

$$\frac{১০।২৩}{৩} = ৩.২৭৭ \text{ এক তৃতীয়াংশ}$$

সুতরাং দুই তৃতীয়াংশ = ৬।৫৫

অতএব লগ, ক্রা, প, কো-স্প Log cotan O. E. = ১.°৩৬২৫.৪

+ লগ জ্যা Log sine = ৩.২৮ - ৮.৭৮১৫২৪

লগ স্প চর Log tan I. Pole = ৭.৫৬ ২.১৪৪০২৮

এবং

লগ ক্রা, প, কো-স্প Log cotan O. E. = ১.°৩৬২৫.৪

+ লগ জ্যা Log sine ৬।৫৫ = ২.°৮.৭১২

লগ স্প চর Log tan II. pole ১৫।৩০ = ২.৪৪০২২৩

অতএব পাইলাম কলিকাতার জন্ম

একাদশাদির - ৭।৫৬ বা ৮

দ্বাদশাদির - ১৫।৩০ বা ১৫

এতদ্ব্যতীত লয়ের তদন্বয় অক্ষ ২২।৩০

এবং দশমের বিদ্যুৎক্ষ ০।০

এইবার ভাব গণনার সূত্র পোনো—

কোনও গৃহের বক্রোখান-চাপের লগ কোজ্যা (Log Cosine) + ঐ গৃহের চর-(Pole)

কো-স্প-লগ (Log Cotangent) = বক্র কোণের কো-স্প-লগ (Log Cotan) গৃহের চাপ ২০ অংশে কম ও ২৭০ অংশের বেশি হয় তবে বক্র-কোণে পরমাপক্রমের (obliquity of the ecliptic) অংশাদি যোগ করিলে ঐ কোণ হইবে, অতথা উভয়ের অন্তরই ঐ কোণ।

তৎপরে বক্র কোণের কোজ্যা-লগ (Log cos) + গৃহের স্প-লগ (log tan) হইতে ঐ ঐ কোণের কোজ্যা লগ (Log cos) বিরোধ করিলেই লয়ের স্প-লগ (Log cos) হইবে। গৃহের বক্রোখান পরিমাণ তুলা বা মেঘ হইতে এক্রপে স্থণাঙ্ক বা ধনাঙ্ক অংশাদির দ্বারা নির্দেশ করিতে হইবে যেন ২০° অংশের অধিক না হয়।



“বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ,—
সকলেই একভাবে ভাবুক, একই মস্তের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক।
ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইয়ারাই প্রথম সেনাপতি।”

গৃহস্থ

“মনে পড়ে সে বালকে ? বুহুং সে প্রাণ
ববীর ঔর্যের যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে ?
চৌকিকে প্রকৃতি তার হস্ত প্রসারিছে
আনন্দ স্রুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গুরু বাধি তরু ছায়ে, তরুণে তরুণে—
সমুদ্রে নবন, মাথা হস্ত পথে পথে,
বৌস করে অহতব, সিদ্ধ অহতব,
স্বপ্নস্পৃষ্ট প্রাণে প্রতিবিন্দু অহতব।

* * * * * কত চিরদিন—

কোথা লোক ? প্রাণ বার মুক্ত ? পৃথিবীর
সর্বদ্রোণ পড়ে দেখা ? লুপ্ত কি গভীর—
প্রতিবর্ণ জড়জীবের বন্ধু এক করি’
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি ?
দুর্ভাগ—ওই জেলে-ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্র মাঝে করিয়া কেপণ
নিজেরে সহসা, বহু, হুলিয়া ভুবিয়া
আবার অনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্তমুখে ফলাশস্ত ফেলে কব্জিহাল—
“নিশ্চয় উঠিরে মংগু”—বৈরাঘ্যুত ভাল।
সে লোক নিশ্চয় অতি পোষ ভালবাসে
—তা ন’লে কি জলে পড়ি ওইকণ্ঠ হাসে ?
—জীবন, জীবন, তাই, আনন্দ জীবন।”

সত্যীশচন্দ্র রায় ।

৫ম খণ্ড

৫ম বর্ষ

ফাল্গুন, ১৩২০

৫ম সংখ্যা

আলোচনা

১। সাহিত্যে কাচিষ্ট-ধর্ম
আমরা গতবার “বঙ্গের উদীয়মান কাব্য-
সাহিত্য” আলোচনায় পরলোকগত ভাবুক-
কবি সত্যীশচন্দ্র রায় সখদে বলিয়াছিলাম,
“সত্যীশচন্দ্র পালায়ান—বিত্তিকার সঙ্গে,
ছথের সঙ্গে মন যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি

দৃঢ়পদে জীবনসমুদ্র-মন্ডনে ব্যাপ্ত। সত্যীশ
মাহুয়, মেঘ-হুল্লভ দুর্দলতা তাঁহাকে স্পর্শ
করে নাই।”

প্রায় পনের বৎসর পূর্বে “সাহিত্য”-পত্রে
শ্রীমুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের জীবনী মহাশয় ৩৫মেশ
চন্দ্র বটব্যাল সখদেও আলোচনা করিতে

সিয়া প্রায় এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তখনকার সাহিত্য-সমাজের প্রতি স্নিহেবী মহাশয় একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন।

“এই দুর্ভাগ্য দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় সমগ্র প্রদেশটা যে সেনা-কর্তৃক অধিকৃত, সেই সেনাতন্ত্র বীরপুরুষগণের বীরত্বের আফালন বশেষ্ট আছে। কিন্তু তাঁহাদের শমীর মেঘদণ্ডের ও অস্থিরকালের অস্থির-সংক্ষেপে যোর প্রমাণভাব। রামায়ণের আমলে ও হোমারের আমলে বীরপুরুষেরা বাহ্যুত্রে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বাহ্যুত্বটিকে একবারে অনাবৃত্তক বলিয়া জানিতেন না; তাহে বাহ্যুত্বটুকু একবার আরম্ভ হইলে তাহার কল শব্দর পক্ষে বড় বিষম হইত। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রের বীরেরা যে বাক্য-বাণ প্রয়োগ করেন, তাহার তীক্ষ্ণতা কখন অহভবের বিষয় হয় না; এবং তাঁহারা যে অন্তরের আফালন করেন, তাহা কাহারও পৃষ্ঠে কখন কাটিয়া বসে না। এক শ্রেণীর লেখকের অত্যাচারের মনে হয়, কি অন্তঃকণ্ঠেই এ দেশে কমলাকান্তের দগ্ধর ও উদ্ভূতপ্রসঙ্গের প্রকাশ্য হইয়াছিল। আর এক শ্রেণীর লেখক নিত্য পুরাতন জীব সত্যকে জীর্ণতর বেশকুণ্ডায় কথকিং সাজিত ও আবৃত্ত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেন; তাহার প্রতিও কোনরূপ অহুয়োগ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বরকৃষ্ণি স্বয়ং যে ব্রীহিস্পত্য বর্ষে বর্ষে উৎপাদন করেন, তাহা, ভ্রমিতে পাই, একান্ত নাইট্রোজেনবর্জিত; আর বঙ্গের বাগদেবতা যে সাহিত্যের স্রষ্টা করেন, তাহা “ধুম-শ্লেতাঃ সলিল-মরুতাঃ সপিপাতাঃ;” বঙ্গদেশে কাঠিত-বর্ধকবিশিষ্ট সামগ্রীর এত অভাব কেন, তাহা বৃথাগণের আলোচ্য।

উদ্দেশ্যচর্চা-বিশেষের বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটয়াছিল। উদ্ভূতসের হাওয়া ও বাক্যের কুয়ঙ্গা কাটাঁইয়া উদ্ভূত আলোকে ও কঠিন মস্তিষ্কার দুই দণ্ড দাঁড়াইবার অবসর দিয়া তিনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। তাঁহার উদ্ভূত অন্ত্রে কেবল অজ্ঞান ও ক্ষমতা ছিল না; তাহাতে ধার ছিল; যে বাহ্যতে তিনি সেই অঙ্গ ধারণ করিতেন, তাহাতে অস্থি ও পেশী বর্তমান ছিল। কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি প্রবণেজ্ঞের বিরক্তি জন্মাইতেন না। তিনি প্রায়ই নূতন কথা বলিতেন, এবং পুরাতন কথাকেও নূতন ভাষায় বলিতেন। নূতন সামগ্রীর আশ্বাসনে আমাদের রসনা নিত্য নিন্দ্য পরিতৃপ্ত হইত; নূতন নূতন তথ্যের আভাস পাইয়া আমাদের অস্বস্তিক্রিয় বহিমুখে আসিত ও তন্ত্রাত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিত। এদেশের লেখকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসা নহে; এবং এদেশের পাঠকের পক্ষে ইহা সামান্য মৌজা নহে।

আমরা বঙ্গের নব্য কবি ও লেখকগণকে রামেন্দ্রচন্দ্র-প্রচারিত কাঠিত-বর্ধকের সন্ধান করিতে আহ্বান করিতেছি। এই জ্ঞাত গত সংখ্যায় বলিয়াছিলাম, “এই ঈশাণ, আশ্বর্ষন, চিত্তাবীন, বাগাভবপূর্ণ কবিতারামির দিনে সতীশচন্দ্রের গভীরতা, গাভীরা, ওজপিতা ও ভাবুকতা উদীয়মান লেখকসম্প্রদায়কে সাধনার প্রবালী দেখাইয়া দিবে। বোধ হয় সতীশচন্দ্র তোমাদের নিকট করুণ, নীরস, ঐতিহ্যের বোধ হইবে; কিছু দুর্বোধ্যও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রাণময় কবিতার মধ্যে পাইবে, ‘জীবন, জীবন, ভাই, আনন্দ জীবন।’ * * এই সরস সজীব ভাবপুঞ্জ আবার নিজেই

তাঁহার বিচিত্র ভাষা গড়িয়া লইবে। তাঁহার প্রয়োজন হইলে তোমরা সতীশচন্দ্রের ব্যাকুল আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কাঠিতা ছিঁড়িয়া, ভাষাকে ভাঙিয়া চুরিয়া বাহির হইতে পারিবে।”

* *

২। পাঠকসমাজ

আমরা সাহিত্যে কাঠিত-বর্ধক কামনা করিতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইতেছে, বঙ্গের পাঠক-সমাজকে সেই কাঠিত উপভোগ করিবার জ্ঞাত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাঁহারা অনেক দিন ধরিয়া ম্যামামারা প্যানপ্যানে ভাবেই উপভোগ করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁহাদিগকে সলল ও কঠোর ভাব এবং গভীর ও গভীরতর চিন্তা-রাশি গ্রহণ করিবার জ্ঞাত উদ্ভূত হইতে হইবে।

গত সাত আট বৎসরের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশবাসী শিক্ষা ও সাহিত্যের আন্দোলনের ফলে সমাজের সকলস্তরের সাহিত্য-রস-পিপাসা জাগ্রত হইয়াছে। ইহা আমাদের এই যুগের একটা স্বলক্ষণ। কিন্তু এই পানেই সম্ভট থাকিলে চলিবে না।

এখন নূতন নূতন তথ্য, নূতন নূতন জগৎ-কথা, নূতন নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশীল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়ে সেই বিষয়গুলি অনেক পাঠকের কাছেই কথকিং দুর্বোধ্য ও কঠিন বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া পতঙ্গবদ হইবার প্রয়োজন নাই। সে গুলিকে বুদ্ধিতে চেষ্টা করিতে হইবে—সে গুলি নবশিক্ষার্থীর দ্বারা শিক্ষা করিতে হইবে।

বঙ্গভাষা নানা উপায়ে অপূর্ণ শ্রী লাভ করিতেছে। এক্ষণে মানুষী উপায়ে আমরা তাহাকে কিছুতেই বুদ্ধিতে পারি না। ভাষার প্রাঞ্জলতা সপক্ষে পুরাতন মাপকাঠি এখন সর্বোপায়ে প্রয়োজ্য হইবে না বুদ্ধিরা রাধা উচিত। আজ কাল সময় সময় লেখকগণের ভাষা কঠিন বোধ হইয়া থাকে। তাঁহার প্রধান কারণ—আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি নূতন। যাহারা নূতন কথাগুলি শিখার জায় বুদ্ধিবার জ্ঞাত সাধনা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা ইহা ভাষার অপ্রাঞ্জলতা ও দুর্বোধ্যতা করুণা করিয়া ভীত হইতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গের নূতন-তত্ত্ব-প্রচারকগণের ভাষা সকল স্থলে দুর্গমই নহে। স্তব্ধতা পাঠকগণ ঈর্ষ্যা এবং মনোযোগ স্বত্বকরে নূতন জ্ঞান অর্জন করিতে যদি প্রস্তুত না থাকেন, তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে বাঙ্গাল-সাহিত্য দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, এবং বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি জগতের দ্রুত সমস্ত-গুলি বিমোহন করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না।

আমাদের আশা আছে, বঙ্গীয় পাঠক বাঙ্গালী জাতিকে সেই নিম্ননীয় ও শোচনীয় অবস্থায় অধঃপতিত হইতে দিবেন না, এবং বাঙ্গালীর সমালোচক ও সম্পাদক মহাশয়গণও এই বিষয়ে তাঁহাদের গুরু দায়িত্ব উল্লিখিত করিতে পরাম্ভ হইবেন না।

* *

৩। বঙ্গভাষায় প্রাণ-বিজ্ঞান
বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষা, সমাজ, ধন-সম্পত্তি ও রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু প্রাণ-বিজ্ঞান সপক্ষে সেরূপ কিছু দেখা যাইতেছে না। অথচ এই বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণোক্ত কোন

বিষয়ের আলোচনা বা জ্ঞান কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

হৃৎকের কথা ছই একজন লেখক এইরকি অগ্রসর হইয়াছেন। গতবর্ষের "অর্থনীতি"য় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ বি, এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত বিধগুণি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, যথা, 'স্বাভিবেচিতা', 'স্বাভাবিক নিরীচন', 'প্রাপের বিকাশ', 'জীব ও উদ্ভিদ', 'জীবন-সংগ্রামে স্বাভাবিক নিরীচন', 'জীবের শক্তি: উৎপত্তি', 'আদি প্রাণ' এবং 'সুখশান্তি জীবের শ্রেণীবিভক্তি'। শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ বি, এল্ মহাশয় বহুদিন হইতেই 'নব্যভারত' এই বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। তাহার সেই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে—নাম 'মানব-সমাজ'। এই পুস্তকখানি প্রত্যেক শিক্ষিত বাদ্দালীর পঠি করা কর্তব্য। নবীন ও প্রবীণ পাঠক এবং লেখকগণ সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মহলে সুপ্রসিদ্ধিত তত্ত্বগুলি সহজেই অধিকার করিতে পারিবেন। অক্ষয়কুমার দত্তের 'বান্ধবজ ও মানব-প্রকৃতি' গ্রন্থের পর বন্ধুভাষ্য এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাহির হয় নাই। আধুনিক প্রাণ-বিজ্ঞানের নিদান্ত-গুলির মোটামোটি জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বন্দী সাহিত্যসেবীরা অগ্রসর হইবেন না কি? আমরা রায় মহাশয়ের ভাষায় বলিতেছি—

"আর 'সৌন্দর্য'-উপভোগের সময় নাই; আমরা ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি। হিতকর বৈজ্ঞানিক আলোচনা কটকর হইলেও, একগে তাহাতেই দীর্ঘভাবে মনোনিবেশ করা আমাদের অসম্ভব হইয়াছে, সম্ভব নাই।"

৪। যুক্ত-প্রদেশে শিক্ষা-সমস্যা। হিন্দুস্থান অঞ্চলে হিন্দী ও উর্দু ভাষার পাঠ্যপুস্তকগুলি দেশীয় সন্তান সন্ততিগে পক্ষে অযোগ্য নয়। তথাকার জনমানবগণ পাঠ্য-পুস্তক নিরীচন প্রণালীর সংস্কার করিতে চেষ্টা হইয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশের জনগণ শিক্ষাব্যাপারে এত পশ্চাদগম কেন? ইহার প্রধানতম কারণ এই যে এখানে উর্দুর মধ্য দিয়া সাধারণ শিক্ষা দান-চলিয়া থাকে। কিন্তু উর্দুর মধ্যে আরবিক ও পার্শী শব্দের বড় মিশ্রণ। ইহার অক্ষর স্ত্রীলা ও বড় কঠিন এবং বিদেশী। সেইজন্য যদিও এ ভাষা আদালত এবং শিক্ষিত মূল্যমানবিধের মধ্যে প্রচলিত, অধিকাংশ লোকই ইহা ভাল রকম বুঝিতে পারে না।

পঞ্জাব প্রদেশেও প্রায় যুক্ত-প্রদেশের মতই অবস্থা। সেখানেও এই উর্দু ভাষার প্রচলন। কিন্তু যুক্ত-প্রদেশের কুমায়ুন বিভাগে 'আদালত স্থল' প্রভৃতিতে উর্দু ব্যবহৃত হয় না। সেখানে নাগরীর চলন। সেইজন্য সেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা হাজার করা ২২১ জন। তারপর এলাহাবাদের সংখ্যা—১৩ জন। অত্যাধিক, সেখানে হিন্দী ভাষার প্রাবল্য, শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী। বারানসীতে হাজার করা ৭১ জন শিক্ষিত। কিন্তু রোহেলখণ্ডে উর্দুর প্রাবল্য। সেইজন্য সেখানে হাজার করা ৪৪ জন মাত্র শিক্ষিত। কয়লাবাদ এবং লক্ষনৌতে, হাজার করা ৫০ এবং ৫৬ জন, কারণ সেখানেও উর্দুই বেশী প্রচলিত।

তারপর দেখা কর্তব্য—যে সমস্ত বালক গ্রাম্য স্থলে উর্দুতে পাঠ সমাপন করে, তাহাদের কি পরিমাণ সংখ্যা পার্শী পড়িতে ও লিখিতে পারে—শিক্ষতা লিখিতে ও

পড়িতেই বা তাহাদের কত বৎসর লাগে। কিন্তু নাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী সম্বন্ধে এসব প্রশ্ন আদৌ উঠে না। যে কোন বালক ছই তিন বৎসর গ্রাম্য পাঠশালা বা স্কুল কোথায়ও এই ভাষা শিক্ষা করিলে, সে তাহার সমস্ত জীবনই এই ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। আজকাল স্থলে যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হয়, তাহাদের ভাষা বড়ই কর্ণা। অনেক সময়েই তাহা প্রতিকট এবং অস্পষ্ট। ইহার কারণ পাঠ্যপুস্তকগুলির লেখকেরা সাধারণতঃ খুব শিক্ষিত অথবা প্রথিতনামা সাহিত্যিক নহেন। তারপর শোনা যায় যে পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রথমতঃ ইংরাজীতে লেখা হয়, এবং শেষে হিন্দী ও উর্দুতে অনূদিত হইয়া থাকে। ইহাতেও ভাষাটা নীরস ও কর্ণা হইয়া উঠে।

উর্দু এবং হিন্দী পাঠক উভয়েই সহজে বুঝিতে পারিবে এই ভাবিয়া অনেক লেখক উর্দু ভাষা প্রয়োগ করেন, অথচ সেই ভাষাকেই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী বলিয়া মনে করা হয়। এই ভাষার মধ্যে পার্শী ও আরবিক শব্দের মিশ্রণ খুব বেশী হইয়া থাকে, ইহার ফল বড়ই শোচনীয়। সাধারণের ভাষা করিতে গিয়া হিন্দী ভাষাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ লেখকেরা অথবা এমন সব বিদেশী শব্দ চালাইয়া যান যাহা শিক্ষিত মূল্যমান এবং আদালতে সন্নিষ্ট হিন্দু ভিন্ন দেশের আর কেহই বুঝিতে পারে না। এই সব লেখকদিগের রুত ভাষা কাজে কাজেই দেশবাসীর এবং আধুনিক ও পুরাতন হিন্দী লেখকদিগের ভাষা হইতে নিতান্তই বতস্ত হইয়া পড়ে।

এমন সমস্ত হিন্দী ও উর্দু পাঠ্যপুস্তক নিরীচন করা কর্তব্য, যাঁহা এই সব ভাষার প্রসিদ্ধ লেখকদিগের দ্বারা প্রণীত।

আধুনিক পাঠ্য পুস্তকের ভাষার জন্য শিক্ষার বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে। শিক্ষিত পিতামাতা এই সব পুস্তক নিতান্তই মূল্যহীন বলিয়া মনে করেন, এবং পুস্তকজ্ঞানের শিক্ষা দিতে যাঁহা তাঁহারা অনেক সময় এই সব পুস্তকের পরিবর্তে প্রসিদ্ধ লেখকদিগের পুস্তক পাঠ করান। গ্রামের অথবা সহরের ছেলেরা ছই তিন বৎসর পাঠসমাপনান্তে হিন্দী রামায়ণ ভাল করিয়া পড়িতে ও বুঝিতে পারে। ইহাই গ্রাম বা সহরের অধিকাংশ হিন্দু অভিভাবকদিগের অভিপ্রায়। কারণ রামায়ণ হিন্দুশিক্ষার কাছে অতিশয় আদরণীয় এবং ছেলেরদের হাতে দিবার নিতান্ত উপযুক্ত। আজকাল শিক্ষা ছয় বৎসর উপরিউক্ত পাঠ্য পুস্তক পড়িয়াও ছেলেরা রামায়ণের ভাষা বুঝিতে সমর্থ হয় না! অতএব যাঁহাতে ছাত্রেরা হিন্দী পড়িতে ও লিখিতে শিখিলেই রামায়ণ শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

আর খিওন্ডার মরিনন বলিয়াছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষাকার্য্য মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই যাহাতে হয়, তাহাই এখন দেশবাসী প্রার্থনা করিতেছে। আজ হোক কাল হোক বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রার্থনায় কর্পাত করিবেন, একগুণ আশা করা যায়।

হৃত্যং বিস্তৃত হিন্দী অথবা বিস্তৃত উর্দুতে পাঠ্যপুস্তকগুলি লিখিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং ক্রিমি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক লিখন-প্রণালী একেবারে বর্জনীয়।

৫। কংগ্রেসের আবশ্যকতা

পূর্বে কংগ্রেস সন্থে আলোচনাকালে আমরা বলিয়াছিলাম, কংগ্রেসকে রক্ষা করা নিত্যান্তই প্রয়োজনীয়। এত বড় একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসমুখে প্রেরণ করা কিছুতেই মুক্তিসম্ভব নহে। ইহার সহিত যোগদান করিয়া ইহার মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করা নতুন নতুন কৃষ্ণিগণের সর্গাধা কর্তব্য। এবার “প্রবাসী”ও করাচীর কংগ্রেস প্রসঙ্গে আমাদের অল্পরূপ কথাই বলিয়াছেন—

“দেশীয় সমালোচকেরা বলেন যে একটি বার্ষিক তিন দিনের তামাশা করিয়া কি লাভ? প্রথম উত্তর এই যে, কংগ্রেস ত বলে না যে তোমারা কেবল তিন দিনই রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা করিবে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন করিতে কংগ্রেস নিষেধ করে না, বরং করিতেই বলে। সম্বল্লের যে কাজ হইবে, সে বোধ দেশের লোকের; কংগ্রেসের নহে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে বৎসরান্তে কেবলমাত্র একবারও সমস্ত দেশের লোকদের কি অভাব ও দাবী তাহা এক প্রাণে অহুতব করা এবং বলার মূলা আছে ও আবশ্যক আছে। তত্ত্বির, এই যে সমগ্র ভারতের নানাতামাভাবী, বিভিন্নপ্রাধিকারধারী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু জাতীয় মহত্বের তিন দিনের ভ্রমও একত্র সমাবেশ, একত্র বাস, একত্র কণ্ঠস্থটান, পরস্পর কথোপকথন ও বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হওয়া, ইহা কি একজাতিত্ববোধ বৃদ্ধি করে না? নিশ্চয়ই করে। কংগ্রেস আর কিছু না করিয়া থাকিলেও যে ঘূরের মাছকে নিকট এবং পরকে আপন করিবার সাহায্য করিয়াছে, ইহাতেই তাহার জয় ও অস্তিত্ব সার্থক হইয়াছে।

দেশীয় সমালোচকদিগের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে কংগ্রেস কেবল আবেদন প্রার্থনাই করেন, ধাবলধন করেন না। ইহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, কংগ্রেস এমন অনেক বিষয়ে আবেদন করেন, যাহাতে আবেদন ভিন্ন আর কিছু করা যাইতে পারে না। আমরা খুব খাবলম্বী হইলেও নিজেই জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারি না, দিবালা সারিসের পরীক্ষা ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ চালাইতে পারি না, কাপড়ের শুক উঠাইয়া দিতে পারি না, বিচার ও শাসন-বিভাগ স্বতন্ত্র করিতে পারি না। সত্য বটে, দেশমধ্যে শিক্ষা-বিস্তার আমরা নিজেই অনেকদূর করিতে পারি, নানা শিল্পেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিংবা পরিমাণে করিতে পারি, দেশের বাহ্যের উন্নতির চেষ্টাও অল্পকাল করিতে পারি। এরূপ চেষ্টা দেশে যে একেবারে হইতেছে না, তাহা নয়; কংগ্রেস যে “এরূপ চেষ্টার বিরোধী, তাহাও নয়।”

৬। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বদেশী বিদ্যালয়

ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ভারতবাসী যত্ন দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনাদের জগৎ গড়িয়া তুলিতেছেন। সেই চেষ্টার তাহার কত নির্ণায়ক সফল করিতেছেন, সে সংবাদ কাহারও অবিরতি নাই। আমরা বলিয়াছি, সেই নির্ণায়ক ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণীর লোক নহেন। তাহাদের মধ্যে “প্রায় সকলেই মুল্লী, দোকানদার, ফেরিওয়ালা; সোঝা কথায় ‘চামা’ অর্থাৎ mass পদবাচ্য।”

এই অনিশ্চিত জনসাধারণ প্রবাসে অসাধারণ চরিত্রবস্তার পরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের এই চরিত্রবস্তা কেমন করিয়া জাগ্রত হইল, সে কথা স্মৃতিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, কৃষকীর পাকীর অস্বাস্থ্য ও নিষাধ সেবাই ইহার একমাত্র কারণ। শুধু কতগুলো কাপা বক্তৃতায় তিনি জনসাধারণকে মুগ্ধ করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি নানা উপায়ে তাহাদের আশ্রয় হইতেও আপন হইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার বহু কথের মধ্যে আজ একটি মাত্র কথের উল্লেখ করিব।

যত্ন প্রবাসে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার স্বত্ব তিনি একটি স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিম্নতর হইতে কোন বেতন লওয়া হয় না। গ্রন্থপাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রভৃতি প্রায় বাস্তবীয় বিষয়ই ছাত্রদিগকে শিখান হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের উপরে ছাত্রদিগের চরিত্র যাহাতে সংগঠিত হয়, তাহার যাহাতে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করে, তাহার দিকেই অধ্যাপকগণের বিশেষ দৃষ্টি। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার নিজের নিজের ধর্ম সন্থেও কিছু কিছু উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে—এতদ্বর্ষে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠও নির্দিষ্ট করা হয়। সমগ্র শিক্ষাপ্রণালীর মূল উদ্দেশ্যই এই যে—ছাত্রগণের মনে এই ভাবটা দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া দিতে হয় যে, তাহার ভারতবর্ষের সমান এবং সেই হিসাবে তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস পৃথক হইলেও তাহার পরস্পরের অত্যন্ত আপন। বিদ্যালয়ে ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের জীবন-যাত্রাও বড় সাদাশিখা।

এই সকল নৈতিক কারণেই দক্ষিণ

আফ্রিকার ভারতবাসীগণ আজ অত্যাশীনের সঙ্গে দৃঢ়চিত্তে গংগ্রাম করিতে বন্ধপরিকর হইতে পারিয়াছে।

৭। সিংহলে বৌদ্ধ শিক্ষাপরিষৎ

কলিকাতার শিক্ষাবিষয়ক পাব্লিকপত্র ‘কলেজিয়ানে’ কলম্বো নগরের একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তথাকার বহু পণ্যমাত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ একটি বৌদ্ধশিক্ষাপরিষৎ সংগঠন করিয়াছেন। সিংহলবাসী বৌদ্ধদিগের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য তিন উপায়ে সাদিত হইবে। প্রথম—স্কুল, কলেজ, ট্রেণিং ইনষ্টিটিউশন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এবং টেকনিক্যাল স্কুল অথবা এবিধ অথ কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা, দ্বিতীয়—সিংহল অথবা সিংহলের বাহিরে যুগ্মদ্বি প্রদান করিয়া। তৃতীয়—পুস্তক প্রকাশ করিয়া।

উক্ত পরিষদে তিন শ্রেণীর সভা গ্রহণ করা হইবে। যাহারা বৎসরে ১০,০০০ টাকা দান করিবেন, তাহার যাবজীবন সভা, এবং যাহারা বৎসরে ১২০ টাকা দান করিবেন, তাহার সাধারণ সভা এবং যাহারা বৎসরে অন্তর ২০ টাকা দিবেন, তাহার বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

আমরা এই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সর্গবিধ মঙ্গল কামনা করি।

৮। ভারত সম্বন্ধে “টাইম্‌স্‌” ও “ইংলিশম্যান”

“টাইম্‌স্‌” পত্রিকায় “ভারতাত্ত্বিক” নামে কতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলিশম্যান তৎসম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া, বলিয়াছেন—“টাইম্‌স্‌” ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন—তিনি বাস্তবকে বড় কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। সত্যসত্যই ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা তত ভীতিপ্রদ নহে। অবশ্য রাজবিদ্রোহের ঘটনাগুলি জন্মশই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং বহু জেলায় সম্প্রদিত ভীষণ ভীষণ অপর্যবেক্ষিত কর্তৃপক্ষ কিছু উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, গবর্ণমেন্ট অবিস্মৃতিভাবেই চলিয়াছেন। জনসাধারণ শান্ত এবং সুখী। কোথায়ও বাণিজ্যের কোন বাধাবিপত্তি ঘটে নাই। এখনও ইউরোপীয়গণ নির্ভীকভাবে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমনাগমন করিতে পারেন। পর্যটকগণ পুস্তক পড়িয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা করেন, তাহাই তাঁহারা আজও বিশাল লোকারণ্য কিংবা পরিত্যক্ত প্রাচীন নগরের মধ্যে দেখিতে পান! ইউরোপীয়গণ কোথায়ও সশস্ত্র হইয়া গমন করেন না। পল্লী এবং নগরবাসী ব্রিটিশ শাসনে পূর্বের মত নিরপজ্জবেই কাল কাটাইতেছে।”

৯। পকনদে হিন্দী—“সংস্করণ”

হিন্দী ভাষার শ্রীলঙ্কা ও পরিপূর্ণিত ভ্রম সমগ্র আধ্যাত্মিক বিশেষতঃ পকনদে বিপুল আয়োজন চলিতেছে। শ্রীলঙ্কা সত্যদেব হিন্দী সাহিত্য প্রচারকেই জীবনের ব্রতরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আমেরিকার

একজন গ্রাজুয়েট। স্বদেশে আশিয়া তিনি অতি সামান্যভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। তিনি বারিয়ারত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ নিত্যসুই সামান্য রকমের—স্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার করেন। সাহিত্যের হিতকরতা তাঁহার এই স্বার্থত্যাগ বঙ্গদেশে অনেকেরই অস্থ-করনীয়। “আধ্যাত্মিক” ও নানাশৈল গুরুত্ব প্রদীষ্টা করিয়া হিন্দীসাহিত্যকে উন্নত করিয়া তুলিতেছেন। বঙ্গত অচিরেই হিন্দীসাহিত্য বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি পঞ্জাবের “হিন্দুস্তান” উচ্চ-শিক্ষিতের মধ্যে হিন্দী-অধ্যয়নবর্ধনার্থ ৫০০ পঞ্চাশ টাকার একটি ত্রৈমাসিক পারিতোষিক বিতরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন গ্রাজুয়েট হিন্দুস্তানের অধ্যয়নদিত বিষয়ে হিন্দীতে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন, তিনিই উক্ত পুরস্কার লাভ করিবেন।

১০। মহারাষ্ট্রে সংস্কৃত-চর্চার

ভবিষ্যৎ

মহারাষ্ট্রে সংস্কৃত-চর্চা জইয়া বিষয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। স্মার সাম-কৃষ্ণ ভাগ্যরকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করেন যে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সংস্কৃত প্রকৃতি প্রাচীন ভাষা শিক্ষার ভিত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হউক। অধ্যাপক পরাধ্বজ প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাহাতে আপত্তি করেন। তাঁহাদের মতে পণ্ডিতদিগের শিক্ষাপ্রাণী উদার নহে। প্রাচ্য পণ্ডিতেরা চিরন্তন প্রথায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া বড়ই মর্জী

হইয়া উঠেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের মত্ব করিবার অভ্যাগা বড়ই নিম্ননীয়।

অবশ্য ভাগ্যরকরদের এ সব কথা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা নানারূপে প্রায় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বহু সম্মান পণ্ডিত ও শাস্ত্রী উদারতার দৃষ্টান্তস্থল। দাফিনাভা বিধবা-বিবাহের আন্দোলন সর্ব প্রথমে একজন শাস্ত্রীর দ্বারাই উপস্থাপিত হয়। স্ততএব এই ইংরাজী শিক্ষার দিনে দেশভের চর্চা “গুরুজিত” হইলে বহু বিষয়ে দেশের মঙ্গল হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণের নিকট হইতে সংস্কৃতধ্যায়ীরা নূতন প্রণালীতে তুলনামূলক সমালোচনা শিক্ষা লাভ করিবেন, এবং গ্রাজুয়েটগণও পণ্ডিতদের নিকট হইতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়া তাহা নানা কাজে লাগাইতে পারিবেন। পণ্ডিতগণ “মত্ব” করিবার পক্ষপাতী বটে, কিন্তু না সুবিধা মুখ বরা তাঁহারা কেহই অহমোদন করেন না।

..

১০। বঙ্গের লোক-গণনা

বঙ্গদেশের বিগত ১৯০১ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের লোক-সংখ্যা সম্ভ্রতি সরকারের পক্ষ হইতে গণনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে সরকারী কাগজ-পত্র মধ্যে মধ্যে বাহির হইতেছে। সেই সকল কাগজ-পত্র হইতে সংকলন কর্তৃক বঙ্গদেশবাণিগণ সম্বন্ধে অবগতাতব্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে দেওয়া গেল। বহরম-পুরের সাহিত্যসেবী উকীল শ্রীকৃষ্ণ রাধারমণ মণোপাধ্যায় বি. এল., মহাশয় আমাদিগকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

(১)

এখনকার বঙ্গ প্রদেশের লোক-সংখ্যা ৪,৩৩,০৫,৬৩২ জন, বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে গেলেই প্রথমে হিন্দু-মুসলমানগণের সম্বন্ধই লিখিতে হয়।

(২)

এক্ষণে যে জেলাগুলি লইয়া নূতন বঙ্গ প্রদেশ সৃষ্ট হইয়াছে তথায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ৩২ লক্ষ বেশী, শতকরা ৫২ জন মুসলমান ও ৪৫ জন হিন্দু।

পূর্বে যে সকল জেলা বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল তন্মধ্যে পূর্ব্বায়া, মানস্কুম, সাঁওতাল পরগণা, ধলভূম, হাজারীবাগ, ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর এবং আসাম প্রকৃতি জেলাগুলিতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুই বেশী। এক্ষণে এই সকল স্থান বাঙ্গালাদেশের বহির্ভূত।

(৩)

পশ্চিম বঙ্গ শতকরা ১৩ জন মুসলমান

মধ্য	৪৮	৪৮	৪৮
উত্তর	৫২	৫২	৫২
পূর্ব	৬২	৬২	৬২
বগুড়া জেলায়	৮২	৮২	৮২

এবং পার্শ্বায়া জিপুরা ও চট্টগ্রাম প্রদেশে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

ইহা হইতে যেন বোধ হয় এমন কি বাঙ্গালীদের মধ্যেও মুসলমান-সংখ্যা হিন্দু-দিগের অপেক্ষা অধিক।

(৪)

পশ্চিম বঙ্গ শতকরা ৮২ জন হিন্দু

মধ্য	৫১	৫১	৫১
উত্তর	৩১	৩১	৩১
পূর্ব	৩১	৩১	৩১

(৫)

নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক—

বর্ধমান মেদিনীপুর ২৪ পরগণা
বীরভূম জগদী দার্শনিক
বাঁকড়া হাবড়া জলপাইগুড়ি

চট্টগ্রাম পাহাড়

কুচবিহার শার্কিত্তিকগুণা

কলিকাতার হিন্দু সংখ্যা মুসলমানের
অপেক্ষা অনেক অধিক। কলিকাতার দশ
আনা লোক-হিন্দু।

(৬)

সমস্ত হিন্দুর সংখ্যা যত তাহার

তিনভাগের একভাগ পশ্চিম বঙ্গে
সিকরিও বৈশীভাগ পূর্ব

পাঁচ ভাগের এক ভাগ মধ্য ও উত্তর

“

১১। বঙ্গে লোক-বুদ্ধির হার

হিন্দু মুসলমান

সমগ্র বঙ্গে—শতকরা ৩২	শতকরা ১০৪
পশ্চিম “ “ ১৭	৪২
উত্তর “ “ ২৩	৮২
পূর্ব “ “ ৬৬	১৪৬
মধ্য “ “ ৫২	৩২

বিগত ৩০ বৎসর হইতে হিন্দু অপেক্ষা

মুসলমান বরাবর বেশী বাড়িয়া আসিতেছে।

নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বেশ বুঝা

যাইবে—

সাল	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭২	১৭,১২২,২৪৫	১৬,৬৮৭,৬৪৩
১৮৮১	১৭,২৫৪,১২০	১৭,৮৩৩,৪১১
১৮৯১	১৮,০৬৮,৬৫৫	১৮,৫৮২,৩৪২

এ সময়ে হিন্দুরা শতকরা ১৬ জন বাড়িয়াছে

মুসলমানেরা “ ২৪ “ “

পূর্ব বঙ্গে এই সময়ের মধ্যে মুসলমানের

সংখ্যা শতকরা ৫০ জনেরও অধিক এবং হিন্দুর

সংখ্যা শতকরা ২৬ জনেরও অধিক বৃদ্ধি

পাইয়াছে।

১৮৯১ সালের পূর্বে যাহাঙ্গিগকে হিন্দু
বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহাদের
মধ্যে ভূতপ্রভু-পূজক অনেককেই এখানে
ভিন্নশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ধর্মগত
উদ্ভাৱের সহিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পার্থক্য
নির্ণয় করা অসম্ভব কঠিন, এ কথা কর্তৃপক্ষীয়
অনেকেই স্বীকার করেন। উদ্ভাৱের মধ্যে
বংশ-বুদ্ধির হার অধিক।

হিন্দুদের বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে বুদ্ধির হার
নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্রাহ্মণ শতকরা ৭৫ জন

বৈদ্যা “ “ ২ “

কায়স্থ “ “ ১৩ “

পুষ্ঠানদের মধ্যে বুদ্ধির হার শতকরা
২২ জন।

সহরেই পল্লীগাম অপেক্ষা অনেক অধিক

হারে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অথচ পল্লীগামে হাজার করা ২০৬ জন

সহরে “ “ ৭৪ জন

বাস করে “ “ “

“

১২। বঙ্গের সামাজিক অবস্থা

১৫—৪৫ বৎসরের সম্ভাব্য জীলোক সংখ্যা

হিন্দু শতকরা ৭৬ জন

মুসলমান “ “ ৮৭ “

এ বয়সের বিধবা জীলোকের সংখ্যা

হিন্দু শতকরা ২২ জন

মুসলমান “ “ ১১ “

এই পার্থক্য মুসলমান-সংখ্যাবৃদ্ধি এবং হিন্দু-
সংখ্যা-হ্রাসের একটি প্রধান কারণ বলিয়াই

সরকারী কাগজ-পত্রে প্রকাশ।

১০—১৫ বৎসর বয়সের বিবাহিতা

বালিকাগণের সংখ্যা

হিন্দু শতকরা ৬৭ জন

মুসলমান “ “ ৫৬ জন

১৫—১০ বৎসরের বিবাহিতা বালিকার সংখ্যা

হিন্দু শতকরা ১২৫ জন

মুসলমান “ “ ২ “

বালা-বিবাহ হিন্দুজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি
করে নাই, বরং উহা হিন্দুদের সংখ্যা-
হ্রাসের অন্যতম কারণ বলিয়া উল্লেখিত
হইয়াছে।

জী-পুরুষ-সংখ্যা

১ হাজার পুরুষ মধ্যে ২৪৫ জন জীলোক

তন্মধ্যে অনেকে একাই এদেশে উপার্জন

করিতে আছে। তাহাদের সংখ্যা বার দিলে

১ হাজার পুরুষ মধ্যে ২৭০ জন জীলোক।

পুরুষদের শতকরা ৩৪ জন বিপত্নীক

জীলোকদের “ ২০ “ বিধবা

৫ বৎসরের কম বয়সের

৪৭১১ বালক বিবাহিত

১৫ ৬২২ বালিকা

এ বয়সের

১৩১ বালক বিপত্নীক

১৮৪৭ বালিকা বিধবা

“

“

১৩। শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী

লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা

১৯০১ সালে হিন্দু শতকরা ১০৩ জন

“ “ “ ৩৫ “

১৯১১ সালে হিন্দু “ “ ১১৮ “

“ “ “ ৪২ “

লিখিতে পড়িতে পারে একজন মুসলমানদের

সংখ্যা হিন্দুদিগের ১ অংশ। অথচ মুসলমান

সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা ৩০ লক্ষ বেশী।

লিখনপঠনক্ষম জী-পুরুষের সংখ্যা

পুরুষ জী

মুসলমান ... ২৯ ... ৩১

হিন্দু ... ১৬ ... ৬৪

স্তত্রাং হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শিক্ষা-
বিতার জীদিগের মধ্যে পুরুষদিগের অপেক্ষা
বেশী। হিন্দুদের জীশিক্ষা-বিতার পুরুষ-
শিক্ষার ৪ গুণ। আবার মুসলমানদিগের
মধ্যে পুরুষদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিতার হিন্দুদের
পুরুষদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ।

লেশ্য-পড়া-জানা লোকের সংখ্যা

বঙ্গে শতকরা ৭৭ জন

মাজাজে “ “ ৭৫ “

বোথাই “ “ ৬৯ “

উত্তর বঙ্গে “ “ ৫ “

পূর্ববঙ্গে “ “ ৭ “

পশ্চিম বঙ্গে “ “ ১০ “

মধ্য বঙ্গে “ “ ১১ “

নিম্নলিখিত জেলায় শত করা ৫ জনেরও

কম

মৈমনসিংহ রাংপুর

রাজসাহী নালদহ

পুরুষ ৭ জনের ১ জন

জী ২১ “ “

মোট জী অর্থাৎ পুরুষের ১৬ অংশ বুদ্ধির

হার ১০ বৎসরে

শতকরা পুরুষ ১২৫

জী ৫৬

শতকরা ১ জন ইংরাজী জানে

তন্মধ্যে উহার নিকি কলিকাতায়।

“

“

১৪। বাঙ্গালীর অঙ্গসংস্থান

৫,৫০০০ বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে

১৮,৩০০০ অঙ্গ প্রদেশীয় বাঙ্গালার ভিতরে

বাস করিতেছে।

তন্মধ্যে বিহার উক্তিয়া হইতে ১২৭ লক্ষ

অগ্রা-অগ্রায়া হইতে ৪ লক্ষ ৬ হাজার।

লোকের ধারণা এই যে বাঙ্গালীরা অঙ্গ

দেশে অধিক সংখ্যায় গমন করিয়া অর্থ

উপার্জন করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নৈখা

যাইতেছে অতঃপরে হইতেই অধিকসংখ্যক ব্যক্তি আসিয়া এ দেশ হইতে অর্থ উপার্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

৩.৫৫ লক্ষ লোকের কৃষি ও পশুচারণ

৩ কোটি " কৃষি (অর্থাৎ সমগ্র

লোকসংখ্যার প্রায় ১/৩ অংশ)

১২ লক্ষ চাষীর আয়ে

৩০ লক্ষ ৪০ হাজার (অর্থাৎ শতকরা ৭৫

খামাদের চাকর বা ক্ষেতের মূল্য)

৩৪ লক্ষ ৪১ হাজার শ্রমজীবী

উহার সিকি কাপড় ইত্যাদি বুন বা হুতা

প্রস্তুত। ৩ লক্ষ ২৮ হাজার পাট ইত্যাদি কল

কাষ, ২৩ লক্ষের উপর ক্রয়-বিক্রয়াদি বাণিজ্য

৫ লক্ষের সরকারী চাকরী

১০ হাজার আইনব্যবসায়ী

কৃষিহীন অতঃপরে উপায়েমজীবীদের মধ্যে

শতকরা ৫২ জন মুসলমান

" ৪৫ " হিন্দু

• •

১৫। বৈদিক যুগের জীবজন্তু

আমরা বহুবার বলিয়াছি, হিন্দুরা বাস্তব জগতের উন্নতিকল্পে বহু বিষয়ের, নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন। তাহার দেশের হিতকল্পে বাধা কিছু করণীয় কিছুই বাধা দেন নাই। তাঁহাদের এই বাস্তব জগতের উপরে কি বিপদ-বিস্তৃত অধিকার ছিল, তাহা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় তাহার "The Positive Background of Hindu Sociology" গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই গ্রন্থ প্রয়াগের "হিন্দু-সাহিত্য-প্রচার-পরিষৎ" (পাণিনি কার্যালয়) হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। পূর্বে এই শ্রেণীর গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় আরও প্রকাশিত হইয়াছে। তাবুক্ষেপে দার্শনিক ব্রহ্মজ্ঞান, বিজ্ঞানচর্চা প্রদূরচর্য, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। সম্প্রতি "প্রতিভা" পত্রিকায় বৈদিকযুগের জীবজন্তু সম্বন্ধে কিছু

আলোচনা বাহির হইয়াছে। 'আমরা তাহা হইতে সিংহ, হস্তী, অশ্ব, মুগ প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান জন্তু সম্বন্ধে কথিত্বা করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম, তাহার বিষয় পাঠকগণকে অনাইতেছি—

"মহিষাশো ময়িনকিত্ত ভানবো

গিরমোহন শতবসো রথুযাঃ।

মুগা ইব হস্তিনঃ ঘা ঘা বনা বদারুণীশু

তবির্যায় যুগধুমুঃ

সিংহা ইব নাননিত্তি প্রচেতঃ পিশা ইব

হুশিনো বিবৎবৎসঃ।

ক্ষপো জিহ্বন্ত পৃথিতিভিক্ষ মিতিঃ সন্নিম্ন

সংবাদঃ স্বেদাহি মন্তবঃ।"

কৃষেদ ১ম মণ্ডল—৩৪ সূক্ত।

অর্থাৎ যে মরুগণ, তোমরা মৎস, প্রাক্ক, হৃন্দর, দীপ্ত্যমান, পূর্বতের ছায় বলবান এবং শীঘ্রগতি; তোমরা করকৃষ্ণ গজের ছায় বন ভ্রমণ কর, যেহেতু তোমরা অরণ্যবর্ণ বড়বাকে বল প্রদান করিয়াছ। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মরুগণ সিংহের ছায় নিনাদ করেন। সর্পজ মরুগণ হরিণের ছায় হৃন্দর; তাহার (শব্দ) বিনাশকরী, (তোমরা) ধীতিকারী, অশ্ব জন্তু হইলে বিনাশকম বলকৃষ্ণ, একাক্ষ মরুগণ তাহাদের বাসন যুগের সহিত এবং আয়ুধের সহিত শত্রুপীড়িত যজ্ঞমানদিগকে (রক্ষা করিতে) যুগপৎ আশ্রিতহেঁচেন।"

"বেদের পূর্বোক্ত ভ্রমকে যে হস্তী, মুগ শব্দের দ্বারা বিবেচিত হইয়াছে, তাহাতে মুগ ও হস্তীর মধ্যে একটি যনিষ্ট সংস্কৃতির প্রচ্ছন্ন ইতিহাসেরই যেন আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রাকৃতিকজগৎস্থিত হস্তিদের দ্বারা উদ্ভূত আদিম বা মাইবেরিয়াতে যে অতিকায় জন্তু কবালের বিশালক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই অতিকায় জন্তু প্রাচীন মাম্মথ (mammoth) বা হস্তীজাতীয় জন্তু বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে।"

"মৃগশব্দ হস্তীশব্দের সহিত এইরূপে সংযুক্ত

হইয়া যে সাধারণ সংজ্ঞাশব্দে পরিণত হইতেছে, তাহার স্পষ্ট প্রক্রিয়াই বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা অতঃপরেই স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে।

"দিনা মুগো ন বারহঃ পুরুজা চরৎস মধে।"

কৃষেদ ৮ম মণ্ডল, ৮ম সূক্ত।

অর্থাৎ (শত্রুগণের) অশ্বঘণকারী হস্তী যেক্ষণ মরুজ দ্বারা ধারণ করে, সেইরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মন্ততা ধারণ করে।

"যুবাং মুগেব বারুগা মুগণ্যাবে

মোষাবতোহবিষা নিরুদ্যমবে।"

কৃষেদ ১০ মণ্ডল, ৪০ সূক্ত।

অর্থাৎ যেক্ষণ ব্যাঘেরা বৃহৎ বৃহৎ মুগকে (হস্তীদিগকে) বাধা করে, তদ্রূপ তোমাদিগকে আমি দিবারাত্রি যজ্ঞের দ্রব্য লইয়া আশ্রয় করিতেছি।"

• •

১৬। আমাদের অনাদৃত বিদ্যা

বাঙ্গাল-দেশে আঞ্চলিক কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যবিষয়ক অনেকগুলি পত্রিকা চলিতেছে। "ব্যবসা ও বাণিজ্য"ও সেই গোষ্ঠীভুক্ত। সম্প্রতি তাহাতে আমাদের কতগুলি প্রাচীন সম্বলিত পুনরুদ্ধারন করিবার জন্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমরা আমাদের স্বদেশ-প্রাতিভার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি—

"সার্যিক শক্তি ও কৌশলের পরচায়ক মনুষ্য জগতের নিম্নস্ত বিজ্ঞা। মহাত্মজের মনুষ্য ভীমসেন প্রভৃতির এই বিজ্ঞার পারদর্শিতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্যবিজ্ঞার প্রতি আশ্রয়মান-বিশুদ্ধনৈতিকতা প্রস্তাব ফলে এই ভারতীয়-বিজ্ঞা তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর অশ্রদ্ধায় নিম্ন-শ্রেণীতে নির্দোষিত হইয়া তাহাদেরই আদরে এতদিন কোনক্রমে জীবনধারণ করিয়াছিল। হৃদয়ের বিষয় আমরা জ্ঞাতো নামের মোহে অনেকটা কাটািয়া এখন পুনরায় ভারতের মলিন-বসন "অঙ্ক-অঙ্গুষ্ঠা" ভাষণ রায় ও দেদার বসন্তের প্রতি দৃষ্টি কিরাইতে

পারিয়াছি। সম্রাটের দেশের লোকের সামান্য বেশ-ক্কাবর প্রতি তাক্সিলা এখনও আমাদের ভিত্তোহিত হয় নাই।" তাই একটু ভক্ত-সামান্যভিত্তি গোবাক-পরিচ্ছদে ও পাশ্চাত্য-কৃতি মেঘেরা একটু বিলাতীধরণে "রামমুস্তি" ও "ভীম ভবানী" প্রভৃতি যে দেশের অর্থ দেশে রাখিতে পারিতেছেন ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। বঙ্গের লালিয়ার সম্প্রদায়েও একটা বিজ্ঞা বানাদৃতভাবে বর মর অবস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। পুষ্কা প্রভৃতির উপলক্ষে যদি আমাদের দেশের দনবান ও জমীদার-সম্প্রদায় তাহাদের জীভা দর্শন করেন তাহা হইলে এ বিভাগে আবার সক্রিয় হইতে পারে। বাঙালিদের ভারতের এক বিশিষ্ট নামধী। তাহদের জীভা ভোগবিভোগে অন্তরীক্ষে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ এমন জিহ্বহতীতে পরিণত। তবাবি-পলাধঃকরণ অনেক সাহেবও প্রত্যক্ষ করিয়া বিভাগ্যের অনেক পাঠ্য পুস্তকেও তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উৎসাহের অভাবে এ সমুদয় মৃতপ্রায়। বিবাহ প্রভৃতি কার্যে সেকালের লোকে আতোষ বাজীর অহুষ্ঠান করিতেন। এখন বিলাতী "পাই-মোটরনিম্ন"এর মাধ্যমপ্রভাবে দেশের গরীব-উচ্চা আতোষ বাজী ছাড়িয়া হাল ধরিতে বাধ্য হইয়াছে। সকলেই যদি হাল ধরে তাহা হইলে চাষাবৎ অবস্থা কতদূর শোভনীয় হইয়া উঠে, তাহা অনায়াসেই অস্বপ্নময়। আমরা বিলাতী ম্যাক্সিক ও পাইরোটেকনিজ প্রভৃতিতে মত অর্থব্যয় করি, দেশীয় আয়াদে তাহার অর্ধেকেরও প্রয়োজন হয় না; অথচ দেশের কল লুপ্তপ্রায় বিজ্ঞা পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে, তৎপন্ন আমাদের স্বমতি ও স্বশৃঙ্খলি দান করুন।"

• •

১৭। বঙ্গীয় সাহিত্য-সাম্রাজ্য
ছদ্দিন

যমদনসিংহের বঙ্গীয়-সাহিত্য-সাম্রাজ্যে জলের মত ঢাকা বরত হইয়াছিল। তখন

হইতে জনসাধারণের মনে একটা প্রশ্ন উঠিল—“সাহিত্য-সম্মিলনের আবশ্যিকতা কি?” সাহিত্য-সম্মিলন কি কবিতো চাহিতেছেন?” তাহার পর চুঁড়িয়া ও চট্টগ্রামে, গৌহাটী ও দিনাজপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন হইয়া গেল। এই সবগুলি বৎসরের ভিতর সাহিত্যের কোন মুহূর্তই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য দেশ-বাসীকে জানাইবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। গতপ্রাপ্তিকভাবে বঙ্গের সাহিত্যসেবীগণ ভিন্ন ভিন্ন হানে আমগিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছেন।

আমরা আমাদের গত বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলন-সংখ্যা (চৈত্র, ১৩১৯) এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম—এবং সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এবারও এই প্রশ্ন তুলিতেছি। সাহিত্যসেবীগণ ও জন-নায়কগণ, আপনারা জনসাধারণকে, পল্লীবাসীকে, মধ্যবিত্তবাসীকে, বাঙ্গালার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ও মধ্যপ্রদেশকে বুঝাইতে চেষ্টা করুন—সাহিত্য-সম্মিলনগুলির সার্থকতা কি।

আমরা বুঝিয়াছি—ভবিষ্যতে যাহাই হউক, বর্তমানকালে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রচার, লোক-শিক্ষাবিস্তার, জনগণের মতগঠন, সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের অধ্যয়নাদি আশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং ইংরাজিতে অনুভিজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর ঔৎসুক্য ও উৎসাহবর্ধন। বোধ হয় ভাগলপুরের সাহিত্য-সম্মিলনে বক্তৃতা-সেবক রামেন্দ্রচন্দ্রের ও আমাদের সমাজের ও সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা বুঝিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন।

তবে “বিশেষজ্ঞ-সমিতি,” “পণ্ডিতসভা,” “ঐতিহাসিক-সভা,” “বৈজ্ঞানিকসভা”—এ সব অস্থায়ী কলিকাতার সম্মিলনে এ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতেছে কেন? সুইডেনে “বিশেষজ্ঞ” বা ওস্তাদগণের মুখামুখি বিসার জড়ই কি এবার কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন হইবে? এই ওস্তাদ মহাশয়গণ

ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ “কোটে” বসিয়াই তাহাদের মৌলিকতা ও স্বাধীন গবেষণা বাস্তবে ঘাটাই করিয়া লইতে পারেন। তাহার পরস্পর অপরিকৃত নন।

প্রয়োজন হইলে চিত্রিত্রের সাহায্যে তাহাদের সম্মেলনগুলি মীমাংসিত হইয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞান-মণ্ডলে প্রকৃচ্ছত্র, মনীষ্যগণ, পণ্ডান, বিদ্বাদসি কি একরূপে তাহাদের কার্য চালাইয়া লইতেছেন না? ইতিহাস-মণ্ডলে যদুনাথ, বাগ্যচন্দ্র, অক্ষয়-কুমার, রাধালালসি কি এই উপায়ে তাহাদের কার্য উদ্ধার করিতে পারিতেছেন না? ধর্ম-মণ্ডলে ব্রজেন্দ্রনাথ সর্দার, ওরফে সর্কলকেই ত উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। কোন সাহিত্য-সেবীর কাজকর্ম বিশেষজ্ঞ-সম্মিলনের অভাবে বন্ধ থাকিতেছে?

অধিকন্তু, যদি বঙ্গসাহিত্যের নানাবিধাগে বহুধাণক “বিশেষজ্ঞের” প্রাচুর্য্য হইয়াই থাকে তবে এখন হইতে বস্ত্ত “ঐতিহাসিক-সম্মিলন,” বস্ত্ত “বৈজ্ঞানিক-সম্মিলন,” বস্ত্ত “দার্শনিক-সম্মিলন,” বস্ত্ত “শিল্প-সম্মিলন,” বস্ত্ত “সমালোচক-সম্মিলন,” বস্ত্ত “চিত্রকর-সম্মিলন” ইত্যাদির অস্থগঠন করিলেই ত চলে। সাধারণ বঙ্গীয়সাহিত্য-সম্মিলনের যাড়ে এই সকল “পরগাঁজ” চাপান হইতেছে কেন? বর্ত্তমান অবস্থায় এইগুলি পরগাঁজই বটে—সামাজিক বিকাশের স্বকল নয়।

সাহিত্য-সম্মিলনের গুরুত্বগণ, আপনাদের নিকট এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা ভাবিতে চাই। যদি বিশেষজ্ঞ সচিব রাই সাধারণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহা দেশবাসীকে সহজ কথায় জানাইয়া দিন। নীরব জনসাধারণকে অগ্রাহ্য করিবেন না—মধ্যবিত্তের বাণী যথোচিত প্রচারিত হইতেছে না বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করিবেন না। সর্ব্বদা যেন মনে থাকে—ইহা “জনসাধারণের যুগ” চলিতেছে। গত তিন বৎসরের ভিতর জনসাধারণ সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বারা স্বাধীন করিয়া লইয়াছে। এজন্যই এই বহুল আন্দোলন যুফল মান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জন-

সাধারণের ক্ষমতা লাভ করিয়াই, দেশের প্রতিপক্ষ সংশ্লেষে আসিয়াই বঙ্গ সাহিত্য প্রতিপাদনী হইয়া উঠিতেছে। এই বৃক জনসাধারণকে, এই নীরব মধ্যবিত্তকে, এই অশিক্ষিত নরনারীকে, এই অপ্রগল্ভ গণ-শক্তিকে আজ আপনারা তুলিয়া যাইতে প্রস্তুত।

আমরা যেন বেশ বুঝিয়া রাখি যে,—যে সময়ে আমরা এক উজ্জ্বল বিশেষজ্ঞ-সম্মেলন “গভীর গবেষণা” ব্যাপ্ত থাকিয়া বাঙ্গালী জাতিকে দৃষ্টি করিতে বসিবে, সেই সময়েই প্রয়োজন হইলে বাঙ্গালার বিরাট গণ-শক্তি নূনতন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিতে পারে। বঙ্গীয়সাহিত্য-সম্মিলনের সেই অপূর্ণ অবস্থা দেখিয়া ওস্তাদ মহাশয়গণ কিছু বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু তাহার ফলে বাঙ্গালীদেশ, বাঙ্গালী সমাজ, এবং বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি স্বাধীন উন্নতি, বিজুতি ও ক্রম-বিকাশের পথ বুজিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। জনসাধারণের সেই ক্ষমতা-প্রবাহে তথাকথিত জন-নায়কগণ ও সাহিত্য-গুরুত্বগণ তৃপ্তের ন্যায় ভাসিয়া যাইবেন।

১৮। সাহিত্যে পরাজীবন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্তর্গত ছাত্র-সাধারণ ছাত্র সভাগণের সাহিত্য-চেষ্টা পরীক্ষা হইয়াছে দেখিবা আমরা স্থখী হইলাম। পরিষদ-পত্রিকা তাহাদের নাম ও লিখিত প্রবন্ধের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

১। শ্রীকৃষ্ণ কুমারজয় রায় গুপ্ত
প্রবন্ধ—(ক) পরীপ্রবাহ (খ) মাছ ঘরে নওয়া

২। শ্রীমোহনচন্দ্র ভৌমিক
প্রবন্ধ—(ক) লক্ষীর পাঁচালী (খ) ধোরক্ষনাধের পাঁচালী

৩। শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য
প্রবন্ধ—(ক) চৌপুত্রা (খ) স্বলব্ধপুত্রের ইতিহাস (গ) সিরাজগঞ্জের গ্রামা মঙ্গল (ঘ) কালপাড়া মঙ্গল (ঙ) হরিপুরের

৭মঙ্গলচৌ (চ) পাবনা জেলার জাঁড়া-কৌতুক।

৪। শ্রীসিকলান সেন
প্রবন্ধ—(ক) গুলনার দাঁড়া (খ) পিল্লিকে (গ) জমাই আনার কথা (ঘ) একটি চৌপুত্রা (ঙ) চটিকথা প্রবন্ধ।

(৫) শ্রীশশীকৃষ্ণ পাল
প্রবন্ধ—(ক) সারিগান (খ) বাবুমালা গান।

৬। শ্রীশিবচন্দ্র পাড়ালী
প্রবন্ধ—(ক) পূর্ববঙ্গে প্রচলিত প্রবচন (খ) গ্রাম্য কবিতা।

৭। শ্রীদ্বিজগণ বন্দোপাধ্যায়
প্রবন্ধ—(ক) মূর্খিয়ার জেলার অধীন বেলাজাড়া গ্রামা ও সাধুত্ব।

৮। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার
প্রবন্ধ—(ক) চৌপুত্রা।

৯। শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য
প্রবন্ধ—(ক) পতঙ্গের অহংকরণ-ক্ষমতা (খ) হাক আখড়া।

১০। শ্রীমোহনীরামোহন রায়
প্রবন্ধ—(ক) বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধর্ম্মনায় বিষয়।

১৯। “অসাহিত্য, না দুর্ভিক্ষ?”

আমরা অনেকবার বলিয়াছি অসাহিত্যই স্বাধীনতা আনয়ন করে। অসাহিত্যই যুক্তি আর ম্যালেরিয়ার জু পড়া খান-কোষায় কেরাসিন ঢালিতে হয় না। দেখিতেছি, ইটালীর ম্যালেরিয়া-কমিশনেও এই প্রকারের কথা সাধারণ হইয়া গিয়াছে। “বাসা ও বাসিন্দা” সেই কথার মর্ম্ম আন-বিবেচনা হইয়াছে—

“ইটালীতেও এদেশের ছাত্র ম্যালেরিয়ার প্রাচুর্য্য অত্যন্ত অধিক ছিল; কিন্তু কমিশনেও চেষ্টা তাহা বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। প্রাতি সন ইটালীর গবর্ণমেন্ট ম্যালেরিয়ার জু যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। ম্যালেরিয়া-কমিশনের রিপোর্টেই তাহা জানিতে পারা যায়। ইটালীর

ম্যালেরিয়া-কমিশনে এবার একটা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার অতি উত্তম প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অজ্ঞাতা সিবিল সার্জনগণ ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের জন্ত দৈনিক একমাত্রা অল্পতঃপক্ষে ৩৭ গ্রেণ কুইনাইন ব্যবহার করার ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন, এমন কি তাহাদের এমন হুকুমও ছিল যে সেই হুকুমের বলে স্থানবিশেষের সরকারী কণ্ঠচারণ উক্ত মাত্রায় কুইনাইন প্রতিনিয়ত সেবন করিতে বাধ্য হইতেন। অধুনা ইটালীর ম্যালেরিয়া-কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ যে ক্রমাগত দীর্ঘকাল ৪১৬ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন সেবন করিলে মৃত্যুয়ের অস্বস্ততা জন্মিবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। ফলতঃ কুইনাইন যদি অল্পমাত্রায় কাজ না করে, তবে দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলেও কোনও উপকার হয় না। অপর, পক্ষে দেখা গিয়াছে—উহা দ্বারা যোগ্যতার আরও অনেক প্রকার অস্বজনক উপসর্গ ঘটাইতে পারে। ইটালিয় কমিশনে উল্লিখিত হইয়াছে, ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন ম্যালেরিয়া-প্রধান প্রদেশে ৩০ জন চিকিৎসক ম্যালেরিয়ার গতিবিধির পর্ষাবেষণ করিবেন। তাহাদের কেহই প্রতিষেধার্থে কুইনাইন ব্যবহার করেন নাই, যে স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার অবিকার স্থলে কুইনাইনের সাফল্য লাভ হয় নাই। অপরজ্ব ইটালীর ম্যালেরিয়া-কমিশন অতি স্পষ্টতাই বলিয়াছেন যে, অগ্ররিত্ত জীর্ণ শীর্ণ ব্যক্তিরাই ম্যালেরিয়ার অধিকতর আক্রান্ত হইয়া থাকে; সুতরাং লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন না করিলে ম্যালেরিয়ার হত হইতে সহজে নিবৃত্তি পাওয়া যাইবে না। ইটালীর ম্যালেরিয়া-

কমিশনের এই সদৃষ্টিক আমাদের নিকট অতি স্পষ্টতঃ বলিয়া বোধ হইতেছে।"

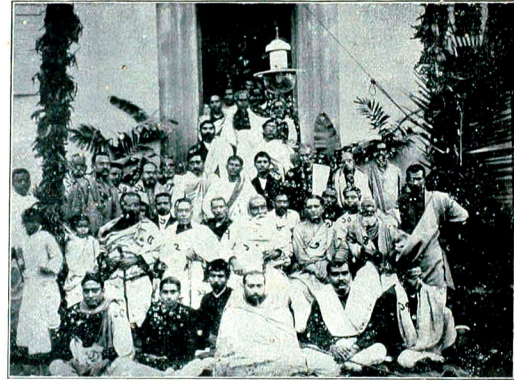
২০। 'গৃহস্থ'-সম্মিলন

বিগত ১২ই মাঘ 'গৃহস্থের' নবগৃহ-প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবীণ সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীৰেন্দ্রনাথ দত্ত, ধন্যমথ্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, বিশ্বেশ্বর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঠাকুর, কবির শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রত্নপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং কলিকাতার অজ্ঞাত বহু গণ্য মান্য কবি ও লেখক মহাশয়গণ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অমৃতবাজার পত্রিকা, সাহিত্য, ভারতবর্ষ, বঙ্গবর্নন, যমুনা, অর্চনা, আধারবর্ষ, বঙ্গবাসী, বঙ্গমতী, হিতবাদী, আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি দৈনিক, মাসিক ও সপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক মহাশয়গণও উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহাদের আপ্যায়নের জন্ত কথকতা ও কীর্তন সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। চুড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ কথকচুড়ামণি কথকতা করিয়াছিলেন এবং শটানন্দন বাবাজী ও শ্রীযুক্ত তিনকড়ী চক্রবর্তী কীর্তন গাইয়া ছিলেন। ইহাদের গুণগণায় সকলেই মুগ্ধ হন।

এইরূপে 'গৃহস্থের' নবগৃহ সেদিন মহাভাগ্যের চরণ-ধূলায় পবিত্র হইয়াছে। তাহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।



'গৃহস্থ'-সম্মিলন



১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার	৮। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দত্ত
২। " বিপিনচন্দ্র পাল	৯। " জগদ্বর সেন
৩। " নগেন্দ্রনাথ বসু	১০। " অমলাচরণ ঘোষ বিদ্যাকৃষ্ণ
৪। " হরিনাথ ঠাকুর	১১। " অমলাচরণ মিত্র
৫। " শিশুকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১২। " রসময় লাহা
৬। " কেশবচন্দ্র গুপ্ত	১৩। " বর্ণিনাথ নন্দী
৭। " অক্ষয়কুমার বড়াল	১৪। " হরিনাথ কথকচুড়

১৫। শ্রীযুক্ত অমলাচন্দ্র গোস্বামী কাব্যাকবরগণ্ডী
১৬। " নলিনীকান্ত গুপ্ত
১৭। " অধ্যাপক স্যারানারায়ণ সেন

দুর্গা পূজার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

(৩৬৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

“দৈত্যোপশ্রেন প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নবসি মায়েবং ততঃ কিস্তে করোম্যহম্ ॥”

(৬১১)

দেবীর এই বাক্য শ্রবণ মাত্র অসুর-
সেনাপতি দুষলোচন তাহাকে আক্রমণ
করিতে দাবয়মান হইলে ভ্রগমাতা হকার দ্বারা
তাহাকে ভুত্বীভূত করিলেন। এখন অসুর-
সৈন্য দেবীকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে
দেবীর বাহন সিংহ ক্ষণকালের মধ্যে দৈত্যবল
সকল বিনষ্ট করিল।

অনন্তর সটগন্ধ ধ্বলোচনের ধ্বংস সংবাদে
অসুররাজ ক্রোধান্বিত হইয়া দেবীকে
আনয়ন করিতে চণ্ডমুণ্ডকে আজ্ঞা দিলেন।
আজ্ঞা মাত্র সে চণ্ডমুণ্ডবী সমভিগ্যাধারে
গমন করিয়া দেবীকে দৃঢ় করিতে উদ্ভাত
হইল। দেবী তাহাতে অতীর ক্রোধান্বিত
হইলে তাহার অকুট-কুটিগ লগাট হইতে
অসিখজ্জাখরিণী করালবদনো ভয়ঙ্করী
কালীদেবী আবির্ভূত হইলেন।

“বিচিৎ পট্টাঙ্গধারিণী নবমাগাবিভূষণা।

ঈপিচর্খ পরীধানা শুকমাংঘ্রাতি ভৈরবম্ ॥

অভিষেকারবদনা ব্রিহ্মাললনভীষণা।

নিমগ্নারজুনবনা নাদাপূত্রদিগ্ঘৃণা ॥”

(৭৭—৮)

বিচিৎ পট্টাঙ্গধারিণী, নুগুমালিনী,
বায়ুচর্খপরিধানা, মাংশুশুভা হেতু মহা
ভয়ঙ্করী, বিস্তারবদনা, লোলরসনা, কোটর-
গত বক্তনয়না, ভীষণদর্শনা, বিকট শব্দ দ্বারা
দিগ্‌দিগন্তর পূর্ণকারিণী আবির্ভূত হইয়া
সর্বোপায়ে অসুরসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া।

মহাসুরদিগকে, পার্শ্বরক্ষক, অগ্ররক্ষক যোদ্ধা
এবং ঘণ্টাদি বিকৃত কৃত্তরগণকে, অশ-
সহিত অশারোহীদিগকে, রথ সহিত সারথি
গণকে হস্তে ধারণ পূর্বক মৃগমধ্যে নিক্ষেপ
করতঃ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কাহাকে
কাহাকে কেশদ্বারা, কাহাকে কাহাকে বা
গ্রীবাদ্বারা, কাহাকে কাহাকে বা পাদদ্বারা,
কাহাকে কাহাকে বা বক্ষদ্বারা আক্রমণ
করতঃ মর্দন করিতে লাগিলেন।

“পাক্ষিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি যোধঘণ্টা সমধিতান্।

সমাদারৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারগান্ ॥

তথৈব যোধাস্তরগৈঃ রথং সারথিনা সহ।

নিকিণা বজ্রে দশনৈকর্ষতাত্তিষ্ঠিরবম্’।

একঃ ব্রহ্মহ কেশেন্ গ্রীবায়ামথ চাপরম্।

পাদোক্রম্য বৈবানামুরগাত্মমপোধৎ ॥”

(৭১০—১২)

অজ্ঞাত অসুর সৈন্যগণ দেবীর প্রতি নান।
প্রকার অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল।
তিনি ও মূগ বাধান করিয়া সেই অস্ত্র সকল
গ্রহণপূর্বক রাগ ভরে দস্তদ্বারা চূর্ণ করিয়া
ফেলিলেন। এবং কোন কোন অসুরকে
অসির আঘাতে, কতকগুলিকে বা খট্টা
প্রহারে নিহত করিলেন। চণ্ড ও মুণ্ড তখন
অসুর সৈন্যগণের নিধন দর্শন করিয়া মহা-
ভয়ানক সহস্র বাণ দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন
করিল। দেবীও মহা অসি উল্লেগনপূর্বক
বিকট শব্দ করিয়া চণ্ডের প্রতি ঝাতি
হইলেন এবং তাহার কেশাকর্ষণ করতঃ
অসির প্রহারে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।
চণ্ডাসুরের নিধন দর্শনে মৃণাল অসুর দেবীর

প্রতি খাবান হইলে, দেবী রোহতের অসি প্রগরে তাহাকেও সংহার করিয়া ক্রুদিতলৈ নিপাতিত করিলেন। এবং চওমুণ্ডের মুণ্ড ছুটি গ্রহণপূর্বক যোর উক্তরবে হাত করিতে করিতে চণ্ডিকা দেবীর নিকট আসিয়া তাহাকে উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন— “দেবী! স্বয়ং শুভ নিমুণ্ডকে নিহত করন; শিরচণ্ডা কালী চ গৃহীয়া মুণ্ডমেব চ।

প্রাঃ প্রচণ্ডট্টাহাসনির্মমভাতা চণ্ডিকাম্ ।
মহা তবরোপস্কতৌ চওমুণ্ডৌ মহাপ্রম্ ।
যুদ্ধজ্ঞে বধঃ শুভঃ নিমুণ্ডক হনিমামি ।

(৭২০-২৪)

তখন তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। প্রসন্ন প্রতাপ অহরেশ্বর শুভ রোহতের সকল সৈন্যগণকে দৃষ্টাব্দে স্বজ্ঞাতি হইতে আশেপাশে দিলেন। তদনুসারে উদ্যোগ নামক যজ্ঞশক্তি-সংখ্যক, কণ্ড অহর-হুলসমুচ্চ চতুর্দশীতি, কোটিবীধ অহরকুলোৎপন্ন পঞ্চাশ, ধূম-বংশবতশ একশত, কালক, সৌভত মোর্ধা এবং কালকেয় অহর-সেনাপন আপনাপন অসংখ্য সৈন্য সমভিযায়াহরে রূপাভিমুখে প্রহরন করিল। এবং অহরেশ্বর শুভ বধঃ সহস্র সহস্র সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

এলিকে চতুরানন, পঞ্চানন, যজ্ঞানন, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের শরীর হইতে তাঁহাদিগের শক্তি সকল নিক্ষেপ হইয়া সেই সেইরূপ ভূষণ ও বাহন বিশিষ্ট হইয়া এবং নিজ নিজ বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্বক অহরগণদ্বয় সংগ্রামার্থে দেবীর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

“ব্রহ্মণ গুহ্যবিষ্ণুণা তথৈবৈব চ শক্রমঃ ।
শত্রুরেবেণা বিনিক্ষিপ্য তজ্জপেপ্তিকাং যমঃ ।
নরৈঃ সৈবৈব যজ্ঞং যথাক্ষিপ্য বাহনম্ ।
তথবৈব হি তজ্জক্রিরহানম্ যোগ্যমায়মৌ ॥”

(৮১৩-১৪)

আবার দেবী চণ্ডিকাও স্বীয় শরীর হইতে অতি ভয়ানক বিষম ক্রোধানুগত তলীয়া শক্তি বিনির্গত করিলেন। উহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত শিবাগণ সমুৎপন্ন হইল, যোরতর নির্মাদ করিতে লাগিল।

“ততো দেবীশরীরাভ্যঃ বিনিক্ষিপ্তাতিভীষণা ।
চণ্ডিকাশক্তিরভ্যাগা শিবাশতনিদানীনি ॥”

(৯২০)

তখন দেবী ঈশানকে স্তম্ভনিস্থের ও অজ্ঞাত অহরের নিকটে দূত স্বরূপে প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে “ইন্দ্র ত্রৈলোক্য-রক্ষার্থে অদ্য হইতে নিমুণ্ড হইলেন, দেবগণ আপনাপন যজ্ঞভাগ হবিঃ গ্রহণ করিবেন। আর তোমারা যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে পাতালতলে প্রবেশ কর। আর যদি বলগর্ভে পর্জিত হইয়া যুদ্ধ বানান কর, তবে শীঘ্র আইন, তোমাদের মাংসে আমার শিবাগণের কৃপিসাধন হইবে।

রৈলোক্য আইশ্রোলভতাং দেবাসঃ সন্ত হবিবৃজঃ ॥
যুগং প্রারাম পাতালং যদ্বিজীবিবৃক্মিচ্ছতঃ ॥

বলাবলোপদধ চেষ্টবস্তো যুদ্ধকাক্ষিণঃ ॥
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্ত মচ্ছিরাঃ পিশিতেন যঃ ॥”

এতদ্বাক্যে মহাহর শুভনিমুণ্ড কোপান্বিত চিত্তে দেবীকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহার প্রতি অনবরত শর, শক্তি, ও ঋগি অস্ত্রগুটি করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে তুমুল রণ চলিতে লাগিল। অহর-নিক্ষিপ বাণ, শূল, চক্র ও পরশ প্রভৃতি অস্ত্র দেবী দহইবার পূর্বক আপন উৎকৃষ্ট বাণদ্বারা অসংখ্য লোককে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শক্র-গণের মধ্যে কাহাকে কাহাকে শূল প্রহারে চূর্ণীকৃত, কাহাকে বা খপ্পা দ্বারা বিমর্দন করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবীর সহচরিনী ত্রাণাণী, ইন্দ্রাণী, বারাহী

নারসিংহী, প্রভৃতি দেবীগণ স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রয়োগে অহর-সৈন্য ধ্বংস করিলেন। এইরূপ অবস্থায় দৈত্য দৈত্যদাফগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন মহাহর রক্তবীজ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অগমন করিল। অদ্বায্যভাবে উহার শরীর হইতে ভূমিতে পতিত প্রতিবীর রক্ত হইতে এক একটি তন্তুল্য বলবীর্ঘ ও পরাক্রমবিশিষ্ট মহাহর সমুৎপন্ন হইয়া অজস্রং গ্রহণ পূর্বক ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিল। যাবৎপতিতাত্ত্য শরীরাত্ত্র বিন্দবঃ ।
তাবন্তঃ পুঙ্খবা জাতা শুভবীর্ঘবলবিক্ষমাঃ ॥
তে বাপি যুধু তত্র পুঙ্খবা রক্তপদ্ববঃ ।
সমং মাতৃভিরভ্যাগশ্রপাতাততিভীষণম্ ॥”

(৯৪৪-৪৫)

রিভিন্ন শক্তিগণ বিভিন্ন প্রকারে রক্ত-বীজকে আঘাত করিয়া কেবল মাত্র অহর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এবং তদ্বারা জঘৎ পরিপূর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া দেবতাগণ ভীতিস্থ হইলেন।

তখন দেবী চণ্ডিকা কালিকা দেবীকে বলিলেন “হে দেবি! তুমি আপন স্থবিশাল আসন বিস্তার কর এবং আমার অস্ত্র দ্বারা নিপাতিত রক্তবিন্দু-গুহৃত মহাহরকে ভক্ষণ কর এবং উহার রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইবার পূর্বেই অতি সত্বরে তাহা পান করতঃ রসস্থল বিচরণ কর।” তৎপরে দেবী শূলদ্বারা রক্ত-বীজাহরকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং উহার দেহ হইতে যত শোণিত পতিত হইতে লাগিল কালিকা দেবী তৎসমুদ্র পান করিতে লাগিলেন। এবং সেই রক্তকণিকা দেবীর মূখবিরে পতিত হইবার সময় তাহা হইতে যে সকল অহর উদ্ভব হইয়াছিল দেবী সে সমস্ত অহরকেও ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ অবস্থায় চণ্ডিকাদেবী সেই মহাহর রক্তবীজকে সংহার করিলেন।

রক্তবীজ ও অজ্ঞাত অগণ্য মহাহরগণকে নিহত দেবীরা কোদাধুস্মৃতিতে শুভ ও নিমুণ্ড অজ্ঞাত মহাহরপরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। দেবীর সহিত উৎসবের যোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। দেবী অহর-প্রক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল একে একে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে দৈব্যাপনুব নিমুণ্ড কৃত্যর ধারণ করতঃ দেবীকে প্রহার করিতে আসিলেন দেবী বাণাঘাতে তাহাকে কুতলশায়ী করিলেন। তখন শুভ স্বীয় বৃণীর্ঘ অশূলদালি অষ্টভূদে বিবিধ অস্ত্রগুণ ধারণ করতঃ রথারোহণপূর্বক দেবীকে আক্রমণ করিতে আসিলেন। সে

প্রথমে ভীষণ জালাময় অগ্নিময় শক্তিগণ দেবীর প্রতি সন্ধান করিল। দেবী ও মহোদ্য শক্তিগণে উহা নির্ধাণ করিয়া গিলেন। তৎপরে উভয় উভয়ের প্রক্ষিপ্ত শূল সহস্র অস্ত্র উচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবী শুভকে শূলদ্বারা ভূগাতিত করিলেন। সে সময় আবার নিমুণ্ড চৈতন্য লাভ করিয়া অমৃত হস্তে বিস্তার পূর্বক চণ্ডিকা-দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং তাঁহার প্রতি বাণগুটি করিতে লাগিল। তখন দেবী ক্রমে ক্রমে উহার প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি বিদীর্ণ করিয়া পরিশেষে ত্রিশূলদ্বারা উহার কায় বিদীর্ণ করিলেন, এবং উহার বিস্ত্র ভগ্ন হইতে মহাবলবীর্ঘ বান অপর এক পুঙ্খ বহির্গত হইয়া দেবীকে “ভিষ্ঠ” বলিয়া ভাঙ্গপ্রদর্শন করিলে দেবী তৎক্ষণাৎ উহার মস্তক ছেদন করিলেন, অতঃপর সিংহ ও দেবীর অহুযায়িনী অপরূপ দেবী শক্তি অহর সকল নিহত করিতে লাগিলেন। অবশিষ্টগুলি রণস্থল করিতে পলায়ন করিল। তখন শুভ দেবীকে

ভংসনা করিয়া বলিলেন :—“দুর্গে! বলদর্পে
দর্পিতা তুমি আর ধর্ম করিও না, কেন না
তুমি বৈশ্বক্শিকগণের সহায়তায় অতিমানসী
হইয়াছ।” তখন দেবী বলিলেন :—“তুমি যে
সমস্ত বিভিন্ন মূর্তি স্বেচ্ছতেছ উদ্ধার আমায়ই
বিস্তৃতি—এই দেশ আমাতেই প্রবেশ
করিতেছে।”

“একবারে জগতায় দ্বিতীয়া কাম মপরা।

পঠিতা ছুট মনোবিশেষা মন্বিত্বতঃ।

(১০৫)

অমনি বৈশ্বক্শিক মূর্তি সকল উত্তোষেই গীন
হইলেন এবং তিনিই একাকিনীসার বিরাট
করিতে লাগিলেন।

এখন দেবী একাকীই যুদ্ধে অবতীর্ণ
হইলেন। দেবী ও উত্তোষ সর্বলোকভাষ্যর
যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি

স্থাপিত শরবর্ণ ও দারুণ অস্ত্রের প্রয়োগ
করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই উভয়ের
অস্ত্রশস্ত্র ছেদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে

অস্ত্র শস্ত্রাবণ বর্ষণাদ্বারা দেবীকে আচ্ছন্ন
করিল। তখন দেবী কুণ্ডিতা হইয়া তাহার
ধ্বংস করিলেন।

“হৃৎকেশর তখন অস্ত্র
হইতে অস্ত্রান্তর গ্রহণপূর্বক দেবীকে আক্রমণ
করিল। দেবী ও ক্রমে ক্রমে উৎসমুদ্রই

ছেদন করিলেন। ঐশাদিগণ আত্মবিশেষে
দেবীর প্রতি দাবিত হইয়া তাহার দ্বন্দ্বয়ে

মুষ্টিপ্রহার করিল, দেবীও তাহার ফকে
পর্যবাহিত করিলেন। তাহাতে সে হতচেনন

হইয়া কৃত্তলে পড়িল। কিন্তু ক্ষণবিলম্বে
জ্ঞান পাইয়া উত্তিত হইল এবং দেবীকে

গ্রহণপূর্বক গগনমার্গে আরোহণ করিল।
তখন দেবী অবলম্বন বহিত হইয়া তাহার
সহিত বহুকালব্যাপী বাহবুদ্ধ করিয়া পরে

করতঃ ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। ভূপতিত
হইয়া অস্থির আবার মূর্তি উদ্ভাত করিয়া
আত্মবিশেষে চক্রিকানিদর্শ্য গমন করিল।

তাহাকে আসিতে দেখিয়া দেবী শূলধারা
তাড়ায় দ্বন্দ্ব বিদীর্ণ করিলে সে পৃথিবীতলে
নিপতিত হইল এবং প্রাণত্যাগ করিল।

তখন দেবগণ নির্ভয়ে আপনাপন নষ্ট আদি-
পতা পূর্ববৎ অধিকার করিয়া লইলেন এবং
স্ব স্ব প্রাণা যজ্ঞীয় হবিঃ ভোগ করিতে

লাগিলেন। আর অবশিষ্ট দৈত্য সকল
পাতালে পলায়ন করিল।

“তেহপি দেবানিরাত্তাঃ স্বাদিকারম্ যথা

পুত্রা।

যজ্ঞভাগ্যভূতঃ সর্গে চক্রবিমহিতারম্।

দৈত্যাক

... .. শেষঃ পাতালমাব্যতঃ।”

(১১০৩,৩৫)

তৎপরে স্বরূপ নামে সমস্ত পৃথিবীর অধী-
শ্বর যখন-স্বরূপগণ বস্তুক-রাজ্য-সম্পত্তি-পরিভ্রষ্ট
হইয়া মুগ্ধাচ্ছন্ন একাকী অশ্বারোহণে গমন

করেন গমন করেন।

“ততো মুগ্ধাব্যাজেন হৃতপন্যমঃ স ভূপতিঃ।

একাকী হনুমাক্ষ জগাম গনং বনম্।”

(১১১)

এবং পরে হিংসারাজিত বনপশু ও শিযা-
পরিগোষ্ঠিত বিপ্রশ্রেষ্ঠ মেধসু মূনির আশ্রমে
আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহার মনে স্ব-
শাস্তি কিছুই ছিল না। তিনি সর্গদাই পুত্র-
কলত্র, বন্ধুবান্ধবদিগের বিষয় ভাবিতেন।

এবং অষ্টরাজা-উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিত।
পরিশেষে তিনি ‘মেধসু মূনির নিকট

স্বীয় অবস্থা নিবেদন করিলে মূনিবর
উত্তোষ এই মহাশক্তি মহামায়ায় মাহাত্ম্য

কর্ত্তন করিয়া শুনাইলেন। এবং পরিশেষে

উপদেশ দিলেন যে “তুমি সেই পরমেশ্বরীকে
শরবাগত হও, তিনি আরাদিতা হইয়া প্রসন্ন
হইলে মহাযোগ ভোগ, ঐশ্বর্য, ধর্ম, অপূর্ণ

লাভ করিতে পারে।”

“তাস্মৈহি মহারাজ শরবঃ পরমেশ্বরীম্।

আরাদিতা সৈব যুগাং ভোগধর্মপারবরা।”

(১০৫)

এই উপদেশানুসারে স্বরূপ রাজা দেবীর

আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

“ইতি তত্ত্ব বচঃশাস্ত্র স্বরূপঃ স নরাধিপঃ

নির্ধিঃসৌহৃতিদম্বদেহেন রাজ্যাপহারণেন চ

জগায় সত্যতপসে * * * (১০৭)

তিনি নদী-পুলিনে অবস্থান করতঃ তথায়
দেবীর মুগ্ধমূর্তি নির্ধারণপূর্বক পুষ্প, ধূপ ও
হোমাদি এবং স্বীয় গাত্র-বস্ত্রাদ্বারা উগার

পূজা এবং-দেবী যুক্ত অপদ্বারা দেহী দেবীর
প্রতিই মনোনিবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে তপস্বী
করিতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের
পর বৎসর এইরূপ তপস্বীতা কাটিয়া গেল।

অবশেষে তিন বৎসরের পর দেবী পরিতুষ্ট
হইলেন। তখন তিনি রাজাকে সাক্ষাৎ
দর্শন দিয়া তাহার কাজিত বর প্রদান

করিলেন।

“* * * যুগতে স্বরাজ্য প্রাপ্ত্যন্তে ভবান্।

হস্তা রিপুনখলিতঃ তব তত্ত্ব ভবিষ্যতি।”

(১০১১)

[এখানে মার্কণ্ডেয় উক্ত দেবী মাহাত্ম্য
শেখ। কিন্তু দেবী-মাহাত্ম্য যথাক্রমে লিপিতে
নগিলে শ্রীমহাভাগ্যের দেবীপূজার বিবরণ না

পাশিলে প্রবন্ধ অপূর্ণ থাকে। সেইজন্য

সেই বিষয়ও এখানে দেওয়া হইল।

আবার যখন লক্ষ্য মহাপারাক্রমশালী

অশ্বরাজ্য দশানন রণাঙ্গের বিরুদ্ধে মহাসংগরে
প্রাণোপেক্ষা প্রায় অশ্বজ লক্ষণকে শক্তিশেলে
ভূপতিত দেখিয়া শোকে মুগ্ধমান রামচন্দ্র

গীতার উদ্ধারের আশা নষ্টপ্রায় দেখিয়া

ভয়েংসার হইয়া

“দুঃখার লোটায়া ছিন্ন নীলোৎপল প্রায়”

তখন স্বর্গাদিগণিত

“ইন্দ্ররাজ বিধাতার সনিনয়ে কয়।

শ্রীরাবণে ছুগ আর প্রাণে নাহি সয়।

ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী, কন কমললুপাদি,

উপায় কেবলি দেবী-পূজা।

তুমি পূজি যে চরণ, জিনিলে অশ্বরগণ

বোধিয়া শরতে দশভূজা।

পূজা রাম কৈলে তাঁর, হবে রাবণ সংহার,

শুনগার সংঘোলোচন”

তখন দেবরাজ ব্রহ্মার উপদেশ শুনিয়া
তাহাকেই রাবণ-বধের বিধিত উপায় বিনিময়
জগৎ রামচন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন। ব্রহ্মা

বাইয়া বলিলেন—

“বিধাতা কেনে প্রভু, এক কন্ধ্য-কর বিবু,

তবে হবে রাবণ সংহার।

অকালে বোদন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী

তরিবে যে ছুগ পাখার।”

তখন অশ্বকী। শরৎকাল আগত। রামচন্দ্র

বিধাতার পরামর্শে অকালে দেবীর বোধন

পূর্বক যথাবিধি কল্পে দেবীর পূজা আরম্ভ

করিলেন। দেবীর তিন দিন পূজা। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা বিধিমত করিলেন।

“বিধি মতে পূজা সাধ করিলা শ্রীহরি।

কিন্তু হৈল সন্দেহ না দেখি মহেশ্বরী।

বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর।

আমি প্রতি দয়া বৃষ্টি না হ'ল দুর্গার।”

মহেশ্বরী সাক্ষাৎ দিলেন না দেখিয়া

রামচন্দ্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন

বিক্রয়শেষ পরামর্শে অষ্টোত্তরশত নীলোৎপল পূজা করিতে সক্ষম করিলেন। বীর হৃদয়ান কৰ্জুক তৎসংখ্যক পদ্ম আনীত হইলে রামচন্দ্র ক্রমে উহা একে একে দেবীর চরণে দিতে লাগিলেন। এদিকে

"করিলেন ছল, বৃদ্ধিতে সকল
দেবী হর-মনোহরা।

হরিলেন আর, এক পদ্ম তাঁর
মহেশ্বরী পরাংপর।"

শেষে এক পদ্ম কম পড়িল। রামচন্দ্র তখন বিম্বিত ও ব্রত-ভঙ্গভয়ে ভীত হইলেন। নীলপদ্ম "দেবীদহ" ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না এবং তথায়ও আশা পদ্ম নাই—এ কথা হৃদয়ানের নিকট তুলিলেন। তখন

"দাঁপি ছল ছল, বর্ধে অশ্রু জল
কান্দেন জিলোক ধাম।"

এবং পুনর্বীর কালিকার স্তুতি করিলেন
'হের মা পার্শ্বতী। আমি দীন অতি
আপদে পড়েছি বড়।

মম প্রতি দয়া, কর যেনে অত্যা
ভবার্থে করে পার।"

"জিত্ববনে দুঃখ তাপে স্থাপিছ আমায়।
আর দুঃখ দিও না মা নিবারি তোমায়।"

"এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়।
ভগাপি তারার তাহে সাক্ষ্য না হয়।
তখন রামচন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন
"কমলালোচন মোরে বলে সর্বজন।

এক চক্ষু দিব আমি সন্মুখ পূর্ণে।
এত বলি তুণ হইতে লইলেন বাণ।

উপাড়িয়া যান চক্ষু করিতে প্রদান।"

চক্ষু উপাড়িতে রাম বলিলা, সাক্ষাতে।
হেন কাল কাভ্যায়নী ধরিলেন হাতে।

তখন দেবী তুষ্টা হইয়া সাক্ষ্য দিলেন।
এবং রাবণবধের আদেশ দিলেন।

"অকাল বোদন পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা
বিম্বিত্তে বলিলা বিস্তার।

লোকে জানাবার জ্ঞত, আমারে করিতে ধন্ত,
অবনীতে করিলে প্রকাশ।

রাবণে ছাড়িছ আমি, বিনাশ করহ তুমি
এত বলি হইল অস্তর্ভাষী।

তখন রামচন্দ্র নবমী পূজা সমাধা করিলেন।
এবং

"দশমীতে পূজা করি, বিসর্জিয়া মহেশ্বরী
সংগ্রামে চলিল যযুপতি।

আবেশ পাইয়া রাম, সিদ্ধ হইল মনস্কাম
চণ্ডীসীতা মধুর ভারতী।"

(রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রুতিবাসী

রামায়ণ, ৪৪৫-৪৪২)

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-সংহার জ্ঞত
অকস্মেৎ বোদন করিয়া দশভুজার পূজা করিয়া

সংস্কার এই যে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র দুর্গা-
দেবীর আরাধনা করিয়া রাবণ-বধে কৃতকার্য

হন। রুতিবাসে উপরি উক্ত অংশ হইতেও
বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়েও জনসাধারণের

ইক্লুপ সংস্কার ছিল। কিন্তু বাহা অবলম্বন
করিয়া রামের চরিত্র নিপীত হয় এবং বাহা

রামের জীবদশায় রচিত, সেই বাম্বীকির
রামায়ণে এই দুর্গোৎসবের কোনও উল্লেখ

পাওয়া বাওয়া যায় না। রাবণ-বধের পূর্বে
বাম্বীকির রামচন্দ্র অস্ত্রের দ্বব বা অস্ত্রোপাসনা

করিয়াছিলেন। কিন্তু কালিকা পুরাণে রাবণ-
বধের পূর্বে রামের দুর্গাস্ততির পূজার উল্লেখ

আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন

যে, বাহা রামায়ণ-রচনার অনেক পঞ্চাতে
গৌরাণিক কবির কল্পনা করিয়া যান, হিন্দুদের
মধ্যে তাহাও দুর্গোৎসব বলিয়া প্রসিদ্ধ।
কালিকাপুরাণ রামায়ণের বহু পরে রচিত এই
কথা বীকার্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে দুর্গোৎসব
গৌরাণিক কবির কল্পনা তাহা বলা যায় না।
বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুর নিকট দুর্গাপূজা
অস্ত্রোপাসনা হইতে পুত্ৰত্ব নহে। আদিভা-
বের ব্রহ্ম স্তোত্র—বাহা বাম্বীকির রাম রাবণ
বধের পূর্বে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—ব্রহ্মকেই
নির্দেশ করিলেও উহা দুর্গাদেবীর প্রতিও
প্রযোজ্য। কারণ তিনি আমাদের নিকট
"নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণ ব্রহ্মবহুপীণী"
আর যদি বাস্তবিক পক্ষে উহা কবির কল্পনা হয়
তাহা হইলেও আক্ষেপের কোন কারণ নাই।
যে কবি এইরূপ জাতীয় উৎসবের স্রষ্টি
করিয়াছিলেন তিনি ধর্ম। তাঁহার কল্পনা
দেবচর্চা। দুর্গোৎসব আমাদের এখন
জাতীয় উৎসব। স্বতরাং উহার যেরূপেই
উপপত্তি হউক না কেন, তাহাতে কিছুই
আশে যায় না। এ বিষয়ে এক্ষণে তর্ক

জোঁলাই বুঝা মনে হয়। দাক্ষিণাত্য
ও উত্তর পশ্চিমাক্ষেপে যে প্রকাণ্ড হিন্দু
সম্প্রদায় আছে তাহাদের মধ্যে এই দুর্গোৎসব
প্রচলিত নাই। তবে "নব রাত্রি" নামে
এই সময়ে একটা জাতীয় উৎসব হইয়া
থাকে। স্থলবিশেষে উক্ত উৎসব "রামলীলা"
লইয়াই হয়। কিন্তু সে সকল স্থানেই
উহা দেবী পূজার অঙ্গরূপ। যে যে স্থানে
প্রাচীন কাল হইতে দেবীর স্থান প্রতিষ্ঠিত
আছে, সেই স্থানের লোকেরা আর যত্ন
মুগ্ধি গড়িয়া নিম্ন গৃহে পূজা করার
আবশ্যকতা মনে করেন না। সকলে সেই
দেবী স্থানেই গিয়া দেবীর পূজা করিয়া
থাকে। পশ্চিমোত্তর দেশাদির হিন্দু-
অধিবাসিগণ এক্ষণে প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত স্থান
বিশেষে বা মন্দিরবিশেষে গিয়া মুগ্ধি পূজা
করিয়া থাকেন, তবে বঙ্গবাসিগণ স্বীয় গৃহে
প্রতিমা গঠন পূর্বক মুগ্ধির উপাসনা করিয়া
থাকেন—উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

শ্রীধারামণ্ডন মুখোপাধ্যায় বি, এল।

পরগণাতি সন

পরগণাতিসনের উৎপত্তি রংগে পরিপূর্ণ।
১৩৮৮ সনের প্রতিষ্ঠা পঞ্জিকার পৌষ সংখ্যায়
আমার পেনরাজবংশ নামক প্রবন্ধে পরগণাতি
সন লইয়া কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম।
সৌভাগ্যের বিষয় এবার পরগণাতি সন
সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য মিলিয়াছে। সাধারণতঃ
তাহা জানাইবার জ্ঞত এই প্রবন্ধের
অন্তর্ভাগ।

বিগত শারদীয়া পূজার অবকাশে শ্রদ্ধাশ্রদ্ধ
বদ্বার চাকার ইতিহাস-লেখক শ্রীমুখ্য যতীন্দ্র-

মোহন রায় মহাশয় তাঁহার চাকার ইতিহাসের
দ্বিতীয় খণ্ডের জ্ঞত উপকরণ সংগ্রহ করিতে
বিক্রমপুর অঞ্চলে যাইয়া এই প্রবন্ধের অসুতী
লেখকের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া
তাহাকে কৃতার্থ করিয়া আসিয়াছেন।
যতীন বাবুকে আমাদের গ্রামের আশে-
পাশের ঝটবা ঐতিহাসিক জিনিসগুলি ঘুরিয়া
ঘুরিয়া দেখাইবার সময় মনে পড়িল যে এক
বাড়ীতে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁবি
আছে। পুঁবিগুলির অস্তিত্ব আমি পূর্বে

হইতেই যবগুত ছিলাম, কিন্তু ছই তিনবার দেখিতে চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়া, এবং পুথিগুলির মূখ্য বিশেষ কিছু হইবে না অস্বাভাবিক কথায় আমি পুথিগুলি দেখিতে আর বিশেষ চেষ্টা করি নাই।

পুথিগুলির কথা যতীন বাবুকে বলায় তিনি তাহা দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যতীন বাবু ভাষা ভাল, পুথিগুলির অধিকারী মহাশয়কে সেগুলি দেখাইবার জন্য অহরহ করিলে বেশী ওষুধ আপত্তি না করিয়া সহজেই তিনি সে পুথিগুলি দেখাইতে স্বীকৃত হইলেন। আমরা দুইজনে বেলা

নয়টা হইতে প্রায় ষটা পর্যন্ত সেই পুথির ভূপ পত্রিকা করিয়া দেখিলাম যে, তাহার প্রায় সমস্তই বৈষ্ণব গ্রন্থ। ছইখানা ক্ষুদ্র পুথি কেবল বাড়িয়া আমরা লইয়া আসিলাম—তাহাদের একখানার নাম স্বপ্নাধায়, আর একখানা হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান দর্শন ও যোগতত্ত্বের অপূর্ণ মিশ্রণভ্রাতৃ এক অদ্ভুত গ্রন্থ। গ্রন্থখানার আরম্ভ ঠিক শূনা পুরাণের মত—ভাষাও পড়া ও গানের এক খিড়ী—যথা

যখন না ছিল আসমান না ছিল জমিন
তখন ছিল এক দুল।

এই পুস্তকের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীহই মাধবাবের প্রকাশিত করবার ইচ্ছা আছে।

দ্বিতীয় যে ক্ষুদ্র পুথিখানা আজ আমাদের আলোচনার বিষয়, তাহা নিতান্তই ক্ষুদ্র—মাত্র তিনটি পাতা—তাহারও প্রথম পাতা খানা কিছুতেই পুঞ্জিগা পাইলাম না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাতাখানা আছে, তাহা অবিলম্বে লক্ষ্য করিয়া দিলাম, আশা করি পাঠকের বৈধাচারিত হইবে না। পুস্তকের নাম স্বপ্নাধায়, স্বপ্নের ফলাফল পুস্তকে বর্ণিত

আছে, আমাদের প্রণিতামহরণ স্বপ্ন দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে কিরকম ফলাফলের আশা ও আশঙ্কা করিতে ইহা হইতে তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইবে। হুংবর্ণ দেখিয়া মন ব্যাধাৎ হইয়া যাওয়া এবং স্বপ্নের দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠা আজকালও বিরল দেখে, কাজেই আধুনিক রুচির পাঠক ও ইহাতে উপভোগের জিনিষ পাইবেন, এমন আশা করা যায়। অসম্ভব বর্ণাশুদ্ধিগুলি সন্ধান করিয়া দেখা য়ে।

(প্রথমপাতা লুপ্ত)

(২য় পাতা) * * * *

(১ম পৃষ্ঠা) গীতা হই তার।

কাকন পাইলে হয় বংশলাভ হয়।

লোহা পাইলে হুং পায়ে জামিন নিশ্চয়।

নদী দেখিলে স্বপ্নে হুং পত্নী ভরাস।

গীড়িত দেখিলে গীতা হইত বিশেষ।

অগ্নি নিবাইলে স্বপ্নে হুং বায় দূর।

নিবাইতে না পারে অগ্নি হুং প্রচুর।

জীর্ঘ গর্ভবতী পাইলে বাহা সিদ্ধি হয়।

পদ পক্ষে অম পাইলে রাজসম্পদ হয়।

এহি মতি রাজসম্পদ পায় শুন মহাশয়।

নামাজে বাইলে তার আশা পূর্ণ হয়।

অম পাইলে আশু বাড়ে গুত বাইলে কাস্তি।

কটকি বাইলে জান দন হয় অত্যন্তি।

উলরে জন্ময় রোগ হস্তীর মাংস বাইলে।

শরীরেতে হুং পায়ে হাঙ্গরে কামড়াইলে।

স্বপ্নে জোকে কামড়াইলে পায় দিয়া নারী।

সর্পে ক্ষত করিলে পুত্র হয় শুন অধিকারী।

স্বপ্নে বিবস্ত্র হইলে অলঙ্কার পায়।

রোগী দেখিলে তবে হুং জন্মে পায়।

আপনে কান্দয়ে আর জোকায়ের দনি।

মারগ বাইয়া যদি হয় অভিমানী।

আপনা ভালই তবে পর মন্দ হয়।

বড় লম্বী হয় যদি চন্দন প্রেরয়।

(১ম পৃষ্ঠা শেষ)

বহল চিহ্ন হয় বহল হাসিলে।

সর্বজ্ঞে ভাল হয় জান সভাতে বসিলে।

মহাযোয় মাংস যদি ধায় পেট ভরি।

নানান দেশ মাঝিরা হইব অধিকারী।

স্বপ্নে মুগ মারিলে অশুভ হয় পায়।

ধন লাভ হয় জানি চড়িলে দোলায়।

শরীরেতে হুং পায়ে তৈল দিলে পায়।

ধনবন্ত হয় অসুখী লেপিলে বিঠায়।

হীন জাতি লজ্জিলে অসম্ভাব বহতায়।

সর্বশাসন হয় তার ভাঙ্গি পড়ে ঘর।

উচ্চেতে উঠিয়া যদি কিছু না দেখয়।

তার পুত্র নাশ হয় জানিয়া নিশ্চয়।

দক্ষিণে ময়ূর গড়া যৈস পয়ান।

সেই জন যন হুং পায়ে তাহার।

স্বপ্নে যদি মহায়া ধায় দন হয় তার।

শুক বস্ত্র মহায়া পাইলে মহিমা অর্পায়।

দিবাতে দেখিলে পুনি নহেত স্বপ্ন-বল।

যত সব দেখে সন মনের বৈকল্পন।

প্রভাতে দেখিলে স্বপ্ন মাসেকে ফলয়।

প্রহরে রাহিতে দেখিলে বংশরে হুনিশ্চয়।

ভই প্রহরে রাহিতে দেখন্তি যে তিরে।

তার ফল হয় পুনি দ্বিতীয় বংশরে।

শুন শুন যতলোক শুন সাধবানে।

এহি মতে স্বপ্ন অধ্যায়।

২য় পৃষ্ঠা শেষ।

২য় পাতা শেষ।

৩য় পাতা

রচিল নারায়ণে। ইতি স্বপ্ন-অধ্যায় পুস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১১৭৬ সন তিরিখ ২২

ভাদ্র, রোজ মোক্ষলবার রাত্রি ছই ভও গুত

কালে মোকাম হজবতনগরের গোলাতে বসিয়া সমাপ্ত ইতি। ভিন্নকালি রণে ভক্ত মুনিনাক মতিভ্রম যথা দ্বিষ্ট তথা লিখিত লেখক নাতি সোমকঃ। সতীয পুস্তকমিৎ শ্রীযুগলকিশোর দায়ক। সন বলালি ৫৭০ সন সাক্ষা ১৬২২ তিথি পূর্ণিমা।

“সন বলালি ৫৭০ সন” লিখিত থাকায় এই ছইখানা নগণ্য পুরাতন কাগজের পাতার মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আমি প্রতিভার প্রবন্ধে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ-এর তবক্ত-ই-নাসিরি গ্রন্থে বর্ণিত নদীয়া-লুণ্ঠন সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা। মহম্মদি বক্তৃত্যার বিলিখি বিহার লুণ্ঠন সমাপ্ত করিয়া ১২০০ খৃঃ নদীয়া লুণ্ঠন করেন এবং সেনবংশ পূর্ববঙ্গ আশ্রয় করিয়া বিরুতপুত্র রাজধানী হইতে পূর্ববঙ্গ শাসন করিতে থাকেন। লক্ষণসেনের অতীতরাজ্য মানাকবুকু ৩৫ খানা খোরদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। যথা—অশোকবল্লের বুদ্ধগয়ালিপি, তাহার তারিখ এই ভাবে লিখিত—“স্রীমলক্ষণ সেনস্য অতীতরাজ্যে সন ৫১ ভাদ্র দিনে ২৯।” এবং অশোকবল্লের দ্বিতীয় বুদ্ধলরা লিপি, তাহাতে তারিখ এই ভাবে লিখিত—“স্রীমলক্ষণসেন সেন পাদানায় অতীত রাজ্যে সন ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুত্তো।”

আমি আমার প্রতিভার প্রবন্ধে এবং আমার Indian Antiquaryতে প্রকাশিত King Lakshmana Sen of Bengal and his Era * নামক প্রবন্ধে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে লক্ষণ সেনের জন্ম বৎসর হইতে আরম্ভ লক্ষণ সংবৎ যেমন এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে, লক্ষণ

সেনের রাজ্য নাশ হইতে গণিত তেমনি এক সনও পূর্ববর্ষে এই সেই দিন পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। অশোক বজ্রের বৃদ্ধগালিণির অতীতরাজ্য সন এই শেখোক্ত সংবতের মানাক স্বাতীতে আর কিছুই নহে। ইহার ১১ অতীতাব্দ এবং ৭৪ অতীতাব্দ খৃষ্টাব্দে ১২১৫ খৃষ্টাব্দ ও ১২৭৪ খৃষ্টাব্দ। পরগণাতি সনই এই অতীতাব্দ।

এই পরগণাতি সনের উল্লেখ প্রথম বঙ্গুবর শ্রীযুক্ত ঘোষণেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিক্রমপুরের ইতিহাসে পাই। তদবধি খোজ করিতে করিতে পরগণাতি সন মানাক যুক্ত অনেকগুলি দলিল আমার হস্তান্ত হয়। আমাদের নিজ বাড়ীতে ছইখানা ১১৫১ বাঙ্গালা ও ৫০০ পরগণাতি নামে লিখিত। আর এক খানা ১১৫৮ বাঙ্গালা ও ৫৫০ পরগণাতি সনে লিখিত। বঙ্গুবর শ্রীযুক্ত স্বতীন্দ্রমোহন রায় আমাকে জানাইয়াছেন যে তিনি ইহা অপেক্ষাও অনেক প্রাচীন দলিলে পরগণাতি সনের ব্যবহার পাইয়াছেন। গণনা করিয়া দেখিয়াছিলাম যে পরগণাতি সন ঠিক ১২০০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ, এবং পরগণাতি সনের বহুল ব্যবহার পূর্ববর্ষে সীমাবদ্ধ। এই সকল হইতে প্রতিভায়, Dacca Reviewতে এবং Indian Antiquaryতে প্রবন্ধে জানাইয়াছিলাম যে পরগণাতি সন লক্ষ্মণসেনের রাজ্যনাশের বৎসর হইতে গণিত এবং ইহা সেনবংশের প্রতিষ্ঠিত সন। এখন সেই সনই স্বতীন্দ্রবাবুর ও আমার আবিষ্কৃত স্বপাধ্যায়ে বঙ্গালি সন নামে উল্লিখিত দেখিয়া সমস্ত সন্দেহের নিরাসন হইতেছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে

যে পরগণাতি সন বঙ্গালি সন নামেও পরিচিত ছিল, এবং ইহা যে সেনবংশের সঙ্গীত সংবৎ তাহার দ্বিতী লোকে সংবৎ প্রতিষ্ঠার পাঁচশত বৎসর পরেও জুলিয়া যায় নাই।

বঙ্গালি শব্দটি দেখিয়া মনে একটু সন্দেহ হইতে পারে যে, যত ইহার বঙ্গাল সেনের সহিত কোন রকম সম্পর্ক আছে। বঙ্গাল সেনের সহিত যে এই সনের কোন সম্পর্ক নাই, ইহার আরম্ভ বৎসরই তাহার প্রমাণ। কিন্তু মুহুর্তে বঙ্গাল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু সর্বাধিবংশী সময় সমস্ত প্রাস করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টির উপর সেনবংশের যে কীর্তিগুলির নাম রক্ষার ভার দিয়াছিল তাহার প্রায় সমস্তই এই সনে লালিত অনাদৃত রাশিগুলির নাম যুক্ত হইয়া পুত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে, প্রাচীন জিনিস মাঝেই বঙ্গালি আমলের,—প্রাচীন রাজ্য বঙ্গালি রাজ্য, প্রাচীন নীধি বঙ্গালি নীধি, প্রাচীন রাজবাড়ী বঙ্গালবাড়ী, প্রাচীন গুল মাঝেই বঙ্গালি গুল ইত্যাদি। পরগণাতি অথবা বঙ্গালি সন বোধ হয় লক্ষণ সেনের পুত্রগণ,—মাধব, কেশব, বিষ্ণুপুত্র—কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু পুত্রের ভৃত্যগণের আরক সনটিকেও পিতা আশ্রয় করিয়া লইয়াছেন।

পরগণাতি সনের প্রচার শেষ সেন রাজ্যের রাজ্যের সীমা নির্ধারণ করিতে সহায়তা করিবে। স্মরণ হইতেছে ময়মনসিংহের ইতিহাস লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, যে পরগণাতি সন মানাকযুক্ত কয়েক খানা দলিল তিনি ময়মনসিংহে

আবিষ্কার করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য পুঁথিখানাও হরবতনগরে বসিয়া লিখিত। হরবতনগর ময়মনসিংহের কিম্বদন্তি সম্বন্ধিত সনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ভূঞা দেশাধিপতি ময়মনসিংহের বংশধর মূল্যমান জমিদারদের আবাস-ভূমি। এদিকে দক্ষিণে বরিশাল হইতেও পরগণাতি সনযুক্ত দলিল বাহির হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে কোন পরগণাতি

সন যুক্ত দলিল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অবগত নহি। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে লক্ষণসেনের পরে সেনরাজ্যের রাজ্য ত্রিপুরা ও নোয়াখালির কতক অংশ লইয়া গঠিত ছিল।

শ্রীমলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ।

বেদান্ত-দর্শন কাহার রচনা?

(২০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

হরকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্রে লিখিলেন, যদি প্রধানকে জগৎ-কারী না স্বীকার করি, তাহা হইলে কপিল-দ্বিতীর পণ্ডন হয়, কিন্তু স্বীকার করিলে অত অর্থাৎ মহাদ্বিতীর নিরাকরণ হয়, সুতরাং আমাদের মতই অমূল্যরূপ করা উচিত, কারণ তাহাতে স্বর্ধকাতের সহিত বৈশাখ বা উপনিষৎ-মত সমর্থিত হইয়াছে—কপিল-দ্বিতীতে স্বর্ধকাতের সমর্থন নাই, প্রত্যুত বেদে বহির্ভূত প্রধান মহান অহঙ্কারাদির কথা আছে।

স্বতানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেদ্রা

স্বতানবকাশদোষপ্রসঙ্গ।

যখন হরকার এ প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তখন তিনি যে কপিলকে মহুর ভাষা পুষ্যা বলিয়াই জান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই; অথচ বেদে বহির্ভূত বলিয়া তাঁহার মতের পণ্ডন হয়নি হইয়াছেন। ইহার ভাষ্যে ভগবান শব্দর অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের পূজ্যতা সমর্থন করিয়া মহুর

প্রতিই পক্ষপাত্তিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কপিল প্রথম জানী, ইহা বেদান্তত্ব রোপ-নিষেধে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং অতি তাঁহার সিদ্ধান্ত বা অপ্রতিভত জান সমর্থিত করিতেছেন। আবার মহুর মাধ্যম্য্যও ছান্দোগ্যে ব্রাহ্মণে কবিত হইয়াছে। যাহা কিছু মহুর বলিয়া গিয়াছেন তাহা পণ্ডা স্বরূপ জান করিবে। ঐ আশ্রয় গ্রায়ে বেদের ব্যাখ্যান করা হইয়াছে। উহা বেদ রচনার বহুকাপ পরে অতি মধ্যে প্রদত্তক নির্বাক করিয়াছে। উদাত্তে প্রদত্তক কপিলওই বিবৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে উপনিষৎ বা বেদান্তে জানকাত্ত প্রদানতঃ বিবৃত দৃষ্ট হয়। মহর্ষিগণের নিকট স্বর্ধকাত্ত অপেক্ষা জানকাত্তের প্রাধান্যই অধিক গ্রহীত হইয়াছে। কিন্তু জৈমিনির পরবর্তী কাল হইতে এই স্রোত কিম্বা গিয়া পুনঃ পূর্বের স্রোত স্রোত উজান বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। সে যাহা হউক এখন জিজ্ঞাস্ত উপনিষৎ স্রোত না ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ স্রোত? মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাস্ত করিলে

* পরগণাতি প্রচলিত অর্থাৎ বৃহৎ অরাসন বাগিচা প্রচলিত এই অর্থেই বোধ হয় পরগণাতির ব্যবহার। পরগণাতি শব্দ পরগণা শব্দের বিশেষণ যথা বাগিচা বাগিচা,—বাগিচাতি রস, উকীল—ওকালতী বাগিচা।

* যে যোনি: যোনিবহিত্তকতাতে বিখ্যাত রূপাণি যোনীশু সর্গ্য:। নদী: গ্রন্থত: কপিল: যদ্বরে জাণৈববিত্তিত্ত জাণবানকপশ্য: ১২ ৫৭ অধ্যায়।

† যদ বৈ কৈব মহুরবতন তত্র তেজস:।

তাহারা উপনিষৎকেই শ্রেষ্ঠ বলিবেন, কারণ তাহাদের মতে কৰ্মকাণ্ডওবহল বেদগ্রন্থ অপরাধিবা, আর উপনিষৎ, বাহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই পরাবিধ্য। অর্থব্যং শ্রেষ্ঠজ্ঞান। * এই ধ্বনি বচনে যদি কিছুমান আশা প্রদর্শন করা হয় তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় যে, যেখানতঃরাগনিবদের নিকট ছানোগো ব্রাহ্মণ হীনতার গ্রন্থ, স্তুরাগ মধুর প্রমাণ বলে কপিলের মতও গণিত হইতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগবান শব্দ তাহাই করিয়াছেন। বড় তুং ও কষ্টের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, গুণ্যপাদ ভগবান ভাষ্যকার স্বজ্ঞারকে সমর্থন করিতে গিয়া চাতুরী করিয়া ভগবান কপিলকে হীনতর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দরাচাধ্যা লিখিয়াছেন যে কপিল শব্দবেদে সামান্য ভাবেই কথিত হইয়াছে, স্তুরাগ বেদে কপিলের জ্ঞানান্বেষণ কথিত হইলেও তাহার বেদ-বিরুদ্ধ মতের প্রতি প্রত্যাশা বান করিতে পারা যায় না।† যিহী কারণ সগরপুত্রের দাহনকারী কপিল অস্ত্র ব্যক্তি, তাহার নাম বাহুদেব। ‡ ইহা দ্রিক হয় না। কারণ রামায়ণ বালকাণ্ড-৪০ অধ্যায় ২৩ স্লোকে (দ্বিতী অর্থে) এখানে রামায়ণকেই বুঝাইতেছে) কপিল বাহুদেব বা নারায়ণের

অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। নারায়ণ দেবভাগবতের কাকোক্তিতে কপিলরূপ পরিগ্রহ করিয়া সগরপুত্রদিগকে দধু করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যথা—
যুজ্যেৎ বহুধা কুংখা বাহুদেবস্ত হীনমতঃ।
মহিষী মাংসংমোহা স এব ভগবান প্রভুঃ ॥ ২
কপিলং রূপমাস্ত্রায় ধারয়তানিশ ধরায়।
তস্ত কোপায়িনা দম্মা দ্রাবিষ্টি নৃপাংস্বাঃ ৩০
এই স্লোকদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বেশ বোধ হইবে যে, সগর-পুত্রদের দধুকারী কপিলের অপর নাম বাহুদেব ছিল না। বাহুদেব, মাংস এ হলে বিষ্ণু নারায়ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ পৃথিবীর তাহারই মহিষী হওয়াই সম্ভব। তিনি যখন কপিলের রূপ ধারণ করিলেন, তখন কপিল যে নারায়ণের অবতার তাহাতে আর সন্দেহ কি? অপিচ কপিল শ্রুতিসামান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় নাই। উহা কেবল একমাত্র সাংখ্য-গ্রন্থে কপিল অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দরাচাধ্যা একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে নারায়ণ স্বজন করিলে জগৎ ব্যক্ত হয়, আর সহস্রার কালে তাহা একবার অদেই বিলীন হয়। এই বচনটি একই ব্যবহৃত হইয়াছে স্তুরাগ নারায়ণ অর্থে বিষ্ণুর বোধ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু এই বচনটি মহাভারত শাস্তিপর্গ ৩০১

* তরাপরা কথনো যদুর্লভঃ সামবেদোৎপত্তিঃ শিকাকরো ব্যাকরণ নিরুজঃ তলো জ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যদা তদকরনবিদ্যাতো ৬ বৃহতঃ

† বা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানান্বেষণঃ প্রদর্শনঃ প্রদিশঃ, ন তয়া শ্রুতি বিদ্বদ্রমপি কপিলঃ মতঃ সত্যাত্মকঃ।
শব্দঃ কপিলমিতি শ্রুতিসামান্য মাংসং। অজনা চ কপিলস্য সগর পুরাণাঃ প্রভৃৎপুত্রবিশেষবান্ধাঃ সগরায়।

‡ বঙ্গীর রামায়ণের পাঠে ইহা অনাপ্য থাকিলেও উক্তের ভাব এক। যথা—

বিজ্ঞাং যো জগৎ কুংখঃ যস্যোংপাশ্বিনং বিদ্যাতো।

তেনো বাহুদেবো কপিলোনাগমিতঃ।

পৃথিবীশক্তির জেদারঃ দৃষ্টান্তেভিত্তমস্মিতঃ।

সগরস্য চ পুত্রাণাঃ বিনাশোহস্মিতভেদজাঃ।

§ অতঃকালেন্দ্রপমিনঃ সুখাঃ নারায়ণঃ সর্গমিগঃ পুরাণাঃ।

ন সর্গকালে চ করোতি সর্গং সাংসারকালে চ তদন্তি ভূতঃ।

অধ্যায়ের ১১৪ স্লোকে। এই অধ্যায়ে সাংখ্য-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ও কপিল-মতাদ্বাহারী সাংখ্য-গণের গুণগরিমা ভীষ্মবেদ যুধিষ্ঠিরকে বর্ণন করিতেছেন। এখানেও কপিলকে নারায়ণ বলা হইয়াছে। তিনি সমগ্র সাংখ্য ধারণ করিয়া আছেন। অধিকন্তু সাংখ্য যে অমুর্ন্তরুদ্ধের সাধার মৃষ্টি, তাহাও বলা হইয়াছে। যথা—
সাংখ্যো রাজস্রমহাপ্রাজ্ঞা গজ্জিহ্বা পরমান গতিং।
জ্ঞানেনানেন কোন্তেয় ভূতানাং জ্ঞানং
ন বিদ্যতে ॥ ১০০
অত্র তে সাংখ্যো মাতুলজ্ঞানং সাংখ্যং
পরং মতঃ।

অক্ষয়ঃ ক্রমবোক্তঃ পূর্ণং ব্রহ্ম
সনাতনং ॥ ১০১

অমুর্ন্তেতস্ত কোন্তেয় সাংখ্যঃ
মুক্তিরতিশ্রুতিঃ ॥ ১০৬

জ্ঞানং মহৎ যদ্বি হি মহৎ স্বরাজনং
বেদেষু সাংখ্যেয়ং তদেব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে
সাংখ্যাগত্যং তদ্রিখলং নরেন্দ্র ॥ ১০৮

যচ্চৈতহাসেন্দ্রমহৎ দৃষ্টং
বদ্যার্শাশ্রেয়ং নৃপ শিষ্টকৃষ্ণে।
জ্ঞানং চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
সাংখ্যাগত্যং তচ্চ মহমহাশ্রয়ং ॥ ১০৯

সাংখ্যং বিশাখাঃ পরমং পুরাণং
মহার্যবং বিমলদ্বারকাস্থং
কুংস্কম্ভ সাংখ্যং নৃপতে মহাশ্রয়
নারায়ণো ধারয়তেপ্রসন্নমতঃ ॥ ১১৪

এতন্মায়োক্তং নরদেবতৎ
নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণং
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং
সাংসারকালে চ তদন্তি ভূতঃ ॥ ১১০

উপরিলিখিত অংশ দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে উপনিষৎ পুরাণ ইতিহাস অর্থ-শাস্ত্রে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব দৃষ্ট হয় এবং শিষ্ট-সমাজ বাহা অবিদ্যাক্রমে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন সে সকলেব মূল কপিলদেবের সাংখ্যশাস্ত্র। এই প্রত্যক প্রমাণদর্শনে পুণ্ড্র্যপাদ ভাষ্যকার ভগবান কপিলের অশ্রদ্ধা করিয়া হইয়াছেন—তাঁহার কথাটি 'যে সাংখ্য উপবেশন তাহারই ছেদনরূপ হইয়াছে।

তারপর স্বজ্ঞার যে মধুর মত অম্বসরণ করিয়া সাংখ্যমত গুণন করিয়াছেন, সেই মধুরও প্রথম, যত ও দ্বাদশ অধ্যায়ে সাংখ্য-মত বিবৃত হইয়াছে। স্তুরাগ স্বজ্ঞারের সমগ্র হয় বর্ত্তমান সময়ের মানব ধর্মশাস্ত্র এ আকারে লিখা না, না হয় তিনি অনুভবায়ী; এই দুই পক্ষ ব্যতিরেকে আর তৃতীয় পক্ষ নাই।

এইরূপে স্বজ্ঞার একটি একটি যুক্ত প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতির অঙ্গপদ্রব জগৎস্রষ্টি, বংশগোষার্থ্যে বেদের দুঃস্বপ্নরূপ প্রদানের যচ্চৈতহাসেন্দ্রমহৎ দৃষ্টং বদ্যার্শাশ্রেয়ং নৃপ শিষ্টকৃষ্ণে। তারপর, বাসদেব পরমাত্মা, সঙ্কল্প জীব, প্রদ্রায় মন ও প্রদ্রায় হইতে অংকুররূপ অনিরুদ্ধ এই ভাগবত মতও নিরাকৃত করিয়াছেন। বৌদ্ধদের স্বপ্নকথার বিজান-বাদও গুণন করিয়াছেন। তারপর প্রকৃতি দৈবরাবিক্তি তাইহা জগৎ স্বজন করিতেছে গীতোক্ত এই মতও নিরাকৃত করিয়াছেন। তারপর অবতারবাদও নিরাকৃত করিয়াছেন। স্তুরাগ জগতে যত ধর্মমত আছে, তাহার একটিও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। এইরূপে

নিষ্কর বিবর্ত্তাব স্থাপন করিয়াছেন অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মণ্য-ব্রহ্ম ইহা হইতে পৃথক নহেন। এই বিষয় একই গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বোধ হইবে যে, ইহা একরূপ সাংখ্যমতই; কারণ তাহাতে মূল প্রকৃতি অনাদি, তিনি জগৎ সৃজন করিতেছেন। পুরুষ ও অনাদি, কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় তিনি সত্তা মাত্র। এখানেও কি তাহাই দাঁড়াইল না? কারণ যদি বিখ্যাতেরই বিবর্ত্ত, তাহার যখন পরিণতি নাই, তাহা হইলে উহা ব্রহ্মের জায় আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। যদি তাহাই হইল, তো এত মন্তক কণ্ঠন ও চালনা করিয়া সাংখ্যাস্ত্রের প্রকৃতির নিয়াকরণের প্রয়াস কেন করা হইল? আমি যে, বিষয় উপরে লিখিলাম সৌভাগ্যক্রমে ভগবান ভাষ্যকারও তাহারই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার বচন এই—

মূল প্রকৃত্তানভূতগুণমেনব্রহ্ম প্রসঙ্গাৎ। যা মূলপ্রকৃত্তিরভূতগুণম্যতে তদেব চ নো ভেদভ্য-
রোহঃ। ২.৩০ ভাষ্য; অর্থাৎ সাংখ্যগণ মূলপ্রকৃত্তিতেই জগৎসৃষ্টির মূল স্থাপন করিয়া নিঃসৃত হইয়াছেন। ইহা করায় ভালই করিয়াছেন, কারণ যদি না করিয়া ঈশ্বর বা ব্রহ্মের মূল প্রকৃতি সৃষ্টির কথা বলিতেন, তাহা হইলে অনবস্থা-বোধ আসিয়া পড়িত অর্থাৎ তখন এই একটা তর্ক দাঁড়াইত যে, তাহা হইলে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে কে সৃষ্টি করিল? হুতরাং কোনকাল পুরুপূরারস্থার বিরাম ঘটিল না। তাই ভগবান ভাষ্যকার বলিতে বাধ্য হইলেন যে, যাহাকে তোমরা মূলপ্রকৃতি বলিতেছে, আমরা তাহাকেই ব্রহ্ম বলি; হুতরাং আমাদের উত্তরের কোন বিরোধ

নাই। এই সত্যভাষণ-গুণেই ভগবান ভাষ্য-
কারকে লোকে শব্দের অবতার বলিয়া
পূজা করে। হুতরার নিষ্কর জ্ঞেয় যথা
মনে মনে জানিয়াও স্বীকার করিতে পারেন
নাই, ভাষ্যকার অগত্যা তাহাই করিতে বাধ্য
হইলেন।

হুতরার আকাশ ও বায়ুকে সৃষ্ট পদার্থ
বলেন নাই, ইহাতে স্রষ্টির দোহাই
দিয়াছেন। * এক ছান্দোগ্য উপনিষৎ
ব্যতিরেকে অন্য সকল স্রষ্টিই তারশ্বরে
ঘোষণা করিতেছে যে, “এই ছই পদার্থ পঞ্চ
মহাভূতের অন্তর্গত, হুতরাং সৃষ্ট পদার্থ।

দিব্যোহ্যমুর্ভুঃ পুরুষো স বাহ্যাত্ত্বস্ত্রোহ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যকরাৎ পরতঃ পরঃ ৥২
এত আশ্চর্য্যেতে প্রাণোঃ মনঃ সূক্ষ্মজিহ্বা চ।
ধংবায়ুজ্যোতিরাপাঃ পৃথিবী বিশ্বস্য দারিণী ৥৩

২য় মুণ্ড ২ বাকী।

অখাখিলোকং। পৃথিবী পূর্পরূপং।

দ্যৌরুশ্চরূপং। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ু সন্ধানং।

অখাখিজ্যোতিষঃ। অগ্নিঃ পূর্পরূপং। আদিত্য

উত্তররূপং। আপাঃ সন্ধিঃ। বৈদ্রাঘ্যঃ পশ্চানং।

২ অহ্বাক। পৃথিব্যধ্বজিকং দৌদিশোহাবস্তর-

দিশঃ। অগ্নিবায়ুদিত্যশ্চন্দ্রম্যনকম্যগ্নি।

আপ ওষধ্যো বনপশ্চয় আকাশ আত্মা ইতি

অদ্বিত্বং। ৩ অহ্বাক ঐতরীয়া উপনিষৎ

এত আদ্যান আকাশঃ সন্তুতঃ। আকাশাদ্-

বায়ুঃ। বায়োরাগ্নিঃ। অগ্নেরাপা। অতঃ পৃথিবী।

১ অহ্বাক, ব্রহ্মবাক্য।

সদেব সোমো দময় আসীদেককমেবা দ্বিতীয়ঃ ৥২

তদৈক্যং বহুত্বং প্রজায়ায় ইতি তত্ত্বজ্ঞোহ

হুতং ১০ তত্ত্বজ্ঞ একত

তদপৌহস্বজতঃ.....৩

ছান্দোগ্য ৩ষ্ঠ প্রাণা ২য় খণ্ড

ছান্দোগ্য উপনিষদে নূতন নূতন অস্বত
কথা বলা হইয়াছে ব্রহ্মস্বত্বকার তাহার সকলই
চর্কিত করিয়া হুত্রে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।
পূর্বেকাল বচনে জলের পরে অগ্নির কথা আছে,
হুত্বকার এই অগ্নি অর্থে পৃথিবী বুঝিয়াছেন এবং
তাহার হেতু, মুক্তিও প্রশংসা করিয়াছেন;
ইহা সকলই এই উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায়।
এই অগ্নির সহিত আকাশের ব্রহ্মত্বকে
উপাসনার কথা আছে। হনয় পুত্রওভাবে
দহর-বেশ্য বলা হইয়াছে। তাহার অন্তরে
যে আকাশ আছে, তথায় ব্রহ্মের উপাসনার
কথা আছে। এই সকল কথা হুত্বকারও
জীর্ণ করিয়া বেদান্ত-দর্শনে প্রকাশ করিয়া
গিয়াছেন। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠত্ব
বিষয়ক গল্প ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উভয়
উপনিষদেই আছে। শেবাতিতে তাহা
বিস্তারিত ভাবে রহিয়াছে। তার পর
আরুণেয় শেভকৈতু ও জৈবলি প্রাবহণের যে
সংবাদ হয় তাহা উভয় গ্রন্থেই আছে।
বৃহদারণ্যকে তাহা অতি স্পষ্টভাবে প্রদত্ত
হইয়াছে। ছান্দোগ্যে সেক্রপ নাই, মধ্যো
মধ্যে খলিত দৃষ্ট হয়। বোধ হয় যেন পূর্
হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তার পর
উভয় গ্রন্থ ভুলনা করিলে বেশ বোধ হয় যে
ছান্দোগ্যোদি পরবর্ত্তী রচনা।

বৃহদারণ্যকের বর্ষ অধ্যায় তৃতীয় ব্রহ্মকে
উদ্ভালক আকর্ষিত হইতে সত্যকাম-জাবাল
পর্য্যন্ত শিষ্যগণের ৬ পুরুষের ধারাবাহিক
নাম লিখিত আছে। আকর্ষিত ছাত্র যাজ্ঞ-
বল্ক্য। তবে এই উপনিষদে আকর্ষিত যাজ্ঞ-
বল্ক্যকে প্রশংসা করিতেছেন এবং জাবালকেও
মুনিগণ প্রশংসা করিতেছেন এইরূপ সংবাদও

বিবৃত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে
অন্ততঃ জাবালের সমসাময়ে বৃহদারণ্যক
বিস্তৃতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান আকারে
নিবদ্ধ হয়। ছান্দোগ্যে একটা কথোপকথন
লিখিত হইয়াছে তাহাতে উদ্ভালক আকর্ষিত
ভবিষ্যৎ-অগ্নি-বেশ্য কথার আভাস আছে।
ইহা দ্বারা কতক অংশে এই ভাব
প্রকাশিত হইতেছে যে লেখক জাবালের
পরবর্ত্তী। ইহাতে সত্যকাম জাবালের কথা
আছে। * ইহা নিঃসন্দেহে প্রকাশ করিয়া
দিত্তেছে যে ইহার লেখক জাবালের
পরবর্ত্তী। জাবাল যে যাজ্ঞবল্ক্যর বর্ষ পুরুষ
অন্যতম তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।
পূর্বে বেদগ্রন্থই স্বীকৃত হইয়াছিল। তার পর
মৃৎকোপনিষদে অথর্ববৈদের কথা স্রুত হওয়া
যায়। বৃহদারণ্যক কোথাও বেদগ্রন্থ,
কোথাও ছন্দ্যাসি ধরিয়া চারিবেদ আবার,
কোথাও অথর্বসিদ্ধির বলিয়া ছন্দ্যাসির স্পষ্ট
গুণ প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ শব্দ ব্যবহার
যে পর পর সময়ে হয়, তাহার সন্দেহ নাই।
ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্বসিদ্ধির বলিয়াই
সর্বত্র লিখিত হইয়াছে হুতরাং ইহা দ্বারাও
এই উপনিষদের বৃহদারণ্যকের পরবর্ত্তিত্ব
প্রকাশিত হইতেছে। বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মকে
অসৎ সং ছই-ই বলা হইয়াছে। গীতার
১২শ অধ্যায়েও তাই বলা হইয়াছে। ইহা
পূর্বে উপনিষদের প্রতিপাদন, হুতরাং অগ্নির
প্রতি সমান। ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে সং বলা
হইয়াছে এবং অসৎ হইতে সং উৎপন্ন হইতে
পারে না এইরূপ তর্ক আছে। হুতরাং ইহার
লেখক পূর্বে অগ্নি বচনে এক প্রকার অনায়াস
প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও প্রকাশিত
হইতেছে যে ইহা পরবর্ত্তী রচনা।

ছান্দোগ্যে ঋষি-মতের প্রতি অনেক স্থলে অনাস্থা দেখান হইয়াছে। পঞ্চ মহাভূতের আকাশ ও বায়ু যে অশ্বত্থ পর্নাথ তাহা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। এখন অশ্বত্থ-প্রদর্শন করিতেছি। ইহার যন্ত্র প্রাচীর তৃতীয় খণ্ডে “ভূশানাং ক্রীণোব বজানি ভবজাংগুজোবজ-মুক্তিহ্রমিতি।” অর্থাৎ তিনপ্রকার ভূতযোনি বা জীব-ভগ্নং আছে—অশ্বত্থ, জরাশূক ও উদ্ভিজ্জ। ব্রহ্মবাদিগণ ইহার সহিত যেরূপ (অর্থাৎ বাহ্যার ঘর্ষ হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন উৎকুন ছাত্রপোকা ইত্যাদি) ধরিয়া তাহা চারি প্রকার স্বীকার করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবাদীগণ ছয়টি ঋতু গণনা করেন। ছান্দোগ্যাকার ২য় প্রপাঠক ৪ম ও ১৬শ খণ্ডে পাঁচটা ঋতুরই কথা বলিয়াছেন—
কৃত্ত্বং পূর্বাংশং সান্দোগ্যাদীনীত বসন্তাহিয়ারো গ্রীষ্ম-প্রস্রাবো বর্ষা উদীপীঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তঃ নিম্নং।

এই চরনে বর্ষা উদীপী থাকায় বোধ হইতেছে বর্ষা বৎসরের মধ্য স্থানে পড়িত এবং তাহাতে দুইটা ঋতু ধরিয়া বর্ষার চাতুর্ভাগ স্বীকার করা হইত। নাগার্জুনের প্রতিপাদিত হুস্তে ও চরক-সংস্কৃত অগ্নি বেশতঃ বৎসরের দুইটা প্রকার গণনার স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। একটা প্রাচীন প্রবালী—ইহাতে শিশির আদি হেমন্তাশ্র ছয়টি ঋতু স্বীকৃত হইয়াছে। উহা উত্তরায়ন ও মাঘ মাসে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণায়ন ও পৌষে শেষ হইয়াছে। অষ্টমী আধুনিক রীতি—ইহাতে বর্ষা ও প্রারম্ভ নামে দুইটা বর্ষা স্বীকৃত ও শিশিরটা পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্বতরাং নাগার্জুনের মতে নামে মাত্র ছয়টি ঋতু হইলেও বসন্তঃ তাঁহার গণনায় বৎসরে ষাট মাত্রই ঋতু হইতেছে। তাঁহার প্রাবর্ত্তি

এই গণনা বৌদ্ধগণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ মথুরায় কবিক বহুদেব আদিদাহিনব-পতিগণের যত শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে এই প্রবালী অবলম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতে ঋতু ও পক্ষের গণনা আছে, মাসের নাম নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং আভাস্তরিক ও বাহ্যঃসাক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের মনে একটা সংশয় ও বিতর্ক উপস্থিত হইতেছে যে এই উপনিষৎগানি নাগার্জুনের সমন্বয়ের রচনা ত নহে? অথবা ছান্দোগ্য-কার বর্ষাবলল কোন দেশে বাস করিতেন। তথায় বৎসরের ঐক্লব ঋতুবিভাগ প্রচলিত ছিল। নাগার্জুন কাম্বোজের মণ্ডলেশ্বর-পূজিত ছিলেন। স্বতরাং ইহাই অধিক সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে যে কাম্বোজের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবস্থিতি তাঁহার নিদ্রিষ্ট ঋতুর অধরূপই ছিল, তাই তিনি বৎসরের ঋতুর ঐক্লব স্বরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। এই প্রকারে ছান্দোগ্যাকারেরও যে ঐক্লব নির্দেশের কারণ ছিল তাহা বেশ বোধ হইতেছে।

প্রাচীন উপনিষৎগুলি ভ্রমে গ্রথিত দৃষ্ট হয়। ‘আনন্দিক গুলি গদ্যে গ্রথিত হয়। প্রাচীন গুলিতে যজ্ঞের নাম দৃষ্ট হয় না। পরবর্তী গুলিতে যজ্ঞ-কার্যের সমর্থনের সহিত উপনিষৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যজ্ঞ-কার্যের প্রধান পাণ্ডা হোতা ও উদাত্তা উপনিষদের মাদুগী শীঘ্র বৃষ্টিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার কণ্ঠেই বিভোর থাকিতেন, জ্ঞানের উন্মেষের তাঁহারি অঙ্গই অবসর পাইতেন। কিন্তু যজ্ঞের কার্য অঙ্গ দ্রুত হইয়া অঙ্গমুখা ও ব্রহ্ম এই অবসর বাহুল্যভাবে প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, তাই তাঁহারি কণ্ঠাণ্ডের প্রমোতা ও জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেয়তা শীঘ্রতর অবলোকন

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কারণে আমরা কঠোপনিষৎ, মুণ্ডক ও বেতাখতর পদ্যে গ্রথিত দেখিতে পাই। ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি গুলে লিখিত দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয় ব্যতিক্রমে গুলে লিখিত অল্প সকল অপেক্ষা বৃহদারণ্যকে প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ ইহার মৌলিকতা দৃষ্ট হয়, অশ্লীলতা ইহারই ভাবের ছায়া পড়িয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। অথবা এইগুলির গুলে রচনা নাগার্জুনের হস্তক্ষেপ আছে কি না সে সন্দেহও মনে পড়কা উপস্থিত হয়, কারণ বাহাতে যজ্ঞের অশ্রেয়তা প্রথ্যাপিত ও সাংখ্যমত সমর্থিত হইতেছে, তাহা তিনি স্পর্শ করা মুক্তিগ্ধ মনে করেন নাই; যেহেতু ইহাতে তাঁহার বিশ্বদীর্ঘতাবের অশ্রমোদানই করিয়াছে, কিন্তু বাহাতে যজ্ঞদানতপের কর্তব্যতা প্রথ্যাপিত হইয়াছে তাহার গদ্যে রচনার আজ্ঞা প্রচারিত করেন—গদ্যে লিখিত হইলে সাধারণের চিত্ত সবার আকর্ষিত হইবে না, স্বতরাং তাহা না হইলে তাঁহার নিম্বন্ধ-প্রচারেও অন্তরায় উপস্থিত হইবে না।

এইরূপ প্রদর্শন করিতে পারা যায় যে ছান্দোগ্যের রচনা উপরোক্ত অল্প উপনিষৎ অপেক্ষা অধীন। ইহা কোন কাম্বোজ-বাসীর রচনা। ইহার রচনা-কালে বৌদ্ধ-প্রভাব সনাতন সমাজকেও স্পর্শ করিয়াছিল। বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মগণ যেমন নিরবচ্ছিন্ন সামবেদের কৌশুম্ভাশী বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, কাম্বোজের সেইরূপ কৌশুম্ভের সহিত সামবেদের অল্প শাখাও প্রচলিত স্কৃত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ তদক্ষীয় ব্রাহ্মগণ সাম-বেদীয় বিভিন্ন বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী হইবেন। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মগণ যেমন কণ্ঠকাণ্ডের মোহে

বিভোর, কাম্বোজদেশীয় ব্রাহ্মগণও তদ্রূপই বিশ্বল, স্বতরাং তাঁহাদের রচিত উপনিষৎ ছান্দোগ্যেও তাহারই ছায়া বাহুল্যভাবে পতিত হইয়াছে।

এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞ ও ছান্দোগ্যের রচনা-কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উপরে লিখিয়া আসিয়াছি যে ইহা নাগার্জুনের রাজত্বকালে রচিত হয়। নাগার্জুন বুদ্ধদেবের নির্ধাণ-প্রাপ্তির ১৫০ বৎসর পরে জগতে অবতীর্ণ হন, বৌদ্ধ সমাজে এইরূপ বিশ্বস্ততা প্রচলিত আছে। সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধগণের গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ভগবান বুদ্ধদেব খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব ৫৪৩ বৎসরে নির্ধাণ লাভ করেন স্বতরাং নাগার্জুনের সময় খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব ৩৯০ বৎসরের নিকটবর্তী কোন সময় হইতেছে। অতএব এই সময়ের কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে ব্রহ্মজ্ঞকার সাধারণও প্রাদুর্ভূত হন। কেহ কেহ আবার এমতও সম্ভারিয়াত। তাঁহারি বলেন নাগার্জুন অশ্রমোদানের সময় বুদ্ধ নির্ধাণের ৪০০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন, স্বতরাং পূর্বলিখিত সময় হইতে ইহা ৩০০ বৎসর অধীন হইয়া পড়িতেছে।

বায়দ্য নামে জনৈক জ্যোতিষী ও ব্যাস নামে যোগদর্শনের জনক ভাষ্যকারের নাম শ্রুত হওয়া যায়। জ্যোতিষীর বচনাবলী ভট্টাংশপল তাঁহার বুদ্ধজাতক টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্যাসের বচন বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার তত্ত্ব বৈশাখরী নামী পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তথায় তিনি এই ব্যাসকে ভগবান কৃষ্ণদেবায়ন ব্যাস হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং তাঁহার পাঠকণ্ঠকে সন্দেহহীনায় স্থাপিত করিয়া

ওলকচুর চাষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যয়ের হিসাব

১। ভূমির খাজনা—	২।
২। ভূমি প্রস্তুত ও মূল রোপণের ব্যয়	২০।
৩। বীজমূল খরচের ব্যয়—৬৫৬১টী	
মূলকাণ্ড শতকরা ৪০ দরে—	৬২০।
৪। মূল সংগ্রহ ও মজুত করার ব্যয়	৭।
৫। জঙ্গল নিদান ও গাছের গোড়ার	
মৃত্তিকা উন্মোচন দিবার ব্যয়—	৫।
৬। সার দেওয়ার ব্যয়—	৫।
	১০৪০।

দ্বিতীয় বৎসরে ইহার অল্প কোন পাইট নাই। বর্ষান্ত্রে গাছের গোড়ার মৃত্তিকা খুঁটি বা পানন দ্বারা আলগা করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছু করিতে হয় না। গাছ অশুভিত হইবার পরে এই কার্য করিতে হয়। এই বৎসরে অবশিষ্ট ৩২৮০টী মূল গড়ে ৭০ আনা দরে বিক্রয় হইতে পারে। তাহা হইলে এই বৎসরের ৪১০০ টাকা উপদ্রব হইতে পারে। বাহা হউক, উহার মূল গড়ে ৭০ এক আনা হিসাবে ধরিলে এ বৎসরেও ২০৫০ টাকাই উপদ্রব হইবে। ইহার চাষে এ বৎসর অতি অল্প ব্যয়ই হইবে। ওলের গাছ পুষ্টিতে বার না। স্বতরাং ওলক্ষেত্র বেড়া দিবারও প্রয়োজন হয় না। এ বৎসরে নিম্নের হিসাব মত মার ২৪০ টাকা ব্যয় হইবে। এ বৎসরের উৎপন্ন ২০৫০ হইতে উহা বাদ দিলে ১৮১০ খাটী লাভ হইবে। তন্নিম্ন ইহার মূল হইতে বহু পরিমাণ চক্ষু পাওয়া যাইবে। উহা বিক্রয়

করিলেও কম লাভ হইবে না। উহার ভাবী বীজের কার্য করিবে। উহাও বাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বৎসরের ব্যয়ের হিসাব

১। ভূমির খাজনা	২।
২। জঙ্গল নিদান ও গাছের গোড়ার	
মৃত্তিকা আলগা করিয়া দিবার ব্যয়	১৫।
৩। মূল সংগ্রহ ও মজুত করার ব্যয়	৭।
	২৪।

উল্লেখিত হিসাবমত দ্বিতীয় বৎসরে ১৮১০ লাভ হয়। উহা হইতে আগন্তুক ক্ষতি ৪১০ টাকা বাদ দিলেও দ্বিতীয় বৎসরে এক বিঘার নানাদিক ১৫০০ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় বৎসর গাছের গোড়ার মৃত্তিকা চুড়িয়া হালকা করিয়া দেওয়ার ব্যয় প্রথম বৎসর অপেক্ষা অধিক লাগিবে। কেন না বর্ষান্ত্রে মৃত্তিকা কঠিন হইয়া যাওয়ায় উহাকে চুড়িয়া খুলিব্য করিতে অধিক শ্রমের প্রয়োজন হয়।

অল্প এক প্রণালীতে ওলের চাষ করিলে আরও অধিক লাভ হইতে পারে। যে সকল মূল রোপণ করা হয়, প্রথম বর্ষে উহাদের প্রত্যেক দুইটী গাছের মধ্য হইতে একটী গাছ উঠাইয়া লইবে। তাহা হইলে ৩২৮০টী মূল উঠাইয়া লওয়া হইবে। তৎপরে বৈশাখ মাসে যে স্থান হইতে মূল উঠাইয়া লইবে ঐ স্থানে একটী করিয়া মূল রোপণ করিবে। তাহা হইলে একই ক্ষেত্রে একাদিক্রমে ৩৬ বৎসর ইহার চাষ করিতে

পারিবে। ভূমি অবশ্য, একেবারে সারহীন ও অক্ষুণ্ণ না হওয়া পর্যন্ত একই ক্ষেত্রে বহুদিন ইহার চাষ চলিতে পারে। পঞ্চান্তরে দ্বিতীয় বর্ষে অবশিষ্ট ৩২৮০টী মূলের প্রত্যেক দুইটীর মধ্যবর্তী একটী মূল উঠাইয়া লইলে ১৬৪০টী মূল উঠাইয়া লওয়া যাইবে। উহার প্রত্যেকটী মূল গড়ে ৭০ আনা দরে বিক্রয় করিলে ২০৫০ টাকাই উপদ্রব হইবে। তৃতীয় বৎসরে অবশিষ্ট ১৬৪০টী মূল রূহদাকার হইবে। উহার প্রত্যেকটী ৭০ আনা হইতে ১০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে। গড়ে প্রত্যেকটীর মূল্য ৭০ ধরিলে নানাদিক ৩০৭০ টাকা উপদ্রব হইবে। উহা হইতে চাষের ব্যয় ২৪০ টাকা বাদ দিলেও ২৮৪০ টাকা লাভ পাওয়া যায়। উহা হইতে আগন্তুক ক্ষতি ৮১০ টাকা বাদ দিলেও অনুরূপ ২০০০ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা। এরূপ লাভের সহজ উপায় বিদ্যমান থাকিতেও ভারতবাসী অধিকাংশ ভাষিয়ার, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

পূর্ববঙ্গের কোন কোন ক্ষেত্রে বাজ্রভূমির পতিত জায়গায় কেহ কেহ ওলের মূল রোপণ করিয়া থাকে। উহা দ্বারা পারিবারিক ব্যবহারের কার্য সম্পন্ন হইয়াও সামান্য পরিমাণে লাভ হইয়া থাকে। কলা-বাগানে ও বাগাইর বরজেও কেহ কেহ উপ-ক্ষল-রূপে ওলের চাষ করিয়া থাকে। ইহাতেও লাভ হইয়া থাকে। শেখর হিসাবে ইহার চাষ করিতে হইলে ছায়াযুক্ত স্থানে না সূর্য গৃহে ইহার চাষ করিতে হয়। প্রকৃত স্থানে ইহার পাতার বর্ণের গাঢ়ত্ব ও চাকিত্য রুদ্ধ হয়। অর্ধছায়াবিশিষ্ট স্থানেও ইহার চাষ হইতে পারে। সেইজন্য কলা-বাগানে ও বাগাইর বরজে ইহার চাষ হয়। খোলা জায়গায়ও ইহার চাষ হইতে পারে। বিস্তৃত পরিমাণে

ইহার চাষ করিতে হইলে খোলা জায়গায়ই করিতে হয়। ইহাদের মূল অর্ধছায়াযুক্ত স্থানে সত্ত্বর বর্জিত হয়। মূলের বৃদ্ধি ক্ষত্র যে ছায়ায় প্রয়োজন তাহা ইহাদের পাতা দ্বারা ই সাধিত হইয়া থাকে। ইহাদের পাতাই একরূপ ছাতির কার্য করিয়া থাকে। স্বতরাং ইহাদের মূলের উপরে আর অল্পক্ষণ ছায়া করিবার প্রয়োজন হয় না। তৎপরি মূলের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে গাছের গোড়া চাকিয়া দিতে হয়। এই ক্ষত্র বড়, সর্বপরে খোলা, ধানের খোলা (তুষ husk) বা ত্তরূপ অল্প কোন বস্তুর দ্বারা গাছের গোড়া চাকিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে ওলের মূল সত্ত্বরই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত পদার্থ সকল গাছের গোড়ায় পচিলে উহা দ্বারা ভূমির সাক্ষরতা রক্ষা হয়। অধিকন্তু ইহারা পচাকা ভাবে সারের কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। অধিক ছায়াযুক্ত স্থান ওলের চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসুযোগী। যুদ্ধ স্থান-কিরণ ও আলোকবল্লভ স্থানই ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অধিক ছায়াতে উৎপন্ন ওল বাবুহারের অসুযোগী হয়। উহা খাইলে গলা ধরিয়া থাকে অর্থাৎ কর্ণনালীতে চিন্ চিন্ করিয়া দাহ ও জ্বালা উপস্থিত হয়। কখন কখন কর্ণনালী ক্ষীণ হয়। এরূপ স্বভাবের ওলের মূলের বাকল উঠাইয়া উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কর্তন করিবে। তৎপরে ঐ সকল টুকরাকে চূর্ণের জলে ই যতী কাল ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপরে সূর্যোত্তাপে শুষ্ক করিবে। তৎপরে উহাদিগকে জলে দোত করিয়া সর্গশেষে হাড়িতে জল রাখিয়া উহাতে রাখিবে এবং অগ্নিগোষণে সিদ্ধ করিয়া লইবে। তাহা হইলে উহা

বাগানে ব্যবহারের উপযোগী হইবে। তখন উহাতে গলা ধরিবে না, বরং স্বচ্ছ হইবে। খোলা জায়গায় ইহার চাষ করিলে ইহার মূল গলা ধরে না। ইহার কারণ এই যে, স্বর্ণো-পাতা ধরা, উহার দুই রং শোভিত হইয়া থাকে। নতুন সংগৃহীত মূল কর্তন করিলে উহার একরূপ জলীয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা শরীরে লাগিলেও স্পষ্ট হানে জালা উপস্থিত হয়। এই জন্ত ইহার মূল সাগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুক করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন ওল নানা জাতি। কোন কোন জাতির গলা ধরা দেখা আছে ও কোন কোন জাতির এই দেখা নাই। বাস্তবিক তাহা নহে। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, খোলা জায়গায় ইহার চাষ হইলে ইহা কড়াচিৎ গলা ধরিয়া থাকে। কিন্তু ছায়ায় উৎপন্ন মূল অধিকান্ত সময়েই গলা ধরিয়া থাকে।

ইহার মূল ও (আসল মূলের পাত্রজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল বা চক্ষু) বাইতে মন্দ নহে। ইহার পাকপ্রণালীও পরিপক্ব মূলের পাক-প্রণালীর জায়। ওলের মূল সংগ্রহের পরে উহার পাত্রক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল বা চোপ সকলকে ভাঙ্গিয়া মজুত করিতে হয়। উহারাই ভাবী বীজের কার্য করে। উহা সংগ্রহের পরে ২০ দিন রৌদ্রে শুক করিয়া ঘরের মেঝেতে বালি বিছাইয়া উহার উপরে উহারিগকে রাখিতে হয়। তাহা হইলে উহার ভাঙ্গা থাকে। ওলের মূল পরিপক্ব হইলে উহার ভাটা ও পাতা পচিয়া যায়। তখন উহার মূল সাগ্রহ করিতে হয়। সাধারণতঃ কার্তিক মাস হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ইহার মূল সংগৃহীত হইয়া থাকে। কখন কখন মাঘ ফাল্গুন মাসেও উহা সংগৃহীত হইয়া থাকে।

২। এমরফোফেলাস-

বাল্‌বিফিরা-ম্—

(AMORPHOPHALLUS
BULBI FERUM.) বাকুরাজ

ইহা বাকুরাজ ও বুনো বা বাজ ওলক্ষু নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহা বাকুরাজ বা বাজুরাজ নামে অভিহিত হয়। ইহার সংস্কৃত নাম স্থল-কন্দ বা অগ্র্যামাকন্দ।

“স্থলোকন্দোঃগ্র্যামাকন্দঃ।

অগ্র্যাম শব্দে বাহা গ্র্যামা নহে তাহাকেই বুঝায়। ‘স্বতরাং বজ ওলক্ষু-নামটাই ইহার ঠিক নাম বলিয়া বোধ হয়। ইহার জন্মস্থান বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশের জমলে ইহা বড়বড়ই জন্মিয়া থাকে। ইহার মূল ক্ষুদ্র ও ইহাতে গলা ধরিয়া থাকে। কোন উপায়েই ইহার গলা-ধরা দেখা বারণ করা যায় না। সেই জন্ত ইহার চাষ হয় না। ইহার মূল একটা মধ্যমাকার শালগমের অপেক্ষা বৃহৎ হয় না। গ্রীষ্মারম্ভের সময় ইহার মূল হইতে প্রথম মূল বহির্গত হয়। উহা মরিয়া গেলে ভাটা ও পাতা বহির্গত হয়, উহার বর্ষাকাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকে, তৎপর মরিয়া যায়। ইহার ভাটার বহির্দেশ বহুবৎ আশপূর্ণ। ইহার গাছ ও পাতা অতিবৃহৎ। পাতা কখন কখন ৪৫ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট হয়। গাছ ৪৫ ফুট উচ্চ হয়। পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণ। নানা বণ্ডে বিভক্ত। পাতার কিনারা রেখাযুক্ত। ভাটা ক্ষুদ্রাক নূরূপ বর্ণ। মাঝে মাঝে স্নেহ বর্ণের পোছ থাকে। ইহার পাতার দেখকণ্ড ও অন্তর উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার মূল উৎপন্ন হয়। ইহারই ইহার ভাবী বীজ। ইহার ফুল পাটল বর্ণের আভ্যমুক স্নেহবর্ণ। ফুল বন্ধা। পাতার উপরে ইহার বীজ হয়।

ইহার ভাটা ও পাতা পাওয়া যায়। ইহার কচি-পাতা ভাঙ্গা অতিশয় স্বচ্ছ। ইহার কচি-ভাটা সিদ্ধ করিয়া বাগানে-ব্যবহার করা যায়। ইহার ভাটার শাকও মানকচুর ভাটার শাকের জায় পাওয়া যায়। ইহার মূল অতি-শয় দুই ও তীরসম্পূর্ণ। ইহা খাইলে গলা ধরে, কঠিনালীতে জালা উপস্থিত হয়, জিহ্বা ও মুখ চিন্‌চিন্‌ করিয়া জলিতে থাকে। ইহার মূল অখাদ্য। মূলের মাংস পাটল বর্ণের আভ্যমুক স্নেহবর্ণ ও আশমুক। ইহার মূলও শুষ্ক ব্যবহৃত হয়। এই জাতির মূলই বিশেষ উপকারী।

৩। এমরফোফেলাস টিটেনাম্—

(Amorphophallus Titenum)

ইহা বিশ্ববিদ্যার অনন্ত শক্তি পরিচায়ক। ইহার জায় আশ্চর্য্য উদ্ভিদ জগতে আর আছে কি না সম্ভেহ। ইহার জন্মস্থান হুয়াভাওপ। ইহার গাছ, পাতা ও ফুল হুম্বর। সৌন্দর্যের অপেক্ষা ইহার আকর্ষণই বিশেষজনক। ইহার পুষ্পাভ্যন্তর স্বীস (Spadix) ৫ ফুট উচ্চ হয়। ইহা কৃষ্ণাভ বেগুনে বর্ণ। দেখিতে একখানি চালির জায়। পুষ্পাবরক পর

গোলাকার। ইহার ব্যাস প্রায় তিন ফুট হয়। ইহার কিনারা বা প্রাশর্দেশ দৃষ্টিতে অর্ধাৎ দাঁত কাটা, পুষ্পাভ্যন্তর-ভাগ সবুজবর্ণ, গাত্র উজ্জল বেগুনে বর্ণ, পুষ্পস্তম্ভ ৭৮ ফুট দীর্ঘ হয়। ইহাতে স্নেহবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক থাকে। ইহার মূল অখাদ্য।

৪। রিভারি A.—Riverii.

ইহাও অতিশয় হুম্বর জাতি। ইহার পাতা ও ভাটা নানা বর্ণে-চিত্রিত। দেখিতে ছবির জায়।

৫। এমরফো-ফেলাস কিঙ্গি—A. Kingii.

৬। এই গ্রেন্ডিস—A. Grandis.

৭। এই লেক্রি—A. Lacroii.

৮। এই এন্স, পি, ডাহু—A. S. P. Dahoo.

এই কয়েক জাতির নামও উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ফুল ও গাছ দেখিতে হুম্বর। এতদ্বির ইহার আরও বহুজাতি আছে। উহারা মহুয়া বা মহুয়াতর কোন প্রাণীর ন্যূনত্বের আইনে না, তজ্জন্ত উহাদের নাম এখানে পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

হুইটম্যান *

ওয়াল্ট হুইটম্যান (Walt Whitman) ১৮১৯ সালের ৩১শে মে ওয়েস্ট হিল্‌সে (West hills, Long Island) জন্মগ্রহণ করেন। নয়টি ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। ভ্রাতাদের তের বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষা। তৎপরেই তাঁহার

চাকরী করিতে হয়। কিন্তু চাকরী ত্যাগ করিয়া পত্রিকার সম্পাদকরূপে বহু দিন ধরিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল।

১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ “লীভ্‌স্‌ অব্‌ গ্রাস্‌” (Leaves of Grass)

প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানার ছাপাইবার পারিপাট্য বড় বেশী কিছু ছিল না, কেবল গোড়াতেই কবির একটি ছবি দেওয়া হইয়াছিল।

কতগুলি পুস্তক, মাসিকপত্রিকাদির সম্পাদকের নিকটে সমালোচনার জ্ঞাত পাঠান হইল, এবং কতগুলি উপহার দেওয়া হইল প্রধান প্রধান লেখকদিগকে। বাকী গুলো নিউইয়র্ক ও ব্রুকলিনের দোকানে বিক্রয়ার্থ বিক্রীত হইল।

কিন্তু পুস্তকখানার ভাগা বড়ই নৈরাশ-জনক। একখানিও বিক্রীত হইল না। কোন কোন পত্রিকার সম্পাদক ইহার প্রাধিকার পূর্ণাঙ্গ করিলেন না। কেহ বা বিক্রয় করিলেন এবং কেহু বা ভাণ্ডার লেখক আবার অপমানযুক্ত মন্তব্য লিখিয়া বইগুলি ফেরত দিয়া পাঠাইলেন।

তবে এমন একখানা পুস্তক সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞাত হইতে পারে না। কয়েক মাস পরে এমাদন সাহেব খুব প্রশংসা করিয়া হুইটম্যানকে এক চিঠি লেখেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, “লীভ’স অব গ্রাসের আশ্চর্য গুণ সখ্যে আমি অক্ষ নহি। জান ও বুদ্ধির এমন অপূর্ণ জিনিষ আমেরিকায় এই নূতন প্রকাশিত হইল। * * * আপনার মত জীবনের প্রারম্ভেই আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। এইরূপ প্রারম্ভ ঐশ্বর্য, তাহার বহিষ্কারবনের যশোভাতি বহনবিধায়ী হইবেই হইবে।”

নিউইয়র্ক ট্রাইবিউনের ম্যানেজার মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে হুইটম্যান এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে অস্বমতি দেন এবং ১৮৬৬ সালে তাহার পুস্তকের নূতন

সংস্করণে ইহা সন্নিহিত হয়। তাহার পরেই আমোলনের প্রকৃত আরম্ভ। ইংলও এবং আমেরিকার ক্ষুদ্র লেখক পণ্ডিত এই পুস্তক খানির পৌরুষে, পবিত্রতায় এবং গণতন্ত্র-মূলক ভাবে নিজকে অপমানিত বিবেচনা করেন। এমনি একটা হৈ চৈ উপস্থিত হইয়াছিল যে, প্রকাশক আর ইহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু প্রথম হইতেই ইউরোপ ও আমেরিকার কতগুলি দূরদর্শী মহাত্মা ইহাকে সারের গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হোক এইরূপ বিবাদ, “বিসম্বাদ ও বিজ্ঞপের মধ্যেও অটল ও নীরব রহিয়া তিনি সেসেসন যুদ্ধের (Secession war) পূর্বে পণ্ডিত্য ব্রুকলিনে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে কয়েকটি আগত দৈত্যের শুশুণ্যর ভার লইয়া তিনি ওয়াশিংটনে গমন করেন। সেইখানে তিন বৎসর থাকিয়া প্রতিদিন যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের আগত সৈন্যদিগকে যত্ন লইবার সময় সৈনিক হাঙ্গপাতালের বীভৎস দৃশ্য তাহাকে মর্শ্বীত করে।

১৮৬২ সালে একটি হাঙ্গকর ঘটনা ঘটে। সরকারী একটি কেরানীগিরি তাহার ভাণ্ডে জুটে—কিন্তু সেক্রেটারী সাহেব অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে বরখাস্ত করেন, অপরাধ; তিনি না কি একখানা অলীল পুস্তকের রচয়িতা।

১৮৭৩ সালে তিনি পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত হন। সেই বৎসরেই তাহার মাতার মৃত্যু হওয়ায় তাহার মুক দারুণ আঘাত লাগে।

তার পর মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি ক্যামডেনে (Camden) বাইরা অবস্থিত করেন। এইখানে তাহার উপর দিয়া বাহা ও অস্ট্রের নানী বিপদগ্ধ যাত্রা যায়। কিন্তু তাহার শ

ক্রমশই বর্ধিত হইতে থাকে। এই সময় কতিপয় বন্ধু তাহাকে অর্থ সাহায্য করেন। তারপর ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে মার্চ হুইটম্যান ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া যান।

জে. এ. সাইমন্ডস (J. A. Symonds) সাহেব বলিয়াছেন, “হুইটম্যানের জীবনের শেষ বিশবৎসর বুঝায় নষ্ট হয় নাই। তাহার সমস্ত রচনায় তিনি যে একজন মৌলিক কবি, ইহা অক্ষররূপে প্রচারিত হইয়াছে।”

(২)

হুইটম্যানের জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এখন তাহার গ্রন্থসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

পুস্তকলেখাই হুইটম্যানের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য ছিল—মাৎস্যের জীবন্ত প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা।—

“Comerado, this is no book,
Who touches this touches a man.”
(বন্ধুহর, পৃথি মোর নহে এত নুহে,
মাৎস্য পরণ করে, পরণে যে এঁরে।)

তাঁহার লীভ’স অব গ্রাসে (Leaves of Grass) বিজ্ঞতার পরিচয় যথেষ্ট

আছে। ইহার বর্ণনামৌলিক, বাস্তবিকতা, কোমল সহানুভূতি, আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি বোদ্ধ শতাব্দীর পরবর্তী সাহিত্যে অতুলনীয়। লোকের বলে, হুইটম্যান তাহাদের কবি, আমেরিকার কবি, বাহীনতার কবি এবং প্রজাতন্ত্রের কবি—ভবিষ্যৎকাল। এক কথায় তিনি স্বাধোঁহ—শারীরিক, নৈতিক, রাজ-নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধোঁহ—কবি।

এ কথা সত্য, অনেক সময় তিনি পৃথিবীর ছন্দ, কথা, দৃশ্য এবং বহিঃকল্পের সখ্যে করুণা ও বিপুল সহানুভূতির কথা বলিয়াছেন, কেন না তাহার ধারণা ছিল—কোন কারণে

এই সকল ব্যক্তির উদ্ভূতি-পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু হৃদয় এক সময়ে আবার তাহারা বিজ্ঞ ও হৃদয় হইয়া উঠিতে পারিলে। স্বাধোঁহ লক্ষণ দিয়াই তিনি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু বিচার করিতেন। বিশ্বের সুসীমূহত নিয়মই হইতেছে—স্বাধা। স্বাধাই মহাস্বাধা দান, এবং মানবের সমুদ্রে তাহাই তিনি আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। “আমি বলি, পাঠকের চিত্তব্রণ, তাহাকে পরিজ্ঞ ও মনোমর কিছু প্রদান করা, অথবা কোন বৃত্তি, মনুষ্য বা

কোন ঘটনার অন্তর্নয় কবিতা বা অজ্ঞাত রচনার প্রদান দ্বারা নহে। কিন্তু তাহাদের প্রদান দ্বারা ইহা পাঠকের স্বাধোঁহরূপকে সল ও নির্মল মনুষ্যতা এবং ধর্ম্মে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে এবং তাহার হৃদয়কে হৃদয় করা।”

অনেক বিজ্ঞানবিদ ও নীতিবিদ নিয়ম-পালনের যে সব বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন, হুইটম্যান স্বাধোঁহের অর্থে দেব সব ব্রুতিভেদ না। আঁকোরা যেমন সংঘত ও সল জীবনের সমন্বয় (harmony) ধারণা করিয়াছিল, তাহার ধারণাও ছিল অনেকটা সেইরূপ।

ঐশ্বর্য সখ্যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ তাহার নিম্নাবাদও করিয়াছেন। কিন্তু হুইটম্যান নিজের উপরত, সারল্য এবং সহায়তার ভাব কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। পৃথিবীতে কিছুই সাধারণ নহে, কিছুই অন্তর্নয় নহে, এই নীতিব্যাক্যের অহমরণ করিয়াই তিনি চলিতেন। আজকালকার সমাজ যেমন সব বিষয়েই জ্বালাতন—পাপকে, সর্গসাধারণের কাছে বস্তুত্যা নিন্দা করে, কিন্তু গোপনে তাহাকেই প্রশংসা দেয়, অন্তরে পঁতা দুর্গন্ধ, বাহিরে চাকচিক্য—হুইটম্যানের

কাছে এ সব জ্যাচুরি ছিল না। যাঁহা বলিবার তাহা তিনি সরল ভাবেই বলিতেন। সেই জন্ত তিনি খন ক্রুদ্ধমতের মলিন অশ্রুভ্রম তুলিয়া মানব-শরীরের পবিত্রতার গান করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে আমরা কিছুতেই নিম্না করিতে পারি না বরং প্রশংসাই করি।

তাঁহার প্রেমবাদের সঙ্গে সাহচর্য্যবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই মতবাদের লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার কারণ সমস্ত মতের মধ্যে এইটাই প্রচলিত রীতির বিশেষ বিক্ষুব্ধ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে বন্ধুত্বকে যে চোখে দেখে, সেই পুরুষপারিক সুবিধার ক্ষেত্রে বসিয়া হইটম্যান বন্ধুত্বের জয় ঘোষণা করেন নাই—পরন্তু পুরুষের সঙ্গে পুরুষের, স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্ত্রীলোকের যে প্রবল জীবনাস্তায়ী, সঙ্গীতময়ী ভালবাসা জন্মিতে পারে, তাহাই তাঁহার ঘোষণার বিষয়। তিনি সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়াছিলেন যে, বন্ধুত্ব অজ্ঞাত সমস্ত প্রকার ঘৃণার মত, নৈমিত্তিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের সখ্য-ক্ষেত্রে যাঁহা ঘটে, বন্ধুত্বের সময়ও যে তাহাই ঘটিতে পারে, তিনি সরলভাবে তাহাই আদর্শগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে এক্ষণে বুঝিতে হইরে না যে, প্রেমের ভিত্তি খন নৈমিত্তিক, ইহার প্রকাশও তদ্রূপই হইবে।

প্রজাতন্ত্র-শাসন সখ্যে তাঁহার যত কিছু ভাব ছিল, নিম্নসন্দেহে বলা যায় তাঁহার বন্ধুত্বের এই মতবাদই সে সকলের ভিত্তি। “For you O Democracy” নামে যে কবিতাটি আছে, নিয়ে তাঁহার আংশিক অমুদ্রাবাদ দেওয়া গেল। পাঠক

দেখিবেন, হুইটম্যান বন্ধুত্বকে কি চোখে দেখিতেন।—

“গাঠিব এমন দেশ অস্তব করিন,
গাঠিব এমন জাতি উজ্জল শোভন—
দিন-দেখতার চোখে নিভান্ত নবীন,
এমন চুখকমল স্বর্ণায় ত্বন,
সে কেবল বন্ধুত্বের প্রণয়ের বলে,
যে প্রণয় জীবনের প্রান্ত চুমি চলে।
মার্কিণের মাঠে ঘাটে করিব ঘোষণ
বন্ধুত্বের তরঙ্গম স্নিবিড় করি।
গাঠিব নগরী হেন—বিভাগ-শাসন
অসম্ভব হবে যার, গলাগলি ধরি
চলিবে যা বন্ধুত্বের বলে চিরদিন,
যে বন্ধুত্ব নহে ক—পুরুষকর্মি।”

ডেমোক্রেসি (প্রজাতন্ত্র) সখ্যে তাঁহার সমস্ত কবিতাই এইরূপ আবেগময় বন্ধুত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও ডেমোক্রেসি—এই কথাটার তিনি কি বুঝিতেন, তাহা বড় স্পষ্ট নহে। কারণ তিনি যে সাগ্রহমণীল ব্যক্তিও ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি যে অবলভাবে বুঝাইয়াছেন—প্রত্যেক ব্যক্তির স্বয় তাঁহার নিজের দ্বারা ই শাসিত, অস্তের দ্বারা নহে, সেই সকলের সঙ্গে তাঁহার ডেমোক্রেসি মিল কোথায়?

কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যে বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়, তাহা বাস্তবিক সত্য নহে। হুইটম্যান দেখিয়া-ছিলেন যে জাতি-সংগঠনের আবশ্যকতা আছে, এবং সেখানে জাতীয় উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতেই হয়। বর্তমান সমাজের প্রকৃতি যে যান্ত্রিক, ইহা কিন্তু তিনি রাজনৈতিক স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বপূর্বে বিবেচনা করিতেন। তাই ডেমোক্রেসি তাঁহার মতে ছিল সামাজিক। কিন্তু

ব্যক্তিগকে তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতেন। তিনি বলিয়াছেন—“বিশ্বের সমস্ত সিদ্ধান্তই এটি ব্যক্তির দিকে চালিত, এবং সেই ব্যক্তিই তুমি।”

এই কথাটার কবির ধর্ম-ভাব অনেকটা বুঝা যায়। হুইটম্যানের বিজ্ঞ ও গভীর মনো-ধর্মের মধ্যে। সন্দেহ নাই এই কথাই তাঁহার পক্ষে বেশী ষড়-থে, তিনি “অদৃষ্টকে আনন্দের সহিত অভিবাদন করিয়া থাকেন।”

যে আশাবাদ (optimism) জগৎপট পূর্ণ তত্ত্বের উপর স্থাপিত, সেই আশাবাদই তাঁহার ধর্ম, এবং তাহাই তাঁহার সমস্ত লেখা ও জীবন চালিত করিয়াছে।

হুইটম্যান যে সবল, সবদিকে পরিপূর্ণ, তিনি যে আশাবাদী, তিনি যে জগৎকে রহস্যময় দৃষ্টিতে দেখিতেন, এ কথা কোন নিরপেক্ষ পাঠকই সন্দেহ করেন না। পৃথিবীর ঘটনা যেরূপ ভাবে ঘটে, তাহা তিনি রীতিমত বুঝিতেন। পৃথিবীর মধ্যে যে নৈরাজ্য আছে, তাহাও তিনি পরিষ্কার জানিতেন, “তথাপি তাঁহার বিশ্বাস ছিল—প্রত্যেকের চিরকাল ধরিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। অচিরতের সখ্যে কোন অসম্পূর্ণ বিশ্বাস নহে, রহস্যময় সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত কোন নাটকীয় আনন্দ নহে—কিন্তু সামান্য একটা জিনিসের রহস্য আছে, এই দ্বিধা দ্বারা ই তাঁহার বিশেষত্ব। এই জটিল জগৎ যে জড়বাদের কোন বাঁধা নিয়মের দ্বারা বুঝা যায় না, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু জড়বাদ বলিয়া তিনি যে কোন জড়বাদীকে হীন করিয়াছেন তাহা নহে। আমাদের মন যে জড় হইয়া থাকে—প্রথাজনিত ধর্মের ব্যবসা-মূলে যে নাতিকতা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে তাঁহার যত সংগ্রাম। অর্থপূর্ণ

লোভাতুর পৃথিবী বাহাদিগকে “কর্মী” বলিয়া আখ্যা দেয়, যে সমস্ত “কর্মী” কোন রূপ আশাবাদকে বাক্য সহ্য করিতে পারেন না, হুইটম্যান তাহাদিগকে বড় দ্বার চক্ষে দেখিতেন। এ কথা সত্য, তিনি জড়ভাবাপন্ন পুরোচিত-কুলকেও অজ্ঞ চক্ষে দেখেন নাই, কিন্তু সে রূপা-কটাক দাস-শৃঙ্খলে বদ্ধ আত্মার প্রতি—সমাজ ও ধর্মের কুসংস্কারের গঠিত ব্যক্তিত্বের প্রতি। তবে নীচতা, মিথ্যাতা, বাস্তবের জন্ত কপট ভীতি কিংবা অজ্ঞাতের জন্ত সাহসের কাহুতি এ সমস্তকে তিনি রূপার চক্ষে দেখেন নাই, বরং দ্বার চক্ষে দেখিয়াছেন।

পূর্ণের কথা হইয়াছে, হুইটম্যান আশাবাদী ছিলেন। তাহা হইতে ইহা যেন কেহ মনে না করেন, তিনি “অলপ ব্যক্তির মত ভাবিতেন—“পরিণামে সব শ্রমিণীই ভাল হইয়া আসিবে।” তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। ডারুইন সাহেবের প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলি প্রকাশিত হওয়াতে অনেকেরই ক্রমাগতবিশ্বাস সখ্যে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু সেই পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্বে হইতেই হুইটম্যান একজন প্রখ্যাত ক্রমাগতবিশ্বাসী ছিলেন। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর মধ্যেই একটা যান্ত্রিক সখ্য আছে এবং সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা পরিণতি ও পরিবর্তন চলিতেছে, এ কথা তিনি খুব দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিতেন। কেহ কোন পূর্ণ চিহ্নিত আদর্শ অগ্রসরে গঠিত হইতেছে, ইহা তিনি মনে করিতেন না, কিন্তু প্রত্যেকেরই অপরিবর্তনীয় অসীম পরিণতির দিকে চলিতেছে, ইহাই তিনি মনে করিতেন। সেই পরিণতি সখ্যে উত্তম, অসম, উচ্চ, নীচ প্রকৃতি বিভেদ-চিহ্ন ঘাটে না, কেবল উন্নতি

সম্বন্ধে ভিন্নর একটা তারতম্য আছে।

“আমার গান” নামক কবিতাটির ঠাঁহার এই বিবাদের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

এখন আমরা হুইটম্যানের Mystic teaching বা গুট-বহুত্ববাদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। ঠাঁহার এই মত নতুন নহে। পৃথিবীর বড় বড় দার্শনিক বহুদিন হইতেই আমাদেরিগকে এই রহস্ত জনাইয়া আসিতেছেন। পার্শ্বকা এই যে, হুইটম্যান সেই মতবাদকেই বর্তমান যুগের উপযোগী করিয়া এবং ভাষার অসামান্য তেজের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমরা জানি, প্রত্যেক জাতির পণ্ডিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করেন—ঠাঁহাদের জাতি দেবকুলোদ্ভূত। বহু পূর্বের হিব্রু ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাত্মনামা শিক্ষকটি বলিয়াছিলেন, “তোমরা সকলেই ভগবান।” ভাগ্যবশতের বিনয় সাধুটিও “আমি এবং আমার পিতা (পরমেশ্বর) এক” এই কথা বলিয়া সমসাময়িক লোক-দিগেরে বিন্দিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর হুইটম্যানও অস্বাভাব্যে, তেজের সহিত বর্তমানযুগে ঘোষণা করিয়াছেন, “প্রত্যেক প্রাণী আপাতদৃষ্টিতে নীচ অথবা অসহৃত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—কিন্তু কালে তাহার অজ্ঞানমিত স্বপ্ন সেবৎ জাগ্রত হইয়া তাহাকে পরমৈবর্ঘ্যে বিভূষিত করিবেই।”

“I have said that the soul is not more than the body,
And I have said that the body is not more than the soul,

And nothing, not God, is greater to one than one's self is”
etc.

অর্থ—“আমি বলিয়াছি—আত্মা শরীর-ছাড়া আর কিছুই নহে, এবং শরীরও—আত্মা-ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকন্তু মাংসের আত্মা ছাড়া মাংসের কাছে আর কিছুই—এমন কি ঈশ্বরও—শ্রেষ্ঠ নহে।”

হুইটম্যানের সেই অদ্ভুত কবিতাটি—“Chanting the Square Deific,” তাহাতে এই একই ভাব পুনঃ পুনঃ প্রকটিত। সেখানে কবিতার স্থানে স্থানে এইরূপ কতগুলি পদ আমরা দেখিতে পাই, যথা—“আমিই জিহোবা, আমিই ব্রহ্ম, এবং আমিই ত্রুটি-নির্মল। আমিই বেহ—আমিই আনন্দময় ঈশ্বর, এবং আমিই সকলমঙ্গলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান সত্যতা।”

ইহাই হুইটম্যানের রহস্ত-বাদ। অবশ্য ঠাঁহার জ্ঞান অনেক ঠাঁহাকে পাগল বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—যাহারা গালি দেন, ঠাঁহারা প্রচলিত নীতি-নীতি, বিবাহবিবাহ ভাব-বন্ধন প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত হইতে অসমর্থ। ঠাঁহাদের যুগদৃষ্টি নাই—উগের উত্তীর্ণ শক্তি নাই। অতএব ঠাঁহাদের মস্তককে আমরা মূ্যাবান বলিয়া মনে না করিলেও পারি।

যাহায্যেক, পূর্ণোদ্ভূত রহস্তবাদ হইতে ইহাই বুলিতে পারা যায় যে হুইটম্যানের আধ্যাত্মিকভাবের মূল কথাই এই যে—“বিশেষ এবং বিশেষ প্রত্যেক বিভিন্ন অংশের প্রকৃতির স্বর্গীয়।”

হুস্তরা এইরূপ একটা নীতিক মতবাদকে “পাপলাদী” বলিয়া উড়াইয়া দিতে আমরা নিতান্তই সন্মত বোধ করি।

ত্রিকুমুদনাথ লাহিড়ী

লালা ও তাহার কার্য্যকারিতা

আমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, চর্ম্মণের সময় শব্দের সহিত একটা আঠান-স্রব্য লাগিতে থাকে, ইহাকেই আমরা “লালা” বা চলিত কথায় “গুথ” বলিয়া থাকি। এই লালার উৎপত্তি সম্বন্ধে আজ দুই একটি কথা বলিব।

লালার উৎপত্তি:—কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। কাজেই আমরাও আজ ইহার উৎপত্তির সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

মুখগলবের কতগুলি গ্রন্থি (glands) নিম্নতর রসক লাল। বলা হয়। মস্তকের মুখগলবের এক এক পার্শ্বে তিনটি করিয়া সর্ম্মপমিত ছয়টি গ্রন্থি আছে। গ্রন্থিগুলির অবস্থান অস্থারের ইহার নামকরণ করা হইয়াছে যথা:—কর্ণগ্রন্থি (Parotid), হৃৎগ্রন্থি (Submaxillary), জিহ্বাগ্রন্থি (Sublingual)। সকল গ্রন্থিগুলিকে এক কথায় লালগ্রন্থি (Salivary glands) বলা হয়। প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস, মুখগলবে আসিবার-নির্দিষ্ট প্রণালী বা নালী আছে।

কর্ণগ্রন্থি-প্রণালী দ্বিতীয় “কর্ণদাঁড়ের” (molar) পার্শ্বে, হৃৎগ্রন্থি ও জিহ্বাগ্রন্থি-প্রণালী জিহ্বার নিম্নদেশে অবস্থিত। প্রত্যেক গ্রন্থিরই ভিন্ন ভিন্ন রসনিঃসারক সাথ্য আছে। কোন প্রকারে এই সাথ্য উত্তেজিত হইলে লাল নিঃসৃত হইতে থাকে।

লালার স্বর্ধ ও উপাদান:—লালার কোনও বিশিষ্ট বর্ণ নাই, তবে ইহা একবারে

বহু নহে; ভিন্নের খেতভাগের বর্ণ যেরূপ লালার বর্ণও অনেকটা সেইরূপ, তবে সচরাচর যাহাকে আমরা গুথ বলি, তাহাতে বায়ু-কণিকা (air-bubbles) থাকার জন্ম অনেক সময় “মায়া” দেখায়। দাঁতের গোড়ায় লবণ বা পিঁপারমেন্টে দিয়া অথবা Glacial acetic acidএর বাষ্প মুখগলবের চিনিয়া লইলে অতি সহজেই প্রচুর পরিমাণে লাল নিঃসৃত হইতে থাকে। এইরূপে নিঃসৃত লাল কোনরূপ কাঁচের পাত্রে একত্রিত করিয়া ইহার বর্ণ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। Litmus কাগজের সাহায্যে লাল হইতে আমরা ক্ষার-প্রতিক্রিয়া (alkaline re-action) পাইয়া থাকি, কিন্তু Phenolphthalein ইহার অম্ল-প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০০ ধরিলে লালার আপেক্ষিক ১০০০। অস্থীকরণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে ললাতে কতগুলি ভিড়াকৃতি কোষ ভাঙিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিকে কেহ কেহ লাল-কণিকা (salivary corpuscles) বলিয়া থাকেন, আবার কাহারও কাহারও মত যে এইগুলি বিশিষ্ট আকার প্রাপ্ত খেতরজ-কণিকা মাত্র। ইহা ছাড়া কতগুলি মুখগলবের স্বীয়র কোষও দেখিতে পাওয়া যায়। লালার প্রধান উপাদানের মধ্যে (১) আঠাল পদার্থ mucin, (২) ptylin নামক খেতমার (amyolytic) (৩) শ্রাকশর্করা, কিন (maltase) (৪) অঙ্গার জাতীয় albumin এবং (৫) কতগুলি লবণই প্রধান। লবণের মধ্যে ক্ষার দাতৃ লবণেরই আধিক্য দেখা যায়

• লেখক যাহাকে “গুট-বহুত্ববাদ” বলিতেছেন আমরা পৌষ স্থানায় তাহার হবিগুত আলোচনা করিয়াছি। এছাড়াও পাশ্চাত্য “নিউসিয়ান” (ভাস্করতা বা জড়ীকৃততা বা অববোধ) এর পার্শ্বকা রবীন্দ্র-নাথের জাতিগোষ্ঠের গোড়াগ্রন্থি—সম্পাদক।

(Sodium Chloride, Potassium Sulphate, Sodium Carbonate, Calcium Carbonate ও Phosphate) ইহা ব্যতীত Sulphocyaniteও দেখা যায়। বাহ্যিক দৃশ্যকর করেন, তাহাদের লাল্য এই Sulphocyanie যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এই লাল্য দুই এক ফোটা Hcl. দিয়া অল্প

Ferric Chloride দিলেই লাল রং হয়। বালকধূমপানিগণ সাধারণ। ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই আপনাদিগকে বিজ্ঞান-কবলে আনা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া লগিতে যথেষ্ট অশ্বার্য্য বাষ্পও থাকে। নিম্নে ত্রিভিন্ন বিশ্লেষণের একটি বিশ্লেষণ তালিকা দেওয়া গেল।

বিশ্লেষক মহোদয়ের মিশ্রিত লালের উপাদান প্রতি হাজার ভাগে

	জল	মোট কঠিন পদার্থ	অশ্বার্য্য পদার্থ	স্রাব্য জৈবিক পদার্থ	Pot Sulpho-tylino	অজলবণ
১। Berzelius	৯২২.২	৭.১	১.৪	৩.৮	—	১.২
২। Jacobowitsch	৯২৫.১	৪.৪৮	১.৬২	১.৩৪	০.০৬	১.৪২
৩। Frerishs	৯২৪.১	৫.২	২.১৩	১.৪২	০.১০	২.১২
৪। Tiedmann ও Gmelin	৯৮৮.৩	১১.৭	—	—	—	—
Herber	৯২৪.৭	৫.৩	—	৩.২৭	—	১.০১
Hammer teacher	৯২৪.২	৫.৮	২.২০	১.৪	০.০৪	২.২

Jacobowitsch মহাশয়ালার ভদ্রের উপাদান (প্রতি ১০০০) নির্ণয় করিয়াছেন :—

মোট কঠিন পদার্থ	১৮২
ফস্ফরিক এসিড	৫.১
সোরা	০.৪৩
চূর্ণ	০.০৬
মাগনেসিয়া	০.০১
স্বারস্ক রোরাইড	০.০৪

উপাদানের কথা ত শেষ হইল। এখন এই উপাদানগুলির স্বার্থ সন্ধান্ডে কিছু বলা যাক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে mucin-এর অবস্থিতিই লালার “গাঠন” হইবার কারণ। লালার প্রধান উপাদান খেত-সারয় কিং ptylin. অধিকাংশ জন্তর লালাতেই ptylin-এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়,

তবে গুন্ডাচোজী জন্তর লালাতেই ইহা অধিকমাত্রায় পাওয়া যায়। মহোদয়ের কর্ণ ও হুই উভয় গ্রন্থি নিঃসৃত লাল্য এই খেতসারয় পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। জন্তরের পর কেবল কর্ণ-গ্রন্থিতেই ইহা পাওয়া যায়, তবে দুই মাস পরে ইহা হুই-গ্রন্থি হইতেও নিঃসৃত হইতে থাকে। Ptylin-এর কার্য-কারিতা এই যে, খেতসারয়ের অশ্ববর্ণীয় শালি-জাতীয় (storch) অব্যাক্ত ব্রণীয় শর্করায় পরিণত করা। ইহার সহিত মিশিয়া শালি-জাতীয় অব্যাক্ত বিশ্লেষণ ঘটয়া থাকে এবং নানা প্রকার কিম্বা প্রতিক্রিয়ার পর খেত শর্করা (maltose) এ পরিণত হয়। পরীক্ষা-পারে কখনও কখনও Dextrose বা ড্রাক্সা শর্করার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহার কারণ

যে লাল্য ড্রাক্সা শর্করা কিং (maltose) নামক অল্প একটি খেতসারয় পদার্থ আছে; ইহা খেতসারকে ড্রাক্সা-শর্করায় পরিণত করে। তাহা হইলে মোটের উপর দাঁড়াইতেছে এই—লালার দ্বারা খেতসারের কিয়ংশ খেতসার-শর্করা ও অতি অগাধ Dextrin নামক অপর একটি অব্যাক্ত পরিণত হয়। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এইরূপ পরিবর্তন কিরূপে ঘটে? অবশ্যই অনেকগুলি কিম্বা-প্রতিক্রিয়ার পর ইহাই ইহার শেষ পরিণতি। পরীক্ষাণ্যের নিয়মিত কয়েকটি বিষয় বেশ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে শালিজাতীয় অব্যাক্ত সহিত আইডিন দিলে লাল রং হয়। এক্ষণে আমরা যদি একটি Test-tube-এর ভিতর কিছু শালিজাতীয় অব্যাক্তের উপর প্রচুর পরিমাণে লাল দিই এবং ইহাকে ৪০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে রাখিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে ইহার যথেষ্ট বিকার হইতেছে। অল্পক্ষণ পরে আইডিনের সহিত লাল রং না হইয়া লাল রং হয়। ইহাকে এক্ষণে erythro-dextrine বলা হয়। আরও কিয়ৎক্ষণ পরে ইহা maltose ও acifro-dextrine নামক পদার্থে পরিণত হয়। তখন ইহার সহিত আইডিনের সংযোগে কোনও প্রকার বর্ণ-বিকার ঘটে না। কিন্তু শর্করা খেতশর্করারূপে রক্তমধ্যে শোষিত হয় না। রক্তের মধ্যে না পৌছাইলে এই শোষণ-কার্য আরম্ভ হয় না। অতএব মধ্যে মধ্যে maltose বা ড্রাক্সাশর্করার কিম্বার দ্বারা ইহা প্রথমে ড্রাক্সাশর্করায় পরিণত হয় এবং কেবল তখনই রক্তের মধ্যে শোষিত হইতে থাকে।

উত্তাপের ভারতম্বে Ptylin-এর কার্য-

কারিতার ভারতম্বে ঘটয়া থাকে। ৪০°Cতে ইহার কার্যকারিতা সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক। কিন্তু উত্তাপ যত বৃহৎ হইতে থাকে ইহার কার্যকারিতাও হ্রাস হইতে থাকে। ০°C ইহা একেবারে অস্বর্ণ্য্য হইয়া পড়ে তবে নষ্ট হয় না। কিন্তু ৪০°C বেশী উত্তাপে ইহার শুধু যে কার্যকারিতা হ্রাস হইতে থাকে তাহা নহে, ৬৫°-৭০° ডিগ্রির মধ্যে ইহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

এই ত গেল উত্তাপের কথা। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে লাল ক্ষার-প্রতিক্রিয়া-বিষয় বেশ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে ক্ষার-প্রতিক্রিয়া-সমুচ্চ ক্ষেত্রে অধিক কার্যকারী। সম্ভ্রুতি আমেরিকার বিখ্যাত অধ্যাপক Chittendon সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে ক্ষার বিবজ্রিতক্ষেত্রে ইহা অধিকতর কার্যকারী। ক্ষারের আধিক্য হইলে ইহার স্বর্ণম্বে লোপ হইয়া থাকে। তবে অতি অল্পমাত্রা অতএব সংযোগে ইহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। Chittendon বলেন এমন কি ১০০৩ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অস্তিত্বে ইহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

এক্ষণে কথা হইতেছে তাহা হইলে পরিপাক দ্বিগবে লালার মূল্য কোথায়? আমরা জানি যে পাকস্থলীতে যথেষ্ট হাইড্রোক্লোরিক এসিড আছে কাজেই সেখানে লালামিশ্রিত খাদ্য পৌছিবামাত্র ptylin-এর কার্যকারিতা লোপ পাইয়া সত্ত্ব্য। তাহা ছাড়া চরুণকালে অতি অল্পই পরিপাক হইয়া থাকে। পরীক্ষাণ্যের দেখা যায় যে, লালাদ্বারা শালিজাতীয় খাদ্যের পরিপাক হইতে ১১-২২ ঘণ্টা সময় লাগে।

পূর্বে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, পাকস্থলীতে খাদ্য পৌছিবামাত্র ptylin একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। Grutzner

Cannon প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ সম্মতি প্রদান করিয়াছেন ইহা যে পাকস্থলীর বায়ু অংশে অনেককণ পাচকরসের সহিত মিশ্রিত না হইয়া অবস্থান করে। কাজেই লালার কার্যকারিতা এ অংশে প্রায় এক বা দেড় ঘণ্টা চলিয়া থাকে।

সিদ্ধ শালিজ্জাতীয় খাদ্যের উপর Ptylin এর প্রভাব অত্যন্ত অধিক। কিন্তু “স্ট্যাচ” বা “সিদ্ধ” দ্রব্যের উপর কোষাঙ্ক (cellulose) থাকায় ইহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার সুবিধা পায় না।

পরিপাক হিসাবের মূল্য ছাড়িয়া দিলে লালার খাদ্যের সহিত মিশিয়া ইহাকে অতি সহজে “গিলিবার” উপযোগী করিয়া দেয়। অনেক সময় কটিন পদার্থকে অপেক্ষাকৃত নরম করিতে সাহায্য করে। লালার সহজে এই পদার্থ বলিয়া ক্যান্ডাইলাম। ভবিষ্যতে অস্ত্রাচ্ছ পাচক রসের কথা বলিবার বাসনা রহিল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাম্যস্বাস্থ্যে কীটগুপাল

পল্লীগ্রামের অধিকাংশ অঞ্চলে জনসংখ্যার আকীর্ণন আম্রা প্রদানতঃ দুইটি ব্যারামের সঙ্গে তুলন যুক্ত করিতে দেখি। ইহাদের একটি ওলা, অপরটি ম্যালেরিয়া। আর একটি ব্যারামের কথা শোনা যায়; ইহার চিহ্ন আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে আছে; বিশেষতঃ কাম্বীয়ে। কিন্তু ইহার তত্ত্বাভ্যাসন সম্বন্ধে বেশী খোঁজ খবর লওয়া হয় বলিয়া মনে হয় না। আমেরিকা ও ইউরোপে এটি নামজাদা। ইহার নাম ম্যালিকজর বা Typhoid fever; আমেরিকায় সময় সময় এই জরের প্রকোপ থাকিলেও ইহাতে মৃত্যুর সংখ্যা কম। বপুতত্ত্বের একনিষ্ঠ জ্ঞানিগণ সতর্কতা ও দৈর্ঘ্য সহকারে বিবিধ গবেষণার ফলে ইহার উচ্ছেদ সাধনের তত্ত্ব অহুদজ্ঞান করিতে সক্ষম হইয়াছেন; আর রাশীকৃত পুথক লিখিয়া জনসাধারণের সমক্ষে প্রদর্শিত করিয়া আসিতে

ছেন। জনসাধারণও তাঁহাদের উপদেশ বেদবাণীবরূপ গ্রহণ করিয়া ও তদনুসারে কার্য্য করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া থাকে। কাজেই এখানে এ জরের ক্রমাঃ হ্রাস হইতেছে। আর আমাদের দেশকে এ সকল দেশের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে হতাশা হইতে হয়; কিন্তু হতাশা হইলে কি আর চলে! আমরাগিকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে আর বাহ্যের মহাভারত রচনা করিয়া গৃহে গৃহে বিতরণ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া আজ একটি কাণ্ডের একটি অধ্যায় লিখিতে বসিয়াছি।

এই তিন ব্যারামই কীটগুপাল কর্তৃক স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে—ম্যালেরিয়া কোন কোন মশক কর্তৃক আর ওলা ও ম্যালিকজর সাধারণ গৃহমাছি, কিংবা অস্ত্রাচ্ছ মাছি কর্তৃক।

নগর ও পল্লী

এটি সত্য যে ম্যালেরিয়া ও ওলা উভয়ই বড় বড় নগরে উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই জন্য তাহার প্রায়ই পল্লী বা গ্রাম্য ব্যারাম বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যালেরিয়াকে ভৈষজ্যবিদ্যার ব্যক্তিবর্গ পল্লী ব্যারাম বলিয়া সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কেননা, সাধারণতঃ পল্লীতেই স্রোতবিহীন, বহু, উন্মুক্ত নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্রাতন স্থির জলে কর্ম বা বেশী স্বাধীভাবে ম্যালেরিয়া-বাহী মশক উত্তরোত্তর প্রসব করিতে থাকে; ইহা পল্লীগ্রামের প্রায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নাগরিক অবস্থা তদনুরূপ না হওয়ায় মশকদল জলাভাবে বসতি বিস্তার করিতে পারে না। অতীত শুকনান এবং কোন কোন মালভূমি ইহাদের উপনিবেশ স্থাপন পক্ষে অসুবিধাজনক। যেখানে নির্দিষ্ট বর্ষাকাল আছে কিংবা খাল কাটিয়া জমি সিক্ত করা যায়, সে অঞ্চল শুষ্ক হইলেও মধ্যে মধ্যে ইহাদের বৃদ্ধি দেখা যায়। জল-চেতনার্থ খাত মশকের স্থলর স্থতিকাণার। যাহারা পল্লী কিংবা উপনগর হইতে ম্যালেরিয়ার বীজ লইয়া নগরে আগমন করে, সাধারণতঃ সেই সকল লোকের নিকট ম্যালেরিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি কোন কোন নগরের আশে পাশে মালভূমি থাকে, সেখানেও ইহার অস্তিত্ব সম্ভাব্য। আবার কোন কোন নগর ম্যালেরিয়া অঞ্চল হইতে প্রবাহিত নৈশ সমীরণ দ্বারা আক্রান্ত হয়। মশাহর ম্যালেরিয়া রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিতে ইহার প্রকোপ হয়; কেন না রাজিকালে

শ্রুতলাগ সমস্তের জলরাশি অপেক্ষা অধিক শীতল হয় বলিয়া, স্থল হইতে সাগরাভিমুখে অর্থাৎ দক্ষিণাভিমুখে বায়ু প্রবাহিত হয়।

ওলাউচার স্থান

যে সকল নগরে টবেব্রজল সরবরাহ হইয়া থাকে, যদি সেই জলে আবর্জনারাশির গন্ধ (Trace) থাকে এবং মলমূত্রাদির লেশ থাকে, তাহা হইলে সেই সকল নগর বক্ষ্যমান আধার হইতে ওলায় আক্রান্ত হইয়া থাকে: (ক) দূষিত পল্লীভূমি; (খ) অপেক্ষাকৃত কম স্বাস্থ্যকর পল্লী হইতে পূজা ও গ্রীষ্মাকাশান্তে জনসমাজের প্রত্যাবর্তন; (গ) এবং যে সকল লোক এই আধারস্থরের যে কোনটা হইতে ওলার বীজ সংগ্রহ করিয়াছে, সেই সকল লোকের দেহবিনিঃসৃত পদার্থ নিঃসরের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবার ক্ষেত্রে

অভাব। কিন্তু পল্লীগ্রামের অবস্থা ভিন্ন ধরণের। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ঘরেই কুপের বন্দোবস্ত থাকে; এই কুপাদিকই যাবতীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পোকেরা নদীর জলে শৌচ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে; কোথাও মলমূত্র থোলা মাঠে, কোথাও গর্তে, কোথাও পাত্ৰবিশেষে সঞ্চিত হইতে থাকে; ওলা-রোগের বীজ মলমূত্রের সঙ্গে বহির্গত হয়। এই মলমূত্র চূর্ণিত বীজ ধারণ করতঃ কত প্রকারে নদী, নালা, খাল, বিলের জলের সংস্পর্শে আসিয়া সেই সব জল দূষিত করিতে পারে। অনেক সময় রোগীর মলমূত্র-বমনাদি নদীর জলে বর্ষাবর নিক্ষেপ করা হয়। এই জল বাহিত বীজ মলমূত্রের পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিংবা এই জল দোহন-চোকার সংস্পর্শে আসিয়া চূর্ণক দূষিত করিতে পারে, ছুনিম্ব নদীর সাধায়ে

বরাবর কুপে বাহিত হইতে পারে; কিম্বা সেই সকল সন্ধিত মলমূত্রের উপর মাছি অবতরণ করিয়া পরে অবশ্যে গৃহের খাচ্চ-সামগ্রীর মধ্যে গাভ্রসংলগ্ন বীজ ঢালিয়া দিতে পারে কিম্বা রোগোৎপাদনকারী পুষ্টিবাশ্পোদ্যম লইয়া সমীপবর্তী গৃহের রাস্তাঘরে ও খালে বসিতে পারে। পরে এই প্রকারে বীজ মন্থবোয়ের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিয়া অস্বাভাবিক ভাবে বংশ পুষ্টি করিতে থাকে আর রক্তকে জল করিয়া মাতৃবোয় সভ্যতা হরণ করিয়া লয়।

ওলা হইতে রক্ষার উপায়

ওলার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আমায়গিকে দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে। প্রথমটি গৃহের স্থবন্দ্যবস্ত ও দ্বিতীয়টি সাধারণের ঘোষাচিত পরিদর্শন। রোগীর মলমূত্রাদি সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত করিতে হইবে কিম্বা পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, কিম্বা স্বগভীর গর্ভ করিয়া প্রচুর চূর্ণ দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে। দরজা, জানালা ও পাখাখানায় তারের জাল দিতে হইবে যাহাতে ঘরে মাছি প্রবেশ করিতে না পারে। রোগীর বিছানা, বালিশ, পরণের পুটি ইত্যাদি যত অব্যাসক্তরে আসিয়াছে সবই সম্পূর্ণভাবে বিশোধিত করিতে হইবে। গৃহের পরিকার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জল ব্যবহার করিবার পূর্বে খুব ভাল করিয়া অন্ততঃ ১০ মিনিট কাল ফুটাইয়া লইতে হইবে। চতুপান করিবার পূর্বেও তদন্তরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে রোগের বীজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার বীজ কেবলমাত্র মলমূত্র ও বমনের সঙ্গে বাহির হয় বলিয়া ইহারিগকে সঙ্গে সঙ্গে বিশোধিত

করিতে হইবে; তাহা না হইলে হয়ত ইহার বীজ বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া অত্যন্ত আক্রমণ করিতে পারে। ব্যক্তিগত যন্ত্রের মধ্যে পরিকার-পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকর অথবা আহার, বিশুদ্ধবায়ু সেবন, স্বস্থশরীরে থাকা আক্রমণের আশঙ্কা দূরে রাখা, এই কয়েকটি বিষয় আনিয়া রাখিবে। রোগীর মুত্বা হইলে শবদাহার সঙ্গে সঙ্গে বিছানাদি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, কিম্বা প্রচুত চূর্ণ দিয়া খুব গভীর করিয়া পুষ্টিয়া ফেলিবে। রোগীর ঘরে চূর্ণকাম ও অস্ত্রাঙ্ক বিশোধনকারী অব্যাদি প্রবেশ করিতে হইবে। এই ত গেল গৃহের বন্দোবস্ত।

যাহাতে রোগের প্রসারণ না হয় তজ্জন্ত সাধারণকে সর্গালা পরিদর্শন করিতে হইবে। নিম্নতঃ পরাধর্গলি যাহাতে বিশোধিত হয়, আবর্জনারাশির যাহাতে হ্রস্বদোবস্ত হয় সেই জন্ত উপযুক্ত পথ অবলম্বন করিতে হইবে। গৃহের ও বাহিরের, (দোকান, মদ্যার) আহাতি অব্যাদি, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, কোথায় হইতে রোগ আসিল তাহার ইতিহাসের অনুসন্ধান করিতে হইবে; আর স্বপ্নযাক্সিদের আরোগ্য ও মৃত্যু-সাধারণ থতিয়ান করিয়া মন্যাদপরে প্রকাশ করিতে হইবে। এই কয়েক প্রকারের উপায় যদি যথাবিধি অনুসরণ করা হয়, তাহা হইলে ওলার আধিপত্যের কিছু ভ্রাস হইবে, বোধ হয় জন্মের মত বিদায় লইলেও লইতে পারে। নগর ও পল্লী উভয় স্থানেই উল্লিখিত পথাবলী অনায়াসে অবলম্বন করা যাইতে পারে। বিবৃতিচাঁও ওলা সম্বন্ধে এই পর্যাপ্ত।

ম্যালেরিয়া

পূর্বে এক সময় ছিল, যখন জলাভূমির

পুষ্টিগতময় বাষ্প নিষাসের সাহায্যে দেহে প্রবিত্ত হইলেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ বিন্ধ্যা জানিতাম। কিন্তু আজকাল সে ধারণাটা প্রকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অমফলি (Anopheles) শ্রেণীর মশক-দশনই ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান কারণ। লোহিত শোণিত কোষের মধ্যে অতীব ক্ষুদ্র পরভোজী বপুণ্ডর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতিই মানবীয় ম্যালেরিয়ার প্রধান ও একমাত্র হেতু। এই বপুণ্ডর জ্ঞানবসমাজের ক্ষুদ্রতম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সম্প্রদায়টি প্রোতোজী (Protozoa), কিম্বা এক-কোষিক জগৎবাহী। যে সকল ক্ষুদ্রপ্রাণী আমোবাস (Amoebas) বলিয়া পরিচিত এবং যাহারা জলে, সৈতসৈতে গৈকত-পুলিনে, পালায়, কিম্বা পরভোজীর মত অস্ত্রাঙ্ক জন্তর দেহান্তরে অবস্থিত করে, তাহারা প্রোতোজীয়ে শ্রেণীভুক্ত। দেহের মধ্যে এই পরভোজী বিতরিত হইয়া লোহিত শোণিতকোষ বিচ্ছিন্ন ও শোণিতকারে প্রবেশ করিয়া পুষ্কংগাদন করিতে থাকে। বিশদভাবে বলিতে গেলে, যখন মানবের রক্ত অমফলিশ্রেণীর মশকের পাকস্থলীতে শোণিত হয়, তখন ম্যালেরিয়া-পরভোজী মশা যে অন্তঃস্থায়ী লক্ষণ ও বৃদ্ধি সংঘটিত হয় এবং রক্তনামে (Blasto) কবিত স্বস্থস্থকারী কোষসমূহের জন্ম প্রদান করে। লোকের অবশেষে বিষ লইয়া প্রতিষ্ট হয়, যদি এই লোকটি ম্যালেরিয়া মুক্ত হয়, ম্যালেরিয়া এই প্রকারে তাহার অবশেষে প্রবেশ করিয়া নিজের স্বভাবগত প্রভাব বিস্তার করে।

লোকে যে এই প্রকারে ম্যালেরিয়া দ্বারা

আক্রান্ত হয় তাহা আমরা বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি। এই বিষয়ময় অধীনতার হত হইতে নিম্নিত পাইতে হইলে ম্যালেরিয়াবাহী মশকের দংশন এড়াইতে হইবে। এই হেতু যে যে অবস্থায় ম্যালেরিয়া-বাহী মশকজাতি বংশ বৃদ্ধি করে সেই সেই অবস্থা ও ম্যালেরিয়াবাহী এবং অস্ত্রাঙ্ক নিরীহ মশকসমূহের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

ম্যালেরিয়াবাহক মশক

এমন অনেক মশা আছে যাহারা কোন রোগ বহন করে বলিয়া অলপাতি প্রমাণিত হয় নাই। বসন্ত, তাহাদের হলবিশ্ব ভীত-যন্ত্রণা ব্যতীত অধিকাংশ মশকই নিরীহ বলিয়া আমাদের নিকট অহমিত। সমস্ত প্রকারের মধ্যে সর্গাপেক্ষা সাধারণ কুরেক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সকল মশা সাধারণতঃ ক্ষণস্থায়ী ডোবা পরিপূর্ণ বৃষ্টির জলে বংশ বৃদ্ধি করে। কুরেক (culex) শ্রেণীর মশক নিরীহ; আর অমফলি শ্রেণীর মশক ম্যালেরিয়াবাহক, কাজেই মারাত্মক। অতএব এই দুইয়ের বিভিডতা ও সাদৃশ্য সম্বন্ধে যথা-সংক্ষেপে আলোচনা করা সর্গতোভাবে যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

কুরেকের পাখা পরিষ্কার, কিন্তু অমফলির পাখা কম বা বেশী দাগ সঞ্চলিত। আরও দেখা যায় যে কুরেকের পল্লী (Palpi) (যাহা চক্ষুর উত্তর গর্ভে প্রলম্বমান) অতি ছোট; অমফলির পল্লী লম্বা—এমন কি প্রায় চক্ষুর সমান। অমফলি, ইহাও লক্ষিত হয় যে, যখন কুরেক সেওয়ালের গায়ে অবস্থিত করে, তখন ইহাকে কম বা বেশী হুজুগুঠ দেখা যায়, অর্থাৎ মস্তক ও চক্ষু টিক দেহ ও পাখার সঙ্গে একতলে অবস্থান করে না, কিন্তু

দেওয়ালের গায়ে একটা কোণ করিয়া প্রলম্বিত হইতে থাকে; দেহ ও পাখা দেওয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অঙ্গ-কলির মস্তক ও চক্ষু প্রায় দেহের সঙ্গে একতলে থাকে এবং দেহটা সাধারণতঃ দেওয়ালের সঙ্গে একটা কোণ করে; বিশেষতঃ যখন অট্টালিকার ভিতরকার ছাদের উপর অবস্থান করে তখন অঙ্গকলির দেহ সমতলের সঙ্গে একটা খুব বড় কোণ উৎপন্ন করে। আমরা পল্লীগায়ে জিজ্ঞাস্য ম্যালেরিয়া-শ্রেণীর অঙ্গকলি দেখিতে পাই, যথা—অঙ্গকলি মন্তলিঙ্গ, অঙ্গকলি পংকিলিঙ্গ, অঙ্গকলি কুশেঙ্গ।

আমি অবস্থায় অঙ্গকলির ডিমগুলি কুরেকের ডিমগুলি হইতে অনায়াসে পৃথক করিতে পারা যায়; কুরেকের ডিমগুলি এক জায়গায় জড়িত হইয়া নিরেট আকারে থাকে, কিন্তু অঙ্গকলির ডিমগুলি জলের উপর পৃথক পৃথক থাকায় সর্বথা পার্শ্বের উপর ভরিয়া থাকে। কুরেকের larvae সাধারণতঃ পানির পিপায় এবং বৃষ্টিজল পরিপূর্ণ খালে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল larvae জলের মধ্যে ইস্তততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে; নিঃশাস লইবার জন্ত প্রায় ঘন ঘন জলের উপর আসে; যখন উপরে আসে তখন তাহার লেজের অগ্রভাগ বাহির করিয়া কুলিতে থাকে, আর তখন সেহের অবশিষ্টাংশ একটা বড় কোণ করিয়া নিয়ে থাকে। যাহাকে একেজ্রে “লেজ” বলা হইল, সেটা কিছুই নয়, কেবলমাত্র নিঃশ্বাসের নল, তাহারা এই লেজ দিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণ কুরেকের wigglers লম্বা আর শুঁড়ের মত। কিন্তু ম্যালেরিয়া-মশকের wigglers কতকপরিমাণে ভিন্ন ধরণের।

ইহা প্রায় অধিকাংশ সময়ই উপরে থাকে; জল-তলের সঙ্গে সমান্তরাল হইয়া থাকা ইহার স্বভাব; কুরেক wigglersএর মত দ্বিম দোতুল্যমান হইয়া থাকে না।

ম্যালেরিয়া নিবারণার্থ উপায়

ইহার আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে হইলে মশকের সর্পনাশ করাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। মশক যাহাতে প্রসব করিতে না পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কিংবা প্রসব করিলেই ইহার larvae চোখে পড়িবারাত্র আননই লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু আমরা জানি, কোন কোন জাতীয় মশা নিরীহ; এ অবস্থায় ম্যালেরিয়া-মশকের বিশেষত্ব জানা সকলের কর্তব্য। অঙ্গকলির মশা বেশীদূর উড়িয়া বেড়ায় না; এক মাইল ব্যাসার্ধই ইহার দূরত্ব। কাজেই প্রসবস্থানের একমাইল ব্যাসার্ধ লইয়া অহুসন্ধান করিলেই বেশ আশঙ্জনক ফল পাওয়া যাইতে পারে। প্রসবস্থান আবিষ্কৃত হইলেই তাহাকে অনেক মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে, কিংবা কেরোসিন তেল পাড়লা করিয়া জলের উপর ঢালিয়া দিতে হইবে—তাহা হইলে অঙ্গকলির larvae অচিরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে; কিংবা যে সকল মংস্ত larvae থাইয়া জীবন ধারণ করে, সেই সকল মংস্ত সেখানে ছাড়িয়া দিলে-উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে।

যতদিন পর্যন্ত ইহাদের সর্পনাশ না হয়, ততদিন সে সব অঞ্চলে মশকের প্রবেশে বাধা দিবার জন্ত খুব ভাল করিয়া প্রত্যেক ঘরে তার-জালের পর্দা দিতে হইবে। যদি ঘরে ইতিমধ্যে মশক প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে মারিয়া ফেলিতে হইবে। কিংবা মিনের ঢাকনীর উপর Pyrethrumএর চূর্ণ পুড়াইলে মশা

অজান হইয়া জীবন হারায়। মশকের দংশন এজন্য সকলের উচিত; এজন্য বাহিরে, বিশুদ্ধতা, রাতে, বিশ্রাম থাকা উচিত নয়। যে সকল লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, তাহাদিগকে সদাসর্বদা মশারির মধ্যে রাখিতে হইবে; মশারিই মশার অরি। ম্যালেরিয়ার শত্রু যে সুইনাইন তাহা তা কার্যে অজাত নয়। কিন্তু ইহার ব্যবহারে অনেকই অনভিজ্ঞ। শরীর ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ হইলেই দাগ বা দোষ প্রদান করিতে হইবে এবং আরও মনে রাখিতে হইবে যে দাগের বার (time) অতীব আবশ্যক। দূরদর্শী চিকিৎসকগণের ইহাই অহুঙ্কৃত মত।

যদি আমরা এই সকল প্রণালী লক্ষ্য করিয়া সতর্কতাসহকারে অগ্রসর হই, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার নিকট নিজেদের জীবন বলি দিতে হইবে না।

কোঁটাপুঙ্কজ বাহিত অত্যন্ত রোগ ম্যালেরিয়া, ওমা, আল্রিক জর ভিন্ন ইঞ্জি ও ফিজিওপপুঙ্কে একপ্রকার মারাত্মক মানবীয় চক্ষু-রোগ আছে, এই রোগ সাধারণ গৃহমাছিকজরু নীত হয়। আমে-

রিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে একপ্রকার চক্ষুরোগ আছে যাহা হিপ্পলন্ত (Hippelates) শ্রেণীর অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছি কর্তৃক বাহিত হয়। কোন কোন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে Leprosy মত দেখিতে Filariasis নামে একপ্রকার ব্যাধির আঘাত, যাহা কতিপয় মশা দ্বারা মানবদেহে প্রকটিত হয়। গরুর তথাকথিত Texas জর সাধারণ গরুর মাছি (tick) কর্তৃক স্থানান্তরিত হয়। অন্নদ্রক (Anthrax) নামীয় গো-রোগ কোন কোন মাছি এক স্থান হইতে অপরস্থানে লইয়া যায়। শয্যাকীট যে ছারপোকা, সেও রোগ-বীজবাহক বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। হরিদ্রা-জরের কারণ আমরা এখনও নির্দেশ করিতে পারি নাই; তবে ইহার উৎপত্তি যে পরভোজী বপু হইতে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন মশক এই হরিদ্রা-জরের যান বলিয়া সম্ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

ওহায়ে বিশ্ববিদ্যালয়,
আমেরিকা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে বেক্রম আন্দোলন চলিয়াছে তাহাতে স্বতঃই প্রাণে একটা আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়। মহামহিম গোথলে মহোদয়ের শিক্ষাবিলের (Primary Education Bill) পাণ্ডুলিপির বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহার গভীর গবেষণা এবং দেশের উন্নতি কামনার বলবতী

স্থূহা দেখিয়া প্রাণে যুগপৎ আনন্দ ও উদ্যোগের উদ্রেক হয়। শিক্ষার বিষয় লইয়া আমরা যে কেবল রাজনীতিবিদগণ আন্দোলন করিতেছেন এজন্য নয়, যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন সর্বত্রই শিক্ষার আলোচনা দেখিতে পাই। পিতামাতা, অভিভাবকগণ, শিক্ষা-পরিষদের সভ্যমণ্ডলী এবং শিক্ষক

মহোদয়গণ সকলেই শিক্ষার বিষয় লইয়া আপনাপন মতামত প্রকাশ করিতেছেন। কেহ হযতো আধুনিক শিক্ষার অধুনাগততায় হতাশ হইতেছেন, আবার কেহ হযতো আশার আলোকে শাস্যামিত প্রাণে ভবিষ্যতে স্বপ্নের আশা স্থাপন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন। কিন্তু কাহার নিস্তার নৃত্যনুক্রম এক সঠিক তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে সে বিষয়ের সম্যক আলোচনা আবশ্যক—তাই এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছি।

শিক্ষার সফলতা আশা করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত স্বাব্যবহার প্রয়োজন এবং ঐ ব্যবস্থা নির্ধারিত করিতে হইলে প্রথমই “শিক্ষার উদ্দেশ্য কি” তাহাই মনে মনে ধারণা করিতে হইবে। উদ্দেশ্যবিহীন কোন কাহিঁই স্বকল প্রসব করিতে পারে না। এ অবস্থায় শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাই প্রযুক্ত। হুতরাং দেখা বাউক এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত? একটু বিশেষভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে ইহার উদ্দেশ্য জ্ঞাতির প্রকৃতিতে ভিন্নরূপ বলিয়া নির্ধারিত হইলেও প্রকৃতভাবে তাহা ভিন্ন কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। মনুষ্য-জন্মের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার উদ্দেশ্য যে একই ইহা বোঝা যায় সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে মহত্বজননের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে কথিত হয়—তাহাও স্বাভাবিক। কারণ সে সমস্তই মানবিক উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে। কোন জাতি হয় তো এই ঐহিক জীবনকেই একমাত্র চিন্তার বিষয় মনে করিয়া দেহের স্বপক্ষমততার উপরেই জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্যের আরোপ করেন, আবার কোন জাতি হযতো এই ঐহিক বা

সাংসারিক স্বপ্নকে উপেক্ষা করিয়া পারলৌকিক নিত্যস্বপ্নের অধেষধনের চেষ্টাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। জীবনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্যেরও ঐরূপ বাহ্যিক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রথমমত-সমর্থনকারী মহাত্মারা “অর্থ-উপার্জন এবং ঐহিক স্বপ্নবন্ধনছাড়ার অহুকূল উপায়-উদ্ভাবন-চেষ্টাকেই” শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করেন; পক্ষান্তরে অপর পক্ষীয়েরা “পরমার্থলাভ এবং পারলৌকিক স্বপ্নের চেষ্টাকেই” শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া নির্ধারিত করিতেছেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উভয়ই মূল এক—“নিত্যস্বপ্নলাভের চেষ্টা।”

জগতে জীবনযাত্রাই স্বপ্নের আশায় ছুটছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। “স্বপ্ন স্বপ্ন” করিয়া সকলে উন্নত। স্বপ্নিক স্বপ্নের আশাবাদে নিত্য চঞ্চল নাই—তাই জগতের এই অধিরাম স্পন্দন। “জানম্মময়ের” রাজ্যে সবাই যে পরমানন্দ ভূমিয়া থাকিতে চাহিবে ইহাতে আর আশ্বব্য কি? এই স্বপ্ন-লাভেচ্ছা যখন স্বাভাবিক—তখন বেধিতে হইবে চির উপায়ে ইহা নিত্যাভাবে ধারণ করিয়া চির শান্তি লাভ করা যায়।” এই স্বপ্ন লাভের চেষ্টার প্রণালীই স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন প্রকার এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত হইতেছে। পৃথিবীর আদিম অবস্থা কল্পনা করিলে বুঝা যায় যে, প্রথম অবস্থায় মহত্বগণ অসভ্য ছিল। সেই সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও শিক্ষার প্রয়োজন হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমানের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্য এতই সঙ্গীর্ণ ছিল যে, আমরা অধুনা তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকি। আদিম অবস্থায় অসভ্যগণের মধ্যে যে অভাব তাহারা ধারণা করিতে

পারিত, তাহার পূরণই যে তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? কাজেই সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত শিক্ষার প্রকৃতি ধারা সংসার প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য লাভ করাই তৎকালীন শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। হুতরাং সে শিক্ষায় যে মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টার অভাব অবশ্যস্বার্থী ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ, প্রথম অবস্থায় বাহ্যিক ও ব্যবহারিক (যাহা নিত্য প্রয়োজনীয়) জ্ঞানই চরমজ্ঞান ও—শিক্ষার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। সে অবস্থায় আহার-সংস্থান, সন্তান-উৎপাদন ও পরিবার-প্রতিপালনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই শিক্ষার বিষয়ও তদনুযায়ী হইয়া তৎকালীন স্বপ্নলাভেচ্ছাকে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু মানবের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টই দেখিতে-পাওয়া যায় যে, সামাজিক ব্যবস্থা ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে করিতেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী ভিন্ন আকার ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপে সময় ও সামাজিক অবস্থার বিপর্যয়াবস্থায় শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য ও প্রণালীর বিপর্যয় অবশ্যস্বার্থী।

এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, যদি স্থান, কাল ও পাত্রভেদে শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য ও তাহার প্রণালী বিভিন্ন হয়, তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির শিক্ষা-প্রণালী একরূপ হইলে একইরূপ ফল প্রসব করিবে কি? এই সমস্তার মীমাংসা তত সহজ নয়। প্রাচ্য বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য জাতির প্রকৃতি ও অবস্থা উভয়ই আজ

পার্থ্য কিছু না কিছু পৃথক বলিয়াই উপলব্ধি হয়। প্রাচ্য অস্বাভাবিক, পাশ্চাত্য বহিস্বাভাবিক। পাশ্চাত্যজাতি অধুনা বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান এবং ভারতবর্ষের বিনিময়ে তাহারা কৃষ্য-রাজ্যের রাজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; আর প্রাচ্যজাতি বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই ধর্মভীরু ও ভক্তিপ্রবণ—হুতরাং শাস্ত্রবিজ্ঞানের রাজা। তাহার প্রত্যক্ষের বিহিত হইলেও ঐশ্বর্যশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাহার আলোচনায় মানসিক উৎকর্ষসাধনকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। ইহা হইতে কেহ একরূপ মনে করিবেন না যে পাশ্চাত্যজাতি ঐশ্বর্যশক্তিতে বিশ্বাসী বলিয়া নির্দেশ করিতেছি। কারণ—তাহাদের কবিও গাহিতেছেন:—

“Act, act in the living present
Heart within and God over head.”

তবে আমার ঐরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে প্রাচ্যরূপ অনেকটা ধর্মপ্রবণ এবং পাশ্চাত্যরূপ অধুনা বিজ্ঞানের উৎকর্ষেই অধিক উন্নত। এ অবস্থায় উভয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী এক হইবে কি?

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে উপলব্ধি করা যায় যে, শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে কোথাও কোন পার্থক্য নাই, এবং থাকিতেও পারে না। তবে অধিকারভেদে তাহার প্রণালী পৃথক হওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য—“সেই নিত্যস্বপ্ন” লাভ করিবার জন্য পাশ্চাত্যজাতি আজ প্রকৃতিকে তাহারিগের দাসীরূপে নিয়োজিত করিয়াছেন। আজ তাহারিগের স্বপ্নের আশাতৃষ্ণির জ্ঞা বাপ্পীয় শকট দুই দিনের পথ হই ঘণ্টায় ছুটিতেছে; তাহারিগের শ্রান্তি দূর করিবার জন্তই

বৈদ্যাতিক বাহ্যনী অশান্তভাবে প্রকৃত সেবার নিমুক্ত। তাঁহারিগণের স্থিতির জ্ঞাত মাইল দূর প্রবাসী বন্ধুর ক্রশন-সংবাদ মুহূর্ত্তে আনিয়া পৌছিতেছে; ক্ষুদ্র প্রাণের অবসাদ দূর করিবার জ্ঞাত এই যে মধুরথের “কলের গান” বাজিয়া উঠিতেছে—আরও কত বলিব। প্রকৃতি আশ্রয় পাশ্চাত্যের আত্মহ-বর্ত্তিনী হইয়া তাঁহারের স্থানের সরবরাহ করিতেছে। কিন্তু হায়! শান্তি কি? এখনও এই যে সেই ছুটাছুটি! এই যে সেই অবিরাম স্পন্দন! নিরবচ্ছিন্ন আলোড়ন। সেই হির, ধীর, প্রশান্ত, গভীর শান্তির ছায়া কি?—আবার প্রাচ্যের দিকে চাহিয়া দেখুন। এই যে শাক্যভোগী, অবলম্বনহীন, যোগীর উর্ধ্বনগের আকাশের পানে চাহিয়া জীবনের শান্তি দূর করিতেছেন। সংসারের ভোগসুখচ্ছাদ্য নিবৃত্তি আনিয়া অকলপ্রেণ-ভাবে কর্ম করিয়া যাইতেছেন—উহাও কি সেই চিরস্থখ, পূর্ণশান্তিলাভের অভিশাপ নয়? তবেই দেখিতেছি উভয়ই সেই মুখ্য-উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। তবে একটা ধারা, মাহুষ, স্বভাব-রোগ-পর্দিতপুষ্যস্বারা হরণেচ্ছা হইয়াও, স্বভাব-সৌন্দর্যের সারবস্তুর প্রকৃতির বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমুগ্ধচিত হইয়া পর্দিতপুষ্যের আকারাকা পথ অতিক্রম করিতে করিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা করে; আর অপরটা ধারা মাহুষ সকল প্রলোভনের হাত হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া সোপাংখ্যিক লক্ষ্য-স্থানে পৌছিতে প্রাণপণ সচেষ্ট। ভারতবর্ষ ধর্মপ্রবণ বলিয়া এরূপ মনে করা উচিত নয় যে সেখানে কর্মের আদর নাই। এদেশ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমগ্ৰীভূত আদারভূমি। এদেশ জ্ঞানরূপী শরদাচার্য্য, কর্মরূপী বুদ্ধদেব এবং ভক্তিরূপী চৈতন্তের জন্ম ও লীলাভূমি।

হুতরাং এখানে কর্মের আদর নাই—এ কথা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ গীতা গাহিতেছে :—

“ন কর্মণ্যমানরন্তাতৈকর্ম্মং পুরুষোহশ্রুতে।

ন চ সম্যাসাদেব দিগ্ধি সমধিগচ্ছতি ॥”

“নিয়তং কুরু কর্ম্ম যৎ কর্ম্ম জ্ঞাতোহ্যেকর্ম্মণঃ।

শরীরযাজ্ঞানি চ তে ন প্রসিধ্যোদ্যকর্ম্মণঃ ॥”

“তদ্ব্যাদিসত্ত্বঃ সত্যতঃ কার্ধ্যং কর্ম্ম সমাচর।

অসজ্জো হ্যচরন কর্ম্ম পুরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

অর্থাৎ “কর্ম্মের অহুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। (চিত্তভ্রমি ব্যতীত) কেবলমাত্র সম্যাসেই জ্ঞানলাভ হয় না ॥

তুমি সম্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম কর। যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল, সর্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্লীহ হইবে না।

অতএব তুমি কল্যাণকৃশ্ণজ্ঞ হইয়া সর্বদা অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত কর্ম্ম অহুষ্ঠান কর। যেহেতু অসঙ্গত হইয়া কর্ম্মাহুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্ত হয় ॥”

কাছেই দেখা যাইতেছে—সামান্য পার্থক্য থাকিলেও পাশ্চাত্যের জায় আমরা কর্ম্মী এবং তাঁহার অধিকাংশই বিজ্ঞানের মোহিনী-শক্তিতে অভিজ্ঞ থাকিলেও তাঁহারিগের মধ্যও ধর্ম্মবীরের অভাব নাই। হুতরাং প্রজাতিতে পার্থক্য থাকিলেও সকল সভ্যদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মুখ্যভাবে একই থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইভাবে আলোচিত হয়। প্রথমতঃ পিতামাতা ও অভিভাবকগণ জীবিকা-

উপার্জনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা করেন। আজকাল দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে “জীবিকা-উপার্জনই” যে শিক্ষার সকল উদ্দেশ্য আত্মসাৎ করিয়া স্বগ্রন্থান হইবে ইহা স্বাভাবিক। পিতামাতা ও অভিভাবকগণ বাধ্য হইয়া সেই উদ্দেশ্য-সাধনেই চালিত হইয়া থাকেন। ইহার ফলে ইহাই পাড়াইয়াছে যে, অধুনা শিক্ষার মাহুষকে প্রকৃত-মাহুষ করক বা না করক, তাহাকে “অর্থকরী বিদ্যা” দান করিয়া থাকে। হুতরাং “শিক্ষা” বলিলে এখন আমরা “অর্থকরী বিদ্যা” ব্যতীত আর কিছুই বুঝি না কিবা বুঝিতে চেষ্টাও করি না। তাই বলিয়া “জীবিকা উপার্জন” শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিহিতত্ব এরূপ প্রতিবেদিত না— কারণ ইহা জীবনের একটা প্রধান কাজ, এতদ্ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব। তবে উহাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে আমরা দিন দিন যে মহাভ্রম-বিহীন হইয়া অংগপতনের পথে অগ্রগত হইব তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই “জীবিকা-উপার্জনকেই” চরম উদ্দেশ্য না ধরিয়া শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্যের অংশবিশেষ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রকৃতভাবে শিক্ষিত হইলে কখনও কাহারও উপার্জনের অভাব হয় না, কিন্তু দেশের বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রভাবে আমরা এতই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি যে, প্রকৃত শিক্ষার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা কেবল বাহ্যিক আবরণেই (বি. এ., এম. এ. প্রভৃতি) ডুবিয়া আছি। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, যদি শিক্ষাকে আমরা প্রকৃতপথে চালিত করিতে পারি তবে আমাদের সর্বপ্রকার অভাব তো দূর হইবেই,

পরন্তু সম্ভব সম্ভব নিত্য শান্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধনই তাহার একমাত্র উপায়।

এখন দেখিতে হইবে এই সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন কাহাকে বল? আমরা জানি যে মাহুষের অন্তরীক্সিত জ্ঞান, অহুত্বিত ও কর্ম্মের সমগ্ৰীভূত। * জ্ঞানলাভের ইচ্ছা-মাহুষের যেমন স্বাভাবিক, তেমনি তাহা হইতে আনন্দ বা হৃদয়-অহুত্বিত এবং সেই জ্ঞানের প্রকাশ-স্বরূপ কর্ম্মের নিয়োগও মাহুষের স্বাভাবিক। এই তিনের সমগ্ৰী লইয়াই মাহুষ এবং তাহারদের সমগ্রা অংশীলন হইলেই সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধিত হইল। শুধু জ্ঞানের পরিপূর্ণি হইলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; কারণ শুধু জ্ঞানী হইলেই জীবনে স্থনী হইতে পারা যায় না অথবা তাহার দ্বারা জগতেরও বিশেষ কোন উপকার হয় না। তেমনি জ্ঞানবিহীন কর্ম্মজীবনও অশুপযুক্ত এবং অহুত্বিতবিহীন জ্ঞান বা কর্ম্মজীবন ভারবহ বই আর কিছুই না। ভক্তিব্রবণ কর্ম্মময় জীবনই জ্ঞানের পরিসমাপ্ত হয়—তেমনি চিত্তাকর্ষণকারী (interesting) বিষয়ের ব্যবহার হইতেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। হুতরাং জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বিষয়টা চিত্তাকর্ষণকারী হওয়া চাই এবং সেই লব্ধ জ্ঞান যাহাতে কার্যে পরিণত করা যায় তদ্বিষয়ে চেষ্টা চাই; নতুবা সেই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয় না এবং তাহা প্রকৃত জ্ঞান বা শিক্ষা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলেন “It (Education) is the preparation for complete living.” অর্থাৎ শিক্ষা মাহুষের শারীরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি

* Mind is the sum-total of “knowing, willing and feeling.”

সর্ববিধ উন্নতির উপায়স্বরূপ। প্রফেসর জেম্‌স্‌ (Professor James) তাহার "Talks to teachers" নামক গ্রন্থে বলেন "Education is the organisation of acquired habits of conduct and tendencies to behaviour." অর্থাৎ শিক্ষা আমাদের লব্ধভাব ও কৰ্মপ্রবৃত্তির সুশৃঙ্খলা আনয়ন করে; অর্থাৎ ইহাই আমাদের "চরিত্রগঠনের" একমাত্র উপায়। এখন দেখা যাউক এই "চরিত্র" কাকে বলে? বাহ্যিক আচার, ব্যবহার, হাব, ভাব ইহেই আমরা "চরিত্র" সম্বন্ধে ধারণা করিয়া থাকি; কারণ অহুত্বের বিকাশই চরিত্রের প্রকাশ—"character is nothing but the outward manifestation of the inward feeling. For, there is no reception without re-action; no impression without correlative expression." (Professor James). প্রাণে যখন আকাঙ্ক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন কোন না কোন উপায়ে তাহার অভিব্যক্তি হইবেই হইবে। কাজেই অহুত্বের (feeling) উৎকর্ষ-

সাধনই চরিত্র-গঠনে প্রধান উপায়-স্থল। অহুত্বের বিকাশ হইলেই তাহাতে কৰ্মের অধিকার আসিল। আবার অহুত্বের উপ-যুক্ততা ও অল্পযুক্ততা প্রমাণ করিতে হইলে জানের প্রয়োজন। যেমন,—আমি মদ খাইতে আনন্দ পাই, ইহা একটা অহুত্ব। কিন্তু ইহার উচিত্যবিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে জানের আবশ্যক। হস্তরাং দেখা যাইতেছে চরিত্র-গঠনে জ্ঞান, অহুত্ব ও কৰ্ম এই তিন বৃত্তিরই উৎকর্ষ প্রয়োজন। ফলতঃ চরিত্র-গঠন ও মনের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ-সাধন উভয়ই শিক্ষার একই উদ্দেশ্যে পরিণত হইল।

সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধনই যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য, তখন দেখিতে হইবে যে কিসে এবং কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই উদ্দেশ্য কাৰ্য্যে পরিণত করা যায় এবং শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারন, শিক্ষার স্থান এবং শিক্ষকের কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য। বারাস্তরে এই সব বিষয়ের সংকলিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

ত্ৰীশরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ।

গোমূত্র

মহুত, পশু, পক্ষী ও উদ্ভিদগণের শরীর-রক্ষার্থ গোমূত্রের উপযোগিতা বড় অল্প নহে। মহুতের স্রীহা, পাণ্ডু, কৃষ্ণ প্রভৃতি রোগে, পশু-পক্ষীর চর্মরোগে, উদ্ভিদগণের নানানরূপ ক্রমিনাশার্থ গোমূত্রের ব্যবহার সচরাচর হইয়া থাকে। সকল প্রবোয়ই একটা এমন দ্রব্য আছে যাহা শরীরের পক্ষে উপযোগী নহে। ইহা কখনও মাত্রার ক্রম বশীতে হয়

এবং কখনও অজ্ঞানতা বশতঃ অপ্রয়োজের ফলেও ঘটয়া থাকে। এইরূপ গোমূত্রে বহুগুণ নিহিত থাকিলেও ইহা নির্দোষ নহে। এক্ষত চরম বলিয়াছেন,—
বিজ্ঞাতব্যাপি দুযুক্ত মনর্থাযোগ্যপজতঃ।

হরঃ ১ঃ

ঔষধের নাম, রূপ ও গুণ জানা থাকিলেও যদি উহা সম্যক প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে

তাহা হইতে অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন, মাত্রা কালপ্রায় যুক্তি: সিন্ধিক্তো প্রতিষ্ঠিতা। তিত্তত্বাপরি যুক্তি: প্রযোজনবতঃ সদা।

সেব্য যুক্তি অর্থাৎ প্রয়োগ কেবল অব্য-গুণ জানা থাকিলেই করা যায় না, মাত্রা ও কাল অহুত্বের করিতে হয়। এই যুক্তির ফলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এক্ষত যুক্তিজ চিকিৎসক ব্রজাজানী অপেক্ষা সমান-ভাজন।

মূত্রের গুণ ও ক্রিয়া ভগবানপুনর্নব সাধারণ ভাবে বলিতেছেন,
উষ্ণ তীক্ষ্ণমথ রূক্ষং কটুকং লবণাঘিতং।
মূত্রমুশাধনে যুক্তং যুক্তমালপনেন চ ॥
যুক্তমাহাপনে মূত্রং যুক্তকপি বিরচনে।
ষেদেখপি চ তদযুক্তমানাহেৎবদর্শ চ ॥
উদরেষথ চার্শঃ শুষ্কমূকটিকালিশি ॥
তদযুক্তমুনাহেৎ পরিষেকে ভবৈব চ ॥
দীপনীযং বিষমকৃ ক্রিমিয়কোনদিশাতো।
পাতুরোগোপশ্যস্তানামুত্তমং শর্ম চোচ্যতে ॥

স্নেহাঘ্ন শময়েৎ পীতং মারুতকৃষ্ণলৌঘয়েৎ ॥
কথং পিত্তমধোভাগ মিতাশ্চিন্ত গুণংগ্রহঃ ॥
মূত্র কটু ও ঈষৎ লবণ রস; (১) উষ্ণ-বীর্ঘ (২) এবং তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট। ইহা তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণ হইলেও রূক্ষ নহে, বরং মিষ্ট। মূত্র অগ্নির দীপ্তিকর এবং বিষ ও ক্রিমিনাশক। মূত্র, স্নেহপ্রশমক, বায়ুর অহুত্বোৎপাদক এবং পিত্তকে অধো-মার্গে আকর্ষণ করিয়া বিরোচন করাইয়া থাকে। ইহা পাণ্ডুরোগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মূত্র আনাহ উপর, অর্শ, গুল্ম, কৃষ্ণ ও কিনাশ রোগে, অন্তঃ-পরিমার্জন ও বহিঃ-পরি-

মার্জনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মূত্র, উৎসাদন (উদ্বর্জন), প্রলেপ, আস্থান (নিরুহবস্তি), উপনাস (হুলককৃষ্ণার সেদ—Pultice), পরিষেক (গায়ে সেচন), বিরোচন, শ্বেদ ও পানার্থ ব্যবহৃত হয়। আগ্রহ অর্থাৎ বিষয় ঔষধে মূত্র একটা বিশেষ উপাদান।

গোত্রের সাধারণ নাম "চেনা" বা "চোন"। ঔষধার্থ গোমূত্র-গ্রহণ করিতে হইলে, যে সকল অস্ত্র বিচরণ করিয়া ঘাস খায় তাহাদের মূত্রই গ্রহণ করা উচিত। যে সকল জন্তু সর্দনা বাঁধা থাকে, তাহাদের শারীর শ্রমের অভাবে, শারীর ধাতু ও মলের সম্যক পরিণতি হয় না। এক্ষত ইহাঙ্গুর মূত্র লঘু হইতে পারে না। এবং সময়ে সময়ে অজীর্ণতা হেতু, মূত্রের সহিত নানা অবাস্তব পদার্থ নির্গত হয়।

কথা, গভিগা, বৃদ্ধা গাভীর মূত্রও গ্রহণ করিবে না।

প্রাচীনরা বলিয়া থাকেন—ত্ৰীলোক পিত্তপ্রধান এবং মূত্রেও পিত্তগুণাধিক্য থাকা উচিত। এক্ষত গাভীর মূত্রই প্রশস্ত। (১)

যে সকল বৎসন্তরীর ২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মূত্রই গ্রহণ করিবে। প্রহৃতার মূত্র গ্রহণ করিতে হইলে প্রসবের অন্ততঃ ২ মাস পরে গ্রহণ করিবে।

মহর্ষি হারীত বলেন, প্রহৃতার মূত্র তরল এবং অপ্রহৃতার মূত্র ঘন হইয়া থাকে। বস্ত্ত: গুণে কোনও পার্থক্য নাই।

বৎসের মূত্র ঘন। বৃষগহীনের মূত্র ঈষৎ লঘু।

বৃষের মূত্র শোধ ও ক্রিয়। অগ্নিদীপক
এবং কামলা গ্রহণী ও পাতুরোগনাশক।
পানার্থ গরীমূত্র প্রশস্ত। (১)

গোমূত্রের গুণ ও ক্রিয়া

চরক—

গব্যং সমধুয়ং কিকিং দোষয়ং ক্রিমিকৃষ্টং।
কণ্ডুলশ্রময়েৎ পীতং সম্যগ্ধোষোবৈরে হিতং।
(বৃহৎ ১ম)

হর্যত—

গোমূত্রং কটুতিক্রোঞ্চং সক্ষারস্বাস্মবাতলং।
লঘুদ্রিদিপনং মেধ্যং পিত্তলং কফবাতজিৎ।
শূলগুন্দোদরানাহবিরেকাস্থাপনাদিহু।

মূত্রপ্রয়োগসাধ্যৈশ্চ গব্যং মূত্রং প্রয়োজয়েৎ।
(বৃহৎ ৪৫ অং)

ধনুস্তরীয় নিমট—

গোমূত্রং কটুতিক্রোঞ্চং সক্ষারং লেখনং সরং।
লঘুদ্রিদিপনং মেধ্যং পিত্তলং কফবাতজিৎ।
মূত্রপ্রয়োগসাধ্যৈশ্চ গব্যং মূত্রং প্রয়োজয়েৎ। (২)

(৬ষ্ঠ বর্গ)

রাজনিমট—

গোমূত্রং কটুতিক্রোঞ্চং কফবাতহরং লঘু।
পিত্তকৃন্দীপনং মেধ্যং অদোষজং মত্তিপ্রদং।
(১৫শ বর্গ)

(১) সৌর তৈরকমুদ্রাধ্বন্যঃ সারঃ প্রপত্ততে।

তদুৎ বৃষদ্বীপানাং কিকিষ্ণুসূত্রং মতঃ।

বৃষমূত্রক শোধয়ঃ ক্রিমিদোষবিনাশনঃ।

কামলাগ্রহণীপাত্নাশঃ চারিদীপনঃ।

অজাপরী ভবঃ মূত্রঃ শাশনৈঃ শবঃ ক্রিমিসংহৎ।

হারীত গ্রন্থানাম্ বনমাতায়াং।

(২) এখানে ধনুস্তরীয় নিমটের মত হর্যতের অঙ্গরূপ। না তুলিলেও হইত। পাঠক মহাশয়-
লিপ্যেক একটী বিষয় দেখাইবার জন্ত তুলিলাম। হর্যতের দ্বিতীয় চরণের পাঠ "সক্ষারস্বাস্মবাতলং"।
গোমূত্র, কটু ও তীক্ষ্ণ। একত্র ত্রয়া সন্ধ্যার পরে বাতবর্ধক হয়। একত্র হর্যত উহা কেন বাতবর্ধক নহে
তাহার হেতু দেখাইতাছেন। যে কারণেই হউক ধনুস্তরীয় নিমটে উহা পরিবর্তিত হইয়া "সক্ষার-
লেখনং সরং" হইতাকে। পাঠক দেখিবেন—হর্যতের "শূলগুণ্ড ইত্যাদি" ভরন দুইটী ধনুস্তরীয় নিমটে নাই।
ফলে ধনুস্তরীয় মতে "মূত্রপ্রয়োগ" ব্যবস্থা হইলে সর্বত্র গোমূত্র গ্রহণ করা উচিত বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ
হর্যতের মত তাহা নহে। হর্যতঃ ধনুস্তরীয় নিমটের পাঠ পরিভাষ্য।

হারীত—

মূলং (১ম ৩ম অং)

গোমূত্রং দ্বৈতং মধুরং ও কটু রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ।

ইহা ত্রিদোষপ্রশমক অর্থাৎ মধুরতার জন্ত—

পিত্তপ্রশমক; কটুরস হ্রতরাং শৈতগুণ বায়ুর

প্রশমক। কটুরস ত্রয়া বায়ুবর্ধক হইয়া

থাকে, কিন্তু গোমূত্র কারবহলতার জন্ত

বাতবর্ধক হইতে পারে নী। গোমূত্র অগ্নি-

দীপক ও দ্বৈত বিরক্তক। হারীতের মতে

ইহা মূত্রকর। গোমূত্র, নাসারোগে

পানার্থ প্রয়োগ করা যায়। যথা—

উদররোগে—জলাদার—মল কাদার মত

শেত বা কৃষ্ণবর্ণ। সর্বাঙ্গগত শোথ। সন্দে

অন্ন অন্ন জর। দিনে দুই বার জল নিষ্কাশিত

করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া

যায়। পথ্য দুধ ও ভাত।

গ্রীহা—(ক) গ্রীহা বড় ও কঠিন। শরীরের

বর্গ সারা থাকাকালে। মল কঠিন। সন্দে

অন্ন অন্ন জর। দিনে ২ বার প্রয়োগ।

পথ্য দুধ ও ভাত। (খ) দিনে দুই বার

গ্রীহার উপর বেদ।

ক্রিমি—(ক) ক্ষুধা ও বড় ক্রিমি। মল
অত্যন্ত কঠিন হইলে কমলা গুড়ি প্রক্ষেপ।
দিনে এক বার সেব্য। মলের কঠিনতা না

থাকিলে বিড়ম্ব তড়ুল চূর্ণ প্রক্ষেপ। দিনে

দুই বার সেব্য। (খ) মতকের উকুন (ক্রিমি-
বিশেষ) এবং গায়ে যে এক প্রকার উকুন

দেখা যায় তাহা প্রশমনের জন্ত গোমূত্র দ্বারা

মাথা ও গা ধুইয়া দিবে।

জর্জর—বৈকাল্যে অন্ন অন্ন জর। যকৃৎ

ও গ্রীহার বেদনা। চক্ষুর কোণ সাদা।

মল কঠিন ও বিবর্ণ। দিনে দুই বার।

প্রক্ষেপ চিরস্তা চূর্ণ।

শূল—প্রবল বেদনা উপস্থিত হইলে সেই

সময় সেবন করিতে হয়। মায়া ২—৪

তোলা। মল কঠিন ও বিবর্ণ।

যকৃৎ বড়, কঠিন ও বেদনা যুক্ত। সন্দে

অন্ন অন্ন জর। শরীর রক্তহীন। (ক)

দিনে দুইবার সেব্য। (খ) দিনে দুইবার

বেদ।

আনাহ—পেটকাঁপা, পেটে গড়্গড় শব্দ

ও মন্দ মন্দ বেদনা। মল কঠিন ও বিবর্ণ।

গরম থাকিতে থাকিতে সেবন। অথবা

গরম জলে রাখিয়া গরম করিয়া সেবন।

দিনে দুইবার।

শোথ—শোথ রোগে গোমূত্র উষ্ণ করিয়া

তদ্বারা অবসেবন করাইবে।

অর্জীপ—ক্ষুধা ভাল হয় না। প্রাতে মূত্র

ও চক্ষু ভার ভাব বোধ হয়। শরীর অলস।

কোষ্ঠ অপরিষ্কার। দিনে দুইবার।

গোমূত্রের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া—গোমূত্র

শ্লেষাস্রাব্যত নষ্ট করে, একত্র শ্লেষগ্রোথ

বশতঃ যে গ্রীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হয়, তাহা দূর

করে এবং উর্দ্ধপ বায়ুকে অহলোম করিয়া

পিত্তকোষের পিত্ত অধোগামী করে এবং বায়ুর

অহলোমতা বশতঃ স্থানান্তরগত পিত্ত যথা-
স্থানে আগমন করে। কার ত্রয়া সারক ও
সংঘাতনাশক। এই জন্ত গোমূত্র মল তৈল
করিয়া মলের কাঠিত দূর করে।

মায়া ও সেবন-বিধি

জন্মের পর ৩ মাস পর্যন্ত ৫ ফোঁটা

৪ মাস হইতে ৮ " " ৭ ফোঁটা

৮ " " ১২ " " ১০ ফোঁটা

তদুর্দ্ধে ২ বৎসর পর্যন্ত ১৫ ফোঁটা

" " ৫ বৎসর পর্যন্ত ৩০ "

" " ১০ " " ৬০ "

" " ১৫ " " ২৫ কাঁচা

" " ৪০ " " ৫৫ হইতে

১০ কাঁচা

(১) রোগীর স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি,

এবং শারীর গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে এই

মাত্রার গ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে।

(২) গোমূত্র দ্বারোক্ষ সেবন করিবে।

ইহাতে গুণাদিকা হয় এবং দুর্গন্ধ তত

থাকে না।

(৩) দ্বারোক্ষের অভাবে অন্ততঃ দুই

ফটীর মধ্যে সেবন করা কর্তব্য। সেবন

কালে গরম জলের উপরে রাখিয়া গরম

করিবে। ইহা সেবনের পর শীতল জল পান।

বাহ্যিক প্রয়োগ

—অর্থাৎ ধবল রোগে গোমূত্র দ্বারা

পীড়িত স্থল প্রত্যহ দুইবে এবং উহার সহিত

সোঁদাল গাছের ছাল বা পত্র ভালরূপ পেঁষন

করিয়া পীড়িত স্থলে প্রলেপ দিবে।

কুষ্ঠ—গলিত কুষ্ঠ, মতুল ও উভয়ের কুষ্ঠে

পীড়িত স্থল দিনে দুইবার গোমূত্র দ্বারা

ভালরূপে ধুইবে। একগোষা শব্দ তৈল

আঙুণে চাপাইয়া তাহাতে গোমূত্র এক

সের ঝাওয়াইবে। গোমুত্র শেষ হইলে উহা পীড়িত বস্ত্রে মালিশ করিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা গোমুত্রে চক্ষু (বুট-জোঁটা) ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে ছোলা চিবাইয়া লইয়া গোমুত্রটুকু পান করিবে।

চুষ্তরপ—এক বছরদিনের পুরাতন হইলে নিমণ্ডাসিক গোমুত্র ঘাষা ক্ষত স্থান দুইখা ত্রণটাতে গব্য ঘৃত গরম করিয়া ঘাষাইয়া নূতন কদলীপাতা বা বাসকপাতা ঘাষা চাকিয়া রাখিবে।

কর্ণশূল—কাণের কামড় উপস্থিত হইলে গোমুত্র উষ্ণ করিয়া উহা ঘাষা কর্ণ পূরণ করিবে। অল্প সময়ের মধ্যেই বেদনা তিরোহিত হইবে।

বেদ

গোমুত্র উষ্ণ করিয়া গোমুত্রের হাড়ীটা একটা সচ্ছিন্ন আসনের নীচে রাখিয়া উপরে রোগীকে বসাইয়া রোগীর শরীর (মস্তক বাদে) এবং হাড়ী সহ আসন একটা কবল বা অল্প মোটা কাপড় বা কাঁবা ঘাষা বেটীত করিবে। গোমুত্রের বাষ্প রোগীর শরীরে লাগিবে এবং দ্রব হইবে। এই প্রথের ফলে ১। আমবাতের বেদনা ২। বাত কক্ষজ রোগ সন্তোষিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আর্যপুর্বে গোমুত্র যোগে নান্ন রোগে নানা প্রকার ঔষধের কদনা আছে। বারাস্তরে তাহার উল্লেখ করিব।

উদ্ভিদের রোগে গোমুত্র

১। এক প্রকার কিমি উৎপন্ন হইয়া ধানের পাতার রস শোষণ করিতে থাকে। ইহার ফলে ৭০ দিনের মধ্যে পাতাগুলি শুকাইয়া যায়। এই অবস্থায় পিচকারী করিয়া গোমুত্র সেচন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

২। শাক বা চারা গাছের পাতা নানারূপ ক্রমিতে ভক্ষণ করে। এরূপ স্থলেও পুরোঁজ গোমুত্র সেচনে উপকার পাওয়া যায়।

পশু-পক্ষীর রোগে গোমুত্র

গৃহপালিত পশু-পক্ষীর এক প্রকার ক্রিমি রোগ হয়। তাহার ফলে গায়ে রোস ও পক্ষগুলি ক্রমে বরিতে থাকে এবং চর্মে শুক হইয়া ফাটিতে থাকে। এই গীড়ায় গোমুত্র ঘাষা গা দুইসে হৃদয় ফল পাওয়া যায়।

গোমুত্র ও মোড়া

যেখানে সর্ষপা গোমুত্র শোণিত হয় এরূপ স্থানে মোড়ার বীজ পাইলে সেই মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে মোড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এরূপ মোড়ার কারখানার নিকটে গোমোল রাখা হইয়া থাকে।

শ্রীচূর্ণানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

জন-নায়ক গান্ধি

মহাত্মা গান্ধির স্থপতি নাম আজ ভারতবাসীর,—নব-উদ্ভোধিত যুবকমণ্ডলীর—কণমন্ত্র—প্রান্তঃস্বরণী! আজ সভ্যজগৎ বাঁহার ত্যাগে গুস্তিত, সেই মহাহৃদয় শাক্ত-

শ্রেষ্ঠ কর্মী শ্রীকৃষ্ণ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি এই “হুজলা-খফা-শক্ত আন্দোলন” রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতার প্রিয়সন্তান। হিন্দুধর্ম চিরদিনই ত্যাগের ধর্ম। ত্যাগ করিতে না শিখিলে

বা ত্যাগী হইতে না পারিলে হিন্দু হিন্দু লাভ করা যায় না! এ বাণী যুগে যুগে নানারূপে ভারতের আদর্শ বীরগণ নিজেদের কণ্ঠের ভিতর দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

‘আত্মকাল’ অনেকের লেখায় পড়ি যা অনেকের মুখে শুনিতে পাই ভারত এমন অধঃপতিত হইয়াছে যে এদেশের উন্নতি হৃদয়-পরাহত,—হৃদয়ের নিঃসর ইদানীং শিক্ত যুবক-সম্প্রদায় এ কথা সমীচিন মনে করিতে প্রস্তুত নন! যেই দেশের সন্তান এমনও হৃদয় আত্মিকাপ্রাপ্তে নির্জন কারাবাসে নিতান্ত নিঃশব্দে ভাবে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর হিতার্থে এমন ক্লান্ত-ব্রত সাধন করিতেছেন, সেই দেশের নব-নারী কি এমনও এ দেশের ভবিষ্যৎ সঞ্চক্ষে নিরাশ হইবেন?

নিরাশার রাঙি এখন প্রভাতপ্রায়, চারিদিকে পাণীর কাকলী শুনিয়া সকলেরই জীবনের মহাভরত উদ্গোধন করুক,—কর্ম-স্বপ্নে নাসিয়া মহুগুণের পরিচয় দিক—ইহাই বাঞ্ছনীয়!

ভাতগণ! বিশ শতাব্দীর মহাত্যাগী শ্রীকৃষ্ণ গান্ধি তোমাদেরই দেশের সন্তান,—পরিবারের কড়া ও গৃহিণী। ধর্মকর্ম তোমারই মায়ের অঞ্চলের নিধি,—তোমারই ভাই! আল তোমার ভাতার ত্যাগ ধৈর্য এবং তাঁহাকে আদর্শ করিয়া জীবনকে দখল কর। আজ ভারতবর্ষ বিশেষ ভাগ্যবান যে মাতৃভূমিকে দেখা করিবার জন্ত গান্ধির মত মহাবীরের আবির্ভাব হইয়াছে! যেই দিন মাঘ্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবে,—যেই দিন জগৎ জাতীয়-সর্বাধিপত্য গভী ছাড়াইয়া আরও উর্ধ্বে উঠিবে—সেই দিন সমগ্র জগৎ জুড়িয়া গান্ধির পূজা চলিবে—সেই দিন মহাহৃদয় গান্ধি সমগ্র বিশ্বের হৃদয়ের দেবতারূপে প্রোমোত্তলি পাইবেন।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার “ভারতীয়-দলন” ব্যাপার উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধি ভারতের আবার-বৃদ্ধের সহিত স্থপরিচিত হইয়াছেন। বাঁহারা দেশের ও দেশের স্ববর রাপেণ—তাঁহাদের অনেক গান্ধির-ব্রাহ্ম যজ্ঞ সঞ্চক্ষে অজ্ঞ নন;—অনেকেই গান্ধিকে দেবতা জ্ঞানে মনে মনে পূজা করেন, হৃদয়ের ভক্তি উপহার দেন। কিন্তু হৃদয়ের বিষয় তাঁহাদেরই অনেকে বিশেষতঃ অধিকাংশ বাঙ্গালী এই মহাহৃদয় ত্যাগীর আদর্শ জীবনে কিছু জানেন না। তাঁহাদেরই কাছে গান্ধি সঞ্চক্ষে আমার বঙ্গমাতা জ্ঞান ও ধারণা ভয়ে ভয়ে উপস্থাপিত করিলাম; আশা করি, এই অসুখী লেখকের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস স্বীকৃতি মণ্ডলী কর্তৃক উপেক্ষিত হইবে না।

গৃহীণ ১৮৬৩ অব্দে (২রা অক্টোবর) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাথিয়াবাড়ের তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পোর্সন্দর ও রাজকোট রাজ্যে অনেক বৎসর ধরিয়া মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গান্ধির পিতা কিয়দংশ কাথিয়াবাড় ও অধিকাংশ লণ্ডন নগরে হয়। তাঁহার মাতা নিষ্ঠাবান হিন্দু-পরিবারের কড়া ও গৃহিণী। ধর্মকর্ম তাঁহার প্রাণ্যত বিদ্যা ছিল। গান্ধি যখন সর্ষ প্রথম সাগর বকে “সাত সমুদ্র তেরনলী” পারের সেতুদীপে যাত্রা করেন, তখন মায়ের কাছে তাঁহাকে জীবিত প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল; প্রথম, মাংস-অভক্ষণ; দ্বিতীয় মাদক দ্রব্য সেবন, তৃতীয় বা সর্বলেশ, নারী জাতির প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন। ইহা হইতেই গান্ধি-জ্ঞানবীর চরিত্র পাঠক-পাঠিকায় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি লাভিতে পারেন। তিনি “লণ্ডন” বাসকালেও মাতৃ-উপদেশ ও স্বকীয় প্রতিজ্ঞা সর্বদা পালন করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে 'ব্যারিষ্টার' হইয়া তিনি বিলাত হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং মধ্যে হাইকোর্টে Advocate (এডভোকেট) হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। যখন দেখিলেন সেই দেশে তিনি ভারতসন্তান হইয়া চণ্ডালের মত (as a Pariah) সম্মানিত ও অসভ্য বর্বর আদিম অধিবাসীদের মত আদৃত হইতেছেন, তখনই গান্ধি মধ্যে মধ্যে স্বীয় জন্মভূমির দৈন্য ও হীনতা বিশেষরূপে অনুভব করিলেন,—তখনই মহাত্মা গান্ধি সেই স্বদেশের জন্ত আত্মত্যাগে বন-পরিব্রাজক হইলেন। সেই দেশে ভারতবাসী বর্ণ-পার্থক্যের অপরাধে যেতাদ্বয়ের সঙ্গে যথেষ্ট থাকিত পণ্য না, পণ্যে হাটুতে পারে না, এক স্থানে বাস করিতে পারে না। ভগবানের বিশ্বমাঝে মানুষের মধ্যে এপ্রকার পার্থক্য, এইই নূতন। আফ্রিকার যেত-দেহধারী খৃষ্টানগণ হিন্দুকে পদে পদে লাঞ্ছনা ও অপমান করেন। মহাত্মা গান্ধি স্বচক্ষে এই সব প্রত্যক্ষ করিয়াই তাহার প্রতীকারার্থে আত্ম-ত্যাগে ভক্ত-সংকল্প হইলেন।

ভারত-বাসীদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে একটা ঘটনা এখানে ভুলিয়া দিলাম; পার্শ্বপূর্ণ বিচার করিয়া দেখিবেন। মানুষের উপর মানুষ এমন নিষ্ঠুর ও দৈন্যচাকি অত্যাচার করিতে পারে না; মানুষের লেখনীতে উহার যথার্থ বর্ণনা অসম্ভব।

“শ্রীকৃষ্ণ গান্ধি সেই দিন মহারাষ্ট্র-জননায়ক গোথলে মহাশয়ের কাছে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছেন যে, ‘১৮৯৬ সালে ও তৎ পূর্বেও দুটা জাহাজে করিয়া ভারত-বাসীরা তার্কান-বন্দরে আসিয়া পৌঁছায়; তাহারা

যাহাতে জাহাজ হইতে নামিতে না পারে তৎক্ষণাৎ তিনি (কর্ণেল ওয়াইলি) অনেক লোক সংগ্রহ করিয়া লইয়া বন্দরে উপস্থিত হন। প্রকাশ্য সভায় ভারতবাসী যক্ষসহ ছেঁটুটা জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন। আর একজন বক্তা বলে যে কেহ যদি একবারও ভারত-বাসীর উপর গুলি চালায় তাহা হইলে সে নিশ্চয় এক মাসের মাদানি দিবে। কর্ণেল ওয়াইলি এই বক্তার প্রস্তাবের প্রশংসা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে আর কে কে ভারতবাসীর উপর এক একগুলি ছোট্টার জন্ত এক এক মাসের বেতন দিতে রাজি আছে?’”

এই হুস্মিস্ক মহাত্মা কর্ণেল ওয়াইলিকেই তৎকাল প্রবর্ণমেন্ট ভারতবাসীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে অহুসমান্যনি নিযুক্ত কমিশনের একজন সভ্য করিয়াছেন!! এতৎ-সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহ্যল্য মাত্র।

এই সময়ে মজীপুত্র, সৌভাগ্যকোন্ডে শায়িত বারিষ্টারদের ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া লাহিত ও অত্যাচারিত স্বদেশীয়-অসম্পন্ন উপকারার্থে স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ বিসর্জন দেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের বৃহদ-সমরে মহাত্মা গান্ধি ইংরাজদের পক্ষে অনেক সহযোগী লইয়া যাত্রা করেন। এমন কি ইহার পুরস্কার স্বরূপ সমর-পদকও (war-medal) তাহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যখন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ বশত ভারতে যাত্রা করেন তাহারই—কিছু পূর্বে সেই দেশের (নোটলের) প্রধান মন্ত্রী স্ত্রাবরজন রবিন্সন একদিন চিঠিতে তাহাকে লিখিয়াছিলেন, “মিষ্টার গান্ধির জায় স্থবিধাত ও সক্ষম নাগরিকের কার্যকালে যদি আমি উপস্থিত

থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে কতই স্বপ্নের বিষয় হইত। তাঁহার স্বদেশীয় জনসাধারণের হিতার্থ তিনি যে মহা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, আমি অন্তরের সহিত তাহার সাফল্য কামনা করি।” সেই দেবতাকেই আজ অনাহারে অনিদ্রায় কারা-ক্লেমে দিন যাপন করিতে হইতেছে।

তাঁহার সহযোগী ভ্রাতৃপণের ছদ্মকান্ধিনী গবর্ণমেন্ট ও বিশেষ রূপে জানাইবার উদ্দেশ্যে একখানা সংবাদ-পত্রের আশ্রয়কৃত্য অনুভব করিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে (Indian Opinion) “ভারতীয় মতামত” নামে এক খানা সংবাদ-পত্র বাহির করেন। এইরূপে আফ্রিকাবাসী ভারত-সন্তানদের সেবার গান্ধি কতবার কারাক্লেষ ক্রিয়াজনিত তাহা ভাবিতে গেলে বাস্তবিক বিশ্বাস পূর্ণ হইতে হয়।

ভারত-দলনার্থ সে দেশে কতবার কত আইনকাঠন জারি হয় এবং তাহাণ, প্রতি-রোপণ অনেকরূপে অনেকবার তিস্তি-বিবদ কষ্টে ত্যাগ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

একবার ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন ভারত-বাসী ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যখন এই সংবাদ মহাপ্রাণ গান্ধি জনিতে পাইলেন তখনই তিনি নিজেকে বজ্রবর্গের অপরাধের নেতা ও উৎসাহদাতা বলিয়া স্বীকার করতঃ তাঁহারও যাহাতে তাঁহার বজ্রবর্গের মত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় এইজন্ত প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিক্ষা মাত্র ছয় মাস বিনা শ্রমে কারাবাসেরই আদেশ হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধির কার্য সকলই অলৌকিক! সপরিবারে তিনি এত দুঃখ ক্রিয়াই দেশের সেবা করিতেছেন। একবার “কিনিস্ত”

নগরে তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানের রোগ-সংবাদ পাইলেন। যদি পুত্ররক্তকে ‘বাঁচাইবার’ সাধ থাকে তবে গান্ধি যেন আগেগোষে সেখানে যাইয়া তাহাকে দেখেন এই মর্মে সংবাদ আসে। কিন্তু কর্তব্যপ্রাণ আদর্শকন্ডযোগী উত্তরে লিখিলেন; My greater duty lay in Johannesburg, where the community had need of me, and my child's life or death must be left in God's hands.” অর্থাৎ ব্রোহ্মদেবতার্ণে আমার বিশেষ কাজ আছে; এখানেই আমার মহত্তর কর্তব্য বিরাজমান। আমার প্রিয় সন্তানের জীবন বা মৃত্যু বিভূর হইতেই জন্ত হইবে, তিনিই সমুচিত বিধান করিবেন।

গান্ধির ষোড়শ পুত্র অনেক বার অত্যাচারের প্রতিরোধার্থে কারাবাস ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানকেও কারাক্লেষ প্রভৃতি শারীরিক কষ্টে (Hardships) অভ্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অজ একবার ট্রান্সভালের কারাগারে তাহাকে দণ্ডী করিয়া লইয়া যান। তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে বোধ করি পাঠকগণ অবগত আছেন। অল্প দিন হইল গান্ধি-জাহাজে হইতে জীবী ধীর ককালময় শরীর লইয়া ফিরিয়াছেন। তাঁহার জন্ত কারাগারে বিশেষ খাদ্য (Special diet) ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সহযোগী কারাবাসী ভাই-ভগিনীগণকে ফোঁফা উহা খাইতে সম্মত হন নাই। ইহাই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের এক মাত্র কারণ।

তিনি সেখানে হিন্দু-মুসলমানের “একতা” মাধনের নিমিত্ত অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ তথায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যুব কতিয়ই বিরোধের সংবাদ শোনা যায়। তাঁহার চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান একযোগে তথায় কাজ, ধর্ম্যত, অথবা

দুঃখকষ্ট ভোগ করে। তিনি মনে করেন হিন্দু ও মুসলমান একই জননীর সন্তান।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় বিশতি বৎসরাদিক ধরিয়া স্বভিক্ষু মহাশয়তব গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে “ভারত-মলন-প্রতীকার”-যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন আজও তাহা সমাপ্ত হয় নাই। জানি না এই মহাযজ্ঞ কত দিনে শেষ হইবে।

মহাত্মা গান্ধি এখনও ৪৫ বৎসরের পূর্ব যুবক।

এখন ভারতবাসীগণ, দেখুন আপনাদের পরম আদর্শ—ভারতমাতার আদর্শ সন্তান—ভারতের অমানিশাকশের উজ্জ্বলতম আশাতারা এই হৃদয়ে বেগিময়। একবার মনঃমনেতে তাঁহার মোহনরূপ ধ্যান করিয়া নিজেদের সার্থক করুন।

গান্ধির পূজার সমাপ্তি এখনও বহুদূরে। ভ্রাতৃগণ! আপনাদিগ্রে এই মহা মাতৃযজ্ঞে তাঁহার সহায় হউন!

শ্রীমণীন্দ্রজ্ঞান চৌধুরী।

পশুখাদ্যের অভাব*

যাহা সাফল্য সঞ্চয়ে আমাদের স্বার্থে অঘাত করে, তাহাই নিবারণ করিতে আমাদের সতত তৎপর থাকি; পরোক্ষভাবে যাহা দ্বারা আমাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, দিন থাকিতে আমরা তন্নিবারণে যত্নবান না হইয়া অনেক সময় বিষম বিপদে পড়ি। কিন্তু জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হইয়া অধিক পরিমাণে শস্ত উৎপাদন হইতে পারে, মাছদের খাদ্য-শস্তাদির দর কোথায় কিন্তু, ভৃত্তিক উপস্থিত হইলে কোন উপায়ে কোথা হইতে খাদ্য-শস্ত আমদানি করিয়া ভৃত্তিকের কবল হইতে মানবকুলকে রক্ষা করিতে পারা যায়, দ্বাদ্ধি আদৌ উৎপন্ন না হইলে তদন্তকল্পে কোন দ্রব্য দ্বারা মাছদের স্ত্রিবিবৃদ্ধি করিতে পারা যায়, এই সব চিন্তাতেই মাছের সর্বনাশ আকুল। যে পশু-কুলের পরিভ্রমের অমৃতফল স্বরূপ খাদ্য-শস্ত আমরা মুক্তিকা হইতে প্রাপ্ত হই, যে পশু-কুলের বসগণের খাদ্য-শস্ত অপহরণ করিয়া

আমরা আমাদের পুষ্টিবর্ধন ও বিলাসবাসনা তৃপ্ত করি, যে পশুকুল আমাদেরিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, স্থান হইতে স্থানান্তরে আমাদের খাদ্যাদি বহন করিয়া থাকে, সেই পশুকুলের খাদ্যাভাব আশঙ্কিত হইলে আমরা কি বিচলিত হই? সেই পশুকুলের ধ্বংসে আমাদেরও ধ্বংসের আশঙ্কা আছে, এক কথা আমরা কখনো ভাবি? আমরা ভাবি না, কেননা আমরা স্বার্থপর;—আমরা ভাবি না, কেননা আমরা নির্দোষ।

দাঙ যেমন আমাদের প্রধান খাদ্য, ঘাস ও গড় তেমনি গবাদির প্রধান খাদ্য। আমরা দাঙ হইতে আমাদের খাদ্যোপযোগী ততুল লইয়া আমাদের অখাদ্য সামান্য পরিমাণে কুড়াইয়া গবাদির খাদ্যের জন্ত দিয়া থাকি; কিন্তু এই সামান্য দানের আমরা বিপুল প্রতিদান লইতে ছাড়ি না,—পশু-খাদ্যের অধিকাংশ আমরা আমাদের বিবিধ প্রয়োজনে

গ্রহণ করিয়া থাকি। চাল নির্ধাণ করিতে খড়ের আবশ্যক হয়, দড়ি করিতে উলু খড় লাগিয়া থাকে, কাঁচলা তৈয়ারী করিতে খড়ের দরকার, গৃহস্থের ঘরের জন্ত যে অসংখ্য বিড়ার দরকার, খড় হইতে তাহা প্রস্তুত হয়, সামান্য গৃহস্থগণ বিবিধ জন্ত খড় দিয়া নিম্নেট বিড়া তৈয়ারী করিয়া থাকে, পুষ্করীণের পানা তুলিয়া ফেলিতে অতি দীর্ঘ ও বুল খড়ের কাছি তৈয়ারী হইয়া থাকে, প্রতিবার আদ্য প্রস্তুত করিতে খড় আবশ্যক। অব্যাবস্থাবে হিন্দু গৃহস্থ খড় বিছাইয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া থাকে, কৃষক, অনেক বীজতলা খড় দিয়া ঢাকিয়া থাকে, অনেক কৃষিজীবী গৃহস্থ সারা বৎসর খড়ের জালে রন্ধন-কার্যাদি সমাধা করিয়া থাকে। এইরূপে আমরা গোজাতির মূত্রে গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনাপন স্বার্থ সিদ্ধি করি। কৃষিকার্যে গোজাতি আমাদের অশীলার, কিন্তু কৃষিজন্ত দন-ভোগে তাহা-দ্রিককে আমরা আমাদের অশীলার হইতে দেই না। যে বৎসর হুজুর্ হুজুর্ ষড়-মাঠে মাঠ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, যে বৎসরও আমরা ভিন্ন ভিন্নরূপে খড়ের ব্যবহারে গোজাতির পক্ষে খড়ের-ছত্রিক সন্ধান করিয়া থাকি। পূর্বে খড়ের অভাব পূরণ জন্ত গোজাতির পক্ষে গোচারণক্ষেত্র উন্মুক্ত ছিল, পুরাতন গোচারণক্ষেত্র এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, এখন আমাদের জালায় গোজাতিকে আব্দীশনে থাকিয়া কৃশ ও দুর্বল হইতে হইয়াছে। ইহার কুল আমরা অলঙ্কিত ভাবে ভোগ করিতেছি বলিয়া আমরা আমাদের ভয়বহ পরিণাম—আমাদের জাল—বৃদ্ধিতেছি না। পূর্বে যে ক্ষেত্রে ১২৩৪ মণ দাঙ ও তদগুণ্যে খড় উৎপন্ন হইত, এখন সে ক্ষেত্রে ৫ মণ দাঙ ও তদগুণ্যের খড়

উৎপন্ন হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই জটিল ব্যাপারের ভিতর না তুলিয়া বলিয়া থাকি যে উপযুক্ত পরিচালনা অপরূপ হওয়ায় এইরূপ ফল-হানি হইতেছে। কিন্তু বিশেষরূপে তথ্যসম্বলিত করিয়া বলিতে গেলে বলিতেই হইবে যে এই ফল-হানির একমাত্র কারণ জমির অপরূপতা নহে; কৃশ ও দুর্বল গরু দ্বারা চাচ চাকরূপ না হওয়াও এই ফল-হানির অন্ততর কারণ।

পাশ্চাত্য দেশে কৃষিজাত খড়ের উপর লোকে গবাদির জন্ত নির্ভর করিয়া কান্ত থাকে না। শস্তের যেমন চাষ হইয়া থাকে, তেমনই গবাদির আহাৰ্য্য তৃণ-মূল্যদির বস্ত্র চাষ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে মেটোকপি (field cabbage) মেটো শালগাম (field turnip) পশু খাদ্য বিবিধ শাক (clover, Lucerne &c.,) বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন করিবার জন্ত কৃষকগণ সতত ব্যস্ত থাকে। পশু-খাদ্যের পূর্বক চাষ করা ধূরে বাতুক, যে সকল গোচর জমি পতিত অবস্থার পড়িয়া থাকিলে তাহাতে সাধারণ ঘাস জন্মিয়া গোজাতির স্ত্রিবিবৃদ্ধি করতঃ গোকুল রক্ষা করিতে পারিত, সেই সকল গোচর জমি পর্যন্ত আমরা আবাদ করিয়া আমাদের উদরপুষ্টি করিতেছি। খাদ্যাভাবে গোবৎস নির্মূল হইলে আমাদেরিগকে যে অবশিষ্ট ভূমি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে, উৎসবের জালায় আমরা এক কথা ভাবিবার অবসর পাই না।

পূর্বে পূর্বে বৎসর খড়ের বাজার খুব গরম হইলেও ফান্সন মাসে টাকায় প্রায় ছয় সাত পণ বিচালী খড় ও বেড় পণ নোট খড় পাওয়া যাইত, মফঃস্বলে নোট খড় টাকায় চারি পণ হিসাবে বিক্রয় হইত। গত বৎসর ফান্সন

মাসে খড়ের দর হইয়াছে। কাঁথি সহরে টাকায় বিচারী তিন পণ মাড়ে তিন পণ, নোট খড় বার গণ্ডা হইতে যোল গণ্ডা, মধ্যস্থলে নোট খড় টাকায় দেড় পণ হইতে চুই পণ। এখন ঘর ছাওয়ার কাজ আরম্ভ হয় নাই, এনেকি খড়ের এই অধিমূল্য, দুই এক মাস পণ, লোকের ঘর ছাওয়া কাজ আরম্ভ হইলে খড়ের যে কি চড়া দর হইবে,—চড়া-দর দায়ে পড়িয়া দিলেও লোকে খড় পাইবে কিনা এ তর্ক মনে উদয় হইলে আশঙ্কার অবশিষ্ট থাকে না। দেশে যে খড় বর্ধমান আছে তাহাতে ঘর ছাওয়ার পর খড় উদ্ধৃত্ত হইয়া গরাদির গায়ের সঙ্কলন হওয়া দূরের কথা, সেই খড় লোকের ঘর ছাওয়ার জন্য পর্য্যস্ত হওয়াই ভার। দুই মাস পরে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইলে মাঠে গরু চরা বন্ধ হইবে। তখন গরু খাইবে কি, না পাইয়াই বা গরু চাষের কার্য্য করিবে কেমন করিয়া? চাষের

গরু ঋণ্য প্রাপ্ত হইলে বা অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিলে আগামী বর্ষে হ্রস্বল প্রাপ্তির আশা বা কেমন করিয়া করা যাইবে? বর্তমান অবস্থায় আমরা মন্দের ভাল একটী উপায় নির্দেশ করিতে পারি। উপায় একবৎসর অবলম্বিত হইলে গোরক্ষা-কার্য্য কিংবৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে বসিয়া আমাদের বিশ্বাস। উড়িয়া কোঠা কেনেল ও হিজলী টাইডেল কেনেলের উভয় পার্শ্বে যে বাঁধ আছে এবং বদোপগাঁওর কূলে যে বৃহৎ সিং-ভাইক রহিয়াছে, তাহাতে যে ঘাস জন্মায় তাহা এত দীর্ঘ নহে যে লোকে তাহা কাটিয়া আগিয়া গরুকে খাওয়াইতে পারে। গরু সে বাঁধের উপর অব্যবহিত চরিতে পাইলে অনেক গরু বাঁচিয়া যাইতে পারে। পুষ্ঠ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ এখন সে সব বাঁধে গরু চরিতে দেন না।

শ্রী-পুরুষ ভেদ

কোন কোন এককোষীয় জন্তু ও উদ্ভিদে যৌনসম্মিলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা প্রকৃত যৌন সম্মিলন নহে, তবে যৌনসম্মিলনের সামান্য সংযোগ মাত্র। দুইটা কোষ পরস্পর সংলগ্ন হইলে উভাদের প্রত্যেকটী হইতেই একটি শুণ্ডবৎ অংশ নির্গত হইয়া অপসৃত হইলে বিস্তৃত হইতে থাকে। কলতঃ উভয়েরই প্রাণাঙ্ক মিশ্রিত হইয়া যায়। সুতরাং দুইটা কোষকেসের মিলনে একটি কোষবৎ প্রকৃত হয়। এই মিলিত কোষের নাম জাইগ-স্পোড। কিংবৎকাল যাবৎ জাইগস্পোড নিষ্ক্রিয়বস্থায় অবস্থান করে; তৎপরে সামান্য কোষবিভাগ ঘটিয়া তাহা হইতে কতিপয়

সংখ্যক বীজকোষ জন্মে। ইহারািই ভবিষ্যৎ-জন্তু বা উদ্ভিদ। এই জাতীয় কোষসম্মিলনকে সামান্য সংযোগ বলা হইয়া থাকে; যেহেতু সম্মিলিত কোষযং একই প্রকারের। প্রকৃত যৌন সম্মিলন সর্বদাই উচ্চস্তরের প্রাণিজগতে বিদ্যমান। এরূপ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। যে যে জন্তুর মধ্যে এতদুপায় সন্তানোৎপত্তি হয় কেবল মাত্র তজ্জাতীয় স্ত্রীরই গর্ভদধার হইয়া থাকে। স্ত্রীর গর্ভাশয়ে শুক্রকোষ ও গর্ভকোষের সম্মিলনকে গর্ভাধান কহে। এই সম্মিলনের ফল যে পদার্থের উৎপত্তি হয় তাহার নাম জগ। কোষ-সম্মিলন ও জগোৎপত্তির

ব্যবধান কালে নানাবিধ জটিল পরিবর্তন ঘটে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অসংখ্য কোষাবিশিষ্ট যে জীবদেহ তাহা এই এক কোষীয়ক জগেরই পরিবর্তিত অবস্থা। প্রত্যেক জগেই কোষসংবিভাগ সম্বন্ধীয় বহু প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। এইরূপে উহা উত্তরাধের স্বীয় জাতীয়তা বিকাশে অগ্রসর হয়।

এই পরিবর্তনশীল জগ যে প্রভাবের বশবর্তী হইয়া পুরুষ অথবা স্ত্রীক প্রাপ্ত হয় তাহাদের প্রকৃতি নির্ণয় করাই আমাদের আলোচ্যভাব্য। এই সমজাতী প্রাণ-বিজ্ঞানে নূতন বিষয় নহে। প্রকৃতির সমীচীন মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। এ পর্য্যন্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীর দ্বারা মতগুলি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে কোনটাই একেবারে নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে না “এইটাই সর্বোত্তমভাবে সত্যমূলক অধিতীয় তথ্য।” যৌক্তিকতা ও তত্ত্ববদ্ধন তাহাদিগের আপেক্ষিক গুরুত্ব-হ্রাস্য এই তথ্যাদিকে প্রণীতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

(১) পর্য্যবেক্ষণ ও কল্পনামূলক ও (২) পর্য্য্যালোচনা ও যুক্তিমূলক।

(১) পর্য্যবেক্ষণ ও কল্পনামূলক তথ্য নির্ণয়—অধিকাংশ বিষয়েই বৈজ্ঞানিক চর্চায় বহুপূর্বে তৎপরেই দীর্ঘকালবিধির শাস্ত্র ও পরাবিদ্যার আলোচনা-যুগ লক্ষিত হয়। এতদ্বারা দীর্ঘকাল বিধির পর্য্যবেষণপূর্ণ দার্শনিক ব্যাপার নহে। এই দীর্ঘকাল Theologyর দীর্ঘকাল বিধির পর্য্যবেষণপূর্ণ দার্শনিক ব্যাপার নহে। আর এই পরাবিদ্যায় হিন্দু-ধর্ম ও বৈদান্তবাদ বা পান্চাত্য-খণ্ডের কান্ত, হেগেল, ও বার্গসোন্স প্রমুখ মনীষীর দর্শন-শাস্ত্র যুক্তি-তর্কাদিগকে নিত্যন্ত অধ্যয়নমা-

ভাসন করা হয়। ইহা যুঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীর Metaphysics, এইকালে গ্রীক পণ্ডিত এম্পিডোক্লিস জীবাবিস্মৃতিতে স্বপ্ন-বিহীন হস্ত, পশুর মতকবিশিষ্ট মহত্ত্ব ও মহত্ত্বের মতকসংযুক্ত পশুরাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রাণালী-অনুমোদিত পরীক্ষা ও তজ্জাত কল হইতে যুক্তিমূলকতার কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে এমনই এক যুগ অতীত হইয়াছে। তখন কেবল পণ্ডিতেরা স্থানীয় অল্পসংখ্যক ঘটনার তালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর ভাস্যভাস্য চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। এইরূপে বীহার বাহা ইচ্ছা তাহাই মতরূপে প্রকাশ করিয়া বসিতেন। হীরকৃত হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত ইত্যাকার মূল্যহীন মতের সংখ্যা পাঁচশতে দাঁড়ায়। ইহাদের প্রত্যেকটীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা একদম অসম্ভব; অধিকন্তু, তাহাতে কোন লাভও নাই। ঐশ্বরিক ব্যক্তিবাদী, পরা-হয়ধী, ও পর্য্যবেক্ষক,—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথমোক্তদিগের উত্তরটা অতীব সহজ। “পরমেশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী স্বজন করিয়াছেন,—ইহা বলা অপেক্ষা আর কি অধিকতর সহজ হইতে পারে? দ্বিতীয় দল জীবের “অন্ত-নিহিত বিবেক শক্তির” আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাদিগের মতে—এই শক্তিই জীবের পুরুষ ও স্ত্রীক বিধাতা। ইহার প্রকৃতি বোধাতীত। তৃতীয় পর্য্যায়ান্তর বৈজ্ঞানিকগণ সমস্তে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। ইহাদের প্রচারিত দুই প্রকার ভিত্তিকোষের কথাই এখনও কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তার পর বীহারী না কি বলেন যে ভিত্তিকোষে একাধিক সংখ্যক শুক্র-প্রাণের স্বাভাবিক ও ইহাি

বর্তমান সমস্তার কারণ, তাঁহারা সম্পূর্ণই কল্লনাবিহারী।

খ্রীর বিবেচনায় গর্তাধানকালে ভিক্ষকের বয়সক্রম লিঙ্গভেদের কারণ। ইহা অবিভীষ বা স্ত্রী প্রধান কারণ না হইলেও তিনতীর বিষয় বটে। হেনুনেও এই মতের পৃষ্ঠপোষক। তা ছাড়া তিনি বলেন শুক্র-কোষের বয়সও এ ব্যাপারে ভাগ্যনিয়ামক। হোকেকের ও সেডুলার যে হেতু নির্ণয় করেন, তাহা প্রমাণভাবে নগণ্য। তাঁহারিগের প্রচারিত মতবাদে পিতামাতার বয়স দ্বন্দ্ব। পণ্ডিতের ওয়েষ্টারমার্ক তাঁহার প্রখ্যাত “মানব বিবাহের ইতিহাস” নামক গ্রন্থে পুত্র বা কন্যা জন্মবার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি কারণের আলোচনা করিয়াও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি এই একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন যে, পিতামাতার মধ্যে যদি পিতার বয়স মাতার অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে সন্তানের মধ্যে ছেলের সংখ্যা বেশি হইবে এবং যদি মাতার বয়স পিতার অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে মেয়ের সংখ্যা বেশি হইবে।” হোকেকের স্ত্রীজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তে সমাধিক বলিয়া প্রতিষ্ঠার হইয়াছে। অবশ্য লোহার, বন্দোয়ার, লেসগিট, ব্রেসল, নইরট ও কতিপয় পশুপক্ষিপালকগণ এই সিদ্ধান্তে সহায়দ্বিত প্রমাণ করেন; কিন্তু কলিত-প্রাণবিজ্ঞানে অধিকতর প্রতীতিবিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার প্রতিদ্বন্দী। ষ্ট্রিডা কর্তৃক সংগৃহীত আয়ালুসলোরেইন প্রকারের ও বেরনার সংগৃহীত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার, জরাতালিকাশ্বশার উক্ত মতের সমীচীনতা প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

তারপর আমরা দেখিতে পাই গিক ও হাফ্‌ওয়েয়ার প্রচারিত মতদ্বয়ও আধুনিক প্রাণবিজ্ঞান হইতে নির্বাসিত। বর্তমান প্রশ্নের সমাধান মহাশয় চার্লস ডারউইনের নিরুপ্ত ও বড় বেশী স্বীকৃত। অভিযান্ত্রিক যুগের সর্বপ্রথম শ্রীপুরুষভেদে বিভিন্ন জন-কোষের উৎপত্তি, অথবা জগৎপার্শ্বন, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের জগৎপুত্রিকালে ইহার যৌনবিধানসংক্রান্ত বিষয়াবলীর আলোচনা। তিনি কিছুই নূতনই প্রতিপাদন করেন নাই। শোবাক্ত বিষয় সম্বন্ধে বয়সক্রম, গর্তকাল, ইত্যাদি তৎকাল প্রচলিত কাণ্ডেরই সাধারণভাবে পুনরাবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন।

(২) পর্যালোচনা ও মুক্তিমূলক তথ্যনির্ণয়—জীবজগতের পরাবর্তনের মূলে বাস্তবজগতের প্রভাব অতিশয় প্রবলবাহ্য। বর্তমান রহিয়াছে। অভিযান্ত্রিক-মার্গে যৌনিপ্রকরণের প্রধান সহায় বাস্তবজগৎ—ইহাই বর্তমান সময়ের ডারউইন, এবং প্রাণবিজ্ঞানী যুগান্তর-আনন্দকারী অধ্যাপক ভানিঙ্কমারের বর্ণিত। স্বত্ত্বাং রক্ত-বার্গার্ড যে জগৎপার্শ্বন খাটকেই পুত্রকল্প-জন্মের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বিন্দুমাত্র অসমীচীন নহে।

এই সর্বপ্রথম মতের ভিত্তি হৃদয় করিবার জ্ঞান বহুসংখ্যক কর্মী পরীক্ষা ও পরীক্ষিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই ভেদ, মধুমক্ষিকা, বোলতা, আফাইডপতঙ্গ, প্রাপতি, বহুসংখ্যক শুভ্রাণী ও উত্তর লইয়া কার্যারম্ভ করেন। যদৃশকালে পুত্রিকর বাস্তব প্রদান করিয়া উৎ-ভেদকল্পার সংখ্যা শতকরা ৫২ হইতে ৯২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ, ফোন প্লাট,

আইমার, রোলফ্‌ ইত্যাদি কতিপয় বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষা হইতেও একই মত সমর্থিত হয়। ফোন সিবেল্ড, বোলতার সহিত, শ্রীমতী টিটসপুত্রী কয়েক জাতীয় পতঙ্গ লইয়া, এবং রোলফ্‌ কাসেলসিয়া বা চিংড়ি শ্রেণীর জন্তু সহকারে পরীক্ষা করেন। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে এই একই মত উত্তরোত্তর পুত্রীভুক্তিরূপে থাকে।

এ সম্বন্ধে উক্তযুগের জ্ঞান লইয়া কার্য করা বড়ই দুঃসাধ্য। তথাপি বিজ্ঞানভিক্ষণ পদ্ধতিগত হইবে না। সকল প্রকার বাধ্যয় অতিক্রম করিয়া গিক দক্ষতার সহিত একটি প্রাথমিক পরীক্ষা সমাপন করেন। তিনি তিনতর মৌরীকে সযান ছই দলে বিভক্ত করিয়া প্রথমদলের জ্ঞান রাজভোগের ব্যতী, এবং দ্বিতীয় দলের জ্ঞান আতপ চাল ও কাঁচা কলার বস্তুবস্ত করিয়া দেন। তারপর প্রথম দলের মধ্যে পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত ছইটী মেথ, এবং অপরদলে ছইটী পৌত্র মেথ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ছই দল যুগাক্রমে গড়ে শতকরা ৬০ ও ৪০ সংখ্যক কন্যা প্রসব করিয়াছিল। ধারাসম্বন্ধীয় কারণের সমর্থন করণান্তর ভূমিগ আরও বলেন, যে সকল মৌরী না কি স্থলকায় তাহারাই কন্যা প্রসব করে।

মাহয় সম্বন্ধে এই সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করা যদিও যৎপরোনাস্তি কষ্টকর, তবুও যাহা হইয়াছে তাহা ধ্যান বা পুত্রীমতেই পোষক। হোমিনিডি পরিবারের জাতিসমূহে এই প্রাণী প্রযোজ্যকারীদিগের মধ্যে প্রসূ হইতেছেন সর্বপ্রথম। কলিত তথ্যের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, কোন সংক্রামক গীড়ার বাজাবাচি ও মুদ-বিগ্রহের পর কন্যা অপেক্ষা পুত্র অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে।

তা ছাড়া ভূমিগ বলেন, যে সকল জীবলোকের গর্তাধয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং যাহাদের ক্ষুদ্রাণ্য খুব কম, তাহারাই অধিক সংখ্যায় পুত্রসন্তান প্রসব করে। ক্ষুদ্র গর্তাধয় ও ক্ষুদ্রাণ্যের অন্তর কারণ পুত্রিকর বাস্তব অন্তর।

শতক্ষাফলা ও বাজার দরের তারতম্যের সহিত পুত্রকল্পার সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। সময়ে ও ভূপ্রদিশগুণে কন্যাবিকা এবং দরিদ্র-গুণে পুত্রাবিকা লক্ষিত হয়।

উত্তরবিজ্ঞানে প্রাপ্ত প্রমাণ সর্বত্র প্রামাণিক না হইলেও পুত্রীমতেই অসম্মতিক। পুত্রকল্পার জন্মবিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান তাপেরও প্রভাব পরিগণিত হয়। স্বধরক তাপব্রহ্মবৈদ্যের কল্পারই সম্ভাবনা বেশী। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, (ক) পিতামাতার ধাম, বয়সক্রম, স্বাস্থ্য ইত্যাদি; (খ) মাতার গর্ভের আভ্যন্তরিক অবস্থা; (গ) মাতৃগর্ভে জগৎপুত্রির অবস্থানাক্রম, এই প্রভাবত্রয়ের সমবেত শক্তি যৌনি-প্রকরণের কর্ণাধিকারী স্বরূপ।

জনকোষে কি কি পরিবর্তনের সহিত উল্লিখিত প্রভাবত্রয়ের কার্যকারিতা সম্বন্ধে, প্রবন্ধের শেষার্শ্বে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইবে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পশুপালের শুক্রপুত্রী পর্যালোচনা করিয়া মাক্সক্রাং উহাদের শুক্রকোষে ছই প্রকার রজন-স্রব আবিষ্কার করেন। অবশ্য এ বিষয়ে প্রথমে চেষ্টা করেন হেন্জিং। তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে থম্যোতফেলের প্রতি দৃষ্টি নিষ্পন্ন করেন। মাক্সক্রাংয়ের আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই গিভেনস ও উইলসন নানা জাতীয় পতঙ্গ বাজাবাচি ও মুদ-বিগ্রহের পর কন্যা অপেক্ষা পুত্র অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে।

প্রকার স্ত্রকোষে দেখিতে পাইলেন। বাহ্যিকভাবে ইহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। পার্থক্য ইহাদের রঙন-স্থরের সংখ্যা; অর্থাৎ কতকগুলির রঙন-স্থর অবশিষ্ট কোষের স্থাপেক্ষা এক অধিক। এই স্থরটীর আকার ও গঠনের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। ইহার নাম 'অমুদ্র রঙন-স্থর'। উক্ত একই জাতীয় স্বাগণের প্রত্যেক গর্ভকোষই অমুদ্র রঙন-স্থর-বিশিষ্ট। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে গর্ভকোষে সমচরিত্র রঙন-স্থর ও স্ত্রকোষে বিষম-চরিত্র রঙন-স্থর। এই সাম্য ও বৈষম্য জুগের লিঙ্গনির্ণায়ক।

এখন দেখা যাক কি রূপ কৌশল সহযোগে অমুদ্র রঙন-স্থর কার্যকরক। যখন একটি অমুদ্র রঙন-স্থর স্ত্রকোষ একটি গর্ভকোষের (যাহার সকলগুলিই অমুদ্র-স্থর) সহিত মিলিত হইয়া গর্ভস্ফার বা জগোণপাশন করে, তাহা হইলে এই জুগে দুইটা অমুদ্র রঙন-স্থরের সমাবেশ হইল। জুগ পুনঃ পুনঃ সংবিভাগ দ্বারা অসংখ্য কোষে বিভক্ত হয়। ইহার কতকগুলি দ্বারা দেহ-গঠন-ক্রিয়া চলিতে থাকে; এই জন্ত ইহাদের নাম দৈহিক কোষ। অপরগুলি জনন-কোষ রূপে নিদ্বিষ্ট হয়। কালে এই আদি জনন-কোষই স্ত্রকোষে কিংবা গর্ভকোষে পরিণত হয়। আমরা দেখিতেছি যে আমাদের জুগের আদি জনন-কোষে দুইটা অমুদ্র রঙন-স্থরের সমাবেশ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কতিপয় সংখ্যক সাধারণ রঙন-স্থরও সর্বমান রহিয়াছে। পুং-কোষ বা স্ত্রকোষ ও স্বীকোষ বা গর্ভকোষে ইহাদের সংখ্যা, আদি জনন-কোষ সংখ্যার অন্তর্কে। ধরা যাক এখানে জুগের সাধারণ রঙন-স্থরের

সংখ্যা ২২; কতিপয় সংখ্যক স্ত্রকোষে অমুদ্র রঙন-স্থর এক। সুতরাং কতকগুলি স্ত্রকোষে ২২টা রঙন-স্থর; অপরগুলিতে ২৩টা। গর্ভকোষের সকল গুলিতেই ২২+১=২৩টা রঙন-স্থর। তাহা হইলে, যে জুগের আদি জনন-কোষ ২টা অমুদ্র স্থরের সমাবেশ তাহার মোট রঙন-স্থর ২৪। কাজেই তৎসংপর গ্যামেটে এই সংখ্যার অন্তর্কে ২২টা রঙন-স্থর দেখিতে পাইব। তাহার অর্থ প্রত্যেক গ্যামেট সমচরিত্র রঙন-স্থরযুক্ত, যেহেতু প্রত্যেক স্থলেই এক একটা অমুদ্র রঙন-স্থর অবস্থান করিতেছে। অতএব এইরূপ সম্মিলনে কল্যাণ গ্রহণ করিল।

যখন অমুদ্র রঙন-স্থরবিহীন একটি স্ত্রকোষ একটি গর্ভকোষের সহিত মিলিত হয় তখন পুংসন্তানের জন্ম অনিবার্য। কারণ গর্ভকোষীয় রঙনস্থর ২২+স্ত্রকোষীয় রঙনস্থর ১১। অতএব আদি জনন-কোষে ২৩। সুতরাং উপর গ্যামেটের অন্তর্কে ১১ ও অবশিষ্ট ১২টা রঙন-স্থর পাওয়া যাইবে। এরূপ চরিত্রের বিশেষণ কি? বিষম। তার মানেই পুং। বিস্তৃত প্রাণালী বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক দ্বারা নানা জাতীয় জন্তুতে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইয়াছে। এখানে ইহা প্রাণ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নাই। এ সম্বন্ধে কোন বাস্তবিকতা নাই। সম্ভ্রান্তি ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অন্ততম অধ্যায়।

পারিভাষিক শব্দ

এই প্রবন্ধের যে যে শব্দ 'সঙ্করজাতি ও তাহার বন্ধ্যাতা' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে তাহাদের পুনরুৎপাদন করা হইল না।

অমুদ্র রঙন-স্থর

আদি জনন-কোষ
এককোষীয় জন্তু
গ্যামেট
আইগমোপ্ল
বীজকোষ
জগোণপাশন

'X' chromosome, sex chromosome or accessory chromosome.
Primordial germ cell.
Unicellular animal,
Gamete—স্ত্রকোষ ও গর্ভকোষ উভয়।
Zygospore.
Oospore.
Ontogeny.

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র,
উইলসন বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা।

সেবাশ্রমের আবশ্যকতা *

স্বামী বিবেকানন্দের "দরিদ্র-সেবা, নারায়ণ-সেবা" এই বাণী দেশের মধ্যে কি না মহা উৎসাহ সাধন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে দেশের মধ্যে আত্মপ্রাণ, কৃতিপ্রাণ, প্রভৃতির অসংখ্য হইয়াছে—ধনী নির্ধনীর জন্ত, উচ্চ নিচের জন্ত, স্বপ্ন আত্মের জন্ত আশ্রয়লাভিত শিখিতেছেন—আজকালি কেহ নিজের লইয়া থাকিতেই আনন্দ বোধ করেন না—নিঃস্বের যাহা কিছু আছে, পরের জন্ত বিলাইয়া দিতে পারিলে যেন আত্মপ্রাণ লাভ করেন—এখন কেহ ভোগে সন্তুষ্ট না, ত্যাগেই আনন্দ। দেশের মধ্যে এক প্রেমের আবাস। অস্তঃকাল আকর্ষণের ভাব বেশ দেখা যাইতেছে—ইহাই দেশের পক্ষে মহা লাভ। এখন যে গরীব অসংখ্য আত্মর সকলেই আমার আপন, আমারই কেহ বলিয়া ধরাত। হইতেছে ইহাই দেশের পক্ষে বড় লাভ। এতদিন দেশের লোক দেশের জন্ত হৃদয় দিয়া প্রাণ দিয়া অসংখ্যদিকে ডাকে

নাই, তাহাদের ভ্রমে ছদ্মবিত হইয়া নাই, অভাব অভাব অহুভব করে নাই, হুপে হুপে হয় নাই, আনন্দে আনন্দিত হয় নাই—তাহারা যেন পরিত্যক্ত, অস্পৃক্ত এইরূপ ধারণাই ছিল—লোকের হৃদয়ও শূন্য ছিল, যেন কিছুই মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না—সবই উপরের চাক্ষুণ্য দ্বা বা উপরের কার্য-কলাপেই সন্তুষ্ট হইতেন—যে দিন হইতে দেশের এই ভাব দূর হইয়াছে, সেই দিন হইতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে—দেশের লোক বেশে ভল্লরূপে চিনিতেছেন—দেশের কাজ আজকাল বিশ্রাম-স্থত নয়, দেশের কাজ আজকাল করতালির আকাঙ্ক্ষা করে না, দেশের কাজ আজকাল সভা-সমিতিতে পর্যাবসিত নয়। দেশের কাজে আজকাল একনিষ্ঠ, একপ্রাণ হৃদয়বান লোকের আবশ্যকতা বেশ অহুভব হইতেছে। এখন দেশের অভাব নানা প্রকারে সকলের সমুখে প্রতিষ্ঠিত আকার ধারণ করিয়াছে। অভাবের তুলনায় প্রকৃত কর্মী ও দানবীরের

* দরিদ্র-নারায়ণের সূত্র-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি (১২ই মার্চ) উপলক্ষে লিখিত।

অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। যদিও দু' দশ জন ক্ষয়বান একপ্রাণ একনিষ্ঠ লোকের অভাব-মোচন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা এত বিক্ষিপ্ত যে একপ্রাণে কার্য্য করিবার সুযোগ পাইতেছেন না—স্বতন্ত্রা দেশের অভাব অভাবেই থাকিয়া যাইতেছে। এই কলিকাতা সহরে যদিও কতক জেলা-সমিতি আছে, যদিও ছাত্রাবাসের মধ্যে এক-প্রাণতা আছে, যদিও সাধারণের নিজের গ্রামের নিজের জেলার নিজের আপন জনের বিপদ-আপদে, দুঃখে কষ্টে সাহায্য করিতে সক্ষম আছে, তথাপি অনেকে স্বাবদ-অভাবে নিজের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম পাইতেছেন না—এই কলিকাতায় নিঃসহায় অবস্থায় অপরের পরিতাপ হইয়া যে কত প্রাণী অকালে অন্তশ্রবায়, অসুস্থিসাধ্য, অসুখে জীবলীলা সম্বরণ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

আমাদের শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে। ইচ্ছা আছে, কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি আছে, নাই কেবল শৃঙ্খলের সহিত কেন্দ্র-শক্তি-গঠনের ক্ষমতা। যদিও এই সকলের অভাব দূর হয় তথাপি নিম্নলিখিত জন্মে পোষ্য কার্য্য দূরভবিষ্যতের জন্ত প্রতীক্ষা করিবার উৎসাহ বা ঐর্ধ্য আমাদের নাই। ইহাই আমাদের বর্ধমানের অভাব। এই ভিত্তি-হীন অভাবের যত শীঘ্র মোচন হইবে, আমাদের কার্য্য তত শীঘ্র ফলপ্রসূ হইবে, ইহা আমাদেরই জ্বলিলে চলিবে না। এই নিরাশ্রমের সর্বদা মনে রাখিয়া আমাদেরই আগ্রহ হইতে হইবে, যত এই সেবাশ্রমে অনেক বাধা-বিঘ্ন পড়িবে—হয়তঃ এই সেবাশ্রমে পীড়িতের শুশ্রূষা, আত্মের দুঃখ-মোচন অনেকের অনেক সময়, অর্থ ও শক্তি

ব্যয় হইবে, তজ্জন্ম হয়ত অনেকের কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হইবেন, অনেকের হয়ত তজ্জন্ম ইহার সাম্রাজ্য ভাগ্য করিতে হইবে, অনেকের হয়ত ইহার সম্বন্ধে নানা ভাবে নানা কথা বলিতে হইবে, তজ্জন্ম দুঃখিত বা হতাশ হইলে চলিবে না। এই সকল নৈরাশ্র, ও নানালোকের ধ্যান সহ্য করিয়াই মহৎ কার্য্য জগতের সমক্ষে ও আপনার অন্তরে প্রকাশ করিয়াছে, জগতের ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দিতেছে। সাধারণের উপকার, আত্মের সেবা, পরহিত প্রাণদানই হিন্দুর ধর্ম—হিন্দুর প্রধান বাণী—“পরার্থে প্রাণান্ উৎসংজেং।” আত্রকাল দেশের এইরূপ যে কত অভাব আছে তাহা সামান্য চিন্তায়ই সহজে অহুমের। একজন দেশের কাল কখনই সত্ত্ব নয়—দেশে দশজনের কাল করিলেই কার্য্যের সফলতা আশা করা যায়। বিশেষতঃ সেবা-শুশ্রূষায়, রোগীর সেবায়, দশ জনের সাহায্য একান্ত বাহনীয়। কারণ একজন সফল কাল করিতে গেলে তিনি হয়ত নিজের পীড়িত হইতে পারেন এবং এইরূপ ইহাই থাকেন—তাঁহারও জীবন সন্তাপন হইয়া পড়ে—ইত্যাদি কারণে যদি দশজনে সামান্য করিয়া সময় করিয়া মনের আনন্দে জন্মের উৎসাহে পরহিতে নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারেন, তবে দিন দিন তাঁহার নিজের জন্মে যে অশীশ-বল সঞ্চার হইবে, মনে যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন, তাহার তুলনায় তাঁহার সময় যে অনর্থক ব্যয়িত হয় নাই, এইরূপই ধারণা হইবে। আমাদের এই বিবাস, ধর্ম ও কর্ম পরম্পর পরস্পরের অধীন—ধর্মের ভাবই কর্মের পরিবালক—আমার কর্ম-ধর্মের ধারা পরিচালিত মানবের জীবনকাল একটা বৃহৎ

কর্ম-ক্ষেত্র—এই কর্ম-ক্ষেত্রে যত বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য সম্পন্ন হইবে মানবের মহত্ব ততই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক দিগা প্রকাশ পাইবে। ধর্মভাব বাল্যকাল হইতেই শিক্ষার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে না শিখা করিলে ইহার পরিচালনা হয় না, কতকগুলি নীতি শিক্ষা হয় মাত্র—এই নীতি শিক্ষা ও কার্য্য পরিচালনায় অনেক প্রভেদ—এই কার্য্য পরিচালনাই মানবের ধর্ম-ভাব-গঠনের সহিত মানব-চরিত্র গঠন করিয়া থাকে। সেই জন্ম আমাদের প্রত্যেক দিনের শাশ্বত-আত্মিক প্রকৃতি ধর্ম-কর্মের একটা স্থির সময় নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক দিনকে আজকাল সাধারণের কার্য্যে কোন না কোন প্রকারে নিয়োজিত করা ই আমাদের দেশ-ধর্ম। দেশের অভাব ঘাঁহারা দেখিতেছেন তাঁহাদের নিকট কার্য্যে বা সময়ের অভাব হইবে না—যদি অভাব কিছু থাকে তবে তাহা প্রযুক্তির। পরের সেবা অপেক্ষা ধর্ম নাই। আত্মের যত্নে, রোগীর শুশ্রূষায় মনকে উন্নত করিবে ভিন্ন অবনত করিবে না। ইহাতে সকলের সময়ও অনর্থক বয়স হইবে না এবং ইহার সার্বকাল্য প্রত্যেক দৈনন্দিন উপলব্ধি করিবেন। বর্ধমানে কলিকাতা সকল কার্য্যের পরিচালক—এই কলিকাতায় লোকেরও অভাব নাই—আশা করি, সাধারণের প্রবৃত্তিরও অভাব হইবে না। যাহাতে কলিকাতায় এইরূপ একটা সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়, আমরা তদ্বিষয়ে সাধারণের পৃষ্ঠ আকর্ষণ করিতেছি—ইহাতে বালক যুবা যুগ সকলেরই যোগ দান করিতে বাধ্য নাই। ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের সমল মাতৃবলই লোকেরই সমান অধিকার। ইহাতে ধর্ম-হিংসা মনোমালিঙ্গের কোনও কারণ নাই—ইহাতে আর্থিক বা সামনের কোনজন

তারতম্য নাই—ইহাতে আপন পর প্রভেদ নাই—ইহাতে রাজা প্রজা ভেদ নাই—অথচ ইহাতে কি রাজা কি প্রজা কি উচ্চ কি নীচ কি ধনী কি দীন সকলেরই আবশ্যকতা আছে। দেশের এই অভাব-দেশের অনেককেই বোধ্য করিতেছেন; বিশেষতঃ বর্ধমান বর্ষে কলিকাতায় এখন হইতেই কলেজ, বসন্ত প্রভৃতির বৈষ্ণব প্রকোপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এরূপ একটা সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা যে একান্ত বাহনীয় তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতবৈধ নাই।

বিনা চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায়, এমন কি আত্মীয় স্বজনকে পর্য্যাপ্ত বিনা স্বাবদ মানে যাহাতে কষ্ট অকালে কাল-কবলে পতিত না হয় বা জীবলীলার সাধের সহিত যাহাতে মৃতের ধর্ম্য মৃত্যুচীরে পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে আমরা সাধারণের সহায়ত্ব প্রার্থনা করিতেছি। আমরা এরূপও দেখিয়াছি যে লোকভাণ্ডে বা অল্প কোন কারণে কোন মৃত্যুবলি ২০ দিন সংকরাতাবে বাড়িতে পড়িয়াছে—তাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যের হানিত হইতেই পারে অধিকন্তু গৃহবাসীর জন্মে দেশের লোকের প্রতি যে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেয় তাহা কিছুতেই লুপ্ত হইবার নহে। যে অসহায়ের সহায়, যে গরিবের দুঃখে দুঃখিত, সে-ই প্রকৃত বন্ধু। হিন্দুশাস্ত্র লেখকগণ বলিয়াছেন, উৎসবে বাসনে চৈব চুক্তিক রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজস্বের আদানে চ যতিষ্ঠিত স বাসবঃ। আরও বলিয়াছেন যে হিন্দুর মৃতের সংকরাতাবে বাধ্য। যদি কাহাকেও প্রকৃত বন্ধু করিতে বাসনা থাকে, দেশের প্রকৃত করিবার কাহারও জন্মে আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি পরের জন্ম কাহারও প্রাণে যাতনা

অহুভব হয়, যদি পরকে আপন করিতে অভিনায়ী হও, তবে পরের কষ্টে কষ্ট অহুভব করিয়া, পরের দুখে দুখিত হইয়া তাহার প্রতিকারে জীবন-প্রাণ উৎসর্গ কর—দেখিবে দ্রুবে অশীম সফল, মনে অশীম বল আপনা হইতেই আসিবে। যে হিন্দুদের তুমি গৌরব কর, সে হিন্দু মুতসংকার যদি মেঘের মুদ্রাকরাস দ্বারা সাধিত হয়, তবে তোমার সে গৌরবের স্থান কোথায়?

তোমার জাতির মুতসংকার যদি পরের করিতে হয়, তবে তোমার জাতীয়তাতেও দিক।

আমাদের এই কাতর প্রার্থনায় যদি নগরে নগরে, সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে এইরূপ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে। দেশবাসীর ভবিষ্যৎ কাৰ্য্যাবলী ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়।

আবাসের পত্র

প্রায় বড় বড় লেখকের একটা নিয়ম আছে তাঁহার নিত্য আগ্রহের সহিত প্রবাসের পত্র লিখিয়া থাকেন। “প্রাক্তনলভে ফে লোভাচুখারিব বামন” আমার মনে কেন অকস্মাৎ সেই আকাজ্জ হইল তাহার কোন কুল-কিনারা করিতে পারিতেছি না, গোপসে যে কেন সমুদ্রের ঢেউ বেগিতে চাহে, বসন্তঃ তাহার কোন জ্বান নাই। প্রবাসের পত্র লিখিতে হইলে যে অন্ততঃ তিনটা জিনিসের দরকার। প্রথম বিশিষ্ট গ্রন্থকার হওয়া চাই, দ্বিতীয় প্রবাসে থাকা চাই, আর শেষে সঙ্গ বা অন্তরে একজন শিক্ষিতা অন্তর গৃহলক্ষ্মী চাই। আমার প্রথম ঘরে নেহাৎ হংসিদ্ধ না হইলেও যোক্তার ভিমের মত একটা কিছু আছে। দ্বিতীয় ঘরেও একবারেই শূন্য—খালি শূন্য বলে কি শূন্য, পূর্ণ হওয়ার আদৌ কোন লক্ষণই যে নাই, আমার আত্মহুঁড়ে দরঘটা “বন্দাবনঃ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।” আর তৃতীয় ঘরে একজন আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রতি মাতা বাণীপানির এমন স্বনন্দ

যে হৃদয় এলোপথিক ডোজের হইলে, গার্হস্থ্যজ্ঞানের অবগানে, রামায়ণ-মহাভারতের হৃৎক টোক কোন মতে গিলিতে পারেন। আমার অবস্থা ত এরকম, তবুও গোঁয়ার-গোবিন্দ মনটা কোন মতেই বুকে না, সে আমার অভাব-অভিযোগ কিছুই শোনে না, খালি প্রশংসা—পাত্র বিধিতে হইবে। এমন করি কি? বিস্তারী মন যে প্রণালভা গৃহিণী হইতেও ভয়ঙ্কর, তাহার শাসন না মানিয়া ত এক পলও তিষ্ঠিবার উপায় নাই। চিত্তার মাগরে হাবডুবু খাইতেছি, হঠাৎ কে কাণে কাণে বলে গেল “তোমার অনেক বন্ধু প্রবাসে আছেন, তাঁদের কার নিকট পত্র লিখ। তুমি ত আর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে বস নাই, তোমার ঘরের কথা তুমি বলিবে, আর তোমার বন্ধু শুনিবেন, আর কারো ত্রোয়াকা রাগিও না। তত্ত্বপরি তোমার জিনিসটা নুতন হইল—সকলে প্রবাসের পত্র লিখে, তুমি না হয় আবাসের পত্রই লিখিলে। এখন দেখনি চালাও, হরি বলে পাড়ী লাগাও।”

প্রবাসী বন্ধুবর্ষেয়,

তোমার নিকট পত্র লিখিবার ঠিক করিতেই আশ্রমকে একটা ছোট খাট যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। লিখিতে বসিয়া বেধি আরও সঙ্কট। প্রথম, তোমাকে কি বলিয়া সযোজন করিব? তুমি ত পাড়গায়ের কোন খবর লওয়া উচিত মনে কর না, গতিকে তোমার নামটা যে এখন কি হয়েছে তাহা আমার জানিবার কোন কারণ নাই। তবে গায়ের লোকের মাঝে কেহ কেহ, দ্বন্দ্বায় দস্তের কেহ আছে কি না জানিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কর, আর কেহ তাহার বশের বাতি এক নাতি আছে জানিয়াই দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। আমরা সেন ভাষার নাম জানি বলিয়াই তাঁহাকে ‘ছি, ছি সেয়ান’ বলিয়া লিখিয়া থাকি। তোমাকে প্রবাসী বন্ধুর লিখিলাম, আর গতন্তর নাই। দ্বিতীয়, তোমার মা’র কাছে পত্র লিখিতেও My Dear Mother হইতে হুক ক’হে—প্রণামটী পর্য্যন্ত ইংরাজিতে কর। আমার বিদ্যাবুদ্ধির ববর ত রাখ, তাহাও আমার সাধ্যাতীত, তবে তোমরা যখন মা’র ‘মা’ ‘মা’ বলে কাদ, আর স্বপ্নটাও বাঙ্গালাতে দেখে থাক বলিয়া জানি, সেই সাংসেই স্বপ্নরাজ্যের কথাগুলো বাঙ্গালাতেই লিখিতেছি। হুকতেই ছুটে বোয়াদবী করিয়া বলিলাম, মাগ করিও।

ভাই, তুমি আজ ইঙ্গপুত্রীতে, আর আমি আছি তোমাদের মতে অন্ততঃ যমপুরী না হইলেও তার কাছাকাছি একটা কিছুতে। হংসাবল সৌখিন্যে তালার উপর তাল চড়াইয়া তোমাদিগকে পুষ্টে করিয়া প্রায় বর্ণের ঘারে উপস্থিত। দেবতারা তোমাদের ভয়ে ভীত। বর্ণপদেব নলের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া করযোড়ে তোমাদের গৃহকোণে অবস্থিত, অগ্নিদেব গৃহিণীর অঙ্গে আবদ্ধ, সৌন্দর্যমীনার প্রেমের রসে পড়িয়া পবনদেব কারাকঙ্ক। কলে কান্টা টানলে বরুণ বেচারী আঁখির জলে তোমাদের বুক ঠাণ্ডা করে দিতেছে, মস্ত্রোবধিকঙ্কবীরা তুঙ্গেশ্বর মত পবনদেব কোঁস কোঁস করিতেছে; আর অগ্নিদেবের ত কথাই নাই—একটু চোট পড়িতে না পড়িতেই তোমাদের গৃহিণীদের মত চটে একেবারে লাল। কান টানলে যে এত কাছ হয় ভাই আগে আর ঠাণ্ডর পাই নাই।

এখন তোমার ঠাঙ্গুরদানার কথা একবার চিন্তা কর দেখি। একটু জলের জন্ত তাঁহাকে কত বড়সহই না গড়িতে হয়েছে। প্রথমতঃ ধরণদেবীর উপাসনা ক’রে তাঁর নিকট কিছু মাংস ভিক্ষা ক’রে নিতেন, তারপর বিখকম্ভা-হুককায়ের দ্বারা কলসী অস্ত্র গড়াইয়া অগ্নিদেবের দ্বারা পোড়াইয়া শেষে দুর্গভান্দিনী গৃহিণীর ঐশ্বর্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ইতি উযোগ্যপূর্ণ। তার পর ঠান্দি সেই অস্ত্রকে বরণদেবী মূর্তি দ্বারা করিয়া কোন বাজাইতে বাজাইতে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ছুটিলেন। একেবারে বর্ণপরাজার পুরী ঘরে আসিয়া সপর্ণে উপস্থিত হইলেন। বর্ণপদেবের ত তাঁহাকে দেখিয়াই চম্ভস্থির, ভয়ে জড়মর, পা ধর ধর কাঁপিয়া উঠিল। চাওকা ছাড়ে কৈ? হৃৎক চড় মেয়ে তাঁহাকে সেই অমোঘ অস্ত্রের দ্বারা একেবারে চাপিয়া ধরিলেন। বর্ণপদেব করুণকণ্ঠে হৃৎক ডাক ছাড়িয়া শেষে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইতি বর্ণপ-বন্ধন পূর্ণ। ঠান্দি বর্ণপদেবকে লইয়া বিজয়গর্গে ছুটিলেন, তিনি হৃৎক ফোটা অশত্যাগ করিয়া প্রথম প্রথম

বিজয়িনীর চরণসিক্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু বধন কাঁকরেনে রুণু রুণু বাধা শুনিতে পাইলেন, ঘোঁটা ঢাকা নন্দনবনে বাসের পারিজাত ফুটিতে দেখিলেন, তখন সেই বধন অবস্থাতেও অনুনমে আঁটখানা হইয়া ধীরে ধীরে হাততালি দিয়া বলিতে লাগিলেন—
“ওগো! বেঁধে ফেল বেঁধে ফেল, অজ্ঞে পরে কা কথা, স্বয়ং ইজ্রাই বা কোন্ এমন বন্ধন না চানো!” বিজয়িনী তাঁহাকে রক্ত কব্জি নিয়া বশী করিলেন, বরণদেব কি জানি কি মনে করিয়া করুণনয়নে ঠানুদীর মুখানার দিকে একবার চাহিলেন। অভাগা বৃদ্ধি না যে বিজিতকে দেখে দেখে নন্দন সার্থক করিবার জন্ত কেহ তাহাকে আবদ্ধ করে না। তাহাকে আশ্রয়-পরিদ্রন লইয়াবাটীয়া পাইতে না পারিলে প্রায় কাহারও তুলি হয় না। বরণদেবের কতক সাধা শোণিত তিনি তোমার ঠাঙ্করদ্বাংকে দিলেন, তাহার তুম্বার শাস্তি হইল। ইতি বরণবটন পক্ষী। বেধিলে ত কি কাওটাই না হয়ে গেল। ইহাকে কি বুঝাছ-বধ বলিবে? না শুভ-শুভকথ-বলিবে? তার পর অমিরেও ও পরনদেবকে লইয়া যে তাহারিগকে কত বিব্রত হইতে হয়েছিল তা ত জান। ও সব শিখিতে গেলে যে আশ্রয়-পক্ষীর অনেক অধিক হইবে, আর অনর্থক পুঁথি বাড়াইয়া লাভ কি? এত লড়াইজি করে কি ভাই আর বেশে থাক। বায়। বিশেষত: এত বজাতি করিতে, এমনভাবে শাস্তিভঙ্গ করিতে তোমাদের মত শিক্ষিত লোকে যাবে কেন? তার পর খরকম্মার দিকটা দেখ দেখি। গিন্নী তোমার কত উপদ্রাস পড়িতেছেন, কত রসের কথা শিখিতেছেন, হাতে কয়লা বা বসনে ময়লা লাগিবার সাধ্য নাহি। আয়া

ছেলেকে দুধ দিতেছে, রাঁধুনী বামন আর পাকাইতেছে, গোয়লা দুধ খোঁপাইতেছে, ডাক্তার পানি ঢালিতেছে; কি তোমাদের ঝাঁট দিতেছে। গৃহিণী হিষ্ট্রিয়ার রাবীটা বুল ক'রে দিয়ে একটু ফরফর পাইলেন ত খিলে বসে জিতলের বীম চৌকাটের জন্ত কইটা ধান পাছের দরকার, তার আঁক ক'রে ক'রে একদম হয়রাণ, হইতেছেন। আর তোমার ঠানুদীর যে হাতে ভাল্লা সেই হাতে মাল, যেই হাতে কোদালী সেই হাতে পরিবের জন্ত তিক্যার ভালি ও গো-বাছুরের খোল-কিচালী, যেই হাতে স্ফার্মজী সেই হাতে থানাখানি। আর একটু স্থিধা পাইলেন ত কথক ঠাঙ্করের মুখে মহাভারত শুনিতে লাগিলেন, আর নয় ধান গাছগুলি মাড়াবে একবারে ঘাস ক'রে দিলেন, কি সর্বনাশীই না ছিল রে!

“যোগা পায়ে মিলে যোগা”—তেমন তোমার ঠাঙ্করদ্বাং ও কি সর্বনাশীই ছিলেন! পথ ত। পাড়াগায়ে থেকে না হয় দেশ-বিদেশ ঘুরে দু পয়সা রোজগার করিতে, আর কতজনকেই তাহা ভাগ ক'রে দিলেন। গুরু-পুরোহিত, জ্ঞান-পণ্ডিত, কুলী-মজুর, কামার-কুমার, অতিথি-ভিখারী, গরীবের ছেলে, ইষ্ট-মিত্র-ইষ্ট, পাড়া-প্রতিবেশী কত জনের নাম করিব? শুধু কি মাহুয়? পশু-পক্ষীও বাদ যায় নাই। গুরু-বাছুর, মোষ-ছাগল, শুক-শালিক কত নাম করিব? যত অসত্য বর্বরের সহিত তাঁর মিলা ছিল। মনে আছে ত? কালুশেখরকে দেখিবা মাতাই জিজ্ঞাসা করিতেন “নাতি কেমন আছিস?” বুড়া নাগিতকে জিজ্ঞাসা করিতেন “দাদা তোর ছেলেটার জর সেরেছে ত?” রামধন ধুপীকে দেখিলেন আর জেনে

নিলেন তার কলমীর ছেলে-মেয়ে কয়টা। বুড়া পূজা-পার্বণে বাড়ী আগিলেন ত দলে দলে লোক জুটিতে লাগিল। কেহ বলে আমার হালের বল নাই (তখন তোমার জন্মনি) দশটা টাকা দিন, কেহ বলে আমারই ছ'মুখ ধান দিন, কেহ বলে আমার মামলাটা মিটায়ে দিন। খালি দিন, খালি দিন, রাতটা যেন ঠাঙ্করদাদার কাছে বিদায় লয়ে একবারে প্রবাসেই আছেন। শেষ কালটায় একটু শান্তিতে মরিতেও দিল না। মরিবার একমাস পূর্ব হইতে বাড়ীতে একটা হাট-ব'সে গেল। কত জন এসে শিঘরে ব'সে চোখের পাণি ঢালিতেছেন, কত জন ফোঁস ফোঁস করিতেছেন। কেহ হাত টিপিতেছে, কেহ পা টিপিতেছে, কেহ কবিরাস ডাকিতেছে, কেহ ঔষধ পিথিতেছে। বুড়া বহুসে আর কত লোক হিল। সকলে ধরাধরি করে তাঁর মহাপ্রভাবের পথটা পরিষ্কার করে দিয়েই ছাড়িল। কিছুকাল ব্যাপার! মরবার পর দেশভক্ত লোক পাছে পাছে শ্মশান-ঘাটে চলিল। যেন বিধের বয়সাজী আর কি?

তোমার শেখ শাস্তিতে আছে। যোড়শো-পাচারে আশুপূজা করিয়া গণ্ড তুলি করিতেছ। তোমাদের দরজায় পদা আঁটা। ঐ সব খুলি-কাটা-মাথা শুউলঙ্গ মুঠি তোমাদের গিঁড়ার ধাপ মাড়াবে সাধ্য কি? কোন দ্রব্যগো কেহ আদিনিয় গেলও তোমার প্রবাসী বলে এক কথা তার মুখ বন্ধ করে দিতে পার। নেহাত না যায় ত দোবে বা পাঁড়েজীর ঘারা এক একটা অর্ধচন্দ্র দিয়ে উজিত মত বিদায় দিলে। কোন ইষ্টিকরা কাপড়-পরা পরিচিত অপরিচিত বন্ধু আসে ত সতীক তোমাকে কাছাকাছ মত অভিবাদন ক'রে চেঁচাবে বসে পড়িল। কেহ ব্যুর-মুন্সের, কেহ জাপান-মুন্সের কথা বলে হুপিত শুভ ক'রে দিল, কেহ বল-নাচের বাহবা দিয়ে তাহাকে আবার মরস ক'রে নিল। দেশী নজ্জার গুলোর কোন কথা বিল-তুল কাহেই গেল না। ঈশ্বর না করুন তোমাদের কেউ মরিতে যেন না ত একেবারে কপটি বাঁধাই মরিলেন, কেহ আনাগোনা ক'রে বিরক্ত করিতে পারিল না। প্রান্তে মৃদুকরাস এসে নিয়ে গেল, সব ফর্সা হ'ল। গৃহিণী রাতারাতি কুটুম-বাজীর দিকে রওনা হইলেন। শ্রাদ্ধ শেষ। তোমার ভাই মাচার কুম্ভা, চুপ হরকীর মাহুয়। আর তাঁরা ছিলেন একবারে পাকের তৈরী, যে খেতে, তার গায়েই জড়িয়ে গেছেন। এতদিনে বৃদ্ধিলাম তোমাদের মত বুদ্ধিমানেরা কেন পৈতৃক বাড়ী ভিটা ভাগ করিয়া প্রবাসে থাকে। তোমাদের মত উচ্চশিক্ষিত ও পর-হিতব্রত না হইলে কি এমন ভাগ্য হয়! থাক সে কথা। এখন বাড়ীর খবর শুনা।

তোমার বাড়ীতে এখন আর সেই কোলাহল নাই, সেই যুঝা শাস্তি নাই। রক্তবনশা সন্ধ্যার বন্দনা করিতে এখন আর দেব-মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার কর্ণ ধনি প্রতিবেশীর শ্রবণ-জালা উৎপাদন কর্ণ ধনি, পূজা-পার্বণের নিমন্ত্রণে দরিদ্্রের উদরাময় জরিবার আশঙ্কা নাই। তোমার পৈতৃক ভজ্ঞান কেউতে গোহুস্তরে শঙ্খচুড় প্রভৃতি বন্ধন-বন্দনগণের নাগজ হইয়াছে। জোনাকি সাধ্যা ঘুপ জালাইয়েছে। তোমার অপরূপ নিয়োগে চটীমণ্ডপে ভক্ত শিবা ছাগলিশুর তপ্ত শোণিত শিবানীর ধর্ণের অর্পণ করিতেছে। তোমার ঠাঙ্করদাদার জ্ঞানালীকে

মাছব ও পুস্ত্র নির্মম পদাঘাত হইতে রক্ষা করিয়া জলের মধ্যে আরাম করিতে বিদায়। এবং তোমার ঠান্ডিলি মহামায়ার পুষ্করীটিকে একথানা পানার কল পুষ্কর দিয়া জবা-জরের দাক্ষণ শীত হইতে রক্ষা করিয়াছ। দয়াময়ের উপযুক্ত পৌর বলিয়া তোমাকে চু'হাত তুলিয়া সকলেই আশীর্বাদ করিতেছে। ঐ যে পুষ্করে কোণে অসভ্য আমলের যে সব আমগাছ ছিল, ঐ সব এখনো আছে। গ্রীষ্মে, বসন্তে তোমার জন্ত অনেক ফল সংগ্রহ করিয়া অনেক দিন লুকাইয়া লুকাইয়া বুকের মধ্যে রাখিয়া দেয়, শেষে হতাশ হইয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করে। কাক ও শূন্য তাহা আনন্দের সহিত খায়, আর "বাবু কি দয়ালু, বাবু'র কি উচ্চ নজর! এমন নিষ্ঠুর গুলি আমাদের দিবে তিনি টাকায় একটা করিয়া 'আম কিনে খান' বলিয়া তোমাকে দয়াদায় প্রদান করে। ঘাটের দরজার বৃক্ষ তালগাছটা মাথায় জটা পাকাইয়া তিন পুষ্কর দরিয়া ডায়েরী লিখিয়া আসিতেছেন, এবং ভবিষ্যতের জন্ত উপলব্ধি হইয়া আছে। ঐ ডায়েরীর এক কোণে কতি তালগাছের শ'স হইতে বরফ ও লেমনেড উৎকৃষ্ট বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

আজ এ পর্য্যন্ত। দেখ ভাই! আমার পক্ষে বিলাত, আমেরিকা বা ফ্রান্সের কোন খবরই তুমি আশা করিও না—ঐ সব কথা তোমরা নিয়তই শুনিয়া থাক। আমি আমার কুণ্ডলখবর বলিয়া কুণ্ডলখবর কয়েকটা কথাই তোমার নিকট লিখিলাম। তুমি খোশ-মেজাজে বাহাল ভবিষ্যতে তাহা পাঠ করিও।

তুমি বন্ধু, তোমাকে আমার দুঃখদেহ বলিতে লজ্জা নাই। এখন কথা আমার ত ভাই "দিন মজুরী নিত্য করি পঞ্চভূতে যাব-

গো বেটো," তোমার নিকট যে পয়সা খরচ করিয়া পর লিখিব তাহা ত আমার পোষাইয়া উঠিবে না। কাজেই আমাকে কোন সাধারণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমি-দেব বাবাল্লা সংবার-পত্র দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পর্য্যন্ত পড়িছাচ্ছে, বাকী কেবল মণিগাঁওরবিশ্ব, বোধ হয় কথাটা অবৈয়াকরণিক হইল। হটক ক্ষতি কি, আমরা পাড়াগেয়ে। জানত ভাই আমার "দিন ভিক্ষা তহসারিকা" কাজেই দৈনিকের খোরাক যোগান আমার সাধ্য নাই। সাপ্তাহিক, পুষ্ঠে হরিহর-ছত্রে-মেলা, বক্ষে উপহারের ভাল, মাঝে মাঝে কবিগুণ্ডালার পালা লইয়াই পাঠেরের চক্ষু-কর্ণ-আলা-পালা করিতেছে। তোমরা ত মৌখিন লোক, তোমাদের মেলা বেড়াইতে, ভাল বিচারিতে পালা শুনিতে সপ্তাহ কাটিয়া যায়। তবায় যে আমার এই ক্ষুদ্র পত্র তোমার নেত্র-গোচর হইবে বড় একটা আশা করিতে পারি না। "সম্রাট কালো বহবৎ বিয়া"। তাতে আবার পাট্টার মিথাদও ফুরাইয়া আসিতেছে, এই অবস্থায় ত্রৈমাসিকের বারহ গুণ্ডা কোন মতে বুদ্ধিমানের কার্য নহে। আর মাসিক মার্জই বাকী। তা'বলে, বুঝে না যে আর সব কীকি। এখন মাসিক সম্বন্ধেও নানা জমে নানা কথা বলিতে ব্রহ্ম করছে— "ভিন্নকটিহি লোক"। দে দিন সম্ভার বৈঠকে এক বন্ধু বলিলেন "আজ কালকার সম্প্রদায়ের এক বিচিত্র কীদ পেতেছেন; এ যে তসুবীরওয়াল হ'য়ে উঠিল দেখছি। তাঁদের কোলায় ত হরেক রকমের চাঁজ আছে দেখা যায়। দেখে 'শাপিনী তাপিনী' তাগে বিবরে লুকা' আর এটাকে দেখে 'মেদিনী কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া'।

কত নীরব ভারতচন্দ্রই জন্ম গ্রহণ করেছেন দেখ ভ। যেদিনী কাঁপুক আর নাই কাঁপুক অনেক রসজ পাঠকের দৃষ্টিপথে একটা কুসিকর্ণ না উঠে এমন নহে। আমার আর এক বন্ধু রাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বেশ করেছে। সম্প্রদায় ভায়া কতদিন মন-প্রাণের খোরাক যোগায়ে হয়রাণ হ'য়ে পড়েন, আর না হয় দিন কতক খালি চোখের খোরাক যোগায়ে তেঁ—কত কি?" আর এক বন্ধু কোণ হ'তে বলিয়া উঠিলেন "তোমরা ত ভারি বেয়াড়া দেখি, বাহির নিয়ে এত টানা-টানা আরস্ত করিল কেন? তেঁদের দেখে, গুটিক তসুবীরওয়াল নহে। প্রায় মাসিক এক একটা ছোট খাট মোগার বাড়ী বলিতে পার। তাহাতে কোটা, সাট, মোজা, কাঁধা, লেপের খোল, বালিশের গুণ্ডা, ঝিড়কীর পর্দা, মণারির আলর, ছেঁড়া গেঞ্জি, বাগি পরিচিত হইতেছেন, কিন্তু গুলে দেখিলে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি ও ছুটা তোয়ালেই বেশীর ভাগ, কচিং শাল আলোয়ান-চোরে পড়ে। মনে করো না আমি তার নিন্দে করি। সাক হ'য়ে এলে পর ভরসামজের উপযোগী হ'ল কি না বেশ পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়, স্রবিখাটা মন্দ নহে ছুটি পয়সাই খরচ"। বন্ধুরের কথা শুনে আমি একবারে হতভম্ব হইলাম, এখন আমি ত সুরব নীরব কোন প্রকারের ভারতচন্দ্রই নহে। আমার পাড়াগায়ে গরীব লোক, সম্ভবন নীলমণি কাপড় ত আমার এক প্রহর, কখন কখন আছ গ্রহেও নেমে আসে।

এই সব কথা ত আমার মনে কোন দিন

উঠেনি, আমার মনে যে একটা গুরুতর প্রশ্ন ছিল বন্ধুরা কেহই তাহার উল্লেখ করিলেন না। সম্প্রদায় ভায়া এখন আর কিছু পারেন না পারেন, দল পাকাইতে খুব মজবুত দেখা যায়। কাজেই পাঠকদেরও যে একটা দলারলি থাকিবে, আশ্চর্য কি? আশ্চর্য কিছুই নহে, যেখানে বাঙ্গালী সেখানে ত "দলারলি" আছেই, তবে দায়ে তেঁকে যে দিখিচ্ছ তুলিয়া "কোলাকুলি"ও হয় না এমন নহে। দলারলি শব্দটা কোথা হ'তে আসিল তার কোন খবর রাখ কি? জান ত ভাই আমার অত ভাষাজ্ঞান নাই। তবে শব্দটা যোগরূপ বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমাদের দেশে "দলঘাস"—সাধারণতঃ 'দল' বলিতে পার। তাহাতে কোটা, সাট, মোজা, কাঁধা, লেপের খোল, বালিশের গুণ্ডা, ঝিড়কীর পর্দা, মণারির আলর, ছেঁড়া গেঞ্জি, বাগি পরিচিত হইতেছেন, কিন্তু গুলে দেখিলে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি ও ছুটা তোয়ালেই বেশীর ভাগ, কচিং শাল আলোয়ান-চোরে পড়ে। মনে করো না আমি তার নিন্দে করি। সাক হ'য়ে এলে পর ভরসামজের উপযোগী হ'ল কি না বেশ পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়, স্রবিখাটা মন্দ নহে ছুটি পয়সাই খরচ"। বন্ধুরের কথা শুনে আমি একবারে হতভম্ব হইলাম, এখন আমি ত সুরব নীরব কোন প্রকারের ভারতচন্দ্রই নহে। আমার পাড়াগায়ে গরীব লোক, সম্ভবন নীলমণি কাপড় ত আমার এক প্রহর, কখন কখন আছ গ্রহেও নেমে আসে।

এই সব কথা ত আমার মনে কোন দিন

ক'রে একদম জলের তলে ডুব দিল, এই হইল তার ধর্ম। ইহাকে কোন পর্যায়ে তুলু করিবে তাহা ভূমিই জান, ভূমি অনেক বেশ সুবিদ্যাছ, অনেক কিছু দেখিয়াছ, অনেক কিছু শিখিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আমার পক্ষে তত নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে গরু বাছুর মোহ 'দল' পাইলে একবারে আশ্চর্য্য হইয়া ছুটে যায়, হাজার চেষ্টা করিলেও তারা আর কিছুতেই

মুখ দেবে না—দলতাদের এতই প্রিয় জিনিস। এক 'দল' শব্দ বুঝাইতে পজটা কিছু দীর্ঘ হয়ে গেল, করিব কি ভাই, তোমারা ত অনেক দিন দেশ ছেড়ে আছ, দেশের কিছু যে মনে আছে বড় বিশ্বাস হয় না। তাই এত কথা লিখিতে হইল। এখন ভূমি কোন দলের বল দেখি ভাই? ইতি

শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী।

পল্লীভাষা ও সাহিত্য *

সাহিত্যের স্বরূপ ও উহার ক্রমান্বিত্তির সঙ্গে ভাষা নিয়ন্ত্রিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। এবিধ ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ভাষা কোন সমাজ অথবা সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব নহে, উহা সর্বসাধারণের সম্পত্তি হওয়ায় এক হিসাবে জাতীয়ত্বের পরিচায়ক।

সাহিত্য-সৃষ্টির পূর্বে দেশে সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী কোন নির্দিষ্ট ভাষা বিদ্যমান থাকিতে পারে না, কখন-প্রণালীর বৈষম্য-হেতু এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও সমাজে একই ভাষার প্রকার-ভেদ লক্ষিত হয়। এইরূপ পরস্পর বিভিন্ন অথচ একমূলীভূত কথিত ভাষাগুলিকে পল্লীভাষা (dialects or Provincialism) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই পল্লীভাষার মধ্য দিয়াই সাহিত্য ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে। স্বতরাং পল্লীভাষাকে সাহিত্য-ভাষার জন্মদাতা রূপে গ্রহণ করা যায়। সকল ভাষার মূলেই পল্লীভাষা নিহিত আছে। স্বদেশের গৌরাবলী

তৎকালীন কোন একটি পল্লীভাষাতে রচিত হইয়াছিল। পালি সাহিত্যের মূলে পল্লীভাষা রহিয়াছে। বঙ্গের প্রাচীন কবিগণ পল্লীভাষাতেই গান গাহিয়াছিলেন। ল্যাটিন ভাষা রোম নগরীর কতিপয় অভিজাত পরিবারের কথিত পল্লীভাষা হইতে উদ্ভূত। এইরূপে, সকল দেশের সাহিত্যই পল্লীভাষার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। স্বতরাং, সাহিত্যভাষা পল্লীভাষার অভিনব সম্ভরণ মাত্র।

পল্লীভাষা দেশের কথিত ভাষা, উহা সর্গজ একরূপ নহে। দেশের বিভিন্ন স্থানে উহা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। মূলতঃ এক হইলেও কখন-কখন দুই স্থানের পল্লীভাষা এত স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় যে প্রথমতঃ উহাদিগকে এক ভাষা বলিয়া চিনিয়া উঠিতে পারা যায় না, সাহিত্যের সৃষ্টিরপূর্বে দেশের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীভাষাগুলি স্ব স্ব বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য লব্ধি পাশাপাশি ভাবে অব্যাহত ও উশুখল গতিতে চলিতে থাকে। পরে প্রতিনিয়ত সম্পন্ন কবি এবং লেখকদ্বারা চালিত

হইয়া ঐ সকল ভাষার কোন একটি ক্রমশঃ সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়। এইরূপে যখন সাহিত্য-ভাষার সৃষ্টি হয়, তখন পারি-পার্শ্বিক পল্লীভাষাগুলি উক্ত সাহিত্য-ভাষার পোষক ও জীবন-রক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। সাহিত্যের ভাষা যখন পল্লীভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তখন হইতে পূর্বোক্ত ভাষার পতন আরম্ভ হয়।

সংস্কৃত ভাষা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণ দ্বারা বিমুক্ত হইয়া রাড়িন, উহার সহিত যখন পল্লীভাষার কোন প্রকার সংস্রব রহিল না, তখন হইতেই উহার জীবনীশক্তি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল। এই অবসরে এক পল্লীভাষা (পালি) নূতন সময়ে সম্মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে সংস্কৃতভাষার স্থান অধিকার করিয়া বসিল, গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায়ও পূর্বোক্ত কারণেই স্ব স্ব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

স্বতরাং পল্লীভাষা-হইতে বিচ্যুত হইয়া সাহিত্যভাষা বেশী দিন আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। পল্লীভাষা প্রাণের ভাষা, উহার ভিতরে জীবন প্রবাহ বর্তমান থাকে, মানুষ ক্রিয় উপায়ে সাহিত্য-ভাষাকে গড়িয়া তুলে, উহা প্রাণের ভাষা নহে। কেহ সাহিত্য-ভাষায় কথা কহে না, কেবলমাত্র লিখন-পঠন ব্যাপারেই উহা ব্যবহৃত হয়। মানুষ কথা কহিয়া প্রাণের ভাব ও আবেগ পল্লীভাষাতে ব্যক্ত করে স্বতরাং ভাষার প্রাণ কথিত পল্লীভাষাতেই নিহিত। সাহিত্য-ভাষাকে পরিপূর্ণ অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে উহাকে পল্লীভাষার সহিত সম্যক-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পল্লীভাষার প্রাণের স্পন্দন দ্বারা উহার প্রাণে স্পন্দন আনিতে হইবে।

বঙ্গের সাহিত্যভাষা কয়েক শতাব্দী যাবত পল্লীভাষা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত মাণিক-চাঁদ, রাজা গোবিন্দ প্রভৃতি বঙ্গের প্রাচীন কবি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃত্তিবাস, বিদ্যা-পতি, চণ্ডীদাস, কাশীদাস, মুহুন্দ্রাদাস গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ দাসদ্বারা প্রায় প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের কাব্য সঙ্গীত ও পদাবলীতে বিভিন্ন যুগের পল্লীভাষার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। আধুনিক বঙ্গভাষা ঐ সকল পল্লীভাষার বিভিন্ন সমবায় গঠিত হইয়াছে। অতীতের ছায়, বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎও পারিপার্শ্বিক পল্লীভাষাগুলির সাহচর্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

ভাষা চিরদিন এক অবস্থায় থাকে না। উহা পরিবর্তিত হইবেই। আধুনিক বঙ্গভাষাও প্রাকৃতিক নিয়মামুতাবে ভবিষ্যতে একদিন পরিবর্তিত হইবে। তবে, এই পরিবর্তনের সময়কে সমুদ্রে টানিয়া আনা, অথবা পশ্চাতে সরাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। আমরা যদি শৈল্প ভাষার পরিবর্তন চাই, ভাষা প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারি, যদি না চাই, তবে তাহারও প্রতীকার করিতে পারি। মানুষ ভাষাকে বাঁচাইয়া রাখে স্বতরাং সে উহার গতিকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

এখন কথা হইতেছে, সভ্য-সমাজে শৈল্প শৈল্প ভাষার পরিবর্তন সফল-প্রদ কিনা। আমাদের মনে হয় তাহা নয়। প্রধান কারণ এই, মৃত ভাষায় লিখিত সাহিত্যের উপর নূতন ভাষার কোন দাবী নাই। পালি-সাহিত্যের উপর বঙ্গভাষার দাবী নাই, সম্ভব

সাহিত্যকে পালিভাষা আপন সম্পত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই, বঙ্গভাষা ও পার্শ্ব নী, নূতন ভাষায় নূতন করিয়া সাহিত্য গঠন করিতে হয়। জাতীয় উন্নতির পক্ষে সাহিত্য প্রধান সহায়; সুতরাং ঘন ঘন ভাষাবিশ্ব উপস্থিত হইলে নূতন নূতন সাহিত্য গঠনের নিমিত্ত দেশ-বাসীর শক্তির অথবা অপচয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক বারের ভাষাকে গড়িয়া তুলিতে বিপুল স্বয়ং ও চেষ্টার আবশ্যক হয়। এই স্বয়ং ও চেষ্টা অল্প কোন সহুদক্ষে পরিচালিত করিলে দেশের অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। যদি সংস্কৃত ভাষার দ্বারা অপরিবর্তিতাবস্থায় বর্তমানে আসিয়া পৌঁছিত, তাহা হইলে বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য-গঠনের নিমিত্ত বঙ্গের সাহিত্যিকদিগকে নূতন করিয়া এত আয়োজন করিতে হইত না। ভাষা বিশ্লেষণ দ্বারা সংস্কৃত ভাষার পতন ও পালিভাষার উত্থান হইল। পালি-ভাষাকে স্বয়ংস্বত এবং পালি-সাহিত্যকে স্বগৃহীত করিবার নিমিত্ত অনেক শক্তি ব্যয়িত হইল। আবার, পালিভাষা বিলীন হইলে, বঙ্গভাষা জাগিয়া উঠিল। হাজার বৎসরের চেষ্টার ফলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অভিনব সম্ভাষা সন্নিহিত হইয়া ভাষা ও সাহিত্য জগতে স্থান লাভ করিল। যদি একটি মাত্র ভাষার ভিতরে সংস্কৃত, পালি এবং বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডার আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে আজ আমরা কি না অকূল সম্পন্নির অধিকারী হইতাম! ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পালিভাষা ও বঙ্গভাষাকে গড়িয়া তুলিতে যত শক্তি আবশ্যক হইয়াছে তদ্বারা জাতীয় সাহিত্যের অথবা সমাজের অপরিমিত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। অতএব দেখা যাইতেছে, ভাষা-বিশ্ব দ্বারা প্রকৃত পক্ষে দেশের মঙ্গল সাধিত হয় না।

যদি ভাষার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় না হয়, তাহা হইলে ভাষা বাহাতে শীঘ্র পরিবর্তিত হইতে না পারে, বাহাতে ভাষার জীবন স্থবীর হয়, তজ্জন্ত চেষ্টা করা উচিত। রাষ্ট্র-বিপ্লব, সমাদ্র-বিপ্লব প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনাবলী দ্বারা ভাষার গতি হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। আকস্মিক ঘটনার উপর মাহুষের বড় বেশী হাত নাই; বিশেষতঃ পরাধীন জাতির পক্ষে এই সব চিন্তা-দোষাবহও বটে। বর্তমানে ইংরেজ-রায়ের স্বশাসনে দেশের সর্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই অবস্থায়, বঙ্গের সাহিত্যিকগণ ভাষার পুষ্টি ও স্বাধিকারের অকূল অত্র উদ্যোগগুলির প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, সাহিত্যের ভাষাকে দীর্ঘায়ু ও পরিপূর্ণ করিতে হইলে পল্লীভাষার সহিত উহার সংযোগ একান্ত আবশ্যক। কারণ পল্লী-ভাষা জন্মশঃ নিরন্তর হইয়া পড়ে। এই নিয়মের অত্র প্রচারণায় বঙ্গ-ভাষার প্রাপ্ত পত্তন অনিবার্য। বঙ্গভাষাকে নানা প্রকার নিয়ম দ্বারা জড়ীভূত করিয়া উহার স্বাধীনতাকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলে চলিলে না। ভাষার স্বাভাবিক গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেইদিকে উঠাকে কতকটা স্বাধীনতা দিতে হইবে। সাহিত্য-ভাষায় গতি পল্লীভাষার দিকে, সুতরাং পল্লী-ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সংযোগ রাখিতে হইবে।

সাহিত্য-ভাষার গতি পল্লীভাষার দিকে,— কথাটা একটু মৃদু হওয়া আবশ্যক। মাহুষ লিপিতে শিখিয়াছে সুতরাং সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং লিপিত ভাষা কথিত ভাষা হইতে কিছু স্বতন্ত্র হইয়া দাড়িয়াছে। এমন একদিন ছিল যখন লিখন-পদ্ধতি

মাহুষের নিকট স্বপ্নের অগোচর ছিল। মাহুষ চিরকাল কথাই করিবে, বেশীরভাগে সে লিখিত সাহিত্যের সৃষ্টি করিবে; যাহা সৃষ্টি করিবে তাহা আবার কথা করিয়া প্রকাশ করিবে। মাহুষের না লিখিলে চলিতে পারে, কথা না বলিলে চলে না, সুতরাং লিখন ও কথন ব্যাপারের কথন অধিকতর প্রয়োজনীয়। মাহুষ কথা কহিয়া ভাষাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, লিখিয়া নহে। লিখন ব্যতিরেকে মাহুষ লোক কথিত ভাষা, তুলিয়া গিয়া লিখিত বঙ্গভাষায় কথা করিতে আরম্ভ করে, কিছুকাল পরে উক্ত লিখিত ভাষা হইতেই নূতন কথিত ভাষার সৃষ্টি হইবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, সাহিত্য ভাষা পল্লী-ভাষার দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। পল্লীভাষার সহিত সাহিত্য-ভাষার সংযোগ রক্ষা দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। প্রথম, সাহিত্য-ভাষার বিকাশ সাধন; দ্বিতীয়, পল্লীভাষার উৎসৃষ্টগতার অপনোদন।

কোন জীবিত পদার্থকে আবঙ্গ অবস্থায় রাখিয়া দিলে ক্ষুদ্র ও বিকাশের অভাবে উহার জীবনী শক্তি জন্মশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ভাষাও এই নিয়মের বাহিরে নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিজ্ঞাচারণ করিয়া ভাষাকে শৃঙ্খলার করিয়া রাখিলে, জীবিতাবস্থায় উহার বরন বননের আয়োজন করা হয়। অবশ্য মানিতে হইবে, কতকগুলি নিয়মের অধীন না হইয়া সাহিত্য-ভাষা স্ব-ম্যাদা রক্ষা করিতে পারে না, তাই বলিয়া, পদে পদে আইন কাহনের প্রচার করিলে বিপ্লব ও বিদ্রোহকে প্ররোচিত হইবে। বঙ্গ-ভাষার উৎসৃষ্ট-গতির

অবস্থান হইয়াছে, ব্যাকরণ স্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন কেহ 'খাইছা তা' নমুনার ভাষায় একটা কিছু লিখিয়া সাহিত্যিক সমাজে আসন লাভ করিতে পারে না। বঙ্গভাষা জন্মশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; বঙ্গের সাহিত্যিকগণ এই পথকে আরও পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা যদি পারিপার্শ্বিক পল্লী-ভাষাগুলিকে অবহেলা না করিয়া উহাদের ভিতর হইতে আরম্ভ-বাক্য অথচ নবভাববোধক শব্দ, শব্দ-সমষ্টি (phrase), কঠিন ভাব প্রকাশোপযোগী সহজ বাক্যভঙ্গী প্রভৃতি উপাদানগুলি বাছিয়া লইয়া সাহিত্য-ভাষায় স্থান দান করেন তাহা হইলে বঙ্গভাষার প্রাণ নূতন পশ্চানে নাচিয়া উঠিবে।

পল্লী-ভাষার শব্দাবলী সাহিত্য-ভাষার শব্দাবলীর বিকৃত মাত্র, এই দ্বারা প্রমাণ্যক। শ্রমজীবীগণ স্ব স্ব ব্যবসা ও কার্যের উপযোগী এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করে যে সকল শব্দের সহিত অভিধানের মোটেই সঙ্গ নাই। বঙ্গভাষা শব্দ-সম্পদে এখনও দীন। এই ভাষায় উন্নত বিজ্ঞান, চর্চন প্রভৃতি প্রচারের নিমিত্ত চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু ঘরের কথা প্রকাশের জন্ত কোন প্রকার যত্ন লওয়া হইতেছে না। সাহিত্যিকগণ এখনও বঙ্গভাষাকে পল্লী-সমাজের সকল প্রকার ভাব প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। বঙ্গভাষা প্রকৃত পক্ষে বঙ্গের সকল সম্ভারের ভাষা হইবে। উক্ত সাহিত্য প্রচারের আবশ্যকতা অপেক্ষা পল্লী-চিত্ত অঙ্গনের আবশ্যকতা কম নহে।

ইংরাজী ভাষা পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া আজ ভাষা জগতে অদ্বিতীয় হইয়া দাড়িয়াছে। ইংরাজী অভিধান

প্রতি বৎসর শব্দ-সম্পদে পুষ্ট হইতেছে। ভারতের এমন প্রাদেশিক ভাষা নাই যাহা হইতে ইংরাজী ভাষা মেটেই শব্দ গ্রহণ করে নাই। এই দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্গ-ভাষার শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করা উচিত। বর্তমানে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির প্রতি দৃষ্টি না করিলেও চলিতে পারে কিন্তু পারিপার্শ্বিক পল্লী-ভাষা দ্বারা বঙ্গভাষার বিকাশ সাধন না করিলে নয়। অনেক মনে করেন, সাহিত্য-ভাষায় পল্লী-শব্দ ব্যবহার করিলে তাহা সর্বাধারপের পক্ষে দুর্বলিগমা হইবে। ইহা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রযোগ দ্বারা শব্দ ক্রমশঃ সর্বাধারপের নিকট পরিচিতি হয়। অপ্রচলিত অভিধানিক শব্দও প্রথম মূলের প্রয়োগে দুর্বলিগমা হইয়া উঠে, বৈজ্ঞানিক শব্দের ত কথাই নাই। অনেক বিজ্ঞাতীয় ও বৈদেশিক শব্দ বঙ্গভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, এমতাবস্থায় বহুয় পল্লী-ভাষার শব্দ গ্রহণে আপত্তি উত্থাপন করার কোন প্রায় কারণ দেখা যায় না।

তাকে শত বন্ধনে আবদ্ধ এবং অসম্মান্য নিয়মের বশবর্তিনী করিয়া রাখিলেও উহার স্বেচ্ছাচারিতা একেবারে বিদূরিত করিতে পারা যায় না। একটী বাক্য পাইলে সে পল্লীভাষার সংশ্বে আসিবেই। সম্ভবতঃ ভাষা ব্যাকরণ পাশ্বে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিয়াও পল্লীভাষার সংশ্বে আসিয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ল্যাটিন ভাষাও বর্ধের জাতির ভাষার সংশ্বে হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত রাখিতে পারে নাই। কোন ভাষা তাহা পারে না। পল্লীভাষার সহিত সাহিত্য-ভাষার চিরদিনই একটা গুপ্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। এই সম্বন্ধ সংরক্ষণদ্বারা সাহিত্যের

ভাষা বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করে অস্বাভাব্য উহার জীবনশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। পারিপার্শ্বিক পল্লীভাষা হইতে বিশিষ্ট হইয়া কোন ভাষা আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। পুরাকালে প্রাচীন হিন্দুগণ যে যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সকল স্থানের কোথায়ও আজ ভারতীয় ভাষার প্রচলন নাই। পাঠান ও মোঘলগণ যে ভাষা লইয়া ভারতে আসিয়াছিল, সে ভাষা আর নাই। তাহাদের বংশধরগণ ভারতীয় ভাষাতে কথা কহিয়া থাকে। প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে 'নরওয়ে' বাসী পলাতকগণ যে ভাষা লইয়া 'আইসল্যান্ড' দ্বীপে গমন করিয়াছিল সে ভাষার সহিত নরওয়ের আধুনিক ভাষার সাদৃশ্য নাই বলিলেই হয়, 'কেনেডা' বাসী ফরাসীদের ভাষা 'ইউরোপ' বাসী ফরাসীদের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। স্বতরাং দেখা যাইতেছে, পারিপার্শ্বিক পল্লীভাষার সংশ্বে ত্যাগ করিয়া কোন ভাষাই আপন বিশেষত্ব বজায় রাখিতে পারে না।

পল্লী-ভাষার সম্ভবে আসিয়া সাহিত্যের ভাষা যেরূপ সঙ্গীত হইয়া, সাহিত্যের-ভাষার সংস্পর্শ দ্বারা পল্লীভাষাও সেরূপ স্বসংযত হয়। যতদিন পর্যন্ত পল্লীভাষার উপর সাহিত্যভাষার প্রভাব বিস্তৃত না হয় ততদিন পল্লীভাষার উচ্ছ্বল গতির অবগান হয় না, অসভ্য দেশে পল্লীভাষা ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে, শব্দের পরিবর্তন এক জট সাধিত হয় যে কয়েক বৎসরের মধ্যে ভাষার প্রায় অধিকাংশ শব্দই বিবৃত হইয়া পড়ে। ঋগ্-বৈদ্য প্রচারক মিশনারীদের লিপিত বিবরণ হইতে জানা যায় কোন কোন অসভ্য জাতির ভাষা অল্পদিনের মধ্যে এতই পরিবর্তিত হইয়া পড়ে যে হাককে পূর্বের

ভাষা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। একবার কয়েকজন মিশনারী অত্যন্ত মন্বনহংসারে মধ্য-আমেরিকাবাসী অসভ্য জাতির ভাষার অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে তাঁহারা পুনরায় সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, পূর্বপ্রস্তুত অভিধানের শব্দাবলীর সহিত সে ভাষার আর সাদৃশ্য নাই, পুরাতন শব্দের পরিবর্তে নূতন শব্দ স্রষ্ট হইয়াছে, এবং ব্যাকরণে যে স্থানের ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ঋগ্-বৈদ্য প্রচারক মিশনারীগণ অনেক ক্ষেত্রে অসভ্য জাতির ভাষা শিক্ষা পূর্বক সেই ভাষায় বাইবেল অস্বাদ্য করিয়া ঋগ্-বৈদ্য প্রচারের স্বার্থা করেন। এই অস্বাদ্য দ্বারা অসভ্য দেশে সাহিত্যের 'স্রষ্ট' হয় এবং অসভ্যদিগের কথিত ভাষা ক্রমশঃ অসুস্থিত হইয়াবেলের ভাষার সাদৃশ্য ধারণ করিতে থাকে। সাহিত্য-ভাষার সংস্পর্শ দ্বারা পল্লীভাষার অর্থ গতি অবরুদ্ধ ও নিম্নস্ত হইয়া এবং সাহিত্য ভাষা এবং পল্লীভাষার মধ্যস্থিত ব্যবধান ক্রমশঃ ব্রূণ প্রাপ্ত হইতে থাকে।

বর্তমান যুগের পূর্বে, বঙ্গের বিভিন্ন জেলার পল্লীভাষাগুলির মধ্যে যে পার্থক্য বিস্তারিত ছিল, আধুনিক পল্লীভাষাগুলির মধ্যে তদ্রূপ পার্থক্য বিস্তারিত নাই, বঙ্গের সাহিত্য-ভাষা উক্ত পল্লীভাষাগুলির গতি মন্বীভূত করিতে: উহারিগকে নজের দিকে টানিয়া আসিয়াছে। এখনও বঙ্গের বিভিন্ন পল্লী-ভাষাগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে এবং উহা থাকিবে; কিন্তু তাই বলিয়া এক জেলার লোক অজ জেলার লোককে ভিন্ন ভাষা-ভাষী বলিয়া মনে করে না, একশত বৎসর পূর্বেও সেরূপ মনে করিত, বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, দেশে রেল, ঈশ্বর

প্রচলনের পূর্বে তাঁহারা যখন পদব্রজে কাশি গয়া প্রভৃতি তীর্থে গমনাগমন করিতেন, তখন দূরবর্তী জেলা নিবাসী বাঙ্গালীর রূপ তাঁহারা সম্যকরূপে বৃত্তিতে পারিতেন না। এখন চট্টগ্রামবাসী বাঙ্গালী অন্যায়সে মানহুমবাসী বাঙ্গালীর সহিত অসম পল্লী-ভাষায় ভাষের আদান প্রদান করিতে পারে। পল্লীভাষাগুলির বৈষম্য ব্রূণের পক্ষে কতিপয় কারণ বর্তমান থাকিলেও বঙ্গ সাহিত্যের স্রষ্টকেই প্রধান বলিতে হইবে।

সাহিত্য-ভাষা দ্বারা নিম্নস্ত হওয়ার সুবিধা না পাইলে, পল্লীভাষা সাহিত্য-ভাষা হইতে ক্রমশঃ পৃথক হইয়া পড়ে। যখন এই পার্থক্য যুব বৈশি হইয়া দাঁড়ায় তখন চেষ্টা করিয়াও পল্লীভাষার গতি ফিরাইতে পারা যায় না। তখন ভাষা-বিপ্লবের স্বত্বপাতি হয়; সাহিত্য-ভাষার প্রভাব মন্বীভূত হইয়া পড়ে, এবং পল্লীভাষা সাহিত্য-ভাষার স্থান অধিকার করে। আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজের সহিত অশিক্ষিত পল্লীসমাজের বিশেষ কোন সংশ্বে না থাকায়, পল্লী-ভাষা সাহিত্য-ভাষা দ্বারা নিম্নস্ত হওয়ার সুবিধা পাইতেছে না, দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের সহিত মিশিয়া উহারিগকে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেশ দান করেন তাহা হইলে পূর্বোক্ত উদ্বেগ সহজেই নিবৃত্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, এই সম্মিলন দ্বারা সমাজেরও যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পল্লী-ভাষার সংশ্বে আসিয়া বঙ্গ সাহিত্যও উপকৃত হইবে। দেশে ইতিহাস নাই; পল্লী-ভাষায় ইতিহাসের যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে, বঙ্গের প্রাচীন ভট্টকবিদিগের রচিত বিবিধ বিষয়ক গান আজিও বঙ্গের পল্লীতে

পন্নীতে গীত হইয়া থাকে, ঐ সকল গানে বিভিন্ন যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা পরিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। পন্নীবাদী মুখে মুখে দেশের প্রাচীন ইতিহাসকে অনেকাংশে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বর্তমান বাস্তবী পন্নীভাষায় ছড়া, প্রবাস প্রভৃতিরও অল্প নাই, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা স্বাধীনতা অনেক প্রয়োজনীয় কথা পন্নীভাষায় গুপ্ত রহিয়াছে, পন্নীবাদী কথায় কথায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে সকল প্রয়োগ করিয়া থাকে, আজ ডাক ও খনার বচন দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ঐরূপ অনেক বচন এখনও অনাবিকৃত রহিয়াছে। দেশের বৃহৎপন বচন ও হস্তার লোক আবৃত্তি পূর্বক এখনও অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ ঐ সকল লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, শীঘ্র অল্পসময় না হইলে অনেক রস হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। দেশে শিলালিপি কিংবা তাম্রশাসন আবিকৃত হইলে, অথবা কোন ভগ্ন প্রস্তর স্থাপত্যের হইয়া পড়িলে সাহিত্যিকদিগের মধ্যে মহা হতমূল্য বস্তু হইয়া যায়, কিন্তু পন্নীভাষায় যে শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি অপেক্ষাও কত মর্যাদা জিনিষ গুপ্ত রহিয়াছে তাহা কল্পনা-অল্পসময় করিয়া দেখেন? এই সাহিত্য-যুগে পন্নীভাষাকে অবহেলা করিলে চলিলে না, উহার

প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। পন্নীভাষাকে যথাবিধি বিদ্রষ্ট করিয়া উহা হইতে বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। ভারতের প্রাদেশিক ভাষা সমূহের মধ্যে বঙ্গভাষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, বঙ্গভাষার সমুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিরামান। একদিন ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলি বঙ্গভাষা দ্বারা নিম্নরিত হইবে। উক্ত ভাষাগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। বঙ্গভাষা অজ্ঞাত প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের অধিকতর নিকটবর্তী, স্বতরাং, প্রাদেশিক ভাষাগুলির একীকরণ পক্ষে বঙ্গভাষার উপযুক্ততা সর্বাঙ্গীকরণ বোধ্য। এই একীকরণের ভার বঙ্গবাসীর উপর রহিয়াছে। কাব্য ও আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গভাষার উপর ভারতবাসীর দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্য ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিত হইতেছে। বঙ্গের বাহিরে অনেক বঙ্গভাষা শিকা কল্পিতেছেন। বঙ্গবাসী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিতেছেন। প্রয়োজন হিসাবে কাব্য অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। এখন বঙ্গবাসীর সকল দিকে কাজ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীমদেবদ্রনাথ চৌধুরী।

মফঃস্বলের বাণী

১। মেলা

জনসংখ্যের মিলনের নাম মেলা। তীর্থ, পর্বত, পার্বণ, মহাপুরুষের জন্মস্থান প্রভৃতিতে যে জনসমাগম হয়, তাহাকেই মেলা বলা

যায়। আমাদের দেশে মেলার অভাব নাই। বাঙ্গালায় এমন গওগ্রাম নাই—এমন অন্ধ-বাসর নাই, যেখানে কোন না কোন আকারে মেলার আশ্রয় দেখিতে পাইবে না। এই

এই সকল মেলার যে উদ্দেশ্য ছিল, এখন তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা থাকিলেও তাহা এখন নির্মূল করা কঠিন।

শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্তই মেলার সৃষ্টি। পূর্বে মেলায় নানা স্থান হইতে শিল্পজাত সামগ্রী ও বাণিজ্যব্রত প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইত। এখন সে আসল উদ্দেশ্যটার দিকে লোকের আঁক-লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য হইগেলোয় মাংসখাবার কোথা হারাইয়া গিয়াছে।

মেলায় বৈদেশী শিল্পসম্পত্তির আর দেখিতে পাও কি? কাঁধননগরের ছুরিকাঁচি, বাগড়ার বাসন, বহরমপুর-মুর্শিদাবাদের রেশমী কাপড়, করাচিসাড়া-শান্তিপুরের সুখ বস্ত্র, কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্প, পাটুলি-দাঁহাঘাটের শাখা—এ সকল কোন মেলায় দেখিতে পাও কি? দেখিতে কেবল, এনামেলের কলারী করা ঠালের বাসন, কাচের পুতুল, বিলাতি আয়না, চিকণী, ফিতে, আর চটকার নানাবিধ মনোহারী জিনিষ। এই সকল দোকানে লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—কল্যাণিত কাঞ্চন-বিনিময়ে আপাত-নয়নমুগ্ধকর কাচবগু জয় করিয়া কুতূহল হইতেছে। দেশী শিল্পের আমদানিও নাই—খরিদারও নাই। স্বতরাং দেশী শিল্পীরাও বৈদেশিক শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া ব্যবসা করিতে বসিয়াছে। এ ছুখ বলিবার কথাকে? এ আপোষ জানাইব কাহাকে?

দেশী শিল্পের যদি অঙ্গপতন দেখিতে চাও, তবে যে কোন মেলায় গিয়া চক্ষুর্কণের বিবাদ ভঞ্জন করিও। তখন মনে হইবে, এমন মেলা উঠিয়া যাওয়াই ভাল। এক একটা যেমন তেমন মেলায় গিরিবেরই সর্বনাশ। পঞ্জিগ্রামের কৃষক-কামিনী দলে দলে মেলা

দেখিতে ছুটিয়াছে—স্বদেশের বাহারা অভিভাবক তাহারা স্বাধীনতার অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। তাহারা মেলায় গিয়া সর্ব্বথ প্রয়োজ্য। আসিতেছে। কে তাহাদের স্বকৃতি দিবে!

এর উপর মেলার আর একটা দিক আছে। কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া অন্নলী-মৃত্যু-গীতের আয়োজন মেলার একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা নিশ্চিতই আপত্তিজনক। লিখিতে লজ্জা করে, অনেক মেলাতে নিরুপ্ত শ্রমীর বারবানিতার আমদানি পর্যন্ত করা হইয়া থাকে। এই বীভৎস ব্যাপারটা এখন মেলার যেন একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সকল মেলায় লোকসংখ্যের আদিকো স্থানীয় স্বাস্থ্য যে ভয় হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। 'কলেরা'-প্রচারের প্রধান কারণ এই সকল মেলা। যেখানে দেখিবে মেলা, সেখানে হইগেল, পাখাখাতের বিচার নাই, সেই থানাই দেখিবে 'কলেরা' তাহার অঘটন বাজাইয়াছে।

রাণাঘাটে যে কলারার এত বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রধান কারণ শান্তিপুরের রাসমেলা। এই রাসমেলায় জন্তই দেশ বিদেশ হইতে রাণাঘাটে যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে। সেই সকল যাত্রী যাত্রীদের পথে রাণাঘাটে অবস্থান করে। স্থানীয় দোকানদারগণ সুবিধা পাইয়া অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায় নিতান্ত নিরুপ্ত উপকরণে প্রস্তুত শিল্পী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যাত্রীদিগকে বিক্রয় করে। সেই সকল পাখাখাত্য অব্যবহারিক হয়।

এখানে 'কলেরা' একটি মেলার অঙ্গ। যেখানে মেলা, যেখানে লোকজন বা যাত্রীর

ভিত্তি, সেই থানাই 'কদেবী'—ইহা অতঃশুদ্ধি—ইহা অবশ্যস্বার্থী।

তাই বলিতেছি, দেশে মেলার অভাব নাই; কিন্তু সেই সকল মেলা দেশের হিত অপেক্ষা অহিত সাধনই অধিক করিতেছে না কি? দেশের কৃতি মতি প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতেছে না কি? কিন্তু মেলার সংস্কার সম্বন্ধে তাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি না। অতঃ মেলার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বই কহিতেছে না।

নূতন মেলা যাহা সৃষ্টি হইতেছে, তাহার অভিন্নবস্তু কিছুই নাই। মেলা-স্থানের অধিকারীর ছই পক্ষা উপার্জননের চেষ্টা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহাতে মেলাগুলি এক একটী ব্যবসায়ের 'বেঙ্গল' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথায়ও দেবতার নামে কোথায়ও মহাপুরুষের নামে মেলার সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু দেবতা বা মহাপুরুষের সম্বন্ধে যে মেলার কোন সম্বন্ধই নাই, তাহা এখনো বলাই বাহুল্য।

এই মেলাগুলির সংস্কার করিতে হইলে দেশের লোকের চেষ্টা চাই। হজুগপ্রিয় বাহাইয়ারীর পাণ্ডাদিগের দ্বারা সংস্কারের আশা করা বুঝা। আমোদ-প্রমোদের প্রতিই যাহাদের লক্ষ্য, তাহারা কাজের লোক হইতে পারেন না, তাহাদের দ্বারা কাজও হয় না। তাই বলিতেছি, শিক্ষিত স্বকটিপ্রিয়, দেশের আশা-ভরসা-স্থল উন্মোচনী যুবকেরা সংস্কারের মনোযোগী হউন। মেলাগুলিকে শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে মেলাগুলি দিয়া কংগ্রেসের অধিক কার্য হইবে—এ কথা আমাদের মূল্যবোধে বলিব।

মেলায় এখন হিত অপেক্ষা অহিতই অধিক

সাধিত হইতেছে এবং তাহার প্রতীকার আবশ্যক—এ কথা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না।

চুঁড়া-বার্ত্তাহা।

২। আধুনিক শিক্ষা

রংপুর জেলার নিম্নপ্রাইমারি বিদ্যালয় ১০৭৭, উচ্চপ্রাইমারি বিদ্যালয় ১২৮, মাধ্যমিক ইংরাজী বিদ্যালয় ৫৮ এবং উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ১০টি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্ব সময়ে ১২৩৯টি বিদ্যালয়ে রংপুর জেলার অধিবাসিগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; তৎসহ বিদ্যালয়ের সংখ্যা তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজসাহী-বিভাগের অত্যাভাঙ্গিত অঞ্চল রংপুর জেলাতেই বিদ্যালয়ের সংখ্যা অধিক, ইহাতে রংপুর-জেলাবাসী সকলেই গৌরবান্বিত সন্মত নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশী সম্প্রদায়ের সকলেই এক্ষণে ভাবিতেছেন, "এই সকল বিদ্যালয় হইতে যাহা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ কিস্তি?" তাহাদের ভবিষ্যৎ গ্রন্থভর, উদ্বেগপ্রবীণ। শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াই যে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা তাহারা স্বীকার করিতে পারেন না। তাহাদের শিক্ষা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—চাকুরী, কিন্তু শিক্ষিত হইয়া সে লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারেন না। আজ তাই সৈন্য-পীড়িত হইয়া বৃদ্ধিতে পারিষদগণ যেন, তাহাদের শিক্ষা-জীবনটা সম্পূর্ণ লক্ষ্যবাহীন ভাবেই অতিবাহিত হইয়াছে। সেই জন্ত তাহারা যশেশ-বাসী লক্ষ লক্ষ ভ্রাতাকে একই উদ্বেগপ্রবীণ পক্ষে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মিয়মাণ।

আমরাও একই কারণে গত সপ্তাহে কেবল মাত্র পুণ্ডি-পড়ান বিদ্যালয়ের কুল-সমূহ বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং পুণ্ডি-পড়ান বিদ্যালয়-সমূহে যাহাতে শিল্প এবং তদনুরূপ অঙ্গশৃঙ্খলার অত্যাভাঙ্গিত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়াছিলাম।

অনেকে প্রস্তাব করেন যে অধুনা আর পুণ্ডি-পড়ান বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠানের প্রয়োজন নাই এবং যাহাতে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-সমূহও উঠিয়া যায় তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু এ প্রস্তাবে আমরা সম্পূর্ণ সম্মত প্রধান করিতে অক্ষম। কালের গতি কেহই কিরাইতে পারেন না। বাইবেলের মতে মানব যতদিন আপনার মাহু-বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত না হইয়াছিল, যতদিন সে জান-বুদ্ধির ফল আবাদ করিতে না পারিয়াছিল, যতদিন সে শিশুবেশে, আদিষ্ট এবং নির্দিষ্ট পথে কার্য করিয়া যাইত, তত দিন সে দেবতার দ্বারা সন্মানস্বরূপে স্বর্গের নন্দন-কাননেই বসতি করিত। কিন্তু ঈশ্বরের অমধ্য পিপাসা সৃষ্টিকর্ত্তাও কিরাইতে পারেন নাই, তাই মানব নুকাইয়া জানকল আবাদ করিয়া স্বর্গভূত হইয়াছিল। সেই পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া দেশবাসিগণ আজ ছুটিয়াছে—মানবের কি সাধ্য তাহাদিগকে কিরাইয়া রাখে। তাহাদিগকে কিরাইতে চেষ্টা করা পদশূন্য হইবে—তাহারা কখনই ফিরিবে না। জ্ঞান-বুদ্ধির ফল আবাদ করিয়া মানব পতিত হইয়াছিল বটে—আবার সেই জ্ঞানযোগ দ্বারা মানবের উদ্ধারের পথ ভগবানই দেখাইয়া দিয়াছিলেন। স্বতরাং কালের গতিরোধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, বিদ্যালয়-সমূহ উঠাইয়া দেওয়ার প্রয়াস না পাইয়া যাহাতে এই শিক্ষা-পথেই দেশবাসিগণ উদ্ধার পাইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা আমাদের করা আবশ্যিক।

কৃষকেরা পুণ্ডি-পাঠ করিতে শিক্ষা করিয়া কৃষিকার্য করিতে লক্ষ্য বোধ করিবে, এ কথা সত্য এবং ইহার জন্ত প্রকৃত পক্ষে আমরাই দায়ী। আমরাই তাহাদিগকে শিখাইতেছি—লোপাড়া শিখিলে ভক্ত হয় এবং ভক্তের পক্ষে শারীরিক শ্রম লক্ষ্যের কথা। ইহা অমূল্যবিশেষ জ্ঞাত হইয়া চুড়াশ্রম নির্দমন। অতঃশুদ্ধি আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যায়াম-অভ্যাস গহিত কার্য বলিয়া বিবেচনা করিতাম। "স্বাস্থ্য অর্থলোভা করিয়া ছাত্রদিগকে দিব্যরাজ পুণ্ডি লইয়া বসিয়া থাকিতে আদেশ দিতাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার কুল আমরা বৃদ্ধিতে পারিয়াছি। এখন আমরাই উন্মোচনী হইয়া বালকদিগকে পাঠ্যভাষার সঙ্গি, ব্যায়াম-অভ্যাসের উপদেশ দিয়া থাকি। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠের সহিত ব্যায়াম-অভ্যাসের স্থাবস্থা করা হইতেছে, আমাদের মন হইতেও পূর্ণ-কৃষ্ণাঙ্গের দৃষ্টিভূত হইতেছে। সেইরূপ আমরাই যদি বাল্যকাল হইতে ছাত্রদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করি যে শারীরিক পরিশ্রম মানবের গক্ষে গৌরববর্দ্ধক, পিতৃ-পিতামহের অমূল্যত পথ অমূল্যরূপে লক্ষ্য নাই, তাহা হইলে আমাদেরই ভবিষ্যৎবংশধর-গণের এবং কৃষকদিগের ভবিষ্যৎ কালিমাচ্ছন্ন হইবার কোনই কারণ নাই।

অনেকে বলিতে পারেন যে, শারীরিক পরিশ্রম করা অথবা পিতৃপিতামহের অমূল্যত পথ অমূল্যরূপে করার লক্ষ্যে যেন না কলিলেও যে সকল কৃষক যৌনকালস্বার্থি পাঠ্যভাষায় অতিবাহিত করে, তাহারা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলে উন্নতির সংবাদ করিবে কি প্রকারে? এ কথা সত্য। সেই জন্ত আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে যাহাতে শিল্পাভিবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। কৃষিক্রম-স্থানসমূহে চাষ-আবাদের সময় কৃষকছাত্রদিগকে দিবসে ক্ষেত্রে অভিভাবকদিগকে সাহায্য করিতে দিয়া রাজ্য এবং প্রত্যহ তাহাদিগকে পাঠ দেওয়া কর্তব্য এবং যে সময় কৃষকদিগকে সারাদিন ক্ষেত্রে থাকিতে

হয় সেই সময় বিদ্যালয়ে 'আবদি বন্ধ' দেওয়া উচিত।

অঙ্ককাল শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়-গৃহে মাত্রকেই রাজপ্রাসাদের ভায়ে বৃহৎ ও স্থাজিত করিতে চান। স্বীচীরে প্রতিনিয়ত কৃষক-পুত্রদিগের এবিধ সৌন্দর্য পাঠ্যভাস কমিত পঠাইলে দিল্লীর ঐক্যে মুকুতি শিবাধিপুত্র শতুজির ভ্রাতৃ তাহাদের মতিবৃত্ত ও বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা কি? প্রজ্ঞাশ্রয়, মুক্ত প্রাঙ্গণে কি বিদ্যালয়ের কার্য চলিতে পারে না?

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

৩। কাঁথির গ্রামে যেহা সৈবকদল বাপালা গবর্ণমেন্টের মহাপ্রাঙ্গণের সমুদ্র মাত্রের মিঃ লায়ন বাহাদুর বিগত ১৯০২ নবম্বের হইতে ২২০ নবম্বের পর্যন্ত আমাদের কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর, উদালার, কালী-নগর প্রভৃতি-গ্রামে পীড়িত কতকগুলি স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক জলে কাণায় কষ্টে হাঁকির করিয়া গ্রামে পীড়িত ব্যক্তিদের দুর্দশাদি প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মলিন-তরঙ্গাক্রান্ত বিবৃত্ত ক্ষেত্র, গ্রাম-স্রিষ্ট নরনারীর অবিকলান্যর দেহ, সাধাব্যতঃ যেহা-সৈবকদলের কার্য-প্রণালী আদি মচক্‌ক দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া দেখিয়াছেন যে, অনশন-জীবী ব্যক্তিদের গৃহে কিছুই নাই; কাঁথারও কাঁথারও গৃহে "ভেঁট" চাল দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই পরিদর্শনের বিষয় এবং পরিদর্শনের কালে সমবেত ভ্রম্মলোকগণের সহিত গ্রাম-বিশপ স্থানের চৌকিদারী টেম্ব ও পাছনা মাপ, জরীপ বন্ধ, জল-নিকাশের স্থখ্যা এবং সাধাব্য-নাম প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা আমরা ব্যঙ্গময়ে প্রকাশ করিয়াছি।

মিঃ লায়ন বাহাদুরের প্রত্যাবর্তনের পর কাঁথি মহকুমার গ্রাম-পীড়িত ব্যক্তিদের অবস্থা লক্ষ্যে সাধাব্যগণের অবগতির জন্ম "কলিকাতা-পেজেরে" বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের একটা বিজ্ঞাপন প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহাতে গ্রাম-পীড়িত অধিবাসীদের রক্ষাকল্পে কিরূপ ব্যবস্থা

হইয়াছে, আমরা নিয়ে তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম:—

মাত্রবর মিঃ লায়ন বাহাদুর গ্রাম-পীড়িত স্থানসমূহের লক্ষ্যে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দরিদ্র কৃষিজীবীগণের মধ্যে ঋণ-প্রদান পূর্বক বত্‌প্রাপ্তিত অনেক লোককে সাহায্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাহারা কার্য করিতে অক্ষম বিগত অষ্ট মাস হইতে প্রধানতঃ দেশের সেবদলর এবং আংশিক ভাবে গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান পূর্বক রক্ষা করিবার আশিষ্টেছেন।

বত্‌প্রাপ্তিত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ৪৫ লক্ষ সেক্ষেত্রের কার্য করিতেছেন; তন্মধ্যে তিনি কলিকাতা কেন্দ্র-সাধাব্য-সমিতি (সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন) ও রামকৃষ্ণ-মিশনের সেবদলরের কার্য পরিদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহাদের কার্যস্থলে এবং গ্রাম-সমূহে তিনি বিশেষতঃ অহমদন করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, যেহা সৈবকদল খুব স্বন্দরভাবে কার্য পরিচালন করিতেছেন। স্থানে স্থানে সাহায্যের পরিমাণ কিছু অধিক হইলেও সেবকদল সকল স্থলেই খুব সন্তোষজনক অবলম্বন পূর্বক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এই-রূপ মনে হইয়াছে লক্ষ স্থানেই বেশ শৃঙ্খলা ও নিয়মের সহিত কার্য নির্বাহ করা হইয়াছে। ইহারা এই সকল সেবকদলের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহাদের অর্থের প্রকৃত লব্ধ্য হইয়াছে।

নৌহার।

৪। আদর্শ-জননী

অচ্চর কথা বলিতে পারি না, আমাদের কথা এই—রমণী আমাদের দেশে মাতৃ-স্বরূপীণী। আমরা জাতিগতিক সম্মান কষ্ট, মায়ের ভ্রাতৃ তাহারের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব দিই। হিন্দুধর্ম এই মানব শিক্ষা আমাদের জন্ম জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহার রমণীমুখিতে মাতৃমহিমার অপূর্ণ বিকাশ দেখিবার রমণী মাতাকেই মাতার

ভ্রাতৃ ভক্তিপ্রকাশ করিয়াছেন, অতঃকণ্ডেও করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। হিন্দুধর্মেরও "মিত্রবন" যে মায়ের মুখি এই বলিয়া স্বীয় অদ্যতম ও উচ্চ অঙ্গ চিন্তকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। আমরা জাতিগতিক সেবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিতেছি। জাতিগত—মাতৃক-জাতি; মায়ের মেহ, মায়ের রূপা, মায়ের প্রাণ, মায়ের জয় লইয়া নারীজাতি আমাদের কার্য-নির্বাহিতার সমাধানে কত কষ্টে কত যত্নে লালন-পালন করিতেছেন। তাই মায়ের সিংহাসন সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরের সিংহাসন হইতেও শত গুণে শ্রেষ্ঠ। তাই মা হওয়ার চেয়ে নারীজাতির গৌরবের বিষয় অা কি আছে? আমাদের "আদর্শ" সত্য রমণী পতিকেও তাঁহার মাতৃস্বানীয় হইয়া যেহ করেন। ইহা তাঁর নারীর পরম ধর্ম বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। তাই মায়ের গৌরব সর্বত্র, মাতৃভক্তিতে সম্মানের জয় ডরপুত্র, মাতৃপুত্রীয় সন্তান উদ্ভাভ। সন্তান ভূমি হইয়াই মায়ের মনসময়ী মূখর মুখি দেখিয়া শান্ত, স্বঃ ও আশ্রয় হয়। মা ভিন্ন আর আমাদের গতি মুক্তি নাই।

একদিন ভারতের প্রতি গৃহে আদর্শ মাতা, আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ দাসপুত্রী ছিলেন। তাই ভারতের গৃহস্থালী একদিন পরম স্বধেয়ত্রিণী; কিন্তু সেই দিন একবারে না গেলেও এখন আমরা আমাদের মহাত্মা লাত্যে প্রাচীন আদর্শকে ভাঙ্গিতে শিখিয়াছি, গড়িতে শিখি নাই; কাছেই আমরা জন্মে পাতি, জীতি, দয়ামায়া, আত্মতা, দেবজ্ঞান এবং গুরুজনে ভক্তিহীন হইয়া গৃহস্থালীর নির্দল স্বঃ-বাচ্চল্যা হারায়া দীন কণ্ঠ হইতেছি।

জন্মের যে বল মহাত্মকে অতুলনীয় স্বঃ-সম্পদ প্রদান করে, জন্মের যে নির্মলভায়া মাহু মহাপ্রজ্ঞা অধিকারী হয়, জন্মের সেই বল ও সেই নির্মলভায়া আমরা আর কোথাও অর্জন করিতে পাই না, পাই কেবল মাতৃ-হস্তে। সকল মাতাই যে সন্তানের জন্মের সেই শিক্ষা সামর্থ্য দিতে পারেন এমন কথা

বলিতেছি না। কারণ আমরা যেমন প্রাচীন উচ্চ আদর্শকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছি, আমাদের কুলমহিলারাও আমাদের দেখা-দেখি প্রাচীন আদর্শ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কাজেই আমরা আদর্শ-মাতা অতি অল্পই দেখিতে পাইতেছি।

আদর্শ পুত্র-কলার দ্বারা গৃহস্থালী এবং দেশ ও সমাজ উন্নত ও উজ্জল করিবার জন্মেই আদর্শ জননী অতি আবশ্যক। কৌশল্যা ছিলেন বলিয়াই ভারতে রামচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন। আমরা রামচন্দ্রকে পাইয়াছি—পাইয়া দত্ত হইয়াছি; হুমিতা ছিলেন বলিয়াই—লগনকে পাইয়াছি, পাইবার স্তব্ধ হইয়াছি। স্বনীতির ভ্রাতৃ জননী প্রথিত না হইলে ভারতমাতা ঋণ-সম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ক্যাপুত্ব দ্বারা ভাগ্যবতী মহীশূরী জননীকে যদি মহাপুত্র্যের ফলে বশীকরণ না করিতেন, তাহা হইলে ভারতমাতা প্রজ্ঞাশ্রয়ের তার মহারত্নের অধিকারী হইতে পারিতেন কি? কত বলিবা পুত্রায় ইতিহাসে কত কত অধিক জননীর কথা আছে; তাহাদের মাতৃমহিমা পাঠ করিলে যুগপৎ বিশিষ্ট, তত্ত্বত ও আনন্দিত হইতে হয়; ক্ষেত্র জল কৃষক করিয়া রাখা স্বকটিন হয়। আদর্শ মাতা আমাদের গকে যে মহা মঙ্গলের অধিকারী করিয়া দিতে পারেন, কি দিয়া থাকেন, কি দিয়া আসিতেছেন, তাহার তুলনা কোথায়!

আমাদের গৃহ-গৃহস্থালী মহামঙ্গলের নিবন্ধন। আমরা যে মহামঙ্গলের জন্ম মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া গগতে আসিয়াছি, মাতৃকৃত জন্ম আশ্রয় লইয়াছি, পত্নী-পুত্রের ক্রীতপ্রভু হইব পানে সত্বমঙ্গলে চাহিয়া রহিয়াছি, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার-পরিজনকে মেহে শ্রদ্ধার সহিত আমরা অপরিশ্রুত জন্মে ক্রীত-পরিচর্যা করিতেছি, সেই মহামঙ্গলের যুগ্মাধা বীজ জন্ম-জননী আমাদের শিত্তর স্বকোমল জন্মে রোপণ করিতে পারেন। কেন পারেন, এখন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গগতে ছই রূপ—মাতৃরূপ ও পিতৃরূপ।

অধবা দুই শক্তি, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি।
 মায়ে মনুষ্যময়ী মৃতি দেবলীলৈ শিশুর প্রাণ,
 নন্দপ্রসূতিত ফুলের মত ফুটিয়া উঠে;
 মায়ে মনুষ্যময়ী কথা জনিলেই শিশুর
 হৃদয়কে কামল হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে
 থাকে। ধূলা মাখিয়া, ধূলায় পড়িয়া শিশু
 যেন মন করিতেছে, ছিন্নাশির পতঙ্গের প্রায়
 ছুটছুটি করিতেছে, মা তাঁহার অভয়া মৃতি
 লইয়া স্বকামল হস্তে শিশুর প্রাণে হাত
 বুলাইলেন আর অমনি শিশু উড়িয়া বসিল,
 কোলে বাঁপ দিয়া প্রাণ জুড়াইল; মা যেনে
 অক্ষল শিশুর গায়ে ধূলা জড়িয়া বসে
 লইলেন। শিশু কাদিতে কাদিতে হাসিয়া
 দিল। মায়ে এমনই মহিমা, এমনই
 আশাবাস্য মনুষ্যময়ী স্নেহশক্তি! এই যে ধূলায়
 মলিন শিশু দেবতার হস্তে নির্মল হইল, যেন
 বাসিফুলের স্নেহ কলিকাতা সদা; হইল,
 বৃষ্টিতে হইয়া তুলুঙ্গিত হইয়াছিল, ঐশ্বর্য-
 শক্তিতে আবার বৃষ্টি-শব্দের হইয়া হাসিতে
 লাগিল। ইহা হইল মায়ে নারীশক্তি।
 মায়ে দেবী শক্তি আরও অপূর্ণ। মা সেই
 দেবীশক্তিতে সন্তানকে দেবতার আশ্রয়,
 দেবতার বসন, দেবতার সাজসজা দিয়া
 দেবতা করেন, দেবতার নির্মালা মায়ায় দিয়া,
 প্রাণের আশীর্বাদ দিয়া আশ্রয় ও অভয়দান
 করেন। এই হইল মায়ে দেবীশক্তির
 পূর্ণাঙ্গ। সন্তান এই মহৎ দানেরই
 আকাজ্ঞা। এই মহৎ দানের প্রত্যাপনাই
 সন্তান মা বালিকা কালে মা ভা বালিকা
 হানে। আবার মা'র কোলে উঠিয়া আকারের
 চাঁদ ধরিতে চায়। মা দেবীশক্তির প্রভাবেই
 আকারের হৃদয়বতী হুপ্রাণ চক্ষুকে ডাকিয়া
 ডাকিয়া হর্যাস হন; তবু আনন্দে গদগদ
 হইয়া থাকেন—আয় চাঁদ আর, আমার মণির
 কপালে একটি চিহ্ন দিয়া যা।" সন্তানের জন্ম
 মায়ে এমনই মনুষ্যময়ী ইচ্ছা। মা ইচ্ছাময়ী
 ইচ্ছাকে বকে লইয়া সন্তানের জন্ম আকাশের
 চাঁদ ধরিতে যান। তাই বলিতেছিলাম, মা
 বই আর সন্তানের জন্ম কে আকাশের চাঁদের
 উপাসনা করিবে; মা ভিন্ন আর কে মণির
 কপালে আকাশের চাঁদের টিপের কামনা

করিবে? মা বই আর এমন করিয়া কে
 সন্তানের জন্ম আকাশের চাঁদ ধরিতে হাত
 বাড়াইবেন?
 মা দেখেন আকাশের চাঁদে, আর তাহার
 কোলের চাঁদে কোন পার্থক্য নাই।
 আকাশের চাঁদেও জগৎ আলো করিতেছে,
 তাঁহার কোলের চাঁদেও জগৎ আলো করিতেছে।
 তাই চাঁদকে ডাকিয়া মণির কপালে একটি
 টিপ দিয়া বাইতে বলিয়া থাকেন। মায়ে
 মনুষ্যময়ী ইচ্ছার কথা ভাবিলে বিষয়ে
 অভিভূত, আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে হয়।
 জননীই যে আমাদের মহামঙ্গলের পথ
 দেখাইয়া দিয়া থাকেন বোধ হয় আর তাহা
 কষ্ট করিয়া কাগকেও বুঝিতে হইবে না।
 জননী পুত্রকে কচ্ছাকে আত্মিক যত্নে
 জ্ঞপ্তভাবে শিক্ষা দিবেন, যাহাতে পুত্রকুল-
 গুলি যুগে বাস করিয়া, স্বর্গের দৃষ্টিতে
 স্নেহিতে স্বর্গের সন্মতি সন্মিতে সন্মিতে
 মানবজন্মের মধুরতা, সরসতা, ভ্রুভক্তা,
 অপরমিততা ও অসীমতা প্রাণে প্রাণে জন্মে
 হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া ধর্ম ও কৃতকৃত্য
 হইতে পারে। সেকালে রামচন্দ্র কৃত্য
 হইয়াছিলেন, লক্ষ্মণ কৃত্য হইয়াছিলেন,
 ঐশ্বর্য-প্রসাদ কৃত্য হইয়াছিলেন, আর
 একালে ঐশ্বর্য, রামচন্দ্র, কেশবচন্দ্র
 কৃত্য হইয়াছিলেন। সে কালের কথা
 বলিতে হইলে কত কত মহাপুরুষের কথাই
 বলা যায়। সকল বলিবার আবশ্যকতা নাই।
 তবে ভীমের কথা বলিতে হয়। ভীম
 মাতৃশাস্ত্রায় বক-রাফসের ভঙ্ক্য হইয়া
 গেলেন। বোরুণমানা ভ্রাতৃগণবিবারকে
 রাজসের করালস্বাণ হইতে রক্ষা করিবার
 জন্ম দেবী কৃত্য স্বীয় পুত্র কৃত্যকে
 পঠাইলেন। ভীম মাতৃনির্দেশ শিরোধারী
 রক্ষা করাসের সম্মুখীন হইলেন। রাফসকে
 প্রাণে বধ করিয়া দেশশুদ্ধ লোকের জীবন
 রক্ষা করিলেন। নতুবা একচক্রা নগরের
 কি দুর্দশাই না হইত! গৃহে গৃহে পরিবারে
 পরিবারে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে পুত্রশোক,
 ভ্রাতৃশোক, পতিশোক, পত্নীশোক,
 বন্ধুশোক মাতৃপিতৃশোক সকলেই হৃদয়

ছিন্নবিছিন্ন, নয়ন অশ্রুসমাচ্ছন্ন; প্রাণভয়ে
 ছিন্নবিছিন্নিত হৃদয়-পাশের চাঁদ সকলকেই
 উদ্ধৃত্ত হইতে হইয়াছিল। জননী পুত্রের
 জীবন ধর্ম কৃত্যের আশ্রয়জননীগণ
 এইরূপেই পুত্রকে কৃত্য করেন।

দশা রত্নাকর চিত্রাঙ্কলিতে জননীর চরণ-
 প্রান্তে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,
 মা, আমার পাগের জাদিগি কি তুমি নও?
 তখন মা মাগের মত উত্তর দিলেন, করিলেন,
 —না বাহা, আমি তোমার গর্ভধারিণী মাতা;
 দশমাস দশদিন তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া
 কষ্ট করে কষ্ট করে বয়সা পাইয়াছি; এখন আমি
 বৃদ্ধ, আমার ভরণপোষণ করা তোমার
 কর্তব্য—তোমার পাগের ভাদি আমি কেন
 হইব? তোমার পাগের ফল তোমাকেই
 ভোগ করিতে হইবে। এই ত—মাগের
 কাজ। মা নিজের স্বর্গের জন্মও সন্তানের
 মঙ্গলের পথ রক্ষা করিলেন না। তখন
 রত্নাকর গুপ্তিত হইলেন; দৈবদেয়, জননীও
 তাঁহার পাগের ফল স্পষ্টাপরে বুঝাইয়া
 দিতেছেন। দশা দশের শাঠ্যজ্ঞান মূর
 মৃতি দেখিয়া আমার জ্ঞাপোষণ ও জীবন-
 মাহোন্ম উপলব্ধি করিয়া কৃত্যধর্ম হইলেন।
 দশার দশতা ধর্মিক-কথ্যে, দশার কর্তৃ
 কষ্ট করি স্বর্গের পথিগত হইল। মায়ে
 আশীর্বাদে এইরূপই প্রত্যক্ষ ফল।
 মাতৃভক্ত-ধারার এইরূপই মহায়নী শক্তি!

আমাদের গৃহকে স্বর্গের শোভায়
 সুশোভিত, পুত্রকুলান্তিক দেবতার সেবায়
 অঙ্গভূত, এবং আমাদের সমাজকে, দেশকে
 নীতিজ্ঞানসম্বিত করিবার জন্ম ধরে যেন
 কৌশল জননীর প্রয়োজন। আবার-ধর্ম
 কৌশল্য, হুমিতা, গাভারী, হুমিতা, কায়ঃ
 কৃত্য, পদ্মাবতী প্রভৃতি মহায়নী জননীর
 আবশ্যক। তাহা হইলে দেশে জনতার সেই
 শান্তি আশিবে, গৃহস্থালীতে সেই শান্তি,
 প্রীতি, দেবভক্তি, গুরুভক্তি, ভক্তি, দীনে ধর্ম,
 অশ্রুতবেদ্যতা আশিবে। আমরা মঙ্গলের
 গ্রাম হইতে, সর্বশাস্ত্রের বাহন হইতে
 প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইতে পারিব। নচেৎ
 পরপ্রাণা আবাদিগণকে মঙ্গল দানের ব্যবস্থা
 করিতে পারিবে কি?

এই সেই দিন চট্টগ্রামে শ্রদ্ধাশ্রম তীক্ষ্ণ
 অক্ষাঙ্ক সরকার মহাশয় বার্ষিক্য আশ্রম
 অভিজ্ঞতার চক্ষে দেখিয়া, দৃঢ়তার সহিত
 কহিয়াছেন যে, "আমাদের দুর্দশাই এই,
 আমাদের দূরে পশ্চিমদিকে নিয়তই নয়ন নিক্ষেপ
 করিয়া আমি কহি, কখন আমাদের দিকে,
 আমাদের দূরে দূরে দিকে, আমাদের
 গৃহস্থালীর দিকে দূরে দিকে, আমাদের
 পায়ে ঘুঁ, গায়ে কোটি, মাথায় হেট পরাইয়া
 দিয়া আহ্লাবে আঁচনা হইতেছেন, কিন্তু
 সেই প্রাচীনা আশ্রমালী হুমিতার চাঁদ
 গলায় মালা পরাইয়া ভক্তিপথে পঠাইতে
 ইচ্ছা করেন না; মহিমময়ী জননী হুমিতার
 চাঁদ "বৎস, বন্ধন চিত্রে ছোঁড়ের অঙ্গদগন
 কর। বনবাসে স্বয়ং হটক আর দুঃখই
 হউক, সর্বদা ভাব্যে পরিচর্যা করিও, ছোঁড়
 ভাতকে পিতৃভূলা, ছোঁড় ভাতকে আমার
 মত জ্ঞান করিয়া তাহারে হৃদে স্বয়ং চক্ষে
 হুগু হইও—যাও বৎস, সন্তর বনে গমন
 কর" এইরূপ মহাবাহী কহিয়া সন্তানকে
 নিয়ন্ত্রিত ও উৎসাহিত করিতে এখনকার
 জননীরা যেন নিতান্তই অক্ষণ হইয়া
 পড়িয়াছেন। "বৎস দুর্ভোগদন, যোগদন ধর্ম
 পথেনেই জন্ম" এইরূপ পণ্যকথা কহিয়া প্রকৃত
 পথেই মঙ্গল আশীর্বাদ প্রদান করিতে
 এখনকার জননীরা স্বপ্নাবস্থায়ও যেন রাজি
 নছেন। আর পদ্মাবতীর কথা কি বলি!
 তিনি ত গণতে দ্বা হইয়া রহিয়াছেন।
 কষ্ট, আমাদের মায়েরা সেই মত হৃদয়ের
 দেবীজ্ঞান মহিমার ধার ধারেন কি?
 মায়ে সেই ভুবনমোহিনী মৃতি, মায়ে সেই
 অমৃতনিমজ্জিনী চরিতকথা, মায়ে সেই
 জ্বলোকনিময়কর প্রাণের অপূর্ণ রূপ
 এখনকার জননীরা শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণা
 করেন কি? তাঁদের পরিজ্ঞান মায়া শ্রবণ
 করিয়া, দুই বিন্দু অশ্রু বিন্দু করিতে
 পারেন কি?

আমাদের জননীগণের নিকট আমরা কি
 দনের প্রত্যাশা করিয়া থাকি? মা বিদ্বী

হইয়া বিলাসিনী হইবেন, আমরা তাহা চাই না। আমরা চাই, তপস্বিনী মা—আমরা চাই তপাঙ্কশা জ্বরযমহী জননীর পদারবিন্দ, আমরা চাই ভগবদ্ধকিলোৎপা ত্রস্তারিনী জননীর আশীর্বাদ, আমরা চাই ভোগবিলাস-বিশেষণী পুত্রধজ-ব্রতদারিনী জননীর স্বৈশ্বের ইচ্ছা। আমরা চাই, মাঘের মধুরবাণী সুনিতে সুনিতে, শাস্তোজ্ঞান পবিত্র মুক্তি দেখিতে দেখিতে, পুণ্যপনসপালিত ঘেহের অকল ধরিতে ধরিতে, সঙ্গারপথে, জীবনের পথে প্রাণ লইয়া অগ্রসর হইতে পারি এমন মা। নহিলে “মা ম'লে কি তাঁর ছেলে বাঁচে না?”

এখনকার মাদেয়া আবার কন্ডাকে সেমিজ, বড়ি পুরাইয়া ছুটী সংগীত গাইতে শিকা দিয়াই আশ্বে আশ্বহারা হন; আমাদের কণ্ঠকলে ঘোর দুর্দিন আসিয়াছে; এই দুর্দিনে আদর্শজননী না পাইলে আর মহাব্যাধ রক্ষা করিতে পারিব না। তাই বলিতেছি, ঘরে ঘরে আদর্শ জননী চাই।

আমাদের কুলানন্দা এই কথা বুঝন যে, নারীধর্ম মাঘের উন্নত মহিমা মণ্ডিত না হইলে, নারীপ্রাণ স্নেহকর দৃষ্টিতে মানব-শিশুকে অশেষ মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে, মানবজীবনের অভ্যন্তরে যে এক চির-আনন্দময় চির-পুণ্যপরিভ্রামর, চির-স্বপ্নাঙ্কনাময়, অকূল অপরূপ ও অসাধারণ মধুর জীবন আছে তাহা দেখাইয়া দিতে না পারিলে মাতৃদামের ‘স্বার্থকতা’ কিছুই নাই। একদিন ঘেহের মাতৃভক্তসাপক রামপ্রসাদ অশ্রুস্রাবতনয়ে, বিধবজনীর মঙ্গলমুখী মুক্তি ধ্যান করিতে করিতে আবেগ-পূর্ণ প্রাণে গাহিয়াছিলেন—

“মা হওরা কি মূলের কথা

কেবল প্রসব করলে হয় না মাতা!”

আমরাও ভক্ত সাধকের চরণোদেশ্যে প্রণত হইয়া সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছি। মা চাই, ঘরে ঘরে মা চাই—মাঘের মত মা চাই। মা না হইলে আর বাঁচি না, বাঁচিতে পারিব না। জাপাতসৌখ্যে নয়ন মুগ্ধ হইয়াছে, আপাতমার্ধ্যো মন মোহিত হইয়াছে—জ্বর বিষাক্ত হইয়াছে—এখন মাঘের মত মা চাই। কেবল প্রসব করিয়াই মা হইলেন, এমন মা দিয়া আমরা ভারতের শিশু এখন আর স্বস্থ, বলিষ্ঠ, প্রাণবিশিষ্ট হইতে পারিব না, স্বরূপানু হইতে সমর্থ হইব না। যে জরয় প্রাণের প্রকৃত নির্দশন, সেই মনহীন জরয় হইতে বঞ্চিত বহিরা উৎসন্নের পথে বাইতেছি, আরও যাইব। তাই মা চাই—আদর্শ জননী চাই। ঘরে ঘরে আদর্শ জননীর জ্ঞাত্ত্বিক চেষ্টা করিতে চাইবে; প্রাণের সামান্য বঞ্চিত হইবে। নারীজাতিকে আমাদের সর্বোৎসর্গে সর্গপ্রদেই সেই শিক্ষাই দিতে হইবে।

এই মহাসামান্য জ্ঞাত্ত্ব, আমাদের মাতৃকাকাকাকির সমকল মাতৃস্নেহের কথাকেই নীর্তির নিখিল ভাষায় অকিত করিয়া দেখাইতে হইবে। ভারতের কব্যা-ইতিহাসে আদর্শ-জননী চিত্রের অভাব নাই। সেই সমুদয় আদর্শজননী-চিত্র অকিত করিয়া আমাদের কুলমহিলাবিরগে শিক্ষাইতে হইবে, সেই প্রাচীনকালের আদর্শজননীর বিরূপ পুত্র-কৃতাপগক জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা শিক্ষা দিয়াছিলেন, বিরূপ ভাবে বিরূপ প্রাণে সন্তানের নৈতিক মঙ্গল কামনা করিয়া সন্তানকে জগতের মধ্যে উজ্জলরত্ন করিয়াছিলেন, হিন্দুমহিলাগণ ব্যাধাতে সেই পথের সন্ধান পাইতে পারেন সর্বোৎসর্গে সকলেই সেই চেষ্টা করা সম্ভব।

বিশ্ববার্তা ।

শুভ্রে চ। ৮১।

শুভ্রে চোতি। শুক্র (২৫=১) শব্দোহিত্র লম্বার্থকঃ। অতঃ উচ্চবৎ, উচ্চ ইত্যাদি সূত্রভাঃ, কারকাংশাদ্ ব্যয় স্থানে রব্যাদি গ্রহ স্থিত্যা যথৈব ফল বিচার ক্রিয়তে শুক্র চ কারকাংশেহপি তাদৃশ ফল যোগেঃ জ্ঞাতব্যঃ। ৮১।

শুক্র শব্দ বর্ষ শব্দোহিত্রের এক্ষেপে লম্ব অর্থাৎ কারকাংশ বাচী। কারকাংশ রাশির খাপশ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধে যেরূপ ভক্তিমোগ লিখিত হইয়াছে, কারকাংশ রাশি হইতেও তৎ তৎ গ্রহের স্থিতি বশতঃ তদ্রূপই ভক্তি বিচার কার্য। টীকাকরণ এক্ষেপে পূর্বেকৃত অশীতি সংখ্যক হুজের সহিত সমুদয় রাশি, শুক্রগ্রহ কারকাংশ রাশির ব্যয় স্থানে পাপক্ষেপ গত থাকিলে মহাজ্ঞান দেবতার উপাসক হইয়া থাকে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্তরূপে অর্থ হইলে পাপক্ষেপ সম্বন্ধে কাকাত্যা অথবা শুক্র মন্দে বা নিখিলেই যথেষ্ট হইত; হুজারের প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ শুভগ্রহ শুক্র হইতে ভূত পিশাচাদি ক্ষুদ্র দেবতার চিন্তা করা হুস্তপ্ত নহে। ৮১।

অমাত্য দাসে চৈবৎ। ৮২।

অমাত্যো বর্ততে যত্র তস্মিনো বিজসন্তমঃ।

সূর্যাদি গ্রহসমুচ্চৈ তৎ ফলং পূর্ববৎ দিজঃ।

আত্মকারকান্যুনাংশকো গ্রহোহ্যমাত্যঃ। কারকাশিত্রি নবাংশ রাশে ব্যয়স্থানে কাবকাংশে বা যথৈব ভক্তিবিচারঃ ক্রিয়তে, অমাত্য দাসে চৈবৎ অমাত্য কারকারাশিত্র রাশ্যাপেক্ষয়া দাসে (৭৮=৬) যষ্ঠ রাশাবপি সূর্যাদি গ্রহ স্থিত্যা তথৈব দেবতা ভক্তি শিশ্তনীয়াঃ। ৮২।

কারকাংশের ব্যয়স্থে রব্যাদি গ্রহগণের স্থিতি বশতঃ যে প্রকার ভক্তিমোগ বিচার করা হইয়াছে অমাত্য কারকাশিত্র রাশির যষ্ঠ স্থানে হইতেও তত্ব গ্রহের অবস্থিতি দৃষ্টে তদ্রূপ ফল বিচার কার্য। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, এই ভক্তিমোগ বিচারে অনেক টীকাকার ৬৯ সংখ্যক হুজেকে শুধু এক অর্থ করিয়া সন্দেহ ক্রমে কারকাংশ এবং খাদশ উভয় স্থানকেই লক্ষ্য করতঃ নৌকাব্যয়ে পদার্পণ করিয়াছেন। অনেকে আবার বর্তমান হুজে অমাত্য দাস অর্থে অমাত্য কারক গ্রহ হইতে বারাদি গণনায় যষ্ঠ গ্রহকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নগ্রহঃ হুজ শব্দে পদোপস্থ হইতে বর্ষ শব্দোহিত্রের গ্রহজ্ঞান অস্বচিত। কেহ বা আবার অমাত্য দাস শব্দে অমাত্য কারকের অস্বচর অর্থাতঃ ভ্রাতৃ কারক গ্রহ ব্যাখ্যা করিয়া অগ্রোক্ত চতুর্দশ পাদ ৪০ সংখ্যক হুজের নিরর্থক অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু কোন অর্থই এক্ষেপে সঙ্গত বহিরা গ্রাহ্য নহে। ৮২।

মৈমিনী—১০

ত্রিকোণে পাপদ্বয়ে মাস্ত্রিকঃ । ৮৩ ॥

ত্রিকোণে কারকাংশাৎ পঞ্চম নবমঘোঃ ক্রমেণ পাপদ্বয়ে প্রাপ্তে
পুরুষো মাস্ত্রিকো মন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা ভবতি । ৮৩ ॥

এক্ষণে কারকাংশ রাশির ত্রিকোণ রাশি গচ্ছ ফল লিখিত হইতেছে । কারক নবাংশ
রাশির ত্রিকোণ অর্থাৎ পঞ্চম ও নবম স্থানে যথাক্রমে দুইটি পাপগ্রহ থাকিলে মহন্ত মাস্ত্রিক
অর্থাৎ যত্বেকাধিত হইয়া থাকে । পারাশরী হোরায লিখিত আছে যে উক্ত 'স্বানবয়' গ্রহ
থাকিলেই মহন্ত মাস্ত্রিক হয়, তন্মধ্যে শুভগ্রহ হইতে স্বদেবতার এবং পাপগ্রহ হইতে কুর্ষ
দেবতার উপাসনা চিস্তনীয় । যথা—“কারকাংশাৎ ত্রিকোণেষু খেটে চ তাস্মিকো ভবেৎ ।
পাপেন কুর্ষ দেবন্ত শুভেন শুভ দেবকঃ ॥” ইতি । ৮৩

পাপদ্বয়ে নিগ্রাহকঃ । ৮৪ ॥

কারকাংশাৎ ত্রিকোণ দ্বয়ে সপাণে পাপদ্বয়ে সতি সর্কেয়াং ভূতা-
দোনামপি নিগ্রাহকঃ নিগ্রহ কর্তা স্যাৎ । ৮৪ ॥

উক্ত কারকাংশ রাশির সপাণ ত্রিকোণ দ্বয়ে পুনঃ পাপ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে মহন্ত ভূতাদি
পদার্থ সকলের নিগ্রাহকারী অর্থাৎ পিশাচ বাহাদি নিবারণে সক্ষম হয় । ৮৪ ॥

শুভদ্বয়ে নিগ্রাহকঃ । ৮৫ ॥

কারকাংশাৎ ত্রিকোণদ্বয়ে সপাণে শুভদ্বয়ে সতি পুরুষো লোকেষু
অনুগ্রাহকঃ অনুগ্রহকর্তা ভবতি । ৮৫ ॥

উক্ত সপাণ ত্রিকোণ রাশিদ্বয়ে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে মহন্ত 'অনুগ্রহকারী' হয় । এই
নিগ্রাহগ্রহ শক্তি তাহার মন্ত্র বিচার উপরে নির্ভর করে ইথা বলা বাহুল্য মাত্র । ৮৫ ॥

শুভক্রেন্দী শুভদ্বয়ে রসবাদী । ৮৬ ॥

শুভে (২৫ = ১) . কারকাংশ রাশী ইন্দ্রো চন্দ্রে শুক্রদ্বয়ে সতি
রসবাদী রসায়ন শাস্ত্রবেত্তা স্যাৎ । ৮৬ ॥

শুক্র দৃষ্ট চন্দ্রে, কারক নবাংশ রাশিগত থাকিলে, মহন্ত রসায়ন শাস্ত্রবেত্তা এবং ধাতুর জ্ঞান
মারণে সক্ষম হয় । ৮৬ ॥

বুধ দ্বয়ে ভিষকঃ । ৮৭ ॥

কারক নবাংশ রাশি গতে চন্দ্রে বুধদ্বয়ে সতি মনুষ্যো ভিষক্ বৈদ্যো
ভবতি । ৮৭ ॥

কারক নবাংশ গত চন্দ্রের প্রতি বুধের দৃষ্টি থাকিলে মহন্ত বৈদ্যক শাস্ত্রাভিজ্ঞ হৃচিকিৎসক
হইয়া থাকে । ৮৭ ॥

চাপে চন্দ্রে শুভদ্বয়ে পাণ্ডুশ্রিতী । ৮৮ ॥

কারকাংশাৎ চাপে (১৬ = ৪) চতুর্থ স্থানে চন্দ্রে শুক্র দ্বয়ে সতি
জটিকঃ পাণ্ডু শ্রিতী খেতকৃষ্ঠ রোগাক্রান্তো ভবতি । ৮৮ ॥

কারকাংশ রাশির চতুর্থ স্থানে শুক্র সংদৃষ্ট চন্দ্রে থাকিলে মহন্ত খেত কৃষ্ট রোগে আক্রান্ত
হয় । চতুর্থ স্থানগত চন্দ্রেই কৃষ্টরোগের কারক । ঐষ্টা গ্রহ হইতে তদরোগের প্রকার ভেদ
মাত্র জ্ঞাতব্য । ৮৮ ॥

কুজ দ্বয়ে মহারোগঃ । ৮৯ ॥

কারকাংশাচ্চতুর্থ স্থানে চন্দ্রে কুজদ্বয়ে সতি মহারোগঃ রাজরোগো
ভবতি । ৮৯ ॥

উক্ত চতুর্থ স্থানগত চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টি, মহারোগ অর্থাৎ গলিত কুষ্ঠাদির উৎপত্তি
কারক । অন্ততঃ সে ব্যক্তি রক্তপিত্ত রোগে বিশেষ কষ্ট পায় । ৮৯ ॥

কেতু দ্বয়ে নীল কৃষ্ঠঃ । ৯০ ॥

কেতুদ্বয়ে চন্দ্রে কারকাংশাচ্চতুর্থ স্থান গতে সতি নীলকৃষ্ঠঃ কৃষ্ঠ-
রোগ বিশেষো ভবতি । ৯০ ॥

উক্ত চতুর্থ স্থান গত চন্দ্রের প্রতি কেতুর দৃষ্টি থাকিলে মহন্তের শরীরে নীল কৃষ্ঠের
উৎপত্তি হয় । ৯০ ॥

তত্র যত্রো বা কুজ রাহুভ্যাং ক্ষয়ঃ । ৯১ ॥

তত্র কারকাংশাৎ চতুর্থে যত্রো (৬৫ = ৫) পঞ্চমে বা কুজরাহুভ্যাং
মিলিতাভ্যাং স্থিতাভ্যাং ক্ষয়ঃ ক্ষয়রোগো ভবতি । ৯১ ॥

কারকাংশ রাশির চতুর্থে কিংবা পঞ্চম স্থানে মঙ্গল এবং রাহু একত্রে থাকিলে ক্ষয়রোগের
উৎপত্তি হয় । কুজ এবং রাহু দ্বয়রোগের কারক, সুতরাং গ্রহদ্বয় উক্ত স্থানে একত্রিক
থাকিলেও তত্রোয়ের আশঙ্কা করা মাইতে পারে । অগ্রে ১১৩ সংখ্যক সূত্রে ভাগ্যে চৈবঃ বলিয়া
কারকাংশ রাশির দ্বিতীয় স্থান গত ফল 'স্বভাবভবে উল্লিখিত থাকায় এখানে তত্র শব্দে পূর্বোক্ত
চতুর্থ স্থান ভিন্ন, বর্ণ সম্বন্ধে তাহাচারে দ্বিতীয় স্থান অর্থ করা অযৌক্তিক । কোন কোন
পণ্ডিতগণের উভয়স্থল বজ্রাং রাহিয়া তত্র শব্দে দ্বিতীয় ও চতুর্থ এবং মতি শব্দে পঞ্চম ও
অষ্টম অর্থ করতঃ যে বিশেষ জম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র । ৯১ ॥

চন্দ্রে দ্বয়ে নিশ্চন্দ্রেন । ৯২ ॥

তয়োঃ কারকাংশাৎ চতুর্থে পঞ্চমে বা স্থিতয়োঃ কুজ রাহোরূপরি

চন্দ্র দৃষ্টৌ সত্যং মনুষ্যো নিশ্চয়েন কয়রোগাক্রান্তো ভবতি চন্দ্রদৃষ্ট্যভাবে
বল্লকযো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১২ ॥

উক্ত চতুর্থ বা পঞ্চম স্থান গত কুব্ধ রাহুর প্রতি চন্দ্রের দৃষ্টি থাকিলে নিশ্চয়ই কয়রোগের
উৎপত্তি হয় তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না দৃষ্টি না থাকিলে রোগের বলতা মাত্রই
বিবেচ্য ॥ ১২ ॥

কুজেন পিটিকাদিঃ ॥ ১৩ ॥

তত্র কারকাংশা চতুর্থে পঞ্চমে বা স্থিতেন কুজেন শরীরে পিটিকাদিঃ
বিফোটিকাদয়ো ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

উক্ত কারকাংশ রাশির চতুর্থে কিংবা পঞ্চমে মঙ্গল থাকিলে শরীরে বিফোটিকারি নান-
বিধ রোগের উৎপত্তি হয় ॥ ১৩ ॥

কেতুনা গ্রহণী জলরোগো বা ॥ ১৪ ॥

কারকাংশাং চতুর্থে পঞ্চমে বা স্থানে কেতুনা কেতৌ স্থিতে সতি
গ্রহণী সংগ্রহণী জলরোগো বা জলোদরাদ্যা রোগা বা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥

উক্ত চতুর্থ বা পঞ্চম স্থানে কেতু থাকিলে মহাশ্বের গ্রহণী কিংবা জলোদরাদি রোগ হইয়া
থাকে ॥ ১৪ ॥

রাহু গুলিকাভ্যাং ক্ষুদ্রবিষাণি ॥ ১৫ ॥

কারকাংশাং চতুর্থে পঞ্চমে বা স্থানে রাহু গুলিকাভ্যাং স্থিতাভ্যাং
ক্ষুদ্র বিষাণি ভবন্তি ॥ ১৫ ॥

কারকাংশ রাশির চতুর্থ বা পঞ্চম স্থানে রাহু ও মানি থাকিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষাক্ত প্রাণী
হইতে মহাশ্ব বধ প্রাপ্ত হয় । পারাশরী মতে অষ্টম স্থানে উক্ত গ্রহদ্বয়ের যোগ থাকিলে মহাশ্ব
বিষবৈধ্য হয় । যথা—শতাহুগুলিকে রুদ্রে বিষবৈধ্যঃ প্রজ্ঞাতয়ে ॥ ১৫ ॥

তত্র শনৌ বাতুলঃ ॥ ১৬ ॥

কেতুনা শটিকা শত্রী ১৭ ॥

বুধেন পরমহংসো লগুড়ী বা ॥ ১৮ ॥

রাহুনা লৌহ শত্রী ॥ ১৯ ॥

রবিণা শত্ৰুপী ॥ ২০ ॥

কুজেন কুন্তী ॥ ২০১ ॥

তত্র শনান্ন মৃত্যুবিতি পদমত্র নিরুত্তং । তত্র কারকাংশাং চতুর্থ
স্থানে শনৌ সতি নরো ধানুকঃ শত্ৰুর্বিদ্যানিপুণো ভবতি ত্যোবমগ্রে
স্পষ্টং ॥ ২০-১০১ ॥

এখানে পুনরীকৃত তত্র শনু থাকায় বুঝিতে হইবে যে ১১ সূত্রোক্ত মৃতি (৫ম) পদ অত্র
নিবৃত্ত হইয়াছে । কারকাংশ রাশির চতুর্থে শনি থাকিলে পুরুষ দক্ষিণীয়া নিপুণ, কেতু
থাকিলে ঘটিকাশত্রী, বুধ শুভ থাকিলে পরম হংস বা দণ্ডী, পাশাপাশয় লগুড়ী অর্থাৎ লাঠিয়াল,
রাহু থাকিলে লৌহ শত্রী, রাব থাকিলে খড়্গাদারী অর্থাৎ অসি ঘোড়া (ঘাতক বা বলিচ্ছেদক)
এবং মঙ্গল থাকিলে কুস্তার নিপুণ অর্থাৎ গুল বা সড়কিওয়াল হইয়া থাকে । রণাদি ক্রুর
কার্য সাধকিক বলিয়া বর্তমান স্বয়ংইকে কেবলমাত্র পাপ গ্রহের ফল লিখিত হইয়াছে চন্দ্র
শুক এবং বুধস্পতির কোন উল্লেখ নাই ॥ ১৬-১০১ ;

মাতাপিত্রে পুত্রস্ত গুণস্ত ভ্যাং গ্রাহকৃৎ ॥ ১০২ ॥

কারকাংশাং মাতা (৬৫-৫) পঞ্চমে পিত্রোঃ (৬১-১) কারকাংশে
বা চন্দ্রগুরুভ্যাং স্থিতাভ্যাং পুরুষো গ্রাহকৃৎ গ্রাহকর্তা ভবতি ॥ পঞ্চমাং
পঞ্চমস্তা মনব স্থান মন্যত্রোপ-লক্ষণে বিদ্যাদি বিচারে গ্রাহ্যং ॥ ১০২ ॥

কারকাংশে কিংবা তাহার পঞ্চম স্থানে চন্দ্র এবং বুধস্পতি থাকিলে মহাশ্ব গ্রাহকর্তা হয় ।
নবম স্থান পঞ্চমের পঞ্চম স্তরায় বিদ্যা স্থান মধ্যে গণ্য । পারাশরী হোরাতেও বর্তমান যোগে
লিখিত আছে যে—

চন্দ্রেজৌ কারকাংশে চ লগ্নো বা নব পঞ্চমে ।

গ্রাহকর্তা ভবেন্ননং সর্ববিদ্যা বিশারদঃ ॥

স্তরায় লগ্ন পঞ্চম এবং নবম এই স্থান ত্রয় হইতেই গ্রহ কর্তৃবাদি বিচার কর্তব্য । চন্দ্র এবং
বুধস্পতি উক্ত স্থানে ত্রয়ের কোন এক বা দুই স্থানে থাকিলেই জাতক গ্রাহকর্তা হইবে ইহাই
প্রকৃত সত্য । উপরোক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কারকাংশের নায় লগ্নাদি
স্থানত্রয় হইতেও উক্তরূপ বিদ্যা বিচার অমৌলিক নহে ॥ ১০২ ॥

পুত্রোপা কিস্কিন্দুনং ॥ ১০৩ ॥

বুধেন ততোহপি ॥ ১০৪ ॥

উক্ত স্থান গতে শুক্রে স্বল্প গ্রাহকরো দ্বিজ ।

উক্ত স্থান গতে সৌম্যে কিঞ্চিদ্ গ্রহ করোহাসৌ ॥

কারকাংশ রাশৌ তৎপঞ্চমে (নবমে) বা শুক্রেণ চন্দ্র শুক্রাভ্যাং
স্থিতাভ্যাং গুর্বপেক্ষয়া কিস্কিন্দুনং গ্রাহকর্তৃত্বং স্যাৎ । বুধেন চন্দ্র
বুধাভ্যাং ততোহপি শুক্রাদপি কিস্কিন্দুনং গ্রহ কর্তৃত্বং ভবতি । চন্দ্র ইতি
পূর্বসূত্রোক্তোদয়ঃ ॥ ১০৪ ॥

চন্দ্র এবং শুক্র এই গ্রহদ্বয় একত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কারকাংশাদি ত্রিকোণ গত হইলে মহাযু চন্দ্র গুরুর অপেক্ষা নান গ্রহকর্তা এবং চন্দ্র বুধ তদবস্থাগত থাকিলে চন্দ্র শুক্রাপেক্ষা নান গ্রহকর্তা হইয়া থাকে। এই সূত্রদ্বয়ে গ্রহকর্তৃষ যোগ শেষ হইল। এক্ষণে ত্রিজ্ঞান—মূলে না থাকিলেও শুক্র এবং বুধের সহ টীকায় উল্লিখিত চন্দ্রের সাহচর্য্য কোথা হইতে আসিল। তদন্তরে বলা যাইতে পারে যে,—অগোক্ত বিদ্যাযোগে গুরু শুক্র বা বুধ কোন গ্রহেরই গ্রহকারকতা শক্তির উল্লেখ নাই। ঠাঁহাদের একাধিক সে শক্তি থাকিলে তৎতৎ সূত্রেই লিখিত থাকিত। তন্মধ্যে উপরে চন্দ্র গুরুর যোগে মহাযু গ্রহকার হয় লিখিত থাকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে চন্দ্রের যোগ ব্যতীত শুক্র বা বুধ গ্রহও গ্রহ কর্তৃষ শক্তি প্রদানে অসমর্থ। তবে উক্ত লম্বাদি রাশিভয়ে গুরু চন্দ্রাদির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি অপেক্ষা সহস্রিতি সম্বন্ধ যে বিশেষ প্রবল তথ্যযে কোন সম্বন্ধ নাই। অতঃপর বিদ্যাযোগ আরম্ভ হইল । ১০৪ ॥

শুভ্রেণ কবিবাগ্মী কাব্যজ্ঞপ্ত ॥ ১০৫ ॥

কারকাংশ তৎ ত্রিকোণে বা শুভ্রেণ শুভ্রে সতি জাতকঃ কবিবাগ্মী
কাব্যজ্ঞপ্ত ভবতি ॥ ১০৫

কারকাংশে কিংবা তৎ ত্রিকোণে ঘরে শুক্র থাকিলে মহাযু কবি বাগ্মী এবং কাব্যজ্ঞ হইয়া থাকে । ১০৫ ॥

গুরুণা সর্ববিদঃ প্রাশ্নিকশ্চ ॥ ১০৬ ॥

নবাগ্মী ॥ ১০৭ ॥

বিশিষ্য লৈস্বাকরণো বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞ ॥ ১০৮ ॥

পূর্বোক্ত কারকাংশাদি স্থানত্রয়ে যতকুত্র চিৎ গুরুণা গুরো স্থিতে
সতি সর্ববিদঃ সর্বশাস্ত্রার্থজ্ঞো প্রাশ্নিকশ্চ দৈবজ্ঞশ্চ পুরুষো ভবেৎ ।
তথা বিশিষ্য বৈয়াকরণো বিশিষ্ট ব্যাকরণবৈজ্ঞানিক বেদ বেদাঙ্গ বিজ্ঞ ভবেৎ
কিন্তু বাগ্মী সভামধ্যে বক্তৃতা শক্তি সম্পন্নো ন ভবেদিত্যশেষঃ ॥ ১০৮ ॥

উক্ত কারকাংশাদি রাশিভয়ের কোন স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে মহাযু সর্বশাস্ত্রার্থবৈজ্ঞানিক বিশিষ্ট বৈয়াকরণ এবং বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে হনিপূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু সভামধ্যে তাহার বক্তৃতা করিবার শক্তি থাকে না । ১০৮ ॥

সভাজ্ঞঃ শনিনা ॥ ১০৯ ॥

বুধেন মীমাংসকঃ ॥ ১১০ ॥

কুজেন নৈস্বাস্ত্রিকঃ ॥ ১১১ ॥

চন্দ্রেণ সাংখ্যশাণ্ডিল্যঃ সাহিত্যজ্ঞো পান্থকশ্চ ॥ ১১২ ॥

রবিণা বেদান্তজ্ঞো দীপ্তজ্ঞশ্চ ॥ ১১৩ ॥

কেতুনা গণিতজ্ঞঃ ॥ ১১৪ ॥

পূর্বোক্ত স্থান এয়ে শনিনা শনো স্থিতে মতি সভাজ্ঞঃ নরঃ সভায়ং
কিঞ্চিদপি বক্তৃ মসমর্থো ভবতি এবমগ্রাহপি স্পষ্টকং ॥ ১০৯—১১৪ ॥

পূর্বোক্ত স্থানত্রয়ে শনি থাকিলে মহাযু সভাজ্ঞ অর্থাৎ মুখতারো, বুধ থাকিলে মীমাংসা শাস্ত্রজ্ঞ, মঙ্গল থাকিলে নৈয়ায়িক, চন্দ্র থাকিলে সাংখ্য যোগজ্ঞ সাহিত্যসেবী ও সঙ্গীত বৈজ্ঞানিক, রবি থাকিলে বেদ বেদান্ত পারগ এবং সঙ্গীত কুশল তথা কেতু থাকিলে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত হয় ॥ ১০৯—১১৪ ॥

গুরু সঙ্কল্পেন সম্পদাস্ত্র সিদ্ধিঃ ॥ ১১৫ ॥

*পূর্বোক্তে সর্বত্রৈব যোগে গুরুসম্বন্ধেন বৃহস্পত্যন্তর্যোগ দৃষ্টি যজ্ঞ-
বর্গাদি সম্বন্ধে সতি সম্প্রদায় সিদ্ধিঃ গ্রহ কর্তৃষাদিকং তৎতৎ শাস্ত্র
সম্প্রদায়জ্ঞো ভবতি ॥ ১১৫ ॥

পূর্বোক্ত গ্রহ কর্তৃষাদি যোগে তৎতৎ কারকযুক্তি গ্রহ, বৃহস্পতির যোগ দৃষ্টি বা তৎ বর্গাদি
কোনরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলে জাতক তৎতৎ শাস্ত্রসম্প্রদায়ে সবিশেষ পারদর্শী হয়। যথা
মঙ্গল, বৃহস্পতির ক্ষেত্র নবাংশাদিগত কিংবা তৎ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া পূর্বোক্ত লম্বাদি
স্থানত্রয়ে কোথাও অবস্থান করিলে জাতক যেন যথং জায় শাস্ত্র হইবে ॥ ১১৫ ॥

ভাগ্যে চৈবৎ ॥ ১১৬ ॥

ভাগ্যে (১৪-২) কারকাংশাৎ দ্বিতীয় স্থানেহপি চৈবৎ কারকাংশে
তৎ ত্রিকোণে বা চন্দ্র গুরাদি যোগেন যথা গ্রহ কর্তৃষাদি বিদ্যা বিচারঃ
ক্রিয়তে, তদ্বৎ বিচারঃ কার্য্যঃ ॥ ১১৬ ॥

পূর্বোক্ত কারকাংশে এবং তৎত্রিকোণে রাশি হইতে চন্দ্র গুরাদি যোগে যেক্রপ বিদ্যা বিচার
করা হইয়াছে কারকাংশ রাশির দ্বিতীয় স্থান হইতেও তদ্রূপ বিচার কার্য্য। এই দ্বিতীয়
স্থান লম্বাদি রাশি বিদ্যা স্থান মধ্যে গণনীয় হইল ॥ ১১৬ ॥

সদা চৈব নিত্যোকে ॥ ১১৭ ॥

সদা (৮৭-৩) কারকাংশং তৃতীয় স্থানেহপি চৈব তদ্বৎ বিদ্যা-
বিচারঃ কার্য্যঃ ইত্যোকে ইতি একে বদন্তি ॥ ১১৭ ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে কারকাশের তৃতীয় স্থান হইতেও চন্দ্র গুরুাদি গ্রহযোগে
পূর্ব্বৎ বিদ্যাবিচার কর্তব্য। কিন্তু এই ইত্যোকে শব্দ হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে
তৎস্থান হইতে বিদ্যাবিচার স্বরকারের অর্থমোচিত নহে ॥ ১১৭ ॥

ভাগ্যে কেতৌ পাপদৃষ্টে স্তব্ধবাক ॥ ১১৮ ॥

কারকাংশং ভাগ্যে (১৪-২) দ্বিতীয় স্থানে কেতৌ পাপদৃষ্টে সতি
জাতকঃ স্তব্ধবাক শীঘ্রোত্তর দানাসমর্থো ভবতি ॥

কারকাশ রাশির দ্বিতীয় স্থানে কেতু পাপদৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিলে মহয়া স্তব্ধবাক
অর্থাৎ তেংলা হইয়া থাকে। পায়শরী হোয়ার লিখিত আছে যে কারকাশে কিয়া তাহার
দ্বিতীয় ও নবম স্থানে উক্ত যোগ থাকিলে জাতক বাচাল হয়।

যথা—কারকাশাদ ধনে কেতৌ তথা ভাগ্যালে গতে।

পাপু গ্রহেণ সাদৃষ্টে বাচালস্ত ভবেন্নরঃ ॥

স্ব পিতৃপদাৎ ভাগ্য রোগকোঃ

পাপসাম্যে কেমজ্ঞ মঃ ॥ ১১৯ ॥

স্ব আত্মকারকাং পিতৃ (৬১-১) জন্মলগ্নাৎ পদাৎ লগ্নারূঢ়াৎ বা
ভাগ্য (১৪-২) রোগয়োঃ (৩২-৮) দ্বিতীয়ে নিধন স্থানে চ পাপসাম্যে
সমসংখ্যক পাপগ্রহে সতি কেমজ্ঞমঃ কেমজ্ঞনাম যোগো
ভবতি ॥ ১১৯ ॥

আত্মকারক হইতে, জন্ম লগ্ন হইতে কিয়া লগ্নারূঢ় পদ হইতে দ্বিতীয় ও অষ্টম এই দুই
স্থানে সমসংখ্যক পাপগ্রহ থাকিলে কেমজ্ঞম নামক যোগ হয়। বুদ্ধ কারিকায় লিখিত
আছে।—

আরূঢ়াৎ জন্মলগ্নায়া পাপাঃ ত্রিহানিশৌ যদি ।

কেবলে সগ্রহেহপি সমসংখ্যৌ শুভাশুভৌ ॥

চন্দ্রদৃষ্ট্য বিশেষেণ যোগো কেমজ্ঞমো মতঃ ।

উক্তস্থানে গ্রহো নাস্তি কেমজ্ঞম স্তদাপ্যসৌ ॥

আরুঢ় কিয়া জন্ম লগ্ন হইতে দ্বা—দ্বিতীয় এবং হানি—ষষ্ঠম স্থান যদি গ্রহরূঢ় হয় কিয়া
উভয়ই এক একটি পাপগ্রহ থাকে তাহা হইলে কেমজ্ঞম নামক যোগ সংঘটিত হয়। উক্ত

প্রাপ্য ব্রহ্মবনং শীতং নীরজস্কমকটকম্ ।

প্রাপ্য বৃষ্টি পরং প্রাজ্ঞা নিবৃত্তিঃ বৃষ্টিবর্জিতাঃ ॥ ১৩ ॥

ভূতেন্দ্রিয়ময়ং স্থলং ন ত্বং রাজ্ঞ ন চাপ্যহম্ ।

ন তন্মাত্রং ময়া বাচ্যং নৈবাস্তঃকরণান্নাকৌ ॥ ১৪ ॥

কং বা পশ্যামি রাজেন্দ্রঃ প্রধানময়মাবয়োঃ ।

যতঃ পরো হি ক্ষেত্রজঃ সজ্ঞাতো হি গুণান্নকঃ ॥ ১৫ ॥

মশকৌছুষরেবীক-মুঞ্জ-মংস্যাস্তাসাঃ যথা ।

একহেহপি পৃথগ্ ভাবস্তথা ক্ষেত্রান্নো নৃপ ॥ ১৬ ॥

অলঙ্ক উবাচ ।

ভগবৎস্তব প্রসাদেন মমাবিচ্ছ'ত্নমুত্তমম্ ।

জ্ঞানং প্রধানচিহ্নস্তি-বিবেককরমীদৃশম্ ॥ ১৭ ॥

কিস্ত্বত্র বিষয়াক্রান্তে হৈর্হ্যবদ্বং ন চেতসি ।

ন চাপি বেদী সূচ্যেয়ং কথং প্রকৃতিবন্ধনং ॥ ১৮ ॥

শীতল, নীরজ, অকটক ব্রহ্মবন,

নিবৃত্তির সঙ্গে তথা করে বিচরণ। ১৩।

ভূতেন্দ্রিয়ময় স্থল দেখে আমি নয়

তুমিও রাজ্ঞ তাই, জানিও নিশ্চয়।

মন, বুদ্ধি, অব্ধার সম্বন্ধে হয়,

যে অন্তঃকরণ কিয়া তন্মাত্রা—তা' নয়। ১৪।

আমাদের মাঝে কি বা প্রধান রাজ্ঞ ?

ক্ষেত্রজ নিশ্চয় সেই—নহে অস্ত্র জন।

গুণের সংখ্যা এই—গুণাতীত সেই।

তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র—ভবমাঝে নেই। ১৫।

মস্তক-মশকাদি জলে থাকিয়া যেমন

পৃথকে একত্ব,—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ তেমন। ১৬।

বলিলা অলঙ্ক—“প্রসাদে তোমার

উদয় হইল মোর

প্রধান চিহ্নস্তি-বিবেক-কারক

জ্ঞান—যুচে পেল যোর। ১৭।

কিন্তু বিষয়েতে আক্রান্ত অস্ত্র

হৈর্হ্যা তাহে নাহি পায়,

কিসে মুক্ত হয় দাক্ষণ নিগড়ে

বল মোরে সে উপায়। ১৮।

* তন্মাত্র, বিবেক মূল উপাধান। ইহাদের সংখ্যা পাঁচটি। শব্দ তন্মাত্র বা যোমতত্ত্ব, স্পর্শতন্মাত্র বা
বাস্তুতত্ত্ব, রূপতন্মাত্র বা তেজতত্ত্ব, রসতন্মাত্র বা স্পৃশ্যতত্ত্ব এবং গন্ধতন্মাত্র বা ক্রিতিতত্ত্ব। তৎসংখ্যায় অর্থাৎ
যে উপাধান পূর্ণার্থ থাকে তাহাতে গন্ধ রস রূপাদি হইয়াছে তাহাই তত্ত্বং তন্মাত্র। এই তন্মাত্র-তত্ত্ব-পঞ্চকের
পাকীকরণ বলে মাহাত্ম্য-পাকের উৎপত্তি। বরুণ-উপনদ্ধি সাধন সাপেক্ষ।

কথং ন ভূয়াৎ ভূয়শ্চ কথং নিগুণতামিয়াম্ ।
কথঞ্চ ব্রহ্মণৈকত্বং ভ্রজেয়ং শাস্ততেন বৈ ॥ ১৯ ॥
তন্মে যোগং তথা ব্রহ্মন্ প্রণতায়াম্ভিষাচতে ।
সম্যগ্ ক্রুহি মহাপ্রাজ্ঞ সংসদে। হ্যপক্লম্ণাম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে অলক্চরিতো দত্তাজ্যেয়ালক্চরিতাধে
যোগপ্রদো নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

জনম মরণ	ঘুচে যায়, যায়	তব সঙ্গ সম	সাধু-সঙ্গ আর
গুণাতীত হ'তে পারি,		ভোগ্য কা'র কবে হয় ?	
ব্রহ্মকব ভাব	হ'বে, যা'হে লাভ	যোগ-পথ মো'রে	কর প্রদর্শন
বলহ উপায় তারি । ১৯ ।		যা'হে প্রবর্তিত হ'লে,	
সাধু-সঙ্গে হয়	মহা-উপকার	সর্গাভীষ্ট লাভ	হইবে আমার
জানি আমি হুনিশ্চয় ;		জানি আমি, অবহেলে ।" ২০ ।	

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে অলক্চরিতাষ্টগত দত্তাজ্যেয়ালক্চরিতাধে
যোগ-প্রদো নামক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।



একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

দত্তাজ্যেয় উবাচ ।

জ্ঞানপূর্ব্বো বিয়োগো যোহজ্ঞানেন সহ যোগিনঃ ।
স। মুক্তিব্রহ্মণ্য চৈক্যমনৈক্যং প্রাকৃতৈত্ত্বৈঃ ॥ ১ ॥
যোগে চ শক্তিবিন্ধ্যাং যেন শ্রেয়ঃ পরং ভবৎ ।
মুক্তিরোগাং তথা যোগঃ সম্যগ্জ্ঞানামুদীপতে ॥ ২ ॥
সঙ্গদোষোন্তবং ছুৎখং সমস্বাস্ত্রচেতসাম্ ।
তস্মাৎ সঙ্গং প্রযত্নেন মুমুক্শুঃ সন্তোজেনরঃ ।
সঙ্গাভাবে মমোত্মাং থ্যাতের্হানিঃ প্রজায়তে ॥ ৩ ॥
নির্গমসত্ত্বং স্থথায়ৈব বৈরাগ্যাদোষদর্শনম্ ।
জ্ঞানাদেব চ বৈরাগ্যং জ্ঞানং বৈরাগ্যপূর্ব্বকম্ ॥ ৪ ॥
তদগৃহং যত্র বসতিতন্তোজ্যং যেন জীবতি ।
যশ্মুক্তয়ে তদেবোক্তং জ্ঞানমজ্ঞানমগুণা ॥ ৫ ॥

বলিলেন দত্তাজ্যেয়—“তনুহ, রাজন,
শাশন-সম্পদে যোগী সম্পন্ন যেমন
জ্ঞানপূর্ব্ব বিয়োগ যে অজ্ঞানের মনে,
মুক্তি যদি তাহারে বলেন জ্ঞানগণে ।
ব্রহ্ম সহ ঐক্য তাহে হয় সংঘটন
অনৈক্য প্রাকৃতগুণে জ্ঞানে সাধুজন । ১ ।
যোগবলে প্রাজ্ঞগণ শক্তি লাভ করে,
শ্রেষ্ঠ শ্রেয়োলাভ তাহে জানিহ অন্তরে ।
তনু, রাজ্য, যোগবলে মুক্তিলাভ হয়
সম্যক্ জ্ঞানেতে যোগ জ্ঞান হুনিশ্চয় ।
সঙ্গ-দোষে হয় ভবে ছুৎখের উদয়
মমতা আশক্তি হ'তে ঘটে হুনিশ্চয় । ২ ।

সেই হেতু সঙ্গ ত্যাগ করিবে যতনে
মুক্তির বাসনা যেবা রাখে নিজ মনে । ৩ ।
সঙ্গাভাব হ'লে হয় মমতার নাশ ;
নির্গমসত্ত্ব অবৈর কারণ মহেশ্বাস ।
বৈরাগ্য জন্মিলে হয় দোষের দর্শন,
সঙ্গসং বিজ্ঞানের তাহাই কারণ ।
জ্ঞান-লাভ হ'লে হয় বৈরাগ্য-উদয়,
বৈরাগ্যের পূর্ব্ব জ্ঞান নাহিক সংশয় । ৪ ।
সেই গৃহ যথা বাস হইবে যখন ;
তাই ভোজ্য যা'হে হ'বে জীবন-রক্ষণ ;
মুক্তির কারণ যা'হা জ্ঞান বলি তা'রে,
আর সব অজ্ঞান জানিহ এ সংসারে । ৫ ।

ধৃতিঃ প্রাপ্তিস্থথা সংবিৎ প্রসাদশচ মহীপতে ।
 স্বরূপং শূণ্ণ চৈতেমাং কথ্যমানমমুক্ৰমাৎ ॥ ২১ ॥
 কর্ণগামিষ্টকুটীনাম্ জায়তে ফলসঙ্কয়ঃ ।
 চেতসোহপকষায়ত্বং যত্র সা ধৃতিকচ্যতে ॥ ২২ ॥
 ঐহিকামুখিকান্ কামান্ লোভমোহাস্ত্রকান্ শয়ম্ ।
 নিরুপ্যান্তে সদা যোগী প্রাপ্তিঃ সা সার্বকালিকী ॥ ২৩ ॥
 অতীতানাগতানর্থান্ বিপ্রকুটতিরোহিতান্ ।
 বিজ্ঞানাতীন্দু-সূর্য্যক্ষ-গ্রহাণং জ্ঞানসম্পদা ॥ ২৪ ॥
 তুল্যপ্রভাবস্ত যদা যোগী প্রাপ্নোতি সম্পদম্ ।
 তদা সংবিদিতি খ্যাতা প্রাণায়ামস্য সংস্থিতিঃ ॥ ২৫ ॥
 যান্তি প্রসাদং বেনাস্য মনঃ পঞ্চ চ বায়বঃ ।
 ইন্দ্রিয়গীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ স প্রসাদ ইতি স্মৃতাঃ ॥ ২৬ ॥
 শৃণুধ চ মহীপাল প্রাণায়ামস্য লক্ষণম্ ।
 যুক্ততশ্চ সদা যোগং যাদৃধিহিতমাসনম্ ॥ ২৭ ॥

ধৃতি, প্রাপ্তি, সংবিৎ, প্রসাদ, এই চারি,
 হে রাজন, তন বলি স্বরূপ বিস্তারি। ২১ ।
 ইষ্ট দুই বৃত্তিধি বর্ধকল হয়
 যেই অবস্থায় হয় সেই সব ক্ষয়,
 অণ-কষায়ত্ব যাহে চিত্তের নিশ্চয়,
 সেই ত অবস্থা ধৃতি নাইক সংশয়। ২২ ।
 লোভ আর মোহাস্ত্রক, কামনানিচয়
 ঐহিকামুখিক, সে নিকট যাহে হয়
 সকল সময়ে—সেই অবস্থা নিশ্চয়
 প্রাপ্তি নামে খ্যাত তাহে নাইক সংশয়। ২৩ ।
 অতীতানাগত যত অনর্থের নাশ
 হ'য়ে যাহে হয় স্পষ্ট জ্ঞানের বিকাশ,
 চক্ষু স্বর্য্য আদি গ্রহ-সংস্কটনিচয়—
 নবধর্পনের মত জ্ঞানগম্য হয় ;

অতুল প্রভাব লাভ করে যোগী যাহ
 পরম সম্পদ তাহা কি সম্ভেদ তা'য় ।
 প্রাণায়ামে, স্থিতি-পদ সেই ত নিশ্চয়
 সংবিৎ অবস্থা সেই নাইক সংশয় । ২৪-২৫ ।
 যে অবস্থা লাভ হ'লে পঞ্চ-প্রাণ, মন
 প্রসন্নতা লাভি' শূণ্ণ রহে অহঙ্কণ,
 ইন্দ্রিয়নিচয় আর ইন্দ্রিয়-বিষয়—
 প্রশান্ত ভাবেতে নিজ কার্যে রত রয়,
 প্রসাদ অবস্থা সেই তনই রাজন,
 ইথে যোগী শাস্তি-ত্বরণে রহে অহঙ্কণ । ২৬ ।
 প্রাণায়াম লক্ষণ বলিবে হে রাজন,
 মন গিয়ে সেই তত্ত্ব করহ শ্রবণ ।
 যোগের সাধনে যে আসন যোগ্য হয়
 বিস্তারি বলিবে এবং নাশিতে সংশয় । ২৭ ।

পদ্মাসনাদাসনকপি তথা স্তিতিকমাসনম্ ।
 আশ্রয় যোগং যুক্তীত কৃদ্ধা চ প্রণবং হৃদি ॥ ২৮ ॥
 সমঃ সমাসনো ভূত্বা সংস্তুতা চরণাবুভৌ ।
 সংবৃতাস্যন্তথৈবোরু সন্যথিক্তভা চাপ্রত্যঃ ॥ ২৯ ॥
 পার্শ্বভ্যাং লিঙ্গস্বর্ণগবীষ্পুশ্ণং প্রযতঃ স্থিতঃ ।
 কিকিছুমাসিতশিরা দন্তৈর্দন্তান্ন সংস্পৃশেৎ ॥ ৩০ ॥
 সম্পাশ্চ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ।
 রজসা তমসো বৃত্তিং সন্দেশ্ন রজসন্তথা ।
 সঙ্গাদ্য নিম্নলে ভেদে স্থিতো যুক্তীত যোগবিৎ ॥ ৩১ ॥

পদ্মাসন, অর্দ্ধাসন, স্বরিক আসন,
 এ তিনের অচ্ছত্তম করিবা গ্রহণ,
 হৃদয়ে প্রণব ধরি' যোগী যুক্ত হ'য়ে
 প্রাণায়ামে হ'বে রত সতত নির্ভয়ে । ২৮ ।
 সমভাবে সমাসনে করিবা আসন,
 গুটাহিয়া রাবি সদা উভয় চরণ,
 পার্শ্বযুগ্মে বৃণবাধি করিবা পীড়ন,
 সংবৃতাক্ত হ'বে, উক করি' আবরণ,
 ক্ষুদ্রপুষ্টি হ'বে—শির ঈষৎ নমিত

প্রযত হইয়ে হ'বে আসনেতে স্থিত ।
 দন্তে দন্তে সেই কালে না করি পীড়ন,
 নাসাগ্রে-ক্রমশ্চ-স্থলে করিবে দর্শন
 অত্র কোন দিকে দৃষ্টি যাহে নাহি যায়
 মন স্থির করি' তা'র করিবে উপায় । •
 রজোগুণে তমোবৃত্তি করি' আবরণ,
 পরে সর্বগুণে রাজা করি' আবরণ,
 পরে তথাভীত সে নির্মল তবে র'য়ে
 সতত থাকিবে যোগী যোগযুক্ত হয়ে । ২৯-৩১ ।

• শ্রীমহাভাগবতগীতার লিখিত আছে—

“অতৌ যেনো প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাসনম্ ।
 নাভ্যস্থিত তঃ নাভিনীচঃ সৈল্যজিনসুশোভনম্ ॥
 তৈরেকার্য্যঃ মনঃ স্তব্ধা যতচিত্তেন্দ্রিয়কিঞ্চিৎ ॥
 উপবিষ্টদাসেন যুক্তাদ্যংগামবিত্তকৃতঃ ॥
 সমং কাশিরোহীযং পারশ্বেরকো স্থিরঃ ॥
 সাংকো নাসিকাগ্রঃ স্বঃ শিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥
 প্রশপ্তভায়া বিপতন্তীর জটায়ী রতৈরহিতঃ ॥
 মনঃ সংযদা বহিত্তো যুক্তো অশীত বৎসরঃ ॥
 যুক্তমেবঃ সদা স্থানঃ যোগী নিরতমানসঃ ॥
 শান্তিঃ নির্দোষপরমাঃ মংসাঃসানিধিগচ্ছতি ॥

ইত্যাদি (বট অখ্যায়)

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রাণাদীন মন এব চ ।
 নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥ ৩২ ॥
 যন্ত প্রত্যাহরেৎ কামান্ সৰ্ব্বাপ্রাণীৰ কল্পপঃ ।
 সদাশ্রয়তিরেকসং পশুত্যান্নান্নান্নান্নি ॥ ৩৩ ॥
 স বাহ্যভ্যন্তরং শৌচং নিষ্পাদ্যাকণ্ঠনান্ধিতঃ ।
 পূরয়িত্বা বুধো দেহং প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥ ৩৪ ॥
 প্রাণায়াম দশ ধৌ চ ধারণা সান্ধিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥
 যে ধারণে স্মৃতে যোগে যোগিভিত্তবদৃষ্টিভিঃ ।
 তথা বৈ যোগযুক্তস্য যোগিনো নিয়তান্ননঃ ॥ ৩৬ ॥
 সৰ্ব্বৈ দোষাঃ প্রণশস্তি বহুশ্চৈবোপজায়তে ।
 বীক্ষতে চ পরং ব্রহ্ম প্রাকৃতাত্মশ গুণান্ পৃথক ।
 ব্যোমাদিপৰমাণুশ্চ তথান্নান্ননকল্যম্ ॥ ৩৭ ॥
 ইথং যোগী বতাহারঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ ।
 জিতাং জিতাং শনৈশ্চু মিমারোহেত যথা গৃহম্ ॥ ৩৮ ॥

ইন্দ্রিয়-বিষয় হ'তে ইন্দ্রিয়নিচয়
 সংযত করিবে, আর মনোবৃত্তিচয় ;
 প্রাণ মন সংযত করিয়া এক করি'
 প্রত্যাহার সাধন করিবে যন্ত্র করি' ॥ ৩২ ॥
 কৃষ্ণ যথা নিজ অঙ্ক করে আবরণ,
 সেইরূপ সর্ববৃত্তি করি' আচ্ছাদন,
 সকল কামনা করিবেন প্রত্যাহার
 সৰ্বা আশ্রয়িত হ'বে এই তত্ত্ব সার ।
 আশ্রয় মধ্যে আচ্ছাদ্যে করিলে দরশন,
 অন্যদৈ ঘূড়িয়ে যাবে সকল বন্ধন ॥ ৩৩ ॥
 যেই জন এইরূপ করেন সাধন,
 বাহ্য অভ্যন্তর তা'র শুদ্ধ অহঙ্কণ ।
 একরূপ হইয়া ভূতি, সৰ্বা প্রাজ্ঞজন,
 নান্দিত হ'তে কণ্ঠাধি বায়ুর পূরণ
 করিয়া মাণিবে পরে স্তবে প্রত্যাহার
 সাধনের এই বিধি কহিলাম সার ॥ ৩৪ ॥

প্রাণায়াম ধারণ—ধারণা নাম হয়,
 তাহার সাধনে প্রাণ স্থির হনিচয় ॥ ৩২ ॥
 তদ্বদশী নিয়তান্না যুক্ত যোগীগণ
 দ্বিবিধ ধারণা বলি করেন বর্ণন ॥ ৩৩ ॥
 ধারণা হইলে হয় সৰ্ব দোষ ক্ষয় ;
 স্থির স্বাস্থ্য লাভ হয় নান্নিক সংশয় ;
 অস্তর প্রাকৃত গুণ সমুদায় হ'তে
 পররঞ্জে প্রত্যাক করয়ে অস্থরহতে ।
 ব্যোমাদি সকল তত্ত্ব পরমাণু আর
 অকল্প্য আদ্যা নিজ প্রত্যাক তাহার ॥ ৩৭ ॥
 যোগী, যতাহারী হ'য়ে প্রাণায়ামপর
 হইলে এ সব জ্ঞান লাভয়ে সম্বর ।
 দীর্ঘে দীর্ঘে শুভে শুভে সোপানে উত্তীয়া
 যেই মত স্বরূপ নর গুণে প্রবেশিয়া ;
 সেই রূপ, যোগী দীর্ঘে ভূমি জয় করি
 ক্রমেতে উন্নত হন যোগপথ ধরি ॥ ৩৮ ॥

কলিকাতা সিন্ধি ম্যাগাজিন লাইব্রেরি

গবেষণা কেন্দ্র

১৮/এম, ঢামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

গাহস্থ

“মনে পড়ে সে বালকে ?” বুহু সে প্রাণ
 ধরদীর ঈদারের মেন এক ধান—
 বিপুল বটের মত—সুই যে বাড়িছে ?
 চৌকি-প্রকৃতি তার হাত প্রসারিছে
 আনন্দ অকুটিমুক্ত, উদার, নবীন ।
 মহিষ লয়ে সে মাঠে ধার প্রতিদিন—
 গরু বাধি তরু ছায়ে, তরুকে তুলে,—
 সমুদ্রে নদম, মাধা হস্ত পূরে গুণে,
 বৌয় করে অহুভব, সিদ্ধ অহুভব,
 স্বপ্নপুষ্টি প্রাণে প্রতিবিন্দু অহুভব ।

* * * * * কত কিরিলাম,—

কোথা লোক ? প্রাণ যার মুক্ত ? পৃথিবীর
 সর্বস্বাপ পড়ে যেথা ? লম্বু কি গভীর—
 প্রতিকূপ ছড়ছড়িবে রক্ত এক কবি'
 উৎপন্নীত হয় গিয়া অসীম উপরি ?
 বুঢ়াবাহ—ওই জেলে-ছেলের মতন
 জীবন-সমুদ্রে মাঠে করিয়া কেপণ
 নিজেরে সহসা, বহু ছলিয়া ভুলিয়া
 আবার আনন্দে উঠে হৃদয় ভাসিয়া—
 হস্তমুখে ফলাস্কপ ফেলে কর্কশাল—
 “নিশ্চয় উঠিবে মংগু”—বৈরাগ্যচূড় ভাল ।
 সে লোক নিশ্চয় অতি যোবর ভালবাসে
 —তা'লে নলে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে ?
 —জীবন, জীবন, ভাই, আনন্দ জীবন ।”

৬সত্যীশচন্দ্র রায় ।

৫ম খণ্ড

চৈত্র, ১৩২০

৫ম বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

১। বঙ্গ গীতাপ্রচার

আজ কাল প্রায় সকলেই গীতার
 আলোচনা করেন। প্রায় প্রত্যেক গৃহেই
 গীতা পঠিত ও শ্রুত হয়। কিন্তু কিছুদিন
 পূর্বে এরূপ ছিল না। হিন্দুশাস্ত্রাবাদী
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যেই ইহা আবদ্ধ ছিল।

ইংরেজী শিক্ষিত নুতন তত্ত্বের লোক সমাজে
 ইহা আবৃত্ত হইত না। কিন্তু শেষে কিছুকাল
 “শিক্ষিত”দিগের মধ্যে গীতার আদর বাড়িয়া,
 গেল, তাহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস শ্রীযুক্ত
 দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাহার নব-
 প্রকাশিত শ্রীমাদ্ভগবত গীতাহবদে দিয়াছেন।
 তিনি লিখিয়াছেন,—

“প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইল, আমরা এই গীতাহুবাৎ প্রস্তুত হই। তখন এ দেশে ‘শিকিত’ সম্প্রদায়ের মধ্যে গীতার সৌরভ প্রচলন ছিল না। তখন গীতার ভাল সংরক্ষণও পাওয়া যাইত না। তখন কেবল পণ্ডিত হিতলাল মিশ্রের অধিবাসন গীতা আদিত্রাশ্বনমাজ্ কব্জ প্রকাশিত হইয়াছিল।—বটতলার ছাপা গীতা মাত্র অবলম্বন করিয়া, এবং পণ্ডিত জ্যাক ভেলাং প্রণীত পরাহুবাৎ উপলক্ষ্য করিয়া এই অধুবাৎ প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন আমাদের দেশে ‘শিকিত’ যুবকগণ গীতার নামও জানিতেন কি না সন্দেহ। তাহার পর ‘হিন্দুগণের’ ‘পুনরুত্থান’ হয়, অর্থাৎ ‘শিকিত’ সম্প্রদায় মধ্যে সনাতনধর্ম-চর্চা আরম্ভ হয়, এবং তাহার সহিত গীতার আলোচনাও আরম্ভ হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামনি মহাশয়, কুমার শ্রীকৃষ্ণসেন সেনের সহিত এই ধর্মমাত্রার যুগে ধর্মসংস্থাপন জ্ঞাত প্রস্তুত হন। ‘বঙ্গবাসী’ তাহার চেটার সহায় হন,—এবং বঙ্কিম বাবু, চন্দ্রনাথ বাবু, অক্ষয় বাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোক তাহার অধিবাসী হন। ‘নবজীবন’ ও ‘প্রচার’ এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার ফলে অধিকাংশ শিকিত সম্প্রদায়, সনাতন ধর্মের আলোচনায় প্রস্তুত হন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালার গীতা যুগের আরম্ভ। অনেকগুলি গীতার সংরক্ষণ প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধ্যে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের শাস্ত্রভাষ্য স্বামী কৃত ও গিরিকান্ত টাকা এবং অধুবাসন গীতা প্রথম ও প্রধান। সেই সময়ে বঙ্কিম বাবু ‘প্রচার’ গীতা-ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। আমরাও তখন ‘দৈনিক’ পত্র বঙ্কিম বাবুর এই ব্যাখ্যার ধারাবাহিক সমালোচনায় প্রস্তুত

হইয়াছিলাম। যাহা হোক, এই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামনি মহাশয়ের অধুবাসন গীতাও বঙ্গবাসী কাণ্ডালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এই সময়েই পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় কথোপকথনজালে গীতার উপদেশ প্রকাশ করেন। এইরূপে বাঙ্গালার গীতাচর্চার আরম্ভ হয়।”

২। গীতার ‘বিজয়া’ ব্যাখ্যা

নাস্তিক্য বুদ্ধিতে গীতার হাত দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা যখন সর্বোপনিষদের সার, তখন ইহার পরমার্থতত্ত্ব আত্মিক্য বুদ্ধি ভিন্ন কিছুতেই চিত্তে প্রতিভাত হয় না। যাহারা গীতার ব্যাখ্যায় প্রস্তুত হন, এই কথাটা সব সময় তাঁহাদের মনে রাখা উচিত। গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় পরোক্ষাহুতীর দ্বারা যতটুকু আয়ত্ত করা যাইতে পারে, ততটুকু চেটাই ইহার ভাষ্যাকরণ করিয়াছেন। বাবহারিক জগতের প্রত্যক্ষ, অহমান প্রভৃতি প্রমাণ যতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, ততদূর পর্যন্ত এতৎসম্বন্ধে তর্ক, আলোচনা প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। সেইজন্য পরোক্ষাহুতি মহা-ভদ্রে পৃথক গিয়া দাঁড়ায়। একই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া এক একজন এক এক উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু উপায়গুলি পৃথক হইলেও তাহাদের সমন্বয় করা যায় না, একত্র নহে।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাহার গীতা ব্যাখ্যায় এই সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যার নাম—বিজয়া ব্যাখ্যা। ইহার ভূমিকায তিনি তাঁহার অবলম্বিত পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। বেশ বুঝা যায়, আত্মিক্য বুদ্ধি

প্রবোধিত না হইলে দেবেন্দ্র বাবু এই ব্যাখ্যায় হাত দিতেন না। কিন্তু তবুও তাঁহার ব্যাখ্যায় গোড়ামীর নাম পড় না। আধুনিক যুগে যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ চাহে, সে সকলই তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন। হেগেল তত্ত্ব, প্রেটোরাটিক, ইভলিউশনবাদ প্রভৃতি পাকাতা দর্শন ও বিজ্ঞানের মতগুলির সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কৃত করিয়াছেন। কলকাতা বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান মন্ডন করিয়া যে ‘অহুশীল’ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই তত্ত্ব বিজয়া ব্যাখ্যায়ও পরিদর্শিত হয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্র তৎপত্ত্ববহী অহুশীল দর্শন মাথায় রাখিয়া গীতাব্যাখ্যায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সেই জ্ঞাত পরমার্থ-প্রাপ্তি বা নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির কথা তাঁহার ব্যাখ্যায় বার পড়িয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্র বিজয়ের অহুশীল তত্ত্ব ঈশ্বরবাদহীন নহে। তিনি দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথের দ্বারা আত্মিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন। আত্মকাল সাহিত্য-সমস্যাতে অবদিত নহে যে হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার ‘গীতার ঈশ্বরবাদে’ প্রমাণ করিয়াছেন, পরমার্থ তত্ত্বই গীতার মূলীভূত উপাদান।

স্বতন্ত্রাং বিজয়াব্যাখ্যায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও হীরেন্দ্রনাথের সম্মিলন দেখিতে পাই। এই হিসাবে নবযুগের প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দম্বর ধর্মতত্ত্ব ও দেবেন্দ্রবিজয়ের দার্শনিক মতবাদের এক শ্রেণীরই অন্তর্গত। যাহারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত আদর্শ জীবন ও চরিত্র গঠন করিতেছেন, তাহারা ‘বিজয়া’-এইরূপ আমাদের বিবাস।

৩। জ্ঞানীপিতে ভারতবাসীর হুযোগ

ফাওসন কলেজের অধ্যাপক গুণে জ্ঞানীপী হইতে পি, এইচ ডি, প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্ঞানীপী সম্বন্ধে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের কর্তৃপক্ষ সুবিধা হইতে পারে, তৎপক্ষে তাঁহার মত “ফাওসন কলেজ যোগজিন” হইতে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার শিক্ষাবিষয়ক পাক্ষিক ‘কলেজিয়ান’ পত্রিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা তাহার মর্ম নিয়ে বিবৃত করিলাম—

(১) জ্ঞানীপীতে বিজ্ঞান শিক্ষার বেশ বন্দোবস্ত আছে।

(২) অত্যন্ত দেশ অপেক্ষা অতি অল্প ধরতেই এখানে শিক্ষাজাত হইতে পারে।

(৩) এখানে কারখানা গৃহের জ্ঞান লাভ করিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। বিদেশী সম্বন্ধে এখানে কোন বিরক্ত ধারণা দেখা যায় না। ভারতীয় ছাত্র এখানে খুব অল্পই আসিয়াছেন, কিন্তু যাহারা আসিয়াছেন, তাহারা ইহা এখানে কার শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানবিগণকে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

(৪) জাতিবিষয়ে বা অল্প কোন কারণ এখানে নাই। সেই জ্ঞাত ভারতীয় ছাত্রগণ অর্থাৎ ফ্যাক্টরীতে কার্য করিতে পারেন।

(৫) ইংলও ও ফ্রান্স অপেক্ষা খাণ্ডাদিও এখানে সস্তায় পাওয়া যায়।

(৬) ভাষা শিক্ষা করাও খুব কঠিন নহে।

দেশবাসীর মধ্যে থাকিয়া তাহাদের সহিত প্রতিদিনের আলোপ ও পরিচয়ে ভাষাশিক্ষা খুব সহজেই হইয়া থাকে। তারপর আজ কাল ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় শহরে জ্ঞানীপী শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে।

সেই সব স্থানে ছুই তিন মাস খুব মনোযোগের সহিত শিক্ষা করিলেই এদেশে আসিয়া কাজ চালাইতে পারা যায়।

৪। কাম্বোজের অন্তর্বাণিজ্য

কাম্বোজের লোকের চাচলচল এখন অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। তাই পূর্বে সেখানে যেরূপ অভাব ছিল, তাহার চতুর্গুণ অভাব এখন দেখা দিয়াছে। কিন্তু সে অভাব পরিপূরণের উপযোগী জিনিষ পত্র বাড়ে নাই। সেইজন্য সেখানে অনেকগুলি ব্যবসায় অবনত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু বিগত দশ বৎসরে কাম্বোজের চাচলচলের স্থবিধা খুব বাড়িয়া যাওয়ায় সেখানে অন্তর্বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছে। এই বাণিজ্য জামু এবং কাম্বোজের রাজ্য, দক্ষিণে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়া প্রদেশগুলি ব্যাপিয়া বর্তমান।

আমরা কাম্বোজের রাষ্ট্রের জৈবাগিক রিপোর্ট পাঠে অবগত হই, সেখানে এই কয় বৎসরে আমদানী হইতে রপ্তানি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। জামু অপেক্ষা কাম্বোজের বাণিজ্যে মূলধন খরচ হইয়াছে বেশী। শস্যোৎপাদনের মূলধন পূর্বোক্তের দেড়গুণ ছিল।

৫। ভূপাল রাজ্যে পুরাতত্ত্বানুসন্ধান
ভারতের করদ-রাষ্ট্রে আজকাল জীবন-বস্তার নানাবিধ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভূপালের শাসনাধীন বেগম নিজরাজ্যের প্রাচীন কীর্ণগুলির সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্ত নবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাহার যত্ন ও সাহায্যে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নানা অশ্বসন্ধান কার্যে ব্যস্ত আছেন। তাহারই ফলে সচিহ্নিত বহুবিধ বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ, বিহার প্রভৃতি

আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মৌর্যযুগের একটি বিশাল মঠও দৃষ্ট হয়।

এই আবিষ্কৃত মঠগুলির যথাযোগ্য সংস্থারও ভূপালের রাজ সরকার হইতে সাহিত্য হইতেছে।

বড়োদা রাজ্যেও বহুদিন হইতেই এবিধ অনুসন্ধান কার্য চলিয়া আসিতেছে। গাই কোরোড বাহারুর নিজরাজ্যের সর্ববিধ মঙ্গল অঙ্কঠানে তৎপর। তাঁহারই সাহায্য ও চেষ্টায় বড়োদার বহু পুরাতত্ত্ব আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি।

৬। মহীশূরে প্রাথমিক শিক্ষা

মহীশূর রাজ্যে 'প্রাথমিক শিক্ষা বিল' পাশ হইয়া গিয়াছে। বড়োদা রাজ্যে যে প্রণালী সফল হইয়াছে, সেই প্রণালীতেই মহীশূর গবর্ণমেন্ট কার্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, মহীশূর হইতে মৃত্যুভাঙে একেবারে নির্দাসিত করিতে হইবে। আপামর জনসাধারণ অজ্ঞতায়—দুঃস্থানে আবদ্ধ। তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষার আলোক না আনিলেই চলিবে না।

অবশ্য গোড়ায় তাহার বড় বেশী বাধাবিধির মধ্যে যান নাই। শিক্ষার নিয়মগুলি অনেকগুলিই অসম্পূর্ণ। কিন্তু তা হোক—কার্য আরম্ভ করিলেই সেগুলির সংশোধন হইতে বেশী বিলম্ব হইবে না।

৭। বড়োদারাজ্যে প্রজাতন্ত্র

গ্রন্থ সাধারণ মাঝমা মোকদ্দমায় চরিত্র-হীন হইয়া পড়ে, তাহাদের ধন সম্পত্তি উৎসন্ন যায়। এই দুঃবস্থা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা

করিবার জন্ত মহাত্মবর গাইকোয়াদ বাহারুর বিগত দশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

প্রথম প্রথম এসেসরের সাহায্যে অল্পসংখ্যক কঠিন মামলাগুলির বিচার হইত, এখন সেসন কোর্টের ব্যবসায় মামলাই এসেসর বা জুরীর সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

গ্রামের ছোট বাটো দেওয়ানী মামলাগুলি গ্রামা মুন্সেফ একাকী অথবা পাচজন সভ্যের সাহায্যে বিচার করেন। এই মুন্সেফ ও সভ্য গ্রামবাসীদিগের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ঐসব বিচারালয়ে নালিশ কর্তৃক করিতে কোনরূপ কোর্টফি দিতে হয় না।

এতদ্ব্যতীত গ্রামে অনেক রকম বিচারালয় আছে। তাহাকে গ্রামা পঞ্চায়ত অথবা লোকাল বোর্ড বলা যাইতে পারে। যে গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা হাজারের উপর, সেই গ্রামেই এইরূপ পঞ্চায়ত আছে। পঞ্চায়তের অর্ধেক সভ্য প্রজা সাধারণ কর্তৃক এবং অপর অর্ধেক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত হয়। প্রথম প্রথম গ্রামের অভাব অর্ভযোগ পর্যবেক্ষণ এবং গ্রামা মুন্সেফকে বিচারে সাহায্য করাই এই পঞ্চায়তের কার্য ছিল। কিন্তু শেষে তাহাদের ক্ষমতা প্রসার করা হইয়াছে। তাহার এখন সামান্য রকমের দেওয়ানী ক্ষেত্রধারী উভয় বিধ মামলাই বিচার করিয়া থাকেন।

৮। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান মতে

উপাসনাতত্ত্ব

খ্রীষ্টক যামেগ্রন্থের জীবদেী মহাশয় জগন্নাথ মন্দিরগাভীরে বীভৎস চিত্রগুলির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের

অনেক কথা এবং পরস্পরের মধ্যে বর্তমান বহু মূল্যাদুস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা 'মাননী' হইতে তাহার মতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

“...এই ব্যাখ্যার মূল কথা এই কয়টি; প্রথমতঃ—উপাসনামন্দির কেবল মন্দির মাত্র; উহা সমুদয় সম্বের বা Communityর প্রতিকৃতি; উহা আবার মানবের জন্মসংসারের প্রতিকৃতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উহার ভিতর ও বাহির দুইটা দিক আছে। ভিতরটা শুদ্ধ—সেটা বর্ণগোষ্ঠা; বাহিরটা অশুদ্ধ ও সেটা সমুদানের রাজ্য। Community সংক্ষেপে একা খাটে; মানব-দেহ সংক্ষেপে খাটে। Communityর

শরণ লইলে, বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্বের শরণ লইলে। পরিভ্রাণ, নতুন নহে। খৃষ্টানের পক্ষেও সেই কথা। কাজেই মন্দিরের ভিতর একরূপ, বাহির অপরূপ। ভিতরে ভগবান ও তাহার ভক্তগণ; বাহিরে শয়তান ও তাহার প্রভুত্বগণ। খৃষ্টান ও বৌদ্ধ, ইহারা কেহ কাহারও অঙ্করণ করিয়া মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে চাহি না। গোড়ায় যখন উভয়ের মিল আছে, তখন স্বাধীনভাবে গঠিত হইলেও সেই সাপুত্র শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে। উভয় স্থানেই মন্দিরের ভিতরের ও বাহিরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। জগন্নাথ মন্দিরের বাহিরের চিত্রগুলির সহিত প্রকৃতি সাধনা ও লিপ্যঙ্কণের কোনও সম্পর্ক থাকিলে মন্দিরের ভিতরও একরূপ চিত্র থাকিতে পারিত। চিত্রগুলি এতটা অশুদ্ধ, এতটা বিভৎস করিবারও প্রয়োজন থাকিত না। পূর্বে বলিয়াছি বৈদ্যনাথ বলেন—‘ততো ন জগদ্রাজ্যং’, সংসার হইতে ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই, জুগুপ্সার কোনও কারণ নাই।

বৌদ্ধ বলেন,—সংসার হেয়, জুগুপ্সার হেতু আছে। সমাজ বা মার ভয় দেখাইয়া থাকেন, আবার বিয়দাপত্তি দ্বারা প্রলোভিত করেন। তাহার অচুচেরা বৃত্তকে ও গুণকে ভীষণ মৃগী দেখাইয়া লড়াই করিতে আসিয়াছিল, আবার ভোগের সামগ্রী দেখাইয়া প্রলোভিত করিয়াছিল। খৃষ্টীয় শিল্পায় সেই ভয়ের দিকটা খুব ভয়ানকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ ভাবাবৃত্তি হিন্দুর মন্দিরে বিদ্যাসক্তির 'যে মৃগী অতি জঘন্য, অতি হেয়, তাহাই দেখান হইয়াছে। এক মূল হইতে, অজ্ঞ কাণ্ড হইতে, দুইদিকে দুই শাখা বাহির হইয়াছে মাজ, ইহাই আমার বক্তব্য।"

৯। গৈলা গ্রামের কার্ণাটতৎপরতা

বরিশালে গৈলা একটি প্রকাণ্ড গ্রাম। জেলার মধ্যে এই স্থানটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভাবিধ শিক্ষারই কেন্দ্রস্থল। এখানে উপাধিপাদী পণ্ডিতের সংখ্যা পঞ্চাশ জনেরও অধিক। গ্র্যান্ডমেন্ট সংখ্যাও সেইরূপ। এই শিক্ষিত গ্রামবাসীদের বড় ও উচ্চাঙ্গে এখানে অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সংস্কৃত "কবীন্দ্র কলেজ" একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই কলেজে একশতেরও অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করে। গণিতশাস্ত্র ব্যতীত প্রায় সব বিষয়ই এই কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে বহু সংখ্যক টোল, পাঠশালা এবং ছোট্ট বালিকা বিদ্যালয় বর্তমান।

গ্রামবাসীদের আন্তরিক চেষ্টা এইরূপ মঙ্গল কর্মের দিকে দাবিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, অজ্ঞাত গ্রামেও এইরূপ কর্ম-তৎপরতা অল্পস্বত হইবে। শিক্ষাদান কার্ণা

শু শুভলোককরিগের মতোই আবশ্য থাকিবে না। গ্রামের "জনসাধারণ" সকলকেই বিবিধ উপায়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

১০। মহারাজে শিক্ষা-সম্মিলন

বিগত ভিসেখর মাসে নাসিক মহারাজীয় শিক্ষা সমিতির বৈঠক হইয়াছিল। সভায় এগারটি প্রস্তাব সর্বমুমতক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীমতী জনাবাই বোকাডে, শ্রীমতী বাকাডে এবং শ্রীমতী শির্বে সর্ব প্রথম স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাহাদের বক্তৃতা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বড়োদার শ্রীমত খানীরাও দাখব "শবে অর্থ সাহায্য শিক্ষা করেন। তাহার স্বমুখর বক্তৃতার শুণে সভাস্থলেই ৩০০০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়।

এই শিক্ষাসমিতির উন্নতিকল্পে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন। দরবার মহারাজ বাহাদুর তাহার আত্মীয় এবং কম্পট্রাবার্ব এই শিক্ষা আন্দোলনে সবিশেষ যোগ দিয়াছেন।

১১। কলিকাতার চৈতন্য

লাইব্রেরী

সাহিত্য বিস্তার করণে কলিকাতায় খুব কম প্রতিষ্ঠানই বর্তমান আছে। আমরা উক্ত বিষয়ের কোন পুস্তক খুঁজিতে গেলে সাধারণ কোন লাইব্রেরীতে তাহা পাই না। কোন বিষয়ে গভীর গবেষণার প্রয়োজন হইলে একমাত্র ইন্সপিরিয়াল লাইব্রেরীই আমাদের ভরসা। বলিতে কি, এখনও আমাদের নিষ্কলিত লাইব্রেরীগুলির শৈশব অবস্থা।

কিন্তু তা হোক—নৈরাশ্রের প্রয়োজন নাই। রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, কলিকাতার বাহিরে মাজ লাইব্রেরী প্রভৃতি আমাদের গৌরববহুল। ইহাদের সাহায্যে সাধারণের মধ্যে সাহিত্য-পিপাসা জাগৃত হইতেছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ চৈতন্য লাইব্রেরীর কার্যক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। শ্রীমুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ইহার উন্নতিকল্পে যেরূপ পরিশ্রম ও ভাণ্ডার স্বীকার দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বড় প্রশংসনীয় এবং অশ্রুকর-যোগ্য।

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর হইল এই লাইব্রেরীটি স্থাপিত হইয়াছে। শুধু মাত্র একশত থানি পুস্তক এবং পাঁচটি সভ্য লইয়া ইহার সৃষ্টি হয়। কিন্তু অধুনা তাহাদের সংখ্যা প্রায় শতগুণ বৃদ্ধিত। পাঁচ টাকার ফাণ্ড এখন ১৪,৭৫০ টাকার ফাণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

১৮৯০ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্যন্ত বৎসর বহু শ্রেষ্ঠ লেখকগণ এই লাইব্রেরীর উত্তোগে নানা স্থানে নানা বিষয়ে সাধারণের বক্তৃতা দিয়াছেন, বহু সমাজ ইংরাজও নানা সম্মত শুনাইয়াছেন। সে সমস্ত বক্তৃতা নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লাইব্রেরী আর একটি মহৎ কার্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রতি বৎসর দুই তিনটা বিষয় কোনটা বাঙ্গাল, কোনটা ইংরাজী ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ইহাদের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া থাকে। এইরূপে ১৮৯০ সাল হইতে আজ পর্যন্ত ইহারা সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারে অনেকটা কৃণ্ডকার্য হইয়াছেন। শ্রীমুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় প্রতি বৎসর একশত

টাকা লাইব্রেরীর হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিক্ষত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আবহাবাদি কর্ত্তে ঐ টাকা পারিতোষিকরূপে লেখককে দেওয়া হইবে। অবশ্য অবহাদ, মঙ্গলন বা সমালোচনা লাইব্রেরী কর্ত্তক নির্ধারিত পুস্তক লইয়াই করিতে হইবে—লেখকের ইচ্ছা অম্বাণের যে কোন পুস্তক লইয়া করিলেই চলিবে না।

আমরা এই লাইব্রেরীর সর্গাদীন উন্নতি কামনা করি।

১২। জাপানের ধর্ম

জাপানে এখন চারিটি ধর্ম দেখা যায়। সিন্টো, বৌদ্ধ, কনফুসিয়াস এবং খৃষ্টান ধর্ম। কিন্তু প্রত্যেকটা ধর্মকেই জাপানবাসীরা বীরপূজার ভাবে গ্রহণ করে। সিন্টো ধর্মই জাপানে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। রাণী টেমোকোডাইজিনের রাজত্বকালে ইহার প্রবর্তন হয়। বীরপূজাই ইহার মূল প্রকৃতি। যে সমস্ত লোক জীবিত কালে কোন শ্রেষ্ঠ কার্য করিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করেন, মৃত্যুর পরে তাহাদিগকে সম্রাটের আদেশক্রমে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা হয়। এবং তাহাদের স্মরণার্থে মন্দির উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তগণ বৎসরের মধ্যে কোন বিশিষ্ট দিনে, মৃতের প্রতি সন্মানপ্রদর্শনের জন্ত সেই মন্দিরে সমাগত হন।

জাপানীদের মধ্যে এখন প্রায় আশী হাজার দেবতা আছেন, এবং গুণাহার্যের তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাণী টেমোকোডাইজিন, সম্রাট জিম্মু টেমো, রাজমুমার ইটো এবং সম্রাতি পরলোকগত নিকাডো প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

শ্রমণোৎসবের দিনে এই সকল মৃত মহাত্মা-
দিগের মন্দিরে ভয়ানক জনতা হয়। সেদিন
জগদগন নবাব শাক সবজী প্রভৃতি সেই সব
মহাত্মাদিগকে উদ্দেশে উৎসর্গ করে—এবং
সন্মতিও সেই উৎসর্গে খোঁগ দেন।

প্রায় ২৬৪ গুঃ অংশ চৈনিক বর্ষমালা,
বিদ্যা এবং সভ্যতা জাপানে প্রবর্তিত হয়,
সেই সঙ্গে কনফুসিয় ধর্মও তথায় আগমন
করে। বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় ৫৫২ গুঃ অংশ
জাপানে নীত হয়। সম্রাট কেইকো টেমোর
রাজত্বকালে কোরিয়া হইতে এই ধর্ম জাপানে
বিস্তৃতি লাভ করে।

কনফুসিয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে
হালোকদিগের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া
উঠে। সমাজ তাঁহাদের বড় নিরুপস্থান ধার্য
করা হয়। বিদ্যা শিক্ষায় রমণীহীনতা মাথুর্ধ্য
বিস্তৃত হয় বলিয়া, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া
বন্ধ হয়, শুষ্ক গৃহস্থালীর কাজ কর্ধ্য, সঙ্গারের
আদর কায়া, কতকগুলি কায়িক পরিশ্রমেই
তাঁহারা অভ্যস্ত হইতে থাকেন। তবে বিলাত
সম্পদ শতাব্দী হইতে তাঁহাদের এই শোচনীয়
অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন আরম্ভ হয়।

জমি বা মায়েই জাপানী সন্তান সিন্টো
বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার পিতা মাতার যে
ধর্মই হোক না কেন। সদাজাত শিশুকে
নিকট কোন মন্দিরে লষ্টয়া গিয়া সেই
মন্দিরের দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করা হয়।
যদি বা অষ্টম দিবসে জাতকের নামকরণ এবং
অষ্টম মাসে অন্নপ্রাশন হয়।

কোন লোক মারা গেলে, এবং মরিবার
পূর্বে বলিয়া গেলে, পুরোহিতগণ তাঁহার
গৃহে আগমন করিয়া বৃদ্ধের নিকট তাঁহার
মূল কামনা করেন। তারপর কোন বৈদ্য
মন্দিরে মৃত দেহটী নীত হয়, এবং প্রয়োজনীয়

অস্থানের পরে মৃতের সংস্কার করা হয়।
তারপর তিন রাত্রি ধরিয়া পরিজন বর্গ মৃতের
সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ৪৯ দিন
ধরিয়া মৃতের আত্মা গৃহভ্যন্তরেই বাস করে
এইরূপ লোকের বিশ্বাস। প্রাপ্তি সম্ভায়ে
একদিন পুরোহিত গৃহে আসিয়া প্রার্থনা
করেন, এবং শেষ দিন আত্ম ক্রিয়া সমাপনায়ে
আত্মার প্লীতান্ত্রে চাঁউলের পিষ্টক প্রদান
করা হয়। সে দিন কেহ মংস্ত্র মাংস গ্রহণ
করে না।

সিন্টো ধর্মমতে ভূতকর্মের শাস্তি, দন্ডা হইয়া
সাতবার জন্মগ্রহণ করা। প্রত্যেক জাপানীর
মধ্যে সিন্টো মতই প্রবল।

যদিও অল্প দিন হইতে গৃহ ধর্ম জাপানে
বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তথাপি খৃষ্ট দেবকে
কেহ ঈশ্বরের পূজা বলিয়া মনে করে না—
সিন্টো বিশ্বাসই এ স্থানে প্রবল। সকলেই
গৃহ দেবকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া মনে
করে, এবং তাঁহার গুণাহুর্কীর্তনই তাঁহার
পূজা স্বরূপে গৃহীত হয়।

জাপানের বিবাহ বাপার একবারে ধর্ম-
সম্পর্কশূন্য। বিবাহ উৎসবও বড় সামান্য
আর একটা আশুগর্ভের কথা এই, অনেক সময়
দেখা যায় জাপানী পরিবারে স্বামী সিন্টো ধর্ম,
স্ত্রী গৃহ ধর্ম এবং পুত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

১৩। রাত্রি অনুসন্ধানসমিতি

পূর্বে আমরা সাহিত্যআলোচনার জন্ত কেন্দ্র-
বিভাগের আবশ্যকতা বুঝাইতে গিয়া অক্ষেপ
করিয়া বলিয়াছিলাম, বন্ধের প্রায় সব দিকেই
সাহিত্য-জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু মধ্য
বন্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সাফা পাওয়া
যাইতেছে না। সেই জন্ত কলিকাতার বন্ধীয়

সাহিত্য-পরিষৎক এই দুই বিভাগের জন্ত
বিশেষ যত্নবান হইতে অধুরোধ করিয়া-
ছিলাম। আমরা স্বামী হইলাম, বন্ধীয়-সাহিত্য
পরিষদের চেষ্টায় রাত্রি প্রদেশে সাহিত্য-
কেন্দ্রতার "রূপে উপস্থিত হইয়াছে।
"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" হইতে আমরা সেই
সংবাদটি পাঠকগণকে প্রদান করিতেছি—

"বন্ধীয় সাহিত্য-পরিষদের অধ্যক্ষমোদন ক্রমে
একটি অহুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছে ও
এই সংবাদ গত কাব্যবিবরণিতে প্রদত্ত
হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতি
বাঁহুড়া ও পুন্ড্রিয়ার কোন স্থানে ঐতিহাসিক
অহুসন্ধানের জন্ত গমন করিয়াছিল। এই
অভিযানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন
বসু, শ্রীযুক্ত গগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত
রামকৃষ্ণ সিংহ যোগদান করিয়াছিলেন।
এই অহুসন্ধানের ফল যথাসময়ে প্রকাশিত
হইবে। অহুসন্ধাননিমিত্ত অজ্ঞাত দর্শনযোগ্য
বিষয়ের মধ্যে ছাত্রদের বাহুলী মন্দির,
শুনিয়ার পরীতগার্মাঙ্কিত চন্দ্রবন্দ্যার উৎকীর্ণ
লিপি পরিদর্শন করেন। বেঙ্গল স্টোন
কোম্পানীর হস্ত হইতে এই লিপি রক্ষার
কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি না, পরিষৎ তাহা
অগত নহেন এবং, যদি ইতিপূর্বে কোন
ব্যবস্থা করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে
যাহাতে এক্ষণ কোন ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্ত
পরিষদের পক্ষ হইতে গবর্নমেন্টের নিকট এক
অধুরোধ-পত্র পাঠান হইয়াছে।"

..

১৪। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রের দুর্যোগ

ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে ইংলণ্ড এবং
আইরল্যান্ডে ভ্রমি হইতে না পারে, তাহার জন্ত
বিবি ব্যবস্থা গ্রহণনের জল্পনা চলিতেছে। খেতাপ ছাত্রেরা আর কৃষ্যঙ্গ
ছাত্রদের সঙ্গে বসিতে চাহে না—পড়িতে
চাহে না। সম্প্রতি লণ্ডন হাউসপাতালের
ছাত্রেরা কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে এক

আবেদনপত্র পাঠাইয়াছে। আমরা নিয়ে
তাগার অহুবাদ বিধান—

(১) ভারতীয় ছাত্রগণ কিছুতেই খেতাপ-
ছাত্রদিগের সমকক্ষ নহে। হস্তরাজ ইংলণ্ডে
তাহাদিগকে সমান আসন দেওয়া ভারতের
পক্ষে কিছুতেই মঙ্গলজনক হইবে না। বিশেষ
স্বত্রে শুনা যায়, এই সব ছাত্রেরা বিলাত
হইতে কিরিয়া গিয়া দেশে রাজকিয়ারী হইয়া
দাঁড়াই।

(২) পরাদান এবং নীচ জাতি বলিয়া
ভারতীয় ছাত্রগণ ইংল্যান্ডের মত বড় বাদীনতা
পাইতে পারে না।

(৩) ডাক্তারী শিবিয়ার জন্ত বিলাত
আসিয়া ইংল্যান্ডদিগের দেহপরীক্ষা এবং
রোগনির্ণয় শিক্ষা করা ভারতীয় ছাত্রগণের
প্রয়োজন নাই, কেন না দেশেই তাহাদিগকে
কৃষ্যঙ্গকেই চিকিৎসা করিতে হইবে।

(৪) ভারতীয় ছাত্রগণ বিলাত আসিয়া
একেবারেই অলস ভাবে দিন যাপন করে,
এবং অনেক সময় কোন নিঃসহায় ইংরাজ
বালিকাকে বিব্রত করায় কলঙ্কের বোঝা
মাথায় লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করে।

(৫) এমন কি অনেক সময় এই সব
ছাত্রদের মধ্যে বাহারা ভাল, তাহাদিগকেও
হাউসপাতালের রোগীরা দেখিতে পারে না।
এবং ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ত দৈনন্দিন
ঘটনা!

(৬) হাউসপাতালের ধাজীওলা ইহাদের
বিরুদ্ধে একমত। তাহারা ইহাদিগকে একে-
বারেই দেখিতে পারে না, যদিও ভারতীয়
ছাত্রগণ ধাজীদিগের মনোযোগ আকর্ষণের
জন্ত নানারূপ চেষ্টা করিয়া থাকে।

(৭) শিক্ষকগণের দারগ, ভারতীয় ছাত্র-
গণ সর্ববিষয়েই, বিশেষত নিদান তত্ত্বে বড়ই
দীর এবং অধ্যানে তাহাদের ফল নিতান্তই
অসন্তোষজনক।

১৫। যুবক বাঙ্গালার বাণী

বেঙ্গলী একল্ল যুবককে সামাজ্য রক্ষার
একটা ব্যবসা খুলিবার জন্ত আহ্বান করিয়া

ছেন। তদন্তের "সুবক বন্দ" নাম দিয়া জনৈক পত্রীত। যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিয়ে তাহার মর্থ প্রদান করিলাম।—

বঙ্গদেশে বৈষয়িক উন্নতির জন্ত একরূপ দুই একজনে কার্য্য করিলে কিছু হইবে না। নেতারা শুধু কয়েকজন সুবককে দিয়া এতবড় একটা কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে পারিবেন না। একরূপ করিয়া বৈষয়িক মুক্তিলাভ করনই সম্ভবপর নহে। দেশে এতদিন জীবিকা নির্বাহের যতগুলি ছাপমা পণ্য ছিল, সবগুলিই তৎক্ষণাৎ জীবনযাত্রা এখন আর আগেকার মত সাধাসিধা নহে। আগে দশজনের ভরণ পোষনের জন্ত যে অর্থব্যয় হইত, এখন একজনের জন্তই তাহা আবশ্যক হয়। অধিকন্তু চরিত্রিক, কল্যাণ, ম্যালেরিয়া মহামারি ত লাগিয়াই আছে। অতএব এখন কাউন্সিলে বিসবার জন্ত যতই কেন চেষ্টা হউক না, আইন ব্যবস্থার জন্ত যত লোকই অগ্রসর হোক না, এমন কি প্রচণ্ড পণ্যস্ত আমাদের ভাগ্যে ছুটুক না কেন, কিন্তু কৃষি ও ব্যবসায় জগতে যতদিন আমাদের শক্তিবৃদ্ধি না হইবে, ততদিন এ সমস্তই আমাদের কাছে ভুয়া।

বিগত কয়েক বৎসরে অনেকগুলি ব্যবসায় আগন্তু হয়। কিন্তু তাহার অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে, এবং যাহা আছে, তাহাও সঙ্কটাপন্ন। ইহাতে আমরা আমাদের আশ্ব-শক্তির উপরেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, এবং সেই জন্ত মূলধনও হুপ্রাণ্য হইয়া যাইতেছে। অতএব দেশের নেতা এবং স্বদেশপ্রেমিকদিগের নিকটে আমাদের নিবেদন, আমাদেরকে এখন বিপুল শক্তি-সম্পন্ন পাশ্চাত্য জাতিদিগের সহিত বৈষয়িক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তাহার জন্ত বহু বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ, অগণিত

মূলধন, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞিত মঙ্গল ইচ্ছার প্রয়োজন। আমাদেরকে উদ্ধার করিবার জন্ত মাকুইস ইন্টার মত একজন জয়বান এবং বিসমার্কের মত বুদ্ধিমান লোকের প্রয়োজন হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, এই বৈষয়িক সম্ভ্রান্ত মিমাসিত না হইলে, আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্ম্মশুদ্ধায় আন্দোলন বা প্রতীকান গুলি অচিরেই বিলীন হইয়া যাইবে। অতএব নেতারা এই দিকে, তাঁহাদের সমস্ত মনোযোগ প্রয়োগ করুন— সভ্যতার রাস্তায় নহে—জাতির অস্তিত্বের জন্ত আর তাহাদের বিলম্ব করা যাজে না।

১৬। প্রকৃতত্ব শিক্ষা

আজকাল প্রকৃতত্ব শিক্ষার দিকে অনেকেরই ঝোঁক পড়িয়াছে। অনেক ছাত্রই প্রকৃতত্ব লইয়া আলোচনা করিতে ভাল বাসেন। কিন্তু তাহারা অনেক সময়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে প্রকৃত পন্থায় চলিতে সক্ষম হন না—অনেক সময় তাহাদের বুঝা যায়িত হইয়া থাকে।

মুর্খত্ব, মুহুর্তত্ব, স্তম্ভজ্ঞান, লিপিশিক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলে প্রকৃতবাস্তবজ্ঞানে কৃতকাণ্ড হওয়া যায় না। আমরা আশা করি, যে সকল ছাত্র এই বিষয়ের কিছু জ্ঞান হ্রাস করিতে চাহেন তাঁহারা মথুরার আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামের ক্যাটাগর গান। পাঠ্য পুস্তক রূপে পাঠ করিবেন। ঐ পুস্তক ধানিতে ভারতবর্ষীয় মূর্তি, মুদ্রা প্রভৃতির বহু লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে। সেই লক্ষণ গুলি মনে রাখিলে, অমূল্যজ্ঞান কাণ্ডে বিশেষ সফলতা লাভ করা যাইবে, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

শৈলী ও ব্রাউনিঙ্গের কাব্য-শিক্ষণ

অধ্যাত্মবাদ

আধ্যাত্মিক ভাববাদ বা রহস্যবাদ ইংরাজ-দার্শনিকগণ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীনকালে প্লেটো বা নব প্লেটো-সম্প্রদায় এবং আধুনিককালে জর্দান্দ দেনীয় দার্শনিকগণ যে অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার প্রতিষ্ঠা-কল্পে কাণ্ট, হেগেল, হিটলর, প্রভৃতি মনীষি-গণ যুগের পর যুগ অতিবাহিত করিয়া সাহিত্য জগতে অক্ষয়কীর্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিপক্ষিণ একমাত্র আয়র্লওয়েশীয় বর্কলির (Berkley) ভাববাদমূলক পুস্তকে শুনিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বিদ লক, হিউম্-বেকন, মিল, হার্বার্ট স্পেনসার, হাক্সলি প্রমুখ মনীষিগণ ঐহিক ও ঐন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সত্তা ভিন্ন অপর কোন জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

বিচিত্রকলামায়ী—এই দৃশ্যময়ী প্রকৃতির রহস্য সমুদায় উন্মোচন করিবার বিপুল আয়োজনে শেখোক্ত দার্শনিকদিগের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। মানব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ স্থিতি—প্রকৃতির গভীর মধ্যে জীবনমাজা-নির্বাহের সুযোগ ও হবিচা-অহরণের চেষ্টাই তাহার প্রকৃষ্ট-জীবন, ইহাই এই বৈজ্ঞানিক-দিগের উপদেশ।

মানব প্রকৃতির অর্ধবিশেষ। প্রকৃতি বৈশ্বগতিতে মানব-বৈশ্ব স্থিতি করিয়াছে। এই বৈশ্বগতি ও ইহার অর্ধ-প্রত্যঙ্গের অনাবশেষ কলাকৌশলময়ী প্রকৃতির অপূর্ণবিকাশ। অতএব মানব এই অর্ধবাহার অধীন; তাহার

অধীনতাই মানবের গৌরব, তাহার দাসত্বই মানবের কর্তব্য, ইহা বৈজ্ঞানিকদিগের অভ্যাস সিদ্ধান্ত।

তাঁহারা সত্যের যে আংশিক চিত্র যুক্তি-ফলকের উপর চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা সত্য। অংশের সর্বাঙ্গসম্পন্ন বিবরণ ও তাহার সমর্থনকল্পে যে সকল বিচিত্র যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা মনোজ্ঞ ও চিত্তাশক্তির পরিচায়ক। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রহেলিকা! অংশ হইতে সম্পূর্ণের জ্ঞান, আংশিক সত্যের জন্ত সম্পূর্ণ সত্যের প্রকট যুক্তিকে ঠাঁড় করান অত্যন্ত অসম্ভব। সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভিন্ন আমরা ভেদ-নির্বাচ-বৈষম্যের নিরন্তর বজ্রাঘাতে আকুল হই। শারীর বিজ্ঞান হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলেই কি আমাদের দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান হইল? দেহ কি কেবল কতকগুলি মাংস, মাংসপেশী ও অঙ্গের সমাবেশ? তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি? সেইজন্ত বৈজ্ঞানিকগণ সত্যের সম্পূর্ণ ছবি অঙ্কিত হওয়ার পূর্বেই মানব-চিত্তার ধ্বনিকাপাত করিয়া অজ্ঞেয় বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। মানব-চিত্তার সীমারেখা এই স্থানে পাতিত করিলে কি সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান হইল? মানবের অধীন ও বিশালারূপা এখনও যে অনতিকৃত, অনাবিকৃত। ইহাতে বিজ্ঞান নিশ্চিন্ত হইতে পারে কিরূপে? বিশেষ জ্ঞান—ইহাই ত বিজ্ঞান। কিন্তু বিশেষ



জ্ঞান কোথায়? ইহা যে অবিশেষ জ্ঞান, অপরিপক জ্ঞান, আরও সহজ ভাষায় অজ্ঞান।

মানব ও প্রকৃতি যে কতকগুলি আকার ও বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশ নহে এবং এই সমাবেশ যে আপন বৈধ-গতিতে কণ্ঠ করে না, কতকগুলি ক্রিয়মান চলনই যে জগতের একমাত্র উপায় ও উদ্দেশ্য নহে, এই চিন্তা ভাববাদী দার্শনিকগণকে সর্বদেশে সর্বকালে জ্ঞান করিয়াছে। তাঁহাদের চিন্তা তৎ-তৎ কালে সমাজকে আলোকিত করিয়াছে।

প্রকৃতির অন্তরালে, ওতঃপ্রোতভাবে এক সূরঙ্গ সূর্যনিয়ন্ত্রা সর্বকারণ-কারণ অচিন্ত্যময় চৈতন্য বিদ্যমান, বাহার ইন্দ্রিতে এই জগৎ জ্বলন্ত, বাহার ইচ্ছায় এই জীব ও জগতের অংশগুলি সমাবেশ, এই জগৎ এত সুন্দর, বাহার প্রত্যেক পদবিজ্ঞান সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির উপর নির্ভর করে, আকাশের বজ্রনির্ঘোষে এত-ভারতাকার উজ্জলদীপ্তিতে, পর্বতের আলোড়নে, জলের সূর্যজীবন পোষণে, পৃথিবীর সূর্যগতিস্থিত্য ও বৈদ্যো, চরাচরব্যাপী জীবনের বিকাশে এবং জীবনের মাধুরী উপভোগের জগৎ মরগের মঙ্গল হস্ত প্রসারিত, বাহার অমোঘবাণী ধ্বননের অন্তরতম কক্ষ প্রচারিত হইতেছে, তাঁহার সত্য স্বীকার না করিলে চিন্তার স্রসপূর্ণতা থাকিয়া যায়। সে চিন্তাও কত দুর্লভ! এই জগতের সমস্ত সদ্ভীত সত্ত্ব হইয়া যায়, রসে ও গন্ধে নীরস্তা আসে, মুহূর্ত্তে সমস্ত নীরব হইয়া যায়, মহাপ্রলয়ের অদৌম নিত্যকৃত্য-সাগরে সমস্ত নীরব হইয়া যায়।

এই সর্বব্যাপী চৈতন্যকে কেহ বলিয়াছেন "গচ্ছিদানন্দ", কেহ বলিয়াছেন "নির্লিপ্য", কেহ বলিয়াছেন "শূন্য", কেহ বলিয়াছেন "মঙ্গল" (good), কেহ বলিয়াছেন "Eternal

Substance", কেহ বলিয়াছেন "Universal process"—কেহ বলেন "অজ্ঞেয়"।

সর্বদেশেই চিন্তাবীরগণ এই অদৌম ও অনন্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুণগান, তাঁহার বিভিন্ন কৌশলপূর্ণ চরিত্র যুগে যুগে দেশে দেশে কীৰ্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে। সকল দেশের সাহিত্যের মধ্যেই ইহা ধ্বননের বিমল মন্দাকিনীদ্বারাপূত ও জীবনে ইহার প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক অল্পভূত হইয়াছে। ব্যাস, বৃষ্ণ, শঙ্কর, কনফিউসিয়াস (Confucius) জোরোয়াস্টার (Zoroaster), মহম্মদ, খৃষ্ট, চৈতন্য, প্লেটো, স্ক্রেটিস, মার্টিন, লুটার, কার্লাইল, এমার্সন, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে আবির্ভূত হইয়া দেশভাষাভিগত এই অদৌম পরম পদার্থ আবার করাইবার জন্ম অমৃত-পাত্র লইয়া দগুহমান ছিলেন। পিপাহ জনগণ এই অমৃত পান করিয়া সঙ্গার-ধোর দাবানল-দগ্ন হইতে বিমুক্ত হইয়া অমর হইয়াছেন।

এই সর্বব্যাপী সবার অস্তিত্ব, ইহার ঐশ্বর্য্য ও মাদুর্য্য বজ্রনির্ঘোষে প্রচারিত হইলেও মানব এই ঐহিক, দুঃস্থমান জগৎ ও রূপরসগন্ধ দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, ভবের হাটের কোলাহলে এত বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে যে, এই অমৃত-ভারবাহীদিগের আকুল-কণ্ঠ কর্ণকূহের প্রবেশ করে না। সেইজন্ম কোন এক অল্পজ্ঞা নিয়ম অল্পধারে দেশে দেশে যুগে যুগে এই বাণীর প্রচারক—গায়ক, কবি, সন্ন্যাসী, সংস্কারক, ধ্যাননিষ্ঠ যোগী, দার্শনিক, কথক, শিক্ষক ইত্যাদি নানারূপে আসিয়া আবির্ভূত হন।

যদা যদা ইদং পৃথগ্গ্ৰহীতবর্ত্তিত ভারত।
অভ্যুত্থানমধঃপত তদাধ্যাত্ম্যং স্থলমায়ম্ ॥

ভগবান গীতা-উপদেশকালে অর্জুনকে বলিতেছেন যে, হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গান্নি হয় এবং অশ্রমেণ্ড অত্যাখান হয়, তখনই আমি মানব-দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।

তাঁহাদের বাক্য, ভাষা, ভাব আমাদের রস-সংসারের নাড়ীবিদ্যে। তাঁহাদের গুণবিনী ভাষা, বাক্য, অশ্রু প্রভৃতি, অপ্রতিহত গতি, তাঁহাদের চক্ষুর জ্বলন্ত যোগী শক্তি আমাদের জীবনে নব ভাবের আবির্ভাব করে। দেহে ও মনে এক তাত্ত্বিক্রবাহের সকার করিয়া দেয়। তাঁহাদের বৈরাগ্য ও প্রেম, ত্যাগ ও সংযম, স্বামীয়ের পিপাসা ও তজ্জন্ম উৎস্রীষ ব্যকুলতা আমাদের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া মর্মেণ্ড মধ্যে অব্যক্ত হুরে ও ছন্দে নৃতন সঙ্গীতের অবতারণা করিয়া দেয়, নৃতন স্রোতে জীবন চালিত হয়। পাশ্চাত্য দেশে অধ্যাত্মশীল দার্শনিকগণ এই অমৃত-ভাণ্ডার-বিবরণের প্রধান পুরোহিত। তাঁহারা যে পবিত্র ধ্যানমাল-শিখা প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার সন্নিহ-অংশের গের পাশ্চাত্যভাষা এই পবিত্র করিতেছেন।

তাঁহাদের জীবন, সাহিত্য, নাটকে, বিজ্ঞানগণে ভাববাদের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ইহা অহাশিঙ্ক্য মাত্রেরই যোগ্যময় হয়।

বর্ত্তমান যুগে ডেকার্টস (Descartes), স্পিনোজা (Spinoza), লিবনিজ (Leibniz), কান্ট (Kant), হেগেল (Hegel) প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মান ধর্মনাতিহ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া অত্যাধিক জগতের অস্তিত্ব, তাঁহার প্রয়োজন, নীতি ও রাষ্ট্রনীতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শিল্প, দীক্ষা, আচার-ব্যবহারের সর্বত্র ইহার পবিত্র সঞ্চ-স্থাপন দ্বারা ইহাদের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে।

ইংরাজ-লেখকদিগের মধ্যে কার্লাইল, এমার্সন ও ধর্ম্মযাজক-সম্রাট এই ভাবের ভাস্কর্য্য, এই মস্তের উপাসক। ইহাদের সমগ্র মানব-জাতির প্রতি সহায়ভূতি, সমগ্র মানব-জাতিকে বর্ণনির্লিপ্যে সেবা করিবার ব্যাঘাতভাব, মানব-জাতির আদম্পর ক্রিসিস, কার্লাইলের 'Hero', এমার্সনের Representative men-এর পাঠক ইহা সহজেই অল্পভব করিবেন।

ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে যে সকল কবি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব-কালকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। তাঁহার মাতৃহৃদয়ের অমৃত সিকন্দে ইংরাজী সাহিত্যে যে স্থূলভিত সদ্ভীতের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা জগতে অতুলনীয়। মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে যেমন নাটক, সাহিত্য, অলঙ্কিত কলা, শিল্প ইত্যাদি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তেমনি ভিক্টোরিয়ায়ুগেও গীতিকাব্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীবনের মধ্যে যে কক্ষ হুরের কাতর বিলাপধ্বনি অবিরত হইতেছে, তাঁহার প্রতিধ্বনি উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া মানব-জাতির অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের অন্তরতম কণ্ঠের নীরব সদ্ভীত ওয়াড্‌সওয়ার্থ, শেলি, 'কাইল', ব্রাউনিঙ্গের কবিতায় দৃষ্ট হয়।

ইংরাজী সাহিত্যে এই কক্ষ হুর-সম্বল সদ্ভীতের সর্বপ্রথম গায়ক কোলোজি। তাঁহার মধ্যে বাহা বীজরূপে জন্মলাভ করে, তাহাই ওয়াড্‌সওয়ার্থ (Wordsworth) শেলি (Shelly), কাইল (Keats), ব্রাউনিং (Browning) এ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া স্বন্দর বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। আহা সেই বৃক্ষের

কি মনোহর দৃশ্য। কি মধুর তাহার ছায়া।
সেই বৃক্ষবানী বিরহমের কি মধুর কাকলী-
কান্না। এস আমরা ইহার সম্বন্ধে আলোচনা
করিয়া ইহারাজী কাব্যসাহিত্যে ভাববাদের
বরণ তব ও বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগুলি
দেখিয়া জান ও ভাবের ভাঙারের উপভব
করিয়া লই।

(২) ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির মধ্যে আনন্দময়
চৈতন্যের অতিশয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত পুণের
মধ্যে, নির্জন পর্বত-কন্ডেরও উপত্যকার
নিষ্কারিণীর কল কল নিনাদ অহুসন্ধান করিয়া
জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাহার সমগ্র
জীবন এই অহুসন্ধিয়ার বিরাট প্রয়াস।
অতএবে লিখিয়াছেন—“Our birth is but
a sleep and a forgetting”—আমাদের
জীবন এক স্বপ্ন ও ভ্রান্তি।

আমরা যে চৈতন্যময় সখার অংশ, যাহার
ক্রোধ আমাদের পরম আশ্রয়, (জাগ্রত)
জীবনে তাহাকে হুলিয়া মোহ-নিদ্রায়
বিজড়িত হইয়া থাকি। ইহাই তাহার শেষ
ও অমোঘ বাণী।

(২) তারপর শেলি ও কীটস—ইহারা
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা কাব্যসাহিত্যে
ভাববাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। উভয়েই
সমন্বয়িক, একই ভাবের ভাবুক, একই
স্বরে একই ছন্দে জীবন যাপন করিয়া গিয়া-
ছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে নিরাশার তপ্ত
নিঃশাস ফেলিয়া গেলেন, কীটস ও শেলি
আপনাদের হৃদয়ের অহতবের ছায়া তাহার
মোহামা করিয়া মানব-জাতিকে ভাবজগতের
অপূর্ণ সৌন্দর্য, অসীমের পিপাসা, জীবের
স্বাভাবিক দর্শন ইহা নির্দোষের উপায়
সাহিত্যে ও জীবনে প্রদর্শন করিয়া সমাজকে
স্বপ্নে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

কীটস সৌন্দর্যের কবি। প্রকৃতির কোমল
স্পর্শ হইতে ভাবরাশি উদ্ভাসিত করিয়া
মনোহর শব্দ-বিচ্ছাদে হৃদের ছাঁচে ঢালিয়া
গিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিকে স্বচিন্তিত ও
স্বনিয়ন্ত্রিত করিবার অবসর পান নাই।
বিবাহের অমোঘ হস্ত তাহাকে অসময়ে
সরাইয়া লইয়া গেল।

শেলি শুধু কবি নহেন। তিনি প্রেমিক
ও সংস্কারক। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহাকে
মুগ্ধ করিত, কিন্তু মানবের হৃদয়ের অস্ব-
সৌন্দর্য্য তাহার হৃদয়কে (সব সময়েই জন্ত)
এক রসে সিক্ত করিয়া রাখিত। তিনি পুত
ও পবিত্র মানব-হৃদয়কে নৈতিক আদর্শ ও
দর্শনের নিখিল জ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত করিবার
চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কীটসের সঙ্গে
শেলির পার্থক্য এইখানে। কীটস প্রকৃতিকে
ভাল বাসিতেন, তাহার স্বকোমল ক্রোড়ে
শয়ান থাকিয়া যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেন
তাহাতেই তাহার সম্পূর্ণতা ও আত্মতৃপ্তি
জন্মিত। কিন্তু শেলি কেবল প্রকৃতি-স্বন্দরীর
স্বকোমল শশ্ম-শয়নে আনন্দ উপভোগ
করিয়াই তৃপ্ত হন নাই। তিনি সেই সৌন্দর্য্য-
উৎস হইতে মানব জগৎ ছুটিয়া আনিয়া
সেখানে তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ ও পরাকাষ্ঠা
দেখিয়া মানবকে সত্যের পথ, মুক্তির পথ,
আনন্দের পথ দেখাইবার জন্ত সংস্কারকের
ভাবে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন।
শেলি শুধু হৃদয়-শব্দ-বিচ্ছাদে ভাবের ছবি
আঁকিয়া মানবকে স্বাধী করিতে চাহিতেন না;
তিনি প্রেমিক ছিলেন, তাই তিনি উদ্বাদনা
বক্ষে লইয়া আত্ম-হৃদয়ের দায়িত্ব বেদনা
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ছন্দে বাহা লিখিয়া গিয়াছেন
তাহাতে সমাজ-সংস্কারকের অনেক উপাদান
সংগৃহীত হয়। তিনি সাহিত্য ও জীবনে এক

আধ্যাত্মিক জগতের সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস
পাইয়াছিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে শেলি (Shelly) যে
আধ্যাত্মিক রাজ্য স্থাপনের (Theocracy)
জন্ত হৃদয়ের বুদ্ধিদান করিয়া গিয়াছেন এবং
জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত মানব সমাজকে
ভাবের আদর্শ দ্বারা মুগ্ধ ও পরিচালিত
করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা
শেলির কবিতায় ও জীবনে সম্পূর্ণতা লাভ
করে নাই।

শেলি মানব-সমাজ-সংস্কারের পুরোহিত।
কিন্তু তাহার হৃদয়ের বিমল মন্দির-পায়া
বিশুদ্ধ শূন্য আকাশকে প্রাবৃত করিয়াছে।
মানব-স্বপ্ন তাহাকে আদর করিতে পারে
নাই, এইরূপ তীব্র সমালোচনা আব্দুদ
প্রমুখ সমালোচকদিগের মুখে শুনিতে পাই।
তাঁহার ভাবের তীব্র প্রখর স্বাধিকার, তাঁহার
ভাববাদের পবিত্র হোমানল-শিখা, তাঁহার
অসীমের বিরহ দাব্যানল রাষ্ট্রনীতির চক্রে
ঘূর্ণমান মানব-কিরণে বৃষ্টিবে?

আকাশ-বাতাস-জোড়া গীতি-গন্ধভরা জগৎ-
ব্যাপী সখার অতিশয় শোকার কর;
তাঁহার দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া জাগতিক
কর্তব্য পালন কর; সর্বজীবের সমন্বী হও;
হৃদয়কে মুক্তির অগ্রে স্থান দাও; হৃদয়ে
অসীমের পিপাসা-ভরিয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ
কর; পরিশেষে অসীম ও অনন্ত প্রেমসিদ্ধিতে
হৃদয়ের পবিত্র রক্তবিন্দুকে নিমজ্জিত কর।
ইহাই শেলির মণিভাষা হৃদয়ের উদ্ভিন্ন
তত্ত্বীরাণী। ঐ দেখ, ঐ জলন্ত আসন, ঐ পবিত্র
হোমানল-শিখা বিশ্ব গ্রাস করিতে চাহিতেছে।
উহা তোমার হৃদয়ে অচ্যুত ধরে কত কথা
বলিতেছে। কত গানের উৎস ছুটাইতেছে।
ব্রাউনিংয়ের ‘পবিন’ যিনি পাঠ করিয়াছেন,

‘তিনি ইহা অহুতব করিবেন। ব্রাউনিং
বলিতেছেন—

“Sun-treader
Live-there for ever
And be to all what thou hast been
to me,
A Key to music's mystery, when
mind fails
A reason, a solution and a clue.”
Pauline—R. Browning.

ইহা হইতেই বুঝিতেছি যে, কোন
উপাদানে তাহাকে নির্দাণ করা হইয়াছিল।
এখন কালিদাসের সঙ্গে সমন্বয় বলি—
“তৎ বেদো বিদধে মনঃ মহাত্মতসমান্বিতা।
তথাহি সর্বত্র সত্যসানু পরার্থৈকফলা গুণাঃ ॥”
রঘু-১ম সর্গ।

আহা তব বলিতে দোষ কি? ঐ দৃষ্টি
প্রখর হইলেও বড় শীতল। তীব্র হইলেও
শান্ত। দারুণ হইলেও কোমল। ভীষণ
হইলেও মোহন।

ইংরাজের আবালবৃন্দনরনারী প্রবাদ
বাক্যে—“no rose without a thorn,”
‘revolution is never set with rose
water’ ব্যবহার করেন। রাষ্ট্রনৈতিক
আকাঙ্ক্ষার পিপাসা বক্ষে লইয়া যে জাতি
মহাযত্ন-মহাযত্ন উত্তোলনের জন্ত জগৎ-
বিখ্যাত হইয়াছে এবং যাহার অতুল কীর্তি
স্বর্গাশ্বরে ইতিহাসে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই
জাতি “Bloodless revolution” এর
কবিকে শেখ হইতে নির্দোষিত করিয়া
অপনাদিগকে কলরিত করিয়াছেন। “মানব-
হৃদয়ের রক্ত বড় পবিত্র, তাহাকে অশুদ্ধ রাখিয়া
সমাজ সংস্কার কর” এই বাণীর প্রত্যক্ষ
কি না দেশবাসীর নিকট হইতে নির্দোষিত
হইয়া হৃদয়ের দারুণ জলন্ত প্রেম-বাড়নাল

অনন্ত বাচিবিস্কৃত অন্তর সাগরের জোড়ে হুইন পাইল! বিধাতার বিচার ভাঙ্গসমুদ্রই হইয়াছে। সামান্য মানবের দ্বায় গ্রন্থ না করিয়া অনন্ত হস্তের কোমল বাচিমালা স্পর্শে তাহাকে নিভ্রায়ে লইয়া গেলেন। শৈলী মানবের পরিত্যক্ত কিন্তু ভগবানের গ্রাহ্য। ক্ষুদ্র সমাজের দ্বারা লঙ্ঘিত কিন্তু মহতের আদৃত। সীমার বন্ধন তাহাকে উপেক্ষা করিল, কিন্তু অসীমের চির অগ্রগ্রহ তিনি লাভ করিলেন। জীবন-রহস্ত উন্মোচন করিবার জন্ত বাঁহার জন্ম, জীবনের সমস্ত কণ্ঠে, ভাবে ও আরোহনে বাঁহার বিকাশ, অবস্থানে তাহাই মহিমামণ্ডিত হইল। ইহা অপেক্ষা গৌরবের আর কি হইতে পারে?

ট্রাউনিং শৈলীর পরিগণিত্য ও পরাকাষ্ঠা। শৈলিতে যাহা বাঁজ ও অন্ধুর, ট্রাউনিংএ তাহা ফল-ফুল-সুশোভিত মনোহর বৃক্ষ। শৈলী যাহা আজীবন সেবা করিয়া গেলেন, ট্রাউনিং তাহাই স্বতন্ত্ররূপে ধরিয়া অপরূপ করিয়া চলিলেন। শৈলীর অন্ধুরিত বৃক্ষে ট্রাউনিং-এর প্রফুল্ল-হৃৎসমসৌভ সমাজকে আয়োজিত ও আতুল করিয়াছে। শৈলীকে যে সমাজ রক্তচক্ষে বরুণটিতে ভ্রতদী করিয়া বিতাড়িত করিল, সেই সমাজ অশ্রুসিক্ত নয়নে উজ্জ্বলিত স্বপ্নে ট্রাউনিংকে স্থান দিল। শৈলীর "Love is loveliest when embalmed in tears" সমাজ গ্রহণ করিল কিন্তু অল্প স্মৃতিতে, ইহাই শৈলীর গৌরব ও কীর্তি।

ট্রাউনিং শৈলীর শিক্ষায় শিক্ষিত, শৈলীর ভাবে বিভোর, শৈলীর আদরে পরায়ান, শৈলীর প্রেমে মুগ্ধ, শৈলীর গর্বে গম্ভীর। শৈলীর অসীম রাজ্যের বার্তা মানবসমাজে প্রচারের সর্ব প্রথম দূত।

ট্রাউনিং শৈলিকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন শৈলীর সন্নিহিত তাহার যে পবিত্র সম্বন্ধ ছিল এবং সেই পবিত্র বন্ধন তাহার স্বয়ং-সময়গরে যে মুখের কল্লোল-তরঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহা "পলিন"-পাঠকের অবদিত নাই। শৈলী ট্রাউনিংয়ের চক্ষে সামান্য রক্তমাংসবিশিষ্ট মানব নহে, নিবিড় ভাবের বনীকৃত সৃষ্টি, দ্বিগত বায়ুবিপ্লব পৃথিবীর জীব নহে, হৃদয় গগনবিহারী বহু বিধের কাকীতান।

"The blue doop then wingest
And singing still dost soar and
soaring ever singest."

P. B. Shelly.

তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছেন যে, শৈলী প্রদীপ উজ্জল ভাস্কর, নির্মল প্রদীপ জ্ঞানানল। ট্রাউনিংএর আত্মনিবেশন ও আত্মসমর্পণ মানব-সমাজকে প্রাণিত করিয়া মহত্ত্ব ও মহত্ত্বের পথ উদ্ঘাটন করুক। ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এরূপ ভাব করিতায় খুব কম দেখা যায়। ট্রাউনিং শৈলীর নিকটে আত্মনিবেশনকালে যে ভাবে মানব-স্বয়ং-তত্ত্বার আলোড়ন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। ট্রাউনিংএর মহত্ত্বই এই যে, আপনাকে বিশ্বের প্রতি-বিধের দ্বায় দেখিয়াছেন। ক্ষুদ্র মানব-মনে ভাবের যে প্রতিবিম্ব অবিরত পতিত হইতেছে তাহার প্রকট ছবিই ট্রাউনিং। তাহার কবিতা সেই ছবির অসম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি।

জগতের প্রতি রেখণায় বিশ্বের অন্তিম, আত্মার অমরত্ব, প্রেম ও প্রেমের চিরস্থায়িত্ব, ভগবানের সর্বনিয়ন্তৃত্ব, তাঁহার প্রতি মানবের কর্তব্য, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও তাহার উপায়, এই বিষয়গুলি ট্রাউনিং নাটক ও গীতিকাব্যে নানা ছন্দে নানা স্বরে গান করিয়া আপনাকে মহত্ত্ব-সমাজে অমর করিয়া

গিয়াছেন। সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহায়-ভূতি, জগতে ভালবাসাই সর্বোৎকৃষ্ট নীতি ও শাসন, ভালবাসাই জীবের কর্তব্য ও গতি ইহাতেই পরাকাষ্ঠা, ইহা ট্রাউনিংএর কবিতা ও জীবনে প্রতিপদে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ট্রাউনিং শৈলী অপেক্ষা মানব-সমাজের আঁরণের জিনিষ। ট্রাউনিংএ শৈলীর উদ্ঘাটন নাই অথচ শান্তি আছে; ভাবের প্রার্থনা নাই, শীতলতা আছে, তাহাতে শৈলীর দীপ্যমান নাই, তবে ভাবের নিবিড়তা আছে; শৈলীর দ্বায় মানব-সমাজকে পরিবর্তন করিবার জন্ত ব্যগ্র পিপাসা নাই; ভালবাসার মধুর ও বিমল হার্তা, বিকীরণ করিয়া সংসারে পরিচালনের ইচ্ছিত আছে; শৈলীর ঐক্যের দুর্দমগীৰতা নাই, কিন্তু মাধুর্যের তাঁর সংঘম করিয়া; ভাবের প্রগল্ভতা নাই, ব্যাঘ্রের সংঘম আছে; ভাষা নাই, বাগ্ম্য আছে। ইহারই জন্ত ট্রাউনিং হুপাঠ্য নহে।

ট্রাউনিং বেশী লেখেন না। অল্প লিখিয়া একটা চিত্র তুলিয়া দেন—তার পরে পাঠককে সব বুঝিয়া লইতে বলেন। তিনি ভাবমুগ্ধ নীরব বীণা-বদনের কোমল তবী-আলোড়নে সঙ্গীতের "উজ্জ্বল সুর" তুলেন—তুলিয়াই নিজে আপন ভানে আপন মুগ্ধ হইয়া থাকেন—শোভাক্যে ভানের ধোঁঘে স্বকার হইতে ব্যগ্নায় বুঝিয়া লইতে বলেন।

অসম্পূর্ণ চিত্র হইতে সম্পূর্ণ সৃষ্টি অঙ্কিত করা, স্বরের স্বকার হইতে তান-মান-অর্থ সমন্বিত সঙ্গীত যোজন্য করা, কতিপয় শব্দ হইতে ভাবরাশির উদ্ঘাটন করা—বাস্তবিকই সহজ ব্যাপার নহে। সেইজন্য ট্রাউনিংএর পাঠক ও বুঝিবার লোক বিরল। যাহারা দীর্ঘ ও সংঘমী—যাহারা ভাবের ভাবুক—তাহারাই ট্রাউনিং এর অদৃশ্য শৃঙ্খলগুলি

জুড়িয়া লইবার প্রয়াস পাইবেন; সমান-চিত্রই সমানচিত্রকে আশ্বাসন করিতে পারেন। ট্রাউনিং প্রেমিক, প্রেমিক না হইলে ট্রাউনিংএর পাঠক তাঁহার লেখনী সঞ্চালনের কৌশলের স্বথ্যতি করিবেন না। প্রেমিক না হইলে ট্রাউনিংএর প্রেম, পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা, উপদেশ,—মানব সমাজের প্রতি সহায়ভূতি, মানব সমাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা—অস্পৃষ্ট অক্ষুট এমনকি অকী ভোদ্য হইবে। ট্রাউনিং ভাবের কবি—নীরস কবি। উজ্জ্বল উদ্ঘাটন,—শব্দবিচ্ছাদ—অলঙ্কার সমস্তই তাহাতে নীরব। বীণা স্বন্দর, তার বিভ্রান্ত; কিন্তু নীরব। কখন স্বর উঠে কিন্তু পরম্পরেই ধামিয়া যায়। কোন সঙ্গীতই সম্পূর্ণভাবে সকল তারের আলোড়নে ব্যক্ত করা হয় না। কখন শব্দ ফুটে, বাক্য ফুটে—তার পরেই নীরব সঙ্গীতের আলাপনে মুগ্ধ হইয়া যান। এইখানেই ট্রাউনিংএর সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা এই সংঘত উজ্জ্বল। যেন অসীম তঁক সমুদ্র; তাহার মুখের কল্লোল চপলতা পরিহার করিয়া মুগ্ধ গানের তানে বিভোর। তরঙ্গ উঠে সত্য—কিন্তু উঠিয়াই আবার অসীম শীতল সোম্য জলরাশির তলদেশে ফিরিয়া যায়। ভাব ফুটে—ভাষা ফুটে—পর মুগ্ধেই ভাবের অসীম আধার ঐ স্বয়ং-স্বস্তরতম কবে ফিরিয়া গিয়া আত্মাহুত্বান্তে পর্যাবসিত হয়।

এখানে কীড়া নাই—উপভোগ আছে; উল্লাস নাই নিবর্তিতা আছে। বাহিরের সৌন্দর্য্যে বিলাস নাই, অন্তরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ভাব আছে। প্রবৃত্তি নাই—নিরতি আছে। ইন্দ্রিয়ান্ত্রি যে রাজ্য তাহার বাণী প্রচারের জন্ত এই উপায়ই সর্বোৎকৃষ্ট। কবি অসীম আন্তরিকতা বলিবার যে প্রয়াস পাইয়াছেন

তাহা সফল হইয়াছে। আমরা তাঁহার নীরব শাস্ত্র ধ্যানভিমিত্ত অনিন্দ দেখিয়া মুগ্ধ। মুন্দের বাক্য ও আড়ম্বর ধূমতা মাত্র।

অবশেষে একটা মাত্র কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় শেষ করিতে চাই।

বাহারার মানব জাতির হৃদয় আসনে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারায় জগতে নীরবে আসনে নীরবে চলিয়া যান। কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া আপন কার্য সাধন চলে কাহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া যান, কে বলিবে?

শান্তি তাঁহাদের আবাস, ভাব তাঁহাদের সম্পদ, ত্যাগ তাঁহাদের কৃপণ, বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়, প্রেম তাঁহাদের দান, ইন্দ্রিয় তাঁহাদের কৌশল, জীবন তাঁহাদের পরীক্ষা। জগৎ ও সমাজ তাঁহাদের চক্ষে অসীম ও অনন্তের অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া। জগৎকে তাঁহারায় নীরবে ভালবাসেন—ইন্দ্রিতে তাঁহাদের হিতের চেষ্টা করেন। তাহা তাঁহাদের উপায়—ভাবের বাহন নাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ভাবের অতুল সমুদ্রের মধ্যে প্রেমমণিবীজ ও আপ্যায়সাধারণ লইয়া সেই মণির বিমল কিরণে জীবনের গুণ-স্বাদী মুহূর্তগুলিকে আলোকিত করাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের প্রেম মহাত্মার চিত্তাঙ্ঘ্রে উদ্বাহাপিত হয়। মানব সমাজ সেই চিত্তা-ভঙ্গের উপর মঠ-স্থাপনে গৌরব অশুভব বরে।

অতীতের স্মৃতির চিত্তাভঙ্গ লইয়া; মানব তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মহেশ্বের অবশেষ ইহাই। ইহাই মহেশ্বের পরিচয়, পরীক্ষা ও গৌরব।

এস আমরা মানব জাতির সেবক, ভগবানের প্রেরিত সেবা ও প্রেমের ঘনীভূত সূক্ষ্মকে হৃদয় আসনে বসাইয়া কবির সঙ্গে বলি:—

Peace Peace! he is not dead,
he doth not sleep.
He hath awakened from the
dream of life.

He lives, wakes—'tis death is
dead not he.
(P. B. Shelly)

এস ব্রাউনিং, এস, মানবহৃদয় আসনে পবিত্র ভাবের উৎস হইয়া বস। মানবজীবনে মঙ্গল ও মণ্ডুরের মিলন দেখিয়া আমরা ধম্ব হই। ইহাতে তোমার নামের প্রতিষ্ঠা হউক। সর্বোপরি বিশ্বজন্যবাণী যে মহামানে ভূমি অবতারণ এবং বাহার বেজ্যাকৃত অলঙ্কার শাসন ও নিয়মে মুগ্ধে মুগ্ধে-মহাপুরুষেরা জগৎগ্রহণ করিয়া প্রেম ও কর্তব্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহার অটল আসন সর্বজননের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক। তাঁহার নাম জয়কৃত হউক, তিনি দয়্য হউন।

শ্রী আদিত্যনাথ মৈত্রী।

পল্লীর বিচারালয়

সে দিন আমরা মালদহের একটা অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত পণ্ড্রগ্রামে উপস্থিত ছিলাম। চিনিতে পাইলাম, ঐ গ্রামে গ্রিক ঐ দিবসেই 'বাইশী' নামক একটা মজলিস বসিবে। কথাটা যখন ঢোলের সাহায্যে পাড়ায় প্রচারিত হইতেছিল, তখনও তত আগ্রহ

করিয়া উহার আভ্যন্তরিক ঘটনা অস্বপ্নান করি নাই। কথাটা কানে একটু নুতন নুতন ঠেকিয়াছিল মাত্র। ক্রমে আমরাও যখন অস্বপ্ন হইয়া মজলিসে যোগদান করিতে বাধ্য হইলাম, তখন আর কথখাটা না জানিলেই বা কিরূপে চলিতে পারে। মজলিস দেখে

উপস্থিত হইয়া ক্রমে দেখিতে লাগিলাম—বিভিন্ন গ্রাম, পাড়া বা বস্তি হইতে বিভিন্ন বয়সের লোকসমাগম। প্রায় সকলের হাতেই দেশীয় চতুর্দোণ লঠনে কোপ-সংশ্লিষ্ট এক একটা আলো। বাহার অবস্থা এখনও ততদূর উন্নত হয় নাই, সে হযত শুকনা তুতের ডাটা মুঠা করিয়া তাহাই আলিয়া স্বপ্ন-গমনে মজলিস স্থানে আসিয়া বিচিত্র সজরক এবং কথনের উপর উপবেশন করিতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য যে, মজলিসে সকলের জন্ত উক্ত নীচ নির্ধারিত সমান আসন প্রস্তুত ছিল। ক্রমে মজলিস বেশ জমিয়া উঠিল। রাজি এক ঘণ্টা হইতে না হইতেই মজলিস-স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। লোকও নেহাত কম হয় নাই। গ্রাম 'পাইট' (মজুর) নামক দৈনিক উপার্জনজীবী ও তথায় আসিতে বাদ পড়ে নাই।

উল্লিখিত দৃশ্য দেখে আমাদের এক কাজ থাকিলেও এত সময়ের মধ্যে 'বাইশী' ও 'ছত্রিশী' নামক ছুটী মজলিসের বিপর্যয়সভারই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মোড়লের নিকট বিস্তৃতরূপে জ্ঞাত হইলাম। পরে বর্তমান মজলিসের উদ্দেশ্য ও আমাদের জানিতে বাকী রহিল না। ক্রমে আরও জানিলাম যে আশ্রয় না কি 'ছত্রিশী' মজলিসই বলিবে। 'বাইশী'র পরিবর্তে 'ছত্রিশী' হইবে শুনিয়া আমরা ভাবিলাম—কি এক অভিনব কাণ্ড কারণানাইনা জানি খাতিরে, আমাদের আগ্রহও একটু বৃদ্ধি পাইল। মজলিসের বিস্তারিত বর্ণনার পূর্বে সম্ভব পাঠকবর্গকে 'বাইশী' এবং 'ছত্রিশী' কথা ছুটীটার তাৎপর্য বলা আবশ্যক।

'বাইশী ও ছত্রিশী মজলিস'

পূর্বেক্ত বিবিধ মজলিসের মধ্যে 'ছত্রিশী'ই প্রধান। 'বাইশী' মজলিসকে পাড়াগাঁয়ের নির্দিষ্ট জাতির নির্দিষ্ট অপরাধীর জন্ত সর্বসাধারণ সম্মত বিচারালয় বলা যাইতে পারে। হিন্দু মুসলমান এবং নমঃশূত্র ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অজ্ঞ কোন বয়সের অপরাধীর বিচার এই বাইশীর সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমরা এ কথাও শুনিলাম যে, কিছু দিন হইল একজন হিন্দু জঠনে মুসলমানের একটা গল্প খুব কাটিয়া দিয়াছে, এইরূপ গুরুতর বিষয়ও না কি পরবর্তী 'ছত্রিশী' বৈঠকে সীমাসীত হইবে। বৈঠক জানিলাম ও দেখিলাম, মালদহবাসীকে বোধ হয় খুব কমই গবর্ণ-মেণ্টের 'কোর্টফি' (court-fee) বরাদ্দ করিতে হয়। এই মজলিসের সাহায্যে ছোট ছোট এমন কি কখন খুব বড় বয়সের বিবাদ ইত্যাদিও মিটিয়া থাকে। কাহাকেও 'ইংরেজবাজার বড় দৌড়াইতে হয় না।

'বিচারক'

'বাইশী' মজলিসের মধ্যে কয়েক জন বিভিন্ন গ্রামের মোড়ল (গ্রাম বা পাড়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) এবং প্রতি গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া বিচারকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। ইহাও সত্য যে হিন্দুর 'বাইশী'তে শুধু হিন্দুই উপস্থিত থাকেন এবং মুসলমান মুসলমানের 'বাইশী'তে উপস্থিত থাকিয়া নিজেদের বিচার কার্য্য সম্পন্ন করেন। হিন্দুকৃত 'বাইশী' মজলিসের কোন নিয়ম কিংবা আদেশ মুসলমানসমাজের উপর বর্তে না। আবার মুসলমান-অজ্ঞাত মজলিসের দ্বারাও হিন্দুদের বিচার-কার্য্য চলিতে পারে না।

এক আক্ষিপের বিষয় দেখিলাম—এখানকার হিন্দু মুসলমানের আলোচ্য বিষয়ে সহায়ত্বিত। জাতিগত বিষয়ে কোন সম্প্রদায়কেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমরা যে স্থানের বিষয় বলিতেছি, তথায় মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যাই খুব বেশী, কিন্তু তাই বলিয়া অঙ্গ-সম্প্রদায় মুসলমানকে সম অধিকার হইতে কোন ভ্রমেও বঞ্চিত হইতে হয় না। প্রত্যেক মজলিস বসিবার পূর্বে গ্রামের জনৈক ভাবপ্রাপ্ত মোড়ল টোল দ্বারা সাধারণ ঐ কথা এবং নির্দিষ্ট তথ্য প্রচার করিয়া দেয়। যদি কেহ বেচ্ছাক্রমে মজলিসে উপস্থিত না হয়, তবে তাহাকে নিজ অপরাধের জন্য মজলিস কর্তৃক নির্দিষ্ট জরিমানা বা শাস্তি ভোগ করিতে হয়। এ ব্যাপারে, সময় সময় কান্দারও বা সমাজ বন্ধ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক লৌকিক নালিশে বাদী সর্বসমক্ষে ঘোড়হতে গলবস্ত্র হইয়া নিজ আবেদন জ্ঞাপন করে। প্রত্যেক আবেদনেই অপক্ষপাত্ত্ব ক্রমে মজলিস কর্তৃক গৃহীত হয়। আবেদন উত্থাপন মাত্র মজলিসের নির্দিষ্ট ব্যক্তি বাদীর আরজি এবং বাদী-বিবাদিগণের নাম-খাম এবং সাক্ষী ইত্যাদির কথা কাগজ-পত্রে লিখিয়া লন। মজলিসস্থ নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট লোকের নির্দিষ্ট উপাধি আছে। যে কোন ব্যক্তিকে মজলিস কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি ব্যতীত ক্রমে ভোগ করিতে দেখা যায়। মোকদ্দমা বিচারে উঠিলে, প্রধান মোড়ল অথবা সর্ব-শ্রেষ্ঠ বিচারক, বাদী, বিবাদী এবং সাক্ষী হাজির আছে কি না, মজলিসস্থ নির্দিষ্ট ভাব-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে আদেশ করেন। সকলে হাজির থাকিলেই সেই দিন বিচার কার্য আরম্ভ

করেন, পরন্তু এক পক্ষ অধুপস্থিত থাকিলে সেই দিনকার জজ বিচার-কার্য বন্ধ রাখিয়া অধুপস্থিত পক্ষের প্রতী এতদর্থে সবার পাঠান যে, আগামী মজলিসে যেন সকল পক্ষ উপস্থিত থাকে। সময়ে সময়ে বাদী-বিবাদীকে অবকাশও দেওয়া হয়।

‘বিচার-কার্য’

বিচারের পূর্বে সাক্ষী এবং বাদী বিবাদীকে ‘হলপের’ দ্বারা প্রতিজ্ঞা পাঠ করান হয়, মজলিসস্থ অজ্ঞাত মোড়ল এবং গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ উকিলের কার্য করিয়া থাকেন, এ ওকালতিতে পদার নাই, বাদী ও বিবাদীপক্ষের জজ ভিন্ন ভিন্ন উকিল নির্দিষ্ট হয় না। ঘাটমত সকলেই সকলের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, বাদী কিংবা বিবাদী কাহাকেও এজ্ঞাত উকিল-গণের হস্তে পশ্চাৎকালে হইতে সজ্ঞতথও স্থান করিতে হয় না। বাদী ও বিবাদী উভয়কেই মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য এক এক টাকা নজর দিতে হয়। কোন কারণে তাহাদের বিচার ‘ঐ দিবস’ সমাধা না হইলে তাহাদিগকে দ্বিতীয় বারের জন্য নজরের টাকা দিতে হয় না। মজলিসের সর্ব-সম্মতি-ক্রমে অপরাধীর বিচার কার্য শেষ হইলে ইদ্রিতক্রমে প্রধান মোড়ল কর্তৃক রায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এ কার্যে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির অধিকার নাই।

‘অপরাধীর দণ্ড’

অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অপরাধের দণ্ড-রূপে টাকা জরিমানা দিতে হয়। কাহাকেও বা ভূখণ্ড ইত্যাদি দ্বারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু তাহারা দৈনিকশ্রমজীবী (day-labourer) তাহাদিগকে অগত্যা টাকার

পরিবর্তে অপরাধের গুস্ততাহাবাদী পাঁচ, সাত বা ততোধিক দিবসের জন্য পাইট (মজুর) খাটা বন্ধ রাখিতে হয়। বাস্তবিকই এ কার্যে বেচারা শ্রমজীবীদিগের পক্ষে গুস্ত-তর। কাহাকেও দৈহিক শাস্তি (corporal punishment) দেওয়া হয় না।

‘জরিমানার টাকার সন্ধ্যায়’

হিন্দু ‘বাইশী’ মজলিস কর্তৃক আদায় জরিমানার টাকা দ্বারা হিন্দুদিগের এবং মুসলমান কর্তৃক আদায় জরিমানার টাকা দ্বারা মুসলমানদের সংকার্য সর্বসম্মতিক্রমে সমাধা হইয়া থাকে। ষ্টিচারের পূর্বে বাদী ও বিবাদীকে “এই মজলিসকে তুমি কি বলিয়া জান?” এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহার সাবল সমতা এবং ভগবানের আদালত বলিয়া উত্থাকে স্বীকার করে। শুনিলাম, এই মজলিসের বিচার না কি সময়ে সময়ে গুস্ত-মেটের প্রচলিত দণ্ডবিধি দ্বারাও অবহেলিত হয় না। যদি কোন বিশেষ কারণবশতঃ ইহাদের কোন মোকদ্দমা বিচারার্থ আদালতে পৌঁছে, তথাপি বিচারক কর্তৃকও পূর্বে রায়ের অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয় না। মজলিস কর্তৃক বিচারিত কোন মোকদ্দমা গুস্ত-মেটের আদালতে পৌঁছিলে, মোকদ্দমা-উত্থাপনকারীর পক্ষে সাক্ষী ইত্যাদি সংগ্রহ করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কেন না তাহাদের নিজ নিজ মজলিসের অবমাননার ভয়ে সকলেই সাক্ষী হইতে নারাজ। কাজেই এরূপ কোন মোকদ্দমাই বড় একটা সহরে পৌঁছে না। ‘বাইশী’ মজলিসে না কি বাইশ-পল্লীর বাইশ জন মোড়লের উপস্থিতি আবশ্যক। এ কথা সত্যতা সর্বাঙ্গের খাতি ন হইলেও অনেক মোড়লের উপস্থিতি যে

সম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। মজলিস কর্তৃক নির্ধারিত নূতন ব্যবস্থা টোলদ্বারা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত মজলিসের নিকট উক্ত ব্যবসায়ীর কিছু প্রাপ্যও আছে।

এক্ষেণে আমরা ‘ছত্রিশী’ মজলিসের বিবরণ বলিব। ‘ছত্রিশী’ মজলিসের বিচারক এবং বিচার-কার্য গ্রিক বাইশীকে অধ্বক্ষণ কোন পার্থক্য নাই। এতদ্ব্যতীত মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা এই যে, ছত্রিশীতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান ইত্যাদি ছত্রিশ জাতীয় লোক উক্তনীচ নির্বিশেষে একই নামান্বিতার নীচে একই ফরাসে উপবেশন করিয়া যে কোন আতির অন্তর্গত অপরাধীর বিচার-কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এখানেও সকলে একত্র হইয়া বিচার-কার্য সম্পন্ন করে এবং প্রধান মোড়ল কর্তৃক রায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। ষ্টিচারে অবধারিত জরিমানার টাকা দ্বারা হিন্দু মুসলমান সর্বসাধারণের সংকার্য সাধিত হইয়া থাকে। কেহ ঐ সম্মতিক্রমে বিচাররূত দণ্ডাজার প্রতী অঙ্গ প্রকাশ করিতে পারে না, করিলে তাহারও দণ্ড দণ্ড আছে। হিন্দু-মুসলমান, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উক্তনীচ সকলেরই এ ক্ষেত্রে সমান আপন, সমান সম্মান এবং সমান অধিকার। হিন্দু বলিয়া কেহ ডাল বিচার করিল, আর মুসলমান বলিয়া কেহ খরাপ বিচার করিল, এরূপ গোপালম হইবার আশঙ্কা মাত্রও নাই।

আমরা যে সময়েই ছত্রিশ জাতীর সম্মিলন অর্থাৎ ‘ছত্রিশী মজলিস’ দেখিলাম, তাহাতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন মনোমালিন্য লক্ষিত হইল না। আমরা আগ্রহের সহিত তাহাদের নিকট আরও কারণ জিজ্ঞাসা করার

তাহারা বলিল যে,—“আপনারা সত্য এবং শিক্ষিত বলিয়া রাশি রাশি কথা বলিতে পারেন, আপনারদের ভ্রাতৃ আমরা বক্তৃতা করিতে জানি না, আমাদের এ একতা এবং সম্মিলন বদেশী আন্দোলনের ফল নহে,—ইহা আমাদের বহুদিনকার নিজ হাতের গড়া জিনিস।” পাঁড়াগায়ের একজন অশিক্ষিত লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া বোধ হয় অনেকই আশ্চর্য বোধ করিবেন। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন,—ইহা কি সরল কথা, কি হৃদয় এবং মূল্যবান উপদেশ। বাস্তবিক ইহা কি আমাদের নিজ হাতের গড়া,—আমাদেরই আধ্য-সভ্যতার একটা সর্ব্ব প্রধান আদর্শ ন?

‘ছত্রিশী বৈঠকে’ সেদিন আমরা যে সকল বিচার-কার্য্য দেখিলাম তাহাদের মধ্যে তিনটাই কৌতূহলোদ্দীপক এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

‘কয়েকটা মোকদ্দমার বিচার-কার্য্য’ প্রথম নম্বরের মোকদ্দমায় একজন বিদেশীয় পাইট (মজুর) বাদী, জাতিতে নমশঙ্গ। বাদী যখন একাকী এক তুতুকেরের কাণ্ডে নিযুক্ত ছিল, তখন তাহার পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্রে অস্ত্রাঙ্গ দশজন পাইট (মজুর) একই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। ইহারা বিবাদী, জাতিতে মুসলমান। বিবাদিগণ প্রথমতঃ তামাকের অছিল্য বাদীর নিকট উপস্থিত হইয়া জোর করিয়া তামাক আদায় করিয়া লয়। ফলে বাদী তামাক দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বাদী ও বিবাদীতে বচসা হয়, পরে বিবাদিগণ বাদীর দুই হস্ত বদ্ধ করিয়া গুস্তর প্রহার করে। প্রহারে বাদীর দেহ জখম হইয়াছিল। ভাণ্ড্যক্রমে ঘটনাস্থলে কতিপয় সাক্ষী জটয়া-ছিল। বিচারে বিবাদিগণের দোষ্টের উপর

পঠিশ টাকা জরিমানা হয়। এ স্থলে মুসলমানের বিচারক মুসলমানই ছিল। তবুও বিচার-কার্য্যে পক্ষপাতিত্ব-দোষ ঘটে নাই অথবা বিচারে কেহ মামলুর হয় নাই। জরিমানার টাকাও ঐ মজলিসেই আদায় হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মোকদ্দমায় কোন গোয়ালী আত্মস্থ বিবাদী এবং তাহাদের পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয় বাদী। বিবাদিগণ বাদীকে ঝাটশব প্রাপ্তিপালন করিয়া বিবাহ পৃথগ্ন দিয়াছে। কিন্তু একগে তাহারা বিনা দোষে উত্থাকে জীবিকা-নির্ব্বাহোচিত্ত অধিকার হইতে, বঞ্চিত করিতে চাহে। বিচারে বাদী বিবাদিগণের নিকট হইতে উকীরা দেড় বিঘা ভূতের ভূমি দান-স্বত্ব পাইয়াছে। আইনামাযাদী কিন্তু এরূপ দাবী চলিত না। কিন্তু আইন এবং সর্ব্বসাধারণের মত এক নহে। এখানে আমরা দেখিতেছি আইন অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণের বিচারই বাঞ্ছনীয়। এ প্রকার গণশক্তির প্রাদাভ ঝাঁজ কয়টা ভাণ্ড্যায় আছে? কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি এরূপ হাকিম মাজ করিতে পারেন? হয়! এ দেশকে না কি লোকে আবার অহমত বলে! উন্নত রেশ এখনি অর্ধনির্ম্মলিত চক্ষু উদ্বীলন করিয়া একবার অহমত মালদহের এই গ্রাম্য বিচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

তৃতীয় মোকদ্দমায় সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার। স্থানীয় পাইটগণ (মজুর) নিয়মিত সময়ে কার্য্যে যাইত না এবং সময় না হইতেই ক্ষেত্র হইতে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইত। সর্ব্বসাধারণ দেখিলেন এই নিমিত্ত কৃষিজীবীর অনেক অস্থবিধা এবং অনর্থক অর্থক্ষয়। হুতরাং

ইহাদের বিচারে এই স্থির হইল যে, পাইটগণ (মজুর) হুর্থোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রে যাইবে এবং বার ঘটকার সময় কার্য্য বদ্ধ করিয়া অপসরু ছুই ঘটকার সময় পূর্ণায় কাজ আরম্ভ করিয়া হুর্থান্তের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিবে। যদি কোন পাইট (মজুর) ইহাঙ্গ ব্যতিক্রম করে, সে সেদিন-করা মজুরী পাইবে না। আর যদি কোন লোক নির্দিষ্ট সময়ের অন্ত্রে পাইট (মজুর) দ্বারা কাজ করান, সে এক শত টাকার মূললেখা দিবে। মজলিসের পর দিবস চির-প্রথাধায়ী গ্রামে গ্রামে টোল দ্বারা এই আদেশ প্রচার করা হইল। শ্রমজীবী সর্ব্বক্ষেত্র এইরূপ নিয়ম-যে চাক্রা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর বিশেষতঃ বরিশালের দ্বায় কৃষিপ্রধান দেশে স্থাপন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, তাহা বলাই বাছল। আমরা বরিশালবাদীকে এই প্রথার প্রতিষ্ঠা করিতে বিশেষ ভাবে অহুরোধ করি। এ জেলার কোন কোন স্থানে বেলা নয় ঘটকার সময় মজুরগণ ক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে। মালদহে এই শ্রম যে কোন বিশেষ বিশেষ পল্লীতেই আবদ্ধ আছে এমন নহে। এ স্থানে সর্ব্বত্রই এরূপ বিচারালয়ের প্রাদাভ লক্ষিত হয়। আদ্যকার দিনে সামাজিক শাসনেরই প্রাদাভ ছিল। ইহার স্বফলে কাজিদেরও অনেকটা আদ্যাসের লাবণ হইত।

‘ছত্রিশী’ মজলিসে হিন্দু-মুসলমানের এক আশ্চর্য্য সম্মিলন দেখিলাম। সে দিন সমস্ত রাস্মি দ্বারা বিচার-কার্য্য চলিয়াছিল। কিন্তু ক্ষণকালের জ্ঞাও কাহাকে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে দেখি নাই।

যে বিচারে ছত্রিশ জাতির সমান অধিকার তাহা ছত্রিশী মজলিসে সমাধা হয়। ‘বাইশী’

দ্বারা যদি কোন মোকদ্দমার সঞ্চিচার না হয় তবে তাহাও ঐ ‘ছত্রিশী’র সাহায্যে সমাধা হইয়া থাকে। সাধারণ ভাবে বিচারের পর দুই একটা মোকদ্দমা জমে তাহারেই অন্তিম উচ্চ আদালত (High Court) এবং আপিলেও পৌছিতে দেখিলাম। একই বিচারক নিম্ন আদালত (Small Cause Court), উচ্চ আদালত (High Court) এবং আপিলের বিচার কার্য্য করিয়া থাকেন। গুস্তর বিচার্য্য বিরয়ের দ্বায় ইত্যাদি কাগজ-পত্রে লিখিয়া রাখা হয়। এ ব্যাপারে এমন নিরাবিলভাবে, হিন্দু-মুসলমানের এমন পবিত্র সম্মিলন, শিক্ষিতাভিমাত্রী দেশে যুব কর্ম্মই লক্ষিত হইয়া থাকে।

আমরা মাসের ‘গৃহস্থ’র আলোচনাংশে “জনসাধারণের মহত্ব” সর্বে সত্য সত্যই লিখিত হইয়াছে,—“সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষার স্বযোগ পাইয়াও ষ ষ সমাজে যে কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেছেন না, দেখা যায়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকিয়াও তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। শিক্ষিতগণ বিভ্রাদ্ব্যজন ও বৈদ্যুতদীপ-পরিশোধিত প্রকাও প্রকাও সভাসমিতি স্থাপন করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ সঙ্কল্প ও প্রস্তাব করিয়া এবং সংবাদ-পত্র-সমূহের লেখনিপ্রভাবে তুহল আন্দোলন উপস্থাপ্ত করিয়া, বহুদিবসও সমাজের যে সংস্কার করিতে-সমর্থ না হন, নিরক্ষরগণ মলিন পর্ণশালায় একটা মাত্র বৈঠক বসাইয়া নিমেষ মধ্যে তাহা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্য করিতে পারে। ইহারা যাহা হিত বা অহিত বলিয়া ধারণা করে, তাহা গ্রহণ বা বর্জন করিবেই, সে শক্তি তাহাদের আছে। ব্যক্তিগত ক্ষতি হইলেও সমগ্র সমাজের

মঙ্গলের জ্ঞান তাহা তাহার। বেছায় গ্রহণ করে, অথবা অন্যথা থাকিলেও সমগ্র সমাজের প্রভাবে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। দেশের নিকট তাহার অবনতি। দেশের কথা ভনিতো তাহার। বাধ্য। গণশক্তিকে না মানিয়া তাহাদের উপায় নাই। গণের নিকটে থাকিলে অবনতি থাকিতে হইবে। ইহা ব্রাহ্মদেব যুক্তিমূলক প্রাচীন সংস্কার। আমাদেরও এ সংক্ষেপে একই কথা। কার্য-ক্ষেত্রেও চাক্ষুষ তাহাই দেখিতেছি।

আমরা যে কেবল 'দেশের উন্নতি করিব' দেশের উন্নতি করিব' বলিয়া ভাক হাঁক তুলিয়া অথবা বাক-চাতুর্ঘ্য অনেকটা সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকি, ঐ সময়টা বহিঃপ্রতি জেলায় প্রতি পল্লীতে উপস্থিত হইয়া, পল্লী-বাসীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কথার আদান প্রদান করিয়া আশীশ্বিত্যের জীর্ণ নিম্ন ও অস্থানগুলিকে জোড়া গাঁথা করিয়া ঘোল আনা জিনিস পৌঁছাই, তবুই আমাদের বলিবার মত কতকগুলি প্রাচীন সামাজিক অস্থানদের অঙ্গ বজায় থাকিয়া যায়। কিন্তু হায়! আমরা ঘোড়া কিনিবার বেলাই অর্ধের বাহুল্য দেখাইতে পারি, কিন্তু লাগাম কিনিবার সময়ে একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায়। ভাক হাঁকের বেলা যথেষ্ট, কাজের বেলা,— 'আমি নিম্নাধিকার, ভূমিও আইন' 'আমি চলিতেছি ভূমি ও চল' এ কথা বলিতে পারেন এমন লোক, এমন জননায়ক আমাদের মধ্যে খুব অল্পই আছেন। জ্বপের বিষয় দেখিতেছি, আজ কাল পণ্ডিত মণ্ডলের উন্নতিকল্পে যত রকমের অস্থান এবং শুভসাধন কর্তব্য যত রকমের কর্তব্য আবশ্যক, আধুনিক অস্থান, কর্তব্য এবং কন্ম-পদ্ধতির মধ্যে তাহার অনেকটা আভাস দেখা যায়।

কিন্তু এখন এমন কতকগুলি লোকেরও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে,—যাহারা শুধু নিঃস্বার্থ নয়, স্বার্থহীনতার সঙ্গে সঙ্গে নীলাক, অথচ অস্বাভাবিক,—অথবা 'বাকচাতুর্ঘ্যে' আদৌ অক্ষম,—যবনের কাগজে কলমে চালাইতে অনিচ্ছুক,—চালকের অধীনেই কার্য করিতে সক্ষম, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই চালক হইতে নারাজ। আমাদের এ দাবী সমাজের বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট আশা করা যায় না। অপরিশুদ্ধিত, চলাচলিত বালক-সম্প্রদায় দিগাণ্ড এ কাজ সম্পন্ন হইবে না। কেবল যুবক-সম্প্রদায়ই এ কাজের পূর্ণ উপযুক্ত। যুবক কামিগণকে প্রতি জেলার 'সেকেন্ড' শিক্ষিত পাত্রাধীয়ে উপস্থিত হইয়া, যাহাতে 'সেকেন্ড' ভাবগুলি বজায় রাখিতে পারে,—যাহাতে জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, আমাদের আলোচ্য বিচার-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা, হিন্দুসম্প্রদায়ের সমশিক্ষা-মন্দির স্থাপন এবং সমান অধিকার প্রদান,—রূপকমণ্ডকে কুশি-বিব্যা সম্বন্ধে ছুই চারিটা মতন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া, রূপকমণ্ডের প-প পরিম্রোপাঞ্জিত শব্দের 'দমবায় বিক্রম' এবং অজ্ঞান আবশ্যক প্রবোধ 'সমবায় জয়'-পদ্ধতি-স্থাপনের জ্ঞান উপদেশ দান করা যায়, সে নিমিত্ত বঙ্গপরিষদ হইতে হইবে। 'পাড়াগঞ্চে' সাধারণ সম্প্রদায় এবং রূপকমণ্ডই দেশের লোক। আর লোক তুলিয়া গিয়া ইহাদের শিক্ষা, ইহাদের নিয়ম-কাহন, আচার-ব্যবহার এবং মনের ভাব-গুলিকে পোষণ করাই সম্ভাব্য। সর্বদেব সভ্যতার পোষা পরিয়াছে। উহা শীঘ্রই পরিত্যক্ত করিতে হইবে। সহরে দ্বিতল, ত্রিতল বাগ-বাড়ীগুলি দ্বাদশী পল্লীতে পূর্ণরূপে নিখণ্টন করিতে হইবে। পল্লীই ভাইগুলির তত্ত্বাধীনা নেত্রে বার

মিষ্টান্ন দ্বারা আগাইতে হইবে। আমরা দেশ দেশ করিয়া চোঁচাইয়া বরি, আমাদের দেশ—

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার সরকার।

মস্তিষ্ক

বৃহদমস্তিষ্ক (cerebral cortex) যে স্নান, সংজ্ঞা, ইচ্ছা, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা ও শ্রুতির আকার সে কল্প বহুলক হইতেই জানা আছে। মস্তিষ্ক যতদূর নানা প্রকার রোগে হইতে ও অগুণী মস্তিষ্ক হইতে এ সংক্ষেপে নানা প্রকার সত্য নির্ণাত হইয়াছে ও হইতেছে। যাহার মস্তিষ্ক বড়টুকু অগুণী তাহার সেই পরিমণ্ডেই জড়মস্তিষ্ক (idiocy), কোন বিশিষ্ট অংশ অগুণী থাকিলে এই জড়মস্তিষ্ক আংশিক ভাবেই লক্ষিত হয়। রোগে বা দৈবক্রমে মস্তিষ্ক-স্বক কোনও প্রকারে নষ্ট হইলে দ্বিতলোপ, অস্বাভাবিক পরিমাণে সংজ্ঞা-লোপ ঘটতে দেখা যায়। এ সকল ক্ষেত্রে বিবেকশক্তি তিরোহিত হয়, এমন কি অনেক সময় ইচ্ছা করিলেও কার্য করা যায় না। এগুলি কি কারণে ঘটয়া থাকে সে সংক্ষেপে আমরা একটা আলোচনা করিব।

বৃহদমস্তিষ্কের উচ্ছেদ

বিজ্ঞান কোনও কথাই মানিয়া লইতে চাহে না। অমুক এইরূপ পরীক্ষা করিয়া এই ফল পাইয়াছিলেন কাজেই আমাকে আর দেখিতে হইবে না—এ শিক্ষাদিবার বন্দোবস্ত বিজ্ঞানে নাই। তিনি কি দেখিয়াছিলেন, আমাকেও দেখিতে হইবে—বিজ্ঞানের মূল এই মহাময় নিহিত আছে। কাজেই মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সংক্ষেপে নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে হইবে। সমস্তই হাতে কলমে করিতে হইবে। আমাদের অঙ্গবোধ যে

পাঠকগণও যেন কিছু কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

পরীক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কেহ নর-কুলের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন না। মহামায় মস্তিষ্কের উচ্ছেদ করিলে কি ঘটবে পরীক্ষা করিবার জ্ঞান যদি কেহ নরহত্যা করেন তাহা হইলে তাহার মস্তিষ্কে নর হইলেও মস্তককে উচ্ছেদ হইবে বটে। কাজেই পরীক্ষাটা নিরীহ জীবকুলে আবশ্য থাকাই শেষঃ। বিনামূল্যে বা অন্তিমূল্যে যে সমস্ত নিরীহ জীব পাওয়া যায়, তাহাদের উপর পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। তবে মহামায় রোগ হইলে এবং রোগীর মৃত্যুর পর নানা প্রকার পরীক্ষা করা হয়। দৈববশে মস্তিষ্কের কোনও ক্ষতি ঘটিলেও পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

এক্ষণে সর্গপ্রথমই পরীক্ষাটা ভেকের উপর দিয়া হউক। পৃথিবীর সর্গপ্রবাপ্তি এই নিরীহ জীব তত্ত্ববিদের পরীক্ষার জ্ঞান যে অস্বাভাবিক প্রাণ দিয়াছে ও দিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যখনই কোন জীবের উপর পরীক্ষা করা আবশ্যক বোধ হয়, তখনই এই নিরীহ হতভাগ্য জীবকে মনোনীত করা হয়।

ভেকের মস্তিষ্ক পৃষ্ঠদেশ হইতে

O.L. = olfactory lobe. = Ch. = cerebral hemispheres. P. = Pineal Body. Op.L. = optic thalami. Cb. =

redimentary cerebellum. M.O. = Medulla oblongata.

Goltz, Flourens, Ferrier, এই সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল অতি স্থূলর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Corpora striata ও optic thalamiএর সহিত বৃহদমস্তিস্কের উচ্ছেদ করিলে ভেকের সাম্যাবস্থার equilibrium কোনও প্রকার ব্যাঘাত হয় না। নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া এই সাম্যাবস্থার ব্যাঘাত ঘটান কিছু হইল। এইরূপ অবস্থায় ভেককে পিঠের উপর শুয়াইয়া দিলে নিজে উঠাইয়া পায়ের উপর ভর দিয়া সাধারণ জীবের মত বসিয়া থাকে। একটি তত্ত্ব এই যে, পেষ্ট বোর্ডের উপর রাখিয়া থাকে আন্তে উঠাইবার চেষ্টা করিলে নিজের অবস্থা ঠিক রাখিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা যায়। পায়ে চিমটি কাটিলে বা আঘাত করিলে লাফাইয়া পলাইয়া যায়। জলে ফেলিলে অক্লেশে সাঁতার দিয়া জল পার হইয়া নিরাপদ স্থানে পৌছিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পৃষ্ঠদেশে আঘাত আস্তে আস্তে টোকর দিলে টোকরের তালে তালে খাভারিক ডাক ডাকিতে থাকিবে। এ সমস্ত বিষয়ে সাধারণ ভেক হইতে পার্থক্য কি বলা বড় কঠিন। জলে ফেলিয়া আন্তে আন্তে জলের উত্তাপ বাড়াইয়া সিদ্ধ করিয়া মারা দ্রুত; অসহ্য হইলেই ইহা লাফাইয়া পলাইবে। কিন্তু যে ভেক Spinal cord ও Medulla ব্যতীত আর সব অংশের উচ্ছেদ করা হইয়াছে, তাহাকে এইরূপে সিদ্ধ করা অতি সহজ। কল্পবৃদ্ধর পাঠক এ সমস্ত অত্যাচার-কাহিনী পাঠ করিয়া বোধ হয় বৈজ্ঞানিকদের গাল পাড়িতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝা আমোদ বলিয়া মনে করিয়া

এ সব কার্য করেন না। জানের জন্ত, নর-কুলের হিতের জন্তই এই সব করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা ক্ষমার পাত্র।

এক টব জলের নিয়ে ডুবাইয়া ধরিলে নিশ্বাস-প্রবাসের জন্ত জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, এমন কি Pneumatic trough জলপূর্ণ বসান cylinder হইতে বেশ বুদ্ধিমত্তার সহিত নামিয়া বাহির হইয়া পলামন করিতে পারে। সর্পকাঁধেই ইহাদের একটা বেশ সুখ লাগে। ইহারা বেশ বুদ্ধিমানের ছায় প্রতিবন্ধক এড়াইয়া লাফাইয়া পলায়। এ সব বিষয়ে মস্তিষ্কহীন ভেকের কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় না। একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, বাহ্যিক কোন কিছুয় দ্বারা উত্তেজিত না হইলে এক স্থানে বসিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। আর একটি বিশেষত্ব এই যে, খেজুরাশ্রুত সর্প কার্যের বিলোপ ঘটয়া থাকে; পূর্বের স্থিতির বিলোপ ঘটে। পূর্বে যে কারণে ভয় পাইয়া লুকাইয়া পড়িত বা পলাইত এখন আর তাহা গ্রাহ্য করে না। যদি অতি সন্তর্পণে গায়ে হাত দেওয়া যায় তাহা হইলে বেশ শান্তভাবে বসিয়া থাকে, তবে হঠাৎ কিন্তুভাবে গায়ে হাত বা অস্ত্র কিছু লাগাইলে বা চক্ষের সম্মুখে কিছু নাড়িলে লাফাইয়া পলায়। খাতের মধ্যে থাকিয়াও ইহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করে; তবে ইহাদের মানসিক কোন কষ্ট ও ইচ্ছা কিছুই থাকে না।

কিন্তু যদি বৃহদমস্তিস্কের সহিত Optic thalamiএর উচ্ছেদ করা না হয় তাহা হইলে আরও বিস্ময়জনক ফল পাওয়া যায়। ইহাদের খেজুরাশ্রুতির কোনরূপ বিলোপ ঘটে না, তখন ইহারা খেজুরামত লাফালাফি করিতে পারে। সাধারণভাবে পোকা-মাকড় ধরিয়া

সুবিধিত্ব করে। শীতের সময় গর্ভ খুঁড়িয়া শীতের প্রকোপ হইতে আশ্রয়লাভ করে। আবার বসন্তের প্রারম্ভে গর্ভ হইতে বাহির হইয়া জীবন যাপন করে এবং মথাকালে ভিষাধি প্রসব করিয়া বশবুড়ি করিয়া থাকে। কিন্তু বৃহদমস্তিস্কের সহিত optic thalamiএর উচ্ছেদ মধনে সবগুণ বিলোপ না হইয়া অনেক সময় কাণ্ডাকাতিভার হ্রাস পাইয়া থাকে। ভেকের বৃহদমস্তিস্কের পুষ্টি অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার অনেক উপর কেবল 'এক থাক' মাত্র স্নায়ুকোষ বা nerve-cell আছে, কিন্তু thalami এই জীবের সমস্ত চলন-শক্তির উৎপত্তি-স্থান বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া দর্শনজিয়ারের সহিত ও স্পর্শজিয়ারের (tactile sensation) ইহার যোগ আছে, আর এই জন্ত এই দুই প্রধান ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করে।

এতদ্ব্যতীত আমরা ভেকের কথা বলিলাম, এইবার মংস্ত্রের কথা বলা হইতেছে। এক কথায় মংস্ত্রেরও ভেকের ছায় ঘটয়া থাকে। উচ্ছেদের পর মংস্ত্রের জলে স্বীয় সাম্যাবস্থা রক্ষণ বিষয়ে কোনরূপ বিভ্রমতা লক্ষিত হয় না। ইহারা লেজ নাড়িয়া ও ভানান সাহায্যে পূর্বের ছায় স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে পার্থক্য এই যে মস্তিষ্কহীন মংস্ত্র অবনত হইয়া বেড়ায়; ইহাতেও একটা সুখ লাগে আছে। ইহাদের পথে কোন প্রতিবন্ধক দিলে বেশ সহজে এড়াইয়া চলিয়া যায়। কোন প্রকার নাড়াচাড়া না দিলে একদিক হইতে সোজা অগ্রসর চলিয়া আসিবে এবং যতক্ষণ না অবসাদ আসে ততক্ষণ ক্রমাগত এইরূপ কিনারা হইতে কিনারা ঘুরিয়া বেড়ায়। দেখিলে মনে হয়, কোন এক

অচ্ছদা বন্ধনের দ্বারা নীত হইতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ মংস্ত্র একপ. করে না, এপাশ ওপাশ ভাসিয়া বেড়ায়, কোন কিছু ধাড়া ঝুঁকরাইতে থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে ভেকের শির হইয়া বসিয়া থাকা, আর মংস্ত্রের অনবরত চলা ফেরা করায় একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়; কিন্তু ইহার কারণ এই যে, ভেককে সর্পক্ষণ উত্তেজিত করিবার বাহ্যিক কোন কিছুই নাই; কিন্তু মংস্ত্রের মস্তিষ্ক জলের শোতে উত্তেজিত হয় বলিয়াই অবসাদ না আসা পর্যন্ত ইহারা ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়।

অস্থিময় মংস্ত্রের (osseous fishes) এবং যাহাদের বৃহদমস্তিস্কের সহিত optic thalami and corpora striata নষ্ট করা হয়, কেবল সেই সমস্ত মংস্ত্রের উপরোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু কেবল বৃহদমস্তিষ্ক ও corpora striata নষ্ট করিলে সাধারণ মংস্ত্র হইতে ইহাদের বিশেষ কোন বিভ্রমতা লক্ষিত হয় না; তখন ইহারা ধায়ের অধেষণে বেশ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ধায়ের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে। সাধারণ মংস্ত্রের ছায় কিছু পাইলে ঝুঁকরাইতে থাকে।

উপাস্থিময় (cartilagenous fishes, Elasmobranch) মংস্ত্রের কিন্তু ঠিক বিপরীত ঘটয়া থাকে। হালধের 'কেবল বৃহদমস্তিষ্ক ও corpora striata উচ্ছেদ করিলে জন্তট একেবারে অভের ছায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ জ্যোতিষই এই সমস্ত জন্তর একমাত্র জীবন-যাপনের অবলম্বন। বৃহদমস্তিস্কের উচ্ছেদের সঙ্গে জ্যোতিষের উচ্ছেদ ঘটয়া থাকে।

Rolando, Vulpain, Flourens, প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ কপোতের

মস্তিষ্কের উজ্জ্বল ফলাফল বিবৃত করিয়াছেন। মস্তিষ্কহীন কপোত বেশ নামাযস্বায় থাকে এবং কোন প্রকারে এই নামাযনা নষ্ট হইলে ভানা নাড়িয়া বেশ পুনরুদ্ধার করিয়া লয়। পৃষ্ঠের উপর শুয়াইয়া দিলে পায়ের উপর ভর দিয়া বসে। ধাক্কা দিলে বা ফুটাইলে সমুখ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু কোন প্রকার বিরক্ত না না করিলে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে। উড়াইয়া দিলে সাধারণ কপোতের ভাঙে উড়িতে থাকে। অতি সামান্য আঘাতে নিদ্রা নষ্ট করা যাইতে পারে এবং চক্ষু উন্মোচন করান যাইতে পারে। কখনও কখনও বাহ্যিক উত্তেজনা না থাকা সত্ত্বেও চক্ষু টাট্টিয়া থাকে; কখনও দুই এক পা চলে, কখনও বা একপায়ের উপর ভর দিয়া বসিয়া থাকে। নামায মাছি বসিলে মাথা নাড়িয়া উড়াইয়া দেয়; নাকের সমুখে এমোনিয়া

ধরিলে পিছাইয়া যায়। চোখে আব্দুল দিবার ভাণ করিলে চক্ষু বৃদ্ধিতে থাকে ও পিছাইয়া যায়, মাথার কাছে পিতলের আওয়াজ করিলে হঠাৎ চমকিয়া চক্ষু বিফারিত করিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকবার বাহ্যিক উত্তেজনা সরাইয়া নইলে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয় যেহেতু ইহার বড় কোন স্কাঙ্ক করে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহাদের স্বতির বিলোপ ঘটিয়া থাকে। উত্তেজিত করিলে চোঁট ও ভানার সাহায্যে বাধা দেয়, কিন্তু পলাইবার চেষ্টা করে না; বাধাদি দিবার সময় সহজে চোঁট ফাঁক করিতে দেয় না, কিন্তু একবার ফাঁক করিলে বেশ সহজে খাইয়া থাকে। এইরূপে খাওয়াইলে কয়েক মাস বাঁচাইয়া রাখা যায়, তাহা না হইলে মংগ ও ভেকের দ্বায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকবি ভাস-বিরচিত্ত অবিমারক নাটক

আমরা বহুবিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি— “ভাসো ভাসঃ।” * অর্থ্য মহাকবি ভাস এবং কবিতা-কামিনীর যুগ-মধুর হাশ্ব পূর্ণর বিভিন্ন নহে। তাঁহার ভক্ততা এবং মাধুর্য্য এতই বেশী। কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরাও তাঁহাকে প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া সম্মান করিতেন। সেই মহাকবি ভাস-প্রণীত একখানি নাটকের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই মহাকবির প্রণীত কোনও কাব্য বা মহাকাব্য আছে কি না তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ভাস কবি নাটকের জন্তই চির-প্রসিদ্ধ; পঞ্চম শতাব্দীর মহাকবি বাণভট্টও “হৃদযাত্রাকৃত্যন্তরীণটীকবর্জিতমুদিতৈঃ।” সপ্ততান্ত্রিকশেলেভে ভাসো দেবকুলৈব।” এই শ্লোকটি দ্বারা ভাস কবিকে প্রসিদ্ধ নাটক-প্রণেতা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। সর্বত্র স্বরূপার কর্তৃক নাটকের আশ্রয়

প্রদর্শন এই কবির বিশেষত্ব, প্রচলিত সম্ভবত নাটকসমূহ অপেক্ষা আরও অনেক বৈলক্ষ্য ভাস প্রণীত নাটকসমূহে দেখিতে পাইয়া যায়। সেই সমস্ত বিষয় অবসর মত প্রদর্শিত হইবে। বর্তমান প্রবন্ধে ভাস প্রণীত “অবিমারক” নাটকের পরিচয় প্রদত্ত হইবে। সম্ভ্রুতি দাক্ষিণ্য হইতে ভাস প্রণীত কয়েকখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, ইতঃপূর্বে এতদধীন, কেবল এতদধীন কেন, প্রায় সর্বত্র এই নাটকগুলির বিয়ল প্রচার হইয়াছিল, তজ্জন্ম এই ভাস-প্রণীত নাটকের কথাবস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও অপরিচিত।

কথা-বস্তু

কোনও সময়ে সৌবীরাজ্য ব্রহ্মি প্রচণ্ড ভাগ্যব কর্তৃক অভিগম্য হন। তাহাকে সৌবীরাজ্য জীপুত্রের সহিত বর্গভোগ্য চণ্ডালদ্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কৃষ্টিভোজনগরে বাস করেন। সৌবীরাজ্য-কুমার বিষ্ণুসেন “অবি”নামক কোনও রাক্ষসকে নিহত করায় অবিমারক আখ্যা প্রাপ্ত হন। কুমার বিষ্ণুসেন চণ্ডালদ্ব প্রাপ্ত হইয়া পিতৃদর সহিত কৃষ্টিভোজনগরেই অবস্থিত করিতেছিলেন। একদা কৃষ্টিভোজনান্দ্রী কুরঙ্গী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইয়া একটা হুংহং মন্ত হতী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে রাক্ষসও তাঁহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। এই বিপদসময়ে সৌবীরাজ্যকুমার অমাহবিক রক্ষা করেন। দেহী হইতে অবিমারককে দর্শন করিয়া রাজনন্দিনী কুরঙ্গী তাঁহার প্রতি অধরব্রতা করেন। রাজকুমারও কুরঙ্গীর প্রতি মাতিলাষ হইয়া কুরঙ্গীর খাওয়ার সাহায্য গোপনে কড়াভঃপুরে প্রবেশ করেন; কিছুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হইলে অন্তঃপুররক্ষিবর্গ

সন্দেহান হইয়া কুমারের অন্তঃপুর-প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করে। কুমার অবিমারক কুরঙ্গীরশ্রম-লাভে হতাশ হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগে রক্ত-সকল্ল হইয়েও অগ্রিকুণ্ডে প্রবেশ করেন; কিন্তু ভগবান হতাশনের বর-প্রভাবে অগ্নিতে তাঁহার স্বর্ষ্য সিদ্ধি হইল না। তিনি শেষে পূর্ণত-শূদ্র হইতে পতিত হইয়া প্রাণ-পরি-ত্যাগ করিবার আশায় এক অত্যন্ত-শরীত-শূদ্রে আরোহণ করেন। এই সময় এক বিলাসধর-মিথুন যদুচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হয় ও রাজকুমারের অভিলাষ জানিতে পারিয়া দম্যত্র হইয়া রাজকুমারকে একটা প্রভাব-সম্পন্ন অদুরীয়ক প্রদান করে। এই অদুরীয়ক যে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলে সে তৎক্ষণাৎ যে কো-লোচনের বহির্ভূত হইবে এবং তৎপূর্ণ ব্যক্তিও মহাব্য-চক্ষুর অগোচর হইবে। রাজকুমার প্রিয়লাভের এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্টিভোজনগরে আগমন করেন ও সন্তত নামক স্বীয় বয়স্যের সহিত মিলিত হইয়া অলপকিতভাবে কড়াভঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রিমতমা কুরঙ্গীর সহিত মিলিত হন। এদিকে সৌবীরাজ্যের অভিশাপের নিদ্রিষ্ট সময় অতীত-প্রায়, কিন্তু রাজা পুত্রের অদর্শন আশিষ উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালাতীপাত করিতে লাগিলেন।

শাণাবাসনে কৃষ্টিভোজের সহিত তাঁহার ভগিনী সৌবীর-রাজমহিষী স্বচেষ্টনা ও ভগিনীপতি সৌবীরাজ্যের পরিচয় ও মিলন ঘটিল; কিন্তু সকলেই সৌবীরজনয় অবিমারকের অদর্শনে ব্যথিত রহিলেন। কৃষ্টিভোজ রাজকুমারী কুরঙ্গীর জীবন-রক্ষাকারী যুবকের অসম্ভাব ওণাবলী শ্রবণ করিয়া সেই যুবকের সহিত রাজকুমারী বিবাহ প্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন,

* যদা শোরাশ্রিতবিনিকঃ কর্ণপূরোমারো, ভাসো ভাসঃ কবিসুল্লগঃ কালিদাসো বিলাসঃ।

হবে হবো হবরহতিঃ পঞ্চাশত্ত্বাণাঃ কেবা নৈবা কথং কবিতা-কামিনী কোটুকাঃ।

(প্রথমরাশ্ব নাটক)

কিন্তু যুবক অস্বাভাবিকতার বলিয়া তাঁহার অভিনায় পূর্ণ হয় নাই। রাজা কৃষ্ণভোজ অগত্যা স্বীয় অপর ভাগিনেয় কাশীরাজ-কুমার জয়বর্মার সহিত স্বীয় দুহিতা কুরঙ্গীর বিবাহ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। এই সময় দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণভোজনগরে আগমন করিয়া রাজা কৃষ্ণভোজকে বলিলেন “যিনি কুরঙ্গীকে হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া-ছিলেন, তিনিই সৌবীরাজ্যতনয় অবিমারক, কৃষ্ণভোজের ভাগিনেয়।” অবিমারক কুরঙ্গী-লাভে হতাশাস হইয়া যেরূপে স্বীয় প্রাণ-বিনাশে উদ্ভাত হইয়াছিলেন ও যেরূপে বিবাহের-মিথুন হইতে অসুখীয়ক লাভ করিয়াছিলেন, সমস্তই দেবর্ষি রাজা কৃষ্ণভোজের নিকট প্রকাশিত করিলেন। রাজ-তনয়ার সহিত অবিমারকের পুনর্দ্বন্দ্ব হইয়াছে, সে সংবাদও রাজসমিধানে প্রকাশিত হইল।

কৃষ্ণভোজ পুর্বেই কুরঙ্গীর বিবাহ স্বীয় ভগিনীপুত্র কাশীরাজকুমার জয়বর্মার সহিত স্থির করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। সমস্তই দেবর্ষির মুখে এই নূতন সংবাদ অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু দেবর্ষি নারদ সব দিক্ রক্ষা করিয়াছিলেন। নারদ কৃষ্ণভোজকে বলিলেন, “তোমার ভগিনী কাশীরাজপত্নী স্বদর্শনার গর্ভে অবিমারকের জন্ম হয়, কিন্তু স্বদর্শনা স্বীয় অনপত্তা ভগিনী হুচেতনাকে এই পুত্র প্রদান করেন। তজ্জন্ত অবিমারকের সহিত কুরঙ্গীর বিবাহ হইলে স্বদর্শনার বা কাশী-রাজের কোনও দুঃপের বা লজ্জার কারণ

হইবে না। বিশেষতঃ কুরঙ্গী জয়বর্মা অপেক্ষা বয়সে বড়। তজ্জন্ত জয়বর্মার সহিত কুরঙ্গীর বিবাহ হইতে পারে না। তবে স্বদর্শনার মনঃকলিত জন্ত কুরঙ্গীর কনিষ্ঠ সহোদরা হুমিতাকে জয়বর্মার সহিত বিবাহ দাও।” দেবর্ষির আজ্ঞাধারের সমস্ত অগ্রহত হইল। শাপবিমুক্ত সৌবীরাজ্য স্বহৃদ্বন পরিত্যক্ত হইয়া যদেমে প্রস্থান করিলেন।

অবিমারক নাটকের ঘটনাপরম্পরা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, স্থলবিশেষের রচনাও তেমন মধুর। যদিও স্বরধারকৃত্যতন্ত্র ভাস-প্রণীত নাটকসমূহে সর্বত্র “নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি স্বরধারঃ” এইরূপে স্বরধারের প্রবেশ ও প্রথম প্রব্রুত স্বরধার-পটীতে স্নোকেটী স্নোকেটোভাবে নান্দীলক্ষণসজ্জিত, তথাপি কবি ঐ স্নোকেটী নান্দীরূপে সেনে ব্যবহার করেন নাই ইহা চিত্তনীয়।

নান্দী স্নোকে অভিধেয় বস্তুর বীজ-বিচ্ছাদ্য কবির নিপুণতার পরিচায়ক। রত্নাবলীর নান্দীস্নোকেগুলি পাঠ করিলে কবির আশাধার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্র-কারণ নান্দীলক্ষণে “যস্যো বীজস্য বিন্যাসো হৃদ্বিমেদ্যো বসন্তঃ” বলিয়া এই রীতির সমর্থন করিয়াছেন।

আলোচ্য নাটকেও এই নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় * “উৎকণ্ঠাস্য সাহস্কম্পঃ সলিলনিধি-জলাং” এই অংশ দ্বারা কুরঙ্গীর প্রতি মনঃকলিত হস্তীর আক্রমণ ও দয়ালু নায়ক অবিমারক কর্তৃক কুরঙ্গীর উদ্ধার সূচিত হইয়াছে, এবং “সমুজ্জ্বলাং প্রীতিপূর্ণাং স্বকৃজবশগতাং এক চক্রান্তি গুপ্তাং” এই অংশদ্বারা কুরঙ্গীর

প্রতি নায়কের অহরহণ ও অবিমারকের কুরঙ্গী-প্রাপ্তির ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যদিও প্রচলিত নাটকসমূহের দ্বারা ভাস-প্রণীত কোনও নাটকের প্রস্তাবনাতে কবির বংশ-পরিচয় অথবা নাম কীর্ণিত হয় নাই, তথাপি প্রাচীন আলম্বারিকগণেরও হুতানিত্যসংঘ-কর্তৃগণের সাহায্যে এই নাটকসমূহের প্রণেতার নাম অবগত হইতে পারা যায়। এ স্থলে সেই সব প্রমাণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইল।

ভাস-প্রণীত প্রত্যেক নাটকের প্রস্তাবনাতেই স্বরধারেরই স্তবিত্তি পাই যে “অয়ে কিছুখলু ময়ি বিজাপন বাগে শব্দ শ্রবতে” স্বরধারের এই বিজাপনবাগদ্বারা থাকা সত্ত্বেও শব্দ-বিষয় চিরন্তন নাট্যরসিকগণের রীতি ভঙ্গ করিয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে সন্দেহনীয় করিতেছে। নাটক কয়েকখানি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এই নাটকসমূহের প্রণেতা কোনও একজন মহাকবি, প্রস্তাবনা সর্বত্র একরূপ, অস্ত্য স্নোকে সর্বত্র এক, লেখন-কৌশল এক, অনেক স্থলে বর্ণনাও এক, একই স্নোকে দুই বা ততোদিক নাটকে প্রযুক্ত হইয়াছে। “নাটক সমূহের অন্তঃ—

ইমাং সাগরপর্ঘ্যাসাং হিমবদ্বিদ্বাকুস্তলাং।
মহীমেকাতপজাভাং রাজসিংহে প্রশাস্ত নঃ।

এই স্নোকেটী কোনও নাটকে বা ক্রীড়ায় পরিবর্তিত আকারে পরিলক্ষিত হয়। মহাকবি রাজশেখরকৃত স্মৃতিস্মৃক্তাবলীতে—
ভাসনাটকচক্রপেচ্ছেটৈবঃ ক্ষিপ্রে পরীক্ষিতুং।
স্বপ্নাবশদগুস্ত দাহকোভুয় পাবকঃ।

এই স্নোকেটী দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনব গুপ্তাচার্য প্রভৃতি চিরন্তন আলম্বারিকগণ স্বপ্ননাটকের নামও এই নাটকের স্থলবিশেষ

উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বপ্ন-নাটকের সহিত আলোচ্য নাটকের লেখন-প্রণালী, প্রস্তাবনা, অস্ত্য স্নোকে সম্পূর্ণ একরূপ। এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা স্থানান্তরিতভাবে বলা যাইতে পারে অবিমারক নাটকপ্রণেতা মহাকবি ভাস। আরও বহু প্রমাণ দেখান যাইতে পারে, বাহ্যল ভয়ে উপেক্ষিত হইল।

স্বপ্রাচীন মহাকবি ভাস-প্রণীত প্রস্তাবনার অধরূপে মহাকবি কালিদাস বিক্রমোর্ধ্বেশ্বর প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন। ভাসপ্রণীত প্রায় সমস্ত নাটকের প্রস্তাবনাতেই পাত্রপ্রবেশকোশল একরূপ, সর্বত্র স্বরধার “অয়ে কিছুখলু ময়ি বিজাপনবাগে শব্দ শ্রবতে আং জাতম্” এইরূপ বলিয়া প্রবিশ-মান পাত্রের অবস্থাজাপক একটা স্নোকে পাঠ করিয়া নিজস্ব হইয়া থাকে, বিক্রমোর্ধ্বেশ্বরেও স্বরধার ঠিক এই কথাটাই বলিতেছে। “অয়ে কিছুখলু ময়ি বিজাপনানন্তরঃ আন্তানং কুরুরাপাতিবাক্যে শব্দঃ শ্রবতে……আং জাতম্” এইরূপ বলিয়া প্রবিশমান পাত্রের অবস্থাজাপক একটা স্নোকে পাঠ করিয়া নিজস্ব হইয়াছে।

প্রস্তাবনার সাক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। সমস্ত পাত্রগণের পরিচয়ের সহিত নাট্যবস্তুর কাঞ্চৎ পরিচয় প্রদান করিব।

প্রদীপ্তপাশবদগুস্ত তেজস্বী তপঃপ্রভাব-গম্পা প্রচণ্ডভার্গব নামক কোনও ব্রহ্মবিদ এক সময়ে সৌবীর রাজ্যে আগমন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার শিষ্য কাত্তপ ঐ রাজ্যের অন্তর্গত কোনও অরণ্যে ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হন। ভার্গব শিষ্যের এইরূপ মৃত্যুতে শাসন-শিথিল সৌবীরাজ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া-ছিলেন। মুগ্ধা-প্রসঙ্গে রাজার সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল। দুঃখানান বলি প্রজ্জলিত

* উৎকণ্ঠাস্য সাহস্কম্পঃ সলিলনিধি-জলাং।
সেবশাপাবগুস্তাং। সমুজ্জ্বলাং প্রীতিপূর্ণাং স্বকৃজবশগতামেক চক্রান্তি গুপ্তাং।
সুজ্জ্বল তেজস্বী পত্রাঃ।

হইয়া উঠিল, ঐশ্বর্যগর্ভিত বাসনাসক্ত নৃপতিকে ব্রহ্মবিষ তিরস্কার করিলেন। যে গ্লানিতভাব রাজার স্বরূপে প্রচ্ছন্ন ছিল, ব্রহ্মবিষ তিরস্কারে তাহা স্বীয় মূর্তিতে প্রকাশিত হইল। ত্রিলোকপুণ্ড্র ব্রহ্মবিক্রে রাজা "ব্রহ্মবিষপেণ ভান্নং বৃণাকঃ" বলিয়া আগনার বাসনিতার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। অহুগ্রহ-নিগ্রহ-সমর্থ কুব্জপ্রমোদী নৃপতিকে অভিসম্পাত করিলেন—
“সমুদ্রবাসন্তং বৃণাকং বৃণাকং ব্রহ্মবিষং।”

এই অভিসম্পাত সৌবীররাজের প্রতি নহে—ঊর্ধ্বার বাসনাসক্ত হৃদয়ের প্রতি। এটা তাহার পাপের প্রায়োক্ষিতব্যবস্থার নামান্তর।—স্বনিব ইহা সাধারণ জ্ঞেয়-প্রকাশমাত্র নহে। অজ্ঞাতভাবে সৌবীর-রাজের যে অপ্রাপ্তন হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে ব্রহ্মবিক্রেও বৃণাক বলিতে তিনি কুপ্ত হইয়া নাই, স্বনিব অভিসম্পাতে সেই পতিত অবস্থার দৃশ্যই রাজার সমুখে উন্মোচিত হইল। সৌবীররাজ স্বীয় অপরাধ বৃত্তিতে পারিলেন। “ভূমৌ অলিতপাদানাম্ ভূমিরেবাললখনং” জানিয়া পুনরায় ব্রহ্মবিষ শরপায়স্ক হইলেন। স্বনিবের বিজ্ঞান ইহাও গেল, রাজার প্রতি কল্পাসঙ্কার হইল। “অশনেয়মুত্তম চোভয়োবিশিষ্টাশ্বধ্বংসকো যোনমঃ” সত্যবাক্ত স্বনিব, “সমংসর মাত্র চণ্ডাল ভাব ভোগ করিলেই শাপের অবধান হইবে” বলিয়া রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং স্বীয় প্রচণ্ড বৈরাগ্যবীর জঘা ব্যাধিনিত শিখ্য কাশ্যপকে আশ্রয় করিলেন। কাশ্যপ অক্ষতশরীরে গুরু সন্নিধান উপস্থিত হইলেন। তাই বৃষ্টি কবি বলিয়াছেন—
স্বনীপা পুনরায়ানাম্ বাচমহৌষধাবতি।

পূজ-কলত্রের সহিত সৌবীররাজ চণ্ডালত প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কুস্তিভোজরাজ্যানী

বৈরস্বা নগরে বাস করিতে লাগিলেন। পূজ-কলত্রের প্রতি এই অভিসম্পাত কেন প্রযুক্ত হইল, এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়।—ঊর্ধ্বারের চণ্ডালত-প্রাপ্তি স্বনিবশাপের এক অপূর্ণ মাংস। যে অপরাধে সৌবীররাজ অপরাধী, অলক্ষিত ভাবে সেই অপরাধ রাজহুমারকেও স্পর্শ করিত এবং স্বামীর দ্রুত হইতে পত্নীকে বঞ্চিত করিয়া রাবিলে পত্নীর উপর অবিচার করা হয়; তাই বৃষ্টি ব্রহ্মবিষ এক অভিসম্পাতে “সংসদ্বজ্ঞানি নিধনাত্মপি তারয়ন্তি” সব দিক রক্ষা করিলেন।

এখন আমরা নাটকের মধ্যে প্রবেশ করি। কৌড়পারবশ্য রাজনন্দিনী কুন্দরী উজানে গিয়াছেন, কিন্তু আত্ম উজান নিরাপদ নয়, মহারাজের অজ্ঞানগিরি নামক বারমুখপতি মদভাবস্থ হইয়াছে, মহারাজ কুস্তিভোজ-তনয়া কুন্দরী জঘা উড়িয়া ইহা মজাভুক্তিককে উজানে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু মহারাজের আশঙ্কার নিয়ুতি হইতেছে না, বিশেষতঃ কুন্দরী বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে; বিভিন্ন দেশীয় রাজত্বগণ রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া কুস্তিভোজের নিকট দূত পাঠাইতেছেন। এই সময় সদয়মহানিকর যে কোন ঘটনাই রাজার পক্ষে বিশেষ লজ্জাজনক তাই কুস্তিভোজ “* * * * * নমস্তি মনঃ প্রহেটু, কহাপ্তিষুহি সত্যং বহুচিন্তনীয়ং” বলিয়া স্বীয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। আরও বহুবিধ চিন্তা কুস্তিভোজের চিন্তকে নিবিড় হইতে নিবিড়তর করিয়া তুলিতেছে; নানাদিপদেশীয় নৃপতিরূপ কুন্দরীর পাণিগ্রহণেচ্ছ হইয়াছে। কাহার সহিত তনয়ার শুভপরিণয় সম্পন্ন করিলেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না “কঠৈঃ দদাদীতি মহান বিতর্কঃ”

এই বিতর্ক তরুর মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না।

এই স্থানে আমরা মহারাজ কুস্তিভোজের বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাই। মহারাজ বলিতেছেন—

“জামাতসম্পত্তিমচিস্তিষ্য, পিত্রাতু দত্তা

স্বম্নোভিলাষাং।

কুলধ্বং হন্তি মদেন নারী; কুলধ্বং

কুঞ্জজলা নদীবহা”

আজকাল এইরূপ জামাতায়ায় সম্পূর্ণ চিন্তা কয়জন করিয়া থাকেন বা করিতে অবসর পান। যাহা হউক, যখন এইরূপে রাজার চিন্তা সম্মুখে-দোলায় দোলায়মান হইতেছিল এমন সময় অদূরবর্তী একটা কোলাহল শুনিতে পাইয়া রাজার পূর্ণ আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল। “সংস্থ হেতু-সংস্থে কুন্দরী শব্দে মতিঃ” বহু হেতু-তাই এই কোলাহল হইতে পারে; কিন্তু এই কোলাহলে রাজার কুন্দরীর আনুগত্যই প্রবল হইয়া উঠিল। রাজকুমারীর সংবাদ লইয়া অমাত্য কৌজায়ন রাজ-সন্নিধান উপস্থিত হইলেন, উৎকণ্ঠিত নৃপতি ব্যগ্রভাবে তনয়ার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যগ্রক্ষেপে রাজ-নন্দিনীর কুশল খ্যাপন করিয়া অমাত্য বিবৃত-ভাবে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। রাজার মন্তব্যই উজানগত কুন্দরীর যানের দিকে ধাবিত হইলে, রাজনন্দিনীকে রক্ষা করিতে যাওয়া অনেক বীরপুরুষ হত হইল, ভীষণবাকি নিজের জীবন লইয়া ব্যত হইল, নারীগণ ক্রমশঃ-ধ্বনিত স্বীয় প্রশংসার বিনিয়োগ করিল, এমন সময় “কণ্ঠং দর্শনীয়োগ্যাবিষমঃ তরুণোপমহাস্রাঃ শুরোপি দাক্ষিণ্যাবান্ হুহুমারোপি বলবান্ তংকালহর্ষভং অভয়ং প্রদায় সমাদাদিতবান্ ততঃ বিপবরঃ।” মহারাজ

কুস্তিভোজ মন্ত্রিণ্যকো অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া “অনুগং স কার্যগাত্ৰ” এই কয়টা অক্ষরে যুবকের প্রশংসা করিলেন। বহু বাণাভ্রমরও যাহা প্রকাশিত হইতে পারে না, তাহা অতি মধুর ভাবে এই কয়টা অক্ষর দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি আরও অনেক স্থানে এই ভঙ্গীতে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, অবিমারক কুরঙ্গকে লাভ করিয়া বলিতেছেন “অনুগোং যৌবনস্তঃ।” পরার্থ-নিরপেক্ষশরীর শৌর্য্যাপি বিনয়মধুর শ্রীমান্ যুবকের প্রবৃত্তিও অদ্বয় জানিবার জঘা অমাত্য ভূতিক যুবকের অহুসরণ করিলেন, সম্পূর্ণ পরিচয় না পাইলেও যুবক যে মহাকুল-সমুত বিবিধ-সদৃশ-সম্পন্ন তাহা আর বৃত্তিতে বাকী রহিল না। কুস্তিভোজরাজ ভোজপারবশ্য যুবককে অস্ত্রজ্ঞ জানিয়া নানাজঘা চিন্তা করিতেছিলেন। অমাত্য ভূতিক ঊর্ধ্বার সে চিন্তা দূর করিয়া দিলেন। যদিও আমরা কোনও কারণ বশতঃ যুবকের স্পষ্ট পরিচয় পাইতেছি না, তথাপি ঊর্ধ্বার রূপ, বাক্য, ভেদঃ, সৌকর্য্য ও বল দেখিয়া সাহসের সহিত বলিতে পারি এই যুবক অস্ত্রজ্ঞ নহেন, এরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি অস্ত্রজ্ঞ হয় তবে “বার্যাহম্যাকং শাহমার্গেণৈঃ বেদঃ” আমরা বুঝা শাস্ত্রাভ্যুদয়ন করিয়াছিলাম। অমাত্যের বাক্যে রাজার সন্দেহ দূর হইল না। এমন সদৃশসম্পন্ন ব্যক্তিকে কুন্দরীর উপযুক্ত পাত্র এই আশা। মহারাজ যুবকের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতেও মজীর একই উত্তর “মেধাস্তর্গতরবিবঃ প্রভাঃসুমেঘঃ।” স্পষ্ট উত্তর না পাইয়া মজাকে আবার পরীক্ষা করিতে বলিলেন। এদিকে বিভিন্নদেশীয় নৃপতিগণ

“মজা: পতাকামিব” রাজকুমারী কুরঙ্গীকে লাজ করিবার নিমিত্ত দূত পাঠাইয়াছেন। দূতগণের নিকট রাজা কি উত্তর করিবেন তাহা মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। স্থির হইল, সৌবীরাজ-কুমারের সহিত কচার বিবাহ দিবেন। সৌবীরাজ কৃষ্ণভোজরাজের ভগিনীপুত্র এবং জালক। এই ধরনের বিবাহ যথেষ্ট ভট কুমারিল লিখিয়াছেন “মাতুলস্বভা” প্রাণ্য দাক্ষিণাত্যাত্মক ভূষ্যতি” মহারাজ কৃষ্ণভোজকে ভাগিনেয়ের সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ প্রদানে সমুৎসাহ দেখিয়া ভট্টলিখিত ‘ভূষ্যতি’ ব্যাক্যের সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওবার যায়।

কিন্তু মহারাজ চরমুখে জানিতে পারিলেন, “সৌবীরাজ রাজধানীতে নাই, তাহার অমাত্যগণ রাজকাব্য পরিচালন করিতেছে।” রাজারাজ রাজধানীতে অধুপস্থিত থাকিবার কারণ জানিবার জন্য মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি মন্ত্রিগণের সহিত “আদৌ তাতে বরণ প্রস্তাব” ইত্যাদি নীতি-শাস্ত্রে সার্থক সম্পাদনে ব্যগ্র, এমন সময় মোহরঙ্গকণ “দশনাড়িকা: পূর্ণাঃ” দশ রঙ বেলী হইয়াছে এই সংবাদ প্রদান করিল।

মহারাজ বান-বেলা অতিক্রান্ত হইতেছে জানিয়া রাজ্যের প্রতি রাজার কর্তব্যভার বিবহ চিন্তা করিতে করিতে নিজনস্ত হইলেন। আমরা মহারাজ কৃষ্ণভোজের মূখে রাজ-কর্তব্যের বাদুশ গুরুত্ব শুনিতে পাইলাম তাহা পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। মহারাজ বলতে-ছেন—

“আহা মহদভারো রাজ্যং নাম। কৃত: ধর্ম: প্রাগেব চিন্ত্য: সচিবমভিগতি: প্রেক্ষিতব্য।

স্বজ্ঞা, প্রজ্ঞাদৌ রাগরোষৌ মুহুৎকণ্ডণৌ কালযোগেন কার্যৌ। জেয়ং লোকাহুতং পবচরনয়নৈ মণ্ডলং প্রেক্ষিতব্যং, রক্ষ্যে। যদ্যদিহাস্তা রণশিরসি পুন: সোপি না। বেক্ষিতব্য:।”

অঙ্ক যেমন চক্ষুস্মাৎ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, মণ্ডলাবলোকে চারচক্ষু নৃপতিবৃত্তও তজ্জগৎ কবি “চরনয়নৈঃ” বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই “পবচরনয়নৈঃ” বলিয়াছেন। এই শ্লোকটির অল্পরূপ শ্লোক আমরা হস্তাভি-শাস্ত্রের দেখিতে পাই। শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“ধর্ম: প্রাগে চিন্ত্য: সচিবগতিমতী সর্বলা লোকনৌয়ে।

প্রজ্ঞাদৌ রাগরোষৌ মুহুৎকণ্ডিতরৌ

যোজনৌযৌ চ কালে।

জেয়ং লোকাহুতং বচরনয়নৈঃ মণ্ডলং

বীক্ষণীয়

মাত্য়া যন্তেন রক্ষ্যে রণশিরসি পুনঃ

মোহিনাপেক্ষণীয়ঃ।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে প্রবেশক। এই প্রবেশকের পরে সম্ভট-নামধেয় বিদ্যুৎ (অবিমারক-বয়স্ক) ও সৌবীরাজকুমারের চৌচক্রিকা এ উভয়ের আলাপ-প্রসঙ্গে কবি বিলম্বন হস্তরসের অবতারণা করিয়াছেন। বিদ্যুৎ বড় চিন্তাময়। স্থগিণীশে অবিমারক চণ্ডালয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া প্রাক্ষণ ভাবে কৃষ্ণভোজ-নগরে অবস্থিত করিতেছেন। চিরহুতলালিত রাজপুত্র কতই না দুঃখভোগ করিতেছেন। রাজকুমারের এই দুরবস্থা এ আবার কি মোহ উপস্থিত হইল। হস্তিগল্পমে কৃষ্ণভোজনন্দিনী কুরঙ্গীকে দেখিয়া অধি রাজ-কুমারের এ কি ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

কুরঙ্গীর প্রতি কুরঙ্গের এত অসক্তি কেন হইল। কুরঙ্গী রাজনন্দিনী। অবিমারক আজ চণ্ডাল। উভয়ের মিলন অত্যন্ত অসম্ভব। “সম্বচরিত্রাণোমর্ষাঃ” ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুৎ রাজকুমারের গৃহের দিকে চলিয়াছেন। পথে চক্রিকার সহিত দেখা হইল। চক্রিকা বড় পরিহাসরসিকা। আমরা উভয়ের আলাপের কিছবৎ (সংস্কৃত) উদ্ধৃত করিতেছি—

বিদ্যুৎ:। চক্রিকে। কিমত্যং?

চক্রিকা। আর্ঘ্য: কপিৎ ব্রাহ্মণমযমে।

বিদ্যুৎ:। ব্রাহ্মণেন কিং কার্যং?

চক্রিকা। কিমত্যং ভোজনার্থং নিমন্ত্রয়িতুং।

বিদ্যুৎ:। ভবতি। অধিক: অধিক:।

চক্রিকা। অং কিলাতৈবদিক:।

বিদ্যুৎ:। কস্মাদহমতৈবদিক: শৃণু তাবৎ অতি রামায়ণং নাম নাট্যশাস্ত্রং তস্মিন্ পঞ্চপ্রোক্তা অসম্পূর্ণ সম্বৎসরে ময়া পঠিতা:।

চক্রিকা। জানামি জানামি আর্ঘ্যস্ত কুলোচিত ঈদৃশমধোবিভাব:

বিদ্যুৎ:। ন কেবলং শ্লোকঃ এষ, তেভ্যামধোবিগি জাত:। অতঃ অপত্রো বিশেষ: ব্রাহ্মণো ভুলভো অনুরক্তোহর্থজ্ঞঃ।

বিদ্যুৎকের অর্থাৎ পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া চক্রিকা হাসিল। পাঠকবর্গেরও বোধ হয় হাসি পাইবে। দুইয়ের বিষয় কেহ কেহ এই পরিহাস বৃত্তিতে না পারিয়া বড় গোলে পড়িয়াছেন। তাঁহার মনে করিতেছেন, মহাকবি ভাসের সময় রামায়ণ নাট্যশাস্ত্র বনিয়া খ্যাত ছিল। সে নাট্য-রামায়ণ এই প্রচলিত রামায়ণ নহে। ভাসের সময় দেশে ব্রাহ্মণ বড় অল্প ছিল ইত্যাদি। বাহা হউক আজ কবি জীবিত নাই, তিনি জীবিত থাকিলে বলিতেন, “অরসিকৈশ্চ বসনদেবন

শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ”। চক্রিকা বিদ্যুৎকের পাণ্ডিত্য পরীক্ষার ভাগ করিয়া বিদ্যুৎকের নামাক্তিত অদ্বৈতীয় লইয়া প্রশংসা করিল। বিদ্যুৎ চক্রিকার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, কিন্তু বিদ্যুৎ কিয়দূর ধাবিত হইয়াই প্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এখানে ধারণাসমর্থ বিদ্যুৎকের কথাটা বড় হৃদয় “মম পানৌ হস্তিনা আশাঃখ্যানশ্চেব তত্র তত্কেব পভঃ”। বিদ্যুৎ অগত্যা চক্রিকাকে কৃষ্ণদাসী বলিয়া গালি দিতে দিতে বয়স্ক অবিমারকের নিকট নাগিলি কল্প করিতে ছুটিলেন।

প্রশ্নেণকে আমরা অবিমারকের উৎকর্ষার সংবাদ পাইয়াছি। সম্ভ্রুতি অবিমারককে দেখিতে আমাদের আগ্রহ হইতেছে। আজ অবিমারক বড় চিন্তাময়।

“অধ্যাপি হস্তিকরীশরীশতলাদীং বালং ভয়াকুলবিলোলবিষাধনজ্ঞাং। যথেষ্ট নিতাসম্পূর্ণতা পুনর্বিরাধে জাতিস্বঃ প্রথমজাতিমির ‘অরামি।”

হস্তিকরীশরীশতলাদী কুরঙ্গীর স্বতি পুনঃ পুনঃ চিত্রপটে উদিত হইতেছে। যত্নেও সেই কুরঙ্গীর চিন্তা। কুরঙ্গী রাজকুমারী, তাহাকে ত সব সময় দেখিবার উপায় নাই। ভাগ্যক্রমে জাগ্রদবস্থায় একবার দেখিয়া ছিলেন মাত্র। এখন যত্নে কুরঙ্গী-সন্ধ্যায় ভিন্ন আর উপায় কি? জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট কুরঙ্গীর মধুস্বপ্নতির আদান করিয়া নায়ক বাহুজ্ঞানশূন্য, যেন এ জীবনে কুরঙ্গীকে দেখেন নাই, জন্মান্তরে দৃষ্ট কুরঙ্গীর সেই মধুর স্বপ্নটুকু এ জীবনে প্রকাশিত হইয়া যেন তাহাকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে। মাতৃ-মাধবেও আমরা এই ভাব দেখিতে পাই। মকরম শাদুল-কবল হইতে মদমস্ত্রিকাকে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু পুষ্পধার প্রভাবে

মহাশক্তিধর চিত্তায় নিম্ন মরকম
বলিতেছেন—

তমে মনঃ ক্ষিপতি যৎ সরসপ্রহার-
মালোক্য মামগতিত্বলগুরুতরী।

জৈষ্ঠকহায়নকুবজবিলোলপট্ট-
রাগিষ্টবতাস্তমলবলিতৈরিবাধৈঃ ॥

সমান অবসার দুইটা মোক হইলেও “জাতি-
স্বাধীন-প্রথমজাতিমির স্বাধীন” এই কথাটা
নায়কের চিন্তাবস্তু যেমন স্মরণ করিয়াছে,
মরকমের কথায় তেমন পবিত্রত্ব হয় নাই।

যদিও নায়ক কুরদীর চিত্তায় নিম্ন হইয়া “দুষ্টি-
শুভা প্রভৃতি নেছতি জগৎমতঃ” বলিয়া কতই
না আশ্রয় প্রকাশ করিতেছেন তথাপি সাধারণের
দৈর্ঘ্য তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সাধারণের
কঠোর বন্ধনে চিরকৈ আবদ্ধ করিতে প্রয়াসী
হইতেছেন, “অভিধাব মহৌষধঃ” ভাবিয়া
বলিতেছেন “অমূলমুখিতিক পুরুষাণাং। সঙ্গ-
মানো হি বিজ্ঞতে মনঃ তদ্ব্যবহিন্দানিঃ

ন সঙ্গয়ামি” আশঙ্কিত্রোতে চিত্ত বধন ভাগিয়া
যায়, বিবেকসম্পন্ন পুরুষ তখন সেই শ্রোত-
অতিক্রম করিতে এইরূপ সচেষ্ট হইয়া
থাকেন, কিন্তু বিষয়ের আকর্ষণ এতই প্রবল
করাচি কোনও পুরুষ ইহাতে বাধা প্রদান
করিতে পায়নে, বিবেক-বুদ্ধি নায়কের চিত্তে

ক্ষণপ্রভার ভ্রায় প্রকাশিত হইয়াই বিলীন
হইয়া পেল, স্বপনের অন্ধকার আরও গভীরতর
হইয়া উঠিল। সিঁগুভাস্ত করিয়া ফেলিল। “ন
সঙ্গয়ামি” প্রতিজ্ঞা বিশ্বস্ত হইয়া নায়ক
বলিতে লাগিলেন “অহো! তস্তাঃ রূপসম্পৎ,
রূপাহরুণ্য যৌবনঃ, যৌবনসদৃশঃ সৌন্দর্য্যঃ”

প্রতিজ্ঞনঃ দ্বাভ্য যুবতিবপুযা কিম্ রচিতং
গতা বা ত্রীক্লপঃ কথমপি ভাষাধিপুরুষঃ।

এইরূপে হুমার অবিরামচকিত চিত্ত সঙ্গ-
দোলায় দোড়ালমান হইতেছিল। এমন সময়

কুরদীর দ্বারাও সখী নিনিকানি অবিরামকের
গৃহে উপস্থিত হইলেন। নায়কদ্বারাগিনী

কুরদীর জঘনবাধা বুঝিতে পারিয়া স্বভাব-
কোমলা স্বচরু দ্বারা অবিরামকের অবস্থা
অবগত হইবার জন্ত আসিয়াছেন। অব-
িরামকের সহিত দ্বারীর আলাপ বড় রমণীয়,
অবিরামক নামিকার চিত্তায় বাহ্যজানশূন্য।

দ্বারাও সখী তাঁহার গৃহে আসিয়াছে, নায়কের
সেদিকে লক্ষ্য নাই; কখনও বা আবেগবশে
দুইচারিটা কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,
কখনও বা নির্দাক্ত অবস্থায় চিন্তামগ্ন হইতে-
ছেন। নায়ককে দেখিবা মাত্র দ্বারীর বুঝিতে

কিছুই বাকি রহিল না। নায়ক দ্বারা-মুখে
কুরদীর অবস্থা ও কল্যাণ-পুর্বে প্রবেশের
উপায় জামিতে পারিলেন। আনন্দে অধীর
হইয়া “বাক্যাস্তেন পুনরন্ত কৃতঃ সংজ্ঞঃ”

বলিয়া দ্বারীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
করিলেন। দ্বারাও চলিয়া গেলে বিদূষকের
সহিত নায়কের সাক্ষাৎ হইল। রজনীযোগে
অলক্ষিত ভাবে কল্যাণ-পুর্বে প্রবেশ করিবার
জরুরী-কল্পনা হইতে লাগিল। দেখিতে

দেখিতে সাধ্যাক্রম উপস্থিত হইল।
এখানে প্রায় হইতে পারে কুরদী অব-
িরামককে “অশ্রদ্ধ জানিরাও সহসা তাঁহার
প্রতি অশ্রদ্ধার হইলেন কেন?

নায়কের অসাধারণ শৌর্য্য, গাভীর্য্য, দয়া ও
রূপসম্পন্ন দর্শন করিয়া দ্বারিকা বুঝিয়াছিলেন
নায়ক সামান্য বংশোদ্ভব নহেন “ন হি মহোদধিঃ
বর্জ্জয়িত্বা কুপে মোক্ষিকানি জায়তে” এই

জাতিদ্বায় আশ্রমের মহারাজ দুঃস্বপ্নের কথা মনে
পড়ে। পুণ্য তপোবনে, গবি-দুহিতাদিগের
মধ্যে শতশুলাকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বিকার
উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণ কেন হইল, এই

কথা ভাবিতেই তাঁহার মনে হইল—

“সত্যং হি মনঃপদংদেয়ং বস্তুঃ”

প্রমাণমন্ত্যঃকরণপ্রবৃত্তাঃ”

অতএব কুরদীর এই অধরাগী তাঁহার
শ্রোমাস্পদের যথোপযুক্ততা প্রতিপন্ন

করিতেছে। তখনকার যুগে অথরের স্তুতি-
ধোনে দেখানে বিনষ্ট হইত না। তাঁহার
উপার সকলেরই প্রবল আস্থা ছিল। কিন্তু

এ যুগে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। হস্তরা
অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই যে এ সব ক্ষেত্রে
প্রকট প্রমাণ, তাহা আমরা এখন বুঝিতে
পারি না!

(কম্পন)

শ্রীযোগেশ্বরনাথ তর্ক-সাংখ্য-
বেদান্ত-তীর্থ।

ত্যাগ-বল

বিনয়ান্বিত তাঁহার নামান্তর, তিনি বীর,
নীতিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অতি
শুণ্য পরাক্রমশালী ও অধ্যবসায়ী বলিয়া খ্যাতি
লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থাদিক
সাহসবিনম্বন কয়েকবার তাঁহাকে বিপন্ন হইতে

হইয়াছিল। দ্বিবিজয়-বাসনা প্রবল নরপতি-
গণকে কর্তব্যের পথ হইতে বহু দূরে লইয়া
যায়। একই প্রকার নীতি অবলম্বনে স্বর্গ-
কালব্যাপী কর্ণে লিপ্ত থাকিলে ক্রমে ক্রমে
বিকলতার মরু মশো পতিত হইতে হয়।

পরিবর্তনশীল অর্থচক্ৰলক্ষ্য নীতি প্রভাবে
যিনি বীর তিনি সর্গাঙ্গরপরিপুষ্ট হইয়া সাধারণ
সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম নহে।

একদা বিনয়ান্বিত সন্ন্যাসীবশে সন্ন্যাসি-
গণের সহিত ভীষ্মদেব নামক জটন নরপতির
দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রালক সিংহের
কৌশল বন্দীদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা

অত্যধিক সাহসের ফলমাত্র। “বুদ্ধিবলে
বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনশ্চ নৃতন
কর্ণে নিযুক্ত হইলেন। বুদ্ধিও সর্বত্রই দৃষ্ট

হইয়া থাকে মুক্তাভরণপিশুক্ত কণ্ঠগণ পদে পদে
মৃত্যুর সঙ্ঘবীন হইয়াও মৃত্যু কর্তৃক উপেক্ষিত
হইয়া থাকেন। তাঁহার দেহটিকে ধ্বংসনক
ও কর্ণভঙ্গুর বোধে কর্ণশ্রোতে ভাসাইয়া

দেন। কর্ণই তাঁহাদের লক্ষ্য! দেহটা
ত্যাগের বস্তু, এই প্রকার ধারণা লইয়াই
পৃথিবীর উপরে বিচরণ করেন। সেই জন্ত
তাঁহাদের “জয়”-যোষণা চতুর্দিক হইতে
সমুদ্রিত হইয়া থাকে!

যে সময়েই কথা লইয়া-মৃত্যু প্রবন্ধ লিপি-
বদ্ধ করিতে উদাত হইয়াছি, সেই সময়ে
কাম্বীরে জয়াপীড় এবং নেপালে অরমুচি
রাজত্ব করিতেন। ভারতের কথা,—

ভারতের বীর্য্য, নীতি, কৌশল ও ত্যাগের
মহিমা—ভারতের প্রতিগ্রহে প্রায়মুখী ভাষায়
স্ববর্ণিত্ব অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—মানব-
কণ্ঠে বিপার, স্বভাবে, কখন বহ্নিগোলে,

জড়েরও চৈতন্য বিধান করিতেছে। কর্ণগণ
কর্ণের “সন্ধান লাভ করিতেছেন, ভীষ্ম
জয়যে সাহস প্রবেশ করিতেছে, দুই ও শত

সাধু লাভ করিতেছে, নীচ মহৎ হইতেছে।
পুণ্ডকনিহিত নীরব অশ্রুত শক্তি মানব-প্রাণে
মহাশক্তি বিকাশ করিয়া দিতেছে।

প্রাচীন কথিত, তাঁহাদের তপসসিক্ত বিপুল
তেজস্বী সহস্রতাকরে পুণ্ডক স্বরূপ মধ্যে
সাধবানে রক্ষা করিয়া ভাবী বংশধরদের
কল্যাণের যার উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছে।
তাঁহাদের যুগযুগান্তরে সঞ্চিত ত্যাগ-বল

চিত্র নৃতন চিত্র অঙ্গান অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া নিম্ন তেজ বিতরণ করিয়া আমান-লিগকে প্রাণময় করিয়া তুলিতেছে। ভবি-
ষ্যতেও সেই কস্মিন্তেজ যুগযুগান্তর ধরিয়া
ভাষ্যতেক সজীব রাখিবে। সেই প্রাচীন
কস্মিন-সংকিত সংহততত্ত্ব আদ্যনিত
করিয়া যে 'সাদা' প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারই
'লিপি' আমার মনোময় যন্ত্রে যে ভাবপ্রবাহের
সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই কথঞ্চিৎ এই প্রবন্ধে
ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইলাম।

জাতার কুটনীতি বলে বহুদিন গত হইল,
অপর একটা জাত প্রবক্ষিত হইয়াছিলেন।
যাহা-বিগকে অসত্য, বর্ধন, মূর্খ বলিয়া ধারণা
করিয়া রাখিয়াছি, প্রকৃত পক্ষে উহার
তাহার কি না তাহা অবজ্ঞার নেত্রে দর্শন
করিলে বদাত প্রকৃত সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞানলাভে
সমর্থ হইব না। ভেদনীতিপরিশুদ্ধ পক্ষ-
পাতবিরহিত হ্রদে শুভদৃষ্টিগত না করিলে
কদাচ সত্য হ্রদের বিজ্ঞানময় সৃষ্টির আবিষ্কার
হয় না। কাম্বীরপতি নেপালবাসিনগকে
এবং তাঁহাদের প্রাক্ক অরমুড়িকে অবজ্ঞার
চক্ষে দর্শন করিয়া প্রবক্ষিত হইয়াছিলেন।
এই প্রকার প্রবন্ধনকে আমরা স্বেপাক্ষিত
বলিয়াই বিবেচনা করিব।

কাম্বীরপতি লাহিত, অবমানিত হইয়া
অরমুড়ি-হুতে বন্দী হইলেন। কাম্বীর-
বাহিনী নদী-প্রবাহে বিনষ্ট হইয়া গেল।
বিন্যাদিতা নেপাল-জনপদে বন্দীবশে
প্রবেশ করিলেন। লজ্জা ও ক্ষোভে তাঁহার
মস্তক অবনত হইয়াছিল। কালগণিকা-
নদীতীরস্থ অত্যুচ্চ পার্বত্য ভীষণ গর্গমণ্ডে
বিন্যাদিতা বন্দীদশায় ও পরিচারকবীন
অবস্থায় নিঃশব্দকরাবাস-রেশ ভোগ করিতে
অত্যন্ত হইলেন। ভগবানের পরীক্ষা! ইহার

নামই "অধি-পরীক্ষা"। পঞ্চভট কাম্বীর
চৈতন্যোদয়ের জন্ম ভগবানের পুষ্যময় বিধান
কীর্তনের অভিব্যক্তি সৃষ্টি করিয়া দেখে।
যিনি তাঁহার ইচ্ছিত বৃত্তিতে পাদ্রিয়া
চিত্রার দ্বারা কস্মিন্তেজের গতি নিয়ন্ত্রিত
করিতে পারেন তিনিই সংস্কারায়
বিকল্প উদ্ভাদনাপূর্ণ কস্মিন্তেজকে তাঁহার
কর্মের অহুকূলে প্রদর্শিত করিয়া অহর্কর
মক্শান্তর, হুজলা হুজলা শস্যশ্যামলক্ষেত্রে
পরিণত করিয়া থাকেন। ইহারই নামান্তর
"জীবনের সফলতা"।

কস্মিন্তেজী বিন্যাদিতা নেপালের দুর্গে
নিষ্কল বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভগবানের
আশীর্বাদ, আশীর্বাদ দয়ার পরিচয়। মনব
সে মহান আশীর্বাদকেও তুচ্ছ বোধে মহা-
যোগফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।
কারাগারস্থিত একমাত্র গবাক্ষপথে এক এক-
বার বিন্যাদিতার চিত্তাঙ্কিত মুখমণ্ডল
উদ্ভাবের উপায় বিহারগণের জন্ম পদাবিস্কারের
চেষ্টা করিত। বিহারমন্দের দ্বারে লৌহ-
কবাট বহির্ভাগ হইতে আবদ্ধ ছিল।
কারাগারের গবাক্ষ অংশ-মাত্র উন্মুক্ত ছিল।
এ একমাত্র গবাক্ষপথেই তিনি অনন্ত আশা
এবং নিয়ে বহু দূরে কালগণিকা নদীর পায়া-
গলা হ্রদে আবদ্ধ উদ্ভাদনাপূর্ণ প্রবল গতি
দর্শন করিয়া উদ্ভাবের উপায় চিন্তনে জন্মে
জন্মে হত্যা হইয়া পড়িলেন। এ গবাক্ষ-
মণ্ড দিয়া অগ্নেশে নদীযোতে পতিত হইবার
স্ববিধা ছিল, কিন্তু সেই হ্র-উচ্চ স্থান হইতে
নদীকে স্বপ্নপ্রদারের সহিত জীবনেরও
পরিদমায় হীনকৃত্য, তাহা দুর্গনিষ্ঠতা বিশেষ
ভাবে অবগত থাকিয়াই এ স্থানে গবাক্ষ
নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিন্যাদিতার
চিন্তাযোতে এ গবাক্ষ-পথপাশে বদা প্রাপ্ত

হইয়া পুনঃ কারাগার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত।
কখন যুগীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্ম, কারাগার
হইতে মুক্তির জন্ম, গবাক্ষ-বক্ষে সর্বদা
উপস্থিত থাকিয়া বিন্যাদিতার হৃদয় মণ্ডিত
করিত, প্রতি নিয়ে শিলাখণ্ডের যাত-প্রতি-
যাতে প্রবাহিণীর আফলন দৃষ্টে তাঁহার
কঠিন বীর-হৃদয় বিস্তর ছায়া, রমণীর ভায়
একামল হইয়া পড়িত। আশা হ্রদে
দাঁড়াইয়া, হ্রদের মলয় প্রবাহিত করিয়া,
বসন্তের ফুলভরা প্রমোদ-উদ্ভাবনের দৃষ্টি
দেখাইয়া গবাক্ষ হইতে পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন
কারাগারে লইয়া যাইত। জয়গীড় স্বাধীনতা
বা মুক্তির জন্ম যুগের পথে দাঁড়াইতে
পারেননা। আশার মোহিনী রূপ, আশার
নীলব কটাক্ষপূর্ণ উপদেশ তাহাকে পরাধীনতার
মধ্যে মরণের অন্ধকারার মধ্যেও বল প্রদান
করিত। কাম্বীর বাঁধ, কাম্বীর তেজ যে
স্থানে মুক্তির পথ দেখিতে পায় নাই, এক
নির্লোভী ভ্রাক্ষণ, একজন পরহৃৎস্বাক্তর
ভ্রাক্ষণ, ত্যাগবল বলায়ান ভ্রাক্ষণ, সেই অদৃষ্ট
অনাবিষ্কৃত পথকে হুটুই হৃদয় করিয়া
স্বপ্নেশ্বরকে স্বপ্নেশ্বরপ্রাণ রাজার জীবন রক্ষা
করিয়াছিলেন। যে মহাকা স্বীয় প্রাণধানে
রাজার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, জননীর
অপমান যে মহাকা দূরে অপসারিত করিয়া-
ছিলেন, তিনি নেপালরাজের সহিত একটা
মাত্র রাজনৈতিক পালাচল চালিয়াই বুজি
জিতিয়াছিলেন। ভ্রাক্ষণ মরণ দ্বারা অর-
মুড়ির সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া
কাম্বীর-সিংহাসন তাঁহার অধিকারে প্রদান
করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং দিগ্বিদ্য-
লজ জয়গীড়ের অর্থরাশি-বিনিময়ে ভ্রাক্ষণকে
রাজ্যধানের প্রত্যাবৃত্ত উপস্থিত হইয়াছিল।
এবং প্রাক্ত অর্থ ও কাম্বীর-রাজ্য-

প্রাপ্তির আশায় অরমুড়ির চিত্ত অস্থির
হইতেছিল। মন্ত্রী দেবশর্মা সৈন্তগণ সহ
কালগণিকা-তীরে উপস্থিত হইয়া তথায়
সৈন্তগণকে রক্ষা পূর্বক সামান্যবশে একাকী
নদী উত্তীর্ণ হইলেন। নেপালরাজ পূর্ব
হইতেই সামন্তরাজগণকে তাঁহার অভ্যর্থনার
জন্ম তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার
বিশেষ সম্মান সহকারে তাঁহাকে রাজগড়ায়
লইয়া গেলেন। অরমুড়িও তাহাকে উপযুক্ত
সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিশ্রামার্থ উত্তম গৃহ
প্রদান করিলেন।

তাগী ধর্মবীর ভ্রাক্ষণগণের অহুগ্রহে
ভারত ধর্মবল্লের উৎসরূপে আশ্রিত এই
যোরতর দিনে ধর্মজীবনের পিপাসা নিবারণ
করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় ধর্ম-উৎসের
শীতল পানীয় মানবের জ্ঞানোদয়কাল হইতে
পৃথিবীর মহাদেশসমূহের জ্ঞান ও ধর্ম-
পিপাসার শান্তি করিয়া আসিতেছে। সেই
অসুরজ্ঞ ভারতীয় ধর্ম-উৎসের নির্ভাতা
ভ্রাক্ষণ! আজ সেই ভ্রাক্ষণরূপী দেবতা
হৃৎগতীর মগ্নবালে দেশের জন্ম, দেশপ্রাণ
রাজার উদ্ধারের জন্ম উপস্থিত হইয়াছেন।
অরমুড়ির সাধ্য কি নির্লোভী ভ্রাক্ষণের
উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়!

ত্যাগী ভ্রাক্ষণের নিকট অরমুড়িকে পরাজয়
স্বীকার করিতে হইল। পর দিবস কাম্বীর-
রাজমন্ত্রী দেবশর্মা বলিলেন—“জয়গীড়
দিগ্বিদ্যবপদেশে পর্ত্ত-সম্মান অর্থরাশি
উপাঞ্জন করিয়াছেন এ কথা সত্য, কিন্তু উহা
কোথায় রক্ষিত আছে তাহা আমি অবগত
নহি। তবে যে সকল প্রদান প্রদান
গৈনিকগণ উহা অবগত আছেন তাহার
আমার সহিত আগমন করিয়াছেন। মহারাজ
স্বয়ং এই বিষয় বিশেষভাবে অবগত

আছেন। ‘জয়াপীড়কে মোহিত করিয়া, অর্থ কোথায় আছে, তাহা উাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।’ তৎপরে জয়াপীড়ের সৈনিকগণের মধ্যে বাহারা অবগত আছেন, উাহাদিগকে একে একে নদীপার করিয়া সত্যয় আনয়ন পূর্বক বন্দী করিলে কোন প্রকার বিপ্লবেরও সম্ভাবনা থাকিবে না অমিচ অর্থপ্রাপ্তির সুবিধা হইবে।”

অরমুন্দি দানের এবং মানের লোভে বিমোহিত হইলেন। রাজার আদেশ অমুসারে বুদ্ধিমান দেবশর্মা জয়াপীড়ের বন্দীবাসে গমন করিলেন। দীর্ঘকালিক্ত ব্রাহ্মণ জয়াপীড়ের অবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া পড়িলেন। সমাগত প্রহরিগণকে তথা হইতে অপসারিত করিয়া বলিলেন—“রাজ্য বিপদ-মুক্তির মূল যে শক্তি তাহা আপনার আছে ত? যদি তাহা থাকে তাহা হইলে আমি যে আমি সীমাহসের চিত্র করনা প্রভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহা প্রায়ময় হইয়া উঠিবে? ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আশা করিলেও বাতুল একত্রিত হইলে নূতন বিশ্ব নির্মিত হইতে পারে। আপনার যদি দ্রুদে বলা থাকে তাহা হইলে এই জগৎই বিপদাপার উত্তীর্ণ হইয়াছেন জানিবেন।”

জয়াপীড় উপাসনেজে মস্তার বদন-মণ্ডল নির্ভীক পূর্বক বলিলেন “আমি শত্রুহীন বন্দী; কেবল ‘জিন্দাবাদ’ কি অসুত কাঁচা করিব?” ব্রাহ্মণ বলিলেন “ঐ বাতায়ন হইতে নদীজলে পতিত হইয়া পরপারে গমন করিলেই আপনার মুক্তি। ঐ বেধুন কেমন সাগরসমান সৈন্তগণ আপনার জুতাই অপেক্ষা করিতেছে, উাহারা আপনার নিষ্কেষ।” জয়াপীড়ের দ্রুত-শক্তি যেন হীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার জীবনের মমতা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, শিষ্ট

জীবন-রক্ষার উপায় তাহার অজ্ঞাত ছিল। তিনি উত্তর করিলেন “দুর্ভিত বাতায়ন এই অসুত বাতায়ন হইতে নদীতে পতিত হইতে পারিব না, দূতিতও সম্ভবতঃ ছিন্ন হইয়া যাইবে।” দেবশর্মা খায় প্রভুর বাক্য অবশ্যে চিন্তিত হইলেন না—আমি যে সহজ স্থাপ্য উপায় স্থির করিয়াছিলাম তাহাই বিফল হইল, তাহাতে ক্ষতি নাই; অনন্য জন্মহুমির রক্ষার জন্ত, প্রভুর শত্রুত অসহ্য অবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃত লাভের জ্ঞ যে উপায় অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন তাহাই করিব? অরাতিনাশ খচকে দর্শন অপেক্ষা রাজার মুক্তি সর্ব প্রথম আবশ্যক। স্বার্থত্যাগী ব্রাহ্মণের বদনমণ্ডল “স্বর্গীয়” জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি পবিত্র উৎসাহের সহিত জয়াপীড়কে বলিলেন “রাজ্য! আপনি একদণ্ড কাল কোন উপায়ে বহির্ভাগে অবস্থান করুন, তৎপরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন আপনার পলায়নের স্বন্দর রূপেগণ উপস্থিত হইয়াছে।” মহারাজ পাণ্ডুলান গৃহে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ মন্তকের উন্মথ্য উন্মোচন করিলেন। তথারা পদদ্বয় বন্ধন করিলেন। এবং দণ্ডধাতে অশ্রুতি বিদীর্ণ করিয়া কবিরদারা প্রবাহিত করিয়া উন্মথ্য-বস্ত্রের একান্তে লিখিলেন— “ব্রহ্মদেশের মান-রক্ষা ও প্রজাপালক রাজার প্রাণ-রক্ষার জ্ঞ এই ব্রাহ্মণের বায়ুপূর্ণ সজ মৃতদেহ আপনার হৃদয় দুর্ভিত কাঁচা করিবে। এই দেহ অবলম্বনে শীঘ্র বাতায়ন পথ হইতে নদীতটে পতিত হইয়া পরপারে গমন করুন। পরেশের মান ও রাজার জীবন-রক্ষার জ্ঞ ব্রাহ্মণের জীবনহীন দেহ এখানে পতিত হইল।” দ্রুদেহের উত্তর গোণিতে রক্তবর্ণ অক্ষরে এই কয়েকটি বাক্য লিখিয়া

দীর্ঘকাল গ্রহণপূর্বক নিজ হস্তে আপন কণ্ঠে বস্ত্র বন্ধন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ পরাপারময় হস্তাতলে চলিয়া পড়িল। তাগী পরোপকারী ব্রাহ্মণের শব-দেহ অবলম্বনে জয়াপীড় নদীতটে পতিত হইয়া আপন সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নেপথ্য অধিকারে বিলম্ব হইল না। নেপালের সেই কারাগার তীব্রক্রেমে পরিবর্ত হইল। তাগের মহিমা ঘোষন-তরঙ্গ আশ্রিত

তরঙ্গায়িত হইতেছে, প্রান্তরে গমন করিলে আশ্রিত ও স্তনিত পাই “ব্রহ্মদেশ। ব্রাহ্মণের ত্যাগবল।” হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বাহু-তরঙ্গে ধনি বিস্তার করিয়া ছুটিতেছে। সেই পবিত্র তরঙ্গ কখন কাটিকাভেদ কখন মলয়ানীলের সহিত প্রবাহিত হইয়া ভারত-ময় ঘোষণা করিতেছে “ত্যাগবলম্ পূরম্ বলম্।”

শ্রীবনওয়ারিলাল দত্ত।

তিন

গণিত-শাস্ত্রে এমন একটি রহস্যমূলক শব্দ বা অঙ্ক আছে, যাহা সংখ্যায় হীন হইলেও, গুণ-গৌরবে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত সংখ্যাব্যাক শব্দের শীর্ষস্থানীয় ও বরঞ্জীয়। সেই অসুত সংখ্যার অচিন্তনীয় প্রভাবে এই প্রত্যাক পরিদৃশ্যমান বিরাট-বিশ্ব আর তদসুত তাবৎ পানাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। সমস্ত মানবজাতিই সেই সংখ্যাবিশেষে বিশ্বয়কর রূপে বিমোহিত এবং ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অধোরহসি তাহার অধুবর্তনে, গুণ-কীৰ্ত্তনে অগ্রসর বা তৎপর। অনেকে সেই সংখ্যাটিকে পাচ, কেহ নয়, ও কেহ বা আর বলিয়া নির্দেশ করেন এবং তাহার অসুতকে নানারূপ মুক্তি প্রমাণারিত ও অন্তর্যায় করিয়া থাকেন। এক সময়ে একজন প্রবন্ধ-লেখক “বিদ্যাবাস-সংগ্রহ” নামক এক লুপ্তস্থিত মাসিকপত্র ‘চৌরাশি’ সংখ্যা লইয়া এইরূপ আলোচনা করিয়া ছিলেন এবং রাশি রাশি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিশেষত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। সংপ্রতি আবার অধ্যাপক শ্রীমুখ্য সত্যশঙ্কর দে, এম, এ, মহোদয়

“বহবা” মাসিকপত্রের গত ভাস্ক-আধিনি সংখ্যায় ‘আঠারো’ নামক প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া, আঠার সংখ্যাটিকেই প্রকারান্তরে সেই বিশেষ সংখ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তৎসম্পর্কে আরও অনেক কথা বলিবেন বলিয়াও পাঠক-গণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে, যে বিশেষ সংখ্যার সহিত সংসারের দৈর্ঘ্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বাহার মোহিনী মায়ায় জাতিধর্মনির্দেশে পৃথিবীর সমস্ত মহাযা-সম্ভারায়ই বিশেষভাবে মুগ্ধ, তাহা পাচ, নয় বা আর নহে, চৌরাশি কি আঠারও নহে। সে সংখ্যা তিন—সকলিষ সংখ্যা-ব্যাক শব্দের আদি বা মূল যে এক, সেই এক সংখ্যা হইতে সমুৎপন্ন তিনই সেই বিশেষ সংখ্যা, সেই পরম রহস্তময়, বিশ্বয়কর অঙ্ক। আমরা নানা শাস্ত্র হইতে যুক্তি-প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া ইহার সমীচিনতা সম্রাণ করিতেছি।

দৈবর নিতা, তত্ত্ব, বৃত্ত, মূল, সত্য ও চৈতন্যরূপ। তিন নিহাকার নির্মিকার,

স্বামীর স্ত্র্য তাঁহার তিনটী চক্ষু, আর তাই তিনি জিনঘনা। জিনঘনাও ত্রিখ বা তিন শক্তিতে পৃথকীকৃত। সেই তিন শক্তির নাম কানী, তারা ও ত্রিপুরা। দেবদেবত্বের ত্রিতীয় পত্নীর নাম গঙ্গা, আরাধ্যশক্তির সপত্নী আর তজ্জন্ম তাঁহার মতে, স্বামীর 'জীবন-বরুণা' ও 'শিরোমণি'ভূম্বা। সেই ত্রি-পাতনেরী জাহ্নবী দেবী ও ত্রিসোতা, ত্রিপথগা এবং বর্ণে মম্বাকিনী, মন্তো ভাগীরথী ও পাতালে ভোগবতী নামে ত্রিলোকবাসীর বরুণীরা। মহাদেবের প্রিয়তম বাসুদেব নাম কানী। কানী হিন্দুজাতির পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। সেই কানী ও তিনটী—একটী হরিবাহুর উত্তর, ত্রিতীয়টা বাসাবদী নামে, বরুণ, অগ্নি ও গঙ্গা এই নদীত্রয়ের সমন্বয়ে এবং তৃতীয়টী বেন নামে দক্ষিণাংশে, মাস্তাজগ্রাংশে অবস্থিত। শিবের প্রত্ন অস্ত্রের নাম ত্রিশূল। ত্রিশূল ত্রিধীর্ষক বা তিনটী ফলক সম্বিষ্ট। তাঁহার অচ্চর বা ভক্তেরা ললাটে যে ত্রিলক বিশেষের অঙ্কন করিয়া থাকেন তাহাও ত্রিবেদ্যাক্ষ, হৃঙ্গুগের স্ত্র্য তিন ত্রিখ্যক রেখার দ্বার বাচত। তাহা তাহাকে ত্রিগুপ্তক কহে। দানবশাস্ত্রায়, অশ্বরকুলের রথক্ষে যে পুরী বিশেষের গঠন করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যাও তিন। সেই পুরীত্রয় আবার বর্ণ, বৌগা ও লৌহ এই প্রধান ধাতুত্রয়ের সাংখ্যে রচিত। শেষে জিনঘনাপতি, ত্রিশূলধারী ত্রিলোচন, ত্রিধাতুময় ত্রিপদের ধ্বজ সাধন করিয়া জিহিববাসী ত্রিপদশব্দকে নিরূপণ করিয়াছিলেন। ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহ-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জলমগ্না পৃথ্বীর উদ্ধার সাধন করেন, তখন তাঁহার পূর্বে তিনটী কচুং বা মুটির উদ্ভব হইয়াছিল।

তাই তাঁহার এক নাম ত্রিকচুপ। তার পর আবার যখন তাঁহাকে বলি অশ্বরের নির্যাসার্থে বামন রূপ ধারণ করিতে হয়, তখন তিনি ত্রিখিকম নামে অভিহিত হন এবং বলির নিকটে ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিয়া, ত্রিপদ-ধারী হইয়া, এক পদে বর্ণ, অগ্র পদে মন্তো অধিকার করেন, আর নানি-সমুখিত তৃতীয় পদ তাহার মস্তকে স্থাপন পূর্বক তাহাকে পাতালে পাঠাইয়া দেন। ভগবানের এই উগ্রবিধ কাণ্ডে ত্রিখংখ্যার প্রাণান্তের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতাও বঞ্চিত হইয়াছে। সেই পরিবর্তা আবার তিনি শ্রীকৃষ্ণাবতারে 'ত্রিভঙ্গমুরারী'-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশেষ ভাবেই বাড়াইয়া গিয়াছেন। দেবতাদিগের ধনরক্ষক বা ধনাদিগের নাম কুবের। কুবের দেবগণের মধ্যে সর্বাংশেকা কুংসিত বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু তাঁহার তিনটী মস্তক। স্বর্গেইয়া অশ্বিনীকুমার-ত্বয়ের যান বা রথের নাম 'ত্রিচক'। ত্রিচকগ্রন্থ তিনখানি চক্রে পরি-ক্রান্ত। আশ্বিনীদে জরগণের যো মূর্তি কল্পিত হইয়াছে, তাহা তিনেরই প্রাণাত্ম-পরিজ্ঞাপক, জরাহুর ত্রিপদ ও ত্রিশির। তাহার হস্ত ও চক্ষুর সংখ্যাও যথাক্রমে তিনের দ্বি ও ত্রিভাণ্ড সংখ্যক। অশ্বিনীকুমার—মৃগশির রথচক্রে স্ত্র্য, অর-পুত্রের ত্রিপদ ও ত্রিশিরের সৈন্ত আশ্বিনীদোক দোষজয়ের, বায়ুপতক-কণের—কোনও সংশয় আছে কি না তাহা স্বর্ণিগণেরই বিচার্য। হিন্দুজাতির অন্ততম প্রধান তীর্থের নাম ত্রিবেণী। ত্রিবেণী দুইটী—একটী যুক্ত-প্রদেশে প্রয়াগে যুক্ত-বেণী, আর অষ্টটী বঙ্গদেশে হুগলী জেলায় যুক্তবেণী নামে পরিচিত; কিন্তু যুক্ত, যুক্ত উভয় ত্রিবেণীই তিন নদীর—গঙ্গা, যমুনা ও সরযুতীর—সদন-স্থলে অবস্থিত। তিনের

এইরূপ প্রাধান্য বা বিশেষত্ব হিন্দুশাস্ত্রের সর্বত্রই, এমন কি, ছত্রে ছত্রে পড়ে পড়েই দেবীপাশান দেখিতে পাওয়া যায়, চেষ্টা করিলে তৎসংখ্যে রাশি রাশি প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সম্ভবপর নহে। স্তবতার আমরা সে সংখ্যে আর পক্ষি অশ্বসং নী হইয়া, শ্রেণ্যপত্র ধর্মশাস্ত্রোক্ত অভিমতাদির বিষয়েই আলোচনা করিতেছি।

হিন্দুজাতির ধর্মশাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণের মূল যেমন ত্রিগুণ, ওকার বা প্রপথ, ত্রুটান-দিগেরও তেমনই ট্রায়ড বা ট্রিনিটি (Triad or Trinity)। প্রথমে ত্রক্সা পক্ষি শিবের স্ত্র্য ট্রিনিটিও, পিতা, পুত্র ও বিশ্বাত্মাত্মা (God, the father; God, the Son and Holy Ghost) এই তিনের সমবায়ে সংগঠিত। প্রতীচ্যগুণতের আদি সত্তা যে গ্রীক ও রোমান জাতি, তাঁহারাও তিনের সমাদর করিয়াছেন এবং ত্রিধের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সকল বিষয়েও ইহার প্রাধান্য লোকীর ও কীর্জন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক-দিগের নিকটে জিহাস্ (Zeus), অফ্রোডাইট (Aphrodite) ও আপোলো (Apollo) এই তিন দেবতাই ত্রিধরূপে সমানিত ও পূজিত। রোমান জাতির ধর্মশাস্ত্রমতে জুপিটার (Jupiter), নেপচুন (Neptune) ও প্লুটো (Pluto) এই ত্রিধেই সর্বশ্রেষ্ঠ, নিখিল জগতের অধিতীয় অধীশ্বর আর তজ্জন্ম তাঁহাদের ত্রিধের অন্তর্নিবিষ্ট। 'এই দেব-জয়ের মধ্যেও তিনের নিদর্শন প্রকাশমান। জুপিটার ত্রিধাভিন্ন তাড়িতোপার সমানী, নেপচুন ত্রিফলক-দণ্ড বা ত্রিশূলধারী, আর প্লুটোপত্নী প্রোপ্রাস পাইন (Proserpine) সহ-এক ত্রিশির সারমেয় পুতে উপবিষ্ট।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের ত্রিধ অটকন (Otkon), মেসিউ (Messou) এবং অটাহুয়াটা (Atahuata) নামক দেব-জয়। তত্রতা পেক ও মেবসিকো দেশের অধিবাসীরা যথাক্রমে অমমটা (Apomti) চুরেঘনটী (Chureonti) ও ইন্টেইকুইয়েই (Intequiqui) এবং ভিটপুটসি (Vitzputzli), টেলোক (Tlaloc) ও তেজকটু-লিপোক (Tezcatlipoca) নামক তিন ত্রিটী দেবতাকেই ত্রিধ বলিয়া উপাসনা করেন। নরুওয়ে ও স্বইডেনের লোকদিগের নিকটে ওডিন্ (Odin), হিনির (Hœnir) ও লোডার (Lodur) ত্রিধরূপে সমানিত থর (Thor), ফ্রিগা (Frigga) ও ওডেন (Woden) গণ জাতির; হিউ (Hu), ক্রেইয়া (Craiw) ও সেরিডোয়েন্ (Ceridwen) কেটজাতির; হোরাস্ (Horus) আইসিস (Isis) ও ওসিরিস (Osiris) নিসরীয়দিগের, আর অরিমেন্ (Arimanes) মিথ্রাস্ (Mithras) ও ওরোমাসুদেগ (Oromasdes) আদিম পারসিক জাতির ত্রিধ। মুসলমান-জাতিও তুল্যরূপে ত্রিধে আস্থাবান। তাঁহারা আল্লা, আহম ও মহমদ এই তিনকেই ত্রিধ বা তিনে এবং একে তিন বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদিগের ত্রিধ ত্রিধর নামে অভিহিত। ত্রিধর বুদ্ধ, ধর্ম ও সম্ম এই তিনের সমবায়ে সংরচিত। হলও দেশের ত্রিধ বেলস্ (Belus), ভেনস্ (Venus) ও টেমজ (Tamuz) নামক ত্রিধেব। ফিনিসীয়-গণ চেমথ্ (Chemoth), মিলেম্ (Mileon) ও আস্টারোথ্ (Astaroth) নাম দেবত্বদ্বয়কেই সকলের প্রধান স্তবতার ত্রিধ বলিয়া পূজা করিতেন। এইরূপ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতিই আপন

আপন ধর্মশাস্ত্রে ত্রিবেদ মহত কীর্তন
করিয়াছেন।

হিন্দু জাতির জিম্মির ভাষ্য দেবদেবী ও অপরূপ বিষয়েও যেমন জিন্ধখ্যার শাস্ত্র বা যন্ত্রি সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়, অত্যা জাতির মধ্যেও সেইরূপ দেখা গিয়া থাকে। গ্রীক ও রোমান জাতির ভাষ্য-দেবতা তিনজন। যথা—ক্লোথো (Clotho) ল্যাকেসিস্ (Lachesis) এবং অট্রোপস্ (Atropos)। ক্লোথো জন্মের অধিষ্ঠাত্রী। নিম্ন হস্তে পেশধরুণের দ্বারা তিনি যে জীবন-কার্পাস পেশ করেন, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী ল্যাকেসিস্ সেই পিষিত কার্পাসের দ্বারা জীবন-সূত্র রচনা করেন, আর মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী অট্রোপস্ সেই সূত্র ছিন্ন করিয়া থাকেন। ইহারা কার্যতঃ স্বর্গ, স্থিতি ও লয় এই ত্রিকার্যের পরিচালিকা। হস্তরা জিম্মির, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেরই অরূপ গুণসম্পন্ন। গ্রীক জাতির ক্লোথ বা প্রতিহিংসার দেবতাও তিনজন। তাহারা টিসিফোন (Tisiphone), আলেক্টো (Alecto) এবং মেগিরা (Megera) নামে কথিত। ককণার অধিষ্ঠাত্রী বা ক্লপাদেবীর সংখ্যাও তিন। কিছু তাত্রীরা পরম্পর আলিঙ্গিতভাবে একত্র একাসনে উপবিষ্ট। সেই সম্মিলিত দেবী-ত্রয়েখনাম অগ্লিয়া (Aglia), থেলিয়া (Thalia) এবং ইউফোরসিনি (Euphorosyne)। পৃষ্ঠাধাবলম্বীরা ইহাধিগকে যথাক্রমে বিশ্বাস, আশা ও বদান্ততা নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন। গুণদ্বন্দ্ব যে প্রধানতম রহস্য (mystery) বিদ্যমান, তাহাও ত্রিবিধ, ব্রহ্মা—ত্রি (Trinity) এবং প্রাপ (the Original Sin) এবং অবতারণা (the Incarnation)। গুণানদিগের একত

পর্বাঙ্কের নাম "তিন রাজার দিন" (three Kings' Day or Epiphany)। বৃহৎখন্দ-প্রবর্তক মহাশয় যীশু যখন শিশু, তিনের চতুর্ভুজ অর্থাৎ ষাটদশ দিবস মাত্র যখন ঊঁহার বয়স্কম, তখন প্রাচ্যের তিন প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ নরপতি, কাকাপার, মেলুচির ও স্লেথেনের, ঊঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই তিন রাজার আগমন স্বরণার্থেই "তিন রাজার দিন" পর্বাঙ্কের অমুষ্ঠান। মহত্ব জ্ঞাতির যে পতি, স্বহৃৎ বা চুখ নির্ভরিত হয়, মূল্যমান জ্ঞাতি তাহাকে 'তালেবল' নামে অভিহিত করেন। ঊঁহাদের মতে সেই তালেবলও তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—তালেবল মজল্লা, তালেবল জম্মাও তালেবল ভেতুও। এই তালেবলবৎ হয় হিন্দুর আধ্যাত্মিক, আর্দৈবিক ও আর্জিতিক তাগেই অধুস্তুপ বা নামাস্তর মাত্র। হিন্দুজ্ঞাতির 'জিস্তা' শপথের সহিত, মূলমানের 'তালাক' এবং নরওয়ে বংশের 'ত্রি-অঙ্গুলি' শপথের অনেক সৌমাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর শপথকালে তিনবার 'ত্য' করিয়া বলিতেছি' বাকের ব্যবহার করেন, কিন্তু মূলমানের বিবাহবন্ধন ছেদন বা স্ত্রী পরিত্যাগ কালে, স্ত্রীকে সন্ধানন করিয়া, 'আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম' এই বাক্য বার-ত্ৰয় উচ্চারণ করেন, আর নরওয়েবাসীরা শপথগ্রন্থকালে, 'অদৃষ্ট, তর্জনী ও মধ্যমা এই ত্রি-অঙ্গুলি প্রদর্শন বা উর্দ্ধে উপিত করিয়া থাকেন। বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের অষ্টমক দেবতার নাম 'স্বাদ্যগুহ'। ইহার তিন ঘোড়া হাত ও তিনটা মস্তক। জৈনদিগের একদশ ও দেবী যথাক্রমে 'জিম্ভুপ' ও 'জিম্ভা' নামে অভিহিত। বলা বাহুল্য উভয়েরই মস্তকও নথ্য। তিন স্বপ্নের নিউজিও দ্বীপের অসভ্য ও সরাসরি

१७२०

মেয়রী (Maori) জাতি ও রিমে বিশ্বাসী। তাহারা প্রধান বলিয়া যে দেবতার অর্চনা করে তাহারা নাম 'মাওই-রাঙ্গা-রাঙ্গুই' (Maoui-Ranga-Rangui)। মেয়রী ভাষায় 'মাওই, রাঙ্গা ও রাঙ্গুই এই তিন শব্দের অর্থ যথাক্রমে পিতা, পুত্র ও পক্ষী'। সুতরাং মেয়রী দেব পিতা পুত্র ও পক্ষী এই তিনের মিলনে সংগঠিত, আর তত্ত্বজ্ঞা হিমেধারা।

ধর্মশাস্ত্রের দ্বায় স্বভাবশাস্ত্রেও, এই পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতেও তিনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সমগ্রের সমস্ত পদার্থই কালের অধীন। কালেই জগতের উৎপত্তি, কালেই দ্বিতি ও কালেই লয়। এই কালও তিন অংশে বিভক্ত, যথা—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। বিজ্ঞানি কালের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম অণুরাক। অণুরাকও তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—দিবা, রাত্রি ও মধ্যা। দিবাভাগ আবার প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, ও সায়াহ্ন এই তিন অংশে এবং রাত্রিও যাম-ত্রেয় পৃথকীকৃত। শুবীঘীতে যত বিদ্যমান পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার প্রত্যেকটাই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন—প্রথম বা ব্যাব্যবস্থ, মধ্যম বা যৌবনাবস্থা এবং তৃতীয় বা বৃদ্ধাবস্থা। সকল পদার্থেরই আদি, মধ্যম ও অন্ত এই তিন অংশ বর্তমান। শারীরিক হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি অঙ্গদ্বারে সমগ্র জীব-সমাজও উক্ত অবস্থাদির বশতায়। ত্রিবিধ দশাযুক্ত জীব-সমাজ আবার গঠন, উপাদান, লিঙ্গ, বৃত্তি ও বাসস্থান প্রভৃতি ভেদে যথাক্রমে যক্ষ, মাংস ও অস্থি; শরীর, প্রাণ ও আত্মা; পুং, স্ত্রী ও নপুংসক; ঔর্য, স্ত্রী, স্তম্ভ ও স্বপ্ন এবং হলদর, জলচর ও উভচর প্রভৃতি তিন তিন ভাগে পৃথকীকৃত। মানবজাতির মনে সমগ্র

ও কাৰ্যবিশেষে যে মন্তব্য বা গাৰ্হের আবি
র্ভাব হয়, তাহার মূল তিনটা, যথা—ধন, বিষয়
ও আভিজাত্য। পৃথিবীতে ইত প্রকারের বস্তু
বা রং দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল
তিনটির অধিক নহে। সেই তিনটা মূল
বর্ণের নাম নীল, পীত ও লোহিত। এই ব
র্ণের পৰস্পর সংমিশ্রণে হইতাতদি প্ৰসুৰবর্ণের
সৃষ্টি হইয়াছে। রামধন সৰ্ববর্ণের একমাত্র
আধার হইলেও, উহাতে ত্ৰিবর্ণের,—নীল,
পীত ও লোহিতেই—অধিক প্রভাব পৰি
লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর গঠন ও তিন
মূল পদার্থে নিপন্ন। সেই পদার্থ তিনটাই নাম
জ্ঞাস্তব, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ অথবা বায়ু, জল ও
মৃত্তিকা। যৎসারে যত প্রকারের কটু, কাষায়
ও মিষ্ট ভ্ৰব্য বিধানমান, সমস্তই ওণ ও
প্রয়োজন অহসকর, তিন তিনটা প্রধান ভাগে
বিভক্ত। কটু যথা—শুঠ, পিপুল ও মরিচ;
কাষায় যথা—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া
এবং মিষ্ট যথা—মৃত, মধু ও পৰ্ককা। মানব
দেহে নাড়ীর সংখ্যা সাত্ত্বিকোক্তি হইলেও
প্রধান নাড়ী তিনটির অধিক নহে। সেই
নাড়ীত্ৰয়—স্ট্ৰীড়া, পিঙ্গলা ও হৃয়দ্রা নামে
পরিচিত। মানবজাতিকে সমাজ বন্ধ হইয়া
বাস করিতে হইলে বাশ বা গোষ্ঠী বন্ধ হইয়া
অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। সেই বংশ
বা গোষ্ঠীর সাধারণ নাম কুল। কুলও
ত্রিবিধ; যথা—পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুর-
কুল। এইরূপ সকল জাতির সমস্ত পদার্থে,
সমগ্র মহাব্ধা সম্ভাৰ্যের-সৰ্ববিধ আচাৰ-
ব্যবহারে এবং প্রাকৃতিক জগতের সৰ্বত্রই
তিনের প্রাধিক্য পরিষ্কৃতরূপে প্রকাশমান।
তিনে ব্যাতি অপরা কোন স্থাধার ভাগেই
ঈদৃশ প্রাধিক্য, অথবা বিস্বজনীন গৌরব বা
সম্মান লাভ সম্ভবপর হয় নাই। হস্তযা

পাচ, নয়, বার, আঠার বা চৌরাশ কোনও সংখ্যাই সেই উদ্ভিষ্ট বিশেষ সংখ্যা নহে। তিনই সেই সংখ্যা, আর তৎসংখ্যাই ইহার জাত-দক্ষ-নির্দেশে একগুণ সমাদর বা প্রসার-প্রাপ্তি।

ত্রিসংখ্যার এই বিশেষত্ব ইহার দ্বি, ত্রি গুণিত অর্থাৎ ছয় ও নয় সংখ্যাতোও প্রায় তুল্যরূপেই পরিণমিত হইয়া থাকে। চতুঃ, পঞ্চ গুণিত অর্থাৎ বার, পনের প্রভৃতি সংখ্যাতোও যে লক্ষিত হয় না, এমন নহে। তবে তাহার পরিমাণ ছয় ও নয় হইতে বহু-অংশেই নুন। এই জন্ম এবং অন্ম-আরও অনেক কারণ দশতঃ, ছয় ও নয় ব্যতীত,

বার ও পনের প্রভৃতি সংখ্যা ত্রিঘের বহিষ্কৃত, আর তিন প্রকৃত ত্রিঘস্বত্ব এক বচন, ছয় দ্বিঘত বা দ্বিঘিষ্মত্বত্বক বহুবচন এবং নয় ত্রিঘত বা ত্রিঘের ত্রিঘ অর্থাৎ বহুবচন রূপে পরিণমিত। কিন্তু তিনের প্রাধান্য প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, ইহার দ্বি ও বহুবচন সম্বন্ধে আলোচনা করা আমরা তত প্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ করিলাম না। এক্ষতঃ, ছয় ও নয় সংখ্যার আলোচনা বিভীষ্ম সংখ্যাতোও যে লক্ষিত হয় না, এমন নহে। প্রত্যবের বিঘীভূত রাখিয়া, এই স্থলেই আমরা তিন প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

অমলিত্রি।

শ্রীঅদ্যোদয়নাথ বসু কবিশেষণ।

স্থপূর

বীরভূম হেতুমপুরের বিদ্যোৎসাহী কুমার মহিমামিরজন্ম চক্রবর্তী বাহাদুর বহুদিন যাবৎ 'বীরভূম ইতিহাসের' উপাদান-সংগ্রহকার্যে রতী আছেন। উঠাম নং ও সন্ন্যাসে প্রশসনীয়। 'গৃহস্থের ভাঙ্গ সংখ্যায় সম্প্রতি তাঁহার এই মহতী উদ্ভবের ফল-বরুণ 'স্থপূর'-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'স্থপূর' বীরভূমের অন্তর্গত একখানি গ্রামের নাম। প্রবন্ধটি তাহারই প্রাচীন ইতিবৃত্ত-সংগ্রহ। প্রবান-প্রসঙ্গই ইহার মূলভিত্তি। প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্য বদিও নাই, কিন্তু আলোচনার গতি ও প্রবান-সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা কহিতে গেলে তবুও অশোভন হইবে না বলিয়া মনে হয়, আশা করি কুমার বাহাদুরের অবধান করিবেন।

কিঞ্চনতীসমূহের আলোচনায় যে সতর্ক-দৃষ্টি প্রয়োজনীয়, 'স্থপূর' প্রবন্ধে তাহা যথার্থ

ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রায়ই স্মৃতিতে পাওঘা যায় যে, যে স্থানেই কোনো প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ বর্তমান আছেন (অবশ্য পরীগ্রামেরও মধ্যে) সেই স্থানেই পূর্বে 'বেনা-বন' ছিল। এবং যে কোনো একজন গৃহস্থের 'কপিলা গাভী' প্রতিদিন সেই বেনা-বনে ছদ্ম ঢালিত, গৃহস্থানী গাভীর দ্বন্দ্ব-প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া অস্থূলদ্বানে সেই বিষয় জানিতে পারেন, ও জোখাঞ্চ হইয়া বা থগ্নাদিষ্ট হইয়া বেনা-বন বনন করেন। মহাদেবের আবির্ভাব এইরূপেই সংঘটিত হয়। বেনা-বন-খননকারী কোথাও বা রক্ত বমন করিতে করিতে মৃত্যুসুপে পতিত হইয়াছে, কোথাও বা শিশু-লোককে প্রাপ্ত হইয়া অস্থূল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। কোথাও আর কিছু ইত্যাদি। গল্পটি একবারে অমূলক না-ও হইতে পারে,

তারকেশ্বরের মত ক্ষেত্রে হয়তো ঐরূপ ঘটনা থাকিবে, আর বলাই বাহুল্য যে প্রাচীন স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়াই ঐরূপ প্রবাদের এক আদর ও সর্বত্র প্রযোজিত হইবার এতই বহুলতা। এইরূপ যে কোনো স্থানে যে কোনো সময়েই হউক কোনো আত্যাচারী কর্তৃক দেবমূর্তি নিপুতীত হইয়াছে, 'কপিলাগাভী'ই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। দৃষ্টান্ত অনেক।

সম্প্রতি বীরভূমে আবার এক উপদর্গ ছটিয়াছে যে, পূর্বকালে দুইজন সাধকের পরস্পর বন্ধুত্ব ছিল, তাহার একজন প্রাচীর চালাইতেন, একজন বায়ু চালাইতেন ইত্যাদি। মূল কথা এই যাহা—

বীরভূম 'খুশীকুড়ি গ্রামে সাহ আবছুরা নামে একজন বৃদ্ধক ফকীর বাস করিতেন, এ প্রদেশে তিনি বহু বিখ্যাত। দেশবিদেশস্থ বহু মুসলমান শিষ্য ও নিকটবর্তী গ্রাম-সমূহের নিকর জমিদারী-পদ তাহার বহু-গুণাধিত চরিত্রের দাব্য প্রদান করিতেন। খুশীকুড়ির নিকটেই 'মঙ্গলডিহ' নামে আর একখানি গ্রাম। কিঞ্চিদধিক সাদৃশিত বৎসর পূর্বে মঙ্গলডিহেতে শ্রীপার্বীগোপাল ঠাকুর নামে এক সাধক বৈষ্ণব বাস করিতেন। ইহার বিবরণ সম্প্রতি 'বীরভূম'র আঘাত সংখ্যায় 'প্রাচীন মঙ্গলডিহ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত উল্লেখ করিয়াছি। খুশীকুড়ির বর্তমান জমিদার 'হজরৎ মোলানা সৈয়দসাহ মহম্মদ হোসেন' সাহ আবছুরার বংশধর। তিনি ও মঙ্গলডিহের বর্তমান ঠাকুরগণ এবং আরো আরো অনেকেই কহিয়া থাকেন যে, 'পার্বীগোপাল ঠাকুর' ও 'ফকীর সাহ আবছুরা' সমসাময়িক, পরস্পর বন্ধুত্ব প্রবন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়ে যে এক

সময়ের তাহার প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত অনেক আছে। উক্ত পার্বীগোপাল ঠাকুর ও ফকীর সাহ আবছুরা সম্বন্ধে প্রবাহ যে 'ঠাকুর একদিন বায়ু চড়িয়া খুশীকুড়ি আসিতেছিলেন, ফকীর তখন একটা প্রাচীরে বসিয়া দক্ষ ধাবন করিতেছিলেন। ঠাকুরকে আসিতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি প্রাচীরটা চালাইয়া একটা পুষ্করিণীর সন্নিহিত হন এবং দক্ষ-ধাবন কাঞ্চিকাটি মাটিতে পুতিয়া হস্তমুগ-প্রক্ষালন করেন। পরে আরো অগ্রগমন পূর্বক ঠাকুরের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসেন। 'দাঁতন কাঠার গাছ' বলিয়া একটা অল্পত তেঁতুলগুপ্ত আশ্রিত খুশীকুড়িতে বর্তমান আছে। ফকীরের সৎসংগতি পুষ্করিণীর 'গাং গড়ে' 'গদা গড়ে' নাম আশ্রিত ঠাকুরের সহ বন্ধুত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। মঙ্গলডিহে ঠাকুর বংশের শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর বিরাটত প্রায় দেশভৃত বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীশ্রী-চন্দ্রোদয় নাটকে' গ্রন্থের নান্দী বরুণ এই সুসুভ শ্লোক দুইটি লিখিত আছে।

'মন্দিরে বসিতে বস্তু শ্রামহম্মদরবগ্রহ পর্ববিক্রম-অর্থদান পূজা যেন কৃত পুরা, 'যবনাসুর রক্তং পুষ্প ব্যাঘ্রো মঙ্গলপ্রদায়কং' ইত্যাদি পার্বীগোপাল ক্রিয়তে পুস্তকং ময়।' প্রবাদ সাহ আবছুরার হোত্রিত 'পান' পার্বীগোপাল বাহাদুর পুষ্পে পরিণত করিয়া ছিলেন। ফকীর ও ঠাকুর একসঙ্গে বাসিলে আসন তৎক্ষণাৎ বিধা বিভক্ত হইয়া যাইত ইত্যাদি।

খুশীকুড়ির বর্তমান জমিদার মহাশয় বলেন যে 'হজরৎ সাহ আবছুরা' ধ্বংস ছিলেন না, বা একশত সত্তর বৎসর পূর্বে আমাদের বংশে ধ্বংস কেবল বৃদ্ধক ছিলেন না। একগুপ্তে প্রবন্ধে বিশেষ প্রমাণদান না করিয়াই সাড়ে

তিন শত বৎসরের ঘটনা এক শত সত্তর বৎসরে টানিয়া আনা বা আনিম টান গোষ্ঠারীর সঙ্গে ফকীরের প্রবাস ভড়িত করা বিশেষ সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু কুমার বাহাদুর 'বীরভূমি' পাঠ করিয়া থাকেন।

স্বপ্নের সম্বন্ধে আরো একটা কথা স্বপ্নের কথা টানিয়া বুনিয়া দেবী মাগায়া চণ্ডীর "ততো স্বপ্নময়ামাতো নিব্রদেশপিপোহভবৎ।" শ্লোকটী হইতে 'স্বপ্নের' অপভ্রংশে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এটা অত্যন্ত চলেছিল হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মহামাহোপাখ্যায় নাগোজী ভট্টরূপে অতি প্রাচীন ও শ্রীমদ গোপাল চক্রবর্তী রূপে 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামী অতি প্রসিদ্ধ টীকা বর্তমান। বিস্তৃতনামা পণ্ডিতবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ও সম্ভ্রান্তি 'দেবীভাষ্য' নামে চণ্ডীর এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। 'স্বপ্নবানী' প্রকাশিত সংস্করণে চণ্ডীর এই তিনটি টীকা ও ভাষ্য বর্তমান আছে। বিশদ বঙ্গভাষ্যও আছে। কিন্তু সমগ্র চণ্ডী অমূল্যদান করিয়াও আবার 'স্বপ্ন' মানে যে রাজধানীর নাম' এরূপ অর্থ বুঝিয়া পাইলাম না, প্রাচীন তীর্থ-সমূহের ভৌগোলিক সংস্থান পুরাণে ব্যাখ্যাত রূপেই বর্ণিত আছে। 'স্বপ্ন' স্বপ্ন হইলে নাগোজী ভট্ট বা গোপাল চক্রবর্তী কি তর্করত্ন মহাশয়ও অবশ্যই তাহা অবগত হইতেন এবং উল্লেখ করিতেও ভুলিতেন না। 'স্বরথের' শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে কি? লক্ষবলির বা বলি-

পুরের কথাও চণ্ডীতে নাই। চণ্ডীতে আছে সমাধি ও স্বরথ—

'নিরাহারো যতাহারো তন্নরকো সমাহিতো দরভূতো বলিঃ চৈব নিরুপায়াশ্চক্ৰবর্তী'।
বলা অনাবশ্যক যে প্রবাদের সঙ্গে করুন মিথিয়াই ঠাকুরদার কাহিনীর সৃষ্টি ইতিহাস নহে, কেবলমাত্র স্বরথের শিব ও বলিপূর্বের নৈকট্য দেখিয়া স্বপ্নরূপে স্বপ্নের অমূল্য উদ্ভাবনী শক্তির সার্থকতা হয় না। 'মেঘনাস্তব' ডুমরাবন হইবে কেন, পুরাণে তদ্বিদ্বেষ প্রসঙ্গে

'কর্ণকলী সয়ারভা দক্ষিণ সাগরং যযৌ।'
ইত্যাদি রূপ বচন লিখিত আছে। 'কথা এই যে প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে' হইলে 'বরেন্দ্র-অমূল্যদান-সমিতির' মত সমবেত উদ্যোগের প্রয়োজন। একনিষ্ঠ অমূল্যদান, অজস্র অর্থব্যয় ও অস্বাস্থ্য পরিশ্রমের প্রয়োজন। দীপ্যাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারের মত মহাহুতব পৃষ্ঠপোষক চাই, স্থবিজ্ঞ হৃদী অক্ষয়কুমারের মত 'গুরু ও ঐতিহাসিক সমা-প্রসাদের মত সাদর' চাই, অক্ষয়্যার বীরভূমের ইতিহাস আশ্রয়ন হইতে গজাইবে না। হেতুমূলের কুমার বাহাদুরের 'বীরভূম রাজবংশ' ও বারেন্দ্র-অমূল্যদান-সমিতির 'গৌড়ীজমালা' পাঠ করিলেই এ কথাগুলি যথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা হয় কুমার বাহাদুর বীরভূম 'বারেন্দ্র-অমূল্যদান-সমিতি'র মত একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করুন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ নুথোপাধ্যায়।

সহজসাধ্য চিকিৎসা-প্রণালী

চিকিৎসা-শাস্ত্রে হুবিজ ডাক্তার-কবিরাজ-গণকে যে সকল দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিতে অনেক সময় বিশেষ বেগ পাইতে হয়, এবং অনেক স্থলে তাঁহারাও অসুখসমূহ হ'ন এই সকল রোগের অভ্যাস্য ঔষধসমূহ আমাদের বুদ্ধ পিতামহ ও পিতামহীরা অবগত আছেন। এই সকল ঔষধের উপকরণ সংগ্রহ, ও প্রস্তুত-প্রণালী, একটু অসুবিধাজনক এবং ইহাদের প্রয়োগ-প্রণালী একটু 'পাণ্ডা' ধরণের বলিয়া বর্তমান সময়ে ইহাদের আর একেবারে কমিয়া গিয়াছে। এখন কেহ আর এই সকল ঔষধ ও মুষ্টি-যোগাদি শিখিয়া রাখে না; হস্তরাং অনেক অমোঘ ঔষধ ও মুষ্টিযোগ একেবারে লোপ পাইয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শীঘ্রই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সঙ্গে স্বেই অস্তহিত হইবে। অজ্ঞাত ঔষধ হইতে এই গ্রাম্য ঔষধ ও মুষ্টিযোগাদি অনেকটা সুবিধাজনক। প্রথমতঃ এইগুলি উগ্র, বিষাক্ত বা পারদমিশ্রিত নহে, তাই ইহাদের প্রয়োগে রোগোপশমনের পরিবর্তে রোগের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন সম্ভাবনা নাই; দ্বিতীয়তঃ এইগুলি সহজপ্রাণী (অল্প সহরবানীদের পক্ষে নাও হইতে পারে), আর তৃতীয়তঃ এই সকল ঔষধের উপকরণ-সংগ্রহার্থে পয়সা-খরচ বড় করিতে হয় না। এই সকল হুবিজার কথা ভাবিয়াই আমি এই সকল ঔষধ ও মুষ্টিযোগ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার এরূপ চেষ্টা দেখিয়া এই সভা ও বৈজ্ঞানিক যুগের অনেকে উপহাসও করিতে পারেন; তাঁহারা বলিতে পারেন—চাঁব পয়সা খরচ

করিলেই যখন একদাগ ঔষধ পাওয়া যায়, তখন এই সকল 'পাণ্ডা' ঔষধের উপকরণ-সংগ্রহের যত্ন চেষ্টা কেন? আমার উত্তর এই যে, পল্লীগাম্যে সকল সময় 'পয়সা খরচ' করিলেও কবিরাজী বা ডাক্তারী ঔষধ না পাওয়া যাইতেও পারে; আর কোন কোন পীড়ায় কবিরাজী-ডাক্তারী ঔষধ অপেক্ষা এই সকল মুষ্টিযোগই স্বল্প ও সমধিক ফলোপ-দায়ক; তা' ছাড়া উগ্রবীর্য বা পারদমিশ্রিত ঔষধ সেবন করিয়া শরীর নষ্ট করা অপেক্ষা সহজপ্রাণী ও নির্দোষ ঔষধ সেবনই শতগুণে ভাল। ভরণ (মতকের প্রলেপ) প্রভৃতির ব্যবহার শিক্ষিত ভ্রূলোকদের মধ্যে বড় নাই, তবে দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে এই সকল মুষ্টিযোগ শিখাইয়া দিলে তাহাদের অনেক উপকার হইতে পারে। শ্রীলোকদের হৃত্তিকা ও গাম্বিক সখদ্বী পীড়ায় এই সকল ভরণই সমধিক ফলদায়ক; সেই প্রভৃতি পল্লীগাম্যের শ্রীলোকদিগকে এই সকল রোগের যন্ত্রণা বড় ভোগ করিতে দেখা যায় না।

প্রত্যেক পল্লীগাম্যের লোকের এইরূপ অনেককেই মুষ্টিযোগ ও ভরণাদির বিষয় অবগত আছে; ইহাদের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া কেহ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিলে অনেক লোকের উপকার হইতে পারে। আমি কয়েকটি মাত্র মুষ্টিযোগ ও ভরণের কথা এইবার নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আমার সমুদ্রে পরীক্ষিত হইয়াছে; অবশিষ্টগুলির উপকারিতার বিষয় আমি বিশেষ বিখণ্ড লোকের নিকট অবগত হইয়াছি। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে আমাকে

কয়েকটা ভেষজের নাম ব্যবহার করিতে হইয়াছে; তবে যথাসাধ্য ভেষজগুলির পরিচয়ও দিয়াছি। তদব্যতীত 'ভরণ' মন্তকের প্রলেপার্থে ও 'আধখানি মাথা বিয়' অর্দ্ধাভ্যন্তার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হামের প্রতিকার

১। গায়ে হাম হইলে, তৃতীয় দিবসে, উদ্ভল শীতল জল মিশাইয়া রোগীর গা ধোওয়াইয়া দিতে হইবে। পরে মেথিসহ হসুদের রসে, সেইচার (একপ্রকার শাক) হসে ভারিত তৈল ঠাণ্ডা করিয়া গায়ে মাখাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে তুলসীর মঞ্জরী, বেলপাতার কুড়ি (নবজাত বিষণ্ণ), পিন্নলী ১টা, জায়ফল ১টা এবং আলা একত্র করিয়া পিষিয়া একটু গরম করিয়া রোগীর মাথায় ভরণ দিতে হয়। সন্ধ্যাকালে আবার ইহা মাখা হইতে রাখিয়া দিতে হয়। তার পরদিনও ঠিক সেই ভরণই একটু জল বিয়া পিষিয়া মাথায় দিতে হয়। তার পরদিনও ঠিক এইভাবে দিতে হয়। ইহাতে হাম (শ্রীহটে পেচমা, ফেমা) শীঘ্রই সারিয়া যায়। তবে সান্নিদের প্রভাব লক্ষিত হইলে শেষের দুইদিবস কেবল শীতল জলে রোগীর শরীর ধৌত করিতে হয়।

হাম যুব বৈশী হইলে উপরিলিখিত মুষ্টি-যোগে একেবারে না সারিতেও পারে; এরূপ অবস্থায় আমের শাঁস, খৈকল (আমবেতস) ও সাতকরার (একপ্রকার জামির) শুষ্টি, এবং আলা একত্র পিষিয়া ক্রমান্বয়ে দুই দিন মাথায় ভরণ দিতে হইবে। পরের দিন ঠিক সেই ভরণই একটু তৈল মিশাইয়া মাথায় দিতে হইবে। এবং তৎপর দিবস শরৎ বা ভারিত তৈল রোগীর মাথায় মাখাইয়া দিয়া, পরে

আবার সেই ভরণ মাথায় দিলে রোগী নিশ্চই আরোগ্যলাভ করিবে; ইহাতে সন্দেহ নাই।

(পরীক্ষিত)

২। জ্বর একটু কমিয়া আসিলে যদি রোগীর মাথা ভার ভার বলিয়া মনে হয়, বেদনা করে, মুখে শ্বাস না থাকায় কিছু থাইতে না পারে অথবা যদি জ্বর কুপ্থা করা হয়, তবে নিরলিখিত ভরণ নিয়মত ব্যবহার করিলে এই সমস্ত শোষণ সারিয়া যাইবে। জরিপাতা (কিষ্টির পাতা), পিন্নলীর পাতা, ও আলা পিষিয়া একটু ভরণ তৈয়ার করিতে হয়। তৃতীয় দিন আশ্বারের পাতা, আফ্রো আমগাছের ছাল, আফ্রো আমড়া গাছের ছাল, বড়পেনা (পানী) আলা ও জায়ফল একটি একত্র পিষিয়া মুখ ধোওয়ার পর বা শ্বাসের পর ঈষদ্রব্য করিয়া মাথায় দিতে হয়। সন্ধ্যাসময়ে আবার ঘুলিয়া রাখিবে। তৎপর দিন আবার পূর্বোক্ত সময়ে ঠিক সেই প্রলেপই ঈষদ্রব্য করিয়া মাথায় দিতে হয়। তার পরদিনও ঐরূপ ভাবে ভরণটি ব্যবহার করিলে নিশ্চই রোগীর কুপ্থার দোষ, মুখের শ্বাসবিহীনতা কাটিয়া যাইবে।

(পরীক্ষিত)

৩। (ক) বায়ুর আধিক্যবশতঃ স্রীলোকদের মাথা কামড়াইলে, মাথা কনকন করিলে অথবা ঘাড় বেদনা করিলে, কদম ফুলের কচিকচি পাতা কয়েকটা, শামুকের ভিতরের নরম নাজীকুড়ি প্রস্তুতি এবং কয়েকটা লবণ

একত্র করিয়া পিষিয়া মাথায় ভরণ দিলে, মাথাকামড়ান প্রস্তুতি নিবারিত হয়।

(পরীক্ষিত)

(খ) স্পন্দবায়ুর পাতা (অশ্বখ-বটের পাতার মত পাতা) আদাসহ বাঁটিয়া মাথায় ভরণ দিলেও পূর্বোক্ত মাথা কামড়ান প্রস্তুতি নিবারিত হয়।

৪। কৃহকি ফুলিলে বন-কাউকরার পাতা (ইহার গাছ ছোট ছোট লতার মত, ফলও খুব ছোট, পাকিলে কাল হইয়া যায়, ইহা হইতে তখন বনুয়া কালী প্রস্তুত হইতে পারে) আদাসহ পিষিয়া খুব গরম করিয়া কুচুকেতে লাগাইয়া দিলে, ফুলা যাইবে। ত্রণ শুনে লাগাইলে, উগা মিলাইয়া যাইবে। বেদনামুক্ত হানে লাগাইলে বেদনা দূরীভূত হইবে।

৫। (ক) শরীরের কোথাও গরল নামীয় চর্মরোগ হইলে, খট পোড়ার পাতা (ইহার গাছ ছোট ছোট, ফল পাকিলে কাল হইয়া যায়, তখন থাইতে মিষ্ট লাগে) আদার সহিত একত্র বাঁটিয়া ঈষদ্রব্য করিয়া গরলাক্ত হানে লাগাইয়া দিলে গরল রোগ সারিয়া যায়।

(পরীক্ষিত)

(খ) গরল পাতা (পাখাভলী বা পাখা-চুগা) আদার সহিত বাঁটিয়া ঈষদ্রব্য করিয়া গরলাক্ত হানে লাগাইয়া দিলেও গরল-রোগ যায়। (আমি নিজে পরীক্ষা করিয়াছি।)

৬। পনোয়ারীর পাতা আদার সহিত পিষিয়া পাকা ত্রণে লাগাইলে, ৪ রঙের মধ্যে ত্রণ নিকটই ফাটিয়া যাইবে। (পরীক্ষিত)

৭। (ক) স্রীলোকদের প্রদর রোগ হইলে, আপানের পাতা, ভালিমের কচিপাতা—এই সকল একত্র করিয়া নিরামিষ ঝোল রাখিয়া থাইলে উক্ত পীড়ার উপশম হয়। (পরীক্ষিত)

(খ) কেউন্ডের (ইহার গাছ মূল্যবান, ফল গোলাপের ফলের মত, কিন্তু একটু বড়, এই ফলের কষ দিয়া নোকায়ে রস করা হয়, ইহাতে নোকা মধু হইবে ও নোকায়ে ময়লা সহজে ধরে না) কাঁচা ফল কাটিয়া আণ্ডা-দুধে (যে দুধ জ্বাল দেওয়া হয় নাই) ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ইহার কষে দুধ কাল হইয়া গেলে ঐ দুধ পান করিবে। ইহাতেও পূর্বোক্ত পীড়ার উপশম হয়।

(পরীক্ষিত)

(গ) ভূত পালঙের শিকড় সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া, সাপাইবিকণের বহুসহ একত্র চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ সকালে আধপোয়া পরিমাণ এই চূর্ণ খাইলে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে। (পরীক্ষিত)

৮। জলজ ছুইতে-মরার পাতার রস আধ পোয়া, ঘলঘলিয়ার (স্রোণপুষ্পের) পাতার রস এক ছোটকা, কাঁচা দুধ আধ পোয়া একত্র মিশাইয়া পান করিতে হয়। তাহার পর ছুইতে-মরার পাতার রস গোলাঘরিত বগদা-সহ ঝোল রাখিয়া ৩৪ বার খাইলে শক্ত আমাশয়-রোগও ২৩ দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইয়া যায়। (পরীক্ষিত)

জলজ ছুইতে-মরার ছালের ভিতরের নরম অংশটুকুর রস আধ পোয়া, কাঁচা দুধ আধ পোয়া সহ প্রত্যহ সকালে আহারের পূর্বে পান করিয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে দুরারোগ্য প্রমেহ রোগী আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়াছি। (পরীক্ষিত)

১০। (ক) গোকুল ফুলের বীজের শাঁস উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বাংলা পানের ডাঁটা দ্বারা নশ লইতে হয়। তার পর নাশারস্তু দিয়া জল আসিলে, নশ লওয়া বন্ধ করিতে হয়। তৎপর জলপড়া বন্ধ হইলে আবার নশ

নাইতে হয়। এইরূপ করিলে নশারক্ষম্বয় দিয়া অবশেষে দ্বিতীয় বস্তু পর্য্যন্ত আসিবে। যখন রক্তপঙ্কা বদ্ধ হইবে তখন আধখানিমাখা বেদনাও দূরীভূত হইবে। আর কখনও একরূপ মাখা বেদনায় ধরিবে না। (পরীক্ষিত-
(খ) জায়কল ১টা, কর্পূর ৫, লম্বা তেল-কুটার পাতা ৫১০টা একত্র পিষিয়া ভরণ তৈয়ার করিবেন। যাহার মাখা বাখা, তাহার তালু হইতে চুল ফেলিয়া দিবেন, তারপর হান করিবেন (পূর্বে হান করা হইয়া গেলে তখন কেবল শীতল জলধারা মাখা হুইলেই হইবে) তৎপরে কাকিয়ার (এক প্রকার মাছ) মুগের দার (দন্তহ্রদী কটকটলা) দ্বারা মাখা চুকাইয়া পূর্বোক্ত ভরণ শীতলাবদ্বায় ছোকান-স্থানে বসাইয়া দিবেন। যতদিন মাখা বেদনা থাকিবে ততদিন এই ভরণ ভুলিবেন না। এমন কি

যানকালেও তেলা উচিত নয়; যদিও কোন কারণে উঠিয়া যায় তবে আবার বসাইয়া দিতে হয়। মাখা বেদনা নিশেষে করিয়া তবে ভরণ উঠিবে।

১১। সারিকের প্রারম্ভাবশ্যতঃ বা এইরূপ অর্থাৎ কোন কারণে কামে কম অনিলে নিম্ন-লিখিত ভরণ দিতে হয়। জ্বী হরিতকী ১টা, মাসকলাই ৮১০টা, পত্রযুক্ত কেশপুং লতার অগ্রভাগ সহ একত্র শীতল জলধারা পিষিয়া সকালে ঠাণ্ডা জলে মাখা ধোয়ার পর মাখায় দিতে হয়। সন্ধ্যাকালে আবার মাখা হইতে নামাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপে পনের দিন সকালেও ত্রিক সেই ভরণই আবার ঠাণ্ডা জলে পিষিয়া দিতে হয়। এইরূপ ভাবে ক্রমাগত ৩ দিন দিলেই কম-স্তনার বোধ নিবারিত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ পাল।

সমুদ্রযাত্রা *

[এই প্রবন্ধে বর্তমান কালের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত মহাশয় যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা সর্বত্র সন্মানে গৃহীত না হইতেও পারে। আমরা হিন্দুর বিশেষ-গমন, বিশেষ, হিন্দুটোলা-স্থান, অথচ হিন্দু-শ্রী-প্রচারে সর্বত্র হিন্দু-আধারের প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণে নানারূপ আলোচনা করিয়াছি। বিশেষ-গামী এবং বিশেষ হইতে প্রত্যাহার ব্যক্তিগণের কর্তব্য, স্রীম-আধার ইত্যাদি সম্বন্ধেও নব প্রকাশ করিয়াছি। স্রীম-আধার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে কোন সৌকর্য্য বিশেষ-গমন সম্বন্ধে উৎসাহী নহি—অথচ আধুনিক যুগে বিশেষ-গমন, সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদির বিবরণও নহি। সে বাহা হউক, তৎকর্ত্ত মহাশয় হিন্দুগণের মনন করিয়া আধুনিক ভাবে যে সকল প্রাচীন ইতিহাসের তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা এইরূপ। অধিকত,

প্রাচীন ভারতে 'সমুদ্র-যাত্রা' যে প্রচলিত ছিল, সমুদ্র সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া হিন্দুগণ বাঙ্গলাদেশে নিম্নলিখিত কথিতেন, এই প্রবন্ধে আবার ভাবে তাহার মধ্যস্থ পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকর্ত্ত মহাশয়ের আলোচনায় বুঝা যায় প্রাচীন হিন্দুগণকে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, সমুদ্রযাত্রা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে সমুদ্র-যাত্রারকরা যে কর্তব্যই নির্ধারণ করন—ঐতিহাসিকগণ বৈশিষ্ট্যেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমুদ্র-যাত্রার বিশেষ প্রমাণই ছিল। এই ঐতিহাসিক-তথ্য-প্রচারের জটাই অধ্যাপক রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় সমুদ্র-যাত্রা ও নৌবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ। অধ্যাপক মহাশয় তৎকর্ত্ত মহাশয়ের আলোচনা হইতে কিছু নতুন প্রমাণ শাইবেন বিশেষ করিতেছি।]

এই মাসের 'গৃহস্থ' শ্রীমুক অক্ষয়চন্দ্র সরকার সমুদ্রযাত্রা লিখিয়াছেন। তাহাতে পূর্ণাঙ্গার শ্রীমুক পঞ্চানন তর্কর মহাশয়ের মন্তব্য কিঞ্চিৎ প্রতিবার আছে। আমরা তর্কর মহাশয়কে তাহা দেখাইয়াছিলাম।

আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি, সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে আপনার মত কি তাহা আমাকে বিস্তৃতরূপে উপদেশ দিন। আমি সেইমত 'ব্রাহ্মণসমাজে' প্রকাশ করিব।

তর্কর মহাশয় হাস্য করিয়া বলিলেন, চতুরতা প্রকাশ করিয়াছ বটে;—তা হউক, তুমি সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যাহা জানিতে চাও, তাহায়ে প্রশ্ন কর।

প্রশ্ন। বৃহদ্রথদ্বীয় পুরাণ বচনে যে সমুদ্র-যাত্রা স্বীকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কি মরণার্থ সমুদ্র-প্রবেশ, না সাধারণ সমুদ্রযাত্রা? অথবা সমুদ্রে ভ্রমণযাত্রা?

উত্তর—ঐ বিষয়ে প্রথমেই দুই মতই প্রসিদ্ধ। আর ঐক্যে পাঠভেদও আছে;—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "সমুদ্রযাত্রা স্বীকার" এই পাঠ ধরিয়াছেন, অন্তত "সমুদ্রযাত্রা স্বীকার" এই পাঠ আছে। দ্বিতীয় পাঠের অর্থ—যে ব্যক্তি সমুদ্রপথে যাত্রা করে—তাহাকে লইয়া বাহ্যের নিষিদ্ধ। প্রথম-পাঠে "স্বীকার" শব্দ নিরর্থক। তবে যদি "স্বীকার" অর্থে সঙ্গর্য্য ধরা যায়, তাহা হইলে নিরর্থক হয় না, কেননা—"সমুদ্রযাত্রা" এই শব্দটি তৃতীয়স্থানেও হইতে পারে, সমুদ্রযাত্রা শব্দের তৃতীয়ের একবচন—তৃতীয়া সহর্থে, তাহাতে দ্বিতীয় পাঠের সহিত এক অর্থই হয়। বলা বাহুল্য এ মতে সমুদ্রপথে যাত্রাই প্রতিকল্প হইয়াছে।

প্রশ্ন। সমুদ্রযাত্রা স্বীকার পক্ষে—মরণার্থ

সমুদ্র যাত্রা,—ইহা কোন গ্রন্থকারের মত এবং সে পক্ষে যুক্তি কি? সমুদ্রে ভ্রমণযাত্রা এ কথা যাহারা বলেন, তাহাদেরই বা যুক্তি কি?

উত্তর—তৃতীয়াকার কাশীয়ার বাচস্পতির মতে—সমুদ্রযাত্রা স্বীকার অর্থে—মরণার্থ জলপ্রবেশ। এই পক্ষের প্রধানযুক্তি "ইমানু ধর্মান" আছে। মরণার্থ সমুদ্রযাত্রা হইলে—তাহা মরণরূপে গণ্য হইতে পারে, বাম্বিগ্যাদির জ্ঞান সমুদ্রপথে যাত্রা হইলে তাহা মরণরূপে গণ্য হইতে পারে না। সমুদ্রে ভ্রমণযাত্রা নিম্নোক্ত পক্ষেও ইহাই যুক্তি।

প্রশ্ন। আপনার এ বিষয়ে মত কি? উত্তর। আমি এই যুক্তি সমীচীন মনে করি না; কেননা—দ্বিতীয়ের শুল্ককথা বিবাহ ধর্ম নহে, বরং তাহা পূর্বযুগেও অর্থ বন্দিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—
শ্রুতাদৌ পতত্যজ্ঞেয়তথ্যাতনয়ত চ।

শৌনকস্য হুতোপত্যা তদপত্যত্যা ভূগো।
এবং—

"শ্রুতায় শ্রমনারোপণ্য ব্রাহ্মণো ব্যাত্যোগতিং"
মহ—৩৩ অঃ।

অর্থ হইলেও তখন বিবাহ অঙ্গিক হইত না,—বৃহদ্রথদ্বীয়পুরাণ-বচনাদির প্রভাবে কলিকালে ঐরূপ বিবাহ অঙ্গিক হইয়াছে। ঐরূপ বিবাহ যদি অর্থক হইয়াও "ইমানু ধর্মান" এই বচনে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে—তাহা হইলে বাম্বিগ্যাদির জ্ঞান সমুদ্রপথে যাত্রাকে ধর্মের অন্তর্গত বলিতে অপরায় কি? আরও দেখ, প্রাচ্যে মাস আহার যে ধর্মকার্য্য তাহা কোথাও নাই—অথচ ঐ বচনে "মাংসাদানং তথা প্রাচ্যে"—বলিয়া "ইমানু ধর্মান" বলা হইয়াছে,—অর্থাৎ তাহাকেও ধর্মের অন্তর্গত করা হইয়াছে—

অতএব এখানে ধর্ম শব্দ ছত্রিত্রায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছত্রিত্রায় শারীরিক ভাব্যাদিতে গৃহীত হইয়াছে।-দশজন লোক যাইতেছে, তাহার মধ্যে কয়েকজনের মতকে ছত্র থাকিলেই লোকে বলে, ঐ ছত্রধারীরা যাইতেছে; যাহার ছত্র নাই সে ব্যক্তিও এই 'রা'র মধ্যে পড়িয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ ধর্ম না হইয়াও কয়েকটি ধর্ম ধর্মের দ্বারা পড়িয়াছে। ছত্রিত্রায় না বৃত্ত,—এখানে ধর্মশব্দে প্রচলিত আচার মাত্র গ্রহণ কর, সমুদ্রপথে যাত্রা সেই প্রচলিত আচারের অঙ্গপত্র ছিল, তাহাই নিম্নস্থ হইয়াছে—ইহা বলিলে কিছু ক্ষতি আছে কি ?

যে আচার বা ধর্ম সমাজে প্রচলিত—সেই অর্থেও ধর্ম শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। মেদিনী অভিধানে আছে—

“ধর্মোহীশ্রী পুণ্য আচারে বভাবোপনয়মোঃ ক্রতে। অহিনোপনিষদ্বায়ে।”

ধর্ম শব্দের নানা অর্থ, যথা (১) পুণ্য (২) আচার (৩) ভাব্য (৪) উপমা (৫) যজ্ঞ (৬) অহিনা (৭) উপনিষৎ এবং (৮) ভাব্য।

কেবল পুণ্য বা পুণ্যজনক ধর্ম—যে ধর্ম-শব্দ বাচ্য, তাহা নহে; যে আচার নিম্নিত তাহা ব্রাহ্মবীর জ্ঞাত ধর্ম-শব্দের প্রয়োগ নানাহানে আছে, যথা—বামনপুরাণ—

পরদারভিমর্শিকঃ পরার্থেহপি চ সৌলুপা।
স্বাধ্যায়স্ব্যধকে ভক্তির্যোহয়ঃ রাক্ষসঃ স্বতঃ।
অবিবেকতথ্যাজানঃ শেচহানিরসভাতা।

পিশাচানাময়ঃ ধর্মঃ সদা চামিষগ্রহতা।
অর্থাৎ—রাক্ষসের ধর্ম পরদারহরণ, পর ধনে লোভ, বেদ পাঠ ও নিষেধকি। অবিবেক, অজ্ঞান, অন্তর্ভিষ, সত্যাহীনতা এবং সর্বদা আমিষলোভ—পিশাচগণের ধর্ম।

রাক্ষস-ধর্মের মধ্যে প্রথম দুইটি নিম্নিত

আচার হইলেও ধর্ম নামে কথিত হইয়াছে। পিশাচ ধর্মের সমস্তগুলিই ত অধর্ম।

প্রকৃতপক্ষে পরদারহরণ যে রাক্ষসের পক্ষেও অধর্ম, তাহা বাস্তবিক-সামান্যে নানা স্থানে কথিত হইয়াছে, উদাহরণ স্বরূপ একটা দ্রষ্টব্য উদ্ধৃত করিতেছি,—

স বচুৎ ক্রশো রাজা মৈথিলী কামমোহিতঃ।
অসমানাক্ত হৃদনাং পাপঃ পাপেন কর্মণা।

লঙ্কা ১১শ সর্গ।

পাপিষ্ঠ রাজা রাবণ দীতার প্রতি আশ্রয়িত অভিলাষে মোহিত এবং পাপাচরণের জন্ত হৃদয়গণের অবজ্ঞাত, ক্রম হইয়া পড়িলেন।

অতএব বুঝা যেন—পরদারহরণ রাক্ষসেরও পাপকাণ্ড। সেই পাপকাণ্ডও ধর্ম নামে কথিত হইয়াছে, কেননা তাহা রাক্ষস-সমাজে প্রচলিত আচার ছিল।

ভক্তিব্যবস্থা—
অথো বিজ্ঞানং দেবযজ্ঞী নিরহঃ
কৃত্যং পুং প্রেতকরাদিবিদ্যাস।

ধর্মো হুয়ং দাশরথ্যে নিজে নো।
নৈবাধ্যাকারিষ্মহি বৈবরুতে ৬ ভটি ২য় সর্গ।

অর্থাৎ হে রাম! বিজ্ঞপণকে ভঙ্গ্য করি—যজ্ঞব্যংস করি,—(দেবপুত্রকণপকে নিহত করি) নগরকে শ্রাশন-ভূমি করি—এই আমাদের ধর্ম।

গ্রন্থ। এ ঘটন সমুদ্রপথে যাত্রাই নিম্নস্থ হইয়াছে, ইহাই ত আপনার মত ?

উত্তর। এ ঘটন সমুদ্রযাত্রাকারী সহিত সংসর্গ নিম্নস্থ—ইহাই আমার মত বলিয়াই গ্রহণ কর। হেমাদ্রি প্রভৃতি গ্রন্থে যে “সমুদ্রযাত্রা: বীকারঃ” এই পাঠ আছে তাহার অর্থের সমান অর্থ করিবার জ্ঞাত—“বীকার” শব্দ “সংসর্গ” অর্থ আমি করিয়াছি, আর সমুদ্রযাত্রা—এই পদটিকে তৃতীয়াংশ

বলিয়াছি। এক্ষণ রবিবার প্রধান কারণ এই—হেমাদ্রি নির্ঘসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে আদিপুরাণের কতিপয় বচন আছে,—এই সকল বচনের কিয়দংশমাত্র যখনমন্দ ভট্টাচার্য্য ধরিয়া বলিয়াছেন,—

“ইত্যাদীভিত্যায়।
এতানি লোকাণ্ডর্য্যঃ কলারদৌ মহাঘাতাঃ।

নিবর্তিতানি কর্মানি ব্যবস্থাযুগপূর্বকং বৃথৈঃ।”

যখনমন্দ ‘যে ইত্যাদীন’ বলিয়াছেন, যাহার তাহার নাম করিয়া উল্লেখ করেন নাই, তৎসমুদয় বোধক বচনের মধ্যে—
“বিজ্ঞাতকৌ তু নৌযাতুঃ শোদিতস্তাপি

সংগ্রহঃ।”

এই সংগ্রহ আছে—এবং ইহা হেমাদ্রি প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যে বিজ্ঞ সমুদ্রে নৌকাযোগে গমন করিবে—

কৃতপ্রায়িক্ত হইলেও তাহাকে সমাজ ভুক্ত করা যাইবে না। বৃহদ্রাশ্রয়ী কথিত “সমুদ্রযাত্রা-বীকারঃ” এবং আদিপুরাণ কথিত—

“বিজ্ঞাতকৌ তু নৌযাতুঃ শোদিতস্তাপি সংগ্রহঃ”—এই দুই অংশের তুল্য অর্থ হইলে একব্যাক্যতা হয়।

পক্ষান্তরে—যে অর্থই করা বাউক না কেন, তাহাতে দোষ আছেই।

মতার্থ, সমুদ্রযাত্রা বলিলে, এক দোষ—বীকার পদ নির্বন্ধ, বিতীয় দোষ,—“জল প্রবেশ” না বলিয়া সমুদ্রযাত্রা বলতে নদী প্রভৃতির জলে দেহ বিসর্জন নিম্নস্থ নহে—ইহা বীকার করিতে হয়, অথবা সমুদ্র শব্দের লক্ষণা করিতে হয়।

গ্রন্থ। নদী প্রভৃতির জলে দেহ বিসর্জন নিম্নস্থ নহে—বলিলে ক্ষতি কি ?

উত্তর। উদ্দেশ্যের নিফলতাই ক্ষতি। কলির প্রাধুর্ভাবে কোপ, অভিমান, ঈর্ষ্যা

ইত্যাদি লৌকিক কারণে আত্মহত্যা যখন ব্যক্তিগত লাগিল—তখন অগত্যা পূর্ব-প্রচলিত শাস্ত্রসম্মত আত্মহত্যাও নিম্নস্থ হইল। সেই স্থলে কেবল সমুদ্রে দেহ বিসর্জন নিষেধ করিলে—উদ্দেশ্য নিফল হইল না কি ?

গ্রন্থ। আত্মহত্যানিবারণই যে উদ্দেশ্য তাহা কেমন করিয়া বৃথি।

উত্তর। বৃহদ্রাশ্রয়ী পুরাণবচনে “মহা-প্রাণাং গমনং” নিম্নস্থ হইয়াছে। আদি-পুরাণে—“ভৃগুপুত্রতনুং” বলিয়া উক্তহান হইতে পতন ও অগ্নিপ্রবেশ নিম্নস্থ হইয়াছে।

এই সকল দেখিয়া এবং সমগ্র ধর্মের আচার দেখিয়া বৃথিতে হয়—সর্ব সাধারণ আত্মঘাত প্রায়েই কলিকালে শাস্ত্রনিম্নস্থ।

গ্রন্থ। সহস্রপণ্ডিত আত্মঘাত—তাহা ত শাস্ত্রনিম্নস্থ হয় নাই।

উত্তর। সহস্রপণ্ডিত সর্বসাধারণ আত্মঘাত নহে। রমণীর পতির মৃত্যু হইবে, তবে ত সে দেহত্যাগ করিবে; ইহাতে সামাজিক অনিষ্ট নাই, বরং ইষ্ট আছে, ইহাই মনুষ্যগণের মত। যে মনে করিলেই ত আর সহ-

সরণে যাইতে পারে না। অতএব ইহা সর্বসাধারণ নহে। জল-প্রবেশ প্রভৃতি সর্ব সাধারণ। একটু মনঃ কষ্ট হইলেই স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই এ সকল আত্মঘাত ঘটতে পারে। আত্মঘাতপ্রবৃত্তি ব্যক্তি মনে করিতেন—ইহজন্মের কষ্ট লাঘব হইল, আমার সঙ্গ প্রভাবে স্বর্গভোগও

হইবে—এমন স্বযোগ তাগ করি কেন ? এই ভাবের দমন করাই ব্যবস্থাপক মনুষ্যগণের উদ্দেশ্য ছিল।

গ্রন্থ। তাহাই যদি উদ্দেশ্য, তবে তাহার নিষেধ কৈ ? মহাশয়ের মতে সমুদ্রযাত্রা শব্দে ত মরণের জন্ত জল প্রবেশ নহে।

উত্তর। বৃহদারদীয় বচনটা শুন,—

সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু-বিধারণং।

বিজ্ঞানামসবর্ণাশ্চ কল্যাণমমৃতমতঃ।

দেবদেব হুতাংশপতিমধুপুংক পশোর্ষিৎ।

মাংসানং তথা শাকং বাণপ্রদ্বাশ্রমতুবা।

দত্তায়াশ্চৈব কল্যাণাঃ পুনর্দানং পরন্ত চ।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্যাং নরমেধাশ্রমেথকে।

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধক তথা মথং।

ইমান্ ধর্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাংহমনিবিধঃ।

এই বচনে যে মহাপ্রস্থান গমন নিষেধ

আছে, ইহার দ্বারাই ঐক্যাতীয় সকল প্রকার

আত্মঘাত নিষিদ্ধ হয়। ইহাকে উপলক্ষণ

বলে। এক 'মহাপ্রস্থান গমন' নিষেধ

থাকিলেই ঐক্লপ উপলক্ষণ বলা চলে, কিন্তু

সমুদ্রযাত্রা দেহ বিসর্জন ও মহাপ্রস্থান গমন

নিষেধ বলিলে, উপলক্ষণ বিষয়ে একটু

ব্যাখ্যাত হয়। যেমন মনে কর—তোমার মাতা

তোমাকে বলিলেন, "দেখ এ দিদি থাকিল—

কাকে যেন মুখ না দেয়"। কাক আসিল না,

কিন্তু কুকুর আসিল, কুকুরে বাহাতে দগিত

মুখ দিতে না পারে তাহার জ্ঞাত তখন তুমি

প্রস্তুত হও। তখন তোমার মর্মে হয়, মা

'কাকের নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার

অভিপ্রায়, দিদিটা নষ্ট না হয়, হুতরাং কাক

উপলক্ষণ,—যে মুখ দিলে দিদি নষ্ট হইবে, সেই

সকল ভাবই এখানে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু তোমার মা যদি বলেন—"এ দিদি

থাকিল উহাতে যেন কাক বা কাল রংএর

কুকুর মুখ না দেয়, তাহা হইলে তোমার

মনে হয় না কি—সাদা রংএর কুকুর মুখ

দিলে দোষ নাই, ইহা মায়ের অভিপ্রায়,

নিশ্চয়ই হয়। সেইক্লপ সমুদ্রে দেহবিসর্জন

নিষেধ ও মহাপ্রস্থানগমননিষেধ বলিলে—অপর

জলে যেহে বিসর্জন এক প্রকার অশ্রুমানচিত্তই

হয়—মহাপ্রস্থান গমন আর উপলক্ষণ হইয়া

সমক্যাতীয় সর্ববিধ মৃত্যুদ্বারের জাপক

হইতে পারে না। তাহা না হইলে উদ্দেশ্য

নিষ্ফল, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। উপ-

পুনাগ বচনের বহুদেহ হিন্দুর ঘরে আত্মহতা

অজ্ঞ জাতির হিসাবে এখনও কম আছে।

কিন্তু বিপন্নতা শিক্ষার ফলে, ক্রমেই শৈথিল্য

হইতেছে।

প্রশ্ন। আপনি যে "দ্বিত্যাত্রাকৌ তু নো-

যাতুঃ শোবিতস্তাপি সংগ্রহঃ" বলিতেছেন—

এ অংশে তৎপুনন্দন ভট্টাচার্য উক্ত করেন

নাই, অতএব উহা অমূলক।

উত্তর। রঘুনন্দন উদাহৃতবে অশ্রুশোম-

বিবাহ যে অকর্তব্য ইহা প্রমাণ কদিবার

জ্ঞাত পূর্বকবিত্ত বৃহদারদীয় বচন উক্ত

করিয়াছেন এবং তৎপরেই লিখিয়াছেন—

হোমাদিপ্রশারভাষ্যমোরাদিপুণ্যম্

(পাঠান্তরে আদিভাষ্যপুণ্যং)

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্যাং দারণক কমণ্ডলোঃ।

দেবদেব হুতাংশপতিমধুপুংক প্রার্থিতঃ।

কল্যানামসবর্ণানাং বিবাহস্ত দ্বিত্যাত্রিকঃ।

আততাদিবিজ্ঞাত্যাপ্যাদ্যং ধর্মযজ্ঞেন হিংসনম্।

বাণপ্রদ্বাশ্রমস্তাপি প্রবেশো বিধিদেশিতঃ।

বৃহদাধ্যায়াদ্যাপেক্ষমব্যাকোচনং তথা।

প্রায়শ্চিত্তবিধানকং বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্।

সমর্পণোষঃ পাপেব মধুপুংক পশোর্ষিৎ।

দত্তোন্নতসেতরাস্ত্য-পুজ্যেনে পরিগ্রহঃ।

... ইত্যাদীভাষ্য—

এতানি লোকগুণ্যাক কলেরাদৌ মহাশুভ:

নিবর্তিতানি কর্মাণি ব্যবস্থা-পূর্বকং বুদ্ধিঃ।

এখানে যে অংশে অশ্রুশোম-বিবাহ নিষিদ্ধ

আছে—সেই অংশই প্রয়োজনীয়, তাহার

অধিক বৎকিঞ্চিদংশ উক্ত হইয়াছে—তাহা

উক্ত বচনে প্রামাণ্যবৃদ্ধি দৃঢ় করিবার জ্ঞাত।

যে আচার সমাজে প্রচলিত, তাহার মূল-

প্রদর্শনই প্রামাণ্যবৃদ্ধি দৃঢ়ীকরণের হেতু,

সে বচনের সর্বাংশ প্রদর্শন নিশ্চয়োজ্ঞান

বাওঁয়ে পরিপাণ করিয়া, "ইত্যাদীভাষ্য"

বলিয়াছেন, এই ইত্যাদি অশ্রুশোম করিবার

জ্ঞাত রঘুনন্দনের অবলম্বিত প্রাচীন হোমার্জির

নিকট, বাইলেই দেখিবে—"দ্বিত্যাত্রাকৌ

তু নোযাতুঃ শোবিতস্তাপি সংগ্রহঃ"—

নির্ঘণিসিদ্ধ গ্রন্থে হোমার্জি হইতে এই অংশ

উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রশ্ন। "নোযাতুঃ" আছে, জাহাজে

চড়িলে দোষ কি? জাহাজ ত আর নৌকা

নহে।

উত্তর। নৌকা নানা প্রকার, পোতও

নৌকাবিশেষ, যন্ত্রজ পোতই জাহাজ।

প্রশ্ন। সমুদ্রে নৌকায় একটু চড়িলেই

কি দোষ হইবে?

উত্তর। ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ বলেন,—একটু

চড়িলে দোষ নাই, দ্বীপান্তর-গমনই দোষ।

অতএব একব্যাক্যত করিলে এই হয় যে—

তীর্থযাত্রা ব্যতীত বা ধর্মযজ্ঞ উদ্দেশ্য

ব্যতীত সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ।

আমি। কলিকালে সমুদ্রে তীর্থযাত্রাই

"সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ" এই অংশ দ্বারা নিষিদ্ধ

হইয়াছে, হুতরাং শাখাদ্বারাদি তীর্থ কলি-

যুগে গন্তব্য নহে, এ কথা বলিলে তাহার

উত্তর কি?

তর্করত্ন। পরাশর কলিযুগের শ্রুতি—

তাংহতে "সমুদ্রেভূতগমনং প্রায়শ্চিত্তং

বিনির্দিশেৎ" সমুদ্রযাত্রা স্বীকারকে সমুদ্রে

তীর্থযাত্রা বলিলে পরাশর শ্রুতির বিরোধ হয়,

অতঃ সমুদ্রে তীর্থযাত্রা এক্ষণ করনা কবিলে

এ বিরোধ হয় না। হুতরাং বাণিজ্যাদির

জ্ঞাত সাধারণ সমুদ্রযাত্রাই নিষিদ্ধ, তীর্থযাত্রা

নহে, এই জ্ঞাত দ্বারকা-গমন পুরোধামে

সমুদ্রগমন প্রভৃতির ব্যবস্থা সর্বগ্রন্থ এবং

নিষ্ঠাচার সম্মত।

আমি। 'বিবাহ-বিবাহ' বিচারস্থলে আপনি

বলিয়াছেন, পরাশর শ্রুতির ব্যবস্থা দত্তায়াশ্চৈব

কল্যাণাঃ পুনর্দানং পরন্ত চ। আদিপুরাণের

এই বচন দ্বারাই বাধিত, হুতরাং এস্থলেও

পরাশর শ্রুতির সমুদ্রযাত্রা ব্যবস্থা বাধিত হউক

না কেন?

তর্করত্ন। এস্থলে যদি "সমুদ্রে তীর্থযাত্রা

স্বীকার" এইক্লপ স্পষ্ট উক্তি থাকিত, তাহা

হইলে বরং বলিতে পারিত, তাহা নাই, তুমি

কল্পনা করিয়া বিরোধ ঘটাইবে এবং শ্রুতির

বাধা করিবে, ইহা অত্যন্ত অদ্বন্দ্বত।

আমি। আমার একটা বড় ভুল হইয়াছে,

আপনি যে বৃহদারদীয় এবং আদি-পুরাণের

বচন দেখাইয়াছেন, তাহাতে সমুদ্রযাত্রাকারীর

সহিত সঙ্গ-নিষেধই প্রমাণিত হইয়াছে।

সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ত প্রমাণিত হয় নাই।

হুতরাং তীর্থযাত্রার জ্ঞাত সমুদ্রযাত্রার দোষ

আছে কি না? এক্ষণ প্রশ্ন করাই আমার

ভুল, ভুল প্রশ্ন করিয়াও ইহা আপনার উত্তরে

বুঝিয়াছি, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ, ইহা আপনার

মত, কিন্তু তাহার প্রমাণ কি?

একটু ভুলও হইয়াছে, স্বীকার শব্দের সঙ্গ-

অর্থ কিরূপ হইল—তাহা বিজ্ঞানা করা উচিত

ছিল।

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—

ভুল হইয়াছিল বটে, এখন সেই প্রশ্নই

করিলাম, প্রথমে তাহারই উত্তর প্রদান

করুন।

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, স্বীকার শব্দ

দুইটা শব্দের যোগে উৎপন্ন—স্ব এবং কার,—

ব শব্দের অর্থ আত্মীয়, কার—করা,—স্বীকার শব্দের যোগলভ্য অর্থ—আত্মীয় করা বা আশ্রয় করা। ইহার প্রতিশব্দ—আত্মীয় স্বাপন, তাহাই সংসর্গ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি।

আমি বিনোদ ভাবে বলিলাম, আত্মীয় করার ভাবার্থ আত্মীয় স্বাপন হইলেও উহা শব্দলভ্য অর্থ নহে, হস্তরাজ্য সূত্রে তৃতীয়ায় একটু কষ্ট করিয়া বোধ হয়।

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন—অপর ব্যাখ্যার স্বীকার শব্দ বার্থ হয়, তদপেক্ষা একটু কষ্ট-কল্পনা না হয় করিলাম।

আমি। আপনার নিকট আরও কিছু ভাল ব্যাখ্যা শুনিবার আশা করি।

তর্করত্ন। আচ্ছা তবে শুনি,—
সমুদ্রযাত্রা স্বীকার অর্থে সমুদ্রযাত্রা মানিয়া লওয়া।

সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও দেশাচার হেতু বা অজ্ঞ কারণে তাহাকে আচরণীয়রূপে গ্রহণ করাই সমুদ্রযাত্রার স্বীকার।

সেই স্বীকারের পরিচয় দুইরূপ পাওয়া যায়, যথা বা প্রবর্তনাদি দ্বারা সমুদ্রযাত্রায় তাহার একরূপ এবং দীপান্তর প্রত্যাপগতের সহিত সংসর্গ তাহার অন্তরূপ পরিণতি হইয়া থাকে। এই দুইরূপে পরিচিত সমুদ্রযাত্রা স্বীকারই নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। মহাশয় বলিয়াছিলেন, সমুদ্রযাত্রাকারীর সহিত সংসর্গই নিষিদ্ধ, আবার এখন বলিতেছেন, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ, সমুদ্রযাত্রাকারীর সহিত সংসর্গও নিষিদ্ধ,—এই দুইটির মধ্যে কোন কথা সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিব?

উত্তর। সমুদ্রযাত্রায় যে পাপ হয় এ বিষয়ে অজ্ঞ প্রমাণ আছে, হস্তরাজ্য সমুদ্রযাত্রা স্বীকার ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহা না বুঝিয়া

সমুদ্রযাত্রাকারীর সহিত সংসর্গ বুঝাইলেও অজ্ঞবচনবলেই তাহা (সমুদ্রযাত্রা) নিষিদ্ধ।

পক্ষান্তরে যদি “সমুদ্রযাত্রা স্বীকার” অর্থে সমুদ্রযাত্রাই হয়—তাহা হইলেও “বিজ্ঞতাকৌতু নোবাতুঃ শোভিততাপি সঃগ্রহঃ”—এই বচন দ্বারাই সংসর্গের নিষেধ হইবে।

সমুদ্রযাত্রা কর্তব্য তৃতীয়া, সমুদ্রযাত্রাকারী ব্যক্তির আয়ত্ত হওয়াই বর্জনীয়। পংখ্যন্তের অর্থ—এবং প্রকারে নানাবিধ হইতে পারে, যাহা হউক না—সমুদ্রযাত্রা এবং সমুদ্রযাত্রাকারীর সংসর্গ উভয়ই যে নিষিদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্তএব সর্ববিধ অর্থের সিদ্ধান্ত সমানই আছে।

মরবারী জল-প্রবেশই সমুদ্রযাত্রা, এ কথা বিহারী বলেন, তাহাদের মত মানিলেও সমুদ্রযাত্রায় পাপ এবং সমুদ্রযাত্রাকারীর সংসর্গ নিষেধ—অজ্ঞ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইবে।

প্রশ্ন। সেই প্রমাণ কি?

উত্তর। অজ্ঞে অপাণ্ডিত্যে ব্রাহ্মণগণনা প্রসঙ্গে—মহা বলিয়াছেন,—

আগ্ন্যুদাহী। পরমঃ কুণ্ডশি মোঘবিক্রীড়ী।
সমুদ্রযাত্রী বন্দী চ তৈলিকাঃ কুটকাৎক।

ভট্ট অঃ ১৫৮।

সমুদ্রযাত্রী শব্দের কুস্কভট্ট-সম্মত ব্যাখ্যা যথা,—
“সমুদ্রে যো বিহিজাদিনা দীপান্তরং গচ্ছতি।”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমুদ্রে বিহিজ প্রকৃতি দ্বারা দীপান্তরে গমন করে, সে ব্রাহ্মণ অপাণ্ডিত্যেয়।

প্রশ্ন। বিহিজাদিনা কি বিহিজাদিনা?

উত্তর। বিহিজাদিনা।

প্রশ্ন। বদবাসীকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত আপনার সম্পাদিত মহামহাভারত বিহিজাদিনা আছে—তাহা কি তুল?

উত্তর। যদি থাকে ত তুল, আমি সম্পাদক নামে পরিচিত, এক সংশোধন আমার কার্য্য নহে যে, তাহার বর্ণাঙ্কিত বা বর্ণাগুণের জ্ঞান দায়ী হইব।

প্রশ্ন। বিহিজাদিনা পাঠ কোন মুদ্রিত পুথকে আছে?

উত্তর। আছে বৈ কি? ভবানীচরণ ব্রহ্মোপাধ্যায় সর্বপ্রথম মহাদেহিতামুদ্রিত করেন। এখনকার মুদ্রিত মহামহাভারত সমুদ্রে তাহাই সাক্ষ্য বা পরস্পরায় আদর্শ তাহাতে বর্ণাঙ্কিত ও অর; এ পুথকে বিহিজাদিনা পাঠই আছে।

এই কথা বলিয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন,—
“বিহিজাদিনা” লইয়া এত প্রশ্ন কেন, বলি বিহিজ শব্দের অর্থ কি?

আমি বলিলাম, বিহিজসম্বন্ধীয় বস্তু, বিহিজ শব্দের অর্থ অর্থবান; তৎসম্বন্ধীয় বস্তু হাল, দাঁড়।

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন,—বিহিজ বলিলে জল, নাবিক, বাস্তল ইত্যাদি পোতের যাবতীয় উপকরণ বোধ হইতে পায়। একরূপ অবস্থায় কুস্কভট্ট অমন একটা শব্দ প্রস্তুত করিয়া হাল, দাঁড়, বুঝাইলেন কেন? হাল দাঁড় কি সমস্ত নাম নাই, বা কুস্কভট্টের তাহা উচ্চারণ করিতে নাই?

আমি। বিহিজই হাল দাঁড়ের যোগরূপ নাম। “বাহয়ন্ত্যনেন নৌকাং” এই অর্থে নিপাতনেও সিদ্ধ হইতে পারে।

তর্করত্ন। প্রামাণিক অভিধান, প্রসিদ্ধ প্রমাণ, অথবা নিপাতনের স্থল কি আছে? যাক্ এ কথা; বল ত—সমুদ্রে যো বিহিজাদিনা দীপান্তরং গচ্ছতি।” ইহার অর্থ কি?

আমি। সমুদ্রে বিহিজাদি অর্থাৎ হাল দাঁড় দ্বিযা যে দীপান্তরে যায়। অর্থাৎ

নাবিকবৃত্তিসম্পন্ন, যাহার ইংরাজি নাম sailor এইরূপ ব্রাহ্মণই অপাণ্ডিত্যেয়।

তর্করত্ন বলিলেন—তুমি কাব্যতীর্থ, তুমি এ কি বলিতেছ! “বিহিজাদিনা” ইহার অর্থ বিহিজাদি দ্বারা হইতে পারে, বিহিজাদি দ্বিযা হইবে কিরূপে? আর ‘বিহিজাদি’—হাল দাঁড় ইত্যাদি দ্বারা দীপান্তরে গমন কেবল নাবিক করে না, আরোহীও করিয়া থাকে। হস্তরাজ্য বিহিজাদিনা পাঠের যে অর্থ, বিহিজাদিনা পাঠের সেই অর্থই হয়। অথচ বিহিজাদিনা পাঠে ভাষার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, যে ব্যক্তি অর্থ-শব্দে গমন করিতেছে, তাহাকে বুঝাইবার জন্ত ‘অশ্বেন গচ্ছতি’ এরূপ প্রয়োগ হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি হাল দাঁড় যুক্ত নৌকারোগে গমন করে, তাহাকে, বুঝাইবার জন্ত, ‘বাহিরেণ গচ্ছতি’ এমন প্রয়োগও হয় না। প্রয়োগ করিলে ভাষার নিয়ম লঙ্ঘন হয়। আর দেখ, সমুদ্রের নাবিকবৃত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপাণ্ডিত্যেয়, ইহা বলা নিশ্চয়োজন এবং অসম্ভব; নিশ্চয়োজন, কেননা, এই অপাণ্ডিত্যেয় প্রত্যবে মহা বলিয়াছেন—

“বিহজে বুঘলবৃত্তিশ্চ” (১৬৪) বুঘলবৃত্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপাণ্ডিত্যেয়। নাবিকবৃত্তি নিষ্ঠে সত্ত্ব শূদ্রবৃত্তি মধ্যে গণিত। ‘দাশং নৌ কাম্বলীবিনং’ (মহা ১০ম অঃ ৩৪)। অতএব নাবিকবৃত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ত অপাণ্ডিত্যেয় আছেই, তা সে দীপান্তরেই যাক্, আর সমুদ্রের তুলেই ভ্রমণ করুক, তাহাকে অপাণ্ডিত্যেয় করিবার জন্য ‘সমুদ্রযাত্রী’ বলিয়া পৃথক নির্দেশের প্রয়োজন নাই। প্রত্যুত এই পৃথক নির্দেশ অসম্ভব, কেননা, যে ব্রাহ্মণ নৌতে নাবিক-বৃত্তি করে, তাহাকে ত অপাণ্ডিত্যেয় বলা গেল না? ইহা কি অসম্ভব নহে?

আমি। তৈলিক ব্রাহ্মণও ত শ্রুতব্রি
সম্পন্ন, তাহার পৃথক্ নির্দেশ ত এই বচনই
আছে।

তর্করত্ন। তৈলিক, 'তিলপং তিলাদি-
বীজানাং শেঠা' তৈলের জন্ম যে তিলাদি
গেণক করে, এই কাণ্ড শ্রুতব্রি বলিয়া মহ-
শেখিত্যঃ উল্লিখিত নাই। সেইজন্মই পৃথক্
নির্দেশ আবশ্যক। আরও দেখ, কুহুটভট্ট
টীকাবরা, তিনি সরল কথায় ব্যাখ্যা করিয়া
ধাকেন, তিনি কি বলিতে পারিতেন না,
"সমুদ্রে যো পোতাং বাহয়তি" অথবা
"নারিকেলত্যা দ্বীপান্তরঃ গচ্ছতি"। তিনি
স্পষ্ট লিখিলেন,—'বহিরাঙ্গিনা দ্বীপান্তরঃ
গচ্ছতি' যে ব্যক্তি সমুদ্রে বহির প্রকৃতি অর্থাৎ
বানের সাহায্যে দ্বীপান্তরে গমন করে, ইহার
উপায়ও তর্ক করিতেছি।

আমি বলিলাম,—“সমুদ্রবারী” কথা
আছে, ইহার অর্থ যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ
সমুদ্রে গমন করে, বা সমুদ্রাজি যাহার
স্বভাব। স্বতরাং একবার সমুদ্রগমনে ত
দোষ নাই।

তর্করত্ন। প্রথম কথা এই, এখানে
‘পিন্’ প্রত্যয়ের ঐক্লপ অর্থ বিবক্ষিত নহে,
এই বুঝাইবার জন্মই কুহুটভট্ট টীকায়
পৌনঃপুত্ৰ বা শীল অর্থ গ্রহণ করেন নাই।
“আগারদাহী, কুণ্ডালী” এ সকল শব্দও ‘পিন্’
প্রত্যয়নিষ্পন্ন,—এখানেও পৌনঃপুত্ৰ প্রকৃতি
অর্থ নহে। কুহুটভট্টের টীকা দেবলক্ষ্যতির
অষ্টরূপ, দেবলক্ষ্যির বলিয়াছেন, “অমৃত
রাজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তির গোলাকঃ,
যতঃকরণমদ্যতি সতঃকরণীত কথ্যতে”।
সদবার জারজপুত্র কুণ্ড, বিদবার জারজপুত্র
গোলক। যে ব্যক্তি ইহাদের অন্নভোজন
করে, তাহার নাম কুণ্ডালী, এখানে পৌনঃ-

পুত্র অর্থ বচন নাই। তবে একবিধবার
অর্থ এখানে হইতে পারে ইহাও বলা যায়।
কিছু না মানিয়া পৌনঃপুত্ৰ অর্থ স্বীকার
করিলেও, সমুদ্র গমনে দোষ স্বীকার করিতে
হয়। যে কাণ্ড পুনঃ পুনঃ করিয়া অপাঙ্গজ্ঞেয়
হইতে হয়, তাহার একবার অষ্টমানে যে দোষ
হয় না, ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে।

আমি। আর কিছু প্রমাণ আছে কি?
তর্করত্ন। আছে, যথা বোধায়নঃ,—অর্থ
পতনীয়ানি—সমুদ্রবানং ব্রাহ্মণজ্ঞ ভাগ্যাহরণঃ
সর্গপাণ্ড্যোব্যবহরণং ইত্যাদ্যভিধায় তেযাং
নির্দেশকত্বত্বপ্ৰাপ্যমতিভোজননাঃ স্বারণ্যোবহু-
ত্বঃ সর্ববাহকরকঃ স্বানাগমনাভ্যাং বিহরতঃ
এতে ত্রিভির্ধৈ স্বপ্নপত্রস্তি পাপনু। ইতি

অর্থঃ যাহা করিলে পতিত হয়, তন্মধ্যে
সমুদ্রযাত্রা প্রথম, ব্রাহ্মণের হৃত বস্ত্র অপর
দ্বিতীয়, সর্গবস্ত্র পণ্যভাষা (স্বরা, মাংস
প্রভৃতি) বিরুদ্ধ তৃতীয় ইত্যাদি। এই সকল
প্রকারের প্রায়শ্চিত্ত—প্রথম দিন উপবাস, দ্বিতীয়
দিনে রাত্রিতে অন্ন আহার মাত্র করিয়া
ধাকিবে, তৎপরদিন আবার উপবাস, তৎপর-
দিন রাত্রিতে ঐক্লপ অন্ন আহার, এইরূপ
নিয়মে তিন বৎসর কাটাইতে হইবে, এই
তিন বৎসর মধ্যে একবারও শয়ন করিতে
পারিলে না। দশমবানং বা উপবিত্ত অপর
ধাকিতে হইবে, প্রতিদিন ত্রিস্রাণ্ডা অপরগান
পান করিবে। তিন বৎসরব্যাপী এই কঠোর
ব্রত সমুদ্রযাত্রার প্রায়শ্চিত্ত। হেমাঙ্গি হইতে
প্রায়শ্চিত্তবিবেক পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থেই বোধায়ন
বচন উল্লিখিত। আপত্তির একটী সূত্র
দেখিলে, বোধায়ন সমুদ্রবানং কিরূপ পণ্ডিত
বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। বোধায়ন সমুদ্র-
যানের যে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন,
আপত্ত্ব উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের বিমাতৃ-গমন,

ব্রহ্মহত্যা, স্বরাপানও সেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা
দিয়াছেন, যথা,—স্বরাং পীত্বা গুহ্যতন্ত্রক গম্বঃ,
ব্রহ্মহত্যাঃ কৃতা চতুর্থকালমিত ভোজননাঃ
স্বারশাংহুত্যায়েঃ সর্বনাহকরকঃ স্বানাগমনাভ্যাং
বিহরতঃ এতে ত্রিভির্ধৈব পাপং হৃদতে”।
উৎকৃষ্ট বা সপ্তম ব্রাহ্মণের কথা ভবিষ্যপুরাণে
আছে। ভবে বোধায়ন অজ্ঞাত বলিয়াছেন,
দেশবিশেষে কতকগুলি পাপ-কাণ্ড বা
অন্যচার প্রচলিত, যথা—দক্ষিণদেশে মাতুল-
কন্যা বিবাহ প্রকৃতি, এবং উত্তরদেশে সমুদ্র-
যাত্রা প্রকৃতি, দেশাচারভেদে সেই সেই দেশে
ইহা চাচরণ দোষাবহ নহে, অতঃ দেশে
দোষাবহ।

আমি বলিলাম, মহাশয় অনেক নূতন কথা
শুনিতেনি, সংশয় এখনও অনেক, তন্মধ্যে
প্রথম জিজ্ঞাসা এই দক্ষিণদেশ, উত্তরদেশ
বলিলে কোন্ কোন্ দেশ বুঝিবে?

তর্করত্ন। ইহাতে বড়ই গোল আছে,
কেহ বলেন দক্ষিণাপথ দক্ষিণদেশ, এবং
আধ্যাবর্ত্ত উত্তরদেশ। কেহ বলেন, আধ্যা-
বর্ত্তের দক্ষিণ দক্ষিণাংশ এবং উত্তর হিমালয়
পার্বত্য ভূমি।

আমি। ইহাতে আপনাদের মত কি?
তর্করত্ন। বরাহ বৃহৎসংহিতাতে ভারত-
বর্গকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহাতে
অষ্টরিক এবং মধ্য এইরূপে বিভাগ আছে।
বোধায়ন স্বভিত্তে যে দক্ষিণ-উত্তর আছে
তন্মধ্যে মলয়, মহেন্দ্র, ভদ্রকঙ্ক, কোঙ্কণ,
কর্ণাট, কাকী, চোল, ইত্যাদি রাজ্য অনন্দিয়
বা অসকীর্ণ দক্ষিণদেশ। উত্তর হৃৎ, কেকয়,
বপাতি, নিগণ্ড এবং গাঢ়াররাজ্য প্রকৃতি
অন্দিয় বা অসকীর্ণ উত্তরদেশ। সর্গাণ
দক্ষিণ-উত্তর ধরিলেও বস্ত্র, উপবাস, কলিঙ্গ,
মগধ, মিলিলা, কাণী, উৎকল, গৌড়, পৌণ্ড্র,

তাম্রলিপ্ত, প্রাগজ্যোতিষ, পাকাল, ময়ূর,
মৎসাদেশ, অম্বোদ্যাংপ্রদেশ, হিন্দিনা, কুরুক্ষেত্র,
সিদ্ধ, ত্রাবিড়, স্বরাষ্ট্র, অক্ষ এবং অসকীর্ণ
দক্ষিণদেশ মাত্রই কোন প্রকারেই উত্তরদেশ
মধ্যে গণনীয় নহে, ইহা আমি বলিতে পারি।
এ বিষয়ে প্রমাণ বৃহৎসংহিতা (১৪শ অঃ ২য়
শ্লোক হইতে ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত)।

আমাদের অভিপ্রায় এই—পূর্ব, মধ্য এবং
পশ্চিম ব্যতীত যে ৩১ ভাগ বৃহৎসংহিতায়
আছে, তাহার ৩১ দক্ষিণ এবং ৩১ উত্তর
বলিয়া গণনীয়। তাহার পর দেখিলে সেই
দক্ষিণদেশের মধ্যে যে যে প্রদেশে মাতুল-
কন্যা বিবাহ প্রকৃতি অন্যচার বহুকাল যাবত
প্রচলিত এবং উত্তর দেশের মধ্যে যে যে
স্থানে সমুদ্রযাত্রা-স্বরাপানাদি বহুকাল যাবত
প্রচলিত, দেশাচারভেদে সেই সেই স্থানে
তাহা দোষাবহ নহে।

বর্তমান সময়ে নেপাল, কান্দীরপ্রদেশ
এবং হিমালয়ের পার্বত্যভূমি ব্যতীত কোন
হিন্দুপ্রদেশ এই উত্তর ভাগের অন্তর্গত নহে।
উত্তরদেশ বলিতে সমস্ত আধ্যাবর্ত্ত বুঝাইবে
এমন সংজ্ঞা বা নিয়ম কোথাও নাই।

আমি। তাহা হইলে বর্তমান সময়ে নেপাল
বা কান্দীরের অধিবাসী ব্রাহ্মণ সমুদ্র যাত্রা
করিলে পাপী হইবে না?

তর্করত্ন। পাপী হইবে না এ কথা বলিতে
পারি না, কেননা—নীমাংসাধর্শনে ব্যক্তিক-
কার কুমারিল ভট্ট ১ম অঃ ৩য় পাণ্ডে
লিখিয়াছেন,—

সম্রাট প্রমীতি ই স্থতিঃ সোপনিষদনাং।
তন্ত্রান্তরেণ বনীয়শ্মমচার্যনিবন্ধনাং।

ভাষ্য—আচার অপেক্ষা স্থতি বলবৎ
প্রমাণ,—কেননা আচার-কর্ত্তী অপেক্ষা স্থতি-
কর্ত্তৃগণ অধিকতর বিশ্বাস্য।

শাস্ত্রদীপিকাতে পার্শ্বসারথিমিত্র এই
কারিকার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—

সর্বদোষ দ্বিভাবিকৃষ্ণাচার্য্যঃ মাতুলহৃদিত-
পরিণয়াদিবিষয়াণ্যামি হেতুস্তমঃ
বিশ্পষ্টমেব দৃষ্টত ইতি ন কথাঞ্চদপি
অতিমূলকঃ সন্তাবনীযম্ ন চাভ বিকল্লাভ্যাপ-
গমনোভয়েরিপি প্রামাণ্যং সম্ভবতি বজ্জনি
বিকল্লাসম্ভবাং ন হি মাতুলহৃদিতপরিণয়ঃ
প্রতাবাঘোঃপত্নিরহংপত্নিচ্ছ। (২ম হৃদ)
ব্যাখ্যা।

মত দ্বিত্ত বিকল আচার আছে, যথা—
মাতুল-কন্ডা বিবাহাচারি—তাহার হেতু
কানানদি স্পষ্টই দেখা যায়, তাহার
শ্রুতিমূলকত্বের সম্ভাবনাই নাই; যদি বল,
বিকল স্বীকার করিলে দ্বিত্ত এবং আচার
উভয়েরই প্রামাণ্য থাকে, কিন্তু তাহা অসম্ভব,
কলগত বিকল হয় না,—এক মাতুলকন্ডা-
বিবাহ—তাহার ফলে পাপ হইবে এবং পাপ
হইবে না একরূপ হয় না। অতএব দ্বিত্ত
অপেক্ষা আচার দুর্বল।

আমি। আপনি বলিতেছেন, বোধায়ন
বলিয়াছেন, “দেশাচার্য্যহেতু ঐ সকল
অন্যচার দোষাবহ নহে” তাহা অপেক্ষা কি
কুমারিল ভট্ট বা পার্শ্বসারথিমিত্র প্রামাণিক?—
তর্করত্ন। দোষাবহ নহে—বলিলে, পাপ
হইবে না একরূপ অর্থও হইতে পারে, সামাজিক
দোষ হয় না—একরূপ অর্থও হইতে পারে,
এখানে শৈব্যোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে—কেহই
অপ্রামাণিক হ'ন না।

আমি। একই কাৰ্য্য অবস্থাবিশেষে
পাপজনক হয় এবং অবস্থাবিশেষে পাপজনক
হয় না, যেমন—গায়ত্রী-পাঠ—অহুগনীত
ব্রাহ্মণ গায়ত্রী উচ্চারণে পাপী হইবে,
আর উপনীত হইলে গায়ত্রী পাঠ তাহার

পাপ না হইবার হেতু হইবে। সেইরূপ
দেশবিশেষেও একই বস্তু পাপজনক হইবে
এবং অন্যদেশে পাপজনক হইবে না,—
ইহা বলিলে ক্বতি কি?

তর্করত্ন। দৃষ্টান্তে বৈষম্য আছে—গায়ত্রী-
পাঠ কোন শাস্ত্রেই অন্যচার বা পাপজনক
বলিয়া ক্বতি হয় নাই, পরন্তু পাত্ৰবিশেষে,
কেবল পাত্ৰবিশেষে কেন, দেশবিশেষেও
বটে—যথা শূত্রের সমাপ্তে গায়ত্রী পাঠ
নিষিদ্ধ,—সেই নিষেধ-লজ্যনজ্ঞতাই পাপ
হইতেছে, এখানে বোধায়ন স্পষ্ট বলিয়া-
ছেন, “সমুদ্রযাত্রা অন্যচার বা নিষিদ্ধ কথ্য
অর্থও পাপজনক কথ্য, কেবল পরিচারণত
দেশবিশেষে দোষাবহ নহে” যদি ঐ কাৰ্য্য
দেশবিশেষে পাপজনক হইত এবং দেশ-
বিশেষে পাপজনক না হইত তাহা হইলে
বোধায়ন তাহাকে অন্যচাররূপে সিদ্ধান্ত
করিতে পারিতেন না। যাহা দ্বিত্তশাস্ত্রমতে
নিষিদ্ধ তাহা স্থানবিশেষে আচার মাতুল দ্বারা
প্রতিপালিত হইলেও দ্বিত্ত অপেক্ষা আচারে
দুর্বলতা হেতু, অন্যচার বা কুরুক্ষরূপে স্থিরী-
কৃত হইবার যোগ্য। প্রবল প্রমাণ দ্বিত্ত-
শাস্ত্র সমস্ত নিষেধ দ্বারা যে কাৰ্য্য পাপজনক
বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে—আচাররূপ দুর্বল
প্রমাণে তাহা যে আর পাপজনক হইবে ন
একরূপ হইতে পারে না। ‘দোষাবহ নয়’
ইহার অর্থ পাপজনক নহে, একরূপ হইলে
বোধায়নের কথাই অসঙ্গত হইয়া যায়—তিনি
যে সমুদ্রযাত্রাকে পাপকথ্য বলিয়াছেন, তাহা
আর সঙ্গত হয় না—এই জ্ঞত কুমারিল ও
পার্ব্যসারথিমিত্রসম্মত অর্থই বোধায়ন
গ্রন্থের একত্বার্থ। দ্বিত্ত অপেক্ষা আচার
দুর্বল প্রমাণ, হৃত্যবে দেশাচার থাকিলেও
সমুদ্রযাত্রায় উত্তর দেশবাণীও পাপ হইবে;

তাহাতে সংশয় নাই। তবে দেশাচার-
পালনে পাপ হয় না—ইহা কোন কোন পূর্ব-
তন পণ্ডিতের মত বটে,—আমি তদপেক্ষা
কুমারিল মতকে প্রামাণিক মনে করি।
বিশেষতঃ সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে এমন বিশেষ কথা
আছে, যাহাতে বর্তমান সময়ে সর্বদেশেই
পাপ হইবে ইহা মানিতে হয়।

—আমি। যদি সমুদ্র-যাত্রা পূর্ণ হইতেই
শাস্ত্রনিষিদ্ধ থাকে, তাহা হইলে, রত্নহারদীয়
পুরাণে “সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ”—এই অংশে
সমুদ্রযাত্রা নিষেধ বা সমুদ্র যাত্রাকারীর সহিত
সংসর্গ নিষেধ করা নিষ্ফল। পাপীর
সহিত সংসর্গ ত সর্বত্রই নিষিদ্ধ। আমি
প্রাশস্তিত্ত-বিবেকে দেখিয়াছি “গণ্ড যেন
পাপাশ্রিত্য সহ সংস্কৃজ্ঞেব স তৎক্রম প্রাশস্তিত্তঃ
কৃধ্যাৎ—এই বিষ্ণু-বচন স তৎক্রম, মহত
ও বলিয়াছেন,—

ন সংসর্গঃ ব্রজেব সন্ধিঃ প্রায়জ্ঞেহংকৃতে দ্বিজঃ ।
এন্যিভিরনিকিঞ্চনং নার্তং কচ্চিৎ সমাচরেৎ ॥

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, তুমার এই
প্রশ্নে আমি ভুল হইলাম, এমন ইহার উত্তর
তন।

পরশর বলিয়াছেন,—
কৃতে সন্ত্যগদাধবে জ্যোতায়ঃ স্পর্শনে ন তু ।
দ্বাপরেত্বমাদায় কলৌ পততি কণ্ঠ্যং ॥

সত্যকালে পতিত ব্যক্তির সহিত সন্ত্যগদা,
জ্যোতায় পতিত স্পর্শ এবং দ্বাপরে পতিতের
নিকট অর্থ গ্রহণ পতিত হয় এবং কলিকালে
সাক্ষ্যকণ্ঠ্য করিলেই পতিত হয়।

আমি—কিরূপ কথ্য?
তর্করত্ন। এ বিষয়ে ভূইজন হুগ্রসিদ্ধ
মর্থ ব্যবস্থাপকের মতভেদ আছে,—
মাধবাচার্য্য বলেন,—“বধ, অপেয় পান,
(অভক্ষ্য ভক্ষণ) অগম্যা গমন এবং

অপহরণাদি সাক্ষ্য কাৰ্য্য, ইহাই অশুলে কথ্য
শব্দের অর্থ। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা হুগপান
ইত্যাদি কাৰ্য্য করিয়া যাহারা পতিত,
তাহাদের সংসর্গে অগ্রে পতিত হইবে না।”

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বলেন, “সন্ত্যগ, স্পর্শ
ধন গ্রহণ, এই প্রকার লঘুসংসর্গ করিলে,
কলিকালে পাপী হইবে না, পরন্তু পতিতের
অম ভোজন বৈবাহিকসম্বন্ধ এবং অত্যাচার
গুরুসংসর্গ করিলে, পতিতই হইবে,” আর
ব্রহ্মহত্যা দি কাৰ্য্য যে বধ করে—সে যে
পতিত হইবে—ইহা বলা বাহুল্য।

আদি পুরাণে “সংসর্গদোষঃ পাপেতুঃ”—
অর্থঃ কৌনা পাপেই সংসর্গ দোষ কলিতে
নাই—ইহা লিখিত আছে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মতে—সন্ত্যগ, স্পর্শ
ধনগ্রহণ এবং এই প্রকার অত্যাচার লঘু সংসর্গে
দোষ নাই।

অত পাপে যাহারা পাপী তাহাদের সংসর্গে
কলিকালে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও—সমুদ্র
যাত্রাকারীর সর্ববিধ সংসর্গেই পাপ হইবে—
ইহা জানাইবার জন্তই “সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ”
এই বচনে সমুদ্রযাত্রা বা সমুদ্রযাত্রাকারীর
সংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আমি। কথাটা আর একটু পরিষ্কার
করিয়া বলুন।

তর্করত্ন। সমুদ্রযাত্রা স্বীকার—এই
অংশের ৪ প্রকার অর্থ হইয়াছে।

- (১) মরণোচ্চেষ্টে সমুদ্রজলে প্রবেশ।
- (২) সমুদ্রে তীর্থযাত্রা।
- (৩) বাণিজ্যাদির জন্ত সমুদ্রযাত্রা।
- (৪) সমুদ্রযাত্রাকারীর সহিত সংসর্গ।

যদি আমার প্রদর্শিত বোধ ব্যবস্থায়
করিতে না পার—(১) বা (২) অর্থ গ্রহণ
কর, তাহা হইলে এ বচনে তুমার কোন
আপত্তি থাকিতে পারে না।

আমি। আমি ত (১) (২) অর্থ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করি নাই।

তর্করত্ন। উত্তম (৩) এবং (৪) অর্থ স্বীকার করিলে, “সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ” এই অংশ নিষ্ফল হয়—এই তোমার আপত্তি?

আমি। আজ্ঞা হাঁ।

তর্করত্ন। (৩) অর্থে—সমুদ্রযাত্রা দুই প্রকার ইহা মনে রাখিও—উত্তর দেশের ১ প্রকার এবং দক্ষিণ দেশের এক প্রকার। দেশাচার প্রামাণ্য হেতু—উত্তর দেশের সমুদ্রযাত্রা দোষাবহ নহে—এইরূপ বোধায়ন ঘটনে আছে, শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও এই যে আচার-লিঙ্গ সমুদ্রযাত্রা—তাহাই ‘সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ’ ইহাই বলিতে নিষিদ্ধ। দেশাচারের দোহাই দিয়া যে ‘সমুদ্রযাত্রা করিলে, কলিকালে তাহাও হইবে না—এইজ্ঞাই ‘সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ’ আছে, কলিকালে এই নিষেধ নিষ্ফল নয়।

আমি। আপনি বলিয়াছেন, দেশাচার থাকিলেও—সমুদ্রযাত্রায় উত্তরদেশবাসীরও পাপ হইবে, ইহা কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির মত, “সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ” এই নিষেধ দ্বারাও সমুদ্রযাত্রা করিলে পাপ হইবে—এইরূপই বুঝায়; স্বতন্ত্রাং ইহা কি পুনরুক্তি বা বার্থ নহে?

তর্করত্ন। যদি প্রত্যক্ষফল দেখিতে পাই, তাহা হইলে অদৃষ্টফল পর্যাণ্ত অমুদ্রাণের প্রয়োজন করে না, এখানে দেখিতেছি, দেশেশে সমুদ্রযাত্রার আচার ছিল—সেই আচার উঠাইয়া দেওয়া হইল—অতঃপর কেহ সমুদ্রযাত্রা করিলে, সমাজেও নিন্দিত হইবে, —ইহাই নিষেধের ফল। আর একটা কথা স্মরণ করিও—তুমি তখন কুমারিল প্রভৃতির মত মানিতে চাহ নাই, উত্তর দেশবাসী

সমুদ্রযাত্রা করিলে পাপী হইবে না এইরূপ ভাব তুমি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলে, এমন ভাবিয়া দেখ, এই নিষেধ দ্বারা তোমার সেই ভাব অকুণ্ঠা হইল। অকুণ্ঠে উত্তর দেশবাসীর সমুদ্রযাত্রার পাপ হইত না বটে, কিন্তু কলিকালে পাপ হইবে কুমারিল ও পার্শ্বসামর্থির মত না মানিলে—এইরূপে বচনের সফলতা হয়।

আমি। মহাশয়! এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায় কি?

তর্করত্ন। শুনিতে চাও ত আর একটা কথা! শুন; উত্তর দেশবাসীর অজ্ঞ যুগে সমুদ্রযাত্রার পাপ হউক আর নাই হউক, সে বিষয় তুমি ভুলিয়া যাও; যাহা তোমার ইচ্ছা সেই পক্ষই মানিয়া লও, আর দক্ষিণ দেশবাসীর যে পাপ হয়—ইহা মনে রাখ, এরূপ ক্ষেত্রে কলিকালে যে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ আছে তাহা অধিক দোষের জ্ঞাত, পূর্বযুগে যে পাপ হইত, কলিকালের সমুদ্রযাত্রা উত্তর দেশবাসীরই তর্কপেক্ষা অধিক পাপজনক হইবে—ইহা বুঝাইবার জ্ঞাই সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ এই অংশ আছে। এই আমার কথা। সে অধিক পাপ যে করিপ—তাহা আমি পুরণে স্পষ্টীকৃত, “সমুদ্রযাত্রাকারী যিহ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যাবহার্য্য হইবে না” ইহা আমি পুরাণ রচনের অর্থ।

আমি। (৪) অর্থ স্বীকার করিলে, বচন নিষ্ফল হয় কি না? তাহাও বলুন।

তর্করত্ন। পূর্বে বলিয়াছি পানীর সহিত অন্ততঃ কতিপয় লণু সমসর্গে কলিকালে পাপ নাই, সম্ভাবণ স্পর্শ এবং ধন গ্রহণ তাহার অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্রযাত্রাপাপে পানীর সহিত সম্ভাবণ, তাহাকে স্পর্শ করা এবং তাহার ধন গ্রহণ করা এই প্রকার আত্মীয়তা স্থাপন বা

সংসর্গ করিলেও পাপ হইবে ইহার জ্ঞাত “সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ” আছে, স্বতন্ত্রাং নিষ্ফল নহে।

আমি। উপপুরাণে যে কলিকালে সমুদ্রযাত্রা স্বীকার নিষেধ আছে—বোধায়ন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়াছেন, এবং কলিকালেই দেশাচার হেতু উত্তরদেশবাসীর সমুদ্রযাত্রায় দোষ নাই, ইহাও বোধায়নের অভিপ্রায়—এ কথা বলিলে তাহার উত্তর কি?

তর্করত্ন। “কুতে তু মানবা ধর্ম্মাঃ”—এবং “মহাবিপত্রীতা যা সা শ্বতিনী প্রশস্ততে” অর্থাৎ মনুস্মৃতি সত্যসূত্রের পালনীয়, কিন্তু অজ্ঞযুগের শ্বতিনী যদি মহ-বচনের বিরুদ্ধ-বাহিনী হয় ত তাহা প্রশস্ত হয় না। সেই মহ—‘সমুদ্রযাত্রা’ ত্রাণকে অপাঙ্কক্ষে বলিয়াছেন, অতএব সমুদ্রযাত্রা কেবল কলিকালে নিষিদ্ধ নহে। আর, বোধায়ন, “অথ পত্নীযানি সমুদ্রযানান্”—ইতিয়া বচনে পাপকণ্ঠের গণনা করিয়াছেন, তাহার সকল-গুলিই সকলযুগের পাপ—আর তাহার সহিত এক পর্যায়ে এবং সর্বপ্রথমে উল্লিখিত সমুদ্রযাত্রা কেবল কলিযুগের পাপ—এরূপ বলিতে যাওয়া একান্ত দুঃসাহস। আরও দেখ, দেশাচারবশতঃ উত্তরদেশবাসীর সমুদ্রযাত্রা দোষাবহ নহে—বোধায়নের এই কথা দ্বারা উত্তর দেশ যদি কলিকালে সমুদ্রযাত্রা-নিষেধের বন্ধনীয় ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইত, তাহা হইলে, দক্ষিণ দেশ ত অগ্রেই সেই বন্ধনীয় ক্ষেত্রমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত, কারণ তোমার মতে কলিকালের পূর্বে সমুদ্রযাত্রায় নিষেধ না থাকায়, সকলদেশেই ত সমুদ্রযাত্রার আচার থাকিবার কথা—বিশেষতঃ সমুদ্রকুলবাসী দক্ষিণদেশীয়দিগের আচার ত অধিকতররূপে থাকিবারই কথা।

পরজ্ঞ বোধায়ন যখন তাহা করেন নাই, তিনি উত্তরদেশের পক্ষেই দেশাচার বলিয়াছেন, তখন উহা, কেবল কলিযুগে নিষিদ্ধ নহে, চিরকালই নিষিদ্ধ বলিতে হয়, দক্ষিণদেশবাসীরা সে নিষেধ মানিতেন, তাই দেশাচার হয় নাই।

আমি। মহাশয়! চতীতে “শ্রিত্তিঃ পোতে মহাবর্ষে” আছে, মহাভারতে সমুদ্রযাত্রার কথা আছে, বিষ্ণুস্তোত্রে আছে “সমুদ্রযান-সিদ্ধিমাপোঃ” অর্থাৎ পূর্বাযানকক্ষে শ্রাঙ্ক করিলে সমুদ্রযানসিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রার অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়। আর অধিক কি যথেষ্ট আছে, রাধাপুত্র ভৃঙ্খা সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তদপেক্ষা উপপূরণ কি অধিক মাত্র?

তর্করত্ন। মহ এবং বোধায়নের কথা ভুলিয়া গিয়াছ—দেখিতেছি; তা হউক তোমার ভাবের অহবর্জন করিয়া তোমার ভাবাতেই বলিতেছি; ক্ষেত্রবিশেষে উপপূরণ অধিক মাত্র।

আমি। মহাশয়! বেদাদি অপেক্ষা যে উপপূরণ অধিক মাত্র—তাহা ত কখন শুনি নাই, বরং শুনিয়াছি,—

শ্রুতিশ্রুতিপুরণাণাম বিরোধো যজ দৃষ্টতে।
তজ্ঞ অন্তে শ্রাব প্রামাণ্যং তদনৈদ্বৈদে—

“স্বতীক্সর্যা”

শ্রুতিশ্রুতি-পুরণের মধ্যে বিরোধ হইলে শ্রুতি মাত্র, পুরণ ও শ্রুতির বিরোধ হইলে শ্রুতি মাত্র। আপনি বলিতেছেন—উপপূরণ অধিক মাত্র, অতএব ইহা বিশদভাবে আমাকে উপদেশ দিন।

তর্করত্ন। প্রথম বৃত্ত, বিরোধ কি? এক শাস্ত্রের আদেশ অমুসারে কার্য্য করিলে যদি অজ্ঞ শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করা হয়; তাহা

হইলেই বিরোধ বলিতে হয়। যথা—
 ঋতাব্যবস্থাপন বর্ষ বয়স্ক পণ্যস্ত্র ব্রহ্মচর্য
 করিবার বিধি স্মৃতিতে আছে এবং বেদে
 আছে ক্রমব্রহ্ম (যাহার বেশ স্ত্র হইয়া নাই)
 অর্থাৎ যুবাযুগ, নিজের পুত্র জন্মিলে, অগ্নি
 আধান করিবে। যদি কেহ স্ত্রতির আদেশ
 মাত্র করিল—৪৮ বৎসর ব্রহ্মচর্য করে; তাহা
 হইলে তাহার পক্ষে বেদের আদেশ লঙ্ঘন
 করা হয়, তাহার পক্ষে ক্রমব্রহ্ম থাকিতে
 পুত্র-জন্ম ও অগ্নি-আধান ত হইতে পারে
 না, পক্ষান্তরে স্ত্রতির আদেশ মাত্র করিলে
 ৪৮ বৎসর ব্রহ্মচর্য করিবার স্মৃতিশাস্ত্রকে
 বিধি বা আদেশ লঙ্ঘন করা হয়। এইরূপ
 স্মৃতি-স্মৃতি-বিরোধে স্মৃতি মাত্র, অর্থাৎ স্ত্রতির
 আদেশ পালনীয়। যাহার অজ্ঞ কোন কারণে
 অধ্যাপনের অযোগ্যতা থাকিবে, তাহার
 পক্ষে ৪৮ বৎসর বৈব্রহ্মচর্য হইতে পারে,
 নতুবা নহে। তবেই দেব স্ত্রতির সন্মোহ
 হইল। স্ত্রতির প্রবলতাতেই স্ত্রতির সন্মোহ
 এইমাত্র, পরন্তু একেবারে “ন শাস্তি” করিয়া
 উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না।

সেইরূপ উপপুরাণের সহিত যদি স্মৃতি বা
 স্ত্রতির বিরোধ হয়, তাহা হইলে উপপুরাণের
 সন্মোহ করিতে হয়। এখানে ত বিরোধ
 নাই।

আমি। আছে বৈ কি? উপপুরাণে
 সমুদ্রযাত্রা নিষেধ রহিয়াছে, বেদে সমুদ্রযাত্রার
 কথা আছে।

তর্করত্ন। কথা থাকতে আর নিষেধে
 বিরোধ হয় না। কথা থাকার নাম বিধি বা
 আদেশ নহে। বরং যে বিষয়ে বেদে স্পষ্ট
 বিধি আছে, উপপুরাণে তাহাও নিষিদ্ধ
 হইয়াছে; যথা—অশ্বমেধযজ্ঞ ইত্যাদি।
 স্মৃতিতে ক্ষেত্র-পুত্র-উৎপাদনের বিধি আছে

(মহু)। আদিপুরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে,
 দত্তক এবং স্ত্রির ভিন্ন পুত্র নাই, মহু
 অহুলোমজ্ঞা কস্তার বিবাহ বিধি দিয়াছেন,
 এই উপপুরাণে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে—অথচ
 সমাজে তাহাই প্রচলিত; এখানে স্ত্রি স্মৃতি
 অপেক্ষা উপপুরাণ তোমার ভাষায় কি “অধিক
 মাত্র” হইতেছে না? ফলতঃ কিন্তু ইহাকে
 “অধিক মাত্র” বলে না, কেননা এখানে
 বিরোধ নাই।

বেদের অশ্বমেধাযজ্ঞ বিধি এবং স্ত্রতির
 ক্ষেত্র-পুত্র বিধি ও অহুলোমজ্ঞা-বিবাহ-বিধি
 সমতাদ্রি যুগ্মত্বের পালনীয়, এবং তাহার
 লিখন কলিযুগে পালনীয়। এককালীন
 বিধি-নিষেধ নাই বলিয়াই বিরোধ নাই।
 উপপুরাণের প্রভাবের এই কালভেদ ব্যবস্থা
 হইতেছে, এই বলিয়া যদি বল উপপুরাণকে
 অধিক মাত্র করা হইয়াছে, তাহা হইলে আমি
 তাহা স্বীকার করি—তদনুসারে পূর্বের
 বিধিযাছি ক্ষেত্রবিশেষে অধিক মাত্র; ফলতঃ
 ইহা অধিক মাত্র নহে, সর্ব প্রমাণের
 সামঞ্জস্য মাত্র।

আমি। চণ্ডী, বিষ্ণুহুত্রে এবং বেদে যে
 সমুদ্রযাত্রার কথা আছে—তৎসম্বন্ধে আপনার
 সমাধান কি?

তর্করত্ন। সমুদ্রযাত্রা—পুরাণ, বিষ্ণুহুত্রে
 এবং বেদে আছে বলিয়া তাহাকে
 ঐতিহাসিক তথ্যরূপে, না শাস্ত্রের আদেশ-
 রূপে গ্রহণ করিতেছে?

আমি। শাস্ত্রের আদেশরূপে।
 তর্করত্ন। অমুক কাণ্ড করিবে এবং
 অমুক কাণ্ড করিবে না—এইরূপ বিধি বা
 নিষেধ না হইলে তাহাকে শাস্ত্রের আদেশ বলা
 যায় না। আদেশ না হইলেও কেবল ঘটনা
 দেখিয়া কর্তব্য নির্ণয় করা যায় না। যন-

ভগিনী যমী সোধারকে আপনার মনোভাব
 জানাইয়া ‘প্রণয়’ ভিক্ষা করিয়াছিলেন,—
 স্বদেশে ইহা আছে, তাহা বলিয়া সোধাদার
 সোধারক-নিকট ‘প্রণয়’ ভিক্ষা করিবে এতদ
 বিধি কল্পনা হয় না। চণ্ডীতে “হিতঃ পোতে
 মহাবলিবে”-আছে বলিয়া যে মনে করিবে
 পোতে সমুদ্রযাত্রা করিতে হয়, তাহা নহে।
 চণ্ডীতে বৈষ্ণব যে আপনার “পুত্রদানবিরন্তক
 ধনলোভাভ্যাসার্থিতঃ” শব্দলোভহেতু অসদ্ব্য
 পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল, তাহাতে কি
 বৃষ্ণিবে যে স্ত্রী স্বামীকে এবং পুত্র পিতাকে
 তাড়াইয়া দিবে। বিষ্ণুহুত্রে (৭৮ অঃ)
 সমুদ্রযাত্রা-সিদ্ধিলাভের কথা আছে।

এই অধ্যায়েই যদ্বীতে শ্রদ্ধা করিলে “যদ্যাপ
 দ্যুতবিষয়ং” (দ্যুতবিষয়ং) দ্যুতলাভের কথা
 আছে। অথচ দ্যুতকৌড়িক ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধা
 অপাঙ্ক্যেয়। যথা মহু,—
 জটিলকাননধীমানঃ কুর্ল্লবঃ কিতবং তথা
 যাজ্ঞযজ্ঞ চ য়ে পুণ্যং তাম্ভ্যং শ্রদ্ধে ন

ভোজ্যেয়ং ॥—৩য় অঃ ১৫১।

অধ্যয়নহীন ব্রহ্মচারিঃ দুষ্কর্মা, দ্যুতকৌড়িক, এবং
 অশ্বযাজ্ঞী ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধা ভোজনীয় নহে,
 অর্থাৎ অপাঙ্ক্যেয়।

“পিতা বিবদমানস্তি কিতবোমজগপত্যং”
 —মহু ১৫২।

আপনার অর্থে পরদ্বারা যে দ্যুতকৌড়ী
 সম্পাদন করে সে ব্যক্তিও অপাঙ্ক্যেয়।
 ব্রাহ্মণ সমুদ্রযাত্রাও অপাঙ্ক্যেয়, দ্যুতও
 অপাঙ্ক্যেয়। ইহা মহু বলিয়াছেন।

বিষ্ণুহুত্রে যখন সেই দ্যুতবিষয়লাভের কথা
 আছে, তখন সমুদ্রযাত্রা-সিদ্ধির কথা থাকিলে
 দ্বিবিধি কি? ফলতঃ যে সঙ্গল কাণ্ড সমাজে
 ধনলোভী ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা আচারিত হয়,
 ফলশ্রুতিরূপে তাহারই উল্লেখ আছে; পরন্তু

তাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কি বিহিত, তাহার
 বিচার ত সেখানে থাকিতে পারে না।

আমি। ঘটনার উল্লেখ দেখিয়া বিধি-
 নিষেধের অহুমান করা যায়, যদি সমুদ্রযাত্রা
 দুষ্কর্ম হইত, তাহা হইলে তাহা চলিত
 থাকিত না।

তর্করত্ন। দ্যুতকৌড়ীর কথা স্বদেশেও
 আছে, মহোত্তরতে ত তাহার চূড়ান্ত; তাই
 বলিয়া তাহাকে কি সংকল্প বলিবে? অথবা
 মহু দ্যুতকৌড়িকলে অপাঙ্ক্যেয় করিয়াছেন
 বলিয়া তাহাকে বেদের বিরুদ্ধবাদী বলিবে?
 বেদবর্ণিত ঘটনাকে কি ভাবে গ্রহণ করিতে
 হয়, তাহা—

“বিধিনা স্বেকবাক্যাবা” ইত্যাদি নীমাংসা-
 দর্শন ১ম অঃ, ২য় পাদ, ৭ম-সূত্রের ভাষ্য
 দেখিয়া বুঝিবে।

হুজ্রা পিতার আদেশে পোতে আরোহণ
 করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার
 পোতে জলময় হইয়াছিল, অশ্বিনীকুমার
 দেবতার গুণ করিয়া তিনি তাঁহাদের প্রদত্ত
 পোত প্রাপ্ত হইল। এই ঘটনা-বর্ণনার ফলে,
 বেদ-রোপিত বিধি এই হইল যে “পিতার
 আদেশে হুমায়া এবং হুমায়াহু কণ্ড ও কর্তব্য।”
 “স্বধর্মসাধন উদ্দেশ্যে ব্যতীত সমুদ্রযাত্রা কর্তব্য
 নহে” এবং “বিপদ ব্যক্তি বিপদ উদ্ধারের
 জন্ত দেবতার গুণ করিবে” অথবা “পোত-
 ভঙ্গে বিপদ ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারের গুণ
 করিবে।”

আমি। এই সকল বিধি বৈবাক্যে ঘটনা
 হইতে কেমন করিয়া স্থির হইল?

তর্করত্ন। সমুদ্রযাত্রা যে কষ্টসাধ্য এবং
 বিপজ্জনক, তাহা পোতভঙ্গ্যাপাণের কারণে,
 পিতার আদেশে সেইকাণ্ড পুত্র করিয়াছে,
 অতএব কাণ্ড যত কঠিনই হউক—পিতার

আদেশে তাহা পুত্রের অবশ্র কৰ্ত্তব্য—এই উপদেশ বের হইতে প্রাপ্ত হওয়া গেল। যাহা হুম্বজনক, যাহা বিপজ্জনক, সেসকল কার্যে ঘেষ হইয়া থাকে, ঘেষের ফল সেই কার্য হইতে নিবৃত্তি; পিতার আদেশ পালন ধর্ম, এইরূপ ধর্ম-অর্জনে উৎকট অহুসাগ না থাকিলে ঐরূপ কার্য হইতে নিবৃত্তিই স্বাভাবিক। এই ধর্মভাব হইতেই অশ্বিনী-কুমারী তবুে তুষ্ট হইয়া কুজ্যাক রক্ষা করেন। এই বর্নায় ধর্মদান-উদ্দেশ্য ব্যতীত সমুদ্র-যাত্রা করিবে না—এইরূপ নিষেধের প্রচার। নিষেধের ফল নিবৃত্তি। শেষোক্ত সামান্য বা বিশেষ বিধিরও সূচনা।

যে ভাবে বেবের মন্ত্রভাগ-হইতে বৈদিক বিধি-নিষেধের অহুমান করিতে হয়, সেই ভাব অবলম্বন করিলে বেদ সমুদ্রযাত্রার প্রতি-রোধকই হইয়া থাকে। বেদের এইরূপ ভাবই মহাবি মণ্ডলী গ্রহণ করিয়াছেন। কথিতরূপে সমুদ্রযাত্রাকারী বেদ-নিষিদ্ধ বলিয়াই মহা সমুদ্রযাত্রীকে অপাঙ্কুস্তেয় বলিয়াছেন। মহা-বচন বেদের বিরুদ্ধ ত নহেই, প্রত্যুত তাহার সমস্ত উপদেশই বেদে নিহিত; অথা—

“যঃ কচিৎ কচ্চচ্চিচ্ছো মনুনা

সম্ভুকীৰ্ত্তিতঃ।

স স্কোহভিহিতো বেনে সর্গজননময়ো

হি সঃ।”

এবং বেদার্থোপনিবন্ধ্যং প্রাচ্যতঃ

হি মনোঃ স্তম্ভঃ।”

আমি। মহাশয়! ঐ প্রকারে বিধিনিষেধ কল্পনা যাহাই হউক, আমি ঐ পথ পরিত্যাগ করিলাম। ঐতিহাসিক রূপেই দেখিতেছি যখন বেদ হইতে রাজতরঙ্গিণী পর্যন্ত সর্গভূই প্রমাণ আছে, বরষার সমুদ্রযাত্রা দেশে ছিল, তখন কল্য বর্জনীয় হইবে কেন?

তর্করত্ন। বেদ নিত্য। অপৌরুষেয় ইহা ধর্মশাস্ত্র-নীমাংসকের মত, তিনি বেবের ইতিহাসরূপতঃ অস্বীকার করেন, “পরন্তু শ্রুতি সামান্যতঃ” (নীমাংসাদর্শন ১১৩৭ সূত্র) দেখিবে। তথাপি নবীন ভাব অহুসর্জন করিয়াই বলিতেছি, বেদ হইতে রাজতরঙ্গিণী পর্যন্ত সর্গভূই ত অসঙ্করিততার কথা আছে, তাহারও ঐতিহাসিক তথ্যরূপে মূল্য কম নহে, তাই বলিয়া তাহা কি সমাজ প্রচলিত করিতে হইবে? অসঙ্করিততার মূল যেমন লোভ আছে, সেইরূপ সমুদ্রযান প্রকৃতি কতিপয় কার্যের মূলও লোভ আছে; প্রথমোক্ত কার্যে এক প্রকার লোভ এবং শেষোক্ত কার্যে অল্পপ্রকার লোভ, এই যা প্রভেদ। কিন্তু মনে রাখিবে, সংঘমে ধর্ম, অসংঘমে অধর্ম।

যত সমুদ্রযাত্রা ইতিহাসে আছে, তাহার মধ্যে ধর্মীয় যাত্রা অতি অল্প। ধনলোভে সমুদ্রযাত্রাই অধিক। যে ধনলোভ দ্বস্তর সমুদ্র তরঙ্গে মানবকে উৎসাহিত করে, তাহা অধর্ম নহে, তাহা জ্ঞান-প্রধান সংঘমী মানবের পোষণীয় নহে। রাজাদিগের ধর্মকাব্য সাধনাদেশে যে সমুদ্রযাত্রা তাহা তীর্থযাত্রার ছায়া জ্ঞানিবে। রাজস্বয়ং-সম্পাদন করিবার জন্তই পাণ্ডব সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তথাপি যে স্থানে যাইবার জন্ত স্থলপথ ও সমুদ্রপথ যিবিধ পথ বর্তমান, সে স্থানে ধর্মকাব্য-সাধনাদেশেও সমুদ্রপথ অবলম্বন কর্তব্য নহে। এইজন্যই কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন—

পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রভবেত্ব স্থলবন্দনা।
রঘু পারসীকাধিপদকে জয় করিবার জন্ত স্থলপথে যাত্রা করিলেন। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই স্থলপথে যাত্রার কথা কবি লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। আদর্শ ধর্মিক রথকে সাধারণ লোকের ছায়া চিত্রিত করা মহাকবির যে অকর্তব্য। অন্ততঃ সিন্ধুস্র এই, ধর্ম সাধনোদ্দেশ্য ব্যতীত সমুদ্রযাত্রায় পাণ্ডব সর্গভূগেই আছে। পরন্তু কলিযুগে সমুদ্রযাত্রাকারী ব্রাহ্মণরূপে অব্যবহার্য থাকিবে, অথবা ব্রাহ্মণের জাতিও প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অব্যবহার্য এইমাত্র বিচার্য বা জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে।

আমি। এ জিজ্ঞাস্যও আছে।

তর্করত্ন। অতঃ সে সম্বন্ধে উত্তর দিবার অবসর নাই, সমযান্তরে দিব।

আমি। কলিকালে সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ এত কঠোরতা যে হইয়াছে, এ বিষয়ে কি কোন যুক্তি আছে?

তর্করত্ন। যুক্তি নিষ্প্রয়োজন ও অপ্রচলিত, আজাই যথেষ্ট। তবে ভূমি জিজ্ঞাস্য, তোমার তৃষ্ণির জন্ত কিছু বলিতে হয়, তাই বলিতেছি সুন; যে সময়ে আমাদের সমাজস্থ বহু সামাজিক লোভে অভিভূত, স্বীয় ধর্মপ্রভাবে ধীশান্তরবাসীকে আকৃষ্ট করা দূরের কথা, তাগাদিগের আকর্ষণে স্বয়ং আপনাদিগের স্বল্পাবশিষ্ট ধর্মজ্ঞানেও জলাঞ্জলি দিয়া, অর্থ-কামের সেবায় আত্ম-নিয়োগে তৎপর, সেই সময়ে পুরাতন সমুদ্রযাত্রা নিষেধ অধিকতর দৃঢ়ভাবে প্রচারিত হইল। বর্তমান সময়ের হিন্দু সন্তানগণের লোভ আরও বাড়িয়াছে, ধর্মজ্ঞান স্বরতর হইয়াছে। এখন সমুদ্র-যাত্রার ব্যবস্থা প্রকারান্তরে জাতীয় জীবনের উচ্ছেদের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীপঞ্চানন কাব্যতীর্থ।

হিন্দু ট্র্যাঙ্ক

বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় শব্দের সমাস কি? রায়ে খয়ের ছায়া বিশ্ববিদ্যালয় শব্টিরও একাধিক সমাস হয়। বিশ্বের বিদ্যালয় অর্থাৎ যাবতীয় বিদ্যালয়সমূহের সমষ্টিরূপে একটা বিদ্যা-মন্দির কিংবা বিশ্বের বিদ্যার অর্থাৎ যাবতীয় বিষয় শিক্ষিবার একটা আলয় বা স্থল। বিশ্ব-বিদ্যালয় শব্টির আর একটা সমাসও করা যায়, যথা বিশ্ব-রূপে যে বিদ্যালয়। এই সম্বন্ধেই আজ ছ’এক কথা বলি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য দেখিতে পাই—বৎসর বৎসর পরীক্ষা-গ্রহণ, উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উপাধি ও পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। সংসাররূপে পরীক্ষা-মন্দিরেও

আমাদিগকে অনেক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, এখানেও গান-ফল আছে এবং এই গান-ফলের খেলা অহরহই চলিতেছে।

সংসারের যত দুঃখ ও প্রলোভন, এই বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের সমষ্টিরূপে একটা বিদ্যা-মন্দির কিংবা বিশ্বের বিদ্যার অর্থাৎ যাবতীয় বিষয় শিক্ষিবার একটা আলয় বা স্থল। বিশ্ব-বিদ্যালয় শব্টির আর একটা সমাসও করা যায়, যথা বিশ্ব-রূপে যে বিদ্যালয়। এই সম্বন্ধেই আজ ছ’এক কথা বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য দেখিতে পাই—বৎসর বৎসর পরীক্ষা-গ্রহণ, উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উপাধি ও পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। সংসাররূপে পরীক্ষা-মন্দিরেও

বিক্রিয়ক্কে যেষাম্ ন চেতাসিত তব দীর্ঘাঃ।”
“পাগল হরনাথ” * বলেন, যাত্রায় হুম্যান
সেক্কেও (অর্থাৎ সামান্য পার্ট লয়েও)
যারা লোক মুগ্ধ করিতে পারে, জানিবে
তাদেরই অভিনয়-শক্তি অনন্তসাধারণ। সঙ্গার
পরীক্ষাগার সম্বন্ধে এই পুস্তকের ৩৭ খণ্ড
১৪শ পৃষ্ঠা ও অন্ত্যন্ত স্থল দ্রষ্টব্য।

ভাল ছেলেরা কখন কখন স্বতঃপ্রসূত হইয়া
পরস্পরকে প্রেম করে, কে কোন শিখি ঠিক
করিয়া লয়, আপোষে লড়াই করার মত
এইরূপ উপায়ে আপনাদের বল বাড়াইতে
চেষ্টা পায়। এ সংসারেও কোন কোন
মহাপুরুষ কখন কখন যেচ্ছায় এইরূপ ছুঃখ
প্রলোভন বরণ করিয়া লন। রামগ্রন্থাদি
গাহিতেন “আমি নহি মা আটাশে ছেলে, ভয়
করি না মা চোখ রাঙ্গানো।” * প্রাতঃ স্মরণীয়া
কুন্তী দেবী বলিতেন, “ভ্রমণে পড়িলে ভগবানকে
বেশী বেশী মনে হয়, অতএব ছুঃখ ভগবানের
দয়ার দান।” প্রকৃত ভাল ছেলে যারা,
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে তারা সদাই
সমুৎসুক।

আবার, পরীক্ষার নামে অনেক ভাল ভাল
ছেলেরও মূঢ়কম্প হয়। জয়-পরাজয় কখন
কিছুপা হয় স্থিরতা নাই। এই সংসাররূপ
পরীক্ষাগারেও “মুনিরাজ মতিভদ্র” ঘটে, অজ্ঞে
পরে কা কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর
শ্রেণীর বালকগণের পরীক্ষাও কঠিনতর।
যিনি যে পরিমাণে কঠিন পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ
শিক্ষিত মহলে তাঁর তেমনই সমাদর। একটা

পাশ করা ছেলের চেয়ে চারিটা পাশ করা
ছেলের দর বেশী। এম-এ বা ইন্টেলিগেন্সি
পাস করার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর ছাত্রের
মধ্যে মধ্যাচার পার্থক্য আছে। ‘অরি-
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই বাচি সোনা বাহির
হয়। আধ্যাত্মিক জগতেও এই নিয়ম
বিদ্যমান। এ সংসারে অনেক নির্দোষী
অকারণে দণ্ডিত, অনেক গুণবান অকারণে
লাঞ্ছিত হন। রবীন্দ্রনাথ নিম্নগুণে ‘নোবেল
পুরস্কার’ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার
উপাধি লাভ করিলেন, ঠিক এমনই সময়ে
তাহার উপর বিদ্যা অপমানের কি পরিমাণ
বাড়ী না দিয়া গেল। তাহাকে সম্বন্ধনা-
উপলক্ষে তাহার অনন্তসাধারণ বিনয় ও
কবিত্বপূর্ণ প্রভুত্বের (হযত কৌতুক-
ভরেই) যে কদর বাহির হইয়াছে, তাহাতে
অকারণে তাহার মনে কত রেশই না প্রদান
করা হইয়াছে! কিন্তু এইরূপ সব অরি-পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা না থাকিলে আধ্যা-
ত্মিক রাজ্যেও ডাক্তার উপাধি লাভের উপযুক্ত
বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা বিরল। জীবনে
সকলকেই জ্ঞানদী পরিমাণে এইরূপ সব
অরিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, তবেই
শ্রীরাধিকার কলঙ্ক মোচন হয়, রামের সীতা
রামের নিকট সমাধা হন, ভগবানের
নিকট সাধকের আদর বাড়ে। সংসাররূপ
পরীক্ষাগারে যিনি যে পরিমাণে কঠিন পরীক্ষায়
সমুত্তীর্ণ, দেবগণের তিনি সেই পরিমাণে
প্রিয়প্রাপ।

* “পাগল হরনাথ” বা “শ্রীহরনাথের অপূর্ণ পরাবলী”। গ্রন্থিগ্রন্থ, “বৃহৎ”-সংস্করণকারী ২৪ নং
মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।

পরীক্ষায় পাশ হতে পারিলে, বাপ মা
প্রভৃতি গুরুজনের কত না আনন্দ। কোন
কোন ভাল ছেলে, ইহাদের মুখ চেয়ে
ইহাদিগকে আনন্দিত করিবার লোভে মন
দিয়া লেখা পড়া করে ও সাবধানে
পরীক্ষার পূর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া
নিজেরা ধজ হয় এবং আত্মীয়-স্বজন
সকলকেই কৃতার্থ করে। আধ্যাত্মিক
জগতেও যাহারা প্রকৃত সজ্জন, ভগবানের
সন্তোষ-সাধনই তাহাদের জীবন-ব্রত হয়,
অজ্ঞান দণ্ড-পুরস্কার-চিন্তা তাহাদের নিকট
মূল্যহীন, এবং নিজেরা মুগ্ধ হইলেও
অজ্ঞের মুখ চেয়ে সাদাচরণ বিসর্জন দেন না।
কোন কোন ছেলে মুগ্ধ বিদ্যার জোরে
পাশ হয়, ইহারা পরে তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে
পারে না। চরিত্র যতদিন প্রকৃত গঠিত না
হয় ততদিন বিশ্বরূপ পরীক্ষাগারে পাশ
হইতে পারিলেও বেশী কিছু কাঙ্ক্ষের হয় না।
ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে মুগ্ধ ভাল থাকা,
সেটা এইরূপ মুগ্ধ বিদ্যার জোরে পাশ করার
মত।

কোন কোন ছেলে মাফাই গায়ে যে,
সে প্রেমের উত্তর জেনেও একদম ইচ্ছা
করেই ফেল দেয়। এ সব ছেলের
অজিভাবকেরা এরূপ মাফাই শুনে সমুদ্র না
হইয়া দূর দূর করিয়া তাহারিগকে তাড়াইয়া
দেন। এ সংসারেও আমরা অনেক সময়
মাফা উচিত তাহা করি না এবং মাফা অশুচিত
তা হইতে বিরত থাকি না। কিন্তু তাই বলিয়া
এই সব থারাপ ছেলের মত নিজেরা বিদ্যা
মাফাই গাহিয়া মাফ হব অশা কবি, তা
হইলে আমাদের ভাগ্যেও অশুভ ফল প্রাপ্তি
হইবে না। মুগ্ধ জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে যত

বড় বড় কথাই কহিতে পারি বা শিখি না
কেন, পরন্তু তখনও এই বিশ্বরূপ বিদ্যালয়ের
অন্তর্ভুক্ত ছাত্র বলিয়াই পরিগণিত হইতে
হইবে।

পরীক্ষায় পাশ না হইলে প্রোমোশন নাই,
অজিভাবকের হাত থেকেও নিস্তার নাই।
যতদিন না পাশ হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-
দান জ্ঞান পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতে হয়।
তজ্ঞপ এই বিশ্বরূপ বিদ্যালয়েও যতদিন না
পাশ হইতে পারা বাইবে পুনঃ পুনঃ যাওয়া
আসা করিতে হইবে। এটা ব্রহ্মা, প্রকৃত
বুদ্ধিমান যিনি তিনি শীঘ্র মুগ্ধ পাশ হইবার
চেষ্টা পান, বারবার এই ভাবে যেন যাওয়া
আসা করিতে না হয়।

পরীক্ষা-পক্ষে পরের লেখা কপি করে কোন
কোন অথবা ছেলে পাশ হবার চেষ্টা পায় ও
ধরা পড়িলেই দণ্ডিত হয়। এই সংসাররূপ
পরীক্ষাগারেও সেইরূপ অনেক ধার্মিক না
হয়েও বহু ধার্মিক সাজিয়া সহজ উপায়ে
পাশ হইবার চেষ্টা পান, কিন্তু ভগবান ধরা
পড়িলে লাঞ্ছনার অবাধ থাকে না, তাহার
নিকট পরের লেখা নকল করে পাশ হবার
আশা বুঝা।

সব ছেলেরই কিছু পাশ হতে পারে না,
আপনাদের সাহায্যে ও দয়ায় অনেক ফেল
হওয়া ছেলেও উত্তর কালে স্থবী হতে সমর্থ
হয়। মুক্তিরও সেইরূপ একটা মাত্র রূপ বা
একটি মাত্র পথ নাই। যিনি অল্পদায়ের
উপায়, অগতির গতি, গুণবানের ভ্রাম্য
অধর্মেরও তিনিই ভরসা।

যত বড় ভাল ছেলেই হইলেক, পিতা মাতা
অধ্যাপক প্রভৃতি গুরুজনের কৃপাই তাহার
কৃতকাণ্ডিতার মূল। তবুদৃষ্টিতে আপনাকে
দেখিতে চেষ্টা পাও, নিজগুণের বড়াই

একবারে ঘূটবে। বৃষ্টিপাতারিবে, সমস্তই
“স্বা স্বাক্ষরেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিয়ন্তোহসি”

তথা কেরামি।” “স্বং বৈ প্রসন্ন ভূবি যুক্তি
হেতুঃ।”
শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

বক্রেশ্বর

প্রকৃতির ক্রীড়াংশ বীরভূমির উপর কত
শতাব্দী কত যুগ যুগান্তর অতিবাহিত হইয়া
গিয়াছে, তথাপি সেই বীরভূমি অজ্ঞাপিও
প্রকৃতির অতি প্রিয় নিত্য লীলা ক্ষেত্ররূপে
বিস্তারমান। হুপ্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ বক্রেশ্বর
সামারণের নিকট স্থাপিত; স্বাভাবিক
এবং ধর্মসংক্রান্ত দৃষ্টান্তালীর্ণ একত্র সমাবেশে
স্থানটি অতীব মনোরম; এতদ্ভিন্ন সর্ব-
ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতীয় মরনারীগণ বক্রেশ্বর
ধর্মনার্থ আগমন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ
পুরী বারাগনী যেরূপ বকনা এবং অসোনায়ী
নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পাপপঙ্কিল
পুষ্করি হইতে পৃথক ভাবে মুক্তি ক্ষেত্ররূপে
বিরাজ করিতেছে, বক্রেশ্বরক্ষেত্রও সেইরূপ
ছুটী স্বচ্ছলিলা তরঙ্গিণী দ্বারা উত্তর পূর্ব
এবং দক্ষিণদিকে পরিখাবেষ্টিত হইয়া
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যেন উভয়স্থানেই দেবদি-
দেব সান্নিধ্য পূর্ণ ভূমির কলি কল্মষময়
কালরাশ্বের সহিত সীমা নির্দেশ করিয়াছেন।
সত্য বটে, বিপুলায়তন বারাগনী নগরী
হৃদয় সৌন্দর্য্য এবং বিবিধ পণ্যবিক্রয়,
কাফকাব্য ভর্তি অগণ দেবালয় ও চতুর্দিক
দ্বারা পরিখাভিত হইয়া মহেশ্বর রাজধানীর
মহিমা এবং গৌরব ঘোষণা করিতেছে, এবং
তাহার মহোৎসবের সন্তোষ ও তুলনায় বক্রেশ্বর
ক্ষেত্র নিম্নতম স্থানে অবস্থিত অথবা সম্পূর্ণ-

রূপে অযোগ্য তজ্জাত এখানে যে সকল
স্বাভাবিক দর্শনীয় বিষয় আছে তাহা একবারে
উপেক্ষণীয় নহে। এতদ্ভিন্ন যেন মহিমাময়
মহেশ্বরের নির্জনাবাস প্রভু যোগেশ্বর যেন
এখানে নির্জনাবাসের সহিত বৈরাগ্য ও
যোগমগ্ন উপভোগ করিতেছেন। প্রকৃতির
নিভৃতান্তরণ্য অবস্থিত বলিয়া এই বক্রেশ্বর
ক্ষেত্র ‘গুহ্যতীর্থ’ (১) অথবা ‘গুপ্তকানী’
বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে।

এই তীর্থ ক্ষেত্রের পূর্ব ও উত্তরদিকে
বক্রেশ্বর নদ দ্বীপ গতিতে প্রবাহিত
হইতেছে; দক্ষিণাংশে পাপহরা নদী; তদ্ব্য-
নিতা শব সংস্কার হইয়া থাকে। চতুর্দিকস্থ
প্রায় আট দশ মাইল দূরবর্তী গ্রাম ও নগর
হইতে মৃতদেহ এখানে সংকারার্থ আনীত
হয়। পাপহরা যেন মহাকালের অনির্দমন
চিতায় জীবদেহলয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া
জীবজগতে নবরতা ও বিবেক বৈরাগ্যের
উপদেশ প্রদান করিতেছে। নদীর
পশ্চিমতীরে অর্থাৎ বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের
অব্যবহিত পূর্বাংশে একটি বিরল পাদপ
বনভূমি, বনের পশ্চিমাংশে বহুদণ্ডাক শিবালয়
পরিবেষ্টিত বক্রেশ্বর দেবের উন্নত মন্দির।
মন্দিরের দক্ষিণ দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আটটি
যোতরুণ, এই কুণ্ডগুলি হইতে উষ্ণ জল
বৃদ্ধাঢ্যকারে অবিরত প্রসৃত হইয়া পাপহরা

নদীর সহিত মিলিত হইতেছে। মন্দির-
প্রাঙ্গণেও শ্বেতগন্ধা নামে একটি জলকুণ্ড
আছে, এতদ্বিধ জীবকুণ্ড নামক আর একটি
যোগকুণ্ড আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই
যে, মন্দির জল শীতল। উষ্ণ কুণ্ডের
অব্যবহিত পার্শ্ববর্তী কুণ্ডের জল কি জল
শীতল, তাহার কারণ নির্দেশ ভগবৎজ্ঞের
পক্ষে অতীব সহজ, কিন্তু বিজ্ঞান-বিদগণের
পক্ষে বিষম সমস্যা। যোগকুণ্ড এবং

বক্রেশ্বর-দেবের অজ্ঞাত বহুদণ্ডাক শিবালয়
বক্রেশ্বর-মন্দিরের চতুর্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে
প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানে স্থানে মন্দিরবিহীন
অনেক শিবলিঙ্গও বিজ্ঞানময় রহিয়াছেন।

শ্বেতগন্ধা-কুণ্ডের উত্তর-পূর্বকোণে এক
প্রকাণ্ড বট (১) কুণ্ডের চারিদিকে কতিয়
বিহুলাঙ্গ প্রস্তরময় দেবমূর্তি ইত্যন্ততঃ
বিক্ষিপ্ত। দাঁড়িহাট নিবাসী শ্রীমুক্ত বাবু
হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহিত এই
পূণ্যক্ষেত্রে একটি মন্দির স্থাপন করিয়া ছুটী
শিবলিঙ্গ এবং একটি ‘কালীমূর্তি’ স্থাপন
করিয়াছেন। তিনি শুধায় মহায়াত্রার
নিত্যসেবা এবং অতিথি-সেবার ব্যবস্থা
করিয়াছেন।

এই তীর্থক্ষেত্র ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের
অণ্ডাল সাইথিয়া কন্ড লাইনের ছত্রাঙ্গপূর
স্টেশন হইতে ৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং
সিউজি স্টেশন হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে

১৩ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত; উভয়স্থান
হইতেই যাত্রীগণের ‘স্ববিধার’ জল্প হুপ্রস্তুত
রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দেখিয়া হইয়াছে।
দিশাছেন। প্রতিবৎসর শিবচতুর্দশীর সময়ে
এখানে সপ্তাহাবধি কাল ব্যাপিয়া মহাসমো
বসিয়া থাকে। সে সময়ে বহুদণ্ডাক স্থান
হইতে যাত্রিগণ ও সাধু-সন্ন্যাসিগণ বক্রেশ্বর
দর্শন এবং কুণ্ডস্থান জল্প আগমন করিয়া
থাকেন।

জৈলাক্যাদিপি বক্রেশ্বরাদিষ্টিত এই পবিত্র
গ্রাম ছুই ভাগে বিভক্ত। বক্রেশ্বর ও ভিহি
বক্রেশ্বর। এখানে অনেক দ্রাক্ষণের বাস।
তাঁহাদের অধিকাংশই বক্রনাথের সেবা ও
পাণ্ডাগিরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন।
ইহা ব্যতীত এ গ্রামে অজ্ঞাত জাতিরও বাস
আছে।

ক্ষেত্রের অবস্থিতি

এই পবিত্র ক্ষেত্রের অবস্থিতি সঘনো
ব্রহ্মাণ্ডপুরানান্তর্গত স্বয়ম্ভু সংবাদে উক্ত
হইয়াছে যে এই পরম পবিত্র বক্রেশ্বর
তীর্থক্ষেত্র ‘গৌড়দেশে’ অবস্থিত। একদিকে
পাপহরা, অত্রদিকে জাহ্নবী বেষ্টিত হইয়া,
বিশেষতঃ পূনাপ বক্রেশ্বর ক্ষেত্রকে বন্ধ
ধারণ করিয়া এই গৌড়দেশ পূর্ণাঙ্গ আধার
হইয়াছে। এই গৌড়দেশবাসী প্রজাগণ
সর্বগুণবান, ধর্মশীল, কুবেরসদৃশ দনী,

(১) এই বৃক্ষটি অক্ষয়বৃক্ক বলিয়া কথিত হয়। অতিশয় মূল হওয়ায় ইহার নামাল বা খুরি কুণ্ড
পূর্ণ করিয়া তলহ সমস্ত বৃক্ষই মূলমধ্যে নিহিত করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কামদেব, শ্রীমদেব, ব্রহ্ম এবং পুরাণোক্ত
অজ্ঞাত মূর্তিগুলি মূর্তিপোতর হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন সময়ে এই পবিত্রক্ষেত্রে আসিয়া এই স্থানে বিলাস
করিয়াছিলেন, কোনও জল সেই স্থানে চরণচিহ্ন স্থাপন করিয়া পবিত্র স্থানটিকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। একটি
মজারতর ও কানীমাজার বেড়ী এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

পরাক্রমশালী এবং সত্যবাদী। এই স্থানে প্রকৃত কুলীন ও লক্ষবর্ণ প্রভৃতি আছেন। (১)

ক্ষেত্রের উৎপত্তি

পুণ্ড্রক ব্রহ্মাও পুরাণে ক্ষেত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে অযোনি সম্ভব লক্ষী দেবীর স্বয়ম্বর সময়ে বৈকুণ্ঠে এক বিচিত্র সভা রচিত হইয়াছিল। (২) তথায় দেবশূন্য পরিবৃত্ত দেববাণ্য পুন্মবর, সশিখা মুনিগণ এবং অক্ষর ক্রিয়র প্রভৃতি সভাগমন পুণ্ড্রক বৈকুণ্ঠের বিপুল শোভা বৃদ্ধি করেন। আমন্ত্রিত মহোদয়গণের অভ্যর্থনার ভার বেবেজের উপর অর্পিত হয়। ক্রমে মুনিশ্রেষ্ঠ

লোমশ ও হরত সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেববাণ্য পাঠ্য ধারা অগ্রে লোমশ মুনির অভ্যর্থনা করিলে হরত অপরান বোধ করিয়া কোণে কথামতি লোচনে ইন্দ্রকে অভিপাণ দিতে উত্তত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তৈত্তিরোয় হওয়াতে তিনি তপোভঙ্গ ভয়ে শূন্য প্রভাবে নিরস্ত হইলেন। যদিও তিনি সম্ভাত কোথাকে প্রশমিত করিয়া শাস্তমুখি ধারণ করিলেন বটে, তত্ৰাচ ক্রোধান্ধিতা হেতু তাহার দেহে অষ্ট অংশে বক বিভক্ত হইয়া গেল। সেই অবধি হরত মুনি অষ্টাবক নামে জগতে বিদিত হইলেন। (৩) তিনি

- (১) গোঁড়দেশে নহং ক্ষেত্রঃ বজ্রেশ্বরঃ হৃদয়তঃ।
যমাদম্বশ্চৈবোপাশ্রিতঃ সর্গপাতকবান।
একদা পাপধারিণ্য। গান্ধার্য্য চ বিশেষতঃ।
বহিঃশব্দেব ক্ষেত্রেণ পুণ্ড্র্যো গোঁড়ঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।
গোঁড়দেশস্ত পঞ্চাশৎবর্ষনাম্।—
নানাগুণ-সম্যাকীর্ণাঃ যত্র সর্গে প্রাণাণ্যাম্।
নানাপুণ্যাপাণোক্তাঃ ধর্ম্মিনা ধনদোষনামাঃ।
বহুনা লক্ষ্যশাস্ত্র কুলীন্য। বহুবৃত্তা।
পরাক্রমশূভাঃ শূন্যঃ গোঁড়দেশ-নিবাসিনাম্।

বজ্রেশ্বর-আরাধ্যম্, প্রধনোংধ্যায়ঃ।

- (২) পুরা দেবদাম্ভাভ্যাস্ত নৃত্যামন্ত্রমুদেহরম্।
লক্ষী-স্বয়ম্বরে পুণ্ড্র্যো বৈকোণ্ঠিকাশ্রয়ঃ।
তত্র দেবান্ত গন্ধর্গাঃ মুখ্যঃ সিন্ধুভারগাঃ।
সমাজম্। পরাঃ উষ্ট্রঃ কমলগাঃ স্বরসরাঃ।
তত্ৰামরেশ্বরা দেবঃ শতীনাঃ পুন্মবরাঃ।
অত্র দূর্য্যো লোমশাশ্রয় পাণ্ড্যাবাসিন্যামকম্।
লোমশক মহারাজানঃ দুইট চ তপস্বীবানুনি।
হরতেন শরণেশ্বরাঃ তপোভক্তভগ্নাণুনি।
মহাকোপেন চট্টোত্তে বজ্রকমলমুদে।
অষ্টাবকভিষেকঃ ততঃ প্রাপি দ্বিজোত্তমঃ।

বজ্রেশ্বর-আরাধ্যম্, দ্বিতীয়োংধ্যায়ঃ।—

- (৩) বিবাকের প্রশংসা মগ্ধেন বাসু লিখিয়াছেন যে 'অষ্টাবক স্থবর্তির গর্ভে ও কাহ্নোড়ের উরুনে জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ধালকর কাছে কাহ্নোড় পানিবার পাঠ করিতেন। উদ্ধালক শিশোর সেবাভক্ষ্যার তুষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গে আপন একটা বস্ত্রের দ্বারা বিলে। স্থবর্তির অপর নাম হুতাভ। কিছুকাল পরে হুতাভ গর্ভবতী হইলেন। একদিন কাহ্নোড় পত্নীর কাছে বসিয়া বেগ পান করিতেছেন; সেদ্বাধারন করিবার সময় তাঁহার জন হইতে লাগিল স্থবর্তির গর্ভে সন্তান শিশুর সেই সকল জন্ম সম্বোধন করিয়া গিল। ইহাতে কাহ্নোড় কোপ করিয়া বলিলেন—এখনও তুমি স্তন্য দিও না। গর্ভে থাকিয়াই তোমার সন্তান এত কষ্ট, অন্তর তুমি অষ্টাবক হইয়া জন্ম লইবে। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে সেই শাপে তাহার শরীরের অষ্ট স্থান বন্ধ হইয়াছিল।—বিবাকোপ—অষ্টাবক ৬৩০ পৃ।

লক্ষ্যার অহতপ্ত হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ পুণ্ড্রক আর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন না করিয়া তীর্থপর্যটনে বহির্গত হইলেন এবং নানা বন, উপবন, মহেশীঠ, উপপীঠ ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া প্রথমে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বাবরাগ্রামে উপনীত হন-ও তাহার পশ্চিম প্রান্তভাগে শ্রীমা মুক্তিস্থাপন করিয়া কঠোর তপে নিযুক্ত হইলেন।

তপঃ প্রভাবে সেই স্থানে একটা কুণ্ড আবির্ভূত হয় ও প্রভা হইতে ভোগবতীর পবিত্র সলিল উৎথিত হয়। (১) কিন্তু অষ্টাবক তথায় দিল্লিলাত করিতে না পারিয়া অবশেষে বজ্রেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রাথমিক মুগ্ধ হইয়া গেল; তিনি দেখিলেন যে স্থানটা বিবিধ বনশ্রুতি সমূহে পরিশোভিত, এবং ব্রহ্ম শাস্তি ও নির্জন্মতার আধার হেতু সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগী।

হরত তথায় আশ্রম স্থাপন করিলেন।
প্রকৃতিই তত্ত্বজ্ঞান-অধ্যয়নসাধনার প্রধান শিক্ষক; হরত বনপাদপ রাজির নিকট হইতে সন্নিহিত, ক্ষমা এক আশ্রিতবৎসলতার জাঙ্ঘল্যমান উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন; কুশমিত-পুষ্পভার-সন্নিধানে পরসেবা এবং ঈশ্বরার্জন করিলেন, কৌমল্যলিতিকা-সংকালে, পরনির্ভরতা, আশ্রয়-নিষ্ঠা শিক্ষা করিলেন এবং কলকর্ষ বিহগ-সমীপে মিষ্টভাষিতা এবং সঙ্গীত সাধনা করিলেন। তিনি বনশ্রুতির

তায় সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইয়া, কৃশাশী বন্যরার তায় পরব্রহ্ম আশ্রয়নিষ্ঠর এবং অনভ্যাশ্রয় হইয়া স্বকর্ষ বিহগেশ্বরে তায় সামগান পুণ্ড্রক কুশমিত-ভারের তায় পুষ্পাঞ্জলি ভগবচ্চরণে অর্পণ করিতে লাগিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে তিনি এই মহাশিক্ষার স্থান আর পরিত্যাগ করিবেন না। অষ্টাবক এইরূপে চঞ্চল মনকে স্থির করতঃ মনোমার লতাভূষণে বসিয়া কঠোর তপে নিযুক্ত হইলেন।

অষ্টাবক বহুকালব্যাপী কঠোর তপস্যা করিয়া পার্শ্ববর্তীনাথকে তুষ্ট করিলেন। তোলানাথ তখন মুগ্ধ হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে "অধ্যাবধি তোমার পূজার পর আমার অর্চনা হইবে, তোমার নামেই আমার স্থিতি হইবে" (২) এবং এখন হইতে এই ক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত হইবে।" (৩)

ত্র্যাহকের এই আদেশ হইবামাত্র বিশ্বকর্মা দ্বারা নদীর পূর্বতটে অষ্টাবকের তপস্যা-স্থানে একটা হ্রদস্থ মন্দির নির্মিত হইল। তন্মধ্যে বিরাজিত বৃহত্তর পাষাণ লিপ-মুদ্রীত অষ্টাবকের ও ক্ষুদ্রতী বক্রনাথের। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণ-অংশে যে প্রস্তর-কলক খোদিত আছে তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই অংশটা বীরভূম্যধিপতি রাজা আশ্ব-জ্ঞানায় ঐশ্বর্যের দর্পনারায়ণ নামক ভৈরব মন্দির দ্বারা ১৬৮৫ সালিাবাহনে (১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে রক্ষিত

- (১) ই জলরাশিই যোতাকারে উত্তরবাহী দ্বারা প্রবাহিত হইয়া কিম্বদ্ব গিয়া গুর পূর্ণাভিমুখ অক্ষর মন্দির সহিত মিলিত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাহ আছে যে উক্ত কুণ্ড মধ্যে হর্গা কামিনীকেশ অভ্যাশ্রিত পাওয়া যায়।

- (২) "সত্যতঃ কুমন্ত্রকোৎসাহালোপোদ্ধিভুক্তঃ সপা।
কৃদ্য তথস্মাৎ চারুপাৎ মম চারু দ্বিত্যভিহং"।

—বজ্রেশ্বর-আরাধ্যম্, দ্বিতীয়োংধ্যায়ঃ।

- (৩) "ইগানীঃ সিদ্ধ পীঠস্ত লোকো যাতো ভবিষ্যতি।—

—বজ্রেশ্বর-আরাধ্যম্, দ্বিতীয়োংধ্যায়ঃ।

আরও দুইটা প্রস্তর-ফলকে হালধা ও সরাব নামক দুই সহোদরের নাম খোদিত আছে, এবং তাহা হইতেও এই অস্থিটি হয় যে, এই দুই ভ্রাতা মন্দিরের এই অংশ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আর একাংশে ১৬৭৭ খ্রিঃাব্দ (১৭৫৫ খ্রীঃাব্দ) অঙ্কিত, কিন্তু অপর্যাপ্ত। প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত সাল বেগিয়া মন্দির বা স্থানের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই; যেহেতু ভগ্নর জগতে কত ভাসিভেতে কত গড়িতেছে। বোধ হয় কালক্রমে মন্দিরটা ভাঙনশা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা সময়ে সময়ে সংস্কৃত হইয়াছে এবং এই সকল প্রস্তর-ফলকে সেই সকল সংস্কার-গণের নাম ও সময় অঙ্কিত রহিয়াছে। (১)

এই স্থ-উচ্চ দেবালয়ের উত্তরে ও পশ্চিমে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল ভক্তিমান সাময়িক যাত্রিগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাবক্র-প্রতিষ্ঠিত বক্রেশ্বরের মন্দির ব্যতীত ভগবানের অস্তুত লীলাপ্রকাশক কয়েকটা

উচ্চ প্রস্তর এই স্থানে বিরাজিত থাকিয়া স্থানের মাহাত্ম্য অধিকতর বদ্ধিত করিয়াছে। নিত্য প্রবহনশীল তপ্ত উৎসগুলিকে তত্ত্বাত্তা অধিবাসিগণ “কুণ্ড” বলিয়া থাকে; ইহার মধ্যে জল ফুটিতেছে এবং তত্পূরি ধুমণিধা সর্বদা আকাশমার্গে উখিত হইতেছে। বীরভূম জেলার কৃতপূর্ণ ম্যাচিষ্ট্রেট স্থানীয় সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, “পুণিবার মধ্যে যতগুলি উচ্চ উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের কোনটাই বক্রেশ্বর-প্রবরণের সহিত সমকক্ষ হইতে পারে না; এই সকল কুণ্ড সংখ্যায় আটটা এবং তাহাদের জলের উত্থাপ পরস্পর বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড নামক প্রবরণটা সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও তাপমান-বয়ে তাহার উত্থাপ ২০০° ডিগ্রী (ফারনহাইট) প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক কুণ্ডই চতুষ্কোণাকৃতি করিয়া নির্মিত এবং সমতল-ভূমি হইতে দশ ফুট নিম্নে অবস্থিত। সর্বাঙ্গ সোপানাবলীর সাহায্যে অবরোহণ করিয়া উচ্চ কুণ্ডের জলস্পর্শ করিতে পারা যায়।” (২) নিম্নে ঐ কুণ্ডের নাম প্রদত্ত হইল:—

(১) ১১০ খ্রীঃাব্দে ঠাণ্ডা স্থান তারিখে প্রকৃতধ্বংস পড়িত বিধাতোঃপ্রাণোঃ ক্ষীণক নগরপ্রাণ বহু বক্রেশ্বর নগর করিতে গিয়াছিলেন এবং তথায় মন্দির-দ্বার রাক্ত শূন্য এর প্রস্তর-ফলক হইতে “মরসিংহ” ও এই কয়েকটা নাম কথার উচ্চারণ করিয়াছেন, অপর্যাপ্ত এক অংশ (যে তাহা) পাঠ করা যায় না, এবং তৎকালীয় অক্ষরবন্দের মূলদেশে রক্ষিত একটা ব্রহ্ম হস্তোদীর মুদ্রা লেখা আবিষ্কার। সেই মুদ্রিতর উড়িয়াদেশীয় প্রাচীন মুদ্রিত সহিত সম্পূর্ণ সৌম্যপূর্ণ আছে। পাঠ্যতার কথা ও অপর্যাপ্ত উড়িয়াদেশীয় রক্ষণাধারের জার এবং তাহার মতে বক্রেশ্বরের মন্দিরটিও উৎসকদেশীয় মন্দিরের অধিকরণে গঠিত। এই সকল দেখিয়া তিনি অনুমান করেন যে, রাজবন্দ-রাজ পালেশ্বরবংশোদ্ভূতনগরপতি অঙ্গল ভান্ডের পুত্র নরসিংহের গোড়াময় মালিক কুশলী ইয়ুগাল থাকে পরাম্বর করিয়া লাহুড় (বর্তমান রাজনগর) অধিকার করিয়া মাংসপাতা বিস্তার করেন; তৎকালে তিনি এই বক্রদেশের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং উপরোক্ত প্রস্তর-ফলকে লিখিত “মরসিংহ” রাজপুত্রপুত্র নরসিংহের পিত্র অঙ্ক করেছেন। তিনিই তৎকালে বক্রেশ্বর মহাপ্রতি মুক্তি সাপনা করেন। নগরস্থ বাবু সঃপ্রতি যে ভগ্ন-মুদ্রিত লেখা গিয়াছেন সেটা নরসিংহের কবুর্ক প্রাতিষ্ঠিত মুদ্রিসংহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

(২)“Southward, the hot springs, to which this mass of buildings owns its renown, send skyward their clouds of sulphurous vapour. They are eight in number of varying temperature; that of the hottest, known as Agnikunda, is not far short of 200° Fahr. Each is enclosed in a cistern 10 ft. in depth and of dimension ranging from a square of 9 ft. to a rectangle of 75 by 30”. &c.....Skrine on “The Hot Springs of Bakreswar.”

(২) ফারকুণ্ড, (২) ভৈরবকুণ্ড, (৩) অগ্নিকুণ্ড, (৪) সৌভাগ্যকুণ্ড, (৫) জীবকুণ্ড, (৬) বক্রকুণ্ড, (৭) শ্বেতগঙ্গা, (৮) বৈতরণী। স্বর্ধাকুণ্ড নামে আরও একটা উৎস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার নাম পুরাণে লিখিত নাই এবং ঐক্লপ না থাকার কোনও কারণ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এই জগৎ অনেকেই এই উৎসটিকে আধুনিক বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সকল পবিত্র প্রবরণের দক্ষিণে সাতঘণ্টে, চন্দ্রশায়ের ও দামুশায়ের নামক তিনটা গৃহ-পুষ্করিণী আছে। (১) তাহাদের উৎপত্তির বিবরণ অতীতের গভীর গম্বীরে নিহিত হইয়াছে, তবে স্থানীয় পাণ্ডাণ বলিয়া থাকেন যে, এই সকল জলাশয় প্রতিষ্ঠাতাগণের নামাঙ্ক-সারে অবস্থিত।

উপরের লিখিত উচ্চপ্রবরণগুলির পুরাণাগত উৎপত্তির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

ভৈরবকুণ্ড—কল্যাণেশ্বর মহাপ্রলয়কারী মহাদেব কল্পদ্রুমস্থিত জিলাক সাংহার করিয়া

অশ্বপদদ্বয়ে সর্বত্রার্থে ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কোন স্থানে শাস্তি না পাইয়া অবশেষে বক্রেশ্বর-মহাপ্রাণে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় বহুতে একটা ক্ষুদ্র-কুণ্ড খনন করতঃ তাহাতে পাণহরার জল-নিষ্ক্ষেপ করিলেন এবং সেই জলে নিমগ্ন হইবামাত্রই তাহার সকল জালা নিবারণ হইল। সেই অবধি ইহা “ভৈরবকুণ্ড” নামে অভিহিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে এই কুণ্ডের জলে অব-গাহন করিয়া জিলাকপুঞ্জিত বক্রেশ্বকে পর্দন করিলে পুনরায় ভয়াবহ ম্যালয়ে বাইতে হয় না, এবং নিশ্চিত রাজস্বয়-মন্ডের ফললাভ হইয়া থাকে। (২)

জীবকুণ্ড—পুরাকালে “সর্ব” নামে এক ধর্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান ব্রাহ্মণ চারুমতি নামী তদীয় স্থলীলা সহধর্মিণীর সহিত একলা তীর্থযাত্রা করেন এবং পথভ্রষ্ট হইয়া এক শাপগদগুহ-মহারণে ব্যাকবর্জক আক্রান্ত ও নিহত হইলেন। পতিগতপ্রাণা চারুমতি স্বামী-বিয়োগে অতিমাত্র অশ্রীয়া হইয়া পড়িলে ঐক্লপ দৈববাণী হইল যে, “তীর্থোত্তম

(১)“To the southwest of these are a curious group of three tanks of various sizes, known as the Satkatuli, the Chandra Sayer and Damu sayer. Their origin is lost in the mists of time; but the attendant priests own that they are named after donors by whose expense they were excavated.”—Skrine on “The Hot Springs of Bakreswar.”

কিন্তু চন্দ্রশায়ের সংক্ষেপে প্রবাহ এই যে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে চন্দ্রকুণ্ড বা চন্দ্রকুট নামে এক নগরপতি অকলেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন কুশুম্বলে পরে চন্দ্রপুরে রাজধানী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কুশুম্বল গ্রাম সিংহিষ্ট নগর হইতে উত্তরে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং উহা হেতুনপুরের মহারাজ বাহাদুরের জমিদারীভুক্ত; চন্দ্রপুর গ্রাম বক্রেশ্বর তীর্থের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই চন্দ্রকুট নগরপতি দ্বারা চন্দ্রশায়ের খনিত হয় এবং চন্দ্রপুর গ্রামও তাহার নামানুসারে আখ্যাত হইয়াছে।

(২) “তোমার মাসি সিংহিষ্টায়া সংকটপ্রিয়মানস।
তদা পানী-মুদ্রতা বানঃ কুপ্তং বিকল্পতঃ
দৃষ্ট বক্রেশ্বরং দেবঃ তত্র সৈলোচ্চপুষ্কিতঃ
যদস্য সর্গনঃ নৈতি পুনঃ পানী ভয়াবহম।
বাক্যশেষমক্ষণাংপি লভতে নাস্য লম্বকঃ
—বক্রেশ্বর মহাশাস্ত্র—তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

বকেশ্বর ক্ষেত্রের মন্দিরের পশ্চিমাংশে যে অমৃতকুণ্ড আছে, শুদ্ধচিত্ত হইয়া তাহাতে মৃত স্বামীর অস্থি নিক্ষেপ করিলে তাহার স্বামী পুনর্জীবিত হইবেন, এবং তৎপরে তাহার বংশ ও সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে।" দৈববাণীর উপর নির্ভর করিয়া চাকমতি ভরিত গতিতে বকেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়া দেবদেব-প্রদর্শিত কুণ্ডে ভক্তি-সংস্কারে স্বামীর অস্থি নিমজ্জিত করিলেন, তাহাতে সর্গ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি এই উৎস জীবিতকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই কুণ্ডের নামান্তর সম্বন্ধে পুরাণে আর একটি বিষয় আখ্যাত আছে। মহামুনি অম্বিরার পুত্র বৃহস্পতির তারা নামে এক জর্ঘা ছিলেন। চন্দ্রদেবের সহিত তারার অবৈধ সম্বন্ধ সম্মতন-হয়। এই কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে বৃহস্পতি সন্কোচে নিশানামকে সমুদ্র সমরে আব্রাহ্মন করিলেন এবং যুদ্ধকালে ভূতগণ সহ ভূতনাথ ভবানী-পতি বৃহস্পতির সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। মহাহবে কোণোমস্ত পিনাকীর দারুণ শূলবিদ্ধ নিশানাম উমাপতির চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। আশুতোষ তাহাকে বকেশ্বর-ক্ষেত্রে তপস্তা করিয়া সর্গপাপ হইতে মুক্ত হইবার আদেশ দেন। শশাঙ্কশেখরের অহুজাক্রমে শশাঙ্কদেব এই মহাতীর্থে দশ

সহস্র বৎসর কাল কঠোর তপস্তা করিয়া পাপ-মুক্ত হইলে, তখন একটি কুণ্ড দেখিতে পান এবং অমৃতের দ্বারা পূর্ণ করতঃ শব্দর-অর্চনায় লক্ষ্যসিদ্ধ হইয়া জিহবে গমন করিয়াছিলেন। সেই অবধি “জীবকুণ্ড” “অমৃতকুণ্ড” নামে নামান্তরিত হইয়াছে।

মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীতে এই কুণ্ডে দান করতঃ শুদ্ধচিত্তে ভীষ্মদেবের তর্পণ করিলে অশ্বমুখ্য ও জ্ঞপহত্যাভজিত পাপ ও মৃত-বৎসাদি পোষ এবং অজ্ঞাত বহুবিধ পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা পুরাণে কথিত আছে। (১)

অমৃতকুণ্ড—দৈত্যভাগ হিরণ্যকশিপু নারায়ণ-বিষেযী হইলে দণ্ডহারী মধুসূদন নরসিংহ-অবতারে তাহাকে বধ করিলেন, কিন্তু ভগবানের এত অন্তর্দাহ ও মনস্তাপ জন্মিল যে, তিনি উন্মাদের দ্বায় জিহুবন পরিভ্রমণ করিয়াও সেই অনশ্বাস্তির নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যিনি ত্রিতাপহারী, নির্দ্বন্দ্ব ও নিরঞ্জন তিনি তাপের প্রত্যাপে কিরূপে তাপিত হইবেন? ব্রহ্মাণ্ডপুত্রাঙ্গগত ঐ স্কোকেসের মর্ম এইরূপ অশুভব হয় যে, জীবগণ তাহাদের সংস্কার ও কুর্খম নারায়ণ-চরণে সমর্পণ করিয়া থাকে, এই জন্মই পুণ্ড্রে এই সকল কুর্খম-জন্মিত তাপ সৃষ্টির আদিকাল হইতে ভগব-চরণে পুরীকৃত হইয়াছিল। এক্ষণে হিরণ্য-

কশিপু বধে তাঁহার পুরুষপ্রমাণ তাপ অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় ত্রিবিদ্যারার্ণা লীলাময় স্নেহেণ তপস্তাচ্ছলে বারাগনী ক্ষেত্রে মণিকুণ্ডল ধরাইয়া “মণিকর্ণিকা” তীর্থ-মাধ্যাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ “বকেশ্বর-মাধ্যাত্ম্য” চর্যারে প্রচার করিবার জ্ঞাতাপ-নিবারণচ্ছলে এই কুণ্ডে অবগাহন করিলেন এবং সর্গজালা বিনিমুক্ত হইয়া মন্ত্যাজীবের ত্রিতাপ-হস্ত্য-মানসে এই কুণ্ডে নিম্ন তেজঃ স্পর্শ করিলেন। বিদ্যুৎতেরে কুণ্ড জলিয়া উঠিল। কত গৃহগৃহান্তর অতীত হইয়াছে, পৃথিবীর কত পরিবর্তন ঘটয়াছে, কিন্তু এই কুণ্ডস্থিত জলের জ্বালাময় প্রবাহ এখনও সমভাবে বিগমান। সেই কারণে ইহা অমৃতকুণ্ড (১) নামে সর্বত্র বিদিত। বৈশাখ মাসে পৌর্ণমাসী তিথিতে এই কুণ্ডে পিও প্রদান করিলে পিতৃপুরুষগণ বধ বধান্তর ভুট হইয়া থাকেন। (২)

ব্রহ্মকুণ্ড—একদা দেব প্রজাপতি ময়গ-পীড়িত হইয়া স্বীয় কভার প্রাতি চটাকপাত

করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া শব্দর ক্রমমুগ্ধিতে তাঁহাকে বাণবিক করেন। ব্যথিতদুঃখ ও অশ্রুতঃ প্রব্ধা বকেশ্বর-তীর্থে গমনপূর্বক এই কুণ্ডে গুণ্ড খনন করিলেন এবং তাহাতে মৃত-সম্বোধে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া “ত্র্যম্বক” মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিশেষভাবে অতিবাহিত হইলে উমানাথ প্রসন্ন হইয়া প্রজাপতিকে সর্গপাপ হইতে বিনিমুক্ত করিলেন। ব্রহ্মার নির্ধিত বলিয়া এই কুণ্ড “ব্রহ্মকুণ্ড” নামে অভিহিত। ইহাতে দান করিলে ব্যতিচার জনিত সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। (৩)

শ্বেতগঙ্গা—সত্যযুগে শ্বেতনামে (৪) এক পুণ্যবান নরপতি তদীয় রাজধানী মঙ্গল-কোট (৫) হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী বকেশ্বরে আসিয়া প্রত্যাহ বক্রনামের অর্চনা করিতেছেন। তদধর্ম উক্তবৎসল অনাদিদেব সম্ভট হইয়া তাঁহাকে বরণনে প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্বেত নরপতি প্রণিপাত করিয়া এই পবিত্র ক্ষেত্রে স্বীয় নাম প্রচারিত হইবার এবং অন্তে ঐ

(১) ইহার অপর একটা নাম জলাকুণ্ড।—

ততোষামিতকুণ্ডেভক্তি জলাকুণ্ড ইতি শ্রুতঃ।
—বকেশ্বর মাধ্যাত্ম্য তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

(২) “শৈলোবাঃ পৌর্ণমাসীকো মনোভাঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তত্র ব্রাহ্মঃ প্রসূকীতঃ তৃষ্ণিঃ পিশুণ্যবিকী।
জলাকুণ্ডং সমুদ্র তাতঃ গাগে বিলোকিত্ব।
বিস্কৃতঃ সর্গপাপতোষাঃ বিদ্যুৎসংকটঃ স সমুদ্রিতঃ।
বহিঃ সাক্ষাতঃ ততঃবৎসলঃ পাপসংকটম্।
পুষ্ণাকৃতকঃ স্রুগীক ন বহুতোষ পাকঃ।”
—বকেশ্বর মাধ্যাত্ম্য, তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

(৩) ব্যতিচারকৃতো দোষো ব্রহ্মকুণ্ডে বিনশতি।

—বকেশ্বর মাধ্যাত্ম্য, চতুর্থোধ্যায়ঃ।

(৪) বাগ্নাভার পুরাণ-প্রমোদী শ্রীকৃত পরব্রহ্মণ্ড বদ্যোপাধার মহাশয় লিখিয়াছেন “কানের বিদ্যাতী প্রভাবে বকেশ্বর কিল্বিদেবের মন্ত্র জগৎপ্রতিষ্ঠা পূর্ণ হইয়া অগ্রকট হইলে মঙ্গলকোটের বেতনামক জৈবক রাজা বকেশ্বর-মাধ্যাত্ম্য পুণ্ড্র প্রচার করেন এবং তাঁহার সময় হইতেই এই পবিত্র স্থান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। বেত নারক নরপতি সর্বত্রঃ চতুর্ধ কি পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ধমান ছিলেন।” কিন্তু ত্র্যম্বক-পুরাণে বেত-রাজাকে সত্যযুগের লোক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; অর্থাৎ—“রাজা কৃত যুগে আসীন...”

বকেশ্বর মাধ্যাত্ম্য, পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

(৫) এক্ষণে মঙ্গলকোট গ্রাম বর্ধমান জেলার অবস্থিত—বকেশ্বর-মাধ্যাত্ম্য, ২৪ পৃষ্ঠা-কো—

(১) “নামে দানি সিতপকে রাষ্ট্রী নামাধর্ম্যঃ।

তদ্মিন্ তীর্থে তদ্রকমুজ্জ্বতা তীর্থ বর্ধনে।
তপসেঃ পরমভক্তাঃ জগাচ্ছলি তদেন চ।
দৈবায়ম্পর্গা-পোহাঃ সাক্ষাতি প্রবাহ্য হি।

অপূজ্যঃ জন্ম দখ্যঃ সমাভ্যুতী জীবধর্মণে।
মন্ত্রোদ্যানে যে বিজ্ঞাঃ তপঃপাণ্ডি সমাধিঃ।
শতধা কৃতঃ পাণ্ডাঃ তৎক্ষণাৎ নশাতি ত্র্যম্বকঃ।
জীবনোষ্যে কুণ্ডবধে কুশাগ্রে দর্শি সেনঃ।
কুণ্ডাং সংযতুজিহাঃ ন বদ্যায়ম্পর্গাভ্যেহা”
—বকেশ্বর-মাধ্যাত্ম্য, তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

শ্রীচরণপ্রাণে আশ্রয় পাইবার কামনা করিয়া
ছুইটা বর প্রার্থনা করিলেন।

বহুনাথ "তৎপাশ্বে" বলিয়া ভক্তের মনোবাণী
পূর্ণ করিলেন এবং সেই অবধি এই কুণ্ড
"শ্বেতগঙ্গা" নামে প্রচারিত হইল। ইহার
জল গঙ্গাজলতুল্য পবিত্র, অশেষ পাপ হরণ
ইহার মাহাত্ম্য। মহাদেবের অতিপ্রিয় কুণ্ড
বলিয়া ইহা তাঁহার মন্দির সরিকটে অবস্থিত
ও প্রত্যহই এই পুণ্য বারিতে তাঁহার
অবগাহন হইয়া থাকে। মাঘ মাসে এই
সলিলে স্নান করিলে সৰ্বপাপ বিনষ্ট হইয়া
যায়। (১)

ক্ষারকুণ্ড।—পুরাকালে লবণসাগর অগন্ত্য
মুনির নিকট ভীত হইয়া এই তীর্থে আশ্রয়
গ্রহণ করেন। সেই সময় এই কুণ্ড ক্ষার-
মিশ্রিত হইয়াছিল বলিয়াও তদবধি এই
উৎসকে ক্ষারকুণ্ড বলিয়া থাকে। আঘাত
মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহার জলে স্নান
করিলে প্রলয়কাল পর্যন্ত স্বর্ণগাত হইয়া
থাকে। (২)

সৌভাগ্যকুণ্ড—ভীষকুণ্ডের দক্ষিণে
সৌভাগ্যকুণ্ড অবস্থিত। শব্বরের অশ্ব ও
মহামায়া উমাদেবীর শ্বেদ হইতে ইহার
উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে স্নান করিলে
সৰ্বপাপ বিমুক্ত হইয়া লোকের সৌভাগ্যের
উদয় হয়। (৩)

বৈতরণী—ব্রহ্মকুণ্ডের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে
পুণ্যতোয়া বৈতরণী বিরাজিত। শুষ্কচিত্তে
এই কুণ্ড অতিক্রম করিলে জীব অনায়াসে
শমন-শাসন হইতে অব্যাহতি লাভ করে।
বজ্রেশ্বর নদীর দক্ষিণদিকস্থ স্রোত "পাপহরা"
নামে অভিহিত। আদিকালে মেদিনী
মহাপ্রাণয়ে মর হইলে সৃষ্টিকর্তার যাবতীয়
সৃষ্ট বস্তু লোপ পাইয়াছিল। তখন সৃষ্টি
প্রকরণের জন্ত প্রমাণপতি ও কল্পদেবের
মধ্যে বাদাধ্বাব চলিতে লাগিল। কোম্পে
জ্যৈষ্ঠ উগ্রমুখি ধারণ করিলে অচিরে তলীয়
মুখ হইতে এক ভৈরব নিঃসৃত হইলেন এবং
পঙ্কানন ভীষকে ব্রাহ্মার একটা মুণ্ড অবিলম্বে
নখাঘাতে ছিন্ন করিতে আদেশ করিলেন।
প্রভুর আজ্ঞা তদুত্তরে পালিত হইল, কিন্তু
ব্রহ্মহত্যা করিয়া ভৈরব শাস্তিহারা হইলেন;
তাঁহার মন সৰ্বদা পাপাঘ্রিতে দগ্ধ হইতে
লাগিল। চিত্ত স্থির করিবার জন্ত তিনি নানা
তীর্থে ও আশ্রমাদিতে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু
কিছুতেই স্বধ্বংসালীর উপশম না হওয়ায়
অবশেষে শিবমুখ বজ্রেশ্বর বাসিয়া চন্দ্রমৌলির
কঠোর আশ্রমাদি করিলেন। আত্মতোয়া তৃপ্ত
হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে, তোমার
ছুই বস্তু মতদূর প্রসারিত হইয়াছে ততদূর
সর্পাকাল প্রবাহিত হইয়া পুণ্যসলিলা পাপহরা
নাম্নী নদী তোমার নামের চির যোগ্য করবে

এবং ইহাতে অবগাহন করিলে ব্রহ্মহত্যা
জনিত পাপ মোচন হইবে ও অমৃত বহাদি
ফললাভ হইবে। (১)

স্মৃতিরিক্ত দৃষ্টাবলী।
প্রবাদ আছে যে প্রায় ২০০ শত বৎসর
পূর্বে এই পবিত্র বজ্রেশ্বর-ক্ষেত্রে মানগিরি
নামক এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন।

মানগিরি গৌঁসাঞীর সমাধি
তিনি এই স্থানেই যোগসিদ্ধ হইয়া
জীবিতাবস্থাতেই সমাধি গ্রহণকরতঃ
৬কাশীধামে পুনরাবস্থিত হন এবং তথায়
জৈনক বজ্রেশ্বরের পাণ্ডাকে দেখিয়া আশ্রম
করেন যে, তাঁহার বজ্রেশ্বর-ক্ষেত্রের
সমাধিস্থলে অচিরেই একটা শিবলিঙ্গ স্থাপন
করিবে। ঐ সমাধি-স্থানের মৃত্তিকা শুল-
পীড়িত ব্যক্তিগণ তথায় গিয়া ভক্তি সহকারে
ভক্ষণ এবং উদরে লেপন করিলে তাহাদের
গীড়া ও বেদনার অচিরে উপশম হইবে।
ফলতঃ ঐশ্বর্য (মৃত্তিকা) গ্রহণ কালে এক
ভোত কৌপীন মানসিক করিয়া ঐ সমাধির
উপরে প্রদান করিলে। মচরাচর অনেক
বৌদ্ধকে ঐরূপে প্রত্যক্ষ ফললাভ করিতে
শুন্য গিয়াছে। এই সমাধি-মন্দিরটা
শ্বেতগঙ্গার উত্তরতট-সংলগ্ন, ঐ তটস্থিত

বাধা-ঘাটের বামপার্শ্বে অক্ষয়বট-বৃক্ষের নিকট
অবস্থিত।

গুহা।

বহুকাল পূর্বে রুণ্ণগিরি নামক এক
যোগী এই বজ্রেশ্বর-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া
যোগ সাধন করিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে
যে, একদা বজ্রেশ্বর নিবাসী জৈনক পাণ্ডার
একটা বৃদ্ধাকার বৃষ নিরুদ্ধেশন হইলে
যোগিবরের আশ্রমে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার
অঙ্গীকার করিলে তিনি তিনটা অঙ্গুলি
ফোটক (ভুড়ি) দিবা মাত্রই এই গুহা হইতে
বৃষটা বাহির হইয়া পড়ে, গুহাটা বজ্রেশ্বর-
দেবের ও জগদ্বাধ্যায়া মহিমমন্দির-দেবীর
মন্দিরের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য
প্রায় চারিহস্ত, প্রস্থ সার্কিহস্ত এবং উচ্চও
প্রায় ইহা সার্কিহস্ত।

ভৈরব-বেদী ও শালালী-বৃক্ষ

শ্বেতগঙ্গার অনতিদূরে পশ্চিমোত্তর কোণে
একটা অতি প্রাচীন স্বরূপ শালালী বৃক্ষের
পাদমূলে নান্নি-উচ্চ ইষ্টকনির্মিত গোলাকার
বেদীর উপরে ভৈরবের এক প্রতিমূর্তি আছে।
উহা স্থানে স্থানে ভর হওয়ায় পূজাপার শ্রীকৃষ্ণ
বাকী বাবা (২) তাহা উত্তমরূপে সংস্কার

- (১) যাবৎ প্রমাণ্য বাহু দৌ তপস্কৃতং মহামতে।
সর্পাকারে শিবকেশে নরী পাপহরাত্ত তঃ।
আনিন্দোপবতী গঙ্গা সা চ পাপহরা ভক্তা।
তব ব্রহ্মবনপাশঃ বিলম্বঃ যতঃশমশমঃ।
ব্রহ্মহত্যা দি পাপানি যানি যানি কৃতানি চ
তানি সন্ধানি নষ্টন্ত ত্বেন পাপহরা বেদাঃ।
—বজ্রেশ্বর-মাহাত্ম্য, দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

(২) ইনি একজন সাধক পুংসব। ইনি সপ্তবিধের উচ্চল বায়ুসম্মে বাস করিতেছিলেন এক্ষণে কলিকাতায়
থাকিলেও অধিকাংশ সময় এক জেলায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বয়স ক্রিষ্টাব্দ ৮০। অতি
প্রাচীন লোক যুগেও শুনা যায় যে তাঁহারও ভীষকে বাল্যকাল হইতেও প্রায় ঐরূপ বৈদিক অবস্থার দেখিয়া
আগিলেন। তিনি ব্রহ্মবেদ ভক্ষণ করেন বলিয়া লোকে ভীষকে "খাঁকী বাবা" বলিয়া থাকেন। তথাহী
তিনি যখন অঞ্চল এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বিবাহ হইয়া থাকিলেন বলিয়া তিনি এক জেলায় সেটা বাবা
নামেও পরিচিত। ইনি গোপপুর রাজবংশের বংশীয় ব্যক্তি।

- (১) "মামে মাদি কুহপানঃ ততঃ সৰ্পাঘনানশন।"

—বজ্রেশ্বর মাহাত্ম্য, পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

- (২) "তদ্বাৎ তৎক্ষণাতঃযোগাৎ ধারকৃতঃ প্রতিক্রিষ্টঃ
তৎক্ষণা শিরসা দৃশ্য নঃঃ পাপাৎ প্রমুক্তাৎ।"

—বজ্রেশ্বর মাহাত্ম্য, ষষ্ঠোধ্যায়ঃ।

- (৩) "সৌভাগ্য কুণ্ডঃ বিখ্যাতঃ সৰ্পপাপ প্রমোচনং"

—বজ্রেশ্বর মাহাত্ম্য ষষ্ঠোধ্যায়ঃ।

করাইয়া দেবীর সমুদ্রে একখণ্ড প্রস্তরের নিজে নাম খোদিত করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞে পতিনিষ্ঠা-ঋণে সমস্ত দেহত্যাগ করিলে মহাদেবের হৃদয়স্থ পত্নী-দেহকে উদ্ধৃত্ত হইয়া উদ্ভাসিত বিকট তাড়নে চরাচর সন্মোহিত করেন। তখন সহসা প্রলয়কারী কল্লভেজ পৃথিবীকে পীড়িত করিয়া শূন্যদেশ সমাক্ষর করিতে থাকে। তদর্শনে দেবগণ সাতকে বিস্ময় শরণাগন হন। নারায়ণ হৃদয়-চক্রে সত্যদেহ একপক্ষাংশ অংশে বিভক্ত করতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করিলে ঐ বিভিন্ন অংশ যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহা এক একটা পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। বক্রেশ্বরে দেবীর ইন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ মনঃ (জন্মস্থান স্থান) পতিত হওয়ায় এই পৃথালুই মহাপীঠ-স্বরূপে চিরপুজিত। এখানে দেবী মহিষমর্দিনী ও মহাদেবের 'ভৈরব-বক্রেশ্বর'। (১) এই জন্ম এই স্থানটীর নাম বক্রেশ্বর হইয়াছে। এখানে শূগাল, কুঙ্গুর ও গুহাধির পরম্পর মিশ্রভাবে শব-ভক্ষণ দর্শন করিলে বিশ্বাস্যতাই হইতে হয় এবং ভূতভাবান ভবাঙ্গী পতির প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চ-

হারা হইতে হয়। ফলতঃ এরূপ ঐশিক লীলার প্রত্যক্ষদর্শন তীর্থক্ষেত্র অত্র সুখ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় কি না সন্দেহ।

অধুনা কৈবল্যনিক পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষা এবং গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অস্তঃস্থল তরল উষ্ণ দ্রাব্যে (Soda) পরিপূর্ণ, এজন্য অত্যন্ত উত্তাপময়। ভূগর্ভের বালুকাধারে যে জল সঞ্চিত থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থান হইতে প্রস্রবণ আকারে বহির্গত হয়। উভয় সিদ্ধান্তই প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসিদ্ধ। ধরণীতল সঞ্চিত জলই ভূগর্ভে উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া উষ্ণপ্রস্রবণের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বক্রেশ্বর তীর্থের নিকটবর্তী কুণ্ডগুলির জল সম উষ্ণ নহে কেন? আর একই স্থানে শীতল এবং উষ্ণ জলের প্রস্রবণ কিরূপে সম্ভব হইল? আর এই সকল কুণ্ডগুলি প্রায় ভূমিভাগের সমতল, কিন্তু ঐ গুলির নিকটে কৃপ খনন করিলে তাহা অধিকতর গভীর করিতে হয় কেন? এবং সেই কূপের জল শীতল হইবার কারণ কি?

শ্রী

রুহন্তর বঙ্গ *

স্বাগত!—বিশ্ববিস্তৃত পাটলিপুত্রে পরিত্রাশ্রমানে,—ভারতের অতীত স্মৃতির গৌরব-নিকेतনে আপনার স্বদেশবাসী—অনুনা-উপনিবেশী বাঙ্গালী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত হৃদয়-সমিতির প্রতিনিধিরূপে আজ আমি আপনার রাজশ্রীর আবাহন করিতেছি।

আপনি যে রাজসুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন, আপনার স্বদেশীকীর্ত্তিরক্ষাকরণে সেই বংশের গৌরব অধিকতর উজ্জ্বলিত হইয়াছে।—অনুনা-বাঙ্গালীর সর্ববিধ হিতসাধনে সদাই সমুৎসুক। বাঙ্গালার সকল সদৃষ্টান্তে আপনি অগ্রণী,—বহু সংপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। আপনি নবযুগের নবজাগ্রত বাঙ্গালীর মাতৃযজ্ঞের

(১) বক্রেশ্বর মন্দির পাতঃ।

* নানাগুণালঙ্কৃত, বিদ্যাগোবিন্দী, স্বদেশবৎসল, বক্রেশ্বর, শ্রীলক্ষ্মীমহারাণী সন্নীলজল নদী বাহাধরের পাটলিপুত্রে শুভাগমন উপলক্ষে পঠিত।

অজ্ঞতম স্বধিক,—মাতৃভাবার একনিষ্ঠ সেবক,—স্বদেশবাৎসল্যের প্রতিচ্ছবি। গোড়া-বাসীর নবজীবনের ইতিবৃত্তে আপনার স্বদেশসেবার-কাহিনী যে অধ্যায়ে স্বরূপাকারে লিখিত থাকিবে, আমাদের ভাবী উত্তরপুরুষ গৌরববৃদ্ধিসহকারে তাহার অমূল্যলন করিব; উপরূত হইবে। আপনার সমুজ্জল আদর্শ প্রভাবতার স্রায় তাহাদের গন্তব্য পথ নির্দেশ করিবে। আপনি সদ্ধম, গুণগ্রাহী, পরোপকারী; সমাজের হিতসাধনে, বঙ্গভ্রাতার অগ্রণী। দেশের ভাষা, সাহিত্য ও শাস্ত্র; কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য; দেশের সমাজনীতি, রাজনীতি; সকল বিষয়েই আপনার অসীম অহুসার। আপনার এই অকৃত্রিম অহুসার বহুক্ষেত্রে মাধ্যমে পরিণত করিয়া আপনি দ্বন্দ্ব হইয়াছেন, দেশবাসীকে দ্বন্দ্ব করিয়াছেন। সর্বোপরি আপনার মানব-প্রীতি ও ধর্মাহুসার, নিকলক চরিত্র ও পুত্র দেশচ্যুতির আমাদের আদর্শবস্তু।

কিন্তু মহারাণী, কেবল এই সকল কারণেই আমরা আপনাকে আমাদের আতিথ্যস্বীকারের কষ্ট স্বীকার করিতে অহুসার করি নাই। কেবল আপ্যায়নমাত্রই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। * * বাঙ্গালীর প্রান্তবর্তী এই বঙ্গীয়-উপনিবেশে আপনার শুভাগমনের অজবিধ সার্থকতাও বড় অল্প নহে।

বঙ্গবিযুক্ত বিহারের স্থল-কলেজে এখনও বঙ্গভাষার চর্চা চলিতেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বিহারের সারস্বত-আখ্যতনসমূহ হইতে আমাদের মাতৃভাষার নিদানিত হইবার সম্ভাবনা ঘটমাছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি জেলার আদালত হইতে বঙ্গভাষা নির্দাসিত হইয়াছে। বিহারের কয়েকটি বঙ্গভাষী জেলা বাঙ্গালী হইতে বিযুক্ত হইয়াছে। এই সকল

কারণে এ অঞ্চলে বঙ্গভাষার প্রসার-সাধোঁ ঘটমাছে। এখন হইতে প্রতীকারের উপায় না করিলে বিবিধকারণমধ্যমে ভবিষ্যতে বিহারে বঙ্গভাষার চর্চা লুপ্ত হইতে পারে। যে ভাষায় প্রথমে 'মা' উচ্চারণ করিয়া দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, সে ভাষা ভুলিলে প্রবাসী বাঙ্গালী থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা আর বাঙ্গালী থাকিব না। সেই শোচনীয় জাতিগত মৃত্যুর প্রতিবেদকল্পে বিহারের স্থানে স্থানে—

(১) বঙ্গভাষাভাষীদের জন্ম পতঙ্গ সারস্বত-আখ্যতনসমূহের প্রতিষ্ঠা।

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার জন্ম,—প্রাচীন ও নব্য সাহিত্যের সহিত সংযোগসহ অহুসার রাবিবার জন্ম পরিষৎ প্রভৃতির স্থাপন,

(৩) বঙ্গভাষাভাষীদের পরম্পর মিলন, সামাজিক সহৃদয়ের ঘনিষ্ঠসাধন প্রভৃতির জন্ম নিজগোষ্ঠী, আলোচনা, সমিতি ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা,

(৪) এবং এইরূপ বিবিধ পথে উপনিবেশী বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রীতি ও সহৃদয়ত্বের সৃষ্টি ও রক্ষা স্রাতীয়ে জীবনের পুষ্টি ও বিবর্তনের জন্ম আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

মহারাজ! 'ব্রজলা, হুফলা, শশুতামলা', 'নদীমেখলা' বিগ্ৰহজন্মসুখা বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালদেশে বিদ্যমান। Greater Britain-এর মত Greater Bengal-অতীত-বঙ্গ নহে, সত্য। আজ বাঙ্গালী অমৃতপুত্রারী মৃত্যুর সহিত উপমিত হইতেছে বটে, কিন্তু অতীত যুগে এই বাঙ্গালীর পূর্ণপুরুষগণ ত্রিকলিঙ্গে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এবং 'নীলগিন্ধকলদৌচরণতল—অনিল-বিশ্বপিত্তশ্রম-অঞ্চল' কলিঙ্গের 'তমাল-তালীবনরাজিনীলা' বেলা হইতে এই

বাঙ্গালীর বিবিধরী বংশধরণ হ্রদ্র বয়সীপ, অসুখা, কাথোজ, ঝাম প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদেশের সারথতত্বী নালন্দার ইতিহাস-প্রথিত বিশ্ববিজ্ঞানে বাঙ্গালী মনীষী জগৎশাসিকে জানরত্ন বিতরণ করিতেন। হ্রদ্র অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইংরেজ-অধিকারের পূর্বেও বাঙ্গালীরা ভারতের প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষকে বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহারাজ! এই 'বৃহত্তর বংশের' সহিত যোগস্বজ-রক্ষার গুরুভার আপনাদের দ্বারা মনসী কর্ম্মদিগকেই বহন করিতে হইবে। যে সকল জ্যোতিষের যশ-প্রভাব বাঙ্গালী চিন্তামঞ্জলি-অঙ্গকালের জ্ঞাত ভাবেই দর্শন লাভও আমাদের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর ও সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়, তাহা বোধ করি না করিলেও চলে। আপনার সভাপদনে আমরা অনির্লক্ষ্যনীয় শ্রীতি অমৃতভব করিয়াছি, এবং বংশের বাহিরে যে বৃহত্তর বংশ দেশমাতার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার কথাও আপনাদের মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিতে স্মরণোৎসাহ করিতেছি।

আমরা প্রবাসী, বিহারের উপনিবেশী বটে, কিন্তু বিহারবাসীর সহিত আমাদের যথার্থ অভিন্ন বলিলেও, বোধ করি, অত্যাধিক হইবে না। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ভবে জাতির সভ্যতার একমাত্র উদ্ভিষ্ট—'স্বাধ্বংস সর্বকৃত্ত্বং' যে জাতির ধর্মের উপদেশ, সে জাতি কখনও ভ্রাতৃত্ববোধে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বিহারের ও বিহারবাসীর উদ্ভিষ্ট ও শ্রীশুদ্ধির সহিত আমাদের ভাগ্য জড়িত হইয়াছে। আমরা—বিহারী ও বাঙ্গালী। স্বধ-দুঃখের অংশী হইয়াছি, তাহাও সত্য।

তথাপি বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যরক্ষা আমাদের কর্তব্য। আমাদের পূর্বপুরুষগণের অবদানের উত্তরাধিকার আমরা বিশ্বস্তির কর্ম্মনাশায় বিসর্জন করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষের জাতিসমূহ মণিমালায় জায় এক স্বরে গুণিত। এই মোহনমালায় প্রত্যেক রয়েই বৈশিষ্ট্য কখনও লুপ্ত হইবার নহে। আমরা প্রত্যেক জাতি—আমাদের জাতীয়তার রয়টিকে শত সাধনায় আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিব,—মালা তিয়া করিব না,—সে গ্রন্থ যে অচ্ছেদ্য, তাহা হইবে আরও দীর্ঘায়মান, সমৃদ্ধ, শুচি করিয়া দেশমাতার চরণে উপহার দিব। অতএব, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য-রক্ষার চেষ্টা বিবাদের চেষ্টা না হইয়া মিলনের সেতুতে পরিণত হউক। মহারাজ! জাতীয় জীবনবন্ধনে আপনাদের নৈপুণ্য সর্বজনবিদিত—আমরা এই উদ্দেশ্যসাধনে আপনার পরামর্শ ও উপদেশ ভিক্ষা করিতেছি।

ভাবের আদান-প্রদান, মানস-সঙ্গত হৃৎ-হৃৎয়ের বিনিময়ই জাতিকে এক স্বরে গুণিত করে। বিহার-প্রদেশেও সেই একীকরণের হ্রস্বপাত হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় বাঙ্গালী-সাহিত্যের সমৃদ্ধি প্রতিবিম্বিত হইতেছে। অনেক লক্ষ্যপ্রতিষ্ট আধুনিক বাঙ্গালী গ্রন্থকারের গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

হিন্দী ভাষায় বাঙ্গালী ভাষার প্রভাব অত্যন্ত স্বস্পষ্ট। বৃহত্তর বাঙ্গালার এই অংশের অবিবাসীরাও হিন্দী ভাষায় ও সাহিত্যের প্রভাব প্রভাবান্বিত হইতেছেন। আশা করা যায়, বঙ্গসাহিত্যেও প্রাচীন হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি অচিরে উপযুক্ত আদান লাভ করিবে।

এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ করিবার জন্ত, হিন্দীভাবী বিহারী ও বঙ্গভাবী বাঙ্গালীর হৃদয়ের যোগ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত উভয়ের মধ্যে উভয়ের ভাষার অঙ্গীকরণের ব্যবস্থা উভয় সম্প্রদায়ের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে হয়। আমরা—যে গবর্ণমেন্টের অধীনে বাস করি, হিন্দী সেই গবর্ণমেন্টের অঙ্গগৃহীত ভাষা। অতএব তাহার ভাষাবিক পুষ্টির পথ প্রশস্ত। কিন্তু বিশেষে বাঙ্গালীভাষা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। স্বতরাং বাঙ্গালী ভাষার ও সাহিত্যের চর্চাকালে আমাদের পুরুষকার-প্রয়োগ অপরিসীম বলিলেও বোধ করি অত্যাধিকারোপেক্ষ হইবে না। যাহাতে হিন্দীভাষাভাবীদের মধ্যে বাঙ্গালীভাষার ও সাহিত্যের প্রচার হয়, তাহা এই হিসাবে আমাদের কর্তব্যের অন্ততম।

মহারাজ! আবার বলি,—আপনি আমাদের মাতৃভাষার ও স্বদেশী সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য পৃষ্ঠপোষক। এই বঙ্গদেশে আপনার পূর্বেও ধনকুবেরগণ বঙ্গভাষার

প্রতি অগ্রগতি করিয়াছেন। কিন্তু কালধর্ম্মে আপনাদের অগ্রগতি যে অগ্রগতির পরসরিন মিশ্রিত হইয়াছে, তাহাকে 'মোনায় সোহাগা' বলিলেও ত্রুটি হয় না। আপনি শুধু সিংহাসনবিহারী অগ্রগ্রাহক নহেন, কক্ষক্ষেত্রে খণ্ডকলেবর কর্মীদের কর্ম্মদক্ষী। ভারতে যে বিশাল বিরাট মানবতার উন্মেষ হইতেছে,—আপনি সেই ভাবের ভাবুক, এবং সেই জনতত্ত্বজ্ঞান মহাভাব উদ্ভূত হইয়াই আপনি ঐশ্বর্যের উচ্চত্ব হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুরুষকার-প্রয়োগ অপরিসীম বলিলেও প্রমাণে দেশবাসী বুকুন,—সমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে যে ফেনাকিরীট শোভা পায়, তাহা উদ্ভাস, অবিরাম, চঞ্চল, তরঙ্গসমূহ ললিতস্নেহই অতঃম অংশ।

উপনিবেশী বাঙ্গালী-সমাজের পক্ষ হইতে আমরা ভগবানের নিকট আপনার দীর্ঘায়ন, স্বাস্থ্য, শান্তি ও বৃত্তি কামনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীমথুরানাথ সিংহ বি, এল।

ব্রাহ্মণ-সমাজ

[বহুকেমল পূর্বে মূল্যবান গ্রন্থ-লিখনের ধসতা বিবরণ 'পূর্বে' পাতায় হইতে প্রকাশিত হয়। তজ্জন্ত আমাদের অস্বাভাব্যতাই প্রবাস্ত: দারী। এবারকার 'ব্রাহ্মণ-সমাজ'পক্ষে লেখিত পূজনীয় পণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রের তত্ত্বনা দ্রুতি হইয়াছেন। আমরা অনেকদিন কঠিন চাহি যে গ্রন্থ-সভা ইত্যাদি বঙ্গী হিন্দুসমাজের প্রভাবান্বিত সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ একমত আছে। মুসলিম জাতিগণ: যে বোধ খাটরাছে তাহার জন্য আমরা লাভপ্রাপ্তি দ্রুতি। সমগ্র বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে যে একটি নূতন সঙ্ঘবাসী প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।]

বিপ্লব ঘনীভূত। আচার ব্যবহার আচার বিচার সর্বত্রই উচ্ছিন্নতা, ধর্ম্মে অবহেলা,—ইহাই সমাজের প্রকৃত বিপদ।

আমাদের পূর্বপুরুষগণের উপনিষ্ট সনাতন ধর্ম্ম সর্বধর্ম্মের আবিষ্কৃত, অধিকার অস্বাদ্য সনাতনধর্ম্মের এক একটা অংশ মহাপুরুষগণের প্রভাবে একতানে প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রভাবেই মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ।

কিন্তু বর্তমান সময়ে সর্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব

মন্দির, কল্যাণস্থলে অকল্যাণ—শাস্তিহলে বিপর্যয় এবং সন্তোষস্থলে অসন্তোষ নানাদিক ভাবে আবিস্কৃত হইতেছে।

আরশের অধঃপতন, সর্গধর্মের আবিষ্কৃত সনাতনধর্মের অবদার—প্রত্যক ও পরোক্ষ ভাবে এই অকল্যাণের হেতু।

ব্রাহ্মণের কর্তব্যভঙ্গই সনাতনধর্মের অবদার।

এখন অনেকেই জাতীয় অত্যাচারের জন্ত সচেত, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও তাহাদের উত্তরাগীয় শিক্ষাহরণ চেষ্টা প্রকৃত অত্যাচারের হেতু নহে।

কলকারখানা শিখিয়া বাণিজ্যনিপুণতালভ করিয়া অরসংস্থানের উপায় করা বাইতে পারে, সামাজিক ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা বাইতে পারে, সমাজে ধনের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলাসের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত করা বাইতে পারে বটে;—কিন্তু তাহা প্রকৃত অত্যাচার নহে, তাহা ক্ষুদ্র কাম মাত্র।

ব্রাহ্মণ শু ভূদেহোৎসব ক্ষুদ্রকাম্যে মেস্তেত।
অর সংস্থানে ব্যক্তির মৃত্যু নিবারিত হয় বটে, জাতীয় মৃত্যু নিবারিত হয় না, এই হিমাঙ্কজাতিক কত ব্যক্তি ধর্ম নামের জোতে বা প্রাণের ভয়ে জাতীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছে, ব্রাহ্মণবংশধর পিতৃ-ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া স্নেহে হইয়াছে,—ব্যক্তি জীবিত আছে—কিন্তু তাহার জাতি মরিয়াছে। যদি সকলেই এইরূপ স্বধর্মত্যাগী হয়, তখন সেই ব্যক্তিসমূহ হইবে থাকিলেও জাতীয় জীবনের অবসান হইবে।

ধর্মরক্ষা হইলে জাতির মৃত্যু হয় না। অম্মাভাবে বা পীড়ায় শত শত ব্যক্তি বিধ্বস্ত হইলেও অবশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন প্রবাহিত থাকে।

যে জাতির ধর্মবল যত অধিক—সে জাতির জীবনী শক্তি তত অধিক। জীবনীশক্তির প্রবলতা থাকিলে—অন্তজাতির সংঘর্ষে কোন কতিই হয় না, এমন কি অন্তজাতি বাহ্যবলে বা ধনবলে বলীয়ান হইলেও—জীবন বল-সম্পন্ন জাতির সম্পর্কে নিপুস্ত ও অবসর হইয়া পড়ে।

ধর্ম কেবল—কতকগুলি আর্থিক অভিনয় নহে, ধর্ম বাস্তব মন এবং শরীরের আশ্রয়। ব্রাহ্মণের এই ধর্ম—শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে সম্যক উপদিষ্ট হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ বংশধরগণ বাহারা জগতের ধর্মগুরু—সেই ক্রমেবগণের সন্তানগণ তাহাদেরই পূর্বপুরুষের সাধনলব্ধ শাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রায়শঃ ধর্মশত্রু। সেই জন্তই বিপদ ঘনীভূত।

অনেক ব্রাহ্মণসন্তান আছে বাহারা এই বিপদ বুঝিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারের উপায় অব্যেগ্ন করিতেছেন; কিন্তু সেই সকল সহপাঠ্যদেবী ব্রাহ্মণসন্তানগণ পরস্পর অপরিচিত। বিপদের সময়ে সমভাবে ভাবুক বিপদ ব্যক্তিগণের পরস্পর পরিচয় শক্তিসৃষ্টি হইয়া থাকে, মন্ত্রণায়া উৎকর্ষ হইয়া থাকে, বিপদের বিভীষিকা মন্দীভূত হয়। সমভাবে ভাবুক ব্রাহ্মণ-সন্তানগণের পরস্পর পরিচয়—ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের প্রত্যক উদ্দেশ্য। বর্গাশ্রম ধর্ম রক্ষাই চরম ও প্রধান উদ্দেশ্য। বিবাহ বিবাহিত ধর্মরক্ষার প্রধান উপায়, বয়সী ব্রাহ্মণসভা সামাজিক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার কলস্করণ, বিক্রমপন্যের ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীতে রাষ্ট্রীয় সমাজের কৌলজ প্রচার সংস্কার প্রস্তাব এবং বারংবার শ্রেণীস্থ বিভিন্ন তাহার কলস্করণ, বিক্রমপন্যের ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীতে রাষ্ট্রীয় সমাজের কৌলজ প্রচার সংস্কার প্রস্তাব এবং বারংবার শ্রেণীস্থ বিভিন্ন পঠাঙ্কিত কুলীনগণের স্বপটী ও স্ববর্ণাধার রক্ষা পূর্বক সমীকরণ প্রস্তাব উপস্থাপিত

করিয়াছিলেন, ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপনায় অল্পকালে তথিযয়ের স্বমীমাংসা ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অপর উদ্দেশ্য।

(২) অতীত ডকুমেন্ট দ্বারা পতিত ব্রাহ্মণ ও অপর বর্ণের হিন্দু সমাজে বিরূপ স্থান, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও মীমাংসা।
(৩) ব্রাহ্মণের অবস্থা পালনীয় আচার ও সেই আচার রক্ষার্থ উপায় নির্ধারণ (৩) ব্রাহ্মণের কতিপয় জাতির সদাচার রক্ষা (৪) এবং ক্রান্ত প্রায়শ্চিত্ত পতিতগণ সমাজে ব্যবহার্য কি অব্যবহার্য এ বিষয়ে আলোচনা ও মীমাংসা।
(৫) পতিত ব্রাহ্মণদিগের পুত্র ক্ষত্রগণ সমাজে গৃহীত হইতে পারেন কি না এ বিষয়ে আলোচনা ও মীমাংসা, (৬) পুরুষ পরম্পরায়কমে দ্বিধেস্তর জাতিরূপে পরিগণিত বিভিন্ন জাতির উপনয়নে (প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই হউক অথবা না করিয়াই হউক) অধিকার আছে কি না, এবিষয়ে আলোচনা ও মীমাংসা। এই মহা-সম্মিলনের কয়েকটি উদ্দেশ্য। সমস্ত ব্রাহ্মণ-জাতি বিরূপ শাস্ত্রাধ্যাপনাদেশিকা প্রায় হইয়া স্বধর্মে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও হুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, সকল জাতির মঙ্গল কর্তা হইতে পারেন, পৃথিবীর মঙ্গল সাধনে সক্ষম মহাপুরুষ উৎপাদনে সমর্থ হইতে পারেন—তাহার উপায় নির্ধারণ—ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনের প্রধানতম কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্ত আপাততঃ সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী একটা ব্যবস্থাপকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থাপকমণ্ডলী কি না, পূর্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, নিরপেক্ষ মধ্যস্থ পণ্ডিত দ্বারা তাহা স্বমীমাংসিত হইয়া সর্বত্র প্রচারিত হইবে। সমস্ত বঙ্গদেশে একমুখে বহু লক্ষ ব্রাহ্মণ বর্তমান, এই ব্রাহ্মণগণ সম্মিলিত হইয়া সংক্যাধীনত

হইলে সমস্ত পৃথিবীতে নূতন অত্যাচারের—নূতন মঙ্গলের—সংস্কার হইবে।

ব্রাহ্মণ সন্তানগণ জড়তা, অব্যাদ, উদারীনতা পরিভ্রাণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধন জন্ত উৎকৃষ্ট হউন। জ্ঞান অর্জনে—জ্ঞানালোক বিতরণে—ধর্ম অর্জনে—ধর্ম শিক্ষা প্রদানে সকলের অসীম উপকার করিতে যত্নবান হউন, সেই যত্ন কি যদি জাতিতে চাহেন, ত আছেন; এই ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনে প্রীতিভূত হউন। আমরা একীভূত হইয়া আমাদের চিন্তিত উপায় আলোচনা করি, তাহা হইলে সেই যত্নের স্বরূপ স্বয়ংসম করিতে পারিব। আমাদের রাজা জ্ঞানের প্রতিভুল নহেন, আমাদের রাজা জ্ঞানের প্রতিভুল নহেন, প্রভূত ধর্ম ও জ্ঞানের অস্থূল, এ সময়ে অব্যাহত ভাবে আমরা বৈধব্য করিলে যে সফলতালভ করিব, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনাদের মধ্যে অনেকেই অনেক বিফল যত্ন করিয়াছেন, অনেক অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। আর একবার অন্ততঃ পরীক্ষার জন্ত যত্ন করিয়া দেখিতে আপনাদিগকে আমরা অহরোধ করি।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের কক্ষ শেব হইলেও ব্যবস্থাপক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ব্যবস্থাপকমণ্ডলী সময়ে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অস্থান বর্তমানবর্ষে আগামী ২৬শে ফাল্গুন হইতে ৫ দিন হইবে। স্থান ও কালীঘাট, অধিষ্ঠানের সফলচরণ পূজার যানের মন্দিরে হইবে। ২৬শে ২৭শে দুইদিন ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর বিচার সভা হইবে। ২৮শে হইতে তিন দিন ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের মহাধিষ্ঠান। শাস্ত্রাহরণ ভাবে বিবাহযজ্ঞতির সাধোদান, পণ প্রচার সংক্ষেপ কুলপরিচরকার স্বব্যবস্থা

বিন্দু সন্তানের ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা, সমগ্র ধর্মপ্রাতিষ্ঠান সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ সংস্থাপন, আশ্রমপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ব্যবস্থা এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে।

পাঁচদিন সভাবিবেশনের মধ্যে শেষ তিন দিনে সকল ব্রাহ্মণের সভায় উপস্থিতি প্রার্থনীয়। যিনি এই সভায় উপস্থিত হইবেন, তিনি ৩০শে মাঘের মধ্যে বর্ষীয় ব্রাহ্মণ সভায় তাঁহার আগমন বাধ্য ও কলিকাতায় তাঁহার অবস্থিতির স্থান আছে কি না, এই সকল বিষয় ৩২ নং আমহাষ্ট্র স্ট্রীট কলিকাতা বর্ষীয় ব্রাহ্মণসভা, এই টিকানায় জ্ঞানাইয়া করিতে করিবেন। তাহার পর আমাধিগের নিমন্ত্রণ পত্র ও নিয়মাবলী প্রেরিত হইবে।

এই অগ্রহস্তানপত্র বাঁহা হইয়াছে হইবে তিনি অগ্রহস্ত পূর্বক তাঁহার বন্ধুবর্গকে

দেখাইয়া মহাদামিলনীর সহায়তা করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বর্ষীয় ব্রাহ্মণ সভার সহকারী সভাপতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন,

শ্রীকৃষ্ণদেব সিংহ শর্মা,

(মহারাজা হৃদয়)

শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায়,

(হাইকোর্টের বিচারপতি)

শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি,

শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়,

(রাজা উত্তরপাড়া)

শ্রীললিতারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,

(হাইকোর্টের বিচারপতি)

কর্মাদ্যক

শ্রীচন্দ্রকান্ত ম্যাললঙ্কার।

শ্রীজ্যোত্মকেশোর রায়চৌধুরী

মফঃস্বলের বাণী

ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ

“হাকিম” নামক মাসিকপত্র বলেন,— “এ দেশে মালেশিয়ার কারণ বাঁহাই হউক না কেন, মালেশিয়ার উচ্ছেদসাধন ব্যতীত যে বাহালীর বাঁচিবার উপায় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। হুতরাং মালিতে মালেশিয়া প্রশমিত হয়, তাহাই করা আমাদের কর্তব্য। সম্প্রতি ‘ইণ্ডিয়ান ম্যাট্রি’ গেজেট’ পত্রে নীলগিরিতে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ইউক্যালিপটাস গাছের পতন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গাছ অতি দ্রুত বর্ধিত হয়; এবং ইহারই কলায়ে নীলগিরিতে জালানীর যত স্থবিধা আর কোন পার্শ্বতা সহরে তত স্থবিধা নাই। আবার

ইহাতে মালেশিয়ার প্রকোপ প্রশমিত হয়। কিছুদিন পূর্বে ব্রহ্মের বনবিভাগ এই গাছের চাষের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ফল জানা যায় নাই। ব্রহ্মে জালানীর অভাব নাই বটে, কিন্তু তথায় এক মালেশিয়ার যত লোক মরে—করোরা, বসন্ত, মগ্নে সব রোগে তত লোক মরে না। হুতরাং এই গাছে যদি মালেশিয়ার প্রকোপ প্রশমিত হয়, তবে ইহার চাষ করা ভাল। বাঙ্গালায় ইউক্যালিপটাস গাছ বেশ বাড়—দেখা গিয়াছে। বাঙ্গালায় জালানীকাঠের যেমন অভাব, মালেশিয়ার প্রকোপ তেমনই প্রবল। এ অবস্থায় বাঙ্গালার বৃহৎহা যদি বৃহৎসংখ্য জমীতে এই গাছ লাগান, তবে ভাল হয়।

মিউনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ড রাস্তার ধারে এই গাছ লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহার তৈল শর্দি-কাশীর ঔষধ—ইহার ফুলের গন্ধও ভাল। আমাদের দেশে পূর্বে লোকে নিষতরু রোপণ করিত; লোকের বিশ্বাস ছিল—নিষতরু দ্বিতীয় বায়ু বিস্তৃত করে। কিন্তু প্রাচীন বিশ্বাস, সুরাগণ কি অসুরগণ, বিচার না করিয়াই আমরা সে সব কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকি। তাই এখন রাস্তার ধারে বেনটী, গোল্ডমোহর টি প্রভৃতির বাহার বুলিতে দেখা যায়। যে সব গাছে লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, সে সব গাছের আদর না করিয়া আমরা পাতানবাহারের ও রত্নালা ফুলের গাছেরই আদর করি—রক্তত ফেলিয়া রাস্তার পশরা মাখায় তুলিয়া লই। প্রাচীন সস্তার সবই কুসংস্কার—ইহাও যে একটা কুসংস্কার। আমরা জানি, বাঙ্গালার মাটিতে এই গাছ বেশ বাড়িয়া থাকে। এ অবস্থায় মালেশিয়ার-প্রাণীভিত্ত বাঙ্গালার যাহাতে এই গাছের চাষ হয়, তাহার চেষ্টা করা বাঙ্গালীমাত্রেই কর্তব্য। এ বিষয়ে সরকারের মূখ্য চাহিয়া থাকিতেও হয় না।”

ইউক্যালিপটাস বৃক্ষের শাস্ত্রীয় নাম ইউক্যালিপটাস রোবিলিয়ার। অষ্ট্রেলিয়া ও টাস্মেনিয়ার অন্তর্গত জাত মাটৌণী জাতীয় বৃক্ষ। যে জলে ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি জীব থাকে, ইউক্যালিপটাস সম্পর্কে তাহা বিশোধিত হয়। এমন কি, কোন জলাশয়ের নিকটবর্তী ইউক্যালিপটাস বৃক্ষের পত্র সেই জলাশয়ে পতিত হইলে, তাহার জল দ্বিতীয় হওয়া দূরের কথা, সেই জল পান মালেশিয়ার জন্মে প্রতিষেধক। নিমন্তল, আর্য, মালেশিয়ার প্রধান স্থানে এই বৃক্ষ রোপিত হইলে সেই স্থান স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। যে স্থানে

এই বৃক্ষ থাকে তাহার নিকটবর্তী স্থানে মালেশিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয় না। ইউক্যালিপটাসের পত্র চর্চণ করিলে দস্তের রোগ-জনিত রক্তস্রাব বন্ধ ও দস্ত দৃঢ় হয়। ইহার পত্রের ধূম পান করিলে জ্বররোগজনিত শ্বাসের উপশম হইয়া থাকে।

কীসাই নদীতে ‘এনিকট’ নিধাণ করায় নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে মেদিনীপুরের মত স্বাস্থ্যকর নগর মালেশিয়ার নীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস—যদি মেদিনীপুরের বড় বড় রাস্তাগুলির ধারেও আবহ কীসাই নদীর তীরে ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ রোপিত হয়, তবে মেদিনীপুর আর মালেশিয়ার প্রকোপ থাকে না। যদি ডিক্টেবোর্ড মফঃস্বলের বড় বড় সড়ক রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বে ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ রোপণ করিবার ব্যবস্থা করেন তবে মফঃস্বলের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে। যখন সরপাই নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলিত, তখন কাঁথিতে মালেশিয়ার নামগন্ধ ছিল না। সরপাই নদী কেনেলে পরিত্যক্ত করতঃ তাহা লক দ্বারা আবদ্ধ করার পর হইতে কাঁথিতে মালেশিয়া দেখা দিয়াছে। যদি পৃষ্ঠবিভাগ কেনেলগুলির উভয়পার্শ্বে ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ রোপণ করন, তবে এ অঞ্চল আবার স্বাস্থ্যকর স্থান হইতে পারে। আমরা এই অত্যাবশ্যক বিষয়ের দিকে মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটি, ডিক্টেবোর্ডের ও পৃষ্ঠবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আজকাল ইউক্যালিপটাস বৃক্ষের চারা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের নর্শারিতে ও চার-গুয়ালাপের নিকট পাওয়া যায়। এক একটা চারার মূল্য চারি আনার অধিক নহে। মফঃস্বল বৃহৎসংখ্য পথ্যন্ত এ চারা ক্রয় করিয়া

আপনাদের বাটার সংস্কার ভূমিতে লাগাইতে পারেন। তাহাতে তাহাদের বাটাও স্বাস্থ্যজনক হইবে, আলানীকাঠেরও অপব্যয় দূর হইবে।

নীহার।

পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক

বঙ্গপল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। একমাত্র ভদ্রতা রক্ষা করিতে গিয়া ইহারা প্রতিপদেই বিপন্ন। শুধু বিপন্ন কেন সম্পূর্ণ পরাধীন। “বাহিরে কোঁচার পত্তন ঘর ছুঁচোর কীটন” বলিয়া যে প্রবাদটা চলিয়া আসিতেছে, তাহা পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের উপরই বেশ ষাটে। বাটতে চাকর না থাকিলে ভদ্রতার হানি হয়। ভিতর বাটতেও চাকরাণীর প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল পল্লীর যেকোন অবস্থা ঘটনাছে তাহাতে চাকর-চাকরাণী মেলাই কঠিন। পূর্বে অনেক দরিদ্র মুসলমান হিন্দুদের বাটতে চাকুরী করিত। এক্ষণে শাসনে মুসলমানগণ হিন্দুর ভাত পরিভোগ্য করিয়াছে। তাহাদের দ্বারা কাঞ্চ্য করাতে হইলে আপথোরাকী নবোদ্বোধ করিতে হয়। ধোরাণী দিয়া যাহাকে পাঁচ তাহার পাওয়া যাইত, এক্ষণে এই বন্দোবস্তে দ্বারা চাকতে মেলা কঠিন। পল্লীর ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে একজনদের ঘর খাইতে সেওয়া সহজ, কারণ সকলেই তেত-পানার আছে, আর একজন লোক দেশের সঙ্গে খাইলে গরখই বা কি লাগে? কিন্তু মাসে মাসে রক্তত মুদ্রা বাহির করাই কঠিন। তাহা ছিঁড় চাকরদের তিন বেলা বাটতে যাহা-রাতেই দিন দুরাইয়া যায়। ইহা ভিন্ন যাহারা বাটার উপর রান্না করিয়া পায়, তাহাদের লইয়াও আরও বিপন্ন। আজকাল আমাদের পারনা জিলায় অনেক স্থানে মুসলমানগণ হিন্দুর বাটতে কাঞ্চ্যও পরিভোগ্য করিয়াছে।

এই তাহাইল মুসলমানদিগের কথা। আবার হিন্দু চাকরের অভাব আরও বেশী। হিন্দু-দিগের প্রত্যেক জাতির মধ্যে সমাজ-সংস্কারের এক প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে। পূর্বে যে সমস্ত জাতি বৈদ্যা, কাঠস্থ প্রভৃতি জাতির আর গ্রহণ করিতে দিখা বোধ করিত না, এক্ষণে সমাজের শাসনে তাহা করিতে পারিতেছেন। আবার অনেক জাতি উপরোক্ত জাতির বাটতে চাকরাণীও বন্ধ করিয়াছে। পূর্বে চাকর-মনিবে যে একটা সম্পর্ক ছিল, তাহা এক্ষণে নাই। পূর্বের চাকরেরা মনিবের সমস্ত কাঞ্চ্য নিজের ভাবিয়াই করিত, এক্ষণে এটা পারিব না, ওটা পারিব না প্রায়ই অনিয়া থাকি। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, আপনার বাটতে একজন মুসলমান ভৃত্য আছে। আপনাকে কোনও কার্যবাদপক্ষে অজ্ঞ হইতে হইবে; তাই নিজ ভৃত্যটাকে বলিলেন “ওহে আমার ট্রাঙ্কাটা স্ট্রিমার ঘাটে লইয়া চলগ” ভৃত্যটা অমনি উত্তর করিলে “মহাশয়, ওটা মুটের কাঞ্চ্য আমার দ্বারা হইবে না।” পূর্বে দেখিয়াছি বাটার চাকর-গণ সমস্ত বিন কাঞ্চ্য করিয়া বাটতেই শুইয়া থাকিত। এক্ষণে থাকিতে বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা দাবী করিয়া বসে। বলে “মহাশয় রাতীতে পাহারা দিতে বসত বেতনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।” আজকালকার দিনে চাকর ভদ্রলোকের ভদ্রতার অঙ্গ হইয়া তাহার চাকুরের জায়ই হইয়া উঠিয়াছে।

পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যাজেরই জমি আছে। কিন্তু ভদ্রতার স্বাভাবিক কাহারও নিম্ন হতে চাঞ্চ্য-আবাদ করিবার উপায় নাই। বদশী আন্দোলনের হুকুমে ছুটার বিন অনেকেরই লাললের গুটি ধরিয়াছিল বটে, কিন্তু বদশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও ঘর প্রাপ্ত হইয়াছে। পল্লীর ভদ্রলোকদিগের জমি আছে, কিন্তু স্থায় পণ্টে অলিয়া যায়। ক্ষেত্র অজ্ঞান না হইলেও কতকগুলি কারখাই অজ্ঞান করিয়া তুলিয়াছে। আজকাল চাকরের যেকোন দর তাহাতে চাকরের দ্বারা আবাদ লাভ হওয়া সম্ভব। আবার চাকর-

দিগের উপর নির্ভর করিয়াও কোন ফল নাই। চাকরের সঙ্গে নিজে খাটিতে নাই। পারিলে এখনকার দিনে কাঞ্চ্য পাওয়া কঠিন। পল্লীর মধ্যবিত্ত সন্তিক ভদ্রলোকের পক্ষে এই ক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই চৈকিয়া অনেকেরই বর্ণা দিয়া জমি আবাদ করায়া থাকেন। আমাদের দেশে কৃষকদিগের বর্ণা জমি গ্রহণ করে। আজকালকার দিনে পাটের দ্বারা বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। প্রত্যেক কৃষকের কিছু না কিছু জমি হইয়াছে। তাই বর্ণাদার নিজের জমিগুলি যেকোন ভাবে চাঞ্চ্য আবাদ করে, বর্ণাজমি সেসকল ভাবে বিক্রয় করে না। আবার শস্তাদিও ঠিকভাবে জোতদারকে দেয় না। তাই পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ভেজনিম্ন রাধিয়াও তাহার ফল লাভে অসমর্থ। এক্ষণে পেটে ক্ষিপে মুখে লজ্জা লইয়াই পল্লীর ভদ্রসমাজ পথহারা হইতেছে।

পল্লীতে ধারী নাই। প্রত্যেক পল্লীতে “দাই”এরও অভাব। এই “দাই” কথাটা বোধ হয় ধারী হইতেই হইয়াছে। এং বানা গ্রামে একজন দাই আছে। তাহার সামান্য প্রসব-প্রক্টিয়া দাই বটে, কিন্তু তাহার নাড়ী-দেহে ভিন্ন অঙ্গ লাগি করিতে বড় একটা আসে না। এই সামান্য কাণ্ডাটুকু করিয়াই তাহার একজন ডাক্তারের ডিক্টি অপেক্ষাও বেশী চার্জ করিয়া থাকে। “নাড়ীকাটা” কাজটা অতি সামান্য। প্রসব-গ্রামেরই কঠিন। এই প্রসব-সময়ে সকল গ্রামের লোকেরা ইহারের পাইয়া উঠে না। প্রত্যেক গ্রামেই কতগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তাহারাও প্রসব-কাঞ্চ্য সম্পাদন করিত। এক্ষণে সমাজের আঁতুনিতে সেটা আর হইবার উপায় নাই। প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক জাতিই এই কাণ্ডাটাই হীন ভাবিয়া থাকে। এ কাণ্ডাটা যাহারা করিয়া ছুপদয়া উপায় করিত তাহাদের পথও নষ্ট হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের “ভদ্রতা” গণশয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা স্ত্রীকাগারকে নরকতুও ডাবি। ছেলেও ফেলি না, স্ত্রীকেও ভ্যাগ্য করি না। কারিগরীকেই যুগা করি। দস্ত আমুর।

আমাদের আত্ম-ধর নরকতুও বিশেষ। আমাদের দেশেরা ছুইলেও মান করিতে হয়। এত মাধের পুত্র, এত ভালবাসার স্ত্রী তাহা-দিগকে এ ঘরে রাখিয়া আমরা মহাশয় ঘরে থাকি। পূর্বে অনেক লোক তাহাদের প্রহারের জন্ত পাওয়া যাইত। এক্ষণে কি মুসলমান, কি হিন্দু, কেহই এ কার্য স্বীকার করে না। এটা অজ্ঞ জাতির উপর (তাহা গড়াইতে পারে নাই) কারণ সকল জাতির মধ্যেই শিক্ষা আছে, স্বাভাবিক কাজে দেখে নাই, তাই যাহারা উচ্চ তাহাদেরই দুর্দশার সীমা পাওয়া যায় হইয়াছে। উচ্চ গণীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যাহাদের পদে পদে ভদ্রতার হানি হয়, তাহাদের উপরই এটির প্রভাব বেশী দেখা যাইতেছে।

যে দিক দেখি না কেন, পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অবস্থা দিন দিন শারাপ হইয়া পড়িতেছে। আটটা দিন দিনই কম হইতেছে বটে, কিন্তু ব্যয় হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকালকার দিনে সন্ধানদিগকে শিকত করিত খণ্ড অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছে। বি-চাকরের দর অত্যন্ত বেশী, পণ্ডিতের মজুরের মজুরী ন্যাশী, জমি অজ্ঞান হইতেছে। তাই পেটে ক্ষুধা মুখে লজ্জা লইয়া ভদ্রসমাজ দ্বা-হস্ত্য করিতেছে। তারপর স্বর্গীয় কবিরের ক্রিয়া-কলাপ রক্ষা না করিলে লোকের নিকট মুখ থাকে না। পিতৃদায় মাতৃদায় ত আছেই, তাহার উপর কতদায় সকল দায়ের উপরে উঠিয়াছে। এই দায়ে পড়িয়া অনেক ভদ্রসমাজের ভিত্তি-মাটা পথ্য বিকৃত হইতেছে।

আজকাল বাবগামামাজেই জোটবট হইয়া দর বৃদ্ধি করিতেছে। নাপিতের বেতন বা চাকরাণ পূর্বে থাকা ছিল, এক্ষণে তাহাতে তাহার সমস্ত নাই। নগর পরগণা কাঞ্চ্য করিতেই ইচ্ছুক। পূর্বে তাহারো যেকোনভাবে ক্ষৌরকাণ্ডের পরগণা লইত, এক্ষণে তাহার চারিগুণ আদায় করিয়া থাকে। ধোপা আর বেতন লইয়া কাজ করিতে রাজী নাই। তাহার সহিত “হুড়ি চুড়ি” দর করতে হইবে। বেতন দিয়া বাটাইলে মাসে

একবার দেখা দিবে কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। স্বতন্ত্র দর বৃদ্ধি করিয়াছে। বাস্তু-স্রবোর মূল্য হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। এসময়ে সমাজ যদি মধ্যবিত্ত-দ্বিগের প্রতি না তাকায় তাহা হইলে সমাজের দেকনও ভাঙ্গিয়া যাইবে।

স্বরাজ

গো-রক্ষা

ছুমিট হইবার পর হইতে আমরণ দৈনিক পুষ্টিসাধনে ছুটু আমাদের প্রধান সহায়। কিন্তু দিন দিন দুধের দুর্ঘ লাভ, যেক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কিছু দিন পরে, ধন কুবের ভিন্ন অপরের পক্ষে ছুটু সংগ্রহ করা হুমসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে, এইরূপই আশঙ্কা হয়। শরীররক্ষণ আশায়, কষ্টোপার্জিত অর্থে যাচা ছুটু বলিয়া ক্রয় করা যায়, তাহাকে “ছুটু” বলিতে লজ্জা বোধ হয়; জল মিশ্রিত হওয়ায় তাহা এতই বিবশ। ষাটি ছুটের অভাব শিশুগণের অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ। শিশুর অকাল মৃত্যু নিবারণের জন্ত, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীর বাহাতে কৃশ ও নিবেজ হইয়া না পড়ে, তাহার জন্ত ছুটু ও যুতের একান্ত প্রয়োজন, এবং ছুটু ও যুতের জন্ত গাভীর প্রয়োজন; হুতরাং গাভীর সারক্ষণ যে সর্বতোভাবে আমাদের কর্তব্য, তাহা আর বুঝাইতে হইবে কেন? ভারত কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি কার্যের উন্নতি গৌরবে ভারত এক সময়ে জগতের আদর্শ ছিল। এক্ষণে বৈদেশিকগণ কৃষি কার্যের উন্নতিসাধন বিষয়ে আমাদের পক্ষে শিক্ষা দিতেছেন; গবর্ণমেণ্ট কৃষি কার্যের উন্নতি সাধনোপযোগী নব নব উপায় অবলম্বন করিতেছেন, ককন; কিন্তু দরিদ্র ভারতে গরু চাবের একমাত্র সহায়, একথা যেন বিস্মৃত হইয়া থাকেন না। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে, সকল দিক

বিবেচনা করিলে, গোময়ের সারই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। লাদল টানিবার জন্ত উৎকৃষ্ট বলদের প্রয়োজন; বলদ সবল না হইলে, কর্শনকাথ্য রীতিমত হওয়া সম্ভবপর নহে। লাদলের জন্ত উৎকৃষ্ট বলদের বড়ই অভাব হইয়াছে; এইরূপ বলদের মূল্য গত ৪০ বৎসরের মধ্যে পাঁচ গুন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা গোমাংস খাইয়া থাকেন, তাহাদের রসনার তৃষ্ণির জন্ত, প্রত্যহ কত গরু কসাই হতে প্রাণ হারাইতেছে, তাহার হিসাব শুনিলে হৃদয়স্থ উপস্থিত হয়। অহ-সন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, এক কলিকাতা, টাম্বার কসাইখানায় ১৯১২ সালের মার্চ হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসে ষোল হাজার দুইশত সাতটি গোহত্যা হইয়াছে, ইহার মধ্যে বকুন বা যে গরু অগ্নিনি পরে প্রসব-হইবে, এমন গরু বিস্তর হত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝুন, সমগ্র ভারতে বৎসরে, কত গোধন নিধন হইতেছে। স্বাস্থ্যের জন্ত গো-রক্ষার আবশ্যকতা সন্দেহ মতদ্বৈধ হইতে পারে না। দেশের লোক দিন দিন অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে; পাক্তের মূল্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল জিনিসেরই মূল্য বৃদ্ধি হয়। প্রচুর ধাতোব্যপানের জন্ত কৃষির উন্নতি আবশ্যক; কৃষির উন্নতির প্রধান সহায় গরু। দেশে প্রচুর যি ছুটের সন্ধান হইলে ও খাদ্যসামগ্রীর দুখলাভার হ্রাস হইলে, লোকে প্রয়োজন মত আহার পাইয়া শরীরের পুষ্টি সাধনে সমর্থ হইবে। ছুটু যুতের প্রাচুর্য্য গরুর উপর নির্ভর করিতেছে। বাহাতে দুধবর্তা ও গর্ভধারণকা গাভী নিহত না হয় ও বাহাতে ভারতের কৃষিকার্যের প্রধান সহায় ও উপায়—উৎকৃষ্ট বলবান বলদের অভাব অহুত না হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করুন।

চুঁচুড়া বার্তাবহ।

পরিশিষ্ট

দোষান্ বাধোন্তথা মোহমাক্রান্তাভূরনির্জিতা ।
 বিবদ্ধয়তি নারোহেৎ তস্মাদ্ভূমিমনির্জিতাম্ * ॥ ৩৯ ॥
 প্রাণানামুপসংরোধাৎ প্রাণায়াম ইতি স্মৃতং ।
 ধারণেভ্যুচ্যতে চেযৎ ধার্যতে যন্মনো যয়া ॥ ৪০ ॥
 শব্দাদিভ্যঃ প্রযুক্তানি যদক্ষণি যতাস্মভিঃ ।
 প্রত্যাহ্রিয়ন্তে যোগেন প্রত্যাহারন্ততঃ স্মৃতং ॥ ৪১ ॥
 উপায়শ্চাত্ত্ব কথিতো যোগিভিঃ পরমমিভিঃ ।
 যেন ব্যাখ্যাদয়ো দোষা ন জায়ন্তে হি যোগিনঃ ॥ ৪২ ॥

মোহবশে ভূমিভ্য না করি' যে জন
 উন্নত হইতে চায়—যটে অলক্ষণ ।
 দোষ আর বহু ব্যাধি জনমি' নিশ্চয়
 অচিরে তাহার দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ।
 এই হেতু ভূমি ভ্য না করি' কখন
 উন্নত সাধন পথে ক'রো না গমন । ৩৯ ।
 প্রাণের নিরোধ এই সাধনেতে হয়,
 এই হেতু প্রাণায়াম স্থধীগণ কয় ।
 বেই ত সাধনে মন দীর স্থির হয়,

ধারণা তাহারে বলে নাহিক সংশয় ॥ ৪০ ॥
 শ্রোত্র-চক্ষু আদি যত ইন্দ্রিয়নিকর
 শব্দাদি হইতে যাহে হইয়া অন্তর
 প্রত্যাহত হ'য়ে রহে আপনে আপন
 প্রত্যাহার বলি' তা'রে বলে স্থধীগণ ॥ ৪১ ॥
 যোগীর যাহাতে নহে রোগের উদয়,
 পরমমিগণে হেন উপায় নির্ণয়,
 করিয়া রাখিলা এই শাস্ত্রের ভিতর
 উচিত যোগীর তাহা জানে নিরন্তর ॥ ৪২ ॥

* সাধককে সপ্ত অজানভূমি ও সপ্ত জানভূমি আদ্য করিতে হয় । যোগবিশিষ্টে উৎপত্তি লক্ষণের ১১৭ ও ১১৮ শ্লোকে সে কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে ।

সপ্ত অজানভূমি—

“দীর্ঘলম্বাৎ তথা জাগ্রদবোধোত্তমোৎসাহঃ ।
 জাগ্রদবোধোত্তমঃ স্বপ্নবোধোত্তমঃ ॥”

সপ্ত জানভূমি—

“জানভূমিঃ তত্তেজোব্যাগ্ৰধান সন্মুখাভূতা ।
 বিচারণা বিত্যাগাত্ত তৃতীয়া ওপমানস ।
 নব্যাপকিস্কৃত্বী প্রাৎ তত্তোহসমাজ্ঞানসিক ।
 গদাধর্মানবদী যজ্ঞ সপ্তমী ভূত্যাগা স্মৃতা ॥”

সাধক গুরুপদ্বি পথে সাধন করিতে করিতে সোপানরোহণের ভাব এইগুলিকে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিলাভ হইয়া থাকেন । যোগবিশিষ্টে ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে । কিন্তু বিনা সাধনে কেবল এগুলি ধারা কিছুই হইবার নয় বলিয়া এ হলো সে সব উচ্ছৃত করা হইল না ।

যথা তোয়াধিনস্তোয়ং যজ্ঞনালাভিঃ শনৈঃ ।
 আপিবেয়ুস্তথা বায়ুং পিবেদযোগী জিতক্রমঃ ॥ ৪৩ ॥
 প্রাঞ্জনাভ্যাং হৃদয়ে চাথ তৃতীয়ে চ তথোরসি ।
 কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেক্র-ক্রমধ্য-মূৰ্দ্ধস্থ ॥ ৪৪ ॥
 কিশু তস্মাৎ পরস্মিংশচ ধারণা পরমা শ্রুতা ।
 দশৈতা ধারণাঃ প্রাপ্য প্রাপ্তোত্যক্ষরসাম্যাত্ম ॥ ৪৫ ॥
 নান্যাতঃ স্পৃহিতঃ প্রান্তো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ ।
 যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র যোগী সিদ্ধার্থমাদৃতঃ ॥ ৪৬ ॥
 নতিশীতে ন চোক্ষে বৈ ন দ্বন্দ্বেন নানিলাস্ককে ।
 কালেষেতেষু যুঞ্জীত ন যোগং ধ্যানতৎপরঃ ॥ ৪৭ ॥
 শশদ্যমিঞ্জলাভ্যাসে জীর্ণগোষ্ঠে চতুস্পথে ।
 শুক্লপার্শ্বচয়ে নদ্যাং শ্মশানে সমরাস্তপে ॥ ৪৮ ॥
 সভয়ে কুপতীরে বা চৈতাবগ্নীকসঙ্কয়ে ।
 দেশেষুতেষু তত্ত্বজ্ঞো যোগাভাসং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

জলের কারণে যার হয় প্রয়োজন,
 যন্ত্র-নাশ-আদি-যোগে জলের গ্রহণ
 করি' সেই, যথা হুখে সরা করে পান'
 জিতক্রম যোগী তথা বাতু করে পান' ৪৩ ।
 প্রথমে নান্তিতে, পরে হৃদয়ে, বক্ষেতে,
 পরে, কণ্ঠে, মুখে সে নাসাগ্রে—ক্রমধোযতে ।
 পরে সে মূৰ্দ্ধায় হয় বায়ুর গমন
 তখন যোগীর হয় মানস পূরণ ৪৪ ।
 ইহার পরেতে হয় পরমা ধারণা
 অক্ষর-সাম্যতা যাহে—অপূৰ্ণ সাধনা ।
 এ ধারণা লাভ হয় যেই দশ স্থানে,
 কহিহু তা'দের নাম তব বিজ্ঞমানে ৪৫ ।

• আগ্রাতঃ, স্পৃহিতঃ, শান্ত, ব্যাকুল চেতন,
 যোগ্যভাসি না করিবে সিদ্ধির কারণ ৪৬ ।
 অতি শীতে, অতি গ্রীষ্মে, অন্ধকালে আর,
 বেগবান বায়ুকালে কর পরিহার ৪৭ ।
 শশদ্যমি যথা, কিশা জল সমিধান
 জীর্ণগোষ্ঠে চতুস্পথ তাজ মতিমান ।
 শুক্লপার্শ্ববৃত্ত স্থান আর সে শ্মশান,
 নদীকূল আর সরীসৃপযুক্ত স্থান ৪৮ ।
 ভয়যুক্ত স্থান, কিংবা কুপতীর আর
 চৈতাব আর আছে যথা বগ্নীক-সঙ্কার ।
 এই সব স্থান কতু যোগ-যোগ্য নয় ;
 তত্ত্বজ্ঞ যোগীরা ইহা জ্ঞানেন' নিশ্চয় ৪৯ ।

সদস্যানুপপত্তৌ চ দেশকালং বিবৰ্জয়েৎ ।
 নাসতো দর্শনং যোগে তস্মাৎ তৎ পরিবৰ্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥
 দেশানোতাননাদৃত্য যুত্ৰদ্বাদ্ব্যো যুনক্তি বৈ ।
 • বিদ্বায় তস্য বৈ দোষা জায়ন্তে তামিবোধ মে ॥ ৫১ ॥
 বাধির্ধ্যং জড়তা লোপঃ স্মৃতেষু কল্পমন্ধতা ।
 জ্বরশচ জায়তে সদ্যস্তত্তদজ্ঞানযোগিনঃ ॥ ৫২ ॥
 প্রসাদাদবোগাগিনো দোষা যদ্যন্তে স্মৃশ্চিকিংশিতম্ ।
 তেষাং কাশায় কর্তব্যং যোগিনাং তন্নিবোধ মে ॥ ৫৩ ॥
 স্নিদ্ধাং যবাগ্নুমতু্যফাং ভুক্ত্বা তত্রৈব ধারয়েৎ ।
 বাত-শূল্যপ্রশান্ত্যর্থমুদাবর্তে তথোদরে ॥ ৫৪ ॥
 যবাগ্নুং বাপি পবনং বায়ুগ্রস্থিঃ প্রাতিক্ষিপেৎ ।
 তদ্বৎ কপ্পে মহাশৈলং স্থিরং মনসি ধারয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
 বিঘাতে বচসো বাচং বাধির্ধ্যৈ শ্রবণেন্দ্রিয়ম্ ।
 যষ্টৈবাজফলং ধ্যায়েৎ তৃফার্ভৌ রসনেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

সব্দের অল্পপত্তি ঘটিবে শব্দন
 দেশকাল পরিহার করিবে তখন ।
 যোগে অগতের কতু না হয় দর্শন,
 এ কারণে তাহা সরা করিবে বর্জন ৫০ ।
 ইহে অনাদির কবি' এইসব দেশে
 যোগযুক্ত হ'লে বহু বিঘ ঘটবে শেষে ।
 তাহে যেই লোমচয় জনমে নিশ্চয়,
 বিস্তারি' বলিবে এবে সেই সমুদয়—৫১ ।
 বাধির্ধ্য, জড়তা হয় স্মৃতিলোপ আর,
 মূৰ্দ্ধ, অন্ধতা ঘটে—হয় জর তা'র ৫২ ।
 প্রসাদ বশেতে যদি ঘটয়ে এমন
 যোগীর চিকিৎসা ভিন্ন, শুনহ রাখন ।
 যেরূপে সে সব রোগ গড়ে নষ্ট হয়,

সে সব উপায় কহি করিয়া নিশ্চয় ৫৩ ।
 স্নৈহযুক্ত অতি উষ্ণ যবাগ্নু ভক্ষণ
 করিয়া সে অগ্নি স্থান করিবে ধারণ ;
 ইথে বাত শূল্যরোগ উদাবর্ত আর
 উদর রোগের শাস্তি কহিলাম সার ৫৪ ।
 যবাগ্নু অথবা বায়ু করিয়া গ্রহণ,
 ঘীরে ঘীরে করিবেন উদর পূরণ ;
 তাহে বায়ুগ্রস্থি নাশ হইবে নিশ্চয়
 পাঞ্জের বচন ইথে নানিক সংশয় ৫৫ ।
 যোগীর কখন হ'লে কপ্পের উদয়,
 মহাশৈল ধ্যানে তাহা যাইবে নিশ্চয় ।
 বাক্যের বিঘাতে বাক্য করিবে চিহ্নন ;
 বাধির্ধ্যৈ শ্রবণেন্দ্রিয়ে রাখিবেক মন ৫৬ ।

যস্মিন্ যস্মিন্ রজ্জা দেহে * তস্মিন্ স্তম্ভপকারিণীম্ ।
 ধারয়েদ্ধারণামৃশে শীতাং শীতে চ দাহিনীম্ ॥ ৫৭ ॥
 কীলং শিরসি সংস্থাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন তাড়য়েৎ ।
 লুপ্তশ্বতেঃ স্মৃতিঃ সন্ধ্যো যোগিনস্তেন জায়তে ॥ ৫৮ ॥
 দ্যাবাপৃথিব্যো বায়ুয়ী ব্যাপিনাবপি ধারয়েৎ ।
 অমানুষ্যং সত্ত্বজ্ঞানী বাধাস্বিত্তিচ্চিকিৎসিতম্ ॥ ৫৯ ॥
 অমানুষ্যং সত্ত্বমন্তর্বোধিগিনং প্রবিশেদ্বদী ।
 বায়ুগ্ৰিধারণেনৈনং † দেহসংস্থং বিনির্দ্দেহেৎ ॥ ৬০ ॥
 এবং সর্বাঙ্গানাং রক্ষা কার্য্যা যোগবিদা নৃপ ।
 ধর্ম্মার্থ-কামমোক্শাণাং শরীরং সাধনং যতঃ ॥ ৬১ ॥
 প্রবৃত্তিলক্ষণাধ্যানাদযোগিনো বিস্ময়াত্তথা ।
 বিজ্ঞানং বিলয়ং যাতি তস্মাদ্যোগোপ্যঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ৬২ ॥

তৃক্ষ্যং সে কঠকূপ কিম্বা আত্মকল্,
 চিন্তনে তৃক্ষ্যর নাশ, না পেলেন ও জল ।
 যেই অঙ্গে যেই রোগ হইল উদয়
 সে অঙ্গে রাখিলে মন যাইবে নিশ্চয় ॥ ৫৭ ॥
 উক্ষতে শীতল আর শীতেতে দহন,
 ধারণা করিলে যাবে—শাস্ত্রের লিখন ।
 নৃতিলুপ্ত হ'লে কাষ্ঠ-কীলক লইয়া
 শিরে রাপি, আঘাত করিবে দণ্ড দিয়া;
 লুপ্ত-স্বতি যোগীর তাহাতে হ'বে নাশ,
 সন্ধ্যা ফল লাভ হ'বে—না হবে নিরাশ ॥ ৫৮ ॥
 স্বর্গ-মর্ত্ত-বায়ু-অগ্নি দ্বারের আশ্রয়,
 কীব কিম্বা অমানুষ্য সব যত হয়,
 সে সব হইতে বাধা নাশিবার তরে

সেই সেই তব সধা ধরিবে অন্তরে ॥ ৫৭ ॥
 অমানুষ্য সব যদি যোগীর অন্তরে,
 প্রবেশয়ে তবে যোগীর তার নাশ তরে
 বায়ু অগ্নি † অন্তরেতে করিয়া করিয়া চালন,
 অনায়াসে করিবেন তাহার দাহন ॥ ৬০ ॥
 এইরূপে-নিরন্তর যোগবিংগণ
 সর্বাঙ্গ্যার রক্ষাকার্য্য করেন সাধন ॥ ৬১ ॥
 ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্শ চতুর্ভূগর্গ হয়,
 নর দেহ এ সবার সাধক নিশ্চয়;
 প্রবৃত্তি উদয় আর বিস্ময় উদয়ে
 বিজ্ঞান বিলয় হয় কলহীন হ'য়ে,
 এই হেতু প্রবৃত্তি-নিচয়ে যোগিগণ,
 সংযত করেন সধা করিয়া গোপন ॥ ৬২ ॥

* বেশে ইতি বা পাঠঃ ।

† শরীরাত্মাধারিত, বায়ু ও তেজস্বত্বের চালন দ্বারা সেই সকলকে দণ্ড করিতে হয় । সাধনসম্পন্ন
 ব্যাপী এই উপায়ে নিজের ও অন্তের রোগ নাশ করিতে পারেন ।

অলৌক্যমারোগ্যমনিষ্ঠু রত্নং
 গন্ধঃ শুভো যুদ্ধে পুরীষমল্লম্ ।
 কান্তিঃ প্রসাদঃ স্বরসৌম্যতা চ
 যোগপ্রবৃত্তেঃ প্রথমং হি চিহ্নম্ ॥ ৬৩ ॥
 অনুরাগং জনো যাতি পরোক্ষে গুণকীর্তনম্ ।
 ন বিভাতি চ সত্ত্বানি সিদ্ধৈর্লক্ষণমুত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥
 শীতোষ্ণাদিভিরভ্যুগ্রৈর্দস্য বাধা ন বিদ্যতে ।
 ন ভীতিমেতি চান্যোভ্যন্তস্য সিদ্ধিরূপস্থিতা ॥ ৬৫ ॥
 ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে অলকচরিতে দত্তাজ্ঞেয়ালকসংবাদে
 যোগনিরূপণং নামৈকোনচষাংশোধ্যায়ঃ ।

অলৌক্য, অরোগ আর অনিষ্ট-রূপ-
 শুভ গন্ধ, কান্তি আর প্রসন্ন স্বভাব,
 অলব পুরীষ যুদ্ধে, স্বরের মাদুরী
 যোগ প্রবৃত্তির চিহ্ন রেখো ইহা 'স্মরি' ॥ ৬৩ ॥
 সর্ব সন্ধে হয় অমরাগের উদয়,
 পরোক্ষে সবার গুণ কীর্তন করয়;
 হেরি' কোন প্রাণী বাহে নহে ভীত মন,
 সে যোগীর ছেনো এই সিদ্ধির লক্ষণ ॥ ৬৪ ॥
 অত শীত উষ্ণে যার কষ্ট নাহি হয়,
 অত হ'তে ভয় প্রাণে না হয় উদয় ।
 সেই যোগী অচিরে করিবে সিদ্ধিলাভ,
 এই সব শক্তি সেই যোগের প্রভাব ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে অলকচরিতাত্তর্গত দত্তাজ্ঞেয়ালকসংবাদে
 • যোগনিরূপণং নামক একোনচষাংশোধ্যায়ঃ ।



চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

দত্তাশ্রেয় উবাচ ।

উপসর্গাঃ প্রবর্তন্তে দৃষ্টে হ্যাহ্ননি যোগিনঃ ।

যে তাংস্তে সম্প্রবক্ষ্যামি সমাসেন নিবোধ মে ॥ ১ ॥

কাম্যাঃ ক্রিয়াস্তথা কামান্ মানুষানভিবাঙ্কতি ।

স্ত্রিয়ো দানফলং বিদ্যাং মায়াং কুপ্যং ধনং দিবম্ ॥ ২ ॥

দেবত্বমমরেশত্বং রসায়ন-বয়ঃক্রিয়াম্ ।

মরুৎপ্রপতনং যজ্ঞং জলাগ্ন্যাবেশনং তথা ॥ ৩ ॥

শ্রাদ্ধানাং সর্বদানানাং ফলানি নিয়মাংস্তথা ।

তথোপবাসাং পূর্তাচ্চ দেবতাভ্যর্চনাদপি ।

তেভ্যস্তেভ্যশ্চ কুর্ধ্যন্ত উপসংকৌহভিবাঙ্কতি ॥ ৪ ॥

চিত্তমিখং বর্তমানং যত্নাদযোগী নিবর্তয়েৎ ।

ব্রহ্মসঙ্গী মনঃ কুর্কম্প উপসর্গাং প্রমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

উপসর্গৈর্জিতৈরেভিরুপসর্গান্ততঃ পুনঃ ।

যোগিনঃ সম্প্রবর্তন্তে সাক্ত-রাজস-তামসাঃ ॥ ৬ ॥

বলিলেন দত্তাশ্রেয়—“শুনহ রাজন,

যোগীর বশন ঘটে আছার দর্শন,

সে কালে যে সব উপসর্গের উদয়

বিস্তারি' বলিব এবে শুণ সমূহয় । ১ ।

কাম্য ক্রিয়া করিবারে মন যেতে চায়,

কর্ণের কামনা বহ ব্যস্ত করে তায়,

নারীসঙ্গ, দান ফল, বিদ্যা গৌরব,

মায়ার তাক্তন, ধন-রত্ন আদি সব,

স্বর্গবাস-আশা সে দেবদ্ব লাভ আর,

ইন্দ্রেশ্বর বাসনা অন্তরে আসে তার,

স্থিতির যৌবন আশে বাহে রসায়ন,

বায়ু, অগ্নি, জল, যজ্ঞ পেতে চায় মন । ২-৩ ।

শ্রাদ্ধফল, সকল দানের ফল আর

নিয়মোপবাস অর্চনফলে আশ তায় । ৪ ।

এ সব ফলের আশা জাগিলে অন্তরে

মনেরে সংযত যোগী করিবে সর্বদে । ৫ ।

ব্রহ্মে মন দিলে এই উপসর্গ যায় ।

পরে অল্প উপসর্গ ব্যস্ত করে তায় ।

স্ব-রজ-তমঃ এই এই গুণ জয় হ'তে

উপসর্গ জরি ব্যস্ত করে বিধি মতে । ৬ ।

প্রাতিভঃ শ্রাবণে দৈবো জ্ঞানবর্ত্তো তথাপরো ।

পঠৈতে যোগিনাং যোগ-বিদ্যায় কটুকোদয়াঃ ॥ ৭ ॥

বেদার্থাঃ কাব্যশাস্ত্রার্থা বিদ্যাশিল্পান্যশেষতঃ ।

প্রতিভাস্তি যদস্যোতি প্রাতিভঃ স তু যোগিনঃ ॥ ৮ ॥

শব্দার্থানখিলান্ বেতি শব্দং গৃহ্ণাতি চৈব যৎ ।

যোজনানাং সহস্রেভ্যঃ শ্রাবণং সৌভিধীয়তে ॥ ৯ ॥

সমস্তাদ্বৈক্যতে চাকৌ স যদা দেবযোনয়ঃ ।

উপসর্গং তমপ্যাছদৈববস্তুভবদ্ব্যুৎ ॥ ১০ ॥

জ্ঞান্যতে যম্মিরালম্বং মনো দোষেণ যোগিনঃ ।

সমস্তাচারবিভ্রংশাদ্ভ্রমঃ স পরিকীর্তিতঃ ॥ ১১ ॥

আবর্ত্ত ইব তেয়স্য জ্ঞানাবর্ত্তো যদাকুলঃ ।

নাশয়েচ্চিত্তমানবর্ত্ত উপসর্গঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

এতৈর্নশিতযোগাস্ত স কলাদেবযোনয়ঃ ।

উপসর্গৈর্মহাঘোটৈরারবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাতিভ, শ্রাবণ, দৈব, জ্ঞানবর্ত্ত আর

উপসর্গ পঞ্চবিধ জনমে'তাহার

এই পঞ্চ উপসর্গ যোগ বিদ্য হয় ।

বিত্তারি' লক্ষণ বলি শুন সমূহয় । ৭ ।

বেদ-অর্থ, আর কাব্যশাস্ত্র আবাদন,

বিদ্যার গৌরব, শিল্প শাস্ত্র আলোচন,

প্রতিভার ফল ইহা 'প্রাতিভ' নিশ্চয়,

এ সবতে দিলে মন যোগ নষ্ট হয় । ৮ ।

অখিল শব্দার্থ তরে মন সধা ধায়

যোজন সহস্র ঘুরে শব্দ শোনা যায় ;

“শ্রাবণ” নামেতে বিদ্য যোগ পথে এই,

ইহাতে ভুলিলে আর সিদ্ধি আশা নেই । ৯ ।

যে সময়ে হয় তাঁর দেবের দর্শন,

যেহে অষ্ট দিকে সধা আছে দেবগণ,

এই বিদ্য “দৈব” নামে কহে হৃদিগণ,

এই সব হ'তে চাই ফিরাইতে মন । ১০ ।

কত্ব দোষ বশে হয় নিরালম্ব মন

বুধায় বিষয় বহু করে অশেষণ ;

বুধা জমি' তাজে যত যোগীর আচার

উপসর্গ—“ভ্রম”-নাম জানিহ ইহার । ১১ ।

জ্ঞানের আবর্ত্ত যধা ঘুরে অহঙ্কণ

জ্ঞানের আবর্ত্ত পড়ি' ঘুরে তথা মন ।

চিত্ত ইচ্ছা নয় তাহে হৃদয় নিশ্চয়

“আবর্ত্ত” নামেতে উপসর্গ এই হয় । ১২ ।

এই সব উপসর্গে যোগভ্রষ্ট হ'য়ে,

পুনঃ পুনঃ জন্মে জীব নানা দেহ লয়ে । ১৩ ।

প্রারূঢ়্য কঞ্চলং শুক্লং যোগী তন্মামনোময়ম্ ।
 চিস্তয়েৎ পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণা তৎপ্রবণং মনঃ ॥ ১৪ ॥
 যোগযুক্তঃ সদা যোগী লঘুহারে জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 সূক্ষ্মস্ত ধারণাঃ সপ্ত ভুরাদ্যা মুক্তিং ধারয়েৎ ॥ ১৫ ॥
 ধরিত্রীং ধারয়েদ্যোগী তৎসৌখ্যং প্রতিপদ্যতে ।
 আত্মানং মন্যতে চোর্বীং তদাধকং জহাতি সঃ ॥ ১৬ ॥
 তথৈবান্দ্রুং রমং সূক্ষ্মং তদ্বজ্রপঞ্চ তেজসি ।
 স্পর্শং বায়ৌ তথা তন্নদ্বিত্ততন্তস্য ধারণাম্ ॥ ১৭ ॥
 ব্যোমং সূক্ষ্মাং প্রবৃত্তিঞ্চ শব্দং তদ্বজ্রহাতি সঃ ॥ ১৮ ॥
 মনসা সর্কীভুতানাং মনস্যাবিশতে যদা ।
 মানসীং ধারণাং বিভ্রনুনঃ সূক্ষ্মঞ্চ জায়তে ॥ ১৯ ॥

এই সব উপসর্গ নাশের কারণ,
 মনে মল-হীন করি' করিয়া যতন,
 মনোময় স্বকল কথলে তার পর
 অবিরত করি' যোগী আপন অন্তর
 একান্তেতে একতান করি' প্রাণ মন,
 নিরন্তর পরব্রহ্ম করিবে চিস্তন ॥ ১৪ ॥
 জিতেন্দ্রিয় হইবে করি' হৃদয় আহার,
 যোগযুক্ত হইবে সদা এই মুক্তি সার ॥ ১৫ ॥
 কৃ-আদি সে সপ্ত হুস্ত তবের ধারণা
 করিবে মনকে, তাকি' জ্ঞানর ভাবনা ॥ ১৬ ॥
 ধরিত্রী-ধারণা সিদ্ধি হইবে যখন
 গচ্ছ তদ্ব্যয়ের জ্ঞান হইবে তখন ।
 ক্রিত্তিত্ত্বাকরিত আত্মায় সেই কালে
 গচ্ছ অহুত্ব তব হইবে অবহেলে
 সেই কালে পরিহার করিলে তাহার
 অপের ধারণাসিদ্ধি হবে ইহা সার ।
 বস তদ্ব্যয়ের উপপত্তি সে সময়
 হইবে আত্মায় ইহা জ্ঞানি নিশ্চয়
 বস-অহুত্ব তব হইবে নিরন্তর,

তাকিলে তাহারে তেজস্তর তার পর ।
 রূপতদ্ব্যয়ের উপলব্ধি সে সময়
 অনায়াসে হইবে ইহা জ্ঞানি নিশ্চয় ।
 চক্-অগ্নোচর রূপ হইবে অহুত্ব,
 যতনে তাকিলে যোগী সেই ত বিভব ।
 তার পরে বায়ুতর হইবে ধারণা
 তাহে স্থিত হলে, স্পর্শজ্ঞান হয় নানা ॥ ১৭ ॥
 স্পর্শতদ্ব্যয়ের জ্ঞান করি পরিহার
 যোনতর-ধারণা হইবে তবে তার ।
 শব্দতদ্ব্যয়ের হইবে উপলব্ধি তায়
 অশেষ মধুর শব্দ শুনে যোগী যায় ॥ ১৮ ॥
 সে সব তাকিলে যোগী করিয়া যতন
 হবে মনঃ স্থির ক্রমে শুন হে রাধিন ।
 পরে মনস্তবের ধারণা হইবে তার,
 এ তব বিবৃত অতি জেনে ইহা সার ।
 হুস্ততম মনস্তবের স্থিতি হইলে পর
 জানিবার শক্তি হয়—সবার অন্তর ।
 মানসের হুস্তগতি জনমে তাহার
 ইচ্ছা হইলে মনের ভাবনা জানা যায় ॥ ১৯ ॥

এখানে লগ্নকাল পর্যন্ত নাক্ষত্রিকাল ঘটাদি ২১১১৯

২ ঘটিকা = অশোনি ১৩৫১ ০ ১০

১১ মি = " ২১৪৫ ১ ০

২ সে = " ২১১৫

২ ১১ ১২ = ১৩৭ ৪৭ ১৫ দশমের সরলোথান বা রাইট

আসেনপান অব দি মেরিডিয়ান (R.A.M.C.)

অতএব—

১৩৭ ৪৭ — দশমের সরলোথান (R.A.M.C.)

+ ৩০

= ১৬৭ ১৭ — একাদশের বক্কেথান (O.A. XI.)

+ ৩০

= ১৯৭ ৪৭ — দ্বাদশের " (O.A. XII.)

+ ৩০

= ২২৭ ১৭ — ত্রয়োদশের " (O.A. Asc.)

+ ৩০

= ২৫৭ ৪৭ — চতুর্দশের " (O.A. II)

+ ৩০

= ২৮৭ ১৭ — পঞ্চদশের " (O.A. III)

দশম ব্যতীত পাঁচটির ফুট পূর্ণ হুয়াহুসারে হইবে । দশমের জ্ঞাত পতন্ত্র নিয়ম আছে ।

এখন লগ্ন কনি—

লগ্নের বক্কেথান (O.A. Asc.) = ২২৭ ৪৭

— ১৮০

= ৪৭ ৪৭

অতএব লগ্ন কো-জ্যা (Log. cos.) লগ্নের ব-উ ৪৭ ৪৭ = ৯.৮২৭৩২৮

+ লগ্ন কো-স্প (Log. cot.) অক্ষ ২২৭৩০ = ১০.৩৮১৭৫০

— লগ্ন কো-স্প (Log. cot.) \angle ক ৩১১৪ = ১০.২০৯০৩০

— জ্যামির পরামাঙ্কম

২২৭২

= \angle ব ৮১.৮

লগ্ন কো-জ্যা Log. cos. ক ৩১১৪ = ৯.৯০৪৪৪৯

+ লগ্ন স্প Log. tan. লগ্ন ব-উ ৪৭ ৪৭ = ১০.০৪২২৬১

৯.৭৬৮১০

— লগ্ন কো-জ্যা Log. cos. অ ৮১.৮ = ৯.৯০৪৪৪৯

= লগ্ন জ্যা Log coo লগ্ন ৪৭ ৪৭ = ৯.৯৮১১৪৬

+ ১৮০

৩০ ২২৭৪৫

৭১৩৪৫ সায়ন লগ্ন

এইরূপেই একাদশাদি অপর চারটি গৃহের ফুট নির্ণয় ক'ন্তে হইবে । দশমের জ্ঞাত—

লগ্ন কো. জ্যা ক্রা. প. (Log coo O. E.) ২২৭২ = ৯.৯৬২৫৬২

+ লগ্ন কো. স্প. (Log cot) দশম ৪২১৩ = ১০.০৪২২৬১

= লগ্ন কো. স্প. (Log cot) দশম ৪৪৪১ = ১০.০৪৮২৩০

জ্যা-প্র—১৫

ভাগ্যে তার ভাগ্যে। কর্তার পক্ষে কল্যাণ প্রদর্শিত হয়। লোকটার যদি বাহ্যিক কঠোর ব্যবস্থা করবার সুবিধা হয় বা ইন্ডিয়ানিং কাল করবার সুবিধা হয় তবে তাতে লাভ হতে পারে কিন্তু সেটা গ্রহ স্থান দেখে বলা যেতে পারে। এবার কি বকম?

আমি। এই বাহ্যিক কঠোর আর ইন্ডিয়ানিং বাদে সব ঠিক মিলেচে বলতে পারি।

গুরুদেব। তা'লে এই ১০। ২২। ৪০ই সায়ন লগ্ন। তাহলে দশম ৮। ৩। যার জন্ম সময়ে দশমে ধর ১ থেকে ৫ অংশের মধ্যে কোন অংশ উদিত থাকে, সে ব্যক্তি লোকমাত্র লাভ করে অর্থাৎ অনেকেই তার ভালবাসে।

আমি। এটাও মিলেছে।

গুরুদেব। তবে এখন দেখ জন্ম সময় কখন?

আমি। কি রূপে?

গুরুদেব। কেন? জন্ম সময়ে মধ্যাকাশের সরলোথান পেলে ১৬। ৩। ৪৮ এবং তদ্বিনের মধ্য মধ্যাহ্নে মধ্যাকাশের সরলোথান বা নাকত্র কাল পদ্ধিতে পাছো ১৩৪২৪৮ উভয়ের অন্তর ২১২ চু'খটা ২১ মিনিট নাকত্র কাল তাকে মধ্যাকাল করবার জন্ম চু'খটায় ২০ সেকেন্ড, আর ২৪ মিনিটে ৩ সেকেন্ড এই তেইশ সেকেন্ড বাদ দাও পেলে অপরাহ্ন ২টা ২০ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড সময়ে জন্ম।

আমি। অপরাহ্ন বলে যেন এর চেয়েও একটু বেশী বোধ হয় না?

গুরুদেব। যখন আকৃতি প্রকৃতি মিলে যা তখন আর আপত্তি করবার হেতু কোথায়? যাই হোক এখন রাশিচক্র একে গ্রহ নির্দেশ কর, তারপূর্ব যদিই চু'খের মিনিট এদিক ওদিক হয় তবে ২০ অংশ না হয় ২৪ অংশ হু'বে এই বই ত নয়?

আমি। আমি, একটা স্বতন্ত্র বিষয় জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছি।

গুরুদেব। জিজ্ঞাসা করুন।

আমি। আপনি ইতিপূর্বে অস্থাপত্য দ্বারা মানচিত্র হতে অনিচ্ছিত স্থানের অক্ষাধি নির্ণয়ের যে নিয়ম বলেছিলেন, যদি মানচিত্র উপস্থিত না থাকে, কেবল এরকম জানতে পারা যায় যে কোনও প্রসিক স্থানের উত্তরে পূর্বে পশ্চিমে বা দক্ষিণে এত দূরে এই স্থানটি তা হ'লে কি অক্ষাধি নির্ণয় করা যায় না?

গুরুদেব। তা যাবে না কেন? কোড়ির উপযোগী স্থল অক্ষাংশাদি ও দেশান্তরাংশাদি অল্পায়াসেই নির্ণীত হ'তে পারে। আমার বাতায় ও রকম নির্ণয়ের

একটা টেবিল আছে। এই দেখ—

ভৌম দূরত্ব সারণী #				
উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষ	অক্ষাংশের		দেশান্তরের	
	এক অংশে মাইল	এক কলায় ফুট	১ম অংশে মাইল	১ কলায় ফুট
০° অংশ	৬৮.৭১২০	৬০৪৫.৭৭	৬২.১৭২১	৬০৮৭.১৮
১০ " "	৬৮.৭২৩১	৬০৪৭.৬৩	৬৮.১২৮৬	৬২২৫.৩২
২০ " "	৬৮.৭৪০০	৬০৫২.২৮	৬৫.০২৬৮	৬৭২২.৩৬
৩০ " "	৬৮.৮৭৭৬	৬০৬১.২৩	৬২.০৫৬২	৬২৭৬.১৪
৪০ " "	৬৮.৯৯২৬	৬০৭১.৩৫	৫৩.০৬৩৭	৫৬৬২.৬২
৫৫ " "	৬৯.০৫৪০	৬০৭৬.৭৫	৪৮.০৯৫৮	৪৩১১.৬৩
৬৪ " "	৬৯.১১৫৪	৬০৮২.১৬	৪৪.৫৫২৩	৩৯২০.৬০
৬৫ " "	৬৯.১৭৬১	৬০৮৭.৪১	৩৯.৭৬৬৬	৩৪২২.৪৬
৬৬ " "	৬৯.২৩১১	৬০৯২.৩৪	৩৪.৬৭৪৮	৩৫৫১.৩৮
৭০ " "	৬৯.৩২৫৭	৬১০০.৬৬	২৩.৭২২৮	২০৮৮.২২
৮০ " "	৬৯.৩৮৭৫	৬১০৬.১৫	১২.০৫১৫	১০৬০.৫৩
৯০ " "	৬৯.৪০২০	৬১০৮.০০	—	—

এখন মনে কর কেহ বলে কলিকাতা হ'তে অহমান জিশ কোশ পশ্চিমে ও পূর্ব কোশ উত্তরে কোন স্থানে একটা বালক জন্মেছে, এ অবস্থায়, কিরূপ কস'বে?

আমি। কলিকাতার অক্ষ ২২°৩০' উত্তর ও দেশান্তর ৮৮°৩০' পূর্ব স্বীকার করে কস'বে কি?

গুরুদেব। কস'বার সুবিধার জন্ম? তা কস'।

আমি।—

২০ অংশ অক্ষ = ৬৮°৭৮'৪০" মাইলে এক অংশ

৩০ " " = ৬৮°৮৭'৭৬" " " "

∴ ১০ " " = ০°২৩৬ মাইল দূতি

∴ ১ " " = ০°২৩৬ " "

∴ ২ " " = ০°১৮৭ " "

এবং ৩০ কলা = ০°৪৭ " "

∴ ২°-৩০' = ০°২৩৬ " "

এবং ২০° = ৬৮°৭৮'৪০"

+ ২°-৩০' = ০°২৩৬

= ২২°-৩০' = ৬৮°৮০'৭৪" মাইল = ১ অংশ বা ৬০ কলা

* এলেন লিও এণ্ড্রিওস জিওগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড ন্যাভিগেশনাল

স্থানটি ১৫ কোশ উত্তরে

সুতরাং ৩০ মাইল

$$\therefore ৩৮৮ \times ১৪ : ৩০ :: ৬০' : কত ?$$

$$৩০ \times ৬০ = ২৬ কলা$$

$$৩৮৮ \times ১৪$$

যদি ফুট ধরে কসি, তবে ১৭৬০ গজ বা ৫২৮০ ফুটে মাইল

$$২০' অক্ষ = ৬০৪৭'৬৩ ফুটে ১ কলা$$

$$৩০' " = ৬০৫২'২৮ " "$$

$$\therefore ১০ অংশে ৫'৩৫ ফুট বৃদ্ধি$$

$$১ " = ৫'৩৫ " "$$

$$২ " = ১'০৭ " "$$

$$৩০ " = ২'৭ " "$$

$$২'-৩০ = ১'৩৪ " "$$

$$\text{এবং } ২০' = ৬০৪৭'৬৩ " "$$

$$২'-৩০ = ১'৩৪$$

$$\therefore ২২'-৩০ = ৬০৪৮'২৭ = ১ কলা$$

$$\text{অতএব } ৩০ \text{ মাইল} \times ৫২৮০ = ২৬ কলা$$

$$৬০৪৮'২৭$$

$$২২'-৩০' + ২৬' = ২২' - ৫৬ উত্তর$$

সেই দেশের অক্ষাংশ

দেশান্তর অঙ্ক—

$$২০' অক্ষ ৬৫' ০২৮ মাইলে এক অংশ$$

$$৩০' " = ৫২' ২৫৬২ " "$$

$$১০ অংশে ৫' ০৭০৬ মাইল হ্রাস$$

$$১ অংশে ৫' ০৭০৬ " "$$

$$২ " = ১' ০৪১ " "$$

$$৩০ কলায় ২৫৩৫ " "$$

$$২০'-৩০' = ১' ২৬৭৬ " "$$

$$\text{এবং } ২০' অক্ষ = ৬৫' ০২৮$$

$$+ ২'-৩০' = ১' ২৬৭৬$$

$$\therefore ২২'-৩০ = ৬৩' ৭৫২ = ১' বা ৬০'$$

স্থানটি ত্রিশ কোশ বা ৬০ মাইল পশ্চিমে

$$\therefore ৬৩' ৭৫২ : ৬০ :: ৬০ কলা : কত ?$$

$$৬০ \times ৬০ = ৫৬ কলা$$

$$৬৩-৭৫২২ = ৫৬ কলা$$

ফুট হিসাবে

$$২০' অক্ষ ১ কলা = ৫৭২২' ৩৬ ফুট$$

$$৩০' " = ৫২৭৬' ১৪ " "$$

$$১০' " = ৪৪৬' ২২ " হ্রাস$$

$$১০' " = ৪৪' ৬২২ " "$$

$$২' " = ৮২' ২৪ " "$$

$$৩০' " = ২২' ৩১ " "$$

$$২'-৩০' = ১১১' ৫৫ " "$$

$$২০' অক্ষ = ৫৭২২' ৩৬ ফুট$$

$$+ ২'-৩০' = ১১১' ৫৫ " "$$

$$২২'-৩০ " = ৫৬১০' ৮১ " "$$

$$\therefore ৬০ \times ৫২৮০ = ৫৬'$$

$$৫৬১০' ৮১$$

$$\therefore ৮৮' ৩০' - ৫৬' (পশ্চিমে বলিয়া)$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

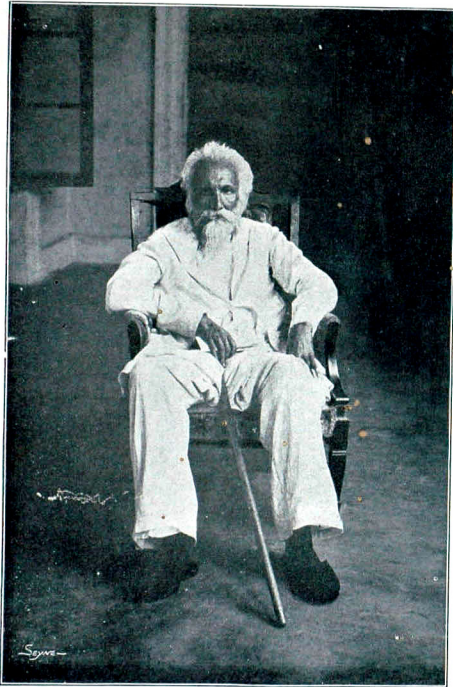
$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

$$= ৮৭'-৩৪' সেই দেশের গ্রী-পূ দেশান্তর$$

অংশ	-কলা	মধ্যকাল			নাক্ষত্র সংস্কার	
		ঘণ্টা	মিনিট	সেকেন্ড	মিনিট	সেকেন্ড
০	১	০	০	৪	০	০১
০	২	০	০	৮	০	০২
০	৩	০	০	১২	০	০৩
০	৪	০	০	১৬	০	০৪
০	৫	০	০	২০	০	০৫
০	৬	০	০	২৪	০	০৬
০	৭	০	০	২৮	০	০৭
০	৮	০	০	৩২	০	০৮
০	৯	০	০	৩৬	০	০৯
০	১০	০	০	৪০	০	১০
০	১১	০	০	৪৪	০	১১
০	১২	০	০	৪৮	০	১২
০	১৩	০	০	৫২	০	১৩
০	১৪	০	০	৫৬	০	১৪
০	১৫	০	১	০	০	১৫
০	১৬	০	২	০	০	১৬
০	১৭	০	৩	০	০	১৭
১	১৮	০	৪	০	০	১৮
১	১৯	০	৫	০	০	১৯
১	২০	০	৬	০	০	২০
১	২১	০	৭	০	০	২১
১	২২	০	৮	০	০	২২
১	২৩	০	৯	০	০	২৩
১	২৪	০	১০	০	০	২৪
১	২৫	০	১১	০	০	২৫
১	২৬	০	১২	০	০	২৬
১	২৭	০	১৩	০	০	২৭
১	২৮	০	১৪	০	০	২৮
১	২৯	০	১৫	০	০	২৯
১	৩০	০	১৬	০	০	৩০
১	৩১	০	১৭	০	০	৩১
১	৩২	০	১৮	০	০	৩২
১	৩৩	০	১৯	০	০	৩৩
১	৩৪	০	২০	০	০	৩৪
১	৩৫	০	২১	০	০	৩৫
১	৩৬	০	২২	০	০	৩৬
১	৩৭	০	২৩	০	০	৩৭
১	৩৮	০	২৪	০	০	৩৮
১	৩৯	০	২৫	০	০	৩৯
১	৪০	০	২৬	০	০	৪০
১	৪১	০	২৭	০	০	৪১
১	৪২	০	২৮	০	০	৪২
১	৪৩	০	২৯	০	০	৪৩
১	৪৪	০	৩০	০	০	৪৪
১	৪৫	০	৩১	০	০	৪৫
১	৪৬	০	৩২	০	০	৪৬
১	৪৭	০	৩৩	০	০	৪৭
১	৪৮	০	৩৪	০	০	৪৮
১	৪৯	০	৩৫	০	০	৪৯
১	৫০	০	৩৬	০	০	৫০
১	৫১	০	৩৭	০	০	৫১
১	৫২	০	৩৮	০	০	৫২
১	৫৩	০	৩৯	০	০	৫৩
১	৫৪	০	৪০	০	০	৫৪
১	৫৫	০	৪১	০	০	৫৫
১	৫৬	০	৪২	০	০	৫৬
১	৫৭	০	৪৩	০	০	৫৭
১	৫৮	০	৪৪	০	০	৫৮
১	৫৯	০	৪৫	০	০	৫৯
১	৬০	০	৪৬	০	০	৬০

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি)



“এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ অগুণ সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই মহত্ত্বের সময় জ্ঞান-মন-প্রাণ চরিতার্থতা লাভ করতে পারে না। সেই এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যে সবই আছে—আনন্দ আছে, জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, শক্তি আছে,—‘নাট’ শব্দই সেখানে নাই।”

গৃহস্থ

“মনে পড়ে সে বালকে ? বৃহৎ সে গ্রাম
ধর্মীর ঔপাধীর যেন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে ?
চৌকির প্রকৃতি তার হাত প্রসারিছে
আনন্দ অকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধার প্রতিদিন—
গুরু শাশি তরু ছায়ে, তরু মূলে শুয়ে,—
সমুদ্রে নদন, মাথা হস্ত পবে থুয়ে,
বৌদ্ধ কবে অমৃতব, সিদ্ধ অমৃতব,
স্বপ্নাশ্রু গ্রামে প্রতিবিন্দু অমৃতব।

* * * * * কত কিবিলাম,—

কোথা লোক ? গ্রাম যার মুক্ত ? পৃথিবীর
সর্বদ্বাপ পড়ে যোথা ? লস্ক কি গভীর—
প্রতিকূর্ণ অকুজীবে বন্ধ, এক বাড়ি ?
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি ?
দূতবাছ—ওই জেলে-ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্রে মাঝে কবিতা স্বেপন
নিজেরে সহসা, বহু চলিয়া ডুবিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাস্তমুখে ফলাশুস্ত ফেল কণ্ঠজাল—
“নিশ্চর উঠিবে মংস্ত”—বৈদ্যদূত ভাল।
সে লোক নিশ্চর অতি যোর ভালবাসে
—তা ন’লে কি কসে পুড়ি ওইরূপ হাসে ?
—জীবন, জীবন, তাই, আনন্দ জীবন।”

সত্যীশচন্দ্র রায়।

৫ম খণ্ড

৫ম বর্ষ

বৈশাখ, ১৩২১

সপ্তম সংখ্যা

আলোচনা

১। বিগত বর্ষের দান

বাদ্দালী জ্ঞাতীর একটি বর্ষ আজ চলিয়া গেল। এই ৩৬৫ দিন ধরিয়া বাহার সহিত বাস করিলাম তাহার নিকট হইতে কি শিক্ষা করিয়াছি তাহা আর একবার শ্রবণ করিয়া তাহাকে বিদায় দিব।

৩৬৫ দিন অতিবাহিত হইয়াছে; সব-গুলিরই সমান মূল্য আছে, সব দিনেরই একটা হিসাব নিকাশ লইতে হইবে এমন কথা আমরা বলিতেছি না। সমগ্রভাবে এই বৎসরের মধ্যে আমরা জাতীয় উন্নতির কোন্ দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছি তাহারই আলোচনা করা যাক। আমরা পূর্বে অনেক-

বার বলিয়াছি এ বৎসরে স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এটা জনসাধারণের যুগ। এই যুগে আমরা আবার নতুন আশা নতুন বিশ্বাস লইয়া কণ্ঠসমুদ্রে অবতীর্ণ হইব। নতুন নতুন কার্যাবলী ঘোষিত পাইব। কপাটা যে কত সত্য তাহা ক্রমশঃই বুঝিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে ছই তিন বৎসর আমরা খুবই কণ্ঠস্তম্পর ছিলাম। পরে নানা কারণে সে অস্বাভাবিক কিছু পরিবর্তন হইল। আমরা ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতে লাগিলাম। শিল্প বল, ব্যবসায় বল, শিক্ষা বল, রাজনীতি বল সমস্ত দিকেই আমাদের চোটা অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িল। কিন্তু এবার আবার আমাদের মধ্যে যে বিপুল কণ্ঠশক্তি জাগিয়াছে, টাউন হলের বিরাজ সভার প্রথম পরিচয় আমরা পাই। অবশিষ্ট যে আলস্ত-জড়তা ছিল, তাহা দামোদরের বজায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতে আমরা আবার কণ্ঠে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আত্মিকার প্রবাসী নিপীড়িত ভারবাসীর জন্ত তাকার স্মৃতি লইয়া আমরা ঘরে ঘারে ঘুরিতেছি, নানা সভামিলিত্তিতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের জন্য আন্দোলন করিতেছি। আমাদের হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ সমাজ-শক্তিকে পুনরায় জাগ্রত করিয়া সনাতন ব্রহ্মধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে এবার সমবেত হইয়াছেন। সমাজের সুপ্রাণ-সমুদ্রের উচ্চের সাধনের জন্ত চারিদিকে বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; সে আন্দোলনে সমাজের নেতা হইতে সাধারণ জন-সমাজ পর্যন্ত সকলেই যোগদান করিয়াছে। বঙ্গবাসী, এরূপ কণ্ঠ-প্রবণতা গত তিনচারি বৎসরের মধ্যে দেখিয়াছি কি? এই সময়ে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান-

বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির মনোরম দেশের নেতারা সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু কেহ সেদিকে এতদূর বিশেষ দৃষ্টিপাত করে নাই। তোমরা হয়ত বলিবে, কিস্তি কয়েক বৎসরে এমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই, যাহার ফলে দেশ-বাসীর বিশেষভাবে সাজা দিবার আবশ্যকতা ছিল। আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব। তুফানের যুদ্ধের সময় যখন গত বৎসর মুসলমানেরা স্থানে স্থানে সভা করিয়া আহত সৈনিকদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছিল, তখন কেবলমাত্র কতিপয় নেতা ও শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত অল্প কয়েক তাহাদের ডাকের উত্তর দেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের কণ্ঠে করিবার অনিচ্ছা। যাক, দুই অতীতের কথা এখন আমাদের কাজ নাই। পুনরায় যখন আমাদের আশা ও উৎসাহ ফিরিয়া পাইয়াছি, তখন তাহাই লইয়া কাজ প্রবৃত্ত হই।

মনোরাবিণ্ড, বাঙ্গালী, বিগত বর্ষ তোমাদের জাতীয় জীবনের আর এক শুভ মুহূর্ত্ত আনিয়া দিয়াছে। এই বৎসরে তোমরা যেমন বীরোচিত, মনুষ্যোচিত কাজ করিয়াছ তেমন আবার চারিদিকে হইতে যথেষ্ট সম্মানও পাইয়াছ। ডাক্তার বাগবাজারীর দানে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধিত হইল, অপর দিকে বাঙ্গালী জাতির বিশেষতঃ হিন্দুর দানস্তম্পরতার কথা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অবশ্য এই দানকে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দান বলিয়া ঘোষণা করিতেছি না। ডাক্তার ঘোষও এই দানের ফলে কত লাভবান হই নাই। তিনি এই জন্ত গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের নিকট যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার

তুলনায় এ দশ লক্ষ টাকা মূল্য অতি নগণ্য। আর যদি তিনি সম্মান নাও পাইতেন, তবুও বর্ষের সম্মানবাহার করিয়া তিনি যে স্বয়ং ও শান্তি উপভোগ করিতেছেন তাহারই বা তুলনা কোথায়? ইতিপূর্বে দানবীর তারকনাথ, ব্রজেশ্বরিণের ও মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্রও, যথেষ্ট দান করিয়া আদর্শ সমুদ্রে রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত সে দানের অঙ্ককরণ বড় কয়েক করেন নাই। কিন্তু রাখিয়াছার দানের পর আমরা শিক্ষার জন্ত নানাদিক হইতে আরও ছই হাজার দশ হাজার দানের কথা শুনিতেছি। আমরা এই সকলকে এই বিগত শুভ বর্ষেরই দান বলিয়া মনে করি।

তোমাদের জাতীয় সম্মান লাভের আর ছই একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিব। দামোদরপ্রবাসনের কালে ছাত্রগণ যে জীবন-গুণ পরিশ্রম করিয়াছিল, তাহাতে একদিকে এই যে ভাষণ বহুপাণ্ডিত্যের জয় যেমন ক্রয় করিয়া রাখিল, অতদিকে তেমনি স্বয়ং বড়লাটের নিকট হইতে প্রশংসাপত্রক সার্টিফিকেট আদায় করিয়া ছাড়িল। এ পর্যন্ত গভর্ণমেন্টের অনেক কণ্ঠচারী ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রবর্গকে 'ছাত্রগণ', 'হটবাকী', বিলাসী প্রভৃতি বর্ণনায় সম্ভাষণ করিতেন, এবার তাহাদের মুখ বন্ধ হইয়াছে। ছাত্রগণের এই সম্মান-লাভ তোমাদেরই জাতীয় সম্মান।

তৃতীয় কথা, তোমাদের জগৎপ্রসিদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের সম্মানলাভের কথা। তিনি গর্ভে ব্রাহ্ম হইলেও জাতিতে হিন্দু, জাতি-শরীরে হিন্দুর রক্ত বিভ্রম্যান; হিন্দুস্থানের মাটিতে তাহার জন্ম; হিন্দুস্থানের মাটিতে তিনি লালিত পালিত। তিনি যে চরম সত্য

কবিতার প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজ জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বিবেচিত হইতেছেন, তাহাই হিন্দুর চিরজন্ম আদর্শ। স্বতরাং তিনি ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী হইলেও তাঁহাকে তোমরা হিন্দুই মনে করিও। বিগত বর্ষে তিনি যে সম্মান-লাভ করিয়াছেন তাহা শুধু জাতিককে গৌরবান্বিত করে নাই; বাঙ্গালী ভাটিককেও তাহার অংশভাগী করিয়াছে। তাই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবাসীকে সম্মানিত করিয়াছে বলিলেই সত্য কথা বলা হয়।

পাকাতোর নিকট আমাদের এই সম্মানলাভ অজ্ঞে কি চক্ষু দেখিবে, জানি না। তবে আমরা দেখিতেছি, ১০-১৫ মাইল যে যুগের স্বজপাত করিয়াছে, ইহা সেই যুগোপযোগী একটা কণ্ঠ মাত্র। এই যুগের শেষভাগে যে অভিনব দৃশ্য দেখিতে পাইব, ইহা তাহার সূচনা মাত্র। আজ রবীন্দ্রনাথের যে সম্মানলাভে তোমরা আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছ, তাহার যোগ্য অধিকারী তোমাদের মধ্যে এখনও বহল রহিয়াছেন; তোমরা তাহাদিগকে চিনিতে ও সম্মান করিতে চেষ্টা কর। স্মরণ্যন, তাহারা যেন আবার একথা বলিত হুঁখি না পান, যে 'দেশের লোকের হাত থেকে যে অগণ্য ও অগমান আমার ভাগে পৌঁছেছে, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতাবৎকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কি জন্ত যে বিদেশ হতে আমি সম্মানলাভ করলাম, তা এখনো পর্যন্ত আমি নিজেই ভাল করে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্বভূমিতে বসে যাইকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলাম, তিনিই সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্ত যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন সে কথা আমি জানতুম

না।—ইহাদিগকে সমান প্রশ্রয়নের অর্থ ইহাদের দ্বায় পাশ্চাত্যকে জয় করিয়া— তাহার উপর প্রাচ্যের বিজয়পতাকা উড্ডীন করা; প্রাচ্যের ভাবে প্রতীত্যকে বিভোর করিয়া তোলা। তোমরা ভারতের অধিবাসী; স্বতরাং তোমরা ইচ্ছা করিলেই তাহা পারিলে।

এখন চিন্তা ও ভাব জগত ছাড়িয়া শিক্ষা ও সাহিত্যের দিক ছাড়িয়া শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি কর্তৃকগত প্রবেশ করা যাক। এরিকে আমাদের দেশবাসী ভারী পৌরবৃদ্ধগঠনোপযোগী কোন কর্তৃক এখন পর্যন্ত আরম্ভ করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত বিভাগে আমাদের উপযুক্ত কর্তার ও একান্ত অভাব। চাকরীগতপ্রাণ বাঙ্গালী জাতি সমসারের দ্বায়ে পড়িয়া ভবিষ্যৎ দেখিতে পারে না। প্রথমে একটু স্বার্থভাগ না করিতে পারিলে এই সমস্ত শিল্প-ব্যবসায়াদিতে লাভবান হওয়া যায় না; কাজ আরম্ভ করিতেও মূলধনের প্রয়োজন। স্বতরাং আমরাও প্রথম হইতে অল্প পথে মনোনিবেশ করি। ইহানীং শিল্প-কৃষির উন্নতির জন্ম কর্তৃকগুলি প্রস্তুত চলিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের অবস্থা আমাদের আশঙ্কাজনক নহে। স্তার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী মহাশয়ের দ্বায় শত শত কর্তার আবির্ভাব না হইলে শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভের আশা সুদূর-পর্যন্ত। বিদেশে ধারার শিল্পাদি শিক্ষার্থ যাত্রা করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া চাকরী গ্রহণ না করিয়া যদি স্বার্থভাগ পূর্ণক সামান্য সামান্য মূলধন লইয়া কার্য আরম্ভ করিতে পারেন, তাহাই দেশের প্রকৃত মঙ্গলের কারণ হইবে। কয়েক বৎসর হইতে দেশীয় ছাত্রগণের বিশেষ-যাত্রা অনেক বাড়িয়া

গিয়াছে। গতাবৎসরে এই বিদেশ যাত্রিগণের সংখ্যা পূর্ণ পূর্ণ বৎসর অপেক্ষা বেশী। ইহা আমাদের আশার কথা। বৎসর অধিবাসী, এই প্রসঙ্গে তোমাদিগকে কয়েকটি কথা স্মরণ করাইয়া দি। তোমরা বৃষ্টিয় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে ভারতের স্বীকৃত ছিলে। তোমাদের সেই যুগের ইতিহাস এখন বিশ্বতির গব্বরে লুপ্তহিত; কিন্তু তাহার নিদর্শন এখনও লুপ্ত হয় নাই। স্মরণ রাখিও, তোমরা সেই শিল্পকর্ম বিপ্লব ও ধীমানের উত্তরাধিকারী; তোমরা সেই দোহিওপ্রতাপ পাল-রাজগণের উত্তরাধিকারী। তোমাদেরই পূর্ণপুরুষগণ হুমিত্রা, যবদীপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিত। আর আর কোথায় তোমরা? কিন্তু আমরা বলি, তোমরা হতশ হইও না। এখন পুনরায় তোমাদের বংশ মার্টিন কোম্পানির কর্তা স্তার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হিপোক্রেন্ডে মার্কসের স্বধাধিকারী ও চার্লস ক্রফলাল ব্যাক, চিক-শিল্পী, অসীমজ্ঞানবীঠাকুর, ধর্মসমবায়ের ব্রহ্মর অধিকাচরণ উকীল প্রভৃতি লোক জন্মগ্রহণ করিতেছেন। তাই নৈরাশ আনিও না, পরন্তু জীবনব্যাপিনী পানায় প্রবৃত্ত হও। আগে চরিত্র গঠন কর।

২। বিদেশে ভারতবাসীর অবস্থা

আমরা গ্রন্থের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি ভারতের বাহিরে যে বিশাল জগৎ পড়িয়া আছে, তাহার অনেক স্থানে ভারতীয় হিন্দু মূলধন ব্যবসায়াদি উপলক্ষে বাস করিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, ইউনাইটেড স্টেট প্রভৃতি স্থানসমূহ ইহাদের

প্রধান উপনিবেশ। সম্ভ্রান্ত এই উপনিবেশ সকলের অধিকাংশেই ভারতবাসীকে লইয়া যে বিঘ্ন পোলযোগ উপস্থিত, তাহা আফ্রিকার ব্যাপার হইতে সকলেই বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। অতঃপর এই জাতীয় আর কয়েকটি সংবাদ আপনাদিগকে প্রধান করিতেছি।

কানাডার কথা

কানাডা উত্তর-আমেরিকায় ব্রিটিশের একটি উপনিবেশ। এদয়ার নানা দেশ হইতে বহুলোক ব্যবসায়, কৃষি প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া এই রাজ্যে যাইয়া বসবাস করিতেছে। ১৯০৬। ১৯০৭ সাল হইতে এই সমস্ত উপনিবেশকর্মের সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল যে কানাডার অধিবাসীরা তাহাতে একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কানাডাকে বিশুদ্ধ শ্বেতাভারত দেশ করিয়া রাখিতে অভিলাষী। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রাচ্য জাতির ঐ দেশে উপনিবেশ-স্থাপনের একান্ত অপকপত্তি হইয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন। ফলে স্থির হইল আর কোন প্রাচ্য জাতিকে কানাডায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। চীন উপনিবেশিক-দিগের Head tax-নামক কর বাড়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাতে কানাডার বিশেষ কিছু লাভ হইল না, কারণ সেসমু রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, প্রতি বৎসর যে সমস্ত লোক চীন হইতে আসে, তাহাদের সংখ্যা পূর্ণাঙ্গেক্ষা কম নহে। জাপান গবর্ণমেন্ট কানাডার সহিত নীনাংসা করিয়া লইলেন যে, তাঁহাদের বাজীর সংখ্যা প্রতি বৎসরে ৫০০এর অধিক হইবে না। কিন্তু ভারতের দৃষ্টান্তে তাই তাহার সহিত এক্ষণ কোন সন্ধি হইল না। বিশেষতঃ তাহারাই

কানাডায় শেষে উপনীত হইয়াছে। স্বতরাং আইনের চাপ তাহাদের উপরই বেশী পড়িল। তবুও ভারতবাসী ইংরাজ-রাজের প্রজা বলিয়া তাহাদের প্রবেশাধিকারের একটা পৃথক আইন ছিল। কিন্তু কানাডা গবর্ণমেন্ট আর এক জড়ত আইন জারি করিয়াছেন। তাহার মর্ম এই যে, প্রাচ্য জাতি তাহাদের দেশ হইতে জাহাজে উঠিয়া অল্প কোন স্থলে না অবতরণ করিয়া মোজাহাজ যদি কানাডায় উপস্থিত হন, তবে তাঁহাদিগকে নামিতে দেওয়া হইবে কি না বিচার করা যাইবে। এই আইনে প্রকারান্তরে ভারতবাসীকেই সেখানে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে; কারণ ভারতবর্ষের কোন স্থানে কানাডার টিকেট পাওয়া যায় না। আমাদিগকে ইংলও জাপান হইয়া যাইতে হয়। আমরা ভারতবাসী এই আইন দেখিয়া বিম্বিত হইয়াছি। কানাডা শ্বেতাভারত দেশ থাক তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই; কিন্তু তখন অল্প জাতি সেখানে গিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পায় তখন আমাদের জন্ম এ আইন কেন? কানাডার উপর তাহাদের অপেক্ষা কি আমাদের দাবী অধিক নয়? যদি সেখান হইতে সকলেই বিতাড়িত হইত তবে আমাদের ততটা ক্ষোভের কারণ ছিল না। ভারতবাসী দ্রুত, তাই কি তাহার প্রতি এত অত্যাচার?

এখন সে দেশের আর কয়েকটি পাশবিক অত্যাচারের কথা বলি। বিগত অক্টোবর মাসের ১১ই তারিখে ৫৬ জন হিন্দু কানাডায় উপস্থিত হয়। তাহাদের ১৭ জনকে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ৩৯ জনকে নির্দোষিত করিবার জ্ঞা প্রায় করিয়া রাখা হয়। এই সমস্ত বাজীর আর সকলেই কোথায় না নামিয়া

কানাডায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু উপনিবেশ-বিভাগের কর্মচারীরাও এই আইনের নান্দ্রি অর্থ দেখাইয়া তাহাদিগের অনেককে বন্দী করেন, অবশিষ্ট কতকগুলির একত্রে ক্রিকেট ছয়শত ছাফ্লিন টাকা না পাওয়ার দরুন তাহাদিগকেও আবদ্ধ রাখা হয়। এষ্ট আবদ্ধাবস্থায় তাহাদিগকে ধর্মের অমুমোদিত অথবা ভোজন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা নিজেদের দেশের কোন লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতেও পায় নাই। অপরদিকে কায়াগারে তাহারা জাপানী, চীনা প্রভৃতি জাতিগণ কর্তৃক যত্নে লালিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই যে, ভগবান সিং নামক জনৈক পুরোহিতকে ১৮ই অক্টোবর তারিখে বলপূর্বক নির্বাসিত করা হইয়াছে। তিনি ৫ মাস ধাবৎ সেখানে অবস্থিত করিতেছিলেন। তাহার প্রবেশাধিকারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার ছিল না। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা গেল তাহাকে বন্দী করা হইয়াছে, কারণ তিনি সেখানে রাজবিরোধ-সূচক বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু সেখানকার কেহই সে কথা বিশ্বাস করেন না। যাই হোক তাহাকে জোর করিয়া নির্বাসিত করা হইল।

যে সমস্ত ভারতীয় হিন্দুদিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় তাহাদের মধ্যেও আবার কানাডার কর্তারা শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন। একটা আইন আছে ঐলোক লইয়া কোন ঔপনিবেশিক কানাডায় বাস করিতে পাইবেন না; কিন্তু কেহ কেহ যে এক্সপ করিতেছেন সে দৃষ্টান্তও বিরল নহে। স্বতরাং বলিতে হয়—ইহার নাম অন্তরঙ্গ বাছাই।

নিউজিল্যান্ডের কথা

টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,

নিউজিল্যান্ডেও হিন্দুর প্রবেশ অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তথাকার গবর্ণমেন্ট শীঘ্রই হিন্দু অথবা অজ্ঞান এশিয়াবাসীর প্রবেশ-পথ বন্ধ করিবার জন্ত বিশেষ-বিধি প্রণয়ন করিবেন। হিন্দুরা শুদ্ধ দাঁল ভাত খাইয়া থাকে, তাহাদের সহিত ব্যবসা-সংগ্রামে জরলাভ করা সহজ নহে। সেইজন্য নিউজিল্যান্ডবাসী এবং ইউরোপীয়দিগের পার্থক্যের পক্ষে তাহারা নিত্যন্তই চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রজা। তাই তাহাদের প্রতিফুল হঠাৎ কোন বিধি প্রণয়ন করা বড়ই কঠিন। ওদিকে আবার, চীনবাসীরা ফলের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে, এবং হুয়ত শীঘ্রই আবার অজ্ঞান এশিয়াবাসী হাত দিবে। অতএব দেখা যাইতেছে এই সমস্ত এশিয়াবাসীদিগকে বিতাড়িত না করিতে পারিলে নিউজিল্যান্ডের কিছুতেই মঙ্গল নাই।

পূর্ব আফ্রিকার কথা

পূর্ব আফ্রিকা ব্রিটিশের অধীন একটা রাজ্য। ইহা তাহার উপনিবেশ নহে। ভারতবাসীরা সর্বপ্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এখানে সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়া। বহুগণের ইউরোপীয় ও এশিয়ায় অজ্ঞান বংশবাসী এখানে উপস্থিত হইতেছেন। এক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা দেখিয়া পূর্ব আফ্রিকার ঔপনিবেশিক ইউরোপীয়গণের মনে ভেদবুদ্ধি জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারাও এশিয়াবাসীকে তাহার বাসিকার হইতে বিচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প। সম্ভ্রান্ত উপনিবেশ-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হার-কার্টের নিমিত্ত তাহারা ব্যবস্থাপক-সভায়, সমস্ত-নির্বাচন-প্রথা রহিত করিয়া গবর্ণমেন্ট

কর্তৃক মনোনয়ন-প্রথা প্রবর্তিত করিবার জন্ত একটি দরখাস্ত করিয়াছে। গবর্ণমেন্ট তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, কেবল এশিয়ায় ঔপনিবেশিকগণের জন্ত এই নির্বাচন প্রথা রহিত হইল, তাহাদিগের পক্ষ হইতে গভর্ণর দুই একজন ইউরোপীয় বেসরকারী ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া লইবেন। -যে ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় জাতি এশিয়ায় নামে নাশা কৃত্রিম করে, তাহারা কোন দিন এশিয়ায় হাবভাব, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির সহিত রিসুয়ার পরিচিত নহে, তাহারা নামে মাত্র প্রতিনিধি সাজিয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবে এবং ভিত্তি বিপরীত ঘটাইবে। কিন্তু এশিয়াবাসী সংখ্যা সেখানে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা অনেক বেশী হইলেও ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারিল না।

ভারতবাসী এই তোমাদের সম্মান! জাতিত্বের চক্ষে তোমরা কি তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তোমরা মাহুয় না হইলে আর একলক যুটিবে না। তোমরা পুনরায় মাহুয় হও, বিশ্ববাসীকে বুঝাইয়া দাও, বার্ষ কীটকীলন যাপন করিবার জন্ত তোমরা জয়গ্রহণ কর নাই।

যে, তোমাদের জন্ত বিদেশের লোকও কাদিতেছে; আফ্রিকা তোমাদের দুর্দশা মোচনের জন্ত ইংলণ্ডের কর্মী অবতীর্ণ হইয়াছেন। কানাডায়ও বহু ইংরাজ তোমাদের সাহায্য করিতেছেন। সেখানকার বিচারক গভর্ণমেন্টের আদেশ আইন বিরুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আসামীদিগের ৩৪ জনকে মুক্তি দিলেন। আর তোমরা তাহাদের জন্ত কিই করিতে পার না! ইহা কি কম দুঃখের কথা?

৩। সামাজিক সমস্যা

বিবাহের পূর্ণপ্রথা রহিত করিবার জন্ত দেশে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে ব্যক্তিগত ভাবে সমাজের কাহারও যে কিছু ক্রিষ্টি উপকার না হইবে, এক্সপ কথা আমাদের মনে হয় না। তবে সাধারণ ভাবে উপকারের আশা বড় কম। আবেগের বশে, উচ্ছ্বাসের তাড়নায় অনেকই সংপথে প্রধাবিত হন। কিন্তু সে নাময়িক। অবস্থাটা প্রকৃত ভাবে তলাইয়া মজাইয়া দেবিবার অবসর যখন আসে, তখন মনের গতি পরিবর্তিত হইয়া যায়।

এই পূর্ণপ্রথা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসে—সমাজে ইহার প্রবর্তন হইল কেন? তত্বত্বের মনে হয়, থোমালের বশে ইহা কেহ প্রবর্তিত করেন নাই। আর্থিক দুরবস্থা বা লোভই ইহার কারণ। তবে একজন যে কারণেই হোক কোন একটা দৃষ্টান্ত দেখাইলেই অজ্ঞ লোকে সেই দৃষ্টান্তেরই প্রতিবিম্ব লইয়া থাকে। তারপর ধীরে ধীরে সেই প্রথাটাই প্রচলিত হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই যে আর্থিক দুরবস্থা, এই যে ধনের প্রতি অনাবশ্যক লোভ, এ সকলের সুলীভূত কারণ আমাদের ধর্মহীনতা। আমাদের দেশ হইতে তাগের শিক্ষা বৈরাগ্যের আদর্শ অন্তর্হিত প্রায়। তাই ধনকে আমরা চুছ করিতে পারি না—দৈত্যক বরণ করিতে সক্ষম হই।

অতএব যতদিন পর্যন্ত আমাদের আর্থিক দুরবস্থা অপনোদন না হইতেছে, ধর্ম-কীর্জন গঠন করিবার আয়োজন না হইতেছে, ততদিন পূর্ণপ্রথা রহিত করিলেও, অর্থ-শোষণের অজ্ঞ কোন উপায় অচিরেই সমাজ উদ্ধারিত করিয়া লইবে।

বাহা হোক, পণপ্রথা বন্ধ করিবার আশ্রম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা আমাদের খুবই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সশে সশে নেতারা ইহার মূল কার্যের নিকট দৃষ্টিপাত না করিলে, এবিধ আন্দোলনের যে বিশেষ কোন মূল্য নাই, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

..

৪। ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র-শাসন

ভারতের স্বাধীন রাজত্ববর্গের প্রতি বহু বিদেশীয়ই বড় একটা অশ্রদ্ধা নাই। তাহারের বিশ্বাস, এই সব রাজারা ধৈর্যশপক এবং অমিত্যচারী। এই মিথ্যা ধারণা অপনোদন করণে “রাজপুত হেরত্রে” একটি প্রচেষ্টা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার মূল প্রদান করিতেছি।—

ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির শাসনপদ্ধতি নিত্যন্তই গণতন্ত্রমূলক। সামান্য একটা টেটের রাজারও প্রজাদের উপর স্বেচ্ছাচার প্রসূত কর্তৃত্ব দেখা যায় না। প্রজাপাধারণের সহিত পরিচিত সজ্ঞী এবং পারিষদবর্গই তাঁহার পরামর্শদাতা। বিশেষতঃ যজ্ঞিষ বংশোদ্ভূত হওয়ায় তাঁহাদের সহিত লোকের আন্তরিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সেই জন্ত তাঁহারা পিতৃ-পিতামহের গৌরব সর্বদাই অক্ষুর রাখিতে যত্ন করেন, দূরদূরত্বের মত একাদেশের মঙ্গল তাঁহাদিগকে অহোরহ রক্ষা করিতে হয়, প্রজাদের মনের কথা তাঁহাদের মূখ দিয়াই বাহির হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে রাজা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মধ্যস্থলে তাঁহারা দণ্ডায়মান। এই সব লোকের নাম ঘরে ঘরে অন্তিম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়। শুর সলজ্জ, শুর মাধব রাও প্রভৃতি মহাত্মাদিগের বর্ণ-প্রাণাঙ্গী

অবগত হইলেই বুঝা যায়, তাঁহাদের চালিত রাজ্যগুলির অবস্থা একেবারেই অস্বভাব নহে। মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, গোন্দাল, হায়দারাবাদ এবং বড়োদার শাসনপ্রণালী ব্রিটিশ শাসনের সহিত তুলিত হইতে পারে, এমন কি কোন কোন অংশে তাঁহাদের শাসন বেশী উন্নত বলিয়াই বোধ হইবে। সাবেক ধরনের রাজ্যগুলি থাকা উদয়পুর, কাম্বৌর, জয়পুর, বোধপুর এবং বিকানীর, ইহাদেরও শাসন সম্বন্ধে একটা বিশেষ রকমের প্রসিদ্ধি আছে। সর্বমুখ্যেই একজন গুণি শিক্তি, দায়িত্ববোধবিশিষ্ট এবং শক্তমান কর্মচারীর হস্তেই শাসনভার স্তম্ভ। বলা বাহুল্য তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য যথাবিধি পালন করিয়া থাকেন।

স্বাধীন রাজ্যাদিকে অমিত্যচার বলা হয়, কিন্তু তাহাও সত্য নহে। তাঁহাদের রাজ্যে নানাদিক হইতেই উন্নতির জন্ত অসুতীন ও প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। তাহা হইতেই বুঝা যায়, প্রজার মঙ্গলের জন্ত রাজকোষ কতখানি মুক্ত। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটাকে আর একটু স্পষ্ট করা যাক।

গোন্দাল টেটে স্ত্রীনাথি সংস্কার ও উন্নতি-জনক প্রতিষ্ঠান নিত্যন্তই বিদ্যমান। মহাশ-ভব ঠাকুর সাহেব প্রজাদের শিক্ষা ও স্ববিচার জন্ত একেবারেই পক্ষান্তর নহেন। স্বাভা-আর্থিক অবস্থা এবং শাসন বিষয়ে তিনি যেরূপ মঙ্গলকর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সেদুগ উপায় ব্রিটিশ-শাসিত বহু জেলায়ই এখনও অবলম্বিত হয় নাই।

বিকানীর টেটের জেলের ব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিদেশীরাও সম্যক করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার শাসক শুর গদাধর জী একজন আশ্রম পুরুষ। তাঁহার শাসন-ক্ষমতা সর্বজনবিদিত।

মহীশূর এবং বড়োদার বিষয় সকলেই জানেন। এমন কি আমেরিকা ও ইউরোপের দৃষ্টিও এই দুইটা রাজ্যের শাসন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। মহীশূরের শিবসমুদ্র জলপ্রপাত, জীশিক-বিভার, আইন সমিতি, বড়োদার বিচারপদ্ধতি, শিক্ষা সংস্কার, গ্রন্থাগার, কলাভবন প্রভৃতি অসংখ্যমান করিলেই বুঝা যায় এই রাজ্য গুলি উন্নতিক্রম দিকে কত অগ্রসর।

ত্রিবাঙ্কুরে শিক্তির সংখ্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সর্বাংশেই বেশী। দায়িত্ব-নিবারণ কল্পে এখানে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান আছে। তাহাতে টেটের বহু অর্থ ব্যয়িত হয়।

কোচিনের অবস্থাও মন্দ নহে। প্রজাদিগকে শিক্তি করিবার জন্ত স্থানে স্থানে বিভাগ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ফল কথা, বড়ই হোক, ছোটই হোক সব টেটেই উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতেছে। এবং সব টেটেই প্রজাদিগের প্রিয়শ্রম, সম্ভার, শিক্তি রাজনীতিবিদ্য মহীশূরের সাহায্যে পরিচালিত।

..

৫। জাপানের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি

আমরা গত অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, “এত উচ্চ সম্মান-লাভ এক কোন এশিয়াবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই—এমন কি জাপানেরও এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এই দুল্লভ যশ প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হই নাই।” কিন্তু বসন্তের বাহিতে না বাহিতেই আমাদের কথার পরিবর্তন করিতে হইল। আমরা সেবিলাস জাপানের নোবেলপ্রাইজ পাইলেম। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় প্রাচ্য প্রভাব পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

জাপানে যিনি উ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার নাম ডাক্তার নেগুচি। তিনি একজন রসিক কৃষকের সন্তান। নেগুচি পূর্ণে কানই ভাগিতে পারেন নাই তাঁহাকে

চিকিৎসা ব্যবসা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার হস্তে একবার অস্ত্র চিকিৎসা করা হয়, তাহার স্লেহ-তিনি রোগ মুক্ত হন। সেই অবধি ডাক্তারী শিক্ষার জন্ত তাঁহার প্রবল আগ্রহ জন্মে। তিনি নিজের চেষ্টায় বহুদূর অগ্রসর হন। তারপর কয়েক পাঠ সমাপন করিয়া তিনি আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে চলিয়া যান। রকফেলার ইনষ্টিটিউটে তাঁহাকে সহকারী রূপে গ্রহণ করা হয়। সেইখানে তিনি সর্প বিষ সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। তাহাতেই প্রশসিত চিকিৎসা শাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পরে তিনি তথায় কিছুদিন অধ্যাপকের কাঙ্ক্ষ করেন। বীজতত্ত্বসম্বন্ধে তাঁহার গত দুই বৎসরের আবিষ্কারগুলি বৈজ্ঞানিক জগতে স্তম্ভীমান্যিত এবং বহু মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

এসিয়ার দুইটি সন্তান,—একজন আধ্যাত্মিক আর এক জন বৈজ্ঞিক উভয় জগতেই পাশ্চাত্যজাতিকে বিমুগ্ধ করিল। ভবিষ্যৎ জগতের পক্ষে ইহার মূল্য বড় বেশী।

..

৬। কাশীর নাগরী প্রচারিত শভা

গত অক্টোবর মাসের ১লা তারিখে কাশীর নাগরী প্রচারিত শভা-গৃহে সভার বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বারানসীর কমিশনার মিঃ এ, মোলোনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমগ্রক মণ্ডলের বাসবাসিক বিবরণ হইতে সারাংশ নিয়ে উক্ত করা যাইতেছে:—

“ভারতবর্ষ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ১৯০১ জেলা হইতে বহুলোক এই সভার সভ্য হইয়াছেন। তাহারের সংখ্যা বর্তমানে ১৬৩৩। যে সকল খ্যাতনামা মহোদয়গণ সভা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সারজেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, ভারতসভার সদস্য সার কে. জি. ডব্লিউ এবং ছাত্রাবতার মহারাজা-দিরাজের পরিদর্শন উল্লেখযোগ্য। সভার বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, রেখা, গোয়ালিন্দর, বিকানীর, বরোদা, ভাওয়ারপুর,

আলোয়ার এবং বনোয় প্রভৃতি স্থানের রাজা মহারাজগণ ইহার পৃথকপৃথক এবং ইহার উদ্দেশ্য ও আশা পূরণের জন্ত তাঁহার সভাকে প্রতিপদে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

সভার কার্যাবলীর মধ্যে বর্তমান বসন্তের অঙ্গনস্থানের কলে ৩৪৪ খানি হস্তলিখিত পুরাতন হিন্দীগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। অল্পসংখ্যন বিভাগের কার্যাবলী বিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত স্ত্রীমতীমহাশয় শ্রীমতী মহাপ্রভুর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইতেছে। সভার তিনী কার্যের সম্পাদন ব্যতীত হিন্দী ছন্দোবদ্ধ মহাকাব্য "পুণ্ডরীক রাসো" সম্পাদিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বাবু রামাকৃষ্ণ দাসের জীবনী এবং রাজা সার টি, মাধব রাওর "মাইনর হিষ্টরী" প্রবন্ধ ও মুদ্রিত হইয়াছে। সম্ভ্রুতি কার্যাবলীর মধ্যে ষষ্ঠকারের মুদ্রিত হিন্দী অভিধান ব্যতীত ভেঙ্গলপুর মেটাকিলিস (Metaphysics) এবং প্রাচীন হিন্দীতে অনুদিত হইতেছে। শেষোক্ত কার্যের জন্ত ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ প্রয়াস করিয়াছেন। সভার পয়সীনে সাধারণের সহায়কৃত্তিতে একটা লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যহ সেখানে অনেক পাঠক আসিয়া থাকেন।

পাঠাগারে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর সঙ্গীত বক্তৃতা দেওয়া হয়। সভা হইতে পণ্ডিত রামচন্দ্র স্বরূপকে, বাবু রামাকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের জীবনী রচনার জন্ত একটা রৌপ্য পদক দেওয়া হইয়াছে। লাল সন্তরাম গোহাল হিন্দী ভাষা ও নাগরী অক্ষরের উন্নতি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ এবং পণ্ডিত শ্রীলাল উপাধ্যায় পারিবারিক বাস্তব সঙ্গীতের একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সভা তাঁহাদের উভয়কেই এক একটি স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন।"

..

৭। আয়ুর্বেদীয় ভেলসংহিতার প্রামাণ্য

প্রধানতঃ আয়ুর্বেদ দুইটি শাখায় বিভক্ত। সর্বাঙ্গ আশ্রয় করিয়া যে সকল ব্যাধি উপস্থিত

হয়, যথা রক্তপিত্ত, উন্মাদ, কৃষ্ঠ প্রভৃতি, তাহাদের চিকিৎসাপ্রণালী যে শাখায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার নাম কায়-চিকিৎসা। অপর শাখায় নাম অস্ত্রচিকিৎসা। প্রথম শাখার প্রকৃতিটাকা আশ্রয় মূলি। দ্বিতীয় শাখার প্রকৃতিটাকা রাশির্বিষয়ত। কিন্তু আশ্রয় মূলির অস্ত্রতম শিষ্য। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর নাম 'ভেলসংহিতা'। এই পুস্তকখানা খুব অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও মুদ্রিত হয় নাই। তেলেগু ও অক্ষরে লিখিত মূল পুস্তকখানা তাহার প্যালেস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মজী ত্রিমুখী আচার্য মহাশয় কর্তৃক তাহার একাধিন দেবনাগরী অক্ষরে প্রতিলিপিত করিয়াছেন। সেই প্রতিলিপিবিশিষ্ট চিকিৎসাযন্ত্রের কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ, এল, এম, এস বিজ্ঞানিগণ মহাশয়ের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাই দেখিয়া শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্ম, এস, সি মহাশয় (সাহিত্য) মহোদয় ভেল সংহিতে এক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বর্তমান বহুপ্রচলিত চরকসংহিতা অগ্নিবিশেষাংহিতার চরক কর্তৃক প্রতি-সম্ভূত এবং দৃঢ়বল কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পুস্তক। অপর সংহিতাগুলি কেবল সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে স্থান স্থানে উদ্ধৃত হইয়া তাহাদের প্রাচীনতা এবং বর্তমান লুপ্ততার সাক্ষ্য দিতেছে। তবে অম্বুমান করা যাইতে পারে যে ঐহারা উদ্ভব করিয়াছিলেন তাঁহাদের সময়ে হস্ত উদ্ভাদের কয়েকখানি ভাষ্যের ছিল। বার্নেল ভেলসংহিতায় গন্ধার এবং তৎসংল্লিখিত প্রদেশের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া গ্রন্থকারকে তৎদেশবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ভেলসংহিতা সম্ভ্রুতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, মুদ্রিত হয় নাই। উহার সঙ্কে সংগ্রহকারগণ ও টীকাধারগণ অনেক সময়ে হীনমত প্রকাশ করিলেও সময়ে সময়ে নিম্ন পুস্তকের মধ্যে উহাকে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতে বিরত হন নাই। যথা বাগভট:—

স্ববি প্রণীতে প্রীতিশেখং মুক্ত। চরকসংহিতা।
ভেলাদ্যা কিং ন পঠ্যতে তন্মাত্ গ্রন্থঃ

স্বভাবিতম্।

বাগভটের এই উক্তিতে বুঝা যায় যে তাঁহার সময়ে চরক সংহিতার পাঠনা প্রমল হইয়াছিল এবং ভেলাদি বোধ হয় পঠিত হইত না। তিনি এই কথা উল্লেখ করিয়াই বলিতেছেন যে যাহা স্বভাবিত তাহাই গ্রন্থ। স্ববি প্রণীত বলিয়াই যদি আদর করিতে হইত তাহা হইলে, ভেলাদি গ্রন্থ কেহ পরিত্যাগ করিতেন না এবং চরক সংহিতার পাঠনা পরিত্যক্ত হইত। এই উক্তিতে ভেল হইলে সময়ে লুপ্ত হয় নাই, তবে মরণোশ্মর তাহা বুঝা যায়। হর্নলে (Hoernle) সাহেব বলিয়াছেন যে বাগভট প্রণায়তঃ ভেলসংহিতার অনেক বঙ্গ গ্রন্থ করিয়াছেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন বাগভটের এই উক্তির সহিত হর্নলে সাহেবের মন্তব্যের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। আমরা বলি তাহা নহে। বাগভটের গ্রন্থধরের মধ্যে বড়খানি আমাদের দেখা নাই এবং কোন পুস্তক উহার পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীর নিকট তত্বের স্বীকৃতি তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হয় না; স্বতরাং কোন গ্রন্থকার তাঁহার পূর্ববর্তী লেখকগণের গ্রন্থ হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধার করিয়াছেন তাহা আলোচনা না করিয়া তিনি উদ্ভাদের নিম্নে কবদ্র রঞ্জী তাহা বলা যায় না। তবে এই কথা বলিতে পারি যে বাগভট চরক সংহিতা হইতে প্রকৃত পরিমাণে উত্তর করিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আর আবার বোধ হয় যখন মূল ভেলসংহিতা মুদ্রিত হইবে তখন পুণ্ডরীকসংহিতা পরীক্ষা করিলে ভেল এবং চরকাদি উভয় পুস্তকের অনেক স্রোত একই দেখান যাইতে পারিবে। এমনকি চরক সংহিতার মধ্যে অনেক স্রোত সমান দেখা যায়। এইরূপ স্থলে কোনট প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা স্বকলিত হইয়া উঠে। যেমন মূল সংহিতা চরকের অপেক্ষা পূর্ববর্তী হইলেও, বর্তমান চরকসংহিতাই প্রচলিত সংগ্রহের অপেক্ষা প্রাচীনতর। এতদ্ব্যতীত বার্নেল সাহেবের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া

যদি ধরা যায় যে বাগভট ভেল হইতে কোন স্থান উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইলেই নিশ্চিত হইবে যে এ সকল স্থান হস্ত বাগভটের মতে গ্রন্থ বা উৎকৃষ্ট হইতে পারে। আর এক কথা, বাগভটের উক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে বোধ হয় সম্ভব হয়। প্রচলিত চরক ও সংহিতা তৎকালিক পণ্ডিতগণ কর্তৃক দেশ ও কালানুযায়ী ভাবে সম্ভব ও তত্ত্বান্তের সাহায্যে পরিবর্তিত হওয়াতে তাহাদের মূল্য মূল্যসংহিতা হইতে যে আদিক হইবে তাহাতে বিভ্রান্ত কি? বোধ হয় এই কারণেই ভেলাদি অসংস্কৃত গ্রন্থাবলীর পাঠনার লোপের স্বরূপাত হয়। যদি একাধারে সমস্ত বর্তমান গ্রন্থমতের সমাবেশ থাকে তাহা হইলে লোকে কোন উৎকর্ষগ্রন্থস্থানে অজ্ঞাত অসংস্কৃত মূল পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিবে? আর এক কথা, প্রচলিত চরকে বোধ হয় ভেলাদি হইতে অনেক বঙ্গ পুথীত হইয়াছে। কয়েক দৃঢ়বল লিখিয়াছেন যে তাঁহার সময়ে যে চরক কর্তৃক সম্ভবতঃ অগ্নিবিশেষ তত্ত্বের চিকিৎসা-২৭ অধ্যায় পর্যন্ত পাওয়া যাইত এবং তিনি চিকিৎসায় বাকী ১০৩ অধ্যায় এবং কল্প ও সিদ্ধি স্থানস্থ উদ্ভাভে করিয়াছেন। এক্ষণে যদি ভেলসংহিতা তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া পরীক্ষা করা যায় তবে বেশ প্রমাণ করা যাইতে পারিবে যে উহা হইতে দৃঢ় বল অনেক সাহায্য পাইয়াছেন। এবং উহার যে একটি সম্প্রদায়ের (school) পুস্তক তাহা আশি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। অনেক স্থলে অধ্যায়ের নাম এক এবং প্রতিপাদ্য বস্তুও এক। অধ্যায়ের ক্রমেরও সামঞ্জস্য আছে।

ভেলসংহিতার অকিঞ্চিৎকর প্রমাণের জন্ত শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় তদীয় পুস্তকে উল্লিখিত হইতে আর একটা কথা উদ্ধার করিয়াছেন, যথা 'হিানীং ভেলসংহিতা পুণ্ডরীকসংহিতানাম তত্ত্ববিদ্যাং মতেন বিষম অরোপংগতিভিহা' ইত্যাদি। এস্থলেও যখন প্রয়োজনীয় বলিয়া উদ্ধার করিতেছেন, তখন আবার তাহার উপর অশ্রয় মূল্যের লাবণ্যকারী টিকনীও সংযোজন করা উচিত বলিয়া

মনে করি না। কিন্তু প্রাচীন দীকারগণের মধ্যে এক্ষণ অভ্যাস বিরল নহে। * * * যেন শাস্তি রথশূন্য মহামহোপাধ্যায় শূল-পাণিকে খেঁচান আক্রোশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার মত অগ্রাহ্য, তিনি অস্বীকার ইত্যাদি বলিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় শব্দের উল্লেখ করেন নাই; আবার যেখানে তাঁহার মত আপনার সহিত মিলিয়া গিয়াছে, সে হলে মহাপ্রাণের বক্ষ্যা মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির উক্তি বলিয়া তাহা যত পূর্বক উদ্ধার করিয়াছেন। স্বতরাং প্রাসঙ্গিক মতামতের প্রতি লক্ষ্য করিবার কথা আমার মনে বিশেষ সন্দেহ বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক এক্ষণকারে (শ্রীকৃষ্ণ গণনাথ সেন) সম্মতিক্রমে প্রত্যক্ষ শাস্তিরের ভূমিকা হইতে বিব্রত রক্ষিত এবং শিবিকা বস্তুক ভেলের উক্ত স্লোক উদ্ধৃতি নিম্নে লিখিত হইল। উহাতে ভেলের মূল্য পাঠকগণ স্থির করিবেন। বিজয় রক্ষিত অরক্ষিকার নিদান দীকার্য লিখিয়াছেন—

“ভেলহপি পৈত্কিঃ পঠাতে—

আশাশয়ঃ পবনো হৃদয়মঙ্গতোহপি বা।
বৃষ্টিঃ কোপয়ত্যন্ত প্রেমানন্দমহাশয়ঃ ৪”

শিবাবাস ও চক্রবাক-গ্রন্থের নিম্নলিখিত স্লোক ভেলের বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

“নারায়ণেব কাঠক ধন্যক বুহতীযম্।

দণ্ডাং পাচনকং পূর্বং জরিতায় অগ্ন্যগ্নম্”।
স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে পবন বায়ুভট, শিবাবাস, বিজয় রক্ষিত, বৃন্দ ও চক্রবাসী দত্ত প্রভৃতির পুস্তকে ভেলের গ্রন্থ হইতে স্লোকটির উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন ভেল নিশ্চয়ই অপ্রামাণ্য নহেন, পরন্তু সাহিত্যসাধকগণের মধ্যে অন্ততম বলিয়া বিশেষ সন্মানের পাত্র।”

* *

৮। যোধপুরে জৈন সাহিত্য-সম্মিলন

বিগত মার্চ মাসে যোধপুরে জৈন সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। জৈনগণের ব্যাবনা-ক্ষেত্রে নিপুণতা এবং দৃষ্ট বিষয়ে একনিষ্ঠা ভারতের সুবিসিষ্ট। বর্তমান সময়ে

তাহাদিগের মধ্যে ভারতের অজ্ঞাত জাতির ছায় জাতীয়জীবনের দূর্ভাগ্যসুখীন্নাঙ্গগণের স্বরূপান্তর হইয়াছে। এই সাহিত্য-সম্মিলন তাহাদের অসমত লক্ষণ। সভায় ছয় হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

এই সম্মিলনী নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেন।

(১) বিজালয়ের পাঠ্যোপযোগী জৈন গ্রন্থের প্রায়শঃ

(২) বিভিন্নভাষায় জৈন গ্রন্থের অম্বুবাদ।
(৩) জৈন সাহিত্যের শ্রমবিধিভাষায় পাঠ্য তালিকা স্বত্বভুক্ত করিবার অল্প ভারত-গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা।

(৪) জৈন বাহুবর নিম্নোক্তের জ্ঞাত অর্থসংগ্রহ।

(৫) একটা স্থায়ী সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠা।

বাহুবর নিম্নোক্তের জ্ঞাত সভ্যতাই ২০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

* *

৯। আনন্দ-তত্ত্ব

মানব-জীবনের প্রধান লক্ষ্য আনন্দ। কিন্তু বাহুজগতের কোন কিছু বিষয় আনন্দদীপকে তাহা দিতে পারে না। তাই আনন্দদীপকে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের মধ্যে তাহার সন্ধান করিতে হয়। সেই সন্ধানের নাই পাননা বাধ্য। তাহার ফলেই আমাদের তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। সেই চক্ষুই দেখিতে পারে—আনন্দই নিখিল জগতের জীবনপদ্ম। এই আনন্দ-তত্ত্ব যথেষ্ট শ্রীকৃষ্ণ তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

“ভিখারী ভিক্ষা পেয়ে আশীর্বাদ করে গেল ‘আনন্দে রহে’; মহাপুরুষগণের মূখ-নিশ্চয় উপদেশও এই ‘আনন্দে রহে’। এক্ষণ ব্রহ্মজগতের জীবনের লক্ষ্য নির্দেশ আর কি হতে পারে? মণি মুক্তা গমে মালা গাঁথার ছায়, হৃৎকায়ের এইপক্ষ ককটগুলি সারত্ব সংগ্রহ করে, হৃদয়ের জ্ঞাত একটা জগৎলাল রচনায় সার্থক হলে কত না সুখের হয়। এইরূপ জগৎলালার একটি মণি বা বীজ

হইতেছে অন্যকার এই বৃক্ষ প্রবন্ধের সমালোচনা ‘আনন্দে রহে’।

ভাবের গুণে বা খেয়ালের দ্বারা, অনেক ভালা জিনিসও মন্দ এবং মন্দ জিনিসও ভাল হয়ে দাঁড়ায়। ‘আনন্দে রহে’ উপদেশ-বাণীরও সেই দশা ঘটেছে। ‘বনিন তিসির-গর্ভে লুপ্তায়িত মণি,’ দেখিলেও সহস্রা চেনা যায় না, উৎসকে মাজিয়া যদি উপযুক্ত স্থানে সমিতিবিশিষ্ট করিত পারিলেই উহার কত গুণও কি দাম ধরা পড়ে।

“বাবল্লীবেং হুবা ভবেং, স্বগং কুশা যুতং পিবেং” চার্লস কাম্বির মূখের একখাটা সৈন্য কোন স্বপ্রাচীন যুগে প্রচারিত হয়েছিল; শুনেই সকলে শিহরে উঠা গবেৎ এবং উৎসকে ভুলে যাবার অল্প শত উদ্দেশ্য দিয়ে এক শত আরাগ্ন পেরেও জনশ্রুতি হইতে উগা লুপ্ত হই নাই কেন? কৃষ্ণ অর্জুন, কথো সাধারণতঃ যত হয়েও অসত্য বলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাই না কেন, উহার ভিতরেরও সার সত্য আছে। শত বাধা সবেও উহার এতদিন তিরিয়া থাকাই তাহার প্রমাণ। হুরোগে প্রাচীনকালে এপিকিউরিয়ান দর্শন নামে একটা জীবদর্শন প্রচারিত হয়েছিল এবং সবিশেষ আলোচনাস্থে অনেক উহা জীবদর্শন বলে গ্রহণও করিয়াছেন, ইহার কারণই যে যোগতত্ত্ব অস্বাধিক ছিলেন এমন করা অস্বিকার্য ফল মাত্র। সভ্য বটে কালবেশে এপিকিউরিয়ান দর্শনের কর্ণধারী লোকে ভাবিতে শিখিল এবং চার্লসের সেই গ্রন্থিক বাণীর ছায় এপিকিউরিয়ান দর্শনের সমাধারও যুগপ্রায় হইল।

সত্য কিন্তু তাগীরা রাখিবার নহে। ঐ চার্লসও এপিকিউরিয়ান দর্শনের ভাবের প্রাতিষ্ঠান লয়ে বাস্তবায় সাধারণ নরনারীর মুখে শীতান শব্দনও প্রত্ন হয় ‘হেসে খেলে লওরে যাহ মনের হুখে’ ইত্যাদি। এই ধরণের কথা সব আমরা যখন শুনি, কখন কি ভেবে দেখি, শ্রদ্ধার দৃষ্টি লয়ে আলোচনা করিলে উদারের ভিতর কত পার্শ্বিক সত্যের আভাস পাওয়া যায়—ভারতের উহার কিঞ্চদ অমূল্য রত্ন?

জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়—

ইংরাজিতে এক দলকে পেসিমিস্ট বা দুঃখতন্ত্রী এবং অপর দলকে অপটিমিস্ট বা সুখতন্ত্রী বলে। এক দলের দৃষ্টিতে জগৎপূর্ণ যাবতীয় বিষয়ই যৌব দুঃখময় ও পরিতাপ্য বিবেচিত এবং অপরদের চোখে সেইরূপ জগতের তাৎপার্য্যই স্বপ্নপ্রদ ও আনন্দময় নিকটজন রূপে প্রতিভাত হয়। এই আশাত বিরোধী দুটা দলের কিন্তু একটা সম্মিলন আছে, সেটা হচ্ছে—“আনন্দে রহো” উভয়েই এখানে একমত, উভয়েরই উদ্দেশ্য দুঃখ-মুক্তি, উভয়েই একই লক্ষ্য সাধনে সচেষ্ট; স্বতরাং পরস্পরের যম্বতঃ বিরোধী নহেন। প্রাধান-ভেদ দেখেই সহসা উভয়দলকে পরস্পরের বিরোধী বলে ভ্রম হয়। দুই ভায়ে যেন নির্বিষয়ে বিহ্বলিত, কেহ একদিকে কেহ বা অন্য দিকে এই মতে প্রভেদ। এক দল হৃদুশীলনাগ সহকারে এই স্বপ্নলেনে বাস্তা যোষণা করছেন, ‘ভাইরে আর ভয় নাই, দুঃখ-জয়ের সন্ধান পেয়েছি। বিষয়ের সহিত সংযোগ হইতেই স্ব-দুঃখ আগে, কোন উপায়ে এই বিষয়বস্তুনা ছিন্ন করে, এই স্বৈচ্ছজ্ঞানটা উড়িয়ে দিয়ে, আপনাকে আপনি ভেতরকার উড়িয়ে দেও। পরের সোণা কানে দিয়ে আর হৃদয় মাজিতে দেও না, সর্বমাতাভবং স্বয়ং সর্বপরাগরণং দুঃখম্। স্ব-দুঃখ-উভয়েরই মূল—এই স্বৈচ্ছজ্ঞান বা বিষয়ের হাত এড়িয়ে নির্দ্বন্দ্ব হও, পরমানন্দে বিরাজ করিয়ে। ইহাই পরম যোগ, পরম তপস্বী, পরম পুরুষাশ্রয়, দ্বৈতের অত্যন্ত নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট পথ। আর একদলও সেইরূপ মঙ্গলমুখ্য বারিয়ে অস্বাধী প্রচার করছেন, “সাঁতে কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের ভয়? মায়াশিষ্টার প্রলোভনে ভুলে না গিয়ে প্রকৃত বৈতত্যবে মজে যাব, যিনি মায়াভূত বিচার-রাহিত, তাহার সহিত সংযোগ দূর হতে দূরতর কর, তিনিই তোমার নিজ হতে নিজ জন। এইট কর না বলেই আনন্দলাভের অবশিষ্ট রহিয়াও আনন্দলাভে ব্যস্ত হও।”

“ভাইরে, যে ব্রহ্মিন সমাই দুলিতেছে তাতে বলে স্থির থাকিবার চেষ্টা পাগলের কর্ম। এক জগতের সবাই দুলিতেছে, একমাত্র কৃষ্ণ-পাণপন্ন রাহি। অতএব স্থির হইতেই হইলে,

অবধি কেমন আনন্দ বৃদ্ধি জন্ম অপরকে
নিজের টেনে লইতে যায়। স্বপ্ন-দৃশ্যে
অশী মিছিলে স্বপ্ন বাড়ি দ্ব্যর্থ কমে। আনন্দ
বিতরণ, আনন্দে রহিবার একটা সন্ধেত।

আনন্দলাভের একটি উপায় হচ্ছে,
প্রত্যেক ছেড়ে শ্রমের অহসরণ। বাহার
প্রথমে স্বপ্ন শেষে গ্রন্থ তাহার নাম প্রের্য,
আর বাহার শেষ ফল স্বপ্ন তাহাই প্রের্য।
প্রথমে দুঃখদাক্ষ্য হলেও প্রেমের অহসরণ
করাই আনন্দকামীর সর্গদ্বা কস্তব্য। রন্দ-
কেশ থাকিলেও আহারের জন্ম বস্ত্র দীকারে
কে কবে পরাশ্রয় ন?

অহরূপ যুক্তি দেখাইয়াই প্রেমের অহসরণ-
কারী প্রের্যকে ত্যাগ করিতে কখন কখন
সাহসী হন। কাঁটা ফুটিবার ভয় আছে বলে
কি মাছ খাওয়ায় বিরত থাকি? 'সংসার
একাদেশী'র নিম্ন দণ্ডও একদিন অহরূপ যুক্তি
ঘটিয়ে সিদ্ধান্ত করেছিল, 'লিভার পাকিবার
ভয়ে কি মদ ছেড়ে দিতে হবে?' তবে আর
মেডিকাল সায়াগ কি জন্ম? পাশের কুকল
নাশ করে পাশের আনন্দ উপভোগ জন্ম
একল নিয়ত চেষ্টিত।

এইরূপে চেষ্টা হইতে 'ঋণ কৃপা দ্ব্যর্থ
পিবৎ' প্রকৃতি কথার স্রষ্ট। বাহার প্রেমের
অহসরণতৎপর এই শ্রেণীর কিতা ভুলিলে
তাঁহার শিহরিয়া উঠেন, কিন্তু ভাবিয়া
দেখিলে ইহাতে শিহরিয়া উঠিবার একরূপ
পথপ্রান্ত পাপিগণকে ঘৃণা করিবার কিছু
নাই। ভিতরের প্রকৃত কথা কি? আনন্দের
সন্ধানে সবাই ঘুরিতেছে এবং আনন্দময়ই
সবলকে পরিচালিত করছেন। অতিমান-
ডরে এতদ্ব তুলে গিয়ে অপরকে অবজা
করিতে আমরা সাহসী হই মাত্র। একবার
তত্ত্বগতি সাহায্যে ভেবে দেখ, বৃষ্টিবে এ

জগতে পাপী কেহই নাই, থাকিতে পারে না।
সবাই আনন্দের সন্ধানে ঘুরিতেছে এবং
নিজ নিজ শক্তি-বুদ্ধির অহরূপ আনন্দেই
অবস্থিত আছে। বিষ্ঠার কৃমিকীট অবাধি
আনন্দবঞ্চিত নহে। ঘোর নিরানন্দের
মাঝেও আনন্দবোধ প্রচ্ছন্ন থাকে।
মৃত্যুকামী কার্খিয়ার সমীপগত যমরাজকে
কাটা তুলে দিতে বলায় গল্পটা 'স্বপ্ন
কবি' অনেক স্থলে আনন্দবোধের
তারতম্যটাই স্বপ্নদ্ব্যর্থ নামে অভিহিত হয়।
যাহার যে পরিমাণ শক্তিবৃদ্ধি সে সেই
পরিমাণে আনন্দের আশ্রয় পেয়ে কৃতান্ত হয়।
উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতররূপে পরমানন্দের
সহিত মিলন সংঘটন করে দেওয়াই পুরুষো-
ত্তমপণের কার্য এবং ইহাই দ্বৈতের একটা
প্রধান লক্ষণ। দ্বৈত ও অদ্বৈত বস্তুতঃ কোন
প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু আনন্দের পরিমাণে
ও আনন্দ লাভের উপায়ে।

কত 'ভাদ্রিমান' যত অনিষ্টের মূল।
বৈতবাদী অবৈতবাদী উভয়েই এখানে
একমাত্র। সেই আনন্দময়ের চরণে আপনাকে
বিমর্জিত রাও। 'নিবেদয়ামি যাদ্ব্যনং স্বপ্নাং
পরমেশ্বর' অথবা 'স্বপ্না স্বয়ীকেশ স্রুতিহিতেন
যথা নিমুক্তহোশি তথা করামি।' কিংবা
অবৈতভাবে অবস্থিত-হও। কত 'ভাদ্রিমান'
থাকিতে পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

ভয় উদ্বেগ ত্যাগ করে আনন্দময়ের চরণে
শরণ লও। আনন্দের অহসন্ধানই জীবনের
অন্ত কর। কেহ দেখে শিখে কেহ বা চৈত-
কিবে। পাপ কি পুণ্য কি আপনাই বৃষ্টিবে,
কাল সব ঠিক হয়ে যাবে। যারা শুধু দণ্ডের
ভয়েই সাধু, প্রকৃত সাধু হতে এখনও তাহদের
বহু বিলম্ব। সার কথাটি তুল না—সেটি
হচ্ছে "আনন্দে রহ।"

সভাপতির অভিভাষণ *

ও নমো ব্রহ্মণেবায় গোত্রাঙ্গগহিতায় চ।

জগদ্বিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

বৈদ্যাদীনো জগৎ সর্বত্র মন্ত্রাধীনো দেবতাঃ।

তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাত্মন্যং ব্রাহ্মণ দেবতাঃ।

অথ যে মহত্বদেহে আমরা পূতসলিলা-
জাহ্নবী-তটস্থিত মহাপ্রাণী ও কালীঘাটে সমবেত
হইয়াছি, তাহা বঙ্গের ভবিষ্য ইতিহাসে একটি
স্মরণীয় দিবস বলিয়া কীৰ্তিত হইবে।
ও কালীঘাট ভারতবিখ্যাত মহাপ্রাণী; ইহার
পবিত্র রক্তস্পর্শে ব্রাহ্মণ-মহাসাম্মিলন পবিত্র
হইলেন। ব্রহ্মণদেব ইহার উপর অমোঘ
আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।

আমি ব্রাহ্মণসন্তান এবং "ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণো
গতিঃ" এই আশ্রম-বাণীর উপর নির্ভর
করিয়াই নিত্যন্ত অক্ষমতাসত্ত্বেও মহা-
সাম্মিলনের সভাপতিত্ব ভার গ্রহণে সম্মত
হইয়াছি। সমবেত ্রহ্মণ-ব্রাহ্মণবর্গকে
সামিধ্য নমস্কার জ্ঞাপন পূর্বক আমি বিষম
দায়িত্বপূর্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলাম;
আমার গৃহতা আপনারা নিজগুণে মার্জনা
করবেন, ব্রহ্মণদেবের আশীর্বাদে এবং
আপনাদের সহায়তায় ও মহামায়ার কৃপায়
কৃত কার্যে জ্ঞাপন করিতে পারিলেই
কৃতার্থমুখ হইব।

অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিলে
দেখিতে পাই যে, এই কল্পভূমি ভারতবর্ষে
খনই কোনও জটিল বিষয়ের সমীপমাংসা বা
নিষ্কার্য প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই
উদারদৃষ্ট, লোক-হিতপ্রণা-প্রণোদিত, পরম

কালবিক স্বয়মুপ্রদায়, জনকোলাহল ও
শান্তিপূর্ণ লোকালয় হইতে স্বদ্রবিত
শান্তসম্পাদ, পবিত্র নৈমিষারণ্য প্রকৃতি
নির্জন স্থানে সমবেত হইয়া অতি দীর্ঘ ভাবে
ও সমাহিত চিত্তে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা
করিয়াছেন। ইহাই ভারতীয় সমাজের
চিরকামাগত প্রথা। অঙ্গকার এই সন্মিলনও
সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই, নৈমিষারণ্য প্রকৃতির
পাশে নির্জন স্থানে না হউক, অন্ততঃ অতি
প্রায় গীটস্থানে বন্ধীয় ব্রাহ্মণগণ সমবেত
হইয়াছেন; ভরসা করি, তাঁহারাও আমাদের
পূর্বপুরুষ স্বয়মুপণের তায় সংঘত ভাবে, কোন
সম্প্রদায় বা জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি
বিন্দুমাত্রও কটাক্ষপাত বা অগ্রিয় বচন-
পরম্পরা প্রয়োগ না করিয়া, আলোচ্য বিষয়-
গুলির যথাযথ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করতঃ
ব্রাহ্মণদের গৌরব রক্ষা করিবেন। তাহা
হইলেই এই মহাসাম্মিলনের সদৃশপ্রায়-সিদ্ধির
পথ উন্মুক্ত হইবে। নতুবা ইহা নিরর্থক
পওশম মাজ হইবে। নানাবিধ প্রতিফুল
কারণে এবং কালচক্রের ভীষণ আবর্তনে
ভারতীয় অতি প্রাচীন ও পবিত্র হিন্দুমতাজ
কিছু বিপর্যস্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন
এবং সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতার ভাব
পরিলক্ষিত হইতেছে; অতাবস্থায় সমাজকে
শাস্তিনিক্ষিপ্ত স্বপ্নে পরিচালিত করিতে না
পারিলে ইহা বিপদময় লক্ষ্যকোণী সংকীর্ণ
বস্তু প্রধাবিত হইয়া ঘোর বিপন্ন হইবে;
হইবেই বা বলি কেন? প্রকৃত প্রস্তাবে



হইতেছেও তাহাই। এই ভাবে সমাজ চলিতে আরম্ভ করিলে ইহা অচিরে বিলম্ব-দশা প্রাপ্ত হইবে এবং হিন্দুনামও চিরকরে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে। হিন্দুসমাজের উপর দিবা বহু প্রবল স্বাধীনতা এবং ভীষণ স্বাধীনতার প্রোত চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা এ পর্যন্তও একেবারে অকলঙ্কালবিশিষ্টে নিমজ্জিত হয় নাই; নানা প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও হিন্দুজাতি সম্যক প্রকারে না হটুক, কথঞ্চিৎ প্রকারেও তাহার বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কোন্ মনোশক্তি প্রকাশ এবং কি যত্নে অটল ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়াতে হিন্দুসমাজ আজও একেবারে বিলম্বদশা প্রাপ্ত হয় নাই এবং হিন্দুজাতির প্রকৃত মঙ্গলও কোন্টী, তাহা চিন্তাশীল স্নানজিহ্মবীর্য বাক্ত্যমাজেরই অভিনিবেশ সহকারে চিন্তনীয়। আমরা মূঢ় বুদ্ধিতে যতদূর ধারণা করিতে পারিযাছি, তাহাতে মনে হয় **ব্রাহ্মণ** ও **সমাজ-শাস্ত্র**ই হিন্দুসমাজের প্রাণ এবং **বর্ণাশ্রম-ব্রহ্ম**ই ইহার মেরুদণ্ড। **বর্ণাশ্রম-ব্রহ্ম** ও **সমাজ-শাস্ত্র** এবং **ভগবান্** **ভক্তিবিশ্বাস** অঙ্গুর খালিলে কিছুতেই হিন্দুসমাজ নষ্ট হইতে পারিবে না; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা বর্তমানকালে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও আত্মহারা হইয়াছি, তাহাতেই আমাদের নানা দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে বর্ণশ্রম-রক্ষার ভার রাজার বা রাজপণ্ডিতের উপর দ্রুত ছিল এবং ব্রাহ্মণ তাহার নিয়ামক, চালক ও উপদেষ্টা ছিলেন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন “রাজস্ব বর্ণশ্রমপালনং যৎ। স এব ধর্মো মনুনা প্রণীতঃ” বর্তমান কালে আমরা

যে রাজার শাসনাধীনে আছি, তিনি বৈদেশিক হইলেও আমাদের ধর্ম বা সমাজের উপর কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না; ইহা রাজপুরুষদের হৃদয়দর্শিতা ও সমীচীনতারই পরিচায়ক। অতএব সমাজ-শাস্ত্রের অপব্যবহার হইরা থাকিলে বা ধর্মকাণ্ডে অবহেলা সমাজে প্রাবল্য লাভ করিয়া থাকিলে আমরাই তত্ত্বজ্ঞ দায়ী। ব্রাহ্মণ ভারতীয় হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। “বর্ণানাম ব্রাহ্মণো গুরুঃ” ইহা ভারতের চিরপ্রচলিত বাক্য। সেই ব্রাহ্মণ যদি বিপণ্যধারী বা আত্মহারা এবং আচারভ্রষ্ট হইয়া থাকেন তবে সমগ্র সমাজ তৎপথভ্রষ্ট হইবেই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—
“দুঃখদাচ্যতি শ্রেষ্ঠতত্ত্বমেবেতেরা জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকতদনুবর্ততে।”
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞস্ব আচরণ করিয়া থাকেন ইতর ব্যক্তি তদনুসরণই করিয়া থাকে এবং তিনি যাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করেন, সেখা তাহারই অমুকরণ করে।
“ব্রাহ্মণাঃ” সমাজের উত্তমাদ্বরূপ, উত্তমাদ্ব বিকৃত হইলে মানবদেহ যেমন বিকার প্রাপ্ত হয়, সমাজ-দেহের উত্তমাদ্ব প্রকৃতভিহ হইলেও সমগ্র সমাজই উত্তমাদ্ব বিপণ্যভ হইবে; অতএব সর্বপ্রথমে উত্তমাদ্ব প্রকৃতভিহ এবং হৃদয় রাখা কর্তব্য। অতীত-কালে ব্রাহ্মণ যে গুণে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, সেই গুণ হইতে দ্রুত হইলে তিনি আর সমানার্য বা গৌরবান্বিত হইবার আশা করিতে পারেন না। জন্মগত ব্রাহ্মণ্য ও গুণগত ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণ মুখ্য ও গৌণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারেন। এই মুখ্য ব্রাহ্মণস্ব লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে

“তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ জন্ম ব্রাহ্মণকারণম্”
যাঁহারকেবলমাত্র জন্মগত ও সংস্কারগত ব্রাহ্মণ্য আছে তাঁহাকেই গৌণ ব্রাহ্মণ বলা যায়। জন্মগত ব্রাহ্মণ্য, জাতকধর্মাদি দশবিধ সংস্কার দ্বারা পরিচ্ছন্ন ও নির্মল হয়। যাঁহার ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সংস্কারহীন ও আচারভ্রষ্ট হইলে সমাজে মুখ্য ব্রাহ্মণ্যের সম্মান-লাভের অধিকারী হইতে পারেন না, ইহা অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নহে। শাস্ত্রে কথিত আছে—
“আচারহীনঃ ন পুনশ্চিৎ ব্রোহাঃ।
যস্যপ্যদীত্যং ন শূন্য ভুক্তিরদৈঃ”
ভূত্বাণ্যম্ মহু বলিতেছেন :—
“আচারবিহীনতা বিপ্রো ন বেদকলমমুভূত।
আচারেণ তু শূন্যত্বঃ সম্পূর্ণকলমুভূতঃ”
সদাচারবিহীন হইলে যজ্ঞবৎসব পাঠদ্বারাও ব্রাহ্মণ্যপূর্ণ পবিত্র হইতে পারেন না; অতএব সদাচার অবশ্য পালনীয়। চিত্তজ্ঞ সদাচারের উপরই নির্ভর করে এবং সদাচার ভক্ত্যভ্যাস প্রকৃতি বিচারপক্ষে।
“আচারভ্রষ্টভতে হ্যসুচারানার্যপিতাঃ প্রজাঃ।
আচারানুমানমধ্যমাচারোহস্ত্যশ্রমকম্”
অন্যতানে ব্রোহাণ্যুচারস্ত চ বর্জনাং।
আলতাশ্রমদম্যোয়াক মুতুর্বিপ্রাধিব্রাহ্মণজিঃ।
আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যাগঃ শাস্ত্রী এব চ।
তদ্বাদ্বিন্দিত্বং সরা যুক্তো নিত্যং ত্রাদান্ববিন্”
বিষমঃ”
(মহু)
শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে :—
“আচারভ্রষ্টো মনুজিহ্মঃ শূন্যভুক্তো ব্রোহা শূন্যভিঃ”
যুক্তিলভ্যে সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষকঃ”
প্রমথানীয় এখানে বক্তব্য এই যে, অধুনা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাংশেই দারগা এই যে, ভক্ত্যভ্যাস-বিচারের সহিত ধর্মাদ্বয়ের

কোন সম্বন্ধ নাই। এই মত কটকটী বিচারসহ তাহা চিন্তনীয়। অমের বিকারই প্রাণ, প্রাণের স্থান্যাবস্থা মন, মনের স্থান্যাবস্থা আত্মা; অতএব চিত্তভ্রষ্ট যে আহার ভিত্তির উপর নির্ভর করে, তৎপক্ষে তর্কদ্বারা মীমাংসা উপনীত হওয়া একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। চিত্তভ্রষ্ট না হইলে মাহুষের ধর্মভাব উদ্বেষিত হইতে পারে না, অতএব আহারের সহিত ধর্মাদ্বয়ের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ আছে কি? এ কথা আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আমরা আহার করিবার জন্ত জীবন ধারণ করি না, পরন্তু জীবন ধারণ করার জন্তই আহার করি। যে আহারে পাশবিক প্রকৃতির উদ্বেষিত হয় তাহা মাহুষের পক্ষে সর্বদা পরিত্যজ্য। আহার-বিহারের সময় না থাকিলে কখনও মাহুষ মহাজ্ঞ লাভ করিতে পারে না; প্রকৃতির প্রোতে গা ঢালিয়া দিলে কখনও মাহু জীবনে স্থবী হইতে পারে না। শাস্ত্র বলিতেছেন :—
“ওজস্বর শরীরস্ত চেতসঃ পরিতোষনং।
ধর্মভাবোদীপনং যৎ তৎ সুপথ্যং বিদুর্ভোঃ”
শরীর চীয়েতে যেন কীয়েতে রোগপ্ৰসূতঃ।
সমাতীর্জ্যতে যদ্যং তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ।
ইহামুখং যদ্যং তৎসোদার্যঃ প্রযত্নতঃ।
আত্মকামেন হাতব্যং তদতর্জং গরলং যথা।”
যে আহার্য দ্রব্য দেহের শাস্তিজনক, চিত্তের প্রফুল্লাভকারক ও ধর্মভাবোদীপক তাহাকেই পণ্ডিতগণ সুপথ্য বলিয়া থাকেন। যাহা দার্য হইকালে হৃদয় এবং পরলোকে শাস্তি লাভ করায়, তাহাকে সুপথ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আত্মকাম ব্যক্তি অজ্ঞপ্রকার আহার বিবরণ ত্যাগ করিবেন। আহার্য দ্রব্য সত্ব, রজঃ ও তমো গুণ-ভেদে তিনভাগে বিভক্ত করা

হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গীতায় কথিত হইয়াছে :—

“আয়ুঃসবল্যারোগ্যস্বচ্ছ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ।
রজাঃ সিন্ধাঃ শিরাঃ দল্যাঃ আহার্যঃ সাম্যিক-
প্রিয়াঃ।”

কটুরূপবাত্যাক্তীক্লরস্ববিদাহীনুঃ।

আহার্যঃ রাজসংস্তেতাঃ দুঃখশোকাময়গ্রহাঃ।

যাতব্যং যতঃ পুণ্ড্রপুণ্ড্রবিভক্তং যৎ।

উচ্ছ্রিতস্থি চামেধাঃ ভোজনম্ তামসপ্রিয়ম্।”

আহার-ভেদে মানুষের সখ, রজঃ ও তমো-

গুণের বিকাশ সম্বন্ধে তারমতা হইয়া থাকে।

ইতর প্রাপিগণ ও প্রকৃতির অলজ্ঞা নিয়মাদীনে

আহার সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকে।

“মানুষের পক্ষে ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচারের প্রয়োজন

নাই,—এ কথা নিতান্তই অস্বপ্নে। কেবল-

মাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ

দ্বারা ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার হইতে পারে না,

অতএব ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার সম্বন্ধে স্ববিদের

যোগজ্ঞান-লব্ধ, শাস্ত্রানুসারিত মতই গ্রাহ্য

হওয়া সমীচীন। সাময়িক পরিবর্তনাদ্বারা

ভক্ষ্যভক্ষ্য নির্ণয় করিতে হইলে গীতাজে ও

অত্যাশ্চর্য্য উদ্ধৃত শ্লোকগুলির প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া তাহা করাই শ্রেয়ঃ। বর্তমান

কালে অন্নবিচার প্রায় রহিত হওয়ার উপক্রম

দেখা যাইতেছে, ইহার ফল যে শুভ হইবে

তাহা আমার মনে হয় না। বর্তমান শিক্ষা-

প্রণালীর দোষে ও কালধৰ্ম্মে ভক্ষ্যভক্ষ্য-

বিচারের শিথিলতা হইলেও এ বিষয়ে

সমযোচিত সতর্কতা অবলম্বন বিধেয়। এখন

প্রকৃত বিষয়ের অংশগ্রহণ করা যাক্ :

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

“চাতুর্কর্ষ্যং মহা যন্তঃ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

তত্ত কৰ্ত্তারমণি মাং বিদ্বাকগুণারমণায়ম্।”

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগদ্বারা আমি চতুর্কর্ম্ম

করিয়াছি, অথচ আমি ইহার কৰ্ত্তা হইলেও আমারে নিজস্ব বলিয়া জানিও।

ব্রাহ্মণাদি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) চতুর্কর্ম্ম

সখ, সখরজঃ, রজঃস্বঃ ও তমোগুণের প্রাপ্তি-
জাত। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃতির গুণ

হইতেই কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতেই জাতি বা বর্ণ

নির্গত হয়। এই গুণ ও কর্ম্ম বাস্তবিক,

মানুষের ইহাতে স্বাধীনতা নাই। প্রকৃতি

জিওগাণ্ডিকা। “স্বরজঃসমাসা সাম্যাবস্থা

প্রকৃতিঃ” (সাম্যাবস্থা)। এই প্রকৃতির

প্রেরণাতেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও কর্ম্ম উৎপন্ন

হইয়াছে। কর্ম্মকে শাস্ত্রে “স্বভাবজ” বলা

হইয়াছে, তহ যথা :—

“ব্রাহ্মণ্যক্ষত্রিয়বংশাঃ শূদ্রাণ্যাক্ষ পরম্পর।

কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈঃ পৈঃ।

শমো দমণতাঃ শৌচং কান্তিয়ার্জবমেবচ।

মনবিজ্ঞানমাত্মকঃ ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।”

শৌধ্যং তেজো দুঃখনির্দামকং যুক্তে চাণ্ডাল্যদায়কং।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রজঃ কর্ম্ম স্বভাবজম্।

কৃষি-গো-বৃক্ষ-বাণিজ্য বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।

পরিচর্যাশ্রমকং কর্ম্ম শূদ্রপ্রজাণি স্বভাবজম্।

উপরোক্ত শ্লোকগুলি পাঠে প্রতিপন্ন হয় যে,

জাতি বা বর্ণভেদ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরই

প্রতিষ্ঠিত। জগতের সমগ্র মানব-সমাজেই

কোন না কোন প্রকার জাতি বা শ্রেণী-ভেদ

আছেই। ভারতের বর্ণ বা জাতি-ভেদের

বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ইচ্ছা করিলেই কেহ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইতে পারে

না। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে, জন্মজন্মান্তরে

জাতান্তর সংঘটিত হইতে পারে। হিন্দু জন্মা-

ন্তরবাদী, অতএব তিনি যে কোন জাতিতেই

জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে দুঃখিত

হইতে পারেন না। আমাদের বর্তমান পূর্ব-

জীবন পূর্বজন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের সমষ্টিক্র,

অতএব জন্মান্তরীণ স্রষ্ট্রুতি-চক্রুতিই আমাদের

ইহজীবনের স্বধর্ম্মাধের কারণ বা নিয়ামক।

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক মহাত্মাই দাব্য

এই যে, জাতি বা বর্ণভেদই, ভারত-
বর্ষের সর্ববিধ অনিষ্টের মূলীভূত, কারণ এবং

উাহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের

নিয়ম ও আচারনিষ্ঠতার শত বন্ধনেই সমাজ

বিলম্ব ও মূঢ়কল্প হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-সাম্প্রদায়

ঠাগাদের এই মতবাদের সমালোচনা

করিবেন এইরূপ আশা করিতে পারি।

আমার বিশ্বাস বর্ণাশ্রম-বন্ধের দৃঢ়ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই হিন্দুসমাজ শত

বিগ্রহের ভীষণ তাড়নাতও অদ্যাপি বিলুপ্ত

হয় নাই। অজ্ঞ কোন দুর্বল ভিত্তির উপর

সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেই তাহা আর

ভারতীয় সমাজ থাকিবে না। যে কোন

জাতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইলেই তত্তজাতি বিলুপ্ত

হইবেই। যাহারা সমাজের প্রকৃত কল্যাণ-

কামী, উাহারা যেন হিন্দুজাতির জাতীয়ত্ব

নষ্ট করিতে চেষ্টা না করেন। বর্ণাশ্রম-বন্ধের

নিষ্কম্ব স্রষ্ট্রুতি করিতে হইলে কাল, দেশ

ও পাত্র অহুযারে সেগুলি যাত্র পরিবর্তিত বা

পরিবর্তিত হইতে পার্বে তাহার চেষ্টা করা

সমীচীন, ব্রাহ্মণ-সমাজ এ বিষয়ে যথাসক্তি

চিন্তা করিবেন, এক্ষণ আশা করা যায়।

যুগভেদে ব্যবহারিক ধর্ম্মভেদে ধর্ম্মবিধিগণের

অনভিপ্রের্ত নহে। “হুতে জু মানবো

ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং শম্মনিবর্তিতো”—ইত্যাদি ঋষি-

দেবাই মত। “কলৌ পারাস্যতঃ স্তুতঃ।

এ কথা গতিগণের স্ববিদিত। মহা

বলিতেছেন—“অজ্ঞে কৃতঘ্ণে ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং

স্বাপরেহপরে। অজ্ঞে কলিযুগে নৃণাং যুগ-

প্রায়াক্রমণতঃঃ।” কাল, দেশ ও পাত্র অহুযারে

বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্তনীয় বা পরিবর্তনীয়।

শাস্ত্র চিরকালই এই নিয়মের বশবর্তী ছিলেন;

“দেবরেন স্তুতোঃপত্নিমপুর্কে পশেবধঃ।

দৃষ্টায়াটৈব কঠায়াঃ পুনর্নিবং বরদা চ”

প্রকৃতি বচনেই ইহার প্রমাণ। সামাজিক

বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন পরিবর্তন চিরকালই

বৃহৎগুণী কর্ত্তব্য, বিশেষ বিবেচনা সহ, সাধিত

হইয়াছে। সামাজিক রীতি, নীতি ও বিধি-

ব্যবস্থা পরিবর্তিত করিতে হইলে বিশেষ

যীরতা, ভবিষ্যৎদর্শিতা ও সমীচীনতা সহকারে

করাই সূক্ষ্মতা কর্ত্তব্য। প্রাচীন ঋগ্বেদের

স্থানে বর্তমান কালে অধ্যাপক ও শাস্ত্র-

ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকেই গ্রহণ করা

যাইতে পারে, উাহারা অপকৃপাত-বিচার সহ

শাস্ত্রানুসারিত মূক্তির আশ্রয়ে সর্ববিধ

সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিলে সমাজ

স্ব-প্রগতিতে থাকিবে। শ্রীভগবান গীতায়

বলিতেছেন—

“যঃ শাস্ত্রবিদ্যুঃস্বয়ং বর্ভতে কাম্যকরতঃ।

ন স শিদ্ধিমবাপ্নোতি ন স্বখং ন পরাং

গতিম্।”

যে শাস্ত্রবিদ উল্লম্বন করতঃ যথোচ্ছ্রাচারী

হইবে, সে শিদ্ধি, স্বখ অথবা মুক্তি লাভ

করিতে পারিবে না। এই মহতী বাণীই

সমাজ-সংস্কার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

সখ, রজঃ ও তমোগুণের তারমতামু-

সারেই মানুষের বর্ণভেদ হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে :—

“ব্রাহ্মণ্যানাং দিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়গাণ্য লোহিতঃ

শৈশ্যানাং পীতকঃ বর্ণঃ শূদ্রানামিন্তত্ত্বাঃ।”

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বর্ণ বর্ণা-

ক্রমে খেত, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণ। এই

নিয়ম অব্যাহতকারী নহে। ইহা প্রায়িক মাত্র।

কারণ প্রাচীন ভারতে মহর্ষি ব্যাসদেব ব্রাহ্মণ

হইয়াও কৃষ্ণবর্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ক্রেতা-

বতার শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় হইয়াও শ্রামবর্ণ এবং বলদেব ক্ষত্রিয় হইয়াও শ্বেতবর্ণ ছিলেন। স্বর্ণবেদে উক্ত হইয়াছে :—

“ব্রাহ্মণোহন্ত মুখ্যমাসীং বাহুঃ রাক্ষসঃ কৃতঃ।

উরু তদন্ত যদ্ বৈশ্যঃ পদ্যভ্যাং শূদ্রোহ্ণায়তঃ”

বিরটি পুরুষে যুগ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরুদেশ বৈশ্য এবং পাদদেশে শূদ্র হইল।

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁহাদের

মতাবলম্বী অনেক ভারতীয় স্থায়ীণ বেদের

এই উক্তিতে প্রাচীন বলিয়া মনে করেন না।

তাঁহারা এই হস্তান্তর প্রকৃষ্ণ বসিয়া বিবেচনা

করেন; আমি এ বিষয়ে কোনও বিচার

করিতে ইচ্ছা করি না। বেদপন্থীদের মতে

জাতি ও বর্ণবিভাগ অনাদি কাল হইতেই

বর্তমান, ইহা মহাযুক্তকল্পিত নহে, ইহা প্রাকৃতিক

অলঙ্ঘ্য নিয়ম বৈধ হইয়াছে; এ বিষয়

পূর্বেও বলা হইয়াছে, পুনরুক্তি নিম্নপ্রদেয়।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের ১০ম সর্গে

বলিচ্ছেন :—

“চতুর্গুণকলং জ্ঞানং কালাবস্থাকৃত্যুগাঃ।

চতুর্গুণ্যেয়ো লোকন্তুৎ সর্গং চতুর্গুণং।”

প্রকৃতির প্রেরণাভিত্তি যে, জাতি ও বর্ণ বিভাগ

হইয়াছে ইহাই যুক্তিমান বলিয়া মনে হয়।

বর্তমান কালে আমাদের মধ্যে প্রকৃত মুখ্য

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির একান্ত অসদৃশ

ঘটিয়াছে, আমাদের অধিকাংশই এখন “ক্রূপা

ব্রাহ্মণ” মাত্র। এরূপ হওয়ার বহুবিধ কারণ

বিদ্যমান; সে সমস্তের প্রত্যেক কারণ কতগুলি

আমাদের সাধারণ এবং কতগুলি নব্বো

ব্রাহ্মণ-সম্মিলন যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

করার প্রকল্প পথ নির্ধারণ করিতে পারেন,

তবেই উদ্দেশ্য সফল হইবে, নতুবা ইহা পশ্চাদ্ধ

মাত্র হইবে। আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে অনেক

শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, তদ্ যথা,—

“দেবে যুনির্বিজে রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রে।

নিষাদকঃ।

পশু ক্ষেত্রোহপি চতালো বিপ্রা দশবিধাঃ

স্বভাভাঃ”

এই দশবিধ ব্রাহ্মণের অব্যাহত ভেদ এই

প্রকারে কথিত হইয়াছে :—

“সম্ভাং যানং জঘং হোমং দেবতানিত্য-

পুঞ্জং।

অতিথি বৈশদেবক দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে। ১

বৈশদেবকে ত্যক্তবস্ত্রং কুর্যদ্রিত্য প্রণয়ীমঃ।

শাকো পাত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ

নিযতোহহরংহঃ শাক্তে স বিপ্রো মুনিকচ্যতে।

বোহাং পঠতে নিত্যং সর্গদমঃ পরিত্যজেৎ।

সাংখ্যযোগবিচারঃ স বিপ্রো বিজ্ঞ উচ্যতে। ৩

অজ্ঞতাশ্চ বদানঃ সংগ্রামে সর্গদমশূন্যে।

প্রায়স্ত নিমিত্তা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে।

কৃষিকর্ম্মতে যশ্চ গবাক্ষে প্রতিপালকঃ।

বাণিজ্য ব্যবসায়ক স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে। ৫

লাকালবণ সমিধ কুন্তু ক্ষৌর সর্পাণাং।

বিক্রেতা মদ্যমদ্যোনাস্য বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে। ৬

চৌরক স্তম্ভরষ্টব স্তকো দংশকস্তথা।

মৎস্যমাংসে সদা বুক্কা বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে।

অথতৎ স ভানাতী ব্রহ্মহত্রেণ গর্জিতঃ।

তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুদমাংসতঃ। ৮

বাণীহুপত্ভাগানামারামস্ত সঃস চ।

নিষদং রোধকস্তব স বিপ্রো দ্রোহ

উচ্যতে। ৯

ক্রিয়াহীনস্ত মূর্খস্ত সর্গদর্ম্মবিবর্তিতঃ।

নির্যঃ সর্গভুক্ত্যে বিপ্রস্ত ওল উচ্যতে। ১০

বর্তমান কালের ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত শ্রেণী

বিভাগের মধ্যে কে কোনটির অন্তর্গত, একটু

চিন্তা করিলেই তাহা অনার্য্যে বৃদ্ধিতে

পারেন, এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা

নিম্নপ্রদেয়। যে গুণ ও কর্ম্মবশে ব্রাহ্মণ

প্রাচীন ভারতের সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন

ছিলেন তাহা অনন্য-সাম্রাজ্য।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমির একচ্ছত্রী

সম্রাটের বহুমূল্য রত্নজিহ্বাচিত মুচ্চুক

মন্তক যে ব্রাহ্মণের পদতলে পড়ই অবনত

হইত, সে ব্রাহ্মণ কখনও দুঃস্থকশনিভ শযা-

শায়ী, অমূল্যহিপ্রাদানবাসী ধনকূলের

ছিলেন না। তিনি বাছিযা বাছিযা এমন

একটা বৃত্তি জীবিকাধরণ গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন, যাহার ভূল্য হীন ও ছায়েব বৃত্তি

আর হইতেই পারে না, সেটা কি? না

“ভিক্ষা”। সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ-

কাম্যামতেই ব্রাহ্মণ সর্গভাগী, পর্ণকুটীরবাসী

এবং শাকামভোজী হইয়াছিলেন। তাঁহার

ধনবান্ বা অজ্ঞবান্ ছিলেন না; অথচ

তিনি এমন একটা ধনে ধনী ছিলেন যাহা

“জাতিভিত্তিতে নৈব চৌরোগাপি নীয়াতে।”

জানবল তাঁহার প্রধান বল ও অস্ত্র ছিল এবং

সংযম ও ত্যাগই তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ

প্রতিপাক ছিল। ব্রাহ্মণই ভারতের জনা-

ভাগ্যের রক্ষক ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ

ধনলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অর্থকে

পরমাধরে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই

মুহূর্ত্তেই তাঁহার অধঃপাতের হস্তপাত

হইয়াছে। ব্রাহ্মণ যদি নিকাম, নিলোভ,

নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, শিশু, দাশ, উপরত ও

ভিত্তিক না হইতে পারেন তবে তাঁহার

ব্রাহ্মণ্য অটল থাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মণোচিত বাহ্যভাস্তরচিত্তা না থাকিলে

তিনি ব্রাহ্মণ্যের দাবী করিতে পারেন না।

ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতৃপুরুষের বহু আয়াসলভ্য

অতুল সম্পত্তি হারািয়া বাতবিকই আশ্রয়

দরিদ্র হইয়াছেন ও হইতেছেন। আর্থিক

দারিদ্র্য তাঁহার চিরকালই ছিল; কিন্তু

প্রকৃত ধন হারািয়া তিনি আশ্রয় পথের

ভিখারী হইতেছেন। যাহার নিকট পৃথিবীর

সমগ্র মানবজাতি জানানান্তর জন্ম এক সময়

বাহ্যস্থ ছিল, আশ্রয় সেই ব্রাহ্মণই পরের দ্বারে

ভিক্ষার্থী; আমাদের স্বীয় কর্ম্মফলেই এই

দশা-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, ভো বিভৎসনা!!

তুভবে ব্রাহ্মণবর্গ! আপনারা সময়োচিত

সমর্কতা অবলম্বন করুন, নতুবা আর ত্রুষ্ণার

সীমা থাকিবে না। বর্তমান ধর্ম্মহীন, সংযম

ও ব্রাহ্মণ্যহীন শিক্ষাপ্রণালীই আমাদের

অধঃপতনের অন্ততম কারণ, ইতঃপূর্ব সমাজ-

শক্তির ধ্বংস এবং অজ্ঞাত প্রতিকূল কাণ-

সমুদ্রায় এই দশাবিপর্য্যয়ের হেতু বটে।

ত্রুষ্ণা-পালন ব্যতীত প্রকৃত মহাযুগ

উজ্জ্বলিত হইতে পারে না। হিন্দুর চতুরাশ্রম

অতি স্থিতিস্থিত নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং

ইহা মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অঙ্গকূল। মহা-

কবি কালিদাস রঘুবংশ-বর্ণনাকালে চতুরাশ্রমের

একটা হৃদয় আভাস দিয়াছেন, তাহা এই :—

“প্রশংসেভ্যোভাব্যান্যান্যো যৌবনে বিধিরিযাণাং।

বাক্ষ্যকা মুনিরজ্ঞানং যোগেনান্তে তত্শাস্ত্রম্,

রঘুনামময়ং বক্ষ্যে” ইত্যাদি। ইহাই মানব-

জীবনের স্বাভাবিক বিভাগ; এতদপেক্ষা

উৎকৃষ্ট বিভাগ আর কখনই কল্পনা করা

সম্ভবপর নহে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অপব্যবহারই যে আমাদের

অধঃপাতের মূলীভূত কারণ তাহা বোধ হয়

আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

“ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায় বীৰ্য্যলাভঃ” এবং “রেতো

বৈ ব্রহ্ম” এই কথাগুলির মূল গভীর সত্য

নিহিত আছে। ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই

আমাদের বলহীন ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হ্রাস

হইতেছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে “যং

বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।” অর্থাৎ

মৈথুনবর্জনই ব্রহ্মচর্য্যব্রত। মরণ্য কীর্ত্তনঃ
কেলি প্রেক্ষণং গৃহভাষণং। মরুগ্নোহথাব-
সাম্যং কিরানিপাতিব্রতং। এতন্মৈথুনমীদং
ব্রহ্মবিভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্। বিপরীতঃ ব্রহ্মচর্য্য-
মহতঃৈ মুমুক্ষুঃ।” বর্জনমকালে ব্রহ্ম-
চর্য্যর কঠোরনিয়মমুম্ব সর্বাথা পালন করা
সম্ভবপর না হইলেও কতকটা পালন করা
যাইতে পারে এবং ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ
জীবন গঠনের চেষ্টা করা যাইতে পারে।
কি উপায়ে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ পুনঃ
প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহা দেশভিত্তিক
ব্যক্তিমাজেরই চিন্তনীয়। অধ্যাপকগণ
ছাত্রাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের) পক্ষে
চতুর্ভাষ্যমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
তন্মধ্যে উপনয়নান্তে গুরুদ্বারে বাস করতঃ
বিদ্যাভাণ্ড ও বেদাধ্যয়নের কালই
ব্রহ্মচর্য্যাম্ব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের
জ্ঞা এই আশ্রমের কাল তিন ভিন্নরূপে
নির্দ্ধারিত ছিল। অধুনা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য,
অন্ততঃ বঙ্গদেশে, তিন দিনেই শেষ হয়।
কোন কোন স্থলে ইহা তিন ঘটাইই শেষ
হয়; কোথাও বা ইহা একবারেই অনাবশ্যক
বলিয়া বিবেচিত হয়। ইতঃপরেই গার্হস্থ্যশ্রম
আরম্ভ হয়। মহা গার্হস্থ্যশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
বলিয়াছেন। কারণ গার্হস্থ্যশ্রম ভিন্ন পক-
মহাভাজ্ঞা সাধিত হইতে পারে না; বেদাধ্যয়ন,
অগ্নিহোত্র, অতিথিসেবা, বলিকর্ম্ম (পশু
পক্ষীকে আহার দান) পিতৃতপণ ও শ্রাদ্ধদি
ব্যাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞ, দেবজ্ঞ, ভূতজ্ঞ ও পিতৃজ্ঞ
নামে শরে নির্দ্ধিত হইয়াছে। পকমহাভাজ্ঞা দ্বারা
মাহুয মোক্ষলাভের অধিকারী হয়, নতুবা
শে পশুভাবাপন্ন হয়। মহা বলিতেছেন :—
“থ্যা বায়ু সমাশ্রিত্য বর্জ্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বর্জ্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ।”

ব্রহ্মচর্য্যের পর সমাবর্ত্তনান্তে দার-পরিগ্রহ
গার্হস্থ্যশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্য। বিবাহ সম্বন্ধে
শাস্ত্রীয় বিধানগুলি এত স্বন্দর, পবিত্র ও
স্থিতিস্থিত যে, জগতের কোন জাতির
বিবাহবিবিধি ইহার সহিত তুলিত হইতে
পারে না। নিত্যন্ত ছাং ও লঙ্ঘ্যার
বিষয় যে আমাদের বর্ত্তমান সময়ে বিবাহের
মূল উদ্দেশ্য তুলিয়া, শাস্ত্রবিধি অনান্যদে-
উল্লেখ্যন করতঃ সমাজে কতকগুলি অতি
দুর্গত ও যথেষ্ট আচার-ব্যবহারের প্রবর্ত্তন
করিয়াছি ও করিতেছি। পণ-গ্রহণ-প্রথা
তন্মধ্যে একটা অতি গুরুতর অনিষ্টজনক;
ইহার মাত্রা ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে,
সমগ্র ইহার গতিরোধ করিতে না পারিলে
পরিণাম ভয়াবহ। সমাজে তাহার অসুচফল
প্রত্যাহই প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে, তথাপি
আমরা তাহার কোনও প্রতিবিধানের চেষ্টা
করিতেছি না বা করিতে পারিতেছি না।
কেবল মাত্র সভ্যসমিতি ও বক্তৃতাব্যারা এই
দুর্গত প্রথা সমাজ হইতে উন্মূলিত হওয়ার
আশা বহুপ্রদায়িত। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন এ সম্বন্ধে
গভীর ভাবে চিন্তা করতঃ স্থানীয়মাংস উপনীত
হওয়ার চেষ্টা করিবেন। অতঃপর অনেক
প্রকার অনাশ্রীয় বিবাহও সমাজে আধা
প্রচলিত হইতেছে। বংশ-পরিচয় প্রভৃতির
অদভাবই এই প্রকার ছুঁটনার মূলীভূত
কারণ। পূর্বে কুলপুরোহিতগণই বংশপরিচয়
ইত্যাদি লিপিবদ্ধাবস্থায় রাখিতেন। সম্ভ্রান্ত
তাহাদের ব্যবসা প্রায় বিলুপ্ত। আমার
বিবেচনায় ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের এ সম্বন্ধে
ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।
বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিলে
সমাজ ক্রমেই হীনমশা প্রাপ্ত হইবে এবং
পরিণামে জাতির ক্ষয় হইবে। সামাজিক

সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার শীর্ষস্থানীয় বিবাহ-ব্যবস্থা;
কারণ বিবাহই সমাজ-বন্ধনের মূল সূত্র, এবং
ইহার পবিত্রতা-রক্ষার উপরই সমাজের স্থিতি
ও গতি নির্ভর করে। অতএব সর্ব্বপ্রথমে
বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধি অম্লগালে সমাজকে
চলিত করার চেষ্টা করা সমীচীন।
অভিভাষণের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণদেরকে
নমস্কারোপলক্ষে তাঁহাকে গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ
বলা হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানি না আমাদের
কোন মহাপাতকের ফলে তিনি অধুনা তত্ত্ব-
বধায় হইয়াছেন। চতুর্দিকে যে প্রকার
প্রতিকূল লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে,
তাছাড়া আশা হয় গো-ব্রাহ্মণ অচিরাং
ভারতবর্ষ হইতে অম্লগিত হইবে। শাস্ত্র
বলিতেছেন :—
“ব্রাহ্মণাশ্রমে পাবশ্চ কুলমেক্ষং বিধাকৃতং।
একজ মন্যন্তিহি বিহরজ্জত তিষ্ঠতি।”
গো ও ব্রাহ্মণ এক কুলেই উৎপন্ন হইয়া দুই
ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, এক (ব্রাহ্মণ)
মূর এবং অজ্ঞ (গোতে) হবি (যুত)
অবস্থান করিতেছে। “হবির্বে ব্রহ্ম” যুতই
ব্রহ্ম, এ কথার মূলও গভীর তত্ত্ব নিহিত
আছে। শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে
“গোভিন্ন” তুল্য দমনতি কিঞ্চিৎ” অপরক
“গোমু লোকঃ প্রতিভাতঃ”। বস্তুতঃ ভারতের
প্রধান সম্পত্তিই গো, এবং, গো-রক্ষাভেই
ভারত রক্ষিত। গোজাতির অবনতিতে যে
ভারতের কি দুর্দশা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে
তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে। গোজাত দুষ্কারিণ
আমাদের প্রধান জীবনীয় পদার্থ; গোজাতির
অবনতি ও বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃ,
নবনীত প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের অদভাব
ঘটিতেছে, তাহার পরিণাম বাহা হইবার
তাহাই হইতেছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান

দেশ; হলচালনা, ভারবহন ও শকটাদি-
চালনের প্রধান সহায় গো, অতএব গোজাতির
হীনতায় ভারতে কৃষি-বাণিজ্যের অস্তরায়
ঘটিতেছে। ক্ষেত্রের প্রধান দায় গো-
“মস্কোলে জায় আর কিছুই নাই; তাহার
অগ্রচুরতায় ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি
হানি হইতেছে। শাস্ত্রে গোমূত্র ও গোমূষ
অতি পবিত্র পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।
“শকুনমূষঃ পরশ্রামলক্ষ্মীমানঃ পরম্”
ইহা ঐক্যভাষ্য এবং বর্ত্তমান সময়ের ভাষায়
বলিতে গেলে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।
এক কথায় বলিতে গেলে গোজাতির
অবনতিতে ভারতের স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য
প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই অবনতি হইতেছে।
গোবংশ-লোপের কতকগুলি প্রধান কারণ
এগুলি উল্লেখ করা যাইতেছে :—
১ম—গোপালনের প্রতি অশ্রদ্ধা।
২য়—গোচার্য-ক্ষেত্রের ক্রমে অসম্ভাব।
৩য়—গো-মড়ক (বসন্ত), গলা-বোলা
প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব।
৪র্থ—গোবংশ-রক্ষার জ্ঞা উৎকৃষ্ট বীজ-
সেক্সা যতের অত্যা।
৫ম—যথেষ্ট গোবধ।
৬ষ্ঠ—চর্ধ্যব্যবসায়ের আধিক্য-হেতু চর্ধ্য-
কার কর্ত্তক বিষ-প্রায়েণ গোবধ।
৭ম—গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা।
ইতঃপরে আরও অনেক প্রতিকূল কারণে
গোবংশ ক্রমে ধ্বংসোন্মুখী হইতেছে।
উপরোক্ত কারণ পরস্পর মধ্যে যে গুলির
প্রতিবিধান আমাদের পক্ষে সম্ভবপর তাহা
করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ-সম্মিলন এ বিষয়ে
মনোযোগী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।
জৈনমত্সদ্বাদয়ের অহুকরণে দেশের সর্ব্বজ
শিশু-কল্যাণোপলেক্স অহুধান করা

অতএব যে কোন জাতি হইতে অথবা যে কোন ব্যক্তি হইতে জ্ঞান আহরণে কোনও পোষের কারণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কথনও সজীর্ণমনা হইতে পারেন না; ব্রাহ্মণ ও অনুদত্ততা, পরম্পরবিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত। "চণ্ডালমপি বিত্তং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ" ইহা ব্রাহ্মণেরই উক্তি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অথবা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী মাহুষের গন্তব্য পথ। ব্রাহ্মণ নিবৃত্তি বা শ্রেয়ঃ পথকেই অবলম্বন করতঃ মোক্ষলাভের প্রয়াসী হইয়াছিল। ফলতঃ কেবলমাত্র প্রবৃত্তির প্রোতে ভগিন্দা চলিলে মহত্ম্যের হানি হইবে। তাহারে মধ্যে ভোগকে গ্রহণ করাই ব্রাহ্মণের বিবিশিষ্ট লক্ষণ। প্রকৃত ব্রাহ্মণের নিকট "বহুধৈব কুট্টকম্" "অন্নং নিজে পয়ো বেতি গণনা লঘুচেতমানং"। তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও জলোৎসর্গের শাস্ত্রীয় মন্ত্রগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে সহজই ব্রুতিতে পাণ্ডা যায় যে ব্রাহ্মণের হৃদয় কত উচ্চ, কত উদার, কত নির্দল ছিল। ভগবান্ মনে অতি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেনঃ— "এতদ্বৈশ্বপ্রভৃত্য সকাশাদব্রজমানঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পুথিবাং সূক্ষ্মমানসঃ॥" এই উক্তি কখনও উন্নতপ্রজ্ঞান নহে, ইহা নিষ্ফলা নহে, স্ববিধাক্ষ মিথ্যা হইবার নহে। আমি বিধা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, সমগ্রগ্রন্থ আত্ম ভারতীয় স্বাধীন জ্ঞানের নিকট ক্রমে অবনতমস্তক হইতেছেন। ভারতীয় স্বাধীন চরণে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানদৃষ্ট জাতিসমূহ সত্বিত পুষ্পাঙ্কলি প্রদান করিতেছেন। বেদান্তদর্শনের গভীর দার্শনিক তত্ত্ব-সমূহ সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত ও চমকিত করিয়াছে। "চিন্তানন্দ-

ব্রাহ্মণ শিবোহহং শিবোহহং" ভগবান্ শকরাচার্যের এই গভীর বাণী আজ জগতের নিকৃষ্টগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং সনাতন বেদবাক্য সর্বত্র "অহং ব্রহ্মা" অতিরেই পাশ্চাত্য জগতে গভীর সত্য বলিয়া আত্ম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; আমরা ভারতের স্ববিধা সত্ত্ব ও কথা মনে জুলিয়া না যাই। পিতৃপুরুষের বহু আশাশ্রিত অতুল সপাতি গোলায় হারাইলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইবে না। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণ-স্বভাব হারাইয়া কেবলমাত্র আফলনে ব্রাহ্মণ-স্বভাব করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি উপহাস্যাপন্ন হইবেনই। সত্য কথা বলিতে কি, হুসমানা যেমন শরৎকালে স্বতই গভীরমুখে প্রধাবিত হয়, মহৌষধ যেমন নিশাকালে স্বয়ংই দীপ্তমান হয়, নৌহ যেমন স্বভাবতই অরুণাস্তমবির দিকে আকর্ষিত হয়, তেমনই বোগ্যবলে বলায়ান, বৈশ্বপরিমিত, শুদ্ধবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, (মহ বলিতেছেন—) "শ্রদ্ধা, স্পৃষ্টা চ দৃষ্টা চ, জুক্তা, স্বাভা চ যো নরঃ। ন দ্ব্যতি স্নাত্যত চ স বিজ্ঞয়ো জিতেজ্ঞঃ"। সংঘী ও প্রশান্ত চেতা, পরমশ্রী ব্রাহ্মণের নিকট সমগ্র জগৎ-বাসী জ্ঞানার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইবেই। হৃদেব ব্রাহ্মণগণ! আপনারা স্বীয় শক্তির অপব্যবহার করিবেন না এবং সামান্য অর্থ-লাভে পরমার্থ হারাইবেন না, আপনারা স্মরণ্যাতীত কাল হইতেই জগতের শিক্ষা-গুরুপণে অবিরতি ছিলেন এ কথা জুলিয়া যাইবেন না। উপদংহারে আমার সনির্দগ্ধ অহরোধ এই যে, পারম্পরিক ধর্ম-বিস্মা প্রভৃতি জুলিয়া, ক্ষুদ্র দর্শন-দৌর্ভাগ্য পরিভাগ্য করতঃ আপনারা সকলে মিলিত ভাবে ব্রাহ্মণের এবং তৎসহ চতুর্বাংশিত সমগ্র

ভারতীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের হিতকামনায় নিখিল জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং শক্তি নিয়োজিত করুন, ব্রহ্মণ্যদেব আপনাদের সহায় হইবেন এবং ব্রাহ্মণ আবার জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত হইয়া জগতের সমক্ষে উন্নত শীরে প্রশান্ত ভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবেন। বাহা সনাতন তাহা কখন নষ্ট হইতে পারে না, নষ্ট হইলে আর তাহা সনাতন হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান সনাতন এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, অতএব ব্রাহ্মণও সনাতন।

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার এই ক্ষুদ্র সংঘে কোন অসম্বন্ধ উক্তি থাকিলে, অথবা কোন প্রকার গৃহীত প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে

গভীর ও অতি পবিত্র বেদবাণী উচ্চারণ করিতেছি:—

"দগ্ধচ্ছলং সংবদলং সং-দেবা মনাসি জ্ঞানতাম্। দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজ্ঞানান উপাগতঃ। সমানো সম্যঃ সন্নিভঃ সমানী সমানঃ মনঃ স চ তত্ত্বমেষাম্। সমানঃ কে তো অভিজগৎপলং সংজ্ঞানেন বো হবিষা যজামঃ।

সমানীবা আকৃতিঃ সমানী হৃদয়ানি বাঃ। সমানমন্ত বো মনঃ যথা বাঃ স্বমহাসিতি॥ সনানী ববক্তৃ সননৌ ভূনক্তৃ সুহরীণ্যঃ করবাবত্হ তেজস্বিনাবহ ধীতমজ্ঞ মা বিদ্বিষাহং। ঐ শান্তিঃ ঐ শান্তিঃ ঐ শান্তিঃ ব্রাহ্মণভো নমঃ শ্রীকৃষ্ণদত্ত সিংহ শর্মণ্যঃ।

নিখোজাতির কণ্ঠবীর *

প্রথম অধ্যায়

গোলামাবাদের আব্বাহওয়া

আমি কেনা গোলাম—জাতিতে নিখোজ। ভাঙ্গিনীয়া প্রদেশের ফ্রাঙ্কলিন জেলার কোন গোলাম-খানায় আমার জন্ম। ঠিক কবে কোথায় জন্মিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। শুনিয়াছি একটা ডাকঘরের নিকটে আমার জন্মস্থান; এবং বোধ হয় ১৮৫৮ কিংবা ১৮৫৯ সালে আমি জন্মিই হই। কিন্তু জন্মের মাস, তারিখ ইত্যাদি কিছুই জানি না। নিতান্ত ছেলেবেলার কথাই মধ্যে গোলামাবাদের কাঙ্কধর্ম ও চাটালনগুলিই

মনে পড়ে। আর অরণ্য হয় সেই আবাদের গোলাম-মহাশায় কুঠিবিগুলি—যেখানে আমার স্বজাতিরা তাহাদের দাস-জীবন কাটাইত। নিতান্ত ঘৃণ্য, অবনত, দারিদ্র্যহীন, নৈরাশ্রপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই আমার বাল্য-জীবন কাটিয়াছে। অবশ্য এই ছঃখ-দৈন্য-কেশের জন্ত আমার মনিবদের বিশেষ দৃষ্টি দোষ ছিল না। তাহার আত্ম প্রভুগণের জুলনায় সজ্জন ও দয়ালু ছিলেন। তবে কেনা গোলামমাহের যে শোচনীয় দশা তাহাই আমাকেও ভোগ করিতে হইয়াছে। একটা ১৬ ফিট লম্বা এবং ১৪ ফিট চৌড়।

* আমেরিকার শিক্ষাগুরু ক্রিস্টা ওয়াসিটনের "আফ্রিকান-চরিত" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

কাঠের কামরার মধ্যে দাস-জাতির সকলকেই বসবাস করিতে হইত। এইরূপ একটা কুহ্মুরিতে আমি, আমার মাতা, এবং এক ভাই ও ভগ্নী এই চারিজন আমাদের দাস-জীবন কাটাইতাম। পরে “বৃত্তপাশের” গৃহবিবাদের ফলে দাসজাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। তখন হইতে আমরা স্বাধীন হইয়া গোলামখানা পরিতাগ করিয়াছি।

আমার পূর্বপুরুষদের কথা কিছুই জানি না। গোলামাবাদের লোকজনেরা মাঝে মাঝে কাণামুখা করিত। তাহা হইতে অল্প বিবরণ কিছু অস্বাভাবিক লইয়াছি হইত। আমরা আফ্রিকাবাসী। আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় চালান দিবার সময় জাহাজে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে মনিব-সম্প্রদায়ের লোকজনরা যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছিল। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বৃত্তান্ত এইটুকু মাত্র জানা যায়। বলা বাহুল্য সেই যুগে গোলাম-জাতির বংশতালিকা, পুরাতত্ত্ব, পিতামহের জীবন-কাহিনী ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজনই বোধ হইত না।

কোন উপায়ে এক ব্যক্তি আমার মাতাকে হত্যা করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তিনি আমাদের প্রাকৃ হস্তা-কর্তা-বিধাতা। একটা মৃতন গরু, ঘোড়া বা শূকর কিনিলে তাহার পরিবারে রেক্ষণ সাড়া পড়ে, আমার মাতা তাহাদের গোলামাবাদে প্রবেশ করিলে তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু হৈ-চৈ পড়ে নাই।

আমার পিতার সংবাদ আমি একেবারেই কিছু জানি না। বোধ হয় তিনি কোন শ্রেষ্ঠকায় পুরুষ—সম্ভবতঃ নিকটবর্তী কোন আবাদের প্রাকৃ জাতীয় একব্যক্তি। তাঁহার আমি কখন দেখি নাই—তাঁহার নাম পৃথক

তিনি নাই, তিনি আমাকে মাহুয় করিবার জন্ত কোনরূপ চেষ্টাও কোন দিন করেন নাই। এইরূপ পিতা বা জন্মদাতা গোলামীর যুগে আমেরিকার শ্রেষ্ঠদাস-সমাজে অসংখ্যই ছিলেন।

আমাদের কামরাটিতে কেবল মাত্র আমাদেরই গৃহস্থালী চলিত না। এই কুহ্মুরিতে সমস্ত গোলামাবাদের জন্ত রন্ধন-কাণ্ড সম্পন্ন হইত। আমার মাতা আমাদের সকল কুলীর জন্তই রান্না করিতেন। ঘরটা নিত্যই জীর্ণ-দীর্ঘ অতিশয় স্বাভাবিক এবং পীড়াজনক। ইহার ভিতর আলোক বা বাতাস বেশী আসিত না। কিন্তু মাঝে মাঝে ফাঁকের ভিতর দিয়া শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস যথেষ্টই প্রবেশ করিত। তাহার উপর, মেজেরে অনেকগুলি গর্ত ছিল—তাহার মধ্যে একাধিক বিভাল আসিয়া আশ্রয় লইত। মেজের উপর কোন কাঠের আবরণ ছিল না। মাটির উপরেই সকল কাঠ-বর্গ চলিত। মেজের মধ্যস্থলে একটা বড় বড় করা হইয়াছিল। শীতকালে তাহার মধ্যে শকরকন্দ আনু রাখিয়া একটা কাঠের তক্তা দিয়া ঢাকা হইত। এই আলুগুণামের কথা আমার বেশ মনে আছে। এখান হইতে নাড়াচাড়া করিবার সময় দুই চারিটা আনু আমার হস্তগত হইত। সেইগুলি পরে নির্জনে গুড়াইয়া পাইতাম।

রন্ধনদির সরঞ্জাম অতি কর্দমাক্ত হইয়াছিল। ‘পোতা’ দেওয়া হইত না। খোলা উননে রান্না করিতে হইত। ফলতঃ শীত-কালে যেমন ঠাণ্ডা বাতাসের দৌরাণ্ডো প্রাণে বাঁচা কঠিন হইত, তেমনি গ্রীষ্মকালে এই খোলা উননের উত্তাপ আমাদের জীবনধারণ অসম্ভব করিয়া তুলিত।

আমার বাল্যজীবনে এবং অজ্ঞাত হাজার হাজার গোলামের বাল্যজীবনে কোন প্রভেদই ছিল না। আমাকে এবং আমার ভাই ও ভগ্নীকে দিবাভাগে কখনই মাতা দেখিতে শুনিতে সময় পাইতেন না। খুব সকালে সরকারী কাজে হাত দিবার পূর্বে এবং রাত্রে সকল কাজ সারিবার পর আমার মাতা আমাদিগের জন্ত কিছু সময় করিয়া লইতেন। মনে পড়ে—কোন কোন দিন রাত্রে আমার মাতা আমাদিগকে জাগাইয়া কিছু মাগ খাওয়াইতেন। কোথায় যে তিনি তাহা পাইতেন কিছুই জানিতাম না। অশ্রু আমার মনিরেরই পতঙ্গালা হইতে জঙ্কট লইয়া আসা হইত। এই কাণ্ডকে ‘আপনারা’ ‘চুরি’ বলিবে। আমিও আশ্চর্য হইয়াই চুরিই বলিয়া থাকি। তবে যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ইহাকে কোন দিনই চুরি ভাবিতে পারি নাই, এবং কেহ আমাকে বুঝাইতে ও পারিত না যে আমার মাতা চোর। গোলামী করিলে এইরূপই ঘটয়া থাকে। দাস-জাতির ইহা স্বাধীন।

ছেলে-বেলায় আমরা কোন দিন বিছানায় শুইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা তিন ভাই বোন মাটিতে পড়িয়া থাকিতাম। কতকগুলি ছোট্টা ময়লা জাক্‌জাক্‌র বস্তুর উপর রাজি কাটাইতাম।

সম্প্রতি কেহ কেহ আমার বাল্যজীবনে খেলা-ধূরার কথা শুনিতে চাহিয়াছেন। খেলা-ধূরা কাহাকে বলে ছেলে-বেলায় আমি তাহা জানিতাম না। যতদূর স্মরণ করিতে পারি—প্রথম হইতে এখন পর্যন্ত চিরকাল খাটিতে খাটিতেই আমার জীবন চলায়ছে। কিছু খেলিতে পাইলে বোধ হয় আশ্চর্য্য বলি। কাজই করিতে পারিতাম।

নিগ্রোজাতির গোলামীর যুগে আমার যুগ নিত্যই অল্প ছিল। আমার দ্বারা বেশী কাজ হইতে পারিত না। তথাপি আমাকে আবাদের অনেক কাজই করিতে হইত। আমি উঠান বাড়িভাড়া—এবং কৃষিক্ষেত্রের চাষীদের কাজের জন্ত জল যোগাইতাম। অধিকন্তু কলে পিষিবার জন্ত সম্ভায়ে একবার করিয়া শস্তাদি বিক্রয় লইয়া যাইবার ভার আমার উপর ছিল। এই কাণ্ড বড়ই কষ্টসাধ্যক হইয়া উঠিত। আবাদ হইতে কল তিন মাইল দূরে। একটা ঘোড়ার পিঠের উপর শস্তের প্রকাণ্ড বোঝা চাপান হইত—বোঝাটা ঘোড়ার ছুঁ পিঠেই স্থলিতে থাকিত। আমি মধ্যস্থলে বসিতাম। মাঝে মাঝে দুইদৈবকমে বোঝাটা ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া যাইত—আমিও চাঁৎপাত হইয়া পড়িতাম। আমার সাধ্য ছিল না যে আমি একা সেই বোঝা অথুগ্ঠে তুলি। একাকী নির্জন রাস্তায় বহুকণ বসিয়া থাকিতাম—কাঁদিয়া কাটাইতাম। হঠাৎ কোন লোক সেই দিক দিয়া গেলে তাহার সাহায্যে মাল ঘোড়ায় চড়াইয়া কলে পৌঁছিতাম। ইহাতে সময়ে সময়ে একজন লাগিত যে কলে কাজ সারিয়া গৃহে ফিরিতে বেশ রাত্রি হইয়া যাইত। অন্ধকার-পথে বড়ই ভয় পাইতাম। স্থানে স্থানে ঘন জঙ্গল ছিল—তাঁহার মধ্যে না কি চাকুরী ত্যাগ করিয়া খেতাল সৈন্যাদি বাস করিত। শুনিয়াছিলাম—একা পাইলেই তাহার নিগ্রো বাসকের কাণ কাটিয়া রাখিত। স্তব্রতা ঐ রাস্তায় বাওয়া-আসা আমার পক্ষে বিষম উৎপাত বোধ হইত। বিশেষতঃ বেশী রাত্রে ঘরে ফিরিলে আমার জুতা লাগি লাগি খাওয়ার স্বাবস্থাপন্ন ছিল।

গোলামী করিতে করিতে আমি কখনও শিক্ষালাভের জ্ঞান বিভালায়ে যাই নাই। অশস্ত্র বিদ্যালয়-গৃহের ফটক পৃষ্ঠায় অনেক-বারই গিচ্ছাই। আমার মনিবদের সন্তান-সন্ততিরা খুলে যাইত। আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুতুকাদি বিহায় হইতাম। দুই হইতে দেখিতাম বিভালায়ের ঘরগুলিতে ছেলে-মেয়েরা দলে দলে লেখা পড়া শিখিতেছে। সেই দৃশ্য আমার চিত্তে কি অপূর্ণ ভাবই না সৃষ্টি করিত! এক্ষণ একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া লেখাপড়া করিতে পারা আমার নিকট স্বপ্ন-প্রবেশের ত্রায় স্বপ্নকর মনে হইত।

আমরা যে গোলাম বা ক্রীতদাস তাহা আমি অনেকদিন পর্যন্ত জানিতাম না। আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবার জ্ঞান দেশবাসী যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই। একদিন সকালে জাগিয়া দেখি আমার মাতা আমাদিগকে সমুখে রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন:—“হে জগদীশ্বর, সেনাপতি লিফলুনের সৈন্যদল যেন জয়লাভ করে। যে অনাথের নাথ, আমরা সপরিবারে এবং সহযোগিতা যেন স্বাধীন হই। হে পতিত-পাবন, এই অবনত দাসজাতিকে বন্দন-মুক্ত কর।”

বলা বাহুল্য, গোলামাবাদের আমার বন্ধুত্বাভাৱী সকলেই নিরক্ষর ছিল। কেহই লেখাপড়া, পুস্তক, গ্রন্থালয়, সংবাদপত্র ইত্যাদির দ্বারা দূরিত না। তথাপি দেশিমালা প্রায় সকলেই দেশের কথা বেশ জানিত ও বুঝিত। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে একটি বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহা কাহারই অজানা ছিল না। কবে কোথায় কি

ঘটিতেছে দাসজাতির সকলেই তাহা বুঝিতে ও শুনিতে পাইত। আমাদিগকে স্বাধীন করিবার জ্ঞান যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপ্রান্তবাসী গ্যারিসন, লাত্জবয় ইত্যাদি মানবসেবকগণ দেহদিন হইতে আন্দোলন শুরু করেন,—আশ্চর্যের বিষয় সেইদিন হইতেই দক্ষিণ-প্রান্তের গোলামাবাদের মহলে মহলে সংবাদ রটনা গেল। স্বাধীনতার আন্দোলনের দৈনিক ঘটনাগুলি গোলাম-সমাজে সুপ্রচারিত হইত।

উত্তর প্রান্তে এবং দক্ষিণ প্রান্তে এই বিষয় লইয়া লড়াই হইবার উদ্ভব হইল। দক্ষিণ-প্রান্তের মনিবেরা পোলামের জাতিকে স্বাধীনতা দিতে নিতান্তই নারাজ। শেষ পর্যন্ত দুই প্রান্তে সংগ্রাম বাধিল। এ সকল কথা গোলামেরা—আমার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুরাঙ্কবণ—অতি সহজেই বুঝিতে পারিত। তাহারা এই আন্দোলন ও সংগ্রামের মুখে কত রাক্ষসি যে কাণামুখায়, গল্পগল্পে ও গুপ্ত পরামর্শে কাটাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমাদের গোলামাবাদ রেলের রাস্তা হইতে বহুদূরেই অবস্থিত ছিল—ইহার নিকট কোন বড় সহরও ছিল না। কিন্তু আমরা খবর পাইতাম যে, উদারস্বভাব সেনাপতি লিফলু যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হইবার জ্ঞান চেষ্টা করিতেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতাম যে তিনি সভাপতি হইলে আমরা স্বাধীন হইব। তাহার পর যখন যুদ্ধ বাধিল, তখনও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই যুদ্ধের ফলের উপর আমাদেরই ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লিফলু এবং তাঁহার উত্তরপ্রান্তবাসী জনগণ যদি দক্ষিণপ্রান্তবাসীদিগকে মুক্তে পরাত্ত

করিতে পারেন, তাহা হইলে দাসজাতির গোলামী সূচিয়া যাইবে। এজন্য এই সংগ্রামের জয়-পরাভয়ের খবর পাইতে আমরা অতিশয় আগ্রহান্বিত হইতাম।

ভগবানের রূপায় আমরা স্কল সংবাদই পাইতাম। এমন কি, আমাদের প্রভুরা খবর পাইবার পূর্বেই অনেক সময়ে ব্যাপার বুঝিয়া লইতাম। কথাটা কিছু হেয়ালির মত বোধ হইবে বটে, কিন্তু রহস্ত আর কিছুই নয়। শ্বেতা প্রভুদের পরনির্ভরতাই আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ উপকার করিত। আমরা তাঁহাদের গোলাম সত্য, কিন্তু আমাদের মনিবেরাও অনেক বিষয়ে আমাদেরই। গোলাম ছিলেন। আমাদের সাহায্য না পাইলে তাঁহাদের এক পাও চলিবার ক্ষমতা ছিল না। গোলামেরাই ডাকঘর হইতে চিঠিপত্র লইয়া আনিত। সপ্তাহে দুই বার করিয়া ডাকঘরে যাওয়া-আসা করিতে হইত। সেই সুযোগে ডাকঘরের নিকট জটলা ও মল্লিশ এবং পোপগল্প বুঝিয়া লইত। ফলতঃ, প্রভুরা চিঠিপত্র পাঠ করিয়া বুস্তান্ত্রানিতে পারিবার পূর্বেই গোলাম-মহাজায় সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িত।

মায়ে ভায়ে সকলে এক সঙ্গে বসিয়া কখনও আমি আহার করিয়াছি—এরূপ মনে হয় না। গোলামখানার ষাওয়া কোন উপায়ে নাকে চোখে গোঁজা মাত্র। তাহাকে আহার বলে না। গরু ছাগল ইত্যাদি যেরূপ চরিয়া আহারেরও ভোজনব্যাপার সেইরূপই ছিল। কেহন সময়ে কাছ করিতে করিতে যাত একটুকরা মাংস বাইলাম। কখনও বা দুই-

একটা পোড়ান আলু ইটিতে ইটিতে চিবাইতে হইত। মাঝে মাঝে উননের কড়া হইতেই তুলিয়া নেন্না ব্রুয়া মুখে দিতাম। কীটা চামচ ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে কোথা হইতে? টিকি নিয়মিতরূপে যথাবিধি পান-ভোজননরই যে বাবশ্বা ছিল না! যখন কিছু বড় হইলাম, তখন বড় কুটির সাহেব প্রভুর আহারের সময়ে পাখা টানিতে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এই উপায়ে মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে মনিব-পরিবারের কাপেপকখন শুনিতে পাইতাম। অনেক সময়ে গুপ্তকথাও বাহির হইয়া পড়িত। লড়াই সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বুঝিতে পারা যাইত। সময়ে সময়ে তাঁহাদের থানা দেখিয়া যথেষ্ট লোভও হইত। আর মনে হইত কোনও দিন একথা অস্বপ্নজন স্বাধীনতার ভাগ্যে জুটে, তাহা হইলে আমার বহিমানতার চূড়ান্ত ফলভাজ হইবে।

সংগ্রাম চলিতে লাগিল। আমার শ্বেতা প্রভুদের ষাওয়া-পারার বড়ই কষ্ট হইল। দূরদেশ হইতে চা, কাকি, চিনি, ইত্যাদি আসিলে তবে মনিবদের গৃহস্থালী চলে। কিন্তু ক্রমশঃ এ সব দ্রব্য হ্রাস হইল। তাঁহাদের দুঃখের আর সীমা রহিল না। গোলাম জাতির কিন্তু বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। কারণ আমরা অত পরমুখাপেক্ষী ত ছিলাম না। আমাদের আবাদেরই যে সব শস্ত জমিত তাহাতেই আমাদের ভরপ-পোষণ যথেষ্ট চলিত। আর শূকর-পালন ত সবচেয়ে আমরা নিজ মহাজায় করিতাম। কাজেই লড়াই বাধিবার পর প্রভুদের দুর্গতি দেখিয়া আমরা বিস্ত্র হইলাম। আমাদের কোন সময়ে কাছ করিতে করিতে যাত একটুকরা মাংস বাইলাম। কখনও বা দুই-

ময়লা শুড় দিয়াই চা বাইতেন। অনেক সময় আবার সেই শুড়ও যোগায়েতে পারিতাম না। নিতে না দিয়াই তাহারদিকে অনেক দিন চা পান করিতে হইয়াছে। আবার যখন প্রকৃত চা বা কাকিও থাকিত না, তখন তাহার মুড়ি বা চিড়ে ভাজা অথবা অল্প কোন শস্তের শুড়া ভিজাইয়া 'জুসের সাথ ঘোলে' নিয়াইতেন।

আমি জীবনে সর্বপ্রথম যে ছুতা পরি, তাহা কাঠের তৈয়ারী। উপরিভাগে কিছু চামড়া ছিল। তাহা পরিতে পাছের তলায় বড়ই লাগিত। কাঠের ছুতা তবুও ভাল—কিন্তু গোলামীর আমলে আমাদিগকে যে জামা পরিতে হইত তাহা অল্প ভদ্রের আশ্রয় হইয়াছিল। তাহা টানিয়া তুলিলে যে কষ্ট হয় এই জামা পরিতে তাহা অপেক্ষা কম কষ্ট হইত না। ভার্জিনিয়ার গোলামাবাদে খুব মোটা বড়ুগুড়ে চটের শাট পরিতে দেওয়া হইত। ইহার নতুন অবস্থায় অসংখ্য কাটা বাহির হইয়া থাকিত। গায়ে চামড়া, কাটাগুলি বিবিধ অসুখ সঞ্চারিত। আমার চামড়া কিছু নরম—সেজন্য কষ্ট অত্যধিকই বোধ করিতাম। কি করিব?—বাবু-বিচারের অবসর ছিল না। তাহাই পরিতে হইবে নতুন। অল্প কোন গ্রায়াঙ্কান পার্ভে না। আমার দাদা 'জন' এতদূর দাম-হলের পক্ষ আশ্রয়িত উন্নততা দেখাইয়াছিলেন। চটের নতুন জামা পরিতে আমার কষ্ট দেখিয়া সে নিজেই ১০।১৫ দিন সেটা পরিল। যখন ভিতরকার কাটাগুলি তাহার গায়ে লাগিয়া ঘমিয়া গেল, তখন হইতে আমি সেই জামাটা ব্যবহার করিতে লাগিলাম। এই জামাই আমার গোলামী যুগের বহুকাল পর্যন্ত একমাত্র পোষাক ছিল।

আমাদের দুঃস্থতার এই শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া আপনারা ভাবিতে পারেন—বোধ হয় দক্ষিণপ্রান্তের কাল গোলামেরা তাহাদের খোতাশ মনিবদের উপর বড়ই বিরক্ত ছিল। সত্য কথা বলিতে পারি যে, আমরা তাহাদের সখ্যে কখনই বেশী ভীতভাব পোষণ করি নাই। আমরা জানিতাম যে তাহারা আমাদের মতোকাল গোলামের অবস্থায় রাখিবার জন্যই উত্তরপ্রান্তের খোতাশ মহোদয়গণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপ্ত। আমরা জানিতাম যে, আমাদের মনিবেরা জিতিলে আমরা চিরজীবন গোলামীই করিতে থাকিব। তথাকি আমরা আমাদের প্রভুদের প্রতি শ্রদ্ধা আচরণ করি নাই—বৎস সকল সময়ে তাহাদের স্বখে স্বখী হইয়াছি, স্বখে দুঃখী হইয়াছি। আমরা কোনদিনই তাহাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার জটীক করি নাই। যুদ্ধে আমার একজন যুবক মনিব মারা যান, এবং দুই জন আহত হন। ইহাদের পরিবারে যতটা দুঃখ হইয়াছিল—এই ঘটনায় গোলামখানায় তদপেক্ষা কম দুঃখ হয় নাই। আমরা আহত প্রভুদ্বয়কে প্রাপণপথে সেবা করিয়া রাখি। কত রাজি তাহাদের রোগশয্যার পার্শ্বেও কাটাইয়াছি। তাহা ছাড়া, যখন আমাদের প্রভু-পরিবারের পুরুষেরা সকলেই লড়াই করিতে বাহির হইয়া যাইতেন তখন আমরাই তাহাদের গৃহের প্রবর্তী থাকিতাম,—তাহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে রক্ষা করিতাম। সমস্ত পরিবারের 'ইচ্ছা' এবং সম্পত্তির রক্ষাবেশ্বক আমাদের হাতেই থাকিত। নিগোজাতির সত্যানি, দখলভাড়া এবং কর্তব্যপরায়ণতার আরা কোন প্রমাণ আবশ্যক কি?

অধিক কি, নিগোর অনেকক্ষেত্রে তাহাদের পূর্ণ মনিববিশিষ্টে অল্পবয়স দিখা মাহুও করিয়াছে। চিরদিন সকলের সম্মান যাহা না। আজ যে রাজা কাল সে গোলাম, আজ যে দাস কাল সে প্রভু। স্বয়ংদুঃখ চক্কর মত ঘুরিতেছে। দক্ষিণ-প্রান্তের খোতাশ প্রভুসম্প্রদায়ের অনেকেই যুদ্ধের ফলে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি জানি সেই ক্ষুণ্ণের সময়ে তাহাদের পূর্ণতন গোলামেরা তাহাদিগকে অর্থসাহায্য করিত। আমি জানি এইরূপে গোলাম-জাতির দানে মনিব-সন্তানসম্ভূতির লেখাপড়া নিশিয়াছে। একজন মনিব-পুত্র চিরজীবনহার ফলে, স্বগ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমি জানি গোলামেরা নিজেদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও টাকা তুলিয়া এই পাপস্রা প্রভু-সন্তানকে বিচারি রাখিতে চেষ্টা করি নাই। কেহ তাহাকে কাকি পাঠাইয়া দেয়, কেহ বা চিনি কেহ বা মাংস দেয়। এই দানের উপর নির্ভর করিয়া সেই ব্যক্তি এখনও জীবন ধারণ করিতেছে। পুত্রাতন মনিবের পুত্র বা পুত্র আত্মীয় বলিয়া যদি কোন ব্যক্তি নিগোর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নিগোর কষ্ট জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে, আমি সর্বদা বিনিতে পারি, দক্ষিণপ্রান্তে এমন কোন নিগো নাই যে, তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য না করিবে। নিগোজাতির কি দ্বন্দ্ব নাই?—নিগোজাতির কি কৃতজ্ঞতা নাই? কাল চামড়ার ভিতর কি পরমাত্মার সিংহাসন নাই?

আমি বলিলাম নিগোর কখনও অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক হয় নাই। তাহার দখ-ভীক, কৃতজ্ঞ, কর্তব্যনিষ্ঠ। তাহার কথার দাম বৃদ্ধ, কোন প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা দ্বন্দ্ববৎ পালন করে। একটু দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ভার্জিনিয়া প্রদেশের একটি কাল গোলাম তাহার মনিবের সঙ্গে একটা চুক্তি করিয়া লইয়াছিল। তাহার সঙ্গে সে নিজে মনিবের আদ্যে না খাটিয়া তাহার পরিশ্রমের মূল্য-স্বল্প কিছু টাকা বৎসর বৎসর মনিবকে দিতে প্রস্তাবিত হয়। সেই টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য এই ব্যক্তি ওহোয়া প্রদেশে স্বাধীন ভাবে মজুরি করিত। বৎসর বৎসর ভার্জিনিয়ায় বাইরা প্রভুর হাতে তাহার প্রাপ্য টাকা গুণিয়া দিত। ইতি মধ্যে লড়াই বাধে—লড়াইয়ের ফলে সমগ্র দাসজাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। পুত্রাতন চুক্তি, প্রতিজ্ঞা, বন্দোবস্ত ইত্যাদি সবই ভাঙিয়া ফেলা হয়। কোন প্রভুই তাহার পূর্ণতন কোন গোলামকে কোন বিষয়ের জন্যই ধর্মীয় বাধিয়া রাখিতে বা খাটাইতে পারিবেন না—এই আইন যুক্তরাজ্যের মন্ত্রণাসভা হইতে জারি হয়। স্বতঃপা এই গোলামটি যদি এই ব্রহ্মোপে তাহার পুত্রাতন চুক্তি অমান্ত করিত এবং প্রভুকে বাকী টাকা দিতে 'অধীকার করিত, তাহা হইলে কোন আইনে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইত না। কিন্তু আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে এই ব্যক্তি ষাট দিন পর্যন্ত তাহার স্বপ্ন পরিশোধ করিতে না পারিয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত পূর্ণতনকার প্রতিজ্ঞা মত ভার্জিনিয়ায় বাইরা প্রভুর নিকট টাকা দিয়া আসিত। এমন কি, স্বদেশে শেষ কপদক পর্যন্তও সে দিয়া আসিয়াছিল। প্রতিজ্ঞার মূল্য নিগোর যুদ্ধে না কি? এই কৃৎসক্য নিগো বুদ্ধি-ছিল যে, সে স্বাধীন হইয়াছে বটে, প্রতিজ্ঞা জাতিতে এখন তাহার কোন দোষই হইবে না। কিন্তু সে শারীরিক স্বাধীনতা অপেক্ষা চিত্তের ও আত্মার স্বাধীনতাকেই বেশী পণায়

করিল। সমাজে স্বাধীনভাবে বিচরণ
করিবার পূর্বে সে আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জন
করিয়া লইল।

তবে কি নিগ্রেয়ার স্বাধীনতা চাহিত না ?
গোলামের জাতি গোলামীগিরিতেই কি
অদ্বয় হইয়া গিয়াছিল ? গোলামী ছাড়াইয়া
উঠিতে কি আমার স্বজাতিরা ইচ্ছাই করিত
না ? প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের হৃদয়ে
মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অশিষ্য বলবতীই ছিল।
আমি এমন একজন নিগ্রেয়কেও জানি না যে
স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করিত না। আমি
এমন একজন গোলামেরও কথা শুনি নাই যে
গোলামীতেই লাগিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল।

দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ চূর্ণাঙ্গ জাতি
মাত্রেরই দুঃখ দেখিয়া আমি মর্মে মর্মে কষ্ট
অনুভব করি। এইরূপে শৃঙ্খলিত জাতির
অশেষ দুঃখই। কোন কারণে একবার
পর্যায় হইয়া গেলে সে জাতি শীঘ্র সেই
অবস্থা কাটিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের
সমাজ-বন্ধন, তাহাদের পারিবারিক জীবন
সকলই এই পরায়নতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে
জড়াইয়া যায়। অন্নদান্বানের উপায়গুলিও
এই দাসত্বের সর্বমুখী প্রভাবের অধীন হইয়া
পড়ে। চলিতে ফিরিতে গেলেও সেই
প্রভাব ভুলিয়া থাকার যায় না। কাজেই
দাসত্বাধিকার পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা বড়
সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। আমি এই কারণে
আমার প্রজন্মের সম্বন্ধে কখনও কোন
শ্রদ্ধাভাব পোষণ করি নাই। দাসত্ব অনেকটা
জীবন-ব্যাপনের স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যেই
গড়াইয়া গিয়াছিল। দাসত্বপ্রথা বাদ দিয়া
সেই যুগের যুক্তাঙ্কিলা কোন অল্পহায়ে
চলিতে পারিত না। যুক্তা রাজ্যের কৃষি-
শিল্প-বাণিজ্য, সমাজ, ধর্ম সবই গোলামী-

প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতে-
ছিল। ফলতঃ এই গোলামীগিরিকে দোষ
দেওয়া সত্যসত্যই বড় অবিচারের কার্য।

এমন কি, আমি একথা বলিতেও বাধ্য যে,
গোলামীর ফলে নিগ্রেয়াজাতির যথেষ্ট উপকারই
লাভিত হইয়াছে। দাসত্বের আবহাওয়ায়
আমাদের অতি উজ্জ্বল অন্ধের শিক্ষালাভ
হইয়াছে। আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য
অনেকটা পুষ্ট হইয়াছে—আমরা নিয়মিতরূপে
প্রাণালীভবভাবে কাজ করিতে শিখিয়াছি।
আমাদের কর্মণটুই জগিয়াছে। আমরা
অনেকটা চিন্তাশীল হইয়াছি। কৃষি ও শিল্প-
বিজ্ঞান আমাদের ‘হাতে-কলমে’ শিক্ষালাভ
হইয়াছে। আমাদের নৈতিক চরিত্রও কিছু
গঠিত হইয়াছে—ধর্মভাবও জাগিয়াছে।
আমেরিকার গোলামাবাদগুলির আবহাওয়া
আমাদের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি
বিভালমহাবল্লভ ছিল। আমেরিকার যেতাব
মনিরাগঞ্জে একজন আমি সর্বদা সন্মান
করিয়াই আদিয়াছি।

আমি গোলামী-প্রথার পক্ষপাতী নহি—
দাসত্ব-প্রথা ভাল একথা আমি বলিতে চাই
না—সমস্যাের গোলামীগিরির আবশ্যকতাও
আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমি
জানি আমার প্রজন্ম আবাদিগণকে ধর্মভাব
অল্পপ্রাণিত হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন
নাই। আমি জানি যে তাঁহার নিজ স্বার্থ-
নিষ্ঠের জন্তই আবাদিগণকে গোলাম করিয়া
রাখিয়াছিলেন। আমি জানি—আমরা যে
কোন দিন মাহুদ হইয়া উঠিব তাহা ইহার
স্বপ্নেও ভাবেন নাই—এবং মাহুদ করিয়া
তুলিবার জন্ত সজ্ঞানে কোন চেষ্টাও করেন
নাই। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাই
যে, ভগবানের কর্মকোশল বিচিتر। জগদীশ্বর

যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্ত। প্রথম
দৃষ্টিতে যাহা তিক্ত ও কঠোর, পরিশেষে
তাহাই মধুর ফল প্রসব করে। আমাদের
অজ্ঞাতসারে এই উপায়ে জগতের মহৎকর্ম-
গুলি নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ভগবানের অপার
করণায় বিধে কত অসম্ভব সম্ভব হইতেছে।
মাহুদ, অস্থান ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিখ্যাতার
মঙ্গলহস্তে যথেষ্ট দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাই
ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। এই আশাতম প্রচার
করিবার জন্ত এত কথা বলিলাম।

আজ কাল লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা
করে—“তুমি এই যোরতর দৈহত, অজ্ঞতা,
ও কুম্ভকার্যরশির মধ্যে থাকিয়াও নিগ্রে-
জাতীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপে এত
আশাবিহীন ?” আমার একমাত্র উত্তর এই যে,
আমি ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাসবান।
যাঁহার করণায় নানা দুর্ভেদ্যের ভিতর দিয়া
আমরা এতদূর উঠিয়াছি তাঁহাই করণায়
আমরা আরও উন্নত হইব। নিগ্রে-জাতি
জগতের বিরাট কর্মক্ষেত্রে তাঁহার স্বকীয়
কৃতিত্ব দেখাইয়া জগদীশ্বরের অসীম ক্ষমতার
পরিচয় দিবে।

আমি বলিলাম গোলামীর ফল আমাদের
যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। অবশ্য অপকারও
কম নহই। কিন্তু আমার বিশ্বাস—আমাদের
যেতাব প্রভু মহোদয়গণেরই ক্ষতি বেশী
হইয়াছে। মনিব মহাশয়েরা বিলাসে ডুবিতে
লাগিলেন। শারীরিক পরিশ্রম তাঁহাদের
কষ্টকর বোধ হইত। বড় মহলে বাড়িয়া
থাওয়া একটা নিম্নলীয়া কার্য বিবেচিত হইত।
জন্মশ্রম তাঁহারা সকল বিষয়ে স্বাধীন, এবং
আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইলেন। প্রভুগণের
সন্তোষের কেহই কোন কৃষি বা শিল্পের পটুত্ব
লাভ করিতে শিখিল না। মনিবের কন্ডায়া

কেহই দাঁড়িতে, শেলাই করিতে অথবা ঘর
ঝাড়িতেও শিখিল না। সকল কাজই
দাসেরা করিত। কিন্তু গোলামীদের স্বার্থ
আর কতটুকু ? তাঁহারা কোন উপায়ে কাজ
মারিয়া মনিবকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত
মাত্র। স্বচাক্ষুরূপে বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ
করিতে দাসেরা শিখিত না। ফলতঃ, প্রভু-
পরিবারে কোন শৃঙ্খলা দেখিতে পাইতাম
না। লক্ষ্মীশ্রী যাহাকে বলে মনিবমহলের
গৃহস্থালীতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইত না।
ঘর ভালরূপ পরিষ্কৃত থাকিত না। জানারাল
খড়খড়িগুলি তাঁহাদেরই বহদিন পড়িয়া
থাকিত। দরজার খিল না থাকিলে তাহা
লাগাইবার জন্ত কেহই মাথা ঘামাইত না।
যাহা যেখানে পড়িত তাহা সেখানে সেই
অবস্থাতেই পড়িত। খাওয়া দাওয়ারও স্বথ
মনিব-মহলে দেখি নাই। কোন দিন ঝাল
বেশী পড়িত—মুখ কম পড়িত। কখনও
তাঁহারা মাংস আধ কাঁচাই খাইতেন—কোন
দিন বা বেশী পোড়া খাড়াই তাঁহাদের করপালে
জুটত। অর্থব্যয় কম হইত না—সকল
বিষয়েই অপব্যয় যৎপরোনাস্তি হইত।
পূর্বেই বলিয়াছি লক্ষ্মীশ্রী মনিব-মহল হইতে
বিদায় লইয়াছিল।

জন্মশ্রম দেখা গেল যে, গোলামেরাই
মনিবসমাজ অপেক্ষা বেশী স্বখে আছে। যে
সময়ে মনিবেরা বিলাসসাগরে ভাসিয়া অকর্মণ্য
ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে
গোলামেরা সকলেই কর্মনিষ্ঠা, পরিশ্রম-
স্বীকার, ইত্যাদি সপ্তগুণ অর্জন করিতেছিল।
যখন তাঁহারা স্বাধীনতা পাইল তাঁহাদের
পক্ষে নবজীবন আরম্ভ করিতে বিশেষ কোন
কষ্ট হইল না। গোলামীর যুগের শিক্ষাই
স্বাধীনতার যুগের কাজকর্মের জন্ত তাঁহা-

নিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল। কেবল মাত্র পুণ্ডিত ব্যতীতই তাহাদের অভাব ছিল। তাহা ছাড়া অনেক বিষয়েই তাহাদের চরিত্র ও বুদ্ধি মার্জিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহারা কোন না কোন কৃষিকর্মে বা শিল্পকার্যে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মনিব মহাশয়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইল। তাহারা গোলামদিগকে খাটাইতে খাটাইতে নিজেরাই সকল বিষয়ে যথার্থ গোলাম, পরমুখাপেকী ও পরনির্ভর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বেশিতে বেশিতে লড়াই শেষ হইয়া গেল। আমরা মুক্তি পাইলাম। গোলামাবাদে মহা আনন্দের রোল উঠিল। আমরা যে স্বাধীন হইতে পারিলাম তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ইতি-পূর্বেই অস্বাভাবিক কঠোর পুরিয়াছিল। কারণ প্রায়ই দেখিতাম দক্ষিণপ্রান্তের মনিবেরা হারিরা গৃহে ফিরিতেছেন—কেহ পলাইতেছেন—কেহ ঘরবাড়ী সামলাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। উত্তরপ্রান্তের ইয়াক সৈন্তেরা দলে দলে গোলামাবাদগিল দখল করিতে আসিলে—এইরূপ ভাবিয়া আমাদের প্রভুগণ টাকা-কড়ি মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। আমরাই এই লুণ্ঠিত ধনের পারাবার নিবৃত্ত হইলাম। আমরা ইয়াক সৈন্তগণকে অস্ত্র বর্জ্য জল ইত্যাদি সকল জিনিষই দিতাম—কিন্তু সেই লুণ্ঠিত জ্ঞাতার কাহাকেও দেখাই নাই। কারণ আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া প্রভুরা নিষ্ঠুর হইয়াছেন।

নতাই দিন অগ্রসর হইতে লাগিল আমরা গলা ছাড়িয়া গান হুক করিলাম। আগে শুন্ শুন্ করিয়া গাহিতাম মাত্র। ক্রমশঃ আগোরা বাড়িল—সম্ভার আমাদের গভীর

রায়ে শেষ হইতে লাগিল। স্বাধীনতা পাইবার পূর্বেই অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিলাম। এই আনন্দ-উৎসবের সময়ে আমরা স্বাধীনতার গানই গাহিতাম। পূর্বেও আমরা অনেক সময়ে স্বাধীনতার গান গাহিয়াছি। কিন্তু তখন যদি কেহ স্বাধীনতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিত, আমরা তাহাকে বুঝাইয়া দিতাম যে তাহা পরলোকের স্বাধীনতা মাত্র—স্বাভাবিক মুক্তি মাত্র। এক্ষণে আমরা আর সেই আশ্রয় রাখিলাম না। এক্ষণে আমরা সোজা-সুজি বলিতাম যে স্বাধীনতার অর্থ এই জগতেরই স্বাধীনতা—এই ভৌতিক শরীরেরই মুক্তি—অমরত্ব, চলা-ফেরা ইত্যাদি সকল বিষয়ের বন্ধন-হীনতা।

সেই মহা আনন্দের দিনের পূর্বে রায়ে গোলামখানার মহলে মহলে সংবাদ পাঠান হইল “কাল সকালে প্রভুরের বড় কুঠিতে একটা বিশেষ সম্মিলন হইবে। তোমরা সকলেই উপস্থিত হইও।” সেই রায়ে আমাদের আর ঘুম হইল না। সকালে উঠিয়াই আমরা প্রভুর গৃহে সমবেত হইলাম। দেখিলাম মনিব-পরিবারের সকলেই বসিয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া বা বসিয়া আছে। সকলকেই যেন কিছু চিন্তিত ও উত্ত্বিগ্ন দেখিলাম—কিন্তু কাহাকেও বিশেষ দুঃখিত বসিয়া বোধ হইল না। বরং মনে হইতে লাগিল যে তাহারা আর্থিক ক্ষতির জ্ঞাত বেশী চিন্তা করিতেছেন না—তাহারা যে এতদিনের সঙ্গী ও আশ্রয়গণকে একদিনে বিদায় দিচ্ছেন সেই দুঃখেই তাহাদের চিত্ত ভরিয়া রহিয়াছে। আর দেখিলাম একজন নৃতন পুরুষকে, ইনি বোধ হয় যুক্তরাষ্ট্রের কোন কর্ণচারী। তিনি একটা লম্বা কাগজ হাতে করিয়া একটা

দৃষ্টি বজুতা করিলেন। তার পর সেই কাগজ হইতে পাঠ করিলেন—স্বাধীনতার ঘোষণা।

পড়া শেষ হইয়া গেল, আমাদিগকে বলা হইল যে আমরা স্বাধীন হইয়াছি। যাহার যেখানে ইচ্ছা বাইতে পারি। এখন হইতে যাহার যে কাজ ভাল লাগে সে সেই কাজই করিতে পারে। আমরা মনে মনে তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাহার চকু হইতে আনন্দাশ্রু বরিতে লাগিল। তার পর তিনি বলিলেন যে, এই দিনের জন্তই তিনি এত কাল প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহার বিশেষ দুঃখ এই ছিল যে, বোধ হয় তিনি এই স্থানের দিন পেরিবার পূর্বেই মারা যাইবেন।

কিয়ৎকাল সর্বজন নাচানাচি এবং ধন্যবাদের পালা পড়িল। আনন্দের আর সীমা নাই—বিকট উল্লাসে সকলেই যেন অধীর। কিন্তু প্রতিহিংসা বা মনিবদের প্রতি বিরুদ্ধতাচরণ করিবার প্রস্তুতি কোথায়ও লক্ষ্য করি নাই। পরে স্বাধীনতার প্রস্তাব গোলাম মহলে চিত্তা আসিয়া জটিল। স্বাধীনতা হইল না। কিন্তু স্বাধীনতার দায়িত্ব তা বড় কম নয়? স্বাধীন ভাবে চলিতে ফিরিতে হইবে—স্বাধীন ভাবে আশ্রয়-সংস্থান করিতে হইবে। নিজ মাথা পাটাইয়া নিজ নিজ অভাব মোচন করিতে হইবে—নিজ বাহুল্যে ও নিজ চরিত্র-বলে গৃহস্থালী, পরিবার-পালন, সন্তানরক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম-কর্ম সকলই চালাইতে হইবে। এ যে বিষয় দায়িত্ব। দশ বৎসরের একটি বালককে যেন তাহার বাপ বা বহিন্দেন যে “বাছা ভূমি নিজ শক্তিবলে যাহা পার কর—চরিত্রা থাও—আমাদের কোন সাহায্য পাইবে না।” আমাদের পর থেকে ঠিক যেন

এইরূপ আদেশ হইল। ইহা অস্বপ্ন কি নিগ্রহ ভুক্তভোগী ভিন্ন কে আর তাহা বুঝিবে?

সমগ্র য়াংগো-স্বাংগুন জাতি হাজার বৎসরেও যে সকল সমস্তার মায়াঙ্গা এখনও স্বন্দররূপে পরিচয় উঠিতে পারে নাই, নিগ্রো-জাতির ঘাড়ে সেই সমস্তার সমাধান করিবার ভার হঠাৎ চাপাইয়া দেখা হইল। কাজেই বেশিতে দেখিতে স্বাধীনতা-লাভের আনন্দ গোলামাবাদের মহলে মহলে গভীর দৃষ্টিভা ও উদ্বেগে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? যে স্বাধীনতা-রত্নের জ্ঞাত তাহারা অনেকে এতদিন অশ্রু ফেলিয়াছে, আজ যখন তাহা সত্য সত্যই তাহাদের করতলগত হইল, তখন যেন তাহারা ভাবিতে লাগিল—“ছেড়ে দে মা কঁদে বাঁচি।” অনেকের বয়স প্রায় ৭০-৮০ বৎসর। তাহারা নৃতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। ইহাদের পক্ষেই কষ্ট সঙ্গীপেক্ষা বেশী। অধিকন্তু, তাহারা এত কাল মনিবদের সেবা করিয়া তাহাদের প্রতি সত্য সত্যই অস্বস্তি হইয়া পড়িয়াছিল—তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন জন্মিয়াছিল। তাহারা যে ইহাদের আপন হইতেও আপন। তাহাদের পারিবারিক স্বখে ইহারা যে কতই না হৃৎকৃত করিয়াছে এবং দুঃখে কতই কষ্ট ভোগ করিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে বসবাস করিয়া অর্ধ শতাব্দী কাটিয়াছে, তাহাদের মায়া যে কোন মতেই ছাড়ে না। সমস্ত গোলামাবাদের আবহাওয়াতেই তাহাদের জীবন পুষ্ট হইয়াছে। তাহাদের স্ববয়ের শিকড়গুলি প্রভুর গৃহ-কন্ডার এবং মনিবের সম্পত্তিতে দৃঢ় ভাবেই প্রবেশ করিয়াছে। সেই স্বপ্নের সমুদ্র একদিনে ছিঁড়িয়া ফেলা কি সম্ভবপর? সেই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিলে কি তাহারা বাঁচিতে পারে?

ঐতিহাসিক অধ্যায়

আমার বাল্য-জীবন

স্বাধীনতা লাভের পর দক্ষিণ প্রান্তের গোলামেরা তাহাদের কর্তব্য হির করিতে লাগিল। প্রথম সত্যাহ হইল যে তাহাদের নামগুলি পরিবর্তন করা আবশ্যিক। গোলামী যুগের নাম রাখা আর কোন মতেই মুক্তি সম্ভব নয়। আর একটা প্রস্তাবেও সকলেরই যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল। তাহারা হির করিল যে কিছু দিনের জ্ঞাত গোলামাবাদের বাহিরে যাইয়া তাহাদের বাস করা আবশ্যিক। তাহা হইলেই তাহারা সত্য সত্য গোলাম হইয়াছে কিনা সংশয় বৃদ্ধিতে পারা যাইবে। বিশেষতঃ গোলামখানার গভীর বাহিরে যাইতে পারাটাই তাহাদের নব প্রাপ্ত স্বাধীনতার প্রথম লক্ষণ বিবেচিত হইবে।

গোলামীর যুগে দাসপণের নামগুলিও গোলামী হতক ছিল। তাহাদের নামের আগে পিছে কোন পদবী বা সম্মান বা জাতি বা ব্যবসায় বা ধর্ম বাচক কোন শব্দ সংযুক্ত থাকিত না। একটি মাত্র শব্দই তাহাদের নাম প্রকাশিত হইত। কেহ 'জন', কেহ বা 'হুদান', কেহ 'হরা', কেহ বা 'পদা', ইত্যাদি। বড় জোর প্রভুর উপাধি বা পদবী এই সকল নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। প্রভুর পদবী 'হাবের' থাকিলে, তাহার দাসেরা 'হাবারের জন' বা 'জন হাবার' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। 'জন' তা হাবারের সম্পত্তি বিশেষ। হাবারের কুকুর বলিলে কুকুরে হাবারে বৈরুপ সম্বন্ধ বুঝায়

এবং কুকুরকে বৈরুপ সহজে চিনিয়া লওয়া যায়, 'হাবারের হুদান' এই নামেও হুদানের সঙ্গে হাবারের সেইরূপ সম্বন্ধই বুঝাইত এবং সেইরূপ সহজেই দাস-মহল হইতে হুদান গোলামকে চিনিয়া লওয়া যাইত। বলা বাহুল্য এরূপ নাম করণে স্বাধীনতার গন্ধ মাত্র নাই—যাকি একটি নিজস্ব পদার্থ স্বরূপ, কেনা গোলাম মাত্র। প্রভু যেন তাহার কপালে একটা দাগ দিয়া নিজ সম্পত্তির হিসাব ও চিহ্ন রাখিয়াছেন মাত্র।

স্বতন্ত্রা পুরাতন নাম বর্জন এবং নতুন নাম গ্রহণই স্বাধীন নিগোঁর সর্ব প্রধান কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইল। প্রভুদের নাম নিজ নিজ নাম হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল। তাহার পরিবর্তে কেহ 'জন এসলিহলুন' কেহ 'জন এন্ শা'খান' ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। মধ্যযুগের 'এন্' শব্দের কোন অর্থই থাকিত না। তিন শব্দের নাম রাখিতেই হইবে—স্বতন্ত্রা প্রথম শব্দে প্রকৃত নাম, তৃতীয় শব্দে উপাধি বা পদবী, দ্বিতীয় শব্দে যা হয় কিছু বৃদ্ধান হইত।

তাহার পর গোলামাবাদ ছাড়িয়া সকলেই কিছু দিনের জ্ঞাত এদিক ওদিক ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। পরে কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়া পুরাতন মনিবের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কারবার করিবার জ্ঞাত নতুন নতুন চুক্তি বা বন্দোবস্ত করিয়া লইল। বাস্তবিক পুরাতন করা বড়ই কঠিন। যাহারা এইরূপে পুরাতন

মনিবের সঙ্গেই বসতি করিতে চাহিল, তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধদের সংখ্যাই বেশী।

পূর্বেই বলিয়াছি আমি আমার জনককে

কখনও দেখি নাই। আমার মাতার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী ছিলেন। তাহাকেও বড় বেশী দেখি নাই। আমরা যে মনিবের গোলাম ছিলুম তিন, সেই মনিবেরই গোলাম ছিলাম। না। তাহার গোলামীর কর্মক্ষেত্রে কিছু দূরে ছিল। স্বাধীনতা পাইবার পূর্বেই তিনি পুরাইয়া একটা নবগঠিত প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রদেশের নাম ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া। সেই সময়ে লড়াই চলিতেছিল—একটা তাহার পলায়নের বিশেষ বিষয় ঘটে নাই। যখন সবল দাসেরই স্বাধীনতা ঘোষিত হইল, তিনি আমার মাতাকে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহার নতুন বাসভবনে আসিতে আদেশ করিলেন। ভার্জিনিয়া হইতে ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া প্রদেশে যাইতে হইলে পার্কটা প্রদেশ পার হইয়া যাইতে হয়। দূর বড় কল নাম—প্রায় ১০০৮০০ মাইল। আমাদের জামা কাপড় ইত্যাদি কিছুই ছিল না। যাহা হউক গরুর গাড়ীতে চড়িয়া আমরা সকলে যাত্রা করিলাম। অবশ্য বেশী পথ হাঁটিয়াই চলিয়াছিলাম।

আমরা পূর্বে কোনদিনই এক প্রদেশ ছাড়িয়া জ্ঞাত প্রদেশে যাই নাই। এমন কি, গোলামাবাদ ছাড়িয়া বেশী দূর যাইবার অবসর বা কারণও কখন উপস্থিত হয় নাই। এইবার কাজেই আমাদের বিদেশযাত্রার মনিবগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে দৃষ্টান্ত অতিশয় স্বয়ং বিদায়ক। সেই চির-বিদায়ের কথা সর্বদা আমার মনে আছে। তাহাদের সঙ্গে এখন পর্যন্ত আমি

চিঠি-পত্রের আলাপ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এখনও তাহাদিগকে ভুলিতে পারি নাই।

রাষ্ট্রায় কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। খোলা মাঠে শুইতাম, গাছতলায় রাখিয়া থাইতাম। এক রাত্রে একটা পুরাতন ভাষা-বাক্য পাইয়া আমার মাতা তাহার মধ্যে বহুসনের আশ্রয়ন করিতে লাগিলেন। সেই বাড়ীতে একটা 'ষ্টোভ' ছিল। ষ্টোভের ভিতর আগুন জালিয়া মাত্র উহার নলের ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড কাল সাপ বাহির হইয়া আসিল। আমবা 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িয়া সেই গৃহে ভেজন-শব্দের আকাজ্জ ত্যাগ করিলাম। এইরূপে নানা স্বপ্নভয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে করিতে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া। নগরটি ক্ষুদ্র—নাম ম্যান্ডেভেন। ইহার পাঁচ মাইল দূরেই ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া-প্রদেশের রাজধানী বা প্রধান নগর চল্লিষ্টন।

এই সময়ে ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ায় হুনের কারবার বেশ চলিতেছিল। আমাদের নগরের ভিতরেই এবং আশেপাশ অনেকগুলি হুনের কল ছিল। এইরূপ একটা কলে আমার মাতার স্বামী একটা চাকরী পাইয়াছিলেন। তাহার নিকটেই তিনি একটা কামরাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কামরা আমাদের পুরাতন গোলামখানার কুঠরী অপেক্ষা খারাপই হইবে, কোন অংশেই ভাল নয়। গোলামাবাদের কুঠরীগুলি রেক্সপই থাকুক না কেন, তাহার বাহিরে আসিলে নিখিল বাতাস যথেষ্টই পাইতাম। কিন্তু এই স্বাধীন বাসভবনে ইহার অভাব যৎপরোনাস্তি। কামরাগুলি এত লাগালগি এবং চারি ধারে এত ময়লা জমিয়া থাকে যে

একটা প্রকাণ্ড নরকের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি মনে হইত।

আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে সাদা কাল দুই প্রকার লোকই ছিল। সাদা চামড়ার লোকেরা অবশ্য খেতাব-সম্রাটদের অতি নিরশ্রমের অন্তর্গত। তাহাদের না ছিল বিদ্যাবুদ্ধি, না ছিল পরিচ্ছন্নতা, না ছিল ধর্ম-ভয়। বরং অশ্রদ্ধ, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার যেন সেই আবহাওয়ার মধ্যে অপ্রতিহতগতিতে বিরাজ করিত।

পাড়ার প্রায় সকলেই হুনের কলে কাজ করিত। আমার বয়স অত্যন্ত অল্পই ছিল। তথাপি আমার মাতার স্বামী আমাকে একটা কাজে লাগাইয়া দিলেন। আমার দাণ্ডাও একটা কাজে লাগিয়া গেল। আমাকে প্রত্যয়ে চারিটা হইতে কাজ করিতে হইত।

এই হুনের কলে কাজ করিতে করিতে আমার প্রথম কৈতাবীশিক্ষা লাভ হয়। হুন বস্তাবন্দি করিবার পর বস্তার গায়ে একটা করিয়া নম্বর বসাইবার নিয়ম ছিল। আমার অভিভাবকের চিহ্ন ছিল ১৮। প্রতিদিন কলের কাজ শেষ হইবার সময়ে কলের একজন বড় সাহেব আসিয়া আমার অভিভাবকের বস্তাগুলির উপর ১৮ এই চিহ্ন লিখিয়া হাইত। আমি আর কোন চিহ্ন চিনিলাম না। অনবরত দেখিতে দেখিতে ১৮ চিহ্নটি আমার স্থপরিচিত হইয়া গেল।

আমার প্রথম হইতেই লেখা পড়া শিগিবার বড় মাখ ছিল। শৈশবেই আমি সঙ্গ করিয়াছিলাম যে জীবনে যদি আর কিছুই না করিতে পারি অন্ততঃ যেন কিছু বিভ্রাট করিয়া মরিতে পারি। আর কখনও যদি আমি লেখাপড়া শিখি তাহা হইলে অন্ততঃ সাধারণ ধবরের কাগজ এবং সাদা সিঁদা

পুস্তকাবলী পড়ি। বৃকিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব। এখানে আসিবার পর আমার মাতাকে অহুরোধ করিয়া একথানা পুস্তক আনাইয়া লইলাম। ওয়েবষ্টারের 'বর্ণ-পরিচয়' বই আমার হস্তগত হইল। আমি অতি মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলাম। কোন শিক্ষকেরই সাহায্য পাই নাই। যাহা হইক, যেন তেনে প্রকারেণ অক্ষরগুলি চিনিয়া ফেলিলাম। আমার মাতাই আমার এই প্রাথমিক শিক্ষালভের চেটায় একমাত্র সহায় ছিলেন। তাহার পুথিগত বিজ্ঞা কিছুই ছিল না সত্য—কিন্তু তাহার সাংসারিক জ্ঞান, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা, সংলাহস, দৃঢ় সঙ্কল্প, উদ্ভাসিত আকাজ্ঞা ইত্যাদি অশেষ গুণ ছিল। কাজেই আমার উক্ত অভিলাষে তিনি যেরূপই সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার নিকট উৎসাহ না পাইলে আমার জীবনের গতি হয়ত অগ্রসর হইত।

ইতিমধ্যে একটি নিগ্রে বালক ম্যালডেনে আসিল। সে ওহায়োগ্রাণ্ডেশের কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিত। তাহাকে পাইয়া আমার নিগ্রে স্বজাতিরা যেন চাঁদ হাতে পাইল। তাহার আদর দেখে কে? প্রতিদিন সন্ধ্যা কালে কাঙ্গ-কন্ধ সারিয়া আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিতাম। সে একটা ধবরের কাগজ পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইত ও বুঝাইয়া দিত। সে আমাদের পড়ার গুরু মহাশয় হইয়া পড়িল। তাহার এই সম্মান ও ক্ষমতা দেখিয়া আমি সত্যসত্যই তাহাকে হিংসা করিতাম। যখন হইত তাহার সমান বিজ্ঞার অধিকারী হইতে পারিলে আমি আর কিছু চাই না।

ক্রমশঃ আমাদের পল্লীতে নিগ্রেদের জন্ম একটা পাঠশালা খুলিবার প্রস্তাব চলিতে লাগিল। মহা দুঃখময় আরম্ভ হইল। কক্ষ-কাছ সমাজে একটা বিদ্যালয়ের কথা এ অঞ্চলে আর পূর্বে কখনও উঠে নাই। সর্বত্রই আন্দোলন পৌছিল। প্রধান সমাজ হইল—শিক্ষক পাওয়া যায় কোথায়? ওহায়োর সেই বালকের নামই সকলের মুখে মুখে বহিয়াছে। কিন্তু সে যে নিতান্তই চ্যাণ্ডা। যাহা হউক, ওহায়ো হইতে আর একজন শিক্ষিত যুবক ম্যালডেন নগরে হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। তাহার বয়স সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইল না। সে কিছুকাল সেনাবিভাগেও কাজ করিয়াছে। স্বতরাং তাহাকেই শিক্ষকপদে নিযুক্ত করা হইল।

পাঠশালার খরচ চালাইবার জন্ম নিগ্রেদের সকলেই মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইল। শিক্ষকের বেতন জোগান কঠিন। কাজেই বন্দোবস্ত হইল যে, সে প্রত্যেক পরিবারে একদিন করিয়া শমন ভোজন করবে। এইরূপে চাঁদা করিয়া খাওয়ান-ব্যবস্থা শিক্ষকের পক্ষে মন্দ নয়। কারণ যেদিন যে পরিবারের খালা সেদিন তাহার শিক্ষকে যথাসম্ভব 'চরু' চোষা লেখ পেয়ে' না দিয়া থাকিতে পারে কি? আমার মনে আছে—আমি আমাদের পরিবারের সেই 'মাঠারের দিন' কবে আসিবে তাবিহা হইতাম। সেই দিন ফাঁকতালে আমারও বেশ ভাল খাওয়া জুটত।

এই প্রণালীতে আর কোথায়ও বিদ্যালয় হইয়াছে কি? আমি জানি না। সমস্ত জাতিটাই যেন একটা পাঠশালা—সমস্ত গ্রামটাই যে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অঙ্গ—পাঠ্য সকল লোকই যেন বিদ্যালয়ের ছাত্র, অভি-

ভাবক, পরিচালক। সমগ্র জাতির পক্ষে বিজ্ঞারম্ভ ও 'হাতে খড়ী' হইল। এই উপায়ে আর কোন জাতি ভগতের ইতিহাসে গড়িয়া উঠিয়াছে কি?

নিগ্রে সমাজের কেহই এই শিক্ষার আন্দোলনে যোগদান করিতে পচাৎপদ রহিল না। বৃদ্ধ, বালক, যুবাকলেই আগ্রহের সহিত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। "মরিবার পূর্বে যেন অন্ততঃ বাইবেল-গ্রন্থ পড়িতে পারি"—এই আকাঙ্ক্ষায় আশি বৎসরের বৃদ্ধ লোকেরাও বিদ্যালয়ে ভর্তি হইল। কোনরূপে শিক্ষক পাইলেই পাঠশালা খোলা হইত। দিব্যবিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, রবি-বারের বিদ্যালয় ইত্যাদি নামানি পাঠশালার সাহায্যে নিগ্রেপল্লীতে বর্ণ-জ্ঞান, বানান, সরল ধর্ম-ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রচারিত হইতে লাগিল।

যাহা হউক, আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় ত প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু আমার কপাল ফিরিল না। আমি বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পাইলাম না। আমার অভিভাবক আমাকে হুনের কলে পাটাইয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। বড়ই অল্পতাপের বিষয় হইত যখন আমি কল হইতে দেখিতাম যে, আমারই সমান-বয়স্ক নিগ্রে-বালকেরা সকলে সন্ধ্যায় স্থলে খাওয়া আসা করিতেছে। অবশ্য আশা ছাড়িলাম না। আমি আমার সেই ওয়েবষ্টারের 'প্রথম ভাগ'ই পূর্বের ছাত্র পড়িতে থাকিলাম।

পরে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। রাজে যাইয়া তাহার নিকটে কিছু কিছু শিখিয়া আসিতাম। এই উপায়েই আমি অনেকটা শিখিয়া সকল লোকই যেন বিদ্যালয়ের ছাত্র, অভি-

কারিতা নিজ জীবনে দেখণ উপলব্ধি করিয়াছি আর কেহ তাহা বোধ হয় করেন নাই। এইজন্য আমি আজকাল নৈশ-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার এত পক্ষপাতী। এই অভিজ্ঞতার সাহসেই আমি পরে হ্যাম্পটন এবং টাঙ্গেরীতে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি।

কিন্তু কেবলমাত্র নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়াই আমি কোন মতে স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম—দিবাভাগের বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবই হইব। কামাটী করিতে করিতে অভিভাবকের অহমতি পাইলাম। স্থির হইল যে, আমি খুব সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই নষ্টা পর্যন্ত কলে কাজ করিব। পরে বিদ্যালয়ে যাইব এবং বিদ্যালয়ের ছুটির পরেই আরও দুই একটা কলে কাজ করিব।

আমি হাঁপ ছাড়িয়া পাঁচিলাম। কিন্তু বড় কঠিন ব্যাপার। পাঠশালা ঠিক নয়টার সময়েই বসে—অথচ আমার বাড়ী হইতে ইহার দূরত্ব কম নয়। কাজেই নষ্টা পর্যন্ত কলে-কাজ করিয়া স্থলে পৌছিতে রোজই আমার দেহী হইতে লাগিল। এ অস্থিবা এড়াইবার জন্য আমি একটা দিকি-করিলাম। আপনাতঃ আমার ছুটীময় দেখিয়া চলেছেন। কিন্তু কি করিব? সত্য কথা বলিতেছি। আমাকে বাধ্য হইয়াই অসত্যের পথ ধরিতে হইয়াছিল। কলের আফিসে একটা ঘড়ি ছিল। সেই ঘড়ি দেখিয়া সকলে কাজ-কর্মের সময় ঠিক করিত। আমি রোজ সকালে যাইবা সেই ঘড়ির কাঁটা সরাইয়া দিতাম। ঠিক ৮-০ সময়ে ৯টা বাজিয়া যাইত। আমি কল ছাড়িয়া যথাসময়ে পাঠশালায় পৌছিলাম। পরে বড় লাহেব

ব্যাপার বুঝিয়া আফিস-ঘরে ঢাবি লাগাইয়া দিলেন। আমি আর ঘড়ির কাঁটা সরাইতে পারিতাম না।

পাঠশালায় ভর্তি হইলাম। হইয়াই বিপদ। সকল ছাত্রের মাথায় একটা করিয়া টুপি। কিন্তু আমার মাথায় কোন আবরণই ছিল না। মাথায় টুপি দিবার প্রয়োজন আছে কি না তাহা অবশ্য আমি পূর্বে কখনও চিন্তা করিতেই পারি নাই। পাঠশালায় যাইবামাত্রই আমার অভাব বুঝিতে পারিলাম। তখন আমাদের অঞ্চলে নতুন ফ্যানশনের এক টুপি উঠিয়াছে। ছেলে বড়ো সকলেই সেই টুপি ব্যবহার করে। আমার মাতার অত পরামর্শ নাই। তিনি দুই টুকরা কাপড় দিয়া ঘেঁষে একটা টুপি শেলাই করিয়া দিলেন। আমি টুপি মাথায় দিলাম।

আমি এই ঘটনায় একটা বড় শিক্ষা পাইয়াছিলাম। তাহা আমি চিরজীবন কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার মাতা কখনও লোক-বোধান বাবুগিরি বা সামাজিকতা অথবা লোকিকতার দ্বার ধরিতেন না। সর্বদাই নিজের আর্থিক অবস্থাহসারে তিনি গৃহস্থালী চলাইতে। অজ্ঞাত অনেক নিয়মকে দেখিয়াছি—বাহাদের পেটে অন্ন জুটে না—কিন্তু নতুন ফ্যানশনের টুপি মাথায় দিয়া বেড়াইতে না পারিলে ঘুম হয় না। এজন্য তাহারা স্বপ্নগ্রস্ত পর্যন্ত হইয়া থাকে। আমার মাতার সংসাহ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। তিনি দার করিয়া বাবুগিরি ও ফ্যানশনের দাস হইলেন না। তৎকালীন নিয়ম-সমাজের পক্ষে এরূপ চরিত্রবত্তা নিতান্তই বিবল। আজ অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে আমার সমপাঠীদের ভিতর যাহারা বাবুগিরি ও

বিলাসের নতুন নতুন অলঙ্কারগুলি ব্যবহার করিত তাহারা পরে অনাহারে মৃত্যুে শাসিতো জীবন কাটাইয়াছে।

পাঠশালায় ভর্তি হইবার সময়ে আমাকে আর একটা বিপদ উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এতদিন আমাকে লোকে ‘বুকার’ বলিয়া ডাকিত। তাহাই আমার নাম জানিতাম। স্থলে যাইবা মাত্রই নাম লইয়া মহা গোল-বোথে পড়িলাম। প্রত্যেক ছাত্রেরই দুইটা শব্দে নাম ডাকা হইতেছে। কাহারও বা তিন শব্দে নাম সম্পূর্ণ। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় যখন আমার নাম খাতায় তুলিবেন তখন কি বলিব? ভারিতে ভারিতে একটা ঠিক করিয়া লইলাম। যেই শিক্ষক আমার গোটা নাম শুনিতে চাহিলেন, আমি গভীর-শ্বরে বলিয়া দিলাম ‘বুকার ওয়াশিংটন’ যেন তির দিন আমাকে লোকে এই নামেই জানে। পরে শুনিয়াছি, আমার মাতা আমাকে ‘বুকার ট্যালিয়াকারো’ নাম দিয়া-ছিলেন। কিন্তু ‘ট্যালিয়াকারো’ শব্দ কোন কারণে আমার মনে ছিল না। যখন ইহা জানিলাম তখন হইতে আমি তিন তিনটা শব্দের নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। স্বতরাং আজ আমি বুকার ট্যালিয়াকারো ওয়াশিংটন।

অনেক সময়ে আমি নিজকে কোন বড় লোকের সন্তানরূপে কল্পনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেন আমার পূর্বপুরুষেরা খনি-সন্ধান, স্বপণ্ডিত ইত্যাদি ছিলেন। যেন উত্তরাধিকারের হুজু আমি বংশ-গৌরব, সামাজিক কীর্তি, জমিদারী ইত্যাদির অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছি। যেন আমি একটী বিনিয়াদি ঘরের সন্তান। কিন্তু এইরূপ কল্পনায়

আমি বিশেষ স্বার্থী হইতাম না। আমি বুঝি, পূর্বপুরুষের গৌরবের দোহাই দিয়া যদি আমি বড় হইতে যাই তাহা হইলে আমার নিজের কৃতিত্ব কি হইল? পরের ঘাড়ের চড়িলে সকলকেই বড় দেখায়। নিজ ব্যক্তি-গত চরিত্রের প্রভাব তাহাতে বিহীন বুঝা যায় কি? তাহা ছাড়া উন্নতির পথে একটা বড় অস্থিবা বোধ হয় আসিয়া জুটে। সকল বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, পরের ধনে পোকারি করিতে ইচ্ছা হয়। নিজে খাটিয়া নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করিতে স্থগোপ বৈশী পাওয়া যায় না। নিজের দায়িত্বজ্ঞান এবং কর্তব্যবোধও কমিতে থাকে।

এই সূত্রে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। নিগোদের পূর্বগৌরব কিছুই নাই। অতীত ইতিহাসের নজির আনিয়া তাহাদের কীর্তি-কলাপ প্রচার করিবার কোন উপায় নাই। এমন কি, তাহাদের অতীত নাই বলিলেই চলে—যাহা আছে তাহা অক্ষরায়ম, হযত স্থগ, নিশ্চনীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া আপনরা তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না—তাহাদের বর্তমান কার্যকলাপ বিচার করিতে যাইবা নাসিকা কৃষ্ণিত করিবেন না। তাহারা জাতীয় জীবন আরম্ভ করিতেছে মাত্র, সমগ্র নিগোজাতির এখন শৈশব অবস্থা। কাজেই তাহাদের বিষ অনেক, অস্থিবা অনেক, অকৃতকার্যতার কারণ অনেক। আপনরা বহুদিন হইতে জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, আপনরা প্রারম্ভিক যুগের নৈরাশ, অকৃতকার্যতা ইত্যাদি অভিজ্ঞত করিয়া সফলতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এখন ‘হাতে খড়ী’ অবস্থা। আপনাদের আজকালকার

কাজ-কর্ম দেখিবার পূর্বে সকলে খরীদা রাখে যে আপনাদিগকে রুতকাধ্য হইবে না। কিন্তু আমরা কাজ আরম্ভ করিলে লোকেরা ভাবিয়া থাকে যে আমাদের অরুতকাধ্যতাই স্থানান্তরিত। আমাদের সফলতা হারের পাঁচ বরূপ। কারণ আর কিছুই না—পুণ্ডরীক কর্মক্ষেত্রে আপনাদিগকে প্রবীণ, আমরা নবীন, আপনাদের এখন জীবন-মধ্যাহ্নের যুগ চলিতেছে, আমাদের জীবন-প্রভাতও বোধ হয় আরম্ভ হয় নাই।

হুতরা অতীত—ইতিহাসের সুবিধাও আছে। পূর্বপুরুষগণের চরিত্র-সম্বল বর্তমান কালে ব্যক্তির ও জাতির মূল্যবন বরূপ কাণ্ড করে। অতীতের স্মৃতি মাছুকে বর্তমানে কর্তব্য দেখাইয়া দেয়, ভবিষ্যতের জ্ঞান দায়িত্ব লিখাইয়া দেয়। আর বাণ দায়িত্ব দেখাই অত্যধিক না দিলেই আশ্চর্য্যজনক বজায় থাকে। পূর্বকীর্তি বানিকটা মনে রাখিয়া চলিলেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আজকাল আপনাদিগকে কথায় কথায় খেতাব বালকবালিকা এবং নিগো বালকবালিকার চরিত্র তুলনা করিয়া আবাদিগকে অব্যবহৃত সপ্তমাণ করিয়া থাকেন। আমরা অনেক বিষয়ে যে হীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার আপনাদিগকে কখনা করিয়া দেখিবেন যে আপনাদের কোন পিতামহ মাতামহ ইত্যাদি ছিল না, আপনাদের বংশকথা নাই, আপনাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাস্তবিক ইত্যাদি কিছুই নাই। তাহা হইলে আমাদের নৈতিক চরিত্রের অবস্থা বৃদ্ধিতে পারিবেন।

আমাদের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, তাহাদের কি চরিত্র গঠিত হইতে পারে? তাহাদের পারিবারিক বন্ধন কিছু নাই, তাহারা

কি চক্ষুলাঙ্কার ভয় করে? তাহাদের সমাজই যে নাই। তাহারা পূর্বপুরুষদের কথা ভাবিতে শিখে নাই, তাহারা বর্তমানে রক্তের সম্পর্ক স্বীকার করে না, তাহাদের মামা বুড়ী দিদি পুত্র ইত্যাদি সম্পর্কবিশিষ্ট গুরুজন নাই, তাহাদের সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়ের জ্ঞান মায়া বিকশিত হইতে পারে না, তাহারা কি মাছুয়ের ধর্ম, মাছুয়ের বিবেক, মাছুয়ের সদস্যজ্ঞান, ইত্যাদি অর্জন করিতে পারে? নিগো-জাতির এই অবস্থা। সমাজের বা আত্মীয়-গণের মুখ চাহিয়া তাহাদিগকে কোন কাজ করিতে হয় না। কাহারও গোবর নই হইয়া গেলে সমাজে পরিবারের কলঙ্ক ঘটবে, সে ভয় তাহাদের নাই। নিজে কোন কীর্তির কথা করিয়া গেলে পরিবারের দশজন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাহা লইয়া গোবর করিবে—কোন নিগোই এইরূপ ভাবিতে শিখে না।

আমার কথা বলিলেই সকলে বিষয়টা বৃদ্ধিতে পারিবেন। আমার মাতামহী কে ছিলেন কখনও জানি না। আমি শুনিয়াছি আমার মামা মামী, পিসা পিসী, কাকা কাকী এবং মাসুভূত পিসুভূত বুড়ভূত ভাইবোন ইত্যাদি আছে। কিন্তু তাহারা কে কোথায় কি করিতেছেন কিছুই জানি না। আমাদের নিগোজাতির সকলেরই পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা এইরূপ। কিন্তু খেতকারদিগের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রতিপদবিক্ষেপেই তাহাদিগকে পশ্চাতে ফিরাই তাকাইতে হয়। তাহারা যদি একটি অজ্ঞা কার্য করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার চৌদ্দপুরুষের মুখে চুপ-কালি পড়িবে। এই জ্ঞান তাহাদের সর্বনাশ থাকে। কাজেই প্রলোভন, অসদ্যম ইত্যাদি তাহারা

সহজে কাটাওয়া উচিত—পারে। যখনই কোন খেতকার ব্যক্তি কর্ম আরম্ভ করে, তখনই তাহার মনে বিব্রাণ করিতে থাকে যে, তাহার পূর্বপুরুষেরা নানা সংকল্প করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, হুতরাং সেও যে সিদ্ধিলাভ করিবে তাহা ত স্থানান্তরিত। পূর্বপুরুষদের রুতকাধ্যতা বর্তমানে প্রদায়ের একটি মন্ত হইয়াছে।

আমার অভিব্যক্তি বেশী দিন আমাকে পাঠশালায় বাইতে দিলেন না। কিছুকাল পরেই আমার নাম কাটা হইয়া গেল। তখন হইতে আমি আবার সেই নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই জীবনের সম্বল করিলাম। আমার বাবা-জীবনের সকল শিক্ষাই আমি নৈশ-বিদ্যালয়ে লাভ করিয়াছি—এ কথা বলিলে কোন অত্যাধিক হইবে না। দিব্যভাগে আমি লিখিবার পড়িবার অবসর কিছুমাত্র পাই নাই বলিলেই চলে।

অনেক সময়ে কণ্ঠ্য শেষ করিয়া নৈশ-শিক্ষার চেষ্টায় রত হইয়া দেখিতাম—শিক্ষক নাই। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আমাকে খুব ভুগিতে হইয়াছে। অনেক শিক্ষক এমন জুটিয়াছেন যাহাদের বিদ্যা প্রায় আমারই সমান। বহুকাল এরূপও কণ্ঠ্য আছে যখন রাজকোলা শিক্ষালভের জন্ম ১৮ মাইল দূরে হাটীয়া যাইতাম। আমার বাবা-জীবনে দুঃ-প্রতিজ্ঞা ছিল—যেমন করিয়াই হউক আমি শিক্ষালাভ করিব। এই জ্ঞান নৈশকোলা আমাকে কখনও আকমণ করিতে পারে নাই।

ওয়েস্ট-ভার্জিনিয়ায় বসতি করিবার সময়ে আমার মাতা একটি পিতৃমাতৃহীন আনাথ শিশুকে শোভাপূর্ণ গ্রহণ করিলেন। “নিজে সন্তে ঠাই পায় না—শরকারে ডাকে!”

আমাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়—অথচ একজন নতুন লোক পরিবারের প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে ভাইয়ের ছাত্র গ্রহণ করিলাম। তাহার নাম দিলাম জেমস্ বি ওয়াশিংটন।

হুনের কলের কাজ ছাড়িয়া একটা কয়লার খনিতে কাজে নিযুক্ত হইলাম। এই খনি হইতে কলের কয়লা ভোগান হইত। কয়লার খনিতে কাজ করিলে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। পরিবার-পরিজ্ঞাত তাহাকে বলে তাহা জানা যায় না। সমস্ত দিন খাটিতে খাটিতে শরীরে এত ময়লা আসিয়া জমে যে তাহা আর উঠে না। এইজন্য আমি এই কাজে বিশেষ নারাজ ছিলাম। তাহার উপর, বনির মুখ হইতে কয়লার স্তর পর্যন্ত এক মাইল দূর। সেই রাত্য় অন্ধকার স্বর্ভূতের ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে তবে কয়লার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সেই থানে আমার মৃত্ত মৃত্ত কয়লার কামরা বা পাড়া। সেইগুলিকে অন্ধকারের মধ্যে চিনিয়া বাহির করা বড় সোজা কথা নয়। সেখানকার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কয়লার কামরা-গুলিও আমি কোন দিনই বুঝিয়া লইতে পারি নাই। অধিকন্তু হঠাৎ যদি লঠনের আলো নিবিয়া যাইত, তাহা হইলে “ছিয়েনবর্থা বহলীভবন্তি” হইত। এদিক ওদিক অন্ধের ছায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম—দৈবাৎ অজ্ঞ কোন স্থলীর দেখা পাইয়া পথ বাছিয়া লইতাম। মৃত্যুভয়ও কম ছিল না। বনির ভিতর দুর্ভেদ প্রায়ই ঘটিত। কোন সময়ে একচাপ কয়লা ধসিয়া পড়িয়া অসংখ্য লোকের মৃত্যুর কারণ হইত। কখনও বা বান্ধন মধ্যসময়ে পূর্বে ফাটিত। তাহাতে অসংখ্য স্থলীরা মারা যাইত।

ছেলেবেলায় যখন আমি যুনের কলে অথবা কয়লায় খাঙ্গে কাজ করিতাম, তখন আমি খেতাপ বালকদের মনের অবস্থা এবং হৃদয়ের আকাজ্ঞা কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতাম। যৌবনকালেও অনেকবার খেতাপ যুবকদের অন্তরে চিত্তাৱামি অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল হইত। ভাবিতাম তাহাদের উজ্জ্বল অভিল্যাকে বাধা দিবার কিছুই নাই—সংসারের সকল পরাধীনতা তাহাদিগকে বড় বড় কণ্ঠের দিকে উৎসাহিত করিতেছে। ভাবিতাম তাহারা অনন্ত প্রেম, অনন্ত কণ্ঠ, অনন্ত জ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সুযোগ পায়। কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ, পন্থ, নীচতা তাহাদিগের চিত্তা ও কণ্ঠারশিকৈ স্পর্শ করিতে পারে না। বড় বড় কাঁবার লইয়াই তাহারা ব্যাপ্ত। তাহারা চেষ্টা করিলে মুক্তরাজের সভাপতি হইতে পারিতেন—বড় বড় অশুভ্যের প্রবর্তক হইতে—বিশাল কণ্ঠকেন্দ্রের পরিচালক হইতে। তাহারা ধর্ম্মান্বিতের গুণের পথে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, দেশ-শাসকের মর্যাদা পাইতে পারে। কেহই তাহাদিগের উদ্যম আকাজ্ঞা ও আশার সম্মুখে একটা সীমা-রেখা টানিয়া দিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না। আমি ভাবিতাম যদি আমার এই সকল সুযোগ থাকিত তাহা হইলে আমি সামান্য পল্লীর নগণ্য কুটির ভগ্নিগাও ক্রমে ক্রমে সহরের নেতা, জেলার কর্তা, প্রদেশের নায়ক, সাম্রাজ্যের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হইতাম। হায় আমি নিগ্রে—এই কল্পনা আমার পক্ষে উন্নতের প্রাণ, বস্তুকর্ম্মের মরীচিকা।

ও সব বাল্যকল্পনা ও যৌবনের মনোভাব। আজ কিন্তু সত্য বলিতেছি—আমার গুরু

কল্পনা বা আকাজ্ঞা হয় না। আমি খেতাপ মানবের সঙ্গে ঠিক ঐক্য ভুলনা করিয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করি না। আমি খেতাপ মানবের সুযোগ স্থিতি সাহায্যগুলি 'আমো' হিসাব করি না। আজ প্রচণ্ড অবস্থায় আমি অতীতের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতেছি, মান, মর্যাদা, কীর্তি, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মহাশয়ের সত্য মাপ-কাঠিন্য। কোন লোক জগতে বিখ্যাত হইলেই সে কৃতকার্যতা লাভ করিল, আমি তাহা স্বীকার করি না, অথবা তাহার সাধনা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল—আমি এক্ষণ ভাবি না। আমি সফলতা অল্প প্রণালীতে মাপিতে শিখিয়াছি। আমি কৃতকার্যতার মূল্যসূত্র সাধারণিক যশোলাভ দেখিতে চাহি না। আমার মতে সেই ব্যক্তিই যথার্থ সফল যে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি, বিষ-হৃদৈবের মধ্যে সঙ্গাম করিয়াছে। কার্য উদ্ধার করিতে বাহিয়া কোন ব্যক্তি যদি বিফল হয় তাহাতে আমি দুঃখিত হই না। তাহার প্রাঙ্গণ, তাহার সাধনা, তাহার দৃঢ়তা, তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদির পরিচয় পাইলেই আমি তাহাকে কৃতকার্য, "সফল ও সার্থকতা-প্রাপ্ত ব্যক্তি বলিব। হয়ত সে জগতে যশস্বী হইল না—হয়ত তাহার নাম সর্বত্র প্রচারিত হইল না—হয়ত ভবিষ্যসমাজে তাহার কোন স্থিতি থাকিবে না। তথাপি সে কৃতকার্য, কারণ সে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে, হারিবারে বোঝা মাথা বহিয়াছে—নৈরাশ্যেও ভীতিকেই জীবনের একমাত্র সহায় করিয়া কঠোর কণ্ঠকেই অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাই আমার মতে মহাশয়ের কষ্টপাথর—সফলতার মাপকাঠি। এই দিকে হইতে বিচার করিয়া দেখি নিগ্রেজাতির মধ্যে

ভগ্নিয়া আমার উপকারই হইয়াছে। আমি প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম দেখিয়াছি—যথার্থ জীবনের আশা পাইয়াছি। নিগ্রেজীবনের আশি-হাওয়া হৃৎ-মদারিভাঙ্গু, নিগ্রেজের পক্ষে বিপরীত একটা প্রকাণ্ড সমুদ্রান, নিগ্রেজের সংসার হতাশার লীলানিকতন। আমি বলি, মহাশয়-বিকাশের পক্ষে, প্রকৃত জীবন-পটনের পক্ষে এই অবস্থাই অতি হিতকর। কারণ, কষ্টই মাহুষের পরীক্ষক, কষ্টই মাহুষের বিচারক।

এই কষ্টের জগতে যাহাকে বাস করিতে হয় তাহারই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেই যথার্থ মাহুষ হওয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, আমি খেতাপকে আজকাল হিসাব করি না—নিগ্রেজ জীবনই আমার শ্রেষ্ঠ।

খেতাপের কার্য উচ্চ শ্বের না হইলেও তাহার ঘোষ বোঁশী লোকে ধরে না। কিন্তু নিগ্রেজের কণ্ঠ যদি সামান্যমাত্র জটিল থাকে তবে তাহার জটই সমস্ত পরিচয়। কাজেই নিগ্রেজ সর্বদা অগ্নি-পরীক্ষার জগৎ প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য। খুব ভাল করিয়া না থাকিলে তাহার কাজ ব্যর্থ হবে মনোনীত হইবে না। ইহা কি তাহার উন্নতির পক্ষে কম সুযোগ? কিন্তু খেতাপের "সাত খুন মাপ"।

ফলতঃ তাহার তত বোঁশী পরিশ্রমী এবং সহিষ্ণু না হইলেও চলে।

আমি নিগ্রেজ থাকিতে চাই। দুঃখের সংসারই আমার শিক্ষালয় থাকুক—জগতের সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধনাই আমার জীবনের ব্রত হউক।

আজকাল নিগ্রেজাতির অনেককে রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবী করিতে শিখিয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা ব্যক্তিগত যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করে না।

কেবলমাত্র খেতাপদিগের সঙ্গে আড়া আঁড়ি করিয়া তাহাদের সমান হইতে চায়। আমি তাহাদিগকে বলি "ভাই নিগ্রেজ, তুমি সাদা

কাল চামড়ার প্রভেদ মনে রাখিও না। নিজ কর্তব্যবোধে কর্তব্য করিয়া যাও।

যদি শক্তি অজ্ঞান করিতে পার তোমাকে কেহই অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারিবে না। বিশ্বের মধ্যে সেই শক্তির স্থান আছেই

আছে। গুণ কখনই চাপা থাকিবে না। তাহার সম্মান হইবেই হইবে। তোমরা

আজ নিষ্ঠাভিত্তি পদবিন্দিত, কিন্তু ভগবানের এই সনাতন ধর্মে বিবাস স্থাপন কর।

বেহিবে, যথাকালে তোমার শক্তি মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।" (কমণ্ডা)

শ্রী বিনয়কুমার সরকার।

ময়নামতীর পুঁথি। *

(ময়নামতী ও রাজা গোপীচাঁদের কথা)

ইতিপূর্বে "ময়নামতীর পুঁথি," "মানিক চাঁদের গীত" বা "গোপীচাঁদের গান" সম্বন্ধে কেউ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৫ বৎসর পূর্বে ভাঙ্গার গিয়ারসন এমিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত পত্রিকা ৪৭ খণ্ডে ও শ্রীযুক্ত নীলেন্দ্রনাথ সেন তাহার "বঙ্গভাষা ও

* চট্টগ্রাম নাহিক-পরিষদের মানিক অধিবেশন শ্রুতি।

† The Song of Manik Chand, J. A. S. B. Vol. XLVII.

সাহিত্যে, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল ষষ্ঠ বর্ষের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" শ্রীযুক্ত বিবেকের ভট্টাচার্য্য পরিষৎ পত্রিকায় পঞ্চদশ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত "প্রতিভা" ২য় বর্ষ ১১ম সংখ্যায় এবং মৌলবী আবদুল করিম "মাননী" ৫ম ভাগ তৃতীয় সংখ্যায় এবং "ভারতবর্ষ" ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় এই অতি হৃদয়রহিত প্রাচীন পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহার ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশ এবং তাহার কবিত্ব-সমালোচনায় সফল নিম্ন নিম্ন অভিভূত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ডাঃ গ্রিয়ারসন এবং বিবেকের বাবু ইহাকে রচয়িতার ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৌলবী আবদুল করিম মনমানসী এবং গোপীচাঁদের এক বাড়ী চট্টগ্রামে থাকা নির্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ-দীপেন বাবু ইহাকে বৌদ্ধযুগের এবং বৈকুণ্ঠ বাবু রাজা মানিকচাঁদ বৌদ্ধ ছিলেন এ কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই সব উক্তির সহিত একমত হইতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম।

এই পুস্তকের ঘটনাবলী অতি প্রাচীন। পুস্তক-খানাও বহু পুরাতন। ইহার স্থানে স্থানে হৃদয়রহিত কবিত্ব ও তাত্কালিক লেখের

সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক অবস্থার কতক পরিমাণে আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই হিসাবে পুঁথিখানি বড়ই মূল্যবান। ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা বর্তমানে নাই। তবে স্থানে স্থানে পাঠের অসঙ্গতি বাহা লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করি। মৌলবী আবদুল করিম গ্রন্থখানাকে ২০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং ইহাতে অল্প-বিস্তর চট্টগ্রামের প্রচলিত ভাষার ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া গৌরব করিয়াছেন। কিন্তু এইগুলি যে পুঁথিবন্দনাব্যবস্থায় গমের * দ্বারা অল্প-প্রতিভ হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। এক্ষণে দু'একটা কথা বাদ-দিলে পুস্তকের আমূল ভাষা যে অবিকল ত্রিপুরা জেলার প্রচলিত গ্রাম্যভাষা, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। এমন কি পুস্তকের ভণিতা,—

"হুনেহ বসিক জন এক চিত্য মন।

কহেন ভবানীদাসে অম্পূর্ণ কথা"।

এই দুইটা ছন্দের মধ্যে কোনটা ত্রিপুরা জেলার চলিত গ্রাম্যভাষা ও কোনটাই বা চট্টগ্রামের প্রচলিত গ্রাম্যভাষা তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এবং যদিও চট্টগ্রামের ও ত্রিপুরার বহুবিধ ভাষার আশ্চর্য্য রকম

মিল রহিয়াছে, তথাপি সমালোচ্য গ্রন্থে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা কেবল ত্রিপুরা জিলারই নিজস্ব, চট্টগ্রামে তাহার অদৌ ব্যবহার নাই। আমরা নিম্নে তাহার একটা ফর্দ দিতেছি। যথা:—পিকশুল (পিতৃশুল), চেপুয়া (গোলা), পাছরা (পরিবেশ বস্ত্রবিশেষ), তাজিখোড়া (তোজিখোড়া), মিয়াশ (নিম্বর বা পৈত্রিক মোহরী), কয়া (ঘরের চালের "বাঁশ", জমেন্দ্রে (জম থেকে), পশর (আলোক), জাদ (চুলে বাঁধার জড়োয়া দড়ি), লড় দিয়া (দৌড় দিয়া), মুষ্টেক (এক মুঠ), কুদাইয়া (খেলাইয়া), এরা এরি (ছোড়াছড়ি), গেছিহানি (গিয়াছিল কি না?), পাত্তির (পাথার বা প্রান্তর), উলুর কহুয়া (উলুশোনের দড়ি বা কাছি), জৈস্তা (যহ ছানি দিবার শোন), মুলিগাশ (পাইয়া বাঁশ বা তল্লা বাঁশ), গাছা (শাল বা কাঁটা), পনি—হনি—(কাঁকই), বন্দন = বন্ধন (পকী) ইত্যাদির মূলভাষা), অহেথা (অকারণ); ইহা ছাড়া (অগছিম, বান্দিম, কয়িম, গিম, গাথিম, বেছিম, ডাকিম, রাতিম, সহিম প্রভৃতি বহুতর শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কারণে পুস্তকের কবির বাস গ্রামের নির্দেশ করিতে না পারিলেও তাহার নিম্নাং যে ত্রিপুরা জেলায় ছিল তাহা নিশ্চয়-রূপে বলা যাইতে পারে। নতুবা উপরি-উক্ত এতগুলি ত্রিপুরা জেলার নিজস্ব গ্রাম্য-ভাষা পুস্তকে প্রবর্তি হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ কবির বাড়ী যদি নিজ চট্টগ্রামে হইত, তবে তিনি নিজ দেশকে "চাটিগ্রাম" না লিখিয়া "ছাটিগ্রাম" লিখিতেন না। যথা:—"ছাটিগ্রাম পুঁথি মাটি জানিবা বিশেষ।"

যদিও স্থলবিশেষে চট্টগ্রামেও "চ" স্থানে

"ছ" বলিবার রীতি আছে সত্য, কিন্তু এথলে তাহা প্রযোজ্য নহে। কেননা নিজ দেশকে বিকৃত নাম দেওয়া সাধারণ কবিরও স্বভাব-সিদ্ধ নহে।

ত্রিপুরা জেলার উত্তরাঞ্চলবাসীরাই 'চ'কে 'ছ' বলিয়া থাকে। অতএব পুঁথির কবির সম্পূর্ণ পরিচয় না পাইলেও তিনি যে ত্রিপুরা জেলা নিবাসী ছিলেন তাহা স্মৃতিতে বাধা হইতেছে না। দেখা যাইতেছে মৌলবী আবদুল করিম তাহার ভারতবর্ষে লিখিত দ্বিতীয় প্রবন্ধে পুস্তকের ভণিতাকারের পরিচয়ে—"কবি চট্টগ্রামবাসী না হউক অন্ততঃ প্রবর্ত্তবাসী"—এই কথা বলিয়া নিজকে

বৈকুণ্ঠ বাবুর মতে "মূল পুঁথিখানি বোধ হয় গুপ্তিচাঁদের সম্মানের পরেই লিখিত হইয়াছিল। তারপর স্বরীর্ষকাল পর্য্যন্ত ইহার নকল চলিয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী লেখকের হাতে পতিত হইয়া ইহাতে কয়েকটা ভেদবীর্য্য বোধ্য ও বহু মূলমানবী শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন কবির লেখার সহিত তাহা মিলান যাইতে পারে নাই।" মৌলবী আবদুল করিমের মতে "ত্রিপুরী ছন্দগুলি প্রকৃষ্ট।" তাহা আমরাও অহুমোদন করি। ত্রিপুরী ছন্দের একরূপে আমরা—"কহে ফকির করমের বেটা।"

এবং—

"আমি সবার পদরেখু না লায়কে চিত্ত তত্ব
মুই হিত্ত জগতে তুস্তিত।
লিখিতও পাণিষ্টমতি কি লিখিতে জানি পুঁথি
পড়িতে গোলা ক্ষেমিবা আমার।"

এইরূপ পাঠে প্রাপ্ত হইতেছি। এই "ফকির করমের বেটা" কে তাহা নিরূপণ

* প্রাচীন কালে একদল প্রাচীন পুঁথিবন্দনাবাসীরা লোক ছিল। কিন্তু অর্থ বিলিয়ে তাহাদের দ্বারা যে কোন প্রাচীন পুঁথি নষ্ট করাইয়া লগায়া হইত। তাহাদের ভালোনাও পুঁথির তদ্রূপে বিড়-একটা বোধ ছিল না। কখনও পুঁথি বেচিয়া কখনও বা আগুনি ধরন করিয়াই তাহার পুস্তক নষ্ট করিত। "বহুটা তলিবিহীন" তাহাদের মূল মন্ত্র ছিল। এ সম্বন্ধে দু'একটা গল্প প্রচলিত আছে। কোনও নকল বাসায়ীকে এক বানি পুঁথি নষ্ট করিতে দেওয়া হয়। ঘটনাক্রমে তা পুঁথির এক হাশে দু'ত দক্ষিণা আদায় ছিল। নকল-কারীর ভায়ালাল টুটুনে ছিল, সে এই দক্ষিণাটিকেও একটা অক্ষর মনে করিয়া তাহা অবিকল চিত্রিত করিয়া দিয়াছিল। আর একজন একবানি মন্তুর পুঁথি নষ্ট করিতে বাইয়া ইচ্ছামতে অনেকগুলি এ এবং : বাব দিয়া দিয়াছিল। পুস্তকের গ্রাহক মহাশয় ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে এই বিবরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিস্ময়ভঞ্জন "খামার-পার ভায়াইজ (ঃঃ) মন্তুরার বিদ্যৎ কলাসাল করি।" ইহারাবারি বুঝা যাইতেছে যে নকলকারীরা যেখানে মুদ্রিত না পাঠিত পুঁথিই নিজের বিদ্যা ফলাইতে যত্নবান হইত। একদল প্রাচীন পুঁথির অনেক পাঠ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আমরা বাল্যদ্বন্দ্বোদী নকলকারীগণ ও মূলমানব নকলনশের কথাও শ্রবণ করিয়াছি তাহারা যাহা দেখিত অবিকল চিত্রিত করিয়া দিত।

করা হুঙ্গার। আর “লিখিত পান্ডিত্য” পরবারা তিনি যে পুঁথির নকলনবীশ তথাৎ বুঝা যাইতেছে, কেননা তিনি বলিতেছেন “স্মি পুঁথি লিখিতে (নকল করিতে) ছিল জানি না, পাঠক আমার গোলা ফাৎ করিবেন।” নকলনবীশেরাও অনেক সময় নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া পদ রচনা করিয়া দিয়াছেন ওরূপ দূরান্ত বিরল নহে।

ত্রিপুরা জেলার সদর হুমিয়া (প্রাচীন কমলাক) • নগরীর ৫ মাইল পশ্চিমে মেহেরকুল পরগণা মধ্যে “লালমাই” নামক ১০ মাইল দীর্ঘ ও ১ মাইল প্রশস্ত অনতি-উচ্চ পর্বতশ্রেণী বিস্তারমান আছে। ইহার সাধারণ উচ্চতা ৪০ ফিটের অধিক নহে, কিন্তু সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা একশত ফিট হইবে।

এই লালমাই পাহাড়ের পূর্ব-দক্ষিণ অংশে “চতৌড়া”† ও উত্তরে ময়নামতীর টিলা এবং “অদুনমুড়া” ও “পদুনমুড়া” নামক দুইটা

পর্বতশৃঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন “রাঙ্গা” মানিকচাঁদের কছা লালমতীর নামাখ-শারে লালমাই পাহাড়ের নাম হইয়াছে (কিন্তু আবার ভাংরাই বলেন “ইহা জনশ্রুতিমাত্র”) বিশেষতঃ পূর্বকালে ময়নামতীর ভাড়া কোন স্থান ছিল না। বর্তমান ময়নামতী যে স্থানে অবস্থিত তাহাও পূর্বে লালমাই পর্বতের অন্তর্গত ছিল (এই লালমাই অংশে আগাম বঙ্গ রেলপথের একটা স্ট্রুট্টেশন) রাণী ময়নামতীর আমল হইতেই উহার এই নাম হইয়াছে।

আমরা তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। যদি পূর্বে ময়নামতী বলিয়া কোন স্থান না থাকা প্রতিপন্ন হয় এবং ময়নামতী লালমাই পর্বতের অন্তর্গত থাকা সত্য হয় তবে দেখা যায় যে লালমাই ময়নামতীর পূর্ববর্তী। অংএব লালমাই ময়নামতীর মাতা তিলকচাঁদের জী। কেননা কছার

নামে কোনস্থানের নাম হওয়ার পর মাতার নামে একটা স্থানের নাম হওয়া স্বাভাবিক নহে। বিশেষতঃ লালমাই ময়নামতীর কছা হইলে সমালোচ্য গ্রন্থে তাহার কিছু না কিছু উল্লেখ থাকা সম্ভব হইত। সমালোচ্য গ্রন্থে আমরা কোথাও “ময়নামতী” পর্বতের নাম-গন্ধও পাইতেছি না, কিন্তু “লালমাই” পর্বতের নাম পাইতেছি—

লালমাই পর্বতের সব গ্রাণ ছোঁচাওয়া।

(চুঁচাল করিয়া)

কুণ্ডের নিকটে সব রাখিবে গাড়িয়া।

(ময়নামতীর পুত্রবধূণ ময়নামতাককে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া কুণ্ডের মধ্যে গাড়িয়া রাখিবার সংকল্পে মৈনামতীর প্রতি উপদেশ)। ইহাই ময়নামতী হইতে লালমাইর প্রাচীনত্বের জঙ্ঘলমান প্রমাণ। ইহার পর লালমাইকে ময়নামতীর অব্যবর্তী বলিতে কোন বাধা থাকিতেছে না।

রাঙ্গামালা-লেখক শ্রীমুন্ড কৈলাসচন্দ্র সিংহ মণ্ডায় এই প্রকার বা জনশ্রুতিক অত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:— “প্রবাদ অম্বুয়ার গোপীণী নামক জৈনক নরপতি এই পর্বতে বাস করিতেন, তাহার পত্নীর নাম ময়নামতী ও কছার নাম, লালমাই ছিল (!) তদুৎসাহেই পর্বতের নাম লালমাই ও ময়নামতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।” পাঠক দেখিবেন জনশ্রুতি কি ভাবে পরিবর্তিত ও উলটাপালট হইয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছি যে প্রথমে তিলকচাঁদের জী লালমাইর নামাখস্থানে এই পর্বতের নাম লালমাই হয়, পরে তাহার একাংশ উহার কছা ময়নামতীর পাতাল-

প্রবেশের পর তাহার নামাখস্থানে আখ্যাত হইয়াছে। ইহাই সমীচীন। ধরিতে গেলে ময়নামতী স্থানটি ঠিক পাহাড় নহে। ময়নামতী যদি লালমাইর মাতা হইতেন, তবে সমস্ত পাহাড়টা ময়নামতী বলিয়া উক্ত হওয়ার কথা ছিল আর তাহার একাংশ লালমাই প্রাপ্ত হইতেন। এই সমস্ত কারণে স্পষ্টভাবে অস্বত্ব করা যাইতেছে যে লালমাই ময়নামতীর মাতা—তিলকচাঁদের জী। “লালমাই” শব্দের “মাই” অংশটুকুও মাতৃচাকর।

আর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের “ময়না পাথর” নামাখস্থানে ময়নামতীর নামাখকরণের গল্পটা যে একেবারেই অসার তাহা আমরাও সমর্থন করি। যদি ময়নামতী হইত ইহার নামকরণ হইত, তবে স্থানের নাম “ময়না-পাথর” বা “ময়নাপুরী” “ময়নানগরী” বা “ময়না পাহাড়” হইতে পারত, কিন্তু কখনই “ময়নামতী” হইত না। ইহা বিশেষ করিয়া বুঝান অনাবশ্যক। মণিকচাঁদ ও ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদের জী “অদুন” ও “পদুন” নামাখস্থানে দুইটা টিলার নামকরণ হইয়াছে এবং একটীর নাম “মণিকচাঁদের মুড়া” টিলা তিনটাই অত্যাধি বিজ্ঞান্য। কছাটী মুড়ার সহিত অল্প রাজার নামও লিপ্ত দেখা যায়। • পর্বতের সম্বন্ধিত স্থানে বহুতর দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্বৎ একটীর নাম “লাল খাফা”। গাফা—পাহাড়—বাড়। এই পুষ্করিণীটিকে লালমাইর কীর্তি বলিয়া মনে হয়। অল্প কয়েকটীর সহিত অচ্ছাত্র রাজারিণের নাম জড়িত রহিয়াছে। “সালমান রাজার দীঘি,”

* গ্রন্থিক ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীমুন্ড কৈলাসচন্দ্র সিংহ মণ্ডায় “ত্রিপুরা রাজমালা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন— প্রাচীন কালে কলেশ (প্রাচীন ত্রিপুরা) অনেকগুলি মুন্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই রাজ্যসমূহের ভৌগোলিক তথ্য কিংবা ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে করা নিম্ন লিখিত। আধুনিক বুদ্ধিমা ও তত্ত্বাবহিত গ্রন্থের শব্দার্থের সহিত “কমলাক” আখ্যার প্রাচীনতা বিহীন। চীনপরিব্রাজক “হিউয়েন সাং” সম্রাট (বঙ্গ) রাজ্যের পূর্ব দক্ষিণে “কমলাক” রাজ্যের স্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন। কবি কালিদাস যেমন ইংগে “তালিবদর প্রদাপগোষ্ঠক” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিজয়নগর ও কমলাককে সামর্যভারতী বলে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বহুলা তৎকালে নবরাজ ব্রহ্মপুত্র ও বেদনাদকে সাগর সমুদ্র জঙ্গ আশ্রিত হোয়না অতিক্রম করিতে হয় নাই।

শাক্যের দশম শতাব্দী পশ্চিম দিগন্ত পাল্লিকার। নামক স্থানে কমলাক্কের রাজ্যবনী ছিল। ব্রহ্মের ইতিহাস “হর্যাক্ষোঃ” গ্রন্থে লিখিত আছে যে ১১১ শতাব্দীতে ব্রহ্মরাজ “বার্মাদেশ” সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে পাল্লিকার একজন রাজকুমার ব্রহ্মরাজ্যে গমন করেন। * * * ১১৪১ শতাব্দীর কখনও তাম্রশাসন পাওয়া জাত হওয়া যায় যে ব্রহ্মরাজ্যে নামক ভৌমক নরপতি কমলাক ও পাল্লিকার রাজ্যও পরিচালন করিয়াছিলেন। উক্ত রাজকুমার ব্রহ্মরাজ্যের এক বংশীর ছিলেন। আধুনিক মেহেরকুল, পাল্লিকার ও পরামণ্ডল এবং তৎসম্বন্ধিত শালগণ্ডাল এই রাজ্যের অধীন ছিল। কমলাক বা পাল্লিকার রাজ্যের পূর্বদিকে রাজ্যমাটির নামে আর একটা রাজ্য ছিল। রাজা মাদারির উত্তরদিকের প্রদেশে কতগুলি খজর রাজ্য ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা হইবে। কিন্তু “ভরগুণ” “পাণ্ডা” বা খ্রীষ্ট লাইটের প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত রাজবংশ শাসন কর্তৃক পরিচালন করিয়াছিলেন তাহারা অজ্ঞাতনাম নহেন। * * * পাল্লিকার রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে প্রদেশে যে কতগুলি মুন্ড রাজ্য ছিল তাহাও এক্ষণে নির্ণয় করা হইবে। এবার অম্বুয়ারে আধুনিক চৌদ্দখান ও তৎসম্বন্ধিত স্থানে অবস্থান নামে এক নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন। উক্ত নরপতি ও তাহার মন্ত্রী দরজল সব্বকে বহুবির আনন্দিক গরু স্তত হওয়া যায়। Rajmala pp. 4,5,6.

† এবার যে তপস্বী চতৌড়ী এই ইতিহাসের পরে দ্রষ্ট হইয়াছিল। ইহার অর্থ নাম “চতৌড়গড়”।

“আনন্দরাজার দীঘি,” “বৃথ রাজার দীঘি,” “ব্রহ্মনারায়ণ দীঘি” প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ময়নামতীর পূর্বাংশে “সাগর দীঘি” * বা “দেব দীঘি” নামক একটা বৃহৎ দীঘিও বিজ্ঞমান রহিয়াছে। আশোচ্য গ্রন্থে সাগর দীঘির বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল পুষ্করী ও দীঘিকার দ্বারা ময়নামতীর উচ্চতা—“কাহার পুষ্করীবার জল কেউ নাহি পাইত” প্রমাণিত হইতেছে। পাহাড়ের স্থানে স্থানে বহুতর ভয় ইত্যকাল ও ইতস্ততঃ—বান্দুপ ইষ্টকপ্রস্তুত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্বারা এইস্থানে “উনশত রাজার রাজত্ব করিবার অথবা উনশত রাজার বাড়ী” থাকার প্রমাণ সত্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ময়নামতী রাণীর উনশত রাজবাড়ী থাকা অবশ্যস্বত্ব, তথা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। উক্ত উনশত রাজার সময়ে বোধ করি উনশত কবার বিশেষ “ছড়াছড়ি” হইয়াছিল। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকারও বোধ করি সেই অঙ্কনগণ পুথির উদ্যত স্থানে উনশত কবার উল্লেখ করিয়াছেন যথা—“উনশত রাজা,” “উনশত বাণিজ্য,” “উনশত নক্ষত্র,” “উনশত কোদাল,” “উনশত টুকরী,” কত বলিব এক্ষণ উনশত!

* ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে “কালীর বাজার” রাস্তা

প্রস্তুত কালে এই পূর্বত-শিখরে একটা হৃদয়গিরিহৃৎ শাখিত হইয়াছে। ইহাকে লোকে “কোটমর” বলিয়া থাকে। এই দুর্গের পার্শ্বে মৃত্তিকানিগ্রে হৃদয়ের হৃদয় দেবমূর্তি স্কল প্রায় হওয়া গিয়াছে। ইহাখারা অসম্মান হয় যে এই পূর্বতের রাজত্বকারী নরপতিগণ পৌত্তলিক হিন্দু ছিলেন। “রত্নবক্সমন্ডর” ভাস্কর্য্যাদিগণ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পূর্বত মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। তৎকালে ইলিয়ট সাহেবের ত্রিপুরার ভ্রম জাতিষ্টেই ছিলেন। এই ভাস্কর্য্যাদি ১৮৪৩ শকাব্দে লিখিত উহা এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত আছে।

ময়নামতীর বাটার চতুঃসীমা এইরূপ :— চতীমুড়া, উত্তরে দেবপুর প্রভৃতি গ্রাম, দক্ষিণে পূর্বে গোমতী নদী এবং পশ্চিমে পাটিকাড়া ও পদ্মামণ্ডল পরগণা—কিন্তু মৌলবী আব্দুল করিমের নির্দেশিত “দক্ষিণে চতীমুড়া প্রকাশ চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড” এই কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। চতীমুড়া ময়নামতীর বাড়ী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে লালমাই পূর্বতের সর্গ-দক্ষিণাংশে অবস্থিত, কিন্তু তাহা “প্রকাশ” করিতে চতীমুড়া হইতে কিঞ্চিদূর একশত মাইল দূরবর্তী চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ডের উল্লেখ বড়ই অসমীচীন মনে হয় না কি? চতীমুড়ার অসম্মান যদি চন্দ্রনাথ বা সীতাকুণ্ড হইত, তবে এই “প্রকাশের”

অর্থ সঙ্গতি হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু কোথায় চতীমুড়া আর কোথায় চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড! এইরূপ সামঞ্জস্যহীন চৌহদ্দী হইতেই পরে নাই এবং এইরূপ চট্টগ্রামে রাণী ময়নামতীর বাড়ী থাকা প্রতিপন্ন হয় না। সত্যতঃ দূরের কথা। সমালোচ্য পুথির যে উক্ত অংশদ্বারা তিনি ময়নামতীর চারিদিকে চারিটা বাড়ী থাকা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা যে তিনি বৃত্তিতে পারেন নাই, তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। * তাঁহার উক্ত অংশ **

“অব্রোহা হইল শিখা খোঁটার (১) উপর।
এক নাম রাধি জায খোঁটার (২) সহর।
আস্কামাটী আছে কিছু মোহারকুল নগরে।
নিম্ন মাটী আছে কিছু বিক্রমপুর সহরে।
আর আছে আস্কামাটী তরপের (৩) দেশ।
ছাট্টগ্রাম (৪) পূর্ব মাটী জানিবা বিশেষ।”

অথচ ইহার পূর্ববর্তী মাজ ছুটী চরণ যথা :—

“তা দেখিগা গোপনাথে মনে মনে শুনে।
এমন হৃদয়ী যাবে জন্মের ভবনে।
উল্লেখ করিলেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইত যে ইহা ময়নামতীর নিজের উক্তি নহে— তাহার গুরু “সিন্ধা গোপনাথের” উক্তি এবং নির্দেশিত চারিটা স্থান তাহার নিজের সিদ্ধ পীঠ ভিন্ন অল্প কিছু নহে। গোপনাথের উক্তির দ্বারা ময়নামতীর চারিদিকে চারিটা রাজবাটী থাকা অসম্মান তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে। একজন সিদ্ধযোগীর চারিদিকে চারিটা “আতানা” থাকা বিচিত্র নহে। ১ম—মোহারকুল, ২য়—বিক্রমপুর, ৩য়—তরপের দেশ (খ্রীষ্ট), ৪র্থ—চাট্টগ্রাম

শ্রদ্ধেয় মৌলবী সাহেব এই “তরপের দেশ” রত্নপুরের কি না জানিতে চাহিয়াছেন। আমাদের মতে তাহা রত্নপুরের নহে, খ্রীষ্টে। কেন না খ্রীষ্টে “তরপ” বলিয়া একটা বিস্তৃত পরগণা বা দেশ অব্যাপিত বিদ্যমান। আর রত্নপুরের সহিত এই ঘটনার কোন সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া আমরা একবারেই মনে করি না। এতগুলি প্রমাণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থল প্রাপ্ত হইয়াও যদি কেহ তাহাকে অথবা রত্নপুরের ঘটনা বলিতে চান তবে নাহি। তরপের দেশের একটা “গ্রন্থ” নাম “কৌলীগ্রন্থ” দ্বারা কষ্ট করিয়া স্থান নির্দেশ করার কোন অর্থ নাই।

আর রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য “খোল দণ্ডের পথ বিস্তৃত ছিল” বলিয়া ব্রহ্মত মল্লিক কৃত গোপীচাঁদের গীতে পাওয়া যাইতেছে। এই হিসাবে বর্তমান ময়নামতী হইতে রত্নপুর বোল দণ্ডের অথচ অসম্মান দীর্ঘ হইবে সন্দেহ নাই। বহুৎ আশ্বাদের নির্দেশিত তরপের দেশ বর্তমান ময়নামতী হইতে বোল দণ্ডের পথের অধিক দূরবর্তী নহে। তরপের দক্ষিণ ও মুন্সিরা জেলার উত্তর সীমা এক। এক দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উল্লিখিত মালিকচাঁদ রাজার ও ময়নামতীর পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সম্বাসের বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থের মূল বিষয়-সংক্ষিপ্ততঃ এইরূপ :— রাজা মালিকচাঁদের পরলোক-গমনের পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র রাজা হন এবং অতীত বিলাসী ও অভ্যাসের পরায় হইয়া উঠিতে থাকেন। তাহাকে চারিটা বিবাহ করান

* আদরা ইতিহাসে অনেকগুলি “সাগর দীঘির” নাম পাইয়াছি। একটা সুবিধাবাসে নলহাটা আশ্রম-গ্রন্থে। ইহা ১৪০ শকে পণ্ডিত হয়। ইহার খনন কার্যে ১০ সহস্র শব্দও কুলী, ১ সহস্র শব্দক, ১০ লক্ষ ইষ্টক ও দুই ছই লক্ষ মণ তুণকাটী লাগিয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্য প্রবন্ধও প্রস্তুত আছে। অতঃপরেই মতো একটা ঢাকা জেলার সাধারণ আদে, একটা শ্রীহট্ট ও অপরী এই ময়নামতীতে। প্রত্যেকটীই আকারে বৃহৎ। বোধ করি সাধারণের জ্ঞাত বিস্তৃত বলিয়াই প্রত্যেকে এই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ এদের অধিকাংশই অনাদী পণ্ডিত হইয়াছিল। আর বনবের সমসাময়িকতারও বিশেষ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

† এই উনশত রাজার বাড়ী রাজা গোপীচাঁদের বিপুলবাণীশাখারালক “উনশত বাণিজ্য” বাড়ী হওয়া বিচিত্র নহে। আদরা গোবিন্দচন্দ্রের উক্তি—“এমন গড় এতদ্বারা উনশত বাণিজ্য।” পাঠ প্রাপ্ত হইতেছি, এই জন্যও অন্যান্য কারণে গোপীচাঁদের বনিক জাতীয় রাজা বলিয়া নির্দেশ করা যাইবে। তাহা ক্রমে উদ্ভব্য।

‡ Rajmala p. 420.

* মানসী ২য় ভাগ তৃতীয় অধ্যায়ের তাহার লিখিত প্রবন্ধ উদ্ভব্য।

† (১) বাটরি। (২) মোহারকুল। (৩) তরপ-পরগণা—খ্রীষ্ট। (৪) চট্টগ্রাম।

হয়। সর্বদা রমণী-সংসর্গে থাকিয়া তিনি
হীনবর্ধা হইয়া পড়িতেছিলেন। ভাই
রাণী ময়নামতী পুস্তকে নানা প্রকার
হিতোপদেশ দিয়া বিলসিতা ও প্রজাপীড়ন
প্রকৃতি হইতে বিরত করিতে যত্নবতী হন।
এবং যোগ সাধন করিয়া শারীরিক ও মানসিক
উন্নতি সাধন ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াও জ্ঞান
চেষ্টা করিতে বলেন। এই উপদেশ-বাক্য
নমুনা-বহুশ্রুত কতক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া
গেল। ইহাতে বেশ স্মরণীয় কথা পাওয়া
যাইতেছে।

“কামিনীর রূপ দেখি চিত্তে হইল ভোল।
কিন্তু নহে গুণীচাঁদ হৃদীর ফুল।

কৃপাপাতার পানি জেন করে টলমল।
তেন মতে যাবে তোমার ঘোঁষন সকল।
নল খাগ কাটিলে জেহেন পরে পানি।
তেন মতে জাইব বাপু তোমার জোঁগাখানি।”

প্রাণী নিকিলে বাপ কি করিব তৈলে।
আইল বাকিলে কিবা ফল জল ফুটি গেলে।

নিখড় কাটিলে বাপু বাতাসে পড়ে গাছ।
নিখিলে জলে থাকতে স্বপনা ২ জিঞা ৩ মাছ।
রাজা নহে আপনা কৈতয়াল নহে মিত। ৪
যরে স্ত্রি আপনা নহে চঞ্চল পিরিত।
জে ঘরে থাকয়ে জান আপন সুকা ৫ নারী।
ভাগ্য বৃদ্ধি নাহি তার পুরুষের নহে স্ত্রী ৬।
বে ঘরের নারী সবে পুরুষে বলে তুই।
সেই ঘরের লক্ষি বোলে ছাড়িয়াম সুই।

যেই ঘরে হজ জান নিত্যএ কমল ৭।
লক্ষিএ ছাড়িয়া যায় দারিদ্ৰ বিকল ৮।
কপাল তুলিয়া নারি জ্বরি দেএ গাইল ৯।
আএউ ১০ নট টি ১১ জাএ মরিবে আজু
কাইল।
রাজার পাণে রাজা নষ্ট ভাবি চাহ মনে।
স্ত্রি পাণে গ্রিহ লক্ষী পলায় আপনে ১২-
ঘরে বাহিরে রজু ১৩ নাই জায় অদার ১৪
জীবন।

মনিস্তের চর্চ মাজ সুকুর বরণ।
পতিকৈ সেবয়ে নারি হৈয়া সাবধান।
পুণ্যকলে নারি জাবে বৈকুণ্ড ভোমনে।
চারি জাতিএ লাগল পাইল গুণিচাঁদ রাজাএ।
মুখে মধু দিয়া জান সর্ব ধন থাএ ১৫

ইষ্ট মিজ বাপ ভাই কেহ নহে সার।
পুল কৈছা সঙ্গে রাজা না জাবে তোমার।
কাছা ১২ মাছা ১৩ সব ছারি বলে খরি
নিব।

এমন হুম্মর তগু থাকতে ১৪ মিশির ১৫।
এই সমস্ত উপদেশ-বাক্য শুনি “গুণিচাঁদ”
মায়ের নিকট চারি জাতি নারীর বর্ণনা জানিতে
চাহিলে ময়নামতী চারি জাতি নারীর এক
দীর্ঘ বর্ণনা দিয়া নারী জাতির অসারতা
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এবং
রাজা গোবিন্দচন্দ্র প্রজার উপর ১৬ স্থলে ১৭
এক আনা বাজনা স্থির করিয়া কর বৃদ্ধি
করিয়া মহাপাপ করিয়াছেন এই জ্ঞাত হইয়া
রাজ্যধন আদ্য নষ্ট হইয়া যাইবে, দেশে
মহাভ্রাট্যার হইবে এবং গোপীচাঁদ বহু দুঃখ
পাইবেন এইরূপ অনেক কথা আছে।

“তোমার বাপের মৈত্রেয় তুমি লহিলা
লাড়ি (৬)।
খেত পিছে (৭) দাড়ি (৮) লইলা এক
পৌন কড়ি।

এহার কারণে রাজা বহু দুঃখ পাবে।
এ স্থখ সম্পদ তোমার সব হারা হইবে।
কলির প্রবেশ হইব জানিয়া নিশ্চয়।
এ কারণে স্বর্গে গেল রাজা মহাশয় ১৮।
কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে শুক্লতর অতুলি পূর্ণ বর্ণনা
থাক। শেষে শ্রীমুক বৈকুণ্ড বাবু কেবল
“কলির প্রবেশ হইব”—এই কথাকে কবির
অতুলি বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন বুঝিতে
পারিলাম না। এইরূপ গ্রন্থের অজ্ঞাতও
পাইতেছি।—গোপীচাঁদ, রাণী ময়নামতী,
তাহার পিতার সহিত সহমরণ যাইতে
চাহিয়াছিলেন কি না তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ
কালে “দ্বিজ সন্দ্বিহরের” সত্য বাক্য অবিশ্বাস
করিয়া বলিয়াছিলেন :—

“কলি হইল ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা কএ।
তে কারণে ব্রাহ্মণের সম্পদ নাহি হএ ১৯।
বৈকুণ্ড বাবুর হিমান ময়েই গোপীচাঁদের
ঘটনা প্রায় সংস্রব বৎসরের প্রাচীন বলিয়া
নির্দেশিত হইতেছে। ২০ সংস্রব বৎসর পূর্বের
সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা যে আশঙ্কালকর
তুলনায় বর্তমান পরিসরে উন্নত ছিল তাহা
বলাই বাহুল্য। আশঙ্কাল ভূমিকারারী ২১
স্থলে প্রজার উপর ১০২ টাকা খাজনা বৃদ্ধি
করিয়াও নিজকে ততটুকু অপরাধী মনে করেন
না যতটুকু রাণী ময়নামতী পুত্র গোবিন্দ-

চন্দ্র কর্তৃক চিরস্থান প্রথার পরিবর্তন করিয়া
মাত্র ৩১ গড়া স্থলে কাণি প্রতি ১০ আনা
খাজনা বৃদ্ধি করায় তাহাকে অপরাধী মনে
করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রজাপীড়ন মহা-
পাপ ছিল। তখন কথার মূল্য ছিল।
“হাকিবা দীত মরল কা বাত” অর্থাৎ
অকরে মতা ছিল। পৃথিবী উটাইলেও
বাক্যের নড় চড় হইতে পারিত না। তখন
পথে পোনা পড়িয়া থাকিলেও কেহ
ছুঁত না। এই জ্ঞাতই রাণী ময়নামতী
পুস্তকে তাহার পিতার “সত্য লাড়িয়া”
বোলাই দেখিয়া “কলির প্রবেশ” মনে করিয়া
বিত্তবিকা দেখিতেছিলেন। অতুলি কোন
জায়গায় বোঝা গেল না। এমন “ঘোর
কলি” কালের লোকেরাও কোন বিষয়ে
অজ্ঞান দেখিলে “ঘোর কলি” বলিয়া চীৎকার
করিয়া উঠেন। উপমাগুলো অতুলি অবশ্য
মার্জনাীয়।

তারপর ময়নামতী তাহার স্বামীর
রাজত্বের গোঁবর করিয়া তখনকার দিনের
লোকের আচার-ব্যবহার ও গ্রন্থ-সাম্রাজ্যের
কথা, কৃষক বাহনের কথা, ও আর্থিক স্বচ্ছন্দতার
কথা বলিতেছেন। এই উক্তিগুলির ভিতর
বেশ একটু ঐতিহাসিক বিষয় রহিয়াছে।
“বাপ পুণ্যের লাগি দিল দিবি আরা জালা।
সোনা রূপায় গড়া গড়ি (২২) না ছিল
কাপাল।
হিরা মণি মাণিকা লোকের তলিতে (২৩)
স্বহাইত।

(৬) পরিবর্তন। (৭) অমিত্রিত—কাণি প্রতি। (৮) পড়িফ—খাজনা, ঘর সোকা—খাজনা।

(৯) মৌলবী আবদুল করিমের গ্রন্থে পুথিতে “বরাণসি” লিখা আছে। তাহা ভুল। বৈকুণ্ড বাবুর
গ্রন্থে পুথির পাঠ “গড়গড়ি” ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। আবার (১০) বৈকুণ্ড বাবুর পুথিতে “পুলিত” ও
ও মৌলবী আবদুল করিমের পুথিতে “কলিত” পাইতেছি। এখানে তুলিতে কথার অর্থ হয় না। তুলি
ঘরের মইলা। ঘরের মইলায় মনোনিবেশিত থাকি অর্থহীন। তুলিতে অর্থ তলই বা তাইহা, চটাই বা তাই
তাই বলি “তলিতে” খবর ছড়াইয়া শুকনা পান্ডিত্য—কথাটা যদিও আমাদের নিকট আশঙ্কনীয়। কিন্তু

কাহার পুষ্করিণী জল কেহ নাহি গাইত ।
কাহার বাড়ীতে কেহ উলারে (১)

না যাইত ।

সোনার ঢেপুয়া লইয়া বালকে খেলাইত ।
হাজারিলে ঢেপুয়া (২) পুণি না চাহিত আর ।
এমতে গোয়াইল (৩) লোকের হরিণ অপার ।
মেঘের কুল বেড়ি ছিল মূলি বাশের (৪)
বেড়া ।

গ্রিহস্তের পরিদান সোনার পাছরা (৫) ।
গরিবে চরিয়া ফিরে খাশা (৬) তাজি (৭)
ঘোড়া ।

ফকিরে গাছে (৮) দিত বাসা বাসা কাপড়
জোড়া ॥

তোমার বাপের কলেরা সব ছিল ধনি (৯) ।
শোনার কলসি ভরি লোকে খাইত পাণি ।
রপার কলসি ভরি বিবাহ্য জলখানি (১০)

কিবা রাজা কিবা প্রজা চিনন না
জাইত ॥ (১১)

দুই পহর (১২) মুজুরী করে গ্রিহস্তের ঘর ।
এক পহর দৌড়ান ঘোড়া মদান
পান্তর ॥ (১৩)

অথ আরহিয়া সেই মুজুরী করি খাএ ।
জার জেই নিতি কণ্ঠ এড়ান (১৪) না জাএ ॥

দেড় বুদ্ধি কড়ি ছিল কাণি গেষ্টের কয় ।
চৌদ্দবুদ্ধি কড়ি ছিল তদ্বার মোকর ॥ (১৫)
দশ টাকার বাড়ী থাইত দেড় বুদ্ধি দিত ।
বার মাস ভরিয়া বছরের শঙ্কনা নিত ॥

এই উক্তিগুলির বিশদ ব্যাখ্যা না দিলেও
ইহাখারা মননামতীর স্বামীর সময়ে দেশের
অবস্থা বৃষ্টিতে বাধা হইতেছে না । লোকের
এত স্বপ্ন-স্বচ্ছন্দে ও ধন-সম্পদের দিন কাটাইত
যে রাজা প্রজা চিনিয়া উঠা যাইত না ।
অন্তঃপর রাজা গোপীচাঁদ মাতার বাক্যের
সারবত্তা বৃষ্টিতে পরিয়া বলিতেছেন

“এই মতে ঠৈল জদি ইমানমতী খাএ ।
জোর হস্তে নিবেদিল গুণিটার রাজাএ ।
আমি রাজা যুগি হোবো তায়ে যদিও নাই ।
কিন্তু, এসব সম্পদ আমি এড়িমু

কার ঠাই ॥”

এইখানে গোপীচাঁদের মনে একটু “কিন্তু”
রহিয়া গিয়াছে । কাজেই মায়ের কথা
এড়াইবার জন্ত পথ নির্দেশ করিতে চেষ্টা
হইতেছে । মাতাকে প্রশ্ন করা হইতেছে ।

“আমি যেন যোগী হব, কিন্তু এসব বিষয়-
বৈভব কার কাছে রাখিয়া যাইব ?”

“গাঙ্গেতে এরিয়া জাবে বস্ত্রিণ কাহোন
নাও । (১)

পুরিমধ্যে এরি জাবে তুমি হেন মাও ॥ (২)

কিন্মথের (৩) এরি জাবে আশি হাজার হাতি ।
বিশেষ গমন কৈলে কে ধরিবে ছাতি ॥

আন্তাবিলায় (৪) এরি জাবে নললায় ঘোড়া ।
জোর মন্দিরে এরি জাবে শাহেমামি (৫)

দোলা ॥

পুরিমধ্যে এরি জাবে পঞ্চ পাড় বরা (৬)

পান জোগাণি এরি জাবে উনশত নকর ॥ (৭)

শেঁতবালা (৮) এরি জাবে হারিয়া
ছোহর ॥ (৯)

অধুনা পহুনা (১০) এরি জাবে কার ঘর ।
বাতেনে (১১) এড়িয়া জাবে সন্তর কাহন

(১২) বেত ।

গোয়াইলে এড়িয়া জাবে গাই বাশন্ত ।
এহি সব এড়ি জাবে আপনে জানিয়া ।

নএশানপাড় এরি জাবে উনশত
বাণিয়া ॥

বাপের মিরাম এরি জাইমু গোড়
(১৩) সহজ ।

দাদার মিরাম এরি জাবে কমলাক (১৪)
নগর ॥

তুমি মায়ের জত বাড়ী কলিক
নাপল (১৫) ।

আমি বাড়ী বাদিয়াছিম মেহার কুল (১৬)
সহর ॥

চল্লিশ রাঙ্কায় কর দেয় আমার গোচর ।
আমা হতে কোনজন আছএ ডাঙ্গর (১৭) ॥

(১) নৌকা ।

(২) তোমার মত বৃদ্ধা মাতা । (৩) হাতিশালায় । (৪) অবশ্যলয় । (৫) মাঘের লোকের বাবহার
উপর কড়ি দোলা । (৬) পঞ্চদশ মস্ত্রী । (৭) চাকর । (৮) খেতবর্গের ঘাস । (৯) চামরখারি হারিয়া ।

ছোহর—চোহর—চামর । মৌলবী আবদুল করিমের “মানসী” পত্রিকায় লিখিত একত্রে “কিল, যত্নে” হলে
“কিলযত্নে” এবং “আন্তাবিলায়” হলে “আন্তাবিলায়” মূলিত হইয়াছে, আরও “হারিয়া” হলে “হারিকা” ও
“কাফা” হলে “কাফুকা” হইয়াছে ইহা অন্তর্ভুক্ত পাদ্যখানার সূত্রের কাণ্ড । (১০) রাজা গোপীচাঁদের দুই ছী ।

(১১) বিতানে । (১২) কাহন । (১৩) গোড়-বৈহী । (১৪) সুমিমা । (১৫) কালিকাপুর । (সুমিমা) ।
(১৬) রাঙ্গামালাকার বালিগায়েন “মিরি” কুল হইতে “মেহার কুল” নামের উৎপত্তি । “মিরি” অর্থ ঘর ।

তাই অর্থ ঘর শব্দকৃত এবং যথা পূর্ববর্তিক উক্ত হইল এই জন্ত অর্থ-পূর্বক । গোপীচাঁদের পাদিকাণ্ডে
ও মেহারকুল সম্বন্ধের (৩৭) পৃষ্ঠার ১৭৭৭ বর্ণিয়া নির্দেশিত হইত । ইহা সমস্ত (বহু) রাঙ্কায়ের পূর্ব-
দিক্‌দিক্‌পে অবস্থিত । (১৭) শ্রেষ্ঠ, বড় ।

আমরা শিশুকালে শ্রুত হইয়াছি যে আমাদের জিপুয়া রাজ্যের কোন এক চতুর দেওয়ান “টাকা বৌদ্রে না দিলে
মুখে ধরিবে” এই কথা বুঝিয়া বসায় একবার রাষ্ট্রব্যবসার ধন-সম্পত্তি ভেঙ্গে দেওয়াইয়া এবং রক্তের
বাসেই কিছু কিছু তত্ত্ববিদ্য যাইত । এবং ঐ তত্ত্বত্রি অর্থে দেওয়ানের বিজ্ঞত জমিদারী সঙ্কিত
হইয়াছিল । আধুনিককালে যখন একজন ইয়াহাঙ্গিল তখন পুরাকালে চটাইতে ধন-সম্পত্তি কাকার আশ্রয় হইলেও
বিদ্যাসংগো ।

(১) উবার—হাওলাত । (২) গোলা ; Ball । (৩) কাটাইল । (৪) তলবীশ । (৫)
পরিষেয় বস্ত্র বিশেষ । (৬) উত্তর । (৭) জোজীয়া । (৮) গায়ে । (৯) মৌলবী আবদুল করিমের পুঁথিতে
“তোমার বাপের কালে রসের ছিল ধনি” এইরূপ পাঠ আছে তাহা ঠিক নহে । তাই পরিভাষিত হইল ।
(১০) মৌলবী আবদুল করিমের আশ্রুত পুঁথিতে “বিবাহ্য” হলে “পুসিএ জল খাএ” এইরূপ পাঠ আছে ।
(১১) রাজা প্রজা চিনা যাইত না । (১২) গ্রহর । (১৩) গ্রাহর—মদান । (১৪) বাদ বাজরা । (১৫) মৌলবী
আবদুল করিমের পুঁথিতে “মেহার” লিখা আছে । মেহার হইতে “মেহাক” ভাল অর্থ হয় । মোকর—মুখ্য
অর্থ টাকার মূল্য ১০০ দিল । আশার “মেহার অর্থও নামাঙ্কিত মূল্য । তত্বে এখানে মোকরই ঠিক মনে
হয় ।

কিছু জুইয়ের বিষয় শুধয়ে মৌলবী আবদুল করিম “নয়ানগড়কে” ত্রিপুরা জিয়ার নবীনগর কি না অস্থগত্বান করিতে বলিয়া অত্রদিকে রত্নপুরের প্রতি অল্পলী সন্দেশ করিতেছেন। বা হ'ক নয়ানপুর হইতে নবীনগর যে অনেক আধুনিক ভাষা বলাই বাহুল্য, বিশেষতঃ নয়ানপুরের সন্নিহিত আবার আরো কয়েকটা “গড়”এর নাম পাইতেছি। যথা :—“লোহগড়,” “বিশাল-গড়” ও “কৈলাজ গড়” (আধুনিক কবায়)। আরো দেখিতে পাই যে ময়নামতীর নিকটবর্তী “চৌগড়,” শুওরিয়া দুর্গ, মেহার-কুল দুর্গ, সোনামাটীয়া দুর্গ, রাশামাটীয়া দুর্গ, প্রভৃতিও প্রায় একই সময়ে স্থাপিত। সম্ভবতঃ “নয়ানগড়” নাম পরবর্ত্তিত হইয়াই “নয়ানপুর” হইয়া থাকিবে। অথবা নয়ানগড় বা নয়ানপুর দুইটিই এককালে বিদ্যমান ছিল এক্ষে “গড়” লুপ্ত হইয়া “পুর” রহিয়া গিয়াছে। নয়ানপুর এখনও একটি বন্দর। এখানে পুরাকালে উন্নত বণিক্যের দ্বারা পরিচালিত

রাজ্য গোপীচাঁদের বিশাল বাণিজ্যপার থাকার বিচিত্র নহে। তৎকালে এই স্থান গুলি সমুদ্র বা হ্রদ তীরবর্তী ছিল বলিয়া ইতিহাসে লিখিত আছে। ইহার পর কতক আভাস পূর্বেও দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বর্ণিত নয়ানপুরের সন্নিহিত পূর্বাংশে বর্তমান রেল রাস্তার পূর্বা পার্শ্বে প্রাকৃতিক হস্তনির্মিত একটি অতি হৃদয় “গড়” দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে পর্বতরাশি দ্বারা এবং উত্তরাংশে একটি পার্বত্য নদীদ্বারা সুরক্ষিত। ইহাই যে আমাদের উদ্দিষ্ট নয়ানগড় নহে কে বলিবে? মৌলবী আবদুল করিমের লিখিত “বাগের মিশ্রাণ” গোবর সহঃ” ট্রিক পাঠ্য নহে। বৈকুণ্ঠ বাবুর পুঁথির “গৌড় সহঃই” সত্য। প্রাচীন শ্রীহট্টের অজ নাম গৌড় লিখিত আছে। অতএব সমালোচ্য গ্রন্থের গৌড় সহঃ যে বালালার রাজধানী নহে—শ্রীহট্ট গৌড় ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নাই। পদ্মপুরাণের কবি নারায়ণ দেব তাঁহার গ্রন্থে এই শ্রীহট্ট

গৌড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীহট্ট গৌড়ের পরগণা “তরফ” ও “মিরানী” এবং “মাণিক-চন্দ্রের” সহিত রাজা মাণিকচাঁদের বিশেষ সংগ্রহ আছে বলিয়া মনে করি। রাজা মাণিকচাঁদ শ্রীহট্ট গৌড়ের অধিবাসী বা অধিকারী ছিলেন।

গোপীচাঁদের গীতে “স্বর্ণচন্দ্র মহারাজ ধাতিচন্দ্র পিতা, তান পুত্র মাণিকচাঁদ শোন তাঁর কথা”—এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। এখন বুঝা যাইতেছে ধাতিচন্দ্রের পুত্র—স্বর্ণচন্দ্র মহারাজের পৌত্র মাণিকচাঁদ, “তিলক-চাঁদের বি” ময়নামতীকে বিবাহ করিয়া মেহারকুলের রাজগণীর অধিকারী হইয়া ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে মাণিক-চন্দ্র, পালবংশীয় রাজা মহাপালের পুত্র। এ কথা যে সত্য নয় তাহা উপরিউক্ত পদাবলী দ্বারা ই প্রমাণিত হইতেছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের ময়নামতী গোপীচাঁদকে বলিতেছেন,—

“তাঁর বাগের ঘর ছিল শম্ভুচারা মতি।”
ময়নামতী দেখানে যাইয়া “পলাঞ্জলি পাতীর *
উপর “মেনোর পালি” পাতিয়া পুষ্পের
বিধান,” পুষ্পের পাতী “সম্মাহিয়া” নেতের
পেশা” পাতিয়া চাঁদোয়া টাপাইয়া বুদ্ধরাজা
মাণিকচাঁদকে কাছে ডাকিয়া আনিলেন এবং
তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান উপদেশ গ্রহণ
করিবার জন্ম “আড়াই অক্ষরি মন্ত্র” +
গ্রন্থ করিতে অগ্রহরোধ করিলেন। ইহা দ্বারা

দেখা যাইতেছে রাজা মাণিকচাঁদ ময়নামতীর সহিত এক বাটতে বাস করিতেন না। তাঁহার স্বতন্ত্র বাড়ী “শম্ভুচারা” গ্রামে ছিল। আরো দেখিতেছি মাণিকচাঁদের মৃত্যুর সময়ও ময়নামতী ভিন্ন বাড়ীতে ছিলেন। এবং সেই বাড়ী মাণিকচাঁদের বাড়ী হইতে বড় বেশী দূরে ছিল না। কেননা তাহাতে “লড়” ও দিয়া বা দৌড় দিয়া যাওয়া যাইত।

যথা—
“তাঁর বাগে পরি মৈল রাজি নিশাভাগে।
আমি খবর না পাইল সকালের আগে।
লড় দিয়া গেল মুই রাজা দেখিবারে।
মেত্যা দেখে লাগ পাইল শৈশবীর উপরে।”
এই কথা দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে “রাজি নিশাভাগে” মাণিকচাঁদ রাজ্যের যত্ন গ্রহণ। ময়নামতী “সকালের আগে” অর্থাৎ রাজি প্রভাতের পূর্বে খবর পাইল না। তাঁর পর খবর পাইয়া “লড়” দিয়া রাজাকে দেখিতে গেল এবং সেখানে যাইয়া রাজার মৃতদেহ দেখার উপর দেখিতে পাইল। আমাদের শব্দার্থ “শম্ভুচারা” অর্থাৎ ত্রিপুরা জিয়ার “লোহগড়” পরগণায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাও সুমিমা বা কমলাঙ্কের সময়েও উত্তরাংশে অবস্থিত এবং লড় দিয়া যাইবার মত নিকটবর্তী। এক্ষেপে সোকে ইহাকে “শম্ভুচাঁদ” বলিয়া থাকে। এই গ্রামের মধ্য দিয়া ও পার্শ্ব দিয়া কয়েকটা পার্বত্য ছড়া বা

* এই রাজ্য সমুদ্র বা হ্রদ তীরবর্তী। শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিমায় ময়নামতিয়ারে পূর্ণাংশ, ত্রিপুরা জিয়ার উত্তর-পশ্চিমায় দক্ষিণে বোধ হয় এই স্থানে পূর্বে একটি বড় হ্রদ ছিল। তৎপুত্রের প্রবাহিত কন্দ-রাশি দ্বারা ঢাকা, ময়নামতি ও ত্রিপুরার সন্নিহিত সমস্ত ক্ষেত্রে পরিণত হইলে এই হ্রদ ময়নামতীয়া দুর্গ-পথে পতিত হইয়াছিল। এই জটিল ধারণ বতাবীর পক্ষে বিদ্যমান সব শিলহট্ট ও কমলাচর বা পাটিকারা রাজ্যভোগের সাধারণতীরবর্তী বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বড় বড়, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার প্রভৃতি নদীসমূহ এই হ্রদের দ্বারা প্রবাহিত হইত। এই সকল নদীসমূহে আনন্দ বন্দরদ্বারা দ্বারা এই হ্রদে জল জমে গড় হইয়া অসংখ্য দ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল দ্বীপের কালি বা উড় দ্বারা দ্বীপের প্রান্তভাগে অসংখ্য বর্ষাকালে সমুদ্র স্রোত দ্বারা দ্বীপের বোধ হয়। আধুনিক শ্রীহট্ট জেলার ভার চতুর্দিক দ্বীপ ও নিম্নদ্বীপ ও ইহার সহিত ময়নামতি জেলার পূর্ণাংশস্থিত নিম্ন দ্বীপ ও গুলি সমুদ্র কলিক বোধ হয় উল্লিখিত হ্রদের পরিমাণ ফল দুই সহস্র বর্গ মাইলেরও অধিক হইবে। Rajamal, pp. 285 & 286.

+ মিরাল শব্দের দুইটি অর্থ হয়। এক মিরাল নদীর ত্বনি বা ধারের সামান্য কণ দিতে হয়, সখ চিত্রহট্ট। শ্রীহট্টের অনেক ভূমিকাধিকারী “মিরালগড়” “ভরবাগ” বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। মিরাল শব্দের বিস্তারিত অর্থ নৌবাহী বা নৌকর। আমাদের মতে এই সমস্ত নৌকর ও গুহারাম শব্দে প্রাপ্ত বলিয়াই “মিরাল” বলিয়া লিখিত হইয়াছে। “তরফ” শব্দের অর্থ জমিদারী।
† প্রাচীন কালে শ্রীহট্ট তিনটি গুরু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ১। গৌড়-শ্রীহট্ট। ২। লাউর।
৩। জলকীয়াপুর। এই তিনটি রাজ্যমধ্যে গৌড় বা শ্রীহট্টের অধিপতি অধিক বলশালী ছিলেন। Rajamal, P. 287.

কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্টের প্রাচীন রাজা “গৌড় গোবিন্দের” নামাঙ্কিত “গৌড় নামকর” হয়। জনশ্রুতি।

* এই গড়াগল পাট ও শ্রীহট্টের জিনিষ। উহা হস্তান্তরে নির্দিষ্ট হইত। আঙ্গুল ও শ্রীহট্ট হৃদয় হৃদয় শীতল পাট পাওয়া যায়।
† হিন্দু ধর্মাত্মী বীরমহা (আড়াই অক্ষর)।

‡ ইহা দ্বারা দ্বী-বাণী-নগর ও একটি আভাস পাওয়া যায়। যেমন—
“বাড়ী দ্বীপের বড় চুলিলা হাটী।” বাড়ীতে হস্তা করিবার জন্ম গোপীচাঁদের বয়সের বিধি কল্যাণ নিমাই বাণীয়ার বাড়ী দ্বারা। ময়নামতীর বহু হাট্টির দ্বারা দ্বীপের বাসিন্দা ঘরে বাওয়া। এক্ষণে বলা তখন সেখানে বিনা বায়ায় যাওয়ার আরো অনেক কথা গ্রহণযোগ্য পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা দ্বী-বাণী-নগর বিশেষ ভাবে ছিল বলিয়া মনে হয়।

করবা বিহায় যাইতেছে। বর্ষমানে এখানে একটা বাজার আছে। কেয়েকটা পুরাতন বৃহৎ দীর্ঘিকাও দৃষ্ট হয়। * প্রাচীনও এক প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বাজারটীও একটা বৃহৎ দীর্ঘিকার অতি নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কোন রাজা রাজ্জা ভিন্ন এত বড় দীর্ঘিকা খনন অল্প দ্বারা সম্ভব না। বিশেষতঃ মণিকর্টারের মৃত্যুর পর তাহাকে দাহ করিবার জন্ত হান পাওয়া গিয়াছিল।†; পুণ্ডরী বলবৎ ছিল। "আবার মাসেতে মৈল মণিকর্টার গোলাই H প্রিতান্তিতে জলময় পুরিতে স্থল নাই।

দৈত্য মুগে গঙ্গাদেবী ভূর্গতে ঐ আছিল। গোমুইদের কুলে বসি কান্দিতে লাগিল। দেখা যাইতেছে মণিকর্টার রাজাকে দাহ করিবার জন্ত গোমতী নদীর তীরে লুপ্তা হইয়াছিল। আমাদের বর্ণিত "শম্ভুছড়া" গোমতী নদীরও অতি নিকটবর্তী স্থান। রাজা মণিকর্টারের সহিত ময়নামতীর সহ-মরণের কথাই বিবাস না করিয়া সাকী তলপ করিলে ময়নামতী বলিয়াছিল,—

"হেন সাকী দিবে হেন নাহি মেঘার কুল।
হাসিতে হাসিতে মৈলাএ কহিতে লাগিল।
সেই দিনের তিন সাকি আছে হেন জানি।
তাহারে আনিয়া জন সে সব কাহিনী ॥"

এক সাকী আছে ঘোর ভাতি
দামোদর।
আর সাকী আছে রাজা ব্রাহ্মণ
সন্দীপন ॥ ৪

আর সাকী আছে রাজা সাউল
লক্ষীলজ।
সাকী আনিবারে শীঘ্র পাঠাও অছর ॥"

এই উক্তিকেও মণিকর্টারের অন্তর মৃত্যুর সাক্ষ্যবশত উপস্থিত করা যাইতে পারে। ময়নামতীর বাড়ী "মেঘারকুল"—কালিকা-নগর" আর মণিকর্টারের বাড়ী "শম্ভুছড়া"—লৌগগড়। এই দুইটাই পৃথক পরগণা। এই জুড়াই বোধ করি ময়নামতী বলিয়াছিল যে মণিকর্টারের মৃত্যুকালে তাহার সহমরণ হাইবার চেষ্টার সাকী মেঘেরকুলে পাইবার

সম্ভাবনা নাই। মণিকর্টারের বাড়ী ভিন্ন জিলায়ও বহু দূরবর্তী স্থানে হইলে তাহাকে গোমুতী নদীর তীরে আনিয়া দাহ করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনায় মণিকর্টার লৌগগড়ের রাজা ছিলেন এবং শম্ভুছড়া বা বর্ধমান শম্ভুছড়ায় তাহার রাজপট নিদিষ্ট হইয়াছিল। ময়নামতী একজন প্রতাপাবিত রাজার কন্যা বলিয়াই বোধ করি পিত্রালয়ে বাস করিতেন। বিশেষতঃ তাহার পিতা তিলকর্টারের কোন পুত্র সন্তান থাকার কথা পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ ময়নামতীই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। তিলকর্টারের মৃত্যুর পর মণিকর্টার তাহার রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই কারণেই বৃদ্ধ বয়সে "মেঘেরকুলের রাজা মৈল মণিকর্টার গোলাই" লিপিত হইয়া থাকিলে।

দৌড় দিহা বা "লড়ু" দিহা যে সকল স্থানে বাঙা যাইত এগুলিকে নিকটে অস্থগ্ধান না করিয়া সারা বর্ষ বৃষ্টিয়া বেড়ান আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। প্রাচীন বঙ্গ-গৌড়ের সহিতও এই ঘটনার কোন সম্ভব থাক। প্রতিপন্ন হয় না। গাঁৱারা "মণিকর্টারের গানের" একটা গান প্রাপ্ত হইয়া বা শ্রুত হইয়া নানা প্রকার মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের কথা ধর্ম্যব নহে; কিন্তু গাঁৱারা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে ভালমতে বিচার না করিয়া কোন কথা প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি না। যে বিঘরের কোন ইতিহাস নাই তাগার একটু সামান্য খুঁচি নাট প্রাপ্ত হইলে তাহা ধারাই একটা অস্থান করিয়া লইতে হয়, কিন্তু বাহার একটা একটা বহুপ্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ রাখিছে,

তাহার স্থাননির্দেশে এত অসামঞ্জস্য কেন হইল একটু চিন্তা করিবার বিষয়। ডাক্তার গ্রিয়ার্সেন যখন এই বিষয়ের আলোচনা করেন তখন তিনি এই প্রাচীন পুঁথিখানা গ্রাণ্ড হইলে তাহার মত কোন দিকে যাইত তাহা অস্থান করা যাইতে পারে। অথচ আমরা এখনও সেই ধুরা খরিয়াই চলিতেছি। তৎকালে রাজা গোপীচাঁদের সম্ভানসাকহিনী দেশবাণীর জ্বয়ে বিশেষভাবে আঘাত করিয়াছিল। এই বিষয় লইয়া দেশে দেশে নানা প্রকার গীত, ভাড়া, কবিতা ও চিত্র না রচিত হইয়াছিল। ছাড়া ও চারপাশের দ্বারা ইহা দেশেদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই গীত বা গাথারই জু'একটা আবিষ্কার করিয়া বর্ধমান সময়ে কেহ কেহ স্থাননির্দেশে বিঘম গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

আমরা এক সময়ে আমাদের এক মাড়ো-য়ারী বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তাহার গৃহদেষ্ঠারের একখানি চিত্রপট দৃষ্টে কোঁতুলপরণ হইয়া চিত্র-পরিচয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গৃহস্থানী খাস হিন্দিতে বলিয়াছিলেন "ইহা রাজা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস-বাঙার চিত্র।" তখন কোঁতুল একটু অস্পষ্ট বুঝে করিল, কেন, বোধ হয় সকলেই খারিজ পারিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এই গোপীচাঁদ কে এবং কোথাকার রাজা ছিলেন?" তিনি বলিলেন "হীন ময়নামতীর পুত্র রাজা গোপীচাঁদ, ঢাকার নিকটবর্তী স্থানে স্থানে তাহার রাখানো ছিল—তাঁহা ঠিক আমি জানি না। তিনি হিন্দীতে "ঢাকেকা তরকরা" বলিয়া ছিলেন। এই ঢাকেকা তরক শব্দ দ্বারা বোধ হয় 'ময়নামতীকেই' (মেঘারকুল) লক্ষ্য করিতেছে। এই সম্বন্ধে বোঝাই নগরো না কি

* শম্ভুছড়া বা শম্ভুছাইলের পার্বত্য ভূগো এবং প্রভৃতি গ্রামেও অনেক দীর্ঘ পুষ্করী দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা সন্ধ্যাক্ত প্রাচীন কলিকাতার কাছে নিম্নোক্ত রাজ্যপালের কাছী বলিয়া মনে করি; কিন্তু এমন অনেক দীর্ঘ পুষ্করী আছে যাহা নিম্নোক্ত রাজ্যপালের কাছী বলিয়া মনে করি। ইহাও তাহা কোচের কাছী অনেক দীর্ঘ পুষ্করী আছে। এখন যে কোচের "এক ভাঙের পুষ্করীর জল যাইত নাই" ইহাধারা ময়নামতীর উক্ত "কবের পুষ্করীর জল কেহ নাই" সম্ভাবনিত হইতেছে। আমরা উক্ত দীর্ঘিকার নিকটে প্রাচীন রাজপালের রাজা চিত্ররূপে এবং করিতে পারি।

† এখানে গোলাই—গোলাই—স্থান—রাজ্য অর্থে ব্যৱহৃত হইয়াছে।

‡ গোমুতী নদী।

§ ব্রাহ্মণ শব্দের বাদ্যময় কুনিম্ব শব্দের সমিহিত উত্তরমানে গোমুতী নদীর পরপারে "শানধর বা শানধর" নামে অবস্থিত। শনধর শব্দ বা বর্ধমান শানধর নামে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। ময়নামতী তিন জন সাকীর নাম করিলে রাজা গোপীচাঁদ কেবল মাত্র তিন শনধরের সাক্ষ্য এখণ করিয়াছিলেন একপট সমালোচনা এখণ পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ তাহার বাড়ী অতি নিকটে ছিল বলিয়া তাহাকেই উপস্থিত করা হইয়াছিল। শানধর গোমুতীর পরপারে অবস্থিত বলিয়া ময়নামতীর কথাও সম্ভাব্য রক্ত হইতেছে কেন না তাহা নিকট হইলেই পৃথক পরগণা। শনধরের আনিবার জন্ত বনন বড় জোর করা হইত বস্তুতঃ দীর্ঘ দৈর্ঘ্য "দিয়ে রাখণ নাই যাহে উপর" ইহাধারাও তিন শনধরের নদীরতবর্তী আশ্রয়ের এমন পাওয়া যাইতেছে। অসম্ভাব্য বলিয়া মনে ভাট শানধরেরকে আমরা ঢাকা শানধরের দ্বারা হরিপুরের ভানিদের এবং উত্তরাধিকারী "শানুজার" বলিয়া এবং সম্ভাব্যবে চাঁদ সন্যাসেরের পুত্র লক্ষীর বা লক্ষীর বলিয়া নির্দেশ করিতেছি। তাহা বখালিতে বর্ণিত হইবে। এই হিসাবে তাহার অতিদূরদেশবাসী বলিয়া সাকীকে তাহারপক্ষে উপস্থিত করা হয় নাই।

লেখক।

শুভ্রাটী ভাষায় পুস্তকও আছে। এবং তাহা অবলম্বন করিয়াই বোধ করি ভারতের শিল্পীকুলগৌরব রাজা রবিবন্দ্য এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকিবেন। উক্ত চিত্র রবিবন্দ্য প্রেসে মুদ্রিত। ভাগ্য বলিতে হইবে যে, বহুবর ঘটনাতিকে মাড়োয়ার বা বোম্বাই প্রদেশের বলিয়া বসেন নাই। ছবিখানি এই রূপ :—

গোপীচাঁদ ঐগরিক আলখোলা পরিধান করিয়া নরীম সম্মানীর বেশে এক হাতে এক ছড়া জপমালা ও এক হাতে ভিক্ষার থালা লইয়া ভিক্ষা করিতেছেন। ছবির ডানে ভিক্ষার অনভ্যুত্থাত কৃষ্টিয়া উঠিয়াছে। সমবেত রমণীকুল মধ্যে এক হৃদয়ী ভিক্ষা দান করিতে উদ্যত, অত্যা রমণীকণ তাহাই নির্দ্বন্দ্বক ও আশ্চর্য্য ভাবে দর্শন করিতেছেন। বহুবর বলিয়াছিলেন ভিক্ষাপ্রদানোদ্ভাত হৃদয়ী রমণী না কি গোপীচাঁদের ভগিনী। এ সম্বন্ধে পুস্তকে কোন বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছি না। এই চিত্রদর্শনে পুস্তকোক্ত—

দিন অবশেষে গেল রাজা গোবিন্দাই।

কালিকা নগরে ভিক্ষা মাগেগে বোণাই।*

কথাই আমাদের মনে পড়িতেছে। এই চিত্র বর্তমানও দৃশ্যাপ্য আছে। রাজা রবি বন্দ্য অল্পনা ও পছন্নার চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। “পুত্র কত্তা নাহি আর একলা গুবিন্দাই।” পাঠ দ্বারা ময়নামতীর অল্প পুত্র কত্তা না থাকা প্রমাণিত হইতেছে।

যাহা হ’ক—এখন দেখা যাক—“দাদার মিরশ কলমাক সহর” কি? “কলমাক” যে কলমাকের নামান্তর তাহা বিবেচ্য করিয়া বৃন্দান অনাবশ্যক।* কলমাক বা কুমিল্লা

ময়নামতীর অতি নিকটবর্তী স্থলয় স্থান। এখন কথা হইতেছে “দাদার মিরশ” অর্থে পিতামহের না মাতামহের মিরশ? দুইজনই হইতে পারে। মারিকটাদেশের পূর্বা নিবাস শ্রীহট্টগৌড় তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মারিকটাদ শ্রীহট্টের রাজা দাড়িচন্দ্রের পুত্র। অতএব তাঁহার পিতৃরাজ্য গৌড়-শ্রীহট্ট। এবং এইজন্য গৌড়-শ্রীহট্টকে গোপীচাঁদেয় পিতামহের রাজ্য নির্দেশ করা যায়। পূর্ববর্তী লেখকেরা “দাদার মিরশ” অর্থে গোবাহজিভাবে পিতামহের মিরশ টিক করিয়া লইয়াছেন। একটু চিন্তা করলেই ইহা সহজে প্রতিপন্ন হইত। আমাদের মতে এই “দাদার মিরশ” গোপীচাঁদের মাতামহের মিরশ বলিয়াই বোধ হয়। ময়নামতী রাজা তিলকচাঁদের বি পূর্বে বলা হইয়াছে। তিলকচাঁদের কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় দৌহিত্র-স্বত্রে এই রাজ্য গোপীচাঁদের অধিকার-ভুক্ত হয়। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিম্নপোষ্যে। মৌলবী আবদুল করিম তাঁহার প্রবন্ধের পাঠ্যটীকা এক স্থলে লিখিয়াছেন “মারিকটাদ কোথাকার রাজা ছিলেন এখনও কেহ নির্দিষ্ট রূপে স্থির করিতে পারেন নাই।” অথচ তিনিই মারিকটাদেশের পিতার রাজ্যকে কলমাক নির্দেশ করিয়া তাহা গোপীচাঁদের পিতামহের (দাদার) মিরশ বলিতে সন্মত মনে করেন নাই।

“ভূমি মাগের যত বাড়ী কলিকা নগর।” ইহার জ্ঞাত বৈশুদ্র অস্থসজ্ঞান করা অনাবশ্যক। ইহাকে আমরা কুমিল্লার নিকট-বর্তী “কালিকাপুর”† নির্দেশ করিতে পারি।

হয় “কালিকা” “কলিকা” রূপধারণ করিয়াছিলেন, নয় “কলিকা” কালিকা রূপে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। আর “পুরী” ও “নগর”—এখানে কবির পদ মিলের স্বাধীনতা। তাঁহার অনেক স্থলে পুরকে নগর এবং নগরকে সহর লিখিয়া দিয়াছেন। এখনও কুমিল্লাকে কেহ কুমিল্লানগরী, কেহ কুমিল্লা সহর লিখিয়া থাকে। একটা গানের পদে “কলমাক পুরী” ব্যবহার হইতেও দেখিয়াছি। এক হিসাবে ধরিতে গেলে পুরী, নগরী, সহর (একান্তজাপক বলিয়া) একের স্থলে অল্পের ব্যবহার তেমন দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

ময়নামতীর বাড়ী রাজা গোপীচাঁদের বাড়ীর নিকটবর্তী ছিল। যখন তখন আসা যাওয়া করা হইত। যেমন—

“একরাজ ছিল রাজা নিরুজ মন্দিরে। (১)

প্রভাতে চলিয়া গেল মাগের হৃদয়। (২)

বসিয়াছে মৈনামতী হরশিত মন।

হেন কালে গেল রাজা মাগের সদন।

সোনার খাটে বৈসে মৈনামতী রূপার খাটে পাণ্ড।

হওকে হওকে পড়ে শোত ছোবরের (৩)

অতঃপর ময়নামতী বর্ধগণের কর্তৃক লালিত হইয়া গোপীচাঁদের নিকট নালিশ করিবার জন্য “গোপীচাঁদের মহাস্তে উত্তরিল গিয়া।” এইরূপ অনেক পাঠ পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা ময়নামতীর বাড়ী ও গোপীচাঁদের বাড়ী

অতি নিকটবর্তী বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

ময়নামতীর বাক্যে প্রসূত হইয়া যখন গোপীচাঁদ সম্মান গ্রহণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন

তাঁহার চারি স্ত্রী অনন্তোপায় হইয়া ময়নামতীকে লালনা করিবার পরামর্শ করিয়া মনে মনে ধমকাইতেছে।—

“অবশ মরিবা ভূমি আমরার বাসরে। (৪)
সপ্ত দিনের বাসি মরা করিব তোমাতে।”

তারপর বিয়ের লাড়ু “নিমাই বাণিয়ার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহা অচ্ছাদ ব্রব্য-সম্ভার সহ ভেট দিবার জন্ম—

“ভেট ঘাট জতেক বেগারের(৫) মাখার দিয়া।

শান্তরী দর্পণে (৬) বধু চলিল হাতিয়া।

এই সকল উক্তিদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ময়নামতী ও গোপীচাঁদের বাড়ী অতি নিকট ছিল।

এই জ্ঞাই মৌলবী আবদুল করিমের নির্দিষ্ট “মাগের মিরশ” (যদিও পাঠে তাহা নাই) কলিকা নগর কি তরকের দেশ ওরফে কোলিক নগর বা রঙ্গপুর?† স্থান-নির্দেশের গোলাঘোণ প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্বেই

বলা হইয়াছে সমালোচ্য গ্রন্থের বিষয়াদির সহিত রঙ্গপুরের কোন সম্ভার থাকা প্রমাণিত হয় না। ইহা দ্বারা তিনিই প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে ১। নিজবাড়ী, ২। অন্তর মহল,

(প্রত্যেক বধুর বাড়ী পৃথক, যথা—অল্পনা

মড়া ও পছনা মড়া) ৩। মাগের বাড়ী।

সবগুলি একে অল্পের নিকটবর্তী অথচ

পৃথক পৃথক।

গোপীচাঁদের রাজবাটীর সহিত কালিকা-

পুরের নৈকট্যসম্বন্ধ আর একটা কথা পাওয়া

যাইতেছে। গোপীচাঁদ সম্মান-যাত্রার পথে

এই গ্রামে ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

* কলমাক নগরী বহু প্রাচীন, চৌদশশতাব্দীর হিসাবানুসারে ইহা দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

† জিলা রিপূরা ৩০শী শতাব্দীর বিজ্ঞত, তদান্যে এই “কালিকাপুর”ও একটি পৃথক পরগণা।

(১) অন্তরমহল। (২) মাগের বাড়ী। (৩) শোত চামর। (৪) আমাদের বাড়ী অর্থাৎ গোপীচাঁদের অন্তরমহল। (৫) ময়ূর। (৬) শাক্তীর বাড়ীতে।

“দিন অবশেষে গেল রাজা গোবিন্দাই। (১)
কলিকা নগরে (২) ভিক্ষা মাগেস্ত জেগাই।
খোও খোও করিয়া দিবাতে দিল ফুল।
পুরী থাকি চারি বধু স্নানিতে লাগে হুঃ।

(শোক)!

গোপীচাঁদের সম্রাসের দিন দিবা অবশেষে
রাজা গোবিন্দাই কলিকা নগরে ভিক্ষামাগিয়া
যোগাইতে ছিলেন। “বুধু” করিয়া সেখানে
দিবাতে যে “হুক” দিয়াছিলেন, পুরী
হইতে তাহা শুনিয়া চারি বধুর “শোক”
লাগিয়াছিল “স্বধু” নহে। ইহাও নকল-
নবীশগণের ফলিত বিদ্যা! তাঁহারা যে
কলিকাকে কলিকা করেন নাই তাহার
বিবাস কি? যাহারা শোকের স্থলে স্বধু
লিখিতে পারেন, তাহাদের দ্বারা অসম্ভব কিছুই
নয়। এই সময়ে গোপীচাঁদের জীর্ণগণের স্বধু
লাগিবার কথা নহে, শোক লাগিবারই কথা।
কলিকা-পূর্বের সিঙ্গার ধ্বনি গোপীচাঁদের
অন্ধর বাড়ী হইতে শোনা গিয়াছিল। এমন
পাঠকগণ তাহার দ্রুত নির্ণয় করিবেন।

“আমি বাড়ী বাঁধিয়াছি মেহারকুলগঙ্গার।”

“চলিঙ্গ রাজ্য কর ঘেয় আমার গোচর।

আমা হতে কোন জন আছেয়ে ভাঙ্গর।” (৩)

ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

ইহাছারাও গোপীচাঁদকে বিশেষ ক্ষমতাশালী
রাজা বলিয়া বুঝা যাইতেছে। আর বুঝা
যাইতেছে তাহার এক ডাকে ৭২ লক্ষ সৈন্য
(পরাতি) উপস্থিত হয়, তাহার ৬২ উজ্জীর
(সেনাপতি), ৬৪ সিকদার (সহকারী সেনা-
পতি), আবার ৮২ হাজার সৈন্য (অবারোহী),
নয় হাজারী দায়কী ছিল। আরো বিশেষ,
তত প্রাচীন কালেও বন্দুকের ব্যবহার
ছিল।—

“সাজ সাজ করি রাজা দিলে এক ডাক।

এক ডাকে সাজি আইল বাহুস্তের লাক।

হস্তি হোতা সাজে আর মোহা মোহা বীর।

সাজিল অপার সৈন্য আঠার উজ্জীর।

বাঘাট্ট উজ্জির সাজি চৌপশ্ট শিকদার।

হোন্তে ঢাল সৈন্য সাজে বিরাগি হাজার।

নয় হাজারী দায়কী সাজে গুণ টকাড়িয়ার।

বন্দুকি সাজিয়া আইল পলিতা হাতে লৈয়া।”

গোপীচাঁদের রাজ্যের চতুঃপার্শ্ব যে অনেক-
গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল তাহা আমরা

খ্রীষ্টাব্দ ১৬৯৯ সালে সিংহ মহাশয়ের রাজমালা

হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। সম্ভবতঃ

ইহাবাই গোপীচাঁদের করণ রাজ্য ছিলেন।

এবং তাহার গণনা ৩০ জন ছিলেন।

(ক্রমসং)

শ্রীমোহিনীমোহন দাস।

হস্তীর জীবন-যাত্রা

রোগের কারণ ও নিবারণোপায়

বহু অবস্থায় হস্তীর রোগাদি খুব কম
হয়। যখন ইহাদিগকে গৃহে রাখিয়া পালন
করিতে আরম্ভ করা যায় তখনই ইহাদের
নানাবিধ রোগ হইতে দেখা যায়। ইহার
কারণ হস্তী বহু-জীব, বনই ইহাদের প্রকৃতি-
সিদ্ধ আবাসভূমি। যদি গৃহপালন-অবস্থায়
ইহাদিগকে বিশেষভাবে যত্ন করা যায়, তাহা
হইলে অনেক রোগ হইতে ইহারা নিষ্কৃতি
পায়। অনেক সময় দেখা যায় গৃহপালিত
হস্তীর প্রতি অত্যন্ত যত্ন লইয়া ইহাদিগের
দ্বারা বহুল পরিমাণে কার্য করা ইয়া লওয়া
হয়। ইহাতে হস্তী ঘর্ষাক্ত হইয়া দুর্বল ও
অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। কোন কোনও হস্তী-
পরিদর্শকের হস্তী সখ্যে আসে জানে নাই।
এ কারণ ইহারা মাহুত এবং হস্তী-পরিচর্যা-
কারীদের শোষণ-বিচারের অসমর্থ। মাহুতেরা
নিজ ইচ্ছামত হস্তীর তত্ত্বাবধান করে রমিয়া
গৃহপালিত হস্তী অনেক সময় রোগাক্রান্ত
হইয়া পড়ে।

ভার-বহন এবং জিনিষপত্র স্থানান্তরিত
করিবার জন্ত হস্তী অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।
যদি ইহারা উপযুক্ত যত্ন পায়, তাহা হইলে
ইহারা প্রায়ই পীড়িত হয় না। হস্তী নম্র,
ধীর ও আত্মবিশ্বাসী। অজ্ঞাত ভারবহনকারী
জন্তাদিগের প্রতি সন্ত্রস্ত যত্ন লওয়া হয়, অনেক
সময় হস্তীর প্রতি সন্ত্রস্ত যত্নও লওয়া হয়
না। যদিও ইহাদের বল খুব বেশী এবং
শরীরের আয়তনও খুব প্রকাণ্ড, তাহা হইলেও
ইহাদের প্রতি উপযুক্ত যত্ন লইতে অবহেলা
করিলে শীঘ্রই ইহারা রোগাক্রান্ত এবং

অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। হস্তীর প্রায়ই পুটে
এবং পদতলে ক্ষত হয়। একটু যত্ন লইলে
কখনও এরূপ হইতে পারে না। ইহাদের
খাদ্য এবং পানীয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি
রাখিতে হয়। যেখানে হস্তী আদৌ চরিয়া
বেড়াইতে পারে না, সেখানে পরিদর্শকেরই
হস্তীর খাদ্য এবং পানীয়ের প্রতি মনোযোগ
দিতে হয়। হস্তীর নিদ্রা অতি অল্পকণস্থায়ী,
এ কারণ যাহাতে ইহাদের নিদ্রার কোনও
ব্যাপ্যাত না হয় সে জন্ত সত্বা হইবামাত্র
রাবারে খাদ্য দিতে হয়। অধিক রাতে
ইহাদিগকে আহার করিতে দিলে আহার্য
চর্ষণ করিতেই ইহারা সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া
দেয় এবং একবারেই নিদ্রা যাইতে পারে
না। যে হস্তী যে পরিমাণ ভার বহন করিতে
সক্ষম, সেই হস্তীকে সেই পরিমাণ ভার বহন
করিতে দিতে হয়। কার্যের পূর্বে এবং পরে
ইহাদের সর্প শরীর বিশেষভাবে পরীক্ষা করা
কর্তব্য। অধিক উত্তাপে ইহাদিগকে অনেক-
ক্ষণ কাঁধ করিতে দেওয়া কোন ক্রমেই
উচিত নহে।

প্রাকৃতিক খাদ্য

হস্তীকে সম্পূর্ণ স্বধু রাখিতে হইলে ইহাদের
আহারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া
কর্তব্য। আহারের প্রতি যত্ন না লইয়া অজ্ঞ
প্রকারে বহু যত্ন করিলেও ইহাদিগকে স্বধু
রাখা যায় না। বাহাছুরি কাঠের কারখানায়
নিযুক্ত হস্তী এবং গভর্নমেন্টের অধীনস্থ হস্তী
ভিন্ন অজ্ঞাত হস্তাদিগকে কার্যের পর জঙ্গলে
ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বনে ছাড়িয়া দেওয়ার
সময় ইহাদের পায়ে বেজনিখিত শৃঙ্গল

(১) “গবিন্দাই বা গোবিন্দাই” বোধ হয় গোপীচাঁদের আখ্যেয় ডাক নাম ছিল।

(২) বৈষ্ণব বাবুর প্রবন্ধে ইহাকে “কলিকানগর” লিখা হইয়াছে, যতনঃ ইহা মুদ্রাক্ষর-প্রমাণ।

(৩) ভাঙ্গর = বৃহৎ।

পর্যায় গলদেশে একট ঘণ্টা বাঁধিয়া দিতে হয়। গলদেশে ঘণ্টা বাঁধিয়া দিলে জন্মলের নিত্যকৃত্যর মধ্যেও ঘণ্টার শব্দ কনিত পায়। ইহার বনের কোন কোন বৃক্ষতায় বাঁধিতে ভালবাসে তাহা জানিতে হইলে বনা হস্তীর বাজ পরিদর্শন করিতে হয়। সাধারণতঃ ইহার বৃক্ষতায় অপেক্ষা ঘাস বাঁধিতে অধিক ভাল বাসে। বাজ সহজে বজ হস্তীর কিছুই অজান নাই। ইহার ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া ইচ্ছামত তৃণলতা ভক্ষণ করিতে পারে। সময়ে সময়ে ইহার পাহাড়ের উপর এবং সময়ে সময়ে নিম্ন সমতল-ভূমিতে চরিয়া বেড়ায়। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ইহার জলাশয়ের নিকট আসিয়া স্নান ও পানের জল যে সমস্ত জলাশয়ের উপরফুলে বিস্তার ঘাস থাকে সেই সমস্ত জলাশয় ত্রিক করিয়া লয়।

হস্তী ইন্দ্রও বাঁধিতে বড় ভাল বাসে। বজ হস্তী ইন্দ্রবনে একবার প্রবেশ করিলে তিন চারি দিনের কম বাহির হয় না। ইহার প্রথমতঃ মূল সহিত ইন্দ্রও তুলিয়া বেঁধে রাখিতে খুব মিষ্ট সেই টুকু খাইয়া অবশিষ্টাংশ ফেলিয়া দেয়। গৃহপালিত হস্তীকেও যদি প্রচুর পরিমাণে ইন্দ্রও বাঁধিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে এক্ষণ অনিষ্ট করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যে পরিমাণ ঘাসা হস্তীর শরীরের পক্ষে বিশেষ দরকার তদপেক্ষা কিছু বেশী দিতে হয়, কারণ ইহারা বাজ গ্রহণ করিবার সময় কিছু কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকে। যদি এক্ষণ না করা যায় তাহা হইলে ইহার ক্ষমতা দুর্বল হইয়া পড়ে। হস্তীর উচ্চতা দেখিয়া ইহাদের বাজের পরিমাণ নির্দেশ করা কঠব্য নহে। শরীর-পোষণের জন্ত যে হস্তীর যে পরিমাণ বাজের প্রয়োজন সেই হস্তীকে সেই পরিমাণ বাজ দিতে হয়।

বেদুগে হস্তীকে অনেক সময় জলীয় ঘাস বাঁধিতে দেওয়া হয়। জলীয় ঘাস ইন্দ্রওয়ের ত্রায় বাধ্যকর বাজ নহে। প্রত্যহ হস্তীকে এই প্রকার জলীয় ঘাস বাঁধিতে দিলে শীঘ্রই ইহাদের বাধ্যভদ্র হয়। সময়ে সময়ে নানারূপ বিযুক্ত পদার্থ জলীয় ঘাসের ভিতর দেখা যায়। হস্তী-পরিচারক যদি এই প্রকার ঘাস বিশেষরূপ 'পরীক্ষা' না করিয়া হস্তীকে বাঁধিতে দেয় তাহা হইলে বড়ই দুঃখল ফলে। জলীয় ঘাস দিতে হইলে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেওয়া উচিত। প্রত্যেক ঘাসের আঁঠু খুলিয়া ফেলিয়া ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। যদি উহার মধ্যে কোনও প্রকার 'অপরিষ্কার' ও 'অপাণ্ডব'র জিনিস থাকে, ভৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। অনেক সময় ঘাস সংগ্রহ করা কঠোর বলিয়া মনেতার নিকটস্থ বৃক্ষপত্রাদি হস্তীকে বাঁধিতে দেয় এবং হস্তী-স্বামীর নিকট 'ঘাস পাওয়া যায় না' বলিয়া অস্থযোগ করে। হস্তীস্বামীর এ বিষয়ে প্রবীর দৃষ্টি রাখা একান্ত কঠব্য। মাহাত্ম্যে যদি হস্তীর উপর উপযুক্ত যত্ন লয়, তাহা হইলে কখনই হস্তীর এত রোগ লভ্য এবং অকালমৃত্যু হইতে না। বৃক্ষ-পত্র, লতা, বেগু ও নানাবিধ ফল হস্তীকে বাজরূপে দেওয়া বাঁধিতে পারে। পেপুল, কলা, দান, তাল, বেল, তরমুজ, নারিকেল, আনারস প্রভৃতি ফলও হস্তী অত্যন্ত ভাল বাসে। স্থবিধামত হস্তীকে চরিয়া বেড়াইবার জন্ত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অনেক রোগে হস্তী এই প্রকারে ভাল হইয়া বাঁধিতে দেখা গিয়াছে।

ইন্দ্রও পাওয়া গেলে অজ কোন ঘাস হস্তীকে না দেওয়াই ভাল। শুক ঘাসের পরিমাণ বুঝিয়া কি পরিমাণ কাঁচা ঘাস

ইহাদিগকে প্রত্যহ দেওয়া উচিত, তাহা ঠিক করিতে হইবে। ভাল কাঁচা ঘাস পাইলে ইহার যে পরিমাণ সহজে পরিপাক করিতে পারে তাহাই দেওয়া বাঁধিতে পারে।

হস্তী বাহাতে রীতিমত বাজ পায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রতিদিন অন্ততঃ ১০০ শত পাউণ্ড আহার্য বাহাতে ইহার পায় তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কঠব্য।

পেপুল পত্র অত্যন্ত উত্তেজক। প্রত্যেক দিন হস্তীকে পেপুল পত্র বাঁধিতে দেওয়া ভাল নয়। শীতকালে কলার পাতা ও গুড়ি ইহাদিগকে দিতে নাই। শুক ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে ইহার রীতিমত কাঁচা ঘাস পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত।

হস্তী একট উৎকট কচিবিবিশিষ্ট জীব। যদি ইহার মনোমত খাদ্য না পায় তাহা হইলে ইহার একেবারেই বাস্য গ্রহণ করে না। ইহাদিগকে কখনও জলা ভূমিতে চরিয়া বেড়াইতে দেওয়া উচিত নহে।

মনুষ্যকৃত খাদ্য

গৃহপালিত হস্তী নৈসর্গিক অবস্থায় থাকে না বলিয়া প্রকৃতজাত বাজ বেশী পায় না। নৈসর্গিক অবস্থায় ইহাদের যে সামান্য শক্তি-টুকু প্রয়োগ করিতে হয় তাহা পূরণের জন্ত ইহার সমস্ত দিন এবং রাত্রে কতকাংশ চরিয়া বেড়ায়। বজ হস্তী অপেক্ষা গৃহপালিত হস্তীর অনেক শক্তি প্রয়োগ করিয়া কার্যাদি করিতে হয় এবং ইহাদের বিশ্রাম-সময়ও অতি স্নান, এ কারণ ইহারা বাহাতে রীতিমত পুষ্টির ঘায়া, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া একান্ত কঠব্য। প্রত্যেক দিন হস্তীকে চাউল, দাছ কিংবা ময়দা খাওয়ান উচিত। ইহা হস্তীর পক্ষে বড় পুষ্টির এবং

ইহার উহা সহজে হজম করিতে পারে। প্রত্যহ ইহাদিগকে ২০ হইতে ৩০ পাউণ্ড পঞ্চাঙ্গ চাউল বাঁধিতে দেওয়া উচিত। যদি চাউল অথবা দাছ সামান্যতঃ চূর্ণ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ইহার উহা আরও সহজে হজম করিতে পারে। অনেকে বলেন যে বাজের খোশা (তুস) হস্তীর পরিপাক-যন্ত্র পারাপ করে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা দ্বারা ইহাদের পরিপাক-যন্ত্রের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। গভর্ণ-মেন্টের অধীনে যে সমস্ত হস্তী থাকে, তাহাদিগকে চাউল দেওয়ার সময় কতকগুলি খড়ও ঐ সঙ্গে দেওয়া হইয়া থাকে। খড়ের মধ্যে চাউলের পুটুলি বাঁধিয়া দিলে ইহার অধিক অনিষ্ট করিতে পারে না। ভারতবর্ষে গমের ময়দা পিষ্টকাকার করিয়া হস্তীকে বাঁধিতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই পিষ্টক-গুলি চিনি, গুড় কিংবা মগুদ্বারা স্নিষ্ট করিয়া দেওয়া বাঁধিতে পারে এবং ইহার সঙ্গে দাল এবং শিরাঙ্গ সিক্ত করিয়া মিশাইয়া দেওয়াও চলে। হস্তীর নাড় পুরিকার রাখিবার জন্ত গমের সময় ইহাদের খাদ্যের সঙ্গে তেঁতুলের শাঁস মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। যে সময় হস্তীর বেশী কার্য কর্তব্য, তখন প্রতিদিন ইহাদিগকে ৩ হইতে ৬ পাউণ্ড পরিমাণ এক একখানি কটী অম্বাজ ত্র্যয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহাদিগকে বাঁধিতে দেওয়া অবশ্য কঠব্য। অহর হইলে চাউল এবং গমচূর্ণের মধ্যে ঔষধাদি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া বাঁধিতে পারে। সামান্যতঃ কিছু খাদ্য দেওয়ার সময় ইহাদিগকে চাউল, দাছ ও গমচূর্ণ বাঁধিতে দেওয়া উচিত।

স্বগন্ধি ময়দা বর্জ্যলুকার করিয়া সময়ে সময়ে হস্তীকে বাঁধিতে দেওয়া হয়। নিম্ন-

লিখিত ব্যবস্থার দ্বারা সাধারণতঃ মসলা প্রস্তুত হয় :—আদা, হরিদ্রা, যমনী, পেঁপাজ, মরিচা, লবঙ্গ, মরিচ, ধনে, এলাইচ, রক্তন, লকা, জায়ফল ইত্যাদি। এই সমস্ত মসলা গ্রীষ্মকালে হস্তীর পক্ষে বড় উপকারী। ইহাতে হৃদযন্ত্র শক্তি বৃদ্ধি করে। উক্ত মসলার উপাদানগুলির সহিত যুত, গুড় কিংবা মধু মিশ্রিত করিয়া দেওয়া চলে। প্রতিদিন ইহাদিগকে মসলা খাইতে দেওয়া ভাল নহে। এরূপ করিলে ইহাদের পাকশক্তি এবং শরীরের অস্ত্রাঙ্গ স্বাভাবিক শক্তিমূহ একে-বারে নিশ্লেষ হইয়া পড়ে। বাতাস্রবোর সহিত লবণ মিশাইয়া মিশাইয়া ইহাদিগকে লবণ খাইতে শিখান উচিত। লবণে হস্তীর নাড়ী পরিষ্কার রাখে। বহুহস্তী লবণের অভাবপূরণের জগ লবণাক্ত মৃত্তিকা খায় এরূপ দেখা গিয়াছে।

এই পরিচ্ছদের শেষে দেখান যাইবে যে সামান্য তহবিল উদ্ধরণ করা এবং হস্তীর

কাঁচা ও শুক খাদ্যের পরিমাণ

	খাদ্য	
	সতেজ কাঁচা Green	শুক (Dry)
বৃহৎ হস্তী (৮-১ ফিটের অধিক উচ্চ)	৬৫০ পাউণ্ড	৩০০ পাউণ্ড
মধ্যমাকার হস্তী (৭-৮ ফিটের উচ্চ)	৫৫০ " "	২২০ " "
ক্ষুদ্র হস্তী (৬-৭ ফিটের অধিক উচ্চ)	৪৫০ " "	২৫০ " "

(২) যখন কলাগাছের গুড়ি, বৃক্ষের ডাল কিংবা বনজাত লতা-গুল্ম ইহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়, তখন নিম্নলিখিত পরিমাণ নির্দিষ্ট করিতে হইবে :—

বৃহৎ হস্তী.....	১,০০০ পাউণ্ড	যদি
মধ্যমাকার হস্তী.....	১,৫০০ " "	বিনা ব্যয়ে
ক্ষুদ্র হস্তী.....	১,০০০ " "	পাওয়া যায়।

(৩) যদি সতেজ কাঁচা খাদ্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শুক খাদ্যদ্রব্য দেওয়া উচিত।

(৪) নিম্নে যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত হস্তীর খাদ্যের পরিমাণ প্রাপ্ত হইল :—

কার্যে নিযুক্ত	শস্ত্রাদি	শুক	কাঁচা	ফুসি	লবণ	তৈল
বৃহৎ হস্তী	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	আউন্স	আউন্স
মধ্যমাকার হস্তী	১৫	২০০	৪৮০	...	২	১
ক্ষুদ্র হস্তী	১৫	১৭৫	৪০০	...	২	১
	১৫	১৫০	৩২০	...	২	১

(৫) হস্তীর বাধ্যাদা যদি মাহুত কর্তন করিয়া দেয় তাহা হইলে সে প্রতিদিন চারি আনা বৃত্তি স্বরূপ পায়।

(৬) হস্তীর বাস্বা ভাল না থাকিলে উপরিতন কর্তব্য উক্ত বৃত্তি বন্ধ করিতে পারেন।

যদি মধ্যম কিংবা চাউলের পরিবর্তে হস্তীকে খাদ্য খাইতে দেওয়া যায়—তাহা হইলে খাদ্যের পরিমাণ চাউলের দ্বিগুণ করিতে হয়।

হস্তীর খাদ্যাদি সঞ্চয় উপরে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা সব সময় গ্রহণীয় নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে একটি মধ্যমাকার হস্তী একটি বৃহৎমাকার হস্তী অপেক্ষা অধিক খাদ্য গ্রহণ করে।

পানিদির ব্যবস্থা

হস্তী প্রাতে ও সন্ধ্যা পান করে এবং জল ভাল হইলে সেই সময়ই প্রয়োজনীয় জল পান করিয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই পানীয় জলের পরিমাণ ১০ হইতে ১৮ গ্যালন পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। যদি পানের জল ঘোলা হয় তাহা হইলে পানের পূর্বে হস্তীকে উপযুক্ত পরিমাণ পরিষ্কার জল পান করিতে দেওয়া কিংবা হস্তীর শরীর ভাল করিয়া ঘোষাইয়া দেওয়া উচিত। স্বরূপ কিংবা কৃপণ জলই হস্তীর পক্ষে প্রশস্ত। অপরিষ্কার জল পান করিতে দিলে হস্তীর নানারূপ পীড়া হয়। হস্তী প্রাতের জল পান করিতে বড় ভাল বাসে। যদিও হস্তী ঘোলা অপরিষ্কার জল

পান করিতে ঘৃণা প্রকাশ করে না, তাহা হইলেও যাহাতে ইহার স্বচ্ছ নির্মল জল পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে স্রোতস্থতীর বাসুকাম্য স্থলের জল রক্ষা করিবার জন্ত গর্ত খনন করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। যে সমস্ত জলাশয়ে গবাদি গৃহপালিত পশু পান করে, সে সমস্ত জলাশয়ে হস্তীকে কোনও ক্রমেই নামিতে দেওয়া উচিত নহে। হস্তী সাধারণতঃ সূর্য উদয়ের এবং সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে জলপান করে। ইহাদিগকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুইবার পান করিতে দেওয়া উচিত। সম্ভব হইলে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবার ইহাদিগকে পান করান যাইতে পারে। খাদ্যগ্রহণের ৪৫ মিনিট পূর্বে ইহাদের পানের ব্যবস্থা করা উচিত। চলিতে চলিতে পথিমধ্যে যদি ইহার জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে ইহাদিগকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর জলপান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। যদি পথিমধ্যে জলের ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে হস্তীকে সেইরূপ রাস্তায় ৭ ঘণ্টার অধিক কাল চলিতে দেওয়া কোনও ক্রমেই বিবেচ্য নহে। এরূপ রাস্তায় ইহাদিগকে

অধিকক্ষণ চলিতে দিলে ইহার শীঘ্রই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

কার্য্য

এক একটী হস্তীর দ্বারা কি পরিমাণ কার্য্য করাইয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার কোনও বাধা নিয়ম নাই। হস্তীর শরীরের অবস্থা এবং মেজাজের উপর কার্য্যের পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। একটী হস্তীর পক্ষে দ্বাদশ সহস্রাবাধা কার্য্য অত্র হস্তীর পক্ষে তাহা সহস্রাবাধা না হইতে পারে। ইহাদের দেহের পরিমাণ, শরীরের অবস্থা, বয়স একরূপ হইলেও কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রায়ই একরূপ হইতে দেখা যায় না। অনেক সময় মাহুতেরা হস্তীর সামান্য সামান্য অনেক রোগের কথা হস্তীস্বামীকে বলে না এবং বলিলেও অনেক সময় হস্তীস্বামী ইহাদের রোগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন না। ফলে হস্তী দিন দিন অধিকতর দুর্বল এবং রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হস্তীর দ্বারা নিম্নমাত্রার কার্য্য করাইয়া লইতে যাওয়াই ইহাদের স্বাস্থ্যভঞ্জন প্রদান করণ। গ্রীষ্মকালে ১১টার অবধি এবং ৩২টার পূর্বে ইহাদিগকে কোন কর্ম্মেই কার্য্য করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে। কার্য্যের সময় তিনঘণ্টা অন্তর ইহাদিগকে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা ছায়াতে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। এই সময় ইহাদের গায়ে জল স্পর্শ করা ফেলিয়া শরীরের বিভিন্নাংশে কোষাঘাত কোনরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে কি না বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। পরিষ্কার জল এবং কিছু খাও এই সময় ইহাদিগকে দেওয়া উচিত।

হস্তী অলস অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে ইহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য।

অনেক সময় কার্য্য না করিতে করিতে ইহার অলস হইয়া পড়ে। হস্তী যদি প্রত্যাহ বাধ্যমেঘে বহির্গত হয় তাহা হইলে ইহার অলস হইতে পারে না। যদি একরূপ করিবার সুবিধা না থাকে তাহা হইলে ইহাদিগকে প্রান্তে ও সন্ধ্যায় ২১ ঘণ্টা ভ্রমণ করিতে দেওয়া উচিত। গ্রীষ্মকালে ১১টা হইতে ৩২টা পর্য্যন্ত ইহাদিগের দ্বারা কোনও কার্য্য করান উচিত নহে। অধিক উত্তাপে কার্য্য করিতে দিলে ইহাদের শর্দি-গর্দি হইতে পারে। হস্তীর শরীর ভাল থাকিলে ইহাদের দ্বারা একটু আট বেণী কাজ করাইয়া লইলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না এবং ইহার জ্ঞাত ইহাদিগকে বেণী বাধ্য দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। রীতিমত খাও পাইলে হৃৎকায় হস্তী দৈনিক ৬৭ ঘণ্টা অপ্রশ্রুত কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু অবিরত ৬৭ ঘণ্টা যদি কঠোর পরিশ্রমের কার্য্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে স্বাস্থ্য হস্তীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কার্য্যের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবা- কার্য্যের পরিমাণ নির্দেশ করিয়া দিতে হয় :—(১) বোঝাইএর পরিমাণ, (২) যাত্রাঘরের রাস্তার অবস্থা, (৩) সময়, (৪) রাস্তার আবরণ, (৫) হস্তী কতদিন কার্য্যের পূর্বে বিশ্রামলাভ করিয়াছে এবং কার্য্যের পর কতদিন বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে, (৬) খাও ও পানীয় জলের পরিমাণ এবং অবস্থা।

হস্তী রাজিতে চরিয়া বেড়াইতে বেশ ভাল বাসে, এ কারণ খুব প্রত্যুহে এবং সন্ধ্যায় ইহাদের দ্বারা অধিক কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়। বোঝা লইয়া হস্তীকে এক সময় অধিক পথ চলিতে দিলে ইহার স্নান হইয়া পড়ে। কাঠের গুড়িগুলি ডারি হইলে উড়া

টানিয়া লইয়া যাইতে প্রথমতঃ ইহার অনিচ্ছা প্রকাশ করে। বলপূর্ব্বক ইহাদের দ্বারা এই কার্য্য করাইয়া লইতে গেলে কিছুদূর গুড়িগুলি টানিয়া লইয়া ফেলিয়া দেয়। ইহাদের পূর্বে কোনগুরু বোঝা চাপাইবার সময়ও বিশেষ বিবেচনা করিয়া বোঝা চাপাইতে হইবে। যদি বোঝা লইয়া অধিক রাস্তা চলিতে হয় তাহা হইলে স্নান বোঝা না করিলে পথিমধ্যে ইহার স্নান হইয়া পড়ে। সময় সময় একরূপ ভাবে অনেক হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, একরূপও দেখা গিয়াছে।

হস্তী ভারবহনকারী জন্তু। কোনও কিছু টানিয়া লইয়া যাইতে হইলে ইহার বড়ই অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং উহাতে সমস্ত বলও প্রয়োগ করিতে পারে না। রাস্তা মত বেণী হয় বোঝাইএর পরিমাণও তত কমাইয়া দিতে হয়।

গর্ভবতীর অন্তর্ভুক্ত হস্তীগুলি সময়ে সময়ে ১০০০ হইতে ১২০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত টানিতে পারে দেখা গিয়াছে।

পাহাড়ের উপর কার্য্য করিতে হইলে ইহাদিগকে তিন ঘণ্টা এবং সন্ধ্যাকালে তিন ঘণ্টা কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। এক এক ক্ষুত্রে যদি এক একটী হস্তী সর্ব্বস্ব ২০০ টন করিয়া টানিতে সক্ষম হয়, তাহা

হইলে যথেষ্ট মনে করিতে হইবে। পাহাড়ের উপর কোন কোন স্থানে স্রোতধর্তাগুলির উপর দিয়া অবাধে কাঠের গুড়িগুলি ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। একরূপ স্থলে হস্তীর কার্য্য অনেক কমিয়া যায়। একরূপ সুবিধা না থাকিলে হস্তীকে অনেক দূর পর্য্যন্ত কাঠগুলি টানিয়া লইয়া যাইতে হয়।

অল্পকাল বড় বড় কাঠ টানিবার জ্ঞাত একরূপ গাড়ী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা হস্তীর পরিশ্রমের অনেক লাভব হইয়াছে।

কার্য্য করিবার পূর্বে ও পরে হস্তীর শরীরের কোনও অংশে কোনও রূপ ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে কি না বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। কার্য্য করিবার পর ইহাদের পৃষ্ঠদেশ ভাল করিয়া টিপিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কার্য্যের সময় শুও এবং পদতলের মধ্যে কোনও কটক কিংবা বীশের গোঁল প্রবেশ করিয়াছে কি না কার্য্যের পর ভাল করিয়া দেখিতে হয়। বর্ষাকালে ইহাদের শরীরে উলুন হয়। যাহাতে একরূপ না হইতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। উলুনের দ্বারা অনেক সময় ইহাদের শরীরের উপর ক্ষত উৎপন্ন হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র সাম্যাল, এম, বি

ও

শ্রীগিরীশ্রুৎশেখর বসু, বি, এন্স, সি
এম, বি।

প্রাচীন চীনের শিক্ষাপ্রচারক

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর ইতিহাস ভারতের একটা গৌরবময় অধ্যায়—রাষ্ট্রনীতির ও ধর্মনীতির অস্বাভাবিকতা। সেই সময় বঙ্গে পরাক্রান্ত পালরাজ্যের রাজত্ব করিতেছিলেন, নালন্দার মঠে শ্রমবণগ শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন, সমস্ত বঙ্গদেশ তখন বৌদ্ধ-ধর্মে দ্রাবিত। তখন বকীয় শিরী বিটপাল ও বীমান তাঁহাদের কলাবিজ্ঞান চীন, নেপাল তিব্বত প্রভৃতি দেশকে মুগ্ধ করিতেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে চোল রাজ্যের পালবংশীয় নরপতিগণের দ্বারা ধর্মরাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন। সমগ্র ত্রাবিড়প্রদেশে শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইতেছিল। কনৌজে ও কাশ্মীরে তখনও পরাক্রান্ত নৃপতিগণ বেশের গৌরবরক্ষা করিতেছিলেন। ভারত হইতে তখনও বহু বহু পণ্ডিতগণ নিজ নিজ জ্ঞান ও ধর্মদেশের সভ্যতা লইয়া চীনে গমন করিয়া বহুতর ভারত গুপ্তিতেছিলেন। চীন-রাজ্যের ভারতীয় অধঃগণের সম্মান-প্রদর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সেই সময়ে ইউরোপখণ্ডে, মাঝে মাঝে, এলফ্রেড প্রভৃতি নরপতিগণ রাষ্ট্র, সাহিত্য ও শিক্ষার সংস্কারসাধন করিতেছিলেন। সারলেমেন (Charlemagne) খৃঃ ৮০০ অব্দে রাজ-বিহাঙ্গনে উপবেশন করেন। সেই সময় মুসলমানদিগের গৌরববৃদ্ধি চলিতেছিল। পাশ্চাত্য সারলেমেন (Charlemagne) মুসলমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচারিত স্বরূপ পরাক্রান্ত প্রাচ্যদ্রুপতি হারল্ড-অল-রিঙ্গের নিকট সন্ধি ও প্রীতির চিহ্নবরূপ উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন।

এই সময়ে চীন-সম্রাট সিন্ সাং (Hsien Tsung) তাঁহার একজন সভাবাদী মন্ত্রী মন্ত্রি এবং স্বীয় উদার শাসনের দ্বারা একটা বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহাই একমাত্র "গৌরবের ও আশ্রয়ের বিষয় যে" নবম শতাব্দীতে দুইটা প্রধান সমবেত শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা মধ্যেও চীন সাম্রাজ্য সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ প্রাধান্ত রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। আমরা এই প্রবন্ধে চীনের সেই মন্ত্রীমন্ত্রীর জীবনের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ করিব।

মন্ত্রীমন্ত্রীর হানিউ নাম্নিকের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা হইতে স্বকীয় প্রতিভা-বিকাশোপযোগী বিষয় কোন সুবিধাই পান নাই। কিন্তু যদিও পার্থিব উত্তরাধিকারীর দ্বারা বংশগত যোগ্যতাহ্রদ্বারাও অনেক সময় ত্রুণ আশা করা গিয়া থাকে, কিন্তু সময়ে সময়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটয়াইয়াছে। হানিউর জীবনকেও আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। পুরুষাধিক্রমে অজ্ঞিত ভীকৃতার মধ্যে সাহসের একটা উজ্জ্বল গৌরবময় রেখা, অথবা বাদ্যবীর্যের অজীর্ণিত অভিসম্পাতের ফলে চিরমৃত্যুর মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বল রশ্মি প্রজ্জ্বলিত হইতেও দেখা যায়। এই সকল অভাব-অসুবিধার মধ্যে দিয়া যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা শৌর্ধ্য-মহত্ত্ব, ধর্ম-ভক্তি, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা দেশ প্রাণিত করেন। ইহারা শুধু ধর্মীর গৌরব-বুদ্ধির নিমিত্তই যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমরা যে ধর্মবীর্যের জীবনী আলোচনা করিতেছি তিনিও এইরূপ ছিলেন।

খৃঃ ৭৬৮ অব্দে চীনদেশে হানিউ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন উচ্চবংশে বা কোন রাজপরিবারের অঙ্গুল ঐশ্বর্যের অংশভাগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, অথবা বংশগত কোন সম্মানের দাবীও তাঁহার ছিল না। তিনি অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন। হানিউ স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে শ্রেষ্ঠ লেখক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ বলিয়া দেশময় খ্যাতি হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী চীনভাষার আদর্শ। তিনি নিজ প্রকৃতিগত উদারতা ও অমায়িকতা দ্বারা সকল শ্রেণীর লোককেই বাধ্য করিয়াছিলেন।

সম্রাট সিন্ সাং (Hsien Tsung) অনেকাংশে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি পার্থিব সৌন্দর্যের অসারতা মধ্যে মগ্ন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি জনসাধারণকে বুদ্ধের মহত্ত্ব বুঝাইয়া, তাঁহার কেশ-নখাদির পূজা প্রদান করিয়াছিলেন।

চীন-রাজমন্ত্রী হানিউ (Hanyu) বৌদ্ধ-ধর্মকে ঘৃণা করিতেন। ঐশ্বর্যশালী ও ক্ষমতাবান চীন-সম্রাট নিজ বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে কোন কাজে হাত দিতেন না। কোন এক সময় যখন তিনি সমস্ত নাগরিক-গণকে আশ্রয় করিয়া একই আসনে উপবেশন করিয়া অমৃতকণ্ঠে গুণগান করিয়া বুদ্ধের প্রতি সম্মান দেখাইতে ছিলেন, সেই সময় সমবেত জনতার মধ্য হইতে কণ্ঠের কঠোর নিম্নে সমাগত জনমণ্ডলকে নিরন্তর করিয়া চীন-রাজমন্ত্রী স্বীয় আরাধ্য দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন "বুদ্ধ অসত্য জাতির সম্মান, তাঁহার পরিচয়

বসন-ভূষণাদি চীনীয়দিগের অস্বরূপ ছিল না, তাঁহার ভাষাও চীনীয়দিগের মত নহে, তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা ধর্মমত বুঝাইতে পারেন নাই, পিতা-পুত্র, রাজা-মন্ত্রী মধ্যে সেইও ভালবাসার পরিচয় বন্ধন স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। আমাদের রাজধানীতে তাঁহার আগমনে একে মাজাই বুঝাইতেছে যে, তিনি তাঁহার স্বদেশ হইতে একটা স্বাধীন জাতির স্থিতি ও শান্তি স্থাপন করিবার নিমিত্তই দৌতাগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং চীন সম্রাটও তাঁহাকে তদস্বরূপ সম্মান আদান-প্রদান দ্বারা আশ্বাসিত করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।"

হানিউ স্বীয় যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, ধর্মনীতির ভিতর দিয়া জাতিগত বিবেকের বহিঃপ্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন। নিজকে একজন ধর্ম-প্রচারকের আসনে উপবেশন করাইবার জন্য জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন।

হানিউ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা হইল না। জনসাধারণ তাঁহাদের সম্পত্তি—বুদ্ধের বাণী ত্যাগ করিয়া সংসার-ব্রহ্মণ্য আর অভিজ্ঞত হইতে চাহিল না। জনসাধারণ তাঁহার বিরুদ্ধে পাড়াহুইল। চীন-সম্রাট নিজেরও তাঁহাকে বুদ্ধ-বিষয়ে প্রতিপত্তি করিয়া, মন্ত্রি হইতে বিদায় দিয়া সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশে কাটনের নিকটবর্তী গভীর অরণ্য-প্রদেশে কোন একটা সামান্য রাজ-কন্ঠে নিযুক্ত করিয়া নিঃসঙ্গ করিলেন। যিনি একদিন চীনের রাজধানীতে নাগরিক-গণের মধ্যে স্বীয় প্রতিভা বিকাশের ও উদ্দেশ্যশক্তির উপায় খুঁজিতেন, সেই রাজমন্ত্রী হানিউ আজ সাম্রাজ্যের একটা অজান্ত

অশ্রুত প্রদেশে দৈহিক জীবনের একটি নূতন অধ্যায়ের উন্মেষ করিতেছেন। আজ তাঁহার উদ্বেগ-সিদ্ধির প্রতিবৃদ্ধি কেহই দাঁড়াইয়া রহে নাই, অথবা তাঁহার বাণ্যবিক্রাসের কোশলে কেহই মুগ্ধ হইয়া যায় নাই। অরণ্যানীর গভীরতম প্রদেশে তাঁহার মস্তিষ্কের আজ আর সে সমায়ব নাই।

হানিউ বুদ্ধবান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই নিৰ্দ্ধন প্রদেশে যে ক্রিয়াক্ষিত্র পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে চিরকাল সজীবিত করিয়া রাখিবে। অসভ্য অশিক্ষিত সমাজে এখন তাঁহার জীবনের সাধী, হানিউ তাঁহারিগকে শিক্ষা দান করিয়া শাস্তি অম্লভব করিতেছিলেন। তিনি আজ একটি নগজ প্রদেশের নরনারীগণের জ্বর-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন।

ক্ৰমশঃ তাঁহার কৃত্তিকাহীনী চীনরাজ-দরবারে উপস্থিত হইল। গুণগ্রাহী সম্রাট তাঁহাকে রাজধানীতে আনাইয়া স্বর্যকাল পর আবার সম্মান করিলেন। হানিউ পুনরায়

উপযুক্ত আগনে আসীন হইলেন। ইহার কিছুকাল পরই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধিস্তম্ভের উপরে খোদিত ছিল—
“তিনি যে পথ দিয়া গমন করিতেন, তাহা পবিত্র হইয়া যাইতে।”

ইহার প্রতি অক্ষরে হানিউর প্রতি তাঁহার স্বদেশবাসিগণের গাঢ় মেহ মিশ্রিত রহিয়াছে। তিনি বিপুল প্রতিভা, লইয়া অশিক্ষিত পরিবারে, দরিদ্রসমাজে জন্মিয়াছিলেন, আবার জীবনের শেষভাগে তাঁহাদের জগৎ জীবন পাত করিয়া নিম্ন কর্তব্য সাধন করিয়াছেন। যদিও এক সময় তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার চরিত্র স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে, বংশের কবিগণের কাব্যে ও গাথাব্য চিরকাল প্রকাশিত রহিয়াছে। চীনের হৃদয়ে তাঁহার দৃতি রহিয়াছে। নবম শতাব্দীর ইতিহাসে তিনি প্রাচীন চীনের শিক্ষা-প্রচারক বলিয়াই খ্যাত থাকিবেন।

শ্রীবিদ্যোদেবহারী চক্রবর্তী।

ভারতীয় স্থপতি-শিল্প

(আচার্য্য ভাস্কর ব্রজেননাথ শীলের মতামত)

আচার্য্য ভাস্কর ব্রজেননাথ শীলের নাম জগৎ-বিখ্যাত। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভার কথা দেশ ও জাতির গভী অতিক্রম করিয়া সমস্ত সভ্য জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। মানব-জ্ঞানের এমন বিভাগ নাই যাহাতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি অসামান্য নহে। দর্শন, সাহিত্য, গণিত, অর্থনীতি, ইতিহাস, কোন

বিষয়েই তাঁহার সমকক্ষ লোক পৃথিবীতে অধিক নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রাজগোহী সাহিত্য-সাম্রাজ্যে সত্যই বলিয়াছিলেন—
“তাঁহার ছায়া পণ্ডিত লোক বহুশত বৎসর ভারতবর্ষে ছায়ে নাই এবং শীঘ্রই যে জন্মিবে তাহাও আবার মনে হয় না।”

ভারতের প্রত্যেক শিক্ষিত ও বিজ্ঞানসাহী

লোকই তাঁহার নাম অবগত আছেন। কিন্তু ধুংসের বিষয় তাঁহার দেশবাসী এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এতদিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে King George V Professor of Philosophy পদে মনোনীত করিয়া যথেষ্ট গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। গত ১৯ই অক্টোবর হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে Comparative Philosophy অর্থাৎ তুলনামূলক দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে ইহাতে একটি নূতন যুগের অবতারণা হইল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। Comparative Philosophy সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশেই প্রণালী বন্ধভাবে (Systematically) আলোচনা হয় নাই। কারণ ইহা করিতে হইলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত দর্শনেই অসামান্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। তাঁহার ছায়া ব্যক্তি যখন একাধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন শীঘ্রই জগতের দর্শনে ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় যুক্ত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমরা ভাস্কর শীলের ছাত্র। আমরা মনে করিয়াছি বর্তমান যুগের বহু প্রয়োজনীয় প্রশ্নের তাঁহার কি সমাধান আছে, তাহা জানিয়া প্রকাশ করিব। এ বিষয়ে পূজনীয় অধ্যাপক বিপিন বাবুই বাঙ্গালা সাহিত্যে পথ-প্রদর্শক। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ-ভাবে ঋণী।

বর্তমান প্রসঙ্গ ভারতের art ও architecture লইয়া। শ্রোতার পক্ষে এ বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান আছে মনে না করিয়া তিনি এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় বিষয় বিবৃত

করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ইহাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা হইবে না।

বহু যোগেশ্বরনাথের সহিত একদিন বেলা আটটার সময় এই উদ্দেশ্যে রামমোহন সাহার লেনে আচার্য্য শীলের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখন অধ্যাপক প্রমথ বাবু ও অপর কয়েকজন ভ্রমরকে উপস্থিত ছিলেন। প্রমথ বাবুর সহিত আলাপ হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কি মহাশয় সেদিন ভাস্কর শীলের বক্তৃতা কি সমস্ত বুলিতে পারিয়াছিলেন?”
আমি বলিলাম “না, সম্পূর্ণ পারি নাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক নূতন কথা তিনি বলিয়াছেন যে, সমস্ত বিষয় ধরিতে পারি নাই। সেই জন্তই ত আজ আসিয়াছি।”

ভাস্কর শীল শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—
“আগামী সপ্তাহ হইতে আমি তোমাদিগকে আর একদিন করিয়া lecture দিব তাহাতে।”

প্রমথবাবু আমাকে বলিলেন “মহাশয় উহাকে বিশেষ গাটাইবেন না। যদি তাঁহার শরীর আবার অসুস্থ হয় তাহা হইলে একেবারে সকল বিষয়ই পণ হইবে।”

এই সকল কথা পরে প্রমথবাবু ও তাঁহার বন্ধুগণ উঠিয়া গেলেন। আমরা দুইজন ও ভাস্কর শীল রহিলাম। তখন হিন্দু-সভ্যতা সম্বন্ধে আমি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। বহু যোগেশ্বরনাথ পূর্বেই কাগজ পেলিল লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি যথাসম্ভব ভাস্কর শীলের কথাগুলি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন।

ভাস্কর শীলকে প্রথমেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

“আপনি দেখিন যে বলিয়াছিলেন রামাহুজ তাঁহার ভজনের অনেক স্থানে খুঁটান যোমান কাব্যোলিক ধর্মের ভজনের অহুসরণ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কি বিশেষ কোনো প্রমাণ পাইয়াছেন?”

ডাক্তার শীল বলিতে লাগিলেন—

“রামাহুজের ভজনের অনেক স্থানে খুঁটান ধর্মের যে কোনো কোনো ভাবের আভাষ পাওয়া যায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দূর্বাস্তবস্থাপন বলা যাইতে পারে রামাহুজের লক্ষ্যের চিত্র Mary's Intercession for sinners এর আভাষে অঙ্কিত। এত-স্ত্রির Christian Sonship ও Parable of the Prodigal Son এর ছায়াও স্থানে স্থানে বিশেষ ভাবে স্বেচিত পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ অল্প কিছুই নাই। তবে ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—রামাহুজের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বের কোনো সাহিত্যে এরূপ ভাবের আভাষ পাওয়া যায় না। রামাহুজ যে সময়ে তাঁহার পুস্তক লিখিয়াছিলেন সে সময়ের পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—তখন খুঁটান ধর্ম দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিশেষ প্রবল ভাবে বিরাজ করিতেছিল। এমন কি তাঁহার জন্মের বহু পূর্বে হইতেই উহা ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তামিল সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে সাহিত্যের বহু বিখ্যাত লেখকই খুঁটান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এমন কি খুঁটানেরা একস্থান নবীন বেদ পর্যন্ত প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে

পারি রামাহুজের দর্শনের উপর খুঁটান ধর্মের প্রভাব বিস্তার করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

“ইহাতে কিন্তু অস্বাভাব্য কোনো কারণই নাই। ভারতবর্ষের সভ্যতার ইহাই এক বিশেষত্ব যে-দরিদ্র ভারতবর্ষ বাহির হইতে অজ্ঞাত জাতির কোনো কোনো সাধনা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু তবুও সে তাহাকে তাহার Synthetic genius এর সাহায্যে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। ভারতের Art and architecture সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। গ্রীকদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ এ বিষয়ে অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এমনই তাহার National peculiarity যে সে ইহাকে তাহার নিজের সাধনার অঙ্গরূপ করিয়াছে।”

এই স্থানে আচার্য্যকে বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

“গ্রীকদের নিকট হইতে যে হিন্দুদের Art and architecture borrow করা, সে সম্বন্ধে কি বিশেষ কিছু প্রমাণ পাইয়াছেন?”

ডাক্তার শীল বলিতে লাগিলেন—

“প্রমাণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আছে। তবে একটি কথা বলিলেই বুঝিবে যে, গাছার form of architecture এ হারকিউলিসের উপাখ্যান ঘটিত অনেক বিষয় উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের একটি বিশেষ ভুল যে আমরা মনে করি বিশেষ হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছি, ইহা স্বীকার করা অস্বাভাব্যজনক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। সম্ভাব্যতার চিত্রই হইতেছে Assimilation এর সম্পূর্ণ originalityর দিক দিয়া দেবিত্ব গেল গ্রীকদের architecture ত তাহাদের নিজের নহে। উৎকর্ষ Egyptiansদের নিকট হইতে গৃহীত।

Art ও Architecture এর প্রথম উঠাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

“দক্ষিণ ভারতবর্ষের অনেক দেব-মন্দিরে যে বহু সুকৃতিপূর্ণ চিত্র উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আপনার ব্যাখ্যা কি? এবিষয় লইয়া ত অনেকে অনেকই কল্পনা জল্পনা করিতেছেন।”

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই আচার্য্য বলিলেন—

“হঁ, এ বিষয়ে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এ সম্বন্ধে আমাকে কে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন আমি যাহা বলিয়াছিলাম বোধ হয় তাহা কোনো magazine এ published হইয়া থাকিবে। সেদিন বিপিন বাবু (Prop. B. V. Gupta) এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ইহার ব্যাখ্যা আমার যাহা মনে হয় তাহা বলিতেছি।

“বাস্তবিকই পবিত্র দেবমন্দিরের গাছে কিরূপে যে এরূপ অশ্রীল চিত্র আসিল, ইহা প্রশংসিত বড়ই বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ ইহার কারণ অহুসন্ধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে ইহা বাধাক্ষেপের প্রেম-ঘটিত ব্যাপার হইতে গৃহীত হইয়াছে। কেহ বা আবার ইহার মূল বৌদ্ধ উপাখ্যানে নিহিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে ইহার কোনটাই সত্য নহে। বৈষ্ণব বা বৌদ্ধধর্মের সহিত ইহাকে কোনো দিক্ দিয়াই সংশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে না।

“ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে গেলে আমাদেরকে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষের architecture এর initiative, monks অথবা সম্রাটদের নিকট হইতে

আসিয়াছিল। ইহা এ দেশের একটি বিশেষত্ব। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ ও অজ্ঞাত বিষয় আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। এই সকল monks বা সম্রাটী ভাঙ্গর ও শ্রমজীবীদিগকে suggestions দিতেন। তাহারা ইহার উপর নির্ভর করিয়াই মন্দিরাদি গঠন করিত।

“এখন ভারতবর্ষের সাধনার একটি ইহাই বিশেষত্ব যে ভারতের জাগরণ কখনই পরলোকের কামনা করিয়া কোনো কার্য করেন নাই। তাঁহারা মুক্তি চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সে মুক্তি পৃথিবীর বাহিরে অল্প কোনো পারলৌকিক জীবনে নহে। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল জীবমুক্তি এবং এই মুক্তি লাভ করিবার জন্ত তাঁহারা passions বা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতীয় mediaeval বা মধ্যযুগের ইহাই সর্বোৎকর্ষ প্রাধান বিশেষত্ব (important character)। European mediaeval times এর তুলনায় এ বিষয়ে এ দেশের একটি বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে পরে বলিব।

“ভারতবর্ষীয় জ্ঞানী সম্রাটীরা এই যে প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া মুক্তি চাহিয়াছিলেন—ইহার জন্ত তাঁহারা ভিত্তি ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একটি বিষয় এই ছিল যে, যে প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিতে হইবে তাহা দিগপকে বীভৎস ভাবে বাহ্য আকার প্রদান করা। যাহাকে principle of auto-suggestion বলে অনেকটা তাহারই উপর ইহার ভিত্তি ছিল। ক্রমাগতঃ প্রবৃত্তিগুলিকে এইরূপ বীভৎস ও ভীষণ ভাবে কল্পনা করিতে করিতে সমস্ত

অন্ধকরণ ইহা হইতে যুগায় দূরে সরিয়া আসিবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। শিকা বিষয়ে এ প্রথমে অবলম্বন করা যে নিরর্থক নহে, এ সম্বন্ধে কোনো কোনো পাক্ষাত্য পণ্ডিতও আজকাল এই কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তরূপ ফ্রান্সের মৃত মহাপণ্ডিত Guyan-এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

“যাহা হউক এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা দেবমন্দির ও অস্ত্রাস্ত্র উপাসনা যাহা এই সকল ভীতস্ত্র চিত্র উৎকর্ষ করাইয়াছিলেন। ইহা হইতেই বৃষ্টিতে দেব-উপাসনা-গৃহে অশ্লীল চিত্রের ও ভাঙ্কণের উৎপত্তি হিন্দুদের মধ্যে নৈতিক অবনতির প্রমাণ নহে। বরং ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ moral ও religious”.

আবক্ষিত মুখ দোলাইতে দোলাইতে ক্রমশঃ উত্তেজিত কর্তে আচার্য যখন এই সকল বাখ্যা করিতেছিলেন আমরা সকলে মরমুগ্ধের স্থায় বসিয়া তাহা শুনিতেছিলাম। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসাধারণ মনোমী ও অশূর্ষ বাখ্যা-নৈপুণ্য দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যে দেশে এমন লোকের জন্মগ্রহণ এখনও সম্ভবপর হইয়াছে, যে দেশের ভবিষ্যৎ কখনই নৈরাশ্যপূর্ণ নহে।

আচার্য শীল বলিতে লাগিলেন—
“তাহা হইলেই দেখিতেছে এই সকল উৎকর্ষ চিত্রের মধ্যে বৌদ্ধ অথবা বৈষ্ণবীয় ভাব কিছুই নাই। বাসনার বস্তকে ধর্ম্য ও ভীষণ ভাবে কল্পনা করিয়া তাহা হইতে চিত্রপটিক রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল।

“কিন্তু এইখানে প্রাচীন monk-গণ একটা মহাজয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার

আপনাদের আধ্যাত্মিক সাধনার নিরাপদ পরিবার মধ্যে থাকিয়া যথিতে পারেন নাই যে, প্রাকৃত জনের চিত্রে এই সকল চিত্রের প্রভাব মঙ্গলজনক হইবে না। জনসাধারণের অশিক্ষিত মন ইহা হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হথতো গ্রহণ করিতে পারিবে না ইহা তাঁহাদের মনে হয় নাই। ফলে হইয়াছেও তাহাই। এই সকল mural decorations জনসাধারণের মধ্যে “নৈতিক অবনতি বিস্তারের একটা প্রধান কারণ হইয়াছে। আমার মনে হয় দক্ষিণ ভারতবর্ষে অনেক দেবমন্দিরের সহিত যে সকল ব্রূপ্রথা বিজড়িত রহিয়াছে ইহাই তাহার মূল কারণ।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“অনেক চিত্রে দেখিতে পাই—কোনো ঘোঁষী বা সমাসী মালা জপ করিতে করিতে এই সকল অশ্লীল কার্যের প্রশংসা দিতেছেন—ইহার কারণ কি মনে করেন?”

ডাক্তার শীল বলিলেন “ইহার উত্তর অতি সহজ। বহন দেশে mural decoration-এর এইরূপ একটা tradition হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহাকে অবলম্বন করিয়া অল্প উদ্বেগ সাধন করা দেশের অল্প কয়েক লোকের পক্ষে কঠিন হয় নাই এইজন্য এদেশের ভিত্তি উদ্ভাসক-সম্প্রদায় যখন আপনাদের মধ্যে কলহে ব্যস্ত ছিলেন তখন একদল আর একদলকে সাধারণের চক্ষে ছেয়ে বসিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে এইরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন ইহাতে বিশ্বাসের কিছুই নাই। বরং এই type-এর মধ্যে শ্রেণী বিশেষের ও ব্যক্তি বিশেষের tastes ও requirements অস্বাভাবিক variation হওয়াই স্বাভাবিক। এই বৃহৎ পণ্ডিতের মধ্যে স্বাধীন শক্তি প্রকাশের যথেষ্ট অবসর ছিল।

আমি বলিলাম “স্বাপনি যাহা যাহা বলিতেছেন সমস্তই যুক্তিসিদ্ধ ও অতি original বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু আমি একটা বিষয় বৃত্তিতে পারিতেছি না—কেন উড়িষ্যা ও দক্ষিণাঞ্চলেই প্রধানতঃ এই শ্রেণীর mural decorations-এর প্রাচুর্য্য হইল?”

“আচার্য্য আগ্রহের সহিত উত্তর করিলেন—“হাঁ, আমিও তাহাই বলিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু তাহা বলিবার পূর্বে কেন এরূপ traditions আদৌ স্বাভাৱী হইয়া তাহাই বলিতেছি। ইহার প্রধান কারণ এই যে ভারতবর্ষের power of rejection অথবা পরিবর্জনকারিণী শক্তির বিশেষ অভাব। ইহা হইতেই তাহার conservatism। হস্তায় একবার mural decoration-এর বেদী দর্শনে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, দোষণ স্বর্গদেবও তাহা রহিয়া গেল। বিশেষ পরিবর্তন হইল না।

“কিন্তু ইহাতে কেন Southern India-তেই বিশেষ ভাবে ইহা থাকিল তাহা বুঝা যাইতেছে না। তাহা বৃষ্টিতে গেলে দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসে তামোদিগকে কিছু কিছু বলিতে হইবে।

“যখন সামাজিক ইতিহাসের কথা উঠিল তখন একটা কথা তোমাদিগকে না বলিয়া পারিতেছি না। আচার্য্য বিশ্বাসের পক্ষে তাহা নিতান্ত অগ্রাসঙ্গিকও হইবে না। বৈদিক সাহিত্যে প্রভূতি আলোচনা করিলে মধ্যে বাণ্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। ইহা স্বাভাবিকও নহে। সমাজের প্রথম অবস্থাতে যখন বিবাহের বিশেষ কোন দৃঢ়-বন্ধন হয় নাই এবং যখন জীপুসুকের আসক্তির

উপরই, আমরা যাহাকে বিবাহ বলি, তাহা নির্ভর করিত তখন অধিক বয়সে বিবাহই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ আর্থোরা শীত-প্রধান দেশের আদিম অধিবাসী, এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ত এ সম্বন্ধে বিশেষ হস্তক্ষেপ হইতে পারে না। যে কারণেই কোন বৈদিক যুগে early marriage-এর প্রচলন ছিল না—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু স্থতির যুগে মনুষ্য প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। এই ছুই যুগের মধ্যে এই যে সামাজিক প্রচার একটা বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, ইহার কারণ কি?

“Southern Indiaতে আর্থদিগের উপনিবেশ স্থাপন হইবার পূর্বে অনাধ্য আদিব্রজাতি বাস করিত। আর্থোরা যখন তথায় আগমন করিলেন তখন এই সকল জাতি মধ্যে promiscuity ও polyandry বিশেষভাবে প্রচলিত। Sexual relation সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। কিন্তু পক্ষান্তরে আর্থ উপনিবেশিকদের মধ্যে তখন Patriarchal form of family প্রচলিত হইয়াছে। সামাজিক অত্যন্ত নিয়ম অনেক পরিমাণে দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে তখন বালা বিবাহের আরো প্রচলন আরম্ভ হয় নাই।

“এইরূপ বিভিন্ন সামাজিক রীতিপদ্ধতি লইয়া ইহুদি বিভিন্ন জাতি যখন দক্ষিণ ভারতবর্ষে মিলিত হইল, তখন সভ্য ও শক্তিশালী আর্থজাতি প্রথমতঃ অনাধ্য আদিব্রজ সভ্যজাতিকে অভিজ্ঞত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহাকে নিজের

অস্বীকৃত করিয়া লইতেই বাধ্য হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে আৰ্য্যসমাজে কুমারীগণের বিবাহের ব্যয়ক্রম কমাইয়া দিতে হইল। পারিপার্শ্বিক promiscuityর মধ্যে থাকিয়া আৰ্য্যকুমারীগণের চরিত্র অবনত হইয়া পড়ে, এইজন্য অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাহাদিগের বিবাহের ব্যবস্থা হইল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রিপূর উত্তেজনা শীতপ্রধান দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক—ইহাও অপর কারণ হইতে পারে, সন্দেহ নাই। ইহার আর একটি ফল এই হইল যে, আৰ্য্যগণকে বিবাহের definition অর্থাৎ সমাজী wider করিয়া লইতে হইল। গান্ধারী, রাক্ষস, পৈশাচ প্রভৃতি যে সকল বিবাহের কথা আমরা স্মৃতিতে দেখিতে পাই, এই থানেই ইহার উৎপত্তি। অনার্য্য প্রথাকে দ্বাঙ্গ্য influenceএ পরি-
মার্জিত ও সম্ভবমত বিতর্ক করিয়া একটি religious sanction দেওয়া হইল।

“হায়া হউক, ইহা আমাদের বর্তমানে আলোচ্য বিষয় নহে। দক্ষিণ ভারতবর্ষেই বিশেষ করিয়া obscene mural decoration কেন আসিল ইহাই আমরা বুঝিতে-
ছিলাম। সেখানকার আসিম অধিবাসী ত্রাণ্ডি জাতির মধ্যে sexual relationএ বিশেষ strict ধরণের ছিল না—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। স্বতরাং সেখানে mural decorationএর এই ধারা সামাজিক প্রথার সহিতই বেশ মিশিয়া খাপ খাইয়া গিয়াছিল। সমাজগত ভাবের সহিত তাহার কোন বিরোধ উপস্থিত না হওয়াতে ক্রমে তাহা সেখানে স্থায়ী পাঁড়িয়াই গিয়াছিল।”

ডাক্তার শীলের কথা শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাস্য করিলাম—“আমাদের দেশে এই

দুইটা ভিন্ন আর কি architectureএর ধারা আছে জানিতে ইচ্ছা করি।”
যড়িতে দশটা বাহিয়া গিয়াছিল। আচাৰ্য্য এক ঘণ্টারও অধিক কাল আমাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, কিন্তু তবুও কিছুমাত্র বিরক্তি বোধ না করিয়া প্রশ্নের চিত্রে উত্তর করিলেন—

“আমাদের দেশের architectureকে সাধারণতঃ তিন ধারায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমটির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা এক হিসাবে ভারতবর্ষেরই বিশেষ প্রাণী। তবে আর এক হিসাবে যুরোপে ইহার analogous একটি architectureএর ধারা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

“ইহা ছাড়া আর দুইটা ধারা এদেশের architectureএ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা যুরোপের architectureএ-ও বর্জমান।

“তাহার মধ্যে একটি হইতেছে supernatural বা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটিত বিষয় হউক, ইহা আমাদের নানা যুগে নানা ধর্ম মুক্তিবাস্তা লইয়া ‘আবিকৃত’ হইয়াছে। অবতারবাদ ভারতবর্ষের একটি প্রধান বিশেষ—বাহার সহিত যুরোপের কথঞ্চিৎ মানুস্ব থাকিলেও সম্পূর্ণ একা দৃষ্ট হয় না। সমস্ত দেশের উপর এই যে ধর্মবীরগণের, অবতারগণের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল তাহার ফল architectureএ প্রকাশ পাইয়াছিল। ভারতের বহু মন্দির-গারে ভগবানের লীলাঘটিত নানা চিত্র এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই এই শ্রেণীর mural decoration সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্ভিষ্টাছিল। বুদ্ধের জন্ম কৰ্ম মৃত্যু—
যাহাকে অতিপ্রাকৃত আকাশ প্রদান করিয়া

বৌদ্ধ জাতকের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারই architectural expression মন্দিরে, গিরিজাহাট ও বৌদ্ধমুর্তিতে দেখিতে পাই। Museumএ একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই এই শ্রেণীর architectureএর নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে দেখিবে।

“কিন্তু বৌদ্ধ ভিন্ন বৈষ্ণবীয় প্রভৃতি মধ্যে ভগবানের লীলা লইয়াও অনেক mural decoration ও মুর্তি দেখিবে। মৎস্য কৃষ্ণ ব্রাহ্ম প্রভৃতি বহু অবতার অস্তিত্ব দেখবাব্য-
যটিত বহু ব্যাপারেও architectural expression প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। ভারতবর্ষের architecture এইখানেই তাহার চিত্র ও চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিয়া তুলিয়াছে।

“যুরোপে খৃষ্ট ও তাহার কাহিনী লইয়া এবং গ্রীসে নানা দেবদেবী লইয়া যে সকল art ও architecture উদ্ভিষ্টাছে তাহার সহিত ইহার মধ্যে একা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে গ্রীসে ভারতবর্ষের মত অতিপ্রাকৃত ভাব এরূপ প্রবলভাবে প্রকাশ পায় নাই। গ্রীসের art ভারতের অপেক্ষা অনেকাংশে ‘naturalistic’। অবতারবাদ যুরোপে এরূপ ভাবে জনসাধারণের চিত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই, বোধ হয় ইহাই তাহার কারণ হইবে।

ভারতবর্ষের mural decorationএর তৃতীয় ধারা হইতেছে মাহুষের দৈনন্দিন জীবন লইয়া। তোমরা হুস্তো ভাবিয়া থাক ভারতবর্ষের সাধনা যখন বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া মুক্তির দিকে, তখন মাংসারিক জীবনের কোনও ভাব তাহার art ও architectureএ ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তাহা হুয় ধারণা। পুরীর মন্দির-গারে এবং অস্তিত্ব অনেক স্থানেই ভারত-সমাজের তাত্‌কালিক চিত্র

প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সৈন্ত-
দিগের যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য-বহরের সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি বিষয়ের চিত্র পুরীর মন্দির-গারে দেখিতে পাইবে। Mural-decorationএর এ ধারা ভাস্করিক, স্বতরাং ইহা এ দেশের কোনো বিশেষত্ব-প্রকাশক নহে। যুরোপের architectureএ-ও ইহা বিদ্যমান।

ডাক্তার শীলের কথা শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাস্য করিলাম—

“আপনি যে প্রথম ধারার—mural decorationএর analogous ধারা যুরোপে আছে বলিতেছিলেন তাহা কি?”

ডাক্তার শীল বলিতে লাগিলেন—

“ভারতবর্ষের যে mural decorationএর প্রথম ধারার কথা বলিয়াছি তাহার motive হইতেছে religious। যুরোপে ইহার—যে analogous ধারা দেখা যায় তাহার motive-ও religious, কিন্তু form অন্তরূপ। ইহার কারণ এই যে যুরোপের মধ্যযুগ ভারতীয় মধ্যযুগ হইতে একটু স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ জীবমুক্তি চাহিয়াছিল। কিন্তু যুরোপের monkগণ পরলোকের যে স্বর্ষ তাহাই কামনা করিয়াছিলেন। এই জন্ত সেখানে পরকালের বশা একটু বিশেষ ভাবে art ও architectureএ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। স্বর্গ ও নরকের যত প্রকার চিত্র মাহুষের মন রঞ্জনা করিতে পারে তাহার প্রায় সকলই যুরোপের art ও architectureএ ফুটিয়া উদ্ভিষ্টাছে। উদ্দেশ্য এই যে, মাহুষ নরকের অনন্ত ভীষণ শাস্তির কথা এবং স্বর্গের অনন্ত শান্তি ও হৃদয়ের কথা মনে করিয়া যেন ধর্ম-জীবন যাপন করিতে পারে। ভারতবর্ষের architectureএ কিন্তু স্বর্গ ও নরকের এই সকল চিত্র বিশেষ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।”

দান্তের Divina Comediar সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় আচাৰ্য শীল বলিলেন—

“হাঁ, Dante-এর স্বর্ণ ও নরক বর্ণনার সহিত ইহার বিলম্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা ইহা নহে যে Dante-র চিত্র হইতেই ইহা গৃহীত। বরং Dante-র বর্ণনা ও architecture-এর এই ধারা একই common ideas-এর parallel expression। পরলোক সম্বন্ধে কতকগুলি ভাব, আমার মনে হয়, বহু প্রাচীনকাল হইতেই আৰ্য ও অনার্য সমস্ত মানুষের মধ্যেই রহিয়াছে। Flora ও Fauna সম্বন্ধে যেমন সমস্ত পৃথিবীকে কতকগুলি zones অর্থাৎ মণ্ডলে বিভক্ত করা যাইতে পারে, স্বর্ণ ও নরক সম্বন্ধীয় ভাবেরও সেইরূপ কতকগুলি zones দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল zones-এর মধ্যে ভাবব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও ইহাদের মূলে কতকগুলি ভাব common। এই জগৎ পাপপুণ্যের কতকগুলি শাস্তি ও পুরস্কার যুরোপ ও ভারতবর্ষে একই প্রকার দেখিতে পাইবে।

“এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই ভাব এক দেশ আর এক দেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় borrowing-এর theory এ সকল বিষয়ে আদৌ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। যেমন beast fable আৰ্য ও অনার্য সকলের মধ্যেই কোন না কোন form-এ দেখিতে পাওয়া যায়, এ সকল ভাবও সেইরূপ। Beast fable সম্বন্ধেও কেহ কেহ এই borrowing-এর hypothesis উপস্থাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সমাধিক। নিম্নো, বাহ্যভোগ, হট্টেনটস প্রভৃতি

আফ্রিকার অসভ্যজাতি ও আমেরিকার বেড ইণ্ডিয়ান জাতির মধ্যেও যেরূপ ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, আবার আৰ্য্যজাতির মধ্যেও ইহার সেরূপ চিহ্ন বর্তমান।”

আমি বলিলাম “যদি তাহাই হয়, তবে ত ভারতবর্ষেও অনাসাধারণের মধ্যে এই সকল স্বর্ণ ও নরক সম্বন্ধীয় ভাব বহু প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান ছিল। অথচ তাহার কোন architectural expression হয় নাই, ইহার কারণ কি?”

ডাক্তার শীল বলিলেন—“ইহার কারণ কি সম্পূর্ণ নির্ণয় করা যায় না। এই সকল ভাবের উপর নির্ভর করিয়াও ত প্রাচীন মনোবিগণ লোকশিল্পার অঙ্কন art ও architecture-এর প্রচলন করিতে পারিতেন। কিন্তু কেন তাহা করেন নাই ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তবে হয়তো যাহারা architecture-এর suggestion দিয়াছিলেন সেই monk-দের মধ্যে এই ভাবগুলি সেরূপ প্রবল না হওয়ায় এগুলি architecture-এ প্রকাশিত হয় নাই।”

এ দেশের architecture সম্বন্ধে আর কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় আচাৰ্য উত্তর করিলেন—

“হাঁ, জানিবার অনেক বিষয়ই আছে। যাহা বলিলাম এগুলি ভাবের দিক দিয়া মোটামুটিভাবে শ্রেণী-বিবরণ যাত্র। এ ছাড়া forms of architecture সম্বন্ধে জানিবার অনেক কথা আছে। কিন্তু তাহাতে অনেক technicalities আসিয়া পড়িবে।” তাহা কি ভোমাসের সেরূপ চিত্তাকর্ষক হইবে? তবে একটা কথা জানিয়া রাখ যে এই forms of architecture সম্বন্ধেও borrowing theory প্রয়োগ

করিবার পূর্বে বিশেষ ভাবিয়া দেখা উচিত। খুব strongly প্রমাণিত এক জাতি আর এক জাতি হইতে ধার করিয়াছে ইহা বলা অন্তায়। কিন্তু আজকাল দেখিতে পাই একশ্রেণীর প্রকৃত্তবিশদগণ lightly এই মত প্রচার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ architecture এর ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা “প্পট দেখিতে পাই যে, কতকগুলি masonic traditions সমস্ত জাতির মধ্যেই common ছিল।

“ভারতের architecture সম্বন্ধে আর একটা কথা এখন আমার মনে হইতেছে। এ বিষয় সংক্রান্ত যে সকল পুরাতন সংস্কৃত পুস্তক গ্রন্থে আছে, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় তাহার অধিকাংশই theoretical। ইহার কারণ এই যে এদেশে masonic class ও যাহারা এ বিষয়ে theoretical suggestions দিয়াছেন সেই monk-দের মধ্যে একটা বৃহৎ ব্যবসায় চিরদিনই ছিল।”

তদ্রূপ হইয়া আমরা ডাক্তার শীলের এই সকল কথা শ্রবণ করিতেছিলাম। বেদা প্রায় এগারটা বাজিয়া গিয়াছে সে কথা কাহারও মনে হয় নাই। যতই তাহার এই সকল জানগত কথা শুনিতেছিলাম, ততই আমাদের কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছিল। আমি আবার বলিলাম—

“এই architecture ও art সম্বন্ধে যখন কথা আসিয়াছে, তখন আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষে লিঙ্গ-পূজার যে প্রচলন হইয়াছে, ইহার কি অর্থ আপনাদের মনে হয়?”

ডাক্তার শীল ষড়ির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“সে অনেক কথা। আর একদিন হইবে।” এই বলিয়া তিনি পাঞ্জোখান করিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী

বি, এ।

একাদশী

আজকাল আমরা (শাস্ত্রের মধ্যাধা রক্ষা হউক বা না হউক) সকল বিষয়েতেই, একটা না একটা স্বাধীনমত প্রকাশ করিয়া মীমাংসা করিয়া থাকি। বালিকা বা বুদ্ধা বিধবা বসনীদিগের একাদশীর উপবাসজনিত কষ্ট যতদূর হউক বা না হউক, কিন্তু আমরাই দয়ার সাগর হইয়া বাগাড়ম্বর তাহাদিগের কষ্ট এতদূর বাড়াইয়া দেই যে, তাহা বলিবার নহে। মনে করি প্রাচীন আৰ্য্যঋষিরা বড়ই নিষ্ঠুর ছিলেন বলিয়া, এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়া রাখাছেন;

কিন্তু একবার ভাবিয়াও দেখি না যে তাহাদের উদ্দেশ্য কতদূর হইবে, ইচ্ছাসংযমাদি করিবার যদি প্রকট উপায় থাকে ত তাহা একমাত্র উপবাস। বিহঙ্গমজন্তুর সহিত যে অন্তর্জগতের কতদূর মিল, তাহা ত্রিকালজ্ঞ হৃৎস্পর্শী ঋষিগণই বুঝিতেন; এবং তাই বলিয়া তাঁহারা চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া এইরূপ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই বেবে বাহ্যজগতের সবই আছে। এই বিহঙ্গমজন্তু যেমন উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বর্তমান, সেহেও তজ্জল উর্দ্ধ দক্ষিণাংশ দক্ষিণ

মেক ও উর্দ্ধ উত্তরাংশ উত্তর মেক। বাহিরে যেমন পৃথিবীর মধ্যভাগে বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘায়া পৃথিবী ছইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, দেহে তজ্জপ মেকদণ্ড দ্বারা দেহ ছই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বাহিরে যেমন মেকদণ্ড ও কুমেক উভয় প্রদেশ স্বপীকৃত বরফবেষ্টিত এবং সেই বরফরাশির আত্মকন ও প্রসারণ দ্বারা সমস্ত জীবজন্তু প্রাণ ধারণ করে, দেহে তজ্জপ ছই পার্শ্বে ছই ফুস ফুস আছে, তদ্বারা আত্মকন প্রসারণ বা শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া নিরীক্ষিত হয় এবং সমস্ত জীবদেহ পরিচালিত হয়। সপ্তদশী-সমমিত মেক অর্থাৎ স্মাভার, বাহ্যিক, মণিপুঞ্জ, অসংহত, বিস্তৃত, আত্মা ও সহস্রার এই সমস্তকবেষ্টিত মেকদণ্ড। সত্রিং-দেহগত রসপাত্ত, সাগর-দেহের কথির, শৈল—অস্থিপ্রকর। ক্ষেত্র—দেহ বা তদ্ব্যবস্থার বিভিন্ন স্থান; ক্ষেত্রপালক—ক্ষেত্ররক্ষক। স্ত্রীসংহার কর্তা-ব্যাধ্যক্রেম চক্ষু, সূর্য্য, চন্দ্রের গুণ বিসর্গ, এবং সূর্য্যের ভণ আদান। চক্ষু যে শীতল বায়ু দান করেন, তাহা জীবজন্তু বাসরূপে গ্রহণ করে এবং সূর্য্য যে উষ্ণ বায়ু গ্রহণ করেন, তাহাই জীবজন্তু প্রাণস্বরূপে ভোগ করেন। স্তত্রাং গ্রহণই দেহের স্থিতি, আর ভোগই দেহের লয়। এই দেহে সর্গদ্বাই জন্ম-মৃত্যু বা স্ত্রীসংহার-ক্রিয়া চলিতেছে। এই সংহার-ক্রিয়াকেই ধওপ্রথম বলা যায় এবং ভোগ করিয়া আর গ্রহণ করিতে না পারাকে মৃত্যু বা মর্হা প্রথম কহে।

বহির্ভাগেও যেমন বায়ু, অগ্নি ও জলের হ্রাস-বৃদ্ধি, সমতা ও অসমতা ঘটে, অন্তর্ভাগেও তজ্জপ ঘটে। চক্ষু, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ঝড়, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, প্রকৃতির সমস্ত শরীরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উপদ্রুপির ছইদিন বৃষ্টি হইলেই শরীর মাজ মাজ করে,

বেশী শীত হইলেই শরীর খর খর করিয়া কাঁপে, বেশী গ্রীষ্ম হইলেই প্রাণ উত্তাপিত হয়। দশমী, একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে স্বস্থ শরীর ও ভাব ভার বোধ হয়। রোগ পুরাতন হইলে দশমী, একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে বৃদ্ধি হইবেই হইবে। এই সকল কারণেই সহজে বুঝা যায় যে, বাহ্যজগতের সমস্ত শরীরের অজ্ঞেয় সম্বন্ধ। আধ্যাত্মিক এই সকল যে স্বক্ষণবেষণার স্থাননিদর্শন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শরীর চেতনার অবিচল ও পঙ্কজতাত্ত্বিক। শরীরের সমযোগ্যবাহী ধাতুসকল যখন বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তখন শরীর রিষ্ট ও বিনষ্ট হয়। সাম্যভাব রাখাই শরীর রক্ষার হেতু। বৈষম্য নষ্ট করার জন্তই ঔষধাদির প্রয়োজন। তজ্জপ উপবাসও একটা বৈষম্য-ভাব নষ্ট করিয়া সমতা রক্ষা করার প্রধান উপায়।

আধ্যাত্মিকের কি স্বব্যবস্থা—দশমীর দিন হইতেই শরীরে রসের ভাগ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় বলিয়া, সন্ধ্যা করিয়া তৎপর দিনে একাদশীতে উপবাস, দ্বাদশীতে পারণ, এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে নিশি-পালন দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শরীরের রসপাত্ত শোষণ দ্বারা স্নান আদান করাই মধ্য উদ্দেশ্য। এই সকল স্বব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের হিত-কর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, তাহারা অসীম দয়ার সাগর। কিন্তু তাহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া রসাদিক সময়ে কতকগুলি গতেপিতে ভোক্ষাত্রব্য ভোজন দ্বারা রসাদির বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের সাধনী-কৃত শরীরের লংসের উপায় করিয়া থাকি। তাহা না করিয়া তাহাদের স্থানীয় পালন করতঃ ধাতু সকলের সাম্য রক্ষা দ্বারা আমরা

বল বর্ণ বাহ্যাদির যুক্ত ও শীর্ণাঘ্র হইয়া ধর্ম্মার্থ-কাম ও পরলোকে পরমগতি লাভ করিতে পারি।

উচ্চ সোপানে তুলিবার জন্ত আধ্যাত্মিক, অষ্টম বর্ষ হইতে বালকদিগকে কঠোর তন্ত্রচর্চা ও তপস্যা আরম্ভ করাইতে। আত্ম কি না আমরা, হিন্দু বিধবাগিরের অতিশয় কষ্ট হইবে বলিয়া তাহারিগকে একাদশীর উপবাস-রূপ ব্রত হইতে বিচ্যুত করিবার প্রয়াসী হইয়া দয়ার পরাকর্ষী দেখাইতে বলিয়াছি। বিধবাগিরের যে ব্রতোপবাসাদির দ্বারা দুর্ভিবার কামাদি ব্রিগ্ধব্রত করা প্রধান কাণ্ড, তাহা আবিধাও দেখি না। ইহা যুগ-বাহ্যাত্ম্য বই আর কি বলা যা বে? বিধবার অহুকল্লাচরণ শাস্ত্রসম্মত কি না, তাহা মুক্তিভর্তুপূর্ণ স্বাভাবিকপ্রায় দ্বারা নিয়ে ব্যক্ত করা গেল।—

ছাত্র। শাস্ত্রাধ্যয়নের অশক্ত বিধবা এক-দশীর উপবাসমূল অহুকল্লাচরণ করিতে পারে কি না?

অধ্যাপক। হাঁ, পারে।

ছাত্র—কি করিয়া পারে? আর্ন্ত যখন “বিধবায়ান্ত সর্ষবা নিত্যস্বায়া কাত্যাবন।” “বিধবা য়া ভবেম্মারী তুষ্ণীতৈকাদশী দিনে।” তত্ত্রাশ্রয় ব্রহ্মতং ন্যেদ্য জগৎহত্যা দিনে দিনে ॥” এই বচন তুলিয়া সকল প্রকারে নিতাত্ত্বই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অ—তুমি ভুল বুঝিয়াছ। কারণ সর্ষবা অর্থাৎ সকল কালে

“ঐগাঙ্গাদিকো মর্ষো হৃপুর্ণাশীতিবংসঃ।”

স পাপকর ॥

অষ্টম বৎসরের অধিক এবং অপূর্ণ অশীতি বৎসরের মধ্যে, মোহবশতঃ একাদশীতে মানব

সাধারণ মাজেরই ভোজন করিলে পাপ করা হয়। স্তত্রাং অষ্টম বৎসরের পূর্বে এবং অশীতি বৎসরের পর অর্থাৎ বাল বৃদ্ধ বয়সে বিধবারও একাদশী ব্রত বিধয়ে কাম্য প্রযুক্ত, সর্ষবা এই বাক্য দ্বারা তৎকালের মধ্যেই তাহার নিত্য স্বীকার করা হইল। ইহাই স্বাভাবিকপ্রায় বলিয়া বোধ করিতেছি।

ছা—সে কি মহাশয়? যখন “আয়েয়ে—” “গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ অহিত্যিতি তুর্ষবে চ।” একাদশ্যাং ন তুষ্ণীত পক্ষ্যোক্তভয়োপরিণ ॥” ইত্যাদি বচন দ্বারা পূর্বেই সামান্য গৃহস্থ মানব মাজের পরিগ্রহ দ্বারা ইতি, বিধবারও পরিগ্রহ করা হইয়াছিল, আবার “বিধবা যা ভবেম্মারী” এই বচন দ্বারা বিধবার একাদশীতে ভোজন-ভাব করার তাৎপর্য্য কি? ইহা দ্বারা অহুকল্লাচরণ ভিন্ন আর কি বুঝিবে।

অ—তাহা নহে। দেখ “অশক্তঃ প্রতি

নারীয়ো—

“অহুকল্লা নৃণাং প্রোক্তঃ কীর্ণাণাং বরবার্ণিণ।

মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেজ্জুভং ॥”

মহঃ—

“বিশেষ দেবৈঃ সঠৈঃশক্ত্যন্তঃশৈশ্বং মহর্ষিভিঃ।

আপংঘং মরণ্যাত্তৈঃবিধিঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ ॥”

ইত্যাদি বচন দ্বারা বিশেষধরূপে অনর্থক মানব মাজেরই অহুকল্লাচরণ নিষেধ করা, বিধবাত্তিক্ত কল্পনা করিতে গেলে, বচনের স্ফোট হইয়া পড়ে। স্তত্রাং অনর্থক পক্ষে বিধবার অহুকল্লাচরণই শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এই বিচার-মূলেই পূর্ববদে এইরূপ আচরণ প্রচলিত আছে এবং আজ-কাল আমারাও অহুকল্লাচরণে লুচি মোহন-ভোগের ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করিয়াছি।

ছা—আত্মা না

“একাদশী ব্রতং নিত্যং, তদাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তঃ—

“ইতি বিজ্ঞায় কুর্য্যতা বশ্যমেকাদশীব্রতং।
বিশেষনিয়মাপ্রকোংহোরাং তুচ্ছিবন্ধিতং।”

ভবিষ্যে—

“নিত্যমেতৎ ব্রতং নাম কর্তব্যং সার্বভৌমিকং।
সর্গাশ্রমাণাং সামান্যং সর্বপঞ্চৈঃ স্তম্ভং ॥”

ইত্যাদি বচন দ্বারা নর মায়ের নিত্যতা প্রাপ্তি হইলেক, বিধবাগিরের পুনরায় নিত্যতা বিধানের অদ্বয় দ্বন্দ্ব দ্বারা “বাবদ প্রাপ্তং তাবদ্বিধীয়তে” এই সিদ্ধান্তের বশবর্তী হইয়া, যেখানে বিধবাগিরের নিত্য উপবাসের অপ্রাপ্তি হইবে, সেই বানেন তাহারিগের উপবাসের প্রসক্তি হইবে। এই নিয়মগ্রন্থসারে “অষ্টাদশাদিকা মর্ত্যো” ইহা দ্বারা অষ্টাদশ মধ্য জম্বীতি বৎসরানন্তর বয়সে বালবৃদ্ধের বৈদ্রপ উপবাসের অপ্রাপ্তি এবং অসিত্তকাদশী দিনে, পুত্রী নোপবসেৎ গৃহী ॥” ব্রহ্মপুত্রের এই বচন দ্বারা গৃহস্থ বিধবাগিরের কৃষ্ণা একাদশীতে বৈদ্রপ উপবাসের অপ্রাপ্তি, সেই-রূপ অদমর্ষ পক্ষেও উপবাসের অপ্রাপ্তি হওয়ায় সেই সেই অপ্রাপ্তি স্থলে উপবাসের আবশ্যকতা প্রতিপাদন জন্ত, বিধবাগিরের, একাদশ্যপবাসের পুনর্নিত্যতা বিধান করা হইল। ইহা অবশ্য স্বীকার্য।

অ। ঐরূপ স্থলে বিনিগমনা বাতিরেকে ঐরূপ ব্যবস্থা কি করিয়া করিতে পার?

ছ। সে কি কথা—অদমর্ষদহন জায়াহ্মসারে “বাবদপ্রাপ্তং তাবদ্বিধীয়তে” ইহা দ্বারা ইতি সর্গজ বিধানের কর্তব্যতা হইয়া পড়িয়াছে।

অ। দেখ ঐরূপ করিতে গেলে অর্থাৎ অশক্তস্থলে উপবাসের বিধান করিতে গেলে, অশক্তাচ্ছটানোপদেশেরই আশ্রিত হইয়া পড়ে।

ছ। কেন মহাশয়! আপনার মতেও যে, অষ্টাদশাদিকা মর্ত্যো ইত্যাদি বচন দ্বারা,

বালবৃদ্ধের পক্ষেও ত অশক্তমূলকই উপ-বাসাদাব বিধানস্থলে বিধবাগিরের পুনরায় উপবাসের বিধান করিয়াছেন; সেটা কি অশক্তাচ্ছটানোপদেশের আশ্রিত বিপরীত হইয়া নাই?

বাত্তবিক পক্ষে অশক্ত বলিতে যাহার অজ্ঞাত লোকোপেক্ষা অতিশয় উপবাসজনিত রোগ হইরা থাকে, তাহাকেই বুঝাইবে। যাহার উপবাসকরণাত্মক শক্তির একে-বারেই অভাব তাহাকে কখনই বুঝাইবে না। “অরুক্রো নৃণাং প্রোক্তঃ স্ত্রীণামাং বরবর্ণিনা” এই বচনে দুর্বলদেরই অরুক্র ভাণ্ডান করা হেতু “মরণশীতঃ” এই কথাটা যাহার উপবাস দ্বারা সম্ভবই মরণ হইবে তাহার পক্ষে খাটিবে না, কিন্তু যাহার রোগাত্মকত্ব সম্ভব তাহার পক্ষেই খাটিবে। অর্থাৎ যাহারা ব্যাদীপীড়িত কিম্বা সভাবন্তঃ অতিশয় ক্ষীণতা প্রযুক্ত উপবাসে একেবারেই অসমর্থ তাহারাই অরুক্রাচরণ করিতে পারিবে। আর আশ্রয় পণ্ডিত কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি যে, বিধবারা উপবাস করিয়া সম্ভবই মরিয়া গেল? বরং যেমন অগ্নির উত্তাপে দ্বন্দ্বের জলটুকু মরিয়া গাত কীরটুকু হয়, সেইরূপ উপবাসজনিত প্রবল উদ্ভীর্ণ জঠরাগ্নি দ্বারা রসরক্তাদিহা হুঁ সকল শোণিত অর্থাৎ পরিপাক পাইয়া, লঘুতা প্রাপ্তি জন্ত সারময় গুণোদ্যাতুর বৃদ্ধিবশতঃ জড়তা নষ্ট হইয়া চৈতন্যের বিকাশও মনঃস্থির হওয়ায়, দেহ অষ্টাদশের সাদনীকৃত হইয়া পড়ে। পরিণামে শরীর দুঢ় ও হাতীর মত হইয়া উঠে ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট।

অ। তোমার কথা সব বুদ্ধিমান। আচ্ছা বল দেখি “বিধবা যা ভবেমারী” এই বচন দ্বারা বিধবাগিরের লগ্নত্ব যখন একাদশী

ব্রতেরই নিত্যতা বিধান করা হইয়াছে, তখন অরুক্র দ্বারা ব্রতের নিত্যতা রক্ষা করা হইবে না কেন, ইহার কোন সহজর আচ্ছ কি?

ছ।—মহাশয় চট্টবনে না—আপনার যে কুলেই তুল “ভূতীতৈকাদশী দিনে” এই বচনের এই অংশটুকু বলার তাৎপর্য কি, বুঝিয়াছেন কি? ভোক্ত্রনে দোষ দেখাইয়া উপবাসেরই যে নিত্যতা বিধান করা হইয়াছে। আর অরুক্রের ব্রতও স্বীকার করিতে গেলে, নিম্নমাণ লক্ষণার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। তা ছাড়া কৃষ্ণেকাদশীতে পূজবতী, শক্ত-বিধবাগিরের পক্ষেও উপবাসের আবশ্যকতা নষ্ট হইয়া যায়। কারণ অরুক্র দ্বারা ব্রতের নিত্যতা পালন হেতু, নিষেধ-বাধার অল্পপত্তি হইয়া পড়িতেছে। আর ভাবিয়া দেখুন, কৃষ্ণেকাদশীতে পূজবতী বিধবাগিরের উপবাসের আবশ্যকতা আপনারও অনভিমত নহে; স্বতরাং “বিধবা যা ভবেমারী” এই বচন দ্বারা একাদশী সাতায়ে বালবৃদ্ধগিরের এবং কৃষ্ণেকাদশীতে পূজবতী বিধবাগিরের পূর্বেই উপবাসের আবশ্যকতা বিধান করা হইয়াছে, কেবল অশক্ত বিষয়ে আপন উপবাসের আবশ্যকতার স্বীকার করেন নাই। এখন সেই সেই স্থলেই যদি ব্রতের নিত্যতা বিধান অভিমত হয়, তবে বিধবার বিশেষ নিষেধটা একেবারেই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

বাত্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে “একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুংক্তে

দ্বাদশী দিনে।

শুক্রো বা যদি বা ক্রুৎত্বং বৈফল্যং মহং ॥”

“অহং তে কথয়িষ্যমি শূণ্য পাণ্ডুলোভব।

নিত্যভোক্ত্রং ব্রতং নাম কর্তব্যং সার্বভৌমিকং।

বাহুস্তিঃ সর্গাশ্রমঃ পুঙ্খপাণ্ড-চতুষ্টয়ং ॥”

“রতীকীং পুণ্যগানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে

হরিবাসের”

“ইতি বিজ্ঞায় কুর্য্যতা বশ্যমেকাদশীব্রতং।

বিশেষনিয়মাপ্রকোংহোরাং তুচ্ছিবন্ধিতং ॥”

ইত্যাদি নানাবচনে একাদশীর উপবাসেরই ব্রতভাষিতান হেতু অরুক্রের ব্রতও কিছুতেই হইতে পারে না। তবে উপবাসের অরু-কল্পটা ব্রতাকল্পের বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। আর

“উপোজ্ঞ নন্তেন বিভো,”

“একভক্তেন যো মর্ত্য উপবাস ব্রতকরং ॥”

ইত্যাদি বচনদ্বারা নন্তাদিতেও উপবাস

পদপ্রয়োগ থাকায় নক্তাভ্যুপাসে গোপোবাস-মতের দ্বারা ব্রতাকল্পটা গোপব্রতরূপে সিদ্ধ

হইল, কিন্তু মৃগ্যব্রতরূপে কিছুতেই অভিহিত হইবে না। তাহা না হইলে অরুক্র দেখে-

দানাদিরও প্রাজ্ঞাপত্যাদিরতপদব্যাপ্তি হইয়া পড়ে।

সেই হেতু আপনার মত ব্রতের নিত্যতা-

বাবীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপবাসটা নিত্যতা

স্বীকারের বিষয়ীভূত হওয়ায়, অদ্বয় দ্বন্দ্ব দ্বারা যে যে সকল বিষয়ে উপবাসের

অভাব, অজ্ঞাতের তাবৎ সেই সকল বিষয়েই উপবাসের প্রাপ্তি হইতেছে;

স্বতরাং বিধবাগিরের উপবাসের নিত্যতা হেতু অশক্ত হইলেক উপবাসের আবশ্যকতা

বিশিষ্টাশ্রয় হইয়া পড়িল। এই জন্তই গ্রহ-কর্তা মহামহোপাধ্যায় আর্ষ ভট্টাচার্য্য সর্গাশ্র-মিত্যং বলিয়াছেন। সর্গাশ্র পদের অর্থ সর্গ-প্রকার হওয়ায় কোনও প্রকারে বিধবার

উপবাসের বাধা না হয়, ইহাই স্পষ্টতঃ জানা

গেল।

অ। বাপুকে, তোমার শাস্ত্র যুক্তিপূর্ণ

কথাগুলি শুনিয়া বড়ই শ্রীত হইলাম।

শ্রীমামচন্দ্র লাহিড়ী।

মফঃস্বলের বাণী

১। অঙ্গারের উপকারিতা

কাঠের কয়লা আমরা অনেক সময়ে অনাবৃত্তক বোধে ফেলিয়া দেই। এই সকল অঙ্গার প্রকৃত পক্ষে কত প্রয়োজনীয় প্রত্যেক গৃহস্থের তাহা জানিয়া রাখা উচিত।

অঙ্গার সর্গপ্রকারের দুর্গন্ধ নষ্ট করে, রোগের বীজাণু ধ্বংস করে। ব্যবহার্য খাত্ত-পাড়াগিতে কোন প্রকার গন্ধ হইলে কয়লা দিয়া মাঝিয়া ফেলিলে গন্ধ দূর হইবে। মাছ টাটকা রাখিতে হইলে উষ্মাধিককে কয়লার মধ্যে রাখিয়া দাও, মাছ বেশ ভাল থাকিবে। ঘরি মাছ পূর্বেই নষ্ট হইয়া থাকে, রাখিবার সময় রন্ধন পাড়ে ছই তিন খানি কয়লা ফেলিয়া দিবে, উহাতে মাছের কোনই ঘোষ থাকিবে না, যেন টাটকা মাছ রন্ধন করা হইয়াছে এইরূপ মনে হইবে।

যে ঘরে মস্তমাসাদি রাখা হয়, তথায় তাহারে স্ফুড়ি কিংবা আর কিছুতে করিয়া কয়লা রাখিয়া দিবে, ঘরে কোন প্রকার গন্ধ হইতে পারিবে না। বিছানা-পত্রের জড় ঘরে দুর্গন্ধ হইলে ঘরের ছাদ হইতে কয়েক স্ফুড়ি কয়লা টানাইয়া দিবে—গুদাম-ঘরেরও কয়লার স্ফুড়ি রাখিয়া দিবে, ঘরে কিছুমাত্র গন্ধ থাকিবে না। ঘরি কোন জিনিষ এমন দুর্গন্ধ হইয়া থাকে যে, উহাতে পীড়ার বীজাণু আকর্ষণ করে, তবে কয়লার গুঁড়া ও জল দিয়া উহা ধুইয়া লইলেই পীড়ার ভয় থাকিবে না।

ঘরের নল, চুতি প্রভৃতিতে দুর্গন্ধ হইলে কিছু কয়লার গুঁড়া ও জল দিয়া ধুইয়া দিবে। উহাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হইবে এবং কোন গোল থাকিবে না।

কয়লার গুঁড়াতে দস্ত বেশ পরিষ্কার হয়। কয়লার গুঁড়ায় মূখুইলে দাঁত খুব পরিষ্কার হয়, আহারের পরে দস্তের অভাষের যে সকল খাওয়ার কণিকা থাকে উহা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া মুখে কোনই গন্ধ হইতে পারে না।

এক টুকরা মলমল কাপড়ে কয়েক খানি অঙ্গার বাস্তিবা পানীয় জলে ফেলিয়া দিলে জল বিশুদ্ধ হইবে। কোন স্থান পুড়িয়া গেলে দড় হানে তৎক্ষণাৎ অঙ্গারচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে পারিলে যুদ্ধ মধ্যে জালা-যন্ত্রণা দূর হইবে। বহু দিনের দুর্গন্ধ ক্ষতের উপর কয়লার গুঁড়া দিয়া রাখিয়া দিলে দুর্গন্ধ দূর হইবে ও ক্ষত ভাল হইয়া যাইবে।

দুই খণ্ড তারের জালের মধ্যে কয়লা পাতাইয়া দিয়া উহা বাড়ীর আশপাশের ছোট ছোট গলির মধ্যে বসাইয়া দিলে কোন দুর্গন্ধ থাকিবে না।

কয়লা ব্যবহার করিবার পূর্বেই উহা আগুনেন্দ্র ও রক্তবর্ণ করিয়া লইতে পারিলে উহার উপকারিতা খুব অধিক হইবে।

মেদিনীপুর হিতৈষী।

২। কন্যাদায়

বর্তমানে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈজ্ঞ-জাতীয় ব্যক্তিগণের দরবহার অনেক গৌণ কারণ থাকিলেও মৃগ্য কারণ কন্যাদায়। কতলোক যে কন্যাদায়প্রাপ্ত হইয়া সর্গশাস্ত হইয়াছেন, তাহার ইয়দা নাই। কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি গিয়াছে, কাহারও ব্রহ্মশাস্ত গিয়াছে, কেহ বা শাস-শামার জমিজমা জমা করিয়া দিয়া অস্বাভাব্য কারণেই কালশায়ন করিতেছেন। কন্যা কুমিতি হওয়ার সংবাদ

শ্রবণ করিলে লোকে এখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন। প্রথমতীয়া ২৩টি কথা প্রদত্ত করিলে স্বামীর বা সৎসারের অজ্ঞাত লোকের বিশ্ব-মন্ডনে পতিত হন। “এনিন্দী” শব্দের আর যে অর্থ নাই। এখন কন্যা-মায়েই সংসারের স্বপ্না ও আপদের জিনিষ হইয়া পড়াইয়াছে। আজকাল অনেকই স্বপ্নায়ে কন্যাদান করিয়া স্বপ্নায়ে আবদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিয়া থাকেন। পণ-প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি কত সৎসার উন্মাদ গিয়াছে, কত আনন্দবাজার ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার অবধি নাই। ২৪৩০ বৎসর পূর্বে এই শুক্র-বিষ্ণু-প্রথা—এই মহাপাপ এবেশে ছিল না। কিসের অঙ্করণে যে বরপণে এই পাপস্রোত প্রবাহিত হইল তাহা বুঝা যায়। আমরা যে ইংরাজ-জাতির আচার-ব্যবহার অঙ্করণ করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে এই প্রথা নাই।

বর্ণদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈজ্ঞগণই শিক্ষিত বিদায় নেতৃস্থানীয়। কিন্তু এই বিষয় পাপস্রোতের ধ্বংসে তাহাদের আত্মিক যত্ন দেখা যায় না কেন? আজকাল এই বিষয় লইয়া দুই একটি সভাসমিতি হুইতেছে বটে, সংবাদ-পত্রেও লেখালেখি চলিতেছে। কিন্তু সে আন্দোলনে বিশেষ কোন ফল দর্শিতেছে না। কেহ কেহ পুজুর বিষয়ে যত্ন গ্রহণ না করিয়া উদারতা দেখাইতেছেন। কিন্তু সে উদারতা “সিদ্ধি নাই না, সিদ্ধির স্কেল খাই” রকমের। বরকটা পণ লইলেন না, কিন্তু কন্যাকর্তার কন্যা আভরণ, বরণখাদি দিতে নগদের উপরে গেল। যাহা হউক, এই পাপের প্রতিষ্ঠার করিতে সর্গশাস্তারপণের বন্ধপরিষ্কার হওয়া উচিত। দেশের মহাবিশ্ব জেগীর লোককে রক্ষা করিতে হইল বিবাহ পণ-

গ্রহণ-প্রথা একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে। এই পণ-প্রথা তুলিয়া দিতে হইলে নিম্নলিখিত রূপে কার্য করিলে ফললাভ হওয়া সম্ভব। বন্দনেশের প্রত্যেক গ্রামে অবধা দুই পাঁচটি গ্রাম লইয়া এক একটি কমিটি গঠন করা উচিত। এই সকল কমিটির মেধবর্গগণ যাহাতে তাহাদের ভিত্তর কেহ বরপণ গ্রহণ না করেন, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিবেন। তাহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কেহ বরপণ গ্রহণ করিলে উক্ত পণ-গ্রহণ-কারীর সহিত আলাপ ও সর্গপ্রকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবেন। এইরূপে জেলার নানা-স্থানে এই ভাবের কমিটি গঠিত হইলেও যাহাতে এই সকল স্থানের সমস্ত ও ভাল ভাল লোক ও কমিটির মেধবর্গজ হন, তৎপক্ষে চেষ্টা করিলে ক্রমে এই পাপস্রোত দূরীভূত হইয়া যাইবে। প্রত্যেক বৎসর অন্তে প্রত্যেক জেলার প্রধান স্থানে এই জেলার সমস্ত উচ্চতরিত কার্য একটি সাধারণ সভায় প্রকাশ করিলেও সংবাদপত্রে প্রচার করিলে ভাল হয়। যাহারা প্রকৃতই দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী, যাহাদের স্বয়ং মধ্যবিত্ত ব্যক্তি-গণের জড় কাঁদে, তাহারা অগ্রগী হইয়া এই উপায় অবলম্বন করুন এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণসাধন করুন।

পল্লীবাব্তা।

৩। পুঁকুরে নাছের চাষ

পুঁকুরে অনেক রকমের মাছের চাষ করিয়া বেশ ফল পাওয়া যায়, এবং উহাফলাভ আছে। কিন্তু কুই, কাতলা, মুগেল এবং কালবোম এই ত্রয়কটা মাছের চাষেই সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। বাঙ্গাল দেশের প্রায় প্রত্যেক পুঁকুরেই বোয়াল, কুই এবং সোল মাছ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বোয়াল এবং সোল মাছ অত্যন্ত পেষ্টক। ইহারা অল্প মাছ খাওয়া ফেলে।

রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবোশু পুঙ্খুর ডিম পাড়ে না। উহার কেবল নরীতেই ডিম পাড়ে। জুন এবং জুলাই মাসই ডিম পাড়িবার সময়। যেমন বর্ষা আস্ত হয় অমনি মাছেরা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। ধাড়ী মাছেরা ছোট ছোট দল বাঁধিয়া নরীতে সাতার দিয়া দেয়। মারী মাছেরা ডিম পাড়ে, ঐ ডিমের সঙ্গে মদ্য মাছের কোমল বীজ মিশিলে উহারে প্রাণ সঞ্চার হয়। এক্ষণ ডিম দেখিতে ছোট, (প্রায় আলপিনের মাথার আকার,) স্ফূট এবং আঠাল। এই ডিমগুলি সচরাচর নদীর তীরের দিকে ভাসিয়া যায়; জেলেরা কাপড় দিয়া ছাকিয়া ইহারিগকে সংগ্রহ করে এবং অল্পপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে রাখে। ডিমগুলি ছোট হাঁড়িতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে ও বাড়িতে পারে, তবে দিমের মধ্যে অনেক বার হাঁড়ির জল বদলান দরকার। ডিম পাড়িবার পর প্রায় দশ দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া ধান্না বাহির হয়। বর্ষাকালে অনেক লোক নদী হইতে রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবোশু মাছের ডিম সংগ্রহ করিয়া, ঐ ডিম কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল মাছের ডিম অল্পপূর্ণ হাঁড়িতে বাঁচিয়া থাকিতে ও বাড়িতে পারে বলিয়া, ইহারিগকে রেল বা নৌকা করিয়া দূরবর্তী স্থানে পাঠান হইতে পারে। তিন বৎসর পূর্বে রেল করিয়া রুই মাছের ১,০০০ ডিম কলিকাতা হইতে লাহোর পাঠান হইয়াছিল; ইহারের মধ্যে ২০০ ডিম উৎপাদিত জীবন্ত এবং সুস্থ অবস্থায় পহঁছিয়াছিল। ডিমের দাম কিছু কমো বাড়ি। ডিম যদি টাটকা হয়, এবং বেশী বড় না হয়, তবেই হইলে, ১ কুনিকার দাম ৫, কিম্বা ৬, টাকা। এক কুনিকার প্রায় ৫,০০০ ডিম থাকে। যদি ডিম, ধর, পাঁচদিনের হয়, তাহা হইলে উহার দাম আরও বেশী হইবে। আর যদি ছোট চারা মাছ কেনা যায়, তাহা হইলে উহার দাম হাজার করা ১০, হইতে ১৫, টাকা। বাঙ্গালা দেশে সচরাচর পুঙ্খুর রুই এবং এই প্রকারের অজ মাছের ডিম ভর্ত্তি করিয়া রাখা

হয়। এই প্রথা, বিহার ও উড়িষ্যাতে প্রচলিত নহে। এই কার্য অতি লাভজনক; কিম্বা এই বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্বে মায়া, প্রথমতঃ যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে ডিমগুলি নিশ্চয়ই ফুটিবে ও শেষে বাড়িয়া বড়-বড় মাছ হইবে, সেই সকল কথার আলোচনা করিব।

যে পুঙ্খুর ডিম বা ছোট মাছ ছাড়া হয়, তাহা খুব বড় বা খুব গভীর হইবে না। কারণ তাহা হইলে দরকার মত মাছ দখিতে পারা যাইবে না।

যদি ও বাঙ্গালা দেশের অনেক পুঙ্খুর রুই ও এইরূপ অজাত মাছের ডিম ভর্ত্তি থাকে, তথাপি ইহার ফল সকল সময়ে ভাল হয় না। ইহার অনেক কারণ আছে। কোন কোন স্থলে ঐ সকল পুঙ্খুর বোয়াল, সোল প্রভৃতি পেটুক মাছ থাকে। এইরূপ পুঙ্খুর ডিম ফেলা হইলে, বোয়াল সোল মাছ সমস্ত কিছা প্রায় সমস্ত রুই মাছের ডিম হারিয়া ফেলে। হুতরান ডিমগুলির ডিম ফেলিবার পূর্বে যত্নের সহিত পুঙ্খুর হইতে সমস্ত পেটুক মাছ তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। নতুবা অতি শীঘ্র অজ সমস্ত মাছ নষ্ট হইবে।

পুঙ্খুর মাছের চাষে প্রায়ই যে ভাল ফল পাওয়া যায় না, তাহার আর একটি কারণ এই যে, রুই মাছের ডিমের সঙ্গে বোয়ালদিগ পেটুক মাছের ডিমও আসিয়া পড়ে। হাঁড়িতে কেবল ছোট ডিমই থাকে, সেই হাঁড়িতে কোন ডিম রুই প্রভৃতি মাছের ও কোন ডিম বোয়ালদিগ পেটুক মাছের তাহা বলা প্রায়ই অসম্ভব। এক্ষণ স্থলে একমাত্র উপায় এই যে, যতদিন ডিম ফুটিয়া ধান্না বাহির না হয়, ততদিন ডিমগুলিকে একটা বড় হাঁড়িতে রাখিয়া বাড়িতে দিতে হয়। ইহাতে ৭৮ দিন মাছ সমস্ত লাগে। যদি কোন পেটুক মাছ থাকে, তবে এখন তাহার ধরা পড়িতে পারে ও তাহারিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইতে পারে। তার পর ভাল মাছ গুলিকে পুঙ্খুর ছাড়িতে পারা যায়। যদি এইরূপে হাঁড়িতে ডিম ফুটাইতে হয়, তবে মনে রাখা উচিত, জলটি খুব ঘন

ঘন, অন্ততঃ দিনে ত্রিশবার, বদলাইতে হইবে। যদি রুই মাছ প্রভৃতির ডিমের সঙ্গে মদ্য অর্থাৎ পেটুক মাছের ডিম পুঙ্খুর ফেলা যায় তবে যেমনই পেটুক মাছেরা বড় হইবে, অমনি তাহার সর্ব মাছ ধাইতে আরম্ভ করিবে।

আবার যাহাতে বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের সঙ্গে পুঙ্খুর পেটুক মাছের ডিম আসিতে না পারে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, কারণ যদি কোন পেটুক মাছ পুঙ্খুরে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহার সেই পুঙ্খুরের রুই মাছের সমস্ত ডিম হারিয়া ফেলিবে।

সমুদায় পাছিয়া এবং কচ্ছপ গুলিকে পুঙ্খুর হইতে তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং বেঙ মল বাহাতে মাছের ডিম খাইতে না পারে, যত্নের সন্ত্বে, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। কিছু কিছু সর্ব্ব আগাছা জলে জমিতে দিতে হইবে। অধিকাংশ পুঙ্খুরে অতিরিক্ত আগাছা থাকে। মধ্যে মধ্যে পুঙ্খুরের আগাছা গুলিকে পাতলা করিয়া দিতে হইবে এবং উহারিগকে এমন ঘনভাবে বাড়িতে দেওয়া হইবে না যাহাতে পুঙ্খুরে জাল টানার ব্যাঘাত হয়। পুঙ্খুরে নিম্নলিখিত আগাছা-গুলি জমিতে দেওয়াই ভাল—

- (১) জন্ধী (বাঙ্গালা), বদী, ফুলজী (হিমি);
 - (২) পান্ডি (বাঙ্গালা); সারগালা, জালা (হিমি);
 - (৩) উল্লি পানা (বাঙ্গালা);
 - (৪) কেশর দাম (বাঙ্গালা);
 - (৫) কলমী শাক (বাঙ্গালা); নরী (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ), নলিচী বগা (বোম্বাই), উল্লন্দু (তামিল); তুটিকরা (তেলেগু), কলমী (সংস্কৃত);
 - (৬) মল (বাঙ্গালা); উদম্বা (সাঁওতাল), মুতা গুণ্ডী, মুক (সংস্কৃত), কোরাই (তামিল), গুলা (তেলেগু) মুতা বারিখ-গু (বোম্বাই); বিখণ (মারাঠী), মোখা (গুজর), কাসুয়া (Sing)।
- যে সকল মাছ জলে জন্মায় তাহাদের গুড়ি প্রস্তুতি যাহাদের দ্বারা জল খারাপ হইবার

সম্ভাবনা, তাহারিগকে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। সমুদায় পেটুক মাছ পুঙ্খুর হইতে তুলিয়া ফেলিবার পরও দেখা যাইবে, কতগুলি পুঙ্খুরে রুই-মাছ অজ পুঙ্খুর অপেক্ষা অতি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। মাছের বৃদ্ধি, বাস্তবের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কতগুলি পুঙ্খুরে প্রচুর খাদ্য থাকে, কতগুলিতে থাকে না। যে পুঙ্খুরে খাবের পরিমাণ অল্প সে পুঙ্খুরে এক বৎসরে রুই মাছ বাড়ি ও উহার ওজন আরও অধিক হয়।

বাঙ্গালা দেশে ও অজাত স্থানের প্রত্যেক পুঙ্খুরে এক প্রকার ছোট প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার খুব বেশী জন্মায় এবং দেখিতে চিংড়ী মাছের মত। কেবলমাত্র অস্থবীক্ষণ দ্বারা সাহায্যে ইহারিগকে দেখিতে পাওয়া যায় এই ছোট "চিংড়ী"গুলি বোধ হয় সারা বৎসর ধরিয়াই ডিম পাড়ে। রুই মাছেরা এই ছোট চিংড়ী খায়।

রুই মাছেরা আগাছাও খায়, কিন্তু তাহার অজ মাছ খায় না; অতি অল্প উল্লিছাই আছে যাহা রুই মাছে খায় না। সাধারণতঃ মাছেরে বাঁধিবার জন্ত কৃত্রিম কোন খাদ্য পুঙ্খুরে ফেলিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু কখনও কখনও এইরূপ উচিত মনে হয়, বিশেষতঃ যদি এক বৎসরের শেষে দেখা যায় যে মাছেরা যেরূপ খাদ্য উচিত ছিল সেই পরিমাণে বাড়ি নাই, তাহা হইলে এক্ষণ করা উচিত। তখন কিছুভাত, কটর টুকরা, ধল্লপরিমাণ তরকারী ইত্যাদি মাছের জন্ত মধ্যে মধ্যে পুঙ্খুরে ফেলা হইতে পারে। কিন্তু এমন পরিমাণে ফেলা উচিত নহে, যাহাতে পরিশেষে জল খারাপ হইয়া যায়।

এক্ষণে রুই এবং এইরূপ অজাত মাছের বৃদ্ধির সংক্ষেপে কিছু জানা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে ২০ সের ওজনের রুই ধরা পড়ে এবং দশ সের ওজনের রুই মাছ খুবই দেখা যায়। মাছের দান্না বা ডিম, পুঙ্খুরে ফেলা হইলে এক বৎসরের শেষে প্রত্যেক মাছের ওজন কত হইবে তাহা, মাছের প্রচুর খাদ্য থাকিলে, প্রত্যেক মাছের ওজন তিন পোয়ার কম হওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয় বৎসরের

শেষে রুই মাছ ওজনে একসের হইতে দুই সের হওয়া উচিত। তৃতীয় বৎসরের শেষে উহারের প্রত্যেকের ওজন তিন সেরের কাছাকাছি হওয়া উচিত। যদি একসের অবশ্য ভাল না হয় তবে মাছের ওজন এরূপ বাড়িবে না। কিন্তু যদি পুঙ্খের অবশ্য ভাল হয় এবং ব্যাঘ্র প্রচুর থাকে, তবে তিন বৎসরে তাহার ওজনে তিন সেরের অধিক হইতে পারে।

পুঙ্খের কত ভিন্ন ফেলিতে হইবে, তাহা পুঙ্খের আকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি পুঙ্খের চার মাছের স্থান্য অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে মাছেরা ভাল বাড়িতে পারিবে না, অনেকই মরিয়া ভালি এবং মাহারা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারের আকার ছোট হইবে। আরও, যে পুর গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় কাছাকাছি জমি মূঠের কম হইয়া যায়, সে পুঙ্খের মাছের ভিন্ন ছায়ায় কোন ফল নাই। ভিন্ন ছাড়াবার পুঙ্খের এই বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া কাঁচা করা উচিত। আবার, যদিও একটা পুঙ্খের ২,০০০ অতি ক্ষুদ্র মাছের পক্ষে যথেষ্ট থাথা থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল মাছ যখন বাড়িবে তখন ঐ থাধো তাহাদের কুলাইবে না। ৫০ ফিট লম্বা, ৫০ ফিট চওড়া এবং ১৪ ফিট গভীর একটা পুঙ্খ এক হইতে ২,০০০ ছোট মাছকে ৪ মাস হইতে ৬ মাস কাল পর্যন্ত যথেষ্ট থাথা দিতে পারে বটে, কিন্তু এই সময়ের শেষে, যাহাতে অত্যন্ত ঘোরোঁষিয়া গিয়া সে জ্ঞা অধিকাংশ মাছেরই এই পুঙ্খের হইতে উঠাইয়া অল্প পুঙ্খের ফেলিতে হইবে। পুঙ্খেরই বলা হইয়াছে যে, পুঙ্খের রুই, কাতলা, মুগেল এবং কালবোস মাছের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। যাহাদের পুঙ্খ আছে, তাহার সাহায্য ভাবে চাষ করিয়া যে লাভ করিতে পারে, তার কৈ, জি, গুণ মহাশয় তাহার এইরূপ আন্দাজী হিসাব প্রদান করিয়াছেন—“দুই বৎসরের রুই মাছের ওজন গড়ে গড়ে সের হয়। যদি কোন পুঙ্খের ১,০০০ ছিমা ছাড়া যায় মূঠের কব তাহাদের মধ্যে ৫০০ মরিয়া গেল—

তাহা হইলে ২ বৎসরের পরে ৫০০ মাছ প্রত্যেকে সের সের ওজনের হইবে, মাছের সের ১০ আনা ধরা গেল। ৫০০ মাছের প্রত্যেকের ওজন সের সের হিসাবে ৫০০ সের। ১০ আনা করিয়া সের হইলে মোট দাম ১০০ টাকা হইল। খরচার মধ্যে ছানা মাছের দাম, জেলের খরচা এবং অশ্রান্ত আহারাদিক ব্যয় আছে। নিম্নের তালিকায় তাহা দেখান হইয়াছে :—

জমা।

টাকা।

৭৫ সের মাছের মূল্য প্রতি সের

১০ হিসাবে ... ১০০

খরচ।

টাকা।

১,০০০ ছানা মাছের দাম ১৫

জাল টানা ইত্যাদি ব্যয়

জেলের খরচা ... ৩০

অহারাদিক খরচা ... ৫

মোট ... ৫০

তাহা হইলে দেখা গেল খরচা বাড়ে ১৫০ টাকা লাভ হইবে। ইহাতে কম লাভই দরা হইয়াছে, অনেক স্থলেই ইহা অপেক্ষা বেশী লাভ হয়।” উল্লিখিত হিসাবে পাওয়া যে, ছানা মাছের দাম ১৫ টাকা দ্রুত হইয়াছে। কিন্তু যদি ভিন্ন ফেলা হয়, তবে ১,০০০ ভিন্ন কিনিতে ১০ টাকা লাভ পাবে। আবার পুঙ্খেরই বলিয়াছি যে সময় ভিন্নই রুই মাছের ভিন্ন না হইতে পারে। বোয়ালের ভিন্ন উহারের মধ্যে থাকিতে পারে। ঐ ভিন্নগুলিকে ইহা আমরা পুঙ্খেরই দেখাইয়াছি।

আমরা পুঙ্খেরই বলিয়াছি যে বোয়াল ও সোল উভয়ই পুঙ্খ মাছ, এবং তাহার মাছ লাভ থাকি। পুঙ্খের তাহাদের চাষ হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের চাষ রুই মাছের চাষের অপেক্ষা কঠিন। বোয়াল ও সোলের ভিন্ন পাওয়াই দুই; আবার

যদি পাওয়া যায়, তবে ঐ সকল মাছ যেমন বাড়িতে থাকে, উহারদিকে অল্প মাছ পাওয়াইবার আবশ্যক হয়।

জল ছাড়িয়া কই মাছ অনেকগুলি বাড়িতে পাবে। এই মাছ যে পুঙ্খের থাকে সময়ে সময়ে তাহা ছাড়িয়া অতি নিকটবর্তী অল্প পুঙ্খের খাইয়া থাকে। যে পুঙ্খের রুই, কাতলা, মুগেল এবং কালবোস মাছ থাকে সেখানে বোয়াল, সোল, কই ও চিত্র মাছের চাষ মাছ স্থলকে থাকিতে দেখা উচিত নহে। একথা যেন মনে থাকে।

আশা করা যায় যে, যাহাদের পুঙ্খ আছে, তাহার এই পুঙ্খকার লিখিত প্রণালী অনুসারে রুই ও তরুণ মাছের চাষ করিবেন। একরূপে সম্বন্ধেই বেশ লাভ করিতে পারা যাইবে এবং বদশেষে মাছের সরবরাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। যাহারা রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছের চাষে নিযুক্ত বা এরূপ চাষ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারদিকে, ঢাকা বাস্তব রাইটস বিল্ডিংস ভবনে অবস্থিত মৎস্যমৎস্যবিভাগ আনন্দের সহিত এদেশকে পুঙ্খপুঙ্খপুঙ্খ উপদেশ ও সংবাদ প্রদান করিবেন।

বরিশাল হিতৈষী।

৪। ভারতের হস্তশিল্প

যন্ত্রশিল্পের অনুদয়ে ভারতের হস্তশিল্পগুলি দিন দিন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিক যুগে পক্ষে অল্পগ্রন্থসমূহ অধিকতর কার্যলাভ করিতে চায় এবং যে শিল্প হ্রাসভে প্রাচীন সরবরাহ করিতে পারে, লোকে তাহারই পক্ষপাতী হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতাক্রমে হস্তশিল্প যন্ত্রশিল্পের সহিত কার্য দেখাইতে পারে না এবং শিল্পাদিও হ্রাসভে মূল্যে সরবরাহ করিতে অক্ষম। তাই হস্তশিল্পে যন্ত্রশিল্পের নিকট পরাভব হইয়াছে। যন্ত্রাধার দ্বারা এক পক্ষে স্থিতি হইতেছে বটে, কিন্তু দেশীয় শিল্পদের অবস্থা কেহ ভাবিতেছেন কি? দেশীয় কল-কারখানা এক্ষণে দেশীয় শিল্পদিকে উৎসাহ দিতেছে না, কেবল মাত্র কলী-মুদ্রকের

স্থান্যই বৃদ্ধি করিতেছে। তাই দেশের শিল্প-ব্যবসায়ীরা দিন দিন স্বকীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করতঃ কৃষিকার্যাদি অবলম্বন করিতেছে।

কার্যের প্রতিযোগিতায় এবং স্থলভের হিসাবে যন্ত্রশিল্পের প্রাধান্য শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু অত্যাধিক সর্ববিধেরই হস্তশিল্পের প্রাধান্য সর্বব্যাপীসম্যক। হস্তশিল্পের কার্য যেখণ্ড স্থায়ী, যুগ্ম এবং কার্যকরীসম্পন্ন হয়, যন্ত্রশিল্প তাহার নিকটেও যাইতে পারে না। ঢাকার হস্তশিল্প মসলিন-বস্ত্র এখনও যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদান অধিকার করিয়া আছে। ঐ মসলিন-নির্মাতাপোষণার্থে হুজ এবং ঐ বস্ত্র-যন্ত্রে যন্ত্র দক্ষতার সহিত সূত্রে হয়, সূত্রে কৃত্রিম যন্ত্রের কোন যন্ত্রশিল্প তদূরকার কথা হস্তশিল্পও দেখাইতে পারিয়াছে কি? কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের অবশেষে আমরা এমন একটা উজ্জ্বল চিত্রদিনের জন্ম হইয়াছে বলিয়াছি। মসলিন-বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি সমগ্র ঢাকা নগরীতে মাত্র একজনের অধিক নাই। ঐ ব্যক্তির লম্বা নড়ে যে ভারতের একটা হুম্বর শিল্প লম্বা প্রাপ্ত হইবে, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? ভারতবাসি, তুমি ইটালীর রাসেল কর্তৃক দেখান চিত্র বর্ণ ব্যবহৃত করিয়া লম্বা রাখিতে পার, আর তুমি দেশের শিল্পের উৎসাহ দিতে পার না।

আমাদের দেশে ঢাকা, ফার্সভাঙ্গা, পাটখুন্স, পাবনা, কলিকাতার প্রভৃতি স্থানে যে সময় বস্ত্রশিল্পী বিজ্ঞানায় হইতেছে, উৎসাহ পাইলে তাহার আরও হুম্বর হুম্বর বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে। ম্যানুফেকচার বাস্তবিকভাবে বহান হইতেছে তাহারের দাতা মরিবার চেষ্টায় আছে। তাহাদের নির্মিত বস্ত্রের অধিকরণে বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই নিষ্কট নকল নানা ভিন্ন অল্প কোন সমানমতক পণ্য বা কার্যকরী উৎসাহ দেখাইতে পারেন না। দেশীয় উৎসাহ বস্ত্রগুলি যন্ত্রে প্রস্তুত হইবে তাহাদের হুম্বর হয়, যন্ত্রনির্মিত বস্ত্রের সে স্থান অধিকার করিতে এখনও বিলক্ষণ সময়ের প্রয়োজন

আছে। আবার হস্তশিল্পের ভিতর সে সমস্ত শিল্পদৈনুধ্য আছে, যন্ত্রশিল্প তাহার সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে কি? জাপানি কলওয়ালারা আমাদের দেশের শালের অল্পকরণে হাঁসিয়া প্রবৃত্ত করিতে গিয়া উপহাস্যাম্পদই হইয়া আসিতেছেন। এ স্থলে মূল্যের বস্তুতার মূল্য কি?

এক সময়ে ভারতবর্ষ হস্তশিল্পের জন্মভূমিতে খ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। ভারতের হস্তশিল্প হুদূর ইউরোপখণ্ডেও সৌখিনতার পরাকাষ্ঠা প্রদান করিত। কথিত আছে ইটালীর অধীশ্বর পর্য্যটকও এক সময়ে সৌখিন-ব্রহ্মাদি ভারতজাত না হইলে পছন্দই করিতেন না। ভারতের রেশমী বস্ত্র এক সময়ে ইউরোপ-খণ্ডে স্বর্ণ মূল্যে বিক্রয় হইত। তাই বলি ভারতের হস্তশিল্প আধুনিক নহে। হস্তশিল্পের প্রত্যেক ধারা অল্পধারে এ দেশের জাতিভেদেরও এক অঙ্ক রহিয়াছে। কোন শিল্পই এক পুরুষে সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। তাই শিল্পের ক্রমবিকাশের জন্মই যে এরূপ জাতি-বিভাগের প্রবর্তন তাহা কে অস্বীকার করিবে?

আমরা মতই যন্ত্রশিল্পের পক্ষপাতী হইতেছি, দেশের শিল্পীদের অবস্থা ততই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। দেশে যদি হস্তশিল্পের আদর থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ঘরের ভাই তত্ত্ববায় হায় হায় করিত না। তাহাদের অনেকে তাঁত ছাড়িয়া খেতে নামিয়াছে, অনেকে আবার দেশী ও বিদেশী বস্ত্রের বিচরী দোকান সাজাইয়া স্বীয় ব্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে। শুধু তাঁতের উপর নির্ভর করিয়া কাহারও দিন সুখে যজ্ঞন্দে যাইতেছে কি? তবে মধ্যে ব্যবধান একটা। হাওয়া আসিয়াছিল, তাই তাঁতগুলি এত দিনও ভারতে আছে। এই যন্ত্রশিল্পের প্রভাবে কৃন্তকায়ের মতক চক্রপাকের ঘুরিতেছে। সে দিন পর্য্যন্তও

কৃফনগর, যুগ্ম প্রভৃতি স্থানের কারিকরণ মৃত্তিকাজাত বর্জ্য কাঠোপযোগী ও সৌখিন জিনিষ প্রস্তুত করিয়া জগতবাসীকে বিমোহিত করিয়াছে। এক্ষণে আর তাহাদের প্রতিষ্ঠা কোথায়? জাৰ্মানি, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ কলের সাহায্যে নানাবিধ সৌখিনব্রহ্ম খেলনা ইত্যাদি সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া তাহাদের লাভের ভাত আশ্বাস্য করিতে বসিয়াছে। দায়ে পড়িয়া তাহাদের অনেকেই কাণে কলম গুলিয়া মাছিমারা কেরাণীর দল বুদ্ধি করিতেছে। আজকাল কঠোর ও লোহার কাঁথা অনেকটা যন্ত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। কালে হস্তধরের শিল্প, লাঙ্গলের গুটিতে এবং কন্দকারের বাহাদুরী কাস্তের ধারেই যে শেষ হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের চন্দ্রকারের পাতুকা আর সৌখিন বাবুদের ভাল লাগে না। তাই তাহার “সেলাই ক্রস” বলিয়া পথে পথে ঘুরিতেছে। এক্ষণে যে দিকেই দেখি না, হস্তশিল্পের অবনতি ভারতের দিকে দিকে। এই হস্তশিল্পের অবনতিতে যে ভারতের অবনতি একথা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। যন্ত্রশিল্পে অর্থাগম যথেষ্ট হইলেও তাহা সমাজ পোষণ করে না। কতকগুলি অশীলারের অবস্থার পরিবর্তন করে মাত্র, আর দেশে কুলী-মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

এক্ষণে দেশের যেরূপ অবস্থা ঘটরাছে, তাহাতে হস্তশিল্পীদিগের উৎসাহ প্রদান করা একান্ত কষ্টব্য ভারতে যে সমস্ত হস্তশিল্প প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল আমরা যদি উৎসাহ দিয়া সে গুলিকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দেশের হস্তশিল্পের কাঠাম বজায় থাকিবে। হয়ত সেই কাঠামোতেই আবার একদিন মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়া দেশের সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া দিবে।

হুজরা।

পরিশিষ্ট

পাপদ্বয় সহ উভয় স্থানেই সয় সংখ্যক শুভ বা অশুভ গ্রহের যোগ থাকিলেও কেমক্ষম যোগ ভঙ্গ হয় না। উক্ত যোগে পুনর্বার চন্দ্রের দৃষ্টি থাকিলে যোগের প্রাবল্যই জাতব্য। কারিকা বচনে আশ্ব কারকের উল্লেখ নাই বলিয়া স্বজ্ঞানুগত স্ব শব্দের অর্থে ব্যবহার করা যথোচিত কারের যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। ১১৯।

চন্দ্রদৃষ্টৌ বিশেষণে ॥ ১২০ ॥

প্রোক্ত যোগে দ্বিতীয়াষ্টময়ো শচন্দ্রদৃষ্টৌ সত্যাং বিশেষণে কেমক্ষম যোগো ভরতি ॥ ১২০ ॥

কেমক্ষম যোগ সংখ্যটি হইলে যদি তদ্বিতীয়াষ্টম স্থানে পুনর্বার চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে বিশেষরূপে তদযোগোক্ত ফল পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রহোক্ত কেমক্ষম যোগ ব্যতীত শাস্ত্রান্তরে ভিন্ন প্রকারে কেমক্ষম যোগ ও তৎফল লিখিত আছে। যথা—

ন ধনে ন ব্যয়ে খেটা শচন্দ্রাদিহ ভবন্তি চেষ।

তদা কেমক্ষমং প্রাজঃ পণ্ডিতা মিহিরাদয়ঃ ॥

কেমক্ষমে হুরপতে রপি নন্দনোহয়ঃ

দেশান্তরং ভ্রজতি পুত্র কলত্র ইনঃ।

ধর্মচ্যুতো বিকলিতো গদসংঘভীতো

নানাদিতাপ সহিতো মহিতোয ইনঃ ॥

সদ্বিত্তসূহৃ বনিতানুজ্ঞনৈ বিহীনঃ

প্রোথ্যো ভবেৎ তু মমুজ্জ্ হি বিদেশবাসী।

নিত্যং বিরুদ্ধমিথগো মলিনঃ কুবেশঃ

কেমক্ষমে চ মমুজ্জ্জ্বলিপতেঃ স্ততোহপি ॥

চন্দ্রের দ্বিতীয় এবং ষোড়শ এই উভয় স্থানেই গ্রহবর্জিত হইলে তাহাকে কেমক্ষম যোগ বলে। কেমক্ষম যোগভাত ব্যক্তি ইন্দ্রপুত্র হইলেও ধন দাত্ত এবং পুত্র কলত্রাদি বঞ্জন বিরহিত হইয়া মলিন বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করে। সে ব্যক্তি পরাস্থসেবী ধর্মচ্যুত বিকলিত রোগপীড়িত বিবিধ মানসিক সম্ভাপ সম্মিত এবং সংসারে সন্তোষ বর্জিত হইয়া কালযাপন করে। ১২০ ॥

সর্কেষাং রাশীনাং পা ক। ১২১।

সূত্রে হগ্নিন্ দ্বিভাবো বর্ততে। সর্কেষাং রাশীনাং গ্রহাণাং চৈব বা পাকে দশায়াং পুরৌক্তানি যোগফলানি ভবন্তি। অথবা সর্কেষাং রাশীনাং গ্রহাণাং বা পাকে দশারন্তকালে তাৎকালিক গ্রহ স্থিত্যা

কেমদ্রম যোগবিচারঃ কার্যঃ। কেমদ্রমে সতি দশায়াং দারিদ্র্য
স্যাৎসিতি ॥ পারাশরীয়েহপি—

কারকাংশেষু যে যোগাঃ পূর্বেবাল্লা গদিতা ময়া।

তৎতৎ রাশি দশাপাকে সর্ববিধাং ফলমাদিশেৎ ॥

এবং তন্মানি ভাবানাং দশারন্তেনু যোজয়েৎ।

তৎতৎ গ্রহাসুসারেণ ফলং বাচাং বুধৈঃ সদা ॥ ১২১ ॥

এই সূত্রমধ্যে দুই প্রকার অর্থ নিহিত আছে। প্রথম—পূর্বে যে সমস্ত যোগের বিষয়
উল্লেখিত হইয়াছে। তৎতৎ রাশি বা গ্রহদশাকালে সেই সমস্ত যোগফল কীৰ্ত্তন করিবে।
অথবা রাশি ও গ্রহগণের দশারন্ত কালেও তাৎকালিক গ্রহ সমিবেশাদি দ্বারা কেমদ্রম যোগ
বিচার করা কর্তব্য কারণ তৎকালে কেমদ্রম মধ্যে দশাকালে কেবল মাত্র দারিদ্র্য দ্বংখ
সংঘটিত হয়। ১২১ ॥

ইতি উপদেশ সূত্রে প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।



উপদেশ সূত্রঃ

প্রথম পরিচ্ছেদে তৃতীয়পাদঃ।

অথ পদং ॥ ১ ॥

অথ অনন্তরং “যাবদাশাশ্রয়ং পদমৃক্ষাণাং ইতি সূত্রসিদ্ধং লগ্নারূঢ়
পদং অবলম্ব্য ফলং বিরূপোতি ॥ ১ ॥

এক্ষেণে লগ্নারূঢ় পদকে লগ্ন কল্পনা করতঃ ফলবিচার আরম্ভ হইল। গ্রহমধ্যে পদশব্দে
সর্বত্রই কেবল লগ্নারূঢ় পদ জ্ঞাতব্য ॥ ১ ॥

বাস্তবে সগ্রহে গ্রহদুস্তে ক্রীমন্তঃ ॥ ২ ॥

লগ্নপদাৎ ব্যয়ে (১১) একাদশ স্থানে সগ্রহে কেন্দিচি শুভেন
পাপেন বা গ্রহেণ সহিতে তথা গ্রহ দুস্তে তথা বিধেন কেন্দিচি গ্রহান্ত-
রেণ চ দুস্তে সতি পুরুষঃ ক্রীমন্তঃ ভাগ্যবান্ ভবতি ॥ ২ ॥

লগ্ন পদের একাদশ স্থানে শুভাশুভ কোন গ্রহ থাকিয়া তথাবিধ অপর কোন গ্রহকর্তৃক
পরিদৃষ্ট হইলে মহত্যা ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। এস্থলে একাদশ স্থানগত গ্রহের প্রতি গ্রহান্ত-
রের দৃষ্টি বিশেষ আবশ্যক। কোন কোন টাকাকার স্বজ হইতে যোগ বা দৃষ্টি অর্থ করতঃ
বর্তমান সূত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেও জানা উচিত যে কেবল মাত্র যোগ বা দৃষ্টি সামান্য
ধনযোগের কারক হইলেও ক্রীমন্ত যোগের কারক হইতে পারে না। তবে দৃষ্টি বা যোগের
অন্যতর থাকিলে কিছু না কিছু ভাগ্য যোগ-কল্পনা করা যায়। অহুজি সম্বন্ধেও পরবর্তী
ঘাদশ সংখ্যক স্বজ পর্যন্ত প্রতি সূত্রেই এই দৃষ্টি শব্দের অহুজি অভিহিত নহে। হিত গ্রহের
প্রতি গ্রহান্তরের দৃষ্টি ফলের দৃঢ়তা সম্পাদন করে। ২ ॥

শুভৈর্ন্যাগোলাভঃ ॥ ৩ ॥ পাপৈর্ন্যমার্গেণ ॥ ৪ ॥

উচ্চাদিভি বিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

লগ্নপদা দেকাদশে শুভৈঃ শুভগ্রহৈ যুক্তে দুস্তে বা সতি ন্যায়ে-
লাভঃ ন্যায় পথেন লাভঃ স্যাৎ ॥ পাপৈঃ পাপগ্রহৈ যুক্তে দুস্তে বা
সতি অমার্গেণ অসৎ পথেন কুরূত্যা বা লাভো ভবেৎ। অতএব
শুভাশুভৈ মিশ্রগ্রহৈ যুক্তেক্ষিতে সতি মিশ্র প্রকারেণ লাভঃ সূচিতঃ।
উচ্চাদিভিঃ উচ্চ স্বক্ষেত্রাদি স্থানগতৈগ্রহৈ যুক্তে দুস্তে বা সতি
বিশেষাৎ বাহ্য রূপেণ লাভো নিশ্চিতঃ। অতাপি পারাশরীয়ে।—

পদাদেকাদশে স্থানে শুভগ্রহ যুক্তকিতে।
 লক্ষ্মীবানু জায়তে বালাঃ প্রজাবানু শীলসংযুতঃ ॥
 বিস্তোপার্জন চায়েন নীতিমান জায়তে সদা।
 নরো ন নাস্তিকো নুনং নতু শাস্ত্র বিরুদ্ধকৃতঃ ॥
 পদাদেকাদশে বিপ্র পাপখেট যুক্তকিতে।
 অত্যায়েপার্জিতং বিতং বিরুদ্ধ শাস্ত্রমার্গতঃ ॥
 মিশ্রমিশ্রাকলাং জেয়ঃ উচস্বকাদিগৈঃ গ্রহৈঃ।
 বজ্রা জায়তে লাভঃ যত্র যত্র বিজোত্তমঃ ॥

পদের একাদশ স্থানে যে কোন গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি বশতঃ লোকে ভাগ্যবান হইলেও শুভ এবং পাপগ্রহ জনিত ফলের বিশেষ বিলক্ষণতা আছে। শুভ গ্রহের যোগ ও দৃষ্টি বশতঃ মহাশয় সংপথে এবং সংকার্যে অর্থোপার্জন করে। শাস্ত্র বিরুদ্ধ অর্থাৎ পথে কিংবা সুবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জন পাপগ্রহের ফল। ব্রহ্মী বা স্থিত গ্রহ উক্ত স্বকর্মা দ্বারা স্থান গত হইলে বিশিষ্টরূপ লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে উক্ত একাদশ স্থানে শুভ এবং পাপ উভয় বিধ গ্রহের যোগ দৃষ্টিতে সদস্য উভয়বিধ মিশ্র ভাবায়ণ কার্যে মহাশয় ভাগ্যশালী হয়। ব্রহ্মী এবং স্থিত গ্রহের সংখ্যা এবং বলের ন্যূনত্বের ফলে তারতম্য অবশ্যই কর্তনীয়। অগাঃ ॥

নীচে গ্রহদৃশ্যোপাং ব্যাখ্যায়িকাং ॥ ৬ ॥

নীচে (৬০=১২) লগ্নপদাং দ্বাদশ স্থানে গ্রহদৃশ্য যোগাং গ্রহ সত্ত্বে গ্রাহান্তর দৃষ্টে চ ব্যাখ্যায়িকাং ভবতীত্যর্থঃ। অত্রাপি পূর্ববৎ সর্বং বিচার্যং যথা দ্বাদশে শুভগ্রহে যুক্তকিতে সং কর্ণনি, পাপে রসং কর্ণনি, নীচ কর্ণনি বা তথা মিশ্রখেটে মিশ্র প্রকারেণ ব্যয়ঃ স্যাৎ। উচ্চাদিতি এইহ বর্ষাধিক্য চিন্তনীয়ং ॥ ৬ ॥

লগ্নপদের দ্বাদশে যে কোন গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি বশতঃ মহাশয়ের ব্যাখ্যায়িকা ঘটে। একাদশ স্থানের জায় এখানেও গ্রহগণের শুভাশুভ এবং বলপরমাপাদি সমস্তই বিচার্য। শুভ গ্রহের দৃষ্টিযোগে শুভকার্যে পাপগ্রহের দৃষ্টিযোগে পাপ কার্যে এবং শুভাশুভগ্রহের দৃষ্টিযোগে সদস্য কার্যে ব্যয় হইয়া থাকে। এই আয় ব্যয়ের বিচারে গ্রহগণের কারকত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখাও বিশেষ আবশ্যক। এক্ষণে প্রধানতঃ কোন গ্রহ হইতে কি প্রকারে আয় ব্যয় হইয়া থাকে লিখিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

লবি রাহু শুক্রো নৃপাং ॥ ৭ ॥

লগ্নপদাং দ্বাদশে রবি রাহু শুক্র ব্যস্তেঃ সমস্তৈ বা, পূর্ব সূত্রানু-
 বুত্তা যুক্তে দৃষ্টে বা সতি নৃপাং রাজমূলাং ব্যয়ঃ স্যাদিতি ॥ ৭ ॥

লগ্নপদের বায় স্থানে রবিরাহু এবং শুক্র এই গ্রহত্রয়ের ব্যস্ত বা সমস্ত ভাবে দৃষ্টি যোগাদি থাকিলে ভূপতির নিমিত্ত মহাশয়ের ব্যয় হইয়া থাকে। টাকাভারগণ কেহই এখানে রব্যাতি গ্রহের স্থিতি ভিন্ন দৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু পূর্বোক্ত বট স্বত্রে গ্রহ দৃশ্য শোপাং লিখিত থাকায় দৃষ্টি শব্দ পরিহার করা যুক্ত যুক্ত নহে ॥ ৭ ॥

চন্দ্র দৃষ্টৌ নিশ্চক্লেহন ॥ ৮ ॥

চন্দ্রেতি রব্যাতি এই যুক্তে দৃষ্টে তৎ দ্বাদশে পুনশ্চন্দ্রদৃষ্টৌ সত্যং নিশ্চয়েন রাজ মূলাৎ ব্যয়ঃ শ্রাদ্ধতথা সন্দিগ্ধ ইতি ॥ ৮ ॥

উক্ত দ্বাদশ স্থানে রব্যাতি গ্রহদ্বয়ের যোগ বা দৃষ্টি সম্বৎ পুনরায় চন্দ্রের দৃষ্টি থাকিলে ব্যয় বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না, বাহিলে অবশ্য বিশেষে নাও খচিত্তে পারে। প্রায় সর্বত্রই চন্দ্রের দৃষ্টি ফলের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করে। পারাশরী মতে উক্ত দ্বাদশ স্থান গত শুক্রের প্রতি রবি ও রাহুর দৃষ্টি থাকিলেই নৃপতি কর্তৃক মহাশয়ের ধন ব্যয় হইয়া থাকে। যথা—

পদারূঢ়াৎ ব্যয়ে শুক্রে ভায়ুর্ভাষ্য বীক্ষিতে।

রাজ মূলাৎ ব্যয়ং বাচ্যং চন্দ্র দৃষ্ট্যা বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥

বুধেন জ্ঞাতিভ্যো বিবাদাদ বা ॥ ৯ ॥

গুরুণা কর মূলাৎ ॥ ১০ ॥

কুজ শনিভ্যাং ভ্রাতৃমুখাং ॥ ১১ ॥

লগ্ন পদাৎ দ্বাদশগণে বুধেন জ্ঞাতিভ্যো জ্ঞাতি নিমিত্তং বিবাদাদ বা, গুরুণা করমূলাৎ করব্যাজেন তথা কুজশনিভ্যাং ভ্রাতৃমুখাদ ভ্রাতৃদিতি ব্যয়ঃ স্যাৎ ॥ ৯।১০।১১ ॥ পারাশরীয়েহপি।—

পদারূঢ়াৎ ব্যয়ে সৌম্যে শুভখেট যুক্তকিতে।

জ্ঞাতি মধ্যে ব্যয়ে নিত্যং পাপদৃক্ কলহাদ ব্যয়ঃ ॥

পদাভ্যয়ে সুরচার্যে বীক্ষিতে চান্য খেটরে।

কর মূলাভ্যয়ং বাচ্যং কর ব্যাজেন বৈ বিজ ॥

আরুঢ়াৎ দ্বাদশে সৌরী ধরা পুত্রোৎসংযুতে।

অন্য গ্রহেষ্টিতে বিপ্র ভ্রাতৃ মূলাৎ ধনব্যয়ঃ ॥

লগ্নপদের দ্বাদশে বুধের যোগ থাকিলে জ্ঞাতি নিমিত্ত বা বিবাদ জনিত, মহাশয়ের ধন ব্যয় হইয়া থাকে। তজ্জন বৃহস্পতির যোগ থাকিলে করদান হেতু এবং শনি বা মঙ্গলের যোগে

ব্রাহ্মদি কার্যে ধন ব্যয় ঘটে । উক্ত যোগ যুক্ত দ্বাদশ স্থানের প্রতি গ্রহাঙ্করের দৃষ্টি থাকিলে ফলের উপচয় এবং নিশ্চয়তা বলবান করিবে । স্থিত এবং দ্রষ্টা গ্রহের শুভাশুভে ব্যয় সম্বন্ধে ও শুভাশুভ চিহ্ননীয় । যথা—দ্বাদশস্থ স্থানের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে জাতি-যোগে এবং পাপের দৃষ্টি যোগে বিবাদে খাদ্যি হানি বিচার্য ॥ ১—১১ ॥

এতে ব্যাঃ এবং লাভঃ ॥ ১২ ॥

এতে দ্বাদশ স্থানাদিগে রব্যাদি গ্রহে যথা ব্যয় উক্ত স্থথা তৈরব একাদশাদিগে স্তেনৈব প্রকারেণ লাভোহপি ভবেৎ ॥ ১২ ॥

আরুঢ়াৎ দ্বাদশে স্থানে যে যোগা কথিতা ময়া ।

লাভ ভাবেযু তে যোগা লাভযোগ করাঃ সদা ॥

লগ্ন পদের দ্বাদশ স্থান গত যে গ্রহ হইতে যথার্থা যে ভাবে ধন ব্যয় কথিত হইল, লাভ ভাবস্থ তৎগ্রহ হইতে তৎ ব্যক্তি দ্বারা সেই ভাবেই প্রযোজ্য লাভ বলবান করিবে । এ স্থলে বুদ্ধ কারিকা হইতে উক্ত লাভ ভাব দ্বিগুণিত কয়েকটি ফল আশংক্য বামে লিখিত হইল ।

আরুঢ়াৎ লাভভবনঃ

প্রবলো ধনবানপি ॥

তথা দ্রষ্টরি তুঙ্গপে ।

বহুর্গল সমাগমে ।

তত্রাপ্যুক্ত গ্রহাংগলে ।

লগ্নভাগ্যাদিপেন বা ।

নির্দিষ্টে দৃষ্টরোস্তরঃ ।

যস্য জন্মনি সোহপি স্যাৎ
দ্রষ্টুঃ গ্রহাণাং বাহুল্যে
সার্গলে চাপি তত্রাপি
শুভ গ্রহাংগলে তত্র
স্থখানি স্থানিনা দুষ্কৈ
জাতস্য পুংসঃ প্রাবল্যং

জন্মকালে লগ্নপদের দ্বাদশ স্থানে কোন গ্রহের দৃষ্টি না থাকিয়া কেবল লাভস্থানে থাকিলে মনুষ্য প্রবল ধনবান হইয়া থাকে । লাভ স্থানে বহুগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, লাভ স্থানদ্রষ্টা গ্রহ তুঙ্গাদি স্থান গত হইলে, উক্ত স্থান অর্গলা সংযুক্ত হইলে, বহু অর্গলার সংযোগ ঘটিলে, শুভগ্রহ জনিত অর্গলার সম্মিলন হইলে, অর্গলা কারকাগ্রহ উচ্চাদি স্থান গত থাকিলে, তৎস্থানে তদধিপতির বা লগ্নভাগ্যাদিপতির দৃষ্টি থাকিলে স্নাতক উত্তরোত্তর যোগ ক্রমাহসারে ভাগ্যবান হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

লাভে রাহু কেতুভ্যাং যুদ্ধে রোগঃ ॥ ১৩ ॥

লাভে (৪৩=৭) লগ্নপদাৎ সপ্তস্থানে রাহু কেতুভ্যাং রাহৌ

কেতৌ বা স্থিতে সতি উদর রোগো ভবতি ॥ ১৩ ॥

আরুঢ়াৎ সপ্তমে রাহু

রোগান্তঃ শোদনের বালঃ

শচাখা সংস্থিতঃ শিখী ।

শিখিনা পিড়িতোহধিকং ॥

লগ্ন পদের সপ্তমে রাহু রা কেতুর সংযোগে থাকিলে মহাশয়ের উদর পীড়া জন্মে । কেতুর যোগে রোগের প্রাবল্য জ্ঞাতব্য ॥ ১৩ ॥

তত্র কেতুনা নাতিতি জ্যানি লিপ্তানি ॥ ১৪ ॥

তত্র (২৬=২) লগ্ন পদাৎ দ্বিতীয় স্থানে কেতুনা কেতৌ স্থিতে সতি ঋতিশী শ্রয়মেব জ্যানি লিপ্তানি শরীরে বার্ক্যক চিহ্নানি ভবন্তি ॥ ১৪ ॥

পদাচ্চ সপ্তমে কেতৌ পাপ খেট যুক্তিতে ।

সাহসী শ্বেত কেশীচ দীর্ঘ লিপ্তী ভবেনরঃ ॥

লগ্ন পদের দ্বিতীয় স্থানে কেতুগ্রহের সংযোগ থাকিলে মনুষ্য শীঘ্রই শরীরে বার্ক্যক চিহ্নাদি প্রাপ্ত হয় । পারাশরী মতে উক্ত কেতুর প্রতি পাপ গ্রহের দৃষ্টি যোগাদি থাকিলে মনুষ্য সাহসী শ্বেত কেশী এবং দীর্ঘলিপ্তী হইয়া থাকে । যত্নে তত্র শব্দের উল্লেখ থাকায় শব্দার্থবিধানে দ্বিতীয় স্থানকে লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু সপ্তম স্থান উক্ত তত্র শব্দের লক্ষ্য হইলে যত্ন মধ্যে উক্ত তত্র শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না । কেতুনা ঋতিত্যা দি যত্ন করিলেই পূর্বোক্ত যত্নের অল্পবৃত্তিতে সপ্তম স্থানই পরিলক্ষিত হইত । বিশেষতঃ পরবর্তী যত্নে তত্র পদোপলব্ধি স্থান হইতেই ধনভাবের বিচার করা হইয়াছে; কিন্তু সপ্তম ভাব হইতে কোথাও ধন বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না । হস্তান্তর তত্র শব্দে এক্ষণে দ্বিতীয় স্থান লক্ষ্য করাই সম্ভব । পারাশরী এক্ষণে, পরবর্তী শ্লোকে, দ্বিতীয় এবং সপ্তম উভয় স্থান হইতেই ফল বিচারের পরামর্শ দিয়াছেন কিন্তু সেটি গ্রহ সংগ্রহ কারের বুদ্ধি বিচিহ্নতা ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না ॥ ১৪ ॥

চন্দ্র গুরু শুক্রেনু ত্রীমন্তঃ ॥ ১৫ ॥

উচ্চেন বা ॥ ১৬ ॥

পদাৎ দ্বিতীয়ে (পারাশরী মতেন সপ্তমে চ) ব্যস্ততয়া সমস্ততয়া বা চন্দ্র গুরু শুক্রেনু স্থিতেষু মনুষ্যঃ ত্রীমন্তঃ ভাগ্যবান্ ভবতি । উক্ত স্থানে শুভেন পাপেন বা কেমচিৎ উচ্চেন উচ্চ স্থিতেন গ্রহেণ মনুষ্য স্তথাবিধঃ ত্রীমন্তো ভাগ্যবান্ ভবতীতি ॥ ১৫ । ১৬ ॥

পদাচ্চ সপ্তমে স্থানে গুরু শুক্র নিশাকরঃ ।

একো দ্বয়ঃ ত্রয়ঃ তত্র লক্ষ্মীবান্ কারয়েৎ ধ্রুবঃ ॥

তুঙ্গদে সপ্তমে খেটে শুভো বাপ্যশুভঃ পদে ।

ত্রীমান্ সোহপি ভবেনু নং সংকীর্তি সহিতো নরঃ ॥

যে যোগাঃ সপ্তমে ভাবে রাহবাদি কথিতঃময়া ।

তে যোগাঃ বিভভাব্যে দ্যনবচিস্তয়েৎ দিজঃ ॥

লম্ব পদের দ্বিতীয় স্থানে (সপ্তমে ?) চন্দ্র গুরু এবং শুক্র এই গ্রহজয়ের ব্যাপ্ত সমস্ত ভাবে অবস্থিত থাকিলে মহাব্য শ্রীমন্ত হয় । উক্ত স্থানে শুভ বা পাপ যে কোন গ্রহ উচ্চস্থ থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে । স্বত্রোক্ত চন্দ্রাদি কোন গ্রহ তথায় উচ্চস্থ থাকিলে অবজ্ঞাই ফল বাহ্য জ্ঞাতব্য । উপরোক্ত পারাশরী স্লোকে প্রকাশ যে ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ স্বত্র পর্যন্ত চারি স্বত্রে যে সমস্ত দ্বিতীয় ভাবোক্ত ফল লিখিত আছে, আর্যচ লয়ের সপ্তম স্থান হইতেও তৎ সমুদায় বিচার্য । বৃহৎ কারিকায় এই দ্বিতীয় স্থান সংক্ষেপে ভিন্ন ফল লিখিত আছে যথা—আর্যচাং যষ্ঠতে (দ্বিতীয়ে) পাপে চৌরঃ স্রাং শুভ বজ্জিতে । আর্যচাং বাহপি (দ্বিতীয়ে) গোমো ভু সর্গ দিশ্চিপো ভবেৎ । সর্গজ শুভ জীবে স্রাং কবি বারী চ ভর্গবে । ইতি । ১৪১৬ ।

স্রাং শব্দদ্ব্যং প্রাক্ষেপঃ । ১৭ ।

অতঃ অত্র দ্বিতীয় স্থানে বদনুত্তং ফলং তৎ সর্গং স্রাং বৎ
করাকাংশবৎ প্রায়ৈণ বোধ্যং ন সর্গত্রি মিত্তি জ্ঞেয়ং । ১৭ ॥

যে যোগ্যশ্চ পদে লগ্নে যথাবল্ গদন্তো সম ।

করাকাংশস্ত কুণ্ডল্যাং তৎসর্বমপি চিন্তয়েৎ ॥

করাকাংশ কুণ্ডলী হইতে যে যে ভাবের যে প্রকার ফল চিন্তা করা হইয়াছে পদলগ্নে অমুক্ত অপরাপর ফল প্রায় সেইরূপই চিন্তা করিবে । পারাশরী হোয়ায় পদকুণ্ডলীর ফলই করাকাংশ কুণ্ডলী হইতে বিচার করিবার বিধি আছে । ইহাতে অস্বহান হয় যে পূর্বোক্ত যোগ্য সমুদায় করক কুণ্ডলী এবং পদ কুণ্ডলী উভয় প্রায় সম ভাবেই বিচার্য । অম্ব কুণ্ডলী হইতেও অনেক স্থানে ফল মিলিতে দেখা গিয়াছে । ১৭ ॥

লাভপদে কেন্দ্রে ত্রিকোণে বা শ্রীমন্তঃ । ১৮ ॥

অন্যথা দুঃস্থে । ১৯ ॥

লগ্নার্যচাং কেন্দ্রে কেন্দ্রস্থানে ত্রিকোণে পঞ্চম*নবম রাশৌ বা
লাভপদে শমুমাঝে স্থিতে সতি জাতকঃ শ্রীমন্তঃ ভাগ্যবান্ ভবতি ।
দুঃস্থে যষ্ঠাষ্টম দ্বাদশগে সতি অন্যথা, শ্রীমান্ ন ভবতি । দরিদ্রঃ
সাদ্যদিত্তি শেষঃ । ১৮ । ১৯ ॥

আর্যচাং কেন্দ্রে কোণেষু স্থিতে লাভ পদে দ্বিজ ।

শ্রীমাংশ জায়তে নুনং চাচ্ছাধা নির্ধনো ভবেৎ ॥

শমুমাঝে পদ লগ্নপদের কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে গত হইলে মহাব্য ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে ।
দুঃস্থান গত হইলে তদ্বিপরীত অর্থাৎ দরিদ্র হয় । স্তত্রাঃ অবশিষ্ট স্থানজন্মে মধ্যবিধ
ফল বিচার্য । ১৮১৯ ॥

তদ্বদু দ্বিমশেষাণাং সত্ত্বানামেত্য বোগবিৎ ।

পরিভাজতি সম্প্রাপ্য বুদ্ধিসৌক্যামনুভবম্ ॥ ২০ ॥

পরিভাজতি সূক্ষ্মাণি সপ্ত ত্ত্বানি বোগবিৎ ।

সমাদ্বিজ্যায় যোহলর্ক তস্মাদবিন্দি বিদ্যতে ॥ ২১ ॥

এতাং ধারণানান্ত শমুনাং সৌক্যামান্ববান্ ।

দৃষ্টা দৃষ্টা ততঃ সিক্তিঃ ত্যক্তা ত্যক্তা পরাং ব্রজেৎ ॥ ২২ ॥

যস্মিন্ যস্মিংশ্চ কুরুতে ভূতে রাগং মহীপতে ।

তস্মিংশ্চিহ্নি সমাসক্তিং সম্প্রাপ্য স বিনশ্যতি ॥ ২৩ ॥

তস্মাদ্বিদিস্তা সূক্ষ্মাণি সংস্কৃতানি পরস্পরম্ ।

পরিভাজতি যো দেহী স পরং প্রাপ্নুয়াৎ পদম্ ॥ ২৪ ॥

এতথেষ্ব তু সন্ধায় সপ্ত সূক্ষ্মাণি পাণ্ডিবি ।

ভূতাদীনাং বিরোগোহত্র সন্তাবজস্য যুক্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

গন্ধাদিষু সমাসক্তিং সম্প্রাপ্য স বিনশ্যতি ।

পুনরাবর্ততে ভূপ স ব্রহ্মাপরমাত্মম্ ॥ ২৬ ॥

সাপ্তোতা ধারণা যোগী সমতীত্য বদিস্ছতি ।

তস্মিংশ্চিহ্নিষ্যৎ সূক্ষ্মে ভূতে যাতি নরেশ্বর ॥ ২৭ ॥

তা'র পরে বৃহত্ত্বই জমিলে ধারণা

সর্বজন্ম লাভ হয় যুগ্মে ভাবনা ।

এ সিদ্ধি পেয়েও যোগী করি পরিহার,
সিদ্ধিতে না হয় মন্ত্র শ্রেষ্ঠ মতি ধার' । ২০ ।

এ সকল সিদ্ধি, তবে করি পরিহার

লভে যোগী জন্মেতে আনন্দ আপাব ।

এই সপ্ত-তত্ত্ব সিদ্ধি লাভ হলে পরে

যে যোগী ত্যজিতে পারে প্রকৃত অন্তরে ।

হে অলর্ক, সেই যোগী মুক্ত হইনিকর ।

পুনরায় আগমন তা'র নাহি হয় । ২১ ।

এ সপ্ত ধারণা আদিবেক নিরন্তর,

পুনঃ পুনঃ ত্যজিলেক হইয়া ভৎপর ।

এই সপ্ত সিদ্ধি যেবা করে পরিহার

পাশ্বে সে পরমা গতি সন্ধ নাহি তা'র । ২২ ।

যে বিষয়ে ঘটে যা'র আসক্তি উদয়

সে আসক্তি হ'তে নাশ ঘটে হুনিশ্বর । ২৩ ।

স্বপ্নে ধারণায় লাভ করি' সেই জন

অন্যাসনে তাজে তা'র সফল জীবন ।

অন্যে পরম পদ লাভ হয় তা'র

নিশ্চয় জানি'ই ইথে সন্ধ নাহি আর । ২৪ ।

এই সপ্ত-স্বপ্নের সন্ধনা লাভ করি'

ভূতচরে সদা অহরায় পরিহার,

সেই জন সন্ধাবের লভেন সন্ধান

সন্ধাবজ্ঞ সেই জন, মুক্তি পদ পান । ২৫ ।

গন্ধাদিতে সমাশক্তি ঘটিবে যাহার

ত্রিলোক হ'তে ঘটে আরক্তি তাহার । ২৬ ।

এই সপ্ত ধারণা হুসিদ্ধি হলে পরে

ত্যাগিতে সমর্থ সেই যোগী যুক্তান্তরে,

ইচ্ছা হ'লে সেই ভূতে লয় হয় তা'র

শুন নরেশ্বর ইথে সন্ধ নাহি আর । ২৭ ।

দেবানামহুগ্ৰাণাং বা গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্ ।
 দেহেষু লয়মায়াতি সঙ্গং নাপোতি চ কচিৎ ॥ ২৮ ॥
 অগ্নিমা লম্বিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ ।
 প্রাকাম্যঞ্চ তথেশ্বং বশিষ্টঞ্চ তথাপরম্ ॥ ২৯ ॥
 তত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেনতাংস্তথৈশ্বরান্ ।
 প্রাপোত্যকৌ নরব্যাত্র পরং নির্বাণমূচকান্ ॥ ৩০ ॥
 সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতমোহুগ্ৰিয়ান্ শীঘ্রত্বং লম্বিমা গুণঃ ।
 মহিমাশেষপূজ্যত্বাং প্রাপ্তিনীপ্রাপ্যমস্য যৎ ॥ ৩১ ॥
 প্রাকাম্যমস্য ব্যাপিত্বাদীশ্বিকক্ষেত্রো যতঃ ।
 বশিষ্টাঙ্ঘ্রিশিমা নাম যোগিনঃ সপ্তমো গুণঃ ॥ ৩২ ॥
 যত্রেচ্ছাস্থানমপ্যুক্তং যত্র কামাবসায়িতা ।
 ঐশ্বর্য্যকারণৈরৈত্তিৰ্ঘোগিনঃ প্রোক্তমক্ৰধা ॥ ৩৩ ॥

দেবতা অহর আর গন্ধর্ব ভূতদ
 রাক্ষসেও হ'লে লয় নাহি হয় সৰ্গ । ২৮ ।
 অনিমা, লম্বিমা, সে মহিমা প্রাপ্তি আর,
 প্রাকাম্য, ঐশ্বি, সে বশিষ্ট নাম যার । ২৯ ।
 কামাবসায়িত্ব নামে সিদ্ধি সে অষ্টম
 ঐশ্বরিক গুণ অষ্ট অতি অল্পম,
 নির্বাণমূচক ইহা জানিও নিশ্চয়
 ক্রমেতে যোগীর লাভ হয় সমুদায় । ৩০ ।
 সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতম হইবে বেঙ্কদ্য
 যেই শক্তি বলে বলি 'অনিমা' তাহার ।
 শীঘ্রত্ব হইবে লাভ যেই শক্তি বলে
 লম্বিমা নামেতে গুণ শাস্ত্রে তার বলে ।
 অশেষ ভূতের পূজ্য হয় যোগী যার
 "মহিমা" সে শক্তি বলি যোগ শাস্ত্রে গায় ।
 অপ্রাপ্যের লাভ হয় যেই শক্তি বলে

"প্রাপ্তি" নামে শক্তি তার বলে ত
 সকলে । ৩১ ।
 ব্যাপিত্ব শক্তির লাভ হয় ত বাহ্য,
 "প্রাকাম্য" নামেতে সিদ্ধি সবে কহে তায় ।
 সবার অদীশ হয় প্রভাবে যাহার,
 "ঐশ্বি" বলিয়া খ্যাতি,অনিহ তাহার ।
 যে শক্তি প্রভাবে সবে বশীকৃত হয়—
 "বশিষ্ট" তাহার নাম শাস্ত্র মাঝে কয় ।
 এই ত সপ্তম সিদ্ধি সনহে রাজন,
 এরি ফলে নির্ভয়ে রহেন যোগিগণ । ৩২ ।
 শেষ সিদ্ধি "কামাবসায়িতা" নাম যার
 সৰ্গ কাৰ্য্য সিদ্ধ হয় প্রভাবে তাহার ।
 অপূর্ণ না রহে ইচ্ছা এই সিদ্ধি ফলে,
 জগতের হিত হয় এই শক্তি বলে ।
 ঐশ্বরের অষ্ট বিধ এই শক্তি চয়
 এর ফলে যোগী সৰ্ব্ব-সিদ্ধ স্থানিচয় । ৩৩ ।

মুক্তিসংসূচকং ভূপ পরং নির্বাণমাত্মনঃ ।
 ততো ন যায়তে নৈব বদ্ধতে ন বিনশ্যতি ॥ ৩৪ ॥
 নাপি ক্ষয়মবাগোতি পরিণামং ন গচ্ছতি ।
 ছেদং ক্রোধং তথা দাহং শোষণং ভূবাদিতা ন চ ॥ ৩৫ ॥
 ভূতবর্গাদবাগোতি শব্দাদৈত্বিয়তে ন চ ।
 ন চাস্য সন্তি শব্দাদ্যাত্তদোক্তা তৈর্যুক্ত্যতে ॥ ৩৬ ॥
 যথা হি কানকং খণ্ডমপদ্রব্যবদগ্নিনা ।
 দন্ধদোষং দ্বিতীয়েন খণ্ডেনৈক্যং ত্রৈলোক্য ॥ ৩৭ ॥
 ন বিশেষমবাগোতি তদ্বদযোগিনি যতিঃ ।
 নির্দন্ধদোষন্তেনৈক্যং প্রয়াতি ত্রৈলোক্য সহ ॥ ৩৮ ॥
 যথাগ্নিরগ্নৌ সজ্জিগুঃ সমানত্বমকৃতজ্ঞেং ।
 তদাখ্যাত্তদ্যো ভূতো ন গৃহ্যেত বিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥
 পরেণ ত্রৈলোক্য তদ্বৎ প্রাপ্যৈক্যং দন্ধকিঙ্কিঃ ।
 যোগী যতি পৃথগ্ভাবং ন কদাচিন্মহীপতে ॥ ৪০ ॥

মুক্তির সূচক এই অষ্ট, হে রাজন,
 লভেন নির্বাণ পরে মুক্তসঙ্গ জন ।
 জন্ম-বন্ধি-নাশ আর না হয় তাঁহার
 পরিণাম হীন হ'য়ে করেন বিহার । ৩৪ ।
 কিত্তি আদি ভূত চয় হতে তাঁর ভয়—
 ক্ষয় পরিণাম আদি আর নাহি হয় ;
 ছিন্ন ভিন্ন, স্কিন্ন কিছা দধ, শুক আর,
 হইবার ভয় আর না রহে তাঁহার । ৩৫ ।
 শব্দ-স্পর্শ-আদি হ'তে আকর্ষিত হ'য়ে
 অপহৃতান্তর নাহি ন, বদ্ধ রয়ে । ৩৬ ।

দধ স্বর্ণ হ'তে গেলে অপজব্য চয়
 শুভ স্বর্ণ সনে তাহা যথা যুক্ত হয় । ৩৭ ।
 না রহে প্রভেদ তার—যোগী সেই মত
 যোগারি সংস্কৃত হয়ে যুক্ত অবিরত
 ব্রহ্মসনে, ঐক্যলাভ করেন নিশ্চয়
 জানিহ রাজন, ইথে নাহিক সংশয় । ৩৮ ।
 অগ্নিতে অপর অগ্নি করিলে অর্পণ,
 প্রভেদ—স্বাতন্ত্র্য কিছু না রহে যেমন । ৩৯ ।
 দধ দোষে যোগী তথা পরব্রহ্ম সনে
 সাম্যতা সাক্ষ্য লভে; রেখা ইহা মনে । ৪০ ।

যথা জলং জলেনৈক্যং নিক্ষিপ্তমুপগচ্ছতি ।

তথাস্মা সাম্যমভ্যতি যোগিনঃ পরমাত্মনি ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দত্তাক্ষেয়ালকসংবাদে
যোগিসিদ্ধিনাম চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥

জলেতে মিশালে জল, যেমন আবায়
পৃথক করিতে সাধ্য না রহে কাহার,

তেমতি মিলিলে আত্মা পরমাত্মা মনে
যোগির স্বাতন্ত্র্য নাশ হয় জিহুবনে । ৪১ ।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে দত্তাক্ষেয় অলক সংবাদে
যোগিসিদ্ধি নামক চত্বারিংশ অধ্যায় ।



একচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

অলক উবাচ ।

ভগবান্ যোগিনশ্চর্য্যাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

ব্রহ্মবজ্রান্যহুসরন্ যথা যোগী ন সৌদতি ॥ ১ ॥

দত্তাক্ষেয় উবাচ ।

মানাপমানৌ যাবেতৌ প্রভ্রাৎগগকরৌ নৃণাম্ ।

তাবেব বিপরীতার্থৌ যোগিনঃ সিজ্জিকারকৌ ॥ ২ ॥

মানাপমানৌ যাবেতৌ তাবেবাহুর্বিষায়ুতৌ ।

অপমানোহিয়ুতং তত্র মানস্ত বিসমং বিষম্ ॥ ৩ ॥

চক্ষুঃপুতং স্যসেৎ পাদং বজ্রপুতং জলং পিবেৎ ।

সত্যপুতং বদেদ্বাণীং বুদ্ধিপুতঞ্চ চিস্তয়েৎ ॥ ৪ ॥

শুনি, দত্তাক্ষের মুখে এ হেন বচন

বলিলা অলক—“পদে করি নিবেদন,

ভগবন, বল এবে হইয়া সদয়

যোগিজনচর্যা যেবা শাপ্ত মত হয়,

শুনিতে বাসনা এবে হাতেছে আমার

বিস্তারি বলহ দেই সর্বতত্ত্বসার ।

যেই রূপে ব্রহ্মবজ্রো কবুলে গমন,

অবসন্ন নাহি হন কতু যোগিজন । ১ ।

দত্তাক্ষেয় শুনি রাজার একথা,

বলিলেন নররায়,

মান অপমান উচ্ছেপের হেতু

নাহিক সম্ভেদ তা'য় ।

যোগির সত্য বিপরীত ভাব

এ ছাটরি প্রতি হয়,

এই সে কারণে নিকষেগ তিনি

সর্ব সিদ্ধি হসিন্দয় । ২ ।

মান অপমান বিষ ও অমৃত

তা'র কা'ছে বোধ হয়,

অপমানামৃত মান বিষ সম

বিষয় যাতনাময় । ৩ ।

চলিবার কালে পদক্ষেপ আগে

পথ দৃষ্ট-পুত করি'

পদক্ষেপ করি চলে যোগি সবে

সদা মন স্থির করি' ।

বস্ত্রপুত করি' পবিজ সলিল

করিবেন সদা পান,

সত্যপুত সদা বলেন বচন

রাখিয়া সবার মান ।

বুদ্ধিপুত করি, করি বিবেচনা

চিস্তনীয় যে বিষয়

তাহা স্থির করি' করেন চিস্তন

যোগিজন হসিন্দয় । ৪ ।

আতিথ্য আন্ধ-যজ্ঞেযু দেবযাত্রোঃসংবেষু চ ।
 মহাজ্ঞেনেযু সিদ্ধার্থং ন গচ্ছেদযোগবিশং কচিৎ ॥ ৫ ॥
 ব্যস্তে বিধূমে ব্যঙ্গারে সৰ্বশ্মিন্ ভুক্তবজ্জনে ।
 অটেত যোগবিশৈক্যং ন তু তেষেব নিত্যশঃ ॥ ৬ ॥
 যথৈবমবমন্তস্তে জনাঃ পরিতভতি চ ।
 তথা যুক্তশচরেদযোগী সতাং বজ্জান্ দুষয়ন্ ॥ ৭ ॥
 ভৈক্যং চরেদগৃহস্থেযু যাববরগৃহস্থে চ ।
 শ্রেষ্ঠা তু প্রথমা চেতি বৃন্তিরতোপদিশ্যতে ॥ ৮ ॥
 অথ নিত্যং গৃহস্থেযু শালিনেযু চরেদ্যতিঃ ।
 শ্রদ্ধধানেযু দাস্তেযু শ্রোতিয়েযু মহাস্বয়ং ॥ ৯ ॥
 অত উক্তং পুনশ্চাপি অচুচ্চাপতিতেষু চ ।
 ভৈক্যচর্যা বিবর্ণেযু জঘন্য বৃন্তিরিয়তে ॥ ১০ ॥

আতিথ্যের আশে কিম্বা আন্ধ কালে
 যজ্ঞ, যাত্রা, মহোৎসবে,
 কিম্বা সিদ্ধি আশে মহাজন পাশে
 গমন কর্ত্ত না হ'বে । ৫ ।
 ধুম অমিহীন গৃহীর ভবন
 হইবেক যে সময়,
 গৃহীগণ যবে ভোজন করিয়া
 বিশ্রামেতে রত হয়,
 সেই ত সময়ে যোগবিশংগণ
 ভিকার বাসনা করি'
 গৃহীর ভবনে করিবে গমন
 মনে শাস্ত্যভাব ধরি,
 নিত্য এক স্থানে না যাবে কখন
 ভিক্ষাতরে যোগিজন
 বেহ রক্ষামাত্র উপলক্ষ্য তায়
 ভোগে নরত মন । ৬ ।
 যাহে পরিভব কিম্বা অপমান
 নাহি ক'রে কোন জন,

হেন ভাবে সদা সাধুরাশ্রয় থাকি'
 করিবেন বিচরণ । ৭ ।
 গৃহীর ভবনে, যাবাবর-বাসে
 ভিক্ষা মুক্তিযুক্ত হয়,
 গৃহীর ভবন ভিকার কারণ
 শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মচর্য । ৮ ।
 শালীন, গরুড়, দাস্ত দেবা আর
 শ্রোত্রিয় মহৎ মন,
 হেন গৃহস্থের ভবনে ভিক্ষার্থে
 যোগী করিবে গমন । ৯ ।
 অরুণ্ড যে জন পতিত যে নয়
 হেন গৃহস্থের বাসে
 যথা কালে যোগী করিবে গমন
 যথাযোগ্য ভিক্ষা আশে ।
 বিবর্ণ জনের ভবনে কখন
 ভৈক্য আশে নহি যাবৈ,
 জঘন্য সে বৃন্তি জানে সাধুজন
 তাহে বহু কষ্ট পাবে । ১০ ।

ভৈক্যং যবাগুং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব বা
 ফলং মূলং প্রিয়ঙ্গুং বা কণ-পিণ্যাক-শক্তবঃ ॥ ১১ ॥
 ইত্যেতে চ শুভাহারা যোগিনঃ সিদ্ধিকারকাঃ ।
 তৎ প্রযুক্ত্যামুনির্ভক্ত্যা পরমেণ সমাধিনা ॥ ১২ ॥
 অপঃ পূৰ্ব্বং সন্ধুং প্রাশু তুফ্যং কুঙ্কমাহতঃ ।
 প্রাণায়ৈত ততস্তস্ত প্রথমা হ্যাহুতিঃ স্মৃতা ॥ ১৩ ॥
 অপানায় দ্বিতীয়া তু সমানায়ৈতি চাপরা ।
 উদানায় চতুর্থী স্ত্রাব্যানায়ৈতি চ পঞ্চমী ॥ ১৪ ॥
 প্রাণায়ামৈঃ পৃথক্ কুঙ্কমাশেযং ভূঞ্জীত কামতঃ ।
 অপঃ পুনঃ সন্ধুং প্রাশু আচম্য হৃদয়ং স্পৃশেৎ ॥ ১৫ ॥
 অন্তেষ্টং ব্রহ্মচর্য্যক ত্যাগোলোভস্তথৈব চ ।
 ত্রতানি পঞ্চ ভিক্ষুণামহিংসাপরিমানি চ ॥ ১৬ ॥

যবাগু সে আর, তক্র, ছুড় কিম্বা,
 যাবক, প্রিয়ঙ্গু, ফল,
 মূল, কণ, শক্তু পিণ্যাক সে আর
 ভৈক্য-দ্রব্য এ সকল । ১১ ।
 এই সব দ্রব্য সদা শুদ্ধাচার,
 সিদ্ধির কারণ হয়,
 মৌনী হ'য়ে যোগী ' নিরঞ্জন বসি'
 হুজিবেন সমুদায় । ১২ ।
 প্রথমে কিঞ্চিৎ জল পান করি'
 যোগী সমাহিত হ'য়ে,
 "প্রাণায়" বলিয়া প্রথম আহুতি
 সদা বাক্যত্ব রা'য়ে ।
 প্রথম আহুতি এই ত যোগীর
 বলে শাস্ত্রে এই মত
 তাঁ'র পর যেরা বলি শুন রাজা
 আহার বিধি যেমত । ১৩ ।

"অপানায়" বলি দ্বিতীয় আহুতি
 "সমানায়" বলি পরে ।
 "উদানায়" বলি চতুর্থ যে হয়
 পঞ্চম "ব্যানায়" আরে । ১৪ ।
 পরে প্রাণায়াম করি' একবার
 পৃথক ভাবেতে পরে,
 হুজিবেন অন্ন যথাস্থখে যোগী
 সদা প্রকৃষ্ট অন্তরে ।
 আহারের পর পুনঃ জল লয়ে
 করিবেন আচমন,
 আচমন পরে— হৃদয় স্পর্শিয়া
 তবৈ তাক্রিবে আসন । ১৫ ।
 অন্তেষ্ট, অলোভ, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ
 অহিংসা এ পঞ্চ ব্রত,
 ভিক্ষু যেই জন করিবেন পালন
 কায়-মনেতে নিয়ত । ১৬ ।

অক্ৰোধো গুরুশুশ্রূষা শৌচমাহারলাঘবম্ ।
 নিত্যস্বাধ্যায় ইত্যেতে নিয়মাঃ পঞ্চ কীর্তিতাঃ ॥ ১৭ ॥
 মারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্যাদাধকম্ ।
 জ্ঞানানাম্ বহুতা যেষাং যোগবিদ্বকরী হি সা ॥ ১৮ ॥
 ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যত্নযিতশ্চরেৎ ।
 অপি কল্পসহজেষু নৈব জ্ঞেয়মবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥
 ত্যক্তসঙ্গে জিতক্ৰোধো লঘাহারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 বিধায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি মনো ধ্যানে নিবেশয়েৎ ॥ ২০ ॥
 শূদ্রেদেবাবকাশেষু গুহ্যং চ বনেষু চ ।
 নিত্যযুক্তঃ সদা যোগী ধ্যানং সম্যগুপক্ৰমেৎ ॥ ২১ ॥
 বাগদণ্ডঃ কৰ্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ ।
 যন্ত্ৰৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীগুরুশুশ্রূষা, অক্ৰোধ সে আর
 শৌচ আর লঘাহার
 নিয়ত স্বাধ্যায় নিয়ম এ পঞ্চ
 যোগীর জানিহ মার। ১৭ ।
 মারভূত আর, কার্যের সাধক
 জ্ঞান সেই হৃনিষ্ঠয়
 তাহার সাধনে রত রবে সদা
 যোগীর কৰ্ত্তব্য ছয় ।
 জ্ঞান লাভ তরে বহু বিচারের
 চেষ্টা করু ভাল নয়
 বেগ বিদ্বকর সে চেষ্টা জানিয়া
 তাজিবে তাহা নিষ্ঠর। ১৮ ।
 এটা জানা চাই ওটা জানা চাই
 এই ভাবে ঘেঁই জন,
 তৃপ্ত হইয়া পূরে নিরন্তর
 বুধা পূরে সেই জন,

সহস্র কল্পেও কখন তাহার
 জ্ঞেয়ত্ত্ব জ্ঞাত নয়,
 বুধায় ঘুরিয়া জীবন তাহার
 অকারণে হয় ক্ষয়। ১৯ ।
 ত্যক্ত সঙ্গ হ'বে হবে জিতক্ৰোধ
 লঘাহারী হবে আর,
 জিতেন্দ্রিয় হয়ে ধ্যান যুক্ত হবে
 কঙ্ক করি সৰ্বদ্বার। ২০ ।
 শূদ্রে, অবকাশে, গুহ্য, বাননে
 যোগী নিত্য যুক্ত হযে,
 ধ্যানপর হবে ইষ্টে দৃঢ় করি
 সত্তত সংযত র'বে। ২১ ।
 বাক-কৰ্ম-মন তিন দণ্ড করি
 সংযত সঙ্গা য়ে জন,
 সেই সে ত্রিদণ্ডী মহাযতি সেই
 রাখিও মনে রাজন। ২২ ।

গৃহস্থ



সাহিত্য সম্মিলনের বিভিন্ন বিভাগের মনোনীত সভাপতিবৃন্দ ।

“মনে পড়ে যে বালকে ?” সুহৃৎ সে প্রাণ
ধবীর ঈশ্বরের ঘন এক দান—
বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে ?
চৌকিকে প্রকৃতি তার হাত প্রসারিছে
আনন্দ অকুটিমুক্ত, উদার, নবীন ।
মহিষ লয়ে সে মাঠে খায় প্রতিদিন—
গরু বাগি তরু ছায়ে, তরুসে শুয়ে,
সমুদ্রে নান, মাথা হস্ত পরে খুয়ে,
যৌবন করে অমৃত, মিষ্ট অমৃত,
প্রখণ্ড প্রাণে প্রতিবিম্ব অমৃত ।

কঃ দিব্যিগাম—

কোথা লোক ? প্রাণ যাব মুক্ত ? সুধিবীর
সর্পছাণ পড়ে দেখা ? লঘু কি গভীর—
প্রতিকণ অজ্ঞানবৎ বস্তু, এক করি’
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি ?
দূতবাহ—ওই জেলে-ছেলের মতন
জীবন-সমুদ্রে মাঝে ক’রিয়া ক্ষেপণ
নিজেরে সহসা, বহু-ভুলিয়া ভুলিয়া
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিয়া—
হাততলে ফলাবস্ত্র ঘেলে কণ্ঠজাল—
“নিশ্চয় উঠিবে মস্ত”—ধৈর্যদূত ভাল ।
সে লোক নিশ্চয় অতি খোব ভালবাসে
—তা ম’লে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে ?
—জীবন, জীবন, ভাই, আনন্দ জীবন ।”

সত্যীশচন্দ্র রায় ।

৫ম খণ্ড

৫ম বর্গ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

অষ্টম সংখ্যা

আলোচনা

১। কলিকাতার
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

সে দিন কলিকাতার বঙ্গীয়সাহিত্য-
সম্মিলনের বৈঠক হইয়া গেল । এবার এই
সম্মিলনকে—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও
ইতিহাস ওই শাখায় ভাগ করিয়া প্রত্যেক
শাখায় এক একজন সভাপতি মনোনীত করা

হইয়াছিল । আর তাঁহাদের সকলের উপরে
একজন কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন, তিনিই প্রকৃত
প্রস্তাবে সম্মিলন-সভাপতি । জৈ বিভাগ
চতুষ্ঠয়ে যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-
রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র তর্করত্ন, মাননীয়
শ্রীযুক্ত অসন্নকুমার রায়, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী ও ঐতিহাসিক-
প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়

গোষ্ঠ—১

সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। সম্মিলন-সভাপতি ছিলেন জানকী, দার্শনিক শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

মধ্যস্থলবাসী জনসাধারণ এবারকার এই সম্মিলন-ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝেন নাই; কারণ এ পর্য্যন্ত সম্মিলনের এরূপ অবিবেশন আর হয় নাই। তাই তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেওয়া প্রথমে আবশ্যক বোধ করিতেছি। পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্য-সম্মিলন, বিজ্ঞান-সম্মিলন, ইতিহাস-সম্মিলন প্রভৃতি নানা প্রকারের সম্মিলন আছে। বংগের মধ্যে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিকগণের কেহ কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার করিলেন কি না, বঙ্গের মধ্যে এই সমস্ত বিভাগের কোনটী কতদূর উন্নতি লাভ করিল—ইত্যাদি বিষয়ের পর্যালোচনা করাই সমস্ত সম্মিলনের উদ্দেশ্য।

আমাদের সাহিত্য-সম্মিলন এই সাত বৎসর যেরূপ ভাবে চলি তাহাতে বুঝা যায় ইহার উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমাদের সাহিত্য-সম্মিলন সাহিত্য-প্রসারের জ্ঞাত একটা অগ্রগতি। ইহার উদ্দেশ্য—ইংরাজী শিক্ষা ও দীক্ষার পরিপূর্ণ জনসমাজে বাঙ্গালী সাহিত্যের গৌরব প্রচার করা, আর তাহার ইংরাজী শিক্ষা পাণ্ডা নয় সেই অপর মুঢ় মুক জনগণকে সাহিত্যের দ্বারা উদ্ধৃত করা। তাই সাহিত্য-সম্মিলনের মতগুণ নৈমিত্তি গরিব হাজার লোকের সমাবেশ হয়। ধন-পুত্র ও ইংরাজী শিক্ষার গৌরব থাকে না। সাহিত্য-সম্মিলন-মণ্ডপে কখনও টিকিট ক্রয় বিঘ্ন হয় না—এবার তাহাই হইয়াছে—তাঁহারা বাঙ্গালী ভাষা বুঝে তাহার দেশের নীতী-দিগের নিকট বেশ সমুদ্র আলোচনা শুনে একেই শিক্ত প্রতিভাবানদিগের সহিত অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতগণের একটা ভাবের ফলে নীতিগণের চিন্তা সমগ্র সমাজে একটা আলোচনা আনিবার সুযোগ পাই।

এবারকার সম্মিলনে এ সব উদ্দেশ্যকে একেবারেই বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার কর্তৃপক্ষগণ নতুন প্রকার আয়োজন করিয়াছেন। সম্মিলন চারিটা

শাখায় ইহাকে ভাগ করিয়া তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরের ব্যবস্থা করিয়া বিশেষজ্ঞগণের আলোচনার সুবিধা সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণ মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়া বিবেচ্য আলোচনা দ্বারা স্বীয় স্বায় বিভাগের উন্নতি ও সংস্কার করণে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন ইহা তাহাদের মত। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিরাট সাহিত্য-সম্মিলনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটা আলোচনা-সমিতিতে পরিণত করিয়াছেন।

এই শাখা-বিভাগ লইয়া সম্মিলনে বেশ একটা গোলমালও হইয়াছে। শাখা-বিভাগী দলের সংখ্যা বড় কম ছিল না, তাঁহারা বিলিয়াছেন—আমাদের বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা এখন আসে নাই। কাজেই সাহিত্যকে চারিটা বা পাঁচটা শাখায় ভাগ করিবার কি প্রয়োজন? গৌরব লোক শতকরা নিরানুগ্রহী জন অনিশ্চিত; ইংরাজী শিক্ষিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকই মধ্যশিক্ষিতের দলে। এমনকি অবস্থায় কতকগুলি বিভাগ করিয়া সম্মিলনের যে একটা উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, তাহাতে বাধা দেওয়া কখনই সমীচীন মনে হয় না। এই সম্মিলনের মধ্য দিয়া আমাদের সাহিত্যের প্রতি অগ্রদূত-গুণ্ডির সমগ্র নগর সাহিত্যের বেগের লোহের প্রক্তি অশ্রু-সমুদ্রাচ্ছন্ন জ্বলিতেছে। লোকশিক্ষাও কম হইতেছে না। শাখা-বিভাগ হইলে বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করিয়া ছুই-একটি নিগূঢ় তথ্যের মীমাংসা করিতে পারেন, সভা। কিন্তু এক এক বিশেষের প্রকৃত বিশেষজ্ঞগণের সম্মানই বা কত? তাঁহারা ত মুষ্টিমেয়, তাঁহারা কি চিঠি পড়ে তাঁহাদের আলোচনা বিবেচনা করিতে পারেন না। যদি নাই বা পারেন, তবে তাঁহারা একটা পৃথক আলোচনা সমিতি করুন না কেন, সাহিত্য-সম্মিলনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রয়োজন কি? সাহিত্য-সম্মিলন কখনই কয়েকজন বিশেষজ্ঞের নহে, সাহিত্য-সম্মিলন দেশের, সমাজের, জনসাধারণের, অনিশ্চিত ও অর্ধশিক্ষিতের। কলিকাতার কর্তৃপক্ষগণ কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষে

অনেক যুক্তি-তর্কের পর তাঁহারা বলিলেন অশ্রুত: এবার পরীক্ষা (experiment) করিয়াই দেখা যাক্ যে কি ফল হয়। অশ্রুতবে ভোট দ্বারা বিভাগীয় সভার অধিবেশন স্থিরীকৃত হইল।

আমরা পৃথকীকরণের পক্ষপাতী নহি। যদিও ইতিহাস-শাখার সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবজ ওজনীয় ভাষায় বক্তৃতা দিলেন যে, এই শাখা-বিভাগের দ্বারা আমাদের কাজ হ্রাসকল্পই চলিয়াছে; যদি আমাদের মত-পার্থক্য থাকিত, তবে নিশ্চয়ই এত লোক আমেরা এই সভায় উপস্থিত পাইতাম না। কথাতা কিন্তু আমাদের মতে ঠিক নহে। এক ইতিহাস-সভায় ত লোক সমবেত হইয়াছিল, অপর তিনটি বিভাগে একত্রে তত লোক ছিলেন এ কথা বলিলে অত্যাধিক হয় না। ইতিহাস-সভায় যে লোক-সমাগম—বহল হয়, তাহারও বর্ণের কারণ আছে। সে সবার আলোচনা-আমাদের কাজ নাই। তবে জিজ্ঞাস্য এই—এটা কি ইতিহাস-সম্মিলন? তাহা যখন নহে, তখন অজ্ঞাত বিভাগগুলিতে যাহাতে সমাজে উপস্থিত থাকেন, তাহার ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে? অজ্ঞাত আছে। তাহার ব্যবস্থা করিতে নেতৃত্ব হয় পৃথক সময়ে পৃথক সম্মিলন হউক—নতুবা এমন কোন বিশেষ ইন্দোবস্ত হউক, যাহাতে তার এরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয়। সম্মিলনে আমরা দেখিলাম যে সভার চারিদিকে লোক কেবল হস্তা করিতেছে। সভাতা যেন একটা মজলিস আড্ডা বিশেষ। বিশেষত: যে উদ্দেশ্যে এই পৃথক সভা অধিষ্ঠিত হইল তাহারও কোন ফল সুবিধা নাই। কলিকাতার কর্তৃপক্ষগণ বলিয়াছিলেন পৃথক সভা করার একটা বিশেষ কারণ এই যে সময়ের অম্মতা হেতু আমরা লেখকদিগকে প্রদ্রষ্ট পড়িতে দিবার সুযোগ পাই না। যদি একই সময়ে পৃথক সভা হয়, তবে অনেক প্রদ্রষ্ট পড়িত হইতে পারিত। কিন্তু এবার দেখিলাম সাহিত্য-সভায় ২৪টা প্রবন্ধের ৩৪টি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। অবাঞ্ছিত সৃষ্টি ছুই দিনে পঠিত হইলেও পাঠকদের মধ্যে

অনেকেই ছুই তিন মিনিট সময় পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ সভাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিতেও সৃষ্টিত হন নাই। অবশ্য ইতিহাস-বিভাগ বেশ সুস্বাভাব্য সহিত চলিয়াছিল। অজ্ঞাত বিভাগে প্রবন্ধ অনেক কম ছিল হস্তান্তর কোন গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু কথা এই, যদি সৃষ্টিটা প্রবন্ধ হইলেও পাঠক-দিগকে ছুই তিন মিনিট সময় দিতে হয়, তবে আর পৃথক বৈঠকে লাভ কি হইবে।

আর এক কথা, সম্মিলন-সভাপতির কাজ কি কেবল অভিভাষণ-পাঠ ও ধর্মবান-গ্রন্থ? যিহেজ্ঞান প্রথম দিন সভায় আসিয়া অভিভাষণ পাঠ করিলেন, পরে অগ্রহস্তা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উপস্থিত হইয়াই বা তিনি কি করিতেন? কোন সভায় তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট হইত? সাধারণ সম্মিলনের দিগ্নে অর্থাৎ শেষ ধর্মবাদের পালায় দিনে অগ্র তাঁহার কাজ ছিল স্বীকার করি। কিন্তু সে কাজও বিগত সম্মিলনে যেমন হইয়াছিল—অপরের দ্বারা দগ্ধ হইতে পারিত।

উপরোক্ত নানা কারণে আমরা সাহিত্যের পরিচালক ও সম্মিলন-কর্ত্তৃদ্বিগণকে আর একবার এ বিষয় সমুদ্র চিন্তা করিতে অহুরোধ করি। যাহাতে সব দিক আমরা বজায় রাখিতে পারি তাহার চেষ্টা করা উচিত। এবার সম্মিলনে এইরূপ নানা গোলযোগ হইবে তাহা আমরা পূর্বেও একবার বলিয়াছি। ইহার একটা শেষ মীমাংসা না করিলে সাহিত্যের যে তুচ্ছিন আসিয়াছে তাহার আর অবদান হইবে না।

উক্ত গোলযোগসমূহের প্রতিকারকল্পে কয়েটি প্রস্তাব হইয়াছে, আমরাও একটি প্রস্তাব করিতেছি। আমরা মনে করি ইহা কাঙ্ক্ষার হইবে। আমরা প্রস্তাব করিতেছি সম্মিলনের নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ সম্মিলনের কাজ হউক এবং বিশেষজ্ঞগণের আলোচনার জ্ঞাত অজ সময় নির্দিষ্ট হউক। প্রস্তাবকালে তাঁহারা মিলিয়া আলোচনা করিলে কেহই তাঁহাদের কাজে বাধা দিবে না। সেখানে গোলযোগের আশংকা কম। নতুবা শাখা বিভাগ করিয়া বিশেষজ্ঞগণ

একই সময়ে আলোচনা করিতে বলিলে একদিকে যেমন দুই চার জন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত হইবেন, অন্যদিকে যেমন শ্রোতৃবর্গ বিভাগ গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা ত সকলেই একেবারেই অজ্ঞ অথবা অ-বিশেষজ্ঞ, সুতরাং এ মিলন ব্যাপার তখন 'বাৎসব'-মিলনে পরিণত হইবে। তাহাতে সাধারণের সহানুভূতি থাকিবে না। ফলে এ প্রকার সম্মিলনের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না।

বাস্তবিক সম্মিলনে এবার রক্তেণ গোলযোগ ঘটানো ছিল তাহাতে এইরূপ বুলিয়া বলা প্রয়োজন হইয়াছে তাই আমাদের এত কথার অবতারণা। আশা করি, ইহার একটা স্বাভাবিক হইবে। সাহিত্য-সম্মিলন শেষে কংগ্রেসের অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত নয় কি ?

..

২। সাহিত্য-সম্মিলনের প্রস্তাব

আমাদের দেশে যে কতটা চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই সম্মিলন হইতেই বৃদ্ধিতে পারিতেছি। সাহিত্য-সম্মিলনের গোলযোগও ঐ চিন্তাশীলতারই উদ্ভাবন। লোকের বিভিন্ন মত তাহার বিভিন্ন চিন্তার পরিচয় দেয়। এটা জীবনের লক্ষণ। জীবনশূন্য জ্ঞানির মতামত নাই, তাহার বিবাদ-বিসম্বাদও নাই। কলহ-বিবাদ না থাকে, দলদ্বাদ্বি না থাকে, পরস্পরের মিলন থাকে তাই ত আমরা চাই। কিন্তু জীবনশূন্য জ্ঞানির নির্মিত্যের অবস্থা স্পৃহনীয় নহে। এবারকার সম্মিলনে জীবনবস্তুর পরিচয় আমরা পাইয়াছি।

সাহিত্য-সম্মিলন এবার কতগুলি স্মরণ প্রস্তাব করিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষা আন্দোলন আর হেয় ভাষা নয়। যে ভাষা নৌরেল পুরস্কার লাভ করিতে পারে, পাশ্চাত্য জাতির নিকট তাহার মূল্য বড় বেশী। শুধু আমাদের নিকট নয়, জগতের নিকট আমাদের ভাষার স্থান বড় কম নহে। তাই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন পাঠ্য

বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিম প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিতে কর্তৃপক্ষকে অহুগার করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থার জন্ত আপাততঃ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদকে অহুগার করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবের জন্ত আমরা সম্মিলনকে দৃষ্টবাদ দিতেছি। তাঁহারের সাধু উত্তম জয়যুক্ত হউক, এই আমরা কামনা করি।

আর একটা শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব উল্লেখ-যোগ্য। এই প্রস্তাব বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী-শিক্ষা দেওয়ার সমর্থনস্বরূপ। বাস্তবিক পক্ষে বাঙ্গালাভাষা দরিদ্র নহে। তাহাতে ভেষজ ও চিকিৎসাবিষয়ক কোন পুস্তকাদি নাই, অথবা প্রাচীন হইতে পারে না, এমন নহে। স্বতরাং কেন যৈ আমাদের ছাত্রেরা বাঙ্গালায় ডাক্তারী শিক্ষা পাইবে না তাহা ব্যক্তি না।

আজকাল ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে। তাহারের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যোগ রাখা নিত্য আবশ্যিক। তাই পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির ব্যবস্থা বাহাতে হয়, তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। এই মধ্যেও আর একটা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আমরা এখন প্রায় এক সময়েই কতকগুলি সম্মিলন স্থানে স্থানে করিয়া থাকি। তাহাতে সম্মিলন যোগ দিতে পারেন না। তাই অস্থবিধা দূর করিবার জন্ত বিভিন্ন সময়ে সম্মিলনগুলি বাহাতে বসে, তাহার ব্যবস্থাপন করা নিত্যস্বই দরকার হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন একটি প্রস্তাবে ইহার জন্তও চেষ্টা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

..

৩। বেহারের শিক্ষাসমস্যা

বেহার প্রদেশের সমস্ত রক্তাঙ্গত মহাশয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রাধিকান-যোগ্য। বেহার শিক্ষা বিষয়ে এখনও খুব উন্নত নহে। অতএব সেখানে বিতর্ক ও গভীরভাবে শিক্ষা-প্রশ্নের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের বিবৃতি, গর্বমণ্ডিত যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় জীবনের অস্বস্তিক নহে। শিক্ষাটিকে বেশী বায়মূল্য করিলে, তাহা সূচীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং সেই ক্ষয় রক্ত অতএব বহনযোগ্য লোক তাহা হইতে বিকৃত হয়। আজকাল দেখা যায়, ভাল বাড়ী, ভাল বেগ, ভাল চেয়ার প্রভৃতি না হইলে বিদ্যালয় খোলাই কঠিন। কিন্তু প্রাচীন প্রণালীতে এ সমের শিক্ষণ দরকার ছিল না। তখনকার দশনে শিশুকে লোকের কি আজ্ঞাকারার ন্যায়-প্রণালীতে শিক্ষিত লোক অপেক্ষা কোন অংশে হীন? হয় ত এই সব আড়ম্বর-আলোচনের অভাবই অনেক বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতেছে। তারপর আর একটা কথা— বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধমান নিয়ম অস্থায়ের কতক শ্রেণীতে নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করা য়। ছাত্রসংখ্যা বেশী হইলে প্রত্যেক শ্রেণীতে অন্তর্গত শাখাগুলিবার নিয়ম আছে, তাহাতে শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়াইতে হয়। কিন্তু গর্বমণ্ডিত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াইতে চাননে না। সেইজন্ম বেহারের অনেক জেলা স্কুল হইতে বহু ছাত্র প্রবেশাধিকার না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। পূর্ণ নিয়মে এ সব উৎপাত ছিল না—তখন ছাত্রের সংখ্যা-বাহুলা আকাঙ্ক্ষা হইত। বাস্তবিক পক্ষে তখনই শিক্ষাটা ব্যাপক করিবার চেষ্টা ছিল—কিন্তু আজ তাহার একেবারে উল্টা হইতে গিয়াছে।

সভাপতি মহাশয় অতিরিক্তভাষা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় সম্বন্ধেও অনেক কথা তুলিয়াছেন। তাহার মতে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় নিত্যস্বই বাক্যনীয়। কিন্তু তাহাতে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কেন বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। ছাত্রেরা লক্ষ্যে বাইরা মেডিক্যাল কলেজে পড়িবে, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। এক

প্রদেশের লোক আর এক প্রদেশের উপর কেন নির্ভর করিতে বাইবে? তারপর আট জনের বেশী ছাত্র একযোগে সেখানে যাইতে পারিবে না, ইহাই বা কেন? বাহা হোক, তাঁহার মতে পাটনা মেডিক্যাল স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করাই ভাল, এবং জন-সাধারণের প্রয়োজন অস্থায়ের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও যথোচিত বহায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

একটা প্রস্তাব হইয়াছে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অস্থায়ের ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হইবে। অতঃপর 'স্কুল-ফাইনাল' পরীক্ষা প্রবর্তিত হইবে, অর্থাৎ শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর, স্কুল-ইনস্পেক্টর কিংবা জেলা ম্যাট্রিক্টে প্রস্তুত কোন কর্তৃপক্ষ হারা ছেলেরের কলেজে পড়িবার উপযোগিতা স্থিরীকৃত হইবে, এবং তৎসমুদয়ে তাহাদিগকে ম্যাট্রিকিউটে দেওয়া যাইবে। সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাবকে নিতান্তই ভীতিজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষাটিকে ব্যক্তি-বিশেষের অধীনে রাখিলে অনেকদিকেই অস্থবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। হয় ত সে সব ছেলেরের আত্মীয়স্বজন সমাজ-হিত্যয়ী, নেতা বা কংগ্রেসগোষ্ঠী, অথবা যে সব ছেলেরা স্বাধীন চিন্তা বা কণ্ঠের পরিচয় দিয়াছে, অথচ স্বাধীনতাবির দারও তাহারা ধরে না, পরীক্ষক তাহাদিগকে ম্যাট্রিকিউটে অস্থপঞ্জিত মনে করিতে পারেন, এবং তাহা হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ছেলেরের কাছে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার কথা। অতএব বিষয়টা গভীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। পরীক্ষাটা কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর চ্যুত না রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটি নিয়ম প্রবর্তিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যে সব ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিবে, তাহাদিগকে আর একটিবার মাত্র পরীক্ষা দিবার স্বযোগ দেওয়া হইবে। এ নিয়ম প্রবর্তন করাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ইহা

নিশ্চিতই শিক্ষা-বিস্তারের প্রতিকূল। দেখা যায়, অনেক ফেল-করা ছেলেও উত্তরপাশে গভীর চিন্তার পরিচয় দিচ্ছে—কণ্ঠশক্তি দেখাইয়া বেশের নেতা হইয়া ঝাঁড়াইয়াছে। অতএব পরীক্ষায় দুই একবার ফেল করিলেই অপরাধ বলিয়া তাহারিগণকে একেবারে বর্জন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য নহে।

..

৪। প্রকৃতদ্বান্দ্বয়মুক্তানৈমিত্তিক কৰ্ত্তব্য

ফাঁকি দিয়া প্রকৃতদ্বন্দ্ববিশুদ্ধাধিকার দিন এখন গিয়াছে। বিদেশী লেখকের দুইএক খানা হইয়ের পাঠা উলটিয়াই নাক্ষের বেশের লুপ্ত রত্ন আধরণের চেষ্টা এখন হাঙ্গর বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। এখন আর দেশ মূৰ্খ নাই যে তাহাকে ঠকাইয়া সহজে বাহাদুরী লাভ যখন। অনেকেরই চোখ মধু মজিয়াছে, তখন চেষ্টাও আমাদের নুতন ভাবে করিতে হইবে। সেই নুতন চেষ্টার ফলে আমরা যাহা আবিষ্কার করি, হয়ত বিদেশীর পুঁথি হইতে তাহা সম্পূর্ণ যত্ন। অতএব বর্তমান প্রত্যবস্থাস্থান-মুখে আমাদের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে কবির শরৎ-কুমার রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সৰ্বশেষে কনাইহেতু,—

“বাস্থানীকেই বাস্বার্য ইতিহাসের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে এবং তাহাকেই স্কন্ধালী হস্তে ভূগতে অবতরণ করিতে হইবে। গায়ে কাটা লাগিবার ভয়ে বা অস্তিত্ব অসমাপ্য বোধে হঠাৎ চলিবে না। যিনি অৰ্শ্বালালী, তাহাকে অৰ্শ্ব দান করিতে হইবে, যিনি অশ্বশীল তাহাকে অশ্বশীকার করিতে হইবে, যিনি বিশেষত্ব তাহাকে মস্তিষ্ক চালনা পূৰ্ণক লব্ধ বস্তুর বিশেষণ করিতে হইবে— যিনি যে কাণ্ডে পারদর্শী, তাহাকে তাহারি করিতে হইবে। এইরূপ বিভিন্ন শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সমাবেশে এই কাণ্ডের স্বন্দা নিপুণ হইবে, এবং প্রচুর ধৈর্যাবলম্বন পূৰ্ণক নিপুণ ও সতর্কভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই বাস্বার্য ইতিহাস সংকলিত হইতে

পারিবে। ইহা একের কাৰ্য্য নহে, বা শুধু গৃহভাস্ত্রের বসিয়া এ কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবার নহে—ইহাতে সমগ্র বাস্বার্য জাতির সমগ্র শক্তি-নিয়োগের প্রয়োজন।”

..

৫। হিন্দু-মুসলমান-সমিতি

আমরা মুসলমান-সমাজের মধ্যেও বর্তমান যুগের প্রভাব বেশ স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইতেছি। তাহাদের মধ্যেও আত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছে। তাহার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দূত্বের মিলন-ভিত্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা বেশা যাইতেছে।

মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিরোধভঞ্জন অভিপ্রায়ে কলিকাতায় একটি সমিতি গঠিত করিবার জন্ত ঢাকার বিগত “মুসলিম লীগ” সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আবার এবিধ প্রস্তাব সর্বোচ্চভাবে প্রশংসা করি।

উক্ত সমিতি গঠিত হইলে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে এমনও যে সামাজ্য দ্বাৰা বিবেচনা আছে, তাহা অতিক্রম করা যাইতে পারে। কাগজে এক হস্তায় পরস্পরের প্রীতি-সৌহার্দ্য বর্ধিত হইবে। আমরা তখনই যথাসম্ভব সহযোগিতা করিতে সন্মত হইব— যিৎখী— হইলেও ভারতের মুসলমানগণ ভারতমাতারই সন্তান।

..

৬। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের স্মৃতিস্তম্ভ

রিয়াজুস সালাতিউল্ল্যে নাম ঐতিহাসিকগণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের রচয়িতা মল্লবহরের লোক ছিলেন। মাল্লবহরের সদর সদর ইংরাজবাহুরে যিনি নিউনিপালিটরে যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তাহা তাহারি বাস্তবচরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। রিয়াজের গ্রন্থ-কর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মস্জিদে গুলাহে জাতীয়শিক্ষা-পরিষৎ এই পরলোকগত রিয়াজ-রচয়িতার এক স্মৃতিস্তম্ভ

নিৰ্মাণ করাইয়া ঐতিহাসিকের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদান করিবার্থে। এজন্য পরিষৎ সাধারণের নিকট দৃষ্টব্যার্থ।

আমাদের রূপরূপ বস্তুমাতার নিত্য প্রবেশ এইরূপ কত হারাবনের স্মৃতি লুক্কায়িত আছে, তাহা কে গণনা করিবে? নব্যবস্তুর অনেক স্থানে ইতিহাস চর্চা

আরম্ভ হইয়াছে, নানা অঙ্গসম্মান চলিতেছে। অনেক পুরাতন শিল্পকলা, কবিতাশিল্প, গদ্য, বীর-প্রকৃতির বিরল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের জন্মকুমিতে এইরূপ স্মৃতিকল নিৰ্মাণ করান যায় না কি? এই সমস্ত আরকলিপি দ্বারা প্রাধান্য: দুইটা বড় কাণ্ডে। প্রথমত: ইহা, দেশের লোককে সংস্কারে নিয়োজিত হইতে উৎসাহিত করা করে। দ্বিতীয়ত: ইহার দ্বারা বাহিরের লোকের ঐ দেশের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

রাজবাহীগ্রন্থের বা বস্ত্রভূমি না কি বস্ত্র-পাল, ধোঁমান প্রভৃতি শিল্পগুরু জগন্নাথ; বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক দীপঙ্কর সঞ্জয় বিক্রমপুরে জগদগুরু করেন, যুগভূম জয়দেব ও চণ্ডীদাসের বাস্তব; এইরূপ আমাদের প্রত্যেক ভক্তোতেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক কণ্ঠবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা সেই সমস্ত স্মৃতিগুরুদের স্মরণলিপি নিৰ্মাণ করাইতে দেশ-বাসীকে অনুরোধ করি।

..

৭। সামাজিক সরলতা

আজকাল আমাদের সামাজিক সরলতার নিত্যই অসমর্থ যথোচিত। সহরের মধ্যেই বিশেষ ভাবে সেটা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পল্লীর নিম্নতম নিকটতম এমনও সহরের বিখ্যাত গ্রন্থে লাভ করিতে পায় নাই। তাই এখন সেখানে সরলতা বিদায় গ্রন্থ করে নাই— শুধু শিশুগণের আচরণ সেখানে বৃদ্ধ কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে সহরকেই যখন সকলে অসংকল-স্থল হইবে, তখন সহরের আবহাওয়া গ্রামে আস্তে আস্তে আনিয়া জুটিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহই? কিন্তু এমন হইতেই আমাদের সাধন হওয়া

আবশ্যক। আমাদের ভাল করিয়া বুঝা উচিত—গ্রামই সমাজ-শক্তির স্থযোগ্য ক্রীড়াভূমি, অতএব তাহাকে সহরের আবহাওয়া বিধি করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। তাই সর্ব প্রথমেই আমাদের গ্রামের দিকে নজর দিতে হইবে—আমাদের সমাজে সরলতার সাধন করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রেশ্বর কক মহাশয় “সাহিত্য”-পত্রিকা যবদান সমাজের সরলতা ও শিশুগণের সম্বন্ধে পঞ্চায়েচনা করিয়াছেন। তাহাতে আশ্চর্য ও আশা দুইই মিশ্রিত আছে। আমরা নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

“আজকাল বাল্যে এবং ব্যবহারে বাহিরে যুব ভক্ততা দেখাইতে শিখিয়াছে বা শিখিতেছে, কিন্তু আমাদের ভিতরের সরলতা বা সত্যত্বতা ক্রমশঃ চাপা পড়িয়া যাইতেছে। যাহাকে ভূমি বলিলে চলে, তাহাকে এখন আমরা আশ্রয় বালি, কিন্তু আসল কাজের লোভ অক্ষম ভাইকেও হঠাৎ ভাত দিতে নারাজ। ইহা এখন সামাজিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কথা যুগাইয়া বলিতে না পারিলে এক কালের সমাজে বাস করা চলে না, ইহাও এখন অনেকেরই ধারণা। * অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের এই শিশুগণ-সমাজে একটু স্বাধীন আশার আলো দেখা দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই যে, দুই একজন বিবাহিত যুবক পিতার শিশুগণের সঙ্গতঃ শব্দেব সাহায্য করিতেছেন। আর গত অক্টোবরমাসের সময়ে বাস্বার্য বালকদিগের ব্যবহারে যে সরলতায় সৌভাগ্যের স্বরূপতা দেখিবারিলা, এবার দামোদরের বড়ায় তাহার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছি। বালকসকল সেবার আপনাদের গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া মহিলাদের স্নানের নিমিত্ত গঙ্গার ঘাটে আবার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। এবার তাহারি শিশুগণের বহিঃস্থ হইয়া অক্টোবর অবসরকাল সাতরাইয়া যাইয়া বিপদের সেবা করিয়াছে। ইহাতেই আশা হয় যে, আমার আমাদের সমাজে মানবরূপের অঙ্গানিদি সরলতা

কিরিয়া আসিবে। যে সমাজে সরলতার অবতার পরমহংসদের দ্বারা গুরু, স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা শিষ্য, এবং দ্বারা অবতার বিদ্যাসাগরের দ্বারা মহাপ্রাণ কেশবের বিবাক্ত হই, সে সমাজ হইতে সরলতা একেবারে ভাঙিয়া যাইবে, ইহা মনে হয় না।"

৮। পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্য-শিল্পের আদর

সম্প্রতি প্যারিসপর্বতের বাবিক চিত্রশিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতের অনেক চিত্রকলা প্রদর্শিত হইয়াছে। কলিকাতার প্রাচ্য-কলা-সমিতি হইতে এইগুলি প্রেরিত হইয়াছিল। প্যারিসের এই প্রদর্শনীতে প্রাচ্যশিল্পের বিম্ব-গৌরব ঘোষিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় পদ্ধতিতে অস্বনীয় স্থিতিযুক্ত চিত্রশিল্পী শ্রীকৃষ্ণ অস্বনীয় ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রেই প্রাধান্য ছিল এবং তাঁহার কলা-পণ্ডিত এই গৌরবের প্রধান কারণ। তদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ মুকলচন্দ্র দাস, শ্রীকৃষ্ণ হরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শ্রীকৃষ্ণ অনিষ্টকুমার হালদার এবং শ্রীকৃষ্ণ নন্দলাল বসু প্রভৃতি আরও অনেক ভারতীয় শিল্পীর চিত্র-কলায় প্রদর্শনী শোভিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ অস্বনীয় প্রথম বর্ষে ইউরোপীয় পদ্ধতির উপাসক ছিলেন। কিন্তু পরে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় পদ্ধতির অঙ্গস্বরূপ করেন এবং তাহার অঙ্গশিল্পের ব্যর্থতা সময়ে ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে এক্ষণ পাশ্চাত্যলাভ করিয়াছেন যে, তাঁহার অঙ্কিত চিত্র-দর্শনে পাশ্চাত্যজগৎ বিম্বিত হইতেছেন। ইহাতে কেবল যে তাঁহার স্থাতি বিবৃত হইতেছে তাহা নহে, অনুদূত প্রাচ্য চিত্রশিল্প পাশ্চাত্য-জগতে ক্রমেই বহু আদর লাভ করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অস্বনীয় ঠাকুর প্রমুখ শিল্প-গণের চিত্রকলা ভারতবর্ষীয়ের নিকট বর্ত্তমানের আরও প্রশংসা প্রাপ্ত হইত না কেন, কিন্তু পাশ্চাত্যজগতে যে তাহা সম্মান

লাভ করিল, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। এইরূপে এক্ষণে কেবল সাহিত্য, দর্শন নহে, প্রচারের প্রত্যেকটি বিষয়ই পাশ্চাত্য জাতিগণের নিকট সম্মানযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে যাইতেছে। ইহা যুব জলধণ।

৯। হিন্দু কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্রবের তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি হুমুর কথা বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিভাষণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"দ্বন্দ্বমধ্যে বাইরা বলকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া অভিনয় দেখিতে দেখিতে যদি অভিনেতার অভিনয়-কলায় লক্ষ্য মুগ্ধ হইয়া পড়, তখন অভিনয় দেখিতেছি বলিয়া আর বোধ থাকিবে না। প্রত্যুত, তখন অভিনীত বিষয় ও পাত্রগুলি প্রকৃত বলিয়া মনে প্রতিভাত হইবে। অভিনেতাকে আর অভিনেতা বলিয়া চিনিতে পারা যাইবে না। বোধোপদেশ ও প্রকৃতির নাট্যলীলায় বিমুগ্ধ হইলে, প্রকৃতির নাট্যলীলাকে প্রকৃত মনে কারুক, সেই আদ্যন্তমুগ্ধ নাটকের স্বাধারকে আর চিনিত পারা যাইবে না। প্রকৃতত্বহারা প্রথমতঃ তোমার যে দুইটা পঙ্খ ক্ষতিক-নির্মিত পানপাত্র আছে, তাহাকে পূর্ণ করিয়া অস্বস্ত মুগ্ধ আকাশস ঢালিয়া দিবে। তুমি অস্বস্ত বলিয়া সেই মদিরা পান করিবে, আর প্রকৃত নাটক দেখিবে। পিপাসা বাড়িলেই আমরা প্রকৃতির উল্লুখ ভাগ্যের হুমুটি মদিরা পাইব।" * * * * *

দেব-গুণের দ্বারা ঋষিরাই স্বর্গ-বৈষ্ণব যুগাইয়া গুণগুণীভবের বলিতেছেন। "স্বাধীন!" এই পাপ-প্রকৃতির প্রদান পান-মদিরা পান করিবে না, কদাচ করিবে না। সেই বৃক্ষ গুণের অস্বস্তী দখলারও তাহাই বলিতেছেন। স্বাধীনতায়, প্রাণপাশও তাহাই বলিতেছেন। এমন কি, ভারতীয় কাব্য পর্বাঙ্ক তাহাই

বলিতেছে। তাই বৃক্ষ আলম্বারিকেরা বলিতেছেন, শাখা তিন ঐক্য; রাহুলতা, বহুত্বা, কাব্যত্বা। রাহুলতা বিবিধ ও নিয়মের আভা থাকে, যুক্তি থাকে না। বেদের উপদেশও সেইরূপ বিবিধ-নিয়ম আছে, যুক্তি নাই। বহু সংকীর্ণ প্রসঙ্গ করিবার জগৎ ও অদ্বং কাব্য হইতে নিগূঢ় করিবার জগৎ প্রদর্শন করে। পুরাণও সেইরূপ যুক্তিপ্রদর্শন আছে। কাব্য কান্তকে নিজেতে অঙ্গরক্ত, ও অঙ্গে করিবার উপদেশ রাহুল দ্বারা প্রচার করে না, বহু দ্বারা উপদেশ দিয়া যুক্তি প্রদর্শন করে না, কেবল নিজের সৌন্দর্য্যচাতুর্ঘ্যের আশিষ্য ব্যতীয়া দেয়।

কাব্য সেইরূপ অমুক কাব্য করিবে, অমুক কাব্য করিবে না, স্পষ্টাক্ষরে বলে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক পাত্রবিশেষের মধ্যে সমুদ্র ও অশ্বমুগ্ধের চরিত্র এত স্পষ্ট করিয়া চিত্রিত করে এবং তাহার উত্তরফল—কল্যাণ ও অকল্যাণ—এত স্পষ্ট করিয়া ব্যতীয়া দেয় যে, কাব্যের পাঠক ও দর্শকের পাপে প্রবৃত্তি জন্মে না, পুণ্যে প্রবৃত্তি জন্মে। চুংগের বিষয়, দ্বন্দ্ব-সাহিত্যে সেই ভারতীয় আদর্শে তিরোপান হইয়াছে—চণ্ডীমণ্ডলে আত্ম শম্বাণ্ডীর পরিবর্তে "জারিওন্ট" ব্যক্তিহেছে; সীতাপারিণয় আগনে আত্ম হৃদয়ানন্দিনী উপরিয়া।"

১০। কাব্যে কাষ্টিন্য-ধর্ম

পণ্ডিতপ্রবর আনন্দিক কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কবিতায় আর বীণার নিকণ, বেগু স্মৃতি, বশীর বসিত চাচেন না, এখন চাচেন তিনি কাব্য-সাহিত্যে দেবদত্ত প্রেমের ভীম গমন।

"ভাবের জন্মোৎপত্তি কবিতাও জন্মোৎপত্তি কবিতারও বড়ই চড়াছড়ি দেখিতেছি। কিন্তু সমস্তই এক বিষয়, সমস্তই প্রেমপাখা।"

পত্রিকায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা বাহির হয়, সেই সমস্ত কবিতার মধ্যে আমরা এইরূপ প্রণয়ের একটা ইঙ্গিত পাই। যেমন নিত্য ষ্ট্রিটের গ্রন্থ কবিত্তে ক্ষিপ্রা অস্মর্য, যেমন অক্ষির মূর বংশীপন ও কর্ণে মধুবর্ণ করে না, সেইরূপ বিরতিশূন্য প্রেমকাহিনী শুনিতে কর্ণ অনিচ্ছুক—সেইরূপ দ্বারা বাহী প্রেমপাখা কর্ণে অমৃতভুক্তি করে না। সেই জগৎ জগৎ রসের অবতারগণও অবশ্যকতা আছে।

একদিন উত্তর গোপুণের মঙ্গলমতের দেবদত্ত শম্বের ভীম গর্জনে বিরতিগুণ উত্তর বীর হইয়াও চেতনা হারাইয়াছিল, প্রতিপক্ষ বীরগণ মুগ্ধ জয়ের আশা নাই অম্বারত করিয়াছিল; একদিন মধুবর্ণের মধ্যাকর্তে প্রসূতি হইয়া দেবদত্ত শম্বের সতিত পাণ্ডুর শব্দ প্রলম্বধোনিধির ঘোর গর্জনে বিশ্ববিজয়ী হারাবধিককে পর্বাঙ্ক ভীত, ভুক্তি, রোমাঞ্চিত, বেগবিল ও বিপ্লবিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে গভীর গর্জনে কি আর কবির মুখে শুনিব না? তিরিদি কি বীণার নিকণ, বেগুপান ও হুগুশশিত শুনিব? বাহালীর শব্দ নাহি, বলিতে পারি না। সে দিনও শোকাবধি বাহালীর মেঘমন্ত্র গভীর ভেরীনিদান শুনিয়াছি। আর শুনি না কেন—এই জগৎ চুংগ হয়।

কাব্যের রসস্বরূপ ত্রৈলোক্যের পরিচয় বৈধায়া বসনে আহারের পরে বিশ্রাম-কোয়ার অঙ্গশয়নাবস্থা ঘূর্ণনানের মত কবিতার প্রয়োজন; তাহারিণের সতিত আমরা একমত হইতে পারি না। ভিন্ন দেশে তাহা হইতে পারে, ভারতে তাহা নয়। পূর্বে বলিয়াছি আবার বলিতেছি, বেদ, তন্ত্র, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ যেমন অস্বস্তীক কবিতাও সেইরূপ অস্বস্তীক। ভারতের সত্য যেমন স্বরের লহর তুলিয়া অন্তরে টানিয়া লয়, ভারতের কবিতাও যেমন ভারতের তন্ত্র ছুটাইয়া অন্তরে টানিয়া লয়। ভারতের চিত্র ভারতের ভাষা যেমন চুংগ ও মূণের ভাবে অস্বস্তি ব্যতীয়া দেয়, ভারতের কবিতাও সেইরূপ অস্বস্তি

মূল্য দেয়। ভারতের জ্যোতিষ যেমন গ্রহ-উপগ্রহ দেখাইতে দেখাইতে সত্য-লোকে লইয়া যায়, গণিত যেমন এক ছুই করিয়া গুণিতে গুণিতে সম্যকভিত্তিতে সমাচার ঘোষণা করে, কবিতাও সেইরূপ এরূপ সেরূপ বলিতে বলিতে রসস্বরূপ ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করে। সেই জ্ঞান বলিতেছি কাব্য খেলার সামগ্রী, আশাদের সামগ্রী নয়। কাব্য দিব্যচক্ষুর উন্মীলক, ব্রহ্মসত্তার পরিজ্ঞাপক। এইরূপ বিশিষ্ট ভাব আছে বলিয়া সহস্র চিত্রের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকে টানিয়া বাহির করিতে পারি; এইরূপ বিশিষ্ট ভাব আছে বলিয়া সহস্র কবিতার মধ্যে হইতে ভারতীয় কবিতার অবধারণ করিতে পারি। বিদেশে যাহাকে রোম্যান্টিক (Romantic) কাব্য বলে, এদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহাকেই স্পষ্টাক্ষর কাব্য বলিয়াছেন। বাচ্যার্থের উল্লঙ্ঘিত হইতেছে না—এমন কাব্যকে রোম্যান্টিক বা স্পষ্টাক্ষর কাব্য বলিতে পারি না। তাহা হইলে প্রসাদ-গুণকে জলে ভাসাইতে হয়। বাচ্যার্থের উপলব্ধি না হইলে অক্ষম কবির ভাষায় অক্ষুণ্ণতারই দোষান্বিত হয়। যে কাব্য পক্ষিফুটকর বাচ্যার্থের উপলব্ধি করা যায় শব্দে যাই না, বাচ্যে যাহা নাই, ইচ্ছিতে এমন আর একটি অর্থ বুঝিয়া দেয় এবং সেই ইচ্ছাও অশেষ। সেই অর্থের যদি চমককারিতা থাকে, তাহাকেই ভারতীয় পণ্ডিতেরা স্নানিকাব্য বলিয়াছেন।”

..

১১। বঙ্গসাহিত্যে দর্শন-চর্চা

দার্শনিকপ্রবর পণ্ডিত যাদেরই আদর্শগণকে বঙ্গসাহিত্যে কতকগুলি সংস্কৃত দর্শনের অঙ্গবাদ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার এতলে উপদেশ বিশেষ অঙ্গবাদনযোগ্য সম্ভেদ নাই।

“আমরা যে দার্শনিকতা আছে, বিদেশে তাহার সম্যক উপলব্ধি হয় নাই; এ জ্ঞান তাহারো রোম্যান্টিক কাব্য কি—লক্ষণনির্দেশ দ্বারা বুঝাইতে পারেন নাই; কিন্তু গাঙ্গে

অশ্রুভব করিয়াছেন। বাঙ্গালীয় লক্ষ্যাত্মক কাব্য আছে, প্রচুর পরিমাণে নাই, বাড়াইতে হইবে। বাঙ্গালীয় অলঙ্কারশাস্ত্র আছে, লঙ্কার-প্রধান বাঙ্গালী গল্পগ্রন্থ বাঙ্গালী তাহা পড়িতে যাইয়া মন্তব্যের বাধ্যমান করিতে অসম্মত।

প্রত্যেক বাঙ্গালী মানিকপত্রিকাও একটি দুইটি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিতে হইবে; বঙ্গসাহিত্যে তরল বিধেয়র অবতারণা কবিতায় গভীর বিধেয়র অবতারণা করিতে হইবে।

বঙ্গসাহিত্যে এখনও * নব্য চায়েবর অঙ্গবাদ করিতে কেহই অগ্রসর হইতে নাই। মীমাংসা-দর্শনের অঙ্গবাদ হয় নাই, শিষ্টাচার-জ্যোতিষের অঙ্গবাদ হয় নাই। অনেক পুরাণের অঙ্গবাদ হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত অনেক দ্বিতীয়ের অঙ্গবাদ হইয়াছে; একাদশী-তত্ত্বের অঙ্গবাদ হয় নাই। এতলে স্বর্গীয় পণ্ডিত হুমিকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্ঞান বড়ই শোকস্বরূপ হইতেছে। তিনি রঘুনন্দনের তর্ককটিল মীমাংসাগুলি জলের মত বঙ্গভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে, আমরা অনেক গভীর তত্ত্ব বাঙ্গালীয় পাইতাম। ভট্টরচিত কৃত “বাল্যদায়ী” “বয়স্করত্নভূষণা”— “ব্যাকরণসম্মত দার্শনিক মতের প্রতিপাক গ্রন্থ, “মহাভাষ্যের” স্থানে স্থানে ব্যাকরণের দর্শনবাদ আছে। এই সমস্ত গ্রন্থের বাঙ্গালীয় অঙ্গবাদ হওয়া চাই। বৌদ্ধ দর্শনের ও জৈন দর্শনের বাঙ্গালীয় অঙ্গবাদ নাই। বাঙ্গালীয় তাহা জানিতে হইবে।”

..

১২। বাঙ্গালীর আত্মবিশুদ্ধি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের ইতিহাসে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বাঙ্গালীর ইতিহাসে সফলভাবে তাহার মাতৃভাষা-শিক্ষণের অভিজ্ঞাধনে অনেকগুলি তথ্য ও যুক্তির সন্নিবেশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে কতগুলি বিষয়

উদ্ধৃত করিয়া বিভিন্ন নামে নিয়ে প্রকাশ করিলাম।

“আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিশুদ্ধ জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোন কবির শাপে তিনি আত্মবিশুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ধর্মপাথে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর একথা তিনি কখনও বলেন নাই, কারো বা কণ্ঠে কখনও বেদনও নাই এবং কখনও তিনি স্বপ্ন করেন নাই। বাঙ্গালীও তেমনই। স্রেষ্ঠ শত বৎসর পূর্বে একজন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর জন্ম এক উর্ধ্বা, বাঙ্গালীয় এত শত্রু উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালীয় এত বড় বড় নীতি আছে, নৌকাযোগে বাঙ্গালীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এত সহজে যাওয়া যায়, ইহার জঙ্গলে এত অসুস্থ পর্যাণে উপলব্ধি হয়, ইহাতে এত লোক আছে, তাহার এইরূপ পরিশ্রমী ও মিতাচারী যে বোধ হয়, বাঙ্গালী আতি প্রাচীনকালে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠান করিয়া ছিল। যে কেহ মন দিয়া বাঙ্গালীর কথা ভাবিয়াছে, বাঙ্গালীকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা হইতে বলিতে হইবে বাঙ্গালী একটি অতিপ্রাচীন সভ্যদেশ। বাঙ্গালীর ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে বাঙ্গালী Egypt হইতে প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালী Nineveh-এ Babylon হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালী চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। কিন্তু একথা স্থির, বাঙ্গালী নূতন দেশ নহে। যখন আর্ঘ্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালী সভ্য ছিল। আর্ঘ্যগণ আশানের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্যন্ত উপলব্ধি হন, তখন বাঙ্গালীর সভ্যতায় ঈর্ষণারসব হইয়া তাহার বাঙ্গালীকে ধর্মজাননশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙালীতে বাঙ্গালীকে ঘটোংকচের লীলাক্ষেত্র বলা হয়।”

১৩। বাঙ্গালীর বাণিজ্য ও

উপনিবেশ স্থাপন

“বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজ্যের একটি তাম্রাপুর শত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লক্ষ্যদীপ দখল করিয়াছিলেন। তাহারই নাম হইতে লক্ষ্যদীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ। রায়চরণ লক্ষ্যদীপের নাম সিংহল দ্বীপ কোথায় নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লক্ষ্য নাম উঠিয়া গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে স্থিতিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় বাঁটি আর্ঘ্যরাগণ, এমন কি বাঁটা ডারভাংখী বলিয়া আশানাদের গৌরব করিতেন, তাহারায় বিবাহসম্বন্ধে বঙ্গদেশের সহিত মিলিত হইবার জ্ঞান প্রায় একাধি করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীকৃষ্ণ রাজার জ্ঞান নহে, রাজনীতিতে বঙ্গ কখনই তত প্রবল হয় নাই। খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব দশ শতাব্দীতে ও আর একবার খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাঙ্গালী দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অনেকটা কৃতকার্যও হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালীর গৌরব রাজনীতিতে নহে, যুদ্ধবিগ্রহেও নহে। বাঙ্গালীর গৌরব শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্যে এবং উপনিবেশ-সংস্থাপনে। যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানা দেশে গমন চাউল বিক্রয় করিতে যাইত। সে নৌকার নাম ছিল ‘বালান নৌকা’। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত তাহার নাম বালান চাউল হইয়াছে; বালান বলিয়া কোন ভাষার কথা আছে কি না জানি না; কিন্তু তাহা সংস্কৃত-মূলক নহে। তমসুক বাঙ্গালীর প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমসুক বাঙ্গালীর বন্দর ছিল। তমসুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত। ফারিয়ান তমসুক হইতেই গিয়াছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমসুকের নাম পাওয়া যায়।

তমসুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিঙ্গি। তাম্র-লিঙ্গি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সম্ভূত তাম্রলিঙ্গি নামে ভাষায় লেপা। কিন্তু তমসুকের নিকট কোথাও তাম্রার খনি নাই। তমসুক হইতেই যে তাম্রা রপ্তানী হইতে তাহার কোন নিশ্চয় পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন সম্ভূত উহার নাম দামলিঙ্গী অর্থাৎ উহা দামলমাত্রের একটি প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়।

৭৩২ খৃ অব্দে যখন যশোবর্মণের কনৌজের রাজা, বৈদিকভূতামনি ভবকৃতি তাহার রাজকবি, সেই সময়ে বহুদেশে কোন রাজা বৈদিকযজ্ঞের জ্ঞাত তাহার নিবেদন গ্রহণ চাহিয়া পাঠান। সেই যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাঙ্গলাদেশে আসেন, তাঁদের হইতেই বাঙ্গলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দৃতিভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বেও অনেকবার এদেশে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া ভনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের ঘরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিশেষ উপকার হওয়ার কথা ভনিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চব্রাহ্মণের সম্ভাসনভিত্তিগণ এদেশে আসিয়া প্রথম প্রথম বড় একটা প্রভাব বিস্তার করিতে যত্ন করেন নাই। তাঁহাদের আসিবার পরেই বাঙ্গলাদেশে এক প্রবল বৌদ্ধ রাজবংশ স্থাপিত হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নিরীদিত মুখ হইয়া তাঁহাদিগের হস্তে নানাবিধ রাজকর্মের ভার লিভেন। তথাপি বৌদ্ধগণই এদেশে প্রবল ছিল। কুলগণের সম্ভাসনভিত্তিগণ পাওয়া যায়, বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রাপণপণ করিয়া বিচার করিতে হইত। মুসলমানেরা বৌদ্ধশাস্ত্রিক লোক করিয়া ফেলিবার পর এদেশে পঞ্চব্রাহ্মণ-সম্ভাসনদিগের প্রভাব বিস্তার হয় এবং দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্যদেশসমূহ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালার গৌরব—শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও উপনিবেশে। শিল্প

শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে নানা প্রকার রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইত। সর্কোজকুট প্রকারী কেবল বাঙ্গালারই পাওয়া যাইত। তজ্জিন্ন নিজ বস্ত্র এবং পৌণ্ড্রদেশে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে উৎকৃষ্ট শিল্প প্রস্তুত হইত। ভাতবর্ণে অস্ত্র ছই একটা বেষ্ট্রও বেশম-শিল্প ছিল, কিং তাহা তত ভাল নহে। ঐ গ্রন্থেই আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভূগোল কাপড় ও বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

মগধসাম্রাজ্যে হুটী মাত্র প্রথম বন্দর ছিল। একটা ভবন্তবজ্র ভূকোচি ও আর একটি মাত্র। ভরতকলি হইতে আরম্ভ—মাগধ পার হইয়া লোকো বাহিন্য করিতে যাইত। এবং তমসুক হইতে পূর্বা উপদ্বীপ চীন ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ যাইত। ভরতকলির সহিত আম্রাবতীর বন্দর নাই, কিন্তু বাঙ্গলা হইতে বহুমাত্র্যক লোক জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া নানা দেশে যাইত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের দশ ভূকলি নামক গ্রন্থে লেখা আছে, “তোমরা নির্যাসের পথে আসার হইতেছ, কচ্ছ কর, শীলকর তচ্ছ, কচ্ছ কিছুদিন পরে সেখানে এক সকল কি উপকার হইতেছে না। যখন পাটলীপুত্র হইতে হেহ সমুদ্রের পারে বাবসা করিতে যাইত, সে যেখানে গাড়া উঠে বোঝাই দিয়া নানাবিধ-স্রো হইয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তাম্রলিঙ্গিতে উপস্থিত হইয়া সেখিল এক সকল কোন কাছই হইবে না। সেই উত্তর হইবে না, যেখানে যাইবে না, গাড়াও যাইবে না। তখন নুতন প্রকার যান-বাহনের আবশ্যক হইবে।” সেইকথন কিছুদিন অগসর হইয়া সেখিল শীলকরতাসির দ্বারা কিছুই হইতেছে না। তখন যানের আবশ্যক। এই দ্বীপকে দেখা যায় যে, সমুদ্র-যাত্রা সেকালে অসম্ভব ছিল। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান তমসুকে জাহাজে আরোহণ করিয়া অপর্যায়িত্য করিয়াছিলেন। দশভূম্যারচিত্র লেখা আছে, তমসুক

হইতে জাহাজে গিয়া তিনি রাজসদের দ্বীপে উপস্থিত হন এবং তথায় রামেশু নামক এক বন্দরের সহিত যুক্ত হয়। অন্তর্দিনের কথায় বরকার নাই; মুগ্ধমান-অধিকারের পরে ১২৭৬ সালেও তমসুকের কয়েকজন বৌদ্ধ-ভিক্ষু পেলানে গিয়া বৌদ্ধধর্মের সম্ভার করিয়াছিলেন। এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামকল্প কবিতাভাষ্য সিংহলে গিয়া তাম্রার বৌদ্ধ নামে চক্রবর্তী লিখিয়াছিলেন। যেহেতু শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিধবংশীদ্বার লিখিতছেন যে, চার সপ্তমাব্দ সিংহল দ্বীপে ও দক্ষিণে চৌদ্দ দিনের পথ খেল পল, সমুদ্রে যাহা কড় উঠে। তাহার চৌদ্দখানি জাহাজ ছিল। স্বভেদের মধ্যে তাহার এক-খানিও দেখা গেল না। তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া নাবিককে বলিলেন, আমরা সন্ধান হইল, ইহার কিছু উপায় নাই। নাবিক কতকগুলি তেলের পিপা যুগিয়া জলে ফেলিয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যে তেলের সমুদ্র ব্যার হইয়া গেল। তখন দুই দূরে দেখা গেল চাঁদের একখানিও নৌকা ডুবে নাই।

প্রাচীনকালে কৃষি বিষয়ে বাঙ্গালীর কৃষিকার্য্যের কথা সকলেই জানেন। সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কৃষিকার্য্যে শ্রীকৃষ্ণ হইলেই দেশে হস্তিকৃত্য। বৃত্তিক হইলেই ভিক্ষকের সাখা বৃত্তি হয়। হইয়ামাত্র বাঙ্গালার ভিত্তি নগরীতে ধর্ম সহস্র সম্ভারাম দেখিতা হইতামেন। তিনি শুদ্ধ বৌদ্ধদের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া উৎকল ও ভৈরব ভিক্ষুও যথেষ্ট ছিল। কাপাল-ভুল্লার চাঁয়ের জল বর্ষণে বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। ভূতের চাষ ভিন্ন রেশম হয় না। ভূতের চাষ প্রকৃত্ত পরিমাণে না থাকিলে বাঙ্গলাদেশে রেশমশিল্পে একপ্র প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। শন, পাট, ধকে এখনও বাঙ্গালার একচেটিয়া, চিরদিনই একচেটিয়া ছিল।

সিংহলে উপনিবেশ স্থাপনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যাবা, বালি, মাগধ উপদ্বীপ, পোনি প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুদিগের যে

উপনিবেশ হইয়াছিল তাহা কোথা হইতে গিয়া হইয়াছিল, ঠিক জানা যায় না। ভারত-বর্ষের পূর্বা উপকূলে তিনটি প্রধান বন্দর ছিল, মাদ্রাস, কলিঙ্গনগর ও তমসুক; এই তিনটির মধ্যে তমসুক অতিপ্রসিদ্ধ। তমসুক হইতে নানাদিকে জাহাজ যাইবার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অনেক মনে করেন সমুদ্রযাত্রা যখন এতই নিবিড়, তখন বাঙ্গালীরা কি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিল। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা নিবিড় নহে। বহুসংস্কার কবি বোধায়ন বলিয়া গিয়াছেন যে, অর্থাৎ বর্ষাবসীরা পক্ষে সমুদ্রযাত্রা কোন দোষ নাই। যদি কোন দোষ থাকে, সে দাক্ষিণাত্যে। হস্তরাস অর্থাৎ বর্ষাবসীরা প্রাচীনকালে অসাব্য সমুদ্র-যাত্রা করিত এবং বিশেষে গিয়া মোকাম করিত এবং তথায় বাস করিত। প্রভৃত্যের প্রভাবে জানিতে পারা যায় যে, মগধদেশ হইতে অধমেশ কাথোডিয়া অন্যান্য প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকখানি উপনিবেশ এমন কি সাম্রাজ্যও স্থাপিত হইয়াছে। ফরাসীদিগের অধিকৃত কাথোডিয়া ও আনামে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতেও সেখানে ব্রাহ্মণদিগের রাজত্ব ছিল এবং শৈব-ধর্মের প্রভাব ছিল। গত বৎসর অধমেশের যে Archaeological Report বাহির হইয়াছে, তাহাতে পেগানে এককালে হিন্দু-দিগের রাজত্ব ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। Dr. Annandale বলেন যে, কাথোডিয়া এক সময়ে মালয়দ্বীপে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঐ দ্বীপে ব্রাহ্মণদিগকে ‘প্রা’ বলিত। প্রায়েরা তাহাদিগের প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপনিবেশ কোথা হইতে গিয়াছিল, ঠিক বলিতে পারা যায় না। সকল বলে সমুদ্র হইতেই গিয়াছিল। মগধসাম্রাজ্য বহুর বিস্তৃত ছিল, বাঙ্গলা মগধের মধ্যে ছিল। সমুদ্রযাত্রায় বাঙ্গালী অগ্রগী ছিল। হস্তরাস এই সকল উপনিবেশের অবকাশই যে বাঙ্গালীর ঘরাই স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অন্যায়সেই বিবাস করা যায়।

একবার বলিয়াছি, বাঙ্গালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি। প্রাচীনকালে বাঙ্গালার যে এত প্রভাব, এত আশাশীল্য ছিল, বাঙ্গালীরা এখন সে কাহ্না ভুলিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালী সমুদ্রে ঘাইতে চায় না, উপনিবেশ-স্থাপন ত ঘরের কথা। শিল্পবাণিজ্যেও বাঙ্গালীর যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। আছে কেবল চাষ, তাহাও ক্রমে একমাত্র পাট ও ধানের চাষে পরিণত হইতেছে। সাহিত্য-চর্চায় যদি আবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হয়, সাহিত্যসেবির যদি আবার বাঙ্গালীদিগকে শিল্পী ও বণিক করিয়া তুলিতে পারেন, সাহিত্যেরও উন্নতি হইবে বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইবে, শিল্পবাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে। যদি সাহিত্যব্যবসায়ীদিগকে স্বস্বত্বব্যবসায়ী-দিগের দ্বারা ভিক্ষাক্রীড়ী হইতে হয় এবং সে ভিক্ষাও না মেলে, তাহা হইলে আর যেমন আছি তেমনই ভাল, সাহিত্যচর্চায় কাজ নাই। এইবার বাঙ্গালীর সাহিত্যচর্চায় কথা কিংবদন্তি।"

* *

১৪। প্রাচীন বাঙ্গালীর ভাষা

"এখন বাঁহারা সিংহলে বাস করেন, এক-কালে তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। অর্থাৎপ আবারও আবারও বাঙ্গালীর আদিয়া উপস্থিত হন। তাহদের আরও অনেক জাতি বাঙ্গালী আদিয়াছে। বাঙ্গালীর ভাষা অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। সিংহলের ভাষা বড় একটা পরিবর্তিত হয় নাই, এবং সিংহলী ভাষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে আছে। এই ভাষা সম্যকরূপে আলোচনা করিলে বাঙ্গালীর প্রাচীন ভাষা কেমন ছিল, অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কার্য এখনও পুরাঙ্গরূপে কেহ করেন নাই। সাহিত্য-সন্নিধান হইতে এই দুই ভাষার তুলনায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে। বাঁহারা একটু সমালোচনা করা আবশ্যিক। তাঁহারা বলেন ঐ ভাষা আধুনি দেখিযাও, তাঁহারা বলেন ঐ ভাষা স্বাস্থ্যমূলক। কিন্তু তাঁহাদের কথার উপর আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ভাল করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যিক।

মধ্যে সিংহলে পালিভাষার বহুল প্রচার হইয়া গিয়াছে। পালিভাষা স্বাস্থ্যমূলক। সিংহলে পালিভাষা প্রচলিত হইবার পূর্বে যে সকল গ্রন্থ ছিল ও সিংহলে যে ভাষায় কথাবার্তা কথন করিত, এই দুই ভাষার সমালোচনা আবশ্যিক। পালিমিশ্রিত সিংহলী ভাষা কোন কাজ হইবে না। বাঙ্গালীরাশে আমরা আর এক ভাষার সম্মান পাইয়াছি, উগাত্তে বৌদ্ধধর্মের সাংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দগুলি মাত্র দুখা যায়, আর কিছু দুখা যায় না। ক্রিয়াপদগুলি এক সম্ভূত রকমের। এ ভাষারও বিশেষত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়া আবশ্যিক। অতি প্রাচীন বাঙ্গালী ভাষার কতকগুলি গান পাইয়াছি এবং কতকগুলি ছড়া পাইয়াছি; তাহার অনেক idioms বাঙ্গালীতেই আছে, অল্প মনে নাই। এইগুলির অধিকাংশই যে বাঙ্গালীর লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

* *

১৫। বাঙ্গালী সিদ্ধান্তার্থ

বাঁহারা গান লিখিয়াছিলেন তাহাদিগকে সিদ্ধান্তার্থ বলে। সিদ্ধান্তার্থের মধ্যে যিনি আদি হইল সিদ্ধান্তার্থেরও গান পাইয়াছি। কিন্তুতাহারা সিদ্ধান্তার্থদিগের সকল গ্রন্থই আপনাদিগের ভাষায় তর্জমা করিয়া লইয়াছে এবং তাহারা সিদ্ধান্তার্থদিগকে আজিও পূজা করিয়া থাকে। সিদ্ধান্তার্থেরা যে ধর্ম প্রচার করেন তাহাকে সহজীয়া বৌদ্ধধর্ম বলে। সহজীয়া ধর্ম কি, এখানে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা জাতিভাষা যে সহজীয়া ধর্ম চৈতন্য-সম্প্রদায় হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই বৌদ্ধ সহজীয়ার মত চৈতন্যসেবের প্রায় আট নব শত বৎসর পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ দুই সিদ্ধান্তার্থের গ্রন্থ ক্রমে দুর্লভ হইয়া আসিলে উহার টীকার আবশ্যক হয় এবং দীপবর শ্রীজ্ঞান ১০০০ খৃঃ অব্দের কাটাশ্বাসি সময়ে উহার স্বস্বত্ব টীকা লিখেন। দীপবর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালী হইতে তিব্বতে গিয়া তথায় বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার করেন। স্বতরাং তিনি একজন

খুব বড় লোক ছিলেন। তিনি খনন লুই-এর গুপ্তধর টীকা করিয়াছেন, তখন বুদ্ধভেদ হইবে তিনি লুইকে একজন পুরাঙ্গর ও বড়লোক বলিয়া মনে করিতেন। বাঙ্গালীরও লুই-এর নাম একেবারে লোপ হয় নাই। মধ্যকালে এবং পশ্চিমবঙ্গে এখনও তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। দ্বারিক লুই-এর নিম্নের চেলা। দ্বারিকেরও গান পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থে আরও অনেকগুলি প্রাচীন সহজীয়া কবির গান পাওয়া গিয়াছে। ক্রমচিৎ এই মতের একজন বড় লোক। তিনি স্বস্বত্ব ও বাঙ্গালীর এই মতের অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর তাহাকে কাহ্না নাই। তাঁহার গানগুলি অতি সরল ও মিষ্ট। আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে "কাহ্না ছাড়া গীত নাই।" আমরা মনে করি এ কাহ্না আমাদের ক্ষয় কানাই। যেহেতু এখন গান লিখিতে গেলেই দুখাবসে কল্পনালীই লিখিতে হয়। কিন্তু কল্পনাও প্রাচুর্য্যব চৈতন্যের পর; এ প্রবাদ-বাক্যটি কিন্তু তত নূতন বলিয়া বোধ হয় না। সেই ভ্রম আমি বিবেচনা করি এ কাহ্না সেই প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণাচায়া বা কাহ্না। ময়োরহংসাদি বারং সহজীয়া ধর্মের আর একজন কবি। তাঁহার অনেকগুলি ধোঁহাও পাইয়াছি। তিনি ব্রাহ্মণ মানে ন=না, জাতিভেদ, মাননে না। ঈশ্বর মাননে না। নন্দন কথ মানে না। সৌন্দর্য মত মাননে না। তিনি বলেন বুদ্ধকে সহজীয়া মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন ও সহজীয়া মত গুরুর মুখ ভিন্ন জানা যায় না। তাঁহার মত মায়ের মত মনে নাই মুক্ত। ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বন্ধ না করিলে কে তাহাকে বন্ধ করিতে পারে? অথবা ব্রজ তাঁহার ধোঁহাকায়ের টীকা করিয়াছেন। অভ্যাকর গুপ্ত অথবা ব্রজের গ্রন্থ হইতে অনেক বাহ্য উদ্ধার করিয়াছেন। অভ্যাকর গুপ্ত রাজা রাণাপালের রাজত্বের ২২ বৎসর একজন গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রাণাপালের রাজত্ব ৪২ বৎসর। ১০৬৬ হইতে ১০৬৭ হইতে আরম্ভ হয়। অথবা তাহার পূর্বে হইতে আরম্ভ হয়। অথবা ব্রজ তাঁহার পূর্বে। সর্বোচ্চ তাঁহারও

পূর্বে। স্বতরাং বাঙ্গালীর মুসলমান-অধিকার বিশ্বস্ত হইবার তিন চারিশত বৎসর পূর্বে যে, গান ও ধোঁহা রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সময়ে আরও অনেক বাঙ্গালী গীত ও ছড়া লেখা হয়। আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই 'ধান ভান্ডে ময়ীপালের গীত'। স্বতরাং ময়ীপালের গীত বলিয়া একটা জিনিষ সকালে ছিল। পাল্যঙ্গ সহজীয়া মতের ময়ীপাল ছিলেন। তাহার মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, সাহসনাথে তাঁহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে (১০২৬)। ময়ীপালের গীত পাওয়া যায় নাই। মায়িক-চর ও পোষিষচরের গীত পাওয়া গিয়াছে। ইংহারা দুইজনই রাজা ছিলেন। প্রঃ একাংশ শতাব্দীর পরে ইংহাঙ্গিগকে লইয়া আসা যায় না। বরং কিছু পূর্বে লইয়া ঘাইতে পারা যায়। কিন্তু চূর্ণের বিষয় এই যে, ইংহাদের গীতগুলি যেমনটি লেখা হইয়াছিল তেমনটি পাই নাই। কারণ কালের লেখা পুঁথি পাওয়া যায় নাই। হয় বাঁহারা গায় তাহাদের মুখ হইতে লিখিয়া লইতে হইয়াছে, অথবা একালের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উগাত্তে অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে; এমন কি নূতন ভাবও প্রবেশ করিয়াছে এবং অনেক বিভক্তিগুরু শব্দ অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে আমি যে সহজীয়া গীত, গান, ছড়া ও ধোঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি বদল হয় নাই। যে পুঁথিগুলি পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান-অধিকারেরও পূর্কের লেখা। পুঁথিগুলি পাকানো ভালপাতায় লেখা, সে ভালপাতা প্রায় কাগজের মত। আশংক্য সেই সকালের বাঙ্গালী। পুঁথিগুলিতে ত্রুটি নাই। কিন্তু ঐ কালের যে সমস্ত ত্রুটি-গুণালা পুঁথি আছে, তাহার মতই ইংহাদের বেশ মিল আছে। বাঁহা পাওয়া গিয়াছে তাহার তিব্বতী ভাষায় তর্জমা আছে। তাই মনে হয় যদি তিব্বতী ভাষায় গ্রন্থ সব ধোঁহা যায়, আরও অনেক বাঙ্গালী গানের তর্জমা পাওয়া যাইবে। হয় ত তিব্বতে দেশে এই সকল

বাপালা গানের পুঁথিও আছে। সাহিত্য-সম্মানের একান্ত কর্তব্য যাতে এই সকল বিষয়ে অধ্যয়ন হয় তাহার বিষয়ে চেষ্টা করা।

পালবংশের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃঃ ৮০০ হইতে ১২০০ পর্যন্ত বাঙ্গালীরা যে কেবল বাঙ্গালারের জন্ত নানা দেশে যাইত, তাহা নহে, ধর্মপ্রচারের জন্তও নানা দেশে যাইত। তিস্তেতে তেতুর নামে ২২২ volume বই আছে। ইহা ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমূহের ত্রিসত্তী ভাষায় তর্জমা। ইহাতে প্রায় ৩০০০ পুস্তকের তর্জমা আছে। তর্জমায় গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থকার কোন দেশের লোক তাহার নাম, তর্জমাকর্তার নাম প্রায়ই লেখা আছে। তর্জমাকর্তা প্রায়ই দুইজন পাণ্ডিত্যে। একজন ভারতবর্ষীয় ও আর একজন তিস্তীয়। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বাঙ্গালীই অধিক। এই তর্জমা সমগ্র শতাব্দীতে আরম্ভ হয় ও জরোথন শতাব্দীতে শেষ হয়। এই তেতুরের এখনও পুরা catalogue হয় নাই। তাস্কিক গ্রন্থসমূহের কিছু কিছু catalogue হইয়াছে। সেই অল্প Catalogue মধ্যেই আমরা প্রায় ৫০ জন বাঙ্গালীর নাম পাইয়াছি। এই ৫০ জনের মধ্যে বুদ্ধকায়স্থ টকবৈরী কর্মপালেশ, সমকালীন। তাহা হইলেই বুঝা গেল বুদ্ধকায়স্থ খৃঃ ৮০০ সালে বস্তুমান ছিল। এইরূপে বৃত্তিতে বৃত্তিতে আমরা অনেক কবি, তেলী ও সাহসিগের নাম পাইয়াছি। ইহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে তিস্তীয়দিগের গুরু ছিলেন। স্তবরাও দৈব পাঠেছে যে, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে নিস্তেজ ও বীনবীড়া ইহঁরা পড়িলেও তাঁহারা সমস্ত তিস্ত দেশ নুতন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন।

নেপালের সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। অনেক সময় মনে হয় নেপাল আশে পাশে হয় বাঙ্গালীই উপনিবেশ ছিল। ইতিহাস পাঠ্য যাহা না, কিন্তু অনেক পুরাতন কথা আছে। একটা কথা এই যে বাঙ্গালার শাস্ত্রপুর নামে এক নগর ছিল। তাহার

তিন দিকে গড় ছিল, একদিকে মাত্র রাস্তা ছিল। সেখানে প্রচণ্ডকায় নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য ভাঙ্গা করিয়া সিদ্ধাচার্য্য হন। সিদ্ধাচার্য্য হইলে তাঁহার নানু হয় শাস্ত্রিকরা। তিনি নেপালে গিয়া স্বয়ম্ভুক্ষেত্র প্রকাশ করেন। এখন স্বয়ম্ভুক্ষেত্র নেপালী, তিস্ততী ও মল্লানীয়া বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থান। গিয়াহ তনিতাওয়া চুচাটিগা গান পাওয়া গিয়াছে। সে শাস্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। জানি না ভূই শাস্ত্রি এক হইবে কি না। শাস্ত্রিক গাণ্ডলিতে ভাষার একটু বৈচিত্র্য আছে। তাঁহার ক্রিয়াবিক্রির সহিত অজ্ঞানের ক্রিয়াবিক্রি মিলে না।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপালে যখন রাজবিগ্রহ হইত, তখন নেপালে রামগুপ্ত ও বুদ্ধগুপ্ত নামে দুইজন পণ্ডিত ছিলেন। ইহারা বাঙ্গালী অক্ষরের পুঁথি লিখিতেন। হস্তাক্ষর যোহ হয় ইহারা বাঙ্গালীই ছিলেন। মূলমন্ত্রের যখন বাঙ্গালার বৌদ্ধমঠগুলিকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ নেপালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মঠে করিয়া অনেক পুঁথি লিখিয়া যান। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে গেলে এই সকল পুঁথিই আমাদের প্রধান অমূল্যসম্পদ করিতে হইবে। নেপালের ন কি জম-ধাওয়া ভাড়া, তাই সে সকল পুঁথি এখনও নষ্ট হইয়া যাই নাই, এখনও বৃষ্টিতে অনেক তথ্য পাওয়া হইবে।

আবার বলি আমরা বাঙ্গালী, আশ্চর্য্যবৃত্তি জাতি; আমাদের পূর্ব-গৌরব আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। একসালে আমরা শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিক্ষেত্রে ও উপনিবেশস্থাপনে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রধান অবস্থিতি ছিলাম। ধর্মপ্রচারেও বাঙ্গালীরা বড় কর্ম ছিল না। সেদিনও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাঙ্গালীরা মণিপুর, আসাম, উড়িষ্যা ও বেহার উত্তর-পশ্চিমে দীক্ষিত করিয়াছে এবং রাজপুতনার স্থূর মন্ত্রণীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। অতদিন হইল বাঙ্গালীরা ইয়াত্র-রাজেরে উৎসাহে উৎসাহিত ইয়া

ভারতবর্ষের সর্বত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষের ও ইয়াত্ররাজের প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছে। তাহাদের যত্নে, শ্রমসাধনে ও উজ্জ্বল বাঙ্গালীসাহিত্য, ভারতীয় সাহিত্যে সূর্যোপারি স্থান অধিকার করিয়াছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। সমবেত বাঙ্গালী লেখকমণ্ডলী সেই সাহিত্যকে সমুদয়ে চালিত করিয়া বাঙ্গালার পূর্বগৌরব যাতেও পুনরুদ্ধার করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন। পূর্ব-গৌরবের প্রধান উপায় ইতিহাস।

**

১৬। বাঙ্গালীর অনাবিকৃত ইতিহাস

বাঙ্গালার ইতিহাস অতি অল্পত পরিপূর্ণ। এই ইতিহাসের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের কাজ শুধু যত্নে বঁধা পুঁথি পড়িলে হইবে না। নিকটবর্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে। Burma, Cambodia, Anam, মালয় উপদ্বীপ, শ্রাম দেশ, থায়া দ্বীপ, তিস্তত, মল্লানীয়া এমন কি চীনদেশ অবধি যাইতে হইবে, এবং যতই অধ্যয়ন হইবে ততই বাঙ্গালীর গৌরবের নুতন নুতন কথা জানা যাইবে, বাঙ্গালীর স্বভাবের পরিবর্তন হইবে, বাঙ্গালী বৃত্তিতে পারিবে যে, তাহারে পূর্বপুরুষেরা নিত্যন্ত জীক এবং অসম ছিলেন না। ভেষ্যের মধ্যে কত কাজ পড়িয়া আছে। মিংলংব্রহ্মী বিংশযশ্বের পিতা কোথায় রাজত্ব করিতেন এক কোথায় তাঁহার রাজধানী ছিল, ইহার আমরা কিছুই জানি না। অশোকেরও পূর্বে গৌরবর্জিত ভারতের একটি প্রধান নগর ছিল। কিন্তু তাহার বস্তুর কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহার কিছুই জানি না। এই যে নোখায়া আবিষ্কৃত ইহঁরা নানাদিকে শৈবধর্ম প্রচার করিয়াছিল, তাহারের মধ্যে কয়জন বাঙ্গালী কি প্রকারে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, কোথায় বা জমিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানি না। এই যে বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য্যেরা এক কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারেরও কোন কথা জানি না। এই যে

ভারতবর্ষে, বিশেষ বাঙ্গালার, বৌদ্ধধর্ম ছিল বলিয়াই শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহা কোথায় গিয়াছে? কখনো করিয়া গিয়াছে? তাহাই বৃত্তিতেছিলাম। শেষে অম্মায়াসেই বুঝা গেল বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম এখনও লোপ এখন নাই। কয়েকজন অম্মজ্ঞানকারী ঠেঠায় এখন আমরা জানিতে পারিছিছি যে, বাঙ্গালার অস্তিত্ব বৌদ্ধধর্ম এখনও চারিদিক ব্যাপিয়া আছে। আমাদের চক্ষু নাই, তাই আমরা দেখিতে পারিছিছি না।

* * *

একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন। ইতিহাস বৃত্তিবার জন্ত ভারতবর্ষে সর্বত্রই পুরাতন জায়গা সকল খোঁড়া হইতেছে। পুরুষপুত্র, তক্ষশীলা, শ্রাবস্তী, সারনাথ, বুদ্ধগয়া, পাণ্ডিপুত্র প্রভৃতি স্থানে কত গুপ্ততত্ত্ব বাহির হইতেছে; কিন্তু বাঙ্গালার এখনও এক কোণাল মটিও উঠান হই নাই। সমগ্রমাত্র একটু আদর্শ বৃত্তিলে অনেক খবর পাওয়া যাইবে। নব্বইপের নিকটবর্তী স্বর্ঘ, বিহার, বালগতিপ অনেক কথা শুকাইয়া রাখিয়াছে। বলিবে এ সকল কথা অগ্রদূতের; কিন্তু যাও না পৌণ্ডবর্ধনে, যাও না পৌণ্ডে, যাহা না কল্পবর্ষে। এ সকল জায়গা ত আধুনিক নহে, এ সকল বৃত্তিলে অনেক পুরাতনতত্ত্ব পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে বিষয়ে উন্নয়ন কই, অধ্যবসায় কই? একরূপ সম্মিলন হইতেই তাহার বাসনা হওয়া উচিত।

* * *

১৭। আমাদের অক্ষমতা

গত বৎসর বৈশাখের মধ্যায়া "ডাকাত" নিরাপত্তার উপায় সম্বন্ধে আমরা "ডাকাত হেরশের" মত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। "অম্মদীন পঞ্জাবী" ডাকাত ঘরিতে বা আশ্চর্য্যকরিত সমর্থ নহে। তাহা সেই মতে পরিমুচিত হইয়াছে। "ডাকাত হেরশ" তাই গ্রামবাশীকে অজ্ঞ প্রাণন এবং অশচল্যায় শিক্ষিত করিবার জন্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পর্ণনা করিয়াছিলেন। সুমিয়ার প্রাণদৈবক সমিতির সভাপতি মহাশয়ও সেই কথাটা

উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, “রাজনৈতিক অপর্যাপ্ততার সংখ্যা কম হইলেও বড় শক্তিশালী এবং দূরদৃষ্টিমণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে। পুষ্টি তাহারিগকে অনেক সময়েই ধরিতে পারিতেছে না। সেইজন্য গণবর্মেট আমাদিগকে তাঁহারের এই কঠিন কার্যে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। আমরা আমাদের সাধারণ্যের যেকোন সাহায্য আবশ্যক, তাহা করিতে স্বীকৃত আছি। কিন্তু গণবর্মেট আমাদের সাহায্য এখনও গ্রহণ করেন নাই অথচ আমাদিগকে উদারীন কর্তৃপক্ষ এবং এমন কি বড়মন্ত্র-আন্দোলনের সহায়কুতিপূরণ বলা হইয়াছে। আমরা উদারীন একথা স্বীকার করি, কেননা এ পর্যন্ত আমরা প্রতি বিষয়েই, বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, উদারিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছি—তাঁহার একমাত্র কারণ এই যে আমাদিগকে কেঁচ চাহে না। বীহারী আমাদিগকে অসমর্থ বলিতেছেন, তাঁহারী আমাদিগের অসহায় অবস্থা বৃদ্ধিতে পারেন না। তাঁহারী কি জানেন না যখন কোন জাতি, তাঁহার রাষ্ট্রপালনের যোগ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তখন তাঁহার সাহায্য করিবার সমস্ত শক্তিই লুপ্ত হইয়া থাকে? তাঁহারী কি উপলব্ধি করিতে পারেন না যে, অল্প আয়ের ফলে জাতির চরিত্রের কদর অবনতি হইতে পারে?”

“গণবর্মেট ও ব্যক্তিগণ এক সঙ্গে কাজ করিয়া যাহাতে অসং রাজনৈতিক আন্দোলন উদ্ভব করিতে পারে, তৎসময়েই কোন উপায় নির্ধারণ করা ইংরাজ-রাষ্ট্রনীতিবিদের পক্ষে সম্ভবপর কি না একবার ভাবিয়া দেখিতে গণবর্মেটকে কি আমরা বিজ্ঞাসা করিতে পারি না? আমরা কি শুধু জনসাধারণের মত তৈয়ারী করিবার জন্তই ব্যবহৃত হইতে থাকিব? শুধুমত প্রকাশ ছাড়া আর কোন অধিকতর কার্যকর ভাবে আমরা কি গণবর্মেটকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা পাইব না? তবে কথা হইতেছে এই, যে জাতি গণবর্মেটকে একেবারেই নিরস্ত, সে জাতি গণবর্মেটকে অন্ধ কি প্রকারে সাহায্য করিলে সাহায্য

কার্যকর হইতে পারে? যে সকল যুবক সেনানিকার বর্ধমান বছার সময় সাহস, নেতার আজ্ঞা-পালন ও সেবাপরায়ণতা দেখাইয়া জনসাধারণের দৃষ্টিতে বিশ্বাস উদ্ভূত করিয়াছে, তাঁহারিগকে গণবর্মেটের সাহায্য ব্যাপারে কি আনন্দ করা যায় না? তাঁহারিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারিগকে গণবর্মেটের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধীনে বন্দুক ও অস্ত্রাস্ত্র প্রদান করিয়া শিক্ত করা তোমরা আমাদিগকে আনুদীন ঠগ বলিতেছ তাঁহারিগের বিনাশ-সাধনে নিযুক্ত করা কি আনুদীন রাষ্ট্রনীতির নিত্যমুখ্য বিধিকৃত? ইংরাজ-রাষ্ট্রবিদের কৌশল কালোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে নিজদেশের গুরু অস্ত্রত্ব করিতে এবং আচারের সকলের উপর যে বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহার যথার্থতা প্রমাণ করিতে কি একবার চেষ্টা করিবে না?”

সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তব্য আরও বহু প্রয়োজনীয় ও জটিল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে সেগুলির অন্বেষণ ও সম্যক আলোচনা করিতে পারিলাম না। কিন্তু আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। তিনি আমাদিগকে “ব্যবলম্বন” নীতি গ্রহণ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মল্ল মহাশয় বিদ্যুৎ শিল্পনে যে স্বপ্ন বাঁধিয়াছিলেন, তিনিও তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। জেলার জেলায় পরগণায় পরগণায় গ্রামে গ্রামে একটা বিরাট সাধ যাহাতে সংগঠিত হইয়া উঠে, তাঁহার আয়োজন করিতে তিনি মগ্ন হইয়াছেন। তাঁহার মতে দেশের সমাজিক না বাড়িলে কখনই কোন জাতির রাজনৈতিক আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, “ব্রজতে কেহই—শাসক-সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই—দুর্বল, দুঃস্থ, অন্ধ এবং একতান্তি ভিক্ষুকগণের মনোবাক গ্রাহ্য করে না। কিন্তু এটা যেন ভুল না হয় যে, আমরা ভিক্ষুক তত্ত্ববিন বর্তমান আমায় অজ্ঞ, ম্যালেরিয়া-পীড়িত, দুঃস্থ একতান্তি এই অসংখ্য।”

সভাপতির অভিভাষণ *

গত বর্ষে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, আচার্য্য ভাস্কর প্রমুখজন সাহেব সেই অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হইতে পারি নাই। বোধ করি আমার এই অশুশ্রুতির হ্রোগ্য পাইয়া আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন বঙ্গুগণ বর্তমান বর্ষে বিজ্ঞানশাখার সভাপতিত্বের তার আমার উপর অর্পণ করেন। এই বিষয়ে তাঁহার আমার মতামতের অপেক্ষামাত্র রাখেন নাই। যোগ্যতা বিচার দূরে থাকুক, যেকোন দৈহিক অবস্থা না হইলে এইরূপ সভার নেতৃত্বগ্রহণ কখনই সম্ভবপর হয় না, দুই বৎসর হইতে আমার সেই অবস্থাই নাই। যোগ্যতা এবং বিজ্ঞানশাখার সভাপতিত্বের সভার পরিচালন করণে সাধ্য হইবে, সে বিষয়ে আমি তাঁহারের উপদেশপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহারী আমাকে সে উপদেশটুকু দিতে, বৃদ্ধিত হইয়াছেন। সভাপতিত্বের গুরুভার আমার মতকে জ্ঞাত হইয়াছে, এই সংবাদ যখন আমার নিকট পৌছিল, তখন তনিনাম এই ভাব স্বীকারও আমার স্বাধীনতা নাই। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য প্রমুখজন সাহেব যে আনন্দ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই আনন্দ গ্রহণে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে মনে মনে একটা স্নান এবং আনন্দ পাই নাই, এই কথা না—দুর্বল, দুঃস্থ, অন্ধ এবং একতান্তি ভিক্ষুকগণের মনোবাক গ্রাহ্য করে না। কিন্তু এটা যেন ভুল না হয় যে, আমরা ভিক্ষুক তত্ত্ববিন বর্তমান আমায় অজ্ঞ, ম্যালেরিয়া-পীড়িত, দুঃস্থ একতান্তি এই অসংখ্য।

আমার দুর্বল স্বাস্থ্যরূপে একরূপ আহত ও অবসর হইয়াছে যাহাতে এই গুরুভার গ্রহণে নিতান্ত অশুশ্রুতির পরিচয় হইবে, ইহা ব্রহ্মীয়া সাহিত্য-সম্মিলনের কর্তৃপক্ষের নিকট আমার অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম, এবং তৎসঙ্গে কোন যোগ্যতার পায়ে এই ভার জ্ঞাত হয়, এইরূপ বিনীত নিবেদনও জানাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার করুণ কাহিনী তাঁহারের দৃষ্টিতে অন্ধ্র করিল না। বিজ্ঞানশাখার নেতৃত্ব কার্যে যোগ্যতা বা ক্ষমতা কিছুই প্রয়োজন নাই, সম্মিলনের অধ্যক্ষগণ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা আমার নিকট উৎকণ্ঠ সমস্তা থাকিয়া গেল। কিন্তু বঙ্গদেশের এই কেন্দ্রস্থলে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর পুরোভাগে আশীন হইয়া হৃদয়মধ্যে বকের ত্রায় কর্তৃপক্ষ শোভমান হইব, ইহা মনে করিয়া আমার দুর্বল স্বাস্থ্যরূপে কর্তৃপক্ষ কবিত্ব হইয়াছে, আমি স্বয়ংই তাহার তুচ্ছভোগী। যাহা হউক, অধ্যক্ষগণ আমাকে আশাস দিয়াছেন যে, এই সমস্ত সভার পুরোভাগে না গড়াইলেও আমার চলিতে পারে। সেকালে নিয়ম ছিল, এবং একালেও হয়ত বহুস্থলে প্রথা আছে যে, রাজসভার বৈষ্ণব বা গুণিগণের সভায় কার্য্যারম্ভের পূর্বে নবিক ফুকরা, অর্থাৎ, একটা লোক যাহার মুষ্টি এবং বেশভূষা সভার জনগণের হস্ত-উৎসাহনে সমর্থ, সে অতি উচ্চকণ্ঠে প্রায় অবাধে ভাষায় সভার কার্য্যারম্ভ ঘোষণা করিয়া দেয়। ব্রহ্মীয়া, বর্তমান সভায় সেই নবিকের কার্য্য

করিলেই আমি অব্যাহতি পাইব এবং আমার বন্ধগণ আমার প্রতি তুষ্ট থাকিবেন। বর্তমান অবস্থায় নকিবের উক্তকর্ত্ত আমার নাই, তবে বন্ধগণের পরিতোষের জ্ঞাত আপনাদের মত বিজ্ঞ ব্যবসায়ীর সম্মুখে কয়েক মিনিটের মত গলা জাবির করিয়া কার্যারম্ভের ঘোষণা করিয়া দিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি। আমার অবস্থা দেখিয়া আপনাদের অন্তরে যদি হাস্যরসের সঞ্চার হয়, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হইব না।

বকী সাহিত্য-সম্মিলন এবং তৎসম্পৃক্ত বিজ্ঞানশাখা যদি দেশের স্বার্থী অস্বহন হইয়া দাঁড়াই এবং এতদ্বারা দেশের যদি কোন স্বার্থী হিত সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে কোন ভবিষ্যৎকালে এই অস্বহনের ইতিবৃত্ত সকলনের প্রয়োজন হইতে পারে। আঞ্জিকার বিজ্ঞানসভায় আমি আর কোন কার্য করিতে না পারি, ভবিষ্যতের সেই ইতিহাসলেখকের কিঞ্চি সাহায্য করিয়া যাইতে পারি। এ কাজটাও নকিবের কাজের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। নয় বৎসর পূর্বে বকী-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকতা-প্রাপ্তের পর একদিন রোডার্সকোর বাড়ীতে বসিয়া মাননীয় শ্রীমুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাহিত্য-পরিষদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাহিত্য-পরিষদের ঢাক বাজাইয়াছি। এখনই অবসর হইয়াছে, কাঁধ হইতে ঢাক নামাইয়া পরিষদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে অন্তরে সহিত আলোচনা এবং অন্তরে উপদেশ গ্রহণ আমার ব্যাপি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট এখনই গিয়াছি, তখনই কিছু না কিছু লাভ করিয়া আসিয়াছি। সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি

বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের কার্যক্ষেত্র বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যিক। বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই সমস্ত বার্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন মার্থক হইবে। এই কার্যের জ্ঞাত সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে যথা সম্ভব জ্ঞাপাইয়া তোলা পরিষদের সম্বন্ধে মুখ্য কর্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্যায়ক্রমে অস্থিত করিলে কার্যটার সূচনা হইতে পারে। বিলাতের British Association for the Advancement of Science যেমন বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন নগরে উপস্থিত হইয়া নূতন জ্ঞানের বাহরণ ও পুণ্যতন জ্ঞানের প্রচার করিয়া থাকেন, সাহিত্য-পরিষৎও সেই পথে চলিতে পারেন। British Association কেবল বিজ্ঞান-শাস্ত্রেই আলোচনা করেন। বাঙ্গালা দেশে এক্ষণ বিজ্ঞানসভা গঠিত হইবার এখনও সময় হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎকে সাহিত্যের স্নাক বিভাগেই কাজ করিতে হইবে। আজ যদি আমি স্বীকার করি যে, রবীন্দ্রনাথের এক একটা কথা এক এক সময়ে মস্তের গ্রায় আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে নিতান্ত ক্ষণজীবী ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। এই প্রস্তাবটিও তদবধি আমার মোহ জন্মাইয়াছিল। বকী-সাহিত্য-পরিষদের লোকবল এবং ধনবল আমার অজ্ঞাত ছিল না। সেই ক্ষণশক্তি লইয়া পরিষৎ কিরূপে এই বার্ষিক অস্বহনে প্রস্তুত হইবে, সেই চিন্তা বহুরাগি আমার নিস্তার

ব্যাখ্যাত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ১৩২১ সালের শেষভাগে হঠাৎ বকী-সাহিত্য-সম্মিলনের সূচনা হয়। রত্নপুর হইতে শ্রীমুক্ত অমরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এবং বরিশাল হইতে শ্রীমুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রায় এক সপ্তে বাঙ্গালার সাহিত্যশেখিগণকে সম্মিলিত হইবার জ্ঞাত আহ্বান করেন। বরিশালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু বরিশালের সাহিত্য-সম্মিলন সেই বৎসর বরিশালে আহৃত রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনের পুঙ্খ আশ্রয় করিতে যাওয়ায় সম্মিলন-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পর-বৎসর মূর্শিদাবাদ জেলায় সাহিত্য-সম্মিলনের আহ্বানও দৈবক্রমে নিফল হয়। তার পর বৎসর কাশিবাড়ীর মাননীয় মহারাজের আশ্রয়ে সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ঘটে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেখানে সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের সেই প্রথম বৎসরে বিজ্ঞান-আলোচনার বিশেষ কোন স্থিতিই ঘটে নাই। পর বৎসর রাঙ্গসাহারী হইতে নিমন্ত্রণ আইসে। শ্রীমানকার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক-শ্রীমুক্ত শশধর রায় মহাশয়, সম্মিলন কোন্ পথে চালিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়া আমাকে অস্থগৃহীত করেন। সাহিত্যের নানা বিভাগের সম্যক আলোচনার জ্ঞাত সাহিত্য-সম্মিলনকে সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান এই তিন শাখায় আপাততঃ বিভাগ করা যাইতে পারে, এই অভিপ্রায় আমি জানাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য ত্রিটিয় আসোসিয়েশনের আদর্শ আমার মনে জাগিতেছিল। শশধর বাবু এককালে কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অস্থিমজ্জা বৈজ্ঞানিকের দাতুতে নিষ্পিত। নানা মাদিকপকে মানবতত্ত্ব

সম্বন্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা এক শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে আনন্দজনক ও অল্প শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে। Eugenics বা মানবজাতির উৎকর্ষবিদ্যন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রস্তুত হইয়া তিনি দেশ মধ্যে লোকের গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্নের যে সব ছাপান তালিকা চড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার গৃহস্থগণও সম্ভবতঃ ভীত হইয়া পড়িতেছেন। গৃহস্থের জীবনের খুঁটিনাটি তত্ত্ববার্তা সম্বন্ধে Life Assurance Companyদের ছাপান তালিকা ইহার নিকট হারি মানে। রাজসাহারী সাহিত্য-সম্মিলনকে শশধর বাবু যেসকল প্রায় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পরিণত করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমিও কিঞ্চি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেবার সভাপতি ছিলেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কতকটা সেই কারণে এবং কতকটা শশধর বাবুর হুত্বেচালনায় রাজসাহারী সাহিত্য-সম্মিলন বৈজ্ঞানিকের এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ঘনভাট হইয়াছিল। পর বৎসর ঢাকালপুরে এবং তৎপর বৎসর ময়মনসিংহে বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ জটিলার অবসর পান নাই। তবে ময়মনসিংহে স্বয়ং আচার্য জগদীশচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞাষণটাই বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞাষণ। পৃথিবীর যে কোন বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে উহা শাণ্ডে গৃহীত হইতে পারিত। তৎসম্মিলনে এই উপলক্ষে সাদ্ধা-সম্মিলনে তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন তত্ত্ব সকল সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া তিনি একটা নূতন পথ দেখাইয়া দেন। পর বৎসর ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনকে বিভিন্ন শাখায় বিভাগের প্রস্তাব যথারীতি উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তখন তখন উহা কার্যে

যেখানেই আমরা আলোক দেখিব, সেইখানেই আমরাগকে পতঙ্গপুত্রি হইয়া দৌড়িতে হইবে, কিন্তু তাহাতে পতঙ্গের মত জীবনের নাশ না হইয়া জীবনের বর্ধন হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞান-মন্দিরে যাঁহারা সাধক, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা অস্ত্রের পক্ষে দুর্বোধ্য। সাধনা-মন্দিরের বহির্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জনের নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় আশ্ব-প্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সজ্ঞাত বোধ করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আশ্বাদনের প্রত্যশায় অসাধ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে উর্দ্ধমুখে ও শুদ্ধদশয়ে পাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাঁহাবিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা যাহা অর্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাফলী এবং ফলভোগে অধিকারী। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম বস্তুরই নিরাম ধর্ম। কর্মেই তাঁহাদের অধিকার; ফলে তাঁহাদের একেবারে অধিকার নাই। যাহা কিছু তাঁহারা আহরণ করিবেন, মুক্তহস্তে তাহা তাঁহাবিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্দোষ চলিবে না। এই জ্ঞাই দেখিতে পাই যে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যাহারা প্রকৃতই ঋষি, তাঁহাদের দ্বিবা চক্ষু সত্য নিরীক্ষণে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই যেন প্রাণের তৃষ্ণায় বাঁহিরে আসিয়া আপাদর সাধারণকে সেই সত্যের সহিত পরিচিত করিবার জন্ত সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। আমি জানি বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এমন অনেক মহাজন আছেন, যাহারা নির্জন সাধনা ছাড়িয়া

বাহিরে আসিতে চাহেন না। জ্ঞান অর্জন তাঁহাদের কাঁধ; জ্ঞানের প্রচারও কাঁধ বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারি। সর্বত্রই যেরূপ, এখানেও সেইরূপ অস্ববিভাগের প্রয়োজন। আহরণ ও বিতরণ উভয় কর্মই একজনে গ্রহণ করিলে কোনটাই হ্রত হইরূপে সম্পাদিত হয় না। আহরণের শক্তি ও বিতরণের শক্তি ঠিক একজাতীয় নহে। যিনি অর্জনে নিপুণ, বিতরণে তাঁহার নৈপুণ্য না থাকিতেও পারে। নিত্যম অনবিচারী নিকট বিতরণ করিতে গিয়া বিস্তার সাহায্যকেও বর্ষ করিবার কতকটা আশঙ্কা থাকে। কৃষি যেখানে নিত্যম অহরহর, সেখানে বীজ ছিটান কেবল পরিশ্রমের অপব্যয়। এ সমস্ত যুক্তি স্বীকার করিলেও দেখিতে পাই, সত্যের অন্বেষণে যাহারা উজ্জ্বল বস্তুকা হস্তে করিয়া পুরোপারী হইয়াছেন, তাঁহারা ইংল্যান্ডের আপনাদের মেরুও ক্ষেত্রের জন্ত অবনত করিয়া, নিম্নতর সোপানে দামিয়া আসিয়া জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-প্রচারে আমন্ত্রণ করিতেছেন। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে সাধারণের উপভোগ্য করিতে পারা যায় কি না, এরূপ চেষ্টায় কোন লাভ আছে কি না, ইহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা বাধ্যতাব্য চলিতে পারে। ইংরেজিতে বলিলে, Scienceকে popularise করা চলে কি না এবং করা উচিত কি না, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু তৎসঙ্গেও Lord Kelvin অথবা P. G. Tait, Hermann Helmholtz অথবা William Kingdon Clifford প্রকৃতির মত ভাঙ্গরহ্রাসিত জ্যোতিষ্কে আলোক বিতরণ করিয়া দুরাশ্রমের অজান

ভিমির অপদারণে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। এই কথটা নাম উল্লেখের পর বোধ করি আর কেহ যথ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না যে, প্রাকৃত জনের সম্বন্ধে বিজ্ঞান-প্রচারে নিম্নক হওয়ায় কোনরূপ লজ্জা বা অপোরবের হেতু আছে।

বাঙ্গালী দেশে যে সকল মনসী পণ্ডিত এবং তাঁহাদের উৎসাহী ছাত্র বিবিধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূতন তত্ত্বের আহরণে নিম্নক হইয়াছেন, এই সাহিত্য-সম্মিলনে আমরা তাঁহাবিগকে দায়ের আস্থান করিয়াছি। তাঁহারা একত্র উপস্থিত হইয়া পরস্পর ভাব বিনিময় করুন, ইহা প্রার্থনা করি। কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণকেও একেবারে বিমূর্ত হইবেন না। এই প্রার্থনাও এই স্থযোগে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। সাধারণের সম্বন্ধে আসিয়া তাঁহাদের নিজেদের ভাষা ছাড়িয়া সাধারণের বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে হইবে। অজ্ঞ দেশে যাহা সম্ভব, এদেশে এখনও তাহা সম্ভব নহে। এখনও বুড়হীন দরিদ্রা আমাদের বৈদ্যিক জ্ঞান বিদেশী ভাষার সাহায্যে বৈদ্যিক যুগ্মশব্দীকরণে নিম্নক স্থাপিত করিতে হইবে। বিমুক্তিপত্রীকার জ্ঞ যে নিম্নক পাণ্ডের প্রয়োজন, এদেশে তাহা বর্তমান নাই। বিশেষের অগ্রিকূলে গলাইয়া ঢালাইয়া তাঁহার বিমুক্তিপত্রীকা করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালীভাষা এখনও বিজ্ঞান-প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব কমেই অগতঃ হইয়া পড়িবে। এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্ত আপনাবিগকে অগ্রসর করিতেছি। মাতৃভাষাকে এতদূর পর্যন্ত হ্রাসিত করিয়া লইবার জন্ত যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, আপনাবিগকেই তাহা করিতে

হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখা যদি বঙ্গভাষার এই অস্ত্রের পুষ্টিবিধান সাহায্য করে, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

আমাদের বাঙ্গালীভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপূর্ণ হউক, উহা যারা বিজ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে একেবারে অসাধ্য; তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। আমি আশা করি, এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাহারা বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের কৃতকার্মীতা আমার বাক্য সমর্থন করিবে। এমন এক সময় ছিল, যখন স্কুল এবং কলেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ আপনাদের মধ্যে এবং ছাত্রগণের সহিত কথোপকথনে বাঙ্গালার ব্যবহার বেদ্যদ্বি বলিয়া গণ্য করিতেন। এখনও সর্বত্র সেই ভাব চলিত আছে কি না জানি না। ক্রমে বলিয়া অধ্যাপনার সময় বাঙ্গালার ব্যবহার বোধ হয় এখনও অধিকাংশ স্থলে লজ্জার হেতু বলিয়া বিবেচিত হয়। আমি স্বয়ং অধ্যাপনা-ব্যবসায়ী। বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত আমার আর কিছু সম্পর্ক না থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারণ অগ্রসরে পরাধর্মী এবং রসায়নবিজ্ঞান অধ্যাপনাই আমার জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই জন্ত অন্ততঃ জীবিকার অগ্ররোধে যৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞান আলোচনাও আমাকে করিতে হইয়াছে। অধ্যাপকের আসনে বলিয়া বাঙ্গালীভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসম্মে যথোপযুক্ত মিলিবে না। হ্রস্ত ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞতা আমার এই চম্পত্তির মূল কারণ। বাল্যকালে যেইন সাহেবের Higher

English Grammar, মাথ তাহার Companion, যথাস্থি কল্পিত করিয়াছিলেন এবং মুখস্থ বিজ্ঞা উদ্ভিসংগ করিয়া মাতার মহাশয়ের বাহবা পাইয়াছিলেন, কিন্তু আলিও কোথায় shall এবং কোথায় will বসাইবে, এই দুশিক্ষা আসিয়া ইংরেজি লেখাই বন্ধ হয়, কলমটাও অচল হইয়া পড়ে। ইংরেজি ইতিমধ্যে ও বানান সমস্ত আমার সন্মত অপরাধ দিন দিন চিত্তগুণের দ্রাক বহিতে লিপিবদ্ধ হইতেছে। কারণ যাহাই হউক, আমি এই পাণের বোঝা চিরজীবন ধরিয়া মাথায় বহিতেছি। কিন্তু সে জ্ঞান অধ্যাপনা-কার্যে কখনও যে ব্যাঘাত অস্থবহ করিয়াছে, তাহা সহজে স্বীকার করিব না। পরদর্শিবিজ্ঞা বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দের একান্ত অভাব রহিয়াছে তাহা স্বীকার করি। অধ্যাপনার সময় ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ যে নিত্যন্ত আবশ্যিক, তাহাও বোধ করি না। পারিভাষিক শব্দগুলি ইংরেজি রাখিয়াই এবং শাফেতিক চিত্রগুলি ইংরেজি রাখিয়াই আর সমস্ত কথা বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, কোন স্থানে ঠেকিতে বা ঠিকিতে হয় না, এই ধারণা আমার বন্ধন হইয়া গিয়াছে। ইংরেজি ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এইরূপে যে স্বেচ্ছুরী ভাষা প্রস্তুত হয়, তাহা শাদু সাহিত্য কর্তৃক সমাদরে গৃহীত না হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাপনাকার্যে ঐ ভাষা ব্যবহারে শিক্ষক বা ছাত্র কোন অসুবিধা বোধ করেন, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। পরদর্শিবিজ্ঞার যে সকল তত্ত্ব ছাত্রদিগের নিকট নিত্যন্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হয়, আমার এই অপরূপ ভাষার আশ্রয়েও তাহা ছাত্রদিগের বুদ্ধিগম্য করিতে কখনও কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। Maxwell, Hertz অথবা

Thomsonএর পদ্য অস্বপ্নর কথিয়া Electro-magnetic Fieldএর,—অর্থৎ যে দেশে ভাঙিত এবং চুম্বক-শক্তি যুগপৎ কাজ করে সেই দেশের,—অর্থৎ বৃষ্টিবার জন্ত black boardএর কালাপিতে চাখড়ির ধলা খাঁচড় কাটিয়া শাফেতিক ভাষায় যখন বড় বড় equationগুলি লেখা যায়, তখন সেই equationগুলার বিকল্পিত ছাত্রদিগের মনে কিরূপ আতঙ্ক সঞ্চার করে, তাহা কুতূহলগী ছাত্রমাজেই অবগত আছেন। আমি কিন্তু দেখিয়াছি, সহজ বাঙ্গালায় সেই খাঁচড়গুলার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিলে ছাত্রগণের হৃৎকম্প তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এমনকি তাহাদের মনের ভিতর একটা আশঙ্কের সঞ্চার হয়, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। কাজেই আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাহার উপর ভর করিয়া আমি বলিতে বাধ্য যে বাঙ্গালা ভাষা জনসাধারণের সমুদ্রে পরাধ-বিজ্ঞানের প্রচার-কার্যে একেবারে অসমর্থ নহে। রসায়ন-শাস্ত্রের বিবিধ মৌলিক এবং যৌগিক শব্দের পারিভাষিক নামগুলো এবং তাহাদের গঠনবিজ্ঞাপক শাফেতিক চিত্রগুলো ইংরেজি রাখি কি বাঙ্গালায় ভাবাস্তরিত ও রূপান্তরিত করিব, তাহা লইয়া একটা বিবাদ বহুকাল হইতে চলিত আছে। আপাততঃ সেই বিবাদের যৌমাংশের কোন সম্ভাবনা দেখি না, কিন্তু সেই বিবাদের নিষ্পত্তি পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশের শিক্ষার্থীরা—ইংরেজি ভাষায় যাহাদের ধন্য নাই তাহারা—রসায়ন-বিজ্ঞার সমাধানের যে একবারে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা উচিত নহে। উদ্ভিদবিজ্ঞা এবং প্রাণিবিজ্ঞা বিবিধ-উদ্ভিদ জাতীর এবং প্রাণিজাতীর নামকরণে লাতিন ভাষার অগ্রাধীন; সেই উৎকট নামগুলি

কোন কালে বাঙ্গালাভাষার দাতুর সহিত মিলিতে চাহিবে কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যেমনেই হউক—লাতিন নামগুলি বহুদূর রাখিয়াই হউক অথবা তাহাদের অনুবাদের চেষ্টা করিয়াই হউক—উদ্ভিদ-তত্ত্বকে এবং প্রাণিতত্ত্বকে বাঙ্গালী সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিতেই হইবে। কৃত্রিয়াব্যব-পদ্ধতির বিবিধ আকরিকের ও বিবিধ শিলাখণ্ডের যে সকল নাম সর্বদা ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীর কোমল বাণ্ণ্য তাহার উচ্চারণে ছিড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, তাহা স্বীকার করি। বাঁহারা করাত এবং হাড়টি হাতে পাহাড়ে পাহাড়ে লাকাইয়া বেড়ান, তাহাদের দেখে ও মনে আগেরপের ও কোষগমের কাটুজ পাইয়াছে সম্ভব নাই। আমাদের বাণ্ণ্যয়ের এই কোমলতা দেখিয়া তাহাদের হৃদয় কোমল হইবে, একপ্রাণ আশা করি না; কিন্তু ঐ নামগুলোকে কাটুজ ছাটিয়া একটুকু মোলায়েম করিয়া লইলেই উদ্ভেই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাদের কঠিন অন্তঃকরণকে একটু করুণারসার্জ করিতে আমি নির্দ্বন্দ্ব অহরোধ করিতেছি।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিজ্ঞান-বিভাগ যে নিত্যন্ত দরিদ্র, এই আক্ষেপাত্মক সন্দেহই তনিতো পাওয়া যায়, অথচ এ পর্যন্ত ইহার প্রতিষ্ঠারের সম্যক ব্যবস্থা হয় নাই। তনিতো পাই যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্পষ্টতঃ এ বিষয়ে যত্নপর হইয়াছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন যাহার উদ্দেশ্য, সেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে উপেক্ষা মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। কয়েক বৎসর হইতে সাহিত্য-পরিষৎ

বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগের দ্বাৰাবাহিক আলোচনার জন্ত অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র শাস্ত্রী গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত ভাস্কর বনগুপ্তী লাল চৌধুরী ব্যতীত আর কেহ পরিষদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া তনি নাই। তাহারা উভয়েই সাহিত্য-পরিষদের নিত্যন্ত অন্তঃকরণ বদ্ধ; কিন্তু তাহাদের নিকটেও পরিষৎ যেটুকু পাইয়াছেন, তাহা তৃষ্ণা-নিবারণের পক্ষে প্রচুর নহে। শ্রীযুক্ত ভাস্কর প্রসন্নকান্ত রায় এবং স্পষ্টতঃ শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অপরূপজ দত্ত দুইবানি গ্রন্থ দ্বারা পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পুষ্ট করিয়াছেন। যদিও স্পষ্টতঃ আমি পরিষদের সেবাকার্যে অশক্ত, তথাপি পরিষদের পক্ষ হইতে উপস্থিত পুণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট এ বিষয়ে সাহায্য বিচার আধিকার। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানচর্চার এই জাগরণের দিনে সাহিত্য-পরিষদের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, ইহাই আমার আশা। বাঙ্গালাসাহিত্যের বিজ্ঞান-বিভাগের দারিদ্র্য মোচন আপনাদাই করিতে পারেন। ইহা আপনাদের কর্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া উচিত। পারিভাষিক শব্দের অভাব এই বিষয়ে অন্তরায় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। যিনি অক্ষর সহিত মাতৃভাষার সেবাকার্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রন্থ-চনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার মনের ভাব আপনা হইতে শব্দরূপে লেখনীমুখে আবির্ভূত হইবে। স্বদেশসম্ভিতার দশম মণ্ডলে একটা শব্দ রহিতাছে, অস্ত্রশরীরের গুহামধ্যে চিত্তের নিত্য প্রবেশে যে অশরীরী ভাবরাশি প্রজ্জ্বলভাবে গুপ্ত আছে, তাহা অকস্মাৎ শরীর গ্রহণ করিয়া শব্দরূপে এবং নামরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, স্ববি বৃহস্পতি তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত

হইতেছেন। বাস্তবিকই যখনই আপনারা শ্রদ্ধাশীল হইয়া আপনাদের ভাববিশিষ্ট প্রকাশ করিতে চাহিবেন, ভাববিশিষ্ট সৃষ্টি গ্রহণ করিয়া তখনই শব্দরূপে প্রকাশ পাইবে। সর্বদেশে সর্বজাতির মধ্যেই এই ব্যবস্থা। পরিভাষা-সম্বলনের অপেক্ষা কোন দেশেই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিম্নলিখিত ভাবে বিদ্যা থাকে নাই। বিজ্ঞান ও যেমন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, বিজ্ঞানের পরিভাষাও সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পড়িয়া তুলিয়াছে। জব যেখানে আশ্রয়প্রাপ্ত করিতে চাহিয়াছে, তখনই তাহা শব্দরূপে আবিস্কৃত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গের জনসাধারণ জ্ঞানার্থী হইয়া উঠিলে আপনাদের অভিমুখে চাহিয়া রহিয়াছে। আপনারা তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডার নিবারণ করুন। ইহা আপনাদিগের কৰ্ম; ইহা আপনাদিগের ধর্ম। সাধাশুধে এই বিষয়ে সজ্ঞিত হইলে আপনাদিগের প্রভাব্যব হইবে।

নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালদেশে বাঙ্গালা-ভাষার সাহায্যে পাকাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রচারের যে উদ্যম ছিল, সম্ভ্রুতি তাহা যেন দেখিতে পাই না। পশ্চিম দেশ হইতে নবাগত জ্ঞানালোকের ছটায় ঝাঁপানের চক্ষু তখন ঝলসিয়াছিল, তাহার সেই আলোক দেশমধ্যে প্রতিফলিত করিয়া দেশের আঁধার নিবাহার জ্ঞান সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বকীয়া-সাহিত্য পরিষদের সম্পর্কে আসিয়া আমি দেখিয়াছি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে শ্রেণীর যতগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইত, বর্তমানকালে সেই শ্রেণীর তত গ্রন্থ যেন প্রকাশিত হয় না। তখনকার তুলনায় এখন লেখকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, দেশে জ্ঞানভাণ্ডার স্পৃহা প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে, জ্ঞান-বিতরণে সর্ব

শিক্ষাব্যাপ্তি সর্বত্র পণ্ডিতের সংখ্যা প্রচুরবতর বৃদ্ধি পাইয়াছে, গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় কমিয়াছে গ্রন্থপ্রচারের সুযোগ বাড়িয়াছে, অথচ বাঙ্গালীসাহিত্যের কেন এই অবনতি, তাহা আপনাদের চিন্তার বিষয়। যে কালে যাহারা বঙ্গের স্বাধীন সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন, তাহাদের মধ্যে অনেককেই জনসাধারণ মধ্যে এই জ্ঞানপ্রচার কার্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তরূপে রূক্ষমাহেন বঙ্গোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম কয়েক দেখিতে পাই। ইহার যেরূপ অন্ধার সহিত, বঙ্গের অহরাগের সহিত, যেরূপ যত্নের সহিত, বঙ্গের জনসাধারণ মধ্যে পাকাত্য জ্ঞানালোক বিতরণ করিতে জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, বর্তমান কালে তাহাদের সমকক্ষ ব্যক্তিগণকে সেরূপ করিতে দেখিতে পাই না, ইহার কারণ কি? সে কালের রহস্যসম্বন্ধ, বিবিধার্থনা-গর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতিকে যে জ্ঞান-প্রচার কার্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই, একালের কোন বাঙ্গালী পত্রিকার সেরূপ অধ্যবসায় দেখিতে পাই না কেন? হইতে পারে উল্লিখিত মনীষিগণ এবং উল্লিখিত সাময়িক পত্রিকাগুলি যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিতেন, তাহার অধিকাংশ এখন বালকোচিত বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু তাহা সত্য হইলেও একালের উপযোগী বয়োভাষিত কৰ্মে কয় জন লোক এবং কয়খানি পত্রিকা নিযুক্ত আছে? আমার বাল্যকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনোমজ্ঞ দত্ত প্রণীত খগোল বিবরণ প্রভৃতি কয়খানি বাঙ্গালীগ্রন্থ সর্বদাই দেখিতে পাইতাম। হয় ত এ গুলি

তুলপাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু একালেও যে সকল তুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা ঐ কয়খানির তুলনায় নিম্ন পদই পাইবে। তুলপাঠ্য নহে, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-প্রচার উদ্দেশ্যে লিখিত, এরূপ গ্রন্থেরই বা একালে প্রচুর্য দেখাযায়? বাঙ্গালীসাহিত্যের চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছে, অথচ বিজ্ঞানোন্মেষ এরূপ অযোগ্যতার কারণ কি? আমি যে কারণ অনুমান করি তাহা স্মৃতি ভাষায় বলিতে গেলে এই সত্য উপস্থিত বিষয়গুলির বিশেষ স্ফাটার হেতু হইবে না। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব কালের তুলনায় আজিকার দিনে আমাদের দেশে মনোবী পণ্ডিতের অভাব নাই, অভিজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব নাই, রচনাগুপ্ত দক্ষ লেখকের অভাব নাই, তবে কিসের অভাব? আমি অহুমান করি, বলিতে চুপ্‌চুপ, বলিতে লজ্জা হয়, বলিতে ভয় হয়, আমি অহুমান করি, ইহার মুখ্য কারণ অন্ধার অভাব, প্রীতির অভাব, অহুমানের অভাব, প্রেমের অভাব। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা পাঁচজনকে যদে বাঁটিয়া লইব, আমি যাহা অর্জন করিয়াছি শেখারসীকে তাহা বিতরণ করিব, আমি যে অমৃত রসের অধিকারী হইয়াছি, গৌনবিরজি নির্বিশেষে আমার ভাই-ভগিনীকে সেই অমৃত রসের আশ্বাসের ভাগ না দিলে, হই হাতে তাহা বিলাহিতে না পাইলে, আমার প্রাণের পিয়াস মিটিবে না, যে প্রেম হইতে এই মহাভাবের উৎপত্তি হয়, সেই মহাভাবের অসম্ভাবই ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া অহুমান করি। রূক্ষমাহেন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও অক্ষয়কুমার, তোমরা প্রীতির দ্বারা বিলাহী। তোমাদের পার্থিব

কীবনের লীলাভূমিকে উর্ধ্বর করিয়া গিয়াছিলে, তোমাদের পরবর্তী আমরা সেই ভূমির সম্পদ অধিকার করিতেছি, কিন্তু তোমাদের তপন-কর্ম্মে আমাদের অধিকার নাই।

অজ্ঞতার সভ্য সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে এই লজ্জাবিমোচনের জ্ঞান আমার বিনীত অহুমান জানাইয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা কৃতবিশ্ব, আপনারা জ্ঞানী, আপনারা মনোবী, আপনারা যশস্বী, আপনাদের চেতায় বঙ্গের নব আগরণ আরম্ভ হইয়াছে। জননী বঙ্গ-ভূমির কীর্তিধ্বজা আপনাদের হস্তে দ্রুত রহিয়াছে। আপনাদের নিজের যশোরশ্মি দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইতেছে। কিন্তু বঙ্গজননী আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, বঙ্গভাষা আপনাদের ঘেঁষ প্রার্থনা করিতেছে, বঙ্গসাহিত্য আপনাদের ককণা-প্রার্থী, বঙ্গের জনসাধারণ আপনাদিগের অশ্বেশাশী; আপনাদের সমুখে এই বিশাল কক্ষক্ষেত্র পড়িয়া আছে, এক্ষণে আপনারা অবসর করুন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান মহাযজ্ঞভারি সাধারণ সম্প্রতি; দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্ট অধিকার নাই। গণিতবিদ্যা বা জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন-বিজ্ঞান, জীবন-বিজ্ঞান বা আধ্যাত্মবিজ্ঞান, কোন বিদ্যাতেই ভারতবর্ষের কিছা বঙ্গদেশের কোন বিশিষ্ট স্বাধিকার থাকিতে পারে না। যাহারা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, তাহাদের সকলেরও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের অথবা বাঙ্গালদেশের সহিত কোন কোন বিজ্ঞানের বিশিষ্ট অঙ্গের বিশিষ্ট সম্পর্ক অধিকার করা যাইতে পারে। আমাদের এই বকীয়া-সাহিত্য-সম্মিলনে এবং

আমাদের বকীয়-সাহিত্য-পরিষদের বকীয় স্বীয়গণ কর্তৃক সেই সকল বিশিষ্ট অঙ্গের বিশিষ্ট আলোচনা প্রেরিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালার জল-বায়ুক্ষেত্র, বাঙ্গালার আবহাওয়ার গতিতে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহার বিশিষ্ট আলোচনায় বঙ্গের চিকিৎসক হইতে বঙ্গের রূপক পণ্যস্থ সকলেই উপকৃত হইবেন। বাঙ্গালার দেশের বাতাবর্ত্ত বা cyclone অন্তরিক্তবিদ্যায় বা meteorologyতে একটা নূতন পরিচ্ছদ যোজন্য করিয়াছে। এই বিশিষ্ট আলোচনাতে আরও কি কোন নূতন পরিচ্ছদের যোজন্য হইবে না? বঙ্গের সমস্তল ভূমিতে একপানা কষ্টনি পান্য পাওয়া যায় না। যে অতি পুরাতন মালভূমির ক্ষুদ্র আশ আজ পণ্যস্থ সমুদ্রের জলসীমার উর্দ্ধে থাকিয়া ভারতপশ্চিমের দক্ষিণাংশ অংশ গঠন করিয়াছে, গঙ্গাপ্রবাহ দ্বারা উত্তর ও পূর্বা সীমায় প্রবহমান, সেই মালভূমিতে না কি একপানা পুরাতন জীবাশ্ম বা fossil পাওয়া যায় না, এই সকল কারণে এদেশের সমস্তলভূমি এ পণ্যস্থ কৃষিাব্যবস্থার প্রভা আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তথাপি গঙ্গাপ্রবাহ-বিশিষ্ট মৃত্তিকারানি কত কালে কিরূপে আমাদের বঙ্গভূমিকে নিশ্চিত করিয়াছে, এ বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে কি? আমাদের মধ্যে বাঁহারা ইতিহাস লেখেন বা কাব্য লেখেন, তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, এই নিম্নরূপ যেন সেই সেদিন সমুদ্রগর্ভে ময় ছিল; কিন্তু এই কলিকাতা সহরের বহু নিম্নের ভূমি, যাঁহা এখন সাগরবক্ষের বহু নিম্নে অবস্থিত, তাঁহাই একদিন বনমণ্ডিত হইয়া সাগরের উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল, এই তথ্যটা তাঁহাদিগকে জানান আবশ্যক নহে কি? ভাগীরথীর পশ্চিমে

বীরভূমে যে অশ্বর্ষের রাঙ্গামাটির অস্তিত্ব দেখিতে পাই, উত্তরবঙ্গে ও মহানন্দারের সঙ্গে যে রাঙ্গামাটি পুনরাব মাথা তুলিয়াছে, সেই রাঙ্গামাটির সহিত তত্ত্বপরি নিশ্চিন্ত গদ্যমুদ্রিকা-নির্মিত নিম্নবঙ্গের সম্পর্কের কথা নিঃসংশয়ে নির্ভারিত হইয়াছে কি? বাঁহারা ক্ষুদ্রতর অভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট এই সকলের এবং এই শ্রেণীর বিবিধ তত্ত্বের সমাধান পথের পথিক প্রত্যাশা করে। বাঙ্গালার মাটিতে এবং বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার গ্রামে ও বাঙ্গালার বনে, যে সকল পশুপাখী, মাংসপাখী, মশামাছি, পোকামাকড় আহার বিহার করিতেছে, তাঁহাদের বিশিষ্ট বিবরণের জ্ঞান, তাঁহাদের আহার-বিহারের প্রথা জানিবার জ্ঞান আমরা কি কেবল বিদেশী শিকারীর সুখপেক্ষা করিয়াই থাকিব? Asiatic Societyর প্রজ্ঞিকার এবং Indian Museumএর প্রকাশিত monograph-গুলির উৎকট বৈজ্ঞানিক ভাষার আশ্রয় ত্রি আমাদের মত অস্বাভিজ্ঞের পক্ষে বঙ্গদেশের তথ্য জানিবার কোন গতান্তর থাকিবে না? বাঙ্গালার দেশের জীবজন্তু আপন আপন অবস্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া কিরূপে জীবনযাত্রা নিরূপণ করে, কিরূপে পরস্পরকে জীবন-স্বখে হঠাইতে চাহে, কিরূপে বেড়াই এবং কি খায়, কিরূপে আততায়ীর প্রতি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করে, কিরূপে আকারে এবং আচরণে অন্য জীবের, এমন কি আততায়ীর, অশ্রুকের এবং নানা ছদ্মবেশের আবিষ্কার করিয়া, আততায়ীকে ঠকাইয়া আশ্রয়স্থান ব্যবস্থা করে, কিরূপে তাঁহারা সহস্র শত্রুর সন্নিধানে আপন বংশধারা রক্ষা করিবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করে, এই সকল তথ্য জানিবার জ্ঞান আমরা উৎকর্ষ হইয়া রাখি।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা কি মিটিবে না? বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার বায়ুমণ্ডে, আমাদের প্রত্যেকের গৃহকোণে, শয্যাতে, খাতিয়ে ভিত্তর, দেহের ভিতর, যে সকল জীবাণু অলক্ষিতে বাস করিয়া রক্তবীজের মত বর্ধিত হইতেছে, এবং কখনও বা আমাদের দেহ-রক্ষায় সৈনিকের কাণ্ড করিতেছে, কখনও বা মহামারী উৎপাদন করিয়া লোকশয় করিতেছে, তাঁহাদের আবিষ্কারের জ্ঞান, তাঁহাদের বিবরণের জ্ঞান, কি আমরা ভিতর-কালই হকরাবিন-নামা এবং রকারাবিন-নামা বিদেশী পণ্ডিতদেরই মুখের দিকে চাহিয়া রহিব? আশা করি, আমাদের এই সাহিত্য-সম্মিলনে আপনারা বর্ণে বর্ণে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর মধ্যে এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিবেন এবং আপনাদের আলোচনার ফল, অঙ্গসম্মানের ফল, গবেষণার ফল আমাদের মত অজ্ঞজনকে উপদেশ দিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রজ্ঞিকা আপনাদের অঙ্গসম্মান-ফল-প্রচারের ব্যবস্থা পাইলে গৌরবাযিত হইবে! আর আমার বক্তব্য

নাই। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই বৃন্দ-মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণে আমার অধিকার নাই। তাঁহাদিগকে কর্তব্য উপদেশের পৃষ্ঠতা আমার নাই। সে জ্ঞান আমি আপনাদের করণীভা উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি কেবল আমার নিবেদন জানাইতে, আমার প্রার্থনা জানাইতে, আমার ভিক্ষা জানাইতে, আপনাদের সমুদ্রে উপস্থিত। আমার শারীরিক এবং মানসিক দৌর্বল্য আপনাদের দর্শনলাভে, আপনাদের সহযোগিতা-লাভে, আপনাদের উপদেশ-লাভে আমাকে সমর্থ করিবে কি না, এখনও আমি তাহা জানি না। নিতান্তই বদ্ধজনের আগ্রহাভিলাষে আমি আপনাদের সময়েই অপব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমার বিনীত প্রার্থনা, আমার বিনীত ভিক্ষা যদি আপনাদের উন্নত জ্ঞানকে স্পর্শ করিয়া বাঙ্গালী-সাহিত্যের হিতসাধনে অবনত করে, তাহা হইলেই আমার এই চপলতা সাহিত্য-সম্মিলনের ভবিষ্যৎ-হিতব্রতলক্ষ্য কর্তৃক মার্জিত হইবে।

শ্রীমানেন্দ্রচন্দ্র ক্রিবেদী।

বিলাত-বাত্রা

‘ব্রাহ্মণ মহাশয়লনীতে’ যে বিচার ও সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা লইয়া জন কএক ব্যক্তি বড়ই উজ্জ্বল ব্যবহার করিতেছেন। এই উজ্জ্বল ব্যবহারের কএকটা কারণ আছে—১। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ২। তাঁহারা সম্বন্ধের স্থিতি ও উন্নতির মূলতত্ত্ব পর্য্যাপ্ত লোচনা করেন না। ৩। অভিমান

তাঁহাদের অত্যন্ত প্রবল।—অত্যাচার কার্য এক্ষেত্রে বলিবে না; এই ভিন্দীর আলোচনা করিব। এই বিচারের কালে মধ্যস্থপনের ঐকমত্যে যাঁহা নির্ণয় হইয়াছিল, আমি সত্যলোপ স্পষ্টাঙ্গের তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। অজ্ঞ তাঁহাই পুনরাবস্থাপন করিয়া বলিতেছি,—ব্রাহ্মণ যত কিছু পাইবে কখন না কেন,—তাঁহার জাতি ব্রাহ্মণ্য বিনষ্ট

হয় না। তাঁহার সন্ধ্যা করিবার অধিকার, বিঘ্ননাশ স্বরণে অধিকার, এবং আবাদি কার্যে অধিকার আমরম থাকিবে। ব্রাহ্মণ জাহাঙ্গে বসিয়া বিলাতে উপস্থিত হইয়া এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়াও ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিবেন। প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও পারিবেন। কিন্তু ঐ সকল কার্য্য করিবার যে নিয়ম আছে তাহা মানিতে হইবে।

চা বিষ্ণু ঠাইয়া সন্ধ্যা করা চলিবে না। অন্যাহারে যথাকালে পূতভাবে সন্ধ্যা করিতে হইবে,—এই টুকুই মিলনক্ষত্র। যিনি প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, সত্যই প্রায়শ্চিত্ত করিবেন,—তিনি নিশাপ হইয়া নিজের সকল প্রকার বৈধ কার্য্যই করিতে পারিবেন। পরন্তু যে পাপের জন্ত তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, পুনর্বার তাহা তাঁহার অকর্ষ্য। কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি সন্ধ্যা, নিত্য পূজা, পঞ্চমধ্যাহ্ন, দুর্গোৎসব, এ সমস্তই স্বয়ং নিকাহ করিতে পারিবেন। কিন্তু পুরোহিত দ্বারা দুর্গোৎসব করাইলে পুরোহিত পাপী হইবেন। সমাজ বহু প্রকার নিয়ন্ত্রণের ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত হইলেও বিশুদ্ধরূপে পরিচিত ব্রাহ্মণগণের সহিত তাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ, এক-পংক্তি-ভোজন, এবং যজ্ঞ, বাজ্ঞ সম্বন্ধ নাই।—সেইরূপ বিলাত প্রদেশে ব্রাহ্মণ-গণও ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত থাকিলেও অত্র ব্রাহ্মণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও পংক্তি-ভোজনাদির অধিকারী হইবেন না।

যিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই, তাহার গৃহের পায়ে ভোজন করিতে নাই। যিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহার গৃহের পায়ে ভোজন করা যায়। তবে ঐ পাত্র প্রায়শ্চিত্তের পরে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

যে সকল ক্রিয়, বৈজ্ঞ, এবং বৈজ্ঞের উপনয়ন সম্ভার পুরুষাধিক্রমে চলিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে এবং শূদ্রের পক্ষে নূন সিদ্ধান্ত কিছু করা হয় নাই, পূর্ণ নিশ্চিত সিদ্ধান্তই স্থির আছে। ঐ প্রকার সংশ্লিষ্ট যাবৎ প্রায়শ্চিত্ত না করিবেন, তাবৎ যান ও হরিষ্মরণে অধিকারী। দীক্ষিত শূদ্র তাস্কিক সমাধ্য অধিকারী। প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর—নিত্য পূজাদিতেও অধিকার হইবে। আমি সভায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছি,—“যত দিন কোন হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিবে, তত দিন তাহার যত পাপই হউক না, সে হিন্দু নামের যোগ্য থাকিবে।” ব্রাহ্মণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও তাহার ব্রাহ্মণত্ব অপনোত হয় না, সে ব্যক্তির সন্ধ্যা বন্দনাদিতে অধিকার যায় না, তবে বর্তমান ভাষ্যম্বারা তাহাকে হিন্দু বলিতে পারি না, এই মাত্র।

ব্রাহ্মণ, ক্রিয়, বৈজ্ঞ ও শূদ্র—তিন পুরুষ পণ্ডিত নিজের জাতির অধিকারী। উদাহরণ,—রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৃহীন হইলে, তাঁহার বিবাহিতা সর্বাঙ্গপত্নীর গর্ভজাত পুত্র—জি, সি, চ্যাটাজী, যদি কোন ঐ প্রকার মুখার্জী কন্ডাকে বিবাহ করেন, এবং তদীয় গর্ভজাত পুত্রের সর্বাঙ্গ গর্ভজাত পুত্র ভগবৎ রূপায় প্রণীতামহাদির পাগাচরণ বৃদ্ধিতে পারিবার অতুপাধিকরণে যথাস্থায় প্রায়শ্চিত্ত করেন, তবে তিনি উপবীত হইতে পারিবেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইবেন। কিন্তু বিনা প্রায়শ্চিত্তে চতুর্থ পুরুষ কাটিয়া যাইলে তখন তাহার অত্র জাতি হইবে। আর ব্রাহ্মণত্বের দাবী থাকিবে না।

শুধীন না হইয়া কেবল বিলাত গমন বা পুণে বসিয়া পুরুষাধিক্রমে বিলাতী অন্ন-ভোজনাদি স্থলেও এইরূপ ব্যবস্থা।

আমাদের জাতি কাঁচা রং নহে, পাকা ছিট, শত কলগ জড়নের জ্বলেও এ জাতি নষ্ট হয় না। কিন্তু যদি বিবাহে পোল হয়, তবে তাহার জাতি এক পুরুষেই নষ্ট হইয়া যায়। চট্টোপাধ্যায় যদি চট্টোপাধ্যায়ের কন্ডা বিবাহ করে; বা ভিন্ন জাতির কন্ডা বিবাহ করে, তাহা হইলে সে বংশ আর পিতৃপুরুষ জাতির অধিকারী হইবে না।

বাঁহারা এক্ষণে ১৫ ১৬ করিতেছেন,—এসব তব তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন না। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিলাত প্রত্যাগতাদি ব্রাহ্মণের পুত্র কন্ডাদি যদি পঞ্চম বংশের মধ্যে স্থানান্তরে রক্ষিত হয়, এবং অখ্যাত ভোজনাদি অত্র পাপ কার্য্য স্বং না করে, তাহা হইলে অত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই ব্রাহ্মণোচিত উপনয়নাদি সম্ভার লাভে অধিকারী হয়। যদি অকৃত প্রায়শ্চিত্ত বিলাত প্রত্যাগতের ঘরে বাবুজির অন্ন প্রচলিত না থাকে, পরন্তু ব্রাহ্মণের অন্ন, অপর জাতি হইলে অদ্ব্যতঃ স্বভাৱী অন্ন প্রচলিত থাকে এবং অভক্ষ্য মাংসাদি ব্যবহার না থাকে, তাহা হইলে তদীয় অদিক বয়স্ক পুত্র কন্ডাদিও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহার্য্য হইবে।

যদি পুত্র কন্ডাদি বাবুজি প্রভৃতির অন্ন ৪৮ বার জ্ঞান পূর্বক ভক্ষণ করে, তাহা হইলে আর ব্যবহার্য্য হইবে না। কৃত প্রায়শ্চিত্ত অব্যবহার্য্যের পুত্রকন্ডাদিও প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্য যোগ্য। ইহা আমার মত। বিলাত প্রত্যাগতের পুত্র কন্ডাও অব্যবহার্য্য, একথাও কেহ কেহ বলেন বটে, কিন্তু তাহা সমাজীক বসিয়া আমরা অনেকই মনে করি না। সতীত্ব বৎসরে স্মিলনীয় বিলাত প্রত্যাগত বহু ব্যক্তিই সমাজে যীমায়া প্রকাশিত হয় নাই; আলোচনার্থ স্থগিত আছে।

এই সকল শুভ জ্ঞাত না হওয়াতে প্রতিকূল আন্দোলন অস্বাভাবিক উচ্ছ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা আন্দোলনকারীদের প্রশংসার কথা নহে।

২য় কারণ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তব্য এই,—যে সমাজে জ্ঞানপুত্র দারিদ্র্যের আধিপত্য নাই, গর্ভস্থিত ধনেরই আধিপত্য—সে সমাজ নিত্য বিপন্ন বিভীষিকায় বিভ্রস্ত, যে সমাজ তাগের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ভোজের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সমাজের উজ্জলতা সৌদামিনী ক্ষুরণের স্রায় ক্ষণিক। যে সমাজের মধ্যস্থল সত্যধর্মের অমৃত ধারা নাই, বিলাসের গরল ধারা প্রবাহিত, সে সমাজের গতন অশস্ত্রস্বামী। যে সমাজে জাতীভেদের—জাতিগত বিশেষত্বের উদ্বোধনা নাই, বিজাতীয় অহঙ্করণ প্রবলতা আছে, সে সমাজের মৃত্যু আশংক্য, ইহাই সমাজতত্ত্ব।

আমাদের সমাজ সনাতন। ধনের গরিমা, ভোগের আতিশয়া, বিলাসের প্রতিভা এ সমাজে ছিল না, এমনও সমাজের মেধাও এ সব বিষয় উপস্থিত হয় নাই। তবে দূর হইতে আপনার প্রভাব কিছু কিছু বিস্তার করিতেছে। এ সময়ে বাবধান না হইলে সমাজের সমস্ত অংশই অভিকৃত হইবে। এই বিবেচনা করিয়া আশ্চর্য্যকার জগ্গই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও আচারপুত্র অত্র ব্রাহ্মণবৃন্দ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট হইতে মানকুম, মেদিনীপুর হইতে মত। বিলাত প্রত্যাগতের পুত্র কন্ডাও অব্যবহার্য্য, একথাও কেহ কেহ বলেন বটে, কিন্তু তাহা সমাজীক বসিয়া আমরা অনেকই মনে করি না। সতীত্ব বৎসরে স্মিলনীয় বিলাত প্রত্যাগত বহু ব্যক্তিই সমাজে যীমায়া প্রকাশিত হয় নাই; আলোচনার্থ স্থগিত আছে।

সার শত্রু পরিত্যাগ করিয়া খোশা ভূমি লইয়া।
সি সমাজ ভাঙার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে? এ
প্রশ্নই যে কাহারও মনে হয় নাই তাহা নহে;
কিন্তু বাহারা মনোযী, তাহারা চিন্তা করিয়া
দেখিয়াছেন,—“বিলাতী পরিত্যাগই সমাজের
মঙ্গল। সমস্ত ঘেহের মধ্যে বাহার করণরূপই
অমর, পল্লবকমনীয় সেই করণরূপের চম্পক-
কলিকামিত অঙ্গুলিতে হীরকাসুতীরের অশ্রু
হুয়া। সেই অঙ্গুলি যদি সর্পগঠ হয়, প্রাণের
মতাবশেষ সেই কর-পল্লব-কাস্তিকামল
অঙ্গুলিকেও ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হয়,
সমাজের প্রাণের জন্তই—সমাজের এই
সুশোভন “বিলাতী” অংশ সম্ভবতঃ পরিহার-
নীয়। ইহা ঠিক অঙ্গুলিচ্ছেদ নহে। বিষদৃষ্ট
অঙ্গ ও অঙ্গ ছেদের পরম্পর শোণিত প্রবাহ
কল্পকরিবার জন্ত মধ্যে দুটরন্ধন মাত্র প্রদত্ত
হইয়াছে। বিষদৃষ্ট অঙ্গে রক্তমোক্ষণে যদ
বিষ দূরীভূত হয়, তখন বন্ধন শিথিল হইবে।
আমাদের সমাজে যে ধনের, ভোগের, ও
বিলাসের প্রচেষ্টা বাড়িতেছে, বিলাত গমনে
তাহার পূর্ণ পরিচয়। বিলাতী গ্রহণে
তাহার পরাকাষ্ঠা। দেশের মঙ্গলের জন্ত
কেহই বিলাতে গমন করেন না, অধিকতর
অর্থোপার্জননের জন্তই বিলাতে গমন করিয়া
ধাকেন। বিলাত প্রত্যাপত্তগণ অর্জিত অর্থের
বিনিময়ে বিলাসভোগে প্রাধান্য। জাতীয়
নীতিবিনী বিলাসিনী। ইহাদের সংশ্রব—দুগ্ধ
বর্জিত সঙ্গর্গ দেশে যত বাড়িবে ততই
দেশের অমঙ্গল। এই দরিদ্র গৃহে আমাদের
কুলান্নানাগণ প্রভৃৎ হইতে হইয়া দিগন্তের
পর্যন্ত সহ্যাত বরেন গৃহকার্যে ব্যাপৃত;
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহিনী ও পুত্রবধূগণ এ
ভূমিধনে অমরপূর্ণির ত্রায় জাহ্নবির অম
প্রাধনে নিমুক্ত। নিজের অনাধারজনিত

শ্রমে দুর্গত নাই, ভূষণের পারিপাট্যে
লক্ষ্যনাই, চিরসংসার সমুদ্রে কর্তব্যসামর্থ্যতা
উদাহরণকে সমস্ত উপভোগ হইতে এখনও
অধিকাংশ পত্নীসমাজে রক্ষা করিতেছে।
কিন্তু যদি তাহারই সহোদরা বিলাত
প্রত্যাপত্তের সহধর্ম্যচারিণী হন এবং সেই
বিলাসসমুদ্রজিৎ বিলাতী পরিবারের সহিত
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহধর্ম্যচারিণী অবশ্যে সংসৃষ্ট
হন, তাহার জন্মে কি বিলাসের অতুল্যকামনা
জন্মিয়া উঠিবে না?

সাধারণতঃ বিলাতী ধনীরা সংসর্গহেতু যে
সমাজ বিষমুদিত হইতেছে, সেই সমাজে
বিত্যস্তধনীর প্রবাহ—খাল কাটিয়া প্রবেশ
করাইতে বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত
নহে। দরিদ্র দেশ বিলাসে অধিকতর দরিদ্র
হয়। আমদের সমাজের বর্তমান দৃষ্টি
ধনিগণের ধন সমাজের নানা অংশে বিকীর্ণ
হয়। পুত্রা, পার্শ্ব, শ্রান্ত, বিবাহ, সমস্ত
কাহারই সমাজপোষক। কিন্তু অর্থাৎ বিলাত
যাত্রা প্রচলিত হইলে এ সকল ধনীর গতি
কোনদিকে হইবে, তাহা বুদ্ধিমানের চিন্তনীয়।
তাঁহারা কোথুহল নিবারণার্থ ধলে ধলে
বিলাত যাইবেন, তাঁহারা “বহুমুখবিক্রম”
পতঙ্গের ত্রায় বিলাসের অনলে আত্মসমর্পণ
করিবেন, তাহার ফলে তাঁহারা দক্ষসমর্থ
হইবেন। কাহার ধন সমাজে বিকীর্ণ
হইবে?

আর বাঁহারা বিলাত প্রত্যাপত্ত, তাঁহাদের
ধনের ব্যাপ্তি যতই থাকুক, ধন অতি অল্প
কোরেবই থাকে। অর্জন প্রচুর হইলেও
বিলাতী হোটেলের খরচে, বিলাতী বিলাস
সামগ্রীর সংগ্রহে সমস্তই নিবেশিত।
তাঁহাদের অর্থ উপার্জন অধিকাংশ স্থলে
দেশীয় জমীদার বর্গের অর্থ শোষণযাত্রা

হইয়া থাকে। ইহাদের অনেক স্থলে
জমীদার নিমেষ। তাঁহারা শৈতৃক সময়ে
সমুদ্রতঃ। সমাজ তাঁহাদের ধনাগর্য পু-
ষ্টির সুযোগ লাভে ব্যস্ত। আর সেই
ধন ব্যারিটারদের হস্তগত হইয়া হোটেল-
ওখানে প্রকৃতি বিদেশীয় বিনিকৃপণের ভাঙার
পূর্ণ করিতেছে। বিলাতীয় অবাধ সংস্রব
হইলে এই যে অর্থের অপচয়, তাহার মাত্রা
শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। সমাজের পুত্র ধনীর
অভিষেক উদ্বিগ্ন পাইবে। সমগ্র বা সদাচারী
হিন্দুসমাজের বিশেষতঃ, ইহা বিদূষ হইলেই
হিন্দু জাতির উচ্ছেদ অবশ্যজারী। বাঁহারা
বিলাতী চালাইতে চাহেন, তাঁহাদের অদূর-
দর্শিতা জাতীয় জীবনের উচ্ছেদে অগ্রসর;
জাতীয় জীবনের কিস্কিন্দ্র্যও অঙ্গুল নহে,
কেবল বিলাত প্রত্যাপত্ত-সংসর্গেই যে সমাজে
বিলাসযোগ্য পুত্র পাইতেছে বা পাইবে, তাহা
নহে; অজ কারণও আছে, সে কারণ দূর
করিতে সময় লাগিবে। আজ “বলবন্ত
চিকিৎসায়” নীতির অঙ্গসঙ্গ করিয়া
বহুরোগ-নিপীড়িত যুগ্মের একটা প্রধান
আগন্তুক রোগ নিবারণার্থ বিলাতী পরিহার
বায়বা। “এ সময়ে অজ রোগও আছে,
তাঁহার প্রতিকার জন্তই বিলাত হইতেছে?”
একটি আপত্তি করিলে চিকিৎসা করা হয় না।

যদি আবার পুত্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের
কথায় সমাজ ধনাগর্য বিলাতীগণকে উপেক্ষা
করিতে পারে, তখন অজ রোগের চিকিৎসা
করা চলিবে, নচেৎ কোন চিকিৎসা হইবে
না। পণপ্রথা রহিত করিবার জন্ত বাঁহারা
যত্নশীল, তাঁহারাও এই সব তত্ত্ব বুঝিতে
পারেন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়।
সমাজে ধনের অধিকা থাকিবে, বিলাসের
আত্মশযা থাকিবে, সমাজের থাকিবে না;

কতিপয় ব্যক্তির জন্ত শাস্ত্র উপেক্ষিত হইবে,
ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বায়বা অনাদৃত হইবে, আবার
পণপ্রথাও রহিত হইবে, ইহা কি কখন হয়?
তোমার স্বযোগ আছে, তুমি অজ উপায়ে
অর্জন করিতে পার, আমার যদি অজ উপায়
না থাকে, তবে আমি পুত্রের বিবাহ দিয়া
ধন অর্জন না করিব কেন? ধনী বখন
আগাধা, ধনের জন্ত যখন তুমি সকল কাহারই
করিতে পার, তখন আমি পুত্রের পিতা, পণ
ছাড়িব কেন? পরের কল্যাণ আশ্রয়তা কক্ষক,
পর ভ্রাতৃসমূহাও হউক, তাহাতে আমার
কি? ধন না হইলে আমার যে অস্তিত্ব যায়!
আমার ধন চাই, কাজেই আমি ধন লইব।
তুমি ধনী, তুমি পণ না চাহিলেও তোমার
সমাজে ধনী তোমাকে পণ দিবে, তোমার
অস্তিত্ব হইল না; আর আমি দরিদ্র, আমার
সমাজে ধনী দরিদ্র, নিপীড়িত না হইয়া পণ
দিতে পাবে না, তাকি করিব, আমার ধন
চাই, কাজেই পণ লইব, দরিদ্র নিপীড়ন
করিব। তোমার কথা নিবি কেন? এই
“আপনি কিন্তু পণীয়াগিত হইবে?”

এই সকল ভাবিতা চিন্তা সমাজতত্ত্ববিদ
মনবিদগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,
দেশের চিন্তাশীল যুবকগণকে তাহা চিন্তা
করিতে অহরোহ করি।
সমাজে যে অংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রকৃষ,
তাঁহা সমাজের মেরুদণ্ড,—সেখানে এখনও
বিলাসের প্রাভুত্বই তেমন হয় নাই। দিন
ধাকিতে সাবধান হইলে সেই অংশ অবলগ্ন
করিয়া সমাজের মঙ্গলরূপ হইতে পারে।
সকলেই যদি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বায়বা
শিরোধার্য করেন; তাহা হইলে পণ প্রথা
উন্মূল্যনে বেগ পাইতে হইবে না, নতুবা
নিম্নলিখিত আশঙ্কা বিস্তার আছে।

যাহারা বিলাত প্রত্যাপ্ত, তাঁহাদের মধ্যে যিনি কেহ চিন্তাশীল থাকেন, তিনি ভাবিয়া সমাজের অব্যবহার্য্যতা তাঁহার কর্তব্য বিনষ্ট হয় না, হিন্দু সমাজে অনেক অব্যবহার্য্য জাতি আছে, তাঁহারাও সমাজসেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিঃসার্থ সেবাগুণে হিন্দু সমাজ হরক্ষিত। বিলাতপ্রত্যাপ্ত হিন্দু যদি হিন্দুধর্মের বন্ধা সম্ভব গভীর মধ্যে থাকিয়া হোটেলে বাবুজি ইত্যাদি দামে, সর্বণী বিলাহ বজায় রাখেন, সমাজের সাধারণ কার্য্যে যোগদান করেন, এবং সম্ভারের রক্ষার বিরুদ্ধে অত্যাখিত না হইয়া সম্ভারের রক্ষার অহঙ্কৃত যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্ভার সন্ততির কালে পরিস্ফুট হইবেই। বিপরীত আচরণে বিপরীত ফল অবশ্যস্বাভাব্য। আত্ম বাঙ্গালায় যে অর্দ্ধাংশ মুসলমান, তাঁহার অনেক ভাগই হিন্দুর বংশধর। ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘারা যেমন হিন্দুজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না, সেইরূপ সম্ভারসংরক্ষণবিষয়ে হিন্দু সম্ভারের অস্তিত্ব বৃদ্ধি ঘারাও হিন্দুজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না, সেইরূপ সম্ভারচোর সংখ্যাবৃদ্ধি হিন্দুসম্ভারের অস্তিত্ব বৃদ্ধি ঘারাও হিন্দু সমাজের পুষ্টি হয় না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিশেষ চিন্তনীয়। ফলতঃ দারিদ্র্যের প্রতিষ্ঠা, বিলাতের গতিবোধ, তাঁদের শোষণতা, সংঘের পূজা, 'বিলাতীবর্জন' ব্যবস্থার মুখ্য উপেক্ষা।

তৃতীয় কারণ—অভিমান।

কয়েকজন ব্যক্তির অভিমান এতই প্রবল যে তাঁহারা মনে করেন, আমরাই দেশের হকী, কর্তা, বিপাত। তাঁহারা অহুগ্রহ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে দেশনায়ক বলিয়াছিলেন, এমনও পণ্ডপ্রাণনিবারণে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের

নেতৃত্ব স্বীকার করিতেছেন, আর আজ তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটা মত প্রদান করিয়াছেন বলিয়া সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকেই দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, এইরূপ অসমর্থ ব্যবহার যে তাঁহাদের খোর অভিমানমূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, সমাজে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা অতি অল্প। তাহারা স্বদেশীর প্রভাবে যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, তাহার অভিমানে যেমনিই অল্প হইয়া পড়িয়াছেন সে জগৎঘরে তাহা পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত। আমাদের বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ দুইদিকের স্বয়ং নিরম হইয়াও যে অল্পদান ও বিদ্যাদানের আদর্শ দেখাইতেছেন, যে ভ্যাগের পরিত্যক্ত প্রদান করিতেছেন, সমগ্র পৃথিবীতেও তাহার তুলনা অতি বিরল।

অভিমানবশে এই অতুলনীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপেক্ষা, শাস্ত্র ব্যবহার উপেক্ষা, জাতীয়ত্বের অবগামলক্ষণমাত্র। বিলাত যাত্রার ঋয় উপনয়ন সম্ভার বিরহিত জাতির উপনয়ন এই অভিমানের লক্ষণ পরিস্ফুট। মাসাশৌচ স্থলে ঋয়শাস্ত্র প্রভৃতি অশৌচ গ্রহণ—ইহা অভিমানবশে শাস্ত্র অম্যাক করিবাই একটা প্রকট নিদর্শন। এই অভিমানে কপটতা মিশিয়াছে; অন্তরে আছে, শাস্ত্র কিছু নহে, 'দলবীধা' মাত্র। অথচ শাস্ত্রের দোহাই কোন মতে বিয়া নিজ অভিমান বৃত্তি চরিত্যস্ত করা কি কপটতা নহে? যদি যথার্থ উন্নতির ইচ্ছা থাকে, কপটতা ত্যাগ করিতে হইবে। শরীরকে বর্খাস্ত না করিয়া দ্বন্দ্বের বর্ধ পরিধান করিতে হইবে। চরিত্রের উৎকর্ষে 'ব্রাহ্মণ্য' 'কস্তুর' বা 'বৈজ্ঞ' যাহা ইচ্ছা তাহাই পাইতে পারিবে। সে উৎকর্ষের গুণে স্বজাতীয়

না হইয়াও—সমাজের আদর্শ হইতে পারিবে। এ জন্মে স্বত্ব নাই। আকর্ষণ-বিরুদ্ধে কোনই ফল নাই। সমাজের মঙ্গল করিতে চাহ, ত—চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন কর। কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিও না।

যে বিলাতপ্রত্যাপ্ত ব্যক্তি 'অভ্যাস' ভঞ্জে পাপ মনে করেন না, তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত কি কপটতা নহে? যাহারা পাপ মনে করেন, তাঁহার কি পাপ নিগূহিত করা যাহা যাহা করিতে হয়, যথার্থ তাহাই করিয়া থাকেন? যদি না করেন,—তবে সেই প্রায়শ্চিত্তের আবরণ কি কপটতা নহে? শত কপটতা সমাজে থাকিতে পারে, তাহার নিরাকরণে সচেষ্ট হওয়া উচিত, কিন্তু তাহার দূরীকরণে নূতন কপটতার প্রশ্রয় দেওয়া কদাচ উচিত নহে।

অভিমান—অতি বড়, আমার সমাজ মূর্খ—ইহার মধ্যে আমি বড় এই যে ম্পর্ধা—ইহা হইতেই সদম্ভ বিবেচনা বিলুপ্ত হইতেছে। সমাজের মঙ্গল করিতে হইলে—সমাজের সেবক হইতে হয়, ব্যক্তিগত অভিমান বিসর্জন দিতে হয়। ব্রাহ্মণ যদি প্রাধাত্য অভিমানে সকল ভূখণ্ড করেন, তাহা হইলে তিনি যেমন সমাজের শত্রু, অজ্ঞ জাতি বা ব্যক্তিও সেইরূপ অজ্ঞ কোন প্রকার প্রাধাত্য অভিমানে শাস্ত্রাংশে বা শাস্ত্রপ্রচারকে উপেক্ষা করিয়া যথেষ্টচার্য্য হইলেও তাহারা বা তিনিও সমাজের শত্রু, সমাজের সেবক বা মঙ্গল বিধায়ক নহেন।

অভিমানের নানা মুষ্টি আছে,—প্রাধাত্যের অভিমান অনেক সময়ে কর্তব্য পথে পরিচালিত করে। বলা বাহুল্য সে অভিমান আমাদের দোষাবৎ নহে। যে অভিমান স্বার্থভ্যাগে বিরোধী, যাহার সংঘর্ষজ্ঞ নাই, যাহার নিকট সম্মতিই ভূজ, সেই অভিমানই

আমাদের সমাজজ্ঞ কয়েক ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করিয়া সমাজধর্মে গরল সঞ্চার করিতেছে। এক্ষণে দূরভিমান পরিহার না করিলে সমাজের মঙ্গল নাই। দেশ, কাল পাতি অহুগ্রহের ধর্মের পরিবর্তনের যে একটা দুখা উঠিয়াছে, উহা কি যথেষ্টচার্য্যের নামান্তর নহে? দূরভিমানসম্পন্ন কতিপয় উচ্ছল ব্যক্তি যাহা হুবিধা মনে করেন, তাহাই ধর্ম গ্রহণ করিবে তাহা কি উহাতে নিহিত নাই? যাহা প্রকৃতির প্রতিকূল অথচ প্রকৃত মঙ্গলকর, যাহা প্রেয় নহে, কিন্তু শ্রেয়, তাহা কয়জন মানিতে চাহে? (দেশকাল পার অহুগ্রহের শাস্ত্রের যে পরিবর্তন ঘটয়াছে তাহা সংঘের দিকে, সঙ্ঘাচের দিকে, কদাপি উচ্ছলতার দিকে পরিবর্তিত হয় নাই।)

“যে সমর্থব্যক্তি স্বীয় গ্রামে বা জলকটময় স্থানান্তরে জলাশয় খনন না করাইবেন, জল নিকাশের ব্যবস্থা না করাইবেন, এবং নিজ গ্রামের সম্ভারের রক্ষণ জ্ঞাত যত্ন না করিবেন, তিনি পণ্ডিত হইবেন।”

“যে ভূস্বামী নিম্নপঞ্জীকৃত পরিচয়্যাপ্ত করিয়া নগর আশ্রয় করিবেন, তিনি পণ্ডিত হইবেন।”

“যে ভূস্বামী আপনার ভূসম্পত্তির কিয়ংশ স্বীয় কৃষিকণ্ঠে নিয়োজিত না রাখিবেন, ভারতবর্ষের অন্তর্গত নিরম প্রজা সমগ্র করিয়া সেই সকল ভূখণ্ডের কৃষিকণ্ঠ না করাইবেন, তিনি পণ্ডিত হইবেন।”

“যিনি কদা বিজয় করিবেন, বা পুঞ্জের বিবাহে পণ গ্রহণ করিবেন, তিনি পণ্ডিত হইবেন।”

“যে কৃষিকণ্ঠী আপনার উৎপাদিত শস্যের প্রয়োজনমত অংশ সঞ্চিত না রাখিয়া অর্গলাভে বিক্রয় করিবেন, তিনি সমাজে পণ্ডিত হইবেন।”

“যে জুহুমী গোচারপুঙ্খমির স্বাব্যবস্থা না করিবেন, তিনি এবং সমর্থ যে প্রজা অন্ততঃ একটা গাভীর ও পালন না করিবেন, যে হিন্দু গোখাতকের হস্তে গোবিক্রয় করিবে, তাহার সকলের অনালাপা হইবে।”

ইত্যাদি নিয়ম বা সমর্থোগ্যুক্ত ধর্ম, প্রচারিত হইলে কখন মানিতে প্রস্তুত আছে?

অতএব দেখা যাইতেছে, দুর্ভিক্ষমানবশে ধর্মী স্বেচ্ছাচার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানিয়া লউন, তাহাই পরম ধর্ম বলিয়া স্বীকার করুন। তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নেতা, নতুবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপসর্গ্য। ইহাই এখনকার দুর্ভিক্ষানী স্বয়ংসিদ্ধ নেতৃবৃন্দের মূলমন্ত্র।

চিন্তাশীল যুবকগণকে পুনর্মীর আহ্বান করিয়া বলিতেছি—চিন্তা কর, সমাজের বিপ্লব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হও। ধনের প্রাধান্য, বিলাসের প্রকৃতি, ভোগের আধিপত্য দূর করিয়া দারিদ্র্যের, সংযমের, এবং ত্যাগের শরণাপন্ন হও। জাতীয় বিশেষ্য অঙ্গুরাণিতে বহু কর। তোমারাই জগৎগুরু হইবে, সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্ত যদি কেহ অসংলোভলি দিতে প্রস্তুত থাকেন, বিজ্ঞান-সঙ্গত শিল্প বাণিজ্যের শিক্ষার অভাবে দেশের যে দুঃপ, দারিদ্র্য তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে আপনার নরকচূর্ণ গণনা না করিয়া শিক্ষার জন্ত দীপান্তরে গমন করেন, তিনি আমাদের অশ্রদ্ধেয়; কিন্তু মুখের কথায় তাহার স্বার্থ-ত্যাগের পরিচয় প্রদান করিলে চলিবে না। তিনি সমাজকে দান করিবেন, প্রতিপান লইবেন না; উপকার করিবেন, প্রত্যুপকার-এধেনে পরাশ্রুত হইবেন, অখীত বিভা বিনা

বেতনে শিক্ষা প্রদান করিবেন, তিনি চির-কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া এই শিক্ষা বিস্তার করিবেন—এরূপ ত্যাগের আবির্ভাব বাঞ্ছনীয়। ত্যাগী পুরুষ অতীত আপত্তির বাহ্যিক ভোজনে বাধ্য করিবার জন্ত ব্যগ্র হইন না; তিনি আপনার স্বার্থ ত্যাগেই পরিতুষ্ট। ক্ষুদ্র বার্থে তাহার ক্ষমতা ব্যাকুল হয় না।

পরমত্যাগী পিতা কষ্টার অন্ন ভোজন করিয়া না বলিয়া যদি কি পিতৃ সৎসার্য বিমুখ হয়, না পিতার ব্রতভঙ্গে ব্যাঘ্রল, ব্যাপুণ্ডা হয়! না, তাহা কখনই হয় না। অল্পগনীর পুত্রের স্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণ-পিতা ভোজন করেন না বলিয়া পুত্র অভিমান করে না। হিন্দুর এইরূপ মজ্ঞাগত শিক্ষা অনেক আছে। যাহারা এই মজ্ঞাগত শিক্ষা বিপ্লবনে দেন নাই, শাস্ত্রবিধায়া যাহাদের আছে, চিরকৌমার ব্রত রক্ষণ সমর্থ—তাদুপ ভীতুদীপসম্পন্ন আচার-রক্ষায় যত্ববান পুরুষ শিক্ষার জন্ত দীপান্তরে গমনে অধিকারী। তাহার এই দীপান্তর-গমন—পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে চল হওয়া যাইবে, এই আশায় নিজের ‘স্বার্থোপকরণ-সংগ্রহের জন্ত নহে, দেশের মঙ্গলের জন্ত যুদ্ধিতিরের দ্বার স্বীয় নরকের বিনিময়ে মায়ানরকস্থা জাত্যগণের দুঃখবিমোচন জন্ত। এরূপ ত্যাগী ও ত্যাগের প্রতিষ্ঠা সমাজের মঙ্গলাবহ।

তাহারা আদিম মুক্তকণ্ঠে বলিবেন—ভাই সকল! তোমাদের মঙ্গলের জন্ত এই বিদ্যা আনিয়াছি, “নীচাদপুণ্ডিত্যম বিদ্যাং” বলিয়া ইহা গ্রহণ কর। এই বিদ্যাগ্রভাবে তোমরা স্মারিকসমুদ্র হও, ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা, আমার অন্ন দুই মুঠা গ্রহণ কর, একামনা আমি করিব না। এরূপ ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন হইয়াছে। এমন কেহ

ধাক, যাও আপত্তি করিব না, কেননা তুমি একপ্রকার সমাদৌ, তুমি স্বাব্যবহারিরপেক সমাজ-সেবক, তোমার কাজ পরিচা স্বাধরণ লোভী পুরুষ যদি দীপান্তরে যায়, সে ভণ্ড, সমাজ তাহার নিকট কোন উপকার আশা করিতে পারে না, বরং তাহার নিকট সমাজ অপকার পাইবে। তাহাই পাইয়া থাকে। ইহা সূর্কেই আলোচিত হইয়াছে। তবে তাহার যদি ভারতের বহির্ভাগে নিজ নিজ কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করিতে পারেন, তাহা অর্থশাস্ত্রাত্মক প্রকৃষ্ট এই মাত্র।

এরূপবান্ধব উপদায় ব্যবস্থায় আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি গলদকলোচনে কেবল পাপকন্ডের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাকে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। কিন্তু বিশিষ্ট অধিকারী ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও সাধারণে পাইতে পারে না।

সমুদ্রযাত্রা, দীপান্তরে গমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণে কি তাহার পাপ মানে যে প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী হইবে? যদি পাপ মানিত, যদি নরকে বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে কখনই সকল কার্য করিত?

বল দেখি সত্যবাদী যুবক! বুকে হাত দিয়া বল, কোন বিলাত-প্রভায়াগত ব্যক্তি পাপ, পুণ্য, শাস্তিসিদ্ধান্তে বিশ্বাস করেন? যদি না করেন ত তুমি কেন কপটতার প্রদ্রব্য দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তের সমর্থন করিবে!

যদি কখন সমাজ আপনাকে চিনিতে পারে, আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়, তখন অলোভবিক্ত শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ সমাজের মঙ্গলকর উপদেশ মুক্তকণ্ঠেই প্রদান করিবেন। সে মঙ্গল কি? সে উপদেশ কি? তাহা এক্ষণে চিন্তা করিবারও সময় হয় নাই।

অতএব আমি দুঃচিন্তে বলিতে পারি—যাহারা বিলাত-প্রভায়াগতের ব্যবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তাহার সমাজের ঘোর অহিতকারী। কি পরিতাপের বিষয়! ব্যবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন, জন্ত অনায়াসে সন্তোষ অপলাপ করিতেছে, অথচ লজ্জিত হইতেছে না!

আর বলিব না। অজ্ঞ এই বান্দেই শেষ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

নিগোঁজাতির কর্মবার

হুতীয়া অধ্যাক্ষ

বিদ্যার্জনে কাটন প্রয়াস

কল্লার বাধে কাঁজ করিতেছি, এমন সময়ে একদিন দুইজন কুলীর কথাবার্তা শুনিতে গাইলাম। ইঙ্গিতে বুলিলাম ভাঙ্কিনিয়া গ্রন্থেশের কোন স্থানে একটা বড় রকমের নিগোঁজাতিয়া আছে। আমার নিজের পল্লীর

পাঠশালা অপেক্ষা বড় বুল-কলেজের কথা ইহার পূর্বে আর শুনি নাই।

আমার আগ্রহ বাড়িল। বনির অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়া লোক দুইটির নিকটবর্তী হইলাম। তাহার বলাবলি

করিতেছে যে, ভাঙ্চিনিয়ার এই বিদ্যালয়টি নিগোষ্ঠদের জাতীয় বিদ্যালয়। নিগোষ্ঠা ছাড়া আর কেহ এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পায় না। গরিব নিগোষ্ঠা সন্তানদের জন্ম বিশেষ হুবিধাও আছে। বাহারা বাপ-মার নিকট হইতে টাকা-পয়সা আনিতে অসমর্থ, তাহারাও লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পায়। এক্ষণ নির্ঘন ছাত্রেরা বাটীয়া পয়সা রোজগার করে। পরিশ্রম করিতে পারিলে যে কোন বারওই যথেষ্ট উপার্জন করিয়া নিজের ভরণ-পোষণের বরচ নিজেই ভোগাইতে পারে। বিদ্যালয়ের কর্তার একজন একটা নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাহারা সকল ছাত্রকে অন্ত্যস্ত বিষয় শিখাইবার সময়েদেই দুটা একটা কৃষি-শিল্পকর্ম বা ব্যবসায়ও শিখাইয়া থাকেন। এই সুযোগেও ছাত্রেরা নিজের বরচ নিজেই চালাইয়া লয়। অধিকন্তু ভবিষ্যতের জন্তও তাহাদের অর্থ-সংস্থানের উপায় জানা হইয়া থাকে।

এই বিদ্যালয়ের নাম “শিক্ষক ও শিল্প-বিদ্যালয়”। ভাঙ্চিনিয়ার হ্যাপটন নগরে ইহা অবস্থিত।

আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলাম আমি এই পাঠশালায় ভর্তি হইব। আমার পক্ষে উহা অপেক্ষা হুবিধার স্থান আর কি হইতে পারে? নিজে বরচ চালাইয়া লইব। স্বতরাং অভিভাবকের আপত্তি থাকিবে কেন?

আমি হ্যাপটনের নাম জপিতে লাগিলাম। হ্যাপটন কোথায়, আমার ম্যান্ডেন হইতে কোন্ দিকে বা কতদূর আমি কিছুই জানি না। দিবারাত্রি শু শুই বিষমভায়ের ধ্যান করিতে লাগিলাম। আমার মনে আর কোন চিন্তা আসিল না।

কয়লার খনিতে আরও কিছুকাল থাক

করিলাম। এই সময়ে একটা নূতন চাকরীর সম্ভান পাইলাম। আমাদের এই খনি এবং খনির কল একজনেরই সম্পত্তি ছিল, তাহার নাম জেনারেল লুইস রাকনার। রাকনার-পত্নী বড় কড়া মেজাজের মনিব ছিলেন। তাহার চাকর কেহই টিকিত না। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই সকলে পলাইয়া আসিত। সেখিলাম কয়লার খনিতে কাজ করা অপেক্ষা একটা পরিবারের চাকর হওয়া শতগুণ ভাল। আমি চেষ্টা করিয়া ১২ টাকা মাসিক বেতনে রাকনার-পত্নীর ভৃত্য নিযুক্ত হইলাম।

রাকনার-পত্নীর নিকটে ঘাইতে প্রথম প্রথম আমার বড় ভয় হইত, আমি কাঁপিতে থাকিতাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মনিবের ‘রান’ বুঝিয়া লইলাম। তাহার বাপের বাড়ী ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববিখ্যাত বিভাগ নিউ-ইংলণ্ড প্রদেশে। সে অঞ্চলের লোকবিশিষ্ট “ইয়াকি” বলে। ইয়াকিরা আমেরিকার কিছু “চালে” চলে। তাহাদের দেখিখা ভনিয়াই যুক্তরাষ্ট্রের অন্ত্যস্ত বিভাগের লোকেরা কারুকাঁচান, চাল-চালনা ইত্যাদি শিখিয়া থাকেন। কাজেই ইহাদের মন ভোগাইয়া কাজ করা যে-সে চাকরের সাধ্য নয়। রাকনার-পত্নী সকল বিষয়ে পরিহার-পরিজ্ঞহতা ভাল বাসিতেন। সময়-নিষ্ঠাও তাহার মধ্যে বড় গুণ ছিল, তাহার লোক-জনের মধ্যে এই গুণের অভাব দেখিলে তিনি চটিয়া যাইতেন। বাড়ী-ঘর, টেবিল-চেয়ার, থালাবাটী সবই স্বাচ্ছন্দ্য-ফিট-ফাট চাই। তাহার নিকট পান হইতে চুঁ পবিবার জো নাই। অধিকন্তু কুঁড়িমে এবং ঠাকি দিবার প্রবৃত্তিও তিনি দেখিতে পারিতেন না। কাজেই নিয়মিতরূপে খণখণার যাঁহা কর্তব্য

টিক তাহা করিলে দাসদাসীরা তাহার আদর পাইত।

তাঁহার নিকট আমি প্রায় দেড় বৎসর চাকরী করিলাম। এই মনিবের পরিবারে থাকিয়া আমার খুব উপকার হইয়াছে। এখানে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা অন্ত্যস্ত স্থানবিশিষ্ট অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নয়। এখানে চাকরী করিতে করিতেই অনেক দিকে আমার চরিত্র গঠিত হইয়াছে। আমি আজ কাল পত্নী বা সহরের কোনস্থানে মঘিলা জমা দেখিলে তৎক্ষণাৎ নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া ফেলি। ঘরের কোন কোণে ছেঁড়া কাগজ বা মুকুড়া থাকিলে তাহা আমার নিকট বিষয় বোধ হয়। ঘরের বা বাড়ীর বেড়া নড়িয়া বা ভাঙিয়া গেলে তাহা মেয়ামত করিবার জন্ম এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করি না। কাপড় জামা ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে আমি সর্বদাই মনোযোগী। এই সকল সদগুণ আমি রাকনার-পত্নীর নিকট চাকরী করিয়াই লাভ করিয়াছি। সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা-জ্ঞান, স্বাধারক্ষার নিয়মপালন, এবং বৃখনকার যা টিক তখন তাহা করা এবং নানা সদভাষা এই পরিবারেই অর্জিত হইয়াছে। এই চাকরীই আমার কিয়ৎকালের জন্ম শিক্ষালয়, শিক্ষা-হাটা এবং গ্রন্থাগার-স্বরূপ ছিল এক্ষণ বলিলে অসত্য হইবে কি?

রাকনার-পত্নী আমার কাজ-কর্ম দেখিয়া আমার ভাল বাসিতে লাগিলেন। এমন কি, আমার ভাল বাসিতে যাইবার স্বযোগও আমি পাইলাম। এতদিন কেবল বৈশ্যবিদ্যালয়েই পড়িতছিলাম। রাকনার-পত্নীর রূপায় এক ঘণ্টা করিয়া দিনের স্বপ্নেও ঘাইতে থাকিলাম। তিনি আমার রাতের পড়ায়ও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। তাহার বাড়ীতে

থাকিতে থাকিতেই আমি একটা কেরোসিনের বাক্স আনিয়া নিজ হাতে আলুমারী তৈয়ারী করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দুই তিনটা থাক করিয়া লইলাম এবং এখান শুধান হইতে কতকগুলি খাতা-পত্র, পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সাজাইয়া রাখিলাম। উহাই আমার প্রথম লাইব্রেরী বা “গ্রন্থ-শালা।”

স্বতরাং রাকনারপরিবারে আমার দিন বৃদ্ধিই কাটিতে লাগিল। আমি কিন্তু হ্যাপটনকে ভুলি নাই। আমার মাতা অত-দূরে কোন্ অজানা স্থানে ঘাইব ভনিয়া ভাবিয়া আতুল হইলেন। শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির হইল। হাতে এক পয়সাও নাই। এত দিন আমি ও আমার দাখা যাহা কিছু রোজগার করিয়াছি, সবই গৃহস্থলীতে বরচ হইয়া থিরাছে—এবং আমার অভিভাবক উড়াইয়াছেন। যাহা হউক, কোন উপায়ে ঘাইবই ঘাইব।

ভগবান্ সহায় হইলেন। দেখিলাম আমার পত্নীর নিগোষ্ঠা এই সবাদে সকলেই আশ্চর্যক স্থা। তাঁহারা আমাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন “নিগোষ্ঠান্তির মূখ উজ্জ্বল কর।” তাঁহাদের আনন্দের বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহাদের চির জীবন গোলামীতে কাটিয়াছে। কখন হুদিন আসিবে ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। অথচ কেহ বৃদ্ধ বয়সে কেহ বা প্রবীণ বয়সে একে একে নবযুগের নূতন নূতন লক্ষণগুলি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা স্বাধীনতা পাইয়াছেন—তাঁহাদের প্রায়ে একটা জাতীয় বিদ্যালয় পর্যন্ত থোলা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, আজ তাঁহাদের এক সন্তান ঘর বাড়ী ছাড়িয়া একটা মহাবিদ্যালয়ে

লেখাপড়া শিখিতে চলিল। আজ প্রায়ের এক নিশ্চ পরিবাদের স্নেহ হইতে দূরে থাকিয়া একটা উচ্চশ্রেণীর পাঠশালায় নিযুক্ত করিতে প্রয়াসী। তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটা সমস্যা বুঝি কি? কাজেই কেহ আমাকে একটা কমািল, কেহ বা একটা ভলন পয়সা, ইত্যাদি উপহার দিতে লাগিলেন।

আমি যাত্রা করিলাম। মাতাকে অত্যন্ত অশ্রু ও রুদ্র অবস্থায় দেখিয়াই বাইতে হইল। সঙ্গে একটা থল। তাহার মধ্যে কাপড় চোপড় ভরিয়া লইলাম। তখন ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া হইতে ভার্জিনিয়ায় যাইবার রাস্তায় বানিকটা রেলপথ ছিল। অপরিশ্রু রাস্তা ভাড়াপাড়ী করিয়া বাইতে হয়।

ম্যালভেন হইতে হ্যাপ্টেন ৫০০ মাইল। অতদূর যাইবার পথ-ব্যয় আমার নাই। একদিন পাছাড়ের রাস্তায় ভাড়াপাড়ীতে করিয়া বাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর গাড়ী একটা সাদা বাড়ীর নিকট থামিল। সুবিল্লাস! সেটা হোটেল, আমার সহযাত্রীরা সকলেই বেতকায়, আমিই একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ নিগো। তাঁহারা সকলেই একে একে নামিয়া এক একটা কামরা দখল করিয়া বসিলেন। হোটেলের কর্তা তাঁহাদের জ্ঞাত অযোগ্যন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে এমন সময়ে ভয়ে ভয়ে আমি হোটেলের কর্তার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার হাতে এক আদলাও ছিল না। ভাবিয়াছিলাম গৃহস্থানীর নিকট ভিক্ষা করিয়া রাত কাটাওয়া দিব। সেই সময়ে ভার্জিনিয়ার পার্লট প্রদেশে হাড়ভালা শ্রীত। ভাবিয়াছিলাম নিশ্চয়ই হোটেলের এক কোণে আশ্রয় পাইব। কিন্তু আমার

কাল চামুড়া দেবিবারাই আমার প্রতি কঠোর আদেশ হইয়া গেল—“তোমার এখানে ঠাই নাই।” পরমার অভাবই আমেরিকায় একমাত্র বস্তু নয়। পান্না চামুড়ার অভাবও বড় বিষয় পাপ—এই ধারণা সেই রাত্রে আমার প্রথম জন্মিল।

সারারাত্রি সেই হোটেলের সম্মুখে ঠাঁট্টা গা গরম রাখিলাম। গৃহস্থানীর দুর্য্যবহারে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই। হ্যাপ্টেনের স্বপ্নই আমার সমস্ত স্বপ্ন ভরিয়া রাখিয়াছিল।

পরের বসন্ত আরও অসংখ্যপ্রকার কুপিয়াছিল। বানিকটা পদব্রজে চলিয়া, বানিকটা গাড়ীওয়ালার হাতে পায়ে ধরিয়া বিনা পয়সায় গাড়িতে চড়িয়া, বানিকটা সহযাত্রীদের নিকট পয়সা ভিক্ষা করিয়া, শেষ পর্যন্ত ভার্জিনিয়া প্রদেশের একটা সহরে পৌঁছিলাম। তাহার নাম রিচমন্ড, এখানে হইতে আমার গন্তব্যস্থান আরও ৮২ মাইল।

রিচমন্ডে পৌঁছিতে বেশী রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। হাতে পয়সা নাই—তাঁহার উপর ছেঁড়া ময়লা পোষাক ও কাল রং জুখায় পেট জলিতেছে। কত গৃহস্থের বাড়ীতে স্থান পাইবার জ্ঞাত ভিক্ষা করিলাম। কেহই একটা ভালকথাও বলিল না। সকলেই পয়সা চায়। পয়সা দিলে তাঁহাদের বাড়ীতে শয়ন-ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে। যেতাদ গৃহস্থেরা এইরূপই অতিবিসংকার করিয়া থাকেন। আমি নিরুপায় হইয়া রাস্তায় হাঁটতে লাগিলাম। হাঁটতে হাঁটতে রুট পাসের পোশাকের কত খাজস্রা সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। তাহা হইতে একটুই

পাইলেই আমি কৃতকৃত্য হইতাম। ভাবিতেছিলাম যদি এক টুকরা মাংসও আশ্র উঠরা আমাকে দার দেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে চিরজীবন আমি বাহা কিছু উপার্জন করিব সমস্তই উদ্যোগিকো মূল্য-ব্রত দিব প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। কিন্তু আমার প্রতি কাহারও দয়া হইল না। একটা আনু বা এক টুকরা মাংস কেহই আমাকে দিল না। আমি অনাহারে কাটাইলাম।

রিচমন্ডের প্রথম রজনীতে আমার এই অভিজ্ঞতা। আমি ক্ষুধার্ত, দুর্বল ও অবসর ভাবে যাত্রায় সূচিত করিতে থাকিলাম। কিন্তু তথাপি হতাশ হই নাই—জীবনের প্রব-তারাকে ভুলি নাই—হ্যাপ্টেনে বিদ্যার্জনের সমস্ত ত্যাগ করি নাই। তার পর যখন আর পায়ে হাঁটা অসম্ভব বোধ হইল, তখন রাস্তার পার্শ্বে একটা কাঠের বড় তক্তার নীচে শুইয়া পড়িলাম। কোন লোক দেখিতে পাইল না। সেই রাত্রিতে কত লোক তক্তার উপর দিয়া চলাফেরা করিল। আমি মাটিতে শয়ন রাখিয়া থলটাকে বাসিল করিয়া হ্যাপ্টেনের নাম জপিলাম। সকালে উঠিয়া দেখি, আমি একটা জাহাজের নিকটে রহিয়াছি। অসহ ক্ষুধার জ্বালা। জাহাজের কাপ্টেনের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলাম। তাঁহার অহৃৎজক্রমে জাহাজ হইতে মাল নামাইতে লাগিলাম। তারপর থলোমধ্যে জুড়িয়া মূল্য পাইবা খাবার পাইতে বসিলাম। ওড়প হুথের বাওয়া বোধ হয় আর কখনও আমি খাই নাই।

কাপ্টেন সাহেব আমার প্রথম কাজেই প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে আরও কাজ দিতে চাহিলেন। আমি রাজী হইলাম।

যে মূল্য পাইতাম তাহা দিয়া দৈনিক আহারের পরচ চলিত—কিন্তু খরচাড়া কুলাইত না। কাজেই অল্প বাইরা থাকিতাম—এক রাত্রে আসিয়া সেই কাঠের তলায় মাটির উপরে শুইয়া থাকিতাম। এই উপায়ে কিছু পয়সা বাচিল। তাহার খারি রিচমন্ড হইতে হ্যাপ্টেনে যাইবার ব্যয় সংগ্রহ করিলাম।

এই ঘটনার বহুকাল পরে রিচমন্ডের নিগো অবিবাগিন আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্বর্ধনা করিয়াছে। সুবর্ণনা-উৎসবে অশ্রুত: ছই

জাহাজ ক্রুফার পুরুষ ও রমণী যোগদান করিয়াছিল। ঘটনাটিকে সেই কাঠের তক্তার সমীপবর্তী এক গৃহে এই অভাবনা ও সাদর-সম্ভাষণাদি নিম্পন্ন হয়। সকলে অতি আন্তরিকতার সহিতই আমাকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু এই আনন্দের দিনে আমি সম্বর্ধনা অভিবাদন প্রভৃতিতে একেবারেই যোগ দিতে পারি নাই। আমি আমার রিচমন্ডে প্রথম পদার্পণের কথাই মনে করিতেছিলাম। সেই রজনীর অভিজ্ঞতাই আমার চিত্তে অত্যাচ্ছন্ন সজল চিত্তার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আমি সেই রাস্তার পার্শ্বে কাঠের তক্তা এক মুহূর্তের জ্ঞাত কুলাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

কাপ্টেন মহাশয়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া আমি আমার তীর্থযাত্রায় আবার বাহির হইলাম। হ্যাপ্টেনে পৌঁছিবার পথে এবার কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই, পৌঁছিবার সময় হাতে ১৮/০ পুজি থাকিল। বিভ্রামন্দিরের বর্ধিত্য দেখিয়াই আমি রোমাঞ্চিত হইলাম। বড় বাড়ী যেন রাজ-প্রাসাদ। বিভ্রামন্দির এই বিজিত ইষ্টক-নির্মিত গৃহ আমার জন্যে একটা নব জগতের বার্তা আনিয়া দিল। বনি-সমাজ, আপনারা

যদি একবার বৃষ্টিতে পারিতেন যে, নূতন শিক্ষার্থীর চিত্তে বিজ্ঞান-গৃহের দৃষ্টি কি অপরূপ ভাবলহরী সৃষ্টি করে, তাহা হইলে আপনারা বোধ হয়—আপনারের সর্বথ উৎসর্গ করিয়া দেশের বিজ্ঞানমন্দিরগুলিকে নানা উপায়ে হৃদয় পূর্ণ ও অলপত করিতে প্রস্তুত হইতেন। আপনারা শিশুরয়ের কোমল চিন্তাগুলি কখনও কল্পনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? নব শিক্ষার্থীর অন্তরের কথা বৃষ্টিতে চোরা করিয়াছেন কি? আমি হাস্পাতনের বিজ্ঞান-গৃহটি দেখিয়া নূতন জীবন লাভ করিলাম—সবই যেন নূতন বোধ হইতে লাগিল—আমার চোপ একটা নূতন দৃষ্টি শক্তি পাইল। জগতের সকল পরার্থই এক নবভাবে আমার নিকট দেখা দিল—আমি সত্যসত্যই সেই চিরবাহিত স্বর্গ রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমি বাহিরে কাল বিলম্ব না করিয়া বিজ্ঞান্যের কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হইলাম। প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমার বেশশূণ্য ইত্যাদি দেখিয়া ভাঁধাদের যোগ্য ছাত্র বিবেচনা করিলেন বলিয়া বোধ হইল না। বোধ হয় বৃষ্টিয়াছিলেন—এ একটা সহ, ছেলে-খেলা করিতে আসিয়াছে। অবশ্য একেবারে তাড়াইয়াও দিলেন না। আমি তাঁহার আশে পাশে ঘুরিতে লাগিলাম। নানাভাবে আমার যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং শিবিবার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। ইতিমধ্যে কত নূতন নূতন জ্ঞান আসিয়া ভর্তি হইল। আমার মনে হইতে লাগিল—আমাকে ভর্তি করিলে ইহাদের কাহারও অপেক্ষা আমি নিম্নদ্বীপ ফল দেখাইব না।

কয়েক ঘণ্টা পর শিক্ষয়িত্রী আমার উপর সদয় হইলেন। তিনি বলিলেন, “এখানে

বাটা আছে, ওটা লইয়া পার্শ্বের ঘরটা ঝাড় মাও ত।”

আমি বৃষ্টিলাম—ইহাই আমার পরীক্ষা। রাক্ষস-পতীর গৃহে আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি এইবার তাহার যাচাই হইতেছে। ভাল কথা—আমি মহা আনন্দে ঘর পরিষ্কার করিতে গেলাম।

ঘরটা একবার জুইবার তিনবার ঝাড়িলাম। একটা ছাকডার কাড়ন দিল—তাহা হইতে ধূলিরাশি বাহির করিয়া ফেলিলাম। দেওয়ালের আশে পাশে পলি গুলিতে বেথানে থ টুকু ময়লা জমিয়াছিল সমস্তই পরিষ্কার করিলাম। বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, ভেঙ্ক ইত্যাদি কাঠের সমস্ত আসবাবই ঝাড়িয়া চক্কেল করিয়া রাখিলাম। শিক্ষয়িত্রীকে জানাইলাম ঝাড়া হইয়াছে। তিনিও ‘ইয়াহা’ রম্মী। তিনি খুঁটিনাটি সর্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। টেবিলের উপর আব্দুল দিয়া বৃষ্টিলেন ময়লা কিছুই নাই। নিজেই ক্রমাল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন—চেয়ারের কোণ হইতেও কিছু ধূলা বাহির হয় কি না। পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “দেখিতেছি, ছোকরা বেশ কাজের।” আমি ‘পাপ’ হইলাম।

বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময়েও কোন বালককে এত কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় না। হার্ডক ও ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে হইলে স্ত্রিয়ায়ি ছাত্রদের মধ্যে ‘বেগ’ পাইতে হয়। যাহারা ‘প্রবেশিকা’ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হার্ডক ও ইয়েলের কলেজে লেখাপড়া শিবিবার জন্ত সার্টিফিকেট পায়, তাহার বোধ হয় আমার এই বিশেষ আনন্দ কিছু কিছু অল্পমান করিতে পারিবে। আমিও পরে অনেক পরীক্ষার

উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু এই পরীক্ষার উপরই আমার ভাণ্ডা নির্ভর করিতেছিল। ইহার ফলেই আমার জীবনের গতি নির্ধারিত হইল। এতদূর অগতির গতি আর আমি কখনও পড়ি নাই।

হাস্পাতনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, আমার পরীক্ষাকর্তার নাম ছিল কুমারী মেরী এন্স-ম্যাক। আমাকে নিজের খরচ নিজেই চালাইতে হইবে স্ত্রিয়া তিনি আমাকে বিদ্যায়ের একটা খামার কার্য করিতে দিলেন। আমাকে ঘরগুলি দেখিতে স্ত্রিয়া হইত, যুব সকলে উত্তীর্ণ বাড়ার আশ্রয় জালিয়া দিতে হইত। উনি ঘরদ্বাি দিতে হইত। বাট্টনী যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ইহাতে আমার ভরণপোষণের প্রায় সমস্ত খরচই পাইতাম।

হাস্পাতন বিদ্যালয়ের বহির্দৃষ্টি পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে ভিতরকার কথা কিছু বলি। মিস্ ম্যাক আমার জননীর স্ত্রায় মেধাশীলা ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ও উৎসাহে আমি দেখানে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাঁহাকে আমার জীবনের অন্ততম গঠনকর্ত্তী বিবেচনা করিয়া থাকি।

একজন যেতাল পুরুষের পরিচয় আমি এখানে বলি। তখন হইতে তিনি আমার স্বয়ং-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। তাঁহার চরিত্রই আমার জীবনের উজ্জ্বলতম আদর্শবস্তু রহিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টান্ত সমুখে রাখিয়াই আমি কদম্বকের সাহসভবে বিচরণ করিতেছি। সেই উদারস্বভাব বৃহৎপ্রাণ পরোপকারী মহাপুরুষের নাম সেনাপতি শ্রাবুগেল সি আর্মস্ট্রং।

সৌভাগ্যক্রমে আমি ইউরোপ ও আমেরিকা

আসিয়াছি। খাটি বড় লোক এবং তথা-কথিত বড় লোক উভয় প্রকার নামজাদা লোকই আমি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু আমি আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, সেনাপতি আর্মস্ট্রংদের চরিত্রজ্ঞান ধর্মভীক মানব-সেবক একজনও দেখি নাই। তিনিই আমার চিন্তারাজ্যের ‘একমেবাতিহরী’ মহাবীর, তাঁহাকে দেখিয়াই ত্যাগ্যাবস্তার বৈরাগ্য্যাবস্তার প্রেরণাবস্তার যৌতপুট ও সাধু মহাত্মাদের পরিচয় কিছু কিছু পাইয়াছি বলিতে পারি। সেনাপতি আর্মস্ট্রংকে আমি মুক্তিমান ত্যাগ-ধর্মজ্ঞ পূজ্য করিতাম।

শোলামাবাদের যুগ্য জীবন এবং কয়লার খানের দুঃখপরিহা ভোগ করিবার পর-ক্ষেণেই এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিলাম। বহু পুণ্যকলেই আমার একরূপ ঘটিয়াছিল। যেই আমি তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম তখনই আমার মনে হইল যে, ইনি একজন তরুনই আমার মানব। তখনই যেন বৃষ্টিতে পারিলাম ইহার ভিত্তর অলৌকিক, ‘অনমস্যাণ্যং বীরহুলত শক্তি’ রহিয়াছে। সেই প্রথম দর্শন হইতে সেনাপতি আর্মস্ট্রংকে আমি অনেকবার নানা ভাবে, আপনার জন ভাবে, বহুভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তাঁহার সুস্থকাল পণ্ডিত তাঁহাকে আমি আত্মীয় বিবেচনা করিবার স্বযোগ পাইয়াছি। কখনই তিনি আমার জ্ঞানে সহং হইতে মহন্তরূপে অধিকতর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজার পাত্র হইয়াছিলেন।

যতই আমার যত্ন বাড়িতেছে ততই আমি বিবেচনা করিতেছি যে, ‘বাহু’ গড়িবার জন্ত গ্রন্থাঠের ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা বেশী নাই। পুথি-কেন্দ্র, খাতা-পত্র, লাইব্রেরী, কল-কল্লা, ল্যাবরেটরী ইত্যাদি সাহস-সরহাম

—এ সব হইতে ছাড়েরা বেশী কিছু শিখিতে পায় না। এই নিষ্কণ্ঠ পদার্থগুলি মাছদের মস্তক প্রাণাংশ দিতে, বিশেষ সমর্থ নয়। আমি হাস্পটনে থাকিবার কালে ভাবিতাম যে, এই বিভাগ্য হইতে বাড়াই-ঘর, হাতিয়ার-ঘর, বাতাস-পত্র, ইট-কাঠ, বেঞ্চ-টেবিল, ইত্যাদি সবই যদি সরাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও বিভাগ্যের কিছু মাত্র অসম্ভাব্য হইবে না। কারণ এই বিভাগ্যের প্রাণপাতা, এই বিভাগ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, এই বিভাগ্যের পিতা স্বরূপ পরিচালক আর্মস্ট্রং মহোদয় একাকী এই সুদূর দাঙ্গলপ্রান্তে অপেক্ষা মূল্যবান। তাহার নিকট নিগ্ৰহা বালকেরা একবার করিয়া রোজ আসিতে পারিলেই তাহাদের সর্বোচ্চ শিক্ষালভের স্থল ফলিবে। আরও আমি সেই কথা বলিতেছি, প্রকৃত চরিত্রবান্ সমাজসেবক শিক্ষাপ্রচারকের সঙ্গে সহায় করিতে পাইলে যতখানি চরিত্র গঠিত হয়, মনের তেজ বাড়িতে থাকে, চিত্তের শক্তি বিকশিত হয়, কর্মক্ষমতার উন্মেষ হয়, সৌজ্ঞ-নিষ্ঠার অঙ্কিত হয়, অজ কোন উপায়ে তাহা হইতে পারে না। আমাদের তথাকথিত স্থল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে গ্রহ-পাতের আশ্রয় কইয়া যাইবে না কি? আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রের কন্ঠীরা সমগ্র জগতের কাজ-কর্মের মধ্যে রাখিয়া বালক-বালিকাদিগকে মাছ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন না কি?

সেনাপতি আর্মস্ট্রং মৃত্যুর পূর্বে দুই মাস কাল আমার টাঙ্কেলী-বিজায়ে কাটায়েছিলেন। তখন তিনি পক্ষাঘাতে ভুগিতেছিলেন। সর্বদা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তথাপি শেষ মুহূর্ত পধ্যন্ত তিনি তাহার শিক্ষা-প্রচার-কর্তে লাগিয়াই ছিলেন। কাজের

মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া ফেলিতে পারে—একপ লোক সংসারে বিরল। কিন্তু আর্মস্ট্রং নিজেকে সম্পূর্ণ তুলিতে পারিতেন—আত্মমুখী চিন্তা তাহার বিদ্যুৎমাত্র ছিল না। পরসেবাই তাহার একমাত্র ধর্ম ছিল। তিনি হাস্পটন বিভাগ্যের জ্ঞাত এতদিন যাহা করিয়াছেন আমার টাঙ্কেলী বিভাগ্যের জ্ঞাতও সেইরূপ ধাঙিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে। আমাদের অঞ্চলে যেখানে যেখানে নিগ্ৰহ সমাজ শিক্ষা-বিভাগের প্রয়োজন, সেই সকল স্থানের জ্ঞাতও তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকল কার্যেই তাহার সমান আনন্দ। তিনি নিজকে বিসর্জন দিতে শিখিয়াছিলেন—আদর্শের মধ্যে তন্ময় হইতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তাহার কর্মক্ষেত্রের অভাব হইত না। যখন যেখানে থাকিতেন তখন সেইখানেই তাহার আত্মত্যাগী দানদার কার্য চলিতে থাকিত। এখানে আমার কর্মক্ষেত্র, ওটা তোমার কর্মক্ষেত্র, এই আমার গভী, ঐ পধ্যন্ত তোমার গভী—তাঁহার নিঃস্বার্থ চিন্তে একপ চিন্তা স্থান পায় নাই। সর্বত্রই তিনি স্বার্থত্যাগের কর্মক্ষেত্র খুঁজিয়াছিলেন।

সেনাপতি আর্মস্ট্রং নিউ ইংলও অঞ্চলের অধিবাসী 'ইয়াকি'। বিগত সংগ্রামে তিনি এই প্রান্তের পক্ষে দক্ষিণ প্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন। ব্রতরায় অনেকই মনে করিতে পারেন যে, তিনি হযত দক্ষিণ প্রান্তের বেতকাগণের সহক্ষে শক্ত্যব পোষণ করিতেন। আমি বলিতে পারি, তাহা সত্য নয়। তিনি সংগ্রামের পর একদিনও কোন দক্ষিণপ্রান্তবাসী খেতাব বাক্তি সমক্ষে নিম্না বা তিরস্কারহৃৎ বাক্য ব্যবহার করেন নাই। বরং যথা সাধ

তিনি তাহাদের উপকারের জ্ঞাত চেষ্টাই করিয়াছেন।

হাস্পটন বিভাগ্যের ছাড়েরা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। আর্মস্ট্রংয়ের আরও কোন কর্ম কৃতকার্য হইবে না—এরূপ আমরা ভাবিতেই পারিতাম না। তাঁহা যে কোন আদেশই আমরা পলকের মধ্যে সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইতাম। তাঁহার আদেশ অঙ্গুষ্ঠের কাজ করিতে পাইলে আমরা কৃতার্থ বোধ করিতাম। একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি আমার টাঙ্কেলী বিভাগ্যে 'অতিথি' হইয়াছিলেন। তখন পক্ষাঘাতে ভুগিতেছিলেন—নড়িবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার চেয়ার গড়ান রাখা দিয়া একটা পাহাড়ের উপর তোলা হইতেছিল। তাঁহার একটা তৃত্যপূর্ব ছাত্র তাঁহার চেয়ার টানিয়া তুলিতেছিল। রাত্তা ভাল ছিল না বলিয়া সহজে ঐ কার্য সাধিত হয় নাই। অবশেষে যখন পাহাড়ের উপরে উঠা গেল, ছাত্রটি বলিয়া উঠিলেন—“যাহা হউক, আজ আমার সৌভাগ্য, সেনাপতির জ্ঞাত মৃত্যুর পূর্বে একটা কঠিন রকমের কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি।”

যখন আমি হাস্পটন বিভাগ্যে ছিলাম তখন প্রায়ই নূতন নূতন ছাত্র ভর্তি হইত। আমাদের বড় স্থানাভাব ছিল। ছাত্রাবাসে আর ছাত্র লওয়া চলিত না। বাহিরে তাঁবু বাটাইয়া ঘর তৈয়ারী করিয়া লইতে হইত। সেই সময়ে আর্মস্ট্রং মহোদয় পুরাতন ছাত্রদের নিকট আশ্রয় জিজ্ঞাসা করিতেন, “তোমাদের মধ্যে কেহ রাজ্যে তাঁবুতে শুইয়া ঘরের ভিতর নূতন ছাত্রদের জ্ঞাত রাখা করিতে প্রস্তুত আছ কি? অমনি প্রত্যেক

ছাত্রই ঘর ছাড়িয়া দিয়া তাঁবুতে বসে রাজি কাটাঁইবার জ্ঞাত অঙ্গুর হইত।

আমিও এইরূপ একজন স্বার্থত্যাগী “পুরাতন ছাত্র” ছিলাম। আমার মনে আছে—অত্যন্ত কঠোর শীতকালে আমাদের কয়েকবার তাঁবুতে রাজি কাটাঁইতে হইয়াছিল। আমাদের যৎপরোনাস্তি কষ্টও হইয়াছিল। সেনাপতি আর্মস্ট্রংয়ের আদেশ, ব্রতরায় আমরা তাহা প্রাণপণে পালন করিই। আমাদের কষ্টের কথা তাঁহাকে জানাইব কেন? আমরা একমুখে দুই কাজ করিতেছিলাম—করাই হইবার দ্বারা আর্মস্ট্রংকে সুখী করিতাম, এবং নূতন নূতন ছাত্রের শিক্ষালভের সুযোগ বাড়াইতে পারিতাম। এক এক রাজ্যে মহা বড় বাইত—তাঁবু উড়িয়া রাইত—আমরা সেই কনকনে শীতের মধ্যে খোলা মাঠে আশ্রয় থাকিতাম। সেনাপতি সকালে পাদিয়া দেখিতেন—আমরা হাতমুখে প্রসূর-চিন্তে শীত সহ্য করিতেছি।

আর্মস্ট্রংয়ের কথা এত করিয়া বলিবার কারণ আছে। আমি সকলকে জানাইতে চাহি যে, এইরূপ চরিত্রবল বলীয়ান শিক্ষা-প্রচারকগণের প্রায়াসেই আমেরিকার নিগ্ৰহসমাজে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিয়াছে। আর্মস্ট্রংয়ের আদর্শে বহু খেতাব শিক্ষিত নরনারী কৃষ্ণকায় সমাজে শিক্ষা-প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া আমার স্বজাতিকে উন্নতির পথে তুলিয়াছেন। জগতে এই নীরব নিঃস্বার্থ কণ্ঠবীরগণের জীবনচরিত্র এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

হাস্পটনে প্রতিদিনকার প্রতি কক্ষেই, প্রত্যেক উঠা-বাতায় আমি একটা নূতন কিছু শিখিতেছিলাম। সেখানকার জীবন-যাত্রা-কথাও নিত্য কর্ম-পদ্ধতি আমাকে

নানা ভাবে শিক্ষিত করিতেছিল। যখন-সময়ে নিয়মিতরূপে বাইতে হয়, এখানে আমি তাহা প্রথম উপলব্ধি করিলাম। টেবিলের উপর কাগজ বিছাইয়া তাহার উপর খামা বাটি রাখিতে হয়—ইহাও আমি জীবনে প্রথম শিখিলাম। খািতে বসিয়া কিছুকণ ব্যবহার করিতে হয়, কোন ব্যক্তির পর কোন খাদ্য লওয়া উচিত—ইত্যাদি আরও অনেককানেক বিষয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা জন্মিল। বিছানার উপর চাদর দেওয়াও আমি পূর্বে আর কোন দিন দেখি নাই। এইরূপে দৈনিক জীবন-পাণের প্রায় সকল কথোপকথন আমায় 'হাতে বড়ী' মেরল।

হাম্পটনেই আমি আবার স্নান করিতেও শিখি। স্নান করিলে যে কত উপকার হয়, শরীর ও বাত্ব্যের কত উন্নতি হয়, চিত্তের প্রসূততা বাড়িতে থাকে—তাহা আমি পূর্বে বুঝিতাম না। তখন হইতে আমি প্রতিদিন স্নান করিয়া বাইতেছি। মাঘে মাঘে এমন অনেকের ভাঙিতে অতিথি হইতে হইয়াছে, যেখানে স্নান করিবার ব্যবস্থা নাই। আমি সেখানে নিকটবর্তী কোন নদী বা সরগাথ ঘাইয়া স্নান করিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছি। নিগোজাতিকে আমি সর্দারাই বলিয়া থাকি, বাজী তৈয়ারী করিতে হইলেই প্রানাগারও বেন প্রস্তুত করা হয়।

হাম্পটনে আমার ছুটি মাজ গেঞ্জি ছিল—ময়লা হইয়া গেলে আমি রাত্রে সাবান দিয়া কাচিয়া আগুনে শুকাইয়া লইতাম। পরদিন সকালে তাহা ব্যবহার করিতাম।

হাম্পটন বিদ্যালয়ের বোর্ডিং বা খাওয়া বরচ মাসিক ৩০ টাকা। আমি যেখানামার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম তাহাতে সমস্ত আর হইত না—স্বতরাং আমাকে মাসে মাসে নগদ

টাকাও কিছু কিছু দিতে হইত। প্রথমে খন ভত্তি হই, তখন হাতে ১৮/০ মাত্র ছিল। আমার দাদা কচিং কখনও ২৪/০ টাকা পাঠাইতেন। কিন্তু তাহাতে আমার খাই খরচের জন্ত দেয় টাকা কুলাইত না।

কাছেই আমি বাপামাগিরি এক ভাল করিয়া করিতে লাগিলাম যে, শেষে আমি খাইখরচের সমস্ত টাকাই বেতনরূপে পাইতাম। বিদ্যালয়ের বেতন ছিল বার্ষিক ২০০ টাকা। এতটাকা আমার সংগ্রহ করা অসম্ভব অসম্ভব ছিল। আমি ষ্ট্রিম-মহোদয় একজন ইয়াকি বন্ধুকে বলিলাম আমার বেতন দেওয়াইহেঁতেন। বন্ধুটির নাম এন্স গ্রিফিথ মরণ্যাম। শ্রীযুক্ত মরণ্যাম আমার হাম্পটনের পুরাপুরি বেতন দিয়া আশিয়াছেন। আমি পরে খন টায়েক্সীতে নিত্যায় প্রতিষ্ঠা করি—তখন কয়েকবার এই সঙ্গস্য দ্বাতার মধ্যে থেথা করিয়া ধুইয়াছি।

হাম্পটনে পুস্তকখারাব ও বস্ত্রভাব যথেষ্ট হইল। পুস্তক অবস্ত্র পরের নিকট ধার করিয়া লইলেই কাছ চলে। এইরূপেই আমার চলিত। কিন্তু পোষাক পাই কোথায়? সে খেলক-মধ্যে আমার মা কিছু সম্পত্তি তাহাতে ত এখানে চলা অসম্ভব। বিশেষতঃ সেনাপতি মহোদয় কাগজ চোপড়ের উপর বিশেষ দৃষ্টিই রাখিতেন। কোন ছাত্রের জামার বৃত্তাম নাই দেখিলে তিনি অসম্মত হইতেন। জুতা বেশ কালী বা রং করা না দেখিলে তাহার বিরক্তি জন্মিত। কোটে কালীর দাগ থাকিলে কোন ছাত্র তাহার নিকট আসিতে ইতস্ততঃ করিত। আমার মাজ একটা পোষাক। তাহা ঝাংই পাশামাগিরি ও ছাত্রগিরি করিতে হইবে। চম্পন ঘণ্টা এক পোষাক ব্যবহার করিয়া কি

তাহা পরিত্যক্ত রাখা যায়? আমার অবস্থা দেখিয়া শিক্ষক মহোদয়গণের দয়া হইল। তাহারা আমাকে পুরাতন জামা-পোষাকের বস্ত্র হইতে একটা পোষাক দান করিলেন। এই পুরাতন বস্ত্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রের ইয়াকি অঞ্চল হইতে হাম্পটনের দরিস ছাত্রগণের বস্ত্র দানধরুণ পাওয়া যাইত। বস্ত্র দানের এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে আমার মত অসংখ্য বালক বিদ্যালয়ে বঞ্চিত হইত সম্ভব নাই।

এইবার শয্যার কথা কিছু বলিব। এতদিন ত মাটিতে শুইয়া অথবা ছাকড়ার বস্ত্রয় পড়িয়া রাতি কাটাইতে অভ্যাস করিয়াছি। হাম্পটন-বিদ্যালয়ে আনিয়া দেথি—প্রভাতকের বিজ্ঞানর উপরে দুই ছুটী করিয়া চাদর বিস্তৃত রহিয়াছে। দুইটা চাদরের সমস্ত আমি কোন মতেই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। প্রথম রাত্তিতে আমি দুইটা চাদরের নীচেই শুইলাম। বিত্তীতা রাতে তুল দৃষ্টিতে পারিয়া—দুইটা চাদরের উপরেই শুইয়া পড়িলাম। আমার ঘরে আরও ছয় জন ছাত্র শুইত। অত্যাচার আমার দুঃখবস্থা দেখিয়া বোধ হয় মজা দেখিত এবং মনে মনে হাসিত। কেহই কিছু বলিত না। পরে তাহারিগকে দেখিতে দেখিতে দুইটা চাদরের পার্থক্য বুঝিলাম। একটা গায়ে দিতে হয়—আর একটা পাতিয়া শুইতে হয়।

হাম্পটনে বোধ হয় আমা অপেক্ষা ছোট ছেলে আর কেহ ছিল না। অনেক প্রাণীও ঘরে এই বিদ্যালয়ে প্রায় চারি শত ছাত্র ও দাবী ছিল। সকলকেই বিদ্যাভ্যাসে মহা উৎসুক দেখিতাম। অনেকেরই শিখিবার

বয়স পার হইয়া গিয়াছে—অন্ততঃ বই মুখস্থ করিবার সময় আর তাহাদের ছিল না। তথাপি তাহারা চেষ্টা করিত। তাহাদের অকৃতকাৰ্য্যতা তাহারা ভ্রমপূর্ণ করিত না। তাহাদের আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। একে বেশী বয়স—তাহার উপর দারিদ্র্য, তাহার উপর অকৃতকাৰ্য্যতা—তথাপি তাহারা বিচলিত হইত না। এরূপ কর্মযোগ বেশী দেখা যায় কি?

এত আন্তরিকতা, এত উৎসাহ, এত অধ্যবসায়, এত কঠোর সাধনায় ব্রতী হইবার কারণ ছিল। তাহারা সকলেই স্বজাতিকে এবং স্বপরিবারকে উন্নত করিবার জন্ত বস্ত্রপরিকার। তাহারা কেহই নিজ জীবনের জন্ত ভাবিত না। নিজের কষ্ট, নিজের অক্ষমতা, নিজের অকৃতকাৰ্য্যতা—এ সকল দুর্লভতা ও নৈরাশ্যের কারণ তাহাদের চিত্তে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। সর্গশ্রী পরের কথা ভাবিত, ভবিষ্যৎ বংশধর-গণের কথা ভাবিত, সমগ্র নিগোজ সমাজের চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিত। এজন্য লাজ মান ভয় তাহারিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

আর যেতাব্দ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কথা কি বলিব? তাহারা ত স্বর্ণের দেবতা-ধরুণ ছিলেন। তাহারা নিগোজাতীর জন্ত যে ত্যাগপ্রীকার ও চরিত্রবল দেখাইয়াছেন, তাহা সভ্যতার ইতিহাস-গ্রন্থে অতি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। আমার বিশ্বাস, অন্যতম দুই ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে সেই স্বাৰ্থত্যাগ, পরোপকার, মানবসেবা ও শিক্ষাপ্রচারের পুণ্যকাহিনী প্রচারিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

নানা ভাবে শিক্ষিত করিতেছিল। যথাসময়ে নিয়মিতরূপে বাইতে হয়, এখানে আমি তাহা প্রথম উপলব্ধি করিলাম। টেবিলের উপর কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর খালা বাটি রাখিতে হয়—ইহাও আমি জীবনে প্রথম শিখিলাম। বাইতে বসিয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কোন খাজের পর কোন্ খাজ লওয়া উচিত—ইত্যাদি আরও অনেককানেক বিষয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা করিল। বিছানার উপর চাদের দেওয়াও আমি পূর্ণের আর কোন দিন দেখি নাই। এইরূপে দৈনিক জীবন-যাপনের প্রায় সকল কর্মেই হাস্পটনে আমার 'হাতে বাড়ী' হইল। হাস্পটনেই আমি আমার স্নান করিতেও শিখি। স্নান করিলে যে কত উপকার হয়, শরীর ও বাহ্যের কত উন্নতি হয়, চিত্তের প্রসূন্নতা বাড়িতে থাকে—তাহা আমি পূর্ণে বৃত্তান্ত না। তখন হইতে আমি প্রতিদিন স্নান করিয়া আসিতেছি। মাঝে মাঝে এমন অনেকের বাড়ীতে অতিথি হইতে হইয়াছে, যেখানে স্নান করিবার ব্যবস্থা নাই। আমি সেখানে নিকটবর্তী কোন নদী বা সরণায় যাইয়া স্নান করিয়া পরিত্যাগ হইয়াছি। নিয়োগজাতিকে আমি সন্দেহই বলিয়া থাকি, বাড়ী জৈয়ারী করিতে হইলেই স্নানাগারও বেন প্রস্তুত করা হয়।

হাস্পটনে আমার ছুইট মাত্র গেঞ্জি ছিল—ময়লা হইয়া গেলে আমি রাতে সাবান দিয়া কাটিয়া আগুনে শুকাইয়া লইতাম। পরদিন সকালে তাহা ব্যবহার করিতাম।

হাস্পটন বিদ্যালয়ের বোর্ডিং খাওয়া বরচ মাসিক ৩০ টাকা। আমি যেখানামার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম তাহাতে সমস্ত আর হইত না—সুতরাং আমাকে মাসে মাসে নগদ

টাকাও কিছু কিছু দিতে হইত। প্রথমে যখন ভর্তি হই, তখন হাতে ১৪/০ মাত্র ছিল। আমার দাদা কচিৎ কখনও ২৪ টাকা পাঠাইতেন। কিন্তু তাহাতে আমার খাই খরচের জঙ্ক দেখে টাকা ফুলাইত না।

কাজেই আমি খানামাগিরি এত ভাল করিয়া করিতে লাগিলাম যে, শেষে আমি খাইখরচের সমস্ত টাকাই বেতনস্বরূপ পাইতাম। বিদ্যালয়ের বেতন ছিল বার্ষিক ২০০ টাকা। এতটাকা আমার সংগ্রহ করা অবশ্যই অসম্ভব ছিল। আর্মট্রুপ মহোদয় একজন ইয়াকি বন্ধুকে বলিয়া আমার বেতন দেওয়াইতেন। বন্ধুটিকে বার এন্ট্রি পদে মরণ্যায়। শ্রীযুক্ত মরণ্যানু আমার হাস্পটনের পুরাপুরি বেতন দিয়া আসিয়াছেন। আমি পরে যখন টাঙ্কেব্রীতে নিজালয় প্রতিষ্ঠা করি—তখন কয়েকবার এই সজ্জন দাতার সঙ্গে দেখা করিয়া ধন্য হইয়াছি।

হাস্পটনে পুস্তকভাণ্ডার ও বস্ত্রভাণ্ডার খুঁট হইল। পুস্তক অবশ্য পরের নিকট দাঁত করিয়া লইলেই কাছ পড়ে। এইরূপেই আমার চলিত। কিন্তু পোষাক পাই কোথায়? সে খলের মধ্যে আমার যা কিছু সম্পত্তি তাহাতে ত এখানে চলা অসম্ভব। বিশেষতঃ সেনাপতি মহোদয় কাপড় চোপড়ের উপর বিশেষ দৃষ্টিই রাখিতেন। কোন ছাত্রের জামার বৃত্তায় নাই দেখিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। জুতা বেন কাণী বা বর কয় না দেখিলে তাঁহার বিরক্তি জন্মিত। কোটে কালীর দাগ থাকিলে কোন ছাত্র তাঁহার নিকট আসিতে ইতস্ততঃ করিত। আমার মাত্র একটি পোষাক। তাহা ঝাড়াই খানামাগিরি ও ছাত্রগিরি করিতে হইবে। চমিশ ঘণ্টা এক পোষাক ব্যবহার করিয়া কি

তাহা পরিদার রাখা যায়? আমার অবস্থা দেখিয়া শিক্ষক মহোদয়গণের দয়া হইল। তাঁহারা আমাকে পুরাতন জামা-পোষাকের বস্ত্র হইতে একটা পোষাক দান করিলেন। এই পুরাতন বস্ত্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রের ইয়াকি অঞ্চল হইতে হাস্পটনের দরিস ছাত্রগণের বস্ত্র দানস্বরূপ পাওয়া যাইত। বস্ত্র দানের এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে আমার মত অসংখ্য বালক বিদ্যালয়ে বঞ্চিত হইত সন্দেহ নাই।

এইবার শয্যার কথা কিছু বলিব। এতদিন ত মাটিতে শুইয়া অথবা চাকড়ার বস্ত্রায় পড়িয়া রাত্রি কাটাইতে অভ্যাস করিয়াছি। হাস্পটন-বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখি—প্রত্যেকের বিছানার উপরে দুই ছুইটা করিয়া চাদের বিস্তৃত রহিয়াছে। ছুইটা চাদের সমস্তা আমি কোন মতেই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। প্রথম রাত্রিতে আমি ছুইটা চাদের নীচেই শুইলাম। দ্বিতীয় রাতে দুই বৃষ্টিতে পারিয়া—ছুইটা চাদের উপরেই শুইয়া পড়িলাম। আমার ঘরে আরও ছয় জন ছাত্র শুইত। জাহারা আমার দ্বয়বয় দেখিয়া বোধ হয় মজা দেখিত এবং মন মনে হাসিত। কেহই কিছু বলিত না। পরে তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে দুইটা চাদের সার্বকতা বৃদ্ধিলা। একটা গায়ে দিতে হয়—আর একটা পাতিয়া শুইতে হয়।

হাস্পটনে বোধ হয় আমা অপেক্ষা ছোট ছেলে আর কেহ ছিল না। অনেক প্রবীণ পুরুষ ও স্ত্রী এখানে লেগাপড়া শিখিত। এই সময়ে এই বিদ্যালয়ে প্রায় চারি শত ছাত্র ও ছাত্রী ছিল। সকলেই বিদ্যার্জনে মহা উৎসুক দেখিতাম। অনেকেরই শিবিবার

বয়স পার হইয়া গিয়াছে—অন্ততঃ বই যুগ্ম করিবার সময় আর তাহাদের ছিল না। তথাপি তাহারা চেষ্টা করিত। তাহাদের অকৃতকার্যতা তাহারা জ্ঞপ্ত করিত না। তাহাদের আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। একে বৈধি বয়স—তাহার উপর দারিদ্র্য, তাহার উপর অকৃতকার্যতা—তথাপি তাহারা বিচলিত হইত না। এক্ষণ কথ্যযোগ বৈধি দেখা যায় কি?

এত আন্তরিকতা, এত উৎসাহ, এত অধ্যবসায়, এত কঠোর সাধনায় ব্রতী হইবার কারণ ছিল। তাহারা সকলেই স্বজাতিকে এবং স্বপরিবারকে উন্নত করিবার জঙ্ক বঞ্জনরিক। তাহারা কেহই নিজ জীবনের জঙ্ক ভাবিত না। নিজের কষ্ট, নিজের অক্ষমতা, নিজের অকৃতকার্যতা—এ সকল দুর্দলতা ও নৈরাশ্যের কারণ তাহাদের চিত্তে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। সন্দেহ পরের কথা ভাবিত, ভবিষ্যৎ বশধর-গণের কথা ভাবিত, সমগ্র নিরো সমাজের চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিত। এজ্ঞ রাজ মান ভ্য তাহাদিগকে স্পর্শকরিত প্যো নাই।

আর যেতাদ শিক-শিক্ষার্থীদের কথা কি বলিব? তাহারা ত স্বর্গের দেবতা-স্বরূপই ছিলেন। তাহারা নিগোজাতির জঙ্ক যে তাপসীকার ও চরিত্রবল দেখাইয়াছেন, তাহা সভ্যতার ইতিহাস-গ্রন্থে অতি উজ্জল রশ্মি অধিকার করিয়া থাকিবে। আমার বিশ্বাস, অনতিদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে সেই স্বাধিক্যাগ, পরোপকার, মানবসেবা ও শিক্ষাপ্রচারের পুণ্যসাহিনী প্রচারিত হইবে।

(ক্রমঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মহাকবি ভাস-বিরচিত অবিমারক নাটক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে সমাগতা হইলেন, মৃদু সঙ্গীত প্রবাহিত হইয়া মার্গও-তাপে উত্তপ্তা ধূরিতী-দেবীর সন্তাপ কিঞ্চিত্ত অপসৃত করিল, ছই একটা নক্ষত্র গগনাবধানে অস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হইতে লাগিল, রাজিকর প্রাণিবর্গ আপনাদের অবাধ সঞ্চারের স্বযোগ উপস্থিত দেখিয়া দ্রষ্ট হইল। এই সর্বজনানন্দিত প্রদোষে রাজকুমারের হৃদয় কি এক অপূর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি উৎকণ্ঠাক্রান্ত চিত্তে অর্দ্ধরাত্রির প্রতীকা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষণিকীণা বিচারশক্তি প্রকাশিত হইয়া গগনানন্দ বিক্ষিপ্ত তারকার শোভার অঙ্গকরণ করিতেছিল। শাশ্বতসুচ্ছল ও জ্ঞান-ভাষার চিত্তপ্রাশ্নে অন্তর্নিহিত হইয়াছে। দৃষ্টিক্তা রাজিকরীর মত অবশ্যে দ্রুতিতেছে, কিন্তু বা অন্তর্নিহিত জ্ঞানালোকের দ্বন্দ্ব প্রত্যয় দিগন্ত চকিত হইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যাদেবী অপসৃত হইলেন। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। দৈবিত্তে দেখিতে তিমির-গগন নিশীপ-কাল উপস্থিত হইল। নায়কের চিত্তও অবিকল-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠার প্রেরণায় অবিমারক গভীর রাত্রিতে একাকী রাজাস্ত্রপুং প্রবেশ করিতে সত্বর করিলেন। চোরের বেশ ধারণ করিয়া রজ্ঞ ও তরবার হস্তে নিশিথিনীর কক্ষাঞ্চলে লুকাইয়া হইলেন, কিন্তু তখনও বিবেক-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। তাই রাজকুমার যাইতে

যাইতে একবার ফিরিলেন, চিত্ত যেন কি এক তরঙ্গে তরঙ্গাঙ্কিত হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিলেন, ভোঃ কঃ তাক্ষর্য্য নাম রাগং বিজ্ঞম্ভ্যতি সংশ্রয়তে প্রমাণং, দোষানু ন চিন্ত্যতি সাহসমত্কাপতি।
অচ্ছন্দো ব্রজিত নেজ্জতি নীতিমার্গং, বুদ্ধিঃ স্তভাৎ হবিদ্ব্যামবশীকরোতি।
কবির এই কথাটা কত অভিজ্ঞতাপূর্ণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্তভাৎ হবিদ্ব্যাম এই দুইটা পদ এখানে বিলক্ষণ ঐতিহ্য পোষণ করিয়াছে। মল্লিনাথের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় “ধৃত্যো ভাস কবিরংগু স্তভিতস্তং বুদ্ধিসংসেবনাঃ”।
নায়ক এইরূপ চিন্তাময় হইয়া কতকগুলির দিকে চলিয়াছেন, একবার গভীর রাত্রির ভীষণতার দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইল। গর্ভস্থ হইব মোহমত্মপুংগত্যঃ সর্বাঃ প্রজা নিরয়া প্রসাদাঃ স্বপহস্বনীরবজন্য ধ্যানং প্রবিষ্টা ইব।
প্রস্তোত্ব ইব সঙ্কিতেন তমসা পর্শ্যাস্থমেয়া নঃ।
অস্তবানিমেবায্যতি সকলং প্রচ্ছন্নরূপং জগৎ।
অর্দ্ধরাত্রির এরূপ বর্ণনা অতি বিরল। শ্রোতবী পাঠ করিবামাত্র যেন বর্ণনীয় সমস্ত সম্পূর্ণরূপে চিত্তাক্রান্ত হইল। মহাকবি ভাস অন্ধকার-বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। “লিম্পতীব তমোহানি বর্ষত্যাগ্ননঃ নভঃ” এই প্রসিদ্ধ শ্রোতবী এই মহাকবির লেখনী-নিপত্য। পরবর্তী শ্রবক মেঠা প্রভৃতি মহাকবিরও এই শ্রোতবীর লোভ পরিত্যাগ করিতে

পারেন, নাই। নায়ক গভীর রাত্রিতে তিমিরসমাচ্ছন্ন রাজপথে চলিয়াছেন, মনে হইতেছে যেন—

তিমিরনিব বহন্তি মার্গনদাঃ

পুলিননিভাঃ প্রতিভাস্তি হমা মালাঃ।

তমসি দশদিশে নিমগ্নরূপাঃ

গবতরগীষ ইবায়মুদ্বকারঃ।

রাণুপখনদীওলি অন্ধকারকে যেন বহন করিতেছে। “হৃদ্যমালা ততের মত প্রতিভাত। দশদিক অন্ধকার নিমগ্ন—অন্ধকার যেন ভেলাদ্বারা পার হওয়ার যোগ্য। অন্ধকারকে “গবতরগীষ” বলা বড়ই স্বন্দর, বড়ই নূতন। নায়কের কতাস্ত্রপুংগম-প্রসঙ্গে কবি নানা প্রকার রমণীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়া শ্রোতৃগণের চিত্ত বিমগ্ন করিয়াছেন। কোন স্থানে পুরবাসী নায়ক-নাট্যকার প্রণয়কলহ, কোথাও বা নায়কানন্দ, কোনও স্থলে তরবার-সঞ্চার, কোথাও বা সমবেত রক্ষিবৃন্দ, কাহারও বিষয়ই কবি ভুলেন নাই। কুমার অবিমারক ক্রমে রাজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজভবন অত্যুচ্চপ্রাকার-পরিবেষ্টিত, ক্রাজ্জিৎ কুমার সহজে প্রবেশ-লাভ অসম্ভব বুদ্ধিতে পারিয়া চোরের ভাষা-প্রাচীরগায়ে রজ্ঞ আঘাত করিয়া প্রাচীর-উল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই গভীর রাত্রিতে চোরের মত রাজভবনে প্রবেশ করিতেও অবিমারক ভীত হইতেছেন না। নির্ভীক চিত্তে প্রাচীর-উল্লঙ্ঘনের আয়োজন করিতে করিতে

প্রাচীরগায়ে রজ্ঞ বন্ধন করিয়া প্রাচীরে আরোহণ করিলেন ও রাজভবনের শোভা দেখিতে লাগিলেন। অত্যুচ্চ হৃদ্যমালা-ভূষিত লগ্ন-ভবন যেন আকাশমার্গে উজ্জীন হইতেছে।

মণ্ডভবনমিদং সহস্রমালাং

দ্বিগ্নিমিথতীর নভো বহুধরায়াঃ।

অবিমারক রাজভবনে প্রবেশ করিয়া দ্বাভী-কথিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে কতাপুর-প্রাসাদের সঙ্গীপবর্তী হইলেন। মনে হইল এই সেই স্বধারোহ প্রাসাদ। যদি এই প্রাসাদ স্বধারোহ না হইয়া দুরারোহ হইত, তবে কি আমি প্রতিনিবৃত্ত হইতাম? কখনই না। তদুপার্গ বাক্ষি পদকটকটক হইয়া পদশাণ্ডিত জলাশয় পরিত্যাগ করে কি?

“সংসক্তনাগতকটকটকীতচেতাঃ-

তৃষ্ণামিতঃ ক ইহ পুরুণীণং জ্জ্বাতি।”

অবিমারক চোরবেশ পরিত্যাগ করিয়া কতাপুরপ্রাসাদে আরোহণ করিলেন। এদিকে রাজানন্দিনী কুরঙ্গী উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে অর্দ্ধরাত্রির প্রতীকা করিতেছিলেন। কিন্তু দ্বাভীবাচ্যে নায়কের আগমন হৃদিত্ত জ্ঞানিয়া অবধাহতলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। কুরঙ্গীর স্বামী নলিনিকা অবিমারকের বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে বলিতেছে, “কো হ বশু বৃত্তান্তো ভট্টরূপকত?” এই অবশের নায়ক প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নলিনিকাকে বলিলেন “ভবতি! অথং যং বৃত্তান্তঃ”। নলিনিকা নায়ককে দেখিয়া মাত্র অতিশয় আনন্দিত হইয়া আগন্ত-বাক্যে আপায়িত করিলেন। নিশ্চিন্তিত্ত কুরঙ্গীকে দেখিয়া অবিমারকের আনন্দ আর ধরে না। অনিমেয় নয়নে দেখিয়াও

যেন দীর্ঘপিপাসিত দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত
হইতেছে না।

“দৃষ্ট ন ভূপতি পরিকল্পিত সাধন,
বুদ্ধিধারা ব্রহ্মতি বোধযাতী হস্তাং।
রাগোভি চোদয়তি সাধনযাতী চাপন,
হর্থাং প্রসীদতি বিমুক্তি চান্দ্রাশ্রা।”

আনন্দে নাথকের চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে,
আবার আনন্দান্ধিতায়ো চিত্ত বিবুদ্ধও
হইতেছে। এই ভাবতী বড় হৃদয়। আমরা
ভবকুতির নাটকে এই ভাবতী দেখিতে পাই
“বিকারচৈতন্য ভ্রমযতি সমুদীলয়তি”।
সুরঙ্গী তত্ত্বা ভাষিয়াছে। কিন্তু উৎকর্ষ-
পূর্ণদৃষ্টিতে নাথকে দেখিতে না পাইয়া
নলিনিকাকে বলিলেন, “সখি! সেই নির্দয়
কি বলিয়াছিল?” নলিনিকা বলিল “সখি!
তাহা পূর্বেই ত তোমাকে বলিয়াছি।”
উৎকর্ষিতহৃদয় রাজকুমারী কি বলিতে-
ছিলেন বিশ্বস্ত হইয়া সখীকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, “সখি! আমি কি বলিতেছিলাম?”
সখী বলিল, “না তুমি ত কিছুই বল নাই।”
রাজনন্দিনীর মনে হইল, বলিলেন, “সখি
কতক্ষণ আর বলিয়া কাটাটাইব? অর্ধ-
রাত্রি ত অতীত হইয়া গিয়াছে। একবার
আমাকে আলিঙ্গন কর” বলিয়া হস্ত প্রসার
করিলেন। নলিনিকা নাথকেই ইঙ্গিত
করিলেন হইতে বলিয়া স্বয়ং পরসেবা-কার্যে
নিযুক্ত হইল। সুরঙ্গী অতর্কিতভাবে
নাথকে আলিঙ্গন করিবার পরক্ষণেই হস্তা
বৃষ্টিতে পারিলেন। লজ্জায় তাঁহার গণ্ড
আরম্ভিত হইয়া গেল।

যাহার লজ্জা এত উৎকর্ষা, এত প্রয়াস,
বিনীত রাগপ্রস্ত হইয়াও চোয়ের মত
রাজভবনে প্রবেশ করিতে সক্ষিত হইলেন
নাই, মদমত হস্তীর আক্রমণমধ্যে জীবন-

মৃত্যুর সন্ধিসময়ে যে বীজ উদ্ভ হইয়াছিল,
কল্পনায় যাহা পল্লবিত হইয়াছিল, আশ্র তাহা
সুহৃতি হইয়াছে, নাথিকার সহিত নাথকের
মিলন সংঘটিত হইয়াছে; কিন্তু একপাশ্লিলন
স্বামী হইতে পারে না, ইহার ভিত্তি যত্ন নথ,
ফণিক প্রেরণায় সংঘটিত হইয়াছে মাত,
প্রকৃতির চুল্লিয়া নিরম অতিক্রম করিতে
অসমর্থ। একপাশ্লিলন প্রকৃত মিলন নহে।
স্বর্গকার যেমন অগ্নি-পরীক্ষায় স্বর্গের
বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া তাহাতে বীজ
শিল্প প্রকাশ করে, নিমিত্তও সেইরূপ বীর শিল্প-
প্রকাশের পূর্বে অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া থাকেন,
কিন্তু এই পরীক্ষায় কয়জন উত্তীর্ণ হইতে
পারে? কবি এই মিলনের অগ্নি-পরীক্ষা
দেখাইবার আয়োজন করিলেন, মহারাণ
কুন্তিভোজ অবিমারকের কতাপুর-প্রবেশ-
সংবাদ শুনিতে পাইয়া পুররক্ষার বিশেষ
বন্দোবস্ত করিলেন। অশ্বপুত্রাদিকারী
অব্যাহত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতে
লাগিলেন। নলিনিকা প্রকৃতি সমীক্ষণ ভীত
হইল। রাজকুমার অবিমারক নিরুপায় হইয়া
কতাপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

“কুশলোকং তরলা তিড়িপি বজ্রং
নিপাতয়তি।”

রাজনন্দিনী শোকে, লজ্জায় ও ভয়ে
স্রিয়মান হইলেন আর উপায় কি?
অবিমারক কোনওরূপে কতাপুর হইতে
বহির্গত হইয়াছেন বটে, কিন্তু

“অদ্যপি শুভ্রম মনে ন তু মামুপৈতি
নাবেক্ষতে ময়ি তথা প্রিয়য়াবক্ষণং।”

প্রিয়াবক্ষণ চিত্ত এতদং বহির্গত হইতে
পারে নাই। বীর অবস্থা-পরিণতির বিষয়
চিন্তা করিতে করিতে কুমারের একবার
নাথিকার অবস্থার কথা মনে পড়িল

“বাপাবিলা মা মনবেক্ষমাণা
মোহং ব্রজেৎ রাজসু কিং করিয়ে?”
“কিং করিয়ে” ভাবিতে ভাবিতে কর্তব্য
হ্রীকৃত হইল। ভাবিলেন “প্রাপ্যান্
পরিভাজ্যামি।” দেহনিরপেক্ষা রাজকুমারীর
বধা মনে করিয়া নিজেদের দেহও উপেক্ষা
করিয়া, জীবন বক্ষণা বলিয়া মনে হইল,
প্রতিদুর্ভেদে নিরক্ষকে কৃত্য বলিয়া মনে
হইতে লাগিল, কিন্তু কেমন করিয়া দেহত্যাগ
করবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে
মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। কবি গ্রীষ্ম
কৃত্তে মধ্যাহ্নকালের একটা উৎকৃষ্ট চিত্র
প্রদান করিয়াছেন।

“অত্যাধা জরিতেব ভাষকরৈরাপীত-
সারামহী

স্বভাৱা ইব পাদপাং প্রমুখিতচ্ছায়া-
দবায়াশ্রয়াং।

বিকোশশ্যবশাদিবাচ্ছিত্ত শুভা ব্যাতাননাং।
পর্যন্তাঃ

লোকোহং রবিপাকনট্টরয়ঃ সংযাতি
মুচ্ছামিব।”

লিপ্তজিহ্বাপ্রবনঃ, সিকতাচ্যুতির্দুর্গ-
মংবেদ্যস্তি চ নগাঃ পক্ষইহং পলাঠেঃ।
দ্যেব স্ববীকৃততঃ প্রসবতী ভাষান্।

বিরহ ক্রমেই অসহ বোধ হইতে লাগিল।

কৃত্য নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে
লাগিলেন। অদূরে দাবারি দর্শন করিয়া
দাবারিতে দেহ ত্যাগ করিতে কৃতসম্বল
হইলেন। দাবারির সমীপে যাইয়া বলিলেন
উপানুচ্ছাতন!

“ইহে চেষ্টকেচিন্তানং যদ্যপি সাধয়িষ্যতি।
পরায়ণ চ মে কান্তা সা ভবেৎকেকীর্তনী।”

বঞ্চিত বলিতে অদূর হইয়া দাবারিতে
প্রবেশ করিলেন। অদূর-পরীক্ষার সমাপ্তি

হইল। কবি প্রীতির ভিত্তিতে বজ্র প্রহার
করিয়া তাহার দৃঢ়তা দেখাইলেন। প্রজলিত
বহুতে নাথকের শরীর দগ্ধ হইল না দেখিয়া
কুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন “অগ্নিদগ্ধা হি
কুরুতে মদনাত্তুরেহপি।” “কিমন্তঃ পরং
বিশ্বয়নীয়ঃ অগ্নিঃ বলু মাং ন দহত। অথবা
এতপ্যাত্তি কারণং” বলিয়া দাহভাবের কারণটী
প্রকাশ করিলেন না। অজ্ঞ উপায়ে দেহ
ত্যাগ করিয়া অসহনীয় কৃত্যের প্রতিকারপ্রয়াসী
হইলেন। অদূরে অসিতজলদবল্লভাভিত্তি শূদ্র
নানা বর্ণের গৈরিকচিত্রিত অত্যাচল পর্বত
দেখিতে পাইলেন। পর্বত হইতে পতিত
হইয়া দেহত্যাগ করিতে কৃতসম্বল হইলেন।
পর্বতের চিহ্নটী বড় হৃদয়।

“অসিতজলদবল্লভে মিশ্রগন্ধিধৃশূদ্রে।
গগনচরকুলানাং বিশ্রমস্থানভূতঃ।

স্বকবি মতিবিচিক্রো মিত্রসংযোগদগ্ধে।
নরপতিবির নীচো দৃষ্টতে নিম্নলতাঃ।”

বহুবর্ণ-সমাবেশে হেজু পর্বতটী স্বকবি-
মতির তথা বিচিত্র হইয়াছে। এই কলৌ বড়
রমণীয়, কবি-দগ্ধরজতার অতি হৃদয় পরিচয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভাস কবির
প্রাকৃতিক বর্ণনা অতি বিরল। আলোচ্য
নাটকে এই অংশ পাঠ করিলে তাঁহাদের

এই ধারণা বিনষ্ট হইবে।

অবিমারক পর্বতে আরোহণ করিয়া
পর্বতীয় শীতল জলে স্নান ও আচমন করিয়া
পবিত্র ভাবে ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এত

উৎকর্ষভেও জীবিত লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত
হয়েন নাই, নাথিকার সহিত প্রকৃত মিলনে
প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহা কামাত্তুরের ফণিক

মিলন নহে, তাই বাহ ও আন্তর শুকির
এত প্রয়োজন। বিশুদ্ধ অবস্থায় মিলনই

প্রকৃত মিলন। অবিমারক ধ্যানমগ্ন হইয়া

পর্কতোগরি সমাদীন হইয়াছেন এমন সময় আকাশপথে একটা বিদ্যাদরমিখুন মধ্যাহ্ন-নিজাহ্র চন্দ্রনগণমলয়াচলে গমনেচ্ছ হইয়া বিশ্রাম করিবার জ্ঞ উপস্থিত হইল। বিদ্যাদর-মিখুনের আকাশপথে আগমন প্রসঙ্গে কবি দূর হইতে পরিদৃষ্টমানা ধরিত্রী-দেবীর একটা স্বন্দর চিত্র দিগন্তেছেন।

“শৈলেশ্রাঃ কলভোপমা জলধঃ

কৌড়াটাকাপোম,
বৃক্ষাঃ শৈবালসরিভাঃ ক্রিত্তলং
প্রচ্ছন্ননিম্নস্থল।

সীমস্তা ইব নিমগ্নাঃ স্থবিপুলাঃ
সৌধাশ্চ বিন্মূপা,
দৃষ্টং বজ্রমিবাভিভাতি সন্ধ্যাং
সংক্ষিপ্তরূপং জগৎ ॥”

অর্থাৎ স্থবিপুল পর্কতমালা করিশিত্তর স্রায় প্রতিভাত হইতেছে। উদধি যেন কৌড়াপুষ্করিণী সদৃশ, বৃক্ষরাজী পৃথিবীর উপরিভাগে শৈবাল সদৃশ, পৃথিবীর নিম্নস্থান-সমূহ প্রচ্ছন্ন হইয়া সমুদ্রের স্রায় প্রতীয়মান হইতেছে। নদী সল সীমস্ত-লেখ্যার স্রায় প্রকাশিত, সমুদ্রগর্ভিত ক্রিত্তভোজনগরীর অত্যুচ্চ সৌধমালা বিন্মূপদৃশ, জগৎ যেন সংক্ষিপ্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। এ স্থলে “দৃষ্টং বজ্রমিবাভিভাতি” কথাটি চিন্তাগম্য। পৃথিবীকে যেন বজ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। বোঁহার গগনপথে বিচরণ করিয়াছেন উঁাহারাই ইহার বাধার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

আবার যখন বিদ্যাদর-মিখুন বেগে গগন-মণ্ডল হইতে পর্কতে অবতরণ করিতেছেন সে সময়ের চিত্রিত্য ও স্বন্দর—

“জলধগমন মুখাভী বপো-
ভদ্রপতিভী বহী শমুদ্রমুখা।

জলধ সময় ত্যোদয়া ইবামী
ভূশমভিভাতি নগা বিভূষমানাঃ ॥”

মনে হইতেছে গমুদ্র-মুখা মহীই যেন বিদ্যাদর-মিখুনের দিকে উৎকণ্ঠ হইয়াছে; পর্কত-সমূহ বিগ্ধাখ্যাপিনী মুগ্ধিতে প্রকাশমান হইতেছে।

আমরা এস্থলে অভিজ্ঞানশকুন্তল হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

মহারাজ দ্রুতস্ত মাতলির সহিত ইন্দ্রালয় হইতে বিমানে আরোহণ করিয়া মহরজালাকে আনিতেছেন, মহারাজ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন,

“শৈলানামবরোহতীব শিখরা-

দ্বয়জ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং দ্রুমহন্তি
স্বচ্ছদায়াং পাদপাং।

সস্তানান্তহভাব নষ্টগলিলা ব্যক্তিং
ভদ্রস্থাপাং
কেনা প্যুৎক্ষিপতেব পতন্তব্যং

মৎ পার্শ্বানীযতে ॥”
এই শ্লোকের চতুর্থ চরণ ভাস্কর-বর্ণিত অভিপত্ততীর কথারই ব্যাখ্যাস্থানীয়। বিশ্রামার্থী হইয়া বিদ্যাদরমিখুন সেই পর্কতে অবতরণ করিল। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজকুমার অবিমারকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের পরস্পর আলোপে উভয়েই আপাতাভিহেলেন। বিদ্যাদর স্বীয় বিদ্যা-প্রভাবে জানিতে পারিলেন কুমার অবিমারক অগির পুত্র, কিন্তু আশ্চর্যবৃত্ত হইয়া বাঁধ মাহাঘোষের উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না; রাজনন্দিনীর লাভে নিরাশ হইয়া জীবন বিনাশে উদ্যত হইয়াছেন। নায়কের অবস্থা দর্শন করিয়া বিদ্যাদরের কণ্ঠের স্ফার হইল। বিদ্যাদর রাজকুমারের সহায় হইলেন, বৈশ্য-চলনের অপভ্রান্ত সম্পাদক একটা অস্বীয়ক প্রদান করিয়া কুমার অবিমারককে অস্বগ্রহীত

করিলেন। অস্বীয়ক লাভ করিয়া কুমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, বাধা প্রদান করিয়া বিদ্যাদর বলিতেছেন—

“ন ন অহমেবাশ্বগ্রহীতাঃ কৃতঃ

ন তথা রত্নমাসাদা স্বজনঃ পরিতুচ্ছতি।
যথা তৎ তদগতাকাঙ্ক্ষ্যে পায়ে দত্তা প্রদ্রব্যাতি”
রাজকুমার। তুমি অস্বগ্রহীত নও, বসন্তঃ আমিই অস্বগ্রহীত হইলাম। সজ্জন রত্নলাভে তত্তদ্বর আনন্দিত হইয়েন না, রত্নপ্রার্থীকে সেই রত্ন প্রদান করিয়া যেমন আনন্দিত হইয়া থাকেন। এইরূপে রাজকুমারকে অস্বগ্রহীত করিয়া বিদ্যাদর বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালীন বিদ্যাদরের উক্তি বড় রমণীয়—

“সধো মম প্রতিনিবেদয় মামিমাং চ

অং মামদ্বন্দ্বর সখে! গতিরীক্ষাভাং মে।”
রাজকুমার, তুমি আমার স্বখীর নিকটে আমার ও আমার সহচরীর প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইবে, তুমিও আমাকে মনে রাখিবে হইয়া

অবিমারক কৃতার্থমগ্ন হইয়া পর্কত হইতে অবতরণ করিলেন, অবতরণ পরিশ্রমে, শ্রান্ত হইয়া আশ্রিত দূর করিবার জ্ঞ একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এদিকে কুমারের অকৃত্রিম বদ্ধ বিদ্যুক কুমারের বিরহে ব্যাকুলিভিচ্ছ হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্যাহরে অমিশ্রায় চতুর্দিকে ধাবিত হইতেছেন, কোপাঘ ও মাহাঘোষের উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না; রাজনন্দিনীর লাভে নিরাশ হইয়া জীবন বিনাশে উদ্যত হইয়াছেন। নায়কের অবস্থা দর্শন করিয়া বিদ্যাদরের কণ্ঠের স্ফার হইল। বিদ্যাদর রাজকুমারের সহায় হইলেন, বৈশ্য-চলনের অপভ্রান্ত সম্পাদক একটা অস্বীয়ক প্রদান করিয়া কুমার অবিমারককে অস্বগ্রহীত

শৃঙ্খনে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই পর্কতের নিকটে আসিয়াছেন। শরীর ও মন স্নাত। একই বিশ্রাম করিবার জ্ঞ একটা বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন, ক্রমে নিজায় অভিভূত

হইলেন। রাজকুমার ঘটনাক্রমে বিদ্যুৎকের সঙ্গীপবর্তী একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছেন, প্রাণাধিক বয়স্কর কথা মনে পড়িয়াছে, ভাবনায় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, মনে হইল সেই সরলহৃদয় ভ্রাতৃরাজকুমার যদি আমার সংবাদ না জানিতে পারিয়া থাকে, তবে হয়ত তাহার প্রাণশংশয় উপস্থিত হইবে। হায়! তেমন অকৃত্রিম বন্ধকে হারাইলে আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি?

“গৌণীয হাতঃ সময়েষু যোগঃ
পোকে গুরুঃ সাহসিকঃ পরেষু।
মহোৎসবে যো হৃদি কিং প্রলাপৈ-
ধিবা বিজ্ঞতঃ ধনু মে শরীরঃ ॥”

বিদ্যুৎকের প্রতি নায়কের একগু অহুগাপ আমার অঙ্গ নাটকেই দেখিতে পাই। রাজকুমার উৎকণ্ঠিতচিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিষ্কোপ করিতে করিতে বৃক্ষতলে শয়ান একটা পথিককে দেখিতে পাইলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এ পথিক আর কেহ নয়, তাহারই প্রিয় বয়স্ক। রাজকুমার ক্রান্ত-গুণিতে বিদ্যুৎকের সমুখীন হইলেন, বিদ্যুৎকের নিজা ভাবিল, উভয়ে উভয়ের স্বেহালিঙ্গনে বিরহশোক পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে বিরহ-ব্যাকুলিতা রাজনন্দিনী কুসরী প্রতিমূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। সখীবৃক্ষ নানা উপায়ে কুসরীর চিত্ত-লিপ্তনামের প্রকাশ করিয়া দিগন্তে, প্রাণাদে আরোহণ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে কি যেন দেখিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎক-লিঙ্গিত নীল সিদ্ধ জলধর স্বর্ঘ্যবিধ আবৃত করিল, মেঘ বেধিয়া কুসরীর চিত্তে কত কি ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এমন সময় বয়স্কর সহিত রাজকুমার অস্বীয়কপ্রভাবে কল্যাণচলন অভিক্রম করিয়া কতাপুর-প্রাঙ্গণের সমুখীন হইলেন।

অবিমারক দূর হইতে কুরঙ্গীর বিরহরষ্ট
মৃগধনি দেখিতে পাইলেন। বিমুক্তভূষা
হাবভাবশূভা নির্বাণমনোহরাকী কুরঙ্গী যেন
হেতুবদ্ধিত বৈদগ্ধতির জায় প্রতীয়মানা
হইল। নায়ক বলিতেছেন—

“রোগাদকালগুণচন্দ্রান্দ্রী,

বিমুক্তভূষা গভাবাবনা।

বিভাতি নির্বাণমনোহরাকী,

বৈদগ্ধিত হেতুবৈদগ্ধিতবে।”

হেতুবৈদগ্ধিত বৈদগ্ধিত কথাটিতে যে
কত ভাব নিহিত আছে, তাহা বলিয়া
বুঝাইবার নহে।

অদুরীক-প্রভাবে অলক্ষিতগরীর রাজ-
কুমার নিশাধচিত্তে বিদগ্ধকের সহিত কথাপুরে
প্রবেশ করিলেন। ক্রমে কুরঙ্গীর সমীপবর্তী
হইয়া দেখিলেন, রাজকুমারী একাকিনী
আকাশে দৃষ্টদৃষ্টান করিয়া বসিয়া আছেন,
কি যেন এক ভাবতরঙ্গে নায়িকার চিত্ত বেগে
স্পন্দিত হইয়া উঠিল, হঠাৎ উঠিয়া পাড়াইলেন,
অলক্ষিতভাবে একটা কথা নায়িকার মুখ
হইতে উচ্চারিত হইয়া তীব্রভাবে রাজ-
কুমারের চিত্তে বিদ্ধ হইল। নায়ক বুকিলেন
রাজকুমারী আশ্চর্যভাষা উদ্‌ঘুস্তা হইয়াছেন।
অবিমারক আর সহ্য করিতে পারিলেন না,
অদুরীককী দক্ষিণ হস্ত হইতে বামহস্তে ধারণ
করিয়া ক্রমগতিতে যাইয়া কুরঙ্গীকে আশ্রিত
করিলেন।

সৌরীয়ারাজ গৃহীণাশে চতালত্ব প্রাপ্ত
হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কৃষ্ণভোজ নগরে-বাস
করিতেছিলেন, শাপাবদানে কৃষ্ণভোজ-রাজের
সহিত সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে উভয়কে
প্রেমালিঙ্গনে তৃপ্ত করিলেন। এই স্থলে
কৃষ্ণভোজের উক্ত বড় মধুর—

“কিং প্রেক্ষণমুমে মৃগ চিত্রকালদুষ্টো
গাঢ় পশিষঙ্গ সখে।”

প্ৰীত্যা ভবন্তমনিমেষমবৈকিঞ্চু মে;

যেহানবীকৃত ইব্রাজ বয়স্তাভাবঃ।”

সৌরীয়ারাজ দীর্ঘকাল পুত্র অবিমারকের
অদর্শনে ত্রিযমান হইয়াছিলেন। আজ পরম-
সুখের কৃষ্ণভোজের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে
হৃদয়নিহিত শোকরাশি উৎখলিত হইয়া
উঠিল, অশ্রুসংবরণ করিতে করিতে সৌরী-
রাজ বলিলেন—

“যো মে পুত্রগতঃ শোকো

হৃদয়স্থো বিদুস্তে।

সোহ্য লক্সা সহায়ঃ ষাং

বাপ্পরূপেণ নির্গতঃ।”

এই শ্লোকটি পাঠ করিলে পতিশোকাকুল
রুতির “বিবৃত্তদ্বারবিষোপজায়তে” কথাটি
মনে পড়ে। কৃষ্ণভোজ সৌরীয়ারাজের মূখে
পুত্রশোকের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলে
সৌরীয়ারাজ স্বীয় আশ্রিত বৃত্তান্ত কৃষ্ণভোজ-
রাজকে শুনাইলেন। মহারাজ কৃষ্ণভোজ
অবিমারকের বহু অসুখদান করিলেন, কিন্তু
কোনই ফল হইল না। অতঃপর দেবগ্নি নায়ক
আসিয়া সমস্ত রহস্ত উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন।
কৃষ্ণভোজরাজ পরম প্রীত হইয়া স্বীয় তনয়া
কুরঙ্গীকে সৌরীয়ারাজকুমার অবিমারকের
সহিত বিবাহ দিলেন। বিবাহের সময়
অবিমারকের প্রতি কৃষ্ণভোজের আশীর্ষক
বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

“কময়া জয় বিপ্রেদ্রান্ন দয়য়া জয় সংশ্রিতান্।

তত্ত্ববাক্য জয়াত্মানং তেজস্বা জয় পার্থিবান্।”

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য-

বেদান্ততীর্থ।

ইংলণ্ডে ভারতীয় সাহিত্য-প্রচার

পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্যের আদর, প্রাচ্যের
প্রতি সম্মান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।
বর্তমান সময়ে ইংলণ্ডে বিভিন্নবিষয়ক যতবিধ
আন্দোলন চলিতেছে, ভাবতরঙ্গকে বিশ্ববার
ভারতের অতীত-বর্তমানকে সম্যক অবগত
হইবার আন্দোলন তাহাদের অন্তর্গত।

এই আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডে ভারতীয়
সাহিত্যের প্রচার দিন দিন বিস্তৃত হইয়া
পড়িতেছে। এটা শুভ লক্ষণ। কারণ
সাহিত্য জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-রাষ্ট্র,
শিল্প-বাণিজ্য, কলা-কৌশল প্রভৃতি সমস্ত
বিষয়ের দর্পণস্বরূপ। একটা জাতি কোন্
রূপে বিভিন্ন বিষয়ে কিরূপে উৎকর্ষ বা
অপকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সেই জাতীয়
জীবন-সমুদ্রে কখন কিরূপ বৈচিত্র্য-
ময় চরিত্র-তরঙ্গ উথিত হইয়াছিল, তাহা সেই
জাতির সাহিত্য আলোচনা না করিলে
জানিতে পারা যায় না।

আমরা ভারতবাসী, আমাদের জাতীয়
জীবন অবগত হইতে হইলে, সমগ্র জগতের
নিকট বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের
কিরূপ স্থান নিধিবে হইয়াছিল, তৎসংক্ষেপে জান
লাভ করিতে হইলে এবং আমাদের
জাতীয়-জীবনের বিশেষত্বের সন্ধান লইতে
হইলে আমাদের সাহিত্য-সম্পদ বিস্তৃত
ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

প্রায় দেড়শত বৎসরেরও অধিক হইল
ইংরাজগণ ভারতে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু
এতদিন তাঁহারা ভারতের জাতীয়-জীবনের
প্রতি, ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি এক প্রকার

অনায়াহী প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।
বর্তমানে তাঁহাদের সে ভাব আর নাই, এখন
তাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র, সাহিত্য-
কলা প্রভৃতি অবগত হইবার জন্ত সচেষ্ট
হইয়াছেন। পক্ষান্তরে তাঁহারা বুঝিয়াছেন
যতই তাঁহারা এই সকল বিষয় অবগত
হইবেন ততই তাঁহারা ভারতবাসীর স্ব-স্ব-
আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কৰ্ম ও চিন্তা-প্রাণালীর
সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ
করিবার জন্ত বর্তমান সময়ে মিঃ হে, ডি,
ম্যাগারিন বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।
প্রধানতঃ দুই উপায়ে তথ্য ভারতীয় সাহিত্য
প্রচারিত হইতেছে। প্রথমতঃ ইংরাজী
ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের অর্থবাদ,
দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চ ইংরাজীতে
শ্রুণ্বিত ভারতীয় নাটকের অভিনয়-প্রচলন।
শেখোক্তীর চিত্তাকর্ষণী শক্তি প্রাচ্যসাহিত্যের
প্রতি তাঁহাদের অগ্রগণ্য বৃত্তি করিতেছে।
নাটকের অভিনয় প্রচলন বিষয়ে শ্রীযুক্ত
কোনারনাথ দাস গুপ্তের কাণ্ড বিশেষ ভাবে
উল্লেখযোগ্য।

এছলে ইহা উল্লেখ্য যে ইউরোপে জাৰ্মান-
গণই ভারতীয় সাহিত্য এবং পুরাতত্ত্বের প্রতি
সর্বাধিক অধিক সমাদর প্রকাশ করিয়া
আসিতেছেন। এখানেই সংস্কৃত সাহিত্যের
চর্চা অধিক। পাশ্চাত্য জগতে জৰ্মানিতেই
ভারতীয় নাটকের অভিনয় অধিক হইয়া
পাকে। প্রায় ২০১২ বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় রমেশ-
চন্দ্র দত্ত জৰ্মানির উৎসবাবলোকে ও ফ্রাঙ্কফোর্ট

নগরে দোকানে দোকানে সংস্কৃত 'মুছকটিক' নাটকের জাৰ্মানী অধ্বাদ 'বসন্তসেন' নামে বিকীত হইতে দেখিয়াছিলেন। এখানকার জনসাধারণের নিকট ইহা স্বপরিচিত ছিল।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম মহাকবি কালিদাসের অতুল সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন নাটক 'শকুন্তলা' ইংরাजीতে অনূদিত হইয়া অভিনীত হয়।

ইংলণ্ডে ভারতের অতুলনীয় সাহিত্য-সম্পদের কথা বহুই পৌছিতে লাগিল, ততই ইহা উপভোগের স্পৃহা তাহাদের বলবতী হইতে লাগিল এবং ইহার ফলে ভারতের মহাকবি কালিদাসের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাই কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক 'শকুন্তলা' সর্বাঙ্গে অভিনীত হইল।

লণ্ডনের 'রয়াল বোটানিক সোসাইটী' (Royal Botanic Society) উদ্ভাদে এলিজাবেথান টেব্র সোসাইটী (Elizabethan Stage Society) এই অভিনয় প্রদর্শন করেন। 'শকুন্তলা' সর্বপ্রথমে সার উইলিয়াম জোস কর্তৃক ইংরাजीতে অনূদিত হয়। যে সময়ে ইহা অভিনীত হয়, তখন ইহার মাত্র দুইটী ইংরাजी অধ্বাদ ইংলণ্ডে বিজ্ঞান ছিল। প্রথমটী সার রোয়াল ক্রুত এবং দ্বিতীয়টী সার মনিয়ার উইলিয়ামস ক্রুত। কিন্তু এই দুইটী অধ্বাদের কোনটাই রসমঞ্চের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল না। অবশেষে সার জোসের 'শকুন্তলা'ই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে অভিনীত হয়।

এই সময়ে লণ্ডনে রোশচন্দ্র দত্ত, ভাঙ্কার মল্লিক, শ্রীমুক জি, সিংহ এবং আরও অনেক ভারতসুস্থান উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অভিনয়ের সঙ্গীতীন হুস্পন্নতার লব্ধ বিশেষ

সহায়তা করিয়াছিলেন। এইজন্য টেব্র কর্তৃক ইহাদিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শ্রীমুক জি, সিংহ তখন লণ্ডনে ছাত্ররূপে অবস্থান করিতেছিলেন, ইনি দৈনিক কর্তব্যের জ্ঞানী না করিয়া কৃত-অবসর সময়ে অভিনেতা-দিককে সাজ সজ্জা, ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতি নাটককার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অভিনয়ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের বহু বিশিষ্ট স্থানান উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নে 'শকুন্তলা' সপক্ষে ইংলণ্ডের কয়েকটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের অভিমত উদ্ধৃত করা গেল।

'ষ্টাণ্ডার্ড' লিখিয়াছিলেন "শকুন্তলা বিদ্যমান নাটকসমূহের মধ্যে শুধু যে অতি প্রাচীন তাহা নহে, ইহা অত্যন্ত মধুর ও চিত্তাকর্ষক।" 'ডেইলি মেল' বলিয়াছিলেন "ইহাকে অভিনয় না বলিয়া স্বন্দর, মরম ও মনো-মুগ্ধকর কবিতা বলা যাইতে পারে।" 'ডেইলি ক্রনিকল', বলিয়াছেন "শকুন্তলার নাটকীয় প্রভাব একেবারেই বর্তমান যুগোপযোগী।"

১৮৯২ অব্দের গ্রীষ্মকালে ঐ সোসাইটী কর্তৃকই কেথ্রিঙ্গে দ্বিতীয়বার 'শকুন্তলা' অভিনীত হয়।

প্রথম বারের অভিনয় অপেক্ষা এই অভিনয় আরও অনেক বিধে সাফল্য লাভ করিয়াছে। অভিনেতৃগণের কলাকৌশল প্রদর্শন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গোক্ত অনেক উৎকর্ষ ঘটিয়াছে। এবং ইংলণ্ডবাসীর প্রাচ্য নাট্য-সাহিত্যের রস-গ্রাহিতারও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। আর একটী প্রধান উপকার হইয়াছে এই যে, ইতিপূর্বে তথাকার শিক্ষাবিভাগীয় যে সকল মনীষী প্রাচ্য সাহিত্যের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা শু

নাট্য-সাহিত্যে নহে, ভারতের সকল প্রকার সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

ইংলণ্ডে নাটকীয় সমালোচনার জ্ঞান হস্তপ্রাপ্যত পত্রিকা 'মানুচেষ্টার গার্ডিয়ান' এই অভিনয় সপক্ষে বলেন "এই অভিনয় দর্শনে দর্শক অসামান্য কাব্য-সাহিত্য উপভোগ করিতে থাকেন।"

এই অভিনয়ের সৌষ্ঠবদ্বাধানে শ্রীমুক পি, কে, রায়ের এবং পি, এন্স, রায়ের পত্নী বিশেষভাবে সাহায্যতা করিয়াছিলেন।

ইহার পর 'শকুন্তলা'র আরও কয়েকটি অভিনয় হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী পত-পূর্ণ লঙ্ঘন্যাবৃত্তে শ্রীমুক কোরানোথ দাস গুপ্তের উদ্ভোগে বিলাতের 'রয়াল আলবার্ট হল' থিয়েটারে অভিনীত হয়। কোরান বাবু ছাশিগ প্রকার বিভিন্ন অধ্বাদ হইতে সংকলন করিয়া এই উপাদেয় সংস্করণ প্রস্তুত করেন। এই অভিনয়ে রায়গুয়ারের মহারাণা, জাৰ্মানির রাজপুত্র, সার্ডিয়া এবং দেমাকেরের মন্ত্রী এবং বিলাতের অনেক সমাজ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজী সকলেই অভিনয় দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই অভিনয়ের অধিকতর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯১২ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহারই উদ্ভোগে রয়াল কোর্ট থিয়েটারে এডউইন আরনক্ল ক্রুত 'লাইট অফ এগিস' নামক ইংরাजी গ্রন্থ হইতে শ্রীমুক এন্স, সি বহু কর্তৃক সফলিত ব্যবহৃত অভিনীত হয়।

এই অভিনয়টী এত উপাদেয় হয় যে, এক সপ্তাহকাল দখিয়া প্রত্যহ ইহার অভিনয় চলিয়াছিল।

এই বৎসরই জুন মাসে শ্রীমুক দাস গুপ্তেরই আয়োজনে আলবার্ট হল থিয়েটারে শ্রীমুক বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'আর্য্যভট্টের মহারাণী'

অভিনীত হয়। ইহা আরও মধুর এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এই মাসে বিলাত-প্রবাসী কতিপয় ভারতীয় ছাত্র কর্তৃক বকিম হইয়া 'জুর্গেশনন্দিনী' নাট্যকাব্যের প্রণীত হইয়া 'আয়েশা' নামে লণ্ডনের হুইটনী থিয়েটারে অভিনীত হয়।

শ্রীমুক দাস গুপ্ত বিলাতে ভারতীয় নাট্যের প্রতি তত্বেতা জনসাধারণের আগ্রহ ও অস্বরাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু চেষ্টা ও শ্রম করিতেছেন। নাট্যকান্ডিনয়ের মধ্য দিয়া ভারতীয় কলা ও সভ্যতার প্রচারই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য।

নাটকের প্রচার বিষয়ে অধ্যাপক এ, ডবলিউ রাইজারের কাঁধও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ইংরাजी ভাষায় অনূদিত 'লেক্সিকনমুহ' অল্প মূল্যে বিকীত হইতেছে। বার্লীই ইহার বহুল প্রচার সাধিত হইতেছে।

নাট্য-সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে তথায় ভারতীয় কলাও বেশ প্রচার হইতেছে।

বর্তমান সময়ে শ্রীমুক বরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরাजीতে অনূদিত কবিতাগুলি এবং গীতা-গুলীর প্রচার ইংলণ্ডের সাহিত্যিক সমাজে ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা বিষয়ে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার পত্নীর-চিত্রিত প্রস্তুত কবিতাগুণমূহে ভারত-প্রকৃতি চিত্রিত।

এতদিন দখিয়া ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি ইংলণ্ডবাসীর যে অস্বরাগ উদার অস্পষ্ট ভাব দাবণ করিয়াছিল, প্রাচ্য রবির কিরণ-জাল তাহাকে সম্যক উজ্জ্বল করিয়াছে। ইহাতে শুধু ইংলণ্ডে নহে, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি অপরূপ অস্বরাগের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুদায় সাহিত্য জগতের অস্বাভ উচ্চ সাহিত্যের দ্বায বহু সম্মান লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রচারণার পূর্বেই ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয় সাহিত্য মুদ্রমন্ডলভিত্তিতে যেপ্রকারভাবে প্রচারিত হইয়াছে এবং বর্তমান সময়ে অজ্ঞাত থাওয়ার এই প্রারম্ভ-কারণে ত্রুটি রহিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের অস্থবদ অনেক হইয়াছে। সকলপ্রকার আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এতদ্ব্যতীত ভারতের মূল সাহিত্যও তৎকালীন অনেকে পড়িয়া থাকেন কিন্তু এই গুলির অধিকাংশই বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, জনসাধারণের নিকট অপরিচিত এবং দূরবিদ্যমান। দেশের ইতিবৃত্ত বা সামাজিক, নাটক, উপন্যাস অথবা গল্পরাশির আকারে যত সরস এবং চিত্তাকর্ষক হয় ও জনসাধারণের নিকট পৌঁছিতে পারে, স্নানীর বিবশী তাহা পারে না। শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক কিংবা অঙ্গদ্বন্দ্বনবাবী প্রভৃতি বিশেষকোন শ্রেণীর পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় এবং উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের নিকট তাহা অনাবশ্যক, অসুচিতর এবং অনেক স্থলে দুর্বোধ্য হইয়া থাকে।

পরলোকগত লালবিহারী দেবের Folk-tales of Bengal বা বাঙ্গালার উপকথা পড়িয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ বদ্ব্যবসায়ী এক সময়ের অতি স্পষ্ট সামাজ্য-চিত্র পাইয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহাদের নিকট ইহার আদর দিন দিন এত অধিক হইয়াছে। কেবল ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং বাক্য-বিশ্রাসের মনোহারিতার জন্য তাঁহার এই গ্রন্থের আদর করেন তাহা নহে, বাঙ্গালীর নৈনিক জীবন-যাপন ইহাতে মনুভাবো অতি আছে বলিয়াই ইহার এত সমাদর। শ্রীযুক্ত এণ,

বি, বনার্জি প্রণীত বঙ্গকাহিনীও এই শ্রেণীর গ্রন্থ। নিক্টার এফ, এইচ স্মাইন কিছুদিন হইল Tales of Bengal নাম দিয়া ইংরাজী ভাষায় ইহার অস্থবদ করিয়াছেন।

ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভ বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবেরা নিরীহ প্রজাগণের উপর যে পাশাবিক অত্যাচার করিয়া দেশের মধ্যে হাংসারের সৃষ্টি করিয়াছিল স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে তাহা প্রকটিত। রেডারও জে, লং কর্তৃক তাহা ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বলিয়াই ইংলণ্ডের জনসাধারণ নীলকরদিগের এই বীভৎস আচরণের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রসেন', 'আনন্দমঠ', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রভৃতি গ্রন্থও ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রজনীন্দ্রন সেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীপ্রণীত 'বাগিনীকীর জুহু' এবং 'কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর 'রসিনারা' ইংরাজী ভাষায় অস্থবদ করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বপ্রণীত অনেকগুলি উপন্যাস ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ বিভিন্ন-মুদ্র-চিত্র-পূর্ণ বহু মূল এবং ভাষান্তরিত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট পৌঁছিতেছে।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' এবং 'সত্য' ইংরাজীতে অস্থবদ করিয়াছেন। পোদ্দুমতী পুরাণ-কথিত সত্যী দেহত্যাগ-কাহিনী অবশ্যম্বে লিপিত।

'সত্য' পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যসামাজ্য স্বপ্নর অতীত হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত হিন্দু-সমাজের একটি উজ্জল চিত্রের আদর্শ দেখিতে পাইবেন। তাহার দেখিতে পাইবেন—পতিই হিন্দু রমণীর শ্রেষ্ঠ দেবতা, পতির স্বপ্নপত্নীর দেহ-ধারণ; পতিকের বাদ দিয়া বস্ত্র-ভাবে জগৎপূজাভাগের জন্ম দেহ-ধারণের আবশ্যকতা হিন্দু রমণী উপলব্ধি করিতে পারে নাই, পতির স্বপ্নই হিন্দু রমণীর স্বপ্ন এবং পতির জন্মেই দুঃখ। সত্য এই পাকি-উজ্জল মূর্তিমতী আদর্শ। পতিপরায়ণতার উজ্জল আদর্শ জগতের সমুখে স্থাপন করিবার জন্যই তাঁহার জন্ম-প্রসঙ্গ। পতি-বন্দনা-শ্রবণে কাতরা হইয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। একগুণ ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের অনাবিল আদর্শ পৃথিবীর অজ্ঞ কোনও জাতির সাহিত্যকে অলঙ্ঘ্যত করিয়াছে কি না জানি না।

যে যুগে পাশ্চাত্য রমণীগণ পুরুষ-শাসন ছিন্ন করিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোষণা করিতেছেন, সেই যুগে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় স্ত্রীজাতির এই অপূর্ণ মাদুর্য্যের আদর্শ তাঁহাদিগের সমুখে স্থাপন করিতেছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

পাশ্চাত্যের ভোগ-জগতে প্রাচ্যের ত্যাগ-বাণী আজ নূতন প্রচারিত হইতেছে না। ভারতের বৈশ্বাস্ত্রদর্শন পাশ্চাত্য জগতে যে গভীরতমসমূহ প্রচার করিতেছে, বিবেকানন্দ তাঁহাদের ভোগপ্রবণ বিজ্ঞান-জগতে ভারতের যে আধ্যাত্মিকতা এবং নিকাম ধর্ম্ম-ধারণ; পতিকের বাদ দিয়া বস্ত্র-বর্তমান সময়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য যাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছে, ইহাও তাহারই অল্পতম প্রতীক্ষণ।

এই সাহিত্য-প্রচার ইউরোপীয় ভাব-জগতে একটি নূতন রকমের বিপ্লব সৃষ্টি করিতে চমিয়াছে। বহু প্রকারে ভারতীয় স্ববাহন আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজের লক্ষ্য-গোচর হইতেছে। বোধ-হয় অদূর-ভবিষ্যতেই ভবিষ্যতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের মহাবাক্য সফল হইবে। আমরা সেই মহাবাক্য নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম—

"যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিকাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেইদিন মহাযা দেবতা হইবে; তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিকাম প্রয়োগ ভিন্ন সমাক্ষ প্রয়োগ হইবে না।"

শ্রীতরুণোপাল দাস।

হস্তীর জীবন-যাত্রা

সাহিত্য

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

হস্তী প্রকাণ্ড জীব হইলেও ইহাদের সহ্য করার শক্তি অতি অল্প। এ বিষয়টি অনেক জানেন না বলিয়া ইহার প্রতি অনেকের আসে দৃষ্টি নাই। লোকের ধারণা

হস্তী খুব বলশালী। অনেক সময় এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহাদের উপর অনেক কাণ্ডের ভার চাপান হয়। ইহার ফলে ইহার অচিরেই বোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। ভারবহনকারী অজ্ঞাত জন্তুগুলি লোকালয়ে লালিত পালিত হয় বলিয়া হস্তী অপেক্ষা অধিকতর কষ্টগরিম্বু হইয়া থাকে। হস্তী অনেক বৎসর পর্যন্ত ছিটামত বনে বনে চরিয়া বেড়ায় বলিয়া ইহার বৈশী কষ্ট-সহিষ্ণু হইতে পারে না। বন হইতে ইহা-নিগকে ধৃত করিবার পর ইহা নিগকে কার্য্য করিতে শিখান হয়। এইরূপ কার্য্য শিক্ষা দিবার সময়ও ইহাদের প্রতি সম্পূর্ণ যত্ন লওয়া হয় না এবং সময়ে সময়ে ইহাদিগের খাওয়া ইহাদের ক্ষমতাতীত কার্য্যও করা ইয়া লগা হয়। এই সমস্ত কারণে হস্তীর মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। হস্তীসামীর কেবল-মাত্র হস্তীপরিচারকের উপর আদেশ দিলে চলিবে না; আদেশগুলি প্রতিপালিত হইতেছে কি না বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। অনেক সময় পরিচারকের আলস্তপরবশ এবং পরিশ্রম-কাতর হইয়া হস্তীর প্রতি আদৌ যত্ন লয় না। হস্তীও ধীরে ধীরে রোগাক্রান্ত হইয়া কালের কয়লাগ্রাসে পতিত হয়।

ব্রহ্মপ্রদেশে বনবিভাগে নিযুক্ত হস্তীগুলির জীবনই মহাগ্রামের প্রতিষ্ঠা। যদি হস্তী মরিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহাদের টাকা উঠাইয়া লইবার আর কোনও উপায় থাকে না। ইহাদের মৃত্যুসংখ্যা বৎসরে শতকরা ১০ হইতে ২০ পর্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ ইহাদের দ্বারা নিয়মিতরিত্তি কার্য্য করা ইয়া লইতে পাওয়া হয় এবং ইহাদের শরীরের প্রতি আদৌ দৃষ্টি করা হয় না। রেঙ্গুন এবং মৌলমেনে হস্তীকে অনেক উত্তাপ সহ্য করিতে হয়। এখানে ইহার সান্নাধ্যতঃ সকালে তিনঘণ্টা এবং বৈকালে তিনঘণ্টা কার্য্য করিয়া থাকে।

পরিচালকের সাহায্য একটু বিবেচনা-শক্তি থাকিলে হস্তী প্রায়ই রুগ্ন হয় না। যে হস্তী যেরূপ বলবান সেই হস্তীকে সেইরূপ কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। কোনওরূপ পীড়ার স্বরূপাত দেখিলে প্রথম হইতেই বিশেষ যত্ন লইতে হইবে, নতুবা একবার যদি ইহাদের শরীর রুগ্ন হইয়া যায় তাহা হইলে শীঘ্র স্থব করা যায় না।

গতি

হস্তী দ্রুত কিংবা অশ্রের দ্বারা কখনে চলিতে পারে না। ইহার একেবারেই লক্ষ্য দিতে পারে না। ৬, ৭ ফিট প্রশস্ত গর্ভগুলি পর্যন্ত ইহার লাফাইয়া পার হইতে পারে না। ভাল বাস্তা হইলে ইহার বোঝা লইয়া ঘণ্টায় তিন মাইল চলিতে পারে।

বিশ্রাম ও নিদ্রা

হস্তীকে এক সময় অধিক কার্য্য করিতে হইলে, বিশ্রামের সময় কিছু বেশী করিয়া দিতে হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হস্তীর নিদ্রা অতি অল্প। ঐই অভ্যস্ত নিদ্রায় যাহাতে কোনও ব্যাঘাত না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া একান্ত কষ্টব্য। কার্য্যক্ষেত্রে হস্তীকে পাশ্চাত্ত্যদান বেশী বিলম্ব করা মাছবিদগের উচিত নহে। এই বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। যাহাতে রাত্রি ১২টার পূর্বে ইহাদের খাদ্য চর্ষণ শেষ হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বিশ্রামের জন্ত ইহাদিগকে প্রস্তরশূন্য সমতল স্থান নির্দেশ করিয়া দিতে হয়।

শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিবার ক্ষমতা

পূর্বেই বলা হইয়াছে হস্তী রাক্ষিতে চরিয়া বেড়াইতে ভাল বাসে। ইহার স্বর্ণ্যে

উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। যতদূর সম্ভব ইহাদের দ্বারা রাক্ষিতে এবং খুব প্রত্যয়ে কার্য্য করা ইয়া লওয়া উচিত। এই সময় ইহাদের দ্বারা অল্প সময়ের অধিক কার্য্য পাওয়া যায়। রৌদ্রে বাঁধিয়া রাখিলে ইহার বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করে এবং সর্বদা পায়ের দ্বারা বাঁধা ছুঁড়িতে থাকে এবং পাত্তাবরণের দ্বারা মস্তক ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। বাহাদুরি কাঠের কারখানায় নিযুক্ত হস্তীর রৌদ্রে অধিক কার্য্য করিতে হয়। ইহার প্রাতে ১১টা পর্যন্ত এবং বৈকালে ১টা ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত সাধারণতঃ কার্য্য করে। কলের ম্যাসিন খারাপ হইলে এবং কার্খাদি নষ্ট থাকিলে ইহার একটু বিশ্রামলাভ করিতে পারে। এইরূপ ভাবে সময়ে সময়ে বিশ্রাম-লাভ করিতে পারে বলিয়া ইহার কিছুদিন ঝাঁকি থাকে, নতুবা ইহাদের মৃত্যু-সংখ্যা আরও বেশী হইতে এবং ইহাদের দ্বারা আর কার্য্য-প্রাপ্তনের কাজ চলিত না।

হস্তীকে গ্রীষ্মকালে প্রথম স্বর্ণ্য-কিরণে কার্য্য করিতে হইলে ইহাদের চোখের উপর ভিজা কাপড় বুলাইয়া ঘাড় ও মস্তক পাতলা বস্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া উচিত। সুস্থিমান হস্তী-পরিচারক তাহাদের পরাগড়ী হস্তীর মস্তকের উপর বিস্তার করিয়া স্বর্ণ্যোত্তাপ হইতে ইহাদের মস্তক রক্ষা করে। রুগ্নিতে হস্তীর শরীরের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রাজিকালের ঠাণ্ডা বাতাস ইহাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক। যে সময় অনাবৃত স্থান দিনের বেলায় স্বর্ণ্যকিরণে উত্তপ্ত হয় এবং রাক্ষিতে যেখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হয়, সে সময় স্থানে হস্তী রাখিলে হস্তীর নানারূপ পীড়া হইতে

দেখা যায়। প্রকৃতিজাত বৃক্ষাদি যদি ইহাদের শরীর স্বর্ণ্যোত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে যাহাতে স্বর্ণ্যোত্তাপ হইতে ইহাদের শরীর রক্ষা পায়ে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত। যেখানে হস্তী রক্ষিত হয়, সেখানে জল-নির্গমের হুম্বর ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে সময় হস্তী কাঠ-প্রাপ্তনে কার্য্য করে তাহাদের জন্ত উপযুক্ত আবরণ প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। এই সময় আবরণ যাহাতে উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত হয় এবং যাহাতে ইহার মেজে পাকা এবং ঢালু হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। তথায় ময়মূত্র-নিসারণের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয় এবং হস্তী-বন্দনের জন্ত বস্তকগুলি শুল্ক খুঁটি পুতিয়া রাখিতে হয়। হস্তী-পরিচারকদের জন্তও নিকটবর্তী স্থানে এককণ্ডুলি চালা করিয়া দেওয়া উচিত; কর্তব্য করিলে সল সময় ইহার হস্তীর প্রতি যত্ন লইতে পারে।

যে সময় স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতিজাত খাত, স্থানের ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত আশ্রয়স্থান না থাকে, সে সময় স্থানে হস্তীর থাকিবার বন্দোবস্ত না করিলেই ভাল হয়। হস্তীকে উত্তম স্থানে যত্নের সহিত রাখিতে পারিলে রোগ-পীড়া স্বল্প, কম হয়। কার্য্য-পত্তিকে হস্তয় সময় ইহাদিগকে অশাস্ত্যকর স্থানে রাখিতে হয়। কিন্তু যতদূর সম্ভব ইহার যত্নে রক্ষণে থাকিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হয়। যে সময় স্থান জোয়ারের জলে প্রাবীত হইয়া যায় এবং যে স্থান সর্বদা আর্দ্র থাকে, সেখানে হস্তী রাখা কোনও ক্রমে উচিত নহে।

যদি হস্তী লইয়া ছাউনি করিয়া থাকিতে

হয় তাহা হইলে চালু স্থান বাড়িয়া লইতে হয়, এবং সেই স্থানে ঘাঘাতে পাখর কিংবা বুকের গুড়ি না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ হস্তী উপরে উঠিবার সময় যদি একবার পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সহজে উঠিতে পারে না।

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উক্ত স্থানের মলমূত্র, আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া দূরে নিষ্পন্ন করা একান্ত কর্তব্য।

মান

মান হস্তীর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বহু অবস্থায় ইহার প্রত্যহ নদী কিংবা স্রোতবর্তীর জলে অবগাহন করে। প্রত্যহ হস্তীকে মান না করাইলে ইহাদের চর্চের উপর ময়না জন্মে এবং উহা দ্বারা নানারূপ ক্ষুধা উৎপন্ন হয়। ইংরা ঘাঘাতে সমস্ত শরীর জলে ডুবাইয়া মান করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ছুইবার ইহাদিগকে মান করিতে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। মান করাইবার সময় ইহাদের গাভা নারিকেলের ছোবড়া কিংবা কুসুম প্রস্রাবের দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাদের শরীরের বিভিন্ন রন্ধু, এবং পাগুলি প্রত্যেক দিন পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। বিশ্রামস্থানে যদি জল না থাকে তাহা হইলে নিকটবর্তী কূপ হইতে জল আনিয়া ইহাদের গাভা ভাল করিয়া ধোয়াইয়া দিতে হয়। কাধের পর শরীর উত্তপ্ত থাকিতে ইহাদিগকে মান করিতে দিতে নাহি। পথে চলিতে চলিতে সমুদ্রে নদী পড়িলে বতস্কন ইহাদের শরীর সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা না হয় ততক্ষণ নদী-তীরে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। মানের পর হস্তীর শরীর শুকাইয়া গেলে পরিচারকেরা

ইহাদের মস্তকে তৈল মর্দন করিয়া থাকে। তাহার বলে একত্র করিলে হস্তীর মস্তক ঠাণ্ডা থাকে। যদি ইহাদের মস্তক রীতিমত পরিষ্কার রাখা যায় এবং স্বযোগ্যভাপ হইতে উহা রক্ষা করিবার জ্ঞান নরম গমি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্তরূপ তৈল-মর্দনের কোনও আবশ্যকতা নাই। মস্তকে তৈল মর্দন করিলে মস্তকের চর্মা ক্রমবর্ধ হইয়া যায় এবং স্বয়ংক্রিয় পূর্ণমাত্রায় শোষিত হইয়া থাকে। এ কারণ পরিচারকদিগকে হস্তীর মস্তকে তৈল মর্দন করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া উচিত।

পরিচারক ও তাহার কর্তব্য

গৃহপালিত হস্তীর একজন করিয়া পরিচারক থাকে। ইহাদের নাম ওসি (Oosi) অর্থাৎ মাহত। গভর্ণমেন্টের অধীনে যে সমস্ত হস্তী থাকে তাহাদের দুই জন করিয়া পরিচারক থাকে। একজনের নাম ওসি (Oosi), আর একজন তাহার সহকারী নাম পৈসি (Paisi)। কাধের সময় ও কাধের পর হস্তীর প্রতি মন্ত লওয়া উচিত (oosi) কর্ণ। ইংরা হস্তীর যাড়ের উপর বসিয়া ইহাদিগকে চালাইয়া লইয়া যায়। কাধীতে ইংরা ঘাঘাতে উত্তম বাজ, পরিষ্কার জল, উপযুক্ত বিশ্রাম লাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াও ওসির (oosi) কর্তব্য। কাধের সময় হস্তীর শরীরে কোনরূপ ক্ষত হইয়াছে কি না কাধের পর বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়। কোন গীড়ার লক্ষণ দেখা দিলেই জির (oosi) তৎক্ষণাৎ উপনিবৃত্তি কর্ণচারীকে জানান কর্তব্য। কাধের পর হস্তীকে বৈজ-শুশলে আবদ্ধ করিয়া যে সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও নির্মল-জলের ব্যবস্থা

থাকে, সেই সমস্ত স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। প্রত্যেক দিন 'প্রাত্যহে ওসি (oosi) হস্তীর নিকট যাইবে এবং জঙ্ঘতি কি ভাবে রাতি কাটাইয়াছে লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। হস্তী যদি দিনের বেলায় নিজা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে রাতিকে স্বন্দভাবে নিশা যাইতে পারে নাই। ইহাদের মাজসজ্জা, আহার এবং অন্ত্যান্ত সমস্ত বিঘয়ের প্রতি ওসি (oosi) বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। হস্তীকে শুশলাবদ্ধ করা, দ্রুত এবং অব্যাহত বশীভূত করা সম্বন্ধে ওসির (oosi) জ্ঞান দ্বারা দরকার। হস্তী অস্থস্থ হইলে আদেশাধারী ওপরে ব্যবস্থাও ওসিকে (oosi) করিতে হইবে; কিন্তু ওসি (oosi) কোন সময় নিজের মন্তলবস্ত্র ওপুণ্ড্রজের ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।

পৈসি (paisi) সর্দনা ওসির আদেশ প্রতিপালন করিবে। ইহাকে সাধারণতঃ হুনির কাধে নিযুক্ত থাকিতে হয়। বাজ সঙ্গর করা, হস্তীর আবাস-স্থান পরিষ্কার করা পৈসির কার্য। যখন 'মাহত হস্তী চালাইয়া লইয়া যায় তখন পৈসিকে হস্তীর অগ্রে অগ্রে ঘাইয়া যে সমস্ত পথে কদম, চোরা বালি, প্রভৃৎ ইত্যাদি থাকে সে সমস্ত পথের কথা মাহতকে পূর্বে জানাইয়া দিতে হয়। হস্তীকে কাঠাঠি তিনিতে হইলে পৈসি কাঠের দশে শুশলাদি গুঁথিয়া ঠিক করিয়া দেয়। ওসির কাধাধি পৃথক্বেষণ করিবার জ্ঞান একজন সিন্‌ওক (Sin-ok বা gemader) থাকে। ইংর হস্তী সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। হস্তীর কোনও রূপ গীড়া হইলে সর্দনা দেখা, দুই একটি ঔষধের ব্যবস্থা করা, ক্ষত স্থান

দুইখা পরিষ্কার করিয়া ঔষধাদি দেওয়া ইহার কার্য।

খিঁথিটে এবং নিদ্রাপ্রকৃতি লোকের উপর হস্তীর ভার দেওয়া উচিত নহে। অনেক সময় পরিচারকের দোষে হস্তী রুগ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। যে সমস্ত হস্তীচালক হস্তীর প্রতি সর্দনা কর্ণশ ব্যবহার করে এবং সর্দনা অশুশের দ্বারা হস্তীকে গীড়ন করে, তাহাদিগকে জবাব দেওয়া একান্ত কর্তব্য। উত্তম হস্তীচালক কোন সময় হস্তীকে কর্ণশ বাকা প্রয়োগ কিংবা অশুশের দ্বারা ভাঙনা করে না।

হস্তীচালক হইতে হইলে পূর্ণ হইতেই এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়।

হস্তী-শাসীর এক একটি হস্তীর জ্ঞান এক একজন উত্তম পরিচারক নিযুক্ত করিতে হয়।

পুনঃ পুনঃ পরিচারক পরিবর্তন করা ভাল নয়। পরিচারক বহুই পুরাতন হয়, ততই হস্তীশাসীর উপকারে আসিয়া থাকে এবং ততই ইংরা হস্তী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। বিভিন্ন চালকের উপর হস্তীর ভার দেওয়া উচিত নহে, ইহাতে ইংদের স্বাস্থ্য কখনই ভাল থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ হস্তীর বাজ হইতে বাজ চুরি করিয়া বিক্রয় করার জ্ঞান মাহতেরা বিভাজিত হয়। ইং নিবারণ করিতে হইলে বিশ্বস্ত লোকের সমুদ্রে হস্তীকে মধ্যে মধ্যে বাজ প্রদান করিতে হয়। যতদিন হস্তীচালক তাহার হস্তীর স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে সক্ষম হয়, ততদিন তাহাকে জবাব দেওয়া উচিত নহে। সামান্য কিছু চুরি করিলেই যদি হস্তীচালককে জবাব দিতে হয়, তাহা হইলে বৎসরের মধ্যে অনেক হস্তী-

(গজ) ময়, যজুর্বেদে গজময়, সামবেদে ছন্দোময় গেষ ময় এবং অথর্ববেদে পূর্ণোক্ত বৈদ্যায়ের মিশ্রিত ময় সমষ্টি।

এই কৃষ্ণ ঋতি কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে আবার দ্বিবিধ। পূর্ণোক্ত বৈদ্যচতুষ্টয়ের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ সমূহের কোন কোন অংশ কর্মকাণ্ডের এবং উপনিষৎ গুলি জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত।

কর্মকাণ্ড আবার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভেদে দ্বিবিধ, যে সকল বাক্য যজ্ঞীয় অষ্টভূতানের বর্ণনার সহিত কোনও দেবতা বিশেষগণকে উপলক্ষ করা হয় তাহা মন্ত্র, যে সকল গজ গ্রন্থে কোন মন্ত্র কি কার্যে প্রযুক্ত ইহার উল্লেখের সহিত মন্ত্রসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা আছে তাহা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ভাগ আবার বিধি ও অর্থবাদ ভেদে দ্বিবিধ। ব্রাহ্মণ সমূহের যে ভাগে মন্ত্রের বিনিয়োগ সহ যজ্ঞ নির্বাহের প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে তাহাই বিধি, আর মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা বিশিষ্ট অর্থের নাম অর্থবাদ। বিধি আবার দুই প্রকার—“অজ্ঞাত জ্ঞাপক” এবং “অপ্রবৃত্ত প্রবর্তক”। আর্যকালে যে সকল যজ্ঞের বিলোপ ঘটয়াছিল, সেই সকল যজ্ঞের প্রণালী যাহাতে লিখিত আছে তাহা “অজ্ঞাত-জ্ঞাপক”। পরবর্তী কালে যে সকল নব নব যজ্ঞের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার বিধান যাহাতে লিপিবদ্ধ তাহা “অপ্রবৃত্ত প্রবর্তক”। এই গেল বৈদিক সাহিত্যের মোটামুটি কথা। পূর্ণে বলিয়াছি গ্রন্থাংশদ্বয়ের বেদ চারি

প্রকার, এখন তাহারই আলোচনা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম যজুর্বেদের কথা বলিতেছি। যজুর্বেদে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—শুক্ল ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতার অপর নাম তৈত্তরীয় সংহিতা। নব্য পণ্ডিতগণের মতে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। চর্যবাহু মতে কৃষ্ণ যজুর্বেদের ৮৬ শাখা, পতঞ্জলীর মহাভাষ্যমতে ১০০ শাখা। কিন্তু দুইয়ের বিষয়, আশ্চর্য্য কাল কৃষ্ণ যজুর্বেদের বারটি শাখা ও তেরটি উপশাখা মাত্র পাওয়া যায়। এই শাখাগুলির নাম—“চরক”, “সত্যাব্যাক্তি”, “কঠ” বা “কাঠক”, “প্রাচ্যকঠ” “কাপিঠকঠ”, “চারায়নীয়” “বার তর্যীয়” “শ্বেত” “শ্বেততর” “ঐশমজ্ঞ” “পাত্যসিন্ধেয়” এবং “মৈজায়নীয়”। চরক শাখার দুইটি উপশাখা—“ঐরীয” ও “বাণীকীয়”। বাণীকীয় উপশাখার পাচটি প্রশাখা—“শাটায়নীয়” “হিরণ্যকেশী” “বোনা-য়নী” “সত্যাব্যাক্তি” ও “আপত্যনী”। মৈজায়নীয় শাখার ছয়টি উপশাখা—“মানব” “বারাহ” “ছাগলেশ” “হারিষ্রবী” “দুন্দুভ” ও “শ্রামা-নীয়”। এই সকল উপশাখা ও প্রশাখার (১) সংখ্যা জয়েদশ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ বিশিষ্ট কৃষ্ণ যজুর্বেদে অষ্টাদশ সহস্র যজুর্ঘ্য আছে। ইহার মন্ত্রভাগ “তৈত্তরীয় সংহিতায়” পাঁচটি অষ্টক, প্রত্যেক অষ্টক আবার ৭৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলির অপর নাম প্রশ্ন আর অষ্টকগুলির অপর নাম প্রশ্নাষ্টক। প্রত্যেক অধ্যায় অনেকগুলি অহুবাক্যে বিভক্ত, এই

গ্রন্থে সর্বসমেত সাত শত অহুবাক্য আছে। ইহাতে কোন মানব স্বমির নাম পাওয়া যায় না। প্রজাপতি, সোম প্রভৃতি বৈদিক দেবগণই ইহার ঋষি। এই গ্রন্থে নরবেধ, পিতৃমেধ, অর্থমেধ, অগ্নিমেধ, জ্যোতিঃসোম, রাজস্ব ও অতিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ দৃষ্ট হয়।

এই গেল কৃষ্ণ যজুর্বেদের কর্মকাণ্ডের কথা। তারপর জ্ঞানকাণ্ড, তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তরীয় আরণ্যক, তৈত্তরীয় উপনিষৎ প্রভৃতি ও মৈজায়নীয় শাখার মৈজায়নীয় উপনিষৎ, কঠশাখার কঠোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, নারায়ণ উপনিষৎ এবং বাক্রবি উপনিষৎ ইহার জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

শুক্ল যজুর্বেদের আপন নাম “বাক্রসনৈয়ী সংহিতা” ভগবান যজ্ঞবল্ক্য ইহার ঋষি; ইহাতে প্রায় দুই সহস্র এবং ইহার ব্রাহ্মণে সাত্বে সাত সহস্র যজুর্ঘ্য আছে। শুক্ল যজুর্বেদের পঞ্চময়ী শাখা—কাথ, ম্যাদিনী, জাল, শাক্য, বৃষেধ, তাপনীয়, কাণীল, গোণ্ডবংস, আচিক, পরমাবটিক, বৈনয়, পারাশরীয়, বৌধেয়, গালব ও ঐশেয়। “পারসনৈয়ী সংহিতা” ৪০ অধ্যায়ে, ২২০ অহুবাক্য ও বহুসংখ্যক কাণ্ডিকায় বিভক্ত। ইহাতে অনেক ঋতুমন্ত্র ও পাওয়া যায়। দশপৌর্ণ-মাস, পিতৃপিতৃ যজ্ঞ, অগ্নিষ্টোম, বাক্রমেধ, রাজস্ব, অগ্নিহোত্র, চাতুর্থাঙ্গ, যোড়নী, অগ্নিচন্দ্র, চরক-সৌজামণি, অর্থমেধ, পুরুমেধ, পুরুমেধ, পিতৃমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণে এই গ্রন্থের কলেবর পরিপূর্ণ। ইহা পাঠে বৈদিক যুগের সামাজিক রীতি নীতি অনেকটা জানা যাইতে পারে। বিখ্যাত “শত শাখা ব্রাহ্মণ” শুক্ল যজুর্বেদের ম্যাদিনী শাখার অন্তর্গত। ইহা দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ

দশ কাণ্ডে ও দ্বিতীয় ভাগ চারি কাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে প্রায় সাত্বে সাত সহস্র কাণ্ডিক আছে। বিখ্যাত বৃহদারণ্যকোপ-নিষৎ ইহার চতুর্দশ কাণ্ডের অন্তর্গত। এই গেল যজুর্বেদের কথা, এখন সামবেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিব। পুরাণ মতে সামবেদের সহস্র শাখা, ইজ্ঞের বজ্রাঘাতে প্রায় সকল গুলিই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র সাতটি শাখা অবশিষ্ট আছে, যথা—রাণায়নীয়, শাট্যমুগ, কাপোল, মহাকাপোল, কৌণ্ডম, লাক্ষিক ও শাদ্বীল। এই শাখাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র কৌণ্ডম শাখার ছয়টি উপশাখা পাওয়া যায়,—আহুহায়ণ, বাতায়ন, নৈগেয়, প্রাচীনযোগা, প্রাজ্ঞী ও বৈমম্বত।

সামবেদ প্রধানতঃ পূর্ণ ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ণ সংহিতায় ছয়টি প্রাচ্য ঐশ্বর্য অপর নাম “চন্দ্র আচ্চিক”। ইহা ছান্দোগ্য পুরোহিতগণের অবজ্ঞা পাঠ। ইহাই তান লয় সমুচ্চ স্বর প্রকিয়া অহুসারে “সম্পদশ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া “গ্রাম্যায়ণগণ” নামে আখ্যাত হইয়াছে। সামবেদীয় উৎপাতগণ ইহাই গান করিতেন। ইহাকে সম্প্রসামও বলে। সামবেদের উত্তর ভাগের নাম উত্তরাচ্চিক বা আর্যগণ। বঙ্গদেশে সামবেদের কৌণ্ডম শাখা ব্যতীত অপর কোনও শাখার প্রচলন নাই। এই গেল সামবেদের মন্ত্রভাগের কথা, ইহার ব্রাহ্মণ ভাগে আটপানি গ্রন্থ—আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ, সামবিধান, অশ্বত ও যজুর্বিংশ ব্রাহ্মণ এবং তাণ্ডা মহাব্রাহ্মণ।

সামবেদের জ্ঞানকাণ্ডে দুইখানি উপনিষদ প্রধান—ছান্দোগ্য এবং কেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের তৃতীয় ইহাতে

(১) এক এক ঋষি বেদের এক এক অংশ অধ্যয়ন করিয়া শিষ্য সমাজে প্রচার করিতেন। অশ্বত ইহাতে মন্ত্রের পিতৃ পিতৃ পরিবর্তন ঘটাত। পরবর্তী কালে এক এক ঋষির প্রচারিত এক এক অংশই এক এক শাখা হইয়াছে। বেদ যথার্থ নব নব ঋষি কর্তৃক জন্মগ্রহণ করত, ততবার নব নব শাখা উদ্ভূত হইয়াছে। আর ঐ ঋষি সকলের শিষ্যগণ যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা ইহাতে উপলব্ধি, আর ইহাদের শিষ্যগণ যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা ইহাতে উপলব্ধি।

দশম প্রপাঠক পর্যন্ত স্থান হইতে সকলি। ইহা স্থনীতি পরিপূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত। এই উপনিষদের আটটি প্রপাঠক আছে। ইহার পঞ্চম প্রপাঠকে 'আত্মা ও ব্রহ্ম বিষয়ক যে সকল দিক্‌দ্বন্দ্ব স্থলনিত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বড়ই মনোরম। কেনোপনিষৎ চারি কাণ্ডে বিভক্ত এবং 'আধ্যাত্মিকত্বের স্বন্দর আলোচনায় ইহার কল্লের পরিপূর্ণ।' নাম-বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের প্রধান ভাষ্যকার সায়ণ ইহার ভাষ্যের নাম বোধপ্রকাশ।

অতঃপর অথর্কবেদের কথা, চরণবাহু মতে অথর্কবেদের মন্ত্র পরিমাণ ১২০০০; যথা—

"বাদশানামঃ স্বহসানি মহাগাং ত্রিশতানি চ।
কিন্ত আত্মকাল ৭০০টি মন্ত্রমাত্র পাওয়া যায়। অথর্কবেদের নয়টি শাখা, "পৌষল-পাদ", "শৌনকীয়", "ভোক্তাশ্রয়", "দামোদ", "চারণবিদ্যা", "দেবদর্শী", "কুনধ্য", "জাম্বল" এবং "ব্রহ্মপালাশ"। কিন্ত আত্মকাল কেবল মাত্র শৌনক শাখাটি বর্তমান আছে। এই বৈদিকশাখা বিংশতিক্রমে বিভক্ত। অথর্ক-বেদের শ্রেণীভুক্ত, আত্মকাল, বিপদদূরীকরণ প্রভৃতি কার্যের জন্য বহুপ্রকার মন্ত্র ও ঐশ্বরের ব্যবস্থা আছে। আমাদের বোধ হয় তত্ত্বের বহুত্ব (মারণ বিদ্যেমাণাদি) অথর্কবেদ হইতে সকলিত হইয়া থাকিবে।

অথর্কবেদের জ্ঞানকান্ডের অন্তর্গত অনেক-গুলি উপনিষদ ছিল, কিন্তু আজ ২২ খানি মাত্র পাওয়া যায়। যথা—আশ্রম, জাবাল, কৈবলা, পূর্ণরাম তাপনীয়, উত্তররাম তাপনীয়, কালায়ি, রুদ্র, গরুড়, ভৃগুবল্লী, আনন্দবল্লী, পরমহংস, হংস, বৃহদারণ্য (দ্বৈতশাস্ত্র), নারায়ণ, কেনেবিত, পূর্ণ-কঠবল্লী, উত্তরকঠবল্লী, পূর্ণব্রহ্মসংহতাপনীয়,

(৫ খানি) উত্তরমুণ্ডিহতাপনীয়, আত্মা, কঠশক্তি, পিতৃ, আত্মকীয়, সন্ন্যাস, যোগতত্ত্ব, যোগশক্তি, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, অমৃত-বিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, নারিবিন্দু, নীলরক্ত, প্রহ্ম, মহাক, ব্রহ্মবিদ্যা, স্মৃতিকা, চুল্লিকা, অথর্ক শিরস (২ খানি), গর্ভ, মহাগর্ভ, প্রাণায়ামোত্তর, রুদ্রা, মাতৃকা, নীলরক্ত ও সর্কোপনিষদমার।

এই গোল অথর্কবেদের কথা, এখন "অথর্ক" মন্ত্রকে একটু আলোচনা করিব। চরণবাহু বলেন—

"পঞ্চাংশ স্বহসানি কচাংশ পঞ্চশতানি চ।
কচাংশীতিঃ পালকঃ তৎপারায়ণমুচ্যতে।"

অর্থাৎ অথর্কবেদ একসহস্র পঞ্চশত অশ্বীতি সংখ্যক শ্লোক আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের মুদ্রিত সংস্করণে ১৪১৭টি শ্লোক মাত্র পাওয়া যায়। শৌনকীয় প্রাতিশাখা অনুসারে অথর্কবেদের পাঁচ শাখা, যথা—
"শাকল" "বাল্লল" "মাতৃক", "শাম্বায়ণ ও আবলায়ন। কৌরিতকী, শৈশবী, পৈতী, ঐতরেয়ী প্রভৃতি আরও কয়েকটি উপশাখাও আছে। "অথর্কগণের আচার্য্য মহর্ষি শাকল নিজ নামে শাকল শাখার প্রবর্তন করিলেন। মুদ্রল, গোলুল, বাহুল, শৈশবী ও শিবির এই পাঁচ জন শাকলের প্রধান শিষ্য ও তাঁহার শাখা প্রবর্তনের প্রধান সহায়ক। বিষ্ণু পুরাণ মতে শাকলের এই শিষ্যপঞ্চ শাখাবিশেষের প্রবর্তন-কর্ত্তা, যথা—

"মৃগালে গোত্বাঃ বাহুলঃ শিশিরঃ
শৈশবীপুত্রাঃ।

পট্টমতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদপ্রবর্তকাঃ।
বিষ্ণু পুরাণ।

মহাভাষ্য বলেন—“একবিংশতি বহুচাঃ”
অথর্কবেদ শাখা প্রাশাখ্য সংখ্যা একবিংশতি।

কিন্তু কেবলমাত্র শাকল শাখাটি বর্তমান আছে। আবলায়ন গ্রন্থ বৈদ্যসম্বন্ধে শাকল শাখার প্রবর্তক শাকল স্মির অপর নাম "বৈদ্যমিত্র।"

"অথর্ক সংহিতা" দশ মণ্ডলে, আট আঠকে ও চতুঃশ্লি অধ্যায়ে বিভক্ত; ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে দুই একটি করিয়া হুক্ত, প্রত্যেক হুক্তে দুই একটি করিয়া বর্ণ, এবং প্রত্যেক বর্ণে অনেকগুলি শব্দ আছে। ইহার মণ্ডলের সহিত অষ্টকের কোনও সম্বন্ধ নাই। অনেকগুলি হুক্তের সমষ্টিতে একটি মণ্ডল এবং আটটি অধ্যায়ের সমষ্টিতে একটি অষ্টক হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে ২০-২৪টি করিয়া

হুক্ত আছে। হুক্ত বহু প্রকার, মহাহুক্ত, মধ্যম হুক্ত, ক্ষুদ্র হুক্ত; আবার, স্ববিশুদ্ধ, চন্দ্রম হুক্ত, দেবতা হুক্ত; কিন্তু এই বিষয় বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় নহে।

অথর্কবেদ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ দুই খানি—ঐতরেয় এবং শাম্বায়ন বা কৌমিতকী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আট পরিচায় বিভক্ত। প্রতি পরিচায়, পাঁচটি অধ্যায়ে, আবার প্রতি অধ্যায়ে অনেকগুলি কাণ্ডে বিভক্ত, ইহাতে প্রায় তিন শত কাণ্ড আছে।

অথর্কবেদ আর এক অংশ আছে। ইহার নাম ঐতরেয় আরণ্যক। ইহাতে পাঁচটি আরণ্যক ও আঠারটি অধ্যায় আছে।

শ্রীমদেবশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতী।

পদার্থের চেতনাচেতন সম্বন্ধে

আয়ুর্বেদের অভিমত

আমার পূর্ণপ্রবন্ধ 'মৌলিকতত্ত্ব' আকাশাদি পঞ্চ পদার্থকে চেতন-অচেতন সকল পদার্থের অবয়ব-প্রবর্তনের মূল বলিয়া মূল পদার্থ বলা হইয়াছে। কিন্তু এই পঞ্চ ভ্রব্য, পার্শ্ব-সমূহের অবয়বগঠনের কারণ হইলেও চেতনার কারণ নহে। বাল্যে বোধোদয় হইতে পড়িয়া আসিতেছি, "পদার্থ দুই প্রকার; চেতন ও অচেতন।" এই অচেতন অর্থাৎ জড়পদার্থেরই মূল ক্রিতি প্রভৃতি বহু মহাপদার্থ; কিন্তু বাহার চেতনা আছে, তাহাকে মৃত্তিকাদি পঞ্চ ভ্রব্য বায়ুত ভ্রাত্ত ও কিছু আছে বৃত্তিতে হইবে। এই অতিরিক্ত ভ্রব্যই আর্ধ্য মনিষিগণের নিকট আত্মা বলিয়া পরিচিত। আত্মাকে চেতনার মূল স্বীকার করিলে, মৃত্তিকাদি পঞ্চ মৌলিক বায়ুত

আরও মূল ভ্রব্য আছে, স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিকই এই পাঁচটি মৌলিকের অতিরিক্ত আরও কয়েকটি মূল ভ্রব্যের বিদ্য শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।—
বাদীতাত্ত্বা মনঃ কালো দিশক্ত ভ্রবাস্ত্রঃঃ।

চঃ, যঃ, ১ অঃ।
অর্থাৎ আকাশাদি পাঁচটি এবং আত্মা, মন, কাল ও দিক্ মূলতঃ এই নয়টি ভ্রব্য। ইহাদের মধ্যে আত্মা চেতনার মূল; এবং তিনিই ভারতীয় মনিষিগণের নিকট পূর্ণব্রহ্ম, অন্তঃ, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিত্য, বিহু (সর্বগত) প্রভৃতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যিনি আমাদের নিকট অচিন্ত্য-অব্যক্তরূপে প্রতীয়মান, তাহাকে জানিবার বা জানাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই; কিন্তু একটি বিষয়

সত্ত্ব মনে হয়, যিনি বিবৃ অর্থাৎ সূর্যগত, তিনিই যখন চেতনার মূল, তখন জগতে অচেতন বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে কি ?

বাস্তবিক ইহা প্রশ্নের বিষয়ভূত হইলেও, আমরা কিন্তু চান্স দেখিতে পাই, জীবশ্রেষ্ঠ মানবও কালে জড়যে পরিণত হয়। ভারতীয় মনবিগণ, মানবের এই পরিণতি অবশুতাবী জানিয়াও, অকালে যাহাতে দেহের এই ভাব না আসে, তাহার প্রতীকার জড়ই চিকিৎসা, শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছিলেন; এবং সে জড়ই তাঁহাদের বহুগবেষণাক্রমত আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রেও চেতন-অচেতন সম্বন্ধে কিছু আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে আমরা এ সম্বন্ধে কি পরিমাণ তথ্য পাইয়াছি, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

চেতন পদার্থের অপর এক নাম জীব। কিন্তু জীব কি বিশেষভাবে জানিতে হইলে জানা আবশ্যক, আত্মা-মন এবং দেহের একত্র সমাবেশই জীব।

স্বমান্দ্রা শরীরক জয়মন্তজিগ্ৰহণং ।
লোকটিষ্ঠতি সংযোগং..... ॥
সমুমান্চেতনং তত্ত্ব... ॥ চ, হু, ১ অঃ ।
অর্থাৎ মন, আত্মা-এবং শরীর এই তিনটি জিপরিব্রাণ্ড। যে কাল পর্যন্ত এই তিনটির একত্র সমাবেশ থাকিবে, সে পর্যন্ত তাহাতে লোক অর্থাৎ জীব অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। এই লোকই পুরুষ অর্থাৎ চেতন নামে অভিহিত হন। আর এই অবস্থার যাহা বিপরীত অর্থাৎ যাহাতে এই তিনের একত্র সমাবেশ নাই, তাহাই অচেতন বা জড়-পদার্থ। এজ্ঞ আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও, ইন্দ্রিয়াদির অভাববশতঃ বস্তু মাত্রই চেতন

বলিয়া অভিহিত হয় না। এই কারণেই আমরা একটি সাক্ষিপ উপদেশ পাইয়াছি;—
‘সৈন্ধ্রিঞ্চ চেতনং স্রাব্যং নিরৈন্ধ্রিমমচেতনং’

চ, হু, ১ অঃ ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যুক্ত স্রাব্যই চেতন, আর যাহাদের ইন্দ্রিয় নাই, তাহারা ই অচেতন। স্রুতরাং চেতন-অচেতন বিষয় ভানরূপ জানিতে হইলে, ইন্দ্রিয় কি প্রথমে জানা আবশ্যক।

আত্মা, আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্র মহাত্বতের বিকার; তন্মাত্রে আকাশ মহাত্বতের বিকার প্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুঃ স্পর্শেন্দ্রিয়, তেজের দর্শনেন্দ্রিয়, জলের রসনেন্দ্রিয় এবং কিত্রির বিকার স্রাণেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেকিগ্র যথাক্রমে দেহের কর্ণ, বকু, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা নামক স্থানসমূহে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়সমূহের আধার চক্ষু-কর্ণাদি জীবমাত্রেরই রহিয়াছে, কিন্তু এই আধার বিদ্যমানদেহেও প্রাণীমাত্রেরই যে, সকল ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকিবে তাহা নহে। ভৌতিক অংশের তারতম্যবশতঃ ইন্দ্রিয়-বিশেষের সললতা, দুর্বলতা অথবা হীনতা ঘটয়া থাকে। সে জ্ঞান আমরা প্রাণীবিশেষে ইন্দ্রিয়বিশেষের প্রব্রতা ও দুর্বলতা দেখিতে পাই; সেইপ্রকার ভৌতিক অংশের হীনতাবশতঃ ইন্দ্রিয়-আধার চক্ষু-কর্ণ বিদ্যমান সত্ত্বেও, অন্ধের দর্শন, বধিরের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের অভাব দেখা যায়। কিন্তু এককালে সকল ইন্দ্রিয়েরই অভাব কোন প্রাণীতে দেখা যায় না।

ইন্দ্রিয়সমূহ হৃৎ-পঙ্কতন্মাত্র মহাত্বত বিকার সমুদ্রত বলিয়া ইহারা প্রকৃত্ত পদার্থ নহে—অস্থলভবগ্য মাত্র। যেমন আমার শ্রবণেন্দ্রিয় আছে কি না কখন দেখা যায় না; একজন বধির, তাহার যেমন উক্ত ইন্দ্রিয়-আধার কর্ণ

আছে, আমারও সেইপ্রকার কর্ণ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়ের অভাববশতই উক্ত ইন্দ্রিয়-বিষয় শব্দ গ্রহণে সমর্থ হইতেছে না, কিন্তু আমি ইন্দ্রিয়যুক্ত হেতু শব্দ গ্রহণ করিতেছি। এইরূপে অস্থলভূত হইল, এই ব্যক্তি যখন শব্দগ্রহণে অসমর্থ, তখন ইহার শ্রবণেন্দ্রিয় নাই; আর আমি যখন গ্রহণ করিতেছি, তখন আমার উক্ত ইন্দ্রিয় বিদ্যমান রহিয়াছে। ॥ যেমন আমাদের পঙ্কতন্মাত্র, যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণ-বিশিষ্ট; সেইপ্রকার তাহাদের বিকারসমুদ্রত ইন্দ্রিয়গুলিও ক্রমান্বয়ে স্রাব্যাদি গুণবিশিষ্ট। জীবগণ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া আপনাদের চেতনার পরিচয় দেয়; কিন্তু অচেতন পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের অভাববশতঃ চেতনার পরিচয় দিতে পারে না। এজ্ঞই ইন্দ্রিয়যুক্ত স্রাব্য চেতন এবং ইন্দ্রিয়হীন স্রাব্য অচেতন বলিয়া কীর্ণিত হইয়াছে।

জীবগণ শব্দরূপাদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি কি উপায়ে গ্রহণ করে বলা আবশ্যক। দেহিগণ মনের সাহায্যেই এই সকল ইন্দ্রিয়বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। সে কারণ ইন্দ্রিয় বিদ্যমান সত্ত্বেও, মনঃসংযোগের অভাববশতঃ অনেক সময় আমরা শ্রাব্যবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না; এবং মন স্বয়ং একটি পদার্থ বলিয়া, এককালে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্যগণিতও পূর্ণ-বিকার দেখা যায় না।

যেমন, যদি কেহ কোন বিষয়ে পাচচিন্তা-নিবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহার মন সেই চিন্তাময় বিষয়ে একগুণভাবে সম্মিলিত হইবে যে, তৎকালে তাঁহার (ইন্দ্রিয় সকল বিদ্যমান সত্ত্বেও) চক্ষুর নিকট বস্তু ধারণ করিলে অথবা কর্ণের নিকট শব্দ করিলে, হয় ত বা

তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, তাঁহার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উদ্যেগ হইবে না; সেইপ্রকার দর্শনেন্দ্রিয় সাহায্যে মনঃসংযোগপূর্ণক কোন বস্তু দর্শন করিলে, তৎকালে তাঁহার শ্রবণাদি অন্য ইন্দ্রিয়সকল মনঃসংযোগ অভাবে কার্যকরী হইবে না। যদিও আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চেতনার পরিচয় দিয়া থাকি, তথাপি ই সকল ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের প্রবর্তক মন।

মন যখন আমাদের জ্ঞানের প্রবর্তক অর্থাৎ মূল, তখন চেতন পদার্থ বুঝাইতে হইলে তাহার সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। কিত্ত্যাদি পঙ্কতন্মাত্রের বিকার ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বা, আত্মার বিকার মন। মনও কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; ইহা হৃৎ, এক মাত্র এবং অচেতন পদার্থ। চিন্তা, বিচার, তর্ক প্রভৃতি কয়েকটি মনের গুণ আছে; এই গুণরাশি হইতেই ইন্দ্রিয়াতীত মনের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। হৃৎস্বয়ং হেতু ইহা ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়াস্তরে এবং দেহের বহিঃস্থ বিষয়ে সঞ্চারণে সমর্থ হয়। মন, চেতনা, ধাতু, আত্মার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ থাকায়, অচেতন হইতেও ক্রিয়াবান। এই মন, স্রাব্যাদি গুণজয়ের সংযোগে পুরুষ-পুরুষান্তরে বিভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়। মনের সত্ত্বগুণ-বাহুল্যে, পুরুষে ধর্ম-শৌচাদি; রজঃ-গুণবাহুল্যে, ক্রোধ কামাদি এবং তম-গুণ-বাহুল্যে মোহ, ভয়, শোকাদি উপস্থিত হয়। এখানে একটু প্রশ্ন হইতে পারে যে, মনকে আত্মার বিকার বলা হইল, অথচ “নিরীকার পরন্তাত্মা” (চঃ শাঃ, ১ অঃ) এ কথাও আমরা শাস্ত্রে দেখিতেছি। যে আত্মা নিরীকার; তাহার বিকার মন, ইহা কিরূপে সম্ভবপন হইতে পারে ?

পূর্ণে আত্মাকে চেতনার মূল স্বীকার করা

হইয়াছে, হতবাক্য চেতন পদার্থ জানিতে হইলে আত্মা কি জানা আবশ্যক; তাহার পর নির্মলিকার আত্মার বিকার কি জানিতে হইলেও, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্বে আমাদের কীকার করিতে হইবে, যিনি আমাদের নিকট আত্মা, অব্যাক্ত, পূর্বপ্রকৃত-রূপে প্রতীয়মান তাঁহার রূপ বর্ণনা করা আমার ধারা সম্ভবপর নহে। তবে প্রাচীন মহর্ষিগণ, সেই ঐশ্বর্য পরমহংসের চিত্তার বা বর্ণনার যে পদ দেখাইয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহাদেরই অনুসরণের চেষ্টা করিব নান্দ।

অবশ্য কেহ বলিতে পারেন যে, মহর্ষিগণ আমাদের ভাব মতত্ব হইয়া কি উপায়ে সেই চিত্তাভীত অবস্থার চিত্তা বা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? এইরূপ প্রশ্ন উদয় হওয়া বাস্তবিক বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় তাঁহার বলিয়াছিলেন—

.....তচ্চাক্ষরমলক্ষণং।

জানঃ ব্রহ্মবিশ্বাকার্য্য নাজন্তজ্জাতুমহতি।

চঃ, শাঃ, ১অঃ

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম (আত্মা) চিরের অন্তীত অক্ষর নান্দ। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহারই তাঁহার রূপ চিত্তা করিতে পারেন। যেহেতু, "গতিব্রহ্মবিদং ব্রহ্ম" (চঃ, শাঃ, ১অঃ) হতবাক্য ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, তাঁহাতে লীন হইতে হইবে। "নাজন্তজ্জাতুমহতি," আমরা অজ, হতবাক্য আমরা তাঁহাকে কি প্রকারে জানিব। যখন ব্রহ্মে লীন হইতে না পারিলে তাঁহার রূপ পাওয়া যায় না, তখন কি উপায়ে ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়, এবং মহর্ষিগণই বা কি উপায়ে লীন হইয়াছিলেন, অনুমান করা কর্তব্য।

পূর্বে বলিয়াছি, কোন বিষয় প্রগাঢ়ভাবে

চিন্তা করিলে, মন সেই চিন্তনীয় বিষয়ে সম্মিলিত হয়। এ অবস্থায় দেখি, সেই চিন্তনীয় বিষয় বাস্তব অর্থাৎ কোন বিষয়ের ধারণা করিতে পারেন না। কারণ মন, আত্মার সহিত চিরসংশ্লিষ্ট এবং জ্ঞানের প্রবর্তক।

মহর্ষিগণ, এই উপায়ে যখন মনকে, বিচার, তর্ক, ইন্দ্রিয়সমূহ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপ রসাদি হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত রাখিয়া একমাত্র আত্ম চিন্তার অভিনিবেশ করিতেন, তৎকালে তাঁহাদের মন আত্মায় লীন হইত। সকল প্রকার পার্থিব ও ঐশ্বর্য বিষয় হইতে মনের নিমুক্তি বশতঃ, এই সময়ে তাঁহাদের সর্ব-প্রকার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া যায়। হইয়া মানবের সমাদি প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়া।

যখন মানব-মন, রজ ও তম-গুণবিমুক্ত হইয়া শুদ্ধ-স্ব-গুণায়িত হয়, তখন (রজঃ-তমগুণের অভাববশতঃ) লোভ, ভয়, কাম, শোকাদি বিনিমুক্ত পুরুষ, (শুদ্ধ-স্ব-গুণায়িত হওয়ায়) বহু-শোচাচারি উদয়ে চিত্তকে অল্পে লীন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যে শুদ্ধ-মস্তুর উদয়ে মানব, মনকে ব্রহ্মচিন্তার দ্বারা তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হয়, রজ ও তম-গুণের পুনরাবিস্তাবে তখন আর তাঁহার সে অবস্থা থাকে না। তখন সেই সমাধিযুক্ত পুরুষ, স্বয়ং মনের বিষয়—চিত্তা, বৃত্তি প্রভৃতি বহায়ে ব্রহ্মকে ধারণা করিয়া ইন্দ্রিয়-সাহায়ে স্থলভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবেন।

এইরূপে সাধনা করিতে করিতে যে মানব, রজ ও তমঃ গুণ, বা তাঁহাদের বিষয় কাম, কোপ, লোভ মোহাদি হইতে যত আশ্রিত পরিমাণে মুক্ত থাকিয়া সমাদিপ্রাপ্ত হইবার ক্ষমতা অধিক লাভ করিবেন, তিনি তত অধিক পরিমাণে মুক্তির বা ব্রহ্মে লীন হইবার

অধিকারী হইবেন। মহর্ষিগণও এই উপায়ে যিনি যে পরিমাণ সাধনার অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি তদনুযায়ী ব্রহ্ম বা আত্মা কি বৃত্তিতে ও ব্রহ্মাহিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহর্ষিগণ, ব্রহ্মকে নিবিদ্যরূপে দেখিয়াছিলেন, সে কারণেই তাঁহার বলিয়াছেন:—
"ব্রহ্মহৃৎচেতনা ধাতু যতঃ পুরুষঃ স্তুতঃ।"
চেতনাব্যাহারপুণ্যোক্তঃ স্তুতঃ পুরুষমপকঃ।
পুনশ্চ ধাতুতেদেন চতুর্ধিশতকঃ স্তুতঃ।
মনোদশেশ্বিন্নাকৃত্য প্রকৃতিভ্যাস্তক্যৌ ক।

চঃ, শাঃ, ১অঃ

যখন তিনি পূর্ণব্রহ্মরূপে 'বিরাজমান', তখন তিনি অব্যাক্ত, অনন্ত, বিজ্ঞ; কিন্তু স্ত্রীর পর যখন পদার্থে সম্মুক্ত হইবেন, তখন ক্রমশঃ স্থল পদার্থে সম্বোধিত হইয়া আত্মায় যজ-ধাতু কী এবং চতুর্ধিশতকী পুরুষ নামে অভিহিত হইলেন। বলা আবশ্যক, তিনি অক্ষর, নিত্য, বিজ্ঞ; হতবাক্য স্ত্রী পদার্থে তিনি নৃতন করিয়া প্রবেশ করেন না, বা তাঁহার কোন খণ্ডিত অংশবিশেষও জীবদেহে থাকে না। আমরা বুঝিবার বা বুঝাইবার জন্তই তাঁহাকে এই ভাবে পৃথক করিয়া লইয়াছি। যেমন শূন্য মর্যাদা একখানি গৃহ প্রস্তুত হইলে, আমরা এই অখণ্ড আকাশকে পণ্ডিত মনে করিয়া, বহিঃস্থ এবং গৃহস্থ আকাশকে পৃথক মনে করি; কিন্তু আকাশ গৃহ-নির্মাণের পূর্বে যেমন এক ও অখণ্ড ছিল, গৃহ-নির্মাণের পূর্বে সেই প্রকার এক ও অখণ্ড থাকে; সেই প্রকার আত্মাও প্রাণী বা পদার্থ-নির্মাণের পূর্বে বা পরেও সেই একই বস্তু। আরও প্রাচীরাতি ব্যবধানবশতঃ অপ্রতিহত আকাশ যেরূপ প্রতিহত দেখা যায়, সেই প্রকার দেহের ব্যবধানেও নিজিক, চিত্তাভীত আত্মার কাধ্যেও চিত্তাদি দেখা যায়।

জীবদেহে, বিভিন্নগুণবিষয়ী মন এবং ইন্দ্রিয়ানিশাযোগে তিনি স্বপ্ন, দ্রুপ, লোভ, মোহাদি এবং কাৰ্যের যে সমুদয় বিভ্রমতা উৎপাদন করেন, তাঁহা হইতেই আমরা তাঁহার পৃথকত্ব অস্বত্ব করি। এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদির অংশ ভাগ করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার বিষয় চিন্তা করিলে, তাঁহার পার্থক্য কিছু পাওয়া যায় না; সে কারণেই এই জড়দেহ হইতে চিন্তার দ্বারা তাঁহাতে লীন হইতে পারা যায়। স্ত্রীর পূর্বে ব্রহ্ম চেষ্টার শূন্য—নির্মলিকার থাকেন; তাঁহার পর যখন স্ত্রীর মানস করিলেন, তখন তিনি সলিকার; অর্থাৎ স্ত্রীর চিত্তা জন্তই তাঁহাকে মনযুক্ত হইতে হইল। এইরূপে নির্মলিকার আত্মার বিকার হইতে মনের উৎপত্তি হইল। তদনন্তর তিনি বৃত্তিযুক্ত হইলেন (কারণ স্ত্রীর জন্ত বৃত্তির আবশ্যক), বৃত্তির পর অহং অর্থাৎ আশ্রিত (যেহেতু স্ত্রীর কর্তা নির্ণয় জন্ত আশ্রয়ের প্রয়োজন) উৎপাদন করিয়া তাঁহার পর ক্রমশঃ স্ত্রীর উপকরণ—স্বপ্ন আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকার স্ত্রী করেন। আত্মা হইতে উৎপন্ন এই বৃত্তি, অহংকার ও আকাশাদি প্রকৃতি অর্থাৎ জনয়িত্রী নামে পরিচিত এবং আত্মাই একমাত্র জনক অর্থাৎ পুরুষ নামে অভিহিত। এই প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে পর, আত্মা প্রথমে পঞ্চ ভিন্ন আকাশাদির সমন্বয়ে স্বপ্ন অববয়ব সংগঠন পূর্বক মন, বৃত্তি অহংকারাদিগহ কিঞ্চিৎ স্থল ভাবে অবস্থান কালে, মানবের নিকট মজ-ধাতু কী নামে পরিচিত এবং আত্মাও উপকরণ আকাশাদি সংগঠনের প্রথম উপকরণ আকাশাদি পঞ্চ-ভিন্নাঙ্ক পদার্থসমূহ, পরস্পর হীনাদিক সম্মিশ্রণ-ফলে ক্রমশঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থল মৃত্তিকা জলাদিকপে পরিণত হইয়া,

তদনন্তর তাহাদের পুনর্বার হীনাদিক সমবাহে বিভিন্নগুণাকৃতি পর্যায়সমূহের অবস্থান সংগঠিত হয়। এইরূপে এই স্থল আকাশাদির সমবেত বিকার হইতেই জীবের শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-আধার কর্ণাদি, হস্তপাদাদি পৃষ্ঠচর্মে ইন্দ্রিয়, প্রভৃতির সমষ্টি-সেই গঠিত হইয়া থাকে; আর ইহাদেরই স্বস্থ অংশ হইতে জীবের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্বোক্ত বলা হইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন যোড়শ বিকারের (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ চর্মে ইন্দ্রিয়, মন এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের) সহিত পূর্বোক্ত অষ্ট প্রকৃতির একত্র সমাবেশই জীব। ইনিই আমাদের নিকট চতুর্বিংশতিকী জীবাত্মারূপে পরিচিত হইয়াছেন।—ইন্দ্রিয়াদি-যুক্ত স্থলপদার্থসমূহে অবস্থানকালে জীবাত্মার কতকগুলি অস্তিত্ব-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; শাস, প্রাশাস, অচেতন মনের চিন্তাদি বিষয় গ্রহণ, ইন্দ্রিয়-সমূহে মনের গতি, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর-সংকারণ, জন্ম, মরণ, বৃদ্ধি, ইচ্ছা, শ্রেয়, স্বপ্ন, দ্রুগ, গতি, বৃদ্ধি, স্থিতি, অহংকার প্রভৃতি প্রাপ্যগেহে আত্মার অস্তিত্ব-চিহ্ন।

নয়না সমূলপাভ্যন্তে লিপ্যন্তোভানি জীৱতঃ ।
ন সূতভাষ্যলিপানি তদ্বাদ্যতঃ সর্ঘহাঃ ॥
শরীরঃ হি গতে তদ্বিন্ শূভাগারমচেতনম্ ।
পঞ্চভূতাবশেষস্বাং পঞ্চগুং গতমুচ্যতে ॥

চঃ, শাঃ, ১ অঃ ॥

যেহেতু প্রাণিগুণই এই সকল চিহ্ন লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু মৃতের এই সমুদয় আত্ম-চিহ্ন দেখা যায় না, সে কারণেই মহাবিগ্ণ বলেন, আত্মা গত হইলে ওহে শূন্য গৃহেহে ছাত্র অচেতন হয় এবং এই কালে মন প্রাক্কোভিক দেহের অবশেষ হেতু আত্মারই দেহকে 'পঞ্চদ্বপ্রাণ' জড়পদার্থ মাত্র বলা হয়।*

আত্মা, মন এবং ইন্দ্রিয়—এই তিনেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। এক্ষণে ইহা হইতে আধ্যাপকের চেতন-অচেতন সম্বন্ধ মতামত কি প্রকার জানিতে পারা যায় দেখা যাক।

তাহারা একমাত্র আত্মাকেই চেতন-ধাতু বলিয়াছেন। মনও অচেতন, আত্মার সংযোগেই তাহার চেতন। প্রাক্কোভিক অবস্থায় যখন জড়পদার্থ, তখন কিত্যাদিকেও চেতন বলিতে পারা যায় না। স্বতরাং পূর্বোক্ত এক পুঙ্খ ভিন্ন, প্রকৃতি ও তাহাদের বিকারসমূহ অচেতন বা জড়পদার্থ, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। মন এবং বুদ্ধি, অহংকার ও কিত্যাদি প্রকৃতি, স্বয়ং অচেতন বা জড়পদার্থ হইলেও, ইহাদের সহিত স্থিতির প্রাক্কোভিক হইতে আত্মার সংযোগ রহিয়াছে; আত্মা এই সংযোগবশতই পূর্বোক্ত যড়ধাতুকী নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্বতরাং ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে,

প্রকৃতি স্বয়ং অচেতন হইলেও চেতনা ধাতু আত্মার সহিত যষ্ট কাল হইতে চিরসংশ্লিষ্ট হেতু সচেতন। তাহার পর এই সচেতন প্রকৃতি হইতে জাত স্থল ভূতিকা জলাদি পদার্থ-গঠনের উপকরণগুলি বা ধাতু, উদ্ভিদ, পশু, পতঙ্গ, মানবাদি ইতর যষ্ট পরাধগুলিও কখন অচেতন হইতে পারে না।* স্বতরাং প্রকৃতি-পুরুষোৎপন্ন জগতের সমুদয় পদার্থই

সচেতন; কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চেতনার উপলব্ধি হইতে দেখিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়মুক্ত জ্ঞাবকেই সচেতন বলিয়া থাকি; আর আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে বাহ্যতে ইহার বিপরীত দেখি, তাহাকেই অচেতন মনে করি। চেতনাধাতু জ্ঞানের সর্বব্যাপকস্বহেতু স্বাক্ষাতেও অচেতন কিছু থাকিতে পারে না, তাহাও আমরা ভুলিয়া যাই।

শ্রীজীবনকালী রায় বৈষ্ণৱস্ত।

ময়নামতীর পুঁথি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গোপীচাঁদ তাহার বিশাল বিভবের বিষয় প্রদীপিত ও দেখাইয়া রাণী ময়নামতীকে বলিতেছেন "আমার এত লোক-লগ্নর থাকিতেও ভয়ের কথা কি? আর এই বিপুল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া যোগী হইব, আর কার উপরেই বা ইহার ভার দিয়া যাইব? তখন রাণী "ময়নামতী বলে রাজা কিছু নহে মার। ছই চক্ষু মন্দিরে (১) সকল অন্ধকার।" হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক জানগর্ভ উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

"আসিতে লেকটা রাজা যাইতে

জাইবা শৈল। (২)

সদে কইরা লৈয়া জাইবা পাপ আর পুণ্য।"

এ সব দিয়া কিছুতেই যমের হাত এড়াইতে

পারিবে না। যমের কাছে কোন প্রকারে নিস্তার নাই—

"তোমারে নিবারে জন্ম নিত্য

বাউর পারে।" (৩)

এই সমস্ত কথায় রাজা গোপীচাঁদ একটু যেন ভীত হইয়া বলিতেছেন "তাই যদি হয়, তবে বাণের কালের চৌদ্দরাজার ধন, তোমার জোয়ার হিরামণি রত্ন, আমার কামাই রজত কাঞ্চন, চারি বধুর চারি পোলা ধন, এই সমস্ত যমের গোচরে ভেট দিলে যম আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। তখন ময়নামতী বলিতেছে—

"দন দিয়া জন্মে যদি ফিরাইতে পারে।

তবে কেন বড় রাজা তোরা বাপ মার।

তোমার কাঞ্চন নহে সেই মহাজন।"

* ইহা হইতে আমরা আরও একটি, বিষয় উপলব্ধি করিতেছি যে, এই মৃত্যু হইতে সচেতন পদার্থের অচেতনতায় পরিণত হইয়া থাকে। এরূপ ঘটনার কারণ,—জীবদেহের পুষ্টি স্থিতি প্রভৃতি সম্পাদন করণে সর্বদয় পদার্থাত্মিক বায়ুদি এবং কাহা যাব, তাহা মৃত যিনি দেহের ভৌতিক অংশের অধিকারী হয়, তদনিন্দে দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি নির্মল থাকে; কিন্তু ইহা দেহের ভৌতিক অংশের বিরোধী হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকৃত হয়। ইহাই জীবের বিকার বা ব্যাধি। এই ব্যাধি প্রভাবে যখন দেহ অত্যন্ত বিকৃত হওয়ার প্রসারিত হয়, ইন্দ্রিয় সকলের এককালীন সমুদয় কার্যক্ষমি নষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহাকে "মৃত" বলা হয়। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়দ্বন্দ্ব ও ত হাদের কার্যক্ষমি লোপ পাওয়ার তাহার আর চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় না।

* পদার্থ মানেই সচেতন ইহা মাত্র আধুনিকগণ্যকরণই বলিয়াছেন, তাহা নহে; ইহা প্রাচীন আধ্যাত্মবিদগণের মত। মহাবিশ্ব উদ্ভিদের পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাদের সচেতনত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তমসা বহুগুণে বৈষ্টিতাঃ কণ্ঠকৈতুলাঃ।

অস্তঃসাল ভবত্যেতৎ সুবজ্রপদার্থিতাঃ। মঃ সঃ ১ অঃ ॥

(১) মন্দিরে। (২) শৈল। (৩) বাউর=বাহিরীয়া=ঘুরিয়া ফিরে।

রাজি দিনে অষ্ট প্রহরে আটবার যম যাত্ৰায়াক
করিতেন, কখন তোমাকে লইয়া যাইবে
ঠিক নাই। তখন গোপীচাঁদ,—“সত্যই কি
যম বাড়ীর ভিতর আসিবে ?

“তবে লোহাজ বাছির পুঁথি (১)

আমার বাসর।

লোহার জাতনী (২) দিমু পুরীর ভিতর।”
আশি হাজার সৈন্ত পাহারা দিবে, নিজেও
সূর্যদা খড়া হস্তে লইয়া জাগিয়া থাকিবে।
আর যদি নিতান্তই আসে
“লাল চন্দ্রির রূপ (৩) দিয়া জন্মেবে দিমু শাল।
মারিয়া জন্মেতে (৪) নিব বার রাজার মাল।”
ময়নামতী বলিলেন—

“আসিবেক সেই জন্ম হইবে হইয়া। (৫)
তাকে তুমি কি করিতে পারিবে। সে
“চিহ্ন” রূপে আসে “শাচান” (৬) রূপে
যায়, মাছিরূপে যবে প্রবেশ করে। পাণ্ডিত্য
হয়সে কাছে নিস্তার নাই। সে আত্মীয়-
স্বজন কি ধন-স্বজন কিছুইই অপেক্ষা রাখে না।
যমে নিলে সকলেই তোমার জ্ঞাত বার বার
ওজন মত কাঁদিবে, কিন্তু

“জননী কাঁদিলে জান পুরা ছয় মাস।”

আর

“মায় জানে পুত্রের বেদন বার গর্ভের শাল।”

অতঃপর আমার কথা রাখ, ত্রুণচর্চা শিক্ষা
করিয়া জীবন উন্নত ও আত্ম বুদ্ধি কর।”

গোপীচাঁদ বলিতেছে—
“তবে কেন বালককালে বিবা করাইলা।”

এক বিতা করাইলা অদুনা পদুনা। (৭)

সে সব স্বন্দরী জানে আমার বেদনা।

আর বিতা করাইলা খণ্ডোস্ত্র জিনিয়া।

আর বিতা করাইলা উত্তরা রাজার মাঞা।

এবং এই বিবাহের সময় উরয়া রাজার

সহিত দশ দিন লড়াই করিতে হইয়াছিল।

তাহাতে “চৌদশখ-নিয়ম, সাত শত লক্ষ,

তেগটি হাজার হাতি খোড়া নিজ হস্তে

কটিলায়। যুদ্ধে হারিয়া নৃপ আমাকে কড়া

দান করিল।” এখানে গোপীচাঁদের চারি

জীৱ নাম পাইলায়। (১) অদুনা, (২) পদুনা

বা পদ্মমালা, (৩) রত্নমালা, (৪) কাঞ্চনমালা।

গোপীচাঁদের প্রথম বিবাহ অদুনা ও পদুনীর

সহিত হয়। অদুনা ও পদুনা যোহোৱা ভদ্রী

ছিলেন। দুই জনের বিবাহ এক দিনে হয়

বলিয়াই গোপীচাঁদ কহিলেন “এক বিবা”

বলিয়াছেন। অদুনীর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ

গোপীচাঁদ পদুনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক স্থানে অদুনীর উল্লেখে পাইতেছি—

(১) পদুৱার। (২) প্রশস্ত বেড়া। আমাদের মতে “জাতনী” স্থলে “মাতনী” হইবে।

(৩) ভ্রাশা বাস্তি। (৪) বস হইতে। (৫) অশ্রুত হইয়া। (৬) বাজ পুর।

(৭) অদুনা ও পদুনীর বিশেষ সৌন্দর্য-ব্যাতি ছিল বলিয়া মনে হয়। বর্তমান কালেও বিপুল সেনাবাহিনী
মাদুর রূপতী দুইটা মহোদয় ভদ্রী একত্রে দুই হইলে তুলনাহলে রমনীয়া বলিয়া থাকেন যে কড়া দুইটা
কি হুন্দরী বেন “পদুনা পদুনা।” অদুনা পদুনা অবশ্যই তাহাদের ডাক নাম। পদুনীর আসল নাম পদ্মমালা
পাইতেছি, কিন্তু অদুনীর আসল নাম পাইতেছি না। তিনি যোগ করি ডাক নামের বিবাত ছিলেন।
আমাদের মতে অদুনা “অষ্টকমলার” রূপান্তর। (পদ্মমালা) অদুনা যে অষ্টকমলার রূপান্তর তাহাকে
সমস্ত পরিবার কার্য নাই। এই কথার লক্ষ্যমতঃ পর রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধনস্বত্ব ও ঐশ্বর্য বুদ্ধি হইয়াছিল
বলিয়াই এই নাম রাখিত হইয়া থাকিবে। আবার একজন আখ্যান অনুসংক্ভাৱ নামকরন সবচে বৃহত্তর
সংবাদ স্বপ্নতঃ দেখি। জৈনাম শেষের অর্থ ঐকধরিরিহাষা বা সম্পদশালী। ইহাদের সৌন্দর্য-ব্যাতি
একভাবে বর্ণনিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, একসময়ে তারা ভাট ও চারিজনদের খাওয়া সর্বত্র করিত
হইত। ঐক্লুক দীপেন্দ্রজ দেন মহাপ্র “প্রতিভা” আখ্য ১৩১১ বা ১৩১২ খ্রীঃ অব্দে অনেক কথা
নির্ণয়িত হইবে।

“মোর ভৈন পদুনীরে পাইলা বেডার (১)।

ধনস্বত্ব মোর বাপ জাছিল অপার (২)।”

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে অদুনা ও পদুনীর

পিতৃ নাম কোথাও পাওয়া যাইতেছে না।

তবে তাহাদের পিতার রাজধানীও যে বেশী

দূরে ছিল তাহা বোঝা যায় না (৩)।

অদুনীর উল্লেখ আছে—

“যশ অদুনীর মাথে ছোট ছিল চুল।

সেই দিনে তোমার মাএ নিল পান ফুল।”

এক বংশরের কালে নিত্য আইল গেল।

পঞ্চ বংশরের কালে দেখি জোড়া দিল।”

এখানে দেখা যাইতেছে যে, অদুনা ও

পদুনীর জন্মের পর হইতেই রাজা গোপীচাঁদের

মাতা ময়নামতী তাহাদের সহিত পুত্রের

বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়া কেবল আসা

বা গিয়া করিতে লাগিলেন। অদুনীর মাতার

চুল ছোট থাকার সময় অর্থাৎ শৈশব কালেই

ময়নামতী পুত্রের বিবাহ সংকল্প “পান ফুল”

গ্রন্থ করিয়াছিলেন। এক বংশরের কালে

নিত্য আসা বা গিয়া করিয়া পঞ্চম বংশরের

সময়ই “জোড়া দিল” বা যৌতুক মিলাইল।

ইহা বিবাহের পূর্বে কর্তব্য আচার-ব্যবহার।

তার পর—

“পঞ্চ বংশরের কালে আনি বিতা কৈলা।

নব বংশরের কালে মন্দিরেতে মিলা।

ভূমি মাত আমি পাঁচ এতত কালের বিয়া।

হিরামণ মাখিক মুক্কা লৈক্ষদান দিয়া।”

সংস বংশর পূর্বেও বাল্য-বিবাহ প্রচলন

দেখা যাইতেছে। “ভূমি মাত আমি পাঁচ

এতত কালের বিয়া” উক্তি ধারা বুঝা

যাইতেছে যে, পাঁচ বংশরের কালে যৌতুক

মিলনকেই বিবাহ মরিয়া লওয়া হইয়াছে,

প্রকৃত বিবাহ সাত বংশরের সময় সম্পন্ন

হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্র মতে কড়া বান্ধুদত্তা

হইলেই বিবাহ হইল বলিয়া স্থির হয়।

আর বিতা “খণ্ডো” রাজার কড়া। ইনি

অবশ্যই খণ্ডকের রাজার কড়া তাহাতে সন্দেহ

নাই। “খণ্ডো” ও “খণ্ডল” শব্দে বিশেষ

সামঞ্জস্য দেখা যায়। খণ্ডল জিপুরা জেলায়ই

একটা পঞ্চপাণ।

তৎপর “উরয়া” রাজা। এই উরয়া

রাজাকে আমরা “উরুমা” বা হিড়িখা

(কাছাড়) নামের রাজা বলিয়া নির্দেশ করিতেছি।

আমাদের দেশে “হ” স্থানে “অ” বা “উ”

বলার বিশেষ রীতি আছে। * তাই মনে হয়

প্রথমে “হিড়িখা” তাহা হইতে (তুচ্ছার্থে)

“উরুমা,” তাহা হইতে সংক্ষেপ “উরুমা”

করিয়া লওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশে

দেখিলে একটা কন্দাকার “জববহ” বলিকা

সেখানে তাহাকে হিড়িখার সহিত তুলনা

দিতে গিয়া “উরুমা” বলা হইয়া থাকে।

কেননা প্রবাদ যে, হিড়িখা অতি কন্দাকার

রাফসী ছিল। অতএব আমাদের মতে

“উরুমা, উরুমা বা হিড়িখা রাজা (কাছাড়)।

(১) যৌতুক। (২) অশেষ ধনস্বত্ব যাচিল।

(৩) M. Martin's "Eastern India" নামক পুস্তকে অদুনা ও পদুনাকে ঢাকা—মাদারের রাজ্য
হরিশ্চন্দ্রের কড়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া মনে হয়, কেননা রাজা
হরিশ্চন্দ্রের জাতীয় গুণের সহিত মণিপুরীদের জাতীয় গুণেরও সমামান্যিকতার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত
হইতেছে। আমরা রাজা মণিপুর ও গোপীচাঁদকে নিম্নলিখিত বিবরণ-বিবরণ রাজা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।
রাজা হরিশ্চন্দ্রের সাহিত্য জাতীয় বংশধরণ অজ্ঞানিত মাতার ও তৎসাহিত্য হইতে বিভ্রান্ত। এবং তাহার
সকলই হিন্দু-আচারানুগত।

* হোলা বিভাগ—উরয়া বেলুর। হইল—অইল। পশ্চিম বঙ্গের জলকোট জেলা।

এই জন্তই গোপীচাঁদকে এই বিবাহ করিতে দর্শনিত মুখ করিতে হইয়াছিল। কেননা কাছাড়পতি একটা যেমন তেমন রাজা ছিলেন না।

আরও দেখিতে গেলে “উত্তরায়” যদি “উত্তরায়” কথার অপভ্রংশ হয় বা লিপিকর-প্রমাদে “উ” লুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই কাছাড় রাজাকেই লক্ষ্য করিবে, কেননা ময়নামতী (মেহারকুল) হইতে কাছাড় উত্তরে অবস্থিত।

দশ-বস্ত্র ছাড়িয়া যাইবার কথায়, উপমুক্তা চারি স্ত্রী তাগে করিয়া যাইবার কথায়, কোন কথাই ময়নামতীর দৃঢ় পণ বিচলিত হইল না। তিনি পুরুষকে কেবলি যোগ শিক্ষা করিবার জন্ত গৃহত্যাগ করিতে জোর করিতে লাগিলেন। এবার রাজা গোপীচাঁদ নাছোড়-বান্দা মাতার জোর বজায় রাখিতে সীকৃত হইলেন। এই কথায় অতুনা পছন্দা প্রভৃতি চারি নারী ক্রন্দন করিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। “প্তির সঙ্গে যাইবার অস্বাভাবিক চাহিলেন। গোপীচাঁদ পথে বাধের ভয় দেখাইলেন। পত্নীপণ কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইলেন না। বলিলেন,—

“পাউক বনের বাধে তাহে নাহি ডর।

তুমি আগে (১) মৈলে হইব

সাক্ষর (২) মোর ॥”

এইরূপে, কখনও বিনয়ে কখনও একটু জোর করিয়া, কখনও বা প্রণয়ের কথা বলিয়া, গোপীচাঁদকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোপীচাঁদ এবার বেশ দৃঢ়। এখানে কবিতা বড়ই স্বন্দর। বৈষ্ণব বাবু তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত

করিয়াছেন। প্রবন্ধের অতি দীর্ঘতার ভয়ে আমরা তাহা ইচ্ছা সত্ত্বেও তাগে করিলাম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি গ্রন্থের প্রতিপাখ বিষয়ে আমাদের বিশেষ মতভেদ নাই।

এই অংশ পূর্ববর্তী লেখকেরা অনেকস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয় সত্বেও অনেক কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা গ্রন্থের একটা অতি সংক্ষেপ বিবরণ দিয়া আমাদের মূল বক্তব্যের দু-একটা কথা যাহা বাকী আছে বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই গ্রন্থের আমূল আলোচনা করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হইবে। প্রবন্ধও অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। এখন সংক্ষেপতঃ এই :—

গোপীচাঁদের পত্নীগণ তখন শাস্ত্রীর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া সকলে পরামর্শ ক্রমে বানিয়ার বাড়ী হইতে বিঘলাড়ু ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাকে ভেট দেওয়ার কথা, ময়নামতীর বিষতক্ষণ, তাহার লাজনা, বিষজার করা, ময়নামতীর গোঁর্দানথের নিকট জ্ঞান-শিক্ষার ও মঙ্গ-প্রাপ্তির ইতিহাস, মানিকচাঁদের মৃত্যু-কাহিনী, তাহার দাং-সংস্কার, ময়নামতীর সহস্র-গমনের উত্তোপ প্রস্তাবের সত্য-নিষাধার সাক্ষী প্রমাণ গ্রন্থ, বধূগণের বাক্যে গোপীচাঁদের মত-পরিবর্তন, মাতার জ্ঞান-পরীক্ষা-গ্রন্থ, তুষ্ট হইয়া যোগ-শিক্ষা করিতে গমনে সম্মতি-প্রকাশ, গুরু-অনুগ্রহ, হাড়িকার সহিত গৃহত্যাগ, শুভ্রবর্ণ গমন, মদের কড়ির জন্ত বেজার নিকট হাড়িকার গোপীচাঁদ বিক্রয়, গোপীচাঁদ কর্তৃক বেজার প্রেম-প্রত্যাখ্যান, বেজার কোণে রাজা গোপীচাঁদের ছাগল-রক্ষণের বৃত্তিগ্রন্থ।

গোপীচাঁদের পত্নীগণ কর্তৃক তাহার শিক্ষিত ভূতপক্ষী * ছাড়িয়া দিয়া তাহার সন্ধান জ্ঞাত হওয়া, ময়নামতীর আত্মদান, পুনরায় হাড়িকা সিন্ধার নিকট গমন, পুস্ত্রের উদ্ধার-সাধন, হাড়িকা কর্তৃক গোপীচাঁদ-উদ্ধার। রাজ্যে আগমন, রাজ্যগ্রহণ, ময়নামতীর স্বরণ + পথে মহাপ্রস্থান, কপিলমুনির আশ্রমে গমন ইত্যাদি।

আমরা এখানে গোপীচাঁদ ও মানিকচাঁদের সামাজিক জীবনের কথার একটু আলোচনা করিব। বৈষ্ণববাবুর মতে “রাজা মানিকচাঁদ বৌদ্ধ ছিলেন এবং গ্রন্থের আগাণোড়া সমাজচিত্র বৌদ্ধ তান্ত্রিকের সমাজচিত্র।” এ কথা আমরা স্বীকার করি না। তিনি গ্রন্থের যে দুইটা চরণ বাহ্য উল্লেখ করিয়া আগাণোড়া গ্রন্থে বৌদ্ধদের ছায়া দেখাইয়াছেন তাহা এই :—

“মানিকচাঁদের জাতিগোত্র একামুক হৈয়া।
সপ্তদিল কাঠ কৈল লারিয়া চারিয়া ॥”

তিনি এই সপ্তদিলের পরে একটা “ন” যোগ করিয়া ইহার অর্থ কুরিয়াছেন মানিকচাঁদের অজ্ঞোতি-ইহা বৌদ্ধমতে সপ্তদিল দিনে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে দুইটা কথা চিন্তা

করিবার আছে। আমাদের মতে উক্ত উদ্ধৃত চরণ দুইটা নিম্নলিখিতরূপ হইবে।

“মানিকচাঁদের জাতিগোত্র একামুক হৈয়া।
সপ্ত দিল কাঠ কৈল লারিয়া চারিয়া ॥”

“দিল” স্থলে “দিল” করিলেই ইহার পরিষ্কার অর্থ হয় যে, রাজা মানিকচাঁদের জাতিগোত্র তাহার চিত্রায় “সপ্তকাঠ” দিল এবং লাড়িয়া চাড়িয়া কাঠ করিল বা হার করিল। কবি এখানে একটা “কাঠ” শব্দ দ্বারা “সপ্তকাঠ” “কাঠ করা” দুই দিকই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দু মাঝেই বোধ করি অসম্ভবত আছেন, যে মৃতদেহ দাং করিবার সময় শ্মশানে বদ্ধ জাতি গোত্রের একযোগে চিত্রায় “সপ্তকাঠ” দিতে হইত।

আমাদের বিবাস “ল” স্থানে “ন” আমাদের পূর্ববর্ণিত নকলনবীশ মহাশয়দের কীতি! প্রাচীনকালে “ন”র নীচে বিন্দু দিয়া (ল.) “ল” লিখিবার প্রথা ছিল। বোধ করি নকলকারীদের কল্যাণে “ল” “ন” হইয়া পড়িয়াছে। বিন্দু লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আর গুণবাচক পূরণ বাচক তালস করিবার এবং “সপ্ত” কথার

* আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জ্ঞান-প্ৰবেশবার ফলে বার্ত্তবিশ্ব-কণ্ঠান্তের কথা শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য মনে করিবেন। কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থে শুকপাকীর দ্বারা গোপীচাঁদের সন্ধান গ্রন্থকো “নিখা বা বিধান যোগা মধে বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাহা হইতেই শিক্ষিত পণ্ড-পক্ষী দ্বারা অবৈধ আলোচিক কাগা মাধনের ইতিহাস ক্রম হওয়া যায়। কিন্তু উত্তরাংশ হইতে শোখিত হইয়া না আসিলে আমরা কোমোটিই বিশ্বাস করি না।

† এই স্থানে অসম্মতি বর্ণনাম। গ্রন্থদুইপদ বসন্ত হইতে ময়নামতী পূর্ণিতে জিসুরার মহারাজার একটি বাহালা গণ বিবাসনা আছে। যে ত্রিভুতি এই বাহালা বহু হাশিষ্ট তাহা বহু প্রাচীন—মহারাজ বাহালাদের প্রস্তুত মধে। এইখানে ময়নামতীর কোমোটি। উক্ত ত্রিভুতির চতুর্ভুজিক বাক্যেরাচারে একটি বিবীর্ণ মর্দা আছে উক্ত ইষ্টকরানিতে প্রমিত। উক্ত হৃদয় বর্ণনাম বাহালা যবের ১২ মুট পূর্ণবিক্রম অবস্থিত। এমনকি লোকের দ্বন্দ্ব বা কমেদারী উপলক্ষে উক্ত যবের পুঞ্জ করিয়া থাকে। কিন্তুদিন পূর্বেকোন ইষ্টক পূর্ণবিক্রমের একটি অপরদক বালক হৃদয় দেখিতে যাইয়া বৈবাহ উহার মধো শড়িয়া আহত হওয়ার তাহার মূখ ইষ্টক দ্বারা বৃত্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সহিত আর একটা "ম" যোগ করিয়া লওয়াও বিশেষ আবশ্যক দেখা যায় না। আর যদি বৈকুণ্ঠ বাবুর কথাই ধরিয়া লওয়া যায়, তবুও সম্ভব মনে "রাজা" মণিকর্টারদকে কাঠে করিবার বিশেষ কারণ পাওয়া যায়।

"আশার মাসেতে মৈল মণিকর্টার গোমাই।

প্রতিথিতে (১) জলময় পুড়িত স্থল (২)

তারপর ময়নামতী গঙ্গার শুভ করিয়া গঙ্গার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার শ্বেত উপাশন করিয়া গঙ্গার রূপায় চরকুনি (৩) প্রাপ্ত হয়। তবুও রাজা মণিকর্টারদকে দাহ করিবার

আয়োজন করিয়াছিলেন। হইতে পারে এই জহই সাত দিন পর দাহ সংস্কার হয়। ছিল। ঘটনাবশতঃ এরূপ হয়। ছিল। বলায় কোন হিন্দুকে বৌদ্ধ-আচারসম্পন্ন হইয়া করার কোন হেতু নাই। আমরা জানি পুরাপারিত্তেও এরূপ অনেক ঘটনা আছে। বিশেষতঃ কোন বৌদ্ধকে দাহ করিবার জন্ত গঙ্গাতীরে (৪) অশ্রদ্ধাশ্রম করিতে হইত।

গঙ্গার কুলে বসিয়া গঙ্গার আরাধনা করণ বৌদ্ধ রীতি নহে। সাতবার চিত্তা প্রদক্ষিণ করিয়া মুখাশ্রি (৫) করিবার প্রথা এবং সহমরণ (৬) বৌদ্ধমতে নাই।

(১) পুণ্ডরীক। (২) পোড়াইবার স্থান। (৩) এই চর বর্তমান কালও কুষ্টিয়া মহরের অংশ বিশেষ "পাচর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গঙ্গারদ্বক চর বসিয়াই ইহার এই গঙ্গার চর বা পাচর নাম ইহা থাকিলে। বন্দোবস্ত প্রকৃতি স্বতঃ স্বং নদীর অনেক চর দুই দুই, কিন্তু কোনটা পাচর মূলিখা উক্ত হইয়াছে কি না সম্ভেদ। এমন কি নিল গঙ্গা নদীর কোন চর-ভূমিও পাচর বা গঙ্গার চর বসিয়া উক্ত হইয়া থাকে এমন ভাবি নাই। অথচ এই জুহু পার্শ্বটা নদী গোমতীর একটু-দুট চর-ভূমি কেন পাচর নামে অভিহিত হইল, ইহা চিত্তার বিষয় নহে কি? বিশেষতঃ ময়নামতী গঙ্গার শুভ করিয়া চর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম পাচর হওয়া প্রাচীনকাল বলাই হইতে পারে না কি? এবং ইহাই আমাধিকার "নতাস মুখে গঙ্গাবেরী গোমুইবে আছিল" এই কথাটির সত্যতার প্রতি খাটুই করে না কি? আরও বৈদ্যনাথ-গাওঁদের সমগ্র পুস্তিকাংশ "শাজন পাখা" বা শ্রাবণাবলি বসিয়া উক্ত হইতেছে। এই শ্রাবণাবলিও রাজা মণিকর্টারের সমগ্র পুস্তিকাংশের নির্দেশ বসিয়া মনে হয়। সেখা যোগে রাজা মণিকর্টারদকে দাহ করিবার জন্ত জল পাওয়া গিয়াছিল না। ভিজা সোঁতজলে নতাস চরে মাটি পড়িয়া শ্রাবণ কায়ও পুত্রবধি বসিয়া থাকিলে যাহা দ্বারা চিত্তা রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা যাহার বশাবসরে পরিবর্তিত হইয়া গেল। বলাই হইতে পারে। কেননা ময়নামতীর উজ্জিত বৃক্ষাশ্রম শ্রাবণ-রজনীর বালনা বিরণে পড়ই ইহা মনে গাঢ়িখা উঠে। ভারের ভার লাকড়ী ও যাহ পড়িয়া গণ্য হোয়া উঠার বর্ণনা বহুতো কবির এই ইঙ্গিতই পরিলক্ষিত হইতেছে। নতাস লাকড়ী দিয়া চিত্তা রচনা করার বিষয় না বিশ্লেও চলিত। (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০) (২১) (২২) (২৩) (২৪) (২৫) (২৬) (২৭) (২৮) (২৯) (৩০) (৩১) (৩২) (৩৩) (৩৪) (৩৫) (৩৬) (৩৭) (৩৮) (৩৯) (৪০) (৪১) (৪২) (৪৩) (৪৪) (৪৫) (৪৬) (৪৭) (৪৮) (৪৯) (৫০) (৫১) (৫২) (৫৩) (৫৪) (৫৫) (৫৬) (৫৭) (৫৮) (৫৯) (৬০) (৬১) (৬২) (৬৩) (৬৪) (৬৫) (৬৬) (৬৭) (৬৮) (৬৯) (৭০) (৭১) (৭২) (৭৩) (৭৪) (৭৫) (৭৬) (৭৭) (৭৮) (৭৯) (৮০) (৮১) (৮২) (৮৩) (৮৪) (৮৫) (৮৬) (৮৭) (৮৮) (৮৯) (৯০) (৯১) (৯২) (৯৩) (৯৪) (৯৫) (৯৬) (৯৭) (৯৮) (৯৯) (১০০)

"ওবে তোর বাগেলে যে পুঁথিবারে নিল।
গাছ গাছেরা দিয়া তবে শোভে ডালি দিল।"
(৪) "শেতা কোণে গঙ্গাবেরী গোমুইবে আছিল।" অর্থাৎ পুরাকালে গোমতীকে গঙ্গার ভ্রাতৃ পবিত্র মনে করা হইত। যে কোন নদীকে হিন্দুরা গঙ্গা বলিয়া মনে করে। কোন ব্রোহ্মসক্তীর ভীত মতে দাহ করা হিন্দুগণেরই প্রধান রীতি। (৫) "সাত শাক পাখি অগ্নি মুখে নিলাম মুঠ।"
মণিকর্টারের দাহ-বিবরণে ময়নামতী এই কথা বসিয়াছিল।

(৬) "অখিল চরকুনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
আমি কৈলা, কতদিনা বা পল চাপিয়া।
ভারে ভারে লাকড়ি সব ধরিলে তুলিয়া।
তোমার বাগেলে রাখিলাম কীমানি করিয়া।
কাঁধা ইহা গণে তবু করে শত ধর।
উমাছাড়া গণে রাজা অখিল ভিতর।
সে সকল গাছ গণিণ গণে উঠে হোয়া।
সে অখিলে রহিল মুঠ কেন কাণা মোমা।"

ব্রাহ্মণ (৭) দ্বারা চিত্তাপুরকও বৌদ্ধেরা অবশ্যই দেখে না। বৌদ্ধদিগের দাহ-সংস্কার সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে হওয়ারও কোন বাধাবিধি নিম্ন নাই। (৮) আরো দেখা যায় যদি তাহাদের সামাজিক প্রথা "বাসিন্দা" করা রীতিবিশুদ্ধ না হইত, তবে ময়নামতীর বহুরূপ তাহার উপর কোথাকথনতঃ মনে মনে তাকে গালি দিবার সময়
"অবশ্য মরিয়া ভুজি আমরার বাসরে।
সপ্ত দিনের বাসিন্দা করিমু তোমায়ে।"
এরূপ উক্তি করিলে না। এই গ্রন্থে দেখে-দেবীর অর্ধনা-বন্দনা বিশদভাবে না থাকিলেও অনেক স্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গঙ্গার শুভ, অনাদি অসুর প্রভৃতি নিরঞ্জনর নাম, দুর্গাদেবী, মহাদেবীর কথা, চন্দ্র, সূর্য, যমের কথা, গুরুর নিকট আড়াই-অশ্রমী বীজ্ঞান-প্রবর্তের কথা, গ্রন্থ-বিশ্রা-ছায়া শুভদিন-নির্ণয়ের কথা, পাণ করিলে লক্ষী ছাড়িবার কথা এইরূপ অনেক কথা আছে। অতএব ইহা দ্বারা কোন প্রকারেই একেবশব্দ প্রতীতি হইতেছে না। ইহা নিশ্চয় যে রাজা মণিকর্টার ও গোপীচাঁদ প্রভৃতি সকলেই হিন্দু ছিলেন। দেখিতেছি।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি তাহার বাক-জাতীয় রাজা ছিলেন। আমাদের মতে তাহার বৈষ্ণব ছিলেন। উক্তশ্রেণীর নির্ধারন হিন্দু না হওয়াতেই তাহাদের কৌটিল্যের সহিত কোন দেবদেবীর স্তুতি-বন্দনাদির বিশদ

ভাবে উল্লেখ নাই।* তাহারিগকে বাক-জাতীয় হিন্দু রাজা বলিবার কয়েকটা কারণ পাইতেছি।
"গাঙ্গেতে এড়িয়া জাবে বস্ত্রিণ কাহন নাও।"

"নয়গাণ্ড ভেদ জাবে উনশত বাণিয়া।"
বায়সারী ভিন্ন এতগুলি নৌকা ও এতগুলি বাণি-বন্দনাও থাকিবার কোন কারণ নাই। তাহাদেরই উক্তির একস্থলে পাইতেছি
"মাগুণে গৌরব করে যার কাছে নাও।"
(নৌকা) এর উপরও প্রমাণ চাই কি? সাধু অর্থে শুভদায়ক, কাহারও অবিরত নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি রূপগাত্য থাকার বিচিৎ্র নহে।

গোপীচাঁদের টাকা দিয়া স্বয়ং বন্ধীভূত করিবার প্রত্যয়ে ময়নামতী বলিয়াছিল "তাই যদি হইত তবে তোমার বাণ বড় রাজা বলিল কেন?"

"ধনের কাপাল নহে সেই মহাবল।"
এই "মহাবল" শব্দও ব্যবসায়ী অর্থ-জ্ঞাপক। আর মণিকর্টারের দশান-বন্ধ-গণের মধ্যে ময়নামতীর সাক্ষী ক স্বরূপ ছইজন বণিক পাইতেছি, তার মধ্যে একজন "রাজা সাউল লক্ষ্মণ"। এখন বোঝ করি, নিম্নোক্তে ইহা দ্বিগকে বাক-রাজা বলা যাইতে পারে। স্বজাতীয়ের অশ্রোণীক্রিয়ায় স্বজাতীয়ের আগমনই সমীচীন। কথাও আছে

(১) "ব্রাহ্মণের কোলে থাকি আভিষিমাযি।
সে অখিলে পোড়ো না খেল জিলকুসেয়ে যিই।"

(২) হিন্দুও বৌদ্ধের দাহ-সংস্কারের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ভারতবর্ষ ১ম বর্ষ ২য় অধ্যায় বৌদ্ধ দাহ সম্বন্ধে সম্বন্ধীয় প্রস্তাব দেয়া।
* প্রতিভা ১ম বর্ষ ২য় অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ বিজয়কুমার রায় সাধারণের প্রাচীন কোর্টি এবং রাজা হরিকৃষ্ণের জাতি নির্দেশে ইহা সম্বন্ধীয় ইচ্ছা

ই এক সাকী আছে মোর ভাট দামুদর।
আর সাকী আছে ব্রাহ্মণ দম্বির।
আর সাকী আছে রাজা সাউল লক্ষ্মণ।
সাকী আনিবারে শ্রীম পাঠাও অম্বুর।"

মৌলবী আবদুল করিমের গ্রন্থ পুস্তক "ভাট" হলে "ভোটা" লিখা অচল। ইহাও ভুল। বৈষ্ণব বাবুর গ্রন্থে "ভাট" শব্দই নকসনামী-গণের নির্দিষ্ট-শিক্ষণতায় যে ভোটা পরিণত হইয়াছে ইহা বলাই ভাল। এই পুস্তকেই আমরা "ভোটা" হলে "ভোটা" লিখা পাইতেছি।

(১) কুচীনগর। (২) রাঢ়দেশ। “গোর্গ বিজয়” প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। গোর্গ বিজয় প্রবন্ধ ইহার পরে প্রকাশিত হইবে। (লেখক)

গোপীচাঁদ ইক্লপ জ্ঞান পাইলে সম্যাসী হইতে স্বীকৃত হয়। মন্যমাতী বলিলেন "তোমাকে ইহাপেক্ষা আরোও আকর্ষণ্য কাব্য দেখাইব।" মন্যমাতী একদিন এক তামূলীর মাথা কাটিয়া ফেলিল। গোপীচাঁদ মাতাকে ডাকিনী বলিয়া গালি দিল। মন্যমাতী বলিলেন "হাড়িকা এই মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিলেন, কাটা বেধ ছোড়কা লাগিলে—এই জুইই তাহাকে বধ করিয়াছিল।" তামূলীর মৃতদেহ বঙ্গারত করিয়া মন্যমাতী হাড়িকা নিকট উপস্থিত হইয়া সব বলিল এবং এই মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়া দিলে গোপীচাঁদ তাহার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিলেন—তাহার শিখা হইলেন জানাই। এত শুনি সেই শ্রেয়ী (১) হস্তেতে করায়। মন্ত্রমুখী (২) সাগর মধ্যে গেলন্ত চন্নিয়া। (৩) এবং নিজ জ্ঞানবলে মৃতদেহে জীবিত করিয়া আনিয়া দিলেন। রাজা গোপীচাঁদ তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে সম্যাস গ্রহণ করিলেন। তাহার বৈমায়ে জ্যেষ্ঠ ভাতা "মুদাই তামূলীর" নিকট রাজ্যের সমস্ত ভার বিয়া গেলেন।

আরো দেয়ান পিশাচিসত্ত্বের জাঙ্ঘল্যমান প্রণাম। সম্যাস গ্রহণ করিয়া রাজা, হাড়িকায় সহিত হাঁটিতে হাঁটিতে চলিতেছেন—

"আগে জ্ঞান হাড়িকা সিদ্ধা ত্রিশূল (৪) কাম্পে লেয়া।

পিছে জ্ঞান গোপীচাঁদ কাঁধা গলে দিয়া।"

দৃষ্টি করি হাড়িকায় রাজা পানে চাই।
হাঁটিতে বহুল গজা (৫) ফুটায়ছে পাই।
সিদ্ধা বোলে পিশাচ যে শুণ
আঙু হৈয়া।

রাজার পায়ের কাটা ফেলাও বাড়িয়া।
"সিদ্ধা বোলে দৈত্যের মোহ আজ্ঞা পরে।
হরিপুর যাইতে এক জাঙ্ঘাল দেহ মোরে।
হাড়িকায় আজ্ঞা যদি দৈত্যগণে পাইল।
আজ্ঞা অহমারে এক জাঙ্ঘা বান্ধিল।"

তারপর শুড়িপুর গমন, মদের কড়ির স্তম্ভ গোপীচাঁদ বিক্রয়। (৬) বেক্সার প্রেম-প্রত্যাখ্যান, মেঘ-রক্ষা, উদ্ধার, রাজ্যে আগমন।
এই শুড়িপুর কোথায় নির্ণয় করা কঠিন। তবে পুরাকালে ইহা যে একটি শৌণ্ডিক বা মজলিকোস্তাতিবের আবাস-গ্রাম ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা হইতে পারে। চৌদ্দগ্রামের এলাকায় শুড়িকার নামক একটি গ্রাম দৃষ্ট হয়। এই গ্রাম বহু পুরাতন। তথায় কয়েকটা পুরাতন বৃহৎ দাখিলাও বিদ্যমান আছে। এককালে এই গ্রাম যে সমৃদ্ধিশাল্য ছিল তাহা গ্রামের আকৃতিদ্বারা প্রমাণিত হয়। এই শুড়িকার বা হরিকর হরিপুর নগরেরই পরিবর্তিত নাম কি না চিন্তার বিষয়। কথিত আছে রাজা গোপীচাঁদের শিক্ষিত স্ত্রী তাহার সম্মান করিয়াছিল—

"বহদিন উড়ি পক্ষি হরিপুরে গেল।"
ইহা ঘরা বলা যাইতেছে হরিপুর মন্যমাতী হইতে কিছু দূরত্ব। বিশেষতঃ—

"হরিপুর উদ্দেশে স্ত্রী চলতইতৎক্ষণ।

উড়িতে উড়িতে গেল হরুরের সনন।"

সুন্দরী হরিপুরের স্কেন দিকে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া "হরুরের সনন" রিয়াছিল অর্থাৎ পূর্বে দিকেই গিয়াছিল। অতএব দেখা যায় হরিপুর মন্যমাতী হইতে পূর্বে দিকে ছিল। আমাদের নির্দিষ্ট "হরিকর"ও মন্যমাতী হইতে পূর্বাংশেই অবস্থিত এবং কিছু দূরত্বও বটে। অবশ্য একটা

পার্থীর পক্ষ অস্থগমন করিয়া সেইখানে পৌছাইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল—
এক প্রথমে দিক নির্ণয় করিতে না পারিয়া কেবলি পূর্বে দিকে গিয়াছিল তাই "বহদিন উড়ি পক্ষি হরিপুরে গেল।" নির্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। আর একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে "হরিপুর" যাইতে কোন প্রকার বিঘ্নত জলা বা নদী সাগরাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় নাই। তাহা হইলে হাড়ি সিদ্ধা তাহার "তাল বেতান" বা শিলিকর পাঁশাল ভৈরবগণকে "হরিপুর" যাইতে একা জাঙ্ঘাল দেহ মোরে।" বলিয়া স্থলপথ গন্তস্ত করিতে না বলিয়া জলযানের বন্দোবস্ত করিতেই বলিতেন। পূর্বে বলিয়াছি "মোহাবন্ধু" সাগরতীরবর্তী গেল ছিল। অতএব হরিপুর মোহাবন্ধু বা মন্যমাতী হইতে পূর্বাংশেই হওয়াই সমীচীন মনে হয়।

সমালোচ্য গ্রন্থে আমরা তৎকালের ব্যবহার্য

কয়েকটি শ্রবের নাম পাইতেছি। (১), বন, (২) ভূষণ, (৩) ব্যবহার্য শ্রব্য (৪) বাণিজ্য ও বণ-পোতাঙ্গি।
"জাদুনাশ পিছে কাপড় মেনশাল শাড়ী।
সেই শাড়ীর মূল্য ছিল বাইশ লাখ কোড়ি।
পান্দুনাশ পিছে কাপড় তলে বান্ধি নেত।
মাধাকরে বলমল বসার হস্তি বেত।
রতনশালাএ পিছে কাপড় নামে যে তসল।

আমারিয়া ঘর জান আঙনে পশর।
কাপড়শাল আলাশ পিছে কাপড় নামে শিলাবানি।
রূপ দেখি তপতক ভুলিয়ে জ্ঞান অলি।"

পুরাকালে বঙ্গবাস-শিল্পের জিহবা ও শ্রুতি বিশেষ ব্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহার দাক্ষ্য রঙ্গম জীবন্ত কৈলাসভঙ্গ সিংহ বংশধরের রাজমালা হইতে বক্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। * আমাদের বিশ্বাস এই "মেঘনাদ

* বিখ্যাত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডি. কো. বলিয়াছিলেন "ভারতের শিল্পিগণ আমাদের সর্বদান করিল।" এক্ষণে আমরাও বলিতে পারি "ইংরাজ শিল্পিগণ আমাদের সর্বদান করিতেছে।" কার্ণাস ঘর বয়ন রিগুবার প্রথম শিল্পকারী ছিল। * সরাইলেন তত্ত্বাবধানে কার্ণাস পুর দ্বারা উৎকৃষ্ট "তাজেল", মুতি, চারব ও শাড়ী প্রস্তুত করিত। ২০। ২৫ বৎসর পূর্বের তথ্য আমরা লেখিয়াছি। এক্ষণে তাহা বোণ পাইতেছে। প্রাচীন "টাকাই মল্লী" মল্লত পুরস্কার বিদ্যা বাস্তব লাভ করিয়াছিল। সেই মল্লীনেরই স্থানীয় নাম "তাজেল" যে তাজেলের গোলাক পিঠিগণ একটা তাজেলের বালকদের এক স্তম্ভে দ্বারা নিবদ্ধ উপস্থিত হইলে সম্রাট তাহাকে "উলহ" বলিয়া অভিমান করিয়াছিলেন। "তাজেল" প্রচুর পরিমাণে সরাইলেন (রিগুবার) প্রস্তুত হইত। * * * সরাইলেন তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত ২০। ২১ টাকা মুদার মুতি আমদানি করিয়াছিল। পাড়ের হয় যথেষ্ট জঙ্গ এই সকল বস্তুর মূল্য সুদী হইত না। কারণ সরাইলেন তত্ত্বাবধানে পাড়ের কাঠকে অতি তুচ্ছ বিবেচনা করিত। * মুদা পুর দ্বারা তাহার আদ্যাবদ শিল্প লক্ষণে পরিচয় প্রদান করিত।

Rajmala p. 503, 504.
In the north of the District in the Fiscal division of Sarail, a very fine description of "Muslin" is made called "Tanjil" which is said to be nearly as good in texture and quality as the shabnam muslin of Dacca. The thread is spun by hand and the muslin is not usually made by the weavers unless they have special orders.
Statistical account of Bengal Vol. vi. p. 418.

ঐতিহাসিক পুস্তককার্য পুরা দ্বারা নির্দিষ্ট উৎকৃষ্ট "বাণেশ" প্রভৃ (তসল) প্রস্তুত হইত। এইসকল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকটা বাণিমাণ্যের হাতিয়া ছিল। অনুমান ১২ গজ টাকার বাণা তাহাদের দ্বারা প্রস্তুতবৎসর নিম্নে প্রেরিত হইত। এক্ষণে তাহা বধ হইয়া বিদ্যেছে।

Rajmala p. 456.
রিগুবার সুদীর্ণ নাম প্রকারের তাল কাপড়ও প্রস্তুত করিত। বরদা বাত পরবার লস্করীট নামক হায়ে মণিপুর ও গুহর জেলাদের পরিত্যাগ নাড়ী ও লুট প্রস্তুত হইয়া। এক্ষণে তাহা লুট হইয়াছে। অকাল মরে (আলোচ্য) মন্যমাতী পল্লভের মিতকর্তা স্থানীয় সুদীর্ণ এক প্রকার ছিট ঘর বয়ন করিয়া দ্বারা লাভ করিয়াছে। এই ছিট দ্বারা প্রিয়ান দাঁড় ও পেটুলিন প্রস্তুত করা বা। ইহা অনেকটা শিল্পীরা এলাহাবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এক্ষণে উক্ত স্থানের নামাংসারের তাহা "মন্যমাতী চারবানা" বলিয়া ব্যাতি পাইতেছে।

Rajmala p. 504.

শাড়ী" "সিরাবালী শাড়ী" এবং "তমস" ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের ঘরের জিনিষ ছিল। এবং তৎকালে তাহা বহুমূল্য ছিল এবং বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। সমালোচ্য গ্রন্থে "গৃহস্থের পরিধান সোনার পাছড়া" বলিয়া এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্রের কথা পাওয়া যায়। এই "পাছড়া" কাপড় অজ্ঞাপিও "ত্রিপুরা" ও "মেঘালী" জাতীয়দের দ্বারা পর্ত্তকৃত কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইত্বেই। মাগারথঃ (৩) হার নাম "তিপুর্নাই পাছড়া।" "মেঘভূমি" শাড়ীর কথা প্রচলিত গানে ও গল্প-কবিতায় গিয়া থাকি। ইহাই কি কালে "সলতান" বা "তাজেব" নামে পরিচিত হইয়াছিল?

এতদ্ভিন্ন নানা প্রকার শিল্প-কার্যোই ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের কারিগর বিশেষ দক্ষ ছিল। কার্ঠের জিনিষ ও গজদস্তের নিমিত্ত নানা প্রকার অলঙ্কার এবং পাটী বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইত। গজদস্ত পাটীর কথা পূর্বে একবার বলিয়াছি। *

অলঙ্কারের মধ্যে "মুট শম্ম" নামক এক প্রকার শাখার উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

"রাম লক্ষণ ছই মুটশম্ম হস্তে তুলি দিল।
পুত্ৰমাসীর চন্দ্র বেদন আকাশে উড়িল।"

এই মুট শম্ম বহুকাল যাবৎ এতদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, বর্ত্তমান তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা স্বাধ্যাকালেও এই শম্ম দর্শন করিয়াছি। অজ্ঞাপি শ্রীহট্টের প্রাচীনায়ের হস্তে তাহার মূল্য স্বকরণের শোভা দেখা বাইতে পারে। তা ছাড়া "আবের কহই" (১) "লৈক্ষ টাকার জাম" (২) "লৈক্ষ টাকার খোপা" (৩) "সোণার নেপুর্ন" কথিতে "মারিকা মদন কোঁড়ি" (৪) "বাহুতে সোণার তার" "গলায় "সাত ছরা হার।" ইত্যাদি।

কাপা ও পিত্তলের কাজেও এই দেশবাসীর যে ছিলেন নাই। আমরা মননমতী কর্ত্তক সোক্ষনাথের অভিজ্ঞ-সংকার কালে "সাহসী" খানার উল্লেখ দেখিতে পাই।

"স্বভক্তে মলিয়া ভাত চুকেতে মাখিয়া।
লাহর আচাতে অন্ন লৈলেক আনিয়া।"
সম্ভবতঃ এই খান। শ্রীহট্ট "লাউয়ের" প্রস্তুত। † দেশ-প্রথামতে এখানেও "উ" স্থানে "হ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

* ত্রিপুরাবাসী হস্তকরণ যে শিল্প কার্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ গজদস্তের কারিগরের দ্বারা অজ্ঞাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীনকালে গজদস্ত দ্বারা নানা প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। বেশী মহিলাগণ স্বর্ণ রৌপ্যের পরিধেয় এই সকল অলঙ্কার পরিধান করিতেন। ইহাদের প্রস্তুতকারী লক্ষ্য ছিল তাহা দর্শন করিয়া গিয়াছে। প্রস্তরের শিল্প কার্ঠে, সোণার কার্ঠে, কাপড় প্রস্তুত করিতেও তাহারা বিশেষ দক্ষ ছিল।—অজ্ঞাপি তাহার চিত্র পাওয়া যায়। ২২৮ নং লোপ গাইয়েছে। সাইনলের হস্তবস্ত্রের হস্তকরণ মাসীর কার্ঠে বিশেষ দক্ষ ছিল—অজ্ঞাপি তাহার চিত্র প্রাপ্ত হওয়া গাইয়েছে।

(১) অন্ন নিমিত্ত চিকিৎসা কর্ত্তক। (২) স্নান বাধিবার জড়োয়া দ্রব্য বিশেষ। বোধ করি "লাড়োয়া দস্তে" "জা" ও "দড়ির" "ব" লইয়া এই "জা" শব্দ নিম্পন্ন হইয়া থাকিবে। (৩) সৌর অলঙ্কার শোভা যোগ্য নৈশব। (৪) মদন কোঁড়ির মনন শব্দ হইতে "মা" আর "কড়ি" সম্বোধে বর্ত্তমান "মাকড়ী" কথা নিম্পন্ন হয় বাইতে।

† All the old indigenous industries of this province are decaying such as the muslins and others of the finest Cotton fabrics of the coarser clothes, the brass wares, the wicker works and others.

Bengal Administrative Report 1874-75.

শ্রীহট্টবাসিন শিল্প কার্ঠে হমিপূর্ণ। শ্রীহট্টের কারিগর সমস্ত দ্বারা পাটী শালা ছুঁই ও তৈল প্রস্তুত করিতে পারে। দুয়াশিল্পে শিল্প পাটী সর্বোৎকৃষ্ট। তত্ত্ব পরম্পর বৈদেশিক কার্ঠে ইটা পরম্পর উৎকৃষ্ট লৌহের কার্ঠে, প্লাস্টিক দ্রব্যের আধার দ্বারা আত্ম প্রস্তুত করি। আরও শালা বেশীদূর এই আত্ম বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। পাটী ও তমস, মুগা প্রেরণের জন্য বাহাদুর দ্বারাও ৩০টা মহাল কাশ্মীর ছিল।

Rajmala p. 300.

নৌকা জাহাজ প্রস্তুত এবং বহির্বিপণিও তাঁহার অগ্রণী ছিলেন। * এই প্রদেশের "ভাগলিয়া" "লালাড়ী" "কোথ" "ময়ূ-পম্বী" "লাহাই" † এবং বহু আকারের সওদাগরী পাখী প্রস্তুতি নৌকা বর্ত্তমান সময়েও দর্শনীয় পদার্থ। এদেশের বৃহৎ পালোয়ড় পাখী সময় সময় বাষ্পীয় বায়ুবেগে পরাত পড়িতে দেখা গিয়াছে। যুদ্ধক-নৌকা সরবরাহ করিবার জন্য সাইলি শ্রীহট্ট বায়ুশাখের নাওয়ায়া মহাল ছিল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, "ময়নামতীর পুঁথি" সংখ্যক প্রবন্ধাদির প্রতিবাদ জ্ঞান আমার পরম স্বপ্ন মৌলবী আবদুল করিম তাঁহার সংগৃহীত পুরাতন পুঁথির একখণ্ড নকল প্রদান করিয়া আমাদিগকে দ্রুতজ্ঞতা পাশে বন্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সত্যতার আবিস্কারের জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রবন্ধাদিরও প্রতিবাদ করিতে হইল। †

শ্রীমোহনমোহন দাস।

বঙ্গ সাহিত্যের অভাব ও অভিযোগ।

জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যখন কোন জাতি তাহার জাতীয় জীবনকে উন্নতির বর্ধমান অবস্থা পথে পরিচালিত করিবার জন্য আমাদের সমাজে এক নতুন আন্দোলন করিতে যায়, তখনই যথার্থভাবে তাহাকে জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কারণ সাহিত্য মানবজাতির প্রাণ। প্রাণে কোন জীব আকাজ্ঞা গাঙ্গিলে মানব যেমন তাহার ভাঙনায় একদিন এই আন্দোলন অভিক্রম হইয়া পড়ে, তেমনি সাহিত্যেও কোন নতুন ভাব বা আদর্শ প্রবেশ করিলে সমাজও তাহার দ্বারা দ্রাবিত হইতে বাধ্য হয়। অতীত ভাষাতত্ত্ব জাতিগত আদর্শ এক নতুন আদ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। এই মুখে আমরা দেশকে নতুনভাবে অগ্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যথেষ্ট নতুন আদর্শ প্রস্তুতি করা আবশ্যক দেখে করিতেছি। এই

আদর্শে সমাজকে গঠন করিতে হইলে, সাহিত্যের সন্নিবিষ্ট প্রাণ-প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রথম কর্তব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বিশেষ অতিক্রম করিলেও সাহিত্যের প্রতি দেশ-বাসীর অস্বাভাবিক অতি অজ্ঞানদাই দেখা দিয়াছে। এই অজ্ঞানতাবের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের ভাঙনের সাহিত্যিকগণ যে সব স্বল্প দান করিয়াছেন তাহাতে আমরা তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু তুষ্ট হইতে পারি নাই। তাহার আমাদের আকাজ্ঞা মিটাইতে পারেন নাই, পরন্তু ব্যক্তি করিয়া দিয়াছেন। তাহার এ পরাধ বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহারা আমাদের সাহিত্যের পরিপূর্ণ অর্থবস্ত্রের উপাদান স্বরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বাহ্যতে পরজের মধ্যে সাহিত্য স্বপ্রস্তুতি হয়, তাহার আয়োজন এখনও সম্যক হয় নাই।

* শ্রীহট্টের স্মাউরা (এ. বি. আর) লাইনের রাজবাড়ী ট্রেনের নিকট ভাঙেরা টিলায় প্রায় তাম ফলক ধরেন শশী শিব ও বিশ্ণু মন্দির বিশাল রন গোচর বহন কর্ত্তক ভারত একছত্র সাম্রাজ্য ইত্যাদি বিবরণ প্রমাণ ব্যবহৃত। বিপ্লি প্রমাণ মনসা পুঁথিও দ্রষ্টব্য।

† লাহাই নৌকাগুলি বোধ হয় চাঁদ সওদাগরের মুক্ত লক্ষ্মীধর—লক্ষ্মীধর (লাহাই) সময় হইতেই এই নাম গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। লাহাই নামের ইতিহাস আমার পূর্বপুত্র সামন্ত্য রহিয়াছে।

‡ বীরস্বর প্রথম যুগে গতিত জেরম বলিয়াছেন।
If an offence come out of the truth, better is that offence come, than the truth be concealed.

JEROME.

§ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সামিলনের কলিকাতা গ্রন্থাবলি সাহিত্যশাখার গঠিত।

যে সমস্ত গুণ সাহিত্যের জীবনীশক্তি
প্রদান সহায়ক, লেখকের চিন্তাশীলতা
তাহাদের অঙ্গমত। এই চিন্তা-
শীলতার অভাব প্রায় প্রত্যেক
নব্য লেখকের মধ্যেই বর্তমান।
বাংলাদেশে আজকাল

চিন্তা শীলতার
অভাব

লেখকের অভাব নাই, কিন্তু
দুঃখের বিষয় চিন্তাশীলতার
অভাবে ইহাদের মধ্যে বেশী
শ্রেণী-বিভাগও নাই। কবি, গল্পলেখক,
নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক—ইহাদের দলে প্রায়
সকলকেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মানিক-
পত্রিকাগুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
এতদ্ব্যতিরেকে চিন্তাশীল
শ্রেণীর লেখক আছেন—বৈজ্ঞানিক ও
ঐতিহাসিক—তাঁহারা সংখ্যা বড় দরিদ্র।

উপরোক্ত চিন্তাশীলতার অভাবের কতক-
গুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ আমরা
কাজ অশোকা নাট্যকৌশলভিত্তিক
অভাবের
কারণ

মনে করি। কাজেই যাহাতে
সহজে বিনি। আমাদের নাম জয়
করা যায় তাহার চেষ্টা করিয়া থাকি। দরদার
দেখিতে পাই মানিকপত্রিকাভিত্তি গল্প,
কবি লিখিয়া দুই চারজন বেশ বিখ্যাত ও
গণ্যমান্য হইতেছেন; আমার পক্ষেও এটা
চিন্তা করা অত্যন্ত বাতাবিক যে এ উপায়ে
অমিও কিছু নাম যশ লাভ করি; যেহেতু
আমার দারপা এই কাজটী করিতে বিশেষ
অসুদৃশ্যন বা গবেষণার প্রয়োজন নাই।
জীবীভ্যন্তঃ বাহাদের একটি ভাবিবার ও
লিখিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারা কিছু রচনা
করিয়া অনতিবিলম্বে কোন সংবাদ বা মানিক-
পত্রে প্রকাশ করেন। একটু নাম বাহির
হইতে না হইতেই বিভিন্ন সংবাদপত্রের
সম্পাদকগণ তাঁহাদের নিকট রচনার জ্ঞতা দাবী
করিতে থাকেন। দুর্গায়ে ভয়ে অস্বাভাবিক
অবস্থায় তাঁহাদিগকে অসুস্থের রক্ষা বা
আবেশ-পালনের জ্ঞতা প্রসঙ্গাদি লিখিতে হয়,
কলে তাহাতে চিন্তাশীলতার নামগন্ধ মাত্র
থাকে না। আলস্ত ইহার ভূতীয় কারণ।
অসুদৃশ্যন করিয়া কথা দেখিয়া অনিয়া পরে
রচনা করা তাঁহাদের কাছে বড়ই অসম্ভব

বলিয়া অসম্ভবিত, হয়। কেহ কেহ আবার
মনে করেন তাহাতে নিজেই মৌলিকতাও
স্বাভাবিক দৃষ্টব্য হয় না। চতুর্থ কারণ—অস্বাভাব,
তবে সেটা বলাই বাহুল্য।

স্ট্রিক কারণগুলির তিনটি লেখকদের
ইচ্ছাকৃত। তাঁহারা মনে করিলেই সে
তাঁহার গুলিকে অপসারণ করিতে
পারেন। কিন্তু তাহার জ্ঞতা
সাহিত্যের উপযুক্ত সাধনা আবশ্যক।

সাহিত্য-সাধনা বিশ্বের সৌন্দর্য-উপভোগ নয়,
প্রাকৃত উদ্ভাটনিকও ইহার উদ্দেশ্য নয়।
প্রকৃতির বহুতমহী লীলা বিশ্লেষণ করিয়া চরম
সত্যের ধারে উপনীত হইবার জ্ঞতা মানবের
যে চেষ্টা তাহার লক্ষ্য, আর উপনীত
হওয়াই তাহার লক্ষ্য। বিজ্ঞান, ইতিহাস,
দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের সমস্ত বিভাগই এ
এক লক্ষ্য সমুখ রাখিয়া জ্ঞতা মানবকে পথ
দেখাইয়া চলিয়াছে।

অতীত লেখকবৃন্দ, আমাদের ভিতরে
এই চিন্তাশীলতারক অনয়ন করিতে পারিলে
আমরা সামান্য শিক্ষাদাতা করিব। নতুন-
ভাববিভক্তি দেশে অপরূপ দীর্ঘায় করিব।
সাহিত্যের অজ্ঞতা অভাব ও আশাতীত অল্প
সময়ের মধ্যে পূরণ হইয়া যাইবে।

এখন আমি সাহিত্যের অজ্ঞতা অভাব ও
অভিযোগগুলির আলোচনা করিব। বর্তমান
অজ্ঞতা অভাব সাহিত্য-উদ্ভাটনিক যেরূপে এখন
ও অভিযোগ; অবশিষ্ট, তাহার সহিত অজ্ঞতা
(১) সম-
অবস্থার তুলনা করিব না, শুধু
লোচনা-বিজ্ঞান বর্তমানের দোষগুলি প্রদর্শন
করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমাদের সাহিত্যসমালোচনা একপ্রকার
নাই বলিলেই চলে। কোন কোন সংবাদ বা
মানিকপত্রে “পুস্তক-সমালোচনা” শীর্ষক একটি
অংশ দৃষ্ট হয়। তাহাতে কেবল গ্রন্থকারের
নিম্না বা প্রশংসার কথাই থাকে। কোন
কোন স্থলে পুস্তকের মূলটি ও নামের
সমালোচনা এবং পুস্তক-রচয়িতার নামোল্লেখ
করিয়াই সমালোচক নিবৃত্ত হন। বিরুদ্ধের
জ্ঞতা বিজ্ঞাপনের কার্য সাধন করাই যেন
এইরূপ সমালোচনার উদ্দেশ্য। অবশ্য আজ-

কাল দুই একজন লেখক সমালোচনার দিকে
একটু আগ্রহের হইয়াছেন। কিন্তু সাহিত্য-
সমালোচনা তাহাদের বিশেষ আদর নাই।
নিরপেক্ষ সমালোচনার একদিককে সাহিত্যের
আব্দর্শনারাশি দূর করিয়া তাহাকে শিল্প-
সৌন্দর্য দান করে, অত্ৰ নিকে লেখকের
ভাষা ধারণাগুলির উদ্ভেদ দখল করিয়া
তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ও সমাজের
কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে। এমনও দেখা
গিয়াছে, দোষ-গুণের বিচার করিতে গিয়া
সমালোচক অচিন্তিতপূর্ণ ক্রমে তথ্যের
আধিকার করিয়াছেন। এই সব কারণে
সমাজের আদর্শ ও গতি নির্ধারণ পূর্বক
গ্রন্থাদির বিশেষ আলোচনার দ্বারা সাহিত্যে
সমালোচনা-বিজ্ঞানের স্থিতি করা প্রয়োজন।

বর্তমান উত্তরালে ভাবুততা, সৌন্দর্য
ও আদর্শ স্থিতি করিয়াছিলেন। আধুনিক
লেখকগণের দুই চারিজন
তাঁহার কিছু পরিচয় পাই;
অবশিষ্ট সকলেই কেবল ঘটনার
সমাবেশ করিয়াই নিরন্তর।

বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ উপভোগের বড় ভক্ত।
আশৈবশ তাহারা উপভোগের ক্রোড়েই এক
প্রকার লালিত পালিত। বাস্তবের কীক
পাইলেই অভিভাবকুর অজ্ঞাতসারে উপভোগ-
গ্ন প্রকৃতি পড়িয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া
থাকে। যুবা ও যুগ্মরা মজলিস অনেক
সময় উপভোগের বিষয় লইয়া আলোচনা
করেন; জীবেকগণও গুরুত্ব-সমাপনান্তে
উপভোগ লইয়া জলা করিয়া থাকেন।
সুতরাং উপভোগের সাহায্যে আমরা বাঙ্গালী
পাঠকের জ্ঞতা অর্জন করিতে পারি।
উহাতে ভাবুততা প্রবেশ করাইলে সন্দেহ নাই।
পাঠক-সমাজ স্বশিক্ষিত ও চিন্তাশীল হইয়া
উঠিলে সন্দেহ নাই।

উপভোগে ভাবুততার জ্ঞতা নাটকে
জটিলতার আধার কাব্য আবশ্যক। কেহ
হেহ আপত্তি করিলে নাটকে জটিলতার
স্থিতি সহজে গাঢ়িত হয় না; উহা সমাজের
জটিলতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু সমাজ
ত এখন যথেষ্ট জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালীর মধ্যে নানাবিধ আশা-আকাঙ্ক্ষা,
আন্দোলন-আলোচনা, অস্থিষ্ঠান-প্রান্তরিত
দেখা দিয়াছে। চারিদিক হইতে নানাবিধ
সমাজ আত্ম তাহার নিকট উপস্থিত। অতএব
এমন যুগে—এমন জটিল জীবন-ব্যপ্তির
দিনেও যদি আমরা সেই পুরাতন যুগের সহজ
সরল সমাজছবি নাটকে চিত্রিত করি, তাহা
হইলে সত্যসত্যই কি আমরা যুগান্তরের
বাহিরে পড়িয়া থাকিব না? তাহা হইলে
সত্যসত্যই কি আমাদের নাটকীয় ক্ষমতার
অপব্যবহার করা হইবে না? বাস্তবিক পক্ষে
নাটকের মধ্যে বর্তমান সময়ের জটিলতা আনি-
বার যুব কেষ্টেই আমরা করিতেছি।
আশা করি সে দিকেও আমাদের চিন্তাশীলতা,
আমাদের সাধনা পরিচালিত করিবার সময়
উপস্থিত হইয়াছে।

কোন বর্তমান চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন—
“উচ্চ অশ্বের দর্শন-সাহিত্যেও আমাদের যথেষ্ট
(১) দর্শন ও
অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহার
বিজ্ঞান অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার আশা
আলোচনা নাই। জীবনের গতি নির্ধারণ
করিবার জ্ঞতা দর্শনের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু
বাঙ্গালীর লক্ষ্য ও কর্তব্য নতন ভাবে
সুঝাইবার সময় শীঘ্র আর আসিবে না। * *
উনিবিংশ শতাব্দীর রামবোধন প্রভৃতি
চিত্রাশ্রিত দ্বারা সকল প্রকার অজ্ঞতা ও
পান্ডিত্য বিজ্ঞান ও দর্শন, বৈদ্যন্ত ও পদার্থ-
বিজ্ঞান সমস্ত সাধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টা
হইয়াছিল, তাহার পরিমাণটি অর্থাৎ চরম
Synthesis হইয়াছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ
প্রারম্ভিত বিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম। * * *
এই যুগধর্মের কণ্ঠ যতদিন না পরিমার্জিত হয়,
ততদিন আর নতুন কোন দর্শনবাদ বঙ্গদেশে
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। * * *
তবে কতগুলি পারিভাষিক দর্শন-সাহিত্য,
কলেজপাঠ্য দর্শন-গ্রন্থ, মনোবিজ্ঞান, নীতি-
বিজ্ঞান ও তর্কবিজ্ঞান ইত্যাদির সম্বন্ধন
হইলেও হইতে পারে।” লেখকের উদ্দেশ্য
আমরা অবিলম্বে। বর্তমান যুগ আমাদের
দেশে উচ্চ অশ্বের দর্শন-সাহিত্যের অত্যাশ্রয়
নাই হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে আমাদেরই

কোন নূতন দর্শনবাদের বিশেষ নূতন সংবাদ আনিয়া দিবে, এ কথা স্বতঃই মনে উদ্ভিত হয়। এই ভারী দর্শনের আবিষ্কার করিতে আমাদের বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। বিজ্ঞানের ভিত্তর দিয়া নানা তথ্যের নীমাসঙ্গার পর আমরা ঐ ভারী বিশ্বদর্শনের দ্বারদেশে উপনীত হইতে সমর্থ হইব। যতদিন সেই সুযোগ ও শুভক্ষণ না আসিবে, ততদিন আমরা পাশ্চাত্য দর্শনাবির অস্থবোধ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা আমাদের দর্শনবিভাগের জীবন-ধায়ে এক উজ্জীবিত করিয়া রাখিব না কি? এদিকে দর্শনিকগণের দৃষ্টি নিপতিত হওয়া উচিত।

যখন বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্যকের তর্কজাল ছিন্ন করিয়া তাহার উপর দর্শনের প্রভাট করিতে হিন্দুসমাজ জীবিত, তখন সমস্ত যাহাতে দেশে বিজ্ঞানচর্চার জড় বিশেষ আয়োজন করা যায়, তাহারও ব্যবস্থা করা উচিত। আজ কয়েক বৎসর এদেশে বিজ্ঞান-আলোচনা আরম্ভ বা বৃদ্ধি হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিজ্ঞান-জগতে যে কয়েকটা নূতন জ্যোতিষ্মান জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে আমাদের আপা ও আকাঙ্ক্ষা প্রাণের লাভ করিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ এই সমস্ত বিজ্ঞানসেবীগণের সাহায্যে বঙ্গভাষায় পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, শাখার-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তকাদি প্রণয়ন করাইয়া বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অভাব মোচন ও জনসাধারণের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন ইহাই আমাদের অঙ্গুরোধ।

ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনের জন্ত আমরা বঙ্গভাষায় বিশেষীয় সাহিত্যের

(৪) অস্থবোধ দেখিতে চাই। আধুনিক ভাষা ও চিন্তা-বিশ্বের সাহিত্য-সৌখিন্য যোগে পূর্ণ বিশেষীয় সাহিত্যের কার্য্য ন্যস্ত করেন। নতুবা অস্থবোধ সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই কেন? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও উপদ্রাস

লিখিয়া যতটা প্রতিভার পরিচয় দেওয়া যায়, চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ অজ্ঞাত বিশ্ব-সাহিত্যের অস্থবোধ, করিয়া জাতীয় ভাষারক সেমুজ্জ্বল করিলে তৎপক্ষে অনেক বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়। গল্প বা উপদ্রাস লিগিতে যেমন উদ্ভাবনী শক্তির দরকার, অস্থবোধ করিতেও তেমনি বিশেষীয় ভাষায় যোগ্য অধিকার থাকা চাই। এক কার্যে যেমন উদ্ভাবনী শক্তি দেওয়াই মানবের মন মুগ্ধ করিবার, আশা থাকে, অন্তর্গতে তেমনি অগাধ পাতিত্বের পরিচয় দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। প্রতিভা প্রকৃতির দান। প্রতিভাবান পুরুষের প্রত্যেক কার্যের মধ্যেই সে আশ্চর্য্যকর করে। আর বিভাষাতা স্বীয় আয়াসলব্ধ দান। সুতরাং শুধু শৈশবের জন্মের অধিকারীও আমাদের কল সমাজের পাত্র নহেন। পরিষদ ও ব্রহ্মসমাজ এই অস্থবোধ-কায়েও মনোনিবেশ করুন, ইহা আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

বিপুল বন্দ্যায়-সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়

(৫) বিন্ধ্যাচ্ছিন্দে—“আমি বলি সাহিত্যে যা যা সাহিত্য সমৃদ্ধ, ভাষা সমৃদ্ধ, ও গদ্যসাহিত্য আর আমার চিরদিনের কথা প্রাণদার দ্বারা সমৃদ্ধ” আজ আমি সেই কথার প্রতিশ্রুতি করিয়া বলিতেছি, নিজস্ব বাঙ্গালী, এমন বাস্তবের দিকে তাকাও। প্রাণের আলোচনা কর। কলসারের দেহ লইয়া আমরা আর কদিন টিকিব? কিন্তু এ কথা শুনাইবেই বা কে? বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ত এ বাণীর প্রচার করিতে হইবে। সাহিত্যিকসমাজ, সাহিত্যের নিরুৎসাহন হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সকল স্থানেই এই বাহ্যতত্ত্ব প্রচার করুন। অন্যের অভাবে আমাদের এই দুর্দিন। যাহাতে সকলে পার্থিব উন্নতির জন্ত স্বাধীন অন্নস্বাস্থ্যের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার জন্ত সাহিত্যের ভিতর দিয়া লোকজাত গঠন করুন। আপনাবাই বর্তমান সমাজের নেতা।

পরিষেয়ে কাব্য ও কবিতা সমৃদ্ধ আমরা কয়েকটা কথা বলিবার আছে। যদিও

(৬) রবীন্দ্রনাথ কাব্যের সাহায্যে কাব্য ও নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া কবিতায় বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি বিরাট করুন, করিয়াছেন, তথাপি বলিব আমাদের কাব্য-সাহিত্য সম্পূর্ণ সমগ্রতা নহে। রবীন্দ্রনাথ ভাব-জগতে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দানও শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও চারিদিকে বহল অসম্পূর্ণতা বিজ্ঞান। আমরা কবিতায় যে নূতন জগৎ গঠনের আভাস পাইয়াছি, সমস্তকিমে সম্পূর্ণতা লাভ না করিলে লজা আনাইবে পরমসিতি থাকিবে। তাই নব্য কবিগণের বর্তমান কর্তব্য ঐ অস্বাভ-পূরণ। আমরা মনে হয় তাঁহাদের কবিতায় তিনটা অভাবের প্রভাব বড় বেশী—বিরাট কল্পনা, স্বাধা ও সবলতা। আজকালকার কবিতা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে পরিণোভিত; স্বর সাধারণের একমুখে ও নিত্যক নারীস্বত্ব; ভাষা যেন বিলাস-প্রোতে থা চালাইয়া চলিয়াছে। একটা জগৎকে ভাষিয়া পড়ার ভাব তাহার মধ্যে প্রকটিয়া পাওয়া যায় না। যতদিন পর্যন্ত এই সৌখিন্য সাংগোষ্ঠিত হইয়া উত্তরোক্ত গুণজয়ের আবির্ভাব না হয়, ততদিন কবিতা হইতে প্রকৃত অস্থবোধ বাজিবে না। যদি অস্থবোধ করিতেই হয়, তবে Kents এর বাহ্যসৌন্দর্য্য-উপাসনা অস্থবোধ করা

উচিত কি? যে কবির মধ্যে অন্তর-সৌন্দর্য্যের অস্থবোধ পরিদৃষ্ট হয়, আমরা মনে করি, তাঁহাকেই অস্থবোধ করা হীনপ্রতিভ কবিদিগের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। পেটে, ব্রাহ্মিনের ভিতর জীবন আছে, অন্তর সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ আছে, আশ্চর্য্য-উপলব্ধির প্রাধান্য আছে—যদি অস্থবোধ করিতে হয়, তবে তাঁহাদিগকেই অস্থবোধের প্রধান পাত্র বলিয়া বাছিয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে কাব্যের একটা নূতন দ্বারা সাহিত্যের মধ্যে সৃচিত হইবে, নব্য কবিবংশের চিন্তার রাজ্য নিবৃত্ত হইয়া থাকিবে।

উপসংহারে আমি লেখকসম্প্রদায়কে সাহিত্যে কাঠির-ধর্মের প্রচার করিতে (৭) অস্থবোধ করিতেছি; এবং সাহিত্যে কাঠির-পাঠক-সমাজের নিকট নিবেদন করি। করিতেছি, তাঁহারা যেন পুরাতন ধর্মের পরিবর্তন করিয়া এই কাঠিরকে উপভোগ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পরামুখ না হন। সমগ্রতি কোন মানসিক-পরিগ্রাফে এ এই বিষয়ে একটা আলোচনা দেখিয়া আমরা খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

সাহিত্য-সমাজ পুর্বেল্লিখিত পন্থায় অগ্রসর হইলে অচিরে বঙ্গভাষা বঙ্গসমাজের সমগ্রাচ্ছিন্দে লেন কথা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিকলিত হইয়া উঠিবে। আমরা বৃত্তিতে পারিব, বাঙ্গালদেশ আর ক্ষুদ্র নাই—নানাদিক হইতে নানা ভাবের সংমিশ্রণে বাসবিকই তাহার বিশালতা অন্তিম মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীত্রেপুন্দ্রনাথ ঘোষ।

মফঃস্বলের বাণী

১। নিরামিষ-আহারের উপকারিতা

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়াই অনেকে হয়ত একটু নিশ্চিত হইবেন। আজকাল বঙ্গ-মাসাদির এই অগাধ প্রচলনের দিনে

নিরামিষ-আহারের কথাটা বলিয়া যে হস্তাশ্বাস্পদ হইব তাহা বেশ জানি; কিন্তু তাই বলিয়া যাহা বৃত্তিতে পারা যায়, তাহা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করার লোভটা সংবরণ করিতে

পারিলাম না। তাই এই অবস্থার অবতারণা করিলাম।

মৃত্যুকাঙ্ক্ষিত পথার্থী মাছদের উপযোগী বাছ। ভগবান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মস্তকের উদর পূরণ জন্ত মৃত্যুকাঙ্ক্ষিত সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। মস্তকের শরীর পুষ্টির জন্ত যে সকল জিনিষ আবশ্যিক, তাহা সকলই মৃত্যুকাঙ্ক্ষিতই জন্মে। খাদ্য, কলাই, মূগ, বুট, অহরহ, ঘণ, পোখু, ফুলী প্রভৃতি মস্তকের খাদ্য; ইহার প্রত্যেক জিনিষই মৃত্যুকার জন্মিৎ থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মামুসারে এই সকল জিনিষ ভক্ষণ করিয়াই মাছের অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারে। তাহার পক্ষে অল্প কোন প্রকার পার্শ্বিক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।

হিন্দুর জীবন ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শাস্ত্রকণ্ঠস্থ চিত্রনিহী নিরামিষ-আহারের পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দুর প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থ অল্প অল্পের ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে এখন আর কেহ শাস্ত্রের অধ্যয়নগত প্রতীলঙ্ক করে না। প্রবল দেশোদ্ভাবী এখন একজন শাস্ত্রের দান আধিকার করিতেছে। কোনও হিন্দুপরিবারের একটা শিশুর জীবনের ইতিবৃত্ত নীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শরীর-গঠন পক্ষে নিরামিষ-আহারই সম্পূর্ণ উপযোগী। বালক যতদিন মনঃপ্রাণি ভোজন করে না, ততদিন সে স্বস্থ, সবল ও নীরোগ থাকে; কিন্তু যেই সে মস্তক ভক্ষণ আরম্ভ করে, অমনি নানা প্রকার দুষ্কিরিয়া রোগের বীজাণু সকল অনল্যে তাহার শরীরভাঙ্করে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে অচিরেই ব্যাধিগ্রস্ত ও অসুস্থতা করিয়া থাকে। যাহায্য আজ্ঞান নিরামিষাশী তাহাদের শরীর যেমন সবল, পুষ্ট ও নীরোগ, মস্তক ও মাংসাহারী ব্যক্তিগণের রেহ কিছুতেই ভ্রূতপ হইতে পারে না।

হিন্দুপরিবারের ব্রহ্মচারিণী বিদ্যাবাগ্ধের প্রান্তি দৃষ্টিপাত করিলেও এ কথাই দোঁকি-

কত সহজেই উপলব্ধি করা যায়। হিন্দু-গৃহের সম্ভবলানগণ-যতদিন মস্তক ভোজন করেন, ততদিন তাঁহারা কোন না কোন প্রকার রোগের আশীর্বাদেই জীবন যাপন করেন। তখন গৃহস্থকে গৃহিণীর পরিচর্য্যাজ্ঞ পরিত্যাগ ও ব্রহ্মচারিণীর নিকট গঙ্গা পাক নিয়ুক্ত করিতে হয়। কিন্তু কোনও বিদ্যাবাগ্ধ ও ব্রহ্মচারিণী জন্ত কেহ কখনও কোন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন কি? সেবা দিনে তিনবার আহার করিয়াও দুর্বল, অস্থির ও রোগগ্রস্ত, আর বিধবা একবার মাত্র আহার করিয়াই সবল, স্বস্থ ও স্বকণ্ঠ হইয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? একমাত্র ব্যত্যাচার ও নিরামিষ-ভোজনেই কি ইহার কারণ নহে? হাবার হেলোতিকা মহাৰা অবস্থায় নানাপ্রকার রোগের বিদ্যাসংস্থল থাকে, তিনিই যদি আহার বিদ্যা অবস্থায় সবল ও স্বস্থ হ'ন, তবে কি মনে করা যাইবে?

নিরামিষ আহার দীর্ঘায়ুঃ হইবার নিদান। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নিরামিষাশী ব্যক্তিমানুষই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া অজুর স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধ উপভোগ করিয়াছেন। শরীর নীরোগ হইলে যে মাত্র দীর্ঘায়ুঃ হইবে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ; হুত্তরা নিরামিষাহারী দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, ইহা আর বিতর্কিত কি? প্রাকৃতিক আহারে মনঃপ্রাণিত জন্মে; মানসিক প্রকৃষ্টতা শরীর-গঠনকে বিশেষ সহায়তা—করিয়া থাকে, তাই নিরামিষ-আহার শরীর-গঠন পক্ষেও উপকারী।

ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান স্থান। অল্প দেশে যে সকল খাদ্য অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা এদেশের উপযোগী নহে। এ জগৎই দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রকৃতিতে খাদ্যাদির সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাই এদেশের বৌদ্ধিক মূগের যুগ, মজুরের যুগ, খৈর মগ, ডিডার মগ ও প্রাকৃতিক পথা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এদেশের মনোবিগণ দেশ, কাল ও পাজ বিবেচনা করিয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু হায়! কালমাহাত্ম্যে উহা অব্যবস্থা বা কুব্যবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যাত ও

সর্বত্র উপেক্ষিত হইতেছে। আমাদের পাকস্থলী যাহা পরিপাক "করিতে সমর্থ, তৎক্ষণাৎ গুপকা বা গঙ্গা পাকস্থলীতে গুপ্ত করিলে উহা যে পরিপাক হইবে না, তাহা নিশ্চিত; তাই আমরা অনেক সময় পাকাতা চিকিৎসা-শাস্ত্রমুসারেই জুলাপ পদার্থ আহার করিয়া যথ্যা ভোজন করিয়া থাকি। হানীয় অবস্থা ও দেশের জন-স্বাস্থ্য প্রকৃতির-দিকে লক্ষ্য রাখিয়া খাদ্যভাঙ্করে বিচার করিতে হইবে, এ কথা অনেক সময়ই কুলিয়া যাই। ভারতবর্ষ পাকাতা পত্রিতপণও নিরামিষ-আহারের উৎকর্ষতার বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রক্ষেপের ভলন রে বলেন—"মহত্তর বেহু-রক্ষার জন্ত যে কোন খাদ্য প্রয়োজন হয়, এবং যে সকল জিনিষে মহত্তর স্বস্থ ও স্বকণ্ঠতা বিনিন করে, তাহা সমস্তই উদ্ভিদ-গুণ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহত্তরক মাংসানী জীব রূপে স্থগি হইয়া নাই।"

অনেকে মনে করেন যে, শরীর-গঠন জন্ত যে পরিমাণ ব্যবহার্য্যকাল বা তৎসংক উপাদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা কেবল মাংসাদিরে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পর্যায সম্পূর্ণ ভ্রাম্যাক। ভারতবর্ষের মধ্যে এক বংশেই ত্রিভ অল্প মনে স্থান দিতে কি মাস আহারের প্রয়োজন নাই, অথচ সে সকল দেশের লোক বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক স্বস্থ। যদি একমাত্র মাংসাদিতেই মনঃপ্রাণিত পাওয়া যায়, তবে তাহা যে বলিষ্ট হইতে পারিত না। অনেক চিকিৎসকের মতও আমাদের দেশের অস্থল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্ত্রার কেনরী উমদন এম্, ডি, এফ, আর, সি, এম বলেন—"মহা শরীরের জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা সমস্তই উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়।"

গলিত ও পচা মাং শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী। পচা খাদ্য আহার করিলে যে শরীর ক্রমশঃ ক্লান্ত ও শক্তিহীন হয়, এ কথা বেশ বহু কাহিন্যেও বলিয়া দিতে হইবে না। খাদ্যভোজনের মধ্যে যে সকল দ্রব্য শীঘ্র পরিচা হইতে পারে সেগুলি সর্বথা পরিচায়া। হুত্তরা খাদ্যভাঙ্কর বিচার সময়ে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শাক-

সবজী অপেক্ষা মস্তক-মাংসাদি অতি অল্প সময়ে পরিচা নষ্ট হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শাক প্রকৃতি নিরামিষ খাদ্য পরিচা যত অপকার করে, মাংসাদি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ অপকার করিয়া থাকে। মাস সাধারণতই গুরুপাক, তাহার পর যে তাহা পাক করা হয়, তাহাতে উহা একবারের দোষাচা হয়। পরিপাক হওয়ার জন্ত মস্তকে দীর্ঘকাল পাকস্থলীতে অবস্থান করিতে হয়; হুত্তরা অল্প সময়ে পরিচা অনিষ্টকর হইয়া থাকে। ডাক্তার লুকাস-ম্যাম্পনিয়ার বলেন—মাংসাহার নিবন্ধন পাকস্থলী হইতে এক প্রকার বিষম রস নিঃসৃত হয় এবং তাহা হইতে এপেণ্ডিসাইটিস নামক দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ইউরিক এমিড শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এ সম্বন্ধে আনুগিক চিকিৎসক-গণ বহু পরেণা করিতেছেন। মহাশয়-শরীরে উক্ত এমিডের আধিক্য হইলে নানাপ্রকার রোগের আধিক্য হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার পের্ড বলেন—এক পাউণ্ড মাংসে ১৭ গ্রেণ ইউরিক এমিড থাকে। স্বতরাং দেখা যাইতেছে মিনি যত অধিক পরিমাণে মাংস ভক্ষণ করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ইউরিক এমিড উদগত করিবেন।

আজকাল এদেশে পলনালীর রোগের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। এ রোগ দুষ্কিরিত ও দুরারোগ্য। এ রোগে শতকরা একজনও বাঁচে না সম্ভব। এরোগ হইলেই রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত মনে করিতে হইবে। এ রোগে মাংস-ভক্ষণ-গ্রন্থত বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক অভিজ্ঞ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ডাক্তার রবার্ট বেল বলেন—"মাংস ভোজন হইতেই এই রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।" তিনি মনে করেন যদি মাংসাহার ত্যাগ করা যায়, তবে গলরোগ (কেন্‌নার) আরোগ্য করা হইতে পারে।

উপরে যে সকল অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত প্রকটিত হইল, তাহা হইতে দেখা যায়, মাংসাহার মহত্তর জাতীয় উপযোগী নহে। মাংসাহারে যত অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা

বলিয়া বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন, নিরামিষ-আহারে রোগের সম্ভাবনা থাকে না। পরন্তু নিরামিষ আহার শরীর ও মন প্রসূর রাখে। সুতরাং যে বায়ু আমাদের পক্ষে নিরামিষ আহারই বিধাতার বিধান। বলপূর্বক পশুখাদি ভাণ্ড মাংসাদির করিলে তাহাতে অপরকার ভিন্ন উপকার হইবে না।

ঢাকাপ্রকাশ

২। ভাবিবার কথা

(ক) জাতীয় বিজ্ঞান

বিশ্ববিজ্ঞানের যুগসমূহে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষার নাম্যমান নয়। অথচ আজ তাহা অর্থকরী শিক্ষাও নহে। গাড়িতে অথবা আইনে পক্ষী পাখ করিলে কিছু চাকুরী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাৎপরি ২০ টাকা বেতনের চাকুরীই আমাদের জীবনের উচ্চতম উন্নতি মনে হয়। একথা কাহাকেও আর শিখাইয়া দিতে হইবে না। প্রবেশিকার পূর্বাধি দ্বারা যেরূপ পাঠ দেয় হয়, তাহারা একবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। অথচ এই প্রকারে নিরুপায় শ্রেণী একান্ত কম নহে। আজ শিক্ষার বায় যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে, শাসনের কারিত্ব যেরূপ গুরুতর হইতেছে, তাহাতে অধিক সংখ্যক ছাত্রই “বীড়িত গোবর” হইয়া পড়ে। কিন্তু জাতীয় বিজ্ঞানে শিক্ষিত ভাবে প্রথমাধি ধাবলম্বন আসিল নহে। জাতীয় বিজ্ঞান মনে যদি একটা আভাস না থাকিত তাহা হইলে সর্বপ্রকারে এই শ্রেণীর বিজ্ঞানকে উৎসাহ প্রদান করা গণবৈজ্ঞানিক কর্তব্য। অজ্ঞতার এই অন্ধ-মস্তার দিনে এই ভাবে কতগুলি যুবকের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইলে দেশের শিক্ষার বহু পরিমাণে লাভ হইতে পারিত। বাহ্যিক সে অন্ধ কথা। এখনও এই মূলগুলিকে যথা-সম্ভব সাহায্য করিয়া জীবিত রাখা দেশ-হিতকরী ব্যক্তিগণের একান্ত কর্তব্য। আপনাপন মূর্খ পুণঃপক্ষেও যদি তাঁহারা এইমত স্থলে প্রবেশ করেন, তাহা হইলেও তাহারা মাছের হইয়া কালের বোঝা হইতে পারে। একদিন ছিল এক মাত্র

বিজ্ঞার পৌরষকেই পৌরষজনক মনে করা হইত, কিন্তু “আজ আর সেদিন নাই, আজ অর্থাগমের পথ ক্ষতচ্যুত হইয়া উঠিতেছে। এক্ষেত্রে কার্যকরী শিক্ষা বৃদ্ধি অসম্ভব। আজ চক্ষের উপরে দেখিতেছি একজন ফটোগ্রাফার, এক জন ঘড়ী-মেরামত-কারী, একজন চিত্রকর, বহু এন্-এ, বি-এ, বি-এন্সে উচ্চ অধিক অর্থ আয় করিতেছে, অথচ বিশ্ববিজ্ঞানের গুরু ভাব তাহার অধিকাংশ অর্থ করিয়া দেয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, এই জাতীয় বিজ্ঞানরগুলিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করা কর্তব্য। গ্রামনাল স্থলে পড়িলে ডাকাতের হয়, সে অপরায় আর নাই, বং এত পুটে লগাটে বাহাদের বন্ধন তাহাদের কুখ্যাতার হইতে পারে। এ অবস্থায় জাতীয় বিজ্ঞান-লয়ের প্রতি বিস্তর হওয়ায় কাহারও কোনও চেষ্টা নাই।

(খ) ব্যায়াম-চর্চা

বর্তমান সময় মূল-কলমসমূহের উপরে শিক্ষা-বিপ্লবের প্রবুধ মূর্খ ভূপে বিভূত হইয়াছে। শিক্ষক মাত্র চেসেলিগকে পুত্রক পড়াইবেন এবং তদবিত্তি কোনও উপদেশ তাহারা দেন না বা বিদগদগদ দিতে সাহস করেন না। তাঁহারা কোন উপদেশের কি অর্থ হইবে এবং তাহাতে তাঁহাদের চাকুরী রক্ষা পাই কি না এই ভাবে সর্দঙ্গা সশক্তিত। এই এক হিসাবে প্রোগ্রাম ছাড়াইয়া অতিরিক্ত শাসন-শাসনে বদ্ধ হইয়াছে, তেমন অপর যিক তাহারা স্বাধীনতাও ভোগ করিতেছে। আমরা আজ ছাত্রগণের ব্যায়াম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ছাত্রগণ বাহাতে ক্ষুব্ধ হইলে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষকগণের প্রতি উপদেশ আছে। কিন্তু তাহারা প্রকৃত পক্ষে শরীর গঠন করিতে কোনও উপায় করেন কি না সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। ফলে শীতকাল ছাত্রগণ যক্ষ্মা ব্যায়াম করে, কেহ বা আদৌ কোনও ব্যায়াম করেন না। আজকাল কেহ কেহ হকি খেলে, কেহ বা টেনিস প্রভৃতি “কোমল” ক্রীড়া মনোনিবেশ করিয়াছে।

অকস্মেদীয়া প্রাচীন ক্রীড়াসমূহে কাহারও রুচি দেখা যায় না। এই সম্বন্ধে উপদেশও বহু কেহ নাই। “হাড়ু” “ছি ছি” প্রকৃতি বোয়ায় এককিকে যেমন উপকার হইত, তেমন গৃহস্থায়্য আদৌ ছিল না। আজ এই যৌবন-মূল্য-বৃদ্ধি দিনে ফুটবল, টেনিস, বেডমিন্টনে হস্তটাকা উড়িয়া যায়, তৎপারা একটু দুখ বা, মাছ হািলে শরীর ও মন হুহ থাকিত। আমাদের মনে হয় শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারি-বর্গ স্বর্ণ-কল্পককে এই ক্রীড়াগুলির অধিক প্রবন্ধন করিতে উপদেশ দিলে তাঁহারা অসম্মত হইতেন। পশ্চিম-বঙ্গের আংশিক সাহায্য করিতে পারিলেন। আমরা সর্বত্র যেন একটা বিশৃঙ্খলাই দেখিতেছি। এই অবস্থা দ্রুত ভাল নহে।

বরিশাল-হিতৈষী

৩। উদ্বোধন

ভারতবর্ষ এশিয়ার ভূখণ্ডের, কিন্তু আজ ভারতের পৌরষ পুত্র। কিন্তু সেই মহামায় অকৃত পৌরষ আমরা কুলিতে পারিয়াছি কি? পরহুয়ে কাতর দয়াল সন্ন্যাসী যুবকের আত্মপ্রণয়, আদর্শনারী স্ত্রী-সাহাবির পতিপ্রণয়, প্রেমিকপ্রবর নিমাইচাঁদের অহেতুকী দয়া, শতী-কৌশল্যার অপত্য-যেহে,—এসব কি আমরা কুলিতে পারিয়াছি? আমরা-এই কুলি পৌরষবাহিত জাতি? কেহ-বোধ্য, গীতিকাশ্রয়, পুরাণ-তত্ত্ব, আনন্দ-বিজ্ঞান, ইতিহাস-দর্শন, কাব্য-মহাকাব্য আমরা সব কুলিয়াছি, নিত্য কুলিতেছি। আমরা হুফা, শক্তজালা মাফকুমি উন্নতির লক্ষ্যে আমরা এ যাবৎ কিই বা করিলাম আর কিই বা করিতেছি? নিমাইচাঁদের অমিয়বাক্য “নামে কচি কৌবে দয়া” মহাপাশন। শাসনের মূল জীবন দয়া, আর তজ্জিৎ মূল রুচি, দয়া ভিন্ন প্রেম নাই। আমরা এমন প্রেমের জন্মকুলিতে কেন প্রেমের মন হইতেছি, কেন বিশ্বপ্রেমে আমরা ভাগিয়া যাই না? গৃহের আর কণ্ড করিয়া আর যৌর নিরায় জন্মকুলিতে কেন প্রেমের মন হইতেছি, কেন বিশ্বপ্রেমে আমরা ভাগিয়া যাই না? গৃহস্থের পাক-ও না, স্ত্রী, পুত্র, বাসক, বৃদ্ধ সকলেই আগত হও।

উন্নতিত আগত প্রাণা বরান নিবেদন্ত, স্ত্রুত্ব ধারা নিশীথ হুত্বায়া—
হুগ্গি পথতৎ কবয়ো বিদুঃ।
উপনিষৎ।

নগরবাসী, পল্লীবাসী সকলেই আগত হও, সমগ্র ভারত একতাসুয়ে আত্মভাবে মিলিত হও। দীর্ঘকাল আমরা আত্মক কুলিয়াছিলাম, আবার নিকট পর হইয়াছিলাম। আত্মক কি নিষ্ট, আত্মক কত পুণ্য, আত্মক কি অমি-মাঝা তাহা একবার উপলব্ধি কর। জাতির সার্থিতা মনে চেতনা প্রকাশিত হইতেছে। সভ্যতার প্রিয়কুপণ ভায়েত জাতীয় সভ্যতার অন্তরায় হইতেছে। ওই দেখ, আপনাদের দৈহ্য গৃহাধিবার লজ্জা পাকাতা জাতির নৈশিরে ভারতের দান গ্রহণ করিতেছে।

এখন তোমাদের কর্তব্য তোমার কর, মোহনিতা ত্যাগ করিয়া কর্ণে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের নেতা, তোমাদের চালক আপনি আসিব। এখন ভারত মূর্খ উপদেশকর অভাব নাই, ইহার অভাব কুলিয়া অস্ত্রকে ভাল হইবার উপদেশ দেয়। বৈদ্যরাজ্য তাহাতে বৈদ্যিক ভারতবাসীর আজ তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব, মহাপ্রবোধের মহাশোনা। দত্তী নেতা চায় কেবল আনন্দমিশ্র, কিন্তু মানব-সমাজ আপনাকে দ্রব্ধের ভক্তি অর্পণ করিতে অসম্মত। রোমের পাদরী শ্রেষ্ঠ পোপ জনসাধারণের ভক্তি পাইলেন না, কিন্তু তাদারী মাটিগিরির চরণে লক্ষ লোকের রক্ত প্রসৃত। রমের প্রবল সম্রাট প্রজার ভক্তি পাইলেন না, কিন্তু রমের জনসাধারণ সন্ন্যাসী টলমলের চরণে নত হইল। এদেশের অধিকাংশ নেতা ও পাণ্ডপ জনসাধারণের ভয়ের পাক, ভক্তির পাক নহেন। নেতৃত্ব প্রেমের সাধনায় সিদ্ধ হও, আনন্দমিশ্র সফল হও, তবে প্রচারে রক্তবাহী হইবে। উপনিষদকার বলেন, একশাখায় দুই পাত্রী,—এক অশ্বকে দিবানিশি ডাকিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া ভাবে বিচোর হইল। তন্ময় হইয়া যাইতেছে, আশ্বদামার সিদ্ধ হইলে কেহ পর থাকে না। সব পর আপনাব হয়, তখন বিশ্বজনীন মানব-

প্রেমের উদয় হয়। এইরূপ সাধক গীতোক্ত
বিষয়ক দেখিয়া চৈতন্যকথিত প্রেমে দীপ্ণা
লাভ করে—তখন দ্বার্য স্বর্ণের আগমন হয়।

ভারতে মহাসাধনার মহা প্রয়োজন।
অগ্রব সকলে একতাত্ব্যে বদ্ধ হইয়া উন্নতির
পথে অগ্রসর হও। রত্নাকর।

৪। বদেশীর আবশ্যিকতা

আজকাল অবিকাশ ভ্রমলোকই বেন
বিলাসী জীবের পক্ষপাতী। তাহাদের
বশেষের উৎপন্ন জ্বালাদি আত্মী পঙ্কজ হয়
না। আজকাল বদেশী বর অনেক ভ্র-
পরিবারেই ব্যবহৃত হয় না। লবণ-চিনির ভ-
কথাই নাই। দেশের এই দুর্দিনেও আমাদের
চক্ষু জল না, ইহাই বড় আশঙ্কের বিষয়।
আমরা চিরদিন হৃৎপাশ্রয় তাই নৃসি হৃৎপে
মাতিয়া ২৪ দিন লক্ষ লক্ষ করিয়াছিলাম।

বেশে অশাস্ত্রির আগুন জালিয়াছ, ঘরে ঘরে
পুলিশ চুকিয়াছে, তোমরাই তোমাদের
নিপনকে বরণ করিয়া আনিয়াছ। এখন
আবার কেত কেত বলিয়াও থাকে “বদেশী”
শব্দটা উচ্চারণ করাও দোষ। ঐ শব্দই
পুলিশ চটে। আমার দেশকে আমি বদেশ
না বলিয়া কি বিদেশ বলিব? আমি আমার
দেশের ব্যবহার্য জ্বা ফেলিয়া কি বিদেশী
জ্বা গ্রহণ করিব? এ কোনও শায়ে বা
কোনও দেশের রাজার আইননজীবে নাই।
ইহেব ভ্রমবান রাজা, তিনি তাহা কখনও
ব্যবস্থা করিতে পারেন না। গবর্ণমেন্ট কখনও
তোমাদিগকে এক কথা বলিয়া সেন নাই যে,
তোমরা ম্যানুচেষ্টারের কাপড়, লিবারপুলের
লবণ, বীট ও জাবার চিনি এবং বার্কিংহামের
বুট হইতে আরম্ভ করিয়া লৌহ-জ্বা ছুরি
কাচি ইত্যাদি বিদেশী জ্বা গ্রহণ কর, ঘরের
পয়সা পরকে দাও। তোমরা নিজের দেশের
কলকারণানার উন্নতি কর, ঘরের পয়সা ঘরে
রাখিবার চেষ্টা কর, তাহাতে গবর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট
ব্যতীত অসম্ভব হইবেন না; বরং তিনিও

তোমাদের সাহায্য করিবেন, কারণ ভারতবাসী
তাঁহার শ্রিয় প্রজা।

ভাই বলি ভাই সব, এখনও সময় থাকিতে
অগ্রসর হও। কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি কর।
দেশে কৃষিপাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত বৈশ্ব
উন্নত করিতে পারিবে না। তোমরাও উন্নত
হইতে পারিবে না, তোমরা আপ, দেশকে
জাগাও, কৃষিকাৰ্য্যকে হেয় জ্ঞান করিও না।
উচ্চ কার্খের ভার নিরক্ষর চাষী লোকের
উপর জ্ঞপ্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইও না।
যাহা প্রতিদিন আহার করিয়া জীবন ধারণ
করিতে হইবে তাহা নিজে জমাইয়া খাওয়াই
হেয় কার্খ নহে, বরং গৌরবের কার্খ।
দেশকে গৌরবান্বিত করিতে হইলে কৃষি,
শিল্প, বিজ্ঞান ও কলকারখানাদি দ্বারা অভাব-
অভিযোগ নিবারণ ও প্রত্যেক ব্যক্তিকেই
দেশের জিনিষ ব্যবহার করিতে হইবে।
নতুবা দেশ কখনও জাগিবে না, উন্নতও হইবে
না। নিঃস্বার্থ দান ও নিঃস্বার্থ কার্য্যক্ষম ব্যক্তি
চাই। মুখে ও মনে এক হওয়া চাই। মুখে বলিব
এক, আর কার্খের করিব অন্যরূপ, তাহাতে
চলিবে না।

যে বেশ একদিন সভাপনগতের শিথিল
অধিকার করিয়াছিল, সে বেশ আজ কত নিজে
পড়িয়া গিয়াছে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?
তোমরা যাহাকে অসদৃশ বলিয়া বুঝা করিতে,
আজ তাহারাই তোমাদিগকে অসদৃশ বলিতে
ছিদা করেন। ভারতবাসীর দ্বা আবার কোন
দেশের লোকই অগ্রভাবে স্বর্ণ ও জ্বালীর্ণ
নহে। অস্ত্রতঃ তাহারাই দুবেলা চারটা পেট
পুড়িয়া বাইতে পায়। আজ ভারতের অগ্রে
ভিন্নদেশী লোক উদর পূর্ণ করিতেছে, কিন্তু
ভারতবাসী “হা অম্ব, হা অম্ব” করিয়া প্রাণত্যাগ
করিতেছে।

ভাই সব, আবার বলি একবার দেশের
পানে চাও, দেশের স্বর্গ দেশে রাখ। বিদেশী
বর্জন করিয়া বদেশী জ্বালা গ্রহণ কর।

সুরাজ।

পরিশিষ্ট

প্রতি ঘণ্টায় হুস্ব হিগাবে ২৮৪৬২ সেকেন্ড পূর্ণ দেশান্তরে বিয়োগ ও পশ্চিম দেশান্তরে যোগ করিতে হয়। যেহেতু সারিণীর ৪৩৩ পৃষ্ঠায় যে সারিণী আছে তাহার সাহায্যেই এ অঙ্ক গুলি নির্ণয় করা যেতে পারে। এবং ম্যি এলেন লিও প্রণীত, এষ্টলিফার অল নামক গ্রন্থের এই লক্ষ্যীয় যে সারিণী আছে তাহার দ্বারাও নির্ণয় ক'তে পারা যায়। ফলে এসকল সারিণী নানা আকারে নানা স্থানে পাওয়া যায়। ইতঃপূর্বে পেরেছ ১লা জুলাই গ্রীণীচ মধ্য-মধ্যাক্ষে নাক্ষত্র কাল ৬ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড; এখন কলিকাতা যদি ৮৮।৩০ গ্রী: দূ: স্বীকার করি তাহলে এই টেবিল দিয়ে—

$$৭৫^{\circ} - ৪২^{\circ} ২৮'$$

$$৮^{\circ} = ৪^{\circ} ২৬'$$

$$৫^{\circ} = ৩^{\circ} ২২'$$

$$৩৫' = ৩৩'$$

$$৮৮^{\circ} ৩০' = ৫৮^{\circ} ১৭'$$

এই আটাল সেকেন্ড বাদ দিলে—

$$\begin{array}{r} ৬ ঘ \quad ৩৫ মি \quad ৪৪ সে \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \hline = ৬ \quad ৩৪ \quad ৪৬ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + ২ \quad ৩৫ \end{array}$$

$$+ সংস্কার ২ ঘণ্টায় = ১২-৭১$$

$$৩৫ মিনিটে = ৫' ৭"$$

$$২ - ১০ - ১১$$

অমি। এতেও ত লগের পরিমাণের ব্যতিক্রম হ'বে।

গুরুদেব। অতি সামান্য। আপনৈ ত বলেছি—জন্ম সময় কি সেকেন্ড পর্যন্ত স্বস্থ ? ও কেবল জটিলতা গৃহীত করা। যাই হোক ইচ্ছা হয় এসংস্কার দিও। আর গ্রীণীচ জন্মস্থান হ'তে বেশী দূর হ'লে দেওয়া ভাল। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

অমি। পাহাড়ের উপর পৃথিব্যন্ত ও স্বর্গোদয়ের কাল ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে ব্যতিক্রম কি রূপে নির্ণীত হ'তে পারে ?

গুরুদেব। নির্ণয় করার নিয়ম একটু জটিল। এখন থাক। মোটের উপর সমুদ্রতল থেকে এক শত ফুট উচ্চে উল্লম্বে ১ মিনিট ১০ সেকেন্ড বিয়োগ ও অস্ত্র যোগ করিতে হয়, দুই শত ফুট উচ্চে ১ মি ৪০ সেকেন্ড, ৩০০ ফুট উচ্চে ২ মি, ৫ সেকেন্ড ইত্যাদি বেশী উচ্চে শত করা ২০, ১৫ কি ১০ দশ সেকেন্ড অস্ত্রব হয়। কোম্পানী পননায় সে সংস্কার টুকু না দিলেও বেশী তফাৎ হ'বে না।

আমি। দুই তিন মিনিট ও অগ্রাহ্য হ'বে ?

গুরুদেব। বাবা, কে তোমায় ভূমিষ্টের ঠিক সময় দিতে পারবে বল ত ?—প্রথমতঃ ভূমিষ্ট-কাল সম্বন্ধে আচার্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে—কেহ বলেন, ভূমিশর্শ কালই গ্রাহ্য, কেহ বলেন নাড়ীচ্ছেদ কাল গ্রাহ্য, কেহ বলেন প্রথম-জন্মন কাল গ্রাহ্য, আবার কেহ বা বলেন, গর্ত হ'তে শিখা রশ্মি অর্থাৎ মাথার ঘূলি দেখার সময়ই গ্রাহ্য। তার পর, ভূমিষ্টের সময় লোকে প্রকৃতিকে নিয়ে একটি ব্যস্ত থাকে, এমনকি যত্নে যদি থাকলেও ঠিক সময়ে দেখা খটা সম্ভব মনে করি না। তার পর যদিই দেখা হয়, তাহ'লে যদি যে ঠিক ছিল তা'র প্রমাণাভাব, অবশ্য সকলেই নিজ নিজ যুক্তিকে ঠিক বলে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তা'হ'লে ঠিক স্থানীয় কাল যে সেই যদি নির্দেশ করে না, তা' গণিতজ্ঞকে বলে বুঝাবার দরকার কি ?

আমি। তবে কি শুদ্ধ লগ্ন হ'বে না।

গুরুদেব। কে বলে হ'বে না ? আমাদের জ্যোতিষে যখন অনিশ্চিত সময়কে শুদ্ধ করবার উপায় রয়েছে, তখন যত্নের সামান্য অন্তর্ভুক্তি সংশোধন করা অসম্ভব নয়। রণবীর জ্যোতির্বিদেও এবং নিত্যানন্দ ভাতকাদিতে শুদ্ধ স্থানীয় জন্ম কাল নির্ণয়ের উপায় আছে, পাশ্চাত্য জ্যোতিষাচার্য্য শ্রীযুক্ত সিফেরিয়েল সেই নিয়মকে পরীক্ষা পূর্ণক স্থানাকারে নিবদ্ধ ক'রেছেন, বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য্য শ্রীযুক্ত এলেন লিও সেই স্থর বীকার করে নিজ গ্রন্থে দিয়েছেন, এ সব কথা তোমায় পরে বিশেষ ক'রে বলবো। আগে লগ্ন-নির্ণয় প্রণালীটি ভাল ক'রে আয়ত্ত্ব কর। বরং ব্যবহারের সুবিধার জন্য তোমার থাকায় কলিকাতার পাশ্চাত্য লগ্ন রঙাটীও লিখে নিতে পার। সব চেয়ে ব্যাকফেলের টেবুলস্ অব হাউসেস নামক বই একখানা কিনলেই ভাল হয়। দাম এক সিলিং বই নয়।

আমি। আজ্ঞা তাই করবো, এখন একটা জিজ্ঞাসা আছে, মঙ্গলের 'ফুটকে', আর বয়ঃ পরিসংখ্যটিকে কালে পরিণত করে যে যোগ করলেন, তার মানে কি ?

গুরুদেব। ও কথাটা বিশেষ ক'রে এখন বোঝান সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি এই বোঝ, যে লগ্নকে মঙ্গলের স্থানে আনতে যত সময় যায় তাই স্থির করা হ'লো; অর্থাৎ পিত্তবিরোগ সময় লগ্নকে মঙ্গল করা হ'লো। এর পর যখন এ গুলি বোঝাবার মত জ্ঞান হ'বে, তখন বিবিধ উপায় ব্যুত্থি হবে, ভূমিও ব্যুত্থি পাব্বে।

আমি। তবে ক্রিকোণমিত্তির সাহায্যেই করবো, না বগা দিয়ে করবো ?

গুরুদেব। ক্রিকোণমিত্তি দিয়েই কর। অল্প আয়ত্ত্ব হোক।

আমি। যে আজ্ঞা জন্ম সময় ২টা ২০ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড। খ্রীঃ ১৮৪৮ অশ্ব ১৭ই অক্টোবরের গ্রীষ্ম মধ্য-মাধ্যাহ্নিক নাক্ষত্রকাল=১৩। ৪৮। ৪৮ একে স্বদেশীয় মধ্যাহ্নিক করি।

গুরুদেব। তা ক'ন্তে হলে, সে সংস্কারটি যেমন এতে বিয়োগ করবে তেমনই জন্ম সময়ে যোগ করা উচিত। কারণ পূর্ণ অর্ধে গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নিক নাক্ষত্রকালই লগ্ন হ'য়েছিল।

আমি। তবে যা আছে তাই থাক,

গ্রী ম মা নাক্ষত্র কাল=১৩। ৪২। ৪৮

+ জন্মকাল অপরাহ্ন= ২। ২০। ৩৭

+ নাক্ষত্র সংস্কার. = ৭। ০। ২০

= তাৎকালিক নাক্ষত্র কাল=১৬। ০। ৪৮

১৬ ঘণ্টা=২৪০ অংশ

৩ মিনিট= ০। ৪৫ মিনিট

৪৮ সেকেন্ড= ০। ১২ মিনিট

= অংশ ২৪০। ৫৭ মধ্যাহ্নিকের সরলোত্তান R. A. M.C.

+ ৩০

= ২৭০। ৫৭ একাদশের বক্রোত্তান O. A. XI.

+ ৩০

= ৩০০। ৫৭ দ্বাদশের বক্রোত্তান O. A. XII.

+ ৩০

= ৩৩০। ৫৭ ত্রয়োদশের বক্রোত্তান O. A. Asc.

+ ৩০

= ৩৬০। ৫৭ চতুর্থের বক্রোত্তান O. A. II.

+ ৩০

= ৩৯০। ৫৭ পঞ্চমের বক্রোত্তান O. A. III.

দশমের সরলোত্তান ২৪০°-৫৭°-১৮°=৩০°-৫৭°

লগ. কোজ্যা Log. Cos. ২২°-২৮° = ৯.৯৬২৫২৬

+ লগ. কোস্প Log. Cot. ৬০°-৫৭° = ৯.৭৪৪৬৪৫

= কোস্প দশম Log. Cot. ৬২°-৫২° = ৯.৭৭১১১

+ ১৮°

৩০° ২৪২ (৮

৮। ২। ৫২

২৪০

২ অতএব ৮। ২। ৫২ দশম লগ্ন।

তার পর লগ। লগ্নের বক্রোথান = ৩৩° অংশ ৪৭ কক। অথবা মেঘ হইতে

$$৩৬০। ১ - ৩৩ - ১৪৭ = ২২। ৩$$

$$\therefore \text{লগ কোজ্যা Log. Cos. } ২২। ৩ = ৯.৯৪১৬০২$$

$$+ \text{লগ কোস্প Log. Cot. } ২৩। ২৮ = ১০.৩৮১৭১৪$$

$$= \text{লগ কোস্প Log. Cot. } \angle \text{ ক } ২৪। ২৪ = ১০.৩২৩৩১৩$$

$$\begin{aligned} &+ ২৩। ২৮ \\ &- \angle \text{ খ } ৪৮। ৪২ \end{aligned}$$

$$\text{লগ কোজ্যা (পা. প. As. com.) } \angle \text{ খ } = ১০.১৮১৮২৭$$

$$+ \text{লগ কোজ্যা } \angle \text{ ক } = ৯.৯৪১৬০২$$

$$+ \text{লগ স্প. } ২২। ৩ = ৯.৭৪৪৬৪৪$$

$$= \text{লগ স্প. লগ } ৩৭। ২০ = ৯.৮৮২৩২১$$

$$\text{অতএব } ৩৬০। ১ - ৩৭। ১০ = ৩২২। ১৪$$

$$= ১০। ২২। ১৪ \text{ লগ।}$$

লগ টিক তাই হ'লো। দশমও তাই বলা যেতে পারে।

গুরুদেব। হাঁ! তবে টেবিল থেকেই একাদশ ঘাটন প্রকৃতি নিয়ে চক্র আঁকনা কেন?

আমি। তা'পারি, কিন্তু একটা কথা আছে। একাদশ প্রকৃতির চর নির্ণয়ের পাকাতা নিয়ম কি? টেবিল থেকে চর ব্যাতিত পেতে পারি বটে, কিন্তু নিয়মটা যদি অত্যন্ত জটিল না হয় তা'হলে শিখতে ইচ্ছা করি।

গুরুদেব। ব্যাপারটা যে বিশেষ গুরুতর তা নয়। প্রথম সরলোথানও বক্রোথানের অন্তর (যা'কে উদযান্তর বলে) নির্ণয় ক'ত্তে হ'বে। তারপর তারি একতৃতীয়াংশ দিয়ে ঘাটন ও দ্বিতীয় স্তরতাং যষ্ট ও অষ্টমের চর নির্ণীত হ'বে।

আমি। কি রূপে?

গুরুদেব। বর্তমান পরমাপকম ২৩ অংশ ২৮ ককার লগ স্পর্শনীতে অষ্টমীয় অক্ষাংশটির লগ স্পর্শনী যোগ কলেই উদযান্তরের লগ জ্যা হ'বে। তথ্যরা যে অশাধি লঙ্ঘ হ'বে তারি এক তৃতীয়াংশের লগ জ্যা ঐ ক্রমপরমাপকমের (২৩।২৮) লগ কো-স্পর্শনীতে যোগ করলে একাদশাধির এবং দুই তৃতীয়াংশের লগ কোজ্যা যোগ করলে ঘাটনাদির লগ স্পর্শনী হ'বে। যেমন এ'থলে অক্ষাংশাধি ২২°-৩৩' তার লগ স্পর্শনী = ৯.৬১৮২২৪ এবং পরমাপকম ২৩°-২৮' লগ স্পর্শনী = ৯.৬৩৭৪২৬

$$\therefore \text{লগ স্প. } ২৩-২৮ = ৯.৬৩৭৪২১$$

$$+ \text{লগ স্প. } ২২-৩৩ = ৯.৬১৮২২৪$$

$$= \text{লগ জ্যা } ১০-২৩ = ৯.২৪৪২০৬$$

$$\text{এই } ১০°-২৩' \text{ উদযান্তর (Asc. diff.)}$$

$$৩) ১০°-২৩' (৩-২৭) \text{ এক তৃতীয়াংশ স্তরতাং } ৬-৪৪' \text{ দুই তৃতীয়াংশ}$$

$$\frac{১ \times ৬ + ২ \times ৬}{৮}$$

$$\frac{২০}{৮}$$

$$\frac{২০}{৮}$$

$$\text{এখন লগ জ্যা } ৩-২৮ = ৯.৭৮১৪২$$

$$+ \text{লগ কোস্প } ২৩-২৮ = ১০.৩৬২৩২$$

$$= \text{লগ স্প. } ৭°-৪৬ = ৯.১৪৩৩১$$

$$\text{এই } ৭°-৪৬' \text{ একাদশাধির চর}$$

$$\text{এবং লগ জ্যা } ৬-৪৪ = ৯.০৮৭১১$$

$$+ \text{লগ কোস্প } ২৩-২৮ = ১০.৩৬২৩২$$

$$= \text{লগ স্প. } ১৪°-৩০ = ৯.৪৪৩৩১$$

$$\text{এই } ১৪°-৩০' \text{ ঘাটনাদির চর=স্তরতাং}$$

কলিকাতা (২২°-৩৩' উ.)-র চর সারিণী।

লগ্ন	ঘাটন ও দ্বিতীয়	একাদশ ও তৃতীয়	দশম
২২°-৩৩'	৭°-৪৬'	১৪°-৩০'	১০°

ব্যাপারটা বুঝলে, কলিকাতার লগ অক্ষাংশের অঙ্কে, একাদশ ও তৃতীয় ৭°-৪৬' উত্তর অঙ্কে, দশম নিরঙ্কে, ঘাটন ও দ্বিতীয় ১৪°-৩০' উত্তর অঙ্কে, কিন্তু সপ্তম ২২°-৩৩' দ. চতুর্থ নিরঙ্কে এবং ও নবম ৭°-৪৬' দ. এবং যষ্ট ও অষ্টম ১৪°-৩০' দক্ষিণ অক্ষের উপর পড়বে। রাশিচক্র বহু বয়ে ব'লে; ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অঙ্কিত হয় ও তদনুসারে চর নির্ণীত হয় মাত্র। এখন দশম কলেজ, লগ্নও ক'লেজ, একাদশাধির স্ব স্ব চর নিয়ে কসূতে পারি। আমি। ঘাটনটিও কসি। যদি টেবিলের সঙ্গে বেশী অনৈক্য না হয়, তা'হলে টেবিল থেকেই বুঝা যাবে।

$$৩৬০। ১ - ৩০। ৪৭ = ৩২৯। ১৩ \text{ মেঘের অঙ্কে}$$

$$\therefore \text{লগ কোজ্যা } ৩২। ১৩ = ৯.৭০১২১$$

$$+ \text{লগ কোস্প } ১৪। ৩০ = ১০.৪৪৭০১$$

$$= \text{লগ কোস্প } \angle \text{ ক } ২৮। ৪৩ = ১০.২৪৮২২$$

$$+ ২৩। ২৮$$

$$= \angle \text{ খ } ৪২। ২২ \text{ কোজ্যা} = ৯.৭৮৪২২$$

$$\text{লগ কোজ্যা পা. প. } \angle \text{ খ } = ১০.২১৪০৮$$

$$+ \text{লগ কোজ্যা } \angle \text{ ক } = ৯.৯৪২৩১$$

$$+ \text{লগ স্প. } ৩২। ১৩ = ১০.২২২০২$$

$$= \text{লগ স্প. ঘাটন } ৬৭। ১৮ = ১০.৩৭৮৪৮$$

$$\therefore ৩৬০। ১ - ৬৭। ১৮ = ২৯২। ৪১ = ২। ২২। ৪১$$

দ্বিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

দত্তাশ্বেষ উপাচ ।

এবং যো বর্ততে যোগী সমাগ্যোগাবাবিহিতঃ ।
ন স বাববর্তিতুং শক্যো জন্মান্তরশতৈরিপি ॥ ১ ॥
দৃষ্ট্বা চ পরমাত্মানং প্রত্যক্ষং বিধরূপিণম্ ।
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশেষং বিশ্বভাবনম্ ॥ ২ ॥
তৎপ্রাপ্তয়ে সহৎ পুণ্যমোমিত্যেকাক্ষরং জপেৎ ।
তদেবাধ্যয়নং তন্তু স্বরূপং শৃণুতঃ পরম্ ॥ ৩ ॥
অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্ ।
এতান্তিস্ত্রিঃশ্রুতা মাত্রাঃ দাত্র-রাজস-তামসাঃ ॥ ৪ ॥
নিগুণা যোগিগম্যাত্মা চাক্ষরাত্মোক্তিসংস্থিতা ।
গাক্ষরীতি চ বিজ্ঞেয়া গাক্ষরস্বরসংশ্রয়া ।
পিপলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মুক্তিং লক্ষ্যতে ॥ ৫ ॥

যথা প্রযুক্ত-ওকারঃ প্রতিনির্বাতি মুক্তিম্ ।
তথোক্তারময়ো যোগী স্বক্ষরে স্বক্ষরে ভবেৎ ॥ ৬ ॥
প্রাণো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ত্রক্ষ বোধ্যমমৃতমম্ ।
অপ্রমত্তেন বৈদ্যব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৭ ॥
ওমিত্যেতৎ ত্রয়ো বেদান্ত্রয়ো লোকান্ত্রয়োহধমঃ ।
বিমুক্ত্রাক্ষা হরশ্চৈব ঋক্সামানি যজুযি চ ॥ ৮ ॥
মাত্রাঃ সাক্ষাশ্চ তিস্রশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ ।
তত্র যুক্তস্ত যো যোগী স তল্লয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥
অকারস্বপ্ন ভুলোক উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ ।
সবাক্ষনো মকারশ্চ স্বলোকঃ পরিকল্প্যতে ॥ ১০ ॥
ব্যক্তা তু প্রথমামাত্রা দ্বিতীয়াব্যক্তসংজ্ঞিতা ।
মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরীক্ষামাত্রা পরং পদম্ ॥ ১১ ॥
অনেনৈব ক্রমেণৈতা বিজ্ঞেয়া যোগভুময়ঃ ।
ওমিত্যাক্ষরগণং সর্বং গৃহীতং সদসম্ভবেৎ ॥ ১২ ॥

বলিলেন দত্তাশ্বেষ "তদহ, রাজন,
একপ্রণে যে যোগী করে যোগ আচরণ,
বিবর্তিত হ'তে শব্দ কহু সেই নয়
শব্দ জন্মান্তর যদি ঘটে হৃদিশ্রয় । ১ ।
বিশ্বরূপ, বিশ্বপাদ-শিরোগ্রীব-আর
বিশেষ বিশ্বভাবন কিছু সারাসার
পরম-আত্মায় সেই প্রত্যক্ষ করিয়া
মুক্তিভাগী হয় সত্য নিশ্চয় জানিয়া । ২ ।
তাহার পাইতে তা'র পুণ্যময় নাম
"প্রণব" সে একাক্ষর জপে অবিরাম ।
অধ্যয়ন তাহা বিনা নাহি কিছু আর,

তদন এবং বলি আমি স্বরূপ তাহার । ৩ ।
অ-কার উ-কার আর ঋ-কার মিলনে,
প্রণব উৎপন্ন; বিশেষ জানে সর্ব জনে ।
এই তিন সব রক্ত আর ততোময়,
ত্রিমাত্র প্রণব বলি সর্বশাস্ত্রে কয় । ৪ ।
তিনের পরেতে এক অর্ধ মাত্রা আর
নিগুণ, যোগীর গম্য স্বরূপ তাহার ।
সবার উপরে অর্ধ মাত্রা স্থিত হয়,
গাক্ষর তাহার স্বর জানিহ নিশ্চয়,
এ হেতু গাক্ষরী নামে খ্যাত চরাচরে,
শিশিলাকা গতি স্পর্শে মাধার উপরে । ৫ ।

যথার্থ প্রযুক্ত প্রণব, হৃদিশ্রয়
মুক্তিহানে যে সময় প্রতিগত হয়,
প্রণব স্বরূপ পানি-যোগী সে সময়,
অক্ষর সহায় হন অক্ষর নিশ্চয় । ৬ ।
প্রাণ ধনুঃ শর আত্মা ত্রক্ষ বোধ তা'র
অপ্রমত্ত হয়ে লক্ষ্য বিশেষ অবিরাম ।
তদ্রূপ হইয়া কর শরের সন্ধান,
ইষ্ট লাভ হ'বে ইথে কহু নাহি আন । ৭ ।
প্রণবের তিন মাত্রা তিন বেদ হয়
ঋক্সাম আর যজুঃ জানিহ নিশ্চয় ।
তিন অগ্নি, তিন লোক স্বরূপ তাহার
বিষ্ণু ত্রৈলোক্য তিন সন্মিলন কি তা'র । ৮ ।
পরমার্থে সাক্ষি তিন মাত্রা সে প্রণব;
যাহা হ'তে সমুদ্ভূত এই বিশ্ব সব ।
তাঁহে যুক্ত যেই যোগী তিন হৃদিশ্রয়,
অন্তে সেই প্রণবহেতে হইবেন লয় । ৯ ।
অ-কার ভুলোক, ভুবলোক সে উ-কার
ম-কার সে পর্বলোক কি সম্বন্ধ তা'র । ১০ ।
ব্যক্ত সে প্রথম মাত্রা অব্যক্ত দ্বিতীয়া,
চিচ্ছক্তি তাহাতে হন মাত্রা সে তৃতীয়া,
অর্ধমাত্রা সে পরম পদ হৃদিশ্রয়,
মুনিগণ এই তত্ত্ব করিয়া নির্ণয় । ১১ ।
সেই ক্রমে যোগভূমি স্বরূপ ইহার
জানিবে নিশ্চয় ইথে সন্ধ নাহি আর ।

হুবা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়া দৈর্ঘ্যসংযুতা ।

তৃতীয়া চ পুতুর্ভাষ্যা বচসঃ সা ন গোচরা ॥ ১৩ ॥

ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজিতম্ ।

যন্ত বৈদ নরঃ সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ ॥ ১৪ ॥

সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ত্যক্ত্রিবিধবন্ধনঃ ।

প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণি লয়ং পরমে পরমাত্মনি ॥ ১৫ ॥

অক্ষীর্ণকশ্মবদ্বশচ্ছায়া মুক্ত্যমরিত্ততঃ ।

উৎক্রান্তিকালে সংসৃতা পুনর্যোগিস্থমুচ্চতি ॥ ১৬ ॥

তস্মাদসিদ্ধযোগেন সিদ্ধযোগেন বা পুনঃ ।

জ্ঞেয়ান্ধরিকটানি সদা যেনোৎক্রান্তো ন সৌদতি ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়ালকৃপস্বামি যোগশাস্ত্রে

ওঙ্কারধরুণকখনং নাম ত্রিচছারিংশোধ্যায়ঃ ।

প্রণব উচ্চারে সদস্যং সমুদয়

পৃথীত হ'চ্ছে, ইহা জানিও নিশ্চয় । ১২ ।

আজ মাত্রা হুবা জানি, দীর্ঘ সে দ্বিতীয়া,

পুতুর্ভাষা জানি তাহে মাত্রা সে তৃতীয়া ;

অর্ধমাত্রা স্বরুপ বর্ণিতে সাধ্য কার ?

কাহাবো গোচর নয় জেনো ইহা সার । ১৩ ।

ওঙ্কার সংজিত এই মহাবর্ণবির

অক্ষর পরম ব্রহ্ম সকলের পর ;

যেই নর জানে ইহা সম্যক প্রকারে,

ধান করে নিরন্তর অস্তর মাঝারে । ১৪ ।

এড়ানে সংসার-চক্র সেই মহাজন,

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে দত্তাত্রেয়ালকৃপস্বামি যোগশাস্ত্রে ওঙ্কার স্বরুপ

বর্ণন নামক ত্রিচছারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ত্রিবিধ বন্ধনমুক্ত, শাস্ত্রের বচন,

ব্রহ্মে লীন হয়, ইথে নাহিক সংশয়,

সাহস্রা পরম-পরমাখ্যা হয়ে । ১৫ ।

কশ্মবদ্ব ছিন্ন নাহি হইতে ঝাঁহার

অবিষ্টের বশে মুক্তা হয় একবার,

উৎক্রান্তির কালে, ইহা করিয়া স্বরণ,

যোগী হ'য়ে জগদ্বিনে পুনঃ হুই জন । ১৬ ।

সিদ্ধ বা অসিদ্ধ যোগী এই সে কারণে ;

অবিষ্ট জানিবে নিজ উৎক্রান্তি কারণে ;

উৎক্রান্তির কালে আর, তা'হ'লে ঠাহার

অবসাদ আসি নাহি রোদিবেক আর । ১৭ ।

ত্রিচছারিংশোধ্যায়ঃ ।

দত্তাত্রেয় উবাচ ।

অরিকটানি মহারাজ শৃণু বক্ষ্যামি তানি তে ।

যেমামালোকনাম্মৃৎত্বং নিজং জানাতি যোগবিৎ ॥ ১ ॥

দেহমার্গং ধ্রুবং শুক্লং সোমচ্ছায়ামরুদ্রতীম্ ।

যো ন পশ্যেদ জীবৎ স নরঃ সংবৎসরং পরম্ ॥ ২ ॥

অরশ্মি বিশ্বং সূর্য্যস্ব বহিঃ চৈবাংশুমালিনম্ ।

দুষ্টৈকাদশমাসাত্ নরো-নোজ্ঞস্ত জীবতি ॥ ৩ ॥

বাত্তে মৃতপূরীষে চ যঃ স্বর্ণং রজতং তথা ।

প্রত্যক্ষং কুরুতে স্বপ্নে জীবৎ স দশমাসিকম্ ॥ ৪ ॥

দুষ্ট । প্রেতপিশাচাদৌ গন্ধর্ব্বনগরাণি চ ।

ত্ববর্ণবর্ণান্ বক্ষ্যামি নব মাসান্ স জীবতি ॥ ৫ ॥

স্থূলঃ কৃশঃ কৃশঃ স্থূলো যোহকস্যাদেব জায়তে ।

প্রকৃতেশ্চ নিবর্ত্তেত তস্মাচ্ছাস্টমাসিকম্ ॥ ৬ ॥

বলিলেন দত্তাত্রেয় "যাহাতে হইবে শ্রেয়ঃ স্বপ্নে যদি কোন জন করে হেন দরশন

নবনাথ করহ-স্ববর্ণ,

মুক্ত, বিষ্টা, বমদে তাহার,

বলিব অরিকটম্

যা'র দর্শনেতে হয় আছে স্বর্ণ, রৌপ্য আর, নিশ্চয় জানিহ তা'র

যোগী জ্ঞাত আপন মরণ । ১ ।

দশ মাস নাহি হ'বে পার । ২ ।

বেবমার্গ, ধ্রুব আর, শুক্ল, সোম গ্রহাকার যদি দেখে প্রেত আর পিশাচাদি ঘোরাকার

নিজ ছায়া, অরুদ্রতী আর,

দেখে কিবা গন্ধর্ব্বনগর,

যেবা না দেখিতে পায় সদ্যঃসর আর তা'র স্বর্ণ-বর্ণ বৃক্ষ দেখে তবে সেই দিন থেকে

বাচিতে হ'বে না ইহা সার ।

নয় মাসে জীবন-অন্তর । ৫ ।

দৃঢ়্যবির রশ্মিহীন দেখে যেবা কোন দিন অচেষ্টায় স্থূল জন কৃশ হয় সেইকাল

অংশুমালী দেখে যে অনল,

কিবা ক্রপ হয় স্থূলকার

তা'র প্রাণ হ্রসিন্দয় অচিরে হইবে ক্ষয় অষ্টমাস অন্তে তা'র মরণ হইবে, আর

একাদশ মাস মাত্র বল । ৬ ।

সদেহ নাহিক কিছু তা'র ।

খণ্ডং যন্ত পদং পাক্ষ্যং পাদস্থাগ্রে চ বা ভবেৎ ।
 পাংশুকর্দময়োর্মধ্যে সপ্তদাসান্ স জীবতি ॥ ৭ ॥
 গৃধ্রঃ কপোতঃ কাকোলো বায়সো বাপি মূর্দ্ধনি ।
 ক্রব্যাদো বা খণ্ডো নীলঃ যথাসানু-প্রদর্শকঃ ॥ ৮ ॥
 হৃদতে কাকপঙক্তীভিঃ পাংশুবর্ধেণ বা নরঃ ।
 স্বাং ছায়ামত্থা দৃষ্টু চতুঃপদং স জীবতি ॥ ৯ ॥
 অনন্ত্রে বিদ্যাতং দৃষ্টু দক্ষিণাং দিশমশ্রিতাম্ ।
 রাত্রাবিস্ত্রধনুশ্চাপি জীবিতং দিত্রিমাসিকম্ ॥ ১০ ॥
 সূতে তৈলে তথাদর্শে তোয়ে বা নাস্তনস্তনুম্ ।
 নঃ পশ্চেদশিরস্কং বা মাসাদুর্দ্ধং ন জীবতি ॥ ১১ ॥
 যন্ত বস্তসমো গন্ধো গাত্রে শবসমোহপি বা ।
 তন্ত্রাদ্ধমাসিকং জ্যেষ্ঠং যোগিনো নৃপ জীবিতম্ ॥ ১২ ॥

প্রকৃতির বিপর্যয় সহসা যাহার হয় চারি পাঁচ মাস আর জানিও জীবন তাঁর
 তাঁরো জেনো আসন্ন মরণ, তাঁর বেশী নাহি রবে আর,
 অষ্টম মাসেতে তাঁর এ দেহ না রবে আর শাস্ত্রের বচন এই ইহাতে সম্ভেহ নেই
 এই দুচ শাস্ত্রের বচন । ৩ ।
 পাংশু বা কর্দমে যদি পক্ষপেয়ে নিরবধি অনন্তস্থির গাথ যদি দক্ষিণ-অশ্বাথ
 দাক্ষি কিবা পদ-অগ্র যার দেখে কেহ বিদ্যুতের রেখা ।
 যন্ততে দেহিতে পা'বে, সেই যমগায়ে যাবে অথবা নিশায় হায় ইন্দ্রধনু দেখা যায়
 সাত মাস মাত্র বাকি তাঁর । ৭ ।
 গৃধ্র পারাবত আর কাকোল বায়স যার সূতে, তৈলে কিবা জলে অথবা আদর্শতলে
 কিবা নীল মাসাশী বিহব, নিজ মুষ্টি দেখিতে না পায়,
 পড়িবে মত্তক যার নিশ্চয় হইবে তাঁর অথবা মত্তক শূন্য বেহ হেরে—আহু পূর্ণ
 ছয়মাসে ভবলীলা ভঙ্গ । ৮ ।
 উজ্জীন বায়স দল পাশু বৃষ্টি অবিরল ছাগগন্ধ দেহে যার কিবা শবগন্ধ আর
 যেই জনে করয়ে পীড়ন, সে যোগীর জেনো হৃনিশ্চয়,
 বিশপরীত হেরে ছায়া, নিশ্চয় তাহার কায়া অর্ধ মাসে মৃত্যু হ'বে এই দেখ নাহি রবে,
 অচিরাত হারাবে জীবন, শাস্ত্র বাক্যে না কর সংশয় । ১২ ।

যন্ত বৈ স্নাতমাত্রস্ত হ্রৎপাদমবশ্যতে ।
 পিবতশ্চ জলং শোষো দশাহং সোহপি জীবতি ॥ ১৩ ॥
 সন্তিনো মারুতো যন্ত মগ্নস্থানানি কুন্ততি ।
 হৃদ্যতে নান্দ্রসংস্পর্শাং তন্ত যত্নরূপস্থিতং ॥ ১৪ ॥
 ঋক্ষ-বানরযানহো গায়ন যো দক্ষিণাং দিশম্ ।
 যথৈ প্রয়াতি তত্ৰাপি ন মৃত্যুঃ কালমুচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
 — রক্তকৃষ্ণাশ্বরথরা গায়ত্রী হসতী চ যম্ ।
 দক্ষিণাশাং নয়োরারি যথৈ সোহপি ন জীবতি ॥ ১৬ ॥
 নগ্নং ক্ষপণকং যথৈ হসমানং মহাবলম্ ।
 একং সংবীক্ষ্য বনস্তং বিদ্যামু ত্র্যমুপস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥
 আমন্তকতলাদ্যন্ত নিমগ্নং পক্ষমাগরে ।
 যপ্পে পশুত্যাগ্জানং স সত্তো জিয়তে নর ॥ ১৮ ॥
 কেশাদ্বারান্তথা ভগ্না ভুজপ্রানি নির্জলাং নদীম্ ।
 দৃষ্টা যপ্পে দশাহাত্ যত্ন্যকৈরাদেশ দিনে ॥ ১৯ ॥

যার মাত্রে যে জনার রুম্ব চরণ আর সেই জন হৃনিশ্চয়, অচিরেতে মৃত হয়,
 জলহীন হ'য়ে শুক হয়; দেহ তাঁর না রহে নিশ্চয়,
 জল পানে তৃষ্ণা যার, দূর নাহি হয় তাঁর শাস্ত্রের বচন এই ইহাতে সম্ভেহ নেই
 দশাহে জীবন শেষ হয় । ১৩ ।
 মগ্ন হ'য়ে সংভিন্ন, মগ্ন-স্থান করি' ছিন্ন নয় ক্ষপণক একা, যথৈ যদি যায় দেখা
 বাহিরেতে করে আগমন, তাহ'লে নিশ্চয় তাঁর জীবন নাহিক আর
 জলশ্মশ্রু য়েই জন তৃপ্ত নহে কহাচন তাহ'লে নিশ্চয় তাঁর জীবন নাহিক আর
 জেনো তাঁর নিকট মরণ । ১৪ ।
 যপ্পে যদি কোন জন করে হেন দরশন যদি যথৈ দেখে কেহ আমন্তক নিজ দেহ
 চড়ি ঋক্ষ-বানরের যানে, সত্য মৃত্যু হ'বে তাঁর সম্ভেহ নাহিক আর
 করিতে করিতে পান দক্ষিণে করে প্রয়াণ সত্য মৃত্যু হ'বে তাঁর সম্ভেহ নাহিক আর
 মৃত্যু তাঁর বিলম্ব না যানে । ১৫ ।
 যপ্পে যদি কোন জন করে নারী দরশন কেশ, কি অশ্বার আর, ভগ্ন সর্প যোরাকার
 রক্ত কিবা কৃষ্ণাশ্বরথরা, যপ্পে যথৈ যেই জন, না হ'বে তাঁর জীবন;
 হাসিয়া, গাহিয়া পান 'আসি' তাঁর সন্নিধান যপ্পে যথৈ দেখে কেহ দশ-অকালশ দিন । ১৬ ।
 দক্ষিণেতে লয়ে যায় অরা, হ'বে দশ-অকালশ দিন । ১৯ ।

করালৈবিকটৈঃ কৃষ্ণৈঃ পুরুষৈরুদ্যাতায়ুধৈঃ ।
 পামাণৈস্তাড়িতঃ স্বপ্নে সদ্যো মৃত্যুং লভেমরঃ ॥ ২০ ॥
 সূর্য্যোদয়ে যন্ত শিবা ক্রোশন্তী যাতি সমুদ্রম্ ।
 বিপরীতং পরীতং বা স সত্তো মৃত্যুমুচ্ছতি ॥ ২১ ॥
 যন্ত বৈ ভুল্লমাত্রস্ত হৃদয়ং বাধতে ক্ষুধা ।
 জায়তে দন্তঘর্ষশ্চ স গতায়ুর্ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥
 দীপগন্ধং ন যো বেত্তি এতত্যাছি তথা নিশি ।
 নাস্তানং পরনেত্রং বীক্ষতে ন স জীবতি ॥ ২৩ ॥
 শক্রায়ুধধারীকরাং দিবা গ্রহগণং তথা ।
 দৃষ্ট্ৱ মন্যেত সংক্ষাণমান্নজীবিতমান্নবিৎ ॥ ২৪ ॥
 নাসিকা বক্রতাং মেতি কর্ণয়ো নমনোমতী ।
 নেত্রঞ্চ বামং স্রবতি যস্য তস্যায়ুরুদ্যতম্ ॥ ২৫ ॥

উদ্যাতার ল'য়ে করে বিকট করাল নরে দিবানিশি যেইজন সত্তত সত্তর মন
 পামাণে তাড়িত করে তা'র, সে জন না রহিবে বাচিয়ে,
 হেন স্বপ্ন দেখে যেই তাহার জীবন নেই আশ্বমেধে যেইজন পরনেজে দরশন
 অচিরায় যমঘরে যায় । ২০ । যত করি করিতে না পায়,
 তপন-উদয়-কালে শিবা ডাকি এককালে সেই নর অচিরায় যমের আগারে যায়
 সমুদ্রেতে পশ্চাতে বা আর, সন্দেহ নাহিক কিছু তা'র । ২১ ।
 কিবা চারিধারে যার, নিশ্চয় জানিও তা'র ইন্দ্রাযুধে যেই জন অর্ধ রাজে দরশন
 যেতে হ'বে শমনের দ্বার । ২২ । করে শূঁজে আকাশের গায়
 তুচ্ছ মাত্র ক্ষুধা যা'র পীড়িত করয়ে হায় ! দিনে দেখে গ্রহগণ আশ্ববিৎ সেইজন
 দন্ত-ঘর্ষ হইবে বাহার, জানে প্রাণ ত্যাগিবে তাহায় । ২৩ ।
 সে জন গতায়ু হায় স্বরা যমধারে যায় নাসিকা বাকিয়ে যায়, কর্ণ নতৌন্নত তায়,
 তা'র আর নাহিক নিস্তার । ২৪ । বামনেজে বহে অশ্রুধার,
 দীপগন্ধজান যার নাহি আর, জেনো তা'র যে জনার এই দশা প্রাণে তা'র নাহি আশা
 আয়ুঃকাল গেছে ফুরাইয়ে, যায় সেই কৃতান্ত-আগার । ২৫ ।

সম্রাটচাৰ্য্য

রাজ। সার মৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কেটি, সি, আই, ই



India Press, Calcutta.

কলিকাতা পিটেল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি

গবেষণা কেন্দ্র

৯/এব, চ্যামার পেন, কলকাতা-৭০০০০৯

গৃহস্থ

“মনে পড়ে সে বালকে ? বৃহৎ সে প্রাণ
 ধবধীৰ উগ্ৰধোৰ বেন এক দান—
 বিপুল বটের মত—সেই যে বাড়িছে ?
 চৌকিকে প্রকৃতি তাব হাত অঙ্গারিছে
 আনন্দ অকুটিমুক্ত, উদার, নবীন।
 মহিষ লয়ে সে মাঠে ছায় প্রতিনিধি—
 গজ বাখি তক্ত ছায়ে, তরুসে শুয়ে,—
 সমুদ্রে নয়ন, মাথা হস্ত শব্দে গুয়ে,
 বোজ করে অমৃত, সিদ্ধ অমৃত,
 অখণ্ড প্রাণে প্রতিনিধি অমৃত।

***** কত কিরিলাম,—

কোথা লোক ? প্রাণ যার মুক্ত ? পৃথিবীর
 সর্গস্থাপ পড়ে দেখা ? লঘু কি গভীর—
 প্রতিকণ অঙ্কুরে বদ্ধ, এক করি’
 উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি ?
 দুটবাহ—ওই জেলে-জেলের মতন
 জীবন-সমুদ্রে মাঝে কবিতা কেন্দ্র
 নিজেবে সহসা, বহু ছলিরা ভূমি
 আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিরা—
 হস্তমুখে কলাবস্ত্র ফেলে কন্দল—
 “নিশ্চয় উঠিবে মস্ত”—ঐধ্যাতুত ভাল।
 সে লোক-নিশ্চয় অতি ঘোর ভালবাসে
 —তা নাগে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে ?
 —জীবন, জীবন, তাই, আনন্দ জীবন।”

সত্যীশচন্দ্র রায়।

৫ম খণ্ড

৫ম বর্ষ

আষাঢ়, ১৩২১

নবম সংখ্যা

আলোচনা

১। চরিত্র সংগঠন

আমরা বহুবীর বলিহাছি, ব্যক্তিগত
 চরিত্রের উপরে সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর
 করে। যে লোক ব্যক্তিগতভাবে শঠ, চোর,
 প্রবঞ্চক, সে লোক সমাজে দুই একটা
 বাহিরের গুণ দেখাইয়া বড় বেশীদিন নেতৃত্ব
 করিতে পারে না। এক দিন না একদিন

তাঁহার প্রকৃত মূর্তি বাহির হইয়া পড়িবেই।
 তাই সমাজের কল্যাণকামনা বাঁহাদের চিত্তে
 সত্যসত্যই আবিস্কৃত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে
 সর্বাঙ্গে চরিত্রবস্ত্র পরিচয় দিতে হইবে।
 তাহা না হইলে তাঁহাদের কামনার কোনই
 মূল্য নাই। আর নেতৃত্বপদ ?—তাঁহার জগৎ
 লালায়িত হইবার প্রয়োজন নাই। যিনি

চরিত্রবান, তিনিই তাহার জায়গত অধিকারী। সাধারণ ভাষাকে আপনিই সে পদে বৃত্ত করিয়া লইবে।

আমরা বহুদিন ধরিয়া রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করিয়া আসিতেছি। বহুদিন ধরিয়া কংগ্রেসে resolution পাশ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহাতে দেশের আশঙ্করূপ মঙ্গল সাধিত হয় নাই কেন? বিপ্লবাত্মী ভাষায় কথা কহিয়াছি বলিয়াই যে একত্র হইয়াছে, তাহা নহে। পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্ত, মুকুটে ভাষা দিবার জন্ত, শুদ্ধরূপে আশার স্ফূর্ত্ত করিবার জন্ত, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবার জন্ত, আমরা যথার্থ সেবার ভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি নাই; তাহারি জন্ত আমাদের জাতীয় উন্নতি পরিপূর্ণ লাভ করে নাই। আমরা পূর্বে একবার বলিয়াছিলাম, “জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্ত আমাদের কখনই নিখাদ্যবাদী ও কপটের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। কেবলমাত্র কতকগুলি রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিশিষ্ট মতবাদ বৃদ্ধিতে পারিলেই হইবে না, আমরা মাছ খাই, কোন সম্প্রদায় চাই না। কোনও চরিত্রহীন ব্যক্তিকে যেন সমাজে স্থান দেওয়া না হয়; সে রাষ্ট্রনীতিবিদগণ হইতে পারে, পণ্ডিত বক্তা হইতে পারে এবং কুটনীতিসমূহের নীমাংসা করিতে পারে; কিন্তু চরিত্রহীনের পক্ষে এ সমস্তই তুখা। আমাদের সেবা-ধর্মের আন্দোলনের মধ্যে যেন কোনরূপ অর্থ প্রবেশ না করে।”

বাস্তবিকপক্ষে আমরা কেবল এতদিন পাত্তিত্যের এবং বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। তাহা দ্বারা যতটুকু কার্য হইবার, তাহা হইয়াছে। কিন্তু সেইটুকুই আমাদের যথেষ্ট বলিয়া পরিতৃপ্ত হইলে চলিবে

না। আমাদের পত্তীরাভাবে, সভ্যভাবে দেশের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিবে। সেবাই সেই পথের একমাত্র সহায়। হাৰ্ভিয়ার্থের কণামাত্র ভাব হ্রদয়ে প্রস্রাব রাখিলে একাত্তরোদ কদাচ জাগৃত হইবে না। বৈরাগ্য, পবিত্রতা এবং উদারতাই সেবাধর্মের সুলভ। এই সুলভের সাধকই যথার্থ চরিত্রবলের অধিকারী। যিনি এই চরিত্রবলকে অবলম্বন করিয়া কি রাষ্ট্রীয় জীবনে, কি সাহিত্যিক বা পারিবারিক জীবনে, কি সাহিত্যজগতে, কি ব্যবসায়ক্ষেত্রে কার্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তিনিই পদে পদে সফলতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন। তিনি কোন ক্ষেত্রেই হামড়া ভাবে অগ্রগী না হইলেও, লোকে তাহাকেই নেতা বলিয়া স্বীকার করিবে। তিনি নেতা থাকিলে, কোন ক্ষেত্রেই “আভিজাত্য” মধ্যমা পরিলাক্ষিত হইবে না, কারণ সর্বসাধারণ তাঁহার কাধকে নিজের কাধাই মনে করিয়া লইবে।

যতদিন আমরা এই ভাবের ভাবুক, এই ভাবের কর্মী না পাইতেছি, ততদিন আমাদের বাহিরের উন্নতি কিছু কিছু সাধিত হইতে পারে, কিন্তু ভিতর উন্নত হইবে না। কিন্তু আর তুখা আত্মধর—তুখা বাক্যের তুখান তুলিবার দরকার নাই। এখন প্রত্যেককে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে—যথার্থ মূল্য দিক দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে।

..

২। সাহিত্যে জনসমাজ

সভ্যতার বিস্তারে আমাদের জ্ঞান ও কৃষ্ণ যতই উন্নত হইতে থাকে, আমরা প্রকৃতি হইতে ততই দূরে সরিয়া পড়ি। আমাদের

ভ্রষ্টা বস, যাওয়া পরা, চিন্তা, সমস্তই যেন কৃত্রিমতার নিগড় পরিতে থাকে। সরলতা আমাদের নিকটে বুদ্ধিহীনতার নামান্তর বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন একগুঁষা সভ্যতা সমাজের পক্ষে কিছুতেই মঙ্গলজনক নহে। ইহাতে সমাজের জীবনী-শক্তিরূপ পাইতে থাকে। সেইজন্য মাঝে মাঝে একটা রোমন জনিতে পাই—প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়াওঁল—মাছের এই নিদ্রার বুদ্ধির খেলা পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাউক। বাস্তবিক পক্ষে মাছের এই রোমনই তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করে।

আজকাল আমাদের সাহিত্যও নানা কারণে কৃত্রিম হইয়া পড়িতেছে, তাহার প্রকৃত জীবনীশক্তি ও লুপ্তপ্রায়। সেইজন্য অধ্যাপক শ্রীমুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্যিকগণকে জনসাধারণের দিকে—স্বাভাবিকতা ও সরলতার মূল প্রবেশের দিকে দৃষ্টি করিতে বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার কথা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“আমাদের সাহিত্যিক সাহিত্য, বহুকাল হইতে জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। জনসাধারণের ভাব ও চিন্তাপ্রণালীর সহিত আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাব ও চিন্তার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ যুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য আধুনিক সাহিত্য, জাতীয় ভাব, আদর্শ ও আকাজক্ষা প্রকাশ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বলা যায় না। কারণ প্রকৃত জাতি ত কয়েকজন ইংরেজী-শিক্ষিত উকিল ব্যারিষ্টার মাষ্টার কেরানী সম্পাদক লইয়া নহে। বাঙ্গালী জাতিতে চিনিতে হইলে পর্ণকুটীরবাসী অশিক্ষিত কৃষক, ভাতী, জেলা, মজুর, কামার, কুমোর, তেলী ও

নাপিতের অভাব ও অভিজোগ, আশা ও আকাজক্ষা জানিতে হইবে।

ইহাদের ভাব ও চিন্তাই সাহিত্যের মূল প্রবণতা। এই মূল প্রবণনের সঙ্গীতবীণী অমৃতধারা হইতে সাহিত্য যদি বহুকাল বঞ্চিত থাকে, তবে সে সাহিত্যে কাহারও শিপসা মিটিবে না, সে সাহিত্য অস্বাভাবিক, স্বাভাৱ্য আনিবে না। আর সে সাহিত্যের জীবনও অধিক কালের মধ্যে খালুকাশির মত কৃত্রিমতা সে সাহিত্য-ধারার গতিরোধ করিবেই এবং অচিরে বাক্যবিভ্রাস ও হৃদয়হীনতার শুষ্ক মরুভূমিতে সে সাহিত্যধারা জীবন হারাইবে। পক্ষান্তরে জনসমাজ—মহা সমাজের মর্মস্থল, সাহিত্যে সঙ্গীতবীণী প্রকাশ করিলে, জনসাধারণের অভাব ও আদর্শ সাহিত্যের প্রাণস্ফূর্ত্ত করিলে, সাহিত্য অমর হইবে। নদীর স্রোতের মত সে সাহিত্য প্রতি মুহূর্ত্তে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সমাজকে এক হস্তামল ও অনন্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিবে, এবং সে সাহিত্যই জাতির সমগ্র ভাববাহিনীকে বিশ্বসভ্যতারূপ মহাসমুদ্রের দিকে নিশ্চিতই পৌছাইয়া দিবে।”

..

৩। আমাদের মেলো

জনসাধারণের সহিত শিক্ষাদির পরিচয় করাইবার জন্ত আধুনিক উন্নত জগতকে প্রশ্রয়দায়ী সাহায্য লইতে হয়। এই প্রশ্রয়দায়ী দ্বারা জাতি, তাহার কোন নব্যবিকৃত শিল্পের অথবা কোন একটা শিল্পের ক্রমোন্নতির পরিচয় দিয়া থাকে। ব্যবসা ক্ষেত্রে, শিল্প-প্রদর্শনী বতটা সাহায্য দান করে, আর কোন উপায়ে সেগুলি সাহায্য পাওয়া যায় না।

সমগ্র শিল্পের একস্থানে সমাবেশ দেখিয়া জাতি, তাহার কোন শিল্পের অভাব, কোনটির বহুল প্রচার, কোনটির অধিকতর উন্নতির প্রয়োজন ঠিক করিয়া লয়। জাতীয় উন্নতির একটা চিহ্ন, শিল্পাদির উন্নতি ও তাহার বহুল প্রচার, এবং প্রদর্শনীই একাধারে সঙ্গীপেফা হওয়া দান করে। আমরাও আজকাল শিল্পাদির উন্নতিকল্পে, উন্নতজাতির নিকট হইতে, এই তথাকথিত নবাবিকৃত পঞ্চা শিকা করিতে চেষ্টা। তাই আজ আমাদের দেশেও প্রদর্শনীর এত বাহুল্য। প্রতি জেলায়, প্রতি বৎসর এক একটা করিয়া শিল্প প্রদর্শনী হয়। থাকে, তাহা ছাড়া কংগ্রেসের সহিত সমগ্র ভারত ধরিয়া একটা করিয়া মহাশিল্প প্রদর্শনীর অঙ্গঠান হয়।

এখন কথা হইতেছে প্রদর্শনীর সাহায্যে শিল্পাদির উন্নতি করা—এ পথটা আমাদের নিকট নূতন নহে। আধুনিক একজিভিশন এবং আমাদের মেলায় উদ্দেশ্য প্রায় এক। তবে মেলায় উদ্দেশ্য বেশী রকম কার্যকর বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শেষে এই মেলায় সাখ্যও বড় কম নহে। রথ, রাস, দোল, চড়ক, প্রভৃতি প্রতি পক্ষের মেলায় অঙ্গঠান। এখন মেলাতে অঙ্গঠানের জটা কিছুই নাই একমাত্র ইহার উন্নতিরই অভাব। এই মেলায় ধারায় বাবাসাদির সাহায্য যেহেতু কম হইত বা হয় তাহাও নহে। ধারার মিস্রাটের নওচন্দ্রির মেলা ও বেনপুত্রে হরিহরছত্রের মেলায় সংবাল রাখেন তাঁহারা ই তাহা বৃদ্ধিতে পারেন। এতাবৎ কাল আমাদের দেশে গো মহিষ অথ প্রভৃতির যে বাবদ্য চলিয়াছে তাহা এই এক হরিহর ছত্রের মেলাই রক্ষা করিতেছে। আমরা আজকাল যোর জড়বারী হইয়াছি, ফলে

আমাদের কি আছে না আছে দেখিবার সময় পাই না। জড়বারকেই জীবনের চরমলক্ষ্য করিয়াছি, তাই আজ জড়ের উন্নতি—কল্পে জড়বারী যে পথ লয়, আমরাও তাহাই লইতেছি। আর আমাদের “কিছু নাই কিছু নাই” করিয়া হইগোল করিতেছি। ভারত কোন কালেই জড়বারী ছিল না, এখনও নহে, তাহার চরমলক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা। তাই আধ্যাত্মিকতাকেই প্রাথমিক পথ দিয়া ভারতের সমগ্র বৈষয়িক উন্নতি অগ্রসর হয়। এই কারণেই আমাদের মেলায় ধর্মের সহিত যন্ত্রণা। জড়বারীর চক্ষে এ তথ্য লুকাইত। পূর্বের মেলায় পথও আধুনিক একজিভিশন এর পথের মধ্যে কোনটা ভাল তাহাও একটু আলোচনা করিলেই ঠিক হইয়া যায়। আজকালকার একজিভিশন কতকগুলি লোকের চেষ্টা ও উৎসাহের ও অর্থের উপর নির্ভর করে। যতদিন প্রতিষ্ঠাতাগণের এই উৎসাহ ও চেষ্টা থাকে ততদিনই একজিভিশনের অস্তিত্ব। প্রতিষ্ঠাতাগণের স্বত্বাধারের সহিত আধুনিক একজিভিশনের ও মৃত্যু। আবার যদি কোন নব-প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাব হয়, তবেই পুনঃ প্রদর্শনীর স্রষ্টি, নচেৎ সেইখানেই প্রদর্শনীর ইহলীলা শেষ। এ প্রকার অনেক জেলার ভাণ্ডে ঘটয়াছে, কিন্তু আমাদের চিরপ্রচলিত মেলায় ভাণ্ডে তাহা নহে,—কবে প্রতিষ্ঠিত, কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাহার কিছুই জানা যায় না—অথচ সেই মেলা অজাবধি চলিয়া আসিতেছে, যেন কোন একটা যন্ত্র আপনা হইতে (automatically) কাজ চালাইয়াছে।—প্রমাণ সোমপুরের হরিহর ছত্র, মিস্রাটের নওচন্দ্রী, চন্দননগর গোলাই ঘাটের স্তম্ভ

মেলা, মালদহের রামকৈলী ইত্যাদি এরূপ অনেক আছে। ইহাতে আধুনিক একজিভিশনের ত্র্যয় বড় বড় টাচার গাভাও নাই, ধর্মের নিকট হইতে টিকিট করিয়া খরচা তুলিবার ব্যবস্থাও নাই, এত হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপারও নাই, অথচ আধুনিক একজিভিশন অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। বিজ্ঞাপনের হুবিধও বড় কম হয় না, যেহেতু ধর্মও বড় কম নহে। এখন এই মেলা গুলির উন্নতি করিয়া ইহার সাহায্যেই শিল্পাদির সহিত জনসাধারণের পরিচয় করানো যায়। না, একজিভিশন নাম দিয়া Electric light fit করিয়া এক প্রদর্শনী করা সোজা?

অবশ্য কতকগুলি শিক্ষিত লোকের পক্ষে একজিভিশনটাই হুবিধ হইতে পারে কিন্তু জনসাধারণ পূর্ন প্রথাগ্রহণের মেলাটাই অধিক সুখে ইহা হৃনিপ্তিত। আমরা এতাবৎ পাক্ষতাভাবে বাহা করিতে গিয়াছি, তাহাতেই জনসাধারণকে বাধ দিয়াছি। ফলে আমাদের শক্তি আশাহরুপ বৃদ্ধি পায় না। স্বাভাবিক ভাবে যাহাতে তাহার বিকাশ হয়, তজ্জন্ম দেশে এখন চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সেইজন্ম “এই সময়ে জনসাধারণের সহিত আমাদের বহুদিনকার মিলনস্থলগুলি পর্দাবেশণ, পরিবরণকরিতে

ধর্মের নামে যে সব মেলা এবাবৎ অঙ্গঠিত হইয়া আসিতেছে, সেই গুলিকেই কেন্দ্র করিয়া আধুনিক উন্নত শিল্পের বাখ্য ও প্রচার যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে আভি নীল আরম্ভ হয়, তাহার জন্ম সমাজ-হিতমিগণ সচেত হইবেন। তাহা হইলে অল্প বায়ে আমাদের প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিবে এবং দেশও উপরূপ হইবে।

৪। বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব
বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচার সম্বন্ধে আমরা বহুদিন হইতেই আলোচনা করিয়া আসিতেছি। বিশেষতঃ আমরা সাহিত্যে সংরক্ষণ নীতির অবলম্বন আধুনিক কালে একান্ত আবশ্যক মনে করি। কবির রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারলাভে আমরা বলিয়াছিলাম, “যে ভাষার অল্পবাহ মাত্র পাইয়া জগৎ নবাবাবে অঙ্গপ্রাণিত হইল, সেই ভাষা আর বেশীদিন সরকারী শিক্ষাবিভাগের বিদ্যানে দেশবাসীর দ্বিতীয় ভাষা মাত্র থাকিবে না। স্বাধীনতার মাতৃভাষায় অত্যুচ্চ বিজ্ঞান, অত্যুচ্চ ধর্ম, অত্যুচ্চ ইতিহাস রচিত হইতে পারে কি না, এ বিষয়ে বাহারা সন্দেহ করিবেন, তাঁহারা জগন্তের পণ্ডিত-সমাজে পাপল বলিয়া পরিচিত হইবেন। রতঃ অঙ্গকালের ভিতরই দেশীয় সন্তান-সন্ততির সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদানের অঙ্গ তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। বিশেষ্য ভাষাগুলিকে শিক্ষার বাবস্থায় বিস্তারিত হান প্রদান করিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বাভাবিক ও জাতীয় পদব্যা হইয়া উঠিবে।”

স্বকবি শ্রীকৃষ্ণ চর্যামোহন কৃষ্ণার মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি কল্পে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কিসকল সাহিত্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাই বিস্তৃত ভাবে দেখাইয়াছেন। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

এতদিনে কাশ্মালিনী বঙ্গভাষা ভগবানের স্করণ যে সকল মণিমাণিক্যাদি অতুল স্মরণের আদিকারী হইয়াছেন, তাহাতে তিনি যে সহস্রা রাজ্যরাণীর উজ্জল সাজে সাজিয়া দেশবিদেশে—দিগ্বিদিকে বঙ্গভাষা বিকসিত আপনার মহিমা-স্বল্লা উড়াইয়া দিয়াছেন এবং মিলিলাকে আগ্রত পাক্ষতা জগতে রাজ্যরাণী বলিয়া পূজা পাইয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার অফল শ্রাধ্যা শুইয়া নিজাববানের জাগরণ-স্বপ্নে পাথ পরিবর্তন করিতে করিতে সম্যক ধারণাও করিতে পারিতেছি না। মায়ের শ্রীশ্রমের নব-

জ্যোতিঃ আমাদের নিম্নালয় নয়নে লক্ষ্য সঞ্চার করিয়া তাহাকে অর্দ্ধপ্রতিমিত করিয়া দিতেছে।

আমরা জেলায় জেলায় বঙ্গ-সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি সত্য; গৌড়-রাজ্যমালা এবং ঢাকার ইতিহাস লিখিয়াছি সত্য; কাব্য এবং সঙ্গীত রচনায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকারে যোগ্য হইয়াছি সত্য; নাট্য-সাহিত্যে এবং উপদ্রাস রচনায় সকলের নাজে এক পঙ্কজিত্তে বিনিবার অধিকারী হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমরা যা' হইতে পারি, তার তুলনায় তবু কিছুই হইতে পারি নাই ভাবিয়া আজ মন প্রাণ মুহূর্ত্তঃ বিষম বিযাদ-গ্রস্ত হইতেছে।

স্বীকার করি, দেশের অনেক গণ্যমান্য এবং প্রশসিত ব্যক্তি আজ বঙ্গভাষার সামান্য ব্রতী হইয়াছেন। স্বীকার করি, কতিপয় দন্যাত্ম জমীদার অর্থ সাহায্যে মায়ের সেবার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাহারা সংখ্যা কয়জন? ৮ কোটি লোক কে দেশের অধিবাসী, সে দেশের সাহিত্য এইরূপ মুষ্টিমেয় লোক দ্বারা গভীৰ্বস্থ হইয়া থাকিলে কি সাংখ্যাত্মিক লক্ষ্যের কথা?

সাহিত্যই যে মহত্ত্বের লক্ষণ। পশু সম্বন্ধে সাহিত্য জ্ঞান নাই—ভাব নাই—ভাষা নাই—কারণাশূন্য-ইতিহাস নাই—অর্থ নাই, তাই তাহারা কীব হইয়াও নিভস্ত হইয়, নিমেষ, নপুংস। পরমেশ্বরের সং চিত্র এবং আনন্দের বিকাশ এই মূল জগতে একমাত্র সাহিত্যই পরিণতি লাভ করিবে। "কবিতা আত্ম আর কবিতা অমর।" অমর অর্থাৎ নিত্য। তাহাই সং। বেদের পরে পুরাণাদি, দর্শন উপনিষাদাদি এবং রামায়ণ মহাভারতাদি—সাহিত্য। এবং তাহারা নিত্য অর্থাৎ অমর—তাদের রচয়িতারা অমর।

কালিদাস পণ্ডিত্যর সং কবিতা তাহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন? তার পরে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস

ইত্যাদি কবি এবং সাহিত্যিকগণ সব সং। তাহারা যেভাবে বা' ভাবিয়াছেন, যে ভাষায় বা' লিখিয়াছেন—সব সং। ভগবান রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরামাদি ভগবানের পূর্ণ স্বভাবের হইয়াও অমরতা লাভ করিতে পারিতেন না, যদি মৃগে মৃগে সাহিত্য এবং সাহিত্যিকগণ না জন্মিতেন।

সং এর পর চিৎ। চিৎ কি চৈতন্য—চেতনা। যেখানে সং, সেখানেই চৈতন্য, অর্থাৎ জীবন এবং সং। প্রস্তর গুণটি পড়িয়া আছে—সে জড়, তাহার জীবন নাই—অর্থাৎ কন্ড নাই। পিপিলিকাটি চলিয়া যাইতেছে, সে জীব—চৈতন্য আছে। কিন্তু সকলের চাইতে বেশী চৈতন্য মানব-জগতে। বিভা ও জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য শক্তিদ্বারা, সাহিত্যের দ্বারা মানব একটা লোককে, অথবা বা'কে ইচ্ছা তা'কেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া রাখিতেছে। কবে সোপার লড়া মরিয়া গিয়াছে—অবোন্ধাও আর নাই; কিন্তু বলিতে পারিবে, তুমি অবোন্ধা দেখ নাই—রাবণ রাক্ষসকে কি তার বর্ণ লক্ষ্যকে দেখ নাই? তুমি সাহিত্যিক, তুমি সব দেখিয়াছ। সেই দমমতলা, সে কৃষ্ণবন, সে পঙ্কজী, সে অশোক বনের চিহ্ন মাজ নাই—কবি, তুমি মনসে দেখে শত কোটি জন্ম পরেও আজ বিনিময় বিনিময় সে সব প্রত্যক্ষ করিতেছ। এক্ষণ ভাবে প্রত্যক্ষ করিচ্ছে যে জ্ঞানের প্রত্যেককে তাহা শূন্যস্থানস্থলকে চিত্র পটে স্থাপিত ভাবে আঁকিয়া দেখাওয়া দিতেছে—কখন হৃদয় আঁকিয়াছে ঐ অশোক-বনে সৌতা, ঐ শতুলতার প্রতি তুর্কীয়া মুনীর দারুণ আশ্রয়—কত আঁকিয়াছে—তুলি দিয়া আঁকিয়াছে লেখনি দিয়া আঁকিয়াছে—কত করিয়াছে, কত বলিবে।

সাহিত্যে সং চিৎ এর কথা প্রমাণ হইয়াছে; বা'কী, আনন্দ, সং বিশেষতঃ চিৎ যেখানে, সেখানে আনন্দ বা'কী থাকে না,—

সাহিত্যে সং চিৎ এর কথা প্রমাণ হইয়াছে; বা'কী, আনন্দ, সং বিশেষতঃ চিৎ যেখানে, সেখানে আনন্দ বা'কী থাকে না,—

সাহিত্যে সং চিৎ এর কথা প্রমাণ হইয়াছে; বা'কী, আনন্দ, সং বিশেষতঃ চিৎ যেখানে, সেখানে আনন্দ বা'কী থাকে না,—

পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়, অতএব সাহিত্যের মনুষ্যের ঈশ্বর প্রমাণ হয়। মনুষ্যের ঈশ্বরকেই নীচে নামিয়া মনুষ্যর দ্বারা লব্ধা যাক।

লব্ধি প্রাপ্ত হয়, সাহিত্য ছাড়া কি মনুষ্যর হইতে পারে না, উত্তরে এক কথা বলি, না। ব্যক্তিগত ভাবে হইতে পারে কিন্তু জাতিগত ভাবে না। যেসী অরণ্যে প্রবেশ করিয়া যোগাসনে বসিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিলেন, একটা জাতির তাহাতে মনুষ্যর লাভ হইবে না। তিনি জনসাধারণের আশ্রয় বাস বাহ্যিক বা কপিলার চলায় ভাষাধারা আপনার মুক্তি সাধনার স্বজ্ঞতা প্রচার না করিলে সব বিখ্য। তারপরে পৃথিবীতে কৃষ্ণি হইয়াই যোগী যোগাসনে বসিয়া পড়িবেন, তাহা হয় না। তাহাকে গভীরভাবে সাহিত্য সাধনা করিয়া বিভা ও জ্ঞানপূর্ণ মনুষ্যর লাভপূর্ণক বেবলাভের জন্ম অরণ্যে যাইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

অতএব যদি মনুষ্যর চাও—জাতিকে মনুষ্যের জাতি করিয়া তুলিতে চাও—সাহিত্য সাধনা কর—এই মহাবাক্য সকলকেই একতরফে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অতপর জটিলতার সমগ্রায় উপনীত হওয়া হইতেছে।

শেখতবে ভাষাতত্ত্ব হইয়া থাকে। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালী। অতএব আমাদের মনুষ্যত্বের প্রমাণ বাঙ্গালী সাহিত্যই প্রদর্শিত হইবে। এমনও একদল লোক আছেন, বাঁহারা বলেন ইংরেজ আমাদের রাজা—ইংরেজী সাহিত্য রাজ্যমানা কিন্তু অজ্ঞানের গনি—এরিকে বঙ্গসাহিত্য নিভান্ত শিশু—পর্যাপ্ত এবং পরকীয় আশ্রয়—তাহার স্রষ্ট এবং পুষ্টি—তাহাতে পণ্ডিত্যর যোগ্য একখানিও নিজস্ব গ্রন্থ নাই, অতএব তদালোচনা ছাড়িয়া দাও, এমন কি তাহার প্রশংসাই প্রয়োজন নাই। ইংরেজী পড় ইংরেজী লিখ, এমন কি ইংরেজীতেই চিন্তা ও কল্পনা করিতে শুরু কর। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর লোকের প্রতি কোণ দা

হইয়া বিশেষরূপে দয়াই উদ্ভেক হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সব মোহাজ্ঞ ব্যক্তি কখন ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পান না যে, ইংরেজগণ এদেশের প্রতি দৃষ্টি করিতেই সর্বাঙ্গে তাহাদিগকেই দেখিয়াছেন এবং তাহাদিগকেই বাঙ্গালী জাতির শীর্ষস্থানীয় লোক মনে করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই জাতিটাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবার বিশেষ কারণ পাইয়াছেন।

আর একদল লোক আছেন, বাঁহারা আদৌ বরষাই রানেন না বাঙ্গালার একটা সাহিত্য আছে কি না। তাহারা আজ্ঞ ইংরেজী সাহিত্যেরই সেবা করিয়া আসিয়াছেন।

অবশ্য কেহ কেহ কিছু বঙ্গসাহিত্যের জন্ম ঘটিতেছে, কিন্তু পরাধার্য এবং পরাভুক্তকণই তাহাদের জীবনের মূল অবলম্বন। কারণ আজ্ঞ কেবল পরকীয় ভাব ও ভাব্যর মান্য করিয়া করিয়া উদ্দেশ্য মন তন্তব্য ভাবেই গঠিত হইয়াছে। তাহাদের দ্বারাও বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লাভ হইবার আশা নাই। বরঞ্চ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে কর্তব্য আশঙ্কাই দেখা যায়। তাহাদের দ্বারা যে সব যত্নক এবং মানসিক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পড়িতে বসিলে বাঙ্গালী সাহিত্য পড়িতেছি—বাঙ্গালীর প্রাণের কথা পড়িতেছি বলিয়া ভুলেও মনে যাইবে না। কেহ জ্ঞাপানের কথা—কেহ বিদ্যাতের কথা—বিলাতি গল্প—বিলাতী অপ্রীতিকর ছবি ইত্যাদি; বেশী অল্পগ্রহ হইলে কেহ কেহ মেডিক্যাল সাইন্সের বা আইনমির স্বান বিশেষর অজ্ঞান অথবা ছুঁইদশজন ইংরেজ বা মুসলমান ঐতিহাসিকের কথা চর্চিত চর্চণ করিতে করিতে ছাই ভষ মাথা মুহু লিখিয়া ঐ সব মানসিক ছাপিতে পাঠান এমন কি প্রশংসিত রচনা করিয়া থাকেন। এবং নামের সাথে এণটি A. B. C. D বলাইয়া উপাধীর নিদান ভাড়াটী লিখ, আর যুব বাহবা পাইয়া থাকেন।

বাদ বা'কী আর এক দল আছেন, তাঁহারা

* বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জড়ের জীবন আছে। প্রকৃত পক্ষেও বিচার করিয়া দেখিলে—জড় কিছুই নাই—সকলেরই স্বভাবতঃ কন্ড বা পরিবর্তন আছে। তাহাকে বসে, সর্ব প্রকরণে লক্ষ্য। কিন্তু মানবের চিন্তনশ্রীর তুলনায় জড়কে জীব সজ্ঞা দেওয়া যায় না।

হইতে পারে তাহার একটা বিশেষ উপায় হইবে।

এদিকে ইংরেজীতে উপাধি পরীক্ষা আছে—সম্মতে আছে—বাঙালিতে কি হইতে পারে না? সেও একটা কম আলোচনার বিষয় নহে। এবং আমাদের প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করিবার চিন্তা করিতে প্রথমেই শিক্ষকদের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আদিয়া পড়িবে। যাহাঁ কুলেশন রাসের বাঙ্গালার শিক্ষক এবং এম. এ. রাসের বাঙ্গালার প্রফেসর গুণের যথেষ্ট ভারতম্য থাকিবে। তাহা যাহাতে সহজেই পরিমাপ করিতে পারে যায়, তাহার জ্ঞান একটা বস্তুভিত্তিক করা উচিত, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা এখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি যে এম. এ. রাসেরও বাঙ্গালার প্রফেসর নিম্নক হইতে পারেন এমন অনেক লোক এখনো আমাদের কবি এবং সাহিত্যিকদের মধ্য হইতে সহজেই বাছিয়া লওয়া যায়।

আমরা আমাদের চেমেলর বাহাদুর, বঙ্গেশ্বর—লর্ড কারমাইকেল এবং ডাইস চেমেলর বাহাদুরদিগকে সম্মানে আমাদের আরও অকিঞ্চনকর প্রবন্ধের প্রতি একটু কৃপাশীল করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিবেছি।

উপসংহারে আমাদের প্রবন্ধের সারাংশটুকু পুনরুক্তি করিতেছি।

(১) সাহিত্যেই একমাত্র মানবের মহত্ত্বের সাধনা হইয়া থাকে। অতএব উন্নতিশীল ব্যক্তিমাত্রকেই সাহিত্যাহ্বারগী হইতে হইবে।

(২) এবং একটা জাতির বা দেশের উন্নতি করিতে হইলে সেই জাতিকে তাহার সাহিত্য সাধনার সফলতা লাভ করিতে হইবে। দেশভেদে ভাষাভেদ হইয়া থাকে।

আমরা বাঙ্গালী; বাঙ্গালীভাষা আর কিছুই নয়, আমাদের প্রাণের পল্লব—বাঙ্গালী ভাষার যত অনন্যত, আমাদের তত উন্নতিসাধক অবশ্যার্থ। অতএব আমাদের কর্তব্য বাঙ্গালী সাহিত্যের যত্নসূচ সম্ভব

উন্নতি কামনাযুক্ত বর্ধমান যুগে জীবন উৎসর্গ করিয়া মহত্ত্বের সাধনায় নিযুক্ত হওয়া।

(৩) আর তদুদ্দেশ্য সর্গতোভাবে সফলতা লাভ করিতে হইলে, কলেক সমূহের এম. এ. রাসেরও বঙ্গদেশের একটা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করা এবং বিশেষরূপে পাঠ্য নির্দেশপূর্বক উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত বঙ্গ কবি অথবা সাহিত্যিক প্রভৃতিককে বাঙ্গালার প্রফেসর নিযুক্ত করা। আর দ্বন্দ্ব-সমূহের বাঙ্গালী শিক্ষকগণেরও বেতন উপযুক্তরূপে বৃদ্ধিপূর্বক উৎকর্ষে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবার পথ মুক্তকরা এবং তাহার সাহিত্যের প্রচারের পথ মুক্তকরা এবং তাহার পৌরব ও তৎপ্রতি দেশের ছাত্রদের অনুরাগ বন্ধিত করা। দেশের সাহিত্যরত্নী মহারথী মহাপ্রভুর একজন আবদান নিবেদন ও আলোচনা আমোদন করা উচিত।

..

৫. জাতীয় শিক্ষা

বিলাত যাইবার পূর্বে—শ্রীমতী আনি বোসজি আমাদের জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতার কিঞ্চিৎ সারাংশ নিয়ে প্রণাম করিতেছি।—

শিক্ষাকে চারি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ সাহিত্যবিষয়ক, শিলালান, পালন, এবং গণবিস্তারের। চারুদ্রীর জ্ঞান ইহার আবশ্যকতা অস্বত্বব হয়। দ্বিতীয়তঃ টেকনিক্যাল; তৃতীয়তঃ—দ্বী শিক্ষা, ইহা বর্ধমানের আনন্দ হইলেও ইহার দরকার বড় বেতনে। চতুর্থতঃ জ্ঞানমাজের শিক্ষা। ইহাতে জনসাধারণ জাতীয় উন্নতির জ্ঞান সর্ববিধ বিষয়ে এবংযোগে কার্যে করিতে সক্ষম হয়।

প্রথমটির সম্বন্ধে বক্তা একটা পরিবর্তন আবশ্যক মনে করেন। ভারতীয় বিষয়গুলিই ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে—অন্য ভারতীয় বিষয়গুলির স্থান এখানে দ্বিতীয়। ভারতবর্ষজাতিক ভারতীয় দর্শন শিক্ষা দিতে হইবে। পাকাত্য দর্শন তাহাদের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করিবার জ্ঞান শিক্ষা, সেওয়া কর্তব্য,

শিক্ষা তাহা আশঙ্কালকার জায় মুখস্থান পাইতে পারিবে না। আশঙ্কাল ভারতে যেকোনভাবে ভারতীয় ইতিহাস শিক্ষা সেওয়া হইতেছে, তাহার মত শুধু, অমুদ্রার এবং অমুদ্রাহার আর কিছুই হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভারতীয় সন্তান ভারতের বীর-দিশের নিকট হইতে বৃত্তান্তি শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, ইংরাজবীরদিশের নিকট হইতে তত্ত্বানি কিছুতেই পারে না। সেই জ্ঞান, ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিশের ইতিহাস তাহাদিশের নিকটে লিখিত হইবে। সে সব ব্যক্তি যে ক্রমে ধর্মাবলম্বী হইউন না কেন, তাঁহারা ভারতবর্ষকে নির্দোষ করিয়াছেন—

—ভারতের মহত্ত্বপট্টের মধ্যে তাঁহাদের বল প্রদায় আছে। ইংলও যেমন তাহার নিজের ইতিহাস নিজে লিখিয়াছে, তেমনি তাহারিগকেও তাহাদের নিজের ইতিহাস লিখিতে হইবে। প্রত্যেক হিন্দু আকবরকে ভাল বাসিবেন, প্রত্যেক মুসলমান শিবজীকে ভাল বাসিবেন; তাঁহারা সব সময় মনে রাখিবেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে হইতেই একটা জাতি সংগঠিত হইয়া আসিতেছিল, এবং সেই জ্ঞান জাতীর কর্মদীপিকে সম্মানের চক্রে দেখিতে হইবে।

টেকনিক্যাল শিক্ষাসম্বন্ধে বক্তার মত এই যে যি বালকদিগকে টেকনিক্যাল শিক্ষা দিয়া তাহারিগকে কোন কালে না সেওয়া যায়, তবে এ শিক্ষা সেওয়া ভাল নয়। অনেক ছাত্রই বিশেষ দিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া নানাবিধ শিল্প শিক্ষা করিয়াছেন। কিরিয়া আদিয়া তাঁহারা কোন কার্যই পান নাই। ইহাতে মনে হয় দেশের দনী বা রাজত্বসূচ তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিতেছেন না। তাঁহারা অনেক সময় সামান্যিকত দেশজাতীয় পরিবর্তে বিদেশীয় একজনকে কার্যে প্রদান করেন, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। আশা করা যায়, তাঁহারা এই লজ্জা হইতে মুক্ত হইয়া, তাঁহারা শিক্ষিত স্বদেশবাসীকে কার্যে দিতে সক্ষম হইবে।

জাতীয়কর বিষয় উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন, প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া ইহা ভারত-

বর্ষে অনাদৃত হইতেছে। ইহাকে প্রচার করিতে হইলে ভারতবাসীদিগকে সংঘ সংগঠন করিতে হইবে—শিক্ষার ভারতকে সর্গপ্রদম করিয়া তুলিতে হইবে—ভারতবর্ষকে একটা জাতির ভারতবর্ষ করিয়া গড়িতে হইবে।

জনসমাজের শিক্ষাসম্বন্ধে বক্তার মত এই যে সর্গপ্রথম পলায়ে প্রথমে আবার প্রবর্তন করা আবশ্যক এবং সমবায় নীতিতে কার্যে অন্তর্গত হওয়া কর্তব্য। প্রত্যেক ছাত্রের জীবনের অত্যন্ত সাধারণ জিনিষের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাটো অত্যন্ত করিতে হইবে। এখানে সাহিত্যিক সম্মান স্থান না দিয়া হাতের কা, চাষ বাস প্রভৃতিই বৈশী শিক্ষা দিতে হইবে।

..

৭। কৃষিায় সমবায় সমিতি

অনেকেই বোধ হয় জানেন না কৃষিায় সমবায়-সমিতির সংস্থা বড় কম নহে। পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র জার্মানী নোটেই তাহার স্থান।

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে সর্গপ্রথম কৃষিায় সমবায় আমোদন আরম্ভ হয়। তখন কেবল কতকগুলি ঋণ-দান সমিতি, সেভিস দিয়া প্রস্তুত স্থাপিত হয়। কিন্তু বিগত দশবৎসরের মধ্যেই সমবায়ের সর্ববিধ শাখায় প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯১০ খৃঃ অব্দে প্রায় ১২,৫০০ কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ১,৫০০ ডিক্রিবিউটিভ সোসাইটি, ৪৯০০ কৃষি সমিতি, গাখ্য-উৎপাদনের জ্ঞান ৬০০ সমবায় সমিতি, ৫০০ ধর্মগোলা, এবং ২,৫০০ দুগ্ধভাণ্ডার পরিচালিত হয়।

এইরূপ অসুত উন্নতির বহুবিধ কারণ আছে নিম্নলিখিত বলা যায়, কৃষিয়ার সম-কীবাংশপ্রদায়, বিশেষতঃ কৃষক সমুহ তাহাদের নিজদের কল্যাণ সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছে স্বাধীনতামনে মূল্য কি। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত মাথাওয়ালা লোক

আছেন, তাঁহাদের চেষ্টাতেই বিভিন্ন বিভিন্ন সমবায় স্থাপিত হইতে পারিয়াছে। ইহার না থাকিলে নিরক্ষণীরা এত সহজে উদ্ধৃত হইত কি না সন্দেহ। তারপর শাসক-সম্প্রদায় সমবায়ের আবশ্যকতা সাম্য-স্বত্ববন্ধন করিয়া তাহার উন্নতির অত্র বিপাক দশবছর যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সাহায্যেও বহুতর সমবায়সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। বলা বাহুল্য সমবায়-সুখকে তাঁহারা অনেকগুলি নিয়ম-কানুনও সংগঠিত করিয়াছেন।

**

৮। স্বাস্থ্যসীমিতার হেতু

“প্রতিনিয়ত নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হইতেছে। কলেরা, পেগ, বম্বুজ ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশ জনশ্রুত হইবার উপক্রম হইয়াছে। দেশে, ধাতুদোষীরা, অন্ন, অর্জা, ঘন্য ও ক্ষয়কাস প্রভৃতির প্রাপ্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। দেশ যেন ক্রমেই বিমল স্বাস্থ্যস্থলাভে বঞ্চিত হইতেছে। লোকগুলি যেন ক্রমেই বেঁদের কাপির বিঘবদের ছায় বসন্ত, তেজশূল ও উৎসাহশূল হইয়া পড়িতেছে। শরকার দশটা লোকও সবল, সতেজ, নীরোগ ও কর্মক্ষম খুঁজি পাওয়া যাইবে নাই। ইহার কারণ কি? কি পাশে দেশ দিন দিন রাস্তাভলে যাইতেছে? কি দোষে দেশ স্বা-শান্তি হারাইতেছে। এই সমস্ত রোগের নিদান নিরূপণ পূর্বক প্রতিকারপরায়ণ না হইলে দেশের স্বাশান্তি, আশোনাবের ও স্বাস্থ্যোন্নতির আশা বিফল্য না মাত্র।

স্বাস্থ্যই সর্বপ্রকার সুখের ও শ্রেয়সাধনের মূল। শাস্ত্রে আছে—“ধর্মার্থকামমোক্ষণ-মারোগামূলমুত্তমম্।” ধর্ম, অর্থ, কাম কি মোক্ষ যাহাই সাধন কর না কেন, আরোগ্যই সাধনের মূল। রোগমুক্ত, ধার্মাঙ্গী সমর্থিত, রম্য রম্যতুল্যবাসী রাজাদিরাজ অশোক রোগমুক্ত পর্বতকূটবাসী ভিক্ষুকও সমর্থিত হইয়া সন্দেহ নাই।

পূর্বোক্ত রোগ সমূহের তবনিরূপণ প্রস্তুত

হইলে নিম্নলিখিত হেতুগুলিই দেশের স্বা-শান্তির অন্তরায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথা—

- ১। কৃষিকিন্দা। ২। পেটেট উৎপাদ। ৩। খাদ্যবিষয়ে বিচার্যতা। ৪। বিতুল খাজনাব্যয়ের অস্বাভ। ৫। বিতুল পানীয় জলের ও জল নিসরণের বন্দোবস্তের অস্বাভ। ৬। কোরোনি তেল ব্যবহার। ৭। টিনের ঘরে বাস। ইত্যাদি।

উল্লিখিত হেতুগুলি যথাক্রমে বিশদভাবে আলোচনা হইতেছে। ১ম হেতু—কৃষিকিন্দা। চিকিন্দা শাস্ত্রজ, ঔষধ প্রস্তুত পট, মনসী, প্রভৃতিপন্নমতি ও কর্তব্যনিষ্ঠ চিকিন্দক কর্তৃক রোগ ও ঔষধ নির্যাসন পূর্বক বিতুল ঔষধ দ্বারা যে চিকিন্দা তাহারই নাম স্বচিকিন্দা, তথিপরীত স্বচিকিন্দা।

মহনি স্মৃতাচাৰ্য্য চিকিন্দসকের লক্ষণ করিয়াছেন :—

তত্বাধিগতশাস্ত্রার্থে দূষ্টকর্ম স্বয়ংকৃত্য।
লঘুহৃতঃ তুতিঃ শূনঃ সঙ্ক্ষেপভবেদভঃ।
প্রভৃতিপন্নমতিযানু ব্যবসায়ী বিশারদঃ।

মনিমধ্বরো বসু স ভিন্দ্য পাণ্ডিত্যতঃ।

তিনি অধ্যাপকের নিকট যথাচারিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি চিকিন্দসার্থ্য ও ঔষধ প্রস্তুতকার্য্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, যিনি পণ্ডিত, লঘুহৃত, তুতি, বলনাশ, প্রভৃতিপন্নমতি, বৃদ্ধিমান, ব্যবসায়ী, কার্যক্ষম, সত্যবাহী ও ধার্মিক এবং বাঁহীর নিকট চিকিন্দ্যোগ্যযোগী ঔষধাদি সর্গরা প্রস্তুত থাকে তিনিই চিকিন্দক।

এখন চিকিন্দসক মহলে অহমসন্ধান করিলে উক্ত গুণবিশিষ্ট চিকিন্দসক কয়জন মিলিলে, চিন্তা করিয়া দেখুন। অত্র কথা দূর থাকি অধ্যাপকের নিকট যথাবিধি অধ্যয়ন পূর্বক, চিকিন্দা ও ঔষধ প্রস্তুত কার্য্য পরিশ্রমাস্তে চিকিন্দা ব্যবসায় করিতেছেন তেমন চিকিন্দসক শতভাগ পণ্ডিত্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অথচ মহের বন্দরে, হাটে বাজারে, গ্রামে গ্রামে কবিশূন্য, কবিরজন, শাস্ত্রী প্রভৃতির অস্থান নাই।

অশাস্ত্রজ চিকিন্দসককে হস্তচাচাৰ্য্য কি বলেন শুভমঃ :—

পাশ্চাত্তম্যমূল্যাদিগণ্যোপায়াচাসকঃ।

শুভমশয়নের নিকট চিকিন্দা শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক দ্বার বার ঐ বিষয়ের আলোচনা করিয়া যিনি চিকিন্দা ব্যবসায় করেন তিনিই চিকিন্দসক। ঐক্লপ শিক্ষা ভিন্ন যিনি ব্যবসায় করেন, তিনি তত্ত্বের অর্থ্যে দ্বন্দ্ববশে অর্থ অপহরণ করেন, সুতরাং তিনি চোর। মহনি স্মৃতাচাৰ্য্য চিকিন্দসক না বলিয়া চোর বলেন, আমি তাঁহাদিগকে স্বচিকিন্দসক শব্দে অভিহিত করলাম।

বাঁহারা সংস্কৃত জ্ঞানে না, অশুদ্ধ বলাহবাদ দেখিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাঁহারা যেমন স্বচিকিন্দসক, বাঁহারা সংস্কৃত জ্ঞানে—জ্ঞানে বলিয়া আশুর্বেদ পাঠ নিজে নিজে পড়িয়া, ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে “স্বৈতমরিচ” শব্দের অর্থ সাধা মরিচ, “গোন্ধূর” শব্দের অর্থ গন্ধুর মূর এবং “কট-কটী” শব্দের অর্থ কাঁটার অরি অর্থ্যে জুতা ব্যাখ্যা পূর্বক তদুপাধায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া চিকিন্দা করেন এবং সাহিত্য ও নিদানের স্রোত পাঠ করিয়া আশুর্বেদজ্ঞের প্রমাণ দেখান—তাঁহারা, তেমন কি ততোধিক স্বচিকিন্দসক। বাঁহারা বর্ণিষায়ের আর্য বিজ্ঞতা হইতে তুত্ববীজীকৃত তারার অধুগম্য লোহচূর্ণ খরিল করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাঁহারা যেমন স্বচিকিন্দসক, বাঁহারা ভাষা, কোলাল, কড়াই প্রভৃতির লোহকে গোমুখে ভিজাইয়া মুঠের পোড় দিয়া উৎকৃষ্ট লৌহ জাফ দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া বাহাদুরী করেন তাঁহারা তেমন কি ততোধিক স্বচিকিন্দসক। বাঁহারা জামালতার স্থানে—সর্বলতা, পদ্মকারের স্থানে—স্বলপদ্মের গাছ এবং কটকীর স্থানে—হাঁড়পাড়ার শিকড়ের ব্যবহার করেন, তাঁহারা যেমন স্বচিকিন্দসক, বাঁহারা গন্ধক স্থানে বাতি গন্ধক, রক্ত স্থানে জিরাফী রক্ত ও রস-সিন্দুরের স্থানে বাঁহাদের মুঠীতে তোলা

রাসসিন্দুর দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাঁহারা তেমন কি ততোধিক স্বচিকিন্দসক। চিকিন্দা গুণ চান্দু প্রত্যক্স না করিয়া তালিকা সংগ্রহ পূর্বক বাঁহারা ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাঁহারা যেমন স্বচিকিন্দসক, বাঁহারা চিকিন্দা শাণের দ্বারা না দারিয়া, অর্ধলোতে, বিজাপনের জোড়ে, যাহা তাহা দিয়া মক্ষমশল্যবাসীকে ঠকাইয়া চিকিন্দা ব্যবসায় করেন, তাঁহারা তেমন কি ততোধিক স্বচিকিন্দসক।

আশুর্বেদীয় চিকিন্দসকগণের মধ্যে স্বচিকিন্দসকের সংখ্যাধিক হইলেও এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং হাকিমি মতাদ্বায়ী চিকিন্দসকগণের মধ্যেও স্বচিকিন্দসকের প্রভাব নাই। প্রায় কল্যাণ্ডগরই অতীত্বায়ে ভাঙ্গার। আর হোমিওপ্যাথি চিকিন্দসক ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মা গঙ্গা হোমিওপ্যাথি উৎসাহগুণে অবতীর্ণ হইয়ায় পাঁচ পদমার ঔষধের ব্যবসায়ীর সংখ্যা করে সাধ্য কার? স্থলের শিক্ষকসমূহ, কোরাণিটম, অল্প বয়সের কাজীকাজী ভদ্রলোকব্রহ্ম, উদ্দেশ্য-গণ প্রায়ই ঐ স্মৃতাচাৰ্য্যের সেবক।

ঐ সকল স্বচিকিন্দসকের চিকিন্দায় দোষে অনেক দীর্ঘকাল অশেষ যন্ত্রণা ভোগ অবশেষে হইতে কাল কবলে কবলিত হইতেছে, কিংবা অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। অনেক স্থানান্তর রোগ স্তর সাধ্যে কি অসাধ্যো পরিণত হইতেছে। নিকপদর রোগ হইতে বহু উপদ্রব জন্মগ্রহণ করিয়া রোগীর ভবলীলা মায় করিতেছে। দৈবাৎ কোনও ভাগ্যবান লোক তাহারে চিকিন্দায় আরোপ্যামাত্র করিলেও অবিতুল ঔষধ প্রয়োগহেতু পরে রক্তচূর্ণি, ধাতুদোষীরাণি রোগ নিচয় ক্রমে তাহাকে আক্রমণ করিতে থাকে। পারদাম্য ককগুলি ঔষধ আছে, অবিতুল ব্যবহৃত হইলে শুধু ব্যবহারকারীর অনিষ্ট হয় এমন নয়, ঐ ব্যবহারকারীর ঔগঙ্গজাত সন্তানকেই ঐ ঔষধের বিষময় ফল ভোগ করিতে হয়। ফলকথা স্বচিকিন্দসকগণের চিকিন্দা শেষে দেশে নানা রোগের উৎপত্তি, বিকৃতি ও স্বাধিঘের বৃদ্ধি হইতেছে, সন্দেহ নাই।

২য় হেতু—পেটেট ঔষধ। যেগুলি বিজ-

চিকিৎসক কর্তৃক রোগাধুযায়ী যথাবিধি প্রস্তুত ও বহুপারীক্ষিত, বহুল প্রচারে জ্ঞান নূতন নামকরণে পেণ্টেট করা হইয়াছে। এই গুলি আমার এই পেণ্টেট শব্দের অর্থগত নহে। যেগুলি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, চিকিৎসা-শাস্ত্রে অজ্ঞ, দোকানদারদিগ্ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া বিজ্ঞাপনের জোরে বিক্রীত হইতেছে, যে গুলিতে উপকার অশ্রদ্ধা অথবা কার্য বৈধী হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হতহারে সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই গুলিই প্রাণনাশক বিষ বা পেণ্টেট ঔষধ। এই প্রকার পেণ্টেট ঔষধের প্রবর্তক পূর্ণগণ হৃদয় মফঃস্বলবাসী, সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে প্রলুব্ধ করিবার নামে এবং সাংবাদিক, মানাপ্রচার বা কা-বিনাসে বিজ্ঞাপন-কায়া ব্রহ্মশাসিত করিয়া প্রকাশ করেন যে, এই বিজ্ঞাপনবানি যিনি একবার পড়েন, তিনিই তাহারের বৌলজ্বালে আশ্বস্ত হইয়া পড়েন। বাস্তবিক এক-একটি ঔষধের অসংখ্য গুণবর্ণনা পাঠ করিয়া ও অসংখ্য প্রশংসা পত্র দেখিয়া বিজ্ঞাপনে অবিবাসী, মনবী ব্যক্তিরও মতি টলিয়া যায়। দুঃ-প্রভঞ্জন, হৃৎযোগ্য ব্যক্তিও অস্বস্ত: একবার ঔষধী ব্যবহার করিয়া পেলিবার ইচ্ছা করে। রোগী রোগ-গম্যবান অস্থির। তিনি যে যে প্রতিকার পাইতে চান, বিজ্ঞাপনে সেগুলি আছে। এছাড়া আরো বহু উপকারের বিষয় বিবৃত আছে—যাহা তিনি এই জাতীয় ঔষধের নিকট কল্পনাও করেন নাই। এইরূপ আশাতীত ফলপ্রসূ স্বপ্নীক ব্রূহাৎ কথা পাঠ করিয়া প্রচাৰক—বিজ্ঞ কি অজ্ঞ, মাধু কি চোর, উপকারক কি স্বেহারক, এই সব বিচার করিবার ক্ষমতা অনেক সময় বিচক্ষণেরও থাকে না। তার পর প্রশংসা পত্র গুলিতে তরল বিশ্বাসকে আরও ঘনীভূত করিয়া দেখে, চকল ধারণাকে শীতল করিয়া দেখে। রাজা মহারাজের প্রশংসা পত্র ডাক্তার কর্তব্যের প্রশংসা পত্র, জন্ম শূন্যদের প্রশংসা পত্র, উকীল ব্যক্তিদের প্রশংসা পত্র। এ সব প্রশংসা পত্রের অধিগ্রহণ করিবার কারণ আছে কি ?

এই জাতীয় পেণ্টেট ঔষধগুলির অধিকাংশ ঔষধে কিছুমাত্র উপকার হয় না। কতক-গুলিতে আশু কিকিঙ্গা উপকার হইলেও সেই উপকার হয় কণ্ঠস্থায়ী, না হয় পরিস্রাব বিষয়। ধন্যভক্ত ব্রোণে আন্তরঙ্গ্যের তৈলবির বিজ্ঞাপন দিয়া ৫০ টাকা মূল্যে এক ছটাক ক্লিফাতিডালা তৈল প্রদানে মফঃস্বল বাসীকে ঠকাইতেছে। এই প্রকার একজন পূর্ণগণ বিজ্ঞাপন এখনও একটি প্রধান বালা। সাম্প্রতিক পত্রিকায়া বিরাগ্ধ করিতেছে। এ সব দেশের দুর্ভাগ্য বহি কি?

৩য় হেতু—গাভ্রিবিষয়ে বিচারভাব। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণের সহিত মহাযশস্বীর এবং মহাযশস্বীরের সহিত আধার্য শাক, সূত্রী, মন্ত্র, মাংসাদির পরম্পর নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেইজন্য আর্ধ্য বিশ্বপ শরীর ও শরীরসংযোগ্যেয়ী শ্রব্য সম্বন্ধে সর্বিসেষ আলোচনা করিয়া তথি-ভেদে দিবারাজি-ভেদে ও শ্রব্যের সংযোগ-ভেদে কতকগুলি শ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। এই নিবেশ বিধিগুলি মানিয়া চলিলে আমাদের অনেক উপকার সাধিত হয়। তথি-ভেদে নিবেশ যথা—প্রতিপদ তথিতে চালচলন, ষড়ীয়াতে বৃহতীফল, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষড়ীতে নিমপাতা, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কন্দীশাক, একাদশীতে সিম, দ্বাদশীতে পুষ্কীশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে মাংসকলাই, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে মাংস। এই তথিতে এই যে শ্রব্য তৎক্ষেপে শরীরে নানা প্রকার গ্রানি ও রোগের উৎপত্তি হয়। রক্তাগুণাদি পরিবর্তিত হইয়া স্বাভূতগুলিকে নিভেজ করিয়া ফেলে, সেইজন্য তথি-ভেদে নিবেশ শ্রব্য গুলি পরিবর্তন করা নিতান্ত প্রয়োজন। দিবারাজি-ভেদে নিবেশ যথা—রাজিতে রথি থাকিবে না। রাজ্যাদিত অর্থাৎ বাসি ভাত বাঞ্ছন থাকিবে না। দিবাতে উষ্ণকরা জল রাজিতে এবং রাজিতে উষ্ণকরা জল দিবাতে

ব্যবহার করিবে না। শ্রব্যের সংযোগভেদে নিবেশ যথা—ক্ষীরা, শাণ প্রভৃতি লতাভাত ফল, আমড়া, কামরাঙ্গা, ডেউড়া, শিঠা, অন্ন, লবণ কি কাঁচ শ্রব্য, মন্ত্র, মাংস, অশ্বুরিত ধাতু ততুল প্রভৃতির সহিত ছুই সংযোগ বিবন্ধ অর্থাৎ এই সকল শ্রব্যের সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পূর্বে কি পরে ছুই সেবন করিলে বিষদোষ ঘটিয়া থাকে। সেই প্রকার ছুইয়ের সঙ্গে, দধির সঙ্গে, তক্তের সঙ্গে ও তালের বসের সঙ্গে করা সংযোগ বিবন্ধ। মাংসের সঙ্গে মধু, তিল, শুভ্র, শুভ্র, মাংসকাঠি, মূলা ও মূলা মধ্যস্থ্য বিবন্ধ। সম নারায় মধু ও জল, যুত ও মধু সংযোগ বিবন্ধ। শরৎ ঠৈলে ভাঙ্গা কুন্তর মাংস সংযোগ বিবন্ধ। ইত্যাদি ইত্যাদি এ হাঙ্গা আঙ্গ কালকার যেহেতলে নানা প্রকার ব্যাধিগুণ লোকের হাতে ও সঙ্গে বসিয়া গাধার্য এবং নানাভাতীয় বিবন্ধ শ্রব্য ও অথাত শ্রব্য উল্লিখ করায অনেক নীরোগ হইতেছে। গাভ্রগ্রব্য বিচার পূর্বক যাহার হাতে বাইব কি যাহার সঙ্গে বসিয়া থাইব, তাহার সম্বন্ধে অগ্হসন্ধান করিয়া আহার করিলে অনেক প্রকার সন্ধ্যাকাম ও মারাত্মক রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

৪র্থ হেতু—বিশুদ্ধ গাভ্রগ্রব্যের অভাব। এমন সময় পড়িয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেও অনেক সময়ে ও অনেক স্থানে বিশুদ্ধ গাভ্রগ্রব্য পাওয়া প্রকটন। বাজারের গরিয়াতৈলে—তিল, রাই, গোশাণনা, মুলারামনা, রেডি প্রভৃতি ১১১২ রকম বীজের তৈল মিশানো আছে। বিশুদ্ধ যুত যেমন হুইয়া তেমন হুইয়া। বাজারের হুইয়া—গাশের চর্পি, শূণ্ডের চর্পি, পাঁকা কলা প্রভৃতি জেজালের অন্ত নাই। নারিকেল তৈলে—ফোহাট অয়েল কোরোসিন অয়েল ইত্যাদি মিশাইয়া বিক্রী করে। কোচিনের নারিকেল তৈল তৎক্ষণে হইতেছে কিনে পূর্বেই অশুদ্ধন হইয়াছে। ছুই পচাপ্রসূয়ের, নাগার ও গড়ের জল মিশানো। কোনও

কোনও চতুর গোয়াল জলের ভাগ বেশী মিশাইয়া বাতাসার গুড়া-সংযোগে মিষ্টতা রক্ষা করিয়া থাকে। ময়রা দোকানের মিঠাইতে বিয়ের লাড়ু, বলিলেই হয়। যত বৎসরের বোকান, তৈল হুইয়ের নীচও তত বৎসরের। পুরাতন যুত তৈলের সঙ্গে প্রতদিন নুতন কিছু মিশাইয়া মিঠাই ভাঙ্গা হয়, সেইগুলি অশুদ্ধন থাকে সেইগুলি এই আরিভাও পুনরীকর ফেলিয়া রাখে। এই প্রণালীতে ব্যবহার কাজ চলিতে থাকে। স্বতরাং সাক্ষাৎ বসিয়া ইচ্ছাক্রমণ যুত তৈল দ্বারা প্রস্তুত না করা হইলে তাহা তৈল হুইয়ের ভাঙ্গা জিনিষ পাইবার আশা বিদূষনা মাত্র। এইত সেল তৈল হুইয়ের কথা। বাসি মিঠাইর কাওটা দেখুন। যে মিঠাই গুলি বিক্রয় হইল না, পরদিন নুতন প্রস্তুত করিবার সময় সেইগুলি নুতনের সঙ্গে বন্ধুতা হুইয়ে গাধাই হইয়া অভিন্নদ্রব্য হইয়া গেল। এখন ভাবিয়া দেখুন এই গুলি মিঠাই না বিবেশ লাড়ু। তারপর মাছি বোলাস্তর বিষ্টা, বাস্তার বাসুকারাশি সে সব ত আছেই!

৫য় হেতু—বিশুদ্ধ পানীয় জলের ও জল নিমসরণের বশোস্তের অভাব। পল্লীগায়ে বিশুদ্ধ পানীয়জলের অভাব অভাব। অধিকাংশ গ্রামেই ভাল পানীয়জলের পূর্বকুরি নাই। দুই-একটা কোনও গ্রামে থাকিলেও নিত্য হেলোক অগ্হাধন মান করিয়া গাভ্রগ্রব্য এই জল পানের অগ্হযোগ্য করিয়া রাখা। বাড়ীর পূর্বকুরিতে মান, শৌচকর্ম, প্রস্রাব আর্জনা প্রাণনাশাদি সর্কবিষ কাঁচা করা হইয়া থাকে। এই প্রকার জলে শাযারকা করার সম্ভাবনা কি? পূর্বকালে হিন্দুরা জানিতেন “আপো নারায়ণঃ স্বমঃ।” অর্থাৎ জল সাক্ষাৎ নারায়ণ। ফলে এই প্রকার দুর্ভজনা থাকার জল প্রস্রাব করিতে কি খু ফোহাট খণ্ডপ্রাণ ব্যক্তিগণ প্রাণে বায়া পাইতেন। এখন সেই রামও নাই, আর সেই অগ্হযোগ্যও নাই। এই সকল শাযারকা দেশ হইতে একপ্রকার নির্দীপিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রেলসাপ্তা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জল নিকালেশের বাধা প্রায় সর্বত্রই পড়িয়াছে। তৎপ্রতি গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য অতি অল্প। রাস্তা ও পোল দেওয়া, খাল খনন করা ইত্যাদি সাধারণের হিতকর কার্যের জ্ঞাতব্য বৎসর গবর্ণমেন্ট প্রজ্ঞাপন হইতে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করেন, সেই সকল অর্থের সম্যক সদ্ব্যবহার করা হয় না। কাজেই নিরীহ প্রজার ভাগ্যে স্বথ সম্বন্ধতা উপভোগের হযোগ্য বড় ঘটনা উঠে না। তার উপর স্থানে স্থানে পাট ও শণ ভিজাইয়া জল ও বায়ু দূষিত করাত আছে। এই সমস্ত কারণে ম্যালেরিয়া জর, কলেরা, পেটের অসুখ প্রভৃতি মহতরুপে সর্বত্রই বেশে লাগিয়াই আছে।

৬ষ্ঠ হেতু—কোরোসিন তৈল ব্যবহার। না জানি কি পাণের ফল কি ক্রমে ভয়তবর্ণে কোরোসিন তৈলের প্রথম আন্দানি করা হইয়াছিল। কোরোসিন তৈলের আবির্ভাবে রেডিও তৈল, ভরকরকার (কেজ) তৈল, পিত্তরাজের তৈল, পুরালো তৈল, গর্জন তৈল ইত্যাদির ক্রমে ক্রমে ভিত্তোভাব ঘটয়াছে। কোরোসিন তৈলকে এখন তৈলরাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রক্তা মহারাজের প্রাসাদ হইতে ভিক্টর কর্তৃক প্রস্তুত পদার্থ সর্বত্র কোরোসিন তৈলের অধিকার। নানাভাবে ও নানা আকারে কোরোসিন তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোরোসিন তৈলের আলাতে বায়ুরূপ করে, মাথা ধরে। আর আলোকাত ধূমে গৃহের সমস্ত জব্য মসীনকে ক্রমবর্ধ ধারণ করে। এবং এই ধূম বাসের সঙ্গে দেহদেহায়ে প্রবেশ পূর্বক কাস, বাস, যক্ষ্মা, ক্ষয় প্রভৃতি রোগ-নিচয় জন্মাইয়া শরীর সুস্থত্বেরে টানিয়া লইয়া বাহিতে থাকে। বৈদ্যনিক কোরোসিন তৈলের আলোর নিকট বসিলে, দেহ-শক্তিশূন্য, মন—উৎসাহহীন হইয়া পড়ে এবং রূপগণিক কমিতে থাকে। চিন্মী সামুদ্রিক আলোতে

অপকার অবশ্য অন্ন হইবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে চিন্মী ব্যবহার সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কোরোসিন তৈলে প্রতিবৎসর এই দেশে কত গৃহস্থের গৃহ, কত ব্যবসায়ীর কারখানা ও গুদাম ঘর, কত স্ত্রীয়া ও হুমজিত মোকানরাশি, কত বেহের প্রতীমা পুস্তকভা পুস্তিকা ভস্মসাৎ হইতেছে, কত তাহার সংখ্যা করে। কোরোসিন তৈল এদেশবাসীর স্বাস্থ্যের ও হুমসম্বন্ধতার সম্পূর্ণ অল্পপযোগী। এম হেতু-টিনের ঘরে বাস। টিনের ঘরে বাস অপেক্ষা কারাবাসও বোধ হয় শ্রেয়ঃ। গ্রীষ্মকালের বিগ্রহের টিনের ঘরে যে অসহনীয় মৃদুতা, শিককের বেজাঘাত মজাও ছাড়ের পক্ষে তেমন অসম্ব নহে বলিয়া মনে হয়। উঠানের চতুঃপাশে টিনের ঘর থাকিলে সেই উঠানে বৈশাখ ঋতু মাসের মধ্যস্থ তপনে ঝড়ায় সাধা কার? টিনের ঘরে না শীতকালে স্বথ আছে, না গ্রীষ্মকালে শান্তি আছে। বায়ুর রোগী তটিনের ঘরে গেলে উন্মাদ হইয়া পড়ে। প্রাণ আইটাই করিতে থাকে। পলাইবার জ্ঞা ব্যত হইয়া উঠে। টিনের ঘরে বাস করিলে দ্বন্দ্ব শক্তি ও ধারণাশক্তি হ্রাস পায় এবং মস্তক শূন্য ও গরম বোধ হয়। সর্বদা অশান্তিতে অস্থির উৎপেদগুণ হইয়া উঠে। লোণ উড়ু উড়ু করিতে থাকে। এ হেন টিনের ঘরে বাস করিয়া যোল আনা স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র নহে কি?"

পূর্বোক্ত বস্তুবাট আমরা করিবার ঐশ্বর্য প্রাপ্ত প্রাণ করিবর মহাশয়ের নিকট হইতে গোচর হইয়াছি। তিনি আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার যে সব কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সবগুলিই ঠিক। আমাদের বিবাস দেশে যতদিন দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা না হইবে, যতদিন যথার্থভাবে লোকশিক্ষা প্রচারিত না হইবে, ততদিন আমাদের পক্ষে অপব্যবহার হাত হইতে জাগ পাওয়া কঠিন।

নিম্নোক্তাতির কর্মবীর *

চতুর্থ অধ্যায়

হ্যাম্পটনে জীবন-গঠন

বেথিতে বেথিতে হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে আমার এক বৎসর কাটিয়া গেল। গরমের ছুটি আসিল। সকলেই নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আমি বাড়ী যাই কি করিয়া? হাতে এক পয়সাও নাই। অথচ তখনকার দিনে ছুটির সময়ে স্থল থাকিবারও সুবিধা ছিল না। মহা মৃশ্বেলে পড়িলাম। ওখানে হইতে পড়িতে হইলেও ত কিছু খরচ আবশ্যক।

আমি ইতিমধ্যে একটা পুরাতন জামা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ভাবিলাম এটা বেচিয়া যদি কিছু পাওয়া যায়। আমি অবশ্য কোন লোককে জানিতে দিলাম না যে হাতে পয়সা নাই বলিয়া আমি বাড়ী যাইতে পারিতেছি না। ছেলেরালায় ওরূপ অত্যাচার ও লজা সকলেরই থাকে। আমার কোট বেচিয়ার কারণ এক একজনকে এক একরূপ হুইলায়। একটিনি নিজে বাসক আমার ঘরে জামাটা বেথিতে আসিল। সে ইহার ঐকটী খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল এবং মাম জানিতে চাহিল। আমি বলিলাম, “এ টাকার কমে কি ছাড়া যায়?” সেও বোধ হয় মৃশ্বল—মাম ঐরূপই হইবে। কিন্তু তাহারও অর্থাভাবে। কালবিলম্ব না করিয়া সে অতি নির্লজ্জভাবে বলিয়া ফেলিল—“সেখ বাপু, কাজের কথা বলি, তলি। বিল্লন” ওখানে আমিই বলিয়া কাজ করি জামাটা ত আমি এখনই লইতেছি, এবং নগদ

দশ পয়সা দিতেছি। বাকী দামটা যখন হুইবিয়া হয়, দিব।” বলা বাহুল্য আমি নিতান্তই হতাশ হইয়া পড়িলাম। কোন যত্নে হ্যাম্পটন ছাড়িয়া যাইতে পাইলেই আমি নানাস্থানে কাজ খুঁজিয়া লইতে পারিব বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হ্যাম্পটন হইতে বাহির হওয়াই অসম্ভব। এরিকের ছাত্র, শিক্ষক সকলেই একে একে চলিয়া গেলেন। আমি একাকী রহিলাম। আমার দুঃখের আর সীমা থাকিল না।

শেষ পর্যন্ত একটা হোটেলের চাকরী পাইলাম। কিন্তু বেতন বড় কম। যাহা হউক লেখা পড়ার সময় অনেক পাইতাম। ফলতঃ গরমের ছুটিটায় আমি বেশ ধানিকটা শিখিয়া ফেলিলাম।

গরমের ছুটির সময়ে আমি বিদ্যালয়ের নিকট ৫০/- স্পঞ্জি ছিলাম। ছুটিতে খাটিয়া টাকার পাইলে এই ধার শোধ করিব মনে। কিন্তু ৫০/- কোন মতেই জমা হইল না।

একদিন হোটেলের একটা কামরায় টেবিলের নীচে ৩০/- টাকার একখানা ‘নোট’ কুড়াইয়া পাইলাম। আমি হোটেলের কর্তার নিকট উহা লইয়া গেলাম। ভাবিয়াছিলাম কিছু অশ্রুতঃ পাওয়া যাইবে। কিন্তু তিনি—“সেখ বাপু, কাজের কথা বলি, তলি। বিল্লন” ওখানে আমিই বলিয়া কাজ করি জামাটা ত আমি এখনই লইতেছি, এবং নগদ

বলিয়া তিনি ৩০ টাকার নোট পকেটস্থ করিলেন। আমি কিছু পাইলাম না।

এত কষ্টে পড়িলে হতাশ হইবারই কথা। কিন্তু উহা কাহাকে বলে আমি তাহা জানিই না। জীবনের কোন অবস্থাতেই আমি এখন পর্যন্ত নৈরাশ্র আশ্রয় করি নাই। বনই যে কাজ ধরিয়াছি, আমার বিশ্বাস থাকিত যে আমি তাহাতে কৃতকার্য হইবই। হুতরাং বাহারা বিফলতার আলোচনা করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন দিনই মতে মিলে না। কৃতকার্য কি উপায়ে হওয়া যায় একথা যিনি বুঝাইতে পারেন আমি তাহাই ভক্ত। বিফলতা কেন হয়—একথা যিনি বুঝাইতে আসেন আমি তাঁহার কাছে যেমি না।

ছুটির শেষে বিভাগে গেলাম। কর্তৃপক্ষকে বলিলাম—“দার শোধ করিবার ক্ষমতা এখনও আমার হয় নাই—বুকে প্রবেশ করিতে পারি কি?” বাজাঝি ছিলেন সেনাপতি মার্গাল। তিনি সাহস দিয়া বলিলেন, “তোমাকে এ বৎসর ভক্তি করিয়া লইলাম। তুমি একদিন না একদিন আমাদের ধ্বংস শোধ করিতে পারিবে—আমার বিশ্বাস আছে।” দ্বিতীয় বৎসরও পূর্বের ভ্রাম্য আমি গান্ধামা-গিরি করিতে গিলাম। এখানে লেখাপড়া নিষিদ্ধ থাকিল।

হাস্পটন-বিভাগে বই পড়ানও হইত বটে, কিন্তু পুস্তক পাঠ আপেক্ষা অস্ত্রাঙ্গ অঙ্গুণ্য উপায়েই আমি ওখানে বেশী শিক্ষা লাভ করিয়াছি। দ্বিতীয় বৎসরে আমি শিক্ষকগণের স্বার্থভাঙ্গ ও চরিত্রব্যাধি দেখিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। তাঁহারা নিজের কথা না ভাবিয়া কেবল মাত্র পরের কথাই ভাবিতেন। তাঁহাদের জাতিসম্মাদা

ছিল, বংশগৌরব ছিল, বিদ্যার সম্মান ছিল; সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজের আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট করিতে পারিতেন—সমসারে নৃতন নৃতন ঘশোলাভের সুযোগও তাঁহাদের মক ছিল না। কিন্তু তাঁহারা সে সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না—আমাদের অবনত কৃষ্ণকায় সমাজকে বিদ্যা, ধন ও ধর্ম উন্নত করিবার জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কর্ণেই তাঁহাদের একমাত্র স্বপ্ন ছিল। দ্বিতীয় বৎসরের বসবার ফলে আমি শিখিলাম যে পরোপকারী ব্যক্তিই একমাত্র সুখী। বাহারা অন্ত লোককে নানা উপায়ে সুখী ও কুখী করিয়া তুলিতেছেন তাঁহাদের আপেক্ষা সুখী লোক সমসারে আর নাই। এই শিক্ষা আমার জীবনে কখনও নষ্ট হইবে না।

হাস্পটন আমি পশুপক্ষী জীবজন্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব ভাল বকম জান লাভ করি। এখানকার কৃষিবিভাগের জ্ঞান অতি উত্তম জাতির পশুপক্ষী আমদানি করা হইত। ঐ গ্রন্থিক পালন করিবার ব্যবস্থাও অতি উন্নত ধরনের ছিল। এই সকল কাজে আমার অভ্যস্ত হইতাম—তাহায়ে কৃষিকর্ম, পশুপালন, জীব-বিদ্যা, প্রাণি-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কায়দারী শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে আজ পর্যন্ত আমি জীবজন্তুর ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে মর্মণ ছেলে বেলা হইতে ভাল ভাল জানোয়ার এবং তাহাদের গতিবিধি অভ্যাস স্বভাব, খাওয়ান্য, রোগ ঔষধ ইত্যাদি দেখিবার সুযোগ পাইলে প্রত্যেক লোকই ভবিষ্যতে পাকা ওস্তাদ হইয়া উঠিতে পারে।

দ্বিতীয় বৎসরের সর্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষা হইয়াছিল—বাইবেল গানের উপকারিতা।

কেবল ধর্মগ্রন্থ হিন্দুই নহে, উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিমাংকও বাইবেল বিশেষরূপেই পাঠ করা উচিত—এই দাবী অগ্নিয়াছিল। ফলতঃ, আজকালকারে খুব ভিত্তি থাকিলেও আমি হুই এক অধ্যায় বাইবেল না পড়িয়া দিন যাইতে দিই না।

বাইবেলের উপকারিতা আমি দুয়ারী লেটের শিক্ষকতায় বৃষ্টিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট আমি আর এক কারণেও গুণী। আজ কাল আমি বক্তৃতা করিতে মন্য পারি না—এমন কি, সাহিত্যক্ষেত্রে আমি বাধী বলিয়াই ব্যাত। এই বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা আমাকে দুয়ারী লর্ডই শিখাইয়া-ছিলেন। খাগ প্রবাদের নিয়ম, উচ্চারণ করিবার রীতি, জোর দিবার ভবী, মন্য লইবার কায়া, ইত্যাদি বক্তৃতা করিবার আনুযায়িক বিষয়গুলি আমি তাঁহার নিকট শিখিয়াছিলাম। এইগুলি শিবিবার জ্ঞান আমি ইহার নিকট বিভাগের অবকাশকালে একাধি উপদেশ লইতাম।

আমি অবশ্য বক্তৃতা ও বাচালতার একেবারেই পক্ষপাতী নহি। কেবল গুণবিত্ত বা বাক্যদ্বন্দ্ব প্রকার মারপাড় বোকাইবার জ্ঞান আমার অভ্যাস করি নাই—এবং কখনও বক্তৃতা দিই নাই। ছেলেরা হইতে আমি পরোপকার কর্ণে ব্রতী হইব স্থির করিয়াছিলাম। জগতের বিভাজাগর ও কর্ণ-কেজগুলিকে পুট করিবার জন্য আমার বাক্যজ্ঞা গাঢ়িয়াছিল। আমি ভাবিতাম, যদি কোন উপায়ে সমসার উপকার করিতে পারি তাহা হইলে সে সম্বন্ধে লোকজনকে বুঝানও আবশ্যক হইবে। আমি বুঝিয়াছিলাম—একটা কোন অস্থান আরম্ভ করিয়া তাহা সফল করিতে পারিলে

লোকসমাজে তাহার প্রচারের জগুও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বুঝিয়া সদৃষ্টাভের প্রচার, সংকর্ষের বিস্তার এবং সম্ভবের প্রসার ইত্যাদি উদ্দেশ্যেই আমি বাগিচার শিক্ষা লইতেছিলাম—কাঁকা আওয়াজ করিয়া বাহবা লইবার জ্ঞান নহে। আমার মতে “কায়া আগে করিব—তাহার পরে তাহা জগৎকে জানাইব”—এই আদর্শেই বাগিচাগণের জীবন গঠন করা কর্তব্য।

হাস্পটন-বিভাগে অনেকগুলি ভিবেট স্রাব বা আলোচনা-সমিতি ছিল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে তাহারের অধিবেশন হইত। এই অধিবেশনগুলির একটাও কখন বাদ দিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। একিকে এত কোঁক ছিল যে আমি এইগুলির অতিরিক্ত একটা নৃতন সমিতিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। আমাদের বাওয়া শেষ হইবার পর পড়া আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রায় ২০ মিনিট আমি ইহার নিকট বিভাগের অবকাশকালে একাধি উপদেশ লইতাম।

দ্বিতীয় বৎসরের গ্রীষ্মাবকাশ আসিল। এবার আমার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। আমার মাতা ও লাভা কিছু টাকা পাঠাইয়া-ছিলেন, একজন শিক্ষকও কিছু দান করিয়াছিলেন। আমি ‘বদশে’ চলিলাম। ওয়েট ভাঙ্কিনিয়ার মাসুলে কোন এবার ছুটি কাটি।

বাড়ীতে আসিয়াই দেখি, হুনের কল বন্ধ, কয়লার খালে কাজ চলিতেছে না, কুলীরা সব ‘ধর্মঘট’ করিয়াছে। এই ধর্মঘটের একটা রহজ বলিতেছি। প্রায়ই দশভিষ্য, যখন

কুলী মহলের পরিবারে পরিবারে দুই তিন মাসের উপযুক্ত খরচের টাকা জমা হয়। যিহাচ্ছে তখনই তাহার কাজ কর্তৃক ছাড়িয়া গৃহানন্দনপক্ষে বিস্তৃত করিত। যখনই বলিয়া বাইতে বাইতে টাকা ফুরাইয়া আসিত তখনই আবার তাহার দলে দলে কাজে চুক্তিত। এইরূপে অনেক যথেষ্ট দেনাও করিয়া ফেলিত। তখন আর তাহার তাহাদের পুরাতন অভাব অভিযোগ ইত্যাদির কথা চুপ্তিহইত না—কোন উপায়ে একটা কাজ পাইলেই খুশী থাকিত। মোটের উপরে দেখিতাম, যে ধর্মঘটের ফলে কুলীদের সর্বনাশেই ক্ষতি হইত। অনেক সময়ে কল ও ধানের কর্তা তাহারিগকে পুরায় কাজ দিতে অস্বীকার করিতেন। তখন তাহার যথেষ্ট ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অস্ত্র চলিয়া দাইতে বাধ্য হইত। আমার যতদূর বিবাস, কতকগুলি হজুগপ্রিয় পাণ্ডুরিগের পাশায় পড়িয়া কুলীরা নিজেদের সর্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিত। ধর্মঘটের আমি আর কোন ব্যাখ্যা তাই পাই না।

আমাকে দেখিয়া আমার পরিবারের সকলেই অবশ্য মহা খুশী। তাহার পর আমার নিমন্ত্রণের পালা পড়িল। পাচার প্রত্যেকেই আমাকে তাহাদের বাড়ীতে এক এক দিন খাইতে বলিত। আমি তাহারিগকে হাশ্পটনের গল্প করিতাম। তাহা ছাড়া আমাকে ধর্মঘটের রবিবারের বিভাগে এবং আরও কয়েক স্থানে বক্তৃতা করিতেও হইয়াছিল। দিন মন্ম কাটতেছিল না—কিন্তু ধর্মঘটের ফলে আমার স্বগ্রামে কাজ জটিল না। তাহা হইলে পুরায় হাশ্পটনে যাব কি করিয়া? একদিন অনেক দূর পথান্ত চলিয়া গেলাম তথাপি কাজ পাইলাম

না। কিরিতে বেশী রাজি হইয়া পড়ে—রাত্তর একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে শুইয়া থাকিলাম। শেষে দেখি গের রাজি তিনটার সময় আমার দাদা আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঐ 'পোড়ে' বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আমাকে ধর্মঘটের বিলেন যে, রাজে মাতার মৃত্যু হইয়াছে।

মাতার মৃত্যুতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তিনি বহু কাল হইতেই দুঃখিতেছিলেন জানিতাম—কিন্তু হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইবে ভাবিতে পারি নাই। আমার সাথ ছিল—অন্তিমকালে আমি তাহার সেবা করিব। কিন্তু সে সৌভাগ্যে আমি বঞ্চিত হইলাম। তাহার উৎসাহে ও সাহসেই আমি লেগাপড়া শিথিতে পারিয়াছি। তাহার আশা আমার জীবনে একমাত্র হৃৎথের কারণ হইল। ইহার পূর্বে আমি কখনও যথার্থ দুঃখ অনুভব করি নাই। তাহার পরেও আমি কখন অত্যাঁজ হৃৎথকে দুঃখ জানি করি নাই।

মাতার মৃত্যুর পর আমাদের গৃহস্থালী বিশৃঙ্খলতা পূর্ণ হইয়া গেল। ভদ্রীট ছোট—সে সকল দিক দুর্ঘটনা উদ্ভিষ্টে পারিত না। আমাদের কোন দিন খাওয়া জুটিত কোন দিন জুটিত না। তাহার উপর আবার আমার চাকরী নাই। এই হৃৎথের দিনে রাক্ফার পত্রী আমাকে একটা কাজ দিলেন। তাহাতে কিছু পয়সা হইল। তাহার দ্বারা হাশ্পটনের পথ খরচের ব্যবস্থা হইয়া গেল। ইতিমধ্যে আমার দাদা একআধটা জামা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন।

মূল খুলিতে আরও তিন সপ্তাহ বাকী। এমন সময়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী, কুমারী মাকি আমাকে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, আমাকে

সপ্তাহ মধ্যেই কিরিতে হইবে, এবং কিরিয়া বাড়ীঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। এই পত্র পাইয়া আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। কারণ ইহাতে যে বেতন পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা মূলের খরচ অগ্রিম কিছু দেওয়া হইয়া থাকিবে। আমি দেবী না করিয়া হাশ্পটনে রওনা হইলাম।

পৌছিয়াই দেখি ইয়াক্রি রমণী নিজেই দরজা জানালা বেক টেবিল ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার কাজ কর্তৃক দেখিয়া আমি দুইটি শিক্ষা লাভ করিলাম। প্রথমতঃ স্ত্রী সন্তান বংশীয়া এবং উচ্চ শিক্ষিত রমণীরাও দাসদাসীর ভায়ে শারীরিক পরিশ্রম করিতে সক্ষম নহেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ হওয়া যুগের কথা নয়। তাহার জ্ঞান দায়িত্ব যথেষ্ট। কুমারী মাকির দায়িত্ব জ্ঞান খুব বেশী ছিল। তিনি জানিতেন যে, ছুটির পর মূল খুলিবার সময়ে কোন বিষয়ে শৃঙ্খলা না থাকিলে তিনিই নির্মিত হইবেন। হস্তরাজ তিনি সমস্ত ছুটিটি নিশ্চিতভাবে ভোগ করিতে পারেন না। অত্যাঁজ সকলে আসিয়া নৌদিবার পূর্বে সকল ব্যবস্থা তাহাকেই করিয়া রাখিতে হইবে। কর্তার কৃতি তিনি বেশ ভালরকম বুঝিয়াছিলেন।

তখন হইতে আমি নেতার কর্তব্য এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। দায়িত্ববোধীনি পরিচালককে আমি কোন সম্মান করি না। তাহা ছাড়া, যে বিভাগে হারিগকে শারীরিক পরিশ্রম শিক্ষা দেওয়া হয় না আমি তাহার প্রশংসা করিতে পারি না। ধনবান নির্ধন, উচ্চ, নীচ—সকলেরই হাতে পায়ে খাটিকা কাজ করিতে শিক্ষা করা প্রত্যেক বিভাগেই শারীরিক

পরিশ্রম অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা থাক। আবশ্যক। মাকির দৃষ্টান্তে আমার এই ধারণা বন্ধমূল হইয়াছিল।

হাশ্পটনে এবার আমার শেষ বৎসর। খুব বেশী খাটিয়া লেখা পড়া করিতে হইল। আমি 'অনার'-পাশ করিলাম। এই পাশ বেশী গৌরববৃদ্ধি বিবেচিত হইত। ১৮৭৫ মালের জুন মাসে—অর্থাৎ প্রায় ১৮১৭ বৎসর বয়সে আমি 'হাশ্পটন-বিভাগের শিক্ষা সমাপ্ত করিলাম। আমার এই তিন বৎসরের শিক্ষার ফল নিয়ে বিবৃত করিতেছি :—

(১) প্রথমতঃ, আমি একজন প্রকৃত মাহুঘের মত মাহুঘের দর্শন পাইয়া তাহার প্রভাবে জীবন গঠন করিতে শিখিয়াছি। তাহার নাম সেনাপতি 'আল্ট্রার'। আমি পুনরায় বলিতেছি 'তিনি আমার জিন্দারাজের 'একমেবাদ্বিতীয়ম' মহাবীর। তাহার দ্বায় মাহুপুরুষ আর আমি দেখি নাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ, আমি বিভাগভেদে উদ্বেগ সম্বন্ধে নতুন ধারণা অর্জন করিলাম। লোকে লেগাপড়া শিখে কেন? পূর্বে নিগ্রোমালভের মাঠার লোকজনের কথাবার্তা ও চালচলন দেখিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শারীরিক পরিশ্রম হইতে মুক্তি পাইবার জন্তই বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে হয়। এবং লেগাপড়া শিখিয়া মাহুঘ বেশ স্বল্পে স্বল্পে বাণুগিরি করিয়া কাল কাটাইতে পারে। হাশ্পটনে আমার রিযাজান লাভ হইল। তখনকার আব-হাওয়াতে হাতে হাতে কাজ করা, খাটিকা খাওয়া, শারীরিক পরিশ্রম করা ইত্যাদি কার্য প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের স্বাভাবিক ধর্মের মধ্যেই পরিগণিত হইত। শিক্ষা মাহুঘ কাহাকে বলে সেই বিভাগের চতুঃসীমার মধ্যে জানিতে পারিতাম না।

ছাত্র, শিক্ষক সকলেই পরিশ্রম করিতে ভাল বাসিতেন এবং পরিশ্রমীলোককে সম্মান করিতেন। পরিশ্রম না করাইয়া দেখানো একটা নিন্দনীয় ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিল এবং অশিক্ষিত লোকের লক্ষণ বিবেচিত হইত। কাজকর্ম করিলে পয়সা পাওয়া যায়, আরের ব্যবস্থা হয়, আর্থিক নৈশ্র্য ঘুচে, সংসার পালন নিরুপায়ে করা যায়। এ সকল কথা আমাদের ওখানে সকলেই বুঝিত। এই বুদ্ধিযা আমাদের খাতিয়াম—সম্ভেদ নাই। কেবল তাহাই নহে, আমরা স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার হইবার জন্যই এখানে নিজে খাতিয়ামে শিখিতাম। কোন বিষয়ে পরের স্বাধীন থাকিব না, নিজেকে সকল অভাব নিজেকে মোচন করিয়া লইব—এই আদর্শই আমাদের শাস্ত্রিক পরিশ্রমকে আদর করিতে শিখিয়াছিল। ফলতঃ খাতিয়াম খাওয়া এবং শিক্ষালাভে কোন বিরোধ নাই—এই জ্ঞান আমার হৃদয়ে বহুদূর হইয়া গেল।

(৩) তৃতীয়তঃ স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারের শিক্ষা আমি হ্যাম্পটনেই প্রথম পাই। ওখানেই শিশি, বাঁহারা নিজ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন সংসারে একমাত্র তাঁহারা হইল। পরোপকার ও লোকসেবা করিতে পারাই মানব জীবনের একমাত্র স্বার্থ।

আমি হ্যাম্পটনের গ্রান্ডফেট হইলাম সার্টফিকেটও পাইলাম। ইতিমধ্যে পয়সা দুইহায়া আনিয়াছে। কলেজিকট প্রদেশের একটা হোটেলে চাকরী সংগ্রহ করিলাম। একতনের নিকট কিছু দাঁরা করিয়া পথ ধরনের ব্যবস্থা করা গেল। যথা সময়ে সেই চাকরী স্থলে উপস্থিত হইলাম।

আমার বিজ্ঞা বুদ্ধি দেখিয়া হোটেলের কর্তা আমাকে পরিবেষণের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু ও বিষয়ে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। কয়েক জন বড়লোক টেবিলে বসিতে বসিয়াছেন। আমি পরিবেষণের নিয়ম জ্ঞান না দেখিয়া তাঁহারা আমাকে মারিত উত্তর দেন। আমি ভয়ে কাজ ছাড়িয়া দিলাম। তাঁহারা পাছদ্বারা আর পাইলেন না। এই ঘটনার পর আমাকে নিজে শ্রেণীর খাদ্যামার কাজ করিতে হইল। পরে পরিবেষণের কাজ শিখিয়া লইলাম। আবার সেই উক্ত পদে উন্নীত হইয়াছিলাম। যে হোটেলে আমি এই সময়ে খাদ্যমাগিরি করিতেছিলাম, এই হোটেলেই আমি ভবিষ্যতে পয়সা খরচ করিয়া অতিথিভাবে বাস করিয়া গিয়াছি। সংসারে এইরূপ পরিবর্তন অসংখ্য ঘটতেছে।

হোটেলের কাজ ছাড়িয়া আমার বদল ম্যাগডেননগরে ফিরিয়া গেলাম। তখন হইতে আমি আমাদের সেই নিগ্ৰো-বিজ্ঞা লয়ের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। আমার হৃদয়ের দিন আরম্ভ হইল—কারণ এতদিন আমি নিগ্ৰোজাতিকর জন্য কর্ম করিতে উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছি। এতদিন পরে আমার পরীক্ষাদিগকে উন্নত করিবার সুযোগ পাইলাম।

প্রথম হইতেই বুদ্ধিলাম যে নিগ্ৰোসমাজে কেবল পুণ্ডিত বিজ্ঞা প্রচার করিলে আমাদের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। কতকগুলি পুস্তক পড়িতে শিখিলেই নিগ্ৰোরা মায়া হইবে না। তাহাদের সমস্ত জীবনটা নুতন ভাবে গঠন করা আবশ্যক। আমি সকাল ৮ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্যন্ত বাটতে লাগিলাম। স্থলে পড়ান ছাড়া

পল্লী ভ্রমণ এবং গ্রাম, পরিদর্শন আমার কাজের মধ্যে ছিল। আমি ছাত্রদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইতাম। তাহাদিগকে চুল পরিষ্কার রাখিতে শিখাইতাম, দাঁত মার্জিত বলিতাম। তাহারা রান করিতে, পোষাক দুইতে এবং অজ্ঞান নানা কাজ করিতেও উপদেশ পাইত। নিজ হাতে তাহাদের অনেক কাজ করিয়া দিতাম। এই সকল কাজের উপকারিতাও বুঝাইয়া দিতাম। নিগ্ৰো-পল্লীতে এই উপায়ে স্বাস্থ্য-রক্ষার এবং শরীর পালনের সরল উপায় গুলি সহজেই প্রচারিত হইতে লাগিল। গ্রাম করা ও দাঁত মাজার প্রয়োজনীয়তা স্বচ্ছন্দে আমি সর্বত্রই বক্তৃতা করিতাম। যে দিন হইতে নিগ্ৰোরা দাঁত মাজা আরম্ভ করিল সেই দিন হইতে তাহারা যথার্থ সভ্যতার প্রথম স্তরে পদাধি করিল বলিতে পারি।

গ্রামের অনেক লোকেই স্ত্রী-পুরুষ সবেই লেখা পড়া শিখিতে চাহিল। কিন্তু তাহারা দিবা ভাগে খাতিয়াম অর্থ সংস্থান করে। কাজেই তাহাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খুলিলাম। প্রথম হইতেই নৈশ বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী হইত। ৫-৬ বৎসরের বেশী বয়স পুরুষ ও স্ত্রীলোক দ্বিগুণ শিখিবার অধ্যবসায় দেখিয়া আশ্চর্য হইতাম।

পল্লীসেবার অজ্ঞান অস্থানও আমি এই স্তরে আরম্ভ করিলাম। গ্রামের মধ্যে একটা গ্রন্থাগার এবং একটা আলোচনা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলাম। রবিবারের জন্য কয়েকটা নুতন কাজ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া দিলাম। ম্যাগডেননগরে একটা রবিবারের বিদ্যালয় ছিল—এবং এখানে হইতে তিন মাইল দূরে আর একটা রবিবারের বিদ্যালয়

ছিল। প্রতি রবিবারে এই দুইটি স্থলেই আমি পড়াহিতাম। এতদ্ব্যতীত, আমি কয়েক জন যুবকে ঘরে পড়াইয়া হ্যাম্পটনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। এই সকল কার্যের জন্য আমি অবশ্য বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে সামান্য কিছু বেতন পাইতাম। কিন্তু বেতনের লোভেই আমি ম্যাগডেননগরে গিয়াছিলাম। নিগ্ৰো সমাজের উন্নতির জন্য আমার আত্মিক ব্যাঘাতই আমার এই কর্মত্যাগের কারণ ছিল।

আমি যত দিন লেখা পড়া শিখিতেছিলাম। ততদিন আমার দাদা 'জন' আমাদের রবিবারের খরচ চালাইবার জন্য কলার খাদ্যে কাজ করিতেছেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্যও পাইয়াছি। আমার শিক্ষা লাভের জন্য তিনি নিজের বিদ্যালয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাজেই আমি হ্যাম্পটনে পাঠাইতে রুতসম্মত হইলাম। তিন বৎসরে তিনিও হ্যাম্পটনের বিদ্যা শেষ করিয়া আসিলেন। পরে তিনি আমার টাঙ্কেন্স বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তা হইয়াছেন। জন যখন হ্যাম্পটনে হইতে আসিলেন তখন আমরা দুই জনে মিলিয়া আমাদের পোষ্য ভাই জেমসকে হ্যাম্পটনে পাঠাইয়াছিলাম। জেমসও লেখা পড়া শিখিয়া আমার টাঙ্কেন্স বিদ্যালয়ের ডাক খরের কর্তা হইয়াছে;

১৮৬৮, ১৮৭৭ সাল ম্যাগডেননগরে একরূপেই কাটিল। স্থল-পড়ান, পল্লীপরিবেষণ, লোক-শিক্ষা, ইত্যাদি মানবিক কাজে আমার সময় ব্যয় হইত। প্রায় এই সময়ে আমেরিকার তেতাশ মহলে কএকটা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা নিগ্ৰোজাতিকর রাষ্ট্র

অধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবার জন্য বন্ধপরিকর হইল। এই সমিতিগুলির নাম ছিল “কু-কুন্স”। গোলামীর যুগে এইরূপ কতকগুলি খেতাব সমিতি ছিল। তাহারা রাবিকালে নিগ্ৰো-দিগের মহলে মহলে ঘুরিয়া পাহারা দিত। নিগ্ৰোরা কোন গুপ্ত পরামর্শ প্রস্তুত করিতেছে কি না ইহারা তাহার সন্ধান রাখিত। তাহাদের দ্বার এই “কু-কুন্স” সমিতিগুলিও রাবিকালে আমাদের উপর ভীতকৃষ্টিভের কাজ করিত। তাহারা আমাদের কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় উন্নতির বিরোধী ছিল তাহা নহে। তাহাদের দৌরাণ্ডো আমাদের ধর্মমন্দির, বিদ্যালয়মন্দিরও টিকিতে পারিত না। তাহারা আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠানগুহ পুড়াইয়া দিয়াছিল। আমাদের কোন কণ্ঠ-কেজই ইহাদের আমলে নিরাপদ

ছিল না। বহু নিগ্ৰোর জীবনও নষ্ট হইয়াছিল। এই যুগে ম্যালডেনে একবার একটা ছোট পাট লড়াই বাড়িয়া যায়। সাধা চামড়া এবং কাল চামড়া উভয় পক্ষের লোক সর্বসমেত প্রায় ২০০।২৫০ মিলিয়া মহা দাঙ্গা বাধাইয়া দিল। অনেক ভাল ভাল লোক আহত হইয়া পড়েন। আমাদের পূর্বদত্ত নবিন জেনারেল রাব্বনার নিগ্ৰোগণের পক্ষ লইয়া প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিলেন। এজ্ঞাত খেতাব কু-কুন্স সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাকে এমন জখম করিয়া দিয়াছিল যে ত্রিশ আর সারিখা উঠিলেন না। নিগ্ৰোমাল্যাজের জ্ঞাত এই মহত্বয় খেতাব পুঙ্খের প্রাণ গেল।

কু-কুন্সদিগের যুগ চলিয়া গিয়াছে। আর দক্ষিণ প্রান্তের খেতাব এবং কুলাঙ্গ সমাজে সন্ধ্যা বাড়িয়াছে।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার।

রবীন্দ্রনাথের ছুঃখবাদ

অধ্যাস-বিদ্যা ও প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান প্রমাণের দ্বারা ও বিচারের প্রণালী যতই বিভিন্ন থাকুক, উভয় বিদ্যাই সত্যের অর্থও প্রতীতি ক্রমিতে সম্মিলিত হইবে। উভয়বিধ তত্ত্বের দ্বারা চরম প্রমাণ, নিখিল তত্ত্বেরও তাহা চরম প্রমাণ। সেই প্রমাণ—মানব-চিত্তের প্রতীতি ও সম্মতি। আমাদের এই “প্রথম পুঙ্খ” বতঞ্চন না “হা” বলিবেন, ততক্ষণ বিজ্ঞান-মন্দিরের সত্য পরীক্ষা করা, এবং ধর্ম-মন্দিরের সত্য “অচল্যবস্তন”—তাহা সাক্ষ্যেই হউক কিম্বা নিরাক্ষ্যেই হউক।

দেখা যায় জড়-বৈজ্ঞানিকগণ জগতের বিরাট প্রাকৃতিক সত্যকে খণ্ডিত ও বিলুপ্ত করিয়া একই অশেষের একা প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছেন। চক্ষু যাহাকে গোচরের আনিতে অক্ষম, ইন্দ্রিয় যাহাকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ, পরীক্ষায় তাহার মানদ-প্রতিপাদ্য বস্তু সিদ্ধ হইতেছে। স্থলের অন্তরালে যে মহৎ বস্তু ছিল বিজ্ঞান তাহাই এক স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রমাণিত করিতেছে। ধর্মশাস্ত্র-বিশেষে আছে এই জগৎ ঈশ্বর-অন্তর্যায় উৎপন্ন হইয়াছিল। বিজ্ঞান বলেন সে ঐশ্বর-বচন শুধু আদেশ ও অন্তর্যায়-বচন নহে—

সে মহাব্যবীতে বিচার, মীমাংসা ও সামগ্রিকের হৃৎপিণ্ড শূন্য ছিল—এবং তাহাতে যে উচ্চ অমোঘ নিয়ম ছিল তাহারই প্রভাবে তাহার প্রত্যেক একক দ্বিতীয় একককৃষ্ণ হইয়া যোগ ফল হই উৎপন্ন করিয়াছিল। এবং ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত তাহার সেই নিয়মের ও শৃঙ্খলার কুজাপি কোন খলন ও ব্যাঘাত ঘটে নাই।

তথাপি পরীক্ষা-ও বিজ্ঞান-মন্দিরের বাহিরে এমন অনেক “Things” ছিল যাহা বৈজ্ঞানিকের “Philosophy”-তে স্বপ্ন-ভূতও হয় নাই। যাহারা ইচ্ছা করিয়া জগদানন্দত্ব দৃষ্টিকে বর্জ্য করিয়া রাখেন তাহারা ই তাহা অস্বীকার করিবেন।

বাউর সাহিয়াছিলেন—জ্যোতিষমণ্ডল ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেছে, নীল বাগের ডান করিয়া বলিয়াছেন—জ্যোতিষমণ্ডল নিউটনের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। মৌলের ব্যাক্যও নিরর্থক নহে। অবৈজ্ঞানিক যুগ জ্যোতিষমণ্ডলের মহিমার কতকুই বা দেখিতে পাইয়াছিল; আজ যে আমরা দেখিতে পাইতেছি অনন্যেকাটা অধাও, মহত্বের কল্পনা হইতে শরাদ্দ যোজন উঠে, অঘঙ্করিত অবিচ্ছেয় গৌরবে—দিক্‌হারা অনন্তের মধ্যে ঘুরিয়া চলিয়াছে—আমাদের এই দর্শনের মাধ্যাকর্ষণ মন্ত্র,—এবং নিউটন স্তম্ভি।

কিন্তু “লীডেন জারের” ভাঙের বাহিরে বস্তুর যে কোন অপর ঐশ্বর্য ছিল না কিম্বা নাই—ইহাও বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে। বিজ্ঞাতের এমন এক সত্য অস্তিত্ব নিশ্চিত ভাবে বিজ্ঞান—রহিয়াছে—যাহা পরীক্ষাগারের বিদ্যায়-মান বস্তু কখনই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সে সত্যই অস্তিত্ব অন্তর্যায় উপলব্ধি হইবে।

তাহার পরিমাণ-মাত্র কবির ছন্দে এবং কবির মনের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইহাতে বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক কাহারও আক্ষেপের কারণ নাই—ভগবানের ইহাই বিধান—আমরা হাজার ইচ্ছা করিলেও আমাদের মাসিরা মায়া হইবে না।

বস্তুতই এই জরা-জর্জ দুলি-পিঙ্গল পৃথিবী অতি অকিঞ্চিৎকর মৃত্যুর জড়পিণ্ডই থাকিয়া যাইত যদি মহাপুরুষগণ ইহাতে অবতীর্ণ হইয়া না বলিয়া দিতেন যে আমাদের এই উদ্ভটত চারভুক্তি-কথবৎসরের পাশ্চাৎপাশ্চাৎ ভিতরে এবং বাহিরে অনেক প্রকার মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি জাগ্রত থাকিয়া মহা মহত্তম সত্যতা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম কীটগু পৃথগ্ধকে আগ্রত ও পরিচালিত করিতেছে। এবং কণ্ঠবিরে চান্দ্র্য জ্ঞানের অসম্ভাব্য হেতু যদি আশ্চর্য্যবাক্য এবং কবিবচন অসিদ্ধ ও নিফল হইয়া যাইত তবে মানবের সহজাত দুর্দশা কি ছুরগাধা পাথারের মধ্যে সলংগণ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িত।

সৌন্দর্য্য আপনার মৌনবিধুর মাধুর্য্যভার লইয়া বহুকাল যাবৎ লোকচক্ষুকে প্রাণীভূত করিয়াছিল। অবৈজ্ঞানিক যুগ বহুকাল যাবৎ আপনার অঙ্কুরাভারে চরাচরকে পীড়ন করিয়াছিল। নিউটনাদি মনীষিবর্গের পুণ্ডর্য্যায়—মানবের চিরন্তন জিজ্ঞাসানল—যাহা কিম্ব কিম্ব শব্দে বহুকাল ধরিয়া বিফলে বোধন করিয়াছিল—তাহা এক পরমা শান্তিলাভ করিয়াছিল। সেইরূপ কোন এক কল্যাণের অজ্ঞাত শুভদিনে কবি অজ্ঞাত তমসাতীতবে পাহিয়া উঠিয়াছিলেন—তাহাতেই বিধি-সৌন্দর্য্যের যুগান্ত-পরিপূর্ণ ফল-পুট ফাটিয়া গিয়া অপূর্ণ রস-ধারায় জগৎ অভিযুক্ত হইয়াছিল। সৌন্দর্য্যের

পক্ষেও এক মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম ছিল—কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিবার কোন বস্তু ছিল—কবি জগতের সেই বস্তু।

ইহা হইতেও এক শুভতর তথ্যিতে কবি নিখিলের মহাপ্রাণের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন ‘ওম—এম—ইম’। তাঁহার সেই মহামন্ত্রে মানব গণ্ডস্থ পরিহার করিয়া অভিনব নূতন জন্মে দীক্ষালাভ করিল।

কিন্তু হায়! এই “ও” এবং “এম”—বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গোপাধি বৃহৎ সত্য হইতে বৃহত্তর হইলেও, কি অপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক ধারায়ই জগতের পরবর্ত্তিগুণসকলের মধ্যে প্রতিপন্ন হইতে চলিলেন। অস্বাভাবিক পরিত্যক্ত সেই অনন্ত আলোক—ছায়াবৃত সেই অপরিণীম জ্যোতিঃ—তেরিপ্রসেকোটি বিগ্রহেও প্রকটিত হইল না—অথচ কোন দেবতাতোই তিনি অপ্রকাশমান রাখিলেন না। বিরুদ্ধতাবের কোলাহলের মধ্যে তাঁহার অপর চরম সঙ্গতি একাতনে মুক্তি হইতে লাগিল এবং সমস্ত স্বরূপতার অন্তরে অন্তরে তাঁহার বিরাট অরূপতার সাক্ষ্য রহিল। সমস্ত “নেতি”র মধ্যে তাঁহার ইতিভিন্ন বিরাজমান থাকিল। এইরূপে মহাকবি সিন্ধুরে ভগবানের সিংহাসন মেঘের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল—এবং রবীন্দ্রনাথের “রাজা” নাটকের আশ্চর্য অঙ্ককারেই রহিলেন। এমন কি শ্রুতি এ রাষ্ট্রেশ্বরের পরিচয় স্থলে কদাচিৎ বলিয়াছেন যিনি তাঁহাকে জানিতে চাহিলেন তিনি জানিতে পাইলেন না এবং যিনি জানিতে পাইলেন তিনি জানিতে চাহিলেন না—

অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞন্যথা বিজ্ঞাতম বিজ্ঞনতাম।

চিহ্নিত নহে যে হেন এমঃ দার্শনিকের বিচারে ও বৈজ্ঞানিকের মুক্তিতে অগ্রতিপন্ন

হইয়াও আর্থবাবীর সংকট মধ্যে পরমা সঙ্গতি প্রাপ্ত হইয়া মনোবিবর্ণের অন্তরের সমস্ত সম্বন্ধ আর্থবাব করিলেন। কিন্তু যিনি তাঁহাকে মুক্তির ক্ষেত্রে আনিয়া দাঁড় করাইলেন, এবং মতবাদের শৃঙ্খলে তাঁহার অপরাহৃত মুক্তিকে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন তাঁহাকে তিনি বলিলেন—

যদি মনুষ্যে হৃদয়েদেহি দক্ষমবোপি।

কিন্তু সেই “দক্ষম”—অন্তঃ সেই পরিপূর্ণতাকেই নির্দেশ করিতেছে। ভাব্যার সমস্ত দুর্দ্বন্দ্বতা, ছন্দের সমস্ত বন্ধন—মুক্তির সমস্ত সীমার মধ্যেই সেই মহাপূর্ণেরই সংকট রহিয়াছে। যথোনেই ভক্তের কণ্ঠে যে কোন গান গানিয়া উঠিতেছে, তাবুক চিত্ত যে কোন ছায়ায় কাপিয়া উঠিতেছে এবং বিরোধের চিত্ত যে কোন মুক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে তাহাতেই তিনি প্রতিপন্ন ও প্রকাশমান হইতেছেন। কবি সীমার মধ্যে এ অসীমতা সর্বদাই উপলব্ধি করেন।

সীমার মাঝে অসীম ভূমি

বাধাও আপন স্বর,

আমার মাঝে তোমার প্রকাশ

তাই এত মধুর।

উপনিষদ-আচাধ্যাপন এই মর্মেণ বহুস্রোতঃ স্রবণ করিতে পারিবেন।

ছোট-বড়র এই অপর সমস্তার মধ্যে পড়িয়া, নানা অবস্থায় ও নানা ভাবের তাড়নায় ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ ব্রহ্মকে বর্ধক করিয়া, চিহ্নিত অপরাধী হইয়া পড়িয়া, ঘরে বাহিরে বহু তাড়না লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ‘অতি আশ্চর্য্যম’ এই ছোট-বড়র রহস্য, যাহাতে রবীন্দ্রনাথের দ্বায় “ব্রাহ্ম” ভক্তের মনেও এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়—

আমিও কি আপন হাতে

করবো ছোট বিদ্যনাথ?

জানাব আর জানিবো তোমায়

স্বপ্ন পরিচয়ে?

তর্কে নহে, অস্তরের সূচ্যমান দৃষ্টি বাহ্যকে অপর ও অনন্তরূপে দেখিতে পায়, জগৎপটের ভক্তি তাহাকে চাহে—

বস্তু হইয়ে, পিতা হয়ে, জননী হয়ে

আপনি ভূমি ছোট হয়ে এস এ দ্বন্দ্বয়ে।

এই ছোট রূপকেও মিথ্যা বলিতে আমরা বধনই সাহস পাই না।

এইরূপ একটি ছোট জগৎ-পরিসর রূপের সহিত কবি আমাদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান দীনদুঃখীগণ তাঁহার নিকট চিরদিন স্তম্ভিত থাকিবে—কারণ তাহা তাহাদেরই চিরপরিচিত দুঃখেরই রূপ। সেইরূপে ভগবান সর্বদাই আমাদের দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্বিতা করিতেছেন—কিন্তু তাঁহার সেই স্তম্ভিত-দুঃখোক্ত্য জ্ঞানানের পানে আমরা সাহস করিয়া চাহিতে পারি নাই। সেই জগৎ আঁককে তাঁহার পরিচয়ে ভ্রম করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সেই দেবতার স্মৃতিস্মরণ পরিচয় দিয়া আমাদেরই পরম উপকার করিয়াছেন।

গীতার সূক্ষ্ম সাধনায় অথবা তীর্থ জ্ঞান-প্রভাবে দুঃখপাশ ছিন্ন করিয়াছেন তাঁহারা বহু। কিন্তু জগতের সে সমস্ত সাধারণ দীন দীন তাহাদের জগৎ রবীন্দ্রনাথগণের মনোবিবর্ণের সাধনা ভগবানের দৃষ্ট দ্বন্দ্ব দান। কাহার না জীবনে এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে দুঃখের তাড়নায় অস্ত্রাশ্রা একবারে নিষ্প্রাণী হইয়া জগতের সহিত সমস্ত সখা বন্ধ মুছিয়া ফেলিতে উজ্জত হইয়াছে? “থাকেইল” স্বপ্নের কাহার না দ্বন্দ্বের সাধনা-

অতীত বেদনার ক্রন্দন করিয়াছে? এই করাল মর্দনশীড়ক দুঃখ, জগতের এক চিরন্তন সমস্যা। এ চিরস্থায়ী প্রহেলিকার শত শত বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছে, অথচ ইহার অন্তঃনিবদ্ধ রহস্য-চির-অস্বাভাবিক রহিয়া গিয়াছে। কেহ বলেন ইহা পাপের নাস্ত্যবস্থা, কারো মতে ইহা কর্মবিপাক, জগদাত্মার অভিশাপ ও তিরস্কার। কেহ বলেন ইহা প্রকৃতির পরিহাস। ফলকথা—সমস্ত তত্ত্বালোচনার মধ্যে ইহা কঠিন এবং মধ্যস্থতিক দুঃখরূপেই রহিয়া গিয়াছে। এবং সমস্ত তথ্যে প্রকৃত তথ্য অংশভঃমাত্র উদ্ভাষিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে যতদূর বুদ্ধিতে পারা যায়—সাধারণ দুঃখ, দুঃখই বটে। ইহা মায়া নহে, ছায়া নহে, তিরস্কার নহে, অস্বাভাবিক নহে, ইহা দুঃখ—

দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,

তোমা হতে যবে হইয়ে বিরূপ

আপনার পানে চাই।

তবে কি ইহা শুধুই দহন এবং জলন এবং তিজতা? না, তাহা নহে—দীনদীনের প্রতি কবির উপদেশ—

হে দুঃখি, দীনদীন! দীনতা তোমার

তারি হস্ত হতে নিও তব দুঃখভাণ্ডার।

অর্থাৎ ইহা বর্ধাণ্যক্ষেপে ভগবানের তিজদান—কিন্তু সর্বথা গ্রহণযোগ্য। এ তিজদান জীবের পক্ষে পরম পথোন্মায় রহিয়াছে—ইহাতে জাগরণের বস্তু ও বিভ্রাতনল প্রজ্জ্বল রহিয়াছে। তাঁহার জ্বালায় সাধু চিন্তের পক্ষে দুঃখের এক প্রলোভনও বিদ্যমান। তিনি অকৃতভয়ে দুঃখকে প্রলুপ্ত করিয়া ভগবানকে বলিতেছেন—

আরো আখ্যাত হইবে আমার
সইবে আমারো
আরো কঠিন হুইবে জীবন-
তারে স্বাক্ষরো।

এই জন্ত মৃত্যুর মধ্যস্থিত হুইবে সহিতও
তাহার কোন বিস্তার নাই—
পাঠাইলে আত্ম মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের ঘারে,
আদেশ পালন করিয়া তোমারি
ঘায়ে সে আমার প্রভাত আধারি,
শূন্য ভবনে বসি তব পায়

সদ্বিব আপনারে।
মৃত্যু যেমন ভগবানের দূত, হুইবে তেমনি
তাহার সার্থক দান—

আমি চাই তাই ভরিয়া পরাণ,
হুইবে সখে হুইবে জাগ,
তোমার হাতে বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুক্তি।
জাগরণের এই তীব্র বজাল তিনি তাহার
জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,
আমার এ ধূপ না গোড়ালে
গন্ধ কিছু নাই ঢালে,
আমার এ পূজা না জ্বালালে
দেয় না কিছু আলো।

এবং এই জন্তই ভগবানের নিকট তাহার
নিষ্ঠার প্রার্থনা—

মুখ হুইবে খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করোনা।

জলে উঠুক সকল হতাশ
গর্জে উঠুক সকল বাতাস
জাগিয়ে দিয়ে সকল আশা
পূর্ণতা বিস্তারো।

এইরূপে হুইবে মহাদান, এবং মৃত্যুকে
ভগবানের বিশুদ্ধ দূত বলিয়া কদাচিত্ নির্দেশ

করিয়াও আবার কবি হুইবে স্বরূপঃ
দেখিয়াছেন যে “দান” দাতারই নামান্তর
এবং দূত তাহারই আপন ছদ্মবেশ—
হুইবে বেশে এসেছে বলে তোমারো নাই
জরিব যে
যেখানে বাধা সেখানে তোমা নিবিড় করে
ধরিব যে,

আমারে মুখ ঢাকিলে আমি!
তোমারে তবু চিনিব আমি
মরণ রূপে আসিলে প্রকৃত চরণ ধরে মরিব যে।
আবার অন্তজ বলিয়াছেন—
হুইবে পরে পরম হুইবে
তারি চরণ বাজে বৃকে।

ইহা হুইবে বোধের মধ্যে প্রকাশমান
বিশরূপ, ইহা শ্রুতিপ্রমাণের পরম সমীচীন
দর্শন, ইহা মৃত্যুর অমৃতরূপ—
প্রতি বোধবিস্তৃত মতমমুতঃ বিদ্যতে।
কারণ এই “অহমের” সমস্ত বোধের মধ্যে
পুরাকালে জন্মের জন্মে বোধাতীত প্রকাশ-
মান হইতেন—

সং প্রাপ্তেন ন প্রাপ্তিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে
তর্পে ব্রহ্ম অংবিক্তি নেদং যদির্মুগ্ধাসতে।
রবীন্দ্রনাথও এই বোধপুঞ্জের কেন্দ্রস্থিত
“অহম”কে উপলব্ধি করিয়া মাঝখানে
বলিয়াছেন—

হেহ যনে প্রাণে আমি একি অপরূপ!
এমতে কবি দেখাইলেন যে অপার রহস্যময়
‘আমির’ শিখা দাঁড়াইয়া হুইবে রূপী পরমেশ্বর
অহরহ বেদনার অন্ধশাখাতে আমাদিগকে
স্বপ্নের জড়শয্যা হইতে সমুত্তীর্ণ করিয়া
অনুভবের পক্ষে প্রেরণ করিতেছেন।—এক
হুইবে স্তম্ভাগমনে তাহার এই স্তম্ভ প্রার্থনা—

বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নাই মোর প্রার্থনা

বিপদে আমি না যেন করি ভয়,
হুইবে তাপে ব্যর্থিত চিতে
নাই বা নিলে সাধনা
হুইবে যেন করিতে পারি জয়।

এবং এই সমুদ্র ও সমুদ্র প্রার্থনা যে
দিন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সার্থক
হইবে সেই দিন আমাদের হুইবে পরিক্রান্ত
সম্পূর্ণ হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

দানপত্রাবলি

(বাক্পতিরাজের দ্বিতীয় দানপত্র)

যাঃ সূর্য্যবানস্তুদ্বিধানলিমল্লমুপ্রভাঃ

—তিনি সপদ দ্বাদশক সংবৎ মহাশাধনিক—

প্রোগল-

শ্রীমহাইকদুজ্ঞ সেধলপুর গ্রামে—সমুপগতান্

গুণীকবংশপাশ কোটিঘটিতা যাঃ দৈন্য-

সমস্তরাজপুরুষান্ রাক্ষপেত্তান্ প্রতিবাসি

কৈরোগপায়াঃ।

পট্টকিল—জনপদাংশক বোধয়তি—অজবঃ

যাক্কাপিরিজ্ঞাপোললুলিতাঃ

সংবিত্তঃ—“যথা গ্রামোহয় সম্বিত্তঃ যট্রিংশ

কস্তুরিকা বিজ্ঞা-

সংবিত্তঃ সংবৎসরেহস্মিন্—কার্তিক শুদ্ধ

স্তাঃ শ্রীকর্তকচৌরকর্তকচয়ঃ শ্রেয়াংসি-

পৌর্ণমাসাঃ সোমগ্রহণ—পূর্ণিমা শ্রীগ্রহণ-

পুণ্যস্থবঃ ॥

পুরাবাসিতৈ রক্ষাতির্মহা। সাধনিক শ্রীমহা-

বল্লভীবদনেদুনা ন হুইতং যদাগিৎ

ইকপত্তী আসিনী—প্রার্থন্যোপরিগিহিত্যগ্রামঃ

বায়মে-

শ্রীমহা ত্বণমৃতিগোচর পর্য্যন্তঃ সহিরণা-

বায়মে-

ভোগভাগঃ সোপকিরকঃ সর্গাদায় সমেতঃ

বায়মে-

শ্রীমদ্বজ্জিহ্বাঃ ভট্টারিকা শ্রীমন্তেব্রাহ্মণেবৈ

গতম্।

যান বিলেপনপুণ্য গৃহনৈবেদ্য-প্রেক্ষণিকাদি

বিলেখ্যাহিফা সহস্র মধুর শাটর্শ

নিমিত্তং চ, তথা বৎস্কৃতিত দেব গৃহ জগতী

চামাসিতাঃ

সমারচনার্থং চ মাতা পিত্রোরাশ্রয় শ্রু

তজ্জায়া বিরহাতুরঃ মুরিপোবেদ্বজ্ঞপুঃ

পাত্তবঃ ॥

পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ—পরমেশ্বর
শ্রীকৃষ্ণ রাজদেব পাদাহুধ্যাত—পরম ভট্টারক
মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর—শ্রীবৈবিসিংহদেব
পাদাহুধ্যাত—পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ
পরমেশ্বর শ্রীদায়কদেব পাদাহুধ্যাত—পরম
ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীমদ-
মোহনদেবপাগরাভিধান—শ্রীমদ্বাক্পতি রাজ-
দেব পূর্ণীবল্লভ—শ্রীবল্লভ নরেন্দ্রদেবঃ সুনী-

পাত্তবঃ ॥

বহুভিবহুভাক্তা রাজভিঃসগরাভিঃ ।

বহু যন্ত যদা ভূমি শুভ্রস্ত তদাফলং ।

যানীহস্তানি পুরানরেস্ত্রৈর্নানি দধার্থ

বন্দধরাণি ।

নির্দাল্যবাস্ত প্রতিনিহিতানি কো নাম

সাহুঃপুনরাবদীতং ।

অশ্বংকুল ক্রমম্বারমুদাহরন্তিরনৈত

দানমিদমভাহুমানদীয়ম্ ।

লক্ষ্যাত্ত্বং সলিলবৃন্দ চকলাধা দানং

ফলং পরযশঃ প্রতিপালনং চ ।

সর্বানন্তানুভাবিনঃ পার্শ্ববৈক্সন্যং কুহো

কুহো যাচন্তে রামভক্তঃ ।

সামাজ্যোহং যথসেতুনুপাণাং কালে

কালে পালনীয়ে ভবন্তিঃ ।

ইতি কমলদলপুবিদুলোঃ শ্রিয়মহুচিহ্না

মহয়া জীবিত্যং চ ।

সকল মিদমদাস্তং চ বৃদ্ধা নহি পুরুষে

পরকীর্ত্যো বিলোপ্যাঃ ।

ইতি । সংখ্যং ১০৩৬ চৈত্র বরি ২ ।

ওপপুরাবাসিতে শ্রীমদ্রাধিবাহুদ্বাধারে

বৃহদাঙ্গ দায়কশাভ শ্রীকল্পাদিত্যঃ ।

বহুস্তোত্রং শ্রীবাপুতিরাজদেবগঃ ।

আমরা ইতঃপূর্বে অমোঘবর্ষ দেবের এক-

খানি দান পত্রের বিবরণ “গৃহস্থ” প্রকাশ

করিয়াছিলাম । উক্ত পত্রখানির “সংক্ষিপ্ত

সার অহ্বাণ” মাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল । মূল-

পত্র প্রকাশিত হয় নাই । আমরা এবার

এই পত্রের মূল প্রকাশ করিলাম । এই সকল

পত্র অতি প্রাচীন, সেসঙ্গে ইহার সংস্কৃত বড়ই

চমৎকার । এক্ষণ প্রাকাল গভীর সংস্কৃত

ইদানীং অতি অল্পই যখনপোচর হইয়া থাকে,

মঙ্গলাচরণের শ্লোক দুইটা অহ্বাণবন করিলেই

পাঠিক তাহা বুঝিতে পারিবেন । কিন্তু এই

সকল পত্রে অনেক ইদানীং অপ্রচলিত

ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগ আছে ; এবং

রচনাভঙ্গীও কিছু বৈলক্ষণ্য আছে ; স্বত্বদর্শ

পাঠিকগণ এ বিষয় চিন্তা করিলে স্বত্বলের

আশা করা যায় ।

এই দানপত্রের দ্বারা মহারাজ বাকুপতি

১০৩৬ সাংবৎসরে কাষ্ঠীকী পুণ্যমাস চন্দ্রগ্রহণ

উপলক্ষে “মহাসাধনিক শ্রীমহাইক” পত্নী

আদিনিী প্রার্থনাপ্রহারে শ্রীউজ্জয়িনীতে

ভট্টারিকা শ্রীভট্টেশ্বরী দেবীকে সমস্ত আরাধা,

উপদিকর, স্বর্গদান, তৃণযুক্তি গোচর ইত্যাদি

সংস্কারের সেখলপুর নামক গ্রাম “খান

বিলেপন পুষ্পগন্ধ পুণ নৈবেদ্য প্রেক্ষণিকারি

নিমিত্ত” ও “সংশ্লিষ্টিত দেবগৃহ জগতী

সমারচনার্থ” প্রদান করিতেছেন ।

মহারাজ বাকুপতি পূর্ণপত্র ও এই দ্বিতীয়

পত্র উজ্জয়িনীতেই দিতেছেন । মহারাজ

ভোজের রাজধানী ছিল ধারানগরী, কিন্তু

উল্লিখিত দানপত্রদ্বয় হইতে, এবং—

অস্তিত্বভাবজ্ঞানীতি নায়।

পুরী বিহায় শ্রমসংসারবীত ।

বহুদ্ব্যস্তাঃ গদ্যমিস্রকল্পে

মহাপতিবাকুপতিরাজ দেবঃ ।

এই “পরমল কবি” প্রণীত মন-নাংহসাক

চরিত লিখিত শ্লোকদ্বারা বাকুপতি রাজের

রাজধানী যে উজ্জয়িনী ছিল, ইহা অসংশয়ে

জানা যাইতেছে । ধারানগরীতে রাজধানী

স্থাপন স্বয়ং ভোজই করিয়াছিলেন । সিদ্ধ

রাজের রাজধানীও উজ্জয়িনীই ছিল ।

রাজাভিত্তান্তঃ • লুপ্তকালেন্দ্রে নিস্কৃ

বিশ্রান্ত যশস্তরঙ্গঃ ।

ভাষানু গ্রহণামিহ ভূপতি নামযশঃ

সৌখ্যো দূরি সিদ্ধুজাঃ ।

* উজ্জয়িনী:

তদানন্দনানোকহমাপাং যন্ত সমুদ্রসং-

সাম্রাজ্যং প্রস্থন।

গতাত্ত্বিকিং লবলীতেতব নিবহুস্মা-

পরমার লক্ষ্যঃ ।

উজ্জয়িনী বর্ণনার অনন্তর, লিখিত এই

শ্লোক দুইটা তাহার প্রমাণ ।

মঙ্গলাচরণ বংশপরায়ণ প্রভৃতি পূর্ণ

দানপত্র ও এই দানপত্রের একইরূপ । এই

পত্র পূর্ণপত্রের পাঁচবৎসর পরে লিখিত ।

পূর্ণপত্রের আজাদায়ক শ্রীকট্টাইক এই

দানপত্রের আজাদায়ক শ্রীকট্টাইক । উভয়

পত্রেরই হস্তাক্ষর বাকুপতি রাজের ।

পূর্ণপত্রে “যন্ত আশাটঃ বলিয়া প্রদত্ত-

গ্রামের চতুঃপার্শ্ববর্তী সীমা উল্লিখিত হইয়াছে,

এ দানপত্রে তাহা নাই । “বাতাভ্রবিজয়

মিদং” ইত্যাদি শ্লোক দুইটা পূর্ণপত্রে আছে,

এ পত্রে নাই । “বহুভিবহুভাক্তা”—ইত্যাদি

পাঁচটা শ্লোক উভয় পত্রেই আছে ।

আমরা মহারাজ বাকুপতিরাজের দানপত্রের

আলোচনা করিলাম ; সম্ভ্রান্ত আমরা

মুদ্রণ পাঠকবর্ণের নিকট দানবীর ভোজ-

দেবের একখানি দানপত্র উপস্থিত করিব ।

স্বতরাং তৎপূর্বে ভোজদেবের রাজ্যপ্রাপ্তির

পর হইতে অষ্টাঙ্গ বিবরণ আমরা যাহা কিছু

জানি সে সমস্তই উল্লেখ করিতেছি ।

মুখ ভোজদেবকে রাজ্য অর্পণ করিয়া

বনে গমন করিলে, বুদ্ধিমাগরকে প্রধান

অমাত্যপদে বরণ করিয়া ভোজরাজ

রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন । এইরূপে

কিছুদিন অতীত হইলে একদা মহারাজ

কীর্তাপ্রসঙ্গে উজ্জয়িনী গমনকালে দেখিলেন,

কোন একজন ধারানগরবাসী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে

প্রেরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আসিতেছে ।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “দ্বিজ, স্বয়ং মাং দৃষ্টে ।

ন স্বতি ইতি জল্পসি, বিশেষণ লোচনে

নিমীলয়সি, তত্র কো হেতুঃ” ? ব্রাহ্মণ

বলিলেন, “আপনি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণের কোন

বিষয় করেন না কিন্তু আপনি কাহাকে কিছু

দান করেন না, স্বতরাং আপনাকে আশীর্বাদ

করা নিরর্থক । বিশেষতঃ প্রাতঃকালে

কৃপণের মুখ দেখিলে আরও বিশেষ ক্ষতি

হইবার সম্ভাবনা ।

আরও শুভ্রন—

প্রসাদোনিমুক্তো যন্ত কোপকৃষ্ণি নিরর্থকঃ ।

ন স্বঃ রাজান মিচ্ছন্তি প্রজাঃ যণ্ডমিব দ্বিগঃ ।

যাঁহার অহুগ্রহ কোনরূপ শুভ ফল প্রসব

করেনা ; এবং কোপও কোনরূপ অনিষ্টের

কারণ হয় না ; সেইরূপ রাজাকে প্রজারা

প্রার্থনা করেন ।

অগ্রগলভস্ত য় বিজ্ঞা রূপগন্ত চ যক্ষনং ।

যক্ষদাবহল্য ভীরোঃ ব্যর্থমেতৎ এতৎ তুবিঃ ।

“অগ্রগলভের” বিজ্ঞা, রূপগন্ত ধন এবং

ভীরুর বাহুবল এই তিনই জগতে নিরর্থক ।

মহারাজ আরও শুভ্রন—

আমার পিতৃদেব বুদ্ধাবস্থায় কাশী গমন

প্রজ্ঞত হইলে আমি তাঁহার নিকট উপদেশ

চাহিয়াছিলাম । পুত্রমঙ্গলকানী পিতৃদেব

উপদেশ করিলেন।—

যদি তব হৃদয় বিষলুদনং স্বপ্নেহপি

মাং সেবিতাঃ ।

সচিবজিত্তং যণ্ডজিত্তং যুবাতিজিত্তং চৈব

রাজানম্ ।

হে স্বয়ী ; যদি তোমার হৃদয়কে সন্দেহী

মুক্ত করিতে চাও তাহা হইলে “সচিব জিত্ত”

“যণ্ডজিত্ত” এবং “যুবাতি জিত্ত” রাজাকে

স্বপ্নেও ভজন করিওনা ।

পাতকানাং সমস্তানাং ধ্বংসের তাত পাতকে ।

একং হুংসচিতো রাজা দ্বিতীয়ং চতুদাশ্বয়ঃ ।

সমস্ত পাতকের মধ্যে দুইটা পাতক সর্ক-
শ্রেষ্ঠ। প্রথম—“হুসতিবরাক”, দ্বিতীয়—
সেই রাজার আশ্রিত—গণ।

অবিবেকমস্তিগুপ্তিমস্তা গুণবৎ বক্রিতগ্রীবঃ।
যত্র ধলাশ্চ প্রবলাশ্চত্রকং সঙ্কনাবসরঃ।

যেখানে নৃপতি বিবেকরহিত; মন্ত্রী
গুণবানকে আদর করেন না; এবং যেখানে
ধলারাই প্রবল, সেখানে সাধুলোকেরা
কিছুপে অবসর লাভ করিবেন।

রাজা সম্পত্তি হীনোহপি সেবাঃ

সেবা গুণাশ্রয়ঃ।

ভবতাজীবনং তন্ময়ং ফলং কালান্তরাপি দি।
সম্পদীন হইয়াও ভজনীয় গুণালয় নৃপতি
সেবার যোগ্য। ফলান্তরেও তাঁহার নিকট
হইতে আজীবন ফলাভ করা যায়।

হে দেব, কর্ণ, শিবি, দক্ষিণী, বিক্রম প্রভৃতি
ক্ষিত্রস্বরগ যেরূপ পরলোক অলভ্য করিয়া
ও নিজ নিজ দানোৎপন্ন “দিব্যানবগুণের”
দ্বারা পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, সেইরূপ
কি কোন রাজা পৃথিবীতে আছেন?

সেহে পাতিনি কাশফা যশোরক্ষমপাতবৎ।
নরঃ পতিতকায়োহপি যশঃ কায়েন জীবতি।

অবশ্যপতনশীল দেহের রক্ষা করিলে হইতে
পারে, হুতরাং অবিনাশীবশকে রক্ষা করিতে
হইবে। মানব জৌতিক যেহে নষ্ট হইলেও
যশঃ স্বরূপ দেহের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে।

পতিতে চৈব সূর্যেচ বলবত্যাপি দুর্জলে।
ঈশ্বরেচ দরিদ্রেচ মৃত্যোঃ সর্কর তুল্যতা।

কি পতিত, কি মূর্খ, কি বলবান, কি
দুর্জল, কি ঈশ্বরশালী, কি দরিদ্র, মৃত্যু
সর্বত্রই সমান।

নিমেষমাত্রমপিত্তবয়ো গচ্ছত্ব তিষ্ঠতি।
তদ্রাশ্বেহেননিতোহু কীর্তিমকো মুপাঙ্ক্যয়েৎ।

গমনশীল তোমার বয়স “নিমেষমাত্র” ত

থাকিতেছে না, হুতরাং সেইহে অনিত্যই;
কেবল মাত্র কীর্তিই উপাঙ্ক্যয়েৎ।

জীবিত্য তদপি জীবিত মণ্যে
পণ্যতে হুতুত্বিঃ কিমুপুংসাং।

জান বিক্রম কলাপুল লজ্জা

ত্যাগ ভোগ রহিতং বিফলং যৎ।
পুরুষের সেই জীবন হুতুত্বিঃগণের কর্তৃক
জীবন মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে কি? যে
জীবন জ্ঞান, বিক্রম, কলা, কুললজ্জা, ত্যাগ
এবং ভোগরহিত, হুতরাং নিকল।

রাজা ভোগ ভ্রামণের এই সকল বাক্য
শ্রবণ করিয়া যেন অমৃত স্রোতে স্থান করিয়া
উঠিলেন। (পীনুপুস্তকাত ইব)। যেন
পরাক্রমে লীন হইয়া গেলেন। তাঁহার
কপোল দেশ হর্বাশ্রিতে অভিমুখ হইতে
লাগিল।

মহারাজ বলিলেন—“হে দ্বিজবর, শ্রবণ
করুন—

ব্রহ্মতাং পুরুষালোকে সত্যং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রাক্তং চ পণ্যত বক্তা শ্রোতা চ দুর্জতঃ।

সত্য প্রিয়বাদী পুরুষ জগতে হৃদয়।
কিন্তু অপ্রিয়হিতের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই
দুর্জত।

‘হিতমনোহাং চ দুর্লভং বচঃ’।

মনীষিণঃ সন্তুস্তেন হিতৈষিণো
হিতৈষিণঃ সন্তুস্তেন মনীষিণঃ।

ব্রহ্মত বিধানপি দুর্লভো নৃপাং
যথোদয়ঃ স্বাহিতুঃ দুর্লভঃ।

যাহারা মনীষী তাঁহারা প্রায়শঃ—হিতৈষী
হন না; যাহারা হিতৈষী তাঁহারা মনীষী নন।

ব্রহ্মাৎ অথচ উপকারী ঈশ্বরের মত ব্রহ্ম
অথবা বিদ্বান্, জগতে মানবের পক্ষে বিরল।

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রচুর পুরস্কার
প্রদান করিলেন, এবং নাম জিজ্ঞাসা

করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রমিতে, নাম লিখিলেন—
গোবিন্দ। মহারাজ বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণ
আপনি প্রতিদিন রাজ সভায় পদাঙ্গুলি প্রদান
করিবেন। বিদ্বান্ এবং কবিদিগকে সভায়

অনিয়ন করিবেন, এবং আপনি আমার এই
অধিকার পালন করুন, যেন বিদ্বান্ কেহ
হুৎভাক না থাকে।”

শ্রীপুস্তেনাথ ভট্টাচার্য্য।

শিনটো উৎসব *

প্রাচ্য গৌরবকৃমি জাপানে যত প্রকার
উৎসব বা আয়োজ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে
শিনটো উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে
ব্রহ্মণ জাতীয় ভাবোদ্দীপন এবং ধর্ম্মপ্রচারের
অপূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, তাহা অত্র
কুজাপি সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। ইজের
(Isa) সার্কভৌমিক দৈবত বস্তুর শুদ্ধাধার-
গুলি বিগ্রহ সমেত যখন নবনির্মিত দেবালয়ে
স্থানান্তরিত করা হয়, তখনই এ মহোৎসবের
অচ্যুতন হইয়া থাকে। কোন্ এক অজ্ঞাত
সময় হইতে বিশতিবর্ষ পরে পরে আবহমান-
কাল পর্যন্ত যে এই মহোৎসব সংঘটিত হইয়া
আসিতেছে, তাহা জনসাধারণের অপরিজ্ঞাত।
কেহ কেহ অস্থান দ্বারা নির্ধারণ করিয়াছেন
যে, খৃষ্টীয় ৬৯০ অব্দের বহু পূর্বে হইতে
নিয়মিতভাবে শিনটো উৎসব চলিয়া আসি-
তেছে। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে যেটি হুস্প্রদ
হইয়া গিয়াছে, সেটি স্বপ্নকাশং অচ্যুতন
বলিয়া খ্যাত।

প্রত্যেক একবর্ষেই বর্ষে এই সকল
আধারগুলি পরিবর্তনের আবশ্যকতার একমাত্র
কারণ এই যে, ঐ সকল নিশ্চিত হওয়ার পর
মন্দিরভাঙ্গের প্রতিষ্ঠিত হইলে জাপানের

জাতীয় বিগ্রহ তাহাদের অধিকার গ্রহণ করেন
এবং তৎপরে মরজগতের কোনও মানব
কর্তৃক উহাদের পুনঃসংস্থাপন ধর্ম্মনীতি
বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। হুতরাং
কোনও একটি কালগ্রাসে কবলিত প্রায়
বলিয়া অস্মৃতি হইলে নৃতন বেদী ও আধার
গঠনকাণ্ড স্থচিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নব-
মন্দির নির্মাণ কাণ্ডও আরম্ভ হইয়া থাকে।
সম্ভবতঃ ইজের ধর্ম্মমন্দিরভাঙ্গরূপ বেদীগুলি
কিন্ধা দৈবিক বস্তুর পরিব্রজ আধার সমূহ
সাধারণতঃ বিংশ বর্ষের অধিক সর্বপ্রায়
কালকবল হইতে সম্পূর্ণরূপে নিম্নত ভাবে
আধারক্ষা করিতে পারে না, তাই প্রাচীন
বিজ্ঞানজ্ঞগণ কর্তৃক এবং বিধি নিয়মের প্রবর্তন
হইয়াছিল। ফলকথা যাহাই হউক তথাপি
এই প্রাচীন রীতির এতাবৎ কাল পর্যন্ত
কোনওরূপ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়
নাই।

মন্দিরনির্মাণকাণ্ড রাজক্ষমতা-প্রাপ্ত
কতিপয় অভিজ্ঞ ও উচ্চশীল ব্যক্তির উপর
সম্প্রদ হইয়া থাকে। উজোগ হইতে উত্থাপন
পর্যন্ত সকল কাণ্ডই ধর্ম্মপ্রচারণা ও বহুল
আড়ম্বর পরিপূর্ণ। নির্মাণকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে

পরিসমাপ্ত হইলে, কোনও বিশিষ্ট কিছা কলাপ দ্বারা তাহা জনসাধারণ ও রাজত্ববর্গকে জ্ঞাপন করা হয়। তখন রাজনিয়োজিত বাজিগণ সমগ্রমে সন্নিবিষ্ট মঠ সমূহের তত্ত্বাবধান ভার নিশ্চিতি ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের হস্তে সমর্পণ করেন।

এইরূপ মঠ সম্প্রদানের পর হইতেই মিন্টা উৎসবের স্থানা হইল। প্রকৃত উৎসব রজনীতে সংঘটিত হয়। তাহার তিন চারি দিন পূর্বে হইতে নানাবিধ আয়োজন হইতে থাকে; কিন্তু উৎসব দিবস ও বহুমানের ক্রিয়াকলাপই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও কৌতুহলপ্রদ।

স্থূয়োদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ মনোনীত পুতচরিত্রা ও হ-মধ্যমা জাপকুমারী নব-প্রতিষ্ঠিত দেবভবনগুলির সমুখদেশে একটি মুণ্ডয় পায়ে নানারূপ অর্ঘ্যপুষ্পাঞ্জলি লইয়া তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত করে। বহুমানের পৃষ্ঠে দেবালয়গুলি হুতাকরূপে স্বসম্পন্ন হওয়াতে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনবরূপ ধরিত্রী দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করাই উক্তরূপ অহুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, বিশেষ ঘটা ও বহুভাষ্যের সহিত এই কাণ্ড সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অপরূপে শোভাযাত্রা বাহির হয়। সে এক মনোমুগ্ধকর অপূর্ণ দৃশ্য। নীল, গীত প্রকৃতি বর্ণের বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিশোভিত ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ স্ববর্তনালয়ে প্রাপ্পন্দী মগল স্বয়ং ও উপাসনা যন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে রাজবন্দ্য দিয়া ধীরে ধীরে পুরাতন মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। সমুদ্রে পশাতে বহুল জন সমাবেশ হইয়া থাকে; তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৪০০০০ হাজারের ন্যূন নহে বলিয়া বিবেচিত হয়।

মরীচিমালীর রশ্মিরাশি সম্যক করিয়া অস্তাচল গমনের সহিত প্রকৃত উৎসব কিছা আরম্ভ হয়। একদল পুরোহিত রাজবন্দ্য কোনও ভদ্র ব্যক্তির পরিচালনে পূর্ণপ্রজ্জ্বিত মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তথাকার অচির পরিত্যক্ত আধার সমূহ নিহিত দেবকীয় বস্ত্রভরণ পরীক্ষা ও অনিন্দ্যাকাকার্য্যাবিশিষ্ট আচ্ছাদন বসন সমূহের পরিমাণ পরিগ্রহণ করেন। জনশ্রুতি শেখোক্ত সামগ্রী দেখ্যে ইংরাজী ১০০০০০ ফিটেরও অধিক—হুতাং তাহা সামান্য নহে। এই পরীক্ষা কাণ্ড সমাপ্ত হইলে সেই সকল পবিত্র সামগ্রী নবনিশ্চিত দেবালয়ে বাইবার নিমিত্ত নূতন আধার গুপ্তিতে বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষিত হয়। তখন অনাড়ম্বরপূর্ণ অথচ উজ্জল প্রাচ্য দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত অপর একদল ঋষিক বতকগুলি দেব-সেবক লইয়া মন্দিরদ্বার সমুদ্রে উপস্থিত হ'ন—এবং বিবিধ প্রকার ক্রিয়াকলাপদ্বারা চিত্তমন স্তম্ভিকরণান্তর বিগ্রহের বেদী সমুখে উপনীত হইয়া থাকেন।

সমগত জনগণনী বাহিরের মন্দির দ্বারে উৎকৃষ্টভাষ্যকরণে অর্পণকৃত থাকে। মন্দির মধ্যে একটি অতি কীর্ণপথর স্তম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমবেত সম্প্রদায় মধ্যে এক অপূর্ণ গম্বীর নিম্নস্ততা বিরাজ করিতে দেখা যায়। ঠিক সেই সময় শামায়া ঘোষণা করে। তখন সকলের চকল আঁচল নমন মন্দিরাভ্যন্তরে চতুর্দিকে দেবিদ্বার জ্ঞ পুরিয়া বেড়ায়—কখন কখন শুভ মুহূর্ত্ত পৃথিবীতে তাহাদের পবিত্র হইতে পবিত্রতম আরাধ্য সামগ্রীর নির্গমন হয়।

“কো—কো—কো—”একজন পুরোহিত বায়াম্বরূপ ধনি করিতে করিতে মন্দিরা-

ভ্যন্তর হইতে বাহিরের আসেন; উদ্বেজ বলিবার—যেন হুপ্রভাত হইয়াছে—দেবতা আগিয়াছেন। তখন সেই সার্বভৌমিক বিগ্রহ ও দৈবত বস্ত্ররাশি ভক্তিভাবে বহুজাগরি লইয়া কয়েকজন ধর্ম্মযাজক বাহিরের আসিয়া উপস্থিত হন। তাহাদের পরিধানে শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ—সুভাবরণ মুখদেশে আচ্ছাদিত, পাছে, তাহাদের কল্মষিত বাসপ্রকাশ স্পর্শে পবিত্র বস্ত্ররাশি মলিন হইয়া যায়। অপিচ জনসাধারণের পূণ্যভূত নয়নদৃষ্টি হইতে সেই সকলকে রক্ষা করিবার জন্ত চতুর্দিকে পটক-মুদ্রণ বিভিন্ন যবনিকাধারা বেঠেন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবং বিধি আয়োজনের আবশ্যক হয় না। কারণ এখন প্রজ্জ্বলিত মশালের দীপ আলোকে পরিত্যক্ত পুরাতন মন্দির হইতে উক্তরূপে জাতীয় বিগ্রহ তথা দৈবত সামগ্রী সমুদ্রে নব-দেবালয়ে লইয়া যাওয়া হয়—তখন সকলেই ভক্তিপ্রণতাস্তকরণে বিনীত মন্তকে সেই বিগ্রহের দিকে সঞ্চল থাকে না। শুনা যায়, এই কবিত বিগ্রহ একদিন দর্পণ বিশেষ—যাহা জাপানের সর্পপ্রাথম শাসনকর্ত্তার তদীয় বংশদেবতাকর্ত্তক অর্পিত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, এই মহদব্যাপারের সময়

জাপ-জাতি পুতঃপরতঃ যোগদান করে। এমন কি এই শ্রবণীয় উৎসবসময়ে টোকাঘের রাজকীয় ধর্ম্মমন্দিরে জাপরাজ ও তদীয় মহীয়াকে দেবতার বেদী সমুদ্রে উপাসনাবন্দ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপে বিগ্রহসময়ে পুরোহিতদল, নব-মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলে, তথায় কোনও যাজক আসিয়া গৃহ-প্রবেশ মধ্যাতি পাঠ সমাপ্ত করেন—তখন অপর একজন ঋষিক পবিত্র সামগ্রীরাশিকে ভক্তিযুক্তচিত্তে নূতন বেদীতে স্থাপনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, মন্দির দ্বার সংস্থা উন্মুক্ত হইয়া যায়—সেই সময় দৃষ্টিগোচর হয় যে, মন্দিরপাড়া ও চত্বারতপ অনন্বকরণীয় অনিন্দ্য জরি-কার্য্য-বিশিষ্ট স্থলভ বসনবস্ত্রে সূশোভিত। ঋষিক যথাস্থানে সমস্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার উদ্দেশে অষ্টবার প্রণতিপূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সংস্থা সমস্ত আলোকমালা নিরূপিত হইয়া যায়—এবং দূর হইতে জাপানের বীরভাবপ্রায় সৈনিকবাহু প্রাণোন্মাদন হয়ে সকলকে জানাইয়া দেয় যে, উৎসব কিছা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তখন সকল এক অপূর্ণ আনন্দ ও শান্তিরস পরিপূর্ণ হৃদয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন।

শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

কৃষি-প্রসঙ্গ

স্বজালা ফফলা শ্রামা জম্বুজম্বি এই আমাদের ভারতভূমি কৃষিপ্রধান দেশ। আবহমানকাল হইতে এখানে কৃষির মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। বাণিজ্য ও কৃষিই যে স্ব-বহুমানতার সহিত জীবনধারণ করিবার প্রধান

উপায় এবং ধনাগমের নিশ্চিত সাধন ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশীয় লোকের জ্ঞয়স্বয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্দ্দৈব-ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে এতদুভয়েই অবনতির

দেশের শত্রুসম্পদ আজও কম নহে কিন্তু তাহাতে নানা কারণে দেশের লোকের অবস্থা পুঞ্জ হইতেছে না। আবধ রপ্তানির ফলে দেশে আজকাল টাকা সত্তা হইয়াছে বটে কিন্তু দ্রব্যের মূল্য অসম্ভবরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে হুতরাং অধিক অর্থ উপার্জন করিবার লোকে পূর্ণের মত অজ্ঞান্য লাভে বঞ্চিত।

এই সঙ্গে সঙ্গে অনাবশ্যক বিলাস-বাসনাও দেশে অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে আমাদের অনর্থক অর্থব্যয় হইতেছে, অস্ত্র দেশীয়েরা ধনী হইতেছে। রপ্তানী ও আমদানীর মধ্যে এইটাই আমাদের দেশে প্রধান অশুভ্যভাব যে আমাদের জীবনীশক্তির উপাদান চাউল, গম, ডাল, কলাই, তিসি, সরিষা প্রভৃতি বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে। তদ্বিনময়ে আমরা অর্থ পাইতেছি তাহা সত্তা কিন্তু সে অর্থে আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না।

আর ঐ সব জিনিসের পরিবর্তে আমদানী হইতেছে, কাচ ও লোহার নানাবর্ণ বাসন, চুড়ী, মালা, কোঁটায় দ্রুপ, সহস্র প্রকারের সূজ, ইত্যাদি জিনিস। এ সব জিনিস না থাকিলেও আমাদের কোন ক্ষতি নাই কিন্তু তথাপি লক্ষ লক্ষ টাকার এই সব জিনিস এই দেশেই কাটিতেছে।

ইহার প্রতীকার বর্তমানক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

অশুচি বাঁচিতে ভো হইবে! এ ভ্রম দেশের অনেকেরই এই অভিমত যে দেশের কৃষির উন্নতিবিধানে আমাদের যত্নপর হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দেশের নিরক্ষর কৃষকসুল-উৎকৃষ্ট শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহার সুল ক্রমাগত

নিয়ম পদ্ধতি অহুসারেই স্বীয় ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে চম্ভস্ত তাহাদিগকে দোষী করা যাইতে পারে না।

শিক্ষিতগণ এই সব 'চাষা'দিগকে অজ্ঞা ও ঘৃণার ঢক্ষে দেখিয়া থাকেন বলিয়া, তাহাদিগকে লইয়া এ বিষয়ে কোন আলোচনা করাও অপমানের বিষয় মনে করেন। হুতরাং তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়?

আমাদের কৃষকসুল তাহাদের জাতীয়-ব্যবসায় অপটু নহে। অনেক ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারিগণ ইহাদের কৃষিপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহাদের কৃষ্ণদী প্রশংসা করিয়াছেন।

অন্তএব ক্ষেত্র মন্দ নহে, ইহাতে উপযুক্ত বীজ রোপণ করিতে পারিলে ভাল ফলের আশা নিশ্চিতই আমরা করিতে পারি।

বাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাঁহারা যদি কৃষিক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে অনেক উন্নতির আশা করা যায়। কারণ তাঁহারা কৃষি সম্বন্ধে ভাল ভাল পুস্তক-পত্রিকাদি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া, তত্ত্বপরিষ্ঠ প্রণালীর অবগতি দ্বারা সমগ্রিক ফলসা করিতে পারেন। তথ্যে কৃষিকাৰ্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির অঙ্গ, অশ্ববিমূখ, বিলাসপরায়ণ হইলে চলিবে না। তাঁহাকে ক্ষেত্রে যাইয়া কোলাল পরিতে হইবে ইহা আমরা বলিতেছি না; তবে তাঁহাকে জন্মভূমির দ্বারা কাজ করাইতে হইবে, ক্ষেত্রেসমূহের তদ্বির করিতে হইবে।

তাঁহার উপদেশ অহুসারে কাজ হইতেছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

"বাটে খাটায় লাভের গাঁতি, তার অর্ধেক মাথায় ছাতি।"

ইত্যাদি বচনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। আর একটি কথা এই যে সকল কার্যেই 'গুরুকরণের' আবশ্যিকতা আছে।

কৃষিতেও তাহার প্রয়োজন বিশেষরূপই আছে। বাঁহারা লেখাপড়া জানেন তাঁহারা সাহিত্য অঙ্গাদি শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতে পারেন কিন্তু কৃষি বিষয়ে তাঁহারা অজ্ঞ। শুধু কৃষিবিদ্যাবিষয়ক পুস্তকদি পাঠে অজ্ঞিত-জ্ঞানের সাহায্যে কার্য আরম্ভ করিলে অনেক সময় সাধারণ নিয়মাবলীর অজ্ঞতা নিবন্ধন অনর্থকই উৎপন্ন হইতে পারে এবং বহুফল পূর্বে বহুবাসীগণে প্রকাশিত বিদ্যুৎ পাক-রাজেশ্বরী শ্রীমতী চক্ৰবর্তী শশাও অনেকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

হুতরাং বাঁহারা কৃষিকাৰ্য্যে বহুফল হইতে করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে কৃষি বিদ্যায় বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করা নব শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গবর্নমেন্ট কর্তৃক যে সমগ্র আদর্শ-কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে সকল স্থানেও শিক্ষা-নিবশী করিলে উদ্ভেদ সাফল্যলাভ করিতে পারে। মোটকথা যেসকলই হউক কৃষিতত্ত্ব-বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করিবার তারপর কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা বিষয়ে। বাঁহারা ১৮২০ টাকার চাকরীর জন্ম ঘরে ঘরে তোষামোদ করিয়া দিরিতেছেন, তাঁহারা তদপেক্ষা সুযোগ ও সুবিধা করিয়া উপযুক্ত স্থানে কৃষিকাৰ্য্য আরম্ভ করিলে, নিশ্চয়ই স্বাধীনভাবে অধিক ফলসাভে সমর্থ হইবেন এ বিষয়ে আমরা সন্দেহ করি না।

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামের কৃষক-সুলকে উন্নত প্রণালীর কৃষির বিষয়ে 'হাতে হেতেছে' উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন।

আজকাল দেশের অনেক সহরেই নানাজ্ঞ পণ্ডিত প্রদর্শনীর অহুচীন হইতেছে এবং তাঁহাতে বৎসর বৎসর অনেক গুলি কৃষিয়া

অর্থব্যয় হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত উদ্ভেদ কতদূর সিদ্ধ হইতেছে সেটা বিবেচনা বিষয়। এইরূপ সব প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ ব্যাপারেও আসল উদ্ভেদের বিপরীত ব্যবস্থা সময় সময় দেখিয়া স্তম্ভ হইতে হয়। কোনও বাবুর বাগানে ১০৫ টা বাঁধা কপির চাষ হয়, তাহা ভাল বাঁধে নাই, ক্রমে ফল হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনী কেহে তাহা প্রদর্শিত হইল যে বাঁধা কপির বীজ উৎপাদনের চেষ্টা সহরে করা হইতেছে অমনি তাহার উপর একটা পুরস্কারের আদেশ হইয়া গেল!

একজননের গাছে হঠাৎ একটা পেঁপে খুব বড় হইয়া গিয়াছিল; তাহা প্রদর্শনীতে দেওয়া হইল যে খুব বড় পেঁপে ফলনের চেষ্টা হইতেছে—অমনি তাহার উপর একটা পুরস্কার দেওয়া হইল! এ সব আমার নিজের জানা ঘটনা।

ইহাতে কি প্রদর্শনীর কার্য সিদ্ধ হয়? প্রদর্শনীর উপকারিতা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু উপযুক্তভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

কৃষকসুল গ্রামসমূহে যদি ছোটখাট ভাবে এক একটা প্রদর্শনী খুলিরা তাহাতে উন্নত প্রণালীর চাষ, সার প্রভৃতির পদ্ধতি হাতে কলমে দেখাইয়া দেওয়া হয় এবং কৃষকগণকে বলা যায় যে এই প্রণালী অলপখন করিয়া চাষে বাঁহারা সর্বাঙ্গেক্ষা ভাল ফলন হইবে তাহাকে ২৫ কি ৩০ কি ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় কৃষকসুল বেশী আগ্রহ সহকারে এ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। তারপর প্রত্যেক প্রজাতিবিশিষ্ট জমিদার যদি বিবিজা পারদর্শী এক একজন লোক নিযুক্ত করিয়া, তাঁহা-দিগকে পালাক্রমে নিজ নিজ জমিদারীর

অল্পপুত্র গ্রামসমূহে প্রেরণ পূর্বক, কৃষকদিগকে হাতে কলমে উন্নত প্রণালী অবলম্বনে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তৎকালী যুব অধিক ফল লাভ হইতে পারে।

কৃষক-বুল একে অজ্ঞ, তাহাতে বড়ই রক্ষণশীল; সহজে তাহারায় স্বীয় পুঙ্খানুপুঙ্খমুখ্য পণ্যপরিচয়্যাপ্য করিয়া একটা 'মুতন কিছু' করিতে চাহে না। তাহাদিগকে বলিলে তাহারায় বলে "বাবুজি, ওদম আপনাদের বইএর কথা—ও কি কাজে করা যায়?" কিন্তু যদি তাহারায় স্বচক্ষে দেখিতে পায় যে তাহাদেরই সমক্ষে একজন একইরূপ জমিতে ভিন্ন প্রকারে চাষ করিয়া, তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ফল পাইতেছে, তবে তাহাদের নিশ্চয় চৈতন্য হইবে। এবং তাহারায় নিজ জমিতেও সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে, ফল উৎপাদনের জন্ত চেষ্টা পাইবে।

আমরা জানি যে কোনও গ্রামের চাষী-দিগকে আনু রোপণের পরামর্শ পুনঃ পুনঃ দিয়াও, একজন বদ্ধ কোন ফল পান নাই। তারপরে তিনি নিজের ১০ কাঠা জমিতে আনু রোপণ করাইয়া ভগবদ্বিচ্ছায় বেশ ফল পান। তাহা দেখিয়া অজ্ঞ চাষীরাও আশ্চর্য চাষ করা আরম্ভ করিয়াছিল।

বড় বড় জমিদারগণ প্রজার কল্যাণের জন্ত কৃষির উন্নতির বিষয়ে এইরূপে মনোযোগী হইলে, অতি শীঘ্রই ইহার স্বফল পাওয়ার আশা করা যায়। কলিকাতা, বর্ধমান, কাশীমবাজার, উত্তরপাড়া, নড়াইল, নাটোর, দিবাগড়িয়া, মুক্তাগাছা, সন্দ্বাই, ঢাকা, প্রভৃতি স্থানের মহারাজা, রাজা, জমিদার ও নবাব সাহেবগণ যদি স্বীয় স্বীয় মফসল জমিদারীর গ্রাম্য প্রজাগণের শিক্ষার জন্ত, এইরূপ কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষিত লোক নিযুক্ত

করিয়া, পালাক্রমে জমিদারীর মধ্যে পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কৃষির অনেক উন্নতি হইবে। তারপর মধ্যে মধ্যে এই সব পল্লীগামে ছোটখাটো কৃষি-প্রদর্শনী স্থাপিয়া, কৃষিজ্ঞাত ব্রহ্মাদির উৎকর্ষ প্রদর্শন করাইয়া সেইরূপ উৎকর্ষ দেখাইতে পারিলে, বেশ ভালমত পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলেও স্বফলের আশা করা যায়।

নতুবা সামান্য ২১০ টাকা পুরস্কারের দ্বারা কোন কাজ হয় না। মেডেল আদি প্রদান সম্পূর্ণই নিষ্ফল।

লেখাপড়া জানা লোকে কৃষি ব্যবসা আরম্ভ করিয়া তাহার উন্নতি করিতে ইচ্ছা করিলে সহজেই তাহাতে রুতকার্য হইতে পারেন।

বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মহম্মদগিহ, সাঁওতাল পরগণা, ছোটানিগপুর, বন্দরবন, নেপাল, আসাম, গোয়ালিয়র, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে উপযুক্ত জমি নির্দাচন করিয়া বাসুগিরি ও বিলাসিতা পরিচয়্যাপ্য করিয়া, যদি কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে সকলতার সম্বন্ধে হতাশ হইবার কারণ নাই।

কৃষি কার্যেরও অনেক বিষয় আছে সত্য, কিন্তু বিষয় বিনাশনের উপায়ও আছে। তাহাতে অভিজ্ঞ না হইলে চলিবে কেন? তারপর দৈম্য সহকারে স্বীয় কার্য পথ্য-লোচনা করিতে হইবে।

কারবার করিলেই তাহার লাভ লোকসান আছে। কৃষিরও হাজা শুকা আছে। বজ্র জন্তর উপব্রহ্ম আছে, পক্ষপাল আছে, পক্ষী-পাল আছে, চোরা জাকাতও আছে কিন্তু তা বলে "ভাবনা করা চলবে না।"

যদিই বা কখন কখন এই সব উপদ্রবের

জ্ঞাত সত্ত্ব করিতে হয়, তাহাতে হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে না। পূর্ণ উত্তম স্বীয় কার্য করিয়া যাঁহাতে হইবে। তাহা হইলে যথেষ্ট ছুটি এক বৎসর মধ্যেই আশির লোকসান ঘূরিয়া যিয়া লাভই দাঁড়াইয়া যাইবে। স্বীয় স্বীয় কৃষিক্ষেত্রের জ্ঞাত কৃপাদি খননের প্রয়োজন উপেক্ষা করা উচিত নহে। উপযুক্ত সংখ্যক কৃষি-ক্ষেত্রের মধ্যে থাকিলে অন্যত্রের সময়ে শস্তহানির আশঙ্কা নিজেদের চেষ্টায় কতকটা পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

আমরা অজ্ঞ সাধারণ ভাবেই এই কৃষি প্রসঙ্গে ছুটি চারিটি প্রয়োজনীয় কথা বলিলাম।

কৃষির উন্নতিকল্পে যাহা আমাদের বিবেচনায় সহজ ও নিশ্চিত ফলপ্রসূ বলিয়া বিশ্বাস, অজ্ঞ তাহারই ছু একটি কথা নিবেদন করিলাম আশা।

আশা করি আমাদের দেশের স্বয়ংস্থানগণ এবং মহারাজা, রাজা, জমিদার মহোদয়গণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিবেন। তাহারায় চেষ্টা করিলে এইরূপ সব প্রদর্শনীর জন্ত সংগঠিত অর্থ ঘাটাই, ইচ্ছা কৃষিবিৎ উপদেশকের কতকটা সংখ্যক হইতে পারে এবং প্রদর্শনীর আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীযত্ননাথ চক্রবর্তী।

ভারতীয় মুসলমান সন্তাটগণের সাহিত্য-সেবা

ও শিক্ষা বিস্তার

মৈয়দুবংশ

প্রথম দুইজন মৈয়দুবংশাদি বিজয় বা ও মবারিক, তোগলক বংশের প্রথম তিনজন সম্রাটের পরাক্রম অঙ্গস্বরূপ করিয়া চলিতেন। নগরের প্রাসাদ মালা নির্মাণে তাহারায় সে পরিচয় দিয়াছেন। বিজয় বা একস্থানে স্বীয় বাসনার অল্পরূপ হৃদয়াক্ষি নির্মাণ করাইয়া উহার নাম রাখেন বিজয়াবাদ, কিন্তু মবারিকের মোবারকাবাদ সম্পাদিত হইবার পূর্বেই খাতকের হাতে জীবনান্ত হয়। এই দুইজন স্থলতানের সংক্ষিপ্ত রাজত্বের ৩০০ তাহাদের পরবর্তী কালের শামসকর্তৃ-বয়ের রাষ্ট্রীয় অবস্থাও সেইরূপ ছিল। শেষ

মৈয়দুবংশাদি আলাউদ্দিন ৩০ বৎসর কাল ব্রাহ্মণের বাস করেন, এই সময়েই বহুলু তাহার হস্ত হইতে দিল্লী গ্রহণ করেন। হিন্দুস্থানের এই প্রাচীনতম নগর ব্রাহ্মণের পাঠান বংশের যুবরাজগণ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত সেখানে দরবার প্রতিষ্ঠিত করিতেন। হুটাইয়ের অনেক স্থানে কারু-কার্য-খচিত অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদ সমূহের ভগ্নাবশেষ, কোথাও বা রাজোতান, মসজিদ, কলেজ এবং স্মৃতিস্তম্ভের সমূহের ধ্বংসাবশেষ পণ্ডিত থাকিয়া, দর্শকের মনে অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। দিল্লীর পাশবর্তী ১০০ শত মাইলের ভিতর একটা শিকারক্ষেত্র অথবা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিক্ষা

বিস্তারের সহায়তা করিতেছিল। উগার অধীনে অনেকগুলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। দিল্লী ও ফিরোজাবাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য এই শিক্ষা কেন্দ্রেই নিষ্পাদিত হইত।

লৌদীবাংশ

সৈয়দবংশের পর দিল্লীর সিংহাসন লৌদী-বংশীয় বহুলুলের হস্তগত হয়। তাঁহার রাজত্ব সময়ে যে অভাবিতপূর্ণ নগরী আবিষ্কৃত হয়, উত্তরকালে ভাওতের ভারী মুসলমান রাজগণের রাষ্ট্রনীতি ও পুণ্যস্থতি উহারই সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিল। নানা-প্রকার রাজকীয় উৎসাহের ফলে এই নগরী ১০৫০ বঙ্গাব্দের মধ্যে উন্নত হইয়া প্রাচীন নগরী সমূহের সমকক্ষ হইয়া পড়ে।

হুলতান নিজে পণ্ডিত না হইলেও, পণ্ডিত সঙ্গ ভাল বাসিতেন। শিক্ত ব্যক্তিদিকে তাঁহারের যোগ্যতাযুগের পুরস্কৃত করিতেন। বহুলুলের রাজত্বে শান্তি-স্থিতি ফিরিয়া আসে, এবং এই সময়ে বিশেষ ভাবে সাহিত্যাহলীন হইতে থাকে। হুলতান স্বয়ং এই বিষয়ের উৎসাহ দাতা ছিলেন। মাহিরি রহিম হইতে জানা যায়, এই সময়ে অনেকগুলি কলেজ প্রস্তুত হইয়াছিল।

বহুলুল বিশেষ আলোচনার সহিত ইসলামীয় আইনগ্রন্থ পাঠ করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শাসনপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, তিনি কতকগুলি আইন প্রস্তুত করেন। এই সম্রাট তাঁহার অলপকৃপাত বিচারের জন্ত যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন উহা কেবলমাত্র তাঁহার আইনগ্রন্থ পাঠ ও স্বশাসনেরই ফল নয়, উহাতে অন্তর্নিহিত একটি শক্তির বিকাশ হইয়াছে।

হুলতান বহুলুলের পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর বাবিশাহ হন। দিল্লী হইতে আগ্রায় রাজধানী পরিবর্তন সিকন্দরের রাজত্বকালের একটি বিশেষ ঘটনা, কারণ পুত্রীরাজ হইতে বহুলুল পর্যন্ত রাজগণের রক্ষণীয় দিল্লীতেই ছিল। সিকন্দরের রাজত্বকালে আগ্রা সর্বতোভাবে প্রধান হইল। দিল্লী ও ফিরোজাবাদ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আগ্রাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। হুলতান স্বয়ং একজন কবি ছিলেন, সাহিত্যিকদিগকে উপলব্ধি করিতে পারিতেন এবং বিচার উৎসাহদাতা ছিলেন। সিকন্দর সময়ে সময়ে কবিতা রচনা করিয়া গুলবুখ নাম দিয়া প্রকাশ করিতেন। কবিতাবলী বিচার করিয়া মতামতের জ্ঞত কবি দেখ জামালকে অর্পণ করিতেন। তদ্ব্যবহিত একখানি পুস্তকের নাম সিয়াকুল আরফিন্। তাঁহার সভায় দ্বিচরণ রচয়িতা ৮২ হাজার কবি বাস করিতেন। হুলতান সৈনিক বিভাগেরও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় রাজগণের মধ্যে তিনি এ বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক। আরকালও দুই একটি সভা দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে রাজতন্ত্রের ধারা একরূপ বহমানগত হইয়াছে কি না দেখে।

হুলতান এই সকল বিষয়ে উদার হইলেও স্বীয় ধর্মের প্রতি খুব গোঁড়া ছিলেন। তিনি যখন যারওয়ারে ছিলেন, হিন্দুর মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া মসজিদ তুলিয়াছেন এবং এ স্থানে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সকল স্থানে অনেক মাদ্যুপক্ৰম ও পণ্ডিতমণ্ডলী অবস্থান করিতেন। সিকন্দর মথুরার বেওয়াল সমূহ এবং প্রধান প্রধান ভার্ণবান সমূহ লক্ষ্য করিয়া উহাদের স্থানে হোটেল ও উচ্চবিদ্যালয় তৈয়ারী করেন।

হুলতান ধর্মগুরুগণের তর্ক বিতর্ক শুনিতে ভাল বাসিতেন; উহাতে শিক্ত ব্যক্তিগণ যোগদান করিতেন। কোন এক সময়ে একটি শিবির স্থলে হুলতান সমাধিবলয়ী পণ্ডিতগণের ধারা উত্তেজিত হইয়া এবং নিজ ধর্মের মণ্ডালা রক্ষা করিতে বাইয়া একরূপ একটা দিল্লীর ও চরমপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, তৎকর্তৃক একজন হিন্দু-প্রতিনিধির জীবনাশ হইবে। এই হিন্দু-প্রতিনিধির নাম বুহুন, তিনি কবীরের ছাত্র ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন—হিন্দু এবং মুসলমান পবিত্রতা ধারা চালিত হইলে উভয়েই সমভাবে ভগবানের নিকট গৃহীত হয়। সম্রাট সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান পণ্ডিতগণকে সমবেত করিয়া ত্রাণের সহিত তর্ক করিতে আদেশ দেন। নিয়মিত পণ্ডিতগণ বিচার স্থানে উপনীত হইলেন, সম্রাট স্বয়ং বিচার স্থানে উপস্থিত ছিলেন—

ইসলাম বারের { মিয়া কাদির বিন সেখ রজ, মিয়া আব্দুল এলিরাছ এবং মিয়া আলোবাদ।

দিল্লীর— { সৈয়দ মহম্মদ বিন সৈয়দ বা।

সিরাহিন্দের { মোল্লা কুতুবুদ্দিন এবং মোল্লা আলোবাদ সয়ে সৈয়দ আলম।

কর্ণোজের { সৈয়দ বুহুন এবং সৈয়দ আনহুম।

এই সকল পণ্ডিতগণ ব্যতীত হুলতানের সভায় অনেক শিক্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কর্ণোজের সৈয়দ সাজিদ, সিকোর মিয়া, আব্দুল রহমান এবং মঘলে মিয়া আফিজুল্লা প্রধান।

হিন্দু তর্কিক সাহসের সহিত তর্ক করিলেন।

প্রতিবাদীরা হুলতানের নিকট নিবেদন করিল আমরা আর তর্ক করিতে চাহি না, এই বান্ধেই বিচারের নিশ্চয় হউক; ত্রাণকর স্বপ্ন ত্যাগ করিতে বলায় তিনি অধীকৃত হন—

সিকন্দরের রাজত্বে হিন্দুগণ পার্শ্বভাষা এবং মৌলিক উদ্ভূদ সাহিত্য অথবা হিন্দীভাষা শিক্ষার আদেশ করেন হাঁও একটি বিশেষ ঘটনা। কারণ হিন্দীভাষা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মধ্যেই চলিত। আমরা পূর্বেই জানাইয়াছি যে, এইরূপ সম্বন্ধ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং হিন্দুগণ সময়ে সময়ে ইসলামীয়ভাষা পাঠে আগ্রহীত করিতেন। কিন্তু পূর্বে যাহার হুদা মাজ হইয়াছিল এই সময়ে তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। কেরিয়ার বিবরণ হইতে আমরা জানা যায়—যে সকল হিন্দু এই সময় পর্যন্তও পার্শ্বভাষা শিক্ষা করেন নাই, তাঁহারাও এখন পার্শ্ব শিক্ষা করিতে থাকেন।

ঐতিহাসিক আবুজ্জার বিবরণ হইতে হুলতান সিকন্দরের চরিত্রের কয়েকটি বিশেষত্ব অবগত হওয়া যায়—সতের জন ধাতানামা এবং শুশালী পণ্ডিত সর্বপ্রাণী তাঁহার বাসগৃহে অবস্থান করিতেন। রাতি দ্বিপ্রহরের কালে হুলতান আহ্বারের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বাসিতেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীও হস্তপদ প্রক্ষালনের পর হুলতানের সম্মুখে উপবেশন করিতেন। আহ্বারের পূর্বে একখানি বড় চেয়ার শাখার পার্শ্বে আনয়ন করা হইত উহাতে বিভিন্ন প্রকার আহ্বারীয় দ্রব্য সাজান হইলে হুলতান আহ্বার করিতেন। হুলতানের সম্মুখে পণ্ডিতগণের আহ্বার গ্রহণ নিষিদ্ধ; স্বতরাং হুলতানের আহ্বারের পর তাঁহারা ঐ সকল

খানা লইয়া নিজ নিজ গৃহে ভোজন করিতেন। সিকন্দরের শুভাঙ্কুরে ও উৎসাহে অনেক নুতন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়; পূর্বে লিখিত গ্রন্থ সমূহের অল্পব্যয় ও ভাড়া রচিত হয়। আগর মহাবৈদ্যক (অথবা ভেষজবিজ্ঞান এবং নিদান) অনূদিত হয়, এবং তিসিকন্দরী আখ্যায়িক গ্রন্থ হয়। এই গ্রন্থ সমূহে আবদুল্লাহ বলেন—ইহা হাইওর চিকিৎসকগণের শিক্ষার প্রথম সোপান এবং বিশেষ বিশেষ রোগেও ব্যবহৃত হয়।”

ওমাক্ষিত মুস্তাকি বলেন,—মিরা ভূখ মুত হাওয়াজ বীর পদ প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী হন। তিনি উত্তম লেখক ও কতকজন পণ্ডিতকে, বিজ্ঞানের প্রতিশাখায় গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত নিয়োজিত করেন। হুলতান গোয়াসান হইতে পুস্তক আনিয়া পণ্ডিতগণকে ও সংস্কৃতদ্রষ্টাকে পণ্ডিতের দেন। লেখকগণ এই সকল গ্রন্থ রচনা কাব্যে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। হুলতান হাইওর খোরাদানের চিকিৎসকদিগকে সমবেত করেন এবং ভেষজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাদী সংগ্রহ করিয়া একটি নির্বাচন করেন। গ্রন্থখানি একরূপভাবে সাজান হইয়াছে যে, তিসিকন্দরী আখ্যায়িক হইয়াছে। ভারতে তদপেক্ষা প্রাচ্য অজ কোন গ্রন্থেরই ছিল না।

সিকন্দরের রাজ্যে আরব, পারস্ত, বোখারা এবং ভারতের পণ্ডিতগণও হুলতানের অগ্রদূত ও উৎসাহে প্ররোচিত হইয়া নুতন রাজধানী আখ্যাত উপাধিতে বাসস্থান নির্দেশ করেন। হুলতানের দরবারের সহিত, রাজ্যের যে সকল সম্রাট ব্যক্তিগণের বিশেষ খনিষ্ঠা ছিল, তাহার

হুলতানের আদেশে, সম্পত্তি ও অজ্ঞাত প্রকারের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া আখ্যায়িক গমন করেন। অলকার শাস্ত্রের আলোচনায় হুলতান উৎসাহ দিতেন।

যে সময় সম্রাটের সহায়তায় সাহিত্য উন্নত হইতেছিল, সে সময়ের একজন বিশিষ্ট মনবী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহম্মদ আলি হোমেন বা একজন প্রধান দানবীর—তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়, যদি কোন লোক তাঁহার নিকট হইতে টাকা গ্রহণের পর মারা যাইত, তাহা হইলে যে টাকা মৃতব্যক্তির কোন আত্মীয়কে দান করিতেন। এবং যদি কোনস্থলে একমাত্র ঝাঁই জীবিত থাকিত,—তবে তাঁহার দত্তক পুত্রকে বিভাগ্যে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মবিদ্যা ও অধ্যবসায় শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন।

সিকন্দরের রাজ্যে অজ আর একজন মহাব্যক্তির নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার দৈনিক কার্যের তালিকা হইতে জানা যায়, তিনি প্রত্যহ কোরাণের ১৭ অধ্যায় পাঠ করিতেন, ঐ কার্য সমাপ্ত না হইলে তিনি অজ্ঞাত পদক্ষেপ করিতেন না। মাউন্ট-উ-সাকলার ১১ কিস্মিল এবং হাফান-ই—হাসের সমস্ত পাঠ করা তাঁহার দৈনিক তালিকার অন্তর্গত ছিল।

ইব্রাহিম লোদী আদৌ তাঁহার পিতা সিকন্দরের পথাবলম্বী ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতের ভাষাবিশিষ্ট গ্রন্থ, কিস্তি যে হুলতানের বশে উন্নতির উচ্চতরে ক্রমে উঠিতেছিল, হুলতানদিগের বংশের থাকিলে হস্তে উন্নতির পূর্ণমাত্রা বিকাশ পাইত।

কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

খাদ্যে শ্বেতসার

পূর্বে আমরা খাদ্যে অন্নসার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অন্নসার প্রবন্ধে আমরা শ্বেতসার সম্বন্ধে দু'একটি কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে এই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। শ্বেতসারে অল্পসারসার, অন্নসার, উন্নসার ব্রহ্মসার আছে। শ্বেতসারে দুইটি জলে যে পরিমাণে ব্রহ্মসার থাকে সেই পরিমাণে শ্বেতসারে আছে।

খাদ্যরূপে আমরা যে শ্বেতসার গ্রহণ করিয়া থাকি মোটামুটি তাহার চারিটা কার্যকারিতা দেখিতে পাই।

১। দৈহিক কোষগুলির বিশেষতঃ মাংস-পেশী সমূহের কার্য-পরিচালনের জন্ত যে শক্তির প্রয়োজন তাহার অধিকাংশই শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য হইতে উৎপন্ন। নানা প্রকার পক্ষাকার দ্বারা, হিরীকৃত হইয়াছে যে, মাংসপেশী যে পরিমাণে কার্য করিতে থাকে সেই পরিমাণে ইহার জৈবিক শ্বেতসার (Glycogen) লোপ পাইয়া থাকে। উপবাসকালীন অন্ত্যস্ত দৈহিক পরিশ্রম করিলে সময়ে সময়ে দেহের তন্তু (tissue) ও যকৃত (liver) হইতে এই জৈবিক শ্বেতসার একেবারে লোপ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্বেতসার হইতেই মাংসপেশী ও দেহতন্তুর কার্যকারী শক্তির উৎপত্তি।

২। শ্বেতসার হইতে দৈহিক তাপের উৎপত্তি। প্রতি গ্রাম শর্করা হইতে আমরা প্রায় চার ‘ক্যালরি’ • (Caloric) উত্তাপ পাইয়া থাকি। আমাদের বাহ্যে অধিক-মাত্রায় শ্বেতসার ব্রহ্মসার থাকায় আমরা অতি সমৃদ্ধ ইহা হইতে দৈহিক উত্তাপ পাইয়া থাকি। শ্বেতসার হইতে লব্ধ উত্তাপের অধিকাংশই দৈহিক পরিশ্রম কালে অধিক মাত্রায় ব্যয়িত হইয়া থাকে; তবে বিশ্রাম কালেও ইহা যে ব্যয়িত হয় না এমন নহে। মাংসপেশীর স্বভাব সঙ্কোচন (muscular tone) ইহার কিয়দংশ ব্রহ্মসার হইয়া থাকে।

৩। অন্নসার প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহা অন্নসার—রসক (protein sparer)। শ্বেতসারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিলে অন্নসারের মাত্রা হ্রাস করা যাইতে পারে; তবে ইহার একটা সীমা আছে। আমরা জানি যে একমাত্র অন্নসার ভিন্ন অজ কোন খাদ্য সোরাঙ্গান নাই। কিন্তু দেহের উন্নতি বৃদ্ধির জন্ত সোরাঙ্গান অত্যন্ত আবশ্যক। কাজেই কোন জীব কেবল মাত্র শ্বেতসার খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যে খাদ্যের মধ্যে থাকিখা পেট পুরিয়া শ্বেতসার খাইয়া অবশেষে অনশনান মারা পড়িবে। ফলতঃ শ্বেতসার কেন অজ কোন খাদ্যই অন্নসারের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে না এবং এই হিসাবে কোন খাদ্যই

* এক Cubic centimeter পরিমিত জলকে ৪১—৫১ Centigrade এ গরমিত হইলে যে উত্তাপের প্রয়োজন তাহাকে এক ক্যালরি বলা হয়। বিজ্ঞান-জগতে এই হিসাবে উত্তাপ মাপা হইয়া থাকে।

অন্নসার রক্ষক নহে। তবে অন্নসারের যে অংশ হইতে তাপাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে কেবল সেই অংশের পরিবর্তেই শ্বেতসার বা স্নেহ ব্যবহার করিয়া অন্নসার রক্ষা করা হইতে পারে। নূতন তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য ও পুরাতন তত্ত্ব সংস্কারের জন্য—অন্নসার একান্ত আবশ্যক একথা যেন কোন ক্রমেই ভুল না হয়। এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে স্নেহ ও শ্বেতসারের মধ্যে অন্নসার-রক্ষক হিসাবে শ্বেতসারই বিশেষ উপযোগী। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে অন্নসার-বিবাক্তিগত খাদ্য ব্যবহারের সময় স্নেহ অপেক্ষা শ্বেতসার (অল্প শক্তি হিসাবে তুল্য) মাত্রায় ব্যবহার করিলে কার্যকারী। আর মিশ্র-খাদ্য (mixed diet) ব্যবহারের সময় অধিক পরিমাণে শ্বেতসার ব্যবহার করিলে যে পরিমাণ অন্নসারের দ্বারা 'সোরাভান-সাম্যাবস্থা' পাওয়া যায় স্নেহের সহিত অন্নসারের ব্যবহারে তত অল্প মাত্রায় 'সাম্যাবস্থা' পাওয়া যায় না। দেহের পুষ্টির জন্য শর্করা অপরিহার্য। ইহার অভাব ঘটিলে অন্নসারের বিশ্লেষণ ঘটয়া থাকে; এবং তাহা হইতে শর্করা উৎপন্ন হয়। এই কারণই অনেক সময় বহুমূত্র রোগে (diabetes) এমনও মূত্রের শর্করার ভাগের ত্রাশ হয় না।

(৩) শ্বেতসার দেহের মধ্যে জৈবিক-শ্বেতসাররূপে (Glycogen) থাকে। এই জৈবিক শ্বেতসারের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যদি অপরিস্রুত শ্বেতসার ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে দাশাধঃগতঃ ইহা স্নেহরূপে দেহের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হয়। আবার অনেক সময়ে ইহা হইতে নানাপ্রকার বহুমূত্র রোগের উৎপত্তি

হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমরা যথাসময়ে আলোচনা করি।

দৈহিক শ্বেতসারের উৎপত্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি যকৃত (শতকরা এক হইতে চারিভাগ) ও দেহের মাংস তত্ত্বও পেশীর মধ্যে (শতকরা ৫ ভাগ) জৈবিক শ্বেতসার বর্তমান আছে; আর '১—১৫ ভাগ শর্করা রক্তের শোভের মধ্যে আছে। অনশনকালে অন্নসার হইতে এই জৈবিক শ্বেতসারের উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলেন দৈহিক স্নেহ হইতেও ইহা উৎপন্ন হইতে পারে; তবে এ সম্বন্ধে সমতত্ত্ব আছে। যাহাই হউক সাধারণতঃ শ্বেতসারই জৈবিক শ্বেতসারের মূল উৎপত্তির কারণ।

আমরা যে শ্বেতসার খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে নানাপ্রকার বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে এবং পরিশেষে তাহাই জৈবিক শ্বেতসারের পরিণত হয়; অল্প হইতে শ্বেতসার মনো-সাক্কারাইডস্ (monosaccharides) রূপে শোষিত হয়। গাৰুকী হইতে অতি অল্পই শর্করা শোষিত হইয়া থাকে। ইনভার্টেজ (Invertase) নামক কিপের (ferment) সাহায্যে ইন্স-শর্করার (cane-sugar) কতক ভ্রাঙ্কশর্করায় (Grape-sugar) আর কতক মধু-শর্করায় (lavulose) পরিণত হয়। আর দুধ-শর্করা হইতে দুধ কিপের (lactase) সাহায্যে ভ্রাঙ্ক শর্করা ও গ্যালাক্টোজ (galactose) এ পরিণত হয়। এই সকল অম্ল অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে মূত্রের সহিত দেহ ত্যক্ত হইয়া থাকে।

আমাদের খাদ্যের অধিকাংশ শ্বেতসারই শালিজাতীয় দ্রব্য (Starch) হইতে গৃহীত হয়। এ কারণে শোষণ কার্যের অনেক

সুবিধা ঘটে। এই শালী জাতীয় খাদ্য হইতে ভেতশর্করা (maltose) ও 'প্রাথমিক ভ্রাঙ্ক-শর্করা' (Dextrine) হয়। পরে ইহা হইতে ভ্রাঙ্ক-শর্করায় পরিণত হইতে সময় লাগে; ফলে শোষণ বেশ অল্প অল্প ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহাতে ৫০০ গ্রাম বা ততোধিক (প্রায় এক মের) শালী জাতীয় দ্রব্য অনা-য়নে ভ্রাঙ্ক-শর্করায় পরিণত হইয়া রক্তমধ্যে শোষিত হইতে পারে। এই ভ্রাঙ্ক-শর্করা পোটাল ভেন (portal vein) দিয়া যকৃততে গিয়া উপস্থিত হয়। যকৃতের একটা প্রধান কার্য এই যে রক্তের মধ্যে শোষিত প্রাথমিক-শর্করাকে জৈবিক শ্বেতসারে পরিণত করে। এইরূপে রক্তে কেবলমাত্র শতকরা ০.১৫ শর্করা নির্দিষ্ট থাকে। সময়ে সময়ে এমনও ঘটয়া থাকে যে অধিক মাত্রায় শ্বেত-সার ব্যবহারে যকৃত সমস্ত শ্বেতসারকে জৈবিক শ্বেতসারে পরিণত করিতে পারে না; তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে রক্তে শর্করা নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়। এইরূপ অবস্থার নাম হাইপারগ্লিসেমিয়া (hyperglycemia) বা 'শর্কারাধিক্য' এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক শর্করার অংশ মূত্রের সহিত দেহ ত্যক্ত হয়; ইহাকে গ্লিসেমিউরিয়া-ইহা বলা হয়। যকৃত যে পরিমাণ শ্বেতশর্করাকে জৈবিক শ্বেত শর্করায় পরিণত করিতে পারে তাহাকে 'শ্বেত-সার-মাত্রা' (assimilation limit of carbo-hydrate) বলা হয়। মাত্রাধিক্য হইলে শর্করা মূত্রের সহিত দেহত্যাগ হয়। এই 'শ্বেত-সার-মাত্রা' বিভিন্ন প্রকারের শ্বেতসার বিভিন্ন প্রকার শ্বেতসারের জন্য তারতম্য ঘটয়া থাকে; এই হিসাবে দুধ-শর্করার মাত্রা সর্বাধিক।

অন্ন ও শালী জাতীয় খাদ্যের সর্বাধিক অধিক। পূর্বেই বলিয়াছি শালী জাতীয় খাদ্য রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া অবাধে বহুপরিমাণে শোষিত হইতে পারে। ইহার কারণ এই যে শালী জাতীয় খাদ্য প্রথমে লালস্থিতি টাইলাইন (ptyline) নামক কিপের সাহায্যে মাল্টোজ (maltose) এ পরিণত হয়। পরে অস্থিতি প্যানক্রিয়াস (pancreas) এর মাল্টেজ (maltase) নামক কিপের সাহায্যে ডেক্সট্রোজ (dextrose) বা ভ্রাঙ্ক-শর্করায় পরিণত হয়। এতদ্রুপে বিশ্লেষণ সময় সাপেক্ষ; কাজেই যকৃত অতি সহজেই অল্প শোষিত ভ্রাঙ্ক-শর্করাকে জৈবিক শ্বেতসারে পরিণত করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রায় ইহাতে চার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু ভ্রাঙ্ক-শর্করা ব্যবহার করিলে ইহা প্রথম হইতেই শোষিত হইতে থাকে; এবং ইন্স-শর্করার অতি সহজে ভ্রাঙ্ক-শর্করায় পরিণত হয়। কাজেই সময়ভাবে যকৃত স্বীয় কার্যসাধনে অক্ষম হয়। খাদ্যের যে অংশ শোষিত হয় না তাহা গাঁজিয়া উঠে (fermented) এবং তাহা হইতে দাখ্য (acetic acid) দুগ্ধ্য (lactic acid) অম্লসার (carbon dioxide), সুরাসার সুরিয়া (alimentary-glycousia) বলা হয়। যকৃত যে পরিমাণ শ্বেতশর্করাকে জৈবিক শ্বেত শর্করায় পরিণত করিতে পারে তাহাকে 'শ্বেত-সার-মাত্রা' (assimilation limit of carbo-hydrate) বলা হয়। মাত্রাধিক্য হইলে শর্করা মূত্রের সহিত দেহত্যাগ হয়। এই 'শ্বেত-সার-মাত্রা' বিভিন্ন প্রকারের শ্বেতসার বিভিন্ন প্রকার শ্বেতসারের জন্য তারতম্য ঘটয়া থাকে; এই হিসাবে দুধ-শর্করার মাত্রা সর্বাধিক।

জৈবিক শ্বেতসার (GLYCOGEN) একস্থলে বলা হইয়াছে যে যকৃতের প্রধান কার্য জৈবিক শ্বেতসার করণ। ১৮৫৭ খৃঃ অশ্বে রুডভ বার্নার্ড (Claude Bernard) প্রথমে যকৃতের ইহার আন্তর প্রচার করেন। ইহার অনেক স্বর্ণ শালী জাতীয় দ্রব্যের স্তায়; এই কারণ ইহার জৈবিক শ্বেতসার নামকরণ

করা হইল। লালান্দিট টাইলাইন (ptyline) এর সাহায্যে ও অম্লজিত ম্যাল্টেজ (maltase) এর সাহায্যে ইহাও ভ্রাক্ষা শর্করাতে পরিণত হয়। যুক্ততে সাধারণতঃ শতকরা ১'৫২—৪ জৈবিক শ্বেতসার থাকিতে পারে। দৈহিক জীবিত, পরিশ্রম, খাদ্য, ঔষধের উপর ইহার পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অধিক মাংসাদি খেতসার ব্যবহারে এমন কি অস্ত্রতঃ শতকরা দশভাগ পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যুক্ততের মধ্যে এই জৈবিক শর্করার অবস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে ইহার অল্প কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে না আবার কেহ কেহ বলেন যে ইহা একপ্রকার রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এ কারণে যুক্ত হইতে ইহাকে পৃথক করিবার কালে পরম জল ব্যবহার করিতে হয়।

জৈবিক শ্বেতসারের উৎপত্তি।

(ক) খাদ্যের শ্বেতসার হইতে :—

খাদ্যে শ্বেতসারের মাত্রা অম্মদার যুক্ততে জৈবিক শ্বেতসারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শাভিক মাংসাদি খেতসার ব্যবহারে ইহার মাত্রা অধিক থাকিবে অপেক্ষা অম্মদা বেশী হইয়া থাকে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রধানতঃ ভ্রাক্ষা-শর্করা (dextrose), মুখশর্করা (lavalose), ইচ্ছশর্করা হইতে ইহার উৎপত্তি। খাদ্যের শ্বেতসার রক্তের স্রোতে ভ্রাক্ষা-শর্করা রূপে আসিয়া যুক্ততে পৌঁছে এবং সেখানে এক অণু (molecule) জল ভাগ করতঃ জৈবিক শ্বেতসারের পরিণত হয়। $C_6H_{12}O_6 - H_2O = C_6H_{10}O_5$ (খ) খাদ্যের অম্মদার হইতে :—

পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে * অম্মদারের কিয়দংশমাত্র শরীরের নুতন তত্ত্ব প্রভৃতি গঠন করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। আংশিগ্গতঃপর নানা প্রকার বিশ্লেষণ ঘটয়া থাকে এই বিশ্লেষণের ফলে সোরাগান অশটুক যুক্ততে ইউরিয়া (Urea) হইয়া যুক্তের সহিত দেহ-তত্ত্ব হয় এবং সোরাগান বিবজ্জিত অংশ নানা প্রকার জিন্দা প্রতিক্রিয়ার পর শর্করারূপে রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হয়, পরে ইহা হইতে জৈবিক শ্বেত শর্করার উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরোক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে রাইসাইন (Glycine) দ্ব্যাসপেপ্তেটিক এসিড (aspartic acid), অ্যালানিন (alanin) প্রভৃতি হইতে দেহের মধ্যে শর্করার উৎপত্তি হইতে পারে। ইহাতে আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেসেইনোজেন (Caseinogen) বা ছানা বাহাতে শ্বেতসারের কোন অস্তিত্ব নাই তাহা হইতেও রাইকোজেন (Glycogen) বা জৈবিক শ্বেতসারের উৎপত্তি হয়। আরও অনেক সময় কঠিন বহুমুখ রোগে (diabetes) খাদ্যের শ্বেতসার একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র অম্মদার জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করিলেও যুক্তে শর্করার হ্রাস হয় না। ইহা হইতে বেশ বৃদ্ধা বাইভেছে যে, এ ক্ষেত্রে অম্মদারই শর্করার একমাত্র উৎপত্তির কারণ। লাস্ক (Lusk) এর মতে শতকরা ৪৮-৬ ভাগ অম্মদার শর্করায় পরিণত হইতে পারে। আরও দেখা যায় যে বহুকাল ধরিয়া উপবাস করিলেও রক্তে শর্করার ভাগ নির্দিষ্ট পরিমাণে (constant) থাকে এই শর্করার উৎপত্তি

অম্মদার বা দেহ হইতেই সম্ভব কিন্তু কতকগুলি কারণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহার আধিকাংশই দৈহিক অম্মদার হইতে উৎপন্ন। দেহের স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ ঘটে কিনা তাহা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না।

(গ) দেহ হইতে :—

দেহ হইতে জৈবিক শ্বেতসার উৎপন্ন হইতে পারে কি না সেই সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। ক্রেমার (Cremier) বলেন যে, গ্লিসারিন (Glycerine) হইতে শর্করার উৎপত্তি হইতে পারে। বহুমুখ রোগে গ্লিসারিন (Glycerine) থাকিলে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দেহে বহু মধো গ্লিসারিন ও দেহহার্যিত (fatty acids) বিলিষ্ট হয়। কাজেই গ্লিসারিন হইতে শর্করা এবং তাহা হইতে জৈবিক শ্বেতসারের উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব নহে।

জৈবিক শ্বেতসারের স্বধর্ম :

জৈবিক শ্বেতসার, শব্দে কখনা মূনির নানা মত। বার্গার্ডে মত দ্রষ্ট্রিক বাঁহাধারের জ্ঞা যুক্তে এই শ্বেতসার অস্থায়ীভাবে রক্ষিত হয়। পরিপাক কালে পোর্টাল ভেন (portal vein) দিয়া যুক্ততের মধ্যে ভ্রাক্ষা শর্করা আসিতে থাকে। যদি এই শর্করাকে কোনপ্রকারে রক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং যুক্তে মুশাশয় দিয়া যুক্তের সহিত দেহ-তত্ত্ব হইবে। কিন্তু যুক্ত দিয়া যাইবার কালে যুক্ততের কোষগুলি এই শর্করা হইতে জল বাহির করিয়া লইয়া (de hydrating) ইহাকে জৈবিক শ্বেতসারে পরিণত করিয়া নিজের কোষের মধ্যে অস্থায়ী ভাবে আবদ্ধ

করিয়া রাখে। পেভি (Pavy) বলেন, যদি কোন কারণে সমস্ত শ্বেতসার এইরূপে পরিবর্তিত না হয় তাহা হইলে হাইপার রাইসেমিয়া (hyper glycemia) ঘটী সম্ভব। যথার্থই অনেক সময়ে অধিক মাত্রায় শ্বেতসার ব্যবহারের জ্ঞা যুক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

আবার আবজ্ঞক মত যুক্ত হইতে এই জৈবিক শ্বেতসার রক্তের স্রোতে ভ্রাক্ষা শর্করারূপে মিলিত হইতে থাকে কাজেই রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক (০.১—০.২) থাকে।

বাস্তবিক যুক্ততে যে জৈবিক শ্বেতসার হইতে পুনরুৎপাদিত ভ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হয় তাহা নিরানিষিত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। দেহ হইতে যুক্ত, পৃথক করিলে জন্মঃ জৈবিক শ্বেতসারের হ্রাস ও ভ্রাক্ষা-শর্করার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে জৈবিক শ্বেতসারের গোপ হয়। তখন কেবলমাত্র ভ্রাক্ষাশর্করার অস্তিত্ব থাকে। কি কারণে জৈবিক শ্বেতসার হইতে পুনরায় ভ্রাক্ষাশর্করায় পরিবর্তিত হয় তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন ইহাতে এক প্রকার কিণু (Enzyme) আছে। এই জৈবিক শ্বেতসার হইতে দৈহিক দেহের উৎপত্তিও ঘটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

শ্বেতসারের পরিণতি :

দেহে শ্বেতসারের শেষ পরিণাম অম্মদার ও জল। কিন্তু এই পরিণতি ঘটে তৎসম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু ঠিক করিয়া বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে শ্বেতসারের উপর প্যাঙ্ক্রিয়াস (pancreas) এর রসের কার্য-কারিতা আছে। ইহাতে একপ্রকার কিণু আছে, তাহার শর্করা বিশ্লেষণের ক্ষমতা

* মং লিভিত বাস্তে অম্মদার শীর্ণক প্রবন্ধ ক্রষ্টব্য।

আছে। ইহার অভাবে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কোহিউহেম (Cohuheim) বলেন যে দেহতন্ত্রের সার (Expressed juices of muscles) ও প্যানক্রিয়াস (pancreas) এর নিখাস শর্করার সহিত মিশ্রিত করিলে শর্করার লোপ হইয়া থাকে (Glycosis)। কেহ কেহ বলেন জৈবিক খেতসার প্রথমে দুধারে পরিণত হয় পরে সুরাসার (alcohol) ও অম্লার বাষ্প হয়; পরে সুরাসার হইতে ধাত্যার (acetic acid), ফর্মিক এসিড (formic acid) এবং শেষে অক্সারাম ও বাশ্পে পরিণত হয়। আবার কাহারও মতে রাইকিউরোণিক এসিড (Glycuronic acid) বেতসার (oxalic acid) হয় এবং শেষে অম্লার ও জলীয় বাষ্প হয়।

খাদ্যে খেতসারের পরিমাণ :—

মোলেসস্‌টাই (Moleschott)	৫৫০	গ্রাম্‌
রান্কে (Ranke)	২৪০	"
ভয়েট (Voit)	৫০০	"
ফর্স্টার (Forster)	৪২৪	"
ওয়াটার (Atwater)	৪৪০	"

অন্নদার সম্বন্ধে আলোচনার কালে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে এ ক্ষেত্রে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। *

যাহাদের অধিক দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয় তাহাদের অধিক মাত্রায় খেতসার গ্রহণ করা বিধেয়।

খেতসার সম্বন্ধে আর দু একটা কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। খেতসারের একটি বিভাগকে কোষাঙ্ক বা সেলুলোজ (Cellulose) বলা হয়। সাধারণতঃ মনুষ্য সেলুলোজ হজম করিতে পারে না কিন্তু কোন কোন স্থলে (কপি, গাজর, মূলা ইত্যাদি) ইহা বেশ পরিপাক হইয়া যায়। ধান্দা ইহার অস্তিত্ব অল্পের পরিচালন (peristalsis) অধিক মাত্রায় ঘটাইয়া থাকে এ কারণে কোষ্ঠ কাঠিগ্ধ ঘটে না। যাহাদের এই রোগ আছে তাহারা 'মিলের আটার' পরিবর্তে ধাত্যর ডাল্পা আটা বা লাল আটা ব্যবহার করিলে অনেক উপকার পাইতে পারেন। কাঁচা ফলে যথেষ্ট পরিমাণে সেলুলোজ থাকে সেই জন্ত ফল ব্যবহারেও অনেক সময়ে যথেষ্ট উপকার হয়।

বিভিন্ন খাদ্যে খেতসারের পরিমাণ :—

খাদ্যের নাম	পরিপাক যোগ্য খেতসার	সেলুলোজ বা কোষাঙ্ক
মাংস	০.৩	০ নাই—
পনীর বা ছানা	৩-৭	নাই—
গো দুধ	৪.৮	নাই—
মুখ্য দুধ	৫.০	নাই—
ময়দা	৭.৭৮	০.৩
চাউল	৭.৭৪	০.৬
ডাল (ছোল, মটর ইত্যাদি)	৪০-৫৪	৪-৭
আলু	২০.৬	০.৭
গাজর	২.৩	১.৪
বাঁধা কপি	৪-৬	১-২
ফল	১.০	৪

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন *

অল্পের মধ্যে বাস করিয়া কৃষ্ণীরের সহিত বিবাহ করা কিছুতেই সম্ভবে না—সর স্বগতে বাস করিয়াও মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করা দুঃস্থতা মাত্র। আমাদের অলক্ষিতে মৃত্যু তাহার অদৃশ্য রাষ্ট্রা বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে—আমরা প্রতিদিন 'মরণের' সঙ্গেই যর করিয়া থাকি। কিন্তু মৃত্যু ভিন্নিষ্ঠা! এমন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইলেও—দুই একজনের বিবাহ প্রাণ স্বতাই স্বপ্ন স্বরে আশ্রয় করিয়া উঠে—“হে মৃত্যু, তোমার কি এ জীবনটী না লইলে চলিত না? পথের পাশে ঐ যে অন্ধ রোগশিখি ভিখারি একমুঠি অন্ন লালারিত হইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অশঙ্ক মরণ ভোগ করিতেছে—তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে তবে সেও জুড়াইত—ধরণীর দুঃখের ভারেরও কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইত;” কিন্তু তুমি তাহাকে না লইয়া লইলে এমন একটা প্রাণ যাহা নীল আকাশে হীনখিল জ্যোতিষের মত অন্ধকার রজনীতে বিদ্য আলোকধারা বিকিরণ করিতেছিল—যাহা নয়নাভিরাম ভাবল তরু শাখায় মাধুর্য্য মজিত স্বগন্ধি পুষ্পের মত ফুটিয়া পরনে তাহার স্বপ্না গন্ধ বিতরণ করিতেছিল—যাহা গিরি নিঃসৃত স্বচ্ছ জলধারার স্রাব, প্রবাহিত হইয়া উষ্ম ক্ষেত্রে উর্বরতা, ও তৃপ্তিকে স্রুণের প্রদান করিয়া কত তরুণীকে অভীরের পথে বহন

করিয়া লইয়া যাইতেছিল। যাহার অভাবে সমসার নিরানন্দ হয়, সহস্র লোক বন্ধুহারা হয়—জীবনের আকর্ষণ কমিয়া যায়—তুমি বাছিয়া বাছিয়া সেই প্রাণ গুলিকে এমন নির্ধন ভাবে হরণ করিয়া লও কেন?”

আজ যে প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিতে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, সে প্রাণ এমনি করিয়া অকালে মৃত্যু কর্তৃক সংসার হইতে অপস্থত হইয়াছে। আজ এ কথা নিঃসঙ্কেতে বলা যাইতে পারে যে এই আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তির নিদর্শন শূদ্ধ লোকচাচর বা বাহ্য আড়ম্বর মাত্র নহে—এ পুঞ্জা জগৎয়ের পুঞ্জা—অকৃত্রিম ভক্তির ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি—; কারণ যে ব্যক্তি একবারও এই মগন্ধার ময়ূঃপুত জীবনের কল্যাণ গোয়ার মধ্যে পার্শ্বাপ করিয়াছেন—তিনিই এই মৎঃ চরিত্রের শুদ্ধ পুত দেব প্রভাবে অহঃপ্রাণিত হইয়া চিরদিনের জন্ত তাহার ভক্ত সেবক হইয়াছেন। স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথের মধুর চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছে—অথচ তাহাকে ভালবাসে নাই এমন লোক আমি একটাও দেখি নাই, যে তাহার সহিত একবার মিশিয়াছে সেই বলিয়াছে একটা পরিজ পুণ্য শিখার সন্নিধান বাস করিলে মনে যে নিখিল ভাবের উদয় হয় বিনয়েন্দ্রনাথের সহবাসে তাহাই হইত। হায়! এমন জীবনকে আমরা অকালে হারাইয়াছি। বঙ্গ মাতার অঙ্কে এতাদৃশ

* খণ্ডীয় অধ্যাপকের সাংখ্যসরিক আক্ষোপলক্ষে একটি স্থিতি সত্যার পাঠিত।

আখ্যায়—৭

হৃদস্থানের সমাগম বড় অধিক হয় না। জান্নাও এ স্থানকে হারাইয়া প্রকৃতই দীনা হইয়াছেন।

বিনয়েন্দ্রনাথের বিয়াগে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা অস্বকঠিন। সেই সখল বিনয়ী, হুকোমল স্বামী সন্তানের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারে যে নিরাশ্রয় শোকের ছায়া নিপতিত হইয়াছে—জান্না না তাহা আবার কখনও আলোকে উজ্জ্বল হইবে কি না। পরিজনদের গভীর শোকের কথা সঘণ্টে কিছু বলিতে না যাওয়াই ভাল তাহাদের যে স্থান শূন্য হইয়াছে তাহা কখনও পূর্ণ হইবে কিনা জান্না না—তাহাদের শোক অন্তর্দ্বারী ভিন্ন অস্ত্রে কেহ বৃথিবেনা না—আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা দুঃখাপহারী হরি তাঁহাদের হৃদয় বাখায় শান্তিবারি সিঞ্জন করুন—মানব এ পোকে সাহসী রিতে অক্ষম। আত্মীয় স্বজন—যাহাদের সঙ্গে বিনয়েন্দ্রনাথের রক্তের সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল—তাঁহারা তাঁহার অর্শনে শোকে নিয়তময় মৃত্যুমান হইলেও, তাঁহার অর্শনে তাঁহার পরিবারের বহির্ভূত যে সকল ব্যক্তি আজ হাহাকার করিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যাও স্বল্প নহে। বিনয়েন্দ্রনাথ একটী নিষ্কিষ্ট পরিবারে জয়গ্রহণ করিলেও সংগ্রহ দেশের মাধার্য সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। মায়ের শুধু দেহ ও রক্তের সঘণ্টেই আপনার হয় না—স্বপরিভা ভাববাগের সঘণ্টে একটী হৃদয় যে আর একটী হৃদয়ের সতিত শুভ মিলনে সম্মিলিত হয় সেই মিলন দেহ ও রক্তের মিলন হইতেও নিবিড় এবং স্থায়ী। সাধু চরিত্রের ভিত্তি দিয়া ভগবান যখন বৃহদ বৃষ্টিতে আশ্বস্বরূপ প্রকাশিত করিয়া মানবের মন হরণ করেন, তখন মায়ের যে

খনিষ্ঠ বেহে বন্ধন উপলব্ধি করে তাহার সহিত সংসারের কোন সম্বন্ধই তুলিত হইতে পারে না। বিনয়েন্দ্রনাথের প্রেমপূর্ণ হৃদয় প্রেমময়েরই মঙ্গল পৌষের পরিপূর্ণ ছিল—তাঁহার হুকোমল আঙ্গানের পশ্চাতে বিশ্ব-দেবতার আঙ্গানই ধনিত হইত—সেইজন্ত তাহা এমন মধুর, এমন প্রাপ্যপূর্ণী ছিল—সেইজন্তই সে আঙ্গানে মানবহৃদয় শাড়া না দিয়া থাকিতে পারিত না—সেইজন্যই তাঁহার মৃত্যুতে আজ তাঁহার পরিবার বহির্ভূত বহুগতিকা আত্মীয়বিচ্ছেদজনিত শোক অশ্রুতব করিতেছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে দেশের একটী সম্প্রদায় একটী মহান আশ্রয়তরুর শিথ ছাড়াই হইতে চিরমিলনের জন্ম বঞ্চিত হইয়াছে—সেটী দেশের ছাত্র সম্প্রদায়। এমন মহীয়ান ও চরিত্রবান শিক্ষক, এমন হিতকারী উপদেষ্টা ও হুকোমল বন্ধু—এমন আশ্রয়তরী সেবক ও সংসারী নেতা—আর কখনও তাঁহারা লাভ করিবেন কি না সন্দেহ। যখনই যেখানে তাঁহার কোন ছাত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখনই তাঁহার মূখে বিনয়েন্দ্রনাথের অবিস্মৃত প্রশংসার কথা শ্রবণ করিয়াছি, এবং সেই প্রশংসার মধ্যে তাঁহার নির্মল চরিত্রের প্রশংসাই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার অধ্যাপনার প্রণালী সফলও সফলই একবাক্যে প্রশংসা করিয়া থাকেন—কিন্তু তাহারই সঙ্গে সফলই বলিয়া থাকেন এমন স্থিতি চরিত্র কখনও দেখি নাই। অল্প সৌষ্ঠবে তিনি রূপারও পুরুষ ছিলেন এ কথা বলা চলে না—কিন্তু স্থনির্মল আত্মার পুণ্য প্রভা তাঁহার দেহকে যে কি এক অপূর্ণ দিব্যপ্রভে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত

করা যায় না—যে তাহা দেখিয়াছে—সেই হৃদয়ে সে রূপ উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। ছাত্র সম্প্রদায় তিনি তাঁহার প্রাবৃত্র হৃদয়ের গুণে মুগ্ধ ছিল—তাঁহাকে আমরা নিম্নলিখিত আদর্শ অধ্যাপক নামে অভিহিত করিতে পারি।

বিনয়েন্দ্রনাথের এই অধ্যাপনা ও পরিচালনা সাক্ষ্যের মূলে একটি বস্তু ছিল—সেটী তাঁহার ভগবানে আশ্রয়মণ্ডল। যে সখল অন্তঃকরণে ভগবানের হাতে আপনার সকল ভায় সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে, যে প্রাণপণে সর্বকথ্য সম্পাদন করিয়া কলঙ্ক সর্বমুখে নিবেদন করিতে পারে—তাঁহার জয় জগতে অনিব্যাহ্য। যিনি মুককে বাচাল করেন, পঙ্খজনক গিরিজামনে সমর্থ করেন—বামনকে চাঁদ ধরান—তাঁহাতে সকলই সম্ভব। “হামি কি বলিব জান্না না—যে অথটন ঘটন-পট বিধাতা: তুমি আমার মুখে বাণী ধারও”

বিনয়েন্দ্রনাথ বিপরীত অন্তঃকরণের ভক্ত উপাসক ছিলেন—সেই অসীমের চরণোপান্তে সখল শিশুর মত দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারই আধিতে আঁখি রাখিয়া তিনি আপনার জীবনে শক্তি সঞ্চয় করিতেন—এবং অন্তর্নিহিত এই বিশ্বশক্তির বলে বলীয়ান হইয়া, যখন তিনি ছাত্রগণের সম্মুখে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তখন মর্ন্তের জিহ্বায় স্বর্ণের বাণী ধনিত হইত—তখন যাদের মননে আশ্রয় স্বর্গীয় জ্যোতি: সূচিয়া উঠিত—তাই ছাত্র-হৃদয় এমন আগ্রহ ভরে তাঁহার উপদেশস্বাধীন করিতে ব্যাহুল হইত। বাহির তাঁহার অন্তরেই প্রতিকর্ষ ছিল—ভিতরে ও

বাহিরে কোন ব্যবধান ছিল না। চরিত্রের এই বহুতাই তাঁহার কল্যাণ-প্রভাবের নিগূঢ় ভিত্তি ছিল।

বিনয়েন্দ্রনাথ মানবাত্মার অপরিমিত মহত্ত্বে বিশ্বাসবান ছিলেন। তিনি মানবকে ক্ষুদ্র চকুতে দেখেন নাই—মানব অনন্তের সন্তান। তাঁহার মধ্যে ভূমার মহীমতী শক্তি কবিতা স্বপ্ন আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে—ইহা তিনি বিশ্বাসনেজে দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু মানবের প্রাত্যহিক জীবন যে কল্প মলিন ও পাপপঙ্কিল তাহার ধারণাও তাঁহার চিত্তে স্থাপ্ত ছিল। নরজাতি আপনার উচ্চ মহিমা বিশ্বস্ত হইয়া আসক্তি মায়া ও মোহের বৃহকে কল্প দীন জীবন বাপন করিতেছে ইহা ভাবিয়া তিনি ব্যথিত হইতেন—কিন্তু তাঁহার এই মিলন চিরদিনই অটল ছিল যে মানবের এ বিশ্বাস তা কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ব্রহ্মায়ি কিছুদিনের জন্ম ভ্রমাজাদিত থাকিতে পারে—সে অগ্রি কখনও নির্মল প্রাপ্ত হই না—ভগবৎ কৃপার পবনে জীবনের শুভ মুহূর্ত্তে যেদিন এই ভণ্ড উড়িয়া যাইবে সেই দিন প্রজ্জ্বল দৈবীশিবা মংসারের শত অব্যবধানী রাশির উড়ে আপনার উজ্জল প্রভা বিস্তার করিয়া দেবলোকের অমৃতমুখ উখিত হইবে। মায়ের ভুলিয়াছে কি উচ্চকুলে তাঁহার জন্ম—সে যদি বৃষ্টিতে পারে যে সে স্বর্গ পিতার সন্তান—যদি বৃষ্টিতে পারে তাঁহার নিখতি কি মহান—তাহা হইলে মংসারের কোন নীচতা আর দেবলোকবাসী আজ্ঞাকে আপনার মোহজালে জড়াইয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না—তখন তীর্থযাত্রী প্রাণপণে নিজ পায়েই সৎগ্রহ করিয়া সখল দুঃখ দেশ প্রফুল্ল চিত্তে বহন করিয়া সেই ভুবনবাসের মন্দির উদ্দেশে যাত্রা করিবে।

কি উপায়ে মানুষকে এই আত্মজ্ঞানে উদ্ধৃত্ত করিতে পারা যায়? কেমন করিয়া বুঝাইতে পারা যায় যে এই সপার মানব আত্মার চির অবাধ ক্রমি নহে—ইহা তাহার চরিত্র বিকাশের অঙ্কুর বিধাতৃপ্রদত্ত সাধনক্ষেত্র মাত্র—এই পবিত্র সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে সধা সাবধানে ও সংযত থাকিয়া তাহার জীবন-ব্রত উদ্‌ঘাপন করিতে হইবে—এবং যেদিন প্রভু ডাকিবেন সে দিন বিশ্বাসী ভক্তের আনন্দিত মনে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। বিনয়েশ্রদ্ধা বুঝিয়াছিলেন—শিক্ষাই ইহার একমাত্র পথ—নীতিম শুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা নহে, সেমপূর্ণ স্বকোমল হৃদয়ের শিক্ষা স্বায়াই মানব দেহবশে উদীত হইতে পারে। ভগবানের তত্ত্ব সন্তান বিনয়েশ্রদ্ধা ভগবানের নিঃসৃত হইতেই এই বাণী প্রবণ করিয়াছিলেন—সেই জ্ঞানই তিনি শিক্ষকতা কার্য্যকে এমন পবিত্র ও গভীর ভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে জীবিকার্জনের ঠোঁট উপায়ের মধ্যে একটি ছিল না—ইহা তাঁহার পক্ষে হতাশাবশেষ শেষ অবলম্বন স্বরূপ ছিল না—ইহা তাঁহার পক্ষে ভগবানের আদেশ ও জীবনের পবিত্র ব্রত ছিল। এই জ্ঞান এই ব্রতসাধনে তিনি এক্ষণ অসামান্যভাবে দেহমনোপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া সমগ্রী সাধকের স্রাব অঙ্গসর হইয়াছিলেন। কি অসঙ্গ প্রাণপণ যত্নে তিনি ইহার জ্ঞান আয়োজন করিয়াছিলেন। জ্ঞানের সমুদ্র হইতে তিনি সমুদ্রে মগ্নি সংগ্রহ করিয়া মন্দির সাজাইয়াছিলেন—জগতের সাধু ভক্ত বিশ্বের অমৃত উৎস হইতে তিনি রসধারা আহরণ করিয়া প্রাণকে সরস ও সজ্জেল রাখিয়াছিলেন—জীবনব্রত উদ্‌ঘাপনের জ্ঞান তিনি আয়োজনের কোন ক্রটি করেন নাই। অর্থাৎ

দেশীয় আদর্শ শিক্ষক Froebel জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন নান্না বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও তৃপ্তি বোধ করিতেছিলেন না—সেই সময় একবার তিনি Frankfort স্থপতিবিদ্যা শিবিয়ার জন্ত যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন কৃষক বন্ধুর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়া যান। বন্ধুর বিদায়কালে কৃষক Froebelকে তাঁহার নিজের Album এর রক্ষার জন্ত একটি "স্মারকলিপি" লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। ফ্রোবেল বন্ধুর জন্ত এই কথাগুলি লিখিয়া ছিলেন—“মানুষকে জীবিকা প্রদান তোমার লক্ষ্য হউক, আর মানুষকে স্বরূপ দান করা আমার ব্রত হউক। Be it yours to give men bread ; mine to give them—theirself—” এক কথার গুঢ় তাৎপর্য্য তখন তাঁহার হৃদয়সমূহ হয় নাই—তিনি অজ্ঞাতসারে এই দৈববাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—এবং পরবর্তী জীবনে ইহারই পূরণার্থ সর্ব্বশ্রম উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিনয়েশ্রদ্ধা এক্ষণ কোন কথা কখনও বলিয়াছিলেন কি না জানি না—কিন্তু এক্ষণ বাণী উচ্চারণ না করিলেও তাঁহার জীবনব্যাপী উপায়ের মধ্যে আমরা এই-বাণীই ধনিত স্মৃতিতে পাই—মানবকে প্রকৃত্ত মহত্বাশ্বে ফিরাইয়া আনিতে হইবে—মানব সন্তানকে প্রকৃত্ত আত্মজ্ঞানে উদ্ধৃত্ত করিতে হইবে। মানুষকে মহত্বাশ্বে ফুটাইয়া তোলা—এই কার্য্যই তিনি জন্মেরে তৃত্ত জীবনের জন্ত লাভ করিয়াছিলেন—তাই শিক্ষকতা কার্য্যে তিনি এমন আত্মসারা হইয়া যাইতেন। ফ্রোবেল যখন নান্না কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার পর শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইলেন তখন তিনি এই কার্য্য সম্বন্ধে একজন বন্ধুকে পত্র লিখিয়া ছিলেন—“শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আত্ম আত্ম

সেই অল্পমাত্র স্বাভাবিক আনন্দ লাভ করিলাম বাহা বিধেদ উদ্ভূত বাস্তবে পক্ষ বিস্তার করিয়া লাভ করে, যাহা মন্তঃ প্রবর্তমান সলিলে সত্ত্বর্ণণ করিয়া লাভ করিয়া থাকে।” আমাদের এই আদর্শ অধ্যাপক সম্বন্ধেও একথা সম্পূর্ণ সত্য—সত্যই বিনয়েশ্রদ্ধা অধ্যাপনা কার্য্যে জলবিহারী মৌনের ও গগন-বিহারী বিশ্বকর্মেয় মুক্ত আনন্দ ও স্বাভাবিক আনন্দ লাভ করিতেন। জীবন-দেবতার নিকটে জীবনের ব্রত লাভ করিয়া সকল কলকাক্ষা পরিহার পূর্ব্বক, কর্তব্যের বৈধিকাতলে আত্মবলিদান করিয়াছিলেন। বহির্বিহা তাঁহার কার্য্য কল্যাণপ্রস্থ হইয়াছিল। তিনি নিজের শক্তির উপর নির্ভর করেন নাই—সকল শক্তির আধার সেই ভগবান হইতেই তিনি সকল শক্তি সংগ্রহ করিতেন—তাই তাঁহার প্রভাব অজ্ঞেয় হইয়াছিল। অন্য উৎসের সহিত প্রার্থের এই যে নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন যোগ—ইহাই তাঁহাকে চিরদিন সুরভাষ পূর্ণ রাখিয়াছিল—আশা বল উৎসাহ সকলই তিনি এই চিরন্তন মূল উৎস হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণ-সম্পর্শই তাঁহাকে সঙ্গারের আবির্ভাব হইতে প্রমুক্ত রাখিয়াছিল।

তিনি জানিতেন শুদ্ধ জ্ঞানের আলোচনা মানুষের নিকট স্বর্ণের বার্তা বহন করিয়া আনিতে পারে না—কিন্তু দেবপ্রাপ্ত প্রাণ তাহা সাধন করিতে পারে। কলের জল ছিটাইয়া তৃপ্তি মুক্তিকাকে সম্পূর্ণ সরস করা সম্ভবপর নহে—কিন্তু আবারও নবনব হইতে যখন নিবিড় বর্ষার বারিধারা ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হয় তখন ধরণীর সকল শুষ্কতা নিমেষে কোথায় অজহিত হইয়া যায়—খাল বিল নদী নাল—সকলই পরিপূর্ণ হইয়া উঠে—ধরণী নব-

জীবনের শ্রাম-শোভায় অপূর্ণ শ্রীধার করে। মর্ত্ত্য মর্ত্তকে স্বর্ণে উদীত করিতে পারে না—শুদ্ধ জ্ঞানকে মহান করিতে পারে না—সত্য শিব হৃদয়ের প্রেরণা না থাকিলে মেঘের হৃদয় কে ভাঙিতে পারে? বিনয়েশ্রদ্ধা ব্রহ্মগত প্রাণ ছিলেন—তিনি জন্মের অহং-জ্ঞান হইতে সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ রাখিয়াছিলেন—সেইজন্ত দেবজ্ঞত্বেরে তাঁহার জীবনের বাণী এমন মনোমোহন স্বরে বাখিয়াছিল। বাস্তবিক সে বাণীর ধনিত্যে এমন মোহ ছিল যাহাতে যমুনা উজ্জান বাহিত—সংসারাত্মিক চিত্ত পূর্ণাঙ্গেরে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেবলোকের দিকে প্রবাহিত হইত। বাল্যকালে আমরা একটি খেলা খেলিতাম—তাহার নাম ছিল বুড়ি হোঁধো খেলা। একটি বালক চোর হইয়া অস্ত্রাচ্ছ বালকদের ছুঁইতে চেষ্টা করিত—বাহাকে সে ছুঁইত সে “চোর” হইত। অপর একটি বালক বুড়ি হইয়া বসিয়া থাকিত—চোর সমুদ্রে এই বুড়ির চতুর্দিক রক্ষা করিয়া বালকদিগকে ছুঁইয়া চেষ্টা করিত। কিন্তু যদি ইহার মধ্যে কেহ কোন উপায়ে একবার বুড়ি ছুঁইতে পারিত—তবে সে নিরাপদ; কারণ যে বুড়ি ছুঁইয়াছে তাহার উপরে চোরের আর কোন অধিকার থাকে না—চোর তখন তাহাকে ছুঁইলেও সে মরে না। আমার মনে হয় অধ্যাপক জগৎও এই বুড়ি হোঁধো খেলা সর্ব্বদাই চলিতেছে—অন্ধকারের দূরত্ব সহ্যতানের সঙ্গী। আগস্ট প্রোভান্ট সর্ব্বদাই মানুষকে সংহার করিবার জগৎ উজ্জত হইয়া আছে—কিন্তু যে মানুষ ভগবানকে ছুঁইয়া লইতে পারে তাহার জ্ঞান ইহাদের কোন বিভীষিকা থাকে না। সে মৃত্যু সমাচ্ছ উপত্যকার মধ্যে অমর হইয়া বিচরণ করে। আমাদের দেশে প্রাচীন-

কালের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বোধ হয় ইহাই নিগূঢ় অতিপ্রায় ছিল—সমসারের প্রবেশ করবার পূর্বে ব্রহ্মের সহিত পরিচয় স্থাপন ও ব্রহ্ম সম্পর্ক লাভ—ইহাই এই আশ্রমের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা সম্পন্ন হইলে তবে মানব সমসারের প্রবেশ করিবে। বৃত্তিকে ছুঁইয়া লইয়া তবে প্রলোভনের মধ্যে বাস করিবে—নচেৎ কে মানব আত্মাকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারে?—এখন কালক্রমে দেশে আর সে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নাই—আর মনে হয় সেরূপ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের এখন আবশ্যকতাও নাই। কিন্তু ইহার কল্যাণকর শিক্ষা কিছুতেই পরিহার করা চলে না। এখন সমসারের কণ্ঠ-বেলাহলের মধ্যেই মাছকে বাস করিতে হইবে—নির্জন গুরুকুলে বাস এ যুগের আদর্শ নহে। কিন্তু সমসারের নিরাপদ হইবার জন্ত ব্রহ্মের সহিত পরিচয়—ইহা একান্ত আবশ্যক। এই কোলাহল-মুখরিত সমনভার মধ্যেই আত্মার নির্জনতা রচনা করিয়া মাছকে প্রতিদিন একবার বিশ্বদেবতার চরণতলে বসিতে হইবে—সেই জীবন-উন্মত্ত হইতে জীবনী-বস সংগ্রহ করিয়া সমসারের কাণ্ডে ব্যাপ্ত হইতে হইবে—নচেৎ কণ্ঠ কেবল “কুন্তের বেগার” মাঝে পর্দাবসিত হইবে এবং সে কণ্ঠে জগতের কখনও শুভ হইতে পারিবে না।

পরমাশ্রমের সহিত জীবনের এই নিগূঢ় যোগ বিনয়েশ্বরাত্মার সকল মাধুর্যের কারণ—এবং ইহাই তাঁহার সকল সাফল্যের প্রকৃত স্বেচ্ছা। আমি পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার বিয়োগে দেশের ছাত্রকুল নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—এ কথা বলার অপভ্রংশই হই নাহে—যে বিনয়েশ্বরাত্মার জায় পাতিতশাস্ত্রী শিক্ষক ছাত্র সম্প্রদায় আর পাইবেন না। তাঁহার

পাতিত যে অশ্রিয় গভীর ছিল—যে তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে সেই তাহা বলিবে—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটা উজ্জল রত্ন ছিলেন। তাহা হইলেও জ্ঞানের হিসাবে তাঁহার অপেক্ষাও যে উন্নততর ব্যক্তি নাই তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—যে জ্ঞানের বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান গভীর প্রবেশ অতি অল্প লোকেরই আছে। তিনি কাহারও দ্বারা করা কথা লইয়া কোন বিষয়ের আলোচনা করেন নাই—যদি কাহারও নিকট দ্বার করিয়া থাকেন তবে সে তাঁহার জীবন-সংকল্পের নিকট। এ দ্বার তিনি উচ্চকণ্ঠে জগতের নিকট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোন বিষয়ের আলোচনায় একজন যে ভাবে তাহা দেখিয়াছেন তিনিও সেই ভাবেই তাহা দেখিবেন—এ প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। সেই জন্ত তাঁহার সকল আলোচনাই মৌলিকত্বের পরিচয় দ্বিত্বিত থাকিত। দেবতা তাঁহার জীবনবেশে প্রতিদিন নৃতন তত্ত্ব লিখিয়া দিতেন—তিনি জগতের নিকট সেই তত্ত্ব প্রচার করিতেন। সেইজন্যই তাঁহার আলোচনা সরল ও প্রাথমিক হইত। একবার তিনি যুবকদের এক সভায় নটিকতা ও যমের উপাখ্যান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। যম বলিলেন—“নটিকতা, তোমার মত এমন শ্রোতা আর আমি কখনও পাই নাই।” নটিকতা বলিলেন—“আপনার মত এমন বক্তাও আমি কোথাও পাইব না।” বিনয়েশ্বরাত্মা বলিলেন—প্রকৃতই যমের মত এমন বক্তা আর কোথায় আছে। যাও শ্রমণ ঘাটে—ধাঁড়াও চিত্তার সম্মুখে—কত কথা তোমার মনে জাগিবে—জীবনের কত

অন্যোচিতপূর্ণ ঘটনাদ্রবী নিম্নে তোমার স্মৃতির পথে উদিত হইবে—একটির পর একটি—আর একটি—আর একটি—কথার আর ‘অন্ত নাই—চিত্তার বিবাস নাই। যম শ্রমণক্ষেত্রে তোমাকে কত কথা বলিবেন—এত কথা এমন দ্বন্দ্বের গ্রাণী ভাবে আর কে বলিতে পারে? যাও প্রায়াগ সৌমধোঁর বধ সেই মমতামহলের গভীর সমাধিমন্দিরের সম্মুখে—সেই রূপের ছবি তাঁদের সম্মুখে দাঁড়াইলে দেখিবে যম সেখানে নীরব ভাষায় তোমাকে কত কথা বলিবেন—তোমার মানদ-নেত্র যুগান্তের ইতিহাস স্বপ্নেই রেখায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে—মোগল ইতিহাসের সেই অতীত কাহিনী—সাম্রাজ্যের সেই চির-স্বপ্নের পত্নীজীতি। দ্বন্দ্বের বেলাচূড়ি গাথিত কতীয় দ্বিতর অনন্ত প্রাণন অনন্ত দারায় ছুটিয়া চলিবে। যমের মত বক্তা কে? আর নটিকতার জ্ঞান শ্রোতাই বা কে?—কে উপদেশ দেন?—যাহার দ্বন্দ্বের শ্রদ্ধা আছে তাহারই নিকট উপদেশ ফলপ্রসূ। ব্যাকুলতা ও আগ্রহ ভিন্ন কখনও কোন জনসাধারণ হয় না—অজ্ঞান বিধীন চিত্তে উপদেশ দান উত্তর ক্ষেত্রে বীজ বপনের জায়—তাহাতে ফল প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র। অজ্ঞান দ্বন্দ্বই উপদেশ লাভ করবার যথার্থ অধিকারী।

কোন অধ্যাপক সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ে ছাত্রকে পূর্ণজ্ঞান প্রদান করিবেন—এ প্রত্যাশা আশা করি, কোন বক্তা ব্যক্তিই দ্বন্দ্বের গোষণ করেন না। কিন্তু যে অধ্যাপক অধ্যাপনার দ্বারা ছাত্রের অন্তরে জ্ঞানের জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিতে পারেন, ছাত্রকে নির্মল চরিত্র গঠনের অহঙ্কুল জ্ঞান লাভের জন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিতে পারেন—তাঁহার

অধ্যাপনাই সার্থক হয়। এই মানদেও পরিমাপ করিয়া দেখিলে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, বিনয়েশ্বরাত্মার অধ্যাপনা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল—এবং ‘এক্লব ফল বড় অধিক শিক্ষক হইতে লাভ করা যায় না—সেই জন্তই বিনয়েশ্বরাত্মার মৃত্যুতে ছাত্র সম্প্রদায়ের সমুদ্র ক্ষতের কথা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি যখন ইতিহাস পড়াইতেন তখন প্রকৃতই ইতিহাসের শুদ্ধ অস্ত্র জীবনের সরসতায় সজীব হইয়া উঠিত। তিনি কেবল নীরব ঘটনাবলির—পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিতেন না—কিন্তু বিষয়ের আলোচনায় নিজের পরিপূর্ণ জীবনীয়ল ঢালিয়া দিয়া তিনি ইতিহাসের ঘটনাদ্রবীকে বিধাতার সীলার নির্দর্শনে পরিণত করিয়া তুলিতেন। সমাজের ও জাতির ইতিহাসে সেই বিশ্বপতি, মেতা হইয়া কিরূপ দীর্ঘ দীর্ঘে দীর্ঘে জাতি-জীবনকে জন্মবিবশিত করিয়া তুলিতে—নেন—জীবনের ইতিহাসে কোন ঘটনাই যে নিরর্থক নয় প্রকৃত বিধাতারই অভিপ্রায় প্রসূত—এ সত্য যেন দেবীপায়মান হইয়া উঠিত। তাঁহার ইতিহাসের ছাত্রসম্প্রদায় ইতিহাস পাঠের জন্ত একটা ব্যাকুলতাপূর্ণ আবেগ লইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিত। এমনই, তিনি যখন ছাত্রদের নিকট কোন কাব্যালোচনা করিতেন তখন কাব্য তাঁহার প্রাপ্যপূর্ণ ভাবমাধুর্যে মগ্নিত হইয়া নৃতন অর্থ ও নৃতন সৌন্দর্য লাভ করিত। তিনি Tennyson-এর Holy Grail, এ যে অভিনব ভাবপূর্ণ দান করিয়াছেন তাহাতে কাব্যের মহিমা শতগুণে বর্ধিত হইয়াছে। ইহা জানী ভার্কির নীরব সমালোচনা নহে—ইহা পরিপূর্ণ উপভোগের নিম্নল মধুর উজ্জ্বল। একদিন তিনি Tennyson-এর আর একটি

কবিতা Sir Gallahadএর আলোচনা
কালে—যখন এই ছত্রগুলি সমবেদনাপূর্ণ
মর্থস্থল হইতে উদ্ধার করিলেন—
My strength is as the strength of

ten,

Because my heart is pure :

সুনির্মল কাচবগে স্বর্গীয় স্ব্যালোক
পতিত হইলে যেমন তাহা দীপ্তপ্রভায়
চতুর্দিকে প্রতিকলিত হইয়া পড়ে, বিনয়েন্দ্র-
নাথের শুদ্ধপুত্র স্বচ্ছ হৃদয়ে এই ছত্রগুলির
ভাব পতিত হইয়া উপস্থিত শোভামণ্ডলীর
হৃদয়ে তেমনি দীপ্ত প্রভায় প্রতিফলিত হইয়া
উদ্ভূত। পূর্বেও অনেকে ঐ কবিতা পাঠ
করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার মধ্যে এমন
অলৌকিক প্রভাব আছে তাহা কেহই
অল্পভব করিতে পারেন নাই। শুভতার
তোষে তেজীমান হৃদয় যখন আপনার মর্থস্থল
হইতে এই বাণীর পুনরুচ্চারণ করিল তখন
সত্যই যেন সকল হৃদয় আলোড়িত করিয়া
আকাশে ও বাতাসে এই বাকের প্রতিধ্বনি
বিস্তৃত হইতে লাগিল।

কিসে দেশের যুবকস্বয়ের হৃদয়ে মহেশ্বের
ভাব জাগ্রত হইয়া উঠে—বিনয়েন্দ্রনাথের
জন্ম সর্বদা সেইজন্ম ব্যাকুল ছিল। আপনার
হৃদয়ে তিনি যে অমৃত রসের আশ্বাদন লাভ
করিয়াছিলেন সেই অমৃত প্রতিজ্ঞকে প্রদান
করিবার জন্ত তাহার প্রেমিক হৃদয় সদা
লালায়িত ছিল। তিনি নারীর কোমল হৃদয়
লইয়া জগদগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেখানেই
তাঁহার আশ্রয় তুষ্টি ছিল। প্রেমময়ের
এমন নিষ্ঠাবান সাধক অস্তি অজ্ঞই দেখা যায়।
বিশ্বাসের চক্ষে ভগবানকে বিশ্বপিতাক্রমে
দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই অতি স্বাভাবিক
ভাবে তিনি বিশ্বজনকে আপনার করিতে

পারিয়াছিলেন—এ বিষয়ে তাঁহারকে দর্শন
বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় নাই। একটী
গান তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল—“তুমি আমি
নরজাতি, এক বিশ্ব প্রেমে মতি,” ধর্মিক
অর্থও চিনাকার।” ভগবানকে বিশ্বপিতা
বলিয়া ডাকি—অথচ নরনারীর প্রতি প্রেমের
ভাব পোষণ করি না,—ইহা কিরূপে
সম্ভবপর তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না।
যখন কষ্টবোধের অস্থানে তাঁহাকে ইংল্যান্ড ও
আমেরিকায় ঘাইতে হইয়াছিল—তখন সেই
বিশেষে তিনি ঘেরুপে লোকের হৃদয়ের প্রেম
ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—তাহাতেই
বৃদ্ধা মায় তাহার হৃদয় বিকল্প উদ্বার ছিল।
অকৃত্রিম ভালবাসা দান না করিলে
অকৃত্রিম ভালবাসা কেহই লাভ করিতে
পারেন না। প্রেমের মম ঘোষণা করিবার
জটাই যেন বিঘাতা তাঁহাকে জগতে পাঠাইয়া
দিয়াছিলেন। এবং এ মম প্রচারে তিনি
কখনও দ্রাব্য বা কুট্রিত হন নাই। আমরা
অনেকেই উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকি যে পাশ্চাত্য
ও প্রাচ্য আশ্রমের মিলনেই ভারতের প্রকৃত
কল্যাণ সাধিত হইবে। আমাদের দেশে
এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংখ্যা
নিতান্ত অল্প নহে—এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার
গুণে এখন আমাদের শিক্ষিত সম্ভ্রান্তারের দৃষ্টি
দেশের নিজস্ব সম্পত্তির বিকেও আকৃষ্ট হই-
য়াছে। কিন্তু প্রয়াগের সেই আকাঙ্ক্ষিত পুণ্য-
তীর্থে যে এখনও কোন অনাগত ভবিষ্যতের
মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। “মহামানবের
মাগর তীরের” একটী ক্ষীণ কলোমলপনি
যে এখনও স্রুত হইতেছে না। প্রতিভাবান
কবি ভারত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন—

“যেথা একদিন বিরাম বিহীন

মহা ওকার ধ্বনি।

হৃদয় তরঙ্গ একের মতো উঠেছিল রণবিন
তপস্রার বলে, একের অনলে,

বহুরে আহুতি দিয়া,
শ্রিতম কুলিল, আগাগোড় তুলিল,
একটী বিরতি হিয়া।

সেই সাধনার, সে আশ্বাদনার
যজ্ঞ শালায় খোলা আঁজি ঘার
হেথায় সবাই হবে মিলিবারে,

আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের মাগর তীরে।”

কিন্তু এই বর্ণী কি শুধু কবির স্বপ্নেই
পর্যবসিত হইবে? হে ভারতের শিক্ষিত
সম্ভ্রান্ত, তোমরা জীবনে কল্যাণকর শিক্ষা-
লাভ করিয়া আবার কি ক্ষুদ্র সর্বাঙ্গতার মধ্যে
আকর্ষণ নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে চাহিবে?
উর্দ্ধে তোমাদের অমরচূড়িত উন্নত হিমালয়,
নিম্নে তোমাদের দ্বিগন্তবিস্তৃত হ্রদী সিন্ধু—
এই উদারতা ও প্রমত্তির মধ্যে দণ্ডায়মান
হইয়া তোমরা কি হৃদয়ে সর্বাঙ্গতা পোষণ
করিতে পার? মাঘের হৃদয়ান হইয়া মাঘের
পূজা করিতে চাও?—না যে বলিতেছেন,
ডাক আমার সকল সন্তানকে—একটীকে
ছাড়িয়া আশিলেও তোমরা আমার পূজার
মন্দিরে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে না।
মাঘের একটী সন্তানের প্রতিও বিদ্বেষ ভাব
পোষণ করিয়া মাঘের পূজা করিতেছি মনে
করিল মাঘেরই অপমান করা হয়। বিনয়েন্দ্র-
নাথ ভারতের স্বামী প্রবর্তিত ধর্মের ভক্ত
উপাসক ছিলেন—আবার তিনি পাশ্চাত্য
দর্শন জানেও স্বপণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু উভয়
দেশের জ্ঞানের গভীরতা বহুই তাঁহার জীবনে
বিস্তৃত হইতেছিল ততই তিনি—মানব
পরিবারকে “অর্থও চিনাকার” দর্শন করিয়া
মুগ্ধ হইতেছিলেন,—ততই তাঁহার হৃদয়

সম্প্রসারিত হইয়া সকল মানবকে প্রেম
আশিষনে বন্ধ করিতে ব্যাকুল হইতেছিল।
বিনয়েন্দ্রনাথের জীবনে আমরা সেই তির-
বাহিত প্রয়াগ তীর্থের—দুইই মহামানবের
মাগরতীরের আভাস লাভ করিয়াছিলাম।
তিনি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে প্রাণপণে
সকলকে আশ্বাস করিতেছিলেন—

“মার অভিযোকে এস এস স্বরা
মদল ঘট হই নি বে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে—
আঁজি ভারতের মহামানবের

মাগর তীরে।”

বিনয়েন্দ্রনাথ স্বাভাবিক কবিহৃদয় লইয়া
জগদগ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি প্রকৃতির রস-
মাধুর্য্য এমন একান্তভাবে নিমগ্ন হইয়া
হইতেন যে জেও ও তেতনে তাঁহার নিকট
কোন পার্থক্য থাকিত না। সত্যহৃদয়ের
উপাসনায় বহুই প্রাণের স্ববর্ণকোষ সৌন্দর্য্য-
মুগ্ধে পরিপূর্ণ হইতেছিল, ততই তিনি বিধে
সেই হৃদয়ের মোহন প্রতিচ্ছবি স্বপ্নাটাবে
প্রতিফলিত দেখিতে পাইতেছিলেন।
Emerson বলিয়াছিলেন যদি বাহিরে আমরা
দেবতা দেখিতে না পাই, তবে বুঝিতে হইবে
যে অন্তরেও আমাদের দেবদর্শন ঘটে নাই—
অন্তরে সৌন্দর্যের ও রসের উৎস বিদ্যমান
না থাকিলে বাহিরে কেবল মরুময় শুষ্কতাই
দেখিতে হয়। আর হৃদয় যখন আনন্দে
পরিপূর্ণ থাকে—তখন প্রকৃতির সুখমণ্ডলে
অনাবিল সৌন্দর্যের উজ্জল তরঙ্গদ্বারা
লীলায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি
তখন প্রকৃতিমানবের পরিমল-স্বচ্ছ হইয়া পিপাহ
মানবাত্মাকে স্পর্গ-সম্প্রদায়ের অধিকারী করে।
প্রকৃতির রমা নিকতেনে হইট-জার-ল্যাণ্ডের
নির্মলহৃদয় হৃদয়জ্বলি স্বচ্ছজলিনে বিনয়েন্দ্রনাথ

অনন্তের মুষ্টি রূপ দেখিয়া বিমোহিত ও তন্ময় হইয়াছিলেন—লোকবিশ্রুত নারায়ণের ভীষণ-কষ্ট রূপরাশি বিলোকন করণবানের মহাযশী মহিমা তাঁহার দ্বন্দ্বয়ে কি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। শারঙ্গ যামিনীর প্রসন্ন নির্মল আকাশে কমলীয় জ্যোৎস্না রাশির অপূর্ণ লীলায় মুগ্ধ হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য-পিণাৎ দ্বন্দ্ব-বিহ্বল মুখ ও হইয়া কোন্ হৃদয় আনন্দলোকে গিয়া উপনীত হইত। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ সেই রসবস্তুর তুষ্টি-হেতুর মদলবারতা বহন করিয়া তাঁহার চিত্তকে আবুল করিয়া তুলিত। যখন কোন দিন কোন নদী তীরে নির্জন প্রশান্তির মধ্যে উদ্ভুক্ত আকাশতলে বসিয়া তিনি দ্বন্দ্বারাধের উপাসনা করিতেন—তখন তাঁহার কর্ণের মধুর ভাবাবেশে কেমন গভীর ও কোমল হইয়া আসিত—মুখে তাঁহার কি অপূর্ণ লাবণ্য ছুটিয়া উঠিত—আর ভাষা যেন তরুণীর অবিরাগগতি তরঙ্গের ন্যায়ই মধুর নৃত্যে ছুটীয়া চলিত। গীতার বিপ্লব রূপ নন্দন অধ্যায়ে তাঁহার প্রাণ যে কি আনন্দ রসের আশ্রয় পাইয়াছিল তাহা সত্য-কঠোর আমাশের দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তবে গীতার সেই মোকগুণি যখন তিনি ভাব-বিমুগ্ধ-দ্বন্দ্বয়ে উচ্চারণ করিতেন, তখন স্পষ্টই বুঝা মাইত যে তাঁহার মন তখন আশ্রয় হ্রদে সর্পিণী সীমা অতিক্রম করিয়া এমন এক আনন্দলোকে উপনীত হইয়াছে—যেখানে “অসীম তাহার মধ্যে আশ্রয় হ্রদ বাজাইতেছেন” এবং সেই জলই মস্তকের ভাষা তখন ঋষার্থই দেবভাষায় পরিণত হইত। যখন অকূল বাহিরধিক পোতা-রোহণে তিনি আমেরিকায়া যাইতেছিলেন, তখন দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতির সেই উজ্জ্বল

প্রাঙ্গণতলে তাঁহার চিত্ত স্বতঃই গাহিয়া উঠিয়াছিল—

পশ্চাৎ দেববাণ দেব-দেহে
সর্গাৎ শুভা ভূত বিশেষ সম্মান—
ব্রহ্মাণ্যমীশ্ব কমলাসনস্থ
মুখাশ্চ সর্গাহরগাংক দিব্যানু।
অনেক বাহুরবস্ত্র, নেত্রঃ,
পশ্চাৎ আং সর্গাত্তনন্তরুপম
নাশ্রয় নথান পুনস্তবায়িঃ
পশ্চাৎ বিশেষর বিশরূপম।

এইবার তাঁহার পীড়িতাবস্থার সম্বন্ধে ছ একটা কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

যখন আটলান্টিক গর্ভে বিশালকায় টিটানিক বৃহৎ যত কোথায় মিলাইয়া গেল, যখন তাহার যাত্রাবিশেষে শোচনীয় মৃত্যুকাহিনী সংবাদ পরে প্রচারিত হইল—তখন জানিতে পারা গেল যাত্রীরা মৃত্যুভয়ে ভীত না হইয়া, সেই সফট-মুহূর্ত্তে সফটহারীর নাম গাহিতে গাহিতে বিবাসী বীরের দ্বন্দ্ব মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বিনয়েন্দ্রনাথের কোমল দ্বন্দ্ব এই দুর্ভটনায় অত্যন্ত পীড়িত হইল—তাঁহার অতীত কাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, এই ঘটনায় তাঁহার সহ্যক্ষমতা আরো অধিক করিয়া জাগ্রৎ হইল—তিনিও একদিন এই সমুদ্রের উপর দিয়া অর্ধবপোতে আমেরিকায়া গমন করিয়াছিলেন। সে যাত্রায় তিনি আটলান্টিকের রক্তমুষ্টির কোন পরিচয় পান নাই বলিয়া, যেন তাঁহার দ্বন্দ্বয়ে একই ক্ষোভ থাকিয়া গিয়াছিল—আর আশ্রয় একি নিরাশ্রয় সংবাদ। তিনি এ জাহাজ ভূরি সম্বন্ধে এই মন্দিরে দাঁড়াইয়াই একটা গভীর সহ্যক্ষমতাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইদিন প্রাতঃকালের একখানি ইংরাজী দৈনিক

একজন পত্রপ্রেরক এই ঘটনা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে লেখক আরোহী-দিগের অন্তিম মুহূর্ত্তের সংগীতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া “বলিয়াছিলেন—ভীষণ মৃত্যু যখন কয়াল মুখাবাদান করিয়া প্রাণকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তখন এই সংগীত গাহিবার সাহস কাহারও থাকে কিনা সম্ভব। এরূপ মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে দ্বন্দ্বয়ে কি ভাব উপস্থিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করা দুঃসাধ্য—তখন ভয় ব্যতীত আর কোন উচ্চ ভাব থাকে সম্ভবপর নহে—স্বতরাং ওরূপ মুহূর্ত্তে এরূপ সংগীত নিরাশ্রয় ও ভীতির আর্তনাদ ছিন্ন আর কিছুই নহে। বিনয়েন্দ্রনাথের বিবাসী দ্বন্দ্ব লেখকের এই কটাক্ষে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন—তিনি প্রবন্ধ পাঠ-কালীন সেই সম্মুখীন এমন আশ্চর্য্যকর সমবেদনপূর্ণ কর্তে পাঠ করিলেন, যে তাঁহার সেই আবৃত্তি শুনিয়া মনে হইল যে টিটানিকের আরোহীরা এ সংগীতে কি ভাবে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা না জানিলেও ইহা সত্য যে বিবাসী দ্বন্দ্ব মৃত্যুর দ্বৈতবিকাকোপে অতিক্রম করিয়া প্রাণের শক্তি অশ্রুণ রাগিতে পায়—তোমারই নিকট বন্ধু তোমারই নিকট ক্রমশঃ নিকটতর হইতেছি আমি—বদিত ভীষণ ক্রম করে উত্তোলন আমায়ে তোমার পানে যে জীবনস্বামী; সমস্ত পরাণ ভরি উঠিবে সংগীত অহুধিনি এই স্থরে কখন না আমি—তোমার নিকট বন্ধু তোমার নিকট ক্রমশঃ নিকটতর হইতেছি আমি। কিন্তু বিনয়েন্দ্রনাথের তখনও ভক্তির পরীক্ষা হয় নাই—তখনও তিনি ভক্তের মূল্য গ্রহণ করেন নাই—স্বতরাং তাঁহার মুখে মৃত্যুর উপরে নিশ্বাসের জয় ঘোষণার পূর্ণ

মর্যাদা—তখনও সম্ভার বৃত্তিতে পায় নাই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাকে ভীষণ অগ্নির পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল—এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি চিরদিনের জ্ঞান অগতঃ ভক্তবৃন্দের সহিত সমন্বয়ে গ্রথিত হইয়া গিয়াছেন। যখন তিনি টিটানিকের আরোহীদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন যে অলক্ষিতে তাঁহার নিজের জীবন-তরঙ্গী এক ভীষণ বরফপুষ্পের সম্মুখীন হইতেছিল, সে কথা কেহই ভাবেন নাই। তার পর—তাঁহার জীবনেও সেই জাহাজভূমির অভিনয় আশ্রয় হইল। ভীষণ ব্যাধি তাঁহার হৃদয়কে দেহকে আক্রমণ করিয়া তিলে তিলে তাহা ক্ষয় করিতে লাগিল। বিনয়েন্দ্রনাথ বৃদ্ধিলে তাহার দেহতরঙ্গী ভয় হইয়াছে—তাহাতে ভাল সমুদ্রের জল প্রবেশ করিতেছে—অচিরেই তাহা মৃত্যুর সাগরে নিমজ্জিত হইবে। চিকিৎসকেরা নানারূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন—কিন্তু তিনি মনে মনে বৃদ্ধিলে ইহা ক্রমশঃ শেষ পরীক্ষা—বিবাসী-দ্বন্দ্ব নীরবে ব্যাধির ভীষণ যন্ত্রণা সহ করিতে লাগিলেন। স্নেহেচ্ছিত তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন—মৃত্যুর সেই মহাপ্রাণ বৃত্তি তাঁহার রোগশয্যা পার্শ্বে আসিয়া তাঁহার কর্ণে অভয় বাণী উচ্চারণ করিলেন—“ভয় নাই, পান পান হইতে তিক্তরস প্রকৃত চিত্তে পান কর—এ মৃত্যুতে নবজীবন লাভ হইবে।” দেব-শিশু ঈশা তাঁহার প্রাণের প্রিয় আরাধ্য ছিলেন—তাঁহার রোগ শয্যার সমুদ্রস্থ দেওয়ালে সেই ক্রমবিক্রম যীতর মুষ্টি স্থাপিত ছিল—ভীষণ ক্রমের আঘাতে রেহ কথির রম্বিত—কিন্তু শিরোপরি স্বর্গীয় জ্যোতিষ

কি মহিমাময় আবেষ্টন! সেবনন্দন যীশু
বৃষ্টি নীরব ভাষায় তাঁহার ভক্ত অশ্রুচরকে
আশ্বাস দিয়া বলিলেন—“ভয় নাই, কশাক
স্বপ্নে লইয়া আমার অশ্রুস্রবণ কর—বিনয়ে
নাথের রূপে স্বর্গীয় বল উপচিত হইল।
ভক্তের অগ্নি পরীক্ষায় জগতের সকল শাপ-
জ্বরের সঞ্চিত শক্তি ভক্ত হৃদয়ে সঞ্চিত
হয়—বিনয়েক্ষনাথ মৃত্যুভয়ে ভীত হইলেন
না—ভীষণ ক্রশের ভিতর দিয়া তিনি জীবন-
স্বামীর নিকটতর হইতেছেন এই আশ্বাসে
আশ্রয় হইলেন। পথ বড়ই কঠোর বড়ই
নির্ধম কিন্তু তিনি হৃদয়ের উপাশ্রকে নিবেদন
করিলেন—

পথ যেন মনে হয় হে পরাঞ্জয়
বর্গে ঘাইবার তব স্বপ্নের সোপান,
যাহা কিছু নিজ হাতে দিতেছ আমার,
প্রেমস্রমে পে তোমার কল্পনার গান।
শেখে জীবনদেবতা এই স্বনির্ধন প্রাণ
পুশ্টীকে দেহতক হইতে নিঃস্বপ্নে তুলিয়া
লইলেন।

বিনয়েক্ষনাথ বলিতেন—ক্রশের শিক্ষাই
পুষ্ট ধর্মের চরম শিক্ষা নহে—কিন্তু “Resur-
rection বা নবজীবনের শিক্ষাই চরম
শিক্ষা। বাস্তবিক ক্রশের শিক্ষাই যদি
চরম শিক্ষা হইত, তবে ধর্মের প্রতি মানুষের
কি আকর্ষণ থাকিত? ভাবিয়া দেখ ভক্ত-
জীবনের ইতিহাস—মৃত্যু ভিন্ন কখনও

নবজীবনের আবির্ভাব হয় না। বীজকে
মরিতে হয় কাণ্ডের জন্ম—তদিনি নবীজ অকত
ধাক্কাবে ততদিন কাণ্ডের আবির্ভাব অসম্ভব।
আবার এমন যে মননাত্তিমায় হৃদয়-স্বপ্ন
পুষ্প তাহাকেও মরিতে হয় ফলের জন্ম।
পরিশেষে “আবার ফলকেও আশ্রয়বলিমা
দিতে হয়—কারণ তাহা না হইলে এক হইতে
বহুজীবনের উদ্ভব হইতে পারে না।
বিনয়েক্ষনাথ সংসার তত্ত্বর একটি বাহিত-
ফল—সে ফলটি পরিয়া পড়িয়াছে। মাংস
আমরা চিরদিনই ইহার জ্ঞাত শোক করিব—
কিন্তু ভগবান এই জীবনের সাহায্যে আরও
বহুজীবন গড়িয়া তুলিবেন বলিয়াই বৃষ্টি
তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন।
বিষাভার লীলা মাংস কখনও বৃষ্টিবে না—
সে প্রয়াস ব্যথা। আমরা আজ শ্রাদ্ধবাসরে
বিনীতহৃদয়ে কেবল এই প্রার্থনা করি—“হে
বিষাভা তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক; তুমি
এই আশীর্বাদ কর যেন জগতের প্রতি গৃহে
বিনয়েক্ষনাথের ত্রায় দেবসন্তানের আবির্ভাব
হয়।”

“যো ভূতকৃ ভগ্নাথ, সর্গং যচ্চাতিষ্ঠতি।
স্বর্গং চ কেবলং তম্হৈ, ক্রোড়ায় ব্রহ্মণে নমঃ।”
ভূত ভবিষ্যৎ এবং সমুদায় যিনি অখণ্ডিত
আছেন, স্বর্গলোক কেবল গাঁহারই, সেই
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

হিন্দু ট্রাষ্ট

ঈশ্বর নিজ জন

তিনিই সর্বাঙ্গে। নিজ জন গাঁহার সহিত
আমার সম্বন্ধ কিছুতেই ঘূচিবার নহে।

আরাধ্যকে যদি যথার্থতঃ আমা হইতে
পৃথক বলে মনে করি তবে তাঁহাকে যতই
নিজ জন বলে লক্ষ্য প্রকাশ করি না কেন,

তাঁহাকে ঠিক নিজ জন বলা সাজে না। যে
মুহুর্তে তিনি ও আমি অভিন্ন বলে ধারণা
হবে, তখনই প্রকৃত ভক্তির সম্ভাবনা, কারণ
তখনই তিনি সর্বাংগে আমার নিজ হতে নিজ জন,
তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ ঘূচিবার নহে,
তাঁহাকে আর হারাইবার ভয় নাই।
অতঃপূর্বে তাঁহাকে নিজ জন বলা আর উপর
পড়া হয়ে পড়কে আপন বলা একই কথা।
যে বস্তুতঃ পর তাহাকে আপনার লোক বলা
একটা গাছুরি কথা ছাড়া আর কি? “জন
জামাই ভাড়া তিন নহে আপনা”—তা যাই
আপনার আপনার বলে মাথা গুঁড়ে মর;
এও নেন সেইরূপ। সেইজন্য যে ভক্ত
সোহবৎকার অস্বীকার করেন বা সোহবৎ-
কারের নামেই শিরিয়া উঠেন, তাঁহাকে
ভক্তের আশ্রি বলিতে একটু ধেন কুঠা
আসে। অথবা মনে হয় তাঁহার ঐ অস্বীকার
ও শিরিয়া উঠার মর্ম্ম আমরা বোধ হয়
বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যেমন একই
বাক্যে সকল রসনার সমভাবে তৃষ্ণি হয় না,
কেহ ঝাল ভাল বাসে কাহারও বা ঝাল
থেকে চোখ দিয়ে জল ঝরে, বাগালীর পরম
উপাদেয় মিঠাও ইংরাজের রসনায় যেমন
অতৃপ্তিকর, পরমাণে কেহ যেমন অধিক মিঠে
কেহ বা অল্প মিঠে পসন্দ করেন, সেইরূপ
অজ্ঞে ভাবনায় সকলে হৃদয় সকল সময় স্বত্বী
হন না। প্রকৃত ভক্ত কখনও অশেষবাদের
বিরোধী হইতে পারেন না।

অশেষবাদের সাহচর্য মহাবাহ্যী আমা-
দিগকে অজ্ঞ ও আশ্রয় দিয়া এই প্রশ্নমাচার
প্রচার করছে যে হে ভগবৎপ্রেমিক ভক্ত
তোমার ভয় কি, ভাবনা কি, কেন ব্যা উদ্বিগ্ন
হছ? তোমার আরাধ্য যিনি তিনি যে
তোমা হ’তে অভিন্ন, সর্বাংগেই তোমার নিজ

হ’তে নিজ জন, তাহাকে কিছুতেই হারাইবার
ভয় নাই, তাঁহার ও তোমার মধ্যে কিছু
ব্যবধানও নাই। তাহাকে পাইয়া স্বত্বী ও
শান্ত হও, যে ভাবে ইচ্ছা যে পরিমাণে ইচ্ছা
রসায়নের কার্য তৃষ্ণি লাভ কর, রসমুদ্রে
তলাইয়া যাও, রসের ক্ষীরোদ সাগরেই
তাঁহার অবস্থান এবং তিনিই রসধরুণ—রসো
বৈ সঃ। দর্পণে নানাবেশে আপনাকে ধেরে
হৃদয়োর স্বার্থহত্ব করার মত তাঁহার সঙ্গে
পিতামাতা পতি সত্য প্রভৃতি যে কোন সম্বন্ধ
মাথ যায় স্থাপন কর। কোন সম্বন্ধ স্থাপনেই
বাধা নাই কারণ সবগুলিই কল্পনা বা ভাবের
খেলা মাঝ, রসাহুভবতা শুধু সত্য আর সত্য
হইতেছে সকল সম্বন্ধের অন্তর্লীন এই সার
সম্বন্ধ বোধ যে তুমি তাঁর এবং তিনি
তোমারই, তোমা হতে তিনি অভিন্ন, তত্ব-
মসি, সোহবৎ, অহং সঃ। যে মনে জানে ইহা
জেনেছে, সেই সে নীর ছেড়ে ক্ষীরপাত্রী,
ক্ষীরোদসাগরে বিচরণকারী পরমহংস।

আমাদের মনে হয় ভক্তিমার্গের ও অশেষ-
মার্গের এইরূপ একই গন্তব্যস্থল, উভয়েই
মিলনান্ত নটক এবং উভয় নটকেরই নায়ক
ও নায়িকা অভিন্ন।

তিনিই প্রকৃত নিজ জন পদবাচ্য যিনি
আমার এবং আমি তাঁর প্রিয়। কেন সময়ে
সময়ে আপনার লোকও পর এবং পরও
আপনার লোক বলে বিবেচিত হয়? প্রিয়-
প্রিয় বোধই ইহার কারণ। মুখে কাহাকেও
নিজ জন বলে প্রচারে ফল কি, যদি সেই
নিজ জন আমার প্রিয় বা আমাকে উৎকৃষ্ট
আনন্দ দান সমর্থ না হয়? ভক্তিমার্গ
এইরূপ শুদ্ধ জ্ঞানমার্গের বিরোধী। ভক্তির
যেমন ভাণ আছে সেইরূপ জ্ঞানের ভাণ,
আনন্দের ভাণ এবং নিজ জন বলে প্রচারেরও

ভাণ আছে। সত্যের সাক্ষ্য পেলে ভাণ চলে যায় এবং অধিক আনন্দের পরিচয় পেলে অল্প আনন্দে আর মন মজে না। আমাদের সম্বন্ধে হয়, ভগবান শ্রীগৌরানন্দেব ভগবান শঙ্করাচার্যের মতের প্রকৃত বিরোধী নহেন, নববলে উঠাতে বল দিয়া প্রচারে চেষ্টা পাইয়াছিলেন মাত্র। বৃষ্টিবার বা বুধারিবার দোষে ক্রমশঃ ছুটা প্রতিপক্ষ দলের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। পরমহংস শ্রীরামসুখ দেবের প্রসাদে এখন আবার উভয়ে উভয়কে চিনিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হবার কাল এসেছে। অম্বৈতবাদী প্রকাশানন্দের পরাজয়ের এইরূপ একটা গুঢ় অর্থ যে নাই কে বলিতে পারে? অম্বৈতমত পরিত্যাগ না করেও যে ভক্ত হওয়া যায় বা ভক্ত হয়েও যে অম্বৈতমার্গে অগ্রসর হওয়া যায়, বাহার্য দল বাদিতে সমুৎসাহক এই তত্ত্বটি তাঁহাদের তেমন মুখ ঘোচাক মনে হয় না, আর এই জুই এই বিষয়ে দলালিও পড়ে না। কিন্তু এ বিষয়ে একবার একটু ভেবে দেখ, কি দেখিবে? শুকজানো সিদ্ধান্ত হল, এই জগৎ থেকে ভূমি স্বতন্ত্র নহ, এই জগতেরই ভূমি অংশীভূত, অংশজানটা নিত্যতাই কারনিক, সমাজজানটাই সত্য; আত্ম একটা স্থলের নাম ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বর্ষ পরে মানচিত্রে ভারতবর্ষের সীমা নির্দেশ হয়ত অতঃপূর্ণ দেখিবে—চোখের উপর বঙ্গদেশটার আকার কেমন—বেমানুষ বসলে যাচ্ছে—কিন্তু সমষ্টীভূত জগৎ পূর্ণেরও যা ছিল পরেও তাই থাকিবে। এইরূপ অংশজানটা কারনিক বিভাগমাত্র সিদ্ধান্ত হলে বুঝা যায় জগৎ ও আমি যথার্থতঃ বিভিন্ন নহি, জেয়েকে ছেড়ে জ্ঞাতার বা জ্ঞাতাকে ছেঁটে ফেলে জেয়ের পৃথক সত্তা নাই এবং সাক্ষ ও অনন্তের মধ্যে বসন্তঃ কোন ব্যবধান

নাই। কিন্তু এই যে শুক জ্ঞান ইহাতে ফল কি? যদি ঐরূপ জ্ঞানে তিরিখা থাকিতে না পার? সমগ্র জগতটাকে মূখে আণার না বলিলেই সেটা আণারন হয় না। শব্দ 'মিছ উদাসীন, জেয় জগৎ এই ত্রিধা বিভক্ত। শব্দস্বরীয় জগৎশব্দটা বিলুপ্ত হইলেই আমি স্থবী হই। আমার ইচ্ছা যেখানে বাণা যায় সেখানেই যত্ন বোধ, যত্ন হ'তে মুক্তিলাভই পুরুষার্থ, ইহাই জীবনমাজেরই জীবনব্যাপী একটা সাধনা। আমাদের সাধা থাকিলে বিপক্ষরূপে প্রকাশিত জগৎশব্দগুলি আমরা বিলুপ্ত করিয়া দিতাম। উদাসীন জগৎ সম্বন্ধে আমিও উদাসীন বেল থাকলে কারের কি? কামদাহিকাব্যাসীর ক্ষতি বৃত্তিতে আমার কোন কলিকৃত্তি মনে করি কি? যেদিন কোন যে পরিমাণে কামদাহিকাব্যাসী আমার নিকট নিজ জন বিবেচিত হবেন, সেইদিন হইতে এবং সেই পরিমাণে কামদাহিকাব্যাসীর স্বয়ং দুঃখে আমিও উল্লাস বা বেদনা বোধ করিব।

আবার, শুধু আমার প্রিয় হলেই চলিবে না। ভালবাসা ছদিক থেকে না হলে জন্মটি বাঁধে না। পঞ্জিভূত নিষেগটু ছুটা তাড়িত ঘোড়ের সমাবেশ না হলে তাড়িশক্তি জাগে না, নিতে যায়। "ভালবাসিবে বলে ভাল বাসিণী" কথাটার ভিতরে একটা বিবাদের একটা বৈরাগ্যের ভাব প্রচ্ছন্ন নাই কি? ভালবাসার প্রতিদান পেলে প্রেমিক তাহা উপেক্ষা করে কি? আমি গুণহীনই হই বা গুণবানই হই আর একজনকে অত্যাচার ও চির প্রিয় এ ভাবটি অত্যাচারে ভাবনা ছাড়া বোধ হয় আসিতে পারে না। ভক্তির চরম হইতেছে এই অম্বৈতজ্ঞান।

বুদ্ধিলাস বোধ হয় তিনিই আমার নিজ জন

মিনি আমার এবং আমি ঐরূপ প্রিয়। ঐশ্বর এই প্রিয়বন্ধ না হয়ে অজ কোন বিষয় যদি আমার প্রিয় হয় তবে সেই অজ বিষয়টিই আমসম্বন্ধে নহি। যুগে যুগেই ঐশ্বর নিজজন বলি না কেন, সেটা শুধু মূখের কথা ও শুক জ্ঞান। ভক্ত এই শুক জ্ঞানের বিরোধী। আবার দেখ বাহার সম্বন্ধে কিছু জানি না তাহাকে ভালবাসা অসম্ভব কি না এবং ভালবাসা অসম্ভবটা জ্ঞানেরই প্রকারভেদ কি না? ভক্তি এইরূপ কখন জ্ঞানের বিরোধী হইতে পারেন না কারণ জ্ঞান ছেড়ে ভক্তি অসম্ভব।

সগুণ ঐশ্বরে সর্গগুণের সমষ্টি। যোগ বিযোগ মিলে শূন্য হয়ে যাবার মত বিরুদ্ধ প্রকৃতির গুণরাশির সমবায়ে সগুণ ঐশ্বর নিগুণ রূপেই প্রতিভাত হইবে। ঐশ্বরে সৌম্য রূপে, স্বন্দর অস্বন্দর, স্বজন সংহার ইত্যাদি বাবতীয় গুণরাশির সমবায়। যত কিছু আছে তিনিই সব—"যো কুঃ স্বায় সব হুঁহি স্বায়।"

বালাকালে যুযুৎসব ঐরূপ কি এক পাখীর গাখীর বেদনা কাতর ধানি মনকে বড় আকৃষ্ট করিত। "জননী দেবী বুঝাইতে পাখী তাহার হারান পুত্রটিকে ভাকিতেছে; জলের ধারে বাসা ছিল, একদিন বান এসে কোথায় তারে ভাগিয়ে লয়ে গেছে, পাখী তাই করুণধরে বিনরাত তাহার পুত্রকে ডাকে "উঁ চিতি পুত্র পুত্র।" বিশ্ব-জননী, এইরূপ যেহেমাধা উষোদন গীতি শ্রেয়ে আমাধিগকে ডাকছেন, জাগাবার চেষ্টা পাচ্ছেন, অশাড় আমরা সে স্বর শুনেত পাই না, বা হারিয়ে কাগজোতে কোথায় ভেসে চলেছি। নৈনিতালের পাহাড়ী কিছুদিন অবধান কাশেও এক বকম পাখীর ডাক শত

গোলমালের ভিতর থেকেও মাঝে মাঝে কাণে যেতে। পাখী ঠিক যেন বলে "সব হুঁহি" "সব হুঁহি" সবই হুঁহি, সবই হুঁহি। এ ডাকও প্রায় নিশ্ফল হইবে বায়ুশোষণে ভেসে যায়, কাণে এসেও মরমে পশে না। ক্ষণেকের তরে গাটা শুষ্ক কাঁটা দিয়ে উঠে মাজ। ঐশ্বর কোথায় বলে কত না হুঁহু মরি, তিনি যে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে, মহৎ হতেও মহত্তর হয়ে নিখিল জুড়িয়া সকলের জ্ঞাত সর্বজ বিরাগমান। জ্যামিতির বিমুখ গণিতের অনন্ত উভয়ই কি এই নিগুণ শূন্যবৎ পদার্থ নহে? কিন্তু নহে অচর সমস্তই। ব্রহ্ম ও জগৎ সেইরূপ "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিমাং পূর্ণাৎ পূর্ণমদ্যতে, পূর্ণতা পূর্ণ-মায়ায় পূর্ণ মেবাবিশিষ্যতে।" ব্রহ্ম পূর্ণ, মায়াও পূর্ণ, সে পূর্ণ হইতে এ পূর্ণের উৎপত্তি এবং পূর্ণ থেকে পূর্ণ বেরিয়ে এসেও পূর্ণই অবশিষ্ট রয়ে যায়। ইহা ঠিক গণিতের শূন্য নহে কি? শূন্য সহ শূন্য যোগ কর ফল হবে শূন্য, শূন্য হতে শূন্য বাদ দাও, ফল পাবে শূন্য। একভাবে শূন্যের অর্থ কিছুই নহে কিন্তু প্রকৃতই কিছু নহে কি? শূন্যই পূর্ণ দশ শতাংশ জাপক-প্রাণ একে শূন্য দিলে দশ হয়ে শূন্য হুঁহি ইত্যাদি। ব্রহ্ম বাবতীয় বিরুদ্ধ গুণরাশির সমবায়, তাই তিনি সগুণ হয়েও নিগুণ। কেহ যদি কখন বুদ্ধিমত্তা কর্বন বা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয় তাহার প্রতিভা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে আমরা কি? নিশ্চয়তার থাকি না কি? কেহ যদি কখন সগর কখন বা নিষ্টির প্রকৃতির পরিচয় দেয়, তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে আমরা কি উত্তর দিব? ব্রহ্মও এইভাবে কোন গুণ নাই অথবা সব গুণই আছে। ব্রহ্ম বাবতীয় গুণরাশির সমবায়

তাই তিনি পবিত্রের শূভের ভাষা শগুণ
নিগুণ উভয় লক্ষ্যাদিত। মায়া পিশাচীও
নহেন, পরিত্যক্তাও নহেন এবং ব্রহ্ম হ'তেও
ভিন্ন নহেন, তিনিই ব্রহ্ম। "যোগনিমিত্তা যদা
বিসৃজ্ঞগত্যোকার্যবীকৃতো আত্মাঃ শেখমভ্যন্তঃ
কলাশে ভগবান্।" প্রলয়কালে
শগুণ ভগবান্ যখন যোগনিমিত্তা নিষ্ক্রিত হয়ে
অনন্তে বিলীন হয়ে অবস্থান করেন, তখন
তিনি শাস্ত্র শিবসংক্বেতঃ চতুর্থাঃ সমুদ্রতে, সঃ
আত্মা সঃ বিজ্ঞেয়ঃ ইত্যাদি স্মৃতি নির্দিষ্ট
নিগুণ তুরীয় ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত হন
এবং এই অনন্ত গুণাবাহি আবার হ'তেই
শক্তি সূর্য হয়ে জাগ্রত বিষ্ণু শগুণ ভগবান্ রূপে
জগতের দুঃখভার লায়ব ও দৈবকার্য সাধন
কৃত মুগ্ধ যুগে অবতীর্ণ হন। নিম্ন জাগরণ
একই জীবের দুই অবস্থা, ইহাদের একটি
সত্য অপরটি মিথ্যা বলি কি? Hypnotis-
ed বা মুগ্ধ অবস্থার মত যখন যে ভাব প্রবল
হয়, তদনুসারে কখন যুক্তি দেখাই যেতেই
নিম্ন জাগরণ উভয় অবস্থাতেই নিগুণ অং
ভাবটা বিজ্ঞান থাকে; অন্ততঃ অঙ্গের নিগুণ
ভাবটাই সত্য, আবার কখন বা শবের সহিত
জীবের স্পর্শকি এবং শগুণ ভাবটাই সত্য
বলে বিবেচিত এবং তিনি হ'তে চাই নারে
যন, চিনি যেতে চাই বলে পুরুষার্ধ্য অর্থাৎ
জীবের লক্ষ্য নির্দেশ করি। এই সব
গোলমালের ভিতর সার কথাটি হচ্ছে "যার
যেই ভাব সেই সে উত্তম, তটস্থ হয়ে বিচারিলে
আছে তার সত্য।" সবই ভাবের খেলা, যার
হাত এড়াবার ঘো নাই তিনি প্রসাদ্য হলেই
সুমানন্দ ভোগ সম্ভাবনা, শগুণ এবং নিগুণ
ব্রহ্ম উভয়ই মহামায়ার দুই ভিন্ন সৃষ্টি বা
ভাব মাত্র, যার যে ভাবে বিশ্বাস ও মন আকৃষ্ট
হয়, তাহার পক্ষে সেইটাই সত্য ভাব।

নেতি নেতি করেছে হটক বা "সর্গা
খণ্ডিব ব্রহ্ম" চিন্তার পরিণামেই হটক, নিগুণ
ব্রহ্ম ভাবে ভাবুক হ'তে যদি কেহ সমর্থ না
হন কিংবা যে ভাবটি যদি কাহারও যথেষ্টগণ
চিত্তাকর্ষক না হয়, তবে কি তিনি অধৈত-
বাসের শরণ লইবার ছলে একটা ভাণের
আশ্রয় লইয়াই সমস্ত রহিবেন? প্রলয়ের
উপসংস্পর্শে দীর্ঘ প্রতীকৃত, শুভ জ্ঞানের মূল্য
নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, জানুদ্বিগতে
বসুধা ও আশি অভির হলেও উহার মধ্যে
আমার প্রিয় বা নিজ জগৎসকলই প্রকৃত-
পক্ষে আমার আপনার অংশ বা নিজ জন বলে
মনে হয়। এই শ্রেণীর সাধকগণের উচ্চার
সাধনেই ভক্তিবাদের সফলতা। ভক্তিবাদের
ফলে, অস্বাদিকার চর্যার হাত থেকে
অধৈতবাদটা ব্রহ্ম পরিমাণে রক্ষা পেয়েছে।
পিতা মাতা প্রভৃতি ভক্তিপারম্পর্য সপক্ষে
যতটুকু জ্ঞান আছে, তাহা লইয়াই উচ্চাদিপক্ষে
ভক্তি করা চলে, ভক্তি করার আনন্দ থেকে
বঞ্চিত হ'তে হয় না, বরং ভাল করে
জানিলাম না বলে ভক্তি বিরত রহিলে সেটা
দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় দেওয়া হয়। নৈনিতাল
থেকে দূরে এসে কেহ যদি বলে নৈনিতালের
আর সব দেখেছি কেবল যাহার জ্ঞান
নৈনিতালের নৈনিতাল নাম পাহাড়ের উপর
নয়নীমায়ের সেই দৃষ্ট দেখা হয় নাই, কিংবা
কলিকাতা থেকে পল্লীগামে নিজ বাসভবনে
ঘিরে গিয়ে কেহ যদি পরিচয় দেখে কলিকাতার
ভাল ভাল জিনিসগুলাই শুধু দেখা হয় নাই,
তা হলে আমরা তাহাকে কি বলি? সেইরূপ
ভাবে এসে যে ঈশ্বর ভক্তির কি আনন্দ বুঝিল
না বা বিশ্বাসের চেষ্টাও করিল না তাহার ভবে
আমা প্রায় বিফল হল বলিব না কি? ভক্তি
জ্ঞানের বা জ্ঞান ভক্তির অন্তরায় নহে।

ভক্তিপারম্পর্য সপক্ষে জ্ঞান যে পরিমাণে
বাড়িতে থাকিলে ভক্তিও সঙ্গে সঙ্গে সেই
পরিমাণে বাড়িয়া চলিবে এবং আমরা
দেখিযাই ভক্তির চরম এই অধৈতজ্ঞান।
সোহং ভাবে উপনীত হলে ভক্তি শাস্ত্র এবং
জ্ঞানও তদনুযায়ী প্রাপ্ত হয়। সচরাচর শাস্ত্র
দ্বারা বাঙ্গলা সখা ইত্যাদি রূপে যে ভক্তির
বিভাগ আমাদের পরিচিত, আনন্দরূপে
বিজ্ঞান ভক্তি এই মহারাস ভাব উহা
হইতে একটু বৃত্তর বটে কিন্তু আমাদের
বিবেচনায় ইহাই প্রকৃত শাস্ত্র ভক্তি নামে
অভিযেয়। যতদিন এই পদমার্গে ভাল পর-
জ্ঞান উন্নয় না হয় ততদিন আশ্রয়প্রবন্ধ না
করে উপাস্ত্রসহ সম্বন্ধটা বজায় রাখিতে ভক্তিই
একমাত্র উপায় এবং আমাদের ভগ্নাঙ্গুল।
যতদিন স্বর্গীয়জ্ঞান থাকে ততদিন কেহ
অধৈতজ্ঞানী বলে পরিচয় দিতে পাবেন না,
বড় জোর বলিতে পারেন অধৈতমার্গে বিচরণ
করছেন কিন্তু ক্ষুদ্রভক্ত ও নির্ভয়ে ভক্তবলে
পরিচয় দিতে পারেন। আমাদের মনে হয়
ভগবান্ ঈশ্বরোপাস্ত্রসহ এই ভাবেই
প্রকাশানন্দকে স্বদলভূক্ত করে লয়ে ঈশ্বরের
হিস সাধন করে গৌরব, প্রেম বিলাহিতে এসে
জান ও ভক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে যান নাই,
প্রত্যুত শিখাইয়াছিলেন ভক্তিই জ্ঞান এবং
জ্ঞানই ভক্তি, কিন্তু কালই বলবান্ ছু দিন না
যেতে যেতেই জ্ঞানমার্গী ও ভক্তিমার্গী
প্রেমের চেয়ে যন্ত্রের আনন্দটাই বড় করে
দুব তাহাতেই যেতে গেল। মা মহামায়া
চিরকালই রণাঙ্গণা, সন্ধানগণও তাই
কোমর বেঁধে স্বগড়া করে আনন্দ পেতে যায়,
শেষে হেলে ধরিতে শক্তি নাই কেউতে
ধরিতে গিয়ে স্বর্গীয় ও কাতর হয়ে পড়লে
ঐ মাঝেই আবার নানা সাজে অবতীর্ণ হয়ে

মহাপুরুষগণের হাত দিয়ে সকলকে শাস্ত্র
করিতে হয়। জয় মা ভৃগুবীরী!
"চিনি যেতে চাইনা রে মন চিনি যেতে
চাই।" জানে ও আনন্দে কি অধিনতুল
সম্বন্ধ? কেহ জানে, কেহ কর্মে, কেহ বা
ভক্তিপথে আনন্দ পান। একটু ভাবিলেই
আমরা সকলেই ইহা বুঝিতে পারি- কিন্তু
তথাপি ভাবের বশে মুগ্ধ হয়ে উহাদের
একটাই সার অর্থ পথে কিছুই নাই বলে
বড়াই করিতেও ছাড়ি না। এই জাগতিক
ব্যাপারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানই কত আনন্দ।
চরম ও পরম জ্ঞান না জানি কতই আনন্দ
নিগুণ ব্রহ্ম অবস্থির রহিবার যে সচ্চিদানন্দ
তাহা চিনি যে যোগ্যতার সঙ্গে উপমিত হওয়া
আমরা অসমর্থ মনে করি, কারণ চিনি নিজের
মিথ্যার অশুভব করে না কিন্তু সচ্চিদানন্দ
অবস্থায় পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ যে মিলিত
হইয়া থাকে।
জ্ঞান যখন আনন্দ দানে সমর্থ হয় তখন
আর তাহা শুক জ্ঞান নামে অভিযেয় নহে।
ভক্তের ভাবে রসাবধান না হলেও জ্ঞানীও
আনন্দরস বঞ্চিত নহেন। বিশ্বরূপ ভগবানের
অনন্ত সৃষ্টি ভুলে গিয়ে এইরূপ হলে জ্ঞানী ও
ভক্তের দলে বিবাহ উপস্থিত হয়। কিন্তু
দুইয়ের কোন দলেই না ভিড়ে বাহির হইতে
উভয়ের স্বগড়ার প্রকৃতি ও পরিণাম পর্য্য-
লোভনা করিলে চোখ দিয়ে আনন্দাশ্র বাহির
হবে। মনে হবে, দুই ভাই নিজের নিজের
কৌচকত ভাল ভাল খাবার পেয়ে পরস্পর
পরস্পরকে নিজের গায়ে ভাল খাবারটির
আখাদ দেওয়ার জ্ঞে চেষ্টা পেয়ে শেষে তাই
লয়ে ভুল্ল স্বগড়া বাঁধিয়ে বসেছে। জানী
ও ভক্ত, দীর্ঘ ধর্ম, গল্পদ্বায়ে সম্ভ্রাদ্যে,
আত্মিক ও নাত্মিক তাই এত বিবাদ।

হে জানী ও ভক্ত মহাজন বৃন্দ আপনারা আপনাদের ঐ উৎকৃষ্ট ধারাবাহিক প্রসাদ স্বরূপ অকৃত আমাদিগকে কিছু কিছু দান করে কৃতাৰ্থ করুন। ইহাই ঠিক আধ্যাত্মিক হরির সূচী।

নামের হরির লুট বিলিয়ে ঐ নিজ হতে নিজ জনকে চিনিবে ও মিলিয়ে দিবার জ্ঞান নিতাই গৌর অবতীর্ণ। ভক্ত বলেই সাধারণতঃ ইহার প্রসিদ্ধ কিন্তু ইহার কি জানের বিরোধী? ভক্তিপাত্রকে চিনিতে ও পাইয়া ভক্তের মনের ভাবে প্রাপ্ত পূরে আনন্দ অল্পভব করিতে ইহাদের কি নিষেধ আছে? জানীর ছায় ভক্তও কি বিষয় বিমূৰ্হ নহেন? শ্রীগৌরদেবের এবং তাঁহার কোন কোন পারিষদের পাণ্ডিত্য জ্ঞ প্রসিদ্ধিও কি কম ছিল? লৌকিক ভাব উপেক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলেও নিত্যানন্দ যে নিত্য আনন্দময় এবং শ্রীগৌরদেব যে প্রিয় ও হৃদয়র। জানী ও ভক্ত উভয়েরই যিনি আরাধ্য ও নিজজন তিনিও কি এইরূপ হৃদয় প্রিয় ও আনন্দ মূর্তি নহেন?

আমাদের আশঙ্কা হয় গৌর নিত্যের এইরূপ আধ্যাত্মিক মূর্তি সকল বৈষ্ণবের হৃদয় সমান শ্রীতপ্রদ হবেন না, কারণ ভিন্নকচিহ্নি লোকাঃ। তথাপি কোন কোন আধুনিক বৈষ্ণবগণের এ ভাবের সমর্থক কথাও দৃষ্ট হয়। “জগতে যত হৃদয় অহৃদয় পার্থ আছে সকলই তাঁর রূপ; তিনি সকলরূপের আশ্রয়, তাঁর রূপই জগৎকে রূপবানু করিয়া রাখিয়াছে।” (পাগল হরনাথ ৪র্থ ভাগ ৮৭ পৃষ্ঠা)। ইহা সেই অতিকথিত “সর্বত্র বর্ণিত ব্রহ্ম” ভাবে জগদর্শন ব্যতীত আর কি?

নামমায়াহো বৈষ্ণবের অগাধ বিশ্বাস।

ঈশ্বরকে নিজস্বরূপে চিনিতে ও পাইতে নাম রূপ একটি অতি সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় বলে ইহার নির্দেশ করেন। নাম রূপের কত ফল বীরা করে দেখেছেন তাঁরাই জোর করে সেটা বলতে পারেন কিন্তু সহজ বৃত্তিতে ভেবে দেখিলেও নাম মায়ায় আমরা কিছু কিছু বৃত্তিতে পারি। অনন্তমূর্তি ভগবানের নানাভাবেবের অন্ত নাই, নামেই শুধু সেই সব ভাবের সমন্বয়। যনস্তায় বাহার নাম তিনি কখন পুত্র কখন পিতা কখন আনন্দিত কখন বা বিরক্ত, কখন একবেশে কখন বা অন্তবেশে নানাভাবে বিভ্রম্যমান কিন্তু সর্বা-বস্থাতেই তাঁর ঐ যনস্তায় নাম। নামে এইরূপ নানাভাবেবের সমন্বয়।

নাম যেন বীণী, ভাবগুলি যেন রাগ-রাগিনী বা হর। বীণী ঠিক থাকিলে সব রকম হরই বাধির করা যায়। কোন কোন সমন্বয়কার ব্যাধার গানের কথা শুনার চেয়ে হরটাকেই বড় বলে মনে করেন; হরে যদি ভাব আসে ভাবার আর প্রয়োজন কি? হর, ভাবার শত জটী শুধরে দেয়। “যেবতাকে ভাবিবার বেলায়ও সেইরূপ রূপবর্ণনাপূর্ণ বন্দনাগীতি সবার রুচিকর হয় না; যিনি লীলাভয়ের প্রেমে মূর্ত্ত, শুভকামি দিগন্তের ভাবনা কিংবা নীরব শূন্য শ্রামা তাঁহাকে হৃদয় তৃপ্তি দেয় না। নব্যকৃতি অহুয়ারে এইজন্ম দেবতার বন্দনাধিতে আজ কাল রূপবর্ণনাটার আর পূর্বের ছায়া তেমন দৃষ্ট হয় না, তৎপরিবর্তে গুণব্যাঞ্জক বিশেষণ রাশিরই সমাদর দৃষ্ট হয়। গুণবর্ণনায়ও কিন্তু একেবারে নিরাপদ নহে। যিনি একবিধ গুণ ভালবাসেন অস্ত্রবিধ গুণব্যাঞ্জক বিশেষণ তাঁহার হৃদয় ভাল লাগিবে না, যিনি প্রেমের হরি চাহেন, বিহু হরিতে তাঁহার মন মজিবে না। নামে এ সব বাগাই

নাই কারণ নামে যে সর্বভাবের সমন্বয়। হৃদয় যখন ব্যথিত, কাতর প্রাণে শুধু হরিবল, দয়াময় বিশেষণ নাই বা যোগ করিলে। তখন হৃদয় যখন উল্লসিত শুধু হরি বলেই সে উল্লাস কি প্রকাশ করা যায় না? রাগ করে যখন কাহাকেও ভাবি এবং আদর করে যখন কাহাকেও ভাবি শব্দই যে সেই রাগের বা আদরের ভাব বাধির হয়ে পড়ে, ভাবার অপেক্ষা রাখে কি? এস্বাভ্যের তারে যখন রাগ রাগিণী খেলিতে থাকে, তখন কি ভাবার অভাবে হর ছুটা বন্ধ হয়? ঐ হরের ভিতরই যে ভাবা ও ভাবার বাধা আছে। নাম এইরূপ ভাষা ও ভাবের উচ্চৈ তাই নামের এত মান—হরি হতেও হরিনামের অধিক মায়ায়। নামে যেন সত্ত্ব ও নিগুণ উভয় ভাব মিলে গেছে, কোন একরূপ বিশেষ ভাবহীন অথচ সর্ববিধ ভাবের বীজ স্বরূপ।

নাম লয়েও অনেক সময় গোল দিয়ে।

যিনি কালী বলেন কৃষ্ণনাম হৃদে আনিতে তিনি হয়ত শঙ্কুচিত হন। শব্দব্রহ্ম প্রণবে তাই সর্বনামের সমন্বয়। কিন্তু যে কারণেই হউক প্রণব রূপে সকলের অধিকার স্বীকৃত হয় না, গুরুদত্ত বীজ মন্ত্র রূপে শিষ্যেরই শুধু অধিকার। মহাজনগণ তাই আচড়াল জনসাধারণের নিয়ে ব্যবহার জ্ঞান নাম মহামন্ত্র প্রচার করেন ও সকলকে নামাশ্রয় করিতে উপদেশ দেন।

নামলয়ে গোলা বীধান উচিত নহে, তাঁহাকে যে নামে ইচ্ছা ভাবিতে বাধা নাই, পুরুষ প্রকৃতি ব্রহ্ম কালী কৃষ্ণ শিব সবই তিনি (পাগল হরনাথ ৪র্থ ভাগ, ১১৭ পৃষ্ঠা)। এত নামের ভিতর বীরা যে নামে হৃদয় গলে তিনি সেই নামই আশ্রয় করুন, অথবা, মহাজনো যেন গন্তঃ সঃ পথাঃ। বীর বীহাকে হরাজন বলে শ্রদ্ধা হয় তিনি তাঁহারই প্রদর্শিত মার্গে অগ্রসর হউন।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

নাট্যসাহিত্য ও দীনবন্ধু *

আলোক ও ছায়ার বিচিত্র বর্ষদম্পাতে লীলাচক্র প্রকৃতি নানা অভিনব গোড়া ধারণ করে, মানবজগতে সেইরূপ ব্রহ্ম ছায়েব্রহ্ম প্রত্যাঘাতে অবিরাম ভাবের লহরী খেলিতে থাকে। মানবের ভাব প্রকাশ করিবার জ্ঞান ভাবার হৃদে ইহা আছে, কিন্তু শুধু ভাষা ভাব প্রকাশ করিবার জ্ঞান পর্যাপ্ত নহে, হাব, ভাব, আকার, ইন্দ্রিয়, লীলা, ভঙ্গী, উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ইহা অবিভীদ্য মনোভাব কতটা অসম্পূর্ণ থাকে তাহা

বুঝিবার হৃদয় উপায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটক পাঠ এবং তৎপরে রঙ্গালয়ে গিয়া তাহার অভিনয় দর্শন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যে কতদূর, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। নিম্নেও ভাবে মানবের ভাবতত্ত্বের স্পষ্ট চিত্র তুলিবার জ্ঞান নাটকের জ্ঞান। নাটক এই জ্ঞান দৃষ্টকাব্য; ইহার মধ্যে প্রাণ আছে, চেতনা আছে, জিয়া আছে। হৃদয় মানবরাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ইহা অবিভীদ্য শক্তিশালী।

মানবের এই মনোভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা এতই স্বাভাবিক ও সহজলভ্য যে ইহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না। মানব শিশুর অহরহ পশুপাখী ইহার মূলে বিদ্যমান আছে। গ্রীক দার্শনিক Aristotle বলিয়া গিয়াছেন,—“To imitate”, says Aristotle “is instinctive in man from his infancy; and from imitation all men naturally receive pleasure. Gesture and voice are means to imitation common to all human beings; and the aid of some sort of dress or decoration is generally within the reach of children and of childhood of nations. The assumption of character, whether real or fictitious is therefore the earliest step towards the drama. But it is only a preliminary step; nor is the drama itself reached till imitation extends to action.”

কাহ্য বা গতিই নাটকের প্রাণ। একটি বা বিভিন্ন চরিত্র প্রথম উদ্দেশ্য হইতে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কিরূপে পরিণতি লাভ করে, বা যে চরিত্র যেক্রম বিকশিত হওয়া সম্ভব, তাহাই নাটকে প্রদর্শিত হয়। অসভ্যতার মধ্যেও নাট্যসাহিত্য না থাকুক, নাটকের প্রকৃতিগত ধর্ম তাহাদিগের প্রমোদ উৎসবে স্থগতির দ্বংশ শোকে প্রকাশ পায়। কোন জাতির মধ্যে সভ্যতা বিস্তৃত না হইলে, নাট্যসাহিত্যের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। সেই জন্তই সকল দেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, নাটক কাব্যসাহিত্যের অঙ্গগামী। আমাদের দেশে, রামায়ণ ও মহাভারত রচিত

হইবার পূর্বে কোন নাটক ছিল না থাকিতেও পারে না।

এক শ্রেণীর পাক্কা লেখক ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব ধর্ম করিবার জন্ত বিধিমতে প্রণামী কিন্তু সোভাগ্যক্রমে তাঁহারাও ভারতীয় নাট্যকলার প্রাচীনত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের বিষয় অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে নাট্যসাহিত্য ভারতবর্ষের নিজস্ব এবং এমন কি পুরাকালে এক গ্রীক দেশ ভিন্ন আর কোন দেশে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

বলা নিম্নোক্ত যে প্রাচীন যুগে সকল নাটক সংস্কৃতভাষায় রচিত হইয়াছিল, বাঙ্গলা ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে বাঙ্গলাভাষা যেক্রম উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা প্রকৃতই বিষয়কর। বাঙ্গলাভাষা কাব্যসাহিত্যে আশাতিরিক্ত ফল দিয়াছে, নাটকে এখনও আশাহরুণ ফল পাওয়া যায় নাই এ কথা সত্য। কিন্তু উৎকর্ষ নাটক রচিত হইবার পক্ষে যে শুভ মূহুর্ত্ত, আবশ্যক, সে হুদিন অদ্যাপি সমুচিত হয় নাই। জাতীয় জীবনে যখন কাব্যের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়, উৎকর্ষে নাট্যসাহিত্যের বিকাশ সেই সময়ে সম্ভব। কালিদাস ভবভূতি বা Shakespear কর্তৃক রচিত-মুর্খোৎকর্ষ নাট্যসাহিত্যের সহিত বঙ্গভাষায় অত্যন্ত নবনাটকের সমান আসন দিতে না পারিলেও দেশের প্রতিভাবান লেখকের হৃদে অস্তিত্ব নরনারীজিত কোন ক্রমে অপর্যবেক নহে। বরং এইরূপ অবস্থায় আমরা যাগ পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার মধ্যে কোন চরিত্রজিত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার স্তম্ভ চরিত্রের সহিত তুলনীয় এ কথা অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারে।

মুসলমান কর্তৃক ভারতবর্ষ অধিকৃত হইবার পর বহুকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যসাহিত্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। একে আমরা পরাধীন জাতি, তাহার উপর যদি এ বিষয়ে রাজার নিকট হইতে কোনরূপ উৎসাহ বা স্বশিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ না ঘটে, তাহা হইলে যে এরূপ কলোন্ময় হইবে ইহা তাৎকালিক স্বতঃসিদ্ধ। ইংরাজাদিকারে পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের অসাড় জড়বৎ জাতীয়-জীবনে নব জাগরণের হৃদয় করিয়াছে, সম্ভাবনার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ইহার ফলে বহুকালের পর বঙ্গদেশে জাতীয়-সাহিত্যের শ্রীগন্ধির সহিত জাতীয় নাট্যশালায় শ্রীগন্ধি সম্পাদিত হইতেছে। বর্ষে বর্ষে এক্ষণে এক বাঙ্গলা দেশ হইতে যে সকল নাটক গ্রহণনাদি বাহির হয়, ভাল হউক মন্দ হউক তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিংবদন্তি অর্ধ শতাব্দী মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছে।

বাঙ্গলাভাষায় নাটক রচনা করিয়া প্রথম পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন সম্ভ্রত কলেজের সুযোগ্য ছাত্র সুগীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁহার স্কুলীন-কুলসম্বন্ধ নাটক এই হিসাবে সকল নাটকের অগ্রগামী। তাঁহার এই নাটক-খানি প্রকাশিত হইবার পরেই, বাঙ্গালার অমর কবি অদ্বৈত প্রতীভাশালী মাইকেল মধুসূদন নাটক গ্রহণনাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্প কাল মধ্যে “শম্ভিষ্ঠা” ও “পদ্মাবতী” নাটক এবং ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বুড়াশালিকের ঘাড়ে বোঁড়া’ দুইখানি অতুল্য গ্রন্থন রচনা করেন। প্রতিভার লক্ষণ এই যে সে পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। প্রতিভাবান ব্যক্তি এই জন্ত স্বকীয় উদ্ভাবনীশক্তি বলে পুরাতনের মধ্যে নতনের

সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মধুসূদনের কাব্যে অমৃতাক্ষরছন্দ প্রচলনে এই পথরাস্ত্রটি দেশে দেশে যথাস্থান আনয়ন করিয়াছে, নাটক ও সম্ভ্রত নাটকের চিত্রপ্রতিষ্ঠা নটনটীর স্বয়ংস্বরের সঙ্গর্গে হইতে বিজিন্ন করিয়া কৃত্রিমতার কুহকজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছে।

দীনবন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসাময়িক কবি ও নাট্যকার। ফলতঃ এই সময় বাঙ্গলাসাহিত্যাকাশে যে সকল উজ্জল জ্যোতির্মগনীর একত্রে সমাবেশ হইয়াছিল, রাজা এলিজাবেথের রাজত্বকালে এক ইংলও ভিন্ন আর কোথাও এইরূপ সম্মিলন হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই সময়ে বহুমুখ শতদল বিস্তার করিয়া বঙ্গবাণীর চরণ-মুখল ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাহারই চারিপার্শ্বে অজ্ঞাত সাহিত্যসৌরী হরভিত পুষ্পের মত বিকাশ লাভ করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিথের নাটক বৃদ্ধিতে হইলে, এই সময়ের ইতিহাস জানা আবশ্যক। কিরূপ শিক্ষা দীক্ষার, কিরূপ পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল, তাহা না জানিলে তাঁহার গ্রন্থের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্যে গ্রন্থকারের মতামত, কৃতি প্রবৃত্তি, দ্বৈলিত আদর্শ সহজ প্রতিফলিত হয়, ইহার মূল্যবেষণ করিলে নাটক বুঝিবার পক্ষে আমাদের বিশেষ সুবিধা হইবে।

মাইকেলের জায় দীনবন্ধু মিথও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তৎকালে হিন্দু কলেজে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাভাজন হইয়াছেন। ডিবেজিও ও Captain

Richardson হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বিবরণ হুলেখক যোগেন্দ্রনাথ বহু তাঁহার হৃদযাতা "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত্রে" প্রকাশ করিয়াছেন।

রিচার্ডসন সাহেব যখন Shakespear-এর কোন নাটক পড়িতেন তখন মনে হইত যে কোন উৎকৃষ্ট অভিনেতা আশ্রিত করিতেছেন। অপ্রস্তুত মেকলে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

'I can forget everything in India but your reading Shakespear'

অভিনয় ক্রিয়া তাঁহার এতই প্রিয় ছিল, যে কোন ছাত্র শাস্ত্রাণ করিতে যাইলে তিনি তাঁহাকে থিয়েটারের টিকিট দিয়া বিদায়ের সময় বলিতেন 'I hope you are going to the Theatre to-day.' ছাত্রেরা অনেক স্থলেই শিক্ষকের অধিকরণ করে Richardson-এর উপদেশ ও দৃষ্টান্ত হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের হৃদয়ে নাট্যাচরণাঙ্ক উদ্দীপিত করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যসাহিত্যের প্রতি অধরাগের বীজ এই হিন্দুকলেজ হইতেই প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল যে বিষয়ে সম্মত নাই।

হিন্দু কলেজীয় শিক্ষার পূর্বেই দীনবন্ধু বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে যিনি প্রথম উৎসাহ দান করিয়াছিলেন কেবল দীনবন্ধু নহে, তৎকালে তরুণবয়স্ক লেখক মাজি হাযার আয়ত্তের মধ্যে ছিল রহস্ত-চন্দায় দীনবন্ধু যাহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী সেই কবি ঈশ্বরচন্দ্রের নাম কে না জানেন? ঈশ্বরচন্দ্রের নাম অনেকে জানেন বটে, কিন্তু এককালে বঙ্গ-সাহিত্যের উপর তাঁহার কিরূপ একাধিপত্য ছিল তাহা বর্ধ-

মান কালে অনেক ধরিয়া কহিতে পারিবেন না। "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যক্ত চরাত্রের হাযার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর" এইরূপ বিজয় যোগাধারী জয়পতাকার ভ্রাম্য তাঁহার পরেই শীর্ষদেশে সন্নিবিষ্ট থাকিত। তখন সাহিত্যের স্বর্ণসিংহাসনে তিনি একছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রশংসা বা পুরস্কার লাভ তখনকার তত্ত্ব সাহিত্যবীরের মাত্রার বস্তু ছিল। আমাদের দেশের অনেক বড় বড় লেখক এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম অবস্থায় গুপ্তকবির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু কবিও হস্তারসের অবতারগায় দীনবন্ধু ভিন্ন আর কেহ গুপ্তর ছায়া নিঃসৃত ছিলেন না। তাঁহার নাটকের অনেক রহস্ত-চিত্রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে।

যে সকল গুণের অধিকারী হইলে এশিঙ্গ নাট্যকার হওয়া যায় বিখ্যাতর তুলায় দীনবন্ধুর জন্মে তাহার কোন অসুখ ছিল না। তাঁহার জন্ম অতিশয় কোমল ও ভাবপ্রবণ ছিল। তাঁহার আনন্দের উৎস সহস্র লোককে তৃপ্ত দিত, তাঁহার 'কৌতুহল শত শত লোককে আকৃষ্ট করিত, এবং সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিবার তাঁহার এমন একটি মহত্ত্ব ও অদ্বুত ক্ষমতা ছিল, যে কেহ তাঁহার সহিত একবার পরিচয় করিত, সে তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িত।

মৌভাগ্যক্রমে দীনবন্ধু পঠদশার শেষে অল্পকাল পোষ্টমাষ্টারের কার্য করিবার পরে ইন্সপেক্টরিং পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রাপ্ত হন। এই কাৰ্য্যেই তাঁহার নানা লোকের সহিত মিশিবার ও নানাবিধ অভিজ্ঞতা লাভের অপূর্ণ সুযোগ ঘটে। তখন এই কাৰ্য্যের নিয়ম ছিল সম্বৎসরে ভ্রমণ করিতে হইবে, কোন স্থানে ছুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন

এইরূপ ভাবে দার্জিলিং হইতে বরিশাল, কাছাড় হইতে পজাব সর্বত্র ভ্রমণ করিত হইত। ইহার ফলে দীনবন্ধুর নাটকে যেরূপ বিভিন্ন জাতীয় ও বিচিত্র চরিত্রচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, বঙ্গভাষায় আর কোন নাটকে সেরূপ লক্ষিত হয় না। কিন্তু কেবল নানাস্থানে বেড়াইলেই হয় না প্রেমিবার চক্ষু ও মিশিবার শক্তি থাকা চাই। দীনবন্ধু লোকের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে মিশিতে পারিতেন তাহার একটি সত্য আধ্যাত্মিক বর্ণনা করিব। ইহাতে তাঁহার কৌশলের অভিনব এবং আশ্চর্য্য করিবার স্পৃহা একাধারে বিরাজিত হইয়াছে। একদিন তিনি পাণ্ডী করিয়া এক গ্রামের ভিতর গিয়া গমন করিতেছিলেন, অগ্রে এক ভঙ্গলোকের বাটার বৈঠকখানায় কতিপয় ভঙ্গলোক সমবেত দেখিয়া বেহাওয়ার ভদ্রায় পাণ্ডী লইয়া বাইতে আদেশ করিলেন। পাণ্ডী তথাযা পৌছিলে তিনি পাণ্ডী হইতে নামিয়া বৈঠক-খানায় গিয়া বসিলেন, বেহারা তাঁহার বাজা তাঁহার সমীপে রাখিয়া দিল। তিনি কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া একটি দরকারী রিপোর্ট নিবিত্ত চিত্ত হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত ভঙ্গমহোদয়গণ মুখ কাওয়াচাচী করিতে লাগিলেন। তাঁহার লিখা শেষ হইয়াছে এমন সময় সংবাদ আসিল পাত হইয়াছে। সকলে গাঝোখান করিলেন, দীনবন্ধুও সেই সঙ্গে গাঝোখান করিয়া একটি পাতা ধল করিলেন।

তাঁহার এই আশ্চর্য্যপ্রিয়তা ও রহস্তপটুতার আরও ছুই একটি নিদর্শন দিব। দীনবন্ধু কাছাড় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বঙ্কিম বাবুকে একছোড়া কাছাড়ের নিশ্চিত বস্ত্রের জুতা পাঠাইয়া দেন এবং তৎক্ষণে একখানি

পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রে কেবল এই ছুইটি কথা লেখা ছিল। "কেমন জুতা"।

এমন কি দীনবন্ধু যখন যত্নাশ্রয়ায় তখনও তাঁহার ব্যাধশক্তি একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'অনেকেই জানেন যে তাঁহার যত্নার কারণ বিফোটক, প্রথমে একটি পৃষ্ঠদেশে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাদ্ভাগে হইল। তাঁহার পর শেষে একটি বামপদে হইল। এই সময়ে তাঁহার এক বন্ধু কাঞ্চানান হইতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু অতি দূরবর্তীস্থানের ক্ষীণবিস্তারের দ্বারা ঈশ্বর হানিয়া বসিলেন, 'কোড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।' আমি কিছু বিস্তারিত ভাবেই দীনবন্ধুর রহস্ত-প্রিয়তার উল্লেখ করিলাম, তাহার কারণ তাঁহার এই প্রবৃত্তি আত্মতৃপ্ত সহজাত সংস্কারের দ্বারা কাঞ্চানান করিয়াছিল, এবং এক নীলদর্পণ ভিন্ন অস্ত্র সকল নাটক ও গ্রন্থন ব্যাধ কোতুকে অভিযুক্ত হইয়াছে। আমার আশঙ্কা হয় কেহ কেহ ভাবিতে পারেন দীনবন্ধু কেবল সরস বিষয়ের বর্ণনায় হনিপুণ ছিলেন, গভীর বিষয়ের অবতারগা কিসা স্বল্প দ্বন্দ্বের চিত্র প্রস্তুত করিতে তাঁহার শক্তি সেরূপ কার্য্যকরী হইত না। কিন্তু এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত্যক নীলদর্পণ হইতেই তাহা হৃদয়রূপে প্রমাণিত হয়। বঙ্গীয় কৃষকের নিরাক্ষর মর্দ্দবেশনা যখন দীনবন্ধুর কন্ম-তত্ত্বীতে আঘাত করিল, তখন সর্বা প্রকৃষ্ট হাওয়াঞ্জল দীনবন্ধু আর নাই। নীলকরদিগের অসাহায্যিক অত্যাচারের বড়ে শিক্তর ছায়া সর্বত্র তাঁহার হৃদয় বিদ্বুত হইয়া উঠিল। তাহার ফলে, দীনবন্ধু জালামায় ভাষায় সেই অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিতে পারিয়াছেন

এবং তদানীন্তন কালের নিপীড়িত ব্যক্তির সন্ধান চিত্র সহায়ত্বিতর তুলিকায় রঞ্জিত হইয়াছিল বলিয়া এমন স্বাভাবিক উজ্জল বর্ণে তাহা দৃষ্টিয়া উঠিয়াছে। এই সহায়ত্বিতর কেবল দুঃখের সঙ্গে ছিল না, বন্ধিমবাস্থ্যার্থই লিখিয়াছেন, “স্বপ্ন দুঃখ রাগ শেখ সকলের সঙ্গে তুল্য সহায়ত্বিতর, আত্মীয়র বাউট পৈছার সঙ্গে সহায়ত্বিতর, ভোরাপের রাগের সঙ্গে সহায়ত্বিতর, ভোলানাথ যে শুভ কারণবশতঃ স্বতন্ত্রবাক্তী হইতে পারে না সে স্বপ্নের সঙ্গেও সহায়ত্বিতর। * * * * *

তাহার সহায়ত্বিতর তাহার অধীন বা আত্মর নহে। তিনিই সহায়ত্বিতর অধীন। তিনি নিজে স্বশিক্ষিত ও নিখল চরিত্র তথাপি তাহার গ্রন্থে যেকন্ডির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রবলা দুর্দমনীয়া সহায়ত্বিতর তাহার কারণ। * * * * * ভোরাপের ভাষা ছাড়িলে, ভোরাপের রাগ আর ভোরাপের মত থাকে না, আত্মীয়র ভাষা ছাড়িলে আত্মীয়র ভাষা আর আত্মীয়র ভাষামাত্র মত থাকে না, নিমিটদের ভাষা ছাড়িলে, নিমিটদের মাতলামী আর নিমিটদের মাতলামীর মত থাকে না। সপটুই দিতে হইবে। তাই আমরা একটা আন্ত ভোরাপ, আন্ত নিমিট, আন্ত আত্মীয়র দেখিতে পাই। রচিত মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ভেঁড়া ভোরাপ, কাটা আত্মীয়র, ভাষা নিমিট আর ভাষা পাইতাম।” দীনবন্ধুর রচিত মুখ রক্ষা প্রসঙ্গে বন্ধিমবাস্থ্য যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রধান কারণ বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নহে। এক্ষেত্রে, তখনকার বন্ধী সমাজের এবং গুপ্তকবির প্রভাব দীনবন্ধু অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনে কোথাও কোথাও এমন

ভাষার প্রয়োগ, আছে যাহা কোন ক্রমে স্বকচিত্র অস্বাভাবিক নহে এবং সর্বসাধনে বর্জিত হইবার যোগ্য। দ্বিপতি চরিত্রের চিত্র করিতে করিতে কখন কখন নবমুষ্টি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দীনবন্ধুর এসময়ে যেন কোন ক্রক্ষেপ নাই। কোন নাটকে নায়ক নায়িকার কথাগুরুন স্বদীর্ঘ কবিতার, কোন নাটকে গৃহস্থ বন্ধুর অতিরিক্ত সাধু ভাষার বচনবিব্রাণে, কোথাও বা পিতার মরল প্রহসের উত্তরে পুত্রের শব্দালঙ্কারপূর্ণ ভাষার উজ্জ্বল, কর্ণ নিপীড়িত এবং স্বাভাবিকতা পদদলিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। দীনবন্ধুর নাটকে এসকল দোষ আছে তৎপরবর্তী অনেক নাটকে হইতে এসকল দোষ নাই, তথাপি দীনবন্ধুর নাটকাদিতে এমন একটি বিশেষ গুণ আছে যাহার জন্ম দীনবন্ধুর নাটক স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান এবং বিশিষ্টতায় উজ্জল হইয়া থাকিবে। সে গুণটি আর কিছু নহে দীনবন্ধুর আত্মরিকতা। এক্ষেত্রীর সমালোচক দীনবন্ধুর নাটকাদির উক্ত প্রশংসা করিতে পরাম্ভ; যেহেতু ইহার মূল প্রাচীন উপাঙ্গ, ইংরাজী গ্রন্থ বা প্রচলিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত। তাহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে তাহা হইলে কালিদাসের শব্দশূন্যতা, ভবভূতির উত্তরগতিত এবং Shakespeare-এর সকল নাটক, এক কথাই পুথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি গৌরবের আসনে স্থান পাইতে পারে না এবং দীনবন্ধুর জ্ঞান কালিদাস ভবভূতি ও Shakespeare এক অপরায়ণ অপরাধী। লোক চক্ষুর অন্তরালে যখন ধনির মধ্যে রক্ত থাকে তখন তাহার গৌরব কোথায়? যথেষ্ট যখন তাহার মালিন্য দূর করিয়া তাহাকে ব্যবহার্য্যো-পযোগী করা হয়, তখনই তাহার পার্থক্যতা।

আখ্যায়িকার কদাল যখন যথোযোগ্য উপাদান সংযোগে সজীবিত হইয়া উঠে ও মুষ্টি পরিগ্রহ করে, তখন কাহার গৌরব প্রকাশ পায়? দীনবন্ধু নাটকের না প্রাচীন আখ্যায়িকার? দীনবন্ধুর প্রথম রচনা নীলদর্পণ। ১২৬৭ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর ‘নবীন তপস্বিনী’ কৃষ্ণমগরে মুদ্রিত হয়। নবীন তপস্বিনীর পর ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’। “সদবার একাদশী” ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা তৎপূর্বে লিখিত। পরবর্তী নাটক ‘লীলাবতী’ প্রথমবার কিছুকাল পরে ‘জামাই বারিক’ এবং মৃত্যুর অন্তরালে পূর্বে ‘কমলে কামিনী’ তাহার শেষ নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। সর্বমুখেই এই সাতখানি নাটক ও প্রহসন।

এক ‘কমলেকামিনী’ নাটক ভিন্ন আর সকল নাটক প্রহসন দেশের দুর্দশা, সামাজিক দোষ, দুর্নীতি দূর করিবার অভিপ্রায় লিখিত। যে নাটকে দেশের একটা স্থায়ী মহা অমঙ্গল বিনাশ করিয়াছে, তাহার কাব্য-সৌন্দর্য্য হ্রাস্য ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন কি? শুধু এই কারণে নীলদর্পণ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নীলদর্পণ বিশেষভাবে দীনবন্ধুর নাম সার্থক করিয়াছে। নবীন তপস্বিনীতে কাব্যের চিত্র অপেক্ষা রক্ত চিত্র অধিক ফুটিয়াছে, তজ্জন্ম বিজয় ও কামিনী অপেক্ষা ব্যাঘ্রের জগদ্বাস্য অধিকতর জাগ্রত। মল্লিকা মূল তাও বেশ ফুটিয়াছে, নবীন তপস্বিনীর হৌদল কৃতকৃতির প্রহসন ভাগ এবং কাব্যোপ-একক যুক্ত না করিয়া যদি পৃথক পৃথক ভাবে অংশান্বিত হইত, তাহা হইলে এক খানি নবমুখ নাটক ও উৎকৃষ্ট প্রহসন হইতে পারিত কিন্তু দীনবন্ধু তাহা করেন নাই। সদবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক

এই তিন খানি প্রহসনের মধ্যে সদবার একাদশী নামে ও গুণে শ্রেষ্ঠ এবং ইহার বিশেষ গুণ এই যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাট্যোপযোগী ভাষা সচ্ছল প্রবাহে চলিয়াছে, কোথাও এতটুকু পদশলন হয় নাই, সর্বত্র সজীবতা ও সরসতায় মণ্ডিত এবং ঐহিহাস্যে বোধ হয় সদবার একাদশীর স্থান সর্বসাধনে। এই সকল রহস্তচিত্র এমন যুগলত, স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য যে মনে হয় রহস্ত চিত্রশালার চাবী দীনবন্ধুর হস্তে ছিল, এবং তাহার ইচ্ছামাত্রই তার উন্মুক্ত হইয়া যাইত, এবং তাহার ইঙ্গিতক্রমে রাজীব, নশীরাম, রতা নাপিত, জামাই বারিকের জামাইবন্ধু, নিমিট, ভোলানাথ, রামমণ্ডিকা প্রভৃতি আশিয়া উপস্থিত হইত। সমুজ্ঞ সংস্কারে নাট্যকারের ক্ষমতা অপরিণীম। একটি বিজ্ঞপ্তি যে দোষ সংশোধন হয় সহস্র ইচ্ছামাত্রই তার হয় না। আমরা দীনবন্ধুর নাটক হইতে কেবল দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিব। এক শ্রেণীর মূর্খ জমীদার সভ্যতার কোন খার খাবে না জামাই বারিক পদ্ম-লোচন তাহাদের মৃগপাত বিজয়বল্লভকে সোধেদন করিয়া বলিতেছেন ‘আপনি যুবরাজ অঙ্গদের দ্বা লালু পাকিবে বলে রইলেন আর আমি নলজাঙ্গার নায়েবের মত নীচেয় বসে নিকেশ দিচ্ছি।’ সদবার একাদশীতে ঘটরাম ডেপুটির আদালতির সহিত অটলের মজলিসে প্রবেশকালে নিমিটের জিজ্ঞাসা করেন, ইনি কি তোমার মোসায়েব? কেনারাম—ও আমার আদালত। নিমিট—তবে ওর এক লেজ বেঁধে এনেছেন কেন? এরূপ তীব্র কশাঘাতে অনেক বিজয়বল্লভের ও অনেক ঘটরামের চৈতন্য হইয়াছে। বর্তমানকালের পণগ্রন্থ

প্রথাও দীনবন্ধুর চক্ষু এড়াই নাই। কমলে কামিনীর একস্থলে আছে 'এখন সময়েত বিয়ে নয় সত্যভামার ব্রত করা, বরেশ ওঞ্জন স্বর্ণালি। পরিণয়ের হাটে আজকাল হেলে বিকী হয়।'

দীনবন্ধুর নাটকগুলি অভিনবিশেষ সহকারে পাঠ করিলে তাঁহার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার, স্বভাব সঙ্গত মুগ্ধিগঠন ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত অর্ধ সম্পূর্ণভাবে ঘটনাসংস্থান করিবার এবং ইঙ্গিত রস উদ্বেগ করিবার শক্তির অপূর্ণ সমন্বয় দেখা যায়। ১৩৩০ সালের সাহিত্যে 'দীনবন্ধুর নাট্যকীর্তি'র লেখক এ সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তিভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি আর একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। আমাদের দেশের প্রায় সকল নাটকের পাত্র পাত্রী দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া অভিনয় করে, কিন্তু দীনবন্ধুর নাটকের পাত্র পাত্রী যেরূপ প্রয়োজন দাঁড়াইয়া উঠে, বা কোন বিশেষ কার্যে নিযুক্ত অবস্থায় দর্শক সন্মুখে উপস্থিত হয়, ইহাতে নাটকের স্বাভাবিকতা কিঞ্চপ উৎকর্ষ লাভ করে তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়।

দীনদর্পণের ১ম অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাভ্যন্তরে ঠৈরীকী বচনুলের দৃড়ী না বিনাইয়া কেবল বসিয়া বসিয়া 'ছোট বড় বড় পয়মন্ত' ইত্যাদির পরিচয় দিত, দর্শকের আগন্তির কোন কারণ থাকিত না, রস বোধেরও কোন ব্যাঘাত ঘটিত না, কিন্তু দৃড়ী বিনাইতে বিনাইতে ঐ কণাগুলি বলয়, যে একটু যেন মধুর রসের উদ্ভব হইয়াছে, সে স্বাভাবিকতার ছবি আমরা দেখিতে পাইতাম না। এই স্বাভাবিকতার ছবি দীনবন্ধুর অজ্ঞাত নাটকের আছে। বাহুল্যভয়ে তাঁহার পরিচয় দিতে বিরত রহিলাম। দীনবন্ধুর নাটকে ও প্রহসন অনেক প্রকৃত ঘটনার সিরিশা এবং

তাৎকালিক অনেক জীবিত চরিত্রের প্রতিচ্ছবি আছে। তজ্জন্য সেই সময়ে দর্শকদের চক্ষু ইহার একটি বিশেষ সূচ্য ছিল।

আজকাল সাহিত্যের পরিজ্ঞানদের একটি বিশ্বেষের ভাণ্ড একটু সংকীর্ণতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু দীনবন্ধুর সময়ে ইহার কোন চিহ্ন ছিল না। তাঁহার সখ্যার একাদশী ও লীলাবতী নাটকে বঙ্কিম ও বাইকেল মধুসূদন দত্তের উক্ত প্রশংসা আছে। নবীন তপস্বিনী ও জামাই বারিকে প্রজন্মভাবে বন্ধুপ্রীতির ছায়া রহিয়াছে। হিমুর মনোরঞ্জনর জ্ঞান পরবর্তী অনেক নাটকে ও প্রহসনে ব্রাহ্ম যন্ত্রের প্রতি অথবা আক্রমণ আছে, কোথাও একটু দুর্বলতার ছিট পাইয়া ব্যঙ্গ বিজ্ঞপের শ্রবণা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু দীনবন্ধু এইরূপ সাম্প্রদায়িক গাণ্ডের উদ্ভেদ ছিলেন। হিমু হইয়া দীনবন্ধু লীলাবতী নাটকে যেরূপ ব্রাহ্ম পরিবারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ইহা তাঁহার উদার দলয়ের পরিচয়। দীনবন্ধুর নাটকে বাঙ্গাল দেশের প্রবাদ প্রবচন যেগুলি শ্রোত ও ছড়ার যেরূপ স্ব-প্রচুর ভাবে বিস্তারিত আছে অজ কোন নাটকে যেরূপ নাই এবং সর্বত্রই তাহাদের স্বপ্রয়োগ হইয়াছে। ইহাতে দীনবন্ধুর জাতীয় সাহিত্যের প্রতি অহরূপ এবং দেশের প্রতি ভ্রাতাও প্রকাশ পাইতেছে।

আমাদের দেশে বঙ্গের মাসের সংখ্যা অপেক্ষা পার্শ্বদেশ সংখ্যা অধিক ছিল। আমোদ আফ্রাদ হাঙ্গ কৌতুক পূর্ণ পার্শ্বদেশ নিত্য সহচর ছিল। কিন্তু কালবশে আজ সে দিন পরিপণিত হইয়াছে। এমন প্রাণ থলিয়া কেহ হাঙ্গ না কেন না লোকে অসভ্য বলিবে। রঙ্গরসের প্রবণ শুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, শিশুও এখন মহা বিজ্ঞাতের ঘাড়

নাড়ে, এই দুর্দিনে দীনবন্ধুর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ হয় এবং তাঁহার অভাব মর্মে মর্মে আমরা অশ্রুত করি।

তাঁহার এমন একখানি নাটক বা প্রহসন নাই যাহাতে আনন্দ কৌতুকের ও রঙ্গরসের বিদ্যুৎ প্রাণ প্রবাহিত না হইয়াছে। বহুকাল অধীনতার নিগড়ে আসিলে জাতীয় অবসাদ অশ্রুতাবী। দীনবন্ধুর নাট্যকীর্তিতে এমন একটি প্রজন্ম ভাব আছে, এমন একটি সরসতা

আছে, এমন একটি বৈচিত্র্য আছে, যাহাতে মুগ্ধতার জ্ঞান আত্মবিশ্রুত হইয়া পড়ি এবং নীরসপ্রাণও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠে। তাই আজ নববর্ষের প্রথম উৎসবে দীনবন্ধুর স্মৃতিপূজার আয়োজন হইয়াছে এবং তাঁহার স্মরণে আজিকার উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, আজিকার সভা চরিতার্থতা লাভ করুক।

শ্রীশ্রামরতন চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গ-সর্পভীতি

সর্প সর্পাংস জাতীয় প্রাণী। এদেশে ইহার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সর্প হিমে নিস্তেজ এবং দুর্বল হইয়া পড়ে; এই নিমিত্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহাদের অধিকতর প্রাচুর্য। শীতকালে এদেশেও নিস্তেজ হয় এবং অচেতন-প্রায় বিবর-মধ্যে শয়ান থাকে। এই সময়ে ইহাদের জ্ঞান থাকে না।

সর্প নানাবিধ; তন্মধ্যে গোকুর, কেউটে, শম্ভুচ (১), কবাজ, বৈতল্যাচা (২), কালনাগিনী (৩), চন্দ্রবোড়া, উলুবোড়া ও রাজপাণ প্রভৃতি প্রধান ও বিখ্যাত। দাঁড়াস, হেলে, জুতু (৪), ও মেটে গিরগিটি আদি সর্পের বিধ নাই। কেউটে, গোকুর ও শম্ভুচ ইহারা মস্তক ক্ষীত করিলে, কণার উপরিভাগে বিচিত্র চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ফণাধারী সর্পকুল আশিবিষ (৫) নামে অভিহিত।

কবাজ এবং রাজসাপের ফণা নাই বটে, কিন্তু বিষ অত্যন্ত তীব্র; তবে ইহারা সহজে কাহাকেও দংশন করে না। রাজসাপে ডুগুত প্রভৃতি নির্দিষ্ট সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে। ফণাধারী সর্পমধ্যে গোকুরই উদ্যবৎ এবং কোপন স্বভাব। ইহাদের সংখ্যাও বহুল। এদেশে পদ্ম, থরিস, তেঁতুলে ও কুম্ভ প্রভৃতি গোকুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। শম্ভুচও গোমুর জাতীয়। ইহার সন্মুখ-ভাগে মানব অথবা অজ কোন প্রাণী পতিত হইলে, স্থাবিশাল ফণা বিস্তারসূর্যক দণ্ডায়মান হয় এবং বজ্র-সদৃশ ছো মারিয়া অস্তিত্ব করিয়া ফেলে।

ফণাধারী সর্প ফণা বিস্তার না করিয়া দংশন করে না। ইহাদের কোথ বা বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইলেই, ফণা বিস্তার করে। এমন সময়, নেত্রদ্বয় অসিস্পর্শ তেজবিশিষ্ট হয় এবং

(১) ইহারা কোঁ মারিলে মানবের শরীরে চূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া ইহারিগণকে শম্ভুচ বলা হয়। শম্ভুচ দ্বারা, সর্বোৎকৃষ্ট বিষ। শম্ভুচ লোকলোকে প্রায় দেখা যায় না; নিবিড় জঙ্গলে থাকে।

(২) বৈতল্য টিক বৈতল মত, ইহারা গাছে থাকে।

(৩) কালনাগিনীও ফণাধারী; ইহাদের সর্পাল নাভাবর্ণে চিত্রিত, চকু বড়।

(৪) চোঁড়া।

(৫) যে সকল সর্পের দন্তে বিষ আছে।

নাসিকা হইতে ফোঁস ফোঁস শব্দ হইতে থাকে। কোথের সময় ইহাদের সমুখ-ভাগে বাহা কিছু পতিত হয়, তাহাভেই ভীষণরূপে ছোঁ মারে।

ক্ষপাবিহীন সর্পমধ্যে বোড়া সর্প সর্বাগ্রেষ্ঠ। বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর। বোড়া অজগর জাতীয় (১)। ইহার প্রকাণ্ড দেহ-ভাগে বহন অসমর্থ হইয়া, প্রায় একস্থানেই শয়ন করিয়া থাকে। বোড়ার কলেবর দর্শনে, সহসা সর্প বলিয়া অস্বস্ত করা যায় না। মেঘ, ছায়া, পোষা অথবা অস্ত্র প্রাণী নিকটবর্তী স্থানে বিচরণ করিতে আসিলে, ইহার তাহাঙ্গিকে বেটন-পূর্বক প্রভুত বলে পঙ্কর ভয় করিয়া ফেলে, তৎপরে দীর্ঘে দীর্ঘে কবলিত করে। উদরস্থ শিকার পরিগ্রাহক না হওয়া পর্যন্ত ইহাদের চলচ্ছক্তি থাকে না, শয়ন করিয়া থাকে। বোড়া এত বলশালী যে, প্রকাণ্ড গো অথবা মহিষকেও বেটন করিয়া পঙ্কর ভয় করিতে পারে।

আশিবিষ সর্পের উপরের চোয়ালে দুইটি বক্রস্ত থাকে; এই দস্ত্র অতীব তীক্ষ্ণ, ফঁপা ও চলনশীল অর্থাৎ ইচ্ছামত সঞ্চালিত হয়। মুখ বন্ধ করিলে উদর দুই হয় না, তখন মাড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ইহাই সর্পের “বিষদস্ত” বলিয়া কথিত হয়; কারণ, এই দস্ত্রের পশ্চাদ্ভাগে মাড়ীর অভ্যন্তরে বিষ-কোষ; উহাতে তরল বিষ সঞ্চিত থাকে।

ইহাদের কোথের কারণ হইলেই, এই শৃংখ-গর্ত দস্ত্র বিষপূর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হয়। কাহারও দেহে দংশন করিলে, দংশিত-স্থানে বিষ নিপতিত হইয়া শোণিত-মিশ্রিত হইলেই প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। সর্প-বিষ শোণিত-মিশ্রিত হইবা মাত্রই যে আহতের-প্রাণ বিয়োগ ঘটে, তাহা নহে; যতক্ষণ পর্যন্ত উহা হৃৎকোষে উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ জীবের মৃত্যু হয় না। এই বিষ হৃৎকোষে উপস্থিত না হইতেই নিক্রাসিত করিতে পারিলে, কোন ভয় থাকে না। দংশনের সঙ্গে সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পরেই ক্ষত-স্থানের উদরিভাগ রক্ত দ্বারা দৃঢ় রূপে বন্ধন-পূর্বক, কোন অস্ত্র দ্বারা আহত স্থান বিদীর্ণ করিতে হয়; তৎপরে অস্ত্রাঘ্র লৌহ দ্বারা উক্ত বিদীর্ণস্থান দৃঢ় করিলেই, শোণিত-সঙ্গেই বিষ নিঃসৃত হইয়া যাইতে পারে (২)। আশিবিষ সর্পপ্রধান দেশবাসীর সর্বাঙ্গ সাবধান থাকা আবশ্যক। অসতর্কতা নিবন্ধন, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অনানু-বিশ্রুতি সহস্রাবিধ ‘লোক, সর্পদংশনে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে।

যে সকল জন্তু শোণিত স্ভাব্যতঃ শীতল, তাহাদিগের সর্প-বিষে কোন অপকার হয় না। অনেকানেক আশিবিষ সর্প, ভেক কবলিত করিয়া উদরস্থ করিতে না পারিলে উহা উদ্ভীরণ করিয়া ফেলে। সেই বিক্ষত

ভেক, অনায়াসে চলিয়া গিয়া অস্থ-শরীরে দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকে—ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে,— এইরূপ শীতল রক্ত শিশু অনেক প্রাণী-বিশাক্ত সর্পকর্তৃক দংশিত হইয়াও বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না। আশিবিষ সর্প এক প্রাণীকে দংশন করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই অত্রক দংশন করিলে, সে বিষাক্ত হয় না। কারণ, সর্পের বিষ-কোষে প্রচুর বিষ সঞ্চিত থাকে না; যাহা থাকে, প্রথম-দংশনেই নিশেষ হইয়া যায়। পুনরায় কোষ বিসর্প হওয়া সময় সাপেক্ষ এই সময়ে, আশিবিষ সর্পের বিষ-দস্ত্র ভয় করিয়া ফেলিলেও, বিষ-কোষের বিষ নিঃসৃত হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন,—“সর্পের বিষ-দস্ত্র ভয় করিয়া ফেলিলে, উহা এক সপ্তাহের পর উৎপত্ত হইয়া থাকে।” তাহাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। বিষ-দস্ত্রের নিকটবর্তী যে ছুইটি ক্ষুদ্র দস্ত্র থাকে, তাহা শূন্য-গর্ত হইয়া যায়; তদ্বারা বিষ-দস্ত্রের কার্য নিকর হইয়া থাকে।

সর্প মাংসী প্রাণী বটে, কিন্তু মাংস চর্ষণ বা ছিন্ন করিবার উপযুক্ত নয় নাই। উহার ভেক, ইন্দুর ও পক্ষী প্রভৃতি শিকার একেবারে কবলিত করিয়া ফেলে, হৃতরাং চর্ষণ বা খাদ্যরূপে প্রয়োজন হয় না। সর্পের উভয় চোয়ালের দস্ত্রই ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণতম এবং গলদেশাভিমুখে বক্র। ইহার শিকার গ্রাস করিবার নিমিত্ত, এক চোয়ালের দস্ত্র দ্বারা সর্পের কবির আবরণ করে, দ্বারার অস্ত্র চোয়ালের দস্ত্রে উহা ধারণ করে। এইরূপে শিকারটিকে উদরস্থ করিয়া ফেলে।

সর্পের অস্ত্রগুলি একপাড়াতে সজ্জীভূত থাকে যে-সহজেই সঞ্চালিত হইতে পারে।

আহার উদরস্থ করিবার সময়, পঙ্কর ও পৃষ্ঠদেশের অস্ত্র সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া, উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া লয়। এই নিমিত্তই, সর্প আপন অপেক্ষা স্থল প্রাণীকেও অনায়াসে উদর-গহবরে স্থান দিতে পারে। ইহাদের মুখ-গহবর মস্তক অপেক্ষাও বৃহত্তর।

সর্প পর্ববিহীন। ইহার শব্দের সাহায্যে ক্ষত গমন করিতে পারে। প্রথমে পঙ্কর অগ্রসর করে, পরে শব্দ দ্বারা ভূমি অথবা বৃক্ষ দৃঢ়রূপে ধারণ করে। পঙ্কর পালাও, শব্দ দ্বারা শাখা আকৃষ্ট হয়। ইহাদের শব্দ কটক সূত্র। গমন সময়ে উহা উন্নত হইয়া থাকে। সর্প বিবরণমধ্যে, প্রবেশ করিলে উহারি লালু সমধিক বলে আকর্ষণ করিলেও বিপরীত হয় না। কারণ শব্দগুলি উন্নত হইলেই, তদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রাখিতে পারে।

সর্প জল, স্থল, তরু ও লতা সর্বত্রই বিচরণ করিতে পারে। কতকগুলি সর্প সর্বাঙ্গ বুদ্ধিগণি অবস্থান করে। ইহারা পক্ষী, কাঠ-বিড়ালী বা অজবিদ বৃক্ষেরই প্রাণী ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নিরীহ করে। জুহুভ, মেটে গিরিগিট এবং পানীয় কেউটা প্রভৃতি সর্প সলিল-বাসী। পানীয় কেউটার দংশনে, প্রাণিগণকে প্রায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয়। জুহুভ ও গিরিগিট বিষহীন সর্প নহে। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মংস্ত ও ভেক সর্পের কবির কবির থাকে। মেটে-গিরিগিট যেমন নিরীষ, তেমনই নিরীহ; ইহাদিগকে উভ্যক্ত করিলেও উত্তেজিত হয় না।

সর্পের শিক্ষা চলল ও ছুইভাগে বিভক্ত; থাকে যে-সহজেই সঞ্চালিত হইতে পারে।

(১) অজ অর্থাৎ ছাগকে গ্রাস করিতে পারে বলিয়া অজগর জাতীয় বলা হয়। ইহার শিকার লালু বেটনপূর্বক লালারি ভিলাইতে থাকে। সমস্ত প্রাণীর লালুইে খালাস্ত নহয় হয়। ইহাদের গুরু লালার শিকার নহয় হইয়া গেলে মুচাইয়া অস্ত্র ভয় করে; তৎপরে গ্রাস করে। ইহাদের সর্প-বিষের গুরু হয়। দুই চোয়ালের অধিক সর্পের সঙ্গে মৃত, এই নিমিত্ত ঐ সর্প বিসৃত। বোড়ার দৈর্ঘ্য ০৮০০ ফুট এবং বৈ-বিস্ত ১০ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে।

(২) ক্ষতস্থানে কাপ: গ্রাস লাগাইয়া রক্ত টানিয়া লইতে পারিলে অথবা মুখ দিয়া রক্ত টুনিয়া লইলে নিরীহ হয়। কিন্তু পানীয়ের দস্ত্র-মুখে যা থাকে, কিংবা সর্পের মাড়ী হইতে রক্ত বাহির হয়, তাহার দ্বারা ই-বিষ মাড়ীর রক্তের সহিত মিশিয়া গ্রাস বিনাশ করিতে পারে। সর্প-বিষ উদরস্থ করিলেও মৃত্যু হয় না; কিন্তু রক্তের সঙ্গে এক বিপুল বিষ মিশ্রিত হইয়া রক্তকোষে উপস্থিত হইলেই মৃত্যু ঘটে।

এই নিমিত্ত, উহা স্মৃতিত করিতে পারে না। চক্ষু ধ্বা কিংবা বাসুকা নিষ্কপ করিলে সর্প অত্যন্ত বিহ্বল হয়। ইহার নিমিত্ত স্থানে থাকিতেই ভালবাসে; এই নিমিত্ত, কলিকাতার দ্বায় বহু-জনা-কীর্ত্তন হানে প্রায়ই সর্প দৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ সর্পই নিরিপ্ত বনজন্মি ও ভয় আট্টালিকায় বাস করিয়া থাকে। সর্প শয়ন বিষয় খনন করিতে পারে না। ইহার ইন্দুর বা অস্ত্র জীব-কৃত্ত গর্ভ অধিকার করিয়া লয়।

সর্প দ্বয় হইতে বানী অথবা অস্ত্ররূপ মদুর স্বর শ্রবণ করিলে উঠাসে নিকটবর্তী হয়। এই নিমিত্ত, সর্প-ব্যবসায়িগণ বংশীধ্বনি দ্বারা বিবরণ হইতে সর্প বাহির করে। উহার সর্প-ক্রীড়া দেখাইবার সময়ও উৎকর্ষধনি করিয়া থাকে।

সর্পজাতি অতি হিংস্রক, ইহাদের স্বজাতি-প্রীতি একেবারেই নাই। প্রবল সর্প হুর্ললকে ভক্ষণ করে, এমন কি, কোন কোন

সর্প স্বীয় সন্তানকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহার এতাদৃশ হিংসা-রত বলিচাই পণ্ডিতগণ সর্পকে “খল” নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোন হিংসাপরাধ মানবের উল্লেখ করিতে হইলে, সর্পের স্মৃতি উহার তুলনা করা হয়।

নানা কারণে বোধ হয় যে, সর্পজাতি কেবল অনিষ্ট সাধন নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; বাস্তবিক তাহা নহে। সম্বলময় পরমেশ্বর জগতে কোন বস্তুই নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই।

সর্প দ্বারা জগতে যে কত মহোৎসব সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। ইহার দৃষ্ট বায়ু গ্রহণ করিয়া প্রাণিগণের জীবন রক্ষার সহায়তা করে; চিকিৎসকগণ সর্পবিধ হইতে বিবিধ ঔষুধ প্রস্তুত করিয়া কত কত উৎকট ব্যাধির শাস্তি করিয়া থাকেন

(১)। সর্পবিধ না থাকিলে জগতে যে কত অনিষ্ট ঘটিত, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীউমাচরণ দাস

ইউরোপে ভারতীয় স্থাপত্য

ও চিত্রকলা

সম্প্রতি একজন ওলন্দাজ চিত্রকর ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। এদেশে চারিমাশ কাল কাটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

লক্ষাদ্বীপ, মাদ্রাস, ত্রিচিনপলি, গোয়া-লিয়র, আগ্রা এবং কাশী এই কয়েকস্থানের দৃশ্যসমূহ ইনি দেখিয়া গিয়াছেন। আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি কি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রাচীন স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন?” ইনি বলিলেন, “না। আমি পুরাতন প্রাণ-হীন বস্তু ভালবাসি না। আমি জীবন্ত জিনিষ দেখিতে চাই। মরা শরীর দেখিতে যেমন মাদ্রাসের কষ্ট বোধ হয়, তাহার দৃষ্ট যেমন কাহারও ভাল লাগে না

তেননি পুরাতন, ধ্বংসপ্রাপ্ত আট্টালিকা, মন্দির বা মূর্ত্তিরাশি আমার চিত্তে বেদনা দেয়। সেগুলি দেখিয়া বা তাহাদের কাছে যাইয়া আমি আনন্দ পাই না। আমি জীবন্ত মাছুষ দেখিতে ইচ্ছা করি। নগরের কোলাহল, জনগণের যাতায়াত, পাখীর গান, কানোয়াবের শব্দ, নৌকার গতি এই সবই আমার বেশী ভাল লাগে।”

ইনি তিনচারিটা বড় বড় পোর্টফোলিও দেখাইলেন। সে গুলিতে সিংহল ও ভারতবর্ষের নানা দৃশ্য এবং খননা চিত্রিত রহিয়াছে। মন্দির, সন্ধ্যাসী, দেবতা, ভিক্ষু, ছাপল, পাতী, হাতী, নৌকা, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এগুলি কি সম্পূর্ণ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে? না, এই সমুদয়ের উপর আরও কাজ করিতে হইবে?” তিনি ধামিয়া বলিলেন “এগুলি কিছুই নয়।

বেথকেরা যেমন ডায়েরীতে সফতে ও ‘নোট’ মাজ লিখিয়া রাবেন, আমিও সেইরূপ নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি মাজ। এক একটা চিত্রের জন্ত প্রায় ৩০ খণ্ডী খাটাইয়াছি। প্রত্যেকটা লইয়া ১৫২০ দিন কাজ করিলে তবে চিত্র সম্পূর্ণ হইবে।”

বেথিলাম এ খাতায় তিনি প্রায় ৬০ খানা ছবি বোদ্ধ ও মুসলমান দৃশ্যের নোট বা সফতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এ গুলিকে পূর্ণতা দান করিতে ইহার দুই বৎসর লাগিবে বলিলেন। চিত্রগুলি প্রচুর ছাপাইয়া বিক্রয় করবেন। এক একখানা চিত্রের ২৫০০ টা নকল ছাপা হইবে। প্রত্যেক নকল-চিত্র ১৫০২০০ টাকার বিক্রয় হইবে। ইউরোপের ত্রিভিন্ন দেশের মিউজিয়াম, চিত্রশালা, খনী

বাস্তি, চিত্রকর এবং সৌধীন লোকেরা এই সমুদয় চিত্রের ক্রেতা।

আমি বলিলাম—“দেখিতেছি, আপনার এই সকল চিত্রের সাহায্যে ওলন্দাজেরা হিন্দুসমাজের এবং ভারতবর্ষের অনেক কথাই সহজে বুঝিতে পারেন।” তিনি বলিলেন, “নিশ্চয়, আপনি যদি কোন ভাষায় পুস্তক লিখেন, তাহার পাঠক ও বোদ্ধা কেবল মাত্র সেই ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু চিত্র দেখিয়া মাছুষ মাত্রই চিত্রের পর কল্পিত বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জান হ্যাঁতেও হ্রস্ভগারিত। লাইভেন-পদার্থাট, শ্রমশা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নানা বিষয়ের ‘পেন্সিল-স্কেচ’ দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এগুলি কি সম্পূর্ণ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে? না, এই সমুদয়ের উপর আরও কাজ করিতে হইবে?” তিনি ধামিয়া বলিলেন “এগুলি কিছুই নয়।

বেথকেরা যেমন ডায়েরীতে সফতে ও ‘নোট’ মাজ লিখিয়া রাবেন, আমিও সেইরূপ নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি মাজ। এক একটা চিত্রের জন্ত প্রায় ৩০ খণ্ডী খাটাইয়াছি। প্রত্যেকটা লইয়া ১৫২০ দিন কাজ করিলে তবে চিত্র সম্পূর্ণ হইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি ভারতবর্ষের সাহিত্য কিছু আলোচনা করিয়াছেন কি? ভারতের সংস্কৃত, প্রাকৃত বা আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য আপনার জানা আছে কি? তাহা না হইলে আপনি নিজেই বা হিন্দুস্থানের দৃশ্য, খননা, সমাজ বা কাজবন্দ

বুঝেন কি করিয়া? আর এগুলি না স্থূল চিত্রাঙ্কন কথা কি সম্ভবপর?" চিত্রকর বলিলেন, "বালীধীপে আমাদের রাজ্য এখনও আছে। সেখানে অনেক হিন্দুর বাস। আমি সেদেশে তিনবার গিয়াছি। তিনবারে তিন বৎসর কাটাইয়াছি। তাহা ছাড়া আরও দুই বৎসর বালীধীপের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে জানলাভ করিয়াছি। ঐ ধীপের ভাষাও কিছু কিছু শিখিয়াছি। ওখানকার হিন্দু কারিগর ও শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া হিন্দু-ধর্ম ও সভ্যতার অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি। পরে আমার অভিজ্ঞতাসমূহ একথানা স্বহৃৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে প্রায় ২৫০ খানা চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রচার কার্যে আমাদের গবর্ণমেন্ট সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি অনেক আলোচনা করিয়াছি। হিন্দু, হিন্দু দেবদেবী, হিন্দুর আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। বালীধীপে বাস করিয়া আমি ভারতবর্ষের আবহাওয়া বানিকটা বুঝিতে পারিয়াছি।"

প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে ওলন্দাজ মত

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষ্কর্য্য সম্বন্ধে ইনি বেশ উচ্চ দাব্যবাহি পোষণ করেন দেখিতেছি। মাহুদা মন্দিরের পারদ্বিত একটা রমণী মূর্তি সম্বন্ধে ইনি বলিলেন "গ্রীকদিগের রচনা-কৌশল অপেক্ষা ইহাতে কম শিল্পনৈপুণ্য নাই। সমস্ত মূর্তিটির মধ্যে সোদাশূদ্র এবং গঠন-লাবণ্য অতি দক্ষতার সহিতই পুষ্ট করা হইয়াছে।"

মাহুদা কিংবা কলম্বোর কোন চিত্রশালায় তিনি নটরাজ শিবের কাস্তেময় মূর্তি দেখিয়াছেন। ইহার প্রশংসাও তাঁহার নিকট তুলিনাম। শিবের চরণ-বিভাস এবং গোলাকার আবেষ্টনের মধ্যে মূর্তির অবস্থিতি শিল্পীর সামগ্রস্ত জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যবোধের সাক্ষ্য দিতেছে।

ইনি ভারতের আধুনিক চিত্রকরগণের কোন সংবাদ রাখেন না। রবি বর্মা, কুমার-স্বামী বা অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদির নাম এমনও শুনে নাই। কিন্তু ছাত্তলের গ্রন্থসমূহ ইহার নিকট দেখিলাম। আমার নিকট একথানা "মডার্ন রিভিউ" ছিল। তাহাতে শৈলেন্দ্রনাথ দেবের জগদ্ধাত্রী প্রথম পৃষ্ঠায়ই দেখিতে পাইলাম। এইটা ওলন্দাজ শিল্পীকে দেখান গেল। ইনি বলিলেন "ধর্ম হিসাবে, দেবতা হিসাবে আমি ইহার আদর পূর্ণমাত্রায় করিতে পারি কি না সম্ভেদ। কিন্তু চিত্র-কলাবিধানে ইহা অতিশয় সুশ্রী। গিৎসের উপর যে মূর্তি উপবিষ্ট তাহাতে সৌন্দর্য্য, সামগ্রস্ত, অস্থাপত্য ইত্যাদির মাত্রা বেশ রক্ষিত হইয়াছে। রং ফলাইবার ক্ষমতাও শিল্পীর বেশে। সমগ্র চিত্রের ভিতর অপেক্ষে বেশ একটা মিল পাইতেছি। তবে মুখমণ্ডলটা আরও সুন্দর এবং সতেজ হইতে পারিত।"

এই সংখ্যায়ই, অবনীন্দ্রনাথের একটি চিত্রের কুত্র প্রতিজিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ইংরাণী নাম "In the dark night." এইটা দেখাইলাম। চিত্রকর এই অভিসারিকার চিত্র দেখিয়া বলিলেন—"নরকেও মন্দ দেখাইতেছে না—শেষ ভাবপূর্ণ ইহাও হইতেছে। এত ছোট প্রতিজিপিতে কৌশল বাস না।"

এই ওলন্দাজ শিল্পীর মতে গ্রীক রচনার সঙ্গে তুলনায় মাহুদা তাঙ্কোর ইত্যাদি স্থানের শিল্প কণ্ঠ নন্দনীয় নয়। অনেকগুলি সমান অবস্থ কোন কোনটা নিকট শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রাচীন মিশরের ভাষ্কর্য্য ইউরোপীয়েরা পূর্বে আদর করিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি সেগুলির সৌন্দর্য্যও ইউরোপের চিত্র আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার বিশ্বাস—অঙ্গ-কণ্ঠের ভিতরই ভারতবর্ষের প্রাচীন মূর্তিগঠন, থোপাই কার্ঘ্য, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদির যথোচিত আদর পাচ্চাত্য জগতে আরম্ভ হইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভারতবর্ষের মূর্তিগুলির চারি হাত ও তিন চোখ, এবং সিংহ বাঘ ইত্যাদির উপর অবস্থান—এগুলি কি পাশ্চাত্যের কোন দিন বুঝিতে ও আদর করিতে পারিবে? আপনাদের চোখে এরিগিন ত এই সব অতি অপ্রাভাবিক, অসত্য, প্রকৃতি-বিকৃত বিবেচিত হইয়াছে। কেহ কেহ ত আমাদের দেবদেবীর মূর্তিগুলি, ষড়্ভুজ, বিশ্রী, বীড়ম্, কদাকার বিবিধা থাকেন। আমাদের প্রাচীন শিল্পীদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান আদৌ ছিল না—এইরূপই অনেক চিত্র-ও-মূর্তি সমালোচকগণের বিশ্বাস।"

ইনি হাসিয়া বলিলেন, "অপ্রাভাবিক পরিকল্পনা কি আসে যায়? প্রকৃতি বিরুদ্ধ হই পর যতক্ন নেজ থাকিলেই বা! তাহার ভিতর ও কি সৌন্দর্য্য ফুটান যায় না? শাঙ্কর, শূশলা, অস্থাপত্য, লাবণ্য, থোপাই-কাঠ ইত্যাদির জ্ঞান কি এই তথাকথিত অপ্রাকৃত রচনাসমূহে লক্ষ্য করিতে পারি না? আমার ত বিশ্বাস—অতি উচ্চ অঙ্গের সৌন্দর্য্য স্রষ্টব্য ক্ষমতা ভারতীয় কারিগরগণের ছিল। আমি সম্প্রতি বাহ্য সৌন্দর্য্য ও স্থূল

আকৃতি সৌষ্ঠবের কথাই বলিতেছি—অন্তর্নিহিত ভাব-সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি না। পাশ্চাত্যের ভারতীয় মূর্তির বহির্ভাগ মাত্র দেখিয়া থাকেন। হিন্দু দেবদেবী বা বাহনাদির ভিতরকার কথা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নিকট আশা করা যায় না। কিন্তু তথাপি আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এইরূপ বাহ্যাবরণের দর্শক এবং বোদ্ধারাও হিন্দু মূর্তিগুলির মধ্যে উৎকর্ষ্ত কলা-নৈপুণ্য বেগিতে পাইবেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে এই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ও অপ্রাভাবিক হস্তপদবিশিষ্ট মূর্তিগণ সভ্যসভায় উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। বাদ্যার গ্রীক ও মিশরীয় প্রকৃতি-সম্পন্ন মূর্তির আদর করেন তাহাদেরও ভবিষ্যতে এই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্ঘ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আদর করিতে শিখিবেন।"

তাব পর চিত্রকর ও ভাষ্কর্য্যের ভিতর-কার কথা এবং অন্তর্নিহিত আদর্শ ও ভাব-রাশি সম্বন্ধে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, "প্রকৃতির নকল করাই ত হুম্মার শিল্প ও কলার কার্য নয়। শিল্পী অনেক নূতন নূতন পরার্থ স্রষ্ট করিয়া জগৎকে ঐশ্বর্য্যময় করিয়া থাকেন। তাহার কল্পনাশক্তির পরিচয় না পাইলে তাহাকে উচ্চ শ্রেণীর কারিগর বলিতে পারি কি?"

গ্রীকদিগের দেবদেবী সমূহ—সেগুলিও কি কল্পনার স্রষ্ট নয়? সেগুলি কি আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতিবিম্ব বা নকল মাত্র? কখনই নয়—সেগুলির মধ্যেও ভাব্যুত্থা যথেষ্ট আছে।

প্রত্যেক জাতির চিত্রে ও ভাষ্কর্য্যে নিজস্ব চিত্রাঙ্গার প্রভাব থাকিবেই। সেই চিত্রা-রাশি নানা আকারে, নানা মূর্তিতে হৃদয়

প্রকাশিত হয় কিন্তু মূর্তিগুলির পরিকল্পনার সামঞ্জস্য জ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ, অল্পপাণের ধারণা চুম্বিয়ার লোকই বেশ বুঝিতে পারে। ভিত্তিকার কথা, ভাবুকা, চিত্তের ক্রিয়া ইত্যাদি দৃঢ়দৃষ্টম করা অশ্রদ্ধা স্বভাবীয়দিগের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু সেই ভাবনারাশি যে আকারে আমাদের চোখের সমুখে ইন্ডিয়-গোচর হয় সেগুলি বুঝা ত বেশী কষ্টের নয়। এই কারণে আজ পাশ্চাত্যজগৎ মিশরের শিল্প আদর করিতে পারিয়াছে। মিশরীয় ধর্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, ও বাহনতত্ত্ব, আধুনিক ঐষ্টীশানজাতি এখনও সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই সত্য। কিন্তু তাহাদের শিল্পের বাহু অঙ্গগুলি জ্ঞানসম্মতই বোধগম্য হইতেছে। আমরা দিন দিন সেই প্রাচীনতম জাতির কলাজ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। শীঘ্রই ভারতের প্রাচীন কলাইনপুণ্যও জগতে সূচননা লাভ করবে। ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ভারতের নব্য চিত্র-শিল্প এবং

রুশ সামালোচক

লওনের "ভিক্টোরিয়া এবং ম্যালবার্ট-মিউজিয়ামের" এক অংশের নাম ভারতীয় সংগ্রহালয়। কলিকাতা মিউজিয়ামের শিল্প ও ঐতিহাসিক বিভাগে যে সকল বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে এখানেও সেই জাতীয় বস্তু রাখিত হইয়া থাকে। এই ভবনে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার নমুনাই বিশেষভাবে দেখিতে পাইলাম। এতগুলি ভারতীয় চিত্র পূর্বে এক সঙ্গে কখনও দেখি নাই। প্রায়ই মূল্যবানী যুগের রচনা। রাজপুত, পাহাড়ী, মোগল এবং কাদ্মীর এই সকল দরবারে চিত্রাবলীতে এই ভবনের কিয়দংশ ভরিয়া গিয়াছে। ভারতীয় চিত্রকলার একদল স্রষ্টার সংগ্রহালয় ভারতবর্ষের কুজাপি দেখি নাই।

এতযাতীয়, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার কতগুলি নিদর্শন এই গৃহের কয়েকটা প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে এই গুলি প্যারিস নগরের প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। ফরাসীরা এই সমুদয় শিল্প-কর্মের যথেষ্ট দৃষ্টিভাষি করিয়াছেন। তাহা শুনিয়াই ইংরাজেরা এইগুলিকে লওনের প্রদর্শনীতে স্থান দিয়াছেন। এই চিত্রগুলির সন্নিবিষ্ট বিবরণ এক বাহা পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছিলেন যে এগুলিকে একটা promise বা ভবিষ্যতের স্বচনামাত্ররূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। Fulfilment বা সিদ্ধান্তের পরিচয় এই সকল নমুনা নয়। অর্থাৎ ভারতশিল্পীরা এখন চিত্র বিদ্যায় হাতে খড়ি দিতেছেন মাত্র। এখন ইহাদের সাধনার যুগ চলিতেছে—ভবিষ্যতে নব্য ভারতীয় চিত্র কলা কি দাঁড়াইবে এখনও বলিবার সময় আসে নাই।

আধুনিক চিত্রগুলি প্রাচীন চিত্রাবলীর পার্থক্যই রক্ষিত হইয়াছে। তাহার ফলে ভারতীয় কারিগরীর দুই যুগ তুলনা করা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন দর্শকই এক্ষণে প্রাচীন এবং অস্বাভাবিক-নাথপ্রবর্তিত নব্য কলার পরিচয় পাইবেন। মোটের উপর, এই ঘরে প্রবেশ করিলে চিত্র শিল্পে ভারতবাসীর ক্রমবিকাশ বুঝিতে কাহারও কষ্ট পাইতে হয় না।

দেখিতে পাইলাম একবাঁজি অতি মনোযোগ সহকারে নেটরূপে সমুদয় লিখিতোছেন। আলাপে জালিলাম ইনি কস। কবিতারচনা, কাব্যসমালোচনা এবং চিত্র-সমালোচনায় ইহার খুব বোঁক। ইনি একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক—স্পেনসেরীয় মুসলমান সমাজবিষয়ক কাহিনী ইহার রচনায়

বিশেষ বিবৃত হয়। ইনি বলিলেন "আমি এই চিত্রগুলি দেখে কলভাষায় একটা প্রবন্ধ লিখি, এইজন্য নোট সংগ্রহ করিতেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ভারতের আধুনিক চিত্রসম্পদ বিখ্যে কশিয়ার লোকেরা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ লাভবান হইবে কি?" ইনি উত্তর করিলেন, "ভারতবর্ষ দেখে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমার স্বদেশবাসীরা বিশেষ ব্যয়। আজ কাল রবীন্দ্রনাথের কাব্য কশিয়ার বিশেষ সমাদৃত। ইতি মধ্যে "গীতাঞ্জলি"র কণ অম্বাবাদের তিন সংস্করণ বিক্রী হইয়া গিয়াছে। অম্বাবাক আমার ইহার মাতৃভাষা অনেকটা সঙ্কুচের মত এবং চিন্তাপ্রণালীও কথঞ্চিৎ ভারতীয় ধরণের। এই জন্য আমি ইহাকে গীতাঞ্জলি অম্বাবাদ বিখ্যে করিয়াছিলাম। সম্রাতি আমি নিজেই "গার্ডেনার" গ্রন্থের অর্থাৎ কোন কোন কবিতার কণ অম্বাবাদ করিয়াছি তাহার আদরও কম নয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "Gardener" এর কোন কবিতাটি আপনার ভাল লাগে?" উত্তরে বুঝা গেল— "ওগো মা রাজার ছালা যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে, আজি এ প্রভাতে গৃহ কাজ লয়ে রহিব বল কি মতে?"— ইত্যাদি কবিতাটি ইহার প্রিয়।

ইনি প্রথমেই বলিলেন "মহাশয়, যদি স্মরণিত না হন, তাহা হইলে বলি যে, আপনার চিত্রশিল্পীরা বিদেশীয় কাব্যসমুহ নকল করিতেছেন কেন? জাপানী ও ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব আপনারা এই নব্য চিত্রকলায় অত্যধিক দেখিতে পাইতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বলিতে চাহেন যে, আমাদের শিল্প চিরকাল এক-ভাবেই থাকিবে? যুগে যুগে নতুন নতুন রীতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতশিল্পের নতুন নতুন আকার ফুটিয়া উঠিবে না? আজকাল ভারতবর্ষে বিশ্বের সকল প্রকার শক্তিই প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ভারতবাসীর জীবন কি এই শক্তিসমূহ অব্যবহার করিয়া বিকশিত হইতে পারে? কাজেই আধুনিক ভারতীয় শিল্পে বিশ্বের সম্পদই সন্নিবিষ্ট হইতে থাকিবে তাহার আশঙ্ক্য কি?"

তিনি বলিলেন, "বিদেশীয় রীতি অম্বকরণ করা ভারতবাসীর পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নয়। অম্বজ জগতের সকল প্রকার রীতিই আপনারা আলোচনা করুন ও শিক্ষা করুন। আপনার শিল্পীরা জগতের নানা প্রকার কাযদার পরিচয় গ্রহণ করুন। তাহাতে আমি অপরিচিত করিব না। শিক্ষার জন্য এই সমুদয়েরই প্রয়োজন আছে। নানা জিনিষ না দেখিলে চোখ ফুটে না। কিন্তু যখন আপনার ছবি আঁকিতে বসিলেন তখন এই সকল পরকীয় জিনিষ মনে রাখিবেন না। সকলগুলি কুলিয়া গিয়া নিজ করন শক্তির লাভায়া গ্রহণ করিবেন। বকী সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এবং শিল্পবোধ এত নিনাকার শিক্ষার ফলে মেরুণ পুষ্ট হইয়াছে তদুদ্যমেই কাঁচ্য করিবেন। যাহা কিছু দেখিতেছেন, শিখিতেছেন ও বুঝিতেছেন সকলই আপনাদের নিজস্ব হইয়া যাওয়া আবশ্যক। যথার্থ রূপে হজম ও মজাগত হইয়া গেলে পরকীয় শিল্পের প্রভাবও পেরিকল্পিত হয় না। কিন্তু দেখিতেছি আধুনিক ভারতীয় শিল্পীরা বিদেশীয় প্রভাব এখনও পূর্ণরূপে হজম করিতে পারেন নাই। পরকীয় রীতি-

গুলি এই শিল্পজ্ঞানের অঙ্গীভূত হইয়া গেলে ভারতের আধুনিক চিত্রকরণ জগতে একটা নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং পূর্বাভাস এই কার্যার্থের মধ্যে যথেষ্টই দেখিতে পাইতেছি।"

এই বলিয়া রূপ সমালোচক ও ঔপন্যাসিক আমাকে যোগল, রাজপুত্র, পাহাড়ী এবং কাম্বোজি চিত্র-গুলি দেখাইলেন। তাঁহার মতে "এই সমূহ অতি উচ্চ অঙ্গের শিল্পকর্ম।" এই সকল চিত্রে perspective বা পারিস্পেক্টিভের পরিচয় নাই সত্য। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। প্রত্যেক চিত্রেই সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা যত সহকারে রক্ষিত হইয়াছে। প্রত্যেক কার্যেই চিত্রের ভাব পরিষ্কার রূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া বর্ণ সমাবেশ ও নিখুঁত। পাশ্চাত্য চিত্রকরণও এরূপ রং ফলাইতে পারিলে কৃত্রিম বোধ করিবেন।"

এই উপলক্ষে তিনি আরও বলিলেন, "এই প্রাচীন চিত্র সম্পদের পারস্পর্য্য রক্ষা করাই আধুনিক ভারতশিল্পিগণের কর্তব্য। এরূপ উচ্চ শ্রেণীর কার্যার্থে যে দেশে তাহার সন্তানগণ বিদেশ হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবেন কেন?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি রূপ ভাষায় যে প্রবন্ধ লিখিবেন তাহার সারমর্ম আমাকে বলিতে পারেন কি?" তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে চিত্রগুলির সমূহে লইয়া গেলেন। প্রত্যেক চিত্রের সমুদয় দাড়াইয়া ছুই জনে নানা আলোচনা হইল।

মুকুল চন্দ্র দেব রং ফলাইবার ক্ষমতা আছে। "অপরার নৃত্য"-চিত্রে নর্তন অতি সুন্দর দেখান হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক রেখা সার্থক—একটীও বাজে লাইন বা

দাগ নাই। ইহাতে সর্বোচ্চ শ্রেণীর কারিগরি বৃত্তিতে পরা যায়।

কিন্তু রূপ মজুমদার এক একটা ছবির মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। প্রত্যেক বিষয় হৃৎকিত্ত হইয়াছে। কিন্তু সকলগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। যেখানে চিত্রে তিনটি পদার্থ আছে—রশ্মী, ময়ূর ও মেঘ। এই তিনটির ভিতর যে কোন দুইটি থাকিলেই সৌন্দর্য্য বাড়িত।

অসিত হালদারের পেন্সিল-স্কেচ ও নক্সাগুলি অতি মনোরম। কিন্তু কোন কোন রেখায় ও কল্পনায় আপানী প্রভাব পরিষ্কৃত। অথচ তাহা অজ্ঞ কার্যদার সঙ্গে বিশেষ বাপ পায় নাই।

নন্দলালের কার্য দেখিয়া ইনি বিশেষ প্রীত। ইহার মতে নন্দলাল ছবি আঁকিতে যেরূপ দক্ষ রং সমাবেশে সেরূপ পট্ট নন। নীল, সবুজ ইত্যাদি বর্ণের সামঞ্জস্য বিধান করিতে ইনি পারেন নাই। রাজপুত্ররীতির বর্ণ-সমাবেশ পড়ায় তাহা বৃষ্টিতে নন্দলালের দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। "হরিকেশের অশ্বান-দৌবান" চিত্রেই দেখিয়া রূপসমালোচক যথেষ্ট স্তুতি প্রদান করিলেন। রামায়ণের দৃষ্ট সমূহও ইহার ভাল লাগিল।

গণপেন্সেনাথ ঠাকুরের অনেকগুলি রচনাই এখানে প্রদর্শিত। রূপ সমালোচক এগুলি বিশেষ বৃত্তিতে পাল্লিলেন না। ইহার মতে গণপেন্সেনাথের শিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব অত্যধিক।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কার্যগুলি ইনি প্রায়ই নিখুঁত বলিলেন। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন "অবনীন্দ্রনাথের বয়স কত?" আমি বলিলাম "ইনিই নব্য শিল্পের প্রবর্তক। অতীত যে সকল শিল্পীর কার্য এখানে প্রদর্শিত

হইয়াছে তাঁহারা সকলেই ইহার ছাত্র।" তিনি বলিলেন "আমি ভাবিয়াছিলাম ইনি অল্পবয়স্ক যুবক।"

রূপ বস্তুটি পূর্বে অবনীন্দ্রনাথের নামও শুনে নাই এবং ভারতীয় চিত্রের কোন সংবাণও রাখেন নাই। তিনি বলিলেন "এই সমূহ চিত্র যদি ইউরোপের নানা প্রদর্শনীতে প্রচারিত হইতে থাকে তাহা হইলে অত্যধিক মূল্যে এগুলি বিক্রীত হইবে। কেবল তাহাই নহে। সমস্ত জগতের চিত্র-শিল্পীরা ও এই ভারতীয় কলা হইতে নূতন শিক্ষা পাইবেন। আমার বিশ্বাস, আপনাদের চিত্রকরেরা বর্ণসমাবেশের ক্ষমতা লাভ করিলেই ভারতীয় শিল্প-চিত্রজগতে এক অভিনব রীতির প্রবর্তন করিতে পারিবে। ইহাদের "ভাবাইন" করিবার ক্ষমতা এবং চিত্রাঙ্কণের দক্ষতা এখনই নিরপেক্ষ সমালোচকেরা প্রশংসা করিতে বাধ্য।"

অবনীন্দ্রনাথের "মর্ডার-রিভিউ"-প্রসিদ্ধ উষ্ট্র-চিত্র সম্বন্ধে রূপ সমালোচক বলিলেন "সবই ভাল হইয়াছে। কিন্তু বর্ণ-বিভাগে পাকা হাতের নয়।" যেরূপে সখী নায়িকাকে নায়কের স্তূতি দেখাইতেছেন তাহাও ইনি যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। সখী, রাধা এবং স্তূতি—তিনটি বস্তুই অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। সমস্ত চিত্রের ভিতর দিয়া একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ভাবময় চিত্রের মূল্য অত্যধিক। নায়িকার উচ্চ অভ্যন্তর বৃহৎকার ও কর্মধ্য দেখাইতেছে সত্য। কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি এমিকে ঘাইবে না। মুখশ্রী ও চিত্রের সামঞ্জস্যই সকলের চোখে আগে পড়িবে। কাজেই এই বৃত্তে চিত্রের অপর্যায় নাই।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীতে রংফালন

প্রায়ই সর্বোচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। ওনার থাইয়ামের আলোচ্য বিষয়গুলি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু ছবির নীচে কবিতার পদগুলি না লিখিলেই ভাল হইত। কারণ কবিতা পাঠ করিয়া ছবির অর্থ বিশেষ বুঝা যায় না। বরং ছবিগুলি দেখিয়াই উচ্চ অঙ্গের শিল্পার্থের পরিচয় পাওয়া যায়। "নির্বাণিগত যক্ষের পত্নী"-চিত্রটি দেখিলেও যে-কোন দেশের যেকোন দর্শক বিরহের দৃষ্ট বৃত্তিতে পারেন। ইহার নীচে কোন কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই। বর্ষা ঋতু বুঝাইবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ একটি অন্ধকারময় বনভূমিতে তিনটি নর্তকীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বর্ষা, অন্ধন, রেখাপাত, মনোভাব হইতে পড়িবে। রমণী ইত্যাদি সবই এই চিত্রে স্ফুট হইয়াছে। তমণী-জয়ের আকার কিছু দীর্ঘ সত্য। কিন্তু নৃত্যের অবস্থায় ইহাদিগকে যেরূপ সাজান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ দর্শকের চোখ পড়িবে না। সকলেই নৃত্যের চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবেন।

ভারতীয় সংগ্রহালয়ের চিত্র-প্রকোষ্ঠে থাকিতে থাকিতেই রূপ সাহিত্য সেবার সঙ্গে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমাদের আধুনিক শিল্পীরা অতি ক্ষুদ্রাকার চিত্র আঁকিয়া থাকেন মনে হইল না কি? ইহার বড় বড় ছবি আঁকিতেছেন না কেন? আপনি কি বিবেচনা করেন যে ইহাদের সে ক্ষমতা নাই?" তিনি বলিলেন "না, ক্ষুদ্র ছবি আঁকিতেই বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। বড় ছবি অপেক্ষাকৃত সহজ। হস্তরং ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব সুচিত হইবার কারণ নাই। সর্বোচ্চ শ্রেণীর শিল্প ক্ষমতা আপনাদের আছে—জগতের লোক এক কথা বলিবে। আমি

আপনার স্বদেশকে বুঝা বাড়াইতেছি না।"

তিনি আবার বলিলেন "আপনাদের চিত্র কার্যগুলি জগতের সকল প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে প্রদর্শিত করুন। শীঘ্রই আধুনিক ভারত পৃথিবীর মধ্যে উচ্চ সম্মানের যোগ্য হইবে। সাহিত্য-চর্চা দ্বারা আপনাদের জগতে যত প্রসিদ্ধ হইতে পারিবেন শিল্প চর্চা দ্বারা তাহা অপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ হইতে পারিবেন। কারণ আপনাদের সাহিত্য সভ্য ভাবে স্বয়ংসম করা বিদেশীয়গণের পক্ষে অসম্ভব। আপনাদের মাতৃভাষায় স্থপতিত না হইলে কেহ সাহিত্যরস উপভোগ করিতে পারিবেন না। অল্পবাদ মাত্র পাঠ করিয়া সাহিত্যের মন্দংকণ গ্রহণ করা বড়ই কঠিন।"

"বিশেষতঃ ২৪০১০ খানা গ্রন্থের অস্থাবর হইলেই বা কি হইবে? কোন সাহিত্যের একশাখা গ্রন্থ বৃষ্টিতে হইলে সেই সাহিত্যের প্রাচীন নবীন অসংখ্য গ্রন্থের সহিত পরিচিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু চিত্র বৃষ্টিবার জন্ম কোন ভাষায় পণ্ডিত হইবার প্রয়োজন নাই। চিত্র সমূহ মানবজাতির সাধারণ ভাষায় শিল্পীর মনোভাব প্রকাশ করে। চিত্রের ভাষা জাতিহিমায়ে ভিন্ন ভিন্ন। জগতের সকল জাতি এবং সকল জাতির সকল লোকই এক চিত্রভাষা ব্যবহার করে। এখানে অস্থাবরের প্রয়োজন নাই—ব্যাখ্যা সমালোচনারও প্রয়োজন নাই। ভাষান্তরিত করিয়া মৌলিক চিত্রের রহস্য বুঝাইবারও আবশ্যক হয় না। মাতৃস্থ মাত্রই যে কোন চিত্র দেখিয়া স্পষ্টতঃ সোজা দৃববর্তী জাতির স্বয়ং-কথা অন্যায়সে বৃষ্টিতে পারে। একজন্ম ভারতবর্গকে আধুনিক জগতে প্রচারিত করিতে হইলে চিত্র শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করাই অত্যাবশ্যক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে শিল্পের উপর জাতীয় চিত্রকের কোন প্রভাব নাই? যে কোন হিন্দুই কি পুটান শিল্পীদের যে কোন কার্য সহজে উপভোগ করিতে পারেন? যে কোন খ্রীষ্টানই কি হিন্দু কারিগরের যে কোন শিল্প কার্যে সৌন্দর্য্য বৃষ্টিতে পারেন? ভারত-বর্ষের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি না জানিলে কি ভারতীয় চিত্রকলা অল্প দেশের লোকেরা সম্যক বৃষ্টিতে পারিবেন? আমরাই কি পাশ্চাত্য জগতের পূর্ণাঙ্গের ইতিহাস-কথা না জানিয়া পাশ্চাত্য শিল্প বৃষ্টিতে পারি?" রূপ সমালোচক বলিলেন— "বাস্তবিকই চিত্র শিল্প সার্বভৌমিক, সার্বকালিক এবং সার্বজনীন। সকল যুগের সকল লোকই যে কোন চিত্র বৃষ্টিতে সমর্থ। অবশ্য কোন কোন জিনিষ বুঝাইবার জন্ম ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বিত হয়। তাহাতে ক্ষতি কি? ঐ বৈচিত্র্যে জগৎপরে বিশেষ অস্থিবিধা হয় না।

পূর্বেই বলিয়াছি চিত্রের নীচে বিবরণ স্বরূপ কোন কবিতার পদ লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। ছবির নীচে কিছু না লিখিলেও সকলেই বিষয়টা সহজে বৃষ্টিতে পারে।

ইহারাজ শিল্পীরা সাধারণতঃ চিত্রের নীচে বর্ণনা লিখিয়া রাখেন। কিন্তু ফরাসী ও রূপ চিত্রকরেরা ইহা পছন্দ করেন না। মনে করণ, রেফারেন্স প্রসিদ্ধ "ম্যাডোনা" চিত্রের নীচে "ম্যাডোনা" শব্দ পর্য্যন্ত লেখা নাই। তথাপি জগতে এমন কোন লোক আছে কি যে এই চিত্র দেখিয়া মাতৃভাব বা ধাত্রীভাব স্বয়ংসম করিতে না পারে?

দেবদাসী, জনগণ, তরুণলতা, জীবজন্তু

ইত্যাদির কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন নিয়মেই করিয়া থাকেন। ভারতীয় দেবদেবীগণের রূপ ও মূর্ত্তি দেখিতেছি কতকগুলি বাধা নিম্নের অধীন। সেগুলি আমরা জানি না—বুদ্ধিও না। কিন্তু সেগুলির সৌন্দর্য্য ও উদ্দেশ্য কি আমরা বৃষ্টিতেছি না? দেবদেবীসমূহের শাস্ত্রীয় রূপ রক্ষা করিয়াও আপনাদের চিত্রকরণ যথোচিত ব্যাকগ্রাউন্ড এবং পারিপার্শ্বিক ও আবহাবিকের সাহায্যে উত্তম কাব্যকাণ্ড ফটি

করিতে পারেন। আপনাদের প্রাচীন চিত্রগুলি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। কোন কোন মূর্ত্তির একাধিক হস্তপদ মূখ চোখ দেখিতেছি বটে—কিন্তু তাহাতে শিল্পীরা মূর্ত্তিকে বিসদৃশ বা বীভৎস করিয়া তুলেন নাই। বরং সমস্ত চিত্রের মধ্যে ঐ গুলি বেশ সামঞ্জস্যের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিল্পীর অভিপ্রেয়ও দক্ষতার সহিত প্রচারিত হইয়াছে।"

ইতি শ্রীশিক্ষার্থী।

পথ কোথায় ?

জগতে আসিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কোন পথে যাইব? কোন পথে যাইলে দ্রুত বলত হইবে, কটক কুহুম হইবে, গরল অমৃতময় হইবে? কে বলিয়া দিবে? মানব জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল স্বপ্নের অরণ্যে প্রদাবিত হয়। কেবল আনন্দই তাহার উৎপত্তির স্রোত। যথা শাস্ত্র বাক্য "আনন্দং পৃথিবীমনি ভূতাত ঞ্জয়ন্তে," ইত্যাদি। মাতৃগর্ভ হইতে জন্মিষ্ট হইয়া যত দিন জানোদয় না হয়, ততদিন নিশাশঙ্কি পরিচালনা করিবার ক্ষমতা থাকে না। ক্রমে যথোবুদ্ধি সহকারে, জানোদয় হইলে, বিচার বুদ্ধি আসিলে ও আপন স্বার্থ পূর্ণ রাখায় কিরূপে সাধন হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হয়। আপনার প্রয়োজনীয় সর্ববিষয়ের মধ্যে কোনটুকি সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় স্থির করিতে গিয়া অভ্যুদ্বিগ্ন সাহায্যে আনন্দলাভই প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বলিয়া নির্ণীত হয়। তখন কিসে আনন্দ লাভ হইবে এই চেষ্টায় কেবল জগত-

ময় ঘুরিয়া বেড়ায়, আনন্দ . . . যে কি পদার্থ, আনন্দ যে কাহাকে বলে তাহা স্বয়ংসম করিবার চেষ্টাও করেন না, বাহা কিছু তাহার আনন্দ বলিয়া মনে হয়, তাহাতেই মগ্ন হইতে যায়। এইরূপ ক্রমাগত আনন্দাহরণ করিতে করিতে সে দেখে যে আনন্দবোধে প্রাপ্যপণে যাহাকে চেষ্টা করিয়া আনন্দ করিলাম, তৎ তাহাত মনমত আনন্দ দিল না। তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য বস্তুর সন্ধানে যায়, তাহাতেও নিরাশ হয়। এইরূপে বার বার যখন দেখে যে মরিত্যুকার ন্যায় মিথ্যা আশা উদ্দীপনকারী দৃশ্যতঃ এই আনন্দ সম্ভার তাহার হৃদয় হইতেছে, বিনিময়ে কেবল নিরাশা ও পরি-তাপ। এইরূপে নিরাশা ও পরিতপ্ত হইয়া আনন্দ হইতে আনন্দান্তরে পরিভ্রমণের পর যখন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া মর্যদ্বন্দ্ব ময়রা পায়, তখন বৃষ্টিতে পারে এই সত্যতঃ পরি-বর্তনশীল বাহ্য জগতে আনন্দের লেশ মাত্র নাই। তখন দৃষ্টি অন্য দিকে পড়ে।* এ জগতে বাহ্য বস্তুতে কোন আনন্দ নাই,

আর কোথাও কি কিছু আছে? আমার বাহিরে কিছু নাই, অন্তরেও কি কিছু নাই? এই বিরাট বানিকার অন্তরালে, আর কোথাও কি কিছু আছে?

যাহারা ভাগ্যবান, পূর্ণ হৃদয়িতর দ্বারা, যাহাদের অজ্ঞানদ্বাকার শীঘ্র দূরীভূত হয়, তাহাদের এইরূপ চিন্তা স্বতই উদ্ভূত হয়। আর যাহারা একেবারে “বন্ধকীব” তাহারা “তেজঃ বারিভ্রমের” জায় এই আপাতঃ মনোমুগ্ধকর আনন্দের আশায় আত্মবিস্তৃত হইয়া চিরকাল কাটায় ও শেষে এই আনন্দের বাসনা লইয়া বেহতাগ পরিণে ইহা হারা মূনক পদে পড়ে পড়ে হয় ও বার বার জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এই পৃথিবীতে আসে। অন্ধবৎ দৃশ্য, দৃশ্য, বৃত্তিতে পারে না। কেবল অনিত্য নিমেষমাত্র আয়ুস্মান এই জড় জগতে আনন্দের আশায় প্রধাবিত হইয়া বার বার নিরাশ হয় ও আশেবিধি কষ্ট পায়।

যাহারা ভাগ্যবলে প্রবৃত্ত হন, তাহারা বাহ্যজগতে আনন্দের বেশ মাত্র না পাইয়া অস্ত্র কোথাও কিছু আছে কি না অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে অন্তর্জগতে তাহাদের নুষ্টি পড়ে। ক্রমে তাহাদের মনে হয়, বাহিরে কিছু নাই, অন্তরেই সব; তখন অন্ধবর্মীর অন্বেষণের চেষ্টা হয়। তখন স্বতই মনে হয় “হায়, এ জগতে আশিরা এ কি করিলাম? মিথ্যা আশার আশায় আত্মবান কাটাইলাম, এখন কোন্ পথে যাইব? কোন্ পথে যাইলে আনন্দময়ের সন্ধান পাইব, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোপভোগে সঙ্গারের কল্মষ বিধেত করিতে পারিব?”

তখন উপদেষ্টার প্রয়োজন হয়। এই আনন্দের আভাস মিনি দেখাইয়া দেন,

তিনিই গুরু। তখন মনে মনে বৃত্তিতে পারে, আনন্দময়ের সন্ধাননে যাইতে হইলে শিক্ষকের প্রয়োজন। তখন উপযুক্ত শিক্ষক অন্বেষণ করে। কোন্ পথে, কিরূপে অগ্রসর হইলে, অন্তরের লুকায়িত আনন্দ ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে, ও অবিরত বিমল আনন্দ ও শান্তি স্বরূপ ভোগ সম্ভাব্যের পাপ, ভোগ, শোক, দুঃখ, মোহ প্রভৃতিকে পরাঙ্কিত করিতে পারিবে, এই চেষ্টায় সন্তুষ্কর অন্বেষণ করে। সন্তুষ্কর রূপা করিয়া আনন্দ সন্তোষের গুণ্ড দ্বার দেখাইয়া দেন। তখন জীব সেই দ্বারের দৃশ্যমাত্র হইয়া আনন্দময়কে আশ্রয় করিতে থাকে। মনে মুখে এক করিয়া, সকল বাসনা বন্ধিত হইয়া একবার কাতর প্রাণে সেই স্বয়ং-বিহারী সচ্ছিদানন্দময় বাহ্যদেবকে চাকিত্তে পারিলেই, তিনি দেখা দেন ও চিরদিনের জ্ঞাত আনন্দভাণ্ডার খুলিয়া দেন। জীব স্বয়ং প্রয়োজনের অধিক আনন্দ ভোগ করে ও অজ্ঞাত জীবকেও সে আনন্দ ভোগের আশ্রয়ে কৃতকৃত্য করি।

পরমহংসদের ঠাকুর-রামকৃষ্ণ বলিতেন “যেমন বড় বড় জাহাজ, আপনিক ওপরে যার যার অনেক জীব অন্তরকে ওপরে লইয়া যায়।” সেইরূপ যে জীব ভিতরের আনন্দের সন্ধান পায়, সেও জীবদুঃখ-এবং সে অন্যায়ের অপরকেও সেই আনন্দের সন্ধান দিয়া রক্ষা করিতে পারে।

বন্ধকীবের অবস্থা ঠিক কন্তুরিয়ের জায়। আপন নাভিগণ্ডকে উন্নত হইয়া বেষণে মূগ সেই সপলাঙ্ঘের অন্বেষণে বনভূমি তরতর করিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বন্ধকীব সেইরূপ আপন অন্তরের আনন্দ উৎসের সন্ধান না পাইয়া জগৎময় দুঃখের মরে ও অবশেষে হতশ হইয়া অশেষ কষ্ট

পায়। পরে সান্ত্বন্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখী হইলে, সন্তুষ্কর মিলে ও সেই আনন্দ সন্ধান পাইয়া তদাধারনে জীবন কৃত্য ও বাস্তু বাস গত্যায় নিবারণ করে।

সন্তুষ্কর অন্তরের অন্তরতম দেশে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে অধঃ-বিরাগিত থাকেন ও দ্বারের দ্বীপে শিশুকে আনন্দময়ের সপনে পছঁড়াইয়া দেন যা যখন আনন্দময়ের স্থান অবধিকার করিয়া শিশুর দ্বয়ে অবিরল আনন্দধারা বর্ষণ করিয়া তাহাকে জীবন্তু করিয়া দেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে “কঃ পথঃ?” কোন্টি পথ? কোন্ পথ আশ্রয় করিলে শ্রীগুরু-দেবের প্রসাদলাভে ভোগ্য সান্নিধ্য লাভ হয়? জগৎ সাধারণের বাপার পর্যালোচনা করিলে দুইটি পদার্থ দৈবিকতা পাওয়া যায়। একটি আলোক, অপরটি অন্ধকার, এক সং প্রভর অসং, একটি আর্কণ অপরটি প্রতিক্রিয়া। এইরূপ দেখা যায় যে বিখ স্তম্ভের মূলভূত কারণ যে মায়াশক্তি তাহাও পরা ও অপরা ভেদে দ্বিবিধ।

পর্যায় বিকাশক জীবকে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভে উন্মুক্ত করে এবং অপরা বা অবিভা শক্তি তাহা হইতে জীবকে দূরে লইয়া এই গম্যারূপে মর রাখে। জীব মাঝেই প্রায় এই অবিভা মায়ায় আশ্রয়ে জগতে বাস করিতে চায়। বৈরাগ্য ব্রহ্মপথ ত্যাগ করিয়া সর্বদা স্বাধু দ্রুতপথেই প্রার্থনা করে, তাহাতে রোগ বৃদ্ধি করিয়া মৃত্যু আনয়ন করে, সেদিকে দৃষ্টান্ত ও করে না, সেইরূপ অবিভা-ভ্রান্ত জীব বিকাশক ত্যাগ করিয়া অবিভাতেই মৃত থাকে ও বিয়য়কীট হইয়া আশেবিধি কষ্ট পায়।

এই পরা ও অপরা মায়া অতীব দুঃখর ইহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব।

অজ্ঞানের দ্বারা শিশু, যিনি সাক্ষৎ মনোমায়ণ রূপী, তাহাকেই উপদেষ্টাশ্রমে দ্বারায় গীতায় বলিয়াছেন—

“দেবীহো গুণময়ী মম মায়া দুরতায়।
মায়েষ যে প্রপাদমৈ ময়ামেতাং তত্রসি তে ॥”

“দেবসম্বন্ধীয়া, রিগুণময়ী, সত্য, রজঃ ও তমোময়ী আমার মায়া দুরতায়। কেহই ইহার পক্ষে যাইতে পারে না। ইহা পার হইবার একমাত্র উপায় আমার শরণাগতি। আমাতে যে প্রপন্ন হয় সেই কেবল এই মায়ায় হাত এড়াইতে পারেন।”
অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ণনারী অজ্ঞানকে বলিয়াছেন—

“সর্বং স্বর্গাণাং পরিত্যাগ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অংং স্বং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যমি মা
ত্বাং ॥”

“অজ্ঞান সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। অর্থাৎ সকল রকম কাম্য ও নিষিদ্ধ ধর্ম এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি বাধ্যপ্রমিত্তিক ধর্ম কথারি পরিত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও।”

ভগবান সম্পূর্ণ আত্মনিবেরনই ভগবৎ ব্যাকার তাৎপর্য কিন্তু এই সমস্ত বাহ্য ব্যাপার হইতে কেবল নিবৃত্ত হইলেই হইল না। বৈদ্য ও শ্রুতির মত বিসর্জন দিয়া, বেদধর্ম অর্থাৎ বাস্তবতাপ আদি, ইন্দ্রিয়ধর্ম দর্শন ও অধ্যাপি, মনোবধি অর্থাৎ কাম্যাদি, বুদ্ধিধর্ম অর্থাৎ বিচার ও অহংকার এই সমস্ত পরিত্যাগ করিলে স্বয়ং নিষ্কল ভক্তির উদয় হয়। তখন যথার্থ শরণ লওয়া হয়, ও ভক্তের প্রাণ শীতল করিতে ভক্তপ্রাণ আশিয়া উদয় হন।

মায়ায় বেলাঘার এই জটিল সংসারে, কি সং কি অসং, কোন্টি বিদ্যা কোন্টি অবিদ্যা বিচার বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় করা ছেদ বুদ্ধি মনোবের পক্ষে অতীব কঠিন ব্যাপার তাই প্রয়োজন হইলেই উপদেষ্টা আশিয়া উপাধ্ব হন। গীতার শিদ্ধান্ত—

“কিং কথম কিমর্থং কথ্যেয়াং মায়া
মোহিতাঃ
ততে কথম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞান্বা

মোক্ষসংসংভাং”
তাই গুরুকল্পী ভগবান পথ না দেখাইলে, জীবের সাধ্য কি যে এই মায়াবরণ ছেদ

করিয়া, অবিন্যাস্য অক্ষর্য বার্থ করিয়া সত্যিদানশক্তিদের প্রশংসাকীর্তি লাভ করে? অক্ষর্যের ব্যাপারে মানব ভাষা অথবা প্রাণী আপন পশ্চিমি জ্ঞান (Instinct) দ্বারা কার্য করে। তাহাদের কার্যগুলি সীমাবদ্ধ। মানবের হ্রায তাহাদের কার্যক্ষেত্র বিশাল নহে। আহােরের জ্ঞা শিকার, ও সন্তানদের পালনের ভাষাবিক প্রবৃত্তি মাত্র তাহাদের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু দায়াম্ব, মানবকে বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে আত্মপ্রকাশের সৃষ্টি করিয়া বিচার বিবৃতি দ্বিা এই কথক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন। অবিন্যাস্য প্রভাবে এই বিচারবুদ্ধি হইতে অংবুদ্ধি বা অঙ্কদের উদ্ভব হইয়া মানবকে আত্মপ্রকাশ করিয়া মেলে। তাহার স্বপ্ন ভূলাইয়া দেয়। সে, মূলক ভাষে “আমি কতী” এই অঙ্করাপে শো আত্মনাশ করে।

গীতাধ ভগবদ্গীতা—

প্রকৃতে: ক্ষয়মাণাণি গুণৈঃ কথানি সর্গাঃ।
 অংকার বিমৃশ্যা সর্গভাষ্যমিত্যুচে।
 প্রকৃতিতে গুণে সর্ব কাশ্যে সর্বং হলেগে।
 অংকারে হতবুদ্ধি দুর্ভাগ্য মানব স্বয়ং সবল।
 বিবর্তিত ইহাই মনঃ করে। “শাস্য কথানি”
 এই অংকারে বশে কাশ্য করিতে পিয়াস করে।
 অং করে। অংকারাঙ্ক মানব আপন কৃত্যেতে
 সমাইবার জন্ত যে কাণ্ডের অহুষ্ঠান করে
 কালি আনিম্যমা বাসে। অংকারে বিম্বা
 কলির অহুত্ব পৃথাক হরাইয়া ফেলে
 কাণ্ডের চাচিকাকাম্যই উজ্জলত। দর্শনে
 হীরকের ভাস্কর লাবণ্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে
 মা। এই বিক্রপ জানাই আশাধিক বিপণে
 কলিত করে। পদ্যভাষ্য করায়।

সকল বিগড়ান দিয়া, অহংকার ত্যাগ
করিয়া, কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করিয়া জীব
ব্রহ্ম একবার মৌনরূপে মৌনানুষ্ঠেয় শরণ লয়,
তাহাকে সর্গভাষ্যন করিয়া নিঃশব্দ হয়,
তাহা হইলে 'অবিদ্যাবশে' আর পথ স্ভাষ্ণ
হইতে হয় না। জীব ইচ্ছা করিয়া তাহার
দিকে এক পদ অগ্রসর হইলে, দয়াময় আপনায়
বিষভাষ্য প্রেমবশত তাহাকে দশ পদ আপনায়
দ্রিক টানিয়া লয়ন।

এই ভক্তি সাধন করিতে করিতে যদি
ভাগেছা জগৎক হয বা মৃত্যু উপস্থিত হয়,
গোহাতেও ক্ষতি নাই।
গীতার যষ্ঠ অধ্যায়ে “যোগব্রজের কি গতি
য” এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন—
“পার্থ, নৈবেহ নাম্ব বিনাশন্ত্য বিজ্ঞতে
হি কল্যাণ কৃত্ব কশিন্দুগতিং তাত গচ্ছতি।
প্রাপ্য পুণ্যকৃত্যং লোকাহমিষা শাসতঃ।”
সমা:

শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন “ভিজ্যতেঃ”
লোককে, কি পরলোকেও ভাঁড়ুশ লোকের
বিশাল নাই। স্বভাৱগঠনকারী কখন দুৰ্গতি
প্ৰাপ্ত হ’ন নাই। অতিভাৱ যোগ হৈছে
প্ৰতি পুণ্যকৰ্মসাধনের শাসন সৰল প্ৰান্তৰ হইয়া
সেই সৰল স্বাভাৱ বহু বছৰ বাসের পৰ
পুনৰ্জন্ম হৈ পুৰ্ব্বিতে পৰিভ্রম বনবশ
প্ৰাপ্ত পুৰুষ জগতৰণ কৰেন তাৰ বিষয়ভাৱ
সাধন বিষয়ে যত্ন ৰহিত হইলৈও পুৰ্ব্ৱভাৱ
বিশেষে আৱৰ্ত্ত হনেন। কোন নীচ ভাৱিত
কখন তাত্তৰ জন্ম হয় নাই। কাৰণ ভাৱিত
কখন ভ্ৰম হয় নাই। যত্ন প্ৰতিমাণ ভক্তি ধৰ্ম্মে
জানক হইলৈ, ক্ৰমে তাতা বৰ্দ্ধিত হইলৈ
থাকে, ক্ৰমেই সেই ভক্তির শ্ৰীভক্তি হইলৈ
থাকে।

কিন্তু আমরা সে পথে যাই না। যেখানে যেখানে যাইলে অরিচ্ছেদ স্বথ, শাস্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া যোগীর ছায় রূপখের সেবা করি ও অবশেষে এই ভবব্যাধিতে চিকিৎসার অভাবে অশেষবিধ যন্ত্রণার পর মৃত্যু হয় ও বার বার এই কৰ্মক্ষেত্রে আপন পূৰ্ণসংস্কার বশে হুং দুং ভোগে রত থাকি।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—
 “অন্যোচ্চিন্তয়ন্তো মাং য়ে জনাঃ পথ্যুপাসতে
 তেযাং নি আভিগুস্তানং যোগক্ষেণং

বহাগ্যহম।
 গাছারা অনন্তচিন্ত হইয়া বিশেষরূপে
 আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিভার
 সেই সকল ভক্তগণের ভার আমি বহন করি
 ইহাশ্রদ্ধা আশাপ্রদ বাক্য আর বি

হইতে পারে ? সকল কামনা, বিসম্ভব দিয়া
সকল বাসনা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া
আনন্দময়ের প্রতি সৰ্বভার্পণ করিলে
তিনিই ভক্তের সব কার্য্য করিয়া দেন।

সমরাজ বখশী আশানুবেকন করিয়া নবিশত
হইয়াছিলেন বলিয়া, ভগবান উহার দ্বারে
তিব্বকালের মত ঘুরি হইয়া রহিয়াছেন।
কৃষ্ণজন্মের পূর্বে অসাব্যাহিত পূর্বে, কুরুজ
জ্যোত্স্ন উত্তম্যি পাতব আনন্দ উভয়েই
শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যভক্ত আনন্দ স্বাক্ষর
উপস্থিত হইয়াছিলেন। জ্যোত্স্ন মাদ্ধ,
নাগাধী সেনা লইয়াই তুই হইল কিন্তু
ভগবান বাহেমে কি পদার্থ বিলম্ব
হানিচ্ছে, তাই নাগামাতুল্য তেজোবান
নাগাধী সেনা উৎসাহ করিয়া একমাত্র
ভগবানই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এবং
কৃষ্ণজন্মের পূর্বে যশীকৈ আপন কপাভ
করিয়া লইয়াছিলেন। পাদপদ্ম সস্ত্রীক
ভগবানের পদে আশ্রমমর্ষণ করিয়াছিলেন
বলিয়া অবনীলোকসে কৃষ্ণজন্ম সমরঙ্গ
ভগবান পার হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্তাগবতের ১০ স্বদের প্রথমেই
স্বর্গরাজ পরীক্ষিত শ্রীপাদ শুকদেবকে প্রশ্ন
করিয়াছিলেন "প্রভু, আপনি সোম ও সূর্য্য
বংশের বিষয় সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু
আহার শ্রিতরূপ "ঈশ্বা" তরঙ্গী সাহায্যে
আমার পূজ্যপাদ পিতামহগণ কুরুক্ষেত্র রণরূপ
হোমাগর পার হইয়াছিলেন, আপনি সেই
সময় মোক ভগবান বাহুদেবের লীলা বর্ণন
করুন।"

এই পথ। আপন। কল্লভাভিমান। সম্পূর্ণরূপে
জিন। করিয়া ভগবানে। নির্ভর। পরমহংসদেব
কৃত। রামকৃষ্ণ বলিতেছেন। “ভগবানকে বকলু।
গোড়া।” সব ভার তাঁহার উপর জন্ত
বিধি। নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে, মঙ্গলের আর
ঘিঘতা থাকে না। এ মঙ্গল। তাঁহার, এই
কৃত। প্রভুত্ব দিয়া। মাঝন। খব। তাঁহার, আমি
আঁ। তাঁহার। নিয়ুক্ত। কন্ঠচ্যারী। এই ধারণ।

করিয়া মানব যদি সংসারযাত্রা নিরীক্ষা করিতে
পারে, তাহা হইলে সে "হৃৎখেদস্থিগমনঃ।
স্থখেযুগিতত্পূঃ।" কি হৃৎগ, কি স্থগ
উভয়েই নিলিপ্ত হইয়া, স্থগ হৃৎগ সমজ্ঞানে সে
সংসার করিতে পারে।

বাহা মোহোৎকারে নিমজ্জিত জ্ঞানচক্ৰ
 ক্ষুণ্ণস্ত মানব ইহা বৃত্তিত পারে না, তাই
 "আমি কব, আশ্রয় সব" এই মনে করিয়া
 দ্বাৰ ভাগ করিয়া পরাবেষে বসে পায়। শ্রুত
 সমস্যাে ভুতানন্দ স্বৰ্ণ কবিত্তে চাটলে যেসক
 পদে পদে লালিত হই, সেইসব আশ্রয় পদে
 পদে লালিত হইয়াও জুলিয়া গাই। তাই
 এত কব, এত জ্ঞানপ্রাণ, এত মনোবেদনা!
 সব জুলিয়া, সরল প্রাণে মনে যুবে এক
 করিয়া একবার বল দেখি "ঠাকুর, এ সংসারে
 যাহা কিছু সমস্যায়ের জন্ম স্বপ্ন করিয়া তুরে
 ঘরে সাক্ষাৎই বাখিলা, এ সকলি তোমার।
 আমি তোমার আশ্রয়বাহী দাস,মুখ্য। আমি
 স্বপ্ন, তুমি যত্ন, আমি তব তুমি সানন্দ, যেমন—
 বলাও তেমনি বল, যেমন ঢালাও তেমনি
 চলি, যেমন করাও তেমনি কর। আর কিছু
 চাহিবা না, যে, যেন এই নির্ভরতা করিতে
 পারি, যে, এই আশ্রয়বেশে প্রাপের আশ্রিত
 ও উৎসব বিরূত করিয়া যেমন শান্তি
 উভয়ে প্রাপ্ত প্রাপ শীতল করিতে পারি,"
 দেখিবে সব কাহা হসার হইবে। তোমার
 কিসে ভাল হইবে, তোমাদেশে। তোমার
 পিতামাতা তাহা ভাল জানেন। তুমি
 স্বশক্তিভেত কাৰ্য করিতে যাইবেই কবিত্ব
 হইবে। কারণ তোমার শক্তি কবিত্ব।
 আর তাঁহার উপর নির্ভর করিলে, তাঁহাকে
 ভাব দিলে, তাঁহাকে "বসুমত" দিলে সব
 কাৰ্য স্থলভূতপে নান্দে হইবে সম্ভব নাই।
 ইহা ভিন্ন পথ নাই। ইহাতেই আনন্দ, স্বপ্ন,
 শান্তি সকলি। তাই বলি ভাই একবার
 মনে দেখি

“অয়া স্বযিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।”
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু ।

মফঃস্বলের বাণী

কাটোয়া মুমূর্ষু আশ্রম ও তৎসংলগ্ন

সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা

সূতা: পাতক সংগ্রহী সন্ধ্যোভূষণ বিনাশিত।
স্বপ্নান মোক্ষা গঙ্গা পশ্চিম পরমাগতি ॥

এই শাঙ্গ বচন হিন্দু সন্তানগণের প্রত্যেক অধিবাস্য, প্রত্যেক শৈশব-বিন্দুতে বিমিশ্রিত। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত যখন এই নবম জগতের সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন হিন্দু-সন্তানের আকাঙ্ক্ষার আর কিছু-না, কেবলমাত্র পুণ্যভোগ্য গঙ্গা দর্শন ও তাঁহার পরিক্রম বারি পশ্চ করিয়া "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" স্বরূপ পুণ্যকর কক্ষ লীন হইবার বলবতী ইচ্ছা। অশ্রুসলিলা ফন্তর স্রাব তাঁহাদের চিত্তে প্রাবাহিত হইয়া থাকে। পুণ্যভোগ্য ভাগীরথী-দেবীর মহিমা এবং শ্রীভক্তের সন্ন্যাস গ্রন্থে স্থান বলিয়া প্রাচীন কাটোয়া নগরী হিন্দুগণের একটি পুণ্য ভাণ্ডার। জীবনের অন্তিমকালের শেষ দুইটি দিনও এই স্থানের গঙ্গা-পুলিনে বাস করিতে এবং গঙ্গা-সৌকর্য্যবাহী পরিক্রম সমীরণে রোগ-বাতন-শ্লিষ্ট শরীর শিথ করিতে অকসের ইচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে; কিন্তু অকসের হিন্দুস্থান-গণের এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পক্ষে বিলক্ষণ অন্তরায় বিঘ্নমান রহিয়াছে। কাটোয়ার গঙ্গা পুলিনে অনেক স্থান বা আশ্রয় নাই, যেখানে সুস্থগণ আনন্দ হইয়া দুইটি দিনও অবস্থিত করিতে পারেন। অনেক পিতা মাতার এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আশ্রয় আশ্রয় ও কোলাতাবে এবং তৎ-কালোপযোগী সাহায্যভাবে অত্যধিক দূর পাইয়া গিয়াছেন। শবাব্যবহরণ ও গুরুতর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের জ্ঞান স্থান প্রাপ্ত না হইয়া অস্তিম কষ্টভোগ করিয়া থাকেন।

এই কাটোয়া নগরগত গঙ্গাপূজা, কান্তিক সংক্ৰান্তি, বোল, সুলল প্রভৃতি পর্বেপালকে এবং স্থানটি বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া নানাবিধ

অবাধ্যতা ক্রম বিক্রমার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, ভিন্ন স্থানের লোক এখানে আসিয়া পীড়িত হইয়া আশ্রয়ভাবে বিনা চিকিৎসায়, বিনা স্বাস্থ্যায় প্রাণ হারাইয়াছেন। করাল ব্যাধি হুগা আক্রান্ত হইয়া সাধারণতঃ, আশ্রয়শূন্য অবস্থায় যখন তাঁহারা রোগে মাতন ভোগ করেন, তখন সে দুঃ দেখিলে পাণাৎ ক্রমঃ বিপণিত হয়। ইতিপূর্বে এক ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও দুইটি শিশু পুত্র কষ্ট সমভিষায়াহরে শ্রীযোগীশ্বর দর্শন জ্ঞ এখানে আগমন করেন। এখানে আবার পর তাঁহার শিশু পুত্র কষ্টা দুইটি (আড়াই) রোগাক্রান্ত হয়। যে গৃহে তিনি বাসা লইয়াছিলেন, শিশু দুইটি রোগাক্রান্ত হইয়া পর গৃহস্থানী সেখান হইতে ভাঙাফে বিতাড়িত করেন। একটি জঘন্য গৃহে তিনি আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কয়েক মন্টার মধ্যেই শিশু দুইটি মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ তাঁহার গুণ্য পুত্রী দুইটিকে হারাইয়া কিরণ দুইতে পতিত হইয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সহায়-মুখ 'আশ্রয়শূন্য' ভ্রমণটি যদি ভাল আশ্রয় পাইতেন, শিশুদের যত্নসা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাদের অকসের নিধি হুতীকে হারাইতে হইত না। গোমালপাড়া সমগ্রায় আরও একটি বোক ঐক্লপ ভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া গিয়া আশ্রয়, বিনা স্বাস্থ্যায় পশি-পায়ে মারা গিয়াছেন। একদা ঘটনা বিরল নহে। নিত্যই চক্ষুর সমুখের একদা ঘটনা স্মরণীয় হইয়া থাকে। এই অসুখ দূর করিবার জ্ঞান কাটোয়াতে একটি মুমূর্ষু আশ্রম ও তৎসংলগ্ন একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আশ্রম মুমূর্ষুগণ ও বিপন্ন পীড়িত ব্যক্তিগণ স্থান পাইবেন এবং বিনা বায়ে চিকিৎসিত হইতে পারিবেন। এই সকল আগন্তুক লোকদিগের পরিচর্যা জ্ঞ আশ্রমে পরিচারক নিযুক্ত থাকিবে। সেবা-

শ্রমে রোগীর পথ্য এবং উপযুক্ত ঔষধাদি বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনা পরিশ্রমিক আশ্রমস্থিত রোগীর চিকিৎসা করিবেন। বহুমাত্রিক স্বেচ্ছাসেবক উভয় আশ্রমস্থিত লোকের পরিচর্যা ত্রুটি থাকিবে না।

এই সহস্রচিন্তা সাহায্যে শীঘ্র কার্যে পরিণত হয়, জল্পিত বসিবে চেষ্টা করা হইতেছে। স্থানীয় বহু ভবিষ্যৎ ব্যক্তি এই কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিবার জ্ঞ অগ্রসর হইয়াছেন। মুমূর্ষু ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে অনুদান ২০২২ হাজার টাকা, প্রয়োজন। জনসাধারণের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই শুভ অমুষ্ঠানের সহজপা করা হইয়াছে। আমাদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন। মুমূর্ষুগণের সেবা বানানা পুত্র করিবার জ্ঞ এবং বিপন্ন পীড়িতের সেবা স্বক্কাধার স্থাপনা করিবার জ্ঞ সকলে এই কার্যে সহায় হইন, মুক্তহৃতে দান করিয়া এই শুভাশ্রম কার্যে পরিণত কন। ইহাই আমাদের সাহসয় প্রার্থনা।

কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া কাটোয়ায় একটি আশ্রম-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সাধুগণকে যিনি যাঁহা দান করিবেন, তাহা গণ্যে গৃহীত হইয়া স্থানীয় "প্রস্থান" পক্ষে প্রদত্ত হইবে। সাহায্যের টাকা সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরিতব্য।

অতঃপক্ষে সন্মানার্থ বিবৃত ৬ই বৈশাখ অপরাজিত শ্রীমুক্ত রাখানা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সভাপন জ্ঞ সন্ন্যাস বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সভাপতিমহোদেয় বুদ্ধাধিলা দিলেন। এইসময় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্বক্কাধার করিয়া সাহায্য অর্থ সাহায্য করিতে প্রকৃষ্ট হইয়াছেন। অজ্ঞাত স্বর্ণগত স্বক্কাধারী বাবু ভগবতিন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহস্রশ্রী শ্রীমতী মোক্ষদাম্বরী দেবী মহাশয় দেউ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। আরও কতিপয় সন্ন্যাস ব্যক্তি প্রত্যেকে একশত টাকা করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা হইয়াছেন। কয়েক-

জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজ নিজ বায়ে এক একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করিয়া দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। ইহা দ্বারা পল্লীর অধিবাসি-গণ অধিকতর উপকৃত হইবেন। সকল স্থানের অধিবাসিগণ এই কার্যে সহায় হইলে এই শুভ অমুষ্ঠান সম্বন্ধে স্বক্কাধার হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

প্রসূন।

২. ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার

অনুদান ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই একত্রাকো স্বীকার করিবেন যে ভারতবর্ষের সর্বদীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে কেবল-মাত্র পুরুষদিগকে শিক্ষিত করিলেই চলিবে না, স্ত্রীলোকদিগকেও স্ত্রীমত শিক্ষিত প্রদান করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে দেশকে শক্তিতে গেলো জাতীয় গঠন কার্য স্ত্রীলোকদিগের হস্তেই অর্পিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি ও চরিত্রের উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পতিপ্রাণা, বীরা, শিক্তা রাজপুত্র রমণীর হস্তেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাণপুত্র জাতি গঠিত হইয়াছিল। রাণপুত্র রমণী স্বহস্তে পতি-পুত্রকে বীর সাহসে সাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেন, তাই একদিন রাণপুত্র বীরের নামে ভারতবর্ষে সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া, তাই একদিন যে জাতি উন্নতির উচ্চনির্ভর আধার করিয়াছিল। বিদেশীয়ে বালিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষে স্ত্রী জাতি কোন দিনই মর্দান প্রাণ হয় নাই, কিন্তু আমরা নষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে একমাত্র ভারতবর্ষের স্ত্রীজাতি প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রাণ হইয়াছিল। ভারতের দেবীপূজা তাহার প্রকৃত প্রমাণ। ভারতবাসী ধর্মপাত্ত-কাল হইতে শক্তি মাজকেই রমণী-কল্পে কল্পনা করিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে। স্ত্রীজাতি যুগ ও অবস্থার চক্রে দৃষ্ট হইয়া থাকিলে শক্তি মাজই কখনও স্ত্রীপুত্র কল্পিত হইত না।

একান্তি পতন হইল কেন তাহার কারণ নির্দেশ করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে একান্তি স্ত্রী পুঙ্খ উভয়ই যে পতন হইয়াছে তাহা আর স্বীকার না করিয়া উপায়

নাই। এই পত্তনের জ্ঞানী পুরুষ উভয়েই সমভাবে দায়ী; তবে পার্থক্য এই যে পুরুষের প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী, স্ত্রীলোকেরা পরোক্ষ ভাবে; আবার একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে স্ত্রীজাতির পত্তনের কারণও আমরা। কিন্তু যারা ছিল, যারা গিয়াছে, তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি প্রকাশ করা যুগ; এখন সময় বুঝিয়া, কর্তব্য বুঝিয়া কার্য করাই উচিত। এখন ইংরাজ শাসনে ভারতবাসীর জীবনীশক্তি আবার বিকসিমা আসিয়াছে ভারতবাসী আবার পূর্ব জাতীয়তা লাভে বহু পরিকর হইয়াছে, এমন এই উদ্দীপনার কার্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সমভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। পুরুষই বলিয়াছি শিক্ষার পূর্ণ বিস্তার ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। এই শিক্ষার ফলে ভারতীয় মহিলা সম্প্রদায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাই আলাচ্য।

জাতীয়তাবোধ সর্বপ্রকার মহিলা বিদ্যালয় ১৯১২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে ১৪৪০ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৮০৭৩ পড়িয়াছিল। ১৮৯২ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত এই দশ বৎসরে বিদ্যালয়ী বালিকার সংখ্যা ৩০৩২-৩১ হইতে ৪৪৪৪৭ হইয়াছিল। ১৯০৭ সালে উক্তসংখ্যা বদ্ধিত হইয়া ৪৪২৪৪ এবং ১৯১২ সালে ২২২০১১ হইয়াছিল। উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯০৭ সালে ৪০ ছিল, ছাত্রীর সংখ্যা ৪৪৪৫। বর্তমানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৬ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৩০৪৫। প্রতি মাইলে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা হইতে ১০ হইয়াছিল। যে দিক দিয়াই দেখিবা কেন, স্ত্রী শিক্ষা ভারতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

তবে মহিলারা যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন তাহা প্রকৃত শিক্ষা কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করা হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই শিক্ষা বিস্তারের আশাহতরূপ ফল লাভ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অধিকাংশ বালিকা-বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে কেবলমাত্র পুঁথি পড়ান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল পুঁথি পড়িতে শিখিলেই শিক্ষিতা বলা হইতে পারে না, পুঁথি পাঠে ক্ষমতা

অল্পিলে নটিক নভেল পড়িয়া সময় কাটাইবার সুবিধা হয় বটে কিন্তু তাহা যারা চরিত্র গঠিত হয় না, জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না। এই সকল বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে জীবনের কর্তব্য কার্য শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদের সমুদ্র উক্ত আদর্শ দাপন করিতে হইবে। ভারতের লুপ্ত শিল্প বিজ্ঞা কিরায় তাহা হইলে স্ত্রীজাতিতে কখন সহায় রূপে গ্রহণ করা আবশ্যিক। মহিলাদিগকে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিয়া গৃহে গৃহে শিল্পজাত ব্রহ্ম-উৎপন্ন করিতে পারিলে প্রতিযোগিতায় খ্যাতিয়া উঠা সম্ভবপর, নতুবা ছিঁ চারিটা কল কারখানায় তাহা হইবে না।

দ্রস্পদ দিক-প্রকাশ।

৩। আমাদের স্বাস্থ্য

বৈদেশিক অধিকরণে, দারিদ্র্যের কশাঘাতে ও হিতাহিত জ্ঞানহীন উদারীন জীবন যাপনে আমরা ক্রমশঃ শক্তিশীন স্বাস্থ্যহীন চিরবেগী জীবনবিশেষে পরিণত হইতেছি। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া নানাপ্রকার মারাত্মক রোগ-পীড়ায় আমাদের দেহে আক্রমণ করিতেছে। আমাদের দূর্বল দেহে যে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। ফলে, একদিকে কলকাতা প্রকৃতি জনপদদগ্ধসংসারী প্রচণ্ড সন্ধ্যাকার বোগ, অজীর্ণকে ম্যালেরিয়া প্রকৃতি স্মরণীয় যন্ত্রণাপ্রদ ও পরিণামে, অন্তঃসারস্রাবের রোগ, অধিগণিক - বেশ কাবু করিয়া বসিতেছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের এই শারীরিক দুর্দশার দিকে আজকাল দেশের সুখী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সন্ধ্যার ভারত গর্ভমন্ডেও নানা প্রকারে লোকের স্বাস্থ্যের দিকে চোঁটা করিতেছে। প্রতি বৎসর সেনিটোরী কনফারেন্সে ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসা চিকিৎসক মণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতির উপায় নির্ধারণ করিয়া থাকেন। তাহার ফলে গর্ভমন্ডে এক দেশের স্বাস্থ্য সংস্কারের অনেক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমাদের জন সাধারণেরও এই বিষয়ে কর্তব্য আছে।

আমরাও চেষ্টা করিলে গ্রাম্য সমুদ্র হইতে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রকৃতি মারাত্মক রোগ সম্পূর্ণ রূপে না হউক অল্পতঃ কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূর করিতে বা উপস্থিত ব্যাধি-প্রকোপ হ্রাস করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিবে কে? আমাদের কো সে বিষয়ে চৈতন্য নাই! আমরা এমনই অপর্যাপ্ত যে আমাদের নিজের অভাবই নিজের বৃদ্ধি না। অথবা, বৃদ্ধিলেও তাহার প্রতিকারের জ্ঞান কিছুই করি না। গ্রাম্যে বাস করিয়া আমরা দশদশলি নিয়া বাস্তব-বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার আমাদের সময় নাই বা প্রস্তুতি নাই। গ্রাম্যে দৃষ্টিত গ্যাসের আধার স্বরূপ বহুকালের পুরাণ পুঁথি আছে। থাকে থাকুক। উহা ভরাট না হইলে আমরা কি? অনেকেরই এই ভাব। কিন্তু ক্রমে এই পুঁথিরূপী হইতে যে রোগের বীজাঙ্ক গ্রাম্যস্থ ছড়াইয়া পড়িবে এবং অজ দগ্ধজনসমূহে ম্যালেরিয়া বিপদ করবে, সে বিষয় পারতাই আসে না। ডিক্টারী বোর্ড হইতে পুঁথিরূপী বা ইন্দ্রাধন কলকাতার অল্পমতি কিংবা মাহায়া লাভের জ্ঞান যার কেহ চেষ্টা করে তবে আমরা গ্রাম্যের অপর দগ্ধজনসমূহে যৎপরোনাস্তি বাধা দিয়া থাকি। উহাতে যে আমাদের দশজনদেরই বিস্তৃত গণের জলের অভাব ঘটিবে তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না।

আমাদের কার্যই, দলাদলী করা, পরনিষ্ঠা করা, পরের অনিষ্ট সাধন করা। আমরা আমাদের লাভ লোকসান খতাইয়াও দেখি না—অন্তরে একটা অহিত সাধন করিতে গিয়াসেই আমরা পরম সুখার্থী। তাহাতে আমাদের ক্ষতিই হইল আর লাভই হইল। এই প্রকার আচরণের ফলও আমরা হাতে হাতেই পাই—বেশী দিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। বৎসরের বার মাসই যমরাজ আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত রূপে করিয়া থাকেন। কখন কলারূপে কখন বাস্করূপে আমরা কখন বা ম্যালেরিয়া আশ্রয়ই ইত্যাদি নানারূপে তাহার আগমন। তাহার রূপায় বেশ যে ক্রমে মৃত্যু হইতে চলিল। এখনও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? এখনও

পরমুখ্যপেক্ষীতা ত্যাগ করিয়া নিজের পায়ে ধরাইতে শিখিব না? এখনও কি ব্যক্তিগত হিসাব দেখে আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবে না? এখনও কি তুচ্ছ দলাদলি স্ত্রীলোকে আমরা সকলে সমবেত হইয়া পল্লী গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনে অগ্রসর হইব না?

প্রান্তবাসী।

৪। ধূমপানের অপকীর্তি

বহুকাল পূর্বে এক্ষণে তামাকের ব্যবহার ছিল না। মূলতামানিগের আল হইতে আরম্ভ হইয়া, এক্ষণে চূড়ান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা এবং নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকেও অবাধে ইহার ব্যবহার করিতেছে। ইহার এত মারাত্মকী হইয়াছে—নেম নিতা ব্যবহার্য সামগ্রীর মত হইয়াছে। সামাজিক অভ্যর্থনায় প্রধান উপকরণ হইয়াছে, যে ব্যবহারই লোক দেখানোই যান না কেন, অগ্রে তামাক দিয়া অভ্যর্থনা করিতে হইবে। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহার অপকারিতা সূক্ষ্মে রাশি রাশি প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সকল প্রমাণনাপূর্বক পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, যে তামাক সেবনে আমাদের বিশেষ অনিষ্ট হয়। ইহার ব্যবহার যতই উগ্রীয়া যায়, ততই মন্দ।

আজকাল পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে দেশের শিক্ষিত সকলেই প্রায় "সিগারেট" ধূমপান করিয়া থাকেন—তামাক নাষিয়া, আগুন ধরাইয়া, ধূমপান করিতে কিছু সময় যান—কিন্তু "সিগারেট" তাহা হয় না, ইচ্ছা হইলেই মিনিটে মিনিটে ধূমপান করা যায়। অজ্ঞাতশক্তি, স্বস্থ্যর বালক হইতে বৃদ্ধদের পথে, ঘাটে, মাঠে "সিগারেট" ধূম উড়াইতে দেখা যায়।

তামাকে ধূমপান করিতে হইলে, হ'কা বা গুড়গুড়িতে জল দিয়া টানিতে হয়, তাহাতে তামাকের রস জলে সিক্ত হইয়া, পরে মুখে প্রব্রিষ্ট হওয়ার দশ, উহার উগ্রতা অনেকটা কম হয়। কিন্তু "সিগারেট" টানিবার সময়, উহা জীর্ণ ধূম মুখের ভিতর

দিয়া একেবারে ফুসফুসে লাগে, মধ্যযন্ত্রী কোমর সামগ্রী না থাকায়, ফুসফুসে তীব্র ধূমের উগ্র ক্রিয়া দর্শে। “সিগারেট” সেবনে সেহের লাভ্য নষ্ট হয়, মুখশ্রী পাকাটে হইয়া যায়, হেহের বুদ্ধি পায় না, সর্ব শেখে নানাপ্রকার কাশরোগে আক্রান্ত হইতে হয়। স্বতরাং ইহা যে তামাক অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিক ধূমপানেও বর্ণের উজ্জলতা নষ্ট হয়; শিরোবর্ণন, স্থিতি-শক্তির বৈলক্ষণ, পেশীস্পন্দন, বৃক্কডফড়ানি, ও চক্ষুরোগ হইয়া থাকে। ধূমপানের অপকারিতা সন্দেহ নানা লোকের নানা প্রকার মত হইলেও, সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন, যে “তামাক বা সিগারেটের” ধূমে দৃষ্টিশক্তি বিধায়ক আয়তে “এইপি” হইয়া দৃষ্টিশক্তির হানি হয়, ওঠে ক্যান্ডার পর্ধ্যস্ত হয়। সন্দি কাশি নিত্য সহচর হয়। দাঁতগুলি শীঘ্র ক্ষয়িয়া যায়—কিন্তু দেশের লোকের ধারণা অন্তরঙ্গ। অনেকই বলিয়া থাকেন যে “তামাক চুরোট ও সিগারেট” সেবনে দাঁত শক্ত হয়—তাহাদের ভুল।

অধিক পরিমাণে ধূমপানের সহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়ার এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে আজ কালিকার ডাক্তারেরা ঐ পীড়াকে Tobacco Heart বলিয়া থাকেন। সকল রকম মানক রোগেরই উদ্ভেজনা ও অবসাদ-জনকতা এই দুইটা গুণ আছে, কিন্তু “তামাক ও সিগারেটের” উদ্ভেজনা গুণ অধিক থাকায়, নিজস্ব বিধ হয়, এবং তাহা হইতেই অনিষ্ট।

উৎপন্ন হয়—অথো মধ্যো আয়শুল বেদনা, হৃদে, পুষ্টে, কখনও বা বক্ষের বামভাগে, হৃদপিণ্ডের উপর হইয়া থাকে।

এই ধূমপান হইতে আর একটি সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়—উজ্জিষ্ট দোষ। পূর্বে প্রথা ছিল, সকলেরই বাড়ীতে আলাদা আলাদা ছ'কা বা গুড়গুড়ি থাকিত। তাহার নিম্ন নিম্ন ছ'কা, বা গুড়গুড়িতে অপরকে ধূমপান করিতে দিতেন না। অধুনা দেশের ত্রিগুহির সহিত পূর্ষ প্রথাটা লোপ পাইতেছে। ছ'কার মুখে বা গুড়গুড়ির নলের মুখে, এক ব্যক্তি ধূমপান করিয়া ছাড়িয়া দিতে না দিতে, অত্র ব্যক্তি আগ্রহের সহিত সেই পরমুখের লালার উপর মুখ দিয়া, আয়াস মিটাইয়া থাকেন।

বালক ও যুবকেরা একটা সিগারেট লইয়া ৩৪ জনে মিলিয়া খাইয়া থাকে। এই রোগ-প্রবণ কালে এতদ্বারা অস্ত্রের রোগ সংক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এই রুগপ্রাধিকার নিবারণ হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

যদি কোন ধূমপায়ী লোক পূর্ষ বর্ণিত লক্ষণগুলির একটা মাত্র লক্ষণও অস্বভব করেন, তাহা হইলে তিনি কিছু দিন ধূমপান বন্ধ করিবেন। এই সকল উপদর্শ প্রকৃতপক্ষে ধূমপানের ফল কি না তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবেন। ধূমপান একেবারে পরিত্যাগ করিতে না পাইলে, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কমাইয়া লইবেন। আর সিগারেট—বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।

পল্লীবার্তা।

পরিশিষ্ট

কেন্দ্র কোণোপচয়েষু স্বরো মৈত্রী ২০।

রিপু রোগ চিন্তাসু বৈরতঃ ২১।

লগপদাৎ সপ্তমপদে কেন্দ্র কোণোপচয়েষু ষষ্ঠস্থান ব্যতিরিক্তেবিত্তি
পর সূত্রবিরোধাৎ স্থিতে সতি দ্বয়োঃ ভার্গ্যভক্তৌ মৈত্রী ভবতি।
তথৈব রিপু (১২) রোগ (৮) চিন্তায় (৬) ষষ্ঠাষ্টম দ্বাদশগে সতি পত্ন্যা সহ
জাতস্য বৈরতঃ ভবতি। এবং ক্রমেণ লগপদাৎ পুত্রাদি ভাবপদে
কেন্দ্রাদি স্থানগে সতি তয়োস্তয়ো মৈত্রী, দ্বস্থানগে তথৈব বৈরতা চ
জ্ঞেয়া ॥ ২০। ২১ ॥

পদাচ্চ সপ্তমাক্রুড়ে কেন্দ্র কোণ চয় স্থিতে।

স্বর্বার্যাসংস্থিতে খেটে ভার্গ্যভর্কৃ স্থপ্রদঃ ॥

এবং লগপদাদ্ বিপ্র পুত্র ভাবাদি চিন্তয়েৎ ॥

সপ্তমাক্রুড় পদ লগ পদের কেন্দ্র কোণ কিংবা (ষষ্ঠব্যতিরিক্ত) উপচয় স্থান গত হইলে
দশমস্তর মধ্যে বিশেষ মৈত্রী এবং দ্বস্থান গত হইলে বৈরতা সংঘটিত হয়। উক্ত প্রকারে
পুত্রাদির সহিত জাতকের মিত্রামিত্রাদি চিন্তা করিবে। যথা পুত্র ভাব পদ লগপদের
কেন্দ্রাদি গত হইলে, পুত্রপদ, জাত ভাব পদ কেন্দ্রাদি হইলে জাত সহ জাতকের মিত্রতা
ঘটে এবং তদ্রূপ দ্বস্থান গত হইলে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা সংঘটিত হয়। এই অষ্টাদশাদি
নয় চতুর্দশ সপক্ষে বৃদ্ধ কারিকায় লিখিত আছে যে—

লগ্যাক্রুড়ং দারপদং মিত্রঃ কেন্দ্র গতং যদি।

ত্রিলাভে বা ত্রিকোণে বা তথা রাজাহম্বথা হ্রদমঃ ॥

আক্রুড়ে পুত্র পিত্রোস্ত ত্রিলাভ কেন্দ্রগৌ যদি।

দ্বয়ো মৈত্রী ত্রিকোণেতু সাম্যং দ্বৈয়োহম্বথা ভবেৎ ॥

এবং দারাদি ভাবানা মপি পত্ন্যাদি মিত্রতা।

জাতক জয় মালোকা চিন্তনীয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥

এতদনুসারে দেখা যাইতেছে যে আক্রুড় পদদ্বয় পরস্পর ত্রিলাভ বা কেন্দ্র গত
হইলে উভয়ের মধ্যে মিত্রতা, কোণগত হইলে সমতা এবং তদ্বিত্তি স্থান গত হইলেই শত্রুতা
সংঘটিত হয় ॥ ২০। ২১ ॥

পত্নী লাভকো দিষ্টা নিরাভাসা গুলকা ॥ ২২ ॥

পত্নী (০১=১) লগপদ লাভয়োঃ (৪৩=৭) জায়া পদয়োঃ নিরাভাসা

গল্যা বাধক রহিতা গল্যা জাতকো দিষ্টা ভাগ্যবান্ ভবতি ॥ ২২ ॥

তহু পদ এবং জায়াপদ বাধক বিবজ্জিত অর্গলা সংযুক্ত থাকিলে মদুহা (দিষ্টা) ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। এখানে তহু কিংবা জায়া পদ অর্গলা সমন্বিত হইলে স্বল্প ফল এবং উভয়ক

অর্গলার সংযোগ থাকিলে পূর্ণফল জাতব্য।

যেমন মেঘলগ্নে মঙ্গল মিথুনে থাকায় সিংহ-

রাশি তহু পদ। ধারণে গ্রহ বজ্জিত তহুপদ

ঔষ্টা তুল্য শনির দ্বিতীয় স্থানস্থ বৃহ, তহু

পদের অর্গলা কারক হইয়াছে। পুনরু জায়াভাব

তুল্য রাশির পক্ষে তদধিপতি শুক্রের অবস্থিতি

নিবন্ধন মিথুন রাশি জায়াপদ, এবং দশমে গ্রহ

বজ্জিত জায়াপদ ঔষ্টা ধর্ম রাশিষ্টি রবির

চতুর্থস্থ, মীনরাশি গত বৃহস্পতি, জায়াপদের

অর্গলা কারক। এখানে লগপদ এবং জায়াপদ

উভয়ই হুভাগলা সংযুক্ত হওয়া দিষ্টা ভাগ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। দিষ্টা ভাগ্য মথদে

পাশাশরী গ্রহে লিখিত আছে—

ধন ধান্য পুত্র পশু দারা বন্ধু কুলৈমুতঃ।

শরীরারোগ্য মৈশ্বর্গ্য ভৃত্য বাহন সমুত্তঃ।

হরভক্ত স্বপ্নমুজ্ঞো দিষ্টা ভাগ্যাত লক্ষণং ॥

জ্যোতির্বিদ নীলকন্ঠ স্বকৃত টীকার উক্ত গ্রন্থের “লগ পদ তঃ সপ্তময়োঃ” ইত্যাদি রূপ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সূক্ষ্মকৃত নহে। কারণ মূলে পত্নী (লগ) এবং লাভ (জায়া) এই দুইটা শব্দ আছে মাত্র। বর্তমান অবস্থায় লগাদি আকৃত স্থান হইতে ফল বিচার হইতেছে বলিয়া পত্নী শব্দে লগাকৃত পর বিবেচ্য কিন্তু লাভ শব্দে জায়াপদ ভিন্ন উক্ত লগাকৃত পদের সপ্তম স্থান বিবেচনা করা কখনই কর্তব্য নহে।

এই স্থান মথদে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উক্ত আছে যে—

যস্য পাপঃ শুভো বাপি গ্রহিস্তিষ্ঠেঃ শুভার্গলে।

তেন ভ্রষ্টেদিক্তং লগং প্রাবল্যায়োগপক্কাত ॥

যদি পাপেই গ্রহ শুভ বিপরীতার্গল স্থিতঃ।

প্রথমাঃ তু বিজ্ঞানীয়াৎ বিপরীতার্গলাং দ্বিজ ॥

কোন ভাব বা গ্রহঔষ্টা গ্রহের শুভার্গলে অর্থাৎ চতুর্থ দ্বিতীয় বা একাদশ স্থানে কোন গ্রহ থাকিয়া অর্গলাকারক হইলে যদি উক্ত ঔষ্টা গ্রহের পুনরবি লগেও দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে উক্ত ভাব বা গ্রহোৎ ফলের প্রাবল্য কল্পনীয়। কিন্তু লগোপরি উক্ত ঔষ্টা গ্রহের বিপরীতার্গলস্থিত কোন গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে তদুপরি উক্ত ঔষ্টা গ্রহের দৃষ্টি কোন কার্যকরী হয় না। এখানে বলা বাহুল্য মাত্র যে ঔষ্টা গ্রহের দশম স্থান স্থিত চরাদি এক রাশি গত গ্রহ ভিন্ন অত্র কোন গ্রহ ঔষ্টা সহ লগকে দৃষ্টি করিতে পায়ে না। সুত্রে অর্গলা সংজ্ঞায় দাবভাগ্য এবং রিপক নীচ বলিয়া প্রথমেই চতুর্থ ও দশম স্থানের উল্লেখ থাকায় পূর্ণোক্ত নোকে “প্রথমাঃ তু বিজ্ঞানীয়াৎ” বলিয়া তৎ তৎ স্থানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেহ কেহ লগোপরি অর্গলা কারক গ্রহের দৃষ্টি অর্থ করেন কিন্তু ঔষ্টা শব্দে অর্গলা কারক গ্রহকে লক্ষ্য করা অস্বচিত ॥ ২২ ॥

শুভার্গলে ধন সমৃদ্ধিঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র তনুপদ জায়াপদয়োঃ শুভার্গলে শুভগ্রহ কৃতার্গলে ধনসমৃদ্ধিঃ ধনবৃদ্ধিঃ স্যাৎ। পাপগ্রহ কৃতার্গলে ধনবন্ধ্যমাত্র মতিস্থিত মিত্য-গম্যতে। অতঃ শুভপাপগ্রহ কৃতার্গলে কদাচিত্ ধনবৃদ্ধিঃ কদাচিত্ ধনবন্ধ্যমাত্রঃ সূচিতং। তথাচ পাশাশরীয়ে—

শুভগ্রহার্গলে বিপ্র বজ্জব্য প্রদায়কঃ।

পাপেন স্বল্প বিত্তঃ স্য্য বিবিশকঃ দ্বিজোত্তমঃ ॥

উভাগলা ভবেৎ তত্র কদাচিত্ ধনবান্ ভবেৎ।

কদাচিত্ বিত্ত চিত্তান্তি জায়তে দ্বিজ সন্তমঃ ॥

তনুপদ এবং জায়াপদ উভয় স্থানই শুভগ্রহ কৃত অর্গলা সংযুক্ত হইলে ধন সমৃদ্ধি হয়। পূর্ণ গ্রহে শুভ বা পাপ, যে কোন গ্রহ কর্তৃক উক্ত স্থান দ্বয় অর্গলা সংযুক্ত হইলে ভাগ্যবদ্য যোগ উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু এখানে কেবল শুভগ্রহ কৃত অর্গলা হইতেই ধন সমৃদ্ধি যোগ বলা হইল। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে শুভগ্রহে যে পরিমাণ ধন সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, পাপ গ্রহে ততদূর হয় না, এবং শুভগ্রহে যে রূপ নিয়তই ধন বৃদ্ধি হইতে থাকে পাপ গ্রহে সে রূপ ঘটে না। মিশ্র গ্রহে মিশ্র ফল জাতব্য। এই গ্রহে পদ মথদে পরিত্যক্ত হইল ॥ ২৩ ॥

জন্ম কাল ষষ্টিকাংশে কদুষ্ঠাসু রাজানঃ ॥ ২৪ ॥

জন্ম লগং প্রসিদ্ধং কাল লগং হোরালগং ঘটিকা ঘটিকালগং ৫ তেম্ বিপ্রপি কেন চিদেকেনৈব গ্রহেণ দৃষ্টেয় রাজানো ভবতি।

এক্ষেণে রাজযোগাদি আরম্ভ হইল। কুণ্ডলী মধ্যে জন্ম লগ্ন হোরালগ্ন এবং ঘটিকা লগ্ন এই তিন স্থানে একই গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে রাজযোগ চিন্তা করিবে। একই গ্রহ শম্বে জন্মলগ্নে যে গ্রহের দৃষ্টি থাকিবে অপর লগ্নদ্বয়ও সেই গ্রহ দ্বারা পরিদৃষ্ট হইবে ইহাই বিবেচ্য। পরাশর বলেন “জন্মাঞ্চে চাপি হোরাঞ্চে লিঙ্গাঞ্চে বেচরেক্ষিতে। রব্যাধ্যয় স্তম্বে স্থানে রাজযোগ প্রদায়ক।” অর্থাৎ জন্মাদি তিনটি লগ্নই যদি কোন না কোন গ্রহ বীক্ষিত থাকে তাহা হইলে রাজযোগ জাতব্য। তাহা হইলেও সূত্রোক্ত যোগ হইতে পারাশরী যোগ যে স্বল্প ফল প্রদ ইহা সহজেই অস্বত্বব সিন্ধু ২১৪।

এবমংশতো দূকানৈবশ্চ ২১৫ ॥

এবং পূর্বোক্ত প্রকারেণ অংশতো নবাংশ কুণ্ডল্যাং দূকানৈবশ্চ দূকান কুণ্ডল্যামপি রাজযোগবিচারঃ কাৰ্য্যঃ ॥ অতঃ ক্ষেত্রলগ্ন কাল ঘটিকাস্থ, দূকান লগ্ন কাল ঘটিকাস্থ তথা নবাংশ লগ্ন কাল ঘটিকাস্থ চৈক দৃষ্টাস্থ রাজানো ভবন্তীতি রাজযোগ এয়ং সিধ্যতি ২১৫ ॥

পূর্বোক্ত সূত্রে ক্ষেত্র কুণ্ডলী হইতে যে প্রকার রাজযোগ বিচার করা হইয়াছে, দূকান কুণ্ডলী এবং নবাংশ কুণ্ডলী : হইতেও তদ্রূপ বিচার্য্য। অর্থাৎ উক্ত লগ্নদ্বয় যে যে রাশির দূকানে বা নবাংশে অবস্থিত তৎসং রাশি ত্রয় একগ্রহ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে রাজ যোগ জাতব্য। অতএব ক্ষেত্রাদি কুণ্ডলী ত্রয়ে, জন্ম হোরা ও ঘটিকা লগ্নের প্রতি রব্যাধি কোন এক গ্রহের দৃষ্টি বশতঃ তিনটি রাজযোগ বর্ণিত হইল ২১৫ ॥

পঞ্জরী লাভস্কোচ স্পাংশক দূকানৈবশ্চ ২১৬

ক্ষেত্র বর্গে নবাংশে বা দূকানে ভাষ্যজাদয়ঃ।

লগ্নং চ সপ্তমং বিপ্র পশ্যতি রাজযোগকং ॥

রাশ্যাংশক দূকানৈবশ্চ রাশি (ক্ষেত্র) কুণ্ডল্যাং নবাংশ কুণ্ডল্যাং দূকান কুণ্ডল্যাং বা পঞ্জরীলাভস্কোচ লগ্ন সপ্তময়েশ্চ, যানি লগ্নানি যানি তৎসপ্তম্যানি চ তানি যদ্যেকগ্রহ দৃষ্টানি তদা পূর্ব সূত্রানুসয়েন রাজানো ভবন্তি। এবং ষট্ৰপি দৃষ্টেস্থ পূর্ণযোগঃ ২১৬ ॥

রাশি অর্থাৎ ক্ষেত্র কুণ্ডলী দূকানকুণ্ডলী এবং নবাংশ কুণ্ডলী এই তিন কুণ্ডলীতেই লগ্ন এবং সপ্তম স্থান একই গ্রহ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে মহায়া রাজ্য হইয়া থাকে। কুণ্ডলী ত্রয়ে ছয়টি স্থানই একগ্রহ দৃষ্ট হইলে পূর্ণরাজ যোগ জাতব্য ২১৬ ॥

তৈশ্চৈকশিন্ ন্যুনে ন্যুনে ২১৭ ॥

তেষু জন্মকাল ঘটিকাস্থ রাশ্যাংশক দূকানাদিকেযু রাজযোগ চতুর্দশয়ে-
পি একশিন্ ন্যুনে চৈকগ্রহ দৃষ্ট্যা ন্যুনেযু ন্যুনে রাজত্ব মিত্যর্থঃ ২১৭ ॥

পূর্বোক্ত সূত্র ত্রয়ে লগ্নাদিতে একই গ্রহ দৃষ্টি জনিত যে কয়টি রাজযোগ কীর্ণিত হইয়াছে, তৎসং যোগে এক গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট স্থানের ন্যূনাত্মক রাজ যোগের ও ন্যূনাত্মক জাতব্য। প্রথমোক্ত যোগে কুণ্ডলী ভেদে তিনটি করিয়া নয়টি এবং দ্বিতীয় যোগে দুইটি করিয়া ছয়টি দৃশ্য স্থান আছে। একগ্রহ কর্তৃক প্রতি যোগে যত অধিক স্থান পরিদৃষ্ট হইবে ততই যোগের প্রাবল্য বিনিশ্চিত। উক্ত যোগাদিতে পুনরীকৃত ত্রয়ো গ্রহের বলাবল এবং শুভাশুভ বিষার করাও আবশ্যক। নীচগ্রহ পরিদৃষ্ট ভাবাদি কখনই উচ্চগ্রহ পরিদৃষ্ট ভাবাদির সহ সম ফল দাতা হইতে পারে না। অতঃস্থল সথেষ্ট বুদ্ধ করিকায় লিখিত আছে—

বিপ্রা ঘটিকা লগ্ন হেরো লগ্নানি পশ্যতি।

লগ্নং চ সপ্তমং বিপ্র পশ্যতি রাজযোগ কং ॥

পূর্ণ দৃষ্ট্যা পূর্ণ যোগো ন্যুনে ন্যুনে যথাক্রমং।

এবং নবাংশ কুণ্ডল্যাং দূকানৈপি বিচিন্তয়েৎ ॥

লগ্ন সপ্তময়ো থেটো রাজযোগপ্রদায়কঃ।

উচ্চগ্রহে রাজযোগো লগ্নদ্বয় মখাপিবা ॥

রাশে দূকানতোহং শাক্ত রাশে রশাদমখাপিবা।

যুবা রাশি দূকানাভ্যাং লগ্নং ত্রুটী তু যোগদঃ ॥

জন্মকাল ঘটিকায় একনৈব নিরাশ্বিতে।

উচ্চাকটে তু সপ্তাংশে চন্দ্রাকান্তে বিশেষতঃ ॥

ক্রান্তে বা গুরু শুক্রাভ্যাং কেনাপ্যুক্তগ্রহেণ বা।

চুটীগলি গ্রহাভাবে রাজযোগো ন সংশয়ঃ ২১৭ ॥

শুক্র চন্দ্রস্কো মিথো দৃষ্টেস্কোঃ সিংহস্কোঃ বীমানবস্তঃ ২১৮ ॥

শুক্র চন্দ্রয়োঃ যত্র তত্র স্থিতয়ো যদি মিথঃ পরস্পরং দৃষ্টয়োঃ দৃষ্টি ভাজোহথবা সিংহস্কোঃ (সিংহ=৭৮=৩). তৃতীয়স্কো স্তহি জাতকো যানবস্তো ভবতি ॥ তদুত্তং বুদ্ধৈঃ=চন্দ্রঃ কবিং কবিশ্চন্দ্রে পশ্যত্যাপি তৃতীয়গে। শুক্রাক্ষন্দ্রে ততঃ শুক্রে তৃতীয়ে বাহনাবান্ ২১৮ ॥

যদি তত্ত্বাবস্থিত চন্দ্র শুক্রের মধ্যে পরস্পর দৃষ্টি থাকিলে অথবা পরস্পর তৃতীয়ৈকাদশস্থ হইলে জাতক বাহনাবস্থান হইবে। দেখা গিয়াছে জাতক শাস্ত্রোক্ত সাধারণ দৃষ্টিও এই গ্রহদ্বয়ে ফল বিচারের অনেক স্থলে অগ্রাহ্য নহে ৷২৮৷

শুক্র কুজ কেতু বৈতানিকঃ ৷ ২৯ ৷

শুক্র কুজ কেতু যত্র কৃত্রাবস্থিতেষু পরস্পরং দৃষ্টিমৎস্র তৃতীয়েষু বা বৈতানিকা বিতানাদি রাজ চিত্র ধারকা ভবন্তি ৷২৯৷

শুক্র মঙ্গল এবং কেতু এই গ্রহদ্বয় যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া পরস্পরকে দৃষ্টি করিলে অথবা পরস্পর তৃতীয়স্থ অর্থাৎ এক এক রাশি অন্তরস্থ থাকিলে জাতক বিতানাদি রাজ চিত্র ধারণ করে ৷ এ স্থলে জানা আবশ্যক রাশি দৃষ্টিতে কেতুগ্রহ চক্ষুহীন নহে ৷২৯৷

শ্রভাগ্য দার মাত্তভাব সমেন্ম শুভেন্ম রাজানঃ ৷ ৩০ ৷

যু স্থাৎ আয়ুকারকাং **ভাগ্য (২) দ্বিতীয় দার (৪) চতুর্থ মাতৃ (৫) পঞ্চম** এতেন্ম ভাবদ্বয়েষু **ভাব সমেন্ম ভাবশ্চুট তুল্যেযু শুভেযু শুভগ্রহেযু** স্থিতেষু **রাজানো ভবন্তি**। এবং তত্তৎ কারকবশাৎ তেভ্যমপি রাজ-যোগ্য কল্পনীয়ং। অর্থাৎ পুত্রাদি কারকাৎ দ্বিতীয়াদি স্থানত্রয়েষু ভাবসমেন্ম শুভেযু পুত্রাদীনামপি রাজযোগ্যো বাচ্যঃ তথাচ পারাশরীয়ে—কারকাৎ দ্বি চতুর্থে চ পঞ্চমে ভাবগো দ্বিজ। শুভ খেটৌ ন সন্দেহো রাজযোগ্যং দদাতি চ ৷৩০৷

আয়ু কারক গ্রহ হইতে দ্বিতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে ভাবতুল্য অর্থাৎ তত্তৎ ভাবের ক্ষুণ্ণাংশাদি তুল্য শুভগ্রহ থাকিলে জাতক রাজা হইয়া থাকে। এ স্থলে গ্রহ এবং ভাব উভয়ের ক্ষুণ্ণাংশাদি সমান না হইলেও অন্ততঃ গ্রহগণের ভাবস্থিত বল জিয়ারাদিক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বর্তমানে কোন টীকাকার তাহার স্বার্থ প্রকাশিকায় ভাব শব্দে অষ্টম স্থান ধরিয়া বড়ই ভ্রম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কেন যে পুত্র, সম শব্দ হইতে নবম স্থানকে যোগ মধ্যে গণ্য করেন নাই ইহাই আশ্চর্য। পূর্বোক্ত পরশুরামের স্লোকে ৮ম বা ৯ম স্থানের উল্লেখ নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে বর্তমান যুগে আয়ুকারক গ্রহ হইতে যে প্রকারে রাজ যোগ বিচার করা হইয়াছে, পুত্র কারকাদি হইতেও তদ্রূপ বিচার কার্য। অর্থাৎ পুত্রাদি কারক গ্রহ হইতে দ্বিতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে ভাবসম শুভ গ্রহ থাকিলে তত্তৎ ব্যক্তির রাজ যোগ বক্তব্য ৷৩০৷

কর্ম দাসাক্রোঃ পাশক্রোশ্চ ৷ ৩১ ৷

কারকাৎ তৃতীয়ে যষ্ঠে রাশ্যোক্তভয় পাপযুগ।
রাজবংশোদ্ভবো বালে রাজা ভবতি নিশ্চিতং ৷

আয়ুকারকাদিতি পূর্ব সূত্রেণায়ং **কর্ম (৫১=৩) দাসয়োঃ (৭০=৬) তৃতীয় যষ্ঠয়োঃ ভাবসময়োঃ পাপয়োশ্চ** রাজানো ভবন্তি ৷৩১৷

আয়ুকারক গ্রহ হইতে তৃতীয় এবং যষ্ঠ স্থানে ভাব তুল্য পাপ গ্রহ থাকিলে (রাজ বংশোদ্ভব) ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। এখানেও পূর্বোক্ত যুগের দ্বায় পুত্রাদি কারক হইতেও এই যোগ বিচার্য। তত্ত্ব লগ্নাদি হইতেও উক্ত যোগাদি বিচার নিরর্থক নহে ৷৩১৷

পিতৃ লাভাধিপাট্টৈলং ৷ ৩২ ৷

লগ্নাদিশাৎ দাননাথাৎ ধনে তু্যে চ পঞ্চমে।

শুভখেটু যুতে বিপ্র রাজা চ ভবতি ধ্রুবং।

তৃতীয়ে যষ্ঠভে পাপে তদ্বদেব বিচিন্তয়েং ৷

পিতৃলাভাধিপাট্ট লগ্নাদিপাৎ সপ্তমাধিপাট্ট এবং পূর্বোক্ত সূত্রদ্বয়বৎ বিচার্য কাব্যঃ। অর্থাৎ তদধিপাৎ দ্বিতীয় চতুর্থ পঞ্চম ভাবেষু ভাব সমেন্ম শুভেযু তথা তৃতীয় যষ্ঠ ভাবয়ো ভাবতুল্যয়োঃ পাপয়োশ্চ রাজানো ভবন্তীত্যর্থঃ। অত্র লগ্ন শব্দে ন জন্মলগ্ন পদলগ্নস্যপি গ্রহণমিতি ৷ ৩২

পূর্বোক্ত যুগদ্বয়ে কারক গ্রহ হইতে যেভাবে রাজযোগ বিচার করা হইয়াছে, লগ্নাদিপতি এবং সপ্তমাধিপতি হইতেও তদ্রূপ ফলবিচার কাব্য। অর্থাৎ লগ্নাদিপতি কিংবা জায়পতি হইতে ধন সুখ এবং ইত্যন্যে ভাবসম শুভগ্রহ তথা সহজ ও শক্তভাবে পাপগ্রহ থাকিলে রাজযোগ চিন্তনীয়। এই স্থলে লগ্ন শব্দে পদ লগ্নও গ্রাহ্য ৷ ৩২ ৷

মিশ্রে সমাঃ ৷ ৩৩ ৷

উপরোক্ত যোগদ্বয়ে **মিশ্রে শুভপাপ মিশ্রে সমাঃ** মধ্যবিধাভবন্তি।
তথাচ পারাশরীয়ে—ন দরিত্রো ভবেজ্জীবো ন রাজা জায়তে দ্বিজ।
সমান কুলজং প্রাজ্ঞং প্রতিষ্ঠা গৌরবান্বিত মিতি ৷ ৩৩ ৷

উপরোক্ত যোগদ্বয়ে দ্বিতীয়াদি তৃতীয়াদি স্থানে শুভ এবং পাপ উভয় বিধ মিশ্রিত গ্রহ অবস্থিত থাকিলে মহাশয় মধ্যবিধ গৃহস্থ বলিয়া জান করিবে ৷ ৩৩

দরিত্রা বিপন্নীতে ॥ ৩৪ ॥

পূর্বোক্ত যোগব্যয়ে বিপন্নীতে শুভগ্রহ স্থানে পাপাঃ পাপগ্রহ স্থানে শুভাশেৎ তদন দরিত্রা ভবন্তি ॥ ৩৪ ॥

পূর্বোক্ত যোগব্যয়ে শুভ গ্রহ স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয়াদি স্থানত্রয়ে পাপগ্রহ এবং পাপগ্রহ স্থানে অর্থাৎ তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে মহত্বকে দরিত্র বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ৩৪ ॥

মাতলি গুরৌ শুক্রে চন্দ্রে বা রাজ্যকীর্ত্নাঃ ॥ ৩৫ ॥

আত্মকারকাং লগ্নাধিপাং সপ্তমাধিপাং মাতরি পঞ্চম স্থানে গুরৌ শুক্রে চন্দ্রে বা গুরুবীর্জা মন্যতমে স্থিতে সতি রাজ্যকীর্ত্না রাজ্যধিকারিপো ভবন্তি ॥ ৫ ॥

আত্মকারক লগ্নাধিপতি কিংবা সপ্তমাধিপতি হইতে পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতি শুক্র কিংবা চন্দ্রের অবস্থিতি দেখিলে জাতব্যক্তিকে কোন না কোন রাজকাৰ্যের অধিকারী বলিয়া চিন্তা করিবে ॥ ৩৫ ॥

কক্ষ্মণি দাসে বা পাপে সেনান্যঃ ॥ ৩৬ ॥

আত্মকারকাং লগ্নেশা জ্ঞায়াপভেৰ্বী কক্ষ্মণি তৃতীয়ে দাসে যষ্ঠে বা পাপে পাপগ্রহে সতি সেনান্যঃ সেনাপত্যয়ে ভবন্তি ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব যজ্ঞোক্ত আত্মকারকাধি স্থানত্রয় হইতে তৃতীয় বা ষষ্ঠ স্থানে কোন পাপগ্রহ থাকিলে মহত্ব সেনাপতিত্ব লাভ করে ॥ ৩৬ ॥

সপিভৃত্যঃ কক্ষ্মদাসস্ব দৃষ্টা তদৌশ দৃষ্টা

মাতৃনাথ দৃষ্টাচ শীমন্তঃ ॥ ৩৭ ॥

সপিভৃত্যঃ আত্মকারকাং জন্মলগ্নাধী কক্ষ্মদাস দৃষ্টা তৃতীয় যষ্ঠ স্থানগ্রহ গ্রহদৃষ্টা কারকে লগ্নে চ ইত্যর্থঃ বা তদৌশ দৃষ্টা তৃতীয় পতি দৃষ্টা যষ্ঠেশ দৃষ্টা বা তথা মাতৃনাথ দৃষ্টা পঞ্চমেশ দৃষ্টা কারক লগ্নয়োঃ ধীমন্তঃ নরা স্ত্রীক বুদ্ধি সম্পন্ন ভবন্তি । পিতৃশব্দাৎ পদলগ্নমপ্যত্র গ্রাহ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

আত্মকারক গ্রহ, জন্ম লগ্ন কিংবা পদ লগ্ন এই স্থান হইতে তৃতীয় বা ষষ্ঠ স্থানগ্রহ গ্রহ অথবা তত্ত্বস্থান হইতে তৃতীয় যষ্ঠ কিংবা পঞ্চম স্থানপতি উক্ত আত্মকারকাদিকে দৃষ্টি করিলে জাতক বিচক্ষণ এবং স্ত্রীর বুদ্ধি সম্পন্ন হয় ॥ এখানে পিতৃ শব্দে জন্মলগ্ন হইলেও পদ লগ্ন গ্রাহ্য নহে ॥ বর্ধমান যুগে যোগ সংখ্যা সমুদায়ে পঞ্চদশ । যোগবাহুরো ফল বাহনাই বিচার্য ॥ ৩৭ ॥

আরক্তভ্যমেতি মুখং জিহবা বা শ্যামতাং যদা ।

তদা প্রাজ্ঞো বিজানিয়ান্য ত্যুত্সামসাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

উষ্ট্র-রাসভযানেন যঃ স্বপ্নে দক্ষিণং দিশম্ ।

প্রয়াতি তপ জ্ঞানীয়াৎ সদ্যোমৃত্যুং ন সংশয় ॥ ২৭ ॥

পিধায় কর্ণে নির্ধোষণং ন শৃণোত্যাত্মসম্ভবম্ ।

নশ্বতে চক্ষুর্মহোজ্যোতির্বশ্য সোহপি ন জীবতি ॥ ২৮ ॥

পততো ব্যস্য বৈ গর্ভে স্বপ্নে দ্বারং পিথিতে ।

ন চোত্তিষ্ঠতি যঃ শব্দাৎ তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥ ২৯ ॥

উর্দ্ধা চ দৃষ্টিন চ সপ্রতিষ্ঠা

রক্তা পুনঃ সম্প্রিবর্তমানা ।

মুখস্য চোঙ্গা শিশিরা চ নভিঃ

শংসন্তি পুংসামপরং শরীরম্ ॥ ৩০ ॥

দেপুহগ্রিং প্রবিশেদ্যন্ত ন চ নিজ্রমতে পুনঃ ।

জলপ্রবেশাদপি বা তদন্তং তন্ত জীবিতম্ ॥ ৩১ ॥

মণ্ডাভিহৃতে তুটৈতু তৈ রাজ্যবধো দিবা ।

ম মৃত্যুং সপ্তরাত্রন্ত নরঃ প্রাপ্তোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩২ ॥

আরক্ত বদন যার জিহবা যদি স্নায়াকার জীবন ভাগের পথ ঘেনে রেখো শিশিবে হেরি তারে, তবে প্রাজ্ঞজন, বাঁচাইতে কেবা পারে তার। ২৬ ।
বুঝিবেন মনে মনে যাঁহে শমন-সমনে; উর্দ্ধদৃষ্টি হৈল যার হুলোহিত আঁধার-তার অচিরায় তালিবে জীবন । ২৭ ।
উষ্ট্র কি রাসভ যাহ্নে স্বপ্নে সে দক্ষিণ পানে মুখে উদ্ভা বর্ধমান নাতি শিশির সমান চলিয়াছে করে দরশন, দেহাস্তর হ'লো জেনো তার। ৩০ ।
সদ্য মৃত্যু হ'বে তার সন্মুখে নাহিক আর স্বপ্নে দেখে যেই জন করে অগ্নি-গ্রবেশন কর' রক্ত হ'লে যার নির্ধোষণ না হয় আর কিংবা জলে সেই মত; সে জন হইল হত চক্ষুজ্যোতি যার লুপ্ত হয়, সন্মুখে নাহিক কিছু তা'য়। ৩১ ।
শির জেনো সেই জন হ'য়েছে হতজীবন যেই জন দ্রুত-ভয়ে রহে অভিজ্ঞ হ'য়ে অচিরে যাইবে যমালয়। ২৮ ।
স্বপ্নে দেখে যেইজন গর্ভতে হ'য়ে পতন, সপ্তরাত্রি পরে তার জীবন না রা'বে আর উত্তিবার পথ নাহি পায়, সন্মুখে নাহিক কিছু তা'য়। ৩২ ।

স্ববস্তুমলং শূরং রক্তং পশুত্যাগাসিতম্।
 যঃ পুমান্ হৃত্যু্যাসামং তস্যাপি হি বিনিদ্দিশেৎ ॥ ৩৩ ॥
 স্বভাবৈবপরীত্যস্ত প্রকৃতেশ্চ বিপর্যয়ঃ।
 কথয়ন্তি মনুষ্যাণাং সদাসন্নৌ যমান্তকৌ ॥ ৩৪ ॥
 যেষাং বিনীতঃ সততং যেহস্য পূজ্যতমো মতাঃ।
 তানৈব চাবজানান্তি তানৈব চ বিনিদ্দতি ॥ ৩৫ ॥
 দেবান্ নার্কীয়তে বুদ্ধান্ গুরুন্ বিপ্রাংশ্চ নিন্দতি।
 মাতাপিত্রোৰ্ন সংকারং জামাতৃগুণং কৰোতি চ ॥ ৩৬ ॥
 যোগিনাং জ্ঞানবিদ্বদামন্তোষাক মহান্মনাম্।
 প্রাপ্তে তু কালে পুরুষস্তদ্বিজ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৩৭ ॥
 যোগিনাং সততং যজ্ঞাদরিত্যাবনীপতে।
 সংবৎসরান্তে তজ্জ্ঞেয়ং ফলদানি দিবানিশম্ ॥ ৩৮ ॥
 খিলোক্য বিশদা চৈষাং ফলপাতিঃ প্ৰভীষমাণ।
 বিজ্ঞায় কার্যো মনসি স চ কালো নরেশ্বর ॥ ৩৯ ॥

অমল শুভ বসন করে যোবা বরশন জামাতার অনাদর করে সদা যেই নর
 রক্ত কিথা অসিত বরণ, যোগী জানী জনে নিন্দা করে
 আসন্ন মরণ তার সন্দেহ নাহিক আর বিদ্বানে মহান্মজনে সদা তুচ্ছ করে মনে
 যাঁবে সেই শমন-ভবন। ৩৩। অচিরে সে যারি যম ঘরে। ৩৬-৩৭।
 স্বভাবের বিপর্যয় প্রকৃতি পর্য্যন্ত হয় তন ওহে মহারাজ, এসব জানিয়া কাজ
 কোন নবে, হের যে সময়, করা চাই যোগীর সতত;
 নিশ্চয় জানিও মনে সন্দেহ তার জীবনে; যত্রে যদি যোগিগণ সতত করে সাধন
 অচিরে যাইবে যমালয়। ৩৪। বৎসরান্তে ফলিবে নিয়ত। ৩৮।
 বিনয়ে যাঁদের পায় লুটান উচিত, হায় ভীষণ ফল নিচয় যাঁহে যেই মত হয়
 হেন পুজা জনে যেই জন, তার প্রতি দৃষ্টি থাকে চাই;
 করে কতু অপমান, তাহার নাহিক প্রাণ দৃষ্টি যোবা রাখে তায় সেই ত দেখিতে পায়
 বিশেষে জানেন বিজ্ঞাণ। ৩৫। ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।
 বিমুগ্ধ যে দেবচার্য, ব্রাহ্মণের নিন্দা গায় যে কালে যে ফল হ'বে তাহে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রবে
 বুদ্ধজনে নিন্দা করে আর, হ'বে তাহে সর্বস্বভোদয়,
 গুরুজনে নিন্দে যেই পিতৃজনে নতি নেই হৃদয়ে না হবে ভয়, দূরেতে যাবে সংশয়
 মাতারে না করে নমস্কার, মরণ না হবে ভয়ময়। ৩৯।

জ্ঞান্য কালঞ্চ তং সম্যগভয়স্থানমানশ্রিতম্।
 যুঞ্জীত যোগী কালোহরৌ যথা নাস্যাকলো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥
 দৃষ্ট্যুরিক্তং তথা যোগী ত্যক্ত্যু মরণঞ্জং ভয়ম্।
 তৎস্বভাবং তদালোক্য কালে যাবত্যাগাতম্ ॥ ৪১ ॥
 তস্য ভাগে তথৈবাহু যোগং যুঞ্জীত যোগবিৎ।
 পূর্বকালে চাপরাঙ্কে চ মধ্যাহ্নে চাপি তদ্দিনে ॥ ৪২ ॥
 যত্র বা রজনীভাগে তদরিক্তং নিরীক্ষিতম্।
 তত্রৈব তাবদযুঞ্জীত যাবৎ প্রাপ্তং হি তদ্দিনম্ ॥ ৪৩ ॥
 ততস্ত্যক্ত্যু ভয়ং সর্বং জিহ্বা তং কালমাব্ধবান্।
 তত্রৈবাবসথে স্থিহ্বা যত্র বা স্বৈর্যমাব্ধনঃ ॥ ৪৪ ॥
 যুঞ্জীত যোগঃ নির্জিত্য ত্রৌণ গুণান্ পরমজ্ঞানি।
 তদ্ব্যসক্ত্যন্য ভুগ্না চিদ্রুতিমপি সম্যজ্ঞেৎ ॥ ৪৫ ॥
 ততঃ পরমনির্বীণমভীক্ষিয়মগোচরম্।
 যদবুদ্ধৈর্মম চাখ্যাভুং শক্যতে তৎ সমম্ভূতে ॥ ৪৬ ॥

কাল জাত হ'লে পরে নির্ভয় হয়ে অন্তরে যত দিন সেইকণ, গত নহে কদাচন,
 যোগযুক্ত হইবে নিশ্চয়, অত চিন্তা না আন অন্তরে। ৪০।
 হবে তাহে শুভোদয়, নিশ্চয় কতু না হয় সর্বভয় পরিহারি' আশ্রায় অন্তরে খরি'
 যোগ চেষ্টা না কর সময়। ৪১। আশ্রয়বান্ আশ্রয়ত হ'বে
 অরিত হইলে দৃষ্ট মনেতে ঘরিতে ইষ্ট সেই স্থানে যোগ্য হয়, কিথা যোগ্য স্থানিত্য
 তাকি' বুধা, মরণের ভয়, মন প্রাণ বিশ্ব ধরি রবে। ৪২।
 যে কালে হইবে কাল, যুচাতে সব জ্ঞান জয় করি তিন গুণ, তৎকার্যে যোবা নিপুণ
 যোগযুক্ত হ'বে সে সময়। ৪৩। আশ্রয়বান্ হইবে নিশ্চয়,
 সেই দিনে সে সময় পূর্বাত্ মধ্যাহ্ন হয় তাহে যোগযুক্ত হ'লে সতত হৃফল ফলে
 কিথা হয় অপরাহ্ন কাল চিন্তয়ন্তি তাহে কৃষ্ণ হয়। ৪৪।
 বিচার না করি তার যোগে রত আপনার পরম নির্বাণ তায় অনায়াসে পাওয়া যায়
 হইবেন যুচাতে জ্ঞান। ৪৫। ইন্দ্রিয়গণের অগোচর,
 • সেই দৃষ্ট কাল হ'তে যোগরত বিদ্যি মতে বুদ্ধি অগোচর যাঁহা বাক্যে কে বলিবে তাঁহা
 রহিবেন অনন্ত অন্তরে, তাঁহা লাভ হইবে সময়। ৪৬।

এতৎ সর্বং সমাপ্যাতং তবালক যথার্থবৎ ।
 প্রাপ্যসে যেন তদ্ব্রজ সংক্ষেপাৎ তমিবোধ মে ॥ ৪৭ ॥
 শশাঙ্করশ্মিসংযোগাক্ষত্রকান্তমণিঃ পয়ঃ ।
 সমুৎসৃজতি নায়ুক্তঃ সোপমা যোগিনঃ স্মৃতা ॥ ৪৮ ॥
 যথাকরশ্মিসংযোগাদর্ককান্তো হৃতশনম্ ।
 আবিষ্করোতি নৈকঃসন্নপমা সাপি যোগিনঃ ॥ ৪৯ ॥
 পিপীলিকাখু-নকুল-গৃহগোধা-কপিঞ্জলাঃ ।
 বসন্তি স্বামিবদগেহে ধ্বন্তে যান্তি ততোহনৃতঃ ॥ ৫০ ॥
 ছংগন্ত স্বামিনো ধ্বংসে তন্ত তেষাং ন কিঞ্চিন ।
 বেশ্মনো যত্র রাজেন্দ্র সোহপমা যোগসিদ্ধয়ে ॥ ৫১ ॥
 যুদ্ধেহিকাল্লদেহাপি মুখাগ্রোণাপ্যচীয়াস ।
 করোতি যুদ্ধাচরয়মুপদেশঃ স যোগিনঃ ॥ ৫২ ॥
 পশু-পক্ষি-মনুষ্যানৈঃ পত্র-পুষ্প-ফলাদিতম্ ।
 বৃক্ষং বিলুপ্যমানস্ত দৃষ্টা সিধ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৫৩ ॥

এই ত বলিছ রায় যাহা বাক্যে বলা যায় গৃহে গৃহী সহ রয় গৃহ গেলে স্থানিচয়
 যথার্থ তোমার গোচরে, অজ্ঞ স্থানে গমন তাহার ॥ ৫০ ॥
 যাহে ব্রহ্ম লাভ হয় এবে সেই সমুদয় দেহ ধ্বংসে দেহী আর না সহে সে ছংগ ভার
 সংক্ষেপে বলিবে তব ত্তরে ॥ ৪৭ ॥ দেহে যত হয় সংঘটন,
 শশাঙ্কের রশ্মি গেলে চক্রকান্ত অবহেলে গেহ সম ভ্রেনো দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হ'লে দেহ
 নিখল লালন ভাণ্য করে, কিছুই না জুড়ে যোগিজন ॥ ৫১ ॥
 না গেলে সে সিত-কর অশক সে নিরন্তর যুদ্ধেহিকা জ্বলকায কিছু তার মুখে যায়
 সেই কথা মিলে যোগী ত্তরে ॥ ৪৮ ॥ রশ্মি রশ্মি মুক্তিকা উদয়,
 অর্করশ্মি গেলে পর হৃৎকান্ত নিরন্তর যোগী সেই উপদেশে ঘীরে সাধি পায় শেষে;
 অনল করয়ে উল্লারণ, পরম সে ব্রহ্ম লভ হয় ॥ ৫২ ॥
 রশ্মি বিনা নাহি পারে যোগী যে, জানিও তাঁরে পশু পক্ষী আর নরে ফলাগিত তত্ত্ববরে,
 সেই মত শুনহে রাজন ॥ ৪৯ ॥ ঘীরে ঘীরে করয়ে বিনাশ
 পিপীলিকা, আখু আর, গৃহ গোধা নিরীকার যোগী দেখি সেই কার্য করেন আপন কার্য
 কপিঞ্জল নকুল সে আর, দীর-বস্ত্রে সদা পুরে আশ ॥ ৫৩ ॥

রুক্ষশাবিষাণাগ্রামালক্ষ্য তিলকাকৃতিম্ ।
 সহ তেন বিবদ্ধন্ত যোগী সিদ্ধিমবাগ্ধ্যুৎ ॥ ৫৪ ॥
 দ্রবপূর্ণমুপদায় পাত্রমারোহতো ভুবঃ ।
 ভূঙ্গমঙ্গং বিলাকোচ্চৈকবিজ্ঞাতং কিং ন যোগিনা ॥ ৫৫ ॥
 সর্বদেবে জীবনায়ানং নিখাতে পুরুষন্ত যা ।
 চেষ্টাং তাং তন্ততো জ্ঞাত্বা যোগিনঃ কৃতকৃত্যতা ॥ ৫৬ ॥
 তদগৃহং যত্র বসতিস্তত্তোজ্যং যেন জীবতি ।
 যেন সম্পদ্যতে চার্ঘ্যন্তং হৃৎং সমতাত্র কা ॥ ৫৭ ॥
 অভ্যথিতোহপি তৈঃ কার্য্যং করোতি করণৈর্গদা ।
 তথা বুদ্ধাদিভিযোগী পারক্যৈঃ সাধ্যয়েৎ পরম্ ॥ ৫৮ ॥
 বিজ্ঞপ্তজ উবাচ ।
 ততঃ প্রণম্যত্রি পুত্রজমলকঃ স মহাপতিঃ ।
 প্রপ্রয়াবনতো বাক্যমুমাচাতিমুদাহৃতঃ ॥ ৫৯ ॥
 অলক উবাচ ।
 দিক্ট্য দৈবৈরিদং ব্রহ্মণঃ পরাভিভবসম্ভবম্ ।
 উপাদাদিতমভ্যুগ্রং প্রাণসন্দেহদং ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥

রুক্ষশাব-শিরে হায় তিলাকার দেখা যায় যাহা অর্ঘ্যমুক্ত হয় হৃৎ তাই স্থানিচয়
 শূদ্র তার-ক্রমে বুদ্ধি পায় । এ সব মমতা যোগ্য নয় ॥ ৫৭ ॥
 ক্ষুদ্র বীজ গুরুদন্ত তাহাতে রহিলে মত অভ্যর্থিত যেই মত করণেতে কার্য্য শত
 যোগী সিদ্ধি লাভ করে তাহা ॥ ৫৪ ॥ সাধিত হইছে নিরন্তর,
 দ্রবপূর্ণ পাত্র করে উচ্চৈ আরোহণ করে পারক্য বুদ্ধির বলে সেইরূপ যোগিদলে
 ঘীরে, ঘীরে নয় যে সময়, ব্রহ্মের সাধনে হৃতংপর ॥ ৫৮ ॥
 যোগী অঙ্গ দেখি তাঁর বৃক্কে কার্য্য আপনার বিজ্ঞপ্তজ বলে "পিতা করহ শ্রবণ,
 সাধনেতে বিরত না হয় ॥ ৫৫ ॥ নরেন্দ্র অলক বান্দী" মূনির চরণ,
 জীবনের তরে নরে সর্ব্বং নিখাত করে প্রপ্রয়াবনত হয়ে হর্ষভৃত মনে
 তাহা দেখি, সদা যোগীগণ করিলেন নিবেদন মূনির চরণে ॥ ৫৯ ॥
 ভাঙ্গিয়া সকল ভয়, যোগযুক্ত হয়ে রয় দৈবের ইচ্ছায় হলো সৌভাগ্য উদয়
 কৃতকৃত্য হবার কারণ ॥ ৫৬ ॥ তেঁই এই পঁরাভব ঘটল নিচয়
 যেই স্থানে থাকা যায় গৃহ বসি জানি তায় জীবনসাধকর এই ভীতি ফলে,
 তাই ভোজ্য যাহে দেহ রয়, আদি' মিলিলাম তব চরণ-কমলে ॥ ৬০ ॥

দিক্টা কাশিপতেভু'রি-বলসম্পৎপরাক্রমঃ ।
 বহুচ্ছেদাদিহায়াতঃ স যুগ্মৎসম্পদো মম ॥ ৬১ ॥
 দিক্টা মন্দবলশ্চাহং দিক্টা ভূত্যাশ্চ মে হতাঃ ।
 দিক্টা কোষঃ কয়ং যাতো দিক্টাং জীতিমাগতঃ ॥ ৬২ ॥
 দিক্টা স্বৎপাদমুগলং মম শ্রুতিপথং গতম্ ।
 দিক্টা স্বদুক্রয়ঃ সর্বা মম চেতসি সংস্থিতাঃ ॥ ৬৩ ॥
 দিক্টা জ্ঞানং মমোৎপন্নং ভবতশ্চ সমাগমাৎ ।
 ভবতা চৈব কারুণ্যং দিক্টা ব্রহ্মন কৃতং মম ॥ ৬৪ ॥
 অনর্থেহিপর্যতাং যাতি পুরুষশ্চ শুভোদয়ে ।
 যথেন্দুপকারায় ব্যসনং সম্প্রদাৎ তব ॥ ৬৫ ॥
 স্ববাহুরূপকারী মে স চ কাশিপতিঃ প্রভো ।
 তয়োঃ কতোহহং সম্প্রাপ্তো যোগীশ ভবতোহস্তিকম্ ॥ ৬৬ ॥
 সোহহং তব প্রসাদাগ্নি-নির্দগ্ধাজ্ঞানকিক্লিষ্ম ।
 তথা যতিষ্যে যেনেদৃণ ভুয়াং দুঃখভাজনম্ ॥ ৬৭ ॥

কাশিপতি সৈন্য সনে কৈলা আগমন,
 সৌভাগ্যের ফলে মোর হেন সংঘটন ।
 নাশিতে সে সৈন্য আমি আইছ হেথায়,
 তাহ'তে খটল সদ তোমায় আমার ॥ ৬১ ॥
 ভাগ্য ফলে হয়েছিছ আমি হতবল
 ভূত্যাগণ হত হলো সেও ভাগ্য ফল ।
 সৌভাগ্যের ফলে হ'ল কোষকয় মোর,
 সৌভাগ্যের ফলে হৃদে এল জীতি ঘোর ॥ ৬২ ॥
 সৌভাগ্যের ফলে তব যুগল চরণ
 স্মৃতিপথে আমি' দুঃখ করিল হরণ ।
 সৌভাগ্যের বলে বাক্য মধুর তোমার,
 স্বপ্নয়েতে আমি বন্ধ হয়েছি আমার ॥ ৬৩ ॥
 ভাগ্যবলে সমাগম ঘটি আপনার
 হৃদিমাঝে জ্ঞান আঁজি উদয় আমার ।

ভাগ্যবলে, আপনার করুণা লভিয়া
 অমৃত সাগরে আঁজি যেতেছি ভাসিয়া ॥ ৬৪ ॥
 শুভ ভাগ্যোদয় যবে ঘটয়ে যাহার
 অনর্থতে অবলাত ঘটে ভাগ্যে তার ।
 ব্যসনের বশে আমি পেয়ে তব সদ
 পূর্ণায়ুতরঙ্গে হলো হুঁশীতল অঙ্গ ॥ ৬৫ ॥
 স্ববাহু হইল আজ মহা উপকারী
 উপকারী কাশিপতি শক্রবৈশদ্যারী ।
 তাদের কার্যের ফলে এই শুভোদয়,
 তব পদ পেয়ে হলো শীতল হৃদয় ॥ ৬৬ ॥
 তোমার প্রসাদ আমি দিহিল আমার
 অজ্ঞান-কিঞ্চিৎ-রাশি কি সম্ভব তার ।
 এবে আমি সেইরূপ করিব যতন,
 যাহে আর নাহি হয় দুঃখের ঘটন ॥ ৬৭ ॥

পরিত্যজিষ্যে গার্হস্থ্যমার্তিপাদপকাননম্ ।
 স্বতোহিমুজ্ঞাং সমাসাদ্য জ্ঞানদাতুর্মহাত্মনঃ ॥ ৬৮ ॥
 দত্তাজেয় উবাচ ।
 গচ্ছ রাজেন্দ্র ভদ্রং তে যথা তে কথিতং ময়া ।
 নিশ্চমো নিরহঙ্কারস্তথা চর বিমুক্তয়ে ॥ ৬৯ ॥
 বিষ্ণুপুত্র উবাচ ।
 এবমুক্তঃ প্রণম্যৈনমাজগাম দ্বরাগ্নিতঃ ।
 যত্র কাশিপতি ভাতা স্ববাহুশ্চাস্মৈ সোহগ্রজঃ ॥ ৭০ ॥
 সমুপেত্য মহাবাহুং সোহলকঃ কাশিভূপতিম্ ।
 স্ববাহোরগ্রতো বীরমুবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৭১ ॥
 রাজ্যকানুক কাশীশ ভূজ্যতাং রাজ্যমুক্তিতম্ ।
 যথা বা রোচতে তদ্বৎ স্ববাহোঃ সম্প্রযচ্ছ বা ॥ ৭২ ॥

কাশিরাজ উবাচ ।

কিমলক পরিত্যক্ত্য রাজ্যং তে সংযুগং বিনা ।
 ক্ষত্রিয়শ্চ ন ধর্মোহ্যং ভবাংশ্চ ক্ষত্রধর্মবিৎ ॥ ৭৩ ॥

আজি পাদপেতে ভরা গার্হস্থ্য কানন,
 তাজি হুখে শাস্তিপথে করিব গমন ।
 ওহে জ্ঞানদাতা আজ্ঞা করহ আমার
 যাই তথা যাহে লোক চির শাস্তি পায় ॥ ৬৮ ॥
 বলিলেন দত্তাজেয় "যাও হে রাজন,
 শুভাশ্রয় করি কর সকল জীবন ।
 যমতা বিহীন হ'য়ে তাজি অহঙ্কার
 যত্র কর মুক্তিলাভ হইবে তোমার" ॥ ৬৯ ॥
 বিষ্ণুপুত্র বলে "পিতা করহ শ্রবণ
 দত্তাজেয় মুখে শুনি এ হেন বচন,
 প্রণমি তাঁহার পদে, সেই নরনাথ
 স্বরাগিত হ'য়ে তবে ফুল মনে দায়,

যেইখানে কাশিপতি সনেতে তাঁহার
 অগ্রজ স্ববাহু গেলা নিকটেতে তার ॥ ৭০ ॥
 স্ববাহুর সম্মুখেতে করিয়া গমন
 মহাবাহু কাশিরাজে বলেন বচন ॥ ৭১ ॥
 হে কাশীনরেশ রাজ্যকামনাকাতর,
 ভোগ কর হুখে মোর রাজ্য নিরন্তর,
 কিছা যদি হয় তব বাসনা অস্তুরে
 স্ববাহুরে সেই রাজ্য—যেথা মনে ধরে" ॥ ৭২ ॥
 কাশিরাজ বলে "একি শুনি হে রাজন,
 বিনা যুদ্ধে রাজ্য ত্যাগ কর কি কারণ ?
 ক্ষত্রিয়ের এই মত ধর্ম কভু নয়,
 ক্ষত্র ধর্ম জ্ঞান জুনি ওহে ধর্মময় ॥ ৭৩ ॥

নির্জিতামাত্যবর্গস্ত ত্যক্তা মরণজং ভয়ম্ ।
সন্দধীত শরং রাজা লক্ষ্যমুদ্दिष्ट বৈরিণম্ ॥ ৭৪ ॥
তং জিহ্বা নৃপতিভেগান্ যথাভিলষিতান্ বরান্ ।
ভূঞ্জীত পরমং সিদ্ধৈক্য যজ্ঞেত চ মহামথঃ ॥ ৭৫ ॥

অলক্ উবাচ ।

এবমীদৃশকং বীর মমাপ্যাসীদানং পুরা ।
সাম্প্রতং বিপরীতার্থং শৃণু চাপ্যত্র কারণম্ ॥ ৭৬ ॥
যথায়ং ভৌতিকঃ সজ্জন্তধাস্তঃকরণং নৃণাম্ ।
গুণান্ত সকলান্তদ্বন্দশেষেবেব জন্তুযু ॥ ৭৭ ॥
চিহ্নক্লিরেক এবায়ং যদা নাচ্যোহস্তি কশ্চন ।
তদা কা নৃপতেহজ্ঞানামিত্রারি-প্রভু-ভৃত্যতা ॥ ৭৮ ॥
তদ্বয়া দুঃখমাসাদ্য হস্তয়োস্তবমুত্তমম্ ।
দন্তাত্রেয়প্রসাদেন জ্ঞানং প্রাপ্তং নরেশ্বর ॥ ৭৯ ॥
নির্জিতেন্দ্রিয়বর্গস্ত ত্যক্তা সঙ্গমশেষতঃ ।
মনো ব্রহ্মণি সন্ধাশ্চে তজ্জয়ে পরমো জয়ঃ ॥ ৮০ ॥



আপন অমাত্যগণে আয়ত্ব করিয়া
যুদ্ধ করিবেক সদা ভয় তেয়াগিয়া ।
বৈরিগণে লক্ষ্য করি' করিবে সন্ধান,
শর আদি অস্ত্র সদা বহিতে পরান । ৭৪ ।
শত্রু জয় করি-করি রাজ্যেয় রক্ষণ
নরপতি ইষ্টলাভ করে অর্গণন,
পরে মহাবজ্র যত করিবে সাধন
লভিবে পরম সিদ্ধি শাস্ত্রের বচন । ৭৫ ।
বলেন অলক্ "রাজা কি বলিব আর
এই মত মত আগে ছিল হে আমার ।
কিন্তু এবে বিপরীত বোধ করি তায়
যেত্রপে হইল হেন বলি হে তোমায় । ৭৬ ।
যা কিছু দেখিছ ভবে সেই সমুদ্র
পক্কভূতসমূহের নাহিক সংশয় ।

মানবের এ অস্ত্রঃকরণ গুণ আর
অশেষ জন্তুর সবি সমষ্টি তাহার । ৭৭ ।
চিহ্নক্লি' সে সবে রাজা একমাত্র হয়
এই হেতু ভবে কভু পর কেহ নয় ।
অজ্ঞানের বলে ভাবে শত্রু এ আমার
এই মিজ—প্রভু এই—এই ভৃত্য আর । ৭৮ ।
তব ভয়ে ভীত হ'য়ে মিছা দুঃখ সয়ে
দন্তাত্রেয় প্রসাদেতে জ্ঞানযুক্ত হ'য়ে
জিনিয়া ইন্দ্রিয় প্রাণ—আসক্তি ত্যাগিয়া
ব্রহ্মে মন দিছি আমি প্রভুজ হইয়া । ৭৯ ।
এই জয় শ্রেষ্ঠ জয় জেনেছি নিশ্চয়;
তা বিনা অপর সিদ্ধি কার্য্যকরী নয় ।
ইন্দ্রিয় সংযম করি এ সিদ্ধি যটিলে,
সকলি এ ভবে সিদ্ধ হবে অবলীলে । ৮০ ।

বৈষ্ণব-কুল-চূড়ামণি
মহাত্মা কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



গৃহস্থ

“মনে পড়ে সে বালকে ? বৃহৎ সে প্রাণ
ধর্মীর উদ্বোধের যেন এক দান—
বিপুল বটের স্তম্ভ—সেই যে বাড়িছে ?
চৌরিকে প্রকৃতি তার হাত্ত্র প্রসারিছে
আনন্দ জটুটমুক্ত, উদার” নবীন ।
মহিষ লয়ে সে মাঠে ধায় প্রতিদিন—
গরু বাঘি তরু ছায়ে, তরমুসে শুয়ে,—
সরসে নয়ন, মাথা হস্ত পরে পুখে,
বৌদ্ধ করে অহুতব, সিদ্ধ অহুতব,
প্রপঞ্চ্য ঐ প্রাণে প্রতিবিন্দু অহুতব ।

কত ফিরিলাম,—

কোথা লোক ? প্রাণ যার মুক্ত ? পৃথিবীর
সর্বস্বাপ পড়ে যোবা ? লম্বু কি গভীর—
প্রতিকণ অড়লোবে বহু এক কবি’
উপনীত হয় গিয়া অসীম উপরি ?
দূতবাহ—ওই জেলে-জেলের মতন
জীবন-সমুদ্রে মাঝে কবিতা স্বেপন
নিজেরে সহসা, বহু ঢলিয়া ডুবিতা
আবার আনন্দে উঠে হাসিয়া ভাসিতা—
শাস্ত্রমুখে ফলাশয় ফেলে কণ্ঠজাল—
“নিশ্চয় উঠিবে মংগল”—বৈষ্ণবচূড়ামণি ।
সে লোক নিশ্চয় অতি যোর ভালবাসে
—তা ন’লে কি জলে পড়ি ওইরূপ হাসে ?
—জীবন, জীবন, তাই, আনন্দ জীবন ।”

৬সত্যীচন্দ্র রায় ।

৫ম খণ্ড
৫ম বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩২১

দশম সংখ্যা

আলোচনা

১। ইউরোপে গ্রন্থ প্রকাশ
আজকাল বঙ্গদেশে পুস্তক লেখক ও পুস্তক
প্রকাশকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া
চলিয়াছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের লেখক
ব্যতীত বাঙ্গালীর মধ্যে বেশী কেহ গ্রন্থ
লিখিয়া পয়সা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়
না। ঐকরূপ পুস্তকের প্রকাশক ব্যতীত আর

কেহ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পয়সা করিয়াছেন
বলিয়াও শুনি নাই। অল্প কোনরূপ গ্রন্থের
লেখক ও প্রকাশক উভয়ই দুঃখের সহিত
বলিয়া থাকেন “টেক্সটবুক লিখিলে পয়সা
করা যাইত। এই সকল গ্রন্থে কেবল কাদী
খরচ হইয়াছে মাত্র। খরচ উঠিবে কিনা
সন্দেহ।”

বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দেশে পুস্তক-রচনা বীণসায় এখনও অল্পসংখ্যের উপায় স্বরূপ হয় নাই। আমাদের মধ্যে বাঁহারা গ্রন্থকার তাঁহারা জীবনধারণের জগৎ পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। গ্রন্থলিখন তাঁহাদের জীবিকা নয়—একটা উপরি মাত্র। পয়সা করিবার উদ্দেশ্যে বোধ হয় অনেক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন না। প্রকাশকগণের মধ্যেও এমন কেহ নাই বাঁহারা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ছাড়া অজ্ঞাত পুস্তক প্রকাশকেই ব্যবসায়রূপে গণ্য করিয়াছেন। তাহা করিতে গেলে ইহাদের আগাগোড়া লোকসানই হইবে।

ইউরোপে অবশ্য একদল লেখক আছেন বাঁহারা পাঠ্যপুস্তক লিখেন না কিন্তু অল্প-প্রকার পুস্তক রচনা করিয়া জীবন ধারণ করেন। ওখানে প্রকাশকও আছেন বাঁহারা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ না করিয়াও অজ্ঞাত পুস্তক প্রকাশের দ্বারা লাভান্বিত হন। অর্থাৎ সঙ্গ্রহের লিখন এবং প্রকাশ উভয়ই এই সকল দেশে লাজজনক ব্যবসায়। এতদূর পুস্তক রচনার উপর নির্ভর করিয়াই এই সকল দেশে কেহ কেহ ঘরে হাঁড়ী চড়াইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহাদের উদরপূর্তিও হয়

• • •

২*। বিলাতের লেখক ও প্রকাশক

বাহির হইতে ইউরোপের উদ্ভূত বহুর পাইয়া আমরা নিজেদের অবস্থায় হতশ হইয়া পড়ি। কিন্তু ইউরোপীয় গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ প্রকাশকগণের যথার্থ অবস্থা আলোচনা করিলে আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ নাই। সঙ্গ্রহ রচনায়ই জীবিকা অর্জন হয়

এরূপ দুঃস্থ পাশ্চাত্য সমাজে বিবরণ। এখানেই মত-ওদেশেও বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক রচনিতারাই পয়সা করেন। অজ লেখকদের অবস্থা আমাদেরই মত শোচনীয়—হয়ত কিছু উন্নত। অবশ্য স্বামী দুই-দুই নির্দন পাশ্চাত্য মাগেই বুঝিতে হইবে।

বিলাতের কথাই ধরা যাক। রিচিউরিন হইল “নাইনটিথ সেঞ্চুরি” পত্রিকা এবং একজন লক্ষ প্রতিষ্ঠা গ্রন্থকার এই সংক্ষেপে একটু বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি নিজে স্ক্র-বুহ ৩০ বানা গ্রন্থের লেখক। তিনি বিলাতের ৮০টি প্রকাশকের সঙ্গে কাব্যের করিয়াছেন। দু এক ক্ষেত্রে তিনি গ্রন্থের করিয়ারিট বা স্বত্বাধিকার বিষয়ক আইন রচনায়ও সাহায্য করিয়াছেন। কাজেই গ্রন্থের ক্রয় বিক্রয় এবং গ্রন্থ মূল্যের ব্যয় ইত্যাদি বিষয় তাঁহার বেশ জানা আছে। তিনি বিলাতের কথা যাঁহা বলেন তাঁহা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আর বুঝিয়াছি—একমাত্র গ্রন্থ রচনাকেই বিলাতের জীবিকার উপায় বিবেচনা করা হলে না।

এমন অনেক গ্রন্থ বিলাতে প্রকাশিত হয় বাহার ক্ষেত্রে একজনও নাই। লেখক বড় লোক না হইলে ওল্প-গ্রন্থ বাজারে বাহিরই হয় না। প্রকাশকও লেখকের নিকট মূল্য ও প্রকাশের সমস্ত ব্যয় লইয়া গ্রন্থ প্রকাশ রাই হন। কাজেই প্রকাশক ওল্পক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত থাকেন। নাইনটিথ সেঞ্চুরি প্রবন্ধ লেখক বলেন “এইরূপ গ্রন্থের মধ্যে অনেক সময়ে ভাল ভাল লেখকও থাকে।” আমি একবানা কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। তাহা প্রকাশ্যে করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। বিখ্যাত কবিগণ পাঠাইয়া ছিলাম। কয়েক মাস পর প্রকাশককে

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—মাত্র ৭ বানা পুস্তক বিক্রী হইয়াছে।”

সকল দেশেই গর, উপজাঙ্গ, নাটক ইত্যাদি জাতীয় গ্রন্থ বেশী বেশী প্রকাশিত হয়। বিলাতেও প্রতি সপ্তাহে যত গ্রন্থ বাহির হয় তাহার মধ্যে উপজাঙ্গের সংখ্যা অত্যধিক। কোন সপ্তাহে দশবানা, কখনও কখনও বিশ বানা নভেল ইংরাজী সাহিত্যকে প্রাতিষ্ঠ করে। অধিকাংশ উপজাঙ্গই অপাঠ্য, কুচিৎপূর্ণ, চরিত্রহানিকর। কচিৎ কখনও সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য নভেল বিলাতে দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থ ১০০০ এর বেশী কখনও বিক্রী হয় না। প্রচারপত্র: পাঠাগার, লাইব্রেরী ইত্যাদিতেই এই গুলির কাটুটি। নভেল পাঠকেরা প্রায়ই পুস্তক কিনিয়া পড়েন না। তবে নিত্যমু ভাল উপজাঙ্গের কথা স্বতন্ত্র। এই সকল পুস্তক বৎসরে ৩০ বানা বাহির হয় কিনা সম্ভেহ।

তবে বিলাতী ভ্রমতার নিমিত্ত পুস্তক পানের ব্যবস্থা আছে। এজ্ঞ ইংরাজেরা মাঝে মাঝে উপহার দিবার জন্ত পুস্তকাদি ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। প্রবন্ধ লেখক বলেন, “পুস্তক ছাড়া সত্য উপহার দিবার আর কোন জিনিষ নাই। কাজেই উপহার পুস্তক ইংরাজেরা কিনিয়া থাকেন।” অজ ক্রয় পুস্তক তাঁহারা কিনিতে জানেন না।

আজকাল বাঙ্গালী সাহিত্যে জেলার ইতিহাস, পরগণার ভৌগোলিক বিবরণ, ব্রাহ্মণের ইতিহাস, ত্রিপুরার সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নানা প্রকার গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিলাতেও এই প্রকার অনেক গ্রন্থ বাহির হয়। কোন পণ্ডীর গির্জা সংক্ষেপে হয়ত কেহ লিখিলেন। কোন ব্যক্তি হয়ত তাঁহার বংশের কথা প্রচার করিলেন। কোন জমিদার

তাঁহার জমিদারীর ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিলেন। এই সকল গ্রন্থ ওদেশে কখনও বিক্রী হয় কি? গ্রন্থকারের বহুগুণ ব্যতীত আর কেহ এ সকল বই কিনেন বলিয়া জানা যায় না। পুস্তক প্রকাশের পরচ প্রায়ই উঠে না।

চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ, বিশেষজ্ঞদের রচনা, পারিতোষিকশব্দসম্বল বিজ্ঞান-গ্রন্থ এরূপ নানা প্রকার উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ সাধারণতঃ বিক্রী হয় না বলিলেই চলে। শিক্ষাবিভাগের ছাত্রেরা এই সকল পুস্তক কিনিয়া থাকে। কাজেই এগুলিকে পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত বলা হইতে পারে। পরীক্ষার্থী ছাত্রমহল ভিন্ন অজ্ঞাত এই সকল গ্রন্থের কাটুটি আদৌ নাই। কাজেই এই সকল গ্রন্থের মূল্য কিছু বেশী রাখা হয়। কিন্তু মোটের উপর বিক্রী এত কম হয় যে, কোন মতে বরচ উঠিয়া যায়। লেখক ও প্রকাশকের লাভ অল্পমাত্র থাকে। কিন্তু এইরূপ গ্রন্থ লিখিয়া কেহ অল্পসংখ্যায় করিতে পারেন না ইহা স্থির।

তারপর দ্বন্দ্ব গ্রন্থ। এই সকল পুস্তকও যথেষ্টই প্রকাশিত হয়। কিন্তু লোকেরা বক্তৃতা শুনিতে পাইলে আর পুস্তক ক্রয় করিতে চাহে না। সত্য পাইলেও পুস্তক ক্রয় করা ইংরাজদের অজ্ঞানতা নয়। বিলাতে অসংখ্য দনী পরিবার আছেন বাঁহারা পুস্তক ক্রয়ের জন্ত বৎসরে এক পয়সাও খরচ করেন না। মদের খরচে যত ব্যয় হয় ইংরাজীতির সহজ লোকের মধ্যে একজনও পুস্তকের জন্ত তত ব্যয় করেন না।

নাইনটিথ সেঞ্চুরি প্রবন্ধ লেখক বিলাতী সমাজে গ্রন্থের ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে এইরূপ চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কথায় আমরা বুঝিতে পারি যে, ভারতবাসী বা

বাস্কালীই এসম্বন্ধে একমাত্র পাপী নয়। জগতের বড় বড় জাতিরাও এই হতভাগ্য-দিগের অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নয়।

..

৩। গ্রন্থ-ব্যবসায়ের সংরক্ষণ-নীতি

দেউশত বৎসর পূর্বে বিলাতের গ্রন্থকারেরা ধনী মন্ত্রণেরে অর্থ সাহায্যে পুস্তক প্রকাশ করিতেন। সাধারণ পাঠক-সমাজের উপর নির্ভর করিলে তাঁহাদের জীবন ধারণ চলিত না। লেখকগণ গ্রন্থ রচনা দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারিতেন না। পাঠকসংখ্যা তখনও বেশী ছিল না। কাজেই বিজ্ঞানসাহী মুকলিমদিগের সংগ্রহভিত্তি চলন-কার গ্রন্থকারদিগের আশ্রয় ছিল। অত্যাচার ব্যবসায়ের দ্বারা গ্রন্থ-ব্যবসায়ও "সংরক্ষণ-নীতির" প্রভাবে পরিচালিত হইত।

আজকাল ইংলও পাঠক সংখ্যা বাড়িয়াছে। গ্রন্থকরের কতি জনগণের মধ্যে সেবা দিয়াছে। কাজেই লেখকেরা এখন মুকলিমদিগের অর্থ সাহায্য বা সংরক্ষণের উপর নির্ভর করেন না। পাঠক-সমাজের বিজ্ঞা-চর্চাই আজকাল ধনীদিগের রূপার স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রন্থকারেরা এক্ষণে স্বাধীন হইয়াছেন।

কিন্তু এখনও বিলাতে ধনীগণের অর্থ সাহায্য ও রূপা বাতীত বহু সাহিত্য প্রচারিত হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট পুস্তক মাকেরই ওদেশে কটতি আছে একথা বলা যায় না। একমাত্র পাঠক-সমাজের জ্ঞানলিপির উপর নির্ভর করিলে অনেক অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থও প্রকাশ করা অসম্ভব হয়। কাজেই লাভবান হইবার আশা ত্যাগ করিয়া প্রকাশের জন্ত অর্থ ব্যয় করিলে ইংরাজী সাহিত্যে ভাল ভাল গ্রন্থ বাহির হইতে পারে

না। স্বতন্ত্রাৎ সংরক্ষণ-নীতি এখনও বিলাতে চলিতেছে আদ্যাবলি বলিতে বাধ্য।

পাশ্চাত্যদেশে অসংখ্য দ্ব্যাক্সাডেমী, অক্সফোর্ড-সমিতি, সাহিত্য-পরিষৎ, গিজন-সম্ম, শিল্প-সমিতি ইত্যাদির কথা আমরা জনিতে পাই। এই সকল পরিষৎ প্রধানতঃ ধনবান ব্যক্তিগণের অর্থসাহায্যে গঠিত। সভাপণের টাণ্ডাও এই সমুদয়ের আয়ের এক পক্ষ। অন্ত্যাত্মীত, রাষ্ট্র হইতেও মাদিক বা বার্ষিক সাহায্য ইহার পাইয়া থাকেন।

এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে যে সকল গবেষণা প্রকাশিত হয় তাহা সাধারণ্যে প্রায়ই বিক্রী হয় না। এইগুলি অধিকাংশ-স্থলেই নিত্যস্থ বিশেষজ্ঞগণের উপযোগী। এই সমুদয়ের প্রকাশ যদি পাঠক-সমাজের কটির উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে এই-গুলি জগতে প্রচারিত হইতই না। যে সকল গ্রন্থের দ্বারা জগতের এবং মানবজাতির দ্বারা উপকার হয় সেগুলি গ্রন্থ প্রকাশের জন্তই বাস্তবের কাউটির উপর নির্ভর করা চলেনা। কারণ সেই সকল গ্রন্থের দ্বারা উপকারিতা বৃদ্ধি উঠা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। এই প্রকার গ্রন্থের জন্ত বার্ষিক্যীয় মুকলি নিত্যস্থ আবশ্যিক।

কিছুদিন হইল প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্য, সভ্যতা, ধর্ম, হুয়াক-শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে এক থানা বিরাট গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ ছয় ভাগে সম্পূর্ণ—পৃষ্ঠা ৩১২২—সর্বসমেত ২৩১ থানা ছবি, ও মানব-চিত্র অনেক। এই গ্রন্থের বিক্রয় কাতি হইয়াছিল? বড় বড় গ্রন্থশালা, রীতিংগম এবং কলেজের কণ্ডাক্টর ৫৮ থানা লইয়া ছিলেন। সাধারণ পাঠকগণ ৫৮ থানা কিনিয়াছিলেন। বড় বড় দোকানদারেরা

১৫৫ থানা রাখিয়াছিলেন। ঘোড়ার উপর ২৭০ থানা মাত্র পুস্তক বিক্রী হইয়াছিল। ভাল ভাল পুস্তকের বিক্রী ইহা অপেক্ষা বেশী হয় না। অবশ্য যে সকল পুস্তক বা পুস্তকায় সাময়িক উত্তেজনা বা নুতন কোন ধরণের আলোচনা থাকে তাহার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু উচ্চ মস্তিষ্ক গ্রন্থাবলীর ভাগ্য বিলাতে সাধারণতঃ এইরূপ।

২৫০২৭৫ জন ক্রেতার সাহায্যে কি এই গ্রীক সভ্যতা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল? কখনই না। মুকলি না থাকিলে এই গ্রন্থের উৎপত্তি হইত না। এখানে মুকলি ছিলেন কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ। গ্রন্থকারের অর্থ বস্ত্র ভোগ্যইহা তাঁহাকে যথাসম্ভব নিশ্চিন্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রন্থকার নিশ্চিষ্ট সময়ের ভিতর পুস্তক সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। তাহাতেও চিন্তিত না হইয়া কলেজের কণ্ডাক্টর ছুইবার সময় বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। স্বতরাং চুক্তি অপেক্ষা তিনগুণ বেশী সময়ও খরচ হইয়াছিল। গ্রন্থ লিপাইবার খরচই এত। তাহা ছাড়া মুদ্রণ ও প্রকাশেরতঃ কথাই নাই।

স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধনবান অথচ বার্ষিক্যীয় মুকলির "সংরক্ষণ" বা অর্থ-সাহায্য না পাইলে উন্নত বিলাতেও উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থাবলীর প্রকাশ অসম্ভব। ভারতবর্ষেও গ্রন্থপ্রচারের জন্ত ধনিগণের দান আবশ্যক হইতেছে দেখিবা লেখক বা পাঠকগণের দৃষ্টিতে হইবার কারণ নাই। বরং স্বদেশ-সেবক ও সাহিত্যপ্রেমিক মাত্রেই এই সংরক্ষণ-নীতি প্রচার করা কর্তব্য।

..

৪। প্যান-ইসলাম

জাপান, চীন, হিন্দুস্থান ও মুসলমানজগৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ঈষ্টার্ন সমাজের আধিপত্যে পরিচালিত হইয়াছে। তাহার শেষ কল দেখা যাইতেছে বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র এশিয়ার জাগরণ। পাশ্চাত্যেরা এই জাগরণে নিত্যন্তই ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের প্রধান ভয় দুইটি—এ জন্ত দুইটি নুতন নাম রাষ্ট্রীয় সাহিত্যে সৃষ্টি হইয়াছে। একটির নাম "Yellow Peril" বা পীত জাতির বিস্তারে ইউরোপের আশঙ্কা। তাহাদের দ্বিতীয় পারিভাষিক শব্দ Pan-Islam বা মুসলমানী-বিশ্ব একপ্রতিষ্ঠায় ঈষ্টার্নের আশঙ্কা।

পাশ্চাত্যেরা স্বীয় সমাজে রটাইতেছেন যে, চীন ও জাপানের পীত-জাতি সমবেত হইয়া ইউরোপীয় সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতাকে ধ্বংস করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। এমন কি, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানেরাও পাশ্চাত্য জগতের বিরুদ্ধে সন্ধিত হইতেছে। প্রয়োজন হইলে এশিয়ার সকল জাতি মিলিত হইয়া ইউরোপের সকল জাতির সঙ্গে সমুখ সমরে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ যেমন প্রাচ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানানিক্রম ক্রমতঃ, আবিষ্কার, রাজ্য, সাম্রাজ্য, আধিপত্য বা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এশিয়ার জাতিগুলিও সেইরূপ বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ভিতর আধিপত্য, প্রভাব, রাজ্য, সাম্রাজ্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভূত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রাচ্যবাসীরা ক্ষমতা লাভ করিতে পারুক বা না পারুক, অবশ্যতঃ প্রাচ্য জগতের সকল

স্থান হইতেই ইউরোপীয়দিগকে হঠাৎই দিবার জ্ঞ তাহার তৈয়ারী হইতেছে। পাকাতা পণ্ডিতগণ 'এসিয়ার' 'জাগরণ' 'ইয়েলোপেরিল', এবং 'পান-ইসলাম' ইত্যাদি শব্দে এইরূপই বর্ণনা থাকেন।

৫। বিংশ শতাব্দীর মুসলমান

পাকাতা জাতিগণ প্রাচ্য জনগণকে চির-কাল নিজ আঙত্য রখিতে চাহেন। এই জ্ঞই তাহার এসিয়ার জাগরণ সম্বন্ধে নানা অশকা প্রচার করিতেছেন।

ধর্মের দোহাই দিলে লোকেরা যত শীঘ্র ক্ষেপে অত আর কিছুতেই না। সকল দেশেই এই নিয়ম। কাজেই খ্রীষ্টান ধর্ম, খ্রীষ্টান সমাজ, খ্রীষ্টান সভ্যতা ইত্যাদির বিপৎকাল আগত প্রায় এইভাবে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীকে উত্তেজিত করিবার জ্ঞ শিক্ষিত খ্রীষ্টানেরা পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। 'প্রাচ্য জগতের কোন স্থানে সামাজ্য মাত্র নড়ন চড়ন বা গোলাঘোণ উপস্থিত হইলেই তাহার প্রচার করিতে থাকেন—খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধে চানার ক্ষেপি-যাছে, খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা ষাঁড়হিতেছে ইত্যাদি। জাপানকে ইউরোপ কাবু করিতে অসমর্থ হওয়া তাহাদের ভয় প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এসিয়ার বিরুদ্ধে খ্রীষ্ট ধর্মের আন্দোলনও ধানিকটা প্রসার লাভ করিয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রীষ্টধর্ম বা সভ্যতার বিরুদ্ধে এসিয়ার কোন জাতিই প্রবন্ধ হন নাই। আধুনিক মুসলমানের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিতে চেষ্টা করিলেই বিশ্বটা স্পষ্ট হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে মুসলমানের জাগরণে

হিন্দুগণের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বিরোধের আকার ধারণ করিতেছিল। তাহার যথেষ্ট কারণও ছিল। যথেষ্ট কথা চিন্তাশীল মুসলমানেরা ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া এক্ষণে আর হিন্দু-বিরোধে প্রস্রব্ব দেন না। মুসলমানী জাগরণের প্রকৃত অর্থ ভারতীয় এবং অজ্ঞ স্থানের মুসলমানেরা বৃদ্ধিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে মুসলমান সমাজ মানবজাতির সভ্যতা ভাঙারকে অশেষ উপায়ে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছেন। সমস্তি কিছুকালের জ্ঞ তাহার জগতের গুরুপদ হইতে অপসৃত হইয়াছেন। আর কি তাহার সেই বরদায় স্থানে উঠিতে পারিবেন না? এজ্ঞ কি তাহাদের এক্ষণে চেষ্টিত ও চূড়ঙ্গল হওয়া কর্তব্য নয়? বিংশ শতাব্দীর মুসলমান এইরূপই চিন্তা করিয়া থাকেন। তুরস্ক, মিশর, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন সকল স্থানের মুসলমান-চিন্তেই এই আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বে সৌরবের স্বাভাবিক কর্তব্যচালনের আকাঙ্ক্ষা সমবেত হইয়া এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার চিন্তাশীল মুসলমানগণকে বর্ষমানের দ্রববহা নিবারণ করিবার জ্ঞ ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। "মা, আমাদের মাহর কর"—জগতের ইসলাম-সম্মান এই প্রার্থনাই জগজ্জনমনীর নিকট সর্গলা করিতেছেন। নবযুগোপযোগী মহত্বের বিকাশ মুসলমানমাজের কুজাপি নাই—সুতরাং সেই মহত্ব ও চরিত্রের অর্জনই বিংশ শতাব্দীর মুসলমানগণ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এই মহত্বের অজ্ঞিত হইলে অজ্ঞাত জাতীয় জনগণের দ্বায় মুসলমানেরাও জগতে নব নব উপায়ে কাব্য, শিল্প, সভ্যতা, ধর্ম ও নীতি বিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন।

মানবজাতির উৎকর্ষবিধানে সাহায্য করিতে যোগ্যতা লাভ করিবার জ্ঞই মুসলমানেরা জাগিতেছেন। বিংশ শতাব্দীর মুসলমানগণের ইহাই চরম আদর্শ ও লক্ষ্য।

এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সকল মুসলমান সমাজ একীকৃত হইয়া যাইবে ইহা কোন চিন্তাশীল মুসলমানই ভাবেন না। দুনিয়ার মুসলমান নরনারী এক অণ্ডও মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রজা হইয়া পড়িবে—এই চিন্তা কোন পাগলের মনেও স্থান পাইতে পারে না। ধর্মের একা থাকিলেই যে রাষ্ট্রীয় একতাও সৃষ্ট হইবে জগতে তাহার দৃষ্টান্ত একবারে নাই। তাহা হইলে অধুনিক ইউরোপের সকল খ্রীষ্টান সমাজে রাষ্ট্রীয় একা থাকিত। তাহা হইলে লড়াই, মারামারি, কামড় কামড়ি পাকাতা ইতিহাসে দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলে ক্ষুদ্র ইউরোপ একটি মাত্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত থাকিত। প্রাচীন হিন্দুধর্মেও স্বাধীনতার যুগে অণ্ডও মহাভারত অধিক কাল ব্যাপী ছিল না। ইউরোপের দ্বায় ভারতেও ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য রাজ্য এক সময়ে প্রতিস্থিতি-ভাবে বিরাজ করিত। খ্রীষ্টান এবং হিন্দু সমাজধর্মের অবস্থা মুসলমান সমাজেও দেখা গিয়াছে। মুসলমানেরা কোন কালেই একাবদ্ধ ভাবে কাম করেন নাই। তাহাদের গৌরব-গৌরব ও ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, পারস্য, আরব, তুরস্ক, মিসর, মরক্কো, স্পেন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান-রাষ্ট্র বর্তমান ছিল। বৃহৎকার মুসলমান সাম্রাজ্য অল্পকালের জ্ঞ স্থায়ী হইত। এই সকল মুসলমান-রাজ্যে পরস্পর সংগ্রাম প্রায়ই চলিত। অধিকন্তু প্রত্যেক মুসলমান-রাষ্ট্রেই বিপ্লব, গৃহ-বিবাদ, রাজবংশের উত্থানপতন,

সেনাপতিগণের অত্যাচার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা স্বরূপ ছিল। রাষ্ট্রীয়-জগতে নানা প্রকার অশৈল্যই চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি।

প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রীয় একা কোন ধর্মমত বা ধর্মকর্মের উপর নির্ভর করেন না। ধর্মের অশৈল্য থাকিলেও জনগণের ভিতর রাষ্ট্রীয় একা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আবার ধর্মের একা সত্ত্বেও জনগণ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত থাকিতে পারে।

সুতরাং চিন্তাশীল মুসলমানেরা সমগ্র মুসলমান সমাজের জ্ঞ এক অণ্ডও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করেন না। মুসলমানেরা যে যেখানে আছে সে সেই স্থানেই স্থানীয় অবস্থার উপযোগী মহত্ব লাভ করিয়া, মুসলমানের আদর্শ, মুসলমানের গৌরব, মুসলমানের সভ্যতা বিস্তার করুক—ইহাই মুসলমান জাগরণের অর্থ। এই জ্ঞই মুসলমানেরা প্রাচীন শিল্প, কায়দা ইত্যাদির প্রতি অমুদ্রাণী হইতেছেন। আর্যের সাহিত্য আলোচনায় তাহার উৎসাহ হইতেছেন। প্রাচীন উৎকর্ষের পরিচয় পাইবার সঙ্গে সঙ্গে অধুনিক বিজ্ঞান শিখারও যত্ন লইতেছেন। মুসলমানদিগের 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ইসলামের জন-নায়কগণ সর্বত্র চেষ্টিত হইয়াছেন। মক্কা হইতে প্রাচীন আদর্শ এবং সংস্কার অমরানী করিবার জ্ঞও তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বাড়িতেছে।

যাহারা আধুনিক জগতে হিন্দু সভ্যতার প্রচার করে চেষ্টা হইয়াছেন তাহাদের সঙ্গে পান-ইসলাম আন্দোলনকারিদিগের সকল বিষয়েই একা ও সাদৃশ দেখিতে পাইতেছি।

৬। প্যানামা-থালে ভারত প্রদর্শনী

আর সাত আট মাসের ভিতর প্যানামা-থালে বিরাট প্রদর্শনী খোলা হইবে। দুনিয়ার লোক এই প্রদর্শনীতে তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি প্ৰতিভা ও মনোবলের পরিচয় স্বরূপ নানা বস্তু পাঠাইবেন। আধুনিক বিশ্বের সকল প্রকার শিল্প, কাককাৰ্য্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, বন্যসম্পদ এই কোষে প্রদর্শিত হইবে। জগতের প্রাচীন নবীন সকল জাতি এই প্রদর্শনীক্ষেত্রে নিজ নিজ কৃতিত্বের নিদর্শন পাঠাইবেন। নিম্নোক্ত নানা পণ্ডিতগণের সম্মিলনও এই উপলক্ষে অঙ্কুরিত হইবে।

আমরা ইতি পূর্বে প্যানামা-থালের উল্লেখ হুই চারিবার করিয়াছি। ভারতবর্ষে এই থালের কথা শীঘ্রই বিশেষরূপে আলোচিত হইতে থাকিবে। প্যানামা-থালের প্রভাবে জগতের অচিন্তনীয় পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনা আছে। জগৎবাসী সকলেই ইহার তথ্য জানিতে ব্যগ্র—ভারতবাসীও এসম্বন্ধে উদ্যোগী থাকিবেন না।

স্বপ্নের কথা, আমাদের আমেরিকা-প্রবাসী বাঙ্গালী মারাঠী ও পঞ্জাবী ছাত্রগণও প্যানামা প্রদর্শনীতে ভারত-তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্ত চেষ্টিত হইয়াছেন। এই বিরাট বিশ্বসভায় যাহাতে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের শিল্প, শিল্প ও সভ্যতার বিবরণ প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা ইহারা করিতেছেন। একটা ক্ষুদ্র ভারতীয় প্রদর্শনী এই জগৎ-সম্মিলনের এক অংশে খোলা হইবে। এতদ্ব্যতীত, পুস্তিকা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, সম্মিলন ইত্যাদির দ্বারাও আমেরিকার এই বিশ্বসভায় ভারতবর্ষকে প্রচার করা হইবে। এই কার্য্যে প্রায় ১৫,০০০ টাকা খরচ হইবে। ভারত-

বাসী জনগণ কি তাহাদের প্রবাসী কর্ম্মদিগকে যথোচিত অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিবেন না? জগতের সভ্যমণ্ডলে ভারতবর্ষের প্রতিমূর্তি সংস্থাপনের জন্ত আমাদের সকলেরই সাহায্য করা কর্তব্য।

যাহারা যে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাহারা সেই সেই বিষয়ে ত্র্যব্যাপি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন। ভারতের শিল্পী, শিক্ষক ও গ্রন্থকার-গণ তাহাদের নিজ নিজ কৃতিত্বের নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে পাঠাইবার জন্ত উদ্যোগী হউন। কলিকাতার “নব্য-চিত্র-কলা-সমিতি”কে আমরা বিশেষ ভাবে এ সম্বন্ধে উৎসাহী হইতে অগ্ররোধ করিতেছি। তাহাদের প্রদর্শিত চিত্রাবলী এবংসর প্যারিসগণের প্রদর্শনীতে সবিশেষ আদৃত হইয়াছে। তাহার পর লওনের “ভারতীয় সংগ্রহালয়” বিভাগে এই সমুদয় দেখান হওয়ায় বর্তমান ভারতের প্রতি পাশ্চাত্যগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। আমেরিকার বিশ্ব-প্রদর্শনীতে এই গুলি পাঠান নিত্যন্ত কর্তব্য।

নিম্নলিখিত টিকিটের সম্পাদকের সঙ্গে পত্র সাধারণ করিবার জন্ত দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি—
The Secretary.

“The Panama Pacific Exposition
Commission of India”

1844, Jackson Boulevard
Chicago, Illinois

(U. S. A.)

..

৭। ফরাসী কবি মিষ্ট্রাল

আলদার মাসেলের অতি স্মরিকটে।
ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি মিষ্ট্রাল এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সম্প্রতি মারা

গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে ইনি নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইনি ফরাসী দেশের দক্ষিণ-পূর্বে অঞ্চলের উপভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

এই অঞ্চল মধ্যযুগের ফরাসী সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। প্রোভেন্সাল-রীতির রচনা কৌশল সমগ্র ফ্রান্সে প্রভাব বিস্তার করিত। ইংরাজী সাহিত্যেও এই কাব্য-শিল্পের প্রভাব পড়িয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে, ইউরোপের মধ্যযুগ প্রেমসঙ্গীত, স্বদেয়োচ্ছাস, গীতিকাব্য, লোকসাহিত্য ইত্যাদি কাব্যের কয়েক বিভাগ প্রোভেন্সাল-রীতির নিয়মেই অঙ্কুরপ্রাপ্ত হইত। ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্বে অঞ্চলের নাম প্রোভেন্স। কবিগণ টুবেভোর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রেম-দরবার, প্রেমের বিচারালয়, প্রেমের রাজা ইত্যাদি বিষয় এই টুবেভোর গণের সাহিত্যে বিশেষ আলোচিত হইত।

অবশ্য সাহিত্যের সেই যুগ এবং সমাজের সেই অবস্থা ফ্রান্স ও ইউরোপ হইতে আজকাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কবি মিষ্ট্রাল সেই রচনা-রীতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের ভাষায় কাব্য না লিখিয়া এই জনপদের স্থানীয় ভাষাতেই গীতাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তথাপি হুইডেনের বিশ্ব-পরিষৎ ইহাকে পুরস্কারযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন।

কেবল তাহাই নহে। তিনি সেই প্রাচীন সাহিত্যার্শ দেশের ভিতর সংকামিত করিতে চেষ্টা ছিলেন। তাহার স্বদেশাধ্বরাগ স্থানীয় লোক-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্য তিনি তাহার নোবেল পুরস্কারলব্ধ সমগ্র টাকার দান করিয়াছেন।

সেই অর্থে সম্প্রতি একটা মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় নির্মিত হইয়াছে। তাহা তিনি

দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই মিউজিয়ামে প্রাচীন প্রোভেন্সাল-রীতির সাহিত্য-বিষয়ক নানা পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন পুঁথি, প্রাচীন লেখকগণের চিত্র, প্রাচীন প্রোভেন্স প্রদেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, শিল্পব্যবসায়, প্রবাদ জনশ্রুতি ইত্যাদি এখানে এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজের অবস্থা বৃষ্টিবার পক্ষে মিষ্ট্রাল-প্রবর্তিত এই মিউজিয়াম সাহায্য করিবে।

মিষ্ট্রালের প্রোভেন্সাল-মিউজিয়ামের আদর্শের প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে স্থাপন করা কর্তব্য। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যাজ্ঞা, কথকতা, কীর্তন, পদ, বাউল ইত্যাদির প্রতি আত্মকাল সাহিত্যোৎসর্গগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, দেশের পুরাতন ধর্ম্মভাষা, সামাজিক অবস্থা, শিল্পকর্ম্ম ইত্যাদি বৃষ্টিবার জন্ত এই সমুদয় অত্যাবশ্যক।

সম্প্রতি একমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতেই এইগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সময় জাতীয় জীবনের ইতিহাস-কথাই এই সমুদয় লোক-সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। হস্তরাজ ঐতিহাসিক উপকরণহিাবে এই সকল পদার্থ আলোচিত হওয়া কর্তব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সম্মিলন, জাতীয় শিক্ষা-সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পদাবলী, বিষহরির গান, বাউল, সন্ধ্যা, গভীরার গান, ভাটিয়াল গান, সারিগান, পত্তীপ্রবাদ, গান, জনগণের সংস্কার, মেয়েলি ছড়া ইত্যাদি সংগৃহীত হইতেছে। সেইগুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিলে উক্ত অঞ্চের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যও রচিত হইতে

পারে। প্রাচীন কবোয়র আলোচিত বিষয় এবং লোকমত ও বর্ধবিবাসগুলিকে বর্ণনায় যুগের অবস্থাভাষায় নুতন আকার দান করা বাইতে পারে। স্বপক্ষ কবি, চিত্রকর ও ভাস্কররা এই সমুদয় বস্তুর সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবনে নুতন নুতন আদর্শ সঞ্চারিত করিবার সুযোগ পাইবেন।

এই সকল কারণে আমাদের প্রাচীন 'লোক-সাহিত্য'-বিষয়ক স্বতন্ত্র সংগ্রহালয় এবং স্বতন্ত্র পরিষদ দেশের নানা স্থানে প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* *

৮। স্থানীয় মিউজিয়াম

আজকালকার ফরাসীরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বস্তুসমূহ প্রায় প্রত্যেক নগরেই সংগৃহীত করেন। একজ প্রত্যেক নাতিক্ত জনপদেই এক বা ততোধিক মিউজিয়াম নির্মিত হইয়াছে। স্থানীয় ঐতিহাসিক উপকরণসমূহ বেশী দূরে চালান করা হয় না।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশে একটি মাত্র মিউজিয়াম আছে। প্রদেশবাসী জনসাধারণ এই সকল মিউজিয়াম দেখিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ প্রায়ই পায় না। বড় সহরের বিলাসভবনে প্রবেশ করিয়া কয়েক নগরবাসী কোতুল নিবারণ করিতে সাহস পায় ? কিন্তু প্রত্যেক জেলায় ছোটখাটো সংগ্রহালয় থাকিলে কৃষিকারী, শ্রমজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, কেরানী, হাকিম সকলের চোখের সম্মুখে দর্শনীয় বস্তুগুলি বিরাজ করে। মিউজিয়ামের আব্বাংগা জেলার মধ্যে জাননাগের একটি। নুতন উপায়স্বরূপ হয়। কথায় কথায়, বিশেষ কষ্ট কল্পনা না করিয়াও জনসাধারণ এই সকল

মিউজিয়ামের অন্তর্গত জবাসমূহের সহিত পরিচিত হইয়া পড়ে। দেশবাসীকে বর্ধদেশের মুষ্টি বুঝাইবার পক্ষে আর কোন সহজ পথ অবলম্বন করা অসম্ভব।

তারপর বিহারা পাণ্ডিত্যের জ্ঞান এই সকল বস্তু দর্শন করিতে চাহেন তাহারা জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া অবশেষে প্রদেশের বড় সংগ্রহালয়ে আসিলেই তুলনামূলক 'আলোচনার বিশেষ সুযোগ পাইতে পারেন। স্থতরা অর্থনৈতিক এবং ইংরাজীতে অসিদ্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারীর দ্বয়ে বর্ধদেশের প্রতিদ্বন্দ্বি অধিত করিয়া দিবার জ্ঞান ভারতবর্ষের ভিতর ছুড় বৃহৎ নানা সংগ্রহালয়ের প্রদর্শন করা কর্তব্য। যত স্থানে যত বেশী কেন্দ্র স্থাপিত হয় সমস্ত জাতির ভিতর জ্ঞানবিস্তার করিবার হাতিয়া তত বেশী হইত হয়। দেশের মধ্যে কোন এক কেন্দ্র স্থানে একটি বিশাল কেন্দ্র স্থাপন করিলে মূল্যবোধ লোক ব্যতীত উপকার লাভ করে না।

বিশেষতঃ বিশাল সংগ্রহ-কেন্দ্রে জেলায়, নানা প্রদেশে, নানা জাতির নানা সংগৃহীত, হইয়া থাকে। কিন্তু সেগুলি দেখিয়া জনগণ বিশেষ উপকৃত হয় না। সে সমুদয় পদার্থ তাহার নিকট নিত্যস্থায়ী অপরিচিত। কিন্তু যে জেলায় বা যে জনপদে লোকের বাস কর্তে সেই স্থানের স্বরণযোগ্য পদার্থ নিকটবর্তী কোন কেন্দ্রে জমা থাকিলে লোকেরা সহজেই সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরিচিত সামগ্রীগুলি ভাল করিয়া বুঝিলে ক্রমশঃ অপরিচিত ও দূরদেশীয় বস্তুসমূহ আনিবার জ্ঞান তাহাদের আগ্রহ জন্মে।

ফরাসীজাতি এই নিয়ম কার্যে পরিণত করিতেছেন এই জ্ঞান তাহারা নগরে নগরে

মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ফলতঃ মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় ফরাসী জনগণের নিকট 'আজব থানা' বা যাদুঘর মাত্র নয়। তাহারা এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়-জীবনের উৎস্বরূপ বিবেচনা করে।

* *

৯। জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা

বিগত এপ্রিল-মে মাসে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-মণ্ডলে বিশেষ কতকগুলি স্বরণযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের অদৌষর ফ্রান্সে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। প্যারিস জনগণ পঞ্চম জর্জকে যৎপরোনাস্তি আদর করিয়াছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে বিলাতের বন্ধুত্ব বিগত দশ বৎসর হইতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ঘটনায় বন্ধুত্বের জ্ঞেয় আরও চলিবে।

ইহার প্রায় ১৮১০ দিনের ভিতরেই ভেন্সান্সের রাজা ও রাণী লণ্ডনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভেন্সান্সের বন্ধুতা বৃদ্ধি ইহার দৃষ্টান্ত। উভয় পক্ষের রাজবন্ধুত্ব হইতে এই স্বপ্ন উদ্ভূত হইয়াছিল। সম্ভাব্যপূর্ণগুলি এক্ষণে এই বন্ধুত্বের কথা প্রচার করিতেছে। এখন জাতিগণ ভেন্সান্সকে কাবু করিতে শীঘ্র পারিবেন না।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই লণ্ডনে আর একটি দুঃম পড়িয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরাজ জাতির সন্ধি স্থাপিত হয়। বিগত মে মাসে তাহার শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই ঘটনা জগতে বিশেষরূপে প্রচার করিবার জ্ঞান হয় সমারোহের সহিত একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। তাহাতে আমেরিকান এবং ইংরাজ জাতীয় জনগণ কৃষি, শিল্প, চিত্র, ব্যবসায়, শিক্ষা,

বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজ নিজ কৃতিত্বের নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চই জাতির মধ্যে সখ্যভাব স্থায়ী করিবার পক্ষে এই অমূল্যের দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে। ইংরাজ সম্পাদকগণের এইরূপ মত।

এদিকে ক্রিশ্চর সঙ্গে ইংলণ্ডের আনানোনা বেশ চলিতেছে। গত দুই তিন বৎসরের ভিতর দুই জাতির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লোকেরা পরস্পর পরস্পরের সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি দেখিয়া আসিয়াছেন। পারস্ত-বিস্তার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকটা কমিতেছে। ক্রিশ্চর লোকেরা বিলাতী নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চা করিতেছেন। বিলাতের লোকেরা ও রুশ অধ্যাপকগণ এই নিমিত্ত ইংরাজী ভাষায় একথানা 'জৈনামিক পুজ ও বাহির' করিয়াছেন। নাম Russian Review প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভিনগ্রেডফ Vinogradof এই পত্রিকার একজন যুগ্মসম্পাদক। ইনি বর্ধদেশে পরিচিত। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।

দেখিতেছি জগতের বড় বড় জাতির শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এখন গোলমাল আমেরিকার শিশুসভ্যতাকে লইয়া বাধিতেছে। মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি নবীন দেশেই অশান্তির কারণ বিরাজমান।

জগতে নুতন কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিতে না দেখেই ইংরাজ জাতি পছন্দ করিতেছেন। ইংরাজ সর্বত্র শান্তি চাহেন—নুতন কোন প্রকার শক্তির উদ্ভব ইংরাজ জগতের পক্ষে অকল্যাণকর বিবেচনা করিতেছেন। বিলাতের সম্ভাব্যপূর্ণগুলি সবই হিত ও শান্তির প্রচারক।

* *

১০। দিনাজপুরের ঐতিহাসিক

পল্লী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুপ্ত দিনাজপুর জেলার শিব-বাড়ী গ্রামের কাহিনী প্রদান করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

‘দৈত্যকুলোজ্জলকারী হরিকৃত প্রজ্ঞাদেব পুত্র বলি ও তৎপুত্র মোদীও প্রতাপশালী শিব-ভক্ত মহেশ্বাছ বাণের রাজধানী শোণিতপুর অধুনা শিব-বাড়ী নামে খ্যাত।

শিববাড়ী দিনাজপুরের ১৪ মাইল দক্ষিণে নওবাজার দমদমা গ্রামের নিকটবর্তী। অদ্যাপি এই স্থানে বাণের রাজধানীর ভাষ্য-শেষ বিদ্যমান আছে। প্রায় ১০০ শত বৎসর পূর্বে এই ভাষ্যবংশগুলি, অত্যাচার ও শোষণশালী হইয়া অসহ্যবাহীতে উপহাস করিতেছিল, ইদানিং নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়া হিংস্রক পশুগণের আবাস ভূমি হইয়াছে। কেবল মন্দির মধ্যে আনন্দিন্যেব বাগলিঙ্গ মহাদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এখনও যথা বিধানে পূজা অর্চনা দিয়া হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ নিয়মিত নম্রোচ্চারণপূর্বক পূজা করিয়া থাকেন।

ধান।

‘প্রমত্ত শক্তিঃসমুৎক বাণাখ্য মহাপ্রভম্।

কামবাণাধিতং দেবং সংসার মহন কমম্।

শূশারারিসোম্যং বাণাখ্য পরমেশ্বরং।

প্রণাম।

বাণেশ্বরায় নরকার্যবিত্তারণায় জ্ঞানপ্রণায়

করণ্যাম সাগরায়।

কপূরকুম্ভবলেন্দু জটীদারয় দারিদ্ৰ্যদুঃখ

মহনায় নমঃ শিবায় ॥

গায়িত্রী।

তৎপুত্রকুম্ভবিন্দু মহাদেবায় বীমহি ততো

রক্তপ্রচোদয়ানং ॥”

এই শিববাড়ীর অনতিদূরে গড় পরিমাণ ফল ৪ বর্গ মাইল; গড়ের প্রচীর ভগ্নাবস্থায় ৫৬ ফিট উচ্চ রহিয়াছে। গড়ের বহির্ভাগ ৬০ ফিট বিস্তৃত পরিধায় পরিবেষ্টিত। কোন কোন স্থানে অগাধ জল, কোন কোন স্থানে ১ হাঁটু, আবার কোন কোন স্থানে একবারে শুষ্ক অবস্থায় আছে। গড়ের মধ্য স্থান বংশ বনে পরিপূর্ণ, পরিষ্কার জলও উদ্ভিদে আছে। এই স্থানে এক কালে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, জনিলে দ্বন্দ্ব কল্পিত হয়। যে বাণ শিবের বর প্রভাবে অমরত্ব লাভ করতঃ ত্রিগুণ কল্পিত করিয়াছিলেন, যে বাণের প্রতাপে দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নর, কিম্বদ প্রভৃতি সকলেই শম্ভবিত, যে বান নিজ ভক্তি বলে অসংখ্য অসংখ্য যোদ্ধাবীরে বিনাশ দান করিয়াছেন, যে বাণপুরী অসংখ্য সেনা কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিত, আজ সেই বাণপুরীর অবস্থা এইরূপ,—অতীত ঘটনা স্মরণ করিলে কোন পাপাণ দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বের বিদীর্ণ না হয়।

দৈত্যভূতি বাণ সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তিনি সঙ্গীত দ্বারা মহাদেবকে ভূষ্ট করিয়া অমর ও পুণ্ডরীক করিয়াছিলেন, দেবদায়িত্ব শব্দর ইহাকে অশ্রুতানির্দেশে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন, বাণ শিবের অমৃতভক্ত্যেব শোণিত পুরে (বর্তমান শিববাড়ী) রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বাণ ক্রমে যোর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, দেবগণ ইহার ভয়ে সর্দধা শম্ভবিত অবস্থায় কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে বাণের কন্ডা উষা বধে কৃষ্ণ পৌষ অনিষ্টকর দেখিয়া তৎ প্রাতি আসক্ত হইয়া প্রিয় সখী চিত্রলেখার সহায়তায় অনিষ্টকর আনন্দপূর্বক তাঁহার সহিত গম্ভীর বিরাহে আবদ্ধ হয়। ক্রমে বাণ

সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সৈন্তগণের প্রাতি অনিষ্টকর প্রাণ বিনাশের আদেশ প্রদান করিলেন, অনিষ্টকর সমস্ত দৈত্য সেনা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন বাণ স্বয়ং সমরারূপে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে অনিষ্টকর পরাভূত করিয়া বন্দী করিলেন। অনন্তর বাণ তাঁহার প্রাণ বিনাশে উজ্জত হইলে, স্বয়ং ভগবতী অনিষ্টকর মশানে জোড়ে লইয়া জীবন রক্ষা করিলেন, এবং দর্শনপ্রার্থন মন্ত্রী কুন্ডাও, বাণকে তৎকার্যে নিবারণ করিলেন, বাণ মন্ত্রীর বাক্য রক্ষা করিয়া, অনিষ্টকর কারাগারে বন্দী রাখিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ নারদ প্রমুখ এই সংবাদ পাইয়া বলয়াম ও প্রজ্ঞাদেব সমভিব্যাহারে শোণিতপুরে সমাগত হইলেন। উভয়ক্ষেপে যোদ্ধার বৃত্ত পরিদর্শিত হইলে, স্বয়ং মহাদেব, শিবজয়, নন্দীও ভূত প্রেত সহ বাণের সাহায্যার্থে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন, তথাপি বাণ স্বধলইলে পরাজিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের অঙ্গরোধে বাণের প্রাণ বিনাশ না করিয়া, মহেশ্বাছ মধ্যে ৯৯ বাছ রাখিয়া বাণরূপে সর্বক বিষ হীন কুন্ডল করিলেন। ‘অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের রূপায়,’ বাণ জীবিতাবস্থাতেই মহাকাল নামে খ্যাত হইয়া; শিবের পারিষদ মধ্যে পরিগণিত হইলেন, শোণিতপুর সহ দৈত্য রাজা দাম্বিক প্রবর কুন্ডাও প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব ও মন্ত্রী সকলে একত্র হইয়া শোণিতপুরের অনতিদূরে, বাণের ৯৯ বাছ দান করিলেন। অত্যাগি সেই ‘হানটা ‘করবাহ’ নামে খ্যাত।

এই শিববাড়ীতে বহুদিন হইল একটা ঘটনা হইয়াছিল। জনৈক বিক্রমপুর নিবাসী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কঠাখাণ্ডগত হইয়া, রাস্তা ধরিয়া দিনাজপুর অভিমুখে যাইতেছিলেন,

পথি-মধ্যে রাত্রি হওয়ায় শিববাড়ীতে জনশ্রুত বাণপুরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অধিক রাত্রি হইলে, নির্জন বাণপুরী জন কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল তন্মধ্যে ক্ষেত্র দ্বারবান, কেহ কন্ডাচারী, কেহ মন্ত্রী এবং কতকগুলি পদাধিকার; ব্রাহ্মণ সহসা এইরূপ ব্যাপার দৃষ্টে ভয়ে ভীত হইলেন, এবং বাকশ্রুত হইয়া তাহারে কার্য্য কলাপ দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্ত্রী স্বয়ং আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ সহসা দণ্ডায়মান হইয়া থু থু করিয়া কাপিতে লাগিলেন। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নিবাস কোথায়? তুমি কি জাতি এবং কি জন্য তুমি এখানে আসিয়াছ? তোমার কিসে ভয় নাই, আমি মন্ত্রী নিশ্চয়কি, তোমার মনভাব প্রকাশ কর। মন্ত্রীর আশ্বাসবাণী শ্রবণে ব্রাহ্মণের ভয় কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইল এবং আপনাদের অবস্থাও জাতির বিষয় যথাযথরূপে বলিলেন, পরে মন্ত্রীর নিকট কঠাখাণ্ডগত বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। মন্ত্রী বলিল, দেহ, ব্রাহ্মণ এসব সম্পত্তি আমাদের নহে, ইহার এক কপদকও কাহাকে দান করিতে পারিব না, ইহা দিনাজপুরনিবাসী বর্তমান রাজা গোবিন্দনাথের সম্পত্তি। তিনি বাণ রাজার বংশধর গোবিন্দনাথরূপে জগদ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কেবল সম্পত্তি রক্ষক। তিনিই যতপি আপনাকে দান করিতে পারেন তবেই পাইতে পারেন নচেৎ আমাদের ক্ষমতা নাই, আপনি অল্পগ্রহ পূর্বক দিনাজপুরের মহারাজার নিকট যান। আর তাঁহাকে বিবেচ্য করিয়া বলিয়া দিবেন যে আপনাদের অজ্ঞপ্তি আছে আপনি ‘রাজযোগে শোণিতপুরে বাণরাজার গড়ের ভিতর যোগেই ধনসম্পদ এবং সমস্ত বিবরণ অবগত হইবেন।

আর ইহাও বলিয়া দিবেন যে আপনার সম্পত্তি রক্ষাকরা বহরিন যাবৎ সম্পত্তি রক্ষা করিল, এখন তাহারা সম্পত্তি রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহে। এমন কি যত্ননি আপনাই অগ্রহ করিয়া এইস্থানে মহারাজকে লইয়া আসেন তবে সর্বোত্তম, ইহাতে আপনারও লাভ হইবে এবং মহারাজ ও আপনার সম্পত্তি সুস্থিরা পাইবেন। কিন্তু নিশা ভিন্ন দিনে আসা আমাদের সাক্ষ্য পাইবেন না, অতএব রাজিতেই তাঁহাকে আসিতে বলিবেন।

এতদ্বশবণে ব্রাহ্মণ আশ্চর্যাব্যাহিত হইয়া সমস্ত রাজি বাণপুত্রীতেই কাটাইলেন। প্রাতঃকালে আবার বাণপুত্রী জন শ্রুত হইল। রাজির ঘটনাগুলি শ্রবণবশ মনে ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ দিনাজপুরাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি দিনাজপুর পৌছিয়া মহারাজ গোবিন্দনাথের সহিত সাক্ষ্য লাভকরতঃ বাণপুত্রীর সমস্ত ঘটনাগুলি যথাযথভাবে বর্ণনা করিলেন। রাজা অত্যন্তই হইয়া ব্রাহ্মণের যথারীতি সেবা শুশ্রূষাতে বহুশ্রুত ও হস্তি-বৎ ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে গন্তব্যস্থানে গমন করিলেন। নিম্নযোগে বাণ পুত্রীতে প্রবেশ করতঃ—ব্রাহ্মণের কথাবাহারী সমস্ত ঘটনাই প্রকৃত জানিতে পারিলেন। মহারাজ ঐ বাণপুত্রীস্থ মন্ত্রী ও আর আর যোদ্ধার্ত্ত কর্তৃক সম্মান ও সম্পত্তি লাভ করতঃ দিনাজপুর বাহিতে উভত হইলে মন্ত্রী করবাড়ে রাজাকে বলিল, মহারাজ আজ হইতে আমরা নিষ্কর্ত্তি লাভ করিলাম, এইজন মানবশ্রুত বাণপুত্রীতে, এক মাত্র অনাদিনাথ বাণলিঙ্গ মূর্ত্তিটাই মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিল, অতঃ হইতে আপনার হস্তে ইহার যথারীতি পূজার্কনার ভার অর্পিত হইল, আশা করি যথা বিধানের পূজার্কনা হইতে থাকিবে। ইহা আপনারাই

বংশধর মহারাজ বাণের স্থাপিত সাধনের দন, এই কথা বলিয়া মন্ত্রী, যাবতীয় বাণপুত্রী রক্ষক সহ কোথায় অস্তর্দ্ধন হইল। মহারাজ ধনাদি ও ব্রাহ্মণসহ দিনাজপুরে আগমন করত ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট মূল্য প্রদান করিলেন। কতাদায়গত ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিতে করিতে দৃষ্টিচিতে শ্রদৈশাভিমুখে গমন করিলেন। মহারাজ গোবিন্দনাথ প্রায় একশত বৎসরের পূর্বের লোক। এই কাহিনীগুলির কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা, আশা করি, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নির্ধারণ করিবেন।

১১। বিলাত যাত্রা

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'গৃহস্থ' পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিত 'বিলাত-যাত্রা' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ বাঙ্গালার মনোি ও চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি ও মহাশ্রদ্ধতি আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রদ্ধের সাহিত্যচর্চায় শ্রীযুক্তঅক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উহার উপযোগীতা সম্বন্ধে যথা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"সার্থক আমি মাঘের 'গৃহস্থ' সমুদ-যাত্রা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 'পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সেই প্রবন্ধের প্রতিবার 'ব্রাহ্মণ-সমাজে' প্রকাশ করেন, সেই প্রবন্ধ 'বদবাণী'তে এবং চৈত্রের 'গৃহস্থ' পুনরীর প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে স্বয়ং পঞ্চানন বর্ণনা—বেদব্যাস, আর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যতীর্থ পঞ্চানন—সে কথা যাইক। জ্যৈষ্ঠ মাসের 'গৃহস্থ' পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় 'বিলাত-যাত্রা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন,

তাহা তাহারই উপকৃষ্ণ এবং সমসংকল্প উপশেষাদী।

এমন সন্তোষ, হৃদয়, সহজ ভাবায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রবন্ধ লিখিলে আমাদের বদে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তাঁহার লেখার ভঙ্গী ও বড় হৃদয় আর মেঘগুলিও বেশ পরিষ্কৃত। এইরূপ করিয়া আমাদের সামাজিক কথার যদি বিচার চলে, তাহা হইলে অচিরে অনেক সমস্তার মীমাংসা হইবে। আমরা ব্রাহ্মণ-সমবায় বা ব্রাহ্মণ-সম্মিলনী বৃন্দ না, সম্মিলনী বা সমবায় একেবারে ইউরোপীয় জিনিষ—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হাজার হাজার হইলেও সমবায়ের বোঝা স্বল্প লইতে পারিবেন না; কেবল হাজাপ্রদ হইবেন। সাময়িক পক্ষে লেখাও কতকটা ইউরোপীয় জিনিষ বটে, কিন্তু তাহা আমরা ভারতীয় করিয়া লইয়াছি।

আমরা পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয়কে বিশেষভাবে অহরোধ করি, তিনি "অতঃ এইখানেই শেষ" বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। কল্যাণে আমরা কিছু পাই। কেন না, তিনি যে বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; আরও অনেক কথা তাঁহার বলিবার আছে নিশ্চয়। আমরা কথটা উত্থাপন করিয়া "সার্থক" হইয়াছি বলিয়াছি; এখন তিনি উত্থাপিত কথার সমগ্র আলোচনা শেষ করিয়া আমাদের কৃত-কৃতার্থ্য কখন ইহাই ভিক।"

..

১২। বৈষ্ণব সমাজের কেরদারনাথ

বৈষ্ণববুল চূড়ামণি মহাত্মা কেরদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি পরলোক-গত। তাঁহার অভাবে বৈষ্ণব সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এক সাক্ষিপ জীবনী প্রদান করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

"নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর উলা নামক গ্রামে ১৭৬০ শকাব্দে ১৮ই ভাদ্র তারিখে কলিকাতা হাটখোলার দত্ত বংশীয় দক্ষিণ রায়ী কাঞ্চনকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বালা-কর্ণে মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজিতে স্থলে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ পূর্বক কলিকাতায় তদীয় মাতুলস্বপাতি বিখ্যাত ইংরাজী লেখক কাকীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবস্থান করিয়া তদানিধন হিন্দু কলেজে সিনিয়র প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৮গণেশনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত টি. পালিত ও ৮কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি।

তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অর্থবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত, ইংরাজী, পার্শী, বাঙ্গালা, উর্দু ও উড়িয়া ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার ছিল। এই সকল ভাষায় তদীয় বর্ণিত গ্রন্থাবলী তাঁহার জন্ত জটিল।

তাঁহার উচ্চতম আদর্শজীবন বাস্তবিকই অতুলনীয়। নৈতিক ধর্ম শাস্ত্রাদি, বিচারপূর্ণ দর্শনশাস্ত্রমূহ ও পরিশেষে শ্রীচৈতন্যদেব প্রদর্শিত ভক্তিমাগ্য তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্তমান কাঞ্চন সমাজের উগ্রভিমানকল্পে তাঁহার বহুবর্ণব্যাপী উদ্যম পরিলক্ষিত হয়।

১৮৩ খৃঃ শত বৈষ্ণবধর্ম প্রচার উদ্দেশে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গদেশের নানা স্থানে

প্রচার কার্যে উৎসাহ প্রদর্শন করে স্বয়ং ব্রতী হন।

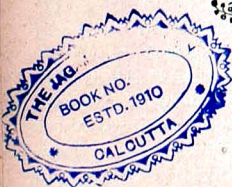
বর্তমানকালে বৈষ্যবস্তু প্রাণিকল্পে তিনি ১৮৮০ খৃঃ প্রথম সাময়িক বৈষ্যক পত্র "সজ্জন তোষনী" প্রচার আরম্ভ করেন। অমৃত বাজার পরিচার ৩শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি তাঁহারই উৎসাহ বলে শ্রীগৌর কথ্য দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের আংশিক সহায়তা করেন। বস্তুতঃ এই মহাত্মার আন্তরিক চেষ্টা ফলে বর্তমানকালে শিক্ষিত সমাজ বৈষ্যবস্তুকে আদর করিতে শিখিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালের নবদ্বীপ নগর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার নবদ্বীপের অপর পারদ্বীপে কুলিয়া গ্রামকে অনেকেই ভ্রম বশতঃ নবদ্বীপ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু এই মহাত্মার অধ্যবসায়বলে বঙ্গের প্রভুত্ব-বিবরণ ও শিক্ষিত বৈষ্যব সমাজ শ্রীধাম

মায়াপুরকেই প্রকৃত প্রাচীন নবদ্বীপ নগর বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। ইহারই অনির্লুপ্তনীয় চেষ্টায় তথায় শ্রীমদ্রাঙ্গের জন্মভিটার তদীয় শ্রীমুষ্টি প্রকাশ ও বৈদ্যনন্দিন সেবা দাখিল হইতেছে।

তাঁহার অলৌকিক সরলতা, ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রীতি, ভগবদ্বিষয়ক পুণ্য দার্শনিক অহং-ভূতি, শ্রীধার পার্শ্ববর্ণের অকৃত্রিম দাঙ্গ, নিজ প্রতিষ্ঠায় ঐদানীত, কৃষ্ণ সেবা বিষয়ে-শব্দতঃ পূর্ণ বিশ্বাস, কৃষ্ণের অহংলীলনের অকর্ম্মজতা ও কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ ব্যতীত অপর সদ্য রাহিত্য তাঁহার জীবনের প্রতি অমুঠা-নেই জাজ্ঞল্যমান ছিল।

এই মহাত্মার দ্বারা গোড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্যব জগৎ যে কি পরিমাণ প্রকৃত লাভবান হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক সত্যাত্মসঙ্কিৎস্ব নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকটই গভীর গবেষণার বিষয়।"



নিগ্রোজাতির কর্মবীর *

পঞ্চম অধ্যায়

‘যুক্ত-রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার যুগ

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আমার ৮২ বৎসর বয়সে আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে গচ্ছিত হয়। তাহার ফলে গোলাদের জাতিতে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত ছুই প্রান্তের খেতকায় মহলে নানা বিষয়ে বুঝাপড়া চলিতে লাগিল। রাষ্ট্রশাসন সংক্ষেপে ছুই অঞ্চলের লোকেরা মিলিয়া একটা রফা করিয়া লইলেন। যথার্থ ঐক্যবিশিষ্ট যুক্ত-রাষ্ট্র এই সময়ের মধ্যেই গড়িয়া উঠে। এই ১০১১ বৎসর আমার ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষেও অতি মূল্যবান সময়। কারণ এই সময়ের মধ্যে আমি আমার বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া মাহুৎ হইবার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। গোলামাবাদের আব্বাওয়া ছাড়িয়া নব নব চুংখ দারিঙ্গের সাঙ্গাস বাড়িয়া উঠিয়াছে। হাম্পটনে লেগা পড়া শিবিবার জন্ম কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তাহার পরে ম্যালডেনে পরোপকার ও শিক্ষাপ্রচার কর্ণে ব্রতী হইয়াছি।

এই যুগ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রোজাতির ইতিহাসেও স্বর্ণীয় কাল। ইহাকে তাহাদের নবজীবনের শৈশব কাল বলিতে পারি। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের দ্রুতবে নব নব আশা জাগিয়াছে তাহারা নূতন চোখে পৃথিবী দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের চিত্তে প্রথম হইতেই দুইটি ইচ্ছা স্বামী ঘর করিয়া

বসিল। প্রথমতঃ গ্রীক ও ল্যামটিন শিবিবার জন্ম তাহারা অত্যধিক লালায়িত হইল। দ্বিতীয়তঃ লেগাপড়া শিবিয়া সরকারের চাকরী পাইবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। বলাই বাহুল্য, যুগযুগান্তর ধরিয়া বাহারা গোলামী করিয়াছে তাহাদের পক্ষে বিদ্যা-লাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝা সহজ নয়। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামেই অবজ্ঞা অসংখ্য পাঠশালা খোলা হইতে লাগিল। দিবা-বিদ্যালয়, নৈশ-বিদ্যালয়, রবিবারের বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যালয়ে নিগ্রোসমাজ ভরিয়া গেল। ফুলগুলি ছাড়া ছাত্রীতে পূর্ণ থাকিত। ৩০৭০৮০ বৎসর বয়সের বুজ্জরো ও লেগাপড়া শিবিতে ছাড়িল না। শিক্ষা লাভের জন্ম এত আগ্রহ দেখিয়া কাহার না আনন্দ হয়? কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা এই যে নিগ্রোসমাজেই ভাবিতে লাগিল যে, আর তাহাদের হাতে-পায়ে বাটিতে হইবে না, লেগা পড়া শিবিয়া তাহারা আকিসেন্দ্রকেয়ী অথবা বড় সাহেব হইতে পারিবে। মাথায় তাহাদের আর একটা ধৈর্য্যল চুকিল যে, গ্রীক হামটিনে ভাষায় ছুই চারিটা বুকনি না দিতে পাস্টিলে পণ্ডিত হওঁয়া যাই না। এই সকল ভাষায় বাহারা কথা বলিতে পারে, তাহারা না জানি কোন্ অপরূপ জগতের লোক! এমন কি, আমারও এইরূপই অনেক সময়ে মনে হইত।

* আমেরিকার শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটনের ‘আম্মজীবনচরিত’ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

লেখা পড়া শিখিয়া আমার স্বজাতির কেহ শিক্ষক কেহ ধর্মপ্রচারক হইতে লাগিলেন। কৃষিকর্ম, শিল্প, ব্যবসায়, পশুপালন ইত্যাদি কার্যে মজুরের ভাষা ঘটিতে হয়। স্বতরাং যথাসম্ভব সকলেই এই সকল কার্যে বর্জন করিতে প্রয়াসী হইল। বিদ্যাদানকেই জীবনের ব্রতবস্ত্র গ্রহণ করিতে অবশ্য খুব কম লোকই পারিত। প্রকৃত ভক্ত্যানে ধর্মগুরু দায়িত্ব গ্রহণ করাও অনেকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাহার সহজে বিনা পরিশ্রমে বাবুগিরি করিয়া জীবন কাটাইবার লতাই এই দুই দিকে ফুটিয়া ছিল। যাহারা পতিতী করিতে চাহিত তাহাদের পেটে অনেক সময়ে তিল মাত্র বিদ্যা থাকিত কি না সম্ভব। কেহ কেহ কোন উপায়ে নাম সহি করিতে শিখিয়াই মস্তুরী খুঁজিত। আমার মনে আছে একবার এক ব্যক্তি একটা পাঠশালার চাকরী চাহিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, “বল ত পুখিরী আরকর কিরণ ? তুমি ছেলেরিগকে এ বিষয় কিরূপে বুঝাইবে ?” সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “কেন মহাশয়, পুখিরী গোলাকার বা চ্যাপ্টা এ সব জানিয়া আমার প্রয়োজন কি ? ফুলের কল্লীদের ও সম্বন্ধে বাহা মত আমি তাহাই ছাত্রদিগকে শিখাইতে প্রস্তুত আছি।” এই গেল গুরুমহাশয়দিগের অবস্থা। ধর্মপ্রচারকগণের অবস্থা আরও শোচনীয়। অত নিরেট মূর্খ ও কুসংস্কারপূর্ণ এবং চরিত্রহীন লোক বোধ হয় অল্প কোন ব্যবসায় দেখা যায় না। যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক সকলেই মনে করিত, “আমি ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।” ধর্মপ্রচার বিঘ্নে “আদেশ” বহু লোকেই পাইতে লাগিল। দুই তিন দিন ফুলে আসিবার পর দেহিতাম

ছাত্রেরা চলিয়া যাইতেছে। অহুসঙ্কান করিলে বুঝা যাইত—তাহারা ‘আদেশ’ পাইয়া ধর্মগুরু কার্যে ব্রতী হইয়াছে। এই ‘আদেশ’ পাওয়া ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক। গির্জাঘরে লোকজন বসিয়া আছে এমন সময়ে একব্যক্তি হঠাৎ মন্ডের উপর পড়িয়া যাইত। বহুক্ষণ নিশ্পন্দ অসাড় ও বাৎসল্যহীন অবস্থায় থাকিত। অমনি পাড়ায় সাড়া পড়িয়া যাইত, অমুক ব্যক্তির ‘আদেশ’ হইয়াছে। তাহার পর হইতেই সে ধর্মগুরু। এইরূপ ‘দশায়’ পড়া প্রায় প্রত্যেক নিগো-পন্নীতে প্রাপ্তি সম্বাহেই দুই চারিটা ঘটিত। আমি এই ‘দশায়’ পড়া ব্যাপারটাকে বুঝকি মনে করিতাম। আমার ভয় হইত পাছে আমিও বা কোন দিন দশায় পড়িয়া ভগবানের আদেশ পাইয়া বসি। আমার সৌভাগ্য আমি সেরূপ আদেশ পাইবার অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়াছি।

সমাজে ধর্মগুরু সংখ্যা যারপর নাই বাড়িতে থাকিল। একটা ধর্মমন্দিরের কথা আমার মনে আছে—তাহার অন্তর্গত ঝুট-ধর্মাবলম্বী লোক সংখ্যাই ছিল সর্বসমেত ২০০ জন মাত্র। অত তাহার ধর্মপ্রচারক সংখ্যাই প্রায় ২০। আজকাল নিগো সমাজে ধর্মের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষক জাতি যথেষ্ট নৈতিক শক্তি লাভ করিতেছে। দশায় পড়া এবং আদেশ পাওয়ার ছদ্মগ অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আর ৩০০ বৎসর পরে আমাদের আরও উন্নতি হইবে আশা করিতেছি।

এখন ধর্মপ্রচারের ব্যবসায় না লাগিয়া কৃষিকার্যে শিরকর্ম ও পশুপালনে নিগোরা মনোনিবেশ করিতে উৎসাহী হইতেছে। ইহা

স্বলক্ষণ। প্রকৃত চরিত্রবান হুশিক্ষিত ব্যক্তি-গণ ধর্মমন্দিরের কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শিক্ষক-সমাজেও যোগ্য শিক্ষাপ্রচারকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি ১৮৩৭ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত উত্তরে দক্ষিণে এক হইয়া জমাত বানিতেছিল—প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিচার বিবাহক সর্বপ্রধান কর্তৃপক্ষের নাম ‘ফেডারেল সরকার’ বা ‘যুক্ত দরবার’। এই যুক্ত দরবারের ন্যায়কি তাহাই আমেরিকার গৃহবিবাদ শীঘ্র শীঘ্র ঘটিয়া গিয়াছে। এই ফেডারেল সরকারের চেতায়ই গোলামের জাতি স্বাধীনতা পাইয়াছে। এই ফেডারেল সরকারই এখন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন শাসন-প্রণালী, নূতন বিচারপ্রণালী, ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া নবীন রাষ্ট্রপথে বিশেষ উজোগী।

স্বতরাং নিগোরা এই যুক্ত দরবারের নিকট সকল অভাব-অভিযোগের মীমাংসা আশা করিতে লাগিল। তাহার ভাবিত যে, ২০০ বৎসর নিগোজাতি গোলামী করিয়া আমেরিকার ধনসম্পদবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। গোলামগণের রক্ষেই যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বল, শিল্প বল, ব্যবসায় বল সকলই পরিপুষ্ট হইয়াছে। নিগোজাতিই যুক্তরাষ্ট্রের সকল-প্রকার ঐশ্বর্য, সকলপ্রকার স্বভোগ, সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠা লাভের মূল কারণ। নিগোজাতিকে কেনা গোলাম করিয়া রাফিল আমেরিকার সমতা পড়িয়া উঠিতে পারিত না। আজ তাহার নিগোজাতিকে স্বাধীনতা দিয়াছে সত্য। কিন্তু ইহা নিগো-জাতির জুইশতবৎসরী কঠোর পরিশ্রম শ্রমিকারের, মূল্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখনও তাহার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অনেক দাবী করিতে অধিকারী। কেবল আশ্বাস মাত্র নয়, জননীর নিকট বালকের ক্রন্দন ও প্রার্থনা মাত্র নয়, প্রকৃত নিকট ভিক্ষা চাওয়া নয়, নিগোজাতি যুক্তদরবারের নিকট তাহার ভাষা অধিকারের দাবী করিতেছে—তাহারা এইরূপই ভাবিত। আমিও অনেক সময়ে ভাবিয়াছি—যুক্তদরবার আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন কেন ? আমাদের প্রতি এই দরবারের কর্তব্য, ইহাকি জাতির কর্তব্য, সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজের কর্তব্য এই টুকতেই কি শেষ হইয়া গেল—এই সামান্য কর্মেই কি তাহার আমাদের ঋণ শোধ করিয়া ফেলিল ? আমি ভাবিতাম, যুক্তদরবারের আমাদিগকে স্বাধীন করিবার শপে সবেই রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এছাড়া আমাদিগের সমাজে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করাও তাহার কর্তব্য ছিল।

এই ধানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিচারাদি কার্য দুই দরবারে নিষ্পন্ন হয়। কতকগুলি কার্য প্রত্যেক প্রদেশের দরবারই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রের দরবারগুলি ঐ সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। আর কতকগুলি কার্য আছে যাহার উপর প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাত নাই, সে গুলিকে প্রাদেশিক দরবার নিয়ন্ত্রিত করিতে অনধিকারী। এই সব কাৰ্য্য-গুলিকে, আমেরিকায় ‘জাতীয়’ বা ‘সার্ব-প্রাদেশিক’ নামে চিহ্নিত করা আছে। এই সমুদয় কাৰ্য্যনির্বাহের ভার ‘ফেডারেল সরকার’ বা যুক্তদরবারের উপর হস্ত। যুক্ত দরবার প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলির মত লইয়া

একটা নূতন বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই ব্যবস্থাকে “জাতীয়” বিধান বলা হইয়া থাকে। আমি বলিতে চাহি নিগোজমস্তা আমেরিকার অজ্ঞতম “জাতীয়” সমস্তা—প্রাদেশিক-সমস্তা মাত্র নহে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাতে নিগোজাতির ভাগ রাখিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিগোজাতি এত দিন যে পরিশ্রম করিয়াছে তাহার ফলে সমগ্র যেতাত জাতিই লাভবান হইয়াছেন—আমেরিকার সকল প্রদেশেই তাহার ফল ফলিয়াছে। হুতরাং নিগোজাতিকে মাহু করিবার জন্ত প্রাদেশিক দরবারগুলিকে উপদেশ দিয়াই যুক্তদরবারের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় নাই। প্রাদেশিক দরবার গুলি আমাদের জন্ত বাহা করিতেছেন কখন। কিন্তু আমেরিকার “জাতীয় বিধান” হইতেও আমরা ভ্রান্ত: ও দ্বন্দ্ব: অনেক আশা করিতে পারি।

যুক্তদরবার আমাদিগের স্থাবর সম্পত্তি লাভ সম্বন্ধে সাহায্য করিতে পারিতেন। যুক্তদরবার আমাদের শিক্ষার জন্ত “জাতীয়” কোষাগার হইতে বার্ষিক কিছু প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। যুক্তদরবার আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকারভোগের জন্ত ধারাবিধি উপযুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। যুক্তদরবার মালা কাচা চামড়ার প্রভেদ ধীরে ধীরে তুলিয়া দিবার জন্ত অবহাঙ্গার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবার পরক্ষণ হইতেই এই সকল সমস্তা যুক্তরাষ্ট্রে উঠিবে তাহা কেভালের সরকারের জানা উচিত ছিল। তাহা জানিয়া প্রথম হইতেই আমাদিগের ভবিষ্যতের জন্ত কিছু কিছু কর্তব্য করাও উচিত ছিল। কিন্তু যুক্ত দরবার বেশী কিছু করিলেন না।

আমার স্বজাতির অবস্থা আশা করিতে ছাড়িল না। আমরা প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিকট যাহাই পাই না কেন, যুক্তদরবারের নিকটও আমরা সকল বিষয়েই স্থিতির এবং ত্রাণদ্রবত অশ্রুশাসন আশা করিতে লাগিলাম। আমার বয়স তখন বেশী নয়—প্রায় ২০২১ বৎসর হইয়াছে। তখনই বৃষ্টিতে পারিয়াছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে যে নূতন “জাতীয় বিধান” প্রস্তুত করা হইতেছে তাহাতে নিগোজাতি সম্বন্ধে ত্রাণ বিচার করা হয় নাই। নিগোজমস্তা কর্তৃপক্ষেরা যথার্থ বৃষ্টিতে পারেন নাই অথবা পারিয়াও তাহার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন নাই।

সহজে ছুটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম। প্রথমত: আমরা অশিক্ষিত এই আপত্তি তুলিয়া তাহারা সকল কাজকর্মে আমাদিগকে ছাড়িয়া যেতাত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিতেন। দ্বিতীয়ত: উত্তরপ্রান্তের যেতাতেরা দক্ষিণপ্রান্তের যেতাতদিগকে অপমান ও যন্ত্রণা দিবার জন্ত তাহাদের উপর ‘ফল আর্মি’ চাপাইতে চেষ্টা করিত। আমি দেখিলাম ছুই দিকেই অত্যাঘ হইতেছে। আমি বুঝিলাম এ ব্যবস্থা বেশীদিন টিকিবে না। শীঘ্রই উভয় পরিবর্তন অবশ্যক্য।

জোর করিয়া আমাদিগকে দক্ষিণপ্রান্তের যেতাতসমূহকে কন্ডামি করিতে দিলে আমাদের বর্তমান অহঙ্কার বাড়িতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে আমাদের সমূহ ক্ষতি। কারণ এই লোভে পড়িয়া আমরা আমাদের যথার্থ উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে পারি আশা করা আছে।

কুশি শিল্প ও ব্যবসায় লাভবান হইয়া সম্পত্তির মালিক না হইলে কখনও কি প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করা যায়? না রাষ্ট্রকীবনে

প্রভাব বিস্তার করা যায়? টাকা পরস্যা গৃহ-সম্পত্তি ইত্যাদির অধিকারী হইবার জন্ত চেষ্টা করাই তখন আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল। অধিকন্তু লেখা পড়া না শিখিলেই বা রাষ্ট্রীয় জীবনের কর্তব্য পালন করিব কি করিয়া? রাষ্ট্রকীবনের জন্ত দায়িত্ববোধ পুষ্ট করিবার পক্ষে বিদ্যালভই প্রধান সহায়। হুতরাং শিক্ষালাভ ও সম্পত্তিলাভ এই দুই দিকের মন না দিয়া আমরা যদি হুজুগে পড়িয়া দক্ষিণপ্রান্তের যেতাতসমাজে বড় বড় চাকরী করিতে থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল কূট্যাম্যাত হইত আমি ইহা বেশ বুঝিতাম। এই জন্তই উত্তর অঞ্চলের যেতাতদিগের সোজা দেখিয়া আমি একবারেই খুশী হই নাই। আর আমার মনে বেশ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নিগোজাতিকে যে অবতাবিক ভাবে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা কোনমতেই টিকিতে পারে না।

তাহার উপর, আমাদের মূর্ত্যও অজ্ঞতার দোহাই দিয়া যুক্তরাষ্ট্র আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাই কি চিরকাল টিকিতে পারে? আমি বুঝিয়াছিলাম তাহাদের এই “অছিলা” শীঘ্রই ঘুচিয়া যাইবে। আমরা বেশী দিন অজ্ঞ থাকিব না। আমাদিগকে শিক্ষিত করিয়া লইতে তাহারা বাধ্য হইবেন। আমি ত আমাদের ভবিষ্যতের স্থায়ী স্বপ্নের কথাই ভাবিতাম। কিন্তু নিগোজমস্তার সাধারণজনগণ ত অত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল না। তাহারা শিল্প, শিক্ষা, কৃষি সম্পত্তি ইত্যাদি তুলিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনের দিকেই বেশী খুঁজিল। অতি সামান্য মাত্র বিজ্ঞা লইয়াই নিগোজা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের পাড়া

হইতে লাগিলেন। কত নিগোজাই যে এইরূপে প্রাদেশিক দরবারের সমগ্রসাধারণ চুকিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমিও একবার এই হুজুগে পড়িবার মত হইয়াছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমার তুল বৃষ্টিতে পারিয়া সাময়িক লইয়াছি।

রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্যক্ষেত্রে সমাজে বেশ সাময়িক নাম করা যায়। কিছুকাল ঠৈঠে গওগোল হুজুগ আন্দোলন লাফালাফি ইত্যাদি স্রষ্ট করিয়া খ্যাতি অর্জন করা যায়। দলপতি, জননায়ক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইয়া গৌরব ও অহঙ্কার করা চলে। কিন্তু দেশের মাটির ভিতর জাতীয় উন্নতির বীজ বপন করিবার জন্ত ওরূপ হুজুগে মাতিলে চলে না। স্থিরভাবে, সাহসিকভাবে, দৃঢ়ভাবে লোকচরিত্র ও লোকমত, গঠন করা আবশ্যক। জনগণের বিভ্রান্তি দূরীকৃত না হইলে—তাহাদিগকে দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন—তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ দিয়া নানা উপায়ে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। তাহার উপর স্বাধীন অঙ্গসংস্থানের ভিত্তি স্বরূপ বৃত্তিবাণিজ্য ইত্যাদি সমাজের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্তব্য আবশ্যক। এই সকল কার্য স্বচা-রূপে সম্পন্ন করিতে হইলে নীরবে নিশ্চেষ্ট লোকচরিত্র অন্তরালে থাকিয়া কর্ম করা কর্তব্য। কিন্তু এই কঠিন সাধনায় ত্রুতী না হইয়া লোকেরা তরলমতি শিশুর ত্রাণ রাষ্ট্রনৈতিক হুজুগে খোঁগ দিতেই বেশী ভালবাসে। আমার নিগোজামস্তাও প্রথম প্রথম এইরূপ ঘটয়াছে।

আমার স্বজাতির দলে দলে রাষ্ট্রকীবনে প্রবেশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অবস্থা বেশ যোগ্যতার সহিতই দায়িত্বপূর্ণ কর্ম

করিতে পারিলেন। মহাশয় সভার, বিচারালয়ে, শাসনকর্ত্তে নিগোজা। অনেকাই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গলাই বৈশী বাহির হইত। অনেক ক্রটি, অনেক অসম্পূর্ণতা আমাদের নিগোজা কর্মচারীদের মধ্যে দেখা যাইত। আজকাল সে অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখন আমরা নিতান্তই অজ্ঞ ও মূর্খের ভাষা কাঁচা কিনি না। বিগত ৩০ বৎসরের শিক্ষার ফলে, অজ্ঞাদের ফলে এবং অভিজ্ঞতার ফলে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ রাষ্ট্রকর্ত্তে যথেষ্ট পাকিতাই অর্জন করিয়াছে একথা বলিতে আমি যিহা বোধ করি না।

আজ আমি বলিতে পারি যে সাধা ও কাল চামড়ার প্রভেদ এখন পূর্বের ভাষা রক্ষিত হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। যোগা-তাহারারে কৃষ্ণাঙ্গ ও খেতাব সমাজের মধ্যে কর্তব্য বিভাগ করা হউক, এবং স্থানীয় লোকের সুযোগগুলিও বিকিরণ করা হউক। ভাষা-নির্দেশে সকলকে সকল কর্ত্তের অধিকার প্রদান করা হউক। নিগোজে আর সকল বিষয়ে চাপিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক প্রাদেশিক রাষ্ট্রেই যথার্থ জাতিস্বত্ব আইন প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। যদি শীঘ্র আইন নতুন যুক্তিসঙ্গত বিধান প্রস্তুত করা না হয় নিগোজিগকে বিরক্ত করিয়া তোলা হইবে। আমি বলিতেছি—নিগোজা আর সহ্য করিবে না যেভাঙ্গ সমাজেরও অসম্মত হইবে—যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ৩০ বৎসর পূর্বে দাময় প্রথা যেমন আমেরিকার প্রধান পাপ ছিল, আজ অবিকার, অজ্ঞা আইন, সাদাকাল চামড়া ভেদে রাষ্ট্রীয় অধিকার-বিস্তার ইত্যাদিও আমেরিকার রাষ্ট্র-জীবনের ঠিক সেইরূপ গর্হিত ও পাপপূর্ণ লক্ষণ। পক্ষপাতশূন্য

অহুশাসন প্রবর্ত্তন পূর্বক এই পাপ দূর করিবার জন্ত সকলেরই চেষ্টা করা কর্তব্য।

১৮৭৮ সাল পর্যন্ত আমি ম্যাসাচুসেট শিক্ষকতার কর্ম করিলাম। এই দুই বৎসরে আমি আমার দুই ভাইকে এবং আরও কয়েকজন বালক ও বালিকাকে অনেকটা তৈয়ারী করিয়া লইলাম। ইহারা ইতিমধ্যে হাম্পটনে উচ্চ শিক্ষালয়ের উপযুক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর আমি নিজে কলম্বিয়া প্রদেশের ওয়াশিংটন নগরে আট মাস লেখা পড়া শিখিতে গাই। এই বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না—সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়েই গ্রন্থ পাঠ এখানে বেশী হইত। কিন্তু হাম্পটনে কৃষি, পশুপালন, শিল্প ইত্যাদির কিকেই বেশী দৃষ্টি থাকিত।

আমি ওয়াশিংটনে থাকিতে থাকিতে এই দুই প্রকার শিক্ষালয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম। ওয়াশিংটনের ছাত্রদের বেশে ভ্রমণসা আছে। “তাহারা কিছু ‘বাবু’—তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ উচ্চ ধরনের—বিশ্বাসের মাত্রাও যথেষ্ট। বোধ হয় ইহারা লেখাপড়া হিসাবেও মূঢ় নয়। নিতান্ত গণ্ডমুখী আমি ওয়াশিংটনে ঢুকিতে পার না। কিন্তু হাম্পটনের আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বস্তর। ওখানকার চালচলন ভিন্ন রকমের। দাতার ছাত্রদের বেতন দান করিতেন—স্বস্তর উহা অতিবর্ত্তনিক বিজ্ঞান। কিন্তু কাপড় চোপড়, কাগজ পত্র, পুস্তক সরঞ্জাম ইত্যাদি এবং খাওয়া পরার খরচ ছাত্রদিগকেই দিতে হইত। এই টাকা ছাত্রেরা বাটীয়া সমগ্র করিত। কেহ কেহ বাড়ী হইতেও কিছু আনিত।

ওয়াশিংটনের ছাত্রেরা একবারেই স্বাবলম্বী নহে—তাহাদের খরচপত্র সম্বন্ধে তাহারা

নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইত। কিন্তু হাম্পটনে স্বাবলম্বন এবং নিজের খরচ নিজে চালানই ছাত্রদিগের বিশেষ লক্ষণ। ওয়াশিংটনের ছেলেরা বাহিরের ‘চটকে’ বেশ দৃষ্টি রাখিত। জীবনের প্রকৃত ভিত্তি আত্ম-স্থান, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতি তাহাদের বিশেষ নজর ছিল না। জীবনের লক্ষ্য, মানবের কর্তব্য, ভবিষ্যতের আশ্রয় ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাহারা বেশীকিছু শিখিত বলিয়া মনে হয় না। তাহারা গ্রীকস্যাটিন ইত্যাদি কত বিষয়ই শিখিত। কিন্তু প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা কঠিন। লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা যে সমাজে বাস করিবে তাহার উপযুক্ত কাৰ্য্যকর্ম, চালচলন তাহারা আদৌ শিখিত না। বরং অনেক বিষয়ে তাহাদের ক্ষতিই হইত। কয়েক বৎসর বেশ ভাল বাড়ীতে বাস, ভাল খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি করিয়া তাহারা অনেকটা অক্ষমতা, অসহিষ্ণু হইয়া পড়িত। পল্লীতে আসিয়া বাস করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব বোধ হইত। শারীরিক পরিশ্রমে তাহারা নারাজ হইত। গৃহস্থালীর কর্তব্য, চাষবাগ, পশুপালন ইত্যাদি তাহারা একেবারেই কুলিয়া যাইত। থাকিসের কেবলী, পরিবারের ম্যানেজার, হোটেলের বাবুজি, অথবা থালামা, দারওয়ান ইত্যাদি হইয়া জীবন কাটাইতে তাহারা ভাল-বাসিত। কিন্তু মাঠে বাইরা কঠ-খৌকার পুর্বক জমি চম্বিতে তাহারা অসমর্থ হইয়া পড়িত।

আমি যে কয়মাস ওয়াশিংটনে ছিলাম তখন ওখানে অনেক নিগোজা বাস করিত। সকলেই পল্লীভাগ্য করিয়া সহরে আসিয়াছে।

গ্রামের কষ্ট তাহাদের সহ্য হয় না। সহরের বিলাস ছাড়িয়া তাহারা অজ্ঞা বাস করিতে অসমর্থ। কেহ কেহ প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিয়-পন্থা কর্মকারী, কেহ বা যুদ্ধদরবারের বড় চাকরী পাইবার আশা কাল কাটাইতেছে। কেহ কেহ মহাশয় সভার এবং ব্যবস্থাপক সমিতিতে সদস্যগিরিও করিত। ফলতঃ কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের একটা বড় টোলা কলম্বিয়া প্রদেশের এই নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। নিগোজিগের জ্ঞাত তখন এখানে কতকগুলি বিজ্ঞান ও খোলা হইতেছিল। সকল বিষয়ে আমি এই নগরটা পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়ালাম। আমাদের সমাজের গতিবিধি ও নৈতিক অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম।

বড় সহরের হুফল সুফল সবই আমার স্বজাতিতে আক্রমণ করিয়াছিল। কতকগুলি নিকম্মা লোকের ‘আজ্ঞা অনেক হানেই দেখিতে পাইতাম। বিলাসের স্রোত প্রবল বেগেই বাড়িতেছিল। ৩৫ টাকা মাদিক বেতনে কর্ম করিয়া কত নিগোজা যুবক জুড়ি-গাড়ী চড়িয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন—আমি নিজ চোখে এবং দেখিয়া মর্মান্বিত হইতাম। পেটে তাহাদের অন্ন জুটিত না কিন্তু সম্ভারকে তাহারা দেখাইতে চাহিত যে তাহারা নিতান্তই গরিব ও গণনা নয়। আরও কত নিগোজে দেখিয়াছি বাহারা ২৫০০০ মাদিক বেতনে সরকারের চাকরী করিত—অথচ প্রতি মাসেই তাহাকে ধার করিয়া সম্ভার খরচবাবুরের খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। আরও অনেক নিগোজার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাহারা কয়েক মাস পূর্বে ‘জাতীয়’ মহাসমিতি কংগ্রেসে বাইরা কর্মচারী ও দেশ-নায়কতা করিয়া আসিয়া-

ছেন। কিন্তু পরকণ্ঠেই তাঁহাদের অর্থাভাব ও দুর্দশার সীমা নাই। অধিকন্তু বহুলাক ম্যাল ফ্যাল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। নিজে খাটিয়া অমের ব্যবস্থা করিতে তাহাদের চেষ্টা ছিল না। সরকারের একটা চাকরীর আশায় বসিয়া থাকিয়া জীবন নিরানন্দময় করিতে থাকিত। তাহাদের বিবাহ মুক্তরাষ্ট্রের কণ্ঠচারীদের খোশামোদ করিলে ছুটুকটা চাকরী তাহাদের করণ্যে জুটিলে।

বড় সহরের নিগ্রেসমাজ দেখিয়া আমি স্থবী হইতে পারি নাই। তাহারা নিজেদের প্রকৃত পার্থ ভুলিয়া সাময়িক উদ্বেজনায় এবং অনবধ বিলাসভোগে দিন অতিবাহিত করিতেছিল। আমার ইচ্ছা হইত যে, কোন বাহুমেয়ে তাহাদের ঐ মোহ কাটাইয়া দিই। আমার সাধ হইত যে, তাহারিগকে সম্মোহন-মস্ত্রে ভুলাইয়া জীবনের যথার্থ কণ্ঠক্ষেত্রে তাহারিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিই। আমি ভাবিতাম যে, আমার ক্ষমতা থাকিলে, আমি তাহারিগকে সহর ছাড়াইয়া পল্লীগ্রামে বসাইতাম। সেখানে প্রকৃত জননীর স্বকামল জোড়ে বাস করিয়া তাহারা জীবনের যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে পারিলে। দেশের মাটিতে তাহারা একবার বসিতে পারিলে প্রকৃত স্বভোগের উপায় গুলি তাহারা আবিষ্কার করিতে পারিলে। কৃষিক্ষেত্রেই শিল্পের জন্ম লাগ মাল তৈয়ারী হইয়া থাকে—পল্লীজীবনেই সকল জাতির যথার্থ সভ্যতার প্রধান উপাদান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে কৃষিকর্ম করিয়াই সকল দেশের জনসমাজ সভ্যতার প্রথম স্তরে পদার্পণ করিয়াছে। এই স্তরে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তাহারা শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞা, ধর্ম, ইত্যাদি জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গের

পুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করা বড় কঠোরসাধ্য সাধ্য সম্ভব নাই। কিন্তু একবার ঐ কার্য হইয়া গেলে ভবিষ্যতের সকল উন্নতিই সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। এই কথাগুলি আমি আমার 'সমুদ্র' নিঃপ্রোগদিককে বুঝাইতে ইচ্ছা করিতাম। কিন্তু তখন আমার সুযোগ ছিল না। ভবিষ্যতে এই সকল কথা আমি নানা ভাবে নানা স্থানে প্রচার করিয়া আসিয়াছি।

ওয়াশিংটনের নিগ্রেসমণ্ডলিদের অর্থহী কিছু বলিতেছি। অনেকে ধোঁয়ার কার্য করিয়া অন্ন সংস্থান করিত। পারিবারিক ভাবে এই ব্যবসায় গুলি চলিত। মায়ে স্বিয়ে সকলে মিলিয়া কাপড় চোপড় পরিচার্য করিত এইরূপে সমস্ত পরিবারই কর্ম করিয়া যৌথভাবে অর্থ উপার্জন করিত। ইহার ফলে মেয়েরা অল্প বয়স হইতেই দেখিয়া দেখিয়া এবং কাজ করিয়া বস্ত্রযোজিত কর্মে পটুত্ব অর্জন করিত। কিন্তু ক্রমশঃ মেয়েরা শুলে ভক্তি হইল। ওখানে গাঢ় বস্ত্রের কাল লেখা পড়া শিখিত। যখন বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়া যাইত তাহারা ভাল ভাল পোষাক চাহিত। তাহাদের বরষ পত্র বাড়িয়া গেল—অর্থ উপার্জন 'করিবার ক্ষমতা কমিতে থাকিল।' কারণ ইতিমধ্যে তাহারা গৃহস্থালী ভুলিয়া গিয়াছে দেখিবার কর্ম করিতেও অপারগ হইয়া পড়িয়াছে। পুঁথিবিজ্ঞার ফলে তাহাদের সর্দশনা উপস্থিত হইয়াছে। মা মাদীরা যে কাজ করিতে পারিত সে কাজে তাহাদের এখন লজ্জা ও অপমান বোধ হয়। পারিবারিক স্বর্থ আর থাকিল না। মেয়েরা দুঃশরিত হইতে লাগিল। সহরে বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের রমণী সমাজ ক্রমশঃ অবনত হইতে থাকিল।

শঠ অনাচার

আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও লোহিত জাতি

আমি যখন ওয়াশিংটনে পড়িতেছিলাম তখন ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়াপ্রদেশে একটা ভূমূল আন্দোলন চলিতেছিল। একটা নৃতন স্থানে প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা উঠিয়াছিল। ঐ জন্ম দুই তিনটি স্থানও নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই স্থানগুলির অধিবাসীরা নিজ নিজ নগরের জন্ম প্রদেশায় আন্দোলন সৃষ্টি করিতে লাগিল। আমার মাগলেজন-পল্লীর পাঁচ দশ দূরই চার্লটননগর অবস্থিত। এই নগরবাসীরাও রাষ্ট্র-কেন্দ্রের মধ্যমা লাভ করিবার জন্ম চেষ্টা করিতে জট করে নাই। আমি ওয়াশিংটনের ছুটির পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি, এমন সময়ে দেখি আমার নিকট চার্লটনের বৈতাল অধিবাসীরা দলবদ্ধভাবে একথানা পত্র লিখিয়াছেন। আমাকে তাঁহারা তাঁহাদের জন্ম ভোট সংগ্রহ কার্যে আস্থান করা এই পত্রের উদ্দেশ্য। আমি তাঁহাদের হইয়া প্রদেশের নানা স্থানে 'ক্যান্ডাভাস' করিয়া বেড়াইতাম। তিনমাস কা পল্লীতে পল্লীতে বক্তৃতা দিয়া চার্লটনের দিকে জনগণের সহায়ত্ব আকৃষ্ট করিলাম। কলতঃ পথ পথ্য চার্লটনের অধিবাসিগণই জয়ী হইল। সেই সময় হইতে এখন পথ্য চার্লটন নগরই ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্দ্র এবং প্রধান নগর রহিয়াছে।

এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমি বেশ একটু নাম করিয়া ফেলিলাম। অনেক স্থান হইতেই আমাকে লোকেরা রাষ্ট্রীয়

আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করিতে অস্বরোপ করিল। কত দলপতি ও জন-নাথক আমাকে তাঁহাদের দলে ঢুকিতে আস্থান করিলেন। আমি কিন্তু হৃৎপে মতিলাম না—সাময়িক যশোলাভের মোহে পড়িলাম না। বরং সেই প্রলোভন কাটাইয়া উঠিয়া আমার জাতির স্বার্থ উন্নতিবিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাই চিন্তা সমর্থণ করিলাম। আমি জানিতাম, যে রাষ্ট্রীয়-জীবনে যোগদান করিলে আমি কৃতকার্য হইয়া নামজারা লোকই হইতে পারি। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কর্ম করিবার যোগ্যতা, প্রবৃত্তি ও উৎসাহ সবই আমার ছিল। কিন্তু উহাতে লাগিয়া গেলে আমার স্বার্থপরতাই প্রমাণিত হইত। আমার নিজ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইত বটে, কিন্তু আমার সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

আমি বুঝিয়াছিলাম সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তিনটি কার্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ সমাজের সকল স্তরে শিক্ষা বিস্তার করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ আমাদের কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় পুঁঠ করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ আমেরিকার সমাজে নিগ্রেগিদের জন্ম সম্পত্তি গৃহ ভূমিদারী ইত্যাদি সঞ্চিত করা আবশ্যক। এই তিনটির কোনটিই তখন আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে ছিল না বলিলেই চলে। স্বতরাং সমাজের এই ভিত্তি প্রাথমিক অস্তর যোচন করাই আমার কর্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাহা না করিয়া আমি যদি প্রথমই নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ম

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মাতিয়া যাই তাহা হইলে আমাদের স্বার্থপর এবং আত্মহিতাশ্রমী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কাজেই আমার নিজের স্বযোগে সুবিধা ক্ষমতা যোগ্যতা পাতিত। যশোলাভ ইত্যাদি সকল কথা তুলিয়া গেলাম। নিগ্রোসমাজকেই আমার জননী-স্থানীয় বিবেচনা করিয়া একমাত্র তাহারই স্বার্থখানে নিজকে নিম্ন করিলাম। আমার জীবনব্যাপিণী সাধনার কেন্দ্রস্থলে নিগ্রো-সমাজকে রাখিয়া আমার ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিলাম। এই সমাজ-সেবা ব্রত হইতে কোনরূপ প্রলোভনই আমাকে টলাইতে পারে না।

নিগ্রোজাতির অনেককেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিলেন। অনেককেই যুদ্ধ দরবারের 'জাতীয়' মহাসমিতি কংগ্রেসের সভ্য পদপ্রার্থী হইলেন। অনেককেই উকিল হইয়া আইন ব্যবসায় ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ ছোট বড় চাকরীর সম্মান করিতে লাগিলেন। অনেককেই সঙ্গীত-শিক্ষকতার কণ্ঠ ফাটিতে থাকিলেন। আমি ব্রিটিশাম নিগ্রোসমাজের উন্নতি এই কংগ্রেসওগালা উকিল কেরাণী বা সঙ্গীত-শিক্ষকগণের দ্বারা সাধিত হইবে না। তাহার জ্ঞাত অস্তরূপ তপস্যা আবশ্যক। এমন কি কংগ্রেসের কার্য, উকিলী ব্যবসায় এবং সঙ্গীত-শিক্ষকতার শিক্ষার জ্ঞাত ও নিগ্রোদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিবার জ্ঞাতই কঠোর সাধনা আবশ্যক। সেই তপস্যা ও সেই সাধনায় ত্রুটি না হইয়া কেবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ অভিজ্ঞা পোষণ করিলে কি হইবে?

আমার স্বজাতিদিগের এই দময়কার হাব ভাব দেখিয়া আমাদের গোলামীবাদের একটি ঘটনা মনে পড়িত। এক নিগ্রো সেতার বাজান শিখিতে চাহিয়াছিল। তাহার

একজন যুবক প্রুঁ সেতার বাজাইতে পারিতেন। তাহারই নিকট সে মনোবাঞ্ছা জানাইল। প্রুঁ বুঝিলেন, নিগ্রোর ইহা সাধ্য নয়। মজা দেখিবার জ্ঞাত বলিলেন, "আচ্ছা, জাক দাখা, তোমাকে আমি সেতার শিখাইতে রাজী আছি। কিন্তু দাখা একটা কথা বলি। এজ্ঞাত কত করিয়া আমাদের দিব? আমার দস্তর এই—প্রথম গং শিখাইবার জ্ঞাত আমি ২, লইখা থাকি, দ্বিতীয় শিক্ষার জ্ঞাত ৬, লইখা থাকি এবং তৃতীয়টির জ্ঞাত আমি মাত্র ৩, লই। আর যেদিন তোমাকে ওস্তাদ করিয়া ছাড়িয়া দিব অর্থাৎ শেষ দিন মাত্র ৬০, লইখা। রাজী আছ কি?" নিগ্রো দাখা উত্তর করিল, "ছোট কস্তী, কড়ারটা ত ভালই দেখিতেছি। তোমাকে আমি এইরূপই বিয়া যাইব। কিন্তু কস্তা আমার একটা অসুখের রাগিতে হইবে। তুমি শেষ গংটাই আমাকে প্রথম শিখাও না কেন?"

আমি আমাদের স্বজাতিদিগের জননায়ক ও বড় বড় কন্ঠধারী ইত্যাদি হইবার আকাঙ্ক্ষাকে এই গোলামের শেষ গংটাই অর্গে শিবিবার ইচ্ছায় ভ্রাস্য সর্বনাশ মনে করিয়া আসিয়াছি। এজ্ঞাত আমি ওসব 'বড় কাজে' না যাইয়া নীরব শিক্ষাপ্রচার করাই থাকিয়া যোগ্য।

চালটেনে রাষ্ট্রকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া। আমি মাল্লেজেন শিক্ষকতা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে একথানা হাম্পটনের পত্র পাইলাম।

সোমপতি আর্মস্ট্রং আমাকে হাম্পটনে একটা বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রতি

বৎসর কাঞ্চা আরম্ভ হইবার পূর্বে হাম্পটনের পুরাতন গ্রান্ডেটের মধ্যে দু'একজন বক্তৃতা করিয়া থাকেন। এবার আমার উপর এই

ভার পড়িল। আর্মস্ট্রংয়ের পত্র পাইয়া এক সপ্তে লজ্জিত ও আনন্দিত হইলাম। আমি এই সম্মানলাভের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছি দেখিলাম। আশ্চর্য্যবিত্তও হইলাম। যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। আমার আলোচ্য বিষয় হইল "বিজ্ঞানভাষার সম্ভাব্য।"

পাঁচ বৎসরের মধ্যে নতুন রেলপথ অনেক খোলা হইয়াছে। হাম্পটনে যাইবার সময়ে এবার সমস্ত রাত্তা রেলপথেই গেলাম। পাঁচ বৎসর পূর্বে কি কষ্টে আমি কত গং হাটিয়া কত দিন না যাইয়া, সেই একই রাত্তা হাম্পটনের বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম! আজ আমি সেই থানে সম্মানজনক পদলাভ করিয়া বক্তৃতা দিতে চলিয়াছি। অতীত ও বর্তমান তুলনা করিতে করিতে শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন লোকের এরূপ ভাগ্য পরিবর্তন ঘটয়াছে কি, না আমার জানা নাই।

হাম্পটনে শিক্ষক ও ছাত্রগণ আমাকে খুবই আদর আপ্যায়িত করিলেন। আমি অনেক দিন পরে আসিয়াছি বহুবিধের পরিবর্তন ও উন্নতি লক্ষ্য করিলাম। আমাদের সমাজের যে যে বিষয়ে অসম্পূর্ণতা ও অভাব রহিয়াছে বিদ্যালয়ে ঠিক সেইগুলি পূরণ করিবার জ্ঞাতই আর্মস্ট্রং মহোদয় এবং হাম্পটনের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ চেষ্টা করিলেন।

অনেক স্থলে দেখিয়াছি, শিক্ষাপ্রচারকের সমাজের অবস্থা বৃদ্ধি। বিজ্ঞানানের ব্যবস্থা করেন না। অব্যত ও দরিদ্র লোকসমাজে শিক্ষাবিস্তার করিতে যাইয়া বহু সংপ্রায়ী কষ্টপূর্ণ এজ্ঞাত হ্রফল স্রষ্ট করিতে পারেন।

নাই। অজ্ঞ এক সমাজে যে অজ্ঞানেন হ্রফল লাভ হইয়াছে তাহাই অবশ্য সমাজে প্রবর্তন করিতে যাইয়া তাহার বিফল হইয়াছেন। তাহার বুঝেন না যে, এক সমাজের যাহা শুভ, অজ্ঞ সমাজের তাহা অশুভও হইতে পারে। বেতকায় সমাজে যাহাকে উন্নত শিক্ষাপ্রণালী বলি তাহাই যে ক্রুদ্ধ নিগ্রো সমাজেও হ্রফল প্রদান করিবে কে বলিতে পারে? এমন কি, পূর্ববর্তী কোন যুগে হ্রফল একটা অজ্ঞানেনের দ্বারা হ্রফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার দ্বারা ই যে এখনও উপকার হইবে এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি? কিন্তু শিক্ষাপ্রচারকেরা দেশকাল-প্রায় বিবেচনা না করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে কণ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দেখিতে পাই। ১০০ মাইল দূরে কোন দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাই অজ্ঞের ভ্রাস্য হইবার হ্রফত কোন সমাজে প্রচার করিতে থাকেন। অথবা ১০০ বৎসর পূর্বে যে বিজ্ঞা কার্যকারী ছিল এতদিন পরেও তাহারা তাহাই চালাইতেছেন। হাম্পটন-বিজ্ঞানালয়ের কর্তৃপক্ষেরা এরূপ অবিজ্ঞ ছিলেন না। তাহারা জানিতেন যে, উনিবিশ শতাব্দীতে তাহারা রহিয়াছেন। তাহারা বুঝিতেন যে, নিগ্রোজাতির জ্ঞাত তাহারা ব্যবস্থা করিতেছেন। আর তাহারা মনে রাখিতেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রদেশের মধ্যেই তাহাদের কর্তৃকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে আর একটা দোষও অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি। শিক্ষকেরা মনে করেন যে, ছাত্রেরা সকলেই একরূপ, সকলকেই একই প্রণালীতে, একই আদর্শে, একই জীবনযাপন প্রণালী ভিত্তি দিয়া মানুষ করা যায়। এজ্ঞাত সকলের উপর একটা

'পেটেন্ট' ছাপ মারিয়া দিবার জন্ত শিক্ষকেরা সাধারণতঃ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তুলিয়া যান যে, মাছর বিভিন্ন ছাত্রগণের স্বভাব বিভিন্ন, এক একজনের এক এক প্রকার মেজাজ, প্রবৃত্তি ও ধারণা। হস্তরাং প্রত্যেকের অভাব বুঝিয়া শিক্ষা দিলেই ফল ফলিতে পারে। যথের কথা হ্যাপ্টনে ছাত্রদের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা বিষয়ে বেশ লক্ষ রাখা হইত। এক এক জনকে এক এক প্রকার শিল্প, কৃষি ও পুথি শিখান হইত। ফলতঃ ছাত্রেরা সম্ভাব্যভাবে মনের আনন্দে বাড়িয়া উঠিত। যাহার যে বিষয়ে অভাব তাহার ঠিক সেই বিষয়েই শিক্ষা হইত। লেখা পড়া শিখিয়া যে তাহাদের উপকার হইতেছে প্রতিদিন তাহারা ইহা নিজেই বুঝিতে পারিত।

হ্যাপ্টনে আমার বক্তৃতা দেওয়া হইয়া গেল। সকলে যুগী হইলেন। আমি ম্যাল-ডেনে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে শিক্ষকতার জন্ত পুনরায় ব্যবস্থা করিতেছি এমন সময়ে আর্মস্ট্রং মহোদয়ের আর একপানা পত্র পাইলাম। তিনি আমাকে হ্যাপ্টনে একটা শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে আমি আমার দুইটা ভাই ও আমার পক্ষীর অপর চারজন সর্বসম্মত ছয় জন ছাত্রকে ম্যালডেন হইতে হ্যাপ্টনে পাঠাইয়াছি। তাহাদিগকে আমি ঘরেই এতদূর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলাম যে তাহারা হ্যাপ্টনে যাইয়া সকল বিষয়েই উচ্চ শ্রেণিতে ভর্তি হইবার স্বযোগ পাইয়াছিল। ইহাদের লেখাপড়া এবং স্বভাব চরিত্র দেখিয়া আর্মস্ট্রং আমার গুণপনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন, আমার দ্বারা বেশ ভালই শিক্ষকতার কার্য চলিতে পারে। এজন্তই

তিনি উৎসুক হইয়া আমাকে হ্যাপ্টনে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি যে সকল ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে একজন আজ কাল বোঠেন নগরে প্রসিদ্ধ চিকিৎসা ব্যবসায়ী। তিনি ঐ নগরে শিক্ষাপরিষদেরও একজন সদস্য।

এই সময়ে আর্মস্ট্রং মহোদয় লোহিত জাতিক শিক্ষা দেবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তখনকার দিনে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না, যে, লোহিতবর্ণ ইতিয়ান জাতির লোকেরা লেখাপড়া শিখিয়া সভ্য হইতে পারিবে। আর্মস্ট্রং কিন্তু পরীক্ষা করিতে রতসমক। তিনি ফেডারেল দরবারের সাহায্যে প্রায় ১০০ লোহিত শিশু ও যুবক হ্যাপ্টনে লইয়া আসিলেন। তাহাদিগকে বিজ্ঞানের মধ্যেই রাখিলেন। আমি তাহাদিগের ভ্রমরপোষণ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার গ্রাণ্ণ হইলাম। এই কার্য আমায় খুব ভালই লাগিত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি আমার স্বজাতির জন্ত কষ্ট ত্যাগ করিয়া এই মৃতদেহ লোকসম্প্রদায়ের সেবার নিযুক্ত হইতে ততবেশী উদ্যোগী ছিলাম না। কিন্তু আর্মস্ট্রংয়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

প্রায় ৭২ জন লোহিত ইতিয়ান আমার রক্ষণাবেক্ষণে থাকিল। আমি ছাত্র তাহাদিগের নিকট আমাদের স্বজাতীয় আর কেহ ছিল না। কাজেই দায়িত্ব আমার যথেষ্ট। একে ত ইতিয়ানেরা শেতকার বিপকেই সম্মান করে না। তাহারা শেতকার অপেক্ষা উন্নত ও সভ্য একরূপই তাহাদের বিবাস। কৃষ্যঙ্গ নিগ্রোর তাহাদিগের কাছে উল্লেখযোগ্য জাতিই নয়। তাহার উপর আখরা এত কাল গেলান্দী করিয়াই ইতিয়ানেরা "মায় প্রাণ থাকে কান্দা" ভাবিয়া

কোন দিনই গোলায় হয় নাই। এমন কি তাহারাও তাহাদের বেশে অনেক ক্রান্তদাস রাখিত। হস্তরাং জাতিসমস্ত নীমাংসা করিবার জন্ত আমাকে প্রথম প্রথম বড় বেশী ভাবিতে হইয়াছিল।

অধিকন্তু সকলেরই দারবা জন্মিয়াছিল, আর্মস্ট্রংয়ের এই চেষ্টা ফলবতী হইবে না। তিনি একটা অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, অরকালের মধ্যেই আমি ইতিয়ানদিগের বন্ধু হইয়া পড়িলাম। আমি তাহাদের তাহারা আমার এই ভাব বেশ জন্মিয়া গেল। আমাদের মধ্যে বেশ সম্ভাব্য ও খ্রীতি এবং ভালবাসার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি দেখিলাম, লোহিত ইতিয়ানেরাও মাছর—তাহাদেরও হৃদয় আছে—তাহারাও ভালবাসিতে জানে—তাহারাও সদস্য বুঝিয়া কষ্ট করিতে পারে। ক্রমেই দেখিলাম তাহারা আমাকে স্থগী করিবার জন্ত কত কি করিতে চাহিত।

তাহাদের একটা 'গো' ছিল। তাহারা তাহাদের স্বজাতির ভিত্তি স্বরূপ চুলগুলি কাটিতে দিত না। কখন মুড়ি দিয়া বেড়াইতেও তাহারা ভাল বাসিত—এ অভ্যাস তাহারা তাহাদের একটা "জাতীয় চরিত্রের অন্তর্গত"। তাহাদিগকে কোন মতে ইহা বন্ধ করান যাইত না। কিন্তু দোষ কি? সকল জাতিরই কতকগুলি 'গো' থাকে। শেতকার জাতিদেরই কি কতকগুলি খেয়াল নাই? তাহারা পৃথিবীর সকল জাতিতেই তাহাদের ধর্ম, তাহাদের ভাষা, তাহাদের পোষাক, তাহাদের খানা ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পীড়াপীড়ি করেন। যেন মাদা চামড়াওয়ালা

লোকেরা যাহা যাহা করে অজ্ঞাত জাতির লোকেরা ঠিক সেইরূপ অমুকরণ না করিলে তাহারা সভ্য হইতে পারে না। হস্তরাং লোহিত শিশু ও যুবকদিগের স্বাভাবিক অভ্যাস গুলিতে আমি বিশেষ বিরক্ত হইতাম না।

আমার বিবাস—কৃষ্যঙ্গ ও লোহিত ছাত্রদিগের মস্তিষ্কে কোন প্রভেদ নাই। তাহারা বোধ হয় ইংরাজী শিখিতে কিছু বেশী সময় লইত। অজ্ঞাত সকল বিষয়ে ছুইএরই প্রতিভা এক প্রকার। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় অথবা ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা করিবার জন্ত নিগ্রো ও ইতিয়ান দুই জাতিরই একপ্রকার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ই ছিল।

হ্যাপ্টন বিদ্যালয়ের নিগ্রো ছাত্রেরা নানা উপায়ে ইতিয়ানদিগের "সাহায্য করিত। ইহাতে আমি বিশেষ সম্বর্ধিত হইতাম। নিগ্রোর অনেক সময়ে লোহিতদিগকে নিজ ঘরে থাকিতে দিত। ইতিয়ানেরা একরূপে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নিগ্রোদিগের সহবাসে থাকিয়া ইংরাজী ভাষা সহজে আয়ত্ত করিতে পারিত।

হ্যাপ্টনের কাল ছেলেরা এই লাল ছাত্রদিগকে দেখুপ বক্তৃতাতে গ্রহণ করিতেছিল, যুক্তরাজ্যের কোন অঞ্চলের শেতকার সম্মানেরা অজ্ঞ কোন জাতির ১০০ ছাত্রকে সেইরূপ হৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি কতবার শেতকার যুবকদিগকে বলিয়াছি "যতই তোমরা অবনত জাতিতে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে ততই তোমরা নিজেই উন্নত হইবে। সেই অবনত জাতি যেই পরিমাণে অবনত ছিল তোমাদের উন্নতি ও সভ্যতা ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে।"

এই উপলক্ষ্যে আমার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। মাননীয় শ্রীযুক্ত ফ্রেডরিক ডগলাস এক সময়ে পেনসিলভেনিয়া প্রদেশে রেল বেড়াইতেছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ নিগ্ৰো। রেল কোম্পানীকে তিনি পয়সা সমানই দিয়াছেন—কিন্তু তিনি যেতান্নবিশের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসিতে পাইলেন না। তাঁহাকে মাল গাড়ীতে অজ্ঞাত নিগ্ৰাহের সঙ্গে বসিয়া যাইতে হইল। একজন যেতান্ন বন্ধু সেই মালগাড়ীতে যাইয়া ডগলাসকে বলিলেন “মহাশয়, আমরা আপনার এই অপমান দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।” ডগলাস সোজা হইয়া বসিলেন এবং মর্দপে উত্তর করিলেন “ডাগলাসকে অপমান কে করিতে পারে? আমার আত্মাকে কোন বাহিরের লোক স্পর্শ করিতে পারে কি? আমি বলিতেছি, এই ব্যবহার আমার বিন্দুমাত্র অসন্মান বা নিন্দা হয় নাই। যাহারা এইরূপ দৃষ্টান্তবাহর করিয়াছে তাহারাই যথার্থ নীচাশয় এবং নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের হৃদয়েই কালিমা জন্ম হইতেছে।”

আমি রেলপথের আর একটা নিগ্ৰোমস্ত্রার ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। একজন নিগ্ৰাহের সমস্ত শরীর অতিশয় সাধা ছিল। তাহাকে কক্ষাধিনিগ্ৰাহের সঙ্গে তুলনা করিয়া কেহই তাহার জাতিস্থির করিতে পারিত না। সে এক সময়ে কক্ষাধিনিগ্ৰাহের গাড়ীতে বসিয়া যাইতেছে। টিকেট-সংগ্রাহক তাহাকে সেই-খানে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সে কি নিগ্ৰো না ইয়াকি? তাহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল। যদি সে নিগ্ৰো হয়, ভালই। কিন্তু যদি সে যেতান্ন হয় তাহা হইলে তাহাকে কি করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় যে সে নিগ্ৰো কিনা? হাতে যেতান্নের অপমান হইয়াই

সম্মান। টিকেট-সংগ্রাহক সেই ব্যক্তির আপদ মতক পূর্নহৃদয়তরুণ পরীক্ষা করিল। তাহার চুল, চোখ, নাক, হাত, কান কিছুই বাকী রাখিল না। কোনোমতেই বুঝাইল না যে এই লোক নিগ্ৰো কি সত্য সত্যই যেতান্ন। শেষে উপায় না দেখিয়া লোকটা মাথা হেঁট করিয়া তাহার পায়ের দিকে দেখিতে থাকিল। আমি সেই গাড়ীতে বসিয়াছিলাম এবং রেলের কেরাণীর ঐ পরীক্ষা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম “যাহাউক” এইবার সন্ধান পাওয়া যাইবে।” সত্যই তাহার পা দেখিয়া সে বুঝিল যে ঐ ব্যক্তি নিগ্ৰোই বটে এবং তাহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আমি স্থবী হইলাম যে গোলমালে আমার একজন স্বজাতি কিম্বা গেল না!

আমি ভ্রতস্ত মথক্ষে একটা নিয়ম স্থির করিয়াছি। কোন লোক সত্য ও ভ্রত কিনা তাহা বিচার করিবার জন্য আমি কোন নীচ জাতির লোকের সঙ্গে তাহার আচার ব্যবহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। পূর্বের গোলাবীর যুগে দক্ষিণপ্রান্তের যেতান্ন প্রভুরা তাহাদের ক্রীতদাসগণের সঙ্গে যেকোন আচরণ করিতেন তাহাতে তাহাদের মধ্য হইতে ভ্রত ও অভ্রত, সত্য ও অসত্য খুঁজিয়া বাছা সহজ ছিল। এখনও পুরাতন মনিবের সন্তানেরা পুরাতন গোলামবন্দনাদিগের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাই ভ্রততা বিচারের প্রকৃত মাপকাঠি।

জর্জ ওয়াশিংটন একদিন রাষ্ট্রায় হাটতে ছিলেন এমন সময়ে একজন কৃষ্ণাধিনিগ্ৰো তাহাকে টুপি তুলিয়া নমস্কার করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিগ্ৰোকে তাহার টুপি খুঁজিয়া নমস্কার করিলেন। তাহার যেতান্ন বন্ধুরা এজন্য তাহাকে পরে নিন্দা করিতেন। তিনি

উত্তর দিতেন—“তোমরা কি বলিতে চাহ যে, একটা অশিক্ষিত অসভ্য নিগ্ৰো আমাকে ভ্রতত্ব হারাইয়া দিবে?”

আমেরিকায় জাতি ভেদের দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি যখন হাম্পটনে লোহিত ছাত্রদিগের অভিভাবকতা করিতে-ছিলাম সেই সময়ে আমার অধীনস্থ একজন ছাত্রের “অস্থত্ব হয়। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া “ফেড্রাল দরবারের” কণ্ঠস্বরীর নিকট ওয়াশিংটনে যাইতেছিলাম। তিনি ইহাকে যথা স্থানে তাহার স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ওয়াশিংটনে যাইবার পথে যানিকটা একটা ঈমারের যাইতে হয়। উহাতে হোটেল ছিল। নরুলের বাগা দাওয়া হইয়া যাইবার পর আমি সেখানে বাইতে যোগালাম। আমার লোহিত ছাত্রও আমার সঙ্গে ছিল। ঈমারের হোটেলওয়ালার বলিল “লোহিত যুবক থানা পাইবে, তুমি পাইবে না।” আমি অবশ্য বিমিত্ত হইলাম—কারণ আমাদের দুইজনের বদে বদে বৈশি তফাৎ ছিল না। কিন্তু সে এত গুস্তায় যে দেখিবাঝাই কক্ষ লোহিত সহজেই-চিনিয়া ফেলিয়াছে।

তাহার পর আর একটা হোটেলও এইরূপ ঘটিল। আমি হাম্পটন হইতে আসিবার সময় সেই হোটেল থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহারও আমাকে জায়গা দিল না।

জাতিভেদের আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার একটা সহরে মহাগোলযোগ পড়িয়া যায়। একজন লোককে “লিগ” বা সমাজনে মারিয়া ফেলিবার যোগাড় হইয়া উঠিল। ব্যাণাধিক কি অসহন্যে জনা গেল যে কাল চামড়ার একটা লোক স্বাধীন হোটেলের একজন নৈশ-বিজালয়ে না থাকিলে তাহার দিবা-পাইতে গিয়াছে। কিন্তু সে নিগ্ৰো নয় সে

মরজো দেশের একজন অধিবাসী, আমেরিকায় বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহার রং কাল এবং ইংরাজীতে সে কথা বলিতে পারিত। কাজেই লোকেরা তাহাকে নিগ্ৰো ভাবিয়া লইয়াছিল। যখন রটিয়া গেল যে, সে নিগ্ৰো নয় আর কোন গোলযোগ থাকিল না। তাহার পর হইতে মরজোবাসী ব্যক্তিষ্ট ইংরাজীতে কাল না বলাই শ্রেয়জ্ঞান করিয়াছিল।

লোহিত ছাত্রদের লইয়া হাম্পটনে এক বৎসর কাটাইলাম। এই সময়ে আমার ভবিষ্যৎ উত্তির আর একটা সুযোগ জুটিল। তাহার ফলে আমার টাকেক্সির কর্মে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। আর্মস্ট্রং দেখিলেন, নৃতন নৃতন নিগ্ৰো পুরুষ ও রমণীরা দলে দলে শিক্ষালভের জুড় তাহার নিকট আবেদন করিতেছে। কিন্তু তাহাদের বড়ই দুরবস্থা। পয়সা দিয়া স্থলে থাকা কঠিন, এমন কি, দুই চারি থানা কেতাব কিনিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। সেনাপতি মহাশয় ইহা-দিগের জন্য একটা নৈশবিজালয় খুলিবার আয়োজন করিলেন।

ব্যবস্থা হইল যে তাহারা দিনে ১০ ঘণ্টা করিয়া খাটিবে এবং রাত্রে ২ ঘণ্টা মাত্র স্থলে পড়িবে। এই কক্ষেই তাহাদিগকে বিজালয় হইতে খোরাক দেওয়া হইবে। তাহাছাড়া নদপও কিছু তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে। এই নগদ টাকাটা সম্ভ্রতি তাহারা বিজালয়ের দনভাণ্ডারে জমা রাখিবে। ভবিষ্যতে তাহাদিগকে দিবাভাগের বিজালয়ে ভর্তি করিয়া লওয়া যাইবে। তখন ঐ পুষ্টি হইতে তাহাদের খোরাক পোষাক চলিতে পারিবে। অবশ্য এইরূপে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল নৈশ-বিজালয়ে না থাকিলে তাহারা দিবা-বিজালয়ের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না—এবং

বিদ্যা-বিদ্যালয়ের জ্ঞান নিজ নিজ অভাবমোচনোপযোগী টাকাও জমা হইয়া উঠিতে না। অধিকন্তু এই দুই বৎসরব্যাপী জীবনযাপনের মধ্যে তাহারা কতকগুলি দিল ও কুমিদ্ধ শিখিয়া ফেলিবে। তাহাদের পুঁথিবিজ্ঞাও কিছু কিছু হইয়া থাকিবে। এদিকে হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের ও কৃষিবিভাগ এবং শিল্পবিভাগ সর্বশেষ পুষ্টিলাভ করিবে। হুতরাং এই নৈশবিদ্যালয়ের দ্বারা অশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

অর্ম ষ্ট্রদ মহোদয় তাহার এই নব প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের ভার আশ্রয় দিলেন। প্রায় ১২ জন উৎসাহী ও কণ্ঠস্থ ছাত্র ও ছাত্রী সহিয়া নৈশবিদ্যালয়ের কার্য আশ্রয় করা গেল। বিদ্যাপ্রাণে পুষ্কর্যের বিদ্যালয়ের করাভ্যনায় কাজ করিত এবং মেয়েরা ধোপার কণ্ঠ করিত। চুই কাজই অত্যধিক ছিল। কিন্তু তাহারা বেশ ভাল করিয়া করিত। এদিকে নৈশবিদ্যালয়ের জ্ঞান পড়া প্রস্তুতও তাহারা মনোযোগের সহিত করিত। লেখাপড়া শেষ করিবার ঘণ্টা বাজিয়া গেলেও তাহারা উঠাতে লাগিয়া থাকিত। ঘুমাইতে হইবার সময় হইয়া যাইবার পরেও তাহারা আমাকে তাহাদিগের পড়া বুঝাইয়া দিতে অগ্রহণ করিত।

ইহাদিগের দিনের ও রাত্তিরে কাজ দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। তাহাদের পরিশ্রম স্বীকার এবং বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগের জন্ত ইহাদিগকে আমি একটা নৃতন নাম দিয়াছিলাম। তাহাদিগকে ‘কণ্ঠস্থ সমিতির’ সদস্য বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের মধ্যে তাহাদের স্থান ছড়াইয়া পড়িল—হ্যাম্পটনের বাহিরেও এই নামের আদর হইতে লাগিল। নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে আমি ছাপান সার্টফিকেটও দিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে এইরূপ লেখা থাকিত—

‘হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের ‘কণ্ঠস্থ সমিতির’ ‘অমুক’... ‘অত’ বৎসর নিরমিতরূপে কার্য করিয়া এই প্রশংসা পত্রের অধিকারী হইয়াছে।’ সমাজে এই প্রশংসা পত্রগুলির আদর বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাম্পটনের নামও সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া গেল। আজ সেই নৈশবিদ্যালয়ে ৩০০।৪০০ ছাত্র লেখা পড়া শিখিয়া থাকে। ইহার ছাত্রেরা ইতিমধ্যে দেশের নানা গণকণ্ঠে উচ্চ-স্থানও অধিকার করিয়াছে।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ *

পরিষদের সম্পাদক মহোদয়ের আরাধনে যখন অধ্যাকার বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত হই, যেন এই সভার সহস্রের অন্তর্গত জনৈক সভ্যরূপে উপস্থিত বিষয়ের উপযোগী সাক্ষা

আনন্দ্যভ্য প্রকাশ করিয়া যাইব বলিয়াই আশা করিয়াছিলাম, আপনারা উহা সহজে ঘটিতে দিলেন না, আপনারা আমাকে আকমণ্যপূর্ণক অধ্যাকার সভাপতিত্বে

বসাইয়া দিয়াছেন, হুতরাং আমি নিজকে কিঞ্চিৎ বিপন্ন মনে করিতেছি। সভাপতিত্ব গভীরভাবে আসন দখল করিয়া বসিতে হয়; কোন দিকে অতিরিক্ত উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা তাহার পক্ষে অবৈধ; তাহাকে সভার যাবতীয় আলোচনার একাধ হইয়া মীমাংসা করিতে হয়—ইত্যাদি, আধুনিক সভাপতিবিষয়ক নানা অলিখিত ব্যবস্থাবিধি মানসপথে প্রবলভাবে উদ্ভূত হইয়া আমাকে এককালে দমাইয়া ফেলিয়াছে। আমার উচ্ছ্বাসের উৎসাহমুখে আপনারা একেবারে অগদগদ চাপাইয়া দিয়াছেন এবং এই সভার আলোচনাও সময় সময় এত বিভিন্ন পথে ছুটিয়া গিয়াছে যে, সমস্তের সামঞ্জস্য করিয়া সভায় উপস্থানকার করিতে হইলে দীর্ঘ সময় এবং প্রচুর বাধ্য কসার আবশ্যক; উহা ভিত্তা করিয়াও আমার মন যে কিঞ্চিৎ উৎপীড়িত হইতেছে না, তাহা নহে।

আপনারা জানিয়া শুনিয়াই একজন সাহিত্য-সেবীকে অধ্যাকার হুদীসমাগমের অধ্যক্ষপদে বসাইয়া দিয়াছেন, এই কার্যের কিঞ্চিৎ ফল আপনাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। সর্বশেষ, ইহা প্রধানতঃ সাহিত্যিক সমাগম বলিয়া, আনন্দকণপকেও কিঞ্চিৎ সাহিত্য-বক্তৃতা শুনিতেই হইবে। তৎপূর্বে, আপনাদের সমক্ষে এই সভার প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি; আশা করি, আমার বক্তৃত্বের উপস্থানে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ-পূর্বক, আপনারা অধ্যাকার সম্মিলন এবং যাবতীয় আলোচনার উদ্দেশ্য সফল করিবেন, প্রস্তাব এই—

কবিবর শ্রীকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ কবিপ্রতিভার ফল প্রদর্শনপূর্বক বিবাস্তরে সাহিত্যিকমণ্ডলীর সমান লাভ করিয়াছেন,

এবং বিশ্বসাহিত্যের দরবার সমক্ষে ১৯১৩ সনের নোবেল পুরস্কার অর্জন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য এবং বাঙ্গালীকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন; উহা সম্যক জয়যধম পূর্বক চট্টগ্রাম সাহিত্যপরিষদ কবিবরকে আন্তরিক আনন্দ এবং শ্রীতি বিজ্ঞাপন করিতেছেন।

দ্বিহাওরগণ, আজ আমাদের পরম আনন্দের দিন। এই আনন্দের পরিমাণ এত অধিক যে স্বয়ং বাঙ্গালী এবং বঙ্গসাহিত্যের সেবক আমি তাহা কোনরূপে ভাষ্য প্রকাশ করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেও পারি না। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে যখন বোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়, এবং রাজকীয় বিদ্যালয়সমূহে বাঙ্গালীর শিক্ষাদানার পক্ষে অপরিহার্য পরিগণিত হইয়া আমাদের স্বাধীনতা যৌক্তক পদবী লাভ করিত, এবং বাঙ্গালী গণ্যে ‘প্রতাপাদিত্য চরিত’ ও ‘তোতার কাহিনী’ লিখিত হয়, অথবা পরে যখন বাঙ্গালীশিক্ষার্থীর সাহায্যের জন্ত প্রদেখ-চক্রিকা রচিত হইয়া পাঠ্যগ্রন্থের স্থান গ্রহণ করিত, তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, যে শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই বাঙ্গালী তাহার সাহিত্য-জয়যধকে বিশ্বদরবারে উপস্থিত করিবার জন্ত যোগ্যতা লাভ করিবে, উহার পর, ৫৪ বৎসর পূর্বে, যখন বাঙ্গালীর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়, কিংবা ৪১ বৎসর পূর্বে যখন বঙ্গবর্ষন প্রথম প্রচলিত হয়, তখনা কেহ আশা করিতে পারে নাই, যে বাঙ্গালীর জয় এত অল্প-কালের মধ্যে ব্রহ্মভালে বাজিয়া উঠিয়া বিদ্যাহিত্যমণ্ডলীর বিশ্বদরবারে উপস্থিত হইবে, কিঞ্চিৎ, বিবাস্তর রূপায় অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে, অথ্য আমাদের মনেবস্ত জয় একান্তর উহা অসম্ভব করিতেও

* চট্টগ্রাম সাহিত্যপরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত সন্মানে সভ্য লেখক যে বক্তৃতা করেন তাহাই প্রথম প্রকাশের লিপিহীন হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

বলিয়াই আনন্দ। বিখ্যাত বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন পূর্বক অসিত্বনীয় লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাই আমাদের অস্বক্যর আনন্দ যেমন আশীর্বাদ এবং কৃতজ্ঞতারূপে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিতেছে, তেমনি চিন্ময় জগতের উপাসনারূপে সেই অস্বক্য-উটনগুটি বিশ্বনিরন্তর চরণ উদ্দেশ্যে উখিত হইতেছে।

পরিষদের সভাপন এবং সমবেত ভক্ত-মণ্ডলী, এই সভায় একরূপ অতর্কিত নানা কথার অবতারণা ঘটাইয়াছে। কোন বক্তা বলিতে চাহিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের এই গৌরব এবং সাহিত্যিক উপাধিরূপে সবে ইংরাজ আমলের আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বা ভাষার ইতিহাস কোন অংশে সম্পর্কিত নহে—তিনি প্রাচীন মহিমাযুক্ত বৈষ্ণব কবিগণের কিঞ্চিৎ ভাবভক্ত গ্রহণ করিয়াই ইয়োরোপের বিশ্ব অর্জিত করিয়াছেন। কোন বক্তা (নিতান্ত অসাময়িকভাবে) পূর্বগত মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রনীর সহিত তুলনা পাড়িতে এবং কেহ কেহ বা ভাল-মন্দ-বিচারে রবীন্দ্রনাথের প্রেমগুণ সম্বন্ধে করিতেও উদাত্ত হইয়াছিলেন। আপনারা জানেন আমিও বঙ্গসাহিত্যের একজন দুঃখী। অসিৎ অকৃতীসেবক, কিন্তু, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যসেবী হইতে হয়, তবে, অস্বস্তি: নিজের ভাষা ও সাহিত্য কি-জিল কি-হইয়াছে, এখন কোন দিকে চলিয়াছে, কোন্ কবি বা লেখক উহাকে কোন্ সম্পদ বান করিয়াছেন প্রভৃতি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গর জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত সাহিত্যসেবার ভূমিকা পরিগ্রহ করাও যে অসম্ভব, তাহা বোধ করি সময়েই স্বীকার করিবেন। সাহিত্যের বহুমুখী ধারা এবং

চরমের অগুণ্ড একত্ব ও সাগরসঙ্গমের তথ্য কিঞ্চিৎসময় ধারণা না করায় সাহিত্যসেবী হইয়াও যেমন অসম্ভব, তেমন এই সাহিত্য-সেবীর পক্ষে প্রকৃত কবিগণের মধ্যে ছোট-বড় বা ছোটমধ্যে বিভাগ করাটাও যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহাও সাহিত্যরসিক মাঝেই স্বীকার করিবেন। এতদ্বিধ সাহিত্যসেবী মাঝেকই আর একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই যে, বর্তমানে সাহিত্যের একরূপ দেশশাসিত্বে তাহার এত পশা এত বিভাগ পরিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে যে, 'সর্বশ্রেষ্ঠ কবি' 'স্বাধীন কবি' প্রভৃতি অতিশয়োক্তিমূলক শব্দবিভাগ সাহিত্য-সমালোচনার রাজ্য হইতে বহির্জন-পূর্বকই নির্মলিত। এমন যে সেক্ষণীয়র, বাঁহাকে কাব্যসাহিত্যের বিভাগ বিশেষে 'অতুলনীয় কৃতিত্ববান' বলিয়া রায় প্রকাশ করিতে অনেক পণ্ডিতেই ইত্তস্ত: করেন না। তাহাকেও 'শ্রেষ্ঠকবি' আখ্যায় বিশেষিত করা যায় না। একত কোন মত কবির সঙ্গে জীবিতের তুলনার সমালোচনা সাহিত্যের শিষ্টাচার সুবিধিত বলিলেই চলিবে কেন না, সাহিত্যের সুভগণ পিতৃলোকের, অমর লোকের অধিবাসী। বিভিন্ন ক্ষেত্রবোটার অধিবাসীর সঙ্গে তাঁহাদিগকে একই সমতলে স্থাপন করা অসম্ভব বলিয়াই মনে করি। তাহার পর, বাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কবি, বাঁহারা কোন-না-কোন গুণ প্রকাশে জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে নিজের করমুদ্রা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, দেশের স্বতন্ত্ররূপকে কোন-না-কোন দিকে আঘাতপূর্বক অপ্রাতপূর্ণ আলোকের গম্যক লুপিয়া দিয়া বাঁহারা কবি পদবী অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইত্বরবিশেষ স্থির করাও সহজ নহে। এই

ক্ষেত্রে পদে পদে দ্বাপ্তি ঘটবার সম্ভাবনা আছে। কারণ, অস্বক্যরকারী বা অস্বক্যের প্রতিধ্বনিবিরগণ যেমন কবি-প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না, কবিসংঘের চিরকালীয় ধারায় যেমন তাঁহাদের নাম উঠে না, তেমনি, প্রত্যেক প্রকৃত কবি নিজের কোন বিশেষ মাহাত্ম্য এবং অনস্বক্য-করণীয় বিশেষত্বের গুণেই কবি। কবিগণের অস্বক্য এই বিশেষত্বটুকু নিরূপণ করাই সাহিত্যসমালোচকের সর্বপ্রধান কর্তব্য। স্বতরাং অস্বক্যর সভায় তথ্যভিত্তিক অপর কোনরূপ আলোচনা নিতান্ত অসম্ভব হইবে বলিয়াই মনে করি। মধুসূদন, হেম, নবীন বা বর্তমানের রবীন্দ্রনাথ যেমন পরস্পরে স্থান বিনিময় করিতে পারেন না, মধুসূদন যেমন হেম নবীন রবি হইতে পারিতেন না, তেমনি রবীন্দ্র ও মধু-হেম-নবীনের কৃতিত্ব-বোটি লাভ করিতে পারিতেন না—চেষ্টাও করেন নাই। তিনি নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিশক্তি এবং কবিত্ব-শক্তির ফল উপাধিব্যবহার কবি-পদবী অর্জন করিয়াছেন, এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের বিশিষ্ট চরিত্রব্রহ্মা আঁকিত করিয়া রাখিয়াছেন। জিজ্ঞাস্য পক্ষে এই কথাটার অর্থবোধ সকল দিক হইতে স্বয়ংস্বয় করাই প্রধান কর্তব্যরূপে পরিগণিত হইবে।

সাহিত্যবুদ্ধগণ, অস্থমাম ১০ বৎসর পূর্বে, 'সাহিত্য' পত্রিকায়া বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অস্বক্য বিচার করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের কতিপয় কবিতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গসাহিত্য সমগৌরবে উৎসাহগমকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে প্রেরণ করিতে পারে। ঐ প্রবন্ধের উপসংহারেও এই মধ্যে বলিয়া-ছিলাম যে, বাঙ্গালী অতঃকালের উত্তরাধিকার-

স্বত্বে নানাদিক দিগা অতর্কিতভাবে নিজের জীবনপথে সত্যশিব-স্বন্দরের যেই সাদনা করিয়া চলিয়াছে, তাহা এখন সত্যক এবং সমুচিতভাবে সে নিজের সাহিত্যের মধ্যে প্রাকটিক করিতে পারে নাই; উহা ঘটাইতে পারিলে বাঙ্গালী বিশ্বসাহিত্যমণ্ডলীর বিশ্বদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে—আমার সেই স্বপ্নাচ্ছুতি সফল হইতেছে; কি ভাবে কোন্ দিকে সফল হইতেছে তাহার নিরূপণ এবং অব্যাক্য সভাপতির স্বপ্নবৃষ্টি নানাদিকে অভিন্ন স্বতরাং অস্বক্যর সভায় তথ্যভিত্তিক অপর কোনরূপ আলোচনা নিতান্ত অসম্ভব হইবে বলিয়াই মনে করি। মধুসূদন, হেম, নবীন বা বর্তমানের রবীন্দ্রনাথ যেমন পরস্পরে স্থান বিনিময় করিতে পারেন না, মধুসূদন যেমন হেম নবীন রবি হইতে পারিতেন না, তেমনি রবীন্দ্র ও মধু-হেম-নবীনের কৃতিত্ব-বোটি লাভ করিতে পারিতেন না—চেষ্টাও করেন নাই। তিনি নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিশক্তি এবং কবিত্ব-শক্তির ফল উপাধিব্যবহার কবি-পদবী অর্জন করিয়াছেন, এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের বিশিষ্ট চরিত্রব্রহ্মা আঁকিত করিয়া রাখিয়াছেন। জিজ্ঞাস্য পক্ষে এই কথাটার অর্থবোধ সকল দিক হইতে স্বয়ংস্বয় করাই প্রধান কর্তব্যরূপে পরিগণিত হইবে।

সাহিত্যবুদ্ধগণ, অস্থমাম ১০ বৎসর পূর্বে, 'সাহিত্য' পত্রিকায়া বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অস্বক্য বিচার করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের কতিপয় কবিতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গসাহিত্য সমগৌরবে উৎসাহগমকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে প্রেরণ করিতে পারে। ঐ প্রবন্ধের উপসংহারেও এই মধ্যে বলিয়া-ছিলাম যে, বাঙ্গালী অতঃকালের উত্তরাধিকার-স্বত্বে নানাদিক দিগা অতর্কিতভাবে নিজের জীবনপথে সত্যশিব-স্বন্দরের যেই সাদনা করিয়া চলিয়াছে, তাহা এখন সত্যক এবং সমুচিতভাবে সে নিজের সাহিত্যের মধ্যে প্রাকটিক করিতে পারে নাই; উহা ঘটাইতে পারিলে বাঙ্গালী বিশ্বসাহিত্যমণ্ডলীর বিশ্বদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে—আমার সেই স্বপ্নাচ্ছুতি সফল হইতেছে; কি ভাবে কোন্ দিকে সফল হইতেছে তাহার নিরূপণ এবং অব্যাক্য সভাপতির স্বপ্নবৃষ্টি নানাদিকে অভিন্ন স্বতরাং অস্বক্যর সভায় তথ্যভিত্তিক অপর কোনরূপ আলোচনা নিতান্ত অসম্ভব হইবে বলিয়াই মনে করি। মধুসূদন, হেম, নবীন বা বর্তমানের রবীন্দ্রনাথ যেমন পরস্পরে স্থান বিনিময় করিতে পারেন না, মধুসূদন যেমন হেম নবীন রবি হইতে পারিতেন না, তেমনি রবীন্দ্র ও মধু-হেম-নবীনের কৃতিত্ব-বোটি লাভ করিতে পারিতেন না—চেষ্টাও করেন নাই। তিনি নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিশক্তি এবং কবিত্ব-শক্তির ফল উপাধিব্যবহার কবি-পদবী অর্জন করিয়াছেন, এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের বিশিষ্ট চরিত্রব্রহ্মা আঁকিত করিয়া রাখিয়াছেন। জিজ্ঞাস্য পক্ষে এই কথাটার অর্থবোধ সকল দিক হইতে স্বয়ংস্বয় করাই প্রধান কর্তব্যরূপে পরিগণিত হইবে।

লাভ করে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই অবস্থার প্রচলিত নাম, Classic. প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক জাতির মধ্যে সাহিত্যের এই লক্ষণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকটিত বলিয়া ক্লাসিক বলিলে সাধারণতঃ গ্রীক এবং রোমক সাহিত্যকেই বুঝায়, গ্রীকজাতি সাহিত্যে শিল্পে এবং সমাজ-জীবনে এই ক্লাসিক আদর্শের সাক্ষ ও শিক্ষক। গ্রীকজাতির সভ্যতা এবং ইহপরকালের আদর্শ সকলদিকে দৃষ্ট এবং মনের মধ্যে এই সঙ্গতির আদর্শ মূর্তিমান পথ্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, এই জাতি দেহ এবং মনের সমঞ্জসিত বিকাশের আদর্শে জীবন পরিচালিত করিতেন বলিয়া, তাহাদের সাহিত্য ও সঙ্গীত এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতি ললিত কলার মধ্যেও সত্য-নিব-স্থম্বরের এই স্থির সঙ্গতির আদর্শ মূর্তিমান হইয়া তাহাদিগকে এই ক্ষেত্রে পৃথিবীর শিক্ষকরূপে তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রাচীন এবং রোমক সাম্রাজ্যের ক্ষয়ের পর সমস্ত ইয়োরোপের সভ্যতা 'মধ্যযুগের অন্ধকারে' আচ্ছন্ন হইয়া যায়, কিন্তু এই অন্ধতমসাম্রাজ্য প্রেম সমুদ্রের বক্ষস্থল হইতেই বিবদেবতা ইয়োরোপীয় আধুনিক সভ্যতার কল-কামিনীর মূর্তি প্রকটিত করিয়াছেন, এই মধ্যযুগ হইতেই ইয়োরোপে নব আধ্যাত্মিক আত্মায় হইতে আরম্ভ হয়। উদাহরণক অবলম্বন করিয়া দেবতা ক্রমে অভিনব বিজ্ঞান দর্শনের স্পষ্টপূর্ণক ইয়োরোপীয় শিল্পসাহিত্যের পথ, নব অভিনব ভূবনেশ্বরী মূর্তি খাড়া করিয়াছেন, তাহা গ্রীসেবৃ ধন্য-সমরপ্তীজাত একোডাইটস বা বিনস হইতে একটা বিশেষ দিকে অগ্রসর। তিনি শতদল-বাসিনী; এবং এই শতদল মহত্ত্ব-সভ্যতার ক্ষয়রূপে উর্দ্ধদিকে—দেহ-মনের অতীত

লোকের দিকে বিকশিত হইয়াই ললিত-কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ধারণ করিতেছে। মহত্বের ভাব ইচ্ছা এবং জ্ঞান তাহার দেহবস্তুর সামর্থ্যকে অতিক্রম করিয়া, পরম প্রাচ্যুবিলাসে উন্নতি হইতেছে বলিয়া, শিল্পসাহিত্যের এই ভাব-অতিরেক অবস্থার নামকরণ হইয়াছে—রোমান্টিক। উহা ইয়োরোপীয় সভ্যতার Renais Cance বা নবজীবন হইতে উপজাত হইয়া ইয়োরোপ-থও আধুনিক সাহিত্য এবং ললিত কলার প্রধান লক্ষণমূর্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই দেশের আধুনিক সাহিত্য এখন নানাদিকে নানামুখে অগ্রসর—কিন্তু যেটামুটি উৎসকে এই 'রোমান্টিক' নামে সঙ্গত করা যায়! উহা সময় সময় এই ভাব-অতিরেকের অবস্থা হইতে আরও অগ্রগামী হইয়া, ভাবার শক্তিও সামর্থ্যকে একবারে উল্লঙ্ঘন করিয়াও—সঙ্গীত এবং চিত্রকলা প্রভৃতির রাজ্যে সাধিকার এবং অনধিকার প্রবেশ করিয়াও অগ্রসর হইতেছে।

এখন, আমাদের সাহিত্যের পূর্ণশুরিগণের কবিবাস্য, পঞ্চাশোচনা করিতে বলিলে দেবিত্ব, তাহারাও সাহিত্যের জিহবার লক্ষণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রাচীন মুহুম্বরাম ঘনরাম প্রভৃতি মনসার পৃথির কবিগণ কিংবা ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেবিত্ব, তাহাদের মধ্যে সাহিত্যের 'ওরিয়েন্টল' আদর্শই ক্ষুণ্ণীভূত করিয়াছে। তাহাদের পথ, নব ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিবেচন পরিচয়ে বাঙ্গালীর মন মুহুম্বরাম হোমজ প্রভৃতির মধ্যে বেশীভাগে ক্লাসিক আদর্শেই উন্নতি। ইহারা নব্য বঙ্গের ভাববাহকে ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া সাহিত্যজগতের সমুদ্র ভাব এবং বস্ত-

সম্ভারকে ভারতীয় মনের দ্বারা আত্মকরিয়াই বঙ্গ-সাহিত্যকে বিবের ক্লাসিক-সাহিত্য-সমতলে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেকের মধ্য দিয়া বঙ্গ-সাহিত্য এবং বাঙ্গালী অপূর্ণকে লাভ করিয়াছে—বাঙ্গালীর মনোবীচন-অভাবনীয় রূপেই প্রসারিত হইয়াছে। ইহাদের প্রতিভা-সম্মান না ঘটিলে, বাঙ্গালী হয়ত প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের গীতকলার অগ্রসর হইতে পারিত, কিন্তু আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের কোলিন্দ-দরবারে বসিবার উপযোগী ভাব ও ভাবার সামর্থ্য এবং বস্তুভিত্তি কথন লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। ইহাদের পর, নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ঐতিহাসিক ক্ষেত্র অবলম্বন পূর্বক বৈষ্ণব 'চরিত' কবিগণের পদ্যাবলম্বনে ইয়োরোপীয় রোমান্টিক আদর্শকে যেমন নবভাবে অত্মসরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শক্তি এবং প্রসার বন্ধিত করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও যেমনি বৈষ্ণব 'গীতি' কবিগণের দীপকালত পূর্বক খণ্ডকথা গীতিকবিতা এবং সঙ্গীতকবিতার ক্ষেত্রে আত্মাহুসরণ করিয়া নব নব ভাব-ভিত্তিকের রাজ্যে বিলসিত হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে হয়ত মুহুম্বরাম শক্তি, হোমজের বিশিষ্ট গৌরব কিংবা নবীনচন্দ্রের জ্বালাতনময়ী ভাবপ্রবণতা নাই, কিন্তু তাহারা মধ্যে বঙ্গভাষার যৌবনোপযোগী এমন একটা তরবোচ্ছল লাস্যলীলা এবং অনীমসংকট নঞ্চচমক আছে, সর্বোপরি মুহুম্বরামের ক্ষুদ্র সরল বস্তুবিশ্ববস্তুলিকে অলম্বন পূর্বক অনন্তের দিকে—অগ্রাঙ্গ এবং অজ্ঞাতের উদ্দেশ্য এমন একটা অনির্লচনীয়া সঙ্কেত বা ঈশ্বার ক্ষুরিত হইয়াছে যে, উহাই আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে প্রাচ্য-সাহিত্যের তরফ হইতে নব

মাধ্যম-অধিকার সঙ্গমণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সাধুবাদ অর্জন করিয়াছে; এবং উহাই ১৩১৩ সনের নোবেল পুরস্কার অর্জন পূর্বক আমাদের বঙ্গসাহিত্যের মুখোচ্ছল করিয়াছে।

আমাদের কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর কবি-সম্পর্কে যাহা বলিয়া আসিলাম তাহা যে নিতান্ত সত্যকথা, উহা বঙ্গসাহিত্যের পরিদর্শক মাঝেই স্বীকার করিবেন, ইহাদের একজন যাহা দিয়াছেন, অজ্ঞানে তাহা স্মারিতেন না। হুতরাং ইহাদের মধ্যে ইহারবিশেষ করিতে যাহা অনেককালে একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া বই নহে।

এই প্রকার বিচারের দ্বারা আমরা কেবল নিজের অজ্ঞততা এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন পরিচয় দিতে থাকিব—উহা প্রকৃত সাহিত্যিকের বিচার হইবে না। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, আমাদের সাহিত্যে এমন কবি জন্মেন নাই—বলিতে কি কোন সাহিত্যেই জন্মেন নাই—যাহার মধ্যে সাহিত্যের মাকুল্য শক্তি সঞ্চারিত হইয়া এবং কৃত্তি লাভ করিয়া তাহাকে সাহিত্যের সর্বাবদীশমত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে তুলিয়া ধরিতে পারে।

বন্ধুগণ, এখন আমাদের সময় উপযোগী বিষয় বিচারে অবহিত হইব। আমাদের রবীন্দ্রনাথ কোন গুণের দৃষ্টান্ত সমুপস্থিত করিয়া ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের সাধুবাদ অর্জন করিলেন; এবং এই পরাধীন দেশের উদীয়মান সাহিত্যের জ্ঞান ইয়োরোপের মূল্যবান স্ট্রীকারগৌরব অর্জন করিলেন? ইহা সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক আহৃত সভা বলিয়া, এবং সভার আলোচনাও কোন কোন দিকে বিশদাধ পন্থায় অগ্রসর হইতে চাইয়াছে বলিয়া, বিশেষতঃ আপনাদিগকে

ক্ষেত্রে আমাদের অভিমতটুকু জানিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন দেখিয়া, আমরা উত্থাপিত প্রশ্নের মোটামুটি ধারণা এবং মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আপনারা হয়ত ইংরাজী গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ কবির জীবনব্যাপী রচনাসমূহ হইতে বিশেষতঃ ‘কবিকা’ ‘নেবেতা’ এবং ‘খেয়া’ হইতে, (প্রচলিত কথা) কেবল ‘ধর্ম-ভাবের’ লক্ষণযুক্ত সঙ্গীত এবং সঙ্গীত-জাতীয় কবিতার অল্পবাহু সমষ্টি। হৃতরাগ শ্রোতৃ জীবনের একটা বিশেষ ভাগযুক্ত কক্ষক্ষেত্র হইতে একটা বিশেষ আদর্শ সমুৎপন্ন রাখিয়াই কবি ইংরাজী গীতাঞ্জলি চতন করিয়াছেন, এবং নানাদিক বারীনভাবে উৎসাহের ইংরাজী অল্পবাদ সমাধা করিয়াই তাহা ইয়োরোপের পরীক্ষাধীন করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ স্ববকের প্রকাশপ্রাপ্তি এবং ভাবসম্পত্তির মধ্যে এমন একটা বিশিষ্ট অঞ্চল মনোমদ সৌরভ বিজাতীয়ভাবের আত্মরূপ ভেদ করিয়াও পরিষ্কৃত হইতেছে যে, ইয়োরোপীয় বিচারক মণ্ডলী কবিকে একজন প্রথমশ্রেণীর কবি বলিয়া চিনিয়া লইয়াছেন; এবং ১৯১৩ সালের নোবেল পুরস্কার উদ্বাহর প্রাপ্য বলিয়া নির্ধারণ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই।

এখন, ষাংরা অতিনিবিষ্ট সাহিত্যিক নহেন, কিংবা ষাংরা তুলনামূলক অধ্যয়নের রীতি অবলম্বনে সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ করেন না, অথবা ষাংরা সমাক্ষমণের কোনরূপ ধার না দিয়া কেবল উপস্থিতের অল্পভব সাহায্যেই ‘ভালমন্দের’ স্বাদ গ্রহণপূর্বক সাহিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের চক্ষে বিলাতী পণ্ডিতমণ্ডলীর এই বিচার-ব্যাপক একটা প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীতি হইতে

পারে। এইরূপ প্রতীতির খণ্ডে দৃষ্টান্ত অজ্ঞকার সভামধ্যেই পাইয়াছি। কবি রবীন্দ্রনাথ যে সকল কবিতামূলে আমাদের অনেকের নিকট পরিচিত, কিংবা যে সকল কবিতা তাঁহাকে এই সাহিত্যে ‘অমর’ করিয়া রাখিবে বলিয়া অনেকে মনে করেন, উৎসাহের অধিকাংশই হয়ত ইংরাজী গীতাঞ্জলিতে পাইবেন না; এমন কি, অল্পবাহিত কবিতা-গুলিও হয়ত বাঙ্গালার যেই সমস্ত অংশমূলে আপনাদের সমক্ষে মাহাত্ম্য প্রদর্শন পূর্বক স্তুতিমুদ্রা লাভ করিয়া আঁছে, অনেক সময় তাহাও অল্পবাহির যোগ্য বিবেচিত হয় নাই দেখিয়া আরও বিশ্বদ্বাপক হইবেন! বহুগুণ, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া এই সমস্তার এক-মাত্র প্রভুত্বের এই হইতে পারে যে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের অধীকা কচি এবং বিচারপ্রণালী আমাদের হইতে নানাদিকে স্বতন্ত্র; অপিচ, রবীন্দ্রনাথও ‘বিলাতী’ কবির সমুচিত নিক্ষেপণ এবং প্রয়োগের প্রণালী অবলম্বনেই তাহাদের সাধুবাদ অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রথমতঃ প্রথম ‘অবস্থায়’ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবার পর বিলাতী সংবাদপত্রে উদ্বাহ যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিলে একটা বিষয় বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। তাহা এই যে, সমালোচকগণ—অশ্রুত তাহাদের মধ্যে বর্তমান ইংরাজী সাহিত্যের নামজালা সমালোচক কেহ আছেন কিনা জানি না—কেহই তাহাদের প্রাচীন কবিগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘তুলনায় সমালোচনা’ করিতে চেষ্টা করেন নাই। কবি ষ্টেয়েটস্ কেবল কুমিকায় গীতাঞ্জলির ভাবগতকে ‘স্বপ্নাবতারের জগৎ’ উল্লেখের সঙ্গে ‘willow wood’-এর

সঙ্গে তুলনা পাড়িয়াছেন; ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান-উত্তরে প্রাচীন পারস্ত কবিগণের ধর্ম-ভাবুতা এবং আধ্যাত্মবাহার শব্দভাষ্য উপনিত করিয়াছেন; টাইমস্ উদ্বাহ প্রকাশ-নীতিকৈ দায়ুদের গীতসংহিতার সমপ্রস্তুতিকৈ বহিরা ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের নব্য-কবিগণ এইভাবে সরল অথচ আন্তরিক ‘অভিনিবেশ’ সাহায্যে ইংরাজ জীবনের দিকে তীক্ষ্ণ তরঙ্গ দৃষ্টি পতিয়ালিত করিতে আনিলে, ইংলণ্ডও যে বর্তমানকালে এই প্রকার কবিতার একটা সাহিত্য পাড়াইতে পারে, গীতাঞ্জলির দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া টাইমস্ এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন। বিলাতী জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা এবং বস্তু-বিষয়কে প্রসিদ্ধাক্ষর অবলম্বন করিয়া, এইরূপে যে একশ্রেণীর নীতিকৈ বা আধ্যাত্মিক মধুরসের তরল কবিতা রচিত হইতে পারে, তাহাযে বিলাতী বিচারকগণ অনেকেরই এক মতে হইয়াছেন, মনে করি। এ স্বল্পেই বিলাতের চক্ষে রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য নিহিত বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রতীতি হইতেছে। রবীন্দ্রকে সর্বপ্রথম সাহায্যে পরিচিত করিয়াছেন, আয়ল্ডের কবিগণ। আয়ল্ডও সম্প্রতি প্রাচীন কেলটিক সাহিত্যের ভাবগত আদর্শের সমুৎপাদক এক নব সাহিত্যের প্রচেষ্টা প্রতীমান; উহা নানাদিকে পারস্তের স্বত্বী এবং স্পেনের বৈষ্ণব সাহিত্যের আদর্শ এবং রীতির সহোদর। বর্তমানে ষ্টেয়েটস্ এই নব সাহিত্যচেষ্টার নেতা। আমি অজ্ঞ কেলটিক সাহিত্যভিত্তির সহিত প্রাচীন প্রাচ্য বিশেষতঃ পারস্যকৈ ও বৈষ্ণব কবিগণের রীতি-সামঞ্জস্য উল্লেখ করিয়াছি। এই আইরিশজাতির সহিত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারতীয় আর্থের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর সাধন্য নানাদিকে পরি-

লক্ষিত হইবে। কেলটিক সাহিত্যরীতিই যে অভিনব ভাবুততার প্রবণত্ব ঘুলিয়া দিয়া গীতাঞ্জলির ঘর্ষ শব্দভাষ্য হইতে ইয়োরোপে রোমান্টিক সাহিত্য স্বপ্নজনের সহায়তা করিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞগণ জানেন। বর্তমানের আইরিশ কবিসমূহ একপ্রকার ‘এক-রোপা’ হইয়াই আধুনিক বিলাতে এই সাহিত্যিক দল গঠন করিতেছেন। বিলাতী সাহিত্যে রেক-একজন নীতিকৈ কবি বহিরা পরিগণিত, ষ্টেয়েটস্ বিস্তারিত ভূমিকাসহকারে তাহার রচনাসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন; এবং প্রবলভাবে মাহাত্ম্য ঘোষণাপূর্বক রেককে প্রথমশ্রেণীর কবি প্রতিপত্তি দানের চেষ্টা করিয়াছেন। নীতিকৈ বলিতে দার্শনিকতার তরল হইতে যাঃ। বুদ্ধায়, অথব রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত প্রস্তাবে সেই শ্রেণীই না হইলেও, কোন কোন বিলাতী সমালোচক গীতাঞ্জলির ধর্মভাবুতা এবং অস্পষ্ট সংকেতের প্রণালী লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকেও নীতিকৈ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। হৃতরাগ আইরিশ কবিগণের প্রাথমিক সহায়ত্বিত এবং সাধুবাদ হইতেই যে বিলাতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের সহায়তা ঘটাইয়াছিল, অপিচ ইয়োরোপের—বিশেষতঃ ফ্রান্স এবং জর্মণীর ‘সিদ্ধ্যোনিষ্ট’ নামক প্রসিদ্ধ কবি সংপ্রদায়ের কাব্য প্রচেষ্টা হইতেও যে ওই পরিচয়ের সর্বপ্রধান অবসর-টুকু অগণীত হইয়া উদ্বাহ ভূমি বিলাতের মনোজগতে আগে হইতে নানামতে পরিষ্কৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই শেষোক্ত বিষয়ে পরে দৃষ্টি করিতে পারিব। গীতাঞ্জলির প্রকাশ রীতিকৈ (manner of style) যে সমগ্রায়ে বিলাতের চক্ষে চমৎকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা বিচারকমাজকেই স্বীকার

করিতে হয়, উহার অর্থ বস্ত্রবিষয়ে প্রকট জ্ঞান কিংবা স্থির সহ্যক্ষমতা জন্মিতে না পারিলেও, উহার ভাষণে ঈশারাগুলি তাহারে প্রাচ্য দ্রব্য অগতি আধাতিক তারম্য গতিকেই সর্বপ্রথমে বিলাতী পাঠকের হৃদয়মধ্যে একটা অনন্তচিত্ততা এবং আবেশ জাগাইতে পারিতেছে। আমরা জ্ঞানি, ইয়োরোপীয় সাহিত্য এখন কত ব্যাপকভাবে স্ফূট অর্থ সাধনায় এবং বস্ত্রনির্মাণ সাধনায় অবস্থিত। কোনরূপ অস্পষ্টতার প্রণালী অলপ-লোকের ভূমিবিষয় অবলম্বন ব্যতীত 'দধ' লক্ষণের নান্দিক সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত, বিলাতী সাহিত্য কাব্যে স্থিতি কিংবা দ্রাঘিইতেও পবিত্র কিনা সম্ভবে। স্তব্ধতা, বেগা হাতের, স্বকীয়লক্ষণ পূর্ণম নৈপুণ্যসহকারেই বর্তমান গীতাগুলি সংগ্রহ পূর্ণক বিলাতের সময়ে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

এখন, এই গীতাগুলি পাঠ করিতে বসিলে যে আনন্দ লাভ হয়, উহাকে পাঠক হয়ত ভুলভাবে মুগ্ধক করিতে পারে না, কোন দূর্বাক্ত অল্প কথার বা স্মরণীয় বাক্যের অর্থ কিংবা বাস্তবশক্তির অধিকারে আনিয়া ধরিতে পারিলেই উহা পাঠকের মুগ্ধক হইল স্থির করিতে হইবে—উহা পাঠকের প্রকৃত প্রাণির অধিকারে আসিল। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কবিগণ মহতের এই প্রাণি অধিকার বর্জিত করিয়াই সম্পূর্ণ হন। কিন্তু, যেই কবি বাক্যশক্তির সীমা-অধিকার উল্লঙ্ঘন করিয়া, কোনরূপ কাহিনী কিংবা অবস্থাকে অবলম্বন পূর্ণক, চিত্রকলা অধিকারের রেখা বা আভাস-প্রণালীর সাহায্যে কিংবা সঙ্গীত-অধিকারের অনির্দিষ্টচরিত্র বস-বাগিনী অন্তর-আভাঙ্গ বা জন্মের ফাঁকতালের সাহায্যে, অথবা

উভয় প্রণালীকেই নির্দেশে এবং ওতপ্রোত ভাবে অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা পূর্ণক পাঠককে আনন্দ দান করেন, তিনি পাঠককে এই আনন্দটুকু তোকবাক্যে নিজের প্রাণি ভাঙারের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে কোন সাহায্যই করেন না। তিনি স্বয়ং যে আনন্দকে স্বামী সীমার মধ্যে আনন্দনপূর্ণক লাভ করেন নাই, পাঠককে তাহা ধরাইয়া দিবেন কি করিয়া? স্তব্ধতা, পাঠকও যে আনন্দ লাভ করে তাহা স্বয়ং অধিকারের আনন্দময় প্রথমমুহুর্তেই মুগ্ধিত হয়। সমস্ত কবিতাকে কঠক করা ব্যতীত, পাঠকের পক্ষে ই প্রদানেশ বা উহার ঈশার টুকুও ইচ্ছাশ্রদ্ধ করার কোন স্থিতিই থাকে না, পাঠককে একরূপ স্থিতি দেওয়ার পক্ষে কবির কোন ইচ্ছা নাই—অগতি, নিজের-প্রণালীবাশ উহার বিরোধী। স্তব্ধতা, ই প্রাণিটুকু বাস্তবিক পক্ষে লাভ কি—এ আনন্দটা কবির কৃতিত্ব না 'পাঠকের বন্ধনাকৃতি-গতিকেই লজ হইতেছে, এইরূপ একটা মশং-প্রশ্নে জিজ্ঞাস্য পাঠকের চিত্র চিরকাল আশোষিত হইতে থাকে। এই কারণে, একই কবিতা পাঠান্তর যেমন কাহারও পরম আনন্দ তেমন কাহারও পরম বেদনা উল্লিখিত হওয়াটাও অসম্ভব নহে। ইংরাজী গীতাগুলির প্রায় সমস্ত কবিতাই এই জাতীয়—এইরূপে সঙ্গীত এবং চিত্রশিল্পের মধ্যপথে—মধ্যভূমিতে রেখা এবং স্থরের আভাসময়ী মায়াপুরীর স্রষ্টা। উহার যেন স্বপ্নদৃষ্ট বাস্তব সত্যের আভাস বই নহে। জিকোবাস্ক্রি অথচ বহু কচাচরুর মধ্যদিয়া মহত জীবনের এবং জগতের দিকে দৃষ্টি। কবি রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন গড়েপড়ে এইরূপ

দার্শনিকতার সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা একদিকে 'যেমন সঙ্গীতের প্রতিভা, তেমন অগ্রদিকে এই দার্শনিকতার প্রতিভা, তাহাতেও সম্ভব নহে। চিত্র-কলার পরিভাষায়, তাঁহার কবিতা অনেকরূপে স্থলভ; চারিদিকের আবেশন-বিশুদ্ধ—কেবল একাধিনিবিশিষ্ট ছবি—জলভবি (water colour "painting") এই প্রতিভা অনেক সময় বরং প্রকৃত সত্যকে প্রকৃতনৈবেদ্যে দর্শন না করিয়াও কেবল একটা বিশেষ চক্রে এবং পথে দর্শন করার প্রতিভা। তাঁহার মেজাজের এই বিশেষত্বকে ইংরাজীতে genius of temperament বলাতে পারি। এই মন্দির সহিত—কবির দর্শন প্রণালী অগতি প্রকাশ-আদর্শের সহিত সহ্যক্ষমতা অর্জনে করিত না পারিলে, এই সমস্ত কবিতার প্রাণত্ব ঈশারা বা সত্যের স্পর্শ সময়ে পাঠকের হৃদয় নিমল হইয়া অবস্থান করিলে, উহার বেদনাধারক হইয়া পড়াও বিচিত্র নহে। ইংরাজী গীতাগুলির কবি এদেশের বাস্তবজীবনের ছোট ছোট কাহিনী এবং ঘটনাবল্যকে ঈশারামাঝে ধরিয়া ধরিয়া নিজের 'অজ্ঞাত এবং অদৃষ্টতত্ত্বের কণিক আভাসময় উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, উহা 'দধ' তরফের বা জগতের 'অব্যক্ত-সদ্ব্যবস্থা' আভাস। অধিকাংশ কবিতাই নিত্য 'পাদের পদ্য' রাগিনী বিনাইয়া সাধারণ শ্রুতির অগম্যলোকে লুপ্তকল রেখা টানিয়াই নিজকে চরিতার্থ মনে করিতেছে। স্তব্ধতা, উহারে মধ্যে অনেক স্থলেই ভাষা-অধিকারের কিংবা প্রাণি সাহিত্য-অধিকারের কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়াও অনেক নিঃসঙ্গোক্ত রায় প্রকাশ করিতে পারিবেন; কেহই

ধরাইয়া দিতে পারিবে না—কি পাইলে! পারিলেও, উহার মায়ায় হত অনেক সময় যুব বেশী বলিয়া ঠেকিবে না। কিন্তু, ঈশার ভাবের অধিকার ভিষ্মায়াও ভাল-মান-রাগিনীর বা সহবৎসরানন্দচৌকির অমুগ্ধ-অদৃষ্ট আনন্দম্পন্দনকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বসিয়া ধর্মার স্পন্দনমধ্যে অদৃষ্ট করিতে চায়, পূর্ণিষ্ট লাভলাভ হিমাংগের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আনন্দ-আবেশ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে চায়, সাহিত্যের তরফে বসিয়াও তানসেনের হস্তস্থিত একতারার একট তার হইতে একোচ্ছিন্ন অথচ বিভিন্ন রাগিনীর সঙ্গত উপভোগ করিয়া পরিচুপ্ত হইতে চায়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের এই জগদ্বিজ গায়ককবি রবীন্দ্রনাথের চরমকণ্ঠপরিপতির কুহককলীকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা উদার উপাঞ্জল বলিয়া মনে করিতে পারিবে। উহাকে বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে গেলে অনেক স্থলে বেদনা ভিন্ন অল্প কোন প্রাণির স্থিতি যেমন কদম, তেমনি হৃদয় দিয়া কিংবা স্মারু পথে বুঝিতে গেলেও অনেক সময় অদৃষ্ট বলিয়াই অদৃষ্ট হইতে থাকিবে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক বা গুণ কবিতা মাত্রের মধ্যেও এই সঙ্গীত এবং চিত্র জাতীয় এবং অনির্দিষ্টচরিত্র একটা প্রাণি না থাকিয়া পারে না; উহা শ্রেষ্ঠ কলা শিল্প মাত্রেরই সমস্ত ভাবার্থ সঙ্গতি এবং পূর্ণিষ্ট প্রাণির উপরি-পাওনা। কোন না, সৌন্দর্য বা আনন্দময়সের অনির্দিষ্টচরিত্রই শ্রেষ্ঠ শিল্প-মাত্রের 'অপরিহায্য লক্ষণ। বলিতে গেলে, উহা শিল্পাভাস—প্রকৃত প্রস্তাবে কবির অন্তরান্ধার সহিত সঙ্গর্গ জন্মিত; উহা কবিতা ভাষা এবং প্রাণশ্রুতি বিষয়বস্তু এবং বক্তব্যের সমূহ এবং আবেশন হইতে উপজাত

হইয়া শিল্পের অগতি কবি-ব্যক্তিকের পরিচিক একটা অনির্লভনীয় প্রাঞ্জলিগত পঠকের চিত্রপটে মূর্তিত হইয়া যায়—আগত ভাষা-বুদ্ধি কিংবা অর্থ-বুদ্ধির তরফে আনিয়া কোন মতে ধরা দেয় না। বিতুরিত রামায়ণ মহাভারত মেঘদূত শকুন্তলা বা কপালকণ্ডলা ইত্যাদি প্রত্যেকের অন্তরঙ্গীয় সমগ্র-হরের মধ্যেই কবির ক্ষমত-সম্পন্ন এইরূপ একটা অনির্লভনীয় সৌরভ আছে—উদাহরণ ভাষা-বীতি ঘটনাচক্র এবং অর্থ-অভিব্যক্তির মধ্য হইতে এইরূপ একটা বানিশি অগতি অনির্লভনীয় সঙ্গীত এবং চিত্র-কল্পিত আনন্দের ইঙ্গিত আছে। গীতাঞ্জলির ক্ষুদ্র কবিতা সমূহ সময় সময় জাগ্রতভাবে স্পষ্ট বাক্যের অর্থনাথ্যতা সাধন না করিয়াও— এমন কি সময় সময় তাহাকে অসঙ্গত করিয়াও, এই অনির্লভনীয়তার ক্ষেত্রে কেবল দূর-দূরপালিনী ক্ষণপ্রভা প্রসারিত করিতে

চাহিয়াছে। এই স্থলেই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব! সাহস করিয়া, হৃদয় অর্থভিত্তিকে উদ্দেশ্যতঃ পবিত্র্যার পূর্বক, দ্বন্দ্বমকে লম্বু তবল কাগজের ঘূড়ীর দ্বায় অধ্যাত্ম-ভাবেয় শূন্যবিশ্লেষ্য যুরিবার জগৎ পরিচালিত করায়, এক্ষেত্রে উহার সার্বভৌমত্ব টুকু সঞ্চিত ফল হইয়াছে সত্য; কিন্তু অগ্রদিকে দূর-দূরান্তরিত অধরুণয়ন মূর্তি দৃষ্টি এবং চমক চমককারভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহারোগীয় বিচারকগণ গীতাঞ্জলির এই প্রতাপ্তিকে মৌলিকতা বলিয়া অহুভব করিতে, অগতি রবীন্দ্রনাথকে ও একজন পরম অধ্যাত্ম-অধিকার-শালী কবি বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারিয়াছেন।

এখন, এই গীতাঞ্জলির সমগ্রভাষ্য বিলাতী সাহিত্যের দিকে একবার দৃষ্টি পরিচালিত করুন।

(ক্ৰমশঃ)

শ্রীশ্যামসেন সেন।

গেটের নাটকশিল্পে অধ্যাত্মবাদ

জগৎ পরিবর্তনশীল—প্রতি মুহূর্তে নব নব মুষ্টিদ্বারা এই জগতের জীবন। প্রত্যেকের শিশিরসিক্ত সৌরক-কন্ডের প্রস্তুত ক্রমের সঙ্গে রহস্যলাপ—জগতের শৈশব-জীবনের ছবি কত সুন্দর। আবার কতিপয় মুহূর্তের পর রত্নময়ী প্রকৃতি সৌর-কিরণজালেয় সহিত মিলিত হইয়া যে রাক্ষস লীলা হুড়িয়া সেন তাহা কি দুর্লভ! তার পর ক্রমশঃ সব লীলা সংহার করিয়া সাক্ষা-নীতুণ মৃদল-হিলোল-পরশে সংসার-জীভাশ্রম দেখেই বিশ্বস্তির গভীর নিস্তার কোড়ে আনিয়া জানাইয়া দেয়—সেখ সবই স্বর্গিক; চকবৎ পরিবর্তিতে দুঃখানি চ স্থানি চ—অন্ত-এবং

সব আপাত মনোরম বিষয়ে আসক্ত হইও না—আপাত দারুণ বিষয়েও বিরক্ত হইও না—স্বপ্নে ছুখে সমভাব অবলম্বন করিয়া চল। এই করণ হরের আশ্রয় প্রকৃতির সুখর বীণার তন্ত্রীতে আপাণিত হইতেছে।

মানবজীবন এই জাগতিক প্রবাহের মধ্যে পতিত হইয়া কখন স্বপ্নে—কখন, ছুখে—কখন আশ্রয়ে—কখন নৈরাশ্রে—কখন আশ্রিত—কখন বিরক্তিতে আবার কখন উদারিত—দিন গরিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে কে বলিবে? কেন এই প্রবাহ—এই বিপুল আবর্তন-কূল মহাভাবি তরঙ্গায়িত কে জানে? ইহার উদ্দেশ্য—ইহার পরিণতি

কথা কেহ জানে বা না জানে—তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া এই জগৎ ও জীবন-সমগ্ৰী ও বাস্তি—বিরাত বিশ্ব প্রকৃতিরও খণ্ড খণ্ড শক্তি-সমগ্রিতদেহ—পরস্পরের দিকে চাহিয়া—উভয়েই সমান স্রোতে সমান তালে সমান কয়লা তুলিয়া ছুটিয়াছে। আদিকাল হইতে ছুটিয়াছে—বিশাল ও বিপুল আশ্রয় স্থিতি করিয়া চলিয়াছে—ভৈরব নাম তুলিয়া চলিয়াছে—এবং অনন্ত কাল ধরিয়া চলিবে—এই আশ্রয়ে চলিয়াছে।

মানবজীবন পরিবর্তনের রত্নময়ী। রত্নময়ী মুহূর্তে পট পরিবর্তন হইতেছে—প্রত্যেক পটেই নব নব শৌর্ধ্য ও মাধুর্য সন্তার বিস্তৃত রহিয়াছে—মানব সেই সকল মাধুর্যের প্রলোভিত হইয়া ছুটতেছে কিন্তু উপভোগ্য বাসনা শান্ত হইবার পূর্বেই আশ্রয় কোঁলে পুনরায় পট পরিবর্তিত হইতেছে। নূতন পর্দা নূতন আসক্তি আনিয়া দিল—আবার তাহাতেই মত্ত হইয়া মানবজীবন ছুটাইয়া দিতে চলিল। ক্রমশঃ যাবার জগৎ ছুটাইয়া দিতেছিল তাহা হারািল। যাবার শক্তিতে জীভা করিতেছিল তাহা হীন হইল। দেহ মন প্রাণ—সমস্ত বিফল হইল—ভবের হাটে আসিয়া কারবার জমাইতে জমাইতে লাগে মূলে বিনশতি হইল। সমস্ত জুরাইয়া—আশা ভ্রমাদ সমস্ত নিমেষে হইল—জীবন-প্রদীপ মাস হইল—চিত্তাধুমে চারিদিক ব্যাপ্ত হইল। জীভা করিতে আসিয়া ইহার সহিত এখন এক সম্বন্ধ পাতিয়া বসিল—যে জীভার সামর্থ্য নাই—তথাপি জীভার শেষ নাই—জীভার শান্ত হইয়াছে—তথাপি জীভা এমন করিয়া পাইয়া বসিয়াছে যে ইহা হইতে নিস্তার পাইতেছি না—নিস্তার পাইবার উপায় দেখিতেছি না। দেহ ছাই হইল—রাহিল অধার। মনের ইচ্ছা ও

বৈধ্য, রহিল—অবসাদ। দেহের বল গেল, —রাহিল ককাল; জীবনের শৌর্ধ্য ও মাধুর্য—সমস্ত বিপুল হইল—রাহিল অশ্রুণ বাসনা। বাসনার প্রজ্জ্বলিত বহি দারুণ জ্বার রবে প্রমত্ত হইয়াছে—ইহুদন দিতে দিতে ক্রান্ত হইলেও যোগাইতেছি। ভক্তহরি সত্যই বলিয়াছেন—

ভোগা ন তুচ্ছা বয়মেব তুচ্ছাঃ।

কালে ন গতঃ বয়মেব গতঃ।

তুচ্ছা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ।

—তাই তুচ্ছা আমাদের জীর্ণ করিতেছে।

মানবজীবন—ইহা কি স্বপ্ন অবলোকার? ইহা কি স্বপ্ন জীভাকের হস্তের কন্ডক? ইহার কি এতথানেই ও এইরূপেই পরিণতি ও অবসান? সত্যই মানব-আশ্র। তাই তাহার ঈপ্সিত পথে চলিতে পারে না। মানবের ভ্রম কি? কিসে ভ্রম দূর হয়? ঈপ্সিত কি? কিসে তাহা পাওয়া যায়? ইহাই মানব-জীবনের অন্তরের বাণী। যিনি সমাজকে প্রবোধাইয়া দেন—যিনি দৃষ্টিহীন বিবেক ও বুদ্ধিকে চক্ষুমান করিয়া দেন—তিনিই বন্ধ—তিনিই দেহতা—তিনি অবতার। তাই পৃষ্ঠ, বৃদ্ধ, মহাদ, শত্রু আমাদের আদরের। তাই যুগে যুগে মহাপুরুষগণের বাণী অবশেষে জগৎ লোকে উদ্গীৰ্য হইয়া থাকে। আমাদের আলোচ্য গেটে উনবিংশ শতাব্দীর লেখক, দার্শনিক ও অবতার।

উহার নাট্যকাব্য 'ফষ্ট' আমাদের অনেক আশার কথা বলিয়াছে। পঞ্চমুখ মানব-সমাজের—মানবজীবনের অনেক রহস্ত উন্মোচন করিয়াছে, তাই আমরা এতদিনের ভাষায় বলিলাম যে, গেটে উনবিংশ শতাব্দীর স্বয়ি (the soul of his century).

(২)

জগতে ও জীবনে অনাদিকাল হইতে যে খেলা চলিয়াছে,—জড় ও জীব—অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতে যে ক্রীড়া প্রসারিত হইয়া সর্বত্র এক উদাসীন গানের স্বজন করিয়াছে ইহাই নাটকের মূল। মানবজীবনে—যে কল্পনাস্বরের উদাসীন গান মর্শের-নীচায় আলাপিত হইতেছে—তাহাই সম্পূর্ণরূপে বিচিত্রভাবে রচিত করিয়া চিত্রিত করাই নাটকের কার্য। উদাসীন গীতযোজনের মধ্যে যে আকার ও বন্দনবিহীন ভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতেছে—তাহাই সর্বসাধারণের সমক্ষে সম্পূর্ণরূপে বাৎসর্য্য করিতে হইলে—নাট্যকারের মোহন কলিকার প্রয়োজন। সেইজন্য গীতিকাব্য ও নাট্যকাব্য—একই তরঙ্গের দ্বিবিধ স্রোত। বৈজ্ঞানিকবিদগের মূর্খে স্তম্ভিত পান্ডা যাহ—সমুদ্রের উপরে যে মূর্খ ও উন্মত্ত তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হইতেছে তদপেক্ষাও ভীষণতর স্রোত জলধির অন্তঃস্থলে প্রবাহিত হইতেছে। তজ্জন নাটকের আলাপন মূর্খ ও নানাবর্ণে রঞ্জিত ও নানা স্বরে ও তানের স্বাক্ষরে মাদুর্য্যপূর্ণ হইলেও মানব মনের অন্তঃস্থলে যে মৌনবীণার আলাপন হইতেছে তাহার স্বাক্ষর আরও গভীর ও বিপুল। সেইজন্য হেগেল বলিয়াছেন নাটক পদ্যসাহিত্যের পরাকাষ্ঠা। তদপেক্ষাও উচ্চ—হান গীতিকাব্যমূলক পদ্যসাহিত্যের।

প্রাণ অপেক্ষা দর্শনের শক্তি অধিক। প্রাণের দ্বারা পরোক জ্ঞান জন্মে কিন্তু দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল। বালকবয়সে শিক্ষা দর্শন হইয়া হইতে আরম্ভ হয়। আজীবন দর্শনশ্রমের ক্রিয়া সমধিক। প্রাণ আত্মাদিপক্ষে কতকগুলি জ্ঞানের সংবাদ দেয় কিন্তু তাহা আত্মাদিগের চিত্তকে তাদৃশ

আকর্ষণ করিতে পারে না। উহা দ্বারা চিত্তে ঈদং ছাপ পড়ে মাত্র—কিন্তু তাহা তুলিয়া মাইবার সম্ভাবনা ততোধিক। কিন্তু দর্শনে সমস্ত মনোবিক্রিয় রমে নিম্ন হইয়া দৃষ্টি-বিষয়ে আবদ্ধ থাকে। তদ্বারা মানব মনো-ভাণ্ডারের সমধিক বৃদ্ধি ও উপচর হইয়া থাকে।

এই কারণে শ্রব্য-কাব্য অপেক্ষা দৃষ্টি-কাব্য আমাদের সমধিক আকর্ষণ-জ্বলিন্দ। বালকের পানের স্বরে শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে—কিন্তু যাত্রার কল্লাবেশভূজিত অভিনীত বিষয়ের প্রত্যেক স্পন্দন আমাদের দৃষ্টির কবাণ্ডলিকে পূর্ণ করে। রঙ্গালয়ের দৃষ্টাবলীসমুচ্ছিন্ন কল্লাবেশভূজিত অভিনয় আমাদের মনপ্রাণে আনন্দ ও মগ্নন করিয়া জীবনের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবেশলাভ করে। অন্তঃস্থ দৃষ্টি অভিনয়ের সঙ্গে জাতীয় জীবনের উত্থান ও পতন সমধিক নির্ভর করে। সাহিত্যে নৈতিক আদর্শ যেমন প্রয়োজনীয়—তেমনি দৃষ্টি ও শ্রব্য উভয়বিধ অভিনয়েও নৈতিক আদর্শ অঙ্গুর রাণা প্রয়োজন।

সাহিত্যের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সাহিত্যে তরলতা, প্রীলতা, স্ফুটন প্রাচুর্য্য—তৎকালীন জাতীয়চরিত্রের জড়তা ও হীনতার প্রতিবিম্ব বিশেষ। সাহিত্যে সমালোচনা—নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্ম বহুত, সংবাদ পত্র, মাসিক পত্রের প্রাচুর্য্য—ইহা তৎকালীন সমাজের উদ্ভিত চেষ্টা ও উৎকর্ষের সজ বাহুল্যের প্রতিবিম্ব। শাস্তি ও জ্ঞানের নির্মল প্রবাহ দর্শন ও ধর্মের চর্চা, বিজ্ঞান, নীতিতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনা—এক কথায় নব নব জ্ঞানের নব নব উৎসের ধারা—জীবনের চারিদিক—রাষ্ট্র, নীতি, শিক্ষা, লীলা, ব্যসায়,

বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প,—আলোকিত করিয়া সংসারকে স্বর্ণক্ষেত্রে পরিণত করে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিক্ষমভিত্তির যুগে রাষ্ট্রীয় শাস্তি ও মানসিক উন্নতির বিশালতা ও গভীরতার জন্ম আমাদের আদরের জিনিস। ইহা স্বাভাবিক সাহিত্যে এলিগবেচ-যুগে সেইরূপ আদরনীয়। ভারতীয় সাহিত্যের বৃন্দাবনের যুগ যেমন, পাশ্চাত্য সাহিত্যের মার্টিন লুথার, নক্স (Knox), ওয়াক্লিফ (Wyclif) মিল্টন (Milton) প্রমুখ নব যুগে সম্প্রদায়ের সাহিত্য তেমন বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রত্নরাশি। এই সকল পরিবর্তন যুগের (Transition Period) সাহিত্য মানবজাতির আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের প্রতি গভীর স্বাক্ষর জলন্ত দৃষ্টান্ত। শ্লেটো, মিল্টন, অ্যাডিসন, ভিক্টর হিউগো, গেটে, সিলার এক এক যুগের সাহিত্যের ও জীবনের পথ প্রদর্শক ঐক্যতারা। তাহাদের বিমল কিরণ ভবিষ্যৎ সমাজকে আলোক দান করিবার জন্ম অশ্রুদ প্রতাপে সাহিত্যের নিখিল আকাশে প্রদীপ্ত রহিয়াছে।

(৩)

আমাদের আদ্যোচ্য গেটে জ্ঞান্যপিতে সাহিত্যে কটপট বিম্বের উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিভাক্ষে অপ্রাকৃতভাবে পেশণী চালনা করিয়া গিয়াছেন। গেটে (Johann Wolfgang Goethe) ১৭৪৯ সালে ২৮শে আগষ্ট ফ্রাঙ্কফর্ট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া ১৭৬৬ সালে লিপ্সিৎক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁহার সমালোচন্য প্রতিভার বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ভাল-বাসা, সহানুভূতি, কর্মে পরম্পরের সহচর্য্য এই স্থানেই আরম্ভ হয়। লিপ্সিৎক হইতে ট্রাসবার্গ

নগরে রসায়ন (chemistry), শারীর-বিদ্যা (anatomy), সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব ও ব্যবহার-নীতি অধ্যয়ন করেন। এই স্থানে তাঁহার সজিত জ্ঞান্য সাহিত্যবীর হার্ডার (Herder) এর মিলন হয়। হার্ডার তাঁহার দৃষ্টি চারনের স্রীতি, হোমারের মহাকাব্য ও শেক্সপিয়রের নাটকের প্রতি আকর্ষণ করেন। ১৭৭২ সালে ব্যবহার-নীতিজ্ঞ হইয়া উপাধি লাভ করেন এবং রাজকীয় প্রধান বিচারালয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৭৭৬ সালে প্রতিক্রিউসেলের হন। সততার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনের জন্ম ১৭৮২ সালে 'লর্ড' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৮৬ সালে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উন্মোচনে প্রবৃত্ত হন। এবং নিউটনের আলোকতত্ত্বের খণ্ডন করিবার জন্ম ঐ বিষয়ের আলোচনা করেন। ১৭৯৪-১৮০৫ প্রসিদ্ধ দাম্পত্য নাট্যকার সিলারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। ১৮০৮ সালে নেপোলিয়নের সহিত মিলন হয়। ১৮১৬ সালে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। ১৮৩২ সালে ২২শে মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সিলারের পার্শ্বে তাঁহার দেহ পৃথিবীর কোড়ে স্থাপিত হয়।

আমেরিকান সাহিত্যবীর এমার্সন 'গেটে' শীকার প্রবন্ধে বলিয়াছেন—যে গেটে উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক ছিলেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণ যন্ত্রণ (Soul of his century) ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর জীবনে—কাব্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রনীতিতে, শিক্ষায়, লীলায়, ধর্মে বৈচিত্র্যের আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহার অভূতপূর্ণ প্রতিভাবলে তাহাদের সমন্বয় করিয়া সকলকে যথাযোগ্য সন্মান প্রদান করিয়াছেন। * এই সময়ে জ্ঞান্য সাহিত্য

* He was the soul of his century. * * He was the philosopher of this multiplying * * able & happy to cope with this rotting miscellany of facts and science, and by his own versatility to dispose of them with ease.

শক্তি বিপুল হইয়াছিল। জাতীয় জীবনে এক অবসাদ আসিয়াছিল; সাহিত্যে অশ্রীলতা ও কুকড়ির প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। কিন্তু আন্দোলনের বিষয় এই সময়ে (১৭৮০-১৮২০) জাধীন-সাহিত্য জাগতিক সাহিত্যের অগ্রগী হইয়া জগতকে নতুন ময়ে দীক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সাহিত্যে চিন্তায় নতুন স্রোত প্রবাহের মূল—গেটে, হার্ডার এবং শিলার। এই তিনজনই সমসাময়িক। ইহাদের জীবন সমন্বয় গ্রন্থিত—একই উদ্দেশ্য সাধনে বহুগতিকর হইয়া জগতে যে অভাবনীয় সাহিত্যের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন তাহার জ্ঞাত সমগ্র মানব সমাজ স্বীকার্য্য।

এই সময়ে দার্শনিক কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) “আধুনিক দার্শনিক” সাহিত্যে অভাবনীয় উদ্ভাবন করিয়া দর্শনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বেকন ক্র্যো-দর্শন (Observation), প্রকৃষ্টি (Experiment) ও অস্থান সাধন চারিটি প্রণালীর দ্বারা জ্ঞানের উপায় নির্ধারণ করিয়া বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন ও দার্শনিক জ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। দার্শনিক কাণ্ট বলেন ইঞ্জির গ্রন্থ প্রত্যাক্ষিক ক্র্যো-দর্শনের মূল। অস্থান সাধন ক্র্যোদর্শনারি প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষের মূলীভূত ইঞ্জিরের উপর মনের অবিকার বাহুজগত অপেক্ষা অধিক; অতএব ক্র্যোদর্শন অপেক্ষা মানসিক ব্যাপারের পৃথক্ অধিক জ্ঞান সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।

এই সত্যের উদ্ভাবন করিয়া তাহার উপর সমগ্র দর্শন শৃঙ্খল স্থাপিত করিয়াছেন। কাণ্ট এর এই আবিষ্কার পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষতঃ দর্শনে—সমগ্র চিন্তার বিষয়কে নতুন বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। কাণ্টের দর্শন, গেটের মানব মনস্তত্ত্বের সহিত উল্কাটনিমূর্ণ নটিক, হার্ডারের সমালোচনা মূল প্রবন্ধ, শিলারের নাটক জাধীন সাহিত্যকে এক অভিনব শক্তি প্রদান করিয়াছে।

নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজশক্তির লোপ ও প্রজা-শক্তির অকৃত্যবানের হৃদয়পাত করেন। যেমনি গেটে প্রবন্ধ সাহিত্যেরীষণ উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে দক্ষ, নীতি, মহত্ব, ত্যাগ, প্রেম, ভগবানের অভিব্যক্তি, এই সকল সত্যের অবতারণা করিয়া কুকড়ির মধ্যায়া স্থাপন করিয়া যান। সেইজন্ত এমার্সন বলিতেছেন—

“Bonaparte is the representative of the popular external life and aims of the nineteenth century: its other half, its poet, is Goethe.”

(৪)

মধ্যযুগ ইউরোপীয় সাহিত্য ও জীবনের নিকট আদরনীয়। এই যুগে এক নবজীবনের প্রবাহ সর্বদেশের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল। সর্বত্র উজ্জ্বল জ্ঞান গভীর আকাজ্ঞা ও অপ্রাণ পরিচয়ের নিদর্শন দেখা দিয়াছিল।

ইহার পূর্বে ইউরোপীয় রাজত্ববর্ণ, তলীয় প্রজাপুঞ্জ, বেশাবাদী চিন্তাবীরণ—ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যবীর—নিজ নিজ দেশের প্রচলিত অভ্যন্তরমণে আপন মনে গৌরবের ছবি অঙ্কিত করিয়া চলিতেন। জগতে জাতব্য জিনিষ আছে—অথবা যে এক নিরবচ্ছিন্ন একতান প্রবাহ নহে—প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্য স্বয়ং ব্রহ্ম করা তাহার মুখ্য কণ্ঠ—বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা স্থানে পরিবর্তন সৌন্দর্য্য ও হ্রস্বতার অবতারণা করে—তাহা “আমরা তখন: পবন” জ্ঞাত হইলেও এবং লেখনীচালন সময়ে অলঙ্কৃত করিলেও—তাহা ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য ও নীরব হইয়া আসিতেছিল—যেখানে মন নীরবতা ও জড়তার স্রোতে গাভাবাহন করিয়া হৃদয়ের মোতর আত্মদানের নিবিড়তা উপভোগে শান্ত হইতেছিল সেই সময়ে রেনাসেসের দুর্দৃষ্টিভাষ চৈতন্যের সঞ্চার করিয়া দিল। স্বপ্ন হইতে জাগরক হইয়া জগতকে নতুন চক্ষু দেখিল—নতুন জগৎ দেখিবার পিপাসা বাড়িল—তামসিক-অভাব-বোধ-রূপ নিরবচ্ছিন্ন একতান প্রবাহের বাধা গড়িল। জীবনকে জীবন বলিয়া চিনি। জীবনের অমৃতসিদ্ধি মৃত্যুজীবনীবাণী সর্বত্র আশার উল্লেখ করিয়া দিল। তাহার সম্মুখে দেখিল—নিবিল মানবের কণ্ঠ-প্রবাহ দশদিকে আবর্তন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সকলে জীবন বৈচিত্র্যের স্থান—বৈচিত্র্যের বিচিত্র পরশ—মরণের হিমময় কোল হইতে তাহার পার্থক্য এবং জীবনের বিপুলতা, অসীমতা স্বপ্নদ্বন্দ্ব করিল। অজ্ঞানের দ্বারা দৃষ্টিশক্তির ক্ষরণের জায় নব আলোকের নব আবাহন—নব

উদ্যমান—নবীন আশা ও ভরসা বক্ষে লইয়া আবার কণ্ঠপ্রবাহের বিপুল আবেগ সংকুল মহাজাগির মধ্যে জীবনতরীকে ভাসমান করিবার জ্ঞাত উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। সর্ব-কণ্ঠের কণ্ঠের মোতর ও তল্লজ সর্বত্র এক বিপুল উজ্জ্বল সাড়া পাওয়া গেল। জন্ম-গুহাশায়ী দেবতা একদিন হৃদয়ের ও মৃত্যুর হিমময় প্রাণে স্রাত হইয়া অসাড়তা ও নিষ্কীবর্তার মধ্যে নিমজ্ঞমান ছিলেন—তিনি সন্ধ্যা জাগ্রত হইয়া বর ও অভয় হস্তে লইয়া বলিলেন—“এই বর তোমারই প্রাপ্য, আমি পবন” জ্ঞাত হইলেও এবং লেখনীচালন সময়ে অলঙ্কৃত করিলেও—তাহা ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য ও নীরব হইয়া আসিতেছিল—যেখানে মন নীরবতা ও জড়তার স্রোতে গাভাবাহন করিয়া হৃদয়ের মোতর আত্মদানের নিবিড়তা উপভোগে শান্ত হইতেছিল সেই সময়ে রেনাসেসের দুর্দৃষ্টিভাষ চৈতন্যের সঞ্চার করিয়া দিল। স্বপ্ন হইতে জাগরক হইয়া জগতকে নতুন চক্ষু দেখিল—নতুন জগৎ দেখিবার পিপাসা বাড়িল—তামসিক-অভাব-বোধ-রূপ নিরবচ্ছিন্ন একতান প্রবাহের বাধা গড়িল। জীবনকে জীবন বলিয়া চিনি। জীবনের অমৃতসিদ্ধি মৃত্যুজীবনীবাণী সর্বত্র আশার উল্লেখ করিয়া দিল। তাহার সম্মুখে দেখিল—নিবিল মানবের কণ্ঠ-প্রবাহ দশদিকে আবর্তন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সকলে জীবন বৈচিত্র্যের স্থান—বৈচিত্র্যের বিচিত্র পরশ—মরণের হিমময় কোল হইতে তাহার পার্থক্য এবং জীবনের বিপুলতা, অসীমতা স্বপ্নদ্বন্দ্ব করিল। অজ্ঞানের দ্বারা দৃষ্টিশক্তির ক্ষরণের জায় নব আলোকের নব আবাহন—নব

* What is strange, too, he lived in a time when Germany played no such leading part in the world's affair. ** He is not a debtor to his position, but was born with a free and controlling genius.—Emerson.

When it lay politically powerless, it created its world-conquering thinkers and poets—a process that has no equal in history.—Winkelband's History of Philosophy.

† With Herder and Goethe begins, what we call, after them world-literature, the conscious working out of true culture from the appropriation of all the great thought-creations of all human history.—Winkelband.

তাদৃশ ছিল না। সর্করই এক আকাজ্ঞা। ভাগ্যকর কিন্তু আকাজ্ঞা পূর্ণ হইবার উপায় নাই। সর্কর অশান্তি—মানবের হৃদয়ের মধ্যে অশান্তির বহিঃপ্রকাশিত হইল। নবীন ও প্রবীণে যোবরতর সংঘ উপস্থিত হইল। সমাজ কর্ণদারবিহীন তরুণীর স্রায় তরঙ্গমালা-কূল সমুদ্রের মধ্যে হারডুর্ভু খাইতে লাগিল। প্রবীন দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া নৃতন পুংষ চলিতে চাহে না—নবীন—নৃতন পুংষ আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া উদ্বেগ বিহীন ভাবে চলিতে লাগিল। এইজন্য সমস্তদেশের চিন্তাবীরগণ প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা পথ আবিষ্কার করিয়া নবীন সমাজের আকাজ্ঞাকে সম্যক পরিচালনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ফরাসী বিপ্লব ও তৎসাক্ষ্য বিপ্লববাহীণগণ সকলেই উদার ও স্বাধীন মতাবলম্বী। ইহারাই উদীয়মান নবীনভাবের নেতা। তাহাদের সাহিত্যের মধ্যে এক গভীর উদ্ভাসনা এক মর্ম ছিল হিংসার অজগর সর্প রাষ্ট্রনীতির পরতলে নিষ্পেষিত হইয়া সমুজ্জিত হইতেছিল। ইহার রাজনৈতিক বিশ্বাস, পদপদ বন্দবেষ্ট হিংসার প্রজলিত বহিঃস্বর অরাজকতা,

বিব্রোহ ও যুদ্ধের করালগ্রাস, রক্ত শ্রোতের উত্তরব কমলো জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার আতঙ্ক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তাহা নির্দোষনের জন্য সর্করদেশবাসী চিন্তাবীরগণ বিশেষ সমগ্র ছিলেন। তন্মধ্যে গেটে, ডিক্টর হিউগো উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাস, সমাজে আদর্শের অভাব, প্রচলিত ভাবের প্রতি বিরোধ, সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী যে বিশৃঙ্খল পরাভিমনস্ক প্রবৃত্তি সর্কর নিরাক্রম বৈষম্য ও ভেদবাদের হুচনা করিয়াছিল তাহা দূরীভূত করিয়া শান্তি ও মঙ্গলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে গেটে তাহার অমরলেনবী ধারণা করিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। সেই লেনবীর অমৃত স্বপ্নাধারা নাট্যকবিতা ফষ্ট (Faust) গেটে 'ফষ্ট' অভিন্ন রচনা—জাতীয়, সমাজ-সম্বন্ধীয় এবং মানবীয় (ব্যক্তিগত) সকল দিক লক্ষ্য রাখিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে স্বদক নাটকের মত তাহার কাব্যের সোপান তরীকে প্রবর্তার দিকে যুগ্ম মন্ডল ফোমল কর পল্লব বিকসোপে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অগসর করিয়াছেন।

শ্রী আদিত্যনাথ মৈত্রী।

স্বর্ণবিহার

নদীয়া জেলার রাজধানী কৃষ্ণনগরের তিন মাইল পশ্চিমে নবদ্বীপের পথে স্বর্ণবিহার একটি প্রাচীন স্থিতি বিজড়িত গঞ্জী। গ্রামের কিছু দক্ষিণে স্বর্ণরাজার গৃহে—ভদ্রাবংশ এবং পণ্ডিত দূর হইয়া থাকে। শুপের চতুর্দিক প্রান্তর ক্ষুদ্র ইষ্টকগণ্ডে ব্যাপ্ত। গ্রামের মধ্যে কাঞ্চোলক বনন করিতে করিতে একটি প্রোথিত প্রাচীর পাওয়া

গিয়াছিল, কনিলাম। বৃদ্ধ গ্রাম্য জমিদার বলেন যে কয়েক বৎসর পূর্বে শুপের নিকটবর্তী ভূমির করণের সময় কতকগুলি ভাঙ করা জীর্ণ বস্ত্র পাওয়া যায়। কাপড়-গুলি ভুলিবার চেষ্টা হইলে সেগুলি চূর্ণ হইয়া যায়। তাহার স্মৃতি সেগুলি স্বর্ণরাজার সময়ের রেশমী বা তসরের কাপড়। মধ্যে এই স্থপ হইতে যে ভিনদানি ক্ষুদ্র শুস্তের

মত প্রস্তরও উন্মোচন করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে একটি স্বর্ণবিহার গ্রামের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাহার উপরে উৎকর্ষ চিত্রালিপি কালে নিরস্তির কক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। শুপে পুরাতন মৃৎপাত্রের কয়েকটি ভগ্নাংশ ও পূর্ণাঙ্গিত বা শূণ্যের পদলাঙ্কিত একটি ইষ্টকও পাওয়া গিয়াছে।

এই স্বর্ণরাজার সম্বন্ধে কেহই এ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন নাই বা পারেন নাই।

৩নং হরি চন্দ্রবর্তীর “নবদ্বীপ পরিক্রমা”র একস্থলে লিখিত আছে।

“স্বর্ণবিহার ঐ দেহ শ্রীনিবাস।

কহিব পলাই এই গ্রামে জে বিলাস।”

প্রাচীনা কবি চকবর্তী মহাশয় গ্রামের নামের উৎপত্তির সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

রাজা সেইখানে দেখে তাঁরে স্বর্ণবিরণ।

স্বর্ণ বিহারের বিহার হইল ধ্যান ॥

এই হেতু স্বর্ণ বিহার নাম স্থান ॥

কিন্তু তদন্তলের লোকের ধারণা যে স্বর্ণরাজার নামমুসারেই গ্রামের নাম স্বর্ণবিহার হইয়াছে।

গ্রামের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে সবুজ তৃণভূমে বিমণ্ডিত যে একটি ক্ষুদ্র পর্বত-প্রমাণ যন্তিকাশূণ্য বিজ্ঞান আছে তাহাই স্বর্ণরাজার গৃহের ভগ্নাবশেষ। শুপের দক্ষিণভাগে একটি শিমুলগাছের পাদমূলে একটি পুষ্করিণী জীর্ণবংশ আছে। গম্ভীর তলদেশে একটি প্রোথিত প্রস্তর শুস্তের অগ্রভাগ দৃষ্ট হয়। কিছুদিন পূর্বে শুস্তের চতুর্দিকের ভূমি বনন করা হইয়াছিল। কিন্তু অর্থ ও উৎসাহের অভাবে বনন কার্য বৈধী দূর অগসর হয় নাই।

কিংবদন্তী এইরূপ, “উপরিস্থ প্রাসাদের নিম্নে

স্বর্ণরাজার পাতালপুরী ছিল। তাহার মধ্যে ছায়াসের উপযোগী আহার্য সংগৃহীত থাকত। প্রস্তর শুস্তের পুরী প্রবেশের স্বরমুখে স্থাপিত ছিল। শুস্তের সমুচ্চ ও নিম্নকরিবার কৌশল রাজার কোন বিশ্বস্ত ভৃত্যের পরিজ্ঞাত ছিল।” এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পুষ্করিণীতে এখন অত্যধিক বারিপাত ও জল জমিতে দেখা যায় না। প্রস্তর শুস্তের উপরিভাগে বিলুপ্ত খোদিত চিত্রাদির অস্পষ্ট চিহ্ন আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রবাদ আছে যে, “হুজুর মারাঠা দস্যর আগমনে অন্তোচায় রাজা পাতালপুরীতে প্রবেষ্ট হইলেন। উপস্থিত ভৃত্য মৃচ্ছা-বশতঃ মারাঠা অসির করাল কবলে নিপতিত হইল। আর রাজা সেই পাতালভবনে চিরসমাধি লাভ করিলেন।” কিন্তু এইরূপ কাহিনী নিতান্ত সাধারণ। অনেক পুরাতন বংশের অধঃপতনের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। তাই এই সামান্য জনকথিতে বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই।

স্থান বিশেষের বনন ব্যতীত এখন এই স্বর্ণরাজার তথ্য নির্ণয় করা অতি দুষ্কর। বনন কার্য ও ব্যয়সাধ্য। সেজন্য আমরা এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ও সাহিত্যোৎসাহিগণের ঐকান্তিক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

গ্রামের নামে ‘বিহার’ কথাটা থাকতে অনেক অস্বাভাবিক করেন যে স্বর্ণরাজা বৌদ্ধ নরপতি ছিলেন এবং স্বর্ণবিহার একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মঠ ছিল। এক সময়ে বঙ্গ-ভূমি যে বৌদ্ধধর্মের প্রোতে প্রাবর্তিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শনও বিরল নহে। গত পূর্বে বৎসরে আমরা জলঙ্গী নদীর বাসুকায় যে একটি অভিনব প্রস্তরমূর্তি পাইয়াছিলাম

তাহা কেহ কেহ “সদাশিবের” মূর্তি বলিয়া অভিহিত করিলেও তাহা সম্পূর্ণ বৌদ্ধ-প্রভাবাবিশিষ্ট। সেক্ষণ মূর্তি এখন কেহ পূজা করে না। বঙ্গদেশে স্বর্ণবিহারের গ্রাম অল্প কোন বিহারের সম্মান পাওয়া গিয়াছে কি না জানি না। সেন রাজাগণের সময় হইতে বৌদ্ধ প্রভাব ধর্ম হইতে থাকে বলিয়া অসম্মান হয়। নরহরি চক্রবর্তীর “কবিব পদ্মাবৎ এ গ্রামে কে বলিগার” (গৌরাঙ্গের) হইতে উপলব্ধি হয় যে স্বর্ণবিহার কোন সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের একটা কেন্দ্র হইয়াছিল। তবে নরহরি চক্রবর্তী গ্রামের নামের উৎপত্তির সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা কাল্পনিক; অত্যধিক স্বপ্নমণ্ডিত। এই বিবরণের মূলীভূত কারণ বলিয়া অস্বীকৃত হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও স্বর্ণবিহারের সম্বন্ধে মত-পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শু.পট্টার বর্ডমান অবস্থা হইতে তাহা অতি প্রাচীন বলিয়া উপলব্ধি হয়। ইহার কয়েক মাইল উত্তরে জলঙ্গী নদীর অপর পারে ‘বলালডিপি’ প্রায় সমবাস্য, কেবল অপেক্ষাকৃত উন্নত।

সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় যে স্বর্ণচন্দ্রের তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার সহিত স্বর্ণবিহারের কোন সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস-পণ্ডানে নতুন আলোকপাত হইবে। বসাক মহাশয়ের আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বর্ণিত স্বর্ণচন্দ্রের রাজ্য বিস্তারের কথা এইরূপ আছে—

“১০। বৃক্ষশ্রোপপদে বভুব নৃপতিঃশ্যবে দীলিপোপমঃ।”

তাম্রশাসন বর্ণিত স্বর্ণচন্দ্র প্রবল প্রভা-

পাণ্ডিত বৌদ্ধ নরপতি ছিলেন তাহা লিপি হইতে জানা যায়। তাম্রশাসনে স্বর্ণচন্দ্রের রাজধানী বা রাজস্বকাল উল্লিখিত নাই।

আবার দুর্লভমল্লিক কৃত “গোবিন্দচন্দ্র গীত” নামক প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে;

“স্বর্ণচন্দ্র মহারাজা ধারিচন্দ্র পিতা।

তার পুত্র স্বর্ণচন্দ্র শুন তার কথা।”

মহারাজা স্বর্ণচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র পিতার পিতা মণিকচন্দ্রের পুত্রপুত্র্য ছিলেন। সম্ভবতঃ মহারাজা স্বর্ণচন্দ্রের রাজস্বকাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী।

আমরা জানি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পাল বংশীয় রাজগণ ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের অধীশ্বর হন। পশ্চিম বঙ্গ তখনও কর্ণস্বর্ণ নামে অভিহিত হইত। জানি না কর্ণস্বর্ণের সহিত স্বর্ণচন্দ্র নামের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। আমাদের আলোচ্য স্বর্ণবিহার বর্ডমান ভাগীরথীর তীরের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ভাগীরথীর গতি চিরপরিবর্তনশীল। এই স্বর্ণবিহার পালরাজ্যের পূর্বসীমান্তবর্তী ছিল। এই সীমান্তের রক্ষার জন্ত বোধ হয় স্বর্ণবিহারে সীমান্তদুর্গ বা রাজধানী স্থাপনের প্রয়োজন হয়। সম্ভবতঃ স্বর্ণবিহার পূর্বদেশস্থ পালরাজ্যের রাজধানী ছিল। অতঃপর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সেন রাজাদিগের অভ্যুদয়ের পরবর্তী কালে ‘বলালডিপি’তে সেন রাজধানী স্থাপিত হয়। উক্ত রাজধানী স্বর্ণবিহারের অনতিদূরবর্তী। সম্ভবতঃ সেন রাজাদিগের অভ্যুদয়ে স্বর্ণবিহার হইতে পালদিগের আশ্রিত্য বিলুপ্ত হয়।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

ভাষা ও জাতি

[আমার প্রকৃতি পথ্যালোচনা দ্বারা জাতির প্রকৃতি স্থির করিবার একটা রীতি আছে।, কিন্তু আমাদের দেশে তাহা খুব কন লোকেরই অবলম্বন করিয়াছেন। অবশ্য এই পদ্ধতি দ্বারা সব সময় যে অনাশ্রয় সত্যতা উদ্ভূত হইয়া যায়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তা না করিলেও পদ্ধতিটা যে একবারে অস্বাভাবিক, তাহা বলিতে সঙ্গতি হইবে। সেই জন্তই লেখকের অবলম্বিত পদ্ধতি আমরা মর্শ্বেনে প্রণিধানযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।]

‘জাতির উপরে ভাষার প্রভাব আছে’ ইহা একটা মৌলিক কথা। যত প্রকারে এই প্রভাবের প্রকাশ হইতে পারে, তাহাও সংখ্যা নির্ণয় বা বিস্তৃত বর্ণনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল একটা বিষয়ের আলোচনা করিয়া সম্বৃত্ত থাকি।

বাংলা ভাষাতে কোন কথা যে প্রকারে লিখিত হয়, পড়িবার সময় সাধারণতঃ আমরা সে প্রকার পড়ি না। লেখা থাকে যদি “নবীন,” পড়িবার সময়শক্তি “নবীন্,” লিখিত ভাষায় শেযোক্ত ‘ন’টা পরযুক্ত; কিন্তু পঠিত ভাষায় হসন্ত। যে জাতির ‘কবিত ভাষায় এবধি হসন্ত শব্দ বা অক্ষরের প্রচুর্থা থাকে, সে জাতি বিশেষ তেজবীর্যশালী ও শক্তিমান। ইংরেজী শব্দের ভিত্তি বাঙ্গালা সামান্য ভুলনা করিলেই বিযম্যতা পরিষ্কৃত হইবে। ইংরেজীতে যদি বলি come (কাম্), বাঙ্গালায় বলিব, ‘এম’। ইংরেজীতে যদি বলি love (লাভ্), বাঙ্গালায় বলিব ‘ভালবাসা’। ইংরেজীতে যদি বলি ‘here’ (হিয়ার্), বাঙ্গালায় বলিব ‘এখানে’। এই প্রকার comparison (কম্পেরিজন্), ভুলনা। Food (ফুড্)

বাধ্য; night (নাইট্) রাত্রি; word (ওয়ার্ড্) বাখ্যা। ইংরেজীতে যে প্রকার হসন্ত শব্দের বাহালা, বাঙ্গালায় তেমনি নাই; ফলে দেখা যায়, যে ইংরেজ জাতি বাঙ্গালী জাতি অপেক্ষা তেজবীর্য অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

হিন্দীর সম্বন্ধেও এ কথা। বলদুশ পাঞ্জাবী ভাষাকে বলে হাম্, স্বম্ ফীক-প্রাণ বাঙ্গালী ভাষাকে বলে ‘আদি’ ‘তুমি’—যঠ হসন্ত পরিমিত পাঠান যদি বলে ‘দেগ্গনে’, ‘ক্যনে’, ধর্মীকৃত আমরা বলি ‘দেহিতে’ ‘করিতে’। ভাষা যে প্রকার মোলয়েম হইয়া আসে, তেজবীর্যও তত হ্রস্ব হইয়া পড়ে।

উল্লিখিত উদাহরণ ব্যতীত আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ভিন্ন অল্প কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। পঠিক নিজেই বহু দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

গুর্খালী হিন্দীর রূপান্তর মাত্র। তিস্তবতী ও বাঙ্গালা ভাষার সামান্য ভেদজাল টুকু বাদ দিলে ইহা বাটী হিন্দি বই আর কিছুই নহে। হস্তভাষা হিন্দীর সম্বন্ধেও যে কথা গুর্খালী সম্বন্ধেও সেই কথা। গুর্খা যে বাঙ্গালী অপেক্ষা শৌণ্ডবীর্যশালী তাহার প্রমাণ তাহার ভাষাতেই বিদ্যমান। গুর্খাদের কবিত ভাষায় বিশ্ব অক্ষরের প্রাচুর্য্যই তাহাদের শক্তি সামর্থ্যের নিদর্শন। ছই একটা উদাহরণ দিলেই ‘কথাটা পরিষ্কার হইবে। গুর্খালী বলে যেমন—কা কুবা গর-

দাইছ, আলিক পানি দিহু পদুহ—আমরা এই ভাববাক্ষ কখা বহুতু করিয়া বলি 'কি কখা হইতেছ'; 'কিছু জল দিতে হইবে' বাঙ্গালা অপেক্ষা গুণালীতে হস্তস্তর ব্যবহার অধিক দেখা যায়, ফলে বল বিক্রমে গুণা বাঙ্গালীর আদর্শনীয়।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন বাঙ্গালা ভাষায় হস্তস্তর শব্দ বা অক্ষরের আদৌ প্রয়োগ নাই, এবং বাঙ্গালী যেকদণ্ড বিহীন। বাঙ্গালায় হস্তস্তর শব্দ আছে—কিন্তু ইংরেজী ও হিন্দির তুলনায় তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; তাই ইংরেজ ও হিন্দুস্থানী অপেক্ষা বাঙ্গালী তেজবোধে ধাটো।

বাঙ্গালা ভাষায় বহুহীন শব্দ আছে, শুধু তাহা নহে; এমন ভাষা আছে যাহাতে সাধারণতঃ বাংলা ভাষা অপেক্ষাও অল্প সংখ্যক হস্তস্তর শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সাঁওতালদের ভাষা তাহার একটা প্রমাণ। যেমন—আমরা যদি বলি 'তোরা কোথায় যাক্সি', সাঁওতাল বলিবে 'ওকাতো চলাকানা হো'; আমরা যদি বলি 'তোরা এলিক আয়'—সাঁওতাল বলিবে 'মা হিঙ্কনে হো'। বাঙ্গালা অপেক্ষা সাঁওতালীতে সচরাচর হস্তস্তর শব্দের সংখ্যা কম দৃষ্ট হইলেও, সাঁওতালীতে যে হস্তস্তর শব্দের একেবারে প্রয়োগ নাই, এমনত নহে; এবং যদিও সাঁওতাল জাতিকে সাধারণ দৃষ্টিতে নির্ভীক বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু সময়ে সময়ে তাহারাও বলাবিক্রম দেখাইয়া থাকে। ১৮৮৮ সনের সাঁওতাল বিদ্রোহই তাহার প্রমাণ।

কিন্তু এমন একটা জাতি আছে, যাহাতে হস্তস্তর শব্দের প্রয়োগ এত অল্প, যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা যেখানে

কবিতা ভাষায় হস্তস্তর উচ্চারণ না করিয়াই পারি না সেখানেও তাহার স্বরাস্ত উচ্চারণ করিবে। তাহাদের সেকদণ্ডের অপর্যাপ্ত তাহাদের ভাষার সমুদ্র। এমন দুর্বল ভাষা ও এমন দুর্বল জাতি জগতে আছে কি না সম্ভব।

পাঠক সুস্থিয়া থাকিবেন যে আমি উড়িষ্যা ভাষা ও উড়িষ্যাবাসীদের কথা বলিতেছি। উড়ুদের ভাষা তুলিলেই মনে হয়, যে তাহাদের শরীরের সন্ধিস্থলের সমস্ত সংযোগ একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। একটা গল্প বলিয়া এ কথাটা সত্যতা দেখাইতে চাই।

কোন সাহেবের এক উড়ু বেয়ারা ছিল—সে একবার ছুটি নিয়া দেশে যাইবার সময় অস্ত্র একখন উড়ুকে তাহার স্থলে রাখিয়া যায় এবং উপদেশমূলক তাহাকে বলিয়া যায় যে 'যখনো সাহেবো বলিবে 'বরং দি ওয়াটার' খাই করি জলো পাকইবা—আর যখনো সাহেবো বলিবে 'ডেমো', 'রাসকেলো', তখনো বুঝলো যে কর্ণালো ভাসলো। ইহার মানে এই যে যখন সাহেব বলবে Bring the water এতই তৎপরতা দ্বিগুণ নিয়া দিবে; আর যখন সাহেব বলিবে dam, rascal তখন বুঝবে যে কর্ণাল ভেদেছে।

ইংরেজী তেজের ভাষা—সে তেজের ভাষাতেও dam, rascal এর মত তেজী কথা আছে কিনা সম্ভব। কিন্তু সেই dam, rascal উড়ুর হাতে পড়িয়া ডেমো, রাসকেলো তে আসিয়া ঝাঁড়াইয়াছে। dam, rascal কথা ছুটা ইংরেজীতে তুলিলেই সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় লাল ভগুগুগে ছুটা চোখ, হস্তস্তর যষ্টির অস্বাভাবিক আন্দোলন, এবং সচুটি পদযুগলের আইনদ্রষ্ট ব্যবহারের কথাই মনে হয়। আর সেই কথাই উড়ুর মূখে

তুলিলে বোধ হয় যেন অন্নগ্রাসনের পর হইতে এ পর্যন্ত সাগু ভিন্ন অস্ত্র কোন খাড়া উড়ুর পাকোদর পবিত্র করে নাই।

Bring the water ও উড়ুর মূখে তাহার 'বরং দি ওয়াটারো' রূপদ্বর্ণিতর সম্বন্ধেও ঐ কথা।

জাতির উপর ভাষার অস্ত্র যে কোন প্রভাব থাকুক না কেন, ভাষার স্বরাস্ত ও হস্তস্তর শব্দের ন্যূনাদিক যে জাতির তেজবোধের ন্যূনাদিক হয়, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। স্বর যোজন্য করিলেই যেন অক্ষরের স্বাধীন তেজে আঘাত লাগে—এবং যিহা সমিগুণই যেন ভাষার উদ্দামশক্তির প্রতিবোধক। অল্প বহুতু—ইংরেজী ভাষা এ বিষয়ে স্ববর্ণ বহুল সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা একটা বন্ধু বলিয়া থাকেন যে রাগ হইলেই তাঁহার হিন্দি বা ইংরাজীতে কথা আসে। বাঙ্গালা ভাষা রাগের ভার সহিতে পারে না—ক্লেদের সময় যে তেজের বিকাশ হয়, ক্ষীণপ্রাণ বঙ্গভাষায় তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না।

বাঙ্গালা ভাষায় ত আজ কাল পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু কবির বীরব্রতনাথের—

পঞ্চ নদীর তীরে
বেগী পাকইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুজর মধ্যে—
আগিয়া উঠিল শিক্

নির্দল্ নিভীক্ এর মত কব 'লাইন পদ্ম আছে' মেঘনাদ বধ, বৃজ সংহার ও পলাশীর যুদ্ধের ভেরী নিনাদের পর আজ কাল প্রায় সর্বত্রই ছেলেবেলা বাঁশীর টুটুনে ও গুমস্ত (sophoric) আওয়াজই শ্রুতিগোচর হয়। ইহাতে কবির ক্ষমতাহীনতা থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষা যে একেবারে দারী নহে, একথা বলা যাইতে পারে না।

ভাষার সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য—ভাষা দিয়াই সচরাচর জাতি বিভাগ হইয়া থাকে; স্বতরাং ভাষার পক্ষে যাহা তেজোবাক্ষক, জাতির পক্ষেও তাহা তেজোবাক্ষক না হইয়া পারে না। স্বর যোজন্য ঘারা ভাষার উন্মুক্ত শক্তির লাবণ্য হইলে, জাতির উপরও যে সে লাবণ্যতার প্রভাব আসিয়া পড়িবে না, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই।

শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

লৌকিক ধর্ম

দ্বন্দ্বমধ্য সাহিত্যসৌরী অশ্বেয় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার পক্ষে এক অমর কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই লোকবিশ্বস্ত গ্রন্থ ধ্যানিতে তাহার অপূর্ণ অংশদ্বন্দ্ব, অসামান্য মনীষা, চমৎকার নিদান-ভঙ্গী, এবং আমাদের ধারণার অতীত আরো অজল বিষয়ের অসংখ্য আদর্শগণকে

বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। এহেন গ্রন্থ বিশদরূপে আলোচনা করিয়া সুস্থিয়া সুস্থিয়া তৎসংগত দুই কথা কহিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একটা ভয়ঙ্কর বিভ্রম। কথাটা বোধ হয় না বলিলেও চলিত। কিন্তু তবুও বলিতে হইতেছে এই অশ্বেয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পাঠ করিয়া কোন কোন বিষয়ে আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে

খানিকটা ক্ষোভ আশ্রয় জুটিয়াছে। পল্লীবাস-
জনিত কুসংস্কার বশতই হউক বা শিক্ষাভাব
নিবন্ধন অজ্ঞতা বশতই হউক কতকগুলি
অসার প্রশ্নের যীমাংসার জন্ম একটা
অনাবশ্যক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে।

প্রায়ই শুনিতো পাই আমাদের অধিকাংশ
গ্রাম্যদেবতার পূজা 'বুদ্ধ' দেবেরই পূজা
মাত্র। অনেকানেক পুস্তকাদিতে পাঠ
করিয়াছি "একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াই গেছে যে
'ধর্মরাজের' পূজা বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত।"
'শ্রীভক্ত'ও এইরূপ, এবং আরও যে কত
"এইরূপ" আছে তাহার ইয়ত কা হুঃসাধ্য।
কুসংস্কারজ্ঞ আমাদের বুদ্ধিতে পারি না কিরূপে
কাহার কর্তৃক 'বৌদ্ধ' দেবমূর্তিগুলি হিন্দুর
প্রচ্ছদ পটে পরিশোভিত হইয়া এইরূপে
পরিণত হইয়াছেন। সিদ্ধান্ত তিনিয়াছি, কিন্তু
অসুশীলনী পাঠের সুযোগও হুবিধা ঘটয়া
উঠে নাই। অবজ্ঞা এমন কথাও বলা
চলে না যে দীর্ঘ নিষ্কার পর গাঝোআন করিয়া
কেহ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া বলিবে,
অমনি "মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়"
তাহার উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন। তবে
দ্রুত হয় যে, আধুনিক যুগের সন্মানস্বত্ব
মহাপুণ্যবর্ণন 'বহুমুচর' 'বরিশ্রদ্ধাধ' প্রভৃতি
কি কথা বলিতে আশ্রিয়াছিলেন, কোন মহা
মন্ত্রের প্রচার করিলেন পল্লীবাসী হাজার
হাজার নরনারী তাহার কিছুই বুঝিল না।
কিন্তু যাক্ত সে কথা, আমরা আমাদের
বক্তব্য বিষয়টা বলিয়া যাই।

রায় সাহেব শ্রীমুক্ বীণেশচন্দ্র সেন মহাশয়
তদীয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' গোড়িয় মূল
নামক অধ্যায়ে "লৌকিক ধর্ম শাখা" নাম
দিয়া লিখিয়াছেন "লৌকিক দেবতাগণের
পূজা প্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন

নহে। যেখানে আমরা দুর্ভল হইয়া পড়ি,
সেইখানেই একটা দুর্ভলের সহায় দেবতার
আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্ম
চিন্তিতা মাতা কি মাতামহীর দুর্ভলতা হইবে
'মদী' কল্পিত হইলেন।" 'মঙ্গল চণ্ডী' বিপদ
নিবারণের জন্ম, 'সত্য-নারায়ণ' আর্থিক অবস্থার
উন্নতির জন্ম, ব্যাঘের দেবতা 'দক্ষিণের
রায়' ও সূর্যের দেবতা 'মনসা' বর্ষাক্রমে ব্যাঘ
ও সূর্যকীর্তি নিবারণের জন্ম কল্পিত হওয়ার
কারণ দর্শাইয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন
"ইহা ছাড়া বৌদ্ধগণের 'হারিতী' দেবীও
'স্বপ্নপূরণ' এবং 'পিজিলা' ভোগান্ত কয়েকটা
মোক হইতে নব শক্তি লাভ করিয়া এই
বিবেকটুকু জর পীড়িত বদদেশে সহজেই
পূজ্যমণ্ডপে স্থান পাইলেন। ভোমাচার্য্যগণের
পুষ্টি নিশ্চয় মতিত ব্রতচিহ্নাঙ্কিত শাণ্ডুয়
মৃৎ পিণ্ডের অবয়ব ত্যাগ করিয়া ইনি হিন্দু
ব্রাহ্মণের হস্তে মৃণালতন্ত্র সন্মুখী মাজ্জিনী
কলমোপেতা স্তূর্ণালঙ্কৃত মন্তকা শিতলা দেবী
হইয়া দাঁড়াইলেন।" আমরা ক্ষুব্ধ হই এই
ভাবিয়া যে এই সমস্ত ব্যাপার বামবা ঘটিল
কিরূপে।" রায় সাহেব মহাশয় তো লিখিলেন
'কঠিন নহে'। কিন্তু আমরা যে বিষয়
সমস্যাগু পড়িলাম। "এতদিন ধরিয়া যাহাকে
পূজা ধ্যানে আপনান্ন করিয়া আঁড়াইয়া
পড়িয়া আছি এক যুগকারে তাহার সবই উড়িয়া
গেল। এত ক্ষণভঙ্গুর ভিত্তিতে তাহার প্রতিষ্ঠা!
মাতামহী ঠাকুরারি উর্ধ্বের মস্তকে যাই 'মদী'
এসঙ্গ গজাইয়া উঠিল, পত্নীবৎসল মাতামহ
মহাশয় অমনি বা করিয়া তাহার এক মঙ্গল
গাথা রচনা করিয়া ফেলিলেন। হারিতী দেবী
শ্রীভক্তরূপে ভোম পুরোহিতগণের হাত
ছিনাইয়া হিন্দু ব্রাহ্মণের বাড়ী হাঙ্গির হইলেন,
আর নির্বিবাবে ব্রাহ্মণে তাহাকে অভ্যর্থনা

করিয়া লইলেন। ব্যাপারগুলি এতই সহজ কিনা
চিন্তা করিবার বিষয়। রায় সাহেব মহাশয়
'পুরাণের' দোহাইও দিয়াছেন আবার "ধর্ম
কলহে ভ্রাতার শ্রীমুখশীলক অধ্যায়ের" একস্থানে
লিখিয়াছেন "সংস্কৃত বচন স্পন্দমণির তুল্য,
তাহার প্রভাবে লোষ্ট্রও বেবৎ প্রাপ্ত হইতে
পারে। এইজন্ম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 'মনসা-
মাহাত্ম্য' সত্বেপে কীর্ণিত হইয়া এবং 'বৃহদ্রত্ন
পুরাণে কালকটু ও শালবাহনের' উল্লেখদ্বারা
বন্দী পদ্মপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যের ভিত্তি দৃঢ়
করা হইয়াছিল," এই সব যে করিল কে এবং
কোথা হইতে কি হইল, তাহার কোনোই
যীমাংসা হইল না। না হউক, আমাদের
কিন্তু ধারণা অস্বল্প। আমাদের মনে হয়
বৈদ্যোপনিষদের পরমোদার ভাবাবলী পুরাণের
অমৃতময়ী ছন্দে প্রচারিত হইয়া ভারতের
মহোপকার সাধন করিয়াছিল। তাই ভারতের
মাহাত্ম্য দারিত্র্যকে বরণ করিয়া পার্থিব সর্ববিধ
স্বর্থ হৃৎথকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছিল।
তাই আমাদের সমাজের হাড়ি ভোম
চাঁড়ালকেও রাম লক্ষণ বা সীতা মাণিক্যের
কাহিনী জায়া করিলে তাহারাই উড়িয়ায়
ফুলীদের মত 'লখোর' জিজ্ঞাসা করিয়া বলে
না। সাধনার নিষ্ঠুর প্রকোষ্ঠে স্বল্প বর্ষাভ্রম
ধর্মের প্রনিয়ন্ত্রিত জাতিভেদের গভীরমধ্যে এই
পৌরাণিক শিক্ষারই অমৃত-দীপ্তি মূচিরাম
দাম প্রভৃতি জগৎগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর
পদম আয়ের দন এতেনে পুরাণে যে অধিকারী-
ভেদে সাধনার বিভিন্ন পথ নির্দেশিত হইবে
তাছাড়া আর বিচিহ্নতা কি? তখনকার উচ্চ-
সম্প্রদায় শিক্ষার বলে জন্মের বলে বলীয়ান
ছিলেন। তাঁহারা কোনো কিছুতেই অস্বল্প
করিতেন না, ব্রহ্মানন্দের অমৃত প্রসবণ
ইহাদের দৃঢ়ম্বে স্বতঃ উৎসারিত হইত। কিন্তু

নিয়ন্ত্রণের ইতর সাধারণ, সাধারণ সামান্য
আধাতেই কাতর হইয়া পড়ে, বিপদের ভীতি
অগ্নেই যাহাদিগকে বিব্রল করিয়া তুলে,
তাঁহাদের তো একটা অবলম্বন চাই, বুকে
পাতিয়া পড়িয়া থাকিবার স্থান, ঈশ্বরের তত
একটা আশ্রয় চাই। লোকহিতরত্ন ত্রিকাল-
দর্শী স্ববিধণ তাহারই জন্ম এই লৌকিক ধর্মের
প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অথচ লোক
সংগ্রহের জন্ম সমাজের আদর্শ শ্রেষ্ঠ সম্প্র-
দায়েরও এসব অস্বচ্ছন্দে নিষেধ নাই, বরং
বিধি আছে। গীতা যে বলিয়া গিয়াছেন—
"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানং কৰ্মসন্ধিনাং"
যোজ্যেৎ সৰ্ব কৰ্মাণি বিধানমুক্তঃ সমাচরন"
তাই বলিতেছিলাম "দুর্ভলের সহায়
দেবতার আবশ্যক" কথাটা ঠিক, কিন্তু
'দুর্ভলতা হইবে' দেবতা কল্পিত হয় নাই।
কালজয়ী স্ববিধণের দুর্ভলের প্রতি অপার
অস্বকম্পাই ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন।
মাহয় যতই বড় লোক হোক তাহার আশা
আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি স্বভাবতঃ কঠিন হইতে
দেখা যায়। তাই ভারতবর্ষ আপনান্ন দৈনন্দিন
জীবনটিকেও ধর্মের অত্মশাসনে নিয়ন্ত্রিত
করিয়া রাখিয়াছেন। "ভোগ সংযমের সাধে
বাধা" পড়িয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে "ভক্ত্যারের
নিকট আশ্রয় ভিক্ষা না করিয়া" 'সংযামগ্নের
পৃষ্ঠে যশের ঢাক না বাজাইয়া' 'গোলামীতে
উপাধ্বনের পথ না দেখিয়া' ভগবদ্ভুক্তি
দেবশক্তিরই নিকটে যদি সমস্ত প্রার্থনা করা
যায়, তাহাতে এমন কি দোষ ঘটতে পারে না।
আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝা গেল না।
ভারতীয় সাধনার মূল মজই হইতেছে—
"দেবান ভাবয়তেনে তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ
পরস্পার ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পশম বাসুপত্য"
উদয়ের চিন্তা যখন তুলিবার নয়, কৰ্ম

করিতেই হইবে, অথচ ধর্মছাড়া কিছুই হইবে না, তখন, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের এই উৎকৃষ্টতর সময় যে সর্বথা সুসম্পন্ন হইয়াছে চিত্তাশীল মনেই একথা স্বীকার করিবেন। তুমি মাংস খাইবে, শাস্ত বলেন বুধা মাংস খাইও না। দরিদ্র তুমি, দেবদেবেশে অনিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিবেন না, তোমার জন্মও বাসনা রহিয়াছে— 'যদ্যো পুঙ্খো রাজা তদন্নং পিতৃদেবতা'। এই অধিকারভেদ গৃহাই স্বল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে অল্পেই লৌকিক ধর্মের প্রচার, ইহা 'চর্যলতাশ্বত্রে' আমার কল্পনা নহে।

লৌকিক-ধর্মের দ্বিতীয় কথা 'দেবতার প্রাধিকার' লইয়া অনেকেরই মত "সম্প্রদায়-ভেদে ধর্ম কলহ আমাদের লৌকিক ধর্ম-সাহিত্যে বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।" এক ধর্মের প্রতি অল্প ধর্মের আক্রমণ অবশ্য স্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি 'কবিকল্প চতুর্' প্রকৃতির তথাকথিত সমালোচনায় যতটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ততটা হয়তো নাও হইতে পারে। স্বপ্ন দুঃখ বিপদে সম্পদে জড়িত করিয়া আপন আপন কুলধর্মস্বার্থায় 'গৃহস্থের' কুল-দেবতার স্তুতি হইয়াছে। এই কুলধর্ম যে অবশ্য পালনীয় শ্রীমদ্গণপদীতায় অর্জনের মুখে তাহা স্পষ্টতঃ পরিব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই কুল-দেবতাকে যদি আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহাতে কৃতি কাহার? আপন আরাধ্য দেবতাকে যদি আমি আমার স্বরচিত গ্রন্থে প্রাধিকার দান করি তাহাতে নিষেধ করিবেন কি বা কে? হিন্দুধর্মে কপিন কালে গোড়া পাতী বলিয়া কোন কথা নাই। তবে নৈতিক ভক্ত চিরকালই বলিয়া আসিতেছেন—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমল লোচনঃ"

এই জন্ম পুরাণে দেখিতে পাই যেখানে যে দেবতার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে তাহাকেই 'তুমি ব্রহ্ম তুমি বিশ্ব তুমি মহেশ্বর' বলিয়া ভক্তি কৃত্যমাঞ্জলি অর্পণ করা হইয়াছে। "কৃতি বৈচিত্রে কল্পকুটীল নানা-পঞ্চাবলম্বী" মানব সাধারণের পক্ষে ইহার উপকারিতা সম্ভবতঃ ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। 'সাহিত্য' হিসাবে ইহার কোনও মূল্য পুরাণকার অবগত ছিলেন কিনা জানি না, আধুনিক কবীরা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাহার 'সাহিত্যে' 'বিশ্ব সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন— "আরো একটা কারণ আছে। সমগ্রাণে বাহ্যকে আমরা দেখি তাহাকে ছড়াইয়া দেখি—তাহাকে এখন একটু, তখন একটু, এখানে একটু, সেখানে একটু দেখি— তাহাকে আরো দশটর দশটি মিশাইয়া দেখি। কিন্তু সাহিত্যে সেই সকল ফাঁক সেই সকল মিশাল থাকে না। সেখানে বাহ্যকে প্রকাশ করা হয় তাহার উপরেই সমস্ত আলো ফেলা হয়, তখনকার মত আর কিছুকেই দেখিতে দেওয়া হয় না। তাহার জন্ম নানা কোশলে এমন একটী স্থান তৈরি করিয়া দেওয়া হয় যেখানে সেই কেবল দীপ্যমান।" একথা সত্য হইলে 'প্রাচীন বর্ষ কবিগণকেও অন্ততঃ কমা করা উচিত।

ক্রমবিকাশ বলিয়া কথাটির আভ্যন্তরীণ বড়ই বাহ্যতা প্রচার। সাধারণ রাস্তাও ইহার যাতায়াত আছে বলিয়া মনে হয়। অপ্রাণিক হইলেও একটী প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করিতেছি। "বক্ষণের পুত্র ভৃগু একদিন পিতাকে বলিলেন তখনই আমাকে 'ব্রহ্ম' উপদেশ করুন। পিতা সন্তোষিতঃ সপা নির্দ্বিষ্ট করিয়া দিলেন—বৎস 'ব্রহ্ম' হইতে প্রাণী সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যক্ষরা জীবনধারণ

করে এবং সময়ে যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয় তাহাই ব্রহ্ম" অর্থাৎ মননাদি দ্বারা তাহারই স্বরূপ জানিতে চেষ্টা কর। ভৃগু পিতৃ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তপস্ভায়া স্থির করিলেন 'অন্নই ব্রহ্ম' কিন্তু তৃপ্তিলাভ হইল না, পুনরায় পিতৃসাক্ষে গিয়া উপদেশ চাহিলেন, বক্ষণ পূর্ববৎ তপস্ভায়া উপদেশ দিলেন। ভৃগুও সাধনার ক্রমোৎকর্ষের ফলে অন্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মন, প্রাণ, বিজ্ঞান, শেষে 'আনন্দকেই ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দেশ করিলেন।" কথায় আছে— "সাহিত্যে চৈকিও সিদ্ধ হয়" কিন্তু তাই বলিয়া "আদ্বল হুঁলিয়া তো আর কদলী বৃক্ষ হয় না" কাজেই অধিকারভেদ না-মানিয়া উল্লম্বে শীঘ্রোহরণের চেষ্টা করিলে লোকে অকাল পকতা বলিয়াই ব্যাখ্যান করবে। পূণ্যবান তুমি, জন্ম জন্ম সাধনার ফলে যদি তোমার "বং লজ্জা চাপবং লভ মজ্জতে নানিকং ততম্" তাহার জন্ম যদি তোমার একাকিত্ব ব্যাকুলতাই জাগে, তখন তুমিও আনন্দময়ের স্বরূপ অশ্রুত করিতে পারিবে। যতদিন তাহা না হইতেছে তখন জন্ম ব্যাকুল হইতেছে, তুমি অল্প দেবতার উপাসনা কর, 'ককণা পারাবারের' কুলে বসিয়া ভুজ্জ বিষয় মরিয়ার কামনা করিও না। পুরাণের তো ইহাই উপদেশ, লৌকিক ধর্মের নিম্নতম তরও এই উপদেশই তো অহুহৃত্য রহিয়াছে।

লৌকিক ধর্ম সম্বন্ধে তৃতীয় কথা 'হিন্দুর ঠাহুর এত পূজা কাঞ্চলে কেন?' এই দেবতাপ্রভাব মধ্যে পূজা গ্রহণের এত চেষ্টা এত ছড়াছড়ি কেন? দেবতার যদি বলে "আয় জন্মান্তর জীব আমার কাছে আয়— কেন মরীচিকা মায়ায় খুরিয়া মরিতেছিস,

এখানে আসিলে তোর সকল আশাই পূর্ণ হইবে, সকল জ্ঞানারই অবদান হইবে।" দোষ হয়? কবীরা রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন— "প্রথমের" চোখে পড়ে দেবী চতুর্ভুজের পূজা স্থাপনের জন্ম অস্থির, যেমন করিয়া হউক ছলে বলে কৌশলে মর্মে পূজা প্রচার করিতে হইবেই। আমাদের মনে হয় এই ভাবের উৎপত্তি শ্রীমদ্গণপদীতা হইতে। শ্রীভগবান যখন বলিতেছেন— "সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রহ্ম অং আং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাভ্যং" "মমনা ভব মন্তজ্ঞো যদ যাকী ন্যো নমস্করু" ইত্যাদি; কই তখন তো শ্রীভগবানের স্বাধীন পরভার আরোপ করিয়া কেহ কোন কথা কহে না। আর গ্রাম্য কবিগণ যখন এই কথাই একটু সংকীর্ণভাবে একটু বং ফলাইয়া পরিবর্তিত আকারে বলিতেছেন—

আমিশতনারায়ণ শুন দ্বিধবর
আমারে ভজিলে দন হইবে বিস্তর
তখনি তাহা দেখের কথা হইয়া দাঁড়ায়।
মায়া মুখে যাহাই বলুক অন্ততঃ অন্তরের মাঞ্চেও অনেকেরই পরাভূত দন দৌলত স্থখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে টান থাকে। এ অবস্থায় শুধু 'পাপ মুক্তির' কথা ভনিলেই যে সকল অর্জনের মত আশ্রয় হইবে সে আশা করা বুধা, স্বভাব 'ভোগের মধ্যেই ত্যাগের শক্তি সঞ্চয়ের' জন্ম বিষয় বিভবেরও আবশ্যকতা আছে বৈ কি। তাই বলিতেছিলাম 'চর্যলতা'য় ধর্মের উৎপত্তি হয় না। শাস্ত বলেন "নামমায়া বনহীনের লভ্য" সেই জন্মই বলিয়াছি নিম্নতম অধিকারীর 'জন্ম বনহীনের বলাধান জন্মই লৌকিক-ধর্মের প্রচার। ইহা ত্রিকালপরীক্ষিত যথার্থই বাবস্থাপিত সনাতন পদ্ধতি।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

আঙ্গাল অনেক বিলাতী মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনীতে মেদহাস করিবার ঔষধাদির নাম দেখা যায়। সকল "সুভা" লোকেই বলিয়া থাকেন দেহে মেদবৃদ্ধি হইলে লোককে কুংসিত দেখায়। বাস্তবিক কুংসিত দেখাক বা না দেখাক মেদবৃদ্ধির যে অনেক অস্থিবা তাহা কৃত্তজঙ্গী মাঝেই জানেন। মোটা হইলে আলস্ত দিন দিন বেশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও মেদযুক্ত ব্যক্তির অনেক নিন্দা করিয়াছেন। চহকের মতে "অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় হ্রস্ব, অতিশয় লোমযুক্ত, একেবারে লোম রহিত, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত গৌরবর্ণ অতি স্থূল ও অতি কৃশ এই আট প্রকারের শরীর" অতিশয় নিম্নিত; তন্মধ্যে অতি দীর্ঘ ও অতি হ্রস্ব বা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ প্ৰভাবতঃ ঐক্যপেই জন্মগ্রহণ করে স্তত্রাং তাহাদের দোষ অপরিহার্য। পরম অতি স্থূল ও অতি কৃশের নিন্দা উপায় অবলম্বনে পরিহার করা যাইতে পারে আবার এই প্রকার নিম্নিতের মধ্যে অতি স্থূল ও অতি কৃশ বিশেষরূপে "অতি স্থূল ও অতি কৃশ ব্যক্তি সত্ততই রোগগ্রস্ত হয়, একারণ পুষ্টির ঔষধের দ্বারা অতি কৃশের ও কণ্ঠ বা কৃশকারক ঔষধ দ্বারা অতি স্থূলের উপচর্যা করিবে। স্থূল ও কৃশ উভয়ে সমান হইলেও এই দুই'এর মধ্যে বরং কৃশ ব্যক্তিকে ভাল বলা যাইতে পারে কেন না পীড়া হইলে কৃশ অপেক্ষা স্থূলব্যক্তি অধিক যত্নগ্ৰাণ ভোগ করিয়া পাকে।"

ফ্যাসানের জালায়ই হউক আর অস্ত্র যে কোনও কারণেই হউক অনেকেই আরকাল এই ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে চান। মেদবৃদ্ধিকে একটা ব্যাধি বলিলাম বলিয়া কেহ'ই যেন না মনে করেন যে, আমি ভুল বলিয়াছি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকবিদের মতে গলদেশে যে Thyroid নামক একটি গ্রন্থি আছে তাহার যথায়ুক্ত কার্যকারিতা না ঘটিলেই মেদবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে বংশপরম্পরায় পিতা হইতে পুত্র চলিতে থাকে। এই সকল লোক অধিকমাত্র খেতমার জাতীয় খাদ্য বা মেহ ব্যবহার করিলে দিন দিন স্থূলকায় হইয়া শেষে জড়বৎ মাংসপিণ্ড হইতে থাকে। আমাদের দেশের বড় লোকদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের অধিককেই আছে। সেহজাতীয় খাদ্যই ত তাহাদের প্রধান খাদ্য, তাহার উপর আবার কায়িক পরিশ্রমের নাম নাই। যাহার হউক বাজে কথা ছাড়িয়া কাষের কথার অবতারণা করা যাক। বৈজ্ঞানিক উপায়ে শরীরের আভ্যন্তরিক কোনও প্রকার ক্ষতি না করিয়া কি করিয়া মেদের হ্রাস করা যাইতে পারে আমি সেই সম্বন্ধেই দুই চারিটি কথা বলিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যে আমি স্বয়ং যে উপায় অবলম্বন করিয়া মেদহাস করিয়াছি তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ কৃত্তকার্য্য হইলে বা অস্ত্র কোন উপায় জানা থাকিলে আমাকে জানাইলে বিশেষ

বাধিত হইব। মেদহাস করিতে হইলে দৈনিক জীবনের আয়ু পরিবর্তন বাহ্যনীয়। সদাশুদ্ধাই কার্য্যে লিপ্ত থাকার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। যত কম বিশ্রাম লওয়া যায় ততই ভাল। বিশ্রাম বলিলে অনেকে নিস্তার কথা যেন না মনে করেন। দিবা নিস্তা' একেবারে পরিত্যজ্য। ইহা ছাড়া নিয়মিত উপযুক্ত ব্যায়ামের আবশ্যকতা। সর্গপ্রথম ও সর্গপ্রধান খাজবিচার। নিয়ে এইগুলির সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে সাধারণ লোকের ওজন ১মন ২৫ সের হইতে ১মন ৩০ সের হওয়া উচিত। কিন্তু জলবায়ুর জঙ্ঘ ইহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সাধারণ বাঙ্গালীর ওজন একমণ ৮শ সের হইতে দেখ্‌মন। একমণ ২৫ সের ওজনের লোক প্রায় অল্প। এক্ষেত্রে সমকায় অর্থাৎ দেহের যেখা মেদ্রপ আবশ্যক সেখানে সেই পরিমাণে মাংস-পেশীকৃত ব্যক্তির কথা বলা যাইতেছে। পেশীযুক্ত লোকের ওজন একমণ ৩০ বা ৩৫ সের পর্য্যন্তও হইতে পারে কিন্তু সচরাচর একমণ দুইশত বিরল শতকরা এক বা বেড় জন মাত্র। মেদহাস করিবার পূর্বে দেহের ওজন কত জানা উচিত এবং প্রতিমাণে, অস্ত্রতঃ একবার ওজন হইয়া দেখা আবশ্যক যে কত পরিমাণ কমিতেছে। ওজন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। যে "কাঁটায়" বা দাঁড়িতে ওজন হইতে হইবে তাহাতে যেন ১ পোয়ার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। আর একটি বিশেষ কথা যে ওজন হইবার সময় প্রত্যেক বারই যেন পরিচ্ছদের সমতা

থাকে অর্থাৎ এক প্রকারের পোষাক পরিয়া প্রত্যেকবার ওজন হওয়া আবশ্যক।

ছয়মাস পূর্বে আমার ওজন ছিল ২মণ ৫ সের। এখন আমার ওজন ১মণ ২২ সের অর্থাৎ ১৬ সের কমিয়াছে গড়ে প্রতি মাসে ২০ সের কমিয়াছে। একমণ ২৫ সের ওজন হওয়াতে আমাকে ক্ষীণ বা অল্প ওজন শারীরিক বা মানসিক দৌর্ব্বল্য ভোগ করিতে হয় নাই বরং অনেক সময় ক্ষুধি লাভ করিয়াছি। দৈহিক ওজন কমাইবার সময় বিশেষভাবে এ বিষয়ে নজর রাখা উচিত, যেন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক দৌর্ব্বল্য না ঘটে। সেদ্রপ ঘটিলে আরও লম্বু প্রাণ অবলম্বন।

মেদহাসের সময় সর্গপ্রধান ও প্রথম কর্তব্য খাওয়ার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা একথা পূর্বেই বলিয়াছি। অনেক সময় আমরা যাহাকে পেটপুয়া খাওয়া বলি, দৈহিক গঠনের ও ক্ষয় পূরণের জঙ্ঘ সচরাচর তত খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তখন বিনা কারণে আমাদের দেহের কোষগুলির কার্য্যকারিতা বাড়াইয়া দিই। বাঙ্গালা দেশে আমরা সচরাচর খেতমার খাদ্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকি। খেতমার খাওয়ার কার্য্যকারী শক্তি অধিক *। খেতমার দেহের মধ্যে নানা প্রকার কিয়দ প্রতিক্রিয়ার পর জৈবিকশক্তি (glycogen) রূপে পরিণত হয় এবং ভবিষ্যতের ব্যবহারের জঙ্ঘ এই জৈবিকশক্তি, আবার মেহরূপে পরিণত হয়। আমাদের দেশের অনেক লোকের দারগা যে কেবল "দুধ দি" বা মেহজাতীয় খাদ্য হইতেই মেদ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ইহা একেবারে

সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মেহজাতীয় খাদ্য হইতে যে মেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও সম্ভেদ নাই। তাহা ছাড়াও শেতসার এমন কি অন্নসার হইতেও যথেষ্ট মেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এখানে আরও বলা আবশ্যক যে এইরূপে উপর মেহ সহজে দৈহিক কার্যে ব্যবহৃত হয় না। কাজেই সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে মেদদ্বাস করিতে হইলে শেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। শেতসার কত পরিমাণে খাওয়া কর্তব্য তাহা বলা বাস্তবিক অত্যন্ত কঠিন। কেন না খাদ্যের পরিমাণ কাহারও ঠিক নহে। কেহ বা দুই বেলায় ২ পোয়া চাউল খাইয়া থাকেন, কেহ বা আদ্যের খাইয়া থাকেন, মোটের উপর এই কথা বলা হইতে পারে যে, চালের পরিমাণ অর্ধেক করিয়া দেওয়াই ভাল তবে ইহাতে নিত্যন্ত কষ্ট হইলে ৩ ভাগ খাওয়া উচিত। আলু যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। আদুর পরিবর্তে শাক সবজী—যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হইতে পারে। তাহাতে অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ অতি সহজে দূর হয়। অজ্ঞাত শেতসার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে চিনি বা গুড় একেবারে না খাওয়াই ভাল। অনেকে অজ্ঞাত অধিক পরিমাণে চিনি বা গুড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বা অজ্ঞাত মিষ্টান্ন ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধাজনক। যাহারা চা পান করেন তাহারা যেন অল্প চিনিই ব্যবহার করেন।

আমরা বাঙ্গালী এত অধিক শেতসার ব্যবহার করি কেন? আমার বোধ হয় ইহার কারণ যে আমাদের প্রভোক্তা বাসোই অন্ন

সারের পরিমাণ অতি অল্প। দেহ রক্ষার জন্ত যথেষ্ট পরিমাণে অন্নসার পাইবার জন্তই আমরা এত অধিক মাত্রায় শেতসার গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের অনেক সময় পেট পুরিয়া খাওয়া হয় বটে, তবে পুষ্টির অল্পপাতে তাহাতে অন্নসার না থাকায়, অনেক সময় উপবাসের সমান হয়। সেই কারণে শেতসারের পরিমাণ কমাইতে হইলে অন্নাসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। দৈহিক উন্নতির জন্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানিকদের মতে এক পোয়া অন্নসার জাতীয় খাদ্যের আবশ্যক কিন্তু দরিদ্র বাঙ্গালীর কয়জনের অদৃষ্টে ইহা জুটিয়া উঠে? এই অন্নসারের অভাবই আমাদের জাতীয় দৈহিক অবনতির প্রধান কারণ। আমি এমন অনেক লোক দেখিয়াছি যাহারা তর্কের খাতিরে দুই একজন বাঙ্গালীর অসুস্থ শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিয়া শেতাস-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা করেন। তাহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে তাহারা যেন হিসাব করিয়া দেখেন, শতকরা কত লোক এক্ষণ দেখিয়াছেন এবং পাশ্চাত্যদেশীয় লোকদের অল্পপাতে কত ঠাণ্ডায়। European বা Eurasians যুবকগণ সাধারণতঃ আমাদের অপেক্ষা যে অনেক পরিমাণে দৈহিক উন্নতি করিয়া থাকে তাহার অজ্ঞাত কারণের মধ্যে খাদ্য যে প্রধান তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ম্যাক সাহেব এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ লোকের যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক মেদদ্বাসকারীর তাহার অর্ধেক জুটিলেই যথেষ্ট বৃদ্ধিতে হইবে। অন্নসারের মধ্যে সাধারণতঃ আমরা ভাল ছোলা, মংশ, মাংস, ডিম্ব এবং ছানা গ্রহণা থাকি।

তবে ভৈষজ্ঞ অন্নসার অধিকাংশ স্থলে পরিপাক ও শোষিত হয় না। এই কারণে মংশ মাংস ও ডিম্ব এই তিনটী প্রধান অন্নসার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গ্রহণা থাকি।

মংশ—একছটাক বা ডিম্ব—একটা হইলেই যথেষ্ট, অবশ্য আমি সাধারণ লোকের জ্ঞাত পরিমাণ দিতেছি না। মাংস অনেকের পক্ষে জুটিয়া উঠা দুস্কর—আবার অনেকের কচিবিরুদ্ধ। যাহারা ডিম্ব ব্যবহার করিবেন তাহাদের পক্ষে কাঁচা ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয় কারণ পরিপাক হিسابে ইহা শ্রেষ্ঠ। যাহাদের কাঁচা রুচে না তাহাদের পক্ষে এ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া লবণের সাহায্যে গ্রহণ করা শ্রেয়। অন্নসার খাদ্যের মধ্যে উহাখন অনেকের পক্ষে সুবিধাজনক। আর ছানা যথেষ্টরকম ও উৎকৃষ্ট হইলেও ইহাতে মেহের পরিমাণ যথেষ্ট আছে, তাহা ছাড়া উহা সকলের পক্ষে কি জুটিয়া উঠা সম্ভব?

মেহ-জাতীয় খাদ্য বিষয়ং ত্যাগ করিতে পারিলে ভাল হয়। বাঙ্গালীর যাহা কিছু “ভাল খাবার” তাহাতে মেহের পরিমাণ এত অধিক যে মেদযুক্ত ব্যক্তির তাহা গ্রহণ না করাই মুক্তিসম্ভব। জীলাকেরা যেমন প্রত্ন করেন বা “বাবা বিশেষরকমে দেয়া দিয়া আনেন” তাহা আর জীবনে গ্রহণ করেন না। মেদযুক্ত ব্যক্তির সেইরূপ মেহ-জাতীয় খাদ্য বাবা বিশেষের নামে উৎসর্গ করা উচিত। বাঙ্গালীর মেহ-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ঘৃত, তৈল, দুধ, মাখনই প্রধান। আমি অনেক স্থলে লক্ষ্য করিয়াছি যে “তরকারিতে” এত বেশী তৈল ও ঘৃত দেওয়া হয়, যে যাহারার পক্ষে উত্তমরূপে মাটি বা সাবান দিয়া না ধুইলে হাতে লাগিয়া থাকে। আজকাল বাঙ্গালীয়া ঘৃত ও তৈল কি উপাদানে প্রস্তুত

তাহা বোধ হয় কাহারও অবগিত নাই। বাঙ্গালীর অন্নরাগের বোধ হয় ইহা একটি অজ্ঞাতম কারণ; এই সকল কারণে মেদযুক্ত ব্যক্তির কোথাও নিম্নমণ না গ্রহণ করাই কর্তব্য। সাধারণ লোকের খাদ্যে এক ছটাক মেহ থাকিলেই যথেষ্ট। সমস্ত খাদ্যেই কিছু কিছু মেহ থাকে কাজেই মেহের জ্ঞাত ব্যক্তির প্রকার মেহ-জাতীয় খাদ্য মেদযুক্ত ব্যক্তির আবশ্যক হয় না।

প্রধান তিন প্রকার খাদ্যের কথা বলা গেল। এক্ষণে জল ও লবণের কথা বলা যাউক। লবণ যতই কম গ্রহণ করা যায় ততই মঙ্গল। অধিক মাত্রায় লবণ খাইলে রক্তের গাঢ়তা বাড়িয়া উঠে এবং উহাকে যথার্থভাবে তরল অবস্থায় রাখিবার জন্ত রক্ত জলের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কাজেই দৈহিক ওজনও বাড়িয়া যাইতে থাকে। Forster প্রমাণ করিয়াছেন যে যদি কোনও অসুস্থ ব্যক্তির সহিত কোনও প্রকার লবণ বা দেওয়া যায় তাহা হইলে অতি অল্পদিনেই সেই জীবের দেহত্যাগ ঘটয়া থাকে। ইহা শুনিয়া কাহারও দেহত্যাগ ঘটবার ভয়েন কারণ নাই, কেন না খাদ্যের প্রভোক্ত উপকরণেই যথেষ্ট পরিমাণ লবণ আছে। আমরা সাধারণতঃ ৪ তোলা আন্ডাজ লবণ গ্রহণ করিয়া থাকি। ২ তোলা আন্ডাজ ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হইবে। সম্প্রতি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকু মেজর ডি, ম্যাক এ সম্বন্ধে একজন Asst. Surgeon এর উপর পরীক্ষা করিয়াছিলেন তিনি লবণের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া যথেষ্ট দৈহিক ওজনে কমিয়াছিলেন। বিশেষ আবশ্যক বোধ না হইলে লবণ ব্যবহার না করাই উচিত। জলের পরিমাণ সম্বন্ধে এই

বলা যাইতে পারে যে, আমরা অনেক সময়ে অস্বাভাবিক অনেক জলপান করিয়া থাকি তাহা না করাই শ্রেয়ঃ। খাদ্যের সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে বলা গেল। এক্ষেত্রে আমার পাঠ্যের তালিকা উক্ত করা গেল।

প্রাতে { চাল—আধ পোয়া
 { ভাল—এক ছটা
 { আলু—একটা মাত্র প্রায় এক ছটাক
বৈকালে { আটা—আধপোয়া
 { ভিথ—একটা
 { আলু—একছটাক
 { বা ছোলা সিদ্ধ—অর্দ্ধছটাক

১০।১৫ দিন অন্তর “পুরা পেটা” ফল খাইলে অনেক উপকারি। অবশ্য সেই দিন ফল ছাড়া আর কিছু খাইতে নাই। যাহারা উপবাস করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে এই প্রথা অবলম্বন করিলে ভাল হয়। তবে আমি বড় উপবাসের পক্ষপাতী নহি, কেন না ইহাতে শরীর অনেক পরিমাণে লঘু হয় বটে কিন্তু অতি অল্পই তৃপ্তি হয়। পড়া হয় ইহা বড় বাঞ্ছনীয় নহে। অবশ্য যাহাদের উপবাস করিলে কোনও কষ্ট হয় না তাহারা মাসে ২বার উপবাস করিতে পারেন। তবে অনেকে লুচি খাইয়া “একাদশীর উপবাস” করিয়া থাকেন অবশ্য এইরূপ উপবাস না করাই যুক্তিসঙ্গত। কলিকাতার ডাঃ বঙ্কর লাবারটরীভ ফল খাওয়ার সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইয়াছিল; এ সম্বন্ধে মন্তব্য “স্বাস্থ্য সমাচারে” প্রকাশিত হইয়াছিল। রোজ কিছু ফল খাইতে পারিলে ভাল হয় কিন্তু গৃহস্থের ঘরে জুটবে কি?

এতক্ষণ পাঠের বিচার হইল। এইবার ব্যায়াম সম্বন্ধে বলা যাউক। আজকাল অনেক প্রকার ব্যায়াম দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

ডাফল, মূল্যর, বৈঠক, ডন ইত্যাদি আছে। তাহা ছাড়া ফুটবল, অজকাল গ্রামের অভ্যন্তরে দেখা দিয়াছে। ইহাকে বাদ্মিনী একেবারে জাতীয় ক্রীড়া করিয়া লইয়াছে। আমার মতে যেরূপ ব্যক্তির পক্ষে ফুটবল ব্যায়াম সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা “দেখানে পাচজননের সহিত দৌড়াইতে” খেলাও আমোদ আছে। আমি নিজে বাদ্মিনী কাজেই বাদ্মিনীর স্বপ্ন জানি, একলা কোন ব্যায়ামই ভাল লাগে না। প্রথম প্রথম হয়ত দুই দশদিন বেশ ডফল বৈঠক ডন দিলাম কিন্তু কিছুদিন পরে আর ভাল লাগে না। তবে পাচজননের সঙ্গে হইলে চলিতে পারে। সেখানে “competition” চলে তাহাতে বাস্তবিকই ব্যায়ামকে আমোদজনক করিয়া তুলে। তবে ফুটবলে অনেকের পক্ষে অস্বাভাবিক ব্যায়াম “over exercise” হইয়া পড়ে।

সেই জন্ত দৌড়ানই প্রশস্ত। ইহাও পাচ মাসে জেনে সহিত বেশ ভাল লাগে এখন নাহে। আমি যখন প্রথম দৌড়াইতাম তখন সকলের পেয়ে এবং অনেকক্ষণ পরে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতাম। কিসে একটু আগে পৌঁছিতে পারি সে বিষয়ে সর্দাদাই লক্ষ্য থাকিত। যখন Fort William এর চারি-ধার দৌড়াইয়াছিলাম তখন যিনি প্রথম হইয়া ছিলেন তাহার লগরিয়াছিল ১৭১ মিনিট আমার লগরিয়াছিল ৩৯১ মিনিট। তবে আমি সবটা দৌড়াইতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে হাঁটুদিছিলাম। অবশ্য এখন আরও অল্প সময়ের কেল্লা ধরিতে পারি। একটা “রেসা” রেসি না থাকিলে ব্যায়ামে স্তব্ধ নাই। যাহাতে স্তব্ধ নাই তাহা কে করিতে চাহে? মধ্যে মধ্যে খুব বেশী হাঁটা ভাল। সম্ভাবে

অন্ততঃ একদিন ৭৮ মাইল হাঁটিলে বেশ ভাল হয়। ইহাও দুই চারিজন একসঙ্গে করা উচিত, অথারোগে, নৌকাবাহন ইত্যাদি খুব ভাল হইলেও সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।

দৈনিক জীবনকে এমনভাবে ভাগ করা উচিত যাহাতে আলস্টের জন্ত যেন এক মুহূর্ত না থাকে। সর্দাদাই কার্যে ব্যস্ত থাকাই ভাল। দিবানিশি একেবারে পরিত্যজ্য, কোনও কারণে ইহাকে প্রস্রাব দিতে নাই। প্রাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে ৩ মাইল বেড়াইতে পারিলে ভাল হয়। রাত্রি ১১টা বা ১১ টা হইতে ৫টা পর্যন্ত নিত্রা যাইবার প্রশস্ত সময়।

অনেকে ঔষধি দিয়া মেদহাস করিতে ইচ্ছুক কিন্তু আমি ঔষধ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। অনেকে বলেন Potassium বা Sodium এর কতকগুলি লবণের মেদ হ্রাসের শক্তি আছে। একথা সত্য কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই জ্বর্ণপিণ্ডের অবসারণ (depressant) আবার অনেকের দ্বারা fatty degeneration of heart হইতে পারে। অনেকে বলেন অধিক পরিমাণে অন্ন খাইলে বিশেষতঃ Vinegar খাইলে উপকার পর্বে।

ইহার কারণ এই যে অম্লের দ্বারা gastritis নামক রোগের উৎপত্তি হয় তাহাতে শোষণ ও পরিপাক কার্য ঠিক হয় না কাজেই মেদ-হাস হইয়া থাকে।

অনেকে আবার Thyroid Extract ব্যবহার করেন। ইহাতে দৈহিক দাহন-কার্য অধিকমাত্রায় হইতে থাকে। কাজেই প্রস্রাবের সহিত urea, uric acid, phosphate xanthine bases ও প্রস্রাবের সহিত অধিকমাত্রায় আদ্রায়র বাষ্প বাহির হইতে থাকে। ইহার ভাগ ঘেহের দহন হইতে এবং ভাগ অদ্রায়র দহন হইতে উৎপন্ন। যাহাদের কোনও প্রকার হৃদরোগ আছে তাহারা যেন কোনও কারণে এই সমস্ত জ্বা ব্যবহার না করেন। আজ কাল আবার Iodothyrene নামক একটা নূতন ঔষধ বাজারে আমদানী হইয়াছে—

“কার্ণার্থ স্কুল দেহানামাস্ত্রশতং মধুদকং” চরক মধুর সহিত জলপান করিলে ক্লশ হওয়া যায় কিনা আমি জানি না, কাহারও এ সম্বন্ধে জানা থাকিলে জানাইল বিশেষ বাসিত হইব।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লী-সংস্কার

“সংস্কার” শব্দে কি বুঝি? “সংস্কার” শব্দে বুঝি যাহা একদিন ছিল, আজ তাহার অভাব হইয়াছে এবং সেই অভাব দূরীকরণ-জন্ত বিশিষ্ট উদ্ভোগের নামই সংস্কার-সাধন। সংস্কার অর্থ কোনও কিছুর অভাব হইয়াছে,

তাহার সেই অভাব দূর করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করা। যাহা ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, তাহারও বেশ-কাল-পাও-দোষে ভুট ভাগটুক বর্জন করিয়া নবীনের মত-নবীনীসুখায় সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতঃ পুরাতনের পুনর্জীবন

দান করা। ইংরেজ কবিচূড়ামণি টেনিসন বলিয়াছেন—

"The old order changeth yielding
place to new."

তবে এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে পক্ষীর কি ছিল এবং এখনই না তাহার কিম্বের অভাব হইয়াছে এবং সেই অভাবের দ্বারা করণার্থ কিরূপ উদ্ভবেরই বা দরকার?

নিত্য উৎসবমুখর অগণ্যবদনসমূহ পরিবেষ্টিত ঐশ্বর্যময়দর্শিত নগর সমূহ হইতে দূরে থাকিয়া শান্তিপ্রিয় মানবমণ্ডলী দলবদ্ধ হইয়া চিরশোভন্য চির-আনন্দধারিনী প্রাথমিক নিমগ্ন মাতার প্রেহাঙ্কলছায়ে যে জায়গায় স্ব স্ব পুত্র কলহাদি লইয়া স্থখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত তাহারই নাম ছিল পক্ষী। ঐশ্বর্যের গর্ভ, প্রভুত্বের লালসা, বিলাসের স্বভাবী আলা, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন, হিংসা, অস্থায়ী প্রভৃতি সেই শান্তিনিকেতনের চতুঃসীমায়ও পদাশ্রিত করিতে সাহসী হইত না। বেহ, মমতা, প্রীতি প্রকল্পতা এবং দৃঢ় স্বাচ্ছন্দ্যের লীলাচুনি সুদূরাবধিত পক্ষীসমূহ লোকসাজেরই বড় লোভনীয় বস্তু ছিল। সেই জন্তই শাস্ত্রে শব্দস্বা আছে "আ পক্ষাস বনঃ ব্রহ্মণঃ" বাল্য, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ় অবস্থা পর্যন্ত মাহুষ সমগায়াত্মা নির্বাহ করিবে; সংসারের শত কামনা, শত উদ্যম এবং শত লালসায় পরিবেষ্টিত থাকিয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করার পর বৃদ্ধ বয়সে শাবির আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্ত বনে গমন করিবে। যদি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত মাহুষ লালসাভাড়াপালাতন করণীয় হ্রাস হইতন্তঃ সফলিত হইতে থাকে, তবে আর তাহার জীবনে তৃপ্তি রহিল কই?—তাহার জীবন ত কেবল লালসার জাল-

মাজেই রহিয়া গেল। অশান্তি, উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষাই তাহার চিরসঙ্গী হইল; সে স্থূলিল না তাহার প্রাণ বাস্তবিক কি চায়।

অনাদি অনন্তকাল প্রবাহের এক অক্ষকারময় কুঁকি হইতে কোন্ এক অজানিত শক্তির বলে উৎথিত একটা তরঙ্গস্বংসারের মত মাহুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি দেখিতে পাইল?—জগৎ তাহার প্রথম নয়নোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ অজানিত অনন্তত্ব সৌন্দর্য্যাদি তার সম্মুখবিনতি চক্ষু দুইটীর আনন্দ বর্জন করিয়াছিল?—নিসংসার নিঃসংখ্য মানব-শিশু জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কেই কোন্ অপার্থিব স্নেহেরদপনে মুগ্ধ হইয়াছিল?—তার অসুস্থ মনোবৃত্তিগুলি কোন্ লোভনীয় সৌন্দর্য্যাদির মধ্যে ক্রমাবিকাশলাভ করিবার অবকাশ পাইয়াছিল?—মানবজীবনের মধুরতা তার প্রাণে কেইবা প্রথম অঙ্গিত করিয়া দিয়াছিল?—অনন্ত নক্ষত্রগতিত, চন্দ্র-স্বধ্যালোকিত, অদীম, উদার গগনমণ্ডল, কল্পময় পিতার জ্ঞানাবলি কল্পনাবিশিষ্ট চিশায়ায়ল প্রকৃতি মাতার অক্ষয় সৌন্দর্য্যভাঙার, স্বভাবচঞ্চল, হৈরুগতি বিহরণদের ললিত মধুর সঙ্গীত, দিগন্তবিস্তৃত স্বপ্নশীতল মলয়াশ্রিতপরিখাতি গন্ধদ্বন্দ্বার, বোলাউট-চুপিত কেন্দুপহার অনন্ত পারাবারের মনোমুগ্ধকর অনন্ত নৃত্য কে তাহার সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিল? কোন্ পৃথ্বীচুম্বিত, কোন্ মাহেহরক্ষণে মাহুষ প্রাণে প্রাণে বা পড়িয়াছিল? আত্মীয়তা এবং সৌহার্দ্যবিকাশশ্লে কোন্ পৃথ্বীজননী তাহার নিরাশ্রয় মানবশিশুকে মলল আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল? সংসারের শত কুটিলতাঞ্জলের বাহিরে রাখিয়া যে প্রেমধর্মী জননী তাহার অপোগণ্ড মানবশিশুকে আপন প্রেহাঙ্কলছায়ে

পুঙ্খ পুঙ্খাঙ্কমে পালন করিয়া আসিতেছেন, আমরা কি তাহার বোঝা করিয়া থাকি? যিনি আপনার প্রাণের সমস্ত ভালবাসা, আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্য, আপনার অক্ষয় ভাওঁর এবং আপনার স্নেহকল্পন হৃদযথানি লইয়া চিরদিনই সমানভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত রহিয়াছেন, আমরা কুলকমেও কি একবার আমাদের ভক্তিকৃতজ্ঞতার একবিন্দু অশ্রু তাহার পূর্ণা চরণে উপহার দিয়া থাকি? স্বপ্ন স্বপ্ন করিয়া মাহুষ পাগলের মত জগৎ সংসারের ঘুরিয়া বেড়াইতছে;—সে জানে না প্রকৃত স্বপ্ননিকেতন কোথায়। দেব আশীর্বাদ প্রকট হইয়া সে রাক্ষসীসেবার নিযুক্ত রহিয়াছে, অহা! কি দৈব বিজ্ঞানা।

অনন্ত করুণাসিন্ধুর একটা অতি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র মাহুষ আনন্দরাজ্যের স্বপ্ন-সংবাদ প্রাণে বহন করিয়া এক অজানা শুভক্ষেপে একটা আনন্দ বিন্দুর মত সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিল সে অদীম প্রেমশীলা পূর্ণামধুরী জননীর স্নেহ-অঙ্কে স্থখে সন্মানীয়। জগৎ তাহার কাছে অভিনব অনন্ত সৌন্দর্য্যাদি লইয়া জননীর স্বপ্নশীতল প্রেহাঙ্কলছায়ে আশ্রয় পাইয়া বেড়াইতছে। জীবনের সেই প্রথম প্রভাতে বিহগসমাজ তাহার শুভ আগমন ঘোষণা করিয়াছিল, প্রকৃতির অঙ্গুগত কুসুম-রাজি তাহারের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য লইয়া তাহারই চক্ষুর সম্মুখে বিবসৌন্দর্য্যের আভাস জ্ঞাপন করিয়াছিল, সখীরা মাতোয়ারা হইয়া মনোহর গন্ধগীতে তাহার শিশু-হৃদযথানি ভরিয়া দিয়াছিল। প্রথম নয়নোন্মেষেই প্রেমধর্মী জননী প্রীতিবিজ্ঞানময়ী জননীর কান্তোজল মুখচ্ছবি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। মায়ের স্নেহকরণ চক্ষু হইতে অনন্ত প্রেমধারা নির্গত হইয়া সেই পৃথ্বীদানে দেব আশীর্বাদী

অক্ষয় কবচের মত তাহাকে আবৃত করিয়া রাখিল, তাহার শিশুপ্রাণ বুদ্ধিা লইল কি মধুর স্বর্গেই তাহার নিমগ্ন হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখিতে পাইল যে তাহাকে আদর করিবার জন্ত তাহার সমস্তশরীর আরও কতগুলি প্রাণ তাহারই পার্শ্বে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ ভাই, কেহ বোন, কেহ আত্মীয়, কেহ স্বা মল্লকাকাকী। সেহারাছোঁর কি মধুর লীলাক্ষেত্র। পিতামাতার স্নেহ, ভাই বোনের আদর এবং আত্মীয় স্বজনের প্রীতি সোহাগ প্রাণে লইয়া বালক তাহার অজানিত জীবনপথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, সে প্রথমেই দেখিল তাহার বাড়ীর প্রাঙ্গণখানি; সে দেখিল তাহার পুজার ঘর, সে দেখিল তাহার মন্তপ্রণিপূর্ণ নির্মল জল পুষ্করী, সে দেখিল তাহার খেলিবার জায়গাখানি, দেখিল আর মজিল, শত দিকের শত আকর্ষণ তাহাকে 'বিয়িয়া ফেলিল। কোমলমতি বালক নিঃশব্দে আশ্রয়মর্গণ করিয়া দ্বন্দ্ব হইল, অমনি খাচার সারী বলিয়া উঠিল।

"টুক টুকে তোর চোঁট ছা'খানি

দেখতে বড় বেশ,

ফুট ফুটে তোর চক্ষু দুইটা

নাইকো চিন্তা লেশ;

ওহে নমস্কার নিচোঁল চরণ

শোন, গো সবিশেষ,

প্রেমের রাজ্যে ধরা পা'ড়েছ,

বা: রে মজা বেশ।"

বাগানের ফুল, পুকুরের জল, পক্ষীর গান, হাঙ্গমুখর পক্ষীময়লা, খেলার সাণিপাণের আনন্দিক আত্মীয়তা, অপরিণতবয়স্ক মানব-শিশুর নিকট নিত্য নৃতন নৃতন উৎসবের সামগ্রী যোগাইতে লাগিল। পেঁচুরা ধাওয়া,

অটুট শারীরিক স্বাস্থ্য, দেহের অপরূপ লাবণ্য এবং প্রাণের আশ্চর্য্য সজীবতা এই সকল গুণিই প্রথম হইতে তাহার পল্লীজীবনকে মধুর করিয়া দিয়াছিল। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুপর্ধ্যয়ে প্রকৃতি মাতার বিভিন্ন মাঙ্গল্য্য তাহার শিশুপ্রাপকে মাতাইয়া তুলিল। গ্রাম্য কালের স্বপ্ন আশ্রমসের অমৃত আশা, নিরাপদ সন্ধ্যার মধুরমনোহর শোভা, বর্ষাকালের কাপোষপত্রা আবির্ভাবজোছা, স্নান, সন্ততপতনশীল বারিদধলের গুরুগম্ভীর গর্জন, চমকচকিতা তড়িৎলতার চক্ৰ, চরণ-বিক্ষেপ, তেজস্কুলের দিনরাতভরা আনন্দধ্বনি, মধুর-দর্শনা শরৎ-রাগীর মুকুতাভূষণ শিশিরাক্ষ, শারদ-সৌন্দর্য্যময়ী অনাবিল -পরিষ্কৃত জ্যোতির্বিকাশ, সুন্দর, কল্যায়, পদ্ম কুব্জক ইত্যাদি কৃষ্ণগণের অমিয় মধুর হাজ্জুটী, হরিষ্রব পুরিমাভিত দিগন্তবিস্তৃত শস্তক্ষেত্র, বিশেষাগত শত শত প্রাণের বাৎসরিক মিলনানন্দ; প্রৌঢ় হেমন্তের তুহিন সম্পাত, স্বর্ণশতপরিপূর্ণ গ্রাম্য মাঠ, কর্দ্দমশূন্য পথ, শীত ঋতুর তুষারধারা, কোয়াসাদম্যাত উদীয়মান স্বর্গদেবের মনোমোহকরাশ্রী শোভা, সংক্ষিপ্ত দিনমান এবং বসন্ত কালের অনন্ত কুহুমশোভা, কোকিলের প্রাণমান পগলকরা কুহুতান, প্রিয়মিলনস্বপ্নসংবাহক দীর্ঘপ্রবাহিত বায়ানিল, স্বর্ণবর্ণরাগরঞ্জিত প্রাতঃকালীন বালন্তর্য্যোরে আলোকসৌন্দর্য্যমহিমাবিকাশে সন্ধ্যারের নবীন অতিথি আপনার মনে মনে চির বিশ্বাস মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

সেই এক দিন গিয়াছে এখন নিরীহ স্বপ্নাশ্রয় পল্লীজীবনই মানব মাত্রেই একমাত্র লোভনীয় বস্তু ছিল, যখন নগরের কলকোলাহলে তাক্ত বিরক্ত হইয়া মাছুষ জীবনের শেষ ভাগে পল্লীজীবনের নির্মল স্বপ্ন এবং অনাবিল

শান্তির মধ্যে সন্ধ্যারের নিকট চির বিদায় লইবার জন্ত সর্ব্বদাই উদগ্রীব হইয়া থাকিত। যেখন শিশু আপন মাঘের কোল পাইলে জগতের আর কিছুই চাহে না, সেইরূপ ধনের আশায় কামনার প্রেরণায় জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে দিগন্তবিস্তৃত দুর্ভাগ্য মানব হত্যা-প্রাণে লুক্কমনে সেই সর্ব্বস্বভূমিত্য, সকল সৌন্দর্য্যশালিনী, মনোহানাদিনী আপন জন্মভূমির অলোকসাম্রাজ্য পল্লীশোভার দিকেই সন্তুষ্টমনে তাকাইয়া থাকে। তাহা তাহার তৎকালীন অবসর প্রাণের আঁকাছা এবং অস্থির, বাতনা ও নৈরাশ্য সমাক্ষিপ্ত বাক্ত করিতে অক্ষম, লজ্জার ভাঙার পল্লীগ্রামে তখন কিসের অভাব ছিল? ধনদাচ, স্বাস্থ্য-সজীবতা, ভালবাগা আত্মীয়তা, সৌহার্দ্য সহায়ভূতি, পরোপকার এবং আতিথেয়তা পল্লীতে ইহার কোনটিরই অভাব ছিল না। তখন পল্লীসমাজ ঐতিহ্যমাঘে পরিপূর্ণ ছিল। ছায়াশীতল পল্লীকূটরেই প্রকৃত মহত্ত্ব মুচ্ছিয়া উঠিত।

যে পল্লীকূটরের দীপ্তনয়ন হলত অনাবিল শান্তিমাণ জীবন একদিন 'অটালিকানিবাশী' বিলাস-পরিবেষ্টিত লক্ষণভিরও বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল, যার নৈরাগিক রমণীয়ত, প্রীতিপ্রসূরতা এই ধর্মসম্ভাব্য মরজগতেও নিত্য নূতন স্বর্গের সন্দেশ বহন করিয়া আনিত, যাহার স্বাভাবিক সরলতা দেবজনেরও অতীব বাঞ্ছনীয় ছিল, সেই প্রকৃতিপালিত, স্বয়মাজ্জিত, চিরপ্রসূর পল্লীজীবনের আজ কি অবস্থা দেখিতে পাই?—এক দিন যেখানে শত শত প্রাণের হাঙ্গলধ্বনিতে দিম্বাওল প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ থাকিত, আজ সেইখানে, সেই আনন্দলীলানিকেতনে গুটিকতক রূপ

শীর্ণ অর্দ্ধ মানবের বোগধনুযায় মর্মবিধারক জন্মদধননিমুখর, মানভোজ্যিৎ, সাধারণের চক্ষু-অভ্যন্ত হেয়, অতি ক্ষুদ্র পাড়ার্তা ধানির শোক করণ 'চিহ্ন'ই মানসগুটি আঘিয়া উঠে। যেখানে এক দিন সৌহার্দ্য, আত্মীয়তা, নির্লোভ এবং স্বল্প-সম্পত্তি সমনিভাবে নির্ভীকো বিলাস করিত, আজ সেখানে ঈর্ষা-হিংসা, বিবাদবিদ্বেষ, পরস্পরে মারামারি কাটাকাটীর -সর্ব্বাঙ্গী তাবেরই অথও রাজত্ব দেখিতে পাই। মিথ্যা প্রবন্ধনা এখন একরকম পল্লী-জীবনের অধী মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে বলিলেই চলে।

বর্তমানের পল্লীজীবন এখন আর ততটা সহজ এবং সরল নহে। আভাব-বারিষ্যের নিত্য-বিবাদবিবাদ-জড়িত কুটিলতা এবং দ্বৈতকতাপরিপূর্ণ স্বর্ঘ্যাবস্থিত পল্লীনিবাস-সমূহ এখন কতকগুলি প্রেতভবন বলিয়াই আছে তার সেই কলাপত্রী, না আছে তার সর্বজনপ্রসাদিনী সজীবতা; না আছে স্বাস্থ্য, না আছে প্রসূরতা;—আগেকার দিনের আদর্শ পল্লীজীবন এখন 'প্রবল বলিহা'র 'প্রতীতি' জন্মে। পাণের উচ্চ নিম্নাশয়ে সরস মধুর পল্লীপ্রাণ অনেক আগেই ইহলীলা সাগর করিয়াছে। শিক্ষালোক-উল্লাসিত জনগণ এখন পল্লীর অজ্ঞানবরণ দূরে ফেলিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছেন। দূষিত জল, কর্দ্দ্বা আহার, হৃদয় বায়ু, কুশিক্ষা এবং ক্রাস, দাষণ দুষ্টিভা এবং হিংসার হত্যা জ্বালয় পরিবেষ্টিত ধার্মিক্য বিবাদ-বিষয়ের অথও শাসনে পড়িয়া পল্লীবাসী সর্বদাই জাহি জাহি রবে চতুর্দিক পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। অলপক্ষয়গতি, কর্তব্য কণ্ঠে অনিচ্ছা, আহার নিত্যার প্রাচুর্য, দলাদলির বৈঠক, মামলা

মোকদ্দমার জটিলতা স্মৃতিকরণ এবং পনের কুসা রটনা ইত্যাদিতেই তাহার চির অভ্যস্ত এবং চিরমুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের একঘেয়ে জীবন এই মনস্ত কুৎসিত বিষয় সমূহের ভিতরেই নিত্য নূতনত্ব খুঁজিয়া লইয়া অধঃ-উপভোগের ব্যবস্থা - করিতেছে। নিত্যনূতনোন্মোদন্যুদ্বীত প্রকৃতি মাতার সে স্নানোনে বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। সেখান এখন আর আগের মত কোকিল ডাকে না, দয়েল নাচে না, জমর গুঞ্জে না, পুঞ্জে পুঞ্জে কুহুমও ফুটে না, কোন্ ছলে যে মাঘের বৃন্দাবন পরিভাণ্য করিয়া জামচন্দ্র মধুধার চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কেহ বলিতে পারে? রূপসী পল্লীবাসিনীর আজ সে রূপশ্রী কোথায়? আর কি তেমন কলসীর প্রাণভরা উল্লাসনূতা দেখা যায়? হায়! কালের কি কঠোর শাসন। আজ শুধু অন্নভায়ে শীর্ণ, চিন্তাশয়ের জীর্ণ কতকগুলি কলসীর প্রান্তে-চেহারা ই পল্লীপ্রান্তের তাৎবনুতা করিয়া বেড়াইতেছে। কি জীবন পরিবর্তন!

মাছুষ মরিলও তার সংস্কারের ধর্মস হয় না। ইহজীবনে মাছুষ যে ভাবে পরিপুষ্ট হয়, যে ভাবে শিক্ষিত হয় এবং যে ধান ধারণা লইয়া সংসারক্ষেত্র হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে, পর জীবনেও তাহারই অভিব্যক্তি-সাধন তাহার পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, এই অতীতের শত দুঃখকষ্টও বর্তমানের চিরনূতনত্বের মধ্যে আপন মাছুষ-প্রকাশের যথেষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই, অজ্ঞাত স্বতি এতই আশামগ্র, এতই মনোহারিণী, এতই কি-অনি-কি স্বপ্ন-বিদায়িনী। বিলাস-বেষ্টিত, আচারমন্ডক, সভ্যতা-শৃঙ্খলিত নগরে থাকিয়াও মাছুষ সময়ে সময়ে আপনার আদিবাস্তবিক স্বভাব-

হুম্মর নয়তখন পল্লীমাতার প্রাতি সচ্ছন্দমনে
তাকাইয়া দেখিতে ব্যস্ত হয়, তাঁর সেই
সেহাঙ্কলছায়ে আশ্চর্যমগ্ন করিতে পারিলেই
যেন তাহার সমস্ত হৃদয়ের অবসান হয়, সমস্ত
যত্নধার লায়ন হয়। পেথের কি মধুর
আকর্ষণ, প্রাণের কি আশ্চর্য টান। কৃষিম-
সৌন্দর্যে মুগ্ধ থাকিয়াও কপটতার অভাব
হইয়াও নাহয় নগরে থাকিয়া পল্লীসৌন্দর্য
এবং পল্লীস্থলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ব্যস্ত
হয়। তাই, নগরে মানবকৌশলরচিত বাগান-
বাড়ীর স্থপতি, তাই, কৃষিম ফোয়ারার আবি-
র্ভাব, তাই, ব্যবহারিক শপওদগম্যাকীর্ণ
বিস্তৃত ভূখুমির অবস্থান, দীর্ঘ বকু ঝিল
এবং মানববিশ্বকর যাত্রণ ইত্যাদিতে নগর
পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পল্লীবাণী এখন নগর
পাড়াগাঁতেই পরিণত হইয়াছে, এবং নগর
তাহার ক্ষয়শী আপনরকে টানিয়া লইতেছে।
যদিও নগর আপনার দনবনে, বুদ্ধির কৌশলে,
উৎসাহে এবং নিশ্চয়তায় পল্লীর গভস্তথের,
ঐশ্বর্য এবং নষ্ট গৌরবের সর্গদ্বান সফল
অধিকরণ করিতেছে, তথাপি পল্লীর সেই স্থপ,
পল্লীর সেই স্বাচ্ছন্দ্য কিরাইয়া আনিতে
পারিয়াছে কি? এই নম্বর জগতে যা
একবার যায়, তাহা আর কখনও ফিরিয়া
আসে না। সৌন্দর্য-ললিত চিত্তপ্রসাদক
পল্লীপ্রাণ বহনিন হয় মরিয়া গিয়াছে; আর কি
তাঁহা ফিরিয়া পাইবার বো আছে?—আর
কি এ দেশে মার্কণ্ডেয় আছে, যে একবার
মরিয়া আরবার ঐতিহ্য আনিবে, আর কি
দেশে সার্বভৌম আছে, যে আপনাতঃস্বাভাবিক
পুণ্যপ্রভাবে মৃত জীবনের পুনরুদ্ধার করিতে
সমর্থ হইবে। মৃতের পুনরুত্থান দানের
কৃপাটা অনেকের হস্তে হসিয়াই উড়াইয়া
দিবে, কিন্তু প্রকৃত যত্নচেষ্টা, একাধ

নিষ্ঠাশাধনার বলে যে অসম্ভবও সম্ভব হইতে
পারে একথা বর্তমান বিজ্ঞানালোকিত যুগেও
বহু প্রমাণিত হইয়াছে। তবেই এখন কথা
হইল, কি করিয়া পল্লীর প্রান্ত জীবনের
পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে, কি সংস্কারদ্বারা
নগর্য পাড়াগাঁ আবার পল্লীবাণীর শোভা-
মণ্ডনের অধিকারী হইতে পারে।

পল্লীর প্রান্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করাই
পল্লীসংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য, তবেই এখন দেখা-
যাইতে পারে যে পল্লীর সেই বিবর্তশ্রীর,
অভীভূত্বের, এবং আকাজিক বস্তুর
মূলভিত্তি কোথায়। পল্লীগৌরবের মূলভিত্তি
এবং প্রকৃত আধার হইয়াছে তাহার অকপট
বিশ্বাসী সরল প্রাণ, তেমন রকমের প্রাণ
তৈয়ার করাই সকলের প্রথম এবং প্রধান
কর্তব্য। প্রাণভরা ভালবাসা, সর্গদ্বাধারনে
অমায়িক ভাব, পরার্থে স্বার্থত্যাগ ইত্যাদিই
পল্লীজীবনের অলঙ্কার। পল্লীসমূহে উত্তম
শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই পল্লীসংস্কারের
প্রথম সোপান, যের পিতামাতার প্রদত্ত
শিক্ষা, আপনার ভাইবোনের স্বভাবসম্মত
ভালবাসাই পল্লীবাণীর প্রথম স্বেচ্ছসম্মত।
জীবনের প্রারম্ভেই সে (পল্লীবাণী) দেখিবে
জগৎ তাহার নিকট চিরমুখ্য; স্বপ্ন
তাহার অপারিষি কিরণমালায় জগতের
অন্যে সৌন্দর্যভাঙার তাহাই নয় সমক্ষে
প্রতিদিন নতুন নতুন ছাঁদে গুলিয়া দেখাইবে,
চাঁদ তাহার পবিত্র শিশু জ্যোছানাদ্বারা
অপূর্ণ বহরসের অঙ্কুরিত জন্মদ্বিয়া দিবে,
অনন্ত স্বয়ম্বারী প্রকৃতিজননী তাহার চির
মনোহর সরলতাটুকু প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া
দিবে, অসীম উল্লুখ গগনমণ্ডল নিত্যা তাহার
উদার গান্ধীর্থে প্রাণ পরিপূর্ণ করিয়া জুলিবে,
বিহঙ্গমসমাজ প্রভাত এবং সন্ধ্যার বন্দনা-

গীতিতে প্রকৃত প্রেমাম্বাদ জ্বালাইয়া দিবে।
পল্লীবাণী তখন আত্মহারা হইয়া ভাবিতে
পারিবে যে সে কোথার আনিয়াছে; এ
স্বর্ণ, মা মর্তা, ইহা লইয়া তাহাকে বিশ্বম
গোলে পড়িতে হইবে। যদি জীবনের প্রথম
অবস্থাতে এমনি ভাবে পল্লীবাণী পরিপূর্ণ
হইয়া উঠিল, যদি সে তাহার আশেপাশের
সমস্ত গুলিকেই আপনার বলিয়া মনে জাখিয়া
লইতে পারিল, তাহার পরাধীনতা এই
খানেই শিক্ষা হইল। যে যাহাকে প্রাণে
প্রাণে ভালবাসে, সে তাহার নিজেই হুগো
হুবিয়াটুকু আপনার প্রেমাম্পদের কাজে
লাগাইতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ
বলিয়া মনে করে, কাজেই, আত্মীয় স্বজন
এবং পাড়াপ্রতিবাসীসমূহ যদি তাহার নিজে
বলিয়াই জানে হইল, তখন তাহাদের স্বপ্ন-
স্বপ্ননের জন্ম প্রাণও আপনাই আত্মল হইয়া
উঠিবে, আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং ক্ষুদ্র স্বার্থটুকু
জগতে বিলাইয়া দাও, দেখিবে, মহাজগতের
মহাধনে জোয়ার প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে,
তখনই যথার্থরূপে বৃদ্ধিত সক্ষম হইবে

“আপনারে লৈয়ে বিরত হইতে।”

আসে নাই কেহ অন্যল গণের,

সকলের তরে সকলে আমরা,

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।”

আলো ও ছায়া।

মহাত্মা বুদ্ধদেব জগৎবাণী সমস্তকেই
আপনার ভাবিয়াছিলেন, তাই, তাহাদের
করণ আন্তরিক অস্থির হইয়া সমীপস্থ, মান
অহঙ্কার, বিলাস প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় পরিত্যাগ
করিয়া জগতের পরিভ্রমণের জন্ম, বিশ্ববাসী
স্বপ্নবিশ্বাসের জন্ম যুগসজীবনী অমৃত
ভাতারের তত্ত্বাসে বর্গিত হইয়াছিলেন।
তাঁহার ব্যক্তিগত নিজ ক্ষুদ্র পরিবারের গভী

ছাড়াইয়া মহাবিশ্বের মহাপরিবারের মুক্তির
জন্ম আত্মহারা হইয়াছিলেন। তাই তিনি
দেবতা, তাই তিনি ভগবানের অবতার
বলিয়া জগৎসংসাধের কীর্তিত। যেখানে
কেবল আপনার প্রতিই ভালবাসা, আপনার
অর্থ চিন্তারই অর্থও রাজত্ব, সেখানে জগতের
ভালবাসা, জগতের স্বার্থ কি প্রকারে প্রবেশ
ব্রাত করিতে সক্ষম হইবে? বিজ্ঞানশাস্ত্রেও
দেখিতে পাই যে একই সময়ে একই স্থানে
দুইটি বস্তুর একত্র সমাবেশ একটি অসম্ভব
যাগার। পরকে পাইতে হইলে আগে
আপনাকে বিলাইয়া দাও। অভাবগ্রস্ত
ভিখারীকেই লোকে ভিক্ষা দেয়; যার আছে,
তাহাকে কি কেহ কখনও কিছু দিতে যায়?
স্বার্থের সীমা ত অতি সূক্ষ্ম; একটি মাত্র
জীবনেই উহা সীমাবদ্ধ, আমার আমি ত
চিরকালই আছে! অপর দর্শনকেও যদি
আমার করিয়া লইতে পারি, তবেই আমার
প্রকৃত পুরুষার্থ-সাধন হইল।—তাঁহাতেই
আমার প্রকৃত স্থপ এবং তাহাতেই আমার
প্রকৃত শান্তিলাভ হইল। আগে যে পল্লীতে
এত সৌন্দর্য ছিল তাহার কারণ কি? এক
পল্লীনিবাসী মানবমাজের মধ্যে এমন একটা
সৌহার্দ ছিল যাহাতে সকলেই সকলকে
আপনার লোক বলিয়া বৃত্তিত এবং পরস্পরের
স্থপ দুইই পরস্পরে এক এবং অর্থও বলিয়া
মনে করিয়া লইত, গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ
না, কেহ গুড়া, কেহ ভাই এবং কেহ
“মিতা” ইত্যাদি কোন না কোন অচ্ছেদ্য
সম্বন্ধ সম্পর্কে একে অরের সহিত জড়িত ছিল,
সেখানে রক্তের সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক
তাঁহাতে কিছুই আশিয়া যাইত না, সকলেই
সকলকে আপনার মনে করিয়া পরস্পরের
প্রতি ভালবাসা দেখাইত এবং পরস্পরের

উদ্ভাসিত। পল্লীবাণীরা সর্সাদাই সচেত
ধাষিত। শুধু মাহুগ বলিয়া কেন, তখনকার
দিনে পশু পক্ষী, বৃক লতা ইত্যাদির সহিত ও
এমন একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ভাবদ্বন্দ্ব সর্সাদ
পরিপুষ্ট হইত। শত্ৰুশ্রীলা যখন শ্রামী-
সম্পদনাভিলম্বে চমক রাজার রাজধানীতে
যাত্রা করিয়াছিল, তখন আশ্রমের মৃগ,
আশ্রমের বিভুল তাহার শোকে আশ্রম
হইয়াছিল; আশ্রমমণ্ডী তাহাতে স্থগপ্রসবা
হয়, তজ্জন্ত শত্ৰুশ্রীলায় কিরূপ আশ্রমিক
কামনা দেখা গিয়াছিল? গমনোক্তা শত্ৰুশ্রী
স্বয়ং পরিপুষ্ট নবমালিকার বিচ্ছেদে প্রাণে
কত যে ব্যথা অশ্রুব করিয়াছিল তাহা
আর কি বলিব। ভালবাসার টান বড় টান।
গৃহস্থামী আপন গৃহপালিত গো মহিষাদি
জগৎগণকে তখনকার দিনে প্রাণের মত
ভালবাসিত। তাই তাহাদের জন্ত চারণের
বিষয়ত ত্বপূর্ণ ভূমি, পরিষ্কার পানীয়, উত্তম
বাসস্থান ইত্যাদির খুব ব্যবস্থাই করা
হইত। পাছে, দুর্ভাগ্যে বৎসগণের কষ্ট
হয় এই মনে করিয়া গৃহস্থামী বৎসগণের
আকর্ষণবান্ধিত ছদ্ম লইয়াই আপন আপন
গৃহবার্য্য নিরীক্ষা করিত। তাহাতে একটিকে
যেমন বৎসগণ হৃৎ বলিত হইত, তেমন
আবার অন্যদিকে প্রচুর পরিমাণে 'দুঃ-
সংস্থানেরও অভাব হইত না। এখন যেমন
অতি লোভে পড়িয়া গৃহস্থামী গাভীর শেখ
বিন্দু পর্যন্ত ছদ্ম আপনকার্য্যে নিয়োজিত করে
এবং বেশী ধরতের ভয়ে তাহার (গাভীর)
বাওয়া এবং বাসস্থানের ব্যয়সংক্ষেপ করিবার
দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকে, তেমন
তাহার ফলে গোবৎসগণ দিনদিনই কম
শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। - গাভীরাও আজকাল
আর তেমন প্রচুর পরিমাণে ছদ্ম যোগাইতে

পারিতেছে না। আজকাল না হয় তাহাতে
গৃহস্থের কাজ, না হয় তাহাতে বৎসগুলের
জীবন রক্ষা, দুইদিকই মাটি হইয়া গিয়াছে।
রাতি ঘাট, দীঘি পুকুরী, মাছ ওরকারী
ইত্যদি যাহা কিছু মানব জীবনের অত্যা-
বশ্যকীয় বস্তু, সমস্তটার সম্বন্ধেই এই একই
কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। অতি গোভেই
তাঁজি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সর্সাদামী যুগিত
স্বার্থই গলীকে শ্রমানে পরিণত করিয়াছে।
নাগের চাকচিক্যে তুলিয়া মাহুগ পল্লীর সরল
সিন্ধু মধুরভাব পরিত্যাগ করিয়াছে। কাচের
মোহে পড়িয়া কান্দনকে পায়ে ঠেলিয়াছে।
তাই আজ পল্লীর এত দুর্ভাগ্য ঘটয়াছে।
সমস্ত লোকই এখন নগরপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।
সেই মাঝাগোজা, আটঘাট বাধা, কৃষি
কোশলজালই তাহাদের প্রাণকে মুক্ত করিয়া
রাখিয়াছে। আদর যত্ন অভাবে পল্লী এখন
ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর বাসভূমিতে পরিণত
হইয়াছে। বাল বিদ্র ইত্যাদি সস্তার-অভাবে
মালেরিয়া জ্বর ইত্যাদির প্রধান অবলম্বন
হইয়া উঠিয়াছে। অস্ত্র শাশের পল্লী এখন
রোগদুঃখার লীলাভূমি এবং দহা ওস্তরের,
মিথ্যা-প্রবন্ধনার, বিবাদ বিষয়ের নিরাপদ
দুর্গ হইয়া পড়িয়াছে। যদি পল্লীর প্রতি
লোকের তেমন টান থাকিত, তবে কি আর
তাহার এত দুর্ভাগ্য হইত, অন্নপূর্ণার অন্ন-
ভাণ্ডারে কি আজ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া
এত ঘনীভূত হইয়া পড়িতে পারিত? একটু
আদর ও স্নেহের অভাবে মাহুগ একবার যাহা
হারায়া ফেলিয়াছে, এখন শত চেষ্টা করিয়াও
তাঁহার পুনরুদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া
পড়িয়াছে।

পরম্পরের প্রতি ভালবাসা এবং সহায়ভূতি
প্রদর্শন এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও সম্ব্যসাধন

ঘারাই বর্তমানের অতি জঘন্য পাড়াগাঁকে
আগেকার দিনের আদর্শ পল্লীতে পরিণত করা
বাইতে পারে। গ্রামবাসী দশজনের মধ্যে
সবই আর সমান হয় না। কেহ ভাল, কেহ
মন্দ; কেহ হৃৎ কেহ ক্রম; কেহ জানী
আর কেহ বা অজ্ঞান; ইহাও থাকিবেই
থাকিবে, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার ভিতরে
ইহাদের জন্ত কোনই বৈষম্য নাই। অহঙ্কৃপা
এবং সহায়ভূতির সর্সাদাই অব্যাহত।
একটা কথা মনে পড়িতেছে

“যুগা অভিমানে দিব না বেদনা,
পশু পক্ষী কীট ইহারি রচনা,
প্রচারি জীবনে দহার মহিমা,
অহিংসামন্ত্র জপি অবিরাম,
অমিহায়ে কেহ সর্বশ্ব ধোয়ায়,
পাড়ায়ে না রব পুতুলেরি প্রায়,
রোগীর শিখরে মৃত্যুর শয্যা
জাগিব গাইব ইহারি নাম।”

ইহাই পল্লীজীবনের অমৃতময় এবং ইহাই
পল্লীপ্রাণের মৃতশব্দবিনী শক্তি।
যদি বিশ্ববাসিন্দকে একই পরম পিতার
সন্তান বলিয়া মনে ধারণা করিতে পারি,
তাহা হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগতে কি
এক মধুর বেধবন্ধনই 'দেবিতে পাই। সে
প্রাণের রাজ্যে, প্রাণের খেলায়, প্রাণের

মেলায় চিত্ত তখন ভরিয়া উঠিবে। সেখানে
ইষ্টা নাই, হিংসা নাই, বিবাদ নাই, বিবেচ
নাই; সেখানে কেবল চারিদিকেই আনন্দের
মেলা দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে। সেখানকার
পুণ্য প্রেমের বাতাস গায়ে লাগিয়া এই
পঙ্কিল মর্ত্যভূমির সমস্ত পাপ তাপ দূর করিয়া
দিবে। তখন বিশ্বাসী মানব ফুল্লমনে পূর্ণ-
প্রাণে দেবিতে পাইবে

“সেখায় বিরাজে দেব আশীর্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
যুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ
বিস্মল প্রতিভা বিকাশে।”
রবীন্দ্রনাথ।

আপন প্রাণের সমস্ত ভালবাসা জগতে
বিলাইয়া দিয়া ভগবৎপ্রতিভাকে প্রাণে
উপলব্ধিকরতঃ আপনার ভাইকে চির-আপন
জানে যুগের ভিতর টানিয়া লইতে পারিলেই
পল্লীজীবন যত হইয়া উঠিবে, সমস্ত দুঃখ-
দুর্ভাগ্যের অবসান হইবে এবং শত বিয়-
বিশদুঃখাল মুহূর্ত্ত মধ্যেই কাটিয়া যাইবে।
আগেকার পল্লীজীবনের চিরমনোহারিত্ব,
চিরমধুরী এবং চিরকলাপ আশীর্বাদ আমরা
আবার আমাদের মধ্যেই ফিরায়া পাইব।
আমাদের সকল আশাই পূর্ণ হইবে। ইতি—

শ্রীশিশুচরণ দাস গুপ্ত।

রামচরিত ও সন্ধ্যাকর নন্দী

গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্য
রচনা করিয়াছেন। পালবংশীয় রাজা যখন
পালের সময় তিনি এই কাব্য রচনা
করিয়াছেন, তাই গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্যে যখন

পালের ইধীর্থ রাজ্য ভোগের কামনা
বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন।
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীকৃষ্ণ হরপ্রসাদ
শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবারের পুস্তকালয়

হইতে এই কাব্য খানি সংগ্রহ করিয়াছেন। আট শত বৎসর পূর্বে যেক্ষণ বঙ্গলিপি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থখানি সেই পুরাতন অক্ষরে লিখিত। গ্রন্থকর্তার হস্তলিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। এখানি নকল। শীলচন্দ্র নামক জনৈক বৌদ্ধ মূল পুস্তক ও টাকা দেখিয়া এখানি লিখিয়াছিলেন। এমিয়াটিক সোসাইটি এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান ইতিহাসিকগণের নিকট এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদর পাইয়াছে এবং সমসাময়িক কবিগণ লিখিত প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

রাজসাহীর ইতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন—“রামচরিত-গ্রন্থ ‘কাব্য’ হইলেও ‘ইতিহাস’; তাহা ঘনিষ্ঠ পরিষ্কৃতরূপে স্থপরিপক্ব। হস্তরাজ কেবল ‘কাব্য’ বলিয়া ‘রামচরিতের’ উক্তি সহসা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ। সে কথা স্মরণ করিলে, সন্ধ্যাকর নন্দীকে বাঙ্গালার কবি বলুন বলিয়াই সমাদর করিতে ইচ্ছা হয়।” ১

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন “সমসাময়িকগ্রন্থ বলিয়া এই পুস্তকখানি অস্বীকার্য ইতিহাস গ্রন্থ।” ২

প্রসিদ্ধ ইতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ রাধালাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—“যদি কেহ কোন বিন সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত ‘রামচরিতের’ জ্ঞায় * * * প্রাচীন গ্রন্থ * * * আবিষ্কার করিতে পারেন, তখন উহা ইতিহাস ক্ষেত্রে সাদরে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে।” ৩

গৌড় রাজমাল্য লেখক বলেন “রামচরিত’ তুল্যকালীন কবির রচিত ঐতিহাসিক কাব্য।” (৪৮ পৃষ্ঠা)।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়কুমার রায় লিখিয়াছেন—“সন্ধ্যাকর নন্দীর এই কাব্য ঐতিহাসিকের অতিপ্রিয় পদার্থ হইয়াছে। তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলির সত্যতা সন্দেহের কোনও কারণ নাই।” ৪

হুতরাং রামচরিত কাব্যের ঐতিহাসিকতা সন্দেহ আর সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। কেহ সন্দেহ করিলে তাহাকেই উপহাস্যপন্ন হইতে হইবে। তথাপি আমি একবার কঠিনপাঠের কিয়দা দেখিব, বাস্তবিক রামচরিতের ঐতিহাসিক মূল্য কত?

(১) সন্ধ্যাকর নন্দী কে?
সন্ধ্যাকর কাব্য শেষে নিজ পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—
“বহুবাশিরো বরেন্দ্রমণ্ডল চূড়ামণি:
কুলস্থানম্।

শ্রীপৌণ্ড্রবর্ধনপুর প্রতিবন্ধ: পুণ্ড্রাকুংহধৃত: ৪১
তত্রবিদিতো বিদ্যো তিনি নন্দির সন্তান।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীই নিধিও পোষক ৪২
তত্তনয়ঃ যতনয়া করণ্যানাম গ্রীৱরূপধণ্যঃ।
নান্দিক শ্রীপা সন্তাবিতাতি ধানত:

প্রজাপতিভ্রাতা: ৪৩
নন্দিকুল কুম্ভ কানন পূর্ণেন্দুন্দোহভবন্তত।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পিতৃনামকী সদানন্দী ৪৪
এই চারিটি শ্লোকে সন্ধ্যাকর নন্দী আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে তিনি “বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ‘নন্দ’ নামক গ্রাম হইতে তিনি কুলোপাধি পাইয়া-

ছেন, নন্দ শব্দ বোধ হয় “নন্দন শব্দের শাস্ত্রিগত রূপ। সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালের শাস্ত্রি গ্রন্থক ছিলেন।”

অক্ষয় বাবু বলেন—“নান্দিকুল” নামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে কোনও কুল নাই, বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে আছে, “এই কারণে সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করাট সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত। সন্ধ্যাকরের পিতা রামপাল শব্দের শাস্ত্রিবিগ্রহিক ছিলেন।”
“করণ্য” শব্দ দ্বারা তিনি ব্রাত্যকজিয় বুদ্ধিগ্রহা-ছেন। তাই তাঁহার মতে সন্ধ্যাকর “নন্দী” কুলের বারেন্দ্র কায়স্থ।

বিজয় কুমার বাবুর মতে সন্ধ্যাকর নন্দী বৌদ্ধ ছিলেন, তাই যুগগ্রন্থ ও টাকা উভয়েরই আরম্ভের পূর্বে শিরোভাগে “শ্রীনাথ নন্দঃ” লিখিয়াছেন। ইহার মতেও প্রজাপতি নন্দী রামপালের শাস্ত্রিবিগ্রহিক ছিলেন এবং সন্ধ্যাকর মদনপালের সভাসদ ছিলেন।

আমার মতে সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তিনি ব্রাহ্মণ, কি কজিয়, কি বৌদ্ধ, কিছুই বলা যায় না। তিনি ব্রাহ্মণ বা হইতে পারেন এমন নহে। শাস্ত্রী-মহাশয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া কুল করিয়াছেন। রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বর্ণিলে সন্দেহ তৈলিয়া যেসিবার উপায় ছিল না। কারণ রাঢ়ীশ্রেণীর সার্বণ গোত্রীয় দেবদত্তের একাদশ সন্তান মধ্যে বিস্ত “নন্দী” গ্রামে বাস করিয়া নন্দী-গ্রাম হইয়াছিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন “নন্দী এখন নন্দী-গ্রাম নামেই আখ্যাত। বর্তমান জেলায় যেখানে কজিয়া ও ব্রাহ্মণ নন্দী মিলিত হইয়াছে, তাহারই পূর্ণাংশে কিছুদূরে এবং কাটোয়া হইতে মাড়েতিন কোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এইগ্রাম হইতে নন্দী বা নন্দিশাল

গাঁই হইয়াছে।” কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দী পৌণ্ড্রবর্ধনপুর প্রতিবন্ধ কুলস্থানে বাস করিতেন। এখনও জেলা মালদহের অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানা হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে নন্দাই বা নান্দাই নামে একটি গ্রাম আছে। “পৌণ্ড্রবর্ধনপুর প্রতিবন্ধ” অর্থ পৌণ্ড্রবর্ধন কুলের অন্তর্গত। এই নন্দাইগ্রাম পৌণ্ড্রবর্ধন কুলের মধ্যেই অবস্থিত বটে। এই নন্দাই-গ্রাম সন্ধ্যাকর নন্দীর কুলস্থান হইতে পারে। তাহাকে নিশ্চয় করিয়া কায়স্থ বলা যায় এমন কোন প্রমাণও নাই। অক্ষয়বাবু এক “করণ্য” শব্দের বলে সন্ধ্যাকরকে কায়স্থ করিতে চান কিন্তু তাহা হয় না। পিতামহ পিনাক নন্দীর সময় জাতির নাম করা হয় নাই, জাতির নাম করা হইল প্রজাপতি নন্দীর বোলায়, ইহা অতি অসম্ভব কথা। পিতামহের নাম করিবার পূর্বে অথবা তৎসঙ্গে জাতির নাম করাই স্বাভাবিক, তাহা করা হয় নাই। প্রজাপতিকে বলা হইয়াছে “করণ্যানামগ্রণী” অর্থাৎ করণ্যদিগের অগ্রণী। করণ অর্থ করা হুতরাং “করণ্য” অর্থ কণ্ঠকর্তা বা কণ্ঠচারী, তাহাদের অগ্রণী অর্থাৎ প্রধান এই অর্থে “করণ্যানামগ্রণী” শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রজাপতি শাস্ত্রিবিগ্রহিক ছিলেন, হুতরাং তিনি কণ্ঠচারীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। করণ শব্দই ব্রাত্য কজিয় বাচক, করণ্য অর্থ তাহা নহে। হুতরাং নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, তিনি ব্রাত্যকজিয় অর্থাৎ কায়স্থ ছিলেন।

বৌদ্ধও কুল্য যায় না। কারণ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে তিনি এক অর্থে মহেশ্বর এবং অপরথ্রে বায়বশের বন্দনা করিয়াছেন। বিজয় বাবু মূল গ্রন্থ ও টাকার প্রথমে “শ্রীনাথ নন্দঃ” দেখিয়া তাহাকে বৌদ্ধ মনে

(১) সাহিত্য। (২) রামচরিত, উপসংস্কৃতি।

(৩) প্রবাসী ১০১১। ১০১১ পৃষ্ঠা। (৪) ঢাকা রিভিউ ও সপ্তমসং ১০১১। ৪২২ পৃষ্ঠা।

করিয়াছিলেন। কিন্তু “শ্রীমদায় নমঃ” তাঁহার লেখা নহে। যে শীল চন্দ্র গ্রন্থ নকল করিয়াছেন, তিনি বোদ্ধ। “শ্রীমদায় নমঃ” তিনিই লিখিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী যে হিন্দু ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ভাষ্য লিখিলেন কি কাব্য ছিলেন তাহা ঠিক করা কঠিন।

প্রজাপতি নন্দী সাক্ষিবিগ্রহিক ছিলেন, কিন্তু কাহার, তাহা গ্রন্থে লিখা নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, “রামপালের,” কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। তিনি রামপালের সাক্ষিবিগ্রহিক থাকিলে সন্ধ্যাকরও পিতার পদের উত্তরাধিকারী হইতেন, তিনি প্রজাপতি অপেক্ষা অযোগ্য ছিলেন না। কিন্তু সন্ধ্যাকরের সাক্ষিবিগ্রহিকতা বা সত্যসদস্যের কোন প্রমাণই নাই। প্রজাপতি নন্দী কাহার সাক্ষিবিগ্রহিক ছিলেন, তাঁহা স্পষ্ট করিয়া না বলিবার কারণ কি? অল্প কারণ কিছুই নাই, তিনি রাম পালের সাক্ষিবিগ্রহিক ছিলেন না, ইহাই একমাত্র কারণ। আমার মতে তিনি “ভীমের” সাক্ষিবিগ্রহিক ছিলেন। ভীমের অল্পে সন্ধ্যাকরের শরীর, তাই রাম-চরিত গ্রন্থ হইলেও, ভীমকে রাম্য বলিলেও তিনি প্রকারান্তরে স্পষ্টতঃ রামপাল অপেক্ষা ভীমের প্রশংসাই করিয়াছেন। কবির উদ্দেশ্য মদন পালের অগ্রহ লাভ করা। ভীমের আশ্রয়ে ছিলেন, তিনি নাই, হস্তরাগ কাহার আশ্রয়ে থাকিবেন, তাই রামচরিত লিখিয়া মদন পালের নিকট উপস্থিত হইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটে নাই। ঢাকা শেষ করিবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মদনপালের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল না, তাহার প্রমাণ রাম চরিতেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখনকার বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকগণ রামচরিতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ মধ্যে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু রামচরিত কাব্যগ্রন্থ—ঐতিহাস্য নহে, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। তাহা দেখাইতেছি—

(১) রামচরিতে লিখিত আছে, বিগ্রহ পালের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল রাধা হইয়া শূরপাল ও রামপালকে নিগড়ভব করতঃ কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করিয়া ছিলেন। কৈবর্ত জাতীয় দিল্লোক তাঁহাকে নিহত করিয়া ‘জনকভূ’ বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন, এবং জাপপুত্র ভীমকে সিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন।” কিন্তু মদন পালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

তদনন্দনচন্দন বারি হারি
কীর্তিপ্রভানলিত বিখ্যাতঃ।
শ্রীমান মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো
দ্বিজেমোলিঃ শিববধভূবঃ। ১৩

অর্থাৎ “সেই বিগ্রহপালদেবের চন্দন বারি মন্দোর কীর্তি প্রভা পুলকিত বিপ নিবাসি কীর্তিত শ্রীমান মহীপাল নামক নন্দন মহাশয়ের দ্বায় দ্বিতীয় দ্বিজেমোলি হইয়াছিলেন।”

তাম্রশাসনে “মহীপাল নাম নন্দন” বলা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, রাধা হইবার পূর্বেই তিনি শিববধ হইয়া ছিলেন, অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ছিলেন। হস্তরাগ তিনি শূর পাল ও রামপালকে নিগড় বন্ধই বা করিলেন কবে, আর কারাগারেই বা বদ্ধ করিলেন কবে? মদন

পালের তাম্রশাসন মিথ্যা হইতে পারে না, সন্ধ্যাকর হয়ত মিথ্যা জনকভূত ত্রিনিয়া লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় মহীপাল রাধা হইয়া ছিলেন, “জনকভূ” হারাইয়াছিলেন, দিল্লোক হস্তে নিহত হইয়াছিলেন এলব কথা কিছুই তাম্রশাসনে নাই। তিনি পিতা বর্ধনানে পুরলোক গমন করিয়াছেন, তাই এলব ঘটনাই হয় নাই। হস্তরাগ সন্ধ্যাকরের এই কুব্যাপন মিথ্যা ঘটনাপূর্ণ, এবং ইতিহাসে স্থান লাভের অযোগ্য।

(২) “দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হইলে রামপাল সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক ‘জনকভূ’ উদ্ধার করিয়াছিলেন।”

সন্ধ্যাকরের একথা ঠিক নহে। উপরোক্ত সৌরের প্রবন্ধকেই মদন পালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

তত্ত্বাভূতহোজো মহেন্দ্র মহিমা ক (২) অঃ
প্রতাপ শ্রিয়ামেকঃ সাহস সারথিগুণবনয়ঃ
শ্রীশুর পাশো বৃণঃ।

যঃ সঙ্কল্প নিমগ্নং বিজয়ভরা (নু) বিজয় (হু)
সর্বাধঃ প্রাগ্জ্যোতানঃ মনঃ হবিষ্ময়ঃ সত্ত্ব

শ্রুতম বিখ্যঃ ১৪

“মহেন্দ্র ভূলা” মহিমায়িত, স্বমভূলা প্রতাপশ্রী সমন্বিত, সাংঘ্যে সারথী নীতিগুণ সম্পন্ন শ্রীশূরপাল নামক নন্দনপাল তাঁহার (মহীপালের) এক অগ্রহ ছিলেন। তিনি সর্ববিধ অশ্রমের প্রাপলভ্য শজবর্ণের বহুমুখ স্বাভাবিক বিস্ময়াভিনয়দ্বারা মনে শ্রীমই বিশ্বয় ভয় বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহা অশ্রয় বাবুর নিম্নেরই অর্থ, হস্তরাগ তিনি একেবারে অধীকার করিতে পারেন নাই, তাই ফুট নোটে লিখিয়াছেন, “শূর পাল অজ্ঞানপু নাম মাজ রাধা ছিলেন বোধ হয়।” শূর পাল নাম মাজই রাধা থাকুন আর নাই

থাকুন, তখনও দিল্লোক বরেন্দ্র জয় করে নাই, তখনও শূর পালের অল্প শরীর প্রাপলভ্য শজবর্ণের মনে ভয় হইত। অতএব দ্বিতীয় মহীপালের নিকট হইতে দিল্লোকের বরেন্দ্র জয় মিথ্যা কথা। শূর পাল রাধাক করেন নাই ইহাও মিথ্যা কথা। বৈজ্ঞানিকের (কমোলি লিখিতে) শূর পালের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই বটে কিন্তু মহীপালের নামও লিখিত হয় নাই। সকলের নাম লিখা বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্যও নহে।

(৩) তবে দিল্লোক কাহার নিকট হইতে বরেন্দ্র জয় করিয়াছিলেন?

মদন পালের তাম্রশাসনে পরের স্লোক লিখিত আছে—

এতগ্রাণি সহোদরো নরপতিদ্বিযা প্রজা
নির্ভর ক্ষোভাত্ত্বত বিদ্যুত বাসবদ্বিযাঃ শ্রীরা
পালোহভবৎ।

সামন্তোব চিরং জগতি জনকঃ শৈশবে
বিশ্বদুঃ স্তোভোভিঃ পরাক্র চেতসি

চমৎকার চকারস্থিরঃ ১৫

অর্থাৎ “(দ্বিযা প্রজার) দেবলোক নিবাসি পনের (অশ্রয়াক্রম সত্ত্বাত) অতিশয় চিত্ত চাকল্যে আহৃত হইয়া আন্দোলিত চিত্ত দেবরাজ (বাসব) যেমন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, এই নন্দনপতির সহোদর (দ্বিযা প্রজার) দ্বিয নামক কৈবর্ত পতির পক্ষভুক্ত প্রজাবর্ণের অতিশয় আক্রমণে আহৃত এবং অত্যুদ্বেগলিত চিত্ত হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার (চিরং) স্বদীপ শাসন সময়েই তিনি শৈশবে তেজঃ পুঙ্খের বিশ্বদুঃ শত্রু মণ্ডলের চিত্ত-ক্ষেজ চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।”

ইহাও অক্ষয় বাবুর অধ্বাবন। আর কতই স্পষ্ট চান। এই নরপতির (অর্থাৎ শূন্য পালের) সহোদর ভ্রাতা শ্রীরামপাল নামক নরপতিও সেইরূপ দ্বিবা নামক কৈবর্ত পতির পক্ষকৃত প্রজাবর্ণের অতিশয় আক্রমণে আহত এবং আন্দোলিত চিত্ত হইয়াও দৈর্ঘ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কথাই স্পষ্টই বুঝা যায় না যে রামপাল দিব্যোক্ত কর্তৃক যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। "ও" শব্দের দ্বারাও কি বুঝা যায় না যে শূন্য পালের সময়েও দিব্যোক্ত আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই? রামপাল আহত হইয়াছিলেন, যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আন্দোলিত চিত্ত হইয়াও অর্থাৎ রাজা-হারাইয়াও দৈর্ঘ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ রাজা উদ্ধার করিয়াছিলেন অতএব সন্ধ্যাকর নন্দীর কথাই মূল্য কবি করনা ব্যতিত আর কি? বৈজ্ঞানিকও কমোলি-
লিপিতে লিখাছেন—

তন্ত্রাঙ্কন পৌরুষ নৃপতে:

শ্রীরাম পোলাইভবঃ পুত্র:

পাল কলাকিত শীত কিরণ:

সাম্রাজ্য বিখ্যতিভাক্।

তেনেযেন অগরয়ে জনকচ্

লাভায় দ্বারবস্ত্রঃ ক্ষোদী

নায়ক ভীম রাবণ বধাছা-

র্জাব বোম্বঃ দ্বনাং। ৪

অর্থাৎ "সেই পরাক্রমশালী নর পালের (বিগ্রহ পালের) রামপাল নামক (এক) পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পাল-কুল-সমুদ্রোত্তীর্ণ (শীতকিরণ) চক্রে (রূপে) প্রতিভাত (এবং সাম্রাজ্য লাভে) ব্যাতি-ভাঙ্গন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যখন অর্ধ লজ্জন করিয়া, রাবণ বধান্তে জনক নন্দিনী লাভ

করিয়াছিলেন; রামপাল দেবও (যখন) সেইরূপ যুদ্ধার্থ সমুদ্রীর্ণ হইয়া ভীম নামক ক্ষৌরী নাথকের বধ সাধন করিয়া, জনককুম্বি (বরেন্দ্রী) লাভে ত্রিগুণতে (শ্রীরা. চন্দ্রে) দ্ব্যধা আত্মবশ: বিবৃত্ত করিয়াছিলেন।"

এখানেও দুটি নোট অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন, "দ্বিতীয় মহীপালের যথেষ্ট শাসনে সংকুচিত হইয়া প্রজাপুত্রের নাথক (কৈবর্ত) জাতীয়দিগকে তাহার নিহাসনচূড় ও নিহত করিলেন।" ইত্যাদি। কিন্তু তাহার অধ্বাবসেই দেখা যাইতেছে রামপাল "পালকুল সমুদ্রোত্তীর্ণ চক্রে রূপে প্রতিভাত" হইয়াছিলেন অর্থাৎ সমুদ্র হইতে উদ্বাহক চক্রে যেমন হীন প্রভ হই, তদ্রূপ প্রতিভাত হইয়াছিলেন। কোন? রাজা নন্দী হইবে। আবার সাম্রাজ্য লাভে ব্যাতিভাঙ্গনও হইয়াছিলেন। অর্থাৎ রাজা উদ্ধার করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেমন জনক নন্দিনীকে হারাইয়াছিলেন, রামপালও তেমনি জনককুম্বি হারাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র যেমন অর্ধ লজ্জন করিয়া রাবণ বধ করত: জনক নন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন, রামপালও সেইরূপ যুদ্ধার্থ, সমুদ্রীর্ণ হইয়া ভীমনামক ক্ষৌরী নামককে বধ করিয়া জনককুম্বি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা গেল মদনপালের তাম্রাঙ্গনে লিখিত বিবরণ বৈজ্ঞানিকের তাম্রাঙ্গন কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে সন্ধ্যাকর মদনপালের সাক্ষ্যও ছিলেন না, তাই প্রকৃত তথ্য জানিতে পারেন নাই। সুতরাং অক্ষয় বাবু এবং রাখাল বাবু কেন যে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতকে এত আশ্রয় করিয়াছেন জানি না। রামচরিতকাব্য ইতিহাস মধ্যে যখন পাইতে পারেন না, ইহার একটি কথাও ঠিক নহে।

কাব্যোপেখা যুব ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই।
১০০ বৎসর পূর্বের অক্ষরের একটি উৎকৃষ্ট

সাক্ষীও বটে। সে হিসাবে ইহার মূল্য কম নহে।

শ্রী বিনোদবিহারী রায়

শূন্য রহস্য

শূন্য গোলাকার কেন

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই ক্রমটি রাশি, আর একটি শূন্য। সংখ্যার চক্র রীতিমতে তত্ত্ব অথবা বৈদিকের সময়দশ অবস্থার দ্বারা এই কথটির সংখ্যা বিয়োগেই আমাদের যাবতীয় রাশিজ্ঞান। সাংখ্যাতত্ত্ব পথ্যালোচনা করিতে বসিয়াই প্রথমই আমাদের শূন্যতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি যায়। ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতির দ্বারা ইচ্ছা কিড়ি দ্বারা হয় একটা কিছু কি শূন্যের অবয়ব হইতে পারিত না? শূন্যকে গোলাকৃতি করার কারণ কি? রোমানদের মধ্যে শূন্যচক্র কোনও রাশি নাই দশবাচক X আছে বটে। গ্রীকদের উচ্চা ৮ এইরূপ। পৃথিবীর আর কোনও জাতি কোনও রূপ চিহ্ন ব্যবহার করে কিনা আমাদের জানা নাই। কিন্তু আমাদের কি উদ্দেশ্যের মত দ্বারা হয় একটা কোনও রূপ চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারিতাম না?

জানি না ইহার ভিতর সত্যই কোন রাশিনাক্ত মুক্তি নিহিত রহিয়াছে কিনা, কিন্তু স্বাধীন শূন্যতত্ত্ব পথ্যালোচনা করিতে বসিয়া শূন্যের এই গোলাকার ব্যাপার হইতে বেশ একটুখানি রস অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

শূন্যের অর্থ কি

পাঠাশার শিল্পতত্ত্ব জানে শূন্যের অর্থ "কিছু নহ"। কিন্তু সত্যই কি কিছু নয়? বিজ্ঞাপ্য করিলে তাহারাই আবার বলিবে কোনও রাশির দক্ষিণে বমাইলে তাহার

দশগুণ মূল্য বাড়িয়া যায়। ইহা যেন বৈদ্যাক্ষদের মতাবাদ। মূল্যে কিছু নয় অথচ দ্বারা দেখিতেছ সমস্তই বটে। শূন্য অর্থহীন পদার্থ নহে—অর্থহীন হইলে দশগুণ বৃদ্ধিচক্র গুণটি আসে কোথা হইতে? শূন্যের এই অর্থ-বৈচিত্র্য "কিছু নয়" এবং "কিছু বটে" ব্যাপারের একটা মীমাংসা কেহ করিয়া দিবেন কি?

শূন্যের উৎপত্তি

মীমাংসা প্রকৃত হইক না হউক মীমাংসার চেষ্টাতেই প্রবন্ধের অবতারণা বটে। কিন্তু মীমাংসায় আসিবার পূর্বে আরও দু একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি দরকার। এক, দুই, তিন ইত্যাদি করিয়া নয়টি রাশি ও একটি শূন্য, এই দশটি মূল সংখ্যা গণিত হইল কেন? বিশিষ্ট বা পঞ্চাশটি অথবা দুই কি পাঁচটি মূল সংখ্যা দ্বারা হইলে কোনও আপত্তি ছিল কি? রোমকদের সংখ্যা গণনায় দশটি মাত্র মূল সংখ্যা ছিল না। গ্রীক, ইহুদি অথবা অন্য কোনও প্রাচীন জাতিরও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল না। আমাদের দশটি মাত্র অঙ্ক দ্বারা সংখ্যাগণনা কি একটা অর্থহীন গণ্যের জোয়ের ব্যাপার, না ইহার ভিতরও কোনও গুঢ় কারণ নির্ণয় করার আছে?

পাচাত্তা পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার কারণ নির্ণয়ে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের বিবেচনায় সম্ভবত: ইহা "দশম" গণ্যের একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। দশজন লোক

সাতারিয়া নদী পার হইল। সব কয়জন আসিতে পারিল কি না দেখিবার জ্ঞান গণনা করিতে গিয়া গণনাকারী দেখে সংখ্যা হইতেছে একজন নাই। প্রত্যেকেই সেইরূপ করিয়া ও সেইরূপ ফল পাইয়া মহা দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছে এমন সময়ে কেহ বুঝাইয়া দিলেন তাঁহাদের মধ্যে অতিবাহীন শূন্যটি অর্থাৎ দশমস্থানীয় ব্যক্তিটি গণনাকারী স্বয়ং। তখন সব গোল চুকিয়া গেল। মূল সংখ্যা-চক্রটি নির্ভ্রাণ সময়েও বোধ হয় সেইরূপ একটি কাণ্ড অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

সকলেই জানেন কবাজুলি দ্বারা গণনা করাই মানবের স্বভাব। কালকে বুঝাইতে হইলে কথা কহিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই কি তিন অঙ্গুলি দেখাইয়া বুঝাইয়া বসিয়া থাকি একজনটির কথা বলা হইতেছে। মানবের দুই হাতে দশটি মাত্র অঙ্গুলি। একটি দিয়া গণনা করিলে নয়টি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাই—নয়টি মূল সংখ্যা এবং একটি শূন্য হইবার মূল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা ইহার কতকটা হস্তেও দেখোয়া থাকেন। গ্রীকদের সংখ্যা-বাচক শব্দের নাম ডিজিট্‌স্‌ উহা অঙ্গুলি অর্থ বাজক। "figure" কথাটিও নাকি "finger" এর অপভ্রংশ মাত্র। সন্তবও বটে, একটা অক্ষর তুলিয়া লইলেই হইল। ফিগারের অর্থ রাশি ও ফিগারের অর্থ অঙ্গুলি হওয়ায় পাক্‌তা পণ্ডিতগণের অস্থানান নিত্যান্ত অমৌক্তিক বলিয়াও বিবেচিত হয় না। কিন্তু প্রমাণের এইখানেই পরিসমাপ্তি নহে। আরও আছে। বিলাতি ঘড়িগুলিতে যে সব ঘটার দাগ দেওয়া থাকে তাহা রোমান অক্ষরের লিখিত। উহা দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন প্রথম চারটি সংখ্যা, I, II, III,

এইরূপ চারটি দাগ দিয়া বুঝান হইয়াছে। ইহা টিক যেন পঞ্চাংকরে অঙ্গুলি তুলিয়া বলা হইতেছে কয়টি সংখ্যা। এইরূপ করিয়া গেলে পাঁচ বলিবার সময় পাঁচটি আঙ্গুল বা সমুদয় করতলটিই দেখিতে হয় স্বতরাং পাঁচের আকৃতি V এইরূপ। ছয় বলিতে একটি হাত ও একটি আঙ্গুল স্বতরাং তাহার আকৃতি VI এইরূপ। দশ বলিবার সময় দুই হাতই দেখাইতে হইবে কাজেই তাহা X অর্থাৎ বিপরীত ভাবে বসান হুটা পাঁচ মাত্র।

প্রমাণগুলি বেশ জোরাল রটে। গোল এইটুকু সংখ্যা-বাচক রাশিগুলির দশটির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। C, L, প্রভৃতি অক্ষর-বাচক অল্প অক্ষরও আসিল কোথা হইতে? দেখাইবার দ্বারা গণনা করাই মূল কারণ হইলে এরূপ হইতে কি?

হয়ত ইহা পর্বতবর্তী কালের রাশিগুলির উদ্ভূত সাধন প্রয়াসের ফল। কারণ ইহা দেখা যায় পর্বতবর্তী কালে চারি লিখিতে হইলে "III" এইরূপ না লিখিয়া IV এইরূপ লিখা প্রচলিত হইয়াছিল। নয় লিখিতে হইলে VIII এইরূপ না লিখিয়া IX এইরূপ লিখা হইত। দশের রাশি যোগবাচক ইহা পূর্ন হইতেই জানা ছিল এমন হইতে বামের রাশি বিয়োগ বাচক এটুকুও ধরা হইতে লাগিল। রোমানদের মন্তিকে এতদপেক্ষা উন্নততর কথা প্রবেশ করে নাই। কালে কিছু আবিষ্কৃত হইত কিনা বলা যায় না। অন্য জাতির মধ্যে কি নিয়ম ছিল আমরা সুবিশেষ জানি না। বর্তমানে প্রায় সর্বদেশেই ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি নয়টি রাশি ও একটি শূন্য সাহায্যে অক্ষগণনা করা হয়।

এ রকম প্রচার উৎপত্তি কোন দেশে সে বিষয় লইয়া প্রতীচ্যগণ মধ্যে অধিক মতভেদ

লক্ষিত হয় না। "Arabic system of notation" এনে নামেই বুঝা যায় উহা। ওদানীশ্বর কালের দিগ্বিজীৱ আরবগণ কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল। সৌভাগ্য জন্মে জ্ঞান-প্রিয় আরবগণ নিজ নিজ গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন উহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদের নিকট হইতেই প্রযীত। উৎপত্তি যে দেখেই হউক আমরা তাহা লইয়া বাদ বিতণ্ডা করিতে বসি না, আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহা নয়। বলিতেছিলাম—

প্রাচীন গ্রীক বা রোমকগণ যে ভাবেই অক্ষ গণনা করুন না কেন উহা যে অঙ্গুলিধারা গণনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল বেশ বুঝা যায়। উহাদের "ফিগার" এবং "ডিজিট্‌স্‌" নামই তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু কথা হইতেছে, বর্তমান রীত্যুহায্যী ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি নয়টি রাশি ও একটি শূন্য সাহায্যে অক্ষ গণনার ও কি মূল তাহাই? কয়েকদিন পূর্বে এদেশে বিলাতি এম্পাইরোগিপিডিয়াগুলির ধরণে অভিধান প্রণয়নে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। "শম্বেশ্বর বাহাদুর" নামে এক-গনি কোষগ্রন্থ এইরূপ গ্রন্থের হইতেছিল।

তাহাতে অক্ষর-উৎপত্তি পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন কবাজুলি দ্বারা গণনা হইলে পদাঙ্গুলি বাদ যাইল কেন ও এই জ্ঞান তিনি বিবেচনা করেন কবাজুলি দ্বারা গণনার কথা অমৌক্তিক; নয়টি রাশির ও একটি শূন্য ছাড়া সন্তবও অল্প কারণ ছিল। লেকেকের মতে, হয়ত বর্ণমালায় অক্ষরাবলি দৃষ্টে উহা বাহির হইয়াছিল। কারণ পঞ্জাবের উত্তরে টাক্‌রীভাষায় অখ্যাতি, এক দুই তিন ইত্যাদি সংখ্যা-বাচক শব্দের আভ্যন্তর দ্বারা (এ, ডি, জি ইত্যাদি) ১, ২, ৩ প্রভৃতি লিখিত হয়। এ অস্থানান কতদূর সঙ্গত

বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে আমাদের উদ্ভাষিত প্রশ্নের—শূন্য গোলাকৃতি কেন? শূন্যের অর্থ ঐকজ্ঞার কারণ কি? কেনই বা মূল সংখ্যা-বাচক রাশিকয়টি দশটি মাত্র হইল অধিক বা অল্প হইল না—কোনই মীমাংসা হয় না। বর্ণমালায় সংখ্যা কিছু দশটি মাত্র নয়, তবে মূল সংখ্যা-বাচক রাশি কয়টি বর্ণমালা হইতে বাহির হইয়াছিল, বলা যায় কিরূপে? ব্যবহারিক কার্যে কখনও প্রয়োজন আত্মক না আত্মক, যে কোন বিষয়েই হউক তথা নির্ণয়ে সজ্ঞানের বিশেষ আনন্দ আছে। আমরাও সেইজ্ঞা এবিষয়ে একটা অস্থানান পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিব। সঙ্গতি অঙ্গতি তাহারাও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আশা, গণিতের এই ইতিবৃত্ত পাঠককে অসম্ভা বর্ষের বলিয়া অনাদৃত পূর্বমণীযীর্ণগণের মানসিক শক্তিকে কতকটা পরিচয় পাইবেন এবং নিরপেক্ষ হইয়া মোকাল ও একালের বিচার করিয়া দেখিতে সুবিধা পাইবেন। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্বে আরও একটি বাজে কথা বলার জ্ঞান পাঠকের ধৈর্য্য চাক্ষুচি।

প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ কি নিয়মে প্রাচীন তত্ত্ব সকলের উদ্ধার করেন আমরা জানি না কিন্তু অনেক সময়ে একটি সোজা কথা মনে রাখিলে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্যতা পাওয়া যায়। কথাটি এই, ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মতে যেমন পৃথিবীর এক একটি স্তর গঠিত হইতে বহুবর্ষ সময় প্রয়োজন, মানব জীবনের ইতিহাসে পরিবর্তনাবলি সাধিত হইতেও সেইরূপ বহু বিলম্ব ঘটে। এক একটি প্রাচীন আচার ব্যবহার যাই যাই করিয়াও যায় না। পূর্বে কি ছিল জানিতে হইলে বর্তমানে যে সমস্ত আচার ব্যবহার ক্রমশঃ শিথিল হইয়া

বিষয়ের তিনি পূর্ণ অধিকারী। "পাপ চারপাশে
হইতেই আপনি ফলের" অর্থ পাপ পূর্ণ হইলেই
তাহার ফল ভোগ করিতে হয় ইত্যাদি—

শুভ্র অর্থ সেইরূপ দশ হইলেও উহাতে একটা
সমগ্রতার ভাব নিহিত ছিল। আমাদের
ব্যবহারিক বাসিষ্ঠান কিন্তু দশ সংখ্যার
মধ্যেই নিবদ্ধ নহে কাজেই আজকাল "গণ্ডা"
কথাটি যেরূপভাবে ব্যবহৃত হয় "শুদ্ধ" ও
সেইরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।
আজ কাল যেমন ১ গণ্ডা বা ২ গণ্ডা প্রভৃতি
কথা ব্যবহার করা যায় তখন বোধ হয় ২দশ
২দশ এইরূপ বলা হইত। শুভ্র দশ সংখ্যা
জাপক ছিল। স্তবরাং এক দশ লিবিবার
সহয় এক ০ অথবা ১০, দুই দশ লিবিবার
সহয় দুই ০ অথবা ২০, দশ দশ লিবিবার
সহয় ১০০ অথবা শুভ্র ০০। কতবার সেই
"দশ দশ" লওয়া হইয়াছে বুঝাইবার প্রয়োজন
হইলে "০০"র পূর্বে সেই সংখ্যাটি বসান
হইত। শুভ্র দক্ষিণে অবস্থিত হইলে বাসি
সমুদ্রের দশগুণ মূল্য বাড়িয়া দিবার ইহাই
কারণ। প্রকৃত পক্ষে শূন্যের অর্থই দশ।
বাসস্থিত সংখ্যা গুলি কতবার সেই দশ
লওয়া হইয়াছে তাহারই প্রকাশক মাত্র।

ইহা হইতেই কালে একক, দশক, শতক
প্রাকৃতি স্থানীয় মান নির্দেশের প্রথা উদ্ভূত
হইয়াছিল। তখন বামে কোনও বাসি
থাকিলেই দক্ষিণে শুভ্র আছে দরিয়া লওয়া
হইত। "১১"র অর্থ তখন ১০ এবং ১,

$$\begin{array}{r} ১০ \\ ১ \end{array} = \begin{array}{r} ১ \\ ১ \end{array} = ১১$$

১১০ র অর্থ
তখন ২০০ এবং
১০০ এবং ৩

$$\begin{array}{r} ২০০ \\ ১০ \end{array} = \begin{array}{r} ২ \\ ১ \end{array} = ২১০$$

শুভ্র কথটা ছাড়িয়া দিলে কিন্তু দেখায় ও
উহাই কালে কিরূপে ১১, ২১০ প্রভৃতির স্রাব
হইয়া পড়িয়াছিল।

শুভ্র হইতে এইরূপে স্থিতিশাল সংখ্যা শাস্ত্রের
সৃষ্টি হইয়াছে। শব্দ মধ্যে যেরূপ বীজরূপী
গুণের সংখ্যা মধ্যে শূন্যেরও দেখি স্থান।

ভারতের আয়ুর্বেদ, ধর্মুর্বেদ, কলাবিজ্ঞা
প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবহারিক শাস্ত্র বেদভিত্তি
বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা দেবীলমায়
দর্শনের সহিত আপাত দৃষ্টিতে সম্পর্ক শুভ্র
গণিত শাস্ত্রও বেদমূলক বেদান্ত দর্শনের উপর
স্থাপিত বলা যায়। জানি না শূন্যভেদে
ভিত্তির সত্যই কোন হুগুভীর দার্শনিক তত্ত্ব
নিহিত আছে কিনা কিন্তু শূভ্রহস্ত পূর্ণা-
লোচনা করিতে বসিলে আমাদের ঐক্যপাই
বারাং হইবে। গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি
আজিকার দিনে নহে। হুগুভীর জ্ঞানদেও
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অত প্রাচীন
কালেও দার্শনিক জ্ঞানের এরূপ বিকাশ
হইয়াছিল (যাহা আমরা ইতিহাসে পরবর্তী
কালে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া শিক্ষা পাই)
সহজ উপায়ে করাগুলি দ্বারা গণনার প্রথা
ছাড়িয়া গণিত শাস্ত্রকে দর্শনমূলক করার জন্ত
কৃষি মস্তিষ্ক চেষ্টা হইয়া ছিল ভাবিলে
একটু বিশ্বাসযোগ্য হইতে হয় বটে। আমাদের
এমনকি যেরূপ দশ দিক বালিলাম এখন
নিরপেক্ষ পাঠক সব দিক বিচার করিয়া
নিজমত স্থির করিবেন।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

যৌথকারবারের বিষয়ে দু'একটা কথা

বাস্তাব্যবহারিক উপর অনেককাল
হইতেই একটা প্রাকৃতিক মন্তব্য চলিয়া আসি-
তেছে। অনেকেই ইহার উপর কটাক
করিয়াছেন— যৌথকারবারেও বাপুলী
সেত্রেপ দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই এ
অশ্রুযোগ্যও অনেক সময়ই শুনা যায়। ইহা
যে একেবারেই ভিত্তিহীন একথাও বলা
চলে না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে আমাদের
এই বদদেশেই অনেকগুলি যৌথকারবারের
কোম্পানি গঠিত হইয়াছিল। যাহাদের কতক-
গুলি অল্পরেই অনেক দরিদ্রের ধন জীর্ণ
করিয়া বিলীন হইয়াছে। কতকগুলির জীবন
কারবার একরূপ চলিতেছে মাত্র। ইহার
কাবর অসম্পদান করিলেও সর্বত্র একই
ভাবের উত্তর পাওয়া যায় না। কতকগুলিতে
যে সব ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা
বিচক্ষণ ব্যবহার্য্যর্জীৱ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জল্প মাকি-
ষ্টেট বা ঐরূপ বিজ্ঞা দমনমণ্ডিত উচ্চদৃষ্টি
হইতে পারেন কিন্তু হস্তে কারবার সম্বন্ধে
তাঁহাদের কোনই অভিজ্ঞতা না থাকায় কি দুই
কি হইতেছে সে বিষয়ে তাঁহাদের কোনই দৃষ্টি
ছিল না। স্তবরাং অধীনস্থ কক্ষচারীগণ
কর্তৃক মণ্ডেই অর্থের অপব্যয় হইয়া কারবার
লেলে হইয়া গেল। কিন্তু কতকগুলির
সম্বন্ধে তাহাও বলা চলে না। কারবারের
কাণ্ডে অভিজ্ঞ ব্যক্তদের দ্বারা পরিচালিত

স্বদেশী আন্দোলনের সময় সাধারণ লোকের
মনোভাব এতই উত্তেজিত হইয়াছিল যে
অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও নিজ নিজ সঞ্চিত অর্থ
এই সব কারবারের অংশ গ্রহণে নিয়োজিত
করিয়াছিলেন। এই সব যৌথকারবারের
অস্থানীয় পক্ষ হস্তে স্বদেশীর সেবক এলোউপগ
গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্বীয় বাকচাতুর্য্যে অনেক
দরিদ্রের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া
তাহাদিগের দ্বারা অংশ ক্রয় করাইয়াছিলেন।
কিন্তু এখন সেইসব দরিদ্র ব্যক্তি কেবল সেই
সেয়ার মার্জিককেটের কাজে দুইই জল
খাইতেছেন আর স্বীয় "অদ্ভুত" দিক্কার
দিত্তেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সেয়ার
মার্জিককেটও পাওয়া যায় নাই।

দেশের গণ্যমান্য লোকদিগের নাম
ভিদের্তর তালিকায় থাকা সত্ত্বেও যদি তাহার
এইরূপ পরিণাম হয় তবে দেশের লোক
পুনরায় তাহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থান
করিতে পারিবে কি? ইহাতে এই সব দরিদ্র
ব্যক্তিগণের প্রত্যক্ষভাবে যে ক্ষতি হইল
তদপেক্ষাও পরোক্ষভাবে যে আরও গুরুতর
ক্ষতি হইল তাহা কি কেহ বিবেচনা করেন
না?

অত আমি নিম্নের অভিজ্ঞতা সন্নিবিষ্ট দুই
চারিটি এইরূপ কোম্পানির বিষয় "গৃহস্থের"
পাঠকবর্গের গোচরে আনিতেছি, ইহা হইতেই
তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে আমার
অভিযোগ প্রকৃত কি না।

১। তারপূর্ব স্বাক্ষর গুণাকর্ষ—দেশপ্রাণিক
দৃষ্টান্ত অগ্রাণ্য নহে।

ববেণ্য বন্দের কৃতি সন্তান অবসার প্রাপ্ত

হইয়া দেশের লোকের দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে এবং সাধারণ ভাবেও যৌথকার্যবাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া পড়ে।

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীগণও যেন এবিষয় মুখিয়া

হুজিয়া কাজে হাত দেন। অধিক আর কি বলিব। নিত্যন্ত ব্যথিত চিত্তেই আজ এই কয়টা কথা বলিলাম।

শ্রীযত্ননাথ চক্রবর্তী।

মফঃস্বলের বাণী

১। পল্লী সংস্কার

পল্লীগুলি একদিনে বা এক বৎসরে জঙ্গলে ভরিয়া উঠে নাই—পথ-ঘাটগুলি একদিনের বা এক বৎসরের সংস্কার-অভাবে দুর্গম হইয়া উঠে নাই। আজ পল্লীগ্রামগুলি যে কলেরা-মালেরিয়ার বিহারভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা পল্লিবাসীর বহু বৎসরের উপেক্ষা ও নিশ্চেষ্টতার ফল, ইহা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন?

তোমার বাজীর কাছে জঙ্গল, ভূমি কাটাওয়া পরিষ্কার না করিলে, ভিন্নগ্রাম-বাসীর তাহাতে স্বার্থ কি? তোমার গ্রামের পুঙ্খ-পুঙ্খকিরী হাজিয়া মজিয়া গেলে অস্ত্রের তাহাতে দায় কি? তোমার গ্রামের পথ সংস্কার-অভাবে দুর্গম হইলে, অস্ত্রের তাহাতে অসুবিধা কি?

তোমার থিড়কিতে জঙ্গল—তোমার চলিবার পথ বর্ষার জলে কর্দমাক্ত—স্বতন্ত্রতা দুর্গম; ভূমি তাহা দেখিয়াও দেখিবে না—প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করিবে না। তোমার পান-পানের পুঙ্খকিরী প্রতি তোমার দৃষ্টি না থাকিলে—উহাদের বক্ষায় তোমার বহু না থাকিলে, তোমাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। তবে ভূমি নিশ্চেষ্ট থাকিবে কেন? কেবল আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হইবে না। কোমর বাধিয়া পল্লীর সংস্কারের

জন্ত অগ্রসর হও। আপনারা উত্তীয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও, তবে ফল পাইবে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে,—

Heaven helps those, who help themselves.

কথাটি খুবই সত্য। পুঙ্খকার ভিন্ন নীতি নাই—মানবা ভিন্ন সাম্য-বস্ত্র লাভের উপায়-স্তর নাই। এ জগতের নিয়মই এই। নিশ্চেষ্টতা, আলস্যের পরিণাম যাহা—পল্লীবাসীরা এখন তাহাই ভোগ করিতেছেন।

অনেক পল্লিগ্রামেই পুঙ্খকিরী আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই অব্যবহার্য—তাহাদের জন্ত অপব্যয়। কিন্তু হইলে কি হয়, পুঙ্খকিরীর অধিকারী স্বীয় স্বচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও উহাদের সংস্কারে মনোযোগী নহেন। তাহারা চাহেন গবর্ণমেন্ট হইতে উহার সংস্কার হউক—অথচ উহার কোন সবই তাহারা ভাগ্য করিতে বাধ্য নহেন। অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট নিজ বাঘে পুঙ্খকিরী ব্যবহার্য করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ান। এরূপ স্বার্থপরতার পরিচয় সর্বত্র না হইলেও—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

তাই বলিতেছি, গ্রামবাসীগণ স্ব স্ব গ্রামের সংস্কারে হাতে কলমে উত্তীয়া পড়িয়া লাগুন। গবর্ণমেন্ট তাহাদের সাধু সংকল্পের সাহায্য করিতে ক্রটি করিবেন না। নচেৎ প্রত্যেক গ্রামের জন্ত গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা

করিলে, তাহা পূর্ণ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে—এবং তাহা সম্ভবপরও নহে। কিন্তু হইতেছেও যে তাহাই।

অধিকাংশ গ্রামই দলদলিতে পূর্ণ। গ্রামের উন্নতির জন্ত—গ্রামের দুরবস্থা মোচনের জন্ত কাহারও আত্মকর কামনা বা চেষ্টা নাই। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র পাঠাইয়া প্রতিকারপ্রার্থী হইলে কি হইবে? সে রূপ প্রতিকার গবর্ণমেন্টের সাধ্যায়ত্ত নহে।

আপনারা যুহুতে গ্রামের অন্ততঃ প্রত্যেক গৃহস্থ আপন বাসস্থানের সমীপবর্তী জঙ্গল কাটিয়া পরিকার করুন। সে ভাগ গবর্ণমেন্টের উপর দিয়া নিশ্চিত থাকিবেন না। পথে ছুই কোদারী মাটি প্রত্যেকে তুলিয়া দিলে, লোকাল-বোজের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না। এইরূপে পুঙ্খকিরীর সংস্কারের জন্ত গ্রাম হইতে চালা তুলিয়া এবং কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু সাহায্য লইয়া সম্পন্ন হইতে পারে।

একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, গ্রামের সংস্কার হইবে না—পল্লীবাসীর দুঃখও সূচিত হবে না। এ কথাগুলি গ্রামবাসীগণ মনে রাখিলে ভাল হয়।

বার্তাবহু।

২। মালদহের গৌমাঞী গভীরা

পরম কারুণিক মঙ্গলময় বিবেচনের ইচ্ছায় আমরা প্রত্যেক নব-বর্ষের প্রথম ভাগে কোন নির্দিষ্ট সময়ে গভীরা-সংগোপে তাহার পূজার আয়োজন করিয়া ধনী, জ্ঞানী, দীন ও দরিদ্র কনক-কমল-পাদ-পদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকি। তাহার ইচ্ছায় অজ্ঞাত বৎসরের ছায় এ বৎসরও নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছারূপে গভীরা

উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। গভীরা যে একটা জাতীয় উৎসব, ইহা যে কোনরূপ ব্যবসাদারী আশ্রম প্রমোদ নহে, তাহা বোধ হয়, কোন সম্প্রদায়েরই লোককে বুঝিতে হইবে না। কিছু দিন পূর্বে গভীরা য়ে অবনতি হইতেছিল একথা গোপন করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। সে সময় গভীরায় নানারূপ অশ্লীল ভাবের অবতারণা করা হইত বলিয়াই গভীরার কথা শুনিলেই স্থবীমণ্ডলী কর্ণে অশ্লীল প্রদান করিতেন। কিন্তু উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সমিতির মালদহ বিবেচনায়নের সময় হইতেই তাহা যেন পুনর্জীবিত হইয়া স্থবীমণ্ডলীর চিন্তাকর্ম করতঃ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। চিত্ত প্রাঙ্গণ রাখিতে হইলে সপ্তীতালোচনার আবশ্যক এবং সপ্তীতে মানব চিত্ত যেরূপ আকৃষ্ট হয় আর কিছুতেই সেরূপ ভাবে আকৃষ্ট হইতে দৃষ্টি গোচর হয় না। অধিকাংশ স্থলেই সপ্তীতের দ্বারাই জন সমাজে ভাব বিনিময় হয়।

গভীরার সমস্ত ভাব বজায় রাখিয়া তাহার মধ্যে সাহিত্য আলোচনা, দেশের নৈতিক অবস্থা, শাস্ত্র, শিক্ষা, সামাজিকতা, বাণ্যবিক বিবরণ, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের সাহায্যে আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনার দল সাহায্যে মালদহবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বঙ্গের জন সাধারণ মালদহের 'সপ্তী' আশ্রমের জায় স্থখে উপভোগ করিতে পারেন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। সেই উদ্দেশ্যেই আজ তিন বৎসর যাবৎ মকছুপপুর গৌমাঞী গভীরার পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ গায়ক ও নটকগণকে পুরস্কার দানে উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হইতেছে। স্থানীয় স্থবী-মণ্ডলীর মধ্য হইতে গভীরা সংকল্প বৃদ্ধদ্বী

কয়েকজন ভক্তমহোদয়গণকে পরীক্ষক মনোনীত করা হইয়া থাকে এবং তাঁহাদেরই মতামতানুযায়ী গায়ক ও নর্তকগণ আপন আপন যোগ্যতাভূমিতে পূর্বস্বার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বর্ধমান বর্ষে প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীমুকুন্ড রজনীকান্ত চক্রবর্তী, বাবু রাধাকিশোর বসাক মোক্তার, বাবু মলিনীকান্ত বহু এল, এইচ, এম, এল, বাবু হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এম, ই, বাবু তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ, প্রফেসর, বাবু দারিকানাথ সিংহ বি, এল, ও বাবু যতীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার বি, এল, মহোদয়গণ অল্পগ্রন্থ-পূর্বক বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া পরীক্ষকের কার্য্য করিচ্ছেন। আমি তজ্জন তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। পরীক্ষকদিগের মধ্যে কেবল তারক বাবু কাব্যবশতঃ গম্ভীর উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়াই পরীক্ষকগণের রিপোর্টে তাঁহার নাম দ্রুতস্থ নাই। এ বৎসর প্রতিযোগিতার গান গাইবার জ্ঞ পূর্বেই মুচিয়া, মহেশ্বপুত্র, কৃত্তবপুত্র, পূজাটীলী, মকছুমপুত্র, গণিপুর, কৌতাহালী, মোহেনপুত্র, জিলিমপুত্র, মলবাতী, চীপাঙ্গানী, ও ভোলাহাট প্রভৃতি স্থানের বোলবাই সমিতির সঙ্গীতগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মকছুমপুত্র, গণিপুর, ও ভোলাহাটের হৃদিকেশ ঠাকুরের দল বাতীত অস্ত্র প্রায় সমস্ত দলেরই সঙ্গীতগুলি গীত হইয়াছিল। পরীক্ষকদিগের মতে তাঁহারা তাঁহাদিগের যোগ্যতাসম্মানে নিরীক্ষিত রূপে পূরিত হইয়াছেন; কিন্তু হৃদয়ের বিষয় পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও গীত সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই সামাজিক ব্যাপার লইয়া গঠিত হইয়াছে, অস্ত্রাভ বিষয় সত্বেও বড় একটা আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় নাই। তবে মকছুমপুত্র বোলবাই সমিতির প্রাপ্ত সঙ্গীত

স্বাধা সত্বেও রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এ দলের অধাক শ্রীমুত শরচ্চন্দ্র দাস গীত্জিত থাকায় গম্ভীরার সময় প্রতিযোগিতায় এ দল উপস্থিত হইয়া গান গাহিতে পারে, নাই। আশাকরি আগামী বর্ষে স্বাধাতে উপরি উক্ত সকল বিষয়গুলিই গম্ভীরাতে আলোচিত হয়, গীত রচয়িতৃগণ তজ্জন বিশেষ যত্ন লইবেন। গণিপুরের শ্রীমুত জগদীশচন্দ্র দাস ও ভোলাহাটের শ্রীমুত হৃদিকেশ ঠাকুর মহাশয়দ্বয়ের দল গম্ভীরার নির্দিষ্ট দিনে অভ্যস্ত গীত হওয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই।

গতবর্ষে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের গাবনা অধিবেশনে মালদহের গম্ভীরার গান যে বিশেষ স্ফূর্ত্যাজিত লাভ করিয়াছে এবং বঙ্গদেশের যে অনেক বিখ্যাত দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় গম্ভীরাগানের প্রশংসা বাহির হইয়াছে ইহা বোধ হয় কাহারও অবদিত নাই।

মালদহের গম্ভীরার গান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেক্ষণ ক্রমশঃ আদর পাইতেছে তাহা মালদহ বাসীর পক্ষে সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমি হৃদয়ের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কিছুদিন হইল স্থানীয় গোড়মুত পত্রিকায় গম্ভীরাবিশেষী জনৈক ব্যক্তি গম্ভীরার কার্য্য সত্বেও একটা বিজ্ঞপ্তি কবিতা লিখিয়া জিলেন। বর্ধমান সময়ে তাঁহার উক্ত কাব্যটি যে কতদূর ভ্রান্তমুত হইয়াছে, তাহা দেশ-হিতৈষী বিশ্বানন্দগুণীর বিবেচ্য। উক্ত কবিতার প্রভৃতাভের কোন কোন গীত রচয়িতা গান রচনা করিয়া প্রতিযোগিতায় গান গাইবার জ্ঞ আমাকে দিয়াছিলেন কিন্তু আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। কারণ, তাহাতে নামের মধ্যস্থান রাখা হয় না।

স্থলের বিষয় আমার এই গম্ভীরার আশ্রয়

এ বৎসর জ্যোতিষ গ্রামে শ্রীমুত ভোলানাথ খলিফা মহাশয় ও ভোলাহাটে শ্রীমুত নৃত্য-গোপাল দাস মহাশয় গম্ভীরার করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের গম্ভীরার কণ্ঠস্বর্ণগণ গম্ভীরার গায়ক ও নর্তকগণকে উৎসাহ দান মানসে রৌপ্য পদক প্রদান ক্রিয়াব্যবস্থা করিয়াছেন; আমি তজ্জন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মালদহের সর্বত্র এইরূপ ভাবে গম্ভীর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বৎসর আমার এই গম্ভীরার সঙ্গ সঙ্গ মকছুমপুত্রের সমস্ত গম্ভীরার পূর্ব পূর্ব বৎসরের নির্দিষ্ট দিন পরিবর্তন করিয়া দশ বা দ্বিগুণ পূর্বে নির্দেশ করা হইয়াছে। কারণ এ সময় প্রায়ই দৈবদুর্ভাগ্য ঘটনা আরম্ভ কার্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে এবং আরও গায়কগণ প্রতিযোগিতার যে সমস্ত গান গাহিয়া থাকেন তাহা তাঁহারা প্রায়ই অস্ত্রাভ স্থানের পূর্ব পূর্ব গম্ভীরায় ই সমস্ত গান না করার প্রচারণা উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত হয় এই উভয় বিধ কারণে আমার দিন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ভবিষ্যতে একটি স্বর্ণ পদক দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঁহাদের দল উপর্যুপরি ৩ বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিতে তাঁহারা এই স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া ইতঃপূর্বে স্থানীয় সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জমাগত একটি দলের উপস্থাপিত তিন বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করা বড়ই দুঃসাধ্য বিবেচনায় যে কোন দল বর্ধমান ১৩২১ সাল হইতে আগামী ১৩২২ সাল পর্যন্ত ৩ বৎসর কাল মধ্যে তিনবার প্রথম স্থান অধিকার করিলে সেই দলই ১৩২২ সালে একটি স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইবে।

পরিশেষে আমাদের বিজ্ঞোৎসাহী ও

সর্বজন প্রিয় শ্রীমুকুন্ড মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর তাঁহার বহুকাব্য থাক। সত্বেও তিনি গত বৎসরের জ্যোতিষ ও বৎসরের বহু কষ্ট স্বীকারে আমাদের এই গম্ভীরামণ্ডলে উপস্থিত হইয়া সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে যেক্ষণ উৎসাহ দান করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ এবং আমরা আমাদের মঙ্গলময় বিবেচনার নিকট সর্বাঙ্গ-করণে তাঁহার মঙ্গল কামনা করি। আমাদের সত্বেও পুণি সাহেব বাহাদুর ও দৈবদুর্ভাগ্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার সহায়ত্ব আছে আমাদিগকে জ্ঞাপন করায় আমরা বিশেষ কৃতার্থ হইয়াছি। স্থানীয় হাকিম, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিবাজ, আমলাবর্গ ও অস্ত্রাভ ভজলাক মাঁহারা অল্পগ্রন্থ পূর্বক গম্ভীরায় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন আমরা সর্বাঙ্গ-করণে তাঁহাদেরও মঙ্গল কামনা করি।

স্থানীয় মালদহ সমাচার ও গোড়মুত আমাদেও এই গম্ভীরার কার্যে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেছেন তজ্জন আমি মালদহ সমাচারের সম্পাদক শ্রীমুকুন্ড বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ও গোড়মুতের সম্পাদক শ্রীমুকুন্ড বাবু কৃষ্ণচন্দ্র আগারওয়াল মহাশয়দ্বয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উপসংহারে আমার নিবেদন এ বৎসর গম্ভীরার সময় যেক্ষণ জন সমাগম হইয়াছিল তাহাতে হৃদয়ত অনেকেই বুঝিতে আদর অভাবনার কটা হইয়া থাকিবে। আশা করি তাঁহারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

আমি ইতঃপূর্বে মুখ্য নাচের নর্তকগণকে গুরদার দিবার ব্যবস্থা করিয়া আজ কৈয়ক

বন্দর হইতে বিজ্ঞাপন দিয়া আদিতেছি, কিন্তু দুইবৎসর বিধে কোনও নব্বইকই রাখি ১২ বাণীটার পূর্বে গভীরা মণ্ডে উপস্থিত হইলে না তৎক্ষণাৎ পরীক্ষক ও ভ্রম মহোদয়গণের দেখিবার অনেক অংশই হইয়া থাকে। আশা করি ভবিষ্যতে নব্বইকগণ যাহাতে সন্ধ্যা রাত্রিতে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের নিজ নিজ ক্ষমতা দেখাইয়া পূর্বকৃত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

এ বন্দর বোলবাই গানের প্রতি যোগিত্যঃ—

১। মহম্মদ হুসিয়ার রহমান সাং ফুলমাজী প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র।

২। সতীশচন্দ্র গুপ্ত সাং আইহা ২য় রৌপ্য পদক।

৩। গোপালচন্দ্র দাস সাং মধেশ্বর ৩য় প্রশংসা পত্র।

৪। মুন্নাওয়াল হালদার সাং চাপাঙ্গানি ৩য় রৌপ্য পদক।

৫। বিধুচন্দ্র মল্লোপাধ্যায় সাং কোতুয়ালী ৪র্থ রৌপ্য পদক।

৬। কিশোরীকান্ত চৌধুরী সাং পুন্ডাটুলী

৭। পোকাই বিশ্বাস সাং ছিলামপুর

৮। হরিচরণ দাস সাং মঙ্গলবাড়ী

এম প্রত্যেক একটি করিয়া প্রশংসা পত্র স্বান অধিকার করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত সতীশ গুপ্ত, মুন্নাওয়াল হালদার ও বিধুচন্দ্র মল্লোপাধ্যায় মেডেল প্রাপ্ত হইবেন।

ইতঃপূর্বে বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হইয়াছিল যে বাঁহারা পূর্বে মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদিগকে এ বন্দর মেডেল দেওয়া হইবে না তৎক্ষণাৎ মহঃ হুসিয়ার রহমান প্রথম স্বান অধিকার করিলেন ও মেডেল প্রাপ্ত হইলেন না এবং গোপালচন্দ্র দাস ও মুন্নাওয়াল হালদার উভয়েই ৩য় স্বান অধিকার করিয়াছেন।

গোপালচন্দ্র দাস প্রথম শ্রেণীর রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন হুসিয়ার মুন্নাওয়াল হালদার এ বন্দর মেডেল প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু বড়ই পরিশ্রমের বিষয় এই যে—ভিন্ন ভিন্ন গভীরা গীত প্রচার করে গীত রচয়িতৃগণকে যোগ্যতাসুচী যেরূপ পুরস্কার প্রদান করা হইতেছে তাহাদিগের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। ইহার মধ্যে মহম্মদ হুসিয়ার রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। আশা করি তাহারা ভবিষ্যতে এবিষয়ে মনোযোগী হইয়া গীত প্রচারের যত্নবান হইবেন। মেডেল প্রাপ্ত দল ব্যতীত অজ্ঞাত দলের জ্ঞাত প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের স্বাক্ষর মুক্ত সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মালদহ সমাচার।

৩। নিরঞ্জন কবি—রামুমালা

বালু ১৯৪৮ সনের মাঘ মাসে যখন-সিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত আউটপাড়া গ্রামে অনঙ্গর কবি রামুমালী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সনের ৩০শে ফাল্গুন ৪টি পুত্র ও ৪টি কন্যা রাখিয়া ৭২ বৎসর বয়সে তিনি এই জড় জগতের সূর্য ছিন্ন করতঃ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রামুর পিতামহ মল্লানন্দ—পিতার নাম রামপদাঙ্গ ও মাতার নাম রামমণী ছিল। প্রাগুক্ত আউটপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় রামুমালীর শিক্ষাগুরু। উপরি না থাকিলেও অমর ভট্টাচার্য একজন মহাপণ্ডিত ও সাধক শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাহারই রূপানুগারে রামু একজন বিখ্যাত কবির সরকার।

কবি প্রায়কবিগণের সাধারণ উপাধি “সরকার”। এই স্বরূপে পরিচয় ছোট বড়

সকলেই রামুমালীকে “রামু সরকার” বলিতেন। আমরাও প্রাদেশিক রীতি অনুসারে সকলের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধে রামু মালীকে “রামু সরকার”ই বলিব।

রামু সরকার বাল্যকাল হইতে লেখা পড়ার দিকে মন না দিয়া গীত বাজের ঘোঁরী মস্বে মুগ্ধ হইয়া কেবল তাহারই সাধনা প্রবৃত্ত হইলেন। স্তবরাগ তারি-আর লেখা পড়া শিক্ষা হইল না। বিশেষতঃ সামাজিক হিসাবে বাহারা নীচ জাতি, তাহার লেখা পড়া শিক্ষার বড় একটা চেষ্টা করিত না।

পুণ্ডপার অমর ভট্টাচার্য মহাশয় বালক রামুর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাথমিক ও সঙ্গীত সাধনার চেষ্টা দেখিয়া তাহাকে আশ্রয়ের সহিত আপন শিষ্য করিয়া লইলেন। রামু ভট্টাচার্য মহাশয়ের মেহাভূষণের ও শাস্ত্র পরিজ্ঞানের মধ্যেই গীতবাঞ্চে ও শাস্ত্র পরিজ্ঞানের মধ্যে প্রাজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি বহুগ্রন্থ, রামু কেবল গুরুমুখে শুনিয়া শুনিয়া শিক্ষা করিয়া ফেলিতেন। তিনি একবার যাহা শুনিতেন,—তাঁহা আবার ফুলিতেন না। রামুর স্বপ্নশক্তি সঙ্গার ছাড়া ছিল। গ্রন্থাদি ব্রহ্মবীর শক্তিও বোঝা ছিল বলিতে হইবে। কেননা, কেবল কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে, রামু শ্রবণ মাত্রই তাহার ভাব গ্রহণে সক্ষম হইতেন। এমন কি সহজ সম্ভবতঃ শ্রোকারির অর্থ নিজেই বুঝিতে পারিতেন।

খুব শিক্ষিত পণ্ডিতের মত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্থাপন ও ব্যুৎপন্ন করিতেও তাহার শক্তি ছিল। যৌবক শিক্ষায় হাশিকিত রামু, শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে,—পাঠ্য, ত্রিপিঠী, চৌপদী

প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে ছড়া পাচালী বলিতেও শিক্ষা করিয়া লইলেন।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে রামু সরকার কবির সঙ্গে প্রবেশ করিয়া ২০১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একজন বিখ্যাত কবির সরকার হইয়া পড়িলেন।

রামু সরকারকে কেহ কোন দিন কবিগানে হারাতে পারে নাই। কি কোন কথার কৌশলে ঠকাইতে পারে নাই।

রামগতি, রামকানাই, শক্তিরাম, বড়কবি মিথাজান, নবু সরকার, গোবিন্দ মালী, বিশ্বস্তর ভাস্কর প্রভৃতি বহু দেশী বিদেশী কবিগণলাগণ রামু সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাহার কবিত্ব শক্তিতে রামুর সমতুল্য হইলেও অনেক সময় বিজয়লক্ষী রামুকেই যেন মেহের চূষন দানে স্বীকৃত করেন।

রামু লেখা পড়া না জানিয়াও একজন মহাকাব্য ছিলেন। একবার (অনেক দিন হয়) “নব্যভারত” পত্রের নারায়ণ দেব প্রসঙ্গে এই অনঙ্গর কবি রামুর কথা বিদগ্ধদর্শন মাত্র আলাচিত হইয়াছিল।

রামু সরকার চৌপদী ছড়া এত হৃদয় ও ভাড়াভাতি বলিতেন যে শুনিয়া অতি বিজ্ঞ লোক অবাক হইয়া পড়িতেন। অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনীয় বিষয়টী সত্যকে বিদগ্ধরূপে বুঝাইয়া দিবার জ্ঞান, রামু সরকারের আনন্দ শক্তি ছিল। এই জ্ঞান অনেককেই বলিয়া থাকেন,—“না,—রামুর ছড়া।”

তিনি যে কেবল ছড়া বলিতে পারিতেন এমন নহে। পাচালীতেও তাহার আম্বাধার ক্ষমতা ছিল। চোলের তালে মিলাইয়া, স্বর সংযোগে অতি স্থলিত পাচালী কীর্তন দ্বারা সভাশ্রম লোকের চিত্তবর্তন করিতে রামুর আম্বাধার ক্ষমতা ছিল।

রামু ইচ্ছা করিয়া সভাকে হাসাইতে কঁদাইতে পারিতেন। কি শূণ্য কি হাজি কি কল্প যখন যে রসের পাচালী বলিতেন—তখন সেই রসই মৃতিমান হইয়া উঠিত।

রামুর ছড়া পাচালীতে যমকাছপ্রাণ কি উৎপ্রেক্ষাপনা প্রভৃতি অলঙ্কারগুলি খুব স্বন্দর হইলেও অনেক স্থলে ব্যাঞ্জকতির স্বভাৱেই অধিক পরিমাণে পরিশ্রুত হইত। সৌন্দর্য্যে মাথুর্য্যে রামুর উপমাগুলির তুলনা ছিল না।

রামু লেখাপড়া না জানিয়া কি প্রকারে এরূপ অসাধারণ কবিত্ব শক্তি লাভ করিলেন,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি?

কবিত্ব শক্তি যে স্বাভাবিক কোন ভাষা-জ্ঞান, সাপেক্ষ নহে,—রামু সরকার তাহার বিলক্ষণ সাফ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

আক্ষেপের বিষয় রামুর এই অতুল্য অমূল্য কবিতাগুলি শুধুই হাওয়ায় মিলিয়া গেল! রামু সরকার কোন পুস্তক কি পদাবলী রচনা করিয়া যান নাই। আমরা বহু যত্নে রামু সরকারের রচিত গীত ও ভাষা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বারাস্তরে প্রান্তবাসীর রূপায়ণ পাঠক পাঠিকাগণকে তাহাই উপহার দিতে ইচ্ছা রহিল।

রামু নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার প্ৰভাব ভঙ্গজনেচিত ছিল।

রামুকে সকলেই সমাদর করিতেন। অনেক কবির আসরে রামু সরকার বঞ্চশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া দ্বন্দ্ববাদ পাইয়াছেন।

একদিন কাটিহালীর সভায় রামু সরকার পঞ্চ ‘ম’ কারের এমন স্বন্দর ব্যাখ্যা ও তাহার সাধন প্রণালী বর্ণন করিয়াছিলেন যে, বহু উপাধিকৃতি পণ্ডিতগণ, “দ্বজ

রামু! দ্বজ রামু!!” বলিয়া তাহাকে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অনেক কবির আসরে রামু সরকার করণ রসের পাচালী গাহিতে গিয়া কাদিয়া অস্থির হইতেন। রামু সরকার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। সময় পাইলে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রান্তবাসী।

৪। প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাবিধান সকল দেশে সকল গবর্ণমেন্টের প্রথম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেকদিন হইতেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্ত গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে অনেক আন্দোলন চলিতেছে।

কিছুদিন হইল ভারত গবর্ণমেন্ট প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিয়াছেন যে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডসমূহের অধীনে স্কুলের সাখ্যা বৃদ্ধি করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করা হোক। যে সকল স্থানে তেমন শিক্ষার প্রসারকল্পে বোর্ডের আর্থিক সাহায্য নাহি, সেই সকল স্থানে প্রাইভেট স্কুলগুলিকে সাহায্য প্রদান করা উচিত।

বন্দী গবর্ণমেন্ট বর্তমান সময় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এই নীতিই অঙ্গসরণ করিতেছেন। যখন পূর্ণবয়স্ক ও আঙ্গম গবর্ণমেন্ট স্থল ছিল তখন ১৯১৩ অব্দে বোর্ড স্কুলের সাখ্যা ১০০ ছিল। কিন্তু ১৯১৩-১৪ অব্দের শেষে এই স্কুলের সাখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি হয় নাই। ১৯১৩-১৪ অব্দে কেবল ২২০টি স্থল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই চেষ্টার স্মরণীতি এই—যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা জনসাধারণের নিরীক্ষিত

প্রতিনিধিগণের অধীনে চালিত হইতে পারে—যাহাতে ডিষ্ট্রিক্ট ও ঘেলা বোর্ডসমূহ আপনাপন সীমার মধ্যে নিজেদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রিটালন করিতে পারে তাহার সুযোগ করিয়া দেওয়া। যে সকল প্রাইমেরী স্কুল ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলিকেও বোর্ডের শাসনে আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ইহার ফল কি হইবে? ইহাতে বাস্তবিক প্রাইমেরী শিক্ষার প্রসার হইবে না; প্রাইমেরী শিক্ষার ক্ষেত্র দিন দিন সর্বাধিক হইতে থাকিবে। সকল সভা বেশেই প্রাইমেরী শিক্ষার ব্যবস্থা ও ভার জনসাধারণের উপর। যাহাতে ব্যক্তিগত চেষ্টা শিক্ষা ব্যাপারে দিন দিন অধিকতর অগ্রসর হইতে পারে তদ্ব্যতীত গবর্ণমেন্ট ব্যক্তিগত চেষ্টাকে উৎসাহ দিবার জরুরী সাহায্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহাকেই Grants-in-aid system বলা হয়। ১৯০৪ অব্দের ভারত গবর্ণমেন্টে রিজলিউশনে গবর্ণমেন্টের এই নীতি স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে:—

“From the earliest days of British rule in India private enterprise has played a great part in the promotion of both English and vernacular Education and every agency that could be induced to help in the work of imparting sound instruction has always been welcomed by the state. The system of grants-in-aid was intended to elicit support from local resources and to foster a spirit of initiative and combination for local ends.”

“ব্রিটিশ রাজত্বের প্রাকাল হইতে দেশীয় ভাষায় এবং ইংরেজীতে শিক্ষার উন্নতি বিধান ব্যক্তিগত চেষ্টাই অধিক ফলবন্তী হইয়াছে। যে সকল উপায়ে এবং ব্যবস্থায় জনসাধারণের চেষ্টা নিজেদের শিক্ষা বিধানের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে তদ্ব্যতীত গবর্ণমেন্ট এতদিন যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। তদ্ব্যতীত গবর্ণমেন্ট অনেক কুলে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; যাহাতে স্থানীয় লোকদিগের চেষ্টা শিক্ষা ব্যাপারে উত্তরোত্তর উৎসাহিত হইয়া উঠিতে পারে—যাহাতে জনসাধারণ আপনাদের শিক্ষার জন্ত নিজেদের চেষ্টায় স্কুলের ব্যবস্থা করিতে পারে তাহার জন্ত গবর্ণমেন্ট Grants-in-aid ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।”

ইহাতে এতদিন খুব শাসাভীত ফল পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৪ অব্দের হিসাবে দেখা যায়, ১ লক্ষ ৪ হাজার ৩ শত স্কুলের মধ্যে ৮২ হাজার ৪ শত স্কুল ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গবর্ণমেন্টের আর্থিক সাহায্য লাভ করিতেছে।

গবর্ণমেন্ট যে স্কুলগুলিতে অধিকতর অর্থ সাহায্য করিয়া ক্রমশঃ সবগুলি নিজের চালনায় লইবেন ইহা কখনও গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য ছিল না এবং কখনও আছে বলিয়া আমরা কোন মতে মনে করিতে পারি না। ১৯০৪ অব্দের উক্ত রিজলিউশনে একস্থলে স্পষ্টই বলিতেছেন:—

“The progressive devolution of primary, secondary, collegiate education under private enterprise and the continuous withdrawal of Government from competition therewith was recommended by

the education commission of 1883 and the advice has been generally acted upon. But while accepting this policy the Government of India at the same time recognise the extreme importance of the principle that in each branch of education Government should maintain a limited number of institutions both on models for private enterprise to follow and in order to uphold a light standard of education."

ক্ৰমে ক্ৰমে সকল স্কুলগুলি উত্তরোত্তর ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বাৰাই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইক—কি প্রাথমিক কি উচ্চ ইংরেজী কি কলেজিয়েট শিক্ষা—সকল শিক্ষা-অনুষ্ঠান-গুলি ক্ৰমে ক্ৰমে জনসাধারণ দ্বাৰাই পরিচালিত হইক—ইহাই ১৮৮৩ অব্দে এক্সেসন কমিশনের অভিপাত। সেই মত অল্পসংখ্য ভারতের শিক্ষানীতি নিয়মিত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট এই নীতি অল্পসংখ্য করিলেও গবর্ণমেণ্টের নিজের চেষ্টায় ও ব্যয়ে কতকগুলি স্কুল দেবের মধ্যে রাখা গবর্ণমেণ্ট একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই সকল স্কুল শিক্ষার একটি উচ্চ আদর্শ লোক-চেষ্টার সমুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে।

শিক্ষাবিশেষ ইহাই ভারত ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মূলনীতি। এই নীতি এতদিন চলিয়া আসিতেছিল এবং তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট ও ব্যক্তিগত চেষ্টাকে যথাসম্ভব উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু বোর্ডের স্কুলের সম্প্রসারণ করিয়া এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করার যে

উত্তম দেখা যাইতেছে তদ্বারা ভারতের পুৰ্ণাঙ্গ শিক্ষানীতির অল্পখাদ্য যে আর কাজ চলিবে এমন মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত গোখলে যখন প্রাথমিক শিক্ষার বিল ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন তখনকার কর্তৃপক্ষ প্রতিকূলে এই আগন্তিক তুলিয়াছিলেন যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাবিধান অতিশয় ব্যয় সাধক—ভারত গবর্ণমেণ্টের তখনকার আর্থিক অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কখনও এই গুরুত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না। জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচার যে অতিশয় প্রয়োজন, এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন। যে অত্যাবশ্যক কার্যে গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক ব্যয় করিতে সক্ষম নহেন তথায় জনসাধারণের চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া শিক্ষা ব্যাপারে নিয়োজিত করা যাইতে পারে তাহাই বর্তমান অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে কোনও মতভেদ হইতে পারে না।

যে সকল প্রাথমিক স্কুল বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত তাহাদের সংখ্যা কম। কারণ বোর্ডের পরিচালিত স্কুলের ব্যয় অত্যধিক। যেখানে একটি প্রাইভেট প্রাইমেরী স্কুলের মাসিক ব্যয় ৮ টাকা দেখানো একটি বোর্ডের স্কুলে ব্যয় ১০ টাকা। যেখানে দুইভেত টাকায় একটি প্রাইভেট প্রাইমেরী স্কুলগৃহ রচিত হয়, সেইখানে বোর্ডের একটি স্কুলগৃহ ১০০০ টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয়বাহ্য্য হেতু বোর্ডের স্কুল বাড়িয়া যে কোনও দিন অতিযাযায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এই দেশে হইতে পারিবে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে।

গবর্ণমেণ্ট ও বোর্ড দিন দিন অধিকতর

অর্থ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ব্যয় করিবেন বটে, কিন্তু উচ্চ ব্যববাহ্য্য হেতু বর্তমানে যেসকল স্কুল রহিয়াছে তাহার উন্নতিসাধনই বোর্ডের সব অর্থ ব্যয় হইতে থাকিবে। কাজেই সব বর্ষ পরিয়া আর যে স্কুলের সংখ্যা বাড়িতে পারিবে এমন মনে হয় না।

এই দেশের বোর্ডের আর্থিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে গবর্ণমেণ্ট বা বোর্ডের কায়েই যে কোনদিন প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন প্রসার লাভ ঘটিতে পারিবে তাহা সম্ভবপর হইবে না।

সাড়ে চারি কোটি বালকের শিক্ষাবিধানের ভার নেওয়া অতিশয় গুরুতর ব্যাপার। জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের যুক্ত চেষ্টাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট বলেন:—"The Government can do no more begin. গবর্ণমেণ্ট এই শুভ চেষ্টার কেবল ঘটনাই করিয়া দিতে পারেন। তদতিরিক্ত অধিক কিছু করা কোন জাতির পক্ষেই সম্ভবপর নহে।

সকল দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা দেশবাসীদের হাতে; গবর্ণমেণ্ট কেবল পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষানীতি নিয়মিত করেন মাত্র।

আমাদের দেশে বোর্ডগুলি যেভাবে গঠিত, তাহাতে বোর্ডগুলি যে সর্বশাশে জনসাধারণের প্রতিনিধি এরূপ বলিতে পারা যায় না। কাজেই এই সকল বোর্ডের হাতে যদি প্রাথমিক স্কুলগুলি সম্পূর্ণ ছাড় করা যায় তবে জনসাধারণ হইতে যে চেষ্টা যে উত্তম 'এতদিন উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া উঠিতেছিল তাহা অনেকাংশে বিনষ্ট হইবেই। লোকেরা নিজের অর্থব্যয়ে নিজের চেষ্টায় যাহা করিয়া থাকে তাহার উপর প্রভুতা করিবে। আদিত্য করিতে তাহা নিম্ন আদর্শ ও ইচ্ছানুয

গঠিত করিয়া তুলিতে না পারিলে কোন কাজেই তাহাদের উৎসাহ উত্তম থাকিবার কথা নহে। এতদিন পরিয়া গবর্ণমেণ্টের Grants-in-aid প্রথা প্রবর্তিত করার মূল দুইটি:—

(1) "The progressive devolution of primary, secondary, and Collegiate education upon private enterprise and the withdrawal of Government form competition,"

(2) "The Government recognises two other great benefits which in Government effort have no place,—
"The fostering of a spirit of initiative and combination for local ends and the imparting of religious and ethical education to complete the educational training of the scholars."

প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ক্ৰমে ক্ৰমে গবর্ণমেণ্ট সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা জনসাধারণের পরিচালনার উপর দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুলসমূহে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট নানা কারণে করিতে পারেন না—যতই লোকেরা উপযুক্ত হইয়া নিজেরের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে শিখিবে, ভূতই ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা তাহারা নিজেসাই করিতে সক্ষম হইবে।

এই দুই আদর্শই, আমাদের মনে আশঙ্কা হইতেছে, যেন বর্তমান শিক্ষানীতিতে অনেকাংশে কাণ্ডাত্য: অছত্রিত হইতে পারিবে না।

আজকাল সভ্যসমাজের নিয়ম এই, যে অঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায়, স্কুলের আদর্শ

স্কুলের ছাত্রদিগের নিত্যজীবনের জীবন-প্রণালী, আহার, বিহার, পরিচ্ছদ, স্থলগৃহের শিক্ষা, স্থলগৃহ ইত্যাদি সমুদয় উপকরণ সেই অঞ্চলের জনসাধারণের নিত্য জীবনের আদর্শ হইতে কোনওরূপে অতি উন্নত না হয়। স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রদিগের পারিবারিক জীবনের সর্বদা যোগ থাকিবে। তাহা হইলে স্থলগুলি পরিবারের সঙ্গে চতুর্দিকব্যাপী পল্লী জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া অনেকাংশে সফল হইতে পারে।

কিন্তু বোর্ড স্কুলের যে একটি গৃহে ১০০০ টাকা ব্যয় হইয়া যায়, তেমন ব্যয়বহুল গৃহাদির দ্বারা কি শিক্ষার উৎকর্ষ কিংবা বিস্তৃতি বাড়িবে? স্কুলের শিক্ষা পারিবারিক শিক্ষার অঙ্গবৃত্তি মাত্র। ছাত্রদিগের আপনাপন বাড়ীগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে সম্প্রসারিত করিলেই বিদ্যালয় গঠিত হয়। যেখানে পল্লী-বাসীর শতকরা ৫ জনও ১০০ টাকা ব্যয়ে বাসগৃহ নির্মাণ করিতে পারে না, সেই স্থানে এক হাজার কিংবা ৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় রচনা করা ভ্রম।

এই উপায়ে বিদ্যাগৃহ পাকা হয় বটে, কিন্তু বিদ্যালয় বিদ্যাগৃহের আসবাবের তলায়

চাপা পড়িয়া যায়। টুল, বেঞ্চ, টেবিলের আড়ালে জীর্ণশীর্ণ, নগ্নপ্রায় শিশুগুলি অস্তিত্ব হইয়া যায়। এই দেশে বাজে উপকরণ দিয়া শিশুজীবনকে ভায়াক্রান্ত করিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বে কোথাও ছিল না। গাছের তলায়, বড়লোকের অস্বাবস্থিত বাড়ীতে, ঘরের বারান্দায় গুরু মহাশয়ের নিজ বাড়ীর এক কোণায় স্থল বসিত। অধ্যাপকগণ পড়াইতেন। কিন্তু তখনকার দিনে গুরু ও শিষ্য এই উভয়ের মধ্যে কতদূর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল আজকাল বিদ্যালয়ের আসবাব আসিয়া গুরু শিষ্যের মাঝখানে দিন দিন জড় হইতেছে। আর গুরু ও শিষ্য উত্তরোত্তর দূরে সরিয়া পড়িতেছেন।

তাই আমরা আশঙ্কা করি, যদি বোর্ড-গুলি আমাদের বিদ্যালয়ের অভিব্যক্তি হইয়া পড়েন, দেশের মধ্যে যৌথ চেষ্টি পদ্ম হইবে, দেশের জনসাধারণের অক্ষমতা দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। আশ্চর্য্যের ফলে এক একটি জাতি যেভাবে সক্ষম ও সমর্থ হইয়া উঠে, আমাদের আশঙ্কা হয়, বর্তমান শিক্ষাবিদানে সেই আশ্চর্য্যের প্রশ্নের সন্ধান হইবে।

জ্যোতিঃ

পরিশিষ্ট

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ ।

দ্বিতীয়-অংশ ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব-কবিরত্ন-জ্যোতির্বিদ্যার-সঙ্কলিত ।

(গ্রন্থ পত্রে প্রকাশিত)

ইন্ডিয়া প্রেস—

২৪নং মিডল রোড, ইটালী, কলিকাতা ।

শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

ii. $\therefore ৮।৯।৪৩-০।০।৮-৮।৯।৩৫$ তাত্‌কালিক সায়ন শুক্র।
 $১৭ই বুধ=৬।১৫।১০$
 $১৬ই বুধ=৬।১৩।২৭$
 গতি $=০।১।৪৩=অ.লগ ১'১৪৫৫$
 ঘটা $৩।৩৩=অ.লগ ৮'১৯৯$
 $০।১।১৫=অ.লগ ১'২৭৫৫$

$\therefore ৬।১৫।১০-০।০।১৫=৬।১৪।৫৫$ তাত্‌কালিক সায়ন বুধ

আর রাহ ১১।৬।৮ স্বতরাং কেতু ৫।৬।৮, এখন এই গুলি চক্রে বসাই। এই-
 -দেখুন (১২৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

গুরুদেব। হা হ'য়েছে। এখন এতে ভাগ্যাংশাদি (Part of fortune) নামে একটি
 বিন্দু নির্দেশ ক'রে হ'বে। কারণ অধিকাংশ পাস্‌চাত্য জ্যোতিষাচার্য এ বিন্দু নিয়ে বিচার
 করেন। আমাদের দেশে তাত্‌কালিক মতে এই রূপ অনেক বিন্দু নির্দেশের রীতি আছে।
 সেগুলি যখন বৃষ্টিয়ে দিব, তখন বৃষ্টিতে পারের এটিও তারি একটি।

আমি। এটি নির্ণয়ের উপায় কি?

গুরুদেব। অনেকেই শ্রমলাঘবার্থে লগ্ন ক্ষুট ও চন্দ্র ক্ষুট যোগ করলে তা'থেকে রবিক্ষুট
 বাদ দিয়ে ভাগ্যাংশ ক্ষুট নির্ণয় করেন। যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে লগ্ন $১০।২২।৪০+চন্দ্র$
 $১০।১৯।২০=রবি ৬।২০।৩১=ভাগ্য ২।১৮।১৯$ রাহাদি। কোনও কোনও আচার্য
 চন্দ্রের বকেখান বা চন্দ্রের পঞ্চমের বকেখান হ'তে সূর্যের বকেখান বাদ দিয়ে, তাতে
 লগ্নের বকেখান যোগ ক'রে ভাগ্যাংশের বকেখান নির্ণয় ক'রে থাকেন।

আমি। জুয়েতে ফলের তারতম্য কিরূপ হয়?

গুরুদেব। ক'সে দেখতে পার।

আমি। লগ্নের বকেখান রয়েছে। চন্দ্র সূর্যের বকেখান নির্ণয় করতে হয় কেমন
 ক'রে? আর বকেখান মানেই বারিক? ভালক'রে বৃষ্টিয়ে দিন।

গুরুদেব। গ্রহগণের এবং জন্মসময়াদির অবস্থিতি স্থান যে ক্রান্তিবৃত্তে তা জান, এবং এই
 ক্রান্তি যে বিষুবতের সঙ্গে বক্রভাবে অবস্থিত তাও জান (৬১ পৃষ্ঠা)। এখন মনে কর
 কোন গ্রহ মিথনে আছে। তার মানে কি?—রাশিচক্রের কোনও নির্দিষ্ট ত্রিশ অংশ
 পরিমিত স্থান মিথন; সেই—ত্রিশ অংশের উভয় প্রান্ত দিয়ে দু'টি রেখা কল্পনা ক'রে
 মেরু প্রান্তদ্বয়ে মিলিত ক'লে যে স্থানটুকু পাওয়া যায় তারি মধ্যে অবস্থিত ব'লে বুঝতে হ'বে,
 একথাও, পূর্বে বলা হ'য়েছে (৬২ পৃষ্ঠা দেখ)। এখন এই গ্রহের স্থিতিস্থান আরও দুই প্রকারে
 নির্দিষ্ট হ'তে পারে। মেঘারোহ বিন্দু হ'তে বিষুবতের উপর ঐ গ্রহের সমসূত্রে যে বিন্দু হ'বে
 সেই পর্যন্ত ঐ গ্রহের সরলোদান (Right Ascension=R. A.) বলা হয়, উহা ঐ
 মেঘারোহ বিন্দু হ'তে অংশাদি বা ঘণ্টাদি দ্বারা নির্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। আর ঐ গ্রহোদয়ের সময়ে

বিষ্মতের যে বিন্দু পূর্বাংশে উদিত হয় তারি কোণিক দূরত্বকে ব্রজোখান (Oblique Ascension=O. A.) বলে। এই দুইয়ের অন্তরের নাম উদয়াস্তর বা অ্যাসেন্সন্যাল ডিফারেন্স (Ascensional Difference=Asc. Dif.)।

আমি। ভাল বুঝতে পারলাম না।

গুরুদেব। এ কথা তবে আর এক সময়ে একটা খ-গোলক সাহায্যে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিব। এখন ঐক্লপ গোলক এখানে নাই কাজেই বুঝাতে পারলাম না। যাই হোক, এখন এই সব অঙ্ক নির্ণয়ের কতক গুলি হুজ তোমাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি, সেগুলি মনে-করে রাখ।
রবির ক্ষুট=৬।২৩।৪১ অর্থাৎ সায়েন তুলার ২৩ অংশ ৪১ কলা। সরলোখান কত নির্ণয় কর্তব্য হবে।

১ম হুজ। পরমাপক্রমের কোণ্য (Log.cos O. E.) ও স্পষ্টচাপস্পর্শিনীর (Log. tan. Long.) চারিখ যোগ-করলে লগ. সরলোখান-স্পর্শিনী (Log. tan. R. A.) হইবে।
বর্তমান পরমাপক্রম প্রায় ২৩°২৭', এবং রবি-ক্ষুট তুলার ২৩।৪১

$$\begin{aligned} \therefore L. \cos. 23.45 &= 2.96266 \\ + L. \tan. 23.81 &= 2.68312 \\ = L. \tan. 21.67 &= 2.60566 \end{aligned}$$

তুলাপর্ধ্যন্ত ১৮০°: ১৮০°+২১°৫৮'=২০১°৫৮' রবির সরলোখান, উহাকে ঘণ্টাদি করিলে ১৩।২৭।৫২ হয়। এই দুই রূপেই সরলোখান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

২য় হুজ। যদি স্পষ্ট গ্রহ দেওয়া থাকে, তাহা হইতে গ্রহের ক্রান্তি (Dec) নির্ণয় করিতে হইলে লগ-ক্যা পরমাপক্রম+লগ-ক্যা স্পষ্টচাপ=লগ-ক্যা ক্রান্তি হইবে। ঐ ক্রান্তিমেরা দি ৬ রাশিতে উত্তর ও তুলাদি ছয় রাশিতে দক্ষিণ ক্রান্তি বুঝিতে হইবে। যথা—

$$\begin{aligned} L. \sin. 23.45 &= 2.40000 \\ + L. \sin. 23.81 &= 2.60819 \\ = L. \sin. 21.67 &= 2.20819 \end{aligned}$$

এই সময়ে রবি তুলার ২৩।৪১ অংশাদিতে থাকাদি ক্রান্তি দ ২।৬ হইল।

আমি। আমি চন্দ্রের সরলোখান ও ক্রান্তি নির্ণয় করি। চন্দ্রের ক্ষুট ১০।১২।২০—
৩১২।২০ অংশাদি। ৩৬০।০—৩১২।২০=৪৮।৪০ মেষের অগ্রে।

$$\begin{aligned} \text{অন্তর} L. \cos. 23.45 &= 2.62246 \\ + L. \tan. 80.18 &= 2.20806 \\ = L. \tan. 68.15 &= 2.27662 \end{aligned}$$

হুজরাং ৩৬০।০—৬৮।১৫=৩৯১।৪৫ অর্থাৎ চন্দ্রের সরলোখান ৩৯১ অংশ, ৪৫ কলা। আবে—

$$\begin{aligned} L. \sin. 23.45 &= 2.40000 \\ L. \sin. 80.18 &= 2.13182 \\ L. \sin. 15.12 &= 2.81064 \end{aligned}$$

চন্দ্র তুলাদি ষড় রাশির অন্তরতম ক্রান্তি থাকায় ক্রান্তি দ ১৫।২ অংশাদি হ'লো।
গুরুদেব। হলো বটে, এবং এ অঙ্ক দিয়ে মোটামুটি কাজও চলে বটে, কিন্তু চন্দ্রাদি গ্রহের বিক্ষেপ (Lat.) থাকায়, ক্রান্তি ও সরলোখান নির্ণয়ের স্তর সূত্র আছে। তা এই—
৩য় হুজ। লগ-ক্যা স্পষ্টচাপ+লগ-স্পর্শিনী পরমাপক্রম=লগ-স্পর্শিনী ৮ক। যদি স্পষ্টগ্রহ যে দিকের রাশি ঘটিবে, বিক্ষেপ ও সেই দিকে হয় তবে ২০ অংশ হইতে ঐ বিক্ষেপ বা দিবে এবং বিপরীত দিকে হয়; তবে ২০ অংশ যোগ করিবে। তাহাতে যে ফল লক্ষ হইবে তাহা হইতে ৮ ক বাদ দিলে ৮ হইবে। তৎপরে ৮ কোণ্য লগ ও পরমাপক্রমের কোণ্য লগ যোগ করিয়া তাহা হইতে ৮ক কোণ্য লগ বিয়োগ করিলে গ্রহের লগ ক্যা ক্রান্তি নির্ণীত হবে।

যেমন র্যাকফেলের পক্ষিচার ১৭ তারিখে চন্দ্রের বিক্ষেপ দক্ষিণ ১ অংশ ২৮ কলা ও ১৬ই তারিখে ২ অংশ ২২ কলা হুজরাং ২৪ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ডে ১ অংশ ১ কলা হ্রাস হ'চ্ছে। এখন জৈরাশিক কর—

$$\begin{aligned} ২৪ ঘণ্টা : ৩।৩৩ ঘণ্টাদি :: ১ অংশ ১ কলা : কত ? \\ = ৩ ঘণ্টা ৩৩ মি × ৬৩ কলা \\ = ২৪ ঘণ্টা \\ = ২ কলা প্রায় \end{aligned}$$

অতএব ১ অংশ ২৮ কলাতে ঐ ২ কলা রোগ করে, তাৎকালিক বিক্ষেপ হ'লো ১ অংশ ৩৭ কলা দক্ষিণ বিক্ষেপ। এখন হুজাহসারে—

$$\begin{aligned} L. \sin. 80.18 &= 2.13182 \\ + L. \tan. 23.45 &= 2.60819 \\ = L. \tan. 81.15 &= 2.85181 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{চন্দ্র দক্ষিণ রাশি ক্রান্তি, বিক্ষেপ ১।৩৭ দক্ষিণ} \\ \text{অতএব } ২০-১।৩৭ = ১৮।২৩ \text{ এবং ইহা হইতে} \\ = ১৫।৪৮ \text{ বাদ দিলে} \\ = ৮ ঘণ্টা ৭২।৩৫ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এক্ষেপ } L. \cos. 81.15 &= 2.89630 \\ + L. \cos. ১.৩৭ &= 2.99222 \\ = ১২.৪৮৮৫২ \\ = L. \cos. ৮.৮ &= 2.98029 \\ = \text{চন্দ্রের ক্রান্তি } L. \sin. 1.৩৭ &= 2.85408 \end{aligned}$$

এখন র্যাকফেলের পাঁজি ধরে কসে দেখতে পার ফল ঠিক হয়েছে।

আমি। প্রায় হ'বে কেন?

গুরুদেব। আমরা ত টেবিল থেকে লগ নেবার সময় ঠিক ঠিক নিই নাই।

আমি। নেন না কেন?

ওক্কেব। অতঃস্থ প্রয়োজন নহে বলে। ফলে ক্রান্তি ১৬। ৩৫ না হয়ে ১৬। ৩৪ কি ৩০ হ'লে বড় বেশী অন্তর হইলো না। তার পর সরলোখান (R.A.), যে গ্রহের ক্ষুণ্ণ ও বিক্ষেপ দেওয়া ও ক্রান্তি দেওয়া আছে তার জন্ত স্থ—

৪র্থ স্থ। লগ্ন কোজা বিক্ষেপ ও লগ্ন কোজা স্পষ্ট যোগ করে তা থেকে লগ্ন কোজা ক্রান্তি বাদ দিলে লগ্ন কোজা সরলোখান হ'বে। যেমন—

$$\begin{array}{r} \text{L. cos. বিক্ষেপ } ১। ৩৭ = ৯৯৯৯৮০ \\ + \text{ L. cos. স্পষ্ট } ৪০। ৪০ = ৯৭৭৭৭৭ \\ \hline ২৮৭৭৭৭ \\ - \text{ L. cos. ক্রান্তি } ১৬। ৩৫ = ৯৯৯৯৫৫ \\ \hline \text{L. Cos R. A. } ৩৭। ৪৩ = ৯৮৮৮২৪ \\ \hline ৩৬০। ০ - ৩৭। ৪৩ = ৩২২। ১৭ \end{array}$$

গ্রহের সরলোখান ও মধ্যাকাশের সরলোখানের অন্তর গ্রহের মধ্যাঙ্গিন রেখাস্তর M. D. ইহাও ফল নির্দেশে প্রয়োজন হয়। এইবার উদয়াস্তর (Asc Diff) নির্ণয় প্রণালী বলি— ৫ম স্থ। যে দেশের লগ্নাস্তর গণিত হইবে সেই দেশের অক্ষের লগ্ন। স্পর্শিনী ও গ্রহের ক্রান্তি লগ্ন স্পর্শিনী যোগ করিলে, উদয়াস্তরের লগ্ন জা লক্ষ হইবে।

যেমন ২২। ৩০ উত্তর অক্ষস্থিতে দেশের জন্ম এ চক্র ও সূর্য্যের উদয়াস্তর নির্ণয় জন্ত

$$\begin{array}{r} \text{L. tan. } ২২। ৩০ = ৪১৮২২২ \\ + \text{ L. tan. } ১৬। ৩৫ = ২৪৭৯৩২ \\ - \text{ L. sin. Asc. Diff. } ৭। ৩০ = ১০২২১২ \text{ চক্রের} \\ \hline \text{এবং L. tan. } ২২। ৩০ = ৪১৮২২২ \\ + \text{ L. tan. } ১৬। ৩৫ = ২৪৭৯৩২ \\ - \text{ L. sin Asc. dif } ৩। ৪৮ = ৮৮২২৮৮ \text{ সূর্য্যের} \end{array}$$

এই যে উদয়াস্তর লক্ষ হইলো। এটি যদি মধ্য মাধ্যাহিক হয় তবে ক্রান্তি উত্তর হলে ২০ অংশে উদয়াস্তর যোগ এবং দক্ষিণ হলে ২০ অংশ থেকে বাদ দিলে দিবাক্ষি চাপ হবে, সূর্য্যের পক্ষে সেই দিবাক্ষি চাপের ঘণ্টাদিই ক্ষুণ্ণ কাল এবং তাহা ১২ হ'তে বাদ দিলে ক্ষুণ্ণোদয়কাল হবে। রবিভিন্ন ভিন্ন গ্রহের জন্ম সেই গ্রহের সরলোখান হ'তে রবির সরলোখান বাদ দিয়ে যে অক্ষ পাওয়া যাবে তা যদি অংশাদি হয় তাকে ঘণ্টাদি কর। উহাই এই গ্রহের মাধ্যাঙ্গিন রেখাতিক্রম সময় এবং ঐ নিয়মে সেই গ্রহের দিবাক্ষিমান নির্ণয় করে সেই অক্ষ ঐ মাধ্যাঙ্গিন রেখাতিক্রম কাল হতে বাদ দিলে গ্রহের ক্ষুণ্ণোদয়কাল এবং যোগ করে ক্ষুণ্ণোদয় কাল হ'বে; তাতে কালসমীকরণ সংস্কার করলেই যড়ির সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু চক্রের পক্ষে একটু জটিলতর অর্থ করা দরকার। যথা নৌপঞ্জিকার প্রতিমাসের IV পৃষ্ঠায় লিখিত চক্রের মাধ্যাঙ্গিন-রেখাতিক্রম-কাল গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুসারে ঐ গ্রহের ৪৩২ পৃষ্ঠা লিখিত সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক, সংস্কৃত মাধ্যাঙ্গিন অতিক্রম কাল নির্ণয় করা উচিত, (প্রতিমাসের V-XII

পৃষ্ঠা লিখিত চক্রের তাৎকালিক ক্রান্তিগ্রহণ করে স্বদেশীয় অক্ষ সাহায্যে দিবাক্ষিচাপ নির্ণয় করে তার ক্রিশভাগের একভাগ সেই অক্ষে যোগ ক'রে হ'বে, পরে ঐ অক্ষ মাধ্যাঙ্গিন রেখাতিক্রম-কাল হ'তে বিয়োগ করে উদয়কাল ও যোগ করে অস্তকাল হ'বে। এই অক্ষে কাল সমীকরণ সংস্কার করলে, ব্যবহার যোগা যড়ির কারণ পাওয়া যাবে।

৬ষ্ঠ স্থ। উত্তর ক্রান্তিযুক্ত সরলোখান হইলে উদয়াস্তর বাদ দিলে এবং দক্ষিণ ক্রান্তিযুক্ত সরলোখানে যোগ করিলে বকেখান লক্ষ হ'বে। যথা

$$\begin{array}{r} \text{রবির সরলোখান } ২০১। ৫৮ \text{ কলা ক্রান্তি দক্ষিণ} \\ \text{এজ্ঞ উদয়াস্তর } ৩। ৪৮ \text{ কলা যোগ করিয়া} \\ \hline \text{রবির অংশাদি } ২০৫ - ৪৮ \text{ বকেখান হইল;} \end{array}$$

এবং চক্রের সরলোখান ৩২২। ১৭ ক্রান্তি দক্ষিণ
অতএব উদয়াস্তর ৭। ৩ যোগ করিয়া

চক্রের অংশাদি ৩২৯। ২০ বকেখান হইল।

এক্ষণে যদি এই চক্রের বকেখানে, লগ্নের বকেখান যোগ করে তা থেকে সূর্য্যের বকেখান বাদ দেওয়া যায় তা হলেই ভাগ্যাত্মের (Part of Fortune) বকেখান হ'বে।

ইংলণ্ডীয় নৌগঞ্জিকায়, রবি চক্র ভিন্ন অতঃস্থ গ্রহের ক্ষুণ্ণ নাই। সরলোখান ক্রান্তি এবং সৌরকক্ষিক, স্পষ্ট আছে কিন্তু কোষ্ঠিতে ভূকক্ষিক স্পষ্টই ব্যবহৃত হয় এজন্য নিম্ন স্থ দুটি জানা প্রয়োজন—

লগ্নজা সরলোখান + লগ্ন, কোম্প, ক্রান্তি = লগ্ন স্প \angle ক। যদি সরলোখান ১৮০ অংশের কম হয় তবে উহা উত্তর অস্ত্রাঙ্গ দক্ষিণ।

সরলোখান ও ক্রান্তি একদিকে হইলে ঐ \angle ক + পরমাক্রম এবং বিভিন্ন দিকে অবস্থিত হইলে ঐ দুয়ের অন্তর \angle খ।

লগ্নজা \angle খ + লগ্ন স্প সরলোখান = লগ্নজা \angle ক = লগ্ন স্প গ্রহক্ষুণ্ণ।

লগ্ন কোজা \angle খ + লগ্ন কোজা ক্রান্তি = লগ্ন কোজা \angle ক = লগ্নজা বিক্ষেপ।

বিশেষ ঔষ্য—চক্র-৩৬০ অংশ কিন্তু উহার পাদ মাত্র ব্যবহারিক কোণ, এজন্য প্রয়োজন মত ১৮০ বা ৩৬০ হইতে চাপ অন্তর করিয়া ২০ অংশের কম অক্ষ দ্বারা, জ্যা প্রকৃত লইতে হয় এবং ফলে, ঐ ২০০ বা ৩৬০ যোগ বা বিয়োগ করিয়া ফল নিশ্চয় করিতে হয়।

সূর্য্যের ভূকক্ষিক ক্ষুণ্ণ হইতে ১৮০ বাদ দিলে পৃথিবীর সৌর কেন্দ্রিক ক্ষুণ্ণ লক্ষ হয়।

অভীষ্ট গ্রহের সৌ-ক, ক্ষুণ্ণ—পৃথিবীর সৌ-ক, ক্ষুণ্ণ = \angle ক

$$\frac{১৮০ - \angle ক}{২} = \angle খ$$

গ্রহ হইতে সূর্য্যের দূরত্বের লগ্ন + কোজা সৌ-ক, বিক্ষেপ = লগ্ন \angle গ

লগ্ন \angle গ + লগ্ন Rad. Vec. (নৌ পঞ্জিকায় ঔষ্য) = লগ্ন স্প \angle ঘ

লগ্ন স্প (\angle ঘ - ৪৫°) + লগ্ন স্প \angle ঘ = লগ্ন ট্যান \angle চ

$\angle \text{ব} + \angle \text{চ} = \angle \text{ইলাহেসন}$

সূর্যের জু. কে. স্প + $\angle \text{ইলাহেসন}$ = গ্রহের জু. কে. স্পষ্ট।

যোগ কি বিয়োগ করিতে হইবে তাহা কার্যকালে চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্থির করিতে হয়।

উপস্থিত ক্ষেত্রে চক্রাঙ্কনের জন্ত পাক্ষাত্য যে সময়ের আঙ্কের প্রয়োজন তা, বল্যাম চক্রে
একত্বাতীত লগ দশম ও সপ্তম সন্নিহিত স্থির তারার নির্দেশ করে নিলে তদ্বারা ফল* বিচারে
স্থিতি হয়। সে কথা বিচার প্রসঙ্গে বিশেষ ক'রে বলবো।

ইতি তৃতীয় প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ।

ইতিহাস এইকালে পশ্চিম পাইতেছি তাহা আমাদের নিকট সুপরিচিত। কোন অনাদি কাল হইতে এই শিক্ষার বীজ পৃথিবীতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বলা বাক্তি। তবে ইহা নূতন নহে। বিপে এই হিসাব ও সংগ্রাম ব্যাপার অহোরহ চলিতেছে। গ্রায় অজ্ঞায়, পাপ পুণ্য, বর্ধরতা প্রভৃতি যে সমস্ত খাপছাড়া কালিক শব্দাবলীর তাকনায় আমরা নিজের জর্জরিত, সে কেবল আমাদেরই জ্ঞা! অবশ্য এটাও প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের অধীন।

এখন আমরা কাজের কথা বলি। যুদ্ধ বাহিল সাভিয়ার ও অষ্ট্রিয়ার। রুশ, জার্মান, ফরাসী, ব্রুইস, ইটালিয়ান ও ইংরাজের তাহাতে এত বিচলিত হইবার কারণ কি? কেন ইংরাজ, ফরাসী ও রুশ সাভিয়ার সহায়তায় কৃতশংকল্প? জার্মানি বা একা অষ্ট্রিয়ার পক্ষ লইলেন কোন সাহসে? এই প্রশ্নবলের উত্তর সর্বাপেক্ষে জ্ঞাতব্য। এবং তাহা জানিতে হইলে এই কয়েকটা রাজ্যের বিগত শতাব্দীর ইতিহাস ও বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে একটু পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

২। বিগত শতাব্দীর ইউরোপ

খ্রীষ্ট উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণ পর্য্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অত্যন্ত জটিল। বর্তমান ইউরোপের রাষ্ট্রীয় বিভাগ-সকলের অধিকাংশই এক সময়ে না এক সময়ে রোম সাম্রাজ্যের কৃপিত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক সংগ্রামের ফলে ক্রমান্বয়ে এক একটা রাজ্য পৃথক হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে থাকে। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট

‘রোমান-ইউর’ উপাধি ত্যাগ করেন এবং ঐ দিন হইতে রোম সাম্রাজ্যের নাম পৃথক বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে মহাবীর ন্যেপোলিওনের মহা সমর এক প্রকার শেষ হইলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ও ১৮১৫ সালের নভেম্বর মাসে যে দিন ভিয়েনার কংগ্রেসে মিলিত হইয়া ইউরোপের পুনর্গঠন করেন, যদিও পরবর্তী যুগে তাহার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তথাপি বলিতে হয় সেইদিন হইতে ইউরোপের বর্তমান রাজ্যগুলি স্থায়ী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য উহাদের সমস্ত রাজাই তখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে নাই; Independent Principality বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল মাত্র। এবং ঐ রাজ্যসমূহের মধ্যে তখন অজ্ঞাত গোলযোগও যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, অষ্ট্রিয়ার-প্রশিয়ার যুদ্ধ, ফ্রান্স-প্রশিয়া যুদ্ধ, পোল্যান্ড, ইটালি বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে বিদ্রোহ, হান্সের ও ইটালিয়ার প্রদেশগুলির স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা প্রভৃতির কারণ ঐ গোলাঘাতের সহিত জড়িত। এমন কি, আজ ইউরোপে যে যুদ্ধালন প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহারও অনেক কারণ ঐ স্থানেই নিবদ্ধ আছে।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ান ওয়াটাল্লুর যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হইয়া সেণ্ট হেলেনায় প্রেরিত হইবার পর প্যারিস নগরীতে দ্বিতীয়বার যে সন্ধি হয়, তাহাতে ফ্রান্স বর্তমান রাজ্য ও অঞ্চ দুই একটি ছোট ছোট প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইংলণ্ড ও ভার্ভের ইণ্ডিজের কয়েকটা দ্বীপ, উত্তরাংশ অস্ট্রীয়, মারিটাস, সিদ্রা ও মালটা দ্বীপ লাভ করে; অষ্ট্রিয়া তাহার ইতালীয় রাজ্যগুলি পুনঃ প্রাপ্ত হয়। প্রশিয়ায় (বর্তমানে জার্মানি) রাইন প্রদেশ, ডানাবিন, ওয়াবস রাজ্যের কতকাংশ

গ্রহণ করিয়া সম্ভ্রত থাকিতে হয়। ওয়াবস রাজ্যের অবশিষ্টাংশ কশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। ইটালির পিডমন্ট, ভেনেত ও ক্রেনোয়া একত্রে যুক্ত এবং অজ্ঞাত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পুনরায় স্বাধীন হইল, তাৎকালিক অষ্ট্রিয়ারিক দোয়ারব্যাও (বেলজিয়াম) হল্যান্ডের সহিত যুক্ত হইয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্যের সৃষ্টি করিল। ব্রুইডেল, নরওয়ে ও ডেনমার্ক এতদিন এক রাজ্যভুক্ত ছিল; এই সময়ে ডেনমার্ককে পৃথক করা হয়। স্পেন সার্ডিনিয়ার পুরাতন বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাট জার্মানির সম্মিলিত প্রদেশগুলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। পশ্চিমাংশের ধ্বন এই অবস্থা তখন পূর্বাংশের গ্রীস, এলবানিয়া, সের্বিয়া, মায়োগানা, সাভিয়া, রুম্যানিয়া, মন্তিনিগ্রো, বুলগেরিয়া, রুমেলিয়া, বোশনিয়া, হার্জেগোভিনা প্রভৃতি পুঠান অধ্যুষিত রাজ্যগুলি অটোমান তুর্কীর পদানত। ইহাদের সকলেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্ত বিকির্দ্দিক চেষ্টা করিতেছিল। বিদেশে: ফ্রান্স, ভেনেত্য়া, মস্কো-অস্ট্রিয়ার শতাব্দীর লেখকর্গণ যে চিন্তাধারা প্রচারিত করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার ফলে ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা যে এই পর পদানত, অত্যাচার প্রতীড়িত ও বিগত গৌরব গ্রীস ও ইতালীর অধিবাসী উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই এমন নহে।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের অবস্থা এই। যদিও ফরাসী বিদ্রোহের ফলে সমস্ত ইউরোপে একটা নূতন জাগরণের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, যখন সকলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বরাষ্ট্রপ্রাপ্তিই জীবনের একমাত্র কাম্যাবলম্বন করিতেছিল, তথাপি ভিয়েনা কংগ্রেস রাষ্ট্রটিতে যে একটা নূতন সৃষ্টির অবতারণা

করিল তাহা কোন প্রকারেই ঐ জাগরণের অঙ্গুল নহে।

সত্যবটে ইউরোপীয়-রাজত্ববর্ণ প্রকৃতিপুঞ্জের হৃৎ শাঙ্কনের প্রতি দৃষ্টি বারিতে কতপক্ষের হইয়াছিলেন কিন্তু ওয়াটাল্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অস্তিত্ব হইল। কারণ, সে সময়ে নেপোলিয়নই প্রকৃতিপুঞ্জের একমাত্র ধুরন্ধর। তাঁহার অবস্থামানে রাজত্ববর্ণ নিজ নিজ ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। হতরাং রাজা প্রজায় আবার বিবাদ আরম্ভ হইল। ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ পর্য্যন্ত এই দেশ-ব্যাপী প্রজাতিবিদ্রোহের যুগ। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম গ্রীস তুরস্কের হাত হইতে মুক্তিলাভ করে। পরবর্ত্তর বেলজিয়াম হল্যান্ডের বিকক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ১৮৪৮ অব্দে ফ্রান্সে লুই নেপোলিয়নের নেতৃত্বে পুনরায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩ বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি সেখানকার সম্রাট নির্বাচিত হন। প্রজাবল্ল চায় শাস্তি কিন্তু লুই নেপোলিয়ন যেখানে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য। ১৮৫৩ সালে রুশ-তুরস্ক ক্রিমিয়াতে যুদ্ধ হয়; কারণ, রুশের কনস্টান্টিনোপল অধিকারের ইচ্ছা। এই যুদ্ধে সার্ডিনিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের সহায়তা করে। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে প্যারিস সন্ধিতে যুদ্ধাভিনয় শেষ হয়। ঐ বৎসর রুশ তুরস্ককে কয়েকটা ক্ষুদ্র প্রদেশ অর্পণ করেন ও নিজের দাবী ভাগ্য করিতে বাধ্য হন। সম্মিলিত শক্তিযুগ তুরস্ককে ক্রমশঃ বাহাদানকারী প্রাচীররূপে আরো কিছুদিন ভেঙা-স্রবির অবসর পাইলেন।

এই যুদ্ধের পরই ফ্রান্সকে অষ্ট্রিয়ার সহিত

যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইতে হইল। ইতালী অস্ট্রিয়ার ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া অবিরত চেষ্টা দ্বারা অবশেষে ক্রান্তের সাহায্যে ১৮৭২ অব্দে ভিক্টর ইমানুয়েলকে স্বাধীন রাজপদে বরণ করিতে সমর্থ হয়। ১৮৬৬ অব্দে প্রুশিয়া অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব (President-ship) অধীকার করিলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে রুশাণী সম্রাট যোগ দিতে পারেন নাই; কিন্তু ইতালী স্বতন্ত্রভাবে অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে। প্রেন সন্ধিতে ভিনিস দ্বারা এতদিন অস্ট্রিয়াসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল পুনরায় ইতালীর সহিত যুদ্ধ হইয়া যায়। ডেমানার্কের নিকট হইতে অঙ্গদত্ত সেলহুইন ও হলষ্ট্রিন নামক স্থানদ্বয় দ্বারা এই বিবাদের আদি কারণ প্রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়া এবং প্রুশিয়া স্বীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিল। এই সুযোগে হান্সেরও অস্ট্রিয়াকে রাজ্যের শাসনে তাহার ন্যায় অধিকার দিতে প্রবৃত্ত করে।

এই সীমান্তান্তে করাণী সম্রাটের কতি হয়; হস্তরাং অনতিবিলম্বে জর্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। কিন্তু ফলে ক্রান্তেরই পরাজয়। ১৮৭১ সালে প্যারিস সন্ধিতে নেপোলিয়ন ভিক্টর সীমান্তান্ত প্রাপ্ত রাজ্যদ্বয় প্রুশিয়াকে ত্যাগ করিলেন। প্রুশিয়া-রাজকে সম্রাটের পদে অভিমুখিত করিয়া উহার উপর জর্মান সাম্রাজ্যের সাধারণ শাসনের ভার দেওয়া হইল। প্রত্যেক রাজ্য অত্যন্ত শাসনভার নিজেস্বায়ী গ্রহণ করিল। ফলে তৃতীয়বার সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। এবং মাঝে মাঝে শাসনব্যাপারে বহু তত্ত্বাবধি-পরিবর্তনের দ্বারা যথি শ্রেণ শাসন-প্রথাই এখন ফলে বর্তমান আছে।

ফ্রান্সো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের ৪ বৎসর পরে

রুশো-তুর্কক সম্রাট পুনরায় ইউরোপীয় শক্তির পুঙ্খবহু দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এবার উহার অস্ত্রধারণ করেন নাই। বালিনে-সকলে মিলিয়া ১৮৭৮ সালে যে শক্তি করিয়াছিলেন উনিবিশ শতাব্দী পর্যন্ত তাহাই বর্তমান ছিল। এই সন্ধিবলে রুশ পুঙ্খবহু হস্তরাং ও আফ্রিনিয়া দখল করিলেন। মস্কিনোগ্রো, সার্ডিয়া, রুমানিয়া, তুরস্কের অধীনে স্বাধীন প্রিন্সিপালিটি হইয়া দাঁড়ায়, বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়া স্বায়ত্বশাসন প্রাপ্ত হয়। আর বোসনিয়া, হারজেগোভিনা অস্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত হইল। ১৮৮১-৮২র মধ্যে সার্ডিয়া, রুমানিয়া, পূর্ণ সর্বভাষার স্বাধীনতা লাভ করে। ইলও সাইপ্রাস স্বীয় ও লোহিত সাগরকে যদুচ্চা ব্যবহারের অধিকার পাইলেন। এই যুদ্ধ হইতে স্পেন ও পর্তুগাল রাজ্যের প্রভাব গৃহবিবাদে একটু নিম্নতর হইয়া পড়িয়াছে।

..

৩। বর্তমান রাষ্ট্রসমষ্টি

এইরূপ বহু গোলযোগের পর বিগত শতাব্দের অবসানে ইউরোপ পুঙ্খবহু আকার ধারণ করিল অনেকই মনে করিলেন এইবার পৃথিবীতে শান্তি আসিল; মানবজাতি এখন বিশ্বমৈত্রীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। কিন্তু ঐ আশা তাহার পদাঘাতে যে অসি লুকাইতে ছিল তাহা সেই অসমীক হৃদয়গ্রাহী (Optimist) মহোদয়গণ দেখিতে পান নাই। একটু স্থির মনে চিন্তা করিলেই দেখা যায় বিগত এই শত বর্ষের এই সমস্ত সংঘর্ষের প্রধান কারণ দুইটি; হয় জাতীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ, না হয় বহির্বিপাক্য প্রসারের সুবিধা লাভ। কাহারও আবার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা

না ছিল এমন নহে। রুশের কনস্টান্টিনোপল অধিকারের চেষ্টার মধ্যে দুইটি উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বহির্বিপাক্যের প্রসার, দ্বিতীয়তঃ তুর্কী-সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন পুঙ্খবহু প্রাচ্যভূমিতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা। অত্যন্ত বৈরাগ্য তুর্কীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের উদ্দেশ্য রুশিয়ার কবল হইতে আশ্রয়ক্ষা। প্রুশিয়ার সহিত অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ স্বীয় প্রভাব বিস্তারের উদাহরণ। ক্ষুদ্র ও অধীন রাজ্যগুলির তত্ত্ব স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই সকলে প্রধান লক্ষ্য ছিল। অনেকের সীমান্ত হইল কিন্তু ভিতরের প্রকৃত গোলযোগ মিছিল না। হুইজারিয়া ও চিরিদি স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, প্রাকৃতিক সীমান্তগুলি তাহার রক্ষাকর্তা; কিন্তু রুশিয়া অস্ট্রিয়া ও তুর্কীদেশের প্রাকৃতিক অপরূপ ক্ষুদ্ররাজ্যগুলির উপর অনেকের লোভপুঙ্খ দৃষ্টি নিশ্চিত ছিল। হান্সেরও ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ-বল্লি তখনও ঘূর্ণায়িত হইতেছিল। নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে যে মিত্রভাব ছিল তাহা ১৯০০ সালে তাহাদের বিচ্ছেদ হইতে জানা গিয়াছে। সার্ডিয়া, রোমানিয়া, মস্কিনোগ্রো, বুলগেরিয়া, পূর্ণ রুমেনিয়া যখন ক্রমাগত স্বাধীন হইল, তখন এলবানিয়া, সের্ভিয়া, মাসিডোনিয়া প্রভৃতি অসিগত বলকান ষ্টেটগুলির মনের অবস্থা সহজেই অহমান করা যাইতে পারে। একে অস্ট্রিয়া হান্সেরও জর্মান, ইতালীয়, মাগয়ার প্রভৃতি নানা জাতির বাস ও তাহাদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল; তাহাতে স্বাধীনতাপ্রার্থী সার্বভৌম প্রদান; বোসনিয়া ও হার্জগোভিনা প্রদেশদ্বয় ঐ সম্রাজ্যের অধীন এবং পরিশেষে ১৯০৮ অব্দে একবারে রাজ্যভুক্ত করা হইল। এই সমস্ত বিষয়গুলি এককালে বিবেচনা করিলে বর্তমান

শতাব্দীর এই মহানয়নের অনেক কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আজ সার্ডিয়ার যুদ্ধ যোগ্যতার সহিত বোসনিয়া ও হার্জগোভিনার ভাগাবিদ্যাতার যোগ আছে। সার্ডিয়ার হস্তে অস্ট্রিয়ার সুবরাজ ও তদীয় পুত্রর গুণ ধরা, বিগত বলকান সময়ের পর ফুটারি বন্দর লইয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে বিবাদ—উপরোক্ত দুয়ামিত অগির শেষ অবস্থা।

জর্মানি যে এই যুদ্ধে যোগদান করিল সেও অনেক কারণে। প্রথম ও প্রধান হেতু তাহার স্থানভাব। বিপুল লোকসংখ্যা রাজ্য ও দৃষ্টি-যাধী অনেক ছোট; এদিকে অর্থবল প্রচুর। শক্তি ও প্রবল স্বতরাং তাহার পক্ষে যুদ্ধটা অত্যন্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ অস্ট্রিয়া বলকান সময়ের পর হইতে বিশেষভাবে জর্মানের প্রতিদ্বন্দ্বী রুশের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার শক্তিও নিতান্ত কম নহে। যদি এই দুই শক্তি একদিকে যায় তবে ইউরোপের সমগ্র শক্তি একনা হইলে বিশেষ ভয়ের কারণ দাঁড়ায় না। এমন কি যুদ্ধ জয়ী হইবার চূরাপও পোষণ করিতে পারে। এই সমস্ত কারণে জর্মান তাহার সহিত যোগ দিল।

এখন জর্মানি যদি রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় তবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুশ নীরব থাকে কি করিয়া। এখন ইউরোপীয় শক্তি-পুঙ্খের একবার চেষ্টা সমগ্র সাধন অথবা প্রত্যেকেরই ভিতরেই একটা 'একরাজ্যত্ব' বা Imperialism এর আকাঙ্ক্ষা। অতি গোপনে ঝগড়া করিতেছে বলিয়া অনেকের এক-ভিত্তি শক্তিবুদ্ধিকে তাহার বিঘ্ন সর্ধন্যের মূল কল্পনা করিয়া বসিয়া আছে। স্বতরাং যুদ্ধ যোগদানের মধ্যে আমরা পুঙ্খবহু হাব ভাব ও উদ্বেগই বর্তমান দেখিতে পাই। তারপর সমরায়োজন দেখিয়া আশাশ্রিত

ইহার ভবিষ্যৎ গতি ও ফলাফল সম্বন্ধে দারপা করিতে হইবে। এই যে অল্প বড় বলকান সমর ঘটয়া গেল তাহার এক আশ্চর্য দেখিয়াছ কি? যুদ্ধ ব্যাপারে 'বলারস্টে লম্বু জিহা' প্রবাহী প্রায় থাকে না। বিশেষতঃ এবারকার যুদ্ধ সভ্যজাতি পরস্পরের প্রতি-দ্বন্দ্বী। এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রবল শক্তির 'অইবজ্ঞ সম্বলন'। বিগত বিখ্যাত শতবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধের পুনরভিনয় হইতে চলিল; যদিও এ যুদ্ধে নূতন আবিষ্কৃত উন্নত প্রণালীর যুদ্ধারি সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত শেষ হইয়া যাইতে পারে তথাপি এ যুদ্ধের ভাবিফল কোন অংশেই তাহা অপেক্ষা কম গুরুতর হইবে না।

৪। যুদ্ধের ভাবী ফল

যদি যুদ্ধ স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া গন্তব্য উপনীত হয় তবে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের বিশ শতকে দ্বিতীয় বার পুনর্গঠন আশা করা যায়। মনে হয় পোলও, বেলজিয়ম, বলকান স্টেটের মানচিত্র আমূল পরিবর্তিত, এমন কি মোরিশিয়াগরের ভীরু পঞ্চাশ এই আন্দোলনের চেটে উপনীত হইবে। বাবল্যার বাণিজ্য ব্যাপারে ইহা সমগ্র জগতকে একবার আলোড়িত করিবে।

৫। প্যানামা বিশ্বমেলা

গত বৎসর পানামা খাল লাইট আমরা একাদিকবার আলোচনা করিয়াছি। ১৯১৫ সালে ঐ খাল খনন উপলক্ষ্যে মানিকুনিগো সাহরে একটি বিশ্বপ্রদর্শনী খোলা হইবে। শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ দাস গুপ্ত ইউনাইটেডস্টেট্‌স

হইতে প্রবাসীতে লিখিয়াছেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় জগতের অজ্ঞাত জাতির মধ্য হইতে এই প্রদর্শনকে প্রতিনিধিত্বণ আসিয়া নানা প্রকার বহু মূল্যবান জিনিষ নিজে নিজে দেখে হইতে আনাইয়া পৃথিবীর লোকবিরগকে দেখাইবেন, আর জলদগ্ধীরদের বলিবেন, আমরা উন্নত জাতি, আমাদের সবই আছে; কিন্তু আমরা ভারতবাসী, যাঁদের শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি বিশ্বজগতের তুলনায় হেয় নহে, আজ যেরে বসিয়া কি করিতেছি? যে আধ্যাতিক অসমর্থ শিল্প, জ্ঞান ও সভ্যতার পৃথিবীর অল্প সমস্ত জাতিকে অতিক্রম করিয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া সমগ্র জগতকে সজ্জিত করিয়াছিলেন, সেই জাতির বশবর্ত্তগণের কি আজ নীরব থাকা উচিত? মহাত্মা অশোকের কৌটিল্যগণ, বিক্রমাদিত্যের নব-প্রবর্ত্তন, কথাকথাকের সভ্যদগ্ধগণের বিবরণ, আগ্রার তাজমহল প্রভৃতির কথা একবার প্রাণের মধ্যে আগাইলেই ভারত-সন্তান সম্যক-রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, "ভারতের সবই ছিল এবং এখনও আছে।" ভারতের এ সব থাকা সত্ত্বেও আজ পঞ্চাশ পৃথিবীর উন্নত ও শক্তিক্রান্তির মধ্যে ভারতসন্তান পরিচিত হয় নাই; কারণ ভারতসন্তান যেরে বাহির হইতে পাল্লি বেঁচে, শত্রু হতাড়য়া। যদি দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ হইয়া আসেন এবং দেশের বর্তমান ও প্রাচীন শিল্পা শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি, দর্শন, বাণিজ্য, ক্রীড়া, সমাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি, জাতীয় উন্নতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় আলোচনা করিয়া পৃথিবীর লোকবিরগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন, তবে ভারতবাসী গৌরব আবার বাড়িবে। দেশে হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণের পানামা-মহামেলায় আসা নিতান্ত দরকার। যদি আমাদের ভারত-গৌরব সাহিত্য-মহারশী রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও আমেরিকাতে না আসিতেন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি-দের সঙ্গে সাংসদ না করিতেন, তবে তাঁহাকে আজ এ সকল দেশে কে জানিত?

তিনি এ সব দেশে আসিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহাকে সকলে পানি ও লোকস্বার্থে তাঁহার গুণের কথা জানিতে পারেন। ভারতের মুগ্ধাভ্যন্তরীণ সন্তান স্বাধীন বিবেকবান যদি ১৯-তম বৃঃ অর্ধশতাব্দীতে মহাপ্রভাতে (Parliament of Religions) আসিয়া সর্বজগৎসমক্ষে ভারতের ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা না করিতেন তাহা হইলে কি ভারতের ধর্ম ও দর্শন আজ সভ্যজগতে এক মধ্যাধা পাইত? জানি না হুবেন বাবু ভারতীয় দেশবাসী স্তম্ভিবেন কি না। আমরা মনে করি, হিন্দুর জ্ঞানভাণ্ডার পাশ্চাত্যজাতির সমুখে যিনি খাড়াভাবে খুলিয়া দেখাইতে সক্ষম, তিনি এই মহামেলারও উপেক্ষা করিবেন না। তবে হুবেন বাবু ভারতীয় বিকসম্প্রদায়কেও ঐ মেলায় উপস্থিত হইয়া ভারতীয় শিল্পার প্রদর্শন করিতে আনেন করিয়াছেন। কিন্তু যে কার্যে আমরা প্রতি-যোগিতায় পক্ষাতি হইব না, তাহাতেই অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের বিকসম্প্রদায় ব্যবসা ও বাণিজ্যে যদি পরিণামে জয়ের আশা বন্ধপরিকর হইতে পারেন, তবেই এই মহামেলার উপাধেয় শিল্প-ব্যবসা প্রদর্শন বিধেয়। "কিন্তু কেবল-কৌতুহল বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের যোগদান আমরা কিছুতেই অস্বমোদন করি না। তবে ঐহারা শিল্পার ভাষায় গমন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা স্বতঃ।

৬। উপাধি প্রত্যাখ্যান

আমাদের দেশে বহুদিন হইতে উপাধি ব্যাধি বলিয়া মনে করা হইতেছে, তথাপি ব্যালিয়ার ওলাউরার মত ইহার প্রবল প্রচার প্রতিহত হইতেছে না। এখনও দেশের বহু দনী, বহু বিদ্বান এই মায়ামৌচিকার মোহে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের নিকটে তাঁহার চিরজাই যে দর্শ গৌরবের গৌরব, সর্ব জগতের জ্ঞান তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আমাদের

বাহিরের দিকে এত নজর গিয়াছে। আমরা সকল কাজে আমাদের বাহিরের চাঁটই বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া ফিরিতেছি। কিন্তু তাহাতে অস্তর জমেই দীন হইতে দীনতর হইয়া পড়িতেছি। এইরূপে আমরা প্রতিনিধি জগতের দিকে কতখানি দীন হইয়া পড়িতেছি, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না। আমাদের খোড়ায়া গলদ। কিন্তু দেখানো "সংস্রাধনের নাম গন্ধ নাই—আমরা চাহিতেছি সমাজের উন্নতি। ব্যক্তিগত যাত্রা অস্বস্থ হইল না, শুধু মাত্র বহুতায় তাহা সমাজে পরিক্রান্ত হইবে, ইহা কোন বৈশাখিক সম্পদ লোকে বিশ্বাস করিতে পারে? কল-কথা তিলে তিলে দীরে দীরে এখন আমাদের আত্মচিত্র প্রত্যাহন হইয়াছে। এমন আমাদের বিশেষরূপে অস্তর-বিলেপনের দিন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের কোথায় কোথায় মোহ, কোথায় কোথায় হীনতা সমুদ্রই পরিষ্কার করিয়া বুঝা উচিত। যেদিন নিজের গলদ নিজকে তাড়না করিবে, সেইদিন বিশ্ব-আমাদের শুভদিন সমাগত। সেইদিন আত্মশোধনের যে প্রয়াস আমরা করিব, তাহাতেই প্রকৃত জাতির মুখ পূরিত হইবে।

মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোলাব মহোদয় 'কে, সি, আই, ই' উপাধি সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। দেশের পক্ষে ইহা একবারে নূতন। ইহাতে তাঁহার কতখানি সাহসিকতা, কতখানি চরিত্রবল, কতখানি আত্মগৌরব প্রদীপ্ত হইল, উপাধি ব্যাধিগ্রস্ত-ব্যক্তিগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পরিবেন কি?

৭। চিত্রশিল্পে ভারত ও চীন

শুধু যে ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ধর্ম্মই চীন ও জাপানের সঙ্গে যোগস্থাপন করিয়াছিল, তাহা নহে। ভারতের চিত্রবিজ্ঞানও ঐ সব দেশের তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অমলীনাথ ঠাকুর মহাশয় ভারতীয় চিত্র-চিত্তার প্রতিনিধি চীন ও জাপান চিত্র-শিল্পের মধ্যে কেমন পরিসৃত 'ভারত' পরি-কায় বহুদর্শন প্রবর্ত্তে তাহা দেখাইবার চেষ্টা

করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“চীন-যুদ্ধের পঞ্চম অঙ্গুরি যে অল্পবাল ফ্রান্সী পণ্ডিত পেত্রুচি (Petrucchi) এবং বিনিয়ান (Binyon) সাহেব দিয়াছেন তাহা পঞ্চদশীর চিত্রকর্ষের এই পঞ্চম দোকটির অবিকল প্রতিধীন যথা :—

“Disposer les lignes et leur attri-
buer leur place hiérarchique.

(La philosophie de la Nature
Laus l'art de l'extreme orient—
Petrucchi, page 89.)

“Composition and subordination
or grouping according to the hier-
archy of things (L. Bignon.
The flight of the Dragon. page 12).

বোহান-বর্ণনের এই চিত্রাট চীন-যুদ্ধের
মধ্যে কোন কালে কি ভাবে প্রবেশলাভ
করিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আমাদের স্বর্ণিণ বসিয়াছেন যে রূপের
ধর্মই হচ্ছে, প্রতিবিম্বিত হওয়া, কল্পিত হওয়া,
ছদ্মকিত হওয়া এবং ছায়াতলে প্রকাশিত
হওয়া, যেমন :—

‘মহাদর্শে তথ্যস্থানি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে
ব্যাখ্যারব দৃশ্যে তথা গন্ধর্বলোকে, ছায়া-
তপয়োবিব ব্রহ্মলোকে।’
(কঠোপনিষদ)

আত্মাতে দর্শনই প্রতিবিম্বের স্রাঘ, পিতৃ-
লোকে স্বপ্নদর্শনের স্রাঘ, গন্ধর্বলোকে যেন
জলের কল্পনের উপরে এবং আমাদের এই
ব্রহ্মলোকে ছায়া এবং আত্মা এতদ্ব্যতিরিক্ত
বৈষম্য দিয়া।

‘মহাদর্শে তথ্যস্থানি’ এই ভাবটির ঠিক
অর্থপূর্ণ ভাবটি ব্যক্ত করিতেছে জাপানের
Sha I যথা :—

‘They paint what they feel rather
than what they see, but they first
see very distinctly (তাত্মাতে প্রতি-
বিম্বং)’. It is the artistic impres-
sion (Sha I) which they strive to
perpetuate in their work’.

(Page 8 on the Lands of
Japanese painting by Henry P
Bowie.)

আত্মাতে প্রতিবিম্বিত না দেখা পর্যন্ত
রূপকে সম্পূর্ণ বোধ করা অথবা প্রকাশ করা
অসম্ভব; ইহা জাপান ও বসিয়াছেন, আমাদের
স্বর্ণিণ ও বসিয়া গিয়াছেন।

‘ছায়া তপয়োবিব ব্রহ্মলোকে’—রূপ প্রকাশ
পাইতেছে ছায়াতলের বৈষম্য দিয়া, যেমন—

‘মহা স্বর্ণাঙ্গী সমুদ্রা সমান্য বৃক্ষং
পরিব্রজ্যজ্ঞাতে,
তয়োরাগ্যঃ পিল্ললঃ বাহন্ত্যাত্মোহনয়তি

চাক্ষুশীতি
দুই স্থানের পক্ষী—শেত, কৃষ্ণ—জাগ্রত,
দুঃস্থ—যেন ছায়াতলের মত একজ বস
করিতেছে। একটি পক্ষী ফল-আহার
করিতেছে, গান গাহিতেছে, অচ্যুত চুপচাপ
বসিয়া তাহা দেখিতেছে। জীবাত্মা পরমাণু
(Spirit and matter) আকার নিরাকার,
রূপ ও অরূপ এই দুয়ের সমতা ও বৈষম্যতা
ব্যক্ত করিতেছে। ভারতের উল্লিখিত যে
সমান্তর চিত্রাগুলি তাহার ঠিক প্রতিধীন
কিহেছে জাপান-চিত্রশিল্পের In Yo মন্ত্রটি,
যথা :—

‘In Yo.....requires that there
should be in every painting the
sentiment of active and passive,
light and shade (ছায়াতপ).....The
term In Yo originated in the earliest
doctrines of chinese philosophy
and has always existed in the art
language of the orient (?) It signi-
fies darkness (In, ছায়া) and light
(Yo, আত্মা) negative and positive
female and male (প্রকৃতি পুরুষ),
passive and active (যেমন, স্বর্ণপূর্ণা)
lower and upper (উৎসাহাৎ) even
and odd.....Two flying crows
one with its beak closed, the other
with its peak open (?).....or

two dragons one ascending to the
sky, the other descending to the
ocean—illustrate the phases of
In Yo, (vide page 43 on the Laws
of Japanese painting, by Henry
P. Bowie.)

‘আমাদের যুদ্ধের দ্বিতীয় অঙ্গ ‘প্রমাণাঙ্গি’
(correct perception, proportion,
measure and structure of forms)
ও চীন যুদ্ধের দ্বিতীয় অঙ্গ (analytical structure)
যে সাধারণ ভাবে বসিতেছে,
তাহা নয়। চীন ও জাপান চিত্রশিল্পে এই
প্রমাণযোগের পুংখ্যাদুপুংখ উপদেশগুলিও
যেন প্রমাণসম্বন্ধ আমাদের চিত্রাগুলির
প্রতিধীন দিতেছে। প্রমাণ অর্থে আমরা
বুঝিতেছি কোন বস্তুর ভ্রমভিন্নজ্ঞান—তাহার
দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির পরিমাপ। জাপান-
শিল্পের Ichi Isho এই চিত্তারই প্রতিধীন
দিতেছে যথা :—

‘Ichi and Isho.....they aim
to supply and express with sobriety
what is essential, to the composi-
tion, proportion (Ichi) determin-
ing the just arrangement and dis-
tribution of the component parts
and design, (Isho) the manner
in which the same shall be handled.
(Vide page 46 on the Laws of
Japanese painting by H. P.
Bowie.)

প্রমাণ বা প্রমা যে কেবল বস্তুর দৈর্ঘ্য
প্রস্থ ব্যুৎসাহ তাহা নয়, প্রমাখারা আত্মা বস্তুর
দূরত্ব এবং নৈকট্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই।
চীন-শিল্পশাস্ত্রে এই দূরত্ব ও নৈকট্য ব্যুৎসাহের
নীতিটিকে বলা হইয়াছে :—

‘En Kin.....So far as the
perspective is concerned, in the
great treatise of Chu Kaishu enti-
tled the ‘Poppy Garden Art Con-
versation’ a work laying down the
fundamental laws of landscape

painting, artists are specially warn-
ed against disregarding the prin-
ciple of perspective called En Kin,
meaning what is far and what is
near (vide page 8 on the Laws of
Japanese painting by Henry P.
Bowie.)

আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হইতেছে
যথা—
‘শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রং ব্যাক্যবসরং স্তম্ভম্’
(কাব্যপ্রকাশ, প্রথম উল্লান)
চিত্রমায়েই অবর,—কি শব্দচিত্র, কি
বাচ্যচিত্র—বুদি তাহাতে ব্যাক্য না থাকে
ইহাও না থাকে। জাপানী শিল্পশাস্ত্রে ব্যাক্য
বলা হইয়াছে :—
Yu Kashi.....Such sugges-
tion or stimulation of the imagina-
tion is called Yu Kashi. The
Japanese painter is early taught the
value of suppression in design.
(Vide page 47 on the Laws of
Japanese painting by Henry P.
Bowie.)

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে আমাদের
বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতির গভীরতম সূক্ষ্মতম
চিত্তাগুলির প্রতিধীন দিতেছে চীনের
জাপানের চিত্র শাস্ত্রে যতদূর পর্যন্ত। নানানিক
দিয়া ভারতে ও চীনে যেরূপ যোগাযোগ দেখা
যায় তাহাতে আমার বোধ হয় যে বৌদ্ধধর্মে
ধর্মের সঙ্গে ভারতের চতুষ্টয়িকলা ও
আলেখ্যের এই যতদূর চীনে নীত হইয়া
ছিল।

৮] গুরুকুলের সংচেতা
গুরুকুল বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ নিজ
সম্প্রদায়ের বাহির হইতেও সাহায্য ও
উপদেশ গ্রহণ করিতে অগৃহস্ব হইয়াছেন।
তাহারা শিক্ষাকে সর্বোত্তমভাবে সম্পূর্ণ
করিবার প্রয়াসী। গুরুকুলে যে সমস্ত বিষয়

৯২২

শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সব বিষয়ে দেশে বাহারা বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইতেছেন, তাহাদিগকে তত্ত্ব বিষয়ের পূর্বীক নিরীচন করা ইহাদের এক প্রধানতম উদ্দেশ্য হইয়া অব্যাহত। সেই উদ্দেশ্যে ইহারা দেশের অনেকের কাছেই আগসর হইতেছেন। ইতিমধ্যে বাহারা ইহাদিগকে অবৈতনিক অধ্যাপকের রূপে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাদের নাম ও পরাক্রমীয় বিষয় নিয়ে উক্ত কত করা হইল—

অধ্যাপক বাস অবতার পাণ্ডে এম এ সাহিত্যাচাৰ্য্য—সংস্কৃত সাহিত্য।

রেবেরেণ্ড মিঃ সি, এফ, এডুস—ইংরাজী।

অধ্যাপক রামাকৃষ্ণ নৃপাণায়ায় এম এ, পি, আর, এস—ইতিহাস।

অধ্যাপক এইচ, সি, মুখার্জী—দর্শন।

অধ্যাপক সহমত রায় এম, এল, সি—রসায়ন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম, এ—উদ্ভিদবিজ্ঞান।

..

৯। বৃত্তজগতে হিন্দু-প্রভাব

চিকাগোর ধর্মমহাসমিতির বৈজ্ঞানিক শাখার সভাপতি মিঃ মারউইন মেরি স্নেল সাহেব বৃত্তজগতে ভাস্কর্যের দান সংঘকে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠক-বর্গকে কনাইতেছি “আধ্যাত্মিক প্রেরণার স্বল্প ইউরোপ ভারতবর্ষের নিকটে সন্নিহিত। বৃত্তজগতে এমন কিছু বসামাত্র উচ্চ-ভাব ও আকাজ্ঞাও নাই যাহা হিন্দুজ্ঞান-কর্মিক প্রভাবের কোন না কোন একটি দ্বারা হইতে নিশ্চয় নহে। পাইথাগোরাস এবং প্লেটোর হিন্দু জ্ঞানবান গ্রীসীয়জ্ঞানবানগণের (Gnostics) হিন্দুজ্ঞানবান তত্ত্ববান, যিহুদী কাসালবিদগণের হিন্দু-জ্ঞানবান ধর্মমত। মূর দার্শনিকদিগের হিন্দু-জ্ঞানবান সহস্রীয় ধর্ম, এমন কি পিগোফিট-দিগের হিন্দুজ্ঞানবান রহস্যবাদ (Occultism) এবং নন-ইগোওর স্কুলে যুবদানদিগের পৃষ্ঠের দিভাব অর্থাৎ দেবত্বের আবিষ্কার প্রভৃতি

বহুস্তর বিষয়ে প্রাচ্য প্রভাব-ধারা পরিলক্ষিত হয়, যাহা সমসাময়িক বৃত্তজগতের ধর্মক্ষেত্রে উল্লব করা যাইতেছে।”

..

১০। বর্ণভাষা ও বর্ণীয় মুসলমান

বঙ্গদেশের মুসলমানগণ বর্ণভাষার প্রতি তত-প্রশ্রাসনপূর্ণ নহেন, ইহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, সম্ভব নাই। বর্ণভাষাই তাহাদের মাতৃভাষা, অথচ তাহাতে তাহারা অল্পরূপে প্রশ্রয় করেন না কেন, বৃত্তিতে পারা যায় না। যে পথে চলিলে স্বাভাবিক অর্থ, সে পথে না চলিয়া অল্প পথে চলা কদাচ সঙ্গত নহে। আরবা ও পারস্ত ভাষা তাহাদের নিকটে সৌন্দর্যের সামগ্রী হইলেও মাতৃভাষাকে অজ্ঞা করিলে, তাহাদের আধুনিক জাতীয় উন্নতি কি প্রকার ব্যাহত হইবে, তাহা একবার তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। মৌলবী আবদুল করিম মহাশয় এ বিষয়ে ‘সাহিত্য’ পত্রিকায়াহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আশা করি বর্ণীয় মুসলমান সমাজ তাহার কথা কৰ্পণত করিবেন।

“আমরা দেখিতে পাই, ইদানীং বর্তমানকালে বালকই বিভাজ্যাস করিবার উদ্দেশ্যে বিভাজ্যে যোগদান করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন সফলমনোরণ হইয়া বিভাজ্য হইতে বাহির হইয়া আসে, সেই তাহাদের সংখ্যা কইয়াছেন কি? ইহার অল্প শুণ্ড শিক্ষাবিদগণের অনুরোধবাসিত্য বা মস্তিষ্কহীনতাযে দেখাযোণ করিলে সত্যের অগলাপ ঘটিবে। মুসলমান বালকেরা প্রায়ই মাতৃভাষায় (বাঙ্গালা) কোনও জানান্যত না করিয়াই, বা অতি সামান্য জানান্যত করিয়াই ইংরাজী পড়িতে যায়। সেখানে শিখা তাহারা বাহা দেখে, তাহাতে তাহাদের অনুরোধই মাথা ঘুরিয়া যায়। তাহারা তাহাদিগকে দুইটা সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হয়;—কিন্তু সেই ভাষা-শিক্ষায় তাহা-

দের মাতৃভাষা তাহাদের কোনও সহায়তা করিতে সক্ষম হয় না। মাতৃভাষায় জানান্যত বা সামান্য জ্ঞান তাহাদের প্রধান পরিপত্তী হইয়া পড়িয়া। একটিকে নিজের অজ্ঞতা, এবং অজ্ঞাতিকে আরবা পারস্ত ভাষার অধ্যাপনার ভার তাহাদের উপর অর্পিত থাকে, মাতৃভাষায় তাহাদের অজ্ঞানতাহেতু তাহারা তত্ত্বাবধার, সাহায্যে স্বতন্ত্ররূপে অধ্যাপনা করিতে পারেন না। ফলে বালকগণ এতাতাগ্রস্ত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, এবং ইংরেজী বা আরবা, বা পারস্ত, কোনও ভাষাতেই লুকপ্রবেশ হইতে না পারিয়া তাহাদের মধ্যে বার আনা ছাত্রেরই উদায় তত্ত্ব হইয়া যায়। অবশ্য তত্ত্বসাহায্যে হস্ত-আরও অনেক কারণ আছে, তাহা অধীকার করিবার কথা নয়। এক্ষণে বিদ্যুৎ সাহায্যের দ্বারা অধিকাংশ ছাত্রকেই অকালে ছাত্র-জীবনে ইতি দিতে আমরা দেখিয়াছি। এখানে একবার হিন্দু শিক্ষাবীর কথা বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহাদিগকেও দুইটি ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিতে হয় সত্য, কিন্তু উচ্চ জ্ঞানার শিক্ষাতেই তাহারা মাতৃভাষার সহায়তা পায়। হিন্দু শিক্ষাবিদগণের ও বাঙ্গালী স্থলে পড়িয়া যায় না, বৈকি ইংরেজী স্থলে পড়িয়া তাহারা মাতৃভাষা শিখিবার সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ, সংস্কৃত ও আরবা ও পারস্ত জ্ঞানার মধ্যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা না শিখিয়াও সংস্কৃতের অধিকাংশ শব্দ আমরা বুদ্ধিতে পারি, কিন্তু আরবা ও পারস্তের বিন্দু বিবরণও বৃত্তিতে পারি না। মুসলমান সমাজের পক্ষে ইহা এক বিশেষ সমস্যা, সম্ভব নহে। কি ভাবে এই জটিল সমস্যার সমাধান হইতে পারে, সমাজ হিতৈষিত্বগণেরই তাহা বিবেচনা।

আমাদের দেশের বৈদেশিকগণ ভূমিপ্রাণে মুসলমান, এবং অল্পাংশ হিন্দু। অত্যাচার ও সাহিত্য যে আজ পৃথিবীর প্রান্তে ও মজীক ভাষাসমূহের মধ্যে একতম স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে, একমাত্র হিন্দুগণ তাহার মূল। বর্ণমূর্ত্তিতার আশাশ্রুত

পুণ্ডি ও সর্দারদীন উন্নতির জন্য হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সমর্থন যত্ন ও উত্তম আবশ্যক। কিন্তু এ প্রাচ্য মুসলমানদের মধ্যে অতি পরিমিতসংখ্যক লোকই মাতৃভাষার সেবায়া অগ্রহীলেন। অগ্রহীলেন করিতে হইয়াছেন। দেশের অধিকাংশ পক্ষাভ্যুগ্রস্ত হইলে, অপরাংশ দ্বারা কোনও কাজ স্থানীকৃত হইতে পারে না। বর্ণভাষার ক্ষেত্রেও কি তাহাই ঘটিতেছে না? বর্তমান বর্ণমহাভাষা হইতে একটা অজ্ঞানতাহে ‘হিন্দু হিন্দু গন্ধ’ অচ্ছত হয় বলিয়া আমরা— মুসলমানেরা অধ্যোগ করিয়া থাকি। এ অধ্যোগ যে কতকটা সত্য, তাহা কেহই অধীকার করিতে পারিবেন না। বর্ণভাষার এক্ষণে হিন্দু-জ্ঞানপাত্রা বাহ্যনীয় না হইতে পারে, কিন্তু তাহা কিছুতেই অস্বাভাবিক হয় নাই। এ পর্যন্ত হিন্দুগণই অজ্ঞাত পরিচয়ে ও সাধারণ শীর্ণশ্রী-সাহিত্যকে প্রাণদিক-তার রৌদ্র-বায়ুহীন সলীর্ণ গুহা হইতে উদ্ধার করিয়া, উপরে উজ্জ্বল বায়ু কিরণমণ্ডল প্রভৃতি স্বপ্নিত করিয়াছেন। তাহাদেরই প্রতিভাবলে উহা আজ জগতের সাহিত্য-পরিবারের সঙ্গে বাণিজ্য-স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। হস্তরায় সে জ্ঞান হিন্দুগণকে কিছুতেই শেষ দেওয়া যায় না,—তল্লজ মুসলমানদের নিশ্চেষ্টতাই সম্পূর্ণ দারী।

অতীত দুঃখের বিষয় এই যে অজ্ঞানতাহে-মানগণ সাহিত্যাক্ষীপনের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞানবান করিতে না পারায়, তাহাদের মাতৃ-ভাষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন। বৈবল্য তাহা নয়, এমনও অনেক বর্ণ-ভাষাকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে বিধা-বোধ করেন। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণভাষার বিপুল প্রাণদিক-বলে তাহাদের ধর্মভাষা সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ রচয়িতা বাঙ্গালায় অনুদিত হইয়াছে। তাহার ফলে মাতৃভাষার সাহায্যে তাহারা তাহাদের অক্ষমতাগী পূর্বপুরুষগণের প্রাণপ্রবাহ অচ্ছত করিতে পারিতেছেন। বর্ণীয় মুসলমানগণও যদি এই দুর্য্যক্ত-অজ্ঞ-সমগ করিয়া আরবা পারস্ত হইতে তাহাদের হিন্দুগণ কীট পূর্বপুরুষগণের গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালায় অপাশ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,

ভাষা হইলে বঙ্গভাষা তাঁহাদেরও জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইত। এবং তাহাতে বঙ্গের উচ্চ সমাজের উন্নতির হেতু ও মিলনের চিহ্নস্বরূপ সেতু নির্মিত হইত। পক্ষান্তরে, বাঙ্গালা ভাষাও সংস্কৃতের দ্বারা আরব্য ও পারস্য ভাষার মহামূল্য রত্নমালায় বিভূষিত হইয়া এক অপূর্ণ মহিমা ধারণ করিত, এবং তাহা এখন হিন্দুগণকী বলিয়া আমাদের অস্ব-যোগ্য করিবার কারণ থাকিত না।

যাচুভাষা বাঙ্গালাকে জাতীয় ভাষারূপে বরণ করিয়া তাহার সমুচিত সমাদর ও অঙ্গীকার না করায়, মুসলমান সমাজের যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা ভাষায় অভিব্যক্ত করা সহজ নহে। প্রাচীন বঙ্গ বহু বহু মুসলমান কর্তৃক স্বেচ্ছা স্বত্ব দেওয়া বঙ্গবাহিরিতের অঙ্গীকার করিতেছিলেন, সেই যত্ন ও উত্তম যদি এতদিন পর্যন্ত অবিরাম প্রবাহে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে আজ আমাদের সাহিত্য বিপুল বিস্তার ও অসীম শক্তি লাভ করিত। আমাদের জাতীয়তা বহন করিলেও তাহা অশেষ সহায়তা করিতে পারিত, এবং বঙ্গ-সাহিত্যও ইসলামের ভাঙ্গর-পৌরবাগিত হইয়া উঠিত। বাঙ্গালা ভাষা ভিন্ন অপর কোনও ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানগণের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, ইহা আমাদের পূর্ণপুরুষগণ স্মৃতিতে পারিয়াছিলেন, এবং তৎসময়ে তাহারা সেই স্তম্ভকার্যে ব্রতীও হইয়াছিলেন। হিন্দু কবিগণ যেমন রামায়ণ মহাভারতাদি প্রস্তুতি সঙ্কত গ্রন্থরাজি বাঙ্গালা ভাষাসম্বন্ধিত করিতেছিলেন। মুসলমান কবিগণও তেমনি তাঁহাদের পূর্বসূরীগণের গ্রন্থাবলী বাঙ্গালায় নিমজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বয়ের বর্তমান মুসলমানগণ যদি তাঁহাদের পূর্ণপুরুষগণের শত শত বঙ্গবীরের সুজাতালক সিঁদুকে অবলোকা করিয়া কোনও নূতন জাতীয় ভাষার আশ্রয় না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা কখনও সাফলা লাভ করবে না। প্রত্যুত, সে চেষ্টা নিজ হাতে নিজের মস্তকে কুঠারাবাদের সহিত তুলিত হইতে পারিব।

আরও একটা কথা অবশ্য। বঙ্গদেশ হিন্দু ও মুসলমানের দেশ এবং হিন্দু ও মুসলমান লইয়া বাঙ্গালী জাতি গঠিত। এই দুই জাতির মধ্যে একটি সাধারণ ভাষা প্রচলিত থাকিলে তাহাতে জাতীয়তা গঠনের যেকোন সহায়তা হইবে, তাহা সার কল্পিতেই হইতে পারে না। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সখিলন-সাধনের প্রয়োজন কি, তাহা বোধ হয় এখন আর কারোকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। একমাত্র বঙ্গভাষাই বঙ্গের দুইটি গোত্রের সমাজকে পরস্পরের প্রতি প্রীতিভূমি ও অহরহগমসম্পন্ন করিতে পারে। প্রায়ই ভাষার ভিত্তর দিয়াই তাঁহাদের পরস্পরের চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান ঘটিতে পারে, এবং এই ভাষাই তাঁহাদের ক্ষুদ্র বর্ণগত পার্থক্য ঘূচাইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিপুল অর্থও জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

* *

১১। মহাশুরে শিক্ষাশিক্ষা

মহাশুরের গণশিক্ষা-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি সেখানে শিক্ষা ক্রমশঃই প্রসারলাভ করিতেছে। আজ পর্যন্ত তথায় ২৬টি শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সব বিদ্যালয়ে শ্রমশিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাণালীতে শিক্ষা দিবার জ্ঞান আয়োজন করা হইতেছে। ইতিমধ্যে যখন যখন ঐ প্রাণালীর প্রবর্তনও করা হইয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়-রক্ষাককে লক্ষাধিক টাকাও বঙ্গবীর ব্যয়িত হইয়া থাকে। উৎসাহ ও তৎপর্যায়ী উৎসাহ না থাকিলে কোন বিষয়েই সাফলা লাভ হয় না। মহাশুর-বাক্য দীর্ঘ দীর্ঘ উদ্ভাটন পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা প্রস্তুত হইয়াছি।

* *

১২। দারিদ্র্য-জুগ্ম-নিবারণ

ভারতবর্ষ দারিদ্র্যনিপীড়নে ব্যথিত হইয়া

উঠিয়াছে। চারিদিকে নাই নাই, চাই চাই রব। লোকের আয়ের দিকে বাড়িতেছে না। বিনিয়োগের দর অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে লোভের কবের সীমা নাই। এই দৈর্ঘ্য-দুর্দশা ঘূচাইবার জন্ত নানা চরমে নানা উদ্ভাবন নির্ভর করিতেছেন। এই সমস্ত পূরণের জ্ঞান নারিধ জন্ম কল্পনার অস্ত্র দেখিতেছি না। কিন্তু কোন উপায়ই কার্যকরী হইতেছে না কেন, লোকের ক্রমে দারিদ্র্যদুঃখ বিমোচনের জন্ত বঙ্গবীরের হইতেছেন না, তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়।

আমরা এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দারিদ্র্য-নিবারণের দুইটি পথ প্রশস্ত দেখিতেছি। এক—দারিদ্র্যের অগ্রাহ করা, অর্থাৎ আমাদের অজ্ঞানের মাত্রা মস্তুর সম্ভব কমাইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। দ্বিতীয়টি—অর্থায়নের রত বিদ্য উপায় আছে, সেইগুলি দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করা। প্রথমটি অবলম্বন করিলে বর্তমানযুগের প্রতিপক্ষে চলিতে হইবে। তাহাতে স্থলবিশেষে লাহোর এবং উপহাস্যাম্পদ হইবার আশঙ্কাও যে না আছে, তাহা নহে।—কিন্তু সেই লোকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহারা চেষ্টা করিব করিতে পারেন, বাহিরের আদায়-অবলোকা তাঁহাদের দিকে তুচ্ছ। তাঁহাদের চরিত্রবল দৈর্ঘ্যের মধ্যে দিয়া প্রস্তুত হইলে জগৎ তাঁহাদিগকে কিছুতেই হের মনে করিতে পারিব না। অতএব প্রথম পথের পথিকের শঙ্কার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় পথ যাহারা গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বর্তমান যুগোপযোগী শক্তিসম্পদ কথা আবশ্যক। যে শিক্ষা ও সাধনা লাভ করিলে স্বাধীন অন্ন সাধনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেই শিক্ষা ও সাধনা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। কৃষি শিল্প বাণিজ্যের বিপুল বিস্তারিত জ্ঞান কায়মনে পরিশ্রম করিতে হইবে—দ্রৌড় ঝড় বৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়া, আপদ বিপন্ন কালের আশা প্রস্তুতি বিসর্জন দিয়া—অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। অবশ্য গোড়াতেই প্রকট কার্যে হাত দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না। আমরা পূর্ণও

বলিয়াছি “বৃহদাকারের কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আমাদের বর্তমান মূলধন, পরিশ্রম ও কাব্যকলশপ্রভা প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়গুলি পরিচালিত করিতে পারিলেই আমরা দ্রুতকার্য হইতে পারিব উন্নত আশা করিতে পারি।” কিন্তু বৈবাহিক উন্নতি চাহিলে এই ক্ষুদ্র পরিদ্রবের মতোই তুল্লাভ অসম্ভব হইবে, তখন ক্ষেত্র বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে, এবং আশা হয়, সেই আকাঙ্ক্ষাপূরণের প্রথাগত ক্ষমতাও দীর্ঘ দীর্ঘে অর্জিত হইতে থাকিবে।

এখন এই দুইটা পথেই সিদ্ধিলাভ বরশ্রম ও শক্তিসাপেক্ষ। আমাদের দেশের লোক অধিকাংশ সময়েই ফাঁকি দিয়া হুগ অর্জন করিতে চাহে। যোগানে বহু শ্রম ও সাধনার আশঙ্কা আছে, সে পথ বিয়া চিন্তিতে চাহে না। তাই আজ দারিদ্র্যদুঃখে পীড়িত হইয়াও তাহারা তাহা মোচনের জন্ত স্থির-প্রতিজ্ঞ হইতেছেন না। কিন্তু এখনও সহজে স্থলভাভের পথ একেবারে বন্ধ হয় নাই, তাই আমরা ভাব্য হইতেছি না, আশার বৃক্ষে বিভোর হইয়া ঘুরিতেছি। কিন্তু অচিরেই এ বৃক্ষ একেবারে জ্বলিবে, তখন আমাদের আলস্ত-জড়তা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অতএব পূর্বে হইতেই নিজের গম্বা চেষ্টা করিয়া কার্যে অগ্রসর হইয়া বর্তমানের কর্তব্য।

* *

১৩। এশিয়ার ঐক্য

তোমরা যে বাহাই বল না কেন—আমরা জানি ভারতবর্ষ এক। ভারতবর্ষ বিংশ শতাব্দীর বড়, কিন্তু এই বিশাল দেশ-কলমে বয়ের ভিত্তর এক চিন্তা, এক প্রাণ, এক আদর্শ বিদ্যমান করিতেছে। এই ঐক্য আজ কালকার “ব্রেসলগাডো” টেলিগ্রাফের যুগস্থ বন্ধ নয়। দর্শের ঐক্য, সমাজের ঐক্য, চিন্তা-প্রাণালীর ঐক্য, আদর্শের ঐক্য—এ সকল ভ ছিলই এবং আছেও। আমরা ক্রমশঃ জানিতে পারিতেছি যে, কাম্বোয়ের পণ্ডিত বিন্যারাজো বাহা আধিকার করিতেন

আবিষ্কারের পণ্ডিত হন তাহার বাখাণ্ড ও ভাষা রচনা করিছেন। আবার গোপেন বৈজ্ঞানিক যে গ্রন্থ রচনা করিতেন সিদ্ধেশ্বরের বৈজ্ঞানিক তাহার বিস্তার-সাধন করিতেন। প্রাচীন ভারতের আয়ুর্কর, রসায়ন, প্রাণী-বিজ্ঞা, উদ্ভিদবিজ্ঞা, স্ত্রুত্মার শিল্প, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, দর্শনতত্ত্ব প্রত্যেকেরই ইতিবৃত্ত অঙ্কন করিলে আমরা ভারতবাসীর গভীর-তত্ত্ব ঐক্য স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। বাঙ্গালীরা আবিষ্কারে প্রাকারী প্রভাবিত হইতেন, মারাত্মক গবেষণায় কান্দীর উপকার সাধিত হইত। কোন প্রদেশের কোন চিকিৎসাই অস্বাস্থ্য প্রদেশের চিকিৎসারূপ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে জীবন যাপন করিতেন না। সমগ্র ভারতমণ্ডলে এক বিশ্বাসাভ্য প্রচলিত ছিল।

গভীরভাবে ঐতিহাসিক আলোচনায় অগ্রসর হইলে দেখিব সমগ্র এশিয়ায়ও এক চিন্তামণ্ডলের অধীন ছিল। প্রাচ্যএশিয়া, মধ্যএশিয়া, পাশ্চাত্যএশিয়া-সর্বত্রই এক বিশ্বাস গভীর বিস্তৃত হইত। ওককুরা বলিয়া গিয়াছেন এশিয়ার সভ্যসভাই এক মানবাত্মার বিকাশ সাধিত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি বিভাজ্যকীয় সম্বন্ধেও সমগ্র এশিয়ার ঐক্য বুঝা কঠিন নয়

আজকাল ইতালীর কোন পণ্ডিত কোন সভ্য আবিষ্কার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ইউরোপের সকল বিজ্ঞান-ক্ষেত্র প্রচলিত হয়। আধিপত্যে কোন নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে সমগ্র ইউরোপেই তাহার প্রচার হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় কক্ষক্ষেত্রে ইউরোপের অসংখ্য দলদলি স্বয়ং বিজ্ঞানমণ্ডলে ঐক্য দেখিতে পাই। প্রাচীনকালে এশিয়াতেও এইরূপ ঐক্য ছিল।

১৪। প্রাচীন জাপানের গণিত চর্চা

সম্প্রতি একজন জাপানী এবং একজন আমেরিকান পণ্ডিত মিলিত হইয়া জাপানী-দিগের গণিতচর্চায় ইতিমধ্যে সফলন করিয়াছেন। তাহারা দেখাইয়াছেন যে, দ্বাদশ শতাব্দী

দশ শতাব্দী পর্যন্ত জাপানীদের মধ্যে চীনা-দের ভাববিনিময় বিশেষরূপেই হইত। জাপানীরা গণিতশাস্ত্রের কয়েকটা বিষয় চীনের পণ্ডিত সমাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে হামাওয়ের সঙ্গে জাপানীদের সংস্রব আরম্ভ হয়। কোন কোন জাপানী পণ্ডিত হল্যাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে গণিত শিখিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাপানী ও ইউরোপীয় গণিতশাস্ত্র সাধিত হইতে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানীরা শূ এর মূল্য নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা ওলন্দাজগণের নিকট গ্রহণ করা হয়। তখনও ইউরোপের কেহ এ বিষয় এতদূর অগ্রসর হই নাই। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাপানীরা যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের উদ্ভাবনী শক্তি বেশী কি গ্রহণ করিবার শক্তি বেশী এ সমস্যা বীমাঙ্গা করা কঠিন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক ইউরোপীয় আভিপ্সুদের দ্বারা জাপানীরাও জগতের সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গণিত চর্চা করিয়াছেন। গণিত চর্চা হিসাবে জাপানীরা নমুনা জ্ঞান নহেন।

এরিক চীনা ও জাপানী ভাব-বিনিময়ের যুগে ভারতবর্ষে কিরূপ স্থান ছিল তাহা মনে রাখিতে হইবে। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের চিন্তাপ্রাণীরা চীনের সঙ্গে অগ্রগত হইত। তাহার যথেষ্ট প্রাচীন লিপিবদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনের নিকট জাপানী যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষেরই আবিষ্কৃত সম্পত্তি।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানীরা শূ এর মূল্য নির্ধারণ করিলেন দেখা যাইতেছে। এ সময়ে ইউরোপে যে মূল্য নির্ধারণ হয় নাই। পরন্তু ১৫০০ খৃষ্টাব্দের একথাটা স্মরণ করিয়া শূ এর যে মূল্য স্থিরীকৃত হইয়াছে সপ্তদশ শতাব্দীর জাপানীরাও ঠিক সেই মূল্যই নির্ধারণ দেখিতে পাইতেছি। অথচ ঐতিহাসিকরা এই আবিষ্কারের মূল্য অঙ্কন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে আমরা ভাস্করাচার্যের পরবর্তী যুগের বহু কথাই জানি না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে যৌড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত হিন্দুজাতি গণিত চর্চা করিয়াছিলেন কিনা তাহার যথার্থ বিবরণ এখনও সন্নিহিত হয় নাই। এই যুগে দক্ষিণ ভারতে নানা বিদ্যার অস্বলীন হইয়াছিল। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে লিখিত ভারতীয় গণিত গ্রন্থনামা দ্বারা ভারতের লিপিত হইয়াছিল। কয়েই জাপানী গণিতকারের আবিষ্কারের মূল অঙ্কনস্থান করিতে হইলে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে যৌড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যুগের দক্ষিণাভ্যন্তরে ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। সেই যুগে চীনের সঙ্গে প্রাচ্য ভারতের, বিশেষতঃ দক্ষিণাভ্যন্তরে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিতে হইবে।

পাঠানদের যখন আধাবর্ষ দখল করিতেছিলেন এবং দক্ষিণাভ্যন্তরে ঐচ্ছিক পাঠাইতেছিলেন ঠিক সেই যুগের হিন্দুজাতির বিদ্যাশুশীলন এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এক্ষণে অঙ্কনস্থান প্রাপ্তি হওয়া আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে চীনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়তত্ত্ব, মধ্যযুগ ও মহিলাতত্ত্ব আবার প্রাচীন কতটা ছিল তাহাও নির্ধারণ করা কঠিন।

১৫। ঐতিহাসিকের সমস্যা স্থল

প্রাচীন যুগে গ্রীকের চিন্তা হিন্দু গ্রন্থে করিতেন, হিন্দুর চিন্তা গ্রীক গ্রন্থে করিতেন। কিন্তু এই আদর্শ প্রাচীন কালের বিস্তৃত ও গভীর ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া কঠিন। গ্রীকে হিন্দুতে যে সকল বিষয়ে সাদৃশ্য আছে সেগুলি সম্বন্ধে পশ্চিমারা লিখা থাকেন যে, গ্রীকরাই এই সমুদায়ের উদ্ভাবিতা, হিন্দুরা নকল করিয়াছেন মাত্র। মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুক্তি প্রায়ই দেওয়া হয় না। ভারতবাসী গ্রীকের নিকট স্বীকৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ। আমরাও এই নীতির বশবর্তী হইয়া বলিয়া থাকি, “গ্রীকরা হিন্দুর নিকট বহু বিষয়ে স্বীকৃতি পাইয়াছেন, ও সেটাই হিন্দু দার্শনিক-

গণের শিষ্টা। এমন কি, হোমারের কাব্য-সাহিত্যে বাস্করারামায়ণের গ্রীক সংস্করণ” সভ্য কথা, জগতের প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি বহুমূল্য তথ্যের যথার্থ তত্ত্ব এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। অতি প্রাচীন কালের কথা আচ্ছাদ্য দিলাম। দ্বিতীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার পরস্পর আদান প্রদানের কথা না তুলিলাম। কিন্তু আলেক-জান্ডারের দিগ্বিজয়ের পর এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এক চিন্তামণ্ডলের অন্তর্গত হইয়াছিল। সে কথা অব্যাহার করা যায় না।

কিন্তু এই মণ্ডলেও কথবিনিময় এবং ভাব-বিনিময় কতটা সাধিত হইত তাহা আমরা বিশদরূপে এখনও জানি না। এই যুগের কথাগুলি বুঝিতে পারিলে যৌড়শ শতাব্দীর তাগপন্থের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনতত্ত্বের সম্বন্ধ পরিষ্কাররূপে জানা যাইবে। এই যুগের চিত্র স্পষ্ট হইলে পটিনসের নব্য প্লেটোতত্ত্বও হিন্দু বৈদ্যাক্তিক তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে পারিব। এই ভাববিনিময়ের আকার ও পরিমাণ জানিতে পারিলে আরও সভ্যতায় ভারতের স্থান বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হইবে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে হারুন আল-রশিদেব আমলে হিন্দু পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও দার্শনিক বাগদাদেব রাজধানীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহা জানা যায়।

“হিভোপদেশ” গ্রন্থের আরবী অঙ্কনও তাহার অঙ্গভূত প্রমাণ। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজান্ডার ভারত প্রবৃত্ত দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি চেষ্টা করিয়া প্রত্যেক জনপদে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটাইতেছিলেন। তাহার পর দেখিতেছি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সম্রাট গ্রন্থ মুসলমান সমাজের স্বল্প অনুদিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে এশিয়ার গ্রীক রাজা বিজয়ের ঐষ্টম্ভ নব্য প্লেটোতত্ত্বের প্রতীকী এবং মহম্মদের আবির্ভাব ইত্যাদি নানা ঘটনা ঘটাইবে। এই গুলির ভিতর প্রাচ্য জগৎ কতখানি এবং পাশ্চাত্য জগৎ কতখানি লুপ্ত হইত তাহার বিশ্লেষণ এখনও হয় নাই।

১৬। গ্রীসে ও ভারতে ভাববিনিময়

গ্রীক সাহিত্যের সকল বিভাগ বিশেষ-রূপে বিশ্লেষণ করা হইয়া গিয়াছে। তাহার ভিতর নূতন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। সম্ভূত সাহিত্যের বিশাল সমুদ্র মনন কবে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এখানেও প্রমাণ পাওয়া বোধ হয় কঠিন। বস্তুতঃ ভারত ও গ্রীসের মধ্যবর্তী জনপদেই তাহার সাক্ষ্য অধেয়ন করিতে হইবে।

ভারতের উত্তর পশ্চিম ব্যাক্টিয়া, পার্শ্বা ইত্যাদি রাণ্য ছিল। সেই সকল রাজ্যের সঙ্গে একদিকে সীরিয়া অপর দিকে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান ছিল। এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পার্শ্বাধার প্রভাব নিত্যই অল্প ছিল না। একিকে পার্শ্বাধার জনপদে ভারতের বৌদ্ধ সাহিত্য, দর্শন ও দম্ভতত্ত্বের প্রচার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পার্শ্বাধার ভিতর দিয়া এশিয়া মাইনরকে ভারতবর্ষ প্রভাবাবিহিত করিয়াছিল এক্ষণ অহুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু তাহার পূর্বে বিশেষ অহুমান আনবক্ত। পার্শ্বাধার ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করা কষ্টব্য। সঙ্গে সঙ্গে সীরিয়া জনপদের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করা কষ্টব্য। এই দুইটি নূতন ভাষায় পারশ্বী না হইলে ভারত ও গ্রীসের মধ্যবর্তী জনপদের জীবন যাবন প্রণালী অগতঃ হওয়া যাইবে না। অবিকল্প, ভারতের সম্ভূত ও প্রাকৃত সাহিত্যে এবং গ্রীসের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য থাকাও প্রয়োজন। এতগুলি ভাষার অধিকারী না হইলে আলেক্সান্ডারের পূর্ব হইতে ১০০০ বৎসরের ব্যবসায়, সাহিত্য ও দর্ম্মমন্তের পরিবর্তন, বিপ্লব ও সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে পারিব না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এতগুলি ভাষা কেহই

জানেন না। জার্মান ও ফরাসীরা একিকে বৃত্ত পরিভ্রম করেন ইংরাজ পণ্ডিতেরা তাহার ১৮ অংশও করেন না। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের পণ্ডিত মংলে এই বিস্তৃত তুলনা-মূলক আলোচনা করিবার ক্ষমতা বাহারই নাই। এমন কি, জার্মান মহলেও বিরল। কাজেই ইহার ফল মারিতহেঁদ। বলা বাহুল্য, ভারতবাসীর মধ্যেও এতগুলি ভাষা কেহই জানেন না।

অথচ এইসম্পর্কে অহুসন্ধান করিলে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাইবে। আজকাল ভারতীয় ছাত্রেরা উচ্চ বিজ্ঞা অর্জনের জন্ত যথেষ্ট কতি স্বীকার করিতেছেন। বিজ্ঞানান্তর পর তাহার আশারূপ অর্থলাভ করিতেও পারেন না। তাহাদের কেহ কেহ এই ক্ষেত্রে অহুসন্ধান লাগিয়া যাইতে পারেন না কি?

আমাদের ছাত্রেরা বহু কষ্টে বিশেষ হইতে শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখিয়া আদিয়া যথেষ্ট নিত্য দরিদ্র-জীবন যাপন করিতেছেন। কেহ খেচ্ছায় কেহ যোগ্যতাভাবে দারিদ্র্যের অপরজন করিয়াছেন। ইহাদের আশ্রয় কয়েকজন ঐতিহাসিক আলোচনার জন্ত এশিয়ার কয়েকক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন এক্ষণ আশা করা অজায় নয়। আমাদের বিশ্বাস, যদি কোন ছাত্র যথেষ্ট সম্ভূত ও প্রাকৃত সাহিত্যে পারদর্শী হইয়া জাণ্যি, আশেবিকা বা ইংলেও গ্রীক সাহিত্য আলোচনা করেন এবং তাহার পর আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, পারস্ত ও এশিয়ামাইনরের সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার এক অপূর্ণ সৃষ্টি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন। শিক্ষিত ভারতবাসীর যথেষ্টসেবা এইরূপ ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রযুক্ত হউক।



নিগোজাতির কর্ম্মবীর *

সম্ভ্রম অশ্রুত

টাক্কোজাতের পল্লীপরিবেক্ষণ

এবার হ্যাপ্টটেন আমার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এক সঙ্গে চলিয়াছিল। আমি প্রকৃত-প্রভাবে একজন ছাত্র-শিক্ষকভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলাম।

লোহিত 'ইতিয়ান' ছাত্রদিগের পরিদর্শন আমার হাতে ছিল। 'নবপ্রতিলি' নৈশ-বিজ্ঞানদের শিক্ষকতাও আমি করিতাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের উচ্চশিক্ষালাভও চলিতেছিল। আমি হ্যাপ্টটেন-বিজ্ঞানদের একজন অধ্যাপকের সাহায্যে কতকগুলি নূতন বিষয় শিখিতে লাগিলাম। তাহার নাম বেভারেরও ভাক্কার এইচ, বি. ফিলে। আমাদেগের মৃত্যুর পূর্বে ইনি হ্যাপ্টটেনের পরিচালক হইয়াছেন।

নৈশবিজ্ঞানেয় এরবৎসর 'কন্ঠ্যমিত্য'কে পণ্ডিত্যাম। ঐযকমে তাহার পর আমার একটা অভাবনীয় প্রয়োগ আসিল। তাহাতেই আমার জীবন-কর্ম্ম আরম্ভ হয়—সেই কয়েই আমি এখনও লাগিয়া আছি।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ আমার যখন প্রায় ২২২৩ বৎসর বয়স সেই সময়কার কথা বলিতেছি। একদিন সম্ভাৎকালে সিঙ্কার 'কাধ্য' শেষ হইবার পর সেনাপতি আর্ম্‌ষ্ট্রং আমাকে বলিলেন;—'দেখ, আমি আশাবাস্য প্রদেয় হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছি। কয়েক জন লোক সেখানে একটা শিক্ষক-বিজ্ঞানয় বুলিতে চাহেন। এই বিজ্ঞানয়ে

নিগোজাতিরই শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। সম্ভবতঃ টাক্কোজী নামক একটা ক্ষুদ্র নগরে তাহাদের বিজ্ঞানয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তাহাদের একজন পরিচালক আবশ্যক। তাহার আমার নিকট লোক চাহিয়াছেন।" আলাবামার পরলেশৎগণ ভাবিয়াছিলেন, তাহাদের প্রস্তাবিত বিজ্ঞানয়ের জন্ত নিগো-জাতীয় শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। তাহাদের বিশ্বাস ছিল সেনাপতি মহাশয় তাহাদিগকে একজন বেতকায লোকেরই নাম করিবেন।

পর দিন সকালে সেনাপতি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি ঐ কাজ লইতে প্রস্তুত আছি কিনা জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম "চেষ্টা করিতে পারি।" তিনি আলাবামায় উত্তর দিলেন "আমি একজন নিগোকে পছন্দ করিয়াছি তাহার নাম ব্রুকার ওয়াশিংটন। কোন যেতাত্ত্বের সম্ভান আমি দিতে পারিলাম না। যদি এই নিগো যুবককে আশান্বিতা গরম করিতে প্রস্তুত থাকেন পত্র-পাঠ লিখিবেন। ইহাকে পাঠাইয়া দিন।"

কয়েক দিন পর আর্ম্‌ষ্ট্রংয়ের নিকট একটা তার আসিল। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে রবিবারে সম্ভা উপাসনা করিতেছিলেন। কাধ্য শেষ হইয়া গেলে তিনি তাবের খবর ছাত্রদিগকে দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল;—"ব্রুকার ওয়াশিংটনের দ্বারা কাজ বেশ চলিবে। শীঘ্রই তাহাকে পাঠাইয়া দিন।"

বিদ্যালয়ের মধ্যে আনন্দ উৎসব হইল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ মিলিয়া আমাকে বিদায় ভিক্ষা দিলেন। আমি টাঙ্কেজী ব্যাঙ্ক কলিলাম। পক্ষে কয়েকদিন আমার পুরী ম্যাপডেনে কাটাইয়া গেলাম।

আলাবামায় টাঙ্কেজী একটি ক্ষুদ্র নগর। ইহার লোক সংখ্যা মাত্র ২০০০। তাহার মধ্যে ১০০০ নিগ্রো। দক্ষিণপ্রান্তের "ক্রফ-বিভাগে" এই জনপদ অবস্থিত। আলাবামা প্রদেশের অনেকগুলি "কাউন্টি" বা জেলা। তাহার কয়েকটিতে নিগ্রোসংখ্যা খুব বেশী। কোন জেলায় শতকরা ৬০, কোন জেলায় শতকরা ৭৫ জন, কোন জেলায় এমন কি শতকরা ৯০ জন নিগ্রোর বাস। যে জেলায় টাঙ্কেজী নগর সেই জেলায় খেতাঙ্গদিগের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এই জহই বোধ হয় এই অঞ্চলকে ক্রফ-বিভাগ বলা হইত।

চনিয়াছি এই অঞ্চলের মাটি কাল বলিয়া উহার নাম ক্রফ-বিভাগ হইয়াছিল। কাল মাটিই উর্বর। এজন্য চাষাবাদের সুবিধা এই সকল স্থানে বেশী। কাছেই এ অঞ্চলে গোলাম খাটাইলে কালা হইবার আশা থাকে। এই সকল কারণে গোলামীর যুগে গোলাম-খানা, গোলামাবাদ ইত্যাদি এই বিভাগকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। একে কাল মাটি তাহার উপর কাল লোকের বাস। হস্তব্যঃ ক্রফ-বিভাগ নাম শীঘ্রই সমাজে প্রচারিত হইয়া গেল। আমাদের বাদীনত্বলাভের পর হইতে ক্রফ-বিভাগ বলিলে প্রদশ বিশেষ বুঝায়। আজকাল যে সকল স্থানে নিগ্রোর সংখ্যা বেশী সেই সকল স্থান ক্রফ-বিভাগের অন্তর্গত বুলিতে হইবে।

টাঙ্কেজীতে পৌছিবার পূর্বে মনে করিয়াছিলাম যে, ওখানে বাড়ীঘর সাক্ষরগণ

ইত্যাদি সকলই বোধ হয় আছে। আমাকে খাইয়াই শিক্ষকতার কৰ্ম আরম্ভ করিতে হইবে। আমি পৌছিয়া দেখি কিছুই নাই। বাড়ী ঘর আসুবার পত্রত নাইই, এমন কি বিদ্যালয়ের-ও কোন কোন নির্মাণিত হয় নাই। সুদূর আমাকে নিজ হাতে করিয়া লইতে হইবে। তবে একথা আমি বলিতে বাধ্য যে, এখানে ইট কাঠ, চূণ শুকরি, খুঁটা-পত্র ইত্যাদি নিম্মতর পদার্থ ছিল না সত্য। কিন্তু এই সমুদয় অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় পদার্থ ছিল। সে ওধানকার নিগ্রো সন্তানগণের শিবিবার আশ্রয়, মাছর হইবার ব্যাকুলতা, জানাঙ্কনের জন্ত আত্মকিকিপিপাসা। তাহাদের বিভালাভের নিমিত্ত আগ্রহ দেখিয়া আমি বুকিলাম এবং মনে মনে বলিলাম যে "ইহাই বিদ্যালয়, এই ক্ষমা ও পিপাসাই বিদ্যালয়ের প্রাণ। এই ব্যাকুলতা হইতেই বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রাণ হইতেই শরীর আসিবে। জায়গাভরি বাড়ীঘর আলুমারী চেয়ার ইত্যাদির অভাব এই "অতিরিক্ততাই পূরণ করিয়া লইবে। যেখানে আত্মা আছে সেখানে দেহের অভাব থাকিবে না।"

টাঙ্কেজী সহরটা নিগ্রো-বিদ্যালয়ের পক্ষে একটি অতি উপযুক্ত স্থান মনে হইল। ইহার চারিদিকেই অনেক গুলি নিগ্রো-পল্লী। স্থানও কিছু নির্জন—বড় রেল রাস্তা হইতে প্রায় ৭৬ মাইল দূরে। অথচ তাহার সঙ্গে একটা ছোট রেল লাইনের যোগ ছিল। তাহা ছাড়া আর একটা সুবিধাও দেখিলাম। এই পল্লীর খেতাঙ্গগণ বিদ্যার আদর করিতেন। গোলামীর যুগ হইতে এখন পর্যন্ত এখানে খেতাঙ্গেরা একটা বিদ্যালয় চালাইয়া আসিতেছিলেন। হস্তরা লেখা

পড়ার একটা আবহাওয়া এই অঞ্চলে মানসিক ও নৈতিক বাস্তবের সৃষ্টি করিত। অধিকন্তু নিগ্রোরাও নিতান্ত চুচরিয়া ছিল না। তাহারা লিখিতে পড়িতে পারিত না বটে, কিন্তু খেতাঙ্গদিগের সম্পর্কে "আমি"র অনেক বিষয়ে তাহারা উন্নত হইয়া ছিল। ছুই জাতির মধ্যে সম্ভাব্যও মন্দ বুকিলাম না। একটা দৃষ্টান্ত বিবেচ্য। এই সহরে একটা ধাতুর কারখানা ছিল। একজন খেতাঙ্গ ও একজন নিগ্রো দুই জনে মিলিয়া ইহার যৌব মালিক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। খেতাঙ্গ মালিকের মৃত্যুর পর ইহা পরীক্ষণে নিগ্রোর সম্পত্তি হয়।

আমি এক বৎসর পূর্বের কাহিনী অবগত হইলাম। হাস্পতনের হুদাম এ অঞ্চলে বেশ কাজ করিতে ছিল বুকিতে পারিলাম। টাঙ্কেজীর নিগ্রো সমাজ হাস্পতনের আদর্শে এখানে একটি শিক ক বিদ্যালয় বুলিতে চাইয়াছিলেন। এজন্য তাহারা আলাবামার প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিয়া বার্ষিক ৬০০০ পাঁহবার আশা পাইয়াছেন। রাষ্ট্রের কঙ্গারী নিষয় করিয়াছেন যে, এই টাকা হইতে শিক্ষকগণের বেতনাদি দেওয়া যাইবে মাত্র। জমি, বাড়ী আসুবার লাইনেরা ইত্যাদির জন্ম এই টাকা হইতে কিছু মাত্র গরত করিতে পারা যাইবে না।

আমাকে পাইয়া নিগ্রোর যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। সকলেই নানা উপায়ে আমার কার্যে সাহায্য করিতে আসিল।

আমি প্রথমেই স্থান বুঝিতে বাহির হইলাম। একটা জায়গা পাওয়া গেল। সহরের মধ্যে নিগ্রোদিগের একটা ধর্মমন্দির ছিল তাহারই পার্শ্বে একটা ডাঙ্গা বাড়ী দেখিতে পাইলাম। এই "পোড়ো বাড়ী"

টাতেই বিদ্যালয় খোলা হইল। বিশেষ বিশেষ উৎসবাদি বা বক্তৃতা ও সম্মেলনের জন্ত পিঞ্জরাধারী পাইবার করিলাম।

যার ছুইটাই অতি কৌশ অবসার ছিল। বর্ষাকাল ঘরের ভিতর বৃষ্টির জল চুইতে থাকিত। অনেক দিন ছাত্রেরা আমার মাথার ছাতা ধরিয়া বসিত—আমি ছেলেরের পড়া তুলিলাম। কোন কোন সময়ে আমি যখন খাইতে বসিতাম আমাদের বাড়ীর মালিক আমার মাথার ছাতা ধরিয়া দাঁড়াইতেন।

আলাবামার নিগ্রোরা এসময়ে রাষ্ট্রনৈতিক ছড়ণ্ডে খুব মাতিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা, আমিও তাহাদের আমোদনে যোগ দিয়া তাহাদের কার্যে সাহায্য করি।

তাহারা অল্প জাতীয় লোককে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বেশী বিবাস করিত না। এজন্য তাহারা আমাকে রাষ্ট্রীয় আমোদনে যোগ দিতে বড় পীড়াপীড়ি করিল। এক বৃদ্ধ আমিরা আমার কাণে প্রায়ই জপিত—"ভায়া, তুমি এবার কাহাকে ভোট দিবে বির করিয়াছ? আমার ইচ্ছা আমরা বাঁহাকে দিব মনে করিয়াছি তাহাকেই তুমিও দিও।" অপরোহাটা রাখিবে কি? আমরা দাগজ পত্র পড়িতে জানি না জানইত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আমরা ভোট দিতে শিখিয়াছি। আমাদের ইচ্ছা তুমিও আমাদের মতজগদারেই ভোট দাও।" আর একজন বলিল, "আমরা কেমন করিয়া ভোট দিয়া থাকি জান?" সাধা চামড়া ওহালারা কি করে আঁসে দেখি। দূরে দূরে থাকিয়া থবর লই তাহারা কাহাকে ভোট দিল। যখন আমাদের ভোট বিবার পালা আসে আমরা যোগে কাণ বুজিয়া ঠিক তাহারের উকী করি। কি বল, ভায়া, আমরা মন্দ করি কি?"

এই ছিল বিশ্ব বন্দর আপেকার নিগ্রো
রানীতি, আল আমি আনন্দের সহিত
বলিতে পারি যে, একশ মনোভাব আমাদের
সমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমরা
এখন কতৃবা বুদ্ধিহীন কান্দ করিয়া থাকি।
বেতান ঘাছ করে রক্তাক্তের ঠিক তাহার
বিপরীত করা উচিত—এরূপ ভাবনা আমাদের
নিগ্রো মংলে অনেকটা কমিয়াছে।

১৮৮১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে
আমি টাঙ্কেজীতে পৌছি। প্রথম মাসেই
আমি বিভাজনের জঙ্গ স্থান বাছিয়া লইলাম।
এখন আলাবামাপ্রদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণ
করিলাম। লোক জনের আর্থিক অবস্থা,
নৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা সবই তন্ন
তন্ন করিয়া বুঝিতে যত্ন লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে
জেলাগুলির ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে টাঙ্কেজী
বিভাজনের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইলাম।
অভিভাবকগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া
ছাত্র সংগ্রহেও নিযুক্ত রহিলাম।

আমি অধিকাংশ সময়টা পল্লীতে পল্লীতে
ভ্রমণ করিয়া কাটিহঁতাম। একটা গরর
পাড়ীতে অথবা একটা গছের চড়িয়া আমার
এই গরর হইত। দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের
স্বল্প স্বল্প কামারের আত্মা গ্রহণ করিতাম।
তাহাদের সঙ্গেই পাওয়া দাওয়া এবং ব্রহ্ম
জন্মের গল্প চলিত। তাহাদের বাগান আবাদ
পাঠশালা মন্দির ইত্যাদি সবই দেখিতাম।
অবশ্য তাহাদিগকে আগে কোন খবর
পাইয়াইতাম না। হঠাৎ যে গ্রামে যাইয়া
উপস্থিত হইতাম তাহার কোন গৃহস্থের ঘরে
অতিথি হইয়া পড়িতাম। এ জঙ্গ তাহারা
আমাকে আদর অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিবার
সুযোগ পাইত না। ইহাতে আমার লাভই
হইত। কারণ এই উপায়ে তাহাদের

স্বাভাবিক 'অটপোহে' চাল চলন বেশ ভাল
রকম বুঝিতে পারিতাম।

এইরূপে আলাবামাপ্রদেশের পল্লীতে
পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া নিগ্রোসমাজের পূর্ণাঙ্গ
সকল অবস্থা আমি জানিতে পারিলাম।
আমি দেখে এই অঞ্চলের জেলা, নগর, গ্রাম,
রাস্তাঘাট, অলিগলি ইত্যাদি আমার নবদর্পণে
বেশিতে পাইতাম।

নিগ্রো সমাজে দারিদ্র্যের প্রকোপ অত্যধিক
দেখিলাম। তাহাদের বাড়ীর ছিলই না
বলিলে অত্যধি হইবে না। 'একটা ছোট
কামারার মধ্যে সমস্ত পরিবার শুইয়া থাকিত।
আত্মীয় বন্ধন হুটুপ বন্ধুবান্ধব অতিথি
সকলেরই সেই কামারায় স্থান হইত।
আমাকে এইরূপ সকলের সঙ্গে একই কামারায়
এবং এমন কি একই বিছানায় বহু রাত্রি
কাটা হইতে হইয়াছে।' যানের সুবিধা প্রায়
কোন বাড়ীতেই থাকিত না। এমন কি মূখ
হাত দুইবারও জায়গা ছিল না। তবে
ঘরের বাহিরে উঠানের কোন স্থানে হাত পা
দুইবার জুজল রাখা হইত।

কটি ও শূকরের মাংস প্রধান খাদ্য ছিল।
কটি ও ডাল ছাড়া অনেক পরিবারের আর
কোন খাদ্য জুটিত না। নিকটবর্তী কোন
সদরের দোকান হইতে পল্লীবাসীরা বেশী
দামে মাংস ও কটি ইত্যাদি কিনিয়া আনিত।
বড়ই আশ্চর্যের কথা, তাহারা নিজে জমি
চাষিয়া শাকসবজী কলমুল ইত্যাদি তৈয়ারী
করিয়া লইতে চেষ্টা করিত না। এমন কি,
এ বিষয়ে তাহাদের কোন ধারণাই ছিল না।
ছিনিয়ায় যাঁহা কিছু কিনিতে পাওয়া যায়
তাহার সমস্তই যে ঘরের সমুদয়বস্ত্রী জমিতে
উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে এ কথা
তাহারা ভাবিতে পারিত না। সহর হইতে

মামুলি ডাল, আটা ও মাংস বেশী পয়সায়
কিনিয়া আনিতেও তাহারা প্রস্তুত। অথচ
জঙ্গ বয়েষে ঘুরে বাইবার পরিবার যথোগ্য যে
তাহাদের বাড়ীতেই রহিয়াছে তাহা এই
সকল পল্লীর কান্দকারী জানিতই না। ঘরে
তাহারা শক্ত যে একবারে বুনিতই না—তাহা
নয়। তাহারা কেবলমাত্র তুলার চাঁচই
করিতে শিখিয়াছিল। এদিকে তাহারা এতই
মজিয়াছিল যে, ঘরের দুয়ার পর্যন্ত তাহাদের
তুলার দোত আদিয়া শৌচিত। তথাপি দুই
চারি হাত জমি স্বতন্ত্র করিয়া 'দৈনিক
আহারের জঙ্গ ফসল তৈয়ারী করিতে তাহারা
তথ্র লইত না।

দুয়ের কথা আর কি বলিব? এই সকল
দরিদ্রের চুটীতে অনেক ধুলে আমি মহামূল্য
শেলাইয়ের কলও দেখিয়াছি। প্রায় ২০০
দিয়া কল কেনা হইয়াছে কিন্তু ব্যবহার
করিবার যোগ্যতা খুব কম লোকেরই দেখিতে
পাইতাম। মাস মাস আংশকভাবে ৫ বা
১০ করিয়া তাহারা অতি কষ্টে কলের দাম
পাশ করিত কিন্তু বল ঘরের এক কোণে
পড়িয়াই থাকিত। আবার সৌধনি যদিও
অনেক পরিবারের আসবাবের মধ্যে দেখি-
তাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি—এই
সকল যদিও মূল্য প্রায় ৫০। এদিকে ত
এত সভ্যতা, বিলাস ও বাবুগিরি লক্ষণ।
কিন্তু সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্তই তাহারা
নিশে নাই। তাহারা থাইতেই কিনিতে না।
আমি এক গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইয়া-
ছিলাম। তাহার ঘরে ঐ সকল হাল
ফ্যানদের আসবাব পত্র কিছু কিছু ছিল।
কিন্তু থাইতে বসিয়া দেখি—একটা টেবিলে
আমরা পাঁচ জন থাইতেছি অথচ একটি মাত্র
চামচ! এবং একটি মাত্র কাটা! ঐ একটির

দ্বারা ই পাঁচ জনের কাজ চালাইতে হইল!
অথচ সেই মাসরারই এক কোণে একটা
প্রকাণ্ড টেবিল হাফমনিয়ার শোভা পাইতেছে।
তাহার মূল্য ২০০। দেখিয়া অস্বস্তি হই-
লাম আর ভাবিলাম ইহাদের কি কাজোজান
নাই। 'অর্গ্যান' বাক্সিয়া সভ্য হইতে
শিখিয়াছে—অথচ এখনও আহারের নিয়মই
জানে না।

অবশ্য বলা বাহুল্য প্রায়ই দেখিতাম
মালিকেরা কেহই অর্গ্যান বাক্সিতে জানে
না। যদি দেখিয়া সময় বলিবার বিষয়
কাহারও নাই। যদি সময়মত করা ত
দুয়ের কথা, কাটা চালাইয়া সময় ঠিক
রাখিতেই কেহ জানিত না। ব্যবহারভাবে
উত্তার চাবি নই হইয়া গিয়াছে। আর
শেলাইয়ের কলও যত্নভাবে এবং লোকভাবে
দ্রুতের পথে থাইতেছে। অথচ অত দামী
জিনিষের মূল্য একবারে দ্বিবার দ্বমতা নাই
বলিয়া তখনও মাসিক ৫০। হিসাবে দাম
শোধ করা হইতেছে!

এক বাড়ীতে আমি পরিবারের সকলের
সঙ্গে টেবিলে থাইতে বসিলাম। তাহারা যে
টেবিলে থাইতে শিখিয়াছে আমার বিশ্বাস
হইল না। অতটা সৌন্দর্য জান তাহাদের
জন্মে নাই। অহুসন্মানে বসিতে পারিলাম যে,
আমি একজন ভক্তলোক তাহাদের গৃহে
অতিথি হইয়াছি, কাজেই আমার বাড়ীর
তাহারা টেবিলে বানা পরিবেষণের আরোজন
করিয়াছে।

মাধারণতঃ তাহাদের ভোজন-ব্যাপার
নিত্যন্তই পশ্চাদগতি। খুম হইতে উত্তীর্ণ
নিগ্রোরমণী উননে কড়া চপায়াই দেয়।
তাহাতে মাংস, ডাল, ঘাস হউক ভাতা হইতে
থাকে। দশমিনিট পরেই উহা নামাইয়া

লওয়া হয়। শানী-প্রজ্ঞত হইয়া গেল। বাড়ীর কৰ্ত্তা কাজে বাহির হইবার সময়ে হাতে একটা রুটি আর কিছু তরকারী লইয়া যায়। পথে বাইরে গাইতে কণ্ঠস্বরে উপস্থিত হয়। স্ত্রী সঘরে এক ক্রোড়ে বসিয়া ইয়ত পাইতে থাকে অথবা উননের কড়া হইতেও খানিকটা মুখে দিয়া চিবাইতে থাকে। আর ছেলেপিলেরা উঠানে দৌড়ানোড়ি করিতে করিতে রুটি ও মাংস খাওয়া পায় তাহাই গলাধঃকরণ করে। অবশ্য ছেলেদের কপালে মাংস প্রায়ই—জুটত না। মাংসের দাম খুব বেশী।

সকালবেলার খাওয়া এইরূপে সমাপ্ত হইত। পরমুহূর্ত্তে সকলে সপরিবারে তুলার ক্ষেতে হাজির। ছেলে বুড়া কেহই বাড়ীতে থাকিত না। সকলকেই যে যেমন পোরে থাকিতে হইত। গোকা পঞ্চাশ মাঠে যাইত। তুলার বস্তার পাশে তাহাকে বসাইয়া রাখা হইত। মা কাজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিয়া আসিত। মধ্যাহ্ন ভোজন এবং নৈশভোজন ব্যাপারও সকালবেলার আহারেরই মত ছিল।

তাহাদের নিত্যকম্পঙ্কিত এইরূপ শনিবার ও রবিবারের জীবনযাপন প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র। শনিবার নিম্নোক্ত সপরিবারে সঘরে আসিত। সমস্ত দিনটাই প্রায় সঘরে কাটাইত। সঘরে যাইত 'বাজার করিতে'। অথচ তাহাদের বা অবস্থা তাহাতে দশ মিনিটের বেশী বাজার করিবার জ্ঞান কোন মতেই লাগিতে পারে না। আর একজন লোক গেলেই চলিতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে না। সমস্ত পরিবারই বাজারে যাইবে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সঘরে থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিত। দিনটা রাখায় রাখায় সূর্য্যোদয় বেড়াইত। মেয়ে পুরুষ জায়গা জায়গা

জটলা করিয়া নাকে নাকি শুষ্কিত অথবা ঘুসপান করিত। এই গেল শনিবারের পালা।

রবিবার তাহার একটা বড় সভা করিত। সেই সভায় খোয়াগল্প বেশ চলিত। তাহাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখিতাম। প্রায় জেলায়ই পরাবাসীরা গণগ্রস্ত। শতাধিক টাকা হইত সমস্তই পূর্বে হইতে পাওনাধারীদের নিকট 'বন্ধক' থাকিত।

পাঠশালা গ্রামে গ্রামে দেখিয়াছি সভা কিন্তু প্রাথমিক রাষ্ট্র তাহাদের জন্ম বাড়ী ঘর জায়গা জমির কোন ব্যবস্থা করেন নাই। কোন শিক্ষাঘরে অথবা মামুলি কাঠের কুঠীরিতে স্থল বসিত। শীতকালে ঘরগুলি গরম রাখিবার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। ছেলে ও মাতারো বড় কষ্ট ও অসুখিয়া ভোগ করিত। উঠানের এক স্থানে কাঠের আগুন জালান হইত। আগুন পোহাইবার জন্ম ঘর হইতে ছাড়ি ও শিক্ষকেরা প্রয়োজন মত বাহিরে আসিত। এদিকে শিক্ষকদের যেমন বিজ্ঞা তেমন চরিত্র।

পাঠ মাল করিয়া বসন্তে স্থল গোলা থাকিত। একটা টোখা কাল বোর্ড ছাড়া বিদ্যালয়ের আয়বাব কিছুই কোথাও দেখি নাই। পুস্তকাদি নাজসরঞ্জাম ছিল না। একবার একটা 'পোড়ো' কাঠের কামরায় চুকিয়া দেখি—পাঠজন ছাত্র জড়াজড় করিয়া একধাণা বই পড়িতেছে। প্রথম দুইজন সমুদ্রে বসিয়া পুস্তকখানা ধরিয়া আছে। ইহাদের পশ্চাতে আর দুইজন পাড়াইয়া প্রথম দুইজনের মাড়ের উপর দিয়া দেখিতেছে। এই চারিজনের পশ্চাতে একটি ছেলে উকি মারিয়া, 'মাথা' হয়, পড়া বন্ধিতেছে।

বিদ্যালয়ের মেরূপ অবস্থা ধর্ম্মান্ধারগুলির অবস্থা তাহা অপেক্ষা ভাল নয়। শিক্ষাব্যবস্থার জীবনীশীল। ধর্ম্মপ্রচারকগণও বিদ্যায় এবং চরিত্রে শিক্ষক মহাশয়গণেরই অতুল্য।

আলাবামা প্রদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি কয়েকটি লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। তাহাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় নিগোজাতির চিন্তার ধারা বৃষ্টিতে পারিলাম। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাহাতেই আপনারা বুঝিবেন ইহাদের মনের গতি কিরূপ ছিল। একজনকে আমি তহহার বশ কথা ও পরিবারের ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার বয়স ৬০ বৎসর। সে বলিল তাহার জন্ম ভার্কিনিয়ায়। ১৮৪৪

সালে সে বিক্রি হইয়া আলাবামায় আসিয়াছে। 'আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমারা সঙ্গে কখন বিক্রি হইয়া আলাবামা প্রদেশে আসিয়াছিল?" "সে বলিল "আমরা সর্ব্বসম্মত পাঁচজন ছিলাম—আমি, আমার ভাই এবং তিনটি বন্ধর।"

জানোয়ার ও মাহুম যে একই শ্রেণীর অন্তর্গত নয় এই বুল গোলামের চিন্তায় তাহা আসিত না। প্রকৃতপক্ষে গোলামী করিতে করিতে মাহুমে আর পত্নতে কোন প্রভেদই থাকে না। মনিবেরাও মাহুমে এবং পত্নতে কোন প্রভেদ রাখেন না। পত্নও যেমন তাঁহার সম্পত্তি, গোলামও তাহার ঠিক সেইরূপই সম্পত্তি বিশেষ।

অষ্টম অধ্যায়

আস্তাবলে বিদ্যালয়

আলাবামা প্রদেশের পল্লী-সমাজগুলি দেখিয়া আমার কাঁধের দারিৎ বৈশ বৃষ্টিতে পারিলাম। আমি কণ্ঠস্বরে একাকী, অথচ সমাজের সর্ব্বত্রই অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। এই সমুদ্র নিবারণ করা কি একজনের পক্ষে সম্ভবপর? আমার বোধ এইতে লাগিল যেন আমি আশা-সাধনে ভ্রষ্ট হইয়াছি।

নিগো-পল্লীগুলির মধ্যে একমাল কাল ছিলাম। তাহাতে আমার কাণ্ডপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত লাভ করিলাম। মোটের উপরে বুঝিয়া লইলাম যে, নিউইংলও অঞ্চলের ইচ্ছা মহলে যে নিম্নে বিজ্ঞান করা হইয়া থাকে, এ অঞ্চলে ঠিক সেই নিম্নে শিক্ষাবিভাগ করিলে, হৃদয় পাওয়া যাইবে

না। এখানে একটা সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের পঠনপাঠনের রীতি চালান আবশ্যক। আমি ভাবিলাম যে, বোধ হয় সেনাপতি আমেরিক হার্শপটন বিদ্যালয়ের জন্ম যে নিম্নে আবিষ্কার করিয়াছেন টেঙ্কেলীর বিদ্যালয়ে সেই নিম্নে প্রয়োগ করা চলিতে পারে। কেবলমাত্র পুণ্ডিত বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে নিগোদিগের উপকার করা হইবে না। নিগো বালকের সমগ্রজীবনই তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

১৮৮১ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে সেই গোড়ো বাড়ীতে স্থল গুলিলাম। কয়দা সমাজ খুব উৎসাহের সহিত আমার কার্যে সাহায্য করিল। সেবার সমাজের অনেকই আমার উপর বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা

নিগ্রোমহলে শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী। তাহাদের বিশাল নিগ্রোরা লেখা পড়া শিখিলে ক্ষেত্রে জন্ম কলী-পাওয়া হাইব্রেন—গ্রন্থ-স্থানীয় জন্ম চাকর ভূটিবে না। নিগ্রোরা আর শারীরিক পরিশ্রম করিতে অস্বীকার করিবে—তাহাদের মধ্যে বিলিঙ্গ ও বাবুগিরি প্রবেশ করিবে। ফলতঃ দেশময় আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপদ উপস্থিত হইবে।

খোশাবদের একগুণ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণও ছিল। এতদিন যে সকল নিগ্রো লেখা পড়া শিখিয়াছে তাহারা সকলেই বাবু! আজ কাল মাধ্যম লক্ষ্য ছুটি, চোখে সোপার চন্দ্রমা, হাতে গিগিট করা ছড়ি, পায়ে সৌখীন বুট—ইত্যাদি আবারের “শিক্ষিত” নিগ্রোর লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আরও শিক্ষার প্রসার হইলে নিগ্রোরা যে ক্রমশঃ কিছুকমিকার করিবে জানোয়ার হইয়া পড়িবে এরূপ সন্দেহ করা অনায়াস নহে। কিন্তু বিদ্যাদানিকার আশ্রয় বদলায় যায়, এবং আদর্শ বদলাইতে পারিলে শিক্ষিত লোকের মতি গতি, ভাব ভঙ্গী ইত্যাদিও বদলায় যায়। যখন শিক্ষাপ্রচার করিতে পারিলে প্রকৃত “মাছুয়”ই গড়িয়া তোলা সম্ভব। এই যেতাপগণ তাহা বুঝিতে নাই। এজন্য তাহারা আমার কণ্ঠের বিরুদ্ধেও প্রাড়াইলেন।

বাহা হউক, টায়েজীতে শিক্ষাপ্রচার-কক্ষে আমার দুইজন বন্ধু মিলিয়াছিল। একজন বেতাদ, আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ। ইহারাই সেনাপতি আর্মস্ট্রংকে লোকের জন্ম “লিথিং” ছিলেন। ইহার বিগত বিশবৎসর পরিয়া আমার কার্যে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। বেতাদ ব্যক্তির নাম জর্জ ক্যাম্পবেল। ইনি পূর্বে অনেক জলীতদ্বারের মালিক ছিলেন। এক্ষণে ইনি একজন বড় সঙ্গাঙ্গর।

শিক্ষাপরিচালনা সম্বন্ধে ইহার অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব। কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির নাম লুইস যাজাম্‌স। ইনি পূর্বে গোলামী করিয়াছেন, এক্ষণে চামড়ার কারু ও লোহা পিত্তল দস্তার কাজ করিয়া অর্থ সংস্থান করেন। গোলামীর যুগে ইনি জুতা তৈয়ারী, জুতা রোয়ামত, ঘোড়ার লাগাম তৈয়ারী, এবং কর্মকার ও স্বয়ংস্বরের কাধা ইত্যাদি নানাবিধ কারিগরি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি কোনদিন বিজ্ঞান লয়ে যাইয়া লেখা পড়া শিখেন নাই কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া সামান্যকর্মের কেতাবী শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

বুখলাম, এই দুই ব্যক্তির জীবনে কখনেরই প্রাথমিক। ইহার কতকটা “আটপীঠে” কর্মের ও “করিতকর্ম” লোক। কাজেই আমার শিক্ষাপ্রণালী ইহারায় খুবই পছন্দ করিলেন।

এইসঙ্গে একটা কথা অবশ্যসত্ত্বে বলিতে চাহি। যাজাম্‌সের বিচক্ষণতা এবং চিন্তাশীলতা দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। চিরজীবন শৃঙ্খলার সহিত শিল্পে, কৃষিকাণ্ডে অথবা ব্যবসায় লাগিয়া থাকিলে বুদ্ধিশক্তি যথেষ্টই সঞ্চিত হয়। কর্ম করিতে করিতে চিন্তা করিবার ক্ষমতা আপনা আপনি বাড়িতে থাকে। গ্রন্থপঠন না করিয়াও সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে সূচী নিবেশ করিবার যোগ্যতা জন্মে। আমার নিগ্রো বন্ধু যাজাম্‌স এই জন্মের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি গোলামীর যুগে শিল্পকর্মের জীবনযাপন করিয়া উচ্চ আচীর চিন্তাশক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। গোলামী-যুগের শিক্ষা বাস্তবিক পক্ষে এই উপায়ে অনেক লোককে কর্মের ও চিন্তাশীল করিয়া তুলিয়াছে। গোলামীর এই সফল উল্লেখ করা আমি অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি। এমন কি, আমি এরূপও বলিতে চাহি যে,

‘আজ কাল দক্ষিণ অঞ্চলের’ লোক-সমাজে কর্মকর্ম ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের মধ্যে নিগ্রোদের সুখ্যাতি নিতান্ত অল্প নয়। নিগ্রোদের এরূপ চিন্তাশীলতার কারণ গোলামীযুগের কৃষিকর্মের অথবা শিল্পকাণ্ডে অভ্যাস।

বিশজন ছাত্র লইয়া পাঠশালা খোলা হইল। আমিই একমাত্র শিক্ষক। ছাত্রদের মধ্যে মেয়ে পুংখ দুইই প্রায় সমান ভাবে ছিল। ইহার সকলেই টায়েজীর সমীপবর্তী পরীসমূহেরে অধিবাসী। আরও অনেক ছাত্র ভর্তি হইতে চাহিল। কিন্তু আমরা নিতান্ত শিশু ছাত্র গ্রহণ করিলাম না। পনেরবৎসর বয়সের কম কোন ছাত্র আমরা লই নাই। যাহারা পূর্বে কিছু শিক্ষা পাইয়াছে এবং শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে লইয়া কার্যে যোগদান করিলাম।

আমরা যেরূপ ছাত্র গ্রহণ করিলাম তাহারা অনেকেরই ৪০ বৎসরের হইবে। তাহাদের সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রও আনিয়াছিল। দেখিতাম, অনেক ছাত্র তাহাদের শিক্ষকগণ অপেক্ষা বেশীই জানে। বিদ্যা-জ্ঞানের উদ্দেশ্যে ও উপায় সম্বন্ধে এই শিক্ষক ও ছাত্রগণের মামূলি পরাধীন ছিল। তাহারা বড় বড় বই পড়িয়াছেন—খুব কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। লুখা চৌড়া নামওয়ালা বিষয়ের নাম করিতে পারিলেই তাহারা সুখী হয়। তাহারা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কিছু জ্ঞানের অধিকারী। তাহারা এই সকল ‘বড় কথা’ রাব্বির কথায় বেড়াইতে অত্যধিক লালায়িত।

বিদেশীয় ভাষা শিখিবার ইচ্ছাটা নিগ্রো-সমাজে একটা নোনাড় পুরিত হইয়াছিল। আমি আলাবামা প্রদেশে পরীক্ষার্থীবেশক-কালে দেখিতে পাই যে, একটা যুবক অতি

কদম্বা ঘরে অপরিস্কার কাপড় চোপড় পরিয়া বসিয়া আছে, ‘অথচ তাহার হাতে একখানা ফরাশী ভাষার ব্যাকরণ-গ্রন্থ।

আমার এই প্রথম ছাত্রদিগের পুণ্ডিত-বিশ্বাসের বড়াই দেখিয়া সত্যসত্যই লজ্জিত হইতাম। তাহারা ব্যাকরণের লখা লখা স্বয়ং আওড়াইয়া মনে করিত তাহারা কত-বড়ই নাপিত। অথচ ভাষাজ্ঞান তাহাদের কিছুমাত্র হয় নাই। অনেকে পণ্ডিতের কন্মূল-ওলি মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে—স্বয়ংকাল, শিলাউট, ঠিক সব বিষয়েরই স্বয়ংকাল ততো-পানীর মত বদলিতে শিখিয়াছে। অথচ ব্যাক-কাহাকে বলে চোখে দেখে নাই—এমন কি নামও শুনে নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের বাত-পত্র কেমন করিয়া-ক্রিয়তে হয় তাহা জানে না। টাকা পয়সার হিসাব রাখিবার নিয়ম কখনই দেখে নাই। বলা বাহুল্য তাহারা মাসগণের কাজকর্মের মধ্যে পণ্ডিতশাস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। কাজেই অল্পে তাহাদের মাথা একবারেই খোলে নাই।

মাথা হউক এজন্য ইহাদিগকে দোষ দিয়া লাভ নাই। তাহারা যে নিজেম শিখিয়াছে তাহাদের ফল আর কত ভাল হইতে পারে? তবে তাহাদের আন্তরিকতা, শিখিবার ইচ্ছা, মাছুয় হইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণাঙ্গারাই বর্তমান ছিল। এজন্যই আমি হতাশ হইতাম না।

তাহারা যে বই মুগ্ধ করিয়া এবং কতকগুলি যুক্ত ও শব্দ আওড়াইতে আওড়াইতে নীতি-কথাজ্ঞানবীর হইয়া পড়িয়াছে তাহা বেশ বৃষ্টিতে পারিলাম। তাহাদের মাসগারি জ্ঞান একবারেই জন্মে নাই। একজন ছাত্র মানচিত্রের কোন স্থানে আফ্রিকার শাহারা মক্কাম্‌স অবস্থিত বিনা ক্রেপেই দেখাইয়া

ছিল। এমন কি চীন দেশের রাজধানী পর্যন্ত সেই মানচিত্রের মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিল। কিন্তু জমির উত্তর দক্ষিণ ভাগ করিয়া নির্দেশ করিতে সে শিখে নাই। টেবিলে বাইতে বসিয়া বেশি কোন্ দিকে বাট কোন্ দিকে আসে রাখিতে হয় তাহার ইহা জানা নাই। কেক্তাবী শিক্ষার ফলে সত্যসত্যই তাহার নিবর্তে মূৰ্খ হইয়া পড়িয়াছে।

দেখিতে দেখিতে একমাসের মধ্যে ৫০ জন ছাত্র হইয়া গেল। সপ্তাহ ছয়েক পরে আমি আমার কক্ষে একজন নতুন সহায়ক আসিলাম। শ্রীমতী গনিভিয়া ডেভিডসন নামে একজন শিক্ষিতা রমণী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষা ও সেবা কার্যে তাহার যথেষ্ট পটুত্ব ও অভিজ্ঞতা ছিল। নিগো-সমাজের নানা স্থানে তিনি ইতিপূর্বে শিক্ষাবিস্তার কর্ণে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি হাম্পটন-বিদ্যালয়ের একজন গ্রাডুয়েট। জাতিতে তিনি নিগ্রো।

নানা স্থানে বসবাসের ফলে এবং নানা কারণেই কাঁধ করিয়া তিনি বিদ্যালয়বাসী অনেক নতুন নতুন প্রণালীর পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাহার মাথায় সর্বদা কক্ষের নব নব উপায় আসিত। তাহার উদ্ভাবিত কার্য-প্রণালীর সাহায্যে আমার টাঙ্কেজী বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

তিনিও আমারই মত পুঁথি বিদ্যার আদর করিতেন না। আমরা দুই জনে দেখিলাম, আমাদের ছাত্রেরা লেখাপড়ায় মন্দ ফল দেখাইতেছে না। কিন্তু স্বাস্থ্যরপ্ত, শরীর-পালন ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা কোন দৃষ্টিই লয় না। তাহাদের গৃহে এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা নাই। “কাজেই বিদ্যালয়েও তাহারা অপরিহার্য ভাবেই থাকিত। আমরা বুঝিলাম

—ইহাদের মধ্যে কেক্তাবী শিক্ষা বেশী প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা স্থির করিলাম—প্রথমতঃ ইহাদের শরীর-গঠন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দাতামাংসা, হাত পা ধোয়া, কাপড় পরিষ্কার করা, খাওয়া পরা, ঘর বাড়ী ইত্যাদি বিষয় ইহাদিগকে প্রথমেই শিখান আবশ্যক। গৃহকক্ষে অভ্যস্ত হইতে থাকিলে ইহাদিগের স্বাস্থ্যজ্ঞান ও সাংসারিক জ্ঞান জন্মিতে পারিবে। তাহার পর এক আশটা অঙ্গসংস্থানের উপায়ও ইহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কেবল দেখান নহে—হাতে কীলমে শিখান আবশ্যক। তাহা হইলে ভবিষ্যতের খাওয়া পরার সংস্থানও হইতে থাকিবে। মদে মদে কম বরকে ও কম সময়ে বেশী কাজ করিবার চেষ্টা, পরিশ্রমের উপকারিতা, সময়নিষ্ঠা ইত্যাদি নানা গুণগুণেরও ইহারা অধিকারী হইতে পারিবে।

আমরা দেখিলাম ইহাদের পরীতে কৃষি-কার্যই অঙ্গসংস্থানের প্রধান উপায়। শতকরা প্রায় ৮৫ জন নিগ্রো চাষাবাদের উপর বাঁচিয়া থাকে। “কাজেই আমরা চাষাবাদের উৎসাহী করিয়া আমাদের ছাত্রগণের জ্ঞান বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করি হইলাম। যাহাতে তাহারা গরুর বাহু না হইয়া-পড়ে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলাম। লেখাপড়া শিখিবার পর যেন তাহারা আবার জমি চমিতে পারে এবং পশুপালন করিতে প্রবৃত্ত হয়—এই লক্ষ্য সমুখে রাখিয়াই আমরা শিক্ষার প্রণালী স্থির করিতে লাগিলাম। তাহার বিদ্যালয়ের শুকসহায়ও হইতে পারিবে—অথচ কৃষিকর্মেও লক্ষ্য বোধ করিবে না—এই আশেই আমরা টাঙ্কেজী বিদ্যালয়ের নিয়ম ও কার্য-প্রণালী উদ্ভাবন করিতে কৃতসম্মত হইলাম।

এক কথা, অর্ধশিক্ষিত কৃষিকৃত এবং

চরিত্রহীন বাহু-সমাজের পরিবর্তে আমরা—ইশিকিত চরিত্রবান চাষী ও শিল্পীর পরিবার গঠন করিবার জন্ত সকল উত্তোষ করিতে প্রয়াসী হইলাম। আমরা স্থির করিলাম—অর্থপক্ষে অতি নিম্ন স্থানে রাখিবে। তাহার পরিবর্তে আমরা সদ্যসের কাক্ষস্বর্ধের সন্ধান। এই নতুন শিক্ষাপ্রণালী কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা দ্রুত পোষণ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু কাঁধ উজ্জার করা যাক কি করিয়া? আমাদের স্থানভাব ত খণ্ডে। কয়েকজন নিগ্রো অগ্রগৃহ করিয়া বিনাপদমায সেই পোড়ো বাড়ীটা বিদ্যালয়ের জন্ত ব্যবহার করিতে দিয়াছেন এই যা রক্ষা। ছাত্র সপ্তাহ দিন দিন বাড়িতেছিল। ইহারাই ত আমাদের নতুন আশ্রয় পরীতে লইয়া বাইয়া ভবিষ্যতের পরীসেবক, পরী শিক্ষক, ও পরী-সংস্কারক হইবে। এই ছাত্রগণভূত আমাদের ময় বরূপ থাকিয়া সমাজে সকল প্রকার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও বীজ বপন করিবে। কিন্তু ইহাদিগকে এখন স্থান দিই কোথায়?

তিন মাস আমাদের বিদ্যালয়ের কার্য চলিল। প্রতিদিনই সকল দিকে উন্নতি লক্ষণ দেখিতে পাইতাম। আলাবামার ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে কত ছাত্র আসিতে চাহিল। বুঝিতাম আমাদের নামও প্রদেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই সময়ে একটা জমির সন্ধান পাওয়া গেল। টাঙ্কেজীর প্রায় দেড়মাইল দূরে একটা পুরাতন গোলামাবাদ বিকী হইবে জানিতে পারিলাম। মূল্য ১৫০০। জমির মালিক আমাদের নিকট ছই কিস্তিতে টাকা

লইবেন। একে জমিটা সত্তা তাহার উপর এই অগ্রগৃহ। কিন্তু হাতে যে আমাদের এক পয়সাও নাই—১৫০০ প্রথমেই দিব ক্রিপ্তে? বিপদ বুঝিয়া হাম্পটনের দন রক্ষা মার্গালের নিকট দার চাহিলাম। তিনি লিখিলেন “হাম্পটন বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে টাকা খরচ বিবার নিয়ম নাই। তবে আমি আমার নিজের ১৫০০ পাঠাইলাম।” ১৫০০ পাঠালাম। ইতিপূর্বে আমি এক সপ্তে ২২০০০০০ টাকাও দেখি নাই। জমিটা কেনা হইয়া গেল। একবৎসরের মধ্যে বাকি ১৫০০ দিব স্বীকার করিলাম।

নতুন স্থানে স্থল উঠাইয়া লওয়া হইল। জমিতে সর্বসমেত ছাত্রিটা পুরাতন ঘর ছিল। গোলামীর যুগে যখন বড় সাহেব এই কুঠিতে থাকিতেন তখন ইহাদের একটা ঘরে রায়া হইত ও একটা খাবার ঘর ছিল। আর দুইটা ঘরে বোঁড়া ও মুরগী থাকিত। কয়েক দিনের মধ্যে কুঠীও গুলি ঘেরামত ও পরিষ্কার করিয়া লইলাম। আশ্রয়াল ও মুসলীমালায় পাঠশালা বসিতে লাগিলাম।

আশ্রয়ালেই প্রথমে কাক চলিতেছিল। পরে ছাত্রগণ বাড়াইয়া যায়। একজন মুসলী-খানায়ও ছাত্রদের জন্ত রান্না খুলিতে হইয়াছিল। একদিন সকালে একজন নিগ্রোকে বলিলাম, “মুসলীমালাটা পরিষ্কার করা আবশ্যক। আমাদের ছেলে বাড়িয়াছে। ঐ ঘরটায় নতুন রান্না বসিবে।” সে তৎক্ষণাত্ বসিয়া উঠিল, “কি বলেন মহাশয়, আপনি বিরাডপে লোক জনের সম্মুখে ঐ ঘর পরিষ্কার করিবেন? সকলে নিন্দা করিবে যে?” চমকল্লা এবং লোকনিশ্চর ভয় নিগো-সমাজে এতদূর পৌছিয়াছিল।

এই নতুন স্থানে ও নতুন গৃহে স্থল বসান

কাজটার মধ্যে কতকটা বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। আমরা একাধিক বাহিরের স্ত্রী এতদূর নিযুক্ত করি নাই। আমরা নিজেই যথেষ্ট সুখের কৰ্ম, কৰ্মকাণ্ডের কাছ, বাড়িঘরের কাজ, ইত্যাদি করিয়াছিলাম। বিকালে স্কুলের ছুটির পর ছাত্রেরা এই সকল কার্যে সাহায্য করিত। রোগাক্রান্ত করা, পরিষ্কার করা, ধোয়া, ঝাড়া, যথাযথানে সাজান—সকলই আমরা সমবেত হইয়া সম্পন্ন করিয়াছিলাম।

যখন এই আশ্রয়ালে ও মুগ্ধশালায় স্কুল বেশ নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল তখন আমাদের জমির সমুখের খানিকটা অংশ পরিষ্কার করিয়া লইলাম। ইহাতে শাকসবজি, ফুল বল ইত্যাদি বিনিবার জন্য ইচ্ছা ছিল। ছাত্রেরা এ কাজ করিতে প্রথম প্রথম বেশী রাস্তা হইত না। তাহারা মাটি কোদলাইতে অপমান ও লজ্জা বোধ করিত। লেখাপড়া

নিখিতে আসিয়া কোদাল ধরিতে হইবে—স্বপ্নেও তাহারা পূর্বে ভাবে নাই। লেখাপড়া শিখিবার সঙ্গে মাটি কাটার সম্বন্ধই থাকি—তাহারা বুঝিত না। তাহারা মনে করিত তাহাদিগকে মজুরের কাজ করাওয়া লইয়া স্কুলের পৃথগা বচান হইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেরই অজ্ঞাত পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করিয়া আসিয়াছেন। তাহারা একরূপ নিম্নসার ও অপমানজনক কাজে একবারেই নারাজ। তাহাদের মনে হইতে লাগিল—সমগ্র ব্রহ্মা নষ্ট করাইতেছে মাত্র।

কিন্তু আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আমি লোক লাগাইয়া জমি পরিষ্কার করিব না। আমার হুচিন্তিত শিক্ষাপ্রণালী কোন মতেই অক্ষত করিব না। শারীরিক পরিশ্রম করা আমার

মতে উচ্চ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। যাহারা হাতে পায়ে খাটিয়া কাজ করিতে অনিচ্ছুক তাহারা আমার বিবেচনায় অশিক্ষিত, এমন কি কৃষিকৃষিত। আমি সকল ছাত্রকেই এই নতুন শিক্ষার আদর্শ বুঝাইতে লাগিলাম। কথায় বেশী উপকার হইল না। আমি নিজে একাকী-মাটি কাটিতে আরম্ভ করিলাম। জমি অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিল। তাহাদের সাহায্য না লইয়াই বিজ্ঞানদের চারি পাশ যথেষ্ট হ্রদ্বন্দ করিয়া ফেলিলাম। ছাত্রেরা দেখিল আমার অপমান কিছুই হইতেছে না। ক্রমশঃ তাহারাও আমার কাজে সাহায্য করিতে আসিল। এইরূপে ৬০ বিঘা জমি সকলে মিলিয়া চবিঘা ফেলিলাম।

এদিকে শ্রীমতী ভেড়িভঙ্গন জমির দাম শোধ করিবার জন্য নানা কৌশলে টাকা জুলিতে থাকিলেন। তিনি আমাদের বিদ্যালয়ে এককটা প্রদর্শনী বা মেলা খুলিলেন। এজন্য কুফার খোঁজা ছুই মহলেই তিনি সর্বদা ব্যস্তা হইয়া বেড়াইতেন। মেলার উদ্দেশ্য ও কাৰ্য্য-প্রণালী সর্বত্র প্রচারিত হইল। টাঙ্কেজীর লোকেরা কেহ কিছু আদু, কেহ কয়েকটা কুটি, কেহ কোন ফল ইত্যাদি দান করিলেন। এইগুলি বেচিয়া পয়সা আসিল। এইরূপ গোটা কয়েক মেলার ফলে টাকা মন্দ জমা হইল না।

তাহার পুর নগর-টাকার জন্তও টাকার খাতি খোলা গেল। কোন নিগোদন পয়সা, কেহ বা চৌদ্দ পয়সা দান করিতে লাগিল। কেহ একটা কমলা, কেহ বা খানিকটা চিনি, কেহ বা একখানা সস্তরফি দান করিল। একদিন এক বুড়ী ছোড়া কিন্তু পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমাদের স্কুলে হাজির হইল। সে বলিতে লাগিল,

“মহাশয়, আপনি ও ভেড়িভঙ্গন যে কাজ করিতেছেন তাহার জন্য ভগবান আপনাদিগকে সাহায্য করুন। নিগোজাতিকে জুলিবার জন্য আপনারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আপনারদের দক্ষিণ আর আমিও মুগ্ধ যে এক-কাল গোসামী করিবার পর আপনারদের ভ্রাতৃ নিম্নসার সমাজসেবকদিগকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পুরিলাম। আপনারদের ভ্রাতৃ কণ্ঠীর মতন তদ্রূপ হইয়া সমাজ-সেবায় লাগিয়াছেন, তখন নিগোজাতিকে স্মৃতি সম্বন্ধই জগতে মাথা জুলিয়া ধাঁড়াইতে পারিবে। আজ আমার জীবনের অন্তিম দশায় সেই আমার আলোক দেখিতে পাইতেছি।” এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তাহার পর সে আবার

বলিল, “বেশুণ, আমি নিতান্ত দরিদ্র। কাঁচা পয়সা আমি চোখে দেখিতে পাই না। আপনারা পাঠশালায় জন্য টাকা চাহিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে আমার স্ত্রী জীবনের ঈদজ্ঞতা জানাইবার জন্য এই ছয়টি ডিন দান করিতেছি। আশা করি, এইগুলি বেচিয়া আপনারা কাজ চালাইতে পারিবেন।”

এইরূপ মুগ্ধ ভিকার ফলে আবু চিনি, কদল, জামা, ভিন্ন, ইত্যাদি পাইতাম। পরে, সেইগুলি বাজারে বেচিয়া টাঙ্কেজীর খন-ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এই উপায়ে সতিয়া কুড়াইয়া বেল তৈয়ারী করিতে প্রয়াসী হইলাম। বৃহৎ ব্যাপারেও গুদ কণার সাহায্য কম কাৰ্য্য করে না।

শ্রীমদ্যজ্ঞান সরকার

দুঃখে স্থখ

“বিপদঃ সন্ততাঃ শতত্রয়ং তত্র জগদগুরো।

ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপনুর্ভবদর্শনং।”

শ্রীমদ্ভাগবত। ১ম স্কন্ধ, ৮ অঃ ২৪।

কুরুক্ষেত্র সংগ্রামবাসনে, পরম্পরাগুরের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিতে উজ্জত হইলে, পৃথু সতী, ব্রহ্মভৈরব হইতে বিনিমুক্ত, অজ্ঞানগণ ও ভ্রোণদীর সহিত, শ্রীকৃষ্ণকে সাধোদন করিয়া যে স্থল করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে উপরোক্ত প্রার্থনাটি ছিল। কৃষ্ণদেবী কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন? “অন্তঃকর হে জগদগুরো, হৃদয়ে পরিবর্তে সেই সমস্ত বিপদ-রাশিই যেন আমাদের সর্বদা উপস্থিত থাকুক, তাহা হইলে এই আমার দুঃখময় সমসার হইতে মুক্তিপ্রদ ভবদীয় দর্শনলাভ হইতে কখন বিকট হইবে না।”

হে ভগবন, আমাদের যখন যে বিপদ হইয়াছে, তখনই ভূমি দয়া করিয়া সে সকল বিপদ হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছ। হৃদ্যোদন যখন যেরূপে আমার পুত্রগণের অন্তরে চোঁটা করিয়াছে, তুমি সর্ব-বিষ-বিনাশন রূপে উপস্থিত হইয়া তখনই সে সমস্ত বিপদ দূর করিয়াছ।

“বিষাঘমহায়েঃ পুরুষাদর্শন-

দনং সভায়া বনবাসকচ্ছতঃ।

যুধে যুধেহনক মহারথাস্ততো

প্রোণাত্য তচ্চান্নং হরৈঃভিরক্ষিতাঃ ॥

শ্রীভাঃ ১। ৮। ২৩।

“হে হরি, বিঘ ভোজন, গৃহহার, রাক্ষসের আক্রমণ, ব্যুতসভা এবং প্রত্যেক যুদ্ধে মহারথগণের শরজাল এবং সম্ভ্রান্ত অশ্বখামার

অমোঘ ব্রহ্মজ্ঞ হইতেও কেবল আপনার
রূপাবলে আমরা উদ্ধার লাভ করিয়াছি।"

অতঃপর হে বিপদবাহু! মনুষ্যের, এখন
দেখিতেছি যে বিপদই আমাদের সঙ্গী।
আমাদের স্তম্ভপদে প্রয়োজন নাই। যে
বিপদে পড়িলে তুমাকে পাইব, সেই আমা-
রিসের সঙ্গী, এবং সেই সমস্ত বিপদই যেন
সঙ্গী। আমাদিগকে বেঁটন করে।

পদ-পাওবের জননী জগন্মাতা কৃষ্ণদেবী
প্রার্থনা করিলেন "আমাদের বিপদই হউক।"
কেন অস্ত্র কিছু প্রার্থনা করিবার কি ছিল না?
কিন্তু প্রার্থনা করিলেন কেন? হুং, শান্তি,
সামান্যত্ব, ঐশ্বর্য এই সমস্ত তাঁহার কাব্য
হইলেও, তাহাতে তাঁহার চিন্তা তৃপ্ত নয়।
তিনি সানন্দে বিপদ চাহিলেন। কেন বিপদ
চাহিলেন?

এখন দেখা যাউক, জগতের অভিধানে
সম্পন্ন কাহাকে বলে এবং বিপদই বা কি?

জগৎসংসারের দুইটি পদার্থ সর্বদাই
একত্রিত দেখা যায়। যেখানে আলোক
বিকাশ, সেইখানেই অন্ধকারের রাজ্য—
হৃদ্যালোক ও অমানিশা জগতের অখণ্ডনীয়
বিধান। যেখানে সত্য মিথ্যাও সেখানে—
সম্পদ বিপদ, সং অসং, পাপ পুণ্য এইরূপ
যুগ্ম লইয়াই জগৎ। মানব কিস্ত সাধারণতঃ
অসং তাগা করিয়া, দ্বৈত ভাষা করিয়া
স্বার্থদেবর্থেই সত্যতঃ প্রবৃত্ত। সকলেই স্বং
চায়—মাংস করিয়া কে দ্বৈত গ্রহণ করে?
স্বং চায় বটে কিন্তু পায় কয়জন? আর
নিজ স্বং এ মর্ত্যলোকে একপ্রকার অসম্ভব।
বাহ্যে বাহ্যে জীব স্বং পাইতে যায়, স্বং
মনে করিয়া জগতের যে দ্রব্য অসম্ভবিত্ত
হয়, সে সকলই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল
নবর পার্শ্ব হইতে কখনও নিত্য বস্তু লাভ

করা যায় না। যাহা নিত্য, অনবর, তাহা
হইতে নিত্য কল লাভ করা যায় কিন্তু স্বপ্ন
পদার্থ মাঝেই মরশীল, অনিত্য। শ্রীমদ্ভগব-
দগীতায় ২য় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে
বলিতেছেন "জ্ঞাত্ব হি কস্মৈ মৃত্যুঃ ক্বং
ক্বং মৃত্যুঃ চ তদ্বাদ পরিহাধ্যার্ধে ন স্বং
শোচিষ্যমহি।"

"জ্ঞানলেই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মরিলেও
পুনর্জন্ম অনিশ্চিত হওয়ায় এই অপরিহার্য
বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়।"

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যখন মৃত্যুসঙ্গী, তখন
এই পরিদুঃখমান জগৎ যাহা কিছু লইয়া
তাঁহাও নবর, মৃত্যুশীল হওয়ায় ইহা হইতে
নিত্য চিরস্থায়ী স্বং অসম্ভব। ইহা জানিয়াও
মানব এই ধানেই স্বার্থদেবকে ও অবশেষে
হতাশ হইয়া অশেষবিধ কষ্ট পায়। মানব-
দেহে যেরূপ আত্মা, চন্দনে বৈষ্ণব স্বগন্ধ,
সেইরূপ এই বিশ্বের যে সারবস্তু তাহা
ভ্যাগ করিয়া অসারে আনন্দ পাইতে যায়,
পায় না, তবুও স্বার্থদেবের অহুধাবন ভ্যাগ
করে না। "আজ নিরাশ হইলাম, হযত কাল
পাইব।" ইহা মনে করিয়া অহরহ এই
প্রধাবন লইয়াই থাকে। প্রাপ্তম মরুক্ষেত্রে
তৃণাঙ্গ পথিক যেমন জলাশয় প্রধাবিত
হইয়া প্রস্তাবিত হয়, সেইরূপ মরণাভিকাশ
হইতে চরু পান, সেই নবর পরিবর্তনশীল
অনিত্য সংসারে, নিত্য অপরিবর্তনীয় স্বার্থায়
প্রধাবিত হইয়া বার বার প্রস্তাবিত হইলেও
এ অশেষ ভ্যাগ করে না। ইহাই জিগুগম্য
চরতায়া দৈবী মায়ার খেলা।

কৃষ্ণদেবী জগতের জীব হইয়াও একি
স্বার্থভাবিক প্রার্থনা করিলেন? স্বং সকলই
চাষা, জীবের স্বাভাবিক প্রবণতা সর্বদাই
স্বংয়ের দিকে কিন্তু পাওবজননী চাহিলেন

বিপদ, সেই সেই বিপদ হউক যে যে
বিপদে আপনি আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা
করিয়াছিলেন। বিশাল ভারতক্ষেত্রের
সাম্রাজ্য, জগতে অতুলনীয় মান, তিনি
পাওবজননী—ঐশ্বর্য, প্রভুত্ব ঐশ্বর্য, এ
সমস্ত ভগ্নভূলা বোধ করিয়া পাওবজননী আজ
বিপদ প্রার্থনা করিলেন! কেন?—বিপদ-
বারণকে পাইবার আশায়।

কৃষ্ণদেবী বেশ জানিতেন যে সম্পদকালে,
ঐশ্বর্য পূর্ণের মদাঙ্কতা মানবকে আত্মহারা
করিয়া ফেলে। সে অস্ত্রদুষ্টি শূণ্য হইয়া
চিরকাল কাম্যকামের দাস হইয়া পরমতঃ
বিস্তৃত হইয়া যায়। অতঃপর দেখিয়াছেন যে
মরাত্ম পুত্রারিত্তয় ঐশ্বর্য পূর্ণের মত হইয়া
পরম মহেশ্বর বাহুদেবকেই কারাক্ষ করিতে
গিয়াছিল। যে বস্তুলাভের জন্ত ব্রহ্মা
মহেশ্বাদি দেবগণ বহু তপস্বী সাধন করেন,
সেই পরম বস্তুকে সমক্ষে পাইয়াও চরু
ধার্ম্যরাগি চিনিতে পারিল না, যোগে চরু-
হইল। তাই ভগবানকে গৃহে পাইয়াও মৃত
তাঁহাকে নির্যাতন করিতে চেষ্টা করিল।

সম্পদে যে উন্নততা থাকে, সেই উন্নততা
মানবকে কাভাকাও, জ্ঞানশূন্য হিতাহিত
বিবেচনাহীন করিয়া ফেলে। আত্মতা,
অবিভাগ, পাপমোক্ষ ক্রমে অপের আভ্যন্তর্য
হইয়া পীড়ায়। তাই বিপদই ভাল বুদ্ধি
কৃষ্ণদেবী বিপদই চাহিলেন।

তোমার উপযুক্ত সন্তান তোমার চক্ষের
সমক্ষে কালাগাসে পতিত হইল, তুমি ভাবিলে
"ভগবান কি নিদ্রায়! কে তাঁহাকে দয়ায়
বলে? এ আশাত যে দিতে পারে সে কিরূপে
দয়ায়?" কিন্তু ভাবিয়া দেখেদেখি, তাঁহাকে
তুনিয়াছিলে, ঐশ্বর্যভোগের বিলাসিতায়
তুনিয়াছিলে, ঐশ্বর্যভোগের বিলাসিতায়
তাঁহাকে একবারও মনে পড়ে নাই, এই

আশাত পাইয়া তাঁহাকে মনে পড়িল, যেমন
করিয়াই হউক, ভক্তিতেই হউক, আর
অভক্তিতেই হউক, ঐশ্বর্য মমতঃ তোমার
কঠিন দ্বায়ে ভগবানের কথা জাগিল।

"বস্তুশক্তি: ন বুদ্ধিমপেক্ষতে।" গুরল—
জানিয়াই হউক আর অজ্ঞাতেই হউক পান
করিয়াই মৃত্যু নিশ্চিত, অমৃত পান করিলেও
তাঁহার কাব্য হইবে, ভগবানের নাম একবার
উচ্চারণ করিলেই সে অক্ষয়বীজ তাহার কাব্য
করিলেই। বিপদই হউক আর সম্পদই
হউক, নাম করিলেই তাহার স্বফল ফলিবে।

কম শত্রুভাবে চিন্তা করিতে করিতে
সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়াছিল। শ্রীমদ্ভা-
গবতে ১০ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে
বলিতেছেন—

"আদৌ: সংবিশংস্তিত্ত্বং ভূজান: পথটন
পিবন্।"

চিন্তাযানে জীবকেশমপত্রঃ তম্রয় জগৎ।"
সে (কম) উপবেশন, শয়ন, উদ্যান, ভোজন,
পথটন এবং পান প্রভৃতি সকল অবস্থাতে
ও সর্বকারণে জীবকেশকে চিন্তা করিতে
করিতে সমগ্র জগৎ তম্রয় দেখিতে লাগিল।

শত্রুভাবেই হউক আর মিত্রভাবেই হউক,
যে যে ভাবে তাঁকে ভজনা করিবে, তিনি
সেই ভাবেই তাঁর প্রতি রূপা করেন যথা
গীতায় দৃষ্ট বাক্য।

"যে যথা মাং প্রপদ্যতে তাস্মৈব ভজাম্যহং।"
কম শত্রুরূপে রূক্ষচিন্তা করিয়া কৃষ্ণদেহ
প্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন মক্ষোপরি উপবিষ্ট
ভোজ্যপরি কেশাকর্ষণ পূর্ণক মঞ্চ হইতে
তাঁহাকে রক্তদ্রুতিতে নিক্ষেপ করিয়া বিচাশায়
আত্মতঃ পদগত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তদুপরি
পতিত হইলেন তখন কে কম, কে কৃষ্ণ কেহ
চিনিতে পারিল না।

শ্রীমদ্ভগবত ১০ স্কন্ধ ৪৪ অধ্যায় ৩৯ শ্লোক

যথা

"স নিত্যদোষিণ বিঘ্ন তন্নীধরং
শিবদমন বা বিচরন শ্বপন বদন।

দর্শন চক্ৰাঘু মগ্নস্তো যত
তদেব রূপং দ্রববাগমাণ ৥"

"চিত্ত সত্যত উদ্বিগ্ন থাকাতো কংস পাণ,
ভোজন, বিচরণ, নিদ্রা ও জাগরণ, সকল
সময়েই চক্ৰাঘু ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সমুদ্র দর্শন
করিত অতএব তাঁহারই দুলভরূপ প্রাপ্ত
হইল।"

তাই বলিতেছিলাম জগৎসাংসারে এই সমস্ত
বিপদরূপ আঘাত আছে বলিয়া তাঁহার দিকে,
সেই অব্যয় দণ্ডান্তার দিকে আমাদের দৃষ্টি
আবর্তিত হয়। শোভাস্রবপ্রস্তুত জয় সেই
নামহুখা নিকনে নীতিলিত হয়, তাই দয়াময়
দয়া করিয়া আমাদের মৃতকে বিপদভার
চাপাইয়া দেন।

উদ্যোগপাদী সন্তান, যদি পিতার শাসন না
থাকে, তবে যথেষ্টাচারী হইয়া পিতার মাথা
হেঁট করে এবং প্রতিবেশীগণকে জ্বালাতন
করিয়া তুলে। তাই পিতা সন্তানের মঙ্গলের
জন্ত, তাঁহার ভবিষ্যতের নৈতিক জীবন অক্ষুণ্ণ
রাখিবার জন্ত সন্তানকে শাসন করেন।

পরমদয়ালু জগৎপিতা তাই অথ
সামান্যের মধ্যে দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন।
দুঃখ না থাকিলে, স্বর্ষের উৎকর্ষ থাকিত না।
নিরবচ্ছিন্ন আলোক যদি জগতের বিধান
হইত তাহা হইলে আলোকও লোকের
বিরক্তিকর হইত। স্বর্ষের মধুরতা বৃদ্ধি
করিবার জন্ত দুঃখের সৃষ্টি। দয়াময় জগৎ-
কর্তা জীবের অভাব বৃদ্ধিহই যেন আবশ্যক
মত সকল ভ্রম দিয়াছেন। কোন প্রাণী
প্রস্তুত করিতে হইলে যেমন তাহাতে কষ্ট,

অম, লবণ প্রভৃতি ভ্রম মিশ্রিত করিয়া তাহার
স্বাদ মধুরতর করিতে হয় সেইরূপ এই দুঃখ
আছে বলিয়া, স্বর্ষকে লোক স্বর্ষ বোধ করিতে
পারে। বিপদ সম্পদের মহিমা বৃদ্ধি করে।
দয়াময় বাহ্য কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন কিছুই
বার্থ নহে। বিদেহ ও প্রয়োজন আছে।
যে বিষ বস্তু মিশ্রিত হইলৈশি নিশ্চিত মৃত্যু,
তাহাই অজ্ঞ ভ্রমের সহিত মিশাইয়া রোগীকে
দেবন করাইলে চুচিকিৎসা ব্যাদি আরোগ্য
হয়।

পাপ না থাকিলে, পাপের উপর জীবের
দুখ না থাকিলে, কে সাধরে পুণ্য গ্রহণ
করিত? পাপের বিভৎস ব্যাপার দৃষ্টিগোচর
করিয়া জীব পুণ্যশ্রম করে।

এই জগৎসংযন্ত্রের আদি কারণ যে মহা-
মায়া, বাহ্যকে চণ্ডীতে দেবগণ কৃত্যকরিয়া
"অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতি স্ফাদা" বলিয়া-
ছেন তিনিও দুইশক্তি লইয়া এই বিশাল
খেলা খেলিতেছেন। একটি বিঘ্না বা পরা,
ও অপরটি অবিন্যা বা অপরা। এই দুই
শক্তির কাহাই এই বিঘ্ন। বাহ্যারা পরা
আশ্রয় করেন, তাঁহারা পরম পথের পথিক
হইয়া ভগবৎ সান্নিধ্যলাভে চিরশান্তি উপভোগে
রত থাকেন, বাহ্যারা বিঘ্ন-তৃষ্ণার মোহাদ
তাঁহারা অপরাপর আশ্রয়ে, স্বপ্ন পাইব মনে
করিয়া বিঘ্নাশক্ত হইলে, কামিনী ও কাকনে
মত্ত থাকেন, শেষে তাঁহাদের দুর্গতির পরিসীমা
থাকে না। তাই হৃদীগণ অবিন্যা হইতে
দূর থাকিয়া, পরাশ্রয়ে পরম শান্তি ও পরম
পদ লাভ করেন। অপরা না থাকিলে,
পরশক্তির শ্রেষ্ঠ কেহ অহুভব করিতে
পারিতেন না।

সৃষ্ট বস্তু কিছুই নিরর্থক নহে। সকল
পদার্থেরই আবশ্যকতা আছে। স্বর্ষও যেমন

দুঃখের তেমনি। স্বর্ষ সম্পদ যে মহান হইতে
উৎপন্ন দুঃখ বিপদও সেই স্থান হইতে
আসিয়াছে। জগতের কোন ভ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব
প্রতিপন্ন করিতে হইলে, তদুপাতীয় নিকট
পদার্থ লইয়া তুলনায় সমালোচনা করিলে
তবে উৎকর্ষ অসম্ভব হয়। দিবালোকে
লীপালোক প্রভাসিত হয় না। অমাদকারে
দীপ উজ্জ্বলতর হয়। অন্ধকারেই আলোক
বিকাশ। দুঃখ স্বর্ষের মানদণ্ড। বিঘ্ন
প্রেমের পরীক্ষক।

ভগবান বাহুদেব গোপকুমারীগণের নিকট
প্রতিশ্রুতি অহুসারে রাস-বিহারে প্রবৃত্ত
হইলে, ব্রজবাসীগণ

এবং ভগবতঃ কৃপালক্কমানী মহাশ্বাসঃ।

আত্মানং মেনিরে স্রীপাং মানিচ্ছোহম্বিকং

তুবি ৥"

শ্রীমদ্ভগবত ১০।২২।৪২।

এই প্রকারে অত্যন্ত উদার চরিত্র ভগবান
শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রার্থনামাত্র গোপী-
সকল পৃথিবীর সমস্ত রাজাতির মধ্যে
অশকল অগৌরবাবিহীন বোধ করিলেন এবং
তরিনিত্ত মানিনীও হইলেন। এবং সেই জন্ত
"হৃদ্যাং সৌভগদমঃ বীক্ষ্যমানক কেশবঃ
প্রশমায় প্রসাদায় তদৈবাস্তরীযীত ৥"

শ্রীভাঃ ১০।২৩।১৩

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহাদিগের সেই সৌমধ্যাভিমান
ও গর্ভ নিরীক্ষণ ক্রিয়া তাহার প্রশমন ও
তাঁহাদিগের প্রতি প্রসাদ বিতরণের জন্ত সেই
স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

তখন গোপকুমারী তাঁহার অর্শর্শনে, হাঃ-
কারবে বনশ্রী প্রভিধ্বনিত করিতে
করিতে তাঁহার অধোমুখ করিতে প্রবৃত্ত হই-
লেন। তৃণ, লতা, বৃক্ষাদি সকলকে প্রিয়তমের
সদৃশে বিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

"চুত প্রিয়ালপনাসান কোবিদার
জঙ্ঘক বিব বকুলায় কদম নীপাঃ।

যেহেতু পরার্থভবকা-যমুনোপকূলঃ
শাসক কৃষ্ণপদবীঃ রচিতানুনাং নঃ ৥"

হে চুত, প্রিয়াল, পদম, অসন, কোবিদার,
জঙ্ঘ, অর্ক, বিব, বকুল, আম্র, কদম, নীধ এবং
হে অপরাপর পরার্থকজীবন যমুনোপকূল-
বর্তী বৃক্ষসকল, তোমারা শূচচিত্ত আমাদিগকে
শ্রীকৃষ্ণের পথ বলিয়া দাও।

এইরূপে সকলকে বিজ্ঞাসা করিয়াও যখন
প্রিয়তমের বাক্তী পাইলেন না। তখন হতাশ
হইয়া, তাঁহার লীলা অহুসরণ করিতে
লাগিলেন।

কেহ পূতনা হইলে অপরা গোপী শ্রীকৃষ্ণরূপে
যেন তাঁহার স্তম্ভগান করিতে লাগিল।
কেহ অখায়স, বকায়স, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের
বাল্যলীলা অভিনয় করিতে লাগিলেন।
পরে যখন বৃন্দিলয় শ্রীকৃষ্ণ লাভের আশা
স্বপ্নরপরাহত, তখন সমস্তের সকলে রোদন-
চ্ছলে শব্দ আরম্ভ করিলেন। তাহাই মহর্ষি
বেদব্যাস গোপীগীতানামে শ্রীভাগবতে স্থান
দিয়াছেন।

এইরূপ বিলাপেতে অশঙ্কলে হৃদয়মলা
বিধৌত হইলে ও গর্ভ প্রশমিত হইলে, যখন
গোপবালা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির আশায় একরূপ
নিরাশ হইয়াছিলেন। তখন

"তাস্যামবিবকৃচ্ছোরিঃ শ্বযমানমুখাধুঃ।

পীতুষরধরঃ শ্রী সাক্ষ্যাসাধমজঃ ৥"

শ্রীভাঃ ১০।৩২।২

সেই রোদনপরায়ণা গোপীগণের মধ্যে
সহাস্রবদনকমল পীতুষরধরবিহিত প্রশ্বন-
মালালভুত সাক্ষ্য মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবি-
দূত হইলেন।

গোপীগণের প্রেমের পরিমাণ কতদূর তাহা লোকশিক্ষার জ্ঞানগত জ্ঞানহীনে ভগবান অজ্ঞান হইয়াছিলেন। এই বিরহজালা গোপীপ্রেমকে উজ্জলতর করিয়া জগজ্ঞানকে মোহিত করিয়াছিল। কামশঙ্করীনে যে নির্ধল প্রেম গোপীগণ দ্বারা গোপন করিতেছিলেন, তাহা কে জানিত? তাই ভগবান দয়াপরবশ হইয়া জীলাঙ্কলে এই অপূর্ণধন, এই “অনুপিত” রত্ন জগতে বিতরণ করিয়াছিলেন।

এই বিরহ বিলাপ গোপীপ্রেমকে আরও পরিষ্কৃত করিয়াছে। ভগবান যে জীবকে ভালবাসেন, আত্মীয় হইতেও পরমাধীন্যরূপে অশ্রু স্থান দেন, তাহা কে জানিত, যদি দয়াময় দয়া করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জীবকে না দেখাইতেন? রত্নবালা যে এরূপ নিঃস্বার্থ প্রেম ভগবানের জ্ঞান রাখিয়াছিল, এই অদর্শন জনিত বিরহ না ঘটিলে, কে জানিত পারিত? বাঁহারা বলিয়াছিলেন

“পতিব্রতায় দ্বাভাব্যাবস্থা

পতি বিজ্ঞাত্যে তেহুচ্যুতাতপাতাঃ।

গতিবিদত্তবোধগীত মোহিতাঃ

কি তব যোবিতঃ কস্যজেরিষাঃ।

গোপীগীতা ১৬

হে অচ্যুত, তুমি আমাদের আগমনের কারণ বিদিত আছ। আমরা তোমার বৈধীতে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, সখী, ভ্রাতা ও বাচ্চ সকলের অনাদর পূর্বক তোমার সন্যাসে আগমন করিয়াছি। আমরা সব ত্যাগ করিয়া তোমার সন্যাসে আসিয়াছি, এই রাজিকালে আমাদের ত্যাগ করিও না।

সর্বস্বত্যাগী হইয়া, যাহা যাহা এই পৃথিবীতে আকর্ষণের পদার্থ আছে সব বিসর্জন দিয়া

শূন্যদ্বার লইয়া, ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি শূন্য দ্বার পূর্ণ করেন। উৎসৃষ্ট ভ্রাতা দেবপুত্র হইয়া না। তাই দ্বার হইতে সমস্ত আকর্ষণ বিসর্জন দিয়া, শুনা-দ্বারা অনন্তজ্ঞান হইয়া, তাহাঁই পারপদে উৎসর্গ করিলে তিনি গ্রহণ করেন। তাই গোপীগণ সর্বস্বত্যাগী হইয়া আসিয়াছি ইহা জানাইলেন।

তাই বলিতেছিলাম স্বয়ং ও দুঃখ অবিযুক্ত। যেখানে স্বয়ং সেই ধানেই “দুঃখ। বিরহ প্রেমের মানদণ্ড। দুঃখ স্বয়ংের পরিচায়ক। তাহা না থাকিলে জীবের স্বয়ংের অস্বাভাবিকতা না। তাই পাণ্ডবজননী পৃথাদেবী বিপদই চাহিলেন।

অন্ধকারে যেরূপ আলোকের জ্যোতিঃ স্পষ্ট হয়, সেইরূপ দুঃখ ভ্রাতৃগণের যদি স্বয়ংের হয়, তাহার মধুরতা প্রকটরূপে জীব অজ্ঞান করিতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন স্বয়ং বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ সেই জগৎের বিধান নহে। তাই কবি গার্হিষ্টেন—

“স্বয়ংজ্ঞানস্বরূপং দুঃখং চাম্ব্যজ্ঞানস্বরূপং স্বয়ং।

চক্রবৎ পরিবর্ততে দুঃখানি চ স্বয়ানি চ”

স্বয়ংের প্রয়োজনীয়তা জগতে যতটুকু দুঃখের প্রয়োজনীয়তাও ততদূর। এইরূপ স্বয়ং দুঃখ সমন্বিত এই সংসার। কিন্তু মোহোচ্চ আশ্রয় দুঃখ ছাড়িয়া কেবল স্বয়ং চাই। দুঃখাশা কখন পূর্ণ হয় না—সুতরাং নিরাশ হই ও বার বার কষ্ট পাই। গুরুপদে মতি স্থির করিয়া স্বয়ং ও দুঃখ, যাহা ভগবানের বিধান, তাহাঁই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে শিক্ষাই মহতত্ত্ব। ইহা আমরা পাই না, তাই এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা এত উৎকণ্ঠ। সব ত্যাগ করিয়া, “ঠারি, স্বয়ং দাও আর দুঃখই দাও, যা” তোমার

“মনে আছে তাই কর” এই বলিয়া যদি নিশ্চিত করিতে পারে। এই মাত্র শাস্তির পথ। ইহা হইতে পারে, তাহা হইলে জীব আর কোন বাস্তবিক দ্বিতীয় নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

মানবজাতির বিবর্তন

“The goal of evolution seems to be men with great Minds of High Character. There is nothing great in the world but man, nothing great in man but mind, and nothing great in mind but character.”

মানবজাতির জগৎগর্ভন ও সম্মেলনস্থান আলোচনা করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা দিয়া স্পষ্ট করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং ইত্যাকার বিষয়ে জাননাভের জ্ঞান ভেদকর্তার পরিপূর্ণ পর্যালোচনা সমুৎকল্যায়ক।

ভেদকর্তার মধ্যে প্রকৃত সদম্যাদান হয় না। প্রকৃতভেদ তাহার সমুৎকল্য পদার্থ সাহায্যে জীবের দেহের পচাদেশ সর্বলোকেই করে মাত্র, এই আলিঙ্গন সাধারণতঃ কয়েক ঘণ্টা হইতে কতিপয় দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। আগন্তুদৃষ্টিতে অসুস্থ মানব হইতে পারে যে এই বাহালিঙ্গনেই দশপতীসুপলের ডিম্ব ও শুক্রনালী উত্তেজিত হইয়া উঠে, উপরূপ সমুৎকল্য হইলে ডিম্ব ও শুক্রাঙ্গী সম্মিলিত হইয়া বহিঃ জলে বা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। ডিম্বকোষে শুক্রকোষ প্রবর্তি হইলে সম্মিলিত-কোষটি দ্বিধা বিভক্ত হয়। এই বিভক্ত-কোষদ্বয় হইতে চারি; তাহা হইতে আট; তৎপর যোল; অনন্তর বত্রিশ, চৌষট্টি; ও সর্বশেষে বহু-সংখ্যক কোষ উৎপন্ন হইলে তাহাদিগের সমষ্টি একটা আভ্যন্তরীণ মত দেখায়। যাকো-যাথনিক গুণবিশিষ্ট বংশপরম্পরাকে এই

কোষসমষ্টি ভবিষ্যতজাতির বিভিন্ন বৈধিক কলায় পরিণত হয়। সুতরাং একটা সম্মিলিত কোষ হইতে বেড়াই ও পরে তাহা হইতে ভেদ উৎপন্ন হয়।

বেড়াই প্রথমতঃ পদবিশীর্ণ ও লালুল সমুৎকল্যায়ক দৃষ্ট হয়, এই সময়ে ইহার মাছের মত হালি বাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে। এই অবস্থায় ইহার দেখিতে ঠিক কোষ হইতে মাত্র, বরাবর এইরূপ অবস্থায় থাকিলে প্রাণিবিশ্বজানবিশ্বের ইহাদিগকে মাছ ব্যতীত অপর কোন প্রাণী বলিয়া গণ্য করিবেন না। মৎস্যজগৎ এই অবস্থা অক্ষুর থাকে; ভেদকর্তা ইহা পরিচালনা করিয়া অজাবস্থা প্রাপ্ত হয়। মৎস্যবিশ্বের পর ইহার মাত্র সমুৎকল্য পদার্থ ও পচাদেশ অপর পদার্থ উপলব্ধ হয়। এতদসময়ে ভেদকর্তা ফুসফুস সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। এই সময়েই ফুসফুস ও হালি উভয়তঃই শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া পরিচালন করিতে থাকে। বর্তমান অবস্থাটি ঠিক মায়াভূমি, যেনোরাখ্যাস ও সাইনে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের উভয় জন্তর অস্বত্ব। এইসকল জন্তর জগৎ এই অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। কিন্তু ভেদ ইহা ছাড়িয়া চলিতে

থাকে। হাণ্ডি খাওয়ার যন্ত্র-কোর ক্রমশঃই
চকায়। বায়ু ও ফুসফুসদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া
উঠে। ভেদকশিষ্ট তখন ফুসফুস নাহায়েই
সম্পূর্ণরূপে বায়ুপ্রাধান্য সাধন করিতে থাকে।
লেজ কিন্তু এখনও অসুস্থ। আইটন ও
ক্লামায়াগারের পরিপূর্ণ অবস্থা ঠিক এইরূপ।
এই অবস্থার ভেদে ইহা অতিক্রম করিয়া ষায়
জাতীয়দের দিকে অগ্রসর হয়। পরিশেষে
ইহার লালু লোপপ্রাপ্ত হয় ও জগৎকে
পরিণত হয়।

এইরূপে ক্রপপুষ্টি সময়ে মৎস-ক্রপ
মৎসাব্যাপী প্রাণির পর আর অগ্রসর হয় না।
পেরেনিয়াব্যাংস মৎসাব্যাপী ছাড়াইয়া উঠে ও
বীজ জাতীয়র লাভ করে। ক্যাডুকিব্যাংস
শ্রেণী প্রথমতঃ মৎসাব্যাপী হয়। অনন্তর
পেরেনিয়াব্যাংস, অতঃপর ক্যাডুকিব্যাংস ও
পরিশেষে ডেক বা ঘ্যাহুরা অবস্থায় উপস্থিত
হয়।

কলত ভেঙের ভ্রূণোষধন হইতে আমরা
 দেখিতে পাইতেছি যে প্রত্যেক ব্যক্তিই
 জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বহির্বিদ্যাকার ও
 গঠনগত পরাবর্ধন সাধিত হয়। এই সকল
 পরাবর্ধন একই চরিত্রের হয়। পাকে যে
 জ্বপের সাময়িক শ্রেণীবিভাগক্ষেত্রে তাহা-
 নিগকে মানদণ্ডস্বরূপ প্রয়োগ করা যাইতে

পারে। এইরূপ সাময়িক শ্রেণীবিভাগে জগৎবিশেষের তাত্কাঙ্কিক জাতি, গোষ্ঠি, পরিবার, বর্গ, শ্রেণী ও এমন কি সমগ্র পৃথিবী নির্ণয় করা বাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত জগৎ-পুষ্টিতে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কোন-একটি জাতি কেবল মাত্র যে সমগোষ্ঠির অঙ্গর এক জাতিতে পরিণত হয়, তাহা নহে; এক শ্রেণী সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিবর্তিত হয়। মংগ্র (পিস্কেস্ শ্রেণী) ভেদে অর্থাৎ উভয় শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। জলচর জন্তু স্থলচরের অবয়ব বিশিষ্ট হয়। প্রত্যেক স্তরই শ্রেণী-বিভাগ বিষয়ক প্রাণিবিজ্ঞানের স্বত্ব-সমূহের সহিত সামঞ্জস্য রাখা করিয়া চলে। প্রত্যেক জাতীয় জংগই তদুপরিভূক্ত। জগৎবিশেষের আবির্ভাব হইবে ও তুলনামূলক অঙ্গবিশিষ্টে যেরূপ প্রজ্ঞা বা প্রত্যেক, মেধাও, ও এতদুভয়ের অন্তর্ভুক্ত অজ্ঞা জন্তুর অঙ্গবিকাশের ক্রম লক্ষিত হয়, ইহাদের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ ক্রমবিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বাপার হইতে পণ্ডিতগণ নিরদিষ্টিত 'হুজ্জী' প্রাপ্ত-ইহাচ্ছেন, "জতিমাছই স্বা-বংশৈচ্ছিত্তের পুনরাগোচন করে", অথবা "জগৎবিশেষ সমুদায়বর্তনীর পরিবর্তন।" এবং

ইহার কারণাহুসন্ধান করিলে বুঝিতে
পারি যাইবে কিরূপে ইহা অভিব্যক্তিবাদে

পটপোষক, জন্মের জ্ঞাপনবহুতে যৈ গুণবানি
বিকশিতপ্রাপ্ত হয় পিতৃ ও মাতৃজ্ঞানকায়ৈ
তাহাদেহে, প্রত্যেকটিইহৈ বংশপারম্পর্য
নিশ্চয়ই নিহিত রহিয়াছে। পিতৃ ও মাতৃ
জ্ঞানকায়ৈহৈ ~~কল্লি~~ গুণের, বংশপারম্পর্য
দৃষ্ট-হইলে বুঝিতে হইবে উক্ত কোষায়ণ এমন
কতকগুলি বাবহারিক ও পারিবারিক প্রভাবের
জীবন দারণ করিয়াছে দ্বারা তাহাদের মধ্যে
সেই বিশেষ গুণের বংশপারম্পর্য রক্ষিত
হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে কোন জাতিই
হউক না কেন জ্ঞাপনবহুতে তাহার অন্তিম
গুণবানি ও বিকশিত হয়।

ডেকের জ্যোৎস্বর্ধনে যাঁহা দট্টে মানব-
জ্যোৎস্বর্ধনে তাহাই দৃষ্টিয়া থাকে। এত-
দ্বিধায় ভেঁক সঞ্চড়ে যে পবেষণার অবতারণা
করা হইয়া থাকে মনুষ্য সঞ্চড়ে তাহাই
প্রযোজ্য। মনুষ্যজগৎও প্রথমতঃ
আত্মবিষয়িক একটি ক্ষুদ্রকোষ মাত্র। দিগ-
কোষ ও গুরুকোষ মিলিত হইলে যে মিলিত-
কোষ উৎপন্ন হয় তাহার আয়তনঃ
মিলিমিটার। এই ‘অবস্থায় ইহাকে একটি
এককোষীয়ক প্রৌক্তিক বা প্রত্যেকী ব্যাতি
আর কি বলা যাইতে পারে? কোষ-
সমিধান আরম্ভ হইলে এমন এক অবস্থায়
উপস্থিত হয় যখন ইহা একটি কোষগুচ্ছ
পরিণত হইয়া বাহ্যে আত্ম ফলের প্রায়
প্রতীয়মান হয়। বিবর্তনমার্গে দ্বিতীয়স্তরের
জন্ত ভলভকম্ ও এই মানবজগতীতে প্রোভেদ
কি? অতঃপর তৃতীয়বাবস্থায় ইহা হাইড্রা
নামক জন্তুর আকার লাভ করে। পরিশেষে
এই বহিস্কৃত মানবজগৎ তাহার মনুষ্য-
স্বাধীনত্ববাহ্য উপভোগ করিয়া স্তম্ভায়া অন্তর্যায়
গতিয়া প্রাপ্ত হয়। সম্ভ্রান্ত হইবার বর্ণ নির্ণয়
করা দুঃসাধ্য। এইরূপে ইহার পরিবর্তিত

হইতে থাকে। ইহার শরীরস্থান একদণ্ড অবস্থায় পরিণত হয় যে তখন উহাকে প্রাই-মোনিবর্গের অন্তর্গত বলা বাইতে পারে। ভেকুসু ছায়া মহুড়া গাওঁও অতি বয়স্ক মইয়া প্রজাঙ্গ হইতে মানবের বিবর্তন পথান্ত সমুদায়টাই ক্রমাগতই পুনর্বিবাকশিত হয়।

বর্তমান জন্তুজগতের বিবর্তন ও তত্ত্বার্গে জন্তুগণের স্থান নির্ণয় করিতে হইয়া প্রাণি-বিজ্ঞানবিদগণ পরবর্তী চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে উৎপন্নীত হইয়াছেন। এই চিত্রের নাম “বিবর্তনতত্ত্ব”। অভ্যাসিক বিকাশক এই চিত্রকে বস্তুতঃ একটা সদ্য নৃক্কের সহিত তুলনা করা হয়। ভূবিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের জন্তু বাস করিয়াছিল। স্মৃতি ঐ সকল জাতি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহা হইলে, ভূগর্ভে আদি প্রাণী হইতে বর্তমান জাতিসমূহ পর্যন্ত সমগ্র জন্তুজগৎকে ঘূরিয়াইবে তুই অগ্নে বিভক্ত করা বাইতে পারে; (১) বর্তমান ভূগৃষ্ঠচরী ও (২) ভূগর্ভপ্রাপ্তিক কঙ্কালবশিষ্ট।

একটি ফুকের মূল কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা উপায়ে বিভিন্ন স্তরের জীববৈজ্ঞানিক বহুবিধ সোপানস্থানীয়। অর্থাৎ, কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার ভিন্ন ভিন্ন অংশ যেন ভূগর্ভস্থ কঙ্কালবায়ির স্তবক ও এই সকল প্রশাখা নৈর্গত শেষ পল্লবরাজি বর্তমান ভূপৃষ্ঠচারী গণের পিতৃস্বয়ক।

প্রজন্ম বা প্রজন্মজীই জন্মজগতের প্রাথমিক
বিকাশ। সুম্যক পরাবর্তন সাধনান্তর যখন
বিবর্তনান্তর শনৈঃ শনৈঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে
থাকে, তখন কতিপয় প্রাণীর অভিব্যক্তির
গতি সরলরেখাক্রমে নিয়ামিত হয়। এই
সরলরেখাংশ প্রাণিসমষ্টি বিবর্তনতত্ত্বের কাণ্ড-
স্বরূপ। এই সরলরেখিক অভিব্যক্তির প্তরে

এইরূপে একটি আত্মজীবনকটোর প্রচেষ্টা করা করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশাবাদে উদুনকুম্ভিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ হাতে জন্মদায়করূপে চিকিৎসাবিদ্যে নিমিত্ত পাঠ্যবিজ্ঞান প্রাণের প্রাণে অতি সহজেই অতি সহজেই অতি সহজেই উদ্ভূত ও জট, ও বিশ্বব্যাপী প্রাণিক রিক্ত করা হয়। থাকে কেবল এই সময়েই বাপা জামিনামুখ্য হাজারে জেক মুখ প্রদর্শিত হইল। মোদার প্রাক্তকালে যখনই প্রকাশ করিয়াই আমি মনে মনে একটু দুঃখ হইল। বীণা পুষ্প প্রকটোৎপাদন মনে করিলাম। আমার বিজ্ঞান প্রকাশের কাশ্য আমি কিছুই নয়। পূর্ববর্তী দুই সময়ে ধরিয়া মন্ত জগৎ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই সময়েই আবার সেই একই পুষ্প যেখানে আমি পুষ্প হইয়া গিয়া। তত্বে যেতে সমর্থ করিতে না পারি। নীচে আমি ও প্রবন্ধীনাথের বাইরে যেখানে যেখানে পড়িতে পারি। তত্বে "Rana clamitans"। আমি অশ্রুতে অভিভূত হইয়া সেই হোনেই বিরক্ত। অভিভূত করিলাম, যেখানে যেখানে শিশু পঠিত দেখানোয় সমস্তকাল পরীক্ষা করিয়াও করিতে হয়, তখন মাধবী লোক যে এই অশ্রুতে জেক মুখ হইয়া যত্নে উদ্ভূত: করিতে তাহাতে আমি সন্দেহ কি?

নিম্নলিখিত জঙ্ঘগুলি প্রধান—(১) প্রত্যোজী; (২) কীট; (৩) মংশ; (৪) উভয়; (৫) সন্ন্যাস; (৬) অণ্ডজন্তুগামী; (৭) দ্বিরাগ (ওগম, কাঞ্চাল); (৮) এক-জন্ম; ও শেষতঃ (৯) প্রাইমেটস্‌বর্ণ। এই বর্ণের আদি স্বাধিপতি পুনঃ স্বল্পবৈশিষ্ট্যের পরিবর্তিত হইয়া ক্রমাগত নিম্নলিখিত জঙ্ঘসমূহে পরিণত হইয়াছে—(১) য়ানুপ্রাইডিয়া (গিবন, ওয়াং, গরিলা ও শিম্পাঞ্জী নামক নরাকৃতির আভাসযুক্ত জঙ্ঘ); (২) য়ানুপ্রাইথিকাস্ বা নরাকৃতি কপি; (৩) পিথেকানথ্রোপাস্ (বানরের আভাসযুক্ত মহাশু); যবদ্বীপে প্রাপ্ত ভূগর্ভস্থ পিথেকানথ্রোপাস্ য্যালোস্।); (৪) প্রথরমুগের মহাশু (প্যালিও লিথিক ও পরে নিওলিথিক); (৫) হোমিনিডি (বর্তমান মানব পরিবার)।

উক্ত সরলরৈখিক অভিযান্ত্রিক কালো কোনও বংশ বিশেষ প্রকারের পরাবর্তন প্রভাবে মূল পতি পরিভাষ্য করা ক্রমশঃ বিপ্রকট হইয়া পড়ে। কাজেই বিবর্তনতত্ত্বের মূল কাণ্ড হইতে শাখাসমূহ বহির্গত হইল। সম্ভ্রুতি নানা প্রকার মানস ও বাহ্যিক করিয়া স্বীকৃত হইয়াছে যে, যে সকল জঙ্ঘাবা কাতের নিরাশ প্রস্থত শাখা নির্মিত হইয়াছে তাহারা উভয়শাখা জঙ্ঘ অপেক্ষা অতীব হীন। বর্তমান কালের সচিবের পরাবর্তনঃ বিশিষ্ট সন্ন্যাস, খেচর ও অণ্ডজন্তুগামীগণের শরীর সংস্থান তুলনা করিলে তাহাদের চরিত্রগত সাম্যসম্বন্ধ একাধিক লক্ষ্য পরিদৃষ্ট হইবে। সাধারণ চরিত্রজী বিশেষভাবে সন্ন্যাস শ্রেণীরই সম্পত্তি। কিন্তু বর্তমান যুগের সন্ন্যাসপুত্র বিশেষ চরিত্রের তুলনায় উহা অতিশয় সরল। গিরি গুহর প্রোথিত কঙ্কালরাজি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে

হুমণ্ডলের জ্বাশাসিক ও ক্রিটোসাস্ বা চ্যাপড়ি বহুলাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে অপর্যাপ্ত সন্ন্যাস বাস করিয়াছিল। কিন্তু এই সকল সন্ন্যাসপুত্র খেচরের চরিত্রও প্রবলভাবে বর্তমান ছিল। তারপর এই যুগে এমনও সন্ন্যাসপুত্র বিবরণ করিত যাঁহাদের অণ্ডজন্তুগামীরা আকার ইতিহাসে স্পষ্টীকরণেই ছিল। ইত্যাকার সন্ন্যাস বহু পূর্বকালে অর্থাৎ পামিথানুগে যে বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে সন্ন্যাস চরিত্র অতীব স্বল্প পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছিল। কালপ্রসঙ্গে উক্ত দ্বিভাবাপন্ন বংশের কিয়দংশ হইতে সন্ন্যাস চরিত্র বিশেষপ্রাপ্ত হয় ও জাতিজী প্রবলভাবে খেচর ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপেই বর্তমান যুগের বিশেষত্ব সম্পন্ন খেচরগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। পক্ষান্তরে কতকগুলি আদি সন্ন্যাসপুত্র খেচরভাব লুপ্ত হইতে থাকে; কিন্তু সন্ন্যাসপুত্র লক্ষণসমূহ ক্রমশঃই প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষতঃ বিশিষ্ট সন্ন্যাসপুল উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রিটোসাস্ যুগের অণ্ডজন্তুগামী লক্ষণবিশিষ্ট সন্ন্যাসপুত্রেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। পরাবর্তন প্রভাবে দীর্ঘ দীর্ঘে উভয়ের সন্ন্যাসপুত্র প্রকট হইতে আরম্ভ করে ও আদি অণ্ডজন্তুগামীরা চিত্রসমূহ প্রাণালাভ করে। এই অণ্ডজন্তুগামী কিন্তু বর্তমান সময়ের ঐকগু স্তম্ভগামী হইতে এখনও বহু দূরবর্তী। উক্ত আদি ভিত্তপ্রস্তম্ভগামী হইতে আধুনিক ভিত্তপ্রস্তম্ভগামী ও আদি দ্বিরাগগণ পরাবর্তিত হইয়াছে। শ্যোকেজ জঙ্ঘর পরাবর্তন হইতে আদি য়ানুপ্রাইডিয়া ও ততঃপর অজ্ঞাত স্তরের মূল দ্বিরা মানব বিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। ইহাই মহাশু ও বানরের সম্ভবত্ব। এই স্থানে সহস্রাব্দ ও কৃষ্ণবৈদ্যের সম্ভবত্ব হইয়াছে।

এই য়ানুপ্রাইডিয়া প্রাচীন ম্যাট্রাইনস্ বা অল্পমৃত ও প্রশস্তমানিক বানরগণের ও ক্যাটা-রাইনস্ বা সর্দীর ও অল্পমৃত মানিকাকুল কপিবংশের পূর্বপুরুষ। পুরোক্ত জঙ্ঘসমূহের বিবরণ পরাবর্তনঃ সহযোগে সেসোপিত্থেমিডি নামক পরিবারে পরিণত হইয়াছে। ইহারা নাকলেই দীর্ঘকালস্থ। কিন্তু ম্যাট্রাইনস্-দ্বিগণের কেহ কেহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের পারিপার্শ্বিকান্তর্গত হইয়া পড়ে। ফলে পরাবর্তন প্রভাবে তাহারা ক্রমশঃই মহাশু-জাতির আকার ইতিহাসে প্রাপ্ত হইল। ইহা-দিগের দ্বারা ইনিমিষ্ট পরিবার প্রস্তুতকৃত হইয়াছে ও একই প্রাণালীসমূহযোগে তাহা হইতে প্রাচীন য়ানুপ্রাইথিকাস্ বা নরাকৃতি কপি জন্মগ্রহণ করে। ইহার লালুবিহীন। ভক্তার মিওডের গিল্ বহুপূর্বেরই নিষ্কান্ত করিয়াছেন যে, ইহারাই বর্তমান কালের শিম্পাঞ্জীর পূর্বপুরুষ। ইহারিগণে এখন হইতে আমরা প্রাচীন শিম্পাঞ্জী নামে অভিহিত করিব। এই প্রাচীন শিম্পাঞ্জী চতুর্দশ বা চতুর্ভুজ জঙ্ঘ। ইহারায় বৃক্ষ বাগ করিত। ইহার কতকগুলি বংশের অভিযান্ত্রিক তত্ত্বের প্রধান কাণ্ড হইতে বিপ্রকট হইয়া পড়ে, ও অপরগুলি সরলবৈশিষ্ট্যেরই পরাবর্তিত হইতে থাকে। বিপ্রকটঃসম্ভ্রুতিগণ দক্ষতার সচিব বৃক্ষবানী হইয়া আধুনিক শিম্পাঞ্জী ও গরিলায়

পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন শিম্পাঞ্জী-সম্ভ্রুতির দ্বিতীয় দল বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ভূচর হইতে আরম্ভ করে। ফলে তাহারা পক্ষাৎ পদস্থ দ্ব্যবাহিত ধারণার পরিবর্তে জ্বিকাশঃ সময় পরিস্রবণের জঙ্ঘই ব্যবহার ক্রিতে বাধ্য হয়। এই প্রধান পরাবর্তন ব্যতীত পরম্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট আরও অনেককোনক পরাবর্তন সংঘটিত হয়; বর্ধা সরলভাবে দগুগ্ধমান, পরিবর্তিতাভ্যন্তরিত, পরিবর্তিত সুব্যবহার ও দক্ষসম্বন্ধীয় নানা প্রকার পরিবর্তন ইত্যাদি। এই বহু মানবজাতি পরাবর্তনের উক্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মাহোলা আকৃত হইয়া বীর পরবিক্ষেপে মেগাস্থাসিমুগে অগ্রসর হইতে থাকে। * ক্রমাগত পিথেকাইড্ ও প্যালিও-লিথিক্ অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া ইদানীন্তন মহাশু-সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। প্যালিওলিথিক্ মানবের বদনমণ্ডল বজ্রতঃই মহোজাতি কোমল ভাবশারির আধার। কপিগণ ও মহাশুজাতির মধ্যে শরীর-সংস্থান সম্বন্ধে অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা যে প্রত্যেক অঙ্গি, প্রত্যেক পেশী ও প্রত্যেক দৈহিককলা সমসংখ্যক, এবং এই অঙ্গ সমূহের কোষ-সংবিধানও তুল্যরূপ। তবে তাহাদের বাহ্যঃ-কৃত্তিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারাই এতই নৈকট্যবিশিষ্ট যে, প্রমাণমধ্য প্রাপ্তবিজ্ঞানবিশ্ব শাস্ত্র চিরাট, আগুয়েন্

* এই মতের পারিপার্শ্বিক পূর্ব ভূতঃ উল্লেখিত হইলেও বিবর্তনবাদীরা পরাবর্তন (অর্থাৎ যেক্ষ পরাবর্তন একজাতি অপরজাতিতে পরিণত হয়) পারিপার্শ্বিক প্রভাবকাতঃ বা অনন্যকোষকাতঃ যে সংঘর্ষে আলোচনা করা হয় নাই ও প্রাচীনীভবতঃ নাই। তবে এই পদ্যতঃ এঞ্জল কীয়াইতে গারে যে Neo-Lamarckian School 'Inheritance of acquired character' এর পক্ষপাতী ও Neo-Darwinian School 'Inheritance of congenital character' এর পক্ষপাতী। Inheritance of acquired characters সম্বন্ধে Brown-Séquard's 'Experiments on guinea pigs' পরীক্ষাই প্রধান সথল। এই পরীক্ষা প্রতিপাদ্য বিবর্তনের বহু প্রতিকূল। পক্ষান্তরে জ্ঞানবান হায়ে কলমে ও দৈহিককোষে যে সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে তাহাতে Inheritance of acquired characters প্রমাণবাক্যে পরিণত হয়।

স্পষ্টতই বলিয়াছেন কপি ও মহত্ত্বদেহে পার্থক্য আবিষ্কার করা অধবিনীত বিংশ শতাব্দীর এক মহাদস্যবস্তুই বটে।

মহত্ত্বের জগাবস্থায় ও প্রদস্যবস্তুর এমন কতগুলি দৈহিক বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়—যাহাধারী ইতর জন্তুদিগের (তথাকথিত) সহিত তাহার জাতিত্ব স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়। আমরা ইহাদের সহিত বহুপ্রত্যুতন জাতিত্বত্বেই আস্থক। তবে এমন লোকও বিরল নহে যাহারা বলিতে পারেন “আজকাল অনেক ‘শিক্ষিত’ লোকেই পরিবর্তনপ্রয়াসী—মনে করেন, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, দীক্ষা—সবল বিষয়েই নিম্নত পরিবর্তন প্রয়োজনীয়, সংসারের গতিই যেন কেবল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; পরিবর্তন স্বাভাবিক সংসারের সকল পদার্থেরই যেন পরিফুটন হইতেছে। এটা তাহারের বিশ্বাস, কিন্তু এটা একটা বিসম ভ্রমাত্মিকা ধারণা।” পাস্চাত্য দেশেও এইরূপ মত প্রকাশ গরল নহে। আমাদের অধ্যাপক মাইকেল গায়রের কথাই এতদ্বারা প্রমাণিত আবার “Rotten chair of biologists” বলিয়া থাকি। পরিবর্তন যদি নাই হইতেছে তাহা হইলে বাস্তবিকই “To admit this view, is, as it seems to me, to reject a real for an unreal, or at least for an unknown cause. It makes the works of God a mere mockery and deception,” I would almost as soon as believe, with the old and ignorant cosmogonists, that fossil shells had never lived, but had been created in stone so as to mock the shells living on the sea-shore.”

কপিলের সহিত মহত্ত্বের দৈহিক সাম্য বাস্তবিক স্পষ্টত্ব সাম্যও অতিশয় আশ্চর্যজনক। কোতুলজনক এই সংসারীয় বর্ণনাই অগ্রে করিতেছি। ডাক্তার লুই বার্নিসন বহুসংখ্যক অসি-অবস্থায় শিশুর দোলায়মান অবস্থায় স্বীয় ভারবহনের ও মুষ্টিবন্ধনের ক্ষমতা নির্ণয়ের নিমিত্ত নিম্নের পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করেন। এই শিশুগুলির মধ্যে দুনিয়াক ৩০ জনের বয়সক্রম এক ঘণ্টার উচ্চ নহে। তিনি বলেন ইহাদের ২৮ জন তাহার প্রলম্বিত অঙ্গুলি অথবা মুষ্টিও মুষ্টিবন্ধ করিয়া ১০ সেকেন্ড পর্যন্ত শূন্য দোলায়মান অবস্থায় নিজের আপন আপন ভার বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এরূপ ঘণ্টারও কম বয়স ১২টা শিশু ৩০ সেকেন্ড কাল জঁকপে অবস্থান করিয়াছিল। ঠিক ঐ বয়সেরই ৪ জন এক মিনিট পর্যন্ত শূন্যে অবস্থান করিয়াছিল। ৪ দিবস বয়সপ্রাপ্ত ৪০ জনেরও অধিক ৩০ সেকেন্ড ঐ অবস্থায় ছিল। তিন সপ্তাহ বয়স্ক কতিবয়স সংখ্যক শিশু মিনিট ৩০ সেকেন্ড কাল পর্যন্ত চলিতে সক্ষম হইয়াছিল। এমন কি একজন ছই মিনিট ৩০ সেকেন্ড পরেও রাস্তা হয় নাই। আর একটা শিশু ১০ সেকেন্ড পরে দক্ষিণ হস্ত ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বাম হস্তে আরও ৫ সেকেন্ড ঐ ভাবে কাটা হইতে সক্ষম হয়। ডাক্তার বার্নিসন বলেন শিশুটা শুধু যে তাহার দক্ষিণ হস্তের বন্ধন পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহা নহে; ঠিক সেই সময়ে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন সে শূন্যমধ্যে যোগাতর অপর কোন পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে ছিল। অধিকন্তু কোনটা শিশুই নিজীব পদার্থের স্রায় বিলম্বিত হইয়া রহে নাই।

অস্বাভাব্য কটীদেশের সহিত সাক্ষ্যে প্রস্তুত করিয়াছিল এবং দৈহিক কল্যায়মুহ বিশদত্বে জাবপূর্ণ বোধ হইতেছিল। বিশেষতঃ বাহুর পশ্চাদ্ভাগের ক্ষেত্রের নামক কলটি অতিশয় নিটোল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত বাপার শিক্ষাভ্যাস না সংস্কারভ্যাস? মাত্র কয়েক ঘণ্টা বয়স্ক শিশু আবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইল কি প্রকারে? এই অশুভ সংস্কার প্রাপ্ত-পুরুষ কপিল হইতে প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত বাস্তব আর কি হইতে পারে? ইহা একটা অস্বাভাব্য সংস্কার ও “জগোষ্ঠের সজ্ঞা-ঘটনের পরিচায়ক” এই হুজুর পরিপোষক।

এক্ষেপে দৈহিক বিশেষত্ব সক্ষম কিংবা অসম্ভাব্যতা করিব।

পঞ্জাবি,—প্রাপ্ত বয়স্ক মহত্ত্বের পঞ্জাবিহীন সংখ্যা ১২ জোড়া। কিন্তু জগাবস্থায় লক্ষ্য করিলে ১৪ জোড়া পঞ্জাবের অস্তিত্ব নিম্ন করিতে পারা যায়। “ব্যগ্রপ্রাপ্ত শিক্ষা ও গহিলায় পঞ্জাব ২৮ সংখ্যক। এই স্থলেও সেই “জগোষ্ঠের জগোষ্ঠের পরিচায়ক।”

কেশ,—গতিধীর ভ্রম-মাস অষ্টসংখ্যকালে গর্তস্থজন্মের কেবলমাত্র পদতল ও ক্রান্তল বাস্তব সর্বাঙ্গই কেশবৃত্ত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। ভূমিগ হইবার পূর্বেই অশুভ উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু কেশবিশেষে উহা জীবাত্মকাল স্বায়ী হইয়া থাকে। ইহাও কি সেই “জাতি-মাত্রই শীঘ্র বংশগতিধুর পুনরালোচনা করে” হুজুর পরিপোষক নহে?

অঙ্গ-উপযোগ,—মহত্ত্বের বৃহৎদের পার্শ্বে সঙ্গের লক্ষ্যনা একটা অস্বাভাব্য অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল নাম “যাপোণিক্ ডামিঅমি।” ইহা অঙ্গের একটা উপযোগ মাত্র। মানবশরীরে বস্তুতঃ ইহা সম্পূর্ণই অস্বাভাব্য। কিন্তু উদ্ভিজ্জোড়ী কোন

কোন জন্তুতে এই অঙ্গের উপযোগ স্বাভাবিক ও ক্রমবর্ধমান কীর্ত্তিগণে সাহায্য করিয়া থাকে। মহত্ত্বজন্মে ইহা স্বাভাবিক না হইলেও ইহা বাস কিন্তু বৃহৎদের সমানই ও বস্তুগতির সহিত যোগাতন হয়। এক্ষেত্রেও পূর্বোক্তাভিত্তিক নিয়মটা প্রযোজ্য।

লাঙ্গুল,—নরাকপি ও মহত্ত্ব উভয়েই লাঙ্গুলীনা। কিন্তু উভয় জন্তুরই জগাবস্থায় লাঙ্গুল বিজ্ঞান থাকে। এমন কি উহার সকালোপযোগী দৈহিক কলা সমুহও দৃষ্টিগোচর হয়। হুজুরা এই ছই জন্তু লাঙ্গুল সংযুক্ত একই পূর্বপুরুষ সম্ভব।

কেবল মাত্র এই চারিটি বিশেষত্ব কেন, আরও একপ বহুসংখ্যক বিশেষত্ব মহত্ত্বদেহে বর্তমান রহিয়াছে যাহা বানভেতর অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষ হইতে হস্তান্তরিত হইয়া আসিতেছে।

তার পর মহত্ত্বের চক্ষু, কর্ণ, মস্তিষ্ক ইত্যাদি প্রত্যেক অঙ্গের জগোষ্ঠের পৃথক ভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইহাদের প্রত্যেকটির পরিপূর্ণকালে শুধু জাতি মাত্র নহে, অজমাত্রই স্বীয় বংশগতিধুর পুনরালোচনা করে। এদিকে আর বিশেষ আলোচনা করিবার স্থান নাই। তাহা হইলে বৃহৎশকার প্রচারিত করিতে হয়।

এই সমস্ত মানসিক সংস্কার ও দৈহিক বিশেষত্ব আত্মিক জগন-কোষে বিজ্ঞান রহিয়াছে; অজ্ঞা কোথাও নহে। কারণ জনন-কোষই যুগযুগান্তর হইতে বাণ রক্ষা করিয়া আনিতেছে ও করিতে থাকিবে। জনন-কোষের অর্থাৎ স্ত্রীর ভিৎ ও পুরুষের শুক্র-কোষের পরিপূর্ণকালে যদি শুণ্ডহ ইত্যাদি প্রয়োজ্য হাভা ইহাদের স্বভাবিক গঠনের বিকৃত-মানন করিতে পারা যায় তাহা হইলে ঐ বিকৃত

বঙ্গের ঐতিহাসিক

পাবনা উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সমিতির অধি-
বেশনে নাটোরের শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ
বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গের
ঐতিহাসিক সম্বন্ধে তিনি অভিভাষণ
বলিয়াছেন—

“অক্ষয় কুমারের রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক
সত্তা কতখানি ছিল বা ছিল না, সে কথা
বিচার তখন মনে আইসে নাই। * * *

ইউরোপীয় মনীষাসম্পন্ন ঐতিহাসিকগণ
বাঙ্গলার মধ্যযুগের যে ইতিবৃত্ত উদ্ধার
এককল্প অসাধ্যসাধন বলিয়া নিরাশার সহিত
উদ্যম ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা ব্রহ্মোপদ
বন্ধু শ্রীমান রমাপ্রসাদ চন্দ্র তাঁহার হৃদয়মণী
আধ্যাত্ম্য ও বিচক্ষণ বিচারশক্তির গুণে সেই
ইতিহাস রচনা করিয়া দিচ্ছি।
চন্দ্র ভগবতের কথায় যে সকল মহাভাব
মনীষীগণ দেশের লুপ্তপ্রায় ইতিহাস উদ্ধার
করন্ত; আমাদের চিরকালনা বিরুদ্ধিত করিয়া
দিয়াছেন, এই তপস্ভার যথার্থ ফল তাঁহার
এখন না পাইলেও আমাদের উত্তর পুরুষ-
দিগের জীবনের সর্বপ্রকার সফলতার মধ্যে
ইহার শাকল্যের বীজ নিহিত হইয়া রহিল।”

প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এই অভিভাষণ
মধ্যে ‘অপর কোন’ ঐতিহাসিকের নাম না
দেখিয়া ১৩২০ চৈত্রের প্রবাসীতে লিখিয়াছেন
—“কালচক্রম, গুণাধিক্রম বা বর্ণনাক্রম না
দখিয়া ঐতিহাসিক তথ্যাদ্যসম্বন্ধাক্ষেপে আরও
কয়েকটা নাম করা যাইতে পারে; যথা—
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, পুণ্ড্র
মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নিখিলনাথ রায়,

নগেন্দ্রনাথ বহু, কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রমুখচন্দ্র রায়, রাশেচন্দ্র পোতা, শ্রীচন্দ্র দাস,
যতুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাখাকুমুদ মুখোপাধ্যায়,
রবীন্দ্রনাথরায় খোষা, হারাণচন্দ্র চাকলাদার”
ইত্যাদি।

গত বৈশাখ মাসের মানসী পত্রিকা
শ্রীকৃষ্ণ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়
লিখিয়াছেন—

“অজ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে সমস্ত
প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের নাম
করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহা কখন
বাঙ্গালাভাষায় মৌলিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। স্বর্গীয়
রামা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা স্বর্গীয় ডাক্তার
রামদাস সেন বাঙ্গালা ভাষায় যে গ্রন্থাদি
লিখিয়াছিলেন বা পুস্তকাদি রচনা করিয়া-
ছিলেন, তাহা তাঁহাদের ইংরাজী ভাষায়
রচিত। মৌলিক গ্রন্থাধ্যাপক গ্রন্থ বা
পুস্তকাদির তুলনায় কিছুই নহে। * * *
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ হরপ্রসাদ
শাস্ত্রী বা রায় বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ শরৎচন্দ্র দাসের
ছায়া প্রত্নতত্ত্ববিদ এমন বাঙ্গালদেশে নাই,
কিন্তু তাঁহারা কখননা হাঙ্গালা ঐতিহাসিক
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন? আচাধ্যাপক শাস্ত্রী
মহাশয় “বাস্তবিক জয়” ও “মেঘদূত”
রচয়িতা বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে বিখ্যাত।
রায় বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ শরৎচন্দ্র দাস, অধ্যাপক
শ্রীকৃষ্ণ যতুনাথ সরকার ও শ্রীকৃষ্ণ রাখাকুমুদ
মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় কোন উল্লেখ

যৌগা ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা গ্রন্থ রচনা
করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। রসায়ন
বিদ্যাবিৎ ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখচন্দ্র রায়
মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালি লিখিয়া থাকেন বটে,
কিন্তু কখনও কোন ঐতিহাসিক তথ্যের
আলোচনা করেন নাই, এতদ্ভাতিত নিখিল-
নাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, বিজয়চন্দ্র
প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক-
গণ সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে কেন
স্থানলাভ করিতে পারেন নাই, তাহা প্রথমে
আমিও বুঝিতে পারি নাই। * * *
সভাপতি মহোদয় বঙ্গ সাহিত্যে যুগ প্রবন্ধ-
গণের নাম দিয়াছেন মাত্র, তাঁহার অভিভাষণে
বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের নামের
তালিকা নাই। যে হিসাবে মনুস্মৃতি, বাক্য-
চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম কীর্ত্তন হইয়াছে,
সেই হিসাবেই অক্ষয়কুমার, দ্বৈতচন্দ্র ও
গিরিশচন্দ্র বাবু পড়িয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব ও
ইতিহাস ক্ষেত্রে * * * প্রাচীনতম মার্গাব
নগেন্দ্রনাথ বহু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ
শাস্ত্রী প্রমুখ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের মহামহারি-
ণ বহুবৎসাব্যাপী চেষ্টায় যাহা করিতে পারেন
নাই, ভিন্সেট স্মিথ, ট্রিট প্রভৃতি ইউরোপীয়-
গণ যাহা অসাধ্যসাধন বলিয়া মনে করিয়াছেন,
রমাদেবদাস বাবু তাহা অসাধ্যসাধন আধ্যাত্ম্য ও
পরিশ্রম দ্বারা সাধন করিয়াছেন।

রাখাল বাবু আরও বলিয়াছেন—“অজ্ঞানচন্দ্র
শ্রীকৃষ্ণ রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় গৌড়রাজমালা
রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই জাতীয়
যশ তাঁহার পূর্বে বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষায়
গ্রন্থ রচনা করিয়া আর কেহ অজ্ঞান করিয়া-
ছেন বলিয়া বোধ হয় না। * * * রমাপ্রসাদ
বাবু ভারতের ইতিহাসের উপাদান হইতে
গৌড়বঙ্গের ইতিহাস সকল করিয়াছেন।

বিশাল সমুদ্ররূপ উত্তরাপথ দক্ষিণাপথের
খোঁজ লিপিমালার সার সংগ্রহ করিয়া
গ্রন্থকার গৌড়রাজমালা প্রণয়ন করিয়াছেন।
ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তি এই উপাদান-
গুলি সংগ্রহ করিতে পারিত, কিন্তু সকলেই
স্বস্ত স্বস্ত খণ্ড প্রমাণগুলি যোজনা করিয়া
উত্তর পূর্ব ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস
রচনা করিতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না।
রমাপ্রসাদ বাবু যে সমস্ত উপাদান লইয়া
গৌড়রাজমালা রচনা করিয়াছেন, তাহার
অধিকাংশই বহু পূর্বে অবিষ্কৃত হইয়াছে।
* * * ভারতবর্ষের অপরাগর দেশ বা
রাজবংশের ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া
রমাপ্রসাদ বাবুকে এই ইতিহাসখানি রচনা
করিতে হইয়াছে, ইহাই রমাপ্রসাদ বাবুর
কৃতিত্ব।” ইত্যাদি।

আমরা এই গ্রন্থকে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ব-
বিষয়ক গ্রন্থকে বৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।
আমাদের দেশে ইতিহাস নাই, কিন্তু
ঐতিহাসিক ছিল এবং এখনও আছে।
ভারতবাসী আধ্যাত্ম্য নাকি ইতিহাস লিখিতেই
জানিতেন না—কিন্তু প্রমাণ আছে, ইতিহাস
শব্দটা তাঁহারা জানিতেন, তনিতেন গাই সেই
বৈদিক যুগের আদি কাল হইতে লক্ষণ সেন
পণ্ডিত ইতিহাস নাই। মুসলমানগণ ইতিহাস
লিখিতে জানিতেন তাই তাঁহাদের রাজস্ব-
কালে আমাদের দেশের ইতিহাস কিছু কিছু
পাওয়া যায়।

প্রথমে আমরা দেখিব ইতিহাস কি?
শব্দরাচাধ্য বৃন্দাবনস্বামীকর্ত্তে লিখিয়াছেন—
উর্দুশী পুস্তকবার কথাপোখনাদি স্বরূপ
ব্রাহ্মণভাষার নাম ইতিহাস। এবং “সর্ব
প্রথমে একমাত্র অসং ছিল। ইত্যাদি স্মৃতি
প্রক্রিয়াখণ্ডিত বিবরণের নাম পুরাণ।

মহাভারতে লিখিত আছে—

যাহাতে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সমুদ্রে
উপদেশ এবং পুরাতন কথা আছে তাহাকে
ইতিহাস কহে।

বিষ্ণু পুরাণের চীকায় (৩৪১০) শ্রীশ্রী
স্বামী এই বচনটা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আর্যাদি বহু বাখ্যানং দেববিচারিতশস্যম্।
ইতিহাসমিতি শ্রোত্ৰং ভবিষ্যতু তদধর্মম্।
ঋষি শ্রোতাদি বহুবিধ আখ্যানং দেব ও
ঋষিচারিত এবং ভবিষ্যৎ অশ্রুত ধর্মকথাদি
যাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস।

এই সমস্ত উক্তিবারা বাহা যায়, ইতিহাস
কি, তাহা আর্যগণ জানিতেন এবং ইতিহাস
তাহারা লিখিতেন। মহাসংহিতায় লিখিত
আছে—

“শ্রাদ্ধাদি গিত্কার্যে বেদ, ধর্মশাস্ত্রসমূহ,
আখ্যানাবলী, ইতিহাস, পুরাণ সকল ও বিল
সমূহ স্তনাইতে হইবে।”

উপরে লিখিত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে
যে, আর্যগণ ইতিহাস লিখিতেন এবং পুরাণ
ও ইতিহাস পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষা
করিয়াছিলেন। এই ইতিহাস গেল কোথায় ?
এখন আমরা ইতিহাস নামে কোন গ্রন্থ পাই
না, পাই কেবল পুরাণ। অতএব ইতিহাস
কি হইল ? মহাভারতে লিখিত আছে—
“পুরাণে সমুদ্র মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান
বাক্তিগণের আদিবংশের বৃত্তান্ত আছে।
পূর্বে আমরা তোমার পিত্তর নিকট সে
সকল কথা শুনিয়াছি।”

অতএব ইতিহাস যে পুরাণের সহিত
নিশিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।
ইতিহাসে কেবল যে রাজারিণের বংশ বৃত্তান্ত
পাকিত না, বুদ্ধিমান বাক্তিগণের অর্থাৎ
সাধারণ বংশবৃত্তান্ত এবং সমাজের বৃত্তান্তও

পাকিত, তাহাও জানা যাইতেছে। অতঃপর
এখন পুরাণ হইতে ইতিহাসকে পৃথক করিতে
হইবে।

ইতিহাস লোপ পাইবার কারণও এই
পুরাণ সমূহ। সমস্ত পুরাণই প্রজ্ঞোতির ক্রমে
রচিত হইয়াছে। স্বতরাং যে বিষয়ে প্রশ্ন
হইয়াছে, পুরাণে কেবল তাহারই উত্তর
পাওয়া যায়। ইতিহাস সমুদ্রে যে প্রশ্ন ঘন
নাই, তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইভাবে
অনেক ইতিহাস নষ্ট হইয়াছে। সে সমস্ত
উদ্ধার করিতে হইলে বিশেষ বৈদ্যতা সহকারে
শাস্ত্রসাধার মনন করা আবশ্যক।

এক্ষণে আমরা দেখিব, এখন ইতিহাস কি
অর্থে ব্যবহৃত হয় ? ইতিহাস জাতীয় বিবরণের
বিশদ বিবরণ। বাক্তি সমষ্টি লইয়াই জাতি।
এই জড়ই ইতিহাস কোন ব্যক্তি বিশেষের
জীবন চরিত্র নহে; এইজন্যই একজনকে
লইয়া ইতিহাস হয় না, সাধারণকে লইয়া হয়।
এই জড়ই প্রধানতঃ প্রজাতি ইতিহাসের বিষয়,
রাজ্য কতিং। সিরাজুদ্দৌলা অত্যাচারী ছিলেন
কিনা, আরঙ্গজেব স্বয়ং মজ্ঞ পান করিতেন
কিনা—ইহাও অপেক্ষা সিরাজুদ্দৌলার সময়ে
প্রজাসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল, আরঙ্গ-
জেবের সারাজ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে
মজ্ঞপান প্রচলিত ছিল কিনা এই সকল প্রশ্নের
ঐতিহাসিক মূল্য অধিক। সাধারণতঃ প্রজাতি
ইতিহাসের বিষয়। তবে যেখানে রাজার
নিয়োগ প্রজার সাহিত্যে বা সম্পদে কোন মূল্য
স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—যেখানে রাজার
শাসননীতির কলে প্রজার জাতীয় জীবনে
উদ্ভাব বা অবনতির বৃত্তপাত হইয়াছে—
যেখানে রাজার আজ্ঞা প্রজার বাহ্যিক
সমুদ্রে বা প্রজাসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার
সমুদ্রে কোন বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত

হইয়াছে, সেখানে রাজার শাসননীতি
সমালোচ্য—স্বতরাং রাজ্য ইতিহাসের বিষয়।
আরঙ্গজেবের হিন্দু বিশ্বাসের অস্বকূল পবন
না পাইলে মহারাজারাজ্যের জাতীয় উন্নতির
তরঙ্গী বেঙ্গা অগ্রসর হইতে পারিত কি না
সন্দেহ; ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্তমান আকার
ধারণ করিত কি না, বলা যায় না; স্বতরাং
আরঙ্গজেবের শাসননীতি ইতিহাসের বিষয়—
আরঙ্গজেব ইতিহাসের বিষয়ীভূত।

এখন আমরা বুঝিলাম ইতিহাস কি ?
দেখাযাক এই ইতিহাস কিরূপে উদ্ধার
করিতে হয় ?

বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে ইতিহাস উদ্ধার
করিতে চেষ্টা করাই বর্তমান ঐতিহাসিক-
গণের মত। তাহাদের মূল মত এই—

(১) কোন চিহ্ন, তাম্রশাসন বা শিল্প-
লিপির প্রমাণ।

(২) স্মকালের গ্রন্থ। তাহা আবার
দেখি সময়ের অক্ষরে হওয়া চাই, কারণ সাত-
নকলে আসল খাত হয়।

(৩) পরবর্তীকালের গ্রন্থে তুল্যকালীন
গ্রন্থে যে প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে তাহাই
কেবল ইতিহাসের উপাদান স্বরূপে গৃহীত
হইতে পারে।

(৪) যে জনশ্রুতি প্রবল এবং প্রত্যক্ষ
প্রমাণের অবিস্তারী, তাহাই ঐতিহাসিকের
কেনও উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের লাস্য
বিবেচ্য এবং যে জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের
অস্বকূল তাহাই ইতিহাসে স্থান পাইবার
যোগ্য।

ইহার বাহিরে যিনি যাইবেন, তাঁহার
আলোচনা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ বিজ্ঞান-সম্মত
হইবে না। স্বতরাং ঐতিহাসিকের এই

নিয়ম বাধ্য হইয়া ইতিহাস উদ্ধার করিতে
হইবে।

এখনকার ঐতিহাসিকগণ তাহা করেন
না। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার
মৈত্রয়ে মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—“সকল
বিজ্ঞার অশুশীলনেই অধিকারী অনধিকারী
আছে, কেবল প্রত্নবিজ্ঞার অশুশীলনেই তাহা
নাই একদা তর্ক আরো উত্থাপিত হইতে
পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে তাহাই
উত্থাপিত হইয়া থাকে। তাহার প্রভাবে যে
কেহ লিখিতেছেন—যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন
—অনেক স্থলে নিত্যন্ত নির্লব্ধের মত
লিখিতেছেন।”

তিনি আরও লিখিয়াছেন—
“একে অস্বকূলকারীর সংখ্যা অল্প;
তাহাতে আবার পেশাদারের সংখ্যা অধিক।
যাহারা পেশাদার নহ, তাহাদের মধ্যেও
অনেকে আপন অধমিকার অথবা স্বার্থের
চরিতার্থতা সাধনের জড়ই অধিক লাভাশ্রিত।
এই সকল কারণে প্রত্নবিজ্ঞার অশুশীলনে
অপরিসীম অন্তরায়ের অভাব নাই। যাহারা
বেতন লইয়া কাজ করে, অথবা দেশের
লোকের নিকট টাকা হুড়াইয়া কাজ চালায়,
তাহারিগণের পক্ষে মনিবের মনোরঞ্জন লাগল্য,
আত্মপ্রাধিক্য সংগ্রহাণের লালসা এবং যে
কোনও উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের লাস্য
বড় অস্বকূল। তাহারা বিজ্ঞাপন চায়, চাটু-
কর চায়, দেশের ডকা বাজাইবার জড় লোক
ভাড়া কুর; যাহারা একটু চতুর, তাহারা
চেনা সংগ্রহ করিয়া, তাহার সাহায্যে আপন
অভিমত প্রচারিত করিতে থাকে। এই
সকল লোক চাকরী বা সুব্যবস্থা বজায়

রাখিবার জন্তই প্রাপণ করে। তুল করিলে তুল বীকার করে না; তুল দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ না হইয়া, উক্ত্যক হইয়া উঠে। প্রত-
বিজ্ঞার বাহা হয় হউক, আপন পদমাধ্যাদা
রক্ষা পাইলেই ইহার কৃতার্থ হয়; এবং
সেই উদ্বেষ্ট মানন করিবার জন্ত তুল
করিলেও, বিজ্ঞতার আড়ালে তুলগুলিকে
চাপা দিয়া রাখিতে চায়।”

বহুবর্ষী অক্ষয় বাবু এই কথাগুলি খুব
ঠিক। প্রমাণস্বরূপ বহুস্ত-অনুসন্ধান সমিতি
হইতে প্রকাশিত “গৌড়রাজমালা”র কথা
বলিতে পারি। রাজসাহী হইতে গৌড়রাজ-
মালা বহন প্রকাশিত হইল, তখন একটা
বিষয় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কলিকাতায়
ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল—শোর-প্রতিম
সখার ব্রহ্মনি মনে পড়িয়া গেল—একাতান
বাহনের সমবেত সজ্জারের জায় জয়-তন্ত্রী
বাজিয়া উঠিল—স্বাধার বিষয় শত-বহি-
ত্রিধা জয় থানা জুড়িয়া বসিল—কেহ
গৌড়রাজমালার মন্ম বুজিয়া পাইল না।
সাহায্যের জন্ত বকীয়া বিজ্ঞান সমাজের নিকট
ভিক্ষার বুলি কাধে করিয়া ধাঁড়াইয়া গেল।
পুস্তকখানি সমালোচনা করিতে যে পরিমাণ
পরিশ্রম করা আবশ্যক, তাহা বীকার করিবার
মত কেহই সমালোচনার হাত দিলেন না।
কেবল খাতির ওজনে সমালোচনা বাহির
হইল। খাতির শ্লোককে ধোঁস দেখিতে
দেয় না, তাই গৌড়রাজমালার ধোঁস কেহ
দেখিল না।

প্রশংসা দেখিয়া পুস্তকখানি দেখিতে বড়
ইচ্ছা হইল। দেখিলাম—কিন্তু দেখিলাম
কি? দেখিলাম যোগাড়ে জটী নাই, কিন্তু

রাকুনী কাঁচা। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঐতি-
হাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় লিখিয়াছেন—“রমাপ্রসাদ বাবু সে-
সমস্ত উপাদান লইয়া গৌড়রাজমালা রচনা
করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বহুপূর্বে
আবিষ্কৃত হইয়াছে।” এই সমস্ত প্রমাণই
ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ আবিষ্কার করিয়া
Epigraphia Indica প্রত্নতত্ত্বে প্রকাশ
করিয়াছেন। তাহা হইতে রমাপ্রসাদ বাবু
সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু যে তরকারীতে যে
মসলা আবশ্যক তাহা দিতে পারেন নাই—
এক তরকারীতে অল্প তরকারীর মসলা
দিয়া ফেলিয়াছেন। সাদা কথায় যাকে
“উদার পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে দেওয়া” বলে।
কর্তব্যবোধে আনন্দ বাজার পত্রিকার ভূত্রে
১৩২২ সালের ৩রা আশ্বিন হইতে ১৩২৩
সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সমগ্রহের পর সমগ্রহে
যে গুলি সকলকে জানাইয়া দিলাম। গৌড়-
রাজমালার দেখক তাহার উত্তর দিতে
অর্থাৎ খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

মিনি মংৎ, খাতির অপেক্ষা সত্যের মিনি
আদর করেন, তিনি দেখিয়া বসিলেন পূর্বে
প্রশংসা করিয়া থাকিলেও পরে প্রতিবাদের
গুরুত্ব বীকার করিলেন, কিন্তু লাভ করিলেন
“দোষ-প্রতিষেদ” গালাগালী।

“(মংৎ ব্যক্তি) ছেড়ে দিলেন পণ্ডা,
(তার) বললেগেল মতটা।” কিন্তু “খাতিরের
গেলনা জেদটা।” তালি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র
সরকারের মত লোক জেদী খাতিরদারদের
নিকট গালি খাইলেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অপরাধ, তিনি
চট্টগ্রাম বকীয়া সাহিত্য সম্মিলনে আমার

প্রতিবাদের গুরুত্ব বীকার করিলেন, অমনি
ভ্রমকলের হাঁড়িতে ঢিল পড়িল, বহুমতি
পুত্রিকা, জলিয়া উঠিল, সরকার মহাশয়কে
গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন। সরকার
মহাশয়ের মত বিজ্ঞ বিতরণ সাহিত্যিককে
একদা তাহার গালাগালি কোন ভ্রম লোককে
দিত পারে না। কিন্তু খাতিরের চোটে
তাহাও হইয়া গেল, আমিও বাদ গেলাম না।
একই নমুনা শুনিবেন। “পরিশিষ্টে সরকার
মহাশয় লক্ষ্যার মাথা বাইয়া শিষ্টতাকে
একেবারে জাহারয়ে দিয়াছেন।” “বিনোদ
বাবু নির্জলের মত আমাদের কথাই কর্তব্য
করিয়া আবাদগিক গালি দিয়াছেন”
ইত্যাদি।

সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—“বিস্ময়প্রিয়া
পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় এই
রাজমালার অবিস্তর ভ্রম বা অনবধানতা
দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে যেন বোধ
হয়, যতটা ভ্রম বা ভ্রম করিলে এতই অসুখ
আরও নির্দোষ হইতে পারিত, ততটা গুরু
করা হয় নাই।” “বিনোদবিহারী রায় স্বয়ং
প্রস্তাবস্বাক্ষরকারী।” সম্প্রতি ‘গবর্ণমেন্ট
টাইমার’ হুবহু পুস্তকের ৫৬ ও ৫৭ জন্ম করিয়া
তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।” (বঙ্গদর্শন
১২৩৪খণ্ড)

এই কথাই বহুমতি সম্পাদক এতই মধ্যাহ্ন
হইয়াছেন যে তিনি ২০শে বৈশাখের (১৩২২)
বহুমতীতে লিখিয়াছেন—
“ইহাই ‘গৌড়-রাজমালা’র সরকারী সমা-
লোচনা, এই সমালোচনার বাহার এই যে,
সরকার মহাশয় এক্ষণে গৌড়-রাজমালা
পাইয়া উহা পড়িয়া উহার দেখক শ্রীযুক্ত
রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয়কে এই গ্রন্থের প্রশংসা
করিয়া এক পাত্র লিখিয়াছিলেন। সেই

প্রশংসার এত বেগ আদিয়াছিল, যে তাহা
প্রকাশ করিবার ভাণ্ডা তিনি বুজিয়া পান
নাই। তাহার পর তিনি চট্টলের সাহিত্যিক-
বৃহৎ পুস্তকালয় হইয়া বহন কৃষ্ণবর সকলের
মনঃপ্রাণ হরিতে আরম্ভ করেন, বহন তিনি
এই গ্রন্থখানিকে একেবারে গোম্ভায় দিয়াছেন।
ইংরাজীতে যাহাকে Damning with
faint praise বলে, সরকার মহাশয় গ্রন্থ-
খানিকে তাহাই করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ
বাবু গ্রন্থখানি লিখিতে প্রম বা মত করেন
নাই, এই কথাই তিনি ‘আড়ে আড়ে’
বলিয়াছেন।

এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা নিজের
দোষ পরের স্বল্পে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত
হইতে চান। লম্বমতী সম্পাদক বলিয়াছেন
—“পরের মুখে ঝাল খাইলে এইরূপ দশাই
হয়। তিনি (সরকার মহাশয়) যদি নিজে এই
গ্রন্থের কোনও দোষ বা ভ্রম দেখাইয়া
দিতেন—তাঁহা হইলে আমাদের দৃষ্টি হইবার
কোনও কারণ ছিল না।” সরকার মহাশয়ের
মত লোককে বহুমতী সম্পাদক এই যে
গালাগালি দিতেন, ইহা কিন্তু একেবারে
বীকার উপর, কারণ বহুমতী সম্পাদক আমার
প্রতিবাদ পড়েন নাই, তিনি বড়ই স্পষ্ট
করিয়া বলিয়াছেন—“তিনি (আমি) কোথাও
কি লিখিয়াছেন, তাহাই যে সকলকে আর মত
কাজন্দুজ ছাড়িয়া পড়িতে হইবে, তাহা তিনি
বুজিয়া লইলেন কিরূপে? আমরা তাঁহার সেই
বিজ্ঞার দৌড় দেখি নাই।” ইহাতেই বুঝা
যাইতেছে যে গৌড়-রাজমালা খাতিরের
বহুমতী সম্পাদক এতই জানশুদ্ধ হইয়াছেন,
যে আমার প্রতিবাদ পড়্য আবশ্যক দেখা
করেন নাই, না পড়িয়াই সরকার মহাশয়কে
গালাগালি দিয়াছেন।

তাই বলি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বহু মূল্যবান কথাই এই একটা জীবন্ত উদাহরণ। এখনও গোড়ারাজমালার যশ অক্ষয় রাখিবার জন্ত এইরূপ অবৈধ চেষ্টা চলিতেছে, তাই রাখাল বাবু মানসী পরিকায় তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু এই প্রশংসা পড়িলে বহুমতীর, না পড়িয়া ঘোষ দিবার কথাই মনে পড়ে। অক্ষয় বাবু কথা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়। এই রাখাল বাবুও হযত বহুমতীর মতই বলিবেন, “সব কাজ কর্ম ছাড়িয়া গোড়ারাজমালার প্রতিবাদ পড়া তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই।” যদি তিনি বাস্তবিক ইতিহাস চর্চা করিয়া থাকেন, তবে আমার প্রতিবাদ পড়িলেই তিনি কখনই গোড়ারাজ-

মালার মত সমর্থন করিতে পারিবেন না। কিন্তু ভালবাসার নিকট সকলেই অন্ধ, তাই আমরা দেখিতে পাই, লোকে কাণছেলের নাম পদ্মলোচন রাখে, খুঁকার নাম রাখে ব্রজাবিন্দী, কালু মেয়ের নাম রত্ন শঙ্করী। বাহা সত্য এবং বাহা মিথ্যা তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইবার উপযুক্ত চিন্তাবল না থাকিলে এইরূপই হয়।

তাই বলি অক্ষয় বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ নিম্ন তুল দেখিতে চান না,—কেহ দেখাইয়া দিলেও গ্রাহ্য করিতে চান না।

আগামী বারে আমার বঙ্গের অজ্ঞাত ঐতিহাসিক সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ত্রিবিন্দোদবিহারী রায়।

বঙ্গ শিক্ষাসমস্যা

মাছুষ চিরকাল গর্হ্য করিয়া আসিয়াছে যে ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ। মাছুষ কিসে শ্রেষ্ঠ একথার উত্তর হযত অনেকই দিতে অসমর্থ কিন্তু সে যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব একথা সে কোন দিন স্বীকার করে নাই ভবিষ্যতে বোধ হয় করিবে না। সে এতদূর গর্হিত যে সে বানরের, রশ্মধর একথা বলিতেও তার বৃক্ক, বাজ্ঞে। মাছুষ বড় কিসে? তাহার দয়ামায়ী?—না সে কথা ঠিক নয় অনেক নিম্নস্তরের জীবও এওণের অধিকারী—পাখীর মায়া কাহার অবদিত! মাছুষ শ্রেষ্ঠ জানে—বিবেকে—তাহার সুস্থিতির ক্ষমতা আছে তাই সে বড়। তাহার ভাষা আছে তাই সে নিজে অভিজ্ঞতা

পরের কাছে জানাইতে পারে সে অপরের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা করে তাহার কি হইবে।

“The distinguishing characteristic between man and brute is reason; and reason, the faculty that sees the general rule in a special example enables man to foresee the possible or probable course of events, to make plans, to avoid danger, and to sow the seed in summer with the expectation of reaping the harvest in the fall. All other creatures, must adopt

themselves to the surrounding as well as all other conditions to his wants.”

বিবেকই মানুষকে বড় করিয়াছে। আজ মাছুষ যে ভ্রূগণের জন্ত সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে বিবেকই তাহার মূল। পাখীরা, জগত যে পুষ্করের উপর এতদিন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছে বুদ্ধি ও বিবেক যে তাহার মূল সে কথা কি কেহ স্বীকার করিতে পারিবেন? না কখনই নহে। আজ যে এশিয়াবাসী পৃথিবীতে শাস্তির বান্দা প্রচার করিতে অগ্রসর হইতেছেন ইউরোপ আমেরিকা যে আজ সেই শাস্তির বার্তা মুখ হইয়া রহিয়াছে ইহার কারণ কি?—ইহার কারণ এদেশবাসীর গভীর অসুখ জান একথা কি বলিতে হইবে। আজ পাক্তা জগত রবীন্দ্রনাথের ভাবুক্ষতা, ব্রজেন্দ্রনাথের ধর্মপ্রাণতা, ভাস্কর জগদীশ-চন্দ্রের ও প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার বিভোর হইয়াছে; কেন?

বিবেকই মানুষকে বড় করিয়াছে। এই বিবেক কোথা হইতে আসিলে? ইহা কি জীবের মধ্যে মহাযুগে মধ্যে নিহিত আছে, না বাহু জগতের প্রভাবে মাছুষ জানী হয়? পুষ্ক্রে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেন এইজন্য মাছুষের মধ্যে নিহিত থাকে ইহার জন্মবিকাশ হয়। এই গুণ লুক্কায়িত থাকে পরে ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতে থাকে। ভিষাগুর মধ্যে যে হস্ত পদাদি উৎপন্ন হইবার জন্ত একটি ভাগ নির্দিষ্ট থাকে বিবেকেরও সেইরূপ থাকে।

“According to theory of evolution the nature of higher animals was

assumed to be predetermined by the mysterious disposition of the original life plasm, in about the same way as the chicken, with all its limbs, its bodily and psychic faculties is some how pre-existing in the ovule of egg.”

কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে এক্ষণে আর কেহ একথা বিশ্বাস করিতে চান না। এক্ষণে বৈজ্ঞানিকগণের মত যে, বাহ্যিক প্রয়োচনাই জান উৎপত্তির প্রধান উপায়। মানুষ জগতের দেখিয়া শুনিয়া বুদ্ধি। সমজাইয়া তবে শিখে তবে সে উন্নতির মার্গে উঠিতে থাকে। যে কোন জাতি চেষ্টা করিলেই উন্নতির মার্গে উঠিতে পারিবে—জন্মের জন্ত তাহার কিছুই আসিয়া যাইবে না। সে নীচ বংশে জন্মিয়াছে অতএব সে কিছুই শিখিতে পারিবে না, তাহার বুদ্ধি মোটা এশিকা এখন আর জগতে স্থান পাইবে না। এখন বলিতে হইবে, যে চেষ্টা করিবে সেই উঠিবে—এখানে যিশুখৃষ্টের ভাষা বলিতে হইবে—যাহার থাক। দাও তোমার জন্ত উদ্ভুক্ত হইবে, চেষ্টা কর তুমি বাইতে পারিবে—এখন তোমারই জন্ত—অগ্রসর কর তোমার নিশ্চয়ই মিলিবে—এখানে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে না। আমি ভারতে জন্মিয়াছি অতএব আমার শিক্ষা ইহার অধিক হইবে না এ দাবী আর মনে স্থান দিও না। আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মাই নাই অতএব আমার শাস্ত্র আলোচনায় ফল নাই একথা এখন প্রচার করিলে চলিবে না।

“The majority of the naturalist of this age hold that the growth of

the higher life is not directly due to the latent qualities of ancestors, but is the result of new acquisitions conditioned by extended experiences under definitely given surroundings. The progress which mankind is making still in its onward march to the planes of higher existence, is due to the lessons of life and not to the mysterious potencies of premordial germs."

জ্ঞানের দ্বার কাহারও একচেটিয়া নহে—হইতে পারে না। কেহ যদি ইহা একচেটিয়া করিতে চায় আমরা তাহাকে অঙ্গপ করিতে নিন। প্রকৃতির চক্ষে আমরা সকলেই এক, তাহার চক্ষে প্রভেদ নাই, থাকিতেও পারে না। কেহ যদি সে প্রভেদ রাখিতে চায় তাহা কালের সোতে টিকিবে না, তাহার প্রতিবাদ বাসুকরাশির বাদেব জ্বায় দুইয়া যাইবে। তাই আজ কাহারও শাস্ত্র আলোচনায় বাধা নাই, তাই আজ কেহ নিজের হীন জন্মের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য নহে। আজ জ্ঞানের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত। ইহার রত্নরাশি যত ইচ্ছা লও ইহাতে কেহ বাধা দিবে না। আর যদি কেহ বাধা দিতে আইসে তাহা কণিক, সে কালের মুখে ভাসিয়া যাইবে।

জ্ঞান অর্জন করিতে ইচ্ছে—জ্ঞান অর্জন করিব কি করিয়া?—ভাবার সাহায্যে—কোথায় কি হইয়াছে, হইতেছে, ইহা সবই ভাবার সাহায্যে অর্জন কর। তোমার যৈ ভাষা আছে যাহার লজ্জা তুমি নিজেকে অজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে কর তাহারই সাহায্যে আজ জ্ঞান অর্জন কর। তোমার ভাষা পুষ্ট করিয়া আজ তোমার জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া

দাও। তোমার দেশবাসীর যাহার যত ইচ্ছা লইয়া যাউক এই অনন্ত সমুদ্র কেহ শোষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিবে না।

‘গৃহস্থ’র মূলমন্ত্র—“মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয়েই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতেও শিক্ষাদান করিতে হইবে। এজন্য ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে অকালের মধ্যে পরিপুষ্ট ও সম্বর্তনমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় যোগ্য লেখক, অধ্যাপক, অমুদ্রাবাসককে অনন্তকথা হইয়া জীবন অতিবাহিত করাইতে হইবে। এই সাহিত্য সেবিগণের অঙ্গ চিন্তা দূর করিবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে “সংরক্ষণ নীতি” (Policy of Protection) প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহারিগকে উপযুক্ত মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।” সকলেই এ কয়েকটি ছত্র প্রতিমাণেই পড়িয়াছেন কিন্তু কখন ইহার উক্ত ভাব বদ্বয়স করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? কখনই ইহাতে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? মৌখিক সম্বন্ধভুক্ত থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে লাভ কি? জগতে ত্যাপই মহৎ—কখনই আজ মাতৃভাষার জ্ঞান কতটা তাগ করিতে পারেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? আজ কখনই প্রাণের সাহিত্য বলিতে পারেন—

“দ্বন্দ্বির রচি মা তোমার লাগি
পদমা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,
তোমারে পুজিতে মিলাছি জননী
স্নেহের সরিতে করিয়া বান,
জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে
(আমি) চাহিমা অর্থ চাহিমা মান।
যদি তুমি দাও তোমার ও ছুটি
অমল কমল চরণে স্থান।”

যদি এখনও বলিতে না পারেন যাহাতে শীঘ্র বলিতে পারেন সে বিষয়ে বিশেষ স্বেচ্ছিত হউন। সে জ্ঞান প্রত্যাহই চেষ্টা করুন। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা লাভ না হইলে উন্নতি কোথায়? আজ বিশপশতাবীর যৌর সংগ্রামে যের দিনে আমরা কোথায় থাকিব একবার চিন্তা করুন। আমাদের কোন কিছু বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে একটি বিদেশী ভাষা আশ্রয় করিতে হয়। ইহা বড় সোজা কথা নহে। ইহা কয়জনের ভাগ্যেই বা ঘটয়া থাকে? বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে অন্ততঃ ১০ বৎসর সময় লাগে। শিক্ষালাভের ভিত্তির জন্ম ১০ বৎসর কাল বড় হয়। ইহার Matriculation এর ছেলের বয়স দেখিয়াছেন তাহার। সকলেই যৌবন হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে প্রায় ১৮ বৎসর বয়সে ছেলেরা এই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে। বাঙ্গালীর এখন জীবন গঠিয়াছে। শিক্ষার ভিত্তির জন্মই এখন ১৮২০ বৎসর কাল ব্যয়িত হয় তখন উচ্চ শিক্ষার সময় কোথায়? তাহা ছাড়া আমাদের কায়েতে যাহাতে উচ্চশিক্ষা বলিয়া থাকি তাহা পাশ্চাত্যদেশে ফুলেই লম্পর হয়। তাহা ত ইহারই কথা। তাহারে ত ভিত্তির জন্ম এককাল কেপন-করিতে হয় না। ইংলণ্ডের ফুলে যে সমস্ত পুস্তক বিশেষতঃ বিজ্ঞান পড়ান হয়, আমাদের দেশে সেগুলি কালেজে পড়ান হয়, কাজেই আমাদের শিক্ষা উদ্ভাবের অপেক্ষা কম হয়।

আমাদের দেশের সকলকেই বাঙ্গালা শিখিতে হইবে এরূপ একটি নিয়ম বা প্রথা বহনই হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রবাস বলিতেছি কেন না কথাটা আছে বটে কিন্তু তদুপায়ী কোনও কাজই হয় না। একথা

জানিয়া হইত অনেকেরই রাগ করিবেন কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিয়া দেখিবেন যে আমি এক্ষেত্রে সত্য ছাড়া আর কিছু বলিতেছি না। আমরা এই ভারতী অর্থ্য বাঙ্গালা শিখাইবার ভারটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়াছি। আর বিশ্ববিদ্যালয় সেটা ফুল কালেজের কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। কর্তৃপক্ষ-গণ পণ্ডিতমহাশয়ের উপর এবং তিনি ছাত্র-দের উপর ভার হস্ত করিয়াছেন। ফুল কালেজে যে বাঙ্গালা পড়া হয় তাহা তামাসা মাত্র। সম্ভবে একদিন বাঙ্গালা হয় কোন কোন ফুলে ছুইদিনও হইয়া থাকে। শিক্ষার্থীরা কিম্বা বাঙ্গালা পড়ে তাহা কাহারও অবদিত নহে। অনেকেরই বাঙ্গালা একটা পড়িবার জিনিস বা শিখিবার আবশ্যকতা আছে মনে করেন না। তাহার চিঠি পত্র সবই ইংরাজিতে লিখেন—আমি এক কৃতবিদ্য ছাত্রের কথা জানি, তিনি মাতাকে পত্র লিখিবার সময় পত্রের শিরোনাম ইংরাজিতে বাটার টিকানা ও তারিখ লিখিয়াছিলেন তাহাতেও তিনি কান্স হন নাই, পত্রের মধ্যেও ছুই চারিটি ইংরাজি শব্দ ছিল। বলা বালায় মাতা ইংরাজির কোনও ধারই পারিতেন না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে একটু কড়া কিছু নিয়ম করিলে বোধ হয় এ অস্থ-বিধাটি দূর হয়। তাহার পরীক্ষাগার সম্বন্ধে ইংরাজি tutorial class সম্বন্ধে অনেক আইন কাছান কাছিয়াছেন ফুল কালেজের কর্তৃপক্ষগণ তাহা মানিয়া চলিতেছেন। আর এটুকু কি চলা সম্ভব।

বাঙ্গালার আদার যথেষ্ট কম একথা বলিলে রাগ করিবার কিছুই নাই। Matriculation এ ইতিহাস বাঙ্গালায় লেখা চলে কিন্তু কখন

ছাত্র বাঙ্গালায় লিখেন এতাবাদ কি কেহ রাখেন। অনেক ছাত্রই বলেন যে ইংরাজিতে লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ। বোব কাহার? ছাত্রের না শিক্ষকের?

আমাদের অতি শীঘ্রই ভাবকে সর্বস্তোমুখী করিয়া লইতে হইবে—আর সেইগুলি বিশ্ব-বিজ্ঞানে ঢালাইবার বন্দবস্ত করিতে হইবে। হইবে বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, উদ্রিখা পড়িয়া লাগিতে হইবে। উচ্চশ্রেণীর ইতিহাস ভূগোল প্রণয়ন করিতে হইবে। ছাত্রেরা যাহাতে নিজ ভাষায় লেখে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতে হইবে। বাঙ্গালায় যাহাতে ছাত্রেরা আত্মহৃদে তথ্যবিষে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

বঙ্গের সাহিত্য সম্পদ জগতের কোনও সাহিত্যের নিকট হেয় নহে। বাঙ্গালায় উচ্চ-পরের সাহিত্যের অভাব নাই। অভাব কেবল পাঠকের। আমাদের স্থূল কালেজ এখনও অনেক অপর্যাপ্ত গ্রন্থ পড়ান হয়। সেইগুলিকে বলাইয়া, ববীন্দ্রনাথের ‘বিজ্ঞানজ্বালার লেখা পঞ্চ ঢালাইতে হইবে। বস্তুমাত্র প্রভৃতি সাহিত্য মহারথিগণের অমূল্য গ্রন্থাদি পড়াইতে হইবে। ভারতের উচ্চতর সকলের প্রাণে প্রাণে ঢুকাইয়া দিতে হইবে। অনেকে বলেন বাঙ্গালায় উচ্চরের গ্রন্থে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা স্থূল চলিতে পারে না। বরীয়া লইলাম এমন অনেক জিনিষ আছে—কিন্তু তাহা হইলে Walter এর কেতাব চলিতেছে কি করিয়া। বাঙ্গালা যে দোষে দুষ্ট, Scott এর লেখা কি সে দোষে দুষ্ট নহে। বরী Scott এর লেখা অব্যাহত চলে তখন বাঙ্গালা চলিবে না কেন?

স্থূলপাঠ্য পুস্তকাদি অনেক সময়ই অতি অপকৃত। ইহাতে শিক্ষা হয় না। ইহাতে

মনের তেজ হয় না। ইহাতে বালককে সর্বদাই মস্তক ছেঁট করিতে বলে, কোথাও বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে বলে না। যাহাতে মধ্যম্য শিক্ষা দেয় না সেতর অপদার্থ জিনিষ পড়াইয়া কি কিছু লাভ আছে। বালক বিনবী হইবে সত্যবাহী নয় হইবে সত্য কিন্তু আবশ্যক মত কি সে তেজবী হইবে না? তাহাকে কি সমস্ত বিষয়ই নির্ভর্যে সন্মুখ করিতে হইবে? যে সাহিত্য একরূপ শিক্ষা দৈয় সে সাহিত্য যুগ্ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কমাগুণ কখন?—যে কমা করিতে পারে? যাহার শক্তি আছে সেই কমার অধিকারী। একজন মৃত্যুকে আমি যদি মারি আর সে যদি কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে কি বলিবে সে আমার কমা করিয়া গেল? কাজেই মাঘব গড়িতে গেলে সব গুণের শিক্ষা দিতে হইবে। যে সাহিত্য একরূপ শিক্ষা দিবে না, যে সাহিত্য কেবল শ্রদ্ধাকরের গুণ শিক্ষা দিবে, তাহাকে বর কলিয়া দিতে হইবে। তাহা সাহিত্য-ক্ষেত্রেই আগাছা। কিন্তু আমাদের এতই দুর্ভিক্ষ যে একরূপ পুস্তকবিহীন আমাদের বালকদের শিক্ষার জন্ত পাঠ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আমাদের স্থূলর জ্ঞান, পাঠশালায় জ্ঞান পুস্তকাদি রচনা করিতে হইবে। আজ কাল আধ্যাতিকীয় দ্বার পুস্তক আর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে স্থান পায় না। কেন? অনেকই বলেন ইহা দুয়বী। বীরত্ব কাহিনী পৌরাণিক ইহা ভারতবাসীর মূলেই শোভা পায়। ইংরাজি একখানি বই খুলিয়া পড় দেখিবে তাহাদের দেশের বীরত্ব কাহিনী প্রতি ছন্দে লিখিত, তাহাদের বদেগপ্রেমিকতা প্রতি অক্ষরে প্রতীক্ষিত। স্বহৃদ্যরমিত বালকগণ ইহা হইতে কি শিক্ষা করিবে? বদেগপ্রেমিকতা

কখনই রাজস্রোহিতা নহে। কে নিজের ছেলে নিজের ঘর নিজের দেশকে না ভালবাসে? ইহাতে দোষ নাই। যে বলে সে পাগল হইয়াছে।

বিশ্ববিজ্ঞান যাহাতে এ বিষয় লক্ষ্য করেন তাহার জ্ঞান আমাদের অশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। গুড আর্থাট মাসের ‘গৃহস্থের’ সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব শীঘ্র আলোচনায় লিখিত হইয়াছে—“এই সময় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ যদি তাহারিগণকে (বিশ্ব-বিজ্ঞানযের কর্তৃপক্ষগণকে) ধরিয়া পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের বন্দবস্ত করিয়া লন তাহা হইলে আজ না হয় কাল অবধি আমাদের আশা ফলবতী হইবে”। বিশ্ববিজ্ঞানযের কর্তৃপক্ষগণের যাহাতে এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে সেতর চেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে। আমরা নিজেদের ভাষা জ্ঞানার্জন করিব ইহা আর অধিক কি? একরূপ বলিবার আমাদের একটা দাবী আছে। ইহা তড়িৎ নাই। এতটুকু দাবী তাহাদের গ্রাহ্য করিতেই হইবে। যাহা জায়া তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। আমরা যদি বিশ্ববিজ্ঞানযের উপযোগী করিয়া সমস্ত জিনিষই লইতে পারি তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা আমাদের এই জায়া দাবী মঞ্জুর করিবেন।—আমেরিকা আজ ফিলিপাইনগিকে স্বাধীনতা দিতেছেন আর আমরা নিজের ভাষায় জ্ঞান অর্জন করিব এতটুকু পাইব না একরূপ হইতেই পারে না।

একণ্ঠে আমাদের কর্তব্য হইতেছে বিশ্ব-বিজ্ঞানযের উপযোগী পুস্তকাদি প্রণয়ন করা। আমদিগকে অধিকাংশ স্থলেই অস্বাদ করিতে হইবে। প্রথমে অস্বাদ না করিলে আর উপায় নাই। আমাদের শেষ উপযোগী

করিয়া টিক করিয়া লইতে হইবে। সাহিত্য-পরিষদ এ বিষয়ে অনেক কাজ করিতেছেন বলিয়া অনেকে বলেন কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এখন আমরা কর্তব্য সমুদ্রের দিক তাকাইয়া দেখি তখনই আমাদের স্বরূপ উপস্থিত হয়। তখনই মনে হয় সাহিত্য-পরিষদের কাজ অতি অল্প হইতেছে। বিশেষতঃ এই দুই বৎসর সাহিত্য-পরিষদ দেশের ও দেশের না হইয়া কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মিলন মন্দির হইয়াছে—কয়েকজন শিক্ষিতের আলোচনার আগার হইয়াছে। দেশের লোক তাহাতে বাদ পড়িয়াছে। মাননীয় রাখালকন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—প্রকৃত দেশবাসী বা পড়িয়াছে। শুধু বঙ্গের কেন ভারতের অধিকাংশ লোকই পঞ্জিবাসী মূখ্য নিরক্ষর। সাহিত্য-পরিষদ তাহারিগণকে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু তাহারিগণকে বাদ দিলে ভারতের উন্নতি কখনও কি হইবে? জ্ঞানের বাণী নিরক্ষর কৃষকের মধ্যে প্রচারিত হইবে—শোকানবার মজুর—দোষা নাপিত কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। রামেন্দ্র বাবু তাই বলিয়াছেন—“বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নিষ্ঠাচন চলিবে না। প্রকৃত দেশবাসীকে বাদ দিয়া আলোচনা করিবার সময় এখনও বঙ্গ আসে নাই। বিলাতি বিশেষজ্ঞদের ‘আলোচনার জ্ঞান অসংখ্য পরিদর্শন আছে কিন্তু ভারতে বিশেষজ্ঞ কয় জন? তাহাদের এখন প্রচার কার্যে লাগিতে হইবে—হাটে মাঠে হাটে জানের বাজ চড়াইতে হইবে বঙ্গ হইতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিতে হইবে। তাহার বসিয়া আলোচনা করিবেন আর দেশবাসী আধারে মরিবে ইহা কি উচিত?

পরিষদের কর্তব্য এখন দেশে কি প্রকারে জানের বীজ অঙ্কুরিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য করা, তৎক্ষণ প্রাতি সম্বাহে সাধারণের উপযোগী বক্তৃতা করা আবশ্যক। তাহাতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি বেশ সরল ও সরসি ভাষায় প্রচার করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিতরণ করা। যদি একান্তই বিতরণ করিতে না পারেন মুদ্রণ-বাধ্যদি লইয়া বিক্রয় করা। কিন্তু সে সব কৈ? সাহিত্য-পরিষদের মাসিক একটা অবিশেষণ হয়, তাহাও আবার বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান-পরিষৎ-পত্রিকা সাহিত্য-পরিষদের পুথ্যজ্ঞ—ইহাতে মৌলিক গবেষণাদি প্রকাশিত হয়। ইহাতে অল্প কিছু স্থান পায় না। এইরূপ পত্রিকার মূল্য যথেষ্ট স্বীকার করি কিন্তু সাধারণের কয়জনের উপকার তাহাতে হয়? তাহাতে মননমতির পুথি প্রকাশিত হয় কিন্তু কয়জন—(সাধারণের কথা বাদ দিয়া বলিতেছি)—উক্ত সভার সভাই বা এ সব পাঠ করেন সে কথা কি পরিষদের কর্তৃপক্ষগণ জানেন?

ঐশ্বর্য ধরনের পত্রিকার আবশ্যকতা নাই বলা বৃথতা স্বীকার করি; কিন্তু সাধারণের উপকার হিসাবে উহার মূল্য সামান্য বলিতে বাধ্য। গত বর্ষীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-সাধারণ সভাপতি বলিয়াছেন—“বড় উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট বখনই গিয়াছি তখনই কিছু লাভ করিয়া অসিয়াছি। সেই দিন প্রঙ্গল ক্রমে তিনি বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের কার্য-ক্ষেত্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি সুপেক্ষ যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষদ যদি সেই সমস্ত বস্তু ক্রোড়ীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে

পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্যের জন্ত সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্ভাবিত মুখ্য কর্তব্য।”

এই হিসাবে সাহিত্য-পরিষদ অতি অল্পই কাঙ্ক্ষ করিয়াছেন বলিতে হইবে। আশ্রয় মতে তাঁহাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকারানি মাসিক হওয়া কর্তব্য আর তাহাতে দেশের ও দূরের প্রয়োজনীয়—চাষাবাসের কথা—আখ্যার কথা—দলদলের উপায়ের কথা—সাধারণ বিজ্ঞানের নানা তথ্য থাকা দরকার। যদি নিত্যন্ত আবশ্যক হয় বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ত্রৈমাসিক পত্র ও মাসিক অবিশেষণ থাক। সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে যে সকল প্রবন্ধ প্রণীত হইবে সবগুলিই তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া জনসাধারণে প্রচারিত হইবার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। Asiatic Society প্রকৃতি বীহাদের হাতে এটি গঠিত তাঁহারা সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন না সভা। কিন্তু সে সভা সাধারণের সম্মতি নহে, তাহাতে সাধারণের দাবী অনেক কম আছে। সাহিত্য-পরিষদের উপর প্রত্যেক বাঙ্গালীর দাবী আছে। কাজেই বলিতেছি তাঁহাদের পত্রিকায় সাধারণের উপযোগী তথ্যাদি প্রকাশ করিতে হইবে।

আজ যদি আমরা সাধারণ লোককে বাদ দিয়া উঠি তাহা হইলে কালই তাহাদের অল্পমতির ভঁরে নিমগ্ন হইবে। সমস্ত জাতিকে সঙ্গে লইয়া উঠিতে হইবে, তাহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই। কাজেই সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

যে দিন বাঙ্গালার শিক্ষা প্রচারিত হইবে সে দিন আমাদের দেশ সভ্যতার মার্গে আরও উন্নতি। তখন স্বীকারোক্তা পথ

অনেক উচ্চ স্তরের শিক্ষা পাইবেন। তখন কৃষকসুল ও বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে চাষ করিতে শিখিবে।—তখন বাঙ্গালী আবার গুহলা

হুফলা শস্যশ্যামলা হইবে—বাঙ্গালী ভূমি কি তাই দেখিতে চাও—তাহা হইলে কিসে ভাষার উন্নতি হইবে চেষ্টা কর।

ত্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ

(৯৩০ পৃষ্ঠায় পূর্বে প্রকাশিত অংশের পর)

ইয়োরোপে এই ভাগ্যভাগ প্রণালীর কিংবা স্বেচ্ছ লক্ষণের কবিতা যে নাই তাহা নহে। বর্তমান ইয়োরোপে সাহিত্যিকতার ভাঙার, ওই কুৎসে, ভাল মন্দ যাহাই হোক, প্রত্যেক জাগ্রত ব্যক্তিই নিজের ব্যক্তিগত মনন বিশেষিত করিতে চায় বলিয়া, যে কোনরূপেই হোক একটা ‘সুতন কিছু’ করিয়া ফেলিয়া সকলের কৌতুহলভাজন এবং দর্শনীয় হইবার জন্ম মাথা ঘামাইয়া অসংখ্য লোক লাগিয়া আছে। সাহিত্যে, শিল্পে, শব্দ-চিত্র-ভাস্কর্যে, কৌতুক কথায়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে, এমন কি বুদ্ধিকর ক্ষেত্রে পর্যন্ত এইরূপে মৌলিক হইয়া পড়ার একটা আভিবিজ্ঞ বৈকি ওইদেশে বেগপতিক প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। কলা-বিভাগের প্রত্যেক তরফেই একদিকে যেমন বক্ষণশীল দল নানাকল্প ছটপট ছুঁবার বা হাফাকার করিয়া প্রাচীনতর পূজ্যসীমা রক্ষা করিতেই লাগিয়া আছেন, অন্যদিকে তেমনি উন্নতিশীল এবং সাহিত্যিকের দলও সমস্ত সীমা শিকলকে পরদলিত করাই যেন একটা মহৎ কার্য মনে করিয়া চলিতেছেন। ইহার ফলে সকল তরফেই দ্রুত স্থিতির এবং অনবস্থ আশ্রয়ের শিল্প উপাঙ্গন কম হইতেছে; কিন্তু মহত্বের মানসভূমি—দৃষ্টিভূমি—নানামুখী

রীতিপ্রণালী এবং আদর্শের ভূমি অভাবনীয়-রূপে প্রসার লাভ করিতেছে। এই ব্যাপারের উত্তর দল এবং দৃষ্টান্তের সাহায্যে ভবিষ্যতের পথ বিস্তারিত হইয়া বরং উত্তরাদিকারী এবং উন্নত শক্তিশালী অর্থচ সংঘত আদর্শ সাংকেয় পক্ষে যে অশেষ সুবিধা ঘটিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে বর্তমান ইয়োরোপের অনেক একদেশ-গামী সাহিত্য-মহিমা ও ইতিহাসিকভাবে ভবিষ্যৎ সাহায্যের উপকরণ নাই নহে। ইদানীং ইয়োরোপীয় সাহিত্যসমাজ ধর্ম কিংবা কলাবিভাগের সর্বত্রই, মোটের উপরে, উপস্থিত প্রাণি অপেক্ষা বরঞ্চ ভবিষ্যতের প্রাণিই যে সমগ্রিক পরিদ্রুত হইতেছে, তাহা পরিদ্রুত মাঝেই বীজাকর করিবেন। মৌলিকতা এবং উদ্ভাগ-গাভিরা, বলিতে কি উন্নততাই বরং ব্যক্তিগা নিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংলও অপেক্ষা বরঞ্চ ফ্রান্স এবং জর্মণীতেই এইরূপ সাহিত্যিকতার দৃষ্টিভূমি অধিক। ইংরাজজাতি প্রাচীনতঃ রক্ষাপ্রবণ। এই জাতির মধ্যে, মহিমামিত অত্যন্তের স্থির সমুজ্জল মাধ্যম গতিকেই, রক্ষাশীলতার একটা আদর্শ এত বলবান যে, তাহার কক্ষী এবং চিন্তাশীলগণ সকল বিভাগে সাহিত্যিকতাকে যেন নিত্যন্ত ভয় করিয়া চলে

—প্রাচীন মনোয় আদর্শকে নানাবিধ মায়া করিয়াই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন। কোন নূতন পদ্য উদ্ভাবিত হইলে, ইংরাজ প্রথমতঃ যেন অজ্ঞাতভিত্তি দৃষ্টান্ত পরিদর্শন পূর্বক নিজের চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে উহার সঙ্গতি চেষ্টা করিয়াই সাধনায় মনোনিবেশ করেন; এবং দীর্ঘ সমস্ত সাধনা ক্রমে অনেক সময় আদিম উদ্ভাবক জাতিকেও অতিক্রম করিয়া যান। নূতন নূতন ভাবের প্রবল তরঙ্গগুলি ইংলণ্ডে আসিয়াই যেন চাক্ষুশ পরিভাগ্য করে, এবং একনিষ্ঠ তদন্ত সাধকগণের সাহায্যে দীর্ঘ দীর্ঘে বিশ্বপরিদৃষ্ট হইয়া উঠে। ইংরাজের এই গুণ সকল বিভাগেই নানাবিধ লক্ষ্য করিয়া পরিবেশন।

জগৎবিভে বিশেষতঃ ফরাসী দেশের কব্যা সাহিত্যেই যেন এই মৌলিকতার হুজুগ সর্বাপেক্ষা অধিক। ফরাসীর অন্তঃকরণ অনেকগুলা কবি এবং লেখকের ভিতর দিয়া, বিগত শতাব্দীর শেষভাগে অত্যাকর্ষণ্য ভাবে সাহিত্যের প্রাচীন ভাবসীমা এবং রীতি-প্রণালীর প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। ইংরাজ পণ্ডিতগণ কৌতুকভরে বলিয়া থাকেন, প্যারীসবন্দীতে প্রতি ৫ বৎসরেই নূতন নূতন কাব্যরীতি এবং মৌলিকতার হুজুগ উদ্ভূত হইয়া বুধদের ছায় বিলীন হইতেছে। এই সমস্ত বুধ হইতে যে সাহিত্য সমাজ কিছুমাত্র লাভ করেন না, তাহা নহে; প্রত্যেক দলদ্বন্দ্বের মধ্যেই তাহার চরম-পরিণতির অন্তরালে একটানা-একটা স্থলক্ষণ না থাকিয়া পারে না—উহার সম্পর্কেই সমাজ লাভবান হয়। সাহিত্যপণ্ডিতগণ জানেন, এইরূপে ফরাসীদেশে এবং তাহার দেহদেশে সমগ্র ইয়োরোপে নানান আদর্শবাদী এবং চরমপন্থী কবিতাসেবকের দল

জগৎগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক দলের মধ্যেই দুই একজন নানাবিধ উত্তরোত্তর কবি উদ্ভূত হইয়াছেন। তাহাদের কেহ বলিতে চাহেন যে, কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য কেবল ছন্দের নব নব লীলা এবং কোমল-নিষ্ঠপদাবলীর চমৎকারিতা সাহায্যে পাঠককে আবিষ্ট করা বই নহে; হুতরাং তাই উদ্দেশ্য সাগাধা করিতে যদি ব্যাকরণের ভুলও করিতে হয় কিংবা অর্থহীন পদব্যবহার ব্যবহার করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আবার, অগ্রদল বলিতে চাহেন যে, আমাদের মনোমধ্যে যে ভাব বাগ্মিয়া উঠে শব্দ প্রকৃতির মধ্যে তাহার এক একটা কারণরূপ আছে; দার্শনিক কিংবা নিম্নবর্গক ব্যাক্ষ্যের সাহায্যে এই কারণরূপ স্পষ্ট করার নামই কবিতা। হুতরাং, তাহাদের মতে কবিতা একটা গুণ বই নহে। যে-কোনরূপ শব্দের সংযোগ বিয়োগ সাহায্যে এই গুণ ভীষিয়া পাঠকের মনোমধ্যে ভাবের স্পন্দ জাগাইতে পারিলেই কবি। এই আদর্শের বশীভূত হইয়া সঙ্গীত হবার ক্ষেত্রে অনেকে যেমন 'ভূতান গাহিতেছেন', 'যুদ্ধ বাজাইতেছেন' সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শব্দ প্রকৃতির ভূতান রচনা এবং যুদ্ধ রচনা চলিতেছে। আবার কেহ কেহ, এইরূপে উচ্চারিত শব্দের অর্থ রেখার জাল বুনিয়া (চিরের আদর্শে) পাঠকের মনোমধ্যে কেবল নিজের মগ্নি-স্থিত 'মুখের চিত্র' আঁকিতেছেন বলিয়াই আপন করেন। এমন সাহসী ব্যক্তিরও অভাব নাই, যিনি বলিয়া থাকেন যে অর্থ সম্পর্কে কবি বা পাঠকের মধ্যে কোনরূপ মিল কিংবা সম্মতিতা থাকার আবশ্যকই নাই। কবি নিজের মনের মতন গাহিয়া যাইবেন; পাঠক নিজ মনের মত উহার অর্থ বুঝিয়া লইবে। রবীন্দ্রনাথের মানসী এই হইতে দুইটা পংক্তি

উদ্ধার পূর্বক এই আদর্শটি বুঝাইতে পারি:—

আমার মনের ভাবে আমি এক গেয়ে যাব
তোমার মনের মত তুমি বুকে যাবে আর।
বলা বাহুল্য, এই রূপে চিত্র এবং সঙ্গীত
কলার রাজ্যে অনেক সময় অনধিকার প্রবেশ
করিয়া, এতদ্বারা ভাবে দলবদ্ধ হইয়া, অপিচ
সাহিত্যের প্রাচীন আদর্শকে নানামতে
ভিন্নতার পূর্বক ইয়োরোপে অগণ্য ব্যাক-
শিল্পী গ্রন্থ রচনা করিয়া চলিয়াছেন।
প্রাচীনতা-নিষ্ঠ স্বাধীনগণ তাহাদের নিশ্চয় করেন;
উদাহরণকে 'সর্বসাংহিত্যের সংহারক' 'উদারগ-
গামী' 'অধোগামী' বা 'অধঃপতন' নামে
নিদেশ করেন। এই সমস্ত দলই আধুনিক
সাহিত্যে decadent, Parnassian,
Symbolist, Magii প্রভৃতি বিজ্ঞপ্যাক
নামে চিহ্নিত হইতেছে। অনেক সময়
তাহারা পরের স্বার্থকে 'স্ববুদ্ধি' প্রকাশ পূর্বক
'হাসিয়া উড়াইয়া' নিজেদেরও সংক্ষেপে এই সমস্ত
অধ্যায় আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত
স্বরূপ বদলেয়ার ডার্টেন মৈত্রলিঙ্ক ভারহাণ
মরিয়াম বিগ্‌নিয়ার রোমেনব্যাক পীলান বোই
প্রভৃতি নানাবিধ দ্বিধ কবিতা লেখকের
নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহার
কাবের ক্ষেত্রে ই প্রাচীন 'অপলিতার' বিপরীত
অনুভব করিতে বন্দপরিকর। "উৎকৃষ্ট
কবিতা এক একটা হেয়ালী বই নহে
"(there should be always an
enigma in poetry)। "To name an
object is to take three quarters
from the enjoyment of the Poem,
which consists in the happiness of
guessing little by little; to suggest,
that is 'the dream.'"—এই সকল কথা

ইহাদের মধ্যস্থত আদর্শকে সক্ষিপ্ত করিতে
পারা যায়। এখন, দল মাজেই উপরে-উপরে
কয়েকজন বিশিষ্টব্যক্তি এবং অপর সমস্ত
অনুচরণকারী লইয়াই গঠিত হয়; এইরূপে
এ সকল দলের মধ্যে কতিপ বিশিষ্ট কবিও
রহিয়াছেন। ইহারা আদিবংশে একযোগে
মতবাদ অবলম্বনে আত্মপরিচয় করিয়া
আসিলেও, ক্রমে আপনাদের মধ্যে সাহিত্যের
সনাতন কিংবা সাধারণ অহুতবের পথার
কিছুনা-কিছু সময় করিয়া দলের বাহিরেও
বহুলোকের স্বীকার এবং সম্মানলাভ করিয়া
ছেন। তাহাদের শ্রেষ্ঠ উপাধ্বননসমূহের
বিচার করিয়া ক্রমে পণ্ডিতগণের এই ধারণা
জন্মিয়াছে যে, প্রত্যেকদলের মধ্যেই কিছু না
কিছু সত্য আছে; অর্থাৎ, কাব্য চিত্র বা
সঙ্গীতের তরফে অনধিকার প্রবেশ করিয়াও
সময় সময় এমন সমস্ত উপায় উপস্থিত
করিতে পারে, যাহাতে উহার প্রাতি অন্ততঃ
বিষয়টুকু কথিয়া যায়, স্থলবিধে সংক্ষেপে
বিচারকের চক্ষে উহা একটা সত্য উপাধ্বনন
বলিয়াও প্রতিভাত হয়। তাহাদের স্থল
আদর্শটুকু অশ্বমেজ। অনুচরণকারীর পক্ষে
শ্রেয়শ্বর না হইলেও, উহা একটা সুরধার পথ।
হইলেও, হীনপুণ্য সাধকের পক্ষে এককাল
অধ্যায় নহে। তাহাদের বদলেয়ার ডার্টেন
এবং আধুনিক বেলজিয়মের মৈত্রলিঙ্ক ও
ভারহাণ প্রভৃতি কবি এইরূপে সঙ্গীত দলবদ্ধ
হইতেই বিশিষ্টতা অর্জন পূর্বক ইয়োরোপীয়
আধুনিক সাহিত্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।
বল বাহুল্য, একালের ইয়োরোপীয় সাহিত্যে
কিংবা আমাদের দেশেও, কবি কিংবা ললিত
শিল্পী যাকে এই অতি-প্রবল 'দিশালিষ্ট'
আদর্শের কিছুনা-কিছু বর্ণন্য স্পন্দ না করিয়া
পারিতেন না।

তবে, ইহাও বলিতে হয় যে, এই গীথোলিষ্ট কবিতা নূতন নহে—উহা প্রাচীন রূপক বই নহে। ইয়োরোপেও সমৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রাকাল পর্যন্ত পরিষ্কৃত রূপক কবিতা ছুরি ছুরি রচিত হইত। ভারতবর্ষের কথাই ত নাই! আমাদের ধর্মের প্রধান লক্ষণগুলি ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণ প্রভৃতি সমস্তই ত রূপকের খেলা! ইয়োরোপের Mystery Plays, Morality Plays প্রভৃতির দ্বারা, স্পেন্সার, চসার, শেপ, ড্রাইডেন প্রভৃতির প্রসিদ্ধ কবিতাসমূহের দ্বারা, আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রচেষ্টা প্রচেষ্টায় এবং আশাকানন প্রভৃতি—কোন কোন দিকে আধুনিক 'যাত্রা'লক্ষণের নটিকগুলি! তত্ত্বজগতের গুণবাচক পদগুলিকে ব্যক্তি-রূপ প্রদান করিয়াই এই রূপক বলিয়াছিল। চরমপন্থী সিথোলিষ্টগণ মৌলিকতা হজুগের বশবত্তী হইয়া, প্রাচীন কালের সহিত সম্বন্ধস্থ স্বীকার করিতে না চাহিলেও, আমাদের চক্ষু প্রকৃত সত্য অবভাত হইতে বিলম্ব হয় না! বিশেষ পার্থক্য এই যে, পূর্বকবিগণ জ্ঞানশাস্ত্র এবং লোকনিন্দার ভয়ে রূপক চরিত্রগুলার ধরণ-ধারণ কথাবার্তা এবং চাল-চলতির মধ্যে একটা স্বতন্ত্রসত্তা এবং পূর্ণাঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চাহিতেন; আর, আমাদের সিথোলিষ্টগণ কোনদিকে ধরা-পড়িতে চাহেন না, ওই প্রকার কোন জ্ঞানসম্পত্তি রক্ষার দিকেও দৃষ্টি করেন না; মহত্বের সাধারণ জীবন এবং সাধারণ চরিত্র অব্যাহনে এক অর্ধের প্রকাশ পূর্বক অল্প অর্ধের উপজ্ঞান করিয়া—মনে 'হৃদয়হ্রি' দিয়াই পটভূমিক আবির্ভব করিতে চেষ্টা করেন। এই আদর্শের দোষগুণ উভয়ই বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। যেমন

বলিয়াছি, এই কাব্যকে এক অশ্রীর পাঠক যেমন ভক্তিগদ্যবৃত্তাবে গ্রহণ করিতে পারে অল্পপক্ষ তেমনই পরম বিরক্তি এবং বেদনাকর বলিয়াও মনে করা বিচিত্র নহে। সাহিত্যে ভাব ভাষা এবং বিষয় বস্তু দুটু সম্মতি এক কথা 'বাগ্যর্থ প্রতিপত্তি'ই তাহার সমান্তর। মাহাত্ম্যলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। রচনার মর্মটুকু মোটামুটিভাবে কিংবা আঁচে আভাসে ধরিতে পারা গেলেই যথেষ্ট হইল না; পাঠকের চিত্রপটে বাক্যসাধারণে যেই ভাবরূপ অঙ্কিত হইতেছে, প্রত্যেক পদের প্রত্যেক তুলি সকালোনের সামগ্র্য এবং অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া না চলিলে, ওই অঙ্গ-তির তরফ হইতে মনে যেই বেদনা উপস্থিত হয়, 'মোটামুটি অর্থবোধের' আনন্দটুকু তাহা দমন করিতে অনেকের পক্ষেই কাজ দেখে না। বিস্তারিত কাব্যের ক্ষেত্রে এই রোগ 'যেন-তেন' সহিতে পারা গেলেও ক্ষুদ্রশিল্পের পক্ষে উহা নিসন্দেহে নারাত্মক হয়। বিশেষতঃ লেখকের সাধুতার উপরেই পাঠকের নির্ভর শিথিল হইয়া পিয়া বিরাগ উদ্ভিজ হইতে থাকে। স্বতন্ত্র সিথোলিষ্ট আদর্শের সমস্ত মাহাত্ম্য মনে রাখিয়াও, এইস্থলে স্বীকার করিয়া যাওয়া কর্তব্য যে উহা একদিকে বর্তমানকালেও একটা চরমপন্থী বিশেষত্ব বই নহে। বিয়ালিষ্ট বা চেসেরলিষ্ট বলিয়া শিল্প আদর্শটাও যেমন নানাদিকে চরমপন্থী! ভবিষ্যতে এই সমস্ত চিহ্নবিধে কিনা সমগ্রটাও কোনমতে অঙ্গদত্ত নহে। কলতা, অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষাধার্য কতকগুলো খামখেয়ালী নীতি নিয়মের সমষ্টি নহে; উহার মূলে শিল্পবোধের—মহত্বের মনস্তত্ত্বের অশঙ্কানীয় নীতি-ভিত্তি রহিয়াছে। জ্ঞানশাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া কোন সারস্বত কাব্যই

'হৃদয়শক্তি' লাভ করিতে পারবে না। 'লম্বিক' হজায় রাখিয়া চলিলে সকল সময়ে ভাল কবিতা হয় না' বলিয়া সিথোলিষ্টগণ যে অজ্ঞাত উপস্থিতি করেন, তাহাতেও কারি-করিতে পড়েন না; যেহেতু, মহত্বের মন নামক পদার্থটি চিরদিন সন্ধিহীন। কে বলিতে পারে, আজ যে, পদার্থ এক কবির হস্তে—তাঁহার ভাষা এবং রীতিমুখে হয়ত অপরিস্রাব্য ভাবেই-অস্পষ্ট বলিয়া চৈকিতেছে, তাহা আগামী কলাই অস্তুরের সমর্থ শিল্পী কর্তৃক বাগ্যর্থের রাজ্যে স্থির দারগা লাভ করিয়া মহত্বের প্রাপ্তি ভাঙার বন্ধিও করিয়া দিবে। 'এই পদার্থ' বলিয়া সাহিত্যে কিংবা প্রতিভার সমক্ষে কোন সীমা নাই। দ্রষ্টার বা প্রকাশকের শক্তিটাইই সীমা! এই ক্ষেত্রে বর্তমানের শ্রেষ্ঠমহা ব্যক্তির রায়-পরামর্শও অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। কে বলিবে যে, এই স্থানেই এই বীরুত 'দৈবা-দুর্গলতা' লইয়াই সাহিত্যের শেষ। ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোন মহত্বকে চক্ষে ধরা দিয়া দীর্ঘকাল অন্ধ করিয়া রাখা কাহারও সাধ্য নহে। আমরা জানি; এই সিথোলিষ্ট আদর্শের বিষয়ে ইতিমধ্যে আমাদের দেশেই একদিক যেমন ভক্তি অধরাগ অজদিকে প্রবল বিরোধের লক্ষণও দেখা দিয়াছে; উভয়েই বিস্তার এবং গাঢ়তা বিষয়ে এদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে তুলনাহীন। মহত্বের সন্ধানত মনস্তত্ত্বের মধ্যেই উহার বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে! মাহাত্ম্য শিক্ষা স্বীকার্য, কথায় কাব্যে জীবনগণে চিরকাল জ্ঞানোত্তির সজ্জাটুকুই সাধন করিয়া চলিতেছে। সমাজের মধ্যেও, মাহাত্ম্য-মাহাত্ম্যে যা-প্রকৃত তৎকাং, ভাল-মন্দ বড়-ছোট এবং হুঁসো-অবোধের মধ্যে যা-প্রকৃত পার্থক্য, তাহাও প্রকাশ্যের মহত্বের বাধা এবং

অর্থ, কথা ও চিন্তা, জ্ঞান এবং কথের স্বক্ষক্ষেত্রে এই জ্ঞানসাধনার সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে। মাহাত্ম্য কখনও সমাজে জ্ঞান-আদর্শকে হজায় পূর্বক কেবল অস্পষ্টতা(জীবী)-হইতে পারিবে না; কাব্য-উপভোগের ক্ষেত্রে আশিয়াছে বলিয়া চিরজীবনের সাধনাকৃত জ্ঞান-সম্পত্তির দাবীটাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। সাহিত্য স্পষ্টভাবে লম্বিকের দাবীকে অগ্রাহ্য করিলে অনসমাজে তাহার বর্তমান মাহাত্ম্য টুকু যে অনেক পরিমাণে ধ্বংস হইয়া পড়িবে, অথেষ্টকামীর পক্ষে তাহার 'প্রসাধোহপি ভয়ঙ্কর' হইয়া পড়িবে, মহত্বের শাস্ত্রকার বা মধ্যলিঙ্গকণণও যে উহাদের 'ক্যান্যাদ্যাদ্য' বজ্জ্যে' নীতি স্পষ্ট করিবার সাপেক্ষে আর একটা প্রবল অজ্ঞাত লাভ করিবেন— তাহাতেও সন্দেহ হয় না। সিথোলিষ্টগণ এই অস্পষ্টতার আদর্শ কখনও সমাজের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছেন না—ধর্মশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও নহে। অল্পলোকের পক্ষাৎ বিদ্যেও মহত্ব-ভাষার অস্পষ্টতাটুকু প্রকৃত প্রস্তাবে অপরিস্রাব্য বা জ্ঞানসম্পত্তি না, ইহা মাহাত্ম্য চিরদিন জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে! অতদিকে, মহত্বের দৃষ্টি সমক্ষে বর্তমানে প্রকটদিকেই যেমন একটা সীমা থাকে। ইতিমধ্যে, ইহাও নিসন্দেহ যে এই সীমা চিরদিন থাকিবে যাইবে—সমস্ত বিজ্ঞানের পরমাণুপ্রাপ্তির পরেও অনন্ত অজ্ঞান থাকিবে যাইবে! মাহাত্ম্য অস্পষ্টতাকে কখন ছাড়িয়াই উঠিতে পারিবে না বলিয়াই অস্পষ্ট কবিতার একটা সম্ভব-ক্ষেত্র চিরকাল মহত্ব-জীবনে থাকিবে যাইতেছে। অজ্ঞার অস্পষ্ট আগামী কলাই হয়ত স্পষ্ট হইয়া চলিতে থাকিবে, এই অনন্ত গতিশীল ভূতচক্রের

ধর্মের আদর্শকেই যদি মহত্ত্বজীবনের সর্ব-প্রধান গঠনশক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, এবং মহত্ত্বের ধর্ম-আদর্শও যদি কেবল কতকগুলি বিশেষত্বসমূহ ভাবুকতার সমষ্টি বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তা' হইলে বলিব, হিন্দুর স্থান সিঁড়ির সর্বোচ্চে। তারপর জটিল—মূলমান—ও বোধ। এমিয়ার মানসপুত্র জটিল ধর্ম ভাবুকতার লক্ষণে বলিষ্ঠ হইলেও তাহার শিশুগণের পক্ষে অধ্যাত্মক্ষেত্রে ভাবুকতা করিবার ক্ষমতা এখন অবকাশ নাই—ইয়োরাপীয় জাতি জীবন-সংগ্রামে পৃথিবীর কর্মকৃতি এবং স্বর্ণকৃতির অধিকার উদ্দেশ্যে লইয়াই বাস্ত। ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্ম বহুপুর্ন হইতেই জগতের অজ্ঞাতান্তিক প্রকারান্তরে জগতের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং তাপোবনে সমাধি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে টাই বলবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই ভাবুকতা যে ভারতীয় আর্থের সকল পাপপুণ্য অশুচি সমস্ত সর্বলতা-দুর্লভতার মূল কারণ তাহা ঐক্যমত্রেই স্বীকার করিবেন। তবে, পূর্বে যেমন বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে, আমরা ভারতবাসী এখন যাবৎ প্রায় সকল দিকেই নিরস্ত্র; আমাদের সনাতন বিশেষত্ব বিষয়ে কেহই আগ্রহ লাভ করিতে পারি নাই; এই ভাবুকতাকে আধুনিক শিল্পকলার সহিত সম্মত করিয়া এখনও আকার দান করিতে পারি নাই; আমাদের সাহিত্য এখন যাবৎ ভাবুকতা খোঁজিবার ক্ষমতা যথেষ্ট বহু-ভিত্তি বা জীবনবৃত্তিটুকু পর্য্যন্ত সম্যক উদ্দেশ্য করিতে পারে নাই। বেদ, উপনিষদ, বাসায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক যুগের পর ভারতবর্ষে কালিদাস-দিগর সাহিত্যযুগের অন্ত্যয়। আমরা অজ্ঞত দেশোইয়াছি, উহাও সকল দিকে আত্ম-আগার

লাভ করিতে-না-করিতেই ভারতের রাজ্যীয় অধীনতা এবং জাতীয় ছুরবন্ধার স্বত্বপাত; হুতরা, ঐ সাহিত্য-চেষ্টা জাগিতে-না-জানিতেই ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরেই আমরা বিশ্বসাহিত্য এবং বিশ্বজনীন আদর্শ প্রভাবের সম্মুখীন হইয়া সময়েভা জাগিতে আরম্ভ করিয়াছি বই নহে; আমাদের জাতীয় আত্মবোধ এখনো বিশ্বের সম্পর্কে বা নিজের দিক হইতেও যথেষ্টমতে অগ্রসর হয় নাই। আমাদের ধর্ম কিছুকাল হইতে বিজাতীয় আঘাতে জাগিয়া থাকিলেও, তন্মধ্যে পূর্ণাঙ্গের স্বত্বধারণা কিংবা বিশ্বচিন্তার দৃঢ়সাংঘ্যত দার্শনিক প্রতিভা এখনও জন্মে নাই বলিতে হইবে। রামমোহন, দয়ানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে ন্যূনাত্মিক আত্ম-সম্মানের চেষ্টা, ধর্ম-ভাবুকতাকে বর্তমানযুগের উপযোগী পথে ন্যূনাত্মিক Practical করার চেষ্টাই যেমন কার্য্য করিয়াছে, তেমন পরবর্তী এবং অল্পায়ু বিবেকানন্দের মধ্যেই ভারতীয় বিশেষত্বের কোন কোন দিক আত্মপ্রাপ্তি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্বা মুখিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, এই সমস্ত দীনতায় স্বর্ষেও হিন্দু মাঝেই, নিজের সমাজতন্ত্রীয় ধর্ম-ভাবুকতার দৃঢ়তা এমন সমস্ত ভাব লইয়া অনাগ্রহণ করে এবং বঞ্চিত হয় যে, নিত্যকাল অশিক্ষিত বাস্তবিক এই ক্ষেত্রে নিজেকে অজ্ঞতা বলে। হইতে বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে থাকে। এই ভাবুকতা, এই চরমপন্থীতা এই বিশ্বাস বা এই অন্ধ অংকারই একদিকে হিন্দুর সর্বধর্ম—তারার অধ্যাপিত পান্থি জীবনের—তারার পঞ্জলীবনের একমাত্র নির্ভর্য্য। যে হিন্দুর লক্ষ লক্ষ লোক এখন যাবৎ, বর্তমান বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানযুগের প্রচণ্ড আলোক সম্মুখেও, বনে জঙ্গলে কেবল ভাবের সাধন

করিয়া সর্বতোভাবে কেবল 'লক্ষ্যছাড়া' হইবার অভিসন্ধিটুকু সমুদ্রে রাতিয়াই চলিতেছে, কেবল বিজ্ঞানের নির্ভর্য্যই প্রাণধারণ করিতেছে, তাহার সাহিত্যও যে কেবল মল্লতা এবং জোছনা ভোগ্য করিয়াই বাচিতে পারিবে কিংবা অব্যক্ত এবং অন্তস্তের উদ্দেশ্যে কেবল হাহাতাশ করিয়াই, দুঃদুঃগামী অহুত্বের ইসারা এবং ইঙ্গিত প্রদান করিয়াই বঞ্চিত হইতে পারিবে তাহাতে কিছুমাত্র বিচিন্তা নাই। যে ভাবুকতার জ্ঞ 'নোবল' পতিতগণ এত প্রাণায়িত হিন্দুর পক্ষে তাহাই নানাদিক পতঃসিদ্ধ—বহুনিষ্ঠ হওয়াটাই বরং তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা দুঃস্বপ্নার্থ!

এখন এই বিশ্বাসের ক্ষেত্র হইতেই ইয়োরাপের শ্রেষ্ঠ সিংহলি কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। নৈতরলিগ স্বয়ং একজন সংসারী। তাহার চন্ডার পাঠে পাঠকনা যে আলোকের আভাষ পায়, উহা যেন স্থস্থির কিংবা সমূলক আলোক নহে—আলোয়ার দীপ্তি। একটা অর্থক বাস্তব: অবলম্বনপূর্বক উহা 'অর্থান্তরঙ্গ' উদ্দেশ্য করিতেছে। অত্র অর্থের ইসারা করিতেছে—এবং চাণিয়া ধরিতেই শূন্য মিলাইয়া থাকিতেছে। প্রতিপদেই মনে হয় ঐই সমস্তের সূলে যেন কবির কিছু মাত্র বিশ্বাসের ভিত্তি নাই—অহুত্বের বিশেষ গভীরতাও নাই। উহা সংসারীর পরমার্থ মতে। ইয়োরাপে এখন বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে; হুতরা এখন অধ্যাত্মবিষয়ে সংসারী বলিয়া অধিকতর দেখি মাঝেই অধ্যাত্মবিষয়ে নৃত্যনিক সংসারগণ বলিয়া এই সিংহলি আদর্শের প্রতিষ্ঠাকৃতি যে বিশ্বব্যাপী হইবে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে, উহার সাধন করিতে

গিয়া যে জাতীয় প্রতিভা প্রকটিত হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রকৃত কবির শক্তির অংশ-অনুপাত অপেক্ষা বরং দর্শনশক্তি এবং দার্শনিকতার একটা বিশেষ বৌদ্ধিকই অপ্রাকৃত্য প্রকটিত থাকে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্য বদুগণ, এই স্থলে সিংহলি শিল্পের কয়েকটা গুণতত্ত্বের দিকেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহার ভাষা অনেকস্থলেই নিত্যক সরল—এত সরল যে উহা অনেক সময় নিত্যক 'যোরা' এবং 'আটরাইরা'—উহার বিরুদ্ধে গ্রাম্যতার অভিযোগও আনিতে পারা যায়। রহস্ত এই যে, ভাষাপ্রণালীর এই আপাতিক সরলতাই যেন অর্ধদ্রবিত্ব বিষয়ে উহার প্রকৃত অপরিসীমত্ব—পরম অসামুদ্রিকত্বও ঢাকিয়া রাখে। মিষ্ট বুলির ইঞ্জলি বিস্তার করিয়া খেলার খেলায় মাহুরের অর্ধবিচার-বুদ্ধির চোক টিপিয়াই যেন উতরাইয়া যায়। মাহুয় প্রকৃতপ্রত্যয়ে কিছু না বুঝিও খুশী হইতে থাকে। মেই সিংহলি বারুণকের সম্মুখীন হইয়াছে উহা সর্বভাষা-মদত হইতেছে কি না ভবিষ্যৎ মাথা ঘাইতে চায় না; খুব বড় একটা কিছু বুঝিতেছি বলিয়া মনে হুড়হুড় লাগিলেই হইল। ইহা যে নিদানত: চিত্ত এবং সর্বকর্তা অধিকারের বিশেষত্ব তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এই হুজ্জে সিংহলি শিল্পের আর একটা রহস্ত—অবলম্বিত বিষয়-বস্তুর দুঃস্বপ্ন ঘটনা। স্বয়ং কবির পাঠকের সম্পর্কে কালে যতই দূরবর্তী হইবেন, উহার মুগ্ধকরী শক্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে। বিমর্ষটুকু পাঠকের আসন্ন মুগ্ধস্বপ্নের বহির্ভূত হইলে উহার চমৎকারিতা বিবানে যেমন বিশেষ সহায়তা ঘটে, কারণ it is distance which gives enchantment to the view, তেমনি, কবিও ভিন্নদেশীয় কিংবা

ভিন্ন-জাতীয় হইলে তাঁহার ভাবের পরিবেশ পাঠকের জাতীয় সংস্কার (race-consciousness) হইতে দূরবর্তী হইলে, উহার কমতা আরও বাড়িয়া যায়। বিষয় বস্তুর মধ্যে সত্য-সত্যই কোন মোহ বা অসঙ্গতি থাকিলেও পাঠকের অনভিজ্ঞতার সাহায্যেই উহার ধারণা টুকুন অনেকটা কাটান যায়, অশিষ্ট সম্পূর্ণ অসত্যও সত্য বলিয়াই মাহাত্ম্য অর্জন করিতে পারে। এইরূপে স্বভাবের নেত্র সম্মুখে আসিলে মাহাত্ম্য অপেক্ষাও বিজ্ঞাতীয়ের চক্ষে নকলের পদবীটুকু বড় হইয়া পড়ার সুযোগও ঘটিতে থাকে—এই শিল্প আদর্শের মাহাত্ম্য টুকুন উহার illusion টুকুন এইরূপে সম্যক সমাধা হইয়া যায়। ফলতঃ এই আদর্শের মূল রহস্ত মায়া বই নহে। কিন্তু তাহাও ত সাহিত্যিকতার একটি বিশিষ্ট বিভাগে সম্পূর্ণ মায়িকতার সাহায্যেও সত্য।

রসনিপুণি বা রসভাস্য সাধন করাটাও কবির পক্ষে কখনও অসম্ভব নহে; উহা চিরকাল সাহিত্যিকতার একটা প্রধান দাবী। বলিয়াই পরিগণিত, সত্যই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য—যে কোন চমৎকার উপায় সাহায্যে উহার পাঠকের জয়যজ্ঞ করিতে পারার নামই কাব্য-তত্ত্বের ‘স্বাধীনতা’।

এইরূপে আমরা আধুনিক ইয়োরাপের একটি প্রবল শিল্প-আদর্শের মোটিমুটি ধারণা করিয়া আসিলাম। এখন দেখিতে পারিব, উহার সহিত—প্রাচীন অথবা আধুনিক প্রাচ্য কাব্য-আদর্শের সহিত বহুদূরের আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের মিল পার্থক্য কিংবা বিশিষ্টতা কোথায় এবং তিনি কোন স্থানে আশ্রয়প্রাপ্তি করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশীকমোহন সেন

হুম্মর বনের দেবদেবী

দেশের ছায়া বনেও দেবদেবীর প্রভাব অল্প নহে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের উপকূলবর্তী হুম্মরবন অঞ্চলে যত অধিক সংখ্যক দেবদেবী দেখিতে পাওয়া যায়, তত আর কোনও বনেই নহে। কিন্তু সহস্রাব্দিক বর্ষ পূর্বে সেখানে একমাত্র হিন্দুদেবদেবীদেরই প্রভাব এবং প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হইত।

পরিবেশে মুসলমান জাতির একেশ্রে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মুসলমান দেবদেবী বা পীরের পোহুর্ভাব হইয়াছে। এখন সেখানে দেবদেবী হইতে পীরবই সংখ্যাধিক্য পরিদ্রষ্ট হইয়া থাকে। সেকালে হিন্দুধর্মবিশ্ববাসীরাই সমস্ত হুম্মরবনের একচ্ছত্রী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার শক্তি সামর্থ্যের, শৌধ্য

বীর্ষের তুলনা ছিল না। *জলের হাল্লর কুম্বীর, স্থলের বায় ভল্লক ও মল্লের ভূত প্রেত প্রভৃতি তাঁহার অধুগত ও বাধ্য ছিল। তাহার তাঁহার পক্ষ হইয়া শক্তির সহিত যুদ্ধ করিত, তাঁহাকে পৃষ্ঠে বহন করিত। যখন তিনি সেই সকল অধুগত সহচরে পরিত্যক্ত হইয়া, স্বীয় প্রবল পরাক্রান্ত সহোদর ও সেনাপতি কালুরাঘের সহিত, ব্যাঘ্র আরোহণে কি কুম্বীর বাহনে বহির্গত হইতেন, তখন মাহুত তদ্বরে কথা, স্বয়ং যমরাজ ও তাঁহার সন্তান হইতে সাহস পাইতেন না। হুম্মর-বনের সমস্ত সম্পদ, কামামধু, কাঠ, গোলাপল প্রভৃতি তাঁহার একাধিক ছিল। তিনি যেহেতুকই সকল পদার্থের সৃষ্টি ও ধ্বংস-সাধন করিতে পারিতেন। এক্ষণ্ড যে সকল বন্যমায়ী ‘মৌলে’ (মধু-সংগ্রাহক) কি কাঠুরীয়া ও তাঁহার কৃপালান্বিত করিত, তাহার রাজ্য হইয়া যাইত—বাহাবনে ‘মহল’ করিয়া, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রভুত্ব অধিষ্ঠাঘ্যের অধিকারী হইয়া উঠিত। কিন্তু হইলে কি হয়, দক্ষিণরাঘের বড় একটা পোষ ছিল। তিনি নরমাংশী ছিলেন—ব্যাঘ্রমুগ্ধ পরিগ্রহ করিয়া প্রায়ই কাঠুরীয়া ও মৌলেদিগকে আক্রমণপূর্বক উদরসাৎ করিতেন। তবে যে বান্ধি তাঁহার উদ্দেশ্যে নরবলি দিত—আপনাদিগের মধ্য হইতে একজনকে তাঁহার

আধারের জন্ত উৎসর্গ করিত, তাহার কোনও বিপদ ঘটিত না। সে তাঁহার যথেষ্ট আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি, পাইত এবং প্রচুর বন-সম্পদে আপনাদিগের নৌকাগুলি পূর্ণ করিয়া লইয়া *যজ্ঞে গৃহে কিরিয়া যাইত। আর দক্ষিণ-রাঘ এইরূপ স্বজন-পরিভ্রাতৃ হতভাগ্যদিগের মাংস শোণিতহেই আপনাদিগের ক্ষুধাপিণ্ডা প্রাণমিত করিতেন। তাঁহার এই অত্যাচার, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড; বহুযুগ যাবৎ বন প্রদেশে অব্যাহত ছিল, শেষে মুসলমান দেব-দেবীর আগমনে তাহা নিবারিত হইয়া যায়—গাজীমাহের, চাঁদসা, ভাণ্ডড়া, বড়পীল, খোকাপীল, কালুগাজী, তাতাল বা, বনবিবি, সাজলগী প্রভৃতি পীরদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, তাঁহার বিশাল বন-রাজ্যের সহিত, সেই অত্যাচারও হ্রাস হইয়া আইসে। এখন তাঁহার সে শোণিত-পিণ্ডা* আর নাই, সে রাজ্যও নাই, সে বলবিক্রমও নাই, সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে, সমস্তই সেই সর্ববিধঙ্গী কালের কৃপিকৃত, নাম মাঝে পৃথিবিস্ত হইয়া গিয়াছে। অতীত তিনি তাঁহার সেই স্থবিশাল বন-রাজ্য, মুসলমান পীরদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া, হুম্মরবনের একাংশে মাত্র আঠার ভাটী * বাহাবনের উপরেই আপনাদিগেরও পরিচালনা বাধ্য হইয়াছেন। দক্ষিণ-রাঘের এই অবস্থার প্রাপ্তি

* সমস্তই মুহাম্মাদপাদার পতিত শ্রীকৃষ্ণ হরগনাম শাহী মহাবীর, বকীর সাহিত্য-সম্মিলনের সপন বাহিক অবিরবে, সন্নিহিতের স্বার্থনা সন্নিহিত সত্যপটিক্সে যে অভিব্যক্তি পাঠ করবে, তাহাতে তিনি দক্ষিণরাঘ ও তাঁহার জ্ঞাতী কালুগাজীকে বোদ্ধ সিদ্ধ পুণ্ড্র বলিয়া উদ্ভব করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ত জানি, তাঁহার সন্তান নহেন; বৈবর্তী—হুম্মরবন-বারী প্রাচীন হিন্দু মৌলেও কাঠুরীয়াদিগের স্বকপাল-করিত বনধের মাত্র। সুতরাং হইলে মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ অনেক লক্ষণই প্রাচুরিগেরা যথা বিদ্যমান থাকিত কিন্তু তাহারা নাইই, উপরন্ত বহু লক্ষণও লক্ষ্য, অনেক বোদ্ধ ধর্মবিশ্বাস আর ও চিত্তবিন্দি তাঁহাদিগের কাব্যকলাপে-পরিচলিত হইয়া

থাকে। “অহিস্যা পরমো ধর্মঃ” বৌদ্ধমতপ্রচারের মূল ধর্ম-নীতি কিন্তু দক্ষিণরাঘ (কালুরাঘ কিংবা জানিনা) নরমাংশী হতভাগ্য যোরা বিস্মাপন ছিলেন। এক্ষণ্ড অব্যাহত কোদ, সৃষ্টি প্রমাণের সাহায্যে যে দক্ষিণরাঘকে বোদ্ধ সিদ্ধ পুণ্ড্র বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া, তাহা আমরা স্মৃতিতে পারিলাম না। শাহীমহাপীর অল্পমহা করিয়া আদিমগণকে তাহা বুঝাইয়া দিবে কি ?

‡ আঠারী ভাটায় অর্থাৎ একশত আট বটায় বা সাত্টি চারি বিঘা কাল নৌকারোহণে যত্নর গমন করিতে পারা যায়, তত্বর বিপত বনবিবি আঠার ভাটী নামে প্রসিদ্ধ। হুম্মরবন অঞ্চলে ‘কোরাণী’ ও ‘ভাটী’ এই দুইটি কালুগাজী নামের পরিচাল বা দূত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে, যেমন—‘হুই ভাটীর পল’ ‘ভিন কোরাণের রাতা, ইত্যাদি।

সম্বন্ধে ভাটীমুখকে • তরতা মুসলমান জাতীয় নিরক্ষর ঘোলে ও কাটুরিয়ারদিগের নিকটে অনেক অল্পত আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহারিগণেরই একটা এই প্রবন্ধে সম্বন্ধিত ও লিপিবদ্ধ করিয়া, পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

বরগছাটা গ্রামে ঘোনাই ও মোনাই নামে দুই মুসলমান জাত্য বাস করিত। তাহারিগণের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হইলেও, ঐরাই ঘোনাই স্বন্দরবনে মগল করিতে অভিলাষী হইল। কনিষ্ঠ ঘোনাই জাত্মমেহ বশতঃ তাহাকে বনে ব্যাঘ্রের গুহে পাঠাইতে অকাঙ্ক্ষা করিল কিন্তু ঘোনাই তাহা শুনিয়া না, অদৃষ্টের রোহাই দিয়া তাহার মত গুণ্ডন করিল এবং শান্তগানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া যথাপ্রয়োজন ভোজ্য-পানীয়, সাজ-সরঞ্জাম ও পাড়ী মাঝী প্রভৃতিতে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কেবল অভাব রহিল একজন পাটকের। কিন্তু অনেক সন্ধানও সেসকল লোক পাওয়া গেল না। ঘোনাই নিরুপায় হইয়া শেষে একটা বালককেই সেই কাধের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিল। তাহার দেহবস্ত্রের অনতিদূরে এক দরিদ্রা বিধবার 'ছুপে' নামে একটা পুত্র ছিল। সে অল্প বয়স হইলেও বেশ স্তম্ভপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল। ঘোনাই নানা প্রলোভনে তাহাকে ও শেষে ঘোনাই মাতাকে বাধ্য করিয়া ফেলিল এবং বিপদ আপদে তাহাকে রক্ষা করিবে, অধিক বেতন দিবে এবং বাটীতে আসিয়া তাহার বিবাহ দিয়া দিবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহাকে লইয়া নৌকায় উঠিল। ছুপের মাতৃ পুত্রকে বিশাখ দিয়া কণকালও গৃহে ত্রিভুজিতে পারিল। উদ্ভাসিত নদীর তীরে ছুটিয়া গেল এবং

ঘোনাই ও তাহার সঙ্গীদিগের হস্তে বার বার ছুপকে সমর্পণ করিয়া, তাহাকে নিচ্ছিনে ডাকিয়া বলিল,—“দেখ বাছা, আমার একটা কথা রক্ষা করিও। বনে মা বনবিবি আছেন, তিনি যেমন ঘাঘাবতী তেমনিই শক্তিশালিনী। বিপদে পড়িলে তাহাকে ‘মা’ বলিয়া ‘স্বরণ’ করিও। তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন। আমার একখাটা ঘন ভুলোনা বাছা।” “না ভুলিব না” বলিয়া হাসিতে হাসিতে ছুপে তাহার ঘোনাচাচার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। নৌকাগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভাসিয়া চলিল। ছুপের মা নদীর ধারে বলিয়া অপেক্ষার নয়নে কীর্তিতে লাগিল।

ঘোনাই মৌলের সাত ভিক্ট্রী ক্রমে বরণহাট, মহাস্থানপুত্র ও দুর্গিয়া দিয়া কানাই কানীতে উপস্থিত হইল। শেষে গঙ্গানদী বামে রাখিয়া রায়মঙ্গল, রায়মাতলা, হাড়ভাঙ্গা, কুলতলা ও পারগাঙ্গ প্রভৃতি অতিক্রম পূর্বক হুম্মরবনে গড়খালীর বাদায় প্রবেশ করিল। ঘোনাই কোনও নিরাপদস্থলে নৌকাগুলি একে একে নোদর করিয়া ছুপকে নৌকায় রাখিয়া সমস্ত লোকজন, অস্ত্র শস্ত ও আবাসিক ব্রহ্মাদি সহ ভাঙ্গায় উঠিল এবং বৃক্ষশাখা বিস্তর মণ্ডুচক^১ দেখিয়া আনন্দে বিচ্ছল হইয়া, মণ্ডুপগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। দূর হইতে দক্ষিণ রায় সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন—তাঁহার পুত্রা, বলিদান ব্যতীত, ঘোনাই শঠতা পূর্বক মণ্ডু আহরণে উভত হইয়াছে বুঝিয়া, মহাবিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অশুভভাবে গড়খালীর বনে প্রবিষ্ট হইয়া, মায়াধারা সমস্ত মণ্ডুচক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঘোনাই

সমুখে একখানি প্রকাণ্ড মোচাক দেখিয়া যেমন তাহার নিকটস্থ হইল অমনই তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল! এইরূপে শত শত, সহস্র সহস্র মণ্ডুচক তাহাদের সমুখে অবিস্কৃত ও শূন্য বিশৃঙ্খল হইল!! ঘোনাই ও তাহার অশুচরণ, মণ্ডুলোভে মুগ্ধ, হতবুদ্ধি হইয়া, তিনদিবস স্বাল ক্রমাগত গড়খালীর বাদায় ঘুরিয়া বেড়াইল কিন্তু এক বিন্দু মণ্ডু বা মোমও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল না! তখন হতাশ হইয়া ঘোনাই নৌকায় ফিরিয়া আসিল এবং দেবতার ছলনা বোধে তাঁহারই উদ্দেশ্যে অনাহারে অনিয়ম—“হত্যা” দিয়া গড়িয়া রহিল। ঘোনাই ভাবিয়াছিল, উহা যদি প্রকৃতই কোনও দেবতার কাণ্ড হয়, তাহা হইলে নিশ্চিতই তিনি তাঁহাকে দর্শন দিবেন এবং মণ্ডু প্রাপ্তির কথাই বলিয়া দিবেন।

ঘোনাই যাচা ভাষিয়াছিল, তাহাই হইল। দক্ষিণরায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দর্শন দিলেন, দিয়া বলিলেন,—“ঘোনাই, তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি?” আমি দক্ষিণরায়, এই আঠার ভাটা বানীবনের অবিগমবাসিত প্রান্ত, সর্বময় অদীশ্বর। এখানকার সমস্ত যোমি মণ্ডুই আমার স্ত্রী হুতরা আমার অশু-মতি ব্যতীত কাহারও ইহা স্পর্শ করিবার শক্তি নাই। তোমার যদি মণ্ডু লইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমার পুত্রাশাও, নরবলি “মানসা” কর নচেৎ একফোঁটা মণ্ডুও এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না।”

“না, ঠাকুর, আমার ঘাচা তাহা হইবে না, আমি সরবলি দিতে পারিব না”—বিশ্মিত ও ভীত হইয়া ঘোনাই উত্তর দিল—“মত সব শরের ছেলে আমি মাথিনা করিয়া আনিয়াছি।

তাঁহাদের কাহাকে কোন প্রাণে বলি দিব? আমার মধুর দরকার নাই।”

দক্ষিণরায় হাসিয়া বলিলেন,—“তবে এত ‘ঘরচপড়া’ করিয়া বনে আসিলে কেন? জানত দক্ষিণরায়ের পুত্রা ব্যতীত এখানে কিছুই পাইবার সম্ভাবনা নাই।”

প্রত্যুত্তরে ঘোনাই বলিল,—“না ঠাকুর, ‘আমি তা’ জানি না। জানিতে পারিলে কি আর বনে আসিতাম না এত ‘ব্যয়ভূষণ’ করিতাম?”

“বা’ করিয়াছ, যে টাকাগুলি ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছ, তা’র উপায় কি করিবে? একটা শরের ছেলেও অল্প সময়ই কি জলাঞ্জলি দিবে—সর্বশ্রম ক্ষোয়াইয়া ভিক্ষা মাগিয়া পাইবে?”

“তা’ কি করিব? অদৃষ্টে যদি আমার তাই থাকে ত হইবে, কেহই থকাইতে পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া একটা মাছয় মারি কিরূপে? না হয়, খালি নৌকা লইয়াই গৃহে ফিরিয়া যাই।”

এবার দক্ষিণরায়ের আর সে প্রসন্নভাব রহিল না। মহাশা তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল, চক্ষু রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বিরক্ত-বরে বলিয়া উঠিলেন,—“তুমি কিরূপা গোয়েই বাচিবে বুঝি? তোমার সাত ভিক্ট্রী জলে ডুবাইবে, লোকজন সব কুস্তার দিয়া খাওয়াইবে, তবে ছাড়িবে।” ভয়ে ঘোমাইএর আত্মপুঙ্খ উদ্ভিয়া গেল। সমস্ত শরীর বায়ু-তড়িত কদলীপত্রের জায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে যুক্ত করে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিল,—“আমার অপরাধ হইয়াছে ঠাকুর, ক্ষমা করুন।”

“ক্ষমা কেবল কথাই হইবে না, কণ্ডে চাই” দক্ষিণরায় একটু নরম হইয়া উত্তর করিলেন,

* যে অঞ্চলে ভাটার সময়ে নৌকার সাহায্যে যাইতে হয় অথবা যেখানে ভেটো বনে প্রকৃত শরিমাণে উৎসব হয় অর্থাৎ দক্ষিণ, হুম্মরবন অঞ্চলে।

—“যদি সকলের জীবন চাপ, তবে একজনের জীবন বলি দাও। সে জীবন ত আমার তোমার আপনার কাহারও নহে, সম্পূর্ণ নিশ্চয়ের। তোমার নৌকায় দুখে বলিয়া যে বালকটা আছে, উঠাকে ছাড়িয়া দিলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে। তাহাতে আমার যেমন ভুগি জন্মিবে, তোমারও তেমনিই হৃৎশেষের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। তোমার সাতখানি নৌকাই যেম মধুপে পরিপূর্ণ করিয়া দিব। সেই মেম মধু বেঁচেয়া কট টাকা পাইবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি ?” একটা পরের জুড় একটাটা কেন ছাড়িবে ?”

সংসা গৃহে অশনিপাত হইলে গৃহমধ্যস্থ লোকেরা যেমন কুস্তিত, তীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠে, দুখের নাম কনিয়া খোনাই-এর অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইল। তাহার উদ্বেগের, বিবাদের, দুঃস্বস্তার অবধি রহিল না। কিন্তু দক্ষিণরাঘের ভয়ে সে ভাব গোপন রাখিয়া বলিল,—“তাহা আমি কিরূপে করিব ? দুয়ের মা যে আমার হাতে হাতে দুখকে সঁপিয়া দিয়াছে এবং আমিও যে তাহাকে বিপদে আপদে রক্ষা করিব ও নিকিঁয়ে বাতীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এখন কেমন করিয়া, বিবাস্যভক্ততা করিয়া, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধন দিয়া যাই ? নরবলি গ্রহণের লালসা যদি আপনার এতই বলবতী হইয়া থাকে, তবে দুখকে ছাড়িয়া আমাকেই গ্রহণ করুন। তাহাতে আমার জীবন নষ্ট হইলেও পঞ্চ বজায় থাকিবে।”

“না, তাহা হইবে না” দক্ষিণরাঘ কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিলেন,—“দুখে

বাতীত আমি আর কাহাকেও লইব না। তুমি আর আমাকে বিরক্ত করিও না, স্পষ্ট করিয়া বল, দুখকে দিয়া যাইবে কি না ? যদি না দাও তবে যা’ বলিয়াছি, নিশ্চিতই তাই করিব—তোমাদের একজনকেও প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিতে দিব না। কি বল খোনাই, আমার কথা সম্মত হইলে ত ?” খোনাই এবার আর প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না, স্থিরভাবে নীরবেই শুইয়া রহিল। দক্ষিণরাঘ তাহার সেই মৌনভাবকেই সম্মতি লক্ষণ ভাবিয়া হুসী হইলেন এবং বার বার, তাহাকে ধন্যবাদ দিগ, শেষে সহ্যেতম শূন্য থাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি কাল সকালেই মধু সংগ্রহ করিবে ?” খোনাই বিধরভাবে উত্তর দিল,—“আর বিলম্ব করিয়া কি হইবে ? প্রভাতেই বনে উঠিব।”

“তবে এক কাজ করিও” দক্ষিণরাঘ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—“গড়খালী বাদায় আর যাইও না—কৈদোখালীর বাদায় গিয়াই মধু আহরণ করিও এবং গমনকালে ঐ কৈদোখালীর চরেই তোমার দুখকে রাখিয়া যাইও। কেমন মনে থাকিবে ত ?” অজ মনস্তভাবে খোনাই উত্তর করিল,—“থাকিবে।” দক্ষিণরাঘ প্রচুর মনে খোনাইকে আশীর্বাদ করিয়া অন্তরত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজিও প্রভাত হইয়া গেল।

রাজিতে দক্ষিণরাঘের সহিত খোনাইয়ের যে কথোপকথন হইল, তাহা কেহই জানিতে পাইল না, জনি কেবল দুখে। সে ভিন্ন নৌকায়, পৃথক শাখায়, শায়িত থাকিলেন, ঘটনাক্রমে সেই সময়ে চৈতন্যলাভ করিয়াছিল, আর আত্মপূর্ণিক সমস্ত কথাই, শ্রবণ করিয়াছিল। কিন্তু সে কাহারও নিকট সে কথা প্রকাশ করিল না, প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া

কেবল হা হতাশ ও কিসে জীবন রক্ষা হইবে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

রাখি প্রভাত হইলেই, খোনাই কৈদোখালীর চরে গিয়া নৌকা বান্ধিল এবং পূর্ববৎ সমস্ত লোকস্বল্প ও আবশ্যক জবাবি লইয়া বাদায় উঠিল। একমাত্র দুখেই কেবল, রক্ষণ করিবার জুড়, নৌকায় রহিল। সমস্ত লোক চলিয়া গেলে সে কান্ডিতে লাগিল। কান্ডিয়া তাহার চুই চুই ফীত হইল, চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। তবুও তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না। কিন্তু ভগবানের রূপায় আর অধিককার তাহাকে বেশ পাইতে হইল না। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার জননীর সেই শেষ কথা কয়েকটা তাহার স্মৃতিতে সন্নিবিষ্ট হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে অশ্রুকারের চাপ, হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও ক্লান্তি অপদারিত হইয়া গেল। দুখে আশ্রয় হইল, মনে সাহায্য পাইল আর উচ্চশ্বের দাকিল, “মা ননবিবি, কোথায় তুমি মা ?” দুখের সেই করুণ-আহ্বানে হৃৎকণ্ঠে ননবিবির আসন টকিল। তিনি বিভ্রান্তগে নৌকায় আসিয়া তাহাকে দর্শন দিলেন এবং তাহার বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া, সঙ্গেহে মিত্রবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেন বাছা, আমাকে আহ্বান করিবে ? তোমার কি বিপদ হইয়াছে বল, এখনই আমি তোমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিব।” দুখে কান্ডিতে কান্ডিতে সমস্ত পরিচয় মিল। ননবিবি তাহাকে আশাস দিয়া বলিলেন,—“ভয় কি বাছা ! আমি তোমাকে রক্ষা করিব। যখন তুমি আমাকে ‘মা’ বলিয়া আহ্বান করিছ তখন সাধ্য কি রায়মণির যে তোমাকে হিংসা করে।” বিবির সাহায্য-বাক্যে দুখে সমস্ত বেশ ভুলিয়া গেল এবং

মৃদুনেত্রে তাহার সেই প্রশান্ত ও প্রফুল্ল মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল। ননবিবি আবার বলিলেন,—“শিষ্ট বাছা, তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে। রায় বণন বাথ হুইয়া তোমাকে ধরিতে আসিবে তখন তুমি ‘মা ননবিবি’ বলিয়া চীৎকার করিও। এই কৈদোখালীর বাধা দক্ষিণরাঘের অধিকৃত, এখানে তাহারই সর্গতোমুখী প্রভুত্ব। আমার নহে। হুতরাং বিনা আহ্বানে আমার এখানে আসিবার কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু করিবার শক্তি বা অধিকার নাই। তবে ‘মা’ বলিয়া শব্দগ আশ্বাসন করিলে, এই বিশাল বনবাজের সর্গভাই, সকল দেব দেবীর অধিকারেই আমি গমন ও বিপদের বিপদ নিবারণ ও জীবন রক্ষা করিতে পারি। অতএব বৎস, আমার এ নিদেশ মনে বিশ্বস্ত হইও না।” দুখে আনন্দে বিহ্বল হইয়া, উত্তর করিল,—“না কিছুতেই নহে। তবে মা, তুমি যেন তোমার দুখকে ভুলিয়া থাকিও না। তুমি ভিন্ন তাহার আপন জন আর এখানে কেহই নাই মা।” ননবিবি অভয় দিয়া চলিয়া গেলেন। দুখে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার দয়ার কথা ভাবিতে লাগিল।

এদিকে খোনাই ও তাহার সঙ্গিগণ বনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চারিদিকেই মধুচক্র, বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, কোটরে কোটরে অসুখে মোচাক মোচাক পাইতেছে—আর তাহাতে মধুহীম কত ! তাহার দক্ষিণরাঘের নৈশোভাপূর্ণিক মধুচক্রে হস্তার্পণ করিতেই সমস্ত মক্ষিকা স্বনত্যাগ করিল। দংশন ঘূরে থাকুক একটা মক্ষিকাও তাহাদের নিকটে আসিল না ! কিন্তু দক্ষিণরাঘের রূপায় বাক্যে দুখে সমস্ত বেশ ভুলিয়া গেল এবং

না। তাহার আদেশে, তাঁহার ভৃত্য প্রেতাতি অশ্বত্থপর্ণাই মধু আহরণপূর্বক ধোনাইএর সাতখানি নৌকা পূর্ণ করিয়া দিল। দক্ষিণ-রায়ের দখা দেখিয়া ধোনাই মুগ্ধ হইল এবং শত মুখে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন দক্ষিণরায় প্রত্যাক হইয়া তাহাকে বলিলেন,—“দেখ ধোনাই, সাত নৌকা মধু দেখিয়া তুমি খুব খুসি হইয়াছ বটে কিন্তু উহাতে তোমার লাভ ত বড় বেশী হইবে না। উহা যেমন স্বল্প মূল্য, তেমনিই অল্পকাল স্থায়ী অতএব সমস্ত মধু জলে ফেলিয়া দাও এবং উহার পরিবর্তে বহুমূল্য ও দীর্ঘকাল স্থায়ী মোম গ্রহণ কর। কেনন, ইহাতে সমস্ত আছ কি?” “কেন অসম্ভব হইবে?” কৃতজ্ঞতাশূন্য মধুর স্বরে ধোনাই উত্তর করিল,—“আপনি যখন আমার মঙ্গলের জন্তই চেষ্টা করিতেছেন তখন আমি আপনার সমস্ত আদেশই শিরোধার্য করিতে বাধ্য। আপনি আমাকে মোমই দিন।” তখন সেই সাত ভিক্রী মধু নদীর জলে নিক্ষেপ হইল আর তৎপরিবর্তে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান মধুকে ভিক্রী-গুলি বোকাই করিয়া দেওয়া হইল। ধোনাই-এর আনন্দ যৌলকলায় পূর্ণ হইল। যেহেতু, যে সর্কারী নবী বা খালে ধোনাই মৌলের সেই সাত নৌকা মধু দক্ষিণরায়ের আদেশে নিক্ষেপ হইয়াছিল তাহা এখন “মধুখালী” নামে প্রসিদ্ধ।

তিনিতে পাওয়া যায়—মধুখালীর জল মিষ্ট-আম্বল যুক্ত সেই মধুর জন্ত, ঠিক মধুরই মত মিষ্ট। বনগামী মৌলেরা মধুখালীর মিষ্টজল পান করিয়া, এখনও নাকি দক্ষিণরায়ের মহত্ব কীর্ত্তন ও তাহার প্রতি আপনাদের জলি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ধোনাই সেই সাত নৌকা মোমের বিনি-ময়ে দক্ষিণরায়ের নিকটে আশ্রয় বিক্রয় করিল,

তাহার ক্রৌঞ্চদাস হইয়া পড়িল। তাহার ধর্ম্মপ্রগতি, পূর্বের সেই সাধুতা প্রকৃতি সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। কি প্রকারে দুখেকে দক্ষিণরায়ের হস্তে সমর্পণ করিবে, তাহারই এখন তাহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল। সে দুখের অসাক্ষাতে, নিজেই মাকীমাল্লাদিগের সতিত, ক্রমাগতই তৎসম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক তর্কবিতর্কের পরে শেষে স্থির হইল,—কাঠ সংগ্রহের অভিল্যায় দুখেকে ভীরে উঠাইয়া দিয়া দক্ষিণরায়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে হইবে এবং দেশে গিয়া প্রকাশ করিতে হইবে যে নৌকা হইতেই দুখেকে বাণে লইয়া গিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। এইরূপ কর্তব্য অব্যাহার করিয়া, সে দিবস তাহার মধুখালীতেই অবস্থিতি করিল।

পরদিবস প্রভাতে গাছোখান করিয়াই, ধোনাই নৌকা খুলিতে আদেশ দিল। মাকীরা তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ পালন করিল। কেবল দুবে “যে নৌকাই ছিল, সেই নৌকার মাকী নৌকা ছাড়িল না, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ধোনাই ক্রুদ্ধ বিষয় প্রকাশ করিয়া, তাহার কাণ্ড বিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,—“নৌকাই একখানিও কাঠ নাই, পথে রঘুন চলিবে কিসে?”

“কাঠ নাই তবে কাল কি করিয়াছিল?” ধোনাই বিরক্ত হইয়া বলিল,—“জান সকলে জোয়ার দিয়া যাইতে হইবে, আগে তার যোগাড় করিয়া রাখ নাই কেন?” এখন দাও দুখেকে ভাঙ্গায় উঠাইয়া, কিছু কাঠ ভান্দিয়া আহুক,” মাকী কথার উত্তর না দিয়া নৌকাখানী তীরের দিকে একটু সরাইয়া দিল এবং দুখেকে নামিয়া কাঠ

ভান্দিয়া আনিতে বলিল। কিন্তু দুখে তাহার কথা শুনিয়া না তাহার পরিবর্তে অপর কাহারো পাঠাইতে অস্বার্থে করিল। ধোনাই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল,—“অগ্নে কেন্দ্রমাইবে? কেহ ত আর তোমার মত বসিয়া থাক না যে কাঠও ভান্দিতে যাইবে? উহার পাটয়া থাথ আর তুমি এক-রকম বসিয়া বসিয়াই মাঘিনা লও—এই সামান্য কাজটা পারিবে না কেন?”

“পারিব না ত বলিতেছি না”—দুখে কাতর ভাবে দীরে দীরে উত্তর করিল,—“আজ আমার শরীরটো বড় খারাপ, আমি উঠিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া এইবারটা আমার আমাকে মাগ করুন। আজকার কাঠটা কাহারও দ্বারা ভাণাইয়া লউন, কাল না হয় আমি ভান্দিব।”

দুখের কাতরতা দর্শনে ধোনাইএর চিত্ত দ্রব হইল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমবার বলিল,—“ভূমিত আর নাব্য নহে অগ্নে তোমার ‘পয়নামী’ করিবে? তা’ হইবে না বাপু, আমি তা শুনিব না, তোমাকেই আজ কাঠ ভান্দিয়া আনিতে হইবে।”

“চাচা, আজ আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রাণ ‘হ’ ‘ত’ করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে এবং শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ঠাণ্ডাইতেই পারিতেছি না, তা’ কালে কাটির কিভাবে? আজ আমার দ্বারা কিছুতেই একাজ হইবে না। আজ চাচা—”

ধোনাই কোঁপে অশ্রুশাধা হইয়া উঠিল এবং দুখের কথায় বাধা দিয়া মাকীকে বলিল,—“ও যদি না নামে, তবে মাকি, উহার দুই গালে দুইটা-চড় মারিয়া, গালাগালা দিয়া ভাণায় না মাইরা দাও। বসে বসে মাঘিনা নেবেন উনি, কাজ করুব আমরা? কেন বল ত?”

যেরে বুকি আমার টাকা দখলিলা না? মাকা ত মন্দ নহে।”

এবার আর দুখে, কিছু না বলিয়া, স্থির থাকিতে পারিল না। রোষে, অভিমানে তাহার ঠোঁটের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। সে বাশ্পনিক্ত ভ্রু কঠি উত্তর করিল,—“বুঝিছি ধোনা চাচা, আমি সমস্তই বুঝিছি। দক্ষিণরায়ের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছ, তাহা আমার জানিতে বাকী নাই। আমাকে বাণের মুখে তুলিয়া দিয়া তুমি গৃহে ফিরিয়া যাইবে, সাত ভিক্রী মোম বেচিয়া বড় মাহুদ হইবে? এই না তোমার সঙ্কল্প? এইজন্যই বুকি আমাকে তুলিয়াই বাধা আনিয়াছিলে? আমার জুঘিনী জননীকে কি বলিয়া বুঝাইয়াছিলে, তাহা কি, ধোনাচাচা, এখন সমস্তই তুলিয়া গেলে? এই কি তোমার ধর্ম্ম—এই কি তোমার মহত্ত্ব? কিন্তু ধোনা কি তোমার এ অপরাধ—”

ধোনাই তাহাকে আর অধিক বলিতে দিল না, কথায় বাধা দিয়া বলিল,—“আর বক্তৃত্য কাজ নাই। আমাকে তোমার আর ধর্ম্মতত্ত্ব, মহত্ত্ব শিক্ষাদিতে হইবে না। আমি পাপ করি আর পুণ্য করি তাতে তোমার কি? তুমি তোমার নিজেদের চরকার তেল দে, আর ভাল চলে ত এখনি বাদায় উঠে কাঠ ভেঙ্গে আন। নচন্ত আজ আর তোমার তর্কটির পরিসীমা থাকবে না।”

“তা’ আমি অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি”—দীরে দীরে দুখে উত্তর দিল,—“কিন্তু তাতে কি তোমার ভাল হবে?”

কোঁপে চক্ষু পাকল, ললাট কুণ্ডিত করিয়া ধোনাই বলিয়া উঠিল,—“কি? যত বড় মুখ না তত বড় কথা? একটা কাজ কোর্সেন না, কথা শুনেব না, কেবল আমার

অম্ব স্বয়ং কোর্সেন আর আমারই অম্বল গাইবেন! এটা বুঝি ধর্ম?"

তুণ্ডে কথা কহিল না, উত্তর দিল না কেবল অম্বমুখে ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাতেও খোদাই-এর রাগ পড়িল না, বরং বাড়িয়াই উঠিল আর সেই বিন্দিত শেষে কণ্ঠিত কলহের হইয়া সে বলিল, "আমার নৌকায় বসিয়া আমারই নিন্দা, আমারই মন্দ কামনা? এত বড় স্পর্ধা, এত বড় যোগ্যতা তোর? পাঞ্জি নজ্জার, নাম আমার নৌকা হ'তে। শীঘ্র নাম বলছি, নচেৎ 'জ্বরদন্তী' ক'রে এখনই তোকে জলে ফেলে দে চলে যা'ব।"

তুণ্ডে পূর্ববৎ নীরবেই সমস্ত কথা শুনি কিন্তু এবার আর স্থিরভাবে' বসিয়া রহিল না, কানিতে কানিতে ধীরে ধীরে নৌকা হইতে অবতরণ করিল। তাহার তখনকার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সকলেই কাতর হইল, সকলেরই হৃদয় দ্রব ও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, কিন্তু পাথর, নিষ্পদ খোদাই তাহাতে বিন্দু-মাত্রও রেশ বোধ করিল না, উপরন্তু আনন্দে অধীর হইয়া, কতকগুলি ওড়াকার ফুল তাহার দেহে নিক্ষেপ পূর্বক উচ্চৈশ্বরে বলিয়া উঠিল,—“কোথা গো রায়মণি, এই তোমার তুণ্ডে রহিল, গ্রহণ ও ভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন। 'আমরা তো দেখে চলিলাম।'" খোদাইএর সাতভিঙ্গী জোয়ার দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গেল।

তুণ্ডে সমস্তই দেখিল, সমস্তই শুনি কিন্তু বাঙনিপত্তি করিল না। আপনাদের অদৃষ্টকেই শত দিকার দিয়া কেবল বিলাপ ও অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিল। সহসা সমুদ্রে ভীষণ গর্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সে চমকিয়া উঠিল এবং ভয়-চকিত-মনেতে চাহিয়া দেখিল,

এক বিরাটায় ভীষণ শাদ্দল, বদন বাদন করিয়া ক্রমবশেষে তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তবে তুণ্ডের মুখ শুকাইয়া গেল, মুক দুঃদুঃ করিতে লাগিল। সে বিশ্বাসে নিশ্বাস ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—“মা বনবিবি, বাঘের হাতে আমার প্রাণ ধাও। শীঘ্র আসিয়া আমাকে বক্ষা কর। কোথায় তুমি মা—” তুণ্ডে সজ্ঞানশূন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার সেই সঙ্কল্প কাতর প্রার্থনা বিফল হইল না। ত্বরিত হইতে বনবিবি তাহা শুনিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাত্ মাতা সাজঙ্গলীর হাতে কৈদোখালীর চরে আসিয়া তুণ্ডের চৈতন্যহীন দেহ কোড়ে লইয়া উদ্ধারবশন করিলেন। বনবিবিকে দেখিয়া ব্যায়জঙ্গলী দক্ষিণরায় ভয় পাইলেন এবং তুণ্ডের আশা ত্যাগ করিয়া পলায়নে উন্মত্ত হইলেন। কিন্তু বনবিবি তাহাকে সহজে যাইতে দিলেন না, সাজঙ্গলীকে দিয়া তাহার শিক্ষাব্যবসার, অপরাধ অতীত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন, জঙ্গলী ছুটিয়া গিয়া তাহার গণ্ডে চপেট খাত করিলেন। দক্ষিণরায় কোধে জলিয়া উঠিলেন কিন্তু নিজস্বত্ব হ্রাস্তির জ্ঞান লজ্জিত হইয়া মনের কোষে মনেই গোপন রাখিতে বাধ্য হইলেন এবং নিম্নস্বীয় দারুণ করিয়া, মহা অপরাধীর ত্রায় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইলেন। সাজঙ্গলী 'মার' 'মার' শব্দে তাহার অঙ্গসরণ করিলেন। দক্ষিণরায় জঙ্গলীকে বিব্রত করিবার জ্ঞান সমুদ্রবর্তী এক নদীতে গিয়া বাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে আকমণ করিবার জ্ঞান, হাঙ্গর কুম্বীরগণকে আদেশ দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নদী অতিক্রম পূর্বক দক্ষিণমুখে চলিয়া গেলেন। জঙ্গলী নদীতে পর্বার্ণন করিতেই শত শত

হাঙ্গর কুম্বীর তাহাকে বেষ্টিত করিল এবং দয়াহাতে তাহার সমস্ত দেহ ক্রমবিকৃত করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও সেই মহাবল গীরের অগ্রগতি নিবারণিত হইল না। তিনি স্বীয় অমুদ্রায় শক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাত্ সেই সকল হিংস্র জন্তুকে নিরস্ত, নিহত ও মূর্খে নিক্ষেপ করিয়া নদী পার হইলেন ও পূর্বের ত্রায় ক্রমবশেষে দক্ষিণরায়ের পট্টাধারন করিতে লাগিলেন। নরহত্যাক্রম মহাপাপের অতীতন করিয়া দক্ষিণরায়, নৈতিকবলে বহল পরিমাণেই হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন একত্রে বেহে শত মন্ত মাতঙ্গের শক্তি লভেও, তিনি জঙ্গলীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাহসী না হইয়া, হৃদয়বনের অতীত পীর, মিত্র গাজী সাহেবের অধিকারে গিয়া তাহার আশ্রয় লইলেন। জঙ্গলী সেখানে গিয়াও স্বীয় উর্দ্ধতাবশত, তাহাকে প্রভার করিতে উন্মত্ত হইলে, গাজী সাহেব তাহাকে নিরস্ত করিলেন এবং সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, মীমাংসার জ্ঞান উদ্বোধক মঙ্গ লইয়া, বনবিবির নিকটে উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণরায়ের সহিত বিবাদ করা বনবিবির অভিপ্রেত ছিল না, কারণ তখনও তিনি হৃদয়বনের প্রায় অর্দ্ধাংশের, আঁঠুরভাটী বাসবনের অধীশ্বর ও মহাপরাক্রমশালী। তাহার সহকারী কান্দুয়াও বড় কম পরাক্রান্ত নহেন। এ অবস্থায় দক্ষিণরায়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বনের শাস্তিরক্ষা করা তাহার পক্ষে কোনও ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। তবে তিনি তাহার নর-হত্যার পক্ষপাতিনী ছিলেন না বলিয়াই, মধ্যে

মধ্যে তাহারিগের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। একজ্ঞ গাজী সাহেবের নদ্যন্তরায় সহজেই বিবাদ মিটিল, উভয়ের মধ্যে অন্যায়সেই শক্তি বা সম্ভাব সংস্থাপিত হইয়া গেল। গাজী সাহেবের অতীতপক্ষে, দক্ষিণরায় নরবলির লালশ, নরমাংসের 'লোভ' সংহত করিলেন এবং তাহার সহিত বনবিবিকে মাত্র সখোদন করিয়া, তুণ্ডেই আসিয়া বীকার করিয়া লইলেন। বনবিবি তুণ্ডেই প্রকৃত দমনসম্পন্ন প্রধানপূর্বক 'সেকো' নামা এক প্রকাণ্ড কুম্বীরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে সে অতি অগ্নিদনের মধ্যেই, একজন দনী ও সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিগণিত হইল এবং বিবাহ করিয়া পত্নী ও জননীকে লইয়া, পরমতুণ্ডে কালযাপন করিতে লাগিল। তুণ্ডের ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়বনের দেবদেবীগণও মহোৎসবের সাধিত হইল। এতদিন তাহারিগের মধ্যে যে প্রজ্ঞার হিংসা, বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য বিস্তারন ছিল, তাহা চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল। সমস্ত দেবদেবীর অধিকার সীমা নির্ণীত ও দৃঢ়ীভূত হইল এবং কেহ কাহারও সহিত কখনও বিবাদ করিবেন না, স্ব স্ব অধিকারে সম্পূর্ণ শাসীনভাবেই শাসনবস্তুর পরিচালনা করিবেন বলিয়া পরস্পর প্রতিজ্ঞাপাশে সংবদ্ধ হইলেন। সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে, এখনও তাহার বনরাজ্য শাসন করিতেছেন—বনবিবিও দক্ষিণরায়কে সমগ্র হৃদয়বনের নেতৃপদে বরণ করিয়া, ধরমানন্দে দেবভীষন যাপন করিতেছেন।

শ্রী অঘোয়নাথ বহু কবিশেখর।

গৃহিণীর কর্তব্য

যেমন দৈনিক পরিচালনে নেতার আবশ্যক হয়, তদ্রূপ গৃহকাৰ্য্য সম্পাদন করিতেও উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সংসার ক্ষেত্রে কাৰ্য্যদি গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্তী সম্পন্ন করেন। তন্মধ্যে গৃহিণীর কর্ত্তব্য কি তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। সংসারচক্রে গৃহকর্ত্তীই নেমি বস্ত্রণ। সৰ্ব্বনিয়ন্তা সেই চক্রে পরিচালক।

সংসারের সময় কাৰ্য্যেই গৃহিণীর কর্ত্তব্য সমভাবে রাখিতে হইবে। তাঁহার কাৰ্য্য-কারীতার শক্তি অঙ্গসারে ভূত্যা প্রভৃতি অশীল ব্যক্তিগণ কাৰ্য্যক্ষম হইয়া থাকে। অলস গৃহকর্ত্তীর অবদ্বন্দ্ব দাসদাসী অধিকাংশ চলেই দূত হয়। কষ্টমিতা গৃহিণীর স্নানম চতুর্দিকে পরিষাণ হইয়া পড়ে। তখন তাহাকেই আদর্শ রমণী বলিয়া লোকে সম্মান করে। সংসারে প্রকৃত স্বর্থ প্রাপ্ত হইতে হইলে এই শ্রেণীর গৃহিণীর ধারাই মানিত হইতে পারে। সলজ্জা যুবতী, বুদ্ধিমতী রমণী, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ, কৰ্ম্মনিপুণ। গৃহিণীই সংসারে শান্তিবারি নিকনে সমর্থ। পশ্চৎ নির্লজ্জা হরুণা নারী অথবা উত্তম পরিচ্ছদ বিকৃতিতা কলহপ্রিয় রমণী তাপনদ্যা জ্বালাময়ী সংসারক্ষেত্রে শান্তিবারি বধণ করিতে পারে না। যে গৃহিণী স্বামী এবং সম্মান সম্ভোগপক্ষে স্বণী করিতে পারে তাহার তপস্বেণা স্বর্থ আর কি আছে, তাহার চরিত্র যে কতদূর উন্নত তাহা আর কি অধিক করিয়া বলিতে হইবে। তাঁহার পবিত্র চরিত্র উপভাস-কথিত নারিকা অপেক্ষা

বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। যিনি পতিকে নরকের পথ হইতে দ্বন্দ্বমার্গে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাকে প্রশংসা না করিয়া কে স্থির থাকিতে পারে। যিনি সংসারে দাস দাসীসমূহকে দ্বিষ্ট বাক্যে সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত গৃহিণী যোগ্য। উপভাসের নারিকা কবির স্বকপোলকল্পিত আলোচ্য। আদর্শ গৃহিণী কবির কবি যিনি তাঁহার স্বরচিত কৌশল সৃষ্টি। প্রথমটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতে যাওয়া আর কোন একটি উদ্ভিদের মূলোৎপাটন করিয়া তত্ত্বপরি জলসেচন করা একই অর্থ। মহাগুরুবর সহিত ক্ষুদ্রাঙ্গি শিখের তুলনা চলিতে পারে না। অনুরা উপভাস-ভোজী পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে এই প্রকার দারপা আছে। কেহ উপভাস কথিত নাথিকার সহিত স্বীয় পত্নীর তুলনা করিতে বাইয়া সংসারকে ঘোর অশান্তি-ময় করিয়া তুলেন। সেই অজ্ঞাই আমরা এই বাক্যের অবতারণা করিলাম।

যাহা হউক, কেহ যেন এ কথা মনে না করেন যে, উত্তম গৃহিণী হইতে হইলে সকল স্বর্থক্ষমতা, কোচকামোদ, বিজ্ঞানাদি পরি-ভাগ্য করা কেবল গৃহকাৰ্য্য লইয়াই অট-প্রহর নিযুক্ত থাকিতে হয়। “এইদেশে একটি প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে “রাধুণীও চুল বাধে।” ইহার অর্থ এই, যে রমণ কাৰ্য্য সম্পাদন করে তাহার পোষাক পরিচ্ছদের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয় অর্থাৎ কেবল এক রকমের কাণ্ড করিয়াই জীবন কাটিয়াতে হইবে না, আমোদ প্রমোদেও যোগদান করিতে

হইবে। শরীরেরদিকে নিরুজ্জ্বল হইলে চলিবে না। অতএব গৃহিণীকে সংসারের কাজ কৰ্ম্ম সকলই দেখিতে হইবে এবং শরীর রক্ষা করিয়া আমোদাদি উপভোগ করিতে হইবে। কোন কাৰ্য্যই নিরাস হইলে শান্তি প্রদ হয় না। এ কথা সর্ববাদী সম্মত। নিত্যন্ত দুঃস্বপ্নকাণ্ড ও মলল ও সরস করিয়া লইতে হয়। যে গৃহিণী সাম্যারিক কাৰ্য্য অশ্রুজ্ঞানতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারেন না, তাঁহার স্বর্থ কোন কালেই নাই। অতএব তাহার কথা স্বতন্ত্র।

গৃহকর্ত্তীর কি কি গুণ থাকিলে সংসার স্বর্থের আশার হয় এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিব। তাহাকে অতি প্রিয়তম শয্যা ভোগ করিতে হইবে। তাহাকে প্রভাতে হস্তোত্তীর্ণ হইতে খেলিবে সেই পরিবারস্থ অজ্ঞ কেহ অধিকক্ষণ শয্যা পড়িয়া থাকিতে পারিবে না। সেই গৃহের দাসদাসী হইতে বালক বালিকাগণ পর্য্যন্ত গৃহকর্ত্তীর পদাঙ্গুলস্পর্শ করিতে বাধ্য হয়। আর যতগুলি স্বর্থ তিনি অসাধারণা হইয়া হৃদ্যোদয়ের পরক্ষণ পর্য্যন্ত নিম্নাভিকৃত্য থাকেন, তাহাই হইলে তাঁহার স্নেহচরবর্ণও তপস্বসরগ করিবে তাহাতে কিছু মারি সন্দেহ নাই। অতএব সংগৃহিণী না হইলে সে সংসারের বিপত্তির পরিসীমা থাকে না। এবং শৈশবে বালক বালিকা হস্তিকা দ্রাশ্রয় না হইলে তাহারা সংসারক্ষেত্রে পদে পদে বিপণ্ডিত হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যয়ে হস্তোত্তীর্ণ হইলে বহু কাৰ্য্য পরিবার অবসর পাওয়া যায়। তৎকালের শীতল বায়ু সেবন করিলে সমুদ্রের জীবনীশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সময় রজনী বিজ্ঞানের পর মস্তিষ্ক হস্তীতল এবং হৃদয় হয় হস্তরঙ্গ অতি দুঃসাধ্য কাৰ্য্যও সহজে হস্তস্পর্শ

হয়। অতএব ছাত্রগণের পাঠ্যভ্যাসের ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। দিব্যারাত্রির মধ্যে এমত মূল্যবান সময় আর নাই। মস্তিষ্ক শীতল থাকে বলিয়া গভীর মনোনিবেশ সহজই হয়। প্রাতঃকালে নিশ্বেশিত না হইলে সময় দিনটিই বুঝায় নষ্ট হয় এবং মন ঘোর অশান্তিতে বাপন করিতে হয়। • যথাসময়ে শয্যা গমন করিয়া প্রত্যয়ে শয্যাভাগ্য করিতে শিক্ষা করিলে ধনী ও জ্ঞানী এবং স্বস্থকায় হওয়া যায়। একজন ইংরাজ কবিও এই কথার অঙ্গমোদন করিয়া বলিয়াছেন—

“Early to bed, and early to rise,
Makes a man healthy wealthy
and wise.”

হতরা হৃদ্যোদয়ের পূর্বে শয্যাভাগ্য করা শিশু বৃদ্ধ সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে কতি বিদ্যুৎমাত্রও নাই কিন্তু লাভ পূর্ণমাত্রায়। হৃদয় হইতে হইলে পরিবার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যেমন অল্প প্রভাতাদি পরিত্রুত রাখিতে হইবে, তদ্রূপ গৃহমধ্যস্থ স্বাস্থ্যসম্ভারের দিকেও দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। শরীর স্বস্থ থাকিলে শীতল জলে স্নান করা বিধেয়। কেহ কেহ ঈশ্বরদ্বয় জল ব্যবহার করিয়া থাকে। সেরূপ করা নিত্যন্ত অজ্ঞায়। প্রত্যহ উষ্ণ জলে স্নান করিলে পাতকের চর্ম্ম লোপ (চিলে) হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে হৃদয়াক্তর পক্ষে শীতল জলই প্রশস্ত। তবে শীতপ্রধান দেশে উষ্ণজল ব্যবহারের আধিক্য দৃষ্ট হয় যদ্যপি দেশকাল-পাত্র ভেদে রীতিনীতির পার্থক্য হইয়া থাকে। অতি শৈশবে শিশুগণের নৈমিক স্নানের ব্যবস্থা প্রধান করা কর্ত্তব্য নহে।

হুনিপুণা গৃহিণী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উখিত হইয়া সাংসারিক সমগ্র কার্য তত্ত্বাবধান করিবার জ্ঞান সময় বিভাগ করিয়া লইবেন। সকল কার্য তত্ত্বাবধান করিতে না পারিলে, গৃহমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইবে। প্রতি কার্যে সময় বিভাগ করিয়া লইতে পারিলে তাঁহার বিশ্রাম করিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। গৃহিণীকে সর্বদা মস্তিষ্ক শীতল রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। কোমলপ্রিয়া গৃহিণী সংসারের জ্ঞান। সে কখনও মিষ্টবাক্যে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না। তাহাতে সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠে।

গৃহকর্ত্তার মিতব্যয়িতা আর একটি বিশেষ গুণ। এই গুণটি শিক্ষা না করিলে সংসারের কোন প্রকার উন্নতির আশা থাকে না। স্বল্প ব্যয় সাংসারিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, মিতব্যয়িতার নিত্যমাত্র আবশ্যক। মিতব্যয়িতা প্রজ্ঞার চূড়ান্ত, পরিমিত পান্য-হারের ভগিনী, স্বাধীনতার জনকজননী বলিয়া কথিত। যে গৃহকর্ত্তা পরাধাতে ইহাকে বিদ্রোহ করেন, তাঁহার এবং সেই সংসারের পতন অনিবার্য। উক্ত গৃহিণীর পরিণাম ফল অতি বিষময়। পরিশেষে তাঁহার জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি।

মিতব্যয়িতা শিক্ষার গুণ সকলেই অবগত আছে। অতি দুঃখ ব্যক্তিও এই গুণ শিক্ষা দ্বারা অভুল বিভবশালী হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে; আবার কেহু উহাকে অপমানিত করিয়া তাহার বিপুল অর্থও নষ্ট করিয়া ধারে ধারে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকাকান করিতেছে। অপিচ, যাহার এই প্রকার প্রবল ক্ষমতা তাহাকে কবললগত করিতে শিক্ষাকরা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে গৃহিণী

ইহাকে স্ব কবলে আনয়ন করিতে সমর্থ তাঁহারই জ্ঞান সার্থক। কেবল তিনিই স্বীয় পরিবাহ্য ব্যক্তিস্বত্বকে অঙ্গুলী বলেন পরিচালিত করিতে পারেন। তাঁহারই ক্ষমতা অসীম। তাঁহারই প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছে। যিনি বিপদসমূহ স্থানে বহু বাধা বিপত্তি উদ্ভাবন হইয়া স্বীয় কার্যক্ষমতা শক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই সমুদ্রে একজন কবি বলিয়াছেন, অতঃস্থানের মধ্যে যে শকটবান তাহার শকটখানি স্বল্পায়াসে নিরাইতে ঘুরাইতে পারে, তাহাকেই হুনিপুণ শকটচালক বলা যায়। অর্থাৎ স্বীয় কার্যের কৃতিত্ব প্রদর্শন বুদ্ধিশক্তির উপর নির্ভর করে। তাহা কোন বাধা বিঘ্নের অপেক্ষা রাখে না। গৃহকর্ত্তাও বুদ্ধিশক্তি হইলে বহু অশ্রুবিধা স্ববেগে সংসারের সকল কার্য হুশ্রুততার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন। গৃহিণীর অন্তর আছে সংসার পরিচালিত করিতে হইবে। বসামাত্র অর্থ দ্বারা ব্যবসায় পরিচালিত করিতে না শিখিলে অধিক অর্থের দ্বারা নিপুল আয়োজন করা সম্ভব হইবে না। প্রথম সরল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে হয়, পরিশেষে কিঞ্চিৎ নৈপুণ্যলাভ করিলে, তৎপক্ষে অধিক আয়াসসার্থ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করা মন্দ নয়।

আবার মিতব্যয়িতা অর্থে যেন কেহ কার্পণ্য না বুঝেন। মিতব্যয়িতার জিহোমায় রূপপতা ভ্রষ্টিতে পারে না। প্রথমটি অতি উচ্চ দ্বিতীয়টি অতি নীচ। অত্যধিক পরিমাণে মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিলেই কার্পণ্য দেখা যায়। পণ্ডা পণ্ডা। সুতরাং এই বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। উত্তম বিষয় শিক্ষা করিতে যাইয়া যত্নপূর্ণ কদভ্যাস শিক্ষা

করা হয়, তদপেক্ষা আর অধিক পরিচালনের বিষয় কি হইতে পারে। নীচতা হইতে যেন সকলেই বহু দূরে অবস্থান করেন। কারণ নীচতাই মনুষ্যকে পশুতে পরিণত করে। পশুশেষে তাহাকে খোর নরক যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয়।

বন্ধু দ্বিবিদ। প্রকৃত এবং অপ্রকৃত। এই উভয় প্রকার বন্ধু নির্দেশ নিত্যমাত্র আবশ্যক। যাহারা ব্রহ্মে হৃদয় ভ্রমে স্থগী হয় অর্থাৎ বিপদকালে সমবেদনা প্রকাশ করে; তাহারাও মধ্য মিত্র বলিয়া কথিত হয়। আর যাহারা 'হৃদয়ে পায়রা' অর্থাৎ হৃদয় বা বিপদকালে বন্ধু সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া দূরে দূরে অবস্থান করে এবং অপরকে দুঃখ ও নিন্দাবাদে অভিহিত 'আনন্দ' বোধ করে তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধু অর্থাৎ ভ্রাতৃত্বিক শত্রু বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীক বন্ধু ওরফে শত্রুকে বন্ধু শ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া লইতে হইবে। পৃথক করিতে না পারিলে সংসারের বিশেষ অশান্তি থাকিয়া যায়। গৃহকর্ত্তা এই কার্যের উপযুক্ত পাত্রী। শ্রেণীক বন্ধুকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করাও শ্রেয়। এই বন্ধুবর্গের বহিরাবস্থা এক ও অন্তরাবরণ অপ্রজ্ঞকার। উহাদিগকে সমস্ত শাস্ত্রকারণ 'বিস্কৃত পায়োম' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কোন পাত্রে কিঞ্চিৎ বিয় রাখিয়া দিয়া তৎপরি দ্বি টালিয়া সেই কৃত্ত শূণ্য করিয়া রাখিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয় শ্রেণীক বন্ধুর অবস্থাও তদ্রূপ। বহির্ভাগ দেখিয়া কিছুই স্থির করিবার উপায় নাই। পুণ্ড্রকে যে প্রকার সর্প লুকাইত থাকে তাহার বহির্ভাগ দর্শন করিয়া কোন বৈদ্যই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না কিন্তু কেহ

উক্ত বন্ধুর নিকট পুণ্ড্রচয়নার্থে আগমন করিয়া পুণ্ড্র হস্ত প্রদান করিবারাত্র সেই শ্রেণীক বন্ধুর দ্বারা লুকাইত বিষদর তাহাকে দর্শন করিল। মনুষ্যগণের এই শ্রেণীক শ্রেণীর বন্ধুগণও তাহাদের অন্তরে করিবার জ্ঞান সুযোগ অন্বেষণ করে এবং অবসর মত ভীষণরূপে দর্শন করে। সুতরাং এই প্রকার গুণবান বন্ধুকে জ্ঞাত হওয়াসার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গৃহিণী যত্নপূর্ণ সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ সময় প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইলে সেই পরিবারের শিক্ষার জ্ঞান কোন পদার্থও উপদেশাবলী পাঠ করিয়া বালকবালিকা ও অপর ললনাপুত্রকে অবশ্য করাইলে এবং তাহার দর্শন দ্বন্দ্বময় করাওলা বিশেষ ফলাদয় হইতে পারে। সেই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করাও মন্দ নহে। অবসর মত বালকগণকে শেলাইয়ের কার্যাদি শিক্ষা দেওয়া উচিত।

কোন নরপাত্রী বন্ধু আগমন করিলেন আর তাহার সহিত দু' তিন ঘণ্টা কথোপকথনের পর 'গজাঙ্গল', 'সন্দেশ', 'মিছরী' প্রভৃতি পাঠিয়া বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিলেন। সৌজন্য করা নিত্যমাত্র জ্ঞাত। এই প্রকার বন্ধুত্বের বিষয় ফল সবেমাত্র অনেকের অনেক কথা অবগত আছে। কতিপয় বৎসর পূর্বে শান্তিপুত্র, নবশ্রী প্রভৃতি স্থানে পূর্বোক্তরূপ বন্ধুত্বের ডেউ উঠিয়া দেশ ভাগাইয়া লইয়া যাইতে বসিয়াছিল কিন্তু কতিপয় -কাণ্ড মধ্যেই হইয়া উক্ত ডেউ একবারে দেশ হইতে অস্থিহত হইয়া গিয়াছে। এই সকল ঘটনা অনেকেরই অবগত আছে। এই মূল বিষয় প্রত্যেক গৃহিণীরই লক্ষ্য রাখা উচিত। তাহা হইলে আর পরিবার মধ্যে

কোন প্রকার অশান্তির কারণ থাকে না। বহুদিন ধরিয়া চরিত্রাদি পথ্যালাচনে। করিয়া কাহারও সন্নিহিত বন্ধুবহুকে আবদ্ধ হইতে হয়। হঠাৎ কোন কাহা হইয়া সম্পাদন করা বিবেচ্য নহে। হঠাৎ বন্ধুবহুকে আবদ্ধ হইলে প্রায়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুই নিমিত্তা যাহ। বস্তুতঃ প্রকৃত বন্ধু প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। সেইজন্য জটন কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

“প্রথময়ে অনেকই বন্ধু বটে হয়।

অনুময়ে হায় হায় কেহ কিছু নয়।

কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি মিনি।

সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।”

তাঁহার বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ভিন্ন যথার্থ বন্ধু আর কেহ নাই।

অতিথিসংস্কার সমস্যার আর একটি বিশিষ্ট গুণ। অতিথিকে স্বপাচ্যাদা পান্য পরি-
তোষরূপে আহার প্রদান করিতে পারিলেই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্যতা সম্পাদিত হইতে পারে। এই গুণটি প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহীকেই শিক্ষা করা কর্তব্য। এক সময়ে আমাদের দেশ অতিথিসংস্কার দ্বারা বিপুল-
ব্যয়িত অর্থনৈতিক করিয়াছিল। এক্ষণে তাহা আংশিক পরিমাণে কোন কোন স্থানে দূর হয় মাত্র। অবিশ্যই স্থলেই উক্ত গুণটি বিপুল হইয়া গিয়াছে। তাহার স্থান আত্মতুলি এবং বীথ উদরপূর্তি অধিকার করিয়াছে। প্রাচীনকালের জায়বালিকাগণের প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করা হয় না বলিয়া, অধিকাংশ গৃহকর্তার এই প্রকার হীনাবস্থা। অতিথিসংস্কারে যে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। অতিথিসংস্কারকারী মনের মধ্যে অলঙ্কৃত-
ভাবে যে নির্দোষবান্য জীভা অলঙ্কৃত থাকে তাহা তাহার বসনমণ্ডল দর্শন করিলেই উপ-
লব্ধি হয়। অতিথিও তাহার হস্তবসন দর্শন

করিয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতে থাকে। এই অপরিমীম্য আনন্দ অপরস্বাদকে অম্ভব করিতে পারে না। বোধ হয় এই সমুদায় সঙ্গুণ ভারতবর্ষ হইতে অর্থদান করিতেছে বলিয়াই ভারতবাসী সংসারে প্রথিত হইয়া শাস্ত্রহীন অম্ভব করিতে পারিতেছে না।

গৃহকর্তাকে আর একটি বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমস্যার কোন কথা দাসদাসীর অথবা বাহিরে কাহারও নিকট প্রকাশ করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। আশীর অজ্ঞাতনামে তাহা তৃতীয় ব্যক্তির কার্য প্রবেশ করিতে দেওয়া অতীব অজ্ঞান। যে সমস্যার গৃহীতি ঘরের কথা গুরুর কাছে উঠাইয়া থাকে সেই সমস্যার শীঘ্রই ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ চিরকাল অশান্তিতে কালযাপন করে। সংস্কার অভাবে এই প্রকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক বালক বালিকাকে শৈশব হইতে ব্রহ্মচর্য দান না করিলে এইরূপ বিষম বিপত্তি সংঘটিত হয়। মাতাপিতা বা অপর গুরুজনের শৈশবাবধি বালক বালিকাগণের সংশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা না করিলে দেশের অচিরে ক্ষয় মান হইবে। বালক বালিকাগণকে শৈশবে স্ত্রীতি, ব্রহ্মচর্য প্রদান এবং গুরুজনে শাস্ত্রীয় উপদে-
শাদি প্রদান করা কর্তব্য। এবং নৈতিক জ্ঞান পরিবর্দ্ধন জন্ত প্রত্যেক গুরুজনকে সচেত হইতে হইবে। তাহারিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া অপর কোনদিন তাহাদের সুখ হইতে তাহা অবগত করিতে পারিলে স্রোতা ও বক্তার উভয় কাহা হইয়া সম্পাদিত হয়। তাহার অধি-
কাশ সময়েই ঐতিহাসিক গল্পাদি ভিত্তিতে আগ্রহ প্রকাশ করে স্ত্রতরা নীতি এবং হিতোপদেশক্ষে তাহারিগকে সেই সকল

উপদেশ করিলে যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। এই সকল বিষয়ের ভার গৃহীকেই লওয়া কর্তব্য। বালক বালিকাগণ অধিকাংশ সময়ে মাতার নিকট থাকে এবং পিতা অর্থোপার্জন এবং অপরকার কার্যাদি সম্পাদন করবার জন্ত অধিকাংশ সময়ে গৃহের বহির্ভাগে অবস্থান করেন, অতএব জননীকে প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে তাহাদের উপদেষ্টা হইতে হইবে। তিনি এই প্রকার কঠনামা কাহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে, তাহার সন্তান সন্ততিগণ প্রকৃত “মাহুষ” হইবে না। এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হঠাৎ হইলেই বলে গুরু-
শিক্ষা। উহা ব্যক্তিরকে বিদ্যাশিক্ষা ফলস্বরূপ হয় না। স্থল, কলেজের মূলপত্র মাতাপিতার নিকটেই হইয়া থাকে। তাহার তত্ত্বাবধান না করিলে উক্ত শিক্ষার কোন প্রকার ফলো-
দয় হয় না। কোন বালক বালিকার পড়া-
দুই হইতে পারে কিন্তু শিক্ষক কি তাহাকে ছুঁ চার খণ্ডি শিক্ষাদি। “পাখা পিঠিয়া ঘোড়া” করিতে পারেন ? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। মাতাপিতার সহায়তা ভিন্ন বাহিরের গুরু উপদেশ বার্ষ হইতে পারে স্ত্রতরা গৃহীকে সর্ব প্রযত্নে সন্তানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সদা সঙ্গুণেশ প্রদান করিতে হইবে। মার্জিত শিক্ষা এবং নিম্নলি চরিত্র এই দুইটি প্রতি ভূতাকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া কাহা করিতে হইবে। পিতা ও গৃহী এই প্রকার চেষ্টা করিলে তবে শিক্ষকের সাধনো বালক বা বালিকার উন্নতি হইতে পারে।

অতঃপর চরিত্র গঠন। প্রকৃত প্রস্তাবে বালক ও বালিকা সকলেরই চরিত্র গৃহেই গঠিত হইয়া থাকে। অতি শৈশব হইতে গৃহীণীর উপরই এই গুরুতর ভার দ্রুত হয়। তাহাকে অতিশয় সাবধান হইয়া চলিতে

হইবে। এবং তাহাদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহারা কোন অজ্ঞাত কাহা করিয়া অস্বীকার করিলে বিবিধ উপদেশ-
বাক্যদ্বারা বলিতে হয়, “স্বীকার কর, কোন শ্রুতি পাইতে হইবে না।” তাহারা স্বীকৃত হইলে মনকাহার্যে দোষ গুণ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তখন হইতে “শাস্তি পাইবার ভয় নাই” ভাবিয়া আর তাহারা মন কাহা করিয়া ফেলিলেও নিম্নাধ্যাক্ষ বলে না। এইরূপ কৌশলে তাহারিগকে সত্যবাদী করিয়া তুলিতে হয়। অজ্ঞাত সত্যাদিও এই প্রকারে শিক্ষা দিতে হয়। বালিকাগণের গৃহকাহা দি শিক্ষা প্রদান করিবারও এই প্রকার নিয়ম।

ভগবানের আরাধনা করিবার জন্ত কোন নির্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া দিতে হয়। এই প্রকারে যথেষ্ট দিকে তাহারিগকে গমন করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। অন্ততঃ বালকবালিকাগণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাহাতে ভগবানকে এক একবার স্মরণ করে তাহার ভার গৃহস্থমী অথবা গৃহকর্তার লওয়া উচিত। এইরূপ করিতে করিতে তাহাদের ক্রমশঃ ভগবানে প্রেমভক্তি হইবে। আত্মকাল অনেকে জুলিয়াও একবার ভগবানের নাম পঠন করে না। ইহা তাহাদের শৈশব শিক্ষার মধ্যে হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহাদের মাতাপিতা সেবিত্ত দায়ী। তবে কোন কোন ব্যক্তি শৈশবে সং শিক্ষা পাইয়াও সংসরণোয়ে মন হইয়া উঠে। তাহাতে আর মাতা পিতার দোষ কি। শাস্ত্রেই উক্ত আছে “সংসরণা দোষ ভগ্না ভবন্তি।” অর্থাৎ সংসর্গ হইতে দোষ এবং সংসর্গ হইতেই গুণ জন্মে। যেমন জড় জগৎ তেমনি অন্তর্জগতে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে, একটি বস্তু অপর বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে, আমরাও অপরকে

আকর্ষণ করিতেছি তাহারাও ঐরূপ করিতেছে। এই আকর্ষণ বিকর্ষণ স্বভাবের আদান প্রদান হইতেছে। তাহাতে কেহ সংস্কারকে আকর্ষণ করিয়া ভাল হইয়া যাইতেছে, কেহ অসৎ সংসর্গ ধরিয়া উৎসরের দিকে চলিয়াছে। ইহাকেই সংসর্গদোষ বলে।

ধর্মহীনতা এবং নাস্তিকতাও গৃহশিক্ষার দোষেই হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহিণীকে এই সকল গুণ শৈশবে শিক্ষা করিতে হইবে তবে সে গৃহিণী হইয়া তাহার সন্তানসম্বন্ধিগণকে শিক্ষা দিতে পারিবে। পরহঃকাতরতা মানব-দুঃখের একটি উৎকৃষ্ট গুণ। তাহা শিক্ষা দান করিতে হইলে একটি নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। প্রতিদিন গৃহে কত অক্ষ, বহু প্রভৃতি ভিক্ষার্থ আগমন করে। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী আপনাদের বালকবালিকাকে ডাকিয়া তাহাদের হস্তে ধানের ভদ্রা দিয়া বলিবেন, “ভিক্ষারীকে এই ভিক্ষা দিয়া আইল; ভিক্ষুককে বাড়ী হইতে দ্রিয়ারিতে নাই।” তাহারা এই প্রকারে বংশিকা প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যৎজীবন স্বেচ্ছার আশা করিয়া রাগিতে পারে।

অপর বিষয় বালকবালিকাগণের পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যাদি। তাহাদিগকে গৃহিণী বা গৃহকর্তা পোষাক এবং খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে প্রকার শিক্ষাদান করিবেন সন্তানগণও তাহাই শিক্ষা করিবে। কোন বাল্য খারাপ হইলে মাতা পিতা প্রাণান্তকণ্ডে আপন বালকবালিকাগণের সম্বন্ধে সে কথা বলিবেন না। খারাপ পাকের কথা না বলিলে তাহাদের পুত্র-কন্যাপ্রাপণ সুখিল মাতা পিতা যখন কোন আপত্তি করিতেছেন না, তখন আমাদের এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবার দরকার দেখি

না। জনহীর্ষট মিল তাহার পুত্রকন্যার সম্বন্ধে কোন খাঞ্চে নিম্না করিতেন না। পোষাক পরিচ্ছদ ও পিতার নিকট হইতে তাহারা যে প্রকার প্রাপ্ত হইবে তাহাই উত্তম বলিয়া প্রদান করিলে তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই গ্রহণ করিবে। তাহাদের সম্বন্ধে “এইটি ভাল, এইটি মন্দ” এই প্রকার কথা উচ্চারিত করাই দোষাবহ। তবে পোষাকাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে গৃহিণীকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বালিকার গৃহকাৰ্য্যাদি শিক্ষার দোষ গুণ গৃহিণীর উপরই নির্ভর করে। দৈনিক বাজার হিসাব ও দোবার হিসাব প্রভৃতি গৃহিণীরই রাখা উচিত। যথাকালে পতি-সেবা এবং তাহার ধর্মকাৰ্য্যে সাহায্য করিতে পারিলেই প্রকৃত গৃহিণীর কার্য্য করা হইল। ইহাকেই স্বর্গের সম্ভার বলে।

গৃহিণীর দোষেই পরিবার মধ্যে বিলাসিতার প্রবল বজ্রা প্রবাহিত হইতেছে। পত্নীগাম্যের কোন কোন অংশে এখন আর পুরসীম্বন্ধীগণ পুত্রবধী বা নবীর ঘাটে কলসীকক্ষে জল আনিতে যান না। এখন তাহারা সভ্য-শৈলীকলা হইয়াছেন। এখন তাঁহারা তেল হলু মাখন না। তৎপরিবর্তে তাহারা এসেন্স, অভিকলোন ব্যবহারে নিরত। অঙ্গার দ্বারা দস্ত পরিষ্কার নিস্তান্ধ হয়ে বলিয়া গৃহীত হয় না। তৎস্থানে টুপ পাউডার শোভা পায়। অঙ্গের শোভা সম্পাদনার্থে গোলাপ-সাবান এবং স্কুন্ডগুলের শোভা বৃদ্ধি মানসে পাউডার ও ক্রিম ‘ব্যবহার’ করিতেছেন। এক্ষণে বামাগণের মধ্যে অনেকেরই প্রভুত্ব ভগবৎ নাম স্মরণ করা অসম্ভব মনে করেন। প্রভুত্ব নিম্নোক্ত হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জ্ঞান গৃহকাৰ্য্যাদি দাসদাসীর উপর জ্ঞপ্ত

হইয়াছে। রত্ননকাধ্যো প্যচক-মহাভাজ নিযুক্ত আছে। পুত্রকন্যাদির লালনপালনের ভার দাসদাসী অথবা প্রভুতির উপর অর্পিত হইয়াছে। স্বল্পভায়ে প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় তাহারাও যেন শিশুগণের প্রকৃত জনক জননী। ধনীগৃহে শিশুগণের জন্মের মাসাদিক হইতে না হইতে তাহাদের সমগ্র ভার এই সকল ঋণিত চরিত্র, দায়িত্বশূন্য, বিবিধ ব্যাধিজড়িত নিয়ন্ত্রণের মনোবীর উপর জ্ঞপ্ত হয়। অপিচ শৈশবাবধি শিশুগণের “হীরতেহি মতিস্তাত, হীনমহ সমাগম্যং।”

বচনের সার্থকতা পূর্ণমাত্রায় সম্পাদিত হয়। এইক্ষেপে সেই শিশুগণের চরিত্র শৈশব হইতেই রন্ধ হইয়া পড়ে। স্বদূর পরীক্ষার বামাগণ আর এখন বুদ্ধা ঠাকুর মার নিকট রামায়ণ মহাভারতের গল্প শ্রবণ করে না। তাহারা এখন মডেল ও গল্পের বহিঃস্বাধ্যয়নে নিযুক্ত। বাহ্য হউক, বতরিন মাতা পিতা তাহাদের পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ না করিবেন ততদিন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশের এই প্রকার হীনাবস্থা থাকিয়া যাইবে।

শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।

কপটতা

হিতং মলোহারি চ ছলভংবচঃ।

ভারবি।

দেশে অসংখ্য নিম্ন, মধ্য, এবং উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞান্য হইতে প্রতি বৎসর অসংখ্য ছাত্র পাঠ করিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়াও, দেশে হইয়াছেন,—তাঁহাদের দ্বারা জননী জন্মভূমিকৃতার্থা হইয়াছেন,—তাঁহা আমরা জানি। আমাদের অভিযোগ এই যে পরীক্ষাকালের “পাশের” অহুপাতে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না। “বিজ্ঞা বিনয় দান করে এবং বিনয় হইতে পাজতা জন্মে”। ইহা আমাদের দেশের অতি প্রাচীন প্রবাদ। কিন্তু “শিক্ষিত” ব্যক্তিরিগের মধ্যে বিনয়ী এবং হৃদয়ালোকের যেন একটা বিশেষ অভাব লক্ষিত হইতেছে। পাঠ করা ছাত্রদিগের মধ্যে “চরিত্র” পদার্থটিরও স্তম্ভন প্রাচুর্য্য নাই। “চরিত্র” শব্দটি ব্যাপক অর্থেই আমরা ব্যবহার করিতেছি। চরিত্র

অভাব হইয়াছে বলিতেছি। দেশে এক বা দুইজন কেন, শত শত হৃদয়ালোক মহাশয় ব্যক্তি আমাদের সমাজকে অলঙ্কৃত করিতেছেন,—তাঁহাদের দ্বারা জননী জন্মভূমিকৃতার্থা হইয়াছেন,—তাঁহা আমরা জানি। আমাদের অভিযোগ এই যে পরীক্ষাকালের “পাশের” অহুপাতে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না। “বিজ্ঞা বিনয় দান করে এবং বিনয় হইতে পাজতা জন্মে”। ইহা আমাদের দেশের অতি প্রাচীন প্রবাদ। কিন্তু “শিক্ষিত” ব্যক্তিরিগের মধ্যে বিনয়ী এবং হৃদয়ালোকের যেন একটা বিশেষ অভাব লক্ষিত হইতেছে। পাঠ করা ছাত্রদিগের মধ্যে “চরিত্র” পদার্থটিরও স্তম্ভন প্রাচুর্য্য নাই। “চরিত্র” শব্দটি ব্যাপক অর্থেই আমরা ব্যবহার করিতেছি। চরিত্র

লইয়া বিচার করিলে একই সমাজের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে তেমন একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

যাহারা বলেন আমাদের ছাত্রগণ ইংরাজী শিথিয়া, অথবা সেই ধরণে অর্থাৎ ধর্মশূদ্ধ আচারশূদ্ধ এবং জাতীয়ভাষা শিক্ষা পাইয়া একরূপ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিতও আমরা একমত নহি। আমরা দেখিতেছি আবারা টোল অথবা মোকাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক ও স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের ভাষা একই প্রকার চরিত্র প্রাপ্ত হইতেছে। মোকাবেদের আদেশের বিষয় আমরা অবগত নহি,—তবে টোলে যে আমাদের শাসনমত ব্রহ্মচর্যা-অমের বিধি ব্যবস্থা রক্ষিত হইতেছে না, তাহা নিশ্চয়। যাহাই হউক, বর্তমান কালে ইংরেজী ভাষা প্রাপ্ত, সংস্কৃত দীর্ঘ উপাধি যুক্ত এবং মোকাবেদের সুন্দী মৌল্যী খ্যাতি বিহীন, অনেক ছাত্রই বিজ্ঞান প্রধান ফল বিনয় এবং পাজস্তাণ্ড বজ্জিত দেখিতেছি।

তুমি ছাত্র কেন,—বুদ্ধাদিপিতৃবৃন্দ ও যেন পাজস্তা বা চরিত্র-বল শূদ্ধ হইয়াছেন দেখিতেছি। সকলেই জানেন সত্য এবং সরলতা চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। প্রাচীন কালে হিন্দু বা আর্ধ্যসমাজ যে এই উচ্চতর বিজ্ঞতি ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে নহে,—বিদেশী অনেক গ্রন্থও প্রচুর

রূপে পাওয়া যায় *। সত্য এবং সরলতার প্রণাম্যমূলক সংস্কৃত শ্লোক এবং সৃষ্টি উদ্ভূত করিলে বোধ হয় একখানি সুস্থ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। অধিক কি, অধ্যাপিত ব্রহ্ম গুণ আশ্রয় করিতে গিয়া “সং” বা “সত্য” গুণের ব্যবহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমাদের চতুর্দশের নিত্য কি দৃষ্ট দেখিতেছি। ভারতের ভূতপূর্ব রাজ-প্রতিনিধি মহামানয়ী লর্ড কার্জন বাহাদুর আমাদের চরিত্রের এই গুণের অভাব উপলব্ধি করিয়া ছাত্রগণকে দুইএকটি উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া বেশশুদ্ধ লোক তাহার উপর গভীর হইয়া নানারূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতঃ সেই অভিযোগের প্রস্তাব্যত দিয়া ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আজি কালি এই সত্যপরায়ণতা এবং সরলতা, আমাদের বড় একটা নাই। কাহারও নাই, এরূপ দুঃখ আমি বলিতেছি না,—তাহা বলাই বাহুল্য।

জানি না, কতদিন হইতে, কাহার অভিযোগে, আমাদের সমগ্র জাতির ভিতর এই দুর্বলতার আবির্ভাব হইয়াছে। রাজ-নৈতিক অসদ্ব্যবস্থা এই দুর্বলতার কারণ যাহারা বলিবেন,—তাঁহাদিগকে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে,—রাজনৈতিক অসদ্ব্যবস্থা আসিল কেন? আজি-কালি, নিম্ন শ্রেণীর বালক বালিকারাও জানে যে ভারতবর্ষ কাল্পি

বাহুবলে পরাজিত হয় নাই। জাতীয় দুর্বলতাই ভারতকে পরহস্তে তুলিয়া দিয়াছে। সেদিন একজন ইংরেজ মিডিলিয়ান বেশ একটুকু গৌরবের সহিত বলিয়াছেন,—“বাহুবলে দুঃখ বা যুদ্ধের কৌশলে ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের হস্তগত হয় নাই,—ভারতবর্ষ বিজয়-বাপ্যর ইংরাজের চরিত্রগুণেই সাদৃশ্য হইয়াছিল।” * এই কথা ত মিথ্যা নহে,—জাতীয় মহাসমার অন্ততম সভাপতি শ্রীযুক্ত বিষ্ণু নারায়ণ দর, ব্যারিষ্টার মহাশয়ই এই কথাটি তাঁহার একটি প্রবন্ধে † বলিয়া ছিলেন,—এবং ‡ ইংরেজ মিডিলিয়ান সাহেবটি কেবল উহা আবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। যাহারা রাজনৈতিক আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য চেষ্টা করুন।

একণে যুদ্ধদর্শী সামাজিক মহাশয়েরা সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন এবং বলুন যে আমাদের সমাজেরই সর্বত্র এই নৈতিক দুর্বলতা, অর্থাৎ সত্যবাদিতা এবং সরলতার অভাব ঘটিয়াছে কি না। উপহরণ যদুচ্ছা, যেখানে সেখানে পাওয়া যাইবে। “নামাযলী আছাদিত, দীর্ঘশিখা এবং ভ্রমহু হুশোভিত নয়শাদ অথবা চটি-পাদ (পাঠক ক্ষমা করিবেন) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে সাহেবী হাট, কোট, কলার কর্মজ পোষাক আর্জাহ, বুটছাদিত যুগ্মি মিটার পর্যন্ত সকলেরই মধ্যে এই সরলতার অভাব। আমাদের আচারে

ব্যবহারে, পরিচ্ছদে, খাঞ্জে, কথায়, কার্যে, সর্বত্র কপটতা। কোন মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কৃষ্ণব্রহ্ম বাটীতে আবাসা যাজন করিতেছেন,—কাষের ‘অয়ে প্রতিপালিত হইতেছেন, মহা-লোভনীয় মহা উপাধিটির নিমিত্ত কোন উচ্চ পদস্থ কাষ ‘ভুললোকের নিমিত্ত নিন্দা ভোযামোদ করিয়াছেন। আবার একদিন প্রাতঃকালে সেই উচ্চপদস্থ ভুললোককে দেখিয়া,—প্রাতঃকালে শূজের মুখ দেখিবার ভয়ে,—উত্তরীয়াবস্ত্রধরে,—অর্থাৎ কিনা ঘোমটা দিয়া, নিজ মুখ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। †—নিজে অত বড় পণ্ডিত,—আচারে বিচারে নিষ্ঠায় পরম পণ্ডিত,—অথচ পুস্তকের প্রত্যহ নৈশ ভোজনের নিমিত্ত লুটির মুহুরিত হংসেও এবং কপোত শিশুর ব্যঞ্জনের নিয়মিত ব্যবস্থা আছে। এই পুষ্টিকর খাণ্ড না পাইলে নাকি সেই ব্রহ্মচারী বটটির স্বাধারক্ষা হয় না,—ইংরাজি পাঠাপুস্তকের ভায়ে তাহার মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই দুষ্টিয় কল্পিত নহে,—সত্য, সত্য, সত্য। এত গেল নির্ভাজ সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা। আর বাবু?—(অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষিত ডেপুটি, যুগ্মক, প্রফেসর, মাস্টার, ডাক্তার—এডিটার করিবেন) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে সাহেবী হাট, কোট, কলার কর্মজ পোষাক আর্জাহ, বুটছাদিত যুগ্মি মিটার পর্যন্ত সকলেরই মধ্যে এই সরলতার অভাব। আমাদের আচারে

* Strabo, Arrian, Hian-Tsiang, Khan-thai, Friar Tordanus, Feijn, Idrisi, Shams-ud-din, Murcopolio ইত্যাদি অসংখ্য বিদেশী লোক প্রাচীন আর্ধ্যগণের সভ্যতারূপিতা এবং সরলতার প্রশংসা করিতেছেন। Prof: Max Müller প্রাচীন বিদেশী পণ্ডিতদিগের কৃত এই সমস্ত বক্তব্যের উল্লেখ করতঃ ঠিকই বলিয়াছেন,—“There must be some ground for this, for it is not a remark that is frequently made by travellers in foreign countries, even in our time, that their inhabitants invariably speak the truth. Read the accounts of English travellers in France, and you will find very little said about French honesty and veracity, while, French accounts of England are seldom without a fling at *Perfidie Albion*!” Max Müller's India: What it can teach us; page 57

* “He (Mr. Bishan Narayan Dar) is most emphatically right. India was not won by sword or by intrigue, but by character.” A District Officer on “Indian Progress and Anglo Indian Bureaucracy” in the Hindustan Review, September 1913, p. 748.

† A serial Essay on “Indian Progress and Anglo Indian Bureaucracy” By Mr. Bishan Narayan Dar, Bar-at-Law, published in July and August isue of the Hindustan Review, 1913.

‡ উপাধি পাইবার পরে অবশ্য এই ঘটনা ঘটয়াছিল।

দরকার, অল্প বয়স্ক, স্বামী-স্ত্রী-সহজ্ঞ জানশুত্র, বিধবা বালিকাদের শাস্ত্রমত পুনর্বিবাহ দেওয়া উচিত,—পুত্রের বিবাহে পণগ্রহণ অস্বহিত ইত্যাদি,—এবং হয় ত তিনি এই সকলের বৈধতা প্রতিপাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণমনে, তারথের বক্তৃতা করিবেন,—অথবা মাসিক পরে বেশ মালমশলাযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিবেন,—কিন্তু কার্যকালে?—একবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। তখন আশঙ্ককতা অহুসারে কখনও শাস্ত্রের দোহাই, কখনও বাবসায়ের দোহাই, কখনও পিতামাতার দোহাই, কখনও পূর্বপুরুষের দোহাই,—কখনও বা শ্রীমতী গৃহলক্ষ্মীর দোহাই দিয়া পাশ কাটাইয়া বসিবেন। সকালে দেশে “মরদের বাতের” (অর্থাৎ পুরুষের বাক্যের) সহিত হাতীর দাঁতের তুলনা দিত, * অর্থাৎ প্রকৃত পুরুষ যে, সে একবার যে বাক্য মুখ হইতে বাহির করিয়াছে, তাহা আর ঘুরাইয়া লইত না;—এখনকার নৃতন প্রবাদ-গতক আমায়ের বাক্যের সহিত কৃষ্ণের মস্তকের তুলনা দিবেন;—“এই আছে এই নাই, এই আরবার!” আমরা সম্পূর্ণ শ্বেচ্ছাচারির ছায় যাহা ঘৃণী করিতেছি, ঠাইতেছি,—কিন্তু লোকের কাছে, একেবারে বকামাখি। সেদিন বিক্রমপুরে “ব্রাহ্মণ মহাশয়িনী” হইয়া গেল;—সভাগণ ছই দণ্ডার সন্ধ্যাকার জু ছুটি লইয়াছিলেন, সংবাদ পরে রিপোর্ট হইয়াছে। ইহার পর মাননীয় শ্রীযুক্ত গজননী সাহেবের আদর্শে, হাকিম কেবাজী

উকীল প্রভৃতির সন্ধ্যা করিবার নিমিত্ত ছুটির প্রার্থনায়, বোধ করি হজুর কৌশিলে দরখাস্ত পড়িবে। কত মোকাজি, চটাজি, জোজি না দেখিয়াও স্বাস্থ্যরক্ষার (১) খাতিরে মুখগী দি-বাইতেছেন,—তাঁহারা ই আবার ঘরে মূল-মান থাকিলে ঈলপান করিতে পারেন না,—এবং বিলাতপ্রভাগত ব্রাহ্মণ যুবককে এক-মুঠের “করিতে যুব পটু!” বর্তমান উৎকল সাহিত্যের মহাকবি কলির ব্রাহ্মণের কি হৃদয় চিত্রই আঁকিয়া গিয়াছেন।

“সারথত ব্রাহ্মণের বাণী আরাবনা রিরত, এবং সেহি দেবী ভিরোভাবে, ব্রহ্মচর্য তেজি বিপ্রে হেরে কলিমুগে, লোভ মোহ জালে পড়ি, অবিতা সেবক। চন্দ্রিকা পীযুষপায়ী চকার-ওরমে জমিবে উলুক,—স্মাতিমির প্রণয়ী! অকর্ষ্যা দ্বিজাতির হেব অবশেষে যটকর্ষে যটকর্ম একমাত্র ব্রত। তপ, দম, নিয়মদি সবু ঘরে যাই একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ-গুণ-বিবে গুণে, ধর্মকু করিবে বিপ্রে জীবন-জীবিকা।”

মহাযাজ্ঞা, গকমসর্গ। ৭

এই যে বৃন্দেী আমোলনে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপরান্ত মাতিয়া উঠিয়া-ছিল,—ইহাতেই বা আমরা কি শিখিলাম? কত কপট, স্বাধিস্থির বাসনা, নেত্র নাম গ্রহণ করিয়া কিছুদিন দিয়া নাম ডাক ও অর্থ উপার্জন করিয়া লইব, তাহার গণনা কেহ করিয়াছে কি? কত বিদেশী ব্রহ্ম

বৃন্দেী বলিয়া বিক্রয় করিয়া উত্তারা দুইদিনে বড়লোক হইয়া গেল;—কত প্রবন্ধক স্বভাভির শোণিতময় অর্থ শোষণ করত জলোকার মত পুঠি কলেবর হইয়া গেল;—তাঁহা কল্লজন লোকে লক্ষ্য করিয়াছে? বৃন্দেীরা উত্তেজনার কত বিশেষী বিলাস-ব্রহ্ম আশাদের মত ভরষা গিয়াছে;—যাহারা আগে সাবান মাখে নাই, গন্ধদ্রব্য চিনিত না,—তাঁহারাও প্রচারকের মোহময়ে বিভ্রণ মূলা বিলাতী ব্রহ্মের বাবসায়ে অভ্যস্ত হইয়া গেল! এই যে কত অস্বয়স্ক দুপের বালক দহাতা এবং মৈরহতাদির দ্বিত কথ্য করিয়া নিজ নিজ জীবন বার্থ এবং পরিবার, বংশ, জাতি এবং দেশের নামে জরপনয়ে কলর রোপণ করিতেছে, কত গৃহস্থের গৃহে নিরানন্দের স্বপ্ন বহিতেছে,—ইহার মূলে সেই কপট, বন্দ্যাজী, ভুল দেশ-সেবক অথচ প্রকৃতপক্ষে দেশের শত্রু তথা কৃষকের নেত্রগণের পাপ বিস্তারন রহিয়াছে। জীবিত বাজাদিগকে পাপ তাপের পথে ঠেলায়া দিয়া সেই বন্ধাখিক পাপিষ্ঠেরা দ্বিবা স্বথভোগ করিতেছে! “বক্তাকারক সেই” কাপুস্ক নরাধমেরা নিপদের* স্বপ্নপাতমাকেই পুঠ-প্রদর্শন করিয়া পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। কতজন অপমানীরা স্বথ স্বপ্নের, ভিন্নদেশে নিরাপদ স্থানে থাকিয়া, তথা হইতে নানাবিধ অসহৃদয়শূণ্য পণ্ড ও পুত্রকামি বারা এদেশের ছেলেরদের ও স্কন্ধ সঙ্গে তাহাদের অভিভাবক গৃহস্থদিগের সর্বস্বনাশ-স্বপ্নের জ্ঞা অবিরত চেষ্টা করিতেছে। আমরা এখন যাহাতে তথাকথিত নেত্রদুপের হস্ত হইতে আশ্রয়রক্ষা করিতে পারি এবং ছেলেরদের বাঁচাইতে পারি, তাহার চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। এ

এবং মনোযোগ প্রদান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা স্বভাবতঃই ভাবপ্রধান জাতি এবং ওমনেও কিছু লঘু,—সেইজন্য ভাবের স্রোতে “জি” সহজই ভাসিয়া যাই। “ছদ্মকে বাস্তবী” বলিয়া যে অখ্যাতি আছে, তাহা মিথ্যা অপবাদ নহে। যতি বাচি বাধা দিয়া লোকে বৃন্দেী নানাবিধ কোশলার সোয়ার কিনিয়াছিল। বর্ষাকালের বেড়েজরাত্তার দ্বা অসংখ্য বৃন্দেী জ্বাচুরী কারবারে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল;—এখন দেখিতেছি কত লোক হাহাকার করিতেছে। আর একটা আমদের গুণ এই যে আমরা যুগ্ম “গং” আওড়াইতে যুব পটু,—তা নুষ্টি আর না পুনি। এই “গৃহস্থেী” দেখিতে পাইলাম যে বঙ্গদেশের কোন পত্র-সম্পাদক “এস দুঃখ” বলিয়া দুঃখকে আবাহন করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই দুঃখের আবাহন নতুন বৈকি!—আমাদের দর্শনশাস্ত্র-জ্ঞানি দুঃখ নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্তই স্বপ্ন হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেবও দুঃখ নিবারণের জ্ঞাতই কত চেষ্টা করিয়া তবো নির্দোষ গুণ” পাইয়াছিলেন। আমা-দের শাস্ত্রের সর্গজই দেখি, প্রত্যেক মাছয়ের চেষ্টা “আমার স্বথ হউক,—দুঃখ কিসে না হয়,—যাহা বাবসায়ে উক্ত হইতেছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন “দুঃখে অস্থির না হওয়া মুনির লক্ষণ।” নীতিশাস্ত্র বলিতেছে “প্রয়োজন না থাকিলে যুগ্ম ব্যক্তিও কারো প্রবৃত্ত হয় না।” অথচ এই সম্প্রদায় বলিতেছেন “আমি লক্ষ্য চাই না,—অলক্ষ্য চাই,—যাচ চাই না, উপাস্য চাই,—স্বথ চাই না; দুঃখ চাই!” এটা কি সরল কথা,—না ভিতরে কোন অলঙ্কারের বা আশাখ্যি-সংকল্প চিন্তাশীল সামাজিক স্বদিপুন্দের দৃষ্টি কতার মার পেঁচ আছে? ৩ বক্সি বাবু

* মরদ কী বাত, হাতী কাঁপাত।

† “গৃহস্থের” গত আশিন সংখ্যায় এই মহাকবির একদানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার নাম “৩৪৪ রাধাবাল্য রায় বাহাদুর। চিত্রখানি ভাল হইয়াছে।—যাহারা কবিরচক চিনিবেন, তাঁহারা ই বৃত্তিতে পারিবেন। আমদের সহিত এই কবির বিশেষ পরিচয় ছিল। “কালর কলিমা” ইহার সন্ধির বাবনী এবং “কলকান্ত” ইহার স্ততি কব্যাদির কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গভীরা দেশে ইহার নাম ঘরে ঘরে। উক্ত কবিতাশ বালানীর বুকা কঠিন হইবে না। বিপ্রে=বিগণপ, হেবে=হইবে, থিবে=থাকিবে।

কমলমণির সাহায্যে বাবলার কাঁটার দ্বারা হরিদাসী বৈষ্ণবীর “মরি মরব কাঁটা ফুটে” বক্তৃতায় ঐশ্বর্য দ্বিবার বাস্তব্য করিয়াছিলেন। আমাদেরও লোভ হয়, এই দার্শনিক সম্পাদক মহাশয়কে চমকিত ঘটনা উপহার্য করাই। এসব কি ব্যাপার? একি সেই ব্রাহ্ম দার্শনিক ষ্টেইক দলের অধিকরণ? বালকোদা এসব পড়িলে কি ভাবিবে? কষ্টব্য পালন করিতে গিয়া দ্বন্দ্ব আসে আত্মক—লক্ষ্য ছাড়ে ছাড়ুন,—এ বেশ নীতি • • • কিন্তু “দুঃখ এস,—আমি যুগ চাহি না”—এ কোন দেশের নীতি? আর সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছা হয়, তিনি যত ইচ্ছা দুঃখ ভোগ করুন;—তাহার সহিত অজ্ঞা দুঃখ ভোগ করিবে কেন? সমস্ত জগৎ সংসারটা স্থবের জন্ত পাগল,—লোণা-পড়া, চাম-বাস, শিল্প-বিজ্ঞান,—প্রভৃতি চেষ্টা, সকলই তা স্থবের জন্ত। কাছেই বলিতে হয়, হয় সম্পাদক মহাশয়ের এই দার্শনিক মতের কোনদামনে কোন প্রকাণ্ড অজ্ঞা,—নচেৎ আমাদের স্থল বুদ্ধিতে ওই স্থম মত প্রবেশ করে নাই।

“গৃহস্থের” আলোচনার একস্থলে দেখিলাম,—আমাদিগের দেশের ভবিষ্যৎ গৃহস্থদিগকে,—অর্থাৎ বর্তমান ছাত্রদিগকে,—বিদেশে অর্থাৎ যুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া নানা বিষয়ে অর্থকরী বিজ্ঞানশিক্ষা করত এদেশে আসিয়া গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় (বিনা বেতনে অথচ) ঘুরিয়া ঘুরিয়া, পল্লীবাসীদিগের সহিত নিত্য আত্মীয়ভাবে মিশিয়া, তাহাদের

ভাবে, তাহাদের ভাষায় ঐ সকল বিজ্ঞান সাহচর্যগুলি শিখাইয়া পল্লীবাসী জনসাধারণকে প্রকৃত সাহায্য করিয়া ভুলিবার নিমিত্ত পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।—অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্রকেই বিবেকানন্দস্বামী, অভাবপক্ষে বৈদ্যকুমার সরকার হইবার জন্ত উপদেশদেওয়া হইয়াছে। এই উপদেশ খুব উচ্চ বটে, কিন্তু গৃহস্থের মূল হইতে গৃহস্থের জেলেরিগের প্রতি প্রদত্ত হইবার যোগ্য কি? ভাব উক্ত হইলেই কি সকলের পক্ষে উপযোগী হয়? উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে “একমাত্র ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান হইলে জগতে জ্ঞানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না।” কথা ত ঠিক,—কিন্তু এ জ্ঞান দিবে কে? আর এরূপ জ্ঞান লাভ করিবার যোগ্যই বা কে? নিষ্কাম কর্মের আদর্শ খুব উচ্চ বটে,—কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে কি? মহা-জ্ঞানী মহা তাই বলিয়াছেন যে “সকাম ব্যক্তির কোন ক্রিয়া বা কর্মই নাই।” কামনা না থাকিলে সাহায্য কোন কাঁচা করিবে কেন? তাই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা “নিষ্কাম” শব্দের অর্থ “ব্রহ্মকাম” করিয়াছেন। জয়া হইতে যে বালকদিগকে আমরা নানাবিধ আকাঙ্ক্ষা শিখাইয়াছি এবং যে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জগাই আমাদের পুত্র বা আত্মীয়গণ বিদেশে গিয়াছেন, এবং তথায় ভবিষ্যৎ জীবনের স্থবের নিমিত্তই নানাবিধ ক্রেশ ও অস্থবিধা ভোগ করিয়াও একতানমনে নিজ নিজ শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিতেছেন, তাহারা এদেশে আসিবারান্ত সকলেই নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা, আশা, কামনা বর্জন করিয়া সম্যাসী হইবেন?

তাহাদের মধ্যে বাহ্যার বিবাহিত—বাহাদের স্বত্বের উপর বৃদ্ধ পিতামাতা, অল্প বয়স ভাই ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতিপালনের ভার, তাহারা কি করিবেন? জাপান কি এইরূপ সম্যাসীদিগের দ্বারা বড় হইয়াছে? প্রকৃত কথা এই যে, আমরা মুখে যাই বলি না কেন, দুই একজন রাতে, আমরা সকলেই ঘোরতর স্বার্থপর; স্বার্থের ভিতরদিখাই আমরাদিগকে ঢালাইতে হইবে। যে মনুষ্য আমাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়ের ভিতর দিয়া দেশের স্বার্থসিদ্ধির উপায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন,—তাহারই জয় হইবে। স্বর্গের স্বপ্ন দেখিলেই যদি বর্ণে যাওয়া যাইক, তাহা হইলে খুব স্থবের হইত বটে কিন্তু সংসার কষ্টের কন্দ-ফল। এখনে যোগ্যতমবলি জয়। বোদনের ফল মৃত্যু।

আবার আর একরূপ স্বদেশভক্ত দেখিতে পাইতেছি। বিলাতী পোষাক পরিয়া “বদেনী” বক্তৃতা দেওয়ার দৃশ্য আমরা অনেক দেখিয়াছি। বাঙ্গালী জোতার সমুখে, বাঙ্গালী বস্ত্র ইংরাজী ভাষায় বদেনী বক্তৃতা দিতেছেন দেখিয়াছি। স্বদেশের গৌরবশ্রুত কথা দেশের অতীত কীর্তি-কাহিনী, এখন ইংরেজী ভাষায় লেখা হইতেছে দেখিতেছি। জম্মু ইংরাজী-ভাষায় লেখা নহে,—বিলাতে মুদ্রিত না হইলে তাহাদের গ্রন্থের গৌরব রুদ্ধ হয় না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বাবুর “প্রাচীন ভারতের নৌ বর্ষবিজ্ঞানের ইতিহাস” শীর্ষক পুস্তকানির কথাই দৃষ্ট। রাধাকৃষ্ণ বাবু প্রথমতঃ এই বিষয় মধ্যস্থ একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পক্ষস্থানিগণেন; সেই সময়ে তাহাকে বাধ্য হইয়াই ইংরাজিতে প্রবন্ধটি লিখিতে হইয়াছিল। তাহার পর বাড়াইয়া,

সংশোধন করিয়া উহা ইংরাজিতে লিখিলেন কেন? হুত ইংরাজদিগকে আমাদের গৌরবের পরিচয় দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই তত্ত্ব বাঙ্গালী সাধারণ পাঠক-দিগের যেরূপ অপরিস্রুত,—ইংরাজদিগের নিকট কি তরুণ অপরিস্রুত? আমরা অবশ্য পণ্ডিত অর্থাৎ প্রাচ্য সাহিত্যসমূহে সুপণ্ডিত ইংরাজদিগের কথাই বলিতেছি। তাহার এই পুস্তক হইতে সাত শিলিং খরচ করিয়া সাধারণ সাধারণ পণ্ডিবে, এরূপ দ্বারাশ কেহই করিতে পারে না। ভারতবর্ষ-দেশটা কোথায়, হিন্দুস্থ একটা পর্জন্ত না একটা জাতি—এরূপ মোটা মোটা কথাই সাধারণ ইংরাজে জানে না। সাধারণ ইংরাজে ভারত-মধ্যস্থ কিছু জানিতেও যে বড় একটা উৎসাহ, তাহা নহে—তাহার উপর আবার আমাদের গৌরবের কথা? এত একেবারে অচল। বিলাতে এখনও আমাদের সমুদ্রে পূর্ণমাত্রায় কুসংস্কার চলিতেছে। বাহাই হউক, এই মুখোপাখ্যায় মহাশয়ের পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালী মজ মজ করিতেছেন কিন্তু কখনই ইংরেজ উহার প্রাণখোলা প্রশংসা করিয়াছেন? একজন খুব দীর্ঘ নিম্না করিয়া-ছেন, তাহা ইণ্ডিয়ান টাইম্‌সে প্রকাশিত। কিন্তু পাঁচ টাকা দশ আনা খরচ করিয়া কখনই বাঙ্গালী এই বই পড়িতে পারেন? যদি হঠাৎ এই থানি না পাইতাম, তাহা হইলে আমাদেরও এই স্থখে বঞ্চিত থাকিত হইত। পুস্তকখানি মূল্যখান মোটা পাগজে বিলাতে অত নবাবী ক্যান্সনে না ছাপাইয়া যদি এদেশে সাধারণ ভাবে ছাপান হইত, তাহা হইয়া দাম বড় জোর দুই টাকা হইত। আমাদের মত এই পুস্তককলমলা এক টাকার অধিক হওয়া উচিত নহে। ইংরেজেরা শিক্ষার বিস্তার করিবার জন্ত ক্রমাগত বইয়ের দাম কুমায়েছেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক

• যদি এই কুসংস্কার দূর করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ রাজসংস্করণ (Edition-de-luxe) বহুমূল্য পুস্তক “দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আজকাল ইংরেজ বড় বড় নানাবিধ বিষয়ে সাধারণকে শিক্ষাইবার জন্ত নানাবিধ প্রলভ সংস্করণের পুস্তক বাহির হইতেছে।

একশিলিএ পাওয়া যায়। নেলসনের যুগে বিশ্বকোষ ২৫ ভাগ, পঁচিশ শিলিএ বিক্রয় হইয়াছে। আর আমাদের দেশের বেশভূষা দেশের সেবক, শিক্ষক মহাশয় তাঁহার নিজ রচিত পুস্তক বিলাতে ছাপাইয়া দেশের লোকের অগ্রাণ্য করিলেন। আর একজন ব্রাহ্ম শিক্ষক (তাঁহার ব্রাহ্মত্বের বিশেষত্বের দিকও খুব লক্ষ্য আছে দেখা যায়) তাঁহার প্রণীত পুস্তক বিলাতে যত্ন সহ বিজ্ঞান লিখাচ্ছে। ইংল্যান্ড হলেদের শিখাতিছেছেন "বিশ্বেশের মাতা, বিশ্বেশের জল, ধাতু হটক, ধাতু হটক, ধাতু হটক হে ভগবান।" এই দুইয়ের স্বপ্ন নাই। ইংরেজ কোম্পানিটার, ইংরেজ-দরদরী, ইংরেজ কোম্পানীর হাত দিয়া পুস্তক বাহির না হইলে কি তাহা ভারতের স্বদেশীয় প্রচারের ব্যাঘাত জন্মাইত। বাক্যে ষড় দুইটি আমরা এত কড়া কথা বলিতেছি। যাহারা শিক্ষক, তাঁহারা আমাদের মাঝার মনি, তাঁহাদের কথা ও কাজে ঐক্য না থাকিলে ছেলেদের কাছে, তাঁহার আশা করা নুহা।

আর নয়, এখন থাকুক। জানি না আমাদের এই সরল-প্রাণের কথা আমাদের শিক্ষিত সমাজ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন। আমাদের প্রার্থনা এই যে সকলেই স্ব স্ব দায় অঙ্গদান করুন। বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, ভোজনে, কার্যে কপটতা ত্যাগ করুন। সমস্ততা এবং সত্য আশ্রয় করুন। কয়েক বৎসর হইতে দেশহিতৈষণার ও কপটতা অবসান হইতেছে এবং সেই কপটতা সাময়িক সাহিত্য দূষিত করিতেছে। ভাবের স্রোতে হাবুডুবু খাইয়া কেবল কতকগুলো এলো মেসো-বাক্যব্যয় করিলেই হইবে না, উক্ত আশ্রয়ের স্রোতে বা মেসো নষ্ট হইলে চলিবে না। আমরা বরিত্ত গৃহস্থ—আমাদের

হাজার মত, কি সম্রাসীর মত কথা শোভা পাখ না। দরিত্র গৃহস্থের, যাহা কর্তব্য, তাঁহার শক্তিই সামর্থ্যে যাহা কল্যাণ, তাঁহাই করিবার চেষ্টা, করিতে হইবে। তাঁহাও করিবার আগে উভয়ের পরিবর্তে দশবার আলোচনা করিয়া লইতে হইবে।

এরূপ কর্য্য অনেক ভাবুক আমাদিগকে কাপুক্ষ্য বলিবেন, এরূপ ভীক এবং হিমারী ভোকের দ্বারা বিশেষ উপকার কখনও হয় নাই এবং হইবেও না বলিবেন। জলে নামিবার পূর্বে সীতার শিখা যায় না—ইতাদি বলিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দিবেন।

আমরাও তাহা স্বীকার করি—হিমারী লোকের দ্বারা "মৃগাক্ষর" আনিত হয় না তাহা ঠিক—সকল সময়ে "মৃগাক্ষর" আনাও প্রার্থনীয় নহে। সীতার না শিখিয়া গভীর জলে বাপ দিলে মৃত্যুরই খুব সম্ভাবনা। * অজ্ঞজলে আগে বলিমাটি ধরিয়া, পা হাত ছুড়িয়া তাহার পর অভিভাবকের সাহায্য লইয়া সীতার শিখিয়া জলে নামিতে হয়। গৃহস্থ নিচুড়ই সাবধানতার সহিত প্রত্যেক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। যিনি অবিদ্যাকারী, তিনি, যতই কৈবত প্রতীভাশালী হউন না, গৃহস্থ নামের অযোগ্য। হুজুগে মাতা গৃহস্থের পক্ষে নিতান্তই অমঙ্গলজনক।

আমরা গৃহস্থ—গৃহস্থের নিমিত্তই আমাদের চিন্তা। বৈরাগী যিনি তিনি জ্ঞানেন,— "সর্ববৈশ্ব ভগ্নাতিত ভূবি নৃণাং বৈরাগী মেবা ভগ্নম্।" অতএব তাঁহার কথা সম্পূর্ণ পুঙ্খ। কপটতা দুর্ভূত না করিলে জাতীয় চরিত্র চর্চনের সম্ভাবনা অল্প। শুধু ছাত্রদিগকে দোষ দিলে কি হইবে? তাঁহাদের অপরাধ দিক।

ক্রিস্তাবধু দাস।

মফঃস্বলের বাণী

১। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

রাজার নিকট আবদার করিবার আমাদের দুইটি বিষয় আছে। সে দুইটি বিষয় আর কিছুই নহে, আমাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমাত্র। একপক্ষে এটা আমাদের আবদার হইলেও চিন্তা করিয়া দেখিলে এটা রাজারই প্রধান কর্তব্য মধ্যে গণ্য। এই যে প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা, মেরু প্রভৃতি পীড়ায় অসংখ্য লোক অকালে প্রাণত্যাগ পান এমন করিতেছে, এই ভাবে যদি ভারতের প্রজা সব মরিয়া যায়, তবে কাহাকে লইয়া রাজা রাজত্ব করিবেন? আমার মূর্খ বলিয়া রাজত্ব করিয়াও যুগ নাই। প্রজা যদি প্রজার কর্তব্য না বুঝে, রাজাকে ভক্তি করিতে না জানে, তবে কি রাজা শাসন করিয়া রাজার অন্তরে শাস্তি আনিতে পারে? তাই বলি, এক পক্ষে আমাদের আবদার হইলেও এটা রাজারই স্ব স্ব শাস্তির জন্ত।

শিক্ষা বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রহ্মবাণীই সমগ্রিক উন্নত বৃত্তি। প্রাণিকি আছে ১, সেই বাল্যকালেই শতকরা দুইশ লোকও বেথা পড়া জানে না। ইহাতেই অসংখ্য মানব যার, আমরা শিক্ষার কত নিম্নতরে অবস্থান করিতেছি। গবর্ণমেন্ট প্রাইমারী শিক্ষা, বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন সত্য কিন্তু উক্ত শিক্ষা বিস্তারে কার্য্যগতাই দৃষ্ট হইতেছে। কলেজের কথা ছাড়িয়া দিলেও উচ্চশ্রেণীর স্থলপ্রতিষ্ঠাও আঙ্গুলকায়ের দলে সহজ ব্যাপার নহে। তাই সহর ব্যতীত সামান্য দুই চারিটা পল্লীতে মাত্র উচ্চশ্রেণীর স্থল দৃষ্ট হয়। অনেক দরিদ্র পল্লীবাসী ইচ্ছা থাকিলেও সেই জন্ত উচ্চশিক্ষা পাইতে পারেন না। অধিকার শিক্ষার ব্যয়ও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাইমারী শিক্ষা বিস্তারে গবর্ণমেন্ট মনোযোগী হইয়াছেন সত্য কিন্তু

অনেক স্থানের প্রাইমারী স্কুলের অবস্থা শোচনীয়। গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত স্কুলের জন্ত যথেষ্টভাবে সাহায্য করেন তাহাতে ভাল শিক্ষা পাওয়া যায় না। আবার যাহারা কাঁধ করে, অল্প ভরতনের জন্ত কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহাদের কার্য্যে শিথিলতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সব কারণে অনেক স্কুল উন্মিথ হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যাই যে আদ্যাত্মক বৃদ্ধি পাইতেছে সে কথাও বলিতে পারি না।

সরকারী রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে ১৯১১-১২ সালে বালিকা শিক্ষাভ্যয়গুলির ছাত্রী সংখ্যা ২,২২,৫৭৬ জন ছিল, ১৯১২—১৩ সালে ২,২২,৯৪২ জন হইয়াছে। অর্থাৎ এক বৎসরে ১৭৩ জন বেশী হইয়াছে। এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে প্রকৃতপক্ষে বালিকা শিক্ষার উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটয়াছে। কারণ প্রতিবৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে হাজার-করা প্রায় অর্ধজন। বঙ্গ জ্ঞানীলোকের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি, হুতরাং প্রায় বৎসর জ্ঞানীলোকের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার ১৫ ভাগের এক ভাগ যদি এমন বয়সের বালিকা হয়, যাহাদের স্কুলে পাঠ করা উচিত, তবে এক বৎসরে অল্প ৬৬৬ জন ছাত্রীর মুখখা বৃদ্ধি হইলে হিমাব্রীক থাকিত।

স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও শোচনীয়। পল্লী-গ্রামে ব্যাধির অব্যাহত রীক্ষত বহিলেও চলে। জল কষ্টই পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যনাশের প্রধান কারণ। এই সমস্ত অভাব রাজার নিকট। ভিন্ন-আর কাহার নিকট জানাইব? এই সকল বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি থাকিলেও সেরূপ দৃষ্টি কৈ? ভারত সাম্রাজ্যের ১৯১৪-১৯১৫ বর্ষাব্যয়ের বাৎসরিক বর্ধিত হইতে পাই দীর্ঘ নিম্নদেশের জল আরও ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হইল। রেলপথ বাড়াইবার জন্ত ১৮ কোটি,

* Swimming is impossible, if I think about it. But if I throw myself into water I easily learn to swim. "Creative Evolution," by Henry Bergson, translated by Dr. A. Mitchell, Ph. D. কিন্তু সত্যই কি তাই? একজন সমাজলোভী ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের "A man following Bergson's advice will inevitably be drowned."

১ সনিক বিভাগের জন্ম ৩০ কোটি ১০ লক্ষ, আর, শিক্ষার জন্ম ২ লক্ষ এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ম ৪ লক্ষ ৬ লক্ষ টাকা। যে দেশের লোক এখনও শতকরা ২২ জন মূর্খ, ম্যালেরিয়ায় কলকালার ভোগ, কলেরা বাহাদের নিত্য সহচর, তাহাদের পক্ষে ও দান ত হাতীর মুখে দুর্দশা নয়। তাই বলি যে গর্বমেন্ট, একবার আমাদের প্রতি তাকাও, আমাদের সম্বন্ধকার বিধান কর, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ম রূপান্তরিত কর। ইহাতে একপক্ষে আমাদের স্বর্থ শাস্ত্রের কারণ বটে, অপর পক্ষে তুমিও রাজত্ব করিয়া স্বামী হইবে।

হরাজ।

২। ব্যবসা ও ধর্ম

হিন্দু শাস্ত্র বলিয়াছেন—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ভুজ সামান্যই পরম পুরুষাচার। শাস্ত্র প্রথমে ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন, পরে অর্থের কথা বলিয়াছেন। হৃতরাং বুঝিতে হইবে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া, ধর্মপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জন করিতে হইবে ইহাই হিন্দুধর্মের আদর্শ। আজকাল অনেকের মুখে ভনিত পাওয়া যায়, “যে ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে ধর্মের আবার সম্বন্ধ কি? ব্যবসা বাণিজ্য করিতে গেলে “ধর্ম” দেখিলে চলিবে না। চাপসা ধন উপায় করিতে হইবে, তখন “ধর্ম” “ধর্ম” করিলে চলিবে কেন? পয়সা না হইলে ধর্ম হয় না।” এই কৃষ্ণধর্মের বশবর্তী হইয়া আজকালকার ব্যবসায়িগণ ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন হৃতরাং ধর্মের নামটি একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ধর্মিক ও ধর্মশ্রিত ব্যবসায়ী যে একেবারেই নাই, তাহা আমরা বলি না, তবে সংখ্যায় তুলনায় অতি অল্প।

—তাহা বটে আমরা দারুণ দারিদ্র্যের নিম্পেষণে নিমেষিত, নিমন্ত্রণ রোগ শোকে অধঃসীড়িত, অকাল জরায় কর্তব্য। অভাবের তীব্র তাড়নায় “হা অর্থ অর্থ” করিয়া চুটিয়া বেড়াইতেছি, অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, পয়সা না হইলে আর চল না, এক মুহূর্তও আমরা বাঁচিতে পারি না। বৃত্তি বা বাণালী নামও

আর বজায় থাকে না। তাই যাবার যেরূপ অবস্থা, যেরূপ সামর্থ্য ও সুবিধা তিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়া ছ পয়সা উপার্জনের লক্ষ্যে সন্তোষ। সকলেরই মন পয়সার দ্রিক্কে যে কোন উপায়ে হটুক ছ পয়সা উপার্জন করা চাই। ধর্মের দিকে আর কহারও দৃকপাত নাই।

যাহারা ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের অসন্তোষ জন্মিত আছে নহে যে—“বাণিজ্যে বসন্ত লক্ষ্য”। বাতারাতি এই লক্ষ্য নাভের তলে লুপ্ত আকাজ্জাই বিস্তর ব্যবসায়ীকে ধর্মভ্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ধর্মপথে থাকিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিতে গেলে সময় সাপেক্ষ। সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন সে ঈশ্বরদান ইহাধর্মের নাই তাই বাতারাতি বড় মাহুয় হইবে, এই তীব্র আত্মিক বশবর্তী হইয়া ধর্ম ও বিবেক বিশুদ্ধন দিয়া ব্যবসায়ের আবরণে যেরূপ প্রস্তারপার অভিময় আজকাল চলিতেছে, তাহা ভাবিলে অন্তরাস্ত্রা শিহরিয়া উঠে। এই সব ব্যবসা-দারের বিশ্বাস, মিথ্যা, শঠতা ও কুট কৌশল অবলম্বন না করিলে ব্যবসা চলে না। এবং এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া ইহাধর্মের হস্তে যে ছ পয়সা না আসিতেছে তাহা নহে। ইহার বেশ ছ পয়সা উপার্জনও করিতেছেন। হৃতরাং দিন দিন ইহাধর্মের লাভও বৃদ্ধি পাই-তেছে এবং প্রস্তারপার নানাবিধ কৌশল এবং উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। সহর মফঃস্বল সর্বত্রই এই শ্রেণীর ব্যবসাদারদিগের কাব্য-স্থল। বিশেষতঃ মফঃস্বলবাঙ্গালী ইহাধর্মের বলি শরণ।

চাউল, ডাউল, চুই, দ্রুত, তরিতরকারী প্রভৃতি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অাবগুলির মধ্যে কোন প্রবাহী খাদ্য-সামগ্রী যাই না। বাজারে গিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যের মূল্য অধিক, অতি নিকট, জঘন্য দ্রব্য গৃহে লইয়া আসিতে হয়।

বীরভূমবর্তী।

৩। সভ্যতায় স্বাস্থ্যহানি।

অন্ত আমাদের আলোচনার বিষয় এই কলিকাতা সহরের হিন্দুনামধারী বাণালী পরি-

চালিত হোটেল সমূহ। হোটেল অর্থে “হিন্দু ভক্তলোকদিগের আহার করিবার স্থান” নহে। অপর চিৎপুর রোড, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, বহুবাজার স্ট্রীট, লালবাজার প্রভৃতি স্থানে আজকাল যে সকল মাংস খাইবার হোটেল বা চাপা-পানারগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলি।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্যবিভাগ মন্য মারিত্তে কামান দাগিতে পারেন। দুষ্ট স্বাস্থ্যবিভাগে, অতএব জনে জনে টীকা লাগে। তাহা হইলে আর ভয় থাকিবে না—ম্যালেরিয়া লক্ষণ করিতে চাও, তবে মশকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর; আর ম্যালেরিয়ার ভয় থাকিবে নাই—ইহা দিগ প্রকার গ্রাউণ্ড এডভান্স করিতে উদ্যোগ গ্রহণ কর। কিসে যথার্থ কারণ নির্দিষ্ট হয়, তৎপ্রতি কিন্তু কোন লক্ষ্য নাই। ময়ূরার দোকানে অনুবর্ত্ত বাবার খাইয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, অতএব ময়ূরারোটোর জন্ম কৃত উচিত। পুলিশগণ যথিতীয় রোগের বিরোধী থাকে, অতএব নুতন আইন করিয়া ময়ূরাবলম্বকে জন্ম করিতে হইবে। এদিকে ভক্তলোক যে দেশের সর্বনাশ হইতেছে সে বিষয়ে কিন্তু কোন আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নাই।

আমরা এ মাংস খাইবার ও মাংসার চার দোকানগুলি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তদ্বারা দেখাযাইতে চেষ্টা করিব—যে ইহার দেশের কি সর্বনাশ করিতেছে।

সামান্যতঃ এই সকল স্থানে যুবকগণের গতিবিধিই বেশী। বাগের পয়সা তাহার। অবশ্যে এই সকল স্থানে গমন করিয়া মাংস-লভ্যে বিষ গলাধঃকরণ করিয়া থাকে।

এই সকল হোটেল ও চায়ের দোকানগুলি খুলিতে হইলে অগ্রে মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি দেখে। লাইসেন্স লইয়া তাহার কি করে তাহা মিউনিসিপ্যালিটি দেখিবার যথেন।

এই সকল হোটেলওয়ালা—তাহাদের রাধুনি ও চাকরবন্দ (ডয়েটার) যে কোন জাতি সে সম্বন্ধ পাঠকের কৌতুহল জন্মিত

পারে। যতদূর জানিতে পারিয়াছি—হোটেল ওয়ালা প্রায়ই স্বর্গবণিক না হয় শুদ্ধ জাতীয়, রাধুনিগুলি সর্বজাতীয় এবং চাকর-বন্দ বহুবিধ। মেডুকা বা কাহার। পুরী হার মানিয়াছে, এবং কলিকাতা এখন নবপুরুষো-ত্তম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লক্ষ্য নাই, যুগ নাই মানসময় নাই, প্রকৃতি বশে আজ বাণালীর হিন্দু ভ্রামণ এই সকল স্থানে বসিয়া অথবা সকল থাইতেছে, এবং কেহ কেহ ম্যালেরিয়া দেশাইবার জন্যও হোটেলের বল লইয়া বন্ধুগণকে দেখাইয়া বড়াই করিতেছে। লক্ষ্যপাণের কি বাঙ্গালীর স্থান হইতে পারে না?

এই সকল স্থানে মাংস অর্থে যেকি ব্যবহৃত হয়, তাহা কি করিয়া বুঝাইব। কিন্তু সিপ্যাল বোর্ডে গিটন বিরুদ্ধ হয়—কিন্তু সব টীকা, বাকী মাংস হিন্দু পায় না—এই বাসী মাংস গুলি দোকানদারেরা মার্কেটের বাহিরে বরফ দিয়া রাখে। হোটেল ওয়ালারা উহার নিকট হইতে সস্তাধারে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনা বলিয়া সময়ে সময়ে অল্প মাংস প্রদত্ত হয়—পাঠক অল্পসন্ধান করিয়া লউন।

চপ প্রকৃতিতে মাংস কিম্বদন্তে ব্যবহৃত হয়। এই কিম্বদন্তে যেকি নাই, তাহা বলিতে না—পৃথক সমস্ত ন্যাড়া ছিঁচি এবং কাঠের কুচি পুত্তর গাছের সহিত প্রস্তুত হয়। তাহার পর হোটেলের যেখানে মশলা মেসারী করা হয়, সেই স্থানটি অতীব রমণীয়। যদি কেহ কোনও সেই সকল স্থান দেখিয়া থাকেন, তবে তিনি আর অমরাবতী দর্শন করিতে ইচ্ছা কেহইবেন না।

রাধিয়ার পাকজল প্রায়ই তাহার না হয় এনামেলের হয়। তাহার ডেকাচি বটে—কিন্তু উহা কলাই করা করে হইয়াছিল—সে কাল হোটেলের বখতিয়া দেখা নাই। তাহার পায়ে কিচা চটাউটা এনামেলের পায়ে সিদ্ধ খাওয়া ভক্ষণ করিলে শরীর কি প্রকার হয়, তাহা দেখিবার প্রকাশ হুয়া শক্ত। ডাক্তারেরা বলেন যে, এমন ব্যাধি নাই যে, উহা ধারা না হইতে পারে।

তারপর মংসাদি যদি একদিনে বিক্রীত না হয়, তাহা হইলে পরদিন উহা চপু কটলেটে পুষ্টিত করা হয়। ঘরদ্বারের তুলাবশেষ উচ্ছিন্ন মাংসও ফেলা যায় না। আমরা দেখিতেছি যে, শশা, আলুসিদ্ধ, পেঁয়াজ কুড়ি প্রভৃতি বাহা দেওয়া হয়—যদি কোন ঘরদ্বার সমস্ত না বাইয়া জল, তৎপর দিবস উগাও পুনরায় ব্যবহৃত হয়।

তারপর পানীয় জল। হোটেলের যে স্থানে বাটা হয়—সেই স্থানে একটা জালা মুক্তিকাপরি অর্ধপ্রোথিত ভাবে থাকে। উহাতে কলসী করিয়া জল পূর্ণ করা হয়। কোনও কালে সেই জালা পবিদার করা হয় না। হস্তরা পানীয় জলের বিশুদ্ধতা সন্দেহ পাঠক অস্বস্থান করিয়া লউন।

পবিদার প্রস্থান করিলে—তাহার তুলাবশেষ সমগ্র সামগ্রীগুলি পুথক বুথক পায়ে রক্ষিত হয়। তারপর একটা বালতীতে রক্ষিত জলে ডিসগুলি ডুবাইয়া ধৌত করা হয় এবং পরিশেষে একপানি তৈলাক্ত পোত্রে বর্ণের তোহালে ঘারা উহা মুছিয়া ফেলা হয়। তাহা হইলে দেখুন যদি কোন আহারার্থীরা কোনও প্রকার সংক্রামক রোগ থাকে—আর তাহার পায়ে অপর ব্যক্তি পুনরায় ভোজন করে, সেই ব্যাধির বীজ সংলগ্নই তাহার শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে। সামান্য বিলাসিতা, সামান্য উদরপুষ্টির জন্য বাঙ্গালী কি সর্কানাশ ঘটাইতেছে! যক্ষ্মা-রোগের দেহস্থ বীজাণু—কিছুতেই বিনষ্ট হয় না—এই উচ্ছিন্ন হইতে গিয়া কি যক্ষ্মা-বিলাগ সাধ করিয়া বাঙ্গালী নিজ দেহে দাখ্য করিতেছে না? অজীর্ণ, অশ্বল, ভিগ্নপুষ্টিয়া, ক্ষুধানন্দ, যক্ষ্মা, ইপানি কেন এত বাড়িয়াছে, এই সকল হোটলে হাওয়া একবার অস্বস্থান করিলেই জানিতে পারা যায়। কিন্তু “কা কস্ত পরিবেশনা!”

আজকাল দ্রুত বলিয়া বাজারে একটা তরল পদার্থ বিক্রীত হয়। পুর্বে দ্রুত বলিলে বাহা বুঝাইত, ইহাতে সে সকল গুণ কিছুই নাই। চার্লসের মতে বাহা হউক, তবু এই পদার্থ সময়ে সময়ে ৭০-৮০ টাকা পর্যন্ত মূল্য বিক্রীত হয়।

রন্ধন কার্যে তৈল কিংবা দ্রুতের প্রয়োজন হইয়া থাকে। হোটেলওয়ালারা যে ৭০ টাকা মূল্য দ্রুত খরিস করিয়া মাংসে উহা দেয়, ইহা পাঠক কল্পনায় আনিবেন না। ভীষণ বাদামের তৈল, কলিকাতার উটাত্তির কলে প্রস্তুত নানাপ্রকার জখম হইলে এই মাংসাদি রন্ধন করিয়া খাওয়া। তারপর ভেড়া চামলের চর্বিও ব্যবহৃত হয়।

মেদিনীপুর-হিঠতৌসী

৪। হুদেদী গেল কেন?

বহু বিচ্ছেদের সহ বহুদেশ এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া, যে একটা বহুদেশীর উদ্দাম উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা এত শীঘ্র হঠাৎ দমিয়া গেল কেন। ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বিরোধে ইহার উৎপত্তি, তাই এতশীঘ্র উহার বিক্রান্ত এবং লয়। ইহাই উহার একমাত্র বা অন্ততম কারণ কিনা তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সামান্য উপলব্ধির ফল আপনাদের সমুখে ধরিতেছি। আপনারা বিচার করিবেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, সতী স্ত্রীর স্বামী পতি তিন, বায়ের সন্তানের প্রতি টান, এবং ত্রুপনের ধনের প্রতি টান, এই তিন টান একজ হইলে ভগবানকে লাভ করা যায়। নিরাসিতা সীতাকে সখ্যেদান করিয়া রাম বলিয়া ছিলেন, ভূমি! মেয়ে মাথা, প্রণয়ে সখা, বিবাসে রমণী, সেবার ভদ্রা, মেয়ে সহৃদয়ী, উপদেশে মন্ত্রী, বিপদে বন্ধু ইত্যাদি। সমাজতত্ত্ববিদ মনোমী ভূষণে উহার একখানা প্রাচীরে উৎসর্গ পক্ষে পরলোক প্রস্তুত সংরক্ষণীকৈ এমনই ভাবে সখ্যেদান করিয়া উহার স্ত্রীর দশবিধ উপযোগিতার কথা লিখিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কথিত তিন টান একজন না হইলে যেমন ভগবান লাভ হয় না, তিন টানের জোরে একজন না হইলে আমরা ভগবানকে আকর্ষিত করিতে পারি না; বস্তুতঃ পক্ষে সেইরূপ স্ত্রীর যদি স্বামীর স্বখ-সৌকর্য্যের ক্ষুদ্র দশবিধ উপযোগিতা না থাকিত, স্ত্রী

মায়ের দ্বায় সতত পতির মঙ্গল কামনা না করিতেন, স্ত্রীর দ্বায় কায়েমনোবোকা পতির সেবা না করিতেন, স্ত্রীজনোচিত-হাব-ভাব-কটাক্ষ কামলতা-শূলীভা-কৃতি-সৌন্দর্য্য-ঘরা পতির মনোবঞ্জন করিতেন না পারিতেন, সখার দ্বায় হাতী আমোদ-বিজ্ঞপ রসিকতা-চলনাতা ঘরা স্বামীর চিত্ত-বিনোদন করিতেন না পারিতেন, বিপদে বন্ধু বান্ধা, উপদেশ-দানে মন্ত্রী কার্য্য না করিতেন, পক্ষী স্বামীর পরাধীন না হইতেন, তবে কি স্বামী স্ত্রীতে এত অমরজন হইতেন, স্ত্রীর সহিত স্বামী এক আত্মা এক-প্রাণ হইতেন, স্ত্রীকে স্বীয় অঙ্গাদিনী করিতে পারিতেন স্বামীর নিকট স্ত্রীর দশবিধ উপযোগিতা আছে, স্ত্রী দশবিধ উপায়ে স্বামীর মাহাত্ম্য, পরিচয়, মহাত্ম্য, মনোবঞ্জন, কামল-কামনা করিয়া এবং স্বামীর দম্ব কার্য্যে স্বয়ং যোগদান করিয়া, স্বামীকে ততপ্রতি আকর্ষিত করেন। এক্ষণে স্বামী আর স্ত্রী হইতে ভিন্ন হইতে পারেন না; দুই এক হইয়া দাম্পত্য বন্ধন স্বত্বত হয়। আমরা যেনে হয়, আমাদের এই সেই দিনকার বহুদেশীটার অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল, তাই-এই বহুদেশী আচারিক-উহার কোলে টানিয়া লইতে পারিল না, আমরা দূরে পুড়িয়া রহিলাম, আমাদের ও বহুদেশীর মধ্যে একটা প্রবল ক্রীড়া ব্যাঘা পড়িয়া রহিল, সেই ব্যাঘান আর খুলিল না। দুই চারি গড়া উকীল বাড়িয়া, আর দুই চারি পাচগুস্ত ছাত্র ইহারাই সমাজের সমস্তা নহেন, ইহারাই সমাজের বহু কক্ষের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র কক্ষের এক কোণ অধিকার করিয়া আছে—মাত্র। আর এই বহুদেশী ক্ষুদ্র মণ্ডলীকে অভিভূত করিয়া ছিল, তাহাও প্রমাণ হইল না। নির্যাসবোধের প্রবল মন্ত্র, স্বপ্নকাল পরেই এই বহুদেশীর প্রভাব এত অপ্রকট হইল। এই সেদিনকার বহুদেশীর সমাজ ও দেশের লোক হাবিহ উপযোগিতা ছিল না। উহার তিন টান ছিল না বা দশটি দিক ছিল না প্রায়ই বা একমাত্র লক্ষ ছিল ভাষাতের অর্থ-সংগ্রাম, দারিদ্র্য-মোহন, ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করিয়া ও দেশেশ্রদ্ধা অথবা ক্রম করিয়া বহুদেশে অর্থাগ

করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম যখন বহুদেশী গ্রাণে বহুদেশী বর্জনের প্রস্তাব হয়, তখনকার সখার পরাবর্তে এতদ্বন্দ্ববোধে সখা রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, যে ক্ষেত্র তাহা পড়িয়া আজ পর্যন্ত বিশ্বত হন নাই, তিনিই এই কথা স্বীকার করিবেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতি কর বহুদেশী জ্ঞান অর্থ্য কর বিদেশের আমদানি অথবা বর্জন কর, গড় হাইব ত চিনি খাইব না, ছেড়া কিনিব না এবং উক্তিতেই ঐ সকল রচনা পূর্ণ হইতে পারে। বর্তমানে গোলামোগ ঘটয়াছে, তাহা বাজারে, ও মেলায়, সর্বত্রই বহুদেশী ও বিলাতি জিনিসের প্রচলন হইয়া গোলামোগ বাধিয়াছে। প্রথম প্রথম বহু বিধে আইন আদালত হইয়াছিল, সমস্তই বিদেশী অথবা বর্জন সম্পর্কিত। দেশের লোক যখন যেন জুলিয়া গিয়াছিল, তাহার কারণ দেশের জিনিষ ছাড়িয়া বিদেশী অর্থ্য গ্রহণ করিয়াছে এমন নয়, তাহার দেশের সমাজকে ঘৃণা করিত শিখিয়াছে, দেশীয় সমাজের বিশেষত্বের সহিত বিদেশীয় প্রথা সমুদ্র উহার অধরে স্রবিল ও হস্তিত করিয়াছে, দেশীয় দম্ব ছাড়িতেছে, দম্বের নোহা ভগামির প্রশ্রয় দিতেছে, সমাজের নোহাই দিয়া দম্ব ও সমাজকে বিকৃত করিতেছে, ভাষা জুলিয়াছে, বিদেশী বুলি পরিচিতেছে, সাহিত্যে বিদেশী ভাব, রচনা পদ্ধতি, শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে চুকিয়াছে। যে, বিদেশের সর্ববিধ প্রভাব-বিকৃত সাহিত্য বাঙ্গালী ই সাহিত্য পাঠ করিয়া উহার অর্থ্যবাহ্য করিতে পারে না, আজব কায়া চাচ চলন সবই বিদেশীর অঙ্গবাহ্য। দেশীয় বস্ত্রে প্রস্তুত হইলেও পোষাক প্রস্তুত হয় বিদেশী পোষাকের চড়ে। ভারতীয় সঙ্গীতের গুণ নষ্ট হইয়া তৎকালে দেশীয় সঙ্গীতের লঘুতার অন্তর্বাছ ফুটি ঘটিয়াছে বহুদেশী ঘোষণা করিতে স্ত্রী রচিত হইয়াছে বিদেশীয় হুরে বা মিশ-হুরে, শিকারীকা-দ্যান-দ্যাবাণ সবই পাশ্চাত্য ভাবে। তাই বলিতেছিলাম, বহুদেশীর সমস্ত গুলি পাশ্চাত্য ফুটিয়াছিল না, একটা মাত্র পাশ্চাত্য মেলিয়া

ছিল, সমাক্ষ অপ্রস্তুত বদেশী পুশের গর্তে দেশের লোক সমুহ মধুপদলের মত গিয়া বসিল না। সমাক্ষ প্রস্তুতি হয় নাই, সমস্ত পাশাগুলি মেলে নাই, তাই মধুপ তাহার দিকে উড়িতেছে না। বদেশীও সমস্তটা দিক সমানভাবে লোক চকুর ও মনের গোচর হইয়াছিল না, উহার দশটা দিকের মধ্যে মাত্র একটা দিক মধুরের নজরে পড়িয়াছিল, উহার সমস্তগুলি উপযোগিতার পরখ হওয়া দূরে থাকুক, উদ্দেশ্যে কথাই আশোনা প্রসঙ্গে স্থান পায় নাই, তাই সমাক্ষটা বদেশীর বকে ঝাঁপাইয়া পড়ে নাই, বদেশী সমাক্ষকে টানিতে পারে নাই। আবার এই বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জনের উপপত্তি হইয়াছিল বহুক্ষেপ জনিত বৈজ্ঞানিক-কোষ-অপমান-অভিমান-জাত বিরোধের ভাব হইতে—সাময়িক উত্তেজনায়। পাথর তপ পাইলে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়, আবার ঠাণ্ডা পাইবামাত্র তপ ছাড়িয়া যায়। সাময়িক উত্তেজনায় জ্বরের উদ্ভাব বৃত্তি জাত বদেশী সারাটা ভারতবর্ষকে সহসা ছাইয়া ফেলিল, উচ্ছ্রাত্তা দ্বারা ভারতবর্ষকে তাপ-জ্বিত করা ভাঙে সহসা তপ্ত হইয়া পুনরায় হিমবৎ ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছে।

তৃত্বের দ্বারা কাঠাল পাকাইবার মত, সাময়িক উত্তেজনায় বদেশীর স্পৃহা না হইলে এমনটা হইত না। যখন মন উত্তেজিত থাকে, তখন উত্তরাধার কোনও পদার্থেরই স্বরূপ বিচার করা যায় না। সমাক্ষ বিচার করিয়া বদেশী গ্রহণ করিয়া ছিলাম না; সাময়িক উত্তেজনায়, হজুগে পেশাবার আভ্যন্তরীণ জালিতে পড়িয়া, বদেশী গ্রহণ করিয়াছিলাম; তাই, নিষ্কিচায়ে সহসা বৃত্ত বদেশী—আমাদের জর-পট হইতে সহসা মুছিয়া গিয়াছে। বদেশী যদি বর্জনীয় উপযোগিতা লইয়া আসিত, আর আমরা যদি সমাক্ষরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া উহার স্বরূপ বুঝিয়া উঠাকে দরিত্র্য, তবে উঠাতে আমরা ভবিষ্য তাইতাম, উঠার নতুন গুলি উপযোগিতার

আকর্ষণে উঠাতে চিরকালের জন্ত বহু হইয়া যাইতাম, উঠার গতিকে আমাদের গতি এবং আমাদের গতিকে উঠার গতি নিরূপিত হইত। দেশের অপর দশটায় যাহার আশা নাই, দ্বন্দ্বের বিখাপ নাই, সমাক্ষে শ্রদ্ধা নাই, ভাষায় রুচি নাই, আচারে অচ্ছদানে প্রস্তুতি নাই, দেশীর ধরণের পোষাকে তুষ্টি নাই, চাল চলতি—আদর কাড়ায় দুষ্টি নাই, সবগুলি ছাড়িয়া একমাত্র অর্থনীতিমূলক একমাত্র মাত্রাংশিত বদেশীতে তাহার স্বার্থী আশ্রয় একান্তিকতা কখনও সম্ভবে না। একমাত্র অর্থনীতিমূলক বদেশী বার্থ-দোষ-দুষ্টি, অর্থ বদেশজাত প্রবাস ক্রেতাকে প্রথম ৩০০ বৎসর খাঁচার মফসতীর জন্ত অগ্রিম অর্থ না দীকার করিতে হইবে ভারী অর্থগণের আশায়। সংযত-চিত্ত ব্যক্তি ব্যতীত এত দৈর্ঘ্য অজ্ঞাত হলত কি? প্রথমতঃ স্বঃ স্বঃ স্বীকার করিয়া শিল্পীগকে অর্থগণের পথা করিয়া দিতে কত জন সম্মত হইবেক? হুদুর ভারী লাভের আশায় কোন ব্যক্তি বৎসরের তিন শত পঞ্চাশ দিন দ্রুত দিয়া দেশজাত জিনিষ জন্ম করিবেক? ইহা সম্ভবপর হইত, যদি অর্থনীতির দিকে নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৎসর সময়ে প্রতি দশ-বৎসর মত, ব্যক্তি। যাহারা বদেশী ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশী হুদুরের পূজা করে; তাহারা কেন অর্থনীতিমূলক বদেশীর মফসতীর জন্ত স্বীয় বিলাসিতার সংক্ষেপ করিতে যাইবেক, কারণ পাশ্চাত্যে সবস্ব দুষ্টি সন্ত বুদ্ধে নাই যে, বিলাসে বিনাশ, সম্যকে বিকাশ। তাহার মৈত্র মিটাইবার জন্ত দেশে তেমন হাল ফেসনের জিনিষ প্রস্তুত হয় না, অর্থ সে দেশীয় সমাজ হলত “অল্পেতে যত্বে” শুদ্ধ হইয়াই ফেলিয়াছে। যে অপব্যয়ের ও অসমতার প্রকৃতি দানের দোহাই দিয়া ধূম-ধার হইতে ভিক্ষকে প্রত্যয়ে তাড়াইয়া দেয়, সে কেমন করিয়া অর্থনীতিমূলক বদেশীর জন্ত অর্থব্যয় করিবে? উঠাও কি তাহার মনে অপব্যয় ও শিল্পীদের অসমতার প্রকৃতি

বুদ্ধি বলিয়া ক্রান্তনার উদ্দেশ্য করিবে না? এই সকলই কিন্তু সম্ভবপর হইত, যদি সে ধর্মপরায়ণ হইত, অল্পে সম্বলিত হইত, বিলাসিতা-পূরাগ্রহণ হইত, পরের বাধ্য বাধী হইত। কিন্তু বদেশীর এই অজ্ঞতার পট প্রস্তুত হয় নাই, তাই বৃত্ত অর্থনীতি নবজাগ্রত শিল্পের আশ্রয় মৃত্যুর মত এই বদেশীও মহাশিখে মিলাইয়া গেল। ইটের বেড়াল গাধিত যেমন ইটের বেড়াল মল্লারও দরকার হয়, মল্লা ব্যতীত ইষ্টকরাশি বস্তুব্য করা পড়িয়া যায়, তেমন ধর্ম-ভাব-পরিপূর্ণ না হইলে অর্থনীতিমূলক বদেশীও অক্ষুরেই বিনষ্ট হয়।

বাঁহারা বদেশী আন্দোলনের নেতা হইলেন, সমাজ তাঁহাদিগের মুন মুন এক দেখিতে পাইল না, বহুঞ্জীর রূপ পরিবর্তনের মত তাঁহাদের মুখের জ্বালা নিত্য নতুন চড়, হইত, তাঁহাদের মধ্যে নিত্য বিবাদ বিরোধ ঘটিত, তাঁহাদের প্রচারিত পদ্ধতি ও অশুভাঙ্গন তাঁহারা নিজেরা পালন করিতেন না, তাঁহারা সমাজে মিশিতেন না, তাঁহারা সমাজের লোক নহেন, সমাজবুজেন না, সমাজ হইতে দূরে থাকিতেন, তাই তাঁহাদের প্রচারের মধু সমাজের মানসপটে গভীর রূপে আঁতর হইল না। দেশ কাল পাশ্চাত্যযোগী আরাধ্য ত্রয়ো বিতৃষ্ণ হইয়া বিদেশী আরাধ্য উদর পুষ্টি কতেছিল; খ্রীষ্টধর্মের দেশে বিদেশীয় অশ্রু-করণে গরমের দিনেও সাট, কোট, গুয়েটেকোট গোল প্রভৃতি গায়ে দিয়া তত্ত্ব দেখেই ক্রিষ্ট কতেছিল; আমরা কেন বদেশী জিনিষের আদর করিব? দ্রুত পিতামহের আমলের গ্রাম্য বাস্তবীতা ছাড়িয়া সবার বাসা করিয়াছিল, পুরাতনের স্বাতি ফেলিয়া সবার বিলাসিতার গা ঢালিয়াছিল; আমরা কেন অতি প্রাচীনতম জাতি পুরাতন সৌর্যের নিদর্শন শিল্প-সম্ভার মরফণে হুত্বপর ও তাগণীল হইব? আমরা এখন পুরাতনকে ছাড়িয়া নবীরের ভক্ত হইয়াছি, “রক্ষণশীল” নামে অপবাদ দিয়া পরাক্রমের বাস্ত হইয়াছি, এরূপ ক্ষেত্রে আমরা পর-দেশজাত শিল্পের গুণগ্রাহী ও গ্রাহক হইব, ইহাই সম্ভবপর।

বজার জল যেমন ছাঁ দিনে গরিয়া যায়, হজুগের

আমদানী বদেশ-জাত শিল্প-প্রীতিও সেইরূপ ছাঁ দিনেই সোপ হইয়াছে।
ব্রাহ্ম সমাজ, খ্রীষ্টীয় পাদবীণ, আর্ধ্য সমাজ, সংস্কারক দল, “ইংরেজী শিক্ষা এইগুলি আমাদের দেশ, সমাজ, নীতি ও ধর্মের নামে নমন করণারোপ করিয়া এবং আমাদের কণে নিষত ইহাদের বিরুদ্ধ কথা শুনাইয়া শুনাইয়া আমাদের দেশ, সমাজ, নীতি ও ধর্ম হইতে আত্মদগিগকে দেশ, সমাজ, নীতি ও ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন। গ্রীণ ও রোমের কলেজ পাঠা একদানা ইংরেজী ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা বুলিয়াই দেখিলাম, লিখা রহিয়াছে,—“The part played by Greece in the great drama of universal history makes her a connecting link between the East and the west, the Asiatic and the European, the enslaved and the free.”

Beacon Lights of History নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে বার বার উহার সংকলন-কর্তা বলিয়াছেন, ঐষ্ট ধর্মের মাপ-কাঠি দিয়া তিনি জগতের অপরাপর ধর্মের উৎকর্ষপণকে বিচার করিয়াছেন, সেই ধর্ম যেই পরিমাণে ঐষ্ট ধর্মের সঙ্গে মিলে, সেই ধর্ম সেই পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ভারতবাসী প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান করিয়াছেন।

এক ভাষিতে অমূলকরূপে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করিল, পরাক্রম-বাহ্য আভি নিজের বিশেষত্ব ও সৌর্য বুদ্ধি কুলিয়া সর্গাংশে পুরোক্ত জাতির অধিকরণ করিতে থাকে। ইহা উহার মনোবের কারণ হয়। “আমাদের জাতির দশাও তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশে জাতি-শিক্ষা না হইয়া, সে দেশে আছে, মায়া অজ হলত, তত্ত্ব, নীতি, সে দেশে নীচ জাতি বলিয়া একটা জাতি নাই। আর এ দেশে এরূপ জাতিসমূহ বর্তমান আছে এবং তাহাদিগকে নিশ্চলিত করা হইতেছে, আমাদের দেশের প্রচলিত ধর্ম ইত্বরের সঙ্গে মানবের বিনষ্ট সম্যগে স্থিতি হয় নাই, পাশ্চাত্যে ঐষ্ট ধর্মের পূর্ণ-

দাক্ষিণ্য দৃষ্ট্য। অশ্বিনঃ ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব সূত্রোক্ত কারকাদিত্যো দারোশ দৃষ্ট্য। চতুর্থে দৃষ্ট্য। তেষাং
কারকাদীনাং সুপরিভাষ্যঃ নরাঃ স্থখিনো ভবন্তি ॥ ৩৮ ॥

আত্মকারক গ্রহ জমলয় কিংবা পদলয়, য য চতুর্থ পতি কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে মনুষ্য স্থখী
হইয়া থাকে। বর্ধমান হয় হইতে পর পর-চারিটি সূত্রে তিনটি করিয়া যোগ আছে।
কুণ্ডলী মধ্যে তিনটি যোগেরই সমবায় হইলে ফলের পূর্ণতা জাতয়া ॥ ৩৮ ॥

রোগেশ দৃষ্ট্য। দরিত্রাঃ ॥ ৩৯ ॥

পূর্ব সূত্রোক্ত কারকাদিত্যো রোগেশ অষ্টমেশ দৃষ্ট্য। তেষাং নাম্না
কারকাদীনাং সুপরিভাষ্যঃ জনা দরিত্রা ভবন্তি ॥ ৩৯ ॥

আত্মকারক গ্রহ জমলয় কিংবা পদলয়, য য অষ্টমাসিপতি কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে মনুষ্য
দরিত্র হইয়া থাকে ॥

রিপুনাথ দৃষ্ট্য। ব্যাশ্রীনাঃ ॥ ৪০ ॥

পূর্ব সূত্রোক্ত কারকাদিত্যো রিপুনাথ দ্বাদশেশ দৃষ্ট্য। তেষাং নাম্না-
কারকাদীনাং সুপরিভাষ্যঃ জনা ব্যাশ্রীনাঃ ব্যাধিক্যকারিণো ভবন্তি ॥ ৪০ ॥

আত্মকারক গ্রহ জমলয় কিংবা পদলয়, য য বায়পতি কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে মনুষ্য ব্যাশ্রী
হয় ॥ ৪০ ॥

স্বামী দৃষ্ট্য। প্রবলাঃ ॥ ৪১ ॥

স্বামী দৃষ্ট্য। কারকে কারকেশ দৃষ্ট্য। লগ্নে লগ্নেশ দৃষ্ট্য। পদে পদেশ
দৃষ্ট্য। বা জনাঃ প্রবলাঃ বলবন্তো ভবন্তি ॥ ৪১ ॥

পূর্ণোক্ত আত্মকারক গ্রহ জমলয় কিংবা পদলয়, য য অধিপতি কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইলে
জাতক বলবান হয়। উপরোক্ত সূত্রপঞ্চক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে আত্ম
কারকগ্রহ, জন্ম বা পদলয়, তৎ তৎ স্থান হইতে যে যে ভাবপতি কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইবে
তৎ তৎ ভাবোক্ত ফল প্রদান করিবে ॥ ৪১ ॥

পশ্চাদ্ধিপুভাগ্যোঃ গ্রহসাম্যো বহুঃ কীট যুগ্ম্যোঃ

ভৃগুদারস্কোঃ কোশস্কো নীলাঙ্গস্কো জ্যৈষ্ঠস্কোঃ

পশ্চাৎ (৬৬১=১) লগ্নাৎ জমলগ্নাৎ পদলগ্নাৎ (কারক লগ্নাৎ) রিপু

(১২) ভাগ্যযোগে (২) দ্বিদ্ধাদশযোগে, কীট (১১) যুগ্মযোগে (৩) তৃতীয়-

কাদশয়োঃ, ভৃগু (১০) দারয়োঃ (৪) চতুর্থ দশনয়োঃ, কোণয়োঃ পঞ্চম
নবময়োঃ, নীর (৮) অশ্বয়োঃ (৬) যষ্ঠাষ্টময়োঃ, জুক (৬) অন্তয়োঃ (১২)
যষ্ঠ দ্বাদশয়োঃ গ্রহসাম্যে একশ্চেদকঃ, দ্বোচেদ্বো, ত্রয়শ্চেৎত্রয়ঃ ইতি
ক্রমেণ গ্রহসাম্যে সতি বন্ধঃ কারপাতনং ভবতি ॥ ৪২ ॥

অন্ন লয় পল লয় বা কারক লয় হইতে দ্বিাদশে, তৃতীয়ৈকাদশে, চতুর্থ দশমে, পঞ্চম
নবমে, যষ্ঠাষ্টমে, কিংবা যষ্ঠ দ্বাদশে এক একটি দুই দুইটি ক্রমে সমসংখ্যক গ্রহ থাকিলে বন্ধন
যোগ জাতব্য ॥ ৪২ ॥

শুভ সম্প্রদর্শে নিরোধ মাত্রঃ পাপ সম্প্রদর্শে পৃথ্বীলাদ্রঃ ॥ ৪৩ ॥

পূর্বোক্তানাম্ দ্বিাদশাদীনাম্ রাশীনাম্ ততঃ রাশ্যাধিপতীনাক্ শুভ
সম্প্রদর্শে সতি কারাগার মধ্যে নিরোধ মাত্রঃ নতু পীড়নায়ঃ । পাপ সম্প্রদর্শে
ততঃ রাশৌ পাপক্ষেত্রে পাপগ্রাহিত্বিত্তে পাপদৃষ্টে বা পৃথ্বীলাগ্রহারা-
দয়োহপি ভবন্তি । মিশ্রে মিশ্রফলং জাতব্যং ॥ ৪৩ ॥

পূর্বে হুয়ে যে যে বন্ধন যোগ উল্লিখিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বিশেষ এই যে উক্ত যোগাদি
শুভক্ষেত্রে শুভগ্রহ কর্তৃক সংঘটিত হইলে সামান্য কার্যাবাস মাত্র বা করে তদায় হইতে
নিষ্কলিত কিন্তু পাপ ক্ষেত্রে পাপ গ্রহ যিতি বা পাপ দৃষ্ট হইলে শূল্য গ্রহাদি বিবিধ
দুর্গতি ভোগ হইয়া থাকে । মিশ্রে মিশ্র ফল অবশ্যই জাতব্য । এতৎ যোগ সম্বন্ধে পারাশরী
হোয়ার লিখিত আছে যে—

পদাঙ্গয়াং কারকায়া যদা বা বিত দ্বাদশে ।

ত্রিকোণে রোগরুদ্ধে বা তথা বা মাতুলান্ত্রিয়ে ॥

তৃতীয়ৈকাদশে বিপ্র চতুর্থে দশমেঃ পিবা ।

গ্রহ সাম্যো তথা বিপ্র একমেকং দ্বয়ং দ্বয়ং ॥

বিত্তে দ্বৌ দ্বাদশে দ্বৌ চ তথা বা স্তাৎ ত্রয়ং ত্রয়ং ।

ইতি ক্রমেণ সাম্যেন বন্ধকারক উচ্যতে ॥

রাশীনাম্ রাশি নাথানাম্ শুভ সম্প্রদর্শে দ্বিজ ।

তদা নিরোধঃ সঙ্গতঃ স্তনুপীড়া বিধীয়তে ॥

তথা ততঃ দশানাম্ চ সম্প্রদর্শঃ খলগেতঃ ।

গ্রহাঃ শূল্যলাদ বিপ্র বন্ধযোগো ন সংশয় ॥ ৪৩ ॥

শুভ্রাব্দ পৌষ পান্দ্রো রাহুঃ সূর্য্যাদৃষ্টৌ নেত্রহা ॥ ৪৪ ॥

ভার্গবাৎ কারকায়াপি লগ্নারুত গুদাৎ দ্বিজ ।

ত্রিকোণহো যদা রাহুঃ সূর্য্যদৃষ্টশ্চ নেত্ররুদ্ধঃ ॥

শুক্রঃ (২৫=১০) লগ্নঃ (জন্মলগ্নঃ পদলগ্নঃ কারকাৎ শুক্র
গ্রহায়া) গোণ (৫৩=৫) পদন্তঃ পঞ্চমারুত স্থানগতঃ পঞ্চম ভাব
গতো বা (উপলক্ষণে নবম মণি গ্রাহ্যঃ) রাহুঃ সূর্য্য দৃষ্ট শ্চেৎ নেত্রহা
নেত্রনাশকরঃ ॥ ৪৪ ॥

হৃদ্য সূর্য্য রাহু, জন্মলগ্ন পরলগ্ন কারকাগ্রহ কিংবা শুক্র হইতে পঞ্চমারুত পরগত কিংবা
ত্রিকোণ গত হইলে নেত্র হানি হয় । এ স্থলে উক্ত সৌক এবং হুয়ে অর্থগত প্রভেদ
হুস্তি । অরহীনতারি যোগে সাধারণতঃ বিষমরাশি হইতে পুরুষের বানান এবং সম রাশি
হইতে দক্ষিণা করনীয় । গ্রীপক্ষে বিপরীত ।

অন্দারগগ্নোঃ শুভ্রা চন্দ্রকো রাতেত্যং রাজ চিহ্নানিচ ॥ ৪৫ ॥

সুদারগগ্নোঃ স্বাৎ আত্মকারকাৎ দার (৪) গয়োঃ চতুর্থ স্থানগয়োঃ
শুক্র চন্দ্রয়োঃ সূতোঃ আতোদ্যং বাদ্য বিশেষঃ রাজচিহ্নানি ছত্র

চামরাদীন চ ভবন্তীতি ॥ ৪৫ ॥

আত্মকারক হইতে চতুর্থ স্থানে শুক্র এবং চন্দ্র থাকিলে মহাজ ছত্র-চামরাদি রাজ চিহ্ন ধারণ
করে, এবং স্বারে চতুর্থস্থান নবমঃ বাসিতে থাকে ॥ ৪৫ ॥

অপর কতিপয় রাজ যোগ অবশ্যক বোধে এ স্থলে লিখিত হইল—

১। শুভে লগ্নে শুভে বর্ধে তৃতীয়ে পাপ খেতরে ।

চতুর্থে তু শুভে প্রাপ্তে রাজা বা তৎসমোঃ পিবা ॥

২। উচ্চো বা হরিণাকো বা জীবো বা শুক্র এব বা ।

একো বন্য ধনগতঃ শ্রিঃ দিশতি দেহিনাঃ ॥

৩। লগ্নঃ পশ্চতি যে বোটা ত্তেসর্বৈ শুভদায়িনঃ ।

নীচ খেটোহপি লগ্নঃ চেৎ পশ্চৈব্রাজা প্রকীর্ন্তিতঃ ॥

৪। রাজযোগো জন্মলগ্নঃ পয়োদ্রুত গ্রহো যদি ।

যষ্ঠাষ্টম গতো নীচো লগ্নঃ পশ্যতি যোগকৃতঃ ॥

৫। যষ্ঠাষ্টমাধিপে নীচে লগ্নঃ পশ্যতি যোগকৃতঃ ।

তৃতীয়ে লাভগে নীচে লগ্নঃ পশ্যতি রাজ্যদঃ ॥

- ৬। উচ্চ যুক্তো গ্রহঃ কশিৎ লাভগো বা চতুর্থগঃ।
 ধনস্থিতো বা লগ্নঃ চেৎ পশ্যেদ্বাহন কারকঃ ॥
 ৭। নিশাক্ষাৎ দিনাক্ষাৎ পরঃ সাক্ষিঃ দিনাভিকা।
 শুভা তদ্বদ্ববো রাজা ধনী বা তৎ সমোহপিবা ॥

ইতি জৈমিনীয় উপদেশে গৃহে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাণ্ডবঃ সমাপ্তঃ ॥

তথ প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ পাদারম্ভঃ ॥

উপপদং পদং পিতৃনুচরাৎ ॥ ১ ॥

অথোপপদাদিক মালম্ব্য ফল মাদেশায় তত্রোদ্যাবুপপদং নিরূপয়তি।
পিতৃনুচরাৎ পিতৃ (১) লগ্নং তস্যানুচরাৎ দ্বাদশ রাশেৰ্ভং পদং তৎ উপপদং
 নির্দেশ্যং, অত্র অনুশব্দস্য পশ্চাদর্শকত্বং সিদ্ধং তথা বহুত্রীহে জগন্নাথ
 তয়া তৎপুরুষমেব গ্রাহ্যং। “পিতৃলগ্নং তস্যানুচরো দ্বিতীয় ভাবঃ” ইতি
 যৎ সূত্রার্থ প্রকাশিকাকারেণোক্তং তদযুক্তং পশ্চাদর্শকানুশব্দস্য দ্বিতীয়
 ভাব বাচকহে অগ্রপদ-ব্যবহারঃ সাধুঃ স্যাৎ। মেবাদীনাস্ত রাশ্যদয়
 রীত্যা বৃষস্য পশ্চাত্ত্বং, নহি লগ্নানামপি তথা। তত্র হি পূর্ব পূর্ব
 ভাবনাং পশ্চাত্ত্ব রীত্যা ব্যয় ভাবস্য লগ্নভাবপশ্চাত্ত্বং প্রतीयতে ॥ ১ ॥

একণে উপপদ হইতে ফল বিচার আরম্ভ হইল বলিয়া প্রথমতঃ উপপদ লক্ষণ লিখিত
 হইতেছে। পিতৃ (১) শব্দে লগ্ন। লগ্নাহুচরভাবের আকরপদকে উপপদ কহে।
 লগ্নাহুচর শব্দে লগ্নের অহুচর অর্থাৎ পশ্চাদ্গামী অর্থ করিলে ব্যয় স্থান এবং লগ্ন বাহ্যর
 অহুচর এইরূপ ব্যাস যুক্তো দ্বিতীয় স্থানকে লক্ষ্য করা যায়। অতএব দ্বিতীয় বা দ্বাদশ
 ভাবের আকর পদই উপপদ। কিন্তু বহুত্রীহী এবং তৎপুরুষ সমাসবন্ধে তৎপুরুষই গ্রাহ্য
 বৃত্তরায় প্রথমোক্ত্যর্থই সমীচীন। সুবাদিনী এবং সুভার্য প্রকাশিকাকার “লগ্ন বাহ্যর
 অহুচর” এইরূপ অর্থ করিয়াই অহুচর শব্দে ব্যয় ভাবকে লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু তাহা
 অযৌক্তিক, কারণ রাশিদিগের উদ্যমুসারে বৃষ রাশি মেঘের পশ্চাদ্ভবতী বটে কিন্তু ভাব
 সম্বন্ধে তাহা নহে। লগ্ন মেঘ বুঝাদি ক্রমে গমন করায় পূর্ব পূর্ব ভাবই তাহার পরবর্তী
 ভাবের অহুচর। অতএব ব্যয় ভাবই লগ্নাহুচর শব্দে ব্যাচ্য। ১।

তত্র পাপস্য পাপশোণো প্রত্নজ্ঞা দার নাশো বা ॥ ২ ॥

তত্র (২) উপপদাৎ দ্বিতীয় স্থানে পাপস্য পাপস্বামিকে রাশো
 পাপযোগে পাপগ্রহাধিকৃতিতে সতি প্রত্নজ্ঞা লক্ষ্যসিঃ দারনাশো বা স্যাৎ ॥ ২

উপপদের দ্বিতীয় স্থানে পাপস্বামিক হইয়া পাপযুক্ত হইলে মহায়া সজ্ঞাস দর্শ অবলম্বন করে
 অথবা তাহার দ্বী বিয়োগ সংঘটিত হয়। এ স্থলে অর্থাৎসারে তত্র শব্দে উপপদ এবং সংখ্যা
 প্রাধান্য হেতু সংজ্ঞাহুচর উপপদের দ্বিতীয় স্থান পরিলক্ষিত হয়। টীকাধারণ প্রায়

সকলেই "উপপদে তং বিতীয়ে বা" এইরূপ অর্থ করিয়া উভয় দিক বজায় রাখিয়াছেন । কিন্তু উভয় স্থান হইতে একরূপ ফল বিচার করানই স্বত্বকারের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না । বিশেষতঃ উপপদ, 'তত্ত্বশব্দে লক্ষ্যস্থল হইলে স্বত্রে উক্ত শব্দ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন ছিল না । স্বতরাং তত্র শব্দে বিতীয়ে স্থান দ্বির উপপদ অর্থ করা অযৌক্তিক । উক্ত দ্বিতীয় স্থান হইতে বুদ্ধবাক্যে ভিন্ন ফল বিচার দেখিতে পাওয়া যায় । যথা—আকট্যং যদ্বৈতং পাপে চোরঃ স্ত্রাং শুভ বজ্জিতে । সর্গজন্তর জীবৈঃ স্ত্রাং কবিবাণী চ ভাগ্যবে ॥ অর্থাৎ বায়াক্রম পদের যদ্বৈ (২৬—২) অর্থাৎ বিতীয়ে স্থানে শুভ সর্গজ রহিত কোন পাপ গ্রহ অবস্থান করিলে মনুষ্য তন্তর হয় । উক্ত স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক সর্গজ এবং শুভ থাকিলে কবি ও বাণী হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

নাত্র রলিঃ পাপঃ ॥ ৩ ॥

অত্র প্রকরণে উপপদসারূপত্বাদেব রবিঃ সূর্য্যো ন পাপঃ । তেন সিংহে উপপদবিতীয়ে মেবাদি পাপরাশৌ বা সূর্য্যোস্থিতে প্রজ্জ্যা দার নাশৌ বা ন ভবেদিত্যর্থ ॥ ৩ ॥

আকট্য পদাদি হইতে ফল বিচারে রবির পাপস্ত না থাকায় এতলে রবি পাপগ্রহ মধ্যে গণ্য নহেন । স্বতরাং সিংহ রাশিতে কোন পাপগ্রহ থাকিলে কিংবা মেবাদি কোন পাপক্ষেত্রে রবি থাকিলে উক্ত প্রজ্জ্যাদি ফল অগ্রাহ্য ॥ ৩ ॥

শুভ দৃগু যোগাঃ ॥ ৪ ॥

উপপদ বিতীয়ে পূর্ব্বোক্তযোগে সতাপি শুভ দৃগু যোগাৎ শুভগ্রহ দৃষ্টি যোগাভ্যাং প্রজ্জ্যাদি তৎ ফলং ন ভবতি ॥ ৪ ॥

উপপদের বিতীয়ে স্থানে পূর্ব্বোক্ত যোগ সত্বে শুভগ্রহের দৃষ্টি যোগাদি থাকিলে তদ্ব্যপেক্ষ প্রজ্জ্যাদি কিছুই ঘটিবে না । স্বতরাং শুভক্ষেত্রে উক্ত যোগের কোন সম্ভাবনাই নাই । এই স্বত্রে উপপদ বিতীয়ে পাপক্ষেত্রে ফল নিবৃত্ত হইল ॥ ৪ ॥

নীচে দারনাশঃ ॥ ৫ ॥

উপপদাৎ দ্বিতীয় স্থানে নীচে নীচগ্রহাদিষ্ঠিতে নীচনবাংশকগতে গ্রহে বা স্থিতে সতি দারনাশৌ ভবতি ॥ ৫ ॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানে কোন নীচগ্রহ কিংবা নীচনবাংশকগত গ্রহ অবস্থান করিলে পত্নীনাশ সংঘটিত হয় ॥ ৫ ॥

উচ্চে বহু দারাগঃ ॥ ৬ ॥

উপপদাৎ দ্বিতীয় স্থানে উচ্চে উচ্চং গতে উচ্চনবাংশক গতে বা গ্রহে স্থিতে সতি মনুষ্যো বহুদারাঃ বহুপত্নীকঃ স্যাৎ ॥ ৬ ॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানে কোন উচ্চ বা উচ্চাংশ গত গ্রহ অবস্থান করিলে মনুষ্য বহুপত্নী লাভ করে । উচ্চ ও নীচ শব্দে উপলক্ষ্যে কেহ কেহ তত্তর রাশির উচ্চ ও নীচ পত্নিক ও লক্ষ্য করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

যুগ্মে চ ॥ ৭ ॥

উপপদাৎ দ্বিতীয়ে যুগ্মে (৫১-৩) মিথুন রাশৌ স্থিতে সতি চ কারাজ্ঞাতকো বহুপত্নীকো ভবতি ॥ ৭ ॥

মিথুন রাশি উপপদের দ্বিতীয় স্থান গত হইলে মনুষ্য বহু পত্নী লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তত্র আশীযুক্তে অক্ষৌ বা তক্ষোতা

বৃত্তরাশি নির্দারঃ ॥ ৮ ॥

তত্র উপপদাৎ দ্বিতীয় স্থানে বাশীযুক্তে তক্ষেত্রে তদ রাশাদিপিতৌ বা স্বক্ষে তস্য অত্র রাশৌ স্থিতে সতি উত্তরাশ্বিনি অধিকবয়সি মনুষ্যো নির্দারঃ পত্নীহীনো ভবতি ॥ ৮ ॥

উক্ত দ্বিতীয় স্থান বাশীযুক্ত থাকিলে কিংবা তত্রাদিপিতৌ স্বয়ং অত্র রাশিতে স্বক্ষেত্রী হইলে মনুষ্য উত্তর বয়সে পত্নীহীন হইয়া থাকে । কোন কোন চাকার তক্ষেত্রে শব্দে দারাকার গ্রহ সিদ্ধান্ত করিলেও তাহা বিচার সিদ্ধ নহে, কারণ তক্ষেত্রে তৎশব্দে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় স্থান ভিন্ন দারাকে কখনই লক্ষ্য করা যায় না । বিশেষতঃ ইহার পূর্ব্ববর্তী কোন স্বত্রেই দারাকার গ্রহের উল্লেখ নাই । এতলে দারাকার গ্রহ হইতে নির্দারতা চিন্তা করিলে, তদগ্রহ উচ্চস্থ হইলে বহু পত্নীক এবং নীচস্থ হইলে পত্নীহীন যোগ কোনই বা না সংঘটিত হইবে । স্বতরাং তক্ষেত্রে শব্দে তত্রাদিপিতৌ ভিন্ন অর্থ করা অযৌক্তিক ॥ ৮ ॥

উচ্চে তস্মিন্ স্তন কুলদার লাভো নীচে বিপর্য্যাসঃ ॥ ৯ ॥

তস্মিন্ উপপদ দ্বিতীয়াধিপিতৌ উচ্চে উচ্চরাশৌ স্থিতে সতি উত্তমকূলাৎ স্বকূলাপেক্ষয়েতি শেষঃ দারলাভঃ স্যাৎ । নীচে তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ নীচ কূলাদারলাভশ্চিন্তনীয়ঃ ॥ ৯ ॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানপতি উচ্চস্থ থাকিলে স্বকূলাপেক্ষা মনুষ্য হইতে এবং নীচ রাশি গত হইলে নীচ কুল হইতে পত্নী লাভ চিন্তা করিবে । মধ্যস্থ হইলে অবশ্যই অল্পপাতে বিচার্য্য । এই স্বত্র পথ্যালোচনায় উক্ত রাশাদিপিত শব্দ মিত্রাদি ক্ষেত্র গত থাকিলে তত্তদ্রূপ স্থান হইতে পত্নীলাভ চিন্তা করা অযৌক্তিক নহে ॥ ৯ ॥

শুভ সম্রাট্যং সুন্দরী ॥ ১০ ॥

উপপদাং দ্বিতীয়ে রাশৌ শুভ সম্রাট্যং শুভবর্গধে শুভগ্রহে দুর্গযোগে
বা মতি সুন্দরী স্ত্রী ভবতি ॥ ১০ ॥

উপপদের দ্বিতীয় রাশি শুভ বর্গধে শুভ যুক্ত বা শুভ দৃষ্ট হইলে মনুষ্যের গুণাবিত্তি ভাৰ্য্যা-
লাভ ঘটে ॥ ১০ ॥

রাহু শনিভ্যাং পদাং ত্যাগো নানো বা ॥ ১১ ॥

উপপদাং দ্বিতীয়ে রাশৌ রাহু শনিভ্যাং যুক্তে মতি অপদাং স্ত্রিয়

স্ত্যাগ স্তম্যা নানো বা স্যাৎ ॥ ১১ ॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানে শনি রাহু কর্তৃক যুক্ত হইলে লোকপবাদ বশতঃ পত্নীভ্যাগে বা
তাহার বিনাশ কার্য সংঘটিত হয় ॥ ১১ ॥

এক্ষণে উপপদের দ্বিতীয় রাশি গত ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ হইতে স্ত্রী সংক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রোগাণি
বিচার লিখিত হইতেছে। স্পষ্টতা নিবন্ধন ইহাদিগের অর্থাদি আর লিখিত হইল না;
কেবল বলাচুবাদ এবং আশঙ্ক্য বোধে ছ এক স্থলে যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা মাত্র প্রদত্ত হইল ॥

শুভ কেতুভ্যাং রক্ষ প্রদরঃ ॥ ১২ ॥

অস্থিস্রাবো নুল কেতুভ্যাং ॥ ১৩ ॥

শনি রবি রাহুভি রস্থিভূরঃ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বে কেতুভ্যাং ছৌলং ॥ ১৫ ॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানে শুভ কেতুর যোগে রক্তপ্রদর (১২) বৃথ কেতুর যোগে অস্থিস্রাব
(১৩) শনি রবিও রাহুর যোগে অস্থি ভ্রুর (১৪) এবং উক্ত বৃথের যোগে ছৌল রোগ উপদ্রব
হয় ॥ ১৫ ॥

নুলক্ষেত্রে মন্দারভ্যাং নাসিকা রোগ ॥ ১৬ ॥

কুজক্ষেত্রে চ ॥ ১৭ ॥

গুরু শনিভ্যাং কর্ণরোগো নরহকা চ ॥ ১৮ ॥

গুরু রাহুভ্যাং দন্তরোগঃ ॥ ১৯ ॥

উপপদের দ্বিতীয় স্থানে গত বৃথের ক্ষেত্র শনি ও মঙ্গল কর্তৃক যুক্ত হইলে পক্ষীর নাসিকা
রোগ জাতব্য (১৬) শনি মঙ্গল যুক্ত মঙ্গলের ক্ষেত্রে উপপদের দ্বিতীয় স্থানে গত হইলে উক্ত
রোগ চিন্তা করিবে ॥ এই হুজে দ্বিতীয় স্থানে গত বৃথের ক্ষেত্রে নিবৃত্ত হইল ॥ ১৭ ॥ মঙ্গলের
ক্ষেত্রগত উক্ত দ্বিতীয় স্থানে শনি গুরু কর্তৃক সংযুক্ত হইলে পক্ষীর কর্ণরোগ কিম্বা নরহকা
নামে এক প্রকার নাকী নিমস্র রোগ (১৮) এবং গুরু রাহু কর্তৃক সংযুক্ত হইলে দন্তরোগ

শ্রীমাকণ্ডেয়পুরাণম্।

উত্তরখণ্ডম্।

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

ভৈমিনিক্রবাচ।

সম্যগেতন্মাখ্যাভ্যং ভবন্তি দ্বিজসন্তমাঃ।

প্রবৃতিশ্চ নিবৃতিশ্চ দ্বিবিধং কৰ্ম্ম বৈদিকম্ ॥ ১ ॥

অহো পিতৃপ্রদানে ভবতাং জ্ঞানমীদৃশম্।

যেন তিৰ্য্যক্তৃমপ্যেতং প্রাপ্য মোহস্তিরিকৃতঃ ॥ ২ ॥

মহা ভবন্তঃ সংসিক্তৈঃ প্রাগবস্থাশ্রিতং যতঃ।

ভবতাং বিষয়োদ্যুতৈর্ন মোহৈশ্চাল্যতে মনঃ ॥ ৩ ॥

দিষ্ট্যা ভগবতা তেন মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।

ভবন্তৌ বৈ সমাখ্যতাঃ সৰ্বসম্বেদহন্তমাঃ ॥ ৪ ॥

বলিলা ভৈমিনি—“আজি তোমা সবাকার

রূপায় হইল নষ্ট লক্ষ্যে অপার,

প্রবৃতি নিবৃতি এই দুই পথ হয়,

সমস্ত বৈদিক কৰ্ম্মে এ দুই আশ্রয়।

সেই দুই পথ জ্ঞানি করিয়া বর্ণন,

করিলে, যতনে মোর সম্বেদ ভঞ্জন ॥ ১ ॥

জনকের প্রসাদে এ হেন চমৎকার

জন্মেছে অপূৰ্ণ জ্ঞান ভৌমা সবাকার।

যদিও তিৰ্য্যক্ দেহ হৈল কন্ধবনে,

মোহ নাশ হ'য়েছে মজিয়া জ্ঞান-বনে ॥ ২ ॥

ধন্য হবে হইয়াছ মোহনাশ-কলে,

পূর্বের মতন মন পেয়েছ সকলে,

সিদ্ধ হ'য়ে বিষয়ে হ'য়েছ মায়াহীন

মোহে মগ নাহি আর যুচেছে ছদ্মিন ॥ ৩ ॥

ভাগ্যবশে মহামনা মার্কণ্ডেয় পাশে

গিয়েছিল 'আমি' শুভ জ্ঞানলাভ-আশে,

তাহার আদেশে আমি আসিয়া হেথায়

হইয়াছি ধন্য, হেরি তুমি সবাকায়।

সুনেছিল আপনারা করিয়া যতন

করেন 'আনা'সে সৰ্ব সম্বেদ ভঞ্জন ॥ ৪ ॥

সংসারেহস্মিন্ মনুষ্যাণাং ভ্রমতামতিসঙ্কটে ।
 ভবন্তিধৈঃ সমং সঙ্কো জায়তে ন তপস্বিনাম্ ॥ ৫ ॥
 যদ্যহং সঙ্গমানাদ্য ভবন্তিচ্ছান্দ্রিগ্ভিত্তিঃ ।
 ন স্থাং কৃতার্থস্তন্মূনং নংমেহয়ত্র কৃতার্থতা ॥ ৬ ॥
 প্রবর্তে চ নিবর্তে চ ভবতাং জ্ঞানকর্মণি ।
 মতিমন্তুমাং মন্তো যথা মাতৃশ্ব কশ্যচিৎ ॥ ৭ ॥
 যদি হ্রস্বগ্রহবতী ময়ি বুদ্ধিছিজোভমাঃ ।
 ভবতাং তৎ সমাখ্যাতুমর্হতেদমশেষতঃ ॥ ৮ ॥
 কথমেতৎ সমুদ্ভূতং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।
 কথঞ্চ প্রলয়ং কালে পুনর্যাস্যতি সত্তমাঃ ॥ ৯ ॥
 কথঞ্চ বংশা দেবযিপিভূতুতাদিসম্ভবাঃ ।
 মনুস্তরাণি চ কথং বংশানুচরিতঞ্চ ৷ ১০ ॥
 যাবত্যঃ স্কটমশ্চৈব যাবন্তঃ প্রলয়াস্তথা ।
 যথা কল্পবিভাগশ্চ যা চ মনুস্তরস্থিতিঃ ॥ ১১ ॥

অতীত সঙ্কটময় এই ত সংসার,
 স্মিন'কে মানব হেথা সহি' কষ্টভার ।
 বহুভাগ্য বিনে হেথা তোমাদের মত
 তপস্বী-সঙ্গ লাভ না হয় সত্ততা । ৫ ।
 জ্ঞান-দৃষ্টি আছিল মোরে করিলে অর্পণ
 তাহে যদি নাহি হই কৃতার্থ এখন,
 নাহি জানি তবে আর কিরূপে কখন
 কৃতার্থ হইব, যত হইবে জীবন ? ৬ ।
 প্রবর্তি-নিবর্তি-পথ করিয়া আশ্রয়
 দ্বিবিধ যে জ্ঞান-কর্ম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়,
 তাহারই মলশুদ্ধ মর্তে সুব্যাকার
 হ'য়েছে নিম্ন মনে জ্ঞানিগণের সার ।
 এমন এ ভবে নাহি হেরি অন্ধ জন
 জ্ঞানবলে বলা তোমা সবার মন । ৭ ।

পুনঃ অগ্রহ যদি হয় মোর প্রতি
 জানিতে বাসনা কিছু হ'বেছে সম্প্রতি ।
 জিজ্ঞাসি'সে কথা—মোরে হইয়া সদয়
 বিচারিয়া বলি' নাম মনের মংশ । ৮ ।
 স্বাবরজঙ্গমাশ্রয় ক'হেবি এ জগৎ ;
 কি রূপে হইয়া স্তই হইল এমত ?
 কেমনে প্রলয় কালে হইবে বিলয় ?
 সেই তত্ত্ব বল এবে হইয়া সদয় । ৯ ।
 কি রূপে বা দেব-ঋষি-পিতৃ-ভূতগণ
 জনমে এ ভবে তাহা করহ বর্ণন ।
 মনুস্তর-কথা, বংশানুচরিত আর
 বিস্তারি' বলহ আজি নিকটে আমার । ১০ ।
 সৃষ্টি মতবিধ আর যতক প্রলয়,
 কল্পের বিভাগ—মনুস্তর সমুদয়— ১১ ।

যথা চ ক্রিতিসংস্থানং যৎ প্রমাণঞ্চ বৈ ভূষঃ ।
 যথা স্থিতি সমুদ্রোজি-নিদ্রগা-কামুনানি চ ॥ ১২ ॥
 ভুলোকাদিশ্চ লোকানং গণঃ পাতালসংগ্রহঃ ।
 গতিতথার্থ-সোমাদি-গ্রহক্ৰজ্যোতিষমপি ॥ ১৩ ॥
 শ্রৌতুমিচ্ছাম্যহং সর্বমেতদ্বাভূতসংগ্রহম্ ।
 উপসংহৃতে চ বহুধেবঃ জগত্যাগ্নিন্ ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

পক্ষিণ উচুঃ ।

প্রমভারোহয়মতুলো যন্তুয়া মুনিসত্তম ।
 পৃষ্ঠেভুং তে প্রবক্ষ্যামস্তচ্ছ্রুৎবেহ জৈমিনে ॥ ১৫ ॥
 মার্কণ্ডেয়েন কথিতং পুরা ক্রৌঞ্চকুয়ে যথা ।
 দ্বিজপুত্রায় শাস্ত্রায় ব্রতস্রাতায় বীমতে ॥ ১৬ ॥
 মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানমুপাসীনং দ্বিজোত্তমৈঃ ।
 ক্রৌঞ্চকৈঃ পরিপপ্রাচ্ছ যদেতৎ পৃষ্ঠিবান্ প্রভো ॥ ১৭ ॥
 তস্য চাকথয়ৎ প্রীত্যা যশ্মনুনিভু গুণন্দনম্ ।
 তৎ তে প্রকথয়িষ্যামঃ শৃণু হুং দ্বিজসত্তম ॥ ১৮ ॥

ভুবন সংস্থান আর পৃথী-পরিমাণ
 সমুদ্র-পর্কট-নদী-কানন-সংস্থান— ১২ ।
 ভুলোক স্বর্গলোক আর পাতাল নিচয়
 অর্কাদি গ্রহের গতি স্বক সমুদয়— ১৩ ।
 এই সব তত্ত্ব জানিবার বাহা মনে
 প্রলয় অবধি সব বলহ একণে ।
 প্রলয়ের পরে-শাস্ত্রা রহিবে নিচয়
 ভূমিতে সে কথা মনে উৎকণ্ঠা উদয় । ১৪ ।
 পক্ষিগণ বলে—“দিলে যেই প্রশ্নভার
 অতুলো সে প্রশ্নগ্রহ—সর্বতত্ত্ব সার ।
 সকল বিস্তারি' মোরা করিব বর্ণন,
 এক মনে গুচতত্ত্ব করহ অবণ । ১৫ ।

ব্রত-ব্রত, শাস্ত্রশীল, ব্রাহ্মণ-নন্দন,
 ক্রৌঞ্চকী এ প্রশ্ন পুরা করিলা যখন,
 মার্কণ্ডেয় ঐনিবর পরম যতনে,
 বলিলেন এই সব প্রস্তুত মনে । ১৬ ।
 স্তন, প্রভো, একদিন আশ্রমে আপন
 ছিলেন বসিয়া মার্কণ্ডেয় তপোধান ।
 সেই কালে তাঁর পাশে ছিল মুনিগণ,
 রত সবে নানা তত্ত্ব করিতে অবণ ।
 এংহেন সময় সেই ব্রাহ্মণ-কুমার
 ক্রৌঞ্চকি করিলা প্রশ্ন নিকটে তাঁহার । ১৭ ।
 সেই প্রশ্নে যে উত্তর দিলা মুনিবর,
 সেই কথা বলি এবে তোমার গোচর । ১৮ ।

প্রণিপত্য জগন্নাথং পদ্মযোনিং পিতামহম্ ।
জগদযোনিঃ স্থিতং সূর্য্যৌ স্থিতৌ বিষৃঙ্খরূপিণম্ ।
প্রলয়ে চান্তকর্তারং রৌদ্রং রুদ্রধরূপিণম্ ॥ ১৯ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

উৎপন্নমাত্রস্য পুরা ব্রহ্মণোহিব্যক্তজন্মনঃ ।
পুরাণমেতদ্বেদাশ্চ মুখেভ্যোহনুবিধিঃ সত্যঃ ॥ ২০ ॥
পুরাণসংহিতাশ্চক্রবর্তীলাঃ পরমর্থয়ঃ ।
বেদানাং প্রবিভাগশ্চ কৃতস্তে স্তস্ত সহস্রশঃ ॥ ২১ ॥
ধর্ম্মজ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ মহাত্মনঃ ।
তস্যোপদেশেন বিনা ন হি সিদ্ধং চতুষ্টয়ম্ ॥ ২২ ॥
বেদান্ সপ্তধ্বন্তস্তস্মাক্তগৃহস্তস্য মানসাঃ ।
পুরাণং জগুহুশ্চাদ্যা মুনয়স্তস্য মানসাঃ ॥ ২৩ ॥
ভূগোঃ সকাশীক্ষ্যবনস্তেনোক্তঞ্চ দ্বিজম্ভনাম্ ।
ঋষিভিঃ চাপি দক্ষ্যায় প্রোক্তমেতন্মহাত্মজিভিঃ ॥ ২৪ ॥
দক্ষেণ চাপি কথিতমিদমাসীৎ তদা মম ।
তৎ তুভ্যং কথয়াম্যাদ কলিকল্মষনাশনম্ ॥ ২৫ ॥

পদ্মযোনি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি কার্য্য বাঁর ;
বিষ্ণুরূপে পালিচ্ছেন নিখিল সংসার ;
রৌদ্রবেশ রুদ্ররূপে প্রলয়-সময়
সেই বিহু বিনাশ করেন সমুদয় ।
সেই জগন্নাথ-পদে করিয়া প্রণাম,
বলিতে লাগিলা মার্কণ্ডেয় গুণধাম—১৯ ।
“আদিত্যে অব্যক্তযোনি ব্রহ্মা য়ে সময়,
উৎপন্ন হইলা; তবে বেদ সমুদয়,
পুরাণের সনে, চারিধুখ হ’তে তাঁ’র
আবিকৃত হৈল ভবে জেনে তত্ত্ব সমুদয় ২০ ।
সে পুরাণ বহুরূপে করিয়া বিস্তার,
মুনিগণ ক্ষম্যামে করিলা প্রচার ।
মহেশ সহস্র ভাগে বেদে ভাগ করি’
শিখমুখে প্রচারিলা অবনি ভিতরি ২১ ।

সেই উপরোক্ত ছাড়ি’ ধর্ম্ম, জ্ঞান আর
বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য চারি ভবে মেলা ভার ২২ ।
তাঁহার মানসজ্ঞাত সপ্ত-ঋষিগণ,
করিলা প্রথমে সেই বেদের গ্রহণ ।
আর আর যত তাঁ’র মানসকুমার
পুরাণ লইয়া বিশেষ করিলা বিস্তার ২৩ ।
ভৃগুর নিকটে ইহা পাইলা চাবন ।
পাইলেন তাঁ’র কাছে যত মুনিগণ ।
মুনিগণ দক্ষপাশে করিলা প্রকাশ,
ভূনিবা দক্ষের তাহে পূর্ব হৈল আশ ২৪ ।
দক্ষ মোহেও রূপা করি’ করিলা প্রদান,
তববিধ এই তব আছে মম স্থান ।
বলি তাহা আদি পুরাইব তব আশ ।
কলির কলুষ যার অবগতে নাশ ২৫ ।

সর্ব্বমেতন্মহাভাগ প্রদ্যতাং মে সমাধিনা ।
যথাশ্রুতং ময়া পূর্ব্বং দক্ষস্য গদতো মনে ॥ ২৬ ॥
প্রণিপত্য জগদযোনিমজমব্যয়মশ্রয়ম্ ।
চরাচরস্য জুগতো ধাতারং পরমং পদম্ ॥ ২৭ ॥
ব্রহ্মাণমাদিপুরুষমুৎপত্তি-স্থিতি-সংযমে ।
যৎ কারণমনৌপম্যং যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৮ ॥
তন্মৈ হিরণ্যগর্ভায় লোকতন্ত্রায় ধীমতে ।
প্রণম্য সম্যগক্ষ্যামি ভূতসর্গ-মনুভূতম্ ॥ ২৯ ॥
মহাদাদ্যং বিশেষান্তং সর্বৈকপ্যং সলক্ষণম্ ।
প্রমথৈঃ পঞ্চভির্গম্যং স্রোতোভিঃ ষড়্ভিঃ স্থিতম্ ॥ ৩০ ॥
পুরুষাধিষ্ঠিতং নিত্যমনিতামিবা চ দ্বিতম্ ।
তচ্ছ্রুতং মহাভাগ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৩১ ॥
প্রধানং কারণং যন্তদব্যাক্তাখ্যং মহর্ষয়ঃ ।
যদাঙ্কঃ প্রকৃতিং সৃক্ষ্যামি নিত্যং সদসদাঙ্গিকাম্ ॥ ৩২ ॥

সমাহিত চিত্তে এবে করহ শ্রবণ ।
দক্ষের বর্ণিত তত্ত্ব করিব বর্ণন ২৬ ।
জগৎকারণ যিনি অব্যয়, আশ্রয়,
চরাচর-ধাতা, অজ, অনাদি, চিদ্রস,
যিনি সে পরম পদ, তাঁহার চরণে
প্রণিপাত কর আমি ভক্তিযুক্ত মনে ২৭ ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ যে জ্ঞান,
উপমান-রহিত, আদি কারণ-কারণ
যাহে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ব চরাচর
তাঁ’র পদে লগ্ন সদা রাখহ অন্তর ২৮ ।
সেই সে হিরণ্যগর্ভ লৌকতন্ত্র আর
প্রণাম করিয়া আমি চরণে তাঁহার,
অহস্তম ভূতসর্গ করিব বর্ণন ।

সমাহিত চিত্তে বৎস, করহ শ্রবণ ২৯ ।
মহাদাদি বিশেষান্ত সর্বৈকপ্য আর
লক্ষণেব সনে বলি নিকটে তোমার ।
পঞ্চ প্রমথের গম্য এই সমুদায়
ষড়্ভিঃ স্রোতের স্থিতি রথেকে যাহায় ৩০ ।
পুরুষাধিষ্ঠিত নিত্য এই সমুদায়
অনিভোর মত আছে এই ত ধরায় ।
গুহুতত্ত্ব তব পাশে করিব বর্ণন ।
সমাহিত চিত্তে এবে করহ শ্রবণ ৩১ ।
অব্যক্ত-নামেতে যেই পরম কারণ
সদসদাঙ্গিকা বাঁয়ে বলে মুনিগণ,
সেই সে প্রকৃতি নিত্য, স্থা অতিশয়,
জ্যেষ্ঠ্রিয়-গ্রাহ্য তাহা কোন কালে নয় ৩২ ।

কুব্জমক্ষ্যামজরমমেয়ং নাচ্যসংশ্রায়ম্ ।

গন্ধরূপরসৈবানং শব্দস্পর্শবিবচ্ছিতম্ ॥ ৩৩ ॥

অনাদিস্তং জগদ্যোনিং ত্রিগুণপ্রভাবায়ম্ ।

অসাম্প্রতমবিক্রেয়ং ত্র্যক্ষাগ্রে সমবর্ত্ততঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রলয়স্যানু তেনেদং ব্যাপ্তমানীদশেষতঃ ।

গুণসাম্যাং ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজাধিত্তান্মনে ॥ ৩৫ ॥

গুণভবাৎ স্বজ্ঞানীং সর্গকালে ততঃ পুনঃ ।

প্রধানং তত্ত্বমুভূতং মহান্তং তৎ সমায়ুগোং ॥ ৩৬ ॥

যথা বীজং দ্বচাঃ তদ্বদব্যাক্তেনারূঢ়ো মহান্ ।

সাব্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধোদিতঃ ॥ ৩৭ ॥

ততস্তস্মাদহঙ্কারত্রিবিধো বৈ ব্যজায়ত ।

বৈকারিকতৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চ স তামসঃ ॥ ৩৮ ॥

মহতা চাবৃতঃ সোহপি যথাব্যাক্তেন বৈ মহান্ ।

ভূতাদিস্ত বিকূর্বাণঃ শব্দতন্মাত্রকং ততঃ ॥ ৩৯ ॥

এব, নিত্য, অগ্রমেয়, অক্ষয়, অজর,
অন্তের আশ্রয় বিনা আছে নিরন্তর ।

গন্ধ রূপ রস আর স্পর্শ শব্দহীন

সেই তত্ত্ব জেনে বস্তু আছে চিরদিন । ৩৩ ।

জগৎকারণ আর অনাদি অনন্ত

ত্রিগুণ-কারণ তিনি কে বুঝিবে অন্ত ।

বিশাণ-বহীন আর চির-বিজ্ঞান,

অবিক্রেয় ব্রহ্ম আগে ছিল বস্তুমান । ৩৪ ।

প্রলয় সময়ে সব করি' আবেগ

থাকেন সতত তিনি স্তন দিয়া মন ।

গুণদাম-সেই কালে রহে ত তাঁহার,

ক্ষেত্রজাধিত্ত হ'য়ে করেন বিহার । ৩৫ ।

সৃষ্টিকালে গুণায় করেন যখন, ৬

প্রধান মহতে তবে করে আবেগ । ৩৬ ।

বীজ যথা একে আচ্ছাদিত হ'য়ে রথ,

অব্যক্ত প্রধানাবৃত মহৎ সে হয়,

মহতেজ-তিন গুণ সব রজঃ আর

তমঃ এই তিনাত্রয় ত্রিধারূপ তার । ৩৭ ।

ত্রিবিধ মহৎ হ'তে তিন অহঙ্কার,

বৈকারিক, তৈজস, ভূতাদি নাম আর ।

ভূতারি অজ নাম তামসাহঙ্কার,

বিশ্ভারি' বলিবে সব নিকটে তোমার । ৩৮ ।

অব্যক্ত আবৃত যথা হইল মহৎ,

ভূতাদি মহতে তথা হইয়া আবৃত,

বিকৃত হইল, তাহে হইল উদয়

শব্দতন্মাত্রের, ইহা জানিহ নিশ্চয় । ৩৯ ।

* দ্বচা ব্রহ্মমূলে তেনাবৃতো মহান্ভিত্তি বা পাঠঃ ।

† সর্বগুরূপার ধারার ভূতশক্তি হইয়াছে তিনিই এ তত্ত্ব প্রত্যক্ষানুভবে সমর্থ ।

সসর্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্ ।

আকাশং শব্দমাত্রস্ত ভূতাদিশ্চারণোং ততঃ ॥ ৪০ ॥

স্পর্শতন্মাত্রমেবেহ জায়তে নাত্রঃ সংশয়ঃ ।

বলবান্ জায়তে বায়ুস্তস্য স্পর্শগুণো মতঃ ।

আকাশং শব্দমাত্রস্ত স্পর্শমাত্রং সমায়ুগোং ॥ ৪১ ॥

বায়ুশ্চাপি বিকূর্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ হ ।

জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তরূপগুণমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥

স্পর্শমাত্রস্ত বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমায়ুগোং ।

জ্যোতিশ্চাপি বিকূর্বাণং রসমাত্রং সসর্জ হ ॥ ৪৩ ॥

সম্ভবন্তি ততো হ্যাপশ্চাসন্ বৈ তা রাস্মিকাঃ ॥

রসমাত্রান্ত তা হ্যাপো রূপমাত্রং সমায়ুগোং ॥ ৪৪ ॥

আপশ্চাপি বিকূর্বন্ত্যো গন্ধমাত্রং সসর্জিহে ।

সজাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধো গুণো মতঃ ॥ ৪৫ ॥

তস্মিন্‌স্মিন্‌স্মিন্‌স্মিন্‌ তন্মাত্রং তেন তন্মাত্রো স্মৃত্য ।

অবিশেষবাচকদ্বাদবিশেষমাস্তত্চ তে ॥ ৪৬ ॥

শব্দতন্মাত্রোক্তে সৃষ্ট হইল আকাশ,

শব্দ গুণ তাহে মাত্র হয় ত প্রকাশ ।

আকাশে আবৃত কৈল ভূতাদি যখন

শব্দতন্মাত্রের ঘটে বিকৃতি তখন । ৪০ ।

স্পর্শতন্মাত্রের হৈল উৎপত্তি, তাহার

স্পর্শ গুণ বলবান বায়ু জন্মে আর ।

শব্দ মাত্র আকাশ আবৃত কৈল তায়

স্পর্শ মাত্র বায়ুর বিকৃতি ঘটে তায় । ৪১ ।

বায়ুর বিকারে রূপতন্মাত্র উদয়

রূপযুক্ত জ্যোতিঃ তাহে জ্বলিহ নিশ্চয় । ৪২ ।

স্পর্শমাত্র বায়ু পরে করে আবেগ

রূপতন্মাত্রেরে, তাহে হইল ঘটন,

জ্যোতির বিকার—রসতন্মাত্র তাহার

নিশ্চয় জানিহ কিছু সন্দ নাহি তায় । ৪৩ ।

সে রসতন্মাত্র হ'তে প্রকাশিল জ্বল,

রাস্মিক সেই তত্ত্ব জীবন সখল ।

রসমাত্র অপে যবে করে আবেগ

সে রূপতন্মাত্র, তাহে ঘটিল এমন । ৪৪ ।

অপের বিকৃতি হৈল উপজিল তায়

সে গন্ধতন্মাত্র পুণীতব হৈল বায় । ৪৫ ।

সেই তর্থে বৈই গুণ গণনীয় হয় ।

সেই সে তন্মাত্র তাহা জানিহ নিশ্চয় ।

বিশেষ বাচক কিছু নাহি এ সুবার

অবিশেষ বলি' তাই হইল প্রচার । ৪৬ ।

ন শাস্তা নাপি ঘোরাতে ন মৃতাচাৰিশেষতঃ ।
 ভূততমাত্রসর্গেহয়মাহকারাৎ তু তামসাৎ ॥ ৪৭ ॥
 বৈকারিকদিহকারাৎ সত্ত্বোজিত্রাত্ সাত্বিকাৎ ।
 বৈকারিকঃ স সর্গস্ত যুগপৎ সম্ভাবর্ততে ॥ ৪৮ ॥
 বুদ্ধোজিয়াগি পঙ্কেব পঞ্চ কন্ঠেজিয়াগি চ ।
 তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ ।
 একাদশং মনস্তত্ত্ব দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥
 শ্রোত্রোদ্বক্চকুম্বী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী ।
 শব্দাদীনামবাণ্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে ॥ ৫০ ॥
 পাদৌ পায়ুরুপশ্বশ্চ হস্তৌ বাকু পঞ্চমী ভবেৎ ।
 গতির্কিসর্গে হানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কন্ঠং তৎ ॥ ৫১ ॥
 আকাশং শব্দমাত্রস্ত স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ ।
 ত্রিগুণো জায়তে বায়ুঃ শব্দস্পর্শগুণো মতঃ ॥ ৫২ ॥
 রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ ।
 ত্রিগুণস্ত ততশ্চায়াঃ শ শব্দস্পর্শরূপবান্ ॥ ৫৩ ॥

সেই সব শব্দ, ঘোর, কিঞ্চ মৃদ নয়
 অবিশেষ ভাই তার জানিহ নিশ্চয় ।
 তামসাহকার হ'তে এই ত প্রকারে
 ভূত-ভয়াজের সৃষ্টি জানিহ সংসারে ॥ ৪৭ ॥
 সত্ত্বোজিত্র বৈকারিক যেই অহঙ্কার
 সত্ত্বগুণযুক্ত তাহা সেন এই সার ।
 বৈকারিক সৃষ্টি তাহে হয় সেই মত,
 বিশেষিয়া বলিব তাহাতে হৈল যত ॥ ৪৮ ॥
 জানেন্দ্রিয় পঞ্চ, পঞ্চ কন্ঠেন্দ্রিয় আর
 তৈজস ইন্দ্রিয় সবে জেনে' ইহা সার ।
 দশ ইন্দ্রিয়াদিবৈ বৈকারিক দশ ;
 একাদশেন্দ্রিয় মন, দেব একাদশ ॥ ৪৯ ॥

শ্রোত্র, কুর্ক, চকু, জিহ্বা, নাসিকা সে আর
 শব্দাদির জানি অত্র জানেন্দ্রিয় সার ॥ ৫০ ॥
 পাদ, পায়ু, উপশ্ব সে হস্ত, বাকু আর
 এই পঞ্চ কন্ঠেন্দ্রিয় জেনে' ইহা সার ।
 গতি আর বিসর্গ, আনন্দ, শিল্প, কথা,
 এই পঞ্চ কার্য তাহে নানিক অঙ্গণা ॥ ৫১ ॥
 শব্দমাত্র আকাশেতে হইল মিলন ।
 স্পর্শমাত্র হ'তে হয় বায়ুর জনন,
 দুইগুণযুক্ত বায়ু শব্দস্পর্শ আর
 বায়ুতত্ত্ব-স্বরূপ জানিহ এই সার ॥ ৫২ ॥
 পঞ্চ স্পর্শে হয় যবে রূপের মিলন
 তিনগুণযুক্ত তেজ জনমে তখন ॥ ৫৩ ॥

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
 ৩
 গবেষণা কেন্দ্র
 ৬/এম, ট্যামার সেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

গহ্ব

“বামভাগে যে মহাদেগ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি । এই দেশ সিদ্ধ-
 গঙ্গাসঙ্গমভূত । ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্তা দ্বৈত.....সামান্যত-
 প্রণতা কপিলদেব অত্র সকল দেশ ভাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন,
 তাহারই অংশাবতারগণ ভায়দর্শন বাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশ
 অবতারণ করেন এবং প্রীতিপীযুষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয় ।.....
 চতুর্থ যুগের প্রকৃত বৈদ্যশাস্ত্র এই দেশেই প্রচলিত হইয়াছে । এই দেশ পরম
 পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—স্বনামাভ্যুদয়কারী তাকিকবর্ণের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-
 মণ্ডিবিদ্যার শক্তিসমুদায়বিস্তারের প্রসূতি । এখানকার লোকেরা কলিকালেও
 দেবভাষায় প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে ।
 ফল কথা, সত্যযুগে সর্বস্বতী-সন্তান তর্কসিগণ যে কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন
 এই যুগে ভাগীশ্বরী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে ।
 ইহাদিগেরই দেশে পূর্বে পিতৃগণের পুনরুৎসাহ সাধিত হইবে ।”

ভূদেব যথোপাধ্যায় (“পুষ্পাঞ্জলি ”)

৫ম খণ্ড

৫ম বর্ষ

আশ্বিন, ১৩২১.

দ্বাদশ সংখ্যা ।

আলোচনা

১। বর্ণাশ্রম ও বিশ্বশক্তি
 কেহ কেহ বিবেচনা করেন, হিন্দুসামাজ্যের
 ‘জাতি’ গুলি স্ব স্ব ক্রমীন সমাজবিশেষ ।
 এই সমুদয়ের বিভিন্নতা ও অনেকাই ভারত-
 বর্ষে রাষ্ট্রীয় একতার অন্তরায় । এই জটিল
 হিন্দুসামাজ্যের বিভিন্ন অংশে এক আদর্শ ও
 এক চিন্তা প্রচারিত হইতে পারে না । ইউরো-

পের মধ্যযুগে বহু বাবসায়ী সমিতি এবং শিল্প-
 “শিল্প” বর্ধমান ছিল । আমাদের জাতি-
 ভেদকে পুরাপুরি সেই ধরণের গিচ্ছ-ভেদ
 বিবেচনা করিয়া ইহারাই এইরূপ বলিয়া থাকেন ।
 জীবন্ততবে সকল সাম্রাজ্যই এক, অথবা অধ্যাত্ম-
 তত্ত্বে সকল সাম্রাজ্যই এক, অতএব মানব
 সমাজে উক্তনীচভেদ, অসাম্য, অনৈক্য থাকে

উচিত নয়—এরূপ মুক্তি অবলম্বন করিয়া উপভোগ লিখিতে পারা যায় সমাজ গড়িয়া তোলা যায় না। হস্তরাং এ যুক্তির অবতারণা সম্ভবিত্ত করিব না। দুনিয়ার লোক অসামান্য স্বীকার করিতে বাধ্য—দুনিয়ায় যত সমাজ উন্নতি আছে মরিয়াছে সকলকেই অসামান্য মানিয়া চলিতে হইয়াছে। আমরাও তাহা মানিয়া লইলাম। নিরবচ্ছিন্ন জায়ের তর্কে কাল কাটাইয়া লাভ নাই। ষাঠার সময় আছে তিনি এবিষয়ে মাথা ঘামাইয়া একটা ক্ষুদ্র দর্শনবার উদ্ভাবন করুন।

তথাপি 'বর্ণাশ্রম' প্রথা সখ্যে বিংশশতাব্দীতে আমাদের আলোচ্য বিষয় বহুবিধই রহিয়াছে। আমরা ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের দিক হইতে বর্ণাশ্রমের ভূত-কল্পিত-বর্তমান বৃত্তিতে চেষ্টা করিব।

আমরা মানব-জীবন-সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুই "ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী"র সাহায্যে বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। এই ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালীকে সাধারণ ঐতিহাসিক তথ্যের বিবরণ মাত্ররূপে বৃথিবে তুল বন্ধা হইবে। ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী "প্রাণ বিজ্ঞানের" নিয়মে অসুশাসিত। যুগে যুগে মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি গ্রহণ করে। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বশক্তির প্রভাবে এই মূর্তির বিভিন্নতা সাধিত হয়। অথচ সকল মূর্তি-বৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে মানবপ্রাণ বিরাজ করিতে থাকে। যে আলোচনা-প্রণালীর সাহায্যে আমরা জন্মকলিত মানবজাতির সঙ্গে বিশ্বশক্তির ভিন্ন ভিন্ন সখ্য ও আদান প্রদান বৃত্তিতে পারি তাহাকেই ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী বলিতেছি।

উনবিংশশতাব্দীতে "জাতিভেদ" যে আকার ধারণ করিয়াছে পূর্বে তাহার অসিকল

সেই আকার ছিল না। কারণে কলমে বর্ণনা করিবার সময়ে আজকাল প্রত্যেক বর্কে এক একটা স্বাধীন সমাজরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কাব্যাত্ত তত বাধাবিধি ছিল না—থাকিতে পারিত না।

বিশেষতঃ স্বাধীনতার যুগে প্রত্যেক সমাজের রাষ্ট্রীয় চতুষ্টয়ীমাত্র প্রায়ই পরিবর্তিত হইত। তাহার ফলে নব নব অবস্থায় জাতি-মুহুরে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা নব নব আকার ধারণ করিত। হস্তরাং আজকালকার আট পৃষ্ঠ বাধা নড়ন চড়ন-হীন বিভাগের দ্বারা বিভাগ বেশী দিন থাকিতে পারিত না। নূতন নূতন শক্তির প্রভাবে জাতিগুলি সর্বদা সজীবভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত।

ইংরাজ আমলে আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের অভাব অত্যন্ত বেশী—ইংরাজ নিজেই তাহা স্বীকার করেন। তাহা ছাড়া আইনের প্রভাব অত্যধিক। এইরূপ প্রত্যেক জাতির ভিতর এক একটা জমাতবদ্ধ দান্য বাধিয়া গিয়াছে। যথার্থ স্বাধীন চিন্তার অভাবে ভিতর হইতে নূতন প্রাণ বিকাশের প্রবণতা নাই। অথচ বাহির হইতেও নবশক্তি সঞ্চারিত হইতেছে না। হইলেও তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই। কাব্যাত্ত জাতি-গুলি অনেকটা গতিবিধিহীন সমাজ-প্রকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। প্রাণ-বিজ্ঞানের হিসাবে ইহা একটা শোচনীয় অবস্থা। এরূপ দুর্দশা আমাদের কোন দিন হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

তবে এই প্রকাণ্ডগুলি নিত্যন্ত ক্ষুদ্র নয়। অদ্বায়তন প্রকাণ্ডের ভিতর চলাচল বেশী হয় না। তাহাতে বিবাহের নির্দোষ, তাব বিনিময়, এবং কর্ম-বিনিময় শীঘ্রই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু হিন্দুসমাজ

জাতিগুলির লোকসংখ্যা-যথেষ্ট অধিক। তাহার ফলে প্রত্যেক জাতির ভিতর উদ্যমানতা এবং আদান প্রদান ভালরূপেই হইতে পারে।

এইরূপ উদ্যমানতা বিনিময় চিরকাল হইয়া আসিয়াছে। এই নিমিত্তই জাতিভেদে সামাজিক উন্নতির পথ বন্ধ হইতে পারে নাই।

যুগে যুগে নব নব আদর্শ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সমাজের ভিতর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

২। জাতিভেদের সমীপবর্তী ভবিষ্যৎ

উনবিংশশতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংঘর্ষ পরাধীনতা, বেলগাড়ী এবং সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন হিন্দুসমাজকে নূতন এক স্তরে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পূর্ণাপুরি ফল এখনও আমরা পাই নাই। কিন্তু কোন্ দিকে যাইতেছি তাহা বুঝা কঠিন নয়। প্রথমতঃ, অস্পষ্ট জাতি সখ্যে আমাদের যে সংস্কার জন্মিয়াছে তাহা থাকিবে না। বিংশশতাব্দীর পুরে বোধ-হৃৎকাহ্নকেও অস্পষ্ট জ্ঞান করিব না। বদেখী আন্দোলন, অর্জুনের যোগ, দামোদরের বজা, রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ মিশন এই গতির লক্ষ্য।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষিকর্ম ইত্যাদি অন্ন সংস্থানের কোন পথই জাতিগত হইয়া থাকিবে না। যে কোন জাতির যে কোন লোকই এই সকল কর্মে যোগদান করিতে থাকিবে। উনবিংশশতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এই কার্য সাধিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে, বাস্তবিকপক্ষে, জাতি হিসাবে কোন ব্যবসায় নাই।

ইহার ফলে আমাদের বৈদেশিক জীবনে

একটা স্বাধীনতা এবং গতিবিধিপ্রিয়তা আনিয়াছে। ক্ষমতা ও যোগ্যতা অসুশাসিত মানব সজন্মেই সকল কর্ম করিতে লোকসারী হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাকমত এবং জাতীয় আদর্শও অনেকটা একপ্রকার হইয়া উঠিতেছে।

পূর্বে ধর্ম ও সমাজের শাসনে সমগ্রদেশের ভিতর একপ্রাণতা বর্তমান ছিল। পাক্যাত্য শাসনের আমলে ধর্ম ও সমাজের প্রকৃত শাসন বেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে নব্য ব্যবসায় ও নব্য শিক্ষার প্রভাবে সেই একপ্রাণতা নূতনরূপে বন্ধিত হইতেছে। আমাদের যতগুলি লোক এক ভাষায় কথা বলে তাহাদের সকলেই আদর্শ ও লক্ষ্য একরূপ এক কথা আমরা বর্তমানের বলিতে পারি।

তৃতীয়তঃ, বিবাহের নিয়ম শীঘ্র বিলুপ্তরূপে বদলাইবে না। জাতিনির্গণ্যে পাঞ্জাবী নির্দোষই জাতিভেদের শেষ নিদর্শন এখনও বহুকাল থাকিবে। বিশেষতঃ, আজকাল পাশ্চাত্যদেশীয় বিবাহবন্ধন এবং সামাজিক জীবনের দুইক্ষেত্রে ভারতবাসী বিশেষ উৎসাহিত নন। তাহার উপর নব্য 'ইউজেনিক্স'-বিজ্ঞান বা বংশতত্ত্ব এবং 'গ্যাস্ট্রপলজি' বা জাতিতত্ত্বের আলোচনায় হিন্দুসমাজের বিবাহ প্রথাই বোধ হয় হৃৎকান্দ্য প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। ইউরোপের নিকট হিন্দুর এ বিষয়ে শিক্ষণীয় কিছু আছে কি না সন্দেহ। ইউরোপ নিজেই তাহার ধর্ম সামাজিক জ্ঞান বিবাহের নিয়মে ও পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন সাধন করিতে বাস্তব।

তবে এক্ষণে হিন্দুসমাজের জাতিগুলি বহু খণ্ডে উপখণ্ডে বিভক্ত রহিয়াছে। এতগুলি বিভাগ থাকিবে না। কয়েকটা মোটা মোটা বিভাগের ভিতর সামাজিক বন্দনে প্রচলিত

হইতে থাকিবে। ইহার ফলেও সমাজ-জীবনের কর্মক্ষেত্র বেশ সুবিস্তৃত হইয়া পড়িবে। যৌনসম্বন্ধে নির্ভরচরিত্রের সুযোগ যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে। আত্মকালই এই সকল স্বপ্ন দেখা যাইতেছে।

চতুর্থতঃ, ভারতবাসীর জাতীয় আদর্শ কখনও সামাজিক জাতিগ্রন্থা অনুসারে খণ্ডনঃ বিভক্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই একরূপ চিন্তা করিত এবং এক আদর্শে জীবন গঠন করিত। ইহার পরম্পর পরস্পরের শ্রদ্ধা বা বিরোধী একানদিনই ছিল না। সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রচার, ধর্মশিক্ষার বিস্তার, পুরোহিতদিগের সংস্থাপন, এবং মেলা, উৎসব, তীর্থগমন, শোভাযাত্রা ও লোক-সাহিত্যের প্রভাব—এই সকলের দ্বারা দেশের ভিতর কালোপযোগী একা প্রবর্তিত হইত। ফলতঃ মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় একা বন্ধনের যেরূপ আদর্শ ছিল সেইরূপ সময়ের এবং এক জাতীয়তা স্থাপিত হইত।

বর্তমানকালে সেই একজাতীয়তা বা একরাষ্ট্রীয়তা কথঞ্চিৎ নূতন আকারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। এক্ষণে প্রাদেশিক সাহিত্য ও মাতৃভাষার প্রভাবে একেবারে পথ বিভক্ত হইতেছে। অধিকন্তু, আর্থিক অবস্থার প্রভাবেও একাবিধান স্থাপিত হইতেছে। জাতিনির্ধিষ্টতায় সকলেই একপ্রকার বৈষয়িক কর্মে যোগদান করিতে পারে। তাহার ফলে নব উপায়ে আমাদের সমুদ্রে একজাতীয়তা বিকশিত হইতেছে।

৩। হিন্দুসমাজে নবশক্তি প্রবেশের পথ

ভারত সমাজ হইতে পরাধ্বাব ও পরাধ্ব-করণের মূল চলিয়া গিয়াছে। একজ

আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বা মেকেল-নীতির বিরুদ্ধে দেশীয় শিক্ষা নীতি প্রসঙ্গনের জয় আন্দোলন করিতেছেন।

আমরা পাক্ষ্যতা বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য বর্জিত করিতে চাহিতেছি না অথচ একমাত্র এই বিদেশীয় চিন্তাশাসির প্রভাবেও জীবন-ধর্মন করিতে অনিচ্ছুক। আমরা আমাদের সনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সঙ্গে নব্যজগতের উৎকর্ষ অঙ্গীভূত করিয়া লইতে প্রয়াসী।

আমরা বুদ্ধিযাছি যে, বাহির হইতে আমাদের উপর পরকীয় সভ্যতার বোঝা চাপান হইতেছিল। তাহাতে আমাদের উন্নতি বাধা পাইয়াছে। তাহার পরিবর্তে আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আধুনিক সভ্যতা হইতে প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি বাড়িয়া লইতে চাহি।

কিন্তু তাত্ত্বিক প্রশ্ন করিতেছেন, “আপনারা-দের এই আকাঙ্ক্ষা, প্রয়াস ও আন্দোলন অস্তান্ত সাধু এবং সুবিবেচনারই পরিচায়ক মনেই নাই। কিন্তু বিদেশের আবিষ্কারগুলি আপনাদের সমাজে ও সভ্যতায় এখিট হইবে কি করিয়া? প্রতিটি হইবার কোন পথ আছে কি? হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রমনীতি কি পরকীয় সভ্যতার অগ্রদূতগুলি সহজে গ্রহণ করিতে অবদর দেয়?”

বর্ণাশ্রমনীতিকে একপক্ষ স্থিতিশীলতার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে-পূজা করিয়া থাকেন, অপর পক্ষ এই জগতই ইহাকে অযথ সমাজ-গঠন-নীতিরূপে ভংগনা করিয়া থাকেন। বজ্রভঃ বর্ণাশ্রমকে স্থিতিশীল এবং পরস্পরবিষোধী ও স্বতঃপ্রদান সভ্যী দলভেদ বিবেচনা করা অসম্ভব। অগ্নিদান ও উনিবেশশতাব্দীর সামাজিক অস্থিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিয়া

ভারতীয় সমাজও বৃথা যাইবে না। তাহা ছাড়া এই যুগে-বর্ণাশ্রমে যে সকল স্বাধীনতা প্রতিষ্ট হইয়াছিল, পূর্বেই বলিয়াছি, সেগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। হস্তরাং তাহার দ্বারা সমাজে নবশক্তি প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা নাই।

৪। হিন্দুসমাজবিকাশের বিচিত্র উপকরণ

অতীত ইতিহাসের দাফা গ্রহণ করিলেই হিন্দু সমাজতত্ত্ব ঐক্যরূপে সূচিত্তে পারা যাইবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দুসমাজ জগতের সকল প্রকার শক্তিপুঞ্জ হইতে মিলিত বলের পুষ্ট করিয়াছে। গ্রীক, রোমান, পারস্য, মুসলমান, চীনা, তিব্বতী সকল জাতীয় সভ্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আমাদের সমাজে স্থান পাইয়াছে। আমরাও এই সকল সভ্যতাকে নানা উপকরণে ভূষিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবাসীরা ভিন্ন ভিন্ন-দেশের নানা প্রকার আবিষ্কার গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে কেন পারিবে না?

সত্য কথা, আমরা কোন দিনই গোড়া একান্দী ভাবে দাড়িয়া উঠি নাই। আমরা নিজেদের ভিতরই কত অসংখ্য বৈচিত্র্যের সময় করিতে করিতে বিকশিত হইয়াছি। ভারতবর্ষ সর্বশ্রাঙ্গী। এতদিন আমরা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রদূত হইয়াছি। নূতন শক্তি ব্যবহার করিবার কক্ষতা কি এক্ষণে অসম্ভব নাই?

নবদ্বিত ভারতবর্ষের লোকেরা স্বাধীনভাবে জগতের কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিত এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাইত,

ততদিন হিন্দু সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও দর্শনে গ্রন্থিয়ার নব নব আবিষ্কার সহজে প্রবেশ করিতে পারিত। সংস্কৃত ভাষার ভিতর কোন চিন্তা একবার প্রবেশ করিলে তাহা ক্রমশঃ প্রাদেশিক ভাষায় এবং লোকসাহিত্যেও আসিয়া পড়িত। অধ্যাপকবর্গের গবেষণায়, শিষ্যগণের আলোচনায়, পুরোহিতগণের সাহচর্যে, কথক ও পুরাণ পঠিকরণের প্রচারে এবং মেলা উৎসব সদ্ব্যভিচৈ শোভাযাত্রা ইত্যাদির প্রভাবে কঠিন, কঠিন তত্ত্বগুলিও অল্পকালের ভিতর-সমাজের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া যাইত। প্রয়োজনানুসারে নিতা নূতন পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি হইত। গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কার বরাহমিহির গ্রহণ করিলেন। পটিকার সাহায্যে সে গুলি এক্ষণে নিগূঢ় ক্রয়কেরও সহজে বোধগম্য হইয়া রহিয়াছে। খনার বচনই বা কেন জানে? দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। আমাদের আর্থসম্বন্ধ, কৃষিতত্ত্ব, জ্যোতিষ ও অধ্যাত্মতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দ গুলি ইহাদের প্রচারের প্রতিবন্ধক হইয়াছে কি?

৫। সমাজশক্তির নবীন মূর্তি

আমরা পাক্ষ্যতা সভ্যতার প্রয়োজনীয় বস্তু গুলি এই উপায়েই আধুনিক কালে গ্রহণ করিতে পারিব। জোর করিয়া গ্রহণ করা-ই-বর্ষ পরিবর্তে আমরা নিজেদের অভাব অনুসারে গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইলেই কোন গোল বাধিবে না। উনিবেশশতাব্দীতে সে সুযোগ পাই নাই। এই জগতই পরকীয় সভ্যতা গ্রহণ করিতে বাহিরা পাহারাকর্মণ ও পরাধ্বাব মাত্র করিতে পারিয়াছি। স্থিতি-শীল দল এই কথা বুঝিলে ক্রমবিকশিত

হিন্দুধর্মের অপূর্ণ মূর্তির পরিচয় পাইবে, না গতিশীল সংস্কারকের দলও একথা বুঝিলে অথবা হিন্দুধর্মের নিন্দা করা হইতে বিরত হইবে। আমাদের সমগ্র জীবনমণ্ডলে এবং ভারতবর্ষের আবেষ্টনে যে একটা অশাভাবিকতা আদিয়া জটিল হইয়াছে তাহা দুই পক্ষই বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করুন।

বিশেষত্বাক্রমে আমরা নিজেদের প্রয়োজন দেখিয়া, নিজেদের স্বভাব বুঝিয়া, নিজেদের কর্মক্ষেত্র অস্থানারে ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে বুঝা পড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হিন্দুসমাজ এইরূপ বুঝা পড়া করিবার স্বযোগ যদি পায় তাহা হইলে সে প্রশংসাজ্ঞানের পরীক্ষায় বিজয়লাভ দেখাওতে সমর্থ হইবে। স্বযোগ যদি না পায় তাহা হইলে হিন্দুসমাজের প্রকৃত পরীক্ষা হইবে না। এখনও আমাদের বিচারের সময় আসে নাই। আমরা এখনও প্রকৃত পরীক্ষাক্ষেত্রের বাহিরেই বসিয়া আছি কিন্তু ভিতরে ঘাইতে পারিব সে আশা আছে। সে আশা আছে বলিয়াই হিন্দু এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহা না হইলে মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস ইত্যাদির দশা ভারতবর্ষে ঘটিলা কেন ?

এই বুঝা পড়ার ফল প্রধানতঃ আমাদের মাতৃভাষায় দেখিতে পাইব। আমাদের মাতৃভাষা কোন জাতিবিশেষের বা ধর্ম-বিশেষের সম্পত্তি নহে। হিন্দু মুসলমান নমঃ শূত্র ব্রাহ্মণ সকলেরই এক মাতৃভাষা। আমাদের নিয়ম এবং রীতাব্যবহাৰ ও পূজা পদ্ধতি বিভিন্ন রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাষা এবং ভাব্যভাব অস্বনিহিত ভাব ও চিন্তাপ্রণালী সকল সম্ভাব্যেই একরূপ। মাতৃভাষার কোন বিভাগে পাশ্চাত্য জ্ঞান একবার স্থান পাইলে অঙ্গকালের ভিতরেই তাহা ন্যূনাদিক পরি-

মণে আপনাদের জনসাধারণের সম্পত্তি হইয়া পড়িবে।

ষট্ঠশ আমোলনের দূরত্ব দিতেছি। এত তথাকথিত প্রভেদ সম্বন্ধেও সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এক হইল কি করিয়া ? এই কথা বুঝিলে আমাদের সমাজে নবশক্তি প্রবেশের উপায় ও কারণগুলি বুঝা যাইবে।

৬। বার্মসৌতন্ত্র

ফরাসী পণ্ডিত হেনরি বার্মসো আঙ্গকাল ইউরোপের দার্শনিক মহলে শীর্ষস্থানীয় কৌণ্ডি-ভোগ করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার পর এডিনবারাও তাহার বক্তৃতা হইয়াছে। ইনি ইংলণ্ডে ফরাসী ভাষা বক্তৃতা করিতেন। বলিয়ার ভদ্রী এবং রচনাপ্রণালী বেশ চিত্তাকর্ষক।

ইউরোপে “একমেবাদ্বিভীতঃ” রূপে পূজা পাওয়া সহজ কথা নয়। বার্মসো সেরূপ পূজা পাইতেছেন না। তাহার দর্শনবাদ সর্বত্র জাতি বা আশ্রিতে পৃথক হইয়াছে। ইহার চিন্তার ভিত্তি কতখানি নিয়ম এবং কতখানি পরকীয় তাহার সমালোচনা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। তাহার দার্শনিক গবেষণার সূচীই বা কতদূর—ভবিষ্যতে ইহার প্রভাব বাড়িবে কি কমিবে সমালোচকেরা, তাহাও বুঝা পড়া করিয়া দেখিতেছেন।

আধুনিক কোন কোন দার্শনিক বলিতেছেন “কাণ্টের পর পাশ্চাত্য জগতে বার্মসোর সমান চিন্তাবীর কেহ জন্মেন নাই। আধুনিক দর্শনের মধ্যে একমাত্র বার্মসৌতন্ত্রই টিকিয়া যাইবে।” বিলাতের পণ্ডিত হ্যাডেন বলেন,

“বার্মসো নুতন কিছুই শিখাইতে পারেন নাই।

জাৰ্মাণ বৈদ্যান্তিক সোপেন-হোয়াবের কথাই বার্মসো, ফরাসী ভাষায় - প্রচার করিতেছেন।

এদিকে আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত জেমস বার্মসোর শিষ্য গ্রন্থও ক্রিয়া ছিলেন। জেমসের বক্তৃতাকালেই ফরাসী দার্শনিক অক্সফোর্ডে নিমন্ত্রিত হন। অথচ জেমস ও বার্মসো দুই ভিন্ন পথের পথিক। ফরাসীরাই কি বার্মসোকে সর্ববাদিসম্মত গুরুরূপে গ্রহণ করিতেছে ? তাহা নহে। প্রবীণ ফরাসী দার্শনিকেরা বলিতেছেন “বার্মসো নাস্তিকতার নুতন অবতারণা।” পক্ষান্তরে যুবক ফরাসীরা বার্মসোকে অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রচারকরূপে পূজা করিতেছেন। ইহারা বিবেচনা করেন, বৈজ্ঞানিকতার পরিবর্তে জাতিত্বের এবং আধ্যাত্মিকতার প্রবর্তন অত্যাবশ্যক। এই জাতিত্বের প্রচার ইহারা বার্মসৌতত্ত্বই পাইয়া থাকেন।

বার্মসৌতত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপ মতবৈচিত্র্য বড়ই বিস্ময়জনক। সত্য সত্যই বার্মসো একটা নুতন বাণী প্রচার করিতেছেন। তাহা বুঝিতে গাইয়া নানা মূল্য নানা কথা বলিতেছেন। এই নুতন বাণীর প্রচারক বস্তুমানজগতে আরও অনেকেই আছেন। ‘অস্তিত্ব সকলেই এক শ্রেণীর অন্তর্গত নন। তাহারা গুপ্ত, শতাব্দির শিষ্ট, ব্যবসায়, বাণিজ্য, সাম্রাজ্য, বিজ্ঞান, ইত্যাদির প্রভাবপ্রাপ্তি মানবজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহার ফলে সমাজ, সভ্যতা, আদর্শ ও চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে নব নব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার স্বযোগ হইয়াছে। মানবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নানা ভাবে আলোচিত হইতেছে। এই আলোচনা প্রণালীগুলি পূর্বনতন প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র—প্রায়ই পূর্বনতন প্রণালী প্রতীবাদ স্বরূপ প্রবর্তিত। সেই

পুরাতন রীতির সাহায্যে মানবজীবন বুঝা যাইবে না—এই ধারণা ইহাদের সকলের মধ্যে বহুদূর।

দার্শনিক ও হুদুমার শিল্পের সমালোচক পোলাওভাস্কী নৌশে, জাৰ্মাণির চিন্তাবীর পলসেন ও অয়কেন, আমেরিকার জেমস, এবং বিলাতের ব্র্যাঙ্কেল ইত্যাদি পণ্ডিতগণ এই নব্যদর্শনের বিভিন্ন প্রচারক। আমাদের রবীন্দ্রনাথও এই নব্য চিন্তাবীরগণের সঙ্গে আসন পাইয়াছেন। আধুনিক ইউরোপ এক্ষণে নুতন নুতন প্রথার জীবন সমালোচনা চাহেন। এই জটিল তাহার ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ‘পীতাঙ্গুর’ শব্দনাম করিয়াছেন।

বার্মসো নব্য দর্শনের যে পথে চলিতেছেন তাহা আমাদের ভারতীয় পথের অনেকটা নিকটবর্তী। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় ইনি একথা বলিয়াছেন। তাহার প্রবর্তিত Intuition বা অন্তর্দৃষ্টিতত্ত্ব হিন্দু দার্শনিকতার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এইরূপই ইহার মত। কিন্তু ইনি নিজগ্রন্থে “ইনটুইশন” সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন সেগুলি আমাদের পুরিতচিত ‘অন্তর্দৃষ্টি’ ‘নিদিধ্যাসন’ ‘ধ্যান’ ইত্যাদি হইতে বহুদূরে। ইনি পাশ্চাত্য মহলের Observation, Experiment, Inductive, Deductive, *apriori*, *aposteriori* ইত্যাদি সমালোচনাপ্রণালী অথবা আমাদের স্বভাব, মনন ইত্যাদি প্রণালী ছাড়াই যে বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত পারিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

মাহাংক এই অন্তর্দৃষ্টিতত্ত্ব ইউরোপে নুতন নন। জাৰ্মাণ শেলিঙ ও সোপেনহোয়ার প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে এই প্রণালী দার্শনিক সংসারে প্রবর্তিত করেন। ইহারা হিন্দু

সাহিত্যের নিকট দৃষ্টি ছিলেন। সেজন্য স্বীকৃত হইয়াছে। বার্লো, শেলিংগের কবিতা, শিশু স্যামুয়েলের নিকট এই নূতন বিজ্ঞা পাইয়াছেন।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা

গত বৎসর মাস্তাজের বিশপ মহোদয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্বন্ধে বাঙ্কালোর সহরে একটি বক্তৃতা দেন। শিক্ষাবিশয়ক পাদিক পত্র 'কলেজিওনে' তাহা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা সেই বক্তৃতা হইতে মাতৃভাষার উপযোগিতা সংক্ষেপে বক্তার মত কি তাহা এই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা কিছুতেই আদর্শ পন্থা হইতে পারে না। যাহা পাদিকার্দে যাইতে চাহে, তাহাদের পক্ষে মাতৃভাষার সাহায্যই গ্রহণ করা স্বাভাবিক। বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া অধ্যয়ন ও চিন্তা তাহাদের নিকট দ্রুত ভাষা বলিয়াই অসম্ভবিত হইতে পারে না। হালা পাদিকার্দে উপর নির্ভর করিতে তাহারা বাধ্য হইবে। ইংরাজীতে ভাষা বা ইংরাজীতে অস্বস্তি করা ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পাদিকার্দ না হইলে হয় না। অবশ্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ ইংরাজীতে যথেষ্টই স্বজিজ্ঞাসা পরিশ্রমিত হয়। তাহাদের পক্ষে এই কাণ্ডিক কঠিন হইবে। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রের ত ওরূপ হইবার জো নাই। তাহারা ইংরাজীতে কীচা থাকে, ইংরাজী ভেদন বলিতে বা লিখিতে পারে না। হতবাক্য তাহাদিগকে ইংরাজী সাহিত্য বা কাব্য পাঠ করিতে দিলে,

তাহারা ঠিক ঠিক ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। খুব সম্ভবত ভারতের কাব্য ও সাহিত্য তাহাদিগকে অধ্যয়ন করিতে দিলে, তাহারা এই বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে কেন না ইংরাজী কাব্য ও সাহিত্য অপেক্ষা দেশের কাব্য সাহিত্য স্বভাবতই তাহাদিগের অন্তর্গত বেশী সম্পর্ক করিবে। ভাব ও সত্য মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই লোকের কাহ্ন পৌছে, তাহাতেই তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে মতদিন ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষাকার্য সম্পন্ন হইবে, ততদিন মর্ক সাধারণের সঙ্গে ইহার যোগ থাকিবে না, ততদিন লোকের মধ্যে মত ভাবগুরু উন্মেষণ হইবে না, ততদিন জাতীয় প্রতিভা নিস্তেজ হইয়া রহিবে—সম্যকরূপে পরিচালিত হইতে পারিবে না।

৮। ভারতের চিত্র-শিল্প

আজকাল ভারতশিল্প সম্বন্ধে নানাধনে নানা কথা বলিতেছেন। সেদিন মাদাম হালবেক (Madame Hollebecque) ভারতশিল্পের নবজাগরণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ এইগুলি চিত্রের সাহায্যচর্চাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধের একস্থানে আছে, "প্রাচীন ভারতগণের রচনায় যে তেজ, শক্তি ও উত্তম দৃষ্ট হয়, কলিকতার চিত্রকরণের চিত্রে তাহা দেখা যায় না। প্রশান্ত কাব্যযাফির প্রতি ইহাদের অল্পাংশই তাহার চিত্র। ইহারা ভারতের খাঁটি লক্ষণগুলি আমাদের নিকট উপস্থিত করেন নাই। বিশাল শব্দের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে অশাশ্বত দেবতারূপে পরিকল্পনা করিয়াছিল। স্বর্গের জ্ঞান তাহাদের

অশাশ্বত হস্ত, ভোগের জ্ঞান তাহাদের সমস্ত মস্তক পরিচালিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন-কালে, আমাদের পরম্পরাবিকারী অনেক ভাব বেধিতে পাই; জীবন ও মৃত্যু, স্বচ্ছন্দ ও চিন্তা, ভোগবিলাস ও সন্ন্যাস। কিন্তু তখনও উত্তেজনার মধ্যে আমরা বিচিত্রীকরণের প্রতি আগ্রহ দেখিতে পাই; এবং উদ্ভাবন শ্রুতির উদ্ভাবিত মধ্য হইতে স্বর্গের চিত্রগুলির উৎপত্তি লক্ষ্য করি। এই বৈচিত্র্যময় ও উজ্জ্বল চিত্রশক্তির উপযুক্ত অভিব্যক্তি আমরা এই চিত্রকরণের নিকট পাইব বলিয়া আশা করি। কিন্তু এরূপও হইতে পারে যে, ভারতবর্ষ একদিন ধ্যানের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিশ্বজগতের কর্মধারা জ্ঞান প্রবেশ লাভ করিবে; তখন উহা নব্য-যৌবন লাভ করিয়া এরূপ এক শিল্পের সৃষ্টি করিবে যাহাশ দৃষ্টান্ত আমরা এ পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই।" লেখিকার কল্পনা সার্থক হইবে কি না জানি না। তবে এই কথা মনে হইবে, আমাদের সত্যজন জাতীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে বাগ্জাড়া কোন শিল্প উন্নতি লাভ করিবে না। আমরা অনেক বিষয়েই নিজের আদর্শকে বাহিরের চাকচিক্যে জুলিতে বসিয়াছিলাম, এখন দেখি মোহ আমাদের অনেক দিকের কাটিতে বসিয়াছে। চিত্রশিল্পও আমাদের মোহ-বিমুক্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই দৃষ্টান্তেই ভারতশিল্পের বিশেষত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ হেমেন্দ্রকুমার 'রায় মহাশয় 'ধর্ম ও কল্পনা এবং ভারতশিল্প' লইয়া যখন এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতশিল্প বিষয়ে তাঁহার পূর্বাগত শক্তি যথেষ্ট প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, "আমাদের সেকালকার শিল্পের প্রধান যে দোষ আমার চোখে পড়ে, তাহা তাহার বৈচিত্র্যভাব।

তখনকার শিল্পীদের পরিকল্পনা যখন বিধ, মূর্তি, ভঙ্গিমা ও ভাব কল্পিত হইয়াছে বটে—কিন্তু বহুদলে একই বিষয়, মূর্তি, ভঙ্গিমা ও ভাব নানানিধানের নানা শিল্পীর কাঁখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যতই অধন বা একেদন-শিল্পে নথ, আমাদের প্রাচীন কাব্য-কলাও এই দোষে ছুট। * * * * * আনকার পুরাতন কলার ভিতরে চাকলা বড় নাই। ইহার আলোক কারের মুখে ভারতের ধর্মাত্মগতা প্রজন্ম আছে। প্রাচীন কোন শিল্প-ক্ষেত্রে গেলে মনে হয়, যেন যুগান্তরের শাস্ত্র, গাভীর সোনাতে সজ্জিত হইয়া আছে। এই অস্বস্তি বহুমুখি— তাহাদের কেহ পদ্যসনে উপবিষ্ট, কেহ সন্ন্যাসভবে দণ্ডায়মান, কেহ ধ্যানতরঙ্গ, কেহ উপদেশদানরত, কেহ স্বপ্নাভাসাচ্ছন্ন, কেহ গভীর চিন্তাপ্রাণ—সমস্তই সমীরণময়ক সমুদ্রে মত স্থির। পরন্তু, বাস্তবিক সাগরের উপরকার চাকলা যেমন তাহার জলতল যুগল শান্তিকে জাগ্রত করিতে পারে না, এখানেও তেমন একটু মত বা একটু ভণ্ডা তাহাদের সে স্থিরতাকে ছুঁইতে পারে নাই। যেখানে বহুমুখি নাই, সেখানেও প্রায় এ স্থিরতা। বলিয়াছি, ভারতের ধর্মাত্মগতা এই স্থিরতার কারণ। যে ধর্মভাবকে প্রকাশ করিতেছে, সে কি কখনও জল হইতে পারে? ধ্যানের আলোকে হিমালয়ের ছায়ায় মতই আশ্রয়হীনমুখ—নৃত্যশীলা তটিনীর দ্বয়ে প্রভাত মণ্ডলের মত চপল নয়।

"কিন্তু যেখানেই দরকার হইয়াছে, সেখানে গতি কেমন ছুটিয়াছে। শিল্পে গতি এই চাকলাকে জাগাইয়া তোলা বড় শক্ত কাজ। * * * * * ভারতীয় ভাস্কর্য্যে গতির চরম পরিণতি 'মহাদেবের তত্ত্ব'।" * * * * *

"ভারতে শিল্পী প্রাপণগণে শিল্পশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। আগে জ্ঞানসম্বন্ধ করিয়া তবে সে কাজে হস্ত দিয়াছে। অজ্ঞতা কি শিক্ষার ফল? অশিক্ষাইত অজ্ঞতার আকার। ভারতে শিল্পীর জ্ঞান যে কত পারা পুঙ্খ ছিল, রাম-রাজ তাহার প্রসিদ্ধপুঙ্খকে বিশদরূপে সে

পরিচয় দিচ্ছেন (Essay on the Architecture of the Hindu, by Ram Raj)। এখানে শিল্পী হইতে কুটিল আরো শাস্ত্রগ্রাহী হইতে হইত। শিল্পী গুণের আদর্শে আত্মা শিক্ষা গ্রহণ করিতেন, এমন কি পণিতে দক্ষতা না জমিলে কেই শিল্পী হইতে পারিতেন না। তিনি গুণের আদেশ আত্ম করিতেন, শিল্পবিদ্যালয়ে তাহার প্রবেশাবধিকার ছিল না। 'মানসার' প্রভৃতি পুথির শিল্প-কারখার নিয়মগুলি পর্য্যন্ত চিত্র করা দেওয়া হইয়াছে। একটি ছোট স্তম্ভ নির্মাণ করিতে বসিয়াও শিল্পী কখনও শাস্ত্রের নিয়মছাড়া কাজ করিতে পারিতেন না। অবশ্য, প্রতিভা কখনও নিয়মের বেড়ার ভিতরে স্বেচ্ছায় বাধা থাকে না। এখানেও থাকিত না। * * * কিন্তু তাই বলিয়া প্রতিভা কখনও যথোচ্চাচার করে না। সে, সেইখানে নিয়মের বেড়া ভাঙে, যেখানে নিয়ম তাহার ভাবপ্রকাশের পরিপন্থী। শিল্পশাস্ত্র এমন উপদেশ দেন। অতএব ইহা নিয়মহীনতার ভিতরেও নিয়মফল। * * * "ভারতের কলা-বিদগণের বহুসংখ্যিত ক্ষুদ্র চিত্রপট আজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কতিপয় চিত্রপট মাত্র আজ দেখা যায়—তাহার অধিকাংশই যে ভাল চিত্রকরের আঁকা, এমনও বলিতে পারি না। তবে ভারতের "ভিত্তি-চিত্রের" কিয়দংশ আজও যে বিশ্রামান আছে, ইহা নৌদোষের কথা। পরন্তু এই সকল "ভিত্তি চিত্র" যে সুপ্রাচীন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ভাস্কর্য অপেক্ষা ভারতের ভিত্তিচিত্রের পরিচয়না অধিক মনোরম, তাহার ক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। কিন্তু রাসায়নিক পদার্থে সে কালের চিত্রবর্গ প্রকৃত হইত, জানি না,—কিন্তু তাহা যে অতি উৎকৃষ্ট, সে কথা অন্যায়গে বলি। কারণ কালের অত্যাচারে, মানুষের অত্যাচারে ও দূরার অত্যাচারে এবং যত্নের অভাবে এই সকল ছবি রং এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই; বরং স্থানে স্থানে তাহার উজ্জ্বল মণ্ডল বিস্তৃত হইতে হয়; মনে হয় এ রং বৃষ্টি নতুন—সবে মাথাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাই ভাবি, যথার্থ নতুন অবস্থায় নানা-জানি বাহা কিরূপ দেখিতে ছিল। তাহাদের অন্ধনকৌশলও অতি প্রাণ-রমক। যুগোপের প্রাচীন চিত্রে কের্নের একটি আশ্চর্য ভাব আছে। কিন্তু এতদধিকার ছবি মূর্তিগুলি যেমন অনায়াসে ভঙা হইত রমণীয়। তেমন পুষ্পপল্লব—তাহাতে কাটিগোলের আঁচ পর্য্যন্ত লাগে নাই। চিত্রকারীদের রেখা টানিবারও কি আশ্চর্য ক্ষমতা, কি অসুত নিপুণতা! রেখার এই ইচ্ছালাভে ভারতের চিত্র-কলা দর্শকের নয়ন-মন একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়। আধুনিক যুগের কোণও প্রাকৃতিক শিল্পই তাহার চাইতে ভাল রেখা টানিতে পারে না। এই সকল চিত্রের এক একটি রেখা টানে এক একবারি সম্পূর্ণ কাব্য সূচিয়া উঠিয়াছে।"

৯। রাজ পিপলায় নতুন বিদ্যালয়
রাজপিপলায় টেটের স্বগরিয়া, সহরে একটি নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়-টিতে ইংরাজী ও মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। উক্ত টেটের পরোক্ষপুত্র দেওয়ান বাহাদুর নুজিঙ্গা এলালি মহাশয়ের নামে বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে। দেওয়ান সাহেব একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাহার কঠোরতা ঘরে ঘরে উদ্ভাসিত হয়। তাহার একটা প্রবন্ধমত আকাজক ছিল যে ইংরাজী শিক্ষাকে প্রজাবর্ণের নিকট অতি সহজলভ্য করিয়া তুলিতে হইবে। তিনি তাহার নিজের জীবনের শিক্ষার চরমফল—উদারতা, সরলতা, সহানুভূতি, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সদুপগ্রাণি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই জ্ঞান বাগিচাও তৎসম্মিতকর্তৃক স্থান সমূহের অধিবাসীরাই তাহারই স্বাভিচারকল্প, এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় বাগা স্থানীয় ছাত্রবর্গের অংশে উপকার হইবে, আশা করা যায়। বীহার নগরের সঙ্গে ইহা সংযুক্ত তাহার আদর্শ, ছাত্রদের মধ্যে অচলিত হইলে, তাহার চরিত্রবান, ধর্মভাষা এবং সমাজের অলসাররূপে

পরিপণিত হইতে পারিবে, সে, বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১০। মহীশূরে বাণিজ্য সম্মিলনা

মহীশূরে বাণিজ্য (Economic) সম্মিলনের পঞ্চমবার্ষিক বৈঠক বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। আমরা নিম্নে কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

(ক) শিক্ষা বিষয়ক

১। প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা এবং কার্যকরী শিক্ষা সম্বন্ধে জনসাধারণ ও তাহার নেতাদের সহকারিতা গ্রহণের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন।

২। রাজ্যে বৈদ্যিক শিক্ষার স্থাপন ও পর্যবেক্ষণকল্পে একজন স্থপারিটেণ্ডেন্ট বা ইনস্পেক্টর নিয়োগ।

৩। প্রতি জেলার এবং প্রত্যেক তালুকের সর্বোচ্চ বয়স্ক-সমিতি স্থাপন।

৪। কল্যাণ সাহিত্যপুস্তি সম্বন্ধে সমিতি গঠন।

৫। বড়োয়ার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সমাক পরিজ্ঞাত হইবার জন্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষা কমিটারীকে তথ্য প্রেরণ।

৬। জেলায় প্রতি গ্রামে বা কয়েকটি গ্রামসমূহে একটি গ্রামা শিক্ষক নিয়োগ—গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ স্কুল-গৃহ-স্থ শিক্ষকের আবাস-বাটী নির্মাণ করিয়া দিলে, এইরূপ শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে।

৭। কৃষিসমিতি বা তদনুরূপ সহকারী সমিতি বৃক্ক গ্রামসমূহে সংগঠিত প্রচারা। ৮। শিল্প ও অর্থ সম্বন্ধী প্রজ্ঞান প্রচারক গ্রামসমূহে স্কুল সমূহে মাতৃভাষায় সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার।

৯। রাজ্যে অষ্টজনিক বাধ্যকরী শিক্ষা প্রবর্তনের উপায় নির্ধারণ।

১০। জনসাধারণের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া বক্তৃতা দিবার জন্ত প্রত্যেক তালুকে অন্ততঃ একজন ভ্রমণকারী কল্ভা নিয়োগ।

(খ) কৃষি বিষয়ক

১। দুধ, পশুখাদ্য এবং সার সরবরাহের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট নিয়মের ব্যবস্থা।

২। রাজ্যে ডেয়ারী উন্নতিকল্পে পাঁচ বৎসরের জন্ত এক জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ।

৩। ছুফানন্দম গাভী উৎপাদনের জন্ত আইনসমূহের বৃদ্ধির আমদানী ও তাহারিগকে কোন স্থিতিজনক স্থানে সংরক্ষণ।

৪। একশ বানি গ্রাম্য কো-অপারেটিভ সমিতিতে কৃষিসমিতি বৃক্ক উন্নত লাভল ও অজ্ঞাত কৃষক উপযোগী যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রদর্শন—এক প্রত্যেক কো-অপারেটিভ সমিতিতে ১০০ টাকা মূল্যের কৃষিযন্ত্রপাতি প্রদান।

৫। বর্তমানে প্রচলিত কৃষিপ্রণালীর মধ্যে কোনটি আছে কি না তৎপর্যবেক্ষণ এবং থাকিলে তাহার শোষণনের জন্য চেষ্টা।

৬। পো-সংরক্ষণ কো-অপারেটিভ সমিতি-সংগঠন।

৭। জলাশয়-বনন এবং সংরক্ষণ নিমিত্ত স্থানলখন।

(গ) ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক

১। প্রাথমিক কোন একটি মনোনীত তালুকে গ্রাম্য সেকিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন।

২। বয়ন, পিল্লের কাজ, ধান ভাণা প্রভৃতি সম্বন্ধে নতুন চিত্রা প্রচারণের জন্য ব্যবসা ও বাণিজ্য সমিতি বৃক্ক তিন জন বৃত্তা নিয়োগ।

৩। কল কাজ ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিবিয়ার জন্য যুবকদিগকে বিশেষ প্রেরণ।

৪। নারিকেল হইতে মাখন প্রস্তুত করিবার কারখানা-স্থাপন।

৫। বর্ষিক ও শাবগারীদিগকে নানা

৬। হাকের সার তৈয়ারী করিবার জন্য নারিকেল স্থাপন।

৭। ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে ব্যবসায়িক প্রভৃতি দেখিয়া ব্যবসায়িক নতুন তথ্য প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ।

শক্তি পূজা

“নমস্তুভৈ নমস্তুভৈ নমস্তুভৈ নমোনমঃ।
বা দেবী সৰ্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সমন্বিতা ॥

সৰ্বধৰ্ম্মে সৰ্বশেষে সৰ্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যাস্থি নো দেবী ধৰ্ম্মে দেবী
নমোস্ততে ॥”

কালচক্রে অধিশ্রান্ত আবর্তনে শরৎকাল
আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা
ভারতের মহা মহোৎসবের কাৰ্য্যকাল।
প্রকৃতি দেবী এই মহোৎসবে যোগদান
করিবার জন্য সংসার ধরিয়া প্রস্তুত
হইতেছেন। নিদাঘের নিরন্তর বারিবর্ষণে
নন্দনদী, তটিনী তড়াগাদির প্রাণে স্নানান্তির
নিকেন্ত কত গ্রাম ভাসাইয়া, কত সমুদ্র
অটলিকাকে ভূমিদান করিয়া, খোর সঞ্চল
দিগদিগন্তবাসিগণকে ভীত জপ্ত করিয়া
চলিয়া গেল। মানব-সমাজে হাফাকার—
ক্রন্দনের রোল। কিন্তু প্রকৃতি-দেবী স্বীয়
সাজ সজ্জা লইয়াই ব্যস্ত। ইহাতে তাঁহার
কিছু মাত্র জগৎ নাই। বর্ষা আসিয়া উঠার
কত লতাগুলির খুলিখুলিত মলিন দুখ
মার্জনা করিয়া, পত্র পল্লব বিশলয় দলকে
সতেজ করিয়া এই উৎসবের উপযোগী করিয়া
দিয়াছে। “নিশির শিশির” বিস্মৃ নব দুর্ভা-
দলজ্বালা ক্ষেত্রে পতিত হইয়া অপরূপ শোভা
ধারণ করিয়াছে—যেন বহুমুখা মনি মুক্তা-
ধতিত আন্তরে উৎসব মণ্ডল শোভা
করিতেছে। স্বর্গদেব প্রথম কিরণে পাতাও
জুগুপ্ত দৃষ্টি করতেন, কখন কখন
পৃথিবীর ভাবান্তর মানমুগ্ধধর্মে লজ্জিত
হইয়া মেঘমালায় অন্তরালে মুখ লুকাইতে-

ছেন। রাত্রির শোভা অতুলনীয়। হুনৌল
আকাশে অসংখ্য স্তবকে নক্ষত্রমণ্ডল দীপ্তি
পাইতেছে যেন একখানি উজ্জ্বল মনিমালা-
ধতিত চন্দ্রাতপের হৃদয় প্রভাসমান হইতেছে।
স্বর্গাকর মেঘবিনিমুক্ত নিম্নল আকাশে উদয়
হইয়া অসংখ্য তারকাবালাগণের সহিত
কেলিতে মত্ত। কখন বা বারিদবসনে মুখ
ঢাকিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছেন।
সরসীতে কুমুদিনী অবগুষ্ঠন উন্মোচন পূর্বক
বাঘ আন্দোলিত চঞ্চল বারির সহিত তালে
তালে নৃত্য করিতেছে। ভূমিতে যুথী,
জাতি, মল্লিকা, মালতি, মেফালিকা,
রজনীগন্ধা প্রভৃতি তরুলতা ছল কুমুদমাঝে
বিভূতি। পবনদেবও আহ্লাদে উগ্ৰভ
হইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রেমভরে
লজ্জাবগুষ্ঠিত পুষ্পবধুর মুখ চুখন করিতেছেন,
কাঠকেও বা আলিঙ্গন, কাঠকেও বা
কোড়ে লইতেছেন এবং উহাদের সকলেরই
পরিমল অঙ্গে মাখিয়া চতুর্দিক গন্ধে
আমোদিত করিয়া চলিতেছেন। প্রোতপ্ৰত-
গণ হেলিয়া তুলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া ঘোড়শী
যুবতীর হাথ আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে
চলিতেছে।

প্রকৃতির এই সাজসজ্জা—এই আন্দোলনস্বর-
কিরণের জগৎ প্রকৃতির রাগী মহাশক্তি
মহামায়ার আবির্ভাবকাল উপস্থিত বলিয়া।
সমস্ত জগৎই আজ আনন্দময়—হাসিমাখা।
কেবল ভারতবাসীর মুখ আজ কেন
বিষাদ-ছায়ায় স্নান? দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি,
অভিস্রুতি, সজ্জামক-ব্যাপি, সমাধ-বিপদ, রাজ-
প্রোহিতা, রাজভয়, দরোহণ আদি ভারতকে
ব্যাধুল করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের
নিশ্চিন্ত হইয়া একটি নিমাসও ফেলিবার
অবসর নাই। ত্রিশ কোটি ভারত সন্তান

আজ অদর্শে, কৃকর্শে, রোগে, শোকে,
সর্গোপরি উদারায়ের অভাবে প্রায় সকলেই
আদৈম-মৃত্যু। কৃষাঙ্গের আর্ন্তদানে গগন
বিদ্যুৎ, পীড়িতের অন্তর স্বরে অন্তর নিরন্তর
দগ্ধ—একবার জ্বালাতাবে বহুযত্নের ফলও
বিলীণ হইয়া যায়, আবার বৃহৎ বৃষ্টির জলপ্রাবনে
আজ একমাত্র আশ্রয়স্থল পর্বকৃষ্টির ধানও
ভাসিয়া গিয়াছে।

হে ভারত! তোমার আজ এই দুর্দশা
কখন? তিরকাল তোমার এ অবস্থা ছিল
না। তোমাদের এই বহুদূর চিরকালই
‘ধন বাজ পুষ্পে ভরা’ ছিল। ভারতের
পল্লী-জীবনে স্বয়ং শাস্ত্র বহুদূর বাস্তব সর্গদার
বিরাজ করিত। ভারতবাসী তিরকাল
‘অগ্ন্যভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে
তরুণী’ ছিল না। একশত বৎসর পূর্বে
আমাদের দেশ অশেষ শিল্প পণ্যের প্রধান
উৎপত্তির স্থান ছিল। এমিয়া ও যুরোপের
প্রধান নগর নগরীর বিপণী শ্রেণী উহার
শিল্প-সম্পদের সর্গদা পরিপূর্ণ থাকিত।
এসকল ঐবাদি এদেশীয় প্রজাবর্গেই
কলিত পরিশ্রম ও অসীম অধ্যবসায় দ্বারা
প্রস্তুত করিত। এবং উহাদের বিনিময়ে
এদেশে প্রকৃত অর্থের সমাগম হইত। কিন্তু
আজ আমরা ‘সামান্য মৃত্যু’, স্বতঃ, জীড়নকে
হইতে বহুদূরাদিক উপকরণ প্রাণত জীবন-
যাত্রা ও সমাজজীবনী নিরাশ্রয়পথেই যাবতীয়
জীব্যোজ্ঞপ্ৰমুখ্যাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। এখন
ছুট ছুটা পণ্য আসে তুম্ব হতে,
দীর্ঘশাসনই কাটি, তাও আসে পোতে,

(মনোমোহন বহু)

তাতি কন্দকার, করে হাফাকার,
মৃত্যু জন্মা টেলে অর ম্লেনা ভায়,
দেখো বজ্র অস্ত্র বিস্তার নাক আর
হসো দেশের কি উদ্ভিদ, ছিল যেই পুষ্প ভূমি;
অনন্ত ঐখ্য বনি প্রাচ্যু ভাঙার;
যাহার মলয়ানিল, যাহার জাহ্নবী জলে,
বাহিত, ভাগিত, চির আনন্দ আবার,
কাঁচ তথা দুর্ভিক্ষের ধনি হাফাকার!

(নবীন সেন)

“প্রদীপটি জালিতে, খেতে, ভুতে বেঁচে,
কিছুতে লোক নয় যাবীন।” ইহার কলে
আমাদের দেশের স্বাভাবিক অর্থ নিশেষ
হইয়া বিদেশে তুলিয়া গাইতেছে। আমাদের
রুশীশিল্পীগণ দিন দিন দরিদ্র হইয়া
পড়িতেছে। এবং দরিদ্রতার চির সহচর
অশ্রম, অর্ধশ্রম, আদিবাসি আমাদেরও
এখন নিত্য সহচর হইয়া দাড়াইয়াছে।
আবার এক দিকে যেমন আমরা দিন দিন
দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি, অপর দিকে তেমনই
আমরা আত্ম-নির্ভরতা হারাইয়া এখন
পরশ হইয়া পড়িতেছি। এইরূপ নিষ্কর্ষ-
ভাব হইতে আমাদের মানসিক অস্বাধ ও
জড়তা আসিয়াছে। আমরা এখন মনে
ধারণাও করিতে পারি না যে আমরাই পূর্বে
তৎকালীন সভ্যজগতকে গাথাওয়াইয়া
পরাইয়া, লেখাপড়া শিখাইয়া “মাছকে” হইয়া
তুলিয়াছি। আমাদের যে কোন কন্ড
করিবার ক্ষমতা আছে তাহাও আমরা মনে
করিতে পারি না। এমন কি আমরা যে
মাছের তাহাও তুলিয়া গিয়াছি।

আমাদের এই আত্মশক্তি বিস্মৃতিই
আমাদের সকল দুর্দশার কারণ। আমরাও
যে মাছের এবং তদুপযোগী গুণাবিত ও কাঁচ
কারবার ক্ষমতাসালী এবং সকল মাছের
হাথ আমাদেরও স্বাধিকার আছে একথা
আমাদের মনে বহুদূর হওয়া আবশ্যক।
“তুলাপাশী হনৌচ” এবং “তোরার বসিহু”
—এই ভাব আধ্যাত্মিক জগতে আবশ্যক হইলেও
বাস্তব জগতে ইহাতে আমাদের অনিষ্ট ভিন্ন
ইষ্ট হয় নাই।

আমাদের এই আত্মশক্তির উদ্বোধন
করিতে হইলে শক্তিপূজার বিশেষ আবশ্যক।
অতএব হে ভারতবর্ষ! তদুদ্বোধন বিধান-
সাগরক্ৰিমিম হইয়া চলিবে না। বিশ্ব-
প্রাণবীজী হাশুপুত্র মহামায়ার আবির্ভাবের
সময় উপস্থিত। এস আমরা ভারতের
ত্রিশশ কোটি কণ্ঠ মিলিয়া তাহার আবাধন
করি এবং স্বর্গী কোটি হস্তে রুতাকালি চিহ্ন
তাঁহার পূজা করি।

বেদমুখে দেবী বলিয়াছেন—

“অং রাশী সপ্তমণী বন্দনাং
চিকিৎসা প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।

মহা সো অমর্যন্ত যোবিপশ্চাত্ত
যঃ প্রাপ্তিতি যঃ যঃ শূণ্যোভ্যন্ত
অমন্তব্যে মাং উপশ্চায়াত্ত
স্থিৎ কত অশ্বিনস্তে বানামি।
অং কস্তাধ দধুরাতনোমি
ব্রহ্মযিষে শরবে হস্ত বাউ।

যং যং কাময়েত ততমুং কৌণোদ্বি
তং ব্রহ্মণ্য তমমি তং হুমেবাং।”
(ঋগ্বেদ দেবী হুক্ত)

আমি সমগ্র অগস্তের রাজা। আমার
উপাসকগণই বিহুতিসম্পন্ন হই। সকল
দেবতা আমারই প্রথম পূজাদিকার। দর্শন,
শ্রবণ, অন্নগ্রহণ ও শাস প্রণামাদি প্রাণীগণের
সমস্ত চেতন ব্যাপার আমার দ্বাৰাই সম্পাদিত
হয়। যে আমাকে উপেক্ষা করে সে বিনষ্ট
হয়। যে হুপি, শ্রদ্ধাবান হইয়া শ্রবণ কর,
ব্রহ্মের হিসক অম্বরদিগের বধের নিমিত্ত
দধুরাশী কস্তের বাহুতে আমিই শক্তিরূপে
অবস্থিত। আমার রূপাতেই লোকের
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। আমার কৃপা কর্ত্তেই
পৃথক শ্রীরা, কৃষি এবং যজ্ঞবুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

দেবগণও দেবীর স্তব করিয়া বলিয়া-
ছিলেনঃ—

“যজ কিকিং, কচিহন্ত সপ্তমণীবালাদ্বিকৈ।
তয়া সর্গন্ত শক্তিঃ সা যঃ কিং তুহ্যতে ময়া।”
(১। ৭৮)

এই অশ্বিন সঙ্গারে ভাবী, ভূত ও বর্ধমান
কালে সদসং যত বজ্র আছে, ছিগ বা ধাবিবে
যে সর্গন্তের আত্মা ধরুণীকী, তৎসমুদায়ের
ভূমিই শক্তি ধরুণী। আমি তোমাকে কি
বলিয়া স্তব করিব।

নমস্তুই নমস্তুই নমস্তুই নমোনামঃ।
যা দেবী সর্গন্তুতু শক্তিরূপেণ সম্বিতা।”
(৩২)

যে দেবী সমস্ত জীবের শক্তি রূপে অবস্থিত
করিতেছেন সেই দেবীই তুমি—তোমাকে
আমরা নমস্কার করি।

“অং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্ত বাধ্যা”
তুমি বৈষ্ণবী শক্তি অনন্তবীৰ্যবতী
“স্বস্তি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিকূতে স্নাততনি”
তুমি স্থায়ী স্থিতি প্রদায়কারীণী সর্গশক্তিমান
স্নাতনতী
“সর্গধরুণে সর্গেশে সর্গশক্তি সমুদয়ে”
ভক্তোভ্যাহি নো দেবী হুর্গে দেবী নোম্যন্ততে।

যে দেবী তুমি সর্গধরুণী, সর্গেশ্বরী,
সর্গশক্তি সম্বিতা আমরা ভদ্রান্ত, আনা-
দিকের রক্ষা কর, আমরা তোমায় নমস্কার
করি।

পুরাকালে দেবতাগণ যখনই বিপদে পড়িয়া
ছিলেন তখনই বিপদভ্রমারের জন্ম পুরোক্ত
প্রকারে পূজাশক্তি মহাশয়া দুর্গাদেবীর স্তব
করিয়াছিলেন। দেবীও—সদা ভক্তগণের
প্রতি প্রসন্ন—তাঁহাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ
করিয়াছিলেন।

দেবতাগণের সর্গদাই বিপদ। দুর্দান্ত
অহরণগ কখন বা দেবরাজ ইন্দ্রকে ধর্গত্ব
করিয়া ধর্গস্থ পোশ করিতেছে, কখন বা
ব্রহ্মাকে আক্রমণ পূর্বক হত্যা করিতে উদ্যত,
কখন বা প্রাধান প্রাধান দেবতাগণকে জয়
করিয়া অহর-রাজ সীয়া ভূত শরুণে কথ
করাইয়া লইতেছেন। দেবতাগণের এইরূপ
বিপদ হইতে আপকর্তী একমাত্র মহাদেবীই।
দেবতাগণের এইরূপ বিপদের সময়ে তাঁহাদের
একান্ত প্রার্থনায় দেবীর আবির্ভাব হয়।
“দেবানাং কাব্যনিচ্ছাধ মাবির্ভবতি সা যদা”
(২। ৪৮)

দেবতাগণের কাব্য সিদ্ধির চক্ষুই তাঁহার
আবির্ভাব।

অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রও যখন লঙ্কায়
মহাপ্রাণকামশালী অশ্বরাজ দশানন প্রাণের
বিক্রমে মহাসমরে প্রাণোপেক্ষা প্রিয় অশ্বজ
লক্ষণকে শক্তিশলে ভূজিত করিয়া শোকে
মুগ্ধমান হইয়া সীতা উদ্ধারের আশায় নিরাশ
হন তখন অকালে দেবীর বোধন-করিয়া

দেবী পূজা করিয়া যে শক্তিবান্ধ করিয়াছিলেন
সেই শক্তি হলেই রাবণকে ধর করিয়া সীতার
উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহাভাঙ্গ অথবা যখন রাজ্যগণপদ্বক সীয়া
রাজ্য ভূই হইলে যখন পূর্ণ পূর্বক কঠোর
তপস্যা ধারা দেবীর গুণ। করিয়া তাঁহার
নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়া-
ছিলেন।

অতএব আমাদের চক্ষু দেখে দুর্দান্ত দুর্
করিতে হইলে শক্তিপূজা একান্ত আবশ্যিক।
উহাই এক মাত্র উপায়। এ কথা দেবী
নিজেই বলিয়াছেন—

“উপসর্গানশেষশ্চ মহাভারী সমুদ্রবান।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতঃ মাহাত্ম্যঃ স্মরণমঃ।”
(১২। ৮)

আমার মাহাত্ম্য কথা পাঠ বা শ্রবণ করিলে
মহাপারিজিত অশেষ উপসর্গ এবং
উৎপাত শাস্তি হইয়া থাকে।

এমন কি শতবর্ষব্যাপী অনার্যুট নিবন্ধন
পৃথিবী জলমগ্নতা হইলে এবং অজ্ঞত লোক
সকল অসম্মান মুগ্ধামুখে পতিত হইলে দেবী
যদ্য আবিস্কৃত হইয়া লোক সকলকে রক্ষা
করবেন এই অশ্রুপরিবার্ণ ও দেবী আমাদিগকে
দিয়াছেন—

“ভূতশতভাবিকামান্যদুঃখানুগমিণি

ততোহমমিলঃ লোকতাপঃ দেহ সমুদ্বৈঃ
তরিষ্যামি স্থাবাঃ শাকৈরাবুস্তে প্রাণধারকৈঃ”
(১১। ৩৭, ৪৮)

এই মহাশক্তির আবাহন করিতে হইলে
আমাদের সমগ্র জাতির সম্মিলিত একান্তিক
ইচ্ছা ও সমাবেশ চেষ্টার স্ফূর্ত্তক। দেবতা-
গণেরও যখন বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল
তখন তাঁহার সর্বাত্মে সকলে মিলিত হইয়া-
ছিলেন এবং তাঁহাদের সকলের সম্মিলিত
একান্তিক ইচ্ছায় তাঁহাদের আশ্বত্থর উপায়
ব্রহ্মণ এই মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল।
এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া যথাস্থি
তাঁহার কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাই
যেদ্য মুনি স্তব্র রাজাকে বলিয়াছিলেন—

“ইত্যোবাং বদিতঃ কুপ সন্ততা সা যদ্য পুরা
দেবী দেবশরীরেভো। অগস্ত্য হিতৈষিণী”
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৪। ৪০)

যে কুপতি জিগন্তের হিতৈষিণী দেবী
পূর্ণাকালে রোহণে হরণের শরীর হইতে
সমুদ্র হইয়াছিলেন তাহা তোমাকে বললাম।

দেবতাগণও তাঁহার স্তব করিবার সময়
বলিয়াছিলেনঃ—

“নিমন্ত্রে দেবগণ-শক্তি-সমুৎ-মুদ্রা”
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ৪। ৩)

মিনি সকল দেবতার শক্তি হইতে সমুৎপাদা
হইয়াছিলেন।

তাই আমরা বিদ্যেতে পাই যে যখন
মহিষাসুর কর্কট পদাভূত হইয়া দেবতাগণ
ব্রহ্মকে সমগ্র করিয়া হরিহরের সম্মিধান
গমন পূর্বক মহিষাসুরের আত্মাচারের কথা
আত্মপুণ্ডিক নিবেদন করিলেন তখন তাঁহার
শাস্তিয কোপাবিষ্ট হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব
এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের মুখমণ্ডল হইতে মহা-
তেজ নির্গত হইয়া একত্রিত হইল এবং সেই
অশ্রম তেজঃপুঞ্জ নারীরূপে পরিণত হইল।
“ততোহতি কোপপূর্ণজ চক্রুঃশো বননান্ততঃ।
নিষ্ঠকমে মংগেজো ব্রহ্মণঃ শরবন্ত চ।
অষ্টোদ্যাইবৈশব দেবানাং শাকটীনাং শরীতঃ
নির্গতঃ হুমন্তেজঃকৈতবঃ সমগচ্ছতঃ।

অতঃপশ্চাত্ত ভক্তেজঃ সর্গবেশশরীরজম্।
একস্মৎ তদুভারী ব্যাধলোকজয়ং তিরাঃ”
(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১। ১০-১৩)

এইরূপে তাঁহাদের একান্তিক ইচ্ছা-
সমুৎপাদা দেবীকে তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ
বিশিষ্ট অস্ত্র শস্ত্র ধারা মহাসুর জয়োপযোগিনী
সম্ভায় সজ্জিত করিলেন। মহাদেব তাঁহার
কিশোর হইতে অজ শূল, শ্রীকৃষ্ণ-তাঁহার চক্র
হইতে অজ এক চক্র, ইন্দ্র যট্টা ও বজ্র, যম
কালচক্র, বরুণ পাশ, ব্রহ্মা অক্ষমালী ও
কামভুল, কাম বজ্র ও বশ, বিদ্যকথা শাসিত
কুঠার, অজ্ঞান নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র এবং
অজ্ঞেয় কচ, হিমালয় বাহনের জন্ম সিংহ,
অনন্তদেব নাগধার, অজ্ঞান দেবগণের বিধ

অন্ত ও নানাপ্রকার অলঙ্কার দ্বারা দেবীকে
কুশিত করিলেন।

“অস্ত্রের পি হইবেদেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।

সম্যানিতা”

(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ২১—৩২)

আবার যখন চণ্ডীমূর্তির নিধনের পর অস্ত্র-
রাজ স্তম্ভ বাবতীয় অস্ত্রের দৈর্ঘ্য লইয়া দেবীর
সহিত যুদ্ধার্থে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল তখন
দেবতাপনও যথাসাধ্য দেবীর সাহায্যার্থে
মহাসমরে উপস্থিত হইলেন। চতুরানন,
পঞ্চানন, যজ্ঞানন, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের শরীর
হইতে তাহারিগের নিজ নিজ শক্তি সকল
নিক্ষেপ হইয়া নিজ নিজ রূপ ভূষণ ও বাহন
বিশিষ্ট হইল। এবং নিজ নিজ বিশেষ অস্ত্র শাস্ত্র
ধারণপূর্বক অস্ত্ররণের সহিত সংগ্রাম
করিতে লাগিলেন।

ক্রমেণমহাবিমানাং তথৈক্ষত চ শত্রুযঃ।

শরীরেভ্যাঃ বিনিক্ষিপ্য তজ্জপৈশ্চিৎকিঞ্চিৎ যযুঃ।

যন্ত সৈবন্ত যজ্ঞপং যথাক্রমং বাহনম্।

তত্বেবৈ হি তচ্ছক্তিরস্তরান্নাং যোদ্ধা মাযমৌ।”

(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ৮১৩-১৪)

তাই বলি এস বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন
জাতীয় ভারতবাসী—

“বশ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠা

গুজিব, পাভার, বাঙ্গপুতান,

হিন্দু, পাশি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান,

মিলাও চুংচে, সৌধো, সোমো, লক্ষ্যে

কায়মনঃ প্রাণ,”

(ঐমিতী সরলা দেবী)

“আয় সবে মিলে করি আগরণ

মিলে পূর্ণস্বরে দেশের উদ্ধার

আয় দেখি সবে করি প্রাণপণ,

দেখিবে দুর্দশা না যায় কেমন।”

(ব্রীহতু শিবনাথ শাস্ত্রী)

“এক তপ্তে কর তপ, এক মস্তে জপ

শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক

এক স্বরে গাও সবে গান

দলান্তিল সব ভুলি হিন্দু মুসলমান;

এক পথে এক সাথে চল,

উড়াইয়া একতা নিধান।”

(জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রকাসিক)

ইহাই শক্তিপূজার আবাহন মন্ত্র। এইরূপে

এক মনঃপ্রাণে মহামারা মহাশক্তিরূপকে

ভালিক তিনি আবিষ্কৃত হইবেন। কারণ

তিনি যতাবতঃ ভক্তবৎসল।

সে জননী মৃতি বিরূপ এসে সকলে মিলিয়া

খানিকদিন লোচনে তাঁহাকে দর্শন করি।

“দশরূপ দশদিকে প্রসারিত তাহাতে

নানা আয়ুধরূপে নানাপ্রকার শোভিত, পদতলে

শক্ত বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী বীর-

জ্ঞান শক্তনিপীড়নে নিযুক্ত—বিগুহা—নানা

প্রহরণ ধাবিত—শক্ত বিমর্দিত—বীরেন্দ্র

পুষ্ট বিহারিত—দক্ষিণে লক্ষ্য ভাগ্যরূপিনী,

বামে বাণী বিলা-বিজ্ঞান-বায়িনী—সম্মে বায়-

রূপী ভাগ্যক্যে, কার্যসিদ্ধরূপী গণেশ।”

এস সকলে মিলিয়া একমনঃ প্রাণে তাহার

প্রণাম করি

“নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমোনামঃ।

যা দেবী সর্বকৃতেষু শক্তিরূপে সংস্থিত।”

“সর্বকরুণে সর্বশৈশে সর্বশক্তি সমস্থিত।

ভয়েভায়াহি নো দেবি দুর্গদেবি নমস্তস্তৈ।

(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

অতএব এস বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্ন

প্রদেশের সকলে মিলিত হইয়া এক মনঃপ্রাণে

দেশের দুর্গতিনাশের জন্ত সেই মহাশক্তির

পূজা নিযুক্ত হই।

এই মহাপূজাই আমাদের দুর্গলের বল-

বিধান, নিরাশ্রয়ের সাহায্যতা, নির্দোষের তেজ

উদ্দীপনা, দুঃখীর দুঃখাপনোদন করিবার

আশ্রয়।—এই শক্তিপূজা আমাদের জাতীয়

জীবনের উৎসব—পূণ্যক্ষেত্র আর্ধ্যভূমি ভারত-

বর্ষের স্বর্গের মহামহোৎসব। ভাবী-ভারতের

একমাত্র ভরণশাল।

শ্রীদ্বারদায়ণ মুণোপাধ্যায় সি, এল।

নিগ্রোজাতির কর্ণবীর *

নলিন সেনগুপ্ত

অর্থচিত্তা ও বিনিদ্র যামিনী

টাম্বোজীবিদ্যালয়ের কাধ্য অগ্রদূত হইতে

গািল। প্রথম বৎসরের উৎসবে আমি

নিগ্রোসমাজকে আরও ভাল করিয়া চিনিবার

স্বযোগ পাইলাম। আমাদের বাড়ীতে বড়-

দৈর্ঘ্যের সময় রোজ প্রায় ১০০০০ ছেলে

মনে আসিত। তাহারা আমাদের নিকট টাকা

পয়সা বকশিশ উপহার ইত্যাদি পার্শ্বী চাহিত।

রাজি ছুটাই হইতে সকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত

বালক বালিকাদিগের ভিড় কমিত না।

আজ্ঞও দক্ষিণ অঞ্চলে বড়দিনের আগমনী

আলক্ষ্যে শিশুরা এইরূপ করিয়া থাকে।

গোলামীর ঘরে বড়দিনের উৎসবের জন্ত

নিগ্রোরা সমগ্রকাল ছুটি পাইত। সেই

সময়ে পুরুষেরা “মহ বাইয়া পুড়িয়া থাকিত।

টাম্বোজীতেও দেবিনাম, বড়দিনের একদিন

পূর্ণ হইতেই নিগ্রোরা কাজ ছাড়িয়াছে।

নববর্ষ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কাজে

আর ফিরিল না। যাহারা বৎসরে অল্প কোন

দিন মদ খাইত নু তাহারাও মদ্যের দোহাই

দিখা এ কয়দিন বেশ মাতলামী করিল।

পল্লীময় উৎসব, আনন্দ, নৃত্যগান,—

কোণায়ও সংঘম বা গুলীতা কিছুই দেখিলাম

না। কেহ কেহ বন্দুক পিস্তল লইয়া শিকারেও

বাহির হইল। হাঁহি, ভাণাবের জম্বাতিথি কি

এইরূপ উদ্‌মাতা উজ্জ্বলতা এবং নির্দয়তার

আঁচনের উপলক্ষ্যমাত্রে পরিণত হইয়াছে।

সহর ছাড়িয়া ছেলার ভিতরকার পল্লী-

গ্রামের মধ্যে “বড়দিন” দেখিতে গেলাম।

এই দূরির সমাজ যন্ত্রের শুভাগমনে কিরূপ

উৎসবের অহুতান করিয়া থাকে জানিতে ইচ্ছা

হইল। কোন কামরায় বাইয়া দেখি কতক-

গুলি ছুই পইকা ছেলেরদের মধ্যে ভাগ করিয়া

দেওয়া হইয়াছে। তাহারা সেইগুলি মাটিতে

আছড়াইয়া আওয়াজ করিতেছে। কোন

কামরায় গোটা কয়েক কলা ঝোলান আছে।

সেইগুলি আট দশ জনে মিলিয়া খাইতে

বসিবে। কাহারও ঘরে কয়েকটা আঁখ

দেখিতে পাইলাম। আর এক গৃহস্থ সন্তায়

এক বোতল মদ কিনিয়া আনিয়াছে। স্বামী

ও স্ত্রী দুই জনে এক সঙ্গে বসিয়া উহা পান

করিতেছে। অথচ সেই ব্যক্তি ঐ পল্লীর

একজন ধর্মগুরু! কোন কোন গৃহে ছেলেরা

নানারঙের ছাপান “কার্ড” লইয়া খেলা

করিতেছে। সেই কার্ডগুলি বিশেষ কিছু

মূল্যবান জিনিষ নয়। বড় বড় সহরের

ব্যবসায়ীদের নিজেদের মাল প্রচার করিবার

জন্ত ঐরূপ কার্ড ছাপাইয়া নানা স্থানে বি বি

করিয়া থাকে। কেহ বা একটা নূতন পিস্তল

কিনিয়া পাড়ার মধ্যে তাহা জাহির করাইয়া

ঝেড়াইতেছে।

ঘোড়ার উপরে, বুঝিলাম, ইহার। সকলেই

কাজ বন্ধ করিয়াছে। যাহার যেকোন প্রস্তুতি

এবং আর্থিক অবস্থা সে সেইরূপ পান-ভোজন ও আনন্দ উৎসবের উল্লেখ করিতেছে। রাজিকালে সকলে মিলিয়া একটা বাড়িতে নাচ গান করিবে। সেখানে মদ খাওয়াও বিশেষণ আয়োজন আছে।" তিনিই এই উদ্দেশ্যত্যাগের আশরে অনেক সময়ে মারপিট এবং রক্তারক্তি পর্যন্ত ব্যতিয়া থাকে।

বড়দিনের সন্ধ্যা করিতে করিতে এক যুদ্ধ স্বভাবের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল, "বুঝিলেন, ইডন-উপায়ে আমাদের জীবন লক্ষ্য করিলেই জানা যায় যে, ভগবান কাজ কর্তৃক ভালবাসেন না। এইজন্য আজকাল বড়দিনের সময় সর্বত্রই দিবসব্যাপী উৎসব। কোথাওও কাজ কর্তৃক কিছুই দেখিতে পাইবেন না। বাঁচিয়াছি, এ কয়দিন খাটিতে হইতেছে না, হাড় ছুড়াইল।" সে আরও বলিল "এক বৎসর কি পাগেই না জীবন কাটিয়াছে—ফেন না একদিনও যথার্থ বিশ্রাম পাই নাই। আজ আমরা কি পুণ্যের দিন—বিছাই কাজ করিবার ভাবনা নাই।"

নিগ্রোগোমারের ধর্মতত্ত্ব এবং লোকচরিত্র দেখিয়া তিনি আমাদের কর্তব্য হিরু করিয়া লইল। আমাদের ঘুলে ছাত্রদিগকে বড়দিনের সার্থকতা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। বড়দিনের চেষ্টায় পঞ্জীতে পঞ্জীতে যথেষ্ট স্বফল ফলিয়াছে। আজ ১৮-২০ বৎসর কঠোর ফলে দেখিতে পাইতেছি যে, নিগ্রোরা বড়দিনের উৎসবে যথেষ্ট সংখ্যক, শুল্ক, চরিত্রবত্তা এবং ধর্মভাব রক্ষা করিয়া চলে।

ট্যাক্সেজীবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আজকাল বড়দিনের সময়ে বিশেষভাবে সমাজ-সেবা লোক-হিত এবং পরোপকারের কর্মে লাগিয়া যায়, গুণগণ ও দরিদ্র লোকদিগকে স্থব্র দিতে

তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সেদিন তাহারা একজন দরিদ্র বৃদ্ধা নিগ্রোরমণীর কামরা নিজ হাতে তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে। একজন লোক শীতে জামা অভাবে কষ্ট পাইতেছিল। এখা আমি আমার ছাত্রদিগকে জানাইবারা তাহাদের নিকট দুইটা জামা পাইলাম।

"পূর্ণে একবার বলিয়াছি যে, ট্যাক্সেজীর শ্রোতাগণেরা আমাদের অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় সাহায্য করিতেন। আমাদের মুষ্টি ফিকা তাহাদের নিকটও আদায় হইত। নগদ টাকাও মাঝে মাঝে তাহারা দিতেন। তাহা ছাড়া কুমারী ডেলিভারন যখনই তাহাদের নিকট ভিক্ষার বুলি লইয়া হাজির হইতেন তখনই কিছু না কিছু পাইতেন।

আমি প্রথম হইতেই বিদ্যালয়টিকে সমগ্র পঞ্জীর জীবন-কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিতে-ছিলাম। পঞ্জীর সকল কাজ কর্তৃকই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ রাখিতাম। গ্রামের লোকেরা সহজেই বুঝিতে পারিত যে, বিদ্যালয়ের সাহায্যে তাহাদের নানা বিষয়ে উপকার হইতেছে। তাহা ছাড়া উহা সকলেরই সম্পত্তি—ট্যাক্সেজীর সাধা কাল সকলেই উহার মালিক ও কর্তা। সাধারণ জনগণের সং-প্রবৃত্তিতেই উহার ভিত্তি। কেহই যেন না বুঝিতে পারে যে, কয়েকজন বাহিরের লোক আশিয়া গ্রামের উপর একটা বোকা চাপাইয়াছে। এই ভাব মনে রাখিয়া আমি বিদ্যালয় চালাইতাম। গ্রামের লোকের উৎসাহ, কর্তব্যজ্ঞান, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ আমি সর্বদাই নানা উপায়ে জাগাইয়া রাখিতাম। জমির মূল্য দিবার জন্ম সকলের নিকটই চানার গাভা লইয়া হইতাম। ইহাতেও তাহারা বিদ্যালয়কে নিজের জিনিষ

বলিয়া আরম্ভ করিতে অভ্যস্ত হইত। জমির দাম শোধ করিবার জন্ম তাহারিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে ইহা আনিবামাজ তাহারা বিদ্যালয়ের জন্ম নৃতনভাবে আত্মীয়তার সম্বন্ধ পোষণ করিতে লাগিল। সাধা কাল চামড়ার ভেদ ভুলিয়া যাইয়া সকলেই বিদ্যালয়কে সমস্ত ট্যাক্সেজীর যৌথ প্রতিষ্ঠানরূপে ভাবিতে থাকিল।

যে ছাত্রদিগের মধ্যে আজ ট্যাক্সেজীর অনেক বন্ধু বহিয়াছেন। আমি প্রথম হইতেই ইহাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। দক্ষিণ প্রান্তের নিগ্রোগণকেও আমি এই বন্ধুত্বের সম্বন্ধে যে ছাত্রদিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতে চিত্তকাল উদ্বিগ্ন করিয়াছি।

আমরা টাকা তুলিতে লাগিলাম। মেলা, প্রদর্শনী, মুষ্টিফিকা, চার্পা ইত্যাদি নানা উপায়ে আমরা তিন মাসের মধ্যেই মার্শালের ৭৫০০ বেনো শোধ করিলাম। তার পর দুই মাসের ভিতর অবশিষ্ট ৭৫০০ জোগাড় করিয়া জমির মালিককে দিয়া ফেলিলাম। জমিটা সম্পূর্ণরূপেই আমাদের সম্পত্তি হইয়া গেল। হর্থের কথা এই সমস্ত টাকাই ট্যাক্সেজী নগরের শ্রোতা ও কৃষ্যাদ লোকদের নিকট হইতেই উঠিয়াছিল।

এখন আমরা জমিচাষিয়ার হব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। "আমাদের উদ্দেশ্য জীবিত। প্রথমতঃ, এই চাষাবাস করিলে বিদ্যালয়ের জন্ম কিছু লাভ" হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রেরা ক্ষেতে কাজ করিয়া কৃষিকর্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। তৃতীয়তঃ, আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক খাওয়ার স্বখও বেশ হইবে।

আমরা সব কাজই এক সঙ্গে আরম্ভ করিতাম না। ভাল কাজ হইলেও তাহা এখন তখন আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবর্তন

করিতে চেষ্টা হইতাম না। আমাদের যখন যেরূপ অভাব হইত তখন ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই করিতাম। আমাদের সর্বপ্রথম অভাব হইয়াছিল—বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্ম ভাল শকে শঙ্কর। উইজন্স সর্বপ্রথমেই "আমরা চায়ে লাগিয়া গেলাম।

জনশ্রম দেখিতে পাইলাম, তিন মাসের ছাত্রেরা এতই দরিদ্র যে বৎসরে আমি মাসের বেশী পয়সা খরচ করিয়া স্থলে থাকিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহাদের অগ্রাঙ্ক মাসের খরচ চালাইবার জন্ম আমাদের নৃতন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইল। এজন্য চাষের ব্যবস্থা ভাল করিয়াই করা গেল। মদে সঙ্গে স্বখেরের কার্ধ্য, কর্মচারের কার্ধ্য ইত্যাদি নানাবিধ শিল্প-কর্ম খুলিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

আমাদের ট্যাক্সেজীতে একটা কাগা খোড়া লইয়া পশু পালন আরম্ভ হয়। খোড়াটা একজন শ্রোতা আমরিগকে দান করিয়া ছিলেন। আজকাল আমাদের বিদ্যালয়ের পশুশালায় ২০০ খোড়া, খড়র, গরু, বাছুর, বলদ ইত্যাদি, ৭০০ শূকর এবং কতকগুলি মেঘ ও ভূগাল রহিয়াছে।

ছাত্রগণা বাড়িয়াই চলিল। পুরাতন বাড়ীতে আর কোন মতেই কাজ চলে না। তখন একটা নৃতন গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব করিলাম। প্রায় ২০,০০০ টাকার আর্থ-কল্প লাভ" হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রেরা ক্ষেতে কাজ করিয়া কৃষিকর্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। তৃতীয়তঃ, আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক খাওয়ার স্বখও বেশ হইবে।

আমরা সব কাজই এক সঙ্গে আরম্ভ করিতাম না। ভাল কাজ হইলেও তাহা এখন তখন আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবর্তন

এক সঙ্গে এক জায়গায় রাখিয়া আমাদের আশ্রয়স্থলগণ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্যে অতি সত্বরই কার্য আরম্ভ করা আবশ্যক। এজন্য বিলম্বের আর সময় ছিল না। কাজেই এত ব্যয়ে প্রকাণ্ড বাড়ীর ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য বর্তমানের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল।

ক্ৰমশঃ সংবার রটিয়া গেল যে, এক বৃহৎ ব্যাপার টাঙ্কেঞ্জীর কর্তার আরম্ভ করিয়াছেন। এক দিন সকালে দক্ষিণ প্রান্তের একজন যেহেন কাঠের সওগদর আসিয়া আমায় বলিলেন, "ভনিতেছি, আপনাদেব নুতন বিজালয় গৃহের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে সমস্ত কাঠ জোগাইতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণেই সূচ্য দিতে হইবে না। আপনাদের যখন সুবিধা হয় তখন বিবেচনা।" আমি বলিলাম "আমাদের হাতে কিন্তু সম্প্রতি এক কড়িও নাই।" তিনি বলিলেন "তাহা আমি জানি। তথাপি আমি আপনাদের জামতে কাঠ পৌছাইয়া দিব।" আমি বলিলাম "মহাশয়, কিছু অপেক্ষা করুন। আগে আমাদের হাতে কিছু টাকা জমা হউক। তাহার পর আপনাকে জানাইব।"

এই ঘটনায় আমি অতিশয় আশাবিহীন হইলাম। ভালিলাম—সৎকার্য্যে অর্থাভাব হয় না।

কুমারী ডেভিড্‌সন আবার নানা কৌশলে বেতাদ ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ হইতে টাকা তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। নিগ্রোরা এই গৃহের কথা শুনিয়া সর্বাঙ্গের অধিক আশান্বিত হইয়াছিল। আমরা একদিন টাকা তুলিবার জন্য একটা সভা আহ্বান করিয়াছিলাম। সভার কাহা চলিতেছে, এমন সময়ে এক প্রৌঢ় নিগ্রো পাড়াইয়া উঠিল। সে প্রায় ১২ মাইল

দূর হইতে আসিয়াছে—সঙ্গে একটা বড় শূকর বহিয়া আসিয়াছে। সে বলিতে লাগিল, "ভাই সকল! আমার টাকা পয়সা নাই। আমার সম্পত্তির মধ্যে দুইটা বড় শূকর আছে। তাহাদের একটি অর্ধ এই বিজালয়ের গৃহনির্মাণ-তহবিলে দান করিবার জন্য আনিয়াছি। আমি আপনাদিগকে কল্পকাব্যে নিবেদন করিতেছি যে, যদি স্বজাতির জন্য আপনাদের দ্বন্দ্বের বিন্যাসে ভালবাসা থাকে, অথবা আপনাদের চিত্তে যদি বিন্যাসে আত্মসম্মান ও আত্মগৌরব বোধ থাকে, তাহা হইলে আপনাদেব সকলেই একটী করিয়া শূকর এই বিজালয়ের জন্য দান করুন। আমার বিশ্বাস আপনাদেব আমার এই আহ্বান গ্রহণ করিবেন না।" আর কয়েক জন নিগ্রো এই সঙ্গে পাড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি আমার স্বজাতির সমুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে এই বিজালয়ের গৃহনির্মাণ কার্য্যে আমি দুই মাসের শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সাহায্য করিব।"

দক্ষিণ অঞ্চল হইতেই ২০,০০০ টাকা উঠা সম্ভব। কুমারী ডেভিড্‌সন উক্তর প্রস্তাবের ইচ্ছা করিলে ঢালা আদায় করিতে বাধিত হইলেন। সেখানে নানা গিঞ্জায় যাইয়া এজন্য বক্তৃতা করিতে হইল। বিভিন্ন বিজালয়-গৃহে এবং সভা সমিতির সমুখেও তিনি টাঙ্কেঞ্জীর বৃত্তান্ত জানাইলেন। বড়ই কঠিন কাহা। কেহই উহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। এদিকে লোকের উৎসাহ আকৃষ্ট করা অল্প পরিশ্রমের ব্যাপার নহে। যাহা হউক, ডেভিড্‌সন দীর্ঘের দীর্ঘে উক্তর প্রস্তাবের ভালবাসা পাইতে লাগিলেন।

ডেভিড্‌সন একদিন এক ঈমারে নিউইয়র্ক যাইতেছিলেন। সেখানে একটী ইয়াকি

রমণীর সঙ্গে তাহার আলাপ-হয়। রমণী ঈমার ত্যাগ করিবার সময়ে ডেভিড্‌সনকে ১৫০০ টাকার একটা 'চেক' লিখিয়া দিলেন। ডেভিড্‌সনকে অর্থদণ্ড-গ্রহের জন্য যারপর নাই খামতি হইয়াছিল। এজন্য তিনি এত দুর্ভাগ ও দ্রষ্ট হইয়া পড়িতেন যে অনেক সময় তাহার চলিবার ক্ষমতা থাকিত না। একদিন বোনি নগরে একটী রমণীর সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া ডেভিড্‌সন তাহার 'কার্ড' পাঠাইলেন। কার্ড পাইয়া রমণী বৈঠকখানায় আসিলেন। আশিখাই বেধেন ডেভিড্‌সন দ্রষ্ট হইয়া মুখাইয়া গড়িয়াছেন।

ডেভিড্‌সন যে সময়ে অর্থদণ্ড গ্রহ করিতেছিলেন সেই সময়ে বিজালয়ের শক্তিকর্তার কাহাও উদার ছিল। তাহা ছাড়া তিনি নিউইয়র্কের রমণী-মহলে খুরিয়া খুরিয়া শিক্ষা দিতেন, এবং যেতাদ ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের মধ্যে সভ্য বর্ধনের চেষ্টা করিতেন। অধিক একটী রবিবারের বিজালয়ের ভারও তিনি লইয়াছিলেন।

তিনি আমাদের সাহায্যকারী বন্ধুগণের সঙ্গে সঙ্গী 'চিটগঞ্জের সাহায্যে' আলাপ রাখিতেন। সময়ে সময়ে তাহারদিগকে বিজালয়ের অবস্থা জানাইতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপে টাঙ্কেঞ্জীর জন্য নানা 'হানে' প্রার্থী বন্ধুর স্তম্ভ হইয়াছিল।

গৃহনির্মাণ আরম্ভ হইয়া গেল। ঘরের নাম রাখা হইয়াছিল 'পোটার হা'। পোটার নিউইয়র্কের কল্লিন দণ্ডের একজন সদস্য হইয়াছিল। ইনি কিছু বেশী টাকা দিয়াছিলেন—এজন্য গৃহের নাম ইহার সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়াছিল। এই ঘর ২০তমার করিবার সময়ে টাকার অভাব খুব বেধে লাগিয়াছিল। একজন পাওনারদারকে কথা

দিয়াছিলেন, অমুক তারিখে তাহার প্রাপ্য ১২০০০ দিব। সেই তারিখ আসিল। সকালে একটমার টাকার হাতে নাই দেখিলাম। দশটার সময়ে ডাক পাইলাম 'সেই সঙ্গে কুমারী ডেভিড্‌সনের একখানা চিঠি ছিল। তাহার মধ্যে একটা ১২০০০ টাকার চেক! আমি অবাক হইয়া গেলাম। আরও অনেক সময়েই এইরূপ অবাক হইয়াছি। এই ১২০০০ বোণ্টনের দুই জন রমণী দান করিয়াছিলেন। এই দুই রমণী এক বৎসর পরে আরও ১৮,০০০ দান করিয়াছিলেন। বিগত ১৪ বৎসর ধরিয়া এই দুইটী রমণী ১৮,০০০ করিয়া প্রতি বৎসর দিয়া আসিতেছেন।

গৃহ নির্মাণ-করিবার পূর্বে মাটি কাটা আরম্ভ হইল। ছাত্রেরাই এই কাজ করিল। অবশ্য এখন পর্য্যন্ত তাহারা নবভাবে মনো-রূপে মজিয়া উঠে নাই। এখন তাহাদের সেই পুরাতন বাসগিরির ভাব কিছু কিছু ছিল। "আমরা লেখা পড়া শিখিতে আসিয়াছি, মাটি কাটিব বা ইট গড়িব কেন?"—অনেকেরই এই ভাব। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে শারীরিক পরিশ্রমের উপকারিতা ইহারা বুঝিতে পারিয়াছে।

মাটি কাটা হইয়া গেলে—দেওয়ালের ভিত্তি গুলি প্রস্তুত হইয়া গেল। এখন সমারোহ করিয়া প্রাকৃতিকভাবে 'ভিত্তি প্রতিষ্ঠা' উৎসবের আয়োজন করিলাম।

১৬তম বৎসর পূর্বে আমরা কেন্দ্র গোলাম ছিলাম। দক্ষিণ প্রান্তের এই অঞ্চলেই গোলামাবাদ বেশী ছিল। এই বিভাগের নামই 'কৃষ্ণ বিভাগ'। গোলামী যুগে এই বিভাগে নিগ্রোকে লেখাপড়া শিখান হইত। পাণ্ডের কার্য্য বিবেচিত হইত। যে শিক্ষক

নিম্নোক্ত শিখাইতে চাহিত সমাজে তাঁহার কৃপাতি রচিত, আইনেও সে-দণ্ডনীয় হইত। আজ ১৬ বৎসরের ভিতর-দেই গোলাম-বাদের আবহাওয়ার মধ্যে বিজ্ঞানগুণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, এবং ভিত্তি প্রতিষ্ঠার উৎসর্গ সর্বত্র আনন্দের মহা কোলাহল-সকলের চিত্তেই ক্ষুদ্রি। যেন কি এক দেবতাকে টোকেজীর বেতাদ কৃপাঙ্গ সকলেই সংসার দেখিতে লাগিল।

আলাবামা প্রদেশের শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধায়ক-উৎসবের সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। তিনিই প্রধান বক্তৃতা করিলেন। গৃহের যে কোণে ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছিল সেখানে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, বন্ধু, আত্মীয়, প্রদেশ-রাষ্ট্রের কর্মচারী, মহাজন, ব্যবসাদারসকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। পূর্বে বাহারা গোলাম-জাতির মালিক ছিলেন আজ তাঁহারা গোলাম-জাতির হাত ধরিয়া এই শিক্ষা মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিলেন। বেতাদ কৃপাঙ্গ সকলেই সেই ভিত্তি-প্রস্তরের নীচে কিছু না কিছু চিহ্ন রাখিতে উৎসুক হইল।

গৃহ-নির্মাণের কাঁধা যখন অগ্রগত হইতে ছিল সেই সময়ে বহবার আমাদের বড়ই

দুষ্টিদ্বয় দিনরাত্রি কাটাতে হইত। হাতে পয়সা থাকিত না—অথচ পণ্ডনারদিগের টাকা দিবার দিন চলিয়া আসিত। দুক্কভোগী ভিন্ন এই উদ্দেশ্য আর কে বুঝিবে? কত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই।

আমি জানিতাম যে, আমি অসাধ্যসাধনে প্রতী হইয়াছি। এখন আমাকে কেহই সাহায্য করিবে না। বরং সকলেই বাধা দিবে। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই অস্বাধ্য আমাকে একাকীই সকল কার্য্য করিতে হইবে। আমি কৌভোগ্য করিয়া, নীরবে হৃৎ সাহস, লোকজনের উপহাসে বিচলিত না হইয়া, দুঃভাবে কাজ করিতে করিতে যদি সফল হইতে পারি, তবে ভবিষ্যতে আমি সমাজের সাহায্য পাইব। সাধারণ লোকেরা আগে কোন কাজ করিতে চাহে না—তাঁহার যখন দেখে যে অস্ত্রের আরম্ভ অহুষ্ঠানটা কৃতকাৰ্য্য হইতে চলিল তখন তাঁহারা উহার প্রতি অহুস্ত হয়। হুতরাং সকল হৃৎ নৈরাশ্য ও হুচিন্তার বোঝা এক্ষণে আমারই নিম্ন সাধ্য বহন করিতে হইবে। আমার কবরের উপরই নিম্নোক্তমাজের জাতীয় বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক।

দশম অধ্যায়

অসাধ্য সাধন

প্রথম হইতেই টোকেজী-বিজ্ঞানদের ছাত্র-দিগকে আমি আমার নূতন আদর্শে তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার মতে বিজ্ঞানদের সকল প্রকার কাজই ছাত্রদের নিজ হাতে করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য।

বাতি-গৃহের ঘরখাড়া, কাপড়খোঁচ, রান্না-ইত্যাদি সকল কাজই ছাত্রদের করা উচিত। তার পর স্কুলঘরের টেবিল চেয়ার মেজে পরিষ্কার করা, এবং আদ্যাব্যপজ সাধান এ সবও ছাত্রদেরই কর্তব্য। অধিকন্তু

বিজ্ঞানদের উঠান মাঠ ও জামর শ্রীবিশাল সঞ্চয় ছাত্রদেরই দৃষ্টি ধাক্কা বাধনীয়। তাহা ছাড়া গুটাপান, কৃষিকার্য্য, চাষাবাদ, মাটি-কাটা ইত্যাদি কর্মের জ্ঞান বাহিরের মজবু লগান উচিত নয়। বিজ্ঞানদের ছাত্রদেরই এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যিক। কেবল তাহাই নহে—বাড়ীঘর মেরামত, নুতন নুতন গৃহ-নির্মাণ, প্রকৃতে কাঠ চোয়া, ইট তৈয়ারী করা, চূণ শুষ্ক প্রস্তুত করা—এই সমস্ত যারামি ও মিস্ত্রিগিরির কাজও ছেলেরাই করা প্রয়োজন।

সকল প্রকার গৃহস্থালী, কৃষি ও শিল্পকর্মে অভ্যস্ত হইতে থাকিলে ছাত্রেরা দেশ পাকা মাহু হইয়া উঠিতে পারে। নানাবিধ কারি-গিরি এবং শিল্পমহলের নূতন নূতন আবিষ্কার-গুলি তাঁহাদের 'হাতে কলমে' শিক্ষা হইয়া যায়। অধিকন্তু তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য অর্জন করে ও কর্মঠ হইতে থাকে; এবং নৈতিক চরিত্র বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। খাটিয়া গাওয়া নিম্ননীয় কাজ নয়। লেখা পড়া শিক্ষিতের 'বানু' হইয়া যাইতে হয় না। শিক্ষিত লোকদেরই পরহেতে চাহ করা উচিত এবং নিজেদের ঘর বাড়ী নিজেই প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। এক কৃষায়, সকলেরই নিজ অতাব-গুলি যথাসম্ভব নিজেই যেচন করিয়া লওয়া উচিত। খাড়া গাওয়া চলা খেঁচা ইত্যাদি কোন বিষয়েই পরের উপর নির্ভর করা শিক্ষিত ও সভ্য লোকের লক্ষণ নয়। এই সকল ধারণা আমার শিক্ষাপ্রণালী অংশের ছাত্রদের মাধ্যম সহজেই বসিতে পারে।

শারীরিক পরিশ্রম এবং স্বাবলম্বন এই দুইটি গুণই আমি প্রকৃত শিক্ষালাভের চিহ্ন মনে করি। বর্ধা শিক্ষিত ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রমকে ধননই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। 'নিজে' থাকিলে অনেক বিষয়ে ধরক কম হয়—তাঁহা, সকলেরই জানা আছে। শিক্ষিত-ব্যক্তি মাজেই তাঁহাও বুঝেন। কিন্তু একমাত্র এই জ্ঞাই তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমের আবরণ করেন না। তাঁহারা খাটিয়া গাওয়াকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও ধর্মের মধ্যে গণ্য করেন। পরিশ্রমের অজ্ঞ কৈশিক, যাক্ক বা না থাকুক, তাঁহারা 'পরিশ্রম করিতে পারিলেই স্বাধীন ও আনন্দিত হইন।' পরিশ্রম করিতে পারাটাই একটা মহাগুণ—পরিশ্রমী ব্যক্তি মাজেই গুণবান এবং সকলের প্রশংসাযোগ্য। বর্ধা শিক্ষিত ব্যক্তি এইরূপ ভাবিয়া থাকেন।

এই ধর্মভাষে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ কর, দেখিবে খাটিয়া গাওয়া কোন অপমান, কষ্ট ও লজ্জাবোধ হইতেছে না। কাম পরিশ্রম করা তখন অপর লোকের কোন উদ্বেগ সাধনের উপায়মাত্র মনে হইবে না। উহার দ্বারা নিজেই উপকার হইতেছে ভাবিতে পারিবে। উহা নিজ জীবনেরই সার্থকতা লাভের অঙ্গরূপ বিবেচিত হইবে। পরিশ্রমের ফলে তুমি প্রকৃত মাহু হইতেছ এই জ্ঞান থাকিবে। কাজেই পরিশ্রম গৌরবজনক গুণের কাজরূপেই আদর পাইতে পারিবে—কোন মতেই যুগ বা কষ্টকর বোধ হইবে না। নিজেই আত্মার বাহাতে উন্নতি হয় তাহাতে কেহ কখনও কষ্টবোধ করে কি?

আমার নূতন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালী অংশের ছাত্রেরা শারীরিক পরিশ্রমের এইরূপ মধ্যমা ও গৌরব দান করিতে নিখে। তাহা ছাড়া বিজ্ঞান চলাইবার পক্ষেও যথ সুবিধা হয়। কারণ এই উপায়ে প্রায়

সকল ধরচেই কমাইয়া ফেলান যায়। ছাত্রদের পরিশ্রমেই আড়দার খোপা নাপিত মিস্ত্রী দ্রুতর কামার কুমার চারী ইত্যাদি সকল প্রকার মজুরের কাজ চলিতে থাকে। এজন্য অর্থব্যয় প্রায় হয়ই না বলিলে চলে। সঙ্গে সঙ্গে, পুরেই বলিয়াছি, ছাত্রেরা নূতন নূতন শিল্পবিজ্ঞা শিখিতে থাকে। জল, বায়ু, বাষ্প, তড়িৎ, জীবজন্তু ইত্যাদি জগতের সকল শক্তি মাহুকে নানা উপায়ে সাহায্য করিতেছে। কৃষিকর্মে এবং শিল্পকাঠে লাগিয়া থাকিলে অতি সহজেই এ বিষয়ে ধারণা জন্মে। বস্তুজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় ছাত্রদিগকে আর নূতন করিয়া শিখাইতে হয় না। তাহারা বিশ্বশক্তিগুলি প্রতিদিনকার নানা কাজে লাগাইতে লাগাইতে উদ্ভিদবিজ্ঞান জীববিজ্ঞা, পদার্থ-তত্ত্ব ইত্যাদি আশ্রয় করিয়া ফেলে।

আমার প্রবর্তিত নূতন শিক্ষা-প্রণালীর সুবিধাগুলি বর্ণনা করিলাম। এই আদর্শে আমি টাঙ্কেজী বিদ্যালয় চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। স্বতন্ত্রাৎ যখন নবগৃহ নির্মাণের সুযোগ আসিল আমি ছাত্রদিগকেই এই বলিলেন "ছাত্রেরা এখন মিস্ত্রীর কাজ জানেই না। কঠি কঠিতেও তাহারা তত পটু নয়। ঘরামিগিরি করিবে কিরূপে? এত বড় ইমারত তৈয়ারী করা কি ইহাদের সাধ্য? পারিলেও যে, বাড়ীটা অতি দ্রিষ্টী ও কদাকার দেখাইবে! আপনান এ পুরোমর্শ ভাল হয় নাই। সহর হইতে পাকা মিস্ত্রী ডাকিয়া আনাই উচিত। ছাত্রেরা না হয়, ইহাদের কাছে সাহায্য করিবার জ্ঞান জল, হাতিয়ার চূণ হুমকি ইত্যাদি বহিয়া দিবে।"

আমি আমার বন্ধুগণকে বলিতাম, "দেখুন,

আমি বুঝিতেছি যে, আমাদের বাড়ীটা ছেলেরা প্রস্তুত করিলে নিতান্তই কদাকার দেখাইবে। কিন্তু, গৃহের সৌন্দর্য্যবিধানই কি আমাদের একমাত্র কর্তব্য? নাই বা হইল বাড়ীটা দেখিতে সুখী। কিন্তু ছেলেরা ত এতগুলি কাজ শিখিয়া ফেলিবে। তাহার। খাবলগী হইতে অত্যন্ত হইবে। আর, এত বড় ইমারতের জ্ঞান মাটি খুঁড়া হইতে অত্যন্ত করিয়া চূণকাম ও রংকরা পর্য্যন্ত সকল কাজ নিরহাতে সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে শিল্পশিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রগঠন মাথেষ্টই হইতে থাকিবে। অধিকন্তু, আত্মবিশ্বাসের পানিবাধিক ও সামাজিক জীবনের অশেষবিধ উৎকর্ষ এবং সাধারণ সভ্যতা বিদ্যেও ইহাদের ধারণা পরিষ্কার হইবে। এইগুলি কি কম লাভ? আমার বিবেচনায় এজন্য ঘরবাড়ীগুলি যদি অতি বিদ্রিষ্ট ভাবেই তৈয়ারী হয় তাহাতেও দুঃখ করা উচিত নয়।"

আমি আরও বলিতাম, "আমাদের ছেলেরা সকলেই গরিব। ইহার। পঞ্জীগ্রামে বাস করে। ইহাদের গৃহসম্পত্তির মধ্যে একটা করিয়া কঠের কামার আছে বাড়ী। তুলা, চিনি ও চাউলের আবাদে ইহাদিগকে সারা দিন ব্যতিতে বসে। বলা বাহুল্য, ইহারা যদি আমাদের বিদ্যালয়ে প্রবেশই করিত প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের মত বাড়ীতে থাকিতে পায় তাহাই হলে ইহাদের আনন্দের ও গৌরবের সীমা থাকিবে না। ইহা স্বাভাবিক, কারণ কঠের পর সকলেই প্রব আশা ও ইচ্ছা করে। কিন্তু আমরা যদি এই অবস্থায় ইহাদিগকে কিছু নূতন আদর্শ ও জীবনের নূতন লক্ষ্য না দিতে পারি তাহা হইলে আমরা ইহাদের জ্ঞান কি করিলাম? পুরেই ইহারা যে চিন্তা ও যে ধারণা লইয়া লেগা পড়া শিখিতে আসিয়াছিল গৃহে

কিরিবার সময়েও ইহাদের সেই চিন্তাও ধরিয়া থাকিরা যাইবে না কি?

এইজন্যই আমি মনে করিয়াছি যে, ইহারা ইটের ঘরে থাকিয়া স্বহস্তে গরিবার পুরে নিজ হাতে ইট তৈয়ারী করিতে শিখুক। তারপর সেই ইট বিক্রা ইহারা ই ঘর প্রস্তুত করিবে। নিজ বসাময়ের জ্ঞান নিজহাতে গৃহ-নির্মাণ করাও কি মাঘের স্বাভাবিক লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? আর ছাত্রগণ ইহাতে গৌরব এবং আনন্দও কি কম পাইবে? অধিকন্তু নিজ হাতে গড়া জিনিষ সর্বদা চোখের সমুখ থাকিলে তাহাই শিক্ষাভারের একটি প্রধান উপায় হইবে। কারা তাহা দেখিয়াই ছাত্রেরা অত্যন্তের জ্ঞানগুলি বুঝিতে পারিবে। তাহারা সেইগুলি সহজেই সম্প্রদান করিবার উপায় বুঝিয়া লইবে, এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান উন্নতি বিধানের পথও খুলিতে থাকিবে। ছাত্রেরা এইরূপে এই নিম্নের শিক্ষক হইয়া পড়িবে। এই 'আদর্শশিক্ষার' সুযোগ আর কোন উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে কি?"

টাঙ্কেজী বিদ্যালয়ের প্রথম-গৃহ ছাত্রেরাই নির্মাণ করিয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ১২ বৎসরের ভিতর বিদ্যালয়ের জ্ঞান যতগুলি গৃহ নির্মিত হইয়াছে প্রায় সকল গুলিই আমাদের ছাত্রগণের প্রস্তুত। আমি আমার শিক্ষাপ্রণালী কোন সময়ই বর্জন করি নাই। আজ আমাদের সর্বসম্মত ছোট বড় ৪০ টা গৃহ। এইগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ৪ টার জ্ঞান ছাত্রদের খাটান হয় নাই। অবশিষ্ট ৩৬ টা গৃহই ছাত্রেরা নিজহাতে তৈয়ারী করিয়াছে। বাহিরের মিস্ত্রীর সাহায্য একরূপের লওয়া হয় নাই বলা যাইতে পারে।

এই বিশ বৎসরের কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই, যে আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের জেলায়

জেলায় লোকেরা আজকাল সকলেই ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে। টাঙ্কেজী বিদ্যালয়েও জ্ঞান প্রায় ৪০ টা গৃহ নির্মাণে সাহায্য করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণ ঘরামি মিস্ত্রী দ্রুতরের কাজে ওস্তাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সম্পর্শে আসিয়া অস্বাভাবিকেরাও কিছু কিছু গৃহনির্মাণ কার্য শিখিয়া ফেলিয়াছে। আর আমাদের বিদ্যালয়ের উপকারই কি হইয়াছে কম? বৎসরের পর বৎসর ছাত্র আসে যায়—কিন্তু গৃহনির্মাণ বিজ্ঞা আমাদের কুলের হারী আব্রাহাম্যর মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পুষ্কর্তন ছাত্রদের প্রাথমিককালের হৃদয়ে নূতন নূতন ছাত্রেরা মাটি কাটা, গর্ত খুঁড়া, কাঠ চেরা, ইট গড়া, গৃহের চিত্র স্বন্দন করা, এবং আত্মমায়িক ব্যয়ের হিসাব করা, হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যাসের কল লাগান, ইলেক্ট্রিক বাতীর ব্যবস্থা করা সবই শিখিয়া লয়, এখন আমরা গৃহনির্মাণ-সংক্রান্ত কোন বিষয়েই বাহিরের লোকের সাহায্য চাই না।

কোন সময়ে একজন নূতন ছাত্র ছেলে-মাহুরী করিয়া কেওয়ালে পেপিলের লাগ দিতে থাকে, অথবা টেবিল ছুরি দিরা নাম লিখিতে থাকে, অমনিই পুরাতন ছাত্রেরা তাহাকে সাবধান করিয়া ধরায়। তাহাদের তিরস্কার আর কিছুই নয়—এইমাত্র "ওহে, ও দেওয়ালটা আমরাই প্রস্তুত করিয়াছি, এই টেবিলটাও আমাদেরই হাতে গড়া। নতুন করিলে আমাদেরই সারিতে হইবে।"

সর্বপ্রথম গৃহনির্মাণের সময়ে ইট প্রস্তুত করিতেই আমাদের বিশেষ ভূগিতে হইয়াছিল। আমাদেরই নিজের প্রয়োজন ছাড়া ইট তৈয়ারী করিবার আর একটা কারণও পাই, যে আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের জেলায়

ইট গড়িবার কোন কারখানা ছিল না। অথচ বাজারে ইটের কাটতি খণ্ডে। কাজেই ইটের ব্যবসায় বেশ লাভ করা যায়। এই লাভের আশায়ও আমি নিখোঁচালয়ে ইটের কারবার খুলিতে ইচ্ছা করিলাম।

বাইবেলে পড়িয়াছি—ইল্লবেদের শিষ্যরা বিনা বড় কুঠায় ইট তৈয়ারী করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমি দেখিলাম আমাদের কাজ তাহা অপেক্ষা কম কষ্টকর নয়। কারণ প্রথমতঃ এ বিষয়ে আমাদের কাহারই শিক্ষা মাত্র অভিজ্ঞতা নাই। দ্বিতীয়তঃ তৎকালে এই ব্যবসা চালাইবার জন্য এক পয়সাও মজুত নাই।

তার পর, ইটগড়া কাটাও নেহাত সোজা নয়। কাদামটির গুঁড়ের মধ্যে ২.৪ ঘণ্টা দাড়াইয়া কাজ করা বড়ই দুঃস্বপ্নজনক। ইট পূর্ণাঙ্গ কাদা লাগিয়া থাকে। ছাত্রদিগকে একাধে ব্রতী করিতে বড়ই বেগু পাইতে হইত। এতদিন তাহারদিগকে বুঝাইতে বুঝাইতে জমি চাষিবার কাজে লাগান যাইত। কিন্তু এখন এই কাদামটি ঘাঁটিবার কাজ আসিল তখন তাহারদিগের সাহসুতা ও ধৈর্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। লেখাপড়া শিখিতে আসিয়া শারীরিক পরিশ্রম করাই ত তাহারা আদৌ পছন্দ করিত না। তাহার উপর এইকণ জমদ ও বটকর কাজ করিতে তাহারা সম্পূর্ণ অপারদ্রব। কষ্টে দুঃখে অপমান ও লজ্জায় অনেক ছাত্র আমাদের স্থল ত্যাগিয়া গেল।

আমি পূর্ণাঙ্গ ভাবিয়াছিলাম ইট তৈয়ারী করিতে বেশী বিস্তী বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কাজে নামিয়া দেখিলাম, খুব পাকাহাত না হইলে ইট গড়া বড় কঠিন। প্রথমতঃ

কাদামটি প্রস্তুত করিতেও বিশেষ অভিজ্ঞতা চাই। আমরা একনা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় আমাদের মাটির গুঁড় সরাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শেষে একস্থানে বেশ ভাল মাটি পাওয়া গেল। সেইখানে ইট প্রস্তুত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ ইট পোড়ান কাজ খুবই কঠিন। ২৫,০০০ ইট মাটিদ্বারা প্রস্তুত করা হইল। কিন্তু এই গুলি পুড়াইতে যাইয়াই মহাবিপদ। আমরা একটা, দুইটা, তিনটা পাঁজা প্রস্তুত করিয়া তিন তিনবার অকৃতকায্য হইলাম। আমার কয়েকজন শিক্ষক ছাপ্পান্টনে ইট প্রস্তুত করিতে শিখিয়া ছিলেন। তাহারা কৃত্রিয় পাঁজাটা বিশেষ দক্ষতার সহিতই প্রস্তুত করিলেন। এক সপ্তাহ আমাদের ইটগুলি বেশ পুড়িতে লাগিল। ভাবিলাম এখানায় সফল নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু সাতদিন পর রাত্রি ১২.১৫টার সময় পাঁজাটা ভাঙিয়া গেল। আমরা কৃত্রিয়বার বিফল হইলাম।

সকলেই বলিতে লাগিলেন, “আর চেষ্টা করিয়া কাজ নাই। ইট গড়া আমাদের দ্বারা হইবে না।” তাহার উপর আমার পয়সাও ফুরাইয়া আসিয়াছে। চতুর্থবার এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা করিতে হইলেও টাকার প্রয়োজন। একে নেত্রাঙ্ক তাহাতে পারিলাম। পুনরায় চেষ্টা করা অসম্ভব মনে হইতে লাগিল। আমার একটা পুরাতন ঘড়ি ছিল। এই সময়ে সেটা একটা দোকানে বাঁধা রাখিয়া ৫০০ দার লইয়া আসিলাম। এই টাকার সাহায্যে ইটের পাঁজা তৈয়ারী করিতে যাওয়া গেল। এইবার কৃতকায্য হইলাম। একদিন পর ২৫০০০ ইট আমাদের কারখানায় তৈয়ারী হইল।

আজ ইটের কারবার টাংকো বিজ্ঞানে

খুব জোরের সহিতই চলিতেছে। গত বৎসর আমাদের ছাত্রেরা ১,২০০,০০০ ইট গড়িয়া ছিল। অঞ্চল এত বৃদ্ধির ও নিরুপে যে আমি যে কোন বাজারে ফেলিয়া দক্ষা দিয়া লাভ করা যাইতে পারে। তাহা ভাবিয়া বিগত বিশ বৎসরের শিক্ষার ফলে, আজ আমারকার দক্ষিণ অঞ্চলে গড়ায় গড়ায় নিগ্রোয়রক ইটের ব্যবসায় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছে।

ইটের কারবার করিতে করিতে আমার একটা নতুন দিকে দৃষ্টি পড়িল। আমাদের বিজ্ঞানে বহু শেতাঙ্ক ব্যক্তি ইট ব্রিড করিতে আসিত। তাহারা পূর্ণাঙ্গ আমাদের সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্তা বলিত না। কিন্তু অল্প ইট পাওয়া যায় না। কাজেই ইলরা কৃষাঙ্গের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল।

আর পূর্ণাঙ্গ অনেক শেতাঙ্কই ভাবিত যে, লেখা পড়া শিখিয়া নিগ্রোরা বাবু হইয়া পড়িবে। তাহারও এখন বৃদ্ধি। নিগ্রোরা এই জাতীয় বিজ্ঞান ব্যক্তি সত্য সত্যই নিজেদের উন্নত করিতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সহরের উপকার হইতেছে। এই উপায়ে কৃষাঙ্গ সমস্ত শেতাঙ্কের দাবী বদলাইতে লাগিল।

ফলতঃ আমাদের দুই সমাজে কন্ডবিনিময় ও ভাববিনিময়ের ইয়োগ্য হইল। আজ দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রোও খেতাবে যে সমস্ত ব্রহ্মাচারে তাহার অস্তিত্ব কারণ আমাদের টাংকোয় এই ইটগড়া এবং ইটের কারবার। বহু বক্তৃতা দ্বারা যে কায্য করিতে পারিলাম কি না সন্দেহ, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাহা নীরবে ও মইজে সিদ্ধ হইয়া গেল।

শেতাঙ্ক যে কৃষাঙ্গকে বাদ দিয়া সংসারে চমিত পারিবে না—এই ব্যবসায় হইতে

তাহারা বেশ সুখীয়া লইল। কাজেই আজ দুই সমাজই এক বৃক্ষের ফলের দ্বায় পরস্পর-মুগ্ধ। পরস্পর পরস্পরের কথন ভাবিয়া থাকিতে পারে না। শেতাঙ্কের কাখে কৃষাঙ্গের ঊপকার হই, এবং কৃষাঙ্গের বিজ্ঞান শেতাঙ্কের অভাব মোচন হয়। শেতাঙ্ক ও কৃষাঙ্গ আজ আমেরিকা-জননির যমজ সন্তানের দ্বারা চলাফেরা করিয়া থাকে। শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার মূল্য কি কম?

আমি আমার স্বজাতিগণকে সর্দাদ বলিয়া থাকি, “দেখ, গলাবাকী করিয়া কখনও একটা বড় কিছু করা যায় না। তোমরা ভাবিয়াছ যে—চৌচৌচৌ করিলেই তোমাদিগকে শেতাঙ্কেরা ভাই বলিয়া ডাকিবে, এবং তাহা-দিগের সমান ক্ষমতা তোমাদিগকে দিতে থাকিবে? ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। কাজ করিতে লাগিয়া যাও। কৃষিক্ষেত্রে লাগিয়া যাও, শিক্ষাক্ষেত্রে লাগিয়া যাও, ব্যবসায় বাণিজ্যে লাগিয়া যাও। বাড়ী, গাড়ী, স্কুল, জাহাজ, জীমার তৈয়ার করিতে থাক। এ সকল বিষয়ে তোমাদের ‘হাত’ দেখাও। তাহারদিগকে তোমাদের বিদ্যা বৃদ্ধির দৌড় দেখাও। তাহারা যত্নে যে তোমরাও মায়া, তোমরাও মাথা পাটাইয়া একটা জিনিষ পাড় করাতে পার। তাহা হইলেই তাহারা তোমাদিগকে সমান করিবে—তোমাদের সঙ্গে বসিতে, চাটাবে—তোমাদের সঙ্গে খাইতে, খাটাবে। দেখিতে পাও না—যে যে অঞ্চলে নিগ্রো শিল্পী ও ব্যবসায়ী বেশ দক্ষতার সহিত কারবার চালাইতেছে সেই সব স্থানে যেখানে কৃষাঙ্গের বিরোধ বড় বেশী নাই—এ সেখানে কাচামাড়া শালা চামড়ার প্রভেদ অল্প মাত্রই দেখা যায়।”

আমি বিশ্বাস করি, শুণ ঘাহার মধ্যেই থাকুক না কেন, সমুদ্র জগৎই তাহাকে সমান করিতে বাধ্য। ছদ্মনি আঙ্গ কিবা ছদ্মনি পরে—এই বা। শুণ, যোগ্যতা, প্রতিভা, চরিত্রবত্তা এ সকল জিনিষ চাপিয়া রাখা যায় না। কেহ এ শুলিকে কোনদিন ঢাকিয়া রাখিয়া দাবিয়া ফেলিতে পারিবে না। আর একটা কথাও আমি সন্দেহা মনে রাখি এবং সকলকে বলিয়া থাকি,—“কথা অপেক্ষা কাজের মূল্য শতগুণ বেশী। একশত জন লোক ঐক্য-বিধান, হুবিচার, অধিকার-বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া সমাজের যে উপকার করিতে না পারে, একজন লোক একটা স্বন্দর শিল্প সৃষ্টি করিয়া সেই উপকার করিতে পারে। যখনই শেখাশেরা রাগায় হাঁটিতে হাঁটিতে নিগ্ৰো-নিষিদ্ধ একবান স্বন্দর গৃহ দেখিবে তখনই তাহারা নিগ্ৰোর ক্ষমতা-বিশ্বাস করিবে। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার পরক্ষণ হইতেই স্বফল শেখাশের বন্ধু ও পুঞ্জার পাঁজ হইয়া পড়িবে। কেবল গৃহনির্মাণে কৃতিত্ব কেন, সকল বিষয়েই কৃতিত্ব দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রভা ও ভক্তি আকৃষ্ট না করিয়া যায় না। তখন তাহারা কে গান করিতেছে, কে চিহ্ন আঁকিতেছে, বা কে মুষ্টি গড়িতেছে, বা কে বাগান তৈয়ারী করিতেছে—এ সকল কথা কুন্দিয়া গিয়া কৃতিত্বের দাগ হইয়া পড়ে। গুণপনার ক্ষমতা অসীম। হুভাণ শেখাশ-বিগকে সন্দেহ কর্ষক্ষেত্র এখন আমাদের গুণপনা দেখান আবশ্যক। গুণমুগ্ধ হইলে শীঘ্রই তাহারা আমাদিগকে আদর করিতে বাধ্য হইবে। আমাদের কাল চামড়ার লজ্জ বেশী বাধা পাইব না।”

ছাত্রেরাই টায়েজীর গৃহগুলি নির্মাণ

করিয়াছে। ঠিক সেই আদর্শের বশবর্তী হইয়াই আমি তাহারিগের দ্বারা আমাদের বিদ্যালয়ের লজ্জা গাড়ী জুড়ি ইত্যাদি তৈয়ারী করাইয়াছি। আজ কাল আমাদের এইরূপ গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ১২টা। সকলি গুলিই ছাত্রদের নিজ হাতে প্রস্তুত। তাহা ছাড়া আরও অনেক গাড়ী তৈয়ারী করিয়া আমরা বাজারে বেচিয়াছি। আমাদের গাড়ীর কাগজের সাহায্যেও খেতাব কৃষ্ণাঙ্গে সন্মান অনেক বাড়িয়াছে। আমাদের শিক্ষিত ছাত্রেরা যে অঞ্চলে গাড়ীর কারবার করে তাহারা সেই অঞ্চলের খেতাবমহলে বিশেষ প্রতিপত্তিই অর্জন করিয়াছে দেখিতে পাই।

যসারে লোকের বাস অভাব তাহা তুমি দেখিতে পার। যখনই গা, তুমার প্রকৃত্ব দেখানে হুনিষ্ঠিত জানিয়া রাখিও। লোকে চায় শাক শজী, ইট কাঠ, লোকে চায় স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতি, লোকে চায় বাড়ী ঘর আসবাব গাড়ী ইত্যাদি। তোমরা যদি দেখানে তোমাদের গ্রীকজাভার ব্যাকরণ লইয়া হাজির হও তাহা হইলে তোমাদিগকে তাহারা সমান করিবে কেন? বাজারে কাটুতি বৃষ্টিয়া মাল জোগান দিতে থাক, দেখিবে যসার তোমার গোলাম।

আমার নূতন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালী ও প্রবর্তিত হইল। ঘনী নির্জন বিচার না করিয়া সকল ছাত্রকেই শারীরিক পরিমার্শ করিতে বাধ্য করিলাম। সকলকেই শিল্পে রূপিকর্মে, গৃহস্থালীতে লাগাইয়া দিলাম। আমার নিয়মগুলি টায়েজীর রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই ভাবিতে লাগিল আমি একজন কিস্তুত কিমাকার লোক। বা যুদী তাই করি। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই। ছেলগুলির মাথা ঝাউতে বসিয়াছি।

ছাত্রদের অভিজাবকেরা পত্র দিলেন— তাহাদের সন্তানদিগকে যেন হাতে পায়ে খাটিতে না বলা হয়। এইরূপ অসংখ্য আপত্তি আসিল। অনেকের বাপ মা বলে স্বয়ংই আসিয়া হাজির। তাহারা চাহেন পুত্রক-শিক্ষা! যত পুত্রকের সংখ্যা ততই তাহাদের ধারণাশ পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি।

দেখিতে দেখিতে আমার বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, আমার শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে এবং আমার নিজের বিরুদ্ধে বেশ একটা বিশ্রোহ বাধিয়া উঠিল। গাড়ীর লোকেরা, সহরের লোকেরা, জেলার লোকেরা, ছাত্রদের অভিজাবকেরা এবং ছাত্রেরা একাকী বা দলবদ্ধভাবে আমার নিম্না ও অপমান করিতে লাগিল। তাহারা আমার ঐক্লম নূতন নিয়মে শিক্ষাপ্রচার চাহে না। আমি কিন্তু অটল অচল ও গুস্তীরভাবে রহিলাম। আমার মত পরিবর্তন করিলাম না। অনেক ছাত্র নাম কাটাইয়া চলিয়া গেল। অনেকে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, আমোদোলন সৃষ্টি করিল। তথাপি আমি নাড়ুলাম না—আমার মত দীরভাবে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। আমি নানাস্থানে যাইয়া অভিজাবকগণকে উৎকর্ষা পরামর্শ করিলাম। জন্মশ্রী লোক-জনেরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। দুই বৎসরের মধ্যে আমার ছাত্রসংখ্যা ১০০ হইল। দেখা গেল আলবামা প্রদেশের সকল জেলা হইতেই টায়েজীতে ছাত্র আসিয়াছে। অগ্রজ প্রদেশ হইতেও দুই চারিজন আসিয়াছে। মোটের উপর টায়েজী বিরোধ কাটাইয়া উঠিয়া উন্নতির পথে পাড়াইল। আমার একটা অগ্রিপরীকা হইয়া গেল। আমার শিল্পশিক্ষা-নীতির জয় হইল।

“পোটার হল” নির্মিত হইয়া গেল।

সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়ের উপযোগী হইবার কিছু ব্যক্তি থাকিল। তথাপি আমরা শীঘ্র শীঘ্র গৃহপুঞ্জের উৎসব সম্পন্ন করিয়া ইললাম। উত্তর অঞ্চলের একজন খেতাব ধর্মগুরুকে এই উপলক্ষে সভাপতির আসনে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তাহার নাম রেভারেন্ড রবার্ট স্বেভকোর্ড। তিনি আমার নাম পূর্বে কখনও শুনে নাই। যাহা হউক তিনি একজন অশ্রিয সন্তান ব্যক্তি—আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিগ্ৰো-জাতিতে উৎসাহিত করিলেন। তাহার পর হইতে তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের অগ্রজ ট্রাষ্টা বা অভিজাবক ও রক্ষকরূপে কাঁচা করছিলেন।

ইহারই কিছুকাল পরে টায়েজী বিদ্যালয়ে একজন কর্মী পুঞ্জ হাঙ্গটন হইতে আসিলেন। তখন হইতে বিগত ১৭ বৎসর কাল তিনি আমাদের হিয়াব রক্ষকের কাঁচা করিতেছেন। ইহার নাম গুয়ারেণ লোগান। এই অধ্যাবসায় ও বিচক্ষণ যুবকের সাহায্যে আমাদের আর্থিক অবস্থা যৎপরোনাস্তি উন্নত হইয়াছে।

আমরা “পোটার হল” কাজ কর্ষ আরম্ভ করিয়া দিলাম। এইবার আমরা ছাত্রাবাস সম্বন্ধে পরিষেব উদ্যোগী হইলাম। দেড় বৎসর হইল টায়েজীর কাঁচা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে বহুদূর দেশ হইতেই ছাত্র আসিতে “আরম্ভ করিয়াছে। ছাত্রসংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। হুত্তরা ইহাদিগের গতিবিধি অভাব চরিত্র বৃষ্টিবার লজ্জ বড় রকমের ছাত্রাবাসের আয়োজন করা আবশ্যক। এই বৃষ্টিয়াই আমরা এত বহু গৃহনির্মাণে উৎসাহী হইয়াছিলাম। এতদিনে তাহার ব্রহ্মোণ সত্যসত্যই আসিল।

পোটার হল তৈয়ারী করিবার সময়ে তাহাতে রান্নাঘর এবং ভোজন শালার কামারা রাখা হয় নাই। কাজেই নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইল। আবার ছাত্রদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করা গেল। স্থির করিলাম যে, গৃহের নীচে একটা স্তম্ভ করিতে হইবে। মেঝে কাটিয়া মাটি তোলাই হইল। একটা বড় গন্ধের মত জায়গা প্রস্তুত করিলাম। সেই স্থানেই রন্ধন ও ভোজনের ব্যবস্থা হইবে।

এখন ছাত্রাবাস চালান যায় কি করিয়া? কাণ্ড আরম্ভ করিতে পদসার প্রয়োজন। খালা বাটি টেবিল চেয়ার ইত্যাদি না হইলে ছাত্রদিগকে শুল্মা ও ভোজনের রীতি শিখাইব কি করিয়া? বাজারে খার পাওয়া সহজ নয়। রৌতও নাই যে ভাল রান্না করা যাইবে। অগত্যা বাহিরেই কাঠ আনিয়া সেকলে নিয়মে রান্না করান যাইতে লাগিল। বাড়ী তৈয়ারী করিবার সময়ে যে সকল বেঞ্চের উপর রাখিয়া কাঠ পাশিষ করা হইত সেই বেঞ্চগুলিকে থানা খাইবার টেবিল করা গেল। আর খালা বাটি বেশী সংগ্রহ করিয়া উঠা গেল না।

গৃহস্থালী চালাইতে কেহই জানে না বুদ্ধিমান। নিয়মিত সময়ে খাইতে হয় তাহারি ছাত্রদের জানা নাই। তারপর সন্ধ্যার সময় দেখিয়া শুনিয়া সকল ছাত্রের স্বপ্ন হইয়া বুদ্ধি কাজ করা সেত আরও কঠিন। প্রথম দুই তিন সপ্তাহ সকল বিষয়েই হট্টগোল চলিল— কেহ খাইতে পাইল, কেহ পাইল না। কেহ এক তরকারী কম, কেহ বা বেশী পাইল। কোন পাচো ছন্ন হইল, কোন বাধা বেশী পড়িয়া গিয়াছে। বিশুল্মার চূড়ান্ত

আমি এই সব দেখিতাম তথাপি উন্নতির

জগৎ জেষ্টিত হইতাম না। ভাবিতাম দেখা দাউক, আপনা আপনি শুল্মা পড়িয়া উঠে কিনা। এক দিন সকাল বোলাও গাওয়া চলিতেছে। আমি খবর কোণে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি শুনিতে লাগলাম। ছাত্রছাত্রীরা মহা হাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছে। 'সকলের মধ্যেই বিরক্তির ভাব। কারণ সে বেলা' কাহারই কপালে খাওয়া জুটিল না সমস্ত রান্নাটাই পুড়িয়া অথবা হইয়া গিয়াছে। একজন ছাত্রী বসিতে বসিতে কুপের নিকট গেল। ভাবিয়াছিল কুপ হইতে জল তুলিয়া খাইবে এবং জল পান করিয়াই সকাল বেলায় ভোজন শেষ করিবে। খাইয়াই দেখে কুপের দড়ি ছেঁড়া। তাহার জল পান করা হইল না। মহা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল "আঃ, এই গুলে একটুকু জল থাইতেও পাই না।" আমি নিকটেই ছিলাম সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একসময়ে আমাদের নূতন বন্ধ বেঙ্কেয়ার্ড টাঙ্কেজী বিশ্বালায়ের অতিথি হইয়াছিলেন। ভোর রাতে তিনি শুনিতে পাইলেন তাহার নীচের ঘরে মহা গোলযোগ হইতেছে। ব্যাপার কি? ছাত্রদের প্রার্থনার চলিতেছে। দুই-জনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়াছে পেয়ালায় কাফি থাওয়া আজ কাঁচ পালা? আগেই বলিয়াছি আমাদের তখনও বাসন কোসন খালা বাটি বেশী জুটে নাই। কাফি পান করিবার জন্ত পেয়ালা সকলেই রোজ পাইত না। দিন চারদিন পর এক এক জনের ভাণ্ডো পেয়ালা পড়িত।

ছাত্রাবাসের এই দুর্দশা অবশ্য বেশী দিন ছিল না। ক্রমশঃ আমাদের শুল্মা আসিল। এই সকল অসুবিধা, বিরক্তি, এবং দুঃস্বপ্ন ভোগের পর আমরা এখন অনেকটা স্বপ্নের মূখ্য চোপেতে পাইয়াছি। পূর্বে হইতে এইরূপ

কষ্টের মধ্যে না পড়িয়া উঠিলে আজ কি এত নিশ্চল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম? 'আম' সেই পুরাতন ছাত্রেরা টাঙ্কেজীকে আসিয়া কি দেখে? অনেকগুলি বড় বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ। চক্কে টেবিল চেয়ার আসবাব পত্র। পরিশাটী গৃহস্থালী বস্তু ও ভোজনের ব্যবস্থা। খাশাসময়ে ভোজনের শয়ন। এই সব দেখিয়া অনেকেই আমাকে

বলিয়াছে— "আমরা" পূর্বে এই বিশ্বালায়ে দুঃখে কাটািয়াছি। তাহারই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে দেখিতেছি এই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান পড়িয়া উঠিয়াছে। আজ বুঝিতেছি, অগ্র-গ্রামীদিগের দুঃখ স্বীকারেই ভবিষ্যৎ সমাজের স্বপ্নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই টাঙ্কেজীর নিকট আমাদের শেষ শিক্ষা।" (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার ও

তাহার ক্রমোন্নতি *

(Cajory's History of Physics অবলম্বনে লিখিত)

জগতের ক্রমবিকাশের সহিত বিজ্ঞান একদিন কতিপয় মানবের বেহেজোড় লালিত পালিত হইয়া বর্তমানে গৌরবের মধ্যাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মাহাকে যেমন বালাবস্থা হইতে বহুতর জ্ঞান দৈর্ঘ্য নৈরাশের মধ্য দিয়া, প্রতিদিন নৈসর্গিক প্রতিকূলতার সহিত বৃদ্ধ করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব অমূল্য রাখিতে হয় এবং মনুষ্যজাতি করিতে হয় সেইরূপ বিজ্ঞান একদিন মূল্যময় কতিপয় লোকের দ্বারা সম্ভবপালিত এবং রক্ষিত হইয়া ও বৃদ্ধি পাইয়া বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত শতাব্দীর প্রথম ভাগে জগতে তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে।* একদিন মানব-সমাজে যাহা অবহেলার ঘোষণা বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ তাহার সন্মুখ গৌরবের শুভালোক মানবমণ্ডলীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মানবের বহু সাধনার মধ্য দিয়া ক্রমে প্রথম ভাগে জগতে তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে।*

পৌছিয়াছে— সংক্ষেপে তাহারই ইতিহাস প্রদান করিতেছি।

বহু পুরাতনকালে অথবা মধ্যযুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের অস্তিত্ব আমরা কোন ইতিহাসে দেখিতে পাই না। বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও এবং গিলবার্টের পূর্বে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণা কাহারও নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। সকলেরই বিশ্বাস ছিল পৃথিবীভাবে চিন্তা করিলেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক গিলবার্ট যে সময়ে Loadstone হইতে নীরেট লুগোয় চুম্বক প্রস্তুত করিয়া দেখাইলেন যে ঐ ক্ষুদ্র নীরেট পদার্থটা যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি পৃথিবীও তাহার চুম্বক শক্তির সাহায্যে অজ্ঞাত চুম্বককে আকর্ষণ করে, তাহার পরবর্তীকাল হইতেই পৃথিবীতে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানভ করিতে আরম্ভ করে। যখন গ্যালিলিও

ইটালির পিসানামক নগরের ত্তরের উপর হইতে একটী ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পদার্থ ভূমির দিকে নিক্ষেপ করিয়া দেখাইলেন যে ইহারা একই সময়ে ভূমিস্পন্দ করে, তাহার পর হইতেই তৎকালীন Aristotolian মতবাদ পরিত্যক্ত হইল এবং “বিজ্ঞান গবেষণার জয় জগতে সূচিত হইল।

অনেকেই হয়ত ভ্রমিয়া বিশ্বিত হইবেন যে অনেক বিখ্যাত দৃশ্যী মহাত্মা তৎকালে মনে করিতেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জীবনের বিশেষ অনিষ্টকর। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে কোন একজন লেখক Royal Society এর ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষপাতী হইয়া লিখিয়াছিলেন—“বৈজ্ঞানিক গবেষণা শিক্ষার অন্তরাই এবং শিক্ষাপরিষদের পক্ষে মারাত্মক হইবে না।” এইরূপ লিখিবার কারণ এই যে তৎকালে ধর্মযাজকগণ বলিতেন ‘সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রবার্ট বয়েলের (Robert Boyle) গবেষণা ধর্মের অনিষ্ট-লাদন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্তঃসার শূন্য করিতেছিল।

বিজ্ঞানতত্ত্বাচক্ষুস্বয়ং ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের আলোচনাও প্রতীতি হইতে লাগিল। তখনকার দিনে প্রত্যেকের পুণ্ড্র গবেষণাগার ছিল। কোন কলেজে বা শিক্ষাপরিষদে বিজ্ঞান-গবেষণার কোন বন্দোবস্ত ছিল না।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হইবার বহু পূর্বেই রসায়ন এবং জ্যোতি-বিজ্ঞান জন্ত গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি জাৰ্মানিতে “Laboratorium” শব্দ অব্যাপি “Chemical Laboratory” বা ‘রসায়নের পরীক্ষাগার’ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। মধ্যযুগ পৃথক ইউরোপে যত পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বিবরণ প্রাপ্ত হই তাহার প্রায় সমস্তই Alchemy এবং জ্যোতিবিদ্যা অধ্যয়নের জন্তই নিয়োজিত হইত। তখনকার দিনে যাহারা রসায়নচর্চা করিতেন, তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—তাঁহারা এমন একটা ‘মহৌষধি’ আবিষ্কার করিতেন যেন তাহা দ্বারা দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় এবং ধাতুসমূহকে স্বর্বে পরিণত করা যায়। ফরাসিপেশের রাজধানী প্যারিস নগরের Louvre গেলারিতে Flemish দেশীয় চিত্রকর Teneers কর্তৃক অঙ্কিত একখানি চিত্র আছে। উক্ত চিত্রখানিতে চিত্রকর এক প্রশস্ত গৃহের মধ্যে Forge Furnace, crucible এবং Retort অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। সেই স্রুংহং-গৃহ-প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থিত একখানি টেবিলের চতুর্দিকে রসায়নের উৎসাহদাতাগণ আসীন রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রসায়ন চর্চার যত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অসিদ্ধাংশ-গুলি হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, পরীক্ষা-নিম্ন গবেষণা বৈজ্ঞানিকগণ নিজ গৃহেই সম্পন্ন করিতেন। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে Berzelius এর মত বিখ্যাত রসায়ন শাস্ত্রবিদ তাহার রচনায় গৃহেই বিজ্ঞান চর্চার স্থানরূপে বিবরণ করিতেন। ধ্বন Gilbert এবং Galileo এর চেষ্টায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ হইল, তখন তাহার পরীক্ষা-গার রক্ষনশাল্যতাই আরম্ভ হইয়াছিল। যখন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Robert Boyle তাহার “Boyle’s law” নামক গ্যাসের স্থিতিস্থাপন-কারণ তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি একরূপ একটা স্থায়ী কাচের নল ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, তিনি গৃহে শানভাব প্রযুক্ত

উহাকে যথেষ্টভাবে নাক্ষিত্যে পারিতেন না। নিউটন তাঁহার স্থায়ীলোক বিশ্লেষণের সমস্ত গবেষণাই কেন্দ্রবিন্দুরে বস্তুগত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। Benjamin Franklin বৃদ্ধির সাহায্যে বিদ্যুতের গবেষণা শেষ করিয়া Philadelphia নগরে বস্তুগত বিদ্যুৎ অপরি-চালক এবংও লৌহ রাখিয়া দিয়াছিলেন, যেন তিনি ইচ্ছামত সকল সময়ে বায়ুমণ্ডল তড়িত ভারাক্রান্ত হইলেই গবেষণাযাগ্যের নিয়োজিত হইতে পারেন।

আমি যে সময়ের বিবরণ প্রদান করিয়াছি সেই সময়ে বিজ্ঞান-পরীক্ষাগার কেবল গবেষণার জন্তই ব্যবহৃত হইত। প্রাথমিক বা উচ্চশিক্ষায় তাহার কোন উৎসাহিতা কেহই উপলব্ধি করিতেন না। এছাড়া তৎকালীন শিক্ষাসংস্কারক Johan Amos Comenius বলিয়াছিলেন “মাতৃশিক্ষা যতদূর সম্ভব পুণ্ড্র ভিন্ন বুদ্ধলতা ভূমি আকাশ হইতে দেখা উচিত। মাতৃশিক্ষা কেবল অন্তরে লক্ষ্য উদ্দেশ্যভার বিহয় জানিয়াই সম্বৃত হইতে তাহা মহে তাহাকে মৌলিক গবেষণাও করিতে হইবে।”

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অল্পজন বাউশের আবিষ্কারক Joseph Priestly বলিয়াছেন “আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতছে যে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান বিজ্ঞিও এদেশে শিক্ষার বিষয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। আমরা যদি বিজ্ঞানমুগ্ধন করিয়া জানলাভ করিতে প্রাণী হই, তবে আমাদেরকে বাল্যকাল হইতেই যত্নসাহায্যে বিজ্ঞান-চর্চা করিতে হইবে। এদেশের লেখকদিগকে শিক্ষার জন্ত হইবেই গবেষণার নিম্ন-প্রণালী জানিতে হইবে এবং উক্ত কার্যে অভ্যস্ত হইতে হইবে।”

আমি পূর্বেই বলিয়াছি প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক গবেষণা রাসায়নিক গবেষণার অনেক পূর্ববর্তী কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একটী চিন্তা করিলেই ইহার ‘স্বার্থ’ কারণ আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিলে। রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ অর্থো-পার্জনই পক্ষে একটা গুণমণ্ড। বিশেষতঃ মৌলিক ধাতুগুলিকে রিফ্রিজ পদার্থ হইতে নিম্নত করিতে হইলে রসায়ন-বিজ্ঞানের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। অল্প একটী কারণ এই যে—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগার স্থাপন করিতে বিপুল অর্থব্যয় ঘটিয়া থাকে।

তখনকার দিনে বিজ্ঞানের উপযোগীতা দেশের সমাজ এবং ঐশ্বর্যাশালী ব্যক্তিগণ অনেক স্বীকার করিতেন না। বিশেষতঃ উচ্চবিজ্ঞান, বাউশের উপযোগীতা এবং চূড়ান্ত বহুবিধ ব্যাপার তখনও নিত্যকাল বাল্যবাহ্য থাকিয়া তদ্ব্যবস্থাসমূহদিয়েই কেবলমাত্র কেঁতুল উৎপাদন করিত। রসায়নগারে সাধারণতঃ বৃত্তাকার, Bottle এবং Test-tube থাকিলে একপ্রকার কাজ চলিতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের জন্ত যত কষ্ট করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তিনশতবর্ষ পূর্বে বায়ুনির্দারণ যন্ত্র, তপমান যন্ত্র এবং ত্বরীকৃত ক্রম করিতে বহু অর্থব্যয় ঘটিত। বিজ্ঞানগার স্থাপন করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দেওয়া প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়েই আরম্ভ হয়; তৎপরে তাহা প্রাথমিক বিদ্যালয়াদিতে প্রচার লাভ করিয়াছে। জগদ্ধিতাত বৈজ্ঞানিক রত্ন কেবলি বলেন যে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্বে সর্ব-প্রথমে Glasgow বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে

যন্ত্র-সাহায্যে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার বন্দেবস্ত হয়। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানীগণ গুলির মধ্যে Liebig এর স্থাপিত বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারই ইহার জন্মদাতা হইতে আর পৃথক অস্তিত্বকরী করিতেছে। ১৮২৪ খৃঃ Liebig G'ssen বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষা দিবার জ্ঞান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহা নিশ্চিত যে স্টল্যাও অপেক্ষা একমাত্র জাৰ্মানীতে রাসায়ন শিক্ষার প্রথম আন্দোলন তীব্রতর বেগে সংঘটিত হইয়াছিল। জগতে প্রায় সমস্ত দেশ হইতে Gissen নগরের ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানলাভের অভিপ্রায়ে ছাত্র-গণ আসিয়া সমবেত হইত। এই সমস্ত দুষ্টাঙ্গ অহসরণ করিয়াই Tubiguen, Bonu, Berlin এবং অত্যন্ত স্থানে বিজ্ঞান-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিল।

আমেরিকায় সর্বপ্রথম নিউইয়র্ক নগরে Reussachusetts Polytechnic Institute বেঠান Massachussets Institute of Technology প্রভৃতি বিজ্ঞানাগার রসায়ন শিক্ষা দিবার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র-দিগকে রীতিমত গবেষণাকার্যে নিযুক্ত হইতে হইত।

এই পৃথক দেওয়া আসিলাম—বৈজ্ঞানিক গবেষণা সর্বপ্রথম লোকালয়ে জন্মলাভ করিয়াছে। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তাহার বৈশেষ্য এবং যৌবন অভিযান্ত্রিক করিতেছে। জাৰ্মানির রাজধানী বালিননগরে Heinrich Gustav Magnus তাহার স্বগৃহে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার জ্ঞান কেন্দ্রকন ছাত্রকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেন। Magnusও বাল্যবয়সে Liebig এর মত Berzelius এবং Gaybessac

হইতে অত্যন্ত উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি বিজ্ঞান অহুশীলন কার্যে নিব্বের জীবন উৎসর্গ করিয়া অত্যন্তে এই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃঃ তিনি বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি যে স্বগৃহে বিজ্ঞান অহুশীলন করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় তাহার শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট হইতে আশ্রিত প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক জগতে মৌলিক গবেষণা হেতু যাহারা অমর কীৰ্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে G. H. Wiedemann, Helmholtz এবং Tyndall প্রভৃতি Magnus এর শিষ্য ছিলেন। দিনরিন ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে Magnus এর গৃহে বিজ্ঞান-চর্চার স্থান অপর্যাপ্ত হইয়া উঠিল, এই জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তাহার বাসভবনই বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানাগার-রূপে পরিণত হইল।

জাৰ্মানীতে উক্ত দুষ্টাঙ্গ অহুসরণ ক্রমে আরও বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হইতে লাগিল। ১৮৪৬ খৃঃ Philipp Gustav Jolly Hudeiburg নগরে একটি বিজ্ঞানাগার স্থাপন করিলেন। এই বিজ্ঞানাগারের যন্ত্র-সমুদায় অজ্ঞান পূর্বে একটা যথোপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত হইল এবং এই নতুন স্থানেই—Kirchoff এবং Busen -আলোকরশ্মি বিশ্লেষণ কার্যে অনেক গবেষণা করিয়া ছিলেন।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি স্টল্যাও গ্রামগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ছাত্রদিগকে রসায়ন শিক্ষা দিবার জ্ঞান বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল তাহাই নহে, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান

শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব-প্রথম যন্ত্রাগার স্থাপিত হয়। ১৮৪২ খৃঃদে লর্ড কেলবিন্ প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তাহার শিষ্য সমুদায়ের অনেককে মৌলিক গবেষণায় তাহাকে সাহায্য করিতে আন্তরিক করিলেন এবং অবশিষ্ট অনেক অনাভ্যস্তভাবে স্বগৃহস্থ্য তাল গ্রহণ করিল। এই সময়ে তাহাদের উৎসাহ এতাদিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে ছাত্রসংখ্যার আধিকা প্রায় একল রাখিতে এবং একল দিব্যভাগে ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অহুশীলনকার্যে নিযুক্ত থাকিত। কিন্তু তখন গ্রামগো বিদ্যা বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন কোন নিয়ম প্রচলিত ছিল না যে বিজ্ঞান-শাখাে জ্ঞানলাভেল্প প্রত্যেককেই বাধ্য হইয়া গবেষণাকার্যে করিতে হইবে প্রত্যেকেরই ইচ্ছার উপরে ইহা নির্ভর করিত।

একমাত্র আমেরিকার বেঠান নগরের Massachusetts Institute of Technology বিদ্যালয়েই বিজ্ঞান-চর্চার জ্ঞান বাধ্যতামূলক নিয়ম প্রচলিত হয় এবং উপাধিপ্রাপ্ত কনুিতে হইলে প্রত্যেককেই উপযুক্ত বোর্ধাইতে হইবে এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয়। ইহার পরে লণ্ডন নগরে King's College এর কর্তৃপক্ষণ বোর্ধানের Institute of Technology এর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উক্ত নিয়ম প্রচলন করেন। ইংলণ্ডে Robert Bellany Cliftons বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপদেষ্টারূপে বিশেষ পরিচিত। তিনি ম্যাকেষ্টার নগরে Owens College প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কথ্য গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে বিজ্ঞানাহুশীলনের

উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপন করেন। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Clerk Maxwell কেম্ব্রিজ নগরে Cavendish Laboratory স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত বৈজ্ঞানিক কারখানাটী পরিদর্শন করেন। তিনি ১৮৭১ খৃঃদে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৭৯ খৃঃদে তাহার অধ্যাপীত বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ডও কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-গবেষণার বিভাগে ছাত্র সংখ্যা অল্প ছিল তবুও এই অল্প কয়েক জনের মধ্য হইতেই অদুনাতন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ দেখা দিয়াছেন।

উনিবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফ্রান্স বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল। তবুও অধ্যাপক Welch বলিতে বাধ্য হইয়াছেন “ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ বৈদ্যপণ্ডিত পরীক্ষাগারের অভাবে অনেক অহুবিদ্যা ভোগ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ পরীক্ষা-বিশারদ Benard এর মত বৈজ্ঞানিকও একটি সৈতসৈতে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গবেষণাকার্য সম্পন্ন করিতেন এবং তিনি নিজে ইহাকে “বিজ্ঞানগবেষণাকারীদের কবরস্থান” আখ্যা দিয়াছিলেন। Gaylussac একটা সৈতসৈতে নিম্নতল প্রকোষ্ঠে পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করিতেন এবং আশ্রিত হইতে নিজেই রক্ষা করিবার জ্ঞান কাষ্ট পাহুকা ব্যবহার করিতেন। এই সকল অহুবিদ্যা মধ্যেও ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব উক্তয়ের সহিত অহুশীলন এবং ছাত্র-শিক্ষাদান-কার্য করিতেন। বৈজ্ঞানিক Liebig তাহার আশ্রিত-জীবনচরিতে বলিয়াছেন “Gaylussac, Thenord এবং Dulong এর বক্তৃতায় কি মনে একটা মোহিনী শক্তি ছিল।.....

তাঁহারা যন্ত্রসাহায্যে বস্তুতার বিষয়গুলি যুগ্মপদ্ধতিতে ছাত্রদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন এবং ফরাসী ভাষা জ্ঞাত ছিলিম বুলিয়া তাহাদের বস্তুতায় বেশ আমোদ অশ্রুত করিতাম।

Gaylussac Liebig কে তাঁহার স্বকীয় পরীক্ষাগারে গবেষণা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ফরাসীতে সে সময়ে ছাত্রদের জন্য কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ছিল না। ইংল্যান্ডে মৌলিক গবেষণা করিতেন, তাঁহারিগকে ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইত। Arago বলেন “অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অনেকের বিশ্বাস ছিল—ইংল্যান্ডের মূল্যবান, সমৃদ্ধিত এবং কাচের বাক্সে সংরক্ষিত যন্ত্র নাই তাঁহারা যথার্থ বৈজ্ঞানিক নহেন। Dulog তাঁহার সমস্ত অর্থরাশি যন্ত্র ক্রয় করিতে ব্যয় করিয়াছিলেন। Frensel স্বকীয় ব্যয়ে তাহার সমুদায় অধ্যাপক্য আবিষ্কার সমূহ স্বগৃহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে Rue-Fosses Saint-victor নগরে তড়িৎবিজ্ঞানবিদ Ampere এর ক্ষুদ্র গৃহে একখানি পেন্সিল পাখুর তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ হইতে উহা যে magnetic meridian স্থিত হয়, তাহা দেখিবার জন্য বহু পণ্ডিত অত্যন্ত কোতূহল-পরবশ হইয়া সমবেত হইয়াছিলেন।

বহুবৎসর পৃথক ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাগার—ও তাহার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির অভাবে অহবিধা ভোগ করিয়া আসিতে-ছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিশেষয় মন্ত্রী Duruy এই সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর করিতে প্রয়াসী হইলেন। শীঘ্রই ফ্রান্সে ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের মৌলিক গবেষণার জ্ঞ

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাহার ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক এবং অজ্ঞাত বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপিত হইল। M. Darboux এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন “গত বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি কল্পে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

সর্বপ্রথম এই উদ্দেশ্যে পদার্থবিজ্ঞানের প্রক্রিয়া-গুণ-নির্ণয় এবং তাহার বিস্তারিতান করা হইয়াছে ও তদ্বাধ্য বহুমূল্য যন্ত্রাদি স্বপ্নকিত হইয়াছে।”

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পুরাতন Sorbonne নগরে একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হয়। J. Jamin মরণাবধি ইহার পরিচালক ছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহা New Faculty of Science এর গৃহ স্থানান্তরিত হয়। বর্তমান সময়ে ইহা বিজ্ঞানবিদ Lippmann এর গবেষণাবলে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষাগারগুলির উন্নতি বিস্ময়-কর বলিয়া বোধ হয়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, Massachusetts Institute of Technology নামক বিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম যন্ত্রসাহায্যে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম সভাপতি William Barton Roger ছাত্রদিগকে রীতিমত পরীক্ষাসিদ্ধ বিজ্ঞানের অংশীদার করিতে নিয়ম প্রচলন করেন। এই সময়েই উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তিনি অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Edward C. Pickering এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের তৎকালীন সভাপতি J. D. Runkle উগার দ্রুত উন্নতি দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন “আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আমরা কালক্রমে

রসায়নের মত পদার্থবিজ্ঞানেরও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন সাধন করিতে পারিব।”

Pickering একবৎসর কাজ করার পর শেখিলেন যে এক সময়ে অনেক ছাত্রকে একই কাজে নিয়োজন করিল বহু যন্ত্রের আবশ্যক হয় এবং যন্ত্রাদি নিান্যরানে স্থানান্তরিত হওয়ার দরুন অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। সেযোক্ত ধোমসী দূর করিবার জ্ঞ তিনি দুইটি প্রকৌট উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে এবং তাহাতে গ্যাসের ও জলের বন্মোবস্ত করিতে প্রস্তাব করিলেন ও যন্ত্রগুলি স্থানান্তরিত না করিয়া টেবিলের উপর দৃঢ়বদ্ধ করিতে কলেক-কল্পপক্ষে অপরোধ করিলেন। তাহার যুক্তি-যুক্ত প্রস্তাব অত্যন্ত বিদ্যালয়ও গ্রহণ করিল। এই সময়ে Pickering বলিয়াছিলেন “বর্তমানে সময়ে আমেরিকা চারিটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-গার আছে; আমাদের বিশ্বাস অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদু সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধিত হইবে।” Pickering-এর ভবিষ্যদ্বাণী সবেও আমেরিকার কলেজগুলিতে বিজ্ঞান অংশীদারের বন্মোবস্ত বহুপদের সাধিত হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হারবার্ড-বহলেজ বিদ্যাপরিমাপক যন্ত্রের অন্তর পৃথক ছিল না; এক্ষণে অধ্যাপক Towbridge অধ্যাপক Cook এর স্বকীয় ভাঙার হইতে গবেষণা করিবার জ্ঞ Cosine Galvanometer দ্বারা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।” আমেরিকার পদার্থ-বিজ্ঞানাগারের আধিক্যশক্তি গত ২০ বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে ইহার ছয়টি এক্সপে গ্রাফা লাভ করিয়াছে যে পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারের সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আঞ্চলিক যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যালয়গুলির মধ্যেও এতই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বৃদ্ধি করা

হইয়াছে যে পূর্বে কোন কলেজেও এক্সপে ছিল না।

ছাত্রদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে এখ্যাত্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এই বিবিধ উপায়ে কোন একটা বাড়িঘরটিই আঞ্চলিক প্রত্যেক স্থল কলেজে অবলম্বন করা হইয়া থাকে। প্রথমটি এই যে—ছাত্র-দিগকে এক সময়ে একই পরীক্ষায় লিপ্ত হইতে দেখে যা এবং দ্বিতীয়টি—প্রত্যেককে একই সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় নিযুক্ত হইতে দেখে যা। এই উভয়বিধ উপায়েই কোন না কোন দোষ বর্তমান রহিয়াছে। প্রথমটির দোষ এই যে—প্রত্যেককে এক সময়ে একই পরীক্ষা করিতে দিলে এক প্রকার বহুযন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে; কিন্তু অধ্যাপক বা শিক্ষকগণ পরীক্ষণীয় বিষয়টি কলের নিকট এক সময়ে হস্তাকল্পে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এক্ষণে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করিতে হয় না। দ্বিতীয় উপায়টির দোষ এই যে—শিক্ষককে প্রত্যেক ছাত্রের নিকট পরীক্ষার বিষয়টি পৃথকভাবে বুঝাইয়া দিতে হয়। ইহাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার সুবিধা এই যে ইহাতে এক প্রকার বহুযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। হস্তরাং একই স্থল বা কলেজে স্বল্পব্যয়ে বিবিধ প্রকার যন্ত্রের সংরক্ষণ চলিতে পারে।

বর্তমান সময়ে জার্মানী এবং ফ্রান্স অপেক্ষা আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের স্থল সমূহেই বিজ্ঞান-চর্চার হস্তাকল্পে বন্মোবস্ত করা হইয়াছে। অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে ইউরোপ একই আমেরিকার গবর্ণমেন্টকে নিঃস্বায়ে জাতীয় বিজ্ঞানাগার স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার বন্মোবস্ত করিবার জ্ঞ অপরোধ করা হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে বিশেষ কোন মনোযোগ দেন

নাই। অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে তাহার কল
স্বরূপ ইংলেণ্ডে Davy-Faraday-Re-
search Laboratory এবং Royal Insti-
tute, জার্মানীর Charlottenberg নগরে
Physio-Technical Institute এবং ফ্রান্সে
এক শতাব্দী পূর্বে Conservatoire des arts
et meters ও প্যারিস নগরে Electrical
Testing Laboratory স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে Royal Institute এর
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার সম্বন্ধে একজন ইংরাজ
লিখিয়াছিলেন “আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির
এবং আবিষ্কার বিস্তারের জন্ত Royal Insti-
tute এ পঞ্চাশ বাহা করিয়াছে; তাহা
বিশ্ববিদ্যালয় সমূহও করিতে পারে নাই।
Young, Davy এবং Faraday—জ্ঞানের
মধ্যে এই তিনজন অসাধারণ প্রতিভাশালী
বৈজ্ঞানিকের প্রকৃত পরিচয় ও শিক্ষাদান
বলে ইহা বাস্তবিকই জগতের সকলের হান
আকর্ষণ করিয়াছে। বর্তমান সময়ে ব্রিটন-
বাসী ইহাকে ‘Pantheon of Science’ বা
‘বিজ্ঞানমন্দির’ নামে অভিহিত করিয়া
থাকেন।” ১৮০০ খৃষ্টাব্দে Royal Insti-
tute এ অভিনবক্ষেত্র, যন্ত্রের নমুনা-গ্রন্থ
এবং কক্ষশালা নির্মিত হয়। প্রথমাবস্থায়
ইহাতে সকল প্রকার যন্ত্রের নমুনা ছিল।
Rumford প্রথমে এই Royal Institute
কলিত-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে স্থাপন করেন।
১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড ভ্রাম্য করিলে
শিল্পবিভাগের অন্তর্গত ঘটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে
বিস্তৃত বিজ্ঞান-পরিবেশের প্রভাব রুদ্ধ পাইতে
আরম্ভ করিল। অল্পকাল মধ্যে ইহাতে
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপিত
হইলে Sir Humray Davy, Faraday
এবং Tyndall এর আবিষ্কার পরাম্পর বলে

ইহা বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ৭০ বৎসর পর্যন্ত
ইহার বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।
ইহার যুগান্ত উন্নতি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতেই
আরম্ভ হইয়াছিল।

Dr. Ludwig Mond এর বদান্ততার বলে
ইংরেজ পরিবর্তন সম্পাদিত হইল এবং তৎ-
সমূহের সাধারণ লোক হইতে অর্থ সংগ্রহ
করিয়া ‘Davy Faraday Research
Laboratory’ নামে একটি বিজ্ঞানাগার
স্থাপিত হইল। বর্তমান সময়ে ইহা Lord
Releigh এবং অধ্যাপক J. Dewar-এর
তত্ত্বাবধানে রূপান্তরিত হইয়াছে। অধুনা জগতের
মধ্যে ইহাই প্রধানতঃ বিস্তৃত বিজ্ঞানাহাঙ্গিনী
নিয়োজিত রহিয়াছে এবং জগতের বিভিন্ন
দশমতাব্দী সকলের নিকট উন্মুক্ত রহিয়াছে।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—জার্মানিতে
Charlottenburg নগরে Physio Techni-
cal Institute বর্তমান সময়ে প্রসিদ্ধিলাভ
করিয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহার স্থাপন
কল্পে Werner Siemens-এ ৩০০৬২৫ টাকা
দান করিয়াছেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হুগো ভল্ট
বৈজ্ঞানিক Helmholtz ইহার পরিচালক
নিযুক্ত হন। বর্তমান সময়ে এই বিজ্ঞানাগারে
কেবলমাত্র যে বিজ্ঞানাহাঙ্গিনী ইহা থাকি-
তাহা—নৈবে, বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযোগী
প্রকৃতপরিমাণে বিবিধ যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া
থাকে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে
ফ্রান্সী দেশে একশতাব্দী পূর্বে বিজ্ঞান চর্চার
জন্ত Conservatoire des arts et meters
স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় ইহাতে
বাণিজ্যোপযোগী সাধারণ যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত
এবং সময়ে সময়ে শিল্পিগণের নিকট কলিত-
বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করা হইত পরবর্তী-
কালে ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আঠারটি জম্হীর সমবেত
চেষ্টায় সাধারণ ও পরিমাণ নির্দেশ
করিবার জন্য ‘অন্তর্জাতিক সমিতি’ গঠিত হয়
এবং তদনুসারে প্যারিস নগরের নিকট

Pavillon de Bretenil নামক স্থানে
পরিমাণ যন্ত্র ও ওজন প্রকৃতি নির্ধারণ করিতে
একটি হুগুয়ে বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হয়।

ক্রিনগেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত।

নব্য-বিলাতের স্বদেশ-সেবক

ইংরাজ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিত্যন্তই
চিন্তিত। কেহ পরীক্ষা শোচনীয় অবস্থা দৃশ্য-
বিদ্যারূপ ভাষায় বর্ণনা করিতেছেন। কেহ
নগরবাসীদিগের দারিদ্র্য-চিত্র উচ্চ-সাহিত্যে
প্রচার করিতেছেন। আধুনিক ইংরাজী
বৈদ্যিক ও সামাজিক সাহিত্য পাঠ করিলে
ব্যথা যায় আজকালকার বিতর্কণ ইংরাজেরা
স্বদেশ সেবায় অনাগপকে প্রতী করিবার জন্ত
উত্তীর্ণা পণ্ডিতা লাগিয়াছেন।

কেহ বলিতেছেন “আমাদের শারীরিক
শক্তি কমিয়া যাউতেছে—ইংলণ্ড শীতলি দুর্বল
হইয়া পড়িবে।” কেহ বলিতেছেন, “আমাদের
শতকরা ৩০ জন লোক পেট ভরিয়া বাইতে
পায় না।” ইহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে তাহার
আশঙ্কা কি? কেহ বলিতেছেন “আমাদের
মৌলিকতা, সংখ্যা, চক্ষুশক্তি—আবির্ভবে কোথা
হইতে?—আমাদের বিবাহিত জনগণের, জন্ম
শরম গৃহই নাই।” কেহ বাড়াঘরের অভাব
বর্ণনোন্নতি। জীর্ণরুমেরা ঘরকমা করিবার
স্থযোগ পাষ না। কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী
নরনারীগণের জন্ম সম্ভাব্য ব্যাপক গৃহ প্রস্তুত
করিয়া না দিলে আমাদের সমাজ অচিরেই
ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।” কেহ বলিতেছেন, “দেশ
যৌকোপার ইহা গেল লোকজন পল্লীভাগ্য
করিয়া নগরে আসিতেছে—নগরেও স্বপ্ন না
পাইয়া ইহা বিদেশে যাইতেছে।”

খাওয়া পরার চরবস্থা, ঘর বাড়ীর অভাব,
বাধা-ভঙ্গ, অকাল-মৃত্যু, চরিত্রনাশ, লোক-
জনের দেশভ্রমণ এই সকল বিষয় ইহা নানা
পদ্ধতি বহুপ্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া-
ছেন। এই ভুলি পাঠ করিলে ইংলণ্ডকে
উপর দারিদ্র্যময় অবনত দেশ ভিন্ন আর কিছু
বিবেচনা করা, কঠিন। ভারতবর্ষের দুর্দশা
এত বেশী কি না সম্বন্ধে হয়। ইংরাজসমাজ
অধিকদালার জাতিতে পরিণত হইয়াছে।
ইংলণ্ডের সেনাবিভাগে যত লোক কর্ম গ্রহণ
করিতে অগ্রসর হয়, তাহার ভিত্তর শতকরা
৫০ জন লোক অশুভ, পীড়িত, এবং
আইনামহুরের সেনাবিভাগের অযোগ্য।
১৯০০ সালের সেনাবিভাগের কার্যবিবরণী
হইতে রাউলি, তাহার বিখ্যাত দারিদ্র্যচিত্র
“Poverty” নামক গ্রন্থে তথ্য সংগ্রহ করিয়া
জানাইতেছেন:—

“The health and physical develop-
ment of one-half of the recruit
who applied for enlistment in the
British Army during 1900 was
below the comparatively low stand-
ard required by the Army authori-
ties, and it must be remembered
that even this does not adequately
measure the low standard of health

amongst the working classes generally, for only those men were sent up for medical examination who were "reasonably probable" to be passed by the Army doctors."

শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য অর্জন করা অত্যন্ত কার্যেণেও অত্যাশঙ্কক। তাহা না হইলে ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা করা কঠিন হইবে। Temperance Problem and Social Reform নামক "মাদকতা নিবারণ এবং সমাজ সংস্কার" বিষয়ক গ্রন্থে রাউলিট্টি এবং শার্লস্‌ফেল্ল বর্ণিতছেন—

"Within the last thirty years Germany, Belgium and even Russia have transformed themselves economically. The two former specially are now highly developed industrial states claiming a large share of the world's markets, while we are as face to face with the unprecedented condition of the United States. The conditions of industrial competition are, therefore, wholly changed, and the question of efficiency mental and physical has become one of paramount importance.

At present our most highly equipped and therefore most formidable competitors are our kinsmen across the Atlantic. America is commercially formidable, not merely because of her gigantic enter-

prise and almost illimitable resources, but because, as recent investigations have shown, her workers are better nourished, and possess a relatively higher efficiency."

এই ভাবনা ইংরাজ সমাজের মজুরের প্রতিষ্ট হইয়াছে। ১৮১৫ সাল হইতে ইংরাজ জগতের একমোবাখিতীয় রূপে বিদ্যমান করিতেছেন। শতাব্দী পূর্ণ হইবার পূর্বে কৃষি ও জাখারির প্রতিচ্ছন্দিতা পদে পদে তাহাকে বাধা দিয়াছে। আজ ১৯১৫ সাল—শতাব্দী পূর্ণ হইল—ইতিমধ্যে ইংরাজ ভবিষ্যৎ অশঙ্ক্যময় বৈশিষ্ট্যে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারই নাম জগতের চক্ৰসত্তা—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তে স্থানি চ চক্ৰখানি চ।"

ইংরাজ স্বদেশ-সেবকেরা প্রধানতঃ এই কথাটি প্রস্তাব তুলিয়াছেন—

- (১) পল্লীজীবনের উন্নতিবিধান
- (২) কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের প্রবর্ত্তন
- (৩) পারিবারিক বন্ধনে দৃঢ়তা ও প্রকৃত মঞ্চভাব আনয়ন।

আজকালকার স্বাস্থ্যহানি, চরিত্রহানি এবং লোককক্ষের কারণ সমুচ্ছ ইহাদের সত্তা—

- (১) নগরে জীবনযাপন
- (২) বিশাল কারখানা ও ফ্যাক্টরীর প্রচাবে শ্রমজীবীদিগের মহাশয় লোপ
- (৩) বিবাহিত জীবনে শিথিলতা এবং উচ্ছ্রাখলতা।

দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় আরশের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত ইংরাজ-সমাজের লক্ষ্য হইয়া পড়িলে। অমূল্য পদ-দলিত জাতিই প্রবল রোম সাম্রাজ্যকে পৃষ্ঠপুর্ষ দান করিয়াছিল। সুতরাং ভারতবাসী,

কোন বিষয়ে পাশ্চাত্যের অল্পকরণ করিবার পূর্বে ব্যাপারটা তলাইয়া মন্ডাইয়া বুঝুন।

অষ্ট্রিশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাপ্প এবং যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। শিল্প ও ব্যবশায়ে এই সুসুখের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পূর্ণরূপে দেখা দেয়। অতীহার ফলেই ইংলণ্ডের সকল প্রকার সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিশাল সাম্রাজ্যের বাজার একচেটিয়া ভাবে ইংরাজ ভোগ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র ল্যান্ডশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের নগরগুলিতে বৃহদাকার ফ্যাক্টরীর "মোচাক" স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র ইংলণ্ডের ৪ অংশ লোক এই প্রদেশের ৮১০ টা নগরে জমা হইয়াছে।

নবনরাদিগের জীবন অতি বিবাদময়, বৈচিত্র্যহীন, সৌন্দর্যহীন, এক্ষেত্রে কণ্ঠে প্রত্যেকের জীবন অতিবাহিত হয়। পরিবারের স্বর্থ দুঃখ দেখিবার সময় মাতারও নাই, পিতারও নাই। কারখানার গোলাম এবং যন্ত্রের সেক্স সেবিকারূপে ইংরাজ জীবনধারণ করে।

ফ্যাক্টরীর মালিকেরাও বেশী কিছু দেখেন না। তাহারা যে মাল জোগাইতেছেন তাহার কান্দি যথেষ্ট থাকিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। তাহারা সর্বদা কাটুতি ও-বাঝার অশেষণ করিতেছেন। যতই সাম্রাজ্য বিস্তারিত হইয়াছে ততই ইংরাজের বাজার দৃঢ় ও বৃদ্ধ হইয়াছে, ততই ইংরাজ ফ্যাক্টরীর কল যন্ত্রগুলি বাড়াইবার সুযোগ পাইয়াছেন; ততই শ্রমজীবীরা নিম্নজীব পদার্থের জায় বাবস্থিত হইতে পারিয়াছে, "দায়াজ্য-নীতির" প্রভাবেই ফ্যাক্টরী-নীতি সফল হইয়াছে। সাম্রাজ্য না থাকিলে এই সকল বিশাল ফ্যাক্টরী গড়িত না।

সম্রাট মাল জোগানই ইংরাজের উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক কলের নিয়ম এই যে, কারবার যত বড় হইবে তত কমিতে থাকিবে। শ্রমবিভাগ নীতি তত বেশী প্রয়োগ করিতে পারা যাইবে। তত অল্প সময় বেশী মাল বাজারে ফেলা যাইবে। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্যাক্টরীর আকার বাড়িয়াই চলিয়াছে। দুইজন একজন মহাজনের আওতাধ ("Trusts") সকল ব্যবশায়ই আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ফ্যাক্টরী-গুলি ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের আকার ধারণ করিতেছে।

সাম্রাজ্য বাড়িয়াছে, কল কারখানা বাড়িয়াছে, সম্পদ বাড়িয়াছে, অর্থচ হুত ত বাড়িতেছে—না, ইংলণ্ডের দারিদ্র্য ত কমিতেছে না। যর যে পরিমাণে সাম্রাজ্য ও ফ্যাক্টরী, সেই পরিমাণেই দারিদ্র্য। যুৎ মাংসে লতনের শ্রমজীবীদিগের বৈষমিক অবস্থা তন্ন তন্ন ভাবে আলোচনা করিয়া এখনও পূর্ণ বিরাট গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ শতকরা ৩২ জন ইংরাজ অর্ধাশ্রয় থাকে। ইয়র্ক নগরের শ্রমজীবীদিগের জীবনও ঠিক এইরূপই শোচনীয়। এক কথায় রাউলিট্টি সাহেবের তথ্য সংগ্রহের ফলে জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বার্খিংহাম নগরের শ্রমজীবী-সমাজ-বিষয়ক গ্রন্থেও দরিদ্রের লক্ষণ ক্রমশঃ সন্নিবেশ পাইতেছি।

শিল্পবিদ্যের মহিমা কীর্তন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইল। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষ হইল ইংরাজ জাতির সর্বনাশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া। চালপু যন্ত্রের Life and Labour in London গ্রন্থ সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর বিক্ষোভ তীব্র প্রতিবাদ।

কাজেই ইংরাজ এখন স্তম্ভিত হইবে ফ্যাক্টরী-নীতির সমালোচনা" প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "কেন গৃহে চলি?" ইহাই ইংরেজের বর্ত্তন সমস্তা দাঁড়াইয়াছে। উনিবিশশতাব্দীর পথে-গুলিলে অল্পকালের ভিতরই সভ্যতা স্বয়ংপ্রাপ্ত হইবে ইহা তাঁহার বিশ্বাস।

সমাজের এই পরিবর্তন সমাজ বিশ্বাস হিন্দু প্রচার করিতেন :-

"রাত্রে কলিতে আর তুলিব না বার বার বাইয়ে দেখেছি তায় কিছুই নহে কত তার সে যে পুত্রিত গরলে, বাইলে কুল ফলে।"

ইংরাজ ইহা বিশ্বাস কি কুল ফলে?

সমাজস্বপ্নের কাল-আগত প্রায় ভাবিয়া

দরিদ্র নরনারীদিগের জন্ম ইংরাজ যথাসম্ভব

ত্যাগ স্বীকারে ব্রতী হইয়াছেন। নগরসংস্কার,

আবাসায়িত, গৃহ নির্মাণ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা,

মিউজিয়াম গঠন ইত্যাদি নানাবিধ লোকহিত-

বিধায়ক কর্মে তাঁহার জলের মত ঢাকা, খরচ

করিতেছেন। অশ্রমজীবীসমাজে বিবাহ বন্ধন

স্বয়ম্বয় করিবার নিমিত্ত ইংরাজ সচেষ্ট হইয়া

ছেন। যাহাতে ইহাদের অবকাশ দীর্ঘকাল

হয়, যাহাতে ইংরাজ কর্ম হইতে বৈমুখ্য

বিবাহ ও শক্তি পায় তাহার ব্যবস্থা আইন

দ্বারা করা হইতেছে। দেশের বৈমুখ্য জীবনে,

দনী দরিদ্রের সম্বন্ধে, প্রভুত্বের ব্যবহারে

কতকগুলি নূতন আদর্শ, নূতন লক্ষ্য এবং

নূতন লক্ষ্য প্রবর্তিত হইতেছে। এই সকল

পরিবর্তনের চিহ্নগুলি দেখিলে মনে হইবে

যে, এদেশে আবার একটা নব্য শিল্পবিপ্লব

সামিতি হইতে চলিয়াছে। উনিবিশশতাব্দীর

ফ্যাক্টরী যুগ ছাড়াইয়া ইংরাজ জাতি এক

নূতন ধরণের বৈমুখ্য অবস্থায় প্রবেশ

করিতেছে। বিশশতাব্দীর এই সমাপ্তাব্দী

শিল্প-বিপ্লব পূর্ণতরন বিপ্লব হইতে কোন বিষয়ে

লোকহিতব্রত, দরিদ্রসেবা এবং পরোপ-

কারের অগ্রদূতগুলি হইবে ইংলণ্ডের বৈমুখ্য

বিপ্লব মাত্র সামিতি হইবে না। ইংরাজের

পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও একটা

বিপ্লব আসিতেছে। স্বী-স্বামী সম্বন্ধ,

পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, বাণিজ্য জীবনের চরম

লক্ষ্য, আশ্রমের কর্তব্য ইত্যাদি সমস্তাত্ম-

বিষয়ক চিন্তাগুলিও অভিনব ভাবে অগ্রপ্রাণিত

হইবে। এই নব্য সমাজ ও পরিবার বিলাতের

পক্ষে একটা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লবের

কলঙ্করূপ বিবেচিত হইবে। বার্ণশ, স্কট,

কার্ণহিল, বাসিন, ওয়ার্ডল ওয়ার্থ গত শতাব্দীর

নব্যযুগ আনিয়াছিলেন। বিশশতাব্দীর মধ্য

ভাগেও ইংলণ্ডে এইরূপ একটা যুগান্ত

সামিতি হইবে বোধ হইতেছে।

সম্প্রতি চিন্তাক্ষেত্রে এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে

সামান্য সামান্য ভিত্তি পাওয়া যাইতেছে।

মানবসেবা, পরোপকার, লোকহিত, ইত্যাদি

কর্মক্ষেত্রেই নব্যযুগের আদর্শ বিশেষভাবে

বিস্তৃতি পাইতেছি। যাহারা উনিবিশ-

শতাব্দীতে বিজ্ঞান ফলাইয়া শতকরা ৩০ জন

নরনারীকে অজ্ঞানে রাখিয়াছেন তাঁহারাই

বিশশতাব্দীতে স্বতঃপ্রসূত হইয়া নানা

বিধানে দরিদ্রনাশার্থে সেবা আরম্ভ করিয়া

ছেন। দরিদ্রসেবার অগ্রদূত ও প্রতিষ্ঠান

ইংলণ্ডে আজ কাল সখ্যাতীত।

আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, ইংলণ্ডে

সমাজ সেবা, লোকহিত, পরোপকার ইত্যাদি

কর্ম সাধারণ জনগণ নিজে করিয়া থাকে,

তাহা নয়। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বিলাতের

স্বদেশসেবক এবং লোকহিতকর কর্মের

প্রবর্তক, উৎসাহদাতা ও অর্থ সাহায্যকারী

কেবল বিদ্যালয় কেন, জলপান, অন্নপান, বস্ত্রপান, ঔষধপান ইত্যাদি দ্বারা দরিদ্র জন-গণের সুকল প্রকার অভাব মোচন করিবার ভার গবর্ণমেণ্টে লইয়াছেন। ইংলণ্ডে কেন বড় ক্যান্টাই গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্য ও পরিচালনা ব্যতীত চলে না।

ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকের জ্ঞানে, যে, একমাত্র জাখাখির জগৎপাই সকল কিছয়ে গবর্ণমেণ্টের যুগাপেক্ষী এবং সাহায্য প্রার্থনীয়। সভ্য কথা, ইংলণ্ডও জাখাখির আশ্রম সকল কর্মে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, শাসন এবং পরিচালনা প্রবর্তন করিতেছে। ইংরাজ জাতির রাষ্ট্র দিন দিন ছাত্র ও যুবকগণের অভিভাবক, কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের মা বাবা, নরনারী-গণের চরিত্রের সংস্কারক, এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, ও বিজ্ঞানের "সংরক্ষক" হইয়া উঠিতেছে। জাখাখি-সমাজের আদর্শ ইংরাজ-সমাজে প্রবর্তিত হইতেছে। আজকালকার লয়েড জর্জ ইংলণ্ডের জাখাখি নীতি প্রচারক।

দেশের জন্মন রাষ্ট্রীয় কর্মদিগের কৰ্মে কিরূপে উত্তীর্ণ? শ্রমজীবীদিগের পক্ষ অবলম্বনকারী "পার্লামেন্ট সভ্যরা" (Labour Party) এখনও প্রবল হইতে পারে নাই।

এমনও ফ্যাক্টরী স্বত্বাধিকারী এবং ভূস্বামীদিগের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করা ইংলণ্ডে অসম্ভব। পরশাওফলা লোকহিতের কথাই লোকেরী উঠে বসে—তাঁহাদের ইচ্ছামুতাবেই জাতীয় মহাসভার সভাপন পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সমাজ যে ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছে, স্বাধীন অভাব, শক্তির অভাব, অন্নবস্ত্রের অভাব, চরিত্রের অভাব যে জনগণকে অধ্যপ্তিত করিতেছে তাহা হইতে কে অস্বাঃ আর বাকী নাই। ইচ্ছায় হইক, অনিচ্ছায় হইক, জ্ঞাতদ্বারে হইক, অজ্ঞাতদ্বারে হইক,

দারিদ্র্য-সমস্তা, ইংরাজ-সমাজে মহাসমস্তা হইয়া উঠিয়াছে। লেপক, সম্পদক, ঔপচাযিক, নাট্যকার, দলবিজ্ঞানবিৎ, সকলেই ইহা বুঝতেছেন। একথা সমাজের সমস্ত জ্ঞাতা পড়িয়াছে। কাজেই পার্লামেন্টের দরিদ্রের পক্ষ অবলম্বন করা অনিবার্য।

মোরের উপর, সমস্ত মহাসভাই কিছু না কিছু দরিদ্র পক্ষের পক্ষ হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিপ্লব ১০-১৫ বৎসরের ভিতর বিলাতে যতগুলি আইন জারি হইয়াছে তাহার অনেকগুলি এই দারিদ্র্য-সমস্যায় হইতে উদ্ভূত।

তাহার ফলে পার্লামেন্ট, টাউন-সভা, কাউন্সিল সভা, পলীসভা, ইত্যাদি সকল সভাই দরিদ্রগণের জন্ম উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

অভাববৃত্ত ছাত্রদিগকে প্রতি-দিন মধ্যাহ্ন খাদ্যদান আজকাল প্রত্যেক নগরে মহাকর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। খরচ মিউ-

নিপিয়ানিগিত হইতে দেওয়া হয়। প্রয়োজন হইলে বুট, জামা, টুপি, মোজাও বিতরণ করা হয়। মাঝে মাঝে স্কুল ও কান্থার

বালকবালিকাদিগকে হুয়ুজীতের লইয়া যাওয়া হয়। নগরের অল্প নরনারীগণকে বিনা

পয়সায় চিকিৎসা করান হয়। স্বস্থ না হওয়া পথ্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

এতদ্ভাতীত গৃহনির্মাণ সম্বন্ধে কথা আইন করা হইয়াছে। লোকের ২১৫৫ বাড়ীতে একটি

মাত্র জলের কল এবং পায়খানা থাকিত। এক্ষণে প্রত্যেক গৃহে কল ও পায়খানা রাখি-

বার আইন জারি হইয়াছে। কারখানার গৃহস্থাল স্বাস্থ্যকররূপে প্রস্তুত করা এবং সর্বদা

মৌরুপ রাখার ব্যবস্থা হইতেছে ও গবর্ণমেণ্ট কর্মচারীরা তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

কারখানার শ্রমজীবীদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের

জন্ম ছই স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।

গর্বমেটের এই অভিজ্ঞাভাবকচিত শাসন কেবল নগরেই আবদ্ধ নয়—গুরাতে এবং কৃষিক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইতেছে। কৃষকদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিকুমির মালিক করিয়া দেওয়া গর্বমেটে নিজের কর্তব্য মনে করেন। ধনী ভূমালিকাদিগকে বাধ্য করিয়া তাঁহাদের জমি কৃষকগণের নিকট বিক্রয় করান হয়।

তাঁহা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সের লোকমাত্রকে পেনশন দেওয়া হইতেছে। তাঁহাও গর্বমেটে ঘাড় পাতিয়া লইয়াছেন। সম্পত্তি কাঁধাখির জীবনবিমা প্রণালীও ইংলণ্ডে অবলম্বিত হইল। কারখানার শ্রমজীবীরা বাহাতে দৈবক্রমে কর্তৃহীন এবং অসুস্থ হইলে অনাহারে মারা না যায় তাহা দেখিবার জন্ত গর্বমেটে আইন করিয়াছেন।

কলকাতা ধনী মহাজনগণের উপর কড়া আইন করিয়া, তাঁহাদের ধনসম্পত্তির উপর অধিকহারে কর বসাইয়া, দরিদ্র অভাবগ্রস্ত নরনারীর বাস্তু, অন্নবস্ত্র, শিকারীতাদির হযোগে সৃষ্টি করিবার জন্ত বিলাতের রাষ্ট্রকে সচেতন দেখা যাইতেছে। ইহার নাম Socialistic State. বিলাতের রাষ্ট্রসমূলে Small Holdings Act, Factory Acts, Allotment Acts, Old Age Pension, Progressive Taxation, Feeding of the Poor, Unemployment ইত্যাদি বিধির তত্ত্ব ও তথ্য বিশেষরূপেই আলোচিত হইয়া থাকে। এখানকার অত্যন্ত রাষ্ট্রীয় আশোলাসমূহও এই সকল আলোচনার প্রভাবে নিরুদ্বিগত।

ম্যাকেটর ফ্যাক্টরীর মৌচাক, আবার ম্যাকেটরই দরিদ্র-সেবক। সোশ্যালিস্টদিগের প্রধান কর্তৃকল্প! ম্যাকেটর নগরই নব্য শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রথা আবিষ্কার করিয়াছে।

ধন বিজ্ঞান এবং ফ্যাক্টরী জীবনের জন্ম এই নগরেই হইয়াছিল। তাহার স্বপ্নল-স্বপ্নল ঐশ্বর্য্য-দারিত্ব উভয়ই এখানে চরম, আশ্চর্য্য দেখা দিয়াছে। একদিকে বিজ্ঞানাবলম্বিত শিল্প ও ব্যবসায় এবং অপর দিকে, স্বাস্থ্যহীন, অসুস্থ, গৃহহীন, চরিত্রহীন, কুলীসমাজ, এই নগরেই আবার কুলীসমাজের জন্ম ধনীদিগের দয়াজনিত সৃষ্টি গ্রহণ করিতেছে।

মাতৃ এক হাতে নিজের ব্যাপি আশ্রয় করিয়া আনে, অপর হাতে তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু “প্রাকলগ্নাঙ্কি পঞ্চত দুঃদার্পশনং বরম”—এই নীতি কি মানব সমাজে প্রচলিত হইতে পারে না? মানব সমাজের এই বিচিত্র ধারা কি বিশ্বজনক! সহজ পথে সমাজ প্রবাহ অগ্রসর হইলে কত শক্তির অপব্যয় বাঁচিয়া যাইত।

এক্ষণে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইংরাজ আইনের পরিচয় দিব। মিউনিসিপ্যালিটির বয়স্ক Infant Life Preservation Committee, Health Visitors Society, Ladies' Health Society ইত্যাদি নানা সেবকসমিতির কার্য্য পরিচালিত হয়। ১৯২২ সালের মিউনিসিপ্যাল কার্য্যবিবরণী হইতে নিম্নের তথ্য উদ্ধৃত হইল—

“In 1909 a cleaning Station was opened by the Sanitary Committee for the cleaning of the verminous children. School children found to be in a verminous condition are sent by the Education authorities to the Cleansing Station, and at the same time a notice to this effect is sent to the Medical Officer of Health, who refers the case to the

Health Visitor for that District. It is her duty to visit and report to the Medical Officer for health upon the condition of the house, and especially of the bedrooms and bedding. She is required to inspect all the children in the house, whether of school age or under, and to instruct the mother or person in charge, as to treatment, also to continue to visit at regular intervals until she can report that all the house has been cleansed, the bedclothes washed, and the children kept clean. This work has to be specially arranged, as those children who attend school can only be seen during the dinner hour on Saturday, and frequently when the Health Visitor calls to inspect the house and children she finds that the family have removed, and much time is spent in trying to trace them. If after making full inquiries, the family cannot be found, a letter is sent to the School Medical Officer asking him to obtain the correct address.”

Those cases which come outside the area worked by a Health Visitor are undertaken by a Nurse specially appointed to deal with them, or by the District Sanitary Inspector. Then, again it has been

found advisable to pay monthly visits to delicate children threatened with phthisis or children of consumptive parents. The object of these visits is to see that the children get medical advice and treatment in time, and that they are sufficiently clothed and fed. In order to ensure the latter, it is sometimes necessary to send warning letters to the parents, or in cases where poverty is causing suffering, efforts are made to procure assistance either from the Board of Guardians District Provident Society or other agency.”

কালিদাস আদর্শ হিন্দু নরপতির বর্ণনা করিয়াছেন—

“প্রজানাম্ বিনয়ানান্দ্য রক্ষন্য ভরণাদপি।

সপিতা পিতরুণসাম্ কেবলং জ্ঞাহেতবঃ।”

নব্য বিলাতের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সেই আদর্শ রাষ্ট্রের কৃষ্ণীক করিতেছেন মনে হইতেছে। যে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বথ ও স্বাস্থ্য বক্ষিত হইলে সমগ্র রাষ্ট্র প্রভাপ্রাপ্ত হইবে বিবেচনা করা যায় একমাত্র সেই দেশেই এইরূপ “সংরক্ষণ-নীতি” অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড বুঝিয়াছেন যে, জনগণকে জটিলত্ব স্বস্থ, সবল না করিতে পারিলে তাঁহারা জগতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। এই জটিলতা তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সমগ্র রাষ্ট্রই নব্য বিলাতে সমাজ-সেবক ও স্বদেশ-সেবক। একজ্ঞ ওখানে জনসাধারণ প্রবর্তিত সেবা-সমিতি, রাষ্ট্রকর্ম-মিশন, সোশ্যালসার্ভিসলীগ ইত্যাদির বেশী আবশ্যক হয় না।

বঙ্গের ঐতিহাসিক

(১০৩৪ পৃষ্ঠার পূর্বে প্রকাশিত অংশের পুনঃ)

রমা প্রসাদ বাবুর সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করিব। তিনি ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসের সহিতঃ পত্রিকায় “আর্য্য” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—“কাহারো আশ্রয় নাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে এই প্রবন্ধের আলোচনা আবশ্যিক; এবং সেইরূপ আলোচনার ঘটনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।”

১নং আলোচনা—“কথ্যে দুইশ্রেণীর লোক আর্থ্যনামে অভিহিত হইয়াছেন; একশ্রেণী—অর্থবর্ষী; অশ্বিরা, কৃষ্ণ, অজি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গোতম, কতপ, অগস্ত্য, কন্দ, বিষ্ণু। মিত্র প্রভৃতি স্বর্ষির বংশধরগণ। আর এক শ্রেণী—যদু, তুর্লঙ্গ, অঙ্গ, জুহা, পুরু, ক্রিবি, কশ্যপ, চেন্দ্র, ভরত, তুহু, স্বরূপ প্রভৃতি বংশীয় যোদ্ধা বা যজ্ঞমাগধ। এই সকল আর্থ্যগণ স্বল্পে আপনাদিগকে একই বীজ-পুরুষের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন নাই। যদিও ক্রিয়া অনেক স্থলে বৈবশ্বত মনুষ্যকে ‘পিতা মহা’ বা আমাদের পিতা, অর্থাৎ মানব-জাতির বীজ-পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি গোত্র প্রবর্তক স্বর্ষিগণের মধ্যে অবিকাশকেই সাক্ষ্য সম্বন্ধে দেখে বংশাবতর বলা হইয়াছে *।”

রমা প্রসাদ বাবু একটু শ্রম স্বীকার করিতেই জানিতে পারিতেন, তিনি যে দুইশ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তাহারা একই বীজ-পুরুষের

বংশোদ্ভব। ব্রহ্মা বীজ-পুরুষ, তাঁহার নয়টি মানস পুত্র, যথা, “ভৃগু, পুরাণ, পুলহ, ক্রতু, অশ্বিরা, মরীচি, দক্ষ, অজি ও বশিষ্ঠ। * * * ব্রহ্মা প্রজাপালনার্থ আপনাকেই আশ্রয়ভূত অর্থাৎ বায়ুভুব মহা করিলেন।†” এই ব্রহ্মপালক বায়ুভুব মহাই ক্রিয় এবং পুরুষোক্ত নয়জন ব্রাহ্মণ। স্বর্ষি ও দেবগণের বংশে কোন প্রভেদ নাই। কারণ “কখন স্বর্ষিগণের পুত্র দেবতা, কখন দেবগণের পুত্র পিতৃগণ; আবার কখন বা দেবপুত্রগণই স্বর্ষি হইতেছেন।‡” হুতরাং ইহারা সকলেই এক বীজপুরুষ ব্রহ্মার বংশজাত।

২নং আলোচনা—“কথোক্ত বশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের ‘বিবশ্ব চ’ এবং পতঞ্জলির (গৌর: চ্যাত্যাকার: পিপল: কপিলাকেশ: ইত্যে: তানপাত্যন্তরাং ব্রাহ্মণ্যে গান্ধী কুর্ত্তি) এই উক্তি একত্র আলোচনা করিলে মনে হয়, বৈদিক আর্থ্য-সমাজে একদল বেতাঙ্গ ছিল; এবং কথের ‘শ্রাব’ বিশেষণ হইতে দেখা যায়, আর একদল লোক শ্যাম্য দিল। শ্রাম্যও বেতাঙ্গ জনসংখ্যার মধ্যে নিকট জাতিস্থের কল্পনা কর্ত্ত। এই নিমিত্তই হয় ত আর্থ্যগণের মধ্যে বাঁহারা বেতাঙ্গ ছিলেন, তাহারা বর্ণগ, প্রজাপতি বা অগ্নির বংশধর বলিয়া আশ্রয়প্রদান দিয়াছেন, এবং শ্যাম্য আর্থ্যগণকে বৈবশ্বত মহর বংশের সাধারণ মানবের শ্রেণীতে গণনা করিয়া গিয়াছেন।‡”

১০২১]

বঙ্গের ঐতিহাসিক

১১২৯

কথের শ্রাবধ সম্বন্ধে রমা প্রসাদ বাবু স্বপ্নেব ১৩১২-১৩ স্বক প্রামাণ্য স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্কে বিবর্তিত আছে—

“কথিত আছে, কথ স্বর্ষি নৃগণের পুত্র। সেই অসংখ্য শ্রাবধ বর্ণ ধারণ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। অগ্নি যেই শ্রাম্যবর্ণ কথের ভ্রাতৃপুত্র। যুক্ত নিজ উদ্য: স্বীকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার অর্থাৎ অগ্নির ভ্রাতৃ আর কেহই তখন যজ্ঞ অহুষ্ঠান করে নাই।” (রমেশ)

রমা প্রসাদ বাবুর প্রমাণেই দেখা যাইতেছে এই কথ স্বর্ষি নৃগণের পুত্র। নৃগণ নামে কাহাকেও বৈবশ্বত মহ বংশে দেখা যায় না। অতএব এই নৃগণের জন্ম যে বৈবশ্বত মহ বংশ, তাহাই প্রথমে প্রমাণ করা আবশ্যিক। তিনি তাহা করেন নাই, অথচ বৈবশ্বত মহর বংশকে শ্যাম্য বলিয়াছেন। হুতরাং এই আলোচনা বিজ্ঞান-সম্মত হইতে পারে না।

৩নং আলোচনা—“কথ্যে যদু ও তুর্লঙ্গ, অঙ্গ পুরু ও জুহা স্বর্ষি সহিত একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। নির্ণটু-নামক প্রাচীন বৈদিক অভিধান যদু, অঙ্গ, তুর্লঙ্গ, জুহা ও পুরু মহর্ষা শম্ভের প্রতিশব্দ রূপে বা জাতিবাচক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। মহাভারতে যদু ‘প্রভৃতি’ শব্দ জাতিবাচক নহে, ব্যক্তি বাচক,—যযাতি পুত্র পুত্রের নাম। জাতি-ভেদের হিসাবে মহাভারতের রাজা যযাতি ও তাঁহার পাঁচ পুত্র বিযয়ক জ্ঞান্যানের অর্থ যদু, তুর্লঙ্গ, অঙ্গ, জুহা ও পুরুগণ এক বংশোদ্ভব বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অঙ্গ, জুহা ও পুরুগণ হয় ত ‘আদৌ যদু ও তুর্লঙ্গ-গণের জাতি ছিলেন এবং বেবিলনের দিক হইতে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন *।”

যদু, তুর্লঙ্গ, অঙ্গ, জুহা ও পুরু এই পাঁচজন রাজা যযাতির পুত্র, ইহা ‘মহাভারতের কথা। নির্ণটু-নামক ‘নাম জাতিবাচক দেখিবার্থ রমা প্রসাদ বাবু গোলে পড়িয়া গিয়াছেন, তাই তিনি মহাভারতের কথা বিদ্যাস ‘করিতে পারেন নাই তাই তিনি বৈজ্ঞানিক প্রাণালীতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ‘অঙ্গ, জুহা ও পুরুগণ ‘হয় ত ‘আদৌ যদু ও তুর্লঙ্গগণের জাতি ছিলেন।” একজনের পাঁচ পুত্রের বংশ যে জাতি তাহা প্রকাশ করিতে ‘হয় ত’ শব্দের প্রয়োগই হয় না। হুতরাং এসমস্ত বিষয় অধিক আলোচনার আবশ্যক, হুতরাং যা তা লেখা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু আমাদের দেশে যা তা লিখিলেই ঐতিহাসিক হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গড় থাকিলেই হইল।

অষ্টম পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট আমরা যত উপকার পাইয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইতিহাস আলোচনার পথ তাহারা দেখাইয়াছেন, কিরূপে ইতিহাস লিখিতে হয়, তাহা তাহাদের নিকট আমরা শিক্ষা করিতেছি। একত্র আমরা তাহাদের নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রামাণিক বলিয়া আমরা তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কারণ কি? তাহাদের গবেষণার ফল আমরা গ্রহণ করিব বটে, কিন্তু নিজে যাচাই করিয়া গ্রহণ করিব। এই যাচাই কাধ্যে নিজেদের দেশের শাস্ত্রজ্ঞান থাকা চাই, কারণ এই শাস্ত্র-সাগর মনন করিয়াই তাহারা ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাদের যে যত আমরা ঠিক বলিয়া বিশ্বস্তে পারিব, কেবল তাহাই লইব। যা তা লইব কেন?

* সাহিত্য ১০১১। ২৬০ পৃষ্ঠা।

† বাবু পূরণ ৩১ অঃ ২১ মোক।

‡ বিদ্যু পূরণ ১। ১। ৭, ১৪ মোক।

§ সাহিত্য ১০১১। ২৬২ পৃষ্ঠা।

* সাহিত্য ১০১১। ৭৫৮ পৃষ্ঠা।

রমা প্রসাদ বাবু নিজের দেশের শাস্ত্রগুলি পরিষ্রম করিয়া আলোচনা করিলে অধ্যাপক উইঙ্কলার (Winckler) এবং অধ্যাপক ডাক্তার ডন লুশনের বক্তৃতায় তুলিতে নাই, তাঁহাদের কথা যাচাই করিয়া লইতেন।

তিনি লিখিয়াছেন—“প্রাচীন মিটেনি রাজ্যের অনতিদূরে, এশিয়া মাইনরের পূর্বাংশে হইতে পুরাত্তর পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কুর্দিগানের পার্শ্বভাগে প্রবেশে অর্থাৎ ভাষাভাষি গোষ্ঠী ও কপিলকেশ মহত্ত্ব অজ্ঞাপিত দৃষ্ট হয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার ফেলিক্স ডন লুশন ত্রিশ বৎসর কাল পশ্চিম এশিয়ার জাতি-তত্ত্বের ও প্রত্নতত্ত্বের অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়া অধ্যয়নানের ফল ১৯১১ সালের হৃৎসালি ভাষ্যক বক্তৃতায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তারিতে তিনি বলিয়াছেন—কুর্দিগণ অধিকাংশই গোঁরাঙ্গ কপিল কেশ (fair hair) বিশিষ্ট, তাঁহাদের মস্তক দীর্ঘ, অর্থাৎ মস্তকের প্রাশস্তা ও ঠোঁড়ের অস্থাপাত ঙ্গ এমুন। ইনি উপসংহারে বলিয়াছেন ‘অতএব কুর্দিগণ অর্থাৎ আক্রমণকারীগণের বংশধর, এবং ৩০০ বৎসরেরও অধিককাল আশানাদিগণের ভাষা এবং আকৃতি অটুট রাগিতে সমর্থ হইয়াছেন।’

কুর্দিগণ কোথা হইতে পশ্চিম এশিয়ায় আসিয়াছেন, অর্থাৎ আর্ধ্যগণের আদিম বাসস্থান কোথায়, ডাক্তার লুশন এ প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়া আন্ত হৃদয়গণ—ইউরোপের উত্তরাংশের ‘অবিভাগসিগণের’ (Nordic Race) উৎপত্তি যে দেশে, কুর্দিগণের

উৎপত্তিও সেই দেশে। গোঁরাঙ্গ ও কপিলকেশ ভারতীয় আর্ধ্যগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পাঠে, কুর্দিগান ভিন্ন এশিয়ার আর কোথাও ইহাদিগণের জাতিগণের বংশধর দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইহাণ্ডাও এই একই কিক হইতে—পশ্চিম এশিয়া হইতে—স্বলপথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।” গোঁরাঙ্গ ও কপিলকেশ ভারতীয় আর্ধ্যগণের, আদিম মিটেনিগণের ও কুর্দিগণের পূর্বপুরুষেরা একদেশশাসী ও এক গোত্রীয় হইতে পারেন, কিন্তু আর্ধ্যগণ পশ্চিম এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি?

বোধ হয় এই লুশন সাহেবের বলেই একদিন শ্রীমুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রবাসী পত্রিকাতে লিখিয়াছেন—“যে সময়ে বেদের বর্ণণ দেব জগৎমাতা সন্মিলিত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ এবং যে সময়ে অথর্বের স্বর্গসিগণের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণের পূর্বপুরুষগণ বাসস্থান খুঁজিয়া হযরান হইতে ছিলেন, সেই সময় কালদায়গণ পারস্তোপ-সাগরের উপকূলে ইউফ্রেতিসের মোহানায় সুরমা এরিপুত বনভাগে মন্দির নির্মাণ করিত—ইহা” দেবতার পূজায় রত ছিলেন, সে আজ পূর্ণপূর্ণিমা সাড়ে চারি মহৎ বৎসরের কথা আমি এই ইহা দেবতার দোহাই দিচ্ছাছি। বেদের প্রথম আশ্রম নিকট পৌছাইছেন না। (!) বেদে পৃথিবী সল্লা ইউন আর অল্লাই ইউন বিনেদ বাবু অন্তরঃপ্রদর হইবার অধিকার নাই। স্বর্গে আর্ধ্যজাতির সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ হইলেও মানবজাতির আদি

গ্রন্থ নহে। আমাদের হাতে যে মালমসলা আছে তাহাতে আর্ধ্যজাতির ভারত প্রবেশ তৈলিগণ ও বৃহ পূর্ণ-পূর্ণোত্তর শত বৎসরের ওপরে বৃথা চলিবে না। লইলে জাহা ইতিহাস হইবে না। (১) এটা কার আশা? বোধ হয় ইয়দুগণ আর অধ্যাপক লুশন সাহেবের আশা! কারণ তিনি বলিয়াছেন “কুর্দিগণ ৩০০ বৎসরের অধিককাল আশানাদের ভাষা অটুট রাখিয়াছেন। ৩০০—১২০০—১৮০০ খৃঃ পূঃ বীরেন্দ্র বাবুর অধ্যয়নকাল ১০০—১৫০ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়। এইরূপ পরিষ্রম-কাতর তৈয়ারী বানার প্রত্যাশী ঐতিহাসিক নান লক্ষ্যকল্পগণের দ্বারা এই দেশের ইতিহাস নষ্ট হইতে বিষয়ছে। অক্ষয় বাবু যথার্থই বলিয়াছেন—“যে কেহ লিখিতেছেন—যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন” ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪নং আলোচনা—“অথর্বের লিখিত আছে ইয়দু ভূর্গণ ও যত্নকে সমুদ্রপার করায়া আনিয়াছিলেন। কোনও কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত স্বর্গে বাবৃত “সমুদ্র” শব্দ সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। ভাগ্যের মনে করেন, পৃথিবী সিংহনদের স্বরূপক দক্ষিণাংশকে সমুদ্র সঙ্গা প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণ মনে করিবার একমাত্র কারণ, আখ্যেয়া উত্তর-দক্ষিণদিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, এই দৃঢ়বাক্য সংস্কার। জগৎকালের বক্ত এই সংস্কার ভাগ্য করিয়া বিবেচনা করিলে, স্বর্গে বাবৃত “সমুদ্র” শব্দকে প্রকৃত সমুদ্র অর্থে গ্রহণ করিবার কোনও বাধা থাকে না।”

এইরূপ আলোচনাবলে রমা প্রসাদ বাবু

শিক্ষিত করিলেন—“আরব সাগরের অপার পার হইতে আর্ধ্যজাতিরা ইয়দু উপাসক (ইয়দু কবুত আনিত) অধ্যয়নগণের জলপথে আনিয়া, সৌরাষ্ট্রে উপনিবেশ স্থাপন অন্তর্ভুক্ত নহে।” কিন্তু একটু বিশেষরূপে আলোচনা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন সিদ্ধান্তদ্বার দক্ষিণাংশ বাবৃত সমুদ্র ছিল, এবং সে সমুদ্রকে স্বর্গের বাবৃত সমুদ্র শব্দে প্রস্তুত সমুদ্র অর্থে গ্রহণ করিবার কোন বাধা দেখা যায় না। যে রামায়ণকে তাহার আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া পরিচয় করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, স্বর্গীয় পশ্চিমদিকপূর্ণিমা বানর-দিগকে বলিয়াছেন—সৌরাষ্ট্র, বিশালনগর প্রভৃতি ও পশ্চিমমহাদীপে সুরিঙ্গ সকল, তপস্বী-দিগের অথবা ঈশ্বর, কল্পারমুত গিরিসমুদ্র, তত্রস্তা মনুজ্ঞি অথর্বণ করিয়া পশ্চিমমুদ্রকে কিম্বদন্ত গমন করিলে তিনি নরক প্রভৃতি জলজ সমুদ্রে সমাকুল সমুদ্র দেখিতে পাইবে।

পরে মুচ্যাপত্তন, জটাপুর, অবন্তী অথর্বণ করিয়া যে স্থলে সিদ্ধ ও সাগরের সমুদ্র হইয়াছে, তথায় শতশতবিশিষ্ট বিশাল সোমগিরি দেখিতে পাইবে। পুরাতত্ত্ববিদগণ বর্তমান ‘সোমোদ্যমান’ পর্যন্তকে ‘সোম-সিঞ্জি’ বলেন। স্বতরাং সোমোদ্যমান পর্যন্ত হইতে হালা পর্যন্তের পূর্বদিকে সমস্ত ভূভাগেই রামায়ণের সময় সমুদ্র ছিল। এই স্থানের ভূতরই এখন তাহার সাক্ষ্য দিবে এবং রামায়ণ যে কতদিনের গ্রন্থ তাহাও জানাইয়া দিবে।

রামায়ণ মহাভারতাদির এবং পুরাণ ও কুলগী প্রভৃতির কোন সূত্রই নাই বলিয়া ইহার সে সমস্ত পাঠরূপ গ্রন্থ হইতে অব্যাহতি

* প্রবাসী ১০১৫২৭২ পৃষ্ঠা। † সাহিত্য ১০১১। ১৭৬ পৃষ্ঠা। ‡ সাহিত্য ১০১১। ১৭৬ পৃষ্ঠা।
* A Note on the Ancient Geography of Asia, By Nabin Chandra Das M. A. Page 62 (Note).

লাভ করিয়াছেন। তবে আবহাওয়া হইলে উপর উপর দুই একটা গুও প্রমাণ লইতে ছাড়েন না। কিন্তু সেটা "কিছু নহে" প্রমাণ করিবার গরজে। গৌড়-রাজ্যমাত্র লেখক কুবানন্দ মিশ্রের বংশাবলী এবং মহেশ্বরের নির্দোষ কুলপঞ্জিকায় আশিশ্বরের নাম নাই দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক এই দুই গ্রন্থে আশিশ্বরের নাম না থাকিবারই কথা। কারণ কুবানন্দ্রের গ্রন্থে কুলবিশিষ্ট প্রচলনের পরবর্তী বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাই শিশু পাদুলী প্রভৃতির বিবরণ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে, স্বতরাং ইহাতে আশিশ্বরের নাম না থাকিবারই কথা। মহেশ্বরের নির্দোষ কুলপঞ্জিকাও অনেক পরে সংক্ষিপ্তভাবে রচিত, তাই তাহাতে আশিশ্বরের নাম নাই, কিন্তু তিনি যে গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আছে। হরিমিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে—

কোনাকদেপন্তঃ পঞ্চ বিপ্রা জানতপোমুখাঃ।
মহারাজাশিশুরেণ সমানিতাঃ সপত্নীকাঃ।
ক্ষিত্তির মোহাতিবিশ্ব বীতরাগ যদানিধিঃ।
সৌভর সচন্দ্রাখ্যা আগতা সৌভমগুণে ॥

ইহার পূর্বে আরও স্লোক আছে। কুলজ-
নিকালে এইগুলি কর্তৃক কবিত্তে হয়, স্বতরাং
তাঁহারা যত বাদ দিতে পারেন, তাহাতে ত্রুটি
করেন না। তাই মহেশ "কিত্তিশ" হইতে
বায় গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব এই
দুই গ্রন্থ আশিশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহ প্রমাণ-
স্বরূপ ব্যবহারের অযোগ্য। এরূপ প্রমাণ
উপস্থিত করিয়া পাঠকের মনে দোঁকা ধরাইয়া
দেওয়া ঐতিহাসিকের কর্তব্য নহে। রমা-
প্রসাদ বাবু অবলীলাক্রমে লিখিয়াছেন—
আমার পরীক্ষিত। রাণির কুলগ্রন্থ মধ্যে
কুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশাবলী" গ্রন্থে কাক-

কুল হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমনের কোন
উল্লেখ নাই। কুবানন্দ "নব্বা তাং কুল-
দেবতাং" ইত্যাদি স্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া
আরম্ভ করিয়াছেন—
"আহিতো বহুরুপাধাঃ শিরো গোবর্ধনঃ স্থবীঃ।
গাং শিশো মকরমুখঃ স্বাধনাখাঃ সমা ইমে ॥"
মহেশ্বরের "নির্দোষ কুলপঞ্জিকা"—
"কিত্তিশো তিথিমো (৬) বীতরাগঃ যদানিধিঃ।
সৌভরঃ পঞ্চমধ্যাখ্যা আগতা সৌভমগুণে ॥"
এই পর্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে, আশিশ্বরের
নাম নাই" (গৌড়রাজমালা ৭৭ পৃষ্ঠা)।
মহেশ্বরের স্লোকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহাতে তিনি
হরিমিশ্রের কতক বাদ দিয়া কতক লইয়া-
ছেন। অতএব এই দুই প্রমাণ উপস্থিত না
করাই রমাপ্রসাদ বাবুর উচিত ছিল।
আদালতে উকীল মোক্তারগণ নিজ নিজ
পক্ষের উপকারী কথা বিচারকের পক্ষে সেরূপ
উপস্থিত করেন, ঐতিহাসিকের পক্ষে সেরূপ
করা বড়ই দোষের কথা। তাঁহাদের মনে
কোনরূপ শেঁচ থাকে উচিত নহে। কুলজা-
গ্রন্থকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে,
এই পণ করিয়া ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করা
ঐতিহাসিকের উচিত নহে। নিরপেক্ষভাবে
লিখিতে বলিলে সত্য মিথ্যা সমস্ত আপুনি
ধরা পড়িয়া যায়। ঐতিহাসিকের পক্ষে একটা
ধারণা লইয়া ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করা,
এবং যে কোন উপায়ে সেই ধারণাকে বজায়
রাখিতে চেষ্টা করা বড়ই অজ্ঞান। কিন্তু
আজকাল বৈজ্ঞানিক-প্রণালীর ধূম ধরিয়া
অনেকেই এইরূপ কার্যে রতী হইয়াছেন।
শ্রীমুক রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়
১৩১৯ সালের ১ম গুও প্রবাসীর ৩৯৯ পৃষ্ঠায়
লিখিয়াছেন—

"এখন এমন একটা সময় আসিয়া পড়িয়াছে।
যাহাতে সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ইতিহাস ও
প্রত্নতত্ত্ব বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।
খোঁজ লিপি ও প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রমাণ
হইতেছে যে, লক্ষ্য সেন ১১৭০ খৃষ্টাব্দের
পূর্বে দেহত্যাগি করিয়াছিলেন, কিন্তু কুলগ্রন্থ-
সমূহ হইতে এবং "দানমাগর" ও "অদ্ভুতমাগর"
প্রত্নতত্ত্ব গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ১০৮১
শকে বজাল সেন অভিজিৎ হইয়াছিলেন ও
১০৯৯ শকে তিনি "দানমাগর" রচনা করিয়া-
ছিলেন; স্বতরাং ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে
কিছুতেই লক্ষ্য সেনের মৃত্যু হইতে পারে
না। একপক্ষে লক্ষ্য সেনের সমসাময়িক
খোদিত লিপি ও মুদ্রা প্রত্নতত্ত্ব ও অপর পক্ষে
খৃষ্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর অন্ধরে লিখিত
কর্তৃকগুলি কুলপঞ্জা, ধর্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষের
গ্রন্থ। কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলি অস্বাভাবিক
ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবার যোগ্য
হয় নাই, কিন্তু "দানমাগর" বা "অদ্ভুত-
মাগর"ের বচনমূল্য অসংস্কৃত লিপি-
যোগ্য। বোধাহতের, কাশ্মীরী বা বঙ্গদেশের
সমস্ত "দানমাগর" ও "অদ্ভুত-মাগর" গ্রন্থই
আধুনিক অন্ধরে লিখিত, ইহার মধ্যে
একখানি গ্রন্থও দুইশত বৎসরের অধিক
প্রাচীন নহে। যদি সত্য সত্যই রাজা বজাল
সেন এই গ্রন্থদ্বয়ের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা
হইলে বুদ্ধিতে হইবে যে শত শত লিপিকারের
হস্তে লিখিত হইয়া তাঁহার পরে আধুনিক
নাগরী বা বঙ্গাকরে এই গ্রন্থদ্বয় লিখিত হই-
য়াছে। বজাল সেনের মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টশত
বর্ষ অভীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে এই গ্রন্থ
কর্তব্যার লিখিত হইয়া তবে বঙ্গ বা নাগরী
অন্ধরে লিখিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব।
বজাল সেন এতদেখে

অভিজ্ঞাত্যভিমানের প্রতিষ্ঠাতা। আভি-
জ্ঞাত্যের অপরোক্ষে এখনও পর্যন্ত ইউরোপীয়
সভা সমাধে "কৃত্তিম বংশ-পঞ্জিকা" প্রস্তুত
হইতেছে। সেই অভিজ্ঞাত্যভিমান রক্ষা
করিবার জন্ত এতদেশীয় কত শত কুলশাস্ত্র
রচনা করাইয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে
পারে। কুলগ্রন্থে উল্লিখিত কোন তাথি
সত্যপ্রমাণ করাইবার জন্ত, কোন ব্রাহ্মণ হয়
ত "অদ্ভুত-মাগর" ও "দান-মাগর"ে মানবাচক
স্লোক কয়টি রচনা করিয়া যোগ্য করিয়া-
ছিলেন, সেই গ্রন্থসমূহের অংশলিপি নানা দেশে
বীত হইয়াছে ও তাহা হইতে শত শত
অংশলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যখন
দেখিতে পারিবার হইতেছে যে, একখানি গ্রন্থে
উক্ত স্লোকগুলি নাই, তখন সেগুলিকে
প্রশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব আর কিছু বলা চলে না।
"দানমাগর" ও "অদ্ভুত-মাগর" ব্যক্তিত্ব "সমুজ্জ্বল-
কর্মমতে" এইরূপ মানবাচক কয়েকটি স্লোক
আছে, কিন্তু সেগুলিও বিশ্বাসযোগ্য নহে।
যদি কেহ কোনান্নি সন্দ্ব্যাকর নন্দী বিরচিত
"রাম পান" চরিত্রের জায় অথবা মহীপাল
দেব, নরপাল দেব, বিগ্রহপাল দেব বা
হরিশ্চন্দ্র দেবের রাজ্যকালে লিখিত "ঋত-
সাহসিকা" প্রজাপারমিত্তার দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থে
পূর্বোক্তগুলি স্লোকগুলি আবিষ্কার করিতে
পারেন, তখন উহা ইতিহাসক্ষেত্রে সামান্য
প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। কোন স্থান অন্ধ-
কার থাকিলে আলোকের আবশ্যক হয়, কিন্তু
স্বভাবতঃ আলোকিত ক্ষেত্রে আলোক আনিলে
তাঁহা রান হইয়া যায়। সেইরূপ অন্ধরতত্ত্ব
বা মুদ্রাতত্ত্ব প্রমাণের বিবন্ধে আধুনিক
সাহিত্যের প্রমাণ উপস্থিত করিলে, তাহা গ্রন্থ
হইবার আশা থাকে না। বাস্তবিক-ভিত্তি
বজাল সেন সন্দেহ নৃতন কথা বলিলে তাহা

সহজে গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা হয় না। চিরশ্রুত-
নামা 'দান-সাগর' ও 'বিভূত-সাগর' গ্রন্থদ্বয়ে
কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিলে স্রবশে বন্ধু বাধা
লাগে। বংশগত আত্মজাত্যভিমান আশিগা
'আমরিগকে' আচ্ছন্ন করে। যদি কোন
স্বদেশীয়, উর্দ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের কোন অংশকে
পরবর্তীকালের রচিত বলিতে চাহে, তাহা
হইলে তাহাকে কল্যাণ্ডার বসিয়া মনে হয়।
জীবনের লক্ষ্য সার সত্যের অসুসন্ধান নেক-
পথ হইতে অপসৃত হয়, হস্তগত জাত্যাভি-
মানজড়িত খটনার বিশেষণ, বিদেশীয়ের
হস্তেই অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়।"

ইনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—
"শশাঙ্কের শত শত স্বর্ণমুদ্রা বঙ্গদেশের
নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার কতক-
গুলিতে 'শশাঙ্ক' এবং কতকগুলিতে 'নরেন্দ্র
গুপ্ত' নাম পাওয়া যায়। ডাক্তার বুলার
বলিয়াছেন যে 'হর্ৎফিল্ডের' একখানি হস্ত-
লিখিত গ্রন্থে শশাঙ্কের স্থানে 'নরেন্দ্র গুপ্ত'
নাম দেখিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়,
তাহা হইলে শশাঙ্কের অপর নাম 'নরেন্দ্র
গুপ্ত' এবং তিনি মগদের গুপ্তবংশ সম্ভূত।
মগদের গুপ্তবংশ বংশের কোনও খোদিত
লিপিতে অজ্ঞাপি শশাঙ্কের বা নরেন্দ্র গুপ্তের
নাম আবিষ্কৃত হয় নাই।"

রাখাল বাবু লক্ষণ সেনের সময় নির্ণয়
করিতে পারেন নাই। ১১০ পৃষ্ঠাস্থের
পরেও বহু বৎসর লক্ষণ সেন জীবিত
ছিলেন। নিজের অক্ষমতা বৃদ্ধিতে না
পারিয়া, প্রাচীন প্রমাণগুলিকে 'অন্তল জলদি-'
জলে ডুবাইয়া দিয়াছেন। ভাবেন নাই যে
একখানা হস্তলিখিত পুথিতে যদি কোন স্লোক
না থাকে, আর সেই স্লোক যদি শত শত

হস্তলিখিত পুথিতে থাকে, তবে বৃদ্ধিতে
হইবে, হয় ত সেই স্লোকটি খেয়ালের বশে,
প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধিতে বা পারিষদ, স্লোকটি
বাদ দিয়াছেন—ভাট্টান নাই যে রাম চরিতের
উপর জোর দিয়া সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রকে
ভ্যাগ্যযোগ্য বলিয়াছেন, সেই রামচরিতই
ভ্যাগ্যযোগ্য, কারণ ঠিক সমসাময়িক তা-
দ্বীশান সহ তাহার মিল নাই।—ভাবেন
নাই যে, বুলার সাহেবের নিকট যে একখানি
হস্তলিখিত পুথিতে "নরেন্দ্র গুপ্ত" লিখিত
চিনিয়া, শশাঙ্ককেই নরেন্দ্র গুপ্ত করিয়াছেন,
সেই পুথিতে স্লোক খেয়ালের বশবর্তী হইয়া
এ নামটি লিখিতে পারেন, হস্তগত শত শত
পুথিই ঠিক হইতে পারে, একখানি পুথি ঠিক
নাও হইতে পারে। এইরূপ স্লোক দ্বারা
প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হওয়া সম্ভবপর হইত।
ইহার রব প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের অন্তরায়
বন্ধন। ইহার পরিশ্রম করিয়া, পাকা
অজরার যাহা তত্ত্ব চিনিয়া বাহির করিত
নামাজ, অথচ পাকা অজরী বলিয়া পরিচয়
দিতে উদ্বিগ্ন। তাই এইরূপ লোকের দ্বারা
ইতিহাস নষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

বর্তমান ইতিহাসিকগণ নিত্যন্ত অসমকায়।
তাই তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ ও পুরাণাদি
না পড়িয়াই বলেন তাহাতে কিছু নাই—
আবার যাহা লইতে ইচ্ছা করেন, তাহার
ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই ঠিক বলিয়া
এহণ করেন। রাখাল বাবু মাসীণী পত্রিকার
১০২ সালের আখ্যাত মাসের সাখ্যায় আমার
আশিষ প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ করিয়াছেন,
তাহাতে তিনি ডাঃ ঠার্নের রচিত 'রাজতরঙ্গিনী'
অনুবাদের ত্রুটি। আমাকে পাঠ করিতে
অহরহা করিয়াছেন। আমি ঠার্ন সাহেবের

এই ভূমিকার বিষয় বিশেষরূপে অবগত
আছি। ইনি চীন ইতিহাসের সহিত মিল
করিবার জন্য রাজতরঙ্গিনীর সময় ২৪ বৎসর
পরিমাণ দিয়া রাজতরঙ্গিনীকে একেবারে
মুটি করিয়াছেন। আমাদের দেশের 'তৈজারী
পানাস্ত্রাস্ত্রী' ইতিহাসিকগণ অবনত মস্তক
ঠার্ন সাহেবের মত গ্রহণ করিয়া আত্মদেীর
সহিত তাহা প্রচার করিতেছেন, এবং পণ্ডিত
কল্লন বেচারীর উপর কতই কঠোর মন্তব্য
আড়তেছেন। কিন্তু যদি তাহারা একটু
পরিশ্রম করিয়া ঐ বিষয় আলোচনা করিতেন,
তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন ঠার্ন সাহেব
বিষয় ভ্রমে পড়িয়াছেন এবং এহেদশীয় যে
যে ঐতিহাসিক তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন,
তাঁহারাও সেই ভ্রমে পথে চালিত হইয়াছেন।

কিন্তু এ আলোচনার পথ তাঁহারা নষ্ট করিয়া
বসিয়া আছেন। রামায়ণ কিছু না, পুরাণ
কিছু না, মহাভারত কিছু না ইত্যাদি "কিছু
না" শব্দদ্বারা তাঁহারা প্রমাণগুলি অন্তল
জলযোগে ডুবাইয়া দিয়াছেন। পুরাণের
সাহায্যে বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করিলে
দেখিতে পাইবেন ঠার্ন সাহেব কোন স্থানে
কি ভুল করিয়াছেন। তাই বলি ঐতিহাসিক
যদি পরিশ্রম করিতে কাতর হন, তবে তাঁহার
দৃষ্টি থাকাই উচিত। যিনি ঐতিহাসিক
হইতে ইচ্ছা করিবেন তিনি সমস্ত গ্রন্থই
হুখে থাকাই উচিত। যিনি ঐতিহাসিক
জগৎকেই তিনি সমস্ত গ্রন্থই
মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। "যেখানে
দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও
পাইতে পার লুকান রতন।" এই বাক্যটি
তিনি সর্গদা মনে রাহিবেন, অথবা রাখাল
বাবুর মত বংশের ইতিহাস উদ্ধারের ভার
বিশেষ্ট্রয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ
করিবেন।

রাখালবাবু কিন্তু অন্তরূপে ইতিহাসের

অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি
এখন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক সাহিত্যিক।
এ পথ মন্দ নয়, কারণ এখন তিনি উপভাসের
আবরণে ইতিহাসের সর্গনাশ করিলেও
উপভাস বলিয়া আশ্রয় করা করিতে পারিবেন।
তাই "শশাঙ্ক" নামক উপভাসে দামোদর
গুপ্তের-পুত্র মহাসেন গুপ্তকে মগধে বসাইয়া-
ছেন, শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত ও মাধব গুপ্তকে
তাঁহার পুত্র করিয়াছেন। শানীশ্বররাজ
প্রভাকর বর্দনকে সম্রাট মহাসেন গুপ্তের
ভাগিনেয় করিয়াছেন। যিনি তাম্রশাসন
এবং শিলালিপি মধ্য বসিয়া থাকেন,
তাঁহার দ্বারা ইতিহাসের এমন সর্গনাশ এই
বংশেরই শোভা পায় এবং এরূপ লেখকের
আদর এই বংশেরই হয়।

রাখাল বাবু প্রবাসীতে "ধর্মপাল" নামে
একখানি উপভাস ক্রমশ প্রকাশ করিতেছেন।
তাহাতে তিনি গোপালকে বরেন্দ্রের রাজা
করিয়াছেন। তাঁহার একথাও আমার সমর্থন
করিতে পারি না। তিনি তাঁহার কল্পিত
বরেন্দ্র রাজ গোপালের রাজধানী করিয়াছেন,
মালদহ জেলার অন্তর্গত গোড়া। বোধ হয়
এই সাহসেই তিনি গোপালকে "বরেন্দ্ররাজ"
করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে ঐ
গোড়া কতদিনের?

ইতিহাসিকেরও এ চিত্র আবার দেখিতে
ইচ্ছা করি না। তাম্রশাসন ও শিলালিপি
মধ্যে বসিয়া থাকিলেই হয় না, ঐতিহাসিক
হইতে হইলে কঠোর পরিশ্রম কুরা চাই।

অক্ষয় বাবুখার্বই বলিয়াছেন—"আবিষ্কার
চেষ্টার স্বেচ্ছা হইতে কার্যের সম্পর্ক রক্ষা
অপরিসীম—অসুসন্ধানের জন্য অধ্যয়ন এবং
অধ্যয়নের জন্য অসুসন্ধান। একের অভাবে
অপর কার্য অসম্ভব হইতে পারে না।"

আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ অধ্যয়ন-
রেশ, খোঁকার করিতে একেবারে নারাজ।
তাহারা দেশ-কাক্সি বিদেশীয়ের পক্ষে দিয়া
কেবল অস্বপ্ন করিয়া বাহাদুরী লইতে চান।

ঐতিহাসিকের এ রীতি নহে। ঐতিহাসিক
যাহা গ্রহণ করিবে তাহা যথাসম্ভব যাচাই
করিয়া লইবে; কেবল অস্বপ্নে ভ্রম
থাকিবার সম্ভাবনা বেশী। (ক্রমশঃ)

ঐখিনিন্দুবিহারী রায় ।

অভিব্যক্তির কারণনির্ণয়ে ল্যামার্কীয় সিদ্ধান্ত

"Nothing in natural history seems to be surer than evolution, and yet the final solution of evolutionary problems defies the most subtle skill of the trained analyst of nature's order."

বিবর্তনশাস্ত্রের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-
গণ সম্পূর্ণরূপে নিম্নলিখিত; তবে কি
ভাবে যে এই বিবর্তন সংঘটিত হইতেছে
তদ্বৎসর্বে এখনও কোন অধিতীয় মতবাদ
প্রচারিত হয় নাই। কারণের প্রকৃতিই
কাঁথের প্রতিনিয়ামক, অতএব প্রাণবিজ্ঞান-
বিদগণ সম্প্রতি অভিব্যক্তির কারণ নির্ণয়ে
মনোনিবেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রাকৃতিক
নির্ভাচনাবাদই অধিকতর প্রতিষ্ঠাবান। এই
মতবাদ চার্লস ডারউইন ও ওয়াডেনসের
স্বাধীন পথ্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফল।
আলফ্রেডের বিষয় ইহার উভয়েই ম্যালথাসের
"Essay on population" পাঠ করিয়া
একই ভাবে প্ররোচিত হইয়াছিলেন।
"Weismann is more Darwinian than
Darwin himself" অর্থাৎ স্বয়ং ডারউইন
অপেক্ষা ভাইজম্যান অধিকতর ডারউইন-
বাদী—এই বাক্যটির তাৎপর্য অবধারণ
করিতে বাইরা আমরা দেখিতে পাইব
প্রাকৃতিক নির্ভাচন মূলে টিকিই রহিয়াছে;
তবে পরবর্তী উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান

সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ক আবিষ্কারের ফলে কি
প্রকারে প্রাকৃতিক নির্ভাচন কাঁথাকারী হয়
তদ্বৎসর্বে নানা পরস্পরবিরোধী গবেষণার
সৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্বৎসর্বেও কতকগুলি মত
অস্বাতন্ত্র্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

জী বাপুটিটে পিসু (১৭৪৪—১৮২২ খৃঃ)
সাধারণতঃ শেভালিয়ে ড্যে লামার্ক নামে
খ্যাত, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসগরের Jardins
des Plantes (জার্ডেন ডে প্লাঁট) নামক
বৈজ্ঞানিক উদ্যানে প্রাণবিজ্ঞানের অধ্যাপক
পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার উদ্যম ও আগ্রহের
ফলে অনতিকালমধ্যেই প্রাণবিজ্ঞানের
শ্রেণিবিভাগমাংশে এক নতুন যুগ প্রবর্তিত
হইল। জাতির স্থিরতাহুমৌলিক প্রাচীন
বিধাসের মূলে তিনিই প্রথমতঃ সূত্রাধাত
করেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম জাতীয়
চরিত্রের চাক্ষুষ উপলব্ধি করেন। এই
মুহূর্ত্তেই বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা-
লাভ করে।

বিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে
য্যারিটেটেল ও ডারউইনের মধ্যবর্তীকালে

ল্যামার্কই সর্বপ্রথম। এসম্বন্ধে তাঁহার
পূর্বসূরী বা সুসাময়িক কোন গ্রন্থেরই
তত্ত্বপ্রণীত, Philosophie Zoologique
(ফিলোসোফি জুজোলজি) এর সহিত
তুলনা হইতে পারে না। যেক্ষণ অবস্থা-
বৈধম্যে তিনি এই কাঁথ্য সমাধান করেন তাহা
চিন্তা করিলে কেহই এই ধোমানের প্রশংসা
না করিয়া থাকিতে পারে না। অধিকন্তু
তাঁহার উদ্ভিদবিজ্ঞান হইতে অল্পকালপূর্বে
মনোনিবেশ করার অন্তরকালমধ্যেই এই
গ্রন্থগ্রন্থন শেষ হয়। তিনি যেক্ষণ পক-
পাক্তত্বের সহিত সমালোচিত হইয়াছেন এক্ষণ
আর কেহই হন নাই। অতি-প্রশংসা ও
স্বল্প-প্রশংসা উভয়ই তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে।
তথাপি আশ্চর্যের হিষ্কেল ও অজ্ঞাত মহোদয়-
গণ, তাঁহার স্বদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ ও বর্তমান
কালে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বহুসংখ্যক
বৈজ্ঞানিক লেখকের নিকট তিনি স্নায়নীয়।
এমন কি স্বয়ং ডারউইন তাঁহার পক্ষসমর্থন
করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদি হারকীট
স্পেন্সারের গবেষণার কেন্দ্রস্থল।

যাহাই হউক, ল্যামার্ক-প্রচারিত কারণ-
সমূহ বিবর্তনবাদে বর্ত্তকঃ জিহ্মাশীল কি না
বর্ত্তমান প্রাণবিজ্ঞান তদ্বৎসর্বেই সন্নিহান।
যাওঁবিকই যদি বিবর্তনমার্গে ইহাদের কোন
মূল্য না থাকে তথাপিও ল্যামার্ক-প্রাণ-
বিজ্ঞানের মতবাদসমূহের ইতিহাস প্রধান
শুস্ত। আর যদি তদ্বৎসর্বেই হেতুবাদ
অভিব্যক্তির প্রকৃতি-নিয়ামক-রূপে প্রমাণিত
হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যে তাঁহার
প্রতিষ্ঠা অধিকতর জালসমান হইয়া উঠিবে।
এই স্নায়নীয় আসন ডারউইনের বড় নিয়ে
হইয়া ন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তত্ত্বপ্রণীত Hydrogeo-

logy (হাইড্রোজোলজি) প্রকাশিত হয়।
এই গ্রন্থে তাঁহার ভূতাত্ত্বিক যুক্তিরাশি লিপি-
বদ্ধ হইয়াছে। এই স্নানেই সর্ব প্রথমে
Biology বা প্রাণবিজ্ঞান শব্দ ব্যবহৃত হয়।
এই বৎসরেই Recherches sur l'organi-
sation des corps Vivants (রেশার্শ্
দু কোর্পস্‌ভিভান্সিওঁ ডে কোর্পস্‌ভিভান্সিওঁ)
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রাণোৎপত্তি,
জীবিত পদার্থের বন্ধনশীলতা; এবং ইহার
ক্রমবিকাশশীল উপকরণাশি আলোচিত
হইয়াছে।

তিনিই সর্বপ্রথমে অতিপ্রাকৃতিক সৃষ্টি-
বাদে আস্থাশীল হইয়া অততর কারণ নির্ণয়ে
নিযুক্ত হন। তিনি বলেন প্রাকৃতিক ব্যাপার
সমূহে কতকগুলি বিধান নিয়োজিত
রহিয়াছে। এই বিধানরাশি প্রাণোদ্ভবের
প্তরে প্তরে প্রকাশ পাইতে থাকে। এইরূপে
আমরা দেখিতে পাই যে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক
শক্তিপুঞ্জ তাহাদের নিয়মাবলী আশ্রিত।
প্রকৃতি অপ্রতিহত প্রভাবে ক্রমশঃই উচ্চ
হইতে উচ্চতর জীবের সৃষ্টি করিতেছে।
বাহ্যিক শক্তিপুঞ্জ এই নিয়মের ব্যতিক্রম
করিতে পারে না। তবে তদ্বারা বহুবিধ
পরাবর্তন সাধিত হয়। তাহা হইতেই
প্রাণের রেখার বা জীবীভাব্যক্তিতে অসংখ্য
শাখা প্রশাখা উৎসব হয়। প্রত্যেক জ্যোতিষ
যে বিশেষ বিশেষ স্বভাব ও জীবনযাত্রার লক্ষ
সহ্য হইয়াছে তাহা তিনি সর্বৈব স্বীকার
করেন। তাঁহার মতে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি-
বিশিষ্ট জীবসমূহ তাহাদের স্বভাবের সন্মাত
ফল মাত্র। গগনবিহারী প্রাণিগণকে গগন-
পদার্থটানের লক্ষ ধনুঃপ্রদান করা হয় নাই,
শুধুমাত্র উজ্জীন হইবার চেষ্টাই তাহাদের
পক্ষোৎপাদনের কারণ।

ফিলোসোফিক জুভেনিঙ্ক এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Histoire Naturelle (ইষ্টোয়ায়ু নাতুইর ইষ্টোয়ায়ু) গৃহস্থে অভিব্যক্তির, প্রামাণিকতা, প্রকৃতি ও তাহার উৎপাদক সপক্ষে তৎকালোচিত চূড়ান্ত মীমাংসা করা হইয়াছে। এগুথকে নিম্নলিখিত স্বতঃচলিত সর্বপ্রধান :—

প্রথম স্বতঃ—পরাধার্ম্যই তদুপনিহিত প্রাণের শক্তি কর্তৃক বহিরাবতার প্রাপ্ত হয়; এবং প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই এই শক্তিদ্বারা সেই কীবের স্বভাবোপযুক্ত নীমায় নীত হয়।

দ্বিতীয় স্বতঃ—যে কোনও অঙ্গোৎপত্তি জীবনযাত্রার নূতন অভাবপূরকতার ফল। এইরূপ অভাব সর্বদাই অসূচ্য হইতে থাকে।

তৃতীয় স্বতঃ—অবশিষ্টের সূচক ও কার্যকারিতা উহার ব্যবহারের সহিত ও তৎপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট।

চতুর্থ নিয়ম—জীবনযাত্রাকালে জীব যে গুণদারের অধিকারী হয় তাহা সেই ব্যক্তি বিশেষের উপর তো প্রভাব বিস্তার করিতেই তদ্ব্যতীত তত্ত্বংগমসমুত্তমযোগে ঐকল গুণ উত্তরাধিকারস্থলে প্রবর্তিত হইবে।

“এ সকল গুণ উত্তরাধিকারস্থলে প্রবর্তিত হইবে”—এই বাক্যটিকে ল্যামার্ক স্বতঃস্বিক্ত ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ বৈহিক স্যবর্জন (adaptation) ভবিষ্যৎবংশাবলীর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করে কি না সে সপক্ষে তিনি আদৌ বিচার করেন নাই। এই স্বতঃস্বিক্ত বাস্তবিকই যদি সত্য হয় তবে অভিব্যক্তির কারণ ও গতিনির্দেশে ল্যামার্কীয় সিদ্ধান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু যত কিছু বিদূষ তাহা ঐ স্থলেই।

কি কি উপায়ে আমাদিগের বৈহিক পরাবর্জন সংঘটিত হইতেছে?

- (১) বাহ্যিক আবহাওয়া
- (২) আভ্যন্তরিক অবস্থা
- (৩) অঙ্গাদির ব্যবহার ও অব্যবহার; এবং
- (৪) নানাবিধ পীড়া। ইহা (১) ও (২) এর অন্তর্গত।

কিন্তু উক্ত সত্যই এই কয়টা প্রভাবের অধীন। ল্যামার্ক বলেন যে প্রাচীন যুগেরে অভাবপ্রযুক্ত বাস্তবী উদ্ভিদ ও নিম্নস্তরস্থ সমুদ্র জন্তই বাহ্যিক আবহাওয়া দ্বারা বিদগ্ধ হইতেছে। ইহাই উৎসাহের পরাবর্জনের একমাত্র কারণ।

তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ কেবলমাত্র ব্রাহ্মযুক্ত জন্তর উপর প্রভাবশালী। ইহাদের মধ্যে শৈথিল্যের অর্থ্যাৎ অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারজনিত পরাবর্জন জন্তরগতের উৎপত্তির “একমাত্র দ্বিতীয় নীতি” হইত। পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটিলে জন্তরগত নূতন রকমের অভাব অসূচ্য হয়। এই নবপ্রবর্তিত অভাব সমূহ উপলব্ধি করণান্তর জন্তরগত স্বতঃপ্রসূত ইহা তদ্রিকারকণে প্রবর্তন হয়। প্রতরা বাধ্য ইহা কোন অঙ্গের অভিব্যক্তির ঘট; ও কোনটির বা একবাহারী বাবহার হয় না। এই অব্যবহৃত অঙ্গ ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে; এবং ইহার ক্ষুদ্রতর স্থাননে প্রবর্তিত ইহা শেষে বিলোপপ্রাপ্ত হয়। তিমির দৃষ্টিহীনতা, নানাপ্রকার জলজন্তু ও কর্মদেবী মৎস্যাদির ক্ষুদ্রতর অব্যবহার প্রসূত। সন্তরগণের প্রচল হইতে জলচর পক্ষীমূলের জলময় পদোৎপত্তি ইহাও। বেলোজমি ও চরনিবাসী পক্ষীসমূহ তাঁরঙ্গলগ্ন শিকার ধরিবার নিমিত্ত অল্পক্ষণ যত্বান। স্বভাবা সৃগাশাস্ত্রনের নিমিত্ত তাহারিগণক লখনান হইতে হয়। ফলতঃ তাহারিগণের

পদস্থ্য স্বার্থ। জিহ্বারের অতি দীর্ঘ কর্তৃ-
শেষ ও বচোপ্রসূত। ইহার স্তরের পত্র
চর্চন করে। হিঃপ্রদগ্ধণের হৃদয় নবর
সৃগাধারণের প্রসাংগ্য। ইহা ল্যামার্কের
যুক্তির গতি।

ইহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি—যে
জন্তরগত পারিপার্শ্বিক সপক্ষে সত্যতঃ জ্ঞান-
বান ও তাহাদের জীবন ধারণের গতি তাহারা
সমাক্র উপলব্ধি করিতে পারে। ভাবুউইউ
একস্থানে বলিয়াছেন “Heaven forbidd
me from Lamarck's nonsense of a
tendency to progressive adoption
from the slow willing of the animals.”
বস্তুতঃ ল্যামার্কের মতাহুগারে
জন্তরগতের পরাবর্জন যদি “slow willing
of the animals” (জন্তরগণের ক্ষীণ উদ্ভি)
এর উপর নির্ভর করে তাহা হইলে তুলনা
ক্ষম মনোবিজ্ঞানবিগ্ণ তৎকালীন গৃহবিবাদে
মাত্রিয়া উঠিতেন। লইডু যোগ্যুগা বলিবেন
“In no case may we interpret an
action as the outcome of the exercise
of a higher psychological
faculty, if it can be interpreted as
the outcome of the exercise of one
which stands lower in the psycholo-
gical scale.” পক্ষান্তরে রোমেনিস যুক্তি
প্রমাণ করিতেন “Common sense
will always and without question
conclude that the activities of
organisms other than our own
when analogous to those accom-
panied by certain mental states are
analogous mental states.” রোমেনিস
এইরূপ মতের পোষক হইলেন ও তিনি কখনই

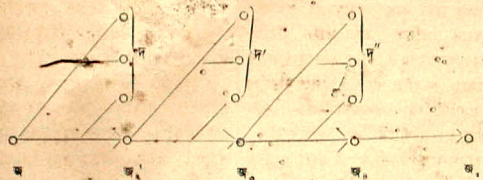
সমগ্র জন্তরগত স্যমানভাবে মানসিক ধর্ম-
রাগিতে বিবৃতিত করেন নাই। তিনি
বলিয়াছেন “Analogous to our own.”
মহাই হউক শেষঃ রোমেনিস একবারেই
ল্যামার্কবাদী নহেন।

এই ত মনোবিজ্ঞান সফলীয় আপত্তি।
এক্ষেণে আমরা বৈহিক পরাবর্জনের বংশপার-
শ্রাণের সত্যতা সপক্ষে আলোচনা করিব।
খরা হউক বৈহিক পরাবর্জন সমূহ উত্তরা-
ধিকারস্থলের স্থাননে প্রবর্তিত হয়। ইহা
সম্বন্ধে ল্যামার্কের নিম্নলিখিত নিম্নলিখিত কৃতিপয়
ব্যাপার সপক্ষে কোনই উত্তর রিতে
পারে না।—

(১) পক্ষিশ্রেণির অধির অত্যাধিক
লম্বোৎসাহাদান। লম্বোৎসাহঃ দূততর। আদৌ
লাঘব হয় নাই। ফুঃ ফুঃ হইতে কেশবৎ
স্বয়ং বায়ুবাধী প্রণালী-সমূহ অস্থিমধ্যে বিস্তৃত
বলিয়াই উহা অতিশয় লম্বু। একপক্ষের
ব্যবহার ও অব্যবহার বিরূপে সংসাদিত
হইতে পারে?

(২) খদ্যোৎপন্ন প্রাণীর আলোক-
বিধায়ক অঙ্গোৎপত্তি; এবং চক্ষু, কর্ণ ও
নাসিকার আয় বর্ণপর্যায়ের উচ্চ অঙ্গ
সমূহেরই বা উৎপত্তি ব্যবহার ও অব্যবহার
দ্বারা কি প্রকারে ঘটিতে পারে? ব্যবহার ও
অব্যবহার কেবলমাত্র ভূতপূর্ব অঙ্গের
সঞ্চার ও প্রসারণ দ্বারা যতদূর সম্ভব জন্তর
পরাবর্জন আনয়ন করিতে পারে।

(৩) বর্ণবিচ্ছিন্নতা।
ইত্যাদি।
বৈহিক পরাবর্জন বংশের উপর কি প্রকারে
প্রভাবশালী হইতে পারে তাহা আলোচনা
করিতে হইলে আমাদিগকে সর্বদাই নিরন্তর
চিত্রিত স্মরণ রাখিতে হইবে।—



(কোলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই. বি. উইলসনের প্রস্তুত চিত্রানুসূপ।)

জ, সম্মিলিত কোষ (অণু + শুক্রকোষ); এই জগোৎপত্তির পরকাল পরেই সাবিত্ত্ব কোষ-মণ্ডল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে জ, ও দ। স্বাভাবিক জগে জ, অণুকোষ, ও পুষ্কাতীয় জগে ইহা শুক্রকোষে পরিণত হইবে। দ শ্রেণীর কোষমণ্ডল হইতে বিভিন্ন প্রকার দৈহিক কলা উৎপন্ন হইয়া পূর্ণাবয়ব সম্বন্ধে পরিণত হয়। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে জন্মগত ও এত শৈশবাবস্থায় জ, অবশিষ্ট কোষ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে যে দৈহিক কলানির্মাণের তখন মাত্র ও স্বরূপাত হয় নাই। তৎপর ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে পরবর্তী বংশ দ, জ' হইতে উৎপন্ন হইবে। দ এর সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। জ, ইত্যাদিও জড়প।

ল্যামার্ক-বিবৃত পরাবর্তনবাদি জ, দ, দ', দ'' ইত্যাদি কোষ-সম্বন্ধীয়। আর পরবর্তী বংশাবলী উৎপন্ন হইতেছে জ, জ, জ, ইত্যাদি হইতে। স্রুতরা দৈহিক পরাবর্তনের বংশপরম্পরের অর্থ হইতেছে ঐ পরাবর্তন সমূহ জ, জ, জ, ইত্যাদি কোষের বিকৃতি সাধন করিবে। কিন্তু ইহা কি উপায়ে সম্ভবপর? কারণ প্রথমতঃ দ, দ' ইত্যাদি দেহগঠনকারী কোষমণ্ডলী বিভিন্ন কলায়

পরিণত হইবার বহুপূর্বেই জ, জ, ইত্যাদি জননকোষ পূর্কোঙ্ক কোষগুচ্ছ হইতে সমাক-প্রকারে পৃথক হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ণাবয়বের প্রাণপদের সহিত পৃথকগৃহীত অণুকোষ ও শুক্রকোষের প্রাণপদের সংযোগ নির্বাহ করিতে যাইয়া লিনিয়াস, ডোকাডো, স্পেন্সার, হাকে, হিস, স্ক্রুপ, ডারউইন, গাল্টন, জক্স, নেগেলি, কোলিকার, ডে ভ্রিন্স, হার্টলিগ ও বাঁকোশ্রমূহ বিখ্যাত প্রাণবিজ্ঞানবিদগণ পরীক্ষা বা গবেষণা কোন উপায়েই সমজ্ঞাসাধন করিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রতিবেকই এক একটা বিশিষ্ট মতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর 'অস্ট্রেলি-চিক' প্রাণবিজ্ঞান মহাসমিতির 'লাইডেন-অধিবেশনে ফ্রাঙ্কলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্যত্ব অধ্যাপক আউগুস্ট ভাইজমান "জননকোষে নির্বাচন স্বয়ংপরাবর্তনের উৎপত্তিবিষয়ক" (Germinal Selection as a Source of Definite Variation) নামক এক দীর্ঘ নিবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে দৈহিক প্রাণপঙ্ক ও জননকোষ প্রাণপঙ্কে যখন কোন সংযোগই নাই তখন যে পরাবর্তনপ্রভাব অব্যাহত

সাদিত হইতেছে অর্থাৎ ঐ পরাবর্তন সম্বন্ধে প্রবর্তিত হয় তাহা নিশ্চয়ই জননকোষোৎপন্ন। কারণ জননকোষ ধারাই গর্ভোৎপাদন হইয়া থাকে। এক্ষণে নানাবিধ পরাবর্তনবিশিষ্ট জননকোষবিধের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন কিরূপ চলিতে থাকে। ইহারই ফলে পরবর্তী বংশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহা উত্তর-ভাউইনবারিগণের মূল বক্তব্য। ইহা ধরাই ভাইজমান স্বয়ং ডারউইন হইতে অবিকতর ভাউইনবারী। যে ক্ষেত্রে ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন

আবিষ্কার করিলেন দৈহিক পরাবর্তনের বংশপরম্পরের প্রভাব হইতে তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পূর্ণবয়স নাই।

সম্প্রতি উত্তর-ল্যামার্কীয়গণ যে কতিপয় পরীক্ষাসাধন করিয়াছেন তাহার মধ্যে ডারউইন সেকার্ডের 'মিনিপিপ' নামক দস্তুর জন্তর সহিত পরীক্ষা প্রদান। ইহা বিধের ফল প্রতিপাদ্য বিষয়ে বড় অস্বকুল নহে। বস্তুতঃ বীদি পিতামাতার দৈহিক বিকৃতি সম্ভাবনগ প্রাণ হইত তাহা হইলে আজ জগৎ ও উদ্ভিদগণের দৃশ্য কি ভীষণই না হইত।

শ্রীযুগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি, এ, ।

বঙ্গ-সাহিত্যে সেখ সাদি

এক সেখ সাদির আবির্ভাবে চিরদিনের জ্ঞান পারস্তের সাহিত্যগগন আলোকিত ও কাব্যকানন মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অনন্ত কালের ক্ষেত্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে, পারস্তের মহাকবি সেখ মসলে 'উকীন' সাদির কবিত্বনিচয় আজও সেইরূপই নূতন-সেইরূপই বিশ্বজন-চিত্তস্বারা। রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে আজ পারস্তের-তত্ত্ব 'ভাউল-বাস্তানোমিত দীপ-নিধার জায় বাগদান কলেবরে আপন নিয়তির প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু সেখ সাদির সিংহাসন অধ্যাপি আপন মহিমায় আপনি সমুজ্জ্বল ও হিমাদ্রিৎ সেইরূপই অটল অচলভাবে, দুঃখায়মান। পৃথিবীর কোন রাজচক্রবর্তীর সাধ্য নাই তাঁহার সেই নিঃশালন অধিকার করেন। সেই এক সেখ সাদি,—যাঁহার জনমে পরিণত দেশ দখ ও কাব্যরঙ্গিণীপুংখণ কৃতার্থমুখ। বঙ্গের

সাহিত্যকাননে আজ আবার আর এক সেখ সাদির উদয়। এক্ষণে অগেই বলিয়া রাখা ভাল, নাম সাদুজ ব্যক্তিগকে এ উভয় সাদির মধ্যে আর কোন বিষয়ে তুলনাই হইতে পারে না। পারস্তের সেখ সাদির মত আমাদের সেখ সাদির বঙ্গীয় কাব্যকাননের প্লাস্কাশ দুরীকরণ করিবার মত কোন প্রতিভা নাই সত্য, কিন্তু তিনি যে বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য-গগনে অসংখ্য তারকাবিজির মধ্যে অস্বস্তঃ একটা কৌণর্যসি জ্যোতিষ্কের মতও প্রতিভাত ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না। প্রাচীন কালে অগণিত কবি আবির্ভূত হইয়া আমাদের নীনা কীর্ণা মাটুভাষার কলেবরের অশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। গীতা ও নগণা সকল কবির সমবেত শক্তিভেই 'যে অঙ্গ-সাহিত্যের এই বিরাট বণুঃ গঠিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কথা নয়। আমাদের এই কবিও

আপনার কুশ শক্তির সাহায্যে মস্তকোদ্ধার
মৌরব সাধনে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই
জন্ত বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার নিকটও কৃতক
পরিমাণে স্বীকৃতি এবং তিনি যে সকলের শ্রদ্ধা
পাঠ, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই
প্রবন্ধে আমরা তাহারই সম্বন্ধে একটু
আলোচনা করিব।

সম্রাট সেখ সাদির ভণিতায়ুক্ত একখানি
অত্যন্ত প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি আবিষ্কৃত
হইয়াছে। উহার নাম গলা-মলিকার পুঁথি।
পুঁথির শেষ পত্রগুলি না থাকায় হস্তলিপির
অধিক জানা যায় না, কিন্তু কাগজের অংশ
দেখিয়া অস্বাভাবিক বলা যায়, উহার বয়স ২০০
বৎসরের নূন হইবে না। ২৪ × ১০ অঙ্গুলি
পরিমিত কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা। ২৮শ
পত্রের পর পুঁথিখানি বন্ধিত হইয়া গিয়াছে।
তাহারপর উহা কতটুকু ছিল, বলিবার উপায়
নাই। আশ্চর্য লাতিন নামক জৈনিক লোক
পুঁথির প্রতিলিপিকারক। তাহারই বাসনান-
দির কোন উল্লেখ নাই। ত্রিপুরা জিলার
অন্তর্গত দেবপুর নামক গ্রাম হইতে উক্ত
সীমান বিজা ইমামুল হামীর আমাকে
পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

পুঁথি হানে স্থানে এইরকম ভণিতা দেখা
যায় :—

সএখ (সেখ) সাদিএকএ মোহাম্মদ বিনে।
মুই গোনাগার নিস্তার না দেবি ন্যানে।
কেবল এই নামটুকু ভিন্ন কবি সেখ সাদির
আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এতদ্বারা
ভাষা আলোচনা দ্বারা তাঁহাকে চট্টগ্রাম
বিভাগের লোক বলিয়া মনে হয়। আগের
বলিয়াছি, পুঁথিখানির বয়স ২০০ বৎসরের
কম বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং কবি
সেখ সাদিকেও অন্ততঃ দুই শতাব্দীর

পূর্ববর্তী লোক বলিয়া অস্বাভাবিক বলা
যায়।

পাঠকগণ পুঁথির নামেই বৃত্তিতে পারিয়া-
ছেন, ইহা একখানি মুসলমানী উপাখ্যানমূলক
গ্রন্থ। দিক এই বিষয়ে ইতিপূর্বে আর
একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি পাঠ্য
গিয়াছে। উহার নাম “মলিকার হাজার
সওয়াল”। হাজিম সারিক নামক গীর্-পদ-খ্যান
করিয়া সেখ সাদির কবিতা জটিল কবি উহা
রচনা করিয়াছেন। এই উভয় পুঁথির মধ্যে
ঘটনা-সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের রচনা
প্রণালীতে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। সেখ
সাদি অপেক্ষা সেখ সাদি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা
উভয় পুঁথির ভাষা তুলনায় সহজেই ধরা পড়ে।
তবে এই উভয় কবির মধ্যে কে আদি কবি,
তাঁহা বিনির্দিষ্ট কবি নিস্তার সহজ নহে।
হাতের দেখা প্রাচীন পুঁথির তুলনায় সমালো-
চনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। দুঃখের
বিষয়, আজ আমরা নানা কারণে সে কাণ্ড
হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছি।

সমালোচ্য পুঁথির উপাখ্যান ভাগ দুই
কথায় সমাপ্ত। মলিকার কবিতার চুক্তি
এবং পঞ্চাশ স্বয়ং কবির গদ্যবাহিনী। তাহা
এক সংগ্রহ প্রস্তর উত্তরবাসনে সক্ষম ব্যক্তিকেই
তিনি দ্বীপ পঠিতে বরণ করিবেন, মলিকার
এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। সেই প্রতিজ্ঞার কথা
দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইলে মনুষ্য জগতের
মত রক্তপূর্ণ মলিকার পানি লাভাভিলাষে
ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই
মলিকার সওয়ালের জবাব দিতে পারিলেন
না। কাজেই

“মলিকারএ স্নেহবরে বন্ধিতে রাখিল।

লজ্জা দিয়া কত জনে মারি পেদালাই।”

অবশেষে ‘তুর্কক’ বেশ হইতে গলা-উপা-দি-

দারী * আব্দুল হালিম (“মলিকার হাজার
সওয়াল”র যত্নে আব্দুল্লাহ) নামক এক কবির
আদিগা-উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি
এই বাগ্ম্যে জয়লাভ করিয়া মলিকার পানি
ও কবিতাকৃত উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন।
এই হইলে গ্রন্থের উপাখ্যানভাগের সারসং-
ক্ষেপ প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে, দুই একটা
অবস্থার কথাও যে নাই, এমন নহে।

সেখ সাদি কৃত “মলিকার হাজার সওয়াল”
হাজার সওয়ালের উল্লেখ আছে; কিন্তু ঠিক
হাজার সওয়াল আছে কি না, গণিয়া দেখি
নাই। সমালোচ্য পুঁথিতেও অনেক সওয়াল
আছে কিন্তু সংখ্যাও কতটি হইবে, গণনা করা
ব্যতীত বলিবার উপায় নাই। উভয় পুঁথির
সওয়াল গুলি মূলতঃ এক—তবে প্রস্তর ও
উত্তরের ভাষা বিভিন্ন। প্রস্তরগুলির
অধিকাংশই আখ্যানিক ভাবে, পাঠকগণকে
নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর প্রশ্নন
করিবেছি :—

(১) তার পাছে এক কথা পুছে মলিকার।
এক আইসে আর জাএ এ হই সদা।
জাবত কৈ আমত হুএ তাবত এইরূপ।
এই কোন জন হই কহত স্বরূপ।
ফকিরের বোলএ জান রাজি আর দিন।
এক আইসে যার জাএ নিবন্ধের চিন।
(২) কোরানের আয়েত পড়ি ফকিরে বহল।
মিরি যার এক ছোয়ালি মলিকারএ পুছিল।
সরিবের কোন স্থানে চন্দ্র উলিয়াছে।
কোন কোন স্থানে বোল নক্ষত্র উলিছে।
চন্দ্র উদএ হইছে-বিনের যন্তর।
নক্ষত্র উলিয়াছে কলিঙ্গ উপর।

* অরুণ উদিত হইছে কমর ঐ বৈদ্যেত।

• গলা—লাতল পথ—অর্থ ফকির।

† গোনা—গোনা।

সেই মলিকার বিবি কলিলাম তোমাত।
(৩) তবে বুঝে দুই যৈছে বসন্ত হেমন্ত।
কোন কোন স্মরণের কহ তার যন্তর।
মগন্ধে উলিয়া বস্ত্রের বায়।
মণিহের নাভিমূলে রহেস্ত সদা।
উলিয়া নাভিমূলে হেমন্তে পবন।
উজান চলিয়া উঠে মেঘের গমন।
(৪) কিরি মলিকার পুছে পড়িয়া কলিমা।
আর কির কহ তান (সিঁদুর) রূপের মহিমা।
গদাএ কহে এইসব কইলে গোনা ঐ হুএ।
পুছিল ঐ কহত তোমি না কইলে নয়।
চন্দ্রের সমান বিলি দিয়াছে কপ।
শরিকপে চুনিয়াই করহে পদর।
রবি রূপে তাপ দিয়া চৌমিগে ব্যাপিত।
সিন্তল রূপে রহিয়াছে জলের সহিত।
তৈজ রূপে রহিয়াছে জলের(?) মাঝার।
কটি (কোটা) রূপে দিয়াছে নাহএ প্রচার।
সিন্তল অগ্নিকপে পুপেত সফরে।
মলিকার দ্বি চরে পুষ্পের মাঝারে।
মলিকার কুন্তলন্তে মধু করে পান।
ফকিরে কহেস্ত কথা মলিকার স্থান।
সবা বিদ্যামান নহে হুএই গোপত।
গোপ্তরূপে রহিয়াছে নাহএ বেকত।
মলিকার প্রশ্নগুলির মধ্যে এমন অনেক
প্রশ্নও আছে, যেগুলি শুধু মোহাম্মদীয় ধর্ম-
বিশ্বাসের দিক হইতেই আলোচিত হইয়াছে।
বিস্তৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত সেগুলি মুসলমান ভিন্ন
অন্তেরা বুঝিতে পারিবেন না। বলিয়া আমরা
সংক্ষেপে কোন প্রশ্ন এখানে উদ্ধৃত করিয়া
দেখাইলাম না। প্রাচীন কালে গ্রন্থরচনার
মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাব্যসৌন্দর্য্যে ভিত্তর দিয়া
লোকজগৎকে ধর্মভাবের দৃঢ়তা করা। কবি

† কমর—কোমর; কলিঙ্গ—

পুসিঙ্গ—কলিঙ্গ।

সেখ সাধিব সেই ভাবেই অল্পপ্রাপ্ত হইয়া
এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই।
এতকণে পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন,
প্রতিপাল্য বিষয় হিসাবে এই পুথি কবির
কবিত্ব শক্তি প্রকাশনের উপযুক্ত কেন্দ্র নহে।
মোটের উপর তাঁহার রচনা যে সহজ, স্বন্দর
ও অনাড়ম্বর, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। হাতে
পারে। তাঁহার সাধারণ রচনার নমুনা স্বরূপ
নিম্নোক্ত অংশগুলি হইতে পাঠকগণ
আমাদের এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি
করিবেন :—

- (১) কেহ হাবিলাসে আইসে সন্সার মাল্লাঃ।
কেহ চলি জাএ নিম্ন যন্তোয়পনার।
সন্সার যাপনা নহে সোন নরগণ।
বারিয়ার বাকি ছেমন থাকে মরণ।
এই ঘন সম্পদ জ্ঞাত জোয়ারের জল।
মৃত্যু কালে ভিন্ন ভিন্ন হইব সকল।

- (২) মল্লিকা স্ববদনী স্বলতান নমিনী
রোমন করহে বহুতর।

আএ প্রহু ছোবাহান হুনি জগতের প্রাপ
কি কহিমু মহিমা তোমার।

আব আসত থাক বাই চারি চিহ্নে হুনিয়াই
চারি চিহ্ন কর এক সঙ্গ।

কাম কোণ লোভ মায়া জীবন যৌবন দিয়া
পরিশ্রমে কেনে কর ভঙ্গ।

- (২) নাথরে মৌর কর পার।
বিসম সফট মাঞ্চে না দেবি উদ্ধার।

উৎপন্ন প্রলয় কেবা করিছে স্বভাব।
আপোত আপনা গুণ করিআ ভোবন।

মিছা ঘর বাড়ি পাইয়া হইল ভোর মন।
নিহুহ মন্দির ছাড়ি পলাই গেল কান্ত (৭)।

আপনা আপনা বোল সেবিলাম জাহারে।
জাহাতে বোলান দিখা না গেলা ঘামারে।
নিদখা হইয়া মুরে (মোরে) ভায়াইল-সাগরেণ
নিচিন্তে বইলা গিয়া নিখোর মন্দিরে।
হুনিআইর থান্দা বাজি লাগে চমৎকার।
বিসম সফট মাঞ্চে কেমনে হইমু পার।
সএখ (সেখ) সাহিএ কেহে মনে করি পার।
আল্লা ভনে উজারিতে কেহ নাই আর।

আর বেশী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ কলেবর
বর্জিত করা আবশ্যিক। উপরে যাঁহা উদ্ধৃত
হইরাছে, তাহা হইতেই পুথিখানির স্বরূপ
সম্যক জ্ঞাপন হইবে, আশা করি। অধুনা
দেশে এই সকল পুথির প্রচলন নাই কিন্তু
এক সময়ে এসকল পুথি সমাজে ধর্ম্মভাব
স্বপ্নের প্রভুত্ব সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ
নাই।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা আবাস্তর কথা
বলি। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে অনেকে
বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা স্বীকার করিয়াও
তাহাকে জাতীয় ভাষা স্বীকার করিতে চাহেন
না। এই কারণে বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের
মধ্যে আশাহরুপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে
পারিবে না। প্রাচীন কালে কিন্তু এরূপ
বিসমৃশ ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যে
সময়ে দেশে পাক্ত ভাষা রাজভাষা রূপে
প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই অনেক মুসলমান
কবি বাঙ্গালা ভাষায় প্রাথমিক রচনা প্রবৃত্ত
হইয়াছিলেন। বঙ্গভাষাকে জাতীয় ভাষা
মনে না করিলে তাঁহারা কখন এরূপ করিতে
যাইতেন না, ইহা ঠিক কথা। তাঁহাদের
সেই যত ও উত্তম যদি এতদিন পর্য্যন্ত অভয়

প্রবাহে চলিয়া আসিত, তবে আজ আমাদের
বঙ্গসাহিত্য এক বিপুল বিস্তার ও অসীম
শক্তি লাভ করিত, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর
জাতীত্ব-গঠন-কল্পেও তাহা অশেষ সহায়তা
করিতে পারিত এবং বঙ্গসাহিত্য এখন যেখণ
হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ কখন
হইতে পারিত না। প্রাচীন মুসলমান কবিগণ
বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব বুদ্ধি ও উৎসাহে জাতীয়
ভাষা রূপে উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে আরব্য
পাক্ত হইতে তাঁহাদের মহাযশা: পূর্বপুরুষ-
গণের গ্রন্থনিচরু বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিতে
মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই
সুভচর্যা মধ্যপথে কল্লগতি না হইলে আজ
বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের সম্পূর্ণ জাতীয় ভাষা
হইয়া পড়াইত এবং বঙ্গের বিশাল মুসলমান
সমাজের উন্নতির একটা চিরস্থায়ী সেতু

নির্মিত হইত। মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে জাতীয়
ভাষারূপে বঙ্গসাহিত্য তাহার সমুচিত আদর
ও অঙ্গুলীন অভাবে বর্জ্য মুসলমান
সমাজের কি যে অনিষ্ট হইতেছে, তৎপরে
বিষয় আজও তাহা অনেক বুঝিয়াও
বুঝিবেছেন না। তাঁহাদের একধা মনে
রাখা উচিত যে, মাতৃভাষা ও জাতীয়
সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কোন জাতি কখন
বড় হইতে পারে না। জাতীয়সাহিত্যই
জাতীয়-জীবন-স্তরীর দিগনির্ণয় করিয়া থাকে
এবং জাতীয়সাহিত্য হইতেই স্বাক্ষর
করিয়া সমাজদেহে পুষ্টিলাভ করে। যতদিন
বঙ্গসাহিত্য সমাজদেহের পুষ্টিপাথনে সহায়
না হইতে পারিবে, ততদিন বঙ্গীয় মুসলমান
সমাজের উন্নতি অসম্ভবপাত্র, একধা ধ্রুব
সত্য।

আবদুল করিম।

উনবিংশশতাব্দী

বিগত শতাব্দী জগতে ইংরাজপ্রভাবের
যুগ। উনবিংশশতাব্দীর ইংরাজজীবন
আলোচনা করিলে নব্য পাশ্চাত্য সভ্যতার
ধরণ ধারণ বুঝা যাইবে। আমরা শুধুকে
তাই একটু কথা বলিয়া এই যুগের পরিচয়
দিতেছি। বলা স্বভাৱ, এই শতাব্দী
ভারতবাসীর পক্ষে মোটের উপর একটা
“নিষ্কণ্ঠ যুগ”।

অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষ হিন্দু ও
মুসলমান আমলে অন্ত্যশৌচীয় অবস্থায়
ছিল। ইংরাজ রাজত্বেরী রাষ্ট্রাভ্যাস, বাণীব্যব,
স্বাধাবিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যভাব দেশে প্রেরণ
দিয়াছে। সত্য কথা ইংরাজেরা যখন ক্রমে

ক্রমে ভারতবর্ষ লাভ করিতে থাকেন তখন
তাঁহাদের স্বদেশেই বড় বড় প্রসাদ কৃত্য
অষ্টালিক, প্রশস্ত রাজপথ, স্বাস্থ্যবিধানের
নিয়মাবলী ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তাঁহারা
ভারতবর্ষকে শিখাইবন কোথা হইতে
বরং বৈয়য়িক স্বশিক্ষিততার অনেক কথা
তাঁহারা দিল্লী, মুর্শাবাদ, লক্ণৌ, ইত্যাদি
নগর হইতে শিখাইছিলেন।

দোশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর
ভারতের সর্দেই হইলও, ষটলাও, আয়লাও
অথবা ইউরোপের অত্যাচরণ দেশের আর্থিক
এবং বৈয়য়িক অবস্থা তুলনা করিলে কিছু
বুঝিতে পারি। উনবিংশশতাব্দীতে

পশ্চিমারা অভাবনীযুক্ত আর্থিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন সম্বন্ধে নাই।" বিষ্ণু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাল পর্য্যন্ত ইহার কোন বিষয়েই ভারতবাসী হইতে উন্নত ছিলেন না। বৈবরণে সীমার প্রয়োগ আবিস্কৃত হওয়ার ইউরোপে যুগান্তর আনিয়াছে।

১৮০২ সালে নেপোলিয়নের রণতরী নেলসন কর্তৃক চূর্ণবিচূর্ণ হয়। এই প্রসিদ্ধ ট্রাফালগার যুদ্ধে, কিরূপ জাহাজ ব্যবহৃত হইয়াছিল? তখনও বাষ্পের প্রভাব দেখা যায় নাই। সেই পঞ্চদশ ঘোড়শ শতাব্দীর মামুলি পালের জাহাজ, কাঠের জাহাজ এবং গাঁড়ের জাহাজই তখন প্রচলিত ছিল। আজকাল সেইগুলিকে জাহাজ বলিতে লজ্জা বোধ হইবে। ভারতবর্ষের লোকেরা যুব্বলীয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সময়ও এইরূপ জাহাজই ব্যবহার করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলমানেরা যে সকল জাহাজ ব্যবহার করিতেন সেগুলির সঙ্গে বিশেষতাব্দীর ড্রেডনটের তুলনা করিলে উপহাস করা হইবে মাত্র। কিন্তু সেই যুগের পাক্ষাত্য রণতরীসমূহও আজকালকার হিসাবে নিতান্ত খেলানার সামগ্রী নয় কি? আম্রোভাট, লিস্বন, ভেনিস, খাল্লা এবং অক্সফোর্ড নগর বন্দরের জাহাজ নির্মাণপ্রণালী আলোচনা করিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে।

কোন সমাজের সঙ্গে অপরাধের সমাজের তুলনা করিতে হইলে যুগ ও সময়ের কথা মনে রাখা আবশ্যক। কোন এক যুগে দুই তিন সমাজের অবস্থা পরস্পর তুলনা করা কর্তব্য। কিন্তু আমরা একথা তুলিয়া যাই। অবিবেচকের দ্বারা আধুনিক পাক্ষাত্যগণের

নৃতন আবিষ্কারসমূহকে অতি প্রাচীন ভাবিয়া থাকি এবং তাহার সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের অবস্থা তুলনা করিয়া হতাশ হইয়া পড়ি। রাস্তাবিক পক্ষে, নব্য ইউরোপের বিশিষ্ট আবিষ্কারগুলি ৩০-৪০-৫০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন নয়। এই কথ বঙ্গবাসীর ভিতরেই ওপেনে এই অভিনব রূপান্তর ঘটিয়াছে।

বাংলাদেশে এজিনের ব্যবহার পৃথিবীতে ১০০ বৎসর মাত্র চলিতেছে। মাসগো নগরে তাহার হস্তপাত। তাহার প্রথমক ভ্রমণ ওয়াট এই নগরেরই স্থান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে “কমট” নামক জাহাজে বাষ্প নিয়ন্ত্রিত কল প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিছুকাল পর্য্যন্ত নৃতন নৌশিল্পের উন্নতি ক্ষত সাধিত হয় নাই। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে একব্যক্তি মাসগোর শিল্পসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কবিকথ, তুলার কবিকার, রত্নশিল্প, মৎস্য চাষ, এবং অক্সফোর্ড জীবিকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু বাষ্পপোত-নির্মাণবিষয়ক শিল্প তখনও প্রসিদ্ধ হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮২২ সাল হইতে এই নৃতন শিল্পের প্রভাব মাসগো নগরে লক্ষিত হইয়াছে।

মাসগো বন্দরের এই ইতিবৃত্তটুকু মনে রাখিলে বুঝিতে পারিব কেন ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পর হইতে ভারতীয় নৌশিল্প অবনত হইয়াছে। তাহার পূর্বে মাসগো এবং ভারতীয় বন্দরে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। বরং ১৮১১ খৃষ্টাব্দে কন্নাসী লেখক বলিতেছেন, হিন্দু জাহাজই উন্নততর। “In ancient times the Indians excelled in the art of constructing vessels, and the present Hindus can in this respect

still offer models to Europe—so much so that the English attentive to everything which relates to naval architecture have borrowed from the Hindus many improvements which they have adopted with success to their own shipping. * * * The Indian vessels unite elegance with utility, and are models of patience and fine workmanship.”

বাস্তবিক পক্ষে, আজকাল ইউরোপে যত কিছু সমৃদ্ধির লক্ষণ হেবিনা কেন প্রায় সকলই একরূপ বঙ্গবাসীর অধিক পুরাতন নয়। আজকালকার লণ্ডন, মাসগো, এডিনবারা নগরের বাহ্য সম্পদ, অট্টালিকা ও রাস্তা সমূহ এই সময়ের ভিতরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং ঊনবিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত এই সমগ্র নগর স্বাস্থ্য, বিলাস, স্বথবুদ্ধিমত্তা অথবা সৌন্দর্য্য হিসাবে নিতান্ত অবনত ছিল।

ঘোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মাসগো নগর কিরূপ ছিল তাহার এক চিত্র প্রদান করিতেছি। ওয়াশেল প্রণীত “মাসগোর ইতিহাস”-গ্রন্থে ত্রিগুণিত আছে :—“The sanitary condition of the city through those early periods was of a somewhat primitive description. In 1589 there was an order made by the magistrates that “no midden be laid upon the hiegate,” but no attention seems to have been paid to this order. In 1655 the state of the streets was such, that

the citizens had to place stepping stones in front of their houses so that they might be enabled to make their exits and entrances “dryshod.” But the main streets were used for other purposes than as the receptacles of midden.” Swine were allowed to roam at large. Hay and pent stocks were erected on the streets and the fleshers appear to have been in the habit of slaying and building the whole bestial they kill on the Hie Street on both sides of the gate, which is very loathsome to beholders and also raise a filthy and noisome stink. * * * About the year 1755 the magistrates erected a new market in King Street, and it was not till then that a public slaughter house was provided.”

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আধুনিক ইংলণ্ডের “দ্বিতীয় নগরের” এই অবস্থা। প্রথম নগর লণ্ডনও এইরূপই ছিল। এই সকল কথা মনে রাখিয়া আমাদের নব্য ভারতীয় ছাত্রেরা মাসগো, এডিনবারা, লণ্ডন, প্যারিস, বিনসন ইত্যাদি নগরে প্রবেশ করিলে চমকিয়া যাইবেন না এবং হতাশ হইয়া পড়িবেন না। “ঐতিহাসিক আলোচনা প্রণালী”র অবলম্বনেই আধুনিক চিত্তসমোহন নিবারণের একমাত্র উপায়।

ঘোড়শ শতাব্দীর গৌড় কিরূপ ছিল? ডি ব্যানোচ্চ ঘোড়শ শতাব্দীর পূর্ণ গৌড় পর্য্যটকগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"It is said to be three of our leagues in length and contain 200,000 inhabitants. The streets are so thronged with the concourse and traffic of people that they cannot see their way past. A great part the houses of the city are stone and well wrought buildings."

ভিটেনসন "Portuguese Asia" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The principal city Gouro, seated on the bank of the Ganges, three leagues in length, containing one million and two hundred thousand families and well-fortified; along the streets which are wide and straight, rows of trees to shade the people, which sometimes in such numbers, that some are trod to death."

পর্ষদীজ পর্ষদীকর্তা মুসলমান গণের মধ্যে
মাথা বলিয়াছেন বিশেষতাবাদীর লগুন-নগরের
ব্যাক-পাড়ায় গাঁড়ীয়ে বোধ হয় সেই কথা
মনে হয়। অথচ লগুনর এই জনতাবাদীর
ইউরোপের অর্থ কোন নগরে দৌলত পাওয়া
যায়া কি না সম্ভেহ। ভারতবাসীর 'পাত্তে' কি
সংগ্রহিত নাই? ইহার কি একমাত্র মাত্রা
অপিতে এবং কোন কতলা লয়া না
করিভেই ওস্তাদ? শ্রীকৃষ্ণ দীনেশচন্দ্র সেন
"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে ভারতবাসীর এই
চিত্রই রিয়াছেন। বিশেষতাবাদীর সমুদ্র
ভারতবাসী নিজ অতীত সংস্কারে ঐকপই
ভাবিতেন। বিশেষতাবাদীর ভারতবাসী
দুর্ভিক্ষেছেন ঐকপই ইতিহাস গ্রন্থ প্রাপ্তির
সংশোধন না করিলে চলিবে না।

এইবার আমাদের তাঁতীপাড়া ম্যাগেষ্ঠোরের কথা কিছু বলিব। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে অল্পে অল্প খোলা হয়। তাহার পূর্বে ম্যাগেষ্ঠোরের ব্যবসায়ীরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। আফ্রিকার দক্ষিণ ঘূরিয়া বাইতে অনেক অতিথি সম্ভাবনা থাকিত। তথা ছাড়া ইরানজাতির ব্যবসায় সক্ষমতা আইনও তখন ন্যায়সঙ্গত ছিল না। কোন কোন কোম্পানীকে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হইত। "তুরস্ক কোম্পানী" ব্যতীত আর কোন ব্যবসায়-সম্বন্ধী তুরস্ক বাণিজ্য করিবার অধিকারী ছিল না। সেইরূপ "ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" ব্যতীত আর কোন কোম্পানী চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসায় সক্ষম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত না। কাজেই ম্যাগেষ্ঠোরের ধনী মহাজন সমিতি-সমূহ সর্বত্র ব্যবসায় বিস্তারের যোগ্য হইতে বঞ্চিত হইত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই সকল "monopolies" বা একচেটিয়া অধিকার সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করা হয়। তাহার পর হইতেই ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী সমাজে স্বাধীনতা এবং কণ্ঠ প্রবলতার যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ম্যাগেষ্ঠোরের ব্যবসায়-শক্তিও তাহার পূর্বে বিশেষ লক্ষিত হয় নাই।

তাহার ফলে শিল্পকারখানার স্বত্বাধিকারী
মাঝেই নিজ নিজ কারবারে যত্নসমূহ প্রবর্তন
করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হন।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ম্যাকেলষ্টারের তৃতীয়া নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার

করিতে থাকে। কিন্তু যখন ব্যবসায়ীরা
স্বাধীনভাবে চলিতে পারিলেন, পাঠাইবার
অসুবিধাগুলি হইল। তাহির পূর্ব ১৮৩৯
পূর্বের বালের প্রভাবে বাদিজী পূর্ব
স্বাধীন মনোভাৱের শিল্প মূল্য
এই বাণিজ্যে যি কালকার কলা।

“ইতিহাস?”

५१

প্রায় সকল হিন্দু-মস্তানই অবগত আছেন যে, যে কোন পুণ্য ভৈরব বা পিতৃকাব্য শাস্ত্র-যাত্রী অস্ফুট হইতে গেলেই ধূপ কৌপের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ধূপ পিলাইর কেনই বা ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহার উপকারিতাই বাকি এবং কি কি দ্রব্য ধূপ প্রদানের কার্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা সম্যকরূপে জ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অনেকে অবগত নহেন; তাই শাস্ত্রীয় অমূলক বর্ণনা দ্বারা ক্র-ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দের নিকট প্রশ্নাধিধারা যাহা অবশ্যই হইয়াছি, তাহাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম। কুল জাতি সংশোধনের ভার পাঠকবর্গের উপর।

সাধারণতঃ বাজারে এক প্রকার ধূনা পাওয়া যায় তাহাই লোকে ধূপ জল ব্যবহার করে। বিস্তৃত শালবৃক্ষের নিখাস বিস্তৃত ধূনা নামে খ্যাত। এই ধূনা অগ্নিতে নিক্ষেপ হইলে এক প্রকার ধূম উর্জিত হয়, তাহাই দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়া থাকে। বাজারে অনেক সময় বিস্তৃত ধূনা পাওয়া যায় না, এবং ইহাতে জল দ্রব্য গুণিত থাকে, প্রথমতঃ আবার শাস্ত্রে কহা হইছে ধূপ বলে, ইহা জানা আবশ্যক। ধূপ (পু) গন্ধ দ্রব্য

বিশেষোবা ধূমপুঙ্খকিত।—এবং বাৎ কবিতো দীপো ধূপান শৃং ত হুতো। নাসাকিরম্-
অর্থঃ তপঃপ্রাণতিমানোহঃ।। দহমানস্ত
কাষ্ঠস্ত প্রযতঃশ্রতঃপ্রযতঃ।। পরাগমাথবা
ধূমো নিত্যাণো যন্ত জায়তে।। য ধূপ ইতি
প্ৰতিজ্ঞা দেবানাম্ তুষ্টিপ্রায়কঃ। রাশি-
কুন্তেন চেক্ষত তৈর্জীব্যঃ পরিপূর্ণদেবঃ।।
অর্থাৎ কোন গন্ধ অথবা অগ্নিতে নিষ্কৃপ
হইলে যে ধূম নির্গত হয় তাহাই ধূপ-বলিয়া
কথিত, ইহা চূর্ণ বা বস্তি আকারের হইয়া
পড়ে। বস্তির সমস্ত পর্বাঙ্গ গন্ধ পিশাচিক
দেবতাদিগের কিত প্রকার ধূম তুষ্টিপ্রায়ক
তাহাও পূর্বে বলা হইল, অর্থাৎ কোন কাষ্ঠ
বা অজ অথবা বা পুষ্পের পরাগ প্রভৃতি যে
সকল অথবা অগ্নিতে দহমান হইলে, তন্নির্গত
ধূম যবি নাসিকার ও শুক্ল অঙ্গীভুক্ত ন হই
ক, অথবা শুক্ল ও তাপহীন হয়, এই ধূম দেবতা-
দিগের প্ৰীতিজনক। এক্ষণে অ্যাসমুদ্র একত
করতঃ ধূপ প্রধান করা আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন
দেবতার আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধূপ প্রায়।
শাশ্বত তাহারও “বিদিত” লিখিত হইয়াছে।
প্রাচীন পুণের উপকারিতা কি তাহাই
অনোচনা করা যাক। শাশ্বতবিধানাথায়ো

পুষ্টি প্রকৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ধূম যথেষ্ট উপকারী। যথা (১) ধূম হৃৎকর্ষ নাশ করে। Instant ৱাফেন Phenylic ৱাফেন ৱাফেন ধূমপান্যার দ্বারা প্রকৃতি হইতে রোগের বীজাণু প্রকৃতি দূরীভূত হয়। ধূমপানের ধূম যদিও দেহতার প্রিয় নয় এবং তীব্রতা প্রযুক্ত নাগার ও ক্রীতিজনক নয়, তথাপি ইহাকে একপ্রকার ধূম বলা যাইতে পারে, এবং সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, যে সময় কলেরা প্রকৃতি মারীভয়ের প্রকাশ হয়, সে সময় গন্ধকের ধূম খুব উপকারী, এবং অনেকেরই স্ব স্ব পূর্বে এই ধূম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্ম আজকাল এই ধূম মিউনিপালিটীতেও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই রূপ অনেক দ্রব্য আছে, যাহাদের ধূম বিভিন্ন বিভিন্ন উপকার প্রদান করে, ও ব্যাধির শাস্তি করে। হিন্দুশাস্ত্রাধ্যায়ী যে সকল ধূম প্রচলিত আছে, তাহাতেও যে সব দ্রব্য মিশ্রিত হয়, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই ধূমের কোন না কোন বিশেষ গুণ আছে; আবার সকলের মিশ্রণে একটী রাসায়নিক ক্রিয়া (Action) হয় ও তাহার ফলে এই দ্রব্য-সমূহ-জাত যে ধূম তাহা উপকারী। যদিও আমরা বৃত্তিতে না পারি তাই বলিয়া কোন দ্রব্যের উপকারিতা কিছু মাত্র নাই ইহা বলাও উচিত নয়। বিশেষতঃ ধূম কেবল হিন্দুর মধ্যেই চলিত এমন নহে, হিন্দু ব্যতীত জৈন, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীও কোন এক প্রকার ধূম ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহার ব্যবহার একপ্রকার সর্বব্যাপীসম্মত বলা

যাইতে পারে। ধূমোপিত ধূম স্বগন্ধকর, মনের প্রশমতা আনয়ন করে (মনের প্রশমতা চিত্তচঞ্চির সোপান) তাহা হইলৈও ধূম উপকারী। ক্ষেত্রক্ষেত্র একথাও বলেন যে, যেখানে স্বগন্ধ উৎপিত হইতে থাকে সেখানে অধিক পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তড়িৎ প্রবাহ জীবনোন্মুক্ত রুদ্ধ করে, অতএব যদি একথা সত্য হয়, তবে ধূম যে কত উপকারী তাহা বলা অনাবশ্যক। আগুনের শায়ে বহুবিধ ধূমের উল্লেখ দেখা যায়, যথার্থ নানাবিধ পাড়া উপশম হইতে পারে, তন্মধ্যে আমি এখানে একটী উল্লেখ করিতেছি—

পলম্বা নিমগ্নজ বচা কুট্ট হরিতকী।
সর্পা সযবা সর্পিপূনং জর নাশনং ॥
অথাৎ গুণগুল, নিমের পাতা, বচ, কুট্ট, হরিতকী, খেত সর্প, যব ও যত এই ছয়টি রকম দ্রব্যের ধূম প্রদান করিলে, পুরাতন জর দূরীভূত হয়। জ্বর প্রতিকার করা, মশক বিনাশ করা ও eucalyptus বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি যেমন ম্যালেরিয়া দূরীকরণের উপায়, তেমনি উক্ত ধূম ও ম্যালেরিয়া প্রকোপের সময় উপকারী। এই জানি মশক ও মক্ষিকা দূর করিবার পুরাণোক্ত একপ্রকার ধূমের উল্লেখ করিতেছি যথা—

"জ্বিন্দু চ পুপানি ভজ্যাতকবিদম্বেক।
বাল্য চৈব সন্ধরাস সৌবীর সপ্পান্তবা।
সর্প পৃক্ষা মক্ষিকানাং মশকানাং নশনং ॥
ইতি গন্ধে

জিকলাধুনপুপানি ভজ্যাতকশিরীষক।
লাঙ্গা সজরশটৈব বিড়শটৈব গুণ্ডগলু।
এতেন্দ্রপো মক্ষিকানাং মশকানাং বিনাশনং।
ইতি গন্ধে

অর্থাৎ জিকলা, জ্বিন্দুপুপ, ভেলা, শিরীষ, বৃক্ষ, লাঙ্গা, ধূম, বিড়শ, গুণ্ডগল এই সকল

দ্রব্য একত্র করিয়া ধূম দিলে মক্ষিকা ও মশক বিনাশ পাইয়া থাকে।
ইহা—অশ্বামেধের পরীক্ষিত। আর ইহার লিখিত মত না হইবার কারণও কিছু নাই। কারণ যদি Carbolic Acid এর গন্ধে সর্প পদান করে, গোয়ালে সঁজাল দিলে গন্ধকে মাছি বিরক্ত না করে, তবে একরূপ তীব্র গন্ধবিশিষ্ট ধূমের গন্ধ দ্বারা যে মক্ষিকাদি পলায়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি; অধিকন্তু উক্ত ধূমের ধূমের এমন একটা শক্তি জন্মায়, যদ্বারা মক্ষিকা প্রকৃতির পাখা পুড়িয়া যায় ও দূরিত ব্যাধাঘটে। একরূপ অনেক স্থানে অনেকবিধ আবশ্যকীয় ধূমের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অথ, হস্তী প্রভৃতি বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তুও দ্রব্যবিশেষ মিশ্রিত ধূমের গন্ধে অস্থির হইয়া পড়ে, এমন কি ঘোড়ার চুই স্বভাব পর্যন্ত সারিয়া যায়।
এবম্ব বাহ্যভায়ে তাহার আলোচনা করিলাম না।

আমাদের দেশে প্রাধান্যে ধূম পূজাদি কার্যে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কোন ব্যৱহার করা হয় তাহারই এক্ষণে আলোচনা করা যাক; এসম্বন্ধে পূর্বেও সামান্য বলিয়াছি।

(১) আমাদের শাস্ত্রোক্ত দেবতাসমূহে অতীন্দ্রিয় এবং স্থল জড় জগৎ অপেক্ষা অস্থাবহিত দেবতাদিগের গ্রহণীয় নয়, এই জগতের অধিবাসী। স্থল পদার্থ, অস্থাবর অস্থাবহিত দেবতাদিগের গ্রহণীয় নয়, এই ভগবান মহা বলিদেহন—
"অমৌ প্রাপ্তাভূতিঃ সম্যগাদিত্যুপতিষ্ঠতে"।
অর্থাৎ আচ্ছাদিত প্রদানে সূর্য্যের উপস্থান হয়। অগ্নি স্থল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া

অস্থল উপাদানে পরিণত করে, এবং অস্থল উপাদান ভুলি দেহে গ্রহণ করেন।
(২) আমাদের বর্তমান পারদর্শী মহাপ্রয়োদ্যে যাহার মন পরিব্রাজন যে, এই গ্রহজগৎ আর একটা অস্থল জগৎ। ইহা গুপ্ততঃ অস্থল পরীক্ষা দ্বারা ভীষণতঃ পরিদর্শন মানা যায় তবে ইহা অবশ্যই শাকার কবিত হইবে যে, spirits দেহ মধ্যে সহ্য অসহ্য দুই প্রকৃতির spiritsই আছে, সহ্য spirits দেহ মধ্যে অনেক জীবের উপকার করিতে প্রয়াস পান, এবং অসহ্য spirits দেহ অনেক জীবের অপকার করিতে যত্ন করেন, এই প্রকারে যে সকল জীবের অন্তীর্জালা spirits আছে, তাহারই অনেকে স্বগন্ধ বা পবিত্রতা লাভ করেন না, সেই জন্ত পূজার্কানের সময় মনোহর গন্ধবিশিষ্ট ধূম ব্যবহার কর্তব্য, যাহাতে অসহ্য প্রকৃতি spirits রা সহজে ধ্যান ধারণায় ব্যাধাত উৎপাদন করিতে না পারে।

(৩) প্রত্যেক দেবতাই সেই এক অনাদি অখণ্ড পরমেশ্বর কোন না কোন শক্তি বা ভাবের বিকাশ সৃষ্টি। নিগুণ ভক্তের উপাসনা অতীত দুরূহ এবং ক্লেশকর, সেই জন্ত অধিকারীভেদে শাকার দেবতা লইয়া পৃথক পৃথক সাধনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। যে বিশিষ্ট উন্নতি লাভ করিবে সে ক্রমে ক্রমে উচ্চ অঙ্গে অগ্রসর করিতে পারিবে। পূজার গুণও উদ্দেশ্য হইতেছে যে বাহার যিনি ইষ্ট দেবতা বা আরাধা দেবতা তাহাতেই সমস্ত ভাবনা করা, সমস্ত জ্ঞাতিক পদার্থ হিন্দু শাস্ত্রের মতে ক্ষিত অর্পণে জগৎ বোম এই পাঁচ অবস্থায় বিভক্ত, ইহা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারাও সমর্থিত, তাহারই short-

symbol স্বরূপে গন্ধ, পুষ্প, দীপ, মৈত্রেয়
এই লক্ষ্যোপচার পূজার অঙ্গিত আশাদের
এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় পূর্ণ বাপ্ত
অনুগ্রহ, তাহার প্রাপ্তি পূর্ণ হইবে
দেখিতে পাওয়া যায়

১৭৮৩ খ্রিঃ ১৭৮৩ খ্রিঃ
 ১৭৮৩ খ্রিঃ ১৭৮৩ খ্রিঃ
 ১৭৮৩ খ্রিঃ ১৭৮৩ খ্রিঃ

ইহা ভিন্ন সাধারণ পুষ্টি পদ্ধতিতে যে
মানস পুষ্টি বিধান আছে তাহাতেও ধূপকে
বায়ুরূপে কল্পনা করা হইতেছে যথা,—
বায়ুস্বকঃ ধূপং অমুক দেবতায়ে নমঃ। ধূপ
হইতে ভিত্তি যুক্ত ক্রমে বায়ুর সহিত মিশ্রিত
হইয়া নিজের বায়ুর লাভ করে, যেমন
Homœopathic ঔষধের প্রত্যেক dilution
potency বৃদ্ধি হয় সেইরূপ ধূপ ক্রমে
বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে এবং ক্রমে
তাহার স্বাদ্য পরমাণুগুলি বায়ুর সহিত
মিশ্রিত হইয়া আয়তন বিন্যাস লাভ করিতে
করিতে অবশেষে অনন্ত বায়ুগুণে মিশিয়া
দান হইয়া যায়।

ধূপ ধূপচি যোগে প্রদানই কর্তব্য অথবা •
বটিকা প্রজ্জলিত করিবে।

তৎপ্রমাণং—
ন ভূমৌ বিত্তরেৎ ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা ।

যথা তথাধারগতং কৃৎস্বা তদ্বিনিবেদয়েৎ ॥
 ধূপ দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিবার
 পূর্বে আজ্ঞা লইবে না। যথা—
 পুষ্পং ধূপকং গন্ধকং উপচারান্তথাপনম্।

একপক্ষে কত প্রকার ধূপ প্রচলিত আছে
এবং কি কি দ্রব্য প্রদানতঃ ধূপে ব্যবহার
হইয়াছে তাহাই উল্লেখ করা যাক।

"শ্রীচন্দনবঙ্গসরল: সাল: কালাগুরুত্বা।
 উদং: সুরথ: কনিষ্কবিক্রম এব চ।
 পীতসাল: পরিমলো বিমদীকামনস্তথা।
 নমেক্ষুদ্বন্দ্বাক্ষত্ৰিণ্ড সাংরাহণ বান্দিয়:।
 সন্তান: পারিজাতত্ৰ হরিচন্দনবল্লভে।
 কৃষ্ণে দুপা: সর্ষেয়া: শ্রীতিদা:
 পরিকীৰ্তিতা:।

উপরি লিখিত দ্রব্যগুলি ধূপে ব্যবহার
হইতে পারে।

পঞ্চাঙ্গ ধূপ—
 চন্দনং কুঙ্কুমং নৃত্যং কর্ণবং শুগ্ণ্ডলোহপ্তক ।
 ধূপোহিষং স্তবতস্যংযুক্তঃ পঞ্চাঙ্গঃ সমদাহৃতঃ ॥

যড়ন ধূপ—
 সিতাজামধুসংশ্লিষ্টা গুণ্ডবগুণ্ড চন্দনং ।
 যড়ন ধূপমেতত্তু সর্বদেব প্রিয়ং সদা ॥

গুণগুণগুণকং তেজপত্রং মলয়মস্তবং ।
কপ্পং বালকং কুষ্ঠং নৃতনং কুক্ষ্মং তথা ॥

শাশ্বৎ ধূপ—
কপূরং কুষ্ঠমগুরু গুগগুলূর্মলয়োস্তবং
কেশরং বালকং পত্রং ত্র্যম্বকাতীকো নমস্কৃতমং ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 पक्षमेतद् दत्तयुतं दशाब्दे धूप प्रेरितः ॥
 दशाब्द धूप—
 गुग्गुलुचन्दनं पत्रं कृष्णकण्ठक कुरूमः

অর্থীষ গুণগুল, সরলকাঠ, দেয়দার, তেজ-
পত্র, খেতচন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়,
দুনা, মৃণা, হরতকী, নবী, লাহা, জটামারী
শৈলজ, এই ঘোলটী জব্য পুগারীর দোকান
হইতে ক্রয় করিয়া রোজে উত্তপ্ত করত চূর্ণ
করিয়া বায়হারাম্বারে কিঞ্চিৎ স্নত মিশ্রিত
করিলেই উত্তম ও সর্বাধিকো প্রশস্ত ধূপ

প্রস্তুত হইবে। নথী দ্ব্যত ডিজিট করিয়া
লইতে হইবে। যদি বর্ধি প্রস্তুত করার

১৪
 ১৫
 ১৬
 ১৭
 ১৮
 ১৯
 ২০
 ২১
 ২২
 ২৩
 ২৪
 ২৫
 ২৬
 ২৭
 ২৮
 ২৯
 ৩০
 ৩১
 ৩২
 ৩৩
 ৩৪
 ৩৫
 ৩৬
 ৩৭
 ৩৮
 ৩৯
 ৪০
 ৪১
 ৪২
 ৪৩
 ৪৪
 ৪৫
 ৪৬
 ৪৭
 ৪৮
 ৪৯
 ৫০
 ৫১
 ৫২
 ৫৩
 ৫৪
 ৫৫
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৯
 ৬০
 ৬১
 ৬২
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৬
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৭০
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৮
 ৭৯
 ৮০
 ৮১
 ৮২
 ৮৩
 ৮৪
 ৮৫
 ৮৬
 ৮৭
 ৮৮
 ৮৯
 ৯০
 ৯১
 ৯২
 ৯৩
 ৯৪
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ৯৮
 ৯৯
 ১০০

গ্রীষ্ম ঋতুতে চন্দনসার দ্বারা ধূপপ্রদান